▼ সত্যজিৎ রায় (ছবি ঃ নিমাই ঘোষ)

সত্যজিৎ : জীবন আর শিল্প

সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত

প্রতিভাস ◻ কলকাতা - ২

▲ পথের পাঁচালী (১৯৫৫) (টেক্‌নিকা)

▼ অপরাজিত (১৯৫৬) (টেক্‌নিকা)

SATYAJIT : JIBAN AR SHILPA
A collection of essays
edited by SUBRATA RUDRA

প্রথম প্রকাশ ❑ বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৯৬

প্রকাশক ❑ বীজেশ সাহা
প্রতিভাস
১৮/এ গোবিন্দ মন্ডল রোড
কলকাতা - ৭০০০০২

অক্ষরবিন্যাস ❑ শঙ্খ দে
ইনফরমেশন টেকনোলজি সার্ভিসেস
৪ তেলিপাড়া লেন
কলকাতা ৭০০০০৪

মুদ্রক ❑ চন্দন মজুমদার
এস. সি. মজুমদার এন্ড কোং
৫২ শ্রীঅরবিন্দ সরণী
কলকাতা ৭০০০০৫

প্রচ্ছদ ও আর্ট প্লেট মুদ্রণ ❑ লাইট অফসেট
১৫ সুইনহো লেন
কলকাতা-৭০০০২৯

প্রচ্ছদ ❑ সুব্রত চৌধুরী

চতুর্থ প্রচ্ছদের ছবি ❑ নিমাই ঘোষ

▲ পরশপাথর (১৯৫৮) (টেক্‌নিকা)

▼ জলসাঘর (১৯৫৮) (টেক্‌নিকা)
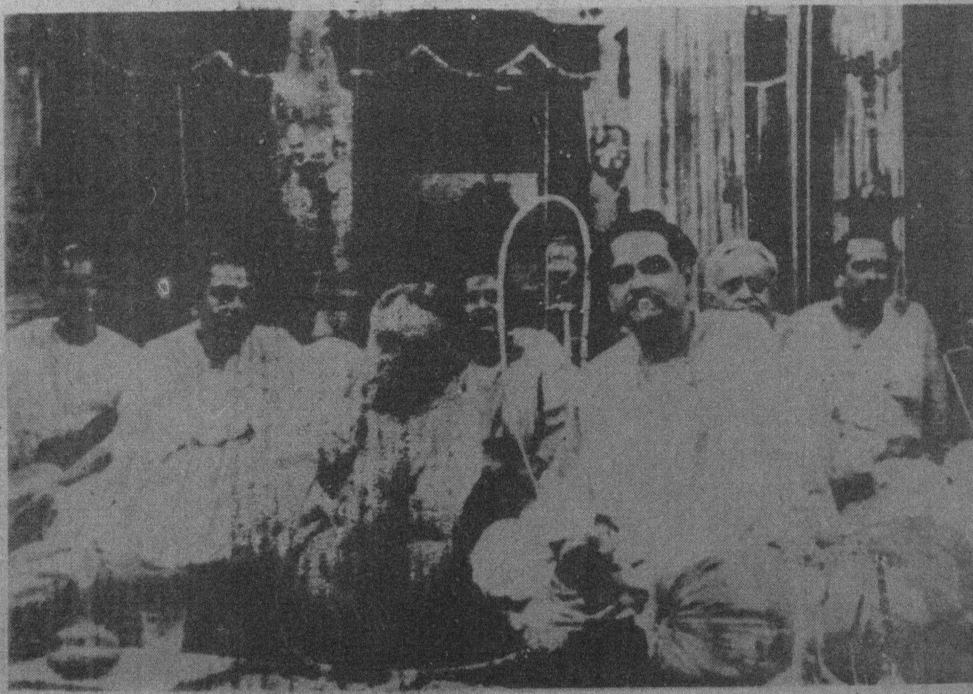
সূচনা

পথের পাঁচালী দেখে কেঁদে ছিলুম। ছবির খুঁটিনাটি বোঝার মন নয় তখন, কিছু একটা হয়ে গেল, সবাই একসঙ্গে বসে দেখলুম অন্ধকারে—দিদি, সাধনাদি, খুড়তুতো ভাইবোনরা। কয়েক ঘণ্টায় ঘটে গেল। কেমন এক ভার, সইতে না-পারা।

এ পথের পাঁচালীতে কিছু আছে। কী আছে বুঝতে পারলুম না।

সেই অল্পবয়সে দেখা ছবিতে অপু দুর্গা ঝলমল, দুর্গার মরে যাওয়া, ইন্দির ঠাকরুণের মরে যাওয়া, বৃষ্টি, পুঁতির মালা, কাশবন, রেলগাড়ি দেখতে যাওয়া।

দৃশ্যবস্তুর পথের পাঁচালী, নিস্তব্ধ, এক অনুভূতির দেশে নিয়ে যায় আমাকে।

১৯৫৫ থেকে ১৯৯১ ছত্রিশ বছরে অনেকগুলি ছবি তৈরি করেছেন সত্যজিৎ। অনেক ভাবনা চিন্তা তাঁর। সেসব ছবির বিশেষ দিক বিচার করার আছে এখনো। এক ছবি থেকে অন্য ছবি তৈরিতে, ভিন্নতর স্পন্দন, বৈচিত্র্য।

তাঁর ছবি নিয়ে আলোচনা, তর্ক, কত উত্তেজনার হল্কা উঠেছে। তার খুব সামান্য আঁচ পাওয়া যাবে এখানে, এ-বইতে। পান্ডুলিপি বেশ বড়ো হচ্ছিল ক্রমশ, থেমে গেলুম আমি। কাতরমনে বাদ দিলুম, অথচ এসে পড়েছিলো চলচ্চিত্র-নিবন্ধগুলি পান্ডুলিপিতে। দাও, বাদ দাও, কাগজের বহু দাম, ছাপার খরচ। বাদ প্রায় হাজার পৃষ্ঠা।

সত্যজিৎ-এর জীবন আর শিল্প তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি পর্যায়ক্রমিক প্রবন্ধ, আলোচনাগুলিতে। এ বই যদি কোনোভাবে কারও সত্যজিৎ শিল্পভাবনা উসকে দেবার কাজে আসে, এইটুকুই।

কয়েক বছর কেটে গেছে এর-মধ্যে, বই ছেপে বেরতে। বই হ'লো, হতে পারলো।

সুব্রত রুদ্র

১৫ই জানুয়ারি ১৯৯৬
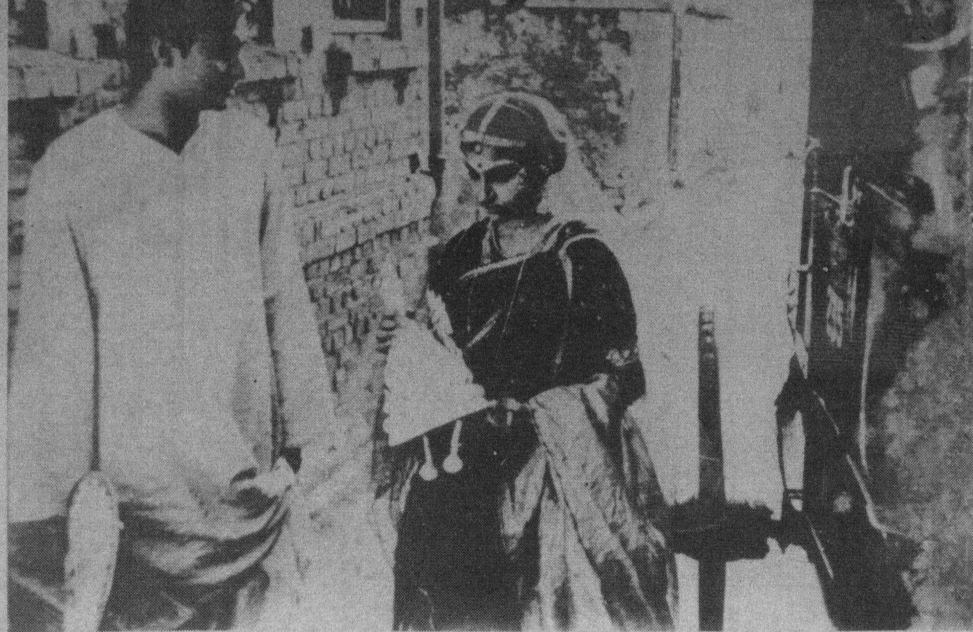
▲ অপুর সংসার (১৯৫৯) (টেক্‌নিকা)

▼ তিনকন্যা/পোস্টমাস্টার (১৯৬১) (টেক্‌নিকা)

প্রকাশকের নিবেদন

সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে একটি মহাগ্রন্থ বা আকরগ্রন্থ আমরা ছাপতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছি। এই সৌভাগ্য খুব কম প্রকাশকেরই হয় অথবা বলা যেতে পারে এই বই ছাপার যোগ্যতা অর্জনের ভাগ্য নিজেকে বার বার আয়নার সামনে দাঁড় করায়, নিজেই নিজেকে বলে—সাবাশ। শ্রী সুব্রত রুদ্র যেদিন আমাকে এই বই ছাপার প্রস্তাব দেন, সেদিন আমার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান থাকলেও একটা জেদ চেপেছিল, এই বই ছাপার একমাত্র অধিকার আমার, এই ভেবে। ভালো লেগেছিল সুব্রতদার আমার প্রতি ভালোবাসা দেখে। কারণ সেদিন অনেক বড় প্রকাশক এই বই ছাপার জন্য আগ্রহী ছিলেন। যখন এই বই-এর পরিকল্পনা হয়েছিল তখন সত্যজিৎ রায় বেঁচেছিলেন, জানতেন এরকম একটি প্রকাশের উদ্যোগ চলছে। দুঃখ এটাই তিনি দেখে যেতে পারলেন না। তাহলে এ মন ভরে যেতো খুশিতে-আনন্দে, প্রকাশনার যাবতীয় সংকট-সমস্যার যে দুঃখ বেমালুম ভুলে যেতুম। যাই হোক সমস্ত সৌভাগ্য তো-আর একজনের উপর ভর করে না। তাঁকে নিয়ে যে এই বইটা প্রকাশ করতে পারলাম, আমার সর্বশেষ ক্ষমতা দিয়ে, এটাই আনন্দের। সত্যজিৎ-প্রেমীদের হাতে এই বই তুলে দিতে পেরে গর্বিত। আয়নার সামনে দাঁড়াতে এবার সত্যিই ভয় করছে। এবার শুরু হবে সমালোচনার ঝড় নানাভাবে, নানাপ্রকারে। সেইজন্য আগাম ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া উপায় নেই। পরবর্তী সংস্করণ একদম নির্ভুল এবং আরও সুন্দর যাতে হয় তার দৃঢ় অঙ্গীকার থাকল।

এই বই ছাপতে গিয়ে যাঁরা আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, চিরঋণী হয়ে থাকতেও আপত্তি নেই। শ্রীমতি বিজয়া রায়, শ্রী সন্দীপ রায়, সত্যজিৎ রায়ের যাবতীয় শিল্পকর্ম-ছবি ব্যবহার করার যে অনুমতি দিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ। এই বই-এর সমস্ত লেখকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তাঁদের অনুমতি পেয়ে। অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব

▲ তিনকন্যা/মণিহারা (১৯৬১) (টেক্‌নিকা)

▼ তিনকন্যা/সমাপ্তি (১৯৬১) (টেক্‌নিকা)

হয়নি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়। প্রত্যেককে আমরা আলাদা ভাবে ধন্যবাদ জানাই। শ্রী নিমাই ঘোষ, যিনি এই বই-এর গুরুত্বকে আরো অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর তোলা ছবি-ছাপার অনুমতি দিয়ে, তাঁকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শ্রী সুব্রত চৌধুরীকে, এই বই-এর প্রচ্ছদ আগ্রহ-সহকারে করে দেওয়ার জন্য। আমার দুই বন্ধু শ্রী পার্থ মুখোপাধ্যায়, শ্রী অমিতাভ কাঞ্জিলাল, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ বইয়ের যাবতীয় ভুল সংশোধনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। শেষের দিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন আরেক বন্ধু শ্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য। এঁদের ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই এঁরা আমার বন্ধু, আমার শুভানুধ্যায়ী। আর এক শুভানুধ্যায়ী যাঁর কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়ে থাকি প্রকাশনার কাজে এবং এই বই-এর জন্য তো বটেই, তিনি আমার পিতৃতুল্য অভিভাবক শ্রী বিষ্ণু বসু, তাঁকেও ধন্যবাদ জানানোব কিছু নেই। এই বই শেষাবধি যাঁরা দায়িত্ব নিয়ে, ভালোবেসে, নিজেদের ভেবে কাজ করেছেন, তা না করলে প্রকাশ কোনমতেই সম্ভব ছিল না তাঁরা ইনফরমেশন্ টেক্নোলজি সার্ভিসেসের বন্ধুরা। বিশেষভাবে বলতে হয় শঙ্খ দে, সুদীপ বেদজ্ঞ ও জগন্নাথ মণ্ডল-এর কথা, দিবা-রাত্র কাজ করেছে শুধুমাত্র ভালোবেসে, বইটিকে ভালো করার জন্য যাতে সুন্দর ও নির্ভুল হয়। এরা আমার অনেক ছোট কিন্তু সত্যিকারের বন্ধু। এদের কাছে চিরঋণী থাকতেও ভালো লাগে। সবশেষে যাঁর কথা বলা প্রয়োজন, যাঁর কৃতজ্ঞতার বন্ধনে সারা জীবন থাকলে উপকার ছাড়া অপকার সম্ভব নয়, তিনি আমার দাদা-অভিভাবক শ্রী সুব্রত রুদ্র। তাঁকে ধন্যবাদ জানানো বাতুলতা মাত্র। আরো অনেকে থেকে গেলেন, অনেকের সাহায্য পেয়েছি যার সাক্ষ্য বই-এর প্রতিটি পাতায় পাতায় থেকে গেল, তাঁদের সবাইকে আমার নমস্কার।

৩১শে জানুয়ারি ১৯৯৬ বীজেশ সাহা

▲ রবীন্দ্রনাথ (১৯৬১) (টেক্‌নিকা)

▼ কাঞ্চনজঙ্ঘা (১৯৬২) (টেক্‌নিকা)

সূচিপত্র

১

▲ অভিযান (১৯৬২) (টেক্‌নিকা)

▼ মহানগর (১৯৬৩) (টেক্‌নিকা)

২

▲ চারুলতা (১৯৬৪) (টেক্‌নিকা)

▼ টু (১৯৬৪) (টেক্‌নিকা)

▲ কাপুরুষ (১৯৬৫) (টেক্‌নিকা)

▼ মহাপুরুষ (১৯৬৫) (টেক্‌নিকা)

▲ নায়ক (১৯৬৬) (টেক্‌নিকা)

▼ চিড়িয়াখানা (১৯৬৭) (টেক্‌নিকা)

৩

▲ গুপী গাইন বাঘা বাইন (১৯৬৮) (নিমাই ঘোষ)

▼ অরণ্যের দিনরাত্রি (১৯৬৯) (নিমাই ঘোষ)

▲ প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৭০) (নিমাই ঘোষ)

▼ সীমাবদ্ধ (১৯৭১) (নিমাই ঘোষ)

সত্যজিৎ রায় □ তথ্যপঞ্জি

▲ সিকিম (১৯৭১) (নিমাই ঘোষ)

▼ দি ইনার আই (১৯৭২) (নিমাই ঘোষ)

১

সত্যজিৎ-পরিবার ঃ মা সুপ্রভা রায়, পুত্র সন্দীপ, সত্যজিৎ ও স্ত্রী বিজয়া।

▲ অশনি সংকেত (১৯৭৩) (নিমাই ঘোষ)

▼ সোনার কেল্লা (১৯৭৪) (নিমাই ঘোষ)

▲ জন-অরণ্য (১৯৭৫) (নিমাই ঘোষ)

▼ বালা (১৯৭৬) (নিমাই ঘোষ)

গড়পার থেকে শান্তিনিকেতন

পার্থ বসু

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ময়মনসিংহ থেকে পড়তে এসেছিলেন কলকাতায়। ময়মনসিংহেরই আরেক ছাত্র, বন্ধু গগনচন্দ্র হোমের উৎসাহে উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন। পরিবার ও সমাজচ্যুত উপেন্দ্রকিশোর এককভাবে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত আর সমাজসংস্কারের চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, জগদীশচন্দ্র বসু এঁদের উদ্যোগে শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'মুকুল' প্রকাশিত হত ; সেখানে উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন নিয়মিত লেখক। তাঁর ছেলে সুকুমারেরও বালকবয়সের প্রথম রচনা 'মুকুল' পত্রে মুদ্রিত হয়। উপেন্দ্রকিশোর নিজে তারপর প্রকাশ করেন 'সন্দেশ' পত্রিকা ;রঙিন প্রচ্ছদচিত্র এবং সুছাঁদ— মুদ্রণবিন্যাসে, 'সন্দেশ' সেকালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'সন্দেশ' পত্রের প্রেসও ছিল উপেন্দ্রকিশোরের স্বগৃহে, সুকিয়া স্ট্রিটে।

'সন্দেশ' পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারও এদিকে বড় হয়ে উঠল। গড়পার রোডে বাড়ি করে উপেন্দ্রকিশোর সেখানে সপরিবারে উঠে গেলেন। সেটি সম্ভবত ১৯১৫ সাল। সে বাড়ির সামনের দিকে 'প্রেস'। পিছনে বসতবাড়ি তিনতলা এই বাড়িতেই সত্যজিৎ রায়ের জন্ম। ২ মে ১৯২১। বাবা সুকুমার রায়, মা সুপ্রভা রায়। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত এই বাড়িতেই সত্যজিতের ছোটবেলা কেটেছে। তিনতলার ছাদে খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো। ঠাকুরদাদা উপেন্দ্রকিশোর তখন প্রয়াত;তিনতলায় তাঁর ঘরে গিয়ে পেয়েছেন একটা রঙের বাক্স— তাতে ছিল তুলি আর লিনসিড অয়েলের শিশি। পিতামহের এই সম্পদ শিশুটির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তি, মনে হয়, প্রচ্ছন্নভাবে তাঁকে গড়ে তুলেছিল। আড়াই বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হল। বাবার সম্বন্ধে সত্যজিতের স্মৃতি অবশ্যই অস্পষ্ট কিন্তু যৌথ পরিবারে মানুষ হয়েছেন বলেই সেই বালকের কোনও অভাববোধ দেখা দেয়নি। গড়পারের বাড়িতে তখন থাকতেন মেজোকাকা সুবিনয় রায় তাঁর স্ত্রী শান্তিলতা এবং তাঁদের ছেলে, সত্যজিতের একমাত্র দাদা সরল কুমার. ছোটকাকা সুবিমল রায়। তিনি সিটি স্কুলের শিক্ষক। অবিবাহিত। এবং ছিলেন ঠাকুমা বিধুমুখী দেবী, উপেন্দ্রকিশোরের স্ত্রী। ছিলেন আর এক দাদু, কুলদারঞ্জন রায় ;তাঁর ঘরে দেখা যেত ছবি এনলার্জ করার অপূর্ব পদ্ধতি, সেখানে পিতৃহীন বালক শুনত পুরাণের গল্প। ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে সেই 'ধনদাদু'র মৃতজনের লুপ্তপ্রায় পোর্ট্রেট থেকে আশ্চর্যভাবে মুখাবয়ব উদ্ধার করে তাকে জীবন্ত করে তোলার কাজটি ছোট বালকটিকে বড় মুগ্ধ করত।

প্রেসে তারপিন তেলের গন্ধে ভরে থাকত বাড়ির আবহ আর ছোট ছেলেটি সারাদিন ঘুরে দেখত ব্লক মেকিং ডিপার্টমেন্ট, প্রোসেস ক্যামেরা, সারবাঁধা কম্পোজিটরের সামনে টেবিলে হরফের চৌকো বাক্স। কুলদারঞ্জন রায়ের বড় মেয়ে বুলুপিসি বা মাধুরী দেবীর কাছে সত্যজিৎ প্রথম পড়া শুরু করেন ; ইংরেজি বইটার নাম মনে ছিল তাঁর, 'স্টেপ বাই স্টেপ'।

▲ সতরঞ্জ কি খিলাড়ি (১৯৭৭) (নিমাই ঘোষ)

▼ জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৮) (নিমাই ঘোষ)

মাধুরী রায়ের বিবাহ হল বুলা মহলানবীশের সঙ্গে। বুলা বা প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ ছিলেন পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনিই বালক সত্যজিৎকে প্রথম গ্রামোফোন দিয়েছিলেন বাবা মারা যাওয়ার পর। 'সেই থেকে আমার গ্রামোফোন আর রেকর্ডের শখ।' আবার 'কলকাতার রেডিও স্টেশন চালু হবার কিছুদিনের মধ্যে বুলাকাকাই আমাকে জন্মদিনে একটা রেডিও উপহার দিয়েছিলেন। ...তাকে বলত ক্রিস্টাল সেট। কানে হেড ফোন লাগিয়ে শুনতে হত।' ছোটবেলায় এই গড়পারের বাড়িতেই একটা বিশ দশকের রেকর্ড ছিল। আশৈশব সেই রেকর্ড তাঁর সঙ্গী ছিল। বারবার শুনতে শুনতে সেই রেকর্ডটি সম্পূর্ণ স্মৃতিতে ধরা ছিল। প্রৌঢ় বয়সেও সেই সুরটি বাজাতেন বা আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। বেঠোফেনের ভায়োলিন কনচার্টোর একটা মুভমেন্ট। তাছাড়া মা দিয়েছিলেন চার খণ্ডে 'রোমান্স অব ফেমাস লাইভস' আর বাড়িতে ছিল দশ খণ্ডে 'বুক অব নলেজ'। এইসব বই থেকে ছোট ছেলেটি খুঁটিয়ে পড়ত বিদেশী সুরস্রষ্টাদের জীবনকাহিনী, তাঁদের কীর্তিকলাপ। বিদেশী সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ এবং উৎসাহ সত্যজিতের ছোট বয়সেই জন্ম নেয়। বিদেশী কমপোজিশনের মিনিয়েচার স্কোর পাওয়া যেত সেকালে, সেটা নিয়ে শুতে যেতেন। সেটাই ছিল 'বেডসাইড রিডিং।' একথাটি বিশদ বলার কারণ আছে। বাড়িতে গানের চর্চা ছিল বিপুলভাবে। উপেন্দ্রকিশোর স্বয়ং বেহালা বাজাতেন, গান রচনা করেছেন। সুকুমার রায়ও গান রচনা করেছেন। এবং সত্যজিৎ রায়ের মাতৃকুলে যেভাবে গীতিকারদের এবং সঙ্গীত শিল্পীদের সংখ্যাধিক্য ছিল, বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারেও এমন অধিকসংখ্যায় সাঙ্গীতিক শিল্পীর দেখা পাওয়া যায়নি। কালীনারায়ণ গুপ্ত বা ভক্ত কালীনারায়ণের সঙ্গীতচর্চা বংশানুক্রমে তাঁর উত্তরপুরুষের মধ্যে প্রবলভাবে বহমান হয়েছিল। সত্যজিতের মা সুপ্রভা রায়ের গানের গলা ছিল বিস্ময়কর এবং যত্রতত্র তিনি অনায়াসে, নিঃসংকোচে গান গাইতেন। মাসি ছিলেন সুখ্যাত কনক দাশ ; তাছাড়া এই পরিবারে জন্ম নিয়েছেন অতুলপ্রসাদ সেন, সাহানা দেবী, মঞ্জু গুপ্ত প্রমুখ। বাড়িতে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা হত। ব্রহ্মসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের গানেই মুখর ছিল সত্যজিতের বাল্যজীবন। তবু ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি কোনও কৌতূহল বা উৎসাহ বহুকাল সত্যজিতের মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন বিদেশী, ধ্রুপদী সঙ্গীতের অনুরাগী। আবাল্য তারই চর্চা করেছিলেন।

পাঁচ বছর বয়সে গড়পারের বাড়ি থেকে চলে আসেন ভবানীপুরের বকুলবাগানে, 'সোনামামা' প্রশান্তকুমার দাসের বাড়ি। কারণ, সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে বাজেয়াপ্ত হল, উপেন্দ্রকিশোরের তৈরি বাড়ি সহ। 'কেন গেল সেটা আমাকে বলা হয়নি। অনেক পরে আমি এসব জেনেছি। পারিবারিক দুরবস্থার কথা আমাকে কিছু বলা হয়নি, এবং অ্যাকচুয়ালি মা-র তখন নিশ্চয়ই ভয়ানক অসুবিধে হয়েছিল। আমার ছোটমামার ওখানে আমরা চলে আসি।' তখন একা সেই বালক সারা দুপুর ওই 'বুক অব নলেজ' পড়ে আর স্টিরিওস্কোপে ছবি দেখে সময় কাটাত। সারাদিন ধরে শুনত ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র ডাক। গরমের দুপুরে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো আসত আর বালক সবিস্ময়ে দেখত সেই ফাঁকেই রাস্তার ছবি উল্টো হয়ে পড়ছে অন্যদিকের দেওয়ালে। বন্ধ ঘরে ম্যাজিকের মত রাস্তার লোক চলাচল দেখা যেত। 'কতদিন যে দুপুরে শুয়ে শুয়ে এই বিনা পয়সার বায়স্কোপ দেখেছি তার ঠিক নেই।' কখনও বা বন্ধ দরজার ফুটোর উপর ঘষা কাচ ধরে আরেক চলচ্ছবি দেখা হত; স্পষ্ট দেখা যেত উল্টো করে পড়েছে ছোট্ট আকার ধরে বাইরের চলন্ত জগতটি। আরেক সঙ্গী ছিল

▲ হীরক রাজার দেশে (১৯৮০) (নিমাই ঘোষ)

▼ পিকু (১৯৮০) (নিমাই ঘোষ)

ম্যাজিক ল্যানটার্ন; তারই সাহায্যে ঘুরন্ত ফিল্মের ছবি পড়ে দেওয়ালের উপর। 'কে জানে, আমার ফিল্মের নেশা হয়ত এই ম্যাজিক ল্যানটার্নেই শুরু।' ভবানীপুরের বাড়িতে এসে ছোট ছেলেটিকে অবাক করেছিল চিনে মাটির টুকরো বসানো নকশা-করা মেঝে। এইসব দৃশ্য আর শব্দকে ঘিরেই তো তৈরি হয় এমন এক শিল্পীর প্রথম পৃথিবী।

এই সময়ে সত্যজিৎ দেখেছেন কয়েকটি নির্বাক ছবি — ম্যাডোনা বা এলিটে, কখনও গ্লোবে ঃ বেনহুর, কাউন্ট অব মন্টি ক্রিস্টো, আঙ্কল টমস কেবিন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম সবাক ছবি সত্যজিৎ দেখেন, 'টার্জন দি এপ ম্যান'। গ্লোবে প্রথমদিন গিয়ে সেই ছবির টিকিট পাওয়া গেল না। অতএব, সঙ্গী মামা ছোট ছেলের হতাশা কাটাবার জন্যই নিয়ে গেলেন কাছেই অ্যালবিয়ন থিয়েটারে, এখনকার রিগ্যাল-এ। সেখানে চলছিল বাংলা নির্বাক চলচ্চিত্র, নাম 'কাল পরিণয়'। সেটি অবশ্যই বড়দের উপযোগী। মামা অস্বস্তির ভাব কাটাবার জন্য ভাগ্নেকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলেন। ভাগ্নে রাজি নয়। তার ফল হল এই যে, সত্যজিতের মনে সেই তখন থেকে বাংলা ছবি সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞার ভাব জন্ম নিয়েছিল যার জের চলেছিল আযৌবন।

বলা দরকার, প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি পরিচালিত এই নির্বাক্ 'কাল পরিণয়' চিত্রে অভিনয় করেছিলেন নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, পেসেন্স কুপার, শান্তি প্রকাশমণি প্রমুখ। ছোটবেলায় লখনৌতে গিয়েছেন কয়েকবার ;সেখানে থাকতেন মেজোমামা আর আরেক মামা অতুলপ্রসাদ সেন, মায়ের মাসতুতো ভাই। সেই স্মৃতি তাঁর প্রথম উপন্যাস আর চলচ্চিত্রে ছায়া ফেলেছে। তাছাড়া গিয়েছেন পিসীমা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর স্বামী অরুণনাথ চক্রবর্তীর কাজের জায়গায় — অনেকবার হাজারিবাগ, দ্বারভাঙ্গা, আরায়। দার্জিলিঙে মেসোমশাই দু'জন থাকতেন ;তাঁদের বাড়িতেও পালা করে থেকেছেন মায়ের সঙ্গে। বছর সাতেক বয়স তখন। সেই সময় দার্জিলিঙের মহারানী গার্লস স্কুলে সুপ্রভা রায় কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা সরকার। সত্যজিতের অল্পদিনের বৈদ্যালয়িক শিক্ষার সূচনা এইখানেই। বকুলবাগানে থাকতেই সাঁতার শেখেন ভবানীপুর সুইমিং ক্লাবে। পদ্মপুকুর স্কোয়ার সেই বয়সেই সত্যজিৎ পারাপার করতে পারতেন। ছোটদাদু প্রমদারঞ্জন রায়ের ছেলেদের দেখে ব্যায়ামচর্চা করেছেন নিয়মিত। আর ছোটকাকার সঙ্গে গিয়ে জাপানি শিক্ষকের কাছে শিখেছেন যুযুৎসু। মায়ের কাছে শুনতেন ইংরেজ ক্লাসিকস, বাংলায় বলতেন। দাদু কুলদারঞ্জন রায়ের কাছে শুনেছিলেন সম্পূর্ণ মহাভারতের গল্প। ছোটকাকার কাছে শুনতেন ভূতের গল্প। খুব অল্পবয়সে বাবার মৃত্যুর কিছুকাল পরে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যে সেবার মা আর ছোট মাসি কনক দাসের সঙ্গে শিশু সত্যজিৎও ছিলেন সেখানে মাস তিনেক। খোয়াইতে দিগন্তবিস্তারী পূর্ণিমার কথা আর সেখানে মায়ের খোলা গলার গান তাঁর বরাবর মনে ছিল। আট বছর বয়সে আবার গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। সেসময়ে দেখা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি স্পষ্ট মনে পড়ত। সত্যজিতের অটোগ্রাফ খাতায় সেবারই রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন যেটি বহু ব্যবহারে বিখ্যাত হয়েছে পরে — 'বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে ...'। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বড় হয়ে এর মানে বুঝবে। কবির টেবিলে বিদেশের স্ট্যাম্প দেখে ভীষণ লোভ হত। প্রায়ই যেতেন কলাভবনে নন্দলাল বসুর কাছে ; নন্দলাল চারদিনে চারটি ছবি এঁকে দিয়েছিলেন ছোট ছেলেটিকে। কবিতা এবং ছবিগুলি সত্যজিৎ সর্বদা পরম সম্পদের মত সগর্বে রক্ষা করে এসেছেন।

▼ সত্যজিৎ রায় (ছবি ঃ নিমাই ঘোষ)

ন-বছর বয়সে ভর্তি হলেন বালিগঞ্জ সরকারি বিদ্যালয়ে। মা তখন বিধবাদের স্কুল বিদ্যাসাগর বাণীভবনে গান আর সূচিকর্মে শিক্ষকতা করতেন। এই স্কুলের স্মৃতি সত্যজিতের 'যখন ছোট ছিলাম' গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বলা আছে। শেষদিকে বেলতলা রোডে এলেন। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে ১৯৩৬-এ সত্যজিৎ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন; তখন তাঁর বয়স চোদ্দ বছর দশ মাস।

স্কুল থেকে বেরিয়ে সত্যজিতের ইচ্ছে ছিল সাহিত্য নিয়ে পড়া বা শিল্পচর্চার। বিধবা মা স্কুলে কাজ করে একটিমাত্র ছেলেকে পড়িয়ে চলেছেন। সেইকালে দেখা হল পাইকপাড়ায় সিংহদের বাড়ির এক সভায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তিনিই প্রস্তাব করেছিলেন, 'আমার আশ্রমে চলে এস।' সত্যজিতের ইচ্ছে ছিল না। তাছাড়া সুকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ অন্যরকম পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, সত্যজিৎ যদি অর্থনীতি নিয়ে পড়ে তাহলে 'সংখ্যা' পত্রিকায় আড়াইশো টাকা মাইনের একটা চাকরি দেওয়া যাবে। অর্থনীতিতে সত্যজিতের আকর্ষণ ছিল না, বাধ্য হয়েই ইকনমিক্সে অনার্স নিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন। কলেজ-জীবন যে তাঁকে কিছুই দেয়নি, এমন মন্তব্য একাধিকবার করেছেন।

এইসময়েই সত্যজিতের ফটোগ্রাফিতে আকর্ষণ বেড়ে উঠল। ভয়েটল্যান্ডার ব্রিলিয়ান্ট ক্যামেরায় কিছুদিন ছবি তুললেন। তখন বিলেত থেকে একটি পত্রিকা আসত, নাম 'বয়েজ ওন পেপার'। সেখানে একবার প্রতিযোগিতায় ফটো পাঠিয়ে পুরস্কাব পেয়েছিলেন এক পাউন্ড। কলেজে পড়ার সময় বাংলা ছবিতে, ভারতীয় সঙ্গীতে কিংবা ভারতীয় চিত্রে কখনই ঔৎসুক্য বোধ করেননি। নিকটাত্মীয় নীতিন বোসের ছবি কিছু দেখে ভাল লেগেছিল। একদম পছন্দ ছিল না প্রমথেশ বড়ুয়াকে। এই কলেজ জীবনেই পূর্ণরূপে সত্যজিৎ তাঁরই কথায়, 'তখন একেবারে ফিল্ম-ফ্যান' কিন্তু দেখতেন মার্কিনি ছবি। ডায়েরিতে ছবি দেখে তার পাশে তারকা-চিহ্ন দিয়ে রাখতেন। ১৯৪০-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হবার পর মায়ের ইচ্ছেটা ফলপ্রসূ হল। শহর ছেড়ে, তাছাড়া শান্তিনিকেতনের কিছুজনের কথাবার্তাব ধরন শুনে সত্যজিৎ কখনই চাননি সেখানে কিছু শিখতে যাবেন। বিশেষত ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে কোনও উৎসাহ যখন বোধ করতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ;এবং সুপ্রভা রায়েবও তাই বাসনা ছিল। এর পিছনে ছোট্ট এক ইতিকথা আছে।

১৯২৯ সালে শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অবসরসময়ে প্ল্যানচেট নামাতেন। সেই কৌতূহলকর এক নতুন খেলা কবিকে বেশ কিছুকাল নেশাগ্রস্ত করে রেখে ছিল। অনেকের মাঝে একদা এলেন প্রয়াত সুকুমার রায় ;কবির বন্ধুপুত্র এবং ভক্ত। প্রয়াত আত্মার সঙ্গে সেই দীর্ঘ সাক্ষাৎকাবের সংলাপ ধরা রয়েছে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে এক খাতায়। সেখানে আছে সুকুমার রায় জিগ্যেস করছেন — 'আচ্ছা, আমার ছেলেকে আপনার আশ্রমে নিতে পারেন ?' রবীন্দ্রনাথের উত্তর ছিল, 'তোমার স্ত্রী যদি সম্মত হন।' সুকুমারের কথা, 'তাঁকেও বলুন না।' রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তাঁকে পেলে আমিও খুশি হব।...আমি তাঁকে বলব তোমার কথা।'

ব্যক্তিত্বময়ী বিধবা মাতার একতম সন্তান সসম্মানে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও এই কারণেই শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হলেন। অনেককাল পরে এক 'অমল ভট্টাচার্য স্মারক' ভাষণে সত্যজিৎ রায় বলছেন, 'শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমার চোখ আর কান খুলে গেল।'

▼ সত্যজিৎ রায় (ছবি ঃ নিমাই ঘোষ)
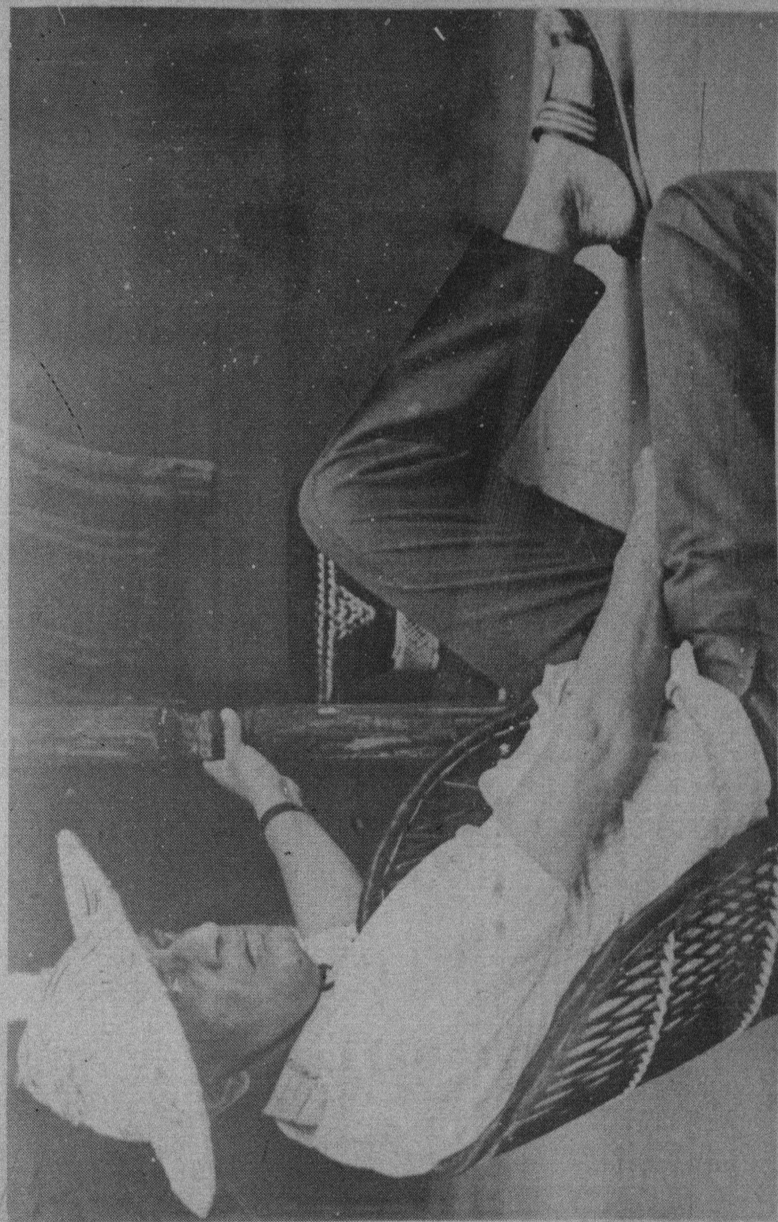
মানিকের ছেলেবেলা

মাধুরী মহলানবীশ

দাদার বিয়ের অনেক বছর পরে মানিকের জন্ম হল গড়পারের বাড়িতে। ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, তিনি আমাদের সম্পর্কে দিদিমা হতেন, তাঁর হাতেই ওর জন্ম হল। সকালবেলায় ওর লম্বা মাথাটা দেখে আমরা খুব হাসাহাসি করছিলাম। তখন দিদিমা-র ভাই দ্বিজেন বসু, তিনি তখনকার 'সন্দেশ' পত্রিকায় লিখতেন —বইটইও ছিল, তিনি বললেন, এ-ছেলে 'প্রডিজি' হবে। মানিকের জন্মের কিছু পরে আমাদের দাদা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সারাক্ষণ শুয়ে থাকতেন, বা পিঠের দিকে বালিশ উঁচু করে বসে থাকতেন। তখন দাদা 'আবোল-তাবোল' এর কবিতাগুলো লিখছেন। সেগুলি আবার বৌদিকে পড়ে শোনাতেন। মানিক তখন খুব ছোট্ট। একটা কবিতা একদিন শোনাচ্ছেন দাদা, 'কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসি?' মানিক সেখানে উপস্থিত ছিল। এই শুনেই সে তো হা-হা করে হাসতে লাগল। আমরা সবাই তাকে জিগ্যেস করলাম, কি বুঝেছ বলো তো? তুমি বুঝতে পেরেছ এর মানে? সে কিছু না বলে শুধু হেসে গড়িয়ে যেতে লাগল।

এই মানিক যখন হল, দাদার খুব আনন্দ হয়েছিল, 'এই তো আমার মানিক। যাও, তোমাদের গিনি-সোনা নিয়ে তোমরা যাও। আমার মানিক আছে।'

মানিকের প্রথম যখন কথা ফুটল, একটাই কথা বলতে পারত —'বাবা।' এই বাবার ঘরে যখন-তখন চলে যেত। দাদা তো অসুস্থ, শুয়ে আছেন। মানিক তাঁর পেটের ওপর বসবেই , জোর করে। দাদা খানিক আদর করে, সুর করে বলতেন, 'মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে দুষ্টু ছেলে।' মানিক হেসে কুটিপাটি হত। মানিক বাবাকে ছাড়তে চাইত না। দাদা ছবি আঁকছেন, রঙ দিচ্ছেন। মানিকও সেই রঙ দিয়ে ছবি আঁকবেই। রঙ্-টঙ্ সব নষ্ট করত। বৌদি নিয়ে যেত মানিককে। বৌদি দিত না কিছুতেই ওসবে হাত দিতে। আর মানিকও বাবার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকবেই। তার মানে, সব রঙ্ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে নষ্ট করবে।

দাদা মারা যাবার সময় মানিক কিছুই বুঝতে পারেনি। কিছুদিন পবে মাঝেমাঝেই বলত, 'বাবার খাটের কাছে নিয়ে চল।' তখন ঐ গড়পারের বাড়ির সামনের দিকে প্রিন্টিং প্রেস ছিল; মানিক সেখানেই একা-একা ঘুরঘুর কবত। জিগ্যেস করত, 'অখিলবাবু, ঐ অন্ধকার ঘরে কেন গেলে?' সেটা ডার্করুম ছিল। আবার প্রশ্ন, 'এটা জলে ভাসছে কেন?' 'এটা কি হচ্ছে?' কেন হচ্ছে?' এইসব। একাই কাটাত। বৌদি তো খুব ভেঙে পড়েছিলেন। ভবানীপুরে মানিকের দিদিমা থাকতেন। তাঁর একবার কঠিন অসুখ হল। বৌদি সেখানেই থেকে গেল। মানিককে সরিয়ে দেওয়া হল। মানিককে নিয়ে আমি গেলাম ছোটকাকা প্রমোকাকার বাড়িতে। আমার সঙ্গেই থাকল। সে সময়ে লেখা ওই চিঠিটা ঃ

বৌদি,

মানিক বেশ ভাল রয়েছে, কান্নাকাটি কিছু করেনি, কাল রাত্রে ঘুমোতে যাবার সময়

▼ সত্যজিৎ রায় (ছবি ঃ নিমাই ঘোষ)

আমাকে শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল 'মা না তবে আজ আসবে?' কিচ্ছু ভেব না, রোজ বেড়াতে পাঠাই ; motor করে এখানে ওখানে নিয়ে যাব, বেশ আছে, কিচ্ছু ভেব না।

বুলু

মা,

আমি রোজ বেড়াতে যাই। বুলা কাকা চকোলেট দিয়েছে। আজ cracker আনবে। চুমু নাও।

মানিক

(বৌদি সুপ্রভা রায়কে লেখা মাধুরী দেবী বা বুলুপিসির চিঠি;তার সঙ্গে মা-কে লেখা মানিকের চিঠি)

সেখানেই মানিকের লেখাপড়া শুরু হল। ছবি এঁকে এঁকে অক্ষর শেখাতাম। আর ইংরেজি বইটা ছিল, 'স্টেপ বাই স্টেপ'। বাংলা শেখাতাম কথামালার গল্প পড়ে-পড়ে। ঐ যে 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' —এই গল্পেরও ছবি আঁকতে হয়েছিল। আমার সেই ছবি আঁকা দেখে মানিকের কী হাসি! ছবিটা ঠিক আঁকতে পারিনি, তাতেই তার মজা। তবে টকটক করে পড়া শিখে নিতে পারত।

মানিকের খাওয়াদাওয়ার কোনও বায়নাক্কা ছিল না। কোনও আবদার ছিল না। দুধ খেত যখন, মেঝের উপর তার আগে ছবি আঁকত —একটা কাপ, তার পাশে লিখত দুধ। পোশাকেরও কোনও শখসাবুদ ছিল না। এসব ব্যাপারে ছোট থেকেই উদাসীন। তার ভাল লাগত চুপ করে চেয়ে দেখতে—আকাশ, গাছপালা নড়ছে, চড়ুই পাখিগুলো কিচিরমিচির করছে। তা-ই চুপ করে দেখত, শুনত। 'কিরে মানিক, কী শুনছিস?' 'কেন! চড়ুইপাখিরা কেমন শিস্ দিচ্ছে!' 'যাঃ, ওরা তো কিচিরমিচির করে শুধু!' 'না, না, ওরা শিসও দেয়!'

মানিককে নিয়ে তার বুলাকাকা মাঝেমাঝেই গাড়ি করে বেড়াতে যেতেন। মানিকের ইচ্ছে তখন নতুন গড়ে ওঠা লেক-এর দিকে যাওয়া। সেখানে তখন কত গাছ ; অজস্র পাখি। মানিকের খুব ভাল লাগত। ঐ প্রকৃতিই ওর প্রাণ ছিল। শান্তিনিকেতনে একবার গিয়েছিলাম আমরা ; মানিক তখন বড়। বৌদি, আমি এদিক-ওদিক দেখাশোনা করে বেড়াচ্ছি। মানিক কেবল বলত, 'চলো মা, কোপাইয়ের দিকে যাই!' বৌদি বলত, 'ওর গাছপালা, নিরিবিলি ভাবটাই বেশি ভাল লাগে —দেখেছ!' মানিকের বুলাকাকা একবার দাদা মারা যাবার পর মানিককে কিডিফোন গ্রামোফোন কিনে দিলেন। মানিক সারাক্ষণ তাতে গান শুনতে চাইত। ছোট্ট ছোট্ট চমৎকার সব রেকর্ড, সবই ওয়েস্টার্ন মিউজিক। তার মধ্যে ব্লু দানিয়ুবের বাজনা মানিক বারবার শুনতে চাইত। ও গান খুব ভালবাসত। বলত, 'বুলুপিসি, আবার দাও, ওটা আবার দাও।' ছোটবেলা থেকেই ওয়েস্টার্ন মিউজিকে মানিক খুব ইন্‌স্‌পায়ার্ হত। গান শুনিয়ে, ছবি দেখিয়ে, গল্প বলে ওকে ভুলিয়ে রাখতাম। ওর মনটা যাতে ভরে থাকে। পিয়ানো বাজাতাম। মানিক এসে বলত, 'বুলুপিসি, ওই হ্যাদে গো নন্দরানী গানটা বাজাও। আমি নাচব, আমি গাইব।' পিয়ানোতে বসলেই মানিক ওই গানটাই শুনতে চাইত, 'হ্যাদে গো নন্দরানী, আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।' আর সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে নাচতও।

এই গানের ব্যাপারে আরও কিছু স্মৃতি রয়েছে। বৌদি একবার মানিককে কোলে

▼ সত্যজিৎ রায় (ছবি ঃ নিমাই ঘোষ)

বসিয়ে গান করছেন, 'হা রে রে রে, আমায় ছেড়ে দেরে, দেরে!' মানিক কী খুশি গানটা শুনে 'মা, পাখিকে ছেড়ে দিতে বলছে? কী ভাল গানটা!' আরেকবার। মানিক তখন আর একটু বড় হয়েছে। অনেক রাত তখন, প্রায় দুটো বাজে। আমি আর বৌদি একটা ঘরে, মানিক পাশের ঘরে। আমাদের ঘরে দাদার একটা মস্ত ছবি ছিল। বৌদি খাটের ওপর বসে সেইদিকে তাকিয়ে একটা গান করছেন, 'আজ নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।' মানিক পাশের ঘর থেকে সোজা চলে এল। বৌদির কোল ঘেঁষে বসে সেই গানটা শুনতে লাগল।

পিয়ানোতেও হাত লাগাত। টুং টুং করে বাজিয়ে যেত। কোনও সুর নয়, এমনিই। কিন্তু ঠাকুরদাদার বেহালাটা কোনও দিন বাজাতে চেষ্টাও করেনি। একটু বড় হতেই বুলাকাকা বড়-বড় রেকর্ড এনে দিতেন—বেঠোফেন, মোৎসার্ট। সেসব নিয়েই থাকত। গান আর ছবি —এ দুটোই ছিল মানিকের সবচেয়ে প্রিয়। ঘরের মেঝে ছবি এঁকে ভরিয়ে ফেলত। জাহাজ, জল, কুঁড়েঘর, মেঘ, বৃষ্টি পড়ছে — এই সব ছবিই আঁকত। ছবি এঁকেই তো অক্ষর পরিচয় হল মানিকের। পরে খাতায় ছবি আঁকা শুরু হল। যা-কিছু গল্প শুনত বা পড়ত বা নাটক দেখত, তার ছবি আঁকত। কোনও কিছু দেখে এলেই তার ছবি আঁকা শুরু হয়ে যেত।

একবার ওর বুলাকাকা 'ডাকঘর' দেখাতে নিয়ে গেলেন। বোধহয় রবীন্দ্রনাথের দল এসে কোনও হলে করেছিলেন। বুলাকাকা মানিককে নিয়ে গেলেন। ফিরে এসে সেই খাতায় মানিক কত কী লিখল। আর ছবি আঁকল। মনে পড়ে, ও এঁকেছিল রাজার পোস্টাফিস, সুধা ফুল এনে দিচ্ছে — এইসব।

ছোটকাকার বাড়িতে যখন মানিক আমার কাছে থাকত, তখন ও শুধু ছবি এঁকে গান শুনে কাটাত। কড়া নিয়মের মধ্যে মানিক থাকতে চাইত না। খুব আদর দিতাম। অন্য কোনও আবদার তো ছিল না। তাই দেখে একদিন ছোটকাকা বললেন, 'তুমি মানিকের মাথাটা নিয়া মুড়িঘন্ট করে খাবে।' এই কথা শুনে খুব রাগ করেছিলাম মনে আছে। আহা, বাবা নেই, মা-ও কাছে নেই তো তখন ওর।

আমার বাবা, মানিকের ধনদাদু যখন মারা গেলেন — মানিককে বলা হয় তাঁর শ্রাদ্ধোপাসনায় একটা কিছু লিখে পড়তে। আমার বাবা অনেককাল বেঁচেছিলেন। মানিকের ছবি-আঁকা দেখে খুব প্রশংসা করতেন, বলতেন, 'পাক্কা হইসে'! মানিক বলেছিল, আর তো কেউ আমার ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠবেন না — পাক্কা হইসে।

আমরা বকুলবাগানে মানিকের মামার বাড়ি ফিরলাম। সেখানে মানিক অনেক সঙ্গীসাথি পেল। বড় পরিবার। মানিকের একাকী ভাবটা কেটে গেল খানিক। ওই মামার বাড়িতে সারাক্ষণ রেকর্ড বাজত, গানবাজনা হত, হৈ চৈ হত। তবু মনে হয়, মার সঙ্গেই থাকতে ভালোবাসত। গান বানিয়ে মার কাছেই শোনাত, আমরা মাঠে মাঠে চরে বেড়াই ...খিদে পেয়েছে মাগো, খেতে দে-না এখন...মা তুমি যাওনা গাইতে গাইতে গান —ওই দূরে কত খেলা করে...। এইসব। তারপর বৌদির ভাই প্রশান্ত দাস রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে উঠে গেলেন। বেশ বড় বাড়ি। বৌদি মানিক আমরা একসঙ্গে সব সেই বাড়িতে থাকতে লাগলাম। মনি মঙ্কু সব সেখানে থাকত। সেখানেও গান, তারপর নানারকম খেলার মধ্যে দিয়ে অ্যাকটিঙ হত।

খুব ছোটবেলাটা তো আমাদের সঙ্গেই কেটেছে। তারপর স্কুলে ভর্তি হল। স্কুলের পড়াশুনো মানিকের ভাল লাগত না। অঙ্কটা একদমই পছন্দ করত না। আসলে মানিক

'লিজিওন অব অনার' নেওয়ার পর সত্যজিৎ রায় (নিমাই ঘোষ)
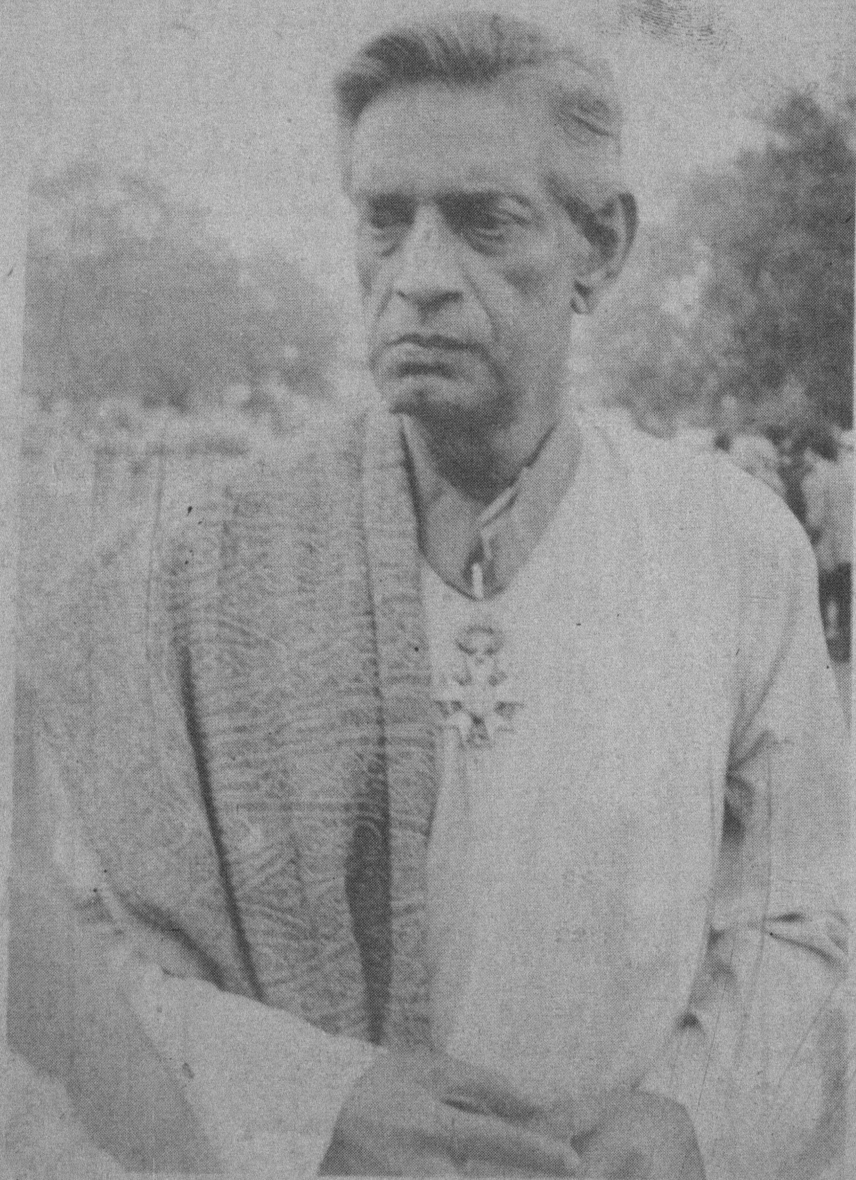
বাড়িতেই অনেক শিখেছিল, বিশেষ করে বাংলা-ইংরেজি বই পড়েছিল বেশ কিছু। ঠাকুরদাদার লেখা রামায়ণ-মহাভারত পড়েছিল। মানিকের ভাল লাগত ধ্রুবর গল্প। ধ্রুবকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, পরে ধ্রুব বড় হয়ে উঠল —এইটা মানিককে খুব নাড়া দিত।

ওর বুলাকাকা আর আমি মানিকের জন্মদিন পালন করতাম। অনেক বয়স অবধি আমি মানিকের জন্মদিনে, এই বছর পাঁচ/ছয় আগেও, ওদের বাড়িতে গিয়েছি। তার ভাল লাগত আমার হাতে 'স্মোকড় চিকেন' খেতে ; তাই নিয়ে যেতাম। খুব খুশি হত।

স্কুল কলেজের পড়াশুনোয় মানিকের আগ্রহ ছিল না। বৌদিই জোর করত, অন্য সব ছেলের মত বি-এ পাশ করতেই হবে। ঐ সব ধরনের পড়া মানিকের ভাল লাগত না। আমার মনে পড়ে, খুব ছোটবেলায় মানিক পথের পাঁচালী পড়েছিল। মানিকের মামা, প্রশান্ত মহলানবীশ মানিককে বই এনে দিতেন। বৌদিও বই কিনে দিতেন।

তবে সংগীতের প্রতি, ছবির প্রতিই তাব টান ছিল ভীষণ। ফাঁক পেলেই পিয়ানো, পরে বাড়ির অর্গানেও বসে যেত; চেষ্টা করত সুর তুলতে। কত ছেলেবেলা থেকেই যে ওই বিদেশী সংগীতের রেকর্ড শুনত, তার কারণ ভালো বাংলা গানের রেকর্ড তখন ছিল না একদম। খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে তখনও রেকর্ড শুনেই যেত।

আমাদের বিয়ের সময় মজা হল। বুলা তো মানিককে খুব ভালবাসত। নিয়ে যেত বেড়াতে, গান বা কোনও অনুষ্ঠান শোনাতে, রেকর্ড এনে দিত। তা আমাদের বিয়ের সময় বাড়িতে সানাই বাজছে, হৈ চৈ হচ্ছে, বব এসেছে। মানিককে তার চাকর নিয়ে গেল, চলো বর এসেছে — দেখবে চলো। মানিক তো অবাক, 'কই বর? বর কোথায়? ও তো বুলাকাকা!'

মানিকের মায়ের মৃত্যুশয্যায় দেখতে গিয়েছি। তখন তো মানিক বেশ নাম করেছে। চুপচাপ বসে আছে ঘরে। ভিতরে প্রবল কষ্ট হচ্ছে কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। চোখ দিয়ে জল পড়ছে না। বৌদিকে ঘিরে তখন গান হচ্ছিল। একটা গান, 'ওগো রহো রহো, মোরে ডাকি লহো, কহো আশ্বাসবাণী।' মানিক পাশের ঘর থেকে এসে বারবার অনুরোধ করতে লাগল, ওই গানটাই আবার হোক। বারবার গাওয়া হতে লাগল, 'ওগো রহো রহো, মোরে ডাকি লহো, কহো আশ্বাসবাণী।'

ছেলেবেলার মানিককে ভাবলেই শুধু মনে পড়ে, মানিক একলা, চুপচাপ, গালে হাত দিয়ে ভাবছে। কিংবা ছবি আঁকছে, গান শুনছে।

(সত্যজিৎ রায় তাঁর 'যখন ছোট ছিলাম' বইতে লিখেছেন, 'পড়াশুনো গড়পারে কী করেছি তা ঠিক মনে পড়ে না। একটা আবছা স্মৃতি আছে যে ধনদাদুর মেয়ে বুলুপিসি আমাকে ইংরিজি প্রথম ভাগ পড়াতেন। বইয়ের নাম ছিল step by step। সেটার চেহারাও মনে পড়ে।' এখানে বুলুপিসি, কুলদারঞ্জন রায়ের কন্যা এবং প্রফুল্লচন্দ্র বা বুলা মহলানবীশের সহধর্মিণী মাধুরী মহলানবীশের স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হল। একানব্বই বছরের সেই বিদুষী, সত্যজিৎ রায়ের প্রথম শিক্ষয়িত্রীর এই স্মৃতিকথাটির অনুলিখন করেছেন তাঁর দৌহিত্রী শ্রীমতী রূপসা মজুমদার।)

দাদা ঃ সুকুমার রায়, বৌদি ঃ সুপ্রভা রায়, মানিকের দিদিমা ঃ সরলা দাশ, ছোটকাকা ঃ প্রমদারঞ্জন রায়, বুলাকাকা ঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের ভাই বুলা মহলানবীশ, ঠাকুরদাদা ঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মানিকেব মামা ঃ প্রশান্তকুমার দাস, মনি ঃ জয়া দাশ, মঙ্কু ঃ বিজয়া দাশ, ধনদাদু ঃ কুলদারঞ্জন রায়।

সত্যজিৎ রায়ের রেখায় রবীন্দ্রনাথ

সত্যজিতের ছেলেবেলা
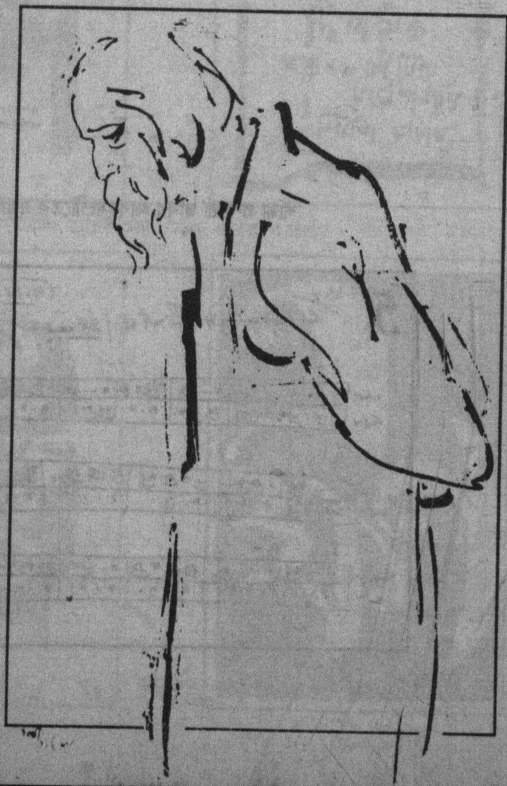
কল্যাণী কার্লেকর

সত্যজিৎ বা মানিকের জন্ম ১৯২১ সালের ২রা মে ১০০ নং গড়পার রোডের বাড়িতে। সেই প্রজন্মে গড়পারের রায় পরিবারের দুটি মাত্র সন্তান দুই ছেলে —আমার মেজমামা সুবিনয় রায়ের ছেলে সরলকুমার আর বড়মামা সুকুমার রায়ের ছেলে সত্যজিৎ -- ডাক নাম অনুসারে ধন আর মানিক। দুজনের বয়সে প্রায় ছ-বছরের তফাৎ।

বড়মামা বিয়ের পর অনেক দিন নিঃসন্তান ছিলেন, পরে মানিকের জন্ম হয় আমাদের বড়মা বিশ্বের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ও এ-দেশের প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর হাতে। আমার বাবা অরুণ নাথ চক্রবর্তী তখনকার বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তাঁর চাকরির সূত্রে আমরা ওই প্রদেশের নানা জায়গায় ঘুরতাম। তখন সম্ভবতঃ আমরা উত্তর বিহারের কিষণগঞ্জে ছিলাম, বড়মামার কাছ থেকে টেলিগ্রাম এলো—'khoka born last night. All well' মানিকের মুখ তার মায়ের মতো হয়েছিল বলে কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলেছিলেন — 'তোমার ছেলের এত সুন্দর দেখতে হওয়া উচিত নয়, ওর চেহারা হুঁকোমুখো হ্যাংলা, কাঠবুড়ো, রামগরুড়ের ছানা বা ওই রকম একটা কিছুর মতো হওয়ার কথা ছিল।' বড়মামা নিজেও যে তাকে আদর করে মাঝে মাঝে দু-একটা উদ্ভট নামে ডাকতেন না, তা নয়।

দু-বছর বয়সে ওর খুব ঘটা করে নামকরণ হয়। শুনেছি কি নাম দেয়া যায় তাই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল, বড়মামা একটা সহজ নামের কথা বলতে কবি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন — 'তা বেশ তো, সরলকুমারের ছোট ভাইয়ের নাম সহজকুমার দাও না'। শেষ পর্যন্ত বোধহয় বড়মামাই সত্যজিৎ নামটা ঠিক করেছিলেন। মানিকের জন্মের কিছু আগেই বড়মামার কালাজ্বর হয়েছিল। মামিমাকে তাঁর শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকতে হতো বলে কুলদারঞ্জন রায়ের দুই মেয়ে তুতু-বুলুর (ইলা, মাধুরী) কোলেপিঠেই তার অনেক সময় কাটতো। তাদের কাছে সেটা পুতুল খেলার মতো আমোদের ব্যাপার ছিল। আমি যখন মায়ের সংগে মামাবাড়িতে যেতাম আমিও নিজেকে খুব বড় একজন মনে করে ওদের সংগে জুটে যেতাম। আমার সংগে মানিকের দশ বছরের তফাৎ তাই ধাপে ধাপে তার বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছোঁড়া, হামা দেয়া, প্রথমে ছেঁচড়ে চলা আর তারপরে টলটলে হাঁটা, শেষে ছুটোছুটি —সবটাই প্রচণ্ড উপভোগ্য মনে হতো। ১৯২৩ সালের বৈশাখ মাসে খুব ঘটা করে মানিকের নামকরণ হলো আর ওই বছরই ভাদ্রমাসে বড়মামা মারা গেলেন। মানিকের তখন মাত্র আড়াই বয়স।

কথায় বলে বিপদ একা আসে না, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। দীর্ঘ রোগভোগের পরে ১৯১৪ সালে ইউ রায় এণ্ড সন্সের প্রতিষ্ঠাতা, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মৃত্যুর নয় বছর পরে বড়মামা গেলেন — ওই সময়ের আড়াই বছরই তিনি রোগশয্যায় ছিলেন, ব্যবসায়িক ব্যাপার পড়েছিল মেজমামা সুবিনয় রায়ের হাতে, তিনি সংকটে উত্তীর্ণ হতে

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ঃ বিজয়া রায়

পারেননি। বড়মামা যাবার আড়াই বছর পরে রায় পরিবারকে গড়পারের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। পাঁচ বছর বয়সে মানিক তার মায়ের সংগে তার সেজমামা (সোনা মামা) প্রশান্ত কুমার দাসের বাড়িতে চলে গেল, ওঁর বাড়িতেই তার লেখাপড়া শেখা, বড় হওয়া। মামিমা শিক্ষিতা ও শিল্পকর্মে অতুলনীয়া ছিলেন, তিনি বিদ্যাসাগর বাণীভবনে চাকরি নিলেন। আগে যেমন আমরা মায়েব সংগে গড়পাড়ের মামাবাড়িতে বেড়াতে যেতাম, এবার থেকে মামিমা তাঁর ছুটিতে আমাদের বাড়িতে যেতে আরম্ভ করলেন। এইসব ছুটির কিছু কিছু গল্প মানিক "যখন ছোট ছিলাম" বইয়ে লিখেছে, আমি আর দুটো যোগ করব, দুটোই তার বছর পাঁচেক বয়সের। আমার বাবা তখন লাহেরিয়াসরাইয়ে (দ্বারভাংগা) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট।

একদিন বড় মামার 'খাই খাই' কবিতা পড়ে শোনাতে শোনাতে

—"ডিংগি চড়ে স্রোতে পড়ে পাক খায় জেলেরা,
ভয় পেয়ে খাবি খায় পদে পদে ছেলেরা—"

এই দুটো ছত্র পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম — "মানিক, তুমি খাবি খেতে পার?" সংগে সংগে "হ্যাঁ" বলে মেঝের ওপর চিৎপাত হয়ে পড়ে, চোখ উল্টে , জিভ বের করে, হাত পা ছুঁড়ে এমন কাণ্ড করতে লাগলো যে আমরা হাঁউমাউ করে তাকে থামাতে পথ পাই না।

আরেকদিন একটা ব্রাউন রঙের ফাইবারের বাক্স পেয়ে ভাবলাম সেটা একটা চমৎকার ডাক্তারি ব্যাগ হতে পারবে। গোটা গোটা অক্ষরে Dr. Satyajit Ray, M.D, F.R.C.S. লিখে মানিকের কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বল্লাম — "তুমি বেশ ডাক্তার, আমরা রোগী, আমাদের পরীক্ষা করে ওষুধ দাও।" কিন্তু সে তাতে রাজি হল না, মাথা নেড়ে বল্ল — "না, আমি ডাক্তার হবো না, জার্মানি থেকে ছবি তোলা শিখে এসে সিনেমা করবো।" সে ছোটবেলা থেকে গ্রামোফোন, স্টিরিওস্কোপ, ম্যাজিকলণ্ঠন প্রভৃতির সংগে পরিচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু জার্মানির কথা মনে হল কেন? গড়পারের প্রেসের অবস্থা খারাপ হওয়ার সময়ে মেজমামা জার্মানি থেকে জিনিস আমদানির কথা ভেবেছিলেন, কিছু কিছু জিনিস আনিয়েছিলেনও, হয়তো সেই ব্যাপারটা মানিকের মাথায় ঢুকেছিল।

আরেকটু বড় হয়ে ক্যামেরায় হাত দিয়ে বয়সের পক্ষে আশ্চর্য সুন্দর ছবি তুলতে লাগলো। একবার হাজারিবাগের ক্যানারিহিলে চড়ুইভাতিতে গিয়ে আমার একটা ছবি তুল্লো, আমি আলোর দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়েছিলাম বলে চেহারাটা কালো উঠলো, মানিক গর্বের সংগে বল্ল —"দেখলে, কেমন সিল্যুয়েট তুলেছি।" সিলুয়েটটা ইচ্ছাকৃত ছিল, না 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমো' বলে চালিয়ে দিল বলতে পারি না।

বয়স বাড়ার সংগে সে বিজ্ঞাপন-কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে অনেক কষ্ট করে সিনেমার জগতে ঢুকেছিল —হয়তো তার পাঁচ বছরের অবচেতন উক্তিই তার বিশ্বখ্যাতির পূর্বগামিনী ছায়ার মতো ছিল।

সত্যজিৎ রায়ের ছেলেবেলা
নলিনী দাশ

মানিকের, মানে সত্যজিৎ রায়ের ছেলেবেলার কথা সুসংবদ্ধ ভাবে লেখা আমার পক্ষে কঠিন, কারণ আমার নিজের সুমধুর বাল্যস্মৃতির সঙ্গে তা মিলে-মিশে গেছে। আমার মা পূণ্যলতা চক্রবর্তী ছিলেন মানিকের বাবা সুকুমার রায়ের পিঠোপিঠি ছোটবোন। একশ' নম্বর গড়পার রোডের যে বাড়িতে ১৯২১ সালের মে মাসে মানিকের জন্ম, আমারও জন্ম হয়েছিল সেই একই বাড়িতে, তার প্রায় পাঁচবছর আগে। দাদামশাই, মানে মানিকের ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নিজে নকশা করে এই বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। তার মাত্র তিনচার বছর পরে, ১৯১৫ সালে তিনি এই বাড়িতেই চোখ বুজেছিলেন।

গড়পার রোডের এই আশ্চর্য বাড়িটার সামনের অংশে ছিল 'ইউ রায় এণ্ড সন্স' নামে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থার কার্যালয়। একতলায় অফিস ও ছাপাখানা আর দোতলায় স্টুডিও ও ব্লক তৈরির ব্যবস্থা। উত্তরমুখী হলঘরের বড় বড় কাচের জানলাগুলি মনে পড়ে। বাইরের দেয়ালে সুন্দর পদ্মফুলের নকশা ছিল, তার উপরে ইংরেজি হরফে সংস্থার নাম লেখা। দুঃখের কথা, এমন চমৎকার বাড়িটার একখানা ভাল ফোটো কেউ তুলে রাখেন নি। মানিকের লেখা 'যখন ছোট ছিলাম' বই-এর প্রথম ছবিটা দেখলে মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। কার্যালয়ের বাঁদিকের মানে পূর্বদিকের গলি দিয়ে কিছুটা ঢুকে ডানদিকে তিনতলার বসতবাড়ির দরজা। একতলা-দোতলা, তিনতলার অনেকগুলি ঘরে বসা, খাওয়া, শোওয়া। আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল সামনের কার্যালয়ের ওপর মস্ত বড় ছাদ আর পিছনদিকে ছোট একটুকরো ছাদ। বাড়ির দক্ষিণে অনেকটা ঘাস জমি, কিছু ফুলগাছ, তরকারি-বাগান, কলাঝাড়, আমগাছ আর পেয়ারাগাছ আমার ছোটবেলার সুখস্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

মানিক বা আমি কেউই দাদামশাই উপেন্দ্রকিশোরকে চোখে দেখিনি। আমার ছোটবেলায় গড়পারের বাড়িতে দিদিমা আর মামামামিরা ছিলেন। বড়মামা সুকুমার রায় আর মামিমা সুপ্রভার ছেলে মানিক আমার চেয়ে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট, আর মেজমামা সুবিনয় রায় ও মেজমামিমা পুষ্পলতার ছেলে ধন বা সরলকুমার আমার চেয়ে কয়েকমাসের বড়। নানকুমামা (ছোটমামা) সুবিমল বিয়ে করেননি। আর ছিলেন ধনদাদু (কুলদারঞ্জন রায়) আর তাঁর দুই মেয়ে বুলুমাসী ও তুতুমাসী (মাধুরীলতা ও ইলা)। মামিমা (সুখলতা রাও) মাঝে মাঝে আসতেন। আমরা প্রতিবছরই কয়েকবার মামাবাড়িতে আসতাম। পাশের বাড়িতেও অনেকগুলি খেলার সাথী ছিল। আমার ছোটবেলার মামাবাড়ির স্মৃতিতে কত যে খেলাধুলার কথা ছড়িয়ে আছে তার সীমাসংখ্যা নাই। তিনতলার বড়ছাদে কুমির কুমির, কানামাছি, এক্কাদোক্কা, আরো কত কি খেলা। মানিকের ছোট ট্রাইসাইকেল পাল্লা দিত ধনদাদার একটু বড় সাইকেলের সঙ্গে। লুকোচুরি বা চোর চোর খেলতে সারাবাড়ি ছাড়িয়ে পিছনের বাগানে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তাম। আমগাছ,

পেয়ারাগাছের ডালে চড়তেও বাধা ছিল না।

ছাপাখানা বা স্টুডিওতে সদলবলে যাওয়া চলত না। মেশিন যখন চলত, তখন যাওয়া নিষেধ ছিল। বলা বাহুল্য তবু আমরা যেতে ছাড়তাম না। কিভাবে একটা একটা পৃষ্ঠাছাপা হত, একটার পর একটা লাল, নীল, হলদে তিনটে রঙ পড়ে কেমন বহুরঙা ছবি ছাপা হত, সব দেখতে ভারি মজা লাগত। বাড়তি পাওনা ছিল ছাপা পৃষ্ঠার কপি, অথবা সামান্য খুঁতওলা রঙিন ছবি। খুব ছোটবেলার স্মৃতিতে এইসব অভিযানে কেবল ধনদাদা আর আমি ছিলাম। একটু বড় হতে মানিকও আমাদের সঙ্গে থাকত।

আমার মামাবাড়ির সমস্ত আবহাওয়াটাই ছিল ছোটদের গল্প, কবিতা, ছবি দিয়ে পূর্ণ। সন্দেশ পত্রিকা আর ছোটদের নানা বই ছেপে বেরোবার অপেক্ষায় না থেকে তার টুকরো প্রুফের 'গ্যালি' নাড়াচাড়া করতাম (কেউ আমাদের পড়তে শেখাবার আগেই দিব্যি পড়তে শিখে গেলাম)। কত যে ছোটদের বই ছিল সেই আশ্চর্য বাড়িতে! চাবি-না লাগানো আলমারির বুকে, এমন কি সেল্ফ টেবিলেও বোঝাই থাকত থরে-থরে বই আরপত্রিকা। প্রথম থেকে সমস্ত সন্দেশ ত ছিলই, আরো কত যে ছোটদের গল্পের বই আর পত্রিকা ছিল। ইংরেজি ভাল ভাল ছবির বই, গল্পের বই, বুক অব নলেজ, আরো কত কি! তাছাড়া, ধনদাদু থেকে শুরু করে মামারা, মামিরা সবাই ছিলেন গল্প বলার ওস্তাদ।

আমার মামাবাড়ির এই আনন্দঘন পরিবেশেব মধ্যে সবার ছোট, সবার আদরের মানিক ক্রমে বড় হয়ে উঠছিল। একটা করুণ বিষাদের স্রোত যে এই আনন্দধারার পাশাপাশি বয়ে চলেছিল, সেটা আমরা, ছোটবা ভাল করে না বুঝলেও কিছুটা অনুভব করতে পারছিলাম। মানিকের জন্মের কিছুদিন পরেই বড়মামা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পরে জেনেছিলাম যে সেটা ছিল তাঁর দুরারোগ্য কালাজ্বর, যার চিকিৎসা পদ্ধতি বা ওষুধ তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। যদিও বড়মামা শুয়ে শুয়েই লিখতেন, ছবি আঁকতেন, ছোটবড় সবার সঙ্গে হাসি-গল্প করতেন, তবু বুঝতাম যে ক্রমেই তিনি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

বড়মামাকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত, প্রায়ই আমরাও সঙ্গী হতাম। দার্জিলিং, গিরিডি আর বিশেষভাবে সোদপুরে (পানিহাটিতে) যাবার কথা মনে আছে। তারপরে আর বড়মামাকে নিয়ে কলকাতার বাইরে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

সোদপুরে মস্ত বাগানের মধ্যে একটা বাড়িতে ছিলাম। গঙ্গার ধারের ঘরে, জানলার পাশে বিছানায় শুয়ে শুয়েই বড়মামা কত যে লিখতেন, ছবি আঁকতেন। কাছেই মানিক বসে খেলা করত, মাঝে মাঝে বড়মামা তার সংগে কথা বলতেন। সেই সময় আঁকা 'সূর্যাস্তে গঙ্গা' ছবিটি সম্ভবতঃ বড়মামার আঁকা সর্বশেষ জলরঙে বড় ছবি। পরে সন্দেশ পত্রিকায় সেটা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে যখন বড়মামা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, তখন মানিকের আড়াই বছরও পূর্ণ হয়নি। দু তিন বছর পরে 'ইউ রায় এণ্ড সন্স'-এর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল, সন্দেশ পত্রিকা উঠে গেল আর বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল। আমাদের মামাবাড়ি যাওয়া বন্ধ হল। আত্মীয়-স্বজনেরা ছড়িয়ে পড়লেন। মানিককে নিয়ে মামিমা চলে গেলেন ভবানীপুরে তাঁব ছোট ভাই-এর কাছে, এবপর থেকে আমাদের বাড়িটাই হল সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের ছুটি কাটাবার জাযগা।

মানিক তার 'যখন ছোট ছিলাম' বইতে লিখেছে যে ছুটিতে বাইরে গিয়ে 'সব চেয়ে বেশি ফুর্তি হত মেজপিসিমার বাড়িতে।' এটা খুবই স্বাভাবিক। আমার বাবা অরুণনাথ চক্রবর্তী বিহার সিভিল সার্ভিসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করতেন। যখন যেখানে বদলি হয়ে যেতেন, শহরের বাইরে বড় দেখে বাগানওলা বাড়ি ভাড়া করতেন। বাড়িতেই আমরা ছিলাম খুড়তুতো জ্যাঠতুতো মিলে পাঁচ ভাইবোন। নানকুমামা আর আমার পিসিমা প্রতি ছুটিতেই আমাদের বাড়ি আসতেন। মানিককে নিয়ে মামিমাও বছরে অন্ততঃ একবার আসতেন। তাছাড়া ধনদাদু, তুতুমাসী, বুলুমাসী, ছোড়দাদুর (প্রমদারঞ্জন রায়) ছেলেমেয়েরা, আরো কত আত্মীয়-স্বজন যে আসতেন। ছুটিতেই সব সময়ই বাড়িটা গমগম করত। বাবা ছিলেন ভারি আমুদে, ফুর্তিবাজ মানুষ। আর মার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল সে-সব আমোদ আর ফুর্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা করার। কত যে ভোজ, দূরে দূরে গাড়ি করে গিয়ে কত পিকনিক, কাছে-দূরে কত যে বেড়িয়ে বেড়ান আর বাড়িতেই কত যে খেলা, গান, গল্প।

আমরা সবচেয়ে বেশিদিন থেকেছি হাজারিবাগে — ১৯২৪ থেকে দুইবারে মোট প্রায় ছ-বছর। স্বাস্থ্যকর আর সুন্দর জায়গা বলে এখানে আত্মীয়-স্বজন অনেকেই এসেছেন, কখনও কখনও বাড়িতে জায়গা হয়নি, আলাদা বাড়ি ভাড়া করতে হয়েছে। সেই সময় মস্ত বড় দল বেঁধে কত যে বেড়িয়েছি আর পিকনিক করেছি , বলে শেষ করা যায় না।

প্রথমবার যখন মামিমারা হাজারিবাগে এলেন, তখন মানিকের বয়স সাড়ে চার বছর। তখন থেকেই সে আমাদের সঙ্গে খেলত। সে সবচেয়ে ভালবাসত ডাক্তার সাজতে। মস্ত বড় ব্যাগ হাতে নিয়ে, গলায় 'স্টেথোস্কোপ' ঝুলিয়ে সে আমাদের পরীক্ষা করে অনেক ওষুধ আর ইন্‌জেকশান দিত।

এরপর গেলাম দ্বারভাঙ্গায়। সেখানে আমাদের বাড়িটা ছিল মস্ত বড় ফলবাগানের মধ্যে। সেই বাগানে অনেক কাঁঠাল, লিচু, কালোজাম আর পেয়ারার গাছ ছিল, আর ছিল চুয়াল্লিশটা আম গাছ। খুব ভাল ভাল ল্যাংড়া, বোম্বাই, ফজলি, সিঁদুরে, পেয়ারাফুলি আরো কত যে বিচিত্র জাতের আম, যা আগে কখনও দেখিনি বা নামও শুনিনি। শুনেছি বড়মামা নাকি কোনো ফল খেতেন না। ছ-বছরের মানিকও খেত না। মামিমার ভারি দুঃখ — এত ভাল ভাল গাছ-পাকা আম, তার একটাও খাবে না? শেষে আমি একদিন খুব ভাল বোম্বাই আমের রস ঘন দুধের সঙ্গে গুলে, তাতে চিনি, কোচিনিল আর ভ্যানিলা মিশিয়ে তার স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ বদলে দিলাম। তখন মানিক আম খেল — তাও খুব ভালবেসে নয়।

ছোটবেলায় মানিকের একটা ভারি প্রিয় খেলা ছিল — সে যখনই আমাদের বাড়ি আসত, সেটা বড়দিন, পুজো বা গরমের ছুটি, যাই হোক না কেন, ফাদার খৃষ্টমাসকে একদিন আসতেই হত। কল্যাণদাই যে ফাদার খৃষ্টমাস সাজত, সেটা আমরা যেমন জানতাম, মানিকও জানত। লালজোববা, লাল টুপি আর লম্বা পাজামা পরে, তুলোর দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে, পিঠে একটা মস্ত ঝোলায় অনেক খালি টিন নিয়ে সে মাঝরাতে ঝমর ঝমর করতে করতে আসত। মানিকের সে কি উত্তেজনা! ঘুমে চোখ জুড়ে এলেও সে ঘুমোবে না। আমাদের সবার জন্যই ছোটখাট কিছু উপহার থাকত। মাথার কাছে ঝুলিয়ে রাখা মোজায় সে সব দেওয়া হত। মানিকের জন্য মা একটা ভাল কিছু উপহার কিনে

দিতেন। যখন মানিক আর ফাদার খৃষ্টমাসকে চাইল না, তখন বুঝলাম যে এবার সে বড় হয়েছে।

মানিক যত বড় হতে লাগল, ক্রমে সে আরো ভালভাবে আমাদের সমস্ত কাজ আর খেলার সাথী হল। আমরা চার বোন আর মানিক ও কল্যাণদা দুই ভাই সে যে কত খেলা জমাতাম তা বলে শেষ করা যায় না।

ফোটো তোলা আর ডাকটিকিট জমানোর ব্যাপারে মানিক আর কল্যাণদার মধ্যে ভারি ভাব। দশ বারো বছর থেকেই মানিক চমৎকার ছবি তুলত। হাজারিবাগে কোনো সুন্দর ঝরণা বা পাহাড়ের ফোটো তুলবার জন্য সে কখনো দাঁতে ক্যামেরা কামড়ে ধরে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে যেত। কল্যাণদা মন্তব্য করত 'ডেসপারেডো!', ঠাট্টা তামাসায় বিরক্ত হয়ে কল্যাণদা যখন মুখ হাড়ি করত, মানিক তাকে বলত 'ডিসগাসটেডো।' দুজনে মিলে 'রায় চক্রবর্তী'। ভারি ফুর্তিবাজ খেলার সাথী ছিল মানিক। লুডো, স্নেকস এ্যাণ্ড ল্যাডার্স, আর তাসের নানারকম খেলাও খেলতাম। কিন্তু প্রচলিত খেলায় আমাদের মন উঠতো না, তাই মজার ছড়া-গল্প লেখা, ছবি আঁকা আর গান রচনার কত যে বিচিত্র খেলা উদ্ভাবন করতাম আর রকমারি বুদ্ধির খেলা খেলতাম তার সীমা সংখ্যা নেই।

একটা ভারি মজার খেলা ছিল। সরু লম্বা একটা কাগজে প্রথমে একজন একটা ছবি আঁকত, দ্বিতীয় খেলুড়ে ছবির একটা নাম লিখে, ছবিটা মুড়ে কাগজটা তৃতীয় জনকে দিত, তৃতীয় খেলুড়ে সেই নাম দেখে একটা নতুন ছবি আঁকত তারপর নামটা মুড়ে পরের খেলুড়েকে কাগজটা দিত, এইভাবে চলতে চলতে কোথাকার জল যে কোথায় গড়াত তার ঠিক নেই। একবার কে আঁকল মানিক একটা বাছুরকে কাতুকতু দিচ্ছে — (সত্যিই সেরকম ঘটেছিল) তারপর নাম আর ছবি বদল হতে হতে শেষ লেখাটা দাঁড়াল যখন 'রায় চক্রবর্তী ফাইট' তখন আমরা এমন হাসলাম যে কল্যাণদা সত্যি সত্যি ডিসগাসটেড হয়ে গেল।

আর একটা খেলা ছিল, একজন একটা গল্প বা কবিতা শুরু করে তার প্রথম অংশটা জুড়ে কেবল এক লাইন খোলা রাখত। দ্বিতীয় খেলুড়ে তার সঙ্গে দু লাইন জুড়ে কেবল শেষ লাইন বের করে রেখে প্রথম অংশ জুড়ে দিত। এই ভাবে চলতে চলতে সে যে বিচিত্র জিনিসে দাঁড়াত তার তুলনা হয় না।

এই সব খেলার সঙ্গে সঙ্গে আবার চলত আমাদের যত উদ্ভট রসের মজার গান, অধিকাংশই নানকুমামার সব অদ্ভুত গল্প থেকে নেওয়া। যেমন একটা গান ছিল, 'কোরোসিনের সুবাতাসে/মহাপ্রাণী ভেসে আসে/খাও খাও ভৈরে টিন/ কেরোসিন। কেরোসিন!' আর একটা গান ছিল 'হনলুলু প্যাঁপ্যাঁ প্যাঁপ্যাঁ!' পাঁচ ছ'জনে মিলে ছবি আঁকা, ছড়া-গল্প লেখার খেলা চলত, একজন যখন লিখত, অন্যরা তখন গান চালিয়ে যেত। নতুন নতুন পদ রচনা করে গেয়ে চলতে হত। যেমন, একজন গাইল 'হনলুলু গরম লুচি।' 'হনলুলু গাইছে বুচি'। যোগ দিল দ্বিতীয়জন। তৃতীয় খেলুড়ে হয়ত গাইল 'হনলুলু কুচিকুচি।' চতুর্থ জনকে গাইতে হবে 'হনলুলু প্যাঁপ্যাঁ প্যাঁপ্যাঁ'। অর্থহীন এই গান রচনার নিয়ম কিন্তু ভারি কড়া। ঠিক পর পর পদ রচনা করে গেয়ে যেতে হবে। যেমন 'হনলুলু বেগুনভাজা/হনলুলু তাজা তাজা/হনলুলু গজা খাজা/হনলুলু প্যাঁপ্যাঁ।' কেউ যদি উপযুক্ত পদ ভেবে চট করে না গাইতে পারে, তার নম্বর কাটা যাবে।

তামাসা করতেও ভারি ওস্তাদ ছিল মানিক। একটা ঘটনার কথা বলি। হাজারিবাগে একবার আমরা সবাই ক্যানারি হিলে পিকনিক করতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি, ওদিবে মেঘ ঘনিয়ে আসছে। আকাশের অবস্থা দেখে মা বলছেন, 'অমন ঝড়জল মাথায় করে বেরিয়ে দরকার নেই, বাড়িতে বসেই খাওয়া দাওয়া করা যাক।' আর বাবা বলছেন, 'কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়া যাক।' মাসিমার ছোট মেয়ে শীলা, মানিকের চেয়ে মাস কয়েকের ছোট। সে তখন আমাদের বাড়িতে ছিল। সে ভারি সরল আর সাদাসিধা। মানিক এসে তাকে বলল, 'শুনলি ত, মেজপিসেমশাই বলছেন যে কপাল ঠুকলেই বেরিয়ে পড়া যাবে। আয়, তুই আর আমি কপাল ঠুকি।' এই বলে মানিক খুব আস্তে আস্তে দেয়ালে নিজের মাথা ঠুকতেই তার পাশে দাঁড়িয়ে শীলা ঠকাশ করে জোরে মাথা ঠুকেছে। আমরা হেসে অস্থির। শীলাকে বোঝাতে পারি না যে 'কপাল ঠোকাটা' কথার কথা, কেবলই সে দেয়ালে মাথা ঠোকে। বাবা-মা এসে রক্ষা করলেন, বললেন, 'এবাব চল্ সত্যিই বেরিয়ে পড়ি।'

কোনো মানুষের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কোন বয়সে প্রথম বোঝা যায়? এর কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম আছে বলে জানি না। মানিকের কথাই ধরা যাক। সুকুমার রায়ের একমাত্র সন্তান যে সাধারণ হবে না, এটা সকলেই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলাম, তাই ছোটবেলা থেকেই তার কথা-বার্তা, ব্যবহারে যে প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত, সেটা তার পক্ষে স্বাভাবিক বলেই মনে করা হত।

পড়াশোনায় মানিক ছোটবেলা থেকেই খুব ভাল ছিল। বয়স এবং শ্রেণী অনুপাতে সে পড়ত বেশি, জানত অনেক বেশি। কিন্তু ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হবার দিকে তার আগ্রহ বা চেষ্টা ছিল না। বরঞ্চ তার আক্ষেপ ছিল যে অন্য বাড়িতে ছেলেরা ভালভাবে পাশ করলেই সবাই খুশি হয় আর তার বাড়িতে কিনা প্রথম বা দ্বিতীয় না হলে কেউ সন্তুষ্ট নয়।

মানিকের মামাবাড়িতে সঙ্গীতচর্চার আবহাওয়া ছিল। তার ছোটমাসি কনক দাস (বিশ্বাস) নাম করা গাইয়ে ছিলেন। মামিমাও চমৎকার গাইতেন। কিন্তু মানিকের গান শেখার উৎসাহ ছিল না। আমাদের বাড়িতে গানের চর্চা ছিল না, কিন্তু ছুটিতে মামিমা এলে আমরা গান শুনতাম। দু-একটা ভাল গান শিখে নিয়ে কোরাস গাইতাম। মানিক আমাদের গানে যোগ দিত না। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তার সুরজ্ঞান এত ভাল ছিল যে কোথাও খটকা লাগলে মানিক তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন।

ছোটবেলায় মানিকের কোনো অসাধারণ রচনাশক্তির পরিচয় পাইনি। আমাদের মজার গান-গল্প-ছড়া রচনার খেলায় অবশ্য সে আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখাত। ভাবতে অবাক লাগে যে যদিও মানিক আমাদের চেয়ে পাঁচ ছয় বছরের ছোট ছিল, খেলাব সময় সে কথা আমাদের মনে থাকত না, কারণ সে সবার সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতে পারত।

দশ বারো বছর বয়সেই মানিক চমৎকার ছবি তুলত। অবশ্য আমরা তখন ছবি তুলতাম বক্স ক্যামেরায়। সেখানে ফটোগ্রাফারের কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ ছিল একমাত্র বিষয় ও দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে। একাজ মানিক খুব ভাল পারত। এখনও আমাদের পুরনো অ্যালবামে মানিকের ছোটবেলায় তোলা হাজারিবাগের পাহাড়-ঝরণার সুন্দর কিছু দৃশ্য ধরে রাখা আছে।

খুব ছোটবেলা থেকে মানিক ছবিও চমৎকার আঁকত। দশবারো বছর বয়সে সে জলরঙে, পেনসিলে ও কালিকলমে সুন্দর আঁকতে পারত। কালিকলমে সে রাজা রামমোহন রায়ের আশ্চর্য সজীব একটা প্রতিকৃতি এঁকেছিল মনে আছে। দুঃখের বিষয় সে ছবিটি রক্ষা করা যায়নি।

আমি যখন বি. এ. পড়ি, মানিক স্কুলের উঁচু ক্লাসে আমাদের এক বিদায়ী অধ্যাপকের মানপত্র মানিককে দিয়ে সৌখিন অক্ষরে কপি করিয়ে, নক্সা আঁকিয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের কলেজে সবার সেটা ভারি পছন্দ হয়েছিল। সকলে মনে করেছিলেন যে সেটা বুঝি কোনো দক্ষ চিত্রকরের হাতের কাজ।

ছোটবেলা থেকেই মানিক সিনেমা দেখতে ভালবাসত। তখন আমরা সিনেমাকে বলতাম 'বায়োস্কোপ'। মানিকরা কলকাতায় থাকত, তার মামাবাড়ির সকলের নানা বিষয়ে উৎসাহ ছিল, তাই ভাল ছবি দেখার সুযোগও সে অনেক পেত। খুব ছোটবেলায় সে বলেছিল যে বড় হয়ে 'জার্মান থেকে শিখে এসে' খুব ভাল ফিল্ম তৈরি করবে। তখন অবশ্য তার সেকথার কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। নিজেও হয় তো দেয়নি।

হোস্টেলে থেকে যখন কলেজে পড়তাম, মানিকরা তার ছোটমামার বাড়ি ভবানীপুরে থাকত। ছুটিতে মামিমারা আমাদের বাড়ি হাজারিবাগ বা ছাপরায় আসতেন। হোস্টেল থেকে ছুটির দিনে আমরাও মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি যেতাম। নানা কথাবার্তার মধ্যে সিনেমার বিষয়েও কথা হত। মার পিসতুতো ভাই পুতুলমামা (নীতিন বসু) মানিকের পুতুলকাকা এবং আরো কিছু গুণী নির্দেশক তখন নতুন ধরনের বাংলা ছবি তৈরি করে নাম করেছেন। বিজলী সিনেমায় কোনো নতুন ভাল ছবি হচ্ছে, আমরা সেটা দেখিনি — শুনলে মানিক উৎসাহিত হয়ে নিজেই টিকিট কিনে এনে আমাদের সেই ছবি দেখিয়েছে, এমনও দু একবার হয়েছে।

কবে থেকে যে মানিকের মনে ছবি তৈরি করবার দৃঢ় সংকল্প গড়ে উঠেছে সে বিষয় কিন্তু জানতে পারিনি। প্রথম জানলাম যখন 'পথের পাঁচালী'র কাজ শুরু হয়েছে। সেসব সত্যজিৎ রায়ের ছেলেবেলার ঘটনা নয়। তাছাড়া এই প্রবন্ধের বিষয়ও নয়।

ষাট বছরের বন্ধু
দিলীপকুমার রায়

হাজার হাজার লোকের কামনাকে ব্যর্থ করে সত্যজিৎ চলে গেলেন। অনেক প্রত্যাশা অপূর্ণ রেখে। আমাদের প্রায় ষাট বছরের বন্ধুত্বের ইতিহাসে কত যে বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল তার সীমাসংখ্যা নাই। তার মধ্যে থেকে কয়েকটি বলছি।

তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রধানতঃ বড়লোকের ছেলেরাই পড়ত, যাই হোক আমরাও পড়তুম। কলেজের একটি দারোয়ান ছিল, তার ভারি বদ অভ্যাস ছিল সকলের কাছে টাকা ধার করা। একদিন আমি আর মানিক (সত্যজিৎ) কলেজ থেকে বেড়িয়ে আসছি। আমাদের দেখে দারোয়ানও হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। মানিক বলল, এই তাড়াতাড়ি দারোয়ানের দিকে চল। খুব ব্যগ্র হয়ে বলল, দারোয়ানজী, আমাদের গোটা দুই টাকা ধার দিতে পার? বিশেষ দরকার।

দারোয়ান তখনই একেবারে উল্টো বাগে দৌড়। আমি আর তখন হাসি চেপে রাখতে পারলাম না।

গরমের ছুটির আগে একদিন মানিক বলল, আউট্রাম ঘাটের ওপর যে রেস্তোরাঁটা আছে, ওখানে খুব ভাল আইসক্রীম পাওয়া যায়। দুই বন্ধুতে যাওয়া হল, আইসক্রীম খাওয়া হল। ফেরবার সময়ে কার্জন পার্কে একটু বসে গল্প করে, বাড়ি যাব। বৈশাখ মাস, সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। পার্কে পৌঁছে একটা দক্ষিণমুখো খালি বেঞ্চে বসতে যাচ্ছি, এমন সময় এক পুলিশ এসে জিগ্যেস করল, কেন? এখানে ত 'রিজার্ভড' বলে কিছু লেখা নেই। তাহলে বসব না কেন?

উত্তরে পুলিশ বলল যে কেন তার জবাব সেও জানে না। তবে, হুকুম নেই, তাই সে বসতে দেবে না।

মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, যে যার বাড়ি চলে গেলুম। মানিক কিন্তু মনে মনে বেশ গজরাতে লাগল, সেটা তার হাবভাব দেখে বোঝা গেল।

এরপর প্রায় এক মাস কেটে গেছে, আমি ঘটনাটা ভুলেই গেছি। মানিক হঠাৎ একদিন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সরকারি ডাকটিকিট লাগানো একটা চিঠি দেখিয়ে বললে, পড়। চিঠি পড়ে ত আমার চক্ষু চড়কগাছ। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মানিককে ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখেছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, বছর দেড়েক আগে কোন এক ইংরেজ দম্পতি ঐ বেঞ্চে বসেছিলেন। বেঞ্চটি তখন সদ্য রঙ করা হয়েছিল। তাই তাদের জামাকাপড় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ওঁরা রিপোর্ট করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ থেকে একটা ওয়েট পেন্ট নোটিশ লাগিয়ে দেওয়া হয়, উপরন্তু একজন পুলিশ পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়। কোনকালে ভিজে রঙ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু হুকুম পালটানো হয়নি, তাই পাহারা রয়েই গেছে। এই ঘটনা থেকে মানিকের অদম্য কৌতূহলেব পরিচয় পাওয়া যায়।

এক বিখ্যাত ব্যক্তির নাতি অনিল আমাদের সঙ্গে পড়ত। মানিক মধ্যে মধ্যে তাকে

ক্ষেপিয়ে মজা দেখত। একদিন আমরা তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ অনিল এসে বলল, এই, তোরা একটু সরে দাঁড়া।

মানিক বলল, কেন রে? তোর কি কোনো ছোঁয়াচে রোগ হযেছে? অনিল উত্তর দিল, রোগ নয়, রোগ নয়, যার পকেট ভর্তি টাকা, তার তোদের থেকে একটু দুরে থাকাই ভাল।

নিজের পকেট থেকে সে এক গোছা দশটাকার নোট বেব করে দেখিয়ে বলল, এটাই ছোঁয়াচে মনোবৃত্তি, বুঝলি?

মানিক আমাকে টেনে নিয়ে বলল, কিরে? থানা পুলিশ হবে নাকি? অনিল রেগে কিছু বলার আগেই প্রোফেসর এসে গেলেন। ক্লাসের পরে যাওয়া হল 'ফারপোতে' খেতে। ফারপো হোটেলের দোতলায় তখন দেড় টাকায় 'টু-কোর্স' লাঞ্চ দিত। ওপরে গিযেই অনিল একটা সিগারেট ধরিয়ে স্টাইল করে বসল। মানিকের মুখ দেখেই বুঝেছি যে একটা রগড় হবে। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী পরা ওয়েটার এসে দাঁড়লো। অনিল সাবধান করে দিল। দেখ এটা হল ফারপো, গুরু গম্ভীর ভাবে ব্যবহার করতে হবে, মনে রাখিস। ওয়েটার মেনু কার্ড দিলে খাবাবের অর্ডার দেওযা হল। একজন ফিরিঙ্গি সাহেব এসে জিগ্যেস করল, এনি ড্রিংকস সার? খুব গম্ভীব মুখে মানিক বলল, ইযেস, ভেরি কোল্ড ওয়াটার উইথ আইস! সাহেব চলে গেলে অনিল ত রেগে টং! এইজন্য তোদের নিয়ে বড় জায়গায় যেতে ভয় করে। জল ত ওরা দিতই। ড্রিংকস চাই না বলে দিলেই হত।

মানিক গম্ভীর মুখে বলল, যদি কলসীব জল দিত? একদিন, মেট্রোতে একটা খুব ভাল ছবি হচ্ছিল, নায়িকা মানিকের খুব প্রিয় অভিনেত্রী। শেষের ক্লাসটা না করেই বেরিয়ে পড়া গেল। মেট্রো সিনেমার সামনে গিয়ে হিসাব কবে দেখা গেল, দুখানা টিকিট কাটলে বাড়ি ফেরার আর পয়সা থাকে না। মানিক ভেবেছিল আমাব কাছে বাড়তি পযসা আছে, আমি ভেবেছি ওর কাছে আছে।

মানিক বলল এখন উপায়? ফিরে যেতে হবে? বললাম, থাম না, এক আধটা কি চেনা লোক বেরোবে না? দুজনেই চারদিকে তাকাতে লাগলাম। যখন পৌনে তিনটে বাজে, হতাশ হবার জোগাড় কিন্তু তবুও দাঁড়িযে আছি। দেখাই যাক! তিনটে বাজতে ঠিক পাঁচ মিনিট আগে দেখি, আমার এক মামা সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। হাতে চাঁদ পাবার মতন মনের অবস্থা নিয়ে দৌড়ে গিয়ে বললাম, মামা, দুটো টাকা দিতে পাব?

জানতে চাইলেন, কেন? বললাম, আমরা দুজন সিনেমা দেখব। তখন মেট্রোতে ম্যাটিনি শোতে বারো আনা কবে টিকিট ছিল। মামা কোনো কথা না বলে আমাদেব দু খানা টিকিট কিনে দিলেন, টাকা দিলেন না। আমবা মজা কবে ছবি দেখে বাড়ি ফিরলাম।

প্রেসিডেন্সি কলেজের উল্টোদিকে কলেজ স্কোয়াবেব পাশে প্যারাগন আর প্যারাডাইস নামে দুটো সরবতেব দোকান ছিল, ক্লাস না থাকলে আমরা প্রায়ই সরবত খেতে যেতাম, বন্ধুরা মিলে দল বেঁধে। কলেজ স্কোয়ারের ভিতর কিছু ভিখারী বসে থাকত, তারা আমাদের কাছে পয়সা চাইত। মানিকের কাছে পয়সা চাইলে সে কিন্তু পয়সা না দিয়ে হয় মুড়ি, না হয় ছোট রুটি কিনে দিত। জিগ্যেস করলে বলত এটা তোর মামার কাছে পাওয়া শিক্ষা! এইরকম কতশত ছোটখাট ঘটনার স্মৃতি যে মনে আসে তা আর কি বলে শেষ করতে পারব?

তাই কবিগুরুর ভাষাতে বলি, 'স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি। ভাবমুক্ত সে এখানে নাই।'

শান্তিনিকেতন ও কলাভবনের দিনগুলি

দিনকর কৌশিক

সত্যজিতের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯৪০ সালে। আমি সেই বছর শান্তিনিকেতনে আসি। শেষদিকে ভাষার সমস্যা থাকার দরুন আমার সম্পর্ক ছিলো যাদের সঙ্গে আমি ইংরেজিতে আলাপ করতে পারি। কলাভবনের ছাত্রাবাসে এসেই দেখতে পেলাম লম্বা ছেলে— টিন এজার— রোগা, সাদা পাঞ্জাবী পায়জামা গায়ে, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ব্যাপার— যেমন পোশাকে, তেমন কথাবার্তায, কাজে, সব ক্ষেত্রে। বারান্দায় বসে—মানিক— (সবাই ওকে মানিক নামে চিনত) সকল সুরিয়া, পৃথ্বীশ ইংরেজিতে গল্প করছিল। আমি অনায়াসে ওদের দলের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। মাঝে মাঝে মানিক পকেট থেকে রুপোর ডিবে বার করে জোয়ান খেতো— নিঃশ্বাসে যাতে অপরিচ্ছন্নতা না থাকে। প্রসন্ন রাও কর্ণাটকের ছেলে। সে সবাইয়ের সঙ্গে খোলামেলা, হাসি-ঠাট্টা করাই তার কাজ। সে আমার নাম দিনু কৌশিক বলে আগে থেকে প্রচাব করে রেখেছিল। হঠাৎ মাঝখান থেকে মানিক বলে উঠলো— 'তুমি কার কাজ পছন্দ কর দিনু?' আমাব জানার মধ্যে— দু-একটি নাম - ভ্যান গগ, সেজান। আমি বললাম 'পিকাসোর কাজে— এতো ধরনের প্রকাশ রয়েছে— সেটা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পাবিনি।' মানিক হেসে একটু নীচু গলায় বলল— 'খবরদার! পিকাসোব নাম মাষ্টারমশাইযের (নন্দলাল বসু) সামনে কখনো নেবে না, বুঝলে?'

ছাত্রাবাসের সামনেই কিঙ্কবদার মাটির বাড়ি ছিল। কিঙ্করদা মোটা জোর গলায় 'রজনীর শেষ তারা— আঁধারে গোপনে আধো ঘুমে' গান করছিলেন, আমি কিছুক্ষণ শুনে বললাম— 'তোড়ি রাগের কী নিখুঁত বন্দিশ— সদারংগ, তানসেনও খুশী হতেন এই ধবনের কাজে!' মানিক চট করে আমাকে জিজ্ঞেস কবল— 'তুমি মনে হয় ওস্তাদী গানের চর্চা রাখো— বেশ তো। — আমায বলো, কোন গাইয়ে পছন্দ কর?' আমি অনায়াসে বললাম 'আমার কিরানা ঘবানা— বিশেষ করে খাঁ সাহেব, আব্দুল করিম খাঁ— সারাই গর্ন্ধব এঁদের গায়কী ভাল লাগে। এঁদের গানে প্রাণ আছে ভাব আছে। কসরত কম থাকে - তান বোল থাকলেও এক ধরনেব সংযম এবং সঞ্চলন থাকে। এঁরা রাগকে মূল আঙ্গিক থেকে কক্ষণো বিচ্যুত হতে দেন না। এঁবা রাগের গভীরে অবগাহন করেন। উপরিতলে লাফালাফি কবেন না। আমায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।' এই সব কথা আমরা ইংরেজিতেই বললাম। আমার বোঝাব জ্ঞান সে সময় কিছুই ছিল না। এখন না হয বাংলা বই পড়ি; চেষ্টা চরিত্র করে লিখিও। লেখবার সময় কিন্তু দেবনাগরী হরফ ব্যবহার করতে হয়।

সেই বছর জু পিয়ো শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে 'ঘোড়া' ছাত্রদের মধ্যে বেশ লোকপ্রিয় হযেছিল। সকল সুরিযা— শ্রীলঙ্কাব ছেলে— সব সময় বড় বড় নেপালী কাগজের পাতা নিয়ে ক্যালিগ্রাফিব অভ্যাস করত। একবার ব্রাশের ক্ষিপ্র

টান দিয়ে মাস্টারমশাইয়ের পোর্ট্রেট করল। মানিক দেখাদেখি আর এক পোর্ট্রেট করল। ব্রাশের টান ছিল আরও জোরালো এবং চরিত্রের সাদৃশ্য আরও বিশ্বস্ত। মানিকের ড্রয়িংয়ের হাত স্বভাবত রূপ-নির্ভর ছিল। ফুল পাতা মানুষ স্কেচ করতে গিয়ে তাকে বেশি ধস্তাধস্তি করতে হত না। সহজভাবে রেখায়ন করা তার কাছে কঠিন ছিল না। জ্যু পিয়োর ঘোড়াগুলি কাগজে যে ভাবে লাফ দিয়ে প্রকাশ পেতো— সেই কৌশল ছাত্রদের বেশ প্রভাবিত করেছিল।

পৃথ্বীশ (নিয়োগী) ছিল আমাদের মধ্যে তাত্ত্বিক। সে নতুন নতুন শিল্প-সমীক্ষার বই পড়ে আমাদের বোঝাতো রোজার ফ্রাই, হার্বার্ট রিড, বিকেন্সকী— কুমার স্বামী এঁদের লেখা পড়ে অনেক শিল্পীদের কাজেব সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। পৃথ্বীশ মাঝে মাঝে কিঙ্করদা বিনোদদার সঙ্গে শিল্পের আধুনিক চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করত। মানিকের মতে কিঙ্করদার কাজে ভাবনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থাকে। কিঙ্করদার পলাশ ফুল গাছের স্কেচ দেখে মনে হয় সবুজ নীল গহনতার মধ্যে 'হঠাৎ খুশী ঘনিয়ে আসে' লাল-সিঁদুর রঞ্জিত! অনুভূতির প্রাণসঞ্চার থাকে। বিনোদদা কিন্তু নিজেকে এই ধরনের মুহূর্তের মধ্যে জ্বলন্ত আগুন ধরে কাজ করেন না। তাঁর কাজে বিষয়-বিশ্লেষণ এবং শেষে এক ধরনের টান থাকে যেটা ক্রমশ ধ্যান ও গাম্ভীর্যে পরিণত হয়। যখন আমি কিঙ্করদা আব বিনোদদাকে নিয়ে তথ্যচিত্রের কথা মানিককে বললাম, মানিক চট করে আমাকে লিখল— 'দেখো দিনু বিনোদদার সঙ্গে কাজ করা মনে হয় আমার পক্ষে সহজ হবে। আমি আগে বিনোদদারই উপর তথ্যচিত্র করব।' এটা হলো পরেকার (১৯৭০-র) কথা।

কিচেনে আমবা দল বেঁধে এক সঙ্গে যেতাম। আমি, মানিক, পৃথ্বীশ, মুথু, প্রসন্ন, সকল সুরিয়া। সেখানে ডানদিকে নিরামিষাশী আর বাঁ দিকে আমিষাশী। কিচেনে ঢোকবার সময় আমি, পৃথ্বীশ, মুথু, প্রসন্ন ডানদিকে। বাঁ-দিকে মানিক, সকল সুরিযা— এরা। প্রায় প্রত্যেকদিন মানিক বলত, তোমরা ঘাস পাতা খেয়ে ছাগল শ্রেণীতে পড়ে যাও। মানুষে খায়— মাংসের কালিয়া, মাছের ঝোল, ডিমের ওমলেট। মানিক কোনও দিন রান্না না-করা জিনিস পছন্দ করে নি। ফল মূল কন্দ তার ভাল লাগত না। অনেক বছর পরে যখন মানিক আমাব বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এল সে সময় ভুল করে আমার স্ত্রী পুষ্প ধনেপাতা তরকারির উপরে দিয়ে ছিল। পরে তার খেয়াল হল মানিকদা তো ওই ধরনের কাঁচা জিনিস খায় না, চট করে ধনেপাতা বাদ দিয়ে আর এক বাটিতে তরকারি পরিবেশন করল।

কিচেনের সামনে চৈতির প্রাঙ্গণে অনেকবাব ছাত্র-ছাত্রীরা টীকা-টিপ্পনী সহ কাগজ-কার্টুন ছড়া এইসব টাঙিয়ে দিত। এক বিশেষ মোটা ছাত্রী ছিল— তার মানিকের প্রতি বোধহয় দুর্বলতা ছিল। মানিক সেটা লক্ষ্য করেছিল। এক দিন মানিক একটা মজাদার কার্টুন করলো। কুমড়ো পটাশ! কুমড়োর মুখ ও সেই মোটা ছাত্রীর চেহারা বেশ চেনা যায় একরকম। সেই কার্টুন দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীরা দেখতে দেখতে মন্তব্য করতে করতে চলে গেল। এই ভাবে এক অপরিণত সংঘাতের সমাপ্তি হল।

১৯৪০-এর ডিসেম্বর মাসে কলাভবনের বার্ষিক ভ্রমণ দুমকায় হবে স্থির হয়েছিল। পৃথ্বীশ এই ধরনের পিকনিক পছন্দ করত না। সে পরামর্শ দিল— আমরা চারজন যদি দল বেঁধে অজন্তা, ইলোরা, এলেফান্টা-খাজুরাহো যাই তাহলে স্টুডেন্ট কনসেশন পাব।

দেখা হবে— শিক্ষাও হবে। মাস্টারমশাই পছন্দ করবেন। ব্যস— ঠিক হল, মানিক, পৃথ্বীশ, আমি আর মুথু সর্বভারত ভ্রমণের জন্য সর্ব ভারত প্রতিনিধি। আমি পশ্চিমা—মুথু দক্ষিণী— মানিক আর পৃথ্বীশ পূর্ব ভারতের। আমার হিন্দী জানা ছিল তাই জন্য উত্তর ভারতও আমার ভাগে ছিল। এই যাত্রার সম্বন্ধে আমি পূর্বেই 'এক্ষণ' পত্রিকায় লিখেছি। তার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। কিন্তু দু'একটি কথা উদ্ধৃত করার চেষ্টা করি।

আমরা চারজন চক্রাকারে ভ্রমণের টিকিট, প্রতিটি উনিশ টাকা বারো আনায় কিনে ট্রেনে কোনোরকমে ঠেলাঠেলি করে উঠলাম। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের যাতায়াত চলছে। তাদের মধ্যে ওঠা সহজ ছিল না। মিলিটারি কামরায় ওঠা অসম্ভব। অথচ প্রায় সব কামরায় উর্দি-পরা জওয়ানদের ঠাসাঠাসি। ঠাণ্ডার দিন ছিল বলে রক্ষে। বেশ শরীর গরমে এবং মনের উৎসাহে সময় কী রকম কাটল, বোঝাই গেল না। ভুল ট্রেনে ওঠা, টি. টির সঙ্গে কথা কাটাকাটি, মারাঠি মালয়ালী ভাষা বলে টি. টি-কে নিরুত্তর করে আমাদের জলগাঁওতে পৌঁছনো— এই সবেতে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। অজন্তায় আমার বাবুর্চিগিরি, পৃথ্বীশ, মানিকের বাবুর্চির অ্যাসিস্টেন্টশিপ রীতিমত চলছিল। এলোরার ডাকবাংলোরএক ঘটনা মনে পড়ে। আমরা গুহাগুলি দেখে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছি। চাপরাশি আমাদের বাজরার রুটি আর ঝাল লঙ্কাসহ আলুর তরকারী খাইয়ে দিল। ঠোঁট-নাক-কান-চোখ ঝালের ঝাঁঝে ঝালাপালা করছিল। কোনোবকম জল খেয়ে আমরা চারজনই মাটিতে বিছানা পেতে শুয়েছি। দরজা বন্ধ করেছি। মাঝ রাত্রে এক অদ্ভুত আওয়াজ— 'ঠন্ ঠন্ ঠন্'। দু মিনিট পরে আবার 'ঠন্ ঠন্ ঠন্'— আবার কিছু সময় পরে 'ঠন্ ঠন্ ঠন্।' মানিক স্পষ্ট গলায় বলল— হোয়াটস দ্যাট! আমি ভয় পেয়েছিলাম— বললাম— সামথিং রিংগিং— আবার ঠন্ ঠন্ ঠন্। আমি লাফ দিয়ে উঠলাম— বন্ধ দরজার উপরে লোহার একটা ছোট সাইনবোর্ড ছিল। এক দিকে অকোপায়েড আর এক দিকে অ্যাভেলেবল লেখা। সেটা হাওয়াতে দরজার পাল্লাতে আঘাত করে 'ঠন্ ঠন্ ঠন্' আওয়াজ তুলছিল। হাত দিয়ে জোরে টেনে দড়ি ছিঁড়ে সাইনবোর্ড নামিয়ে দিলাম। স্বস্তি হল, ঘুমও হল। কিন্তু আমরা রীতিমত ভয় পেয়েছিলাম।

এরপর আমরা এলেফান্টা গুহা হয়ে গোয়ালিয়র খাজুরাহো যাবো। পূর্বোক্ত লেখায় আমি উল্লেখ করেছি। তার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। শুধু আমরা খাজুরাহোতে যে স্থানে শুয়েছিলাম তার উল্লেখ করব। খাজুরাহোতে আমবা সারাদিন তন্ন তন্ন করে মন্দিরগুলো দেখেছিলাম। পৃথ্বীশ আমাদের সুশিক্ষিত গাইড— চন্দেলা রাজাদের শিল্পানুরাগ, ওড়িশা এবং খাজুরাহোর কাজেব মধ্যে পার্থক্য। কামোন্মত্ত মূর্তিদের ভাব-ভঙ্গিতে অলংকরণের ছন্দ। মানবমূর্তি প্রকারান্তরে লতাগুল্মে রূপান্তরিত। মনুষ্য-বৃষ-পশু-পাখি যেন একই পরিবারের। এই ভাবাত্মক একতা ভারতীয় শিল্পের বিশেষ দিক। ওদের প্রকৃতি এবং মানব এই তফাৎ জানা ছিল না। না হলে শকুন্তলাকে বিদায় দেবার জন্য বৃক্ষ এবং লতা কেন অশ্রুক্ষরণ করত। কেন প্রস্তুব ও অহল্যা এক হয়ে সহস্র বর্ষ একীভূত হয়ে ছিল। পৃথ্বীশ এমন রসিযে কথা বলত যে তা শুনে মনে হত মূর্তিগুলো জ্যান্ত হয়ে মন্দির গাত্রে ক্রীড়া করছে। কিন্তু শিল্প দিয়ে পেট ভরে না— বা দিনের ক্লান্তিও দূর হয় না।

কোনোরকম দু মুঠো খেয়ে শোবার জন্য জায়গার তল্লাশি শুরু করলাম। শোব

আর কোথায়? কোনো হোটেল নেই, ধর্মশালা নেই, কোনো ছাদ নেই— যার তলায় চুপ করে পড়ে থেকে রাত কাটাই। শেষে এক গোয়ালঘর পাওয়া গেল। খড়ে ভরতি। এক পাশে গোরু মোষগুলি— হুশ-হাস-ধুপ-ধাপ করে পা নাড়াচ্ছে। লেজে পোকা মাছি তাড়াচ্ছে। 'জয় খাজুরাহো' বলে আমরা শুয়ে পড়লাম। কনকনে ঠাণ্ডাতে গোরুগুলোর নিঃশ্বাসে খুব গবম তাপ দিচ্ছিল। শুধু দুর্গন্ধে ভবা ছিল। সকাল সকাল উঠে আবার চায়ের সন্ধান। এবং স্কেচ বই নিয়ে মাস্টারমশাইকে দেখাবার যোগান।

শান্তিনিকেতনে পুজোর পর আমবা অজন্তা পরিক্রমার হিরো। আমাদের স্কেচ বই ভরতি। মুথু অনেক ফটো তুলেছিল। মাস্টারমশাই আমাদের বাহবা দিলেন।

সে সময় প্রাণেশ বলে এক জোয়ান ছেলে কলা ভবনে ভর্তি হয়েছিল। সে ছিল খাঁটি বরিশালী বাঙাল। বেশ লম্বা, ৫'-১১'' হবে। মানিকের চেয়ে দু-তিন আঙুল কম।

সকালবেলার ক্লাসের পর বেশ ঘন্টাখানেক ধরে শরীরে তৈলমর্দন করত আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করত। একদিন কী একটা বই পড়ছিল। 'মানিকবাবু 'দ্য ওডোর' মানেটা কী?' 'দ্য ওডোর' দেখি দেখি কোথায় লেখা আছে? একটি প্রবন্ধের মুখবন্ধে 'থিয়োডর রুজভেল্ট'- এর নাম ছাপা ছিল। এর প্রথম তিন অক্ষর 'বোল্ড টাইপ'-এ ডিজাইন দিয়ে বক্স করা ছিল। আমরা হেসে আর কুল পাই না। মানিক ওকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। প্রাণেশের শবীর চর্চা বিশেষভাবে ছেলেদেব মধ্যে বিখ্যাত ছিল, কলাভবনে ভর্তির সময়ে তার বিবাহ হয়েছে। সব সময় সে একান্তে দুঃখ করত— সে ভাবত, সে যদি অবিবাহিত থাকতে এখানে আসত তা হলে অনেক ভাল ভাল পাত্রী পাবাব সুযোগ হতে পারত। হায় কপাল! পরবর্তীকালে মানিক যখন কিমার-এ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট বলে খ্যাতি অর্জন করেছে সেই সময় প্রাণেশ অনেক মলাটের কাজ, বিজ্ঞাপনদাতাদের কাজ— মানিকেব হাত দিয়ে করত— এবং কিছু উপার্জন কবত। মানিকের বন্ধুবাৎসল্যে সব সময় অন্যেরা উপকৃত হয়েছে। তাতে কোনও কার্পণ্য ছিল না।

১৯৪১ সালের জুন মাসে গুবরুদেবকে কলকাতা নিযে যাওয়া হয়েছে। গুরুদেব আশ্রমের বাসে বসে শালবীথি, সিংহসদন, শ্রীভবন, আদি ঘুরে ঘুরে যাবার আগে দেখে নিলেন। সেই সময় নন্দিতা, বিশুদা, মাসোজী, সবাই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অগাষ্ট মাসের আট তারিখে সকালে বোধহয় মল্লিকজী সবাইকে জানালেন, গুরুদেবের অবস্থা অবনতির দিকে। যাঁরা কলকাতা যেতে চান — যেতে পাবেন। আমি আব মানিক জোড়াসাঁকোয় গিয়ে যা দেখেছি সেটা অবিস্মরণীয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমুদ্রে আমরা হারিযে গিয়েছি। কোনোরকমে বাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাসায় পৌঁছলাম। চটিগুলি হারিয়ে, ঘামে ভিজে, হুশ-হাশ করতে, মনেব দুঃখ মনে বেখে গুরুদেবের কথা ভাবতে থাকলাম। পরের দিন আবাব শান্তিনিকেতন। গতকাল আব আজকের মধ্যে — কত পার্থক্য। অথচ সব বাড়ি, সব গাছ যেমন ছিল তেমন থেকে গিযেছিল। মনের মধ্যে এক বিরাট শূন্যতা জন্ম নিল।

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে আশ্রমের জীবনধারায় ব্যাঘাত ঘটল। রেললাইন বন্ধ। আমি স্বদেশী দলের সঙ্গে যুক্ত হলাম। কলাভবনের অনেক ছাত্র পদযাত্রা করে কুড়ি মাইল হেঁটে মাঝরাত্রে পানাগড় গেল। তাদের মধ্যে মানিকও ছিল। পায়ে হাঁটার দীর্ঘ পরিশ্রমে মুথু প্ল্যাটফর্মে অজ্ঞান হযেছিল। স্টেশনে গিয়ে ওরা জানতে পারল পাঁচ

মিনিট আগেই এক ট্রেন কলকাতা অভিমুখে ছেড়েছে। এর পরের ট্রেন আসছে ছ ঘন্টা পরে। আমি সেই দলে ছিলাম না। আমি সিউড়ি জেলে ইংরেজ রাজার অতিথি হয়ে দিন যাপন করছিলাম।

কথা প্রসঙ্গে একবার ফিল্ম সম্বন্ধে আমরা বলাবলি করেছিলাম। চার্লি চ্যাপলিনের হাসির পিছনে কি রকম একটা করুণা এবং সহানুভূতির স্রোত অনবরত প্রবাহিত হয় সেই কথা হচ্ছিল। মানিক 'দ্য কিড', 'গোল্ড রাশ' সম্বন্ধে বলার পর 'দ্য গ্রেট ডিকটেটর' সম্বন্ধে বলল। সেই ছবি আমর দেখা ছিল না। মানিক বর্ণনা করতে করতে ডিক্টেটর যে রকম জার্মান ভাষায় ধ্বনিতে আগড়ুম বাগড়ুম কথা বলে যাচ্ছে, যে রকম হাত পা ছুড়ে আক্ষরিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে, আর মাঝে মধ্যে গলা শুকিয়ে গেলে জল খাচ্ছে আবার ঠাণ্ডা হবার জন্য প্যান্ট ফাঁক কবে জল ঢালছে সেই ঘটনাগুলি অবিস্মরণীয়। এই সব মানিক বলে গেল। অনেক বছরের ব্যবধানে যখন আমি ফিল্মে তা দেখলাম মানিকের বর্ণনা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

মাস্টাবমশাই নন্দলালের প্রতি মানিকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর ড্রয়িং-এ লাইনের জোর, রূপের আদিম ছন্দ ধরবার তাঁর প্রতিভা, আর সংরচনার (কম্পোজিশন) সময় গড়নের প্রতি তাঁর অধোরেখন, এই সব মানিক একান্তভাবে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছিল। পরবর্তীকালে মাস্টারমশাইয়েব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখল 'আমার পথের পাঁচালীর ভিস্যুয়াল-এর মধ্যে যা সাদা কালোর ডায়ানামিক্স ও সামঞ্জস্য রয়েছে সেটা নন্দলালের দান বলে আমি মনে করি।'

কিঙ্কবদার রোমান্টিসিজম ও বোহেমিয়ান স্বভাব যদিও ভালো লাগত, মানিক মনে করতো কিঙ্করদা ভিন্ন চরিত্রের লোক। তাঁব কাজে আবেগ আছে, আঙ্গিকেব গ্রহণ, বিশ্লেষণ আছে। বঙের কাব্যময়তা আছে। তবুও মানিকের নিজেব অভিব্যক্তির সঙ্গে মিল হয় না।

বিনোদদার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মানিক বিশেষভাবে সেনসিটিভ ছিল। বিনোদদা নিরালা লোক। নিজেব চিন্তা দিযে দৃশ্য জগতের অনুধাবন করেন। বিনোদদা যে অর্থে রেখাকে প্রাধান্য দেন, যেভাবে বলেন— 'আই বিলিভ ইন লাইভ ডিজাইন' — তাতে তাঁর চবিত্রেব সার পাওয়া যায়। রেখা আঙ্গিককে ব্যাখ্যা কবে। রূপের নির্যাস রেখায় অঙ্কিত হয়। যে রকম সোতাৎসু হোকুসাই বেখার পবীক্ষা-নিরীক্ষা কবতে গিয়ে সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই সত্যই হল প্রকৃত রূপ-সত্য।

১৯৪৮ সালে আমি দিল্লীতে শিল্পী হিসাবে স্থান পাবার চেষ্টায় ছিলাম। একদিন মানিকের চিঠি পেলাম— 'আমাব একটা স্কেচ বই আছে, সেটা ববিশংকর তোমাকে দেবে। সেটা সংগ্রহ করে আমার কাছে পাঠাবে।' পবদিন ববিশংকব খাতাটি আমাকে দিলেন, তাতে কী সুন্দর ভিস্যুয়াল স্ক্রিপ্ট ছিল। মানিক বোধহয় এক সময রবিশংকরের উপব ডকুমেন্টারি করবার পরিকল্পনা করছিল। ববিশংকরের অনেক দিক থেকে সেতার ক্লোজআপস, ফেড্‌আউটস, হাইলাইটস, ক্রিসক্রস ফোর শর্টিংস, হাতের ভঙ্গি, সব শুদ্ধ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, ইনস্‌পাযারড কাজ। প্রত্যেকটি রবিশংকরের চেহাবার ইঙ্গিত করা সাদৃশ্য। দেখে খাতাটি রেখে দেবার লোভ হয়েছিল। পরের ডাকেই আমি সেই খাতা মানিকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম।

১৯৬১ হবে— মাস-তাবিখ ঠিক মনে নেই। মানিক হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে

এলো। বাবর রোডে আমি থাকতাম। চারিদিকে কলরব। প্রখ্যাত ফিল্ম নির্মাতা সত্যজিৎ রায় কৌশিকের উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আশেপাশে যাঁরা বাঙালি ছিলেন, তাঁরা চুপি চুপি একবার দেখে অন্যদের অঙ্গুলি নির্দেশ করে পাঠাতে শুরু করলেন। মানিক বললো 'দিনু, আজকে আমার ফিল্ম দেখানো হচ্ছে সাপ্রু হাউসে। পণ্ডিতজী আসবেন, সেই লম্বা মার্কিন অ্যামব্যাসাডর গালব্রেথ— সেও আসবে। সে আমার চেয়ে এক বিঘৎ লম্বা। তুমি পুষ্পার সঙ্গে দেখতে এসো। কী ভালো লাগছে — বোলবো। এই সময় যদি মা থাকতেন— কী না আনন্দ পেতেন, সত্যি, তাঁর শূন্যতা আমি বিশেষভাবে এই সময় অনুভব করি।'

১৯৬৭ যখন আমি কলাভবনে অধ্যক্ষ হয়ে শান্তিনিকেতনে আসি মানিক প্রথমেই আমাকে অভিনন্দন জানাল। 'খুব ভালো হোলো। এখন মাঝে মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হবে। গান শোনা হবে— ছবি দেখা হবে।'

১৯৭০ সালে মানিক ইনার আই-র শুটিং করবার জন্য শান্তিনিকেতন এলো। তাকে আমি অনেক আগে লিখেছিলাম। 'মাস্টারমশাইয়ের একটা ডক্যুমেন্টারী দেখলাম, তাতে বিশেষ চরিত্র-সূত্র নেই। শুধু কয়েকটি চলন্ত ছবি বয়েছে যাতে মাস্টারমশাইয়ের স্মৃতি ধরা হয়েছে। এখন তো মাস্টারমশাই নেই কিন্তু বিনোদদা, কিঙ্করদা রয়েছেন— এঁদের ছবি যদি করো, একটা দুর্লভ ডক্যুমেন্ট থেকে যাবে।' উত্তরে মানিক লিখলো 'হ্যাঁ, ঠিক কথা বলছো— আমি প্রথমে বিনোদদার উপব কাজ করব বলে স্থির করেছি।'

বিনোদদা ইতিমধ্যে নানান কথা শুনছেন। মৃণাল সেন ডক্যুমেন্টারি করবার প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন ইত্যাদি। বিনোদদা খুশী ছিলেন না। উনি আমাকে বলে পাঠালেন— 'দেখো কৌশিক, সত্যজিতকে আমি চিনি ও যদি আমার সম্বন্ধে ছবি করে তা হলে আমি রাজী আছি। অচেনা লোকের সামনে এই পোজ নাও, এইরকম বোসো, এই সব বললে আমার পিত্তি জ্বলবে।' মানিকের দল এসে মাস খানেক থেকে ছবি তুলল। তার পরে মানিক কাঠমাণ্ডু, পাটনা, মসুরী, বনস্থলী এইসব জায়গা থেকে ছবি তুলল। কলকাতা থেকে বিনোদদার আত্মীয়দের কাজ থেকে ছেলেবেলাকার ফোটোগুলি সংগ্রহ করেছিল। তারপর এই সব মশলার এডিটিং ও তার উপর মানিকের রানিং কমেন্টারি ইনার আই ডক্যুমেন্টারি হিসাবে এক অদ্বিতীয় কীর্তি। তার সমকক্ষ তথ্যচিত্র ক্বচিৎই পাওয়া যায়।

এই গত জানুয়ারি মাসে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে পুষ্পা আর আমার কন্যা দয়ানী আর জামাই দিলীপ বাসু এরাও ছিল। সেই সময় মানিককে দেখে, তার সঙ্গে পুরনো দিনের কথা বলে কী ভালো লেগেছিল। তার শরীর কিন্তু দুর্বল লাগছিল। বলল— 'আজকে দয়ানীর জন্মদিন শুনেছি। বিজয়া সেই উপলক্ষে স্পেশাল বার্থ-ডে কেক বানিয়ে এনেছে। এ সব খাবার জিনিষ দেখেও স্বাদ পাওয়া যায়। আমার কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে স্যালিভারি বাডস শুকিয়ে গিয়েছে। যা মুখে দি ঘুরে ফিরে গলার নিচে নামে না। লুব্রিকেশন-এর অভাব। আজকে তবুও ৪০% ইমপ্রুভড় দেখছি। যাই হোক, আর বেশি খেতে পারবো না। এই যথেষ্ট।'

নির্মাল্যদা পেছনে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন— একবার জানালা বন্ধ করে দিলেন। যখন ফোটো তোলা হচ্ছিল— নির্মাল্যদা গ্রুপের বাহিরে থাকবার কথা বোধহয় ভাবছিলেন।

তাকে কাছাকাছি রেখে মানিকের সঙ্গে চার পাঁচ ফোটো তোলা হল। আমরা খুশী মনে বিদায় নিলাম।

মানিক পুরনো বন্ধুদের এত সহজভাবে নিজের বলে মেনে নেয়। সে এত বিরাট সৃজনী শক্তির অধিকারী, ফিল্ম নির্মাতা, গল্প লেখক, সংগীতকার ও অলৌকিক প্রতিভাধর হয়েও আমার মত সাধারণ ব্যক্তিত্বের মানুষকে আপনজন মনে করে। এত তার মহানতা আর গৌরবের এক বিশেষ দ্যোতক।

মানিক

বিজয়া রায়

ছোটবেলায় পাটনায় থাকতাম বাবার সঙ্গে। সেই সময়েই বাড়িতে একটা গানের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল সঙ্গীতের উপর বাবার অসাধারণ আকর্ষণের দরুন। বাবা চাইতেন আমি খুব ভালো করে গানবাজনা শিখি। কিন্তু ওখানে শেখাবার মতো তেমন কোনো গুরু ছিলেন না। সাহানা দেবী মাঝে মাঝে পাটনা যেতেন। তখন ওঁর কাছে শিখতাম হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথের গান। বাবা সব সময় গাইতেন। সবরকম গানই। তবে Western সঙ্গীতই বেশী।

তখন প্রতি বছর কলকাতা আসতাম। স্কুলের ছুটিছাটাতে। সেই সময় ছোটপিসি কনক বিশ্বাসের কাছে গান শিখতাম। আমাদের পরিবারে গান কিন্তু সকলেই গাইতেন। এই গাওয়াটা এমন একটা সংস্কারের মতো হয়ে গিয়েছিলো যে, কেউ গান গাইতে না পারাটাই আশ্চর্য ব্যাপার হতো। অবশ্য তার মধ্যে Standard -এর তারতম্য নিশ্চয়ই ছিলো। দিলীপ রায় তো খুব হৈ-চৈ-এ মানুষ ছিলেন। তিনি প্রায়ই আমাদের বগলদাবা করে নিয়ে যেতেন গানের আসরে গাইতে। আমাদের বাড়িতে কিন্তু কোনো বাজনা ছিলো না। না হারমোনিয়াম, না এস্রাজ, না তবলা। শুধু গলায় প্রাণ খুলে গাইতাম বলেই খোলা গলার আওয়াজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। ছ সাত বছর বয়সেই স্টেজে গাইতাম! তখন হারমোনিয়াম তবলা নিয়ে যন্ত্রীরা যখন বাজাতেন একটুও অসুবিধা হতো না। সুর ও লয়টা এমন ভাবে মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিলো। বাবুকে (সন্দীপ) আমি ছোটবেলা থেকে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতাম, তা ছাড়াও সবসময় গান শোনাতাম এবং ওকে গান গাওয়াতাম। এইরকম ভাবে শুনে শুনে ওর মধ্যে মিউজিকের সেন্সটা দারুণভাবে কায়েমী হয়ে গেছে। গলাও চমৎকার। মানিককে তো এ বিষয়ে সহজাত সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারীই বলা যায়। ও একজন অসাধারণ composer ও। আমার মা মাধুরী দেবী গান গাইতেন না, কিন্তু গানের ওপর ছিলো তাঁর প্রাণের ভালোবাসা। আমার ঠাকুমার বাবা কালিনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন মস্ত বড় গাইয়ে, বোদ্ধা এবং সঙ্গীতবিদও। ওঁর সময়ে রবীন্দ্রপ্রভাব একেবারে ছিলো না বললেই চলে। ব্রহ্মসঙ্গীতে ওঁর রচিত অনেক গানই আছে।

একবার কলকাতায় ছুটিতে যখন বেড়াতে এলাম জোড়াসাঁকোতে বর্ষামঙ্গল অভিনয়ের মহড়া চলছে। ছোটপিসির জন্য নির্দিষ্ট গানের তালিকায় ছিলো, 'অশ্রুভরা বেদনা'। আমি কলকাতায় পৌঁছে বাড়িতে পা দিতে না দিতেই ছোটপিসি বলে ওঠেন, ঐ গানটা তোকে দিয়ে গাওয়াব। তক্ষুণি তুলিয়ে দিলেন, 'অশ্রুভরা বেদনা' আর 'বন্ধু রহ সাথে'। তখন আমার বয়স বড় জোর সাত। কিন্তু অত কঠিন কঠিন সুরের বড় বড় মীড়ের টানের সুর, টপ্পার তান (বন্ধু রহ সাথে) দেওয়া বিলম্বিত লয়ের তান তুলতে একটুও দেরি হলো না। আসলে গানটা আমাদের পরিবারের সকলের কাছেই ছিলো নিঃশ্বাস

প্রশ্বাসেব মতোই স্বাভাবিক ব্যাপার।

গান তুলিয়েই ছোটপিসি আমায় জোড়াসাঁকো নিয়ে গেলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তখন রিহার্সাল দেওয়াচ্ছেন। ছোটপিসি ওঁকে বললেন, আজ আমি গাইবো না। আমার ভাইঝি গাইবে। উনি শুনে অবাক হয়ে বললেন, ঐটুকু মেয়ে! ও কি পারবে? গান শুনে কিন্তু শুধু খুশিই হলেন না। একটু আশ্চর্যও হলেন। আমার মাথায হাত রেখে বললেন, আজ বিজয়া গাইবে।

আর একদিন সকালে ছোটপিসির সঙ্গে গেলাম সঙ্গীত সম্মিলনীতে। সঙ্গীত সম্মিলনী তখনকার দিনের শিল্পীদের আত্মপ্রকাশের পক্ষে মস্তবড় একটা প্লাটফর্ম ছিলো। ওখানে শেখাতেন তখনকার দিনের সঙ্গীতজগতের প্রায় সকল সঙ্গীতনায়করা। কণ্ঠ ও যন্ত্র দুই-ই। এনায়েৎ খান, হাফেজ আলি, গোপেশ্বব বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কে নয়? ঐ সঙ্গীত সম্মিলনী প্রতিষ্ঠান থেকে সে যুগের অনেক নামী শিল্পী তৈরী হয়েছেন। সকালবেলা ছোটপিসি আমায় সঙ্গে করে সেখানে নিযে গিযে যেই না বললেন, আজ বিকেলের অনুষ্ঠানে এ গাইবে, ওঁদেরও অবাক লাগে। কি বলে? ঐটুকু মেয়ে ষ্টেজে গাইবে! কিন্তু কনক বিশ্বাস বলছেন। অগত্যা বাজী হলেন।

বিকেলে স্টেজে গাইতে উঠেই দেখি সামনেব সারিতে সাহানা দেবী বসে। গাইলাম ওরই শেখানো একটি হিন্দী গান। গাইবার আগে যাঁরা তানপুরা, হারমোনিয়াম, তবলা সঙ্গত করবেন, আমায় জিজ্ঞেস করলেন, কোন স্কেলে গাইবে? তাতো জানি না। ওঁরা আমার গলা শুনে নিয়ে স্কেল ঠিক করে যন্ত্র বাঁধলেন। গাইলাম। গান শেষ হবাব সে কি হাততালির শব্দ। সমুদ্রের বালিয়াড়িতে যেন অজস্র ঢেউ আছড়ে পড়লো। Mrs B L. Choudhury ছিলেন সঙ্গীত সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাত্রী। উনি wings থেকে আমায় আরো গাইতে বললেন। তখন গাইলাম, 'দীন দয়াল গোপাল,' এ গানও শিখেছিলাম সাহানা দেবীব কাছে। এ গানের পর হাততালিতে হল ফেটে যাবাব মতো অবস্থা। স্টেজ থেকে নামতেই অনেকে আমায় অভিনন্দন জানিয়ে মেডেল announce করলেন। যদিও একটা মেডেলও পাইনি, তাব জন্য আমার মনে এতটুকুও ক্ষোভ ছিলো না। অত বড় বড় বিদগ্ধ সমঝদাবের তারিফ পাওয়াটাই ছিলো মস্তবড় পুবস্কাব। বাবা মা তো আমার সম্বন্ধে রীতিমত গর্বিত হয়ে উঠলেন।

আমার বাবা চারুচন্দ্র দাশগুপ্তর ডাকনাম ছিলো 'ময়না'। সাহানা দেবী বললেন, মংকু (আমাব ডাক নাম) আমাদের সব্বাইকে ছড়িয়ে যাবে। কিন্তু তা আর হলো কই?

যাই হোক যা বলছিলাম। আমার বাবা সঙ্গীতপ্রাণ মানুষ ছিলেন একটু আগেই বলেছি। এবং ওঁরই তাগিদে আমায় গান শেখাতে শেখাতে সাহানা দেবী প্রায়ই বলতেন, ময়নাদা বিজয়াকে গানেই দাও। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, রাগপ্রধান, রবীন্দ্রনাথের গান তো আমার প্রিয় ছিলই। এ ছাড়াও বাবার প্রচুব ওয়েস্টার্ণ রেকর্ডের collection ছিলো। বীটোফেন, বাক, মোজার্ট থেকে কেউ বাদ ছিলেন না, মানিকেরও ছোটবেলা থেকে সব রকম গান বিশেষ করে ওয়েস্টার্ণ মিউজিকের ওপর ভীষণ ঝোঁক ছিলো। আমারও তাই এবং সেটা বাবারই জন্য। আমরা দুজনে একসঙ্গে এই সব রেকর্ডের স্তূপ নিয়ে ছুটির দিনে বা অবসর সময়ে শুনতে বসতাম। তাছাড়া তখন ছিলো Second World War-এর সময়। সেই সময় রেডিওতেও খুব westren music বাজানো হতো। সেইসব প্রাণ ভরে শুনতামও। এই

রকম শোনা, তাই নিয়ে আলোচনার মধ্যে আমরা যেন জীবনকে তীব্রভাবে আস্বাদ করতাম। এ সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমাদের মধ্যে একটা mutual admiration গড়ে উঠেছিলো। সঙ্গীতের পথ ধরে চলতে চলতে আমরা দুজনের কত কাছাকাছি চলে এসেছিলাম বুঝতেই পারিনি। কারণ ঘটনাটা স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের রুচি, প্রকৃতি, ভাবনাচিন্তার মিল গড়ে উঠেছিলো সঙ্গীতকে কেন্দ্র করেই। দুজনে নানা জায়গায় কনসার্ট শুনতেও যেতাম।

মানিক ছিলো যাকে বলে শ্রুতিধর। যে কোনো গান বা সুর একবার শুনলেই ও তুলে নিতে পারতো নিখুঁতভাবে। ও বিউটিফুল শিস দিতো। যেকোন মিউজিকের প্যাসেজ ও শিসের মধ্যে এমন আশ্চর্যভাবে জীবন্ত করে তুলতো যে সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতো। ও ভুলিয়ে দিতো এটা পারফরমেন্স নয়, শিস। সন্দীপও বাবাব কাছে এই সঙ্গীতবোধ পেয়েছে।

সেই সময় আমি সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে কাজ কবতাম। মানিক D. J. Keymer-এর Advertising Department-এ। অফিসের পর প্রায়ই দুজনে মিট করতাম। সিনেমা দেখতে যেতাম। বেশির ভাগই ওদেশের ছবি। আমরা একটু নাকউঁচু ছিলাম। বাংলা সিনেমা দেখতামই না। আমি যদি বা মাঝে মাঝে দেখতাম, মানিক একেবারেই না। এই ভাবে চলতে চলতে হঠাৎই একদিন বুঝতে পারলাম আমরা দুজনেই দুজনের কাছে অপরিহার্য। সঙ্গে সঙ্গে এটাও জেনেছিলাম এসব কথা বাড়িতে জানিয়ে কোনো লাভ নেই। তাতে অশান্তিই বাড়বে। তারচেয়ে যেমন আছি তেমনই থাকবো।

এ সব শুনে এখন অনেকেই অবাক হয়ে যান। আমাকে একজন প্রশ্নও করেছিলেন, এত অল্প বয়সে এত sobriety, গভীরতা? ভাবাই যায় না।

কিন্তু তখনকার যুগ প্রগলভতার যুগ ছিলো না। সে যুগেব শিক্ষিত মর্ডান ছেলেমেয়েরাও খুব innocent, sincere এবং sober ছিলো। তারা বিশ্বাস করত বড়দের প্রতি loyaltyতে।

শেষ অবধি কিন্তু মানিকের মা-ই উদ্যোগী হয়ে আমাদের বিয়ে দিলেন। কি ভাবে তিনি এ ডিসিশন নিলেন?

আমি ছবিতে নামলাম। 'শেষরক্ষা', 'রেনুকা' এই রকম কয়েকটি ছবিতে নাম করার পর বোম্বে গেলাম। সেখানেও চার পাঁচ বছর ছিলাম। মেজদি (সতী দেবী) তখন ওখানে থাকতেন। আমাদের দুজনের রোজগারে সংসার চলতো। ছুটিতে মানিক যেতো। সেই সময়ে ওর মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যে ডাক্তার দেখতেন তাঁকে উনি নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করতেন। আমিও বিয়ের পর তাঁকে ভাসুরের মতোই দেখতাম। তিনি মাকে বললেন, এভাবে অসুস্থ হলে, মেয়ের মতো করে সব সময় একজনের দেখাশোনা করা দরকার। বৌ আনুন।

কিন্তু মায়ের শত অনুরোধেও মানিক বিয়ে করতে রাজী হলো না। একমাত্র ছেলে সারাজীবন অবিবাহিত থাকবে এটা মা চাইতে পারেন? বিশেষ করে ছেলের ওপর যাঁব এত স্নেহ ? তাছাড়া ডাক্তারও তাঁকে বোঝালেন, অনেক বললেন, ও যাকে চাইছে তার সঙ্গেই বিয়ে দিন। ওসব সংস্কার মানবার যুগ একেবাবেই চলে যাচ্ছে। তাছাড়া ওরা যদি সুখী হয়, আপনি যদি খুশিমনে ওদের গ্রহণ করেন এসব বাধা কোথায় উড়ে যাবে।

আমার শাশুড়ী খুব মুক্ত মনের মানুষ ছিলেন। পরিস্থিতিটা বোঝার পর উনি আর আপত্তি করলেন না।

তার পর মানিক বোম্বেতে এলো। আমাদের সব কথা জানালো। বোম্বেতে রেজিষ্ট্রি হলো। কলকাতায় ফেরার পর আমার শাশুড়ী আবার নতুন করে ব্রাহ্মমতে বিয়ে দেওয়ালেন। এ বিবাহের আচার্য ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন।

বিবাহের পর আমরা কিন্তু একটি দিনের জন্যেও অসুখী হইনি। আমার শাশুড়ী আমায় কন্যার অধিক স্নেহ করতেন। সংগ্রাম? যে কোনো উচ্চাকাঙ্খী, আদর্শবাদী মানুষকেই তার আদর্শের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। তবে এ সংগ্রাম আমাদের পারিবারিক শান্তিকে একটি দিনের জন্যই ক্ষুণ্ণ করেনি। বরং আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভালোবাসাকে আরো দৃঢ় করেছে।

ওর ছবি করবার বাসনা ছিলো অনেকদিনের । আমি জানতাম সে কথা। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানতাম ও যা করতে চায় তা করবেই এবং ওর যে কোন সৃষ্টিই গতানুগতিকতাকে ছাপিয়ে অনেকদূর এগিয়ে যাবে।

১৯৪৮ সালে আমাদের বিয়ে হয়েছিলো। ১৯৫০ সালে বিলেত গেলাম। সেই সময় ডি. কে. গুপ্তর সিগনেট প্রেসে ও পথের পাঁচালীর ছোটদের Version 'আম আঁটির ভেঁপু'র Jacket ও illustration করছিলো। ফেরবার সময় জাহাজে বসে তারই drawing করতে করতে বলেছিলো এটা খুব ভালো ছবি হবে। এবং এইটেই হবে ওর প্রথম ছবি। আইডিয়াটা আমার খুব থ্রিলিং লেগেছিলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কাও জেগেছিলো। ঘটনা বা সংলাপের চেয়ে ওতে তো মানসিক বিবর্তনের ছবিটাই বড় হয়ে উঠেছে। সেলুলয়েডের বুকে সেই ছবি ফোটানো যাবে? ও বলল, হবেই! মানিক যেমন Optimist তেমন বেপরোয়া।

একটা production-এর খরচ তো আছে?

সেজন্য আটকাবে না। Let us start — ও নির্বিকার মুখে বলল। ও মাইনে পেতো ১৮০০ টাকা। তখনকার দিনে সেটা সামান্য নয়। তাতেও কি কুলোয়? আমার সব গয়না বাঁধা দিলাম। মাসের প্রথমে সব পাওনাদাররা ওর অফিসে লাইন দিয়ে দাঁড়াতো।

পথের পাঁচালী ১৯৫২ সালে শুরু হয়েছিলো। শেষ হতে লেগেছিলো তিন বছর। মাঝে মাঝে কাজ চলতো। সে যে কি tension গেছে ওর, ভাবা যায় না।

অবস্থা যখন সঙ্গীন হয়ে উঠল আমার শাশুড়ী তখন শ্রীযুক্তা বেলা সেনকে ব্যাপারটা খুলে বললেন। উভয়ের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিলো। এতদিন মা তাঁকে বলেননি কারণ তিনি একেবারেই চাননি যে ছেলে এতবড় চাকরি ছেড়ে ফিল্ম-লাইনে যাক।

যাই হোক, বেলা দেবী ডঃ রায়কে বলতে তিনি 'পথের পাঁচালী'র সব দায়িত্ব নিলেন।

পথের পাঁচালী থেকে আয় হয়েছিলো সাতাশ লক্ষ টাকা। মানিক কিন্তু এক হাজারের বেশি কিছু পায়নি। আমরা অবশ্য তাতেই পরম আনন্দে ছিলাম। কারণ আইডিয়ার রিয়েলাইজেশনটাই ছিলো আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়। টাকাটা নয়।

কোনো আইডিয়া মাথায় এলে ওকে ধরে রাখে কার সাধ্য? আমি আর বাবু অনেক দিন ধরে ওকে বলেছিলাম, এবার একটা মিউজিক্যাল ছবি কর।

হঠাৎ একদিন বলল, দারুণ একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। তারপর আমাদের শোনালো 'গুপি গায়েন বাঘা বায়েন' - এর স্ক্রিপ্ট। তখন ওর মাথায় শুধুই লিরিক। এত সুন্দর সুন্দর সব গান লিখেছিলো এই ছবির জন্য। আর কত রকমের। আমার খুব সুন্দর লেগেছিলো 'ভূতের রাজা দিলো বর' গানটা। তাছাড়া 'আর বিলম্ব নয়', মোর দুজনায় রাজার জামাই', 'ধোরো নাকো শাস্ত্রী মশাই', 'কি আনন্দ আকাশে বাতাসে'। সুরও দিয়েছে তেমনই। ও কিন্তু অন্য সবার মতো গলায় গুনগুন করে সুর রচনা করে না, সুর করে পিয়ানো বাজিয়ে। পরে নোটেশন করে নেয়।

এই নোটেশন করাটা যে কিভাবে শিখলো জানি না। ওর কাজের জন্য যখন যেটা দরকার ও চট করে শিখে নেয়। কোথায়, কখন, কিভাবে কেউ বলতে পারে না। কারণ ওর কাছে এটা একটা ব্যাপারই নয়।

ও প্রথম গান লিখতে শুরু করল, 'দেবী'র প্রোডাকসনের সময়। আমার ছেলের স্কুলের ছুটিতে ওকে নিয়ে আমি বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে আসতে আমার শাশুড়ী বললেন, জান মামণি তোমার স্বামী ব্রাহ্ম হইয়া শ্যামাসঙ্গীত লিখসে। তখনই শুনলাম ওর লেখা শ্যামাসঙ্গীত,

'এবার তোমায় চিনেছি মা
তোমার নামে কালি মুখে কালি
অন্তরেতে নাই কালিমা।'

আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিলো, আপনারা তো ব্রাহ্ম, উনি তাহলে এ গান লিখলেন কেমন করে? ভক্ত না হলে তো এ কথা বলা যায় না? উনি কি তাহলে এ সবে বিশ্বাস করেন?

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কোনো বিশেষ বিশ্বাসে অথবা অবিশ্বাসের মধ্যে ওর মনটা কোনদিনই বাঁধা নয়। আগে আমরা ব্রাহ্ম সমাজে নিয়মিত যেতাম, এখন যাই না। এটা ঠিক কোনো বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের জন্য নয়। ইচ্ছে, সময়, সুযোগের অভাবে যাওয়া হচ্ছে না। আবার ইচ্ছে হলেই যাবো। এ হলো একটা কথা আর একটা ব্যাপার হলো মানিকের imagination-এর পরিসরটা চিরকালই বড়। যখন যে বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করে তার আনুষঙ্গিক সবই ওর মাথায় যোগায় আপনা থেকেই। শ্যামা সঙ্গীত লেখার পিছনেও ঠিক এই ব্যাপারটিই কাজ করেছে।

কোনো কিছু নিয়ে ওকে চিন্তাগ্রস্ত হতে কখনও দেখিনি। দুশ্চিন্তা, মনখারাপ এসব ব্যাপারকে ও আমলই দেয় না। ব্যক্তিগত জীবনে কোনো কিছু পাওয়া অথবা না-পাওয়া নিয়েও মাথা ঘামায় না। আমাদের বিয়ের ব্যাপারেই দেখেছি। এ বিয়ে হতে পারে না বলেই জেনেছিলো। কাজেই বিয়ে করতে হবে এরকম কোনো জেদ ধরেনি। কারণ ও খুব বিশ্বাস করে ডিসিপ্লিনে। পৃথিবীতে একটা মাত্র জিনিসই ও জানে, সেটা ওর কাজ। ওকে দেখেছি কাঠফাটা রোদে দাঁড়িয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে। কোনো হুঁশ নেই। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম ও সবের ধারই ধারে না। কিন্তু কাজে বাধা পড়লেই খুব অশান্তি ভোগ করে। ১৯৭৯-৮০ সালে ওর কাজের পক্ষে মস্ত এক প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিলো লোডশেডিং। ও খুব seriously distrubed ছিলো। এত বছরের মধ্যে সেই প্রথম ওকে মাঝে মাঝে আপসেট হতে দেখেছিলাম ওই লোডশেডিং-এর জন্য।

মানিক খাওয়াদাওয়ার ব্যাপাবে খুব সংযমী। ভালবাসে সিম্পল খাবার। ওরা পূর্ববঙ্গের লোক। আমার শ্বশুরবাড়িতে মাছের কত রকম প্রিপারেশন হতো। ও সে সব ছুঁতো না। একটা মাংসের কারি কিংবা ডিমের কারির সঙ্গে রুটি— এসবই ওর পছন্দ। রুই ইলিশ ছাড়া কোনো মাছই খায় না। আমার ছেলে ভালবাসে চিংড়ি মাছ। আমি মাংসের চেয়ে মাছটাই বেশি ভালোবাসি।

বড় বাড়ি করা কিংবা জমকালোভাবে থাকা, এসবে ওর একেবারেই মন নেই। কত সময় আমি ঠাট্টা করে বলি, বোম্বের একজন তৃতীয় শ্রেণীর ডিরেকটাবও তোমায় কিনে নিতে পারে। ও বলে, Why are you so greedy ? ভদ্রভাবে থাকতে পাচ্ছ, খেতে পাচ্ছ, পরতে পাচ্ছ, ভালো গানবাজনা শুনতে পাচ্ছ, ভালো বই পড়তে পাচ্ছ— আরকি চাই? জীবনে আর কি দরকাব?

আমি বলি, সংসার তো তোমায় চালাতে হয় না? চালাতে হয় আমায়। দিনদিন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে দশগুণ করে। বাড়ির খবচও তো কত বেড়ে যাচ্ছে। এই বয়সে একটা বাড়ি নেই। একটুকরো জমি নেই। আমাদেব জীবনটা না হয় এই ভাবেই দিব্যি কেটে গেলো। কিন্তু ছেলে, নাতি? এদের কথা একটু ভাব?

ভাববার দরকার নেই। আমাব ছেলে আমার মতই নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

ছেলের সম্বন্ধে ওর খুব দুর্বলতা। বাবু আমাদের সবারই খুব আদরের। আমার শাশুড়ীর তো ছিলো নয়নমণি। কিন্তু বাড়ির সবার এত আদর পেয়েও spoilt child হয়ে যায়নি। খুব সুন্দর ছবি আঁকে। ডকুমেণ্টারী, ফিচার ফিল্ম, সবেতেই ওর aptitude আছে। পরে নিজের আইডিয়ামাফিক ছবি ও নিশ্চয় করবে। গুপীবাঘার third part, 'গুপীবাঘা ফিরে এল,' ছবিটার চিত্রনাট্য এবং Derection দুই-ই সন্দীপের। ছবিটা এখনও release করেনি। কিন্তু আমরা দেখেছি এবং ছবিটা দেখেই মানিক বলেছিলো, এর চেয়ে ভালো আমিও করতে পারতাম না।

আমরা কেউ-ই বাইরে খেতে ভালোবাসি না। ও সব পাটই নেই আমাদের বাড়ি। কাজ ছাড়া মানিকেব বাইরে ঘোরাব স্পৃহা একেবাবেই নেই। ও পুবোপুবিই গৃহমুখী। অবসব সময়ে আমরা একসঙ্গে বসে বেকর্ড শুনি। বই পড়ি। নানা বিষয়ে আলোচনা করি। ঘবের আড্ডাই আমাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ। তবে মানিক unsocial নয়। সময় পেলেই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনেব আমন্ত্রণে সামাজিক অনুষ্ঠানে যায়। কারো মৃত্যু সংবাদ পেলে মানিক তো সবাব আগে যাবে। মানিকের ফেবারিট ড্রিংক চা। চা খেতে খুব ভালোবাসে। সেইজন্য আমাদের বাড়িতে খুব ভালো চা আসে। গরমের দিনে অরেঞ্জ জুসও খায়।

টাকা পয়সার ব্যাপারে কিন্তু একেবারেই উদাসীন। কাজই ওর মনপ্রাণ সব দখল করে বসে আছে এখন, অসুখের পর অবশ্য Camera operate ছেলেই করে। আগে ও নিজেই করতো।

অসুখেব পর সবাই ভেবেছিলাম ডাক্তাবরা হয়ত ওকে কাজ করতে বারণ করবেন। কিন্তু ওঁরা study করে দেখেছেন মানিক কাজ করলেই ভালো থাকে। কাজ না করতে পারলে Deprerssed হয়ে যায়। সেই জন্য এখন বেশি rest নিতে চায় না। একটার পর একটা কাজ করে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যায়। খুব short interva

এর মধ্যেই 'গণশত্রু', 'শাখাপ্রশাখা', 'আগন্তুক' করেছে।

'আগন্তুক' তো শুরু করেছে আমার নাতির জন্মদিনে। 22nd November আমার নাতি সৌরদীপ জন্মালো। সেই দিনই ১১টায় সময় হলো আগন্তুকের প্রথম শুটিং। বাবা ছেলে দুজনেই চলে গেলে studio-তে।

ডাক্তাররা instruction দিয়ে চলে গেলেন। তার পরের সব ভার আমার। বারবার ওষুধ খাওয়ানো, সময়ে খাবার দেওয়া। মানিকের মস্তবড় গুণ ও আমাদের সকলের সঙ্গে এ ব্যাপারে খুব co-operate করে এবং সে জন্যই এত তাড়াতাড়ি সব কাজ করতে পারে। ও বোঝে কাজ করতে হলে সবার সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেকে ভালো রাখার দরকার। আমার বৌমাও অসম্ভব কাজের মেয়ে হওয়ায় বাড়ির মধ্যে একটা co-ordination রয়েছে। মাঝে মাঝে আমি অনুযোগ করি মানিককে সবাই বড্ড ঠকায় বলে, ফ্রান্সের যে প্রোডাকসনটা করলো, তার জন্য এক পয়সা পায়নি। ছেলেও না, মানিক ও নয়। এখনও তো ঠকায়। ও তো শুধু directionই করে না; একাধারে সিনারিও, গল্প, script-writer -এর কাজও করে। Music-করে। কিন্তু সে সবের জন্য কিছু দক্ষিণা পায় না।

বললে আমায় বকে, It is morally wrong বাংলা সিনেমা এর চেয়ে বেশি afford করতে পারে না সেটা মনে রাখা দরকার।

ওর যুক্তির ওপর কোনো কথা বলা যায় না। শুধু ওর ওপর শ্রদ্ধাই বাড়ে। এখন মানিক, বাবু, বৌমা, নাতি সব্বাইকে নিয়েই আনন্দে ভরপুর আমার সংসার। জীবনে কোন ক্ষোভ নেই। কোন অপূর্ণতা নেই। সব দিক দিয়েই পরিপূর্ণতায় টলমল করছে আমার জীবন।

'পথের পাঁচালী' প্রসঙ্গে শ্রীমতী বিজয়া রায়

নন্দিতা দত্ত

"পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে কি বলব? ওর কোনো কথাই তো আজ কারুর অজানা নয়।" শ্রীমতী বিজয়া রায় একটু হেসে বললেন। সেকথা ঠিক। তবু তাঁর, সত্যজিৎ রায়ের সহধর্মিণীর দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা তো হয়নি।

কবে থেকে সত্যজিৎবাবু সিনেমা সম্বন্ধে আগ্রহী হলেন?

"সিনেমা সম্বন্ধে আগ্রহ অনেক দিনের। তবে সেটা প্রধানত দর্শক হিসাবেই ছিল। ছবি করার কথা মন দিয়ে ভাবতে শুরু করেছিল আমি সিনেমাতে অভিনয় করার সময় থেকে।"

১৯৪২-৪৩-এর কথা। বিজয়া— তখন দাশ, সিনেমাতে অভিনয় করতে আরম্ভ করেন। দুটো বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। 'শেষরক্ষা' আর 'সন্ধ্যা'। তারপর বম্বে চলে যান। সেখানে বেশ কয়েকটা হিন্দী ছবিতে অভিনয় করেন। বড় রোল সব। অফিসের ছুটিতে সত্যজিৎ সেখানে যেতেন। সিনেমা করার কথাটা মনে আসে সেই সময়ই। তবে তখনও স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করছিলেন সত্যজিৎ।

১৯৪৮-এ বিয়ে হয় তাঁদের। বাইরের কাজকর্ম বিজয়ার তখন থেকে শেষ। ১৯৫০-এ দুজনে ইয়োরোপ যান। সেখানে ডি সিকার 'বাইসিক্ল থীফ' দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন সত্যজিৎ।

বিজয়ার বরাবরের ইচ্ছে সত্যজিৎ সিনেমা করেন। তাঁর পরিচালক হবার পিছনে বিজয়ার সক্রিয় অনুপ্রেরণা ছিল।

১৯৫২-তে সত্যজিৎ যখন 'পথের পাঁচালী' সিনেমা তোলার সঙ্কল্প করলেন, বিজয়া খুশি হলেন খুব। কিন্তু প্রবল আপত্তি জানালেন শ্বাশুড়ি সুপ্রভা রায়। ৩১ বছর বয়সে ডি জে কীমারের আর্ট ডিরেক্টর সত্যজিৎ তখন ১৮০০ রোজগার করেন মাসে। ভালো চাকরির বদলে এই রকম অনিশ্চিয়তার মধ্যে ছেলে ঝাঁপ দিচ্ছে, মা ভাবতেও পারছিলেন না। কিন্তু ছেলে অটল। অবশ্য চাকরি ছাড়ার কথা সত্যজিৎও ভাবেন নি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুটিছাটা দেখে শুটিং হবে—এই ছিল পরিকল্পনা। হয়েও ছিল তাই।

"তিন বছর যে লাগল ছবি শেষ হতে, এটা তার মস্তবড় একটা কারণ। প্রায় পুরো ছবিটাই ছুটির দিনে তোলা। অবশ্য আর্থিক অসঙ্গতিও একটা কারণ ছিল।" হেসে বললেন, "সব গয়না বাঁধা দিয়েছি। একবার নয়, বারবার। অনিলবাবু (প্রোডাকশন ম্যানেজার) কতবার যে পুরো গয়নার বাক্স নিয়ে গেছেন, আর কত বার ফেরত দিয়ে গেছেন, তার হিসেব নেই। মা তখন চোখে ভালো দেখেন না। বিয়ে বাড়ি যাব। ভয়ে অন্যের কাছে গয়না ধার করেছি, মাকে বলার সাহস নেই হাতের কগাছা চুড়ি ছাড়া একটি গয়নাও

নেই। সাজার পরে মা বলেছেন, 'দেখি, মামণি, কি পরেছ?' তাঁর দেখতে না পাবার সুযোগ নিয়ে কাছে যাইনি। দূর থেকে বলেছি, ' এই তো, দেখ না, সব পরেছি' তবে সব গয়না ফিরে পেয়েছি। শেষে"

এত যে খুশি হয়েছিলেন বিজয়া স্বামী পরিচালক হলেন বলে, শুটিং দেখতে গেছেন নিশ্চয় রোজই।

"না, সেটা হয়নি, 'পথের পাঁচালী'র সময়। প্রথম দিনের শুটিং-এ গিয়েছিলাম। কাশবনে অপু। সে সব শট পরে বাদ হয়ে গেল। সুবীরের বাড়ি থেকে বললেন, গাড়িতে বেশিক্ষণ চড়লে ওর বমি হয়। সারা পথ সাবধানে ওকে কোলে করে নিয়ে গেলাম। কিন্তু তারপর আর বেশিদিন যেতে পারিনি। খোকন হবার সম্ভবনা হল সেই সময়। মা গাড়ি করে অতদূর যাওয়া একেবারে মানা করে দিলেন। সত্যিই তো, ওখানে সাবধানে থাকা যেতো না। ১৯৫৩-র সেপ্টেম্বর খোকন হল। তারপর অতটুকু বাচ্চাকে ফেলে কোথায় যাব ? ১৯৫৪ তে রানুর বিয়ের সিনটা তোলা হয়েছিল। সেদিন সবাই ওখানে সারাদিন কাটিয়েছিলাম—মা, আমি, খোকন।

খোকন তো বলতে গেলে সিনেমার মধ্যে জন্মালো, মানুষ হল। মনে আছে, 'পথের পাঁচালী' যেদিন বসুশ্রীতে রিলিজ করল, খোকন তখনও দুবছব পূর্ণ করেনি। ওকে নিয়েই চিন্তা। তাই ঠিক হল ছটার শোয়ে মা যাবেন। ওকে খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, নটার শোয়ে আমি যাবো। মা ততক্ষণে ফিরে আসবেন।

বাড়িতে দুজন আছি। আমার খুব ইচ্ছে করছে হলে যেতে। দর্শক কিভাবে নিচ্ছে ছবিটা জানবার অধীর আগ্রহ। হঠাৎ, সাতটা- সাড়ে সাতটা নাগাদ, খোকন বলল, 'চল না মা' আমি আর পাবলাম না। ওকে নিয়ে সোজা হলে, মা তো হতবাক। ওদিকে ঠাকুমা, খোকনের অতি প্রিয় বংশীকাকু, সুব্রতকাকু সবাই সেখানে রয়েছেন। অতটুকু খোকনের কিন্তু কোনো দিকে নজর নেই। ওর চোখ পর্দায় স্থির। সেখানে তখন সর্বজয়া দুর্গার চুল ধরে টেনে বাড়ির বাইবে বেব করে দিচ্ছে। খোকন তন্ময় হয়ে দেখছে। অল্পক্ষণ পরেই ওকে নিযে আবার বাড়ি ফিরে এলাম। সে রাত্রে ভালো করে খেল না খোকন। কান্নাভরা গলায শুধু বলে, 'ছবি দেখব'। সিনেমা জন্ম থেকেই খোকনের বক্তে।"

'পথের পাঁচালী'র অভিনেতা অভিনেত্রীদের কি চিনতেন বিজয়া রায়?

"না, আমি তাঁদেব বিশেষ কাউকেই চিনতাম না। করুণাকে অবশ্য খুবই চিনতাম। কলেজে একই সময়ে ছাত্রী ছিলাম আমরা। অসাধারণ সুন্দরী ছিল ও আর সেই সঙ্গে একটা ঋজু ব্যক্তিত্ব। সুব্রত মানিকের বন্ধু ছিল। সে যখন করুণাকে বিয়ে করল, ওকে আরো বেশি করে চিনলাম আমরা। আমি আর করুণা সাপ্লাইয়ে চাকরি করেছি একসঙ্গে। 'পথের পাঁচালী' ছবি হলে করুণা সর্বজায়া হবে, এটা মনে মনে ঠিক ছিল অনেক দিন।

সুবীরকে কিন্তু আমিই খুঁজে বেব করেছিলাম। অপু খোঁজা হচ্ছে, মনের মত ছেলে আর পাওয়াই যায না। আমরা তখন লেক অ্যাভেনিউতে। বিকেলে একদিন এমনি দাঁড়িয়ে দেখছি, জানলা দিয়ে, নিচে পাড়ার বাচ্চারা খেলছে। বেশির ভাগই অবাঙালি। দক্ষিণ ভারতীয়, পাঞ্জাবী, সিন্ধি। একটি বছর পাঁচেকের ফুটফুটে বাচ্চা নজরে পড়ল। কাজেব মেয়েটিকে ডেকে বললাম, 'শিগগির গিয়ে দেখো তো বাঙালি কিনা।' সে ফিরে এসে

বলল, 'হ্যাঁগো বৌদি। এই তো পাশের বাড়িতে থাকে।'

হেসে ফেললেন। বললেন, " কি যে হয়রান সবাই অপু খুঁজে, আর সে কিনা আমার বাড়ির থেকে দশ গজ দূরে থাকে। তক্ষুণি ডেকে পাঠালাম। বছর পাঁচেকের অসম্ভব লাজুক একটি ছেলে। সাত-আট বছরের দাদার সঙ্গে এসে মুখ নিচু করে দাঁড়াল। একটি কথাও বের করতে পারলাম না তার মুখ থেকে। কথাবার্তা তার দাদাই যা বলল।"

সাতটা নাগাদ কথামত তার দাদা তাকে আবার নিয়ে এল। সাংঘাতিক উৎসাহিত সত্যজিৎ। স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় বাচ্চাটির লজ্জা কিছুটা ভাঙালেন। দু'চারটে কথা বলল সে। এবার বাবা-মার কাছে যাওয়া। বাবা রাজি। মার একটু আপত্তি ছিল প্রথমটায়। তারপর মত দিলেন।

"তবে বরাবরই লাজুক থাকল সুবীর। মানিক বলেছেন, ' এবার ডাইনে তাকাও, এবার বাঁয়ে দেখ, একটু হাসো — তাই করেছে। ঠিক ঠিক করেছে। ছবিতে কি অসম্ভব ভালো!"

আর উমা?

"না, উমা তা নয়। সে অভিনেত্রী, সত্যিকার অভিনেত্রী।"

কি করে পেলেন উমাকে?

"উমাকে এনেছিলেন আশীষ বর্মণ। 'পথের পাঁচালী'তে সহকারী পরিচালক ছিলেন উনি। স্কুলে স্কুলে মেয়ে খুঁজছিলেন। কমলা গার্লসের সামনে উমাকে খুঁজে পান।

প্রথম যেদিন উমা এল, আমি তো হতবাক। মুখটা সুন্দর। কিন্তু সিনেমায় নামতে হবে শুনেছে। প্রচণ্ড সেজেছে। এই দুর্গা? অসম্ভব!

মানিক বলল, 'আঃ, থামো তো। দুর্গা তো সাজাতে হবে।'

আমিই সাজালাম শেষ পর্যন্ত। টেনে চুল বেঁধে, গাছকোমর করে শাড়ি পরিয়ে, নিজেই অবাক। এই তো দুর্গা। কি করে হলো?

পরে শর্মিলাকেও অপর্ণা সাজিয়েছিলাম। কোঁকড়া ঝাঁকড়া অবাধ্য চুলের রাশি টেনে বেঁধে চেহারাই পাল্টে গেল মেয়েটার। কি রূপ অপর্ণার!"

'পথের পাঁচালী'র ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি, বড় ভালো গান করেন বিজয়া রায়। শুধু গান করেন না, রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে জানেনও অনেক। কালীনারায়ণ গুপ্তর বংশের মেয়ে উনি। এই বংশে গান গলায় নয় শুধু, দেহের শিরায় শিরায়। 'চারুলতা'র 'আমি চিনি গো চিনি'র অপ্রচারিত সুরটি ওর গাওয়া টেপ থেকেই তুলেছিলেন কিশোরকুমার। 'চারুলতা'র ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে'-ও ওরই কাছে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের শেখা।

'পথের পাঁচালী'র অভিনেত্রীদের মধ্যে এ ছাড়া রেবা দেবীকে আগে থেকে চিনতেন বিজয়া রায়।

'পথের পাঁচালী'র অচিন্তনীয় সাফল্যের পরেও কি সত্যজিৎবাবুর মায়েব দ্বিধা ছিল?

"না, আর কোনো দুঃখই ছিল না মার। 'অপরাজিত' একেবারেই চলেনি। কিন্তু ভেনিস থেকে প্রথম পুরস্কার জিতে এল সে। মার আর কোনো খেদ ছিল না। কোনো সমালোচকের বিরূপ সমালোচনায়ও আর বিন্দুমাত্র কান দেননি তিনি।"

আর বিজয়া? 'পথের পাঁচালী'র জয়জয়কারে আনন্দিত হয়েছিলেন?

“নিশ্চয় খুশি হয়েছিলাম। অসম্ভব খুশি হয়েছিলাম। আর গর্বিত হয়েছিলাম। সিনেমার জগতে যুগান্ত করল আমার স্বামীর করা ছবি।”

তাঁর স্বামী যে তাঁর মনোমত কাজ বেছে নিলেন তাতেও নিশ্চয় তিনি খুব খুশি হয়েছেন?

“ওর পরিচালক হবার ব্যাপারে আমার কোনো দ্বিধা কোনোদিন ছিল না। আমি দেখেছি এ বিষয়ে ও নিজে প্রথম থেকেই কি দৃঢ়। ও আমার মনোমত কাজ বেছে নিয়েছে এটা কোনো কথা নয়। আমি সবচেয়ে খুশি হয়েছি যে ও জীবনে ওর সত্যিকারের মনের মত কাজ করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।”

সেই কফিহাউসের দিনগুলি ও সত্যজিৎ রায়

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

কখনও কখনও আজও পথের পাঁচালীর কথা উঠলে আমার বছর তিরিশ আগেকার চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউয়ের কফি হাউসের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। এই কফি হাউসের মেরেডিথ স্ট্রীটের ছোট ঘরটাকে তখন অনেকে ঠাট্টা করে হাউস অফ লর্ডস বলতেন। তখন এই হাউস অফ লর্ডস-এ দুপুরবেলায় নানান রকম বিচিত্র লোকজন আসতেন। সাংবাদিক, লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, বুদ্ধিজীবী, বিপ্লবী এমন কি পশ্চিমবাংলা সরকারের বড় বড় সিভিলিয়ান কেউই বাদ থাকতেন না।

এই ঘরে প্রতিদিন দুপুরে লাঞ্চের সময় আমরা কয়েকজন নিয়মিত হাজির হতাম। সত্যজিৎ রায় ছাড়া আরও যাঁরা আড্ডা দিতে আসতেন তাঁরা ছিলেন কমলকুমার মজুমদার, রণেন রায়, বংশী চন্দ্র গুপ্ত, হরিসাধন দাসগুপ্ত, কালী সাধন দাসগুপ্ত, পৃথ্বীশ নিয়োগী, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, চিদানন্দ দাসগুপ্ত, কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ ঘোষাল, জেড এইচ খান (বান্টি) প্রমুখ। বছরের পর বছর রোববার আর ছুটির দিন বাদে আমাদের সেই আড্ডা গমগম করত। যাঁদের আপিস যেতে হোত তাঁরা লাঞ্চের পরও যতক্ষণ পারা যায় থাকতে চেষ্টা করতেন। আর রণেন রায় ও আমার মত বেকাররা আপিসের তাগিদ না থাকায় আড্ডা চালিয়ে যেতো। কফি হাউসের সেই আড্ডার এমন একটা মজা এমন কি মাদকতা ছিল যা আমাদের শরীর আর মনকে একটা অদ্ভুত আনন্দে আচ্ছন্ন করে রাখত। গালগল্প, পরনিন্দা ছাড়া কফি খেতে খেতে কতরকমের কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা হত তার ইয়ত্তা ছিল না। কফি হাউসের আধো-আলো-আধো-অন্ধকারে আমাদের বাঁধা টেবিলে বসে সেই আড্ডার কথা ভাবলে আজও বুড়ো বয়সে আমার মন 'নস্টালজিয়া'য় ভরে যায়।

এই আড্ডায় আমরা সবাই যে সবসময়ে চুপ করে বসে থাকতাম তা নয়। তবে দুজন ছিলেন যাঁদের কথা বলার জুড়ি পাওয়া ভার ছিল। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কমলকুমার মজুমদারের। কমলকুমারের কল্পনাশক্তি ছিল অদ্ভুত, তাঁর রসিকতায় থাকত খাঁটি বাঙালী চিকণতা আর ফরাসি মাত্রাজ্ঞানের মিশেল। প্রায় বিষয়েই সব তাঁর নিজস্ব মৌলিক মতামত ছিল যা আমরা অনেকেই ভাবতে পারতাম না। মানে চোখ খুলে দেওয়ার মতন ব্যাপার। কমলকুমার তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় কতরকমের কথাই না বলতেন। কোনো একটা ব্যাপারে হয়ত মালার্মের লিনিয়ার সেন্‌সিবিলিটার কথা টেনে আনলেন আর তারপরেই বিশাল জালার ভলাপচুয়াস রোটান্‌ডিটির কথা পাড়লেন। আগে যে দ্বিতীয়জনের কথা বলেছি তিনি ছিলেন পথের পাঁচালীর ভবিষ্যৎ স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়। স্বভাবত লাজুক প্রকৃতির সত্যজিৎ কমলবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কি রকম যেন

বদলে যেতেন। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি আলোচ্য বিষয়ের মর্মে চলে যেত, তাঁর কথাবার্তা ছিল মাপাজোপা ; আর ছিল পরিশীলিত মন ও সাহেবরা যাকে বলেন 'ড্রাই উইট'। দামাল কমলবাবুর কথার তুবড়ির সঙ্গে ধীরস্থির সত্যজিতের শান্ত কথাবার্তা ইউরোপীয় সঙ্গীতের ভাষায় কাউন্টার পয়েন্ট-এর মতন ছিল বললে খুব ভুল হবে না। আড্ডার অন্যদের সম্বন্ধে বলতে শুরু করলে থামা যাবে না ঃ রণেন রায়ের দিশি-বিলিতি থিয়েটার নিয়ে তোড়ে বক্তৃতা, পৃথ্বীশ নিয়োগীর ঠাণ্ডা গলার বিলাপ যে মানুষ আজ অবধি বুদ্ধি খাটিয়ে এমন একটা চেয়ার তৈরি করতে পারলে না যা সত্যিই আরামদায়ক, বান্টিখানের অনর্গল পান্ (Pun)। কিন্তু কফি হাউসের আড্ডার কথা আমার এই লেখার বক্তব্য নয় যা খুলে লিখতে গেলে একটা মোটা-সোটা বই লিখতে হয়। তাই আমি এখানে আর একটা কথা বলে কফি হাউস-এর আড্ডার কথা শেষ করবো। এই আড্ডায় আমার মত আরও কয়েকজন যাঁরা যেতেন তাঁদের প্রধানত বই পড়ার দিকেই বেশি ঝোঁক ছিল। এই আড্ডার আলোচনায় আমাদের মনের প্রসার বেড়ে গেল। আমরা 'ভিজুয়াল আর্টস' আর 'পারফরমিং আর্টস' সম্বন্ধেও উৎসাহিত হয়ে পড়লাম। আমাদের দেশে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন আসার আগেই আমরা বিলিতি আর মার্কিনি ফিল্ম ছাড়া রুশ, ফরাসি আর ইতালিয়ান ফিল্ম সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লেখাপড়া করতে শুরু করেছিলাম। তারপর যখন দেশে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের পত্তন হোল তখন আমাদের কফি হাউসের পাড়ার কয়েকজন লোক তার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মানে সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাসগুপ্ত, বংশী চন্দ্র গুপ্ত ছাড়া অন্য কয়েকজনও ভারদের প্রথম 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি'র গোড়াকার সভ্যদের মধ্যে ছিলেন।

এবার আমার এই লেখার আসল বিষয় সত্যজিৎ রায়ের কথা শুরু করছি। চল্লিশের কোঠার শেষের দিকে সত্যজিৎ ডি. জে. কিমার নামে বিখ্যাত বিলিতি বিজ্ঞাপন কোম্পানীর আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন। কোম্পানীতে ঢোকার কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর কাজ নিয়ে তিনি সারা দেশে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ছে এই সময় থেকেই তাঁর কিছু কিছু কাজ বিলেতের সুবিখ্যাত মর্ডাণ পাবলিসিটির মতন বিজ্ঞাপন বিষয়ক বার্ষিকীতে ছাপা হতে শুরু করে। এই বার্ষিকীগুলোতে প্রত্যেক বছরের সারা বিশ্বের নানান দেশ থেকে সেই বছরের বাছাই করা ভাল ভাল বিজ্ঞাপন, পোস্টার ইত্যাদির কিছু কিছু নমুনা ছাপা হোত। গ্রাফিক আর্টিস্ট হিসেবে তিনি কি রকমের চৌকস ওস্তাদ ছিলেন তখনই তাঁর কাজ দেখলে বোঝা যেত। তিনি অনেক সময়ই বিজ্ঞাপনের পুরো ফিনিস্‌ড লে-আউট-টা একা হাতে তৈরি করতেন। বেশিরভাগ সময় কাগজে যে বিজ্ঞাপন বেরোয় তাতে কেউ করেন লে-আউট অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের পুরো চেহারাটির ছক আর সেইমত কেউ আঁকেন ছবি, কেউ করেন লেটারিং এবং পরে সেগুলোকে জুড়ে একাকার করে দেওয়া হয়। সত্যজিৎ ছিলেন এই সব ব্যাপারেই চোস্ত। চল্লিশের কোঠার শেষের দিক থেকেই সত্যজিতের কাজ তখনকার দিনের বিজ্ঞাপন-ব্যবসার দুটি ঘাঁটি কলকাতা আর বোম্বাইয়ের অনেক কমার্শিয়াল আর্টিস্ট-এর ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

তাছাড়া সত্যজিৎ তখন ভারতের একজন অদ্বিতীয় বইয়ের ডিজাইনার হিসেবে নাম করতে আরম্ভ করেছেন। তখনকার দিনে আমাদের দেশে বই ডিজাইনার নামক জীবটির অস্তিত্বই প্রায় ছিল না। সিগনেট প্রেসের হয়ে তিনি যে সব বই ডিজাইন করেছিলেন

সেগুলির মলাট, নামের লেটারিং, টাইটেল পেজ, ভিতরকার পাতার ছাপার মাপজোপ, ভিতরকার পাতায় টাইপের অংশ বা ছাপা লেখার সঙ্গে ছবি সাজানোর কায়দা সবই ছিল অসাধারণ। ফলে বইটি শুধু দেখতে ছিমছাম আর সুন্দরই হোত না পড়তে সুবিধে হোত। আর সবকিছু মিলিয়ে বিষয়বস্তুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে যে চেহারাটা হোত তাতে বইয়ের একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত। অর্থাৎ সত্যজিতের ডিজাইন করা কবিতার বইকে বই বলে একঝলকে চিনতে কোনো অসুবিধা হোত না। এক কথায় আধুনিককালে সত্যজিৎ বাংলা বই-এর ডিজাইনে একটা যুগান্তর আনেন। আর বলা বাহুল্য তাঁর কায়দা নকল করে অনেকেই বই ডিজাইন করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের নকল করাটা অধিকাংশ সময়ে মলাট ও মলাটের লেটারিং-এর বাইরে যেত না। এমন কি সত্যজিতের বাংলা লেটারিং এখনও অনেকে নকল করে যাচ্ছেন। সত্যজিতকে যাঁরা বইয়ের ডিজাইনে নকল করতেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকেরই বইয়ের সামগ্রিক চেহারাটা কি হওয়া উচিত এবং কিভাবে সেটা আনতে হয় সে সম্বন্ধে কোনো বিশেষ জ্ঞান ছিল না। অর্থাৎ বইয়ের মলাট, পুস্তিন, হাফ টাইটেল, টাইটেল পেজ, ছবি, টাইপোগ্রাফি সবকিছুকে সুষ্ঠু ভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিতে না পারলে তার সুষম সামগ্রিক রূপ যে খোলে না সেটা নকলেরা বুঝতে পারতেন না। এখন আমাদের বাংলা প্রকাশনার জগতে কয়েকজন ভাল ভাল বুক ডিজাইনার হয়েছেন। আমার ধারণা তাঁরা সত্যজিতের কাছে এই ব্যাপারে তাঁদের ঋণ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করবেন।

আমরা যারা সত্যজিতের কাছাকাছি ছিলাম খানিকটা আঁচ করতে পারতাম যে বই ডিজাইন ও বিজ্ঞাপন জগতে তাঁর অসামান্য প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও তাঁর মন চাইত ফিল্ম করতে। এইরকম সময়েই জঁ্যা রেনোয়া তাঁর 'দি রিভার' ছবির শুটিং করবার আগে সরেজমিনে লোকেশান তদারক করতে কলকাতায় আসেন। 'সিকোয়েন্স' নামে বিখ্যাত বিলিতি ফিল্ম বিষয়ক পত্রিকায় সত্যজিৎ রেনোয়ার সঙ্গে তাঁর মোলাকাৎ নিয়ে একটি অসাধারণ লেখা লিখেছিলেন। রেনোয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সত্যজিতের মনে ফিল্ম করবার বাসনা আবার জ্বলে উঠল। কলকাতায় থাকাকালীন রেনোয়া সস্ত্রীক দু-চারবার কফি হাউসে আসেন। ঋষিতুল্য এই অনন্য প্রতিভাশালী লোকটিকে দেখে আমাদের মন ভক্তিতে ভরে যেত।

সে যাই হোক সত্যজিৎ প্রথম 'ঘরে-বাইরে'র স্ক্রিপট্ করার পর বেশ কয়েক বছর তখন কেটে গেছে। হরিসাধন দাসগুপ্ত তখন বইটার ফিল্ম কপি রাইট কিনেছিলেন। কিন্তু 'ঘরে বাইরে' তোলবার জন্য তাঁরা কোনো টাকা দেওয়ার লোক পেলেন না। এতে না দমে সত্যজিৎ 'পথের পাঁচালী'র স্ক্রিপট্ নিয়ে বছরের পর বছর কাজ করে যাচ্ছিলেন। তারপর যখন সত্যজিৎ একজন প্রডিউসারের সাহায্যে 'পথের পাঁচালী'র শুটিং করলেন তখন অন্তত আমাদের কাছে একটা ব্যাপার খুব পরিস্কার ছিল। আমরা বিশ্বাস করতাম সত্যজিৎ যে প্রস্তুতি আর যে হাতিয়ার নিয়ে ফিল্ম জগতে তাঁর অভিযান শুরু করলেন তার আগে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে কোনো পরিচালকেব তার ভগ্নাংশও ছিল না। আমি এখানে তাঁর পিতৃপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া জন্মগত সুবিধের কথা তুলছি না, আমি তাঁর সাধনা, ধ্যান-ধাবণা, তাঁব জ্ঞানচর্চাব কথা বলছি। তাঁর সততা, তাঁর সুতীক্ষ্ম বুদ্ধি, অনুভূতি আর তাঁর ত্রুটিহীন রুচি আমাদের সবাইকার মনে তাঁর অসামান্য শিল্পক্ষমতা সম্বন্ধে গভীর আস্থা এনে দিয়েছিল। সাহিত্য, শিল্প ও আরও নানান বিষয় ছাড়া সত্যজিৎ

ফিল্ম-এর ইতিহাস, ফিল্ম টেকনিকের থিয়োরি, ফিল্ম-এর নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে পড়াশুনা করেছিলেন। তার চেয়ে বড় কথা তিনি পৃথিবীর বহু দেশের এবং বিশেষ করে আমেরিকার বড় বড় ডিরেক্টারদের অজস্র ভাল ভাল ফিল্ম ছাত্রের মতন মন দিয়ে দেখে দূর থেকে এই গুরুদের কাছ থেকে তালিম নিয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায় তখন ইংরজিতে লিখতেন। তার দু-চারটে যে লেখা স্টেটসম্যান আর বিদেশি কাগজে বেরিয়েছিল তাই থেকেই স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে লেখা দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে তিনি কি রকম দৃঢ় ছিলেন। শিল্পী হিসেবে তার চোখ তৈরি ছিল। দেশি ও বিদেশি ক্লাসিক্যাল সংগীত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান তাঁকে সংগীত সম্বন্ধে একটা গভীর অনুভূতি আর চেতনা এনে দিয়েছিল। তাই আমাদের মনে হয়েছিল যে যেহেতু চলচ্চিত্রে সাহিত্য, শিল্প, সংগীত সবকিছুই একীভূত হয়ে যায়, সত্যজিৎ-ই সেই লোক যিনি পাকা ওস্তাদের মতন চলচ্চিত্রের মহড়া নিতে পারবেন। সত্যজিতের যে ব্যাপারে আমাদের কিছুটা খুঁত খুঁতে ভাব ছিল সেটা হোল যে তিনি রাজনীতি বা দর্শন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না।

অবশেষে সত্যজিৎ যখন 'পথের পাঁচালী'র শুটিং আরম্ভ করলেন তখন তিনি যে 'বৈপ্লবিক' কায়দা নিলেন তা আমাদের দেশে তাঁর আগে কেউ নেননি। তিনি ষ্টুডিও ছেড়ে ক্যামেরা নিয়ে বাইরের জগতে বেরিয়ে পড়লেন, মেক-আপ, অদ্ভুত পোষাক-আষাকের ব্যবহার বরবাদ করে দিলেন, সংগীত আর চিত্রকল্পের সব বাঁধা গৎ চুরমার করে দিলেন যা বহু যুগ ধরে ভারতীয় সিনেমাকে দাসত্বের শেকলে বেঁধে রেখেছিল। আর তাছাড়া তিনি পেশাদার বাবুদের ধার কাছও না মাড়িয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। একমাত্র শিল্প-নির্দেশক বংশী চন্দ্র গুপ্ত ছাড়া ওঁর আর সব টেকনিশিয়ানরা ছিলেন আনকোরা নতুন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদেব মধ্যে একমাত্র পেশাদার ছিলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। অশীতিপর বৃদ্ধা চুনী[illegible] স্টেজে অভিনয় করলেও ফিল্ম-এ বোধহয় কখনও নামেননি।

সবাই জানেন যে পথের পাঁচালী তুলতে নেমে সত্যজিৎ-কে কতবার বাধা বিপত্তিতে পড়তে হয়। কিছুদিন শুটিং-এর তাঁর প্রডিউসার নার্ভাস হয়ে টাকা বন্ধ করে দেন। তারপর বেশ কিছুদিন বাদে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে সরকারি টাকা দিয়ে সাহায্য করায় আবার ফিল্ম তোলা শুরু হয়।

'পথের পাঁচালী'র শুটিং-এর প্রথম পর্বে সত্যজিৎ মাঝে মাঝে দুপুরবেলায় ছবির স্টিল ফটোগ্রাফ নিয়ে কফি হাউসে আসতেন। ছবিগুলোতে গ্রামের 'এ্যাটমসফিয়ার', পাত্র-পাত্রীদের চোখ মুখের সরল সৌন্দর্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। অনেকের মনে থাকতে পারে এই ফোটোগ্রাফগুলির একটি এডওয়ার্ড স্টাইকেন-এর 'দি ফ্যামিলি অফ ম্যান' বলে জগদ্বিখ্যাত ফোটাগ্রাফের এগজিবিসানে দেখানো হয়। 'পথের পাঁচালী'র ছবিগুলো দেখে আমরা খানিকটা আঁচ করতে পারতাম যে এটি এমন একটি ফিল্ম হবে যার অভিনবত্ব আর উৎকর্ষ সবাইকে তাক লাগিযে দেবে।

এই ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হল যখন 'পথের পাঁচালী'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের শুটিং-এর 'রাস' (rush) গুলো আমাদের দেখার সুযোগ হল। ভাবা যায় না কি রকম আগ্রহ নিয়ে আমরা প্রত্যেকবার টালিগঞ্জের ল্যাবরেটরিতে 'রাস' দেখতে যেতাম যেখানে ফিল্মটা প্রসেসিং হচ্ছিল সেই ল্যাবরেটরির অডিটোরিয়ামে সেই সব দৃশ্য দেখতাম যেগুলো

পরে সারাবিশ্বের দর্শকদের মাত করে দেয় এবং যা পরে বিশ্বের আধুনিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ক্লাসিক সিকোয়েন্সে পরিণত হয়। যেমন অপু আর দুর্গা কাশবনের মধ্যে ছুটে চলেছে প্রথম রেল গাড়ি দেখতে, দুর্গা মারা যাবার পর হরিহরের বাড়ি ফিরে আসা ইত্যাদি। এই দৃশ্য দুটি ও অন্যান্য দৃশ্যগুলি আমরা যখন প্রথম দেখি তখন না ছিল তাতে কথা, না ছিল শব্দ, না ছিল সঙ্গীত। তবুও সেই দৃশ্যগুলিতে সাধারণ জীবনের ও হেঁশেলি খুঁটিনাটির অনির্বচনীয় সৌন্দর্য আর কবিতা অপরূপভাবে ফুটে উঠেছিল। আমরা আমাদের পরিচিত পবিবেশের সাধারণ জিনিষের যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য দেখেও দেখি না সত্যজিৎ তাই আমাদের নতুন করে আবিষ্কাব করতে সাহায্য করেছিলেন তাঁর প্রথম ছবি দিয়ে। আমরা বুঝলাম একটা 'মাস্টারপিস' তৈরি হতে চলেছে। একথা বলে আমি আমাদের দিব্যদৃষ্টির বড়াই করছি না, আমি স্বচক্ষে দেখেছি পরিচালক জন হিউস্টোন 'পথের পাঁচালী'র চার হাজার ফুট 'রাস' দেখে বেশ কয়েক মিনিট নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। ফিল্ম ডিরেকটার সত্যজিৎকে তখন কেউই জানত না।

অবশেষে ১৯৫৫-র কোনো একটা সময়ে 'পথের পাঁচালী' রিলিজ-এর জন্যে তৈরি হয়ে গেল। আমার মনে এখনও 'পথের পাঁচালী' রিলিজ হবার আগের দিন বা তার আগের দিনের কথা জ্বলজ্বল করছে। সত্যজিৎ একটার কিছু পরে কফি হাউসে এলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে হাসিঠাট্টা, নানারকম গল্পগুজব আর 'পথের পাঁচালী'র আসন্ন মুক্তির কথা আলোচনা করলাম। আমার ওঁকে মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর মনে একটা যেন অস্বস্তির ভাব ছিল, একটু যেন ভয় ভয় ভাব। সেটা স্বাভাবিক কারণ তাঁর এত পরিশ্রমের ফল তাঁর এত স্বপ্নের 'পথের পাঁচালী' শেষ পর্যন্ত জনগণের কাঠগড়ায় তাদের রায়ের জন্য হাজির হতে চলেছে। খানিক পরে সত্যজিৎ যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমরা তাঁকে আমাদের শুভেচ্ছা জানালাম। তারপর দেখলাম দীর্ঘদেহী সত্যজিৎ হাঁটতে হাঁটতে কফি হাউস থেকে বেরিয়ে গেলেন যে পথচলা অবশেষে তাঁকে চলচ্চিত্র জগতে অমরতা এনে দিল।

সত্যজিৎ, কিছু স্মৃতি...

রাম হালদার

১৯৩৬-৩৭ সাল নাগাদ আমি রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে মহানির্বাণ মঠের উল্টোদিকে আমার দিদির বাড়িতে থাকতাম। সেখানে আমাদের আট-দশজন বন্ধুর একটা আড্ডা ছিল, ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের পেছনে একটা বাড়িতে। সেইসময় আমরা পাড়ায় একটা নতুন ছেলেকে দেখলাম। বিশাল লম্বা, রোজ সকাল দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ বইপত্র নিয়ে ট্রামস্টপে এসে দাঁড়াত কলেজে যাওয়ার জন্য। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে ছেলেটা কে, কোথায় থাকে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। একদিন আমাদেব দলের একটি ছেলে, সম্ভবত তার নাম জিতু, লম্বা ছেলেটিকে পথে ধরে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করল। উত্তরে ছেলেটি জানাল, 'আমার নাম সত্যজিৎ রায়। আমি আমার মামা পি. কে. দাশের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া কবি।' তার গম্ভীর গলার স্বর ও বলার ধরনেব মধ্যে একটা কিছু ছিল। ফলে বন্ধুরা তাকে আর বেশি ঘাঁটায়নি। সত্যজিতকে সেই আমার প্রথম দেখা।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ১৯৪৩ সালে কমলালয় স্টোর্সে বইয়ের দোকান খোলা হলো— আমি তার দেখাশোনা করতে শুরু করলাম। কমলালয় স্টোর্সে একটা মিউজিক ডিপার্টমেন্টও ছিল। সেটি দেখাশোনো করতেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের ভাই বুলা মহলানবীশ, যিনি সম্পর্কে সত্যজিতের পিসেমশাই ছিলেন। সম্ভবত বুলা মহলানবীশই কমলালয়ে আমার সঙ্গে সত্যজিতের পরিচয় করিয়ে দেন। সত্যজিৎ আমাদের বইয়ের দোকানে যাতায়াত শুরু করে। প্রথম দিকে ও প্রধানত বিজ্ঞাপনের বইপত্রের খোঁজ-খবর করত। নানা ধরনের বিজ্ঞাপনের বই বিদেশ থেকে আনিয়ে দিতে বলত। আমরা সেইমতো বই আনিয়ে দিতাম। একদিন সত্যজিৎ এসে একটা বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত বই খুব তাড়াতাড়ি আনিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। বইটির নাম আমার এখনও মনে আছে ঃ Drawn and Quarter ; বইটি দশদিনের মধ্যে Air Mail-এ আনানো হলো। এত তাড়াতাড়ি বইটা এসে যাওয়ায় অবাক হয়ে সত্যজিৎ জানতে চাইল কীভাবে বইটা এত তাড়াতাড়ি এল। উত্তরে আমি বলি, 'উড়ে'। শুনে সত্যজিৎ চড়া-মাশুলের কথা ভেবে সন্ত্রস্ত হযে উঠলে আমি আশ্বস্ত করে বলি, 'মলাটে যে দাম লেখা আছে আপনি সেই দামই দেবেন।' শুনে সত্যজিৎ খুব খুশি হয়েছিল।

এভাবে আমার সঙ্গে সত্যজিতের আলাপ জমে ওঠে। ক্রমে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিকে সত্যজিতের গভীর আগ্রহের কথা জানতে পারি। মূলত সত্যজিতের কথা চিন্তা করেই ঐ বিষয়ের বিভিন্ন বই সংগ্রহ করে কমলালয়ে রাখতে শুরু করি। সেইসময় একটা বই হাতে আসে Newman -এর Life and Works of Mozart —বেশ মোটা বই। মাত্র দুটো কপি আমার হাতে আসে। তার একটা কপি আমার কাছে রেখে অপর কপিটি দোকানের শো-কেসে রেখে দিই। কাউন্টারে সেলস্‌ম্যানদের আমি বলে রাখি যে কেউ এসে ঐ বইটা কিনতে চাইলে আমাকে যেন জানায়। আমার আন্দাজ ছিল সত্যজিৎ-ই

বইটা কিনবে। দু-চারদিনের মধ্যেই একদিন দুপুরের দিকে একজন সেলস্ম্যান আমাকে খবর দিলযে একজন ভদ্রলোক ঐ বইটি কিনতে চাইছেন। কাউন্টারে গিয়ে দেখি সত্যজিৎ। আমার আন্দাজ মিলে গেল। ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ওপর আরও নানা বই এসেছিল— যেমন *Beethoven's Letters, Symphony, Philharmony,* রম্যা রল্যাঁর Beethoven — এ গুলো সব Pelican-এর বই। আর একটা বই বাজারে ঘুরতে ঘুরতে Allied Publishers-এ পেলাম। বইটির নাম *Polyphony :* Polyphony ব্যাপারটা এক চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় বা বিষ্ণু দে ছাড়া সেসময়ে আর কারো বোধগম্য হবে বলে আমার ধারণা ছিল না। বইটা নিয়ে এসে আমি দোকানে আর্ট ক্রিটিসিজম-সংক্রান্ত বইপত্রের মধ্যে এমনভাবে রেখেছিলাম যাতে সহজে কারো নজরে না পড়ে। কয়েকদিন পর সত্যজিৎ এসে আড়াল থেকে ঐ বইটাকে ঠিক খুঁজে বার করে এবং কিনে নেয়।

১৯৪৭ সালে সত্যজিৎ, চিদানন্দ, বংশী চন্দ্রগুপ্ত এরা সকলে মিলে Calcutta Fils Society গঠন করল। প্রথমে আমি এই Society-র সদস্য ছিলাম না। Filf Society তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সত্যজিৎ আমাকে ফিল্ম-সংক্রান্ত বইপত্র আনানোর অনুরোধ করে। আমি আমাদের নিউইয়র্কের এজেন্ট মারফত তিনটি বই আনাই। বই তিনটি ছিল, আইজেনস্টাইন-এর Film Sense এবং Film Form আর পুডভ্ কিন-এর Film Technique । এই বই তিনটি Calcutta Film Society-তে আমার চাঁদা হিসেবে গণ্য করে আমাকে Society-র সদস্য করে নেওয়া হয়। এরপর থেকে সত্যজিৎ কমলালয়ে এলে আমার সঙ্গে ফিল্ম সংক্রান্ত কথাবার্তা হতো। অনেক সময় আমরা দলবল মিলে সত্যজিতের সঙ্গে Lighthouse, New Empire-এ হলিউডের সিনেমা দেখতে যেতুম। দেখার পর সত্যজিতের সঙ্গে আমার সেইসব ছবি নিয়ে আলোচনা হতো। মনে আছে রেনোয়ার 'Spitherner' ছবিটা দু তিনবার দেখে সত্যজিৎ ছবিটার Script লিখে ফেলেছিল। এত মনোযোগ দিয়ে সে সিনেমা দেখত।

এর কিছুদিন পরে হরিসাধন দাশগুপ্ত বিদেশ থেকে ফিরে এল। সত্যজিৎ ও হরিসাধন মিলে ঠিক করল 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের চিত্ররূপ দেবে। কিন্তু উপন্যাসের চিত্রস্বত্ব কেনার টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? সেই সময়ে হরিসাধনদের বাড়ি বিক্রি হয়েছিল। হরিসাধন সেই বাড়ি বিক্রির টাকা দিয়ে 'ঘরে বাইরে'র চিত্রস্বত্ব কেনে। কিন্তু নানা করণে শেষ পর্যন্ত 'ঘরে বাইরে' সে সময়ে তোলা হয়নি। ক্রমে সত্যজিৎ 'ঘরে বাইরে' থেকে পথের পাঁচালী'র দিকে ঝুঁকল। 'পথের পাঁচালী' করার একটা বড় কারণ ছিল, যা সত্যজিৎ-ও পরবর্তীকালে বলেছে, বিভূতিভুষণের সংলাপ। যে সংলাপ সিনেমার এত উপযুক্ত ছিল যে সত্যজিৎকে সংলাপ নিয়ে বেশি ভাবতে হয়নি। 'পথের পাঁচালী'র চিত্রনাট্য তৈরি হলো। কিন্তু প্রোডিউসর হবে কে? অনেক চিন্তাভাবনা করে ঠিক হলো যারা কমার্শিয়াল প্রোডিউসার তাদের বাজিয়ে দেখা যাক। আমার জানাশোনা ছিল মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি সেযুগের একজন বিখ্যাত প্রোডিউসর। তাঁর কাছে সত্যজিৎকে নিয়ে যাই। সত্যজিৎ কী করতে চায়, কিভাবে 'পথের পাঁচালী' তুলতে চায় বিস্তৃতভাবে তাকে বলে। তিনি সব শুনে পরে আমাকে জানান যে ঐ ধরনের ছবির কোনো বাণিজ্যিক সম্ভবনা না থাকায় তাঁর পক্ষে 'পথের পাঁচালী' প্রযোজনা করা সম্ভব নয়। আরোরা ফিল্ম করপোরেশনের অজিত বোসের কাছেও আমরা যাই, কিন্তু তিনি সব শুনে আমাদের

একদম উড়িয়ে দিলেন। আরেকজন খুব ধনী প্রযোজক, অনেকগুলো তেলকলের মালিক, আমাদের দোকানে এসে প্রচুর কেনাকাটা করতেন। তিনি একসঙ্গে তিন-চারটি ছবি প্রযোজনা করছিলেন। তাঁকে আমি একদিন প্রস্তাব করি, একটা নতুন ধরনের ছবি করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, তিনি কি টাকা দিতে রাজি আছেন? সব শুনে তিনি বলেন, 'যে কোনো দিন স্টুডিওতেই যায়নি, সে আবার সিনেমা কী করবে।'

কয়েকদিন পর সত্যজিৎ একদিন দুপুরবেলা এসে আমাকে বলে যে সে ইনসিওরেন্স থেকে ১৫ হাজার টাকা ধার নিচ্ছে। আমি যদি তাকে ১৫ হাজার টাকা ধার দিই তবে র-স্টক কিনে সে 'পথের পাঁচালী'র কাজ শুরু করতে পারে। আর্টিস্ট, টেকনিশিযানরা আপাতত বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে দিতে রাজি। ছবি রিলিজ করলে, লভ্যাংশ থেকে তাদের পারিশ্রমিক দিলেই চলবে। আমরা এতই অনভিজ্ঞ ছিলাম যে ত্রিশ হাজার টাকায় সেযুগেও একটা ছবি করা যায় না , এটা আমরা চিন্তা করিনি যদিও আমার কাছে সেসময় পনেরো হাজার টাকা ছিল, কিন্তু সে টাকা দিয়ে আমি একটা বইয়ের দোকান খোলার পরিকল্পনা করছিলাম ফলে আমার পক্ষে সত্যজিতের অনুরোধ রাখা সম্ভ ব হয়নি। অবশেষে সত্যজিৎ একজন প্রযোজককে পায়, যে কিছু টাকা দেওয়ায় 'পথের পাঁচালী'র কিছু অংশ তোলা হয়। কিন্তু সেই প্রযোজকেব দু-তিনটে ছবি ফ্লপ কবায় 'পথের পাঁচালী'র কাজ আটকে যায়। পরবর্তীকালে মিসেস বেলা সেনের সাহায্যে বিধান বায়েব কাছে সরকারী অর্থেব আবেদন ও সেই অর্থে 'পথের পাঁচালী'র তৈবিব ইতিহাস তো সকলেরই আজ জানা।

'পথের পাঁচালী' শুটিংযের প্রথমদিন আমি সত্যজিতের সঙ্গে ছিলাম। জি টি. রোড ধরে বর্ধমানের কাছে একটা গ্রামে কাশফুলেব দৃশ্য তোলার কথা ছিল, কিন্তু আলোর অভাবে সে দৃশ্যের শুটিং তোলা গেল না। পরে আউটডোর শুটিং-এ আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি-কিন্তু ইনডোর শুটিং দেখেছি। 'পথের পাঁচালী'র শুটিং ও ছবির 'Rush' দেখে আমাদের ধারণা হয় সত্যজিৎ যা করছে তা বাংলা বা ভারতীয় ছবিতে আগে কেউ কোনোদিনও করেনি। এ ব্যাপারে সত্যজিৎও সচেতন ছিল। তবে 'পথেব পাঁচালী' যে শেষ পর্যন্ত সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলবে, ভারতীয় চলচ্চিত্রের দিক্‌বদলের সূচনা করবে, সেটা আমি অন্তত সেই সময় কল্পনা করতে পাবিনি।

অবশেষে 'পথের পাঁচালী' তৈরি হলো ও মুক্তি পেল। সারা ভারতে, বিশ্বে সাড়া জাগাল। অখ্যাত সত্যজিৎ জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠল। আমার সঙ্গে কিন্তু আগেকার মতোই সম্পর্ক বজায় রইল। 'অপরাজিত' তৈরির মাঝপথে অরোবা ফিল্ম করপোরেশনের তিন অংশীদারের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়। 'অপরাজিত'-এর কাজ আটকে যায়। মিটমাটের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি। সেই সময় সত্যজিৎ অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী—খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল। ও আশঙ্কা করছিল ওকে হয়তো আবার বিজ্ঞাপন জগতে ফিরে যেতে হবে। আমি ওকে আশ্বাস দিই এবং বহু চেষ্টায় অরোরার অংশীদারদের বিবাদ মেটে। 'অপরাজিত' ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'সেন্ট মার্ক অফ গোল্ডেন লায়ন লাভ করে। জীবনের দ্বিতীয় ছবিতে এতবড় পুরস্কার পেয়ে সত্যজিৎ আনন্দ হয়েছিল বাঁধনহারা। ভেনিস থেকে ফিরে আসার পর তার বাড়িতে গেলে সত্যজিৎ আমার সামনে ভেনিসেব সোনার সিংহ মাথায় নিয়ে ছেলেমানুষের মতো নেচেছিল। 'অপরাজিত' প্রসঙ্গে আরেকটা মজাব ঘটনা সত্যজিতের মুখেই শোনা ঃ ভেনিসে অপরাজিত দেখানো হয়েছে—

তখনও পুরস্কার ঘোষণা করা হয়নি। একদিন সত্যজিৎ ও শান্তি চৌধুরি একটা কাফেতে বসে কফি পান করছে। কিছুক্ষণ বাদে একজন বয়স্ক সাংবাদিক ওদের পাশের টেবিলে বসে ওদের লক্ষ্য করে বলে 'The Lion roars'। সত্যজিৎরা ওই মন্তব্যের অর্থ বুঝতে পারেনি, তারপর একটি সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়ে-সাংবাদিক সত্যজিৎদের টেবিলে এসে সত্যজিতের background, biodata ইত্যাদি নিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে। সত্যজিৎ কিছুটা অবাক হয়ে এত প্রশ্ন করার কারণ জিজ্ঞেস করায় মেয়েটি জানায় সত্যজিতের 'অপরাজিত' 'গোল্ডেন লায়ন' পাচ্ছে। শুনেই শান্তি চৌধুরি লাফিয়ে উঠে মেয়েটিকে চুমু খায় ঘটনাটা বলার পর সত্যজিৎ কিছুটা আফশোস করে বলে, 'শান্তি চৌধুরী বিদেশে অনেকদিন ধরে ছিল বলে মেয়েটিকে সহজেই চুমু খেতে পেরেছে। আমরা এদেশে মানুষ হয়েছি তো, এরকমভাবে চুমু খেতে কোনোদিনই পারব না।'

'অপরাজিত'-এর পর সত্যজিৎ একসঙ্গে 'পরশপাথর' ও 'জলসাঘর'-এর কাজ শুরু করে। বংশী চন্দ্রগুপ্ত 'জলসাঘর'-এর অসাধরণ সেট তৈরি করে, সেই দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। এরকম একটা সেট যে বানানো যায়, না দেখলে বোধহয় বিশ্বাস হতো না। সেইসময় এখানকার বিদেশি কনসুলেটের কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার জন স্টাম্প ছিল আমার বন্ধু। আমার কাছ থেকে 'জলসাঘর'-এর সেটের কথা শুনে সে ও কনসুলেটের আরও কয়েকজন আমাকে ধরে পড়ে ওদের 'জলসাঘর' এর সেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি তাদের পাঁচ-ছজনকে একদিন 'জলসাঘর'-এর সেটে নিয়ে যাই। তারা 'জলসাঘর' -এর সেট ও ছবি বিশ্বাসের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়—যদিও বাংলাভাষা তাদের বোধগম্য ছিল না। 'জলসাঘর'-এর শুটিং চলাকালীন আরেকটা ঘটনা আমার বিশেষ মনে আছে। একটা দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস অভিনয় করছেন। তাঁর সংলাপ বলার ধরনটি ঠিকমতো না হওয়ায় সত্যজিৎ 'কাট' বলে তাঁকে থামিয়ে সংলাপটি কীভাবে বলতে হবে দেখিয়ে দিল। তাতে ছবি বিশ্বাস ক্ষুব্ধ হয়ে সত্যজিৎকে বললেন, 'অভিনয় কীভাবে করতে হয়, আপনার কাছে শিখতে হবে নাকি?' সত্যজিৎ সেকথার কোনো উত্তর না দিয়ে ছবি বিশ্বাসকে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আবার আরম্ভ করুন।' ছবি বিশ্বাস সেইসময় বাংলা ছবির জগতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ অভিনেতা। তাঁর একটা অহংবোধ থাকা স্বাভাবিক। সেকথা বুঝেই, বিশ্ববিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও সত্যজিৎ তাঁর সঙ্গে কোনো সংঘাতে গেল না। প্রত্যেক অভিনেতার মেজাজ-মর্জি বুঝে তাঁর কাছ থেকে সেরা অভিনয় আদায় করে নিতে সত্যজিতের কোনো জুড়ি ছিল না।

পরিচালক হিসাবে নামডাক বাড়লেও সত্যজিতের বইয়ের দোকানে যাতায়াতে তখন ছেদ পড়েনি। প্রায় ষাট সাল পর্যন্ত সত্যজিৎ কমলালয়ের বইয়ের দোকানে আসত। সেইসময় আমি সত্যজিৎকে ফিল্ম, মিউজিক ছাড়াও সাহিত্যের কিছু বই পড়াই। একটা বই ছিল স্তাঁদাল-এর 'র্জানাল'; বইটি পড়ে সত্যজিৎ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। আর একটা বই সত্যজিতকে পড়িয়েছিলাম ফ্লবেয়ারের —Bouvard and Pecuchet। যে ফ্লবেয়ার 'মাদার বোভারি'র মতো উপন্যাস লিখেছেন, তিনি যে এরকম একটা কমেডি লিখতে পারেন বইটা না পড়লে জানা যেত না। বইটা পড়ে সত্যজিৎ বলেছিল, 'এটা আশ্চর্য বই।' আমি তাকে বইটা ছবি করা যায় কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম। শুনে সত্যজিৎ হেসে বলেছিল, 'করা যায় তবে এদেশের দর্শকদের জন্য নয়।' পরিবর্তীকালে বইয়ের

দোকানে যাতায়াত কমে গেলেও আমি ওর লেক অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে মাঝেমাঝেই যেতাম। সেখানে ফিল্ম, সংগীত, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে ওর সঙ্গে আড্ডা দিতাম। রেকর্ডে গানবাজনা শোনা হতো। এই বাড়িতেই আমি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখি। মাঝখানে বেশ কিছুদিন সত্যজিতের বাড়িতে যাওয়া হয়নি একদিন আমি কিছু Czech রেকর্ড নিয়ে সত্যজিতের লেক অ্যাভিনিউ -এর বাড়িতে গিয়ে দেখি, দরজায় তালা দেওয়া। সত্যজিৎ অন্যত্র শিফ্‌ট করে গেছে। দরজাটা ঠেলতে একটু ফাঁক হয়ে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে আমি দেখতে পেলাম-ঘরটা ধুলোতে ভর্তি। একটা পুরোনো খবরের কাগজের পাতা হাওয়ায় ভর করে দাঁড়িয়ে উঠেছে —দুলছে এদিক-ওদিক—লুটোপুটি খাচ্ছে। এই ঘরে যত কথাবার্তা, গান শোনা ও সুখের কলরব হয়েছে — সেসব কিছুর স্মৃতি নিয়ে খবরের কাগজটা যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমি কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে দৃশ্যটা দেখলাম। পরে খোঁজ করে অল্পদূরে সত্যজিতের নতুন ঠিকানায় হাজির হয়ে ওকে দৃশ্যটার কথা বলতেই ও একটা স্টিল ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইল দৃশ্যটা ধরে রাখার জন্য। আমি ওকে বললাম সে দৃশ্যটা ধরে রাখতে দরকার মুভি ক্যামেরা। সত্যজিতের হাতের কাছে মুভি ক্যামেরা না থাকায় দৃশ্যটা ধরে রাখা গেল না। এরকম নানা ধরনের অসংখ্য স্মৃতিতে ভরে আছে আমার মন। ক্রমে সত্যজিৎ ছবি করা ছাড়া আরও নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠায় আমি আর ওর সময় নষ্ট করতে যেতাম না। ফলে ওর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে।

আমার মতে 'পথের পাঁচালী' শুধু সত্যজিতের নয়—সারা পৃথিবীর একটা সেরা ছবি। 'পথের পাঁচালী' একটা প্রাকৃতিক ঘটনা—একটা ফুলের মতো আপনি ফুটে উঠেছে। আমি 'পথের পাঁচালী' তৈরির নেপথ্য ঘটনার সাক্ষী। আমি জানি 'পথের পাঁচালী'র প্রতিটি দৃশ্য পরিকল্পিত—সত্যজিৎ স্কেচ করে রেখেছিল শুটিং শুরু করার আগেই, কিন্তু 'পথের পাঁচালী' দেখলে এসব কিছুই মনে আসে না। Art lies in concealing art — বহু প্রচলিত এই কথাটি 'পথের পাঁচালী' সার্থকভাবে প্রমাণ করে।

আমি সত্যজিতের মধ্যে আগাগোড়া একটা শিশুসুলভ সারল্য লক্ষ্য করেছি। আর চলচ্চিত্রের প্রতি সত্যজিতের যে আনুগত্য তাকে শুধু নিষ্ঠা বা দায়বদ্ধতা বললে কম বলা হবে। সে চলচ্চিত্রের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল। সত্যজিৎ যখন 'পথের পাঁচালী'র কাজে নামে তখন সে মধ্যযৌবনে। চাকুরিতে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞাপনশিল্পী, প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবেও রীতিমতো খ্যাতির অধিকারী। 'পথের পাঁচালী' না করেও সে সুখী প্রতিষ্ঠিত জীবনযাপন করে যেতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। বিজ্ঞাপনের কাজে ওর মন টিকছিল না। ছবি করার জন্য সে অস্থির হয়েউঠেছিল। তাই প্রচন্ড ঝুকি নিয়ে সে 'পথের পাঁচালী'র কাজে ঝাপিয়ে পড়েছিল। তার পেছনে ছিল চলচ্চিত্রের প্রতি তার গভীর অনুরাগ, যা শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। অস্কার পুরস্কারের খবর পেয়ে তার চিকিৎসক ডাঃ বক্সী তাকে জিজ্ঞেস করে —সুস্থ হয়ে সে আগে অস্কার আনতে যেতে চায়, না তার আগামী ছবির চিত্রনাট্য শেষ করতে চায়। উত্তরে সত্যজিৎ তার ছবির চিত্রনাট্যের কথা বলে। চলচ্চিত্রের প্রতি তার এই সুগভীর নিষ্ঠা তার মার দেওয়া 'মানিক' নামটিকে সার্থক করে তোলে।

আমার বন্ধু

হরিসাধন দাশগুপ্ত

সত্যজিৎ রায়কে আমি প্রথম দেখি ১৯৪৮ সালে। তাঁর বাড়িতে। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির গ্রুপ মিটিং-এ। দেখা মাত্রই যাকে বলে সম্পূর্ণ মুগ্ধ। একেবারে মোহগ্রস্তের মত অবস্থা। তখনও ত' গুণের খবর পাইনি কিন্তু এমন একজন মানুষ—কী তাঁর কণ্ঠস্বর! কী তাঁর উচ্চতা! সব মিলিয়ে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। হলিউড থেকে ফিরে আমি যে দারুণ একটা অসহায়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম বলতে গেলে ওঁর সংস্পর্শে এসেই তাব সমাপ্তি ঘটে। অসহায়তা কেন-আসলে আমি যখন ফিল্মের কাজ শিখে ফিরলাম তখন এখানকার চলচ্চিত্র জগৎ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। নিজেকে যেন কেমন 'আউট অব প্লেস', কেমন আউটসাইডার মনে হচ্ছিল।

আমার বন্ধু অসিত সেন, পরে যে চিত্র পরিচালক হয়, আমাকে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির খবর দেয়। সত্যজিৎবাবুর সেই বাড়ি লেকের কাছে, আমার আজও মনে পড়ে, খুব বড় ছিল না। মাটিতে মাদুর পেতে বসে মিটিং হয়েছিল। মাসীমা ছিলেন, মানে ওঁর মা। আমি ধুতি পাঞ্জাবি পবে গিয়েছিলাম যাতে সহজেই মিশে যেতে পারি আর কি। সত্যজিৎবাবু ত' ছিলেনই, ছিলেন বংশী চন্দ্রগুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, সম্ভবত 'ছিন্নমূল' ছবির পরিচালক নিমাই ঘোষ এবং আরো কয়েকজন। সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। বন্ধুত্ব হল। সে এক দারুণ অনুভূতি!

তখন সত্যজিৎবাবু ডি. জে. কিমার-এ কাজ করেন। হলিউডের ছবি ত' বটেই দেশবিদেশের বহু ছবি নিয়মিত দেখেন। অফিস থেকে বেরিয়ে উনি কফি-হাউস-এ আসেন। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত আসেন সেখানে। আসেন আরও অনেকে। আমিও যাই। আমার ত' তখন কোনো কাজ নেই। বলা চলে, একেবারেই বেকার। এদিকে একটা শেভ্রলে গাড়ি আছে। সে এক অদ্ভুত জীবন। তখন আমরা যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম। আমরা ছবি ভাবলেই যেন ছবি হবে। 'কল্পনা' ছবির প্রযোজক মিস্টার হেমাউ-এর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি তাঁর অফিসের একটা অংশ দিলেন আমাদের ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাটির অফিস করার জন্য। তাঁর মাধ্যমে আমাদেব সঙ্গে পরিচয় হল কেকী মোদীর সঙ্গে। উনি ছিলেন সোরাব মোদীর ভাই। 'এলিট' সিনেমাটা ওঁরই ছিল। তিনি মালিক। এছাড়া বম্বেতে তাঁর বিরাট স্টুডিও ছিল। 'বম্বে সেন্ট্রাল স্টুডিও'। আমরা স্বপ্ন দেখলাম এই স্টুডিওতে নানারকম কাজ হবে। এই ফিল্ম মেকিং সংক্রান্ত আর কি! যেমনটা হয় হলিউডে।

সত্যজিৎবাবু ইতিমধ্যেই 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের চিত্রনাট্য নিয়ে ভেবেছেন। প্রায়ই নানা আলোচনা হয়। নতুন নতুন সিকোয়েন্স ভাবা হয়। এইরকম আড্ডা মারতে মারতেই একদিন ঠিক হল রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের চিত্ররূপ দেওয়া হলে পরিচালনা করব আমি, চিত্রনাট্য করবেন সত্যজিৎ রায়। শিল্প নির্দেশনার ভার থাকবে বংশী চন্দ্রগুপ্তের

ওপর, ক্যামেরার দায়িত্ব নেবেন অজয় কর।

এই সবই যখন ভাবনা চিন্তার স্তরে তখন হঠাৎই একটা সুযোগ এসে গেল, একটা সিগারেট কোম্পানির হয়ে আট মিনিটের একটা ছবি করে ফেললাম আমরা। ছবির নাম 'আ পারফেক্ট ডে'। যদিও বিজ্ঞাপনের ছবি, কিন্তু আমাদের উৎসাহে বা যত্নের কোনও খামতি ছিল না তাতে। সকলে মিলেই করা হয়েছিল। তবু চিত্রনাট্য করেছিলেন সত্যজিৎ রায়, ডিজাইনার বংশীবাবু, ক্যামেরা অজয় কর আর মিউজিকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। চিদানন্দবাবুও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমি ছিলাম পরিচালকের ভূমিকায়।

এরই মধ্যে একদিন সত্যজিৎবাবু এসে বললেন, 'জানান মশাই, শুনলাম নীতিন বসু 'ঘরে বাইরে' -র হিন্দি-বাংলা রাইট কিনেছেন।' উপন্যাসটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ভেবে আমরা সকলেই খুব আপসেট হয়ে গেলাম। ১৯৪৮ সালে বিশ্বভারতীকে কুড়ি হাজার টাকা আমরা কোথা থেকে দেব। ওই অঙ্কই ত' ওঁরা চেয়েছিলেন তখন।

এদিকে তখন আমার বাবা মারা গেছেন, দাদা বিদেশে, মা একা, বিয়ে করিনি অবশ্য তখনও, তবু পরিবারে টাকার প্রয়োজন। ঠিক হয়েছিল আমাদের যতীন দাস রোডের বাড়িটা বিক্রি করা হবে। আমি এইবার দারুণ উদ্যোগ নিলাম। উঠে পড়ে লেগে বাড়িটা বিক্রি করে ফেললাম। তারপর মার কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা ধার নিযে সলিসিটার এন.সি. মিত্র-র মাধ্যমে ঐ টাকাটা দিয়ে বিশ্বভারতীর কাছ থেকে 'ঘরে বাইরে'-র ডাবল ভারসন কপিরাইট কিনে নিলাম। এই রাইট কেনা সেলিব্রেটও করলাম আমরা। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রাধামোহন ভট্টাচার্য। তিনি তখন আমাদের কাছের মানুষ। কথা ছিল 'ঘরে বাইরে' ছবি হলে তিনি অভিনয় করবেন নিখিলেশ চরিত্রে। আসলে এই রাইট কেনা-টেনা সবই যেন একটা ইলিউশনের মধ্যে দিয়ে ঘটে গেল। পরে অবশ্য এ নিয়ে বাড়িতে অনেক অশান্তি হয় কিন্তু তার সম্ভাবনা বুঝে থাকলেও আমার তখন কিছুই করার ছিল না। ছবি করাটাই তখন আমার একমাত্র লক্ষ্য আর সব কিছুই তখন তুচ্ছ।

কিন্তু তখনও অনেক কাজই বাকি। গল্প ত' হাতে এল, ছবি করার পয়সা আসবে কোথা থেকে! নিখিলেশ চরিত্রে না হয় রাধামোহন অভিনয় করবেন, অন্যান্য চরিত্রে কে করবেন! বিশেষ করে বিমলা চরিত্রে। সন্দীপ চরিত্রের জন্য প্রথমে ভাবা হয়েছিল সুমিত্রাদেবীর স্বামীর কথা। সুমিত্রাদেবী মানে 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবির নায়িকা আর কি। পরে অবশ্য ঐ চরিত্রে অভী ভট্টাচার্যর কথা ভাবা হয়। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যর করার কথা ছিল মাষ্টারমশাই। মেজরাণী চরিত্রে ভাবা হয়েছিল সুপ্রভা মুখার্জিকে।

এই কাস্টিং-এর ব্যাপারটা কিন্তু হঠাৎই একদিনে ঠিক হয়নি। ধীরে ধীরে হয়েছিল। তবে বিমলা চরিত্রের জন্য ঠিক ওই বয়সী এবং মানানসই কারোকেই আমরা ঠিক ভাবতে পারছিলাম না। 'বিমলা' এমন একটা চরিত্র যে প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ এই চরিত্রের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তখন কাননদেবীর খুব নাম-ডাক। হলিউডে যখন ছিলাম তখন তিনি একবার এসেছিলেন সেখানে। আমাদের বেশ আলাপ-পরিচয়ও হয়। তা তিনি নাকি কারোকে বলেছিলেন যে, বয়স অভিনেত্রীর পক্ষে বাধা হয় না। হরিসাধন দাশগুপ্ত হলিউড থেকে কী শিখে এলেন তা হলে! কিন্তু আমাদের মধ্যে বিশেষ করে সত্যজিৎবাবু চরিত্রাভিনেতা নির্বাচনের ব্যাপারে খুবই খুঁতখুঁতে ছিলেন ;আমরা যখন

বিমলা চরিত্রের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন সুপ্রভা মুখার্জি লর্ড সিনহা পরিবারের একটি মেয়ের খোঁজ দিলেন। আমরা তো সেই মেয়ে দেখতে গেলাম। অত্যন্ত সফিসটিকেটেড। একেবারেই ঘরোয়া চেহারা বা হাবভাব নয়। সত্যজিৎবাবু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন 'আপনি হাঁটুগেড়ে মাটিতে বসতে পারেন?' স্বভাবতই তাঁকে নির্বাচন করা গেল না। আমরা ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে এলাম।

বিমলা খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রযোজক খোঁজা ও লোকেশন নির্বাচন করার কাজও সমানভাবে চলছে তখন। এরই মধ্যে একদিন সত্যজিৎবাবু বললেন, শান্তিনিকেতনে থাকার সময় একটি দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে রেকর্ড দেওয়া-নেওয়ার সূত্রে তাঁর কাছে আসতেন, তিনি হয়তো বিমলা চরিত্রে মানানসই হবেন। রাধামোহনবাবুও এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। ভদ্রমহিলা অর্থাৎ সোনালী সেন রায় চিত্র পরিচালক বিমল রায়- এর আত্মীয়া, আবার বিমল রায়-এর দাদা শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতেন। রাধামোহনবাবু ছিলেন তাঁর বন্ধু।

সে যাই হোক, সুভাষ সেন, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বংশীবাবু, মানিকবাবু অর্থাৎ সত্যজিৎ রায় ও আমি পৌষমেলা উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে যাই ও দূর থেকে আমাদের সম্ভাব্য বিমলাকে দেখি। মোটামুটি স্থির হয়; তবে তাঁর সঙ্গে কোনো কথা হয়নি ও ব্যাপারে।

এদিকে মিস্টার হেমাউ আমাদেরকে বি. এন সরকারের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। হলিউড থেকে ফিরে এখানে কেউ বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি আর সত্যজিৎবাবু তখনও কোনো ছবি পরিচালনা করেননি যে সেই পরিচয় কাজে দেবে। ফলে মিস্টার সরকার আমাদের স্ক্রিপ্ট নিয়ে বিমল রায়-এর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমরা যদি দেখা করতাম আর তিনি ও-কে করতেন তা হলে কিন্তু স্টুডিও-র কাজকর্মের ব্যাপারে আমরা অনেক সুবিধে পেতাম। কিন্তু আমরা তা করিনি। করব না বলেই করিনি।

এদিকে সত্যজিৎবাবু স্থির করেছিলেন যে ছবির আউটডোরের কাজগুলি আউটডোরেই হবে। অর্থাৎ স্টুডিওতে সেট তৈরি করা হবে না। প্রায়ই আমরা লোকেশান দেখার জন্য বেরিয়ে পড়তাম। আমি গাড়ি চালাতাম, সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে থাকত তাঁর লাইকা ক্যামেরা আর আমাদের দলে থাকতেন বংশীবাবু। উত্তরপাড়ার এক রাজবাড়ি আমাদের বেশ পছন্দ হয়। শম্ভুনাথ সাহার একটা ১৬ মিলিমিটার ক্যামেরা ছিল। সেই ক্যামেরায় নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ঐ বাড়িটার ছবি তোলা হয়। সেই বাড়িতে একটা ল্যান্ডো গাড়িও ছিল। সেটাকেও কাজে লাগানো হবে ভাবা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে মাখন ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক 'ঘরে বাইরে' প্রযোজনা করবেন বললেন। ভদ্রলোকের নানা রকম ব্যবসা ছিল। বেশ এনটারপ্রাইজিং মানুষ। খুব শিকারের শখ ছিল। তাঁর অনুরোধে আমি একবার চিলকাতে ওঁর শিকারের সঙ্গী হয়ে একটা শিকার বিষয়ক ছবি করে দিই। ১৬ মিলিমিটার, কোডাক ক্যামেরায় এই ছবি তোলা হয়। ক্যামেরাটা ছিল তাঁরই এক বন্ধুর। সে যাই হোক, মাখন ঘোষ তো আমাদের ৯নং ল্যান্সডাউন রোডে একটা ঘর নিলেন। অফিস হল। সত্যজিৎ নাম দিলেন 'কোনার্ক পিকচার্স।' আমি তখন পরিপূর্ণ বেকার, কাজেই অফিস খুলে আমিই বসতাম। আর সকলে অফিস ফেরত আসতেন। প্রচুর আড্ডা হত। স্ক্রিপ্ট নিয়ে অনেক আলোচনা হত। একবার তো প্রায় ঠিকই হয়ে গেল যে সত্যজিৎবাবু আর আমি নেপাল যাব এবং খচ্চরের পিঠে চেপে। তাছাড়া ওখানে যাওয়ার উপায় ছিল না তখন। ওখানে গেলেই নাকি আমরা অনেক অনেক

সোনার বাঁট নিয়ে আসতে পারব এবং তা বেচে ডাবল ভার্সান ছবি করতে পারব। একেবারে হলিউড স্টাইলে। হলিউড তখন আমাদের ভীষণভাবে টানত। আসলে এই সবকিছুবই যে ভীষণ রকম অবাস্তব, স্বপ্ননগরে বিচরণ, তা বুঝতে আমরা একটু সময় নিয়ে ফেললাম।

ছবিটা ফিনান্সের অভাবে স্বভাবতই হতে পারছে না, আমরা সকলেই বেশ হতাশ, হাল ছেড়ে দিয়েছি, বেশ রাগই হচ্ছে আমাদের, এই সময় বিখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্র পরিচালক জ্যঁ রেনোয়া কলকাতায় এলেন।

রেনোয়া নিজে আসার আগে অবশ্য কেনেথ মাইকেল ডাউনি এসেছিলেন ওঁর পক্ষ থেকে। কিন্তু এলেই যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে এমন নয়। কারণ যে কারণে তিনি আগে এসেছিলেন তা ছিল রেনোয়া ভারতে এসে যে ছবি করবেন অর্থাৎ 'দ্য রিভার' তার সাহায্যকারী ভারতীয় কলাকুশলীর দল তৈরির ব্যবস্থাদি করা। এদিকে আমরা তখন ফিল্‌ম ইন্ডাষ্ট্রির কেউ নই।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও-র ল্যাব ইনচার্জ মেটাজি হঠাৎ একদিন আমায় খবর পাঠালেন যে কেনেথ মাইকেল ডাউনি নামে একজন আমায় খুঁজছেন। আমি ত' ও নামে কাউকে চিনি না, ফলে অবাকই হলাম। তবে দেখা কবলাম। বুঝলাম যে রেনোয়াকে আমার নাম দিয়েছেন আরভিং পিচেল। হলিউডে থাকাকালে রেনোয়ার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় হলেও আরভিং পিচল আমাকে অসাধারণ সাহায্য করেছিলেন। ডাউনি ফিরে গেলে রেনোয়ার প্রোডাকশান ডিজাইনার ইউজিন লোরিয়ো এলেন। তারপর এলেন স্বযং রেনোয়া।, সস্ত্রীক।

তখন আমাদের 'ঘরে বাইবে'-ব স্বপ্ন প্রায় বং হারাতে বসেছে। সত্যজিৎবাবু আগের মতোই ডি.জে. কিমার-এ কাজ করছেন। রেনোয়া সস্ত্রীক ও রুমার গর্ডেন অর্থাৎ 'রিভার'-এর লেখক ও সহযোগী চিত্রনাট্যকার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে উঠেছিলেন। আমি প্রধান সহকারী চিত্রপরিচালক হলাম 'রিভার'-এর। সত্যজিৎবাবুকে আমি রেনোয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। তিনি অফিস থেকে হাফছুটি করে প্রায় রোজই রেনোয়ার কাছে যেতেন। আমাদের 'ঘরে বাইরে' প্রজেক্ট চাপা পড়ে গেল।

রেনোয়ার চোখ দিয়ে সত্যজিৎবাবু ও আমি দুজনেই বাংলাদেশকে দেখতে শুরু করলাম। আর রেনোয়াও তাঁর মত এক শিক্ষিত তরুণের সংস্পর্শে এসে প্রচন্ড উপকৃত হলেন। রেনোয়াকে অবশ্য সবচাইতে বেশি মুগ্ধ করেছিলেন কমলবাবু। কমলকুমার মজুমদাব। তবে কমলবাবু সত্যজিৎ ও আমাদের সকলকেই কি কম মুগ্ধ করেছিলেন।

প্রথমে জানতাম, 'রিভার' ছবিতে কাজ করবেন বিখ্যাত সিনেম্যাটোগ্রাফার ক্লাইড ডিভিনা। ক্লাসিক অ্যাডভেঞ্চার ফিল্মে কাজ করে ইতিমধ্যেই তিনি বেশ বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর জায়গায় এলেন ক্লদ রেনোয়া। জ্যঁ রেনোয়া-র ভাইপো, তাঁকে সহকারী হিসেবে সাহায্য করলেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। ইনসিওরেন্সেব এক ভদ্রলোক ইকুইপমেন্ট ও ইউনিটের ব্যাপারে আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন। তাঁর ছেলে সুব্রত মিত্র এলেন অ্যাপ্রেনটিস অবজারভার হিসেবে। তাঁর সঙ্গে একটি আর্গাস ক্যামেরা। 'রিভার'-এর সব স্থিরচিত্র তিনিই তুললেন। আজ তাঁকে রসিকরা সকলেই পৃথিবী বিখ্যাত সিনেম্যাটোগ্রাফারদের একজন বলে মনে করেন।

'রিভার' ছবির অভিজ্ঞতা ও রেনোয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমাদেব 'ঘরে বাইরে' না হওয়াব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আমার বিশ্বাস, হলিউডধর্মী 'ঘরে বাইরে' ছবি করায় আগ্রহী সত্যজিৎ রায় যে প্রথম সুযোগে ইতালীয় নয়া বাস্তবতা বা নিও রিয়ালিস্ট চরিত্রের 'পথেব পাঁচালী' নির্মাণ কবলেন তাব মূলে নিশ্চিত প্রভাব ছিল জ্যঁ বেনোয়ার।

সত্যজিৎ রায় যখন 'পথের পাঁচালী' করেন আমি তখন বোম্বাইতে। খবরাখবর পেতাম। তবে আগের মত যোগাযোগ ছিল না আব। কলকাতার এক ল্যাব-এ হঠাৎই একদিন 'পথের পাঁচালী'-র আংশিক স্ক্রিনিং দেখে ফেলি। দেখেই মনে হয় একটা মাস্টারপিস। তারপরের গল্প ত' সকলেরই জানা। কিভাবে 'পথের পাঁচালী' বিশ্ব চলচ্চিত্রে তার জায়গা করে নিল। সত্যজিৎবাবুব এই অসাধারণ সাফল্য আমাকেও কিছু সুবিধে কবে দিয়েছিল। বিজ্ঞাপনের ছবি হলেও তাতে ওঁব স্ক্রিপ্ট বা মিউজিক ক্লায়েন্টদের কাছে খুবই বাঞ্ছিত ছিল। আমি তখন জীবিকাব তাগিদে শুধুই বিজ্ঞাপনের ছবি করি। আমাব 'টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল' ছবিতে তিনি স্ক্রিপ্ট করেছিলেন। মিউজিক দিয়েছিলেন আমার স্যানডোজের ছবিতে। 'কোয়েস্ট অব হেল্' ছিল বোধহয ছবির নাম। এছাড়া দুটো জয়েন্ট প্রোডাকশানও কবি আমরা। একটা ডানলপের হয়ে। নাম 'আওয়াব চিলড্রেন উইল নো ইচ আদার বেটার'। আব একটা পশ্চিমবঙ্গ সরকাবেব ছবি। ছবিটা ছিল বন্যার উপব। নাম 'ব্রেভ নেভাব ডাইজ'।

তবে একথা বলতেই হবে যে হলিউডের প্রতি ওঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। হলিউডের পরিচালকদের কাজ বিশেষ করে চল্লিশ দশকেব শেযদিকের ছবিগুলি তাঁকে খুবই আকর্ষণ করত। 'অস্কার' বিষয়ে আমাদের বিশেস বকমের দুর্বলতা ছিল। আমবা প্রায়ই 'অস্কার' নিয়ে আলোচনা করতাম। আজ সেই 'অস্কার' পুরস্কাব তাঁর হাতে, এ ত' শুধু তাঁবই আনন্দ নয়, আমাদের সকলের। বিশেষ করে তাঁব চলচ্চিত্রকার জীবনের গোড়ার দিকে আমরা যাবা একসঙ্গে অনেক স্বপ্ন দেখতাম, তাদেরও।

এই অস্কার পুরস্কাব প্রাপ্তিব পর আমি তাঁব বাড়িতে গিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এসেছি। তবে আগে যা করতাম বা কবতে পাবতাম আজ আব তা পারি না। আগে উনি কোনোভাবে সম্মানিত হলে সর্বপ্রথম আমি ওঁকে ফুল পাঠাতাম। শুভেচ্ছার স্মারক হিসেবে। আজ কোনো অর্থেই আমরা আব আগেব জায়গায় নেই। নেই সেই নিউ মার্কেটের ফুলঅলাও, অনাযাসে যে আমাকে ধারে ফুল দিতে পারত।

অনুলিখন ঃ সু:.গ্রা ঘটক

মানিকমামা

রুমা গুহঠাকুরতা

মানিকমামার সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্কটাই হয়তো সকলের চোখে বড়। আমার কাছেও সেটা নিশ্চয়ই অনেকখানিই। কিন্তু সহজাত অধিকারে পাওয়া সেই স্নেহ আরো নিবিড় হয়ে আমাদের বয়সের ব্যবধান অতিক্রম করে এক নির্মল বন্ধুত্বের সম্পর্কে পৌঁছে গেছে কর্মক্ষেত্রে ওঁর ভাবনা চিন্তার কাছাকাছি আসার দরুন। মানিকমামা হলেন একটা dynamic personality। আমাদের সম্পর্কের মধ্যেও ওঁব সেই ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে এবং সেই অফুরন্ত ঐশ্বর্যই প্রতি মুহূর্তে আমাব মনকে ভরিয়ে দিয়েছে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে।

আমাব ছোটবেলাটা কেটেছে বাড়ির মধ্যেই মা-মামা-মাসী-দিদিমা—সবার আদরে ও ভালবাসায়। ওঁবা সবাই শুধু গানই গাইতেন না, এসব নিয়ে রীতিমত ভাবনা চিন্তা করতেন। জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথেব পরিচালনায় রবীন্দ্রনৃত্য ও গীতিনাট্যে মা-মাসীদের বড় ভূমিকাও থাকত। তা ছাড়া সাহিত্য-কাব্য-নাটক নিয়ে পড়াশুনো-আলোচনা-সব মিলিয়ে বাড়িতে একটা সুন্দব সাংস্কৃতিক আবহাওয়া গড়ে উঠেছিলো। সেই পটভূমিকা আমার চেতনাকে অন্য একটা পরিণতিব দিকে নিযে গিয়েছিলো খুব অল্প বয়স থেকেই।

মাসীদের আদরেব সঙ্গে মানিকমামারও স্নেহ আমাব অগোচরেই অর্ন্তপ্রবাহী প্রাণরসের' মতো মঞ্চ, চিত্র, গানের জগৎ সম্বন্ধে আমাব মধ্যে একটা স্পষ্ট প্রাঞ্জল ধারণা গড়ে তুলেছিলো। তখন তো এত বিশ্লেষণ করার মতো বয়স, অভিজ্ঞতা কোনোটাই ছিল না। এখন জীবনের এই পরিণতির বিন্দুতে পৌঁছে বুঝতে পারি মানিকমামার সঙ্গটাই একটা মস্ত বড় শিক্ষাক্ষেত্র।

ছোটবেলাটা আমার বেশিব ভাগই কেটেছে বোম্বেতে, আমার মা, দিদিমা-ছোটমাসীর (বিজয়া বায়) সঙ্গে। মানিকমামা তখন প্রায়ই বোম্বে যেতেন। আমাদের জন্য তো নিশ্চয়ই, তাছাড়া অনেকটাই ছোটমাসীর আর্কষণে। তখন আমার বয়স হযতো দশ, বড়জোব বারো। মানিকমামা গেলেই খুব আনন্দ হতো। উনি ভালো ভালো ইংরেজি ছবি দেখাতে নিয়ে যেতেন, যেখানটা বুঝতে পাবতাম না বুঝিযে দিতেন। এমনি করেই আমার সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন।

মানিকমামার বিয়ের পর আমাব দিদিমা ওঁর বাড়িতেই থাকতেন। দিদিমা মারা যাবার পর ওঁব শ্রাদ্ধের সময় মানিকমামা উপাসনাব অংশটা বাদ দিযে শুধু শ্রাদ্ধবাসর করেছিলেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথেব 'শ্রদ্ধা' নিবন্ধটি উনি নিজেই পড়েছিলেন। সবশেষে আমরা choir -এব ছেলেমেযেবা একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলাম সবাই মিলে। সে গানটি মানিকমামা নিজে গেয়ে শিখিয়েছিলেন। গানটি হলো, 'শান্তি কর বরিষণ নীরব দানে।'

বাড়ির সবাব প্রতি ভালবাসাটা ওঁব অত্যন্ত আন্তবিক ছিল বলেই প্রত্যেকের খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে উনি seriously ভাবতেন এবং সেই ভাবনা অনুযায়ীই চলতো ওঁর কাজের

ধারা। ঠিক এই রকম পারিবারিক সম্পর্কই ওঁর গড়ে উঠতে দেখেছি চিত্র-পবিচালনার সেটে। মানিকমামা আসলে born leader। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। বোম্বে থেকে ফেরার পর ওঁর 'তিনকন্যা' ছবিতে আমি গেয়েছিলাম 'বাজে করুণ সুরে' গানটি। সেটে যাবাব আগে অরূপের কাছে গানটি শিখে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম মানিকমামা হয়তো কত পালটে দেবেন। অন্যরকম করে গাইতে হবে। কিন্তু উনি বললেন, একদম ঠিক আছে। আমি একেবারে খালি গলায় গেয়েছিলাম। গানটি খুব নিয়েছিলো সবাই। মেগাফোন কোম্পানী থেকে ডিস্কও বেরিয়েছিলো। এখন আর পাওয়া যায় না। গানটার এফেক্ট সম্বন্ধে আমি আর কি বলব। ওটা তো সম্পূর্ণই মানিকমামার শিল্পকৃতি। আমাব মেয়ে শ্রমণা ওঁর 'আগন্তুক' ছবিতে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছে, 'বাজিল কাহার বীণা'। ওর ওপর মানিকমামা খুব আশা রাখেন। এই খবরটা আমাব কাছে সত্যি খুব আনন্দেব।

ওঁর 'অভিযান' ছবিতে আমি একটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। খুব নিখুঁতভাবে dialogue মুখস্ত করে গেছি। যদিও জানতাম উনি টেক-এর সময় dialogue অনেক চেঞ্জ করেন। করলেনও। কিন্তু এমনভাবে যে একটুও অসুবিধে হলো না। মানিকমামার কাজেব ধারাই এইবকম। এমনভাবে উনি কাজ কবিয়ে নেন যে কারো মনে হবে না যে দারুণ একটা কিছু পরিশ্রম করছি। সমস্ত ব্যাপাবটাই উনি যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো সহজ করে দেন। কাজের ব্যাপাবে কাবো কোনো tension হয় না। কোনো effort করার consciousness থাকেই না। সেই জন্যই ওঁর ছবির প্রত্যেকটি চরিত্র এমন ঝরঝরে, তরতরে, স্বাভাবিক। 'অভিযানে' আমি একেবারে তিনিশ/চারশ ফিট টানা শট করেছি, কি আনন্দ ভাবা যায় না!

মানিকমামার খুব ইচ্ছে ছিলো ওঁর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে যে পার্টটি অনুভাদি কবেছিলেন সেটি আমায় দিয়ে কবাবার। কিন্তু আমাব মেয়ে তখন একমাসের শিশু। তাই রাজী হতে পারলাম না। উনি আমায অনেক বোঝালেন। ষ্টুডিও সেটে ডাক্তার, নার্স সব রকম ব্যবস্থা করে বাচ্চাকে রাখবেন। কোনো অযত্ন হবে না। তবু আমি ভরসা পেলাম না। ওঁর দিক থেকে কোনো ত্রুটি থাকবে না। আমার মেয়ে বাড়ির চেয়েও যত্নে নিশ্চয় থাকবে ওঁর সতর্ক প্রহরায়। এ সবই জানতাম। তবু নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারলাম না। আমার মনটা যদি ওধারে পড়ে থাকে কাজে নিশ্চয়ই সেই Perfection আসবে না, যা মানিকমামার কাছে সবাই আশা করেন। উনি তো শুধু আমার মামাই নন, সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় film ডিরেক্টর। সেই কথাটা ভেবেই আমি সেবার ওঁর ছবিতে কাজ করবার সাহস পেলাম না। এই দুর্লভ সুযোগকে ত্যাগ করবার শক্তি যুগিয়েছিলো ওঁর প্রতি আমার সেই শ্রদ্ধা, যেখানে আমি ওঁর সন্তানতুল্য স্নেহের পাত্রী নই, ওঁর কাজের বিমুগ্ধ ভক্তদের একজন।

অনুভাদিও প্রথমটায় বাধা পেয়েছিলেন, ওঁকে কুকুরে কামড়েছিল বলে। যাই হোক শেষ অবধি উনি সুস্থ হয়ে করবেন বলে জানালেন। করেছিলেনও সুন্দব।

বহুকাল বাদে বাবুর (সন্দীপ রায) T.V-র একটি ছবিতে একটি চরিত্রে অভিনয় করে খুব ভালো লেগেছিল। বাবুও খুব talented director। ওর ওপর আমাদের সবার অনেক আশা।

'গণশত্রু' ছবিতে কাজ কববার জন্য যেদিন ডাকলেন সেদিন আমার যাওয়া হয়নি।

Russian ballet দেখতে গিয়েছিলাম। পবে রাত ১১ টায ফোন করে বললেন যেন আমি পরের দিন নিশ্চয় যাই। গেলাম এবং এমন সুন্দর করে চরিত্রটা বুঝিয়ে দিলেন যে আমার খুব চেনা মনে হলো। মানিকমামা আমায় একটু ওজন কমাতে বললেন। কমালাম। মাঝে একটু অসুস্থও হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কাজ করে যে কি তৃপ্তি পেয়েছিলাম! এ ছবিতে আমার অভিনয় এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যা আমার কাছেও নতুন লেগেছিলো। Humming-এ আগাগোড়া আমার মেয়ে গান গেয়ে গেছে।

আমাব Calcutta Youth Choir -এর প্রেসিডেন্ট মানিকমাম। শুধু ওঁর মূল্যবান নামটিই আমাদের সংস্থার প্রধান রূপে দেননি, ওঁব advice, direction সব কিছু দিয়ে এতবড় প্রতিষ্ঠানটিকে অমন সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৮৪-তে আমাদের কয়ারের Silver Jubilee Celebration-এর সময় উনি সবে বাইরে থেকে অপারেশন করিয়ে ফিরেছেন। তখন কোথাও বেরোচ্ছেন না। আমি যখন ওঁর কাছে সব খবর ও অনুষ্ঠানের তালিকা জানিয়ে blessing চাইতে গেলাম উনি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষযে প্রশ্ন করে এমনভাবে সব খবর নিচ্ছিলেন যে ওঁর অত কাছের মানুষ হয়েও আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একটা মানুষ অতবড় অপারেশনেব ঝুঁকি কাটাতে না কাটাতেই সবার সম্বন্ধে এমন করে ভাবতে পারে কেমন কবে? কত রকম সব প্রশ্ন! বাইবে থেকে, মানে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে কতজন আর্টিস্ট আসছেন! তাদের থাকা খাওয়াব কি রকম ব্যবস্থা হয়েছে? যদি কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন চিকিৎসা, ডাক্তাবের প্রয়োজন হলে hospitalised কবার কথা ভাবা হযেছে কিনা। তারপর প্রোগ্রামগুলি কিভাবে Present করা হবে, 'সকল দেশের মাটি'ব সুবটি শুনে অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও কোথায আমাদের সঙ্গে ভাবনার মিল রয়েছে সেদিকে যথার্থভাবে আলোকপাত হযেছে কিনা— এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে নতুন করে অনুভব কবছিলাম উনি কিভাবে ওঁব আশেপাশের সবাইকে দাযিত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারেন। মানিকমামা শুধু চিন্তানায়কই নন কর্মনায়কও। চিন্তার সঙ্গে ওঁর কর্মের এমন আশ্চর্য সমন্বয ঘটেছে বলেই উনি এত বড়।

যা বলছিলাম। রবীন্দ্রসদনে সকালের একটা special show-তে ওঁর দেওয়া blessing পড়ে শোনানো হলো। আমার মনে হচ্ছিলো উনি সেখানে উপস্থিতই রয়েছেন। এতবড় show-এর জন্য ওঁর কতখানি উৎকণ্ঠা, স্নেহসজল শুভেচ্ছা রয়েছে আমি তো জানতাম। আর এই শুভেচ্ছার শক্তিতে বিশ্বাস ছিল বলেই এমন সাফল্যেব সঙ্গে এত বড় কাজটা করতে পেরেছিলাম।

মানিকমামার যে বস্তুটি আমায় বারবার এত আশ্চর্য করে সেটি হলো নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ওঁর unassuming স্বভাবটি। পৃথিবীর সেরা চিত্র পরিচালকদের সারিতেই রয়েছে ওঁর নাম এবং এই খ্যাতি কালজয়ী। পৃথিবীতে যতদিন বিদগ্ধ মানুষ থাকবেন মানিকমামা এই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিতে অবিচল থাকবেন, এ কথা উনি নিশ্চয় বোঝেন। কিন্তু স্বভাব, ব্যবহার, চালচলন, স্নেহ, সৌজন্য, ছোটদের সঙ্গে আচরণ— এই শ্রেষ্ঠত্ব বোধের কোনো দম্ভ কিংবা কাঠোরতা কোথাও কোনোদিন দেখিনি।

উনি খুব বিশ্বাস করেন discipline-এ, এবং এই কারণেই কাজের সময় হয়তো একটু রাশ ভারী। কিন্তু কাজের পর উনি কিভাবে ছুটির মেজাজে হৈ হৈ কবতে পারেন

সে খবর আমরা জানি— মানে ওঁর সঙ্গে যাদের কাজ করবার সৌভাগ্য হয়েছে।

অভিযানের শুটিং এর সময় দুবরাজপুর থেকে আমরা এলাম শিউড়ীতে। সেখানে আমি আর মানিকমামা এক জায়গায় ছিলাম। একটু দূরেই ছিলেন দলের আর সবাই। আমি সকালে উঠে 'ওদের সঙ্গে একটু গল্প করে আসি' বলে সেখানে গেলাম। আমি যেতেই সবাই ধরলো, 'রুমাদি, মানিকদাকে বলো আমরা আজ একটু ম্যাসেঞ্জোর বেড়িয়ে আসি।' আমি বললাম, 'তোমরাই বল না? মানিকমামা কিছুই আপত্তি করবেন না।'

'না, না, আমাদের বলতে ভয় করছে।' অগত্যা আমি বললাম। শুনেই মানিকমামা খোশ মেজাজে বললেন, 'খুব ভালো প্রস্তাব। তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব।' শুনে সবার আনন্দ আর ধরে না। মানিকদা ওদের বেড়ানোর সঙ্গী হবেন এটা কেউ ভাবতেও পারেনি। মানিকমামার স্টেশনওয়াগান ও আর একটা গাড়িতে আমরা সবাই মিলে গেলাম। যেতে যেতে দেখা গেলো রাস্তার দুপাশের আমগাছে মস্ত বড় কাঁচা আম ঝুলছে। সবাই লাফিয়ে উঠল, ঐ আম পেড়ে নুন মেখে খেতে যা মজা! মানিকমামা নিজে ফলটল যদিও একদম পছন্দ করেন না, তবু আমাদের কথা শুনে খুব উৎসাহিত হলেন। তখনই গাড়ি থামিয়ে আম পাড়াবার ব্যবস্থা করলেন। নুনও যোগাড় হলো। একটা বড় পাত্রে মাখা হলো। আম পাড়া থেকে মাখা অবধি প্রতিটি কাজ উনি দেখছিলেন আর আমাদেরই মতো উপভোগ করতে করতে বলছিলেন, 'বাঃ কি দারুণ মজা।' আমি বললাম, 'তোমার আবার কি মজা? তুমি তো খাবে না? উনি বললেন, 'তাতে কি হলো? তোরা তো খাবি?'

উনি যে একজন পয়লা নম্বরের International director, ওঁর সঙ্গে চলতে হলে সমঝে চলতে হবে— কখনও কারো মধ্যে সেবকম কোনো মনোভাব জাগতে দেননি। ঐ শিউড়ীতে আমার যেখানে থাকতাম তার কাছাকাছি একটা চাতাল ছিল। সেখানে জ্যোৎস্না রাতে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলতাম। উনি খুব enjoy করতেন। বসে বসে দেখতেন।

আর আশেপাশের সবার প্রতি ওঁর লক্ষ্য! যেমন করে মা-বাবা ছেলেমেয়েদের ওপর নজর রাখেন অনেকটা সেই ধরনের। সেবার আমি প্রচণ্ড সর্দিকাশি নিয়ে শুটিং-এ গিয়েছিলাম। উনি সকালে উঠেই খবর নিতেন আমার মুখ ধোওয়ার জন্য কিংবা গার্গল করার জন্য গরম জল করা হয়েছে কিনা। শুধু আমাব নয়, হিরো হিরোয়িন থেকে টেকনিশিয়ান, মানে দলের প্রত্যেকের প্রতিই ওঁর ঐরকম সজাগ দৃষ্টি থাকে সবসময়ই। আর সবার জন্য থাকে একরকম খাবার ব্যবস্থা। উনি নিজে অসুস্থ বলে এখন ওঁর খাবার অন্যরকম করতে হয়। নইলে উনিও সবার সঙ্গে একই খাবার খেতেন।

এত বড় একটা মানুষের হৃদয়ে যে এমন একটা মিষ্টি soft corner আছে সেটা ওঁকে বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। অথচ ঐটিই আমাদের দারুণ নির্ভরের জায়গা।

সত্যজিৎ রায়ের ছবির শিল্পনির্দেশনা

বংশী চন্দ্রগুপ্ত

আমি 'পথের পাঁচালী' ছবি থেকেই সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে শিল্পনির্দেশনার কাজ করে চলেছি। ভালো ছবিতে শিল্পনির্দেশনার একটা বিশেষ স্থান আছে। বাস্তবতার সম্মুখীন চলচ্চিত্র যতোই হচ্ছে ততোই আমাদের বিভাগীয় সতীর্থদের সজাগ হতে হবে! থিয়েটারি কায়দায় ব্যাক স্ক্রীন ঝুলিয়ে হাতে আঁকা বাড়িঘর দিয়ে মানুষকে আজকের দিনে আর ভাঁওতা দেওয়া চলে না। আজও ব্যাকড্রপের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে এবং ব্যবহারও নিশ্চয়ই করি— কিন্তু এই ব্যবহারের প্রকারভেদটাই হচ্ছে নকল জিনিস নিয়ে আসলের প্রতিচ্ছবি আনার কারুকৌশল— তবেই তো শিল্পনির্দেশনা। চেতন বা অবচেতনভাবে দর্শকের মন সবসময়েই অবহিত হচ্ছে এই পশ্চাদপটের বিষয়ে। এই পটরচনায় বিন্দুমাত্র ত্রুটিও দর্শকের চোখে আঘাত করে, কৃত্রিমতা সৃষ্টি করে। তাই যে কোনো ছবি তৈরির সময়, বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের ছবি তৈরির সময় আমার দৃষ্টি থাকে সদা জাগ্রত। মোদ্দা কথা, এসব ছবিতে ডিটেলের এতো বেশি ঘাঁটাঘাটি করতে হয় যার জন্য পরিশ্রমের পরিমাপ অন্য যে কোনো নির্দেশকের ছবির চাইতে অনেকগুণ বেড়ে যায়। অবশ্যই এইসব সৃষ্টিতে একটা আনন্দও রয়েছে।

চলচ্চিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কাহিনীর ঠিক উপযোগী পশ্চাদপট রচনার দায়িত্ব যেহেতু শিল্পনির্দেশকের, সেট নির্মাণে তাঁর ভূমিকাও তাই গুরুত্বপূর্ণ। 'চারুলতা'র শিল্পনির্দেশনা নিশ্চয়ই 'মহানগরে' হবে না, 'অভিযানে'র সেট উঠিয়ে এনে 'গুপী গাইন বাঘা বাইনে'র কাজ চালানো যাবে না। প্রত্যেকটি ছবি এক একটি স্বতন্ত্র শিল্পসৃষ্টি, তাদের শিল্পনির্দেশনাও স্বতন্ত্র প্রকৃতির। কিন্তু প্রকৃতি যাই হোক না কেন, কাজ সকলেরই এক। ছবির একটি পরিবেশ তৈরি করা, প্রত্যেক চরিত্র ও ঘটনাকে তাদের নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করা, এবং এইভাবেই ছবির নিজস্ব মেজাজ তৈরি করা। সব ছবির ক্ষেত্রেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার প্রাথমিক আলোচনার পর ধীরে ধীরে কাজের আসল রূপটি পরিগ্রহ করে।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' হল এক ফ্যানটাসি ছবি সাধারণত দেশকালের অতিরিক্ত ঘটনার প্রবাহ। কিন্তু সেখানেও ঘটনা প্রবাহে বিশ্বাসযোগ্যতা আনার জন্যে সেটের গুরুত্ব অসীম। হাল্লা রাজার প্রাসাদ একটা বিরাটত্বের ভাব সৃষ্টি করে, অথচ সেই বিরাটত্বের মধ্যে নিহিত আছে আদিম বন্যতা। শুন্ডীরাজার প্রাসাদ শান্তি ও সমৃদ্ধির ভাব নিয়ে এসেছে। প্রথমটায় নীচু খিলানের ঘর, অমসৃণ ধূসর দেওয়াল আর অন্ধকার জড়তা। দ্বিতীয়টাতে শুভ্রতা, শুচিতা আর সৌন্দর্যপ্রিয়তা। দুই রাজ্যের চারিত্রিক ব্যবধান এই পশ্চাদদৃশ্যের মধ্যে স্পষ্ট। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে এই দুই রাজ্যের সেট তৈরি করা নিয়ে আমার আলোচনা যথেষ্টই হয়েছিল। কারণ ডিটেলের ব্যাপার আর কাহিনীতে বর্ণিত চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও সেটের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য যতক্ষণ উনি না-পাচ্ছেন ততক্ষণ তিনি তাঁর পূর্ণ

কাজ শুরু করেন না।

প্রতিটি ছবির শুটিংয়ের পূর্বে উনি সেটের কাজ দেখতে আসেন। সঙ্গে ক্যামেরাম্যান ও সহকারীরাও থাকেন। কি ভাবে, কেমন করে ক্যামেরার দৃশ্যকোণগুলি বেছে নিতে পারেন তার একটা মোটামুটি পরিচয়ের আন্দাজ দিয়ে দেন ক্যামেরাম্যানকে।

সত্যজিৎ রায় এবং আমার মধ্যে বেশ কিছু দীর্ঘ আলোচনার পর ছবির প্রপ্স (প্রপারটিজ)-এর তালিকা উনি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে সাধারণত তৈরি করে থাকেন। সত্যজিৎ রায় এইবার প্রপারটিজ-এর আকৃতিগত ব্যাপারের প্রতি বিশেষভাবে সজাগ দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। অনেকসময় বিশেষ বিশেষ সেট-এর পূর্ণাঙ্গ ছবিও উনি প্রপারটিজ-এর স্থান (পোজিশন) অনুযায়ী স্কেচ করে থাকেন।

'নায়ক' ছবিকে কেন্দ্র করে সত্যজিৎ রায ও আমাকে বিশেষভাবে আলোচনায় বসতে হত কি করে ভেষ্টিবিউল গাড়িটাব অবিকল রূপ দেওয়া যায়। ঐ গাড়ির ব্যবহারিক রীতি দেখবার জন্যে আমরা অনেকবারই কলকাতা থেকে বর্ধমান অবধি গিয়েছি। বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টের স্থিবচিত্রও তুলতে হযেছে। ঐ সময়— 'নাযকে'র শুটিং-এর আগে— কেউ নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর স্টুডিওয় গেলে দেখতে পেতেন ওখানেই একটা ছোট বেলওয়ে ওয়ার্কশপ বসে গিয়েছিল। প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ শ্রীবায় নিজে দেখতে আসতেন।

পরিচালকেব সঙ্গে শিল্পনির্দেশকের সম্বন্ধের কথা না বললে বোধহয় সব কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মনে রাখতে হবে সত্যিকারেব ভালো ছবি মানেই পরিচালকের ছবি। পরিচালক সেখানে সব কিছুরই কেন্দ্রবিন্দু— সমস্ত ছবিটার কল্পনা, পরিকল্পনা সবেতেই তিনি একনায়ক। ছবির সাফল্যই নির্ভর করে এই একনাযকত্বের ওপর। সেট ডিজাইনেও তাঁর ভূমিকা মুখ্য। শিল্পনির্দেশক সেখানে দায়ী কেবল সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্যে।

যে পরিচালক নিজেই তাঁর ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেন, ছবির পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁব ধারণা থাকে। সেই ধারণা থেকেই তাঁর একটা মৌল ডিজাইন রাখতে হয়। সত্যজিৎ রায় তাঁর সমস্ত ছবির মূল ডিজাইন দিযে দেন। শিল্পনির্দেশককে তার ওপর নির্ভর করে ছবিটির সম্পূর্ণ করতে হয়।

একটা বিশেষ জীবনের ইলিউশন তৈবি করা ছবিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা, চলচ্চিত্রের আয়নার জীবনকে প্রতিফলিত কবা। কারণ সাফল্য নির্ভর করে শিল্পনির্দেশক ও পরিচালকদের পাবস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পূর্ণতার ওপর।

দৃষ্টান্ত হিসাবে 'নায়ক' ছবির দুটো ড্রিম সিকোয়েন্সের কথাই ভাবুন না কেন— প্রথমটা, যেখানে কোটি কোটি কারেন্সি নোটের গহ্বরে নায়ক নিমজ্জিত হয়ে যায়— আর দ্বিতীয়টি, একটা জঙ্গলের ভিতর বেশ কিছু উঁচু সমাজের বিত্তশালী মানুষেরা জড়ো হয়ে রয়েছেন একটা পার্টি দৃশ্যে। এই যে বিশেষ জীবনের একটা রূপ চলচ্চিত্রের আয়নায় ধরা পড়লো সে তো আর হঠাৎ-হঠাৎ হয়ে যাযনি। চলচ্চিত্র পরিচালকের কল্পনাশক্তির প্রবণতায় তার সামগ্রিক চেহারাটা অতো সুন্দর দেখিয়েছিল রূপালি পর্দায়।

অপরাজিত-র কথা

অনিল চৌধুরী

১

সত্যজিৎবাবুর 'পথের পাঁচালী' যে দেশে ও বিদেশে ভূয়সী প্রশংসা এবং প্রচুর পুরস্কার পেয়েছে তা সর্বজনবিদিত। আবার এটাও সকলেরই জানা যে এই ছবি তৈরি করতে গিয়ে ভীষণ অর্থসঙ্কটে পড়তে হয়েছিল। এই অর্থসংকটের ব্যাপারে আমার পুরানো দিনের কিছু কথা মনে পড়ে। 'পথের পাচাঁলী'-র সময় বাণী দত্তদের টাকা বন্ধ করার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এগিয়ে আসার মঝখানে আটমাসের একটা ফাঁক ছিল। সেই সময় আমরা সবাই প্রায় রোজই সত্যজিৎবাবুর বাড়ি যেতাম বোধহয় একই নৈরাশ্য ও হতাশার টানে। এই রকম জমায়েতের আরো একটা কারণ ছিল— বৌদির চা, জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন। এই ভাবে চলাকালীন অনেক ছোট ছোট ঘটনা ঘটেছে । তার ভেতরে দু'টো বেশ মজার একটা হল —মাসিমা, অর্থাৎ সত্যজিৎবাবুর মা কলকাতায় কে একজন বিখ্যাত 'ভৃগু' (জ্যোতিষী) এসেছিল, তাকে দিয়ে সত্যজিৎবাবুর জন্ম-বছর মাস, দিন ও ক্ষণ বিচার করাতে গিয়েছিলেন। সেই 'ভৃগু বলেছিলেন, 'এ জন্মক্ষণ যে লোকের সে আলোর কাজ করবে এবং পৃথিবী বিখ্যাত হবে।'

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, হঠাৎ একদিন বৌদি বললেন, তাঁর শোবাব ঘরের জানলায় নাকি লক্ষ্মী প্যাঁচা বসেছিল। এর পরেও বৌদি মাঝে মাঝে ঐ প্যাঁচা বসার কথা বলতেন... অর্থাৎ লক্ষ্মীপ্যাঁচার উপস্থিতিকে অর্থ সমাগমের ইঙ্গিত হিসাবে মনে করিয়ে দিতেন। যাই হোক, ছবি তৈরির ব্যাপারে আলোব ব্যাপারটা মিলে গেল। কিন্তু সত্যজিৎবাবুর পৃথিবী বিখ্যাত হওয়া বা টাকা আসার সম্ভবনা তখন আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যারা তখন সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে ছিলাম তারা কেউই এই ভৃগু বা প্যাঁচার কথা বিশ্বাস করতাম না। তবু ভৃগু বা প্যাঁচার প্রসঙ্গটা উঠলে আমবা যেন নৈরাশ্য বা হতাশার ভেতরেও কিছুটা আনন্দ পেতাম। একটা কথা সত্যি, 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পাবার পরে সত্যজিৎবাবু পর পর প্রায় পঁচিশ খানা ছবি করলেন এবং এই সব ছবি করতে তাঁর প্রযোজক বা টাকা পয়সা পেতে আর কোনো গুরুতর অসুবিধা হয়নি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিই। 'ঘরে-বাইবে' ধরে সত্যজিৎবাবুর এ পর্যন্ত করা পঁচিশখানা পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবির প্রত্যেক প্রযোজকই তাঁদেব দেওয়া টাকা লাভ সমেত ফেরত পেয়েছেন। শুধু ব্যতিক্রম 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র ক্ষেত্রে। এই ব্যতিক্রমের কারণ হল, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-র নেগেটিভ ও প্রিন্ট রহস্যজনকভাবে আজ পনের বছর যাবৎ নিখোঁজ হয়ে থাকা। চিত্রপরিচালক হিসাবে সত্যজিৎবাবুর যা খ্যাতি তাতে মনে হয়, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র নেগেটিভ ও প্রিন্ট থাকলে অনেকদিন আগেই এর প্রযোজকের টাকা উঠে আসত। এই যে সত্যজিৎবাবুর পরিচালনায় ছবি ক'রে কোনো আর্থিক ক্ষতি না হওয়া-এটা, আমার

মনে হয়, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ইতিহাসে একটা বিরল ঘটনা। আমার ধারণা, আন্তর্জাতিক কোনো বিখ্যাত বা অখ্যাত চিত্রপরিচালকের ক্ষেত্রে ও ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেনি।

২

এদিকে অসুবধা দেখা দিল পরের ছবির গল্প নির্বাচনে। গল্প ঠিক হচ্ছে না—সত্যজিৎবাবু নানারকম বই পড়ছেন, কিন্তু মনস্থির কবতে পারছেন না। আমরা অপেক্ষা করছি। এই অবস্থায় আমরা—আমি, সুব্রতবাবু ও আরো অনেকে সত্যজিৎবাবুর বাড়ি প্রায় রোজই যেতাম কি গল্প ঠিক হল জানবার জন্য। এই যাবার মূলে আরো একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল দেড় বছরের শিশু সন্দীপ। সেই সন্দীপ এখন পুরোপুরি চিত্রপরিচালক।

যাই হোক, অপেক্ষা চলতে থাকল। এব ভেতর এম. পি. স্টুডিওব মালিক স্বর্গত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় আমাদের একদিন ডেকে পাঠালেন। তিনি সত্যজিৎবাবুর কাছে প্রস্তাব দিলেন পর পর পাঁচখানা ছবি করার জন্য। কিন্তু আমাদের টেকনিসিয়ানদের রেমুনারেশনের ব্যাপারে মতবিরোধ হওয়ায় সে প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

আমার মনে হয় সত্যজিৎবাবু যখন 'পথের পাঁচালী' করেন তখন তিনি 'অপু ট্রিলজি' করবেন ভাবেন নি। যদি ভাবতেন তাহলে 'পথের পাঁচালী' শেষ হবার পরেই যখন আমরা প্রযোজক পাচ্ছিলাম তখন 'অপরাজিত' ছবি আরম্ভ করে দেবার কথা ভাবতেন। এই গল্প নির্বাচন প্রসঙ্গে সত্যজিৎবাবুর চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা দিক তুলে ধরা দরকার। তাঁর শুধু গল্প পছন্দ হলেই হবে না, তার সঙ্গে গল্পের চরিত্রের উপযোগী আর্টিস্টও পাওয়া চাই। অনেক সময় উপযুক্ত আর্টিস্টেব অভাবে পছন্দমতো গল্পও বাতিল করতে দেখেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ছবি বিশ্বাস, উত্তম কুমার এবং তুলসী চক্রবর্তী না থাকলে সত্যজিৎবাবু বোধহয় 'জলসাঘর', 'নায়ক' এবং 'পরশ পাথব' করতেন না। আরো একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একবার সত্যজিৎবাবু ভালো গল্প খুঁজে না পেয়ে শেষে ঠিক করলেন দু'টো বা তিনটে ছোট গল্প নিয়ে ছবি করবেন। এর ভেতরে একটা ছিল বিভূতিভূষণের 'দ্রবময়ীর কাশীবাস'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ছোট গল্প নিয়ে ছবি তিনি করেননি। কারণ হিসাবে বলেছিলেন, 'দ্রবময়ীর ভূমিকায় প্রভা দেবীকে পেলে করতেন।'

এই গল্প নির্বাচন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমার আরো একটা কথা মনে পড়ল। কোনো ছবি তৈরি করা কালীন পরের ছবির গল্প সত্যজিৎবাবু এ পর্যন্ত স্থির করতে পারেননি। কখনো কখনো কেবল ভাসা ভাসা ভাবে বলেছেন, এটা করলে হয় বা ওটা করলে হয়। শুধু তাই না, ছবি রিলিজ না হওয়া পর্যন্ত পরের ছবির গল্প নির্বাচন করতে পারেননি। যদি তিনি আগেই গল্প ঠিক ক'রে রাখতে পারতেন তাহলে আমার হিসাবে সত্যজিৎবাবুর পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবির সংখ্যা এতদিনে পঁচিশ খানার পরিবর্তে প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশখানা হতো। অবশ্য আমার মতে এই গল্প ঠিক ক'রে রাখতে পারার অক্ষমতা একজন মহৎ শিল্পীরই লক্ষণ।

গল্প নির্বাচনের জন্য তখন অপেক্ষা চলছে। আমি হঠাৎ একদিন ডি. জে. কিমারের অফিসে গিয়েছি। সত্যজিৎবাবু আমাকে বললেন, 'আমি গল্প ঠিক ক'রে ফেলেছি।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'কি গল্প ঠিক করেছেন? উনি বললেন, 'অপরাজিত পড়তে পড়তে আমি একটা অংশ পেয়েছি যেটা আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে। এই থিমটা আমার খুব ভালো

লাগছে এবং এই থিমের উপর নির্ভর করেই আমি 'অপরাজিত' ছবি করব।' বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' উপন্যাসে এই প্রসঙ্গটা নিম্নরূপ ঃ

'সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত —এমন কি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যখন সে তেলি-বাড়ির তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস...একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস, অতি অল্পক্ষণের জন্য—নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরেই নিজের মনোভাবে তাহার দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ কি! সে চায় কি! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিল তাহার সুবিধার জন্য। মা কি তাহার জীবনপথের বাধা?—কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন—তবুও সত্যকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না। মাকে এত ভালবাসিত তো, কিন্তু মায়ের মৃত্যু-সংবাদটা প্রথমে যে একটা উল্লাসের স্পর্শ মনে আনিয়াছিল—ইহা সত্য—সত্য—তাহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।'

৩

'পথের পাঁচালী' রিলিজ হওয়ার পর সত্যজিৎবাবু অনেক সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটা সম্বর্ধনা আয়োজন করা হয়েছিল ডিক্সন লেনে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও চারুপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে। হঠাৎ একদিন ঐ ডিক্সন লেনে আমাকে ও সত্যজিৎবাবুকে ডেকে নেওয়া হল। সেখানে চারুপ্রকাশ ঘোষ, অমিয় মুখোপাধ্যায়—যিনি হীরেন মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই—এবং অমিয়, মুখোপাধ্যায়ের ভগ্নিপতি বি. এন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি খুব বড় ব্যবসায়ী—প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ওঁরা অপরাজিত ছবিতে টাকা বিনিয়োগ করতে চান বললেন। আমি পাণ্ডিত্য দেখাতে গিয়ে বললাম, 'ফিল্ম করতে যাচ্ছেন, ফিল্মে কিন্তু লোকসানের সম্ভাবনা খুব বেশি'। এই সত্য কথা কৌশল হিসাবে বলেছিলাম। পরেও এরকম কৌশল প্রয়োগ ক'রে ভালো ফল পেয়েছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার ভয় হয়েছিল ওঁরা আমার এই সত্যি কথা শুনে পিছিয়ে যেতে পারেন। তাই তক্ষুণি আমি তাঁদের বলেছিলাম, 'যারা 'পথের পাঁচালী'তে অপুকে দেখেছে তারা নিশ্চয়ই 'অপরাজিত' ছবিতে অপুর কি হল দেখতে চাইবে। কাজেই লোকসানের কোনোই সম্ভাবনা নেই।' এতে ওঁরা আশ্বস্ত হলেন।

এদিকে 'পথের পাঁচালী'-র পরিবেশক অরোরা ফিল্মসের সঙ্গেও সত্যজিৎবাবুর কথা হয়। তারাও অপরাজিত ছবিতে টাকা দিতে রাজি হয়। ও ব্যাপারে অরোরার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অজিতবাবু একটা প্রস্তাব দেন। এটা এইরূপ—এক লাখ টাকা মূলধন নিয়ে একটা প্রযোজক-সংস্থা হবে। এর পঞ্চাশ ভাগ মালিকানা থাকবে সত্যজিৎবাবুর আর বাকি পঞ্চাশ ভাগ চারুবাবু প্রমুখ অন্য চারজনের। মূলধনের পঞ্চাশ হাজার টাকা অরোরা সত্যজিৎবাবুকে শতকরা বার্ষিক একটাকা সুদে ধার দেবে আর বাকি পঞ্চাশহাজার টাকা চারুবাবুরা প্রত্যেকে সাড়ে বারো হাজার টাকা ক'রে দিয়ে পূরণ করবেন। প্রিন্ট ও পাবলিসিটি বাবদ খরচ অরোরা পরিবেশক হিসাবে বহন করবে। সত্যজিৎবাবু এই সংস্থার নাম দেন—এপিক ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড। অজিতবাবুর প্রস্তাব অনুযায়ী সংস্থাটি চালু হল।

৪

এখন আরম্ভ হল 'অপরাজিত' ছবির জন্য গ্রামে ও বেনারসে লোকেশন দেখা এবং অপু কে হবে তা ঠিক করা। সত্যজিৎবাবু আর্টিস্ট পছন্দ করার ব্যাপারে সব সময়েই খুঁতখুঁতে।

এ জন্য আর্টিস্ট ঠিক করতে অনেক দেরি হয়। 'পথের পাঁচালী'-তে দু'জন অপু ছিল—এক, নবজাত অপু, যাকে একবার দেখা গিয়েছিল ইন্দির ঠাকুরণ যখন তাকে দেখতে যায় আঁতুরঘরে—আর একজন হচ্ছে সাত-আট বছরেব অপু। 'অপরাজিত' আরম্ভ হয় হরিহরদের বেনারসে থাকা অবস্থায়, যখন ওরা মোটামুটি সেখানে গুছিয়ে বসেছে। এই গুছিয়ে বসতে অন্তত দু-তিন বছর সময় লাগে। তাই সত্যজিৎবাবু চাইলেন অপরাজিতের অপুকে 'পথের পাঁচালী'-র অপু থেকে বয়সে দু'তিন বছরেব বড় হতে হবে। কাজেই আমাদের নতুন অপুর প্রযোজন। আবার এই অপু স্কুলে যাওয়া পর্যন্ত আছে। বড় হয়ে সে যখন ম্যাট্রিক পাশ করে তখন যে চোদ্দ-পনের বছরের হয়। কাজেই আমাদেব আরো একজন অপুর দরকার হয়।

এই দু'জন অপুর কেউই ঠিক হয় নি। আমরা নানা স্কুলের সামনে ছুটির সময় দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু সঠিক অপু আমাদের চোখে পড়ছিল না। শুধু হরিহর ও সর্বজয়া ঠিক আছে আর কোনো আর্টিস্ট ঠিক হয় নি। এদিকে তখন লোকেশন ঠিক করাও চলতে থাকল।

বেনারসে লোকেশন ঠিক হযে গেল। গ্রামেব লোকেশন দেখতে গিয়ে সত্যজিবাবু 'পথের পাঁচালী'-র সময় গড়িয়া থেকে ডান দিকে বোড়াল গ্রামে গিয়েছিলেন। এবার উনি বললেন, বাঁ দিকে যাবেন। গ্রামের শেষে গিয়ে দেখলেন, বিরাট একটা মাঠ। এই মাঠের পরেই একটা বেল লাইন গিয়েছে এবং সেখান দিয়ে ট্রেনও যেতে দেখলেন। উনি বললেন, 'এখানে এই যে শেষ বাড়িটা, এইটে আমার কাছে গ্রামেব বাড়ি হিসাবে খুব ভালো লাগছে।'

এই ট্রেনেব ব্যাপারে আমি এখানে একটা কথা বলে নেই। 'পথের পাঁচালী'-তে স্যাতজিৎবাবু ট্রেনের দৃশ্য দেখিয়েছেন—অপু-দুর্গা বাত্রিতে ট্রেনেব হইসেলের আওয়াজ শোনে—দৌড়ে অনেক গ্রাম পেবিয়ে তারা ট্রেনের লাইনের কাছে যায়। 'অপরাজিত-তে কিন্তু ট্রেন অপুরা বেনারস থেকে এসে যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়ি থেকেই দেখা যায়। আবার 'অপুর সংসার'-এ অপু যে বাড়িতে থাকত সেই বাড়ির পাশেই ট্রেন লাইন এসে গেল। আমি কখনো সত্যজিৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করি নি কেন 'পথের পাঁচালী'-তে ট্রেন অনেক দূরে থাকল, 'অপরাজিত'তে আরো কাছে চলে এল এবং 'অপুর সংসার' -এ-ই বা কেন একদম তার বাড়িব পাশেই বইল। এর কারণ আমিও ভেবে দেখিনি। 'অপরাজিত' -ব স্ক্রিপ্টে অপু যে-স্টেশন থেকে ট্রেনে করে যাবে বা যে-স্টেশনে নেমে বাড়ি আসবে সত্যজিৎবাবুকে নিয়ে আমরা সেই স্টেশন দেখতে যাই লোকেশনে। স্টেশনটি মল্লিকপুর। এখন তার নাম হয়েছে 'সুভাষগ্রাম'।

আমরা লোকেশন দেখে ট্রেনে করে বালীগঞ্জ স্টেশনে এলাম। বালীগঞ্জ থেকে যখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তখন অনেকগুলো ছেলে ঐ ট্রেনে ফিরল দেখলাম। তারা বোধহয় এক্সকারশনে গিয়েছিল। সত্যজিৎবাবু হঠাৎ তাদের একজনকে দেখে বললেন,

'দেখুন তো, ও আমার অপরাজিত-র অপু হতে পারে।' আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই ছেলেটিকে আটকালাম। তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ির ঠিকানা নিলাম এবং তার কে কে আছে জানলাম। ছেলেটির নাম পিনাকী সেনগুপ্ত।

আমি পরের দিন ওদের সুরেন ঠাকুর রোডের বাড়িতে গেলাম। তার কাকা আছে। বাবা নাই, মা আছে। তাঁদের বললাম, 'আপনাদের এই ছেলেটিকে সত্যজিৎবাবু অপরাজিত-র অপু ঠিক করেছেন, আপনাদের মত কি?' তাঁরা রাজি হয়ে গেলেন। তারপর সত্যজিৎবাবু আবার ছেলেটিকে দেখলেন। এইভাবে দশ-বার বছরের অপু যাকে নিয়ে বেনারসের গল্প আরম্ভ, ঠিক হয়ে গেল।

'পথের পাঁচালী'-তে অপুরা কাশীতে গরুর গাড়ি ক'রে যখন রওনা হয় তখন অপুকে দেখানো হয় সাত-আট বছরের ছেলে। 'অপরাজিত' আরম্ভ হয় যখন হরিহররা কাশীতে বেশ গুছিয়ে বসেছে। এই গুছিয়ে বসার ব্যাপারে একটা দৃশ্য দেখা যায়। সর্বজয়া তার জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে পোষ্টকার্ডে একটা চিঠি পেয়েছে—ঝুলানো আলোতে সে চিঠিটা পড়ছে। হরিহর ঘাটে কথকতা ক'রে যে পয়সা পেল তা সর্বজয়ার হাতে দিচ্ছে এবং তখন সর্বজয়া একটা পান খাচ্ছে। সম্পূর্ণ 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ছবি দু'টোতে সত্যজিৎবাবু ঐ একবারই সর্বজয়াকে পান খেতে দেখিয়েছেন। সেই জন্য মনে হয়, সত্যজিৎবাবু অপরাজিত ছবি আরম্ভ করেছেন হরিহররা বেনারসে এসে দু-তিন বছরের মধ্যে গুছিয়ে নেয়ার পরে। তাই 'পথের পাঁচালী'-র অপুকে বাদ দিয়ে তিনি আর একটু বড় বয়সের অপু চেয়েছিলেন। এই সেই পিনাকী সেনগুপ্ত।

শিল্পীদের ভেতর ছোট অপু ঠিক হয়ে গেল। হরিহর ও সর্বজয়া তো ঠিক ছিলই। কথক—কালী ব্যানার্জি, পাণ্ডে ও পাণ্ডে গিন্নি কলকাতায় ঠিক হয়েছিল। কলকাতার ফিল্ম স্টুডিওতে দু'জন পাণ্ডে ছিল— একজন এক্সট্রা সাপ্লায়ার পাণ্ডে, আর একজন 'ব্ল্যাক-লিডার' পাণ্ডে। 'ব্ল্যাক-লিডার' ফিল্ম দরকার হয় ছবির রি-রেকর্ডিং-এর আগে চ্যানেলিং-এর সময়। এই ফিল্ম দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। আমাদের 'পথের পাঁচালী'-র সময় এই ফিল্ম ব্ল্যাক-লিডার পাণ্ডের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল। সেই সূত্রে এঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। আমি জানতাম ওঁর বেনারসে বাড়ি আছে এবং ওখানকার অনেককেই উনি চেনেন। তাছাড়া উনি হিন্দি জানেন। কাজেই আমাদের কাজের সুবিধার জন্য সত্যজিৎবাবু কে বললাম, আপনি তো বলেছিলেন, বেনারসে অনেক হিন্দুস্থানী এক্সট্রা আর্টিস্ট লাগবে। এই পাণ্ডে ও পাণ্ডে গিন্নিকে বেনারসে নিয়ে গেলে কেমন হয়?' সত্যজিৎবাবু বললেন, 'বেশ তো—এতে সুবিধাই হবে।'

বেনারসের শুটিং-এ আর যে সমস্ত আর্টিস্টের প্রয়োজন হয়েছিল সত্যজিৎবাবু তাদের বেনারসেই খুঁজে বের করেছিলেন। যেমন, অপুর বন্ধু, ভবতারণ, পালোয়ান এবং অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা এক্সট্রা আর্টিস্ট।

বেনারসে আমাদের আর্টিস্ট ও টেকনিসিয়ানদের থাকার ব্যবস্থা হয় গঙ্গার ধারে একটা তিনতলা বাড়িতে। সেই বাড়িটা সুব্রতবাবুর এক বাল্যবন্ধুর। এই বাড়ির পাশেই আর একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয় রান্না, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারের জন্য।

সম্পূর্ণ 'পথের পাঁচালী' ছবি 'মিচেল' ক্যামেরায় তোলা হয়েছিল এবং 'কিনে-ভক্স' শব্দ যন্ত্রে শব্দ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই মিচেল ক্যামেরা অত্যন্ত ভারী, বহির্দৃশ্যে ব্যবহার

করতে বেশ অসুবিধা হয়। 'পথের পাঁচালী'-র কিনে-ভক্সে শব্দ-গ্রহণও আশানুরূপ হয় নি। 'অপরাজিত' ছবি যখন করা হবে সেই সময়ে বিদেশে অনেক বিখ্যাত পরিচালক এবং ক্যামেরাম্যান 'অ্যারিফ্লেক্স' ক্যামেরায় শুটিং করত। সুব্রতবাবু সত্যজিৎবাবুকে একটা অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরা কিনলে কি রকম হয় জিজ্ঞাসা করলেন। সত্যজিৎবাবু স্বভাবতই এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। আমরা বেনারসে রওনা হওয়ার অনেক আগেই সুব্রতবাবু ঐ ক্যামেরা আনতে বম্বে চলে গেলেন।

'পথের পাঁচালী'-র রাত্রির দৃশ্য টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে তোলা হয়েছিল। সেই সূত্রে এই স্টুডিওর টেকনিসিয়ানদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তাঁরা একটা নতুন শব্দ-গ্রহণ-যন্ত্র 'স্ট্যান্সিন হফম্যান' টেপ রেকর্ডাব কিনে প্রথম 'অপরাজিত' ছবিতে ব্যবহার করবেন এই রূপ প্রস্তাব দেন। সত্যজিৎবাবু এ প্রস্তাবও সমর্থন করেন। নতুন ক্যামেরা ও নতুন শব্দ-যন্ত্র এই উভয় ক্ষেত্রেই এপিক ফিল্মস থেকে টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়। এখানে একটা কথা বলা দরকার। সুব্রতবাবুর এই অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরাই ভারতবর্ষে প্রথম ফিল্ম শুটিং-এ চালু হয় এবং সেটা 'অপরাজিত' ছবিতেই। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে এখন সমস্ত ছবিরই বহির্দৃশ্য অ্যাবিফ্লেক্স ক্যামেরায তোলা হয়।

যাই হোক, যথা সময়ে সুব্রতবাবু তাঁর নতুন অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরা নিয়ে সোজা বেনারসে এসে হাজির হলেন। বেনারসে 'অপরাজিত'-র শুটিং শুরু হল।

৫

'পথের পাঁচালী'-তে হালকা মেঘ, ঘন মেঘ, আরো ঘন মেঘ, ঝোড়ো মেঘ প্রভৃতি নানাররম মেঘেব প্রয়োজন ছিল। 'অপবাজিত' ছবিতে এই সব মেঘের কোনো সমস্যা না থাকায় আমরা রোজই কিছু না কিছু শুটিং কবতে থাকলাম। বেনারসের গলি, গঙ্গার ঘাট, যন্তর-মন্তর ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায বিভিন্ন দৃশ্য তোলাব কাজ চলতে লাগল। হরিহরের মৃত্যুর পর সর্বজয়া বেনারসে যে লাহিড়ী-বাড়ির গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে—লাহিড়ী বাড়ির এই অংশটুকুই শুধু বেনারসে তোলা হয়েছিল। এদিকে সত্যজিৎবাবুব অনুসন্ধিৎসু চোখ গঙ্গার ঘাটে জমায়েত হওয়া পুণ্যার্থীদের ভেতর সর্বজয়ার জ্যাঠামশাই ভবতারণের ভূমিকায় অভিনয় করার উপযুক্ত কাউকে পাওয়া যায় কিনা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কারণ, সর্বজয়ার লাহিড়ী—বাড়ির চাকরি ছেড়ে দিয়ে অপুকে নিয়ে ভবতারণের সঙ্গে ট্রেনে কাশী থেকে ভবতারণের বাড়ি বাংলাদেশের মনসাপোতা রওনা হওয়া—এই শটে ভবতারণকে দরকার।

যাই হোক সত্যজিৎবাবু তাঁর পছন্দ মতো ভবতারণকে খুঁজে পেলেন। এই ভদ্রলোক অভিনয় করতে হবে শুনে প্রথমে অবাক হয়েছিলেন, কিন্তু শেষে রাজি হয়ে গেলেন। এঁর নাম রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত, বাড়ি বরিশাল। বৃদ্ধ লোক, কাশীতে এসেছিলেন শেষজীবন কাটাতে। ভবতারণের জন্য উপযুক্ত কোনো লোক কাশীর ঘাটে খুঁজে না পেলে আমাদের এই একটি শটের জন্য আবার কলকাতা থেকে বেনারস আসতে হতো।

কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিল বিশ্বনাথ-মন্দিরে শুটিং-এর ব্যাপারে। এই মন্দিরে শুটিং আগে কখনো হয়েছে এমন কোনো নজির নেই। মন্দিরে শুটিং-এর অনুমতি যোগাড় করার ভারটা আমাদের পাণ্ডের উপর দেওয়া ছিল, সে রোজই এ মহন্ত সে

মহন্তের কাছে যায় এবং বিভিন্ন লোক মারফত চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু পাণ্ডে আমাকে কোনো আশার কথাই শোনাতে পারছিল না। আমি পাণ্ডেকে টাকা পয়সা খরচ করতে রাজি আছি এরকম আভাসও দিয়েছিলাম। তাতেও কোনো ফল হয় নি। দু-চারদিন পরে সে একদিন আমাকে বলল, মন্দিরের প্রধান মহন্ত মন্দিরে শুটিং করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি পাণ্ডের কাছে কিভাবে সে এই অনুমতি পেল জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে সে কিছুই আমাকে খুলে বলল না। ব্যাপারটা আমার কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখল।

যথাসময়ে বিশ্বনাথ-মন্দিরে শুটিং আরম্ভ হল। প্রথম শট মন্দিরের বাইরে থেকে মন্দিরের গেট দিয়ে সর্বজয়া ও পাণ্ডে-গিন্নির ভিড় ঠেলে মন্দিরে প্রবেশ। এরপর ক্যামেরা ও টেপ-রেকর্ডার নিয়ে আমরা মন্দিরে ঢুকলাম। অসম্ভব ভিড়। অনেক কষ্টে আমরা বিশ্বনাথের পুজো ও আরতির দৃশ্য তুললাম এবং আরতির বাজনার রেকর্ড করলাম। কাজ শেষ করে আমারা যখন বেরিয়ে আসছি হঠাৎ পাণ্ডে এসে বলল, প্রধান মহন্তের সঙ্গে আমাদের দেখা করতে হবে এবং টেপ-রেকর্ডারও সঙ্গে নিতে হবে। আমি যে সময়কার কথা বলছি সে সময় ফিল্ম লাইনের বাইরে বিশেষ বড় কেউ ম্যাগনেটিক টেপরেকর্ডারের কথা জানত না। পাণ্ডে সত্যজিৎবাবুকে মহন্তজীর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করল। এই অনুরোধ আমাদের কারো পক্ষেই অবশ্য অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না।

ইউনিটের অন্য সবাইকে আমাদের অস্তানায় পাঠিযে দিয়ে আমরা কয়েকজন পাণ্ডের সঙ্গে মন্দিরের কাছেই চারতলা সিড়ি ভেঙে মহন্তজীর ঘরে প্রবেশ করি। দেখলাম, মহন্তজী একটা ফরাশে তাকিয়া ঠেস দিযে বসে আছেন, সামনে কযেকখানা বেতের ছাউনি দেওযা কাঠের চেয়ার এবং পাশে একখানা বেঞ্চ। আমরা নমস্কার করতে তিনি আমাদের বসতে ইঙ্গিত করেন।

আমরা তিন-চারজন চেয়াবে বসলাম—বেঞ্চে রাখা হল টেপরেকর্ডার। এইবার পাণ্ডে আরতির বাজনা প্লেব্যাক করে মহন্তজীকে শোনাতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বুঝতে পারলাম পাণ্ডে কিসের লোভ দেখিয়ে বিশ্বনাথেব মন্দিরে শুটিং-এর অনুমতি আদায় করেছে। মহন্তজী বৈচিত্র্যহীন জীবনে মুহূর্ত-পূর্বের আরতির বাজনা তক্ষুণি তাঁর ঘরে বসে শুনতে পাওয়ার ঘটনায় একাধারে অবাক, অভিভূত ও খুশি হয়েছিলেন। আমি তাঁর মুখে এই রকম অভিব্যক্তিই লক্ষ্য করেছিলাম। মনে হয়, সে সময় তাঁর কাছে টেপ-রেকর্ডারটা আলাদীনের প্রদীপের মতোই আশ্চর্য মনে হয়েছিল।

যাই হোক প্লে ব্যাক চলছে। আর এদিকে মনে হচ্ছে আমাদের ছারপোকা কামড়াচ্ছে। আমার পাশে সুবীর হাজরা ছিল। সেও দেখি উসখুস করছে—অর্থাৎ তাকেও কামড়াচ্ছে। কামড়ানো ক্রমশ বাড়তে থাকে—বলার উপায় নেই দাঁড়াবার উপায় নেই—ভয়, পাছে মহন্তজী অসন্তুষ্ট হন। তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ ঘটালে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। কাশী হিন্দুদের মহাতীর্থ। বিশ্বনাথ-মন্দির এই তীর্থের প্রধান আকর্ষণ। আর সেই মন্দিরের ইনি প্রধান মহন্ত—ইচ্ছা করলেই আমাদের টেপ-রেকর্ডার আটকে রাখতে পারেন।

আরতির বাজনা চলছেই। সেইসঙ্গে কালো কালো ছারপোকা কাপড়ে, জামায় ও শরীরের সর্বত্র ঢুকে পড়ছে। মনে হয়, এরা বহুদিন রক্তের স্বাদ পায় নি, তাই রং লাল নয়। লাল রং-এর ছারপোকা চেনা, তারা হলে অতটা গা ঘিন ঘিন করত না, সে এক অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত পরিস্থিতি। সমস্তই সহ্য করতে হচ্ছে—না পারি উঠতে, না পারি

কিছু বলতে। অবশেষে আরতিব বাজনা শেষ হল। আমরা মহন্তজীকে নমস্কার জানিয়ে হাসিমুখে জামাকাপড়ে অসংখ্য ছারপোকাসহ বিদায় নিলাম।

৬

কলকাতায় ফিরে এলাম। এখনো ছবির শুটিং-এর অনেক কাজ বাকি—অনেক আর্টিস্ট নির্বাচন, কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে শুটিং-এর লোকেশন ঠিক করা, স্টুডিতে সেট তৈবি করা ইত্যাদি।

আমার সহকারী নিতাই দত্ত কলেজ ষ্ট্রিট পাড়ায় এবং ওখানকার কফি হাইসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যেত। একদিন নিতাই সত্যজিৎবাবুকে এসে বলল, একটি ছেলেকে সে দেখেছে, হয়ত অপু হতে পাবে। সাতজিৎবাবু ঐ ছেলেটিকে দেখলেন। 'অপরাজিত-র্ বড় অপুব পক্ষে ছেলেটির বয়স তার কাছে বেশি মনে হল। ছেলেটি অবশ্য তাব অনেক পরে তার জীবনের প্রথম ছবি সত্যজিৎবাবুব 'অপুরসংসার'-এ অপুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। নাম, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

অনেক খোঁজাখুজিব পব যে ছেলেটি বড় অপুব ভূমিকায নির্বাচত হল তার নাম স্মরণকুমার ঘোষাল। কার মারফত এই ছেলেটিব সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল আমার মনে নেই।

'অপরাজিত'-র স্ক্রিপ্টে লীলার ভূমিকা ছিল। সত্যজিৎবাবুর পরিচিত এক পরিবার থেকে ছোট লীলা নির্বাচিত হল। পুরনো দিনের বাংলা ছবির নায়িকা শান্তি গুপ্তা তখন বিশ্বরূপায় অভিনয় করতেন। অনেক চিন্তা ভাবনা করে সত্যজিৎবাবু তাঁকে বেনারসের লাহিড়ী বাড়ির লাহিড়ী গিন্নির ভূমিকায উপযুক্ত মনে করলেন। স্বভাবতই আমাকে বিশ্বরূপার মালিক বাসবিহারী সরকারের অনুমতির জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হল। তিনি দু-একটা শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিলেন। প্রধান শর্তটি হল--আমরা শান্তি গুপ্তাকে কোনো পারিশ্রমিক দিতে পারব না। এ শর্তটি আমার কাছে ভালো লাগল।

কলেজে পড়তে থাকা অবস্থায় বড় অপুর থাকবার জন্য পটুয়াটোলা লেনের যে বাড়ির ছাদের ঘর ঠিক হয়েছিল সেই বাড়িব রকে এক ভদ্রলোককে সত্যজিৎবাবু দেখতে পান। ইনিই লাহিড়ীমশাই নির্বাচিত হন—নাম লালচাঁদ বন্দোপাধ্যায়।

অরোরা 'পথের পাঁচালী'-র পরিবেশনার দায়িত্ব পেলে আমাকে ও সত্যজিৎবাবুকে মাঝে মাঝেই অরোরার অফিসে যেতে হতো। সেই সময় সেখানে সত্যজিৎবাবুর অনেকের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় ও দেখাসাক্ষাৎ হয়। 'অপরাজিত'-র আর্টিস্ট নির্বাচনের প্রশ্ন যখন এল তখন সত্যজিৎবাবু অরোরার এখানে তাঁর পূর্বে দেখা দু'জনকে দু'টি ভূমিকার জন্য নির্বাচন করেন—প্রফেসরের ভূমিকায় হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, যিনি 'পথেব পাঁচালী'-র বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত কাজ দেখতেন। আব হেডমাস্টারেব ভূমিকায় সুবোধ গাঙ্গুলী। সুবোধবাবু বেঁটেখাটো লোক-- নিউ থিযেটার্সের ল্যাবোরেটবির চার্জে ছিলেন। অনেক অনুনয় বিনয় করে শেষ পর্যন্ত সত্যজিৎবাবু তাঁকে রাজি কবাতে পেরেছিলেন। অপুর কলেজের বন্ধু অনিল ঠিক হল সুব্রতবাবুর মাসতুতো ভাই অজয় মিত্র। সে এখন কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। এরপর কেবল বড় লীলা ছাড়া আর সমস্ত আর্টিস্টই অতি সহজে ঠিক হয়ে গেল। যেমন, তেলিগিন্নি—রাণীবালা ; নিরুপমা—সুদীপ্তা রায় ; নন্দবাবু—

চারুপ্রকাশ ঘোষ ; ইন্সপেক্টর—মণি শ্রীমানি ইত্যাদি।

শ্রীরামপুরের বলাই গোস্বামীর ছেলে সুনীল গোস্বামী আমার বন্ধু ছিল। সেই সূত্রে আমি তাদের বাড়িতে অনেক যাতায়াত করেছি। বেনারসের লাহিড়ী বাড়ি গোস্বামীদের এই বাড়ি হতে পারে ভেবে সত্যজিৎবাবুকে নিয়ে আমরা চার-পাঁচজন একদিন বাড়িটি দেখতে শ্রীরামপুরে গেলাম। বলাইবাবুদের ওখানে আমাদের সেদিন দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। সত্যজিৎবাবু ঘুরে ঘুরে বাড়িটির রান্নাঘর, শোবার ঘর, সিঁড়ি, বসবার ঘর ইত্যাদি দেখলেন এবং পছন্দ করলেন। শুধু সর্বজয়া ও অপু লাহিড়ী-বাড়িতে যে ঘরে ছিল সেরকম কোনো ঘর পছন্দ মতো পাওয়া গেল না।

দুপুরে মেঝেতে কার্পেটের আসনে বসে কারুকার্য করা রুপোর বাসনে আহার সমাধা ক'রে আমরা ফিরে এলাম। পরে একদিন ঐ বাড়িতে গিয়ে সর্বজয়ার বিধবা বেশে লাহিড়ীর গিন্নির সঙ্গে কথাবার্তা বলা, অপুর লাহিড়ীমশাইয়ের পাকা চুল তোলা, সর্বজয়ার রান্না করা ইত্যাদিব দৃশ্য নেওয়া হল এবং অপু ও ছোট লীলার একটা খেলা করার দৃশ্যও তোলা হল। লাহিড়ী-বাড়ির শুটিং-এর একটা দৃশ্যই বাকি থাকল যেটা সর্বজয়া যে ঘরে থাকত সেই ঘরের ।

সর্বজয়া লাহিড়ী বাড়িতে যে ঘরে থাকবে সেই ঘরের জন্য টেকনিশিয়ানস স্টুডিওতে সেটের মিস্ত্রীবা যেসব ঘরে থাকে তাবই একটা ঠিক করা হল, ঘরটি এমনিতেই শ্রীহীন ছিল-বংশীবাবু তাকে আরো শ্রীহীন ক'রে দিলেন। এখানকার দৃশ্যে ভবতারণকে দরকার। তাই তাঁকে কাশী থেকে আনানো হল। দৃশ্যটি হল—ভবতারণ সর্বজয়াকে অপুকে নিয়ে তাঁর দেশের বাড়ি মনসাপোতা যেতে অনুবোধ করবে—সর্বজয়া কিছু ফল কেটে ভবতারনকে রেকাবী ক'রে খেতে দেবে—পাশে অপুও থাকবে—ভবতারণ ঐ ফল খেতে খেতে সর্বজযা ও অপুর সঙ্গে কথাবার্তা বলবে।

রিহার্সালেব সময় হঠাৎ দেখা গেল, ভবতারণ অপুব হাতে কিছু ফল তুলে দিচ্ছে। সত্যজিৎবাবু বললেন, 'করছেন কি? অপুকে ফল দিচ্ছেন কেন?' ভবতারণ এই কথায় কান দেয় না। তার অকাট্য যুক্তি—সে বুড়ো মানুষ, ফল খাচ্ছে, আব অপু ছোট ছেলে তাকে না দিয়ে খেলে লোকে তাকে খারাপ ভাববে। সত্যজিৎবাবু বললেন, 'আপনি তো ছবিতে অভিনয় করছেন, এটাতো আপনার আসল পরিচয় নয়, ছবিতে ভবতাবণকে আমি লোভীই দেখাতে চাই।' যাই হোক, অপুকে ফল না দেবার ব্যাপারে ভবতারণকে অনেক কষ্টে রাজি করানো গেল।

কলকাতায় যে সমস্ত দৃশ্য তোলা হল সেগুলো—সিটি কলেজে অপু ও অপুর বন্ধু, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠ ও গঙ্গার ঘাট, অপুর কলকাতায় শোবাব ঘর, প্রিন্টিং প্রেস, পাইস হোটেল, প্রিন্টিং প্রেসের মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা ইত্যাদি—অতি সহজেই হয়ে গেল।

অসুবিধা হল আমহার্স্ট স্ট্রিট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে একটি দৃশ্য তুলতে গিয়ে। দৃশ্যটি হল—অপু হ্যারিসন রোড দিয়ে হেঁটে আসবে—হঠাৎ বৃষ্টি আসায় সে দৌড়ে ঐ রাস্তা পার হয়ে এক গাড়িবারান্দার তলায় আশ্রয় নেবে—সেখানে তিনজন চীনাম্যান নিজেদেব ভেতর কথাবার্তা বলবে। তিনজন চীনাম্যান সংগ্রহ করতেও হিমসিম খেতে হয়েছিল এবং সেটাও একস্ট্রা সাপ্লায়ার পাণ্ডে মারফত করতে পেরেছিলাম।

এই শুটিং-এর জায়গাটা খুবই জনবহুল। কাজেই নিচে ক্যামেরা রেখে শুটিং করা যাবে না ভেবে অপুকে নির্দেশ দিয়ে রাস্তার মোড়ে একটা বাড়ির ছাদের উপর আমরা ক্যামেরা নিয়ে উঠলাম। কিন্তু যা ভয় করেছিলাম তাই হল। জানি না কি ভাবে লোক জানতে পারল শুটিং চলছে। সবাই তখন ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। অগত্যা আমাদের কয়েকজনকে নিচে নেমে এসে ক্যামেরার ফিল্ড থেকে লোকজনকে সরিয়ে দৃশ্য গ্রহণ করতে হল। কাজেই ছবিতে যে জায়গাটা জনবহুল থাকবার কথা ছিল সেটা আর জনবহুল থাকল না। ছবিতে সামান্য এই ত্রুটিটুকু রয়ে গেল।

স্কুলের শুটিং হয়েছিল বোড়াল গ্রামের হাই স্কুলে। এখানকার দু'টো দৃশ্যের কথা বলি।—দুটোই ইন্সপেক্টরের স্কুল-পরিদর্শন সংক্রান্ত। একটা হল— হেডমাস্টার খুব ব্যস্ত উত্তেজিতভাবে সব ঠিক ঠাক আছে কিনা ঘুরে ঘুরে তদারক করবেন—হঠাৎ তাঁর নজরে আসবে একটি গরু স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকে ঘাস খাচ্ছে। গরুটিকে হাতে তালি দিয়ে তাড়াতে তাড়াতে দরজার বাইরে বের ক'রে দিয়েই দেখতে পাবেন সামনে ইন্সপেক্টারের ঘোড়ার গাড়ি—হেডমাস্টার ইন্সপেক্টারকে সাদর সম্ভাষণ জানাবেন। দৃশ্যটি তুলতে কিন্তু বেশ অসুবিধা দেখা দিল। সত্যজিৎবাবুর নির্দেশ ছিল, হেডমাস্টারকে খুব আস্তে আস্তে হাততালি দিয়ে গরুটিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে।............ ক্যামেরা চালু হল। হেডমাস্টার যথারীতি গরুটিকে হাততালি দিয়ে তাড়াতে গেলেন। গরুটি কিন্তু পরম তৃপ্তিতে ঘাস খেতেই ব্যস্ত থাকল। হেঁটেখাটো এই হেডমাস্টারের মর্যাদাপূর্ণ হাততালি সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। ক্যামেরা চলছেই। কি করা যায়! আমরা ক্যামেরার পেছন থেকে বিভিন্ন রকম আওয়াজ দিতে শুরু করলাম। একজন ক্ল্যাপস্টিক দিয়ে যত জোরে সম্ভব খট্ খট্ শব্দ করতে থাকল। অনেকগুলো রি-টেকের পর একটি শট অবশেষে ও. কে. হল।

অন্য দৃশ্যটি হচ্ছে—স্কুলের দেয়ালে ছড়ি হাতে হেডমাস্টারের একটি ব্যঙ্গচিত্র আঁকা থাকবে—স্কুলের কোনো দুষ্টু ছেলের শিল্পকর্ম। ইন্সপেক্টর আসবার আগে উত্তেজিতভাবে তদারকি করতে গিয়ে হেডমাস্টার এই চিত্রটা দেখতে পাবেন—তাঁর নিজেরই চিত্র দেখে আরো উত্তেজিত হয়ে একজন শিক্ষককে ডেকে ঐ চিত্রের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। বলা বাহুল্য, এই দুষ্টু ছেলেটি কিন্তু সত্যজিৎ রায় নিজে।

৭

শুটিং চলা অবস্থায় কর্মরত সকলের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব আমার। 'পথের পাঁচালী'-র সময় রাসবিহারীর মোড়ে লক্ষ্মীনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে লাঞ্চের জন্য মাথাপিছু খাবার আসত। আটখানা ক'রে লুচি, ডাল, আলুরদম, বেগুন ভাজা ও একটি মিষ্টি। ফলে মাথাপিছু লাঞ্চের খরচ দাঁড়াত এক টাকা। এ ছাড়া সকালে টিফিনের জন্য সিঙ্গাড়া ও জিলিপি অথবা খাস্তা কচুরি ও দানাদার এবং সঙ্গে চা বরাদ্দ থাকত। এই টিফিনের খরচ মাথাপিছু চার আনা ছিল। বিকালে চা-বিস্কুট। কিন্তু 'অপরাজিত'-র সময় দুপুরের খাওয়ায় পরিবর্তন করা হল—কার প্রস্তাবে, মনে নেই। পরিবর্তিত ব্যবস্থায়, প্রত্যেকে পেত নিজাম থেকে আনা তিনটে মাটন রোল— দাম ছ-আনা হিসাবে এক টাকা দু আনা এবং একটি দু-আনা দামের মিষ্টি— সর্বসাকুল্যে এক টাকা চার আনার

খাবার। মাঝে মধ্যে অবশ্য চিকেন রোলও দেওয়া হতো— দাম, প্রতিটি আট আনা হিসাবে এক টাকা আট আনা। সঙ্গের দু-আনা দামের মিষ্টি নিয়ে সেক্ষত্রে সর্বসাকুল্যে খরচ পড়ত এক টাকা দশ আনা। সকাল ও বিকেলের ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ। স্টুডিও শুটিং-এর সময় অবশ্য মামুলি খাওয়া— ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ অথবা মাংস এবং দই-মিষ্টি। দাম প্রায় একই— ঐ একটাকা থেকে এক টাকা চার আনার মধ্যে।

ভবতারণের মনসাপোতা গ্রামের বাড়ি ঠিক হয়ে ছিল। স্ক্রিপ্টের প্রয়োজনে সত্যজিৎবাবু বংশীবাবুকে বাড়িটির কিছু কিছু অদল বদলের নির্দেশে দেন। এই অদল বদলে বাড়ির মালিকের কোনো আপত্তি হয়নি। বাড়ির পূর্ব দিকটায় দু'টো ঘরের মাঝে অনেকটা ফাঁক ছিল। সেখানটায় একটা মাটির পাঁচিল তোলা হল এবং তার মাঝখানে এমনভাবে একটা দরজা বসান হল যাতে তার ভেতর দিয়ে পূর্ব দিকের বিস্তীর্ণ মাঠ এবং মাঠের শেষে রেল লাইন দেখা যায়। এই নতুন পাঁচিলকে পুরনো করা দরকার।

নতুনকে পুরনো কবার ব্যাপারে বংশীবাবুর কোনো জুড়ি নেই। পাঁচিলটা যাতে নতুন না দেখায় তার জন্য গ্লোব নার্সারির দমদমের বাগান থেকে মাটি ও শিকড় সমেত দু-তিনটে বড় গোছের ফুলের গাছও নিয়ে আসতে হল এবং যথাস্থানে বসান হল। রোজই গাছগুলোতে জল দিতে হতো যাতে মরে না যায।

'পথের পাঁচালী'-তে হরিহরের বাড়ির উঠোনে একটা জবা গাছ লাগানো এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার অভিজ্ঞতা আমি এখানে কাজে লাগিয়েছিলাম। বাড়িটার চাল টালি দিয়ে ছাওয়া। ছবিতে টালির ঘর চলবে না। 'পথের পাঁচালী'-র ক্ষেত্রে আমি ও বংশীবাবু যে পন্থা নিয়েছিলাম, এখানেও আমরা সেই পন্থা নিলাম। গড়িয়া পার হযে ডান ধাবে ও বাঁ ধারে আমাদের যে সমস্ত গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতো, হতো সেই সব গ্রামেব কিছু কিছু বাড়ির চাল এক ধরনের পাতায় ছাওয়া—এটা আমাদের জানা ছিল। এই সব পুরানো চাল আমরা সংগ্রহ করতাম এবং পরিবর্তে সম আয়তনের উপযুক্ত সংখ্যক টালি দিতাম। বলা বাহুল্য, তাবা খুশি হয়েই ওগুলো দিত— কেননা এতে তাদের ভালোই লাভ হতো। এই পুরনো চাল দিয়ে ভবতারণের বাড়ির টালির চাল ঢেকে দেওয়া হল। ভবতাবণের বাড়িব পেছন দিকে একটা মস্ত বড় তেতুঁল গাছ ছিল। তাব শিকড়গুলো মাটি চাপা পড়ায় ভলো দেখা যাচ্ছিল না। সত্যজিৎবাবু বংশীবাবুকে গাছটির গোড়ার মাটি সরিযে ফেলে যাতে শিকড়গুলো ভালো দেখা যায় তার ব্যবস্থা কবতে নির্দেশ দিলেন।

মাটি সরিয়ে ফেলার পর শিকড়গলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা বড় জানোয়ারের থাবা। এই গাছের নিচে দু'টো দৃশ্য তোলা হযেছিল। একটা সর্বজয়া খুব অসুস্থ—ট্রেন লাইনের দিকে তাকিয়ে গাছতলায় বসে আছে— ভাবখানা যেন, অপুর জন্য অপেক্ষা করছে। অন্যটি—সর্বজয়ার মৃত্যুর পর, সর্বজয়া যেখানে বসেছিল তার বিপরীত দিকে অপু গাছটির শিকড়গুলোর পাশে এসে শোকে ভেঙে পড়ে এবং হাঁটুতে মাথা গুঁজে কাঁদতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ল। গাছের নিচে শুটিং-এর কাজ চলছে। হঠাৎ একজন এসে বলল, গাছটির তলায় মাটিতে একটা কাঠ-বিড়ালীর বাচ্চা পড়ে আছে। কৌতূহলী হয়ে আমরা সকলে দেখতে গেলাম, সঙ্গে স্মবণও ছিল। কাঠ-বিড়ালীটির চোখ বন্ধ, কিন্তু জীবিত আছে। মনে হল হয়ত কয়েকদিন আগেই জন্মেছে। স্মরণ বাচ্চাটিকে

বাড়ি নিয়ে যাবে বলে জেদ ধরল। অগত্যা কি আর করা যায়। ফার্স্ট-এইড বক্স থেকে খানিকটা তুলো নিয়ে তার উপরে আলতো ক'রে বাচ্চাটাকে রাখা হল এবং তুলোর পলতে বানিয়ে চায়ের জন্য রাখা দুধে ভিজিয়ে ওর মুখে ধরা হল—খেল কি খেল না বোঝা গেল না। শুটিং শেষ হলে স্মরণ ওকে খুব যত্ন ক'রে বাড়ি নিয়ে গেল।

এর অনেকদিন পর স্মরণকে শুটিং-এ নিয়ে যেতে একদিন ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভয় হল। কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। উপরে উঠব কি উঠব না ভাবছি, এমন সময় স্মরণের মার সঙ্গে দেখা হল। তাঁর মুখ দেখে সাহস পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কান্নার আওয়াজ কেন? তিনি আমাকে উপরে যেতে ইশারা করলেন। দেখলাম স্মরণ হাঁটু মুড়ে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাড়ির বেড়াল কোনো অসাবধান মুহূর্তে স্মরণের অতি সাধের কাঠ-বিড়ালীটিকে হত্যা করেছে। কান্নার কারণ বুঝলাম। অতবড় হত্যাকাণ্ডের পরেও কিন্তু বড় অপুকে নিয়ে সেদিনের শুটিং-এব কাজ সম্পূর্ণ করা গেল।

৮

'অপরাজিত' ছবির কিছু কিছু দৃশ্যের ব্যাকগ্রাউণ্ডে ট্রেনের পাসিং শটের দরকার ছিল। সত্যজিৎবাবু চাইলেন, ট্রেন পাসিং-এর সময় ইঞ্জিন থেকে যেন বেশ কালো ধোঁয়া ওঠে। এ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হল। বলা বাহুল্য, ঐ সময় ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হয়নি। গড়িয়া স্টেশনে ট্রেনের থামা থেকে ক্যামেরা-ফিল্ডে আসা পর্যন্ত সময় লাগে দু'মিনিট থেকে তিন মিনিট। এই সময়টুকু খুবই অপ্রতুল। এর মধ্যেই আমি ট্রেন স্টেশনে থামার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ে ইঞ্জিনে উঠে— শুটিং হচ্ছে এবং এই ট্রেন সিনেমায় দেখা যাবে—ড্রাইভারকেও দেখা যাবে— ইঞ্জিন থেকে কালো ধোঁযা বেরোলে দেখতে ভালো লাগবে—এই সমস্ত ড্রাইভারকে বুঝিয়ে ওর হাতে দু'টো টাকা গুঁজে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার ও তার সহকারী তাড়াহুড়ো ক'রে ইঞ্জিনে প্রচুর কয়লা দিয়ে পোজ নিয়ে দাঁড়াল। যাদবপুর স্টেশনে নেমে লোকেশনে ফিরে এসে দেখলাম সবাই খুব খুশি। বুঝলাম ওঁরা ইঞ্জিন থেকে বেরনো প্রচুর কালো ধোঁয়া পেয়েছেন। যাদবপুর থেকে গড়িয়ায় ট্রেন আসার ব্যাপারেও একই পন্থা নিতাম। এই কাজে কখনো চেনা ইঞ্জিন ড্রাইভার পাই নি। শুধু ছবির খাতিরে একটা মিথ্যাচার করতে হয়েছিল, কারণ ড্রাইভারদের কখনো রুপোলি পর্দায় কোনোদিন চেনা যাবে না।

৯

আমি আগে জানতাম না, অভিনয়ের ব্যাপারে ডুকরে কাঁদতে পারাটা এমন একটা কিছু কঠিন কাজ নয়, কিন্তু প্রাণ খুলে হাসতে পারাটা খুবই কঠিন এবং অনেকেই সেটা স্বাভাবিকভাবে করতে পারেন না। তেলি গিন্নি সর্বজয়াকে গ্রামের এক প্রতিবেশিনীর কেচ্ছার কথা খিল খিল ক'রে হাসতে হাসতে বলেছিল। অবশ্য সবটাই সত্যজিৎবাবুর নির্দেশে। রানীবালার এই অভিনয়ে সত্যজিৎবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ছবিতে আমাদেব কোনো মেকআপ ম্যান ছিল না। সর্বজয়া মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে— এই দৃশ্যগুলোতে সত্যজিৎবাবুর নির্দেশে কোনো ভালো

মেকআপ ম্যান সর্বজয়াকে মেকআপ করলে, আমার মনে হয়, আরো ভালো হতো।

'পথের পাঁচালী'-তে দিনের বেলার সমস্ত অংশই, এমনকি ঘরের ভেতরের দৃশ্যও লোকেশনে তোলা হয়েছিল। শুধু রাতের অংশ স্টুডিওতে নেওয়া হয়। কিন্তু 'অপরাজিত'-র ক্ষেত্রে হরিহর বেনারসে যে বাড়িতে ছিল সেই বাড়ির দিনের বেলার দৃশ্যগুলো নানা কারণে স্টুডিওর ভেতরে সেট তৈরি না ক'রে তোলার উপায় ছিল না। বংশীবাবু প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে স্টুডিও ফ্লোরে ঐ বাড়ির সেট তৈরি করলেন, যার ভেতরে ছিল—হরিহরের শোবার ঘর, রান্না ঘর, উঠোন, উঠোনে চৌবাচ্চা, দোতলায় উঠবার সিঁড়ি, বাইরে যাবার প্যাসেজ ইত্যাদি। বংশীবাবুর কাজ এত নিখুঁত ও সুন্দর হয়েছিল যে বাড়িটি দেখে পাথরের তৈবি নয় এটা বোঝবার উপায ছিল না।

এইবার আলো করবার ব্যাপাবে সুব্রতবাবুর পরীক্ষা। দিনের বেলায় ঘরের ভেতর চলতে ফিরতে দেয়ালে বা মেঝেতে কোনো ছায়া পড়বার কথা নয়। যত-দূর আমি জানি, এর পূর্বে কলকাতায় তৈরি কোনো ছবির ঘরেব ভেতরে দিনের বেলার দৃশ্যে অল্পবিস্তর ছায়া ঘোরাফেরা করে নি এরকম দেখা যায়নি। সুব্রতবাবু ভেবেচিন্তে একটা নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন। স্টুডিওর আলো সোজা না ফেলে উল্টো দিকে সাদা কাপড়ের উপর ফেলা হল, যাতে আলো ঐ কাপড়ে পড়ে প্রতিফলিত হয়। ফলে দিনের কোনো দৃশ্যেই ঘরের ভেতর ছায়াব চলাফেরা দেখা গেল না।

বংশীবাবুর নিখুঁত কাজ ও সুব্রতবাবুর আলো দেবার নতুন পদ্ধতিতে সেটটি ছবিতে এমন স্বাভাবিক মনে হয়েছিল যে সাধারণ দর্শক তো দূরে থাক ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত টেকনিসিয়ানরা যারা এই শুটিং স্টুডিওর ফ্লোবে হয়েছে জানত না, তাদেরও কোনো প্রকারেই বিশ্বাস করানো যায় নি যে এই সেটের শুটিং স্টুডিও ফ্লোরে হয়েছিল। এর পরে কলকাতায় স্টুডিওর সেটে দিনের দৃশ্য তুলতে আলো ফেলার এই পদ্ধতি আস্তে আস্তে চালু হয়।

এই সেটে হরিহরের ঘরের দিন ও রাতের দৃশ্য তোলা হল। তাছাড়া রান্নাঘর, পাণ্ডে ও পাণ্ডে গিন্নির সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ির বাইরে যাওয়া, নন্দবাবুর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাওয়া ইত্যাদি সমস্ত দৃশ্যই তোলা হল। উঠোনে সর্বজয়া যেখানে বাসন মাজছিল সেই দৃশ্যের জন্য সত্যজিৎবাবু বললেন, 'বেনারসের শুটিং-এ আমি অনেক বাঁদর দেখিয়েছি। তাছাড়া এখানে রাস্তা ঘাটে অনেক বাঁদর তো এমনিই দেখা যায়। কাজেই এই দৃশ্যে একটা বাঁদর দেখাতে পারলে ভালো হয়।' আমি একস্ট্রা সাপ্লায়ার পাণ্ডের শরণাপন্ন হলাম। সে রাস্তায় রাস্তায় ডুগডুগি বাজিয়ে বাঁদরের 'বর-কনে' খেলা দেখায় এরকম একজন লোককে তার বাঁদর সমেত ধরে নিয়ে এল। শুটিং-এর সময় সত্যজিৎবাবু সর্বজয়াকে বাসনমাজার নির্দেশ দেন এবং ক্যামেরা চালু করতে বলেন। বাঁদরওয়ালাকে ক্যামেরা-ফিল্ডের বাইরে একটা জায়গা থেকে বাঁদরটাকে ছেড়ে দিতে বলা হয় যাতে বাঁদরটা চৌবাচ্চার পাশে জল খেতে যায়। বাঁদরটা ঠিকই গেল কিন্তু জল খেতে গিয়ে সর্বজয়াকে আক্রমণ ক'রে বসল। সর্বজয়া ভয়ে চিৎকার ক'রে কাত হয়ে পড়ে গেল। সমস্তটাই ছবিতে উঠে গেল। ক্যামেরা বন্ধ হল। সত্যজিৎবাবু বললেন, 'বাঃ'। খুব চমৎকার হয়েছে।' অবশ্য এই চমৎকারের ব্যাপারে সত্যজিৎবাবু সর্বজয়াকে বা বাঁদরকে আগে থেকে কোনো নির্দেশ দেন নি।

১০

বেনারস থেকে কলকাতা ফেরার পরে বড় লীলার সন্ধান চলছিল। পছন্দমতো কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না। সত্যজিৎবাবুর কথা সম্পূর্ণ আলাদা। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ছবিতে বংশীবাবু ও সুব্রতবাবুর সঙ্গে কাজ করতে করতে আমি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলাম যে সাহিত্য বাদে অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে আমি ওঁদের তুলনায় এক সমতলের লোক নই। কিন্তু এটাও আমি তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘদিন মিশে অনুভব করছিলাম যে আমিও ঐ সমতলের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। আবার সচেতনভাবেও চেষ্টা করছি।

এই চেষ্টার সূত্রে আমি সুব্রতবাবুর সঙ্গে বিভিন্ন গানের জলসায় যেতাম। সুব্রতবাবুর একটা গাড়ি ছিল— নিজেই চালাতেন। তখন গানের জলসা শীতকালে সারা রাত ধরে চলতো। আমাদের কাছে জলসার টিকিট থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আমরা গাড়িতে এসে বসে থাকতাম। ফার্ন রোডের জলসায় আমি গাড়িতে বসে আছি, এমন সময় সুব্রতবাবু উত্তেজিতভাবে জলসা থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'দারুণ একটা মেয়ে দেখেছি, হয়তো লীলা হতে পারে।' আমরা প্ল্যান আঁটলাম।

জলসা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, মেয়েটি তার বাব-মার সঙ্গে একটি গাড়িতে উঠল। গাড়িটি যেদিকে চলল আমরাও সেই দিকে তাদের পিছু নিলাম। লেকের কাছে পৌঁছে কুয়াশায় গাড়িটি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল। মন খারাপ হল— পেয়েও হারালাম! টালিগঞ্জ ব্রিজের কাছে যেতেই সামনে পরিষ্কার গাড়িটিকে আবার দেখা গেল আমাদের পিছু নেওয়াও চলতে থাকল। অবশেষে গাড়িটি টালিগঞ্জ জুবিলি পার্কব একটি বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বেশ দূরত্ব রেখে আমাদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। ওরা গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে গেলে আমি ধীরে ধীরে গিয়ে বাড়ির নম্বর এবং নেম-প্লেট থেকে বাড়ির মালিকের নাম জেনে নিলাম।

পরের দিন সত্যজিৎবাবুর কাছে ভদ্রলোকেব নাম বলায় সত্যজিৎবাবু বললেন, 'এতা আমার দুর সম্পর্কের আত্মীয়।' আমি ও সুব্রতবাবু খুব খুশি বোধহয় পরিশ্রম সার্থক হল— শুধু সত্যজিৎবাবুর মেয়েটিকে দেখে পছন্দ হওয়া বাকি। ফোন ডাইরেক্টরি দেখে সত্যজিৎবাবু ফোন করলেন। আত্মীয় সূত্রে কিছু কথা হল। ভদ্রলোক মেয়েকে সিনেমায় নামাতে রাজি হলেন না।

ষ্টুডিও পাড়ায় বিভিন্ন বয়েসের পুরুষ ও মেয়ে একস্ট্রা আর্টিস্টের রোলের জন্য ঘুরে বেড়ায়। বংশীবাবু একদিন জানালেন, রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে তিনি একটি মেয়ে দেখেছেন— তার মুখটা নাকি নার্গিসের মতো। মেয়েটিকে সত্যজিৎবাবুর লেক অ্যাভিনিউর বাড়িতে নিয়ে আসা হল। সত্যজিৎবাবুর মেয়েটিকে রোগা লাগছিল। বৌদি বললেন, কয়েকদিন সময় পেলে মেয়েটিকে খাইয়ে দাইয়ে স্বাস্থ্য ভালো ক'রে দিতে পারবেন।

স্বাস্থ্য ভালো হয়েছিল কিনা মনে নেই, তবে কিছুদিন বাদে মেয়েটিকে নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছটির নিচে বড় অপুর সঙ্গে লীলার একটি দৃশ্য তোলা হল। মেয়েটির আর একদিনের কাজ বাকি। সেটা কলকাতার বাড়িতে বড় অপুর সঙ্গে লীলার আর একটা দৃশ্য। শুটিং-এর জন্য যে বাড়িটি ঠিক হল সেটা লাভলক প্লেসে সত্যজিৎবাবুর পরিচিত বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রির মালিক চ্যাটার্জীদের। শুটিংও হল। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে

প্রোজেকশন দেখার পর এই দু' দিনের কাজই সত্যজিৎবাবু বাতিল ক'রে দিলেন।

এর পরে একদিন লীলাব ভূমিকায় চলতে পারে সত্যজিৎবাবুর এমন একটি মেয়ের কথা মনে পড়ল। মেয়েটি সত্যজিৎবাবুর এক বন্ধুর। মেয়েটিকে এবং বড় অপুকে নিয়ে চ্যাটার্জীদের ঐ বাড়িতেই শুটিং-এর তোড়জোড় আরম্ভ হল। এই অবস্থায় আমি নিজামের খাবার আনাবার ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেলাম। ফিরে এসে দেখি ইউনিটের লোকেরা হাত গুটিয়ে বসে আছে। খাবার আসতে দেরি হওয়ায় কাজ ফেলে বসে থাকা অতীতে আমি কখনো দেখি নি। ব্যাপাব কি? সুব্রতবাবু বললেন, শুটিং শেষ হয়ে গেছে।

একটু পরেই সকলের হাবভাবে টের পেলাম, অন্য কোনো রহস্য আছে। মেয়েটির শুটিং আরম্ভ হওয়ার আগেই শুটিং স্পটে তাব প্রেমিক এসে হাজিব। তিনি মেয়েটিকে প্রস্তাব দিলেন— হয় সে ফিল্ম আর্টিস্ট নয়ত তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী হবে— দু'টোব যে কোনো একটা মেয়েটি বেছে নিতে পারে— দু'টোই একসঙ্গে চলবে না। মেয়েটি লীলার ভূমিকা ত্যাগ ক'রে এই প্রেমিক ভদ্রলোকের স্ত্রী হবার ভূমিকাই বেছে নিল।

ছবি রিলিজের তারিখ আগেই সিনেমা হাউসেব মালিকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল। হাতে সময় অত্যন্ত কম। তাই পুনবায় লীলা খুঁজে শুটিং করার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হল। স্বভাবতই 'অপরাজিত' ছবিতে অপু-লীলা উপাখ্যানেব অংশটুকু বাদ থেকে গেল।

১১

ছবির এডিটিং, মিউজিক, রেকর্ডিং, রি-রেকর্ডিং ইত্যাদি অনেক কাজ এখনো বাকি। রিলিজেব তাবিখ এগিয়ে আসছে। হাতে সময় অত্যন্ত কম। কাজের চাপও ক্রমশ বেড়ে গেল। আমার যতদূর মনে পড়ে, সিনেমা হাউসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তারিখ থেকে রিলিজের তারিখ এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ছবি সেন্সর হয়ে গেলে নিউ এম্পায়ারে প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে ফিল্মের ও ফিল্মের বাইরের বহু চেনা-অচেনা লোক উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাদাস মিত্রের এই ছবিতেই ফিল্ম-জীবনে স্বাধীনভাবে প্রথম শব্দ গ্রহণ। ছবিটি সাউণ্ডের দিক থেকে যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় তার জন্য তিনি প্রচুর যত্ন নিয়েছিলেন। কিন্তু নিউ এম্পায়ারে ছবি চলাকালীন সাউণ্ডে নানারকম গণ্ডগোল। হলের ভেতবে স্থিব হয়ে বসে থাকতে তাঁর অসহ্য লাগছিল— বাব বার বাইরে বেরিয়ে আসছিলেন। আমি বাইরে বসেছিলাম— যেখানটায় হাউসের 'বার' আছে। দুর্গাবাবু একবার ছুটে ওপরে চলে গেলেন অপারেটরদের ঘরে। ভেবেছিলেন, প্রোজেকশনে বোধহয় কোনো ত্রুটি আছে। দুর্গাবাবু বৃথাই তাদের গালমন্দ ক'রে এলেন। সাউণ্ডের গণ্ডগোল যথারীতি চলতেই থাকল। দুর্গাবাবু আমার কাছে এসে ভেঙে পড়লেন। বললেন, 'অনিলবাবু, আর তো সহ্য করতে পারছি না। মদ খেলে কেমন হয়?'

প্রদর্শনী শেষ হল। ছবির প্রথম প্রদর্শনীর পর যা হয় এক্ষেত্রে তাই হল। অনেকেই চুপি চুপি কেটে পড়লেন, আবার অনেকে নানাপ্রকার সমালোচনা করতে থাকলেন। অনেকে ছবিটিকে অসাধারণ বললেন, কারো কারো মতে এটা 'পথের পাঁচালী'-র মতো হয়নি, আবার অনেকে বিরূপ সমালোচনাও করলেন। আমি তো দিশেহারা।

'অপরাজিত' ছবিও 'পথেব পাঁচালী'-র মতো বসুশ্রী বীণা এবং প্রাচী চিত্রগৃহে

মুক্তিলাভ করল। 'পথের পাঁচালী'-র ক্ষেত্রে মাত্র পাঁচ সপ্তাহের জন্য হল পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এবার 'অপরাজিত' ছবি চলার ব্যাপারে ঐ রকম কোনো নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া ছিল না। ছবিটি মাত্র সাত সপ্তাহ চলেছিল। দু-একজন ছাড়া বেশির ভাগ সমালোচকই চিত্রটি অসাধারণ হয়েছে— এইরূপ মত কাগজে প্রকাশ করলেন। 'পথের পাঁচালী'-তে যারা অপুকে দেখেছিল তারা সকলেই অপুকে আবার 'অপরাজিত'-তে দেখতে চাইবে আমার এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। অনেকে অসাধারণ বলা সত্ত্বেও বিভিন্ন লোক ছবিটি ভালো না চলার কারণ হিসেবে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন।

মায়েরা পছন্দ না করলে নাকি বাংলা ছবি ভালো চলে না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে একটি দৃশ্যে অপু তার বন্ধুর একটি জবাবে বলেছিল, 'না, এবার ছুটিতে মনসাপোতায় মায়ের কাছে যাব না, মাকে দু-টাকা পাঠিয়ে ম্যানেজ করেছি।* অপুর এই উক্তি বাঙালি মায়েদের নাকি খুব মনঃক্ষুণ্ণের কারণ হয়েছিল। অন্য অনেকের মতে — বক্স-অফিসে ভালো রেজাল্ট না হওয়ার কারণ হয়ত দর্শকদের ছোট অপুকে ভালোবাসার পর, বড় অপুকে আব নতুন ক'রে ভালোবাসতে না পারা। তাদের এই হয়ত-ভিত্তিক ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছুটি' গল্পে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঃ

'বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই।... তাহাব শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ে কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধহয়।'

বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে আমাদের সান্ত্বনা দিচ্ছিল। কিন্তু 'অপরাজিত'র চরম পরাজয় যন্ত্রণা থেকে আমরা কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছিলাম না— যদিও অল্প কিছুদিন আগেও আমরা 'পথের পাঁচালী'-র সর্বস্তরে জয়ের আনন্দে অভিভূত ছিলাম। এরপর আবার মরার উপর খাঁড়ার ঘা। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে দিল্লীতে তিনখানা বাংলা ছবি পাঠানো হয়েছিল। 'অপরাজিত' উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় পাঠানো হয়নি। কোন ছবি গুণগত ভাবে এই অ্যাওয়ার্ডে পাঠানোর উপযুক্ত তা বিচার করবার ভার ছিল বি. এম. পি. এ.-র প্রযোজক সংস্থার তিনজন প্রতিনিধির উপর। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে দু-একজন পরিচালক-প্রযোজকও ছিলেন।

'পথের পাঁচালী' মুক্তি পাওয়ার পর দেশ-বিদেশ থেকে বহু প্রশংসা ও পুরস্কার পাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সত্যজিৎবাবুর 'পথের পাঁচালী'-র প্রথমার্ধের কিছু কিছু অংশ নিয়ে খুঁতখুঁতি ছিল— যেন ঐ অংশগুলো আর একবার তুলতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু 'অপরাজিত' ছবির বাঁধুনি এবং উৎকর্ষগত ব্যাপারে তাঁর কোনো খেদ ছিল না। কাজেই বিরূপ সমালোচনাগুলো সত্যজিৎবাবুকে কোনো রকম ভাবেই স্পর্শ করে নি।

পৃথিবীর তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র উৎসব— ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। সত্যজিৎবাবু এই উৎসবের প্রতিযোগিতা-বিভাগে 'অপরাজিত' ছবিটি পাঠাবার ইচ্ছা প্রকাশ

* অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয় এখানেও তাই হয়েছে— অর্থাৎ, প্রসঙ্গ-বিচ্যুত ও ভুল উদ্ধৃতি দেওয়ায় অনেক 'সমালোচক' অভ্রান্ত। মূল সংলাপের জন্য চিত্রনাট্য দ্রষ্টব্য।

কবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় দেড়শো-দুশো ছবি ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠানো হয়। তার ভেতর থেকে মাত্র বিশ-বাইশ খানা ছবি প্রতিযোগিতা-বিভাগে মনোনীত হলে যাতায়াত, প্রিন্ট, পাবলিসিটি ইত্যাদি বাবদ প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দরকার। সমস্যা এই টাকা কোত্থেকে যোগাড় হবে?

১২

সুব্রতবাবুর বন্ধুর দাদা শান্তি চৌধুরী গ্ল্যাসগোতে দু-বছর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে কলকাতায় আসেন। খুব সম্ভব তিনি বিলেত থাকাকালে সেখানকার ফিল্ম মুভমেন্টে জড়িত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সুব্রতবাবুর আলাপ হল। আলোচনার মাধ্যমে শান্তিবাবু একদিন হঠাৎ সুব্রতবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা আবার সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড পড় নাকি?' এখানে বলে রাখা দরকার, 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' পৃথিবীতে যত ফিল্ম পত্রিকা বার হয় তার ভেতর বিশিষ্ট। লণ্ডন থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

সুব্রতবাবু সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে শান্তিবাবুর পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচিত হওয়ার পর শান্তিবাবু মাঝে মাঝে সত্যজিৎবাবুর সান্ধ্য বৈঠকে উপস্থিত হতেন। কিছুদিন পরেই তাঁর ধারণা-তিনি যে 'কানট্রি অব দি ব্লাইণ্ড'-এ এসেছেন— সেটা ভেঙে গেল। দেখলাম, শান্তি বাবু ইঞ্জিনিয়াবিং ভুলে গিযে সিনেমাব মেশায় মেতে উঠলেন। চালু করলেন একটি সংস্থা-নাম' লিটল সিনেমা প্রাইভেট লিমিটেড'। শান্তিবাবু ভেনিসে 'অপরাজিত' ছবি মনোনীত হলে যা খরচ লাগবে দিতে রাজি হলেন। ইংরাজি অনুবাদসহ 'অপরাজিত' ছবি -র একটি প্রিন্ট ভেনিসে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কিছুদিন বাদেই প্রথম সুসংবাদটি এল—'অপরাজিত' ছবি প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে। লিট্‌ল সিনেমা বিদেশে 'অপরাজিত'-র পরিবেশনার ভার পেল ছবিটির প্রযোজক সংস্থা এপিক ফিল্মস-এর কাছ থেকে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। অলেকগুলো মামুলি শর্তের ভেতেরে প্রধান শর্ত হল—বিদেশে অর্জিত অর্থের পঞ্চান্ন ভাগ এপিক ফিল্মস-এর এবং বাকি পঁয়তাল্লিশ ভাগ লিটল সিনেমার। এইবার ছবির স্পটিং শিট, বুকলেট ইত্যাদি করার কাজ খুব তাড়াহুড়ো ক'রে শেষ কবা হল।

চুক্তি অনুযায়ী অরোরাব এপিক-ফিল্মস-কে মাসে মাসে 'অপরাজিত'র ব্যবসা সংক্রান্ত হিসেব দেবার কথা ছিল। এপিক ফিল্মস-এর অংশীদার অমিয় মুখোপাধ্যায় মাঝে মাঝেই অরোরা অফিসে যেতেন এবং ঐ হিসাব দেবার ব্যাপারটা অরোরার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অজিত বোসকে মনে করিয়ে দিতেন। অমিয়বাবুর স্বভাবে পীড়াপীড়ি করার ব্যাপারটা ছিল না জানি। জানি না কেন অরোরা এই হিসেবটা দিতে পারছিল না।

এই ভাবে পাঁচ-ছ মাস কেটে গেল। এপিক ফিল্মস-এর অংশীদার ধনী শিল্পপতি বি. এন. ব্যানার্জি অরোরার হিসেব দেওয়ার গাফিলতিটা সহ্য করতে পারলেন না। ফিল্মের এই ঢিলেঢালা চলন তাঁর নীতি বিরুদ্ধ। তিনি অমিয়বাবুকে নির্দেশ দিলেন, 'এপিক ফিল্মস তুলে দিন।' অমিয়বাবু অরোরার অজিত বোসের শরণাপন্ন হলেন। অজিতবাবু প্রস্তাব দিলেন, তিনি এপিক ফিল্মস কিনে নেবেন। সাড়ে বার হাজার টাকা হিসেবে চার জনকে মূলধনের পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনি ফেরত দিলেন সত্যাজিৎবাবুর পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেরত দেবার প্রশ্ন আসে না—কেননা, সে টাকা অজিতবাবু সত্যজিৎবাবুকে ধার

দিযেছিলেন। সত্যজিৎবাবুব সঙ্গে এপিক ফিল্মস-এব সম্পর্ক ছিন্ন হল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'অপবাজিত' ছবিব লাভ লোকসানেব ব্যাপাবেও সম্বন্ধ চুকে গেল।

যথাসময়ে 'অপবাজিত'-ব নতুন প্রিন্ট, স্পটিং শিট, পাবলিসিটি মেটিবিয়াল ইত্যাদি যা দবকাব ভেনিসে পাঠিযে দেওয়া হল। সত্যজিৎবাবু ও শান্তিবাবু ভেনিসে বওনা হযে গেলেন। কযেকদিন পবেই সেখানে উৎসব শুরু হল। কি ফল হবে জানা নেই। আমবা সকলে কলকাতায অসহাযভাবে এবং অধীব আগ্রহে অপেক্ষা কবতে থাকলাম।

যতদূব মনে পড়ে, আটই অথবা নযই সেপ্টেম্বব ভাবতেব সমস্ত সংবাদপত্রে ফল বেব হল—'অপবাজিত' ছবি শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে 'গোল্ডেন লাযন' পেযেছে। আবও দু'টো পুবস্কাব পাওযাব খববও একই সঙ্গে পাওযা গেল—সমালোচকদেব মতে শ্রেষ্ঠ ছবিব পুবস্কাব এবং 'সিনেমা নুযোভো অ্যাওযার্ড'। 'অপবাজিত' ছবিব আগে বা পবে, কোনো বছবেব ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে একই সঙ্গে তিনটি পুবস্কব প্রাপ্তি আব কোন ছবিব ক্ষেত্রে ঘটে নি।

ভেনিস চবচ্চিত্র উৎসব জগতেব শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র উৎসব এবং 'অপবাজিত' ছবি সেই উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুবস্কাব পেযেছে। সুতবাং সেই বছবে পৃথিবীতে যে হাজাব হাজাব ছবি তৈবি হযেছিল তাদেব ভেতবে 'অপবাজিত' ই শ্রেষ্ঠ ছবি—এই ধাবণাটা ভুল হতে পাবে, কিন্তু এটা ভাবতে ভালো লাগে।

যাই হোক সত্যজিৎবাবু ভেনিস থেকে পুবস্কাব নিযে ফিবে আসছেন। আমবা একটি বি ও এ সি-ব পুবনো দেড-তলা বাস ভাড়া কবে যথাসমেযে কলকাতা বিমান বন্দবে উপস্থিত হলাম। আমাদেব সঙ্গে আড়াই বছবেব সন্দীপও ছিল।

সত্যজিৎবাবু প্লেন থেকে নেমে প্রথমেই সন্দীপকে কোলে তুলে নিলেন এবং সম্মুখে এগিযে আসতে থাকলেন। আমাদেব কাস্টমসেব গন্ডিব ভেতব ঢুকবাব আইন নেই। সত্যজিৎবাবু ভেতব থেকেই আমাদেব দেখতে পেলেন। দূব থেকে দেখলাম, সত্যজিৎবাবু 'গোল্ডেন লাযন' উঁচু কবে দেখাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব হাততালি—আব সেই সঙ্গে কাস্টমসেব অফিসাববাও আমাদেব দলে যোগ দিলেন। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। সত্যজিৎবাবু তাঁব স্যুটকেস এবং 'গোল্ডেন লাযন' নিযে কাস্টমস-এব গন্ডি পেবিযে আমাদেব ভেতব চলে এলেন। আমাব যতদূব মনে হয, কাস্টমস-এব আইন অনুসাবে সোনাব তৈবি সিংহটি বিনা ডিউটিতে সেদিন ছেড়ে দেওযা মোটেই উচিত হযনি।

১৩

'পথেব পাঁচালী' ছবিব পব সত্যজিৎবাবু কে অনেক সম্বর্ধনা দেওযা হযেছিল। সম্বর্ধনা নেওযাব ব্যাপাবে সত্যজিৎবাবুব বেশ একটা অস্বস্তি আছে। কাজেই তিনি ঠিক কবেছিলেন, ভবিষ্যতে আব সম্বর্ধনা নেবেন না। কিন্তু সত্যজিৎবাবু 'অপবাজিত' ছবিব জন্য পুবস্কাব পাওযাব পব দু'টো সম্বর্ধনা নেওযাব অনুবোধ প্রত্যাখ্যান কবতে পাবেন নি। একটি সম্বর্ধনা সভাব আযোজন হযেছিল বণজী স্টেডিযামে। এই সম্বর্ধনা কলকাতাব শেবিফেব দেওযা। প্রধান বক্তা ছিলেন হীবেন মুখোপাধ্যায। অন্যটি কলকাতা কবপোবেশনেব মেযব দিযেছিলেন। তখন মেযব ছিলেন ত্রিগুণা সেন। সত্যজিৎবাবুকে তিনি একটি মানপত্র দিলেন কারুকার্য কবা একটি রুপোব আধাবে। জানি না, এব আগে বা পবে কোনো শিল্পীকে

এরূপ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল কিনা। স্বভাবতই আমরাও পরাজয়ের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাঁরা 'অপরাজিত' ছবি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, যাঁরা ছবিটি নিয়ে বিদ্রূপ করতেন এবং যাঁরা ন্যাশানাল অ্যাওয়ার্ডে ছবিটি পাঠান নি তাঁদের আপনজন করতে আর কোনো অসুবিধাই রইল না। এবং ঐ সব বিরূপ কথা তোলা তখন আমাদের অবান্তর মনে হল।

সত্যজিৎ রায় এবং 'অপরাজিত' ছবি অপরাজিত রয়ে গেল।

পরিশিষ্ট

এখন পর্যন্ত 'অপরাজিত' ছবির জন্য বিদেশ থেকে প্রায় তিন লক্ষ টাকা আমদানি হয়েছে। সত্যজিৎবাবুর ছবির চাহিদা বিদেশে হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় আশা করা যায়, আগামী এক বছরের ভেতর আনুমানিক আরো তিন লক্ষ টাকা এই ছবি থেকে আসবে। হিসেব মতো, এপিক ফিল্মস-এর চুক্তি অনুসারে মোট এই ছ-লক্ষ টাকার পঞ্চান্ন শতাংশের পঞ্চাশ শতাংশ অর্থাৎ একলক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা সত্যজিৎবাবুর অংশে পাওনা হয়। কিন্তু বি. এন. ব্যানার্জির স্বভাবসুলভ অসহিষ্ণুতা, অমিয়বাবুর অতিভদ্রতা এবং অরোরা অফিসের গাফিলতি— এই ত্রহ্যস্পর্শে ভীত হয়ে বৌদির সেই লক্ষ্মীপ্যাঁচা রণে ভঙ্গ দিল। সত্যজিৎ রায়ও এই অর্থপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলেন।

ঐ লক্ষ্মী প্যাঁচাটি কিন্তু সাময়িকভাবে আর্থিক যুদ্ধে পরাজিত হল।

সত্যজিৎ রায়
ও সি গাঙ্গুলী

মানিকবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৪৩ সালে। তখন আমি সবে বিলাতী বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমার কোম্পানিতে সাধারণ শিল্পী হিসাবে যোগদান করেছি। তার কিছুদিন পর আরেক যুবক শিল্পী যোগদান করেন, বয়েস আমারই মত।

আমার মত তাঁরও বিজ্ঞাপন শিল্প সম্বন্ধে কোনো ধারণা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। যাই হোক অল্পদিনের মধ্যে আমাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমরা বসতাম একই ঘরে পাশাপাশি টেবিলে। তখন সেই বিজ্ঞাপন সংস্থার ম্যানেজার ছিলেন মিঃ পিটার ক্রম নামে একজন অতি অমায়িক ইংরেজ ভদ্রলোক। আর প্রধান শিল্পী ছিলেন অন্নদা মুন্সি মহাশয়। তা ছাড়াও ছিলেন স্টুডিও ভর্তি অনেক দক্ষ শিল্পী। তাঁরা সকলেই ছিলেন আর্ট স্কুলের পাস করা শিল্পী, তার মধ্যে আমরা দুজনে ছিলাম সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ শিল্পী যার জন্য আমি আর আমার বন্ধু মানিক বাবু দুজনে মিলে আলোচনা করতাম কি উপায়ে বিজ্ঞাপন শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

আমার অভিজ্ঞতায়-মানিকবাবুকে জানাই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে ফুটপাথের সারি সারি পুরাতন পুস্তকের কথা। ওখানো খুব সস্তায় নানা ধরনের ইংরেজি পত্রপত্রিকা কিনতে পাওয়া যায, যাব পাতায় পাতায় আছে নানা রকমের বিজ্ঞাপন। দেবি না করে সেই দিনই অফিস ছুটির পর আমরা দুজনে সেইসব পুরানো বইয়ের দোকানে যাই। সেই থেকে শুরু হয় দুজনের নানা ইংরেজি পত্রপত্রিকার সন্ধান। মনে আছে একবার দুবার এমনও হয়েছে পুরানো পত্রপত্রিকার কেনার পর দেখি—কারুরই কাছে ট্রাম-বাসে বাড়ি ফেরার পয়সা নেই। অগত্যা ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে টালিগঞ্জ হেঁটে বাড়ি ফিরি।

এমনি করে অল্পদিনের মধ্যে আমরা বিজ্ঞাপন শিল্পের লে-আউট, তদনুরূপ ছবি আঁকা ইত্যাদি এক প্রকার নিজে থেকেই শিখে ফেলি। সেই সময়ে মানিকবাবু আমেরিকান লাইব্রেরী থেকে নিয়ে আসতেন নানা ধরনের অতি আধুনিক সদ্য প্রকাশিত বিজ্ঞাপনসহ পত্রপত্রিকা। তার থেকে আমরা পরিচিত হই তখনকার জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞাপন শিল্পীবৃন্দের কাজের সঙ্গে। সেইসব শিল্পীবৃন্দের নাম—ক্যাসাডে, বেনসান, নরম্যান রকওয়েল, পলর্যান্ড, প্রমুখ। তার ফলস্বরূপ স্বল্পদিনের মধ্যে অফিসে আমাদের কাজের নমুনা দেখে মিঃ পিটার ক্রম খুশি হয়ে আমাদের বেতন বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে দিলেন। বিশেষ বড় বড় কোম্পানির কাজের ভার আমাদের উপর তুলে দিলেন, যেমন—ডানলপ, লিপটন, বার্মা শেল, টি-বোর্ড প্রভৃতি। ওইসব বিজ্ঞাপনগুলির খসড়া করার সময় মানিকবাবু আলোচনা করে ঠিক করতেন কিভাবে বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য বজায় রেখে বিজ্ঞাপন শিল্পকে চারুকলার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। যেমন বিজ্ঞাপন থেকে অবাঞ্ছিত রেখা বাদ দিয়ে পরিচ্ছন্ন, সাধারণের বোধগম্য ছবিসহ Body copy কে পদ্য আকারে ভেঙে ব্যবহার, চারিপাশে যতটা সম্ভব সাদা জায়গা ছেড়ে রাখা, যেটাকে মানিকবাবু বলতেন

White space is like White lettering। তাছাড়া চিত্রশিল্পী মানিকবাবুর ললিতকলা এতো উচ্চমার্গেব ছিল যা কল্পনা করা যায় না। একবার মনে আছে শুধুমাত্র কালি ও তুলির আঁচড়ে পলকের মধ্যে আমার প্রতিকৃতি এঁকে দেন, তৎসহ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাল্পনিক প্রতিকৃতি। প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাতে তিনি মুগ্ধ হয়ে বহুক্ষণ চেয়ে থেকে বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠেন—'এ যে একেবারে হাকুসাইয়ের মতো হে!' এরপরেও মানিকবাবু আর্ট ইন ইনডাস্ট্রির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে কিছু চমৎকাব ছবি এঁকেছিলেন, সেগুলির কোনো হদিস পাওয়া যায় না, সেই ছবিগুলি আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি পত্রিকায ছাপা হয়েছিল। যদি কোনো গুণগ্রাহী বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেগুলির সন্ধান করতে পারেন, সেটি হবে জাতীয় সম্পদ। আমার মনে হয় মানিকবাবুর মত এতো প্রতিভাবান মানুষকে জানতে হলে সমগ্র মানুষটিকে পরিপূর্ণ রূপে জানা উচিত, খণ্ড খণ্ড রূপে নয়।

এই উপলক্ষে মনে পড়ে এক ঘটনার কথা, মানিকবাবু আব আমি কাজ করতে করতে এক সদ্য প্রকাশিত ইংরেজি লাইফ ম্যাগাজিন দেখতে দেখতে দেখি পাতা জোড়া বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পী প্যাবলো পিকাসোর হস্তরেখা। মানিকবাবু পত্রিকাটি আমার কাছ থেকে নিয়ে বলেন— 'এটা আপনি একটু মেলে ধরুন তো।' আমি মেলে ধরতে মানিকবাবু সেটা দেখে দেখে নিজের হাতের তালুতে তদনুরূপ রেখা কালি দিয়ে দাগ টানতে টানতে বলেন— 'দেখবেন ও সি, আমিও একদিন এমনি বিশ্ববিখ্যাত হবো।' তখন সেটা আমি খেলাচ্ছলে নিলেও এবং পরবর্তীকালে সেটা যে এতখানি সত্য হবে আমি কল্পনা করতে না পাবলেও তাঁর মধ্যে বহুমুখি প্রতিভা আছে সেটা অন্তব দিয়ে বিশ্বাস কবতাম ও করি। তাঁর মধ্যে এক মহাগুণ দেখেছি যা অবর্ণনীয, সেটি তাঁর কোমল হৃদয় ও সূক্ষ্ম অনুভূতি, যাকে এক কথায় বলা যায় ভালোবাসা।

একদা সাংসারিক এক বিপর্যযের ফলে আমাব বিষণ্ণতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। আমার কাছ থেকে প্রায় জোর করে সেটি জানার পর আমার মনের দুঃখ লাঘব কবতে প্রায দিনই আমাকে সঙ্গে করে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতেন, বিশেষ করে ইংরেজি ফিল্ম যেমন বাইসাইকেল থিফ, আইভ্যান দি টেরিবল, চাইল্ডহুড অফ ম্যাক্সিম গোর্কি প্রভৃতি। সেই সময়ে উদয়শঙ্করের কল্পনা ফিল্মটি দেখে আমি চমৎকৃত হয়ে যাই, ততোধিক হন মানিকবাবু নিজে। সেই সুবাদে ফিল্মটা বহুবার দেখার পর একদিন ফেবার পথে মানিকবাবু আমার কাঁধে হাত রেখে বলে ওঠেন— দেখবেন আমি একটা ফিল্ম করে দেখিয়ে দেব, ফিল্ম কাকে বলে। সেই প্রথম তাঁর চলচ্চিত্রের প্রেরণা। কোথায় তখন জাঁ রেনোয়ারের রিভার। সে সময় মানিকবাবু 'সিগনেট প্রেসের' ছোটদের জন্য 'পথের পাচাঁলী' ও 'আম আঁটির ভেঁপু'র ছবি আঁকছিলেন। একদিন আমায় ধরে অফিসের ছাদে নিয়ে গিয়ে ভাঁজ করা আঁকা কাগজটা মেলে ধরে মহা খুশির সঙ্গে বলেন 'পথের পাঁচালী' আমি ফিল্ম করবো। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি—ধূ ধূ মাঠ, কাশবনেব মাঝে অপু দুর্গার রেলগাড়ি দেখবার জন্য দৌড়, আবো অনেকগুলি ওদের নিয়ে চমৎকার সব ছবি।

সেই থেকে মানিকবাবু ধ্যান-মগ্ন হয়ে গেলে. 'পথের পাঁচালী' সিনেমায় রূপদান করাব কাজে। তাঁর মুখে তখন সর্বদা পথের পাঁচালীর কথা, চোখে পথের পাঁচালী'র স্বপ্ন। ততোদিনে আমার সঙ্গে মানিকবাবুর গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠায় টালিগঞ্জে আমাদের

পরিবারের লোকদের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে ওঠেন। আমার 'রোলি ফ্লেক্স' ক্যামেরা নিয়ে যেতেন লোকেশনের ছবি তুলতে। তখন দেখে বোঝা যেত কি অমানুষিক পরিশ্রম করছেন তাঁর চিন্তাধারার রূপদান করতে। সে সময় তাঁর কোনো সুহৃদ বিন্দুমাত্র সাহায্য বা উৎসাহিত করা দূরের কথা, তাকে নিরুৎসাহ করার বন্ধুবর্গের অভাব ছিল না। পরবর্তীকালে পথের পাঁচালী স্বীকৃতি লাভ কবলে তাঁরাই হঠাৎ উৎসাহী ও সমঝদার হয়ে ওঠেন। 'পথের পাঁচালী' প্রস্তুতিকালে মানিকবাবুর সঙ্গে প্রায়ই যেতাম প্রোজেক্সন দেখতে, মাঝে শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করতেন— কেমন লাগছে বলুন? ফিল্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ আমি মুগ্ধ হয়ে বলি—আমাব মতে 'বাইসাইকেল থিফ' ফিল্মের চেয়ে বেশি ভালো মনে হচ্ছে। উনি খুশিতে হেসে বলেছিলেন—আপনাব সত্যি ভালো লেগেছে! যাই হোক 'পথের পাঁচালী' ফিল্ম সৃষ্টির ইতিহাস অল্প কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সে এক 'মহাভারত', তাঁকে এক অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায়।

তারপর যা কিছু ঘটে সেও এক ইতিহাস। ডি জে কিমারে কাজ করা কালীন তিনি আবম্ভ করেন 'অপরাজিত'। কি উৎসাহেব সঙ্গে এক একটি সিকোয়েন্সেব কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়তেন, সে আমাব চোখের সামনে এখনও ভাসে। কেন জানি না মানিকবাবু আমার মন্তব্যগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। বোধহয় পথেব পাঁচালী সৃষ্টির সময় একমাত্র আমি অন্তর দিয়ে বলেছিলাম 'বাইসাইকেল থিফ'-এর চেয়ে ভালো ফিল্ম হবে। বোধহয় তার পুবস্কারস্বরূপ তিনি তাঁর পুস্তক সংগ্রহশালা থেকে প্রচুর বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা দামী বইগুলিতে ও সি কে-সত্যজিৎ রায় ও তারিখ লিখে উপহার দেন। সেগুলি সযত্নে আমার কাছে রক্ষিত। শুধু বই ছাড়াও তিনি আমায় প্রচুর পাশ্চাত্য সংগীতের রেকর্ডও উপহার দেন।

এবার একটা হাসির কথা বলে শেষ করতে চাই। মানিকবাবু তখন বিশ্ববিখ্যাত, একদিন ওনার বাড়ি গিয়ে দেখি তিনি স্তূপাকাব চিঠি নিয়ে বসে। আমায় দেখে খুশি হয়ে বলেন— বাঁচালেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে তিনি বলেন— এসব ফ্যানদের লেখা চিঠি, আপনি অর্ধেকটা দেখুন বাকি অর্ধেক আমি দেখছি। যেগুলি বুঝবেন প্রয়োজনীয় আলাদা রাখবেন। বেশ খানিক পড়ার পর মানিকবাবু বলেন— সবাই দেখছি লিখেছেন রে এরা। আমার গুলিতেও তাই লেখা জানাতে মানিকবাবু হেসে বলে ওঠেন— অতো ইংরেজি না লিখে সোজা ভাষায় বলতে পারত' সত্যযুগ'। হাস্য রসিক মানিকবাবু কি কৌতুক প্রিয়, ভাবা যায় না। এমনি রসিকতা করতে মানিকবাবুর জুড়ি আমি দেখিনি। এই রসিকতা প্রসঙ্গে মনে আছে একবার এক ফিল্ম উৎসবে আমি আর মানিকবাবু একটু নিরালায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছি, সেই সময় একজন নামকরা ফিল্ম পরিচালক এসে আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে মানিকবাবুকে লক্ষ্য করে কৌতুকেব ছলে বলেন— 'মানিকবাবু আপনি দেখছি দিন দিনই লম্বা হয়ে যাচ্ছেন ব্যাপার কি?' মানিকবাবু তৎক্ষণাৎ তার দিকে ঝুঁকে বলেন— দেখুন উল্টোটা নয়তো! বলেই আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দেন।

আরেকটা ঘটনা, তখন মানিকবাবু ডি জে কিমাবে কাজ করনে। আমরা দুজনে এক সঙ্গে রোজ অফিসে যাই। তখন পাঞ্জাবীদের দোতলা বাস ছিল। কাঠের সিট। আমরা দোতলায় বসতাম, বাসটি বিশেষ বিশেষ স্টপে দাঁড়ালে কন্ডাক্টর চিৎকাব করে জানাত— যেমন 'ভবানীপুর, ভবানীপুর'। এইভাবে বাসটি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে দাঁড়াতে

কন্ডাক্টর চিৎকার করে জানান দিত— 'হাইকোর্ট হাইকোর্ট'। মানিকবাবু মুখটা আমার কাঁধের কাছে এনে গম্ভীর গলায় বলতেন, 'কে কে বাঙ্গাল আছে নেমে যান'।

এমনি অসংখ্য রসিকতা করতেন— ভাবা যায় না। তখন তিনি বিজ্ঞাপন শিল্পী ছাড়াও চলচ্চিত্র সম্বন্ধেও গভীর উৎসাহের সঙ্গে আমেরিকান লাইব্রেরী থেকে এনে বহু বই পড়তেন। সেই দেখে একদিন মানিকবাবুকে জিজ্ঞাসা করি 'আলেকজাণ্ডার কর্ডা' ও 'ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা' এনাদের ফিল্মস দেখেছেন?

মানিকবাবু বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন— আপনি ওঁদের নাম জানলেন কি করে!

তখনকার যুগে ওঁরা ছিলেন ফিল্ম পরিচালনার কর্ণধার স্বরূপ। সেই থেকে মানিকবাবু আমাব সঙ্গে ফিল্ম সংক্রান্ত বিষয়ে নানা কথাবার্তা বলতেন মহা উৎসাহের সঙ্গে। তখন কে জানতো উনি একদিন সিনেমা শিল্প জগতে শীর্ষস্থানের অধিকারী হবেন। তখন এমন কেউ আসতেন না যিনি ফিল্ম সম্বন্ধে আগ্রহী। অথচ ইদানীং ফিল্ম সমালোচকেরা নানারকম ভুল তথ্য পাঠকদের পরিবশেন করে চলেছেন। কবে কার প্রভাবে মানিকবাবুর প্রথম ফিল্ম সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'? প্রখ্যাত নীরোদ চৌধুরী মহাশয় তুলনামূলকভাবে বলেছেন—ভিক্টর হিউগোব আঁকা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শুরু করেন, সেটা কতো বড় ভুল তা তিনি জানেন না। মানিকবাবুর ক্ষেত্রেও ঠিক সেই কথাই প্রযোজ্য। কোনো অসামান্য প্রতিভার ক্ষেত্রেও কখনই প্রতিভার অনুকরণ বা প্রেরণার উৎস হতে পাবে না। ঐসব ভুল তথ্য ইতিহাসে যেন স্থান না পায়. সেইজনাই আমার এই লেখা। এই প্রবন্ধ লেখাকালীন মর্মান্তিক বেদনা পাই, সেই মহামানব ও আমার বিশিষ্ট বন্ধু মানিকবাবু 'শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

এখনও মন মানতে চাইছে না সেই শিশুসুলভ, সদাহাস্যময় কোমল হৃদয় মানিকবাবুকে আর কোনোদিন পাব না। টেলিফোনে তাঁর সেই ভারি গলার আলাপ আলোচনা। — মনে পড়ে তাঁর সেই দরদী কণ্ঠ। তাঁব বাড়িতে যাবার আন্তরিক আমন্ত্রণ। অসুস্থ শরীর নিয়ে বহুদিন যাওয়া না হলেও টেলিফোনে কত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আর সম্ভব হবে না। যদি কোনোদিন সুযোগ পাই তবে তাঁর হাস্যরস থেকে বহু মূল্যবান ঘটনার কথাগুলি নিশ্চয়ই বলব। মনে পড়ে কত লোক বলতেন ওর সঙ্গে দেখা করা খুব কঠিন। এমনকি কেউ কেউ বলতেন একটু দাম্ভিক। সেকথা একদিন মানিকবাবুকে জানাই— আপনাব লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবটাকে লোকে ভুল বোঝে। শুনে মানিকবাবু প্রাণখোলা হাসতে হাসতে বলেন— আপনার মত আমায় কজন চিনেছে বলুন? আজ মনে মনে বলি— হ্যাঁ বলব অপনার সব কথা, সময় ও সুযোগ পেলে সারা জীবন ধরে বলব মানিকবাবু।

মানিকদার সঙ্গে বত্রিশ বছর

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

'পথের পাঁচালী' ছবির পরে সত্যজিৎ রায় 'অপরাজিত' শুরু করবেন, তাই 'অপু' চরিত্রে নতুন মুখ খুঁজছেন। আমার বন্ধু অরুণ, তার বন্ধু নিতাই দত্ত আমাকে সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকতেই সত্যজিৎ রায় বললেন, ওহো, আপনি তো বড্ড বড় হয়ে গেলেন। বড্ড লম্বা। ঠিক আছে, বসুন।

আমরা দুজন বসলাম। আলাপ হলো। কথাবার্তার ফাঁকে তিনি আমাকে ওঁর প্রোডাকশন ম্যানেজার অনিল চৌধুরীর পাশে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার হাইট কত?

আমি পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি শুনে বললেন, আপনি তো বড্ড বেশি লম্বা হয়ে গেলেন। ঠিক আছে।

সেই প্রথম আলাপ। তারপর যখন উনি 'অপুর সংসার' ছবি করবেন ঠিক করলেন, তখন আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। ওঁর সঙ্গে কাজ করতে আমার কোনোদিন কোনো অসুবিধে হয়নি। আমার সঙ্গে ওঁর একটু আলাদা সম্পর্ক। মোটেই ফর্মাল নয়। তবে হ্যাঁ, প্রথম দেখেই বুঝেছিলাম অসম্ভব রিজার্ভড টাইপের মানুষ, আকাশছোঁয়া ব্যক্তিত্ব। গম্ভীর টম্ভীর খুব বেশি বলে যে সাধারণভাবে কথা বলতে পারেন না, তা একেবারেই নয়। গোড়া থেকেই দেখছি খুব আলাপী। সকলের সঙ্গে সমান ভাবে কথা বলেন। এখন হয়তো কাজের চাপে কিংবা বয়সের ভারে কখনও কখনও কারুর সঙ্গে একটু বেশি গম্ভীর ভাবে কথা বলেন। কিন্তু আমরা কয়েকজন বরাবরই ওঁর স্নেহচ্ছায়ায় রয়েছি। আমাদের সঙ্গে এখনও কত হাসি ঠাট্টা গল্প করেন। আর ওঁর মতন প্রাণখোলা হাসি ক'জন হাসতে পারেন। এমন সূক্ষ্ম সেন্স অফ হিউমার খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখেছি।

আগে বলেছি আমি গোড়া থেকেই কাছের মানুষ। সত্যজিৎ রায় কখন যে 'মানিকদা' হয়ে গেলেন তা আমি নিজেই খেয়াল করিনি। মানিকদার ছবিতে অভিনয়ের ব্যাপারে আমার অবাধ স্বাধীনতা। আসল কথাটা হলো, শুরুতেই আমাদের মধ্যে এমন একটা অনায়াস আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হয়ে গেছে যে উনি অভিনয়ের ক্ষেত্রে কী চান তা আমি অনুভব করতে পারি এবং উনিও জানেন আমি কতটা অভিনয় করতে পারি। তাই আমাকে অনেকটাই স্বাধীনতা দেন। আমিও প্রাণ খুলে কাজ করতে পারি। কেননা আমি জানি ভুলত্রুটি হলে শুধরে দেবার লোক আছে।

গত বত্রিশ বছরে মানিকদার চোদ্দটা ছবিতে কাজ করেছি। ওঁর সঙ্গে কাজ করতে আমার সব সময়ে সব ছবিতে খুব ভালো লাগে। কোনো ছবিতে কাজ করার সময় পরিচালকের কাছ থেকে একজন অভিনেতার অনেক প্রত্যাশা থাকে। মানিকদা শিল্পী বা কলাকুশলীদের দিয়ে যা করাতে চান সে বিষয়টা নিজে খুব ভাল ভাবে জানেন। তাই কাজের ব্যাপারে উভয়পক্ষেরই খুব সুবিধা হয়। তিনি যে গোটা ক্রিয়াকাণ্ডের সম্বন্ধে

বিশেষ ওয়াকিবহাল সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তাছাড়া ওঁর সব কাজে একটা সুন্দর শৃঙ্খলা রয়েছে, শুটিংয়ে কী কাজ হবে আগে থেকে ভাবা থাকে, ফ্লোরে গিয়ে হাতড়াবার ব্যাপার থাকে না। আর একটা বড় কথা হচ্ছে, প্রত্যেক কাজের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেল থাকে, যার মধ্য দিয়ে ওঁর শিল্পবোধ ও শিল্পচেতনা প্রকাশ পায়। সেইটাই অভিনেতা হিসেবে আমাকে অ্যাপিল করে, আরও আকৃষ্ট করে।

মানিকদার যে ছবির চরিত্রলিপিতে আমি থাকি না সে ছবির সেটেও যাই নিয়মিত। কারণটা খুবই সরল। ওঁর সঙ্গে তো আমার পেশাদারী সম্পর্ক নয়। তাছাড়া ওঁর কাজ দেখতে আমার ভাল লাগে। ভাল লাগে ওঁর সান্নিধ্য। ওঁর কাজ সম্বন্ধে শুধু আমার কেন, মনে হয় বেশির ভাগ লোকের আগ্রহ আছে। আমিও সেই আগ্রহ নিয়ে সেটে যাই।

উনি যে এতো বড় হয়েছেন তা বিশেষ কোনো একটা গুণের জন্য নয়। কোনো মানুষ একটা গুণের জন্য এতো বড় হতে পারে না। ডিটেলের প্রতি আগ্রহ, কল্পনা-শক্তি, পর্যবেক্ষণ-শক্তি আর শিল্পবোধ মানিকদার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই 'শিল্পবোধ' কথাটার উপর হাজার হাজার পাতা লেখা হয়েছে, এক কথায় কি করে বোঝাই! এমন শিল্পবোধ কদাচিৎ কারো মধ্যে দেখা যায়। এইখানেই মানিকদার শ্রেষ্ঠত্ব।

মানিকদার যে সব ছবিতে আমি থাকি না সেই সব ছবির চিত্রনাট্যও উনি আমাকে শোনান। আমার প্রতিক্রিয়া আমি ওঁকে জানাই। কেন ভাল লাগছে আমি বলি। আলোচনা করতে আমার ভাল লাগে। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের সম্পর্ক, যোগাযোগটা নিবিড়। আমি প্রায়ই ওঁর বাড়ি যাই। যখন উনি কোনো ছবি করবেন ঠিক করেন, চিত্রনাট্য করেন এবং ভাবেন আমাকে নেবেন, তখন বলেন, ভাবছি এই ছবিটায় তোমাকে নেবো। তারপর যখন স্ক্রিপ্ট তৈরি হয় আমাকে শোনান। পুরো স্ক্রিপ্ট দিয়ে দেন। বাড়িতে নিয়ে আসি। আজকাল মানিকদা প্রধান শিল্পীদের প্রত্যেককেই ছবির গোটা চিত্রনাট্যই দেন। আমাকে তো প্রথম থেকেই দিয়ে আসছেন। সেই 'অপুর সংসার' থেকেই। তখন অন্য কাউকেই দিতেন না। ডায়ালগশিট পরে আসে, তখন সেগুলি আমাদের দেওয়া হয়।

শুটিংয়ে উনি নিজে ক্যামেরা অপারেট করতেন। বেশির ভাগ বড় ডিরেক্টার তা করেন না। এখন আর সেটা করেন না। এটা অবশ্য তেমন প্রয়োজনীয় বলে আমার মনে হয় না। উনি নিজে অপারেট করতেন, কারণ আমার মনে হয় ছবিটা শেষ পর্যন্ত কেমন দাঁড়াবে তা লেনসের মধ্য দিয়ে আগে দেখে নিতেন।

মানিকদা খুব দ্রুত কাজ করেন। এই দ্রুত এগোবার চাবিকাঠি হলো উনি সব ব্যাপারটা আগে ভেবে রাখেন। অনেকেই শুটিং করতে আসেন আগাম ভাবনাচিন্তা না করেই। উনি কেমন শট নেবেন ভাবা থাকে, আর সেই ভাবেই ঠিক জায়গায় ক্যামেরা বসান। পর পর শট নেন। ওঁর আর্টিস্টদের কতটুকু বললে তাঁরা বুঝে নিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারবেন, তা উনি ভাল বোঝেন। আমি ওঁর চোদ্দটা ছবিতে কাজ করেছি। প্রত্যেকটাতে সমান আনন্দ পেয়েছি। আউটডোরে কাজ করেও একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। সারাদিন তো বাইরে কাজ হয়। তারপর ঘরে ফিরে পরের দিনের শুটিং স্ক্রিপ্ট তৈরি করেন। শট ডিভিশন করেন। সাধারণত সন্ধেবেলায় উনি এই সব কাজ করেন। এক সময়ে কাজের ফাঁকে আমাদের সঙ্গে তাস-টাসও খেলতেন।

মানিকদার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ কেউ আসেন সেটে ছবি করার সময়। নানারকম আলাপ-আলোচনা হয়। সবই কিন্তু ছবির কাজ সংক্রান্ত। অপ্রাসঙ্গিক একটি কথাও চলে না ওঁর কাজের সময়।

মানিকদার ছবিতে অভিনয় প্রসঙ্গে আমাকে নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। জবাব দিতে আমি কোনো ডেলিকেসি বোধ করি না। যেমন ধরুন 'ঘরে বাইরে' ছবিতে সন্দীপ চরিত্র। এই রকম কপট চরিত্রে আমার অভিনয় অনেকের কাছে নাকি শকিং লেগেছে। আমি বলি, তাঁরা বড্ড বেশি ইমেজ নির্ভর। অভিনয় দেখেন না, কেবল ইমেজ দেখেন। এটা তাঁদের লিমিটেশন, আমার অভিনয়ের নয়। সন্দীপ কি ডাইনামিক নয়? ছলচাতুরী থাকলে কি অভিনয় খারাপ হয়? চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফোটানো কি খারাপ কাজ? সন্দীপ চরিত্রটাই কি একটা অভিনয় নয়? আসলে এটা হচ্ছে দর্শকদের এক ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। তাঁরা প্রিয় অভিনেতাকে বিশেষ চরিত্রে দেখতে চান, এই আর কী। তাতে আমার কী করার আছে। আমি এই রোল পেয়ে খুব খুশি হয়েছি, অভিনয় করে আনন্দিত হয়েছি। অভিনয় কি কেউ খারাপ বলেছেন?

মানিকদার ছবিতে চরিত্রায়ণের ব্যাপারে এক এক সময়ে এক এক রকম অ্যাপ্রোচ নিয়ে চরিত্রটাকে ভাবার চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি, তারপর প্রিপারেশন করি। 'গণশত্রু' তোলা হয়েছে ইবসেনের কাহিনীকে ভিত্তি করে। ছোটবেলা থেকে ইবসেন পড়েছি। আমার খুব চেনা চরিত্র। অভিনয় করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আবার 'অশনি সংকেত' ছবির গঙ্গাচরণ আর এক ধরনের চেনা চরিত্র। আমি যে জেলার মানুষ সেই জেলার গল্প। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর আমার দেশ। এই রকম পুরোহিত চরিত্র আমি নিজে বহু দেখেছি। এই রকম পরিবেশে, এই রকম মানুষ অনেক দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগে।

মেকাপ পোশাক সব উনি নিজে করেন। তবে অনেক সময় আমাদের কোনো সাজেশন থাকলে তিনি ভেবে দেখেন। যেমন 'গণশত্রু'তে আমি কিছু পরিবর্তন চেয়েছি এবং উনি তাতে রাজী হয়েছেন। অভিনয়ের বেলায় উনি আগাম কিছু বলেন না, তবে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য থাকলে নির্দেশ দেন।

মানিকদার সঙ্গে কাজ করার আগেই আমি বুঝেছি উনি কত বড় ডিরেক্টর। 'অপুর সংসার'-এ অভিনয় করার আগেই তো আমি 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' 'পরশ পাথর' দেখেছি। এই সব ছবি দেখেই তো বুঝেছি উনি বিরাট পরিচালক। না বোঝার কিছু নেই। একটা কথা আবার বলি, এই বত্রিশ বছরে চোদ্দটা ছবিতে কাজ করেছি। এর মধ্যে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ বলতে পারব না। শুধু বলতে পারি প্রতিটি ছবিতে অভিনয় করে সমান আনন্দ পেয়েছি। এটাই আমার বিরল প্রাপ্তি।

ফেলুদা এণ্ড কোং
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

১

যতদূর মনে পড়ছে ফেলুদার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল 'সন্দেশ' পত্রিকার নবপর্যায়ে প্রকাশিত হওয়ার সময়ে। সন্দেশ -এর জন্য গল্প লিখতে গিয়ে মানিকদার চিন্তায় হাজির দলবল সমেত ফেলু মিত্তির। ছোটদের জন্য ডিটেকটিভ গল্প লিখতে হবে এ ধরনের কিছু কথাবার্তা মানিকদা তার আগে আমাদের মত কয়েকজনের কাছে বলেও ছিলেন। পরে লেখা শুরু করার পর জানিয়েছিলেন যে গোয়েন্দা গল্প লেখার ব্যাপারটা দ্রুতগতিতেই চলছে। তারপর তো গল্পগুলো প্রকাশিত হল। অন্য সকলের মত আমিও প্রবল আগ্রহে পড়ে ফেললাম। 'বাদশাহী আংটি' নামে ফেলুদা-কে নিয়ে যে প্রথম রহস্য উপন্যাসটি লিখেছিলেন সেটা আমার খুবই ভাল লেগেছিল, বিশেষ করে উপন্যাসের শেষ পর্বে যেখানে চোখে লঙ্কার গুড়ো ছুঁড়ে পালানোর ব্যাপারটা ছিল, মানিকদা নিজে পড়ে শুনিয়েছিলেন, খুবই মজা পেয়েছিলাম। 'বাদশাহী আংটি' নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় সেই আড্ডার বৈঠকে যেমন হাজির ছিলেন না, তেমন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন, ছবি করার প্রসঙ্গে তখন মানিকদা ফেলু মিত্তিরকে চিন্তাভাবনার মধ্যেই আনেননি।

কিছুকাল পরে মানিকদা যখন শারদীয় 'দেশ' পত্রিকার জন্য 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' লিখলেন, তখন থেকেই ফেলু-কাহিনীর জন্য আঁকা ছবিগুলো একটা বিশেষ চেহারা নিতে শুরু করল। তার আগে যে ইলাস্ট্রেশানগুলো খারাপ হয়েছিল তা নয়, তবে ছবি দেখলেই যে কেউ চরিত্রকে চিনে ফেলবেন এমন পর্যায়ে পৌঁছল ফেলু গ্যাংটকে পৌঁছবার পর।

মানিকদা নিজে তখন কিছু প্রকাশ করেননি, সেজন্য আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না যে মানিকদা তখনই ফেলুকে ছবি করার কথা ভেবেছিলেন না ভাবেননি। তবে আমি ভেবেছিলাম এবং ভাবতাম। আমার ভাবনার কারণ কাহিনীর নিজস্ব আবেদন। এত সুন্দর সাজানো গল্প, পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিবর্তন (যা গল্পের নিজস্ব টানেই উপস্থিত), নানা ধরনের চরিত্র তাদের কথাবার্তা — সব মিলিয়ে মনে হত যেন লেখক স্বয়ং চিত্রনাট্য লেখার কাজটা ইচ্ছে করে খানিকটা এগিয়ে রেখেছেন ; এখন চিত্রনাট্য লেখা শুরু করলেই হয়। কাহিনীগুলোর মধ্যে ভ্রমণপর্ব এমন আকর্ষণীয়ভাবে হাজির যেন পাঠকও বিছানাপত্র নিয়ে তোপসে, লালমোহনবাবু এবং ফেলু মিত্তিরের সঙ্গী হয়ে গিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত যখন মানিকদা ফেলু কাহিনী নিয়ে ছবি করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তা আমার নিজের কাছে একটা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। 'সোনার কেল্লা' তৈরির সময় আমার নিজের ছেলে ও মেয়ে কিশোর-কিশোরী, তাদের জন্য আলাদা করে কোনও চরিত্রে অভিনয় করার কোনও ধরনের সুযোগ পেতাম না। 'সোনার কেল্লা'র ফেলু চরিত্র ছেলে মেয়ের জন্যই করছি—এমন একটা ভাবনা আমাকে তখন খুব খুশি

করেছিল। 'সোনার কেল্লা' তৈরির সিদ্ধান্তে আমিই কেবল খুশি হয়েছিলাম বললে ভুল হবে, ছবিটার সঙ্গে জড়িত থাকা প্রত্যেকেই আনন্দিত হয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে ছবির কাজ শেষ হওয়ার পর সে আনন্দের অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। 'সোনার কেল্লা'র আউটডোর শুটিংয়ের স্মৃতি কেউই ভুলতে পারবেন না।

সিনেমার ছবির আগে বই বা পত্রপত্রিকার জন্য আঁকা ফেলুদাকে নিয়ে মানিকদার সঙ্গে কিছু মজার কথা হয়েছিল। তখন মানিকদার ওখানে প্রায় নিত্য আসা-যাওয়া। ঘরে ঢুকে দেখি মানিকদা তখন ফেলুদার গল্পের বা উপন্যাসের জন্য ইলাস্ট্রেশন নিয়ে বসেছেন। কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর আমি মানিকদাকে বললাম—আমার এই ছবিগুলো দেখে মনে হয় এগুলো আপনার নিজেরই ছবি, একেবারে আপনারই মত। মানিকদা তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের ভঙ্গিতে হেসে ভারি গলায় বললেন— সে কী! আমায় যে অনেকে বলে গেল আমি নাকি একেবারে তোমার মত করে আঁকছি। ফেলু-কাহিনীতে ফেলুর ছবি নিয়ে আরও অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছে, অনেকেরই মত ছবিগুলো নাকি অনেকটা আমারই মত দেখতে। জানি না, তবে আমার নিজস্ব মত ছবিগুলো বেশ খানিকটা মানিকদার মত,হতে পারে কোথাও কোথাও খানিকটা আমার মতই করে এঁকেছেন;আসলে বোধহয় দুটো চেহারার আদলই রয়েছে ওর মধ্যে। মানিকদার তীক্ষ্ণ ও প্রখর স্মৃতিশক্তির কথা যাঁরা জানেন তাঁরাই জানেন যে তিনি সামান্য রসিকতাও ভুলতেন না। ফেলু মিত্তিরকে যখন উপন্যাসের পাতা থেকে স্টুডিও আউটডোরে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখনও মানিকদা ইলাস্ট্রেশন নিয়ে রসিকতার ব্যাপারটা ভোলেননি, নিজেই মনে করিয়ে দিয়ে হেসেছিলেন।

২

মানিকদা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এই ধারণার কথা অনেকবারই বলেছি এবং লিখেছি যেহেতু এ বিশ্লেষণ আমার নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য সেজন্য আরও একবার একথা লেখা ছাড়া উপায় নেই। ফেলুদা এবং প্রফেসর শঙ্কু—বাংলা সাহিত্যের এই দুই জনপ্রিয় চরিত্র আসলে সত্যজিৎ রায়ের নিজের চরিত্রেরই দুটি পৃথক প্রতিফলন। মানিকদাবে খুব কম সময় ধরে দেখিনি, পঁয়ত্রিশ বছর সময়, দীর্ঘ জীবনের ক্ষেত্রেও বেশ একটা বড় অংশ। মানিকদার মধ্যে একটা দুরন্ত জ্ঞানপিপাসা, বিচিত্র বিষয়ে প্রবল আগ্রহের উপস্থিতি আমি লক্ষ্য করেছি। এমনিতেই তাঁর বিরাট পড়াশোনা ছিল একথা তো সবাই জানেন। প্রায় নিয়মিত আলাপ-আলোচনায় বেরিয়ে আসত তিনি কত কী জানতেন। প্রতিনিয়ত নতুন বিষয় সম্পর্কে আরো জানার একটা তীব্র কৌতূহল তাঁর মধ্যে কাজ করত। অপরিমেয় পরিশ্রম করার ক্ষমতার সঙ্গে মিশেছিল আন্তরিক আগ্রহ, এই দুই প্রকার বিশেষ গুণের প্রত্যক্ষ ফল আমরা দেখেছি ফেলু কাহিনী বা প্রফেসর শঙ্কুর অবাক করা কাহিনীগুলোতে। মানিকদার এই অনেক বিষয় জানার ব্যাপারটা শুধু লেখাব মধ্যে আছে তা নয় তাঁর তৈবি সিনেমাতেও। 'আগন্তুক' মানে তাঁর সৃষ্টির তালিকার শেষতম ছবিতেও এই বিচিত্র বিষয়ে জানার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে।

সত্যজিৎ রায়ের চরিত্রের জানার ইচ্ছেটাকে যদি এনসাইক্লোপিডিক কিউবিওসিটি এই দুটি ভাবি শব্দ চাপা দিয়ে ছোট কবে আনি তাহলে বলতে হবে ওঁর মত একজন

বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মনের দুটো জানালা হচ্ছে ফেলু মিত্তির এবং প্রফেসর শঙ্কু। বড় বাড়ি যখন তখন তো আরও কিছু জানালা থাকবেই, আর একটা বিশেষ জানালা হচ্ছে ফেলু কাহিনীর আর একটা চমৎকার চরিত্র তিনি হলেন সিধু জ্যাঠা। বলা যায় সত্যজিৎরায়ের মানসিকতার একটা বিশেষ সংস্করণ হলেন এই সিধু জ্যাঠা। শুধু খবরের কাগজে প্রকাশিত খবর সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি অদ্বিতীয়, অসম্ভব স্মৃতিশক্তি, কবে কোথায় কী ভাবে কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে খবর তা সঙ্গে সঙ্গে বার করে দেবেন বা মুখে বলে দেবেন সিধু জ্যাঠা।

তবে প্রকৃত অর্থে সিধু জ্যাঠা হলেন ইনফরমেশন ব্যাঙ্ক। কিন্তু ইনফরমেশন যেখানে নলেজ হয়ে ওঠে, তার জীবন্ত উদাহরণ ফেলু মিত্তির এবং প্রফেসর শঙ্কু। এদর বুদ্ধিদীপ্ত আচরণ ও কথাবার্তার পিছনে অদৃশ্য চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়, বাঙালি পাঠকের এ সত্য বুঝতে কখনও অসুবিধা হয়েছে বলে মনে হয় না। তথ্য পাওয়ার পর তা বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের জন্য গোয়েন্দা কাহিনীতে কখনও কখনও বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার হয়। নানা তথ্য ও নানা বিষয়ের জ্ঞান শেষ পর্যন্ত রহস্য উন্মোচনের কাজে লাগে, গল্পের শেষপর্বে পাঠক নিজেই তা পরিষ্কার বুঝতে পারেন।

ট্র্যাজেডি বা কমেডির মত সেন্স অফ হিউমারও একজন মানুষের চরিত্রের মধ্যেই থাকে, উপযুক্ত মুহূর্তে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে যে এক পরিচ্ছন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস ছিল তা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই অনুভব করতে পেরেছিলাম। সামগ্রিক ভাবে বলতে গেলে একজন লেখক তাঁর জীবনবোধ থেকেই লেখেন। সত্যজিৎ রায়ের গভীর জীবনবোধ, মানুষের সম্পর্কের বৈচিত্র্য এবং কৌতুকরসের অমর উদাহরণ হয়ে থাকবে 'জটায়ু' চরিত্র। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু দুজন জটায়ু আছে, যিনি সিনিয়ার তিনি রামায়ণে, আর দ্বিতীয়জন ফেলু-কাহিনীতে। জটায়ু দুজন হলেও জটায়ু চরিত্রের অভিনেতা সন্তোষ দত্ত ছিলেন অদ্বিতীয়। সন্তোষদা সম্পর্কে কিছু কথা আলাদা করে বলতে হবে, আপাতত ফেলু মিত্তিরকে নিয়ে কথা হোক।

জটায়ুর মত ফেলুও বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যে একটু আলাদা ধরনের বিশেষ চরিত্র। ফেলু রহস্যের জাল ছিঁড়ে সত্যকে আবিষ্কার করে প্রধানত তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়েই, একথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা আশ্চর্য ইন্টেলেক্ট যাই বলি না কেন তা ব্যবহার করার আরও উদাহরণ কিন্তু বাংলা সাহিত্যেই আছে—ব্যোমকেশ। কিন্তু ফেলু সে অর্থে শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীই নয়, তার মধ্যে একধরণের অ্যাডভেঞ্চারপ্রীতি, দুর্জয় সাহসের পরিচয় রয়েছে। 'সোনার কেল্লা' ছবিতেই কিন্তু মানিকদা ফেলুর চরিত্রের এই পশ্চাৎপট বলে দিয়েছিলেন, একটা দৃশ্যে ফেলু সম্পর্কে তপেশ- এর বাবা বলছেন, 'কার ছেলে দেখতে হবে তো, ওর বাবা শিয়ালের গর্ত থেকে ছানা বের করে আনত'। এই সাহসিকতা, বীরত্ব ফেলুর চরিত্রে, স্বাভাবিকভাবে রয়েছে এবং এটা টিপিক্যালি বাঙালি। আগের দিনে যে সাহসী বাঙালি যুবকের পরিচয় আমাদের কাছে ছিল, যাঁরা সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেই ছিলেন ডাকাবুকো, সমস্যা বা লড়াই সামনে এসে পড়লে পিছিয়ে গিয়ে পৈত্রিক প্রাণরক্ষায় পলায়নে ব্যস্ত হতেন না — এই ধরনের বাঙালি যুবকের আধুনিক সংস্করণ হচ্ছে ফেলু মিত্তির। ফেলু দৈনন্দিন জীবনের চলাফেরায়, ধ্যানধারণায় যথেষ্ঠ সংস্কৃতিবানও বটে, সেটাও তাঁর মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে রয়েছে।

ফেলুর স্রষ্টা ফেলুর চরিত্রের মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছাড়া অন্য মজাও চমৎকারভাবে গুঁজে দিয়েছেন যে সেগুলো আলাদা করে নিয়ে ফেলুকে ভাবা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ফেলু পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, চারমিনার সিগারেট খায় আবার নিয়মিত ব্যায়ামও করে। সে জানে ব্যায়ামের দ্বারা সুগঠিত শরীর তার গোয়েন্দা কর্মের পক্ষে খুবই জরুরি। ফেলু যে খেলাধুলা ভালোবাসে তা তার কথাবার্তা থেকে বহুবার প্রমাণ হয়েছে। প্রয়োজন হলে সে অ্যাকশনে ব্যস্ত হয়, সেখানেও সে দক্ষ। পাঠক হিসাবে আমরা এটাও জানি ফেলুর ঘুষিতে প্রচন্ড জোর আছে। সব মিলে ফেলু মিত্তির একটু অন্য ধরনের গোয়েন্দা। বাঙালিজীবনের কাছে খুবই পরিচিত, যেন গলির মোড়ে কান্তবাবুর বাড়ির পাশেই থাকে।

এবার ফেলুর হৃদয়-প্রসঙ্গ। তার মধ্যে অসাধারণ মানবিক মূল্যবোধও আছে। মানিকদার সঙ্গে এখানেই যেন ফেলুর একবারে হাত ধরাধরি করে চলা। ফেলু সেই সমস্ত ক্রাইমের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয় যেখামে সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষতি হচ্ছে, প্রকৃত অর্থেই যারা সমাজ বিরোধী তাদের বিরুদ্ধেই ফেলুর লড়াই তীব্রতর হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে তার হৃদয়বেত্তার পরিচয়ও আছে। তোপসে ও লালমোহনবাবুর সঙ্গে ফেলুর কথাবার্তা এবং আচরণে এই ব্যাপারটা বারবার প্রমাণ হয়েছে। গল্পের টানে যখন আমরা একটা বিশেষ ধরনের সঙ্কটের সামনে হাজির, তখন সেই নাটকীয় পরিস্থিতিতে হৃদয়বান ফেলু মিত্তির চরিত্রের সম্ভবত সবচেয়ে উজ্জ্বলতম দিকটা প্রকাশ করে।

'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে জটায়ু যখন মগনলাল মেঘরাজ-এর বাড়িতে নিগৃহীত হয় (লালমোহনবাবু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে, তাঁর শরীরের চারপাশে মৃত্যুবাহী ধাবালো ছুরি উড়ে এসে বিঁধে যাচ্ছে) তখন ফেলুর চোখেমুখে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা তার স্বাভাবিক আচরণের চেয়ে একটু অন্যরকম। পরের দৃশ্যে চিন্তিত ফেলু মেঘরাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কাশীর গঙ্গার ঘাটে বসে গম্ভীর মুখে একটা কথাই ঘোষণা করে যে সে যদি মগনলালকে শায়েস্তা না করতে পারে, তাহলে গোয়েন্দাগিরিই ছেড়ে দেবে। সাধারণ বিচারে ফেলুর এ ধরনের ঘোষণা কিন্তু স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া কষ্টকর। কারণ একজন পেশাদার গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র হঠাৎ তার পেশা ছেড়ে দেবে কেন? এধরনের কাজে একজন গোয়েন্দা যে জীবনের সবকটি রহস্যময় সমস্যা সমাধান করতে পারবেই তারই বা কী মানে হয়? ফেলুর এই উক্তি তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতিরই পরিচয়, মনে মনে সে তার বন্ধু জটায়ুর নিগৃহীত হওয়াকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। মানুষের সমস্ত কাজের মধ্যে যতই চমৎকারিত্ব থাক না কেন যদি তা হৃদয়ের আবেদনকে অস্বীকার কবে তাহলে সেই সমস্ত কাজ মূল্যহীন হয়ে যায়। ফেলু চরিত্রের স্রষ্টা এই কথাটি কখনও ভুলতে দেননি। এই সব বিচিত্র গুণের জন্য ফেলু চরিত্র আমাকে টেনেছিল, আজও টানে। ফেলু মিত্তিরের চরিত্রে আমি বহু ক্ষেত্রে মানিকদার অদৃশ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। যা যে কোনও চরিত্রের স্রষ্টা সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

৩

অন্য সব ছবির কাজ শুরু করার আগে মানিকদা যেভাবে কথাবার্তা বলতেন সেই ভাবেই ফেলু নিয়ে কথা হয়েছিল, আলাদা করে তেমন কোনও আলোচনা হয়েছিল বলে মনে পড়ছে না। 'সোনার কেল্লা' নিয়ে ছবি করবেন স্থির করার পর মানিকদা একদিন বললেন—

'ভাবছি এবার 'সোনার কেল্লা' নিয়ে ছবি করব। আউটডোরে অনেকদিন থাকতে হবে। সব খোঁজপত্তর নিয়েছি, চমৎকার লোকেশন পাওয়া যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সময় আবার সেই ইলাস্ট্রেশন-এর রসিকতা করেছিলেন—'সবাই বলেছে ছবিগুলো নাকি তোমার মত করেই এঁকেছি, সুতরাং তোমাকেই ফেলু করতে হবে, বুঝলে।'

'সোনার কেল্লা' ছবি শুরুর আগে এক ভদ্রলোক, যিনি প্যারা সাইকোলজি নিয়ে বইপত্র লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে মানিকদার চিঠি আদান-প্রদান হয়েছিল—এসব তথ্য আমাদের জানিয়েছিলেন। কাজ যখন শুরু হল তখন মানিকদা তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী পোশাক ইত্যাদি কেমন হবে তার ছবিটবিও এঁকে ফেললেন। পোশাকের ডিজাইন কেমন হবে, তা তো বটেই, কী ধরনের কাপড়, কোন রঙের কাপড় ব্যবহার হবে সবকিছুই তিনি নিজের হাতে খাতায় লিখে রাখলেন। মনে আছে এই সব কাজের জন্যও তিনি অন্য কারও উপর নির্ভর করতেন না, কাপড় ইত্যাদি কিনতে নিজেই বাজারে যেতেন। যথাসময়ে চিত্রনাট্য হাতে পেয়ে গেলাম। ভাল করে পড়ে কোথায় কী আছে তা বোঝার চেষ্টাও শুরু হয়ে গেল। ফেলু চরিত্র করতে গিয়ে আমার নিজের আলাদা কোনও বিশেষ প্রস্তুতি ছিল তা নয়। যতটুকু মনে আছে তাই-ই লিখছি।

ফেলুর আচার-আচবণ ছাড়া যে ব্যাপারটা আমি নিজে মনে রাখার চেষ্টা করেছিলাম তা হল ফেলু একজন 'থিঙ্কিং ম্যান'। তার চরিত্রে যে চিন্তাশীলতা আছে সেটা যেন আমি কিছুতেই ভুলে না যাই। প্রখর বুদ্ধিমান একজন মানুষ বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে রহস্যের মধ্যে ঢুকতে চাইছে এটা যেন আমাব মুখে-চোখে প্রকাশ পায় এ ব্যাপারে আমি সচেতন ছিলাম। গোটা ছবিতে নিজের কাজে আমি এই অভিব্যক্তির কতটুকু কী পেরেছিলাম তা মানিকদা এবং দর্শকরা বিচার করেছেন, এ ব্যাপারে আমার নিজের কিছু বলার নেই। বিশেষ ভাবে চোখ, দুই ভ্রূ এবং কপালের কুঞ্চন ইত্যাদির ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলাম। একজন বুদ্ধিমান মানুষের চোখ প্রয়োজনে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। এমন কোনও বুদ্ধিমান মানুষ হয়ত আছেন যে তিনি সেটাও আড়াল করতে পারেন এবং সে ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। বিশেষ পরিস্থিতে জীবন্ত, উজ্জ্বল (কখনও চঞ্চলও বটে) ও বাঙময় চোখের দৃষ্টি একজন বুদ্ধিমান মানুষের মনের মধ্যে গভীর চিন্তার চলাফেরা বুঝিয়ে দেয় বলে আমি বিশ্বাস করি, ফেলুর ক্ষেত্রে আমি সেটাই ব্যবহার করেছিলাম এবং মানিকদা আপত্তি করেননি।

'সোনার কেল্লা' ছবির একটা দৃশ্যের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, যে দৃশ্যে ডক্টর হাজরার কার্ডটা নিয়ে সেখানে হাজরা শব্দটির বানানে 'জে' না 'জেড' কী ববহার হয়েছে ইত্যাদির চিন্তা ফেলুর মাথায় ভিড় করছে সেই দৃশ্যটার কথা বলছি। একটা নিচু চেয়ারে আমি বসে অছি, আমার সামনে কার্ডটা পড়ে আছে। কপালে হাত রেখে ভাবছি, আমার মাথার মধ্যে চিন্তার বিশ্লেষণ চলছে সেটা বোঝানোর জন্য আমি কপালে হাত রেখেছিলাম। একজন অসাধারণ পরিচালকের সঙ্গে কাজ করলে চরম মুহূর্তে একটা ছোট্ট নির্দেশে অভিনেতার অভিনয়ের ডাইমেনশনই বদলে যায়। রিহার্সাল চলছে, এমন সময় মানিকদা ছোট্ট করে বললেন— 'সৌমিত্র, এইখানে তুমি তোমার কপালে রাখা হাতের আঙুলগুলো ড্রামিং -এর মত করে ব্যবহার কর, যেমন আঙুলগুলো দিয়ে কপালে বাজনা বাজাচ্ছ এমন ভঙ্গি কর। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মত তাঁর নির্দেশ আমার মাথায়

কাজ করল এবং চিন্তাশীল ফেলুর অভিব্যক্তি একটা অন্য মাত্রা পেয়ে গেল। চোখের ব্যবহারের উদাহরণ আছে, এরই কাছাকাছি একটা দৃশ্যে যেখানে চিন্তিত ফেলু পায়চারি করছে এবং ক্যামেরা তাঁকে ধরে রেখেছে।

'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে ক্যাপটেন স্পার্ক-এর সঙ্গে ফেলুর কথাবর্তার মধ্যে ফেলু কেন ছোটদের কাছে এত জনপ্রিয় তাও বোঝা গেছে। মাত্র কয়েকটা সংলাপে ফেলু একজন বালকের সঙ্গে সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলতে পারে, অবশ্য তার জন্য তাকে নিজের 'মগজাস্ত্র'র সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের রিভালভারটা দেখাতে হয়েছে। সুরসিক লেখক ও চিত্রনাট্যকার যেন এরই মাধ্যমে একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধির গোয়েন্দার প্রতি আর একজন বুদ্ধিমান গোয়েন্দার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত বুঝিয়ে দিলেন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে ছবিতে কাজের সময়েও মানিকদা কখনও ছোটদের ছোট করে দেখতেন না, বরং বয়স্ক বন্ধুদের মতই ব্যবহার করতেন, কখনও এর ব্যতিক্রম দেখিনি।

ফেলুর চরিত্রে ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ তো মাত্র দুটো ছবিতেই পেয়েছিলাম। কিন্তু এছাড়া ফেলুর গল্প বা উপন্যাস যখনই প্রকাশিত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই তা পড়ে নেওয়ার অভ্যাস ছিল। মানিকদা নিজে অনেক সময় আমাদের বিশেষ বিশেষ জায়গা পড়ে শোনাতেন, সে লেখার শুরু মাঝামাঝি বা শেষ যা-ই হোক। মানিকদার পড়ার ভঙ্গি এমনই আকর্ষণীয় ছিল যে আমরা কয়েকজন ভাগ্যবান তা দারুণ উপভোগ করতাম।

৪

ফেলু যেমন আমিই করব বলে মানিকদা ভেবে রেখেছিলেন তেমন জটায়ু চরিত্রের জন্য সন্তোষদার কথাও তাঁর চিন্তায় ছিল। আমার নিজের বিশ্বাস, 'সোনার কেল্লা' যখন হয়েছিল তখন হয়ত চেষ্টা করলে মানিকদা আমাকে ছাড়া আর কাউকে ফেলু করে তুলতে পারতেন, কিন্তু সন্তোষদা ছাড়া জটায়ু চরিত্রায়ন অসম্ভব ছিল। এখন মনে পড়ছে ফেলুর অন্য কাহিনীর বদলে, 'সোনার কেল্লা'ই পছন্দ করার আসল কারণ ছিল কাহিনীতে জটায়ুর উপস্থিতি। এ সম্পর্কে মানিকদার সঙ্গে কথাও হয়েছিল, বলেছিলেন—'সোনার কেল্লা'ই ভাল হবে কেন জান, ওটাতে তো লালমোহনবাবু আছেন, লালমোহনবাবু যতদিন আসেননি ততদিন ফেলু যেন একটু ড্রাই বুঝলে, সোনার কেল্লায় লালমোহন এসেছেন বেশ একটু হিউমারাস হবে ব্যাপারটা, আর তাছাড়া সন্তোষ রোলটা দারুণ করবে...' ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্তোষদা ও জটায়ু— প্রসঙ্গে কারও কোন বাড়াবাড়ি বা মিথ্যাচারের সুযোগ নেই। সন্তোষদা ছাড়া জটায়ু আমি ভাবতে পারি না। অন্যরাও ভাবতে পারেন না, সবচেয়ে বড় কথা স্বয়ং সত্যজিৎ রায় ভাবতে পারতেন না। সন্তোষদার মৃত্যুর পর মানিকদা তো বলেই ফেলেছিলেন—'আমি আর ফেলু নিয়ে কোনও ছবি করব না, জটায়ু আমি কোথায় পাব? জটায়ু ছাড়া ফেলুর গল্প হয় না, আর সন্তোষ ছাড়া জটায়ু হবে না।'

জটায়ু চরিত্রে সন্তোষদার অভিনয় বাংলা চলচ্চিত্রের অমর সম্পদ হয়ে থাকবে। পরবর্তীকালে সন্দীপ রায় যখন হিন্দিতে ফেলুর কাহিনী করল তখন এ প্রসঙ্গে মানিকদার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। প্রথম এপিসোডটা দেখার পর মানিকদার সঙ্গে দেখা, মানিকদার ঘরেই। আমরা কয়েকজন কথাবার্তা বলছিলাম, মানিকদা নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আমাদের আলোচনার মধ্যে মানিকদা হঠাৎ বলে উঠলেন—'না বাঙালিদের ওটা

পছন্দ হবে না, তুমি নেই, সন্তোষ নেই। এটা ওঁরা নেবেন না'।

সিধু জ্যাঠা যেমন আর পাঁচটা জ্যাঠামশাইয়ের মত নন, তেমনি জটায়ুও সহজলভ্য কৌতুকময় চরিত্র নয়। একটা গোয়েন্দা কাহিনীতে আর একজন সদাহাস্যময় জীবন্ত গোয়েন্দা কাহিনী লেখকের উপস্থিতি কোথাও আছে কিনা গোয়েন্দা-কাহিনীর গবেষকরাই বলতে পারবেন। জটায়ুর কথাবার্তা, কথা বলার ভঙ্গি সবই কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত সকলেই উপভোগ করেছেন। জটায়ুর মনে সর্বদাই তাঁর পববর্তী গোয়েন্দা কাহিনীর নামকরণের অন্বেষণ ঘুরে বেড়ায়। আলাপে উদ্বেগে একেবারে নিজস্ব ঢঙে উচ্চারিত খাঁটি রাষ্ট্রভাষা ও ইংরেজি থাকে। দ্রুত কথা বলতে গিয়ে নার্ভাস হযে তিনি হাঁসজারুর মত 'হাঁয়েস' বলে ফেলেন। উট কাঁটা বেছে খায় কিনা— এজাতীয় প্রশ্ন শুধু তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব। ফেলুদা এমনকি কখনও কখনও তোপসেও লালমোহনবাবুর অজস্র ভুল ধারণা ভেঙে দেয়। তবে বিস্মিত করার কৃতিত্ব কিন্তু একেবারে একতরফা নয়, মাঝে মাঝে লালমোহনবাবুও ফেলু মিত্তির কে চমকে দেন, যেমন— 'রামমোহন রায়ের নাতির সার্কাস ছিল সেটা কি জানতেন'? এমন কথাও জটায়ুব মুখে আছে।

সন্তোষদার সত্যি সত্যিই কিন্তু উটের পিঠে চড়তে অপরিমিত কোনও ভয ছিল না। উটের কথায় পরে আসব, এখন সন্তোষদার কথা বলি। মানিকদা 'সোনার কেল্লা' ছবিতে সন্তোষদার যে বিচিত্র ব্যায়াম পদ্ধতি দেখিয়েছেন সেটা ছবির প্রয়োজনে করতে হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সন্তোষ দত্ত অত্যন্ত ফিট মানুষ ছিলেন। নিয়মিত ব্যায়াম করতেন, একজন পেশাদার অভিনেতাব পক্ষে যা করা খুবই স্বাভাবিক। সন্তোষ অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, বলতে পারি ওঁর ফিটনেস বয়স্ক অ্যাথলিটদের কাছাকাছিই ছিল। 'লাঠি' স্টেশনে তোলা সেই দৃশ্যেব কথা যাঁরা মনে করতে পারবেন তাঁদের বলি, এখানে সন্তোষদা যে-প্রকার ভঙ্গিতে হাত পা ছুঁড়ছিলেন তা কিন্তু শারীবিক সক্ষমতারই পরোক্ষ পরিচয়, একজন নিয়মিত শরীরচর্চা না করলে ও ধরনের মজাদার ভঙ্গি মসৃণভাবে করতে পারবেন না, করা সম্ভব নয়। চমৎকার মেজাজেব বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন, প্রকৃত অর্থেই সুরসিক, সন্তোষদার সঙ্গ কখনও ভোলার নয়, কথা বললেই বুঝতে পাবা যেত যে তাঁর যথেষ্ট পড়াশোনা ছিল, আমাদের দুজনের মধ্যে অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল। শুধু অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতার জন্যই নয়, মানুষ সন্তোষদাকেও মানিকদা অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

উট কাঁটা বেছে নয়, সবসুদ্ধই খায় এবং তাতে তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। সন্তোষদার মুখে সংলাপটা এতই সুপ্রযুক্ত ছিল যে ভাবলে এখনও হাসি পায়। ঠিক এই দৃশ্য টেক করার সময় মানিকদা নিজে ক্যামেরার পিছনে ছিলেন, টেক করার ঠিক পরের মুহূর্তে একটা ট্রাক এসে পিছন দিক থেকে আমাদের গাড়িটাকে ধাক্কা মারে, কয়েকমুহূর্ত সময়ের ব্যবধানে মানিকদার চোখ দুটো যে রক্ষা পেয়েছিল সে কথা আগেও বহুবার লিখেছি। গাড়িতে পিছনের সিটে ছিল ফেলু, তোপসে এবং জটায়ু। সামনের সিটে ডাইভার এবং সিট সরিয়ে ক্যামেরা নিয়ে মানিকদা স্বয়ং (দৃশ্যটায় ছিল সেই বিখ্যাত সংলাপগুলো... একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে?...উট কি কাঁটা বেছে খায়? ইত্যাদি)। কাট্ বলে মানিকদা চোখ সবাতেই ধাক্কা, আর একটু হলেই সত্যজিৎ রায় দৃষ্টিহীন হতে

পারতেন, একেই বোধহয় বলে 'প্রভিডেন্সিয়াল এসকেপ'। আমরা প্রচন্ড বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম মানিকদার অঘাত কতটা জানার জন্য। কিন্তু মানিকদার চরিত্রের এটাও একটা দিক তিনি নিজের আঘাতের কথা ভুলে আমাদের কার কোথায় লেগেছে তা খোঁজ নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, বিশেষ করে তোপসে মানে সিদ্ধার্থের কোনও চোট লেগেছে কিনা।

৫

'সোনার কেল্লা' ছবির শুটিং-এর নানা ঘটনা এখনও মাঝে মাঝে আমাদের সকলের মনে উঁকি দেয়, আমাদের অর্থে মানিকদার ইউনিটের সদস্যদের কথা বলছি। তবে সব ঘটনাই তেমন মজার নয়, একটি তো রীতিমত ভয়ের। গোয়েন্দা ফেলুর বিছানায় বিষধর কাঁকড়াবিছের বিচরণ দৃশ্য মনে পড়ছে। দৃশ্যটা তোলা হয়েছিল কলকাতায়, স্টুডিওতে। দৃশ্যটার রিহার্সাল চলছে, বিছানায় আমি এবং সেই কাঁকড়াবিছে মহাশয়। আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে শ্রীমান তোপসে। এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং হল। তখনও পর্যন্ত স্টুডিওতে জেনারেটর ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়নি, পাওয়ার কাট-এর আদি যুগ সেটা। সত্যি সত্যিই লোডশেডিং, সেই মুহূর্তে প্রথমে বেশ ভয় হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, যদি উনি কামড়ান, আহত হই হব, কারণ এখনে আমার চারপাশে লোকজন, ক্যামেরা, আলোর বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি, নেমে হাঁটাচলা করলে আরও সমস্যা হবে। খানিকটা ভাগ্যের হাতেই ব্যাপারটা ছেড়ে দিলাম। কয়েক মিনিট পরে আলো নিয়ে আসা হল। সকলেই ব্যস্ত হয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে এলেন। ততক্ষণে বিছে মহাশয় সিনেমায় অভিনয়ে প্রচন্ড অনাগ্রহ দেখিয়ে মেঝেতে নেমে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাকে মানিকদার খুব প্রয়োজন, আবার তাঁকে ধরে ফেলা হল এবং পরে দৃশ্যটা টেক করাও হয়ে গেল।

এখানে একটা কথা বলে রাখি; মন্দার বোস অর্থাৎ কামু মুখার্জি, উনি কিন্তু কাঁকড়াবিছে ধরার কৌশল জানেন এবং খালি হাতেই চটপট ধরে ফেলতে পারতেন। কামু এধরনের কাজকর্মের অনেক কৌশলই জানেন, জাগলারি ব্যাপারটায় ওর একটা সহজাত দক্ষতা আছে। বাবু মানে সন্দীপের ফটিকচাঁদ ছবিতে কামুর এই দক্ষতা বেশ কাজে এসেছিল।

রাজস্থানের আউটডোরে পৌঁছে উটে চড়া নিয়ে আমাদের মধ্যে বিস্তর হাসিঠাট্টা চলত, সেই হাসি-ঠাট্টা কখনও কখনও নিরামিষ অথচ ধারাবাহিক রসিকতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তবে ছবিতে উটে চড়া ব্যাপারটা যেমনভাবে দেখানো হয়েছে বাস্তবে তেমন ভয়াবহ হিসেবে আমাদের সামনে হাজির হয়নি। নিজের কথা বলতে পারি, মনের ভিতরে আমার কোনও ভয় ছিল না, থাকার কথাও নয়, কারণ আমি ঘোড়ায় চড়া ব্যাপারটা যত্ন করে শিখেছিলাম। 'সোনার কেল্লা' ছবি করার আগে আমরা কেউই কখনও উটের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিনি, উটের চলনে যে ছন্দ সেটাও অপ্রচলিত এবং চলার সময় শরীরের ওঠা-নামাও অদ্ভুত ধরনের সেটাও ঠিক। কিন্তু আমরা সবাই যতটা মজা পেয়েছিলাম ততটা ভয় পাইনি। ছবিতে লালমোহনবাবুর যে কাঁদো কাঁদো অবস্থা হয়েছিল সেটা পরিচালক মানিকদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং সন্তোষদার অভিনয় নৈপুণ্য ছাড়া আর কিছু নয়। চলার সময় উটের সেই ওঠা-নামা ছন্দের সঙ্গে আমাদেরও ওঠা নামা করতে হবে

সেটা আমরা দেখেই আন্দাজ করেছিলাম আর স্থানীয় লোকজন তা আমাদের বলেও দিয়েছিলেন।

একদিনের শুটিংয়ের স্মৃতি ভেসে আসছে। যে দৃশ্যে আমরা উটে কবে ছুটে এসেও ট্রেন ধরতে পাবলাম না সেটার কথাই বলছি। দৃশ্যে ছিল আমরা উট-চালকদের বলছি আরও জোরে ছুটে চলুন, কিন্তু আমাদের সব চেষ্টা বৃথা হবে আমাদের চোখের সামনেই ট্রেন চলে যাবে। শুটিং শিডিউল অনুযায়ী আমরা ঠিক সময়েই পৌঁছিলাম। ট্রেন তো ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, বোধহয় তার যোধপুর থেকে আসার কথা, আর আমরা জয়সলমীর যাওয়ার পথে তাকে ধবব। আমাদেব ইউনিটের সবাই, মরুভূমি উটগুলো, তাদের চালকবৃন্দ—সবাই হাজির। কিন্তু ট্রেনটা সেদিন আর এলই না। সাবাদিন আমবা বসে রইলাম, সকলেরই টেনশন, কিন্তু ট্রেন আব এল না। সবকাবী বন্দোবস্ত, কোথাও কিছু বাড়তি আলস্য হাঁটুগেড়ে বসেছিল বোধহয়। সকলেই বিবক্ত, মানিকদাও। সারাদিন কোনও কাজ নেই। বসে বসে কী করব? সময কাটাতে কয়েকটা ছড়া লিখেছিলাম, সেগুলো এখন আর মনে নেই, একটার প্রথম তিন লাইন বোধহয় এইরকম ছিল—

মেজাজ গেছে খিঁচড়ে,
ট্রেনটাকে কি যায না আনা
টেনে কিংবা হিঁচড়ে! .. ইত্যাদি

মনে পড়ছে সন্দেশেব পাতায় কোন একটা লেখায বোধহয় কেউ সেগুলো ব্যবহারও করেছিলেন।

'সোনার কেল্লা' ছবিতে বযস্ক চরিত্র ছাড়া কয়েকজন কম বয়সের চরিত্রও ছিল, মুকুল তো গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র। মুকুলের চবিত্রে অভিনয় করেছিল শ্রীমান কুশল চক্রবর্তী। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও চটপটে স্বভাবের ছেলে, তার সঙ্গ আমরা সবাই উপভোগ করতাম। কিন্তু সমস্ত দিনের শেষে কাজকর্মের ঝামেলা মিটিয়ে আমরা হযত হোটেলে ফিরছি, শরীর বইছে না, কিন্তু কুশলকুমারের সব বিষয়েই অদম্য কৌতূহল, অফুরন্ত বিচিত্র সব প্রশ্ন তার। আমরা কেউ কেউ কুশলের কিছু প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, বাকিগুলো, হয়ত বলছি— পরে তোমাকে বলব, কেমন? ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মানিকদার ব্যাপারটা অন্যরকম, তিনি ছোটদের একেবারে অকৃত্রিম বন্ধু, ক্লান্তি যেন তাঁকে স্পর্শই করেনি এমন মেজাজে ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে তিনি তার সব প্রশ্নের জবাব দিতেন। রাজস্থানের বিচিত্র সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদেরই মুগ্ধ করে রেখেছিল আর ছোট ছেলে কুশলকে তো করবেই! তাই দিনের বেলাতেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে মানিকদাকে অসংখ্য প্রশ্ন করত এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই তার জবাব পেয়ে যেত। আউটডোরে কুশলের অভিভাবক হিসেবে আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন তার বাবা অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী। তিনি ফিরে এসে সোনার কেল্লা আউটডোর শুটিং, ভ্রমণ ইত্যাদি নিয়ে একটা বইও লিখেছিলেন।

তোপসে চরিত্রটাও মানিকদার মেজাজের মৌলিক সৃষ্টি বলেই আমার মনে হয়। ফেলুর সঙ্গে কিশোর তপেশের বয়সের অনেক তফাত, তবুও সে ফেলুর সমস্ত অভিযানের সঙ্গী। কোনও গোয়েন্দার এমন কমবয়সী সহকারী আছে এ ধরনের নজির খুব একটা দেখা যায় না। ফেলু-কাহিনীর মধ্যেই দেখা গেছে ফেলুদার সাহচর্যে তোপসের বুদ্ধিতে যেমন শান পড়ছে, তেমনি তার ক্ষিপ্রতাও বেড়েছে। সেভাবে চিন্তা করলে বলা যায়

তোপসে ফেলু চরিত্রেরই এক্সটেনশন, তোপসের মধ্যে যেন আর একটা ফেলু মিত্তির তৈরি হচ্ছে। 'সোনার কেল্লা' এবং 'জয়বাবা ফেলুনাথ', দুটি ছবিতেই তোপসের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়। সিদ্ধার্থের মিষ্টি ব্যবহার এবং বুদ্ধিদীপ্ত আচরণের জন্য মানিকদাসহ ইউনিটের সকলেই তাকে বেশ পছন্দ করতেন। তোপসেও ব্যক্তিগত জীবনে 'চট্টোপাধ্যায়' পদবির অধিকারী বলে শুটিং দেখতে আসা বাইরের অনেকে আমাকে প্রশ্ন করতেন সিদ্ধার্থ আমার ছেলে কিনা।

গোটা রাজস্থান জুড়ে তখন প্রচণ্ড শীত, সেই অবস্থায় আমবা বিকানীর পৌঁছলাম। সেখানে ছ-সাত দিন থাকতে হবে। বিকানীরে আমরা সত্যিকারের কোল্ড ওয়েভে পড়ে গেলাম, একেবারে হাড়কাঁপানো শীত। যোধপুর থেকে একটা ব্রাণ্ডিব বোতল সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রথম দিন আমাদের শুটিং নেই, পরের দিন সকাল থেকে শুটিং হবে। মানিকদা সেই দিন ওখানকাব বিখ্যাত রাজস্থানী লোকগীতির শিল্পীদের ডেকেছিলেন। মানিকদার ছবিতে কাজ করার পরই ওঁরা সকলেই প্রায় এখন ভারত-বিখ্যাত হয়ে গেছেন। এখন তো বাজস্থানের ফোক অ্যাকাডেমিতে এঁদের গান রেকর্ডও করা হয়েছে। জয়সলমীরেও এ ধরনের শিল্পীদের গান-বাজনা আমরা শুনেছিলাম, সত্যিই অসাধারণ গানবাজনা। জয়সলমীরের কাছে একটা গ্রাম আছে সেখানে গ্রামবাসীরা সকলেই শিল্পী। হয় কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী নইলে যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী। ওখানেই প্রথম বিশাল লম্বা একধরনের বাঁশি দেখেছিলাম, তার নাম 'নাড় বাঁশি'। সেই গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই আবার মাঝে মাঝে নাকি ডাকাতিও করেন। গুপী গাযেন করতে গিয়েই মানিকদার সঙ্গে এঁদের পরিচয় হয়েছিল। 'সোনার কেল্লা' ছবিতে দু তিনটি দৃশ্যে এঁদের গানবাজনা ব্যবহার করা হয়েছে। 'লাঠি' স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য অপেক্ষা করার সময় এদের বিচিত্র যন্ত্রবাজানো গান ব্যবহার করা হয়েছিল। যাই হোক, আবার বিকানীরের সেই সন্ধেবেলায় ফিরে আসি। আমরা সবাই শুনব, মানিকদা তো শুনবেনই। শোনার পর কাকে কী ভাবে কাজে লাগাবেন সেটাও স্থির করে ফেলবেন। সকলে তন্ময় হয়ে শুনছি, একটু দূরে চারদিকে শীতের রাতের অন্ধকার, ঠাণ্ডায় মনে হচ্ছে নাকটা এক্ষুনি খসে পড়ে যাবে। গানবাজনার মাঝখানে পাঁচ মিনিটের বিরতি, এই বিবতিতে ব্রাণ্ডির বোতলটা খুলব এমন একটা ইচ্ছেয় আমি আর সন্তোষদা পাশের একটা ঘরে গিয়েছি, আমারই হাতে ছিল বোতলটা, গানের প্রসঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে আমি হঠাৎ দু-হাত তুলে সন্তোষদাকে বলে উঠলাম ওঃ সন্তোষদা, কী সুন্দর গান বলুন তো! সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশনও ছিল, ফলে যা হবাব তাই হল, আমার হাত থেকে বোতলটা সোজা পড়ল পাথরের মেঝের উপর। ঘটনার আকস্মিকতায় এবং অবশ্যই শোকে আমি প্রায় বজ্রাহত, সন্তোষদার মুখেই প্রথম কথা ফুটল— 'যা!, পুলু, এখন কী করবে? কিছুই আর করার ছিল না, সুর কানে নিয়ে শুষ্কসপ্তাহ কাটাতে হয়েছিল বিকানীরে। পরে ঘটনাটা শুনে মানিকদা হো-হো করে হেসেছিলেন।

পরিচালক সত্যজিৎ রায়, অসাধারণ রুচিবান সত্যজিৎ রায়েব সঙ্গলাভের অর্থই হচ্ছে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ। গাড়ি করে বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, সেখানেই রাস্তায় কাচ ছড়িয়ে মন্দার বোস ফেলু মিত্তির অ্যাণ্ড কোং-এর অভিযানে বাধা সৃষ্টি করেছে। সেই গাড়ির চাকা ফেঁসে যাওয়ার স্পটে মানিকদা একটা সুন্দর দৃশ্যের শুটিং করেছিলেন,

কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত ছবিতে নেই। মরুভূমির বালি, কাঁটা গাছ, সূর্যের আলো ইত্যাদি নিয়ে অনেক। যত্নে দৃশ্যটা টেক করেছিলেন মানিকদা। গাড়ির চাকা সারানো হচ্ছে আর সেই সময়ে ফেলু, তোপসে এবং জটায়ুর মধ্যে কথাবার্তা ছিল। কিন্তু পরে এডিটিং টেবিলে চিত্রনাট্যের দাবি অনুযায়ী দৃশ্যটা বাহুল্য মনে হওয়ায় মানিকদা নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলে দিয়েছিলেন। সেটা দেখে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম, মানিকদা শিল্পটাকে কী অসাধারণ যত্ন ও সততার সঙ্গে বিচার করতেন। অত সুন্দর একটা দৃশ্য বাদ দিতে এক মুহূর্তও সময় নেননি, কারণ ওঁর মনে হয়েছিল দৃশ্যটা অপ্রয়োজনীয়, চিত্রনাট্যে যেন অতিরিক্ত মেদ। এটাও অত্যন্ত মূল্যবান শিক্ষা, কিভাবে একজন পরিচালককে লোভ সংবরণ করতে হয়।

আমার মনে আছে, অনেকদিন আগে মানিকদার একটা লেখায় পড়েছিলাম— 'ছবিতে দুটো জিনিসের ইমপিওরিটি আমি চাই না, একটা হচ্ছে পিক্টোরিয়াল আর অন্যটা হচ্ছে থিয়েট্রিক্যাল।' সত্যিই মনে থাকার মত কথা, থিয়েট্রিক্যাল শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'পিকটোরিয়াল' ইমপিওরিটি বলেছেন যদি সেটা ইন্টিগ্রেটেড উইথ দ্য ন্যারেটিভ না হয়।

'সোনার কেল্লা' দারুণ জনপ্রিয় হওয়ার পর অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়েব উপর যেন একটা প্রায় চিরস্থায়ী ছাপ পড়ে গিয়েছিল— আমি মানেই ফেলু। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়নি। মনে আছে, দু একটা লেখায় অথবা সাক্ষাৎকারে আমি এ নিয়ে খানিকটা ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারব না আমার ক্ষোভ মানিকদার কানে পৌঁছেছিল কিনা। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা আমাকে শুধু যেন ফেলুদা হিসেবেই চিহ্নিত করতে লাগল। প্রতিবাদ হিসেবে বলতে চেয়েছিলাম আমি তো বিভিন্নরকম চরিত্রে অভিনয় করতে ভালবাসি, তাই-ই করতে চেয়েছি চিরকাল। কিছু কিছু চরিত্রে খানিকটা সফলও হয়েছি, সেটাও বোধহয় অস্বীকার করা যাবে না। আমাকে কেউ 'অপু' 'নরসিং' বা 'ময়ূরবাহন' হিসেবেও বা মনে রাখবে না কেন? তবে আমি নিজেই কিছুকাল পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলাম। এসব কথা আগেও বহু লেখায় বলেছি, আবারও লিখছি (মানে বারবার উল্লেখ করে আমার অপরাধবোধ থেকে মুক্তি চাইছি) আমার সেই ভাবনায় আমি কিশোর-কিশোরীদের প্রতি অন্যায় করেছিলাম, ওরা যদি ফেলুর চরিত্রের অভিনয়ে খুশি হয় তাহলে সেটাও তো একধরনের প্রশংসা, আমার তাতে খুশিই হওয়া উচিত। সমাজের সবচেয়ে তাজা সংবেদনশীল মানুষ হচ্ছে কিশোর-কিশোরীরা, তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়া আমার অন্যায় ও ভুল দুটোই হয়েছিল। এরা বড় হয়ে নিশ্চয়ই তাদের ধারণা বদলে অপু বা অঘোরকেও মনে রাখবে।

'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবিটা হয়েছিল 'সোনার কেল্লা'র প্রায় বছর তিন-চার পরে। ফেলুনাথের জন্য আলাদা করে কোনও প্রস্তুতি নিইনি। শুধু একটা চিন্তাই মাথায় ছিল যেন দুটো ফেলু আলাদা না হয়ে যায়, অভিনয়ের ধারার মধ্যে যেন কন্টিনিউইটি বজায় থাকে।

আজ এতদিন পরে এই বিষয় নিয়ে লিখছি বলে নয়, একদিক থেকে ছবি হিসেবে আমার 'সোনার কেল্লা'র চেয়েও 'জয়বাবা ফেলুনাথ' ভাল লাগে। 'সোনার কেল্লা' যেমন রাজস্থানের অবাক করা দৃশ্য ইত্যাদি নিয়ে মন জয় করে ফেলে, তেমনি, 'জয়বাবা ফেলুনাথ'-এ জটিল চিন্তার খোরাক বুদ্ধিদীপ্ত মানুষদের আকর্ষণ করে। কাশীর দৃশ্যাবলী

তো অসাধারণ! বস্তুতপক্ষে কাশী চিরকালই মানিকদাকে টানত, ছবি তৈরির প্রথম জীবনে সাদাকালোয় কাশীর গঙ্গা, গঙ্গার ঘাট অমর করে রেখেছেন 'অপরাজিত' ছবির অসংখ্য দৃশ্যে। এবারে রঙিন ছবিতে কাশী। বাত্রিতে সেই গলির দৃশ্যগুলো, মছলিবাবা যে বাড়িটাতে থাকত সেই বাড়িটাকে ঘিরে নানারকম জটিল শট প্রচুর পরিশ্রম ও যত্ন নিয়ে মানিকদাকে কাজ করতে হয়েছিল।

রাতে আমরা অর্থাৎ ফেলু-জটায়ু-তোপসে খেয়ে ফিরছি, ফেলুর মুখে ছড়াও রাখা ছিল— আজকে রাতে ওরে ও ভাই সজারু .... সেই দৃশ্যটার কথা বলছি, সেই দৃশ্যে কাজ করতে খুবই ভাল লেগেছিল। প্রথম দিন স্থানীয় লোকজন শুটিং দেখার আগ্রহে এমন কাণ্ড করেছিলেন যে আমরা কাজ করতেই পারিনি। পরে অবশ্য ওঁদের সাহায্যেই টেক করা সম্ভব হয়েছিল।

আরও একটা কথা, যার উল্লেখ এই লেখার গোড়ার দিকেই করেছি। যে সমস্ত সমাজবিরোধীরা দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার কবে তাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য তুলে ধরা, তারপর শেষ দৃশ্যে যেভাবে জটায়ুর চারপাশে ছোরা বিদ্ধ করা হয়েছিল ঠিক সেই ভাবে মছলিবাবার ছদ্মবেশদারী ফেলুনাথ মগনলালের শরীরের চারদিকে গুলি করার দৃশ্য, মগনলালের স্নায়ুর উপরেও একই ধরনের চাপ পড়ছে, যেন একই ধরনের প্রতিশোধ নিচ্ছে ফেলু মিত্তির— এ সমস্ত দারুণভাবে উপভোগ করেছিলাম। 'জয়বাবা ফেলুনাথ'-এ গল্পের চমকটা যেন আরও বেশি। শেষ দৃশ্যে গোয়েন্দা ফেলু মিত্তির কী কাণ্ড ঘটাবে তা জটায়ু ও তোপসের কাছেও অজানা ছিল।

শেষ দৃশ্যের সংলাপ— যারা দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে .... ইত্যাদি। এর মধ্যে একটা উদ্দীপক দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়, অন্তত আমার তো অভিনয় করতে করতে তাই-ই মনে হয়েছিল।

মানিকদার সঙ্গে ছবি করার অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, স্মৃতির মধ্যে এখনও আমি অপু-নরসিং-গঙ্গাচরণদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই, সেই স্মৃতি-ভ্রমণে আছে নির্ভেজাল বাঙালি গোয়েন্দা ফেলুদা এবং তার সঙ্গীরা, তারা চিরকালই থাকবে।

পথের পাঁচালী

উমা দাশগুপ্ত (সেন)

বেলতলা স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি তখন। ১৯৫২ সাল। ইসকুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা অপর্ণা সেন, আমাদের অপর্ণাদি একদিন ডাকলেন তাঁর ঘরে। বললেন, ওঁর পরিচিত এক ভদ্রলোক, আশীষ বর্মন আমাদের বাড়িতে একদিন আসবেন। ভদ্রলোককে ওঁর ঘরে দেখলাম। বিষয়টা যে কোনো ছবিতে অভিনয় করার ব্যাপারে তা-ও বললেন। আমি স্কুলের নাটক বা নৃত্যনাট্য এ সবে প্রায়ই অংশ নিতাম কিন্তু ফিল্‌মে অভিনয়। ভাবতেই পারতাম না। তাছাড়া আমার বাবাও বেশ রক্ষণশীল ছিলেন। ভবানীপুরের রূপচাঁদ মুখার্জি লেনে ছিল আমাদের বাড়ি। মজা হল ঐ একই পাড়া থেকে 'পোষ্টমাষ্টার'- এর রতন, ফেলুদা সিরিজের ছবির 'তোপসে' আর আমি এই তিনজনেই সত্যজিৎ রায়-এর ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পাই। এবং সেটা আলাদা ভাবেই।

আমরা চার বোন আর বাবা-মা। তবে উপরের দুই দিদির তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাবা সরকারী চাকরি করতেন তবে পল্টু দাশগুপ্তকে লোকে চিনতেন মোহনবাগানের খেলোয়াড় হিসেবে। বাবা ছিলেন গোষ্ঠ পালের সমসাময়িক।

যাই হোক, অপর্ণাদির কথামত নির্দিষ্ট দিনে ওঁরা আমাদের বাড়িতে এলেন। মানিকদা নিজে, আশীষবাবু ও দু- একজন এসেছিলেন। বাবা তো সিনেমায় নামার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ না করে দিলেন। আসলে তখন তো এসব ব্যাপার আজকের মত এত সহজ ছিল না। ১৯৫২ সালে বাংলাদেশের কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারে এ-ধরনের 'ট্যাবু' থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু মানিকদাও ছাড়বেন না। উনি বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে এটা সেরকম ছবি হবে না। মেকআপ, সাজসজ্জা কিছু থাকবে না। একেবারে সাধারণ পোশাকে অভিনয় করতে হবে ইত্যাদি। বাবার সেই এক কথা। মার আলাদা করে কোনো মতামত না থাকলেও সমর্থনও ছিল না। কিন্তু সত্যজিৎবাবু মানে মানিকদা সেদিন যাওয়ার সময় বাবাকে বলে গেলেন, 'আপনি না করলে চলবে না, কাল ক্যামেরা এনে ওর কয়েকটা ফটো নেব। আমরা ঠিক এইরকম মেয়েই চাইছি দুর্গা চরিত্রের জন্য।'

আসলে সর্বজয়া চরিত্রে যে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করবেন তা আগেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। আর সেই সময় করুণাদির নিজের মেয়ে রুনকি, ওকে তো আমি পরে দেখলাম, ওর চাইতে আমার সঙ্গে করুণাদির চেহারায় মিল ছিল বেশি। শুনেছিলাম দুর্গা চরিত্রের জন্য ওঁরা অনেক খোঁজখবর করছিলেন স্কুল-টুলে, শেষ পর্যন্ত আমার বয়স, চেহারা সবই মিলে যাওয়ায় আমাকে যে নিতেই হবে সেটা ঠিক করেছিলেন।

এদিকে ওঁরা চলে গেলে আমার ছোড়দি বাবাকে অনেক করে বোঝাল। 'একে তো বিভূতিভূষণের লেখা, তার উপর সুকুমার রায়ের ছেলে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নাতি সত্যজিৎ রায় পরিচালনা করবেন। এ কখনই খারাপ কিছু হতে পারে না। নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি ওকে ছাড়তে পার।'

বাবা হয়ত একটু নরম হয়েছিলেন ছোড়দির কথায় তবে 'হ্যাঁ' বলেননি। এদিকে ওঁরা তো পরেরদিন ক্যামেরা নিয়ে এলেন। আমাদের বাড়ির ছাতে আমার খানকয়েক শাড়ি পরা ছবি তোলা হল। তার মধ্যে মানিকদার নির্দেশমত একটা ফটোতে আমাকে মুখ ভেংচাতেও হল। সত্যজিৎবাবু জিগ্যেস করেছিলেন, 'তুমি মুখ ভেংচাতে পার?' এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পরের আর এক দিনের কথা। ওঁর বাড়ির বারান্দায় উনি আমার একটা জলে ভেজা ছবি নিয়েছিলেন। বৌদিকে মানে ওঁর স্ত্রী বিজয়া রায়কে বলেছিলেন এক গ্লাস জল আমার মুখের দিকে ছিটিয়ে দিতে, তারপরেই উনি ফটোটা নিলেন। এই সময়ের অনেক ফটোই আমার অ্যালবামে এখনও আছে। আসলে ইউনিটের সকলেই আমায় খুব ভালবাসতেন। কাজেই পরে ওঁরা আমায় ওগুলো দিয়েছিলেন। ঐ সব ফটো তোলার ব্যাপারটা তখন তেমন করে বুঝিনি। এখন ভাবি, দুর্গাকে কোন্‌টা করলে মানাবে, কী করলে তাকে কেমন দেখাবে এ ব্যাপারে আগেই তিনি মাথায় একটা ছবি গড়ে নিয়েছিলেন। কারণ ছবিতে পরে আমাকে মুখও ভেংচাতে হয়, বৃষ্টিতেও ভিজতে হয়।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তো বাবা রাজি হলেন। কিন্তু টাকা পয়সার কথা বলতে বাবা তো অবাক। 'ওমা! মেয়ে ফিল্ম করবে, টাকা নেব কি!' বলেই ফেললেন। আমরা ছিলাম সাধারণ মধ্যবিত্ত। বড়লোক তো নয়। কাজেই বাবার এই মনোভাব মানিকদা ও আর সকলে খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করেছিলেন। ওঁরা আমাকে ছবির শুটিং চলার সময়ে তো বটেই পরেও যে কত কি দিয়েছেন। মানিকদা তো কত আঁকার সরঞ্জাম, এমনকি রবীন্দ্ররচনাবলীও দিয়েছিলেন আমায় এক সেট। আমার কাছে এখনও সেইসব বই যত্ন করে রাখা আছে। এ ছাড়া পরে মানিকদাদের পরিবারের সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমার যে ওঁরা যেন আমার নিজেরই লোক।

কিন্তু 'পথের পাঁচালী'তে অভিনয় করাটা আমার কাছে শুধুই প্রশংসা, খ্যাতি, পরিচিতির ব্যাপারে জরুরী নয়। আমার সেই গড়ে ওঠার বয়সে বা বলা যায় 'ফর্মেশন পিরিয়ড'-এ ওঁদের বাড়ির পরিবেশ, ওঁদের বাড়ির সংস্কৃতি আমাকে যে কত সাহায্য করেছিল তা তখন বুঝিনি। আজ বুঝি। মানিকদার মা, মংকু বৌদিও (বিজয়া রায়) দুজনেই দারুণ সেলাই করতেন, নানা রকম খাবার বানাতেন, এদিকে বাড়িতে নানারকম আলাপ-আলোচনা, ক্যামেরাম্যান সুব্রতদা (সুব্রত মিত্র) সেতার বাজাতেন-- সব মিলিয়ে সে একটা দারুণ ভাল লাগার জগৎ! আমার নিজের ভাই ছিল না। ফলে সুবীর মানে ছোট অপু ছিল আমার নিজের ভাইয়ের মত। ও তখন দারুণ দুষ্টু ছিল। আর ছোটও ছিল অনেক, অন্তত আমার চাইতে। বৌদির জন্য গোটা ইউনিটে একটা ফ্যামিলি স্পিরিট ছিল। মনে হত যেন সবাই মিলে আমরা একটা এক্সটেনডেড ফ্যামিলির সদস্য! আর ছিলেন করুণাদি। ওঁকে আমার এখনও ভীষণ মনে হয়। কতদিন কোনো যোগাযোগ নেই, তবু মনে হয়। কী ভালবাসতেন যে। ইন্দির ঠাকুরুণ মানে চুনিবালা দেবী খুব বড় অভিনেত্রী ছিলেন কিন্তু করুণাদির সঙ্গে যেমন ইমোশনাল একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমার, তেমন ওঁর সঙ্গে হয়নি। যে কোনো কারণেই হোক উনি তেমন মিশতেন না। মনে আছে তখন একটা গাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। তার ড্রাইভার ছিলেন বচ্চন সিং। আমাকে নামিয়ে তারপর চুনিবালা দেবীকে নামাতে যেত গাড়ি। অন্যরাও থাকতেন। তো ওঁর হাতে একটা ছোট হাত বাক্স থাকত। আসলে ওটাই ছিল ওঁর ভ্যানিটি ব্যাগ, কিন্তু আমরা

ওটা নিয়ে খুব মজা করতাম। ১৯৫২-তে যখন শুটিং শুরু হয় তখন কিছু শট নেওয়া হয় যা পরে, আবার যখন ৫৪ সালে ছবির কাজ শুরু হল তখন বাদ যায়। যেমন কাশবনের দৃশ্য। এ ছাড়া একটা দৃশ্য ছিল, যেখানে দুর্গা একটা পাথর কুড়িয়ে পাবে, সে হাতে নিয়ে খুব মন দিয়ে দেখবে। ভাববে যে এটা একটা হীরে জাতীয় কিছু। তাহলে এটা বিক্রি করলে তো তাদের দারিদ্র্য অনেকটা কমতে পারে। এই দৃশ্যের ফটোটাও আছে আমার কাছে।

টাকা পয়সার কারণে ছবিটা প্রথম দফায় খানিকটা কাজ করার পর বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৯৫৪ সালে আবার কাজ শুরু হয়। কিন্তু দু বছরের মধ্যে ঐরকম একটা বয়সে অনেক পার্থক্য হয়ে যায়। ৫৪ সালে যখন শুটিং শুরু হয় তখন শুধু শাড়ি পরে অত মানুষের সামনে ক্যামেরার সামনে আসতে আমার সত্যিই খুব অস্বস্তি হত। কিন্তু সকলের ব্যবহার এমন ছিল যে কাজটা করা সম্ভব হয়েছে।

এখন ঐ বয়সী একটি মেয়ের তুলনায় তখন আমরা অনেক সাধারণ, অনেক সিম্পল ছিলাম। আর আমি বোধ হয় একটু বয়স-ছাড়া সরল, মানে 'বোকা বোকা' ছিলাম। যে কোনো দৃশ্যই সেই জন্যই হয়তো আমাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যেত। মানিকদা যা চাইতেন আমার কাছ থেকে, আমার অভিনয়ের মধ্যে তাই পেতেন। ফলে খুব খুশি হতেন। উনি আমাকে একটা স্ক্রিপ্ট দিয়েছিলেন তবে তাতে অনেক পবিবর্তনও কবতেন এবং সেইমতই আভিনয় করতে বলতেন। ফলে বাড়ি থেকে ভেবে গিয়ে কোনো লাভ হত না। সব ব্যাপারটাই হত স্বতঃস্ফূর্ত। দুর্গা যেদিন তার মায়ের হাতে মার খেল সেদিন সত্যি খুব লেগেছিল। আমাকে অবশ্য উনি আগেই বলেছিলেন, 'আজ কিন্তু তুমি খুব ব্যথা পাবে, রাগ কোর না কিন্তু।' সেদিন সত্যি, চুলের গোড়ায় যা ব্যথা পেয়েছিলাম না। তারপর, দৃশ্যটা হয়ে গেলে সকলে সে কী আদর! করুণাদি, ইউনিটের আর সবাই! আর একদিন যেদিন খুব ভিজতে হল বৃষ্টিতে, সেদিনও শট নেওয়ার পরেই শুকনো জামাকাপড় পরে নিলাম। গরম দুধ এল। 'পথের পাঁচালী'তে দুর্গা হিসেবে পরার জন্য আমার দুটো শাড়ি ছিল। আসার সময় শাড়িটা ছেড়ে আসতাম। বৃষ্টির দৃশ্যের দিনটার কথা খুব মনে পড়ে। এমনিতে তখন তো কোনো ডিপার্টমেন্ট ভাগ ছিল না, সকলেই সব কিছু নিয়ে ভাবতেন আর মানিকদার এক্তিয়ারে তো সব ব্যাপারটাই ছিল। আকাশের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে ওঁর তখন কেমন একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে গিয়েছিল। রুমালের একটা কোণা কামড়ে আকাশেব দিকে তাকিয়ে অপেক্ষার সেই ওঁর বিশেষ ভঙ্গিটা খুব মনে পড়ে।

যেদিন দরকার, সেদিন যখন বৃষ্টির মেঘটা এল, সকলের কী আনন্দ। কী চেঁচামেচি সব বৃষ্টি দেখে। আসলে ডিটেলেব প্রতি এত যত্ন ছিল! আর এখন যেমন 'এতদিনে করতে হবে' এইসব আছে তখন তা ছিল না বোধহয়। যেদিন প্রথম ব্যানার পড়ল, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের পর, চৌরঙ্গি রোডের উপর সে বিশাল এক ছবি। আশীষ বর্মন এসে বললেন 'চল দেখবি চল।' ট্রামে চেপে সুবীর আর আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক কথা লেখা ছিল ব্যানারে কিন্তু আমার কেবল মনে আছে ইংরেজিতে 'ইউনিক' শব্দটার কথা। তারপর তো ছবির প্রথম প্রেস শো হল। তার আগে আমি ছবিটা দেখিনি! রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাযের স্ত্রী এসেছিলেন। সে কী ওভেশান, ভাবলেই কেমন লাগে! তখন তো আমি আরও খানিকটা বড় হয়েছি। কেবলই মনে

হচ্ছিল করুণাদি, চুনিবালা দেবী কত ভাল করেছেন, আমি ওঁদের কাছাকাছি পৌঁছতে পারিনি।

আমি আর কোথাও অভিনয় করিনি। উনি ডাকলে নিশ্চয়ই করতাম। কিন্তু একে তো আমার পরিবার যথেষ্ট গোঁড়া ছিল, তায় আমি খুবই ইনট্রোভার্ট ছিলাম। তার উপর সেটা ছিল কর্মাশিয়াল ছবির সময়। তখন সুচিত্রা-উত্তমের ছবি 'ঢুলি' হয়েছে, আমাকে কে ডাকবে! আর ডাকলেও তো করতে পারতাম না। মৃণাল সেন, পূর্ণেন্দু পত্রী ওঁরা তো বেশ খানিকটা পরে। ঋত্বিক ঘটক অবশ্য তখন ছবি আরম্ভ করছেন, কিন্তু সে তো অন্য ধরনের ছবি। আসলে আর তো কিছুই করিনি জীবনে তবু 'লাইম লাইট'-এ থেকে গেলাম একটা ছবি করেই। একটা ছবি করেই এত খ্যাতি, ভালবাসা, পূর্ণতা পেয়েছি যে সেইটিই হয়তো আমাকে আর কিছু করায়নি।

মানিকদা

শর্মিলা ঠাকুর

কত বয়েস হবে তখন, বড়জোর এগারো-বারো। সিনেমায় নামা নিয়ে তখনই কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। একদিন জানতে পারলাম, আমার ছবি তোলা হবে। স্ক্রিন টেস্ট হবে। কার ছবি? না, সত্যজিৎ রায়ের। 'অপুর সংসার'। আমার আনন্দই হয়েছিল।

মানিকদার সঙ্গে আমার ইন্ট্রোডাকশন বলতে 'পথের পাঁচালী'। বয়েস তখন আর একটু কম। ওই বয়সে সিনেমা দেখার অনুমতি ছিল না। দেখলেও 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে' বা 'গোপাল ভাঁড়' জাতীয় ছবি। 'সাড়ে চুয়াত্তর' দেখেছিলাম অবশ্য। যদিও সেটাকে ঘুষই বলতে হবে। আসলে আমার চুল কেটে দেওয়ায় খুব কাঁদছিলাম। 'সাড়ে চুয়াত্তর' সেই কান্না ভোলানোর ঘুষ।

পথের পাঁচালীর দৌলতে মানিকদার নাম তখন ঘরে ঘরে। পূজোয় যেমন হয়, তেমনই নতুন জামা-কাপড় পরে, সেজে-গুজে আমরা 'পথের পাঁচালী' দেখতে গিয়েছিলাম। তখনও মানিকদার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়নি। অবশ্য গল্পটা পড়া ছিল। কিন্তু এখনও ছবির দৃশ্যগুলো মনে রয়েছে।

এর পর টিঙ্কু কাবুলিওয়ালা করল। তপন সিনহা, মঞ্জু মাসির মতো পার্সোনালিটির সঙ্গে পরিচয় হল। ছবি বিশ্বাসকে দেখলাম। শুটিং সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাতে শুরু করল। তখন আমি কলকাতায় থাকি ঠাকুমার কাছে। বাবা আসানসোল পোস্টেড। ছুটির সময় বাবার কাছে যেতাম। মানিকদা সে সময় বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলেন তেরো বছরের একটা মেয়ের জন্য, যাকে অপুর বউ অর্পণার চরিত্রে নামানো হবে। সেই সময় আমাকে অনেকেই বলেছিলেন, দাও না তোমার ছবি পাঠিয়ে। সে সময় এই নিয়ে আলোচনা হত মনে আছে। কিন্তু ওই পর্যন্ত।

হঠাৎই একদিন শুনলাম মানিকদা আমার বাবাকে ফোন করেছেন। জানলাম আমাকে স্ক্রিন টেস্ট দিতে হবে। ওঁরা কী ভাবে যে আমাকে ডিসকভার করলেন জানি না। মনে হয় নিশ্চয় কেউ আমাকে স্কুল থেকে বাড়ি পর্যন্ত ফলো করেছিলেন। তখন ডায়াসেশন স্কুলে পড়ি। আবার এটাও হতে পারে, টিঙ্কু ছবি করেছে, তপনকাকু হয়তো আমার নাম করে বলেছিলেন একে দেখতে পার। সে যাই হোক না, ঘটনা হল মানিকদা ফোন করেছিলেন। বাবা তাঁকে বলেছিলেন, আমাকে যদি পছন্দ হয়, যদি কাজের হই তা হলেই নেবেন। নচেৎ নয়।

ওই সব কথাবার্তার পরেই আমাকে স্ক্রিন টেস্টের জন্য তৈরি হতে হল। মানিকদা আর ফটোগ্রাফার ছিলেন। খুব সম্ভবত ওঁর নাম ছিল ধীরেন। তাঁর স্টুডিওতে প্রথমে এমনিই ছবি তোলা হয়। মানিকদার সেটা পছন্দ হয়। তারপরে মঙ্কুদি (বিজয়া রায়) শাড়ি-টাড়ি পরিয়ে খোঁপা-টোপা করিয়ে ছবি তোলালেন। তারওপরে স্ক্রিন টেস্ট। যতদূর মনে পড়ছে নিউ থিয়েটার্সে হয়েছিল। মঙ্কুদি আমাকে শাড়ি পরিয়ে দেন। চুল বেঁধে দেন।

মানিকদা আমাকে 'এদিকে দেখো ওদিকে দেখো' করে নির্দেশ দেন। আমিও সেই মতো দেখতে থাকি। কথা অবশ্য বলতে হয়নি। শুধুই সাইলেন্ট স্ক্রিন টেস্ট। মানিকদা আমাকে পছন্দ করে ফেললেন।

মানিকদাকে দেখা বলতে সেই সময়েই। মনে আছে, খুব লম্বা ও রাশভারী হলেও উনি খুব সুন্দর ব্যবহার করেছিলেন। প্রথম দিনের শুটিংয়ের কথাও মনে আছে। দৃশ্যটা ছিল অপু বিয়ে করে অপর্ণাকে টালার বাড়িতে নিয়ে এসেছে। আমার মুখে প্রথম দিন কোনও সংলাপ ছিল না। দ্বিতীয় দিনে ছিল। কিন্তু একসঙ্গে অনেক কথা। অনেক লম্বা। মানিকদা পরে ডায়লগগুলো ভেঙে দেন। সেই সময় মানিকদার একটা ব্যাপার খুব মনে আছে। প্রায় সব সময়ই উনি রুমাল চিবোতেন। দিনে একটা করে রুমাল লাগতই। মনে হয় সেটা হত টেনশন থেকে। উনি বরাবরই খুব টেন্সড থাকতেন। বিকেলে ফিস ফ্রাই ও ভাঁড়ের দই খেতেন। আর মনে আছে ওঁর শিস দেওয়ার কথা। চমৎকার শিস দিতেন। এই সেদিন ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে এখনও শিস দেন কি না জিজ্ঞেস করেছিলাম। মানিকদা মাথা নেড়ে 'না' বলেছিলেন।

স্কুলে যেতে আমার বরাবরই খুব ভাল লাগত। পড়াশোনাতেও খুবই ভাল ছিলাম। তবে এই যে এত দিন ধরে শুটিং, সেসব হয়েছিল স্কুলের ছুটির সময়। সেটাই ছিল বাবার শর্ত। তবে হয়েছিল কী, ডায়াসেশন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিসেস দাস আপত্তি জানান। বলেন, সিনেমা করলে স্টুডেন্টদের মধ্যে তার কু-প্রভাব পড়বে। তাই শুনে বাবা বলেন, ব্যাড লাক। সত্যজিৎ রায় একজন দিকপাল পরিচালক। তাঁর ছবি করতে পারা আমার মেয়ের কাছে একটা বড় সুযোগ। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে প্রিন্সিপ্যালের একটা সংঘাত শুরু হয়। বাবা নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, আমি মেয়েকে অভিনয় করতে দিতে চাই। সে করবেও। তাতে যদি স্কুল ছাড়তে হয় ক্ষতি নেই। সুতরাং আমাকে ডায়াসেশন ছাড়তে হল। বাবার কাছে আসানসোল চলে গেলাম। ভর্তি হলাম লরেটোতে।

'অপুর সংসারে'র শিডিউল কুড়ি কি পঁচিশ দিনে শেষ হয়েছিল। মনে আছে, দেশলাই জ্বালাতে আমি কিছুতেই পারতাম না। খুব ভয় পেতাম। অথচ শটে একবার দেশলাই জ্বালাতে হবে। মানিকদার অ্যাসিট্যান্ট নিমাই কাঠি জ্বালিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। সেটাও ধরতে আমার কী ভয় কী ভয়। ওই রকমই ভয় ছিল আরশোলায়। এ দিকে আরশোলা মারার একটা দৃশ্যও ছিল। সে সব অবশ্য উতরে যাই। শুটিং পর্ব হই হই করে কেটে যায়। কাজের চাপ কখনওই অনুভব করিনি। মানিকদা যা বলে দিতেন তা-ই করতাম। সোজা চলে এসো, ওপরে দেখো, একটু নিশ্বাস নাও, একটু কাঁধটা উঁচু করো। আমরা সবাই ছিলাম একটা পরিবারের মতো। মানিকদা, বংশীদা, সুব্রতকাকু, পূর্ণেন্দু, সৌমেন্দু সব্বাই।

প্রথম ছবিতে অভিনয় করানোর জন্য আমার বাবা কোনও টাকা নেননি। তাই আমার জন্মদিন কিংবা পুজোর সময় মানিকদা আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। মনে আছে, আমাকে শাড়ি, গলার গয়না, ঘড়ি এইসব দিয়েছিলেন। টাকা না-নেওয়ায় হয়তো ওভাবে উনি কমপেনসেট করতে চেয়েছিলেন। শাড়ির প্যাকেট নিয়ে আমাদের বাড়ি ঢোকার সেই দৃশ্যটা আমার এখনও মনে আছে। আর মনে আছে শুটিং শেষ হয়ে যাওয়ার পর একদিনের সাক্ষাৎ। একটা বিয়ে বাড়িতে মানিকদা আমায় দেখেন। সেদিন আমি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে

চুল বেঁধেছিলাম। মানিকদা দেখেই চমকে উঠেছিলেন। আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম, উনি পছন্দ করেননি। কিন্তু আমার সমালোচনা করেননি। উনি সব সময়েই অন্যদের থেকে আলাদা। সব সময়েই অন্যের স্বাতন্ত্র্যকে সন্মান করতেন। কখনও বলবেন না, উফ, এটা কী করেছ। বরং খুব ধীর কণ্ঠে পরামর্শ দেওয়ার ভঙ্গিতে পছন্দের কথাটা বলবেন। অথচ ওঁর যা প্রতিষ্ঠা তাতে আদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে সব সময়েই কথা বলতে পারেন। অথচ মানিকদা তা কখনই করেননি। সর্বদা সৌজন্য বজায় রেখে কথা বলতেন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে। আবার অন্যদিকে তিনি কিন্তু বিরাট রগচটা। সুব্রতদা বা ইউনিটের অন্যদের সঙ্গে রেগে-মেগে কথা বলতেন। সেখানে তাঁর ইগোর ব্যাপার।

মানিকদা বরাবরই খুব ট্রাডিশনাল। মানুষের ট্রাডিশনাল লুক, পোশাক, লম্বা চুল এসব তাঁর পছন্দ। সিঁথির ব্যাপারে, হেয়ার লাইনের ব্যাপারে প্রচণ্ড খুঁতখুঁতুনি। উনি মনে করেন, এসবের মধ্য দিয়ে একজনের চরিত্র বোঝা যায়। বিশেষ করে সিঁথি। সেটা একটুও ট্যারা হওয়া চলবে না। আসলে ফর্ম ও ফ্রেম তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাডিশনাল হলেও ওঁকে ক্ষুদ্রমনস্ক বলা যাবে না। জোর করে বাধা দেওয়ার ব্যাপারও তাঁর ছিল না। উনি যথেষ্টই প্রগতিশীল। ঘরে বাইরে অনেকের ভাল লাগেনি। কিন্তু আমার ভাল লেগেছে। রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ট্রাডিশনাল ও প্রগতিশীল, মানিকদাকেও ঠিক তেমন বলা চলে।

'অপুর সংসার' ও 'দেবী' করার পরে মানিকদা আমাকে 'কাঞ্চনজঙ্ঘার' জন্যে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় আমার ফাইনাল পরীক্ষা। বাবা তাই মত দেননি। ওদিকে বাবা সে সময় মাদ্রাজে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। মানিকদা বাবাকে যে-চিঠি লিখেছিলেন তাতে 'জি এন. টেগোর'-এর জায়গায় নাম ভুল করে 'এ এন টেগোর' লেখেন। এতে বাবা খুব রেগে যান। রেগে গিয়ে বলেছিলেন, "ভদ্রলোক আমার নাম জানেন না। তোমাকেও ওঁর ছবিতে কাজ করতে হবে না।" 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় তাই আমার কাজ করা হয়নি— যদিও তার জন্য মোটেই অনুতপ্ত নই। কারণ, ছবিটা আমার একেবারেই ভাল লাগেনি।

স্কুল পাস করে 'শেষ অঙ্ক' ও অন্যান্য বাংলা ছবি করার পর আমি বম্বে যাই 'কাশ্মীর কি কলি'-তে অভিনয় করতে। কমার্শিয়াল ছবিতে কাজ করার ব্যাপারটা মানিকদা ভাল মনে মেনে নিয়েছিলেন বলে আমার মনে হয় না। কেন না, মনে আছে, 'অপুর সংসার' যখন রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পায় তখন আমরা দিল্লি এসেছিলাম। ছবিটা কার্লোভি ভ্যারি প্রতিযোগিতায় যাবে ঠিক হয়েছে। মানিকদা আমাকেও সেখানে যেতে বললেন। নানা অসুবিধের জন্য মা মত দিলেন না। বাবা বললেন, পরে অন্য কোনও সময় যাওয়া যেতে পারে। বাবার ওই কথাটা মানিকদা লুফে নিয়ে বলেছিলেন, "না না, সে কী করে হয়। অন্য সময় রিঙ্কু কী করে যাবে?" মানে, মানিকদা যেটা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হল, আমার ছবি ছাড়া আর কী করে কার্লোভি ভ্যারি যাওয়া সম্ভব!

কমার্শিয়াল ছবিতে ক্লিক করায় মানিকদা খুশি হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু এটাও ঠিব যে, সেই যাওয়াটা উনি পছন্দ করেননি। মানিকদা সবসময়েই অন্যদের কন্ট্রোল করতে চেয়েছেন। তাঁকে ঘিরেই অন্যরা পরিচিত হোক সব সময় এটাই চেয়েছেন। বংশীদার অবশ্য একটা আলাদা আইডেনটিটি ছিল। সুব্রতও শেষ পর্যন্ত চলে যায়। অনেকের মতো

ওর ইগোও ওই রকম ছিল, আমারা সঙ্গে কাজ করতে গেলে শুধু আমার সঙ্গেই থাকতে হবে। অন্য কারও সঙ্গে কাজ করা চলবে না। আমার মনে হয়, উনি ভাবতেন এই 'কাশ্মীর কি কলি' জাতীয় ছবি বাজে ব্যাপার।

মানিকদা মনে করতে পারেন, তবে অভিনয়ের সামান্য যতটুকু আমি শিখেছি তা কিন্তু হিন্দি ছবি করার দৌলতেই। মানিকদার ছবিতে অভিনয় মানে একজন জিনিয়াস দ্বারা পরিচালিত হওয়া। সেখানে পাখি পড়ানোর মতোই সব কিছু বলে দেওয়া হয়। তুমি জানতেই পারবে না কী করছ। বিশেষ করে ওই তেরো বা চৌদ্দ বছর বয়সে। এমন নয় যে মানিকদার ছবিতে ইমপ্রোভাইজেশনের সুযোগ নেই। রবিদা করেছেন সব সময়। আমাকে যা বলা হত তাই করতাম। অভিনয়ের কিছুই জানতাম না। একটা বেসিক ইন্টেলিজেন্স ছিল, তাই যেটা করতে বলা হত বুঝতে পারতাম ও ঠিক সেই কাজটাই করে দেখাতে পারতাম। ছবিদা (বিশ্বাস) যে-অর্থে অভিনেতা, সেটা আমি ছিলাম না। ছবিদা ইম্প্রোভাইজ করতেন। মানিকদাও তা করতে দিতেন। যেমন 'দেবী'-তে দিয়েছেন। উৎপলবাবুকেও ইম্প্রোভাইজের সুযোগ দিয়েছেন। ওঁদের তুলনায় আমি ছিলাম আনকোরা। আমাকে নিয়ে ওঁকে ঘষামাজা করতে হয়েছে। আমাদের সঙ্গে ওঁর ব্যবহার এক রকম, অন্যদের কাছে অন্য রকম। অনেক পরে শুনেছিলাম, 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী'— তে অভিনয় নিয়ে সঞ্জীবকুমার মোটেই খুশি ছিলেন না। সঞ্জীবকে মানিকদা এতটুকু লিবার্টি দিতেন না। যেমন, গ্লাস ওঠাতে গিয়ে কনুইটা একটু বেশি উঁচু হয়ে গেলে মানিকদা নাকি আপত্তি করতেন। অথচ সাইদ জাফরিকে প্রচুর লিবার্টি দিয়েছেন। মানিকদার এই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা খুব ছিল। সৌমিত্র তো তাঁর সঙ্গে আগাগোড়া ছিলেন তবুও ওই দুজনের সম্পর্কে ওঠা-নামা ছিল। অনেক সময় তো মানিকদা বলেই ফেলতেন, ওফ, সৌমিত্র উচ্চারণ নিয়ে এত মাথা ঘামায়...... ইত্যাদি।

পেশাদারদের কাছ থেকে মানিকদা অনেক সময় নিজেই পরামর্শ চেয়েছেন। কিন্তু কেউ আগ বাড়িয়ে কিছু পরামর্শ দিতে এলে সেটা পছন্দ করতেন না। যে যে-ভাবেই কাজ করুক না কেন, সেটা ঠিক ওঁর মনের মতো হতে হবে। ঠিক যেমনটি উনি চাইছেন। মানিকদার এই মানসিকতাটা সঞ্জীবকুমার বোঝেননি বলে আমার মনে হয়। যে-কোনও কারণেই হোক না কেন, দু'জনে মেলেনি। অথচ মোহন আগাসের সঙ্গে সেই মিল হয়েছিল। হয়েছিল স্মিতা পাটিলের সঙ্গে। ভিক্টরও বলা যায়। 'ঘরে বাইরে'-তে ভিক্টর ফ্যানটাস্টিক। যদিও অন্য কোনও ছবিতে ও মোটেই ভাল অভিনয় করতে পারেনি। এমনকি 'পিকু'-তেও নয়। ছবিটাও বাজে, ভিক্টরও বাজে। কিন্তু 'ঘরে বাইরে' সুপার্ব। আমি নিশ্চিত যে ওটা মানিকদার জন্যেই হয়েছে। ভিক্টর নিজেও জানতে পারেনি যে অত ভাল অভিনয় সে করেছে।

মানিকদার কাছের হওয়া সত্ত্বেও আমি কিন্তু কখনও জন্মদিনে কার্ড পাঠাইনি, ফুল পাঠাইনি। কিন্তু সব সময়েই ওঁকে পছন্দ করেছি, শ্রদ্ধা করেছি। উনিও বরাবরই আমার কাছে ফাদার ফিগার। মানিকদা ডাকলে সব কাজ ফেলে কলকাতা ছুটব। এ জন্য আমার স্বামী, স্বামীর বন্ধুরা সব সময় ঠাট্টা করত, টিজ করত। বলত, 'গড কলস গড'। বাবা ডাকলে যাব কি না ভেবে দেখলেও মানিকদা ডাকলে ভাবার প্রশ্নই নেই। শক্তি সামন্ত এ জন্য আমার ওপর রেগে গিয়েছিলেন। তখন 'আরাধনা' করছি। ওদিকে মানিকদা করছেন

'অরণ্যের দিনরাত্রি'। আমি মানিকদাকে টানা ডেট দিয়ে দিলাম। এ নিয়ে কত কথা শুনতে হয়েছে। যেমন, ওঁর ছবি তো চলেই না... ..... তবুও ওই ছবি করতে চলে যাচ্ছে .... আমিই তো শর্মিলা ঠাকুরকে 'কাশ্মীর কি কলি'তে ব্রেক দিয়েছি অথচ আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না, এইসব কথা। মানে শক্তি সামন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। ডেটের এই গোলমালের জন্য 'মেরে সপনো কি রানী' গানটির ট্রেনের দৃশ্যগুলো আমাকে নিয়ে পরে তুলতে হয়েছিল। 'সীমাবদ্ধ'-এর সময়েও আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে মানিকদাকে পঁয়তাল্লিশ দিন ডেট দিয়েছিলাম। অথচ সেই সময় আমি খুবই ব্যস্ত।

আমার বিয়ের খবরে মানিকদা খুব খুশি হয়েছিলেন। বেনারসি শাড়ি উপহার দিয়েছিলেন মনে আছে। আমাদের বাড়িতেও এসেছিলেন। আসা-যাওযার ব্যাপারে উনি অত্যন্ত ভদ্র। ওয়েল বিহেভড্। ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রিতে এ রকম ভদ্রলোক খুব কম দেখা যায়। ওঁর প্রবল ইগো হয়তো থাকতে পারে, ঔদ্ধত্যও হয়তো ছিল যা ফিল্ম মেকারের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে আমি মনে করি, কিন্তু নিজের মতামতকে উনি নিজেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন। জোর করে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতেন না। ওঁর অহংবোধেরও একটা জাত ছিল। কখনওই সেটা অশ্লীল বলে মনে হয়নি।

বড় হওয়ার পর মানিকদাকে অন্যভাবে চিনতে শিখি। যেমন, সঙ্গীতের ব্যাপারে ওঁর অসীম অনুরোগের কথা জানতে পারি। ছবিব ভাল-মন্দ নিয়ে আলোচনা করতাম। মনে ছিল, একটু বয়স্ক বোঝাতে 'নাযক'-এ উনি আমায় চশমা দিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আমি শর্ট সাইটেড না লং সাইটেড?' শুনে মানিকদা অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ভগবান, তুমি এ সব ভাবতে শুরু করে দিয়েছ? নিজেই ঠিক করো শর্ট না লং সাইটেড।' 'নায়ক'-এর সময়েই টাইগারের সঙ্গে আমার পরিচয়। টাইগার সেটে আসত। শুটিং দেখত। উনি খুব ভদ্র ও ভাল ব্যবহার করতেন। বিয়ে করব জেনে খুশিও হয়েছিলেন। সে দিক থেকে দেখতে গেলে আমাব উত্থানকে মানিকদা অন্য চোখে দেখেননি। বাধা দেননি। বরং এই উত্থানে উনি সত্যিই খুশি। এবার ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে বুঝেছিলাম, মানিকদা আমায় সত্যিই ভালবাসতেন। পছন্দ করতেন। সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। মঙ্কুদি কেক তৈরি করেছিলেন। সেটা কাটা হয় হ্যাপি বার্থ ডে গান গেয়ে। ইন্টারভিউটাও চমৎকার দিয়েছিলেন। অথচ এসব করাব প্রয়োজনই ছিল না। এ সব না-কবেও ইন্টারভিউ দেওয়া যেত!

ইন্টারভিউ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেওয়াটা অবশ্য আমাকে খুব আপসেট করে দিয়েছিল। মানিকদা ভেবেছিলেন যে আমরা ওঁর কাছ থেকে সুযোগ নিয়েছি। অথচ ব্যাপারটা তো তা নয়। আমাদের তেমন কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না। আমি HTV-তে কাজ করি। মালিক নই। ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে তারা কী করবে সেটা তাদের ব্যাপার। ওই ব্যাপারে আমার কোনও কন্ট্রোলই নেই। দূরদর্শনেও যে সেটা দেখানো হবে তা-ও জানতাম না। যদি জানতাম, দূরদর্শনে দেওয়াটা মানিকদা পছন্দ করবেন না, আপত্তি জানাবেন, আমি তা হলে অন্তত করণ কিংবা শোভনাকে বারণ কবতে পারতাম। বলতে পারতাম, প্লিজ ওটা কোর না। আমি যেটা সত্যিই বুঝতে পারছি না, সেটা হল, কী ভুল বা খারাপ কাজ আমরা করেছি। তা ছাড়া করণ যে ওঁকে জানায়নি, সেটাও আমি জানতাম না। এই ব্যাপারটাতে আমি সত্যিই আপসেট। অথচ ইন্টারভিউটা কিন্তু চমৎকার। তাতে

মানিকদার প্রশংসাই ছিল।প্রত্যেকে পছন্দও করেছে। কেন যে মানিকদা অমন করলেন বুঝতে পারছি না। ঘটনাটা আমায় খুব দুঃখ দিয়েছিল। মানিকদাকে আমি সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি লিখেছি। লিখেছিলাম, যা হয়ে গেছে সেটা একদম আমার মাথায় আসেনি। এর জন্য আমি দুঃখিত। ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু প্লিজ আমার দিকটাও দেখুন।

ইন্টারভিউটার বন্দোবস্ত অস্কার পাওয়ার আগেই করা হয়েছিল। অস্কার পাওয়াটা বোনাসের মতো হয়ে যায়। উনি দুর্বল ছিলেন সেই সময়। কিন্তু আমি ঢোকা মাত্র বলে ওঠেন, 'রিঙ্কু, কনগ্রাচুলেট মি। আই হ্যাভ গট অস্কার।' কী খুশি লাগছিল সেদিন ওঁকে। কী থ্রিলড। দুর্বলতা সত্ত্বেও উনি অনেক কথা বলেছিলেন। ঘটনাটা তাঁকে চাঙ্গা করে দিয়েছিল। ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারেও তিনি খুব পার্টিকুলার ছিলেন। যেমন সকালে ওঠা, কী বলবেন তা ঠিক করে রাখা, কী ভাবে বলবেন ভেবে রাখা। ফোন বন্ধ রাখা।

কয়েকটা জিনিস অবশ্য জিজ্ঞেসই করা যায়নি। যেমন সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করতে পারিনি। মানিকদা আগেই শুনিয়ে রেখেছিলেন যে, বি বি সি-র ইন্টারভিউয়ের সময়েই তাঁর প্রথম হার্ট অ্যাটাকটা হয়েছিল। সে জন্য আমি ওঁকে বেশি স্ট্রেন দিতে চাইনি। ভয়ে ভয়ে ছিলাম। আমাদের জন্য ওঁর কোনও ক্ষতি হোক চাইনি। কিন্তু তবু কথাবার্তার ফাঁকে এক সময় আমি ওঁর ছবিতে নারী চরিত্রের উপস্থাপনা বা চিত্রায়ন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম।

মানিকদা বলেছিলেন, 'ইটস আ গিফ্‌ট অব মাইন টু দ্য উইমেন'। মন্তব্যটা এত 'মাচো' যে আমি ভাবছিলাম বলব, মানিকদা এটা কী! এ তো ভীষণ রকমের মাচো রিমার্ক। কিন্তু ভয়ে জিজ্ঞেসই করতে পারিনি। কারণ, যদি আপসেট হয়ে যান, যদি পরের প্রশ্নটার জবাব না দেন। ওঁর জীবনের কয়েকটা 'অন্য' ঘটনার কথাও জিজ্ঞেস করা যেতে পারত। কিন্তু আমার সঙ্গে ওঁর যা সম্পর্ক তাতে আমি সাংবাদিকসুলভ ব্যবহার করতে পারিনি। যদিও করণ বারবার জিজ্ঞেস করতে বলছিল। কিন্তু আমি বলেছিলাম, না, সেটা সম্ভব নয়। এখানে ওঁর বাড়িতে বসে রয়েছি, মঙ্কুদি রয়েছেন। এখানে আমি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারব না।

মানিকদা মা মারা যাওয়া সত্ত্বেও সেটে এসেছিলেন কাজ করতে। এ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, সেটাই ওঁর আসল চরিত্র। কাজ ছাড়া উনি থাকতেই পারেন না। মানিকদার মাকে দেখাব সৌভাগ্য আমার হয়েছে। শিক্ষিতা ছিলেন। ভীষণ শক্ত মহিলা ছিলেন। সোজা দাঁড়াতেন। শি গেভ দ্যাট স্ট্রং কোয়ালিটি। আমার মনে হয়, নারীদের প্রতি ভালবাসা বা শ্রদ্ধার যে-ব্যাপারটা মানিকদার মধ্যে ছিল, সেটা তিনি মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। আরও একটা ব্যাপার, মানিকদার কিন্তু খুব একটা পুরুষ বন্ধু ছিল না। মানিকদা ছিলেন ডিসিপ্লিনড, বংশী নন। সে জন্যেই তিনি রোজগারের জন্যে বম্বে চলে যান।

মানিকদা শুধু নিজেকে নিয়েই ভেবে গেছেন। সে দিক দিয়ে মঙ্কুদির স্যাক্রিফাইস প্রচণ্ড। মানিকদাই ছিলেন মঙ্কুদির জীবন। মানিকদার কাছে শেষ পর্যন্ত তিনি যেন আঠারো বছরের মেয়ে। ওই ভাবে ভালবাসতেন। মানিকদা তাঁর জীবনের পূর্ণতা। এই রকম ভাবনা মানিকদা কাউকে নিয়ে ভেবেছিলেন কি না জানি না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনেক নরম হয়ে গিয়েছিলেন। লোকজনের আসা কমে যাওয়ায় হয়তো বাচ্চাদেব সঙ্গে একটু

সময় কাটাতেন। একটু হিউম্যান কোয়ালিটি হয়তো এসেছিল। কিন্তু আগে শুধু কাজ আর কাজ। পুরুষ-নারী বন্ধুত্ব তিনি ভাল বুঝতেন। শিশু মানসিকতা, একাকিত্বও খুব ভাল বুঝতেন, কিন্তু পুরুষে-পুরুষে বন্ধুত্ব তিনি বুঝতেন বলে মনে হয় না। সে জন্যই বোধহয় 'অভিযান'-এর বন্ধুত্বের চিত্রায়ন ঠিক বন্ধুত্ব নয়। এটাই হয়তো তাঁর ঘাটতি। উনি বড়দা হতে পারতেন। গুরু হতে পারতেন। বাবা হতে পারতেন। কিন্তু বন্ধুর যে একটা ব্যাপার থাকে, সেটা উনি বুঝতেন বলে মনে হয় না।

মানিকদা নিজে সব কাজ করতে পারতেন। ক্যামেরা চালাতে পারতেন, ডায়লগ লিখতে পারতেন, আবহসঙ্গীত, গান কী পারতেন না? অভিনয়ও করতে পারতেন। আমি তো ওঁকে বলতাম, কেন আপনি নিজের ছবিতে অভিনয় করেন না? 'নায়ক'-এ উত্তমকুমারকে ডিরেকশন দিতেন, দেখতাম যা করে দেখাচ্ছেন আর উত্তম যা করছেন তা তার তুলনায় অন্তত পঞ্চাশ ভাগ কম। ট্রেনের ট্রাকগুলো পাস করছে আর নায়ক সুইসাইড করার কথা ভাবছে ও জীবনটাকে পিছিয়ে গিয়ে দেখছে, সেই দৃশ্যটা মানিকদা অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন। তাঁর ডায়লগ ডেলিভারি.... অল উত্তম ডিড ওয়াজ টু ট্রাই অ্যান্ড ডু। 'নায়ক'-এর পরে উত্তম তাঁর অভিনয়ের ধারাটাই বদলে দিলেন। আমি তো মনে করি, অভিনয় করলেও মানিকদা দারুণ হতে পারতেন।

প্রতিযোগিতার ব্যাপারটাও তাঁব মধ্যে সব সময় খেলা করত। এই যেমন জানতে চাইতেন, আচ্ছা মীরা নায়াব কী রকম ছবি কবছে? একটা সময় শশী কাপুর একসঙ্গে পাঁচটা ছবি করছিল। শ্যাম বেনেগাল, গিরীশ কারনাডদের সই করিয়েছিল। উনি জিজ্ঞেস করতেন আচ্ছা, শশী নাকি অনেক ছবি করছে? এই ব্যাপারটা তঁর মধ্যে সব সময়ই ছিল। এই কম্পিটিটিভনেসের ব্যাপারটায় সে দিক থেকে উনি শিশুর মতো। ক্রিয়েটিভ লোকের কাছে এটা প্রয়োজনীয়ও। হিন্দি ছবির মিউজিক যে সব সেরা, এটাও তিনি বারবার বলে এসেছেন। হিন্দি ছবির গান উনি খুব ভাল বাসতেন। মিসেস সেনকে নিয়ে 'ঘরে বাইরে' করতে পারেন নি। এটা হয়তো একটা অপূর্ণতা। ইগোর ক্ল্যাশ। ছবিটা ওইভাবে তৈরি হলে আমরা লাভবান হতাম। ফিল্ম লাভাব হিসেবে এই দুঃখটা আমার থেকেই যাবে। মাধবীর 'চারুলতা' মাস্টারপিস, মিসেস সেনেব 'ঘরে বাইরে'ও তেমনই হতে পারত।

'ঘরে বাইরে'র পরে মানিকদার কোনও ছবি, আমি দেখিনি। তবে দেখতে চাই। 'আগন্তুক'-এর ডায়লগ নাকি দুর্দান্ত। ইদানীং শারীরিক কারণে আউটডোর করতে পারতেন না বলে ছবির ধরনটাই বদলে ফেলেছিলেন। কথা থাকছে বেশি। তবে আমার মনে হয়, মানিকদাকে পছন্দ করাটা এক সময় যেমন ফ্যাশন ছিল, ঠিক তেমনই হঠাৎই অপছন্দ করাটাও একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায় কোনও কারণ ছাড়াই। 'ঘরে বাইরে'ই এর উদাহরণ। যে ভাবে লোকে এর সমালোচনা কবেছে ভাবা যায় না। স্বাতীলেখা ভাল দেখতে নয়, অভিনয় পারে না। আরে! স্বাতীলেখা ফ্যান্টাস্টিক ওই ছবিতে। দিল্লি সেন্টার মানিকদার ছবি নিয়ে কী কাণ্ডটা করেছে আমি দেখেছি। যারা ছবির কিছুই বোঝে না, সেই সমালোচকদেরও দেখেছি মানিকদার ছবির 'খুঁত' ধরতে। যেন মানিকদার সমালোচনা করাটাই একটা ফ্যাশন। একটা ছুটকু আঠারো বছরের মেয়েকেও দেখা গেছে কিছু না-বুঝে 'ঘরে বাইরে'র সমালোচনা করতে। না-পড়ে না-বুঝে সমালোচনা। আমিও হঠাৎই

বুঝেছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকার মানিকদাকে কোনও পুরস্কার না-দেওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছে। আমি জুরি ছিলাম। জাতীয় সংহতির জন্য 'ঘরে বাইরে'-কে পছন্দও করেছিলাম। সিন দেখিয়ে বলেছিলাম এই এই কারণে ছবিটাকে জাতীয় সংহতির পুরস্কার দেওয়া উচিত। অথচ ওরা 'ঘরে বাইরে'-কে কস্টিউম পুরস্কার দিল। হাস্যকর। আর সেরা পুরস্কার কোন ছবি পেল? তপন সিংহের 'আদমি ঔর ঔরত'— পূর্ণ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও বলছি, ছবি হিসেবে 'ঘরে বাইরে'-র তুলনায় যা কিছুই নয়।

নিঃসন্দেহে মানিকদা ছিলেন জিনিয়াস। জিনিয়াস উইথ এ কমিটমেন্ট, যিনি জীবনে কখনও কোনও কিছুর সঙ্গেই বোঝাপড়া করেননি।

বিরাট সৈন্যবাহিনী, সুদক্ষ এক সেনাপতি

তপেন চট্টোপাধ্যায়

আমি মানিকদার, মানে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করেছি। এই কথাটা বলার সময় আমার কণ্ঠস্বরে অজান্তে একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ফুটে ওঠে। অহঙ্কার থাকা ভালো, কিন্তু তার প্রকাশ উচিত নয়। অন্তত কোনো মার্জিত ভদ্রলোকের অহঙ্কার প্রকাশ করা শোভন নয়। কিন্তু কি করব— মানিকদা সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে আমি আমার অহঙ্কার চেপে রাখতে পারি না। আর আমার তো মনে হয় এক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। শুধু আমি কেন মানিকদা সারা ভারতের অহঙ্কার।

মানিকদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমার ছয়/সাত বছর বয়সে। উনি ছিলেন আমার কাকা চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের নামকরা আধুনিক কবি চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর বন্ধু।

১৯৬০ সালে মানিকদা ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় মিলে ঠিক করেন মানিকদার ঠাকুর্দা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সম্পাদিত কিশোর মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ' পুনঃ প্রকাশ করবেন। সেই সময়ে আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত গ্রুপ থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করতাম। সেই সূত্র ধরেই সন্দেশে আসি মানিকদার সহকারী হিসেবে। সন্দেশে আমি কাজ করি ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত। তখন প্রায়ই আমাকে কোনো না কোনো কাজে মানিকদার বাড়িতে যেতে হত। এরই মধ্যে আমার অভিনয় প্রীতির ব্যাপারটা মানিকদার জানা হয়ে গেছে। একদিন সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা মারছি হঠাৎ মানিকদা আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন— কি তপেন ছবিতে অভিনয় করবে? তখন উনি মহানগর ছবিটি তৈরি করছিলেন। সেই ছবিতে আমি এক ব্যাঙ্ক কর্মচারীর ভূমিকায় অভিনয় করি। মানিকদার খুব কাছাকাছি আমি আসি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিটির সুবাদে। ছবিটির কাজ শুরু হয়েছিল রামপুরহাটে।

এবার কিছু শুটিং-এর গল্প করা যাক। 'গুপী গাইন' ছবির 'দেখ রে নয়ন মেলে' গানটি তুলতে আমাদের সময় লেগেছিল চারদিন। কারণ সূর্য। সারা গানটিতে সূর্যের অবস্থান একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার জন্য আমাদের রোজই তিন থেকে চার লাইনের বেশি শুটিং করা সম্ভব হত না। এবং তার পরের লোকেশন স্পটেও প্রায় একই ব্যাপার। শুধু বাংলাদেশে কেন হিমাচল প্রদেশের কুফরি-র কথা ভাবুন। গুপী বাঘা-র ভুল করে শুণ্ডির বদলে বরফের রাজ্যে পৌঁছে যাওয়ার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। যেদিন আমরা সিমলায় পৌঁছলাম সেদিন আবহাওয়ার অবস্থা খুবই খারাপ। প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া, তার সঙ্গে পড়ছে বরফ। সবারই মুখ ভার। কি করে শুটিং হবে। কিন্তু আমাদের কপাল ভাল, ঘুম থেকে উঠে দেখি আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। তৈরি হয়ে রওনা দিলাম কুফরি-র পথে। সিমলা থেকে কুফরি এই যাত্রাপথটুকু আমার স্মৃতিতে চিরকাল ধরা থাকবে। কারণ এই প্রথম আমি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বরফ পড়ে থাকতে দেখলাম। যা এর

আগে দেখেছি শুধু ছবিতে। কুফরি পৌঁছে একটা জায়গা ঠিক করলেন মানিকদা। আমাদের হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ওখান থেকে গড়িয়ে পড়তে পারবে? জায়গাটা প্রায় দোতলা বাড়ির সমান উঁচু। অবশ্য স্থানীয় লোকজনরা আমাদের খুব সাহায্য করেছিল। তাঁরাই সঠিক জায়গা নির্বাচন করে দেন আমাদের। কারণ বরফের নীচে কোথায় ফাঁকা বা কোথায় গর্ত আমাদের তা জানার কথা নয়। নরম তুলোর মত হাঁটু অবধি বরফ ঠেলে কোনোমতে হাঁচড়পাঁচড় করতে করতে পৌঁছলাম সেই জায়গায়। এখানে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভাল। তখন আমাদের পরনে ছিল হেঁটো ধুতি আর সুতির ফতুয়া। ঠিক জায়গায় পৌঁছে অপেক্ষা করছি মানিকদার ইঙ্গিতের জন্য, কিন্তু নীচ থেকে কোনো ইঙ্গিতই আসে না। এদিকে আমাদের পা জমে কাঠ হওয়ার উপক্রম। এইভাবে মিনিট সাতেক থাকার পর মানিকদা ইশারা করলেন— লাফ মার। গড়িয়ে পড়লাম আমরা দুজনে। নীচে পড়া মাত্রই মানিকদা ছুটে এলেন। এসেই জানতে চাইলেন— আমরা ঠিক আছি কিনা। উল্টে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম শট কেমন হয়েছে। জবাব দেওয়ার বদলে উনি জোর করে আমাদের গাড়িতে তুলে সঙ্গের লোকদের বললেন— ওদের এক্ষুণি কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও। আর যদি কারো কাছে রাম টাম থাকে ওদের খাইয়ে দাও। ছবিটা বের হওয়ার পর, অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, এই সেটটা কোন স্টুডিওয় তৈরি হয়েছিল। শুনে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম— এত কষ্টের এই পুরস্কার!

আরো একটা মজার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল মরুভূমিতে শুটিং করতে গিয়ে। বরফ থেকে দ্বিতীয়বার ভুল করে আমরা গিয়ে পৌঁছেছিলাম মরুভূমিতে। ওইখানে জীবনে প্রথম দেখলাম মরীচিকা, যা সুবজ এই বঙ্গের লোকের পক্ষে কল্পনারও অতীত। ছোটবেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম মরীচিকার কথা। বাস্তবে তা প্রত্যক্ষ করলাম। শুটিংটা হয়েছিল রাজস্থানের মোহনগড়ের কাছাকাছি। ওই জায়গাটায় কোনো এক সময় যে নদী ছিল তা দেখলেই বোঝা যায়, নদীর খাদের চেহারা খুব সুস্পষ্ট। আর চারদিকে ছড়ানো গোল গোল নুড়ি যা সাধারণত নদীতেই দেখা যায়। আমরা পৌঁছানোর আগেই অন্য দু'টো গাড়ি ওখানে পৌঁছে গিয়েছিল। দুর থেকে আমরা পরিষ্কার জলের ওপর পড়া ওদের ছায়া দেখতে পাচ্ছিলাম। মরীচিকা দেখে মানিকদার উচ্ছ্বসিত হওয়ার ব্যাপারটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল দেখে আমরাও কম উচ্ছ্বসিত ছিলাম না। কিন্তু মানিকদার উচ্ছ্বাস ছিল এত আন্তরিক যে একমাত্র তা ওঁকেই মানায়। মানিকদার আর একটা বড় গুণ হচ্ছে নজর। কোনো ছোটখাটো ব্যাপারও কখনও ওঁর নজর এড়িয়ে যায় না। হাল্লার আউটডোর হয়েছিল জয়সালমিরে। তার প্রায় মাস তিনেক পর 'ও বাঘারে গুপীরে' গানটার টেকিং হয়। আমরা হাল্লার চাষার পোশাক পরে এসে দাঁড়াবার পর, মানিকদা বলে উঠলেন— একি! কানে দুল কোথায়? সহকারী পরিচালক রমেশ সেন বলে উঠলেন— দুল তো ছিল না মানিকদা। মানিকদা ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে বললেন— প্রিন্ট বার করে প্রোজেকশনে চালিয়ে দেখে এসো। যদি দুল না থাকে, তাহলে ডিরেকশন দেওয়া ছেড়ে দেবো। একটু পরে রমেশ সেন যাকে সবাই চেনে পুনু সেন বলে, মুখ কাঁচুমাচু করে তিনি বললেন— হ্যাঁ একটু চিক্‌চিক্ করছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরাও, মানে আমি আর রবিদাও ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের কানে দুল ছিল কি না। ব্যাপারটা খুবই সামান্য। 'ও বাঘারে গুপীরে'র মতো

জনপ্রিয় গানের ঝাপটায় দর্শকদেরও নজর এড়িয়ে যেত। কিন্তু তাঁর নজর এড়ায়নি, তাই না তিনি সত্যজিৎ রায়!

সকলের মনে একটা ধারণা আছে যে মানিকদা ভীষণ দাম্ভিক। অবশ্য এজন্য সকলকে দোষ দেওয়া যায় না। ওরকম বিশাল চেহারা, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ মুখ সব মিলিয়ে এরকম একটা ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মানিকদা এমনিতে খুব গম্ভীরথাকেন ঠিকই তবে সুযোগ পেলে রসিকতা করতে ছাড়েন না। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে গুপী-বাঘার প্রথম বর পাওয়া খাবারের মধ্যে রসগোল্লার আকারটা মনে আছে তো? কিন্তু অতবড় রসগোল্লা বানাতে কিছু অসুবিধা ছিল। শুধু ছানা দিয়ে অতবড় রসগোল্লা বানালে তা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই ঠিক হল মাঝখানে একটা ময়দার বল দিয়ে তার ওপর ছানা দিয়ে রসগোল্লা তৈরি হবে। রামপুরহাটের এক মিষ্টির দোকান থেকে বানানো হল পেল্লায় মাপের গোটা দশেক রসগোল্লা। আমি, রবিদা ও ইউনিটের কয়েকজন ব্যাপারটা জানতাম। মানিকদা আমাকে ও রবিদাকে বলে দিয়েছিলেন তোমরা ওপর ওপর কামড়িয়ো। পেটুক বলে কামু মুখোপাধ্যায়ের বেশ নাম আছে। খাওয়ার দৃশ্যটা হয়ে যাওয়ার পর মানিকদা কামুদাকে ডেকে বললেন— কি কামু, তুমি তো শুনেছি খুব খেতে পার। একটা গোটা রসগোল্লা খাও দেখি। কামুদার মুখ দেখে মনে হল তিনি যেন এই আদেশেরই অপেক্ষায় ছিলেন। একটা গোটা রসগোল্লা খেয়ে কামুদা মানিকদাকে বলল— বুঝলেন দাদা, ভালোই করেছে, তবে এত বড় তো তাই রসটা ভেতর পর্যন্ত যায়নি। মাঝখানটা শক্ত থেকে গেছে। এতক্ষণ অতি কষ্টে আমরা হাসি চেপে ছিলাম। কিন্তু কামুদার কথা শুনে মানিকদা সমেত আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম।

আগেই বলেছি, আমি আর মানিকদা রামপুরহাটে একই ঘরে থাকতাম। ঘরটার সামনে একটা হল ছিল। সেই হলেও কয়েকজন থাকতেন, তার মধ্যে একজন কামুদা। একদিন রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে ওপরে এসে দেখি হলের ও মানিকদার ঘরের বাতি নেভানো। মানিকদা শুয়ে পড়েছেন ভেবে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি হল থেকে কেউ হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকছে। ছায়ামূর্তিটা মানিকদার বিছানার পাশে রাখা টেবিল থেকে কিছু একটা নিয়ে আবার সেটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে যেই বেরোতে যাবে অমনি মানিকদা বলে উঠলেন— কি কামু, আমার জন্যে দু-একটা আছে না সবগুলোই মেরে দিলে। কামুদার তখন ধরণী দ্বিধা হও অবস্থা। কামুদা ঢুকেছিল মানিকদার প্যাকেট থেকে সিগারেট সরাবে বলে।

একবার কি একটা ব্যাপারে রবিদার মহিম হালদার স্ট্রিটের বাড়িতে আমরা অনেকে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। আমন্ত্রিতদের মধ্যে মানিকদা ও কমলকুমার মজুমদারও ছিলেন।

মানিকদা কমলদাকে একদিন বাড়িতে আসতে অনুরোধ করায় জবাবে কমলদা বললেন— কি করে যাই বলুন, আপনার বাড়িতে যে বড্ড ভদ্রলোকের ভীড়। শুনে মানিকদা হেসে বললেন— ঠিক আছে কবে আসবেন বলুন, সেদিন না হয় কিছু ছোটলোক আনিয়ে রাখব। এরপরও কি বলবেন— সত্যজিৎ রায় বেরসিক। মানিকদার ব্যক্তিগত জীবনে অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলতার কোনো স্থান নেই। 'গুপী গায়েন' ও 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে কাজ করতে করতে আমার মনে হয়েছে— একটা বিরাট সৈন্যবাহিনী একজন সুদক্ষ সেনাপতির নেতৃত্বে কাজ করে চলেছে।

আমার দেখা সত্যজিৎ

অনিল চট্টোপাধ্যায়

মানিকদার সঙ্গে আমি শেষ কাজ করেছি ১৯৬৩ সালে অর্থাৎ ২৮ বছর আগে। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মহানগর' ছবিটি কলকাতায় মুক্তি পায়। তারপর আর মানিকদার সঙ্গে কাজ করার কোনো সুযোগ আমার হয়নি। 'দেবী'তে মানিকদার সঙ্গে আমার প্রথম কাজ। তখন আমি অভিনেতা হিসাবে রীতিমত প্রতিষ্ঠিত। যদিও বাংলা সিনেমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ একজন টেকনিশিয়ান হিসাবে। অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর হিসাবে আমি প্রথম ছবির জগতে আসি। অর্দ্ধেন্দু মুখার্জি এবং পিনাকি মুখার্জিদের প্রোডাকশনে প্রায় ১২টি ছবিতে আমি সহপরিচালক হিসাবে কাজ করেছিলাম। মজার কথা মানিকদা যে বছর 'পথের পাঁচালী' করতে ছবির জগতে এলেন সেই বছরই অমি সহপরিচালক হিসাবে কাজ শুরু করি।

মানিকদার সঙ্গে পরিচয় আমার আরো আগে থেকে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে যখন পড়তাম, তখন আমরা ইংরাজি বাংলা নাটক করতাম। স্টেটস্ম্যান পত্রিকার নাট্য সমালোচক ছিলেন এমারসন্ বলে একজন ইউরোপীয়ান সাহেব। তিনি আমাদের খুব প্রশংসা করতেন। স্টেটস্ম্যানের মত পত্রিকায় নিয়মিতভাবে আমাদের প্রোডাকশনের প্রশংসা বেরোত। মানিকদা এবং রাধাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয় প্রায়ই আমাদের নাটক দেখতে আসতেন। একটু মুখ চেনাচিনিও হয়ে গিয়েছিল। ওই সময় আমরা নিয়মিত সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউতে কফি হাউসে আড্ডা মারতে যেতাম। মানিকদাও সঙ্গীসাথী নিয়ে ওই কফি হাউসের একটি ঘরে, যাকে আমরা হাউস অফ লর্ডস্ বলতাম, সেখানে আড্ডা মারতেন। ঢুকবার বেরোবার সময় প্রায়ই দেখা হতো। পরিচয়টা কুশল বিনিময়েই সীমাবদ্ধ ছিল। সত্যজিৎ রায়ের যে ছবিতে আমি প্রথম কাজ করি সেই 'দেবী'তে আমার রোল ছিল অত্যন্ত ছোট। খান কুড়ির বেশি সংলাপ ছিল না। অর্দ্ধেন্দু মুখার্জি পিনাকি মুখার্জিদের প্রোডাকশনে চিফ অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করতে করতে আমি ছবিতে অভিনয় শুরু করি। নরেশ মিত্রর 'উল্কা' ছবিতে আমি প্রথম রোমান্টিক নায়কের রোল করেছিলাম। 'দেবী'তে ওই ছোট ভূমিকায় অভিনয় করতে আমার কোনো কুণ্ঠা হয়নি তার কারণ আমাকে যিনি ডেকেছিলেন তাঁর নাম সত্যজিৎ রায়।

মানিকদা সাধারণত কাউকে রাশ দেখতে দিতেন না। কিন্তু টেকনিশিয়ান হিসাবে আমার অভিজ্ঞতার কথা তিনি জানতেন বলে আমার সঙ্গে তিনি ছবির বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয় নিয়েও অকপটে আলোচনা করতেন। ছবির রাশ দেখতে দিতেন। কাজেই একজন পেশাদার শিল্পী এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কলাকুশলী হিসাবে আমি চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের উত্তরণ চোখের সামনে দেখেছি, তাঁর কাজের পদ্ধতি, প্রস্তুতি এবং কাজের ধারাকে জেনেছি। মানিকদা কি ভাবে ছবি করতে করতে আরো অভিজ্ঞ হয়েছেন তা আমি লক্ষ করেছি। প্রথম দিকে তিনি খুবই ব্যাকরণ মেনে কাজ করতেন। অর্থাৎ চিত্রনাট্য যেভাবে

সাজানো থাকতো একের পর দুই, দুইয়ের পরে তিন— সেইভাবেই ছবি তুলতেন। পরে চলচ্চিত্র মাধ্যমের উপরে তাঁর এত দখল বেড়ে গিয়েছিল যে, এই ধরনের ব্যাকরণ মানবার আর দরকার হত না। পুরো ছবিটি তাঁর মাথার মধ্যে থাকতো। ছবি করার ক্ষেত্রে তাঁর মত গোছানো স্বভাবের পরিচালক আমি দেখিনি।

মানিকদার যে জিনিসটা আমি সবচেয়ে শ্রদ্ধা করি তা হল তিনি ছবি করতে গিয়ে সবসময় সাধারণ দর্শকের কথা মাথায় রাখতেন। তিনি চাইতেন যে, তাঁর ছবি বেশি সংখ্যক দর্শক দেখুক। হয়তো তাঁর অনেক ছবি অভিপ্রেত জনপ্রিয়তা পায়নি, কিন্তু তাঁর ভাবনায় কোনো খাদ ছিল না। একটা আশাবাদী মানবিক চিন্তা-ভাবনা তাঁর ছবি করার পেছনে সব সময় কাজ করেছে। ইদানিং আমি তাঁর মধ্যে একটা নিশ্চিত পরিবর্তন লক্ষ করেছিলাম। শেষের দিকে যে ছবিগুলি তিনি করেছেন তার প্রতিটিতেই তিনি সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে, নৈতিক স্খলনের বিরুদ্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করেছেন। সেই অর্থে এই ছবিগুলি যথেষ্ট প্রতিবাদী চলচ্চিত্র। শারীরিক অসুস্থতার জন্য যখন তিনি ইনডোরে আবদ্ধ হয়ে গেলেন, আউটডোরে কাজ করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দেখা দিল-তখন, তিনি হয়তো তাঁর বক্তব্যকে আরো জোরের সঙ্গে, আরো সোচ্চারে, মানুষের কাছে তুলে ধরবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। আমাদের দেশে সেই অর্থে রাজনৈতিক ছবি হয়েছে বলে আমি মনে কবি না। অর্থাৎ রাজনৈতিক ছবি বলতে বিদেশে যে ধরনের ছবিকে বোঝায় আমাদের দেশে সেই ধরনের ছবি হয়নি বললেই চলে। আমি নাম না করে বলতে পারি যে, কোন কোন পরিচালক রাজনৈতিক ছবির নামে কেবলমাত্র অবক্ষয়কেই চিত্রিত করেন। আমাদের দেশের পটভূমিকায় এমনভাবে তাঁরা ছবি করেন যাতে একটা নৈরাশ্যজনক অনুভূতি দর্শকদের আচ্ছন্ন করে। অথচ আমার অভিজ্ঞতা তা নয়। ধরা যাক পশ্চিমবঙ্গে যে ধবনের পরিবর্তন গত কয়েক বছরে সূচিত হয়েছে তার মধ্যে যে আশাবাদী দিকটি আমি ধবনিত হতে দেখেছি এসব পরিচালকের ছবিতে তার কোনো প্রতিফলন নেই। মানিকদার সঙ্গে বা ঋত্বিকদার সঙ্গে এই সব পরিচালকের এখানেই তফাৎ। আমি শুনেছি যে, মানিকদা তাঁর শেষ ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে। মানিকদা যদি এই ছবিটি করতেন তাহলে আমার মতে তা হত একটি অবিস্মরণীয় প্রতিবাদী চলচ্চিত্র। দুঃখের কথা মানিকদা এই ছবি করতে পারলেন না। শুনছি তাঁর ছেলে সন্দীপ এই ছবিটি করবেন। সন্দীপ অত্যন্ত যোগ্য। আমি আশা করি এই ছবির মাধ্যমে সন্দীপ মানিকদার প্রতিবাদী ভাবনাকে রূপ দিতে পারবেন।

মানিকদার সঙ্গে আমার দ্বিতীয় ছবি 'তিনকন্যা' সেখানে 'পোস্টমাস্টারে' আমি এক পলায়নপর শহুরে যুবকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম, যে যুবক পোস্টমাস্টারের কাজ নিয়ে এক প্রত্যন্ত গ্রামে এসেছে। পোস্টমাস্টারের একটি শুটিং-এর কথা আমি কখনো ভুলব না। পোস্টমাস্টার যখন গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সেই সময় বর্ষা ঋতুর সূর্যাস্ত মুহূর্তটিকে মানিকদা ক্যামেরায় ধরতে চেয়েছিলেন। হঠাৎ শুটিংয়ের ঠিক আগে ঝোড়ো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, ওই শুটিং করা গেল না। কারণ মানিকদা ঠিক যেরকম আলো চেয়েছিলেন সেই আলো তখন আকাশে ছিল না। পরের দিন শুধু আমরা নয় যেন সমস্ত প্রকৃতিই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য স্বাভাবিক গোধূলির সূর্যাস্তের আলো নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, যে আলোর জন্য 'পোস্টমাস্টারে'র শেষ দৃশ্যটি ওইরকম ভাবে বুকে মোচড় দেয়।

ডিটেলের প্রতি মানিকদা যে কী রকম খুঁতখুঁতে ছিলেন তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। 'কাঞ্চনজঙঘা' ছবিতে আমি রায়বাহাদুর-এর ছেলে অনিলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। কতকটা প্লে-বয় ধরনের ভূমিকা। ওই ছবিতে এ প্রসঙ্গে আমার আরো কিছু মজার ঘটনার কথা মনে আছে। যেমন, যখন আমরা দার্জিলিংয়ে 'কাঞ্চনজঙঘা'র শুটিং করছি তখন দার্জিলিংয়ের চারপাশে নানান ধরনের ও নানান রঙের ফুলে ফুলে ছয়লাপ হয়ে আছে। এক জায়গায় দেখছিলাম পাগল করে দেওয়ার মত অসংখ্য রঙয়ের ফুল ফুটে আছে। মানিকদাও সেই সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি দেখে দারুণভাবে মুগ্ধ। 'কাঞ্চনজঙঘা' তাঁর প্রথম রঙিন ছবি। অন্য কোনো পরিচালক হলে রঙিন ছবিতে এই ধরনের রঙ ব্যবহারের লোভ সম্বরণ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ আছে, কিন্তু মানিকদা মনে করেননি যে, 'কাঞ্চনজঙঘা'তে ওইসব ঢোকাবার দরকার আছে। ফলে 'কাঞ্চনজঙঘা'তে ওই দৃশ্য স্থান পায়নি। আর একবার কালিম্পঙ থেকে দার্জিলিং যাচ্ছি পেশক রোড ধরে। পেশক রোডের এক জায়গাতে বড় বড় পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো পড়ায় এমন এক আলো-আঁধারীর স্বপ্নলোক রচনা করেছিল যে, মানিকদা ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগলেন এবং সবশেষে বললেন যে, জানি না কোন্ ছবিতে এই দৃশ্য কাজে লাগাতে পারব। আমরা বুঝে গেলাম আর যাই হোক 'কাঞ্চনজঙঘা'তে এই ছবি যাবে না।

মানিকদার সঙ্গে আমার শেষ ছবি 'মহানগর', আমার মতে, আমরা এক নতুন সত্যজিৎকে পেলাম। এর আগে কিন্তু মানিকদা মোটামুটি গ্রামীণ জীবন বা ক্লাসিক সাহিত্য ভিত্তিক ছবিই করেছেন। 'মহানগর'-এ-ই প্রথম তিনি এক সমকালীন শহুরে সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরলেন। সেই সময় নারী স্বাধীনতা নিয়ে দেশ-বিদেশে খুব আলোচনা চলছিল; বিশেষ করে কর্মরতা মহিলাদের সমস্যা নিয়ে নানা লোকে নানান কথাবার্তা বলছিলেন। মানিকদাকে এই সমস্যা নাড়া দিয়েছিল। গল্প তৈরি ছিল। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অবতরণিকা। মূল কাহিনী ছিল নায়ক প্রধান। মানিকদা তাকে স্ত্রী চরিত্র প্রধান করে গড়ে তুললেন এবং আমার মতে তা অত্যন্ত সঠিক হয়েছিল। মধ্যবিত্ত সমাজে ৫০ বা ৬০-এর দশকের শুরুতে যখন মেয়েরা প্রথম সাংসারিক প্রয়োজন কাজ করতে বেরোচ্ছেন তখন কী ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তা এই ছবিতে মানিকদা তুলে ধরেছেন। ইদানিং 'মহানগর' নিয়ে বেশি আলোচনা হয় না, এটা খুবই দুঃখের বিষয়। অথচ আমার মতে 'মহানগর' মানিকদার সেরা ছবিগুলির অন্যতম। অপরিসীম কুশলতার সঙ্গে তিনি একটি চাকুরিরতা মেয়ের মানসিকতা, তার প্রতিবন্ধকতা, তার স্বামীর মানসিক বৈপরীত্যকে তুলে ধরে ছিলেন। হয়তো প্রিন্ট পাওয়া যায় না বলে আজকের সমালোচকরা 'মহানগর' নিয়ে এতটা আগ্রহী নন। সাম্প্রতিককালে 'মহানগর' নিয়ে কোনো আলোচনা আমার চোখে পড়েনি, অথচ 'মহানগর'ই সত্যজিৎ রায়কে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান এনে দিয়েছিল। অনেক সময় মানিকদা যে সব কিছুই ভাবনা-চিন্তা করে করতেন তা নয়। 'মহানগরে' ট্রামের ট্রলিতে স্পার্কের উপরে টাইটেল শট পড়েছিল। পরবর্তীকালে একজন সমালোচক তার মধ্যে একটা মানে খুঁজে পেলেন। একদিন মানিকদার বাড়িতে গেছি। আরো অনেকে বসে আছেন। মানিকদা বললেন, "অনিল দেখেছ, ট্রামের মধ্যে তো তুমিও ছিলে, স্পার্কের এই অর্থ ভেবেছ? কিছু না ভেবেচিন্তেই তোমরা ছবিতে অভিনয় কর।" আসলে মানিকদার ছবির বৈশিষ্ট্যই এখানে। নানান লোক নানান ভাবে

তার মধ্যে নানান অর্থ খুঁজে পান। প্রতিটি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ থেকে যায়।

আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, চলচ্চিত্র শিল্প মানিকদার চলচ্চিত্রে আগমনকে প্রথমদিকে ভালোভাবে নেয়নি। নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমি কিন্তু এই মতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে দ্বিমত। চলচ্চিত্র শিল্পের একটা মেলানো মেশানো প্রতিক্রিয়া ছিল। মানিকদার চেহারা, তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রাজ্ঞতা ইত্যাদির কারণে অনেকেরই তাঁর কাছে আসার বিষয়ে কিছুটা সংকোচ ছিল, কিন্তু কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তাঁর বিরোধী কেউই ছিলেন না। কারণ একটা ভালো ছবি তৈরি হলে চলচ্চিত্র শিল্পের কোনো ক্ষতি নেই। বরং চলচ্চিত্র শিল্প এতে উপকৃতই হয়— এই কথা বোঝার মত বুদ্ধি ওই সময় ওই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অনেকেরই ছিল। অবশ্যই মানিকদাকেও নানান প্রতিকূলতার মধ্যে অর্ধ শিক্ষিত প্রযোজকদের দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়েছে। কেউ টাকা দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু তার কারণ এই অন্য ধরনের ছবিতে অর্থলগ্নির ঝুঁকি কেউ নিতে চায়নি। শেষে সরকার টাকা দেওয়ায় ছবি তৈরি হলো। সেই 'পথের পাঁচালী' সরকারকে এত টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে যে পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ আছে বলে আমি অন্তত জানি না।

অনেকে ভুল করে, স্পর্ধা করে, অন্যায়ভাবে বলে থাকেন যে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম গোড়াপত্তন ঘটেছিল সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'কে দিয়ে। আমি এই মতের সঙ্গেও একমত নই। 'পথের পাঁচালী'র আগেও বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে। নির্বাক যুগ থেকে আরম্ভ করে সবাক যুগ পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্র জগতে যথেষ্ট প্রতিভাবান পরিচালকরা কাজ করেছেন। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বাংলা সিনেমা কোনো অংশেই কারো থেকে ন্যূন ছিল না। টেকনিক্যাল দিকে নানান দুর্বলতা থাকলেও বাংলা চলচ্চিত্র যথেষ্ট গৌরবজনক জায়গায় অবস্থান করতো। 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রের তৎকালীন প্রোডাকশনগুলির মূল যে জায়গায় তফাৎ ছিল তা হল, 'পথের পাঁচালী'-তেই প্রথম চলচ্চিত্রের যে একটা নিজস্ব ভাষা রয়েছে তা পরিস্ফুট হয়। এটা 'পথের পাঁচালী'র আগে বাংলা সিনেমার সঙ্গে যুক্ত পরিচালকদের এতটা আয়ত্ব ছিল না। এক্ষেত্রে মানিকদাই পথিকৃৎ। তাঁর আগে চলচ্চিত্রের ভাষাকে রসোত্তীর্ণভাবে দর্শকের সামনে সেইভাবে কেউ তুলে ধরেননি। মানিকদা যখন ছবি করতে এলেন তখন কিন্তু বাংলা সিনেমার জগতে এক সুবর্ণযুগ। ঋত্বিকদা, নিমাই ঘোষেরাও সেইসময় ছবি করতে এসেছেন। ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলনের ফলে এই দেশে ভালো ছবি আসতে শুরু করেছে। সেই ফিল্ম সোসাইটিতে বা মানিকদার বিলাতে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি বিদেশি ভালো ভালো ছবি পাগলের মত দেখেছেন এবং সেই ছবি দেখতে দেখতে তিনি চলচ্চিত্রের ভাষাকে আয়ত্ব করেছেন। তাঁর প্রস্তুতি পর্বের এই পরিবেশকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮-২৯ সালে মুরারী ভাদুরী মহাশয়কে এক চিঠিতে বলেছিলেন যে চলচ্চিত্রের এক নিজস্ব ভাষা জন্মাবে, তাকে সাহিত্যের চাটুকারিতা করে বাঁচতে হবে না। এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, ঋষিপ্রতিম ব্যক্তি ১৯২৮ সালে বসে যে চিন্তা করেছিলেন মানিকদা তাকেই মূর্ত রূপ দিয়েছিলেন। মানিকদা এই কারণেই সেরা, এই কারণেই শ্রদ্ধেয়।

সত্যজিৎ গান গেয়ে যেদিন.....

অনুপ ঘোষাল

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। আমাদের পারিবারিক সূত্রেই ঐ পরিচয়। আমার মা-র সঙ্গে শিশুবয়স থেকেই ওঁর স্ত্রীর (বিজয়া রায়) বন্ধুত্ব। একেবারে ছোটবেলা থেকেই যে আমি গান বাজনা করি সে কথা সত্যজিৎবাবু জানতেন। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, মা-র সঙ্গে মাঝে মাঝে যখন সত্যজিৎবাবুর বাড়ি যেতাম, তখন প্রায়ই ওঁর স্ত্রী (মঙ্কুমাসী) এবং তাঁদের পরিবারের অনেক আত্মীয়পরিজন আমার মীরার ভজন, রবীন্দ্রসঙ্গীত বা রাগভিত্তিক গান শুনে খুব তারিফ করতেন। মঙ্কুমাসী এবং তাঁর দিদি জয়ামাসী সব থেকে অবাক হতেন যখন সেযুগের সব স্বনামধন্য শিল্পীদের কণ্ঠ এবং গাইবার স্টাইল নকল করে হুবহু গেয়ে দিতাম। সময় সময় মঙ্কুমাসী অবাক হয়ে সত্যজিৎবাবুকে ভেতরের ঘর থেকে ডেকে এনে ঐসব বিচিত্র গান শুনতে অনুরোধও করতেন। সদাসর্বদা গভীর কর্মে নিমগ্ন মানুষটি এসে হয়ত কোনও কোনও সময় একটু দাঁড়াতেন এবং স্মিতহাসি হেসে চলে যেতেন। এইভাবেই সত্যজিৎবাবুকে প্রথম দেখেছিলাম। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। অত ছোট বয়সে ওরকম বিরাট লম্বা এবং ভাবমগ্ন বলিষ্ঠ মানুষটিকে দেখে কিন্তু মনে একটুও ভয় আসেনি। বরং মুখের ভাব এবং সরল হাসি দেখে যেন তাঁকে ভালবাসতেই ইচ্ছে করেছিল।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন আমি আকাশবাণী কলকাতার ইন্দিরাদেবী পরিচালিত শিশুমহলে নিয়মিত গান করতাম। আমার সঙ্গে আমার দিদি নমিতা ঘোষালও (বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী এবং সত্যজিৎবাবুর 'চিড়িয়াখানা' ছবির নেপথ্যশিল্পী—'ভালবাসার তুমি কি জান') গাইতেন। বড়দি গীতা সেনগুপ্তা গায়িকা। যাঁর কাছে আমাদের সঙ্গীতের হাতেখড়ি। মা-র গানের গলা অপূর্ব। তিনি নাকি দারুণ ভাল গাইতেন। সেরকমভাবে মা-র গান কোনওদিন শোনার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু কথাটা যে নির্ভেজাল সত্য তা বিশ্বাস করেছিলাম মঙ্কুমাসী এবং তাঁর দিদি জয়ামাসীর মুখে শুনে। ঐ শিশুবয়সেই সত্যজিৎবাবুর বাড়ির কিছু কিছু পারিবারিক অনুষ্ঠানেও আমি এবং আমার দিদি গান গাইতাম। আমার আজও মনে আছে আমাদের গান শুনে ওঁদের পরিবারের সকলেই সব সময় উৎসাহিত করতেন। একেবারেই শিশুবয়স থেকেই একটি অতি সুন্দর পারিবারিক সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলে আমি লালিত হয়েছি। যে সুস্থ পরিমণ্ডল আমার সঙ্গীতজীবনকে সংগঠন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। একেবারে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নিদারুণ আর্থিক সমস্যার মধ্যে প্রচুর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েও আমার মা ও বাবার ঐকান্তিক ইচ্ছে ছিল সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের গান শেখানোর। এজন্য তাঁদের কম মূল্য দিতে হয়নি।

যখন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তখন সত্যজিৎবাবুর মাসী অতীতের বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা কণক দাস (বিশ্বাস) আমার গান শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন। গান

শুনেছিলেন সত্যজিৎবাবুর বাড়িরই একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে। কণকদেবীই আমাকে পাকাপাকিভাবে সঙ্গীতাচার্য সুখেন্দু গোস্বামীর কাছে রাগসঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। এ শিক্ষা আমার অব্যাহত ছিল দীর্ঘ ২০ বৎসর। ১৯৬৬-৬৭ সালের শীতের সময় সম্ভবত সত্যজিৎবাবুর কাছ থেকে ডাক আসে 'গুপী গাইন' ছবিতে গান গাইবার জন্য। তখন আমরা বেহালার সখের বাজার অঞ্চলে থাকতাম। রবীন্দ্রভারতীতে তখন আমি এম এ ক্লাসের ছাত্র। মঙ্কুমাসীর চিঠি পেয়ে মা-র সঙ্গে আমি সত্যজিৎবাবুর কাছে দেখা করতে যাই। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। লেক টেম্পল রোডের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে তিনি তাঁর চেয়ারে বসেছিলেন। আমি যেতেই আমাকে একটু হেসে বসতে বললেন। তারপর গান শুনতে চাইলেন। তার কারণ ছোট বয়সের কণ্ঠ বড় বয়সে অনেক পবিবর্তিত হয়ে যায়। আমার প্রথমে একটু ভয় হচ্ছিল ঠিকই। তারপর হঠাৎ গলা ছেড়ে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলাম পূর্ববঙ্গের একটি ভাটিয়ালি, 'এ ভব সাগর রে, ক্যামনে দিমু পাড়িরে'। সত্যজিৎবাবুর মুখের ভাব থেকে অনুভব করতে অসুবিধে হল না যে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। তারপর একদম ভয় কেটে গেল। পর পর গাইলাম আরও লোকসঙ্গীত, রাগ-সঙ্গীতের কিছু লচকদাব মুখড়া। এরপর তিনি বললেন, 'মাদ্রাজী গান জান?' আমি সঙ্গে সঙ্গে এখটু ভেবে নিয়েই ত্যারাজাব একটি বিখ্যাত কৃতির কিছু অংশ ঠিক দক্ষিণী স্টাইলে গেয়ে দিলাম। গান শুনে আমার আজও মনে আছে সত্যজিৎবাবু খুব তারিফ করলেন। এর পর মঙ্কুমাসীর সঙ্গে দেখা করে এবং কিছু সময় ওঁদের বাড়িতে কাটিয়ে ফিরে আসি। এর কয়েকদিন পর আবাব যে চিঠি পেলাম তাতে জানতে পারলাম সত্যজিৎবাবু আমাকে গুপীর গান গাইবার জন্য নির্বাচন করেছেন। চিঠি পেয়ে সেদিন মনে যেমন অবিশ্বাস্য আনন্দ হয়েছিল তেমনি বেশ কিছুটা ভযও করছিল। কারণ গানগুলো ঠিকমত গাইতে তো হবে। সত্যজিৎ রায়ের গান নিখুঁত গাওয়া না হলে তো অ্যাপ্রুভড হবে না। এছাড়া বহু বিচিত্র যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে গান রেকর্ডিং করার কোনও অভিজ্ঞতাও তো আমার নেই। এসব কথা ভেবে মনে মনে বেশ শঙ্কিত হয়েছিলাম। নির্ধারিত দিন ও সময় সত্যজিৎবাবুর বাড়ি গেলাম। প্রথমেই তিনি বললেন, 'আমার আগামী ছবি গুপী গাইন বাঘা বাইন-এ তুমি সাতখানা গান গাইছ।' বলার মধ্যে যে আন্তরিক ভালবাসার স্পর্শ পেয়েছিলাম তাতেই আমার মন থেকে সমস্ত সঙ্কোচ দূর হয়ে গেল। মনে পেলাম সাহস। সত্যি কথা বলতে তাঁর দর্শন বহু পূর্বে ছেলেবেলায় পেলেও সেদিন থেকেই কাজের মধ্য দিযেই আমার সঙ্গে তাঁর প্রকৃত আত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেদিন থেকেই ক্রমে ক্রমে তাঁকে জানবার সুযোগ পেয়েছি। গান শেখানোর মধ্য দিয়ে, আলাপে-আলোচনায় তাঁর সঙ্গীতে জ্ঞানের গভীরতা অনুভব করে মুগ্ধ হয়েছি। একজন বিশ্ববরেণ্য চিত্রপরিচালক হিসেবে এতদিন সত্যজিৎ রায়কে জানতাম। কিন্তু সেদিন অনুভব করলাম একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরশিল্পী হিসেবেও সত্যজিৎ রায় অবশ্যই বিশ্বের প্রথম সারির একজন। 'গুপী গাইন' থেকে 'হীরক রাজার দেশে' এবং ঐ কাহিনীরই তৃতীয় পর্বে 'গুপী বাঘা ফিরে এলো'-তে গান করে সে ধারণা আরও গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। কারণ এই দীর্ঘ বাইশ বছরে যে অনুভব করতে পারি এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তাই বলে সত্যজিৎবাবুর বিরাট সঙ্গীত প্রতিভার মূল্যায়ন করার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে যাঁর সঙ্গীত রচনার বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য নিয়ে এই আলোচনা, তাঁর সঙ্গীতকর্মের

সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে গায়ক হিসেবে আমার একটা সামান্য হলেও ভূমিকা আছে অনেকদিনের। তাঁকে দেখেছি নানাভাবে। তাই একেবারে কাছ থেকে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভাকে দেখার সুযোগ হয়েছে। এতদিনে আমার বয়স বেড়েছে। দীর্ঘদিন সঙ্গীত সাধনায় নিমগ্ন থেকে নিজেও সঙ্গীতকে কিছুটা জানবাব ও বোঝবার চেষ্টা করেছি। গান নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছি। তাই আমারও এই বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা পরিণতি এসেছে। এসেছে একটি স্বতন্ত্র ভাবনা ও চিন্তা। আর সেজন্য একজন প্রকৃত সঙ্গীতগুণীর গুণের বৈশিষ্ট্য, গভীরতা এবং নান্দনিক গুণকে আগের চেয়ে আরও অনেক ভালভাবে যতটুকু অনুভব করতে পেরেছি সেসব অভিজ্ঞতার কথাই এখানে বলছি। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর কাজ তো শুরু হল। প্রথমদিন তিনি আমাকে গল্পটি বুঝিয়ে বললেন এবং কয়েকটি গানের সিচুয়েশন বলে দিলেন। পরদিন থেকে লাগাতার রিহার্সাল শুরু হল। চলল একটানা চবিবশ দিন। ভাবা যায় না। আজকের দিনে এ কথা বললে হয়ত অনেকে বিশ্বাসও করবেন না। কারণ অজকাল রিহার্সাল ব্যাপারটা প্রায় নেই বললেই চলে। টেপে গান গেয়ে দেন সঙ্গীত পরিচালক। অনেক সময় দেখা যায় গানের অন্তরা বা সঞ্চারী ফ্লোরেই লেখা হচ্ছে। যন্ত্রসঙ্গীতের কোনোরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট বা আয়োজন না করেই গান টেকিং-এ এসেছেন গায়ক এবং সুরকার। অর্থাৎ সবই স্টেজে মেরে দেব গোছের ব্যাপার। এর ফল যা হবার তাই হচ্ছে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় স্বতন্ত্র। সবকিছুতেই। চলনে বলনে এবং কাজের সবদিকে এবং বিভাগেই। সব কাজই তিনি বহুদিন ধরে স্বীয় চিন্তা ও ভাবনা দিয়ে নির্মান করেন সুষ্ঠু ও সমন্বিতভাবে। তাই তাঁর গানের পদে, সুরে, ছন্দে, অর্কেস্ট্রেশনে এবং গায়কের গায়কী এবং সার্বিক উপস্থাপনা রীতি ইত্যাদি সর্ব বিষয়েই 'রে-টাচ' অর্থাৎ একটি স্বতন্ত্র ঘরানার মেজাজ ও স্বাদ লক্ষণীয়ভাবে মূর্ত হয। সে সৃষ্টির সৌরভ ও গৌরব যেকোনও সৃষ্টি থেকেই আলাদা জাতের হয়ে থাকে সব সময় সব ক্ষেত্রে। রিহার্সালের প্রথম দিনই আমি অবাক হলাম একটি বিষয়ে। দেখলাম পিয়ানোতে নোটেশন ষ্ট্যান্ডে স্টাফ নোটেশন করা একটি কাগজ দেখে সত্যজিৎবাবু একটি গানের মুখরা বাজিয়ে চলেছেন। পাশে রবি ঘোষ বসে আছেন। আমাকে দেখেই তিনি একটু থেমে বললেন,'ঐ যে এসে গেছে? তোমার সঙ্গে রবিও মাঝে মাঝে গাইবে বুঝলে?' তাবপর গান লেখা একটি ফুলস্কেপ কাগজ হাতে দিলেন। প্রথম গানটি ছিল, 'ভূতের রাজা দিল বর!' গানটি শুনে আমার মন ভরে গেল। এমন কথা ও সুর কোনওদিন শুনেছি বলে মনে পড়ল না। একেবারে আলাদা ধরনের গান। এবার সত্যজিৎবাবু গান গেয়ে আমাকে গানটি শেখাতে লাগলেন। যেমন অপূর্ব উদাত্ত কণ্ঠ তেমনি নিটোল গায়কী। আবাক হয়ে শুনতে লাগলাম। বুঝলাম পিয়ানোতে ঐ গানটিই তিনি বাজাচ্ছিলেন। পিয়ানোব চাবিতে তাঁর অপূর্ব স্বচ্ছন্দ সুরবিহার করার কায়দা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। মাঝে মাঝে আবার ইংরেজি স্বরলিপি এদিক ওদিক করে নিচ্ছিলেন। স্কেচ পেন দিয়ে। বুঝলাম স্টাফ নোটেশনেও তিনি পুরোপুরি দক্ষ। গানের মধ্যে ১ নম্বর, ২ নম্বর এবং 'বাহাভূত', 'কিম্ভুত', 'ঘোড়াভূত' ইত্যাদি পদ যা রবিদা গেযেছিলেন অতি সুন্দর নাটকীয়ভাবে, সে সমস্ত জায়গাগুলি সত্যজিৎবাবু তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। প্রথম প্রথম রবিদার একটু অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু ক্রমে সত্যজিৎবাবুর শেখানোর কায়দায় তিনি ঐ গানটি থেকে শুরু করে সমস্ত গানেই তাঁর অংশগুলি রপ্ত করে নিলেন। মহড়ার সময় রবি ঘোষ খুব সুন্দরভাবে

তাঁর অংশগুলো গাইছিলেন। এটা কিন্তু একটা আশ্চর্য ঘটনা। কারণ এর আগে রবি ঘোষ কখনও গান করেননি। কিন্তু সত্যজিৎবাবুর শিক্ষাগুণে এবং মহড়ায় সেটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু গোল বাঁধল রেকর্ডিং-এর দিন। 'আহা ভূত' বাহা ভূত' ইত্যাদি অংশগুলি অফবিট থেকে ধরার ব্যাপার আছে যা গায়ক ছাড়া ধরা একটু শক্ত। তার ওপর সঙ্গে রয়েছে অতগুলি অর্কেস্ট্রা। তাই রবিদা পরপর দুবার ভুল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সত্যজিৎবাবু রেকর্ডিং রুম থেকে ফ্লোরে চলে এলেন। এবং এসে বললেন, 'রিহার্সালে এত ভাল গাইলে, এখানে কী করে ভুল করছ? রবি কখনওই ভুল করবে না আর দেখো।' আশ্চর্য। যেন মন্ত্রশক্তিবলে পরের বারই গানটি ও কে হয়ে গেল। এ থেকে একজন মানুষের আত্মবিশ্বাস যে কত গভীর ও দৃঢ় হতে পারে তা বোঝা যায়। এইভাবে 'মহারাজা তোমারে সেলাম!', 'ওরে বাবা দেখ চেয়ে কত সেনা চলেছে সমরে', 'এক যে ছিল রাজা তার ভারী দুখ!', 'ও মন্ত্রীমশাই', 'ও রে বাঘারে গুপীরে', 'দেখরে নয়ন মেলে জগতের বাহার'— ইত্যাদি গানগুলি শিখে নিলাম। এরপর ছ-দিন ধরে রেকর্ডিং চলল টালিগঞ্জের ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে। সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট ছিলেন শ্যামসুন্দর ঘোষ। রেকর্ডিং ফ্লোরে আমার জীবনের একটা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কারণ সে সময়কার বিখ্যাত যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীগণ এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেমন ঃ অলোকনাথ দে, রাধাকান্ত নন্দী, আশিস খান, কল্যাণী রায়, রাজেন সরকার, সুজিত নাথ, অমর দত্ত, ওয়াই এস মুলকি, খোকন মুখার্জি, নির্মল বিশ্বাস, ফণীভূষণ ভট্টাচার্য, কালোবাবু এবং ভাইকীন গ্রুপে ছিলেন দুবেবাবু, দিলীপ রায়, রবীন মজুমদার, রবি রায়চৌধুরী, মন্টু বাবু এবং অরও অনেকে। অশোকবাবু সত্যজিৎবাবুর অর্কেস্ট্রা কন্ডাক্ট করে থাকেন। ফ্লোরের মাঝখানে সত্যজিৎবাবু যন্ত্রানুষঙ্গ রচনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর নিজের করা স্বরলিপির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। প্রতিটি যন্ত্রের বাজনা নিজে শুনছেন এবং সময় সময় নিজের চাহিদা মত তাঁদের বাজানোর কায়দাও বলে দিচ্ছেন। সে এক দেখার মত ব্যাপার। এরপর রেকর্ডিং শুরু হল। কার বাজনার সুর কম-বেশি আছে সে কথাও তিনি রেকর্ডিং রুম থেকে মাঝে মধ্যেই বলে দিচ্ছিলেন। এছাড়া বেহালায় কে কোন অকটেভে (অর্থাৎ হায়ার বা লোয়ার) বাজাবেন তাও গানের সঙ্গে রিহার্সালের সময় বলছিলেন। আমার এখনও মনে আছে আশিস খান সরোদে একবার দুবার চেষ্টা করে তাঁর বাজানোর মিউজিক্যাল পীস বা সঙ্গীতকলিটুকু আনতে পারছিলেন না ঠিকমত। রেকর্ডিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে তিনি আবার সুবিধামত সরোদের অংশটুকু কিছুটা পরিবর্তন করে দিয়ে গেলেন। এমন কর্তৃত্ব সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনিই করতে পারেন যাঁর সঙ্গীতের ওপর অসামান্য দখল আছে। সত্যজিৎবাবু পারেন তার কারণ, সঙ্গীতে তিনি সিদ্ধ। তাছাড়া নিজের মিউজিক্যাল স্কোর বা পূর্ণাঙ্গ স্বরলিপি তিনি নিজেই রচনা করেন। আমাদের দেশে এমন ঘটনা প্রায় দুর্লভ বলা যায়। কারণ যেমন কলকাতায় তেমনি বম্বেতে গিয়েও দেখেছি সঙ্গীত পরিচালক এ বিষয়ে একজন মিউজিক অ্যারেঞ্জার বা যন্ত্রানুষঙ্গ সহায়কের সাহায্য নিয়ে থাকেন। কিন্তু সত্যজিৎবাবু একাই একশ। তিনি নিজে গীত রচয়িতা, নিজেই সুরকার এবং নিজেই যন্ত্রানুষঙ্গ রচনা করেন। ভারতীয় রাগসঙ্গীত (উত্তর ও দক্ষিণ), লোকসঙ্গীত এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাঁর গভীর জ্ঞান। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের মত দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতেও তাঁর যে কত গভীরতা ও সূক্ষ্ম জ্ঞান তার প্রমাণ পাওয়া যায়

'বালা' তথ্যচিত্রে। যেখানে সত্যজিৎবাবু দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী বালা সরস্বতীর ভারতর্নাট্যম এবং কুচীপুরী নাচের অসাধারণ সব মুদ্রা এবং ভারতীয় নৃত্যকলার বহুবিধ রূপ ও রস অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে সংক্ষিপ্ত প্রমাণ্য চিত্রের মধ্যেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে নৃত্যশিল্পে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ মেলে। এ প্রসঙ্গে আরেকটা বৈশিষ্ট্যের কথাও বলা প্রয়োজন। সত্যজিৎবাবু সুরটাকে কখনও ট্রিমেলো করতে দেন না। এক একটা নোটে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়ে থাকে, যেটা ধরে রাখা একজন গায়কের পক্ষে খুব কঠিন কাজ। যেমন 'মহারাজা তোমারে সেলাম' এ 'মহারাজা'তে আটান্ন সেকেণ্ড স্থায়ী হতে হয়েছিল। উচ্চারণের দিকটাও খুব নিখুঁত চান তিনি। কারণ বাংলা গানে উচ্চারণ নিখুঁত না হলে গান মার খেয়ে যায়। এছাড়া দেশী-বিদেশী যন্ত্রের টোন, বাদনরীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর দারুণ অভিজ্ঞতা। এজন্যই যন্ত্রানুষঙ্গ রচনা করার স্বীয় পরিকল্পনা তিনি সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ করতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে এখানে পাঠকবৃন্দকে মনে করিয়ে দিতে চাইছি গুপী গাইনের গানের কয়েকটি কথা। যেমন ভেবে দেখুন, 'মহারাজা তোমারে সেলাম' গানটিতে তিনি একতারা, দোতরা এবং বাঁশী কী অপূর্বভাবে ব্যবহার করেছেন। 'ভূতের রাজা দিল বর' গানটির মুখরা অংশের পর ভায়োলিন অংশটুকু কী কখনও ভোলা যাবে? অথবা 'আহা ভূত! বাহা ভূত!' ইত্যাদি অংশের ফাঁকে ফাঁকে বাঁশী, ক্লারিওনেট, ক্রে-ভায়োলিন ইত্যাদির তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার, যা তিনি ফিলার মিউজিক হিসেবে করেছেন তা এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলেই আমি মনে করি। 'দেখোরে নয়ন মেলে' গানটি ভৈরবী-তে রচনা করলেও রাগসঙ্গীত তিনি যে গুলে খেয়েছেন তার প্রমাণ গানটি সুরবিহারের বর্ণবৈভবে অভিব্যক্ত। আজও সিচ্যুয়েশনটি ভাবলে যে কোনও গায়ক বা সুরের জগতের মানুষ অবশ্যই রোমাঞ্চিত হবেন।

ভোরবেলা— আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে গুপী যখন পরখ করছে যে ভূতের রাজার বরে তার সত্যি গলায় সুর এসেছে কিনা, সেই সময় সা, পা, সা এই তিনটি সুর গলায় দিতেই গানপাগল গুপী তার কণ্ঠের প্রকৃত সুরের ব্যঞ্জনা অনুভব করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ডিগবাজী খেল। সে সময়কার অর্কেস্ট্রেশনের কথা একবার ভাবুন। বৈতালিক গানের পূর্বে বাঁশীর মূর্ছনাটুকু কী অপূর্ব! যেন মনে হয় এক অনাস্বাদিত ভৈরবী। তারপর মধ্যে মধ্যে সেতারের অংশটুকুও অত্যন্ত মনোরম। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হচ্ছে যা সংক্ষেপে উল্লেখ না করে পারছি না। আকাশবাণীর বিখ্যাত সেতারবাদক বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মশাই আমাকে গুপী গাইন দেখে বলেছিলেন, "সত্যজিৎ রায় যে কত উঁচুমানের শিল্পী তা 'দেখোরে নয়ন মেলে' গানটি এবং ঐ গানের সিচ্যুয়েশন থেকে অনুভব করলাম।" কারণ যে গান মনেপ্রাণে ভালবাসে, তার কণ্ঠে যদি সত্যি সুরের আবির্ভাব হয় তবে সে আর কিছুই চায় না। গুপী গান গাইতে চেয়েছিল। তাই বেসুরো গলায় যখন সত্যিকারের সুর এল তখন সে আনন্দে হল আত্মহারা। গানের পদ, সুর, অর্কেস্ট্রেশন সব কিছুই সিচ্যুয়েশনের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এমন মহৎ কর্ম সত্যজিৎ রায়ের পক্ষেই করা সম্ভব। ঠিক এ কথা বাঘা সম্পর্কেও আসে। বাঘার ঢোল বাজাবার খুব বাসনা কিন্তু বাজাতে পারে না। তাই ভূতের রাজার বর পাবার পর বাঘা যখন ঢোল বাজাতে লাগল নানা ছন্দবৈচিত্র্যে তখন সেও দারুণ খুশ মেজাজে—আর বাঘার ঐ অপূর্ব ঢোল বাদনের অংশটুকুই হল 'ভূতের রাজা দিল বর' গানের প্রারম্ভিক

সঙ্গীত বা প্রিলিউড মিউজিক। যে বাজনার ঢঙে গুপীও অবাক হয়ে ছুটতে ছুটতে বাঘার কাছে গিয়ে গানটি শুরু করে দেয়। কী অসাধারণ কল্পনা এবং সৃজনক্ষমতা থাকলে একজন মানুষ এমন সৃষ্টি করতে পারেন সে বিষয়টি সম্ভবত রসিকসুজনকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। 'ওরে বাবা দেখো চেয়ে'— গানটিতে ভায়োলিন, সরোদ-এর অপূর্ব যন্ত্রানুষঙ্গ সঙ্গীত রসিকদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। 'ওরে বাঘারে গুপীরে'— গানটির মধ্যে কর্ণাটকি ঢঙে বীণাবাদ্যের তিনি যেমন ব্যবহার করেছেন তেমন আবার পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র ট্রাম্পেটেরও সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। সঙ্গে রয়েছে দক্ষিণী তালবাদ্য। সব মিলে গানটি এমন রসোত্তীর্ণ হয়েছে যা ভাবা যায় না। আমার এখনও মনে আছে পরিমল চৌধুরী মশাই তখন কলকাতা রেডিও স্টেশনের সঙ্গীতবিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। আমি যখন রেডিওতে গান গাইতে যেতাম তখনই গানটি শুনতে চাইতেন। একদিন আমি স্টেশনে গান গাইতে গিয়েছিলাম সে কথা জানতে পেরে তিনি আমাকে ওপরে ডাকিয়ে নেন। গিয়ে দেখি তাঁর টেবিলের সামনে সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ এবং আরও অনেকে বসে আছেন। গুপী গাইন তখনও হাউসে চলছে। তিনি আমাকে গুপীর গান একটু খালি গলাতেই শোনাতে বললেন। গান শোনার পর সবাই একবাক্যে বললেন রবীন্দ্রনাথের পর কথার সঙ্গে সুরের এমন আশ্চর্য সমন্বয় আর কখনও তাঁরা শোনেননি। এটা খুব স্বাভাবিক। কারণ, সত্যজিৎবাবু নিজে সুবে সিদ্ধব্যক্তি। বহু বিচিত্র দেশী-বিদেশী সুরের তিনি একজন যথার্থ ভাণ্ডারী। এছাড়া তিনি একজন গুণী সাহিত্যিক এবং সুকবি। এজন্যই সঙ্গীত রসে নিষিক্ত তাঁর স্বরচিত পদ ও সুরের সার্থক বেণীবন্ধন হবে এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে। এখানে আরেকটি উল্লেখ না করে পাবছি না। ১৯৭০ সালে শারদীয় পূজার গান করেছিলাম সুধীন দাশগুপ্তর সুরে। সুধীনবাবুর পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বেশ ভাল দখল ছিল। আশ্চর্য ব্যাপার প্রথম দিনই তিনি আমার কাছে গুপী গাইনের গান শুনতে চেয়েছিলেন। শোনার পর বললেন, 'এ গান কোনোদিন মানুষের মন থেকে মুছে যাবে না।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিশুপুত্রকে 'বাবু। বাবু।' বলে ডাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি শীর্ণকায় শিশু সামনে এসে দাঁড়াল। সুধীনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাব কোন গান সব থেকে ভাল লাগে?' সে চটজলদি উত্তর দিল, 'গুপী গাইনের গান।' রসিক সুধীনবাবু বললেন, 'সে গানগুলি কে গেযেছে বল তো?' শিশু বললে, 'অনুপ ঘোষাল!' তখন সুধীনবাবু স্মিত হেসে বললেন, 'এই যে তোমর সামনে অনুপ ঘোষাল হাজির।' এ কথা শুনে শিশুপুত্র অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আজও সে কথা আমি ভুলিনি। খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় সুধীনবাবু অকালে চলে গেছেন আর তাঁর শিশুপুত্রটি বর্তমানে একজন কৃতী ইঞ্জিনিয়ার। গুপী গাইনের সঙ্গীত এ দেশের সঙ্গীতজগতের রথী মহারথীগণ সবাই একবাক্যে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যাঁদের মধ্যে রাইচাঁদ বড়াল, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাজ্যেশ্বর মিত্র, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, দেবব্রত বিশ্বাস, সন্তোষ সেনগুপ্ত প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আমার স্বর্গত সঙ্গীতগুরু সুখেন্দু গোস্বামীর একটি মূল্যবান মন্তব্যও এখানে উল্লেখ করতে হয়। ছবি রিলিজের আগেই মাস্টারমশাইকে গানগুলি শুনিয়েছিলাম। গান শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে শুধু এ কথাই বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের পর এমন প্রতিভাবান মানুষ আমাগো দেশে আর কেউ আইছেন কিনা আমার জানা নাই।' গুপী গাইন প্রসঙ্গে

আরও একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। বহু ঝামেলার পর ছবিটি যখন হাউসে এল তখন আমি প্রায়ই 'বিজলি' সিনেমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম। জীবনে হয়ত খ্যাতি ও অর্থ পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু প্রথম জীবনের ঐ সাফল্যের আনন্দময় দিনগুলি আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অবাক বিস্ময়ে দেখতাম হাউস থেকে সবাই বাইরে এসে গানের আলোচনা করছেন অথবা কেউ উদাত্ত কণ্ঠে গাইছেন, 'দেখোরে নয়ন মেলে জগতের বাহার'। আরেকটি হল গুপী গাইনের রেকর্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে। তখন রেকর্ডের যুগই মূলত ছিল। ক্যাসেট এসেছে তার অনেক পর। এস পি এবং ইপি রেকর্ডে গুপী গাইনের গান এইচ এম ভি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আর প্রকাশিত হয়েছিল ছবির আবহসঙ্গীত এবং গান সহ একটি পূর্ণাঙ্গ লঙ-প্লেইং রেকর্ড। যে লঙ-প্লেইং রেকর্ড বাংলা ছায়াছবির প্রথম লঙ প্লেইং ডিস্ক হিসেবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মর্যাদা পেয়ে থাকে। সে সময় আমি খুব উৎসাহ নিয়ে বিভিন্ন রেকর্ডের দোকানের আশপাশে ঘুরতাম কেমন রেকর্ড বিক্রি হচ্ছে দেখার জন্য। প্রায় সময়ই রেকর্ডের দোকান থেকে তখন শুধু গুপী গাইনের গানই শোনা যেত। ছবি যখন চলমান তখন পাঁজা পাঁজা রেকর্ড প্রতিদিন এক একটি দোকান থেকে বিক্রি হয়েছে।

গুপী গাইনের দশ বছর পর ১৯৭৯ সালে 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে গান গাইবার জন্য আমার ডাক আসে। হীরক রাজাতে মোট এগারটি গান ছিল। এ গানের কথা, সুর ও ছন্দে আমি যেন আরও মজা পেলাম। প্রথম গানটির কথা ধরা যাক। 'মোরা দুজনায় রাজার জামাই'— এক অপূর্ব সৃষ্টি। মিশ্র খাম্বাজ-এর মুখরাতে যে অপূর্ব ভাব ও ভঙ্গীতে কাব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি লোক-অঙ্গের সুর মিশিয়েছেন তা অভাবনীয়। কী সহজ অথচ কী সুন্দর। কী নিটোল ছন্দ বৈচিত্র্য। কিন্তু গুপী গাইনের মত এখানে ঠিক সেই ধরনের অর্কেস্ট্রেশন নেই। এখানে প্রিলিউড খুব ছোট এবং অন্তবর্তী যন্ত্রসুরগুলিকে ফিলার মিউজিক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। শুনলে অবাক হবেন যাতে আমার গাইতে কোনও অসুবিধে না হয় সেজন্য তিনি কথা ও যন্ত্রসুরের মাঝে মাঝে ঘর কেটে এক একটি 'বার'-কে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। কারণ ঐ রকম ব্যাপার না করে দিলে এমন গান গাওয়া যে কোনও গায়কের পক্ষে খুব অসুবিধেজনক হবে সেটা অনুভূতিপ্রবণ স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ই কেবল অনুভব করতে পারেন। আর এভাবে কাজটি করা ছিল বলেই আমারও গান গাইতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

এরপর 'আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে' গানটির কথা মনে হয়। যে গানের কাব্যিক ভাববাণীর সঙ্গে সুরের আশ্চর্য সমন্বয় হয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সুরকার এখানে লোকঅঙ্গের সুর কাব্যের মেজাজের সঙ্গে সার্থকভাবে সমন্বিত করেছেন। যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষঙ্গও ঠিক সেভাবেই রচিত হয়েছে। তালবাদ্য ছাড়াই সত্যজিৎবাবু এখানে মূলত বাঁশী ও সেতারের সমন্বয়ে যন্ত্রানুষঙ্গ নির্মাণ করে নিয়েছেন, যাতে গানটির মেজাজ দারুণ খুলেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এরপর গুপীর কণ্ঠে তিনটি গান অবিস্মরণীয়। যেমন সাগর দেখে সে গাইছে 'আহা সাগরে দেখ চেয়ে', তারপর অরণ্যের নির্জন একাকীত্বে সে গেয়ে উঠল 'এ কী দৃশ্য অন্য, এ যে বন্য, এ অরণ্য', তারপর গুরুগম্ভীর পাখোয়াজের সঙ্গে হিমালয় দেখে অবাক বিস্ময়ে গেয়ে উঠল 'এবারে দেখ গর্বিত বীর চির তুষারমণ্ডিত শির', ইত্যাদি। এসব গানগুলিতেই পদ, সুর ও

যন্ত্রসঙ্গীতের যেন ত্রিবেণীসঙ্গম হয়েছে। শুধু তাই- বা কেন, ভাবুন তো একবার 'তোমার পায়ে পড়ি বাঘামামা' গানটির কথা। চলচ্চিত্রের যে সিচ্যুয়েশনে এই গানটি তিনি নির্বাচনে করেছেন তাতে বাঘ দেখে ভয় পেয়ে যাওয়া একজন গায়কের কণ্ঠ থেকে ঠিক ঐ ধরনের সুরই কী আসাটা স্বাভাবিক নয়? এখানে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি যা থেকে পাঠক আমার বক্তব্যের যাথার্থ অনুভব করবেন। হীরক রাজার জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড নিতে আমি যখন দিল্লিতে গেলাম, দিল্লির মালয়ালম সোসাইটি আমাদের একটি রিসেপশন দিয়েছিল। সে আসরে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কমিটির একজন জুরি যখন জানলেন আমিই সেই গায়ক তখন আনন্দে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'অপূর্ব গেয়েছ ভাই গানটি। আমরা সবাই এই গানটি শুনেই সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ গায়ক নির্বাচন করেছিলাম তোমাকে'। সেদিন দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোকের কথাটি শুনে আমার চোখে জল এসেছিল, একজন মানুষের কথা ভেবে যিনি তখন কলকাতায় শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তাই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকের পুরস্কারটি নিতে যেতে পারেননি, যা তাঁর তরফে আমি গ্রহণ করেছিলাম রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডির হাত থেকে। মনে মনে ভাবলাম আমার এই পুরস্কারের সবটুকু কৃতিত্বের দাবিদার তিনিই— তিনি সত্যজিৎ রায়। কারণ তাঁরই রচিত, সুরারোপিত এবং শিক্ষায় এ গানটি আমি যেটুকু গাইতে পেরেছিলাম তাতে আমার এই পুরস্কার প্রাপ্তি। এখানে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, 'গুপী গাইনে'র মত 'হীরক রাজা'র গানের মহড়াও চলেছিল মাসাধিককাল।

এবার 'হীরক রাজা'র দশ বছর পর গাইলাম 'গুপী বাঘা ফিরে এল' ছবিতে। যে ছবির গল্প, চিত্রনাট্য, গীত রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনায় স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। পরিচালনা করেছেন সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায়। এ ছবিতেও আমি মোট দশটি গান গেয়েছি। এ গানগুলিতে শ্রোতার ভারতীয় রাগসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত এবং কর্ণাটক সুরভিত্তিক গান শুনতে পাবেন, যে গানের পদ, সুর ও ছন্দের বৈশিষ্ট্য তাঁরা অবশ্যই অনাবিল আনন্দে অভিভূত হবেন। কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এবারের গানগুলোতে সত্যজিৎবাবুর সঙ্গীত-কর্মের চরম উৎকর্ষ অভিব্যক্ত হয়েছে। সত্যজিৎবাবুর যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এমন অবিস্মরণীয় সৃষ্টি করলেন তার কারণ হল, এ কথা পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও বলছি, সুরের জগতে তিনি সিদ্ধ। সঙ্গীতের ব্যবহারিক ও উপপত্তিক উভয়দিকেই তাঁর গভীর জ্ঞান। ভারতীয় রাগসঙ্গীতকে তিনি ভালবাসেন মনেপ্রাণে। জলসাঘরের বিশ্বম্ভর রায়ের সঙ্গীত প্রীতি এবং পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে এ কথা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত হয়েছে। জমিদারের জমিদারী-জৌলুস আর আগের মত নেই, কিন্তু তবুও তাঁর জলসাঘরে তিনি অভ্যাগতদের নিয়ে গুণী গায়ক-বাদকের গান-বাজনা শুনতে চান। এ থেকে বোঝা যায় রাগসঙ্গীতের ইতিহাস ও ঘরানা সম্পর্কেও তিনি কতটা সচেতন। পাশ্চাত্য সঙ্গীত তাঁর করায়ত্ত সে কথা আগেই বলা হয়েছে। বেটোভেন, মোৎজার্ট, শোঁপা, শুবার্ট, বাখ প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য কম্পোজারদের রচনা সম্পর্কে তাঁর নিটোল ধারণা। এ বিষয়ে তাঁর রেকর্ড ও বই-এর সংগ্রহ দেখলে অবাক হতে হয়। তিনি একবার আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে এক ঘন্টার একটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান করেছিলেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ওপর আলোচনা সহ; যা শুনে দেশ-বিদেশের বহু গুণী তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ওপর বহু দুষ্প্রাপ্য বইও তাঁর সংগ্রহে রয়েছে।

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র সত্যজিৎ রায়ের বাংলার বাউল গানের প্রতি যে মমত্ব থাকবে সেটা তো স্বাভাবিক। এছাড়া পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি গানের পরমভক্ত। দক্ষিণ ভারতীয় সুর তালবাদ্য ও সপ্তঘট্ট যন্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিখুঁত ধারণা আছে। তাই এমন বহু বিচিত্র সঙ্গীতের যিনি ভাণ্ডারী তিনি সুরের জগতে যে অবিস্মরণীয় সৃষ্টি করবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। তবে সংগ্রাহক মনোবৃত্তি থাকলেই স্রষ্টা হওয়া যায় না, স্রষ্টা হতে হলে তার থাকতে হবে সৃজনগুণ, যে সৃজনগুণের বৈশিষ্ট্যে ও বর্ণবৈভবে সত্যজিৎ রায় সঙ্গীতজগতেও এক অনন্য স্রষ্টা। প্রতিভা হল শিক্ষা সাপেক্ষে দেবদত্ত শক্তি। আমি তাঁর গান গাইতে পেরেছি, এ আমার জীবনের চরম লাভ, চরম পাওয়া। এই তেইশ/চব্বিশ বছরে শিখেছি অনেক, জেনেছি অনেক কিছু তাঁর কাছ থেকে এবং আমার সঙ্গীত জীবনকে সংগঠন করার সুযোগ পেয়েছি।

আমার সত্যজিৎ
অরুণ মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রেব সত্যজিৎ রায় বাংলার নয়, ভারতের নয়, সারা পৃথিবীর এ-কথা যেমন সত্য তেমনই 'আমার সত্যজিৎ একান্তভাবে কেবল আমারই আর কারুর নয় এটাও ততটাই ঠিক। এখানে বেশ কিছু ভাবনা চিন্তার শারিক শুধুমাত্র আমরা দু'জনা।

প্রায় একুশ বছব আগে মানিকদার যখন পঞ্চাশতম জন্মদিন তখন 'ঘরোয়া' পত্রিকায় বিশদ ভাবে লিখেছিলাম 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় নায়ক হিসাবে আমার অন্তর্ভুক্তির ইতিহাস ও সেইসময় ওঁর সঙ্গে আমার ভাব বিনিময়ের নানা কথা। এখানে তাই 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ঘুরে ফিরে এসে পড়তে পারে। তবু মূলতঃ এ-প্রবন্ধে আমি তাঁর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকব কিছুক্ষণ, যেমন তাকাতাম লেক টেম্পোল কিংবা বিশপ লেফ্রয়ে অথবা তাঁর কোনও ছবির সেট -শুটিং দেখতে দেখতে চলচ্চিত্রের পাঠ নেবার সময়।

আমাদের কাছে সত্যজিৎ যেমন স্বমহিমায় মহান ছিলেন সত্যজিতেব মনে তেমনই বিরাটত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ফরাসি পরিচালক জাঁ রেনেয়ো। মানিকদা যখন প্রথম রেনোয়ার সঙ্গে দেখা করবেন বলে Grand Hotel এ যান আজ থেকে প্রায় পঁচাল্লিশ বছর আগের একটা দিন, মনে খুব সংশয় ছিল তাঁব 'কেমন মানুষ' এই ফবাসি ভদ্রলোক। কেমন সমীপ্য পছন্দ কবেন তিনি। কতটা। শেষে দেখা হওযার পব তাঁর সম্বন্ধে লিখলেন 'As it truned out, Renoir was not only approachable but so embarassingly by polite and modest that I felt if I were not too careful I would probably find myself discussing upon the Future of the Cinema for his benefit' যাঁরা সতজিৎ রায়ের কাছাকাছি কখনও এসেছেন তাঁদের সঙ্গত কারণেই মনে হতে পারে উক্ত লাইন ক'টা মানিকদাব নিজের সম্বন্ধেই স্বছন্দে লেখা যেতে পারত। সান্নিধ্য দানে তিনি ছিলেন দরাজ — ঘরের দরজা সকলেব জন্য খুলে দিতেন নিজের হাতে, মনের দরজাটাও হা-ট করে খোলা থাকত সমসিদ্ধদের জন্যে। দুনিযার লরেল মাথায় পরে একজন মানুষ কী করে এত শিষ্ট-বিনম্র থাকতে পাবেন সে জিজ্ঞাসার উত্তর খোজার বিস্ময় আমার সারা জীবনে কাটবে না। কতবার শুনলাম কাউকে অভিনয় করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলছেন 'আপনি এ চরিত্রটা করে দিতে পারলে বড্ড উপকার হয়' 'দেখুন না ভাই যদি ঐ পার্ট-টা আপনার পক্ষে করে দেওয়া সম্ভব হয়—' এর চেয়ে অসম্ভব অভিজ্ঞতা আর হতে পারে না। ওঁর মুখের 'ভাই' সম্ভাষণ যে কী মধুর ও তৃপ্তিদায়ক ছিল! অপর দিকে কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে অমন দৃঢ় স্থিরসঙ্কল্প এবং সদা উন্নত মস্তক পরিচালক সারা বিশ্বের রুপালি পর্দার ইতিহাসে বিরল। যখন 'পথের পাঁচালী'র টাকা দেবার সময় তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবিটির শিল্প মাধুর্য ও উৎকর্ষতা বিনষ্ট করে, চিত্রনাট্য পালটিয়ে সবকারি প্রচার দপ্তরেব ভ্যানে করে দেখিয়ে বেড়ানোর কাছাকাছি 'কলেরা বসন্তের টিকা লউন' জাতীয় সেলুলয়েড পোষ্টারের মত

কিছু একটা তৈরি করবার প্রস্তাব দেন তখন সত্যজিৎ অনড় হয়ে তা ঘটতে দেননি। সরকারের সর্বেসর্বা একজন এমন কথাও বলেছিলেন 'গল্পটা অন্যরকম করে লিখে দেবার জন্য বিভুতিকে ডেকে পাঠাও না আমার নাম করে' !!! হলিউডের অনেক পরিচালক এমন দৃষ্টান্ত রাখতে পারেননি। কিছু বাঘাবাঘা পরিচালক অবশ্য অন্যপন্থা অবলম্বন করেছেন কাজটাকে ভাল করে করার আকুলতায়। গ্রেট ব্রিটেনে আলফ্রেড হিচ্‌কক্‌ একবার তাঁর একটা ছবির শুটিং একটি সুপরিচিত মিউজিয়ামেব মধ্যে করবেন স্থির করেন, কিন্তু জায়গাটি ভাল করে দেখতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন সেখানে শুটিং সম্ভব নয় পর্যাপ্ত আলোর অভাবে। কিন্তু তিনি এমন একটা পন্থা উদ্ভাবন করেন যাতে ঐ স্থানের স্থির চিত্র তুলে কাঁচের স্লাইড বানিয়ে তাব মাধ্যমে দৃশ্য তুললে মনে হবে সব ঘটনা যেন সেই সুপরিচিত মিউজিয়ামেই ঘটেছে। প্রযোজকদের তিনি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে তাঁরা হিচ্‌কক্‌কে প্রায় উন্মাদ ভেবে বসেন। এবং তাঁকে কাজ করার জন্য অনুমতিও দেন না। হিচ্‌কক্‌ প্রযোজকদের চোখে ধুলো দিয়ে ঐ পন্থাতেই কাজটা সমাপন করেন। কাজের সময় হিচ্‌কক্‌ চরেরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। প্রযোজকদের কেউ ফ্লোরে আসছে দেখলেই তারা খবর পাঠাতো, হিচ্‌কক্‌ কর্মপন্থা পাল্টে ফেলতেন। শেষে প্রযোজকরা ছবি দেখে অবাক হয়ে যান। তাঁরা বুঝতে পারেন না কবে মিউজিয়ামের বহিঃদৃশ্য গ্রহণ করে আনা হল। কাজটি এত নিঁখুত হয়েছিল যে কেউ ধরতে পারেনি তা ইনডোব শুটিংয়ের ফল। হিচকক্‌ নমস্য। মানিকদার খুব প্রিয় পরিচালক ছিলেন তিনি। কলকাতাতেও ঘুরে গেছেন, দুজনের সাক্ষাৎ হয়েছে একাধিকবার। তাঁর আর এক প্রিয় পরিচালক বিলি ওয়াইল্ডার। ওয়াইল্ডার হলিউডে কখনও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন না সিনেমায় তিনি শিল্প সুষমার পূজারী। শুনলেই তাঁকে অচ্ছুৎ করে দেবে সিলভার টনিক সুধারস পায়ী যতেক প্রযোজক সংস্থা। ভদ্রলোক কোনও ঢাক না পিটিয়ে কাজ করে যান সাচ্চাসরেস চক্রবূহের মধ্যে অভিমণ্যু। আবার অন্যদিকে জন ফোর্ডেব কিছু ছবিতে জন ফোর্ডের বিরাটত্বকে খুঁজে পাওয়া যায় না তিনি ফরমাসের শিকার হয়ে পড়ায়। ফোর্ডের ছবির কাব্যময়তার সুন্দর এক বর্ণনা পাওয়া যায় ওঁর বিষয়ে মানিকদার ছোট্ট একটা লেখায়। হলিউডের আয়োজন তো খুব সামান্য ছিল না। বানিয়ারা আমেরিকার দক্ষ চলচ্চিত্রকারদের তো বটেই তাছাড়াও পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে শিল্পী কারিগরদের আমদানী করে নিজস্ব ভাঁড়ারে পুরেছিলেন। কিন্তু সেখানে কাজের স্বাধীনতা ছিল না। কর্ত্তার ইচ্ছেয় মানি ব্যাগের স্বার্থে কম্মো বাঁধা পড়ে গেল দাসত্বের শিকলে। সে পরিস্থিতিতে টিকতে না পেরে কেউ কেউ নিজের আগের জায়গায় ফিরে গেলেন। কিন্তু তবু যাঁরা রয়ে গেলেন সে ঐশ্বর্যও বড় কম নয়। তবু রইল কৈ ! এই শতকের গোড়ার দশকে অমন বৈভবের মধ্যে যার সৃষ্টি ক্ষীণায়ু একটা জীবের মত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই নাভিশ্বাস উঠতে লাগল তার। '৫৮-তে মানিকদা হলিউড গিয়ে বেশ বুঝতে পারেন বহু খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিত্ব গভীরভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মানুষকে নাচিয়ে তুলেছিল বটে তবু মানুষের হৃদয়ে আসন পাততে পারেনি স্বমহিমার বৈশিষ্ট্য হলিউড। বাইরের ধাক্কাটা টিভি দিলেও অস্টিওপোরোসিস্‌ রুগির মত ভিতরে ভিতরে তার নিজের হাড় হয়ে গিয়েছিল জিরজিরে। সামলাতে পারল না ভেঙে পড়ল। ভয় হয় ফিল্ম নিজে এত ক্ষণভঙ্গুর নয় তো। চ্যাপলিন এখনও সতেজ সজীব এই যা ভরসা।

ওঁর বসার ঘরের দেওয়ালে একটা আইজেনস্টাইনের ছবি তার নিচে দেরাজের উপর সুন্দর বাঁধানো বেশ কয়েক সার লাল নীল ছোট ছোট চাকার ছবি প্রায়ই দেখি কিন্তু ওটার মাহাত্ম্য বুঝতে পারি না। হয়তো টেকনোলজিক্যাল কিছু কিংবা মর্ডান আর্টের কোনও মাস্টারপিস হবে হয়ত। শেষে একদিন মানিকদাকে জিজ্ঞেসই করে বসলাম 'এমন বাঁধিয়ে রেখেছেন এটা কী?' কাঁচের ঢাউস মাপের একটা মুখ ফাঁদালো বোতলের জলে হাতের তুলি ধুতে ধুতে মুখ তুলে হেসে বললেন 'যাও না ওটার সামনে দাঁড়িয়ে এ পাশ ও-পাশ মাথা নাড়ো গিয়ে।' গেলাম। অবাক। চাকাগুলো ঘুরছে। নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে ফ্রেমের মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে মনে হলো চাকাগুলো আমায় নিয়ে ঠাট্টা জুড়ে দিয়েছে। ভিজুয়াল ইলিউশ্যানের চূড়ান্ত নমুনা। আমার যেন ভোঁ চক্কর লেগে গেল। ওদিকের চেয়ার থেকে উনি বলে উঠলেন 'কী? কী হলো তোমার' সব বুঝতে পেরেছেন। খুব হাসলেন খানিকটা। আমার মুখে কোনও কথা জোগালো না। বিদেশ থেকে কত সুন্দর সুন্দর খেলনা আনতেন। কোনটায় চুম্বকের আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ কোনওটা কসরৎ দেখাচ্ছে পাক্কা ব্যালান্সের। ফেলু সিরিজের কোন ছবির সেট-এ মনে হচ্ছে যেন এদের কয়েকটা ব্যবহারও করেছিলেন।

উনি বলতেন নতুন কিছু শুরু করতে হলে চল্লিশ না পেরুতে দেওয়াই শ্রেয়। ওঁর কাজ পুরোদস্তুর শুরু হয়ে যায় তিরিশের কোঠায় যখন ওঁর বয়স। তবে জিম করবেটের লেখা আমাকে বেশ মুগ্ধ করে। এঁর লেখক জীবনের শুরু বোধহয় ষাট-ও পেরিয়ে যাবার পর, আর সত্যজিৎ রায় জীবিকার অঙ্গ হিসাবে লেখকের ভূমিকায় নামেন তার ঠিক চল্লিশ বছরের মাথায়। তাঁর প্রথম অরিজিনাল সিনারিও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ঐ সময় লেখা। পরে এই লেখা তাঁর বেড়েই চলে বৃহৎ আকারে।

যে বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে 'পথের পাঁচালী' শুরু হয়ে শেষ হলো সে অভিজ্ঞতাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে ছিলেন তিনি। সময় ফিল্ম টাকা কোনটারই আর অপচয় ঘটতে দেননি দ্বিতীয় ছবি থেকে। 'অপরাজিত' অসাধারণ ছবি। চললো না। সার্বজনীন দুর্গাপূজায় জলসার দিন যত ভীড় হয় সন্ধিপূজায় তত লোক আসেনা। মনকে প্রবোধ দিতে এর বাইরে আর যুক্তি পাইনা। অথচ ভেনিস থেকে স্বর্ণ সিংহ আনলো 'অপরাজিত'। সিনেমার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা রূঢ় সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটা 'এ-যেন এক মনোহারী দোকান।' পাখার ব্লেডে জাফরি কেটে নক্সা আঁকলে যেমন বাতাস কমে যাবার ভয়, সুক্ষ্ম শিল্প ভাবনার গন্ধ যদি সিনেমায় ঢুকে পড়ে- সেখানেও ঐ-রকম এক মারাত্মক বিভীষিকার ভয়ে পান্ডুর হয়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট মানুষেরা।

কুরুসওয়ার আত্মহত্যার চেষ্টার কথা আমি মানিকদার মুখ থেকেই প্রথম শুনি। জাপান থেকে ভারতবর্ষে এলে ফিল্ম উৎসবের দর্শকদের কাছে, দিল্লিতে, সত্যজিৎ রায়ই উপস্থিত করেন কুরুসোয়াকে। ওঁর সার্টের কলারের ফাঁক দিয়ে ঘাড়ের কাছে জগুলার ভেইন কাটার জায়গায় সেলাইয়ের সরু দাগটা তখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন উনি।

বার্গম্যানের 'ক্রাইম এন্ড হুইসপার্স' দেখেছিলেন বিদেশে। ছবিটা দেখে উনি চমকে যান। ভাঙ্গা কাচের টুকরো দিয়ে শরীর কেটে সেই রক্ত মুখে মাখছে এক নারী। দৃশ্যটির এবং তার প্রযোজ্যতার যে বর্ণনা তিনি সে-দিন আমায় শুনিয়েছিলেন সে কখনো ভোলা যায় না। বহুকাল পরে ঐ ছবিখানি আমার দেখার সুযোগ হয়। পর পর দু'টি শো দেখে

একটু বেশি রাতেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। কথা বলতে বলতে উনি বললেন শরীরে যন্ত্রণার কষ্ট ফোটাতে 'একটা শব্দ ব্যবহার করেছে' খেয়াল করেছ। মনে পড়ে গেল। দুর্দান্ত সব ছবি। এই ব্যর্গম্যান বলছেন ছবি করতে হয় তাঁকে বাধ্য হয়ে, পরিবারটি বড়, কাজ না করলে তাদের ভরণ-পোষণ বন্ধ হয়ে যাবে।। অথচ কী দারুণ দারুণ ছবি!

বিদেশ সত্যজিৎ রায়কে যা দিয়েছে আমরা স্বদেশে তাঁকে সে তুলনায় কিছুই দিতে পারলাম না। বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসায় বাঙালির রসবোধের যোগান দিতে আঞ্চলিক ভাষার ক্ষুদ্র গন্ডিতেই সন্তুষ্ট থেকে গড়ে বছরে একটি করে সৃষ্টিধর্মী ছবি উপহার দিয়ে গেলেন তিনি। এ-সব আমাদের ক্ষেত্রে যেন এমন না বর্তায় যে আমরা শুধু কলার তুলে বলে গেলুম 'আমাদের সত্যজিৎ' যেমন বলি 'আমাদের রবীন্দ্রনাথ'।

ভাবতে খারাপ লাগে 'সতরঞ্জ কি খিলাড়ি' ছবিতে সাহেবের গলায় ইংরাজি সংলাপের সাউন্ড-ট্র্যাকে হিন্দি সংলাপ প্যারাডাব্ করে দেওয়া হয় এখানে ছবির পরিচালকের অনুমতি বা পরামর্শ না নিয়েই। ছবি তৈরি শেষ হয়ে গেলে সেটা প্রযোজকের সম্পত্তি নিশ্চয়ই তবে সম্ভ্রমের দাম সাংস্কৃতিক জগতে না দিতে পারলে তলিয়ে যাবার ভয় আছেই আছে। 'চারুলতা' বাজার চলতি প্রিন্ট রিলের গোলমালে জগাখিচুড়ি হয়ে রইল দেখলুম কতদিন ধরে। বিড়লা আইস স্কেটিং রিঙ্ক ও গোর্কি সদনের প্রদর্শনের মধ্যে বেশ বড় একটা সময়ের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও একই অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার কয়েক বছর আগে। এখন কি অবস্থা জানি না। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মত অভাবনীয় ছবির অরিজিনাল নেগেটিভ ধ্বংস হয়ে গেল অযত্নে, প্রযোজকদের গাফিলতিতে,সম্প্রতি সে-ছবি নিয়ে যতই মাতামাতি হোক।

এখনই বোঝা দরকার কোনটা চলচ্চিত্রের সম্পদ আর কিসে চলচ্চিত্রের বিপদ।

মানিকদা

নিমাই ঘোষ

সত্যজিৎ রায় মানে মানিকদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ দীর্ঘ ২৫ বছরের। মানিকদার ইউনিটের কাজকর্মের মধ্যে কিছুটা হঠাৎ করেই যেন ঢুকে পড়ি। এখন আমি ফটোগ্রাফার হিসাবে পরিচিত হলেও মানিকদার সঙ্গে যোগাযোগের আগে ফটোগ্রাফি বিষয়ে আমার মধ্যে কোনো ধারণাই ছিল না।

একবার আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে বর্ধমানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এখানে গিয়ে শুনি রামপুরহাটে সত্যজিৎ রায়ের শুটিং হচ্ছে। একটা ফিয়েট গাড়ি করে কিছুটা কৌতুহল বশেই শুটিং দেখতে গিয়েছিলাম। 'চলাচল' নামে কলকাতায় আমাদের একটি নাট্যগোষ্ঠী ছিল। সেখানে পুরোদস্তুর অভিনয় করতাম। 'চলাচলে' অভিনয়ের সুবাদে মানিকদার উইনিটের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ছিল। গিয়ে দেখি 'গুপীগাইন'-এর রিহার্সাল হচ্ছে। সঙ্গে বন্ধুর একটা ক্যামেরা ছিল। কাঁপতে কাঁপতে রিহার্সাল মুহূর্তের বেশ কয়েকটি ছবি তুললাম। একটা অদ্ভুত মিষ্টি অনুভূতি সেদিন শরীর জুড়ে বয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় ফিরে বি. কে. স্যান্যালের স্টুডিও থেকে ছবিগুলি প্রসেস করালাম। দেখি ভালোই হয়েছে। সান্যালদা খুব উৎসাহ দিলেন।

বংশী চন্দ্রগুপ্তও বললেন, বেশ তুলেছো। আমাকে প্রায় টানতে টানতে মানিকদার কাছে নিয়ে গেলেন। ওখানে তখন 'গুপী গাইনের' গানের সিকোয়েন্স হচ্ছে। উনি ছবিগুলি দেখে উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন — 'আরে মশাই, করেছেন কি। আপনি তো আমার এ্যাঙ্গেল মেরে দিয়েছেন।' তারপর সেদিনই ছবি তুলতে উৎসাহ দিলেন। টানা ছ'সাত দিন কভারেজ করলাম। এইভাবেই শুরু হল। কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কিছুই জানি না। একটা ভাঙা, ছোট ক্যামেরা সম্বল করেই মানিকদার ইউনিটের একজন সদস্য হয়ে গেলাম।

জীবনের শুরুতে কোনদিন ফটোগ্রাফার হব স্বপ্নেও ভাবিনি। অভিনয় করবো অভিনেতা হবো—এরকম একটা সুপ্ত বাসনা মনের মধ্যে ছিল। শুনলাম মানিকদা 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিটি করার কথা ভাবছেন। একদিন টেলিফোন করলাম। বললাম 'মানিকদা আমি আপনার ছবিতে অভিনয় করতে চাই। উনি মৃদু হেসে বললেন, 'জানি তুমি অভিনয় করো, তবে তুমি আমাদের ছবি তুলবে। ডালটনগঞ্জে আগামী সপ্তাহে শুটিং আছে। চলে এসো।'

ডালটনগঞ্জে আমি ইউনিটের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে যেতে পারিনি। অভিনয়ের জন্য আটকে যাওয়ায় পরে আলাদাভাবে পৌঁছেছিলাম। গিয়ে শুনি আমি এসেছি কিনা উনি তা বারেবারে খোঁজ নিয়েছেন। পরের দিন সকালে শুটিং হচ্ছে। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—তুমি এসে গেছো। ভালোই হয়েছে। প্রত্যেকটা শটের ছবি নেবে। আমি ভুলে যেতে পারি, কিন্তু তুমি কোনো ছবি নিতে যেন ভুলে যেও না।' এইভাবে উনি জানিয়ে দিলেন যে, আমি এখানে অনাহুত নয়। ওনার আমন্ত্রণেই এখানে এসেছি। আজ

থেকে আর গ্রুপের বাইরের লোক নই। সেদিন উনি যে মর্যাদা, গুরুত্ব দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তাতে আমার আগামীদিনের জীবন পথটাই সম্পূর্ণ বদলে গেল। কিভাবে ছবি নেবো, কোন জায়গাটা ধরবো—সেসব সহজ করে বুঝিয়েছিলেন। আমার ভিতরে ছবি তোলার ব্যপারে এতটা স্বতন্ত্র ভালোবাসার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই।

এইভাবে আস্তে আস্তে পরম আত্মীয়ের মতো কাছে টেনে নিয়েছিলেন। কোনো অবহেলা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব নেই। পর্বতের মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্ব দিয়ে আমাকে আপন করে নিয়েছেন। এরপর থেকে আমি তাঁকে কখনো ছাড়িনি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির মুহূর্তে অনেকটাই প্রায় আমার ক্যামেরায় ধরা আছে।

রাজস্থানে সোনার কেল্লা-র শুটিং হচ্ছে। আমি তখন দলের অন্যতম সদস্য। এফ টি. বি. ক্যানন ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছি। প্রাণভরে অজস্র ছবি তুলেছি। গুরুত্বপূর্ণ সব মুহূর্ত ধরেছি। কিন্তু কলকাতায় ফিরে চূরান্ত হতাশ। ক্যামেরার ভিতরে আলো ঢুকে সব নেগেটিভ নষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকদিন বাড়ি থেকে বেরোইনি। কোনোকিছুই ভালো লাগছে না। লজ্জায় মানিকদার কাছে যেতে পারছি না। উনি কারো কাছে বোধহয় এই বিভ্রাটের কথা শুনেছিলেন। ডেকে পাঠালেন। ভয়ে ভয়ে গেলাম। স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'আমি সব শুনেছি। মন খারাপের কি আছে। আবারতো শুটিং করবো। তখন সাবধানে ছবি নিও।' এইভাবে আমাকে সবসময় উৎসাহ দিয়ে গেছেন।

কখনো কাউকে বকতে শুনিনি। একেবারেই রাশভারি নয়। হাসলে জোরেই হাসতেন—প্রাণখোলা সে হাসি। মার্জিত রুচিবোধ, মুক্তমনে কথা বলতেন। শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে কতরকম যে মজা করতেন। সন্ধ্যের পর তাস খেলতেন। ম্যাজিক ভীষণ প্রিয় ছিল। প্রায়ই দেখতাম শিস দিয়ে বিভিন্ন গানের সুর করতে। অসম্ভব ভালো পিয়ানো বাজাতে জানতেন।

মানিকদার সঙ্গে আমার একটা অদ্ভুত মানসিক যোগ ছিল। দীর্ঘ ২৫ বছরে একশোটা কথা বলেছি কিনা সন্দেহ কিন্তু আমরা চোখে চোখে অনেক কথা বলেছি। মানিকদার চোখের ভাষা আমি পড়তে পারতাম। উনি কি বলতে চান, কিসে বিরক্ত হচ্ছেন, কোনটা ঠিক পছন্দ নয়—তা মানিকদার চোখের দিকে তাকালেই আমি টের পেতাম। উনি প্রায়ই বলতেন, 'নিমাইকে আমার বেশি বলতে হয়না—ওর কাজ ও ঠিক করে যায়।' যোগীপুরুষের মত সাধনা, একাগ্রতা, গভীর নিষ্ঠার যে বলবান প্রত্যয় মানিকদার মধ্যে দেখেছি, তার আলোতেই আমরা নিজেরাও ভেতরে ভেতরে সেইভাবে তৈরি হয়েছি।

যখন ইচ্ছে হ'ত তখনই মানিকদার বাড়িতে যেতাম। হয়তো কিছু কাজ করছেন, নয়তো পড়ছেন। বিরক্ত না করে একটু দূরে চুপচাপ বসে থাকতাম। ভালো ম্যাগাজিন এলে ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত কোনো নতুন লেখা বেরুলে উনি ছুঁড়ে দিতেন। বলতেন, 'ওমুক পাতার লেখাটা দেখো—কাজে লাগবে'। একেবারে বাড়ির লোকের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। ঘরের সব বই কোথায় কি আছে মুখস্থ ছিল। নিজের হাতেই দরজা খুলে দিতেন—ফোন এলে নিজেই ধরতেন—দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন। বাড়িতে সাধারণত পাজামা পাঞ্জাবী পরেই থাকতেন।

মানিকদার মতো নিষ্ঠা, দৃঢ় প্রত্যয় আমি আর কারোর মধ্যে দেখিনি। সমস্ত কিছুই

একটা নিখুঁত পরিকল্পনায় বাঁধা ছিল। তবে মানিকদার ছেলেও যথেষ্ট গুণী। তার কাছেও আমাদের অনেক প্রত্যাশা। সন্দীপ পথের পাঁচালী-র মতো ছবি করতে না পারলেও হিচ্‌ককের মতো ছবি নিশ্চয়ই করতে পারবে। নিজেই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ক্যামেরা অপারেট করছে। টেকনিক্যালি ও বড় হতে বাধ্য। মানিকদার মা যেভাবে তাঁকে মানুষ করেছেন, সন্দীপ তো সেভাবে বড় হয়নি। তবু আমার স্থির বিশ্বাস, সন্দীপও অনেককে ছাড়িয়ে যাবে।

মানিকদা নিজেই অসম্ভব ভালো ছবি তুলতেন। যেটা আমার পক্ষে বেশ সুবিধার হয়েছে। শিক্ষকের মতো উনি আমাকে মন্ত্র পড়িয়েছেন—ওনাকে ধোঁকা দেওয়া মুশকিল ছিল। উনি সাধারণত সাদা-কালো মাধ্যমেই ছবি পছন্দ করতেন। তাতে অনেক সহজ ছিলেন। পরে অবশ্য যুগের পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছিলেন।

বিভিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যেমন একে একে তুলে এনেছেন, তেমনি স্থির ফটোগ্রাফার হিসাবে আমাকেও প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অসম্ভব মানুষ চিনতেন। কার মধ্যে কি আছে যেন দেখতে পেতেন। প্রথম থেকেই আমাকে হয়তো ভালো লেগেছিল আর ভালোবেসেছিলেন বলেই সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ থেকে হাত ধরে তুলে এনে খ্যাতির কেন্দ্রে হাজির করেছেন। তাঁর সংস্পর্শ আমাকে গৌরবময় করেছে।

সত্যজিৎ ঃ শহুরে অপু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হরবোলা নামে আমাদের নাটকের দল ছিল। সিগনেট প্রেসের দিলীপ কুমার গুপ্ত ছিলেন এর প্রাণপুরুষ। আমাদের নাটক পরিচালনা করতেন কমল কুমার মজুমদার। গান শেখাতেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং সন্তোষ রায় নামক ফৈয়াজ খাঁর এক শিষ্য। আমাদের রিহার্সাল ছিল জমজমাট এক ব্যাপার। ঠিক নাটকের টানে নয়, বিখ্যাত ওই সমস্ত ব্যক্তিদের কাছে নানারকম গল্প শোনাই ছিল এর প্রধান আকর্ষণ। দিলীপকুমার গুপ্ত যে অপিসে কাজ করতেন সেই ডি. জে. কিমার-এর বেশ কয়েকজন কর্মী আমাদের এই নাটকের অভিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন এবং নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে নানারকম সাহায্য করতেন। এই ডি. জে. কিমারেরই একজন কর্মী ছিলেন সুকুমার রায়ের তরুণ পুত্র সত্যজিৎ রায়। শান্তিনিকেতন থেকে পাশ করে আসার পর দীলিপকুমার গুপ্ত তাঁকে ডেকে চাকরি দেন। তখন সত্যজিতের বাবার বইগুলি দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল। দিলীপকুমারের উদ্যোগে সিগনেট থেকে সেগুলি নতুনভাবে ছাপা হতে শুরু করে। সুকুমার রায়ের মূল ছবিগুলির সঙ্গে সত্যজিৎও ওই সব বইতে কিছু কিছু ছবি এঁকেছেন। সিগনেট প্রেসের আরও অনেক বইয়ের মলাট ও ভেতরের ছবি আঁকতেন সত্যজিৎ রায়। বিভিন্ন সময়ে কথাসূত্রে দিলীপকুমার জানতে পেরেছিলেন যে প্রখ্যাত লেখক সুকুমার রায়ের এই পুত্রটি বাংলা বই বিশেষ কিছুই পড়েননি। এমনকি পথের পাঁচালীর কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু' বইটির মলাট ও অলঙ্করণের সময়েও মূল পথের পাঁচালী উপন্যাসটি পড়া ছিল না সত্যজিৎ রায়ের। দিলীপকুমার গুপ্ত তাঁকে বাংলা বই পড়তে উৎসাহিত করেন এবং অমাদের হরবোলা ক্লাবটিতে তাঁকে মাঝে মাঝে ডেকে আনতেন। সেই সময়ে সত্যজিৎ রায়কে দেখেছি। আমাদের প্রথম নাটক 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' অভিনয়ের সময়ে মঞ্চ সজ্জা করার কথা ছিল সত্যজিৎ রায়ের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেটা হয়ে ওঠেনি। মঞ্চ সম্পর্কে কমলকুমার মজুমদারেরই নিজস্ব অভিনব পরিকল্পনা ছিল।

হরবোলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার আর সে রকম কোনও যোগাযোগ ছিল না। তবে ডি.জে. কিমার অফিসে দিলীপ গুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে গেলে কখনও কখনও এই দীর্ঘকায়, সুদর্শন পুরুষটির সঙ্গে দেখা হয়ে যেত।

এর মধ্যে পথের পাঁচালী ফিল্মটি মুক্তি পেয়েছে। আমি তাঁর দিকে নতুন মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম। একদিনের কথা মনে আছে, বাইরের একজন লোক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করেছিল, পথের পাঁচালীতে ইন্দির ঠাকুরুণের শবদেহ যখন বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন বলহরি-হরিবোল ধবনি দেওয়া হয়নি কেন? সত্যজিৎ রায় উত্তর দিয়েছিলেন সেই দৃশ্য দেখে যদি হলের দর্শকরাও বলহরি হরিবোল বলে চেঁচাতে শুরু করেন। তাঁর ছবি সম্পর্কে সাধারণ লোকের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তিনি মফঃস্বলের অনেক সিনেমা হলে গোপনে নিজের ছবি দেখতে যেতেন এবং দর্শকদের নানারকম মন্তব্য

শুনতেন। পরে অবশ্য তাঁর চেহারাটা যখন খুব পরিচিত হয়ে যায় তখন আর এভাবে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে মিশে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

হঠাৎ যেদিন তিনি টেলিফোনে আমাকে অরণ্যের দিনরাত্রি উপন্যাসটি সিনেমা করার প্রস্তাব জানান সেদিন খুবই অবাক হয়েছিলাম। উপন্যাস লেখক হিসেবে তখন আমার বিশেষ কোনও পরিচিতি ছিল না। দুটো তিনটে লিখেছি মাত্র। কবিতা লেখা নিয়েই তখন মত্ত হয়ে ছিলাম।

অরণ্যোর দিনরাত্রি উপন্যাসটিও লিখেছিলাম আকস্মিকভাবে। আমাদের কবিতা পত্রিকা 'কৃত্তিবাস' ছাপার জন্য একটা প্রেসের কাছে ধার জমে গিয়েছিল। সেই প্রেস থেকেই ছাপা হত 'জলসা' নামে একটা সিনেমার পত্রিকা। প্রেসের মালিক আমাকে শর্ত দিলেন জলসা পত্রিকার পূজা সংখ্যায় একটা উপন্যাস লিখে দিলে কৃত্তিবাসের জন্য ধার কাটাকুটি হয়ে যাবে। এটা আমার কাছে একটা লোভনীয় প্রস্তাব। উপন্যাসের প্লটেব কথা বিশেষ চিন্তা না করে আমার ও কয়েকজন বন্ধুর জীবনের কয়েকটি ঘটনা লিখেছিলাম অরণ্যের দিনরাত্রি নামে। সেই লেখাটি সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল কীভাবে সেটা একটা রহস্য।

এই বিষয়ে ওঁর সঙ্গে যেদিন প্রথম আলোচনা হয় সেদিন একটা ব্যপারে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ততদিনে উপন্যাসটির অনেক কিছুই ভুলে গেছি। কিন্তু সত্যজিৎ রায় যেন পাতার পর পাতা মুখস্থ করে ফেলেছেন। সামান্য খুটিনাটির দিকেও তাঁর মনোযোগ। এমনকি আমি যা লিখিনি ইংরেজিতে যাকে বলে 'ইন বিটুইন দ্য লাইনস' তাও তিনি উল্লেখ করছিলেন বারবার। তিনিও আরও জানতে চাইছিলেন চরিত্রগুলির পটভূমিকা। তাদের মা বাবার কথা। তারা আগে প্রেমে পড়েছে কিনা কিংবা প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে কি না। যে অরণ্যের কথা আমি লিখেছিলাম উনি জানতে চাইছিলেন তার গাছপালার চরিত্র। শীতকালে সেখানকাব কত পারসেন্ট গাছের পাতা ঝরে যায়। আরেকটা মজাব প্রশ্ন কবেছিলেন। ওই উপন্যাসে মহুযার মদ খেয়ে নেশা করার দৃশ্য আছে। উনি জানতে চাইছিলেন মহুয়া খেতে কিরকম? আমি উত্তরে বলেছিলাম দুধের স্বাদ যেমন না খেলে কিছুতেই বোঝা যায় না মহুয়াও সেরকম। উনি প্রাণখোলা গলায় উচ্চহাস্য কবেছিলেন। দু হাত নেড়ে বলেছিলেন, না না আমি মহুয়া খেতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কি অরণ্যের দিনরাত্রি ফিল্মে চার বন্ধুর মহুয়ার মদ খেয়ে নেশা করার দৃশ্যটি ঠিক বাস্তব হয়নি। ওই ধরনের মদে একরকমের ইউফোরিয়া হয়। চেঁচামেচি বা নাচতে গাইতে ইচ্ছে করে অথবা ঝগড়া মারামারি। আমরাও এইসবই করতাম। কিন্তু ফিল্মে ওরা চারজনই কেমন যেন ঝিম মেরে চুপ করে রইল। নেশাগ্রস্ত আদিবাসী মেয়েটি যখন হাত বাড়িয়ে ওদের কাছে কিছু চেয়েছিল তখন সে কিন্তু পয়সা চায়নি সে এমন কিছু চায় যা সে নিজেই জানে না।

আরেকটি দৃশ্য নিয়েও ওঁর সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়েছিল। গভীর রাত্রে জঙ্গলের শুঁড়িখানা থেকে ডাকবাংলোয় ফেরার পথে আমরা এক এক করে সমস্ত জামাকাপড় খুলে ফেলেছিলাম। অরণ্যে অন্য কেউ দেখার নেই। পোশাক সেখানে অবান্তর। বাঘ, হরিণ, ভাল্লুকেরাও জামা কাপড় পরে না। আমরা সত্যিই এ রকম করেছিলাম। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে আমাদের উপর হেডলাইট ফেলেছিল। সেই গাড়ির

চালক আমাদের কী ভেবেছিল জানি না, দারুণ স্পিডে পালিয়ে যায়। এই দৃশ্যটি সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করেছিলেন সত্যিই কি এই চারজনের গায়ে একটু সুতোও থাকবে না। আমি বলেছিলাম, ফিল্মে নগ্ন নারী দেখাতে গেলে সেনসরশিপের অনেক ঝামেলা থাকে, কিন্তু নগ্ন পুরষ দেখালে বোধহয় কোনও আপত্তি হবার কথা নয়। প্রথমে উনি রাজিও হয়েছিলেন মনে হয়, পরে অবশ্য দৃশ্যটা বদলে যায়। কুয়োর ধারে স্নান করার সময়ে ওই চার বন্ধুর পরিধানে ছিল নামমাত্র বস্ত্র। হঠাৎ সেখানে এক নারী এসে উপস্থিত হওয়ায় ওরা খুব লজ্জা পেয়ে যায় এবং গামছা তোয়ালে ইত্যাদি টেনে নিজেদের শরীর আড়াল করে।

আমার লেখার তুলনায় ফিল্মের এই দৃশ্যটি অনেক ভদ্র-সংযত।

চার বন্ধুর মধ্যে একজনের নাম ছিল রবি, কিন্তু যেহেতু রবি ঘোষও ছিলেন অন্যতম অভিনেতা তাই শুটিঙের সময়ে নামের গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। রবি নামটি পাল্টে হরি করা হয়। এই বদলটা ঠিক মনঃপুত হয়নি আমার। প্রত্যেক নামের ধ্বনির সঙ্গে চেহারার একটা কিছু রূপ ফুটে ওঠে। রবি আর হরি নামের দুজন যুবক একরকম হতেই পারে না। অবশ্য এর জন্য ফিল্মটির কেনও ত্রুটি হয়নি। অরণ্যের দিনরাত্রি ফিল্মটি তৈরি হওয়ার পর আমি যতদূর সম্ভব নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত থাকার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি।এটা কাল্পনিক কাহিনী হলে হয়তো সম্ভব ছিল, কিন্তু এর অনেক ঘটনাই আমার ও বন্ধুদের জীবনে ঘটেছিল। সুতরাং তার কিছু-কিছু যখন বদলে যায় তখন আমার কাছে কেমন অবিশ্বাস্য লাগে। শুধু আমার কাছে। অন্য দর্শকদের কাছে এ পরিবর্তন চোখেই লাগবার কথা নয়। প্রথমবার এই ফিল্মটি দেখে ঠিক ভাললাগা মন্দলাগা নয়, আমি কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। পরে অনেকবার দেখেছি, ছবিটির অন্য গুণাগুণ বুঝতে পেরেছি এবং ক্রমশই বেশি ভাল লেগেছে।

ঠিক পরের বছরই তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী উপন্যাসটির চিত্ররূপ দিলেন। এর মধ্যে একবার আমার আত্মপ্রকাশ উপন্যাসটি নিয়েও তিনি কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। আত্মপ্রকাশ উপন্যাসের অধিকাংশ দৃশ্যই কলকাতার রাস্তা ঘাটে— সেই ষাটের দশকের শেষ দিকে কলকাতার রাস্তা কখনওই প্রায় স্বাভাবিক থাকত না। কলেজগুলোতে নকশালপন্থী গরম হাওয়া, যখন-তখন বোমা ফাটছে, পুলিশ কলস্টেবল ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ছে আর ক্রুদ্ধ পুলিশেরা বেপরোয়া হয়ে এলোপাথাড়ি টিয়ার গ্যাস গুলি চালাচ্ছে। আমরা সেই সময় কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে যেতে গেলে পুলিশের সাঁজোয়া গাড়ির সামনে মাথার উপর দুহাত তুলে রাখতাম। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন কলকাতার রাস্তায় শুটিং করা সম্ভব নয়। আত্মপ্রকাশের পরিকল্পনা তাই বেশি দূর এগোয়নি। তবে এই সমসাময়িক বাস্তবতা তিনি উপেক্ষা করতেও পারেননি। সেইজন্যই কি প্রতিদ্বন্দ্বীর কাহিনীটা বেছেছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর দুইভাইয়ের মধ্যে একজন এই সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিক্ষুব্ধ, আরেকজন পুরোপুরি বিপ্লবপন্থা নিয়েছে। আর তাদের বোন অন্যের হাতের খেলার পুতুল হতে গিয়েও মাথা ঝাঁকিয়ে সরে যাচ্ছে বারবার।

প্রতিদ্বন্দ্বীর চিত্রনাট্যেও মূলকাহিনীর কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু এ সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ কিছু আলোচনা হয়নি। হয়তো সে সময়ে আমি কলকাতার

বাইরে ছিলাম। প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিবর্তন আমার কাছে একটুও অস্বাভাবিক লাগেনি বরং আমার মনে হয়েছিল কাহিনীটিকে তিনি আরও উন্নত রূপ দিয়েছেন। শেষ দৃশ্যটির ব্যঞ্জনা আমার কাহিনীকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে।

এই দুটি ছবি তৈরি করার সময়ে আমার কাছে অনেকেই আসত যাতে আমি তাঁদের সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে দিই। ট্রামে, বাসে, রেস্তোরাঁয় অচেনা-অচেনা ছেলেমেয়েরা আমাকে এসে চেপে ধরত। সত্যজিৎ রায় অবশ্য আগেই আমাকে এ-ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন আপনি কাউকেই চিঠি লিখে পাঠাবেন না, ওতে কোনও লাভ হয় না। আপনার চিঠিকেও অবজ্ঞা করাটা ঠিক না। তিনি সব সময়ে নতুন-নতুন ছেলেমেয়েদের ঠিক চরিত্র অনুয়ায়ী খুঁজে বার করতেন। একবার একটা মজার কথা বলেছিলেন— চরিত্র অনুযায়ী মেয়েদের পাওয়াই বেশি শক্ত। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কোনও মেয়েকে পেছন থেকে দেখে চমকে উঠেছি। শরীরের গড়ন, উচ্চতা ও হাঁটার ভঙ্গি অবিকল আমি ঠিক যেমনটি চাই আমার একটি চরিত্রের জন্য। কিন্তু সামনে গিয়ে মুখখানা দেখে বিংবা চাহনি দেখে হতাশ হতে হয়েছে।

ফিল্ম সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়াও সত্যজিৎ রায়কে আমি বেশি জানতাম একজন লেখক হিসেবে। একসময়ে আমি শারদীয় সংখ্যা খুলেই প্রথমে রাজশেখর বসুর লেখা পড়তাম। তিনি গত হলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায় যবে থেকে লিখতে শুরু করলেন তবে থেকে আমি তাঁর লেখাই দুরন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রথম পড়ি। অনেক সময়ে আমার ছেলে বা স্ত্রীর সঙ্গে এই জন্য শারদীয় সংখ্যা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে হয়েছে। একটা বিস্ময়বোধ আমার এখনও কাটেনি, কৈশোরে বা যৌবনে যিনি একেবারেই লেখালিখির চর্চা করেননি তিনি প্রায় চল্লিশ বছরে পা দিয়ে হঠাৎ লিখতে শুরু করেই কী করে এত সাবলীল স্বচ্ছ গদ্য লিখতে পারলেন। পারিবারিক ট্রাডিশন অনুযায়ী তাঁর প্রতিটি লেখাই অত্যন্ত সরস। কিশোর সাহিত্যে তাঁর প্রতিটি লেখাই অত্যন্ত সরস। কিশোর সাহিত্যে তাঁর এই দিগ্বিজয় দেখে মনে হয় অত বড় লম্বা চেহারা ও গম্ভীর গলার মানুষটির মধ্যেও আগাগোড়া যেন একটি কিশোর লুকিয়ে ছিল। তিনি নিজেই যেন শহুরে অপু। অপুর বিস্ময়ভরা চোখ দুটি ছড়িয়ে আছে তাঁর সমস্ত রচনায়।

'যেটুকু পেয়েছি ......'

মাধবী মুখোপাধ্যায়

'মহানগর'-এর আরতি যেমন একরাশ দ্বিধা নিয়ে প্রথম পা বাড়িয়েছিল অন্দর মহলের বাইরে, কিন্তু, চৌকাঠটা পার হবার পরেই অচেনা এক মুক্তির স্বাদে, স্বাধীনতার আনন্দে বা অভূতপূর্ব এক প্রাপ্তির বিহ্বলতায় তার মন উঠেছিল কানায় কানায় ভরে— আমার সেদিনের সেই অনুভূতিও ছিল ঠিক তেমনই। আরতিরই মতন বা তার চেয়েও কিছু বেশি দ্বিধা বা সংশয় নিয়ে আমি প্রথম পা ফেলেছিলাম সত্যজিৎবাবুর লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে। বুকের তলায় যত কাঁপুনি— ততখানিই সংশয়।

সংশয়ের শুরু হয়েছিল প্রথম ডাক আসার মুহূর্তটি থেকেই। ডাকতে এসেছিলেন অনিলবাবু আর দুর্গাবাবু, আমাদের কাশী মিত্র রোডের বাড়িতে। সত্যজিৎবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে। ওঁরা চলে যেতে অবিশ্বাসী মন নিয়ে মাকে বললাম, 'ডেকেছেন ডাকুন, কিন্তু, ওঁর তো আর সত্যিই আমাকে পছন্দ হবে না। মিছিমিছি যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়াটা আর কেন গুনব.... এই অভাবের সময়ে।' সত্যিই তখন খুবই অভাবে দিন কাটছিল আমাদের। এদিকে আমার কথা মাত্র শেষ হয়েছে— ওঁরা দুজন আবার ফিরে এলেন— 'আপনার ট্যাক্সি ভাড়াটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, এই নিন।' লজ্জায় মরি আমি। যাইহোক, যথাসময়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে আমি রওনা হলাম।

মনে আছে, গিয়েছিলাম একেবারে বিনা সাজেই। এমনিতেই খুব একটা সাজসজ্জায় মনোযোগী ছিলাম না আমি, সে সময়— তবুও, বাইরে বেরোলে যতটুকু বাড়তি যত্নের ছোঁয়া থাকত প্রসাধনে, সেদিন সেটুকুও ছিল না। মাইনাস দুই পাওয়ারের চোখ ঢাকা ছিল আমার সেলের চশমায়। ট্যাক্সিতে বসে মাকে বললাম— 'নাই বা আমায় পছন্দ হল ওঁর, আমি তো এই সুযোগে একটিবার ওঁকে দেখে আসতে পাবব— এই আমার ঢের।'

এরপর গেলাম, দেখলাম, অভিভূত হলাম কিন্তু আত্মবিস্মৃত হলাম না। স্পষ্ট শুনলাম উনি বলছেন 'আউটডোর থেকে ফিরে এসে পরে যোগাযোগ করব।' ওঁরা তখন বের হবেন 'অভিযান'-এর আউটডোরে— তারই তোড়জোড় চলছে। শুনে হাসলাম। এই 'পরে যোগাযোগ করব' কথাটা এতবার শুনেছি— এর অর্থ আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার।

ফিরে এলাম। দিন কাটতে লাগল। ফিরে এলেন ওঁরাও ওঁদের সময়মতনই। আবার ডাক পড়ল। আমি আশ্চর্য হলাম— বিশ্বাসই হতে চায় না। এরপর যে স্বপ্নের মতো ঘটে গেল সবকিছু। উনি স্ক্রিপ্ট পড়ালেন— স্ক্রিপ্ট দিয়েও গেলেন। আমার মনে, মননে, সত্তায় 'আরতি' ছেয়ে গেল।

'মহানগর' শুরু হল। শেষও হল এক সময়। আরতির মতো মার্জিত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর সেদিন আমিও। আমার চোখের সামনে বাইরের মহাপৃথিবীর একটা জানালা খুলে গেল। কিন্তু জানালার বাইরে যে বিশাল আকাশ তাকে কী জানালায় দাঁড়িয়ে পুরোটা

মাপা যায়? তাই আমি যদি বলি, উনি মানুষ হিসেবে অসাধারণ— পুরোটা বলা হয় না। যদি বলি, অসাধারণ অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ, তাতেও সবটা অনুভব করা যায় না। যদি বলা যায় মহান শিল্পী, তাতেও অনেকটা বাকি থেকে যায়। তাই, বিশাল আকাশের 'বিশালত্ব'-কে আমি আমার জানালায় দাঁড়িয়ে মাপি— আমি বলি, আমি ছিলাম একতাল মাটি। উনি পরম যত্নভরে তার থেকে তিনটি পুতুল গড়েছিলেন— আরতি, চারু আর করুণা। আর আমি প্রাণপণ প্রয়াসে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলাম— তারা 'প্রতিমা' হয়ে গেল। এরকম যদি বলি, হয়তো কিছুটা বোঝা যায় তাতে। তাই বিশাল আকাশকে মাপার চেষ্টা করিনি আমি সেদিনের আগে।

সেদিন ছিল 'মহানগর'-এর শেষ শুটিং-দিন। খোলা রাস্তায় কাজ করেছিলাম। কাজের শেষে উনি বললেন ঃ 'তোমার সঙ্গে আবার কবে কাজ করব?'

চমকে উঠেছিলাম, অবাক হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এটা তো আমার বলার কথা!

এরপরে 'চারুলতা'। স্ক্রিপ্ট শুনলাম। শেষ দৃশ্যটা লেখা নেই তাতে। প্রশ্ন করলাম। বললেন ঃ 'পরে বলব।' সেই পরে, দেখেছিলাম, অনুভব করেছিলাম। কী অসাধারণ সেই শেষ!

'চারুলতা'-র পরে 'কাপুরুষ' করতে গিয়ে মনে হল— আর নয়। এবার থামা দরকার। আর আমার ওঁর ছবি করা উচিত নয়। নিজেকে থামিয়ে দিলাম, গুটিয়ে নিলাম। আজ আমার কোনও অসম্পূর্ণতা নেই। নেই কোনও শূন্যতাও।

আমি যেটুকু পেয়েছি তাতেই আমি তৃপ্ত, ধন্য। উনি দীর্ঘায়ু হোন। সক্ষম থাকুন আজীবন। সুন্দর-সুন্দর প্রাপ্তিতে বার বার ভরিয়ে দিন তামাম দর্শকের মন। সে দর্শক আমিও। সব ছবির আমি গুণগ্রাহী। কোনওটার মাত্রা কম.... কোনওটার বেশি, এই যা। আর, আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে তিনটি প্রতিমা আর একটি শেষ-কথা। যেখানে এক গল্পের এক নায়িকা যবনিকাপাতের আগে নবার্জিত রিয়েলাইজেশান তথা চেতনার মজবুত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এক আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে— 'না থাক'।

অনুলিখন ঃ পৃথা সর্বাধিকারী

সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে

অপর্ণা সেন

মানিককাকার আর আমার বাবার পরিচয় যখন, তখন ওঁদের দু'জনেরই বোধহয় বছর পনেরো বয়স। এবং উনি তারপর আমাদের পারিবারিক বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁদের সঙ্গে আমাদের বৈবাহিক সূত্রে কিছু জানাশোনা ছিল। মানে, কুটুম আর কি। তো সেইজন্যেই আমাকে অনেকবারই দেখেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজে দেখেছেন। পারিবারিক অনুষ্ঠানে দেখেছেন। কোনো সময় হয়তো মনে হয়েছিল, এই মেয়েটিকে কাজে লাগানো যেত পারে। উনি যখন 'অপুর সংসারে'র জন্য মেয়ে খুঁজছেন, তখন আমাকে বোধহয় দেখেছিলেন। আমার বোনের জন্মদিনে আসার বাহানা করে আমাকে দেখে গিয়েছিলেন। তখন বোধহয় আমাকে তার খুব ছোট মনে হয়েছিল। সম্ভবত সুকৃতি ঠাকুর বলে একটি মেয়েকে নেবার কথা হয়েছিল 'সমাপ্তি'তে। তবে কি কারণে নেওয়া হলো না, সেটা আমি জানি না। তখন আমার বাবাকে ফোন করেছিলেন, এবং ফোন করে আমাকে চাইলেন। আমাকে এমনিতে হয়তো সিনেমায় অভিনয় করতে দেওয়া হতো না, যদিও আর সবাই জানতো আমি অভিনেত্রী হবো। সেটা আমার বাসনাও ছিল। স্কুল-টুলে অভিনয় করতাম। প্রাইজ পেয়েছি। যেহেতু সত্যজিৎ রায়ের ছবি, এতবড় নামকরা ডিরেক্টর, তার ওপর এত বন্ধুত্ব। সেটা বোধহয় রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ ছিল, সেসব কারণেই আর রবীন্দ্রনাথের গল্প বলেই আমাকে দেওয়া হল। ছবিটিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা বলতে তো বিরাট লম্বা একটা পিকনিকের মতো। 'সমাপ্তি'তে কাজ করতে আমরা যে নিমতিতায় গেলাম, সেখানে তো আমার পিকনিক মনে হতো। অন্যান্য আউটডোরে পরে তো অনেক জায়াগাতেই গিয়েছি। জুয়োখেলা, মদ্যপান, পরচর্চা, অনেককিছুই অনেক জায়গায় দেখেছি। মানিককাকার ইউনিটে সেগুলো হতো না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন, প্রোডাকশনের ভানুকাকা ছিলেন, সবাই তখন কাকা এমনকি সৌমিত্রকেও তখন কাকা বলতাম। আমার মাও ছিলেন। আমরা সবাই মিলে তখন খেলতে বসতাম। নানানরকম খেলা। 'ক্যাটিগরিস' বলে একটা খেলা ছিল। নানান রকম কথা বানানোর খেলা। শব্দের খেলা। মেইনলি বুদ্ধির খেলা আর কি। সেটা মানিককাকা চিরকালই ভালোবাসতেন। পরে দেখেছি, তখনও দেখেছি। বেশ মজাই হত। খুব হই হই করে কাজটা হয়ে যেতো।

আমি অন্যান্য বহু পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছি। নানা ধরনের ছবিতে। তবে তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকের সঙ্গেই মানিককাকার তুলনা করা যায়। কারণ তিনি তাঁদের অনেকেরই মাথা ছাড়িয়ে অনেক ওপরে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কাজ করে আমার যে ভালো লাগেনি তা নয়। অনেকেরই কাজ ভালো লেগেছে। অনেকের কাছ থেকে অনেক রকম কাজ শিখেছি। তবে মানিককাকার মধ্যে যেটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতো, সেটা হচ্ছে যে ছবিটা মানিকাকা বানাচ্ছেন, তার সমগ্র চেহারাটা সবসময় মাথায় রাখতেন। মানিকাকা কখনো একটা মুহূর্তের ভালোলাগাকে গ্রহণ করতেন না। হয়তো একটা মুহূর্ত

খুব ভালো লাগছে, ওঁর খুব ভালো লেগেছে। বললেন, 'এটা তো বেশ, এটাতো বেশ।' তারপরই বললেন ঃ 'না থাক, এটা, বুঝলে, এটা ঠিক যাবে না গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে।' এরকমভাবে সব সময়ই এই বিচারটুকু মাথার মধ্যে করে নিতেন। এটা আমি খুব লক্ষ্য করতাম যে, একটা জিনিস সকলের খুব ভালো লেগেছে। ওঁরও খুব ভালো লেগেছে। উনি বললেন, "দারুণ, দারুণ, দারুণ"। বলেই তারপরই বললেন, না। ইটসেল্ফ হয়তো দারুণ হতে পারে, কিন্তু ছবির সমগ্র চেহারাটা ধরলে নয়। অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয়।

ওই বোধটুকু খুব পরিষ্কারভাবে ছিল মাথার মধ্যে। আবেকটা জিনিস দেখতাম, যেটা আমি যখন ছবি পরিচালনা করেছি, তার দ্বারা খানিকটা প্রভাবিতও হয়েছি। তা হলো মানিককাকা অভিনেতাদের যেভাবে ব্যবহার করতেন বা যেভাবে হ্যানড্ল করতেন। সেটার মধ্যে একটা দারুণ ব্যাপার ছিল। প্রথমত, উনি যে কাস্টিং করতেন চেহারা দেখে করতেন। মানে, 'পহেলে দর্শনধারী' যাকে বলে। চেহারাতে যদি চবিত্রটা মানিয়ে যেতো, মোটামুটি সাজিয়ে নিতেন হয়তো। মনে মনে সাজিয়ে নিতেন। তাকে সাজালে যে চরিত্রেব মতো দেখাবে, সেটাই বোধহয় ওঁর মনে প্রথম ভাবনা ছিল। তাবপর তাব অভিনয় ক্ষমতা-টমতাগুলো কেমন হবে সেগুলো নিয়ে ভাবতেন। আসলে চরিত্রেব মতো যদি না দেখায় তাহলে কিন্তু খুব অসুবিধে হয়। কারণ, যে জায়গায় চেহাবাব গুণে একজন সাধারণ অভিনেতা-অভিনেত্রীও পৌঁছে যান, খুব ভালো অভিনয করেও চেহারাব বৈসাদৃশ্যের জন্য সেখানে পৌঁছানো যায় না। এটা মানিককাকা খুব ভালো করে বুঝতেন। সিনেমা মিডিয়ামে এটা খুব জরুরী কথা। আর একটা জিনিস হচ্ছে, উনি কখনো রাগ করতেন না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ওপর রাগ করতেন না। মানিককাকার একটা ব্যাপার ছিল। যেমন বলতেন ঃ 'ফাইন! খুব ভালো! আর একটা আর একটা শট নেবো'। আমি 'সমাপ্তি'র সময় মাকে বলতাম 'মা, ফাইন বললেন, তবে আর একটা নেবেন কেন?' এটা আমাব সব সময় মনে হতো, ফাইন যখন, তখন আর একটা নেবেন কেন? ভুলটা বলছেন না কেন তাহলে! সেটা আমি ভাবতাম তখন, আমার মনে আছে। কিন্তু মা তখন বললেন, 'দেখো তোমাকে প্রথমেই যদি বলে দেন, তোমার খুব খাবাপ হযেছে, তোমার মনটা হয়তো ভেঙে যাবে, তাই জন্য।' সেটা খুব সত্যি, তাতে মনটা হযতো ভেঙে যায়। অনেক সময় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের হয়তো কনফিডেন্স চলে গেল। কনফিডেন্স চলে গেলে কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রী আব অভিনয় করতে পারবেন না। অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং আমার তোমার প্রতি আস্থা আছে, কনফিডেন্স আছে, এই ব্যাপাবে আশ্বস্ত করতে হবে। তারপর হয়তো শুধরোবার চেষ্টা করতেন। ছোটদেব অভিনয় দেখানোর ব্যাপারে, বা নতুনদের বা যাদের নিজেদের তেমন কিছু দেওয়ার নেই, তাদের বেলায় তিনি অভিনয় করে দেখাতেন একেবারে। এবং মানিককাকার যে ডেলিভাবি, সেটা সোজাসুজি নকল করলেই খুব ভালো অভিনয় হয়ে যেতো, স্ক্রিপ্ট পড়ার সময়ে। ডায়লগ পড়িয়ে দেবার সময়। ফার্স্ট সোজা মানিককাকাকে ধরে নকল করা। দ্যাটস এনাফ! তাহলেই যথেষ্ট ভালো অভিনয় হয়ে যাবে। আমার এখনও মনে আছে। আমি একটা ছোট্ট রোল করেছিলাম 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে। সমিত ভঞ্জের সঙ্গে একটা সিন ছিল। তাতে আমার একটা ডায়লগ ছিল, 'সব কথা বুঝিয়ে বলা যায় না হরি।' হরি ওর নাম ছিল। তো মানিককাকা পড়ছেন। এটা অনেক রকম ভাবে তো বলা যায়। সব কথাটার

ওপর জোর দিয়ে বলা তারপর হরি-র ওপর জোর দিয়ে বলা যায়। মানিককাকা 'যায় না'-র ওপর স্ট্রেস দিয়ে বললেন, 'সব কথা বলে বোঝানো যায় না হরি!' এতে কথাটায় এমন একটা বিরক্তি এসে গেল, এই ব্যাপারটা আমার পক্ষে সত্যি বোঝানো অসম্ভব। মোলায়েম করে বলা যায়। মানিককাকা খুব ভালো অভিনেতা হতেন, যদি উনি অভিনয় করতেন। তবে একটা অসুবিধা হতো। কারণ, তাঁর চেহারা এবং ব্যক্তিত্ব এত বেশি ছাপ রাখতো যে, আলাদা আলাদা চরিত্রে অভিনয় করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়তো। সেই ব্যক্তিত্বকে চেপে রাখা খুব মুশকিল। সেটা সত্যজিৎ রায়ই হয়ে যাবে, চরিত্রটা আর হবে না। অথচ উনি খুব সুন্দর করে দেখাতেন।

ওঃ, আর একটা জিনিস বলে নিই। উনি অনন্য কেন, সেটাতে আমার মনে হয়, আমি খুব কম দেখেছি, একদম দেখিনি যে, তা নয়, কিন্তু কম দেখেছি, যেখানে পরিচালকরা একটা আন্তর্জাতিক লেভেলে ভাবনা - চিন্তাটা করেন। সেটা মানিককাকার মধ্যে ছিল। তাঁর পড়াশোনা, তাঁর ভাবনা, সবটাই কোনো কূপমণ্ডুকতার দ্বারা ভারাক্রান্ত ছিল না।

মানিককাকাকে আমার সবসময় ভারতীয় মনে হতো। বাঙালিও খুব মনে হতো। কিন্তু তাহলেও আমার জেনারেলি একটা 'ওয়ার্ল্ড সিটিজেন' মনে হতো। সে অর্থে খুব কসমোপলিটন লাগতো। মানে, ভাবনা-চিন্তায় কোনো বদ্ধতা ছিল না। মানে, মনের জানলাগুলো সব খোলা ছিল।

মানিককাকা বাচ্চাদের দিয়ে অসাধারণ অভিনয় করিয়ে নিয়েছেন। আসলে উনি বাচ্চাদের খুব শ্রদ্ধা করতেন, আমার মনে হয়। আমি তো অলমোস্ট বাচ্চা হিসেবেই কাজ করেছি। টিন এজার। মানিককাকা আলাদা একটা স্তর থেকে, উঁচু একটা স্তর থেকে বাচ্চাদের সঙ্গে নিচের দিকে তাকিয়ে কথা বলা— এই ব্যাপারটা করতেন না। সমানে সমানে কথা বলতেন। আমি শুনেছি, যখন 'সোনার কেল্লা' করছেন, তখন কুশলের সঙ্গে সারা রাস্তা কুশলের সমস্ত প্রশ্নের অত্যন্ত সিরিয়াসলি উত্তর দিতে দিতে গেলেন। আরো গল্প করার লোক হয়তো ছিল, কিন্তু কুশলের সঙ্গেই গল্প করলেন। উনি পছন্দও করতেন বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প করতে। না হলে বাচ্চাদের ওরকম সুন্দর সুন্দর গল্প লিখতেন কি করে! আরেকটা ব্যাপার মানিককাকার ছিল। বলতে গিয়ে অনেক কিছুই মনে পড়ছে। আগের আলোচনার প্রেক্ষিতে, যে, মানিককাকার মতো ডিটেইলের প্রতি এ্যাটেনশন আমি আর কারুর মধ্যে দেখিনি। প্রত্যেকটা ফিল্ডে উনি খুব সিওর ছিলেন, ডিসিশন দিতে পারতেন খুব সুন্দর ভাবে। এবং প্রত্যেক ব্যাপারে মনোযোগ ছিল। কোনো একটা জিনিসও উনি নেগলেক্ট করতেন না। আর্ট ওয়ার্ক, মিউজিক, সেট, সব কিছু একটা আর্টিকেলের মধ্যে দেখেছিলাম যে, বোধহয় বাবারই (চিদানন্দ দাশগুপ্ত) লেখা— মানিককাকা যে স্ক্রিপ্ট লিখতেন এঁকে এঁকে তার মধ্যে 'চারুলতা'-র একটা জায়গায় লেখা 'চারু' চাবির গোছা 'কোথায় রাখে?' এটা ওঁর ভাবনা ছিল 'চাবিটা ও কোথায় রাখে?' সেটা হয়তো ওনাকে দেখাতে হবে না। এই জিনিসটা পরে আমি নিয়েও ছিলাম। 'থার্টিসিক্স চৌরঙ্গী লেন' করতে গিয়ে আমি কিন্তু মিস একটা ফ্যামিলি ট্রি তৈরি করেছিলাম। কার মেয়ে, কে কে বিবাহিত, ক'জন ভাইবোন ইত্যাদি। এগুলো কিন্তু ছবিতে আসছে না। কিন্তু এতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এটা বোধহয় মানিককাকার ইনফ্লুয়েন্স। ডেফিনিটলি

মানিককাকার। মানিককাকার মধ্যে এই ব্যাপারটা ছিল। আর একটা ব্যাপার, মানিককাকার মধ্যে একটা 'অবাঙালি' ট্রেন্ড মানিককাকা খুব পরিশ্রমী ছিলেন। অনেকে খুব অল্প পরিশ্রমে বাজিমাৎ করার চেষ্টা করেন। মানিককাকার সেটা একেবারে ছিল না। খুব ডিটেলে কাজ করতেন। প্রিপারেশনটা খুব বেশি নিতেন। যে কোনো একটা কাজের জন্য যথেষ্ট প্রিপারেশন নিতেন। যেটা প্রয়োজন সেটা করবার জন্য যে পরিশ্রমটা দরকার, সেই পরিশ্রমটা করতেন। পরের দিকে যে আর পারতেন না শারীরিক কারণে, সেটা বোঝা যায় ছবিতে। ছবিগুলো খুবই সুন্দর, স্ট্রাকচার সুন্দর, আইডিয়া সুন্দর, সব সুন্দর। কিন্তু তিনি হয়তো ভোরের শট আর নিতে পারলেন না। শেষের ছবিগুলো করার সময়ে ডাক্তারদের নিষেধ-টিষেধের জন্য যে পার্থক্যটা এসেছিল, আউটডোবের কাজে সেটা বোঝা যায়। কাবণ উনি মাস্টার অব আউটডোর ছিলেন। কিন্তু অসুস্থ থাকার সময় উনি আউটডোরের কাজ আর কতটুকুই বা করতে পারতেন! ঘরের মধ্যে বদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। আমি একটা ছোট একজাম্পল দিচ্ছি। যেমন, 'অগন্তুক'-এ একটা সিন আছে যেখানে সাঁওতালরা নাচছে। সেখানে মমতা, দীপঙ্কর, উৎপলদা সবাই রয়েছেন। শেষের দিকে দৃশ্য। আগে হলে, আমার মনে হয় যে মানিককাকা ওটা ওরকম দিনেব আলোয, দুপুরের রোদে বা ওইরকম একটা চড়া আলোয় করতেন না। হয়তো পড়ন্ত আলোতে, সেই আলোয় সিকোয়েন্সটা মেনটেন করতেন হয়তো। দেখাতেন ক্রমশ ক্রমশ আলো পড়ছে। এটা করতে নাম্বার অব ডে'জ বেশি লাগতো। পরিশ্রমটা অনেক বেশি হতো। যেটা দিনের আলোয় করলে কাজটা একদিন বা দু'দিনে উঠে যায়, কিন্তু ওভাবে করতে গেলে হয়তো সাতদিন লাগতো। এবং তার জন্য একটা প্রচন্ড টেনসন হয় ডিরেক্টরের। এই বুঝি আলো চলে গেল। এই বুঝি আলো চলে গেল! এই প্রবলেমগুলো হতো। এগুলো মেনটেইন করা খুব পরিশ্রমসাপেক্ষ। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে লোকে বুঝতে পারে না যে, কত পরিশ্রম যায় ডিরেক্টরের এটার পিছনে। আমি ঠিক জানি না, তবে আমার মনে হয়, এই সব ক্ষেত্রে মানিককাকা খানিকটা অসহায় হয়ে পড়েছিলেন, শারীরিক কারণে। তবে এটা আমার আন্দাজ। আমি ঠিক বলতে পারছি না।

মানিককাকার দ্বারা, একজন পরিচালক হিসাবে আমি নিজে প্রভাবিত হয়েছি। ডিটেইলের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। খুব খেটে আমি ডিটেইলের কাজ করেছিলাম 'থার্টিসিক্স চৌরঙ্গী লেন' - এ এবং পরবর্তীকালেও। সব সময়ই। তাছাড়া স্ক্রিপ্ট করার সময় যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপারটা আছে। অবশ্য সবসময় আমি যেটা চাইছি, সেটা হয়নি। মানিককাকার মধ্যে যে জিনিসগুলো আমার ভালো লাগতো তার মধ্যে আছে ওঁর ইকনমি। ধরা যাক, একটা সিন উনি লিখছেন। একটা সিন, অনেকগুলো স্তর আছে তার। কোনো একটা সিন কিন্তু একটাই ইনফরমেশন দিচ্ছে না। 'ইকনমি' বলতে আমি বোঝাতে চাইছি, কোনো একটা সিন অনেকগুলো ইনফরমেশন দিচ্ছি। যেমন 'চারুলতা'-তেই। প্রথম সিনটা যে কতগুলো ইনফরমেশন দিচ্ছে, তার আর বলার নয়। সেই জিনিসটা আমি ব্যবহার করেছি, আমার মতো করে, সেই ইকনমাইজিং-এর ব্যাপারটা। যেমন 'পরমা'-তে প্রথম সিনটা, যেখানে ঠাকুর পুজো-টুজো হচ্ছে সেখানে আমি অনেকগুলো ইনফরমেশন একসঙ্গে দিয়েছি। মানে, একটা সিন অনেকগুলো কাজ করছে। সেটা বোধহয় একদম সোজাসুজি মানিককাকার প্রভাব। মানিককাকা অ্যাকচুয়ালি আমাকে

হাতে ধরে শিখিয়েছেন কয়েকটা জিনিস। যেমন শিখিয়েছেন, সাউণ্ডট্র্যাকগুলো আন-ক্ল্যাটার্ড রাখতে। উনি আমায় বলেছেনও যখন মিউজিক চলবে, তখন অন্য সাউন্ড দিবি না।

'চক্র' বলে একটা ছবি হয়েছিল। ছবিটিতে এত দেখার জিনিস, এত শোনার জিনিস একসঙ্গে হয়েছিল যে, কোনদিকে মন দেবে দর্শক বুঝে উঠতে পারছিলনা। ক্ল্যাটার্ড, মানে বেশ একটা পরিচ্ছন্নতার অভাব। মানিককাকার কাছ থেকে শেখার জিনিসের তো শেষ নেই। সবচেয়ে বেশি শেখার হচ্ছে ওঁর স্ক্রিপ্ট। স্ক্রিপ্টের স্ট্রাকচার। যেমন একটা সিন—মানিককাকার ছবিতে দেখতাম আমি, তার এক একটা দৃশ্যে তার নিজস্ব নাটক আছে। নিজস্ব একটা ক্লাইম্যাক্স আছে। ইনস্পাইট অব বিইং পার্ট অব দ্য ইন্টিগ্রেটেড হোল। একটা সিন নিছক একটা ইনফরমেশন দিয়ে চলে গেল, তা নয়। সে সিনটার নিজস্ব একটা ওঠাপড়া, নিজস্ব একটা নাটকের গতি রয়েছে। তার মধ্যেও একটা, যত সূক্ষ্মই হোক, একটা ক্লাইম্যাটিক পয়েন্ট—এগুলো রয়েছে। এটা কিন্তু মানিককাকার স্ক্রিপ্টে থাকে।

ওই সিনটা ভাবুন 'অপুর সংসার'-এ যেখানে কাজল দৌড়ে বেড়াচ্ছে, একটা মরা চড়ুই পাখি নিয়ে ফেলে দিয়েছে, অমুক-তমুক, ইত্যাদি ইত্যাদি। সব কিছু হলো তো! হয়ে ওই বাড়ির নায়েব না কে, তিনি বললেন, 'তোমার দাদুকে বলে দেব।' ও বলল, 'দাদুকে তুমি বলে দেবে?' উনি বললেন, 'হ্যাঁ, বলতেই তো হবে' তখন ও বললো, 'হ্যাঁ, আমি আমার বাবাকে বলে দেবো। বাবা তোমাকে মারবে, 'অমুক-তমুক'। আমার বাবা কলকাতায় থাকে, তোমাকে মারবে।' তখন উনি বললেন, 'হুঁ! বাবার টিকির দেখা নেই। আমাকে মারবে! বাবার ভয়ে আমি তো..... ' এই সব। শেষ জায়গাটা হচ্ছে কাজলের ক্লোজ আপ, কাজল বলছে, 'বাবার বুঝি টিকি থাকে।' এই জায়গাটা হচ্ছে একদম একেবারে, যাকে বলে দৃশ্যটার তলায় যেন, একটা জিনিস শেষ হলে একটা সুন্দর করে লাইন টানা হয় না! এটা যেন সে রকম। পারফেক্ট। মানে এত পারফেক্ট যে, ভালো লাগে। এই ব্যাপাবটা মানিককাকার খুব বেশি করে ছিল। হয়তো উনি হলিউডের ছবির দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছেন, যেটা উনি নিজে বলেন। হলিউডের ভালো ছবিগুলোতে এসব খুব থাকে। আমি পার্টিকুলার কোনো ছবির কথা বলছি না। কিন্তু হলিউডের ভালো ছবির দ্বারা, সেটা উনি নিজেই স্বীকার করেন। এবং সেই সব ফিল্মের স্ট্রাকচার-টাকচার তো খুবই ভালো। পরিচালক হিসেবে মানিককাকা সম্পর্কে বলতে পারিঃ আমি একেবারে মুগ্ধ ছিলাম। আমার এত ভালো লাগতো, যে বোঝাতে পারবো না। সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর মিউজিক। অসাধারণ। আমি জেনারালাইজেশন না করে ছোট ছোট ইনস্ট্যান্ট বলতে পারি। একটা এডিটিং আছে, মিউজিক্যাল এডিটিং। 'গুপী গাইন বাঘাবাইনে'। যেটা আমি অন্তত পঁয়তিরিশ বার দেখেছি ভিডিওতে। কি যে আমার ভালো লাগে কি বলবো। যেখানে সব গায়করা গেছে, সভায় বিভিন্ন গায়করা গাইছে। এই কালোয়াতি গান হচ্ছে, সেখানে থেকে কেটে বৈষ্ণবপদাবলী হচ্ছে, সেখান থেকে কেটে আর একটা, সেতার কাটিংগুলো কি! কি পারফেক্ট এডিটিং!

নাবী-পুরুষ সম্পর্ক প্রসঙ্গে ওঁর মূল্যবোধ বলতে গেলে বলতে পারি যে আমি কতগুলো জিনিস লক্ষ্য করছি। যেমন উনি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক খুব সুন্দর দেখিয়েছেন।

বারবার দেখিয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের স্বামী-স্ত্রী-র সম্পর্ক দেখিয়েছেন। 'পথের পাঁচালী'তে আমরা দেখেছি, 'অপরাজিত'তে দেখেছি, 'অপুর সংসার'-এ দেখেছি। প্রথমে সর্বজয়া-হরিহর, তারপর অপু-অর্পণা লক্ষণীয়, উনি লীলাকে বাদ দিয়েছেন। অপুর বান্ধবী। সেটার অবশ্য অনেকগুলো কারণ আছে। উনি তখন বোধহয় অলকা চৌধুরীকে নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কোনো কিছু সমস্যা-টমস্যা হয়েছিল। যথেষ্ট সুন্দরী বোধহয় কাউকে পাননি। কি সব হয়েছিল। কিন্তু যেটা পয়েন্ট, সেটা হলো, চরিত্রটাকে বর্জনীয় মনে করেছিলেন বলেই তো বাদ দিয়েছিলেন। ধরুন, অপর্ণাকে উনি পেলেন না খুঁজে। সেরকম মেয়ে, যাকে অপর্ণার রোল দেওয়া যায়। তা বলে কি বাদ দেবেন চরিত্রটাকে? কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, অপর্ণা চরিত্র বাদ দেওয়া যায় না। লীলা চরিত্র, তাঁর মনে হয়েছিল বাদ দেওয়া যায়। সেটা একটা কারণ হতে পারে যে, চিত্রনাট্যের কারণে তাঁর মনে হয়েছিল। কিন্তু এটাও ঠিক যে মানিককাকার ছবিতে বান্ধবী চরিত্র আমি খুব কম দেখেছি। যেমন 'পরশ পাথর'-এ কালীদা যে ফোন করছেন, বান্ধবীর সাথে কথা বলছেন, একতরফা তিনিই কথা বলছেন। বান্ধবীকে দেখা যায়নি কিন্তু। একমাত্র 'প্রতিদ্বন্দ্বী' তে ধৃতিমানের একটি বান্ধবীকে দেখেছিলাম। আর 'জনঅরণ্য'-তে আমি বান্ধবীর অভিনয় করেছিলাম। খুব সামান্য। বান্ধবীর ভূমিকা খুব কম এবং ভালো না ভূমিকাটা। আমার মনে হয় সামাজিকভাবে এক্সেপটেড যে সম্পর্কগুলো, সেগুলো উনি বেশি ভালো করে দেখাতেন। মা-ছেলের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী-র সম্পর্ক ট্র্যাডিশনাল সম্পর্কগুলো উনি খুব সুন্দর দেখাতেন। এমন কি ভাই-বোনের সম্পর্কও অপু-দুর্গার পর অত ভালো আর লাগেনি আমার কাছে। মন ভরানোর মতো ভাই-বোন সম্পর্ক কিংবা মন ভরানোর মতো বান্ধবী আর বন্ধুর সম্পর্ক মানিককাকার ছবিতে তো দেখছি না। তরপর ধরুন, বিয়ের বাইরে কোনো একস্ট্রা রিলেশনশিপ উনি কখনো ভাল দেখান নি। 'পিকু' তে আমার অসুবিধা হয়েছিল মা'র চরিত্রে অভিনয় করতে। মানে, মানিককাকার ছবিতে কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে। আমার চিরকাল ইচ্ছে ছিল কাজ করার মানিককাকার সঙ্গে আরো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বলছি, 'পিকু'তে অসুবিধা হয়েছিল মানিককাকার সঙ্গে কাজ করতে নয়, চরিত্রটাকে বুঝতে। দু'জনের চরিত্র, অর্থাৎ 'পিকু'র মা আর তার লাভার, তাদের আউটসাইড ম্যারেজ যে রিলেশনশিপ ছিল, সেই সম্পর্কটা আমি বুঝতে পারলাম না। তাদের সম্বন্ধে পরিচালকের কোন সিমপ্যাথি নেই কেন, অন্তত কোনো ঔৎসুক্য নেই কেন? কেন তারা এই রিলেশনশিপের মধ্যে গেল? অবশ্য সেটার একটা বড় কারণ হলো গল্পটা তাদের নিয়ে নয়, গল্পটা 'পিকু'কে নিয়ে। সেটা নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ। না হলে ব্যাপারটা ছড়িয়ে যেতো। তা হলেও মানিককাকা আগে যেমন একটা কোমলতার ছোঁয়া দিয়ে যেতেন মাঝে মাঝে, সেটা এই ধরণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আমার মনে হয়েছে, পাওয়া যায়নি। একমাত্র এক্সট্রা ম্যারেজ রিলেশনশিপ যেটা ভালো ছিল, সেটা চারু এবং অমলের ক্ষেত্রে। খুবই ভালো। তবে সেটাই একটা ট্র্যাডিশনাল সম্পর্কের মধ্যেই পড়ে। দেওর-বৌদির ঠাট্টা-ভালোবাসার সম্পর্ক থেকেই একটু মোল্ড হয়েছিল।

এক্সট্রা ম্যারেজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে উনি ওর কোনো ছবিতেই পজিটিভলি আনেন নি।

'চারুলতা'-তেও পজিটিভলি আনেন নি। যদিও তাঁর সমবেদনা গভীর, তবু

'চারুলতা'—তে পজিটিভলি অনেন নি। 'ঘরে-বাইরে'-তে তো নয়ই। আমার মনে হচ্ছিল তো হতেই পারে যে, পিকু সম্বন্ধে সে গিলটি। কিন্তু আমি যেটা বুঝতে পারলাম না, যে, পিকুর বাবার প্রতি তার ইনফিডালিটি রয়েছে বলে তার পিকুর জন্য কেন কষ্ট হচ্ছে? বাবা আর ছেলে একই লোক তো নয়। বাবা একজন মানুষ, ছেলে আরেক জন মানুষ। আমার এটা মনে হয়েছে। আর একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে ওদের যখন ঝগড়া হলো, সম্পর্কটা শেষ হলো, খুব আগলি লেগেছে আমার জিনিসটায় হয়তো উনি আগলি দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেন? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কেন? আমার কাছে মনে হয়েছিল যে পিকুর চোখে জিনিসটা দুর্বোধ্য হতে পারে, কিন্তু তার মানেই জিনিসটাকে অত আগলি হতে হবে, তার কোনো কারণ আমি অন্তত খুঁজে পাইনি।

এ-সম্পর্কে তাঁব সাথে আমার কোনো আলোচনা হয়নি। আলোচনা করতে পারলে ভালো হতো। সে সময়টা আমিও ব্যস্ত ছিলাম। মানিককাকাও নানান কাজে ব্যস্ত ছিলেন। একটা সময় খুবই আলোচনা হতো। ওই যখন 'জন অবণ্য'- টন অবণ্য' হচ্ছে। কিন্তু 'পিকু' তার অনেক পরে। তখন আর আলোচনা হয়ে ওঠেনি। হলে আমার ভালো লাগতো। আমার প্রশ্নের উত্তর হয়তো পেয়ে যেতাম। মনটাও আমার পরিষ্কার হয়ে যেতো। এই প্রশ্নগুলো আমাব রয়ে গেছে। নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে উনি ট্রাডিশানে বিশ্বাসী ছিলেন কিনা জানি না। 'পরমা' করবার সময় আমি গল্পটা ওঁকে বলেছিলাম। আমি বলতামও। আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। যখন বলেছিলাম, উনি বললেন, 'এগুলো কি হয় জানিসতো, মানে সব পক্ষই কষ্টই পায়। প্রত্যেকটা চরিত্রই খালি কষ্ট পায়। পজিটিভ কোনো কিছু হয় না এসব থেকে।' এই কথাটা বলেছিলেন। তো 'পরমা'-র ক্ষেত্রে তখন আমাব তো মনে হয়েছিল যে, পরমা আলটিমেটালি একটা পজিটিভ দিকে গেল। সম্পর্কটার জন্য নয়! কিন্তু সম্পর্কটা তাঁকে ঠেলে দিল এমন একটা জায়গায়, সেখানে প্রত্যেকটা দরজাই তার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ক্যাটালিস্ট-এব ভূমিকা এই ব্যাপারটা তখন আমাব পারসু করা হয় নি যে, কেন আমি 'পবমা'কে আনতে চাইছি। আমি চুপ করে ছিলাম। পরে কিন্তু উনি ছবি দেখে আমায় বলেছিলেন যে, 'পরমা' কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্ট্যান্ট কথা বলেছে। শেষের দৃশ্যে 'আমার কোনো অপরাধবোধ নেই'। উনি বললেন, 'এটা অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট কথা। খুব ভালোভাবে বলানো হয়েছে।'

একটা ব্যাপারে ওঁকে তো ট্রাডিশনাল লাগতো। আমি দেখেছি মানিককাকাকে, যে কোনো শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে, বিয়ের অনুষ্ঠানে, জন্ম দিনে, যে কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে উনি সব সময় যেতেন। উনি খুব পারিবারিক এবং সামজিক মানুষ ছিলেন। এটা আমার মনে হয়েছে। সেন্সেটিভ যে ছিলেন, এটা তো বলাই বাহুল্য। তাব উদাহরণও দিতে পারি একটা বয়েস হয় না। 'সমাপ্তির'-র ঠিক পরে পরেই আমার বয়েসটা তখন, যখন নিজেকে বড় মনে হচ্ছে— অথচ অর্থাৎ অকওয়ার্ড একটা বয়েস। সেই সময়টা আমার মনে আছে। আমি কি একটা রাখতে গিযে পড়ে গেল। চা না কি একটা যেন। ওঁদের বাড়িতে তখন আমি "হাউ ক্লামজি" না কি একটা যেন বললাম। মানিককাকা ইংরেজিতে খুব কথা বলতেন। ইংরাজিতেও বলতেন, বাংলাতেও বলতেন। যাই হোক একটা জিনিস পড়ে গেছে, বা ভেঙে গেছে সেটা কোনো ব্যপার নয়! কিন্তু মানিককাকা সেই সময়টা আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন, তাতে ওই বয়সেও আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম মানিককাকা

আমার হাতটা ধরলেন। ধরে হাতে ছোট্ট একটুখানি চাপ দিলেন। চাপ দিয়ে বললেন যে, 'এটা তো আমারও হতে পারতো। টেবিলটাই অদ্ভুতভাবে রাখা হয়েছে।" কি একটা বললেন। না কি "অনেকগুলো বেশি জিনিস একসঙ্গে টেবিলে রাখা হয়েছে' মানে উনি অনেকটা সময় নিয়ে অনেকখানি এক্সপ্লেইন করলেন আমাকে যে, কেন এটা পড়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। এবং হাতের চাপটা সেই সঙ্গে একটা ফ্রেন্ডলি একটা মানে আমি ওই বয়সেও বুঝতে পারলাম যে, মানিককাকা ফীল করছেন, যে ও এই সময়টা অসম্ভব এক অকওয়ার্ড বয়েস রয়েছে। এই বয়েসে সহজেই কনফিডেন্স চলে যায় কিশোরীদের। সুতরাং ওকে আশ্বস্ত করা প্রয়োজন। এই সমস্ত ব্যাপারটা পলকের মধ্যে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এইগুলোই মানিককাকার খুব কোমল দিক ছিল। উনি খুব বন্ধু হতে পারতেন। আমি আমার অনেক ব্যক্তিগত কথা ওঁকে বলেছি। খুব মন দিয়ে শুনতেন। বিবেচনা করতেন, আমাকে পরামর্শ দিতেন। আমি তো ওনার চেয়ে অনেকটা ছোট। কিন্তু কখনো মনে হয়নি যে, শাসন করার টেনডেন্সি ওরকম আমার মনে হয়নি। কখনো মনে হয়নি। কোনো জেনারেশন গ্যাপের প্রশ্ন ছিল না। একদম আমার সমস্যার মধ্যে ঢুকে গিয়ে বলতেন, আচ্ছা তুই এটা করে দ্যাখ, ওটা করে দ্যাখ। এইভাবেই কথা বলতেন। একেবারে বন্ধু হয়ে যেতে পারতেন। মানে দোষ-গুণ মিলিয়ে উনি একজন সত্যিকারের মানুষ ছিলেন।

অনুলিখন ঃ ঘনশ্যাম চৌধুরী সাক্ষাৎকার ঃ ইন্দিরা ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার দেখা সত্যজিৎ রায়

মমতাশংকর

সত্যজিৎ রায় সর্ম্পকে কোনো আলোচনা করতে বসলে আমার মনে নানান স্মৃতি ভিড় করে। আবেগ, রোমাঞ্চ, আনন্দ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অভিনয় করার ইচ্ছা আমার দীর্ঘ দিনের। আমার সব বড় পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল কেবলমাত্র সত্যজিৎ রায় আর তপনদার কোনো ছবিতে ইতিপূর্বে আমি কাজ করিনি। পরিচিত নিকটজনের কাছে আমি অনেকবারই এই খেদ প্রকাশ করে ফেলেছি। সবাই বলেছেন, তুমি সরাসরি সত্যজিৎবাবুকে বল যে, তার ছবিতে তুমি অভিনয় করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমি কোনো দিন তা পেরে উঠিনি। একটা অসম্ভব লজ্জা আমাকে এইভাবে মানিককাকাকে বিরক্ত করতে দেয়নি। সব সময় মনে হতো, কি করে বলবো? কি ভাববেন তিনি?

'ঘরে বাইরে' ছবি হয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন মানিককাকা অসুস্থতার জন্য কোনো ছবি পরিচালনা করেননি। হঠাৎ একদিন কাগজে দেখলাম মানিককাকা আবার ছবি করবেন। আমার স্বামী চন্দ্রোদয়কে দুঃখ করে বলেছিলাম, মানিককাকা তাঁর নতুন ছবিতে যদি আমাকে নিতেন। পরদিন সকালে তখনো আমার ভালো করে ঘুম ভাঙেনি, চন্দ্রোদয় কি ভেবে মানিককাকাকে ফোন করে আমাকে ডেকে বললেন, 'আমি মানিককাকাকে ফোন করেছি, উনি ফোন ধরে আছেন।' আমার তো শুনে রীতিমত নার্ভাস অবস্থা। মানিককাকার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কাছে সরাসরি তাঁর ছবিতে অভিনয় করতে চাই—একথা বলতে আমার অসম্ভব রকমের লজ্জাছিল। সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে টেলিফোন ধরে আমি বললাম, 'মানিককাকা আমি মম বলছি।' যদি বুঝতে না পারেন তাই আবার বললাম, 'আমি মমতাশংকর।' টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে মানিককাকার মন্দ্রিত স্বর শোনা গেল — 'হ্যাঁ, বল কী ব্যাপার।' আমি রীতিমত তো-তো করে বললাম, 'কাগজে দেখলাম আপনি আবার ছবি করছেন। যদি আপনার ছবিতে আমাকে একটা ছোট ভূমিকায় অভিনয় করতে দেন তাহলে আমি কৃতার্থ হব।' মানিককাকা একটু হেসে বললেন, 'তোমার কথা যে আমি ভাবিনি তা নয়। তবে এখনই ষোল আনা কথা দিতে পারছি না। তুমি আর কয়েকদিন পরে আমায় ফোন কর।' তারপর একথা সেকথার পর টেলিফোন ছেড়ে দিলেন। টেনশনে আমি কয়েক রাত্রি ঘুমুতে পারি নি। মানিককাকা সাধারণত শীতকালে ছবি করেন। আমার একটা অপারেশন হওয়ার কথা ছিল। ডাক্তার চেয়েছিলেন শীতকালেই অপারেশনটা হোক। কিন্তু আমি ভাবলাম যদি মানিককাকা আমাকে ডাকেন তাহলে অপারেশনটা গরমকালেই করাবো। এই ভেবে দিন সাতেক পরে আবার আমি মানিককাকাকে ফোন করলাম। ফোন ধরে পরিচয় দিতেই মানিককাকা বললেন, 'সৈ কিরে, তোকে কেউ খবর দেয়নি? তুই তো আমার ছবিতে আছিস। আজকেই এসে আমার সঙ্গে দেখা কর।' সেই প্রথম তিনি আমাকে তুই করে

বললেন। আমি তাঁর বাড়িতে যেতেই তিনি আমাদের ঘরে নিয়ে বসিয়ে বললেন যে, দুটি ছবির ব্যাপারে তিনি ভাবনা চিন্তা করছেন। একটি 'গণশত্রু' ও অন্যটি 'শাখা প্রশাখা'। কোনটি আগে করবেন তা এখনো মনস্থির করেননি। তবে দুটিতেই আমি আছি। আমার তো হাতে চাঁদ পাওয়ার অবস্থা। একটা ছবিতেই সুযোগ পাবো ভাবিনি, তায় দুটি ছবি। তারপরের দিনগুলি কেমন করে কেটে গেল তা জানি না। স্ক্রিপ্ট পড়া হল, মানিককাকা যখন স্ক্রিপ্ট পড়তেন তখন চরিত্রগুলোকে এমন ভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে, চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠতো। মনে হতো আমি মমতাশংকর নই, ওই অভিনীত চরিত্রই। তারপর কিভাবে শুটিং হল, ছবির কাজ শেষ হল, ছবি মুক্তি পেল তা আমার স্পষ্ট মনে নেই। যেন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেলো। এখনো মনে হয় আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। কেউ আমার ঘুম ভাঙিয়ে বলবে যে, এখনো 'গণশত্রু'র শুটিং আরম্ভ হয়নি।

যখন মানিককাকাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনতাম না, বাইরে থেকে তাঁকে উদ্ধত, আত্ম-কেন্দ্রিক বলে মনে হয়েছিল। পরে তাঁর কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম যে, কী অসম্ভব স্নেহশীল তিনি, কত সংবেদনশীল এবং উদার মন তাঁর! একটুও আত্মকেন্দ্রিকতা ছিল না। সকলের সঙ্গে কী সহজভাবে মিশে যেতেন। টিমের প্রত্যেক সদস্যের, তা তিনি যতই অকিঞ্চিৎকর ভূমিকায় থাকুন না কেন, ভালোমন্দের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। আমার কোমরে দীর্ঘদিনের একটা পুরনো ব্যথা ছিল, যতবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে প্রত্যেকবার আমার কোমরের ব্যথা কেমন আছে খোঁজ নিয়েছেন। ইউনিটের প্রত্যেকের সুবিধা-অসুবিধার দিকে তিনি নজর রাখতেন। শুটিংয়ের সময়ে যখন আলো-টালো পাল্টানো হয়, সেট পরিবর্তনের কাজ চলে সেইসময় অনেক পরিচালকই লক্ষ রাখেন না যে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দাঁড়িয়ে আছেন। মানিককাকা কিন্তু সবসময় বলতেন, 'শিল্পীরা দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁদের একটা বসার ব্যবস্থা কর'। যাতে শিল্পীদের কোনরকম অসুবিধা না হয় সেই দিকে তাঁর প্রত্যক্ষ নজর ছিল। যে কোনো ছবি করার আগে সেই ছবিটির প্রতিটি পুংখানুপুংখ অংশ সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ভাবনা চিন্তা করা থাকত।

সাধারণভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছ থেকে তিনি কিরকম কাজ চাইছেন তা স্পষ্ট করে বলে দিতেন এবং সেই রকম কাজ আদায় করে নিতেন। যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাঁদের ইমপ্রোভাইস্ করার যথেষ্ট সুযোগ দিতেন। আমাকে তিনি প্রচুর সুযোগ দিয়েছেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কখনো তিনি চামচে করে খাইয়ে দেবার চেষ্টা করতেন না। অসীম ধৈর্য্যে, অত্যন্ত সুকৌশলে তাঁদের কাছ থেকে তিনি সেরা কাজটি বের করে নিতেন। যে কোনো শট ঠিকঠাক হলে 'ফাইন' 'এক্সলেন্ট' শব্দগুলো তাঁর মুখে লেগে থাকতো। খুব ছোটখাটো ডিটেলের কাজ দেখিয়ে দিয়ে তিনি অভিনয়কে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতেন। আমার মনে পড়ে 'গণশত্রু' ছবিতে একবার গালে হাত দিতে বলেছিলেন। পরে যখন পর্দায় দেখলাম স্তম্ভিত হয়ে গেলাম যে, ওই সামান্য ডিটেলের কাজে অভিনয়ের মাত্রা একদম পাল্টে গেছে।

আজ যখন মানিককাকার কথা ভাবি আমার সবসময় মনে হয়, মানিককাকার ছবিতে অভিনয় করে আমার যে এতো নাম হয়েছে, সবাই এইরকমভাবে আমার অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন, তার কোনো কৃতিত্বই আমার নয়, সবই মানিককাকার। কিভাবে যে

উনি আমার কাছ থেকে আমার সবচেয়ে সেরা কাজ বার করে নিয়ে এলেন তা আমি বুঝতেও পারিনি। আজকে মানিককাকা নেই, অনেকে, অনেক কথা মানিককাকা সম্পর্কে বলছেন। আমার বাবার ক্ষেত্রেও দেখেছি তাঁর মৃত্যুর পর এমন অনেক কথা তাঁর মুখে আরোপ করা হয়েছে বা তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে আমরা খুব ভালো করে জানি যে তা কখনো সত্য হতে পারে না। আমার বাবা এইরকম ভাবে কথা বলতেন না। মানিককাকা সম্বন্ধেও নানান সমালোচনা শুনেছি। কেউ কেউ বলেছিলেন, তিনি ফসিল হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তাঁর নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রতিভা এবং ধারাবাহিক উৎকর্ষের যে প্রমাণ আমি পেয়েছি তা অস্বীকার করি কি করে।

মানিককাকার সঙ্গে আমার শেষ ছবি 'আগন্তুক'। উনি যখন 'আগন্তুক' করবার সিদ্ধান্ত নেন সেই সময় আমি ২৩ জনের একটা দলের সঙ্গে ইউরোপে গেছি নাচের অনুষ্ঠান করতে। আমাদের এই ট্যুর কিছু বিদেশি সংগঠকের সৌজন্যে আয়োজিত হয়েছিল। একদিন বাড়ি ফিরতেই আমার নন্দাই বললেন, 'তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে কিন্তু সেটা এমনি বলা যাবে না' — বলে আমায় ব্ল্যাকমেল করতে থাকেন যে, ১০০ পাউন্ড দিলে তবে এই খবর তিনি আমাকে দেবেন। অনেক ঝোলাঝুলির পর তিনি প্রকাশ করলেন যে সত্যজিৎবাবু ফোন করেছিলেন। আমি তো পড়িমড়ি করে মানিককাকাকে ফোন করলাম। মানিককাকা বললেন যে, তিনি 'আগন্তুক' ছবিটি করতে যাচ্ছেন এবং সেখানে আমায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। আমার তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মত অবস্থা। এদিকে নাচের ট্যুর অন্যদিকে মানিককাকার এইরকম অফার। ভাবুন একবার অবস্থাটা। মানিককাকার ছবিতে অভিনয় করার জন্য ভারতবর্ষের যে কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রী এক কথায় সমস্ত সিডিউল বাতিল করে চলে আসতে পারেন আর আমি কিনা একান্ত নিরুপায়। আমার প্রায় কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। অথচ এই ট্যুর বাতিল করার কোনো ক্ষমতা আমার নেই। মানিককাকাকে সমস্ত পরিস্থিতি জানাতে তিনি আমাকে বললেন, 'এই রোলটা আমি তোকে ভেবেই করেছি, তোকে ছাড়া অন্য কাউকেই তো সেখানে নেওয়া যাবে না। তুই ফিরছিস কবে?' ২৬শে নভেম্বর তারিখে পারীতে আমাদের শেষ শো। মানিককাকার সঙ্গে আমার যখন কথা হচ্ছিল সেই দিনটি সম্ভবত সেপ্টেম্বরের শেষ দিন কি অক্টোবরের শুরু। বোধ হয় ১-২ তারিখ। মানিককাকাকে সে কথা বলতে তিনি বললেন, "ঠিক আছে আমি অন্য শুটিংগুলো করে রাখছি, তুই পারী থেকে সোজা এখানে চলে আসবি।" নভেম্বরের শেষে কলকাতায় ফেরার পর স্ক্রিপ্ট পড়া হল এবং মানিককাকা তা এমন ভাবে বুঝিয়ে দিলেন যেন মনে হল আমিই অনিলা 'আগন্তুক' ছবির নায়িকা। শেষ পর্যন্ত শুটিং হল। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, 'গণশত্রু' আর 'শাখা প্রশাখা'র পরে আবার তৃতীয় ছবির জন্যও মানিককাকা আমাকে ডাকবেন। এ যেন আমার উপরি পাওনা।

ছবির প্রতিটি দৃশ্যের প্রতি তাঁর কিরকম তীক্ষ্ণ নজর ছিল তা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট বোঝা যাবে। 'শাখা প্রশাখা' ছবির একটি ছোট্ট দৃশ্যে দ্বিতীয়বার টেক করার দরকার হয়েছিল। অন্য কোনো কারণে নয়, ক্যামেরার গন্ডগোলের জন্য মানিককাকা ওই দৃশ্যটি দ্বিতীয়বার টেক করেন। সেট সাজানো হয়ে গেছে, সব তৈরি। মানিককাকা সেটে এসে চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, 'আগের বারে তো জানলায় এই গ্রীল ছিল না, অন্যরকম

গ্রীল ছিল।' ইউনিটের সবাই মানিককাকাকে অসম্ভব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, মানিককাকার অভ্রংলিহ ব্যক্তিত্বকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারতেন না। সকলে মিন মিন করে বললেন, 'মানিকদা সেট ঠিকই আছে।' মানিককাকা জোর দিয়ে বললেন, 'না আমি বলছি ঠিক হয়নি। আনো, আগের শুটিংয়ের স্টক থেকে ফ্রেম কেটে আনো।' পুরনো স্টক থেকে ফ্রেম কেটে আনা হলে দেখা গেলো মানিককাকাই ঠিক। কী অসম্ভব স্মৃতি শক্তি একবার ভাবুন।

মানিককাকাব কথা বলতে বসলে মংকুকাকিমার কথা এসে পড়ে। একটা কথা আছে না, সব সফল পুরুষের পেছনে এক নাবীর ভূমিকা থাকে। সেট কীরকম হল, নায়ক-নায়িকাদেব পোষাক কীবকম হবে, গহনার ডিজাইন কীরকম হবে ইত্যাদি ব্যাপারে মংকুকাকিমা মানিককাকাকে নানা পরামর্শ দিতেন এবং মানিককাকা তা মেনেও নিতেন। যেমন একদিনের কথা মনে পড়ে, একটি সেটের দেওয়ালে একটা ছবি টাঙানো ছিল, মংকুকাকিমা এসে ছবিটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানিক', উনি মানিককাকাকে নাম ধরেই ডাকতেন, 'এই ছবিটি এখানে মোটেই চলে না,' বলে সেই ছবিটি নামিয়ে নিযে অন্যার একটি ছবি টাঙিয়ে দিলেন। আমারও সেটা মনে হযেছিল কিন্তু মানিককাকাকে সেকথা বলার সাহস হযনি। সেটের কোথাও ফুল সাজানোব বিষয় থাকলে মংকুকাকিমা নিজের হাতে তা সাজিযে দিতেন। শেষের দিকে বুনিও এই কাজ কবত। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংবদেনশীলতাকে মানিককাকা কিরকম সম্মান দিতেন তা আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি। গণশত্রু ছবির শুটিংযের সময একদিন আমার শট নেওয়া হল, খুবই ছোট শট। এই শটটি হঠাৎই নেওয়া হল, আমি ঠিক তৈরি ছিলাম না। শটটি নেওয়ার পর মানিকাকা যথারীতি 'ফাইন', 'এক্সেলেন্ট,' শব্দগুলি উচ্চারণ করলেন এবং আমাকে বললেন খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু আমাব মনের মধ্যে খুঁত খুঁতুনি ভাব ছিল। আমার একটা স্বভাব আছে যে কোনো বিষয়ে একবাব খুঁতখুঁতুনি শুরু হলে সেটা কিছুতেই মন থেকে যেতে চায় না। মানিককাকাকে আমি বললাম, 'এই শটটি যদি সম্ভব হয়, আমি রি-টেক করতে চাই, মানিককাকা বললেন, 'কোনো দরকাব নেই, শটটা ঠিক আছে।' কিন্তু আমার মনের খুঁতখুঁতুনি কিছুতেই যাচ্ছিল না। পরে একদিন যখন অন্য একটা শট রি-টেক হচ্ছে তখন আমি বাবুদাকে বললাম, 'বাবুদা তুমি মানিককাকাকে বল না আমার ওই শটটি যদি উনি আর একবার নেন।' বাবুদা মানিককাকাকে সে কথা বলতে মানিককাকা বললেন, 'কেন যে তুই এই রকম বলছিস, নিচ্ছি আর একবার।' তারপর তৈরি হয়ে বসে আছি কিছুতেই আর শট নেওয়া হয় না। আমি ভাবছি মানিককাকা কি রেগে গেলেন? তারপরে জানতে পারলাম যে, মানিককাকার সেই লাল খাতা যাতে সব লেখা থাকে সেটা আসেনি। আমার এই ছোট শটটি নেওয়ার জন্য বাড়িতে লোক পাঠিয়েছেন খাতা নিয়ে আসতে। সেই খাতা এল তারপর শুটিং হল। আমার তো লজ্জায়া মাথা কাটা যাবার যোগার। তারপর যখন ছবি দেখলাম তখন দেখলাম যে, আগের শটটিই বহাল আছে। পরেরবার নেওয়া শটটি ছবিতে লাগেনি। আমার যেরকম লজ্জা হল সেইরকম মানিককাকার প্রতি শ্রদ্ধাও বেড়ে গেল অনেকখানি। অন্য যে কোনো পরিচালক হলে তিনি বলতেন 'আমি বলছি শট ঠিক আছে নতুন করে নেওয়ার কোনো দরকার নেই।' কিন্তু মানিককাকা সেইরকম ছিলেন না। শিল্পীর সত্তাকে সম্মান দিতে জানতেন। অভিনেতা-অভীনেত্রী ছাড়াও

মানিককাকার সঙ্গে যেসব কলাকুশলী কাজ করতেন তাঁরা ছিলেন এক পরিবারভুক্তর মত। চলচ্চিত্র-এর সবকটি ক্ষেত্রে মানিককাকার দক্ষতা ছিল সন্দেহাতীত কিন্তু তার জন্য কারোকে ছোট করতে আমি দেখিনি। প্রত্যেককে তিনি প্রাপ্যসম্মান দিতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, একটি ছবি তুলতে যে কয়েকজনের সাহায্য লাগে, তাঁরা প্রত্যেকেই ওই ছবির ভালো মন্দের পক্ষে অপরিহার্য। এমন কি যে লাইটবয় লাইট ধরে তারও যদি হাত একটু কেঁপে যায় তাহলে ক্যামেরায় ফ্লিকার ধরা পড়বে। কাজেই প্রত্যেককেই সমান সম্মান দিয়ে তিনি কাজ করিয়ে নিতেন। একথা অনস্বীকার্য যে মানিককাকা যখন ছবি করতে এসেছিলেন তখন সুব্রত মিত্র, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, সৌমেন্দু রায়—এর মত কলাকুশলীরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমার কাকা রবিশংকর, আলি আকবর মামা ও ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁয়ের মত লোকেবা তাঁর ছবিতে সুর দিয়েছেন। পরবর্তীকালে মানিককাকা নিজে ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নেন। তাতে হয়তো মাঝে মাঝে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়েছে। আমার বাবা বা মানিককাকা—এঁরা ছিলেন জিনিয়াস। আমার বাবারও প্রথম দিকের যে সৃষ্টি তার তুলনায় শেষের দিকের সৃষ্টিতে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। অসম্ভব জিনিয়াস লোকও তাঁর সৃষ্টির সব ক্ষেত্রে সমান সফল হ'তে পারেন না। সিনেমার সবক্ষেত্রে মানিককাকার স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ত্রুটি মুক্ত থাকবেন এ কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁর কাজের যে মান তাকে স্পর্শ করা দুঃসাধ্য।

আমার বাবার প্রতি মানিককাকার অসম্ভব সম্মানবোধ ছিল। বাবার তৈরি 'কল্পনা' ছবিটি তিনি অসংখ্যবার দেখেছেন। 'কল্পনা'-কে কতবাব দেখেছেন তা নিয়ে প্রায়ই মানিককাকার সঙ্গে তাপস সেনের হাসিঠাট্টা চলতো। মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মানিককাকার মত ব্যক্তিত্ব গোটা দেশে খুব বেশি জন্মাননি। মানিককাকাব অবর্তমানে ভারতীয় ছবির যে কী অপূরণীয় ক্ষতি হল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায না। মানিককাকা আজকে চলে গেছেন। তাঁর কাছে কাজ শিখেছিলাম এবং তাঁকে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায অত্যন্ত আপনজনের আসনে বসিয়েছিলাম। 'আগন্তুক' ছবি যখন মুক্তি পাবে তখন সবাই দেখবেন মানিককাকার কাছ থেকে আমাদের আরও কত পাওয়ার ছিল।

অন্য মানিক

সুব্রত সেনগুপ্ত

আমি তখন বিজ্ঞাপন জগতে একেবারে নতুন। ডি জে কিমারে। গোড়ার দিকে আমার কাজটা ছিল ডানলপ গেজেট এডিট করা, তখন ডি জে কিমার থেকে ডানলপের হাউস জর্নাল যেটা বেরত সেটা এডিট করা। তার অনেকদিন আগে থেকেই মানিকবাবু (সত্যজিৎবাবু) ডি জে কিমারে কাজ করতেন। উনি তখন এখানকার আর্ট ডিরেক্টর। কতগুলো আর্টিকল্ আমরা ওঁকে দিয়ে লে আউট করিয়েছিলাম— যেমন space সম্পর্কে একটা আর্টিকেল্। ব্যাপারটা তখন খুবই নতুন, মানিকবাবু তখন space সম্পর্কে বেশ কিছুটা জানেন, এবং আপনারা তো জানেন-ই যে উনি space নিয়ে তারপর একটা ফিল্ম করতে চেষ্টা করেছিলেন। উনি space সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করেছিলেন। তারপর তো কিছুদিনের মধ্যেই উনি ডি জে কিমারের আর্ট ডিরেক্টরের কাজটা ছেড়ে দিয়ে কিছুটা ছুটি, কিছুটা পার্ট টাইম কাজ করতে করতে নিজের ফিল্মের কাজ শুরু করে দিলেন। অর্থাৎ ৫৩-৫৪ সাল থেকে ডি জে কিমারে সব সময়ের জন্য ওঁকে পাইনি। তার পর ১৯৫৬ সালে ডি জে কিমারের একটা বড় ক্লায়েন্টের বাজেট কাট হয় এবং severe একটা financial crisis হওয়ার ফলে ওঁরা dicide করেন কলকাতার অফিসটা বন্ধ করে দেবেন।

ডি জে কিমার বন্ধ হয়ে গেল। আমরা clarion শুরু করলাম। মানিকবাবু গোড়া থেকেই পুরোপুরিভাবে সমর্থন করেছিলেন, সাহায্য করেছিলেন। উনি তখন ওঁর trilogy নিয়ে fully involved, মানে নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। ডি জে কিমার বন্ধ হয়ে যাবার পরে অনেক বড় বিজনেসই তো চলে গেল। কিন্তু আবার ভাল ভাল কিছু client রয়েও গিয়েছিল। যেমন ডানলপ। আমি ডানলপই দেখতাম। ডানলপের সূত্রে ওঁর সঙ্গে অনেক কাজ করেছি। যেমন ডানলপ একটা নতুন টায়ার লনচ্ করছিল তখন। তো আমরা ওঁর কাছে গিয়ে বলতে গেলে আবদারই করলাম। বললাম ক্ল্যারিয়ন হিসাবে ডানলপের কাছ থেকে one of the first jobs আমরা করছি। আপনাকে এটা করে দিতে হবে। ভেবে দেখুন মানিকবাবু তখন বিশ্ববিখ্যাত ডিরেক্টর আর তিনি বসে বসে ডানলপের পোস্টারের লে-আউট করছেন। ডানলপ গেজেটের আর্টিকল লে-আউট করছেন।

আর একটা বড় ঘটনা। ১৯৫৮ সালের কথা। ডানলপের সেটা হীরক জয়ন্তী। আমরা ওঁকে বললাম দেখুন ওই হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে ওঁরা একটা নতুন কারখানা খুলছেন আম্বাটুরে। তো আমরা মানিকবাবুকে বললাম যে একটা পি আর ফিল্ম করতে হবে। তখন ডানলপের একটা পি আর ক্যামপেন চলছিল। থিমটা ছিল ইয়ু সি সো মাচ হোয়েন ইয়ু ট্রাভেল বাই রোড। নানা রকম ক্যামপেন-মনিউমেন্ট ইত্যাদি দেখান হয়েছিল। এ রকম থিম নিয়েই এই পি আর ক্যামপেনটা। ক্যামপেনটা ছিল আওয়ার চিলড্রেন উইল নো ইচ আদার বেটার — যদি তাদের মধ্যে যোগাযোগটা থু হয়। তো গল্পটা উনিই

লিখবেন। একটা ছোট্টা শিখ ছেলের গল্প। দশ বারো বছর বয়স। সে কলকাতায় থাকে, স্কুলে পড়ে। খালসা হাই স্কুলে। তার বাবা ডানলপে কাজ করে। ভাল মেকানিক। সে আম্বাটুরে বদলি হয়েছে। তো ছেলের মন খারাপ। হঠাৎ একদিন Stow away হয়ে ট্রাকের পিছনে লুকিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে ড্রাইভার তাকে ধরে ফেলে। তো ড্রাইভারের করুণা হল। ও কে একটা টিকিট কেটে ট্রেনে চাপিয়ে দিল। তারপর ছবিটা ওই বাচ্চাটার journey নিয়ে।

বিভিন্ন রাজ্য এলাকা ঘুরতে ঘুবতে ছেলেটা একদিন আম্বাটুরে ওর বাবার সঙ্গে মিলিত হল। ছোট গল্প। ২৫-৩০ মিনিটের। এবং ডানলপ টায়ারের প্রত্যক্ষ প্রচার কিছু নেই। খালসা হাই স্কুলের হেড মাস্টারকে আমরা একজন বাচ্চা ছেলে দিতে বলেছিলাম।

হেডমাস্টার মশাই সহযোগিতা করেছিলেন। স্কুলের ক্যাম্পাসে ২০-২৫ জন ছেলেকে লাইন -আপ করালেন। আমি মানিকবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। এবং আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম উনি ছেলের দলের দিকে এক পলক তাকালেন এবং unerringly কোনওরকম ইতস্তত না করেই যেন এক জনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন "আমি একে চাই।" ওঁর চোখটা এত নিখুঁত ছিল। ছেলেটি ওই ভূমিকায় খুবই সুন্দর অভিনয় করেছিল। দুঃখের বিষয় সেই ফিল্মটা যে কোথায় গেল কোনও খোঁজ পাইনি।

ওঁর বিজ্ঞাপনের কাজকর্ম নিযে অনেক লেখার আছে। ডি জে কিমারের গোড়ার দিকে টি বোর্ডের জন্য ক্যামপেন, ডানলপের জন্য ক্যামপেন। ওঁর ডিজাইন এবং টাইপোগ্র্যাফি নিয়ে কাজকর্ম। ওঁর কবা এক ধরণের টাইপ ডিজাইন তো ওর নামেই পরিচিতঃ রে রোমান। ক্ল্যারিয়নের সিলভার জুবিলিতে (১৯৮১) আমরা একটা ছোট বই ছাপি। তার কভার ডিজাইনটা করা হয়েছিল রে রোমানেই। আর একটা কথা, কর্পোরেট ফিল্ম ৫৮ সালে উনি যেমন বানিয়েছিলেন আজও আমার মতে সেটা একটা দৃষ্টান্ত।

অনুলিখন ঃ দীপঙ্কর চক্রবর্তী

আমার শিক্ষক

সন্দীপ রায়

('আমার বাবা' ধরনের একটা লেখা তৈরী করা আমার পক্ষে এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। প্রথমত এই ধরণের লেখা তৈরির জন্য একটা দীর্ঘ প্রস্তুতি লাগে। একটা নিরপেক্ষ, নির্লিপ্ত মানসিকতা গড়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। পাশের ঘরে লাল চেয়ারে উনি বসে নেই, এই ভয়ঙ্কর বাস্তবটায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে আমার আরও সময় দরকার। দ্বিতীয়ত আমার বাবা, তিনি সত্যজিৎ রায় হলেও আমার কাছে তো তিনি আমারই বাবা, সম্পর্কটা এত ব্যক্তিগত— ভালবাসা, রাগ অভিমান, সুখ, দুঃখ, সবটাই এত বেশি আমাদের নিজেদের যে সেটা আমি তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে ভাগ করে নিতে রাজি নই। এই লেখাটি কখনোই বাবা সম্পর্কে আমার স্মৃতিচারণ হয়ে ওঠেনি। লেখাটি বরং সেদিক থেকে অনেকটাই তথ্যপ্রধান। তবে একটি নির্দিষ্ট সূত্র ধরেই আমি এগোতে চেয়েছি।)

ছোটবেলা থেকেই দেখছি বাড়িতে সিনেমা নিয়ে কাজকর্ম, আলোচনা, বইপত্র। বাড়িতে সিনেমার পরিবেশ ছিল বলে যে বাবার সঙ্গে খুব একটা বেশি সিনেমা দেখেছি তা কিন্তু নয়। ছোটবেলায় সিনেমা দেখা ছিল একটা হৈ-হুলোড়েব ব্যাপার। মনে আছে, সে সময়টা ছিল কার্টুনের যুগ। রবিবার বা ছুটিছাটার দিনে মর্নিং শোতে ঐসব ছবি দেখান হত। টম অ্যান্ড জেরি, ওয়ালট ডিজনির ছবি। বেশির ভাগ ছবিই দেখতে যেতাম মেট্রো ও গ্লোবে। গ্লোব তখন পুরোন থামওলা। যেতাম সমবয়সী আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দল বেঁধে। বাবার সঙ্গে সিনেমা দেখাটা শুরু হল আরও পরে। তখন ষাট দশকের মাঝামাঝি। তখন এসপ্ল্যানেডের হলে মাঝে মাঝেই পুবোন কমেডি কমপাইলেশন্‌স রিলিজ করত। যেমন ধরুন রবার্ট ইয়নসনেব 'হোয়েন কমেডি ওয়াজ কিং', 'ডেজ অফ থ্রিলজ অ্যান্ড লাফটার', 'গোল্ডেন এজ অফ কমেডি।' গ্লোবে এসেছিল সেই বিখ্যাত 'ফোর ক্লাউনস'-মানে লরেল হার্ডি, বাস্টার কিটন, চ্যাপলিন— বাবা তো কাগজে দেখে খুব উৎসাহী। চল, যাওয়া যাক। বাবাব সঙ্গে ঐ সময়ে সিনেমা যাওয়া মানে আমরা একসঙ্গে দুটো পরিবার যেতাম। সুভাষ ঘোষালের নাম হয়ত আপনারা অনেকে শুনেছেন। বিজ্ঞাপন জগতের কিংবদন্তী পুরুষ। আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সুভাষ ঘোষাল, ওঁর স্ত্রী গোপাদি আর ওঁদের ছেলে সুমন্ত্র। আর এদিকে আমি আর মা-বাবা। সঙ্গে মাঝে মাঝে আমাদের মাসি-পিসিরাও থাকতেন। তখন একটুও বড়ও হয়েছি। সব ধরনের ছবি দেখার অনুমতিও পেয়ে গেছি। তখন বাবার সঙ্গে হিচককের বহু ছবি একসঙ্গে দেখেছি। আর দেখেছি জেমস বন্ড-এর ছবি। শন্ কনরির 'থান্ডার বল' থেকে শুরু করে রজার মুরের 'এ ভিউ টু আ কিল' পর্যন্ত। বাবা জেমস বন্ডেব ছবি খুব ভালবাসতেন। ছবি দেখার সময়ে উনি কথাবার্তা বলা একদম পছন্দ করতেন না। তবে বাড়ি ফিরে এসে নানারকম আলোচনা হত। খুব যে সিরিয়াস আলোচনা তা নয়। একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেসব কথা মনে হত সেসবই। বাবা খুবই মজা পেয়েছিলেন আর একটা

ছবি দেখে, সেটা সুপাবম্যান। বিশেষত সুপাবম্যান ২ নম্ববটা। ঐ ছবিটাব স্পেশাল এফেকট, ট্রিক ফটোগ্রাফি নিয়ে বাবাব সঙ্গে আমাব অনেক আলোচনাও হয়েছে। হলে ওঁব সঙ্গে দেখতে যাওযা আব একটা ছবিব কথাও মনে পড়ছে— ক্রিস্টোফাব লিব ড্রাকুলা সিবিজেব একটা ছবি। তবে এবপব কলকাতাব সিনেমা হলগুলোব অবস্থা এত খাবাপ হযে গেল যে বাবা হলে গিযে ছবি দেখা প্রায ছেড়েই দিলেন। তখন বাবাব সঙ্গে একটানা সিনেমা দেখেছি ইউ এস আই এস-এব লিঙ্কন রুমে। প্রায নিযমিত। তখন ওঁবা এক একজনেব একেকটা সিবিজ দেখাতেন। যেমন ফ্রাঙ্ক কাপবা, হিচকক, বিলি ওয়াইল্ডাব। মনে আছে জন ফোর্ডেব সিবিজটা বাবাই উদ্বোধন কবেছিলেন। হলে সিনেমা দেখা বন্ধ হবাব পবে ওখানেই সিনেমা দেখা শুরু হযেছিল। আব মাঝে মাঝে ব্রিটিশ কাউন্সিলে। নইলে কলকাতায বা বিদেশে ফেস্টিভালেব সমযে। একটা গল্প বলি। সালটা ১৯৬৯। গুপী গাইন বাঘা বাইন যখন বার্লিনে গেল, একদিন আমি, মা-বাবা, তপেনদা আব ববিকাকা বাস্তা দিযে হাঁটছি, হঠাৎ দেখলাম একটা সিনেমা হলে চ্যাপলিনেব সার্কাস ছবিটি হচ্ছে। সার্কাস এখন অনেকেই দেখেছেন। তখন কিন্তু 'সার্কাস' একেবাবে বিবল ছবি। বাবা বহুদিন আগে দেখেছিলেন। বার্লিনেব হলে 'সার্কাসে'ব হোর্ডিং দেখেই বাবা উত্তেজিত হয়ে সবাইকে নিযে ঢুকে পড়লেন। এবকম ঘটনা বিদেশে মাঝে মাঝেই হযেছে। ১৯৮৪ সালে আমাদেব বাড়িতে ভিডিও এল। ভিডিওতে ছবি দেখাব পর্বটা তখন থেকেই শুরু হল। বাবাও ভিডিওতেই ছবি দেখতে অভ্যস্ত হযে উঠলেন। বাবাব শবীবও তখন বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। যখন তখন বাইবে বেবিযে ছবি দেখাও সম্ভব নয। ঐ সময়ে কিন্তু আমেবিকান সেন্টাব আমাদেব বাড়িতে এসে অনেক ছবি দেখিযে গেছে। ভিডিও পর্বটা শুরু হওযাব পবে একটা বড সুবিধা হল। আমাব নিজেব একটা মোটামুটি বড় লাইব্রেবী হযে গেল। আমি বিদেশে যাচ্ছি বা কেউ বিদেশে গেলে বাবা কতগুলো ছবিব নাম বলে দিতেন। বাংলা বা হিন্দি ছবি সেভাবে বাবাব সঙ্গে হলে গিয়ে আমি বিশেষ দেখিনি। মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদাব, তপন সিংহেব ছবিব বিশেষ প্রদর্শনীতে ওঁবা বাবাকে ডাকতেন। তখন আমবা বাবাব সঙ্গে যেতাম। শ্যাম বেনেগালেব কিছু ছবিও আমবা একসঙ্গে দেখেছি। তখন আমাদেব মাঝে মাঝেই বোম্বাই যেতে হত। আমবা বোম্বাই গেছি খবব পেলেই শ্যাম একটা স্পেশাল শো-এব ব্যবস্থা কবতেন। কমার্শিয়াল হিন্দি আব বাংলা ছবি আমি আলাদাই দেখেছি। 'শোলে' দেখে বাবা অবশ্য খুব খুশি হযেছিলেন। ছবিটা দেখেন বোম্বাইতে। সঞ্জীবকুমাব দেখিয়েছিলেন। 'শোলে' দেখেই বাবা ঠিক কবে ফেলেন আমজাদই ওযাজিদ আলি কববেন। আমাব মনে আছে 'শোলে' দেখাব পব উনি বলেছিলেন, অনেকদিন বাদে একটা অন্যবকম কমার্সিযাল হিন্দি ছবি দেখলাম। টেকনিক্যাল ব্যাপাবে হলিউডেব কথা মনে কবিযে দেয। একটু বেশি লম্বা আব বোধহয বাধ্য হযেই কিছু মালমশলা ঢোকাতে হযেছে। ওগুলো কম থাকলে আবও ভাল হত। আব কোনো কমার্শিযাল হিন্দি ছবি সম্পর্কে বাবাকে অত সপ্রশংস হতে শুনিনি।

লেক অ্যাভিনিউ-এব বাড়িতে থাকাব সমযেই উনি একটা ৮ মিঃ মিঃ মুভি ক্যামেবা আনেন। বিদেশ থেকে। 'ইযাসিকা' ক্যামেবা ছিল। ব্যাটাবিতে চলত। প্রথমে ক্যামেবাটা উনিই ব্যবহাব কবতেন। দিল্লি, আগ্রা গেলাম সবাই মিলে। উনি ক্যামেবাটা নিযে গেলেন। ছবি তুললেন। আমি ঐ ক্যামেবাটা হাতে পাই আমাব ১০/১১ বছ্ব বযসে। অত ছোট

বয়সে অত দামী ক্যামেরা নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম দেখেও কিন্তু মা-বাবা একবারও বকাবকি করেননি। বাবার তো বেশ একটা প্রশ্রয়ই ছিল। ক্যামেরাটা কিভাবে চালাতে হয় মোটামুটি নিজেই শিখে নিয়েছিলাম। ক্যামেরার সঙ্গে একটা ইন্সট্রাকশন বইও থাকত। সেটা উল্টে পাল্টেও অনেকটা বুঝতে পেরেছিলাম। তাছাড়া বাবা কিভাবে ক্যামেরাটা চালাতেন, সেটা তো লক্ষ করতামই। তবে ঐ সময়ে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে একজন কাজ করত, সে আগে কাজ করত স্টুডিও-র ডার্ক রুমে। ফলে ক্যামেরার ব্যাপারে তার বেশ একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল। বলতে গেলে ও-ই আমার ক্যামেরা নাড়াচাড়ার বয়সে প্রধান সহকারী হয় গেল। ঐ সময়ে ৮ মিঃ মিঃ ফিল্ম কেনা হত কোডাক থেকে। ঐ ২৫ ফুটের ফিল্মগুলোব দুদিকে ছবি তোলা যেত। মানে দুদিক মিলিয়ে ৫০ ফুট। এলাহী ব্যাপার। ছবি তুলে আমরা ফিল্মটা দিয়ে দিতাম কোডাককেই। ওরা বোম্বাই থেকে প্রিন্ট করে নিযে আসত। অনেকেই হয়ত ভাবছেন ছবি তো প্রিন্ট হল কিন্তু দেখতাম কিসে? তখন লিন্ডসে স্ট্রিটে প্যাটেল ইন্ডিয়া নামে একটা নামকবা দোকান ছিল। এখন ওখানে একটা জামাকাপড়ের দোকান হয়েছে। তো ঐ প্যাটেল ইন্ডিযার মালিক ছিলেন আমাদের খুবই পরিচিত। আমাদের বাড়িতে একটা ৮ মিঃ মিঃ ক্যামেবা এসেছে দেখার পরেই উনি আমাদের একটা ৮ মিঃ মিঃ প্রজেক্টব উপহাব দিয়েছিলেন। প্রজেক্টরটা পেয়ে যাওয়ায বাড়িতেই একটা মিনি সিনেমা হল বানিয়ে ফেলা হত। সব সময়েই আমার উৎসাহেই অন্যদের ছবি দেখতে বসতে হত। বাবাকেও। প্রথমদিকে তো বাড়ির মধ্যে আর চারপাশে যা পাচ্ছি আর যাকে পাচ্ছি তারই ছবি তুলছি। ঐ ক্যামেবায় তোলা যাকে বলে আমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি দার্জিলিং। আমি তো অন্তত তখন ওটাকেই আমার পূর্ণাঙ্গ ছবি মনে করতাম। কেননা ঐ প্রথম আউটডোরে গিয়ে ছবি তোলার সুযোগ পেলাম। বাবা তখন কাঞ্চনজঙঘার শুটিং করতে দার্জিলিং গেছেন। আমরাও সকলে সঙ্গে গেছি। বলা বাহুল্য ঐ ৮ মিঃ মিঃ ক্যামেরাটি নিয়ে। বাবা যখন কুয়াশার মধ্যেই শুটিং চালিয়ে যাচ্ছেন, আমি তখন একটু রোদ পেলেই এদিক-ওদিক ঝোপে-ঝাড়ের পাশে ক্যামেরা বাগিয়ে বসে পড়ছি। বাবা কাঞ্চনজঙঘা শেষ করে কলকাতায় ফিরলেন, আর আমি ফিরলাম দার্জিলিং শেষ করে। কোডাক থেকে প্রিন্ট পাওযার পর আমি নিজে একটু লুকিয়ে চালিয়ে দেখলাম, নাহ্, প্রিন্ট মোটামুটি ঠিকই আছে। এবার রিলিজ করা যেতেই পারে। প্রজেক্টর সাজিয়ে গুছিয়ে, বেশ ঘরভর্তি দর্শক নিয়ে ছবি চালালাম। সকলেই বেশ মন দিয়ে দেখলেন। কেউ ঠাট্টা ইয়ার্কি করলেন না। বরং বেশ সুখ্যাতিই করলেন। এমনকি বাবাও। দার্জিলিং দেখার পরেই বাবার কাছে আমার যাকে বলে একটা প্রোমোশন হল। এক নম্বর. আমাকে বাবা মাঝে মাঝে এডিটিং রুমে ঢোকার অনুমতি দিলেন। দু নম্বর, বাবা বাইরে থেকে ৮ মিঃ মিঃ ছবি আনতে শুরু করলেন, কিছুটা আমারই জন্য। বাবা তখন নিয়মিত বাইরে যান। আর বিদেশে তখন প্রচুর ৮ মিঃ মিঃ ছবি পাওয়া যায়। যেগুলোকে হোম মুভিজ বলে। লরেল হার্ডি, চ্যাপলিন, হ্যারল্ড লয়েডের ছবিতে বাড়ি ভরে গেল। বাবা বিদেশ থেকে ফিরলেই তখন আমার একমাত্র আগ্রহ, এবারে বাবা কটা ছবি আনল। বাবার কাছেও এই ছবি কেনাটা একটা নেশার মত হয়ে গিয়েছিল। দার্জিলিং-এর পরে ঐ ক্যামেরায় আমার আব একটা লম্বা-চওড়া ছবি, দি মেকিং অফ গুপীবাঘা। লম্বা-চাওড়া বলছি এই কারণে যে আমি প্রায় চার বোল ছবি তুলেছিলাম।

তবে সবটাই ইনডোরে। বাবা গুপী গাইনের কাজ করেছিলেন এন টি (১)-এ। ওখানেই। আউটডোরে যাওয়ার সুযোগ পাইনি। তখন আমার ১৫/১৬ বছর বয়স। স্কুলে কিছুটা পড়াশুনার চাপও ছিল। গুপী গাইনের ঐ চার রোল ফিল্ম থেকে আমি নিজেই এডিট করেছিলাম। তখন কিভাবে সিমেন্ট লাগাতে হয়, ভালই শিখে গেছি। সিমেন্ট হল ফিল্ম জোড়া দেওয়ার এক ধরনের কেমিক্যাল। তবে গুপী গাইনের পরে ঐ ক্যামেরাটা আর বিশেষ ব্যবহার করা গেল না। কারণ বাজাবে স্ট্যান্ডার্ড ৮ মিঃ মিঃ ফিল্ম বন্ধ হয়ে গেল। পরে ছবি দেখার জন্য সুপার ৮ প্রজেক্টর কেনা হয়েছিল। কিন্তু সুপার ৮ ক্যামেরাটা আর কেনা হয়নি। তবে যেটা সব থেকে দুঃখ লাগে, সেটা হল কাঞ্চনজঙ্ঘার সময় তোলা দার্জিলিং ছবিটা হারিয়ে যাওয়ায়। লেক টেম্পল রোডের বাড়ি থেকে বিশপ লেফ্রয় রোডে চলে যাওয়ার সময়েই ওটা লোপ পায়। গুপী গাইনের উপর তোলা ছবিটা কিন্তু এখনও আমার কাছে আছে।

মুভি ক্যামেরার গল্প যখন হলই, তখন স্টিল ক্যামেরার পর্বটিও বলে রাখা ভাল। আমাদের বাড়িতে একটা বিদেশি আগফা ক্যামেরা ছিল। একেবারেই বক্স ক্যামেরা। আগফাটা ছোটবেলায় আমারই দখলে ছিল। বাড়ির লোকদের ছবি তুলে বেড়াতাম। বাইরে গেলেও ক্যামেরাটা হাতছাড়া করতাম না। বাবা ছবি তুলতেন একটা লাইকা ক্যামেরায়। লাইকা ক্যামেরাটা কিন্তু বাবার ছিল না। ছিল বংশী চন্দ্রগুপ্তের। কিন্তু ক্যামেরাটা বাবাই ব্যবহার করতেন। ষাট দশকের প্রথমদিকে বাবা জাপান গেলেন। এই সফরটা বাবার কাছে খুব গুরত্বপূর্ণ ছিল। কারণ সেবারই ওঁর সঙ্গে প্রথম আকিরা কুরোসাওয়ার আলাপ হয়। সেবার বাবা জাপানে বহু জায়গা ঘোরেন। ফেরার সময় নিয়ে আসেন একটা আসাহি পেনট্যাক্স ক্যামেরা। বলতে গেলে ওটাই প্রথম বাবার নিজের ক্যামেরা। এমনিতে বাবার স্টিল ক্যামেরা খুবই দরকার হত। লোকেশন নির্বাচনের সময়ে বিভিন্ন আউটডোরে গিয়ে নিজেই ছবি তুলতেন। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে প্রিন্ট করে চিত্রনাট্যের সঙ্গে মিলিয়ে জায়গাটা পছন্দ করতেন। এদিকে আমি ততদিনে বক্স ক্যামেরা আগফা ছেড়ে একটু ভাল ক্যামেরা ধরতে চাইছি। বক্স ক্যামেরায় ছবি তুললে তো আর ট্রেনিংটা হয় না।

আজকাল অটোমেটিক ক্যামেরাগুলো যেমন। ক্যামেরা সম্পর্কে ন্যূনতম ধরণা হয় না। ফলে বেড়াতে গিয়ে ব্যাটারি একটু ডাউন হয়ে গেলেই মাথায় হতে পড়ে যায়। যাইহোক ৬৮/৬৯ নাগাদ বাবা পেনট্যাক্সটা আমায় দিলেন। তখন আমাদের ৩৫ মিঃ মিঃ ফিল্ম বাজার থেকে কিনতে হত না। শুটিঙের সময়েই ক্যাসেট লোড হয়ে যেত। ছবি তোলার সময়ে বাবাকে যে সবসময়ে প্রশ্ন করে জর্জরিত করতাম এমন নয়। কারণ আমাকে দেখিয়ে দিতেন ইউনিটের সদস্যরা। যেমন ধরুন সৌমেন্দু রায়। ওঁর কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। ইতিমধ্যে বাবা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাজ শুরু করছেন।

বহুদিন পর্যন্ত সিনেমার স্টিল কিন্তু স্টিল ক্যামেরায় তোলা হত না। তোলা হত সিনে ক্যামেরা অ্যারিফ্লেক্সেই। শটটা শেষ হবার পরে সবাই পোজ দিতেন। মানে একেবারে অরিজিন্যাল শটের কায়দায়। অ্যারিফ্লেক্স চালিয়ে কয়েক ফুট তুলে রাখা হত। তারপর ডেভলাপ করে বাবাকে এনে দেওয়া হত। বাবা তার থেকে বেছে প্রিন্ট করতে দিতেন। একেই বলা হয় গেট স্টিল। এই গেট স্টিলই সিনেমা হাউসের লবিতে টাঙান হত। আমি

যতদূর জানি অন্যান্য বাংলা ছবির ক্ষেত্রেও একই ফর্মূলা ছিল। বাবার সাদা-কালোয় তোলা ছবির যেসব স্টিল ফটোগ্রাফ আপনারা দেখতে পান তার অধিকাংশ ঐ গেট স্টিলই। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র শুটিঙে আমি কিছু স্টিল তুললাম। তবে সে ছিল একেবারেই হাত পাকাবার ব্যাপার। তখন নিমাইবাবু এসে গেছেন। তো প্রিন্ট আসার পরে দেখলাম ছবির অবস্থা খুব একটা খারাপ নয়। বাবাকে নিয়ে গিয়ে দেখালাম। বাবা গম্ভীর মুখে সেসব দেখলেন। আমি প্রায় পরীক্ষায় পাস না ফেল-সেরকম একটা টেনশন নিয়ে অপেক্ষা করছি। শেষপর্যন্ত উনি হাত নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, চলবে।' উৎরে গেলাম। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে আমি শুটিঙে নিয়মিত যেতাম না। 'সীমাবদ্ধ'তে সেদিক থেকে বাবার ছবিতে আমার অফিসিয়ালি যোগদান। বাবা নিমাইবাবু আর আমাকে বলে দিলেন, যেসব কম্পোজিশন আমার নিজের খুব ভাল লাগছে, সেগুলো আমি নিজেই সেট স্টিল তুলছি। বাকিগুলো তোমরা দুজনে মিলে তোল। বুঝতে পারি তখনও বাবা একটু ভয় পাচ্ছিলেন। কাবণ সিনে ক্যামেরা আর স্টিল ক্যামেরা দুটোই ৩৫ মিঃ মিঃ ফিল্ম নিয়ে কাজ করলেও দুটোব ফর্মাট একদম আলাদা। বাবার ভয় ছিল পারফেক্ট কম্পোজিশন তুলতে পাবব কিনা। যাই হোক, কাজ শুরু হয়ে গেল। 'সীমাবদ্ধ'-র আউটডোর ইনডোর দুটোতেই ছিলাম। প্রোডাকশন স্টিল, শুটিং স্টিল দুটোই তুলেছিলাম। বাবা বলে দিয়েছিলেন, আপাতত তুলে যাও। আমি পরে একটা চূড়ান্ত বাছাই করে নেব। 'সীমাবদ্ধ' ছবিতে টাইটেলে আমার নাম যায়, নিমাইবাবুব সঙ্গে স্টিল ফটোগ্রাফার হিসাবে। ইনার আই, অশনি সঙ্কেত থেকে বাবার রঙিন ছবি শুরু। রঙিন গেট নেগেটিভ থেকে তখন ভাল প্রিন্ট হত না। ফলে আমাদের কাজ আর একটু বাড়ল। আমরা রঙিন ও সাদা-কালো-দুটো ফিল্মেই স্টিল তুলতে শুরু করলাম। গেট স্টিলের রেওয়াজ উঠে গেল। অর্থাৎ 'অশনি সংকেত' থেকে 'আগন্তুক' পর্যন্ত সব ছবিরই স্থিরচিত্র তোলা হল স্টিল ক্যামেরায়, অ্যারিফ্লেক্সে নয়। অবশ্য তার মাঝখানে সাদা-কালোয় তোলা 'জন অরণ্য'-তে বাবা কিছু গেট স্টিল তুলেছিলেন।

অনেকক্ষণ ক্যামেরার গল্প হল, এবার অন্য বিষয়। আপনাদের মধ্যে ছোটবেলায় নিশ্চয়ই অনেকেই সন্দেশ পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। গ্রাহক কার্ডটা মনে আছে? ভাঁজ করা কার্ডের সর্বাঙ্গে সন্দেশ শব্দটা লেখা। মধ্যে নিজের ছবি লাগানোর জায়গা। আমারও ঐরকম একটা কার্ড এখনও আছে। এ ব্যাপারে অন্যান্য গ্রাহকের থেকে আমার পার্থক্য একটাই। আমি ঐ পত্রিকার সম্পাদক মশাইকে সন্দেশ-এর কাজকর্মে ব্যস্ত অবস্থায় দেখতে পেতাম। ধরুন, পুজোসংখ্যা সন্দেশ বেরোবার আগেই আমি জেনে যেতাম এবার কী কী থাকছে। এটা কি কম মজা? আপনাদের অনেকের মতই আমার জীবনের প্রথম ছাপার অক্ষরে লেখা প্রকাশিত হয় সন্দেশ-এর হাত পাকাবার আসরে। ছোট ছোট গল্প, ছবি। সব লেখাই সম্পাদক মশাইকে দেখাতে হত। উনি সংশোধন করতেন। সংশোধনের ফলে একটা দারুণ সুবিধা হল। উনি সংশোধন করে দিতেন বলেই জানতে পারতাম স্কুলে যে বাংলা বানানটা শিখি, সেটা আর ঠিক বানান নয়। বানান পালটে যাচ্ছে। সহজ হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি, গাড়ি, এগুলো আর দীর্ঘ ঈ নয়। হাত পাকাবার আসর-এ অবশ্য অল্পই লিখেছি। সতের বছরের পরে তো আর ঐ বিভাগে লেখাও যেত না। বড় হবার পরে আমার মনে হল সন্দেশ-এর জন্য খুব নামকরা সিনেমার মেকিং নিয়ে লিখলে কিরকম হয়। সম্পাদক মশাইকে বললাম। উনি বললেন, খুবই ভাল হয়। তবে এমন ধরনের

সিনেমা নিয়ে লেখ, যেটা ছোটবড় সবাই দেখেছে। মেকিংটা মজাদার। তখন বাবা সন্দেশ-এর জন্য একেই বলে শুটিং লিখতে শুরু করেছেন। ছোটরাও সিনেমা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে, গল্প করতে শুরু করেছে। সেসব নিয়ে প্রচুর চিঠিপত্র আসছে। আমি বেশ কয়েকটা ছবি নিয়ে লিখেছিলাম। কিংকং, বেনহার, সুপারম্যান, জেমস বন্ড ধরনের কয়েকটা বিদেশি ছবি আর ফটিকচাঁদ। এগুলো লেখার জন্য আমি নানারকম বইপত্রের সাহায্য নিতাম। আমেরিকান লাইব্রেরীতেও যেতাম। কিন্তু বাংলায় ঐসব টেকনিকাল ব্যাপারগুলো নিয়ে লেখা বেজায় ঝামেলা। কিংকং কিভাবে দেওয়াল বেয়ে উঠছে? অথবা সুপারম্যান কিভাবে প্রপেলারের মত হাতের মুঠো ঘুরিয়ে ওড়ার দিক পালটাচ্ছে? এসব বাংলায় লিখতে গিয়ে মনে হয় খুব জটিল হয়ে যেত। সম্পাদক মশাই কিন্তু পাণ্ডুলিপি হাতে পেলেই ম্যাজিক দক্ষতায় কেটে কুটে সহজ সরল করে দিতেন। যেটা আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চারলাইনে ম্যানেজ করেছি, সেটা উনি এক ঝটকায় দু লাইনে নামিয়ে দিতেন। আমার সন্দেশ-এ এইসব লেখালিখির পেছনে কিন্তু সবচেয়ে বেশি চাপ নিনি পিসি মানে নলিনী দাশের কাছ থেকে। লেখালিখির চেয়েও বড় কথা ছিল সন্দেশ আমাদের সকলের ভালবাসার কাগজ। অনেকবার এমন হয়েছে যে বাবা প্রচণ্ড কাজের মধ্যেও সময় করে নিয়ে সন্দেশ-এর কোনো লেখার লে-আউট, ডিজাইন নিয়ে বসেছেন। ওঁকে দেখে বুঝতে পারছি ওঁর অসুবিধা হচ্ছে, তবু সন্দেশ তো! ছেড়েও দিতে পারছেন না। অনেক দিন এমন হয়েছে, আমি ওঁর হাত থেকে অর্ধসমাপ্ত কাজটা তুলে নিয়ে নিজে শেষ করে দিয়েছি। সেই সন্দেশ যদি উনি চলে যাওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যায়, তবে খুব দুঃখের ব্যাপার হবে। অনেকেই বলেতে শুরু করেছেন এই তো উনি নেই, আর কী হবে? এটা যেন বেশিদিন লোকে বলতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি সন্দেশ পত্রিকার দায়িত্ব কিছুটা নিয়েছি। আগামী একবছর ধরে ওঁর কিছু বিশেষ লেখার পুর্নমুদ্রণ হবে, কিছু চিত্রনাট্য ছাপা হবে। সেগুলির একটা খসড়া তৈরি করেছি। জানি না কতটা পারব, তবু মাঝে মাঝে সন্দেশ সম্পাদকীয় দপ্তরের মিটিঙে যাচ্ছি। সন্দেশ-এর কভার এখন থেকে নিয়মিত আমি করে যাব।

চারপাশে যা দেখি, তাতে মনে হয় এই সময়ের আধুনিক লোকজনের কাছে পরিবার, ঐতিহ্য— এই ব্যাপারগুলোর বোধহয় তেমন কোনো মূল্য নেই। আমি সে তুলনায় নিশ্চয়ই বেশ সেকেলে। আমার প্রপিতামহ উপেন্দ্রকিশোর সন্দেশ প্রকাশ করেছিলেন ১৯১৩ সালে। ১৯২৬/২৭ নাগাদ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। বাবা আবার সন্দেশকে বাঁচিয়ে তোলেন বাবার চল্লিশ বছরের জন্মদিনে ১৯৬১ সালে। সন্দেশ-এর পুনর্জন্ম না হলে হয়তো ফেলুদা, শঙ্কু আর অন্যান্য সব দুর্দান্ত গল্প কোনোদিন লেখাই হত না। সেই সন্দেশকে ভাল না বেসে পারা যায়। ২০১১ সালে সন্দেশ-এর হৈ চৈ করে পঞ্চাশ বছর পূর্তি না করতে পারলে একটা আফশোস থেকে যাবে।

আমার কলেজ জীবনটা খুব অর্থহীন, অকারণ মনে হয়েছে। কারণ আমি অনেকদিন আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে আমি কী করব। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পাসকোর্সে ভর্তি হই। এ ব্যাপারে বাবা কখনও কোনো চাপ দেননি। বাবা আমায় অনেকবার বলেছেন, অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে পড়াশুনো করে ওঁর কোনো লাভ হয়নি। পাস কোর্সে পড়াশুনা করে আমার একটা বড় সুবিধা হয়েছিল। আমি অনেকটা সময় পেতাম। ঐ ফাঁকা সময়টা

আমি বাবার কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারতাম। কলেজে পড়ার থেকে যেটা আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাক্ষেত্র ছিল। আমি যখন কলেজে পড়ছি, বাবা তখন কলকাতা নিয়ে ছবির কাজ শুরু করেছেন। মনে সেই অস্থির সময়ের কলকাতা নিয়ে। এতদিন বাবা ছবি করতেন টালিগঞ্জের এন টি এক নম্বর স্টুডিওতে। এন টি ওয়ান তখন কলকাতার নকশালপন্থীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ শেলটার। মাঝে মাঝেই পুলিশ রেইড করছে। সে ভীষণ অবস্থা। ইউনিটের অন্যান্যদের পরামর্শে বাবা অরণ্যের দিনরাত্রির সময়ে এন টি ওয়ান ছেড়ে ইন্দ্রপুরীতে চলে এলেন। ইন্দ্রপুরী ১৯৬৯ সালে প্রায় মরা স্টুডিও। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' থেকেই ইন্দ্রপুরী আবার বেঁচে উঠল। ইন্দ্রপুরীর পরিবেশে তখন তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ছিল। কিন্তু রাস্তাঘাটে গোলমাল লেগেই ছিল। ইউনিটের প্রত্যেক সদস্য বাবার সই করা আইডেনটিটি কার্ড পকেটে রাখতেন। পুলিশ অথবা রাজনৈতিক দলের ছেলেরা গোলমালের মধ্যে ওঁদের ধরলেই ওঁরা পকেট থেকে ঐ কার্ডটা বের করতেন। প্রত্যেকে কিন্তু সম্মানের সঙ্গে ওঁদের ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ কখনও বিরক্ত করেনি। আমি একবার একটা ছোট ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম। সাউথ সিটিতে সিট পড়েছিল। পরীক্ষা হলে ভীষণ গোলমাল শুরু হল। বেঞ্চ উলটে, খাতাপত্র ছিঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে সে এক বীভৎস অবস্থা। বাইরে বেরনোর পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে একটা দল আমাকে ঘিরে ফেলে হুমকি দিতে শুরু করে। আমি সত্যজিৎ রায়ের ছেলে, এটাই কারণ সম্ভবত। যাইহোক, ভাগ্য ভাল, আমার কিছু বন্ধুবান্ধব চলে আসায় আমাদের দলটা একটু ভারি হয়ে যায়। আমি বন্ধুদের একজনের গাড়িতে উঠে চলে আসি। ঘটনাটা বাবা শোনার পরে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। এমন কি একটা সময়ে ভেবেছিলেন, কিছুদিন কাজকর্ম বোম্বাইতে গিয়ে করলে কেমন হয়। যাইহোক শেষপর্যন্ত বাবা অবশ্য কলকাতাতেই নিরাপদে কাজকর্ম করতে পেরেছিলেন। আমার নিজের ঐ সময়ের আর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেন্ট জেভিয়ার্সে রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। রাস্তা ঘাটে পোস্টার ওয়ালিং তো সবই দেখেছি। কিন্তু পরীক্ষা দিতে দ্বারভাঙা হলে গিয়ে দেখলাম ক্লাসঘরের একটা দেওয়ালে এক ইঞ্চিও সাদা জায়গা নেই। সবটায় ওয়ালিং করা। ভিস্যুয়ালি অদ্ভুত লাগছে দেখতে। বাবাকে বলেছিলাম ব্যাপারটা। তারপর বাবা নিজেও ঘুবে ঘুরে দেখেন। 'জন অরণ্যে' দৃশ্যটা ব্যবহারও করেন। বাবা অবশ্য একেবারেই প্রফেশনাল লোকেদের সাহায্য নিয়ে এফেকটটা তৈরি করেন।

বাবার সঙ্গে আমি মোট তিনবার বিদেশে গেছি। বিদেশেব মধ্যে আমি অবশ্য কাঠমাণ্ডুটা ধরছি না। দুবার বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে গেছি। একবার যখন 'মহানগর' সিলভার বেয়ার পায়, ১৯৬৪ সালে। দ্বিতীয়বার আবার বার্লিনেই। গুপী গাইনের সময়। ১৯৬৯ সালে। তৃতীয়বার, যখন আমেরিকার হিউস্টনে বাবার বাইপাস অপারেশন হল তখন। প্রথমবার 'মহানগরে'র সময় বয়স খুবই অল্প। বছর দশেক। মনে আছে রোম হয়ে বার্লিন গিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার গুপী গাইনের সময়ে বাবা আমাদের সঙ্গে যাননি। উনি আগে গিয়েছিলেন পূর্ব বার্লিনে। ওখানে ছবি নিয়ে একটা কনফারেন্স ছিল। আমরা সোজা বার্লিন চলে গিয়েছিলাম। সেবার আমাদের বড় দল। বাবা ওদিকের কাজ মিটিয়ে আমাদের সঙ্গে এদিকে দেখা করলেন। সেবার লন্ডন হয়ে ফিরেছিলাম। তৃতীয়বারে তো অসুস্থ বাবাকে নিয়ে যাওয়া। এখান থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে রওনা হলাম। হিথরোতে

নেমে কয়েক ঘন্টা একটা হোটেলে কাটিয়ে গ্যাটউইক থেকে অন্য আরেকটা ফ্লাইটে হিউস্টনে গেলাম। ওখানে তো বাবার অপারেশনের জন্য মাস দুয়েক থাকা হল। ফেরার সময় অনেকে বললেন, সরাসরি না ফিরে লণ্ডন হয়ে ফিরতে। লন্ডনে ওঁর একটু বিশ্রামও হবে। ফেরার সময় হিথরোতে আমাদের পরিচিত অনেকেই ছিলেন। আমরা অক্সফোর্ড স্ট্রিটের একটা হোটেলে সপ্তাহখানেক ছিলাম। কাছেই ছিল তখনকার আকাদেমি সিনেমা। এখন অবশ্য নেই। আকাদেমিতে 'পথের পাঁচালী', বাইরে' রিলিজ করেছিল, মনে আছে এই সময় একদিন সবাই মিলে স্পিলবার্গের 'ইন্ডিয়ানা জোনস এন্ড দ্য টেম্পল অফ ডুম', দেখতে গেলাম। বাবা হিউস্টনে ছবিটা সম্পর্কে অনেক শুনেছেন। একটা উৎসাহও ছিল। ছবিটা দেখার পরে অবশ্য উনি বলেছিলেন, প্রথম দশ মিনিটের পর আর পাতে দেওয়া যায় না। আমি সম্প্রতি আমেরিকার সাল হোসেতে গিয়েছিলাম। ইউনিটি কনভেনশনে বাবাকে মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হল-সেটা নিতে। তো ওখানে গিয়ে শুনলাম 'ইয়ং ইন্ডিয়ানা জোনস' বলে একটা টেলিভিশন সিরিজ চালু হয়েছে। জর্জ লুকাসসহ অনেকেই নাকি বিরাট খাটাখাটনি করে তৈরি করছেন। ইন্ডিয়ানা জোনসের ছোটবেলাটা নিয়ে। ওঁরা একটা এপিসোড শুটিং করেছেন ভারতে এসে। লোকেশন, বেনারস। কবে শুটিং করলেন, কিভাবে শুটিং করলেন জানি না। বুঝতে পারলাম বেশ গোপনেই করা হয়েছে। আমাদের ঐ এপিসোডটি দেখান হল। উদ্ভট ঐ শ্বেতকায়রা এসে আমাদের বাদামী চামড়াদের মানুষ করছে। 'সিটি অফ জয়' মার্কা। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা এখন ওদেশে খুব চলছে। যাইহোক, বাবার সঙ্গে বিদেশে গিয়ে আমাদের প্রচুর সিনেমা দেখা হত বটে। কিন্তু বাবাকে আমরা বিশেষ পেতাম না। কারণ প্রথম দুবারই গেছলাম ফেস্টিভালের সময়ে। আর ফেস্টিভাল মানেই বাবা ভীষণ ব্যস্ত। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তবে বাবা যখন প্রেস কনফারেন্সগুলো করতেন তখন আমরা সেখানে থাকতাম। বাইপাস করে ফেরার পথে লন্ডনে অবশ্য আমরা বাবাকে পুরোপুরি পেয়েছিলাম। তখন বাবার অন্য কোন কাজ ছিল না। হালকা মনে বিশ্রাম। ঐ সময়ে আমরা অনেক বেড়িয়েছি। কাঠমান্ডুতে আমার একসঙ্গে অনেকবার গেছি। কিন্তু কাঠমান্ডুকে তো আর ঠিক বিদেশ বলা যায় না। আমার 'কিস্যা কাঠমান্ডু মে'র শুটিঙের জন্য তো বারবার দীর্ঘ সময়ের জন্য যেতে হয়েছে। তাছাড়া বাবা বিশ্রাম নেওয়ার দরকার হলেই কাঠমান্ডু যেতে চাইতেন। জন্মদিনের দিন কলকাতার ভিড় এড়াতেও। বাবার একটা মজার শখ ছিল। কাঠমান্ডুতে গেলে আমরা সাধারণত থাকতাম হোটেল ওবেরয় সলটিতে। ঐ হোটেলটার ঠিক নিচেই কাঠমান্ডুর বিখ্যাত ক্যাসিনো। বাবা সুযোগপেলেই নিচে নেমে গিয়ে ক্যাসিনোতে ঢুকে স্লট মেশিনে খেলতেন। কাঠমান্ডুতে তো আর বাবাকে কেউ চিনতে পারবে না। চিনতে পারামাত্র এগিয়ে এসে ছবির নান্দনিক তত্ত্ব নিয়ে অলোচনাও শুরু করবে না। বাবা নিশ্চিন্ত। বাবার সঙ্গে আর আমাকে মাঝে মাঝেই যেতে হয়েছে বোম্বাই বা মাদ্রাজ। বাবার ছবিরই কাজে। তবে দুটো জায়গাতেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ থাকত।

ছোটবেলায় বাবার শুটিঙে গেলেই আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল ট্রলি। আমার খুব স্পষ্ট মনে নেই। তবে ইউনিটের সকলে বলেন, বাবা শট নেওয়ার সময় ট্রলিতে উঠে মোড়ার উপর বসলেই আমি নাকি পেছনে গিয়ে দাঁড়াতাম। বাবার সঙ্গে আউটডোর শুটিঙে যাওয়ার পর্বটা অবশ্য এই লেখায় আসছে না। কারণ শুধু সেটা নিয়ে লিখলেই

তো একটা মোটা বই হয়ে যায়। পরে সব গল্পগুলো মনে করে বেশ সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে লেখা যাবে। বরং আসি বাবার ছবির ট্রেলার বানানো হল কিভাবে, সেই গল্পটায়। আপনারা সকলেই জানেন হিন্দি সিনেমার ট্রেলারের একটা রীতি আছে। ছবি রিলিজ করার কিছুদিন আগে থেকে বিজ্ঞাপন হিসাবে সেটা বিভিন্ন হলে দেখান হয়। একসময় বাংলা ছবিরও কিছু কিছু ট্রেলার বানানো হত। আজকাল অবশ্য হলের জন্য বড় স্ক্রীনে এই ধরনের ট্রেলার বানাবার রীতিটা উঠে গেছে প্রায়। ভিডিও সার্কিটে অবশ্য এখনও কিছু ট্রেলার বানান হয়। সতরঞ্জ কে খিলাড়ি ছবির সময় প্রযোজক সুরেশ জিন্দাল বাবাকে বললেন, একটা ট্রেলার বানান উচিত। বাবার আইডিয়াটা প্রথমে খুব একটা পছন্দ ছিল না। আমাকে বললেন, দেখ যেরকম ট্রেলার এদেশে তৈরি হয়, ওটা আমার একেবারে পছন্দ নয়। কিন্তু ওঁরা একটা ট্রেলারের কথা বলছেন। আমি শুনে বললাম, ট্রেলার একটা হলে খুব ভাল হয়। আর তোমার ছবির ট্রেলার যদি হয়, তা অন্য ট্রেলার গুলোর মত হবে কেন? অন্য রকম ভাবতে হবে। হিচককের ছবির কিছু ট্রেলার আমার দারুণ ভাল লাগত। যে রকম ট্রেলার আপনারা দেখে থাকেন, মানে সিনেমার কিছু আলাদা আলাদা দৃশ্য জুড়ে, অদ্ভুত ইংরেজি বিশেষণের সঙ্গে, 'স্টোরি, ' সাসপেন্স', 'অ্যাকশন', 'মিউজিক' শব্দগুলো হৈ হৈ করে যেভাবে পর্দায় আসতে থাকে, হিচককের ট্রেলার মোটেই সেরকম উৎকট ব্যাপার নয়। হিচককের বহু ট্রেলার হয়েছে হিচককে নিয়েই। এর জন্য উনি আলাদা করে স্টোরি বোর্ড তৈরি করতেন, আলাদা শুটিং করতেন। তো আমি বাবাকে বললাম, সতরঞ্জের ট্রেলারটাও এই ভাবে তুললে কেমন হয়। বাবা বললেন, শুনে তো ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। তাহলে তুমিই ট্রেলারটা তৈরি কর, শুধু দেখ যেন তথাকথিত ট্রেলারগুলোর মত না হয়ে যায়। কাজটা বাবা আমাকে পুরো স্বাধীনভাবে করতে দিয়েছিলেন। তখন সতরঞ্জের শুটিং পুরোদমে চলছে। আমি সঞ্জীবকুমার, সঈদ জাফরি, আর আমজাদকে গিয়ে বললাম, দেখ ব্যাপারটা আমি এভাবে করব ঠিক করেছি। ওরাও খুব হৈ হৈ করে উঠল। কর, খুব নতুন জিনিস হবে। ঠিক হল এই বিশেষ অংশের শুটিংটা হবে আসল ছবির শুটিং প্যাক আপ হবার পরে। সকলে মেকআপ তুলে ফেলবেন, কস্ট্যুম পালটে ফেলবেন, তারপর যে যার নিজের পোশাক পরে কথা বলবেন। যে যার নিজের পোশাক বলতে যিনি স্যুট পরেন, তিনি স্যুটই পরবেন, যিনি চোস্ত কুর্তা পরেন, তিনি ঐ পোশাকেই থাকবেন। একেবারে ঘরোয়া মেজাজে আড্ডা মারার ভঙ্গিতে শুটিং হবে। তবে অরিজিনাল সেটেই সকলে বসবেন। আমজাদের হাতে থাকবে ওয়াজেদ আলির মুকুট। আমি সকলকে বলে দিলাম, দেখুন আপনারা নিজেদের চরিত্রটা নিয়ে নিজেরা যেরকম ভাবছেন, সেরকমই বলুন। দেড় মিনিটের বেশি বলবেন না। কারণ আমি বেশি এডিট করতে চাই না, পুরোটাই রাখতে চাই। সঞ্জীবকুমার প্রথমেই বলল, দেখ ওসব চলবে না। আমি নিজে কোনো কথাই গুছিয়ে বলতে পারি না। তুমি আমাকে ডায়লগ শিট দাও। সঞ্জীবকুমার এমনিতে দারুণ ভাল আড্ডা মারে। কিন্তু এত পেশাদার যে ডায়লগ শিট ছাড়া ক্যামেরা ফেস করতে রাজি নয়। সঞ্জীবকুমারকে ম্যানেজ করার জন্য আমি সঈদ জাফরিকে ধরলাম। সঈদ জাফরি বললেন, দূর ডায়ালগ শিট দিলে এই স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপারটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আমি সঞ্জীবকে ঠিক ম্যানেজ করে নেব। তুমি ওটা আমার উপরে ছেড়ে দাও। ক্যামেরা চালু হল। সঈদ এমনভাবে সঞ্জীবকে

গল্পে জড়িয়ে নিল, যে গোটা দৃশ্যটা চমৎকার উতরে গেল। আমজাদ বললেন, দেখ আমি বেশি বলব না। এক মিনিট ধরে রাখ। আমজাদ ঠিক ৪৫ সেকেন্ডে শেষ করে দিল। তুখোড় সময়জ্ঞান, তুখোড় বলা। দুদিনে আমার শুটিং শেষ হয়ে গেল। রিচার্ড অ্যাটেনবরোকে দিয়েও বলিয়েছিলাম কিন্তু সাউন্ডের গোলমালের জন্য ঐ দৃশ্যটা ব্যবহার করা গেলনা। বাবা পরিচালনা করছেন, এমন কয়েকটা স্থিরচিত্রও ব্যবহার করা হল। এটি ছিল ভারতবর্ষের প্রথম সিনেমার ট্রেলার, যেখানে পরিচালকের মুখটাও দেখা গেল। সতরঞ্জের মিক্সিং-এর কাজ শেষ হবার পর ট্রেলারের মিক্সিঙের কাজ হল। একটু বড় ট্রেলার হয়েছিল। প্রায় চার/পাঁচ মিনিট। বাবা দেখে রায় দিলেন,চলবে। ভাল হয়েছে। সুরেশ জিন্দালেরও কাজটা পছন্দ হয়েছিল। মাত্র চার/পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও সঞ্জীবকুমার, আমজাদ খানের মত প্রতিভাবান অভিনেতাদের নিয়ে আমি যে একটা কাজের সুযোগ পেয়েছিলাম, এ আমার সৌভাগ্য। ঐ দুজন অভিনেতা এত কম বয়সে মারা যাওয়ায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের যে কতটা ক্ষতি হলো, ভাবা যায় না।

স্টিল ফটোগ্রাফার হিসাবে কিভাবে বাবার ছবিতে যুক্ত হলাম তা আগেই বলেছি। 'হীরক রাজার দেশে' থেকে একটা বড় প্রমোশন হল। প্রমোশনটাও হল একেবারে হঠাৎ, একটা গোলমালে পড়ে। বাবার সঙ্গে টালিগঞ্জের যাকে বলে প্রচার শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই কাজ করেছেন। 'হীরক রাজার দেশে'র সময়ে যিনি ছিলেন, তাঁকে বাবা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়েছিলেন। ছবির নামাঙ্কনটা বাবা সবসময় নিজেই করতেন। নিজে প্রথমে পেন্সিলে করে, রঙের পরিকল্পনা মানে যাকে বলে কালার স্কিমটা করে রাখতেন। প্রচার অঙ্কন শিল্পীর কাজ ছিল আর্টওয়ার্কটা ফিনিশ করা। হীরক রাজার লোগোটাও ঐ ভাবে বাবা করে আর্টিস্টকে দিয়ে দিয়েছিলেন। সে আর্টিস্ট কাজটা নিয়ে ডুব মারলেন। তার আর কোনো খোঁজখবর নেই। এদিকে ছবি রিলিজের ডেট পড়ে গেছে। পাবলিসিটি শুরু করা যাচ্ছে না। শুরু হবে কি করে? বাবার প্রতিটি ছবিতেই নামাঙ্কনটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাধারণ টাইপে ছবির নাম ছাড়ার কথা বাবা ভাবতেই পারতেন না। ফলে পোস্টার পর্যন্ত ছাপা যাচ্ছে না। এদিকে বাবার হাতে তখন সময় নেই যে, আর্ট ওয়ার্কটা আবার তৈরি করেন। তখন আমি বাবাকে বললাম, তুমি যদি বল, তাহলে আমি একবার চেষ্টা করি। বাড়িতে বাবার কাজকর্ম দেখতে দেখতে আমার ছোটবেলা থেকেই গ্রাফিকে একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। বড় হয়েও কোনো কিছুর খারাপ লে-আউট দেখলে বাবার সঙ্গে আলোচনা হত, হাসি ঠাট্টা হত। ব্যাপারটা যে কিছুটা বুঝতে পারছি, সেটা মাথায় ছিল। বাবা আবার পেন্সিলে লোগোর খসড়াটা করে দিলেন, আমি সেটা ফিনিশ করে ফেললাম। বাবা বললেন, ঠিক আছে! তাহলে পোস্টারের ফিনিশেও তুমিই হাত লাগাও। সুকুমার ঘোষ সে সময়ে ছবিটার পাবলিসিটি দেখছিলেন। উনি ছবির জগতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ লোক। উনিও খুব উৎসাহ দিলেন। বাবা বললেন, হীরক রাজার নামাঙ্কনের ডিজাইনটা লক্ষ্য কর। সারাক্ষণ হীরের কৌণিক ব্যাপারটা পাবে। ওটা মাথায় রেখে কাজে হাত দাও। ঐ আইডিয়াটা পেয়ে যাবার পরেই মাথা খুলে গেল। হীরক রাজার সেটেও দেখেছিলাম, যত মোটিফ ব্যবহার করা আছে, বিশেষত হীরক রাজাকে ঘিরে সবটাই ঐরকম কোণকাটা, হীরের মত দেখতে। বুঝলাম এই হীরক বস্তুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করা যেত পারে। প্রথমে বাবা দুটো পোস্টারের খসড়া ডিজাইন করে দিলেন।

আমি বড় করে আর্টওয়ার্কটা করলাম। তারপর আস্তে আস্তে হাত খুলে গেল। নিজের উপর একটু আস্থা বাড়ল। আগে কিছু না বলে হীরক রাজার একটা ফোল্ডারের ডিজাইন করে সোজা ওঁকে নিয়ে গিয়ে দেখালাম। পরিচালকের ডিজাইন পছন্দ হল। এবং বলা যেতে পারে সেদিন থেকেই আমার প্রমোশন হল। বাবা বললেন, ছবির প্রচারের কাজকর্ম তুমিই এবার থেকে দেখবে। রেকর্ডের জ্যাকেটের কাজটাও আমি পেলাম। সেই শুরু। এরপর ঘরে-বাইরে, গণশত্রু, আগন্তুক, শাখা প্রশাখা। শাখা প্রশাখার কাজটা উনি দেখে যেতে পারলেন না। 'ঘরে-বাইরে'তে একটা মজার ব্যাপার ছিল। উনি নামাঙ্কনের সময় পেনসিলে এঁকেছিলেন আগুন— 'বাইরে'রই-এর শুঁড়টাকে ধরে। ঐ আগুনটা আমার মাথায় গেঁথে বসে। ঘরে বাইরে'র পাবলিসিটির ব্যাপারে যতবার সুযোগ পেয়েছি ওঁর ঐ আগুনটা ব্যবহার করেছি। ছবিটার যখন রজতজয়ন্তী হল, তাখন একটা চমক ছিল। জয়ন্তীর দীর্ঘ ঈ-টার শুঁড়ে আগুনটা লাগিয়ে দিয়েছিলাম। পোস্টারে ছবির নাম কোথাও ছিল না। লোকে ঐ আগুনটা দেখেই আইডেনটিফাই করতে পেরেছিল। তবে 'ঘরে-বাইরে'র বিদেশের জন্য ফোল্ডারটা উনিই করেছিলেন। আমি যতই সাহায্য করি না কেন, বিশেষ করে নিজের ছবির জন্য নিজে ডিজাইন করার এই অভ্যাসটা ওঁর শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। এই কাজটা করতে উনি ভালবাসতেন। স্টিল ফটোগ্রাফার থেকে প্রমোশন পেয়ে সহকারী পরিচালক হওয়ার পরেও শুটিঙের সময় আমার কাজ ছিল কেবল ছবি তোলা। পরিচালককে সহযোগিতা করার কজাটা শুরু হত ছবি তৈরির পরে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, শুটিঙের পরে এডিটিং, ডাবিং, চ্যানেলিং-এইরকম পরপর কয়েকটা জটিল অধ্যায় থাকে। এর মধ্যে আমাদের কাজটা সবচেয়ে বেশি থাকত চ্যানেলিং-এর সময়। আউটডোরে শুটিং করা অংশে অভিনেতা, অভিনেত্রীদের কথাবার্তা তো ডাবিং করে রিপ্লে করে দেওয়া হল। কিন্তু অন্য আজওয়াজগুলো? যেমন রাস্তাঘাটে গাড়ির আওয়াজ, জঙ্গলে পাখির, ঝিঁঝির ডাক, নদীর ধারে জলের কুলকুল বা আরও নির্দিষ্ট শব্দ, যেমন কেউ গাড়ির দরজাটা বন্ধ করল, ম্যালের বাঁধানো রাস্তায় একটা ঘোড়া ধীরে সুস্থে চলে গেল, জলে কেউ একটা ঢিল ছুঁড়ল, কাগজটা পড়া শেষ হলে ভাঁজ করে সরিয়ে রাখা হল— এসব শব্দগুলো সিনেমা দেখার সময় কেউ খেয়ালই করেন না, কিন্তু শব্দ গুলো ঠিকঠিক জায়গায় না থাকলে দেখবেন কানে খট করে লাগছে। অনেক সময় ইনডোর শুটিঙেও কিছু কিছু শব্দ বাদ যায়। চ্যানেলিং-এর সময় ঐ শব্দগুলোও ঢুকিয়ে দিতে হয়। অনেকের ধারণা এই এফেক্ট সাউন্ডগুলো আলাদা করে তুলে রাখা হয়। এটা ভুল ধারণা। একটা বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামল, এই আওয়াজটা সরাসরি টেপ করে ছবিতে বসালে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট। কানে যে আওয়াজটা শুনতেন, সেটা সরাসরি সিনেমায় এফেক্ট হিসাবে ব্যবহার করা হলে মুশকিল আছে। আওয়াজটা বেশিরভাগ সময়েই পাল্টে যেতে বাধ্য। ফলে স্টুডিওতে শব্দটা আলাদা করে তৈরি করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বিদেশে এই ধরনের তৈরি করা এফেক্ট সাউণ্ডের রেকর্ড পাওয়া যায়। আজকাল বোম্বাইতেও এই ধরনের রেডিমেড সাউন্ড সাপ্লাই করা হয়। বাবা কিন্তু এই ধরনের রেডিমেড শব্দ পছন্দ করতেন না। বাবার ছবিতে এই কারণে আমাদের অধিকাংশ এফেক্ট সাউণ্ডই তৈরি করতে হত। কোন শব্দ কিভাবে তৈরি করা হলে তার এফেক্টটা জুৎসই হবে, সেটা প্রায় একটা

গবেষণার ব্যাপার ছিল। এই কাজটা করতে কিন্তু আমাদের দারুণ ভাল লাগত। যাকে বলে একটা আবিষ্কারের মজা ছিল। 'ঘরে বাইরে', 'পিকু' 'সদগতি' থেকে এই এফেক্ট সাউন্ড তৈরি করার কাজে আমি পুরোপুরি ঢুকে পড়ি। অনেকের ধরণা 'ঘরে-বাইরে' ছবিটা আমি শেষ করেছি। এটা একেবারে ভুল ধারণা। 'ঘরে বাইরে' ছবির শুটিং শেষ হওয়ার আগেই উনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন ওঁর প্রথম হার্ট অ্যাটাকটা হয়। ডাক্তার একেবারে বিছানা থেকে উঠতে বারণ করে দেন। একটা খুচরো দৃশ্যের শুটিং তখনও হয়নি। বর্ধমানের কাছে সোমসার বলে একটা জায়গায় শুটিং হওয়ার কথা ছিল। ঐ যে দৃশ্যে সৌমিত্র বক্তৃতা দিচ্ছে। সোমসার জায়গাটাও বাবার পছন্দ করা ছিল। আমি একেবারে ওঁর নির্দেশ অনুযায়ী, ওঁর বিখ্যাত লাল খাতা হাতে নিয়ে শুটিংটা করে দিয়েছিলাম। এর মধ্যে আমার ব্যাপার, আমার বাহাদুরি কিছুই ছিল না। একটা শটও বলতে গেলে আমি নিইনি। বাবার ঠিক যেমন যেমন নির্দেশ ছিল, সেইভাবে তোলা হয়েছে। বিদেশে সেকেন্ড ইউনিট বলে একটা ব্যাপার আছে। পরিচালক মেজর অংশগুলোর শুটিঙে ব্যস্ত, সেকেন্ড ইউনিট গিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা দৃশ্যের শুটিং করে এল। সেখানে পরিচালকের উপস্থিতির দরকার নেই। সহকারীরাই কাজ চালিয়ে নেয়। আমাদের 'ঘরে বাইরে'ব কাজটাকে অনেকে সেকেণ্ড ইউনিটের কাজ বলেন। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হয়েই কাজটা ওভাবে হয়েছিল। ঘরে বাইরে-র মিক্সিং-এর কাজটাও বাবা করতে পারেননি। বোম্বাই যাওয়া ঐ সময়ে ওঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেখানেও আমি একেবারে বাবার নির্দেশ অনুযায়ীই কাজ কবেছি। 'গণশত্রু'ব কাজ শুরু হওযার আগে ডাক্তারবা বাবাকে একেবারে ধরে বলে দিয়েছিলেন, ক্যামেবা অপারেশনের কাজটা না করতে। ক্যামেরা অপারেশন এমনিতে খুব পবিশ্রমসাধ্য কাজ। বাববার ওঠা-বসা, শরীরকে নানা অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছবি তোলা— সব মিলিয়ে বাবার পক্ষে ঐ অবস্থায় কাজটা করা মোটেই ঠিক ছিল না। সুকুমার বায় পর্যন্ত বাবা নিজেই কিন্তু ক্যামেরা অপারেট করেছেন। সাধারণত পরিচালকেরা ক্যামেরা অপারেট করেন না। বাবাকে ডাক্তারেরা বলেলেন, আর কিছু নয়, শুধু অন্যান্য পবিচালকদের মত কাজ করুন। বাবা প্রথমে খুব চিন্তিত ছিলেন, কী ভাবে হবে? কে করবে? ইউনিটেব অন্যান্যরা বাবাকে বললেন, আমার উপর কাজটা ছেড়ে দিতে। 'ফটিকর্চাদ' করার সময় আমি কিন্তু প্রথম দিকে কয়েকদিন ক্যামেরা অপারেট করিনি। নিজের উপর অতটা আস্থা ছিল না। তারপর দেখলাম নিজে না করলে একটা অস্বস্তি থেকে যাচ্ছে। এই অস্বস্তিটা অবশ্য বাবাব কাজ করার প্যাটার্ন দেখে দেখেই তৈরি হয়েছিল। তো বাবাবও বোধহয ততদিনে আমাব উপর কিছুটা আস্থা তৈরি হয়েছিল। বাবা 'গণশত্রু'-ব সময়ে ক্যামেরা অপরেশনটা আমার উপরে ছেড়ে দিতে রাজি হয়ে গেলেন। তারপর 'গণশত্রু', 'শাখা প্রশাখা', 'আগন্তুক'- তিনটে ছবিতেই আমি ক্যামেরা অপারেট করলাম। অন্যদের চেয়েও বাবার সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটা তৈরি হওয়া অনেক সুবিধাজনক ছিল। আর ওঁর ছবিতে তো আমার মাথা খাটিয়ে কোনো লাভ নেই। উনি ঠিক যেভাবে চাইছেন, সেটা নিখুঁতভাবে করে দেওয়াটাই ছিল একমাত্র কাজ। আমি এটুকু বলতে পারি আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

আমি একটা সময়ে ছবি পরিচালনা করব, ভাবাই ছিল। ছোটবেলা থেকেই সে কারণেই আমি যতটা পেয়েছি বাবার কাজের খুব কাছাকাছি থেকে শেখার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু নিজের উপর আস্থাটা তৈরি হতে আমার অনেক সময় লেগেছে। একসময় আমি রেডিওর জন্য অনেক কাজ করেছি। বিবিধ ভারতীর স্পনসর্ড প্রোগ্রামের জন্য একটা ধারাবাহিক নাটক দীর্ঘদিন পরিচালনা করেছি। নাটকের নাম ছিল চন্দ্রবৈঠক। প্রতি রবিবার হত। প্রতি এপিসোড ছিল বারো মিনিটের। গল্পটা ছিল মূলত ভৌতিক। ছোট ছোট প্লট ছিল। শিল্পীদের রিহার্সাল করান থেকে, স্টুডিওতে গিয়ে রেকর্ডিং করা, এডিট করা, এদিক-ওদিক গিয়ে এফেক্ট মিউজিক তৈরি করে আনা সবই নিজে করেছি। করতে করতে মনে হল, এইবার বোধহয় আমি পারব। বাবাকে বললাম। বাবা অমার রেডিওর চন্দ্রবৈঠক প্রতি সপ্তাহেই শুনতেন। খারাপ, ভাল যে-রকম লাগত তা নিয়ে আলোচনা হত। ছবি করার প্রস্তাবটা পাড়ার পরে বাবা বললেন, আগে ভাবো কোন গল্প নিয়ে করবে। একটা ব্যাপারে আমি প্রায় সুনিশ্চিত ছিলাম যে অবশ্যই আমার প্রথম ছবি হবে বাবার লেখা গল্প নিয়ে। বাবার গল্পের ব্যাপারে আমি যতটা স্বচ্ছন্দ, অন্য কোনো গল্পের ব্যাপারে যে ততটা হব না, এ তো স্বাভাবিক। আমার ইচ্ছে ছিল, ফেলুদা দিয়ে আমার চলচ্চিত্র জীবন শুরু করি। কিন্তু সত্যিকারের সিনেমার জন্য ভাবনাচিন্তা শুরু করে মনে হল, ফেলুদাকে নিয়ে ছবি করাটা ঠিক হবে না। বাবা ইতিমধ্যেই দুটো ফেলুদা করে ফেলেছেন— 'সোনার কেল্লা', আর 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। আমার প্রথম ছবিটা একদম নতুন বিষয় নিয়েই হওয়া উচিত। ফেলুদা হল না। হল 'ফটিকচাঁদ।' ফটিকচাঁদ করার পেছনেও দুটো কারণ ছিল। এক নম্বর, আমার খুব প্রিয় লেখা ছিল ফটিটচাঁদ। দু' নম্বর হল, হীরক রাজায় উদয়ন পণ্ডিতের পাঠশালায় রাজীব বলে একটা ছেলে ছিল। ভাল দেখতে, ভীষণ শার্প, ঝরঝরে অভিনয় করত। ও মাথায় না থাকলে ফটিকচাঁদের কথা ভাবতামই না। ফটিকচাঁদের কথা বাবাকে বলতেই বাবা এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। চিত্রনাট্যও করে দিলেন। কামুদা, রাজীবকে নিয়ে ছবি শুরুও হল। আমি জানতাম, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যেরকম, তাতে রটবেই বাবা সব করে দিচ্ছে। তাই বাবাকে বলেছিলাম, তুমি শুটিং দেখতে এস না। লোকে অন্য মানে করবে। ইন্দ্রপুরীতে কাজ হয়েছিল। একদিন এসে বাইরে লোকজনের সঙ্গে গল্প করে চলে গেলেন। আমার কাজ, অথচ বাবা ভেতরে ঢুকছেন না। প্রায় একরকম টর্চার। ফটিকচাঁদ মুক্তি পাবার পর দেখলাম বাবা শুটিং-এ না এলেও কানাঘুষোটা রটেছে। তো আমি দেখলাম বাবা শুটিঙে না এলেও যখন একই কথা রটছে, তখন আর বাবাকে খামোকা কষ্ট দিই কেন। পরের ছবি থেকে ওনাকে বললাম, তুমি এস। বাবা সাধারণত লাঞ্চের পরে আসতেন। চুপ করে বসে শুটিং দেখতেন। বিকেলে চলে যেতেন। শুটিঙের সময় কোনো মন্তব্য করতেন না। তবে শুটিং শেষ হয়ে যাবার পরে রাশ দেখতেন। বাবা আমার কাজ করে দিয়েছে এ কথাটা নানাভাবে আমাকে বহুবার শুনতে হয়েছে। আমি দুঃখ পাইনি। কারণ এটা ভাবাটাই স্বাভাবিক। আমি একটা ব্যাপার তো জানি, তা হল লোকে যাই ভাবুক, যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করেছেন, অন্তত তাঁরা তো জানেন কাজটা কে করেছে। আর তাঁদের সংখ্যাটা খুব একটা কম হবে না। সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস-এর সময়ে আমি ভারতবর্ষের নামকরা অন্তত পনেরজন অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে কাজ করেছি। কিশোরকুমারের কাজটায় তো আরও অনেক বেশি। কিশোরকুমারে তো বাবার কোনো হাতই ছিল না, একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ ছাড়া। 'গুপী বাঘা ফিরে এলো' সম্পর্কে আবার অন্য একটা গল্প বাজারে চালু আছে। আমি

নাকি বাবার গল্পটা কিছুটা পাল্টে দিয়েছি। এটাও একেবারে ঠিক নয়। গল্প থেকে সিনেমা করার মাঝখানে তো কিছু পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু ওনার ভাবা গল্প থেকে একেবারে বেরিয়ে গেছি, তা মোটেই নয়। তবে গল্পের ব্যাপারে আমার স্ত্রী ললিতাই একটা খুব ভাল পরামর্শ দিয়েছিল। গল্প শোনার পর ও আমাকে আর বাবাকে বলেছিল, গুপী বাঘা চুরি করা হীরেগুলো যদি ফেরত না দেয়, তাহলে কিন্তু লোকে ওদের উপর একটু রেগে থাকতে পারে। ফেরত দিয়ে দিলে ওরা একেবারে নির্দোষ থাকবে। এটা গল্পে কিন্তু ছিল না। ঐ ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে নতুন করে ঢোকান হয়। তাছাড়া চোখ সবুজ হয়ে যাচ্ছে, আঙুল থেকে আগুন— এগুলো একেবারে আমারই ব্যাপার। আর আগে, ফটিকচাঁদের সময়ে, বা সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস-এর বেলায় বাবা যেমন প্রথম থেকেই রাশ দেখতেন, 'গুপী বাঘা ফিরে এলো'র বেলায় কিন্তু তা হয়নি। আমি গোটা ছবিটাই এডিট করে বাবাকে দেখাই। টালিগঞ্জের ফিল্ম সার্ভিসে বাবা ঐ প্রথম ছবিটা দেখেন।

বাবা 'জাগরণ' ছবিটার চিত্রনাট্য লিখে গেছেন। পুরো চিত্রনাট্য। শুটিং স্ক্রিপ্ট করেননি। সেটা আমিই করব। প্রাথমিকভাবে কারা কোন ভূমিকায় অভিনয় করবেন, সেটাও ওঁর ঠিক করাই ছিল। বলাবাহুল্য সেটাই থাকবে। ভেবেছিলাম সেপ্টেম্বরের মধ্যে আউটডোর দেখে নিয়ে অক্টোবরে প্রোডাকশান শুরু করব। ছবিটা যদিও আমি পরিচালনা করব কিন্তু উনি তো চিত্রনাট্যটা করেছিলেন নিজে পরিচালনা করবেন এই ভেবেই। সেদিক থেকে এটা একেবারে ওনারই ছবি। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব, ছবিটা যাতে ওঁর মেজাজে তুলতে পারি। ওঁর লেভেলে ওঠার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবু যতটা চেষ্টা করা যায়। এটা হবে আমার বাবা, আমার শিক্ষক, সত্যজিৎ রায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(অনুলিখন)

পথের পাঁচালী

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

২৪ মার্চ-ই বলি। যদিও রাত এখন ১টা। এই নিয়ে ন'বার পথের পাঁচালী দেখা হল। ১৯৫৫-য় সেই প্রথম চোটেই তিনবার। দু'বার টিভি। আরও দু'বার টিভিতেই, ভি সি আর-এ। মাঝে দু'বার বড় স্ক্রিনে। মাত্র ৯ বার! ঠিক তাই। আমার বন্ধু দিল্লির অমিতাভ ভট্টাচার্য খুব অব্যার্থভাবে গুনতে গুনতে আঙুলের সব কড়গুলি ফুরিয়ে যাবার পর লাজুকভাবে দুহাতের আঙুলগুলো নাড়তে থাকে কিছুক্ষণ। যেন অ্যাডালটরি কনফেস করছে। অর্থাৎ অসংখ্যবার। সে তখন ছিল, মুসৌরিতে। আর তার নিজের ভি সি আর আছে।

মনে পড়ে ১৯৫৫। বীণা সিনেমায় দ্বিতীয় দিনের পথের পাঁচালী দেখে আসি ম্যাটিনি শো তে। একা? না, ঠিক একা নয়। সঙ্গে ছিলেন আরও শ' খানেক দর্শক। মেরে কেটে। তারপর বিশ্ববিদ্যালযের তিনতলার ইংরেজির ঘরে আমাকে একটি ক্লাস নিতে আমি দেখি। জনা পাঁচেক ছাত্রছাত্রী। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিলঃ বিস্ময়। 'পথের পাঁচালী' ছিল না।

সেদিনই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস। পূর্ণেন্দু পত্রী, সুধাংশুদা (পদবি?), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল ভৌমিক, মিহির সেন, যুগান্তর চক্রবর্তী, অসীম ঘোষ এরা সব। শনিবার জমজমাট আড্ডা। পূর্ণেন্দু প্রথম দিনেই দেখেছে। এবং পূর্ণেন্দুর কথা একটাই। সুবীর (হাজরা),.তুই সত্যজিতের কাছে নিয়ে চল আমাকে। শুধু একটা প্রণাম করব। গড় হয়ে। কথা দিচ্ছি, আমি একটা কথাও বলব না।

দু একদিনের মধ্যে পথের পাঁচালী দেখে ফেলল সবাই। ঠিক হল আমরা একটা রিসেপশন দেব এর স্রস্টাকে এবং সেটা দিতে হবে সেনেট হলে। ভাইস চ্যান্সেলার নির্মল সিদ্ধান্তের আক্কেল শুনে গুড়ুম। ফিলিম ডিরেক্টাব? সেনেটে? এখানে তো সংবর্ধনা পায় ইতিহাসের লোকজন?

পরিচালকের বংশপরিচয় জেনে তিনি কিছুটা আগ্রহী হলেন। তা, হিরোইন হিরো এরা সব কারা। হিরো স্যাব? হিরো তো অপু। আর হিরোইন আপনার দুর্গা। জানেন তো আপনি। এছাড়া, কানু ব্যানার্জি, তুলসী চক্রবর্তী আর ইন্দির ঠাকরুন— চুনীবালা দেবী। নববই বছর। ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে ডেপুটেশানে ছিল ধৃতীন চক্রবর্তী। ধৃতীন আমাকে বলল, 'করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাপারটা চেপে যাও।' অবশ্য আমি বলতামও না। তাঁর বয়সটা নিঃসন্দেহে সন্দেহের ঊর্ধে ছিল না। শ্রদ্ধেয় ভিসিকে ছোট করে দেখানো আমার উদ্দেশ্যও নয়। তখনও তো হালচাল এমনটাই ছিল। 'অপরাজিত' ভেনিসে পুরস্কার পেলে, ইডেনের সংবর্ধনা সভায় দেবকী বসু বলেছিলেন, 'এতদিন আমরা ছিলাম কুলাঙ্গার। আর আজ আমাদেরই একজন হল কুলতিলক।' শেষপর্যন্ত সেনেট সংবর্ধনা হয়েছিল এবং তৃতীয় ও শেষ সপ্তাহেই। বীণাতে জেমিনির ইনসানিয়াৎ আসতে তখনও দুদিন বাকি।

সেনেটের সিড়িঁশ্রেণীর নিচে ফুটপাতের ওপর পূর্ণেন্দুর আঁকা আলপনা। একপশলা বৃষ্টি এসে ধুয়ে দিয়ে গেল। পূর্ণেন্দু ফের আঁকল। আমি ছাতা ধরে দাঁড়াই। সেদিন সন্ধ্যায় থরো থরো আবেগে তার সেদিনের সেই স্বরচিত মানপত্র, না তো, মন্ত্রপাঠ ভোলার নয়। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে শরৎচন্দ্রের 'তোমার দিকে চাহিয়া'-র চেয়ে ভাল হচ্ছে শুনেই বোঝা যাচ্ছিল।

ইউনিভার্সিটিতে একটি পোস্টার ও কাগজে তিন লাইন। ছাত্রছাত্রীরা ঝেঁটিয়ে এসেছিল। সেনেট আধাআধি ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এসেছিলেন দেবকীকুমার বসু। হিরণ স্যানাল ও গোপাল হালদার এসেছিলেন।

একটি অসামান্য সুভেনিয়ের ঐদিন প্রকাশ করা হয়। কপি অংশ তৈরি করি অমি আর অসীম সোম। সে-পর্যন্ত প্রকাশিত সমালোচনা থেকে উচ্ছ্বসিত উদ্ধৃতি তাতে ছিল। ভিসুয়াল অংশ বলাবাহুল্য পূর্ণেন্দু পত্রীর। সুভেনিয়েরটির অসামান্যতা শুধু তার কারণেই। পুস্তিকাটিতে সে-ই ছাপিয়েছিল 'পথের পাঁচালী'র-সেই অবিস্মরণীয় পোস্টারটি, যেখানে সর্বজয়া দুর্গার চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন, পাশে অপু। ক্যাপশন ছিলঃ সত্যজিৎ রায়ের শিল্পপ্রতিভার আর এক নিদর্শন। বলাবাহুল্য, পথের পাঁচালীর সাদা কালো ব্যানার, পোস্টার, এসব, ছবির মতই, আজও অনতিক্রমনীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ। সেদিকে দৃষ্টি আর্কষণ করা হয় সেই প্রথম। সুভেনিয়েরটি আজও যদি কারও কাছে থেকে গিয়ে থাকে, দেখবেন, মুদ্রক ছাড়া কারও নাম নেই। আমাদের তরুণ সাম্যবাদী যূথচেতনা তখন এত প্রবল যে প্রস্তুতকর্তাদের কারও নামই সেখানে ছিল না। এখন তাই বলা যেতে পারে যে সবচেয়ে দামী কার্টিজে নবাগত লাইনো হরফে ছাপা ব্যয়বহুল পুস্তিকাটির প্রকাশক ছিল সুরকার ও চলচ্চিত্র প্রযোজক বীরেশ্বর সরকার।

পথের পাঁচালী নিয়ে আমাদের আবেগের জের আরও অনেকদিন চলেছিল। সে বছরই পুজো সংখ্যা সাঁকো-তে পথের পাঁচালীর সত্যজিৎকৃত অনেকগুলি ফ্রেমের ছবিসহ স্ক্রিপ্টের অংশ ছাপা হয়। সতজিৎ এমনকি একটি সসঙ্কোচ ভূমিকাও লিখে দেন। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলাম অসীম সোম, প্রশান্ত গায়েন এবং আমি।

নবমতমবার দূরদর্শনে পথের পাঁচালী দেখে এইসব কথা মনে পড়ল। এর প্রয়োজন ছিল কিনা জানি না। ঝড় উঠলে গাছের পাতারা উড়ে আসে। এরা ঘরে ঢোকে। এরা কেন আসে তা আমি জানি না। আর....... আবার পথের পাঁচালী দেখে কেমন লাগল সে ব্যাপারে আমি চুপচাপ থাকাই শ্রেয় বিবেচনা করলাম। আজ ৩৭ বছর পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের প্রথম পাঠ। এখন মায়ের কাছে মাসির গপ্পো আর না করাই ভাল। নয় কী?

একটি চিঠি ঃ পথের পাঁচালী

বিভূতিভূষণ মিত্র

মহাশয়,— 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্র সম্বন্ধে শ্রীসত্যজিৎ রায় মহাশয়ের প্রশংসনীয় শিল্পদক্ষতার বহু সমালোচনা বিভিন্ন সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ছবিখানি তোলার যে সব মূল উপাদান ও তথ্যের দিকগুলো সমালোচকগণের সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভবপর হয়নি, আমি বোড়াল গ্রামবাসী ও একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সেই দিকগুলির কিছুটা এখানে বলব।

আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে 'পথের পাঁচালী' তোলার পরিকল্পনা নিয়ে সত্যজিৎবাবু একজন সহকর্মীর সঙ্গে একদিন বোড়াল গ্রামে ঋষি রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিমন্দিরে আসেন। গাঁয়ের ভিতর হঠাৎ সত্যজিৎবাবুর মত এক সুদীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও সুন্দর চেহারার লোক দেখে আমরা সব অবাক হয়ে যাই, কিন্তু তাঁর অমায়িক ব্যবহারে গ্রামের যুববৃন্দ সকলেই তাঁর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হন। তাঁর কথা মত আমরা তাঁকে বোড়াল গ্রামের পথ-ঘাট, এঁদো পোড়ো বাড়ি, বন-জঙ্গল, লতা-পাতা, নালা, ডোবা দেখাতে লাগলাম। তিনিও তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি বিষয়বস্তু ও গ্রামের প্রতিটি লোকের চেহারা দেখতে থাকেন। পরে চারিদিকে ঘন বনে ঘেরা শিয়াল, বরাহ, সাপ ও তক্ষকের আড্ডা— একটি পোড়ো বাড়ি তিনি মনোনীত করলেন। এই বাড়িটিই হল 'পথের পাঁচালী'র প্রাণকেন্দ্র।

ঐ পোড়ো বাড়িটিকে আরও করুণ ও আরও চিত্তাকর্ষক করবার জন্য তিনি নিরালায় একাকী বসে বসে বাড়িটির পরিবেশের রদবদল করতে লাগলেন দীর্ঘকাল যাবৎ। বনঝোপে ঘেরা এ পোড়ো বাড়িটির মধ্যে ঢুকে তিনি তঁরা নিজ পরিকল্পনার রূপদানের সাধনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। সত্যজিৎবাবু ঐখানেই থাকতেন সারাদিন— আর ঐ পোড়ো বাড়ির মধ্যে নিজে যা পারতেন রেঁধে বেড়ে খেতেন। বেশি লোকের ভিড় জমতে দিতেন না ওখানে। আমরা দু'একবার চেষ্টা করে দেখেছি বাড়িতে এনে ওঁকে খাওয়াতে কিন্তু রাজী হননি উনি কোনো বারেই। ওঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে আমরা বেশি সাহসও পাইনি। এই বাড়িটি ছাড়া গ্রামের মহেন্দ্র মুখার্জিদের একটা পুরনো দোতলা বাড়ি, 'বকুল মাঠে' নৃপেন ঘোষের পোড়ো বর্হিবাটি, মদনমোহনের নাটমন্দির ও তৎসংলগ্ন জীর্ণ দুটি শিবমন্দির মনোনীত করেন। চিত্রে এগুলির দৃশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

আরও একটা মজার কথা আছে। ডাক্তারের ভূমিকায় শ্রীহরিমোহন নাগ ও চক্কোত্তির ভূমিকায় শ্রীহরিধন নাগকে বোড়াল গ্রামের মধ্যে একবার দেখেই সত্যজিৎবাবু মনে মনে ওঁদের ঠিক করে রেখেছিলেন, কিন্তু ছবি তোলার সময় ওঁদের নাম না বলতে পারায় গ্রামবাসীরা ওঁদের হাজির করতে পারছিলেন না। তখন সত্যজিৎবাবু সঙ্গে সঙ্গে হরিধনবাবু ও হরিমোহনবাবুর অবয়ব পেন্সিল স্কেচে একটা কাগজের ওপর এঁকে দিলেন। হুবহু আঁকা ছবি দেখে ওঁদের এনে ক্যামেরার সামনে হাজির করতে আর কারও কোনো বেগ পেতে

হল না। অপূর্ব তাঁবা চিত্রকলা প্রতিভা।

চিত্রে তক্ষকের (চতুষ্পদবিশিষ্ট সরীসৃপ) ডাক শুনতে পাবেন। ওটা কোনো কল্পিত যান্ত্রিক শব্দ নয়। বোড়াল গ্রামের পোড়ো মন্দির ও বাড়ির ফাটলে পুরোনো গাছে বহু তক্ষক আছে। সত্যজিৎবাবু তক্ষকের ডাক শব্দযন্ত্রে ধরিয়েছেন। এছাড়া এঁদো পুকুরের জলে ধাই মশার (অনেকটা মাকড়শার মত দেখতে) খেলা, কলমিলতার আশে পাশে গাঙ ফড়িং-এর আনন্দ-নৃত্য, ঝিল্লিরব, বাতাসলাগা পদ্ম বনের অপূর্ব হিল্লোল, কাশবনে হাওয়া লাগা রূপালি তরঙ্গ, ঝরা বাঁশপাতা বিছানো ঘন বাঁশবনের সুদূরপ্রসারী সরু পথ, বাঁশে বাঁশে ঘষা লেগে কট কটাস শব্দ, মুক্ত প্রকৃতির নানা দৃশ্যে ও বনানীর মাঝে সন্ধ্যা নেমে আসার পল্লী জননীর ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি এই সমস্ত 'পথের পাঁচালী'র সম্পূর্ণ ছবিখানিকে এমনই এক অনাস্বাদিতপূর্ব ভাবধারায় আপ্লুত করে তুলেছে যা দর্শকমনে জাগিয়ে দেয় অসীম অদ্ভুত জীবন রহস্যকে ভেদ করে পূর্ণানন্দ অনুভব করার এক আকুতি।

পথেব পাঁচালী ❑ সত্যজিৎ রাযেব আঁকা চিত্রকাহিনী, ওযাশ ড্রইং।

পথের পাঁচালী ❑ সত্যজিৎ রায়ের আঁকা চিত্রকাহিনী, ওয়াশ ড্রইং।
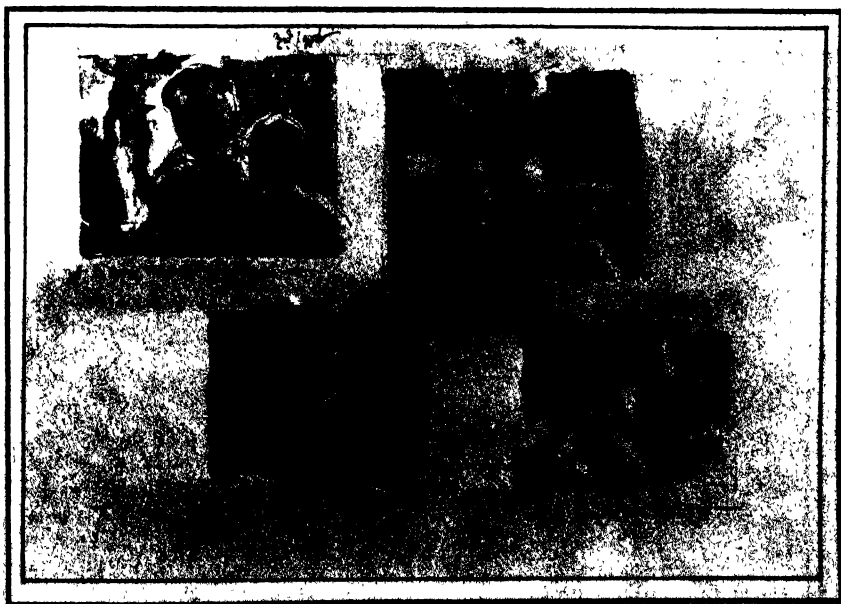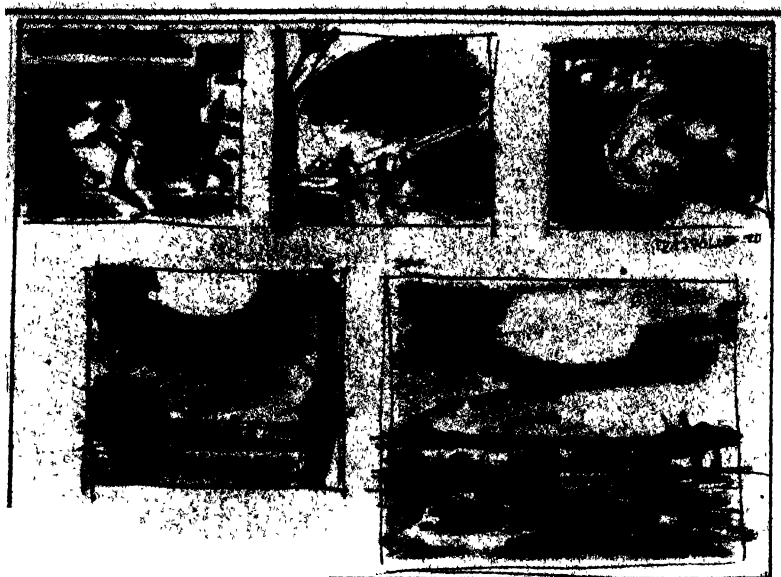
পথের পাঁচালী □ সত্যজিৎ রায়ের আঁকা চিত্রকাহিনী, ওয়াশ ড্রইং।

পথের পাঁচালী—সেই সময়ে

কিরণময় রাহা

পথের পাঁচালী-র ইতিকথা নিয়ে কিছু অস্পষ্টব্যক্ত ধারণা ও গল্প মাঝে মাঝে শোনা যায়, কিংবদন্তীতে যেমন হয়ে থাকে। কিংবদন্তী হবার কথা নয় কিন্তু। কারণ পথের পাঁচালী-র দীর্ঘ প্রস্তুতি পর্ব ও প্রদর্শনোত্তর প্রতিক্রিয়া নিয়ে তথ্যের অভাব নেই; প্রচুর লেখা হয়েছে, সত্যজিৎ রায় নিজেই লিখেছেন বা নানা জায়গায় বলেছেন, নানা সাক্ষাৎকারে।

তা সত্ত্বেও একটি ধারণা অনেকের আছে বলে শুনেছি যে পথের পাঁচালী স্বদেশে সমাদৃত হল বিদেশে সম্মানিত ও প্রশংসিত হবার পর ; কান্-এ পথের পাঁচালী ও ভেনিস্-এ অপরাজিত পুরস্কৃত হবার পর আমরা এ ছবির গুণাবলী সম্বন্ধে সচেতন হলাম। অর্থাৎ সত্যজিৎ রায় স্বদেশে বিখ্যাত হলেন বিদেশে বিখ্যাত হবার পর। এ ধারণা এখনও যে কারও কারও আছে তার একটা প্রমাণ চোখে পড়ল সম্প্রতি প্রকাশিত 'চিত্রপট' পত্রিকার একটি প্রবন্ধ-র একটি উক্তিতে। উক্তিটি হল ঃ 'যতদূর মনে পড়ে ভেনিস্ উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জয় করে তিনি ফিরে এলে আমরা এখানে ওখানে যূথবদ্ধ হয়ে ঢাকঢোল শাঁখ ও কাঁসর বাজিয়ে ছিলাম তারস্বরে।" প্রবন্ধটির প্রসঙ্গ ও বক্তব্য ভিন্ন কিন্তু এই উক্তি থেকে মনে হয় লেখক উপরোক্ত ধারণাই পোষণ করেন।

এ ধারণা হওয়া বা টিকে থাকার দুটো কারণ থাকতে পারে। এক হল, এক ধরণের মনস্কতা যা থেকে জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প, শিল্পবোধ ও শিল্পবিচার সম্পর্কে নিজেদের উপর আস্থাহীনতা আসে। আর দুই হল, পঁচিশ বছর আগে পথের পাঁচালী সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অপরিচয় বা তার বিস্মৃতি। প্রথমটি নিয়ে এখানে কিছু বলছি না কিন্তু না জানাটা বা ভুলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আমাদের, যাদের পথের পাঁচালী-র প্রস্তুতিপর্বে কৌতূহল উৎসাহ সংশয়ের কথা এবং ছবি দেখার পর এক ঘোরের মধ্যে থাকা ও সেই সময়কার উত্তেজনার কথা মনে আছে, তাদের মঝে মাঝেই মনে থাকে না যে পঁচিশ বছর কেটে গেছে। আজকে যাদের বয়স এমনকি ত্রিশ পঁয়ত্রিশের কোঠায় তাদের পক্ষেও চলচ্চিত্র জগতে পথের পাঁচালী যে আলোড়ন এনেছিল তার প্রকৃতি বিশদ ভাবে মনে থাকার কথা নয়। এটা কিছুদিন আগে কলকাতা দূরদর্শনের এক সাক্ষাৎকার দেখার সময় বিশেষভাবে মনে হয়েছিল। সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি পথের পাঁচালীতে অপুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন পথের পাঁচালী মুক্তি পাওয়ার পর যখন সবাই এই নিয়ে কথাবার্তা বলত ও নানা জায়গায় অভ্যর্থনাসভায় ওঁকে নিয়ে যাওয়া হত তখন কী যে ব্যপার সেটা ঠিক বুঝতেন না, এটুকু শুধু বুঝতেন যে কিছু একটা কান্ডকারখানা হয়েছে। আর এটাই এখন মনে আছে। ওঁর কথা শুনে খেয়াল হল আজকের বিপুল সংখ্যক বয়োকনিষ্ঠ দর্শকদের পথের পাঁচালী-র ঘটনা বা অবস্থা না জানা বা না মনে রাখাটাই স্বাভাবিক। এ ধারণাও তাই থাকতেই পারে যে পথের পাঁচালী-

র গুণাবলীর জ্ঞান ও জনসমাদর এসেছে অনেক পরে। এ ধারণা যে ভুল সেটার সাক্ষ্য রাখাই এ লেখার উদ্দেশ্য।

সত্যজিৎ রায় যখন 'পথের পাঁচালী'র কাজ শুরু করেন তখন তিনি অপরিচিত নন। তার অগেই বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে তিনি এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন যার ফলে এই পড়ুয়া ও সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর ছবি করার সিদ্ধান্ত, 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসকে বেছে নেওয়া, অভিনয়ে অপেশাদারী ও কলাকৌশলে অনভিজ্ঞ অনেকের নির্বাচন, ছবির শুটিং শুরু হওয়া, তারপর বন্ধ হয়ে যাওয়া, সরকারী সাহায্য পাওয়া ইত্যাদি ঘটনা নিয়ে জল্পনা আলোচনা যথেষ্ট হত। এবং যদিও তা নিয়ে আলাপ আলোচনা সত্যজিৎ রায়ের বন্ধুবান্ধব পরিচিত মহলেই বেশী হত তা হলেও সেটা যে তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না তার প্রমাণ সে সময়ে সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে এর উল্লেখ। ১৯৫৩ সালে, অর্থাৎ 'পথের পাঁচালী'র সাধারণ প্রদর্শনের দুবছর আগে, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদের আংশিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ "দর্পণ কথাচিত্র নামীয় একটি নতুন চিত্রপ্রতিষ্ঠান সম্প্রতি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস পথের পাঁচালী তুলে বলে প্রকাশ। বইটির প্রাকৃতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রায় সমস্ত ছবিটিই গ্রামাঞ্চলে তোলা হবে। পরিচালনা করবেন সত্যজিৎ রায়।"

Amrit Bazar Patrika : "The famous Bengali classic Pather Panchali....... has been taken up for filmisation by Darpan Kathachitra, a newly formed production unit.......the film has been assigned to the direction of Satyajit Ray."

স্বাধীনতা ঃ "দর্পণ কথাচিত্র নামে একটি নতুন চিত্রপ্রতিষ্ঠান স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় উপন্যাস পথের পাঁচালী-র চিত্র রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। অনেক নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীকে এই ছবির প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে। বহু অন্বেষণের পর অপু এবং দুর্গার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য দুটি কিশোর কিশোরী পাওয়া গেছে।'

যুগান্তর ঃ "শোনা যাচ্ছে পথের পাঁচালী চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। কয়েকটি শট তোলাও হয়ে গেছে। এই অতি জনপ্রিয় উপন্যাসের চিত্ররূপ দেখবার জন্য নিশ্চয় সকলে আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করবেন।"

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ "... কলকাতার কাছাকাছি গ্রামে দিন সাতেক চিত্রগ্রহণ হয়েছে এবং নতুন বছরের গোড়া থেকেই নিয়মিতভাবে কাজ চলতে থাকবে।... (সত্যজিৎ রায়) জানিয়েছেন যে ছবির নব্বই ভাগই তোলা হবে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে গিয়ে...আবহ-সঙ্গীতরূপে ব্যবহার করা হবে প্রাকৃতিক শব্দ, বাতাসের গুঞ্জন আর পশুপাখির কলকাকলী।'

Hindustan Standard : "Work is progressing satisfactorily on Darpan's filmization of Bibhuti Bhusan Bandopadhay's classic saga of rural Bengal Pather Panchali ....At present the unit is engaged in the exciting task of filming an actual kal-Baishakhi thunderstorm which will form a dramatic and pictorial highlight of the film."

আনন্দবাজার পত্রিকা: "খাঁটি ইতালীয় প্রথায় বাংলা ছবি পথের পাঁচালী তুলছেন সত্যজিৎ রায়। বিদেশী প্রথায় দেশী ছবি তোলা এই প্রথম নয় কিন্তু আশার কথা প্রথাটি হলিউডের রপ্তানী নয়, ইতালীর। পর্দায় পথের পাঁচালী-র কতটা দেখতে পাব জানিনা তবে রায় মশাই অনেকটা এগিয়ে এনেছেন।"

উপরের কটি উদ্ধৃতি দৈনিক সংবাদপত্র থেকে। নানা সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায়— Screen, রঙ্গালয়, রূপাঞ্জলী, সচিত্র জীবন, দীপালি ইত্যাদি — দেখা যায় ওই ১৯৫৩ সালেই পথের পাঁচালী উপন্যাসের সিনেমায় রূপান্তরেব খবর প্রকাশিত হতে।

সুতরাং একটা নতুন ধরনেব ছবি তৈরী হতে চলেছে এই সংবাদ মোটামুটি ব্যাপকভাবেই পরিবেশিত হয়েছিল আব তা অনেকের মধ্যেই উৎসাহ সঞ্চার করেছিল, পথের পাঁচালীর সাধারণ প্রদর্শনের দুবছর আগে। ১৯৫৩ সালের পর কিন্তু খবর ও উৎসাহ দুইই কমে যায়। অর্থাভাবে কাজ থেমে যাওযা, পশ্চিমবঙ্গ সবকারের অর্থানুদানের ব্যবস্থা, পুনরায় ছবির কাজ আবম্ভ, ছবি তৈরী শেষ হওয়া, আমেরিকায় Museum of Modern Arts -এ প্রদর্শন- এসব খবর মাঝে মাঝে কাগজে প্রকাশিত হলেও আগের তুলনায় তা বিরল। জনসাধারণের এমন কি যাবা চলচ্চিত্র-ব অভ্যস্ত দর্শক তাদেরও আগ্রহ কমে যায় ; অনুমান করা চলে অনেকেই ভুলে যান এই ছবির কথা। সত্যজিৎ রায়েব ঘনিষ্ঠ মহলে অবশ্য সমান উৎসাহ ছিল। সেই সময়কাব কথা নিযে শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত একটি অনবদ্য লেখা লেখেন কয়েকবছর আগে। সমকালীন নয় বলে সে লেখাটি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি না। যে ধরণের মানসিক পরিমণ্ডল ও মেজাজের আবহাওয়ায় পথের পাঁচালী-র অনেকটা ভাবনাচিন্তা হয়, অল্পকথায় সেই মেজাজ অসাধারণ নৈপুণ্যে বিধৃত হয়েছে এই লেখায়।

পথের পাঁচালী সাধারণভাবে প্রথম প্রদর্শিত হয় ২৬শে আগষ্ট ১৯৫৫ সালে বসুশ্রী, বীণা, ছায়া, শ্রী ও কয়েটি মফঃস্বলের প্রেক্ষাগৃহে। তাব কয়েক সপ্তাহ আগেই কিন্তু পথের পাঁচালী নিয়ে আবার লোকের উৎসাহ জেগে ওঠে। এব কারণটা ছিল কাগজে, পোস্টারে, ব্যানারে চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন। এ জাতীয় শিল্পোদ্ভাসিত বিজ্ঞাপন আগে কলকাতায় কেউ কখনও দেখেনি।

ছবি মুক্তি পাওয়ার পর তিন চার দিন বোধ হয় তেমন ভীড় হয়নি। তারপর ভীড় বাড়তে থাকে, আর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে— যাব মধ্যে হতভম্ব ও হতবাক্ হয়ে তিনবার দেখেছিলাম মনে পড়ে— লোক ভেঙে পড়তে আরম্ভ কবে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে অন্তত পথের পাঁচালী নিয়ে সে সময়ে বিস্মিত উত্তেজিত আলোচনা যে পরিমাণ হয় তা সে সময়ে যাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন বা সে সময়ের কথা যাঁদের মনে নেই তাঁদের পক্ষে কল্পনা করা শক্ত। 'Talk of the town' কথাটা এ ক্ষেত্রে অত্যুক্তি হযনি। যে সংবাদপত্রে কথাটা ব্যবহৃত হয়, সেখান থেকে প্রাসঙ্গিক লেখাব আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে আরেক প্রস্থ উদ্ধৃতি শুরু করছি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে। উদ্ধৃতি. বলা বাহুল্য, প্রকাশিত লেখার স্বল্পাংশ। কিন্তু খণ্ডিত ও সংক্ষিপ্ত হলেও উদ্ধৃতির নির্বচনে খেয়াল রেখেছি যাতে উদ্ধৃতাংশটি লেখার মূল বক্তব্যের বিরোধী বা তা থেকে বিচ্যুত না হয়। যত লেখা বের হয়েছিল তার অল্পই উদ্ধৃতির জন্য বাছা হয়েছে স্থানাভাবের কথা ভেবে।

The Sunday Standard, Sept 18, 1955 : "Habitués of one of

Calcutta's well known coffee houses have for years been overhearing a group of young men heatedly discussing modern trends in flimmaking. Contemptuous of the group's ambitions, some tauntingly called them 'cofee house Pudovkins'.

Recently the 'coffee house Pudovkins' screended Pather Panchali, a Bengali film in which they have put every one of their theories to the test. immediately it was hailed as a great departure in Indian fimmmaking and became the talk of the twon."

অনুরূপ মন্তব্য সংবাদ হিসাবে প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় দুদিন আগে, অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর। তাতে লেখা হয়েছিল ঃ "সারা শহরকে সর্বক্ষণ মুখর করে রাখায় পথের পাঁচালী একটা প্রায় রেকর্ডই সৃষ্টি করে যাচ্ছে। রেস্তরায়, কফি হাউসে, বৈঠকখানায় বা কোথাও কোনরকম আড্ডা হলেই সর্বত্রই ঐ একই বিষয়ের আলোচনা।'

কলকাতার দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক চিত্র সমালোচনা বেশীর ভাগ বের হয় প্রদর্শনের দু সপ্তাহের মধ্যে। নীচের উদ্ধৃতি সেই বিভাগের লেখা থেকে।

Statesman, August 28, 1955 : "To select this book for his first film was unusually bold of director Stayajit Roy... It has enough merits to be considered as a film event.......This vital, moving and emotionally compact picture can only indicate how patiently and meticulusly the director had prepared himself before he put his hand to the task.....The very approach is novel and unconventional....Subrata Mitra's photography does not merely keep perfect pace with the subject. Many of the compositions reveal his or more truly his and the director's artistry.. Talking of musical effect in a film what Rabi Shankar has achived with a few simple Indian instruments and occassionally with the unaccompanied shaky treble of an old woman's voice has had hardly a parallel in Indian films."

আন্দবাজার পত্রিকা ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ ঃ "বিশ্বের একখানি সেরা ছবি তোলার কৃতিত্ব দেখাবার মত প্রতিভাও যে (বাঙলা দেশের) আছে পথের পাঁচালী দেখার আগে তা নেহাৎই স্বপ্নকথা ছিল।... ছবিখানি একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। শুধু তাই নয়, এ কথা বলা একটুও অত্যুক্তি হবে না যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আদি আমল থেকে এ পর্যন্ত দিশী ও বিদেশী মিলিয়ে ভারতে যত ছবি দেখানো হয়েছে তার মধ্যে এমন কোন ছবি মনে করা যায় না যাকে পথের পাঁচালী-র সঙ্গে তুলনায় দাঁড় করানো যায়। ... ছবিতে (পরিচালক) সার বস্তুটাই রূপায়িত করেছেন এবং তা করেছেনও এমন ললিত নাটকীয় ভঙ্গির মধ্য দিয়ে যে ছবিখানি একটি স্বতন্ত্র মৌলিক সৃষ্টি বলেই প্রতীয়মান হয়। ছবির প্রতিটি অঙ্গের মধ্যেই মৌলিকত্ব সুস্পষ্ট। এতোদিকের এতো দেখবার, উপলব্ধি করার, অনুভব করার এবং চমকিত বিস্মিত পুলকিত হওয়ার এতো উপাদান ও কাজে ছবিখানি ভরা যা আগে কোন একখানি ছবিতে কখনো পাওয়া যায়নি। বিন্যাসে নিও রিয়ালিজম ধারাটাই অবলম্বন করা হয়েছে কিন্তু তাতেও সত্যজিৎ রায় ইতালীর মনীষীবৃন্দকে অতিক্রম করে গিয়েছেন।"

Hindustan Standard, September 2, 1955 : "This is the first Indian film which is Indian in every inch. The story is well known; it relates to a Bengal village which is dying out - the sort of village we have all seen and turned away from. It is to such a spot that the young director Satyajit Roy has taken his camera, his seeing eye, his feeling heart and his very capable hands. The result is a film of exquisite beauty and it is in the fullest sense of the term, a work of art... This film, let us aver, marks the Indian film's coming of age."

দৈনিক বসুমতী ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ ঃ " পরিচালকের ছবির চোখ যে কতখানি পাকা তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে এ ছবির প্রত্যেক ফুট-এ। যেমন পাকা এঁর ছবির চোখ তেমনি সূক্ষ্ম এঁর রসবোধ।"

স্বাধীনতা ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ ঃ "ছবিখানি দেখতে যাওয়ার সময়ে ভয় নিয়েই গিয়েছিলাম। অভিভূত হয়ে ফিরে এসেছি। (সত্যজিৎ রায়) আগে কোন ছবি পরিচালনা করেননি কিন্তু এই ছবির পরিচালনায় ইনি আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। ..এত ভাল পরিচালনায় তোলা কোন দেশী ছবি এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সূক্ষ্ম অথচ সহজ ও সাবলীল কতকগুলি প্রকাশ ভঙ্গীতে ইনি চরিত্রগুলির মানসিক অনুভূতি ও বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।"

লোকসেবক ২রা সেপ্টেম্বর ঃ "ছবিখানির গঠননৈপুণ্যে যে শিল্পবৈভবের সমাবেশ হয়েছে তাতে যে কোন রসপিপাসু দর্শকমন পরম পরিতৃপ্তিতে মুগ্ধ হয়ে যাবে।"

Amrit Bazar Partrika, Septemner 9, 1955 : "it is a matter of no small credit that for a beginner in filmcraft to achieve such suprising artistic charm and perfection on the screen as Satyajit Roy has accomplished in his very first film venture. His treatment of the subject matter is marked by a unique blend of imagination and spontaneity...Sensationally sensitive camera work by Subrata Mitra, another newcomer in his line, has singularly helped the director in fulfilling his mission into a creation."

যুগান্তর ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ ঃ "চলচ্চিত্রায়ণে নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গী, বিশেষ একটা ধারা, একটা ভিন্ন জাতেরই ছবির চেহারা উপস্থিত করে দেওয়া হয়েছে সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত পথের পাঁচালী ছবিটির মাধ্যমে।... গল্প নির্বাচন, অভিনয় ও আলোকচিত্র নিয়ন্ত্রণ, বিন্যাস ও সঙ্গীত পরিচালনা—প্রতিটি বিভাগে এমন একটা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়, পৃথিবীর কোন বিশেষ একখানি পূর্ণাঙ্গ চিত্রেই যা ইতিপূর্বে একসঙ্গে পাওয়া যায়নি। আর এই স্বাতন্ত্রের মধ্যে যা সব চাইতে দৃষ্টি কাড়ে তা হচ্ছে সংযম।"

জনসেবক ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ ঃ "অত্যন্ত সামান্য উপকরণ দিয়ে সৃজনের নিষ্ঠা থাকলে কি অসামান্য বস্তুই যে নির্মাণ করা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অধুনা প্রদর্শিত 'পথের পাঁচালী' চিত্রটি। দর্শদের মনোহরণ অভিভূত করার চেয়েও যেটা বড় কথা সেটা হল বর্তমানের কূপমন্ডুক বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালকদের 'পথেব পাঁচালী' জ্ঞানদাতা গুরুর আসন নিয়ে বলছে, অসুস্থ গতানুগতিক পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কিছু বলিষ্ঠ রচনা

করতে।”

শুধু দৈনিক সংবাদপত্রে নয় বহু সাপ্তাহিক মাসিক ত্রৈ-মাসিক পত্রিকায়—একমাত্র সিনেমা-সংক্রান্ত পত্রিকাতেই নয়—একই ধরনের সাভিনন্দন সমালোচনা বার হয়। দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজে প্রকাশিত দৈনিক বা সাময়িকীতেও অনুরূপ লেখা বার হয় কয়েক মাসের মধ্যেই। তাছাড়া বিশেষ প্রবন্ধও কম বার হয়নি। সবকটি থেকে উদ্ধৃতি দূরের কথা, সবকটির উল্লখও এখানে সম্ভব নয়। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

দেশ ১৭ই ভাদ্র ১৩৬২ ঃ “‘হয়তো’, ‘কিন্তু’, ‘যদি’, ‘বোধহয়’ জুড়ে সংকোচ বোধ করে বলা নয়, নির্দ্বিধায় স্পষ্ট করে একথা আজ পৃথিবীকে বলবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে যে, আমাদের দেশ পরিমাণে শুধু নয়, গুণের দিক থেকেও এমন ছবি তৈরী করতে পারে যা পৃথিবীর সমগ্র চিত্রশিল্পেব ইতিহাসেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে পরিগণিত হবার যোগ্য।”

সচিত্র ভারত ৩রা সেপ্টেম্বব ১৯৫৫ ঃ “একদা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাযের পথেব পাঁচালী যেমন বাংলা সাহিত্যে একটা আলোড়ন এনে দিয়েছিল পথের পাঁচালীর চিত্ররূপও সারা ভারবর্ষের চলচ্চিত্র ইতিহাসে অনুরূপ একটা যুগান্তর এনে দিয়েছে।...সারা ছবিতে দুটি জিনিষ পাশাপাশি মনের উপর রেখাপাত করে; একটি হল বাস্তবতা দ্বিতীয়টি হল কাব্য।”

Thought, Delhi September 24, 1955 : "Pather Panchali now showing simultaneously at several cinemas in Calcutta is the finest Indian film I have seen....Satyajit Roy has achieved the impossible With delicate perception and subtle understanding he has made a film of great beauty."

নতুন সাহিত্য, ভাদ্র ১৩৬২ : “.... এমনি যখন অবস্থা তখন মুক্তিলাভ করল পথের পাঁচালী। সমস্ত দেশের মর্মমূল ধরে এমন করে নাড়া দেবার স্পর্ধা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় ছবির আবির্ভাব ঘটেনি, চিত্রজগতের হতশ্রী শিল্পলক্ষ্মীকে এমন করে আর কখনো সিংহাসনে বসানো হয়নি। সাফল্যের সেই অভাবনীয়তায় পথের পাঁচালীর চিত্ররূপ ভারতীয় চিত্রজগতে এক ঐতিহাসিক কীর্তি।”

পরিচয়, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬২ ঃ “গ্রামজীবন নিয়ে দেশ বিদেশের যত ছবি দেখেছি তার মধ্যে পথের পাঁচালীর তুলনা দেওয়া শক্ত। অস্পষ্টভাবে দনস্কয়ের ‘মাকসিম গর্কির শৈশব’ -এর কথা মনে আসে। আব চরিত্রের প্রতি মনোভাব ডি সিকার কথা মনে করিয়ে দেয়। যে মিলটুকু আধুনিক বাস্তববোধের ক্ষেত্রে অন্তরের মিল। ‘মিরাকল অফ মিলান’-এ বিস্তীর্ণ বরফের ক্ষেত্রের উপর রোদের মধ্যে দাঁড়াবার জন্য লোকের ছুটোছুটি, ভোরের কুয়াশার মধ্য দিয়ে ট্রেনের নিঃশব্দ গতি—এসমস্তর মধ্যে জীবনের যে নীরব পর্যবেক্ষণ আছে তার সঙ্গে পথের পাঁচালীর জীবনবোধের কিছু মিল হয়তো আছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বাঙালী হয়ে যাওয়ার ফলে সে মিল ধরা পড়ে না, মন মানতেও চায় না। ... অনেকে প্রশ্ন করেছেন সত্যজিৎ রায় কী করে বাংলা গ্রামজীবনের অমন যথাযথ রূপ ফোটালেন? তার উত্তর এই যে পশ্চিমী শিল্পব্যাপারে সত্যজিৎ-এর দখল অসাধরণ, বিশেষত পৃথিবীব্যাপী সার্থক চলচ্চিত্রেব ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে।

Statesman, Delhi December 34, 1955 : "Pather Panchali belongs no more to Bengal than to India; in its universal values and as a masterpiece of film art it belongs to the world, ... But apart from its sincerity and authenticity which are so real that we forget this is a film, there is the individual touch of the sensitive. Each shot is a study in composition, a masterpiece of light and shade, But never are the characters subordinated to technique–they come first and artistic detail and technical finesse only serve to heighten their clarity and depth. In a film which does not take a single hesitant step nor wastes energy in a single unnecessary move the use of sound is a study in itself...Discussing Pather Panchali is like paraphrasing a poem line by line. One can only see and feel it."

Illustrated Weekly of India, Junuary 1, 1956 : "Satyajit Roy accentuates the atmospheric rather than the factual truth. the incidents are very ordinary but they are revealed with a breathtaking spontaneity so that one gradually becomes unaware of watching them through the medium of art . unconsciously life takes over and art no longer exists in the mind of the spectator."

Times of India, February 10, 1956: "It is banal to compare Pather Panchali with any other Indian picture–for, even the best of the pictures produced so far have been cluttered with cliches. Pather Panchali is pure cinema. .What makes Pather Panchali so intense is the control that Satyajit Roy exercises on his material. He never allows his tense scenes to degenerate into melodrama. He never lets his lyricism slip into sentimentality."

Filmfare, April 13, 1956 · "(Pather Panchali's) real worth lies in the fact that it stands up in the vast wasteland which is the Indian film...It prods an audience which has depended for years only on its eyes and its inexhaustible fund of credulity, prods it to react through the intellect and the emeotions and be stirred to its depths."

প্রশংসাসূচক সমালোচনায় বিরূপ মন্তব্য ও দোষত্রুটির উল্লেখ করা হয়নি বা পুরোপুরি বিরুদ্ধ সমালোচনা একেবারে হয়নি তা নয়। অনেক সমালোচকই শব্দগ্রহণের ত্রুটি নিয়ে অভিযোগ করেন। যুগান্তরের সমালোচনায় কঠোর মন্তব্য করা হয়। সর্বজয়া-র ইন্দির ঠাকুরুণকে নিজে জল গড়িয়ে খেতে বলা আর বৃদ্ধার বাঁশবনে মৃত্যুকে হত্যাকান্ড বলে উল্লেখ করে সমালোচক লিখছেন ঃ "এই দৃশ্য দুটিকে এই অনবদ্য চিত্রের এক অতি কলঙ্কজনক ঘটনা বলে চিহ্নিত করে দেওয়া বোধ করি অন্যায় হবে না।"

শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬২ জন্মভূমি-তে লেখা হয়, "ছবিটি ভাল হয়েছে কিন্তু উপন্যাস

ও ছবির মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। উপন্যাসের রোমান্টিক রূপটি ছবির দারিদ্রের প্রকটতায় বেসুরো হয়েছে।" Filmfare-এ বলা হয়, "the comparativ singnificance of Pathern Panchali does not lie in anything of an inauguratory nature." ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ তারিখে যুগবাণী প্রথমেই প্রশ্ন করেন এ ছবি আমেরিকায় দেখাতে পাঠানো হয়েছিল কেন। আমেরিকানদের বাঙালীর চুণকালি মাখা মুখ দেখাতে? "বাঙালীর ঘরে ছেলেমেয়ে শিশুকাল হইতে চোর হইয়া গড়িয়া ওঠে, শক্তিমান বাঙালী দুর্বল বাঙালীর সর্বস্ব কাড়িয়া নেয়, বাঙালীর পিসীমারা তাড়কারাক্ষসীর মেজ বোন, বাঙালীর বউয়েরা ননদিনীদের খাইতে দেয় না, অভুক্ত ননদিনীকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়া বউ দুধের বাটিতে চুমুক মারে, ননদিনী জঙ্গলে পড়িয়া মরিলে তার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে না, বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুল মুদীরা চালায়, লেখাপড়া শিখিলে গ্রামে বাস করা অসম্ভব ইত্যাদি-এই তো?" রূপাঞ্জলী ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫৫-এ সমালোচনার শুরু বড় হরফে ছাপা ঃ "গৌরী সেনের টাকা পেলে এমন উন্নত শ্রেণীর চিত্রনির্মাণের এলেম বাংলাদেশের একাধিক চিত্রপরিচালকদের আছে বলেই আমার মনে হয়।"

তুলনায় অবশ্য বিরুদ্ধ সমালোচনার লিখিত সাক্ষ্য খুবই কম। সমকালীন লেখায় প্রশংসা বা নিন্দার চেয়ে যেটা বড় কথা সেটা হল জনসমাদর। বসুশ্রী থেকে সাত সপ্তাহ পর যখন পথের পাঁচালী দেখানো বন্ধ হয় তখন ভীড় এতটুকুও কমে নি। পরপরই ইন্দিরাতে দেখানো শুরু হয় আর বসুশ্রী, বীণাতেও দ্বিতীয় দফায় দেখানো শুরু হয় ১৯৫৬ সালের মে মাসে।

সমালোচকদের প্রশংসা ও টিকিটঘর মারফৎ জনসমাদরের সাক্ষ্য ছাড়াও পথের পাঁচালী সেই সময়ে কী ধরণের সমাদর পায় তার আরেকটি নিদর্শন নানা সংস্থা থেকে সম্বর্ধনার আয়োজন। বহু সভা আয়োজিত হয় সত্যজিৎ রায় ও পথের পাঁচালী-র কলাকুশলীদের সাধুবাদ জানাতে। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার একমাসের মধ্যে তরুণ সহিত্যিকদের উদ্যোগে ২৩শে সেপ্টেম্বর সিনেট হলে এক জনসম্বর্দ্ধনার আয়োজন হয় যাতে অগণিত সাহিত্যিক শিল্পীর সঙ্গে বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন সাধারণ দর্শক। সে সময়কার কাগজ ঘাঁটলে সহজেই জানা যায় এরকম আরও অনেক সম্বর্দ্ধনার খবর। তাছাড়া ঘরোয়া আয়োজনের সংখ্যাও কম হয় নি।

জনসমাদর, সমালোচকদের প্রশংসা, সারাদেশে খ্যাতিলাভ, রসিক বোদ্ধাদের উদ্দীপনা এবং কয়েকটি পুরস্কার (উল্টোরথ, Cine Advance) লাভ —এসবই কিন্তু ঘটে ১৯৫৬ সাল মে মাসে অনুষ্ঠিত কান উৎসবে পুরস্কাব ও স্বীকৃতি পাওয়ার আগে।

পঁচিশ বছরে এ দেশের চলচ্চিত্র কতটা এগিয়েছে এবং সেই অগ্রগতিতে পথের পাঁচালী-র ভুমিকা কি, ভারতীয় সিনেমার গত পঁচিশ বছরের বিবর্তনে পথের পাঁচালীর প্রেরণা ও প্রভাব কতটা কাজ করেছে ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ ও প্রশ্ন বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সে আলোচনার সূত্রপাতও এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। প্রস্তুতির পথে ও সাধারণ প্রদর্শনের সময়কার কথা কিছুটা জানার জন্যই এ লেখা। এবং সেটা জানাতে, আমার মনে হয়েছে, সমকালীন পত্রপত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়াই ভাল, ব্যক্তিগত স্মৃতি রোমন্থন না করে।

পৃথিবীরই একটি শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি

শৌভিক (পঙ্কজ দত্ত)

'হয়তো', 'কিন্তু', 'যদি', 'বোধ হয়' জুড়ে সঙ্কোচ বোধ করে বলা নয়, নির্দ্বিধায় স্পষ্ট করে একথা আজ পৃথিবীকে বলবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে যে আমাদের দেশ পরিমাণেই শুধু নয়, গুণের দিকে থেকেও এমন ছবি তৈরি করতে পারে, যা পৃথিবীর সমগ্র চিত্রশিল্পের ইতিহাসেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। একথা আজ সদর্পে বলতে পারা যাচ্ছে, 'পথের পাঁচালী' ছবিখানি দেখবার পর। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি এই 'পথের পাঁচালী', কিন্তু সত্যজিৎ রায় চিত্রনাট্য রচনার বাহাদুরিতে এবং পরিচালন সৌকর্যে এমন একটা মৌলিক জিনিস সামনে এনে হাজির করে দিয়েছেন, যা অন্তত এদেশে চলচ্চিত্রের আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত প্রদর্শিত দিশী বিদেশী এমন কোন ছবির কথা মনে করা যায় না, যাকে এর সঙ্গে তুলনার যোগ্য বলে গণ্য করা যায়। ছবিখানি দেখার পর এ বিষয়ে কারুর যদি সংশয় থাকে তো বুঝতে হবে তার মনে নিজের দেশের কৃতিত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার ব্রীড়াবনত সঙ্কোচ আছে, নয়তো সে ব্যক্তি চরম উন্নাসিক আব নয়তো স্রেফ হিংসুটে। দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর ধরে দিশী বিদেশী মিলিয়ে হাজার হাজার ছবি দেখে কোন ক্ষেত্রেই এমন পুলকিত হওয়া যায়নি এবং আর কোন ছবিকে এমনভাবে বিশেষণে বিশেষণে মুড়ে অলঙ্কৃত করে তোলার জন্য মন উদগ্রীব হয়ে ওঠেনি। এখন সত্যিই সারা পৃথিবীর টিকি নেড়ে এ কথা বলতে পারার আজ সুযোগ এসেছে যে, ভারতীয় ছবি সর্বাঙ্গীন সৌকর্যে সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাবার মতো যোগ্যতার পরিচয় দেবার ক্ষমতা রাখে। এবং বিস্মিত হতবাক হতে হয় ছবিখানি কিভাবে তোলা হয়েছে সেকথা ভাবতে গেলে।

চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের সঙ্গে আগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না ;আলোক-চিত্রশিল্পী সুব্রত মিত্র 'দি রীভার' ছবিখানিতে একজন সহযোগীর কাজ মাত্র করেছেন ;আর শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তেরও চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংস্রব বেশী নয়। এই তিন জন আর তাঁদের সঙ্গে অন্যদেশ হতে বাতিল হয়ে যায় এমনি সরঞ্জাম, তাও নেহাৎই অপ্রচুর। কিন্তু তাই নিয়েই এঁরা ঐন্দ্রজালিকের মতো যা সৃষ্টি করেছেন, তা পৃথিবীর সেরা সব সরঞ্জাম নিয়েও হয়না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, শিল্প ও নাট্যসঙ্গত ভালোটুকু ভেবে ভেবে খুঁজে খুঁজে ছন্দোবদ্ধ দৃশ্যে গেঁথে গেঁথে ক্যামেরায় তোলার যে আদর্শ ধৈর্য, অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতার কাহিনী ছবিখানি নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, সেইটেই একটা ইতিহাস। দেখা গেল, দরদী শিল্পী ও চিন্তাশীল মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে ভোঁতা যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম নিয়েও কি অনিন্দ্য গরিমাই না ফুটিয়ে তুলতে পারে। ছবিখানির সংগঠনকারীদের নেতা হিসেবে পরিচালক সত্যজিৎ রায় চিত্র নির্মাণের সমস্ত বিভাগগুলিতেও প্রাণের যে সাড়া এনে দিয়েছেন, তা সবকিছুকে নতুনের দৃষ্টিতে চোখের সামনে উদ্ভাসিত করে তোলে। প্রত্যেকটি বিভাগেই যার যা ভূমিকাকে

ব্যক্তিত্বপূর্ণভাবে অথচ সবায়ের সঙ্গে সবায়ের সমন্বয়ের রাখি বেঁধে বিকশিত হয়ে ওঠার এমন দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায়নি। সবায়ের কাজ আলাদা আলাদা, কিন্তু সবাইকে মিলিয়ে একটা পরম রূপময় সম্পূর্ণতা গড়ে উঠেছে। ভূপেন্দ্র ঘোষ বা সত্যেন চট্টোপাধ্যায় আগে অনেক ছবিতেই শব্দগ্রহণ বা শব্দ যোজনার কাজ করেছেন, কিন্তু 'পথের পাঁচালী'তে পরিচালক তাঁদের কাজ এমনভাবে সাজিয়ে খেলিয়ে নিয়েছেন, যাতে তাঁদের কাজের চমৎকারিত্ব নতুন করে অঞ্জনায়িত হয়ে ওঠে। সঙ্গীতকেও তো ছবিতে কতোরকমভাবেই ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু এ ছবির সঙ্গীত সংযোজনায় রবিশঙ্করের মতো প্রতিভার মৌলিকত্ব যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি কাহিনীর প্রয়োজন মেটাতেও সেই সঙ্গীতকে কিভাবে প্রয়োগ করলে তা ছবিরও একটা বিশেষ মর্যাদার অঙ্গ হয়ে ওঠে সে বিষয়েও পরিচালক সত্যজিৎ রায় পথ করে দিয়েছেন। পরিচালন প্রতিভা দেখিয়ে দিল যে, কলাকৌশলের প্রতিটি দিকেরই এক একটা স্বতন্ত্র ভূমিকা অনুভূত হওয়ার সঙ্গে প্রত্যেককে জড়িয়ে সমগ্রতাকেও এমন একটা অপূর্বতায় পরিস্ফুট করে তোলা যায়, যা দেখতে দেখতে প্রতিনিয়তই বলে উঠতে ইচ্ছে করবে 'চমৎকার', 'চমৎকার'!

'পথের পাঁচালী'র মৌলিকত্ব এমনি চমকপ্রদ যে ছবিখানি মানুষের আবেগের কোঠায় কি পরিমাণ ঠাঁই করে নিতে পারবে, সে বিষয়ে ব্যবসাদারী মনে দস্তুরমতো সংশয়ের উদ্রেক হয়। নাচগান নেই এবং চুটকি রঙ্গ-তামাসা নেই বলে বাজারের কোন পরিবেশক ছবিখানি তোলা শেষ করতে টাকা আগাম দিতে এগিয়ে আসেননি। তার ওপর সংগঠনকারী ও শিল্পীরা প্রায় সকলেই নতুন লোক, পুরনো দু একজন যাঁরা আছেন, তাঁদের টান নেই। কিন্তু তবুও পরিচালক সত্যজিৎ রায় টাকা পাবার জন্য তাঁর শিল্পনিষ্ঠাকে জলাঞ্জলি দিতে রাজি হননি। এইখানেই আসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিশেষভাবে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহায়তার কথা। কোনদিন ভারতেব কোন রাজ্য যা কবেনি, ডাঃ রায় প্রথম চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থসাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। এ সাহায্য না পেলে চিত্র-জগৎ অবশ্যই একটা মহান সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হতো। পরিচালক সত্যজিৎ রায় রাজ্যের এই সাহায্যের মান তো রক্ষা করেছেনই, এমন কি একথা বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ গর্ভনমেন্ট শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় সবায়ের যে অগ্রণী সে-মর্যাদাও পাইয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি অংশে মৌলিকত্ব প্রতিভাত করিয়ে দেওয়ার জন্য ভেবেচিন্তে কাজ করাব ছাপ সর্বত্র সুস্পষ্ট। মনকে মুগ্ধ করে তুলতে খুচখাচ কতো রকমের কাজ যার বর্ণনা দিয়ে শেষ করে ওঠা যায় না। কাহিনীর মানবিক আবেদনটাও এমন সহজ ও সরলভাবে এনে হাজির করে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষ মাত্রেরই মনকে আবেগে আপ্লুত করে তুলবে। আগাগোড়া ছবিখানির কোথাও একটু অবাঞ্ছিত অংশ নেই, একটু কিছু বাজে নেই, যা মনের তারকে বাজাতে অক্ষম; একটাও মুহূর্ত নেই যা চমক লাগিয়ে যায় না। এমন সবটুকুই তারিফের ছবি একটা প্রপঞ্চ বিশেষ বলে মনে হবে।

সুবৃহৎ উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'কে একখানি প্রমাণ দৈর্ঘ্যের ছবির পরিসরে এনে দেওয়া কঠিন এবং দুঃসাহসিক কাজ। তা ছাড়া 'পথের পাঁচালী' হচ্ছে প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের বর্ণনাময় উপন্যাস। নানাবিধ প্রাকৃতিক শোভাবৈচিত্র্যই উপন্যাসখানির মূল উপাদান। বলা বাহুল্য, বিরাট উপন্যাসখানির সবটুকু ছবিতে এনে দেওয়া সম্ভব নয়, আর সত্যজিৎ রায় তা করতেও চেষ্টা করেননি। কিন্তু তাই বলে চিত্রনাট্যটি মূল গ্রন্থ থেকে

এতটুকুও বিচ্যুত হয়নি, এইটেই সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ কৃতিত্বের একটি। বিরাট গ্রন্থখানি থেকে ছেঁকে ঠিক ভাব আর রসটুকু যথাযথভাবে এমন পরিবেশিত হয়েছে যা দেখবার পর কোন আক্ষেপ করার ছুতো পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ছবিখানিকে একটি স্বতন্ত্র মৌলিক সৃষ্টি বলেই স্বীকার করে নেওয়াই উচিত। কারণ গ্রন্থটির অবলম্বন হলেও চিত্ররূপায়ণে এতো মৌলিক সৃজনী-প্রতিভার লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়, যা এর মধ্যে একটা নিজস্বতার দাবী মূর্ত করে তুলেছে। আখ্যানভাগ বলতে কতোটুকুই বা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিহর। গল্প যখন আরম্ভ তখন তার সংসারে স্ত্রী সর্বজয়া, কন্যা দুর্গা আর বৃদ্ধা ভগিনী ইন্দির ঠাকরুণ। দুষ্টু মেয়ে দুর্গা পাশের বাগান থেকে ফল কুড়িয়ে আনে বলে সর্বজয়াকে কথা শুনতে হয়। সর্বজয়ার রাগ গিয়ে পড়ে ইন্দির ঠাকরুণের ওপর, কারণ দুর্গার টান তার ওপরেই বেশী। তাছাড়া হরিহরের চাকরি নেই বলে অনটনের মধ্যে সংসার চালিয়ে চালিয়েও সর্বজয়ার মেজাজ খিটখিটে। ইন্দির ঠাকরুণের রাগ হলে ছেঁড়া কাঁথা মাদুর আর পার্থিব সম্বল পিতলের ঘটিটা হাতে নিয়ে রাগে গরগর করতে করতে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। অবসর সময়ে হরিহর যাত্রাব পালা লেখে, তার আশা একদিন তার লেখা পালা অভিনয় হয়ে হৈহৈ পড়ে যাবে, তখন আর দুঃখ থাকবে না। এই আবহাওয়ায় জন্মালো অপু— স্বপ্নভরা সন্ধিৎসু দুটি চোখ সার। হরিহর একটা চাকরি পেলে। ইন্দির ঠাকরুণ আবার ফিরে এলো। দিন যেতে লাগলো। অপু বড়ো হতে থাকে দিদির সঙ্গে ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কিন্তু পাশের বাড়ির মেজ কাকিমা ওদের গরীব বলে দেখতে পারে না। ইন্দির ঠাকরুণের কাছে ভাই-বোন দুটি রূপকথার গল্প শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। অপু পাঠশালায় ভর্তি হয়। এক দিন দিদির সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে কাশবন পার হয়ে রেলগাড়ী দেখে আসে; নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের একটা চমক এলো ওদের জীবনে। অনেকদিন মাইনে বাকি পড়ায় সংসার আবার অচল। কাজের খোঁজে হরিহর গেল বিষ্ণুপুরে। তারপর চার মাস তার কোন পাত্তা নেই। ইন্দির ঠাকরুণ মাঝে চলে গিয়েছিল, আবার এক দুপুরে ফিরে এলো। সর্বজয়ার মেজাজ আজকাল আরও তিরিক্ষি। ইন্দির ঠাকরুণ ধুঁকতে ধুঁকতে এসে কোনরকমে ছাওয়ায় বসে একটু জল খেতে চাইলে। সর্বজয়া খেতে বসেছিল, ননদকে বললে নিজেই গড়িয়ে নিতে। ইন্দির ঠাকরুন এলো জল গড়াতে, সর্বজয়ার খাওয়ার দিকে দেখলে। গড়ানো জল আর খাওয়া হলো না; ইন্দির ঠাকরুণ আবার বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে নিজের পুঁজিপাটা নিয়ে। খেলা সাঙ্গ করে ফিরবার পথে দুর্গা আর অপু দেখলে পিসিমা হাঁটুতে মাথা গুঁজে বাড়ির সামনের গাছতলাটায় বসে। ডেকে সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত ছুঁতেই ধুপ করে পিসিমার দেহটা গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। ইন্দিব ঠাকরুণের দেহে প্রাণ নেই। দুর্গা আর অপু ভয় পেলো। দেখতে দেখতে বর্ষা এলো সঘন হয়ে। ভাইবোন দুটিতে আনন্দে মাতামতি করলে বর্ষার জলে। বাড়িতে ফিবে দুর্গার জ্বর; প্রতিবেশিনী সর্বজয়ার এক সহৃদয়া জা ডাক্তার দেখালে; নিউমোনিয়া। দারুণ ঝড়-জলের এক রাত্রে দুর্গা মারা গেল। কিছুদিন পর হরিহর ফিরলো টাকা জোগাড় করে। দুর্গার জন্য আনা শাড়িখানা সর্বজয়ার হাতে দিতেই এতোদিনের রুদ্ধ আবেগে সর্বজযা কান্নায় ভেঙে পড়লো। এবপর হরিহর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বারণসী যাত্রা করলে।

চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনা বলতে কিছুই নেই। এতে আছে বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে

এমন সমস্ত পরিবেশ গড়ে তোলা, যা আবেগকে উচ্ছ্বলিত করে যায়। সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এক একটা নাট্য-পরিণতি। এর মধ্যে যা সব প্রযুক্ত হয়েছে তার মধ্যে অবাস্তবতাও নেই, অসত্যও নেই। দুঃখ দারিদ্রোর সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম করে জীবনপথ অতিক্রম করে যাওয়ার এ এক অপরূপ ইতিবৃত্ত। গল্প হচ্ছে দুর্গা আর অপুকে নিয়ে। নিকষ দারিদ্র্যের মাঝে জন্ম তাদের। বলতে গেলে মানুষ ওরা প্রকৃতির কোলে স্বস্তির আলয় বৃদ্ধা পিসিমা, ইন্দির ঠাকরুণ। তার মধ্যে থেকেই ওরা দেখে গরীব বলে পাশের বাড়ির মেজকাকিমার ওদের ওপরে কি নিদারুণ ঘৃণা। কাকিমার ছেলেমেয়েরা কিন্তু ওদেরই মতো এবং ওদের সঙ্গে মিশতে খেলতে চায়; কিন্তু মার শাসনে দূরে সরে থাকে। এটাও ওরা দেখলে, না খেতে পেয়ে উপবাসে দিন কাটাচ্ছে, পাশের বাড়ির সহৃদয়া আর এক কাকিমাই শুধু তার খোঁজ নিতে আসে, কিন্তু আর কেউ ওধার দিয়েও মাড়ায় না, অথচ দিদি মারা যাবার পর ওরা যখন বারাণসী যাত্রা সাব্যস্ত করলে, তখন ভিটে ছেড়ে না যাবার জন্য পড়শীদের কতো উপদেশ। গ্রামের সেই পণ্ডিতমশাই— হাতে বেত নিয়ে ছাত্র পড়াচ্ছে, আবার মুদিখানাও চালাচ্ছে। তারই ফাঁকে চক্রবর্তী এসে মাথায় এক খাবলা তেল ঘষে বিনিময়ে চলে যাবার সময় পণ্ডিতের বারোয়ারি চাঁদা মকুবের আশ্বাস দিয়ে যায়। নিজের সন্তানদের পালন করার আকুলতায় সহায় সম্বলহীনা বৃদ্ধা ননদের ওপরে সর্বজয়ার হৃদয়হীনতা মানুষের মনের আর একটা দিক উদ্‌ঘাটন করে দেয়। সইয়ের বিয়ের সাজ দেখতে দেখতে দুর্গার চোখের কোণে একটি ফোঁটা জল পল্লীবালার আশা ও স্বপ্নের কি আভাসই না ফুটিয়ে তোলে। ছোটখাটো হলেও আঁতের জিনিসে ভরা সব ঘটনাবলী; মনের ওপরে আঁচড় কাটে না, এমন কিছুই নেই কোথাও।

টুকরো টুকরোভাবে অনেক কিছুই লক্ষ্য করার রয়েছে বিন্যাসের মধ্যে। তেঁতুল চুরি করে চুপিচুপি অপুকে ডেকে তেল আনিয়ে আচার মেখে নিজের মুখে দেওয়া আবার কখনও অপুর গালে দেওয়া— এমনভাবে দৃশ্যটি বিন্যস্ত যে, দেখতে দেখতে দর্শক মাত্রেরই মুখ জলে ভরে ওঠে। এমনিধারা সব অতিসাধারণ, অনাড়ম্বর এবং স্বাভাবিক ঘটনা, যা দেখতে দেখতে দর্শকমাত্রেরই স্মৃতি ও অনুভূতি স্পর্শাতুর হয়ে ওঠে। দুর্গা আর অপুর কাশবনের মধ্যে লুকোচুরি খেলতে খেলতে হঠাৎ টেলিগ্রাফের থাম দেখে থমকে যাওয়া আর থামের গায়ে কান দিয়ে অবাক হয়ে গমগমানি শব্দ শোনা এবং তারপরই ট্রেনের হুইসল শুনে ছুটে ছুটে দেখতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণও ওদের সঙ্গে একানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। গ্রামের সেই মিঠাইওয়ালাকে দেখে তার পিছনে অনুসরণ আর ঘুঙুরবাঁধা বাঁকের তালে তালে হাঁড়ির দোলনের সঙ্গে ছোটদের তাল রেখে চলা; ওদের চড়ুইভাতি করতে বসে নুন আনতে ভুল হওয়া নিয়ে ঝগড়া করে সব পণ্ড হওয়া ইত্যাদি সব সরল ঘটনা মনের ওপরে ভারি প্রশান্তি এনে দেয়। আর একদিকে রয়েছে ও বাড়ির মেজবৌয়ের মেয়ের বিয়ের ব্যান্ড বাদ্যি নিয়ে কেমন সমারোহ; আবার তার আগে রয়েছে অপুর জন্মাবার সময়কার থমথমে দৃশ্য। ইন্দির ঠাকরুণের বারবার রেগে চলে যাওয়া আবার ফিরে ফিরে আসা কেমন একটা করণামেশা অনুভূতি এনে দেয়। তারপর ইন্দির ঠাকরুণের হাঁটুতে মাথা গুঁজে মরে পড়ে থাকা এবং দুর্গার ছোঁয়ায় মাটিতে গড়িয়ে পড়ায় মনটা বড়ো উদ্বেল হয়ে ওঠে। এমন মৃত্যু-দৃশ্য ছবিতে দেখা যায়নি। আর এটা বড়ো বেশী মনে বাজে, অতি শান্ত নিরীহ বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকরুণ বলে

সন্ধেবেলা ভাইপো-ভাইঝীকে রূপকথা শুনিয়ে ঘুম পাড়ায়, তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে গাইতে থাকে— 'হরি দিন তো গেলো সন্ধ্যা হলো'— ওর নিজেকে পার করার জন্য হরির কাছে আবেদনের কথা স্মরণ করে আপনা থেকেই মনটা ভারি হয়ে ওঠে। সর্বক্ষেত্রেই অনুভব হতে থাকে সরল অপুর কৌতূহলী চোখ দুটির অস্তিত্ব— যাত্রাতে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধদৃশ্য দেখতে যেমন, তেমনি পিসিমার মৃত্যু দেখার সময়েও, সর্বত্র সবখানে। দুর্গার মৃত্যুর পর বারাণসী যাবার সময় অপু তার পুঁজিপাটা বাঁধতে গিয়ে তাকের মাথায় দিদির আচার খাবার ভাঙা নারকোল মালায় পুঁতির হার আবিষ্কার করে তার বিমর্ষ হয়ে সে হার পুকুরের গর্ভে নিক্ষেপ করা— সে এক অপূর্ব নাটকীয় স্পর্শ। এই পুঁতির হারটাই ছিল পাশের বাড়ির মেয়ের এবং চুরির দোষ এসে পড়ে দুর্গার ওপর। দুর্গা অস্বীকার করে কিন্তু তবুও মা-র কাছ থেকে বেদম প্রহার খায়। সেই স্মৃতি জড়ানো এই হার। অতুলনীয় এর বর্ষার দৃশ্য। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল; ঝড় উঠলো— অপু আর দুর্গা ছুটেছে ছুটেছে। বর্ষার আভাসে ব্যাঙের দল সাঁতরাচ্ছে জলে। ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিলো এক টাকমাথা ; টুপ করে এক ফোঁটা জল পড়লো টাকের ওপরে। পদ্মপাতার ওপরে টুপটাপ জল পড়তে লাগলো, দেখতে দেখতে আকাশ ভেঙে পড়লো। সেই প্রচণ্ড ঝর ঝর ধারায় দুর্গার চুল এলো করে ভেজার সে কি অপূর্ব দৃশ্য! তারপর দুর্গার মৃত্যু-রাত্রের ঝড়-বাদল। জানলার চটটা উড়ে খুলে পড়তে চায়, ওদিকে দরজার আগলও ঝড়ের দাপটে ভাঙে ভাঙে। একা সর্বজয়া রুগ্না মেয়ে কোলে, পাশে শুয়ে অপু। প্রকৃতির প্রচণ্ড দাপাদাপি, তার মাঝে সর্বজয়ার মুখে আশঙ্কার সঙ্গে জীবনরক্ষার দুর্জয় প্রচেষ্টা একটা দারুণ নাটকীয় পরিস্থিতি গড়ে তোলে। আশঙ্কায়, উদগ্রীবতায় দর্শকমন এমন থমথমে হয়ে যায় যে, তেমন অনুভূতি আজও পাওয়া যায়নি কখনো। পরদিন সকালে জল-কাদা, উড়োচালা, মরা ব্যাঙ, উঠোনের দৃশ্য করুণতাকে জমিয়ে তোলে আরো। তারপর চূড়ান্ত নাট্যপরিণতি ঘটে হরিহর দীর্ঘকাল পর ফিরে এসে সর্বজয়ার হাতে দুর্গার শাড়িখানা তুলে দিতেই। সর্বজয়ার হাহাকারে কোন দর্শকের পক্ষেই আর আবেগধারা রোধ করে রাখা সম্ভব হয় না।

পরিবেশসৃষ্টিতে এমন সব উপাদান এমনভাবে সাজানো, যার মধ্যে একটা চমৎকার সর্বজনীন আবেদন গড়ে উঠেছে। যে আবেদনটা ধনী-দরিদ্র-শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দিশী-বিদেশী, পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন শ্রেণীর যে কোন মনের ওপরে ছোঁয়া দেবেই। বিন্যাসের ধারাটাকে নিও-রিয়ালিজম বলে আখ্যাত করা যায়—যুদ্ধোত্তরকালে ইতালীর দি সিকা প্রমুখ মনীষীবৃন্দের প্রচেষ্টায় যে ধারার প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তাঁদের অনেক পিছনে ফেলে এমন উচুঁ ধাপে গিয়ে পৌঁছেছেন যার ধারে-কাছে কিছু আছে বলে জানা নেই। নির্মম ও স্বাভাবিক বাস্তবকে কাব্যের ললিত ছন্দে, শিল্পের সুকুমার ভঙ্গীতে এবং নাটকের আবেগময় গতিতে এমন একটি সৃষ্টি এই 'পথের পাঁচালী' যা চলচ্চিত্রের মাহাত্ম্যকে নতুন করে উপলব্ধি করিয়ে দেয়। সবদিকেই চমৎকার সামঞ্জস্য। যেটি যেমন চরিত্র, চেহারাগুলিও ঠিক সেইমতোই খাপ খাওয়ানো। সুবীর দাশগুপ্তের অপু কিম্বা উমা দাশগুপ্তার দুর্গাকে দেখে কিছুতেই কল্পনা করা যায় না যে অপু বা দুর্গার চেহারা আর কোনরকম হতে পারে, কিম্বা ওদের অভিনয়ে যে ভাবের চলাফেরা ভাবভঙ্গী অভিব্যক্ত হয়েছে তা আর কোনরকম হতে পারে। ইন্দিরা ঠাকরুণের চরিত্রে

চুণীবালা দেবী তো একটি পরম বিস্ময়। প্রায় নব্বুই বৎসরের বৃদ্ধা; লোলচর্মে চোখ মুখ নাক একাকার, কিন্তু কি হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তিই না তার মধ্যে থেকেই ফুটে বেরিয়েছে! পৃথিবীর এই বয়স্কতমা অভিনয়শিল্পীর এই কৃতিত্ব সমগ্র জগতেরই অভিনয়ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় কীর্তি। তাই ওর অমনভাবে মৃত্যুটা মনকে বড়োই আকুলি-বিকুলি করে তোলে। কানু বন্দোপাধ্যায়ের হবিহর আশা ও স্বপ্নভরা যাত্রার পালা লিখিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ চরিত্রের মতো দেখতেও হয়েছে ফুটেও উঠেছে তেমনি ভাবেই, আর কোন চেহারাই যেন ও চরিত্রে মানায় না। তেমনি ফুটেছে করুণা বন্দোপাধ্যায়ের সর্বজয়া। স্ত্রীরূপে জীবনের কোন সাধই পূরণ করতে পারলে না, কিন্তু তার জন্যে কোন নালিশ নেই। আর মাতৃরূপেও সন্তানসন্ততিকে পেটপুরে খেতেও দিতে পারে না কিন্তু তাদের বাঁচাবার জন্য কি দুর্জয় চেষ্টা। তার মধ্যেও বাঁচিয়ে চলেছে পরিবারের মর্যাদা— চুপিচুপি ভোরে উঠে থালাবাসন বন্ধক দিয়ে চাল এনেছে তবু মুখ ফুটে চরম অভাবের কথা পরম হিতৈষী প্রতিবেশীর কাছেও বলতে যায়নি। ভারতীয় নারীত্বের এই যে বৈশিষ্ট্য, বুক ফাটলেও মুখ না ফোটার, তা করুণা বন্দোপাধ্যাযের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। শেষে দুর্গার জন্য শাড়ি নিয়ে দীর্ঘদিন পর হরিহর উপস্থিত হতে মৃত দুর্গার শোকে সর্বজয়ার কান্নায় ভেঙে পড়ার মতো এমন উদ্গত-আবেগ নিদারুণ করুণ দৃশ্য কমই দেখা গিয়েছে। ছোট ছোট চবিত্রগুলিরও প্রত্যেকটি ঠিক যেমন হওয়া দরকার ছিল তেমনিই হয়েছে। মুদিখানা চালাতে চালাতে গদিতে বসেই পাঠশালাব পণ্ডিতী করার অংশে তুলসী চক্রবর্তীকে যেন নতুনভাবে দেখা গেল; বাঁকে হাঁড়ি ঝোলানো মিঠাইওয়ালার ছোট ছোট খরিদ্দাব আকর্ষণের শৃগাল-দৃষ্টি, আর তার ঝুমঝুম করে তালে তালে দুলে দুলে চলা মন থেকে মুছে যাবার নয়। যতোটুকুই চরিত্র হোক প্রত্যেকটিই এমন চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে যে, মনে হয় এমনটি না হলেই যেন বেমানান হতো।

ছবিখানির বিন্যাসে অবলম্বিত নিও-রিয়ালিজম্ ধাবায় একটা অতিরিক্ত লালিত্য যুক্ত হয়েছে সুব্রত মিত্রের আলোকচিত্রগ্রহণ কৃতিত্বে। ক্যামেরায এই তাঁর প্রথম হাত, কিন্তু এই হাতেখড়িতেই তিনি শ্রেষ্ঠ ক্যামেরার কাজের সমতুল যোগ্যতা দেখিয়েছেন। নির্বাক প্রাকৃতিক দৃশ্যে একটা নাটকীয় ভাব মুখরতা ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। কলকাতার অল্প দূরে বোড়াল গ্রামে ছবিখানি তোলা। এতে ষ্টুডিওর কৃত্রিম আলোতে তোলার অংশ খুবই সামান্য; সবই প্রায় বহির্দৃশ্যে গ্রামের প্রাকৃতিক আলোয় তোলা। তাই প্রতিটি অঙ্গে প্রাণের এমন সাড়া। বাঁশ বনে দুর্গা ও অপুর ছুটোছুটি খেলা ; কাশের ঘন বনে হাওয়ার ঢেউ ; পুকুরের পাড় দিয়ে মিঠাইওয়ালার যাওয়া ; বৃষ্টির আগে জলের ওপর ব্যাঙের খেলা ; কলমিডাঁটায় ফরিঙ ওড়া ; মৃত ইন্দির ঠাকরুণের ঘটিটা গড়িয়ে পুকুরে গিয়ে পড়া ; মড়ার ওপরে একটা মাছি এসে বসা ; বর্ষায় ভিজে কুকুরের গাঝাড়ানি মেঠোপথে শবযাত্রা ; পদ্মপাতায় বৃষ্টিব ধারা, তারপর সেই আসল বৃষ্টি প্রভৃতি ছবিখানির প্রতিটি ইঙ্গিব মধ্যে আলোকচিত্রের সৌকর্য ফুটে উঠেছে। দৃশ্যগুলির রচনাও প্রত্যেকটিই চমৎকার অভিনবত্বে ভরা। বেশ একটা মৌলিকতা অনুভব করা যায়। 'টেকনিক' বলতে দুর্গার ভেজার সময় বর্ষার দৃশ্য এবং দুর্গার মৃত্যুব আগের রাতেব দুর্যোগ অবিস্মরনীয় কৃতিত্ব হয়ে থাকবে। ক্যামেবার মতো শব্দকেও [illegible] ভূমিকায় [illegible]মৎকারভাবে [illegible]

হয়েছে। ট্রেন আসবার সময় রেলের ওপরকার শব্দ, টেলিগ্রাফ পোস্টের গুমগুমানি। বৃষ্টির ঝড়ের গর্জন, কাশবনের শনশনানি এসব শব্দ লক্ষ্য করার বিষয়। শব্দযোজনার জন্য ভূপেন ঘোষ এবং শব্দ পুনঃযোজনার জন্য সত্যেন চট্টোপাধ্যায় তাঁদের কৃতিত্বে নতুন করে মর্যাদা যোগ করতে সক্ষম হয়েছেন। শিল্পনির্দেশ ও সুরযোজনার দিকটায় সাড়া পড়িয়ে দেবার মতো কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। হরিহরের সংসারই হোক, পন্ডিতের মুদিখানাই হোক আর বিয়েবাড়িই হোক, এমন সাজানো যাতে সব ক্ষেত্রেই বাস্তবতা পরিপাটিভাবে ফুটে উঠেছে। বংশী চন্দ্রগুপ্তের শিল্পনির্দেশে কোথাও কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নেই। তেমনি কৃত্রিমতার রেশও কোথাও পাওয়া যায় না রবিশংকর সংযোজিত আবহ সুরে। সবই দিশী বাজনা, মেঠো আর গেঁয়ো সুর, কিন্তু নাটকে চমৎকার মৌতাত যোগ করে গিয়েছে আগাগোড়া। তেমনি আবার প্রয়োজনবোধে দুর্যোগের দাপটও ব্যাক্ত হয়েছে বাজনার মধ্যে দিয়ে। এদিক থেকে রবীন্দ্রশঙ্কর একটা অননুকরণীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিভিন্ন বাজনার সঙ্গে মেল সৃষ্টি করায়ও নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছেন। ছবিখানি সম্পাদনায় দুলাল দত্তের কৃতিত্ব প্রসংসনীয়।

'পথের পাঁচালী'র গুণকীর্তন লিখে শেষ করা যায় না। এতো দিকে এতা গুণের ছবি আগে দেখা আর যায়নি। প্রতিটি ক্ষণ লোককে মুগ্ধ বিস্ময়ে ছবির ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দেবার জোরসম্পন্ন এমন ছবিটি আর হয়নি। উদ্যানের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হতে যেমন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, বুঝিয়ে বলে দেবাব দরকার হয না তেমনি 'পথের পাঁচালী'-র গুণগুলোও স্বতই দর্শককে মুগ্ধ করে রাখে।

‘পথের পাঁচালী’

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

সাহিত্যের কোনো বিষয় যখনি চলচ্চিত্রের পর্দায় দেখা দেয় তখনি দর্শকের মন তার মধ্যে সেই সাহিত্যের ছবি খোঁজে। হাতের কাছে বই রয়েছে,তবু ছবির মধ্যে সেই বই-এর রসকে ফিরে পেতে ইচ্ছে যায়। যেন প্রিয়জন কাছে থাকলেও তার ফোটোগ্রাফ দেখার মতো। বিশেষ করে বাঙালী মন সাহিত্য-প্রধান, সাহিত্য আমাদের কাছে আঁকা ছবি বা নাচের চেয়ে প্রিয়। এমনকি গানের ব্যাপারেও সুরপ্রধান সঙ্গীতের চেয়ে ভাষাপ্রধান গানই আমাদের মনকে বেশি টানে। তবু সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী দল-মত শ্রেণী-নির্বিশেষে বাঙালী মনকে অভিভূত করেছে, এতে চলচ্চিত্রের জয়জয়কার।

কেন না চলচ্চিত্রের ‘পথের পাঁচালী’ বিভূতিভূষণের বই-এর পুনরাবৃত্তি নয়, এমনকি ঠিক পুনঃসৃষ্টিও নয়। প্রায় তিরিশ বছর আগেকার এই উপন্যাসে, বাঙালী জীবনেও শুধু সত্য ছিল না, স্বপ্নও ছিল। বিভূতিভূষণের বাস্তবতা সেই স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা। তাতে দারিদ্র্য আছে, কিন্তু তার কর্কশতা নেই, ক্লেশ আছে, কিন্তু তার অসুন্দরতা নেই। বিভূতিভূষণের রচনার সময়ে তাঁর রোনান্টিক বাস্তবতার মেজাজ কালধর্মী ছিল, আজকের বাস্তববোধ আরো স্পষ্ট, তার মেজাজ আলাদা। অথচ কালধর্মী বলেই, এবং মানুষের ও প্রকৃতির সম্বন্ধে নিবিড় বোধের ফলে বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’র সাহিত্যমূল্য কিছুমাত্র কমেনি। পরে তাঁর রচনা যত আরো স্বপ্নময় হয়েছে, কালধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তত তার মূল্য কমেছে। ‘পথের পাঁচালী’ অমর, কিন্তু ‘দেবযান’ ইতিমধ্যেই স্মৃতিমাত্র। বিশেষ দেশকালের সত্যতাকে যে শিল্প প্রকাশ করে তা-ই সবচেয়ে বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে। ধোঁয়াটেভাবে সারা পৃথিবীর চেহারা নিয়ে যখন কিছু উপস্থিত হয়, তখন তাকে কেউ-ই চিনতে পারে না। ‘পথের পাঁচালী’ একটি বিশেষ দেশকালের বলেই তা সর্বকালের।

এবং সর্বকালীন যে শিল্প তাকে বিশেষ বিশেষ কালে মানুষ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে। আজকের পরিচালক সত্যজিৎ রায় ‘পথের পাঁচালী’কে আজকের মন নিয়েই দেখেছেন। শুধু গল্পের নানা ঘটনার বর্জনে বা পরিবর্তনে নয়, অন্তর্নিহিত ভাবেও ‘পথের পাঁচালী’ বই আর ছবিতে অনেক পার্থক্য। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সবকিছুই সুন্দর নয়, কেবল যা সুন্দর তা-ই সুন্দর, যা অসুন্দর তা অসুন্দর। সত্যজিৎ রায়ের হরিহর সোনার বাঙলার গরিব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নয়। সে যখন খেতে বসে কালো দাঁত থেকে মাছের কাঁটা বার করে, অথবা বিদেশ থেকে ফিরে কোঁচা দিয়ে বগলের ঘাম মোছে তখন সেটা দৃশ্য হিসাবে মোটেই মনোরম নয়, যেমন নয় প্রায়ই সর্বজয়ার মুখ বা ইন্দির ঠাকরুনের লোলচর্ম পিঠ, বা শীর্ণ হাতে বাটিতে ভাত চটকানো। ইন্দির মোটেই ফেটোগ্রাফের বই-এর বুড়ি নয়, অপুও দেবশিশু নয়। বিভূতিভূষণের অপু ‘অপরাজিত’ পেরিয়ে ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’ হয়ে ‘দেবযান’-এ গিয়ে অবাস্তবতার চরমে পৌঁছয়, ‘পথের পাঁচালী’তেই তার দেবশিশুত্বের

আরম্ভ। সত্যজিৎ রায়ের অপু সাদাসিধে গ্রাম্য ছেলে, হয়তো একটু লাজুক, কল্পনাপ্রবণ, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

এজন্যই চলচ্চিত্র মহলে কেউ কেউ বলেছেন বুড়িকে আরেকটু সুন্দর করলে ভালো হত, আর সাহিত্য মহলের কেউ বা বলেছেন অপুর মধ্যে বিভূতিভূবাবুর philosophy of wonder নেই। তবু দর্শকসাধারণের মনকে 'পথের পাঁচালী' যেমন নাড়া দিয়েছে তেমন আর কোনো ছবি কখনো দেয়নি। কেননা সুন্দর-অসুন্দরের এই টানাপোড়েনের ফলেই জীবনের বাস্তব রূপ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সুন্দরকে আরো সুন্দর লাগে, জন্মের আনন্দ মনে আরো দোলা দেয়, মৃত্যুর বেদনা মর্মান্তিক হয়ে বাজে। পোড়ো ভিটে আর ভাঙা দরজার মাঝখানে ইন্দির ঠাকরুনের একটি গালভাঙা হাসি সমস্ত মানুষকে মুহূর্তে আপনার করে দেয়। শ্রীহীন বিপন্ন সংসারের পাশেই পুকুরে পদ্মপাতার ওপর হাওয়ার হিল্লোল জীবনকে আরো কত সত্য বলে প্রতিভাত করে। সর্বজয়ার সংসার যখন ভেঙে পড়ছে তখন দুর্গার বৃষ্টি ভেজার অকারণ আনন্দ, আবার সেই আনন্দের মধ্যে থেকেই মৃত্যুর হাতছানি। রাত্রে হরিহরের পাশে বসে অপুর পড়াশুনা ও সর্বজয়ার কাছে দুর্গার চুলবাঁধার দৃশ্যে কী কর্কশ শাদাকালো আলোকপাত, একটানা ঝিল্লির ডাক আর দূরে ট্রেনের আওয়াজ সঙ্গে মিশে তাতে সমস্ত দৃশ্যকে যেন ভয়াবহ করে তোলে। তারই মধ্যে যখন অপু দুর্গাকে প্রশ্ন করে, 'দিদি তুই রেলগাড়ি দেখেছিস?' আর সর্বজয়া দুর্গার চুলে এক টান দিয়ে বলে, 'ফের মিথ্যে কথা!' তখন সেই কর্কশ আলোছায়াই যেন তাকে আরো জীবন্ত করে তোলে। এই হচ্ছে আজকের মন্তব্যহীন, নিস্পৃহ-প্রায় গভীর বাস্তবতা যা কেবল নীরবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে যায়। আবেগ বা মন্তব্যকে তুলে রাখে দর্শকের জন্য। এই জন্যই 'পথের পাঁচালী' ছবির শেষে কোনো সমাধান নেই বলে আক্ষেপ শোনা যায়নি। শিল্পে যখন মানুষের অস্তিত্বকে পুরোপুরো প্রকাশ করা যায়, তখন সমাধান চর্চার প্রয়োজনও চলে যায়। 'একটি লোক আছে'-এ কথাটুকু শিল্পে পুরোপুরি প্রকাশ করা অতি কঠিন, কিন্তু যদি প্রকাশ করা যায় তবে দর্শকের মনে জীবনের অস্তিত্ববোধ এত নিবিড়ভাবে জাগে যে সমাধানের দায়িত্ব তার আপনার হয়ে যায়। যেখানে দর্শক বা পাঠক চরিত্রের সঙ্গে এই একাত্মতা বোধ করে না, কেবল শিল্পীর অনুরোধে তার অস্তিত্বকে মেনে নেয়, সেখানেই সমাধান-সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, কারণ সেখানে সমাধানের দায়িত্ব শিল্পীরই থেকে যায়। সেই শিল্পই সার্থক যাতে এই দায়িত্বকে দর্শক বা পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারে। তাই 'একটি লোক আছে' এই দিয়ে গল্পের আরম্ভ শুধু নয়, আগাগোড়া গল্পের মধ্য দিয়ে এই কথাটা বলার জন্যই গল্পকারের সমস্ত আকুতি। ঘটনা আছে এটা শিল্পের প্রধান বক্তব্য নয়, মানুষ আছে, এটাই প্রধান বক্তব্য।

কার্যক্ষেত্রে এই বাস্তবতাকে পরিণত করে তোলার কয়েকটি বিশিষ্ট দিক আছে। একটি হচ্ছে প্রধান ঘটনার চারিদিকে অন্যান্য ঘটনাকে শুধু চলিষ্ণু রাখা নয়, কখনো কখনো প্রধান ঘটনা থেকে বিযুক্ত বা বিরোধীভাবে রাখা। যেমন সর্বজয়াও ইন্দিরের যখন কলহ বেধেছে, তখন অপু ও দুর্গা কাশবনের কাছে আখ খেতে ব্যস্ত ; মৃত্যুমুখে ইন্দিরকে যখন দুর্গা অবিষ্কার করে তখন অপু বাছুরকে নিয়ে টানাটানি করে, বছুরের গলায় ঘণ্টা বাজে হরিহর যখন পরবাসে চলেছে তখন অপু ও দুর্গা দিল্লি দেখবার জন্য উন্মত্ত; গভীর

দুর্যোগের রাতে যখন দুর্গার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন অপু ঘুমে অচেতন; হরিহর ফিরে আসার পর যখন সর্বজয়ার রুদ্ধ শোক ফেটে পড়ে তখন অপু রাস্তার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে। চিত্রনাট্যের এই কৌশল একটি সময়, একটি অবস্থা বা ঘটনার গোটা চেহারাটা পরিস্ফুট করে, তার প্রধান ভাবকে আরো ঘনীভূত করে। চিত্রনাট্যের নৈপুণ্য আরো দেখা যায় বড় অপুর প্রথম পরিচয়ে, দুর্গার মৃত্যুর পর থেকে হরিহরের ফেরা পর্যন্ত সর্বজয়ার কান্নাকে ধরে রাখার মধ্যে। বিপরীত ভাবের সাহায্যে দর্শকের মনোযোগকে ধরে রাখার কৌশলও কম বিচিত্র নয়। যেমন হঠাৎ নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের মাঝখানে It's A Long way to Tipperary বেজে ওঠা দিয়ে রানুর বিয়ের পর্যায়ের আরম্ভ। বাস্তবিক এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে যাওয়ার কায়দা এই ছবির চিত্রনাট্য ও সম্পাদনার একটি অভিনব দিক। এক পর্যায় থেকে কেটে সোজা অন্য পর্যাযে চলে যাওযা এবং সেই সঙ্গে শান্ত থেকে চঞ্চল, চঞ্চল থেকে রৌদ্র রসের, তাছাড়া বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুতলয়ের খেলা দর্শকের মনোযোগকে মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দেয় না। একমাত্র বড় অপুর আত্মপ্রকাশের আগে অল্প কিছুটা অংশে এই পরিবর্তনশীলতার অভাব দেখা যায়। সম্পাদনার ব্যাপারে দূর, মধ্য ও নিকট দৃষ্টির সমাজের সামনে সমস্ত আইনকে সত্যজিৎ ও দুলাল মিলে বানচাল করেছেন।

চিত্রনাট্য ও সম্পাদনার বাস্তব ধর্মের সঙ্গে ক্যামেরাও যোগ দিয়েছে। সুব্রত মিত্রের ক্যামেরা অতি সন্ধানী, কিন্তু তারও 'সুন্দর করে তোলার' কোনো চেষ্টা নেই। যা সত্য, তাই সুন্দর। দুপুরের পোড়া রোদ, যাতে শুধু শাদা-কালোর তীব্রতা, টোনের সহজলভ্য সৌন্দর্য নেই বলে যাকে সাধারণত নিকৃষ্ট ক্যামেরাশিল্প বলে মনে করা হত। আবার একটি কোণ-এর আলো নিয়ে কড়া শাদাকালোর বুনোটে তৈরি রাত্রি। যেখানে টোনের প্রয়োজন সেখানে তাও পরিপূর্ণ, যেমন জলের মধ্যে কলমিলতার উপর ফড়িঙের দৃশ্যে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, সকাল, বিকেল—সবেরই সত্যকার রূপ। সবচেয়ে বড় কথা সর্বত্র ক্যামেরার ঠিক অনিবার্য দৃষ্টিকোণের নির্বাচন। ঠিক যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দৃশ্যের উদ্দেশ্য সবচেয়ে ভালো প্রকাশ পাবে তাকে সহস্র সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া যে কী কঠিন তা সবিশেষ চর্চা ছাড়া ধারণাও করা যায় না। 'পথের পাঁচালী'তে দৃষ্টিকোণের এই যথার্থতা বিস্ময়জনক, নতুন ক্যামেরা-শিল্পীর পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য। দুর্গার জ্বরের দৃশ্যে শুধু দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনে জ্বর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারার পরিবর্তন হতে থাকে। খুব নিচু দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা তার অল্প ঘামে-ভেজা মুখ, কান, নাক যেন স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বড়, জ্বরের উত্তাপ যেন ক্যামেরায় দেখা যায়। তবুও বলতেই হবে যে এখানে ক্যামেরার বিশেষ নৈপুণ্য থাকলেও সমগ্রভাবে দুর্যোগের রাত্রির পর্যায়টির মধ্যে সমস্ত ছবির ভিতরে প্রথম একটু স্টুডিও-বদ্ধ কৃত্রিমতার ভাব এসে গিয়েছে। উদ্বেগসৃষ্টির রীতি এখানে বাকি ছবির তুলনায় যেন একটু সেকেলে, স্টাইলের দিকে থেকে সম্পূর্ণভাবে মিশ খায় না। একটু যেন ক্লাইম্যাক্স-সচেতন হতে হয়, অন্য সমস্ত দৃশ্যে এক ফোঁটা জলের মতো যে স্বচ্ছতা, এখানে নেই বলে মনে হয়।

'পথের পাঁচালী'তে সঙ্গীতের ব্যবহার অতুলনীয়। বিশেষ করে সর্বজয়ার কান্নার আওয়াজের বদলে হঠাৎ তার সানাই-এর তীব্র আর্তনাদ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। তাছাড়াও স্মরণীয় বড় অপুর আত্মপ্রকাশের সময় একটি

চোখের ওপর সেতারের হঠাৎ জোরদার স্ট্রোক এবং কাঁথা ফেলে দিয়ে উঠে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে মুখ ধোওয়া ইত্যাদি অনেকগুলি দৃশ্যকে সুরে গেঁথে দ্রুতগতিতে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। ভ্রমর গুঞ্জনের মতো দ্বিপ্রাহরিক সঙ্গীতঃ মেঠো বাঁশির সুর; ইন্দিরের ভাঙা গলায় গাওয়া 'হরি দিন তো গেল' গানের সুর তাব মৃত্যুর পর যন্ত্রসঙ্গীতে বারবার ফিরে আসা; হঠাৎ It's A long way to Tipperary বেজে ওঠা এমন কি পিয়ানোর তার দিয়ে টেলিগ্রাফ-সঙ্গীত বাজানোও কম চমকপ্রদ নয়। কেবল রবিশঙ্করের খরজের গভীর কাজ একটু বেশি দরবারী লাগে। আর সর্বজয়ার দুর্গাকে মারার দৃশ্যে ঢাক ও ঢোলের আওয়াজ একটু বেশি সচেতন প্রযোগ বলে মনে হয়। এই সূত্রে 'দি রিভার'— এ আকাশে উরন্ত ঘুড়ির সঙ্গে দক্ষিণী তানের কথা মনে পড়ে। সে যেন খামখেয়ালি শিল্পীর চমকপ্রদ রঙে ঝলমল একটি সতেজ টান; গল্পের দিকে সেখানে পরিচালকের কোনো হুঁশ নেই। কাজে যেতে গিয়ে পথছেড়ে প্রজাপতি ধরাব মতো। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'তে জলের ওপর ফড়িঙের নাচের দৃশ্যে সেতার কাহিনীর মর্মস্থলে বাজে, তাতে হরিহরের চিঠি এসে পৌঁছনোর আনন্দ, শ্বাসরোধী বিপন্নতা থেকে মুক্তি, মানুষের চারিদিকে প্রকৃতির লীলার প্রকাশ। উদযশঙ্করের 'কল্পনাতে' ও বেনোযা'ব 'দি রিভার'-এ চলচ্চিত্রে ভারতীয় সঙ্গীতেব ব্যবহারের কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। 'পথেব পাঁচালী'তে তার পরিপূর্ণ প্রকাশে আমাদের চলচ্চিত্র-সঙ্গীতের ধারা সম্পূর্ণ বদলে যাবে, অন্তত যাওয়া উচিত।

ভারতীয় ছবির ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম চলচ্চিত্রের বহু আলোচিত detail-এর বিস্তৃত এবং সার্থক ব্যবহার হল। দুর্গার মৃত্যুর পরদিন সকালে জলে মরা ব্যাঙ, বৃষ্টি আসার পরে দাওয়ায় উঠে কুকুরের গা ঝাড়া দেওয়া ইত্যাদি খুঁটনাটি ব্যঞ্জনা বহু দর্শককে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু শুধু এতেই নয়, আরো নানা দিক দিয়ে পরিচালনার অভিনবত্ব চোখে পড়ে। সে হচ্ছে অভিনয় ও পরিচালনার যোগাযোগ। দুর্গার হাতে পরিচালক যতখানি ভার ছেড়ে দিয়েছেন ততখানি অপুর ওপব নয়; অর্থাৎ দুর্গাকে নিজে অভিনয় করতে হয়েছে বেশি, অপুর বেলা চিত্রনাট্য ও সম্পাদনা এগিয়ে এসে তাকে হাত ধরে চালিয়ে নিয়ে গেছে। তেমনি ইন্দির ঠাকরুণেব ওপব যতখানি ভার দেওয়া হয়েছে সর্বজয়ার ওপর ততখানি নয়; হরিহর ফেববাব পরে কান্নার দৃশ্যে সর্বজয়া যতক্ষণ ক্যামেরাব দিকে ফিরে থাকে ততক্ষণ তাব অভিনয অসামান্য। কিন্তু বেশির ভাগটাই ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে পিঠের কাঁপুনি। বোঝা যায় যে এখানে পরিচালক অভিনয়কে পুরোপুরি অভিনেত্রীর হাতে ছাড়তে রাজি নন। এই দৃশ্যে হরিহরের অভিনয়ও মনে হয় একেবারে পরিচালকের হাতে তৈবি—ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ানো, হাত দুটিকে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে দেওয়া, তারপর আবার ধীরে ধীরে নিচু হতে হতে ধপ করে বসে পড়া, তাবপর মুখ হাঁ করে ক্যামেরার দিকে চেয়ে থাকা—সমস্ত দৃশ্যটাই নিদারুণভাবে দর্শকের মনকে আঘাত করে, কিন্তু ভালো করে দেখলে বোঝা যায যে কতগুলি বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গির পরম্পরার ওপর এই দৃশ্য তৈরি, এবং সেই পবম্পরা পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের মধ্য থেকে এসেছে। অভিনয় সম্বন্ধে চলচ্চিত্রেব ইতিহাসে দুটি মনোভাব দেখা যায়— এক, অভিনেতা কিছু নয়, পরিচালকের হাতের পুতুল মাত্র; দুই, অভিনেতাকে অবলম্বন করেই পবিচালনা। সত্যজিৎ বায় এই দুই-এর মধ্যবর্তী পথ ধবেছেন এবং 'পথের পাঁচালীতে' তাঁর পন্থা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। অবশ্য বলা যেতে পারে যে কোথাও কোথাও,

যেমন দুর্গাকে বাড়ি থেকে বারকরে দিয়ে সর্বজয়ার দরজার গোড়ায় বসে পড়া বা দুর্গার মৃত্যুর পর সর্বজয়ার মাথা কোলে টেনে নিয়ে নীলমণির বৌ-এর নীরবে বসে থাকা হয়তো একটু পশ্চিমী ঢঙের। কিন্তু এতে ছবির সাফল্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরঞ্চ দুর্গাকে তাড়িয়ে দেওয়ার দৃশ্য ও তার পরের সমস্ত পর্যায়টির মধ্যে অনিবার্যতা আছে।

গ্রাম-জীবন নিয়ে দেশবিদেশের যত ছবি দেখেছি তার মধ্যে 'পথের পাঁচালী'র তুলনা দেওয়া শক্ত। অস্পষ্টভাবে দন্স্কয়-এর 'মাকসিম গর্কির শৈশব'-এর কথা মনে আসে। আর চরিত্রের প্রতি মনোভাব ডি সিকার কথা মনে করিয়ে দেয়। সে মিলটুকু আধুনিক বাস্তব বোধের ক্ষেত্রে অন্তরের মিল। 'মিরাকল্ অফ মিলান'-এ বিস্তীর্ণ বরফের ক্ষেত্রের ওপর রোদের মধ্যে দাঁড়াবার জন্য লোকের ছুটোছুটি, ভোরের কুয়াশার মধ্য দিয়ে ট্রেনের নিঃশব্দ গতি — এসমস্তের মধ্যে জীবনের যে নীরব পর্যবেক্ষণ আছে তার সঙ্গে 'পথের পাঁচালী'র জীবনবোধের কিছু মিল হয়তো আছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বাঙালী হয়ে যাওয়ার ফলে সে মিল ধরা পড়ে না, মন মানতেও চায়না।

কারণ, 'পথের পাঁচালী' সত্যজিৎ রাযের প্রথম ছবি হলেও তাতে কি রুশ, কি ইতালীয়, ফরাসি, জাপানি বা ইংরেজি কোনো বিশিষ্ট প্রভাবের ছাপ নেই অথচ বিস্তৃত চলচ্চিত্র-অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। বলা বাহুল্য ভারতীয় চলচ্চিত্রের কাছেই সত্যজিতের ঋণ সবচেয়ে কম। আমাদের চলচ্চিত্র হলিউডের ছাঁচে তৈরি, অথচ কূপমণ্ডুক। ১৯৫২ সালের চলচ্চিত্র-উৎসবের আগে পৃথিবীর চলচ্চিত্রে সঙ্গে কোনো ব্যাপক সংযোগ এদেশের চলচ্চিত্র-শিল্পের ভাগ্যে ঘটেনি, কারণ কর্মকর্তাদের কোনো দিন সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। অনেক প্রশ্ন করেছেন সত্যজিৎ রায় কী করে বাঙলার গ্রামজীবনের এমন যথাযথ রূপ ফোটালেন? তার উত্তর এই যে, পশ্চিমী শিল্প ব্যাপারে সত্যজিতের দখল অসাধারণ, বিশেষত পৃথিবীব্যাপী সার্থক চলচ্চিত্রের ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে।

মূল বইয়ের উদার, ভবঘুরে যাত্রীর সুর বাজে না

ঋত্বিককুমার ঘটক

'পথের পাঁচালী' ছবিটা যখন সত্যজিৎবাবু করেছিলেন তখন আমিও আমার ছবিটা (নাগরিক) শেষ করে laboratory-তে কাজ করছিলাম। আমার এবং ওঁর দুজনের কাজই একই lab-এ হচ্ছিল। কাজেকাজেই টুকরো টুকরো খবর উড়োউড়োভাবে কানে আসত। যেহেতু তাঁদের গোষ্ঠীও গতানুগতিকতার বাইরে থেকে কাজ করার চেষ্টা করছিলেন তাই কৌতূহল একটু ছিল। তারপরে আমার ছবিটা শেষ censor-এর পরে বিপর্যয়। চূড়ান্ত হতাশার মধ্যে বোম্বের চাকরি পাওয়া এবং আমার চলে যাওয়া। তবু, ভদ্রলোক তারপরেও বেশ-কিছুদিন কত কষ্ট লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে ছবিটি শেষ করার চেষ্টা করেছিলেন সে-খবর পেতাম। কাজেই যখন শুনলাম ছবিটা উতরিয়েছে এবং প্রায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে, তখন যুগপৎ প্রচন্ড আনন্দিত এবং খুবই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম।

আনন্দিত কারণ, তাহলে বোঝা গেল যে, বিভিন্ন কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়ে এবং সঠিক যোগাযোগেব পথ বেয়ে যদি শেষ অবধি মানুষের সামনে গভীর চেষ্টাকে তুলে ধরা যায় তাহলে এই অবস্থার মধ্যে বদল আনা যায়।

আর, সন্দিগ্ধ এই জন্যে যে ভদ্রলোককে, তখন আলাপ না থাকলেও, যেটুকু শুনে -দেখে বুঝেছিলাম, তাতে মনে হয়নি যে, বিভূতিভূষণের অপরূপ গ্রামীণ রূপকথাকে উনি সত্যিকারের দরদ দিয়ে তুলে ধরতে পারবেন। কারণ ওঁর জগৎ, আমি যতটুকু জানতাম, অপুর জগৎ থেকে একেবারেই ভিন্ন।

তারপবেই ঘটনাচক্রে কলকাতায় এলাম এবং ছবিটি দেখলাম। একবার নয়, পরপর সাতবার। অবাক হয়ে গেলাম, আমার সন্দেহ একেবারে অলীক প্রমাণিত হল। এখানে-ওখানে নানারকম আপত্তি থাকলেও সব মিলিয়ে অপু-দুর্গা একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠল, আমার সামনে ফুটে দাঁড়াল। মনে আছে তখন বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বারবার একটা কথাই বলেছিলাম যে 'পথের পাঁচালী'তে এমন কিছু নেই যা আমরা হাজারবার ভাবি নি এবং স্বপ্ন দেখিনি। 'পথের পাঁচালী' ছবি চিন্তার দিক থেকে বা রচনা-শৈলীর দিক থেকে এমন কিছুই আনেনি আমার কাছে ; যা আমি হাজারবার কল্পনা করেছি, স্বপ্ন দেখেছি, উনি সেটা গুছিয়ে-গাছিয়ে খেটে তৈরী করে ফেলেছেন।

মারাত্মক এবং প্রচণ্ড বৈপ্লবিক তফাৎ। যে তফাৎ ওঁকে আমাদের নবযুগের স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দিল, যে আসন থেকে ওঁকে সরাতে কোনদিনই কেউ পারবে না।

দু একটা টুকরো টুকরো কথা, ভালো এবং খারাপ, 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে এখানে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন ইন্দিরঠাকরুণ অধ্যায়টি। একমাত্র ইন্দিরঠাকরুণের মৃত অবস্থায় বসে থাকার দৃশ্যটি বাদ দিয়ে বলা যায়, ভারতীয় চলচ্চিত্রে, খণ্ডভাবে দেখতে

গেলে, এর থেকে ভালো ছবি করতে আজ পর্যন্ত কেউ পারে নি। তিনিও না, অন্যরা তো না-ই। ইন্দিরঠাকরুণ সম্পূর্ণ গ্রামবাংলার আত্মার প্রতিমা। এখনো ভাবলে এক-একটি দৃশ্য আমাকে তাড়া করে ফেরে। যেমন, যে-দৃশ্যে বুড়ি ঝরা শুকনো নারকোল ডাল টানতে টানতে উঠোনে ঢুকে সর্বজয়ার কর্কশ কণ্ঠে ঝগড়া শুনে সবাইকে জিজ্ঞেস করেছে যে, কী হয়েছে। কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার মনে করছে না। 'দুত্তেরী' জাতীয় একটি ভঙ্গি করে বুড়ি আবার বেরিয়ে গেলো। এ দৃশ্যটি স্বপ্নের মতো বারেবারে চেতনায় এসে ঘা দেয়; এ-দৃশ্যটি জীবনের একটি গভীর সত্যকে কেমন করে জানিনা, উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে, পৌঁছে দিয়েছে একটা উপলব্ধিতে। এমন আরো দৃশ্যের কথা মনে পড়ে।

ভালো লাগে না, বুড়ির মারা যাওয়ার দৃশ্য; ববং বলা চলে, মৃতা বুড়িকে অপু-দুর্গার আবিষ্কার করার দৃশ্য। এখানে একটি বিখ্যাত বিদেশী ছবির ছায়া এসে পড়েছে বলে মনে হয়।

কিন্তু আবার মনে পড়ে, কাশবনে অপু-দুর্গার ট্রেন দেখার দৃশ্য। অনবদ্য। মনে পড়ে সন্দেশওয়ালার বাঁক কাঁধে যাবার দৃশ্য। অপূর্ব। মনে পড়ে পাঠশালায় মুদি-গুরুমশায়ের বেত তাড়নার দৃশ্য। স্নিগ্ধ মধুর পরমসত্য হাস্যরস।

তেমনি ভালো লাগলো দুর্গার মৃত্যুদৃশ্য বা কানু বাঁড়ুজ্জের মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে অতি-অভিনয় এবং করুণা ব্যানার্জীব সেই দৃশ্যে কান্নার বদলে তার সানাইয়ের ব্যবহার।

তেমনি ভালো লাগে বাঁশিতে পাগল-করা, পাকড়ে ধরা, মূলতানটির (theme) ব্যবহার, যেটা মোক্ষম সব জায়গায় ঠিক মনস্তত্ত্বগত উচ্চাবচগ্রামে কানে এসে বাজে। এই মূলতানটি একেবারে ছবিটির প্রাণস্বরূপ।

এই সুবাদে বলে রাখি, 'অপরাজিত'-তে এই সুরটি একবারমাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে সর্বজয়া অপুকে নিয়ে ট্রেনে করে কাশী থেকে বাংলাদেশ ফিবে আসছে, সেখানে জানালা দিয়ে যেই দেখা যায় যে ট্রেনটি বাংলাদেশে ঢুকছে, তখন একবারমাত্র এটি বেজে ওঠে। ফল হয় ঠিক আনবিক বোমা বিস্ফোরণের মতো। হঠাৎ বাংলাদেশ তার সমস্ত শ্যামলিমা নিয়ে আছড়ে পড়ে আমাদের বুকের ওপরে। এটা যে ঘটে তার কারণ হচ্ছে ঐ 'পথেব পাঁচালী'তে এই সুরটি সঠিক জায়গায় ব্যবহৃত হয়ে নিজেকে নিশ্চিন্দিপুর আর বাংলাদেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে নিয়েছে। কাজেই দুচোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র শেষ আমার ভালো লাগেনি। বড় অবুঝভাবে ব্যাপারটাকে শেষ করা হয়েছে বলে মনে হয। মূল বইয়ের উদাব, ভবঘুরে-যাত্রীর সুরটা বাজে না। তার কারণ, আঙ্গিকগতভাবে, আমার ধারণায়, ব্যাপারটাকে ভদ্রলোক অন্যরকম করে চিন্তা করলেও পারতেন।

যাইহোক, এটা সত্যজিৎ বাবুর শিল্পকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা যখন নয়, বরং ছবিটি আমাদের বা আমাকে কীভাবে অনুবুদ্ধ করেছিল তারই একটা ইঙ্গিতমাত্র, কাজেই এ নিয়ে আর বাড়ানোর অবকাশ নেই।

পথের পাঁচালী

নীলকণ্ঠ (দীপ্তেন্দ্রকুমার স্যান্যাল)

১

অসামান্য গ্রন্থের অভাবনীয় চিত্ররূপ বলে বিজ্ঞাপিত এবং বাংলাদেশের নির্বোধ চিত্রসমালোচক-সমর্থিত, 'পথের পাঁচালী', প্রথমেই বলে রাখা দরকার অসামান্য গ্রন্থ নয় তার চিত্ররূপ অভাবিত কি না সে কথায় পরে আসছি। বিভূতিভূষণ অসামান্য লেখক, 'পথের পাঁচালী' অসামান্য সৌভাগ্যের অধিকারী কিন্তু রচনা কৃতিত্বে সাধারণ না হোক অসাধারণ যে নয়ই, বিভূতিভূষণের পরবর্তী রচনাগুলি একের পর এক তার প্রমাণ পরিচয়ে প্রদীপ্ত।

বাংলা সাহিত্যে, সেই সঙ্গে বাংলাদেশে, 'যুগ' বলে যা চলেছে তার বেশীর ভাগই আসলে হুজুগ। দুধের বদলে পিটুলিগোলা; সোনার অভাবে কেমিক্যাল গোল্ড; সাহিত্যের ছদ্মবেশে রম্যরচনা। তার কারণই হচ্ছে, উঁচু সাহিত্যের জন্ম দেয় উচ্চতর সমালোচনা। কীর্তিমান সাহিত্য বিস্তার করে 'প্রভাব'। বীর্যবান সমালোচনা আবিষ্কার করে 'অভাব'। প্রভাবান্বিত লেখকরা করে অনুকৃতি; পাঠকরা হয় প্রবঞ্চিত। সমালোচনা অভিযোগ জানায় 'অভাব'-এর; 'কী নেই',—সেই অভাবের দিকে তার অঙ্গুলিসঙ্কেত। অভাব থেকে আসে অনুপ্রেরণা। জন্ম নেয় প্রভাবমুক্ত নবতব সাহিত্য! খুলে যায় জীবনের এবং সৃষ্টির নতুন দরজা। তাই সৎ সমালোচনা না থাকলে অসৎ সাহিত্য হতে বাধ্য। সাহিত্য creation; সমালোচনা 'Recreation'। সাহিত্য—সৃষ্টি; সমালোচনা—'অনাসৃষ্টি'। সাহিত্য শুধু সৃজন করেনা, রক্ষাও করে; সমালোচনার হাত থেকে কারুর রক্ষা নেই, সৃষ্টিরও না, স্রষ্টারও না। সমালোচনা সর্বদাই মাবমূর্তি নয়, ঠিক। কিন্তু সংহার মূর্তিতেই সে মূর্তিমান, তাতেই তার পূর্তি, স্বতঃস্ফূর্ত সংহারেই যে স্ফূর্তিমান। তাই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাব সমালোচনা' সৃষ্টির যথার্থ উপসংহার।

এই সমালোচনার অভাবেই যোগ্যতর বই থাকে অনুল্লেখযোগ্য অবস্থায়। সাধারণ ভালো রচনা পায় অসাধারণ সৃষ্টির সম্মান। নতুনত্বের চমকে চোখ ধাঁধায়। বিচার-বুদ্ধি বেসামাল হয়। পাঠকের সঙ্গে মুক্তকচ্ছ হয়ে দু'হাত তুলে নাচতে থাকে সমালোচকও: শুধু 'হরিবোল' নয়, গোলে হরিবোল দিয়ে। এ হল একরকম; রকমফের আছে আবার চিত্রসমালোচনায়। একদল যেমন বলছে 'এমনটি আর হয় নাই', 'অপূর্ব', 'অপরূপ'; তখন আরেক দল বলছে এক নিঃশ্বাসে 'কিছু হয় নি।' রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত সমালোচক দলের (অবশ্য 'ছায়াচিত্র' প্রসঙ্গে নয়) তুলনা করেছেন হাঁসেব জলেব মধ্যে মাথা ডুবিয়ে তারপর মাথা তুলে ঝাঁকি দেবার সঙ্গে। এক কথায় সব বরবাদ হযে গেল আর কি! এই দুই দলের 'অজ্ঞ' এবং 'বিশেষ অজ্ঞ' সমালোচকদের আলোচনায় প্রায়ই 'আলোর ভাগ অল্প; চোনার ভাগই বেশী!' সমালোচকের অভাব আমাদের চিত্রকলার ক্ষেত্র থেকে ছায়াচিত্রকলা পর্যন্ত সর্বত্র সমানভাবে মর্মপীড়াদায়ক। 'কলা'র মতই 'কলা'-সমালোচনাও

কলাব ওপব আবেক কাঁদি। চৌষট্টী কলাব মধ্যেই ধর্তব্য। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদেব দেশে সত্যিকাবেব সৃষ্টিব অভাবে 'কলা' যেমন কলাকে কলা দেখানোয পর্যবসিত তেমনি 'কলা'-সমালোচনাও 'কলা'ব নামে ছলা-কলা প্রদর্শনেব সুবর্ণ সুযোগ মাত্র। বর্তমান কলা (Modern Art) বলে যা চলছে তা মর্তমান কলা ছাড়া কিছু নয়, বর্তমান কলা-সমালোচক হচ্ছে আসলে মূর্তিমান ছলা-কলা। লেখবাব কলম যেমন ধরতে জানা চাই, তেমনি সেই লেখাব উপবেও কলম চালাতে চাই অধিকাব অর্জন। কলমেব ওপব নির্ভব কবে হযতো হাতেব লেখা, কিন্তু লেখা নির্ভব কবে লেখাব হাতেব ওপব। তেমনি খববেব কাগজেব column-এ যে আলোচনা হয তাকে বলে পাতা-ভবানো-সমালোচনা। কিন্তু মাথা ভবানো সমালোচনাব জন্যে শুধু 'দৃষ্টি' থাকলেই হবে না, তাব জন্যে চাই দৃষ্টিকোণ। 'Vision' নয 'Angle of Vision'। আদালতে 'বায' দিতে হলে শুধু হাকিম হলেই চলে যায সাহিত্যে বায দিতে হলে, হাকিম হলেই চলে না। তাকে হাকিম এবং হকিম দুই-ই হতে হয। 'কী বোগ' বলবাব সঙ্গে সঙ্গে আবোগ্যেব উপায কী তাও বলতে হয সমালোচককে। এই এক কাবণেই লেখক যখন সাহিত্য সৃষ্টি কবেন, সমালোচক তখন আবও বড় কাজ কবেন, তিনি সৃষ্টি কবেন সাহিত্যিক।

ওদেব দেশেব দিকে তাকালে দেখতে পাই যে ওবা dramatic critic-এব জন্ম দিযেছে বটে কিন্তু film critic-এব নয। চার্লি চ্যাপলিন ছাড়া আব কারুব ছবিকে ওদেব দেশেব চিন্তানাযকবা দর্শনযোগ্য বলে মনে কবেননি। 'মঞ্চ' ওদেব জাতীয জীবনেব সঙ্গে বিজড়িত, কিন্তু পর্দা নয। তাই নাট্যকাব মৌলিক সৃষ্টিব জন্যে পেযেছে দেশেব অভিনন্দন দেশেব জযমাল্য। কিন্তু নাট্যকাবই, চিত্রনাট্যকাব নয।

আমাদেব ছবিই এখনও জলছবি ছাড়া কিছু নয কাজেই আমাদেব ছাযাছবিব সমালোচক তাদেবই মধ্যে থেকে এসেছে যাবা চিন্তা কবতে হলে কবে অনর্থ চিন্তা, বচনা কবতে গিয়ে দেখে তাবা বানানও জানে না, বানাতেও জানে না। বাংলা ছবি যাবা তৈবী কবে তাবা শিব গড়তে তৈবী কবে বাঁদব, বাংলা ছবিব সমালোচনা বাঁদবেব গলায ঝুটো মুক্তোব মালা।

এই কিছুকাল আগে পর্যন্তও 'আমি' কথাটাব বানান 'আমী' লেখা ছিল যাঁব বিদ্যাব শেষ দৌড়, হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান-বঞ্চিত সেই ব্যক্তিই বিশ হাজাবী দৈনিকেব পাতায চিত্রসমালোচনা কবেন অকুতোভযে। (আজ্ঞে হ্যাঁ, এ একমাত্র আমাদেব এ-দেশেই সম্ভব।) সমালোচনাব কিণ্ডাবগার্টেন স্টেজ অর্থাৎ K G Stage-এও এসে পৌঁছযনি যাবা, অর্থাৎ যাদেব সমালোচনা Not Kinder Garten (মানে ছোট কবে বল্লে যাকে N K G বলতে হয) Stage even , তাবাই আমাদেব ছাযচিত্র সম্পর্কে শেষ কথা বলবাব অশেষ স্পর্ধায় ক্ষিপ্তপ্রায।

২

এখন যে-কথা দিয়ে শুরু কবেছি এই সমালোচনা, সেই আলোচনায ফিবে আসি ফেব। আমাব সে বক্তব্য হলঃ পথেব পাঁচালীব স্রষ্টা বিভূতিভূষণ অসামান্য লেখক কিন্তু পথেব পাঁচালী অসামান্য সৃষ্টি নয়। 'পথেব পাঁচালী' প্রকাশেব সঙ্গে সঙ্গে হবণ কবেছে পাঠকেব হৃদয। 'পথেব পাঁচালী'ব স্রষ্টা আত্মপ্রকাশেব সঙ্গে সঙ্গে কবেছেন নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা অর্জন।

দুই-ই সম্ভব হয়েছে রচনা-নৈপুণ্যে নয় ততখানি, যতখানি হয়েছে গ্রন্থের অভিনবত্বে। প্রকৃতিকেও কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর মত করা যায় জীবন্ত; এনে দেওয়া যায় রক্ত মাংসের সজীবতা; প্রকৃতিও যে মানুষের মতই হাসে, কাঁদে, কথা বলে; বেদনায় বিষন্ন হয়, আনন্দে মাথা তুলে দেয় আকাশে, পথের পাঁচালী তারই প্রথম পরীক্ষা নয় শুধু, বাংলা সাহিত্যে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একক এবং অনন্যসাধারণ।

কিন্তু প্রকৃতির পরিবেশনেই মাত্র ; জীবনের পরিবেশনে নয়। পথের পাঁচালী উপন্যাস নয়, পথের saga; রাজপথের নয়; মানুষের পায়ে পায়ে চলার চিরকালের যে পথ তারই saga হতে চেয়েছিল পথের পাঁচালী, হতে পারেনি। তাই সে গুড়, কিন্তু great নয়। পথের পাঁচালীতে গ্রামের জীবন আছে কিন্তু জীবনদর্শন নেই। ব্যক্তি আছে বক্তব্য নেই। তাই বিভূতিভূষণের এ-গ্রন্থ ডকুমেন্টারী এবং dull ; জীবন-রসে জারিত হয়নি ইমোশন্যাল হয়ে গেছে ; সেন্টিমেন্টাল। তাই 'পথের পাঁচালী' সৎ কিন্তু মহৎ নয়; সুন্দর কিন্তু শুভ নয় ; ভয়ঙ্কর দুঃখের মধ্যে যে বরাভয় আনন্দের উৎস হল চিরকালের সাহিত্য, পথের পাঁচালী সেখানে উত্তীর্ণ হতে পারেনি ; পথের পাঁচালী পথের পদ্য হয়েছে কিন্তু পথের কবিতা হয় নি।

৩

'পথের পাঁচালী'র চিত্ররূপ দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। তিনি একাধারে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভা, আবোল তাবোলের স্রষ্টা সুকুমার রায়ের পুত্র এবং বঙ্গভারতীর বরপুত্র। তিনি বর্তমানে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। চিত্রকীর্তির পরিচিত ক্ষেত্র থেকে চলচ্চিত্র-কীর্তি অর্জনের অপরিচিত পরিস্থিতিতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেও বেরিয়ে এসেছেন কীর্তিমান সত্যজিৎ। এ কথা কোন দ্বিধা না রেখেই বলছি, চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের প্রথম চলচ্চিত্র প্রয়াস সার্থক হয়েছে। সত্যজিতের জিত হয়েছে সত্যি। প্রথম কিস্তিতেই বাজিমাৎ। লক্ষ্য করা মাত্রই লক্ষ্যভেদ। হাতেখড়ির সঙ্গেই বর্ণপরিচয় সমাপ্ত। 'পথের পাঁচালী'র চিত্ররূপ অভাবিত কিনা জানি না কিন্তু এ দেশে ছায়া চিত্রের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ত' বটেই।

অচলপত্রের পাতায় (এবং একমাত্র অচলপত্রেরই) বারংবার আমরা লিখেছি যে বাঙালী ট্যালেন্ট সকল ক্ষেত্রে নিজেকে বিস্তার করলেও চিত্রক্ষেত্রে সে আসে নি। বাংলাদেশে যাঁরা এতকাল ছবি তৈরি করেছেন, শিক্ষায়-দীক্ষায়, সাধানায় নিজেদেরকে তৈরি করা দরকার মনে করেননি। সত্যিকারের বাঙালী ট্যালেন্ট ম্যাজিক-বিদ্যার মাধ্যমেও নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম করে তুলেছে, কিন্তু ছায়াছবির তিরিশ বছরের ইতিহাসে ছায়া মাড়ায়নি এ পথের কোনও বাঙালী গুণী। তাই দীর্ঘকাল চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িয়ে কেউ ভালো মিস্ত্রী হয়েছে সত্যি কিন্তু artist হয়নি একজনও, art থেকে গেছে mystery.

অচলপত্রের পাতায় লিখলেও, একেবারে কেউ আসে নি, এ কথা বললে করা হবে সত্যের অপলাপ। দু'জন অন্তত এসেছিলেন যাঁদের কাছে আমাদের আশা ছিলো। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জ্যোতির্ময় রায় তাঁদের মধ্যে প্রথম জন তামাশা করেছেন; দ্বিতীয়জন হতাশ। প্রেমেন্দ্র মিত্র সীরিয়াসলি নিলেনই না 'ছবি'কে ফলে কখনও ভূতের, কখনও রহস্যের,

কখনও প্রমের, কখনও বক্স অফিস ফর্মুলার ছবি তুলতে গিয়ে তাঁর না-এদিক, না ওদিক, কোনটাই হল না। জাতও গেল, পেটও ভরল না। জ্যোতির্ময় রায় জোরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরলেন সিনেমাকে। কিন্তু পারলেন না। কারণ ভালো ছবি করার সংকল্প নিলেন বটে কিন্তু ভালোভাবে ছবি করবার জন্যে যার দরকার সেই নিষ্ঠার হ'ল অভাব। বক্স অফিস ব্যর্থতাও পীড়িত করে তুলল। তাঁর সাধ ছিল, সাধ্য হ'ল না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষে সাধ্য ছিলো কিন্তু সাধ ছিলো না। তবু, জ্যোতির্ময় রায়, বাংলা ছায়াচিত্রকে বাস্তব এবং উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার প্রথম পথিকৃৎ, এ কথা মনে করে তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ না থেকে উপায় কী? [এবং 'মঞ্চে' দু'জনের কাছে আমরা ঋণী একজন শম্ভু মিত্র ; অপরজন তুলসী লাহিড়ী]

এই প্রসঙ্গেই অনেকের মনে বিমল রায়ের কথা উঠলেও আমার মনে উঠবে না। তার কারণ বিমল রায় প্রোগ্রেসিভ হতে চেয়েছিলেন উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, প্যাঁচে পড়ে। 'উদয়ের পথে'র পর এ-সাবজেক্ট ও-সাবজেক্ট ঘেঁটে ঘুঁটে যখন সুবিধে হল না তখনি তিনি মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হলেন দু' বিঘা জমিতে, প্রোগ্রেস তাঁর কাছে end ছিলো না, প্রোগ্রেস ছিলো 'means' মাত্র, তাই দু' বিঘা জমির পরেই 'বিরাজ বহু' এবং 'নোকরী'তে আসল বিমল রায় বেরিয়ে পড়লেন। আই. পি. টি. এ. তাকে ঢাক পিটিয়ে যেখানে তুলতে চেয়েছিলো সেখানে উঠেই ঢাকা খুলে ফেল্লেন তিনি। মুখোশ ঢাকা সেই মুখ, make up উঠে যেতে যে মূর্তি আমরা দেখলাম, জীবনে তা আর বিমল বাবু মেক-আপ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। হলে অত্যন্ত সস্তা 'নোকরী'র কাহিনীকে unemploy-ment problem সল্‌ভ করবার হাতিয়ার বলে মনে হত না তাঁরা কিছুতেই।

অশিক্ষিত পটুত্বের দিন গেছে, আর পেট থেকে পড়েই কারপেটেব ওপর দিয়ে ছুঁচের কাজ করা আজ আর অসম্ভব। খাবার ছাড়াও পেটে আর কিছু থাকা দবকার। বিদ্যার যুগ আছে, সুন্দরেরও। কিন্তু বিদ্যা-সুন্দরদের যুগ বহুকাল বিগত। যে কোন বকম শিল্পকর্মে শুধু ট্যালেন্টে আজ আর চলে না। আগেব জন্মের পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে এ জন্মেও কিছু যোগ করা চাই ; না হলে শূন্য। মনুষ্য-বিদ্যার অধিগত যা কিছু তার ওপর অধিকার না থাকলে, শুধু ইনস্টিংক্ট দিয়ে সৃষ্টিকর্মে এগুলে তা হবে অনধিকাব চর্চা। কারণ Genius is not born ; Genius is made! এবং সৃষ্টির শর্ট-কাট নেই, নেই কোন মেড্ ইজি।

৪

বাংলা চলচ্চিত্রের এই পরিস্থিতিতে সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাবকে আমরা অভিবাদন জানাচ্ছি; শুধু স্বাগতম নয়; সু-স্বাগতম। Wel-come নয়; very very wel-come! তাঁর আসার দরকার ছিলো; আমাদের আশা সার্থক করতেই। যাঁরা মনোপলি করে রেখেছিলেন চিত্রজগৎকে তাঁদের ধরে ধরে বলি দেবার পুণ্য মুহূর্ত সমাগত। এবার পুজোয় নিরীহ পশুবলি না দিয়ে এতকালকার বাংলা ছবির পরিচালকদের বলি দিলে কেমন হয়? নরবলির ভয় নেই তাতে; সে হবে আমাদের 'বানর-বলি'। যারা এতকাল বলত, নিকৃষ্টতম ছবি করবার পরেও বলত, আমরাই; আমরাই চিরকাল ছবি করব, এ আমাদের জন্মগত অধিকার, পথের পাঁচালী তার প্রথম প্রত্যুত্তর। প্রথম কিন্তু শেষ নয়। বাংলা ছবির নতুন সম্ভাবনার পৃথিবী খুলে গেছে। সেই পৃথিবীতে আসবে অনেক আগন্তুক বিচিত্র পসরা নিয়ে। পথের

পাঁচালী-তে শোনা গেছে তারই পদধ্বনি। আগামীকালের জয় হোক।

সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর চিত্ররূপ অভাবিত ; কিন্তু শুধু অভূতপূর্ব বল্লে তাঁকে, একটা সন্দেহ থেকে যায়। উদ্বাস্তু সমস্যাও অভূতপূর্ব, ১৬ই আগস্টের দাঙ্গাও অভূতপূর্ব, আবার অন্য পক্ষে হিমালয়-বিজয়ও অভূতপূর্ব। অভূতপূর্ব কথাটা এমন খারাপ বা এমন ভালো— আগে হয়নি, এই দুই অর্থেই হতে পারে ব্যবহৃত। পথের পাঁচালী শুধু অভূতপূর্ব নয়; শুধু অপূর্বও নয়, অপূর্ব সার্থক সে।

চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের চরম সার্থকতার সঙ্গে সঙ্গেই পরম সঙ্কটকালও এখন। আমরা নিন্দেয় যেমন উন্মত্ত, প্রশংসায়ও তেমনি বেসামাল। তাঁকে অভিনন্দন জানানো আরম্ভ হয়েছে। আমরা অভিবাদন জানাতে প্রস্তুত; কিন্তু অভিনন্দন না; ovation জিনিসটাই কাউকে ডোবাবার পক্ষে যথেষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয় যেমন convocation-এর সঙ্গে সঙ্গেই মনে করে দেশের যুবকদের প্রতি তাদের কর্তব্য শেষ, আমরাও তাই ovation জানিয়েই দফা সারি ; দফায় দফায় ফুলের তোড়া দেয় fool -এরা ; ফুল পেয়ে মনে থাকে না প্রচুর প্রতিশ্রুতি ফুলফিল করার কথা! Ovation -এর মাত্রাধিক্যে প্রোবেশন পিরিওডেই অপমৃত্যু ঘটায় প্রফেশনাল কেরিয়ারের। তাই সমাদরের সঙ্গে সঙ্গেই জানাবো সতর্কবাণী। অনেক দিয়েছেন তিনি, সেই সঙ্গে অনেক কিছু দেননি। আরো অনেক কিছু দেবার তিনি স্পর্ধা রাখুন, আমরা রাখি আশা। যে বংশে অনবরত অপমৃত্যুর পর বাঁচে একটি শিশু, তাকে বেশী আদর দিলে সে শিশুপাল হয়ে ওঠে ; ঠিক পথে চালালে সে শিশু একদিন দেশের শৈশব ঘোচায় ; নিজে ত বড় হয়ই সেই সঙ্গে। তাই এখন আলোচনার হৈ হৈ নয়; সমালোচনার প্রয়োজন। চুলচেরা বিচারের পর তবে রায় দান। কষ্টিপাথরে ঘষে হবে ঘোষণা ঃ সোনা না তামা? তাতেও ভয় নেই সত্যজিতের। তিনি শুধু glittering নন, gold -ও বটে।

৫

একটি অভিনন্দনের উত্তরে সত্যজিৎ বলেছেন ঃ পথের পাঁচালী থেকে অন্তত চারখানা ছবি কৈরী করা যায়; তিনি একখানা করেছেন। না তা যায় না। 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থ হিসাবেই অসম্পূর্ণ। পথের পাঁচালীর চিত্ররূপও নয় সু-সম্পূর্ণ। পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত লেখনী নিয়ে। প্রকৃতিকে পুরোপুরি ধরতে গিয়ে ধরেন নি; ভয় পেয়েছেন। চরিত্র এনেছেন। চরিত্রগুলি ফোটাতে গিয়ে গল্প না বলে ঘটনার বর্ণনা এনেছেন। ঘটনা ধরে এগুতে না পেরে আবার ফিরে গেছেন প্রকৃতিতে। দুর্গাকে সরিযে নিয়েছেন। ফ্রাসট্রেশানে শেষ করেছেন পথের পাঁচালী।

কিন্তু পারিপার্শ্বিক কে কোথাও বড় হতে দেন নি অপুর চেয়ে। কিন্তু চিত্রে পারিপার্শ্বিক হয়েছে অপুর চেয়ে বড়। বই-তে অপু দুর্গার মধ্যে দিয়ে ভাই-বোনের ভালোবাসার যে দিক বিভূতিভূষণ তুলে ধরেছেন, চিত্রে সেই দিকটাই মিস করেছেন সত্যজিৎ। পথের পাঁচালীর সবচেয়ে বড় দিক এই ভাই-বোনের বড় হয়ে ওঠার দিক। চিত্রে 'পথের পাঁচালী'র দারিদ্রের মর্মন্তুদ দিকটা ফোটাতে গিয়ে মর্মে পৌঁছতে পারেন নি সত্যজিৎ। তিনি সমস্ত ছবিটাকে একপেশে করে ফেলেছেন। ভয়াবহ দুঃখের ভয়ঙ্কর ছবি হয়েছে পথের পাঁচালী। অত্যন্ত ইমোশ্যনাল হয়েছে, কিন্তু রসোত্তীর্ণ হয়নি। ছবি শেষ

হবার পর, আমার এক বন্ধু বলেছেন, অডিটোরিয়াম থেকে যেন দীর্ঘ এক mourning procession বেরোয়। কিন্তু তা' হবে কেন? mourning কেন, মর্ণিং, — রাত্রির শেষে নূতন প্রভাতের ইঙ্গিত না ছিল বইতে, না আছে চিত্রে। কাশী চলে যাওয়ার মধ্যে জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়ারই করুণ বিলাপ ধ্বনিত হয়েছে বই-তে, প্রতিফলিত হয়েছে ছবিতেও।

হয় ট্র্যাভেলোগ নয় পুরো গল্প। এর একটাকে ধরা উচিত ছিলো। বিভূতিবাবুর 'তিনি দুটোকেই ধরতে গিয়ে কোনটাই পুরো দিতে পারেননি। মহাপ্রস্থানের পথে-তে প্রবোধ সান্যাল রাণীকে এনে যেমন ভাবে বাড়িয়েছেন বই-এর বিক্রী, তেমনি ভাবে হত্যা করেছেন আর্টকে। গল্প বা উপন্যাস হলে তাতে কাহিনী থাকতে বাধ্য। শুধু বক্তব্যে প্রবন্ধ হয়; শুধু বর্ণনায় ডকুমেন্টারী; ড্রামা হবার জন্য চাই জীবন। পথের পাঁচালী বইতে যেটুকু অসম্পূর্ণ ছিল, চিত্রে তাকে সুসম্পূর্ণ করবার জন্যে প্রয়োজন ছিল যাঁর বেঁচে থাকবার তিনি পরলোকগত কথা শিল্পী বিভূতিভূষণ। পথের পাঁচালী চিত্রে তাই বিভূতির অভাব না হলেও ভূষণের অভাব পীড়িত করেছে যেমন আমাদের ; বিশ্বাস করি তেমনি ভাবেই নিশ্চিত করেছে সত্যজিৎ রায় কে, নিশ্চিন্দিপুরের এই কাহিনীকে চলচ্চিত্রিত করতে গিয়ে।

পথের পাঁচালীর ফটোগ্রাফী বিস্ময়েব বস্তু হয়েছে অনেকের কাছে। আমাব কাছে হয় নি। কারণ পথের পাঁচালীতে ফটোগ্রাফী পাই নি আমি, তার বদলে পেয়েছি পেন্টিং। বহু চিত্র আছে এতে; প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা এবং প্রায় প্রত্যেকটিই ভালো! কিন্তু তা চিত্র, চলচ্চিত্র নয়। মোবাইল নয়, স্টিল। শুধু ক্যামেরার কাজেও নয় এখানে চিত্রনাট্যের কাজেও এক শট 'থেকে আরেক শটে অনিবার্যভাবে উপস্থিত নন! Jump করে গেছেন স্ক্রিপ্টে স্কিপ করে করে এগিয়েছেন তিনি। অপু জন্মে কখন বড় হল তা বেঝাই যায় না। গতানুগতিক টাইম ল্যাপ্স এড়াতে গিয়ে নতুন কিছু দেওয়ার অভাবে যা হয়েছে তাকেও ল্যাপ্সের মধ্যে ধরতে হবে। ট্রেন দেখতে গেল অপু এবং দুর্গা। তার কয়েকটা শট আগে ট্রেনের কথা আছে। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি বেরুল অপু এবং দুর্গা, তখন বেঝাই যায় না, কোথায় এবং কেন যাচ্ছে। অপু দুর্গার বাবা বাইরে রয়ে গেলেন। এলেন যেন ঠিক দুর্গা মারা যাবার পর তবে সিনে ঢুকতে হবে এমন ভাবে। অপু দুর্গার মিষ্টিওলার পেছন পেছন যাওয়া ; পাঠশালা, বিয়ে ; মুক্তোর ছড়ার ঘটনা ; ইন্দিরঠাকরুণের মৃত্যু; সমস্ত দৃশ্যগুলোই কাটা কাটা; অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা নয়।

মৃত্যুর-দৃশ্যে সত্যজিৎ অভিনব হতে গিয়ে বাস্তব হন নি। গাঁয়ে মৃত্যুতে দুঃখের চেয়ে কলরব বেশী হয়। Suggestion -এ সারতে গিয়ে সত্যজিৎ Art -কে বাদ দিয়ে artistic deth দেখাতে গিয়ে সত্যকেই মেরেছেন। সর্বজয়া যদিবা পাথর হয়ে যেতে পারেন, সহানুভূতি দেখাতে যিনি এলেন তিনিই বা অমন নীরব কেন? এখানে ভয় পেয়েছেন সত্যজিৎ। মৃত্যু দৃশ্য একটু মাত্রার এদিকে ওদিকে হাস্যকর হয়ে ওঠে। সেই কারণেই সত্যজিৎ তা এড়াতে চেয়েছেন এইভাবে।

প্রকৃতির দৃশ্যগুলির মধ্যে চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ধরেছেন শুধু বাঁশবনটুকু। বাকী দৃশ্যগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়ায়নি অপু-দুর্গাকে। সেগুলি, যেমন কাশবন, পুকুর, পথ, আকাশ এবং বর্ষা, সবই বাংলা ছবিতে এমন বাস্তবভাবে এই প্রথম উপস্থিত কিন্তু সবই

যেন আলাদা আলাদা ধরে ধরে দেখানো হয়েছে। কারণ মারাত্মক ত্রুটিই হয়েছে এই চিত্র সংস্করণের যে কারণে, সেই কারণই ওই অবস্থার জন্য দায়ী। ছবিতে পথের পাঁচালী অপুর মুখ দিয়ে বলা নয় ; নয় অপুর চোখ দিয়ে দেখা। এখানে প্রকৃতির চোখ দিয়ে অপুকে উপস্থিত করা হয়েছে ; পারিপার্শ্বিক দিয়ে দেখানো হয়েছে প্রধানকে। প্রধান কিন্তু অপু নয় ; প্রধান হয়েছে অপুর 'দেখা'। সেই 'দেখা' পথের পাঁচালী বইতে আমরা পেয়েছি ; কিন্তু 'পথের পাঁচালী' ছবিতে আমরা তার দেখা পাইনি।

সমস্ত ছবিতে যে শটটি জুড়ে রইবে আমাদের মন; ভরে দেবে আমাদের বুক সৃষ্টি করবে আনন্দের ভূবন; সে দৃশ্যটি হল 'চিঠি-চিঠি-চিঠি' —অপুর এই ডাক। এই একটি আনন্দের মুহূর্ত সমস্ত গল্পটির অনেক নিরানন্দ, অনেক ব্যর্থতা, অনেক বেদনা উত্তীর্ণ করে নিয়ে যায় আনন্দলোকে, যেখানে রসের মানস সরোবরে 'খুসীর' পদ্ম টলমল করছে। আর ইন্দিরঠাকরুণের সামনে ছোট দুর্গা যখন এসে বসেছে প্রত্যাশায়, আর পিসী বলছে 'এই যা খেয়ে ফেলেছিরে' তখন, তখনও দুর্গার কপালের ওপর এসে পড়া চুলের ফাঁক দিয়ে তার দুঃখের একটু খানি হাসি অনেকখানি হয়ে ওঠে। আর দাঁড়ায় মিষ্টিওলার সঙ্গে সঙ্গে অপু দুর্গার চলায় বলায় এবং রবিশঙ্করের বাজনায়। বোঝা যায় যাদু আছে বাদ্য যন্ত্রে। নেপথ্য সঙ্গীত তখন চিত্রের চেয়েও প্রত্যক্ষ হয়ে এসে দাঁড়ায়।

আর? সমস্ত ছবিটির চেয়ে অনেক বড় হয়েছেন অশীতিপর চূনীবালা। এ-যুগের 'দেবী' হয়ে যাওয়া সমস্ত 'বালা'-কে লজ্জা দিয়েছেন তিনি age -এর কারণে নয় courage -এর মহিমায়। আর তাঁকে ধরেছেনও সত্যজিৎ রায় এই ছবিতে ছবির মত করে। চূনীতে নয় হীরা-পান্নায় গাঁথা রইবে চূনীবালার ইন্দিরঠাকরুণ।

সর্বজয়ার ওপর বিরক্তি এবং পরে ঘৃণা এনে দিয়েছেন চিত্রনাট্যকার। ইন্দিরঠাকরুণের সঙ্গে তার ব্যবহার মর্মান্তিক এবং ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু অভিনয় হয়েছে চরিত্রের যোগ্য। সেখানে ত্রুটি হয় নি কোন। ছোট দুর্গাকে যত ভালো লাগে, বড় দুর্গাকে তা নয়। অপু ভালো, খুব ভালো নয়। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তুলসী চক্রবর্তী এ ছবির এক বালতি দুধে এক ফোঁটা নয়, দু' ফোটা চোনা। কেন তাঁদের নির্বাচন, —সত্যজিৎ রায় যিনি অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন পাত্র পাত্রী নির্বাচন থেকে স্থান নির্বাচন পর্যন্ত সব ব্যাপারে, তিনি বলতে পারেন। এ-নির্বাচন হয়েছে, জনতার প্রতিনিধি হিসেবে যেন কংগ্রেসের টিকিটে বিধান রায়ের নির্বাচন।

সত্যজিৎ রায় কে যাঁরা অভিনন্দন জানাচ্ছেন, তাঁরা সত্যজিৎ যে-কারণে বড় সেখানে তাঁকে স্বীকার না করে ভুল জায়গায় দিচ্ছেন পুষ্পাঞ্জলি। পথের পাঁচালীর চিত্ররূপ-দাতা যে নূতনত্ব এনেছেন সেটা কিসের নূতনত্ব? পরিচালনায়, চিত্রনাট্যের, অভিনয়ের, ফটোগ্রাফীর? না যেখানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সে হচ্ছে তাঁর দুঃসাহসে। সম্পূর্ণ outdoor shooting -এর মেক আপ বিহীনতার কৃতিত্বেই তিনি আমাদের প্রথম স্মরণীয় চলচ্চিত্রকার। সেই তাঁর এক মাত্র পুরস্কার। স্টুডিও ফ্লোর এখানেই ফ্লোরড হয়েছে। এ না করলে 'পথের পাঁচালী' নির্বাচনের কোন অর্থই হত না। এবং দুঃসাহসের সঙ্গে সত্যজিতের চলিচ্চিত্র প্রয়াসে যে দুর্লভ বস্তুর যোগ হয়েছে সে গুণটি বোঝাবার জন্য বাংলা নেই। বাঙালী চরিত্রেই তা নেই যে। সে গুণ হল সিনসিয়ারিটি, হাজার মাইলের মধ্যে দিয়ে না যাওয়া জোলো বাংলা হল যার নিষ্ঠা।

সত্যজিৎ রায় এরপর কী ছবি করবেন? যে ছবিই করুন, পথের পাঁচালী করবেন না আর। একই বিষয় নিয়ে বারবার ছবি করে যারা তারা মামুলী ছবির মাধ্যমে বিষয় আশয় করে গুছিয়ে বসার লোক। সিনিয়ারিটি যেমন শিল্পকর্মের মূলধন তেমনি সিকিউরিটি আর্টিস্টের সর্বনাশ; তাকে সমূলে বিনাশ করবার প্রধান অস্ত্র ; মূলেই হাবাত করা তার কাজ; শিল্পকে সে করে মূলনির্ধন; আমূল উপড়ে ফেলতে চায়। Subject -এর অভাব নেই, অভাব ছিলো সত্যজিৎ রায়ের মত লোকের। তাঁর পথ ধরে আসুক আরো অনেক লোক। অন্ধকার হোক আলো। আলোছায়ার এই মিডিয়াম মিডিওক্রিটি থেকে উত্তীর্ণ হক class -এ। আউটক্লাস করুক পুরোনদের।

পথের পাঁচালী

সুধী প্রধান

১৯৪৮ সালে 'পথের পাঁচালী'র একটা কিশোর সংস্করণের ছবি আঁকতে গিয়ে 'আবোল তাবোল' 'পাগলাদাশু' — খ্যাত সুকুমার রায়ের অঙ্কন শিল্পী পুত্র সত্যজিৎ রায়ের প্রবল বাসনা হয়েছিল 'পথের পাঁচলী'র সবাক চিত্ররূপ দেবার।

ছায়াছবির রাজ্যে তাঁর যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল 'ক্যালকাটা ফিলম্ সোসাইটি'র সদস্যপদ। এই সোসাইটিতে ছবির তত্ত্বমূলক পড়াশুনা এবং দেশী-বিদেশী ছবির প্রদর্শন ও আলোচনা হ'ত। এই পুঁজিতে ভরসা করে প্রবল আগ্রহে তিনি ১৯৫০ সালে চিত্রনাট্য রচনায় ব্রতী হলেন।

'পথের পাঁচালী'র মনযোগী পাঠক মাত্রেই জানেন যে এই বইয়ের নাট্যরূপ এবং বিশেষ করে চিত্রনাট্য কত কঠিন জিনিস। বাংলা সাহিত্যের এই প্রথমশ্রেণীর রচনা এতদিন যে পেশাদার ফিলম্ মহলের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল—তা' "কমাত্র এই কারণে। দুর্গা ও অপুর দৃষ্টিতে দেখা বাংলার গ্রামজীবনের এই রচনাতে ছিল না ঘটনার সংঘাত, নর-নারীর প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা দুঃস্থ মধ্যবিত্তের দুঃখবাদ। এমন কি বর্হিপ্রকৃতির সঙ্গে এত সংযোগ দুর্গা ও অপুর থাকা সত্ত্বেও এই রচনা নিয়ে আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য প্রচারেরও কোন সুযোগ ছিলনা। কাজেই বক্স অফিসের দিকে লক্ষ্য রেখে যাঁরা ছবি করেন এবং যাঁদের উৎসাহে বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় শ্রেণীর রচনাও হিট পিকচারে পরিণত হয়েছে — তাঁদের নজর স্বভাবতই পড়েনি। সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় 'পথের পাঁচালী' দেখে মনে হ'ল—তাদের অবহেলা শাপে বর হয়েছে। তাদেরই কল্যাণে বাংলাদেশের চিত্রমোদিরা একেবারে নতুন ধরণের চিত্র দেখবার সুযোগ পেয়েছেন।

'পথের পাঁচালী'র যে গল্পাংশগুলি পরিচালক বেছে নিয়েছেন তা থেকে এই ছবির সামাজিক বাস্তবতা খুব স্পষ্টই চোখে পড়ে। ইংরাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আক্রমণে বিধস্ত বাংলার একদা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রামের আত্মভোলা গুরু-পুরোহিতের পরিবারের গল্প। শাস্ত্রের পীঠস্থান কাশী ফেরতা পণ্ডিতেরও গ্রামে কাজ নেই। কারণ গ্রামের অধিকাংশ কৃষকের ছেলেদের শিক্ষা ব্যবস্থা নেই এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে কেরানী গড়ার শিক্ষা শহরে হয়। জমিদারী সেরেস্তায় আট টাকা মাইনে বা পুরোহিতগিরি একমাত্র সম্বল। গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই শ্রেণী উদ্‌বৃত্ত শ্রেণীতে পরিণত পরগাছা স্তরেও নেই। যে অর্থনৈতিক নিয়মে শরৎচন্দ্রের 'মহেশের' গফুর কন্যা-সহ চটকলে যেতে বাধ্য হ'ল—সেই নিয়মে 'পথের পাঁচালী'র হরিহর-অপু গ্রাম ছাড়লো। যদিও শরৎচন্দ্রের রচনায় গ্রামের দাবিদ্রের প্রধান হেতু জমিদার শ্রেণীর যে রূপটি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ—সেটি বিভূতিবাবুর রচনায় অস্পষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ।

হরিহর সরল কিন্তু আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন—তাই সমশ্রেণীর লোকের কাছ থেকে

ভিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে বিদেশে খেটে খাওয়া ভাল এই ঘোষণা করে চলে গেল। মেয়ে কর্তৃক আম, জাম, পেয়ারা চুরির অপবাদ বা অপেক্ষাকৃত ধনী প্রতিবেশীদের অপমান মারফৎ যে মানসিক ক্ষুদ্রতা দেখান হয়েছে তার মূল কারণ ইংরাজ ও লর্ড কর্ণওয়ালিসের ভূমি ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থাই গ্রামের মধ্যবিত্তকে শহরে পাঠিয়েছে, ভূমিহীন চাষীকে গ্রাম ছাড়া করেছে। অথচ বংশের ইতিহাস বিজড়িত পৈত্রিক ভিটা , ব্যক্তিগত শত সহস্র স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম ছেড়ে নূতন স্থানে যেতে যুগপৎ আনন্দ ও গভীর বেদনা আছে। ইতিহাসের গতিতত্বে এই ঘটনা অনিবার্য। কিন্তু তার যন্ত্রণাও অপরিহার্য।

বিভূতিভূষণ এই গতিতত্ত্বের সম্পর্কে সজাগ ছিলেন বলে জানি না। কিন্তু তিনি প্রথমশ্রেণীর শিল্পীর দক্ষতায় এই ঘটনাকে অকৃত্রিম দরদের সঙ্গে ফুটিয়েছেন। সামাজিক গতি নির্দেশ করা অপেক্ষা শিল্পীজনোচিত বাহুল্যই এই রচনার প্রধান ধর্ম। তাই এই রচনাকে নাটক করা এত কঠিন।

কিন্তু বিভূতিভূষণ কেবল মানুষ নিয়ে কারবার করেননি। তিনি বাংলাদেশের প্রকৃতি ও গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যেকার সম্পর্কের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন, বস্তুত এই বর্ণনার আধিক্য দেখেই, বনেদী চিত্রনাট্যকাররা বোধহয় অগ্রসর হননি।

সত্যজিৎ রায় কিন্তু সেইখানেই সব থেকে বেশী আকৃষ্ট হয়েছেন। কারণ তিনি ফিলম্ তত্ত্বের বই থেকে জেনেছেন — ফিল্‌ম একটি কম্‌পোজিট আর্ট — নাটক, দৃশ্য, সঙ্গীত, অঙ্কন, স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্পকলার সমস্ত বিভাগ চিত্রনাট্যের মূল বক্তব্যকে প্রকাশ করতে সাহায্য করবে। এর কোন অংশই পৃথকভাবে পরিকল্পিত হবে না বা প্রাধান্য পাবে না। কাজেই সেই দৃষ্টি থেকে ফিল্‌ম ক্যামেরার চোখ দিয়ে তিনি এই রচনার সম্ভাবনা দেখেছিলেন।

গ্রামের সমাজ, গ্রামের নিঃস্বতা, পাঠশালা, যাত্রা, বিয়ের বাসরের আশে-পাশে এঁদো ডোবা, ভাঙ্গা পাঁচিল, ভাট্ শ্যাওড়া গাছের মাথায় সমুদ্রের ঢেউ। সোঁদালি বলচালতা গাছের উপর বাঁশের ঝাড়। হলুদ, বনকচু, কটু ওল, তিতির গাছের তলা দিয়ে বাঁশপাতায় ছাওয়া সরু পথ, রেললাইন।

টেলিগ্রাফ পোষ্টের বাজনা আর কাশবন—এই সবের সৌন্দর্য ও অভিব্যক্তি সত্যজিৎ রায়কে এক নূতন ধরণের চিত্রনাট্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। যার তুলনা আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় ছবিতে আছে বলে আমার জনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে এদেশের অনেক নৈসর্গিক দৃশ্য এ দেশের ছবিতে অনেক পরিচালক এনেছেন। কিন্তু মানুষ ও প্রকৃতি, বাংলার মানুষের একাংশ ও বাংলার প্রকৃতির এমন integrated প্রকাশ আর কোন ছবিতে দেখা যায়নি। সেই হিসাবে এই ছবিকে জাতীয় ছবি বলা যেতে পারে এবং পৃথিবীর অন্যত্র ছবির আসরে যদি এদেশের প্রতিনিধিত্ব করার কোন প্রশ্ন ওঠে তাহলে নিঃসন্দেহে এ ছবির কথা সর্বাগ্রে বলতে হবে।

'পথের পাঁচালী' সার্থক জাতীয় ফিল্‌মের একটি মানদণ্ড সৃষ্টি করে দিয়েছে। অবশ্য বর্তমান চিত্রনাট্যের প্রথমাংশের গতি সম্পর্কে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। অনেকেই বলতে পারেন—গতি বাড়ানো সম্ভব ছিল—এমনকি উচিতও। আমার নিজেরও একথা মনে হয়েছে। গ্রামেব অধিষ্ঠাত্রী দেবীর গ্রাম ত্যাগ এবং অপুর তাকে দেখা ও বব চাওয়ার

অভিলাষ—যা বিভূতিবাবুর রচনায় আছে— তাই দিয়ে একটা চমকপ্রদ এবং তাৎপর্যপূর্ণ সিকোয়েন্স করা যেত। জমিদারদের অত্যাচারে ঠাকুর দেবতা পর্যন্ত গ্রামে থাকেন না এবং সেই জন্য গ্রামের যে দুর্দশা তা দূর করার জন্য নবযুগের কিশোর অপুর কল্পনায় ঐশী শক্তি প্রার্থনা—এই আখ্যান আনা যেত। কিন্তু সত্যজিৎবাবু সেসব লোভ ত্যাগ করেছেন। পুরাতন দিনের প্রতীক-যোগসূত্র বৃদ্ধা পিসিমার মৃত্যু নবজীবনের ব্যর্থতায় ও অবহেলার প্রতীক দুর্গার মৃত্যু এবং 'অপরাজিত' অপুকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার মূল বিষয়টিতে ক্লাসিক রীতিতে পৌঁছবার জন্য ক্লাসিক গানের পদ্ধতি পরিচালক নিয়েছেন। ফলে ছবির শেষাংশ সবদিক থেকে এমন গভীর রসের সৃষ্টি করেছে—যার প্রভাব ছবি দেখার পরও অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

পরিচালকই প্রধানত ছবির জন্য দায়ী। তবু ছবিতে ক্যামেরাম্যানের দান অসামান্য। ঠিক এই কারণে অর্থাভাবে যখন সত্যজিৎবাবু পরিবেশকদের দরজায় ঘুরছিলেন তখন অনেকে তাঁকে বাংলাদেশের নামকরা ক্যামেরাম্যানকে নিতে বলেছিলন। পরিচালক গুরুতর অর্থনৈতিক দায়িত্ব নিয়েও সে উপদেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন। ক্যামেবাম্যান সুব্রত মিত্র—যিনি সত্যজিৎবাবুরই মত একেবারে নতুন এবং কখনো মুভি ক্যামেরা হাতে ধরেননি—তিনিও আমাদের অবাক করে দিয়েছেন। অপু ও দুর্গার রাক্ষসের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমানোর শট্ দেখলে আইজেনষ্টাইনের শটের কথা মনে পড়ে। দুর্গার চোখের উপর একগাছি চুল ফেলে রেখে তার অন্তরের বেদনা ফোটাবার শট্, জলের উপর কলমিলতা ফুল, জলপোকার শট্‌গুলি তো অনুপম (যার সঙ্গে কেবল ফ্লাহার্টির লুইজিয়ানা স্টোরির তুলনা চলে) কাব্য সৃষ্টি করেছে। তার পিছনে পটুয়া সত্যজিৎরায়ের দৃষ্টি ছাড়াও ক্যামেরার বাহাদুরি কম নয়। ছবির অধিকাংশই স্টুডিও'র বাইরে তোলা—কাজেই নতুন ক্যামেরাম্যানের পক্ষে তাঁর নিশ্চিত ক্ষমতার পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে কলকাতার খুব নামজাদা শব্দযন্ত্রী শ্রীভূপেন ঘোষের কাজের সম্পূর্ণ প্রশংসা করতে পারা গেল না। এই ছবির অনেক জায়গায় শব্দের জন্য রস ব্যাহত হয়েছে এবং আমার মনে হয় Sound dubbing-এ কোথাও কোথাও ত্রুটি থেকে গেছে। এ্যাকশনের সঙ্গে সঙ্গে না হয়ে দু'-এক জায়গায় পরে Sound এসেছে। যেভাবে Long fade outএক জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে—তাও চোখে লাগে। রবিশংকরের সঙ্গীতও রীতিমত নতুন জিনিস। মাত্র চারটি যন্ত্র দিয়ে তিনি যেভাবে আবহসঙ্গীত এবং effect সৃষ্টি করেছেন-তার ধরণও নতুন। বস্তুত এই ছবিতে কোন গান নেই এবং যা আছে—তার সঙ্গে নেই কোন বাজনা। অথচ সঙ্গীত পরিকল্পনা মূলত জাতীয় এবং যে ক্ষেত্রে effect - ধর্মী তার সঙ্গে ব্যালে নৃত্য সঙ্গীতের খুব সম্পর্ক। রবিশংকরের সঙ্গে এককালে গণনাট্যের ব্যালের যোগাযোগ সকলেই জানে। এদেশের ছবিতে মৃত্যুকালে গানের দৃশ্য অসহনীয় অথচ ইন্দির ঠাকুরাণীর মৃত্যুর দৃশ্যে এই কাজটির দ্বারা তা যথোপযুক্ত ভাবে প্রকাশিত হতে পেরেছে। দুর্গার মৃত্যুর খবরে হরিহর ও সর্বজয়ার কান্নার সময়, যে সুরমুখর শব্দ সৃষ্টি হয়েছে—তারও তুলনা আছে বলে জানি না।

অভিনয়ে যারা নতুন নেমেছেন — সর্বজয়া, দুর্গা (বড় ও ছোট), অপু, প্রভৃতি দক্ষতায় কারো চেয়ে কেউ কম নন। কিন্তু বিস্ময় হল চুণীবালার অভিনয়। না দেখলে ধারণা করা যাবে না। একে খুঁজে বার করার জন্য পরিচালক বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

এই হেন ছবিতে অর্থ যোগান দিতে বাংলার কোন পরিবেশক রাজি হননি। এমনকি বসুশ্রী ও বীণাতে মাত্র পাঁচ সপ্তাহের চুক্তিতে এই ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। কারণ ছবিঘরের মালিকরা অপেক্ষাকৃত পুরাতন ও প্রতিষ্ঠাশালী গোষ্ঠীর ছবির জন্য এই নতুন ছবির উপর ভরসা রাখতে পারেননি। সত্যজিৎ রায়ের যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যেত, যদিনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ছবি করার দায়িত্ব নিতেন। প্রামোদের নাম করে যে সব বিজাতীয় ছবি আমাদের দেশে দেখনো হয় তার বিরুদ্ধে জাতীয় ছবির জন্য যে আন্দোলন চলছে এবং বিনা শর্তে যথোপযুক্ত সরকারী সাহায্য দাবী করা হচ্ছে তার পক্ষে 'পথের পাঁচালী' একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

পথের পাঁচালী

ইরাবান বসুরায়

বাংলা চলচ্চিত্র তার যাত্রা শুরু করেছিল বিল্বমঙ্গল দিয়ে। এই ছবি থেকেই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল আমাদের সামাজিক পরিবেশের একটি লক্ষণ, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ গ্রাস করেছিল এই নবজাত শিল্পমাধ্যমটিকে—যা কিনা সম্পূর্ণভাবেই বুর্জোয়া সমাজের দান। অবশ্যই এ আমাদের খণ্ডিত জীবনেরই দায়ভাগ। এ'ভাবেই একদিন উপন্যাস এসেছিল বাংলা সাহিত্যে—ফলে বাস্তব জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকে রচনা করতে হয়েছিল সামন্ত নৃপতি জায়গীরদার অভিজাত পরিবারের নরনারীর রোম্যান্স। ফিল্ম সম্ভবত দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পের বাস্তবতার দাবীর প্রতিক্রিয়ায় শুরু করল সামন্ততন্ত্রের আরও শক্ত খুঁটিকে আঁকড়ে ধরে। ফিল্ম অবশ্য তখন জনমনোরঞ্জক উপাদন মাত্র আর জনমনোরঞ্জন বাণিজ্য জমায়। ফিল্ম যে অন্য কিছু তা যে শিল্প—এ বোধ তখন তৈরী হয়নি। তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হ'ল উনিশশো কুড়ি থেকে উনিশশো পঞ্চান্ন-দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর।

আমাদের জীবনে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ পেরিয়ে আসা জীবনে পথের পাঁচালী এক বিরল অভিজ্ঞতা—শুধু প্রথম নয়, নানা অর্থেই একমাত্র অভিজ্ঞতা। কেন এই ছবি এভাবে আমাদের ভাবনাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল,নির্মাণের দিন থেকে এতগুলি বছরের দূরত্বে দাঁড়িয়ে তা একটু ভেবে দেখা যেতে পারে।

খুব সাদামাটা ক্রেডিট টাইটেলের পরই ছবিতে গ্রামীণ সচ্ছল পরিবারের একটি পটভূমি দেখা যায়—ছাদে কাপড় শুকোতে দিচ্ছেন সেজো খুড়িমা, তারপর অদৃশ্য কারও উদ্দেশে তাঁর গালিগালাজ-ক্যামেরা ঘুরে গিয়ে লং এ দেখায় নীচে বাগান থেকে ছুটে পালাচ্ছে একটি বালিকা—সে দুর্গা।

আমরা দুর্গাকে প্রথম দেখি এভাবে বাইরে থেকে। পথের পাঁচালীর গঠনে এ ব্যাপারটি মনে রাখা দরকার, এখানে ক্যামেরা কোন বিশেষ চরিত্রের অনুকসারী নয়, সে শুধু পরিচালককেই অনুসরণ করেছে। এই প্রথম বাংলা চলচ্চিত্রে সম্পূর্ণভাবেই পরিচালকের স্পর্শ অনুভব করা গেল। উপন্যাসের পাতা থেকে সত্যজিৎ চরিত্রগুলিকে তুলে আনলেন। তাদের সাজিয়ে গেলেন নিজের ভাবনানুযায়ী কেবল গল্প বলে যাবার বাংলা-চলচ্চিত্রের ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসে। পথের পাঁচালীতেও গল্প বলা আছে কিন্তু তা নিছক একটা কাহিনী বিবৃত করে যাবার ধরণের নয়, এখানে চরিত্রগুলি আস্তে আস্তে নিজেদের মেলে ধরে। আবার পথের পাঁচালী শুধুই চরিত্রের বিশ্লেষণ নয়— এই চরিত্রগুলি স্পষ্টতই দাঁড়িয়ে থাকে মাটিতে, স্টুডিওর সাজানো ফ্লোরে নয়। এর আগে একটি মাত্র ছবিতে এই মৃত্তিকাশ্রয়ী বাস্তবতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল—১৯৫১ সালে তোলা নিমাই ঘোষের ছিন্নমূল ছবিতে। পথের পাঁচালী একটি গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী। এই পরিচয় প্রতিষ্ঠা প্রায় ছবির প্রথম থেকেই। সেজো খুড়িমার গালিগালাজের মধ্যেই নীচে কুয়োতলায় সর্বজয়ার সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় হয় এবং

সর্বজয়ার বেশ, মুখচ্ছবি ও সেজো খুড়িমার আক্রমণ সবকিছু থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার দারিদ্র-লাঞ্ছিত রূপটি। এখানেও সত্যজিৎ বাংলা চলচ্চিত্রেব রূপকথার জগৎ যেখানে এমনকি দরিদ্রতম নায়িকারও রূপসজ্জায় ঘাটতি পড়ত না— তাকে ভেঙে দেন। কিন্তু এগুলি তাঁর চলচ্চিত্রের দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতা। শুধু এই পথের পাঁচালীর আসল পরিচয় নয়।

হরিহর রায়, এই ব্রাহ্মণটি গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর পারিবারিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। কিন্তু কেমন চেহারা এই গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর? হরিহরের পেশা পৌরহিত্য— যজমানের আনুকূল্য তার জীবনধারণের উপায়, পূজো করে তার সংসার চলে। ভাগ্য ফেরাবার কথা সে ভাবে কোন শাঁসালো যজমানকে দীক্ষা দিয়ে। স্পষ্টতই পরভোজী সে—এই মধ্যশ্রেণীগত জীবনপ্রণালী অবশ্যই অর্জিত হয় পুরুষানুক্রমে। কিন্তু হরিহর বাঙালী গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর একটা ইতিহাসকে স্পষ্ট করে দেয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ মধ্যশ্রেণী প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে—জমিদার, ছোটখাটো রাজা ইত্যাদিদের আনুকূল্যে পুরোহিত, টোলের শাস্ত্রী ইত্যাদি শ্রেণীর ব্যক্তিরা সামাজিক সম্মান ও কৌলীণ্য এবং মোটামুটি আর্থিক সচ্ছলতার যে সুবিধা ভোগ করতেন-চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত নতুন সামাজিক বিন্যাসে সেটা অনেকটাই ধ্বসে যায় —পরিবর্তে যারা সামাজিক প্রতিষ্ঠার শিখরে উঠে আসে তারা হল শহুরে জমিদারদের আঞ্চলিক নায়েব বা নীলকুঠির সেরেস্তাদার জাতীয় ব্যক্তিরা—প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যাদের যোগ সামানাই বা শূন্য—যারা স্বাদ পেয়েছে বণিকসভ্যতার অর্থকেন্দ্রিক জীবনধারার। সত্যজিৎ হরিহরকে দাঁড় করান সেই ধ্বসে যাওয়া বনিয়াদেই। এই প্রথম বাংলা চলচ্চিত্রে 'ছিন্নমূল' আর 'নাগরিক' বাদে চরিত্র এসে দাঁড়ালো তার শ্রেণীগত ও সামাজিক পরিচয় সহ। ছিন্নমূলে ছিল একটা বিশেষ সময় ও ঘটনার অভিঘাত—নাগরিক শহুরে মধ্যশ্রেণীর পরিচয় তুলে ধরেছিল—পথের পাঁচালী তুলনায় অনেক বেশী ইতিহাসবোধকে কাজে লাগায়। অথচ এ ছবি প্রত্যক্ষত কোন ইতিহাসের কথা বলতে চায়নি।

হরিহব পরভোজী—এছাড়া আর কিছুই করার ছিল না ঐতিহ্যসম্পৃক্ত বাঙালী গ্রামীণ মধ্যশ্রেণী, যারা ভদ্রলোক বলে পরিচিত, তাদের। হরিহর আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে পুরনো অভ্যাসকে—অথচ সেই অবলম্বনটাই তাদের জীবন থেকে সরে গেছে। অনেকদিন বাদে সত্যজিৎ আশনি সঙ্কেতে আবার এই রকম এক পুরোহিত গঙ্গাচরণকে নিয়ে এসেছিলেন। সেও পরভোজী, কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে নতুন অবলম্বন খুঁজে বাঁচতে চেয়েছিল, যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে তাকে বুঝতে হয়েছিল চারপাশের পাল্টে যাওয়া চেহারা। হরিহর এ রকম কোন বিশেষ ঘটনার সামনে দাঁড়ায়নি কিন্তু আভ্যন্তরীণ নানাচাপে তাকে এই ব্যাপারটি বুঝে নিতে হয়।

সর্বজয়া যখন হরিহরকে কাশী যাওয়ার কথা বলে হরিহর ভিটে ছেড়ে যেতে রাজী হয় না। কিন্তু প্রাচীন ভিটেবাড়ীর মায়া গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মতে কি আর হরিহরদের আশ্রয় টিঁকে থাকতে পারে? এই না পারার প্রক্রিয়াটিকে সত্যজিৎ কোথাও অত্যন্ত প্রত্যক্ষ করে তোলেন না, এমনকি সাজানোর ধরণ থেকে আদৌ এ ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে উঠি না-কিন্তু মহৎ শিল্প তো কোন কিছুকেই প্রকট করে তোলে না।

পথের পাঁচালী তার বদলে ধরিয়ে দেয় অন্তর্লীন বাস্তবতাকে —যে ঘটনা বাংলা চলচ্চিত্রে প্রথম।

অপু দাঁড়িয়ে থাকে এই সামাজিক বিবর্তনের মাঝখানে। বিভূতিভূষণের অপু থেকে সত্যজিতের অপু অবশ্যই অনেকটা সরে আসে। এর কারণ অনেকটাই বিভূতিভূষণ ও সত্যজিতের সময় ও মানসিকতার দূরত্ব। পথের পাঁচালী উপন্যাস ও সিনেমার মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় পঁচিশ বছর। এই কিঞ্চিদধিক পঁচিশ বছর তো বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের অবনমনকেই আরও ত্বরান্বিত ও ব্যাপক করেছে। বিভূতিভূষণের বিস্ময়বোধ-তাড়িত রহস্যময়তা, প্রকৃতিমুখীতা ও একধরণের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সত্যজিতের উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার উত্তরাধিকার, প্রেসিডেন্সী শান্তিনিকেতন-ঐতিহ্যলালিত আধুনিকতার তফাৎও যথেষ্ট।

সত্যজিৎ স্পষ্টতই, তাঁর পারিবারিক সূত্রে যে ঐতিহ্য বহন করে চলেন তা হল উনিশ শতকী আলোড়নেব ঐতিহ্য। এই আলোড়নকে একদা বলা হয়েচিল রেনেসাঁস—অদ্ভুত ব্যর্থতায় ভরা সেই রেঁনেসাঁসের কোন ছাপ পড়েনি বৃহত্তর জনজীবনে; কিন্তু মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও পরিবারে তার প্রভাব পড়েছিল। ব্রাহ্মধর্মও এই আলোড়নেরই ফল। বাংলাদেশে মুৎসুদ্দিদের আবির্ভাব, নতুন মত, শ্রেণীর জন্ম—ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সঙ্গে যারা অষ্টেপৃষ্টে বাঁধা—স্বভাবতই এদের প্রয়োজন ছিল গ্রামজীবনের গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসা, না হলে শহরকেন্দ্রিক এই অর্থনীতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা যায় না। সেজন্য হিন্দু সমাজের অচলায়তন ভেঙে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল তাদের। ভালো মন্দ ইত্যাদি প্রশ্ন বাদ দিলেও সমাজ জীবনে একটা ধাক্কা লেগেছিল এটা অস্বীকার করা যায় না। সত্যজিৎ এরই উত্তরাধিকারী—বিভূতিভূষণ তা নন। ফলত নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঐ ব্যর্থ রেনেসাঁস যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত ঘটিয়েছিল—সত্যজিতের মধ্যে তারই অনুসরণ —বিভূতিভূষণের অতীন্দ্রিয় রহস্যাভিসারের সঙ্গে তার দূরত্ব আছেই।

ঐ ব্রাহ্ম ও ব্যর্থ রেনেসাঁসের উত্তরাধিকার থেকে সত্যজিৎ পথের পাঁচালী দেখান। সত্যজিতের ছবি সম্পর্কে যে বিশেষণ প্রায়ই ব্যবহার করা হয়—তা হ'ল মানবতাবাদী। এই শব্দটির ব্যাখ্যাহীন প্রযোগ অনেক ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিতে পারে। সত্যজিৎ রায় অবশ্যই মানবতাবাদী। সে মানবতাবাদ উনিশ শতকের পণ্ডিত ও সীমায়িত মানবতাবাদেরই উত্তরাধিকার। কিন্তু সত্যজিৎ তো উনিশ শতকের নন—বিশ শতকের নির্মম অভিজ্ঞতাগুলি তাঁকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে। ফলে খুব সচেতনভাবে না হ'লেও সত্যজিৎ জেনে যান মানবিকতার ভিতরের ঘুণপোকাকে। সেই জানার সূত্রেই অপুর কাহিনী হয়ে ওঠে বাংলাদেশের গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর বিবর্তনের কাহিনী।

পথের পাঁচালী ফিল্মের অপু তাই বিভূতিভূষণেব বিস্ময়াবিষ্ট অপু নয়। বস্তুত সেই বিস্ময়বোধকে সত্যজিৎ খুব একটা গুরুত্ব দেননি। কুঠির মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যাওয়ার বিস্ময় ও রোমাঞ্চের প্রসঙ্গ এখানে হরিহরেব মুখের একটা কথাতেই সীমাবদ্ধ, শকুনের ডিমের প্রসঙ্গ একেবারে অনুপস্থিত। তার বদলে অপুর ভূমিকা দর্শকের, যে দেখা দিয়ে অপু নিজেকেও পাল্টে নেয়। চারপাশের সব কিছু সে দেখে, স্মিত হাসিতে পৃথিবীটাকে সে জেনে নিতে চায়, তা প্রসন্ন গুরুমশাইব পাঠশালাতেই হোক, যাত্রার আসরেই হোক আর কাশবনের মাঠেই হোক।

অপু আসলে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। কাশবনের মধ্যে প্রথমে টেলিগ্রাফের পোষ্ট দেখেছিল অপু, কান পেতে শব্দ শুনেছিল ; সে জানে না ওটা কি, দুর্গা তার অনুসন্ধিৎসা মেটাতে পারে না। তারপর রেলগাড়ির দেখা। কাশবনের মধ্যে অপু দুর্গার দৌড়, দূরে লংশটে কালো ধোঁয়া-ওড়ানো রেলগাড়ি—তারপরে ক্লোজ-আপে পর্দা জুড়ে রেলগাড়ি চলে যায়—উল্টোদিক থেকে উঠে আসে অপু। অপুর চোখ দিয়ে রেল না দেখিয়ে ধাবমান জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই অপুকে দেখান সত্যজিৎ, আর অপুকে সচেতন করিয়ে দেন এই চলমানতা সম্পর্কে। আমরা জেনে যাই অপুর ঐ স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থাকা টিকতে পারে না—জীবন রেলগাড়ির মতো চলমান।

কিন্তু এই যে চলমানতার বোধ তার মানে তো পুরনো অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসা, অর্থাৎ পুরনো বন্ধনগুলিকে ছিন্ন করা। রেলগাড়ি দেখে ফেরার পথে তাদের আনন্দিত জগৎ ধাক্কা খায়—গাছতলায় বসে থাকা পাথরের মতো ইন্দির ঠাকরুণ, দুর্গার হাতের ছোঁয়ায় সেই মৃত শরীর গড়িয়ে পড়ে যায়, ইন্দিরঠাকরুণের ঘটিটা গড়াতে গড়াতে জলে পড়ে যায়—ভীতচকিত অপু, দুর্গা পালিয়ে আসে। রেলগাড়ি জীবনের চলমানতাকে বোঝায়, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেয় সে। অপু রেল দেখল, সঙ্গে সঙ্গেপুরনো বন্ধন খানিকটা ছিঁড়ল। সত্যজিৎ জানিয়ে দেন এগোনো মানেই অনেকটা পুরনো সম্পর্কের শিকড় ছেঁড়া-এই রক্তাক্ত টান ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়। ইন্দির শুধু নিশ্চিন্দিপুরের এক প্রাচীনা বৃদ্ধাই নন, 'হরি দিন তো গেল'-র আকূতি শুধু ব্যক্তির বেদনাই নয়, গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর প্রাচীন ঐতিহ্যের অবসানের অসহায় যন্ত্রনারই প্রতিরূপ সে। ইন্দির ধরে রেখেছিলেন প্রাচীনতাকে, যে প্রাচীনতা জীর্ণ হতে শুরু করেছে তার পরিধেয় বস্ত্রের মতই। সত্যজিৎ মানবতাবাদী, কিন্তু সত্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখেন না, সেই মানবতাবাদের খাতিরে। ইন্দিরের প্রসঙ্গে সর্বজয়ার কথা মনে হতেই পারে। সর্বজয়া দাঁড়িয়ে আছে এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে—সংসারের অভাব, লাঞ্ছনা এ সবই তাকে বিরূপ করে তোলে—ভিটেমাটির শিকড়-নামানো, বন্ধনকে অস্বীকার করে কাশী চলে যাবার কথা সে-ই বলেছিল, ইন্দিরের প্রতি সেই নিষ্করুণ হয়ে উঠেছিল। সর্বজয়ার এই নিষ্ঠুরতা আমাদের ধাক্কা দেয়। কিন্তু বোঝা যায়, এছাড়া আর কিছু তাঁর করার থাকে না। দারিদ্রের চাপ মানুষকে যে পথে এনে দেয়, সর্বজয়া সেই পঙ্গুত্বেরই শিকার। আর এটাই বোধহয় পরিহাস, মধ্যশ্রেণীর সামাজিক ইতিহাসের মতই, যে সর্বজয়া ইন্দিরকে প্রত্যাখান করে—'অপরাজিত' তে এসে সেই সর্বজয়াই মনসাপোতার নিশ্চিন্ত জীবন আঁকড়ে ধরতে চায়-আর তখন অপু তাকে প্রত্যাখ্যান করে।

পথের পাঁচালীতে জীবন ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ বারেবারেই জড়িয়ে থাকে। রেলগাড়ি দেখে অপুর সচেতন হবার সময়ে ইন্দিরের মৃত্যু প্রসঙ্গই শুধু নয়, দুর্গার ক্ষেত্রেও এটা ঘটে। ইন্দিরের মৃত্যু অপুর কাছে ততটা ধাক্কা নয়, যতটা দুর্গার কাছে। ইন্দির ও অপুর মাঝে দুর্গা একটা যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। ধাবমান রেলগাড়ির উল্টোদিকে আমরা শুধু অপুকেই দেখি, দুর্গাকে নয়। দুর্গা ঐ চলমান জীবনকে ধরতে পারে না—তারও মৃত্যুও অপুর ক্ষেত্রে একটা বিরাট ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি ব্যাপার মনে করা যেতে পারে।

গোটা ফিল্মে অসংখ্য শট ও সিকোয়েন্স কে প্রায় গীতিকবিতা মনে হয়। জীবনের

রমণীয় স্নিগ্ধতার সঙ্গেই যেন তা পরিচয় করিয়ে দিতে চায়, কিন্তু সত্যজিৎ প্রায়শই এগুলিকে তৈরী করেন কোন বিপর্যয়ের সুচনারূপে। চিনিবাস ময়রার পিছনে দৌড়ে যায় অপু ও দুর্গা, খুব সাধারণ একটু চাওয়া তাদের মেটে না। তার পরে ঐ যাওয়াটা হঠাৎ মনে হতে পারে একটু অস্বাভাবিক। চিনিবাস ময়রা, অপু, দুর্গা এই অশ্চর্য ছন্দময় দৃশ্য এ ছবির এক অনন্য সম্পদ—কিন্তু ঐ কবিতাও টেনে নিয়ে যায় এক বিপর্যয়ের দিকে। ছবিতে আমরা দেখি জলের মধ্যে প্রতিফলিত চিনিবাসের বাঁক কাঁধে দুলকি চাল। তার পিছনে নৃত্যপরা ছন্দময়তা—সেখান থেকে সত্যজিৎ তাদের পৌঁছে দেন সেজখুড়ির বাড়িতে— সেখানে সেজখুড়ির তীব্র ভর্ৎসনা তাদের উপর ফেটে পড়ে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের অত্যন্ত সাধারণ ইচ্ছের এই অপমৃত্যু শুধু অপুকেই অভিজ্ঞ করে তোলে না, অর্থনৈতিক সত্যকেও জানিয়ে দেয়। অপু দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢোকে না। দুর্গা ছাদে যায় আর তারপরেই সেই হারের প্রসঙ্গ—আরেকটি বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়ে যায়। দুর্গা নিছক কৌতুহলেই, তার তীব্র অভাবজনিত কৌতুহলে চোর হয়ে যায়।

এভাবেই তৈরী হয় বৃষ্টির দৃশ্যমালা। সেখানে তো কোন বির্যয়ের ইঙ্গিতমাত্র ছিল না। হরিহর রোজগারে বেরিয়েছে, তার আগে চোঙাঅলা বাক্সের ফুটোয় চোখ লাগিয়ে অপু-দুর্গার দুনিয়া দেখার বাসনা মিটিয়ে দিয়ে গেছেসে-সামনে সুখের ইঙ্গিত। প্রকৃতিতেও সেই সুখেরই প্রতিফলন। একে একে প্রকৃতির নৃত্যপরা ছন্দোময়ী রূপের উন্মোচন ঘটতে থাকে। পুণ্যিপুকুর ব্রত করেছিল দুর্গা—সেতো জীবনের আকাঙ্ক্ষায়। বৃষ্টি নামবে, ভরে যাবে শুকনো খালবিল, জীবনও ভরে যাবে খুশিতে—যে খুশির ছোঁয়া বিয়ের সময়ে রানুর মুখে দেখেছিল দুর্গা। দুর্গা তাই বৃষ্টিকে ডাকে। বৃষ্টি আসে। প্রকৃতি খুশী হয়ে ওঠে, কিন্তু কোথায় যেন মৃত্যুর ছায়া পড়ে। দিগন্ত ভাসানো বৃষ্টির নিচে চুল এলিয়ে ভেজে দুর্গা। অসাধারণ একটি দৃশ্য, বিশ্ব চলচ্চিত্রে তুলনাহীন। প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে যায় দুর্গা। অপু দূরে দাঁড়িয়ে দেখে—কিন্তু এত খুশী কি সইবে সময়? যে বৃষ্টিকে আবাহন করেছিল দুর্গা, সিক্ত ভাইকে বুকে জড়িয়ে গাছতলায় বসে সেই বৃষ্টিকেই সে চলে যেতে বলে। কিন্তু ততক্ষণে প্রকৃতি তার থাবা বাড়িয়েছে।

বাঙালী নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের অবধারিত যন্ত্রণার প্রতিরূপ হয়েছিল দুর্গা। গৌরীদানের সামাজিক প্রথার মধ্যে যে যন্ত্রণা লুকিয়ে ছিল, রানুর বিবাহ পর্বের খুশীতে অনুপ্রাণিত দুর্গা যেন সেই যন্ত্রণাকেই টেনে আসে। দুর্গা একেবারেই চলে যায়, বৃষ্টির প্রকৃতি স্নিগ্ধতা তাকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর দিকে। কিন্তু মৃত্যু কি শুধু দুর্গারই। ঐ ঝড়বৃষ্টির সন্ধ্যাতেই আমরা আরেকটি আত্মিক মৃত্যু প্রত্যক্ষ করি। বাগান দিয়ে ফেরার পথে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে সর্বজয়া একটা নারকেল চুরি করে। এক মুহূর্তে ধ্বসে যায় মধ্যবিত্ত সংস্কার, নীতিবোধ। যে সর্বজয়া মেয়ের চোর অপবাদে ক্রোধে দিশাহারা হয়ে দুর্গাকে মেরেছিল তাকেই এই চোরের ভূমিকা নিতে হয়। এখানে ও তো ধরা পড়ে এই চরিত্রগুলির নির্মম পরিণতি।

কিন্তু এ মৃত্যুর তো অন্যতর তাৎপর্যও আছে। প্রকৃতি স্নিগ্ধ থেকে ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে, দুর্গা মারা যায়, সর্বজয়া চোর হয়, ধ্বসে যায় গোয়ালঘর, ভিটে বাড়ি। হরিহর স্বপ্ন দেখেছিল সব নতুন করে সাজাবে সে—সেই স্বপ্ন টেকেনা। এই নিঃস্ব গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর হরিহর রায় আর পুরনো বন্ধনকে টেনে বেড়াতে পারে না।

ফলে হরিহরকে অন্য কথা ভাবতে হয়। সত্যজিৎ জানেন ঐ গ্রাম্য গণ্ডি র আত্মসন্তুষ্ট জীবন টেকে না—সময় অত্যন্ত রূঢ়, ইতিহাস অত্যন্ত নির্মম। ওখান থেকে বেরিয়ে আসাই জীবনের ধর্ম। শেষ পর্যন্ত সেই জীবনধর্মকে মানতে বাধ্য হয় হরিহর রায়।

হরিহর ভিটেমাটি ছাড়তে চায়নি। প্রথমবার সে ঘর ছেড়ে বেরোয় ইন্দিরঠাকরুণের মৃত্যুর পর । আর্থিক চাপ তো বটেই—সেই সঙ্গে ইন্দিরের মৃত্যুতে একটা বাঁধনও ছিড়ে যায়। তখন পর্যন্ত অবশ্য হরিহর নিশ্চিন্দিপুরের মায়া পুরোপুরি কাটাতেও পারেনি—বরং রোজগার করে নিশ্চিন্দিপুরের জীবনকেই সে আরেকটু সাজিয়ে নিতে চেয়েছিল। দুর্গার মৃত্যু শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে তাকে—নিশ্চিন্দিপুরের জীবন থেকে হরিহর এবারে পুরোপুরি বেরিয়ে আসে। প্রথমবার এসেছিল সে একা, তখনও সে ভাবতে পেরেছিল ফিরে যাবার কথা। ইন্দির তো প্রাচীনা, সে তো যাবেই কিন্তু নিশ্চিন্দিপুরের গণ্ডিবাঁধা জীবনের জড়তা, মৃত্যু যখন উত্তরপুরুষের উপর ছায়া ফেললো, গ্রাস করলো তার আত্মজাকে তখন আর সেই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া হরিহরের অন্য কোন উপায় থাকে না।

দুর্গার মৃত্যুর পরেও ছবিতে একটি অনবদ্য দৃশ্যমালা দেখি আমরা—অপু গায়ে চাদর জড়িয়ে বাইরে বেরোতে গিয়ে আকাশে মেঘ দেখে ঘরে ঢুকে যায়, তারপর ছাতা নিয়ে বেরিয়ে আসে, একা হেঁটে যায়, জল, কাদা, ভাঙা বেড়া ডিঙিয়ে। একা হেঁটে যায় অপু—যে অপুকে পাঠশালা যাবার সময় চুল আঁচড়ে দিয়েছে দুর্গা— সেই অপু শুধু নিঃসঙ্গ হয়ে গেল তাই নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মুগ্ধতার সম্পর্কেও একটু চিড় ধরল। এর আগে অপু বৃষ্টির অকৃপণ ধাবায় নিজেকে ভিজতে দিয়েছে—এখন মেঘ দেখেই তাকে ছাতা নিতে হয়।

দুর্গার মৃত্যু অপুর কাছেও শিকড় উপড়ে যাওয়া নিশ্চিন্দিপুবেব জীবনে, বিভূতিভূষণের মতো সত্যজিৎ অপুর অন্য কোন সঙ্গী রাখেননি। দুর্গাকে ঘিরেই ছিল অপুর জগৎ—সেখানে একটা শূন্যতা এসে যায়। এই যে নিঃসঙ্গতার শুরু তাকে সত্যজিৎ পৌঁছে দিয়েছিলেন শহর জীবনের একাকীত্বে। এখানেও বোধ হয় কাজ করে উনিশ শতকী ব্যর্থ রেনেসাঁসের দায়। নানা কাজকর্মের মধ্যেও উনিশ শতকী সামাজিক নেতাদের যে ব্যক্তি-বিচ্ছিন্নতা তার কারণ অবশ্যই আমাদের সামাজিক ইতিহাসের পঙ্গুত্ব। অসম্পূর্ণ বুর্জোয়াবিকাশের অবধারিত ফল শহর জীবনের ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতা, একদিকে গ্রামীণ কাঠামোয় ফাটল ধরে, অন্যদিকে উপনিবেশের নগরে মেলে না কোন আত্মপ্রতিষ্ঠার বনিয়াদ—সেই করুণ পরিণতি সঞ্চারিত হয়ে যায় অনেকটাই বিশ শতকেও। অপুরা প্রথমে এসে পৌঁছেছিল কাশীতে—কিন্তু কাশীও তো পুরনো ভারতবর্ষ, বলা যায় গ্রাম ভারতবর্ষেরই ইট-পাথর মোড়া একটা সংস্করণ। অপুরা তো সেখানে থাকতে পারে না—উৎখাত গ্রামীণ মধ্য শ্রেণীর আশ্রয় তো কাশী নয়। পরভোজী হরিহর, পুরনো ঐতিহ্যকে যে টেনে বেড়াতে চেয়েছিল নানা পালা লেখার সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে—কাশীতে এসে সে কথকতা করে বাঁচতে চেয়েছিল; বিন্তু পুরনো ভারতবর্ষ তাকে আশ্রয় দিতে পারে না, বড়জোর ঠেলে দিতে পারে মৃত্যুর দিকে। হরিহর মারা যায়—সর্বজয়া শহুরে নন্দবাবুর লোভ থেকে যদি-বা বাঁচতে পারে, অপুর তামাকসাজা ভৃত্য হওয়ার পরিণতি সে ঠেকাবে কি করে? ফলে সর্বজয়া আবার ফিরতে চেয়েছিল মনসাপোতার গ্রামীণ

স্বাচ্ছন্দ্যে, যেখানে তথাকথিত নীচু জাতের শ্রদ্ধাভক্তিতে বাঁচতে পারার কথা ভাবা যায়। যেমন ভেবেছিল অশনি সঙ্কেতের গঙ্গাচরণ। কিন্তু যে গণ্ডি থেকে অপু বেরিয়ে এসেছিল, সেখানে সে আবার ফিরবে কি করে? পথের পাঁচালীর সামাজিক পরিধি অপরাজিত-তে একটু গুটিয়ে এসেছিল ব্যক্তিক পরিধিতে—কিন্তু অপরাজিত শুধু অপুর বয়ঃসন্ধি কালের ব্যক্তিক বিদ্রোহ নয়, তার আচরণের নিষ্ঠুরতা, সর্বজয়ার প্রতি ঔদাসীন্য, আসলে গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর শহরে চলে আসার নিষ্করুণ অভিজ্ঞতার প্রতিফলনও বটে, 'অপরাজিত'- তে অপু কলকাতায় এসে পৌঁছয়—সেই সঙ্গে তাকে মেনে নিতে হয় ঔপেনিবেশিক নগরায়ণের খণ্ডিত রূপকে। এখানেও বৃষ্টি আসে—রেলগাড়িও। রেলগাড়ি দেখেছিল অপু, তারপরেই একটি মৃত্যু পুরনো বন্ধনকে খানিকটা আলগা করে দেয়। তারপর বৃষ্টি আরেকটি মৃত্যু সব বন্ধনকেই ছিঁড়ে দেয়—রেলগাড়ি অপুকে নিশ্চিন্দিপুর থেকে কাশী, কাশী থেকে মনসাপোতা, মনসাপোতা থেকে কলকাতায় পৌঁছে দেয়। আর অপু কলকাতায় তার স্বপ্নের জগতে এসে নামে বৃষ্টির মধ্যে-আর বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য নিঃসঙ্গ অপুকে আশ্রয় খুঁজতে হয় এক অপরিচিত বিদেশী পরিবেশে-যদিও তার হাতে ধরা থাকে পৃথিবী। এই বৃষ্টি অপুর কাছে অপরিচিত মনে হয়। নিশ্চিন্দিপুরের এক বৃষ্টি যেমন দুর্গার মৃত্যু ঘটিয়ে অপুকে ছিন্ন করে দিয়েছিল তার অভ্যস্ত, অজ্ঞান জীবন থেকে, এই বৃষ্টিও অপুকে আলাদা করে দেয় তার পুরনো জীবন, এমনকি সর্বজয়া থেকেও। ঔপনিবেশিক নগরায়ণের খঞ্জতা অনেক স্বপ্নকেই ব্যর্থ করে দেয়—অপুকে কাজ নিতে হয় প্রেসে। নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর রায়ের পরভোজী মধ্যশ্রেণীগত জীবন থেকে তার পুত্র পৌঁছে যায় প্রেস শ্রমিকের কালিঝুলি মাখা জীবনে। গ্রামীণ ভদ্রলোকি সংস্কার ও অহঙ্কার ভেঙে যায়। কিন্তু খণ্ডিত নগরায়ণ বলেই গ্রামজীবনকে অপু একেবারেই ছাড়তে পারে না । এমনকি সর্বজয়ার মৃত্যুর পরেও না-তাকে আবার পৌঁছতে হয় খুলনার গ্রামে—অপর্ণার সঙ্গে তার বিবাহ, তারপর আবার রেলগাড়ি একদিন অপর্ণাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার কাছ থেকে। এই মৃত্যুই অবশেষে গ্রামীণ ও প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করে, কিন্তু এতদিন যে ঐ যোগাযোগকে টেনে বেড়াতে হয় তাতেই তো ধরা পড়ে আমাদের মধ্যশ্রেণীর করুণ চেহারা। কিন্তু এই পরিণতি কি সম্পূর্ণই ট্রাজিক? সত্যজিৎ আগাগোড়াই আমাদের মনে করিয়ে দেন এই মৃত্যু। এই বিচ্ছেদ প্রবল যন্ত্রণার সঙ্গেই আবার পুরনো ঘাট থেকে নতুন ঘাটে পৌঁছে দেয়- - অপুর সংসার তাই অপু ও কাজলের মিলনেই শেষ হয়।

পথের পাঁচালী বারেবারে এই পদ্ধতিটিকেই মনে করিয়ে দিতে চায়। দুর্গার মৃত্যুর পর, ধ্বসে যাওয়া ভিটেবাড়ির মধ্যে আর কোনো অবলম্বন পায়না হরিহর। এমনকি তার পুঁথিগুলিও জীর্ণ হয়ে গেছে। অপু খুঁজে পায় দুর্গার চুরি করে আনা মালাটা—কিন্তু সে স্মৃতিকেও তো বয়ে বেড়ানো যায় না—সুতরাং অপু সেই মালাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, পুকুরের জলে পানা এসে একটু বাদে জলের স্তরকেও ঢেকে দেয়। অপু মুছে ফেলে দুর্গা-সম্পর্কিত গ্লানির স্মৃতিকে। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রধান ভূমিকা নেয় স্মৃতিই। অপুদের নিশ্চিন্দিপুর ছাড়ার অধ্যায়ে অপুর অব্যক্ত কান্নাই বড় হয়ে ওঠে, মাঝের পাড়া ষ্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল মিলিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গেও সেই স্মৃতির যন্ত্রণা ; কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা পেরনো বাঙালী মধ্যশ্রেণীর কাছে আর সেই স্মৃতি টেঁকে

না, প্রাত্যহিক জীবনের রূঢ়তা এত প্রকট—তার বদলে সত্যজিৎ তাই হরিহর-অপু-সর্বজয়ার যাত্রাকেই বড় করে তোলেন, ক্লোজ-আপে আমরা তাদের সামনের দিকে তাকানো মুখই দেখি। হরিহরদের পরিত্যক্ত বাস্তুভিটেতে একটি সাপ ঢুকে যায়—হরিহর বা অপুর ফেরার পথ থাকে না। কিন্তু এই সাপের ব্যবহারটি ছবির পক্ষে একেবারেই বেমানান মনে হয়, অপ্রয়োজনীয়।

বস্তুত পথের পাঁচালী সামনে এগোনরই ছবি। বাংলা চলচ্চিত্রকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল পথের পাঁচালী— এত বছর বাদেও যদি টালিগঞ্জ রাজনন্দিনীকে বা দুই পৃথিবীকে আঁকড়ে থাকে, সেটা সত্যজিৎ রায়ের ব্যর্থতা নয় আমাদের শিল্পবোধ আর মধ্যশ্রেণীর করুণ পরিণতিরই ফল সেটা। পথের পাঁচালী প্রথম জানিয়েছিল কিভাবে ব্যক্তি ও সমাজ, জীবন ও প্রকৃতি পরস্পরের হাত ধরে, কিভাবে শিল্প মেনে নেয় জীবনেব অঙ্গীকার। পথের পাঁচালীর সব সিকোয়েন্স নিয়ে টুকরো টুকরো শট নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করা যেতে পারে—দেখা যেতে পারে কিভাবে বিচ্ছিন্ন দৃশ্যমালার মত গেঁথে তৈরী করা হয়েছে আশ্চর্য এক চিত্রসম্ভার। ঐ কথা ঠিক যে চলচ্চিত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্প বলেই ভিস্যুয়াল সৌন্দর্যের একটা বড় ভূমিকা সেখানে থাকেই। কিন্তু প্রথম ছবি থেকেই সত্যজিৎ নিছক ওই সৌন্দর্য উপাদানেই আটকে থাকতে চাননি। পথের পাঁচালীর দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্য ছবির টানেই আসে। বাড়তি প্রয়োগ হিসাবে নয়। কিন্তু সত্যজিৎ প্রধানত মনে করান জীবনই আসলে সুন্দর। পথের পাঁচালীর অপু যেমন তার বিস্ময়বোধের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক মনন পেয়ে যায়; যার ফলে অপুর সংসারে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি উড়িয়ে দিয়ে সে জীবনকেই খোঁজে, দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যবোধকেও সত্যজিৎ তেমনই আধুনিক প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত করে দেন।

ইন্দিরঠাকরুণ থেকে অপু -এই প্রবহমান জীবনের আলেখ্যতে সত্যজিৎ ধরে দেন ব্যক্তি অপুর বিবর্তনের ইতিহাসকে। সেইসঙ্গে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন আমাদের সামাজিক ইতিহাসের স্তরগুলির সঙ্গে তার নিগূঢ় যোগাযোগকে। ছেঁড়াখোঁড়া জীবনকে নতুন চাদরে ঢেকে বাঁচতে চেয়েছিল ইন্দিরঠাকরুণ, পুরনো যুগের প্রতিনিধি সে জানত না ধার করা চাদরে সময়ের শীত বশ মানে না। তার এই বাঁচতে চাওয়া কত কুশ্রী হয়ে ওঠে। তার জন্য দুর্গা চুরি করা ফল নিয়ে আসে—তার ফোকলা মুখের হাসি এক ভয়াবহ পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেয়; তাকেও সর্বজয়ার রান্নাঘর থেকে জিনিস চুরি করতে হয়, আর ঐ বাঁচতে চাওয়ার উপর আছড়ে পড়ে সর্বজয়ার অনাদর ও অপমান। ফলে ঐ মৃত্যু, যাকে মনে হতে পারে সর্বজয়ার অনাদরের ফল, ইন্দিরের অবধারিত পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়। সেই মৃত্যুই সংক্রামিত হয়ে যায়— সর্বজয়া চোর হয়ে যায়। তা হলে রাস্তা একটাই। হরিহর রায় খুড়ো নয়, সর্বজয়া সেজখুড়ী নয়—গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর একাংশের উপরে ওঠার কুশ্রীতা তারা বরণ করতে পারে না। হরিহর তো শিল্পী হতে চেয়েছিল, সুতরাং ঐ গণ্ডি থেকে তাদের বেরিয়ে আসতেই হয়। সেজোখুড়া নিজেও এই সত্য জানিয়ে দেয়। এখানে অবশ্য সত্যজিতের মানবিকতাবাদী ভূমিকা একটু বেশী জায়গা নেয়। সর্বজয়া চলে যাওয়ার মুহূর্তে তাদের বাগানের ফল দিয়ে আসা হয়ত সেজোখুড়ীর চরিত্রের দ্বন্দ্বকেই প্রকাশ করে বা গ্রাম্য সংস্কার-ভীতি, কিন্তু ছোট জায়গায় থাকলে মনও ছোট হয়ে যায়—এ বোধ সেজোখুড়ীর কাছে আদৌ প্রত্যাশিত নয়। এটা আরোপিত, পরিচালক

নিজের কথা সেজোখুড়ির মুখে চাপিয়ে দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গেই বোধহয় একটু অভিযোগ তোলা যায় সর্বজয়ার চরিত্র প্রসঙ্গে। সর্বজয়ার ইন্দিরের প্রতি নিষ্ঠুরতা অনেকটাই স্বাভাবিক বলে বোঝা যায়; বিশেষত প্রবল দারিদ্র সত্ত্বেও হরিহর ইন্দিরঠাকরুণকে চাদর কিনে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও ইন্দির যখন অন্য আরেকজনের কাছে চাদর নিয়ে আসে, তখন সর্বজয়ার কাছে তা অপমানজনক মনে হতেই পারে—যার প্রতিক্রিয়ায় সে কঠোর হয়ে ওঠে, আর অভাবের সংসারে বাড়তি একজনের বোঝাও হয়ত তাকে কঠিন করে তোলে। কিন্তু ইন্দিরের প্রতি কখনো সে একটু কোমলতা দেখায় না। এটা একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। সর্বজয়া রক্তমাংসের মানুষ, অপু-দুর্গার প্রতি তার আচরণের মানবিকতার পাশে এটা একটু বেমানান। ইন্দিরের প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাকে এমন একমাত্রিক কেন করেছিলেন সত্যজিৎ? শুদু দারিদ্রের অসহনীয় চাপের প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য। কিন্তু সেজোখুড়ীর বেলায় যে দ্বন্দ্ব সত্যজিৎ একটু জোর করেই আনেন, সর্বজয়ার ক্ষেত্রে তা একেবারেই ব্যবহৃত হল না।

এইসব টুকরো অভিযোগ অবশ্য তোলা যায় ছবিটি পথের পাঁচালী বলেই, তা নাহলে পথের পাঁচালী-পূর্ববর্তী বাংলা ছবিতে এইসব ভাবনাচিন্তার কোন অবকাশই ছিল না। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ফেললে বোঝা যায় একমাত্র 'ছিন্নমূল' খানিকটা ধাক্কা লাগিয়েছিল আমাদের অনড় ফিল্ম-বোধে। সে ছবিতে পূর্ব-বাংলার ভিটেমাটি ছেড়ে আসার যন্ত্রণা যা ভাষা পেয়েছিল এক বৃদ্ধার সহজ আকুতিতে—সেই যন্ত্রণার পর হরিহর-সর্বজয়ার নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে আসা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

একটা প্রশ্নের সামনে অবশ্য দাঁড়াতেই হয়। একজন সমালোচক অন্য নানা প্রসঙ্গে পথের পাঁচালী সম্পর্কে বলেছিলেন, এটি সহনীয় বাস্তবতার ছবি। পথের পাঁচালী দারিদ্র্য দেখিয়েছে, জীর্ণতা দেখিয়েছে, রূঢ়তা দেখিয়েছে। দেখায়নি জমিদারদের অত্যাচার বা কোন বিপ্লবের পথ। এ জন্য কি এ ছবিকে বাতিল করতে হবে! একথা অনস্বীকার্য যে পথের পাঁচালী আমাদের চলিচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম শিল্পোত্তীর্ণ ছবি—কিন্তু শিল্পরসই কি কোন চলচ্চিত্র বিচারের একমাত্র উপাদান হতে পারে। নিশ্চয়ই না।। পথের পাঁচালী বিপ্লবী ছবি নয়, সমাজ বদলানোর কথা বলেনি সে, আর এ ছবি রচিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপের লড়াইয়ের কয়েক বছর পরে। এ ইতিহাস মাথায় রেখেও আমরা দেখি পথের পাঁচালী যা করেনি, তা করবার অবকাশ এখানে ছিল না। ত্রুফো ভুল করেছিলেন কিন্তু আমরা জানি এ ছবি ভারতীয় কৃষকদের কথা নয়। সত্যজিৎ টেনে আনেন গ্রামীণ মধ্য শ্রেণীকে, তাদের পতন ও বিপর্যয়কে। এটা তাঁর পরিচিত জগৎ। এর বদলে অন্যতর কোন দুঃসাহস দেখাননি বলেই বরং আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করি। নিজের সীমা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। বস্তুত সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রের প্রথম পর্বের সব থেকে বড় গুণই এই মাত্রাবোধ। এই সীমারেখার মধ্যে চলাফেরার একটু বিপদ অবশ্যই আছে, তাতে কোন কোন সময়ে ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জানা যায় না, ফলে জলসাঘরে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের চিত্রায়ণে ইতিহাসের উল্টোদিকে হাঁটেন তিনি। কিন্তু পথের পাঁচালীসহ অপু-চিত্রত্রয়ীতে তা ঘটে না। সত্যজিৎ সচেতনভাবেই, মধ্যশ্রণীকেই উপজীব্য করেন। আমাদের সাহিত্য ও উপন্যাস, ছোটগল্প মধ্যশ্রেণীর গণ্ডি থেকে যেখানে বেরোয়নি, সেখানে অর্বাচীন ফিল্ম তা থেকে বেরিয়ে আসবে এটা আশা করা যায় না। এবং তা

নিয়ে অভিযোগও তোলা যায় না, যদি সেই মধ্য শ্রেণীর যথার্থ রূপায়ণ দেখা যায়। মধ্যশ্রেণীর আত্মসন্তুষ্ট অবস্থান 'উদয়ের পথে' জাতীয় ছবিতে যা আরেকটু তৃপ্তি পেয়েছিল, সত্যজিৎ তাতে ধাক্কা লাগিয়েছিলেন। ইন্দির থেকে কাজল পর্যন্ত দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় সত্যজিৎ সমাজিক ইতিহাসের একটা অধ্যায়কেই ধরে দেন, যে ইতিহাসের আরেক পর্ব তিনি দেখিয়েছিলেন পথের পাঁচালী-র কুড়ি বছর পরে 'জনঅরণ্য'-তে। জমিদারী শোষণ নেই —কিন্তু দেনার দায়ে বাগান বিক্রি হয়ে যাওয়া বা রায় খুড়োর কাছে তিনমাসের মাইনে বাকি পড়ে যাওয়ায় যে সাংসারিক বিপর্যয় তার কোন প্রকট ঘোষণা না রাখলেও অর্থনীতির সূত্রগুলিই ধরা পড়ে এখানে। আর সত্যজিৎই নিষ্করুণভাবে জানিয়ে দেন, যদিবা নিশ্চিন্দিপুরের গণ্ডি ছাড়তে পারে হরিহরেরা, তাদের মানসিক বৃত্ত প্রসারিত হয় না। পুরনো ঐতিহ্য অন্য রূপ নেয়-হরিহর তাই কথকতার জীবিকাতেই মুক্তি খোঁজে। এই ভুলে আটকে থাকে না বলেই অপু প্রেসের কাজে যোগ দেয়। বেরিয়ে আসতে পারে গ্রামীণ জীবন থেকে।

পথের পাঁচালী গ্রাম থেকে শহরে আসার পথ-পরিক্রমাকেই ধবে, সামাজিক ইতিহাসের সূত্র অনুসরণ করে, কিন্তু এইসব বিচার-বিশ্লেষণের শেষেও বাড়তি পাওনা থেকে যায় অনেককিছু। অপু দুর্গার শৈশব, চড়ুইভাতি, ইন্দিরঠাকরুণের দন্তহীন মুখের হাসি , সর্বজয়ার বেদনা, হরিহরের বিশ্বাস—এ সবগুলিই আমাদেব জীবনের ভিতর থেকে উঠে আসা। আর রাংতার মুকুট মাথায় হেঁটে যায় যে অপু, তাব মধ্যে যেমন আমরা খুঁজে পাই আমাদেরই শৈশবকে—দুর্গার এলোচুলে বৃষ্টিতে ভেজাব দৃশ্যে তেমনি আমাদের অচেনা জগতের রোমান্টিক রহস্যময়তা মূর্ত হয়ে ওঠে। এই অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্যও পথের পাঁচালী দেখতে হয় এত বছর ধরে, ফিরে ফিরে।

'পথের পাঁচালী'র প্রাসঙ্গিকতা

সোমেশ্বর ভৌমিক

'নচিকেতা ওয়াজ এ ফুল'—তবু তারই উক্তি, 'সবকিছু জ্বলছে, ব্রহ্মান্ড পুড়ছে।'

আসলে সংবেদনশীল শিল্পী তাঁর উপলব্ধির দর্পণে অগ্নিগর্ভ এক যুগের অতিস্বচ্ছ প্রতিফলনকে প্রকাশ করার লোভ সংবরণ করতে পারেন না আর। হয়তো নিজের রচনার বিষয়গত অস্বচ্ছতা, কৃত্রিমতা এবং দুর্বলতাই তাঁকে এই পথ অবলম্বনে বাধ্য করে। নিজের অনুভূতিকে শিল্পের ভাষায় সম্পূর্ণ করতে না পেরে, কিছুটা মরিয়া হয়েই যেন সারসংকলক এই বাক্যটিকে শেষ পর্যন্ত তিনি বসিয়ে দেন 'নির্বোধ' চরিত্রটির উচ্চারণে। শিল্পের দাবী ক্ষুন্ন করেই তাঁকে পালন করতে হয় তাঁর জীবনবোধের দায়, যুগসচেতন মানসিকতার দায়িত্ব। ঋত্বিকের 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'-ই অবশ্য একমাত্র উদাহরণ নয়। ভারতে প্রাপ্তমনস্ক, জীবনবোধে সমৃদ্ধ চলিচ্চিত্ররচনার ধারাটি, দু-একটি বিরল ব্যতিক্রম বাদে, সাধারণভাবেই প্রক্ষিপ্ত সংযোজনের এই ট্র্যাজেডিতে আচ্ছন্ন।

অথচ এই ধারার সফল সূত্রপাত যেখানে, সেই 'পথের পাঁচালী' ছবিটি কিন্তু তার নিরুচ্চার শিল্পনির্মিতিব বৈশিষ্ট্যেই স্রষ্টার জীবনবোধকে প্রতিপন্ন করেছিল অনায়াসে। শিল্পের মহিমা আর কখনও এমন ভাস্বর হয়ে ওঠে নি ভারতীয় সিনেমার পর্দায়, জীবনের জটিল প্রবাহ এমনভাবে আধিকার করেনি সেলুলয়েডের দৈর্ঘ্য। আজ, পঁচিশ বছর পরেও, সেই তাৎপর্যেই মহীয়ান হয়ে ওঠে এ-ছবি। হঠাৎ - আলোর-ঝলকানি হিসেবে এর খ্যাতি বিশ্বচলচ্চিত্রের দরবারে ভারতীয় সিনেমার আসন স্থায়ী করতে এর অবদান — নিছক আলঙ্কারিক গুরুত্বেই সীমাবদ্ধ থাকে এসব ঐতিহাসিক তথ্যের আবেদন।

একথা সত্যি অন্ততআমাদের কাছে, আমরা— যারা ছবি দেখছি মাত্র অল্প ক-বছর ধরে। 'পথের পাঁচালী'র যুগের মানুষ নই আমরা। এ-ছবির প্রথম আর্বিভাবের সেই যুগ আর আমাদের মধ্যে প্রায় সার্ধ দশকের ব্যবধান। এই অন্তবর্তী সময়ে ভারতীয় ছবির জগতে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষাই হয়ে গেছে, অল্পবিস্তর সাফল্যের সঙ্গে। ভারতীয় সিনেমার নিরবচ্ছিন্ন শিল্পহীনতা নিয়ে আমাদের জায়মান চলচ্চিত্রচৈতন্যেজাগেনি হীনমন্যতা, যার শিকার আমাদের অধিকাংশ পূবসূরী। দেশজ চলচ্চিত্রে আজ আমার যথেষ্ট আস্থাবান।

আবার, শিল্প-সংস্কৃতির জগতে আমরা এসেছিলাম একটা অস্থির সময়ে। প্রচলিত রাজনৈতিক ধ্যানধারণার সমালোচনা আর পুনর্মূল্যায়নের সময় তখন। পুনর্মূল্যায়ন চলছিল শিল্পের জগৎকে ঘিরেও। বিশেষ করে অবক্ষয়ী প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির বিপক্ষে প্রগতি-সংস্কৃতির ভূমিকা এবং কার্যকলাপ নিয়ে শুরু হয়েছিল বিতর্ক। সেই আলোচনায় সমাজের প্রতি শিল্পীর দায়িত্বের বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছিল।

অথচ ঠিক সেই সময়েই একটা প্রবল সামাজিক আলোড়নের অসম্পূর্ণ, যান্ত্রিক প্রতিফলন দেখা গেছে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে, একে একে তাঁর কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি আমাদের সমসাময়িক 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'সীমাবদ্ধ' অথবা 'অশনি সংকেত'। মনে হয়েছে প্রখর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাহিত শিল্পরীতির প্রতি অসীম পক্ষপাত, অধিগত

বুর্জোয়া মানসিকতার সঙ্গে সহজাত সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির এক জটিল বিন্যাস যুগের অন্তর্বস্তু উপলব্ধির পথে তাঁর অন্তরায়। সমালোচনার চরমে পৌঁছে এমন কি অবক্ষয়ের পথিক বলেও তাঁকে চিহ্নিত করেছেন কোন কোন মহল। বিরূপতার এই প্রতিকূল পরিবেশেই আমরা পেয়েছি শিল্পীর বহু-আগে-ফেলে-আসা দিনের স্পর্শ—'পথের পাঁচালী' ছবি। আমাদের চৈতন্যে উঠেছে আলোড়ন— এ-ছবির প্রতিটি ফ্রেমে বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায়, এর সার্বিক ঐশ্বর্যের দ্যুতিতে।

সরল নিস্তরঙ্গ গ্রাম্যজীবনের নিরাভরণ, বাস্তবমুখী আলেখ্য—এই হলো 'পথের পাঁচালী' বিষয়ে প্রচলিত খ্যাতি। জানি না গ্রামের জীবনের ছবি বলেই শহুরে বুদ্ধিজীবি মানসিকতায় তার সম্পর্কে সরলতার ধারণাটি অনিবার্য হয়ে উঠেছে কিনা। সন্দেহটা কিন্তু থেকেই যায়। সম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের যে বিকৃত, সুবিধাবাদী সহবস্থান এদেশের আর্থনীতিক কাঠামোকে পঙ্গু করে দিয়েছিল, উপরিসৌধেও যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল তার। ফলস্বরূপ, এদেশে বুদ্ধিজীবী মানসিকতায় বুর্জোয়া ধ্যানধারণার প্রলেপটি যথেষ্ট পুষ্ট হলেও সামন্ত মূল্যবোধের কোন অবশেষই সেখানে পাওয়া যাবে না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় কি? বিশেষত আধুনিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটি তো প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর রূপান্তর। সমান্ত প্রভুসুলভ পিছুটানে (nostalgia) আচ্ছন্ন শ্রেণীটির কাছে গ্রাম মানেই 'সুখের নীড়'। 'পথের পাঁচালী' - কে নিয়ে মুগ্ধকাব্য প্রচুর হলেও এ - ছবির আসর মূল্য যে আজও নিরূপিত হয়নি, তার প্রধান কারণ বোধহয় বুদ্ধিজীবীর এই আত্মগত (subjective) ধারণা, যা যুক্তিনির্ভর বস্তুনিষ্ঠ (objective) বিশ্লেষণের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

কার্ল মার্কস ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতীয় গ্রামসমাজকে গতিহীন অচলায়তন বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি এ-ও বলেছিলেন, যে, অষ্টাদশ শতকে পুঁজিবাদ-সম্রাজ্যবাদের সংস্পর্শে এসে সে-সমাজে ভাঙন দেখা দিয়েছিল, তাতে এসেছিল অভূতপূর্ব গতি। ফলে আর্থনীতিক বৃত্তি এবং বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার যে সমীকরণ ছিল সেই গ্রামসমাজের বৈশিষ্ট্য, তাতেও অল্প বিস্তর পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। অন্তত বৃটিশ-প্রবর্তিত আধুনিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার চাপে এই অবক্ষয়ী সামাজিক প্রথার যে নাভিশ্বাস উঠেছিল, কোন সন্দেহ নেই তাতে। 'পথের পাঁচালী' ছবির জগৎ তো সেই সংঘাত জনিত অবক্ষয়েরই এক খন্ডাংশের সার্থক প্রতিচ্ছবি। 'পথের পাঁচালী' দেখতে গিয়ে অপুর চরিত্রকে নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। কিন্তু সেটিকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে ধরে নিলে এ ছবির আসল বক্তব্য থেকে আমরা অনেকদূরে সরে আসবো মনে হয়। কোন কেন্দ্রাভিগ প্রবণতার সন্ধান এখানে না করাই ভালো। কোন একটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে 'পথের পাঁচালী' গড়ে ওঠেনি, যেমন গড়ে উঠেছে 'অপরাজিত' বা 'অপুর সংসার'। এ-ছবির কেন্দ্রে আছে সমগ্র রায়-পরিবার। পরিবারের প্রত্যেকেই এখানে সমান গুরুত্বপূর্ণ—ইন্দিরঠাকরুণ, হরিহর, সর্বজয়া, দুর্গা এবং অপু। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আদানপ্রদান ত বটেই, তাছাড়া বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্ক, আদানপ্রদান—এসবের এক জটিল বিন্যাস নিয়েই এ ছবির সংগঠন। তাই তো অনেক ধৈর্য ধরে, অনেক সময় নিয়ে, পাঁচটি মূল চরিত্রেকে বিকশিত করেছেন পরিচালক। এ-ছবিতেই প্রসন্ন গুরুমশায়ের বেলায় যেমন করেছিলেন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (typage establishment) প্রতিষ্ঠার সেই সংক্ষিপ্ত পথটি সযত্নে পরিহার করেছেন এদের ক্ষেত্রে।

চরিত্র-বিকাশের মধ্যে দিয়ে জটিল এক সমাজ-প্রক্রিয়াকে ফুটিয়ে তোলার চিন্তায় আচ্ছন্ন সত্যজিৎ অসংখ্য ডিটেলের (detail) সাহায্য নিয়েছেন ছবিতে। গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবন থেকে আহরণ করা এইসব ডিটেলের দৃশ্যগত তুচ্ছতাও হয়তো সরলতার বিভ্রম তৈরীতে ইন্ধন জুগিয়েছে। কিন্তু প্রয়োগকৌশলের নৈপুণ্যে তাদের বিষয়গত ঐশ্বর্য বা ভাবসমৃদ্ধির যাথার্থ্য যদি উপলব্ধি করি, তারপরেও সরলতার ধরণাটি পোষণ করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে না কি? ডিটেলের অফুরন্ত সমারোহ এখানে। তাদের কোনটি ফুটিয়ে তোলে ব্যক্তিগত অনুভূতি, কোনটি হয়ে ওঠে শ্রেণী বৈশিষ্টের দ্যোতক, আবার কোনটি ব্যাখ্যা করে ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য। আবার একাধিক ব্যঞ্জনার সংমিশ্রণও কোন কোনটা। সব মিলিয়ে আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে ওঠে প্রতিটি চরিত্র , জীবন্ত হয়ে ওঠে সমাজ, ইতিহাস।

ডিটেলের এ প্রয়োগকে অন্যভাবেও দেখেছেন কেউ কেউ। কিন্তু তাঁদের অনুসরণে ডিটেলের ব্যবহারকে এক্ষত্রে ব্যবহারিক (behaviouristic), প্রাকৃতিক (atmospheric) বিন্যসগত (textual) ইত্যাদি আলঙ্কারিক বা প্রকরণগত অভিধায় চিহ্নিত করলে, সেগুলির ব্যঞ্জনাকেই সীমাবদ্ধ করা হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ধরা যাক, রেলের কথা। অপু-ত্রয়ীতে অনেকবার এসেছে এই রেলের কথা। তবে 'অপরাজিত' বা 'অপুরসংসার' ছবি দুটিতে রেলের ব্যবহার একটু ব্যাপক অর্থে, বিষয়গত প্রধান উপাদান (leit motif) হিসাবে। 'পথের পাঁচালী' - তে যে দুবার এর ব্যবহার হয়েছে, সেখানে ডিটেল হিসেবেই এর প্রয়োগ। প্রথমবার, সন্ধেবেলায় ঘরে বসে অপুর রেলের বাঁশী শোনায়, আর একবার দিদির সঙ্গে অনেক দুরের পথ পেরিয়ে কাশবনের ধারে রেলগাড়ি দেখায়। কী বলবো এই ডিটেলকে? প্রাকৃতিক না বিন্যাসগত? বরং এর মধ্যে গভীরতর কোন দ্যোতনার সন্ধান পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক।

তাঁর 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ' (The Future Results of British Rule in India) প্রবন্ধে মার্ক্স লিখেছেন, "The railway system will .....become in India truly the forerunner of modern industry.....Modern industry, resulting from the railway system, will dissolve the hereditary diviisions of labour, upon which rest the Indian castes, those decisivc impediments to Indian power."

অবশ্যই সত্যজিৎ রায় মার্ক্স-এর বিশ্লেষণ-অনুসারে আধুনিক শিল্প-অর্থনীতির সঙ্গে পুরনো গ্রামীণ অর্থনীতির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের অবতারণা করেন নি ছবির কোথাও। কিন্তু মূল উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে অনেকখানি বদলে নিয়ে অপু-দূর্গার রেলগাড়ি দেখে ফিরে আসার পথে মৃত ইন্দিরঠাকরুণকে আবিষ্কার করার ঘটনাটি সাজান তিনি। আধুনিক যুগের সঙ্গে অপুর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর মুহূর্তেই কেন এভাবে ছিন্ন হলো প্রচীন যুগের সঙ্গে তার যোগসূত্র? অথচ রেলগাড়ির সঙ্গে অপুর মানসিক দূরত্ব অক্ষুণ্ণই থাকল—দৃশ্যসুখের আবেশ তো সাময়িক।

ব্যঞ্জনা মনে হয় এখানে আরও ব্যাপক। পুঁজিবাদী অর্থনীতি আর সামন্ত অর্থনীতির সংঘাতের যে কুফল সেটাই হয়তো এখানে প্রধান বক্তব্য। আর তারই সঙ্গে বোধহয় জড়িয়ে আছে এক অনিবার্য বিষাদ—এই সংঘাতে প্রচীনের বিনাশ হলো সত্য, কিন্তু নতুন ব্যবস্থার স্বাভাবিক উন্মেষ তথা বিকাশের সুফল পেল না ভারতের গ্রামসমাজ।

এই সিদ্ধি বা সিদ্ধান্ত যে কোন বিশেষ মতাদর্শে অনুপ্রাণিত সত্যজিতের সচেতন অভিপ্রায় অনুসারী, এমন দাবী করা অসঙ্গত। কিন্তু শিল্পের সংগঠনে শিল্পীর পরিকল্পনা বহির্ভূত কোন গভীরতর ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠার ঘটনা দুর্লভ হলেও অবাস্তব কিছু নয়। বরং তা শিল্পের মহত্তেরই প্রকাশ।

'পথের পাঁচালী'তে রেল প্রসঙ্গে আরও লক্ষ করার বিষয়, এর আগে পর্যন্ত ছবিতে একটা আনন্দ-উত্তেজনার সুর;কিন্তু এর পর থেকেই ছবির মেজাজ ক্রমশ বিষন্ন ভারাক্রান্ত হয় আসে। ছবির মূল দুর্ঘটনাগুলো পরপর ঘটতে থাকে—ইন্দিরঠাকরুণের মৃত্যু, হরিহরের নিরুদ্দেশ যাত্রা, দুর্গার মৃত্যু এবং রায়-পরিবারের নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ। অর্থাৎ রেলের প্রসঙ্গটি নিঃসন্দেহে ছবিতে একটা পর্বান্তর সূচিত করে। রায়-পরিবাবের জীবনযাত্রার খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে না এসেও রেলগাড়ি যে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে গেল, সংকট-ভাঙ্গনকে যেভাবে তরান্বিত করলো, তাতে আদ্যোপান্ত এই ঘটনায় ঐতিহাসিক মাত্রা আবিষ্কারের চেষ্টা অপচেষ্টা হবে না নিশ্চয়ই! আর সেইজন্যেই, মার্কস যেমন বলেছিলেন, বৃটিশ-প্রবর্তিত শিল্প-অর্থনীতি ব্যবস্থা, বিশেষ করে রেলওয়ে, হলো ইতিহাসের নিমিত্তমাত্র (unconscious tool of history), 'পথের পাঁচালী'-র রেলগাড়ির প্রসঙ্গটিকে সেই আলোয় পুনর্মূল্যায়ণ করা যায় বোধহয়। এমনকি এই তাৎপর্য স্বীকারের সূত্রেই 'পথের পাঁচালী'-র যথার্থ রসাস্বাদনের কেন্দ্রটিও পেয়ে যেতে পারি আমরা। জন্ম-মৃত্যুর তরঙ্গাভিঘাতসহ চিরন্তন গ্রামীণ জীবন প্রবাহের কাব্য—এ-ছবি সম্পর্কে এই যে প্রচলিত ব্যাখ্যা, তাতে এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত যোগ করে সমাজ-ইতিহাসের এক অমোঘ প্রক্রিয়াকে এ-ছবি থেকেই খুঁজে নিতে পাবি।

বৃটিশ-প্রবর্তিত নতুন আর্থনীতিক পরিবেশে আর্থনীতিক বৃত্তিনির্ভর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অনুপযোগিতায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গ্রামীণ মধ্যবিত্ত বুদ্ধি জীবী সম্প্রদায়। হরিহব আর তার পরিবার সেই সম্প্রদাযেবই প্রতিভূ। আবার অর্থসর্বস্ব পরিবেশে অর্থ বিষয়ে হরিহরের উদাসীনতা, অর্থ-বিদ্যা বিনিময় প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হতে তার প্রাথমিক আপত্তি পুরনো যুগের গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী মানসিকতারই লক্ষণ। ফলে হরিহরেব অস্তিত্বের সংকট এক বৃহত্তর সমস্যার দ্যোতক হিসাবেই উপস্থিত। এবং দক্ষ রূপায়ণের মাধ্যমে 'পথেব পাঁচালী' ছবিতে তা সার্থকও হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গত 'পথের পাঁচালী'-র এক দেশজ অখ্যাতির বিষয়টিও বিচার করে নেওয়া যেতে পারে। এ-ছবির কাব্যমাধুর্য এর সমাজবাস্তবতাকে লঘু, এমনকি বিকৃত, করে দিয়েছে—এই হলো সমালোচনা। যুক্তি হিসাবে বলা হয়, দ্বন্দ্ব সঙ্কুল গ্রামজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বহু অনুষঙ্গকেই আড়ালে রেখেছে বা উপেক্ষা করেছে এ-ছবি, যেমন ধনী জমিদার বা গরীব কৃষক। আক্ষরিক অর্থে কথাগুলো সত্যি কিন্তু এর জন্যেই 'পথের পাঁচালী'-র সমাজবাস্তবতায় ঘাটতি পড়েছে— এমন সিদ্ধান্ত বোধহয় যান্ত্রিক।

শিল্পে জীবনই কথা বলে, কিন্তু জীবনের সব খুঁটিনাটি, সমস্ত আনাচ-কানাচ একটিমাত্র শিল্পকর্মেই ধরা পড়বে, এমন আশা বাতুলতা। কোন সমাজ-পরিবেশের সামগ্রিক ছবিকে তুলে না ধরলেই শিল্পকর্ম ব্যর্থ বা বিকৃত হয়ে যায় না বোধহয়। অলোচ্য শিল্পকর্মের নির্দিষ্ট পরিধিতেই প্রথমে যাচাই করে দেখা দরকার, কোন সমস্যার সুষ্ঠু রূপায়ণে সেটি সার্থক হয়েছে কিনা। এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকলে একমাত্র তখনই সেই শিল্পকর্মে নির্দিষ্ট পরিধিটির যাথার্থ্য বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যায়।

'পথের পাঁচালী'-র-ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় প্রশ্নে আমরা আসতে পারি কি? 'গ্রামজীবনের নিপুণ আলেখ্য' বলে এ-ছবির যে খ্যাতি, আলোচ্য অখ্যাতি, বোঝাই যায় , তারই এক যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া। কিছুটা অভিমানও বোধহয় মিশে আছে এই প্রতিক্রিয়ায়—কারণ গ্রামের বাস্তব সমস্যাকে সম্যক না বুঝে তাকে নিয়ে কাব্য করার শহুরে মানসিকতা, গ্রামীণ জীবন বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের চোখে অবজ্ঞাপ্রসূত রোমাণ্টিক অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং স্বভাবতই এটা তাঁদের আহত করে। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'- কে যদি দেখি আধুনিক আর্থনীতিক পরিবেশে গ্রামীণ মধ্যবিত্তের সংকটের ছবি হিসেবে, তাহলে ধনী জমিদার বা দরিদ্র কৃষকের অনুষঙ্গ এই বিন্যাসে অপরিহার্য মনে হয় না। ববং কিছুটা রোম্যাণ্টিক চেতনা নিয়েই সত্যজিৎ যে সংকটের গভীরে পৌঁছাতে পেরেছেন, রূঢ় বাস্তবের আলোয় তাকে যাচাই করেছেন, এর জন্য প্রশংশাই প্রাপ্য তাঁর।

সাধারণ অর্থে, 'পথের পাঁচালী' ছবির উপজীব্য গ্রামীণ জীবনযাত্রার গণ্ডি খুবই সীমায়িত —হরিহরেব ভিটের বাইরে তা পা বাড়ায় না কখনও। তবে সেই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও জীবনের বৈচিত্র্য, ব্যাপকতা, গভীরতা, তুচ্ছতা—সব-কিছুই আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে এ ছবি।

ইন্দির 'গ্রামবংলার আত্মা', হরিহর গ্রাম্য 'অচলায়তন', ভাগ্যবাদিতার প্রতীক সর্বজয়া গ্রাম্য সংকীর্ণতা, তুচ্ছতার আর অপু-দুর্গা প্রতীক গ্রাম্য সারল্যের—এই সব বর্ণনার অধিকাংশেই আলঙ্কারিক উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য। এই রূপকার্যে এদের না দেখাই ভালো। নিজস্ব শ্রেণীগণ্ডীর মধ্যেই তারা জীবন্ত, সার্থক এবং প্রতিনিধিস্থানীয়।

"Ray came along to recharge the batteries of humanist cinema at a time when neo-realism had sacrificed its momentum." লিখেছেন বৃটিশ সমালোচক পেনিলোপ হাউস্টন। 'পথের পাঁচালী' ছবিব আলোচনায় ইতালীয় নয়াবাস্তবতার প্রসঙ্গ এসে পড়ে প্রায় অনিবার্যভাবেই। অথচ ১৯৫৭ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সত্যজিৎ মন্তব্য করেছিলেন "পথের পাঁচালী'-র চলচ্চিত্র-আঙ্গি -কের সঠিক ভিত্তি নয়া-বাস্তবতাবাদী বা অন্য কোন ধরনের চলচ্চিত্র নয়, এমন কি এই আঙ্গি ক অন্য কোন চলচ্চিত্র কর্ম থেকেও উদ্বুদ্ধ নয়, বরং এই আঙ্গিক বিভূতিভূষণের এই উপন্যাস থেকেই উদ্বুদ্ধ"। সেই প্রাথমিক উচ্ছ্বাস পর্বে, দেশবিদেশে 'পথের পাঁচালী'-র সংগঠন আর ইতালীয় নয়া-বাস্তবতাবাদী চলচ্চিত্রের সংগঠনে কিছু আপাত-সাদৃশ্য লক্ষ্য করে 'পথের পাঁচালী'-কে নয়াবাস্তবতার সফল উত্তরসূরী হিসেবে প্রচার করা হচ্ছিল যখন মন্তব্যটি তারই প্রতিক্রিয়ায়। পিঠ-চাপড়ানোর ভঙ্গিতে প্রকাশিত এইসব মন্তব্যে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা কতটা ছিল জানি না, কিন্তু তাঁর স্বকীয়তার অবদানকে অনেকখানি খাটো করে দিয়েছিলেন এইসব সমালোচক। সত্যজিতের মন্তব্যে সঠিক স্বীকৃতির অভাবে একটা ক্ষোভের প্রচ্ছন্ন সুর ধরা পড়ে।

তবে বিভূতিভূষণের মূলভাব এবং তার অনুপ্রেবণা শেয পর্যন্ত তাঁর কতটা সহায় হয়েছিল,এব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। হয়তো লক্ষ্য করেন নি সত্যজিৎ, চিত্রনাট্য রচনার সময়ে অনিবার্য পরিবর্জন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি অতিক্রম করে গেছেন বিভূতিভূষণের গন্ডি, ঔপন্যাসিকের বিশুদ্ধ গ্রামীণ (idylic) মেজাজের নমনীয়তা। 'পথের পাঁচলী' ছবির সত্যজিৎ অনেক ঋজু, প্রায় সমাজবিজ্ঞানী এক শিল্পী।

'পথের পাঁচালী'-র মেজাজের অনেক ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন ববং বৃটিশ সমালোচক-পরিচালক লিণ্ডসে অ্যাণ্ডারসন। এ-ছবিব সমালোচনায় রেনোয়া এবং ফ্লাহার্টির প্রসঙ্গ এনে

তিনি লিখলেন, "'To admire on principle', coleridge ovserved, 'is the only way to imitate without loss of orginality.' Ray's admiration of Renoir is of this kind." আবার "To make pather panchali Ray must have lived as closely with his characters as Flaherty had to live with his Polynesians when he made Moana."। কিন্তু আসল কথাটা উপসংহারে বলেন অ্যাণ্ডারসন্, "It is to compliment Ray, not to deny his originality, that I mention names like Renoir and Flaherty. And another fertilsing influence has surely been the neo-reasim of De Sica, Zavattini and Rosellini."

ন্যাট্যনির্মিতির ক্ষেত্রে এ-ছবি সনাতন বর্ণনাত্মক রীতিকেই আদ্যন্ত অনুসরণ করেছে। অথচ প্রচলিত অর্থে আরোহণ-অবরোহণের ধারাটিও এখানে বিশ্বস্তভাবে আনুসরণ করা হয়নি। বরং নয়াবাস্তবতার রীতিতে ছোট ছোট আপাততুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এগিয়েছেছবি। তবুও সেই বহুনন্দিত ইতালীয় ধারার সঙ্গে 'পথের পাঁচালী'-র একটি মৌলিক পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। নয়া-বাস্তবতার প্রধান আশ্রয় ছিল তাৎক্ষণিক সমাজসংকটের রূপায়ণ। সেই সংকটে আপন্ন দরিদ্রশ্রেণীর জন্যে উদ্বেগটাই সেখানে বড়ো হয়ে ফুটে উঠতো। সমস্যার কোন গভীর বিশ্লেষণে যাওয়ার চেষ্টা থাকত না আর সময়ের ব্যপ্তি হতো খুবই সংকীর্ণ। 'পথের পাঁচালী' - তে সময়ের ব্যাপ্তির যে আভাস সত্যজিৎ রাখলেন, নিঃসন্দেহে ধ্রুপদী চলচ্চিত্র ই তার অনুপ্রেরণা। বহমান জীবনের বিশিষ্ট এক যুগসন্ধি ক্ষণে ব্যাপক একটি সামাজিক শ্রেণীর সম্পূর্ণ রূপটি ফুটে উঠলো তাঁর হাতে।

অথচ গঠনরীতিতে ধ্রুপদী চলচ্চিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আত্মস্থ করেও এমন তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক হয়ে উঠেছে আর কটা ছবি? পরিচালকের অসামান্য পর্যবেক্ষণশক্তি ছবিটিকে শুধু কাব্যমাধুর্যেই পূর্ণ করে নি, সামাজিক পরিবর্তনের এক মননশীল বিশ্লেষণ গড়ে তুলতেও তার অবদান অপরিসীম। আর এই বিশ্লষণাত্মক মাত্রার জোরেই 'পথের পাঁচালী' ধ্রুপদী চলিচ্চিত্ররীতির চেয়েও অগ্রগামী—সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রে।

নয়া-বস্তাবতার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য আরও আছে। ইতালীর সেইসব ছবিতে পারিপাট্যের অভাবই ছিল রীতি, কতকটা ফ্যাশন । সত্যজিৎ কিন্তু সে-পথে পা-ই বাড়াননি। অনেক বাধা বিপত্তি এবং অর্থাভাবের মধ্যে তোলা হলেও, 'পথেরর পাঁচালী'-র অঙ্গসৌষ্ঠবে এতটুকু ত্রুটি চোখে পড়বে না দর্শকের।

বলা যায় সত্যজিৎ ধ্রুপদী-রীতির থেকে নিয়েছেন তার সংগঠন-নৈপুণ্য, পারিপাট্য আর নয়া-বাস্তবতা থেকে তার সমাজসচেতন বাস্তবমুখীনতা। কিন্তু তার সঙ্গেই নিজস্ব এক বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গী যোগ করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'পথের পাঁচালী'-র সংগঠন। সেই বিশ্লেষণে সোচ্চার আবেগের প্রাবল্য নেই, আছে সমাহিত, নিরুচ্চার প্রজ্ঞার পরিচয়। তাই তা দর্শকের মনের মধ্যে গিয়ে আঘাত করে, তার আবেগকে উজ্জীবিত করে আনায়াসে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের তো বটেই, হয়তো বিশ্বচলচ্চিত্রের দিগন্তকেও প্রসারিত করেছিলেন সত্যজিৎ রায়, সেই ১৯৫৫ সালেই।

সূত্র নির্দেশ

১। মার্কস-এঙ্গেলস্, 'দ্য ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডন্স'; ১৯৬৮, পৃঃ৩৪।

২। মন্তব্যগুলি পাওয়া যাবে আনন্দম ফিল্ম সোসাইটি প্রকাশিত 'মন্তাজ' পত্রিকায়। 'সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা', জুলাই ১৯৬৬।

একটি ব্যক্তিগত চিঠি

মৃণাল সেন

আজ, এই বিশেষ দিনটিতে[1], এক বিরাট মাপের মানুষকে শ্রদ্ধা জানাতে কী লিখি কী বলি কী দিয়ে শুরু করি আর শেষ করি কী ভাবে ভেবে পাই না। হাজারখানেক শব্দের মধ্যে আটকে থেকে রকমারি বিশেষণে জর্জরিত কণ্টকিত অথবা সমৃদ্ধ কোন প্রবন্ধ রচনা—যেধরণের লেখার প্রবণতা আজকাল বড্ডবেশী দেখতে পাই পত্রিকায়— সে ধরণের লেখায় আমার মন সায় দেয় না। ছোট্ট জায়গায় যেখানে প্রকৃত অর্থে বিশ্লেষণের সুযোগ কম, নেই বললেই চলে, সেখানে হঠাৎ-ই মনে হল একান্ত অন্তরঙ্গ একটা ঘরোয়া কথা টেনে আনলে কেমন হয়। খুবই প্রাসঙ্গিকক কথা, অর্থবহ, মুহূর্তের জন্য হলেও স্তব্ধ বিস্ময়ে থিতিয়ে যাওয়ার মত ঘটনা। অন্তত আমার স্ত্রীর আর আমার যা হয়েছিল। চার বছরও হয়নি একটা ঘটনা। ছেলের চিঠি এল শিকাগো থেকে। আমাদের একমাত্র ছেলে। ছেলের মাকে লেখা চিঠি। রান্নাঘরে ব্যস্ত আমার স্ত্রী। দুহাতই ব্যস্ত। বললেন আমাকে, পড়। আমি এরোগ্রামটা সযত্নে খুলে পড়তে শুরু করলাম। ছেলে লিখছে ঃ মা, মনে পড়ে, ছেলেবেলায় তুমি একবার আমাকে সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত' দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলে? তুমি আগেও একবার দেখেছিলে। তবু আমাদের পাড়ায় প্রিয়া সিনেমায় আসতে আমি আর তুমি গিয়েছিলাম। ছবি দেখতে দেখতে তুমি খুব কেঁদেছিলে। তোমার কান্না দেখে আমারও কান্না পেয়েছিল। বাড়ি ফিরে তুমি আমাকে বলেছিলে, বড় হয়ে তুইও একদিন চলে যাবি বাইরে। আর আমি? সর্বজয়ার মত একা পড়ে থাকব। তারপর একদিন তুই এসে দেখবি.......। আমি, মা, তোমাকে তখন আর একটা কথাও বলতে দিই নি। সবই ভুলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল কাল রাতে। আমরা কয়েকজন বন্ধুরা মিলে, নিশাও সঙ্গে ছিল, কাল সন্ধেবেলায় শিকাগো ইউনিভার্সিটির ফ্লিম ক্লাবে গিয়েছিলাম। সেই 'অপরাজিত' আবার দেখতে। দেখতে দেখতে আমি এবার খুব কেঁদেছিলাম। বারবার তোমার সেই পুরনো কথাগুলো মনে পড়ছিল। ছবি দেখে সবাই আমরা আমাদের ঘরে ফিরে এলাম। সবাই তখন ছবি নিয়ে তুমুল তর্ক তুলেছে। আমার সেইসব বন্ধুরা যারা আমেরিকাতেই থেকে যাবে ঠিক করেছে তারা কেউই সর্বজয়াকে ছেড়ে কথা বলতে ছাড়ে না। বলছে, এ অন্যায় সর্বজয়ার, স্বার্থপর। ছেলের ভবিষ্যৎ নেই? ছেলেকে আঁচলে বেঁধে রাখবে? খুব অন্যায়, বাজে। আমি কিন্তু ওদের দলে নেই। খুব তর্ক করেছি ওদের সঙ্গে। মা বিশ্বাস কর, যেদিন আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবে তারপর একদিনও থাকব না, ফিরে আসব। আসবই।

চিঠিটা পড়তে পড়তে শেষের দিকে এসে একজায়গায় আমার গলাটা আটকে এসেছিল। তাকিয়ে দেখি আমার স্ত্রী কাঁদছেন। চিঠিটায় ফের চোখ বোলাতে গিয়ে দেখি

১। সত্যজিৎ রায়ের জন্ম দিন

আমাদের ছেলে চিঠিটা লিখছিল ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরিতে বসে। কাজের ফাঁকে খানিকটা সময় করে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে হয়ত লিখছিল এবং বাড়ি ফেরার পথেই হয়ত কোন ডাক বাক্সে ফেলে দিয়েছিল।

আমার স্ত্রী হাত দুটোধুয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে এগিয়ে আসেন। চিঠিটা ওঁর হাতে দিয়ে আমি বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। বিষয়টি ভাবি। ভাবি-এক আধুনিক যুবক শিকাগোর এক ইউনিভার্সিটির এক অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিতে বসে কাজের ফাঁকে তার মাকে এক চিঠি লেখে আর সেই মা কলকাতাব এক বাঙালি মধ্যবিত্ত ফ্ল্যাটের রান্নাঘরে নির্ভেজাল মধ্যবিত্ত পরিবেশে সেই চিঠি পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে বিশাল বিস্তর ভৌগলিক ফারাক মুহূর্তের মধ্যে সরে যায়, এক আশ্চর্য সুন্দর সেতু-বন্ধন ঘটে, যে সেতু-বন্ধনের মূলে 'অপরাজিত', যার রচনাকাল ঘটনা, চরিত্র আক্ষরিকঅর্থে 'সেকেলে', বিশ দশকের, যেখানে চলচ্চিত্রকার পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগে ছবি করতে গিয়ে 'সেকেলে' সময়ের এতটুকু হের ফের ঘটতে দেন নি, না ঘরের গড়নে বা সাজসজ্জায়, না চরিত্রের চলনে বলনে বসনে, যেখানে কাশীব মন্দিরে দেখা যায় ঘণ্টা নিয়ে হনুমানের মাতামাতি, গঙ্গার ঘাটে কথকঠাকুরের নিত্যনৈমিত্তিক কথকতা, বাঙালী বিধবাকুলের ভিড়, কাকভোরের আবছা আলোয় পালোয়ানেব প্রাত্যহিক শরীরচর্চা, দেখা যায় আদি ও অকৃত্রিম গ্রাম বাংলার নিপুণ পরিবেশ বচনা, যে গ্রামের আকাশে ডিভিসি-র হাই টেনশন তার অনুপস্থিত, আর অনুপস্থিত কলকাতার গায়ে নিয়ন সাইনে বিজ্ঞাপনের ঝিলিক, নেই বড় রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের লাল-সবুজ-হলদে আলোর লাফালাফি। এবং আরো অনেক কিছু, অর্থাৎ 'সেকেলে' সময়ের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, যার সঙ্গে আধুনিক বাঙালীযুবকের চাক্ষুষ পরিচয় নেই বল্লেই চলে। অথচ ছবি দেখতে দেখতে কী ঘটে যায়, শিকাগো শহরে বাস গুটিকয়েক বাঙালি ছেলে কত স্বচ্ছন্দেই না ছবিটির সঙ্গে নিজেদের ভিড়িয়ে দেয়, যেন আয়নায় দেখতে পায় নিজেদের এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থনে যে যেমন বোঝে এবং যেমন করে নিজেব ভবিষ্যতের পথ খুঁজে নিতে চায় সেইভাবে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। সর্বজয়ার আচরণেও কারও আঁতে ঘা লাগে, অস্বস্তি বোধ করে, বিরক্ত হয়, কেউ বা আবার সর্বজয়ার একাকিত্বে শিউরে ওঠে, মনে মনে ছুটে যায় সর্বজয়ার কাছে, সান্ত্বনা দেয়।

অর্থাৎ সবাই নিজেদের অভিজ্ঞতা বোধবুদ্ধি ব্যক্তিগত ভাল-লাগা-না লাগার মধ্যে দিয়ে সেই বিশ দশকের অপুর মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পায় কৈশোর ডিঙোনো আজকের টগবগে এক ছেলেকে, যে ছোট্ট সংসারের সীমানা পেরিয়ে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় বৃহত্তর এক জগতের মুখোমুখি—অচেনা ও বিশাল—প্রতি পদক্ষেপেই যেখানে ভয় বিস্ময় ভালবাসা। দেখে, বৃহত্তর জগতের টানে ধীরে ধীরে কেমন করে ঘরের টান আলগা হয়ে আসে। আলগা হয়ে আসে বলেই একদিন গড়ের মাঠে বসে কত সহজেই না শহরের বন্ধুকে বলতে পারে, মাকে ম্যানেজ করেছি, দুটাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখে, নিশ্চিন্দিপুরের সেই মা, চিরকালের এক মা, সর্বজয়া, মনোজগতের নানা জটিলতা সমস্যা সংকটে জড়িয়ে পড়েও ধীর স্থির। অর্থাৎ যা বলেছি একটু আগেই আয়নার দেখা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা আর সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে ওঠা, ভয় পাওয়া, অপরাধবোধে কেঁপে ওঠা অথবা ঠিক তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া যা কিনা আমাদের ছেলের চিঠিতে আমরা পাই। পেয়ে অন্তত

কিছুক্ষণের জন্য অবশ হয়ে পড়ি।

স্থান আর কালের প্রতি সশ্রদ্ধ থেকেও সমস্ত রকম ফারাক এবং বাধা ঘুচিয়ে একালের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়াটাই শিল্পসৃষ্টির চরম সার্থকতা। সেই সার্থকতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত সত্যজিৎ রায়ে 'অপরাজিত' যা আমার চিন্তায় ভাবনায় মানসিকতায় চিরকালীন এবং সেই কারণেই আধুনিক মননের এক বিরল দৃষ্টান্ত।

আজ, এই বিশেষ দিনটির কথা ভাবতে গিয়ে স্বতই মনে পড়ে তেত্রিশ বছর আগেকার তোলা সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত'-র কথা। মনে পড়ে আর স্ত্রীকে বলি, পুরনো চিঠির বাণ্ডিল খুলে ওই চিঠিটায় অবার চোখ বুলিয়ে নেবে নাকি? মাঝে মাঝেই এমনিই করেছেন আমার স্ত্রী। এখনও করে থাকেন কখনও সখনও। হয়ত ছেলে ফিরে এলেও করবেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে বিশ দশকের কাশীর কথা, নিশ্চিন্দিপুরের কথা, কলকাতার কথা আর অপু আর সর্বজয়ার কথা। আমার চোখে, হয়ত আমার স্ত্রীর চোখেও, এর কোনো কিছুই পুরোনো হয়ে যাবে না। চির নতুন হয়ে থাকবে। অর্থাৎ যা কিছু আমাদের সমস্ত সত্তা ধরে নাড়া দিতে পারে, পারবে।

সত্যজিৎ ও অপরাজিত

মৃণাল সেন

এই তো সেদিনও কতো কথা বললেন। পুরনো কথা, নতুন কথা-কতো কি। টেলিভিশনে, শর্মিলার সঙ্গে। সেখানেও নানা কথার ভিড়ে 'অপরাজিত'-র কথাও তুললেন। নিজেই তুললেন কথাটা, কিন্তু খুব একটা প্রাণ পেলাম না যেন ওই কথায়। অথচ আমি উচ্ছ্বসিত। ওঁর সারা জীবনের শিল্পকর্মের ভেতর থেকে ওই ছবিটিকেই আমি বারবার তুলে ধরতে চাই, বলতে চাই, বলে থাকি। বলি, ভাবি, অনেক কথা। অনেক অনেক কথা। ছবির শুরুতেই 'পথের পাঁচালী'র অতি পরিচিত জগৎটাকে যেন অনেক যোজন পেছনে ফেলে অজানা অনাত্মীয় এক পৃথিবীতে প্রবেশ করার ভয় আর বিস্ময়। ভয় আর বিস্ময় যেন চলমান রেলগাড়ি আর শব্দের ঝঙ্কার অসামান্য স্পষ্টতা নিয়ে শরীরী হয়ে ওঠে ছবির পর্দায়। তারপর, একটু একটু করে কঠিন বাস্তব কঠিনতর হয়ে ওঠে। তারই মধ্যে টুকরো টুকরো ছবির মধ্যে দিয়ে অপুর অপূর্ব কাশী-দর্শন, কাশীর অলিগলির মন্দির ঘাট, মায় বাঁদরবাহিনীর কীর্তিকলাপ বাঁদরামী আর দৌরাত্ম্য, ভোরের অস্পষ্ট আলোয় গঙ্গার ঘাটে অচেনা পালোয়ানের শরীরী কসরৎ, গঙ্গার ঘাটে নানা কিছুর সঙ্গে বাঙালী বিধবাদের নিয়মিত সমারোহ, আরো কত কি। তারই মধ্যে এক রাত্রে, রাত্রিশেষে, হরিহরের মৃত্যু।... একদিন অপারগ সর্বজয়ার প্রাত্যাহিক দুঃখদৈন্যের চাপে কিশোর অপুর হাত ধরে চলে আসা মনসাপোতায়। বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যাওয়া কিশোর অপুর ধীরে ধীরে যৌবনে পা দেওয়া, বাইরের বড় জগৎটা চিনতে শুরু করা।

এমনি করে আরো কত শত মনে পড়ে, বলি, বলতে ইচ্ছে করে। মা আর ছেলের আন্তঃসম্পর্ক। ছেলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে বদলাতে থাকে সে সম্পর্ক, দৈনন্দিনতার নানা টানাপোড়েনে সে সম্পর্ক কেমন করে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বিবর্তনের যাত্রাপথে কত উত্থান পতন, কত জটিলতা, কত জাগতিক নির্দয় আমোঘ সব নিয়ম, কিন্তু সবই যেন এ যুগে—আমার আপনার বর্তমানের —অঙ্গ। এবং কাহিনীর প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রতিটি চরিত্রই যেন এগিয়ে যায় নির্মম নিয়তির দিকে। যে-নিয়তি পূর্ব-নির্ধারিত নয়, যে-নিয়তি দৈব নয়, যা তৈরি হয় সময়ের নিজস্ব নিয়মে। ধ্বংস হয় আবার জন্ম নেয়। আজও যেমন হয়ে চলেছে।

শেষ দৃশ্যে অপু তার গ্রামে ফিরে আসে, চারিদিকে ধ্বংসের হাওয়ায় অপু বিহ্বল হয়ে পড়ে । কিন্তু সব ঝড় শান্ত ভাবে মেনে নেয়। মায়ের মৃত্যুর খবর শোনে। বাইরের বারান্দায় বৃদ্ধ আত্মীয়ের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে, তারপর বিলীয়মান অতীতকে মুছে নতুন এক জগতের দিকে পা বাড়ায়। পেছনে পড়ে থাকে আকৈশোর শৈশব। এরপর যে-লড়াই তা আরও কঠিন। আপাতদৃষ্টিতে এ-ছবি শান্ত স্থির। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এর ভয়ঙ্কর তীব্রতা। তাই যতবার ভাবি, দেখি, আমার মনে হয় যেন একটা ভু-কম্পন হতে থাকে আমার মধ্যে। আমার সামনে এসে দাঁড়ায় আজকের পৃথিবী-ভয়াল কিন্তু

অনাত্মীয় নয়, অস্বীকার করব না আজও ওঁর অন্য কোন ছবি আমাকে এত নাড়া দেয়না, 'অপরাজিত' এখনো যেমন দেয়। তবু কেন সেদিন টেলিভিশনে ওঁর কথায় তেমন প্রাণের আন্দাজ পাইনি? ছবিটি বাঙালী দর্শক গ্রহণ করতে পারেননি বলেই কি? সেদিন বলেও ছিলেন কথাটা, বলেছিলেন দর্শকেব মুখ ফিরিয়ে থাকার কথা। সেই জন্যই কি?

মনে পড়ে অনেক বছর আগে যেদিন 'অপরাজিত' প্রথম বেরুলো, সেদিনই রাত্রে ছবিটি দেখলাম। পরের দিন সন্ধেবেলায় লেক প্লেস-এর তেতলায় সেই ছোট্ট ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌঁছলাম। ঘরে তখন সত্যজিৎ ছাড়া ছিলেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুক্ষণ গল্পগুজব হল। তারপর ওঁরা দুজন চলে গেলেন। সত্যজিৎ বাবু আমাকে বললেনঃ একটু বসুন না, আমি খেয়ে আসছি। খাবো আর আসবো। আমি অপেক্ষা করলাম। অনেক কথা বলবার আছে আমার, বলাব জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ফিরে এলেন, মা-ও এলেন একটু পরে। একটু আলগা হয়ে বসলেন। অনেক কথা বললাম, অনেক কথা, উচ্ছ্বাসে ভরাট নানা কথা। চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি, দেখেছি। তাই নির্মল উচ্ছ্বাস ছাড়া অন্য কিছু মুখে আসেনি সেদিন। সব শেষে মনে পড়ে, বলেছিলাম, সন্দেহ হয়েছিল বলেই বলেছিলামঃ সর্বসাধারণের কাছে ছবিটা পৌঁছবে এমন মনে হয় না, সযত্নে পরিত্যক্ত হলেও আমি আশ্চর্য হব না। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস বিশ্বের দরবারে মহৎ স্বীকৃতি পাবে 'অপরাজিত'। পেয়েছিলও।

এবং আজও, এই মুহূর্তে, ছবিটি আমাকে উদ্বেলিত করে। ঠিক যেমন করেছিল অনেক বছর আগে, ছবি দেখতে দেখতে, দেখে বেরিয়ে এসেও। হয়তো এখন আরো বেশী টানে।

তবু সেদিন টেলিভিশনে কথাবার্তায় তেমন উত্তাপ পেলাম না কেন? তখনই ভেবেছিলাম, টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করব। করিনি।

অপরাজিত ঃ আবহমান যাত্রাকাহিনী

আলোক সরকার

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত'-র যে অংশটি পড়ে সত্যজিৎ রায় উপন্যাসটিকে নিয়ে একটি ছবি করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত পুরো ছবিতে থিম হিসাবে তা তেমন উল্লেখযোগ্য ঘনত্ব পায়নি। শ্রী অনিল চৌধুরী মহাশয় আমাদের জানিয়েছেন, 'পথের পাঁচালী'-র পরবর্তী ছবির গল্প নির্বাচনের জন্য যখন খোঁজাখুজি চলছে সেই সময়ে তিনি হঠাৎ একদিন ডি. জে. কিমারের অফিসে গিয়ে জানতে পারেন সত্যজিৎবাবু গল্প ঠিক করে ফেলেছেন। অনিলবাবুর ভাষায়, "আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'কি গল্প ঠিক করেছেন?' উনি বললেন, 'অপরাজিত' পড়তে পড়তে আমি একটা অংশ পেয়েছি যেটা আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে। এই থিমটা আমার খুব ভালো লেগেছে, এবং এই থিমের উপর নির্ভর করেই আমি 'অপরাজিত' ছবি করব। বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' উপন্যাসে এই প্রসঙ্গটা নিম্নরূপ ঃ

"সর্বজয়ার মৃত্যুব পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত —এমন কি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যে তেলিবাড়ীর তারের খবের জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস— একটা বাঁধন-ছেড়ার উল্লাস...অতি অল্পক্ষণের জন্য নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পবই নিজের মনোভাবে তাহার দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ কি! সে চায় কি! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিল তাহার সুবিধার জন্য। মা কি তাহার জীবন পথের বাধা? কেমন কবিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন — তবু সত্যকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না। মাকে এত ভালোবাসিত তো, কিন্তু মায়ের মৃত্যু সংবাদটা প্রথমে যে একটা উল্লাসের স্পর্শ মনে আনিয়াছিল—ইহা সত্য—সত্য- তাহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।" (অপরাজিতর কথা ঃ অনিল চৌধুরী। এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯১)

'অপরাজিত' উপন্যাসের উদ্ধৃত অংশটুকু থেকে আমরা বুঝতে পারি অপুর ভিতরে যেমন একটা মুক্তিপিয়াসী মন ছিল তেমনই ছিল ভালোবাসার বন্ধন—উভয়ের দ্বন্দ্ব কখনোই তেমন শব্দময় হয়ে ওঠেনি সত্যজিৎবাবুর ছবিতে। ছবিতে আমরা কেবল এটুকু বুঝি শহরের আকর্ষণ অপুকে ক্রমশ সরিয়ে নিচ্ছে তার মা-র কাছে থেকে ('ছবি দেখে এটা মনে হয় যে শহরের প্রতি অপুর একটা আকর্ষণ গড়ে উঠেছে যেটা তাকে তার মা-র কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।' 'অপরাজিত'-ব চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়। এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯১) সে বড় হচ্ছে , সে পরিণত হচ্ছে। সমস্ত ছবির শেষদিকে এই ঘটনাটুকু আমাদের কাছে কেবল চিরদুঃখী সর্বজয়ার বেদনাটুকুকেই আরো নিবিড় করে। তার বাইরের আর সব কিছুই কেবল এই বেদনাটুকুর আঁধার আরো গহন করার জন্য। আর যা কিছু সবই প্রধানত আনুষঙ্গিক, দ্বিতীয় তা। এমন কি অপুও।

বস্তুত 'অপরাজিত' ছবির প্রধান চরিত্র সর্বজয়া অপু নয়। ছবির দ্বিতীয়ার্ধে 'কেবলমাত্র

চিত্রভাষার সাহায্যে নিঃসঙ্গ সর্বজয়ার, ট্র্যাজিডির উপস্থাপনা' যে দক্ষতা এবং অপরিসীম নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিচালক করেন, তা আমাদের অভিভূত করে অবশ্যই, তবু তা সর্বজয়ার বিষাদকে যতটা বেদনাময় করে তোলে, তার প্রতিপক্ষে কখনোই অপুকে দাঁড় করায় না। অপু সর্বজয়ার নিঃসঙ্গে জীবনের একটা পটভূমি রচনা করে মাত্র।

বিভূতিভূষণের অপু তো নয়ই, সত্যজিৎ রায়ের অপুও কখনো, কোনো শিকড়হীন পথিক চরিত্র নয়। তার জীবনকে বিস্তীর্ণ অবকাশে উন্মুক্ত করার বাসনায় সর্বজয়া কখনোই তেমন কোনো উচ্চারিত প্রতিবন্ধক নয়। হতে পারে মাকে নিঃসঙ্গ ফেলে আসার জন্যে তার মনে একটা দ্বিধা ছিল, একটা কষ্ট, একটা অপরাধবোধ হয়তো বা, মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই দায়িত্বভার থেকে সে মুক্ত হলো, তাই তার ক্ষণ-আনন্দ। কিন্তু এই কর্তব্যবোধ এবং অপরিসীম জীবনপিয়াস এই দুয়ের দ্বন্দ্ব অন্তত সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত' ছবিতে কখনো তেমন তীক্ষ্ণ তীব্র হয়ে বেজে ওঠেনি। একদিকে সর্বজয়ার বেদনাকে আমরা বুঝতে পারি অন্যদিকে অপুর নতুন যৌবনের জীবনকে দেখার প্রাণময় আকুতি —সবটাই এক নির্মম নিয়তি, চিরদিনের বাঙালী সংসার-ছন্দ। সর্বজয়ার মতো নিঃসঙ্গ গ্রামবাসী মা এই শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে যেমন অজস্র, সেইরকম অপুর মতো শহরঅভিলাষী তরুণ। 'অপরাজিত' উপন্যাসের একটি অংশ পড়ে যে থিমটা সত্যজিৎ রায়কে মুগ্ধ করেছিল বস্তুত তার কোন বীজ 'অপরাজিত' উপন্যাসে ছিল না, চলচ্চিত্রেও কোনো অবকাশ ছিল না তার ঘন হয়ে ওঠার।

আমরা ভালো করেই জানি অপু রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদ নয়। নিরাসক্তির প্রশ্নই ওঠে না, বরং জীবনের প্রতি এক ধরণের আসক্তিই তাকে লাবণ্যময় করে তোলে— তার স্বপ্ন আছে, ভালোবাসা আছে। মাকে দুঃখ দিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ট্রেনকে চলে যেতে দিয়ে আবার মা-র কাছে ফিরে আসতেও জানে। তারাপদর মতো সে কোনো আগন্তুক শীতল আসক্তিহীন উদাসীন চরিত্র নয়। কামুর আউটসাইডারের নায়কের সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনাও অবান্তর হবে। কামুর নায়ক তার মা-র মৃত্যু সংবাদে দুঃখ বা আনন্দ কিছুই পায় না, তার কাছে কর্তব্য-কর্ম পালন করা ছাড়া আর কোনো দায় নেই। এমন কি শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তর মতো অপু তেমন কোনো বাউণ্ডুলে চরিত্রও নয়। মানুষের জন্য ভালোবাসায় শ্রীকান্তর কতটা কর্তব্যবোধ এবং কতটা হার্দ্য আবেগ কাজ করে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। মা-র বিষয়ে সে রকম কোনো ভাবনা অপুর মনে আসতেই পারে না, শ্রীকান্ত যে ভাবে রাজলক্ষ্মী বিষয়ে ভাবতে পারে—"চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী জানলার বাহিরে দু-চক্ষু মেলিয়া নীরবে বসিয়া আছে, সহসা মনে হইল ইহাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নাই। তবু ইহাকেই আমার ভালোবাসিতে হইবে, কোথাও কোনাদিকে বাহির হইবার পথ নাই। পৃথিবীতে এত বড় বিড়ম্বনা কি কখনো কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে।" সত্যি বলতে, অন্তত সত্যজিৎ রায়ের ছবির অপুর মধ্যে কোন বিষাদ নেই, বেদনা নেই, যন্ত্রণা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। যা আছে তা কেবল এক মূর্ত জীবন-স্বপ্ন আর জীবন সংগ্রাম। সে আত্মকেন্দ্রিক অবশ্যই, কিন্তু সে আত্মকেন্দ্রিকতা কখনোই রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার গল্পের পোস্টমাস্টারের মতো উদাসীন কণ্ঠে বলে উঠতে পারবে না, 'পৃথিবীতে কে কাহার।'

বিভূতিভূষণের অপু আর সত্যজিৎ রায়ের অপু চরিত্রগতভাবে অনেক ব্যবধান রাখে,

এটা আমাদের মনে আছে। অনিল চৌধুরীর রচনা পড়ে জানি প্রথম দিকে 'অপরাজিত' ছবির জনপ্রিয় না হবার অন্যতম কারণ হিসেবে কেউ কেউ বলেছিলেন, 'মায়েরা পছন্দ না করলে বাংলা ছবি ভাল চলবে না।' বুঝতে পারা যায় তাঁরা 'অপরাজিত' ছবিতে মার প্রতি অপুর শীতল নিস্পৃহ উদাসীনতার দিকটা ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন। আমরা দীর্ঘদিন ও ধরণের আলোচনা একভাবে বা অন্যভাবে শুনে আসছি। কোনো কোনা তরুণ বলেছেন মায়ের আঁচল ধরে বসে না থেকে অপু জীবন-স্যাফল্যের পথে এগিয়ে গিয়ে ঠিকই করেছে। 'অপরাজিত' উপন্যাসের যে অংশটি পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে সত্যজিৎ রায় 'অপরাজিত' ছবি করতে উৎসাহী হয়েছিলেন, যে অংশটি তিনি করতে চেয়েছিলেন 'অপরাজিত'-র মূল থিম, তার থেকেও আমাদের মনে হতেই পারে জীবনসাফল্য এবং মাতৃপ্রেম মাতৃদায় মাতৃবন্ধনই বুঝি 'অপরাজিত' ছবির আসল বলবার কথা, সেটাই অপুর মানস-দ্বন্দ্ব। উল্লেখ কবি, অসংখ্য বাঙালী পাঠকের মতো আমিও 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' বারবার পড়েছি—অপু চরিত্রের এই আত্মকেন্দ্রিক আত্মনিবেশী দিকটা কখনো কোনোভাবেই আমার মনে আসেনি। অপুকে চিনেছি এক সরল আত্মময় কল্পনাপ্রবণ হৃদয় হিসেবে। অপুর এই কবিত্বময় আত্মবিভোর দিকটা সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিত'-তে কখনোই তেমন নিবিড় হয়নি। সেখানে তেমন কোনো পথ নেই যে পথ এক শিশুর চোখের সামনে রামায়ণ-মহাভারতের দেশে যাবার রাস্তা খুলে দেয়। সেখানে তেমন কোনো বালক নেই যে স্কুল যাবার পথে সেই রকম কোন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বলে উঠতে পারে 'বাঃ—যেদিকে দুচোখ যায়, সেদিকে যাওয়ার পথে পথে তীর ধনুক দিয়া শিকার কবা, বনের লতাপাতা কুড়াইয়া দিনের শেষে বেগুন পুড়াইয়া খাওয়া।' সেখানে আড়বোয়াল স্কুলে যাবার সেই আনন্দ-বার্তা ভরা পথটি পর্যন্ত নেই। 'ক্রোশ দুই পথ। দুধারে বট, তুঁতের ছায়া, ঝোপঝাপ, মাঠ, মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁকা আকাশ। স্কুলে বসিয়া অপুর মনে হইত সে যেন একা কতদূর বিদেশে আসিয়াছে, মন চঞ্চল হইয়া উঠিত—ছুটির পরে নির্জন পথে বাহির হইয়া পড়িত। বৈকালের ছায়ায় ঢ্যাঙা তাল-খেজুর গাছগুলো যেন দিগন্তের আকাশ ছুঁইতে চাহিতেছে—পিড়িং পিড়িং পাখির ডাক—হু হু মাঠের হাওয়ায় পাকা ফসলের গন্ধ আনিতেছে—সর্বত্র একটা মুক্তি, একটা আনন্দের বার্তা'। এই সেই অপু যাকে কোনদিন কোনো পাপ স্পর্শ করেনি, যার সরলতা প্রাণময়তা সমস্ত আকাশ ভরে বেজে ওঠে। তাকে আমরা কেবল ভালোই বাসতে পারি এবং তার সম্বন্ধে আর কোনো কথাই আমাদের মনে আসে না। মার কাছ থেকে দূরে সরে আসা সে তো কেবল 'পথের দেবতার' ডাক।

এই অপুকে সত্যজিৎ রায় চেনেন নি। অপুকে যে ঠিক এইভাবেই চিনতে হবে তার অবশ্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই— সাহিত্য-মাধ্যম ও ফিল্ম-মাধ্যম আলাদা এবং সেই প্রয়োজনে গল্প-উপন্যাসকে কিছুটা পরিবর্তন করে নিতেই হয় চিত্র পরিচালকদের। তবু, সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' দেখতে দেখতে এই ভেবে বারবার দুঃখ পেয়েছি এ 'পথের পাঁচালী' অপুর 'পথের পাঁচালী' নয়। অপু এখানে এক পার্শ্ব চরিত্র মাত্র।

'পথের পাঁচালী' প্রধানত ইন্দির ঠাকরুণ আর দুর্গার ট্র্যাজেডি। নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে অপুর চলে-যাওয়ার বেদনাও বেজে ওঠে দুর্গার মৃত্যু ভব্ধতার সঙ্গে। এবং 'অপরাজিত' প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় আমাদের জানিয়ে দেন—'একমাত্র সর্বজয়া চরিত্রই অপরাজিতকে

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই সূত্রে ধরে রাখতে কিছুটা সাহায্য করে'। (এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯১)। দ্বিতীয়বার বলি 'পথের পাঁচালী'-র ইন্দির ঠাকরুণ ও দুর্গার মতো, সর্বজয়াই 'অপরাজিত'-র প্রধান চরিত্র, কেন্দ্রবিন্দু। অপু নয়। অপুর পশ্চাদভূমিতে কেবল বেজে ওঠে সর্বজয়ার আনন্দ-বেদনা-নিঃসঙ্গতা।

অপু ট্রিলজির পর সত্যজিৎ রায়ের প্রায় সব ছবিই বৃত্তধর্মী। অপু ট্রিলজি সরলরেখার নিয়মে এগিয়ে চলে। বৃত্ত একটি বিন্দুতে শুরু হয়ে সর্বতো ছন্দময় অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে সর্বদা সমান দূরত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে যাত্রাপথের শেষে শুরুর বিন্দুতে মিলিত হয়ে একটা অখন্ড সম্পূর্ণতা পায়। সরলরেখার যাত্রাপথ আবহমান — তার শুরু যেমন কোথাও নির্দিষ্ট নয়, তেমন তার শেষও। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' বহমান জীবনস্রোত, সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'ও একই রকম। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' শেষ হয় এক জীবন পার হয়ে অন্য জীবনের প্রবেশ পথের শুরুতে এসে, 'অপরাজিত'-ও তাই। 'পথের পাঁচালী'র শেষ দৃশ্যে সেই গরুর গাড়ি যা অপুকে নিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিন্দিপুর পিছনে ফেলে স্পন্দমান রহস্যময় ভবিষ্যতের দিকে। 'অপরাজিত'র শেষ দৃশ্যেও আমরা দেখতে পাই মনসাপোতা জন্মের মতো ছেড়ে অপু গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে আঁধারময় ভবিষ্যতের দিকে। অপু রাস্তা ধরে যেতে যেতে দূরের পথে হারিয়ে গেল। অন্তহীন সরলরেখা, আবহমান যাত্রাকাহিনী। আর দুই বিদায়-দৃশ্যের ভিতরেই যেন গমগম করে বেজে ওঠে পথের দেবতার কণ্ঠ ঃ 'মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয় নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙারে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়! তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, শুধুই সামনে... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে , জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে... দিনরাত্রি পার হয়ে, জন্ম-মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়— তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না... চলে.. চলে... এগিয়েই ...চলে...অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ...সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি। ...চল এগিয়ে যাই।

বস্তুত অপরাজিত-র কোনো থিম নেই , যদি কোনো থিম থাকে তা সেই সরলরেখা যা কেবল এগিয়ে যায়, সর্বজয়ার মৃত্যুর পরও তা এগিয়ে যায়, অপুর মনসাপোতা ছেড়ে যাবার পরও তা আজও এগিয়ে চলেছে। এক অপু পরিবর্তিত অন্য অপুতে—সরলরেখা আরো আরো এগিয়ে চলেছে, অনন্ত অপু এগিয়ে চলেছে—আর তার বহমান স্রোত মেদুর ধূসর বিধুর বিষাদ দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একাকার করছে। অনন্তকালের যাত্রাকাহিনী আর তার ভিতর ছোট ছোট তরঙ্গের করুণ ব্যাকুল সূর্য-চন্দ্রকীর্ণ মুহূর্তপ্রয়াণ—তাৎপর্যহীনতা অর্থহীনতার ভেতরের আরো বড় রহস্যময় মেঘগহন তাৎপর্য, অর্থময়। 'অপরাজিত'র সামগ্রিক অভিভাব কেবল এইটুকুই বলে এবং আর কিছুই বলে না।

প্রহসনের হীরকদ্যুতি ঃ পরশপাথর (১৯৫৭)

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ছবি দুটির বিশ্বজয় যখন অব্যাহত, তখন যেন কঠিন পরিশ্রমের শারীরিক ও মানসিক ভার থেকে হাল্কা হবার মধ্যে নিজের সৃজনক্ষমতার একটি 'সহজাত বৃত্তিকে' সহজে লঘুভাবে ছড়িয়ে দিয়ে তৃপ্তি পাবার জন্য সত্যজিৎ রায় ১৯৫৬-৫৭ সালে রচনা করলেন 'পরশপাথর'। সেই সহজাত বৃত্তিটি হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের সূক্ষ্ম কৌতুকের রসবোধ বা 'হিউমার', যা তিনি পেয়েছিলেন পারিবারিক সূত্রে, পিতা সুকুমার রায়ের ঐতিহ্য থেকে। এবং ছবির জন্য বেছে নিয়েছিলেন এমন একজনের গল্প যিনি সুকুমার রায়ের পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 'হিউমার' রসের স্রষ্টা 'পরশুরাম' ওরফে রাজশেখর বসু। গল্পটির নাম 'পরশপাথর।'

ছবির গল্পটি মূল গল্পের বিশ্বস্ত চলচ্চিত্রায়ণ। মূল গল্পটি ফ্যাণ্টাসিধর্মী, ছবিটিও তাই। যদিও সুযোগ ছিল মূল গল্পটির ওপর ভিত্তি করে আরো বেশী সামাজিক প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরে সমাজের অশুভ শক্তিগুলোর প্রতি ছবিটিকে আরো ব্যঙ্গপূর্ণ করে তোলার। এবং ছবির ফ্যাণ্টাসি চরিত্র বজায় রেখেও তা সম্ভব ছিল। সম্ভবতঃ এই দ্বিতীয় ধরণের ছবির চরম শৈল্পিক পরাকাষ্ঠা আজো হয়ে আছে ডি সিকা ও জাভাতিনি রচতি 'মিরাকেল ইন মিলান' ছবিটি। 'মিরাকেল ইন মিলান' -এর ফ্যাণ্টাসি যেমন মূলতঃ সমকালীন যুদ্ধোত্তর ইতালীয় জ্বলন্ত বাস্তবতারই একটি পরম কৌতুকপ্রদ প্রতিফলনমাত্র, যেখানে মাঝে মাঝে তীব্র সমালোচনামুখর ব্যঙ্গের সুর ছবিটির স্বাভাবিক মানবিকতার পটভূমিতে এক অনবদ্য শৈল্পিক সমৃদ্ধি এনেছে, 'পরশপাথর' ছবি সেরকম সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার উচ্চস্তরে উন্নীত হতে পারেনি। কারণটা খুবই স্পষ্টঃ প্রথম ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন জাভাতিনির মত মৌলিক তীব্র সমাজ-সচেতন শিল্পী ও চিন্তাবিদ, সেখানে দ্বিতীয় ছবিটির চিত্রনাট্য সত্যজিৎ রায়ের, যাঁর মৌলিক সমাজিক চিন্তাধারায় তুলনামূলকভাবে ঘাটতি বরাবরই কিছুটা ছিল। তবুও, যেহেতু 'পরশপাথর' সত্যজিৎ রায়ের শ্রেষ্ঠ পর্ব অর্থাৎ প্রথম পর্বের ছবি, বিশেষ করে 'অপরাজিতের মত মহৎ ও উচ্চমানের সামাজিক প্রসঙ্গিকতাপূর্ণ ছবির পরেই এই ছবিটি করার জন্যও হয়ত, 'পরশপাথর' ছবিতে সামাজিক ব্যাঙ্গের সুর একেবারে অনুপস্থিত নয়, যদিও তা অপ্রধান এবং 'মিরাকেল ইন মিলান'-এর সঙ্গে কোনমতেই তুলনীয় নয়। তবুও বাংলা তথা ভারতীয় এই ধরণের কৌতুকরসসমৃদ্ধ ছবির মধ্যে 'পরশপাথর' আজো একটি উজ্জ্বলতম সৃষ্টি। আন্তর্জাতিক মানে এই ধরণের ছবি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ না হলেও, ভারতীয় মানে শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য নিশ্চয়ই।

পরশপাথর হচ্ছে একটি কাল্পনিক লোক-প্রবচিত পাথর যার স্পর্শে যে-কোন ধাতু হয়ে যায় সোনা। এইরকম একটি পাথর পাওয়া গেলে, একজন মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের

জীবনে কী কী ঘটতে পারে, তারই এক অসামান্য কৌতুক হচ্ছে ছবির মূল থীম। ছবিটির অসাধারণত্ব হল, যে-প্রেক্ষাপটে এই ফ্যান্টাসিটি বিধৃত হয়েছে, সেটির মধ্যে বাস্তবতার সুর আশ্চর্যভাবে মাঝে মাঝে আমাদের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'-র মত রিয়ালিস্ট ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়, তেমনি বাস্তবতার নিখুঁত ও নিপুণ চিত্রময়তা আছে ছবিতে এবং শব্দে। যেমন ধরুন, পরেশবাবু (ছবির নায়ক), তাঁর মধ্যবিত্ত জীবনের অনবদ্য চিত্রণ, তাঁর বেশবাস আচরণ, তাঁর চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার দিনটির বর্ণনা, তাঁর সন্তানহীন জীবনের বিষণ্ণ সন্ধ্যা, তাঁর গার্হস্থ্য জীবন, তাঁর স্ত্রীর চরিত্রচিত্রণ, তাঁদের সন্তাহীন জীবনে পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে স্নেহ করার মধ্যে তাঁদের সুপ্ত অপত্যস্নেহ—তাঁদের বাড়ীর জীর্ণ গরীব গলিপথ, ঘরের পারিবেশিক ডিটেল এবং হঠাৎ ধনী হবার পর সেই একই পরেশবাবুর অদ্ভুত পরিবর্তন এবং পুনশ্চ গরীব হয়ে পড়ার পর তাঁর মূর্তি—এই সমস্ত কিছুর মধ্যে এক অসামান্য বাস্তবতাবাদী শিল্পীর কল্পনাশক্তির স্পর্শ আছে। এখানে সত্যজিৎ রায়কে সবচেয়ে সাহায্য করেছেন অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী, পরেশবাবুর চরিত্রে তার অসামান্য অভিনয়ে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে বাংলা চলচ্চিত্রের এই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অভিনেতাটি প্রায় সমস্ত জীবন পরিচালকদের দ্বারা অবহেলিত হয়েছিলেন এবং সত্যজিৎ রায়ই তাঁর প্রতিভাকে ঠিকমত চিনতে পেরেছিলেন এবং তুলসী চক্রবর্তীর জীবনের অপরাহ্নে এই একটিমাত্র পরেশবাবুর চরিত্রায়ণের মধ্যে বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন। ছবি বিশ্বাসের মত এমন বহুমুখী অভিনয়-প্রতিভা না থাকলেও এদেশে তুলসী চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে এতাবৎকালের শ্রেষ্ঠ কমেডি চরিত্রাভিনেতা-তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শূন্যস্থান আজো পূর্ণ হয়নি, ঠিক ছবি বিশ্বাসের মতই।

প্রৌঢ় বয়সে পরেশবাবুর হঠাৎ চাকরি চলে গেল— ছবির শুরু এই দিয়ে এবং এটা কি একটা ভয়ঙ্কর বাস্তবধর্মী ছবির প্রারম্ভের মত নয়? নিশ্চয়ই। এবং কী অসাধারণ কুশলতায় এই নিদারুণতার মধ্যে কমেডির সুর এনেছেন সত্যজিৎ রায়, কেননা ছবিটি আসলে ফ্যান্টাসি-ধর্মী। যখন ক্যামেরা দূরবর্তী উঁচু থেকে ছুটির পর অফিস-ফেরৎ জনতাকে দেখায় তখন তা চ্যাপলিন ধরণের কৌতুকময়, কিন্তু যখন ক্যামেরা কাছ থেকে বরখাস্ত হওয়া পরেশবাবুকে ট্র্যাক করে তখন তাঁর বিমর্ষতা, তাঁর অবসাদ ও ক্লান্তি আমাদের হৃদয়ে স্পর্শ করে ও মনে হয় বাস্তবধর্মী ছবির শট দেখছি। একটি অনবদ্য দৃশ্য আছে, যখন পরেশবাবু হাঁটতে হাঁটতে বিষণ্ণ ও চিন্তিত মনে এসে পৌঁছলেন কার্জন পার্কের কাছে, হঠাৎ বৃষ্টি নামল। তখন পরেশবাবু তাঁর জীর্ণ ছাতাটি নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন পার্কের মধ্যে একটি পাথরে বাধান স্থানে। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ছবির পর আবার এল বৃষ্টির দৃশ্য এবং এবার এক নূতনতর তাৎপর্য নিয়ে। 'পথের পাঁচালী'র বৃষ্টি নিয়ে এসেছিল এক আদিম বর্ষণ-ভারাক্রান্ত অরণ্যসংকুল কালের ছবি, 'অপরাজিত'র বৃষ্টি, যদিও নাগরিক, কিন্তু নিয়ে এসেছিল সর্ব-জীর্ণতাভেদী এক অপরূপত্বের মহিমা। এখানে 'পরশপাথর'-এর এই বৃষ্টি এক জ্বালাতন করা নাগরিক বৃষ্টি, ঠিক পরেশবাবুর মানসিক মুডটির প্রতিচ্ছবির মতো এবং সেই সঙ্গে গরীব মধ্যবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতির প্রতীকের মতো। লক্ষনীয়, একঘেয়ে বৃষ্টির জল কি ভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে উপবিষ্ট পরেশবাবুকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে, অসহায় পরেশবাবু যেদিকে একটু সরে বসেছেন সেখানেই একটু পরে জল গড়িয়ে তাঁকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে একটি অসাধারণ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা আছে, আছে মধ্যবিত্ত অসহায়

একটি মানুষের ছবি বা ইমেজ। এই একঘেয়ে বৃষ্টির জলের মতই একটা না একটা অর্থনৈতিক দুর্দশা (যেমন এক্ষেত্রে পরেশবাবুর হঠাৎ চাকরি চলে যাওয়া) কোনদিকে তাকে তিষ্ঠতে দেয় না, যেদিকে ফেরে সেদিকেই তাকে আক্রমণ করে। একটু আগে পরেশবাবুর চাকরি চলে যাওয়ার অনুসঙ্গে তাঁর জীর্ণ অক্ষম ছাতাটির মতই, এই বৃষ্টির জলের চিত্রকল্প বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্যে উত্তীর্ণ। ফ্যাণ্ট্যাসির শুরু ঠিক এই বাস্তবধর্মী মুহূর্তেই। আবার ঠিক সেই সময়েই একটি শিলাখণ্ডের মত পরশপাথরটি আকাশ থেকে এসে পড়ে পরেশবাবুর সামনে। তার গোল মতন মসৃণ গড়ন দেখে পরেশবাবু সেটি তুলে নেন। পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে এটি দিয়ে খুশি করবেন।

পরের দৃশ্যে, বর্ষণক্ষান্ত ভিজে কর্দমসিক্ত পথে কলকাতাব এক গরীব পাড়ার গলিপথে পরেশবাবুকে যেতে দেখি গৃহাভিমুখে। একটি মেয়ে কোথায় সংগীত সাধনা করছে...।

পরেশবাবুর ঘরের মধ্যে ডিটেলে যথারীতি সত্যজিৎ রায়ের এবং বংশী চন্দ্রগুপ্তের নিপুণ হাতের স্পর্শ আছে। ঘরে এসে পরেশবাবু পাশের বাড়ীর ছোট ছেলেটিকে ডেকে পাথরটি দিয়ে খুশি করতে চান। এবং সেই অনবদ্য ছড়াটি বলেন ঃ 'হলদে সবুজ ওরাং ওটাং/ ইটপাটকেল চিৎপটাং/ধর্মতলা কর্মখালি/ মুস্কিল আসান উড়েমালী।' পরশুরামের গল্পে পিতা সুকুমার রায়ের এই 'ননসেন্স রাইম'—এর মিশ্রণ আমাদের মুগ্ধ করে।... তারপর সেই মুহূর্তটি আসে যখন কুড়িয়ে পাওয়া পাথরটি আসলে একটি অমূল্য 'পরশপাথর' তা আবিষ্কৃত হয়। সেই দ্বাররুদ্ধ ঘরে পরেশবাবু ও তাঁর স্ত্রীর সেই নিঃশ্বাস রুদ্ধ করা বিস্ময়। এবং যেহেতু প্রথমবার সেই 'হলদে সবুজ ওরাং ওটাং' বলে একটি লোহার জিনিসে ছোঁয়ানোর ফলে সেটি সোনা হয়ে গিয়েছিল, তাই এখন থেকে পরেশবাবুর কাছে এই ছড়াটি 'মন্ত্র' হয়ে যায়। হলদে সবুজ ওরাং ওটাং ইত্যাদি উচ্চারণ করে লোহার ছোটখাট জিনিস, যেমন জাঁতি ইত্যাদিতে ছুঁইয়ে সেগুলি সোনার জিনিসে পরিণত করার এবং সেখানে তুলসী চক্রবর্তীর অসামান্য অভিব্যক্তির এমন মজার দৃশ্য বাংলা ছবির দর্শকরা এর আগে কখনো দেখেননি। চাকরি-চলে-যাওয়া এক প্রৌঢ় নিম্নমধ্যবিত্ত পরেশবাবুর প্রৌঢ় জীবনে এ এক অসামান্য সৌভাগ্য লাভ।

এর পর পেতল বা লোহা থেকে সোনায় রূপান্তরিত করা একটি জিনিস স্যাকরার কাছে বিক্রি করার একটি মজার সিকোয়েন্স আছে—বিশেষতঃ স্যাকরার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পরেশবাবুর অভিনব কৈফিয়ৎ। পরেশবাবু এখন নিশ্চিন্ত যে বড়লোক হওয়া থেকে তাঁকে কেউ আটকাতে পারবে না, শুধু দরকার লোহা, প্রচুর লোহা— তখন তিনি ট্যাক্সি ভাড়া করে চললেন লোহা-লক্কর কিনতে। আমরা একটি কারখানার ইয়ার্ডে বাতিল লোহার ভাঙা জিনিস-পত্রের সামনে পরেশবাবুকে দেখি, তিনি এসব কিনতে চাইছেন। এরচেয়েও ভয়ঙ্কর কৌতুকের দৃশ্যটি দেখি, যখন বিরাট এক বাড়ীর লৌহ-নির্মিত স্ট্রাকচারের কাছে যেতে যেতে পরেশবাবু ভাবতে থাকেন এই বিশাল স্ট্রাকচারটির গায়ে পরশপাথরটি তিনি ছুঁইয়ে দেবেন কিনা — এমন দমফাটা ও আতংকিত হবার মত হাসির দৃশ্য আমরা কখনো দেখিনি। সেই স্ট্রাকচারের কাছে পরেশবাবু হাতে পরশপাথরটি নিয়ে ভাবছেন 'টু টাচ্ অর নট টু টাচ্' — এ এক অসাধারণ দৃশ্য। অবশ্যই পরেশবাবু এই অকম্মোটি আর করলেন না, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গাড়ী ছেড়ে দিতে বললেন। আমারাও নিঃশ্বাস ফেলে

বাঁচলাম।

পরেশবাবুর অবস্থা ফিরল, তিনি একটি বাড়ী কিনে সস্ত্রীক উঠে এলেন, একটি গাড়ী কিনলেন। কিন্তু লক্ষণীয়, বাড়ীটি পুরানো, কিন্তু প্রাসাদ নয়, এবং গাড়ীটি ছোট সেকেন্ড-হ্যাণ্ড ও পুরানো। তাঁর একটি অফিস হল, এবং তাঁর সেক্রেটারি নিযুক্ত হল প্রিয়তোষ হেনরী বিশ্বাস নামে এক যুবক যার টেলিফোনে প্রেমালাপ ছবির একটি মজার উৎস, বিশেষতঃ তার প্রেমিকা কখনোই আমাদের চাক্ষুষ দর্শনীয়া হয়নি—অথচ তাকে দিয়ে মজার সিচুয়েশান সৃষ্টি হয়। বাংলা চলচ্চিত্রে এ ধরণের প্রয়োগও প্রথম।

এরপর থেকেই ছবিটির মধ্যে সামাজিক প্রাসংগিকতা ইত্যাদির গভীরতা লক্ষ করা যায়। আমাদর মত অনুন্নত দেশে, যেখানে পুজিঁর সীমাহীন প্রতাপ, যেখানে স্বীকৃত সামাজিক প্রচলিত নীতিতে 'ধনলাভই' হচ্ছে জীবনের পরমপ্রাপ্তি। যেখানে একটা বাচ্চা শিশুকে লেখাপড়ায় প্রলোভিত করার জন্য আমরা শেখাই 'লেখাপড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে' অর্থাৎ গাড়ী-ঘোড়া চাপাটাই শিক্ষার পরম উদ্দেশ্য—সেই দেশে, অতঃপর আমাদের পরেশবাবু, একদা বরখাস্ত হওয়া দরিদ্র কেরানী আধুনা ধনী, ধনলাভের গুণে একজন সামাজিক বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে গেলেন, এবং তাঁর সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ আসতে লাগল বঙ্গীয় সংস্কৃতির মঞ্চেও। রাতারাতি তিনি হয়ে গেলেন বঙ্গ সংস্কৃতির এক ধারক-বাহক, যদ্যপি আগে কখনো বঙ্গ সংস্কৃতির সম্পর্কে তাঁর বিন্দু মাত্র জ্ঞান বা বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে তা দেখা যায়নি। আর অবধারিত ভাবে তাঁর মাথায় উঠল গান্ধীটুপি।

এই পর্বটি 'পরশপাথর' ছবির একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য পর্ব। সত্যজিৎ রায় এদেশের সাংস্কৃতিক জগতে টাকার খেলার ভূমিকাটা ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের সঙ্গেই বেশ সরসিতভাবে দেখিয়েছে। টাকা যদি আপনার থাকে তাহলে বিদ্যাবুদ্ধি তেমন কিছু না থাকলেও আপনি কোন সাহিত্যসভার সভাপতি বা প্রধান অতিথি হতে পারেন, এমনকি সর্বাধিক বিক্রীত সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে আপনার নাম নিয়ত জ্বল জ্বল করতে পারে। এদেশে এখনো সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রটিও একটি বাজার, এবং যেমন টাকাই একমাত্র সবকিছুর মূল্যমান নিরূপণ কবে, সাহিত্য-সংস্কৃতির 'বাজারে' ও তাই টাকাই আপনাকে এক মূল্যবান সংস্কৃতির ধারক করে দেবে। ছবির কিস্‌সু না বুঝলেও যামিনী রায়ের ছবির আলোচনা-সভায় তাঁর ছবির সম্বন্ধে আপনার 'অগাধ পাণ্ডিত্য' প্রদর্শন করতে পারবেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথ না পড়া থাকলেও হতে পারবেন রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সভাপতি এবং পেয়ে যাবেন অসংখ্য অনুগৃহীত তৈলদানকারী মুগ্ধ শ্রোতা। এমনি এক সভায় আমরা দেখি বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে পরেশবাবু অনবদ্য ভাবে বলেন ও দেখান 'বঙ্গ সংস্কৃতি'কে কিভাবে 'ধরতে' হবে! বড় অপূর্ব সে দৃশ্যের শ্লেষ!

কিন্তু আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতির সেইসব খ্যাতনামা টাকাওলা ধারকদের একজন পরেশবাবু ঠিক নন, আসলে তিনি একজন ভীতু গৃহস্থ মধ্যবিত্ত কেবাণী. অকস্মাৎ ধনলাভে তাঁর অনেক কিছুর পরিবর্তন হলেও ভিতরে ভিতরে তিনি ঠিক মধ্যবিত্তই রয়ে গেছেন। তবে আমাদের এই অপূর্ব সমাজে একজন মধ্যবিত্তেব হঠাৎ ধনলাভ হলে ধনের উর্ধগতি তাকে এই সমাজের স্বাভাবিক নিয়মেই কেমন রাতারাতি সংস্কৃতির ধারক-বাহক করে তোলে — তারই একটি নির্মম ব্যঙ্গচিত্র সত্যজিৎ রায় রেখে গেছেন।

শুধু এইটুকুই নয়, সত্যজিৎ রায় এও দেখিয়েছেন, এদেশে 'বড় মানুষ' হলে

মদ্যপানের পার্টি দিতেই হয়। 'সীমাবদ্ধ' ছবির শ্যামলেন্দুও দিয়েছে, এবং তখন যদি হঠাৎ তার বাড়ীতে এসে পড়েছে নিজের 'বাপ মা' তাহলে তাদের সঙ্গে কথাটুকু পর্যন্ত না বলে চালান করে দেওয়া হয় পাশের রুদ্ধ ঘরে। তবে পরেশবাবু শ্যামলেন্দুদের মত মতলববাজ বিদগ্ধ বুর্জোয়া নন, হাড়ে হাড়ে একজন মধ্যবিত্ত কেরাণী। তাঁর বড়লোক হওয়া ভাগ্যের দান, পূর্বপ্রস্তুতহীন, হৃদয় ও আত্মাকে দূষিত করার পথ বেয়ে তাকে ধনলাভ করতে হয়নি। সুতরাং তাঁর সেই বিচিত্র পার্টিতে অনভ্যস্ত পরেশবাবু একটুতেই বেসামাল হয়ে পড়লেন এবং তাঁর কৃতিত্বের গৌরবের নেপথ্য ইতিহাস প্রকাশ করার লোভ ত্যাগ করতে না পেরে বলে ফেললেন — 'পরশপাথর রহস্য'।

ব্যাস, তারপর ঘটনা দ্রুতগতিতে ঘটে চলল। চ্যাপলিনের 'গোল্ডরাশ' ছবিতে দেখেছিলাম সোনার জন্য অসংখ্য মানুষের অমানবিক অথচ প্রচণ্ড মজার কাণ্ড কারখানা। 'পরশপাথর' ছবিতে দেখলাম তারই এক কলকাত্তাই চেহারা। এই সময় কলকাতার শেয়ার মার্কেটের দালাল ব্যবসায়ীদের যে হৈ-হট্টগোল ও বিভ্রান্তিকর দৃশ্য আছে তার তুলনা হয় না। সেখানে এক একটি ব্যবসায়ীর মুখ, তাদের 'টাইপেজ' ছবিটিকে ঐশ্বর্যশালী করেছে, এমন দৃশ্যও ভাবতীয় ছবিতে আমরা কখনো দেখিনি। লোহা-পিতলকে সোনা করে দিতে পারে এমন এক 'পরশপাথর' জনৈক ব্যক্তির করতলে—এ এক মারাত্মক সংবাদ, সুতরাং সোনার দাম হু হু করে কমতে লাগল। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশংকা আশ্চর্যভাবে প্রকাশ করল সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরা, সেই শেয়ার মার্কেটের মাড়োয়ারি ব্যবসাদারদের মুখের বিচিত্র মজাদাব অভিব্যক্তির চিত্রকল্পগুলির দ্বারা। এর মধ্যে সূক্ষ্ম সামাজিক ব্যঙ্গও উচ্চারিত।

সুতরাং, এরপর অনিবার্যভাবে এসে গেল 'ল এণ্ড অর্ডার'- এর প্রশ্ন। পুলিশ ছুটল 'পরশপাথর' সরকারের হেপাজতে আনতে, এবং বর্তমান মালিককে গ্রেপ্তার করার জন্য। ওদিকে আরো মজাদার কাণ্ড ঘটতে শুরু করেছিল—প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাস (কালী ব্যানার্জী অভিনীত) অর্থাৎ পরেশবাবুর সেক্রেটারিব ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের ট্র্যাজিডি শুরু হয়ে গেছে। ফোনে প্রেমালাপ চলাকালীন প্রেমিকার সঙ্গে ঝগড়া এবং প্রেমিকা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ব্যর্থ প্রেমিক প্রিয়তোষ আর বাঁচতে চায় না, ঠিক করে আত্মহত্যা করবে। আত্মহত্যার অভিনব উপায়ের সন্ধান পেয়ে যায় সামনে। প্রিয়তোষ ততক্ষণে জেনেছে তার হেফাজতে যে পাথরটি আছে সেটি পরশপাথর এবং তার স্পর্শে যাবতীয় বস্তু সোনা হয়ে যায়, সুতরাং সেটি গিলে ফেললে পেটের নাড়িভুড়িও সোনা হয়ে যাবে এবং তাহলে সাক্ষাৎ মৃত্যু। সুতরাং প্রিয়তোষ পরশপাথরটি গিলে ফেলল। পুলিশের ইনস্পেকটর যখন পরশপাথরের খোঁজে এসে শুনল, সমস্ত পৃথিবীর দুশ্চিন্তার কারণ সেই অমূল্য বস্তুটি এখন প্রিয়তোষের কণ্ঠনালীর মধ্যে, তখন আর্তনাদ করে উঠল, 'গিললেন কেন!' বড় সুন্দরভাবে এই শটটি উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এদিকে পরেশবাবু গ্রেপ্তার হয়েছেন। ওদিকে আসল 'বস্তুটি' একজনের পাকস্থলী অভিমুখে যাত্রা করেছে। চারিদিকে অর্থনৈতিক নৈরাজ্য। এখানে যদিও একটি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু আমার বিনীত ধারণা, সেই ব্যঙ্গের সুর আরো তীব্র করা যেতে পারত। তাবৎ পুঁজিবাদী সভ্যতায় ওই হলুদ বর্ণ বস্তুটি অর্থাৎ 'সোনা' যে কী প্রাণান্তকর ভূমিকা নিয়েছে, এবং জনৈক ব্যক্তির হাতে অন্য যে-কোন সস্তার ধাতুকে সোনা করে তোলার

অস্ত্র এসে গেলে তার প্রতিক্রিয়ায় এই খাদক সভ্যতার (কনসিউমার সোসাইটির) বড় বড় তথাকথিত বনেদী 'ঐতিহ্যসম্পন্ন' নর ও নারীর সভ্যতার আব্রু যে হঠাৎ কেমন খসে যেতে পারে ও ভিতরকার লুকানো স্বার্থন্ধ বর্বরতার কী নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে তার নির্মম কিন্তু কৌতুকপ্রদ ব্যঙ্গ আরো প্রখরতর করার সম্ভাবনা ছিল। যে অর্থনীতিতে শুধু তারই মূল্য স্বীকৃত যার মূল্য একমাত্র সোনা অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ দিয়ে পরিমাপ করা যায় সেই অর্থনীতির মানবিকতাহীন নগ্নতার নিঃস্ব চেহারাটা দেখার আরো একটু ইচ্ছা থেকে যায়।

এখন সারা দেশের চোখ প্রিয়তোষ নামক ব্যর্থ প্রেমিক যুবকটির পাকস্থলীর প্রতি —সেটাই এখন 'জাতীয় ঘটনা', সভা, আলোচনা, জরুরী পরিস্থিতি। ডাক্তাররা তৈরি হন প্রিয়তোষের পেট কাটার জন্য।

কিন্তু কিছুরই প্রয়োজন হল না। এক্সরের ছবিতে ধরা পড়ল কিভাবে ব্যর্থ প্রেমিক প্রিয়তোষের অব্যর্থ পাকস্থলী সেই অমূল্য প্রস্তরখণ্ডটিকে ক্রমে হজম করে নিচ্ছে, ক্রমশঃ তা হয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। অবশেষে পরশপাথরটির সঙ্গে সারা দুনিয়ার বণিক সভ্যতার যত দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনাকে প্রিয়তোষের পাকস্থলী হজম করে ফেলল। এ এক অসাধারণ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন সত্যজিৎ রায়।

'পরশপাথর' ছবির শেষ দৃশ্যের মানবিকতা ঠিক 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'র মানবিকতারই যেন একটি হাস্যদীপ্ত কিছু করুণ রূপ—এই মুহূর্তটিতে অনিবার্যভাবে চ্যাপলিনের মানবিকতাবোধের সূক্ষ্ম রসের কথা মনে আসে। আমরা দেখি, পরেশবাবু থানার পুলিশের কাছে বয়ান দিচ্ছেন। বলছেন পরশপাথর পেয়ে তিনি কি কি করেছেন... চাকরি চলে গেছল নিজের কোন মাথা গোঁজার ঠাই ছিল না, তাই একটি বাড়ী কিনেছিলেন, তাও পুরানো বাড়ী—গরীব ছিলেন বলে গৃহিণীকে কোনদিন একটা গয়না দিতে পারেননি, তাই কয়েকটি স্বর্ণালঙ্কার দিয়েছেন, বয়স হয়েছিল, ট্রামে-বাসে ভিড়ে যেতে বড় কষ্ট হত তাই একটি গাড়ী কিনেছিলেন, এবং পুরানো ছোট একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ী...। এই অংশটি সামাজিক প্রাসঙ্গিকতায় সমুজ্জ্বল, এবং ছবির একটি শ্রেষ্ঠ অংশ। আমরা দেখতে দেখতে অনুভব করি, পরেশবাবু ঠিকমত ভাষায় প্রকাশ না করলেও, যেন তিনি একটি নির্মম সত্য কথা বলতে চান-তিনি তো পরশপাথেরের মত এমন আশ্চর্য বস্তু পেয়েও অর্থাভাবে জর্জ্জরিত মধ্যবিত্ত জীবনের সায়াহ্নে বার্ধক্যের সামান্য কিছু আরাম ছাড়া কিছু চাননি কিন্তু যারা অসৎভাবে কত কিছু করে, কালো টাকা করে, বড় বড় ইন্ডাষ্ট্রি ফেঁদে শ্রমিক ঠকায়, খাদ্যে ভেজাল দেয়, দশবারোতলা বিলাসভবন তোলে, কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে, লক্ষ টাকার বিদেশী গাড়ী কেনে— সে-সব 'বড়লোক দের সম্পর্কে রাষ্ট্র কি ব্যবস্থা নিচ্ছে?

পরেশবাবু আপাদমস্তক ভীরু সৎ একজন মধ্যবিত্ত মানুষ, সাহস করে এই কথাগুলি বলতে পারেন না। কথাগুলি অনুক্ত রেখে, ছাড়া পেয়ে, থানা থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে আসেন এবং আবার আগেকার মত জীর্ণ একটা ছ্যাকরা গাড়ীতে চেপে ফিরে যান মার-খাওয়া স্বপ্ন-ভেঙে যাওয়া বৃদ্ধ চিরন্তন মধ্যবিত্ত মানুষটি।

'পরশপাথর' অবশ্যই ' মিরাকেল ইন মিলান' হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু যা হয়েছে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিপ্রেক্ষিতে সেটাও একটা 'মিরাকেল।'

জলসাঘর

বিজয়কুমার দত্ত

সত্যজিৎ রায়-এর পর মৃত্যুর আনন্দবাজার পত্রিকায় বিশ্ববন্দিত চিত্র-পরিচালকের স্মৃতিচারণে, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেন মন্তব্য করেছেন,—"চলচ্চিত্র এমনই একটা মাধ্যম যাতে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, এ সব কিছুই মিলিত হয়েছে। এবং এটিও যে একটি আর্ট ফর্ম তা আমাদের দেশে মানিকবাবুর পূর্বসুরীদের চোখে পরিষ্কারভাবে ধরা দেয়নি। তাঁরা সিনেমাকে মোটামুটিভাবে এন্টারটেইনমেন্ট হিসেবেই দেখেছেন। চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফির মতই একটু চাক্ষুষ মাধ্যম।" সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সর্ম্পর্কে শ্রী সেন-এর মূল্যায়ণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু চলচ্চিত্র শুধুই চাক্ষুষ মাধ্যম নয়; তা একই সঙ্গে শ্রুতিমাধ্যমও বটে। ইংরেজী ভাষায় এই শিল্পকর্মকে বলা হয় "Audio-Visual Art"। এ প্রসঙ্গে পরিতোষ সেন সত্যজিৎ রায়ের একটি তাৎপর্যজনক মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ঃ "ছায়াছবি তোলার সময় সবচাইতে প্রধান সমস্যা হল এই যে ক্যামেরাটাকে কোথায় বসাব! ছবি তোলার সময় যেহেতু এই প্রশ্নটি বারবার দেখা দেয় তাই আগেভাগে তা এঁকে নিলে তোলার কাজই শুধু সহজ হয় না, ছবির ফ্রেমিং এবং ক্যামেরা মুভমেন্ট কী হবে তা-ও ঠিক কবে নেওয়া যায়।"

ছবির ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান ও সার্থক দিকের ইঙ্গিত আছে উপরোক্ত মন্তব্যে। তা বিশেষভাবে মনোযোগের দাবী রাখে। আর সেটি হ'ল 'ফ্রেমিং।' ছবির ফ্রেমিং, এক হিসেবে শিল্পকর্মের চিরকালীন দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ ফর্ম এবং কন্‌টেণ্ট, অথবা কি বলব আর কেমনভাবে বলব) ছাড়াও, তৃতীয় এক উত্তরণের নির্দেশ দিয়ে থাকে; সেটি হল মাত্রাবোধ। অর্থাৎ কি বলা হবে বা উন্মোচিত হবে,— কেমনভাবে তা করা হবে,—এবং তৃতীয়ত কোথায় চিহ্নিতঃ করতে হবে এই দুটি ভঙ্গিমার ঘেরাটোপ। পরিতোষ সেন নিজে চিত্রশিল্পী বলে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রশিল্পের দখল ও প্রতিভা সম্পর্কে অভ্রান্ত মন্তব্য করেছেন। এবং যে বিষয়ের উল্লেখ করেন নি, তা হ'ল শ্রুতির প্রসঙ্গ।

চলচ্চিত্র দর্শকের কাছে শ্রুতিব মৌল মাধ্যম হ'ল শব্দের শিল্পিত প্রকাশ। আমরা তা পেয়ে থাকি সংলাপ ও সঙ্গীতে। এবং কখনো কখনো দৃশ্যরূপ ও শব্দরূপের অঙ্গীঙ্গী মিলনে নৃত্যের মাধ্যমেও। এক হিসেবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে নৃত্যশিল্পের একটি জায়গায় মিল আছে—আর সেটি হ'ল সচলতার মধ্যে মাত্রাবোধ যার অভাবে নৃত্যের মৌল শর্ত, অর্থাৎ ছন্দ, ব্যহত হতে বাধ্য। ভারতীও চলচ্চিত্র-শিল্পকর্মে, সত্যজিৎ রায়ের আর্বিভাবের আগে—এই মাত্রাবোধের অভাব ছিল একান্ত প্রকট, —এবং দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সত্যজিৎ রায়ের অজস্র ছায়াছবি সৃষ্টি হওয়ার পরেও এই মাত্রাবোধের অভাব, আজো বাংলা চলচ্চিত্রে অত্যন্ত করুণভাবে উপস্থিত। চলচ্চিত্রে দশকের কাছে যা শ্রুতি, পরিচালক-টেকনিসিয়ানদের কাছে তা হল শব্দ তথা ধবনি-ব্যঞ্জনা-যা সংলাপ ও সঙ্গীতের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়ে থাকে। এই সংলাপ ও সঙ্গীত বিশেষ করে নেপথ্য সঙ্গীতের

ক্ষেত্রে, তিনি মাত্রাবোধের শিল্পিত সংযম দেখিয়েছেন অনেক ছবিতেই। আবাল্য সাঙ্গীতিক আবহাওয়ায় মানুষ, সত্যজিতের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ও আসক্তি ছিল স্বাভাবিক। বাল্যবয়সে সঙ্গীতের জগৎ-এর প্রভাব, এবং যৌবনে চলচ্চিত্রের প্রতি আসক্তি—তাঁর অনুসন্ধিৎসু শিল্পীমন, এই দুটির সামঞ্জস্য তথা ঐক্য অন্বেষণ করেছিল, হয়তো তাঁর সচেতন অভিজ্ঞতার নেপথ্যেই। তারই প্রথম ও পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে তাঁর তৃতীয় ছবি 'জলসাঘর'-এর মাধ্যমে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ছোটগল্প অবলম্বনে। চলচ্চিত্রায়িত এই ছবিটিই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় বস্তু —এবং সে কারণে সত্যজিৎ প্রতিভার মূল্যয়ন এ ছবিটির প্রকৃতি-চলচ্চিত্ররূপ-অভিনয় এবং সাঙ্গীতিকী ঐশ্বর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে—একথা অবশ্য সুধী পাঠকেরা স্বীকার করবেন বলে, আশা করা যায়।

'জলসাঘর'-এর চলচ্চিত্রায়ণের একটি পশ্চাদপট আছে। 'পথের পাঁচালী'-র ঐতিহাসিক সাফল্যের পর, সত্যজিতের দ্বিতীয় ছবি 'অপরাজিত' সৃষ্টিকর্ম হিসেবে অসাধারণ হলেও, এই ছবিটির বাণিজ্যিক সাফল্য তেমন হয়নি। মনে রাখতে হবে, সে সময়টা হ'ল ১৯৫৬ সাল। চলচ্চিত্রের শিল্পগুণ উপলব্ধি করার মত মানসিকতা, তখন বাঙালীর চেতনায় স্পষ্ট হয়নি। সত্যজিতের ভাষায়, "ভেবেছিলাম অপু-কাহিনীর দ্বিতীয় পর্বও লোকের কাছে আকর্ষণীয় হবে। কিন্তু তা হ'ল না। অপরাজিত চলল না। ফলে একটা সমস্যার সৃষ্টি হল।" কিন্তু অপরাজিত কেন চলল না, সে প্রশ্নের গভীরে যেমন সত্যজিৎ যেতে চাননি, প্রখ্যাত সমালোচকরাও তা করতে চাননি। অপুর যে ট্রিলজির কথা প্রায়ই সত্যজিতের আলোচনায় বলা হয়ে থাকে—তার প্রথমটি ছাড়া, অন্য দুটি সত্যজিতের অপু হয়েছে, কিন্তু বিভুতিভূষণের অপু হয়ে ওঠেনি। স্পষ্টতই সত্যজিৎ সে প্রসঙ্গে যাননি, তাই তর তাৎক্ষণিক সমস্যার সামাধানে তিনি অন্য পথ ধরেছেন। সে পথ হ'ল চলচ্চিত্রে নাচ-গানের প্রয়োগ ঃ তাঁর ভাষায়, "সুতরাং এমন ছবি করা চাই যা লোকে নেবে। গ্রামের গল্প, জীবনসংগ্রামের গল্প আর চলবে না। মনে হ'ল বাঙালী দর্শক চিরকালই ছবিতে নাচগান পছন্দ করেছে—সেই উপাদান বজায় রেখে কি কোনো ভালো ছবি করা যায় না?" এই সংশয়-বাহিত প্রশ্নের অন্বেষণে একটি কাহিনীর হদিশপাওয়া গেল তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ছোট গল্প 'জলসার'। সত্যজিৎ রায়ের ভাষায়-'পড়তি অবস্থার জমিদারের গল্প। তহবিল প্রায় শূন্য, কিন্তু জলসাঘর প্রতি লোভ সংবরণ করতে পারেন না বিশ্বম্ভর রায়। এ গল্প থেকে ছবি করলে তাতে নাচ গানের সুযোগ স্বভাবতই আসবে।' কাহিনীকারের মত নিয়ে স্থির হ'ল 'জলসাঘর' এর চলচ্চিত্রায়ণের প্রস্তুতি। এবং সত্যজিৎ-এর অনুরোধে স্বয়ং তারাশঙ্কর চিত্রনাট্য লিখে যখন তাকে দিলেন, তখন দেখা গেল মূল গল্পের প্রেক্ষিত পালটে গিয়েছে ; স্বভাবতই এটি সত্যজিৎ-এর মনঃপূত হল না। লেখকের অনুরোধে তখন চিত্রনাট্য লিখলেন সত্যজিৎ।

. এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। জলসাঘর গল্পটি সত্যজিতের পছন্দ হয়েছিল, গল্পের নায়কের সঙ্গীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ - এর জন্য; অর্থাৎ গল্পটির পটভূমিতে নাচ-গান-এর প্রেক্ষিত গল্পের প্রাণশক্তি। তারাশঙ্কেরর কাছে গল্পের পটভূমি ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের এক প্রতিভূর প্রতীকী দম্ভ ও আত্ম অবক্ষয়ের ছবি। তারাশঙ্কর-এর 'জলসাঘর' গল্পটির দুটি অংশ ঃ রায়বাড়ী ও জলসাঘব। প্রথম কাহিনীটিতে গ্রামবাংলার জমিদারদের

যে প্রবল শক্তি-দম্ভ-অত্যাচারের কাহিনী আমাদের জানা, তারই পরিচয়। দ্বিতীয় কাহিনীতে জমিদার বিশ্বম্ভর রায় শুধু জলসাঘরের আসর বসিয়ে উদীয়মান বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে নিজের অহমিকা প্রকাশ করতে উন্মুখ। গল্পের পটভূমি ছিল ১৯২০ সাল - এর গ্রামবাংলার জমিদারী ব্যবস্থা ও উদীয়মান এক অর্বাচীন ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্ব। তারাশঙ্করের এ গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩৮১ সালের বঙ্গশ্রী পত্রিকায়। সত্যজিৎ এ কাহিনীর চলচিত্র করার ভাবনা করছেন ১৯৫৭ সালে। আজ ১৯৯২-এর পরিবর্তিত সময়ের বিক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপটে —পুরো আর্থ-সামাজিক ও আর্থ-সাংস্কৃতিক পালাবদলের দৃশ্যপট কিছুটা ধূসর হয়ে উঠেছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কিছুটা উপলব্ধি করা যায় যে তারাশঙ্করের চেতনায় ১৯৫৭ সালেও জামিদারী-সুলভ দম্ভ ও অহমিকার সঙ্গে উঠতি ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্বের পুরনো রেশ মিলিয়ে যায়নি। তাই তাঁর চিত্রনাট্য রচনায় কাছারী-খাজাঞ্জি-গোমস্তা ইত্যাদির কথা ঘুরে ফিরে এসেছে, এবং ফ্ল্যাসব্যাকের পদ্ধতিতে মহিম তথা উঠতি ব্যবসায়ীর ছেলেবেলার এপিসোডের বর্ণনা এসেছে। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই গল্পের এই গতিপ্রকৃতি সত্যজিতের পছন্দ হয়নি। তাই চলচ্চিত্র শিল্পের মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি চিত্রনাট্য লিখলেন নিপুণ রচনায় এবং পটভূমির সংহত ইঙ্গিতে ও নির্দেশে।

দ্বিতীয়তঃ আর একটি মনে রাখতে হবে। সত্যজিৎ রায় মনে মনে স্থির করেছিলেন ছবিতে নাচ-গানের ব্যবহার থাকলে বাঙালী দর্শকের কাছে সেই ছবি গ্রহণীয় হবে। কিন্তু বাঙালী দর্শক ও শ্রোতা চলচ্চিত্রে যে ধরণের নাচ-গানের ফোয়ারায় মোহগ্রস্থ, —সত্যজিৎ রায় যে সেই অর্থে প্রতিটি ছবিতে নাচ-গানের প্রয়োগের কথা ভাবেন নি, তা পথের পাঁচালী থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ছবিতে প্রমাণ করেছেন; এবং ছবিতে সঙ্গীতের প্রয়োগে তিনি যে সংযম, প্রায়োগিক নৈপুণ্য, নিখুঁত কুশলতার স্পষ্ট চিহ্ন রেখেছেন, — তা বাংলা ছবিতে তাঁর আগে এমনভাবে দেখা যায়নি।

অর্থাৎ প্রমোদ-বিতরণের জন্যই চিত্রশিল্পে সঙ্গীতের তথাকথিত প্রয়োগে সত্যজিতের প্রথম থেকেই যে আস্থা ছিল না— তা তিনি 'পথের পাঁচালী'র নেপথ্য সঙ্গীতের কুশলী ব্যবহারেই প্রমাণ রেখেছেন। 'জলসাঘর' ছবিতে, তিনি সঙ্গীতের ভূমিকাকে শুধু দীর্ঘতর ও ব্যাপকতর করলেন, তা নয়—পুরোদস্তুর পেশাদারী গায়ক ও ভারতবিখ্যাত নর্তকীদের তাঁদের নিজস্বভূমিকায় এনে চলচ্চিত্রের দিগন্ত সম্প্রসারিত করলেন। কাহিনীর প্রেক্ষাপট মনে রাখলে, সত্যজিতের এই সাঙ্গীতিকী প্রয়োগ যে এত স্বচ্ছ-স্পষ্ট-সাহসী পদক্ষেপে দীপ্ত হয়ে উঠেছে, তা যে কোনো শিল্পবোধ-সম্পন্ন রসিক উপলব্ধি করতে পারবেন।

এই কাহিনীতে আমরা দেখেছি পড়তি জমিদারের বিলীয়মান শক্তির সঙ্গে উঠতি ব্যবসায়ীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্বন্দ্ব। তাই উঠতি ব্যবসায়ী মহিম গাঙ্গুলীর ছেলের উপনয়নের উৎসবে যখন সানাইয়ের সুর ভেসে আসে তাঁর কানে তখন তিনি 'সঙ্গীতপ্রেমিক' হিসেবে তার মধ্যে সুরের মায়াবী আনন্দ খুঁজে পেলেন না; তার বদলে তাঁর জমিদারসুলভ অহমিকায় একটা আঘাতের, তাঁর মর্যাদার অবনমনের আভাস দেখতে পেলেন। উজ্জীবিত হয়ে উঠতে চাইলেন অনেকদিন আগে তাঁর নিজের ছেলের উপনয়নের উৎসবের কথা ভেবে। তাঁর মনে পড়ে যায়, এই মহিম গাঙ্গুলী তখন তাঁরই অধীন একটি চরের ইজারা নিতে চেয়েছিল। অর্থের প্রয়োজন সত্ত্বেও তিনি সেই 'সুদখোরের ব্যাটা'কে ফিরিয়ে দেন — কারণ 'সুদখোরের টাকায় আমার একমাত্র ছেলের উপনয়ন হতে পারে

না।' সুতরাং আগের আমলের রায়গিন্নীদের গহনা দিয়েই উপনয়নের আয়োজন করার ব্যবস্থা হল। নাচগানের সমারোহ এবং খ্যাতনামা বাঈজী দুর্গাবাই-এর রূপ ও খ্যাতির উচ্ছলতা শুধু যে আসরের মর্যাদা বাড়িয়ে তুলল—তা নয়, জমিদার বিশ্বম্ভর রায়-এর মান-সম্মান রইল অটুট ও অভগ্ন। কিন্তু সে সব পুরনো দিনের স্মৃতি মাত্র। যে সম্পদের অভিমান বৃদ্ধির নিয়ম জানে না বা মানে না শুধু অপব্যয়ের বিলাসকেই মর্যাদার প্রতীক বলে দম্ভ প্রকাশ করে—তার সমগ্র অস্তিত্বে ক্ষয়ের পদচিহ্ন হয়ে ওঠে অমোঘ।

তাই মহিম গাঙ্গুলী যখন তার নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে পয়লা বৈশাখে বিশ্বম্ভর রায়কে 'পায়ের ধুলো' দেবার জন্য মিনতি করে, এবং বিশ্বম্ভর রায় তার কারণ জানতে পারেন তার মুখে—তখন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জমিদারসুলভ অহমিকায় স্থির করেন যে সেদিন তাঁর পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। কারণ এ পয়লা বৈশাখেই পূণ্যাহ উৎসব হবে তাঁর গৃহে। এই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের পরিণামে সিন্দুকের গহনার শেষ অংশে অবশেষে হাত পড়ে—হুকুম হয়ে যায় সব ব্যবস্থায় যেন কোনো কার্পণ্য না হয়—বুড়ো মুসলমান ওস্তাদ উজীর খাঁকে খবর দিয়ে আনার ব্যবস্থা চলে,—রাণীমা ও খোকাকে ঘরে ফেরার জন্য পাঠানো হয় খবর।

এই তথাকথিত আরোপিত পূণ্যাহ আয়োজনের মাধ্যম কাহিনীর একটা আশ্চর্য গতি দেখা যায়। পরিচালক সত্যজিৎ এই ঘটনাকে প্রতীকী অর্থে বিশ্বম্ভরের জীবনের ট্রাজেডির আভাস দেন। মানুষের জীবনের অনর্থ তথা ধ্বংসের সূচনা শধু তার আর্থ-সামাজিক অবনমন বা পতনের মধ্যে নেই, তার সমগ্র জীবনের প্রেক্ষাপটেও সেই ট্রাজেডির বীজ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাই জমিদার-বাড়িতে জলসাঘরের গানের ফোয়ারা যখন মন্দ্রিত ও আলোড়িত ঠিক সেই সময় রাণীমা ও খোকার বজরাডুবির আকস্মিক দুর্ঘটনার বার্তা। একই সঙ্গে স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে হারান প্রবল গর্বোদ্ধত বিশ্বম্ভর রায় এবং এই ট্রাজেডির প্রেক্ষাপট রচিত হয় গানের আসরের সুরেলা ও নন্দিত প্রমত্ততায়। এই প্রেক্ষাপট রচনাই প্রমাণ করে, চলচ্চিত্রে নাচ-গানের নিছক পরিবেশনায় বাঙালী দর্শকদের কাছে প্রমোদ-বিতরণের মাধ্যমে জলসাঘরকে সফল চিত্রনির্মাণের আশা-আকাঙ্খা করেছিলেন—সেই সঙ্গীত পরিবেশনা, তার সীমানা ছাড়িয়ে গেছে জীবনবোধ ও জীবনবোধির একাত্মতায়। সঙ্গীতের ভূমিকা ও ট্রাজেডি-বিধবস্ত বিশ্বম্ভরের জীবনের পরিণতি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সমান শক্তিতে।

সমগ্র কাহিনীটির চূরান্ত ক্লাইম্যাক্সে পরিচালক একটু একটু করে এই দ্বন্দ্বমুখরতাকে অসাধারণ শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—যে প্রতিষ্ঠা নায়কের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অবিস্মরণীয় অভিনয় এবং কুশলী ও দক্ষ সঙ্গীতকারদের নিখুঁত পরিবেশনা ছাড়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং মানতেই হবে সত্যজিৎ-এর প্রাথমিক পরিকল্পনায় বিন্দুমাত্র ত্রুটির অবকাশ ছিল না। শুরু থেকেই তিনি স্থির প্রত্যয়ে অটল ছিলেন যে 'জলসাঘর' চিত্রটিকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চগ্রামে বেঁধে তার সাফল্য সংশয়াতীত হবে।

ফ্ল্যাশ ব্যাক-এর সাহায্যে স্মৃতিচারিতার মধ্যে জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের জীবননাট্যের দুটি বিশেষ দিক ফুটে উঠেছে ঃ একটি হ'ল সাবেকী জমিদারসুলভ দম্ভ, অন্যটি হ'ল জলসার আসরের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ। 'জলসাঘর চলচ্চিত্রে — পরবর্তী অংশে অর্থাৎ মূল কাহিনীর প্রবাহে, এই দুটি সত্তার প্রবল দ্বন্দ্বে বিশ্বম্ভর রায়ের ট্রাজেডি বিম্বিত

তথা প্রতিফলিত হয়েছে।

মহিম গাঙ্গুলীর ছেলের উপনয়নের নিমন্ত্রণ রক্ষায় পুরনো ঐতিহ্যই তাই দেখা যায় ঃ হাতির পিঠে কাঁসার রেকাবির ওপর একটি মোহর পাঠিয়ে দিলেন বিশ্বম্ভর রায়, কিন্তু সন্ধেবেলায় মহিমের বাড়িতে রোশনাই জ্বলা জলসায় গেলেন না। অজুহাত অবশ্য শরীরের অক্ষমতার, কিন্তু মহিমের মুখে বাঈজী কৃষ্ণা বাঈ-এর নাম শুনে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাবে, তাকেই বায়না দেওয়ার হুকুম দিয়ে নতুন করে 'জলসাঘর' এর আসর ফের বসানোর আয়োজন হল শুরু। প্রায় শূন্য তহবিল, প্রাসাদ জরাজীর্ণ—পুরনো ঐশ্বর্যের শেষ চিহ্ন হিসেবে পড়ে রয়েছে দম্ভ এবং প্রবল আত্মাভিমান এবং বিলীয়মান বংশ মর্যাদা।

'জলসাঘর'-এর এই আয়োজন যে শেষ জলসার সমারোহ, এবং জীবনের জলসার আমোঘ ছন্দপতন—সত্যজিৎ শেষ পর্যায়ের প্রতিটি দৃশ্যে প্রক্ষিপ্ত করেছেন— এবং ছবি বিশ্বাসের অবিস্মরণীয় অভিনয়-প্রতিভায় তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনে হতচকিত বিস্ময়ে-তার শুরু; জলসার উদ্দীপ্ত আসরে, মহিমের ইনাম দেওয়ার হাত লাঠি দিয়ে বিশ্বম্ভরের আটকে দেওয়ার ভঙ্গিমা ও প্রথম ইনাম দেওয়ার অধিকার সম্পর্কে অমোঘ নির্দেশদান—এই একটি ছোট্ট ঘটনায় সামন্ততন্ত্রের প্রভুত্বের প্রতীক স্পষ্ট, এবং মহিমের অপমানিত মুখভঙ্গিমা—এই যৌথ দৃষ্টিভঙ্গীর চিহ্ন অভিনেতাদের সাবলীল অভিব্যক্তিতে যে কোনো উদাসীন দর্শককে, এই দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক দৃশ্যপটের মুখোমুখি করিয়ে দিয়েছে।

বিশ্বম্ভর রায়-এর কাছে প্রজন্মজনিত এই পার্থক্যের কারণ হ'ল —'রক্ত! The Blood in my veins' শ্রেণী-চেতনায় আবদ্ধ মহিমের কাছেও এই পার্থক্য হ'ল 'Self made man, no pedigree' ; কিন্তু পার্থক্য যাই হোক, বিশ্বম্ভর রায় উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর নিজের জীবনের মত সামন্ততন্ত্রের বিসর্জনও হয়ে উঠেছে অমোঘ। তাই আত্মধ্বংস ও আত্ম-অহমিকা একাকার হয়ে গেছে জলসাঘরের প্রতীকী দৃশ্যের মধ্যে। পূর্বপুরুষদের ছবির দিকে তাঁর দৃষ্টিপাতে, মদের গ্লাসের ভিতরে নিভন্ত ঝাড়বাতির প্রতিবিম্বে, দেয়ালগিরির বিলীয়মান আলোর শিখায়,—রাত্রিশেষের ফিকে আলোর ইঙ্গিতে।

প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে শেষবার জ্বলে ওঠে—এই প্রবাদবাক্যের প্রামাণ্য উদাহরণ আমরা দেখতে পাই বিশ্বম্ভর রায়ের অন্তিম পরিণতিতে। তাঁর প্রিয় ঘোড়া তুফানের পিঠে চড়ে দুঃসাহসিক যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন তিনি। এক হিসেবে এটি মৃত্যু অভিসারের তুল্যমূল্য। দুরন্ত বেগে ধাবমান তুফানের পিঠ থেকে পতন ও তাঁর রক্তমুখ অবস্থা শুধু তাঁর অমোঘ মৃত্যু চিহ্নিত করে না, তা এক হিসেবে সামন্ততন্ত্রের প্রতীকী অবসানের আভাস হিসেবে নতুন জীবনবোধ-এর ইঙ্গিত জানিয়ে দেয়। দৃশ্যপটের পিছনে উদীয়মান সূর্য সেই ইঙ্গিতকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করে ।

জলসাঘর সম্পর্কে কিছু তথ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে। সত্যজিতের ভাষায়, "'জলসাঘর' হিট করেনি, তবে অল্প খরচের ছবি বলে লোকসানও হয়নি।" হিট না করলেও এই চিত্রটি কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে মোট ৮ সপ্তাহ চলে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৮ সালের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক লাভ করে 'জলসাঘর'; মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে এটি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের পুরস্কার পায়। ফ্রান্সে এই ছবিটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে, বিশেষ করে প্যারিসের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি

পাবার পর এই ছবিটি ছয়টি সিনেমা হলে একটানা ৬মাস ধরে চলে।

এহো বাহ্য। ছবি বিশ্বাসের অনবদ্য অভিনয় এই ছবিটির অন্যতম সম্পদ। তারাশঙ্করের কাহিনীতে মহিম গাঙ্গুলীর কিছু ভূমিকা থাকলেও চিত্রনাট্যে তাঁর প্রবেশ-প্রস্থান বড় বেশী করুণ ও অনুকম্পামিশ্রিত। তা সত্ত্বেও গঙ্গাপদ বসুর অভিনয়ে উঠতি ব্যবসায়ীর চরিত্র ও চাল-চলন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বিলায়েৎ খাঁর সঙ্গীত পরিচলনা, আখতারী বাঈ-এর ঠুংরী, রোশনকুমারীর নৃত্য—সালামত খাঁর খেয়াল, বিসমিল্লা খাঁ, দক্ষিণামোহন ঠাকুর ইত্যাদির যন্ত্রসঙ্গীতে অংশগ্রহণ, এবং সর্বোপরি সত্যজিৎ রায়ের শিল্পরুচিতে Perfectionism-এর প্রভাব—এই ছবিটির মর্যাদা বহুগুণে সমৃদ্ধ করেছে।

জমিদারী-ব্যবস্থা, তার পরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধোত্তর বাঙালী জনসাধারণের তেমন কোনো ধারণা থাকা হয়ত সম্ভব নয়। সেই কথা মনে রাখলে আমরা যারা উপন্যাস-গল্পে-প্রবন্ধে নায়েব, লাঠিয়াল ইত্যাদির ভূমিকা পরোক্ষভাবে জেনেছি মাত্র। জেনেছি তাদের উদ্ধত প্রতাপ, নিষ্ঠুরতার বর্ণনা। কিন্তু জমিদার-এর অবস্থা যখন স্পষ্ট ভাঙনের মুখে, প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার অবস্থায়—তখন তাদের করুণ ভূমিকা কেমন হয়ে ওঠে—'জলসাঘর' ছবিতে তার কিছুটা পরিচয় আমরা পাই। নায়েব তারাপ্রসন্ন-এর ভূমিকায় প্রখ্যাত অভিনেতা তুলসী লাহিড়ীর অভিনয়ে আরো একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। সেটি হ'ল তার 'হুজুর', তথা বিশ্বম্ভর-এর মরিয়া-স্বভাবের খরচ করার প্রবণতার প্রেক্ষিতে তাঁর অবস্থার করুণতা বোঝাবার জন্য নায়েব-এর বিনীত প্রয়াস, —অন্যদিকে মহিম গাঙ্গুলীর কাছে জমিদারের নায়েব-এর মর্যাদা সম্পর্কে নিঃসংশয় সচেতনতা-দর্শকের দৃষ্টিতে আকর্ষণযোগ্য হয়ে উঠেছে। তুলসী লাহিড়ীর অভিনয়, এক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। অন্যদিকে খানসামা তথা প্রায় পার্শ্বচর-এর ভূমিকায় কালী সরকারের অভিনয়ে সে যুগের আত্মনিবেদিত কর্মচারীর চরিত্র-বিনয়-বাধিত ব্যবহার -এর ছবি স্পষ্ট হয়ে আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে।

ব্যাতিক্রম শুধু বিশ্বম্ভর রায়। তিনি কখনো ভোলেন নি যে অভিজাত বংশের রক্ত তাঁর ধমণী ও শিরায় বহমান। তাঁর প্রতিটি ভাবনায়-কাজে সেই অহমিকা, সেই গর্ব আমরণ ম্লান হয়নি। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই এই চরিত্রের ভূমিকালিপিতে ছবি বিশ্বাস ছাড়া আর কারো কথা ভাবা সম্ভব ছিল না। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য পরবর্তী প্রজন্মের দর্শকের কাছে স্মরণীয়ঃ "ছবি বাবুর মতো অভিনেতা না থাকলে 'জলসাঘর'-এর মতো কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভব হতো কিনা জানি না। বোধ হয় না। একদিকে বিশ্বম্ভর রায়ের দম্ভ ও অবিমৃষ্যকাবিতা, অন্যদিকে তাঁর পুত্রবাৎসল্য ও সঙ্গীতপ্রিয়তা এবং সব শেষে তাঁর পতনের ট্র্যাজেডি—একাধারে সবগুলির অভিব্যক্তি একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।"

আধুনিক যুগের শিল্প-সংস্কৃতি-সমাজ সম্পর্কে প্রামাণ্য ভাষ্যকার Raymond Williams (১৯২১-১৯৮৮) তাঁর Politics of Modernism গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে লিখেছেন —

'High Technology can distrubitue low culture : no problem. But high culture can persist at a low level of technology : that

is how most of it was produced.'

শিল্প-সংস্কৃতির প্রবহমান ধারার ইতিহাস যাঁদের উপলব্ধি হয়নি—তাঁরাই বারেবারে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে , এ দেশে সিনেমায় প্রযুক্তিবিদ্যার এ দৈন্য, এত অভাব সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায় কি যাদুবলে এমন সব বিচিত্র সৃষ্টির প্রাচুর্যে পৃথিবীর সব শ্রেণীর মানুষকে মুগ্ধ করে রেখেছেন। আসলে উন্নত দেশগুলিতে প্রযুক্তির ব্যবহার এমন সর্বত্র-সঞ্চারী হয়ে উঠেছে জীবনের সমস্ত কৃত্যকর্মে যে, তার বাইরে শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মনুষেরা অন্য কিছু ভাবতে পারেন না, অথবা ভাবতে চান না। প্রয়োগ-বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির এমন পরিব্যপ্তিতে, সংযম তথা সূক্ষ্মরুচির অনুপস্থিতি বারেবারেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে শিল্পকর্মে, এমন কি শিল্পভাবনায় ও শিল্পসমালোচনাতেও। সত্যজিৎ রায় এই সংযম, এই সূক্ষ্মরুচির প্রায়োগিক দক্ষতায় পৃথিবীর প্রায় সব চিত্রনির্মাতারে ও দর্শকদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বরেণ্য চিত্রপরিচালকরূপে নন্দিত ও বন্দিত হয়েছেন। Low level of technology তে যে High culture সৃষ্টি হয়েছে— তা ইতিহাসের বিষয় তা কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' এবং 'জলসাঘর'-এর চিত্রনির্মাণে, সত্যজিৎ রায়, প্রয়োগিক সংযম সূক্ষ্মরুচির এই আদর্শ পৃথিবীর সব মুগ্ধ দর্শকেরে সামনে উপস্থিত করে, নিজেই হয়ে উঠেছেন এক মহৎ আদর্শ।

অপু কাহিনীর যবনিকা

চন্দ্রশেখর

গত এক দশকের মধ্যে বিচিত্র প্রাণচাঞ্চল্যের ঢেউ নানারূপে ও ছন্দে বাংলা ছবির কূলে এসে আঘাত করেছে একথা সত্য, কিন্তু এই প্রাণের জোয়ারে বিনা আড়ম্বরে সকলের অলক্ষে যিনি নতুন দিগন্তের সন্ধানে তরীর নোঙর তুলেছিলেন তিনি সত্যজিৎ রায়। তাঁর নবদিগদর্শনের অপরূপ প্রকাশ "পথের পাঁচালী" যা দেশবিদেশের রসিকজনকে অপার বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। বিভূতিভূষণের অবিস্মরণীয় অপুকাহিনীর মধ্য দিয়ে বাংলা ছবির এই নবীন পথিকৃৎ-এর পথ পরিক্রমার অভিনব পাঁচালী 'অপরাজিত'-র পর এক অপূর্ব শিল্প পরিণতি লাভ করেছে তাঁর অধুনাতম ছবি 'অপুর সংসার'- এ।

সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্স-এর 'অপুর সংসার'-এর চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত'র শেষাংশ নিয়ে। কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করে ধূলিরুক্ষ পৃথিবীর পথে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয় অপু। প্রাণে তার অপরিমেয় জীবনীশক্তির উচ্ছলতা, অন্তরে তার বড় হবার স্বপ্ন। সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে সে অমর হয়ে থাকবে অনাগত পাঠকদের মনে। অন্তরের স্বপ্ন আর বাইরের সংঘাতের দ্বৈরথ সংগ্রামে অপু যেন এক ক্লান্তিহীন যোদ্ধা। এমন দিনে হঠাৎ তার দেখা কলেজ দিনের পুরনো বন্ধু প্রণবের সঙ্গে। সেই দিনই অপুর জীবনদেবতা তার ছন্নছাড়া জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূত্রটি অলক্ষে গেঁথে দিয়ে যান।

ভাবপ্রবণ অপু মহৎ কিছু একটা করবার ঝোঁকে বিয়ে করতে রাজী হয় প্রণবের মামাতো বোন অপর্ণাকে। বর অপ্রকৃতিস্থ এ দু-সংবাদ যখন রটে গেল, তখন দুঃখিনী জননী যেন নিয়তির সকল প্রতিকূলতাকে ব্যর্থ করেই মেয়েকে আঁকড়ে রাখলেন বুকে। অপর্ণা দো-পড়া হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় ম্রিয়মান। অপর্ণার ব্যথা, তার মায়ের কান্না এসে আঘাত করে অপুর মনে। তাই বন্ধু প্রণবের অনুরোধ অপুর মনের সুপ্ত মানবতাবোধটিকেই জাগিয়ে তোলে। সেই রাত্রের শেষ লগ্নে সে অপর্ণাকে জীবন-সঙ্গিনী করে নেয়।

কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে অপু অপর্ণাকে হারায় অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই। দাম্পত্যজীবনের রস-মাধুর্যের কোরক নব-দম্পতির জীবনে পাপড়ি মেলতে পারলো না। প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অপর্ণা বিদায় নেয় সংসার থেকে।

অপর্ণার মৃত্যুর নিদারুণ আঘাতে অপু ছিটকে বেরিয়ে পড়ে পথে, প্রান্তরে , দূর দেশে। ছেলের টানও তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঁচ বছর পর সে যখন ফেরে ছেলে কাজলের কাছে, কাজল তখন পরম বন্ধু ভেবেই ধরা দেয় তার কাছে। ছেলেকে নিবিড় স্নেহে কাঁধে তুলে নেই অপু। সুখের বোঝা বয়ে নিয়ে এগিয়ে যায় নতুন জীবনের সন্ধানে। অপু- কাহিনীর এই অধ্যায়ের চিত্ররূপায়নে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের অনন্য সাধারণ প্রয়োগশিল্পের অআশ্চর্য দীপ্তি আলিপ্ত হয়ে আছে ছবির

সর্বাঙ্গে। এ-ছবিতে তিনি যেক্ষেত্রে প্রয়োগরীতির নতুনত্ব দাবী করতে পারেন সেটি হল কাহিনীর ভাববিন্যাসে সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি। তাঁর অন্যান্য ছবির মতো ধোঁয়াটে ভাবের অস্পষ্টতা এতে নেই। আখ্যানভাগের নাট্যাবেগ অকম্পিত এবং মরমীরেখায় রূপায়িত এ-ছবিতে। অপু-অপর্ণার দাম্পত্যজীবনের মৃত্তিকাশ্রয়ী মধুর অনুভূতির গাঢ় স্বাদ (মনসাপোতায় অপুর মনের কথাটি জেনে অপর্ণার চাঁপা গাছের ডাল পোতা, বর্ষণমুখর রাতে তার কবিতা আবৃত্তি, প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় টিপ-পরা মুখের দিকে অপুর বারবার চেয়ে থাকা এবং আরো কত কি।) এ ছবিতে না থাকলেও, শহুরে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নবদম্পতির গৃহস্থলী, ছোট ছোট মিষ্টি কথায়, মান-অভিমানে, দুরন্ত জীবন-পিপাসায় এমন আবেগ নিবিড় হয়ে বাংলা রজতপটে এর আগে কখনও উপস্থিত হয়নি। রূপকার হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের এই কৃতিত্ব হয়তো অনতিক্রমণীয় হয়েই থাকবে।

এ বাদেও ছবির অনন্য শিল্প গরিমা ও রূপরীতি, ব্যাঞ্জনা ও ইঙ্গিতের সূক্ষ্ম অথচ সহজবোধ্য বিন্যাস এবং সর্বোপরি এর নিরুচ্ছ্বাস গীতিময়তা দর্শকের অনুভূতিকে পুলকিত ও বিস্মিত করে। সত্যজিৎ রায়েব আগের ছবির মতো 'অপুর সংসাব' ভাস্কর্যের কঠিন সূক্ষ্ম সুষমা বা শিল্পীর তুলির টানে অস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জনায় অতীন্দ্রিয় নয়। শ্রীরায় তাঁর মননশীল পরিচালনার সঙ্গে সুতীব্র অথচ বসবোধের এমন অনাস্বাদিত সমন্বয় ঘটিয়েছেন যার ফলে ছবিটি রসিকজনের কাছে একটি অভূতপূর্ব কীর্তি হিসাবে শ্রদ্ধাও বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে বিভূতিভূষণেব সাহিত্যিক মানসেব সঙ্গে পরিচালকের কল্পনার গবমিল হয়তো সত্যজিৎ রায়ের এই ছবিতেই বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহৎ শিল্পসৃষ্টির প্রয়োজনে ছোট ছোট ঘটনা ও অংশের পরিবর্জন ও পরিবর্ধন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ছবির প্রধান চরিত্র উপস্থাপনে তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও কল্পনার আশ্রয় যেমনভাবে নিয়েছেন তা চিত্রস্রষ্টার দৃষ্টিসিদ্ধির পবিচায়ক হয়ে ওঠেনি। অপর্ণার মৃত্যুর পর অপুকে দেখানো হয়েছে শ্মশ্রুধারী বিবহীরূপে, যে দীর্ঘ পাঁচ বৎসব দয়িতার বিযোগ ব্যাথা বয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা জায়গায়। অপুব শোকাবেগ নিয়ে ছবিকে যেভাবে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে তার মধ্যে বিভূতিভূষণেব অপুকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। অপর্ণাব ব্যাথা জড়িত স্মৃতি অপু কোনদিন ভুলতে পারেনি সত্য; কিন্তু তার দার্শনিক মনের গহনে সে প্রিয়জনের মৃত্যুকে জীবনচক্রের নিষ্ঠুর দেবতার খেলা বলে ভেবে এসছে মায়ের মৃত্যুর পর তার মনে প্রথমটা আসে একটা 'মুক্তিব নিঃশ্বাস...বাধন ছেঁড়ার উল্লাস' (লেখকের ভাষায়)। এই সর্ববন্ধন-মুক্তির অভীপ্সা অপু-চরিত্রের মূল কথা। অনাদিকে প্রকৃতির কোলেই সে মানুষ—প্রকৃতির জীবনস্পন্দনে সে পেয়েছে নিঃসীম জীবনের সন্ধান। দশ বৎসর বয়সের 'অবোধ, উদগ্রীব, স্বপ্নময়' শৈশবটি ছিল তার চিরদিনের চাওয়ার বস্তু। তৃণে তৃণে, বনবীথির শ্যামল ছায়ায়, গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিলীন হয়ে যেতে চেয়েছে সে মহাজীবনের সন্ধানে। মানুষের যৌবনে-জীবনে, সুখে-দুঃখে, পাপ-পুণ্যে, শোকে-শান্তিতে সে খুঁজেছে বৃহত্তর জীবনকে। এই জীবন যেন প্রকৃতির চঞ্চল জীবনধারারই প্রতীক।

অনন্ত জীবনেব এই উৎস ও বিকাশ সে লিপিবদ্ধ করবে তার উপন্যাসে, এই ছিল তার প্রেরণা। সেই জন্য অপুর অভিযান শুরু হয় 'মানবাত্মার রাজপথে অজস্র মানুষের

মিছিলে' মিশে গিয়ে, জীবনবিচ্ছিন্ন বৈরাগ্যের পথে নয়। তাই অপু 'মা যেমন শিশুকে চোখের সম্মুখে কান্না হাসির মধ্য দিয়া বাড়িতে দেখেন' তেমনিভাবে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিকে পরম আগ্রহে আঁকড়িয়ে রাখে। বিভূতিভূষণের এই জীবনবাদী অপুকে (যার মতে 'জীবনকে যাপন করা একটা আর্ট-তা এরা জানে না বলেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসায়ে দেউলে হয়ে পড়ে') জীবনের উৎসব থেকে পালিয়ে বেড়ানো বিবাগীরূপেই শুধু দেখানো হয়নি, তার সাধের উপন্যাসটিকেও—যা তার কাছে জীবনবেদের মহাভাষ্যের মতো—ফেলে দিতে দেখানো হয়েছে। অপু-চরিত্র কল্পনায় পরিচালকের নিজস্ব ভাষ্য (যার অধিকারগত প্রশ্নটুকু বাদ দিলেও) বিভূতিভূষণের অপু আখ্যানের জীবন-দর্শন ও মূল রসটিকে খর্ব করেছে।

কাজলকে 'অলীক অবাস্তব' ভেবে অপুর দূরে সরিয়ে রাখাটাও ছবিতে রসহানি ঘটিয়েছে। ভ্রাম্যমাণ জীবন শুরু করবার আগে অপু কাজলকে গিয়ে দেখে আসে তার মামার বাড়ীতে। এরপরেও কাজলকে নিয়ে তার মনে হয়েছে 'এই যে ছেলে, পৃথিবীতে সে যাচিয়া আসে নাই—এই নিষ্পাপ বালককে এভাবে সংসারে ছাড়িয়া দিয়া পালানো কি অপর্ণাই সহ্য করিবে?' তার ওপর, যে কাজলকে পরিচালক পর্দায় উপস্থাপিত করেছেন সেও বিভূতিভুষনের কল্পনা-প্রবণ, ভীতু, প্রকৃতি প্রিয় কাজল নয়। কাজল পাখী ভালবাসে, পাখীর ডাক তার মনে পুলক রোমাঞ্চ জাগায়। ছবিতে কাজলের মধ্যে দেখা যায় পাখী মারবার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি। কাজলের পাখী মারা ও পরে মরা পাখীটিকে এক বৃদ্ধার মুখের সামনে নিয়ে ধরার ঘটনাটি শিশু-চরিত্রের স্বাভাবিক মাধুর্য নষ্ট করেছে। কাজলের প্রকৃতির এই 'স্যাডিজম' বা নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি অপু-অপর্ণার ছেলের সম্বন্ধে ভাবতে অবাক লাগে। চরিত্র বিন্যাসে এমনিতরো রুক্ষ্ম তার আভাস মেলে যখন অপু অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মুরারিকে সজোরে ঘুষি মারে, আর কাজলের দাদু যখন লাঠি উচিয়ে মারতে যান। অপু ও কাজলের মধুর সম্পর্কের যে উপাখ্যান মূল কাহিনীতে রয়েছে ছবিতে তার আভাস অল্প। কাজলের পক্ষে তার শ্মশ্রুধারী বাবাকে চিনতে না পারার ফলেই দর্শকেরা বিভূতিভূষণের এই আখ্যানের রস থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কাজলের অপুকে বাবার পরিবর্তে বন্ধু ভাবে মেনে নেওয়া সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব কল্পনা যা ছবিটিকে এক বিশেষ রসসম্ভার থেকে বঞ্চিত করেছে। মূলকাহিনীর রাণু-দি ছবিতে অনুপস্থিত থাকার ফলেও অপু কাজলের উপাখ্যানটি ছবিতে অপূর্ণ থেকে যায়।

ছবির অন্যান্য বৈসাদৃশ্যের মধ্যে বাড়িওয়ালার সঙ্গে অপুর কাটা কাটা কথা তার মতো ভাবপ্রবণ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যুবকের পক্ষে বেমানান। কাহিনীর কাল দেখাতে গিয়ে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য নজরে পড়ে।

রসজ্ঞ দর্শকের মনে ছবিটির একটি দিক বিশষভাবে শূন্যতার সৃষ্টি করবে। অপুর সংসার সর্বজয়ার স্মৃতিমাখানো নয়। দুর্গার কথা বাদ দিলেও, সর্বজয়ার স্মৃতি অপুর জীবনে কোনদিনই অম্লান হয়নি। বিয়ের রাতেও অপুর মনে হয়েছিল 'মাকে বাদ দিয়ে জীবনেব কোন উৎসব।' বিয়ের পর সর্বজয়াকে নিয়ে অপর্ণার সুন্দর স্বপ্নটি কাহিনীতে যে নাট্যআবেদন সৃষ্টি করে পরিচালক তার সুযোগ নেননি। ছবিতে সর্বজয়ার স্মৃতি থাকলে অপুকাহিনীর শেষ ছবিটি আরও হৃদয়গ্রাহী হত এবং এতে 'অপুর সংসারের' কাহিনী স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে বাধা থাকত না।

বিভূতিভূষণের অসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টির মর্মরস ছবিটিতে পরিপূর্ণ রূপে না পেলেও সত্যজিৎ রায়ের একটি নিজস্ব সৃষ্টি হিসাবে 'অপুর সংসার' —ভাবে-রসে ও আঙ্গিকে —বাংলা চলচ্চিত্রের একটা অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে। নিঃসন্দেহে। বিদেশেও এ ছবি একটি অনুপম চিত্রসৃষ্টি হিসাবে আদৃত হবে।

ছবির শিল্পী নির্বাচন সত্যজিৎ রায়ের আর একটি উজ্জ্বল কৃতিত্ব। অপর্ণার ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুর যে সংযম, দরদ ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন তা অতুলনীয়। মনে হয় শর্মিলা বিভূতিভূষণের অপর্ণারই একটি পরিপূর্ণ রূপ যার ছোট ছোট অস্ফুট কথা আর নম্র নেত্রপাত ছবিতে মরমী রসের মাধুরী সৃষ্টি করে। অপুবেশী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় চরিত্রোচিত ও মর্মস্পর্শী। তিনি বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে অপু চরিত্রের মর্মমূলে পৌঁছতে পেরেছেন অনেকাংশে। তাই তাঁর অভিনয়ে বিভূতিভূষণের অপু বারবার মূর্ত হয়ে ওঠে। একটি সাধারণ চরিত্রকে প্রাণোচ্ছল অভিনয়ের গুণে স্মরণীয় করে তুলেছেন পুলুরূপী (প্রণব) স্বপন মুখোপাধ্যায়। কাজলের চরিত্রে আলোক চক্রবর্তী দর্শকমনে মায়ার সৃষ্টি করে। ছোট ভূমিকায় অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধীরেন ঘোষ, বেলারাণী, শেফালিকা (পুতুল), ধীরেশ মজুমদার ও পঞ্চানন ভট্টাচার্য

সত্যজিৎ রায় রচিত ছবির সংলাপ সুন্দর, সাহিত্যরসে মণ্ডিত। অপু অপর্ণার দাম্পত্যজীবনের কথাগুলি মনে রাখবার মতো। অপর্ণার লেখা চিঠিও মধুর রসে সিঞ্চিত।

সঙ্গীত পরিচালনায় রবিশঙ্কর তাঁর সুনাম অবশ্যই রক্ষা করেছেন। সুরের মায়াজালে সুন্দর পরিবেশ রচনা করে তুলেছেন তিনি কয়েক জায়গায়।

আলোকচিত্রে সুব্রত মিত্রের কাজ মোটামুটি প্রশংসনীয় তবে আলো-অন্ধকারের যথাযথ বিন্যাসে (যেমন অপুর বিয়ের রাতের দৃশ্য) তাঁর ক্যামেরা তেমন সফল হয়নি। সম্পাদনায় দুলাল দত্ত, শিল্পনির্দেশে বংশী চন্দ্রগুপ্ত, শব্দগ্রহণে দুর্গাদাস মিত্র এবং মেক-আপে শক্তি সেনের কাজ প্রশংসনীয়।

চিরায়ত সিকোয়েন্স ঃ অপুর বিবাহপর্ব

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র তরণী-বাহিকা তরুণীর মতই মাঝি অপুকে পৌঁছে দেয় তার জীবনের এক রহস্যময় তীরে।

অপুরা পৌঁছে যায় নদীতীরবর্তী সেই অসন্ন বিবাহ উৎসব মুখরিত বাড়ীতে। অপুর মত অনিন্দ্যকান্তি এক যুবকের আগমনে বেশ সাড়া পড়ে যায়। অবিস্মরণীয় সেই পুলুর মামীমার (অপর্ণার মা) সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্তটি ঃ 'যেন কেষ্ট ঠাকুরের মত মুখ, যেন কোথায় দেখেছি'। পুলু বললে, 'হ্যাঁ হাতেও বাঁশি আছে। দেখতো মামীমা, আমার হাতে এমন পাত্র থাকতে অপর্ণার কোথায় বিয়ে দিচ্ছো, আমাকে তো একবার জানাতে পারতে।' অপর্ণার মার ভঙ্গীতে ফুটে ওঠে— 'সবই ভাগ্য'। এই সংলাপগুলি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ— অবশ্যই সবই 'ভাগ্য' বা আকস্মিকতায় ভরা।

এইখানে অপুর দীর্ঘ কাহিনী—'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে এতদূর পর্যন্ত এসে, হঠাৎ একটা নতুন বাঁক নেয়; এর আগের ঘটনাগুলি 'এপিসোডিক' রীতিতে একর পর এসেছে গেছে, কোথাও কোন আকস্মিকতাপূর্ণ 'গপ্লো'র ধরণ পায়নি, সমস্তই স্বাভাবিকতার স্রোতে বহমান অর্থাৎ জীবনে যা সচরাচর ঘটে তারই যেন এক সুখ-দুঃখময় স্রোতোধারা হঠাৎ এখানে এসেই ঘটনাস্রোত এক চমকপ্রদ বাঁক নিল, যা সচরাচর ঘটে না, তাই ঘটতে চলল। এই রীতমতো চমক-প্রদ ঘটনা 'অপুর বিয়ে'- চিত্রত্রয়ীর স্বাভাবিকতার পরিপন্থী। কিন্তু সচরাচর না ঘটলেও, এরকম ঘটনা যে একেবারেই ঘটে না, তা অবশ্যই নয়। মূল গ্রন্থে অপু ও অপর্ণার দুটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবনের এমন আকস্মিক মিলনের মধ্যে স্রষ্টা বিভূতিভূষণ এক মহাকালের বা ঈশ্বরের অলক্ষ্য বিধান দেখেছেন। সত্যজিৎ রায় তার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত না দিয়েও এমন স্বাভাবিকভাবে এটিকে গড়ে তুলেছেন যে কোথাও এই অকস্মিকতা আমাদের, এমনকি বিদেশী দর্শকদেরও মনে এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে না—এবং সেটি সম্ভব হয় সমস্ত অবস্থাটির নিখুঁত বাস্তবসিদ্ধ বর্ণনায়, বিশেষত অপুর মনস্তত্বের এক অসাধারণ কাব্যিক ডিটেলে। এবং এখানেও ল্যান্ডস্কেপের এক অসামান্য ম্যাজিক্যাল ব্যবহার লক্ষ করি।

অপুর বিবাইপর্ব নানাদিক থেকে অপুর ছবিতে এক উল্লেখযোগ্য মূল পর্ব—এবং এটি বিশদ ব্যখ্যার অপেক্ষা রাখে । এটিকে মূলতঃ চারটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

(১) অপর্ণাদের পরিবারের সঙ্গে অপুর প্রাথমিক পরিচয়—যা আগেই বিবৃত হয়েছে। লক্ষনীয় যে অপুর এই বিবাহ উৎসবে আসার কথাই নয়, সম্পূর্ণ বহিরাগত যে অপু তার অপরিচয়ের দূরত্ব কিভাবে কমে এল অপর্ণার মায়ের একটি সংলাপে।

(২) বিবাহপর্বের সমগ্র পরিবেশ এবং অপুর তির্যক উপস্থিতি। এটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য; চলচ্চিত্রের বর্ণনারীতিতে এটি অবিস্মরণীয়। মূল উপাদান হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে নদীতটের এক বিচিত্র ল্যাণ্ডস্কেপ এবং এক অসাধারণ কল্পনাশক্তিময়

সমান্তরাল ট্র্যাকিং শট। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের এই দুরূহ বর্ণনাটির মূল সূত্র (key) বিধৃত আছে এই সমান্তরাল এক ট্র্যাকিং শটের মধ্যে।

বিয়ের দিনের মধ্যাহ্ন গড়ান অপরাহ্ন বেলা, নদীতীরে, তটে সরলরেখায় বিস্তৃত খাড়া সুষমাময় বৃক্ষশ্রেণী। বাম থেকে দক্ষিণে দেখলে—প্রথম দিকে নদীতট সমান বা 'ফ্ল্যাট', কিন্তু কিছু এগুলেই মাঝের জমি একটু একটু করে ওপরে উঠে আবার নদীতীরের চেয়ে কয়েকফুট উঁচু স্তরে আবার মসৃণ সমান হয়ে গেছে। নদীতীরের আর একদিকে (ডানদিকে) অপর্ণাদের প্রাচীন অট্টালিকা। এই হচ্ছে ল্যাণ্ডস্কেপ। আমরা প্রথমে দেখি নদীতীরে নৌকা থেকে নামছে বরযাত্রীর দল। তারপর পাল্কীতে বর — পাল্কী বাহকেরা, বরের গুরুজনেরা অন্যান্য বরযাত্রী, সম্মুখভাগে ব্যাণ্ডপার্টি — এক মিছিল চলেছে অপরাহ্নের আলোয়, ব্যাণ্ডে বাজছে এক ইংরেজি গানের বাজনা 'ফর হিস এ জলি গুড ফেলো...'। অবশ্যই এক বিচিত্র 'জলি গুড ফেলো' পাল্কীতে বররূপে সমাসীন... নদীতীরের এই প্রাণময় মিছিলটিকে সমান্তরালভাবে ট্র্যাকিং করতে থাকে সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরা, এক অনবদ্য চলমান লং শটে — মাঝে মাঝে খাড়া বৃক্ষশ্রেণী পার হয়ে যায়। হঠাৎ ট্র্যাকং হতে হতে দেখি সম্মুখভাগের জমির অংশ একটু ওপরে উঠে যায় ও আবার মসৃণ সমান হয়ে যায় — তখন নদীতীর নীচু হয়ে পড়ে—সেখান চলছে সেই 'জলি গুড ফেলো'র বাজনা মুখরিত শোভাযাত্রা — হঠাৎ এই ভাবে ট্র্যাকিং হতে হতে দেখি সম্মুখভাগের উন্নত জমিতে, অর্থাৎ 'ফোরগ্রাউণ্ডে' এক নিদ্রিত তরুণের মাথা ও মুখ, অপু — তার মাথার তলায় রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' গ্রন্থটি — অপূর্ব পরিতৃপ্তিময় নিদ্রিত অপু — ট্র্যাকিং-এর সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে ডানদিকে মাথা বাম দিকে পা করে শায়িত —ঘুমন্ত হাতের কাছে তার বাঁশিটি ঘাসের উপর লুণ্ঠিত। যখন সম্মুখভাগে নিদ্রিত অপু এবং পশ্চাদপটে নদীতীরে সেই বিবাহের শোভাযাত্রা, ক্যামেরা হঠাৎ ট্র্যাকিং বন্ধ করে দেয়। এবং স্থির শটের ফ্রেমিং-এ ধরা পড়ে সম্মুখভাগে নিদ্রিত অপুর শরীরের উর্ধ্বাংশ এবং পশ্চাদ্‌পটে কিছু নীচে সেই বিচিত্র বিবাহ মিছিল ও নদীতট। এটি একটি অসামান্য লং শট —এই শটে বিন্যস্ত প্রত্যেকটি বস্তু তাদের নিজস্ব সৌন্দর্যে ও তাদের প্রতীকী তাৎপর্যে ভাস্বর। আমরা প্রথমতঃ (ক) এই অনবদ্য কম্পোজিশনটির মধ্যে 'পেস্টোরাল' সুর লক্ষ্য করি — অপু যেন রাখাল বালকের মত মধ্যাহ্নে-অপরাহ্নে নদীতটে নিদ্রিত, মুখে তার স্বর্গীয় শান্তি, মাথার তলায় কাব্য, হাতের কাছে রাখালিয়া বাঁশি—এবং এতটুকুও জানতে পারছে না নেপথ্যে ঘটনাস্রোত কিভাবে তার সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে চলছে। অপুর এই তির্যক উপস্থিতি লক্ষণীয়। (খ) দ্বিতীয়ত লক্ষ করি, এই সেই নদীতীর - যে নদীতীবে 'অপুর সংসার' তথা অপু চিত্রত্রয়ীর শেষ দৃশ্যে অপুর জীবনের প্রতীকী তাৎপর্যে অবস্মরণীয় হয়ে উঠবে। ভাগ্য যেন সেই নদীতীরেই তার জীবনের সবচেয়ে বড় খেলা খেলতে চলেছে এবং সেটিই দৃশ্যময়ভাবে উচ্চারিত হয়েছে এই অসামান্য ট্র্যাকিং শটে। (গ) তৃতীয়তঃ, এবং সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয়, আমরা জানি অপু সম্পূর্ণ বহিরাগত, অপর্ণার বিবাহে তার আগমন একেবারে আকস্মিক ও সর্বযোগসূত্রহীন— বিবাহের আনন্দ আয়োজন কলরব সব থেকে সে দূরে— বস্তুতঃ সে এক নিরাসক্ত দুদিনের দর্শকমাত্র — তথাপি আমরা জানি কিছু পরেই এই অপুই হবে সকল ঘটনার কেন্দ্রমণি, অপর্ণার ইহজীবনের সবচেয়ে প্রিয়জন। এটিকে কিভাবে দৃশ্যময় করে দেখান সম্ভব?

এটিকেই দৃশ্যময়ভাবে (ভিস্যুয়ালি) সমাধান করেছেন সত্যজিৎ রায় তাঁর-অসামান্য চলচ্চিত্র ভাষায়। আমরা প্রথমে দেখি ট্র্যাকিং শটের ফ্রেমের বরকে মধ্যে পাল্কীতে করে নিয়ে চলা এক 'জলি গুড ফেলো'র শোভাযাত্রা, ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ এখন তাদের ওপর, কেননা আজ অপর্ণার বিয়ের দিনে তারাই প্রধান, তারাই ভি, আই, পি। তারপর হঠাৎ সিম্ফনিক সংগীতে চলতি সুরধারার মধ্যে নূতনতর থীম, এবং (সুরে) ক্রমশ আর্বিভাবের মতন, এই ট্র্যাকিং শটে হঠাৎ সম্মুখভাগের জমির অংশ ধীরে ধীরে উঠে গেল এবং অবিভূত হল সম্মুখভাগে (ফোরগ্রাউণ্ডে) নিদ্রিত অপুর 'ইমেজ', নূতনতর 'থীম'। ক্যামেরা খুবই ইঙ্গিতময়ভাবে এখানে স্থির হয়ে চেয়ে থাকে। হঠাৎ এতক্ষণ যে বর ও বরযাত্রীরা ছিল 'প্রধান', ট্র্যাকিং শটের নূতন অবস্থানে তারা হয়ে গেল 'অপ্রধান'। এখন 'ফোর গ্রাউণ্ডে' অপু হল 'প্রধান' এবং পশ্চাদ্‌পটে বরযাত্রীরা শুধু 'অপ্রধান' নয়, ক্যামেরার উঁচু অবস্থানের গুণে উঁচু এংগেল শটে তারা 'নগণ্য' হয়ে যায়—ঠিক কিছু পরেই যেমন তারা 'তুচ্ছ' হয়ে যাবে, অপু হয়ে উঠবে ঘটনাস্রোতের কেন্দ্রমণি। অর্থাৎ ভিস্যুয়ালি অপুর এই অবস্থার পরিবর্তনটি যথাযথ ও স্বাভাবিক। যা কিছু পরেই ঘটনায় ঘটবে, তাই যেন সত্যজিৎ রায় তাঁর ট্র্যাকিংশটের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করলেন 'ভিস্যুয়ালি', ঠিক সংস্কৃত কাব্যনাট্যের পূর্বাভাসের ইঙ্গিতের মত। তাছাড়া লক্ষণীয়, এখানে নতুন থীম (অপুর আর্বিভাব) ঠিক সিম্ফনিক সংগীতের গঠনে উপস্থাপিত।

এরপর নিদ্রিত অপুর অবস্থান থেকে ক্যামেরা যখন দেখায় দূরে অপর্ণার বাড়ীর সামনে বরযাত্রীর শোভাযাত্রা উপস্থিত—বরকে নামান হবে মহা আড়ম্বরে পাল্কী থেকে —তখন আমরা এক অনবদ্য কৌতুহল অনুভব করি। (৩) অপুর বিবাহপর্বের তৃতীয় অংশটি হচ্ছে —অপর্ণার বর যে উন্মাদ তা আবিষ্কৃত হওয়া ও তার মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া। ঘটনাস্রোত এখানেই হঠাৎ অপুর দিকে বাঁক নেয়। বরকে পাল্কী থেকে নামাতে গেলেই জানা যায় এই 'জলিগুড ফেলো'টি উন্মাদ। মুহূর্তে সে খবর অন্দরমহলে ছড়িয়ে পড়ে এক দুর্ঘটনার মত। আমরা জানি সত্যজিৎ রায়ের ক্যামরার নড়াচড়া সর্বদাই খুব ধীর, বাহ্যলক্ষণহীন, যেন সেটি তিনি দর্শদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে যত্নশীল, যেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বলতে চান, দৃশ্যটিকে, তিনি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখাতে চান বলেই এমনি নয়, দৃশ্যটি মূলতঃই এমনি; কিন্তু মাত্র কয়েকবার তাঁর ক্যামেরা হঠাৎ যেন নাটকীয়তার সঙ্গে ভয়ঙ্কর গতিশীল হয়ে ওঠে — যেন নিষ্ঠুর নির্মম। এর সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যবহার আছে অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ শোনার পরমুহূর্তে — ক্যামেরার সেই দ্রুত নির্মম এগিয়ে যাওয়া বেদনাজীর্ণ ক্রুদ্ধ অপুর দুঃসহ মুখের দিকে, ভয়ঙ্কর এক ক্লোজশটে। এই মৃত্যুসংবাদ যেমন দুঃসহ, ক্যামেরা যেন তেমনি দুঃসহ হয়ে এগিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় অপুর মুখের যন্ত্রণার সামনে। এটি একটি ভয়ঙ্কর জান্তব 'ক্যামেরা মুভমেন্ট'। ঠিক এতখানি না হলেও, অনেকটা এই ধরণের এক নাটকীয় দ্রুত ক্যামেরার এগিয়ে এসে এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার মর্মান্তিকতা প্রকাশ করতে দেখি— 'অপর্ণার বর উন্মাদ' এই খবর অন্দরমহলে পৌঁছবার পরবর্তী দৃশ্যে। আমরা দেখি এক গতিশীল ক্যামেরা দ্রুত এগিয়ে আসে স্তম্ভিত এক মায়ের দিকে, যে মা তাঁর মেয়েকে জড়িয়ে ধরে এক মহা সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে চান। দুর্ঘটনার মর্মান্তিকতায় সবাই স্তম্ভিত — তবু সমাজের ভয়ঙ্কর বিধানের কথা ভেবে মেয়ের বাবা বলেন ' এখানেই বিয়ে হোক', মেয়ের মা একেবারে

দাঁতে দাঁত চেপে জানায় 'অসম্ভব'।

এরপর আসে ল্যাণ্ডস্কেপ ব্যবহারে সত্যজিৎ রায়ের আবার সেই আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়। ক্যামেরা আবার অপুর কাছে ফিরে আসে — ততক্ষণে অপরাহ্ণ গড়িয়ে পড়েছে— আলো ম্লানতর — নদীতীর আরো শান্ত। অপু তখনো নিদ্রিত, পশ্চাদপটে ভাঙা হাট নিয়ে বরযাত্রীরা ফিরে যাচ্ছে, বর এখন হাঁটতে হাঁটতে চলছে — বারবার বলছে 'আমার বিয়ে হবে না? বিয়ে হবে না?' তারা চলে যায়। আরো ম্লান হয়ে ওঠে আলো। অপুর মুখের ক্লোজ শট। সে জেগে ওঠে, বিস্মিত চাহনি — আমরা বুঝতে পারি কিছু মানুষ তার কাছে সমবেত। 'কি ব্যাপার!' অপুর বিস্ময়। পুলু সমবেত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বলে, 'বিয়ে হচ্ছে না, বর পাগল'। বিহ্বল অপু উঠে দাঁড়ায়। এরপর একজন অপুর কাছে প্রার্থনা করে, 'মেয়ে দোপড়া হয়ে যাবে। আপনি বাঁচান।' অপু বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ। 'সেকি?' পুলু এগিয়ে এসে বলে যে এ অবস্থায় কোথাও পাত্র পাওয়া যাবে না, এবং অপুর তো বিয়ে করার দরকার। অপু বলে ওঠে, 'সেকি? জানা নেই, শোনা নেই, একটা লোক, যা হোক একজনের সঙ্গে বিয়ে দিতেই হবে, তোরা কি বিংশ শতাব্দীতে বাস করছিস, নাকি?' অপু অনড়। তাঁরা ব্যর্থ মনোরথে চলে যান। নদীতীর আরও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে—সন্ধ্যার আসন্ন ছায়া ঘনায়মান। চিন্তিত, বিস্মিত, ক্ষুব্ধ অপু একা পায়চারি করতে থাকে এবং বাবে বারে তাকায় দূরের সেই বাড়ীটির দিকে — হঠাৎ মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বাড়ীটা যেন পাথর হয়ে গেছে। এইখানে ল্যাণ্ডস্কেপ অসাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। অপুর চিন্তিত মুখের ক্লোজ শর্টগুলির সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের শটগুলির তুলনাহীন এক সাঙ্গীতিক অখণ্ডতায বিধৃত। যেন যা ঘটছে অপুর মনে, এবং সমস্ত কন্যাপক্ষেব মানুষগুলির মনে, তারই বহিঃপ্রকাশ যেন প্রকৃতিতে দেখতে পাই। এবং লক্ষ্য করি একটি 'মুড' সৃষ্টি কবার কি আশ্চর্য ক্ষমতা সত্যজিৎ রায়ের, অসামান্য কুশলতায় ল্যাণ্ডস্কেপের শটগুলি যতিচিহ্নের কাজ করে। মানুষের অন্তরে যা ঘটছে, যে বেদনা, যন্ত্রণা বা দ্বিধা বা আনন্দ, তাকে শুধুমাত্র মানুষগুলির সংলাপে ও আচরণিক ডিটেলের মধ্যে না রেখে— পরিপার্শ্বস্থ পরিবেশের চিত্রণে তাকে কাজে লাগাবার যে পদ্ধতির কথা আইজেনস্টাইন তাঁর 'ব্যাটেলশিপ পটেমকিন'-সংক্রান্ত একটি বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছিলেন 'through the entire enviornment' (Notes of a Film Director - "Organic Unity and pathos in the Composition of Potemkin"– Page 59) — তারই একটি সূক্ষ্ম চেহারা এই সময় লক্ষ করি। আইজেনস্টাইনের অনেক আগে স্বয়ং সেক্সপীয়ারের নাটকে এর ব্যবহার আছে। 'চিরায়ত উদাহরণটি হচ্ছে 'কিং লীয়ারের' ঝড় যেমন তার হৃদয়ের মধ্যে তেমনি তাকে ঘিরে প্রকৃতির মধ্যে ফুঁসে উঠছে' (উক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৫৯)। আমরা ঠিক অনুরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করেছি 'পথের পাঁচালী'তে দুর্গার মৃত্যুর দৃশ্যে, সর্বজয়ার অন্তরে যে ঝড় তাকে ঘিরেও ছিল সেই ঝড়। 'অপুর সংসারের' উক্ত সিকোয়েন্সে এই পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং বোধ করি সেই জন্যই আরো কাব্যিক। অপু ও অপর্ণাদের বাড়ীর সবাইকে ঘিরে যে বিষণ্ণতা, সেই বিষাদ নেমে আসে তাদের সমস্ত ল্যাণ্ডস্কেপ জুড়ে। একটি লং শট ঃ দিনের নিবন্ত আলোয সন্ধ্যার স্বল্পালোকিত আকাশের পটভূমিকায় প্রায় সিল্যুটের মত সেই নদীতীরবর্তী অট্টালিকাটি যেন বেদনায় মুখ চাপা দিয়ে স্তব্ধ, কিছুক্ষণ আগের এত

আনন্দমুখরতা কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় লং শট ঃ আগের দৃশ্যের 'প্যাথোস'-এর ছবি যেন মূর্ত হয় নদী ও নদীতীরের দৃশ্যটিতে, সন্ধ্যার ম্লানময় অশ্রুজলের রেখার মত ছল ছল করে নদীটি। অপুর বেদনাদীর্ণ মুখের একটি শট। এর পরেই আবার দেখি আর একটি লং শটে সমস্ত ল্যাণ্ডস্কেপ জুড়ে এক বিষণ্ণতার ছায়া — অপু হঠাৎ বাড়ীটির দিকে হাঁটতে শুরু করে। তার মানসিক অবস্থাটা, তার ভাবান্তরের কারণ— সমস্ত কিছুর সঙ্গে এই ল্যাণ্ডস্কেপের অন্তর্নিহিত 'মুড'। একদিকে অপূর্ব পারিবেশিক ডিটেল, অন্যদিকে অতুলনীয় কাব্যিক 'মন্তাজ'। প্রথমটি সাধারণ দর্শকদেরও আবিষ্ট করে, দ্বিতীয়টি বিদগ্ধ দর্শকদের আরো মুগ্ধ করে তোলে। এর মোট ফল? আমরা পরের কাট-এ দেখি, অপু সেই স্তব্ধ বাড়ীর সামনে উপস্থিত। একটি শট সমস্ত 'মুড'টিকে গভীরভাবে ব্যক্ত করে, যখন দেখায় সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় আকাশের প্রেক্ষাপটে বাড়ীর দ্বারের ওপর বসান স্তব্ধ রসুনচৌকির ইমেজটি এবং সাজান কলাপাতাগুলির সিল্যুট। এক প্রগাঢ় মানবিক করুণায়, এবং হয়তো বা একটি নিঃসঙ্গ হৃদয়ের তৃষ্ণার্ত মনের সুপ্ত কামনা অপুর ভাবান্তর আনে। মানবিক করুণা তো স্পষ্ট, কিন্তু এই বেদনার্ত নিঃশব্দ পরিবেশ যেন অপুর কাছেই অপুর নিঃসঙ্গতাকে তুলে ধরে এবং এর এক সমাধান হিসেবে সে বিয়েই করবে। মানব মনের এই যে সূক্ষ ছায়া-আলো বা 'nuance'-গুলি প্রকৃতির দৃশ্যের চিত্রকল্পের বুনুনিতে রাখা — এ সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বেব ছবির এক সম্পদ। আজ পর্যন্ত আর কোন ভারতীয় পরিচালক এত সূক্ষ্ম কাজ করতে পারেন নি বলে আমার ধারণা।

বাড়ীর বাউরে কেউ নেই, ভেতরে শোকাভিভূত ছায়ামূর্তির মত কয়েকটি মানুষ ইতস্ততঃ নড়াচাড়া করে। কোথাও আলো জ্বালান হয়নি। অপু ডাকে 'পুলু'। পুলু বেরিয়ে এসে বিস্ময়ে বলে 'কি রে?' অপু আমতা আমতা কবে বলতে থাকে, 'চাকরিটা পাব তো? ...মানে জামা-কাপড়ও ভাল নেই .. দাড়িটাও কামানো হয়নি' (মুখ হাত বোলায়)। পুলু আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, 'অপু!' সে জড়িয়ে ধরে পবিত্রাতা বন্ধুকে! এই এক অপূর্ব সংলাপ, ভারতীয় চলচ্চিত্রে এ সংলাপের কোন জুড়ি নেই। অনেকেই বলে থাকেন সত্যজিৎ রায়ের সংলাপের শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায় 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়'; অবশ্য এক অর্থে কথাটা ঠিক, কেননা ওই ছবির সংলাপ ষোল আনাই তাঁর। অন্য দিকে অপু চিত্রত্রয়ীর সংলাপের অনেকাংশ হয়ত স্বয়ং বিভূতিভূষণেরই দেওয়া। তা না হলে আমার মতে, 'অপুর সংসারে'র সত্যজিৎ রায়ের সংলাপের যে অনির্বচনীয় মাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে, যে অল্প কথায় গভীর ব্যঞ্জনা — বা চরিত্রের নানা মানসিকতার ছায়া-আলো — তা আর কোন ছবিতে নেই। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির সংলাপ কয়েকটি গুরুত্বহীন বিষয়কে নিয়ে, কেননা ছবিটি সব মিলিয়ে খুব সংকীর্ণ পরিসরের ছবি — সেখানে 'অপুর সংসার' ছবিব সংলাপ চিরন্তন মানবিক মুহূর্তগুলির সংলাপ—যা মনে হয় আমবা আমাদের জীবনেও ব্যবহার করেছি, বা হয়ত করব। স্মরণীয়, সেই রেল ইয়ার্ডে সন্ধ্যায় অপুর সংলাপ, স্মরণীয় বাসররাতে অর্পণার সঙ্গে প্রথম কথা বলার সময় অপুব সংলাপ—এগুলি হয়ত অনেক তরুণই বলতে চায়, হয়ত এখন বলেও। স্মরণীয়, অপু ও অপর্ণার দাম্পত্য জীবনের টুকরো টুকরো সংলাপ। আলোচ্য সিকোয়েন্সেও অপুব ওই সবল ছেলেমানুষিভরা সংলাপও তুলনাহীন।

অপুর বিবাহপর্বের শেষ অংশটি হচ্ছে পাণি গ্রহণ ও বাসরঘরের রাত্রিটির দৃশ্য ও অপুর সংলাপ।

এতক্ষণ 'অপুর সংসার' সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হবে যে সমগ্র ছবিটি যেন একটি 'স্টাইলাইজড্ পোয়েম' —এর মত। কিম্বা সাঙ্গীতিক ভাষায় বলা যায় যেন এক অনবদ্য মিউজিক— এবং মোৎজার্টীয়। সত্যজিৎ রায় নিজে এবং তাঁর প্রিয় পশ্চিমী ব্যাখ্যাকারগণ বারবার বলেন ' চারুলতা'র গঠন হচ্ছে মোৎজার্টীয়, এবং সেকথা নিশ্চয় সত্য, তবু আমার কাছে 'অপুর সংসার', তার দাম্পত্য পর্ব পর্যন্ত অনেক বেশি মোৎজার্টীয় বলে মনে হয়। মোৎজার্টীয় সংগীতের সেই অতলান্ত সরলতা, নিষ্পাপ নির্মল সার্বজনীনতা 'চারুলতা'র সেই উচ্চবিত্ত মানুষগুলির সাজান গৃহকোণে কোথায় যেন আটকে যায়, কিন্তু 'অপুর সংসারে'র (তার দাম্পত্য পর্ব পর্যন্ত) দিগন্ত বিস্তীর্ণ সার্বজনীনতায় কোথাও এতটুকু রুদ্ধ হয় না।

অপুর সেই রাত্রির বাসরঘরের দৃশ্যটি মোৎজার্টীয় সংগীতের মেজাজে স্পন্দিত। কিছুতেই ভোলা যায় না। সেদিনের সেই পাঞ্জাবী-পরা অপুর তরুণ মূর্তিটি, খাটের ওপর বসে থাকা কুণ্ঠিতা লজ্জিতা নববধূ অপর্ণা এবং সেই খোলা জানালা দিয়ে দেখা নীচে নদীবক্ষে এক মাঝির উদাস করা ভাটিয়ালি লোকসংগীতের ভেসে আসা অস্পষ্ট সুর। এ এক অসাধারণ রোমান্টিক রাত্রি, ভারতীয় চলচ্চিত্রের তখনও পর্যন্ত (১৯৬০ পর্যন্ত) সর্বোত্তম বোম্যান্টিক রাত্রি। পায়চারি করতে করতে অপু তার হঠাৎ পাওয়া বধূটির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে ঃ

অপু ঃ জান তুমি যাকে বিয়ে করলে, সে কেমন লোক, কি করে —

অপর্ণা মাথাটি নত করে ইংগিত দেয় সে জানে।

অপু ঃ কি জান?

অপর্ণা ঃ আপনি ভাল লেখেন।

অপু (খুশিতে) ওঃ পুলু বলেছে—আর কি জান?

অপর্ণা ঃ বাঁশি বাজাতে পারেন।

অপু (আনন্দে) ঃ তাও জেনে ফেলেছ? কিন্তু জান কি আমার কেউ নেই? আমার এক দিদি ছিল — সেও নেই — মা-বাবা কেউ নেই—জান কি আমার চাল নেই, চুলো নেই ... আমার মত গরীবের ঘরে তোমার কষ্ট হবে না?

অপর্ণা মাথা নেড়ে বেশ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলে, না।

সংলাপটি হুবহু মনে নেই, স্মৃতি কিছু ভ্রান্তি ঘটাতে পারে। কিন্তু মোটামুটি তার মেজাজটি এমনি। কী অনবদ্য সার্বজনীনতায় ভরা এই সংলাপ।

একটি চিঠি ঃ অপুর সংসার

ধনঞ্জয় বৈরাগী (তরুণ রায়)

'দেশ'-এর গত কয়েক সংখ্যাতে 'অপুর সংসার' নিয়ে বেশ কিছু লেখালেখি চলছে — বাইরেও আলোচনা শুনেছি অনেক রকম। এতে মনে হয়, আমাদের ক্ষতিই হচ্ছে।

এ ছবি আমার সাড়ে চার বছরের ছেলে দেখেছে। দেখে সে যেভাবে ছবির গল্পটি আমাকে শুনিয়েছে, তাতে বুঝেছি 'অপুর সংসার' তার কতখানি ভালো লেগেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একটি অশিক্ষিত চাকরের কথা, ছুটি নিয়ে 'অপুর ছবি' দেখতে গিয়েছিল। দেখে এসে সে বলেছে, 'আহা বউটা যদি না মরত, তবে অত দুঃখু হত না।' এই সঙ্গে ভাবছি ছবিটি সম্পর্কে এক শিক্ষিত বনেদী বড়লোকের মন্তব্যটি ঃ 'এই বোধ হয় প্রথম ছবিতে সত্যকার মধুর প্রেম দেখলাম। আর যা দেখি, সে-সব রঙ-চঙে নকল প্রেম।'

যে-ছবি শিশুকে আনন্দ দেয়, অশিক্ষিত জনের মনে বেদনার সঞ্চার করে, শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয় স্পর্শ করে সে-ছবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তর্কের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। শিল্প যত উন্নত হয়, ততই শিল্পী তার মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করে—সকলের কাছে।

কিছুকাল আগে ইউরোপ পরিভ্রমণের সময় আমি দেখেছি সত্যজিৎবাবুর সম্মান সেখানে কতখানি। ছবির যে-ভাষা তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাই বিশ্বের দরবারে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে — সেই জন্যই তাঁর প্রতিভার এই স্বীকৃতি।

সত্যজিৎবাবুর ছবি সমালোচনা করবার সময় আমাদের এই কথা মনে রাখা দরকার সুখের কথা, 'দেশ'-এর সমালোচক 'অপুর সংসার'কে বিশিষ্ট চিত্র হিসাবেই আর পাঁচটি ছবির চেয়ে পৃথকভাবে বিচার করেছেন। সমালোচক বলেছেন, 'অপুব সংসার' ভাবে, রসে ও আঙ্গিকে একটি অনুপম চিত্রসৃষ্টি। শুধু তাঁর সমালোচনার বিষয়, উপন্যাসের অপুর সঙ্গে ছবির অপুর চরিত্রগত বৈসাদৃশ্য। আমার মতে চিত্র-সমালোচনার মধ্যে এ প্রসঙ্গ না এলেই ভালো হত।

তবে এ-কথা সত্য যে সত্যজিৎবাবু স্বয়ং যে চিঠি দিয়েছেন তাও সমর্থনযোগ্য নয়। শিল্পীকে সমালোচনার উর্দ্ধে উঠতেই হবে। সমালোচকের বিরুদ্ধে যে কঠিন মন্তব্য তিনি প্রকাশ করেছেন, তা না করলেই আমরা খুশি হতাম। কারণ চিঠির মধ্যে তিনি নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন, যে কোন ছবি সম্বন্ধে স্বাধীন মত (ভাল বা মন্দ) ব্যক্ত করবার অধিকার সমালোচকের আছে।

আমার অনুরোধ, এই প্রসঙ্গ নিয়ে যেন আর তিক্ততা বাড়ান না হয়। আমরা সকলেই চাই সত্যজিৎবাবু আরও সুন্দর ছবি করুন, বিশ্বের দরবারে তিনি আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হোন। শিল্পের মধ্য দিয়ে, তাঁর ছবির মধ্য দিয়ে, বাঙালির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হোক।

ধর্মের বর্বর মুখচ্ছবি ঃ দেবী

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

আমার মতে, 'দেবী' সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের শেষ ছবি—যে পর্বটি ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। বিভাগটি এইভাবে বিন্যস্ত করার কারণ প্রথম পর্বের সীমারেখাটি এইখানে নির্দিষ্ট না করলে সত্যজিৎ রায়ের রাবীন্দ্রিক ছবিগুলিকে আলাদা করা সম্ভব নয়। রাবীন্দ্রিক ছবির পর্ব থেকে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের শুরু, কারণ বিষয়বস্তু হিসেবে এগুলি নূতন।

গত পনেরো-ষোলো বৎসর ধরে 'দেবী' ছবির আলোচনা ও বিতর্কে দুটি প্রধান ধারা লক্ষ করা যায়— একটি মত হচ্ছে, এ ছবিটি ধর্মীয় কুসংস্কাবের বিরুদ্ধে এক ধরণের 'প্রতিবাদ চলচ্চিত্র' এবং দ্বিতীয় মত হচ্ছে, এ ছবিটি একটি 'পীরিয়ড ফিল্ম' মাত্র — বিগত যুগের ধর্মীয় সংস্কারজনিত এক ট্র্যাজিক মানবিক কাহিনীচিত্র এবং সেই যুগটি অসাধারণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত। প্রথম মতকে কিছুটা স্বীকৃতি দিয়েও মূলতও দ্বিতীয় মতটাই পোষণ করেন পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানিক ভাষ্যকাররা। এবং এ দেশেও অনেকের মত তাই, যদিও তাঁদের বিচারের যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী উক্ত পশ্চিমী ভাষ্যকারদের থেকে আলাদা। পশ্চিমী মত এই প্রকার ঃ উদাহরণ দিয়ে একটু সুনির্দিষ্ট বক্তব্য তুলে ধরার জন্য রচিত শিল্পকর্ম, যাকে ইংরাজিতে বলে ট্র্যাক্ট (Tract) — যেমন ইবসেনের 'ডল্‌স হাউস' বার্নাড শ'র বেশীর ভাগ নাটক। এই ধরনেব শিল্পকর্ম (যেহেতু এগুলি উদ্দেশ্যধর্মী বা 'শিল্পের জন্য শিল্প' নয়।) পশ্চিমী প্রাতিষ্ঠানিক ভাষ্যকারদের কাছে বড় 'অপ্রিয়'। সেই কারণেই তাঁরা 'দেবী' ছবিটিকে এই ধরনের শিল্পের মধ্যে ফেলতে রাজি নন। ছবিটিকে একটি বিগত যুগেব মানব সম্পর্কিত বিচিত্র জটিল ট্র্যাজেডি হিসেবে ভাবতেই তাঁরা ভালোবাসেন।

কিন্তু এদেশে আমাদের মধ্যেও অনেকে যদিও ছবিটিকে সার্থক 'প্রতিবাদ চলচ্চিত্র' হিসেবে মানতে চান না, এবং মানব সম্পর্কের বিগত যুগের ধর্মীয় ট্র্যাজেডি হিসেবেই ছবিটিকে দেখে থাকেন, কিন্তু তাঁদের যুক্তি পশ্চিমী ভাষ্যকারদের থেকে আলাদা। এঁদের বক্তব্য, ছবিটি অবশ্যই অনবদ্য 'ট্র্যাক্ট ফিল্ম', একটা বিশেষ বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য রচিত, কিন্তু সেই বিশেষ বক্তব্যটির আজকের সমাজে বিশেষ কোন মূল্য নেই, অর্থাৎ যে সমস্যাব চেহারা তুলে ধরা হয়েছে বা যে ধর্মীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য শৈল্পিকভাবে উচ্চারিত হয়েছে — সে সমস্যা বা অন্যায় আজকের আমাদের সমাজে উল্লেখযোগ্যভাবে নেই— তা বিগত কালের ঘটনা মাত্র। তাঁরা বলেন, এই ধরণের ট্র্যাক্ট শিল্পের একটা আবশ্যিক সর্তই হচ্ছে, যে সমস্যাটি তুলে ধরা হবে —সমকালীন সমাজের জ্বলন্ত সমস্যা হিসেবে তার উপস্থিত থাকা চাই।

তাঁদের মতে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে রচিত হলে 'দেবী' হতে পারত এক অসাধারণ ট্র্যাক্ট ফিল্ম অথবা অতুলনীয় বলিষ্ঠ 'প্রতিবাদ চলচ্চিত্র'। হিন্দু ধর্মের অন্ধ অবতারবাদের ভিতরের অমানবিক ও অবৈজ্ঞানিক চেহারাটা খুলে ধরা, তার সর্বনাশা

ভয়ঙ্কর দেউলিয়াপনা—এটি অবশ্যই একটি প্রগতিশীল ট্র্যাক্ট ফিল্মের বিষয়বস্তু ও অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এঁদের বক্তব্য, অবতারবাদের যে চেহারাটা 'দেবীতে' খুলে দেখান হল ঠিক সেই চেহারাটি তো আজকের কালের চেহারা নয়। আজকাল এদেশে যেটি প্রচলিত, এবং অর্থনৈতিক দুর্দশা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমানশীল, সেটি হচ্ছে পূর্বপরিকল্পনা করে, ষড়যন্ত্র করে, নানান ম্যাজিক দেখিয়ে একজন মানুষ নিজেকে 'ঐশ্বরিক' বলে ঘোষণা করে, এবং তৈরি করে একটি মোহান্ধ ভক্তের দল ও পরে তাদের আর্থিক সামর্থ্য নিয়ে প্রচার চালিয়ে এমন একটা ধর্মভিত্তিক মোহাবরণ সৃষ্টি করা হয় যাতে আর্থিক, শারীবিক বা মানসিক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ তাদের আজন্ম লালিত ধর্মীয় সংস্কারের বশে সেই 'ঐশ্বরিক' বা অবতার মানুষটির কাছে ধরা দেয়—আপন সমস্যার বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সমাধানের কথা ভাবাটাও জলাঞ্জলি দেয় এবং নিজের পরিবারের ও সামগ্রিকভাবে দেশের সর্বনাশ ঘটায়। এটাই হচ্ছে আজকের হিন্দু অবতারবাদ এবং এটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় নয়, এটি একটি অর্থনৈতিক এবং গভীরতর স্তরে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

'দেবী' অবশ্যই এই বিষয়বস্তু নিয়ে নয়। 'দেবী'র ঘটনা কি? এখানে কি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে কাউকে ঠকাচ্ছে? একেবারেই নয়। সর্বনাশ যিনি ঘটালেন সেই কালিকিংকব তাঁর সর্বদোষ সত্ত্বেও কোন প্রবঞ্চক নন। কালিকিংকর সবচেয়ে যার ক্ষতি করলেন সেই দয়াময়ী তাঁর সবচেয়ে আদরের পাত্রী। একটি সংলাপে তিনি বলেছেন যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর যখন সংসার ত্যাগ করে তীর্থবাসী হবেন ঠিক করলেন, সংসার যখন শূন্য মনে হচ্ছিল তখনি দয়াময়ী এল পুত্রবধূ হয়ে, এবং দয়াময়ীর টানে তিনি আর সংসাব ত্যাগ করতে পাবলেন না। মূলতঃ দয়াময়ীর প্রতি কালিকিংকরের স্নেহের মধ্যে বিশেষ একটা অতিরিক্ত টান ছিল। পরে তা আলোচিত হবে। অন্য (বড়) পুত্রবধূ বা এমনকি ছেলেদের বা নাতিটির চেয়েও তাঁব চোখে দয়াময়ী ছিল বেশি প্রিয়। সুতরাং সজ্ঞানে দয়াময়ীর সর্বনাশ তাঁর কল্পনার বাইরে । এই ছবির প্রত্যেকটি চরিত্র তার নিজের কাছে সৎ অবশ্যই তাদের বিচারবুদ্ধি ধর্মের কুসংস্কারে আচ্ছাদিত — কিন্তু তারা জেনে শুনে কোন অসৎ কিছু করেনি—যেমন আমাদের কালের ঐশ্বরিক বাবাগণ ও তাদের চেলারা করে যাচ্ছে।

'দেবী'র ট্র্যাজেডি ঘটিয়েছে কোন সচেতন মানুষের দুর্বুদ্ধি নয় মানুষেব অন্ধ ধর্মীয় কুসংস্কার। এখানে ধর্মীয় কুসংস্কার যেন গ্রীক নাটকের নিয়মিত ভূমিকায় অবতীর্ণ—অনিবার্য গতিতে যা ধ্বংস করেছে দয়াময়ীকে, কালিকিংকরকে, তাঁর বংশের কুলপ্রদীপ একমাত্র বংশধরকে।

দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাদের বক্তব্য ঃ ঠিক এই ব্যাপারটি আজ গতায়ু। তাঁদের যুক্তি ঃ মূলত গল্পকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় গল্পটি লিখেছেন আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে, এবং তাতেও শুরুতেই জানিয়েছেন এই কাহিনী আরো 'একশত বছর আগেকার' অর্থাৎ এই ধরনের ঘটনার প্রচীনত্ব মূল গল্পকারই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁদের আরো বক্তব্য এই যে, ঠিক এই ধরণের বিশেষ সামন্ত যুগীয় সামাজিক ব্যবস্থাব মধ্যেও এমন নিদারুণ ট্র্যাজেডি ঘটত— আজ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঠিক সেভাবে তা সম্ভব নয়। সুতরাং যে সমস্যাটি আজ প্রায় নেই, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কেবলমাত্র এ্যাকাডেমিক, তার কোন

বাস্তব মূল্য নেই। বরং তার চেয়ে, একটা লুপ্ত বিগত যুগে কি ধরণের ধর্মীয় ট্র্যাজেডি ঘটত , তার নিপুণ চলচ্চিত্র হিসেবে—অর্থাৎ একটি পীরিয়ড ফিল্ম হিসেবেই 'দেবী'র মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয়।

অবশ্যই এই দ্বিতীয় মত সঠিক হলে আমাদের কাছে 'দেবী'র মূল্য অনেক কমে যায়। কেননা একটা বিগতকালের পরিপ্রেক্ষিতে সেকালের কিছু মানুষের চরিত্র , রাজনীতি, তাদের ধর্মীয় সংস্কার, মানুষগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে 'বিগত কালের এক পথের পাঁচালী' রচনার ইচ্ছা থাকলে ছবিটিকে অন্যভাবে, উন্নততর ভাবে গঠিত করা সম্ভব ছিল বা অন্য এক ছবিও করা যেতে পারত—এক মহাকাব্যিক গঠনের ছবি। 'দেবী'তে যেভাবে প্লটটি রচিত হয়েছে — যেহেতু প্রথমবার একটি মরণাপন্ন ছেলেকে শুধু দেবীর চরণামৃত খাইয়ে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে বলেই দেবীত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য ক্লাইমেক্সে আর একটি শিশুকে অন্ধ সংস্কারের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হল— এই যে গল্পের গঠন এর সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিগতকালের 'পথের পাঁচালী' রচনার সুযোগ সীমিত। যদি সত্যিই তেমনি 'অতীতকালের মানবিক দলিল' রচনার ইচ্ছা থাকত তাহলে এরকম সংকীর্ণ প্লটবদ্ধ গল্পের উপর ভিত্তি করে ছবি করার প্রয়োজন হত না। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে সত্যজিৎ রায়ের অতিশয় ভক্তরা এই ছবিকে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদের ছবি হিসেবে প্রমাণিত করতে সচেষ্ট, কিন্তু এত বেশি সচেষ্ট যে উৎসাহেব বশে তাঁরা খেয়াল করেন না ধর্মীয় সংস্কারের যে রূপটির বিরুদ্ধে এই ছবি তা আজ সেই রূপে কোন সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে না এবং যে রূপে বর্তমান সংস্কারটি বিরাজ করছে তার বিরুদ্ধে এ ছবি নয়।

বলা বাহুল্য মাত্র, আমি বহুদিন ধরে এই দ্বিতীয় মতকেই অপেক্ষাকৃত যুক্তিনিষ্ঠ বলে মনে করে এসেছি এবং বিভিন্ন লেখায় এই মত প্রকাশও করে এসেছি। কিন্তু বারবার চিন্তা করে নিবপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ পূর্নভাবনায় একথা আজ স্বীকার কবি যে, ধর্মের সংস্কারের যে রূপের বিরুদ্ধেই হোক না কেন, ধর্মীয় কুসংস্কার যখন এদেশের প্রগতি-ভাবনায় সবচেয়ে বড় বাধা তখন সেই কুসংস্কারের যে-কোন বিগতকালীন রূপের বিরুদ্ধেও বক্তব্য ধর্মী মানবতাবাদী চলচ্চিত্র অবশ্যই শ্রদ্ধেয় সৃষ্টি। তাই যেমন 'দেবী'র মত এমন সুগঠিত বিশেষ বক্তব্যকে পরিবেশনার জন্য রচিত উচ্চতম শৈল্পিকমানের ছবি। একদিকে ধর্মীয় কুসংস্কারের সমকালীন রূপটির বিরুদ্ধে রচিত হল না বলে আফশোষ হয়, তেমনি যখন সত্যজিৎ রায়ের সাম্প্রতিককালের ছবিগুলির বক্তব্যের দৈন্যের কথা ভাবি তখন মনে হয়, 'দেবী' তাঁব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পর্বেব ছবি নিশ্চয়ই, এবং সব নিয়েও 'দেবী' তে যা আছে তাও বড় কম নয়। ধর্মের কুসংস্কাবের বিরুদ্ধে যখন কিছুমাত্র বলা হয়েছে —সেটাই একটা প্রয়োজনীয় সংবাদ। বিশেষতঃ যখন, যেভাবে বলা হয়েছে, যে অন্তরিকতার সঙ্গে এবং যে অসামান্য শৈল্পিক নৈপুণ্যের সঙ্গে, তা এর মূল্য দিয়েছে বাড়িয়ে। 'দেবী' অবশ্যই এক মহৎ মানবিক প্রগতিশীল ছবি।

আর শুধু মাত্র পীরিয়ড ফিল্ম হিসেবে দেখলেও সেই বিগত যুগের বিশ্বস্ত নিখুঁত ছবিটি তুলে ধরার কৃতিত্ব স্রষ্টার প্রাপ্য, বিশেষতঃ ধর্মীয় কুসংস্কারের পুরাতন ছবিটি যেভাবে জীবন্ত তুলে ধরা হয়েছে। গ্রাম্য সামন্ত যুগের একটি সম্পন্ন পরিবারের ছবি— উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে—যখন পিতার একমাত্র শিক্ষা হচ্ছে ধর্ম-শিক্ষা আর পুত্র

যাচ্ছে সেকালের ইংরেজি শিক্ষা নিতে নব্য কলকাতায়—নতুন ইঙ্গ-বঙ্গীয় শিক্ষায় দীক্ষা নিতে। এই দুই প্রজন্মের মূল্যবোধের ব্যবধান ধর্মীয় চিন্তার প্রসারে অসামান্য নৈপুণ্যে চিত্রিত। গ্রাম্য কুসংস্কারের বিপরীত দিকে সে—কালের নব্যশিক্ষিতের কলকাতার থিয়েটার, 'বিধবা বিবাহ', ছেলে-মেয়ের স্বাধীন প্রেম ও বিবাহ—এ সবের ছোট্ট কিন্তু মনোরম উল্লেখ আছে দৃশ্যে ও সংলাপে। শহরের যে সমাজটা মূল গ্রাম্য সমাজের পশ্চাদ্‌পদতা থেকে সরে যাচ্ছে—তার চিত্রণ। কিন্তু এই নব্য ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজটির যে কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে না, এটাও সুন্দরভাবে (অবশ্য পরোক্ষভাবে) দেখান হয়েছে। সেই সমাজের নব্য শিক্ষায় দীক্ষিত উমানাথের (দয়াময়ীর স্বামীর) চরিত্র চিত্রণে। বস্তুতঃ শহরে এই নব্য সমাজটি ছিল দুটি শক্তির সন্তান। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং দেশীয় সামন্ত শ্রেণীর শক্তি—বিদেশী (ইংরেজি) কিছু কিছু প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা তাদের সাহিত্য ও শিল্প মারফৎ এই নব্য সমাজটিকে স্পর্শ করলেও মূলতঃ শক্তি দুটিই ছিল জনগণ বিমুখ—সুতরাং নব্য সমাজটিও ভেতরে ভেতরে ছিল ক্লীব, শক্তিহীন, নির্বীর্য—যেটি ধরা পড়েছে উমানাথের চরিত্রে। শহুরে ইংরিজি শিক্ষা, খৃষ্টান মিশনারী অধ্যাপকের কাছে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলাএইসমস্ত নব্য শিক্ষার পর উমানাথ যখন নিজের স্ত্রীকে কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে সামন্ত যুগীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রাচীনপন্থী উগ্র ধর্মান্ধ বাবার সঙ্গে মুখোমুখি হয়, তখন সে অচিরে হয় পর্যুদস্ত ; এমন কি স্ত্রী অন্ধ কুসংস্কারের মুখোমুখি হয়েও উমানাথ পর্যুদস্ত। উমানাথের চরিত্রের এই শক্তিহীনতা অনেকের ভাল লাগেনি। তৎকালীন বিলেতের আমদানী করা ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত উমানাথের এই দুর্বলতায় ব্যথিত হয়েছেন 'সাইট এণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার সমালোচক এরিক রোড। তাঁর মতে এটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি লিখেছেন যে, পিতার অন্ধ ধর্ম-সংস্কার থেকে স্ত্রীকে উদ্ধার করার ব্যাপারে উমানাথের মত চালাক (শ্রুড্) বুদ্ধিমান একটি চরিত্র কিভাবে ক্ষান্ত হল তা তিনি ভেবে পান না। তিনি লিখেছেন, 'এতে যুক্তিসূত্র হিসেবে উদ্দেশ্যের যে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন রয়েছে—তার প্রযোজন 'দেবী' সামগ্রিকভাবে পূরণ করতে পারেনি।' ('সাইট এণ্ড সাউণ্ড', ১৯৭৪ সালের শরৎ সংখ্যায় এরিক রোড কর্তৃক 'দেবী'র আলোচনা।)

অথচ মজার ব্যাপার হল, উমানাথের চেষ্টার ব্যর্থতা (যেটা গল্পের প্রয়োজনে জরুরি,) যেটি উমানাথের নব্য শিক্ষা প্রাপ্ত চরিত্রে সঙ্গে বেশ সুচারুরূপে খাপ খেয়ে যায়, এবং এ ব্যাপারে সত্যজিৎ রায় বিশ্বাসযোগ্যতা সঠিকভাবেই পূরণ করেছেন। এরিক রোড সেকালের ভারতীয় নব্য শিক্ষিতদের ব্যাপারটা বোঝেন নি, সম্ভবতঃ বিলিতি শিক্ষায় দীক্ষিত উমানাথের ক্লীবত্ব তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন, কেননা এটা বিলিতি শিক্ষারই গলদ দেখানো। এরিক রোড সম্ভবতঃ এটাও লক্ষ করেননি যে, উমানাথ তৎকালের প্রগতিশীল নব্য বুর্জোয়া নয়, সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাবার জমিদারি, তথা সামন্ত যুগের কাছে বাঁধা, সেখানেই সে লালিত-পালিত; এবং কলকাতায় তখনকার ইংরেজের দেওয়া শিক্ষায় কিছু 'প্রগতিশীল' চিন্তার কথা বললেও, মূলতঃ সেটি ছিল একটি মুৎসুদ্দি শ্রেণী নির্মাণের কারখানা, যার টিকি বাঁধা থাকত দুটি শক্তির হাতে—এক, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও দুই, দেশীয় সামন্তশ্রেণী। সুতরাং এই রকম দুটি শ্রেণী-সঙ্গমের ফল যে উমানাথের মত ক্লীব চরিত্রের সৃষ্টি করবে, সেটাতে ভুল কোথায়? তথাকথিত নব্য শিক্ষার ফল যা কিছু সবই তো মুখের,

বড়জোর মস্তিস্কের কোষে, চরিত্রে নয়, কর্মে নয়, তা যদি হত তাহলে তো এক ধরণের বিপ্লব ঘটে যেত। সেই কালের সেই নব্য শিক্ষিতেরা বেশির ভাগই তো এক-একটি উমানাথ, দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকতে পারে, যারা ইংরিজি সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যেকার প্রগতিশীল ভাবনাকে গ্রহণ করে নিজেদের মৌলিক চিন্তার ও চরিত্রের জোরে উক্ত দুই অশুভ শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে নিজেদের উন্নীত করেছিলেন উচ্চতর স্তরে। উমানাথ পড়ে গড়পড়তার দলে এবং সেটাই ছবিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

'দেবী' ছবিতে সেই কালটি অনবদ্যভাবে চিত্রিত। ধর্মীয় বোধ ছাড়াও, পারিবারিক চিত্রণে পরিবারের বিভিন্ন মানুষগুলির আন্তঃসম্পর্ক সুন্দরভাবে বিধৃত। পরিবার পূর্ণভাবে পিতৃ-তান্ত্রিক, পিতা অথবা শ্বশুরবাড়ির কর্তা যাকে যেভাবে রাখবেন সে সেভাবেই থাকবে—বিশেষতঃ বাড়ির মহিলাদের ক্ষেত্রে। পরিবারের বড় ছেলের স্ত্রী, বড় পুত্রবধূই বেশী সম্মানীয়া, আদরণীয়া হত, সেটাই স্বভাবিক। কিন্তু এই ছবিতে পরিবারের কর্তা কালিকিংকর প্রায় একনায়কতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি যেহেতু ছোট পুত্রবধূকেই স্নেহ করেন তাই তার প্রতিষ্ঠাই বেশি। মেয়েরা এই সব পরিবারে হয় 'দেবী', নয় 'দাসী', কখনোই 'স্বাধীন মানবী' নয়। পরিবারের কর্তা-পুরুষটির চোখে কোন নারী যদি মায়া সৃষ্টি করতে পারল, তা ধর্মের মধ্যে দিয়েই হোক বা যৌনানুভূতির মধ্যে দিয়েই হোক (যাকে ভালোবাসা বলা হয়ে থাকে কখনো কখনো) এবং সে-মায়া সৃষ্টি নারীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিতই হোক, বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হোক (অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট হোক) তাহলে সে নারী হল 'দেবী'—ধর্মের 'দেবী' বা ভালোবাসার 'দেবী'। আর তা না হলে নারীকুল সবাই এক ধরণের 'দাসী' —পুরুষের শ্রীচরণে আশ্রিতা। বাংলার লুপ্ত সামন্তযুগের এই নারী চিত্রটি 'দেবী'তে প্রামাণ্য সত্যতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে।

'দেবী'তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দযাময়ী এবং তাঁব সঙ্গে বিভিন্ন পারিবারিক ও সমাজ ব্যবস্থার সম্পর্ক। প্রথমতঃ দয়াময়ী ও তার স্বামীর সম্পর্ক, দ্বিতীয়তঃ দয়াময়ী ও ভাসুরের ছেলে ও পরিবারের একমাত্র শিশুটিব সম্পর্ক এবং সর্বোপরি দয়াময়ীর সঙ্গে সেকালের সামাজিক শক্তিগুলির সম্পর্ক। একদিকে (১) অনড় ধর্মীয় সংস্কার ও নিজে যেহেতু নারী তাই চেষ্টা ও কর্মফল অনুযায়ী তার ভূমিকা হয়সংসারের কল্যাণময়ী অথবা ধ্বংসকাবিণী —এই সংস্কারের সঙ্গে তাব সম্পর্ক, অন্যদিকে (২) স্বামীব মাধ্যমে এক নূতন চিন্তাধারা, কিছুটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে তাব সম্পর্ক যা প্রায় কিছুই পরিণতি পায়নি।

এই সব সম্পর্কগুলির মধ্যে দয়াময়ীর ভূমিকা প্রায় সর্বত্র নিষ্ক্রিয় বা ' প্যাসিভ'— শুধু পরিবারের একমাত্র শিশুটিব সঙ্গে ও কিছুটা স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্র ছাড়া। কালিকিংকরের সাথে দয়া'র সম্পর্ক বা সঠিকভাবে বলতে গেলে দয়ার সঙ্গে কালিকিংকরের সম্পর্ক রীতিমতো কৌতুহলোদ্দীপক, যদি কেউ নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য করেন।

আমরা ছবিতে প্রথম থেকেই লক্ষ্য করি দয়া'র প্রতি কালিকিংকরের স্নেহের টান একটু বেশী। দুই পুত্রবধূর মধ্যে তিনি ছোটটির প্রতি পক্ষপাতগ্রস্ত। সেটা ছোট পুত্রবধূ অতি মনোরম ব্যক্তিত্বময়ী ও সুন্দরী হওয়ার জন্যই কি? এই ছোট পুত্রবধূর ওপর বেশী টানের পিছনে কালিকিংকরের বার্ধক্যে স্ত্রীহীন সংসারী জীবনের এবং কালীভক্ত মাতৃরস

পিপাসাতুর ভক্তজীবনের দুটি বিশেষ অবচেতন ক্ষুধার সূক্ষ্ম জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকা অস্বাভাবিক নয়। এবং সত্যজিৎ রায় একটি সিকোয়েন্সে তা অভ্রান্তভাবে, যদি খুবই সূক্ষ্মভাবে দেখিয়েছেন — আমার কাছে যা প্রশ্নাতীত।

সেই সিকোয়েন্সটি হল ঠিক যে রাত্রে কালিকিংকর প্রথম স্বপ্ন দেখলেন দয়াময়ীই স্বয়ং কালী— সেই রাত্রের আগের সন্ধ্যারাত্রে—এটিও অবশ্য বক্তব্যটিকে প্রমাণিত করে—তখন উমানাথ প্রবাসে—কলকাতায়। দয়াময়ী সন্ধ্যারাত্রে শ্বশুরমশায়ের পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছে। আমরা দেখি একটি হেলান আরাম-কেদারায় কালিকিংকর অর্ধশয়ান, অর্ধ-উপবিষ্ট, সামনে দুটি পা ছড়ানো, মাটিতে সপ্তদশী সুন্দরী দয়াময়ী অর্ধেক অবগুণ্ঠনবতী, বসে থাকা কালিকিংকরের পায়ে তেল মালিশ করেছে। আমরা যেটা লক্ষ্য করি লণ্ঠনের মৃদু আলোয়, তা হচ্ছে যেভাবে কালিকিংকর আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত আছেন, তাঁর মধে একটি দৈহিক পরিতৃপ্তির সূক্ষ্ম (অশালীন?) কিন্তু অভ্রান্ত ইঙ্গিত আছে।

ভঙ্গীটি আশ্চর্যরকম একটি ব্যতিক্রম, অর্থাৎ তা যেন কোন কালীসাধক বৃদ্ধের নয়, যেন এক প্রৌঢ় ভোগী জমিদারের, যে তার পদসেবিকা সুন্দরী পুত্রবধূটির প্রতি অতিরিক্ত স্নেহশীল। সে সময়ের সংলাপগুলিও সত্যজিৎ রায়া অসামান্য যত্নে ও নৈপূণ্যের সঙ্গে রচনা করেছেন—যার নিহিতার্থ অভ্রান্ত। আমরা শুনি নীচে স্বল্প গুণ্ঠনবতী অবনতমুখী দয়াময়ীর দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ কালিকিংকর বলতে শুরু করেন তাঁর পরলোকগতা স্ত্রীর কথা — স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি ভেবেছিলেন সংসারটা ছেলেদের হাতে তুলে দিয়ে কোন তীর্থে কালীর সাধনায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। এই উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠপুত্রের বিবাহের যে কর্তব্যটুকু বাকি ছিল তা সমাধা করলেন। এবং তখনই পুত্রবধূরূপে এলো দয়াময়ী — 'ব্যাস, আর আমার সংসার ত্যাগ করা হল না—কি তোমার গুণ, রূপ মা, শূন্য সংসারটা আবার ভরে উঠল' —আজ আর কালিকিংকরের সংসার ত্যাগ করার কোন বাসনা হয় না। লজ্জিতা দয়ামযী অবনত মুখে নিজের প্রশংসা শুনছে সংসারের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষটির কাছে— এ তার গৃহবধূ জীবনের চরম সৌভাগ্য। কিছুক্ষণ দয়াময়ীর সেবারত কুণ্ঠিতা মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে আবার পরিতৃপ্ত কালিকিংকর কি যেন ভাবলেন। তারপর অদ্ভুত একটি প্রশ্ন করলেন দয়াময়ীকে ঃ 'হ্যাঁ মা, আমি যেমন করে তোমায় চিনেছি উমা তোমার মূল্য বুঝেছে তো — নাকি? এ্যাঁ, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিয়মিত দেয় তো — দেয়, না কি দেয় না?' এটিও সেকালের শ্বশুরের মুখে একটু বেমানান, কিন্তু এখানে বিশেষ অর্থে মানিয়ে তো গেছেই, বেশ অর্থবহও হয়ে উঠেছে। দয়ামযী শ্বশুরের বারংবার এই কৌতুহলী প্রশ্নে লজ্জিত হয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল। কালিকিংকর হেসে উঠলেন। দৃশ্যটি ফেড আউট হয়ে গেল।

এই সংলাপটি লক্ষ করার মত। বিশেষতঃ অস্পষ্ট আলোয় কালিকিংকরের পূর্বোক্ত ভঙ্গিতে অর্ধশায়িত মূর্তি — নীচে গুণ্ঠনবতী দয়া সেবারত — তার মধ্যে কালিকিংকরের সংলাপ। প্রথমতঃ, পরলোকগতা স্ত্রীর শূন্যস্থান পূর্ণ করতে দয়াময়ী এসেছে — সেই ইংগিত। দ্বিতীয়তঃ, একটু পরে, তার নিজের দয়াময়ীর প্রতি টানের সঙ্গে ছেলের (দয়ার স্বামী) দয়া'র প্রতি টানের একটি তুলনীয় ইংগিত অর্থাৎ কোথাও অবচেতন মনে কালিকিংকর কি এই কাজটি করছিলেন — (১) স্ত্রীর সঙ্গে দয়া'র একাত্মীকরণ এবং

(২) পুত্রে, সঙ্গে নিজের একাত্মীকরণ? এই সমস্তটুকুর মধ্যে বৃদ্ধের যৌনচেতনার অবচেতন ক্রিয়ার ইংগিত সুস্পষ্ট, যে চেতনা আজ প্রায় লুপ্ত, যে যৌনচেতনা আজ মানস স্তরে উত্তরিত বা 'সাবলিমিটেড'। এইবার কালিকিংকরের অর্ধশয়ান ভঙ্গীটির একটি তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। দৃশ্যটি ফেড আউট হয়ে যাবার পরই ফেড ইন করে নিসুপ্ত ভোররাত্তির ধূসর ছবি ও কালিকিংকরের সুপ্ত মূর্তি। আমরা দেখি ঘুমের মধ্যে কালিকিংকর ছট্‌ফট্ করতে থাকেন, একটা স্বপ্ন তাঁর নিদ্রাকে ব্যহত করছে। তখনই অনবদ্য মুন্সীয়ানায় সত্যজিৎ রায় কলিকিংকরের স্বপ্নটিকে দৃশ্যময় করেন। আমরা দেখি, ধূসর অন্ধকার বেয়ে কালীর 'তিনটি নযন' দূর থেকে ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছে — এসে স্থির হয়ে গেল দীপ্যমান দেবীর ঐশ্বরিক ত্রিনয়ন, তার পর দুটি— ঐশ্বরিক নয়ন ধীরে ধীরে মিশে গেল দয়াময়ীর দুটি আয়ত অপূর্ব পার্থিব নয়নে এবং কপালের ত্রিনয়নটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দয়াময়ীর কপালে। ঠিক যে-সন্ধ্যায় আমরা কালিকিংকরকে দেখলাম দয়াময়ীর সত্বাকে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে, ঠিক সেই রাত্রেই কালিকিংকর এই স্বপ্ন দেখলেন। এটি খুবই তাৎপর্য পূর্ণ। দয়াময়ীর প্রতি টান পরলোকগতা স্ত্রীর প্রতি টানের একটি বৃদ্ধবয়সের 'সাবলিমিটেড' রূপ — এ ইঙ্গিত উপরোক্ত সংলাপে, দৃশ্যে আছে। কিন্তু কালিকিংকর একই সঙ্গে কালী সাধক, সুতরাং বহুকাল থেকে নিজেকে এক মায়ের (কালীর) সন্তান ভাবতে অভ্যস্ত অর্থাৎ মাতৃরসাতুর। সুতরাং সুন্দরী মনোরমা ব্যক্তিত্বময়ী দয়াময়ীকে আর যে যে অবচেতন কারণে ভাল লাগুক না কেন, অনিবার্যভাবে তাতে মাতৃরূপও আরোপিত হবে— এটাই স্বাভাবিক এবং যখন হবে, কালিকিংকরের ক্ষেত্রে, তখন জগন্ময়ী মা কালীরই রূপ আরোপিত হবে এটাও স্বাভাবিক। আসলে যে তাঁর মত ধর্মান্ধের কাছে মনে হয়েছিল দেবীর 'স্বপ্নাদেশ' — তা যে তাঁরই সংসারী জীবনের, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ দয়াময়ী ও তাঁর রূপ সৌন্দর্য গুণ, এবং নিজের কালী ভক্তি ও ধর্মান্ধতা — এসবের মিলিত এক সূক্ষ্ম জটিল চেতন-অবচেতন মনস্তত্ত্বের খেলামাত্র — সম্পূর্ণভাবে একটি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, তাতে —বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দেশে এসব কথা নির্মোহ বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আলোচনা করাও 'নিষিদ্ধ বস্তু' বা ট্যাবু। আমার এই আলোচনাও হয়ত অনেকের ভাল লাগবে না। কিন্তু সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এটাই হচ্ছে একমাত্র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ধর্মীয় 'অবসেশন' গুলির অনেক কিছুই যে এমনি সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিযার, চেতনা বা অবচেতনার প্রতিফলন মাত্র — যাতে যৌনচেতনারও অংশ থাকতে পারে — তা আজকের মনোবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে নূতন করে বলার কিছু নেই। সত্যজিৎ রায়কে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন যে, তিনি উক্ত সামাজিক ধর্মীয় গোঁড়ামির ভয় সত্ত্বেও, সূক্ষ্মভাবে কালিকিংকরের 'স্বপ্নাদেশ' বা তার কাছে দয়াময়ীর দেবীত্বপ্রাপ্তির মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটিকে ইঙ্গিতে তাঁর চিত্রভাষায় সঠিকভাবে দেখিয়েছেন। এটি সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে শ্রেণীচরিত্র নিরূপণে সত্যজিৎ রায়ের যে দুর্বলতা আছে ধর্মের ব্যাপারে তাঁর সেরকম কোন দুর্বলতা নেই, অন্ততঃ তখন ছিল না, এ ব্যাপারে তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়। তাঁর একটি প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এখানে দেওয়া হলঃ ১৯৭০ সালের একটি সাক্ষাৎকার থেকে নেওয়া। প্রশ্নকর্তা Folk Issakson একজন চলচ্চিত্র সমালোচক।

ইসাকসন ঃ 'আপনি কি ধার্মিক ? আপনি কি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন,

অথবা মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে ?'

সত্যজিৎ রায় ঃ 'আমার নিজের অনুভূতি হচ্ছে মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে, হ্যাঁ আমি তাই মনে করি। অবশ্যই প্রাণের শুরুর ব্যাপারটা নিয়ে রহস্য আছেই ... কিন্তু অমার মনে হয় ঈশ্বর এমন কিছু একটা ব্যাপার নয় যাতে আমি বিশ্বাস করতে পারি। ঈশ্বরে বিশ্বাস করার কোন প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে বলে আমি মনে করি না ...' ('সাইট এণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার ১৯৭০ সালের গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১১৯)।

অন্ততঃ ধর্ম বা ভগবানের ব্যাপারে এইটুকু নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি সত্যজিৎ রায়ের ছিল বলেই তাঁর পক্ষে 'দেবী'র মত ছবি রচনা করা সম্ভব হয়েছিল। কালিকিংকরের চোখে দয়ার দেবীত্বপ্রাপ্তির মনোবৈজ্ঞানিক এই সূত্রগুলি সত্যজিৎ রায়ের মৌলিক অবদান, মূল গল্পের লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এসব কিছুই উল্লেখ করেননি, একথাও স্মর্তব্য।

সামন্তযুগীয় যে পরিবারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক 'দেবীতে' উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেটি হচ্ছে পরিবারের বংশরক্ষার গুরুত্ব ও বংশধরের স্থান। এইসব জমিদার উচ্চবিত্ত পরিবারের সবচেয়ে বড় কথা বংশরক্ষা যেন অব্যাহত থাকে। বংশধর যেখানে একজন মাত্র সেখানে তার মৃত্যু পরিবারের কর্তার বুকে শেল হয়ে বেঁধে। পরিবারের কর্তাপুরুষ যতই অন্য কিছুর মোহে আবিষ্ট থাকুন না কেন,মানুষ হিসেবে বংশধরের কিছুমাত্র মূল্য তাঁর কাছে থাকুক বা না থাকুক তার মৃত্যু কর্তা ব্যক্তির সমস্ত নেশা ও মোহ ছুটিয়ে দেয় এবং ভিতরকার আদিম বংশরক্ষার্থী মানুষটি বের হয়ে আসে। ছবিতে কালিকিংকরের দয়াময়ীকে নিয়ে ধর্মীয় অন্ধ মনোবিকলন বা 'অবসেশন' একমাত্র তখনই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, যখন তার ধর্মান্ধ তার খেলার যূপকাষ্ঠে আপন একমাত্র বংশধর নাতিটি হয় বলিপ্রদত্ত।

চিত্রভাষায় 'দেবী' অসাধারণ ঐশ্বর্যময় ছবি। কিন্তু যা আমাদের কাছে আরও বিস্ময়ের তা হল ছবিটিতে আলোর আশ্চর্য ব্যবহার। সমস্ত ছবিটির বেশির ভাগ দৃশ্যই রাত্রিকালীন, এবং গ্রামের লণ্ঠণ-জ্বালা রাত্রি। এত স্বল্প আলোয় টালিগঞ্জের ক্যামেরার কাজ অভূতপূর্ব। রাতের ও ধূসর ভোরবেলার বা ভোররাতের ছবি শুধু যে অসাধারণ বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে তাই নয়, সেই স্বল্প আলো কী শৈল্পিকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তা ভোলা যায় না। সেই ছায়ান্ধকার ঘর, মশারির আড়ালে একটি সুখী দম্পতি, তাদের মৃদু অনুচ্চ প্রেমালাপ — ক্যামেরার সেই ধীর গতি এবং মশারির আড়ালে অস্পষ্ট একটু চুম্বন। অথবা যে রাত্রে কালিকিংকর 'স্বপ্নাদেশ' পেলেন — সেই ভোর রাত্রে বাড়ীর বাইরের প্রকৃতির কয়েকটি ধূসর অন্ধকার শট্ ..... এবং নিদ্রিত কালিকিংকর, তাঁর বিঘ্নিত নিদ্রাদেবীর দীপ্যমান ত্রিনয়ন... যে মুহূর্তে দয়াময়ীকে দেবী ভেবে কালিকিংকর তাঁকে প্রণাম করছেন-তখন দেওয়ালে দয়া'র হাতে তীব্র আঁচড়ের ক্লোজআপ -এসব অবিস্মরণীয়।

'জলসাঘর' — এর মতই 'দেবী'র প্রারম্ভিক শট্—প্রতীকী তাৎপর্যপূর্ণ। একটি মৃত্তিকার দেবীপ্রতিমার সাদা চক্ষুহীন মুখমণ্ডল। ধীরে ধীরে তাতে দেবীত্ব আরোপিত হয়। চক্ষুদান হয়, মুখমণ্ডল সজ্জিত হয়, অবয়ব অলংকৃত হয়-তৎক্ষণে ক্যামেরার অবস্থান একটু একটু পিছু হটে — সাউণ্ড ট্র্যাকে প্রথমে শব্দহীন, ধীরে শোনা যায়, কাঁসর-ঘণ্টা-ঢাকের আওয়াজ ঃ ক্যামেরা ধীরে ধীরে আরো পিছু হটে দেখি পূজারতি হচ্ছে ষোড়শ-উপচারে-সামনে বহু ভক্তজন দর্শক। একটিমাত্র 'টেক'-এ অর্থাৎ যেন ক্যামেরার একটিমাত্র পিছু হটা ধীর গতিতে দৃশ্যটি নেওয়া (অবশ্যই আসলে তা নয়)। শুরুতে দৃশ্যটি যেন

বিশুদ্ধ প্রতীকী, কিন্তু সেই একই আপাত ব্যাকট্র্যাকিং শটের শেষে যা দেখি, সেটি ছবির গল্পের একটি ঘটনার বাস্তব দৃশ্য — কালিকিংকরের গ্রামের মন্দিরে পুজোর উৎসব হচ্ছে। এবং তারপরের শট্গুলিতে দেখি যথাক্রমে বলিদানের যূপকাষ্ঠ, একটি বলিদানের জন্য বন্দী ছাগশিশু এবং উদ্যত খড়গ। পরের শট্। আকাশে আশ্চর্য আতসবাজির খেলা, নেপথ্যে একটি শিশুকণ্ঠ-তার কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তরে তার কাকার তরুণ কণ্ঠের উত্তর, এবং একটি তরুণী কণ্ঠ।। পরের শটে আমরা দেখি — কালিকিংকরের নাতি তার কাকা উমানাথের কাঁধে চড়ে আকাশে আতসবাজির খেলা দেখছে, পাশে দয়াময়ী। প্রতীকী শট টিকে বিলম্বিত করে গল্পের মধ্যে এনে ফেলা — তারই মধ্যে টাইটেলগুলি দেখান, তারপরে বলিদানের হাড়িকাঠ ও ছাগশিশুর ক্লোজ শট এবং উদ্যত খড়গ থেকে সোজা একেবারে বিপরীত আতসবাজির দৃশ্য — নেপথ্যে শিশুকণ্ঠ, এগুলোর মধ্যে যে দৃশ্য ছন্দ আছে তা অতুলনীয় তো বটেই, উপরন্তু ছাগশিশুর বলিদান, উদ্যত খড়গ এবং পরেই নেপথ্যে কোমল শিশুকণ্ঠ আরো কিছুর ইঙ্গিত দেয় যা তখনো অদৃশ্যমান। শিশুটি যে এখনি ধর্মান্ধতার যূপকাষ্ঠে বলি হবে — তারই ইঙ্গিত। এটি চূড়ান্তভাবে সিনেমাটিক।

কী বক্তব্যে, কী দৃশ্যময়তায়'দেবী' সত্যজিৎ রায়ের প্রথম কৃষ্ণপ্রধান ছবি — এ ছবিতে বাংলার গ্রামের ভোররাত্রি, একটি বৃহৎ অট্টালিকার ঘর এবং বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তর, নদীতীর — কয়েকটি অসাধারণ দৃশ্যেব প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো ঠিক 'অপু চিত্রত্রয়ী'র প্রাকৃতিক দৃশ্যের মত কোন প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত নয়, বা চরিত্রগুলির প্রতিধ্বনি রচনা করেনি। অথবা সঠিক অর্থে পাশ্চাত্যের ক্লাসিকাল সঙ্গীতেব কন্টপুন্ট'ল ধ্বনিব মত কোন বুনুন আনেনি ছবিব মধ্যে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের সে-রকম প্রতীকী ব্যবহার না থাকলেও, বহু কিছু বস্তুর প্রতীকী আছে, যা সত্যজিতীয় রীতিতে একেবারে ডিটেলের অঙ্গ এবং প্রতীক। শব্দের ব্যবহারের আশ্চর্য শৈল্পিক উদাহরণ ছবিতে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পূর্বোক্ত প্রথম দৃশ্যেই পাত্রপাত্রীদের না দেখিয়ে আগে তাদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গেই আমরা পরিচিত হই। আর অবিস্মরণীয় স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর দয়ামযীর শোবার ঘর থেকে শোনা কালিকিংকরের খড়মের নাটকীয় শব্দ যেন নিয়তির পদধ্বনি। 'দেবী' এক ভয়ানক নাটকীয় গঠনেব ছবি, যার চূড়ান্ত মুহূর্ত বা ক্লাইমেক্স এক কুশলী ·ট্যকারেব রচনা। কয়েকটি সুস্থ মানবসম্পর্কের ওপর একজন মনোবিকারগ্রস্ত, অসচেতন বৃদ্ধের অন্ধ ধর্মীয় আবেগময় থমথমে পরিবেশ, যার উর্দ্ধে ধীরে ধীরে ঘনীভুত হয় যন্ত্রণার মেঘপুঞ্জ এবং শেষে নেমে আসে সেই মেঘপুঞ্জনিঃসৃত বিদ্যুৎ বজ্রপাত। ঠিক এই ধরণের নাটকীয় পরিবেশ ও চুড়ান্ত মুহূর্ত রচনায়, এতটুকু সেন্টিমেন্টাল ও মেলোড্রামাটিক না হয়েও, সত্যজিৎ রায় যে সিদ্ধহস্ত — তা এই ছবিতেই প্রথম ও শেষবার (এখন পর্যন্ত) দেখতে পাই। শেষ মুহূর্তটি যেন আমাদের এক ট্র্যাজিক অনুভূতিতে কিছুক্ষণ নিঃসাড় করে দেয়।

নাট্যরসসমৃদ্ধ কয়েকটি সিকোয়েন্সে ক্যামেরার অবস্থান, দৃষ্টিকোণ ও গতি বিষয়বস্তুর সঙ্গে অসামান্য শৈল্পিক সামঞ্জস্যে বিধৃত। আগেই অন্যত্র বলা হয়েছে, সত্যজিৎ রায় তাঁর স্পর্শকাতর ক্যামেরার নাড়াচড়া প্রায়শই দর্শকের অগোচরে রেখে দেন, কিন্তু 'দেবী'তে কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্যামেরার মুভমেন্ট বা দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন গতিময় এবং সেই গতি অনবদ্য সুর-সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে। যেমন সেই সিকোয়েন্সটি, যেখানে একটি মৃতকল্প

অসুস্থ বালককে গ্রামের মানুষরা নিয়ে এসেছে দেবীর চরণামৃত খাইয়ে বাঁচাবার জন্য। যখন মন্দিরে এই নাটকীয় ঘটনা ঘটতে চলছে, তখন ঘরের ভিতর শুরু হয় দুটি মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব— ধর্মান্ধ পিতার ও তথাকথিত নব্য শিক্ষায় দীক্ষিত পুত্রের। এই সময় সত্যজিৎ রায়ের কাটিং যে নাটকীয় ঘনত্ব এনেছে, তা তাঁর আর কোন ছবিতে চোখে পড়ে না। একবার পিতার ধর্মান্ধসুখে নেশাগ্রস্তের মত চোখ, পুত্রের শুষ্ক মুখ এবং তারপর হঠাৎ মন্দিরের পীড়িত ছেলেটির মুখ ও অন্যান্য শট্— এগুলি এক অসাধারণ নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ঠিক যে মুহূর্তে পুত্রের আক্রমণে পিতা বেশ বিহ্বল, হঠাৎ শোনা যায় মন্দিরে দেবীর জয়ধ্বনি — মৃতকল্প বালকটির জ্ঞান ফিরেছে। তখনকার কালিকিংকরের মুখের ক্লোজ শট, তাঁর সেই বিজয়ী ধর্মান্ধ মূর্তি —চূড়ান্ত ফ্যানাটিক এক অসাধারণ অভিনেতাও অসাধারণ চলচ্চিত্র স্রষ্টার যৌথ সৃষ্টি। 'শুনেছ, উমা শুনতে পাচ্ছ— আর তুমি বলছ উনি 'মা' নন' ; বিজয়ী কালিকিংকর চিৎকার করে ওঠেন। উমানাথ বিহ্বল ও পর্যুদস্ত। গোটা সিকোয়েন্সের গঠন যেন বীটোফেনীয় সঙ্গীতের নাট্যরসে সমৃদ্ধ।

এই কালিকিংকরের অন্তিম পরাভবের মুহূর্তেও ক্যামেরা অসাধারণ ভাবে ব্যবহৃত। নাতি বাঁচেনি, কালিকিংকর মন্দিরে মাথা ঠুকছেন, বলছেন, 'যার ঘরে স্বয়ং মা আবির্ভূতা, যিনি অন্যের সন্তানকে বাঁচিয়ে তোলেন, তিনি আপন ঘরের সন্তানকে কেন কেড়ে নিলেন?' সে সময় উমানাথ সবেমাত্র চূড়ান্ত দুঃসংবাদ শুনে কলকাতা থেকে ফিরে সেখানে প্রবেশ করে। ক্যামেরার নীচু দৃষ্টিকোণে ঋজু উমানাথের মূর্তি — অনেক আত্মসংহত, দৃপ্ত। উমানাথ বাবাকে আক্রমণ করে, 'আপনি ওকে হত্যা করেছেন।' বিহ্বল কালিকিংকর উঠে বাধা দিতে চান-হঠাৎ ক্যামেরা উমানাথের পায়ের কাছ থেকে কালিকিংকরের টলটলায়মান বিহ্বল পর্যুদস্ত মূর্তিকে দেখায়; কালিকিংকর পুত্রকে বাধা দিতে এসে আছড়ে পড়েন, তখন ক্যামেরা ফিরে যায় আগেকার অবস্থানে। তার লুণ্ঠিত মুখ তার চূড়ান্ত পরাজয়ের অভিব্যক্তি-সহ ক্যামেরার ক্লোজ আপে বিশাল — তাঁর সমস্ত যন্ত্রণা চূড়ান্ত পরাজয়ে চিহ্নিত। এই দৃশ্যটির মিশাঁ সেন অবিস্মরণীয় এবং অবিস্মরণীয় পাগলিনী দেবীব সেই নদীর চবের দিকে ছুটে যাওয়ার ট্র্যাকিং শট — সেই শটের আলোকসম্পাত ও কমপোজিশনের তুলনা হয়না — আলুলায়িত কেশে উন্মাদিনী দয়াময়ী ছুটছে এবং আবার সেই ভাঙা কাঠখড়ের প্রতিমার অবশিষ্ট অংশ — যা দেখে একদিন রাত্রে স্বামীর সঙ্গে পালাতে গিয়েও দয়াময়ী পালাতে পারেনি। ভেবেছিল ' যদি আমি সত্যিই দেবী হই, যদি আমার এভাবে পালানোতে স্বামী ও সংসারের উপর অভিশাপ আসে।' সেই বিসর্জিত ভগ্ন, অবশিষ্ট প্রতিমার চিত্রকল্প — এক অসাধারণ ব্যঞ্জনা এনে দেয় এবং দেবী অনতিদূরেই লুটিয়ে পড়ে। তুলনাটি স্পষ্ট।

শেষ শট্ — ছবির প্রথম ক্লোজ আপ —ফিরে আসে। সাদা মৃত্তিকার প্রতিমার চক্ষুহীন মুখ। দেবীত্ব বিলোপ।

'দেবী' সম্পর্কে সামগ্রিক মূল্যায়নে পুনশ্চ সেই কথাগুলিই বলা চলেঃ আজকালকার হিন্দু অবতারবাদের নগ্ন রূপটি খুলে না দেখান হলেও 'পিরিয়ড ফিল্ম' হিসাবে ধর্মের সংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশ করায়, বিশেষতঃ যে অসামান্য শৈল্পিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে তার ফলে, সমস্ত দিক থেকে 'দেবী' নিঃসন্দেহে একটি মহৎ সৃষ্টি এবং সত্যজিৎ রায়ের ভাবনা-জগতের প্রগতিশীল দিকটিরই অনবদ্য প্রকাশ।

দেবী

দেবেশ রায়

১৯৬০ সাল নাগাদ — তখন সত্যজিতের ধুলোমুঠি সোনা। এক এক শিল্পীর জীবনে এরকম এক একটা সময় আসে যখন যা করেন তাই শিল্প হয়ে ওঠে। এ যে কার কেমন করে হয়, তা কেউ জানে না। এ যে কখন কার কেমন করে চলে যায় তাও কেউ জানে না। কিন্তু যখন আসে তখন দশহাতে আসে।

ঐ ষাট সালের মুখোমুখি সত্যজিতের ঐ দশহাতেই আসছিল। 'পথের পাঁচালী' কে তো আর একটি ফ্লিমমাত্র বলা যায় না। ওটা একটা আবিষ্কার। সত্যজিৎ নিজেকে আবিষ্কার করেছেন, তা-ই নয়। আমরা এখনও ঐ একটা ফিল্মে নিজেদের আবিষ্কার করে থাকি। যতবার দেখি ততবার করি। এবারও করলাম। 'পথের পাঁচালী'র কথা থাক।

কিন্তু তারপর তো প্রস্তুত ও সচেতন 'অপরাজিত', 'জলসাঘর'। এবং তারও পর 'দেবী'।

আমার এক বন্ধু উদয়, বালিগঞ্জ গার্ডেনসে তার বাড়ি, তেতলা জুড়ে একা থাকত। সেই সুবাদে উদয়ের বাড়িতেই আমাদের আড্ডা চলত, বিশেষত সেই সব আড্ডা যা দু-চার দিনে বা রাতে শেষ হয় না। উদয়ের বাড়ির এই আড্ডায় আসতেন নিতাইবাবু, নিত্যানন্দ দত্ত, সত্যজিতের বিশ্বস্ত সহকারী। নিতাইবাবু এসেই আমাদের সত্যজিতের গল্প বলতেন আর শুটিংয়ের কথা। বলতেন মানে আমরাই বলতে বাধ্য করতাম। 'অপুর সংসার'— এর শর্মিলার কথা। সত্যজিৎ তখন চেস্টারফিল্ড সিগারেট খেতেন। সত্যজিৎ যখন নতুন স্ক্রিপ্টের গল্প বলেন তখন একটা দেয়ালের একটা জায়গার দিকে তাকিয়ে বলেন। সত্যজিৎ খেরোর খাতায় লেখেন। 'অপুর সংসার' — এ শুয়োরের গাড়ি চাপা পড়ার দৃশ্যে একটা কাণ্ড হয়েছিল। 'দেবী'তে শর্মিলাকে দেখতে কেমন লাগছে। 'দেবী'তে একটা খড়মের আওয়াজ ব্যবহার করা হয়েছে — এইসব গল্প। সত্যজিৎ তখন আমাদের মাইথলজির অংশ। সত্যজিৎ একমেবদ্বিতীয়ম্।

দেবী প্রথম যখন দেখলাম, দেখতে-দেখতে হলের ভিতর বসে-বসে নিজেদের তৈরী সত্যজিৎ-কল্পনা নিজেরা ভেঙে খান খান করেছি মাত্র ঐ দেড়ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে। এও সম্ভব? সত্যজিৎ এও করতে পারলেন? এই নিষ্ঠুরতা, এই বীভৎসতা, আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের এই আত্মঘাত?

'অপুর সংসার' হওয়ার পর অপু-অপর্ণার দাম্পত্য দেখে আমাদের কয়েকজন সহপাঠী-সহপাঠিনী টুকটাক নিজেদের বিয়ে করে ফেললেন। শর্মিলার সেই পানপাতা মুখে, বাঙালিনী মুখের যেন পুনরাবিষ্কার ঘটল মহেঞ্জোদারোর মাটি খুঁড়ে সেই বাঙালিনী মুখ। সেই একই পানপাতা মুখ, সেই একই একজোড়া চোখ, সেই একই নাক মুখগুলোর অক্ষরেখা, এবার কলীমূর্তির সঙ্গে মিলে গেল। আর সত্যজিতের যেন কোন ভয়ডর নেই। কোনও কিছু প্রমাণের জন্যে একটার বেশি দৃশ্য নয়। গ্রিক নাটকের মত গতিতে

— দয়াময়ীর দৈনন্দিন, দাম্পত্য এক এক দৃশ্যে। একটিমাত্র স্বপ্নে দয়াময়ী কালীর অবতার হয়ে যান। এমন বুকের পাটা তখন সত্যজিতের — এমন রূপান্তরের জন্য দুটো দৃশ্যও ব্যবহার করেন না। দেয়ালে শুধু দয়াময়ীর নখের আঁচড় পড়ে। স্বামী তাকে উদ্ধার করতে চায়—তাও একটিমাত্র দৃশ্যে। মনে হয়, জ্যোৎস্না-ধৌত চর দিয়ে একটি চাদরে আত্মগোপন করে দুটি প্রাণী দান্তেরে নরক পার হচ্ছে। ঐ দৃশ্যের একাকিত্ব আর দয়াময়ীর প্রত্যাবর্তনেই তো সব ঘটে গেল। স-ব ঘটে গেল। বাকি রইল তো গ্রিক নাটকের নিয়তি — সেই চরভূমিতেই ঝুমঝুম আওয়াজ তুলে দয়াময়ীর নিজের কাছ থেকে নিজের হারিয়ে যাওয়া।

আজ থেকে ৩২ বছর আগে হল থেকে বেরিয়ে এসে মনে হয়েছিল, ফিল্মের বাস্তবে পুনঃপ্রবেশ ঘটছে। ৩২ বছর পর আবার ২৬মার্চ রাতে টিভি বন্ধ করে মনে হল, ফিল্মের বাস্তবে পুনঃপ্রবেশ ঘটছে। এক পলকের জন্যে এ কাহিনী অবিশ্যাস্য ঠেকে না — শিল্পী নিজে কাহিনীর ভিতরে এমন ভাবে প্রবেশ করে আছেন। ৩২ বছর পর ২৬ মার্চ রাতে টিভি বন্ধ করে মনে হল আজকের দুনিয়াতে এ ভারতীয় গল্পের কী আশ্চর্য অর্থান্তর ঘটে যাচ্ছে-অস্তিক্য যদি সংস্কার হয়ে ওঠে মানুষ তাহলে আর মানুষ থাকে না, প্রতিমা হয়ে যায়। মানুষের সব অঙ্গই প্রতিমার থাকতে পারে, প্রতিমার হৃৎপিণ্ড শুধু বাজে না। যেমন ৩২ বছর আগে, তেমনি এই ৩২ বছর পর সত্যজিৎ মানুষের স্তব্ধীকৃত হৃৎপিণ্ডের ওপর আবার সেই হাত রাখলেন, সেই হাত।

দেবী (১৯৬০) সত্যজিৎ রায়েব করা পোস্টার

তিনকন্যা

দেবীপদ ভট্টাচার্য

সত্যজিৎ রায়ের নবতম চিত্রপ্রয়াস তিনকন্যার অন্যতম সার্থকতা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বৃহত্তর দর্শকসমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈচিত্রের অনবদ্য প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের মণিহারা, পোষ্টমাষ্টার ও সমাপ্তি এই তিনটি কাহিনী অনুভূতির তিনটি বিভিন্ন স্তরে কল্পিত। সত্যজিতের শিল্পও সেই বিচিত্র অনুভূতির স্বাদ দর্শকদের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছে। শুধু তাই নয়, ইতিপূর্বে রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল ভাব চলচ্চিত্রে এভাবে কোন দিন রক্ষিত হয়নি। এ ধরণের প্রয়াস বঙ্গীয় তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রে নতুন। এর পেছনে যে সাহস এবং অভিনব ধারণার স্পর্শ আছে তা সত্যজিতের অন্যান্য কীর্তির মতই অভিনন্দনের যোগ্য। আমরা ইতিপূর্বে পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে মম, ও' হেনরী ও কয়েকটি ইতালীয় কাহিনীর গ্রথিত চিত্ররূপ দেখে বিমোহিত হয়েছি। আজ রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে এই 'তিনকন্যা' বাংলা চলচ্চিত্রের যেমন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল, তেমনি এর দ্বারা প্রতিভার বৈচিত্র্য নতুন শক্তিতে দর্শকচিত্তে মুদ্রিত হলো।

মণিহারা কাহিনীটির বর্ণনায় সত্যজিৎবাবু রবীন্দ্রনাথের কাহিনী থেকে যেটুকু সরে গেছেন সেটুকু সরতে হয়েছে তাঁর মাধ্যমের তাগিদে। বাংলা চলচ্চিত্রে অতিপ্রাকৃত, ভৌতিক কাহিনীর চিত্রীকরণ এই প্রথম নয়, কিন্তু ইতিপূর্বে কোন ছবিতে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এমন পরিবেশগত 'expectancy' পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। studio তে দুটি set এবং তিনটি চরিত্রের সাহায্যে এমন অনুভূতির ঘনীভবন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিরল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক অতিপ্রাকৃত কাহিনীর মধ্য দিয়ে যে জগতের সৃষ্টি করেছেন তা পাঠকচিত্তে যুগপৎ ভাবের সঞ্চার করে। একদিকে সেখানে আমরা পাই মানব চরিত্র সম্বন্ধে নিগুঢ় সমীক্ষা, যা মণিহারাতে ফণিভূষণ আর তাঁর সুন্দরী বন্ধ্যা স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই নিগূঢ় মানবচরিত্রানুশীলনের ভিত্তিতেই সৃষ্ট অতিপ্রাকৃতের কল্পলোক। সত্যজিতের চিত্রেও এই দুটি যথার্থভাবেই ফুটেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ফণিভূষণের প্রতি মণিমালিকার আনুভূতিক ঔদাসীন্যের কারণটুকু বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন অতি সহজে; চলচ্চিত্রের দৃশ্যমাধ্যমে সে অনুশীলন বোধ হয় দীর্ঘতর সময় সাপেক্ষ। কিন্তু সমস্ত বিশ্লেষণ করে যে জিনিসটি সত্যজিতের শিল্পকে বিশেষ করে তুলেছে সেটি হোল তাঁর বর্ণনাভঙ্গীর সাবলীল সারল্য। কিন্তু সারল্য সেখানে কোনমতেই তারল্য নয়। সত্যজিৎ বর্তমানে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের সেই ধরণেরই মুষ্টিমেয় পরিচালকদের অন্যতম যাঁরা তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী। যাঁরা মণিহারার চিত্ররূপে গূঢ়তর সমাজচিত্র বা নিগূঢ় প্রতীকধর্মিতার অন্বেষণে ব্যাপৃত হবেন তাঁরা নিঃসন্দেহে বিফল মনোরথ হবেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর মত এ চলচ্চিত্ররূপও জীবনমৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি ভীতপ্রদ রোমাঞ্চকর কল্পনাজগতের সৃজনে ব্যাপৃত।

রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর বর্ণনাকারীকে কোলরিজসৃষ্ট যে প্রাচীন নাবিকের সঙ্গে তুলনা

করেছেন গোবিন্দ চক্রবর্তীর আকারে অভিনয়ে সেই বর্ণনার যেন অনেকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ঘাটে উপবিষ্ট শ্রোতা, তার মুখ দেখা যায় না। তার কণ্ঠস্বরে একটা অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা। প্রথম থেকেই সে আমাদের মনে করিয়ে দেয় সমস্ত পরিবেশে একটা অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ। তারপর সেই ধনীগৃহের নানা মূল্যবান সামগ্রী, সেই দীর্ঘ বিস্তৃত অলিন্দ,সম্মুখে প্রসারিত নদীবক্ষ, সমস্তই রবীন্দ্রকাহিনীর অনুসরণে কল্পিত ও চিত্রায়িত। মণিমালিকার অর্ন্তধানের রাত্রিতে দূরাগত যাত্রাগানের অপূর্ব ব্যবহার, অর্ন্তধানের পর অপেক্ষারত ফণিভূষণ, তার দিকে অগ্রসরমান নূপুরধ্বনি ও তাদের মধ্যবর্তী মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে ব্যবধানও বুঝি অনুরূপভাবেই সূক্ষ্ম এবং রহস্যময়। মণিহারার চিত্ররূপে শিল্পনির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ আর সেই শিল্পনির্দেশকে ব্যঞ্জনাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালকের অপূর্ব ব্যবহার বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ঐ সব কাঠ, পাথর, শিল্প, অলংকারের মধ্যে স্বামীস্ত্রীর মানস সম্পর্কটি, হৃদয়ের বন্ধনটি কোথায় হারিয়ে গেছে তার উত্তর দিয়েছে মণিহারার শিল্পনির্দেশ ও শিল্পবোধ।

পোষ্টমাষ্টার কাহিনীর কারুণ্য এবং চিত্রনাট্যকার পরিচালকের বিস্ময়কর সংবেদনশীলতা আমার মনে হয় আশানুরূপভাবে চলচ্চিত্রে অভিব্যক্ত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনীর শেষ দুটি স্তবকে যে গভীর অনুভূতির বিশ্লেষণ করেছেন, আমার মনে হয় অনেকাংশে সেই গভীরতা সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত হয়, কিন্তু আবার প্রশ্ন জাগে অপরাজিত চিত্রে অপু ও সর্বজয়ার মধ্যে একটা অনিবার্য আনুভূতিক দূরীভবন যে সত্যজিৎ রায় অমন শক্তিতে রূপায়িত করেছেন তা পোষ্টমাষ্টাটার এবং রতনের সম্পর্কের উপস্থাপনে সম্ভবপর হলো না কেন? সত্যজিতের পরিকল্পিত চরিত্র উন্মাদের বিকট চিৎকার ও আচরণ প্রথমে নন্দপোষ্টমাষ্টারকে ভীত ও শঙ্কিত করে তুলেছিল। শেষ দিন কর্দমাক্ত পল্লীপথে সেই পাগলা ও রতনকে ছেড়ে চলে যেতে তার যে হৃদয় বেদনা তার মাধ্যমেই শ্রীরায় তাঁর চিত্রের বক্তব্য বলবার প্রয়াস হয়ত করেছেন। বাংলার পল্লীজীবনের সহজরূপটি চিত্রে অব্যক্ত থাকে নি, তা ধরা পড়েছে ক্ষণে ক্ষণে সেই গ্রামবৃদ্ধদের জটলায়, তাদের সরল, চিৎকারসর্বস্ব সংগীতচর্চায়, দুঃখের মধ্যেও তাদের রসসমৃদ্ধ উক্তিতে।

আমার মতে তিনকন্যার শেষ ছবি সমাপ্তি সত্যজিতের শিল্পীজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। নৌকো থেকে কাদায় নেমে পিছলে পড়া থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সত্যজিৎবাবু এই ছবিতে যে সুরের সৃষ্টি করেছেন তা বাংলা চলচ্চিত্রে অবিস্মরণীয়। মনকে আনন্দে, কৌতুকে, ছন্দে তা পরিপ্লুত করে রাখে এবং তার পেছনে আছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়কলা। সত্যজিতের পরিচালনা এবং সৌমিত্রের অভিনয় সেকেলে চশমাপরা, মায়ের আদুরে অমূল্য (অপূর্ব) কুমার রায়ের যে চরিত্রটি সৃষ্টি করেছে তা বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনয় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের সমাপ্তি আরম্ভ হচ্ছে চপল ছন্দে — সে ছন্দ আসে কিশোরী মৃন্ময়ীর স্বাধীন বন্য প্রকৃতি থেকে, আর অপূর্বর নব্যশিক্ষিত স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের প্রয়াস থেকে। কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মৃন্ময়ীর কৈশোরের চপলতা যৌবনের ভার পায়, তার ছন্দ যায় বদলে, মৃন্ময়ী হয়ে ওঠে প্রেমস্পন্দনে সজীব প্রতিমা। রবীন্দ্রনাথ মৃন্ময়ীর যে মুক্তিপ্রীতি ভাষার ঐশ্বর্যে রূপ দিয়েছেন, সত্যজিতের শিল্পে তা মূর্ত হয়েছে তার বন্য

কাঠবিড়ালী প্রীতিতে, বিয়ের রাতে তার সেই মুক্ত নদীতীরে দোলনার দোলায়, মুক্ত প্রকৃতির মাঝে তার নিঃশঙ্ক অসংকোচে নিদ্রায়। চিত্রীকৃত সমস্ত ঘটনার সাবলীলতা আমাদের Herbert Marshall -এর কথাগুলি মনে করিয়ে দেয় — 'It seems as if a Cine Camera had been hidden and life just went on in front of it completely underhearsed and untouched' মৃন্ময়ীর মুক্তিপ্রীতি স্বাধিকার সচেতনতায় সজীব এবং সত্যজিৎ ফুলশয্যার রাতে বরবধূর কথোপকথনে তা পরিস্ফুট করছেন। বিয়ে হয় প্রেমে, হয় না শুধু শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে তাই মৃন্ময়ী শুভদৃষ্টির সময়েও অপূর্বের দিয়ে চায় না, কারণ শুভদৃষ্টি তো শুধু দৃষ্টিবিনিময় নয়, হৃদয়ের বিনিময়ও। তারপর অপূর্বর গ্রাম ত্যাগের পর নরীত্বের পূর্ণমহিমায় প্রতিষ্ঠিত স্বামী প্রেমে ধন্যা মৃন্ময়ীর চিত্তবৃত্তির উন্মোচন প্রকাশিত হয়েছে অপূর্ব আলোকসম্পাতে আলোকিত একই মুখের বিভিন্ন close up-এ। প্রেমের রহস্য উপলব্ধিতে অপারগ কিশোরীর close up, পরে প্রেমোপলব্ধিতে চরিতার্থ যুবতীর আলোকদীপ্ত মুখের হাস্যময় close up। সমস্ত close up একই cemera অবস্থান থেকে কেবলমাত্র বিভিন্ন আলোকপাতের সাহায্যে গ্রহণ করে মৃন্ময়ীর হৃদয়বৃত্তির বিবর্তনকে অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছ। পরিশেষে জলে ভেজা চশমার কাঁচের মধ্য দিয়ে অপূর্বর মৃন্ময়ীকে নিজের ঘরে দেখা, চশমার ভেজা কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখা আবছা অস্পষ্টমূর্তি যেন অপূর্বর প্রথম অবিশ্বাস আর বিস্ময়কেই ফুটিয়ে তুলেছে অথচ সেই দৃশ্যটি কত সহজগ্রাহ্যভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এখানের ব্যঞ্জনা মননশীলতার জটিল আবর্তে দর্শকচক্ষুর আগোচরে থাকে না, কার্যকারণের সহজ রূপে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে তিনকন্যার সঙ্গীতের কথাও বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়াজন। অন্তর্লীন সুর প্রবাহ রবীন্দ্রনাথের গল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট, তাই এই গল্পের চিত্র রূপে মানবমনের সাবজেকটিভ মুডের ও পরিবশগত ভাবব্যঞ্জনা পরিস্ফুটনে সঙ্গীতের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। আবহসঙ্গীত রচনায় সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রতিভার আর একটি নুতন স্বাক্ষর রেখেছেন এই ছবিতে। এস্রাজ ও অন্যান্য যন্ত্রের সুমিত প্রয়োগে বিশেষ অর্থবাহী গানের সুর বাজিয়ে শ্রী রায় জীবনের ব্যাপক ও বিচিত্র সুরছন্দের একটি রসলোকে যেন দর্শকমনকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। তিনকন্যা সত্যিই এক অপূর্ব দৃশ্যকাব্য।

আমরা সত্যজিতের শিল্পের সাবলীলতা এ গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে আমাদের সেই বিশ্বাসকেই আবার উল্লেখ করব যে চলচ্চিত্রের শক্তি আসে তার রূপপ্রতীকের স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা থেকে; তা আসে না মননশীলতার দুর্বোধ্য কূটকচালির ছড়াছড়িতে। দৃশ্য যদি সহজে বঞ্জনা সৃষ্টিতে অপারগ হোল, যদি অর্থের অন্বেষণে দৃশ্যের আপাত মাধুর্য পরিত্যাগ করতে হোল, সেখানে আর যাই হোক চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য সাধিত হোল না। তিনকন্যা তাই আদর্শ চলচ্চিত্রের ভাষায় রবীন্দ্র প্রতিভার বৈচিত্রের আদর্শ বূপায়ণ। এ ছবি সর্বজনগ্রাহ্য, এ প্রয়াস অকুণ্ঠ অভিনন্দনের যোগ্য। সর্বজনপ্রিয়তাকে যাঁরা শিল্পের তারল্য বলে মনে করেন তাঁদের জন্য আমরা একটি বিখ্যাত ইংরেজী উক্তি দিয়ে এই আলোচনা শেষ করব ঃ

"To condemn because the multitude admire is as essentially vulgar as to admire because they admire." .

কাঞ্চনজঙ্ঘা, নিয়ে দু-চার কথা

ধ্রুবগুপ্ত

সত্যজিতেব এত সব কাজকর্মেব মাঝখান থেকে কেবল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' নিযে আলাদা কবে কিছু লেখা হচ্ছে কেন এ প্রশ্নেব কতগুলি জবাব আছে। প্রথমত, একজন গুরুত্বপূর্ণ চলিচ্চিত্রকাবেব যে কোন একটি বিশিষ্ট ছবি (সব ছবি নয়, কেননা সব ছবিই সমান গুরুত্বপূর্ণ না-ও হতে পাবে) সব সময়েই আলাদা কবে আলোচিত হবাব দাবি বাখে এবং পৃথিবীব চলচ্চিত্রেব ইতিহাসে বিভিন্ন ছবি নিযে সে দাবি পালন কবা হযেছে। এ হল সাধাবণ কাবণ, কযেকটি বিশেষ কাবণও আছে, তাব মধ্যে অন্যতম হল — এই প্রথম সত্যজিৎ পূর্বলিখিত অন্যেব বচনাব অবলম্বন না কবে নিজেব মৌল কাহিনী নিযে ছবি কবেছেন। তাবপব বলা যায, এই প্রথম তিনি ছবিতে বং প্রযোগ কবেছেন। আব একটি বড কথা হল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'তে তিনি অনেক কাল পবে (অর্থাৎ 'জলসাঘব', 'দেবী', তিনকন্যা' ইত্যাদিব পব) সাম্প্রতিক বাস্তবকে ধবেছেন, যে কাবণে সত্যজিতেব এই ছবিব অন্যতম গুণগ্রাহী ঋত্বিককুমাব ঘটক বসিকতা কবে বলেছিলেন, 'মনে হচ্ছে যেন বীপ ভ্যান উইংকলেব ঘুম ভাঙল'। কথাটি ঋত্বিক ঘটক খুব একটা জনসমক্ষে বলেননি বা কোথাও লেখেননি, বলেছেন বাডিতে কথোপকথনকালে। এ ছাডাও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'কে আলাদা কবে নেবাব একটা বিশেষ কাবণ আছে — এ ছবিব দৈর্ঘকাল এবং ছবিতে উপস্থাপিত ঘটনাব কাল এক, সমযেব এমন একাত্মতা খুব কম ছবিতেই দেখা যায, সাধাবণত আমবা দেখি ছবি চলে ঘণ্টাদুযেকে ধবে কিন্তু, ছবিতে চিত্রাযিত কাহিনীব কাল দু-দিন থেকে দুবছব, দু-যুগ দু-শতাব্দী অনেক কিছুই হতে পাবে।

এইসব কাবণেই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আলাদা কবে ভাবা এবং সেই ভাবনা নিযে লেখা যায়। প্রথমে ফিল্ম টাইম-বিয়াল টাইম-এব ব্যাপাবটা দেখা যাক। ছবিব শুরুতেই লংশটে হোটেল দেখি, যাব সামনেব চত্ববে বাযবাহাদুব (ছবি বিশ্বাস) বেবিযে আসবেন। সাউন্ড ট্র্যাকে শুনি ঘড়িতে ঢং ঢং কবে চাবটে বাজল, অর্থাৎ ছবিব ঘটনা (যদিও ঘটনা বলতে তেমন নাটকীয কিছু এ ছবিতে নেই) শুরু বিকাল চাবটেয। এব কিছু পব দেখি ম্যাল-এ অপেক্ষা কবাব পব 'জদদীশ'ই হাতঘড়িতে তাকিযে বলছে — 'It is a quarter past four now' – অর্থাৎ ছবিতে/গল্পেও পনেবো মিনিট পেবিযেছে। এবপব পার্কে অণিমা ও তাব স্বামীব প্রায —ভেঙ্গে পডা সম্পর্কেব খতিযানেব দৃশ্য শুরু হচ্ছে যখন অর্থাৎ অণিমা (অনুভাগুপ্তা) যখন পার্কে প্রবেশ কবছে তখন ঘডিতে পাঁচটা বাজাব শব্দ শোনা যায় — অর্থাৎ এক ঘণ্টা ইতিমধ্যে অতিবাহিত হযে গেছে। এবপব আবও ৩৫/৪০ মিনিট পব ছবিটি শেষ হয় অর্থাৎ ছবি চলাব সময়ে এবং কাহিনীব সময মোটেব ওপব একই (১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট মত) থাকে। এটা শুনতে যত সহজ মনে হয, কাজে তত সহজ নয। হিচককেব 'দ্য বোপ' (দডি) নামক অপবাধমূলক ছবিতে এই জাতীয ব্যাপাব কবা হযেছে। কিন্তু সেখানে ব্যাপাবটা অন্যবকম — সেখানে একটা ঘবেব মধ্যে

সব ঘটছে — spatial continuity আছে তাতে। সেটা করা হয়েছে একটা চালাকি করে, যখনই রিল শেষ হচ্ছে শ্যুটিং-এর সময়, তখনই হিচকক ক্যামেরা ট্র্যাক করে একটা বস্তুর খুব নিকটে নিয়ে যাচ্ছেন, পরের রিলের শ্যুটিং ঠিক সেখান থেকে শুরু করেছেন, তারপর রিলগুলো শুধু জুড়ে দিয়েছেন যাতে মনে হচ্ছে, গোটা ছবিটাই একটা দীর্ঘ শট (যদিও ভূমিকা হিসাবে ঘরের বাইরেও দেখান হয়েছে) তাতে কোনও 'কাট' নেই অর্থাৎ সম্পাদনা বলতে যা বোঝায় তা নেই। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'তে কিন্তু ব্যাপারটা তা আদৌ নয় — সেখানে নিয়তই space ভাঙা হয়েছে, ভেঙে জোড়া দেওয়া হয়েছে এমনভাবে যাতে Temporal continuity অর্থাৎ কাল প্রবাহে একদম ছেদ না পড়ে। অর্থাৎ অনেক হিসাব করে চিত্রনাট্য রচনা এবং এক একটি শট এবং সিকোয়েন্সের সময় মেপে সেই কাল প্রবাহকে রক্ষা করা হয়েছে। সম্পাদনার সময়, ফলত ছবির প্রবাহে যে ছন্দটি প্রস্তুত হয়েছে তার একটি সাঙ্গীতিক চরিত্র তৈরি হয়েছে। ফলত যা হয়েছে তাকে এক অর্থে আবার মালাটি-ট্রিকও (Multitrych) বলা যেতে পারে এবং সাহিত্যকাহিনী রচনায় তার একটা ফল বর্তনোর সুযোগ থাকে, যদিও তাকে ফ্রান্সের 'নুভো রোঁমা'র সঙ্গে তুলনা করলে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

সুধু ওই বৈশিষ্ট্যই নয় ছবিটির চিত্রনাট্যে প্রথমেই স্বল্পসময়ে যেভাবে বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করানো হয়েছে, এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক তার মধ্যে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটাও লক্ষ করবার মত। সেই কাজে কয়েকটি অনবদ্য মুহূর্ত রচিত হয়েছে। পক্ষীপ্রেমিক Brother-in-low- কে (পাহাড়ী স্যান্যাল) নির্দেশ দিলেন 'যাও বইটা বন্ধ করে দেখে এসো ও দিকটা হল কিনা।' পরের 'ও দিক' অর্থাৎ রায়বাহাদুরের স্ত্রী লাবণ্যকে দেখছি, বাক্স গোছাচ্ছেন, নেপথ্য থেকে জগদীশ (পাহাড়ী সান্যাল) ডাকলেন 'লাবণ্য' (করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়), লাবণ্য সামান্য মুখ তুলে বলেন, 'দাদা'। রায়বাহাদুরের তাড়া দেওয়ার খবর দেবার পর উল্টো দিক থেকে ছোট মেয়ে মণির গলা শোনা যায় ' মা, আমি কিন্তু বেশি সাজগোজ করছি না' — লাবণ্য একটু চিন্তান্বিত মুখে আস্তে করে বলেন, "রোজ যা করিস তাই কর।' এখানে পরে লাবণ্য যে তার স্বামীর পেট্রিয়ার্কির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে 'এ পরবাসে রবে কে' গানটি গাইবার পর-তার একটা ভূমিকা তৈরি হয়ে যায়। মণি অর্থাৎ ছোটমেয়েকে আমরা প্রথম দেখি তার বড়বোনের অর্থাৎ অণিমার শায়িত স্বামীর সঙ্গে, যেখানে কথোপকথনের মাধ্যমে একটি জিনিস বেরিয়ে আসছে — ওই বাড়িতে কারও নিজের ইচ্ছে বলে কিছু নেই, সবই কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

ছবিটি পর্যায়ক্রমে সেই কর্তার, সেই পেট্রিয়ার্কের পরাজয়ের পথে এগিয়ে যায়। পরাজয় নিম্নমধ্যবিত্ত চাকুরিপ্রার্থী অশোক (অরুণ মুখোপাধ্যায়)-এর কাছে, যে অপমানের (no charity) দানস্বরূপ চাকরিটি নিতে চাইল না। পরাজয় স্ত্রীর কাছে, যিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, 'সব যদি মুখ বুজে সহ্য করে থাকি ত বেঁচে থেকে লাভ কী'? পরাজয় নিজের ছোট কন্যার কাছেও, যে বাবার নির্বাচিত ইঞ্জিনিয়ার পাত্রটিকে অন্তত তখনকার মত নাকচ করে দিল। অন্তত তখনকার মত — বলার একটি বিশেষ কারণ আছে, সে কথায় পরে আসছি। পরাজয় প্রকৃতির কাছেও, যে গিরিশৃঙ্গ দেখার জন্য তাঁর এত প্রযত্ন তা যখন দৃশ্যমান হল তখন সেদিকে দৃষ্টিপাত করার মত অবস্থা

তাঁর নেই। শেষ শটে শঙ্কাপীড়িত রায়বাহাদুর ফ্রেম থেকে বাঁদিকে 'অফ' হয়ে যান, উজ্জ্বল আলোকে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র শৃঙ্গ প্রতিভাত, মানুষের তখন সেদিকে তাকাবার সময় নেই।

প্রধানত পরাজিত পরাক্রান্ত মানুষটির মানসিকতাকে সত্যজিৎ নানা সূত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন — তাঁর অভিজ্ঞতা বিষয়ে তিনি গর্বিত, তাঁর ধারণা কিসে তাঁর মেয়ে সুখী হবে সেটাও তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই বলে দেবেন এবং মেয়ে সেই কথামত চলবে। তিনি 'glum face' পছন্দ করেন না বলেই তাঁর বিষণ্ণ স্ত্রীকে মুখে জোর করে হাসি ফোটাতে হবে।। যে পাখিতে রোস্ট হয় না, যাতে কোনও উপযোগিতা নেই তাতে তাঁর কোও Interest নেই ; যদিও আর-পাঁচটা লোকের মত কাঞ্চনজঙ্ঘার গিরিশৃঙ্গ দেখার ইচ্ছে তাঁর আছে ইংরেজ টুরিস্টকে সেকথা তিনি একটু ঝোঁক দিয়ে বলেন 'the most beautiful mountain range in the world'। তাঁর ইংরেজপ্রীতির, ভারতবর্ষে ইংরেজের অবদান বিষয়ে ব্যক্তিশ্রদ্ধার ব্যাপারটি সত্যজিৎ নানাভাবে বিদ্ধৃত করেছেন ছবিতে।

এখানে একটি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সম্পাদনার সাহায্যে এক জায়গায় ছবিতে করা হয়েছে — গর্বভরে যখন তিনি অশোককে বলেন, 'এই শহরটাকে কে বানিয়েছেন জান? ছিল ত একটা ছোট ল্যাপচা গ্রাম, এটা কে বানিয়েছেন জান? একজন ব্রিটিশার' — সঙ্গে সঙ্গে কাট করে দেখানো হয় ম্যাল — ও ব্যাগপাইপসহ ব্যাণ্ড বাজছে — 'ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের অবদান' এর চিহ্ন স্বরূপ। দয়া করে যখন বেকাব ছেলেকে চাকরির সম্ভবনার কথা বলছে, যখন ছেলেটি অপমানাহত হচ্ছে দেখি, তার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে — সে শুধু ব্যক্তিস্তবে আপমান নয়, সমগ্র যুবপ্রজন্মের হয়ে আশোক সে অপমান তীব্রভাবে অনুভব করছে, তাই সে সাহস করে যা বলছে তা হল — 'হ্যাঁ, আমার চাকরির দরকার আছে, খুবই দরকার আছে, কিন্তু তা আপনার মত মানুষের কাছ থেকে ভিক্ষের দান হিসাবে নেব না। নিজের চেষ্টায় (রায়বাহাদুরের কথা তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হল) জোগাড় করে নেব।' পরেও সে ঘটনাটা তখন রায়বাহাদুরের ছোটমেয়ে মনীষাকে বর্ণনা করছে, তখন উত্তেজিত হয়ে বলছে, 'No Charity', কিন্তু এই চ্যারিটি প্রত্যাখান করার মুহূর্তটিকে সত্যজিৎ অনবদ্যভাবে ধরেন। দয়া করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে রায়বাহাদুর রেগে চলে যাবার পর প্রথমে অশোক নিজের সাফল্যে হাততালি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে কিন্তু তারপর একটু গম্ভীর হয়ে যায়। কিছু ভাবে, আবার হাসে। ভাবে এমন সংকটময় অবস্থায় এমন দুঃসাহস দেখানো ঠিক হল কিনা। মনেব ভাবকে দৃশ্যমান করার ব্যাপারে সত্যজিৎ রায়ের উৎকৃষ্ট ছবিগুলি অসাধারণ। অনেকের হয়ত মনে পড়বে 'মহানগর' ছবিতে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দ্রুতপদে সিড়ি বেয়ে নেমে আসার পর আরতির (মাধবী মুখোপাধ্যায়) উদ্বিগ্নমুখে থেমে যাওয়া। অল্প আঁচড়ে সত্যজিৎ নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তবকে এইভাবে ধরেন। এই সূক্ষ্মতা একটি জায়গাতে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'তে বজায় থাকেনি। শেষদিকে রায়বাহাদুরের পরাজয়ের পর তাঁকে অশোকের 'Good day Sir' বলে ঘুরে চলে যাওয়াটা ছবির অসামান্যতাব তুলনায় বেসুরো লাগে। একটু খেলো প্রতিপন্ন হয়। ওব কোন প্রয়োজন ছিল না।

লাবণ্য ও মনীষা স্বামী ও পিতাকে অমান্য করল, অণিমার পক্ষে এখন আর সে

প্রশ্ন ওঠে না। সে তার স্বামীকে মেনে নিয়েছে, পূর্বের 'হৃদয়ঘটিত ব্যাপার' তার কাছে এখন অর্থহীন, কিন্তু সেই ব্যাপার নিয়েই যখন তার স্বামী তাকে আঘাত করছে, তখন সে খুব একটা অপরাধবোধে কুঁকড়ে উঠছে না, সে স্থিরভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে, 'সব জিনিস তো বুদ্ধি দিয়ে হয় না'। তা ছাড়া উল্টে সে স্বামীর জুয়া, রেস স্পেকুলেশন নিয়ে মেতে থাকাকেই ধিক্কার দিতে পিছপা হচ্ছে না। এই ভেঙেপড়া সম্পর্ককে সত্যজিৎ জোড়া দেবার ক্ষেত্রে আমাদের পরিবারের 'শিশুকেন্দ্রিকতা'কে রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু শেষ সংলাপে স্ত্রীকে 'তোমাকে ছাড়া আমাব চলতে পারে কিন্তু মেযেকে ছাড়া চলবে না' কথাটা সত্যজিৎ স্বামী (সুব্রত সেনশর্মা)-কে দিয়ে যেভাবে বলান, এবং ফ্রেমে অণিমাকে যেভাবে ধরেন তাতে স্বামীর পাশে স্ত্রী একটু খাটো হয়ে যান, image হিসাবে। অপরপক্ষে মনীষা আলোকেব রুচি, মানসিকতা ইত্যাদিকে ক্রমাগত অনুচ্চারভাবে খোঁচা মারতে মারতে মহাশূন্যের দিকে কুযাশার জন্য ('আপনার কুয়াশা ভাল লাগে না বুঝি') অপেক্ষা করতে করতে আপাতত তাকে তার জগৎ থেকে বার করে দেয়।

আপাতত কথাটাতে এবার ফিরে আসি। এ ছবিকে 'Open ended' বলার পেছনে যুক্তি আছে। এ ছবিব যে স্থানিক গুণ তাতে মানুষের মনে একটা অসম্ভব প্রসার এনে দেয়। এ ছবিব পাত্রপাত্রীবা সকলেই যেন গাযে কলকাতার চরিত্র মেখে আছেন, কলকাতা বহির্ভূত এই সাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে যা তাঁবা করেছেন, করতে সাহস পাচ্ছেন তা কলকাতায় পেতেন কিনা এ বিষযে সত্যজিৎ একটা সংশয়ের সুব ছবিতে রেখে দেন। অশোক ত বলেই ফেলে 'কলকাতা হলে চাকরিটা নিয়েই ফেলতাম।' তাই বলে আবাব এ কথা মনে করা উচিত নয় যে সত্যজিৎ রায স্পষ্ট বলেছেন কলকাতায সাহস-টাহসেব কাজ হয় না আদৌ, তাহলে 'মহানগব'-এ আবতি অত দুঃসাহসের কাজ কবল কী করে? এখানে একটা সংশয়ের ভাব রাখাতে যেটা প্রতিপন্ন হচ্ছে তা হল বাস্তবের চেহাবা-চরিত্র নিতান্তই জটিল। জটিল বলেই শেষ দৃশ্যে যখন মনীষা অশোককে কলকাতায ফিরে বাড়িতে যেতে বলেছে, সেখানেও 'তার বন্ধুদেব জন্য appointment লাগে না', 'সেজন্য বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না', এসব বলা সত্ত্বেও একটা অনির্দিষ্টভাব থেকে যাচ্ছে যেখানে কোনও 'উদয়ের পথে' ধরনের যুগল শোভাযাত্রা দিয়ে ছবি শেষ হচ্ছে না।

সত্যজিতের স্বাভাবিক রসবোধ (হিউমার কথাটা থাক, তার সংজ্ঞা নিয়ে আবাব নানা তাত্ত্বিক ঝগড়াঝাটি আছে), যা হয়ত পারিবারিকসূত্রে প্রাপ্ত। সেই রসবোধে ছবিটি সমৃদ্ধ, যদিও প্রধানত তা সংলাপাশ্রায়ী। মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্ট করতে অভ্যস্ত রায়বাহাদুরপুত্র (অনিল চট্টোপাধ্যায়) যখন কোকো-বার-এ একটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার ফোটো তুলতে চায়, তখন মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, 'of the dog' ছেলেটিকে বলতে হয় 'হ্যাঁ তাই, আমি কুকুর বলতে অজ্ঞান'। অশোককে যখন রায বাহাদুর তার উচ্চতা কত জিজ্ঞাসা করেন, তখন তার 'মাপিনি অনেকদিন'-এর উত্তরে তিনি বলেন 'আহা তুমি তো কচি খোকাটি নও যে দিন দিন বাড়ছ, শেষ কত দেখেছিলে?' অণিমার forecast কথাটি নিয়ে স্বামীকে মৃদু খোঁচাটিও সেই রসবোধসঞ্জাত, প্রাইভেট টিউটর (হরিধন) এবং জগদীশ মামার চরিত্র কল্পনাটিই সেই রসবোধপ্রসূত, তাবই মধ্যে অশোকের প্রাইভেট টিউটর

কাকাটিকে দিয়ে এক ফাঁকে সত্যজিৎ বলিয়ে নেন, 'আজকাল ব্যাকিং-ট্যাকিং ছাড়া চাকরি হয় না তা বোঝেন না নাকি?

কিন্তু পক্ষীপ্রেমিক ওই জগদীশ মামাই আকস্মাৎ নিউক্লিয়ার টেস্ট-এর ফলে, শুধু দার্জিলিং-কলকাতা বা migratory birds নয়, একটি বিশ্বব্যাপী আশঙ্কার যে দ্যোতনা (সাউন্ড ট্র্যাকে প্লেনের আওয়াজ-এর সঙ্কেত রাখে) সৃষ্টি করেন তা ছবিটিকে ক্ষণকালের জন্যও নিকট বাস্তব থেকে একটি সামগ্রিক স্তরে নিয়ে যায়, আর শেষ দৃশ্যে চকলেট-মুখ-মাখা ভূটিয়া বাচ্চাটির অপাপবিদ্ধ Image ও ছবিটির নাগরিক পাত্রপাত্রীর ক্ষণকালের অতিথির প্রতিতুলনায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। পর্বতশৃঙ্গের মত, সেই শিশু-ইমেজটিকে এদের চিন্তাভাবনা বা উদ্বেগ স্পর্শ করতে পারে না।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ঃ এক আলোকদিশারী ছবি

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' (১৯৬২) বিশেষ যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছবি তা হচ্ছে এই ছবির 'অথর' সব অর্থেই সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়ের এর আগের অন্য সমস্ত কাহিনীচিত্রগুলির মূল ভাবনাটি অন্য লেখকের রচিত সাহিত্য থেকে আহরিত, হয়তো-বা তাকে অবলম্বন করে নিজেরও কিছু বক্তব্য সত্যজিৎ রায় বলেছেন, আবার কখনো মূল ভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু তবুও সেই ছবির ষোল-আনা 'অথরশিপ' সত্যজিৎ রায়ের প্রাপ্য কিনা তা তর্কাতীতভাবে মীমাংসিত হয়নি। সেইদিক থেকে সত্যজিৎ রায়কে সম্পূর্ণভাবে পাওয়ার প্রথম সুযোগ ঘটে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে। আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকঃ এই ছবিতে প্রথম পাওয়া যায়।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির থীম কি? এটি স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ের উক্তিতেই শোনা যাক। 'সাইট এ্যান্ড সাউন্ড' পত্রিকার ১৯৭২-৭৩ সালের শীতকালীন সংখ্যায় সমালোচক ক্রিশ্চিয়ান ব্রাড থমসনের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে (এই সাক্ষাৎকারটি সত্যজিৎ রায়ের চিন্তাধারাকে বুঝবার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) সত্যজিৎ রায় নানা কথার মধ্যে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' অনেকটা 'অরণ্যের দিনরাত্রি' জাতীয় ; এবং এই দুটি ছবিই তাঁর মতে, লোকজন ভুল বুঝেছে ('misunderstood')। এসবই অবশ্য সেই সময়কার তাঁর চিন্তাধারা। সত্যজিৎ রায়ের উক্তিঃ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' একটি জটিল ছবি, এবং আমার নিজেব চোখে খুবই সুন্দর ছবি, (তখন পর্যন্ত) আমার একমাত্র রঙীন ছবি। এতে আছে আটটি নটি চরিত্র। ছুটির দিনের অপরাহ্ন বেলায় একটি পরিবার অবসবের মেজাজে ঘুরে সময় কাটাচ্ছে—তাদের জীবনের দুটি ঘণ্টা সময়। কিন্তু এরই মধ্যে অনেকগুলি ব্যাপার ঘটে যায। পরিবারে দুটি মেয়ে একজন বিবাহিতা—স্বামীর সঙ্গে তার প্রচণ্ড ঝগড়া চলে, তাবা বিবাহ-বিচ্ছেদেব কথা বলে, কিন্তু তাদের কন্যা-সন্তানটিকে মনে রেখে একসঙ্গে থাকে। ছোট মেয়েটির (অবিবাহিতা ও বিবাহযোগ্যা) পাত্র পাওয়া যায় এ-সময়ে এবং পাত্রটি অপরাহ্নেই মেয়েটির কাছে প্রস্তাব পেশ করতে চায়। পাত্রটি একজন ইঞ্জিনীয়ার অফিসার, উজ্জ্বল তার ভবিষ্যৎ কিন্তু তার মূল্যবোধগুলি মেয়েটির মূল্যবোধ থেকে আলাদা। পরিবারটির কর্তা হচ্ছে বাবা। বাবা আশা করে মেয়েটি ধনী পাত্রটির বিবাহ প্রস্তাবে রাজি হবে। কিন্তু এই প্রথম এই পরিবারে একটা ঘটনা ঘটে, বাবা যা চায় মেয়ে তা করে না। এই প্রথম বাবার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যাত হয়। এছাড়া আছে একটি কলকাতার তরুণ, সে একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত, কিন্তু মানসিকতায় তার মেয়েটির সঙ্গে মিল আছে, এবং ছবিতে ইঙ্গিত আছে যে, পরবর্তীকালে এই দু'জনের একটি ভবিষ্যৎ থাকতেও পারে। আর আছে পরিবারের একজন ছেলে, যে অত্যন্ত লঘু চরিত্রের, সে ছবির দু'ঘণ্টার মধ্যেই একটি মেয়েকে হারালো এবং সঙ্গে সঙ্গে জুটিয়ে ফেললো অন্য একজনকে।' (মূল ইংরেজী সাক্ষাৎকার থেকে,

বন্ধনীভুক্ত তথ্যগুলি বক্তব্যটি বোঝার জন্য যুক্ত করা হয়েছে।)

এই হচ্ছে সত্যজিৎ রায় কথিত কাঞ্চনজঙ্ঘার চরিত্রবৃন্দ। এছাড়া সত্যজিৎ রায় বলেননি, কিন্তু ছবিতে আছেন পরিবারের মা, যিনি মূল্যবোধের দিক থেকে স্বামীর থেকে আলাদা ; কিন্তু তাঁর নিজস্বতা, স্বামীর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও ব্যক্তিত্বের চাপে প্রায় বিনষ্ট, এবং তাই যেন সবসময় কিছুটা বিমর্ষ। আর আছেন পরিবারের মামা; ইনিই এদের মধ্যে সবচেয়ে মানবিক, এবং তাঁর বিপত্নীক নিঃসন্তান প্রৌঢ় জীবনের নেশা হচ্ছে পাখি দেখা ও পাখি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। কেন জানি না, এত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারে, এমনকি লঘু চরিত্রের ছোট ছেলেটির (অনিল চট্টোপাধ্যায় অভিনীত) উল্লেখ করলেও—এত গুরুত্বপূর্ণ দুটি চরিত্র, পরিবারের মা ও মামা সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় কেন নীরব ছিলেন। এ দুটি চরিত্র কত গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা আলোচনা পরে করব।

এককথায় ছবিটিতে চরিত্র-বৈচিত্রের পরিচয় আছে। এদের নিয়ে যেখানে ঘটনাগুলি ঘটছে সেটি হচ্ছে দার্জিলিং—যারা একদা খ্যাতি ছিলো, হয়তো আজো আছে, 'কুইন অব হিল স্টেশনস' নামে। তার চতুর্দিকে হিমালয়ের অফুরন্ত শোভা ; কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রায়শই থাকে কুয়াশা ঢাকা, কিন্তু অনিবার্যভাবে কুয়াশামুক্ত ছবির শেষ দৃশ্য—তখন উদঘাটিত তার মহীয়ান শাশ্বত সৌন্দর্য।

ছবির গঠন চেখভের নাটকের স্টাইলে। কিন্তু ছবিটি অত্যন্ত চলচ্চিত্রীয়-থিয়েটার ঘেঁষ' একদমই নয়। চরিত্রগুলি পরস্পরকে স্পর্শ করে যাচ্ছে, ছোট-ছোট আপাত-বিচ্ছিন্ন নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি হচ্ছে—যা ব্যাপকভাবে এক সামগ্রিকতায় বিধৃত এবং সেখানে প্রকৃতিও অংশগ্রহণ করছে। হঠাৎ রোদ্দুর ওঠা, হঠাৎ কুয়াশা ঢেকে যাওয়া, হঠাৎ একদল খচ্চরের পার হওয়া—তাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টা, কিম্বা একটা নেপালী ছেলে ফুল ছিঁড়ে খায়, কখনো পয়সা ভিক্ষে করে; কোথাও একটা পাখী ডেকে ওঠে—বিষণ্ণ তার ডাক। অথবা এই আশ্চর্য পরিবেশে হঠাৎ প্রৌঢ়া মা নিঃসঙ্গ পরবাসের একটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে ওঠেন অথবা পরিবারের বাচ্চা মেয়েটি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে ঘুরে আসে বৃত্তাকারে—যেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে তার বাবা মা'র ঝগড়া চলছে। এই সব কিছু 'ডিটেল' শুধু যে পরিবেশকে ঘনিষ্ঠ করে অনুভবযোগ্য করার জন্যই ব্যবহৃত তা নয়; এগুলি ব্যবহৃত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক metaphor-এর মতো, যেন চেখভের গল্পের বা নাটকের পাত্র পাত্রীদের আপাত-তুচ্ছ একটি আচরণ, একটি সুর ভাঁজা বা একটি প্রাকৃতিক শব্দ বা দৃশ্য বা কোনো বিশেষ সংলাপের বাক্য-সংগঠন—syntax-যা একসঙ্গে অনেককিছুর ইঙ্গিতে ঐশ্বর্যশালী করে রচনাকে, তেমনি ভাবেই।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। পরিবারের ছোট মেয়ে, ছবির প্রধান নারী-চরিত্র মনীষা ও তাকে বিবাহে ইচ্ছুক ইঞ্জিনীয়ার স্বচ্ছলবিত্ত প্রণব—এই দুজনে নিরিবিলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই পরিবেশে প্রণব ধীরে ধীরে তার বিবাহ-প্রস্তাব পেশ করার ভূমিকা সৃষ্টি করছে, নানান কথাচ্ছলে। মনীষা সেটা জানে, এবং সেজন্য ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত; কোথায় যেন প্রণবকে, তার মূল্যবোধকে সে মেনে নিতে পারছে না। সে চোখের সামনে দেখছে তার দিদির দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি; তার অন্যতম কারণ বিয়ের সময় পাত্র পছন্দের ব্যাপারে বাবার অর্থকেন্দ্রিক মূল্যবোধের ডিকটেটরসুলভ চাপ। বাবা একজন অটোক্র্যাট, পরিবারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ; ইংরেজ আমলে রায়বাহাদুর, এখন পাঁচ-পাঁচটা কোম্পানীর

ডিরেক্টর, একটির চেয়ারম্যান, এবং বৃটিশ ভক্তিতে ভরপুর। বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষে উচ্চবিত্ত সমাজের যে 'ভদ্রলোক'গুলির চিরন্তন দাস-মনোবৃত্তিকে গৌরবান্বিত করে গেছে—এ তাদের একজন। এমন বৃটিশ ভক্তরা স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে সমান ক্ষমতাশীল, এতে আমাদের শাসক শ্রেণীর চরিত্র স্পষ্ট হয়। বাবার মূল্যবোধ যে দিদির জীবনে সর্বনাশ এনেছে সেটা কিছুটা ছোট মেয়ে বোঝে, এবং বাবার প্রতি তার শ্রদ্ধা ততটা আছে কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু ভয় আছে। এবং এও জানে, প্রণবের সঙ্গে বিয়ের কথা সেদিনই পাকাপাকি হোক, এটাই বাবার ইচ্ছে—এবং সেজন্য বাবা অপেক্ষা করছে। এই অবস্থায় প্রণবের আসন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে মনীষা শঙ্কিত, সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সে আরো কিছু সময় চায়। এদিকে প্রণব চায় আজই, এই অপরাহ্নেই একটা সিদ্ধান্ত যেন নেওয়া হয়। এদিকে প্রণবের ভূমিকা-রচনাকারী প্রশ্নের উত্তরগুলো মনীষা খুব ভাসা-ভাসাভাবে দেয়। আলোচ্য সিকোয়েন্সে — প্রণব ও মনীষা চলেছে দার্জিলিঙের জলাপাহাড়ের পথ দিয়ে-নির্জন পথ।

ছবিতে (ও মূল চিত্রনাট্যে) আছে, নেপালী ভিখিরি ছেলেটি পাহাড়ের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, সে একটি রডোডেনড্রন ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে খাচ্ছে। সামনের রাস্তা দিয়ে প্রণব ও মনীষা হেঁটে যায়, প্রণব এখনো কথা বলছে। কথাগুলি সবই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বিবাহ-সমস্যাজাত, যার সঙ্গে ক্ষুধার্ত নেপালী ভিখিরি ছেলেটির ফুল ছিঁড়ে খাওয়ার বৈপরীত্য বেশ প্রতীকী (যদি অবশ্য দর্শক সেভাবে দেখেন, নয়তো সত্যজিৎ রায় হয়তো এও ইঙ্গিত দেন যে দুর্লভ ফুল আমাদের কাছে এতো দামী, তা এই স্থানীয় ছেলেদের কাছে অতি-দর্শনে নিতান্তই তুচ্ছ)। প্রণব যা বলছে তার মর্মার্থ — সে সম্ভবতঃ বুঝতে পেরেছে তার বিবাহ-প্রস্তাবে মনীষার পক্ষ থেকে আপত্তি আসতে পারে একটা জায়গায় ঃ মনীষার মূল্যবোধগুলি প্রণবের সঙ্গে মেলে না। এই সম্ভাব্য বাধাটি দূব করার জন্য ইঙ্গিতে প্রণব বলে, স্বামী-স্ত্রীর গুণাবলী দুরকম হলে কোনো ক্ষতি হয় না, সেটাই স্বাভাবিক। প্রণব বলে, 'একজন মেয়ের যদি একটি ছেলেকে বিয়ে করতে হয়, তাহলে তাকে অঙ্ক কষে ওজন করে দেখে নিতে হবে তার নিজের যেসব গুণ আছে ছেলেটির ঠিক সেইসব গুণ আছে কিনা — এটাই কি মনীষা চায়?' মনীষা বলে, 'তা নিশ্চই নয়, সেটা হলে খুবই absurd হবে।' প্রণব ঃ 'তাহলে?' এবার মনীষার উত্তব দেবার পালা এবং প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। মনীষা রাস্তার ধারে রেলিঙের পাশে এসে দাঁড়ালো, তার দৃষ্টি দূরের পাহাড়ের দিকে। নেপথ্যে (সাউণ্ডট্র্যাকে) ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। প্রণব উত্তর শুনতে চায়।

প্রণব ঃ 'তাহলে কী বলবে তুমি, মনীষা।'

মনীষাকে এবার একটা উত্তর দিতেই হবে। টেনসন সৃষ্টি হয়। এবং এখানেই সত্যজিৎ রায় একটি চমৎকার কাজ করলেন ঃ আমরা শুনলাম ঘণ্টার ধ্বনি এগিয়ে এলো, এবং মুহূর্তে পাশ দিয়ে একপাল খচ্চর পিঠে মাল নিয়ে হেঁটে চলে গেলো, তাদের গলায় ঘণ্টা বাঁধা, সেই শব্দে প্রণবের কথা ডুবে যায়। এটি অত্যন্ত কাব্যিক ও ব্যঞ্জনাধর্মী —

'দিনগুলি যেন পশুদল চলে
ঘণ্টা বাজায়ে গলে
কেবল ভিন্ন ভিন্ন
সাদাকালো যত চিহ্ন' —

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার অনুষঙ্গ মনে আনে। একপাল মালবাহী খচ্চরের চলমান ছবি কি মনীষার বিয়ের পর শেকল-পরা নারী-জীবনের অনুষঙ্গ সৃষ্টি করে? অতি স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নেই, কিন্তু অনতি স্পষ্ট ইঙ্গিতটি ভীষণভাবে শৈল্পিক। নাট্যমুহূর্ত ঘনীভূত হয়। প্রণবের ব্যাগ্রতা, মনীষার দ্বিধান্বিতা মুহূর্তে তার স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা এই খচ্চরদের গলার ঘণ্টার শব্দে ব্যাগ্রতর হয়ে ওঠে। খচ্চরগুলি চলে গেলে, প্রণব আবার বলে ওঠে, 'তাহলে তুমি কী বলতে চাও মনীষা?' মনীষা রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে দূরের পাহাড়ের দিকে। প্রণব আরো ব্যাগ্র ঃ 'মনীষা!'

মনীষা ঃ 'আমার মনে হয় ...।'

মনীষা চুপ করে যায়, এবং আমরা ভাবি এবার সে সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবে না, ফাঁদে পা দেবে; টেনসন বেড়ে ওঠে।

প্রণব (ব্যাগ্রভাবে) ঃ 'কি মনে হয়?'

মনীষা (শান্ত কণ্ঠে) ঃ ...'mist হবে।'

এবং ক্যামেরা 'প্যান' করে ও আমরা দেখি দূরের পাহাড়ে কুয়াশা জমতে শুরু করেছে, কুয়াশা এগিয়ে আসছে প্রণব-মনীষার দিকে। ... দৃশ্যটি এরপর ফেড্আউট হয়, সিকোয়েন্স শেষ হয়। (মূল চিত্রনাট্য থেকে উদ্ধৃত)। মনীষার এই শেষ উক্তি গভীরভাবে দ্ব্যর্থক, এবং দ্ব্যর্থকভাবেই কাব্যিক। প্রথমতঃ সূক্ষ্ম কৌশলে এবং সৌজন্যের সঙ্গে সে জানিয়ে দেয় প্রণবের প্রশ্নের বাঞ্ছিত উত্তর দিতে সে বাধ্য নয়, এবং এটাও উক্ত হয় যে, প্রণবের ইচ্ছার কাঞ্চনজঙ্ঘাটি কুয়াশাবৃত হয়ে যাবার সমূহ-সম্ভাবনা। 'মিস্ট হবে' এই কথাটা যেন ওদের সম্পর্কের ওপরও শীঘ্রই কুয়াশা নামবে — এ ইঙ্গিত দেয়।

প্রণবের অভিব্যক্তিতে বোঝা যায় যে ব্যাপারটি সে বুঝতে পেরেছে। এবং কিছুক্ষণ পরে ছবির দৃশ্যময়তার মধ্যে সত্যিকারের অর্থে কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ে, আমরা দেখতে পাই।

এখানে দুটি জিনিস লক্ষণীয়—এক, চলচ্চিত্র ভাষায় এখানে ল্যান্ডস্কেপের ব্যবহার 'অপু চিত্রত্রয়ী'র মতো কিন্তু নয়। দুই, ল্যান্ডস্কেপ ব্যবহারের এই রীতিও কিন্তু রীতিমতো চেখভীয়।

অপু-চিত্রত্রয়ীতে ল্যান্ডস্কেপগুলি যেন চরিত্রগুলির মধ্যে যা ঘটছে, অথবা যে মানবিক সত্যগুলি উদঘাটিত হচ্ছে তারই প্রতিধ্বনি রচনা করছে, কন্ট্রাপুন্টাল ধ্বনির মতো। এখানে ঠিক তা নয়; এখানে ল্যান্ডস্কেপগুলি যেন চলচ্চিত্রকারের নিজের 'ফুট নোট'। এগুলি দিয়ে পরিচালক একটি বক্তব্যকে নির্দিষ্ট করতে চান, একটা বিশেষ বক্তব্যকে চান 'আন্ডার লাইন্ড্' করতে। আলোচ্য সিকোয়েন্সে 'mist' এই শব্দটি তবু নায়িকার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে, অন্যত্র কোন চরিত্রই কিছু বলেনি, শুধু ক্যামেরা তুলে ধরেছে একটি ল্যান্ডস্কেপে এবং একটি বিশেষ 'আন্ডার-টোন' নিয়ে বক্তব্যটি পরিস্ফুটিত হয়েছে। এই ল্যান্ডস্কেপের সবচেয়ে বড় উপাদান হল কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য আর কুয়াশা, এবং বিকল্প হিসাবে রৌদ্র। এখানেই রং আশ্চর্যভাবে কার্যকরী হয়েছে।

আগেই বলেছি, এই ধরণের ল্যাণ্ডস্কেপের ব্যবহারে চেখভীয় রীতি অনুভব করা যায়।

এখানে একটি অনবদ্য উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। চেখভের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প The Fit-

এর নায়ক তরুণ ভ্যাসিলিয়েভ অত্যন্ত বেশি রকম স্পর্শকাতর ও সহানুভূতিশীল ; যার সর্বদা মনে হয় পৃথিবীতে যেখানে যা-কিছু অন্যায় ঘটছে তা দূরীকরণে তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব জড়িত। তার নার্ভ ছিলো দুর্বল; অন্যায় দৃশ্য দেখলে সে অসুস্থতা অনুভব করতো, গভীর বেদনা অনুভব করতো। একদিন সে বন্ধুদের সঙ্গে চললো এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের জন্য, গেলো বেশ্যাপাড়ায়। গল্পের প্রথমেই আছে, সে ভাবছে শীত এসে গেছে কিন্তু এখনো একদিনও তুষারপাত হয়নি। বৎসরের প্রথম তুষারপাত দেখতে সে ভীষণ ভালোবাসে। যেতে যেতে মনে মনে সে ছবি আঁকে, শীঘ্রই একদিন আবার সেইসব দুর্লভ দৃশ্য সে দেখবে—বৎসরের প্রথম তুষারপাত, যা তার কাছে, 'মানুষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ স্বচ্ছ, কোমল, নিষ্পাপ কুমারী সুলভ পবিত্র, তারই প্রতিচ্ছবি'। গল্পের প্রথমদিকেই এই আসন্ন তুষারপাতের ছবিটি ভ্যাসিলিয়েভ মনে-মনে ভাবছে। বেশ্যালয়ের মধ্যে সে দেখছে একের-পর-এক ঘরে মেয়েদেরকে পণ্যবস্তুসম ব্যবহার, পুরুষদের পশুসম আচরণ, মেয়েদের ভয়ঙ্কর পরাধীনতা, এবং মানুষের জঘন্যতম নোংরামি ও গ্লানি—যা শুধু তাদের আচরণেই নেই—আছে সর্বত্র। ঘরগুলির মধ্যে যে আসবাবপত্র আছে, দেওয়ালে যে ছবি আছে, যে ক্যালেণ্ডার টাঙানো প্রত্যেকটির মধ্যে এমন নির্দিষ্টভাবে সেই গ্লানি ও ক্লেদ বিকীর্ণ যে তার একচুল এদিক-ওদিক হওয়া সম্ভব নয়। এসব দেখে সেই আশ্চর্য মানব প্রেমিক, সৎ, ভীরু এবং দুর্বল ভ্যাসিলিয়েভ শেষকালে অসুস্থতা বোধ করতে লাগলো, তার বমি পেতে লাগলো এবং তাব 'ফিট' হল। জ্ঞানহারা। ...অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে, দুর্বল শরীরে সে যখন বেরিয়ে এলো এই নোংবা পল্লীর রাস্তায়, তখন মানুষেব ওপর বিশ্বাস সে প্রায় হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তখনই দেখলো তার বাঞ্ছিত, বৎসরের প্রথম অনির্বচনীয় তুষারপাত শুরু হচ্ছে-স্বচ্ছ, কোমল, নিষ্পাপ কুমারীসম পবিত্র তুষারকণাগুলি পড়ছে ঝরে ঝরে ('transparent, Tender, innocent, almost virginal...')। নায়ক ভ্যাসিলিয়েভ হতবাক বিস্মিত। সে ভাবছে, 'এমন তুষারপাত কি করে ঘটছে এমন একটা রাস্তাব ওপর।' (How can the snow fall in a street like this', wonders Vassiliyev)।

গল্পের এইটুকু শুধু আলোচ্য। এখানে পরোক্ষভাবে তুষারপাতকালীন ল্যাণ্ডস্কেপ ব্যবহৃত হচ্ছে ভ্যাসিলিয়েভের নিরুচ্চাব প্রশ্নের উত্তরের মতো। যখন সে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, ঠিক সেই সময়ই চেখভ নাটকীয়ভাবে ঘটালেন সেই 'বৎসরের প্রথম তুষারপাতটি'—নায়কের মনে যেটি মানুষের পবিত্রতার প্রতিচ্ছবি-বিশেষ। ওই গলির মধ্যে যে নোংরা জীবন ও মনুষ্যত্বের নিত্য অবমাননা ঘটছে, সেটা দুঃসহভাবে বাস্তব, কিন্তু সেটাই শেষকথা নয় এই দৃশ্যটি যেন এই কথা ঘোষণা করছে। এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে চেখভ যেন বলতে চাইছেন—মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেও এমন-কিছু আছে যা আজো পবিত্র, যা ক্রুদ্ধ অভিশাপের মতো এই মনুষ্যসৃষ্ট সামাজিক গ্লানি ও পাপের ওপর ঝরে পড়বে, এবং একদিন গ্লানির অবসান ঘটবে। একজন বিশিষ্ট চেখভ-বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, 'বৎসরের এই প্রথম তুষারপাতের 'ইমেজ'টি —যা মানুষের জীবনে সতেজ পবিত্র সৌন্দর্যের প্রতীক, যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয় (এবং গল্পের নায়ককেও) আমাদের জীবন কী অপরূপ হতে পারে! এতক্ষণ গল্পের মধ্যে মানবতার বিরুদ্ধে, ব্যক্তিমানুষের বিরুদ্ধে যে-পাপের ছবি দেখেছি ও তজ্জনিত দুর্ভেদ্য নৈরাশ্য অনুভব করেছি, তা-যেন

একনিমেষে দূরীভূত হয়। ঠিক সাংগীতিক থীমের 'ভেরিয়েশন' এর মতোই স্লো-মোটিফ ঠিক একবার এসেছে গল্পের প্রথমে এবং পুনর্বার শেষে।

(ভি. এরমিলভ লিখিত জীবনীগ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৯৯)।

পাঠক, বিশেষতঃ যিনি চলচ্চিত্র-ভাষার-ছাত্র, নিশ্চয় লক্ষ করেছেন চেখফের গল্পটিতে চলচ্চিত্রের ভাষার উপাদান কীভাবে উপস্থিত; এমনকি 'সাংগীতিক' মোটিভ-এর মতো করে প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতীকী ব্যবহার। এবং নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, এখানে ল্যান্ডস্কেপটি ব্যবহৃত হচ্ছে গল্পকারের নিজস্ব মন্তব্য হিসেবে এবং একই সঙ্গে নায়কের প্রশ্নের উত্তরের মতো। এর সঙ্গে 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়' ব্যবহৃত সত্যজিৎ রায়ের ল্যান্ডস্কেপের ব্যবহারের মিল খুবই সুস্পষ্ট।

এবার দেখা যাক 'কাঞ্চনজঙ্ঘার' ছবির মূলে সত্যজিৎ রায়ের কোনো কেন্দ্রীয় ভাবনা কাজ করেছিল কিনা। আমরা সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে যা পাই তা হচ্ছে বিলেতের Sight & Sound পত্রিকায় ব্রাড থমসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাঁর কিছু কথা। তিনি বলছেন ঃ

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' আমার কাছে একটি উদ্‌ঘাটন—মানুষগুলির নিজেদের খোসল থেকে বেরিয়ে আসা ('an exploration of people coming out of their shell)- এবং পরবর্তীকালের আরো বেশি রাজনৈতিক চিত্রত্রয়ীর পূর্বসূরী। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'অরণ্যের দিনরাত্রি' এই ছবি দুটির মধ্যে আমাকে যা আকর্ষণ করে তা হচ্ছে মানুষগুলিকে নিয়ে আসা তাদের দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিকতা থেকে এবং গুণ্ঠনের আড়ালে তাদের সত্তাকে আবিষ্কার করা। ('taking people out from their ordinary surroundings and discovering the self behind their facade what really goes in their mind) (Ray to C.B. Thompson, Sight & Sound, 1972/73, Winter, page 32)।

সত্যজিৎ রায়ের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। কেননা তত্ত্ব হিসেবে এটি সঠিক কিনা তা প্রশ্নের। মানুষের কাজকর্ম আচরণ তার পরিপার্শ্ব দ্বারা প্রভাবিত—এটা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত তত্ত্ব। আমরা এই প্রসঙ্গে আন্তন চেখভের বক্তব্য তুলে ধরতে পারি—সেটা খুব প্রাসঙ্গিক হবে; কেননা চেখভের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের মিল নিয়ে অনেক কিছু আলোচিত হয়। সাহিত্যে আমরা দেখেছি চরিত্র ও তার পারিপার্শ্ব— environment-একে অন্যোন্দ পরিপূরক। একে অন্যকে প্রভাবিত করে চলেছে। সাহিত্যে চরিত্রগুলিকে কীভাবে বাস্তবসম্মত করা যায় তা নিয়ে চেখভ গর্কীকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, 'গল্পের চরিত্রগুলি যেন কখনো বেশি মাত্রায় প্রকট বা চোখ ধাঁধানো না হয় (not much conspicuous)... যেন তাদের মধ্য দিয়ে অনুভব করা যায় যে জনসাধারণ থেকে তারা এসেছে সেই জনসাধারণকে (masses), তাদের চারিদিকের পারিপার্শ্বকে সমস্ত আবহাওয়াটা, সব পরিপ্রেক্ষিত —এক কথায় পারিপার্শ্বের সব কিছু।' গর্কী একথা জানার পর চেখভের গল্পের অসামান্যতার উল্লেখ করে একমত হয়ে লিখেছেন, 'চেখভের গল্পের চরিত্রগুলির আচরণ, কাজ, চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি—এ সমস্ত কিছুই এসেছে বাস্তবতা থেকে, মানে চারপাশের জীবন থেকে —এককথায় পারিপার্শ্ব (environment) থেকে, যা চরিত্রগুলিকে পরিবর্তিত করছে, প্রভাবিত করছে এবং শিক্ষিত করছে।' তাই চেখভের

একটি বিষণ্ন গল্পের নায়কের জীবনে কত বিষাদ; যখন পাঠক গল্প পড়ে তার জন্য সমব্যাথিত হয়, ইচ্ছা হয় নায়ক যেন তার বিষাদ বা সেই কদর্য জীবন থেকে মুক্ত হতে পারে—তখনই অনুভূত হয় এর মূল কারণ, পরিপার্শ্বের অসহনীয় অবস্থা, তার কদর্যতা—কেননা এই দুঃখী মানুষ এই পরিপার্শ্বের বাস্তবতার দ্বারা প্রভাবিত। তাই যদি এই মানুষকে সুখী হতে হয়—তবে তার পরিপার্শ্বটাকে পাল্টাতে হবে। (চেখভসম্পর্কিত এসব কথাগুলি তাঁর জীবনীগ্রন্থ A. P. Chekov— লেখক V. Vermilov, পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৭-এ পাওয়া যাবে)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চেখভের বক্তব্য, সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে তার পারিপার্শ্ব যেন ধরা পড়ে, আর ordinary surroundings থেকে তাদের বের করে এনে discovering their real self behind their facade. যা সত্যজিৎ রায় বলেছেন—সে কথা চেখভ বলছেন না। যুক্তির দিক থেকে ভাবলে (ক) যদি আমরা স্বীকার করি যে মানুষ তার পরিপার্শ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবিত তাহলে (খ) তার সত্তা কোথায় প্রকাশিত হবে? (১) সেই সাধারণ পরিপার্শ্বের মধ্য দিয়ে যা তার জীবনে প্রায় সর্বক্ষণ ঘিরে থাকে, অথবা (২) সেই পরিপার্শ্ব থেকে সরে এসে ক্ষণকালিক ভিন্নতব পবিপার্শ্বে যেখানে সে কিছুটা ক্ষণকালের মত খোলামেলা বা কিছুটা relaxed সেখানে?

এখানে লক্ষ্য করার, চেখভ ও গর্কী শুধুমাত্র Surroundings বা environment কথাটা বলেছেন — ordinary বা দৈনন্দিন ধরণেব কোন বিশেষণ যুক্ত করেনি। আমাদেরও প্রশ্ন ঃ দৈনন্দিন পরিপার্শ্বে মানুষ একরকম অনুভব করে ; আচরণ কবে সেই পরিপার্শ্ব থেকে বেবিয়ে সুউচ্চ হিমালয়ে বা সমুদ্রতীরে extraordinary surroundings-এ তার অনুভব অন্য মাত্রা নীয়, আচবণ ভিন্ন রকম হয়— এটা সত্য—কিন্তু প্রশ্ন এই পারিপার্শ্ব পরিবর্তনজনিত কোনো মানুষেব অন্যরকম অনুভবটাই কি তার আসল সত্তার প্রকাশ সেটাই কি তার "self behind the facade"?

আমার মনে হয় চেখভ যা বলেছেন তা তো সর্বাংশে ঠিক বটেই, এমনকি সত্যজিৎ রায় যা বলেছেন তাও বেঠিক নয় ; শুধু সত্যজিৎ রাযের ক্ষেত্রে এই কথাটি তেমনভাবে বলা হয়নি যে আবরণমুক্ত (Facade- এর বাংলা কি হবে মুখোস? ছদ্মরূপ? বা আবরণ, যা ভিতরের চেহারা ঢেকে রাখে? আমি 'আববণ' ই লিখলাম) আত্মার বা আসল সত্তার উদঘাটন বা self behind the facade এর উদ্ঘাটন ক্ষণিক কেননা তা ভিন্ন পরিপার্শ্বজাত, ক্ষণকালীন সত্য ; জীবনে আমরা কতদিনেব জন্যে এমনি দার্জিলিং, কাশ্মীর, পুরী, উদয়পুর বা সিমলা যাই ও থাকি? সুতবাং সেই 'অনুভব' কে তার আসল বাস্তবতা — যে পবিপার্শ্বিক তাকে প্রতিদিন ঘিরে রেখেছে সেই বাস্তবতার নিরিখেও শেষ পর্যন্ত বিচার করতে হবে। আমার বিনীত ধারণা সত্যজিৎ রায় যেখানে সামান্য ভুল করেছেন তা হ'ল —দৈনন্দন পরিপার্শ্ব ও দৈনন্দিনতা থেকে বেরিয়ে আসা যে পরিপার্শ্ব পাই — দুটোই আমাদের পরিপার্শ্ব এবং দুটোর মধ্যেই আমাদের সত্তাব উদ্ঘাটন ঘটে এবং নতুন পরিপার্শ্বে নূতন যে অনুভব তারও ভ্রূণ পুরাতন যে পরিপার্শ্ব তার মধ্যে ছিল এটা ভুললে চলবে না — এবং নতূন 'অনুভব'কে নিয়ে মূল পুরাতন পারিপার্শ্বে যে জীবন তার মধ্যে আত্মস্থ না করালে — সেই 'অনুভব'ও ওই মদ্যপানে রত কিছু মানুষেব কিছু 'অনুভবে'র মতই হবে, এটাও স্মর্তব্য। অর্থাৎ শেষ বিশ্লেষণে ঘুবে-ফিরে আমাদেব

ordinary surroundings- এই আমাদের সত্তাকে চিনতে হবে। 'কাঞ্চনজঙঘা'র অশোক হিমালয়ের বিপুল মহিমার সামনে বিশাল সব গাছগুলোর মধ্যে, রৌদ্র-ছায়া-কুয়াশার আশ্চর্য পটভূমিতে একটা অনুভব' সত্যিই পেয়েছিল, নিজেকে নিজের কাছে একটা 'giant লাগছিল' মস্ত বড় একটা কিছু, এবং গর্বিত আত্মম্ভরী রায়বাহাদুরের মূল্যবোধকে তুচ্ছ করে তাঁর দেওয়া চাকরিটা যে নিল না— তার একটা সত্য 'অনুভব' হয়েছিল এবং সেটা 'অরণ্যের দিনরাত্রির' হরির শহুরে মেয়ের কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে তার নিরুদ্ধ বিক্ষোভের জ্বালা মেটানোর মত নয়, তবুও কিছুক্ষণ পরে আশোকের উক্তি 'এখনই একটু আফশোষ হচ্ছে', (হিমালয়ে থাকতে থাকতেই) — এটাই স্বাভাবিক — কলকাতায় গিয়ে সে কী করবে আমরা জানি না। রায়বাহাদুবের মেয়েব সে বন্ধুত্ব পেয়েছে — সেও আশা করি নূতন অনুভবে পাল্টে যেতে পারবে। অনেক মানুষের তা সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ — তাদের অনেক ভ্রমণবৃত্তান্ত ও অভিজ্ঞতা শুনেছি ও পড়েছি—একটা নূতন জায়গায় ঘুরে আসার পরই একটি মানুষের সত্য উপলব্ধি বা অনুভব এমন হয়েছে যে সে নিজেকে চিনতে পেরেছে এরকম খুব কমই শুনেছি। সত্যজিৎ বায় বলছেন —চরিত্রগুলিকে তার সাধারণ পরিবেশ থেকে বের করে এনে তাদের খোলসের আড়ালের আত্মাটাকে আবিষ্কার করার কথা—খোলসের আড়ালের আত্মা মানে 'সত্য অত্মা' বা তার 'আসল রূপ'; এই 'আসল'টা কি, কোনটা, সেইটাইতো বিতর্কের।

বালক বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ দৈনন্দিনতার বাইরে আসমানা প্রাকৃতিক পরিবেশে অনেক 'অনুভব' করেছেন — সে প্রসঙ্গ তাঁর গানে, কবিতায়, গল্পে, চিঠিপত্রে অজস্র আছে। কিন্তু জীবনের যে 'অনুভব'টি তাঁব সারা জীবনকে পাল্টে দিযেছিল — যা তাঁকে লিখিয়েছিল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'—যার কথা তাঁর 'জীবন স্মৃতি'র পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে—তাতো হিমালয়ের ওপর কোথাও ঘটেনি—তা তিনি পেয়েছেন এই কলকাতার সদর স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে, যেখানে তিনি থাকতেন তখন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নূতন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে। তাঁর 'soul behind the facade' তাঁর কাছে অমনভাবে যে মূর্ত হল—যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে তাঁব সারা জীবনের মধ্যে—সে তো হল সাধারণ দৈনন্দিন পরিবেশে, সেই অতি পরিচিত কলকাতার কেন্দ্রস্থলে আবস্থিত অতি পরিচিত সদর স্ট্রীটের সূর্যোদয় দেখার মুহূর্তে; এতো দার্জ্জিলিং-এর টাইগার হিলের দূর্লভ সূর্যোদয় নয়, আমাদের দৈনন্দিন সূর্যোদয়ের মধ্যেই একদা কবি তাঁর সুপ্ত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ দেখলেন। যদি কেউ বলেন রবীন্দ্রনাথের এ অনুভব একটি উজ্জ্বল ব্যাতিক্রম, তাও ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ জাগতিক অর্থেই বড় কবি— তাঁর 'অনুভব'গুলি আমরা আমাদের জীবনেও পাই — (কিন্তু তেমনভাবে ততখানি হয়ত অনুভব করার ক্ষমতা নেই—প্রকাশ তো করতে পারি না তেমন ভাবে বটেই) তাই রবীন্দ্রনাথকে আমরা এত ভালবাসি, আপন ভাবি। যদি তাঁর অনুভব সাধারণমানুষের অনুভব ছাড়া, খাপছাড়া, (যেমন অনেক ধর্মাত্মার জীবনের উপলব্ধির কথা শুনেছি), সে করম হত তাহলে আমাদের হৃদয়ের এতখানি জুড়ে রবীনদ্রনাথ থাকতেন না। তাছাড়া আমরাও ব্যক্তিগত জীবনে পেয়েছি অনেক দুর্লভ অনুভব, যেমন দৈনন্দিনতার বাইরে গিয়েও পেয়েছি, তেমনি দৈনন্দিন পারিপার্শ্বের মধ্যে থেকেও জীবনে এমন অনেক কিছু পেয়েছি যাতে নিজেকে চেনা গেছে।

আসল কথাটা হচ্ছে— দুটো পরিপার্শ্বই আমাদের ওপর প্রভাব ফেলে ও আমাদের নিজেদের চেনার—(১) বৃহত্তর ও অতিমাত্রায় বাস্তব দৈনন্দিন বা সাধারণ পরিপার্শ্ব (যা শতকরা ৯৯ ভাগ) এবং (২) এই সাধারণ পরিপার্শ্বের বাইরে হিমালয়ের মত কোনো জায়গায় বা অরণ্যের মত কোন স্থানে পাওয়া পরিপার্শ্ব। এ দুইয়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই—এই দুই একে অন্যের পরিপূরক। প্রথমটা আমাদের প্রায় চিরকালের পরিবেশ বা পরিপার্শ্ব, অন্যটা ক্ষণকালের। ক্ষণকালের অনুভব নিয়ে কাব্য হয়, গল্প রচনা হয়, নাটক হয়, চলচ্চিত্র হয়—খুব চমৎকারভাবেই হয় ; কিন্তু তাতে করে তাদের 'অবরণমুক্ত আসল আত্মার' আবিষ্কার হয়-বলা একটু বেশি দাবী করা নয় কি? তাহলে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র রায়বাহাদুরের (ইন্দ্রনাথ রায়ের চরিত্র) এই হিমালয়ের সান্নিধ্যে এসে কি আসল আত্মার কোনো উদ্‌ঘাটন হল যা কলকাতার সাধারণ পরিবেশে হয় না? তার বড় মেয়ে অনিমা ও তার স্বামী শংকর যারা বিবাহ বিচ্ছেদের পথে—তাদের মধ্যে শেষমেষ যে একটা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ফয়সালা হল—সে তো হিমালয়ের আশ্চর্য পরিবেশের আশীর্বাদ নয়, তা হচ্ছে অতি নির্মম বাস্তবতা বোধ, স্বামী ও স্ত্রীর। (১) তারা দুজনেই ঝক্কি নিতে রাজি নয়, (২) তারা দুজনেই জানে সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে, (৩) পুরুষটির আর্থিক সংকটের ভয়, কেননা ভবিষ্যতে বিপদের দিনে এমন সম্পন্ন শ্বশুরমহাশয়ের সাহায্য পাবে না, (৪) মেয়েটি জানে যদি তার প্রেমিকের কথা ফাঁস হয়, যতই সাচ্চা প্রেম হোক— 'ঈশ্বর সদৃশ' পিতার কোপদৃষ্টি পড়বে তার ওপর—এবং সর্বোপরি, যেটা গভীরতম কারণ তা হচ্ছে (৫) তাদের শিশুসন্তানের ভবিষ্যৎ। সত্যজিৎ রায় অনবদ্যভাবে দেখান সেই শিশু তাদের ঘিরে আছে, আক্ষরিক অর্থে সে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের চারিদিকে —সেই সব চেয়ে বড়—যাকে বলা যায় 'সিমেন্টিং ফ্যাক্টর'। এ সবই তো কলকাতার মধ্যেই বা ধারে কাছে কোন ফাঁকা নির্জন জায়গায় বসে ঠিক করা যেতে পারত— তার জন্য দার্জিলিং-এর মতো পরিবেশ কি খুব প্রয়োজন ছিল, তাকে নূতন কি আত্মপোলব্ধি হল তাদের? দুটি মাত্র চরিত্র, যারা বিশাল হিমালয়ের সান্নিধ্যে এসে নিজের লুকানো সত্তা বা আত্মাকে চিনতে পারল — সে অশোক এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ শ্রীমতী লাবণ্য রায়, রায়বাহাদুরের প্রায় ত্রিশ বছরের বিবাহিত স্ত্রী। অশোকের কথা আগেই কিছু বলা হয়েছে। শ্রীমতী লাবণ্য রায়ের (করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অতি সুঅভিনীত চরিত্র) সম্পর্কে পরে কিছু আলোচনা করবো। এখানে খুব গুরত্বপূর্ণ একটি ব্যঞ্জনা রয়ে গেছে।

এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে দৈনন্দিন পরিপার্শ্বই আমাদের মূলগত বাস্তব পরিপার্শ্ব—সেটাই প্রধানত আমাদের প্রভাবিত করছে ; আমরাও সেই পরিপার্শ্বেরই অঙ্গ ; আমরাও সেই পরিপার্শ্বকে প্রভাবিত করছি—কলকাতার ঘর বাড়ী রাস্তা ট্রাম বাস ভিড় ক্লান্তি ছিটেফোঁটা প্রকৃতি—আকাশে ফ্যাকাশে চাঁদ—ধূসর নক্ষত্র—এদের মতোই-আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা, সব নিয়ে আমার পরিপার্শ্ব এটা সত্য। কিন্তু যেহেতু দৈনন্দিনতার মধ্যে ক্লান্তি ও একঘেয়েমি আছে মাঝে মাঝে এই পরিপার্শ্ব থেকে নূতন পরিপার্শ্বে আমাদের প্রত্যেকের তার সুযোগ, সম্বল ও ক্ষমতা অনুযায়ী যাওয়া উচিত—সহজ হতে, নিজেকে খোলামেলা পরিবেশে, দায়িত্বের শেকলছাড়া হয়ে নূতন অনুভব নিতে—তাতে আমার মুখোস বা আবরণের আড়ালে 'আসল সত্তা' উন্মোচিত

হবে কিনা জানি না—, কখনো হতেও পারে— কিন্তু নূতন সতেজতা নিয়ে পৃথিবীটা যে কত সুন্দর সে বোধটুকু নিয়ে পুরানো সংগ্রামের পরিপার্শ্বে পুনশ্চ লড়াইয়ে নামবার তাজা 'ওজোন' পাওয়া যাবে। সত্যজিৎ রায়ের সর্বশেষ ছবি 'আগন্তুক' -এর নায়ক মনোমোহন মিত্র (উৎপল দত্ত অভিনীত) সেই আশ্চর্য চরিত্র, (যাঁর মাধ্যমে সত্যজিৎ রায়ের অনেক আত্মকথন আছে) বিদায়ের আগে নূতন প্রজন্মের মানুষ, তাঁর একমাত্র নাতিকে একটি মূল্যবান উপদেশ দিয়ে যান, 'কুপমন্ডুক হয়ো না।' 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' দেখতে দেখতে সেই কথাটা মনে আসে। সেই সঙ্গে মনে আসে তাঁর প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী'র সেই দজ্জাল সেজ বউ-এর অনুতাপ-ভরা উপলব্ধি, 'এক জায়গায় থেকে থেকে মন বড় ছোট হয়ে যায়— এতো নিজেকে দিয়েই দেখলাম...।' সত্যজিৎ রায়ের কাছে দৈনন্দিনতার বাইরে কিছুদিন কাটিয়ে আসার গুরুত্ব ছিল অনেক—তাই বারে বারে এই থীমটি ছবিতে ছবিতে ঘুরে ফিরে আসে — তাঁর নিজের গল্পের ওপর প্রথম ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় তা গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে—একটু বেশি গুরুত্ব দিয়েই।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মূলগত বক্তব্য আরো গভীর-অনেক গভীর।

সত্যজিৎ রায় ব্রাড থমসনের সঙ্গে ওই সাক্ষাৎকারে যে দ্বিতীয় কথাটা বলেছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ—'এবং এ ছবি পরবর্তীকালের আরো বেশি রাজনৈতিক চিত্রত্রয়ীর পূর্বসুরী।' মনে রাখা দরকার এই সাক্ষাৎকার দেওয়া হয়েছিল ১৯৭২/৭৩ সালে যখন ইতিমধ্যেই 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (১৯৬৯) 'প্রতিদ্বন্দ্বী'(১৯৭০) ও 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১) রচিত হয়েছে। 'অশনি সংকেত' ১৯৭৩ সালে এবং 'জন অরণ্য' ১৯৭৬ সালে রচিত। সুতরাং আমার ধারণা সত্যজিৎ রায় যে 'রাজনৈতিক চিত্রত্রয়ী' বলেছেন তা 'অরণ্যের-দিনরাত্রি', 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ও 'সীমাবদ্ধ' নিয়ে। আমার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সেই ভাবেই সত্যজিৎ চলচ্চিত্রকে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায় 'অরণ্যের দিনরাত্রি'কে আর রাজনৈতিক ছবি বলেননি, যতদুর আমার অনুসন্ধান। আমার ধারণা সত্যজিৎ ছবির বিদগ্ধ দর্শকের কাছে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' 'সীমাবদ্ধ' ও 'জনঅরণ্য'—এই তিনটি ছবি বক্তব্যগত দিক থেকে একই রাজনৈতিক চেতনার ফসল বলে মনে হয়েছে। অবশ্য এক হিসেবে দেখলে পৃথিবীর প্রায় সব চলচ্চিত্রই রাজনৈতিক ছবি, খুঁজলে একটা রাজনৈতিক মাত্রা প্রায় সব ছবিতে পাওয়া যাবে—সুস্থ অথবা অসুস্থ রাজনীতি-যাই হোক। অবশ্য ব্যাপারটা বিতর্কিত। কিন্তু যেমন 'প্রতিদ্বন্দ্বী' 'সীমাবদ্ধ' ও 'জনঅরণ্য' ছবিতে স্পষ্ট রাজনৈতিক মাত্রা পাওয়া যায়, সেবকম কিছু 'অরণ্যের-দিনরাত্রি'তে পাওয়া সম্ভব নয় বলে আমার বিনীত ধারণা। তবে সত্যজিৎ রায়ের কথাটা এইভাবে ঠিক যে, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' তাঁর পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ছবির পূর্বসুরী। এবং 'সাধারণ পরিবেশের বাইরে মানুষগুলোকে নিয়ে এসে তাদের খোলসের আবরণমুক্ত আসল সত্তাকে উদ্‌ঘাটন'-এসব তত্ত্বের থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছবিতে আছে— যার মধ্যে সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা তো আছেই, এমন কি রাজনৈতিক ছবির পূর্বাভাষও পাওয়া যায়। আজ যখন আমাদের একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করতে আর বেশি বছর দেরী নেই, সে সময়ে আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে রচিত এই ছবি দেখতে কেন আমাদের এত ভালো লাগে? (যে ছবিকে সেদিন বুদ্ধিজীবীরাও তেমন সমাদর করেন নি, একমাত্র ঋত্বিক ঘটকের মুগ্ধ ও প্রোজ্জ্বল প্রশংশামুখর কণ্ঠস্বরই আমরা শুনেছি)। নানান ভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবির

ব্যাখ্যা হয়— এ ছবিরও হবে। আমার কাছে কেন ছবিটি আজকের দিনে দেখার পক্ষে আরো উপযোগী ও কেন আজও দেখতে আরো ভালো লাগে তার ব্যাখ্যা জানাচ্ছি।

সত্যজিৎ রায়ের এসব ছবিগুলি ও তার বক্তব্য নিয়ে ভাবলে তার মধ্যে দুটো সুস্পষ্ট ধারা বেশ চোখে পড়ে — (১) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যাদের আছে সেই ধনিক সমাজের প্রতি তাঁর বিদ্রূপ, বিরক্তি ও ঘৃণা। (২) ভারতীয় সমাজে নারীর বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদী; যদিও এদুটিই তার ছবিতে ছিল, কখনো স্বল্পচ্চারিত, চলচিত্রের নীবব ভাষায়, গভীরতর ব্যঞ্জনায়, কখনো বেশ সোচ্চার। বড়লোকিয়ানাকে যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন বিদ্রূপ করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য জানতেন, 'উপকরণের বাহুল্য' মানুষকে ছোট করে দেয় — অনেক কৃত্রিম ও পচা মূল্যবোধ জমে ওঠে—যেগুলি আমাদের সামগ্রিক উন্নতির পক্ষে প্রবল বাধা। এই ছবিতে রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ রায় (ছবি বিশ্বাস কর্তৃক সুঅভিনীত) এমন একটি চরিত্র। দেশের স্বাধীনতা তার কাম্য ছিল না, বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাঁবা মাবা গেছেন বা জেলে পচেছেন অনেকেই তার বন্ধু ছিলেন—তাঁদের সম্পর্কে তাব অভিজ্ঞতা - সব মূর্খ। ইংরেজ চলে গেলে দেশে যে নূতন স্বদেশী শাসকরা বসল, সেও বেশ তাদের সঙ্গে জমে গেল—হলো পাঁচ-পাঁচটা কোম্পানীর চেয়ার ম্যান বা ডিরেক্টার-নিজের অবস্থার এই ধরণের উন্নতিতে সে গর্বিত। সত্যজিৎ রায় এটাও ইঙ্গিত দিলেন যে, ক্ষমতার হাতবদল কাদেব মধ্যে হল। তাই ছবিটিব মধ্যে একটি পরিষ্কার রাজনৈতিক মাত্রা আছে৷ যারা দুশ বছর দেশ শাসন ও শোষণ করল ও যারা তাদের ক্ষমতা হাত-বদল করল-তাবা উভয়ে শ্রেণীগতভাবে একে অন্যের আত্মীয়—এবং নূতন শাসক দলের সুবিধাভোগীদেব মধ্যে রাযবাহাদুর ইন্দ্রনাথ রায়ের মত অনেক মানুষ আছে এ ইঙ্গিত ছবিতে স্পষ্ট। ছবিটার মধ্যেও এই রায়ই যেন পচা ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের এক ধরণের প্রতীক, যেন Villain of the piece- এবং ছবিটা যেন তার অর্থকেন্দ্রিক আত্মকেন্দ্রিক মূল্যবোধেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

প্রথম প্রতিবাদ করে গরীব মধ্যবিত্ত অশোক (অরুণ মুখোপাধ্যায় অভিনীত)। তার একটা চাকরির ভীষণ প্রয়োজন এবং বায়বাহাদুর তাকে একটা চাকরির প্রস্তাবও দেয়। কিন্তু তার আগে 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়া উচিত হয়নি' থেকে শুরু করে এমন সব কথা ইন্দ্রনাথ বলে যে মানুষটা যে কীরকম 'অটোক্র্যাট'-পচা মূল্যবোধের ক্ষমতালোভী দাম্ভিক, তার স্বরূপ আশোকের কাছে উদ্‌ঘাটিত হযে যায়। অন্য দিকে বিশাল হিমালয়, মেঘমুক্ত কাঞ্চনজঙ্ঘার অমেয় সৌন্দর্য, দীর্ঘ পাইন গাছ— সমস্ত পরিবেশ অশোকের মনে এমন একটা শুদ্ধ মানবিকতা সৃষ্টি করে যে আত্মমর্যাদার সঙ্গে সে এই তথাকথিত অতিবড় মানুষটার ক্ষুদ্রতার কাছে মাথা না নুইয়ে বলে, তার 'চাকবি চাই না'। রায়বাহাদুরের দম্ভে প্রথম আঘাত। লক্ষণীয়, পচা মূল্যবোধের প্রতীক চরিত্রের বিপক্ষে যেন হিমালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে ল্যাণ্ডস্কেপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন সত্যজিৎ রায় অনেকটা চেখভীয় ধরনে অনবদ্যভাবে। পরবর্তী আঘাত এল বিচিত্রভাবে।

এইখানে সত্যজিৎ রায়ের দ্বিতীয় সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে এবং এখানেও প্রতিবাদরূপে।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ রায়বাহাদুর, যার মতামতই এ সংসারে একমাত্র পালনযোগ্য আইন— তাব নিজের কোনো সুস্থ জীবনবোধ নেই, শিল্পবোধ তো দূরের ব্যাপার। শ্যালক জগদীশ পক্ষিপ্রেমিক, সে দূরবীনে পাখিদের দেখে বেড়ায়। ইন্দ্রনাথ শ্যালককে প্রশ্ন করে যে পাখি

সে দেখছে তার 'রোস্ট' হয় কিনা— 'হয় না' শুনে তার কী বিরক্তি—দরকার নেই ও পাখীর। এমন এক স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘ তিরিশ বছর অতিবাহিত করে লাবণ্য হারিয়ে ফেলেছে ফুর্তি, দীর্ঘকাল গাওয়া হয়নি গান। বড় মেয়ে বিয়ে করেছে ইন্দ্রনাথের মূল্যবোধের চাপে পড়ে—তার প্রেমকে চাপা দিয়ে। তার কুফল ফলতে শুরু হয় — এখন সে বিবাহ সংকটের সম্মুখীন। লাবণ্য সব দেখছে, প্রতিবাদ করতে পারছে না। যে সময়কার ঘটনা ছবিতে দেখান হচ্ছে তখন পরিবারের দ্বিতীয়সন্তান, ছোট মেয়ের সম্বন্ধ চলছে, এবং যদিও ছোট মেয়ের অন্য কোন প্রেমের ব্যাপার নেই, কিন্তু বাবার পছন্দ করা পাত্রটি বড় অর্থকেন্দ্রিক এবং বাবারই মূল্যবোধের মানুষ—উচ্চশ্রেণীর পদমর্যাদা, বাড়ী, গাড়ী, বড় চাকরি ছাড়া তার মুখে অন্য কথা নেই। ছোট মেয়েটি কলকাতার কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী, তার মূল্যবোধ সুস্থ,সে বাবার মূল্যবোধের বিরোধী। দিদির বিয়ের সর্বনাশা চেহারা সে দেখছে। সেই বিকেলেই সেই পাত্রর সঙ্গে জলপাহাড়েব রাস্তায় ভ্রমণ করতে কবতে তাকে বাগদান করতেই হবে. বাবার ইচ্ছা অর্থাৎ নির্দেশ। এই অবস্থায় তার মা শ্রীমতী লাবণ্য রায়কে ম্যালে একটি নির্জন বেঞ্চে বসিয়ে বাবা ইন্দ্রনাথ একটু ঘুরে আসতে গেছে। নির্জন অবকাশ। সামনে মেঘ কুয়াশা—তাব মাঝে মাঝে কদাচিৎ একটু উঁকি মারা কাঞ্চনজঙ্ঘা। হিমালয়। অনেককাল বাদে সেই নির্জনে লাবণ্যর যেন কিছু 'অনুভব' হল, যেন বিয়ের আগের নিজেব সেই নারীসত্তাকে অনুভব করল, — হঠাৎ গান এসে গেল মনে— আর গেয়ে উঠল রবীন্দ্র সংগীত— বড় আশ্চর্য সে গান—

এ পরবাসে রবে কে হায়
কে রবে এ সংশযে সন্তাপে শোকে
হেথা কে রাখিবে দুঃখভয় সংকটে
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে হায় রে।।

সত্যজিৎ রায় কিছু ব্যাঞ্জনা রেখেছেন, তার থেকে অনুমান করতে পারি লাবণ্যর জীবন।

লাবন্য, এক নাবী, যে প্রায় তিরিশ বছর আগে এসেছিল ইন্দ্রনাথের সংসারে, সদ্য যুবতী, তার গান নিয়ে তাব সুপ্ত নারীসত্তা নিয়ে। কিন্তু এ কোন রাজত্বে সে এল — এখানে চলছে পুরুষের একনায়কতন্ত্র— তাকে মেনে চলাই ধর্ম। লাবণ্যও তা ক্রমে মানিয়ে নিল, ধীবে ধীরে সে সন্তানের জন্ম দিল, তাদের পালন করল, এই সংসারকে তার নিজের সংসার ভাবল—দেখতে দেখতে একদিন সে দিদিমা হয়ে গেল— প্রৌঢ়ত্ব নেমে এল। কিন্তু এই তিরিশ বছরে সে ভুলে গেল, সবার আসে সে এক নারী, সে যে একদিন গান গাইতে পারত, 'সে না হলে মিথ্যে হ'ত সন্ধ্যাতারা ওঠা। মিথ্যে হত কাননে ফুল ফোটা'— সব ভুলে গেল। আজ তিরিশ বছর পরে. হিমালয়ের উদার বিশাল গাম্ভীর্য ও শান্তির সামনে বসে সংসারের এক সংকটকালে তাব এই প্রথম মনে হল সে নিঃশব্দে, নীরবে প্রবঞ্চিতা হয়েছে ; যে সংসারকে নিজের ভেবেছিল. সেই সংসারই আজ মনে হচ্ছে তার কাছে চিরকাল ছিল 'প্রবাস' বা 'পববাস'। এই প্রথম তার নারীসত্তা বুঝল তার আসল অবস্থাটা. — তার কেউ নেই ; কে থাকবে আজ তার এই সংশযে সন্তাপে, এই দুঃখে সংকটে কে রক্ষা করবে তাকে —'তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে হায়রে'।

এযে কত বেদনার আত্মোপলব্ধি!

এরকম ঘটনা পরিবারে পরিবারে অজস্র। চারুলতার অবস্থাও এই রকমই। এই রকমই নারীর নিঃশব্দ নীরব বঞ্চনা, সে নিজেও বুঝতে পারে না হয়ত সারা জীবন ;আর অবলা নিরুত্তরা অসহায়া নারীর সর্বংসহা রূপ— সব মেনে নিজের স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিসত্তা, নারীসত্তাকে এমন করে নিঃশেষ করে ওেয়ার চেহারা কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিতে একটি মাত্র সিচুয়েশনে, শুধু একটি উপযুক্ত রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহারের মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় অসামান্যভাবে তুলে ধরলেন। এই গান গাওয়ার সময় ক্যামেরার ব্যবহার এমন যেন মনে হয়, লাবণ্যর অন্তর স্পর্শ করছে ক্যামেরা—ধীরে ক্যামেরার সেই নিঃশব্দ এগিয়ে যাওয়া, দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার সুবর্ণময় আভাস, গানের গভীর বিষাদ, সেই বিষাদের মধ্যে লাবণ্যের উপলব্ধি। গান যখন শেষ হল, পর্দার ফ্রেমে লাবণ্যের কাঁধ পর্যন্ত পাশ ফেরা মূর্তি-ফ্রেমের মধ্যে একটি স্নেহময় হাত স্পর্শ করল লাবণ্যর কাঁধ—লাবণ্য ফিরে তাকিয়ে বলল, 'দাদা!' তখন আমরা দেখলাম সেই পক্ষিপ্রেমিক জগদীশ। দুজনের মধ্যে একটি স্নিগ্ধ মানবিকতাব ধারা লক্ষ করা যায়, বোঝা যায় লাবণ্য কোন মানবিক ও শৈল্পিক উচ্চ ঘরনা থেকে এসেছিল —এক অর্থবান বর্বর ইন্দ্রনাথের সংসারে। জগদীশ বলল, 'তুই কতদিন পরে গান গাইলি বলতো!' এ এক আশ্চর্য সংলাপ। যেন অন্যভাবে বলল তুই কতদিন পরে নিজেকে দেখলি বলতো। লাবণ্য জালতে চাইল সবাই কোথায় আছে, তার বড় ভয় হচ্ছে তার ছোট মেয়ে মণীষার জন্যে। আমরা জানি, সেই মুহূর্তে মণীষার কাছে প্রণব বিয়ের প্রস্তাব পেশ করছে আর মণীষা বাবার চাপে পড়ে মেনে নিচ্ছে— তারই দুর্ভাবনা মা লাবণ্যকে পেয়ে বসেছে। একদিন 'অসম' বিবাহে তার নারীসত্তা যেমন চাপা পড়ে দিযেছিল ইন্দ্রনাথ রায়কে বিয়ে করে— ছোট মেয়ের জীবনে যেন তারই পুনর্গঠন। দাদা জগদীশ বুঝতে পারে না প্রথমটা, সে এত তলিয়ে দেখেনি, বলে 'কিসের ভয়, এমন ছেলে এমন মেয়ে, ভয় কিসের', লাবণ্য তাকে থামিয়ে বলে, 'মণির মধ্যে কত গুণ, সব যদি চাপা পড়ে যায়... দাদা!' লাবণ্য তক্ষুণি মণির কাছে যেতে চায় 'একটা কথা তাকে বলা দরকার এক্ষুণি, এক্ষুনি—' দাদা জানায়, তা কি করে সম্ভব? আমি বললে হবে না?' লাবণ্য তখন ব্যাকুল, বলে, হবে। গিয়ে মণিকে বলবে, আমার নাম করে বলবে— সে নিজে যা ভালো বোঝে তাই যেন করে, কোনো দিক থেকে কোন জবরদস্তি নেই।' জগদীশ বলে, 'আর হিজ লর্ডশিপ?' লাবণ্য বলে. 'সে আমি বুঝব, ঝগড়া করব, সবই যদি মুখ বুঝে সহ্য করি তবে বেঁচে থেকে লাভ কি?'

এটা যে লাবণ্যর কত বড় আত্মপোলব্ধি, এবং সেই সূত্রেই, নারী হিসেবে, মা হিসেবে তার কন্যাসন্তানের মধ্যে যে নারী আছে তার মুক্তির জন্য লাবণ্যের প্রতিবাদ। এতকাল যে নারী নীরব বঞ্চনায় সবই মুখ বুজে সহ্য করে এসেছে আজ হিমালয়ের সামনে যেন সে বুঝতে পারে সে এক নারী, আর বুঝিয়ে দেয় নির্দয়, মূঢ়, পুরুষ শাসনের সামনে সে আর মুখ বুজে থাকবে না। যৌবনকাল তার হয়ত ব্যার্থ হয়েছে কিন্তু এই প্রৌঢ়

যেখানে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর মূল্যবোধের, সংস্কৃতিগত দিক থেকে, বা mental wave length-এর মিল হয় না। সে সমস্ত বিবাহই, যদিও সামাজিকভাবে বৈধ কিন্তু বস্তুতঃ এবং সত্য দৃষ্টিতে 'অসম বিবাহ'। এই অর্থে 'অসম বিবাহ' কথাটি ব্যবহৃত।

বয়সে সে তার নারী ও মায়ের অধিকার বজায় রাখতে বদ্ধ পরিকর।

আগেই বলা হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি থেকেই নারীর বঞ্চনার ব্যাপার এসেছে, 'পথের পাঁচালী'তে ইন্দির ঠাকরুণ ও 'দেবী'তে দয়াময়ীর চিত্রণ, তার উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু পরবর্তী ছবিগুলিতে সত্যজিৎ রায় নারীর বঞ্চনার অন্যদিক তুলে ধরেছেন যে শোষণ ও বঞ্চনা, বিবাহের মধ্য দিয়ে ঘটে বা প্রেমের মধ্য দিয়ে। এই থীমটি প্রথম এল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য়। নিজের হারানো নারীসত্তা সম্পর্কে লাবণ্যর সচেতনতা এল বহুকাল পরে যখন সে প্রৌঢ়া। 'অভিযানে' নারীর বঞ্চনা অন্য ধরনের —হতভাগ্য গরীব নারীর বঞ্চনা ও উদ্ধার। সবচেয়ে জটিল চিত্রণ 'চারুলতা'য়— সে যেন প্রেমের ব্যাধ কর্তৃক বধ্য হরিণী— যে প্রেম সমাজ স্বীকার করে না— অন্যদিকে বৈধ স্বামীর উদাসীনতায় নারীকে একলা দিনযাপন করতে হয়— বাস্তবিক অতি জটিল চিত্রণ। 'কাপুরুষ' ছবিতে একদিকে 'অসম বিবাহে' মদ্যপ স্বামী অন্য দিকে কাপুরুষ প্রেমিক—দুই পুরুষের দ্বারা নারী প্রবঞ্চিতা এমনভাবে যে সারাজীবন তাকে রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে কাটাতে হয়। 'অসম' বিবাহের ফলে নারীর বঞ্চনার কথা সত্যজিতের অন্য ছবিতেও আছে। —'শাখা প্রশাখা' ছবিতে পুনর্বার।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মিশাঁসেন প্রসঙ্গে বলতে হয়, এর মধ্যে কয়েকটা মজা আছে। সবচেয়ে চমৎকার কাজ আলো ছায়া রোদ্দুর—মেঘ, কুয়াশা ও কাঞ্চনজঙ্ঘার ব্যবহার, চরিত্রগুলির বিভিন্ন সংলাপের মুহূর্তে অসামান্যভাবে কাজে লাগান হয়েছে। ছোট মেয়ে মণীষা ও তাকে নিয়ে দুটি যুবক — একজন উচ্চবিত্ত, মনীষার বাবার আর্শীবাদধন্য এঞ্জিনীয়ার, বয়সে কিছু বড়— যে বলে 'ভালবাসা সিকিউরিটি থেকেও আসতে পারে' অন্যজন সমবয়সী অশোক, নিম্নমধ্যবিত্ত, রোম্যান্টিক ও খুব সরল। এই তিনজনকে সত্যজিৎ রায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এটি কোনো ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী নয়। মণীষা অশোককে প্রায় চেনেই না, এবং প্রণব ব্যানার্জীকে মণীষা জীবনসঙ্গী হিসেবে চায় না। কিন্তু ঘটনার পর্বে পর্বে মণীষা একটু করে অশোককে জানছে—জানছে তার সরল সত্যবাদী স্বভাব, জানছে তার মানবিকতা ও আত্মমর্যাদাবোধ, এবং সত্যজিৎ রায় যেন ওই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অর্থকেন্দ্রিক যুবকটির বিরুদ্ধে, মণীষার মূল্যবোধের কাছাকাছি একজন রোম্যান্টিক স্বভাবের সরল সহজ গরীব তরুণকে উপস্থিত করছেন মাঝে মাঝে—এবং কয়েকটি চমৎকার ত্রিকোণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন।

সবচেয়ে মজা আছে যখন অশোক মণীষাকে বলছে তার বিশাল ক্ষমতাবান ('কেউ কখনো তার কথা অমান্য করেনি, নয়' অশোক জিজ্ঞাসা করে মণীষাকে) পিতৃদেবের দেওয়া চাকরিটা হিমালয়ের কী এক আশ্চর্য প্রভাবে সে নিল না — এবং সবই মণীষার অবাক লাগছে। সে সময়ে দূরে উচ্চবিত্ত পাণিপার্থী যুবক এসে গেছে। মণীষা তার দিকে এগিয়ে গেল। দূরে অশোক কিছুক্ষণ ছিল, পরে চলে গেল। ব্যানার্জী বলল, 'তার বিয়ের ইচ্ছে আগেও ছিল না, মাঝে হয়েছিল, এখন ঠিক করল সে বিয়ে করবে না আপাতত। আজকে হয়ত এই দার্জিলিংয়ের রোমান্টিক পরিবেশে মণীষার মনে হতে পারে প্রেম না হলে বিয়ে সম্ভব নয়—কিন্তু যদি কলকাতায় ফিরে গিয়ে তার মনে হয় প্রেমের চেয়ে সিকিউরিটি বড়— মনে হয় সিকিউরিটি থেকেও এক ধরণের প্রেম জন্ম নিতে পারে— তবে যেন তাকে মণীষা জানায়। এখন সে মুক্ত।'

মণীষা ভারমুক্ত মনে ফিরে আসছে— আবার অশোকের সঙ্গে দেখা। অশোক যেন কলকাতায় গিয়ে মণীষার সঙ্গে দেখা করে— মণীষার ইচ্ছে তাই। অশোক জিজ্ঞেস করে 'বাবা'? মণীষা বলে, 'বাবা তার বন্ধুদের কিছু বলেন না।' এই সব কথা — এমন সময় মণীষার মামা তাকে খুঁজতে আসছে তার মায়ের বার্তা নিয়ে। সে অশোক আর মণীষাকে হেসে গল্প করতে দেখে থমকে গেল এবং দূরবীনে পাখী দেখে সেই দূরবীনে তাদের দেখতে লাগল; বোনের বার্তা দেবার দরকার হল না—মুখে ফুটে উঠল হাসি। দূরবীনের ব্যবহার প্রথম করেন সত্যজিৎ রায় 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়'। পরে 'চারুলতায়' দূরবীন নিয়ে চলচ্চিত্র ভাষায় অনেক কাজ দেখব। এখানেও পক্ষিপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক মামা যে দূরবীন দিয়ে পাখি দেখে তাই দিয়ে মণীষা ও অশোককে দেখছে ও মৃদু হাসি তার ঠোঁটে—এটিও বেশ স্নিগ্ধ ও ব্যঞ্জনাময়। সে এদের মধ্যে পাখির মতই সুন্দর, সৎ কিছু দেখল এ বিশ্রী জগতে-এমন একটি ইঙ্গিতও থাকতে পারে।

'কাঞ্চনজঙ্ঘার সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী বক্তব্য আছে এই পক্ষিপ্রেমিক মানুষটির মুখে। অশোকের সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং অশোক পাখিদের ব্যাপারে এমন কিছু শোনে ও দূরবীনের মধ্য দিয়ে দেখে যে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়—আকৃষ্ট হয় এই পক্ষিপ্রেমিক মানুষটির প্রতিও। অশোক জানতে চায়-সে শুনেছে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে কিছু পাখি প্রতি বছর চিড়িয়াখানার জলাশয়ে আসে শীতকালে। জগদীশ, পক্ষিপ্রেমিক মানুষটি, বলে—'সেই পাখি অবশ্য local migration, কিন্তু একরকম পাখি আছে, জানো, যেমন ধর golden pover, সে ভারী আশ্চর্য—একেবারে arctic থেকে চলে আসে, দুহাজার মাইল দূরে ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে আস্তানা গাড়ে প্রতি বছর, without fail। কতটুকু দেহ আর কতটুকুই বা তার ব্রেইন—কিন্তু তাদের পক্ষে কি করে এটা সম্ভব হয়, আজো পর্যন্ত তার ঠিকানা সঠিকভাবে কেউ দিতে পারে নি।' তার পর গম্ভীর স্বরে সে বলে, 'আমার একটা ভয় হয়... তুমি হয়ত শুনে হাসবে—মাঝে মাঝে রাতে শুয়ে ভাবি (এ সময়ে ছবির সাউণ্ডট্রাকে এক ধরনের আশঙ্কাভরা শব্দ)... এই যে test হচ্ছে, নিউক্লিয়ার টেস্ট হচ্ছে— আকাশ বিন্দু বিন্দু বিষাক্ত radiation-এ ভরে গেছে, একবার হয়তো .. দেখবো পাখিগুলো আর এল না, হয়তো তাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে পথ ভুলে গিয়েছে— তারা সেই sense টাই হারিয়ে ফেলেছ, কিম্বা Worse মাঝরাস্তায় মরে বৃষ্টির ফোঁটার মত তারা টুপটুপ করে'... জগদীশের কথা থেমে যায় ততক্ষণে। বহু ইপ্সিত পাখির ডাক শুনতে পেয়ে ডাক লক্ষ্য করে পাহাড়ে সন্তর্পণে উঠতে লাগল সে।

এই কথাগুলি ১৯৬২ সালে, যখন এ ছবি আমরা প্রথম দেখেছিলাম, তখন এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। 'দূষণ' এই শব্দটাই তখন সারা বিশ্বে সম্ভবত ততটা গুরুত্ব পায় নি, এদেশে তো পায়নি নিশ্চয়ই। কিন্তু আজ এই কথাগুলি একটি বিষাদময় সংগীতের মত কানে বাজে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির মধ্যে যে এমন একটা সুদূর প্রসারী বার্তা আছে, তখন আমরা কজন বুঝেছি? বিশেষত যে বিশেষ ভঙ্গীতে সত্যজিৎ রায় এই বক্তব্য রেখেছেন ছবিতে—কথাগুলির পূর্ণ অভিঘাত বক্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবার অগেই অর্থাৎ কথা শেষ হবার আগেই অনেক দিনের ইপ্সিত একটি পাখির ডাক শোনা যায় এবং জগদীশ সন্তর্পণে চলে যায় সেই পাখির ডাক লক্ষ্য করে — তাতে যেন মানুষের সম্ভাব্য সর্বনাশের প্রথম অভিঘাত যাদের ওপর পড়বে সেই পাখির আত্মীয় যে মানুষ

তার প্রতিভূর মত মনে হয় জগদীশকে।

আজ সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি 'আগন্তুক' দেখার পর জগদীশের আর একটি কথাও কানে বাজে — 'অকালে, ১৯৩৪ সালে পত্নীবিয়োগের পর—সারা পশ্চিম দুনিয়া ঘুরে দেশে ফিরি'— এই কথাটা। আমরা ১৯৯২ সালে 'আগন্তুক'-এর নায়কের মুখে শুনি- তিনিও ১৯৫৫ সালে বেড়িয়ে সারা পশ্চিম দুনিয়া ঘুরে ফিরেছেন-অবশ্য জগদীশের মত দেশে থাকার জন্য নয়— আবার পূর্ব দুনিয়া ঘোরার জন্য ফিরেছেন-অবশ্য জগদীশের মত তিনিও আধুনিক সভ্যতা যে রোগ ছড়াচ্ছে তার বিপদের কথা বলেন আরো তীক্ষ্ণভাবে, আরো প্রাঞ্জলভাবে। যাই হোক না কেন, জগদীশের (কাঞ্চনজঙ্ঘা) মধ্যে 'আগন্তুক'-এর নায়ক মনোমোহনের একটি ছায়া লক্ষ করি। অর্থাৎ বলা যেতে পারে মনোমোহন চরিত্রের বীজ ত্রিশ বছর আগের ছবি জগদীশ-এ ছিল।

এ ছবিতে দুটি ক্ষুদে মানুষকে দেখান হয়— এক, অণিমা ও শংকরের মেয়ে — সে যেন ঘুরেফিরে আসে। আর তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আরো চমৎকার ব্যবহার সেই নেপালী বালকটির—সে যেন ছবিটির সাংগীতিক কাঠামোর প্রধান সূত্র—বারে বারে ফিরে ফিরে এসেছে 'মিউজিক্যাল মোটিফে'র মত। শেষে (প্রণব বলে তারই জিত হল) তার কণ্ঠে নেপালী লোকসংগীতের সুর। ইন্দ্রনাথীয় বড়োলোকিয়ানার পচা মূল্যবোধের ওপর মুক্ত মানুষের জয়ের ইঙ্গিত নিয়ে আসে চিরন্তন লোকসংগীতের সুর। কাঞ্চনজঙ্ঘাও মেঘমুক্ত হয়।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক ছবি।

ছবি তৈরির গল্প ঃ অভিযান

অনিরুদ্ধ ধর

নরসিং ছটফটে, ব্যবসায়ীটি শান্ত। নরসিং-এর ছটফটানির কারণ সে যা চায়, তা কিছুতেই হতে পারছে না। তার বউকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে বুধাবাবু, যার মনোপলি ট্রান্সপোর্ট বিজনেস আছে। নরসিং মনোপলি ট্রান্সপোর্টের বিজনেস করে বুধাবাবুকে টেক্কা দিতে চায়। অন্যদিকে ব্যবসায়ীটি যা চায়, সহজেই তা পেয়ে যায় বলে শান্ত থাকে।

এই ব্যবসায়ীটির নাম সুখরাম সাহু। সুখরাম তেজারতির ব্যবসা করে। সুদে টাকা খাটানোর কারবার তার। সে কিসের ব্যবসা করে তা কখনওই ছবিতে সরাসরি বলা হয়নি। কেবল, এমন কতগুলি 'চিহ্ন' ব্যবহার করেছেন পরিচালক যা থেকে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না তার ব্যবসাটা কিসের। ব্যবহৃত 'চিহ্ন'গুলি এতটাই অমোঘ।

'অভিযান' ছবিতে নানা জীবিকার মানুষের সন্ধান আমরা পেয়েছি। বাস ড্রাইভার, সরকারি জিপের চালক, প্রাইভেট ট্যাক্সি চালক, গাড়ির ক্লিনার, নানা ধরনের চাকুরিরত নিত্যযাত্রী, মনোপলি ট্রান্সপোর্টের ব্যবসায়ী, পুলিশ অফিসার, এস. ডি ও., শিক্ষক, উকিল এবং আরও নানা ছোটখাট ব্যবসায়ী। এদের প্রত্যেকেরই কর্মস্থল বাড়ির বাইরে। অর্থাৎ জীবিকার প্রয়োজনে এই প্রতিটি শ্রেণীর মানুষকেই বাড়ির বাইরে বেরতে হয়। সুখরাম শাহু কিন্তু তার জীবিকা নির্বাহ করে বাড়িতে বসেই। এটি হল এক নম্বর চিহ্ন।

তার বাড়িতেই একটি আপিসঘর রয়েছে। সেই ঘরে রয়েছে একটি তক্তপোশ এবং তার উপর পুরু তোশক পাতা। এটিই হল সুখরামের 'গদি'। তক্তপোশের লাগোয়া দেওয়ালে খান তিনেক নানা পর্যায়ের বালগোপালের ছবি ফ্রেমবন্দি হয়ে ঝুলছে। এ-ছাড়া আছে জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর একটি ছবি। টানা কিছুটা দেওয়ালের পরে একটি দরজা। তার পরেই দেওয়ালেব বাকি অংশ। এই বাকি অংশে রয়েছে একটিমাত্র ছবি। ফ্রেমে বাঁধানো ছবি নয়, ছবিব তলায় ক্যালেণ্ডার। ক্যালেণ্ডারের ছবিটি একটি রমণীর। ছবির মেয়েটির চেহারা এবং ভঙ্গিটি লক্ষ করার মতো। পাশের দেওয়ালের বালগোপাল এবং গান্ধীর সঙ্গে বৈপরীত্যে পাল্লা দেওয়াব মতো ভঙ্গি। এ-পাশের ধার্মিক এবং সততার চিত্রকল্পটা যদি সুখরামের বাহ্যিক খোলসের চিহ্ন হয়ে থাকে, তাহলে ওপাশের স্থূলবিভঙ্গের নারীমূর্তিটি তার ভিতরকার চেহারা, যেখানে রয়েছে লোভ, লালসা, হিংস্রতা। এটি সুখরামের তেজারতি বাণিজ্যের 'চিহ্ন' নয়, তার চারিত্র্যের চিহ্ন। কিন্তু, তাহলে তেজারতির চিহ্ন কী?

ঘরের তক্তপোশের উপরেই রাখা আছে পুবানো হয়ে যাওয়া একটি বহু-ব্যবহৃত কাঠের তৈরি ক্যাশবাক্স, যার সামনে অষ্টপ্রহর বসে থাকে সুখরাম। এই ক্যাশবাক্সের উপস্থিতি তার বাণিজ্যেব চিহ্ন-নম্বর দুই।

এই অফিসঘরেই আমবা সুখরামকে দেখি তিনবার। দিনের নানা সময়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার, কোন সময়েই ছোট্ট শহরের বড় মাপের এক ব্যবসায়ীর দপ্তরে আমরা মানুষজনের

আনাগোনা একবারেই দেখি না। অন্য কোনও মানুষের অনুপস্থিতিই হল আসল সঙ্কেত। যে-কোনও ছোট শহরের ছোট দোকানিরা প্রতিদিন ঋণ করে তেজারতি কারবারিদের কাছ থেকে। দৈনিক এই অ-স্বীকৃত ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে কাজ শুরু হয় খুব ভোরে। ভোরেই ছোট দোকানিরা মহাজনের কাছ থেকে, অথবা তার নির্বাচিত এজেন্টদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে দোকানের কাজ শুরু করে দেয়। দিনের শেষে রাতের দিকে সামান্য সুদ সমেত এই টাকা আবার ফেরত দিয়ে যায় এজেন্টের কাছে, বা সরাসরি কারবারির কাছে। এইভাবেই চলে তেজারতির দৈনিক কারবার, ঋণ গ্রহণকারী মানুষকে তাই সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্য সারা দিনে এই তেজারতি কারবারি বা তার এজেন্টের দ্বারস্থ হতে হয় মাত্র দুবার— টাকা নেওয়ার সময় এবং টাকা ফেরত দেওয়ার সময়। 'অভিযান' ছবির সুখরাম সাহুর দপ্তরে তাই অন্য সময় কোনও লোকজনের আনাগোনা আমাদের নজরে পড়ে না।

সুখরামের কথাবার্তায় আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি এক ধরনের নির্লিপ্তিও আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় না। সুখরাম সামান্য সুদে দৈনিক কারবারিদের ঋণ দিয়ে স্থানীয় বাজারের প্রাণ টিকিয়ে রেখেছে। এতে সামান্য দোকানি থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত মানুষের সুবিধে। তারা প্রত্যেকেই উপকৃত। এবং তার ফলে সেই শহরে সুখরামেব কোনও শত্রু নেই। নির্ঝঞ্ঝাট সে তার ব্যবসা করতে পারে। ছোট সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীরে নিজের শিকড় প্রোথিত করতে তার কোনও অসুবিধে হয় না। এ কারণেই তার মধ্যে গভীর আত্মবিশ্বাসের ছাপ। অর্থের পাশাপাশি তার করায়ত্ত হয়েছে প্রতিপত্তি। এই প্রতিপত্তির দৌলতেই স্থানীয় আইনজ্ঞ তার হাতে। এই সক্ষমতার বহিঃপ্রকাশই হল নির্লিপ্তি।

দেখা গেল, সুখরামের যে-সব 'চিহ্ন' পরিচালক ব্যবহার করেছেন তা হল ঃ এক, বাড়িতে বসেই জীবিকা নির্বাহ। দুই, কোলের কাছে ব্যবসার একমাত্র সরঞ্জাম ক্যাশবাক্স। তিন, ব্যবসাকেন্দ্রে বেশির ভাগ সময়েই মানুষের অনুপস্থিতি।

নির্দিষ্টভাবে সুখরামের আরও দুটি 'চিহ্ন' আমরা পেয়েছি। এক, অসম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দেওয়াল-সজ্জা। দুই, আচরণে আত্মবিশ্বাসের ছাপ এবং নির্লিপ্তি। এই দুটি 'চিহ্ন' জানান দেয় চরিত্রটির মনোভাব সম্পর্কে। প্রথমটি থেকে আমরা বুঝতে পারি মানুষটি বাইরে এক রকম এবং ভিতরে অন্য রকম। অর্থাৎ সে একটি মুখোশ পরে থাকে। এবং দ্বিতীয়টি থেকে বোঝা যায়, সে তার নিজের অর্থবল এবং সামাজিক ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। এইভাবে কেবলমাত্র পাঁচটি 'চিহ্ন' ব্যবহার করে পরিচালক 'অভিযান' ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে দাঁড় করিয়ে দেন শক্ত ভিতের উপরে। এই রকম বাঙময় চিহ্নের ব্যবহার এই ছবিতে আরও অনেক আছে।

ছবিতে দুটি সরকারি অফিসারের সাক্ষাৎ আমরা পাই। যে-দুটি শহরে নরসিং-কে আমরা গাড়ি চালাতে দেখি, সেই দুটি আলাদা শহরের দুটি ভিন্ন সরকারি পদে এই দুজন আসীন। দু-ধরনের ঘটনা চক্রে নরসিং-এর সঙ্গে এই দুই সরকারি অফিসারের সাক্ষাৎ হয়। এই দুই সরকারি অফিসারের চেহারা এবং আচরণের বৈপরীত্য ও প্রকট।

প্রথমজন লম্বা, বেতের মতো চেহারা, চলাফেরা দ্রুত, কথাবার্তায় মানুষের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, অশালীন শব্দ প্রয়োগে পটু, ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্যাকে বিপদে ফেলেন।

দ্বিতীয় জন উচ্চতায় কম, গোলমাল, গতি শ্লথ, কথা বলেন ধীরে, ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্যকে সুবিধে দেন।

দ্বিতীয় জন হলেন এস. ডি. ও। তাঁর এই পরিচিতি পরিচালক আমাদের জানিয়ে রাখেন। শ্যামনগরে এসে যখন নতুন করে ট্যাক্সি চালানোর কথা ভাবছে নরসিং, তখন তার নতুন বন্ধু যোসেফ তাকে নিয়ে আসে এই এস. ডি. ও.-র কাছে। যোসেফ এই সরকারি অফিসারেরই গাড়ি চালায়। শ্যামনগরে নরসিং-এর গাড়ি চালানোর পারমিট দেবার মালিক এই মানুষটি। যেহেতু, এই মানুষটি কোন সরকারী পদে আসীন তা জানিয়ে দিয়েছেন পরিচালক, তাই তাঁর কাজের দপ্তরটি আর আমাদের দেখানোর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমরা তাঁর বাড়িটা দেখতে পাই। গেট পেরিয়ে প্রশস্ত নুড়ি পাথর বিছানো পথ, তার পরেই বেশ বড় মাপের কোয়ার্টার। সরকারি অফিসারের বাড়ির আয়তন দেখেই আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না এই শহরে তাঁর ক্ষমতা কতদূর বিস্তৃত—তাই তিনি যখন বলেন, আবেদন করলেই নরসিং-এর পারমিট তিনি মঞ্জুর করে দেবেন, তখন আর আমাদের কোনও সন্দেহ থাকে না। এস. ডি. ও.-র এই বাড়িটি হল তাঁর ক্ষমতার 'চিহ্ন'।

প্রথমজনের সরকারি পরিচিতি আমাদের জানান নি পরিচালক। দ্বিতীয় জন, অর্থাৎ এস. ডি. ও. যেখানে পারমিট পাইয়ে দেবার অথরিটি, সেখানে প্রথমজনকে আমরা দেখি পারমিট কেড়ে নেবার অথরিটি। বেআইনি ড্রাইভিং করার অজুহাতে এই প্রথম অফিসারটি নরসিং-এর ড্রাইভিং পারমিট নাকচ করে দেন। অর্থাৎ, ক্ষমতায় ইনিও কম যান না। তবু এই মানুষটিকে আমাদের কখনও এস. ডি. ও. বলে মনে হয় না। পরিচিতি জানাননি বলে পরিচালক এঁর কাজের দপ্তরটি আমাদের দেখান, এবং সেখানেই তিনি এমন কিছু 'চিহ্ন' ব্যবহার করেন, যা দেখে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, এই মানুষটি শহরের সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ। তাঁর রূঢ় মুখ, অভব্য বাচনভঙ্গি এবং অশালীন শব্দপ্রয়োগ তাঁর পুলিশ-পরিচিতিকে আরও বেশি করে সমর্থন করে। আমরা তাঁর ঘরে পুলিশের উর্দি ঝুলতে দেখি, এবং দেখি তাঁর হাতে রয়েছে একটি পুলিশ-ব্যাটন, যা হাতে নিয়ে তিনি কথা বলেন নরসিং-এর সঙ্গে। এ-ছাড়াও স্থানুবৎ এক কনস্টেবলকেও দেখি দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁরই ঘরে। এই তিনটি অনুষঙ্গই আমাদের বলে দেয় অসীম ক্ষমতাধারী এই মানুষটি কোন সরকারি পদে আসীন আছেন।

শ্যামনগরে এসে নরসিং-এর বন্ধুত্ব হয় যোসেফের সঙ্গে। তার নাম এবং গলার ক্রুসই প্রমাণ করে দেয় সে খ্রীষ্টান। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরও কিছু সঙ্কেতের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন পরিচালক। যোসেফের বাড়িটির পরিবেশে এমন কিছু অনুষঙ্গ রাখলেন তিনি, যাতে আর কোন সন্দেহই না থাকে যে এটি এক খ্রীষ্টান-পরিবারের বাড়ি।

এখানেও তিনটি 'চিহ্ন' আমরা পাই। এক, ঘরের দাওয়ায় রান্নাঘরের পাশে ঘুরে বেড়ায় পোষা মুরগি। দুই, বড়দিনের উৎসবে ব্যবহৃত রঙিন কাগজের শিকলির অংশবিশেষ ঘরের মধ্যে সিলিং থেকে ঝুলতে দেখা যায়।

তিন, যোসেফের বোন নীলিমা নিজের হাতে 'কেক' বানিয়ে আপ্যায়ন করে অতিথি নরসিং-কে। হিন্দু পরিবারে মুরগি পোষার প্রচলন একেবারেই ছিলনা। এ-প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়েরই আরও দুটি ছবির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ছবি দুটি হল 'ঘরে-বাইরে' এবং 'আগন্তুক'।

'ঘরে-বাইরে' ছবিতে দেখানো হয়েছিল একটি মুসলমান গ্রাম এবং 'আগন্তুক' ছবিতে একটি সাঁওতাল গ্রাম। এই দুটি ক্ষেত্রেই দুটি গ্রামকে সত্যজিৎ রায় 'এসটাবলিশ' করেছিলেন পোষা মুরগির চলাফেরা মিড-ক্লোজ শটে দেখিয়ে।

এইভাবে ঘরের দাওয়ায় পোষা মুরগির হাঁটা-চলা দেখিয়ে পরিচালক অব্যর্থভাবে জানিয়ে রাখেন যোসেফ এক খ্রীস্টান পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

'অভিযান' ছবিতে নানা পেশার পুরুষ যেমন আমরা দেখি, তেমনই দেখি নানা পেশার নারীদেরও। বিস্তারিতভাবে দুটি নারীচরিত্রের প্রাধান্য ছবিতে রয়েছে। প্রথমজন নীলিমা। এবং দ্বিতীয়জন, গুলাবী।

নীলিমা পেশায় শিক্ষিকা, সে লেখাপড়া জানে। নরসিংকে ইংরেজী শেখানোর মতো বিদ্যেবুদ্ধি তার আছে। সে চাকরি করে স্থানীয় একটি স্কুলে, আমরা দেখতে পাই তার স্বাধীনতা আছে। আর ভালবাসার মানুষকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো স্বাধীনতা তার আছে ; কেননা, তার উপার্জন অন্যের উপর নির্ভরশীল নয়।

গুলাবী বাধ্যতামূলক বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত। সে এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। ভালবাসতে চায়, বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সে লেখাপড়া শেখেনি। লেখাপড়া শিখলে তার হয়তো স্কুলে কিংবা অন্য কোথাও চাকরি হত। সে স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারত। এখন সে পরাধীন। সুখরাম সাহু তাকে কিনে নিয়ে এসেছে তার বাণিজ্যের স্বার্থে। তার শরীরের লোভ দেখিয়ে শহরের গণ্য-মান্য মানুষদের নিজের দলে টেনে রাখে সুখরাম। বিনিময়ে গুলাবী মাথা গোঁজার জায়গা আর আহার পায়। সে এতটাই পরাধীন যে তার ভালবাসার মানুষকে নিয়ে চলে যাবার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।

প্রধান দুই নারী চরিত্রের মধ্যেও চরম বৈপরীত্যের লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। এমনকি দুই নারীর ভালবাসার মানুষও দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা ; নীলিমা যাকে ভালবাসে সে পঙ্গু, ক্রাচে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ধীরগতিতে চলাফেরা করে। আর গুলাবী যাকে চায় তার পায়ের তলায় ছত্রিশ ঘোড়ার ক্রাইসলারের অ্যাক্সিলেটার। কিন্তু এই রকম একটা পরাধীন এবং সম্মানহীনভাবে বেঁচে থাকার বদলে গুলাবীর আর কিছু কি করার ছিল? অন্য কোনও বিকল্প রাস্তা কি খোলা থাকে? 'অভিযান' ছবিতে সামগ্রিক সমাজ-চেহারাটা দেখাতে গিয়ে পরিচালক আমাদের দেখিয়ে দেন লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হয়ে স্কুল শিক্ষিকা না হতে পারলেও, স্বাধীন এবং সম্মানজনক অন্য অনেক পেশায় গুলাবী নিজেকে ঠিকই নিযুক্ত করতে পারত; কী করে — সত্যজিৎ সেই বিকল্প পেশার ইঙ্গিত দিয়েছেন?

একটি সার্কাসের খেলার দৃশ্য দেখাতে গিয়ে পরিচালক সার্কাসের মেয়ে খেলোয়াড়দের দেখান আমাদের। অর্থাৎ, লেখাপড়া না জেনেও এমন পেশাতেও নিজেকে নিযুক্ত করা যায়। কিন্তু গুলাবী হয়তো এই পেশার খোঁজ রাখে না।

কেন যায়নি? যায়নি, তার কারণ, গুলাবীর জানাই ছিল না অন্তত এইভাবেও সে সম্মানজনক কোনও পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করে উপার্জন করতে পারে। তাই সার্কাসের ওই মেয়ে-খেলোয়াড়টির খেলা দেখানোর দৃশ্য বিক্ষিপ্ত একটি গ্রামীণ-সংস্কৃতির দৃশ্য হিসেবে ভাবলে ভুল ভাবা হবে। সামগ্রিক সমাজ-চেহারার একটি গুরুত্বপূর্ণ 'চিহ্ন'। যে-চিহ্ন দেখে আমরা বুঝতে পারি গুলাবীর মতো মেয়েরা বিকল্প কোনও পেশায় যেতে পারত, এবং গুলাবীরা জানে না শারীরবৃত্তি ছাড়াও তাদের বেঁচে থাকার আরও অন্য

'ভদ্র' পেশা রয়েছে। প্রসঙ্গত, জানিয়ে রাখা ভাল গুলাবীরা জানে না, তার কারণ সুখরামেরা তাদের জানতে দিতে চায় না। গুলাবীরা যদি জেনে যেত, তাহলে সুখরামদের 'গোপন' 'চোরাই' ব্যবসা চলবে কিভাবে? সার্কাসের সামান্য 'চিহ্ন'-টি থেকে এই এতগুলো অব্যক্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ সমাজ-বিশ্লেষণ পাওয়া যাচ্ছে।

'অভিযান' ছবির অনেক পরে তৈরী হয়েছিল স্বল্পদৈর্ঘের ছবি 'পিকু', যেখানেও কিন্তু ঠিক এই রকমই একটা ব্যাপার আমাদের নজরে পড়ে। পিকুকে টেলিফোনে নানা জায়গায় যোগাযোগ করতে দেখি। এই সূত্রে পরিচালক আমাদের দেখিয়ে দেন, ঠিক ওই সময়ে নানা শ্রেণীর মহিলাদের সময় কাটানোর বিকল্প পথ আর কী কী ছিল। আমরা পিকুর মায়ের সামাজিক স্তরের মহিলাদের দেখি নানাভাবে ব্যস্ত থাকতে। কেউ ব্যস্ত বিউটি পার্লারে, কেউ ব্যস্ত দামী রেস্তরাঁয় লাঞ্চ সারতে। পাশাপাশি পরিচালক আমাদের দেখিয়ে দেন, অন্য শ্রেণীর মহিলারা এই সময়টায় কীভাবে ব্যস্ত। মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়েরা ব্যস্ত টেলিফোন এক্সচেঞ্জে শ্রম বিনিময় করে রোজগার করতে। পিকুর মা, রেস্তরাঁয় লাঞ্চ সারতে আসা মহিলার দুল এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কর্মী মেয়েদের মাধ্যমে একই সময়ে সমাজের কনট্রাস্টিং চেহারাটাই শুধু দেখালেন না পরিচালক, তিনি দেখিয়ে দিলেন একই সময়ে কত রকমের বিকল্প পথ খোলা আছে এই সমাজের মেয়েদের সামনে। কেবল নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পথ বেছে নিতে হবে, আর এই সিদ্ধান্ত থেকেই বোঝা যাবে তার চরিত্র কেমন। ঠিক এভাবেই পিকুর মায়ের চরিত্র আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে পড়ে।

'অভিযান' ছবিতে চিহ্ন যেমন রয়েছে সরাসরিভাবে, তেমনই চিহ্ন রয়েছে প্রতীকীভাবেও। ছবির একেবারে অন্তিমপর্বে এমনই দুটি প্রতীকী চিহ্ন হল পাহাড়েব মাথায় স্থির হয়ে বসে থাকা শকুন এবং নরসিং-এর ক্রাইস্‌লারের হঠাৎ স্টার্ট না-নেওয়া। এই 'চিহ্ন' দুটো আমরা তখনই দেখছি, যখন নরসিং গোপনে চোরাই আফিমের চালান দিতে যাচ্ছে আর সামনে এসে পড়েছে যোসেফ। নরসিং কোনও রকমে যোসেফকে বিদায় দিয়ে গাড়ি নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। কেননা, যোসেফের নজরে যদি চোরাই আফিম পড়ে যায় তাহলে তার সম্পর্কে বন্ধুর ধারণাই বদলে যাবে। গাড়ি এঞ্জিনে তাই স্টার্ট দেয় নরসিং। কিন্তু গাড়ি স্টার্ট নেয় না। ঠিক এই মুহূর্তে নরসিং-এর ক্রাইস্‌লার গাড়ি যেন আর মামুলি এক যন্ত্র থাকে না, তার মধ্যে যেন চেতনার সঞ্চার হয়। স্টার্ট না নিয়ে গাড়ি যেন জানান দেয়, সামনে ফাঁদ। এই ফাঁদ যে কত ভয়ঙ্কর, এই ফাঁদে পড়লে যে প্রাণে বেঁচে নরসিং শেষ পর্যন্ত ফিরবে না, তার ইঙ্গিত হয়ে দেখা দেয় পাহাড়ের মাথায় বসে থাকা শকুন।

যে-মুহূর্তে নরসিং সিদ্ধান্ত নেয়, সে এই আফিমের চোরা-চালানে নিজেকে নিয়োজিত করবে না, সে সুখরামকে ফিরিয়ে দেবে ঘিয়ের টিনে রাখা চোরাই আফিম—তার মনোপলি ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস না হয় নাই থাকুক— ঠিক সেই মুহূর্তে 'ইগনিশন কি' ঘোরাতেই ম্যাজিকের মতো কাজ। এতক্ষণ নানা চেষ্টায় যে-গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছিল না, সেই গাড়িই নরসিং-এর সিদ্ধান্ত বদল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন প্রাণের আনন্দে স্টার্ট নিয়ে নিল।

ঠিক এইভাবেই গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হওয়া, এবং আবার চালু হওয়া, আর পাহাড়ের মাথায় নিথর হয়ে বসে থাকা শকুনের প্রতীকী চিহ্ন দেখিয়ে ভবিষ্যতের একটা পূর্বাভাস দিয়ে দেন সত্যজিৎ।

অভিযান/১৯৬২
দিলীপ গুপ্ত

আমার মনে একটি ভাবনার অনুকরণ সঞ্চারিত হয়েছিল যে সত্যজিৎ রায় এই চলচ্চিত্রটির নামকরণ করবেন 'অভিযান—অথবা একটি ট্যাক্সি-চালকের কঠিন পরীক্ষা এবং দুর্ভোগের কাহিনী'—এবং আমাদের নায়কের দুঃসাহসিক অভিযান সম্পর্কে অজস্র পরিণতির কথা।

আমি হয়তো রায় সম্পর্কে অকরুণ হয়ে উঠছি—যাঁর প্রতিটি ফিল্‌ম তথা চলচ্চিত্র শিল্পগত নৈপুণ্যে সফল —যিনি ইউরোপের প্রধান তথা অগ্রগণ্য চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার লাভ করেছেন এবং যাঁর কৃতিত্বে ভারত, সিনেমার আন্তর্জাতিক মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। অভিযান, অন্ততপক্ষে কিছুটা সুযোগসন্ধানী প্রচেষ্টায় কিছুটা ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছে, শিল্পমূল্যের বিনিময়ে।

বোম্বাইয়ের কোনো যোগ্য পরিচালকের হাতে, অভিযান, অজস্র গান ও নাচের সংযোগে, সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করতে পারত। এই চলচ্চিত্রটির চরিত্রে হিন্দি ফিল্মের বিন্যাসধর্মিতা আছে—দীর্ঘ ১৬টি রিল একটি হাস্যকরভাবে অযৌক্তিক ও দ্রুতগতি সম্পন্ন কাহিনী, এবং অতিনাটকীয়তা ও মেলোড্রামার অজস্র সুযোগ।

কিন্তু, একথা স্বীকার্য যে রায় একজন বুদ্ধিজীবী, এবং বাইরের এই চাপ প্রশমিত করতে তিনি কিছুটা সফল হয়েছেন, যেখানে অন্য পরিচালকেরা হয়তো সেই প্রচণ্ড চাপের প্রভাবে আত্মসমর্পণ করে ফেলতেন।

চলচ্চিত্রের প্রথম দৃশ্যটি আমি কখনো ভুলবো না, বিশেষত এখন এ-বিষয়ে আমার একটি ব্যাখ্যা আছে। ঘন শ্মশ্রুতে আবৃত এবং ভীষণদর্শন মুখ এবং জ্বলন্ত চোখের দীপ্তিতে বিশিষ্ট নায়ককে আমরা দেখি একটি চায়ের দোকানে তর্কমুখর। তার এই মুখ একটি বিদীর্ণ ও ভগ্ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত। কয়েকজন দর্শকের মত, আমিও সেই মুহূর্তে ভেবেছিলাম এই দৃশ্যটির প্রতীকী অর্থের কথা, এবং চলচ্চিত্রটির ক্রমউন্মোচনে নিম্নশ্রেণীর এই রাগী যুবকটির কথা। এবং এই সিদ্ধান্তে আসি যে, এই বিদীর্ণ দর্পণটি হ'ল ওই নায়কের চরিত্র ও তার অর্ন্তমুখী আলোড়নের প্রতিফলন। সম্প্রতি আমার এক বন্ধু জানিয়েছেন যে, ব্যাপারটি তা নয়, কারণ একটি সাক্ষাৎকারে রায় জানিয়েছেন যে, দর্পণটি চিত্রগ্রহণের সুবিধার জন্য ভাঙা হয়েছে এবং ওই বিষয়ে প্রতীক ব্যবহারের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করা হয়নি। এ কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে, যখন আমি ভাবি যে, যদি রায় এ সম্পর্কে এই স্বীকারোক্তি না করতেন তাহলে প্রথম দৃশ্যপট-এর সৃষ্টি হয়তো প্রতীকী দৃশ্যের প্রথম উন্মোচন হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেত—অনেকটা সেই বিমূর্ত চিত্রপটের মত, যা দেওয়ালে উলটো করে টাঙানো হয়েছিল, এবং যা বহুদিন ধরে দর্শকদের মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল, এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটে যখন স্বয়ং চিত্রকর সেই ছবিটি সোজা করে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখলেন।

অবশ্য, তারপর গ্রামের বাইরে যেখানে গল্পটির সূত্রপাত ঘটেছে, সেখানকার কালো

পাথর সম্পর্কে। বিশাল কালো পাথরের ও ছোটো কালো পাথরের সমাহারের কথা আমার মনে আছে, এবং রায় তার মধ্যে প্রচুর প্রতীকী অর্থ আরোপ করেছেন। বড় আকারের কালো পাথর (অশুভ শক্তির প্রতীক), ছোট পাথরের (শুভ শক্তির প্রতীক) ওপর সন্নিবিষ্ট?

সুতরাং গল্পটি আপন গতিতে এগিয়ে চলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছোট কালো পাথর, বড় পাথরের পটভূমিকে ছাড়িয়ে যায়, হয়ে ওঠে ব্যাপক, এবং শুভ শক্তি অশুভ শক্তিকে জয় করে। আমাদের নায়ক আফিম-এর চোরাচালান-এর কাজ ছেড়ে দেয়, গুলাবী দূরে সরিয়ে নিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তোলে, এবং অবজ্ঞার সঙ্গে, রিভলবার-আকৃতির সিগারেট রাস্তার ধারে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যার অর্থ হলো, সে এক সৎ এবং সম্মানজনক পথে জীবনযাপন করতে প্রস্তুত।

এই চলচ্চিত্রের একটি চরিত্র হলো আমাদের নায়কের নিত্যসঙ্গী (রবিনশন ক্রুশো-কাহিনীর Man Friday প্রতিম)। সে এক অস্থির-চিত্ত ভাঁড়, অনেকটা রাজসভায় বিদূষকের মত। এই বিদূষকটি ট্যাক্সি ও তার মালিককে ভালোবাসে—এবং আমাদের নায়ক-চরিত্রটির প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য আনে বিপরীতধর্মিতায়, যাতে নায়কের ক্রোধের বিস্ফোরণের মধ্যে সেই বিদূষকের মূর্খতার সহজ ভূমিকা আমাদের আশ্বস্থ করে।

গুলাবীর চরিত্রে ওয়াহিদা রেহমান-এর ভূমিকা ছাড়া সর্বাঙ্গীণ অভিনয় অতি উচ্চমানের। আমার বিশ্বাস ওয়াহিদা রেহমান হিন্দি ফিল্ম্-এর অন্যতম নিপুণতর অভিনেত্রী, কিন্তু যে কোনো কারণে হোক, রায়, ওয়াহিদার অযাচিত সলজ্জভঙ্গিমার কৃত্রিমতাকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেননি, পারেননি এই অভিনেত্রীর হিন্দি ফিল্ম্-এর নায়ক ও দর্শককে প্রলুব্ধ করার প্রচেষ্টাকেও। রায়-এর প্রধান ত্রুটি হলো, বক্স-অফিস-খ্যাত এই অভিনেত্রীকে এই চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ দেওয়া, এই চরিত্রটিতে অভিনয়ের সুযোগ সম্পূর্ণ অজানা কোনো অভিনেত্রীকে দিলে আরো ভালো হতো। আমার অনুমান, রায়, এই সুযোগটি কবে দিয়েছেন, ভারতে তাঁর ছবির প্রচার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। মিস্ রেহমান, মিস্ রেহমান হিসেবে খুব ভালো অভিনয় করেছেন—তাঁর অভিনয়ে অক্ষর-পরিচয়হীন, আতঙ্কিত, গ্রাম্য-বালিকা গুলাবীর চরিত্র ফুটে ওঠেনি।

নায়করূপে সৌমিত্র চ্যাটার্জী, খৃষ্টান বালিকা হিসেবে রুমা, এবং অন্যান্যরাও খুব ভালো অভিনয় করেছেন। আমি এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ, যদি সৌমিত্র, রায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, কিংবা অন্য পরিচালকদের সঙ্গে কাজে এই পরিমাণে যত্নবান হন, তাহলে তিনি আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে গণ্য হবেন।

এই চলচ্চিত্রটির দৃশ্যগ্রহণ অধিকাংশই স্টুডিওর বাইরে করা হয়েছে। এবং স্টুডিও সেটের ব্যবস্থাপনার অভাব বা তা না থাকার জন্য, আমাদের দৃষ্টির পক্ষে আরামদায়ক। এ ছাড়া অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে—যা সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে, এবং তা খুবই বাস্তববোধসম্পন্ন। একটি ছোট্ট দৃশ্যের কথা আমার স্মরণে আছে—যখন আমাদের নায়ক কয়েক মিনিটের জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দেখতে ব্যস্তঃ আমার বিশ্বাস রায় যখন বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন একটি চলমান সার্কাসদল যাচ্ছিল, এবং তখন এই দৃশ্যটি ফিল্মের মধ্যে সংযুক্ত করার ধারণা তাঁর মাথায় আসে। এটি সুন্দরভাবে করা হয়েছে। যেমন অন্য একটি দৃশ্যে দেখা যায়, কয়েক মিনিটের জন্য আমাদের নায়কের দৃষ্টি একটি ফিল্ম-এর দৃশ্যে নিবিষ্ট এবং মুহূর্তের জন্য আপনাবা ভাবতে পারেন যে

একটি ভুল তথা প্রক্ষিপ্ত রিল দেখানো হচ্ছে এবং আমরা দেখি নিম্‌নি কিংবা হেলেন-এ গীতরতা বা নৃত্যরতা দৃশ্যের ক্লোজ-আপ।

আমার ধারণায়, তীব্রতা এবং যন্ত্রণার অধিকাংশই উন্মোচিত হয়েছে, নায়কের বিদূষক বন্ধুর মাধ্যমে, —নায়িকা গুলাবী বা অন্য কারো দ্বারা নয়। বাস্তবিক পক্ষে, এই ফিল্‌ম-এর শ্রেষ্ঠ অভিনয়-এর কৃতিত্ব এই অসীম গুণ সম্পন্ন মানুষটিরই, যিনি দেখিয়েছেন অজস্র আবেগের বিস্তার—সহজ নির্বুদ্ধিতা থেকে গভীর বিষণ্ণতা পর্যন্ত। আমার কাছে তাঁর অভিনয় দৃশ্যগুলিই সবচেয়ে বেশি প্রত্যয় ও বিশ্বাস সৃষ্টিতে সফল।

রায়-এর সৃষ্ট আবহ-সঙ্গীত অত্যন্ত সতেজ ও জীবন্ত, এবং ফিল্‌ম্-এর বিচিত্র ভাবনাচিন্তার অনুসঙ্গে যথাযথ, —কেউ হয়তো একথা চিন্তা করতে পারেন, তাঁর সঙ্গীত-সৃষ্টির সমাহারকে সংগ্রহ করে একটি লং প্লেয়িং রেকর্ডে ধরে রাখার কথা ; যেমন, কারো উচিত তাঁর চিত্রনাট্য প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা। কাহিনীটি একটি দুঃসাহসিক অভিযান-মূলক উত্তেজনায় পূর্ণ, একটি বক্‌স অফিসযুক্ত নাম এবং প্রায় ১৬টি রিল—এসবের মাধ্যমে সমগ্র ভারতের ফিল্‌ম্-এর বাজার দখল করার জন্য সুবিধা ও সুযোগ প্রসারিত করবার চেষ্টা আছে, আমি শুধু এই আশা রাখি, ভারতের চলচ্চিত্র প্রেমিকেরা যদি তাঁর ফিল্‌ম্‌কে শিল্প-সৃষ্টি হিসেবে গণ্য করতে না পারেন, তাহলে তাতে তাঁর উদ্বেগ-এর কোনো কারণ নেই, কিন্তু তাঁর কর্তব্য হবে অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক মানুষের জন্য তাঁর সৃষ্টির ফসলকে ছড়িয়ে রাখা —এবং অবশ্যই পৃথিবীর বাকি অংশের শিল্পরুচির জন্যও।

অনুবাদ ঃ বিজয় কুমার দত্ত

অভিযান/১৯৬২

ঋষি চক্রবর্তী

'অভিযান'-এর মৌল বক্তব্য হলো আসক্তিজনিত অসীম আবেগ, এবং সীমাবদ্ধ হৃদয়ের যন্ত্রণা এবং তার কাঙালপ্রতিম আকাঙ্ক্ষা। একজন 'সিনিক' তথা বিশ্বনিন্দুক কেমনভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, যখন তার জীবনে আসে একটি শিক্ষিতা মহিলা এবং তার খঞ্জ প্রেমিক, এবং একটি গ্রাম্য বালিকা যার চোখ দুটিতে রয়েছে নিষ্পাপ সারল্য? নায়কের বিশ্ববিদ্বেষ চতুর্গুণ হয়ে ওঠে যখন সে দেখে এমনকি ওই শিক্ষিতা নারীকেও কুৎসার শিকার হতে হয়। কিন্তু এই ফিল্‌ম্-এর সিদ্ধান্তে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সে তেমন শ্রেণীর মানুষ নয় যে ডক্টর জনসনের সঙ্গ পাওয়ার ভান করবে, যদিও তিনি পদাঘাত করেন, এবং শিক্ষণবিহীন গ্রাম্যবালিকার মধ্যে দেবদূত-প্রতিম সত্তার সন্ধান পায়।

'অভিযান'-এর মুক্তির পর রায় বক্‌স্ অফিসের সাফল্যের স্বাদ পান। তিনি প্রমাণ করেছেন, শূন্যস্থানের মধ্যেও কিছু না কিছু সৃষ্টি করা যায় (যা শেক্সপীয়র-এর নাটকে দেখা যায়) যদি তার প্রায়োগিক সিদ্ধির মধ্যে পরিপূর্ণ দক্ষতা থাকে। কাহিনীর গঠনে চূড়ান্ত আবেগ আছে, তার বিন্যাসে আছে বয়নশিল্পের দক্ষতা। এই ফিল্‌ম্-এর প্রধান আকর্ষণ হলো অসাধারণ পরিচালনা। এ ক্ষেত্রে রায়-এর মহত্ত্ব প্রশ্নের অতীত। দৃশ্যাবলীতে ও চিত্রগ্রহণের তাৎক্ষণিক যোজনার মধ্যে কুশীলবদের ভূমিকা ফিলমটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। পরিচালক একজন উচ্চশ্রেণীর ও শক্তিমান জেলা অফিসারের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের আয়োজন রেখেছেন, এবং অজস্র রঙিন মফস্বলযাত্রীদের নিয়ে পরিহাসযোগ্য আবহ রচনা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন চতুর ব্যবসায়ী অথবা ধূর্ত আইনজ্ঞের কৃত্রিম-ভঙ্গিমা। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' শীর্ষক চলচ্চিত্রের পর অভিনেতা হিসেবে রবি ঘোষ তাঁর বিরাট সম্ভাবনার প্রমাণ রেখেছেন। গণেশ মুখার্জী এবং রুমা দেবী গ্রামের খৃষ্টানদের অবমাননার আর্তি সফলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অপুর সংসার' ও 'দেবী'-তে তাঁর সাফল্য এবং রোমান্টিক নায়কের ভূমিকায় কয়েকটি ফিল্‌মে ব্যর্থতার পর সৌমিত্র চ্যাটার্জি এই ফিল্‌মে খুব সুন্দর অভিনয় করেছেন। তিনি ভয়ঙ্করভাবে অসম্ভব একটি চরিত্রকে আকার দিয়েছেন — ফুটিয়ে তুলেছেন তার বিশেষ আঞ্চলিক রূপ এবং যুক্ত করেছেন তার চরিত্রের ব্যঞ্জনা তথা পরিচয়। পরিশেষে, ওয়াহিদা রেহমান-এর অনুরাগীরা আনন্দিত হবেন একথা ভেবে, অন্য সব কিছু ছাড়াও, তিনি একজন অভিনেত্রী।

এবং তবুও, সত্যজিৎ রায়ের নামের উপযুক্ত কি হয়েছে এই ফিল্‌ম? অপু-ট্রিলজি অথবা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র সমমর্যাদায় কি একে গণ্য কবা যাবে? আমরা যদি মানবিক প্রকৃতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করতাম কিংবা তার আকাশচুম্বী উত্থান ও গভীর নিম্নে পতনের অস্তিত্বের কথা ভাবতাম—তাহলে কি হতো? বর্তমানে একথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, আমরা যে সমাজে বাস করি তা অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসের উপযুক্ত পটভূমি হিসেবে সমাজের ব্যবহার করেছেন। নায়কের চরিত্র-চিত্রণ হিসেবে

নরসিং অত্যন্ত ক্ষমতাবান, একই সঙ্গে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু সত্যজিৎ দেখিয়েছেন সে কি হয়ে উঠতে পারতো। অপমানের গভীরতম প্রান্তে বিচরণকারী শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি সে নয়। একথা ভাবলে আমাদের দুঃখ হয় যে ট্যাক্সি ড্রাইভার হবার জন্য তার জন্ম হয়েছে। 'অভিযান' ব্যবসায়িক-সাফল্যের শিল্পী হিসেবে সত্যজিৎ রায়কে হয়তো প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্তু শিল্পী হিসেবে তিনি, সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মানুষদের রুচির মর্যাদাদানে ব্যর্থ হয়েছেন,—এবং তিনি ব্যবসায়িক ফিল্ম্-স্রষ্টা হিসেবেও ওয়াহিদা রেহমান-কে দেখতে উন্মুখ দর্শকদের বিনোদন ও আনন্দদানেও সফল হননি।

মহানগর

আলোক সরকার

যে একমাত্র রঙে সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' ছবিটির উপস্থাপন তা ভালোবাসার রঙ, সরল স্নিগ্ধ কোলাহলহীন ভালোবাসা। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দের সঙ্গে সেই রঙ এমনই ওতপ্রোত, তাকে চিনে নেবার জন্য আমাদের কোনো প্রচেষ্টাই লাগে না, জীবনের প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে তা গভীর গোপন বেজে ওঠে। মহানগর ছবির প্রসঙ্গে এই ভালোবাসার রঙটুকুর অর্বিভাব ছাড়া আমাদের আর কিছুই বলার থাকে না। সে এমন একটা রঙ যার পাশে এসে আমরা আবহমান প্রবহমানতার সঙ্গে এক হয়ে যাই।

'মহানগর' প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ মিত্র আমাদের জানিয়েছেন, স্বাধীনতার কয়েক বছর আগে থেকেই পূর্ববঙ্গ থেকে মহানগর অর্থাৎ কলকাতায় আসা আশ্রয়প্রার্থী পরিবারগুলি আশ্রয় ও জীবিকার প্রয়োজনে বাধ্য হয়েছিল প্রচলিত অনেক সংস্কার এবং জীবন-বিন্যাসকে পাল্টে নিতে, অভ্যস্ত হতে নতুন ভাব-ভাবনার সঙ্গে। বলা যেতে পারে সেটা একটা সংক্রান্তিকাল। পুরোনো ধ্যানধারণা আর নতুন পরিস্থিতির মধ্যে সন্ধিস্থাপনের বড় রকমের একটা সংকট মুহূর্ত। লেখক তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সেই সময়ের মানসতা এবং আত্মিক ও বাস্তবিক সংঘাতের একটা ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন তাঁর গল্পে। লেখকের এই বিবৃতির যথার্থ্য যদি 'মহানগর' ছবি থেকে খুঁজে পেতে চাই তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে না। তবু, আমরা নিশ্চয় বলবো সত্যজিৎ রায়ের মহানগর নামের চলচ্চিত্র দেখতে বসে আমাদের এসব কথা মনেই আসে না, আমরা কেবল দেখি এক সজল গৃহবধূকে, যার সর্বাঙ্গীণ উজ্জীবন স্নিগ্ধ নিবিড় অরব ভালোবাসার মৃণালে। তার ভালোবাসা তার স্বামীর জন্য, তার সমর্পণ শ্বশুর-শাশুড়ী-পরিবারের সকলকে নিয়ে তার সংসারের কাছে, তার সব কাজ, সব শ্রম, সব আন্তরিকতা ভালোবাসার শ্যামল শোভন আলো দিয়ে সাজানো— সেই ভালোবাসা তার বন্ধুও যেমন পায় সেইরকম পায় তার স্বামী, তার সংসার।

বস্তুত 'মহানগরে' একটিও জটিল চরিত্র আছে বলে আমাদের মনে পড়ছে না। সেখানে অভিমান আছে, আক্রোশ ষড়যন্ত্র নেই, নেই এমনকি তেমন উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদও। এমনকি মুখার্জিও সহজ স্বাভাবিক মানুষ, তার যেটুকু ম্লানতা তা তার স্বজাতির প্রতি; হয়তো বা ব্যবসায়ের প্রতি আনুগত্য-জাত। অন্তত মুখার্জি যে তেমন কোনো দাম্ভিক নিচু মনের মানুষ পরিচালক তা আমাদের বোঝাতে চাননি। আরতির প্রতি তার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে, একই দেশের মানুষ বলে মজুমদার-পরিবারকেও সে আপন বলে ভাবতে চায়, সুব্রতর দুঃসময়ে সে তাকে সাহায্য করতেও এগিয়ে আসে। তার ইডিথকে বরখাস্ত করার পূর্ব পরিকল্পনার পিছনে আরতির জন্য একটা প্রায় নিঃস্বার্থ সহানুভূতি, আরতির পদোন্নতির ভাবনা যে ছিল না তা বলা যায় না।

আর ইডিথের জন্য আরতির যে প্রতিবাদ সেখানে বন্ধুর জন্য একটা কান্না, একটা

হাহাকারই বড় হয়ে বাজে। প্রতিবাদের দামামা নয়। সুব্রতর কাছে চাকরি ছাড়ার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে আরতি যখন বলে ও অর্থাৎ ইডিথ এখন বিয়েও করতে পারবে না তখন ভালোবাসার নরম দিগন্ত ভরা আলো চারিদিক ছাপিয়ে ওঠে। আমরা, নিস্তরঙ্গ কোলাহলহীন, তার ভিতরে নেমে যাই।

সত্যি বলতে এইসব আলোচনা—কাহিনী-বিশ্লেষণ, চরিত্র বিশ্লেষণ অন্তত 'মহানগরে'র প্রসঙ্গে একান্ত অপ্রয়োজনীয়। শেষ পর্যন্ত এ-ছবিতে তো কোনো কাহিনী নেই, কোনো বিশেষ সময়ের সমাজ পরিবর্তনের রৌদ্রতাপও না, যা আছে তা আবহমান মানুষ আবহমান মানুষের ভালোবাসা, যা চিরদিন নিস্তব্ধ অবগুণ্ঠিত মানুষের সব সম্পর্কের অন্তরালে শুভ্র শান্ত আর অনতিক্রম্য। সে এক অরব উল্লাস, বর্ণ-নিবিড় জেগে-থাকা তার নাম আমরা কখনো জানি না, তবু সেই রঙ আমাদের সব ব্যাথা-বেদনা-খুশি-স্বপ্নকে হাত ধরে নিয়ে যায়।

'মহানগরে' একটি চরিত্রও নেই যা বিশেষ, ব্যতিক্রমী। সব চরিত্রই আমাদের অতি চেনা, এত চেনা যে তাদের দিকে একবারো ফিরে চাইতে হয় না, কাজ থেকে মুখ না তুলেও তাদের উপস্থিতি আমরা ঘর ভরে টের পাই। সবাইকে আমরা ঠিক তেমনই ভালোবাসি, যে ভালোবাসা উচ্চারণের জন্য নিতে হয় না কোনো লালিত ভাষার সাহায্য, নিয়ে আসতে হয় না ফুলগুচ্ছ, স্বর্ণালঙ্কার। সহজ সরল কতকগুলো মানুষ, আবহমান মানুষ। আদিম, শাশ্বত আর পবিত্র। ঠিক সেইরকম পবিত্রতা যা সব স্বাভাবিকতায়, সব প্রবহমানতায়—একটা রাত গড়িয়ে গড়িয়ে দিন হচ্ছে, একটা দিন গড়িয়ে গড়িয়ে বিকেল—এর চাইতে বড় সার্বিকতা আর কি আছে! সার্বিক নিস্তব্ধতা, অখণ্ডতা—আমরা তার ভিতরে ঠিক তেমন করেই হয়ে উঠি যেমন কমল মুকুল দল আস্তে আস্তে চারদিকে পাপড়ি মেলে দেয়। যেমন স্বাভাবিক নির্মেঘ স্বচ্ছ কণ্ঠে ঘোষণা করে একটা থাকা—সর্বব্যাপ্ত একটা সমর্থন, একটা নিশ্চিত 'হ্যাঁ'।

স্বাভাবিকতা এইভাবেই আমাদের অনন্তের সঙ্গে একাত্ম করে। মহানগর সেই স্বাভাবিকতার ভেতর আমাদের নিঃসীম অমোঘ বলে ডাক দেয়।

আরতি চিরদিনের বাঙালী মেয়ে, আমাদের খুব কাছের গৃহবধু। কিরণময়ী-লাবণ্য-কমলের মতো সে ব্যক্তিত্বময়ী বিশেষ চরিত্র নয়, নয় নিজের কেন্দ্রে জ্বলে-ওঠা এক আত্মনির্ভর উচ্চারণ। তার তুলনা রোহিনী, বিমলা, অথবা চারুলতার সঙ্গেও নয়—আত্মকেন্দ্রিকতা তার স্বভাবের সঙ্গে বেজে ওঠে না। আরতি চিরদিনের ঘরের মেয়ে, পরিবেশ পরিস্থিতির ভিতর থেকে উঠে আসা আবহমান। তার আবির্ভাব প্রকৃতির চিরন্তন আবির্ভাব—এক উন্মুখর ধারাবাহিকতা—দূর থেকে দেখলে তার স্তব্ধতা, তার সুদৃঢ়তা আমাদের স্পর্শ করবে; আর নিজের খেলার ভেতরে সে তার একান্ত আপন হাসিকান্নার ধনগুলি নিয়ে সরল ফুল্ল রঙিনতা। ঠিক ততটুকুই রঙিনতা যা বেদনা বিচ্ছেদে অসহায়। 'যেতে নাহি দিব'-র চারি বৎসরের কন্যার মতো সে গর্বিত উচ্চারণ করে 'যেতে নাহি দেব' এবং তাকে যেতে দিতে হয়। যেমন যেতে দিতে হয় আবহমান অশ্রুময়ী জননী বিশ্ব প্রকৃতিকে। কেবল অনন্তকাল অসহায় প্রতিবাদ।

এবং সেই প্রতিবাদ 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণালের প্রতিবাদের পাশাপাশি একবারেই অন্য জাতের। অসহায় বিন্দুর জন্য মৃণালের ভালোবাসা, প্রতিবাদ, তাকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা

আর অপমানিতা ইডিথের পক্ষ নিয়ে আরতির উত্তেজনা এ দুইয়ের আন্তরপ্রেরণা ধর্মত আলাদা। আরতি মূলত আবেগ-আশ্রিত, মুখার্জির কথায় impulsive ; মৃণাল যুক্তিনির্ভর, বুদ্ধিদীপ্ত। বিন্দুর জন্য তার যে আগ্রহ গভীর ভালোবাসার সঙ্গে তার ভিতরে মিলে মিশে আছে আত্মসচেতন কর্তব্যবোধ, স্বার্থপর ক্লীবতা এবং বধির ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে ঋজু সন্নত শরীরী উচ্চারণ। আরতির সবকাজেরই প্রথম এবং মৌল অবলম্বন হৃদয়ভূমি। এই হৃদয়ভূমি সার্বিক মানুষের, চিরদিনের মানুষের, সহজ স্বাভাবিক মানুষের। মৃণালও আমাদের কাছে আগন্তুক সত্তা, বাঙালী নারীর পরিপ্রেক্ষিতে অচেনা, আরতি কখনোই তেমন নয়। তার অভিব্যক্তি আদিম, প্রাকৃত, স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার সৌন্দর্যের যে রঙ, তার ভেতরেই তো আমাদের বাস, সে রঙের নাম আবার কি দেব, তার ভেতরে যখন জেগে ওঠা তখনই কেবল নিজেকে চেনা, অনন্তকালের একজন পথিক হিসাবে চেনা, অন্তহীন পথের পথিক, তার শুরু যেমন জানি না, শেষের প্রশ্নও কি কোনোদিন তেমন করে বেজে উঠেছে আমাদের মনে?

মহানগর

শিখা রুদ্র

এ সময়ে চাকরির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েরা যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে বাইরে বেরিয়ে চাকরি করার সমস্যা এখন আর নেই। প্রথম থেকেই পরিস্থিতি এমন অনুকূল ছিল না। সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' মেয়েদের এই বিশেষ সমস্যা নিয়ে তৈরী হয়েছিল। এই ছবিকে অনেকে অনেকভাবে দেখতে পারেন। কিন্তু মেয়েদের কাছে এ ছবির তাৎপর্য কিছুটা ভিন্ন। তাদের অস্তিত্বের একটা দিক উন্মোচিত করে দিয়েছিল 'মহানগর'-এর নায়িকা আরতি।

দেশ ভাগ এবং উদ্বাস্তু সমস্যা সমাজে মূল্যবোধের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছিল। বেঁচে থাকার তাগিদে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। প্রথা ভাঙার কাজ শুরু হয়েছিল কলকাতা মহানগরকে কেন্দ্র করে। এই নগরের জটিল বিন্যাস নতুন নতুন মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে 'মহানগর'-এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে আসা নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহবধু আরতি সংসারের দায়-দায়িত্ব স্বামীর সঙ্গে ভাগ করে নেবার জন্য চাকরি করতে বাইরে বেরুল। কলেজ পাশ না করা মেয়ে যে কাজ নিল সেটা বেশ সাহসের কাজ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেশিন বিক্রি করার জন্য সেলস্-গার্ল-এর চাকরি।

ছবির শুরুতে আরতির স্বামী সুব্রত দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে। কলকাতার রাস্তাঘাট, ঘিঞ্জি গলির ছোট ছোট ঘরবাড়ি বুঝিয়ে দিচ্ছে মহানগর কলকাতার ভেতরে ক্ষয়ে যাওয়া অবস্থা। সুব্রতর বাবা প্রিয়গোপালের চশমা তৈরীর প্রসঙ্গটি বেশ কয়েক বার ঘুরে ফিরে কাহিনীতে এসেছে। এই বিষয়ের মধ্যে দিয়ে পরিবারটির অর্থনৈতিক দুরবস্থার ছবি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এক সময়ের প্রতিষ্ঠিত মাষ্টারমশায় যিনি বহু কৃতী ছাত্র তৈরী করেছিলেন, আজ সামান্য একটা চশমার জন্য ডাক্তার-ছাত্রের কাছে গুরুদক্ষিণা ভিক্ষা চাইছেন।

ছবির কাহিনী আরো কিছুটা এগোলে জানা যায় সুব্রতর বন্ধু অবনীর স্ত্রী মাষ্টারির চাকরি নিয়েছে। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে সুব্রতও স্ত্রীকে চাকরি করতে পাঠাবার পক্ষে যুক্তি খুঁজে পায়। সে আর তার স্ত্রী আরতি যখন চাকরি করা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে শুরু করছে, সে সময়ে সুব্রতর বক্তব্য এইরকম—'আমি ভয়ানক Conservative, বাবার মতো। ঘরের বউ should stay in her ঘর and not বিচরণ।' তার মুখ দিয়ে পরিচালক খুব স্পষ্টভাবে মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল মানসিকতা প্রকাশ করেছেন। আরতির শ্বশুর প্রিয়গোপালের চরিত্রটি আদর্শনিষ্ঠতা মর্মস্পর্শী করে দেখাবার জন্য সত্যজিৎ রায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্য আর একটি গল্প 'আকিঞ্চন' এর মাষ্টারমশায় চরিত্রটির আদর্শের দিকটা নিয়েছেন। এর ফলে এই চরিত্রে ভিন্ন মাত্র যুক্ত হয়েছে। সত্যজিৎ রায় এই ধরণের চরিত্রসৃষ্টিতে চরিত্রটির আদর্শ নিষ্ঠা সততা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার উপর বেশী জোর

দেন।

প্রিয়গোপাল শুধুই কন্‌জারভেটিভ্ হলে তা চারিত্রিক ত্রুটির মতো দেখাতো। যে মানুষ এক সময় সমাজে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, বৃহৎ পরিবারের দায় অক্লেশে বহন করে এসেছেন, তিনি আজ সামান্য প্রয়োজনের জন্য কুণ্ঠিত মুখে হাত পাতেন এটা দেখা খুবই কষ্টকর। সত্যজিৎ রায়ের প্রধান বৃদ্ধ চরিত্রেরা প্রচলিত বুড়ো মানুষদের থেকে একেবারে আলাদা জাতের। তা সে 'জলসাঘরে'র উদ্ধত জমিদার হোক কি 'জনঅরণ্য'র সমাজ-মনস্ক বৃদ্ধ পিতা বা 'শাখা-প্রশাখা'র কৃতী অথচ সত্যনিষ্ঠ আনন্দ মজুমদার, এমনকি শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এর অসাধারণ মামাবাবু, এঁরা সকলেই তীক্ষ্ণধী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জীবন সম্বন্ধে উৎসুক, প্রাণবন্ত, আকর্ষণীয় চরিত্র। প্রকৃতির নিয়মে শরীর বুড়িয়ে গেলেও বুদ্ধির জড়তা এঁদের কাছে প্রশ্রয় পায়নি। সবজান্তা জ্যাঠামশায় এবং মামাবাবু এই ধারার উজ্জ্বল নিদর্শন। 'মহানগর'-এর প্রিয়গোপালবাবুও এ ধারার মানুষ। সুব্রত তার বাবাকে ক্রশ ওয়ার্ডগুলো করতে নিষেধ করে চোখের কষ্টের জন্য, তার পরিবর্তে পার্কে হেঁটে চলে বেড়াতে পরামর্শ দেয়। তার উত্তরে প্রিয়গোপাল বলেন, 'ও গিয়ে দেখেছি কেবল বাজে লোকের আড্ডা। বুড়োরা পর্যন্ত কেবল গসিপ আর পরনিন্দা।' এই একটা মাত্র সংলাপে বোঝা যায় ঐসব গড়পড়তা বুড়োদের থেকে তিনি কত আলাদা। বুড়োমি তাঁর ধাতে নেই।

চরিত্রের মধ্যে মহত্ত্ব না থাকলে তার দুঃখ-বেদনা আমাদের স্পর্শ করে না। পাজি লোককে কষ্ট পেতে দেখলে আমরা স্বাভাবিক মনে করি। সৎ মর্যাদাবান মানুষ কষ্ট পেলে তা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। পুত্রবধু আরতির সেল্‌স্-গার্ল-এর চাকরি করতে যাবার প্রেক্ষাপটে তার শ্বশুরের ক্ষোভ বিরাগ পুরুষমানুষের অসহায়তারই নামান্তর। যিনি সমস্ত পরিবারের ভার বহন করে এসেছেন এতদিন, দেশ থেকে উৎখাত হবার জন্য তাঁকেই নিজের পরিবার সমেত-পুত্র-পুত্রবধুর ঘাড়ে বোঝা হতে হয়েছে। তাঁদের জন্যই ঘরের বউকে পথে বেরিয়ে চাকরি নিতে হয়েছে, এ দুঃখ এ যন্ত্রণা যে মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টের কত গভীর থেকে উঠে এসেছে প্রিয়গোপালের চরিত্রটি তার প্রমাণ।

সুব্রতর ব্যাপারটা এসেছে অন্যরকমভাবে। ঐতিহ্যসূত্রে কতকগুলো ধ্যান-ধারণাকে সে আদর্শ বলে আঁকড়ে ধরে আছে। অথচ সময়ের দ্রুত তালের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে স্ববিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে। না পারছে অতীতকে মান্য করে চলতে, না পারছে দৃঢ়তার সঙ্গে বর্তমানের সংকটের মোকাবিলা করতে। তাই কখনো বউকে বেশি অ্যাট্রাক্‌টিভ্, কখনো-বা নিজেকে কন্‌জারভেটিভ বলে বউকে চাকরি করতে দিতে চায় না। আবার সে নিজেই ওয়ান্টেড কলাম দেখে বউকে সেলস্-গার্ল-এর চাকরির দরখাস্ত লিখে দেয়। বাবা-মাকে লুকিয়ে বউকে ইন্টারভিউ দিতে নিয়ে যায়। চাকরিটা পাওয়া গেলে বাবা-মায়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাকরিতে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। এখানেই শেষ নয় শ্বশুর-শ্বাশুড়ির বিরোধিতায় আরতি বিব্রত বোধ করলে সুব্রত তাকে এই কথা বলে বোঝায় যে 'এই কোল্ড ওয়র কদ্দিন জানো? যেদিন প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে বাবার হাতে চশমার টাকাটা তুলে দেবে সেইদিন অব্দি।' প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা দরকার যে প্রিয়গোপাল শেষ পর্যন্ত পুত্রবধূর কাছ থেকে মাইনের টাকা বা চশমা কিছুই নেন নি। সুব্রত তার বাবাকে বোঝাতে গিয়ে যে যুক্তি দেখিয়েছিল তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, '..........দিন বদলেছে,

সেই সঙ্গে লোকের মতও বদলেছে, চেঞ্জ আসে কতকগুলো necessity থেকে।' কিন্তু সে কি নিজে বুঝেছিল এই যুক্তি? চাকরি-করা স্ত্রীর কাছে তার গুরুত্ব কমে যাবে এই আশঙ্কা কি তাকে অস্বস্তিতে ফেলে নি? স্ত্রীলোকের কাছে ঘরই যে সব কথা নয় একথা মেনে নেওয়া কোনো সমাজেই পুরুষদের পক্ষে সহজ ছিল না। বাঙালীদের কাছে তো নয়ই। আরতি চাকরি করতে যাওয়ায় সুব্রতর সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরী হয়েছে। আরতি একটু একটু করে চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার বুদ্ধি, সপ্রতিভতা, কাজে নিষ্ঠা এক গৃহবধুকে দিয়েছে ভিন্ন জীবনের স্বাদ। এই চাকরি তাকে কিছুটা অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়েছে শুধু নয়, আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে। এই আত্মপ্রত্যয় থেকেই ছবির শেষে সে নতুন পথের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে পারে।

আরতির প্রথম নাম সই করার দৃশ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মজুমদার লিখতে গিয়ে J লিখবে না Z লিখবে সে কথা স্বামীকে জিজ্ঞেস করে। একটা লেখাপড়া জানা মেয়ে এতদিন পর্যন্ত তার পদবীর সঠিক বানান জানার সুযোগ পায়নি। এই প্রথম যেন সে তার অস্তিত্বকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারল।

মূল যে চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী এগোয় দর্শকেরা তার বৃদ্ধির দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে। কোথায় সে পৌঁছতে চায়। 'মহানগর'-এর নায়িকা আরতির ক্রমপরিণতি আমাদের সে আশা অনেকটাই পূরণ করে। সে যদি শুধুই পোশাক-পরিচ্ছেদে কথায় কাজে অত্যন্ত উজ্জ্বল সফল একজন সেল্‌স্‌-গার্ল হয়ে উঠতো, তা হলে সেটা হতো অনেকটাই মেয়েদের ইচ্ছাপূরণের কাহিনী। সেই যেমন একজন সাধারণ মেয়ের ইচ্ছাপূরণের কথা রবীন্দ্রনাথ কবিতায় লিখেছিলেন শরৎবাবুকে অনুরোধ করে—এও হতো তেমনি কিছু। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে কোনো চরিত্র গড়পড়তা মানুষের চেয়ে অন্যরকম না হলে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। যে চরিত্রের গভীরতা আছে, বুদ্ধি আছে, তার সঙ্গে সততা ও সাহস যুক্ত হলে তা এক ধরণের নৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। সত্যজিৎ রায়ের প্রধান চরিত্রদের এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আরতি দাঁড়িয়ে আছে এই জায়গায়। মানুষ সৎ থাকতে চাইলে সৎ থাকতে পারবে না সত্যজিৎ রায় একথা মেনে নিতে পারেন নি। অন্তত চলচ্চিত্রে সে বিষয়ে তাঁর কিছু বক্তব্য আছে। 'গণশত্রু'তে পরাজয়ের শেষ মুহূর্তেও ডাক্তার ভেঙে পড়ে না, তার ঋজুতারই জয় হয় 'শাখা-প্রশাখা'য় পাগল অথচ সৎ চরিত্রের মেজ ছেলে প্রশান্ত সত্যনিষ্ঠ পিতার রক্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী; 'আগন্তুক'-এ একজন মানুষ সব কিছু ত্যাগ করে অজানায় হারিয়ে গিয়ে নিজের সততার প্রমাণ রেখে যান, 'মহানগর'-এর আরতিও পরিচালকের সেই মানসিকতার প্রতিভূ।

আরতির সাংসারিক ঝামেলা চরমে ওঠে ছেলের জ্বর হলে। সুব্রত একটা পার্ট টাইম চাকরি পাবার আশ্বাসে আরতিকে বারবার চাকরি ছেড়ে দিতে বলে। তার ভেতর আবার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিতে থাকে। আরতির চাকরির প্রয়োজন কেবল সংসারের সুবিধে অসুবিধের দিকে তাকিয়ে ঠিক হয়, আরতির কোনো সুবিধে কোনো শখ-সাধ পূরণের কথা ভেবে নয়। যে বাবার দোহাই দিয়ে সুব্রত আরতিকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করতে চায়, যে সাংসারিক শান্তির কথা বলে মাত্র দেড় মাস আগে সে সব যুক্তি কোথায় ছিল? কেন সে তখন একটা পার্ট টাইম চাকরির চেষ্টা করেনি? আরতি যে ক্রমশ নিজের

পরিচয়ের ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছিল, তাই কি সুব্রতকে অস্বস্তিতে ফেলছিল? তার অধিকারবোধ কি ব্যাহত হচ্ছিল? এসব প্রশ্ন তোলা বোধহয় একেবারে অসঙ্গত নয়।

এ সব প্রশ্ন করতে করতেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাই। সুব্রতর ব্যাঙ্কে তালা পড়েছে। তার চাকরি নেই। চাকরি ছাড়বাব যে দরখাস্ত সে নিজের হাতে লিখে আরতির ব্যাগে ভরে দিয়েছিল, ফোনে সেই সুব্রতর উদ্বিগ্ন গলার স্বর বেজে ওঠে—'দিও না, বুঝেছ? চিঠিটা দিও না। আমার ব্যাঙ্কে তালা পড়েছে, আমার চাকরি নেই। তুমি চিঠিটা দিও না, বুঝেছ? সন্ধেবেলা সব কথা হবে।' এই সেই গড়পড়তা বাঙালী চরিত্র। যে সুযোগমতো ভোল পাল্টায়। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে এরা নানা বেশে নানা ভূমিকায় এসেছে। 'জনঅরণ্য'র নায়ক 'গণশত্রু'র কাগজের সম্পাদক এরা এই শ্রেণীর। 'মহানগর'-এর সুব্রতকে এদের সমান না ধরলেও তার চরিত্রে সেই ন্যুব্জতার বীজ রয়ে গেছে।

চাকবিসূত্রে আরতি এমন কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল যা ঘরের মধ্যে থেকে কোনোদিনই সে অর্জন করতে পারত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা কলহ অধিকারবোধ মিলেমিশে থাকে কিন্তু পুরুষ নারীকে কি চোখে দেখে, সৌজন্য ভদ্রতার পাশাপাশি কত অসম্মান থাকে সে বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না। নারী ভোগের সামগ্রী পুরুষের কাছে, আর তাই সে দোষী, আর অকারণে হলেও অপমানের যোগ্য। নারী কেবল নারী বলেই সন্দেহের বস্তু। এই অনুভূতি তার কাছে নতুন তার সহকর্মিনীর অপমানে সে নিজেকে অপমানিত মনে করে। ব্যক্তিসত্তা ছাড়িয়ে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এটা তার আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা।

অফিসে কাজ করতে করতে আরতি সহকর্মিনীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইডিথ নামে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। অ্যাংলো মেয়েরা স্বভাবতই বাঙালি মেয়েদের তুলনায় সব দিক থেকে এগিয়ে ছিল সে সময়। ইডিথের কর্মতৎপরতা, স্মার্টনেস, নিজেদের পাওনাগণ্ডা বুঝে নেবার ক্ষমতা আরতিকে মুগ্ধ করেছিল। অফিসের বস্ মিঃ মুখার্জীর ইডিথের এই হিসেবি ধ্যান-ধারণা ভালো লাগে নি। আরতি কিছুটা উপযুক্ত হয়ে উঠতেই তিনি ইডিথকে সরাবার মতলব করেন। আরতিকে প্রোমোশন দিলে সামান্য কিছু টাকা বেশি দিতে হবে, কিন্তু ইডিথকে রাখলে পুরো মাইনে এবং উপরি হিসেবে ঠিকমতো কমিশনও দিতে হবে। প্রাইভেট কম্পানিগুলোতে দক্ষ শ্রমিককে সরিয়ে কম মাইনেতে কম দক্ষ শ্রমিককে রাখার পক্ষপাতী। মিঃ মুখার্জীও তার ব্যতিক্রম নন। ইডিথ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে মিঃ মুখার্জী সেই সুযোগটা নেন। ইডিথের অসুস্থতাকে তিনি মনে করেন ভান, আসলে অ্যাংলো মেয়েদের চরিত্রই খারাপ। তারা ফুর্তি করে বেড়ায় বলে অফিস কামাই করে। এই সিদ্ধান্ত থেকে ইডিথকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। এই ঘটনা আরতির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সেই মুহূর্তে মুখার্জী আর আরতির সংলাপ এই রকম ঃ—

আরতি—আপনি ইডিথকে কী বলেছেন?

মুখার্জী—কি ব্যাপার, আপনি?

আবতি—আপনি অপমান করেছেন। ওর চরিত্র সম্বন্ধে.....

মুখার্জী—আপনি ঐ ফিবিঙ্গি মেয়েটার হয়ে আমার সঙ্গে fight করতে এসেছেন?

আরতি—আপনি ইডিথকে কী বলেছেন?

মুখার্জী—অত উত্তেজিত হবেন না, মিসেস মজুমদার—
আরতি—আপনি ওকে অপমান করেন নি?

আরতি—ইডিথ আপনার কর্মচারী হতে পারে, কিন্তু আমি ওর সঙ্গে চার মাস কাজ করছি। ও আমার বন্ধু, ওকে আমি জানি। আমি ওর বাড়িতে গিয়েছি। ওর যে অসুখ সেটা আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি।

মুখার্জী—মিস সিমন্‌স আপনার কী রকম বন্ধু জানি না, ফিরিঙ্গি মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার কতখানি জ্ঞান আছে সেটা জানতে পারি কি?

এই পরিপেক্ষিতে শান্ত অনুগত মেয়েটি ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। নিজের পদোন্নতি অবহেলা করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে, তার বস্‌ মিঃ মুখার্জীকে ইডিথের কাছে ক্ষমা চাইতে বলে। নিষ্ফল ক্রোধে তার পরিবারের জীবন-ধারণের একমাত্র অবলম্বন একশো টাকার চাকরি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় সে হয়তো বেশি উত্তেজিত, হয়তো বাস্তব বুদ্ধি-বিবেচনাহীন, কিন্তু সে কি ভুল? শুধু উত্তেজনায় নিঃস্ব হয়ে পথে দাঁড়ানো যায় না; তার জন্য চাই সততা এবং সাহস।

১৯৬৪-র ১৮মার্চ (পূর্ব পাকিস্তানের) ঢাকায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় ছবি হিসেবে 'মহানগর' দেখানো হয়। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হাজার হাজার মহিলা ছবিটি দেখবার জন্য ধর্না দেন, তাঁদের অনুরোধে একটানা দশ বার ছবিটা দেখানো হয়। এই সংবাদটার উল্লেখ করা হল এইজন্য যে, মেয়েদের কাছে 'মহানগব' ছবিটা সাড়া ফেলে দিয়েছিল। তাদের এই উন্মাদনার কারণ এই ছবির নায়িকা আরতি। ঘরের বউ বাইরে বেরিয়ে চাকরি করছে, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করছে, ভালো জামা-কাপড় পরছে, শুধু এইটুকুই তাদের টানে না। যা তাদের মুগ্ধ করে তা হল আরতি নামে মেয়েটির ঋজুতা, সাহস, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা।

নারীমুক্তি বা নারী স্বাধীনতা বলতে যা বোঝার আরতি তার প্রতীক নয়। স্বামী, শাশুড়ি, শ্বশুর সকলের অনুগত থেকে সংসারে সুবিধার জন্য সে চাকরি নিয়েছে। এই নতুন পথে স্বামীকেও সঙ্গী করে নিয়েছে। জীবনের নতুন সংকট তাদের দুজনকে এক জায়গায় এনেছে।

আরতির স্বামী সুব্রতব কথা বলতে গিয়ে বেশ কিছু নেতিবাচক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শেষের দিকে এসে এই চরিত্রের মধ্যে ইতিবাচক দিক ফুটে উঠেছে। সময়ের পটভূমিকায় তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েরা যখন অস্তিত্বের টানাপোড়েনে ব্যক্তিত্বের আদল গড়ে তোলার চেষ্টা করে, তাদের জীবনে পুরুষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে বাধ্য। কখনো তা ইতিবাচক কখনো তা নেতিবাচক। আরতির সৌভাগ্য তার জীবনে প্রথম চরম দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নেবার সময় তার স্বামী বন্ধুর মতো পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। উপার্জনহীন একটা পরিবারে চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্তে যেখানে হতাশায় ডুবে যাবার কথা, সুব্রত সেখানে বলতে পেরেছে, 'জানো, আজ আমাদের দুর্দিন, আজ বাদে কাল কি হবে কিছু ঠিক নেই—তবু আমার ভালো লাগছে।' এই ভালো লাগা কেবল দূরে সরে যাওয়া স্ত্রীকে কাছে ফিরে পাওয়া নয়, স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতিও দেওয়া।

আরতির সাহসের প্রশংসা করে সুব্রত তার মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে। ছবির শেষে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তারা দুজনে এই মহানগরের পথে বেরিয়ে পড়েছে চাকরির সন্ধানে, সুব্রতর মনে আর প্রশ্ন নেই দ্বিধা নেই আরতির চাকরি করা উচিত না অনুচিত।

একটা চলচ্চিত্রের কাহিনী বিশ্লেষণই শেষ কথা নয়; যদিও চলচ্চিত্র প্রধানত কাহিনী-নির্ভর। আর সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রে গল্প বলার পক্ষপাতী। কিন্তু প্রতিটি শিল্প মাধ্যমের নিজস্ব ভাষা আছে। চলচ্চিত্রেরও আছে। তত্ত্বের কথা বলতে পারি না, তবে সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখলে যেটা মন টানে তা হল স্বাভাবিকতা। মনে হয় না কিছু বানিয়ে তোলা হল। মনে হয় পর পর যা ঘটছে স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটছে। একটা আঙ্গিক সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান গভীর হলেই এমন সারল্য, এমন স্বাভাবিকতা বজায় রাখা সম্ভব।

অন্য ছবির মতো 'মহানগর'ও পরিচালকের ছবি। পরিচালক এখানেও শিল্পীদের কাছ থেকে যথাযথ কাজ বুঝে নিয়েছেন, তাঁর হিসেব মতো। কোনো শিল্পীরই বাড়িয়ে পা ফেলা নেই। এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে যেতে চোখ কোথাও হোঁচট খায় না। ক্যামেরার সচ্ছন্দ ঘোরাফেরা, নিপুণ সংলাপ, অভিনয়, সঙ্গীতের প্রয়োগ চলচ্চিত্রের ভাষাকে আমাদের মতো অদীক্ষিত দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে।

'নষ্টনীড় ও চারুলতা'

সমরেশ বসু

আমার পক্ষে চিত্র সমালোচনা অনধিকার চর্চা। একথাটা বিনয় সহকারে বললেও আমরা বাঙালি দর্শক মাত্রই যে এক একজন ক্ষুদে সমালোচক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বায়স্কোপ দেখে বেরিয়ে আমরা সকলেই ভাল লাগা বা মন্দ লাগার সীমানা পেরিয়ে আরও যত কথা বলি, সেগুলোও সমালোচনার মতই শোনায়। যদিও ঠিক কাগুজে নয়, কিছু টেক্‌নিক্যাল কথাবার্তা বুনে দিতে পারলেই তাও আমাদের চিরাচরিত কাগুজে সমালোচনার মত হয়ে উঠতে পারে। অবিশ্যি সব কাগজের সমালোচনাই নিতান্ত কাগুজে নয়। কোথাও কোথাও আমরা সত্যিই সমালোচনার সন্ধান পাই। যা ভাল লাগার কিছু উচ্ছ্বাস প্রগলভতা মাত্র নয়, কিন্তু ভাল না লাগার কিছু তিক্ত বিক্ষুব্ধ বিস্ফোরণও নয় কেবল।

কথাগুলোর উদ্ভব 'চারুলতা'কে নিয়ে। সত্যজিৎ রায়-কর্তৃক চিত্রে রূপায়িত রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' (চিত্রে নামকরণ, 'চারুলতা') - কে ঘিরে আলোচনা এই পর্যায়ে এসেছে, তৈলাধারে পাত্র না পাত্রাধারে তৈল। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' না সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'। এক্ষেত্রে আমাকেও একটা পক্ষাবলম্বন করতে হয়েছে, যে পক্ষ থেকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'ই সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'। কিন্তু এই পক্ষাবলম্বন সমালোচক হিসেবে নয়, একথা আগেই কবুল করেছি। স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, এখন যে কোন বায়স্কোপ মাত্রকেই খেলনার মত ধরতে ছুটি নে, রুচিতে সাবালকত্বের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এখন বাছবিচারের প্রশ্ন, তাই নিতান্ত বেহিসেবী দর্শনের প্রমোদ নয়, তাই ভাল মন্দের কথায় নীরব থাকা কখনো কখনো কষ্টকর।

এখন আমরা জানি এবং বিশ্বাসও করি সাহিত্যের মতন ফিল্মও একটি শিল্প-মাধ্যম। সাহিত্যের যেমন প্রকাশের একটা নিজস্ব রীতি আছে, ফিল্মেরও তাই। ফিল্ম তার নিজের ভঙ্গিতে চলে, নিজের ভাষায় কথা বলে। তার ভাব-কল্পনার রূপ ভিন্ন প্রকার।

একই কাহিনী সাহিত্যে যেভাবে রূপ নেয় চিত্রে তা-ই অন্যভাবে রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে, যদি এ দুইয়ে-ই আমাদের অনুভূতির ক্ষেত্র এক করে দেয়। গল্প লেখক এবং চিত্র পরিচালকের তফাৎটা এইখানেই। আমি লেখক হিসেবেই এটা অনুভব করেছি। গল্পে যা লিখি তা-ই হুবহু ফিল্মে অনুসরণ করলে সম্ভবত আমার নিজের পক্ষেই বসে দেখা কষ্টকর হতো। হয়তো ছত্রে ছত্রে আমাকে অনুসরণ করলে আমার দিক থেকে কিছু আত্মসন্তোষের কারণ ঘটে, কিন্তু একটি সুষ্ঠু চিত্রোপহার থেকে বঞ্চিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কথাগুলো উচ্চারণ করবার সাহস করছি, নিশ্চয়ই চতুর্থ শ্রেণীর চিত্র পরিচালকদের কথা স্মরণ করে নয়। এমন কি দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীরও নয়। কারণ শিবকে বাঁদর করে গড়তে আমরা কম দেখিনি। অযোগ্য পরিচালকের হাতে পড়লে লেখকের মূল কাহিনী ও বক্তব্য কতদূর বিকৃত হয়ে উঠতে পারে, তার নজিরও সুপ্রচুর। নাম করে, সেসব তিক্ততার বোঝা বাড়িয়ে লাভ নেই। এইসব বিকারের মূলে অর্থকরী দিকটাই

প্রবল। তাছাড়া, পরিচালকদের অযোগ্যতা এবং এক ধরনের প্রাচীন কুসংস্কার কাজ করে। তাঁদের কাছে চিত্র তৈরী কতগুলো বাঁধা ফর্মুলার ওপর নির্ভরশীল। মানসিকতার দিক থেকে এঁরা এন্টারটেনমেন্ট-এ বিশ্বাসী।

আধুনিককালের প্রশ্ন, ফিল্ম প্রমোদ না শিল্প। কিছুকাল আগে বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক হিচকক্ কলকাতায় ঘোষণা করেছিলেন, ফিল্ম একটি প্রমোদ। এবং বলা বাহুল্য, কলকাতা ও বম্বের অধিকাংশ পরিচালকদের কাছে এটাই এখনো মূলমন্ত্র। কিন্তু, এ যুগে ফিল্ম যে স্তরে ওঠবার সাধনায় লিপ্ত, সে স্তরে ফিল্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হয়ে উঠবে। চিন্তা ও ভাবের গভীরে, এক নতুন ঐশ্বর্য্যের আবিষ্কার তার উদ্দেশ্য। হয়তো এর চূড়ান্ত জবাব এখনো পাওয়া যায়নি, কিন্তু পাওয়া যাবে এ আশ্বাস ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছে, এবং দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করতে পারি, আমরা এই নতুন সাধকদের দলে। তাতে সাধক 'নয়া বাস্তববাদী' কিনা সে বিচার আমরা করব না। কারণ, চার্লস চ্যাপলিন-এর বেলায় আমরা সে বিচার করি না। অথচ তাঁব আসন, আধুনিক পরিচালকদের শিরোমণি থেকে কোনক্রমেই টলানো যায় না।

আমাদের ভয় তাদের নিয়ে, যারা বাস্তব চিন্তা ও ভাবের দৈন্য থেকে প্রমোদে আশ্রয় নিয়েছে। আমি জানি, তাদের এই দৈন্যের জনতা-রুচি ও ব্যবসায়িক ভিত্তির জুজুবুড়িটা নিরন্তর চোখ রাঙায়। জেনেও একথা বলতেই হবে, এই চোখ রাঙানিকে ভয় পেলে, তার শিল্পীর আসন টলবেই।

অবিশ্যি এই সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে, কোনো কোনো সুযোগ্য পরিচালকের দুঃসহ দুর্গতিও আমরা দেখেছি। প্রযোজকের নিষ্ঠুর ও অমোঘ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শিল্পকে বিসর্জন দিতে হয়েছে তাঁদের। পরিণামে জনতার খুশির উচ্ছ্বাসে উজাড় করা টাকা হয়তো কিছু পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ, জনতার হৃদয়ে একটুও ঠাঁই পান নি। সে হিসেবে জনতা-মনস্তত্ত্ব কিন্তু অতীব বিচিত্র!

এ প্রসঙ্গে আমি একজন সুযোগ্য পরিচালকের ছোট্ট একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে চাই। এই পরিচালক বাংলা দেশের একটি মোটামুটি নাম করা উপন্যাসের চিত্ররূপ দিয়েছেন, এবং সুধীজনদের কাছ থেকে অনেক প্রীতি ও ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। চিত্রটি বিদেশেও প্রদর্শিত হয়েছে।

পরিচালক তখন নতুন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তব রূপায়ণ তাঁর লক্ষ্য। পিছনের কোনো জুজুবুড়ির চোখ রাঙানিকেও তাঁর পরোয়া নেই। তিনি স্বাধীনভাবেই, স্বাধীন চিন্তার দ্বারা চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। উপন্যাসের সমাপ্তিতে, নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদই কাহিনীর মূল বক্তব্যের একটি বিশেষ অংশ। সেই বিচ্ছেদ, জীবনধারণের মধ্যেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। অথচ পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ ছিল না, কোনো তৃতীয় পক্ষের উদ্ভবও হয় নি, আপাতদৃষ্টিতে কোনো বাধাই ছিল না। বাধা ছিল জীবনধারণের রীতি-নীতি-প্রাত্যহিকতার, জীবনধারণের পদ্ধতিব প্রতি বিশ্বাস ও সাহসের, পরস্পরকে বিড়ম্বিত করার আশঙ্কা ও ভয়ের, তাই বেদনাদায়কও বটে। তাই বিচ্ছেদের বেদনাই সত্য হয়ে উঠছিল। একজন সুযোগ্য বাস্তববাদী পরিচালক এখানে এসেই থিতিয়ে গেলেন। ফর্মুলার ভূত তখন তাঁর ঘাড়ে চেপে বসলো। তিনি স্থির করে বসলেন, এ ধরণেব বিচ্ছেদ চিত্রে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। অতএব হয় নায়িকার মৃত্যু অথবা মিলন, এ দুই পন্থার একটি ছাড়া কোনো উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত

নায়িকার মৃত্যুই সিদ্ধান্ত হল, তা ছাড়া আর বিচ্ছেদ রূপায়ণের কোনো উপায় ছিল না।

লেখককে বাধ্য হয়ে, পরিচালককে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি চিঠি দিতে হল। লেখক জানালেন, 'আপনার মুখেই অযোগ্য পরিচালকদের প্রতি নানান ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুনেছি, এখন দেখছি, আনিও তাদের মতোই কাজ করতে চলেছেন। এতে খুব ব্যথিত হচ্ছি। আইনত চিত্রের প্রয়োজনে কাহিনীর কিছু অদলবদল করবার অধিকার আপনার নিশ্চয় আছে (চিত্রস্বত্বের চুক্তিতে পরিচালক এই অধিকার লেখকের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকেন) কিন্তু জীবিতকে মৃত করে মূলকে এভাবে বদলাবার, বিশেষ করে এক্ষেত্রে, নিতান্তই অযোগ্যতার প্রমাণ হচ্ছে।...'

এই চিঠিতে পরিচালকের সংবিৎ ফিরেছিল, তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেন। এবং সেই পরিবর্তনের ফল যে ভাল হয়েছিল, নানান ত্রুটি সত্ত্বেও চিত্রটির প্রতি অকুণ্ঠ সংবর্ধনাই তার প্রমাণ। এ ক্ষেত্রে পরিচালকের কাঁধে যে ফর্মুলার ভূত চেপেছিল তার পিছনে ছিল দর্শকদের প্রতি অবিশ্বাস। দর্শকসাধারণ এই বিচ্ছেদের মূল সুরটাকে ধরতে পারবেন না, এই ছিল সন্দেহ। একথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, দর্শকসাধারণ সব সময়ে সব জিনিষ সম্যক বুঝেই যে প্রশংসা করেন, তা নয়। সুরের নাম না জানলেও সুর যেমন মুগ্ধ করে, আবেগকে উথলে তোলে, স্বরলিপি না জানলেও সঙ্গীত যেমন রসসিক্ত করে তোলে শ্রোতাকে এও অনেকটা তেমনি।

এই সব কথার অবতারণার মূলে, পরিচালকের কাহিনীকে ভাঙাচোরা অধিকারের বিষয়। এটা একটা নজীর। এবং এহ বাহ্য আগে কহ আর, কথাটা উঠেছে 'চারুলতা'কে নিয়ে। এ ক্ষেত্রে যেমন উপন্যাসের সমাপ্তির মূলকেই অনুসরণ বিধেয় ছিল, অন্যান্য ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। তার একটা উৎকৃষ্ট নজীর, 'চারুলতা'।

অভিযোগ উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় সতজিৎ রায় নানান ভাবে অদলবদল করে বিকৃত করেছেন। এই সব অভিযোগের উদ্ভবও সেই ফর্মুলার ভূতের মুখ থেকেই। এও এক রকমের কুসংস্কার। অভিযোগকারীদের বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথের গল্প ঠিক ঠিক পরিচ্ছেদ অনুযায়ী অনুসরণ করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যা বলেন নি, সত্যজিৎ রায় তাই করেছেন, এবং এই অভিযোগ তীব্র হয়েছে, চারু ও অমলের সম্পর্ক কেন্দ্র করে। স্বভাবতই নৈতিকতার প্রশ্ন উঠেছে, শুচিবায়ুগ্রস্তরা বিবিধ অনাচার দর্শনে কাতর হয়েছেন। তাঁদের নাসারন্ধ্র এবম্বিধ স্ফীত যে, 'চারুলতা'র মধ্যে এঁরা সেক্স-এর গন্ধও পেয়েছেন।

সেক্স যাঁদের কাছে গোমাংসতুল্য সেই সব নাতিবাগীশদের আমি আত্মানুসন্ধানে রত হতে বলব না। কিন্তু প্রথমে নিবেদন করব, ফিল্ম শিল্প, সাহিত্যের আক্ষরিক চিত্রানুবাদ মাত্র নয়। আগেই বলেছি, ফিল্মের নিজের একটা চরিত্র আছে, যেমন সব শিল্পেরই থাকে, এবং সে নিজের মতো সব কিছুকে দ্যাখে, নিজের মতো করে বলে। লেখকের কাছে সে গল্পের সন্ধান বটে, সেটাও ভাল লাগার জন্যেই সন্ধান করে, কারণ সেই ভাল লাগাটা তার নিজের শিল্প মাধ্যমে প্রকাশ করার, সৃষ্টি করার আকাঙ্খার জন্যে। এক্ষেত্রে লেখক লাইনে লাইনে অনুসরণ করার জন্যে নয়।

আরো একটু পরিষ্কার করে বললে, বোধহয় এইভাবে ব্যক্ত করতে হয়, ব্যাসদেবকৃত মহাভারতের কাহিনী নিয়ে আজ পর্যন্ত যতো নাটক উপন্যাস কবিতা ছোটগল্প দেশে বা বিদেশে রচিত হয়েছে, তার কোনটাই অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করা হয় নি। সে জন্যেই

মহাভারতের নানান কাহিনী নিয়ে লেখকদের ভাব কল্পনা আর এক নতুন সৃষ্টির তুল্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই এমন তুলনা অনেক দেওয়া যায়, ঠিক ঠিক যে কথাগুলো মহাভারতের চরিত্রের মুখ দিয়ে কস্মিনকালে উচ্চারিত হয় নি সেইরকম কথাই তাঁর কাব্যনাট্যের চরিত্রদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন বলে। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় নি, কিন্তু মহাভারতের কাহিনী তাতে পাঠকের কাছে আরো বেশী অর্থময় রূপ পেয়েছে, আরো সরস ও সুন্দর হয়ে উঠেছে, এবং একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই ধরণের উদাহরণ অসংখ্য উপস্থিত করা যায়। কিন্তু শুধু প্রবন্ধেরই বোঝা বাড়ে যদি ইচ্ছাকৃত বহেরাকে কখনো কানে শোনানো যায় না।

সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়ে'রই এক আশ্চর্য বিশ্বস্ত ও অপরূপ চিত্রসৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষার স্তবকের মধ্যে যে তীব্রতা লুকিয়ে ছিল, সত্যজিৎ তাকেই প্রকাশ করেছেন। ভূপতি ও চারু, এই দম্পতির প্রাণের বাসা ভাঙার যে ভয়ঙ্কর পরিণতি, যে দুঃসহ হাহাকার পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে ভাষার মধ্যে ফুটে উঠেছে, তার প্রতিটি ঝঙ্কারই আমাদের অনুভূতিতে একই সুরে বেজে উঠেছে। সত্যজিৎ রায় অমলকে বিলেতে পাঠালে, এবং চারুর গহনা বন্ধক দিয়ে প্রি-পেড টেলিগ্রাম করালেও ট্রাজেডির রস নিংড়ে আর এক ফোঁটা বেশী চোখের জলও বের করতে পারতেন না। উপরন্তু লয় যতো বিলম্বিত হতো, আর এক দিকের সুর ততোই কাটতো।

এ সবই হয়তো 'চারুলতা' চিত্রের ও রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়ে'র উদ্ধৃতি দিয়ে বহু ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই।

চারু ও অমলের সম্পর্ক নিয়ে যেখানে বিরক্তিকর মাছির ভ্যানভ্যানানি বড় বেশী সোচ্চার হয়ে উঠেছে, সেখানে ইতিমধ্যেই অজস্র ঝাপটা মেরেছেন দর্শকেরা। অভিযোগকারীদের আপত্তি, চারু অমলকে জড়িয়ে ধরে কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ রবীন্দ্রনাথ কোথাও সে কথা লেখেননি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক গল্পে অনেক কথাই লেখেননি, কারণ তিনি তাঁর পাঠকদের চিন্তা ও কল্পনার জন্যেও কিছু রেখে গিয়েছেন, সত্যকে অনুভব করবার জন্যে। দুর্ভাগ্য তাঁদের যাঁরা তা অনুভব করতে পারেন নি। নইলে 'নষ্টনীড়' পাঠ করার পর, এ প্রশ্নের উদ্ভব হয় কেন যে, চারু তার একটি আবেগময় মুহূর্তে অমলকে জড়িয়ে ধরলেই 'নষ্টনীড়' নষ্ট হয়ে যায়। অমলের জন্যে চারুর বিরহভোগের সেই রাত্রিগুলো, স্বামীর কাছে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করতে না পারার সেই আড়ষ্ট যন্ত্রণাদায়ক দিনগুলো, কোথাও কি একথা অস্পষ্ট রেখেছে, চারু মনে মনে সবরকমে অমলের কাছে সমর্পণ করেছে? নারী চিরদিন পুরুষকেই যেভাবে পেতে চেয়েছে চারু ঠিক সেইভাবেই অমলকে চেয়েছিল, কারণ অমলই তার নারীত্বের সমস্ত ক্ষুধাকে জাগিয়ে তোলার সেই প্রথম পুরুষ। পুরুষ সেখানে কতোখানি নির্বিকার ছিল তা দেখে লাভ নেই, নারী যখন তার স্বর্গ রচনা করে তখন সেই স্বর্গ তার আপন হাতে গড়া, একান্ত নিজস্ব। সে নিজেও জানে না, এই অমোঘ ও অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতি তার ভিতরে কি বিচিত্র রূপকারের কাজ করে চলেছে। চারুও জানতো না। তার নিঃসঙ্গ নারী জীবনের সঙ্গী হয়ে এসেছিল অমল, কিন্তু কবে একদিন তার নিঃসঙ্গ হৃদয়েরও রাজা হয়ে বসেছিল। এই অপরিণামদর্শী ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ তার অজানা ছিল। যখন জানা গেল, তখন প্রাণের সকল দুয়ার বন্ধ। সেই বন্ধ দুয়ারকে যতোই ধাক্কা দেওয়া যায়,

সে ততোই এঁটে বসে। যতোই এঁটে বসে ততোই আমরা বুঝতে পারি, চারুর দেহমন সবই অমলময়। নিশ্চয়ই এমন কোন নাবালক নেই যিনি এর থেকে ধরে নেবেন চারু-অমলের কোনো দৈহিক সম্পর্কের ইঙ্গিত করছি আমি। বাস্তবে তা ঘটেনি। কিন্তু চারুর মর্মের মূলেমূলে, তার অবচেতনের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে স্বাভাবিক মানবিক রস নিশ্চিত বহেছে। সেই জন্যেই চারু সৎ, সুন্দর, স্বাভাবিক আর নারীর এই প্রকৃতিগত গুণগুলোই তার জীবনের ট্রাজেডিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

সত্যজিৎ রায় চারুকে প্রকৃতির কাছাকাছি করে দেখেছেন, এবং সেটাই ঠিক, আর সেইজন্যেই নষ্টনীড়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনাভঙ্গির অন্তরালে, চারুর যে জীবনতৃষ্ণার তীব্রতা (প্যাশান) ছিল, তাকে সুমুখে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির কাছাকাছিকে কোনো অমহৎরূপে ব্যাখ্যার সুযোগ রাখতে চাইনে। এইভাবে বলতে পারি, কৃষ্ণ অর্জুনকে নির্বিকার সংগ্রামের উপদেশ দিতে গিয়ে গীতার সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু দ্রৌপদীর বন্ধ চোখের সামান্য দৃষ্টিপাতেও তাঁর পায়ে কুষ্ঠ হয়েছিল। কারণ, সে দৃষ্টি ছিল সন্তানহারা শোকময়ী মায়ের যিনি জঠরে ধারণ করেন, জন্ম দেন। সেইজন্যেই নারীকে প্রকৃতির সব থেকে নিকটবর্তী বলা হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা নিবিড়, সেইজন্যেই দেহের মূল্য তার কাছে অনেক বেশী গভীর ও অর্থময়। তার ভালবাসা তাই দেহকে বাদ দিয়ে, অনেকটা শিকড়হীন গাছের মতো। দেহহীনতা এখানে কোনো মহত্ত্বই বাড়ায় না।

চারুর সততাও সেখানেই প্রমাণিত যেখানে সে ভূপতিকে দেবার জন্যে আর কিছুই খুঁজে পায় না। এবং সত্যজিৎ রায় সেখানেই আবিষ্কারক, যেখানে তিনি 'নষ্টনীড়' থেকে চারুর বাসনাকে টেনে তুলে ধরেন। আর এই একই কারণে চারুর বাগানের দোলনায় বসে সন্তানকোল প্রতিবেশিনীকে দেখে অমলের দিকে ফিরে তাকাবার সার্থকতা আমাদের কাছে যথার্থ ও সুন্দর প্রতিভাত হয়।

'নষ্টনীড়' গল্পে একথা বলা হয়েছে, কাহিনীর যখন শুরু চারু তখন যুবতী। সুস্থ স্বাস্থ্যবতী চারু তবু সন্তানবতী হয়নি। নিশ্চয় এ কথা বলে দেবার প্রয়োজন হয় না চারু অবহেলিতা। অথচ এই অবহেলা ভূপতির ইচ্ছাকৃত নয়, কাজপাগল বুদ্ধিজীবীটির কাছে ভালবাসার যে একটা স্বাভাবিক সুন্দর মজুরি আছে, অজ্ঞাত ছিল। যখন সে যেচে মজুরি আদায় করবার জন্যে হাত বাড়ালে, জীবনসত্যের নিষ্ঠুর নিয়মেই তখন বেড়া ডিঙিয়ে ভালবাসার ফুল ফুটেছে আর এক শরিকানায়

সম্ভবত এবার আমার থামার সময় হয়েছে। থামবার আগে তাই আর একবার বলে নিই, সত্যজিৎবাবুর 'চারুলতা'র মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়ে'র সেই দুঃসহ বেদনাকেই প্রত্যক্ষ করেছি। তবু যাঁদের সন্দেহ, তাঁরা 'নষ্টনীড়ে'র শেষ পাতায়, মৈশোর যাবার সিদ্ধান্তের পর, চারু সঙ্গে যেতে চাওয়ায়, ভূপতি যে কথাগুলো ভেবেছিল চারুর সম্পর্কে, সেই কথাগুলো আবার পাঠ করতে বলি। তাতে ভূপতির রোদন ও চারুর, 'চারুলতা'র বাস্তবতা অনুভূত হবে। অন্যথায়, চারুর একেবারে শেষ কথায়, ভূপতির মৈশোরে আমন্ত্রণেও যেখানে সে যেতে অসম্মতি জানায়। কারণ, একটা মুহূর্তের ভয়ে সে ভূপতির সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, পরমুহূর্তেই 'না' বলেছিল। কারণ ভূপতিকে নয়, অমলকেই সে মনে মনে সব দিয়েছিল। অতএব, দুজনের নীড় যে নিশ্চিতভাবে ভেঙেছিল, তাতে সন্দেহ নেই আর সত্যজিৎবাবুর স্তব্ধ নির্বাক প্রস্তরীভূত চিত্রে আমরা তা দেখছি।

শিল্পীর স্বাধীনতা

অশোক রুদ্র

ইংরেজিতে একটি কথা আছে Hamlet without the prince of Denmark. আমরা বাংলায় বলি, সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ। কোনো শিল্পী যদি Prince of Denmark-কে বাদ দিয়ে Hamlet-এর মঞ্চাভিনয়ের আয়োজন করেন অথবা সীতা কার বাপ না জেনে রামায়ণের চলচ্চিত্র রূপাযণে প্রয়াসী হন তাহলে আপত্তিটা নিশ্চয়ই এই বলে কেউ করবে না যে অন্য সব স্বাধীনতার মতো শিল্পীর স্বাধীনতারও একটা সীমা থাকা উচিত। সন্দেহটা উঠবে একেবারেই অন্য প্রকৃতির—শ্রীসত্যজিৎ রায় আমাকেই লক্ষ্য করে একটি ইংরেজি কাগজে যা লিখেছেন[১] তারই উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে হবে, শিল্পী নিশ্চয়ই, — 'to Say the least, imperceptive.'

রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার গল্পটা একটি নারীহৃদয়ের গল্প বলে আমার এতদিন যাবৎ ধারণা ছিল। রতনকে নারী বলে বর্ণনা করায় কোনো পাঠক যদি আপত্তি তোলেন তো তাঁকে গল্পগুচ্ছের[২] ৩৮ পৃষ্ঠায় লক্ষ করে দেখতে অনুরোধ করব লেখকের আক্ষেপ, 'কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝবে'। আগে মেয়েটির যখন প্রথম উল্লেখ পাই তখন পড়ি 'বয়স বারো—তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।' অর্থাৎ যে বয়সে অন্য মেয়েদের বিবাহ হয় সে ঐবয়সের। শ্রীসত্যজিৎ রায় 'তিন কন্যা' ছবিতে রবীন্দ্রনাথের পোষ্টমাস্টারের চিত্ররূপ হিসেবে যা পরিবেশন করেছেন তাতে দেখি রতন একটি শিশু, বয়স আটের বেশি হবে না। আমার এতদিন ধারনা ছিল 'পোষ্টমাস্টার' গল্পটির প্রাণকেন্দ্রই হল এই সংলাপটি ঃ

[পোষ্টমাস্টারের অহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদাবাবু আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?' 'পোষ্টমাস্টার কহিল', 'সে কী করে হবে']

ধারণা ছিল গল্পের সবচেয়ে বড় ঘটনাই হল এই যে [সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে ও জাগরণে বালিকার কানে পোষ্টমাস্টারের হাস্যধবনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, 'সে কি করে হবে।']

সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বিবরণই হল [কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোষ্টঅপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে—] পোষ্টমাস্টার গল্পটির উল্লেখে যে দৃশ্যটি সেই ছোটবেলার প্রথম পড়া থেকে আজ অবধি সর্বদা সর্বপ্রথম মানসচক্ষে উদিত হয়েছে তা হল 'যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।'

এই সংলাপ, এই ঘটনা,এই বিবরণ, এই দৃশ্য এদের কোনটিই শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'পোষ্টমাস্টারে' পাওয়া যায় না। একটি করুণরসাত্মক গল্পের চিত্ররূপ দেখতে গিয়ে আমরা একটি অদ্ভুত বা বীভৎসরসাত্মক কাহিনী দেখে ফিরে । কারণ শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ছবিতে রতনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব অর্জন করেছে একটি ভীতি-উদ্রেককর উন্মাদ চরিত্র। পোষ্টমাস্টারের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়র সময়ে কোনো বালিকা-হৃদয়ের মর্মব্যথা পিছু টানে না, বিঘ্ন ঘটায় পথের উপর সেই উন্মাদ চরিত্রের উপস্থিতি।

মণিহারা গল্পে অমরা পড়ি [ঠক্ ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্‌ঝম্ শব্দ শোনা] যেতে [পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্র দৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না।] কিন্তু প্রথম রাত্রে সে [তাহার অসম্ভব আকাঙ্খার আশ্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল] দ্বিতীয় রাত্রিতে [ফনিণভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সে বিদ্যুদ্‌বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল 'মণি।'] সেদিনও ব্যর্থ হয়ে [নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।] তৃতীয় রাত্রিতে ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে।] যে মণিমালিকা সম্বন্ধে যে ফণিভূষণ আগে বলছে, 'এসো মণিমালিকা, এসো তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করে. আয়নার সন্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে' এবং যে ফণিভূষণ বিগতা পত্নীর প্রেতাত্মার সঙ্গে মিলনের অকাঙ্খায় [দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বলি] তাদের অন্তিম সাক্ষাতের দৃশ্যটা রবীন্দ্রনাথে যা আছে তার মধ্যে এইটুকু অংশ মনে হয় বিশেষ রকমের গুরুত্বপূর্ণ ঃ [শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচান আছে, কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখান পানের বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।] কিন্তু শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ছবিতে আমরা কি দেখি? মণিমালিকা আসে, 'তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারিদিকের এই সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড় সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো' ফণিভূষণের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে নয়, একটি নতুন সোনার গয়নার লোভে, যার কোনো উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের গল্পে নেই। মণিমালিকা আসে ফণিভূষণের ভালোবাসার আকর্ষণে না, সোনার আকর্ষণে। [নহবতের শাহানা আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়ত সুন্দর কালো-কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল। সেই চোখে তাকিয়ে কঙ্কাল ফণিভূষণকে সম্মোহিত করে না, অশ্লীলভাবে অস্থিময় হাত দিয়ে গয়নাটির জন্য তার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে। ফণিভূষণও [মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল] না, কঙ্কালের অনুগমন করে নদীর স্রোতে জীবন হারাল না। 'ভয়ার্ত হয়ে কুৎসিত গলায় চিৎকার শুরু করল। এই কাড়াকাড়ি ও চিৎকারই হয়ে দাঁড়ায় গল্পটির চরমবিন্দু, একটি প্রেমের গল্পের চিত্ররূপ দেখতে গিয়ে আমরা দেখে আসি নিতান্ত একটা ভুতুড়ে গল্প। পোষ্টমাস্টার ও মণিহারা দুটি গল্পের ক্ষেত্রেই আমরা দেখি চলচ্চিত্রশিল্পী

শুধু সংলাপ এবং ঘটনা পরম্পরার পরিবর্তনের মধ্যেই নিজের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, গল্পের থীম পর্যন্ত সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন, যে-রসে গল্প লেখা তাকে পর্যন্ত গ্রহণ না করে অন্য রসের সিঞ্চন করেছেন, করুণরসের গল্পকে বীভৎসরসে এবং আদিরসের গল্পকে ভয়ানকরসে ভসিয়ে দিয়েছেন। এতটা স্বাধীনতা যখন নেওয়া হয়েছে তখন কোনো বিশেষ ঘটনা কোনো সংলাপকে কেন বর্জন করা হল তার প্রশ্ন তুলে বোধ হয় কোনো লাভ নেই।

গল্প উপন্যাস বা নাটকের চিত্ররূপ দিতে গেলে তাতে যে খানিকটা অদল-বদল করতে হতে পারে এ তত্ত্ব বা তথ্যটা আমার একেবারে অজ্ঞাত নয়। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের যদিও ধারণা যে এদেশের যারাই তাঁর ছবির কোনো দোষ ধরে তারা কখনই কোনো ভালো ছবি দেখেনি এবং সেজন্যই কিছু বুঝতে পারে না। তা সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে বলব, ভালো-মন্দ কিছু ছবি আমরাও দেখেছি এবং সেই দেখার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং নিতান্তই নিজের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় পরিবর্তনের শিল্পসংগত প্রয়োজন দুই কারণে হতে পারে। প্রথমত, গল্পে বা উপন্যাসে লেখক অনেক ঘটনাকে অত্যন্ত সাধারণ খবরের আকারে পাঠককে শোনাতে পারেন, কোনো মানসিক অবস্থার উল্লেখ করতে পারেন, কিন্তু কোনো বিশেষ ঘটনা বা সংলাপের মারফৎ তাকে নাও ফুটিয়ে থাকতে পারেন, চলচ্চিত্রকার যদি ঘোষণার আকারে সেই খবর দর্শককে লিখে বা কোনো টিপ্পনীকারের কণ্ঠে তা শোনাতে চান তো তাঁকে সেখানে ঘটনা ও সংলাপ সংযোজনের স্বাধীনতা নিতেই হবে। যেমন, ধরা যাক নষ্টনীড়ে যেখানে ভূপতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং যাহা মুহূর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল'— এখানে ভূপতির' এই দেখা ও এই ভাবনাকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে শিল্পীকে কিছু ঘটনা এবং কিছু সংলাপের উদ্ভাবন করতেই হবে। কারণ ঠিক এই স্থানটিতে কোনো বিশেষ একটি ঘটনা বা বিশেষ কোনো সংলাপ গল্পলেখক দেননি, যদিও চারুর কি ধরনের ব্যবহার ভূপতি দেখলে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। তেমনি পোষ্টমাস্টার গল্পে গল্পলেখক এটুকু লিখেই খালাস ঃ 'বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তে সে জননীর পদ অধিকার করিল।' কিন্তু এখানেও গল্পলেখকের বক্তব্যকে রূপদান করতে চলচ্চিত্রশিল্পীকে উদ্ভাবনের আশ্রয় নিতেই হবে।

সংযোজনের প্রয়োজন যেমন হতে পারে, বর্জনেরও হয়। বর্ণিত ঘটনাপুঞ্জাদি অত্যধিক হয় এবং তাদের মধ্যে যোগসূত্র যদি ক্ষীণ হয় তো চলচ্চিত্রে রূপ দিতে অনেক অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সংলাপকে ছেঁটে বাদ দিতেই হবে যদি কালের ব্যাপ্তিতে দু আড়াই ঘন্টায় সীমাবদ্ধ এই বিশেষ মাধ্যমে সংহতিপূর্ণ শিল্পরস পরিবেশন করতে হয়। এই সমস্যা উপন্যাসেই দেখা দিতে পারে, ছোটগল্পে না কারণ সংহতিহীন ঘটনাপুঞ্জ ও পরিহার্য সংলাপে ভারাক্রান্ত লেখাকে ছোটগল্প আখ্যাই দেওয়া যায় না। এই জাতীয় উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপায়ণ অনেক সময়েই অসন্তোষকর হয় কারণ ক্ষীণ যোগসূত্রে গ্রথিত বহুল ঘটনাপুঞ্জ ও সংলাপাবলীও সামগ্রিকভাবে একটা রসের সৃষ্টি করতে পারে যা তাদের থেকে বেছে বেছে তুলে নিয়ে সংহত করে গ্রথিত করা কোনো চিত্রকাহিনী পাওয়া যেতে পারে না। উপন্যাসের প্রকৃতির উপর এই পদ্ধতির সাফল্যের সম্ভাবনা নির্ভর করবে, বলাই বাহুল্য। David Copperfield -এর চিত্ররূপ দেখে বিরক্ত না

হয়ে উপায় নেই, কিন্তু A Tale of Two Cities-এর রসগ্রহণ করা অসম্ভব হয় না উপন্যাসের চিত্ররূপায়ণে শিল্পীকে বর্জন ও সংযোজনের স্বাধীনতাকে যেহেতু অনেক পরিমাণেই প্রয়োগ করতে হয় সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই তা সম্পূর্ণ নতুন একটি শিল্প-সৃষ্টিতে পরিণত হয়। এবং তা যদি শিল্প বিচারে মূল কাহিনীর সঙ্গে তুলার উৎকর্ষ দাবি করতে পারে তো সে স্থলে শিল্পবিচারে মূল কাহিনীর সঙ্গে তুলনীয় উৎকর্ষ দাবি করতে পারে তো সে স্থলে শিল্পীর স্বাধীনতা যথেচ্ছাচারে পরিণত হল কি হল না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অনেকটা অবান্তর। এই কারণেই সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' যে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' নয় সে নিয়ে নালিশ বা আক্ষেপ করা অর্থহীন। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র অবিকৃত চিত্ররূপ সম্ভবই না। তা এত দীর্ঘসূত্র, তাতে এত চরিত্র, এত ঘটনা, গতি এত মন্থর যে তাকে কেটেছেঁটেও এমন কিছুতেই দাঁড় করান যায় না যাকে বলা যেতে পারে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র চলচ্চিত্র। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'ও যেহেতু নিছক শিল্পবিচারে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র তুল্যমূল্য দাবি করতে পারে সেহেতু মূল কাহিনীর প্রতিবিম্ব না পেলেও, এমনকি বিভূতিভূষণের মেজাজ ও সুরের স্পর্শ না পেলেও শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' তার স্বকীয় রসেই আমাদের মজাতে সমর্থ হয়।

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'পোস্টমাস্টার' বা 'চারুলতা'ও তাদের স্বকীয় রসে দর্শকদের মুগ্ধ করতে পারে না এমন কথা বলছি না। কিন্তু আমার প্রশ্নটা অন্য। পোস্টমাস্টার মণিহারা বা নষ্টনীড় গল্পের চিত্ররূপায়ণে সংযোজন কিছু হতে পারে, কিন্তু বর্জনের শিল্পসংগত কারণ কি দেখান যেতে পারে? যেমন ধরুন নষ্টনীড়ের শেষ দৃশ্য ও সংলাপ ঃ [...হঠাৎ চারু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, 'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না।'] [ভূপতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিল। মুষ্টি শিথিল হইয়া ভূপতির হাত খুলিয়া আসিল। ভূপতি চারুর নিকট হইতে সরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।] ...[ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল, 'না, সে আমি পারি না।' মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মতো শুষ্ক সাদা হইয়া গেল, চারু বলিল, 'না থাক।'] শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ভক্তসম্প্রদায় হয়তো বলবেন, এই দৃশ্য ও সংলাপ দিয়ে শেষ না করে শ্রীসত্যজিৎ রায় যেভাবে শেষ করেছেন তাই অনেক বেশি শিল্পসম্মত হয়েছে। এবং চারুকে দিয়ে ভূপতির হাত না চেপে ধরিয়ে অমলের হাত চেপে ধরানটাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বেশি পরিস্ফুটন করেছে। কিন্তু তবু প্রশ্ন করব, শ্রীসত্যজিৎ রায় যখন নষ্টনীড়ের চিত্ররূপ দিতে বসেছেন তখন এই অতুলনীয় দৃশ্য ও এই সংলাপটি বর্জন করলেন কোন শিল্পপ্রেরণার তাগিদে? এর আগাগোড়াই কি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় স্ক্রিপ্ট্—এর অন্তর্ভুক্ত করার কোনো অসুবিধা ছিল? এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। নষ্টনীড় গল্পটিতে প্রচুর ছোট ছোট ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে, প্রচুর সংলাপ আছে। তার একটিও কি কোথাও অপরিবর্তিত আকারে স্ক্রিপ্ট্-এর অন্তর্গত করা হয়েছে? একটা কোনো বিশেষ ঘটনার বিবরণও কি পরিচালক গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন? একটি কোনো বিশেষ ঘটনা বা একটি কোনো বিশেষ সংলাপকেও যে,পরিচালক তঁর স্ক্রিপ্ট্-এ স্থান দেননি তার অবশ্য একটা কারণ এই বোঝা যায় যে যেহেতু তিনি নষ্টনীড় গল্পের প্লট এবং থীম দুইই বদলেছেন তখন সমস্ত ঘটনা এবং সমস্ত সংলাপও

তাঁর নিজেকেই নতুন করে লিখতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের একটি থিম ছিল তাকে প্রকাশ করতে তিনি একটি অতি সুসংবদ্ধ সুসংহত প্লট -এর আশ্রয় নিয়েছেন, এবং বহুবিধ ঘটনা ও সংলাপের জটিল জাল বুনে বুনে এমন একটি গল্পে দাঁড় করিয়েছেন যা পড়ে আজ অবধি আমাদের অনেকের মনে হয়েছে এ হল এমন একটি শিল্পসৃষ্টি যাকে বলা যেতে পারে নিখুঁত। নষ্টনীড়ের চেয়ে ভালো গল্প লেখা থাকতে পারে, নষ্টনীড়ের লেখকের চেয়েও ভালো গল্পলেখক অনেকে থাকতে পারেন (এবং শ্রীসত্যজিৎ রায় তাঁদের একজন হতে পারেন) কিন্তু এই বিশেষ গল্পটির কোথাও একটি আঁচড় দেওয়ার উপায় নেই, একটি কমা সেমিকোলন এদিক-ওদিক করলেও গল্পটির রসহানি ঘটবে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় যাকে নষ্টনীড়ের চিত্ররূপবলে উপস্থিত করেছেন তাতে দেখি থীমও ভিন্ন, প্লটও ভিন্ন। চরিত্র সবকটিই পরিবর্তিত, সংলাপ আগাগোড়াই সংযোজিত। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের চারুলতা ও রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ে যেটুকু মিল আছে তেমন মিল দুনিয়ায় হাজার গল্পে আছে। একটি বিবাহিতা রমণী স্বামীর প্রেমে পরিতৃপ্তি না পেয়ে দ্বিতীয়পুরুষে আসক্ত হয়েছে। মিলন যেমন অসম্ভব, বিচ্ছেদ তেমনি অসহনীয়। এছাড়া নষ্টনীড় ও চারুলতার মধ্যে থীম-এর দিকে অন্য কোনো মিল আছে কি?

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ভক্তসম্প্রদায় সমালোচনার নামে যে-ধরনের ভাষায় তাঁর প্রতিটি ছবির স্তুতি গেয়ে থাকেন তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকার ফলেই থীম এবং প্লট উভয়কেই যে পরিবর্তিত করা হয়েছে এই প্রস্তাবের সপক্ষে কিছু যুক্তি উপস্থিত করার প্রয়োজন বোধ করছি, অন্যথায় করতাম না।

নষ্টনীড় গল্পটিতে কুড়িটি পরিচ্ছেদ— এক একটি পরিচ্ছেদ প্লট-এর একটি ধাপ। অত্যন্ত ঠাসবুনুনি গল্প, জটিল ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ঘটনার গতি অমোঘ এক পরিণতিতে উপনীত হয়েছে। কিন্তু পাঠক যদি মিলিয়ে দেখেন তো দেখবেন চতুর্দশ পরিচ্ছেদ থেকে শুরু করে বিংশতি পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অংশে যা যা ঘটে তার আগাগোড়াই শ্রীসত্যজিৎ রায় অবান্তর বলে মনে করেছেন। তারফলে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অংশে নষ্টনীড়ে যা আছে তা অবশ্যম্ভাবী কারণেই অবিকৃত রাখা যায়নি, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী নয় এমন অনেক পরিবর্তনও করা হয়েছে, কারণ শুধু প্লট নয়, থীমও ইচ্ছাপূর্বক বদলান হয়েছে। বাগান করা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার মধ্যে দিয়ে অমল ও চারুর যে সখ্য সম্পর্কের প্রকাশ গল্পে পাই, তা চিত্রে পাই না, কারণ এই প্রাথমিক সম্পর্কটা রবীন্দ্রনাথের থীম-এ আছে, শ্রীসত্যজিৎ রায়ের থীম -এ নেই। চারু ও অমলের সাহিত্য-চর্চার চেহারাটা ছবিতে ও গল্পে ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের চারু অমলের লেখা কাগজে প্রকাশ হয়েছে জেনে [খুশি হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু খুশি হইতে পারিল না] পরে যখন চারুকে না জানিয়ে অমল চারুর লেখা কাগজে প্রকাশ করে দেয় তখন [তাহার মন কোনো মতেই খুশি হইতে চাহিল না] কিন্তু তবু অমলের মনে হল [আনন্দে চারুর আর চৈতন্য নাই। এবং এই থেকে যে ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হল এবং তাকে যেভাবে মন্দা জড়িয়ে পড়ল তারই মধ্যে আমরা প্রথম নীড়ের মধ্যে নষ্টের ছায়া পড়তে দেখি। কিন্তু শ্রীসত্যজিৎ রায়ের চারু নিজেই অমলকে না জানিয়ে তার লেখা কগজে পাঠায় এবং যখন তা ছাপা হয়ে আসে তখন সেই কাগজ দিয়ে অমলকে মারে। শুধু এইটুকুতেই গল্পের প্লট ও থীম এবং চারু ও অমল উভয়ের চরিত্রই বিকৃত করা হয়েছে এ যিনি

মানবেন না তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে কোনো লাভ নেই। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে একটি দৃশ্য আছে [পাশের বারান্দা হইতে চাপা কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া ত্রস্তপদে গিয়া দেখিল চারু মাটিতে পড়িয়া উপুড় হইয়া কান্না রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এরূপ দুরন্ত শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল] এবং [চারুর পাশে বসিয়া কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।] শ্রী সত্যজিৎ রায় এরকম দুরন্ত শোকোচ্ছ্বাসের একটি দৃশ্য দেখিয়েই ভূপতিকে তার অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান দিয়ে দিলেন, যদিও রবীন্দ্রনাথ [অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল এবং যাহা মুহূর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল] এই বিন্দুতে পৌঁছাতে প্লট— এর আরও ছয়টি ধাপের প্রয়োজন বিবেচনা করেছেন। নষ্টনীড়ে ভূপতির জ্ঞানোদয় হয় ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে, এর মধ্যে চারুর গহনা বন্ধক রেখে প্রীপেড টেলিগ্রাম পাঠানর ব্যাপারটা ভূপতির গোচরে এলো [একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলক্ষ্যভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল] সন্দেহমাত্র, তার চেয়ে বেশি নয়। অমলের বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর বর্ধমান থেকে ফিরে এসে ভূপতি ভাবে [তবে কি চারু অমলকে ভালবাসে না।] এবং বিবাহ করতে যাওয়ার আগের মুহূর্তেও [বিছানায় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে (চারু) হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। হঠাৎ মন্দার কথা মনে পড়িল। যদি এমন হয়, অমল মন্দাকে ভালবাসে। মন্দা চলিয়া গেছে বলিয়াই যদি অমল এমন করিয়া—ছি! অমলের মন কি এমন হইবে। এত ক্ষুদ্র? এত কলুষিত? বিবাহিত রমণীর প্রতি তাহার মন যাইবে? অসম্ভব।] কিন্তু শ্রীসত্যজিৎ রায়ের চারুলতা অমলের বিদায়ের কাল উপস্থিত হলে, তার হাত চেপে ধরে তাকে যেতে মানা করে, তারও আগে অমলের বুকে মাথা রেখে কাঁদে। এই কান্না দেখাতে হয়েছে 'পর্বত পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে মেঘের কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল' অমলের এই উপলব্ধি ঘটাতে। রবীন্দ্রনাথের তা দরকার ছিল না। তিনি 'অমল একবার তীব্রদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারুর মুখের দিকে চাহিল—কি বুঝিল কি ভাবিল জানি না' এইটুকু যথেষ্ট মনে করেছেন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে, অমল যখন পর্বতের পথে সহস্র হস্ত গহ্বর সম্বন্ধে সহসা সজ্ঞান হয়েছে, কিন্তু যার পরেও চারু এতটা আত্মজ্ঞানহীন ছিল যে মনে করেছে, 'যদি এমন হয়, অমল মন্দাকে ভালবাসে।' সেই সময়ে চারু 'দীপ্তচক্ষে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিল।' কিন্তু পরিচালকের নির্দেশানুযায়ী বেচারী শ্রীমতী মাধবীকে আগাগোড়াই অমলের দিকে দীপ্তচক্ষে তাকিয়ে যেতে হয়। কারণ যে অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের চারু ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে পৌঁছেছে, 'এমন লোক নাই যার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যক্ত করা যায়, এমন স্থান নাই যেখানে সমস্ত হৃদয় উদঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে' সেই অবস্থায় শ্রীসত্যজিৎ রায়ের চারু পৌঁছেছে অমলকে দেখা-মাত্র।

প্লট এবং থীম, রস এবং চরিত্র, সবই পরিবর্তিত করাব পরও 'চারুলতা'কে নষ্টনীড়ের চিত্ররূপ বলে পরিচালক বিজ্ঞাপিত করেন কোন যুক্তিতে জানতে কৌতূহল হয়। এই কারণে কি যে, ভূপতিকে কাগজের সম্পাদক হিসেবেই দেখান হয়েছে এবং উমাপতির সিন্দুক থেকে টাকা বার করে নেওয়ার কাজটাকেও বেশ অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দেখান হয়? কিন্তু মৌলিক প্রশ্নটা হল, এই পরিবর্তনগুলির পিছনের শিল্পপ্রেরণাটা কি? একটা

কারণ অবশ্য আমাদের কারো কারো মনে হতে পারে তা এই যে নষ্টনীড় গল্পের সূক্ষ্মতা ও জটিলতা ফুটিয়ে তোলা পরিচালকের সাধ্যের বাইরে ছিল, সুতরাং যেমনটি ভাবে সাজালে তিনি ম্যানেজ করতে পারেন তেমন ভাবেই সাজিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু শ্রীসত্যজিৎ রায় বা তাঁর গুণগ্রাহী সম্প্রদায় নিশ্চয় এহেন যুক্তি মানবেন না। তাঁদের যুক্তিটা কি তা জানতে আগ্রহ হয়। তাঁদের বক্তব্যের একটা অবশ্য আগে থেকেই আন্দাজ করে নিতে পারি। চলচ্চিত্রের অ আ ক খ-ও যে বোঝে না (A tale of cities -এর মধ্যেও যে রস পায় ;) তার সে বিষয় নিয়ে কোনো কথাই বলা উচিত নয়। ছবির কোন কোন অংশে কি কি ধরনের অত্যাশ্চর্য প্রতীকের ব্যবহার রয়েছে যার গ্রহণ করার ক্ষমতাও আমার নেই, ক্যামেরার কাজের কত অপূর্ব নিদর্শন যা আমার চোখেও পড়েনি ইত্যাদি। কিন্তু এসব শুনবার পরও আমার প্রশ্ন থেকে যায় — পরিবর্তন করার স্বাধীনতা না হয় শিল্পীর ছিল, কিন্তু তার শিল্পসংগত প্রয়োজনটা কি ছিল?

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের পোস্টমাস্টার, মণিহারা ও চারুলতা রবীন্দ্রনাথের তিনটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প, যার দুটি অন্তত বিশ্বসাহিত্যের অন্যকম শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে পরিগণিত হওয়ার দাবি রাখে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত এরকম মনে করে নিয়ে তাদেব স্বকীয় শিল্পোৎকর্ষের কোনো বিচাবের প্রচেষ্টা এ রচনায় করিনি। রবীন্দ্রনাথের গল্পের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই তাঁরা এদের নানাবিধ সিনেমাটিক গুণ দেখে মুগ্ধ হবেন তা কল্পনা করতে অসুবিধা হয় না এবং এবংবিধ বহু গুণ নেই এমন কথাও আমি বলিনি। বিদেশে শ্রীসত্যজিৎ রায় সমাদৃত। এবং যদিও তাঁর অনেক ছবিই সমালোচক দ্বাবা নিন্দিত হয়েছে তথাপি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও তিনি প্রায়ই অর্জন করেন। তাঁর Two Daughters (তিন কন্যা থেকে এক কন্যাকে যে তিনি বিদেশীদের সম্মুখে উপস্থিত না করা সমীচীন বিবেচনা করেছেন সেটা কোনো আত্মসমালোচনাব ইঙ্গিত কিনা জানি না) এবং 'চারুলতা' বিদেশী সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন কবলে আশ্চর্য হব না। কিন্তু তাঁরা যে সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার প্রশংসাকালে গল্পলেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে একটু পিঠ চাপড়ে দেবেন সেটা ভেবেই প্রতিবাদের স্পৃহা জগছে। শ্রীসত্যজিৎ রায় মহৎ শিল্পী নিঃসন্দেহে কিন্তু অন্য কোনো দেশের কোনো মহৎ শিল্পী কি তাঁর দেশে সর্বজনবন্দিত অন্য কোনো শিল্পীর সৃষ্টির এমন নির্মম বিকৃতি সাধন করেছেন? শ্রীসত্যজিৎ বায় আমার চেয়ে অনেক বেশি ছবি দেখেছেন, তিনি হয়তো নির্মমতর বিকৃতির উদাহবণ গোটা কয়েক দিতে পারবেন। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের মঞ্চ অভিনয় ও চিত্ররূপায়ণের কিছু উদাহরণও তো আমরা দেখেছি। এমন কোনো দুঃসাহসী পরিচালক কি কোথাও জন্মেছেন যিনি শেক্‌স্‌পীয়রের কোনো শ্রেষ্ঠ নাটক মঞ্চস্থ বা সিনেমাস্থ করবেন তার অনেক কটি দৃশ্য বাদ দিয়ে এবং তার সংলাপ সম্পূর্ণ বর্জন করে, যিনি বলতে দ্বিধা করবেন না যে শেক্‌স্‌পীয়রের দুটি নাটককে তিনি একটি নাটকের মধ্যে একসঙ্গে পরিবেশন করেছেন, যেমন শ্রীসত্যজিৎ রায় নষ্টনীড় ও ঘরে-বাইরে এই দুটি নিয়ে তাঁর চারুলতা সৃষ্টি করেছেন বলে বলা হয়েছে এবং যার কোন প্রতিবাদ তিনি এখনও করেননি।

---

১. Mainstream, November 3.1962 এবং November 17. 1962 -র সংখ্যা দ্রষ্টব্য

২ আমার সবকটি উল্লেখ ও রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড থেকে কর [illegible]

চারুলতা ঃ প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

রুশতী সেন

কথা হচ্ছিল ভূপতির পড়ার ঘরে। উনিশ শতকের অর্থবান বাঙালি ভূপতি—সে সুরেন বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়, সে 'সেন্টিনেল' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদক। তার কাগজের 'মটো' 'ট্রুথ সার্ভইভ্স'।....'পলিটিক্স একটা জ্যান্ত জিনিস —রিয়েল—প্যালপেব্ল!' 'চারুলতা' ছবিতে ভূপতি বলেছিল, 'একটা অন্যায় ট্যাক্স যখন বসছে—অবিশ্যি লীটন সাহেবের দৌলতে তা প্রায়ই ঘটছে, তখন তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এই গরীব দেশের লোকগুলো কিভাবে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে—কষ্ট পাচ্ছে, সাফার করছে?...' যার উদ্দেশে ভূপতির এই সংলাপ, সেই অমল তখন পিয়ানোয় সুর তুলছে 'গড সেভ দ্য কুইন্।'

ভূপতির রাজনীতি, তার মতামত অথবা তার সময়কাল সম্বন্ধে যে-কটি তথ্য উপরের অংশটি থেকে নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তার তেমন কোনো হদিস রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-এ ছিল না। সে কাহিনীতে আমরা দেখেছি, ভূপতি ছিল ধনী, দেশটাও ছিল তখন গরম। জীবিকা নির্বাহের কারণে কাজ করবার প্রয়োজন ভূপতির নেই। কিন্তু সে কাজের মানুষ। কাব্যসাহিত্যে রুচি নেই তার, কিন্তু ইংরেজি বলা এবং লেখাতে আকৈশোর উৎসাহ। নিজের আর পরিপার্শ্বের উৎসাহে সে তাই একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। দিনের মধ্যে সময় তার বাড়তি হয় না কখনো। অথচ ভূপতির স্ত্রী চারুলতার অখণ্ড অবসর। বৈভবের সংসারে তেমন কোনো গৃহকর্ম নেই তার, না আছে পত্রিকার আবরণ ভেদ করে স্বামীর কাছে পৌছনোর উপায়। সত্যজিৎ তাঁর ছবিতে ভূপতির পত্রিকাটির নাম দিলেন 'সেন্টিনেল', আর ভূপতির জন্য বেছে নিলেন লর্ড লীটনের শাসনকাল। অর্থাৎ আঠারোশো ছিয়াত্তর থেকে আঠারোশো আশির বাংলাদেশ। কিন্তু ছবির প্রথম দিকেই ভূপতির মুখের কথায় জেনেছি আমরা মুদ্রণ আইন চালু হওয়ার পরে তিন বছর কেটে গেছে। আর খানিক পরেই দেখব বিলেতের আসন্ন নির্বাচনে লিবারালদের জয় নিয়ে ভূপতি আশাবাদী। এর পর মজলিসি আসর জমে উঠবে ভূপতির বৈঠকখানায়। বন্ধুবান্ধব নিয়ে সে বিজয়োৎসব পালন করছে—বিলেতের নির্বাচনে গ্ল্যাডস্টোন-এর বিজয়ের উৎসব। তা হলে আঠারোশো উনআশি-আশি 'চারুলতা'র ঘটনাকাল।

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-এ দেশ আর সমাজের পটভূমি কখনোই খুব সরব হয়ে ওঠেনি। ওই আকারের একটি গল্পের বিচারে তা হয়তো স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু সমাজ ইতিহাসের সঙ্গে সংসারের প্রতিঘাত যে কী অনিবার্য এমন এক আখ্যানের ক্ষেত্রে, সত্যজিৎ রায় তার 'নষ্টনীড়' পাঠ এবং 'চারুলতা' নির্মাণের মধ্যে দিয়ে তা বুঝেছেন এবং বুঝিয়েছেন। অথচ 'নষ্টনীড়' কাহিনী, এমনকি 'চারুলতা' ছবির পরেও যে সব আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে, সেখানে সংসার থেকে সমাজে আর সমাজ থেকে সংসারে সেই যাওয়া আসাকে তেমন গভীরতায় ভেবে দেখিনি আমরা। 'নষ্টনীড়' ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী কি

না অথবা অমলের সম্পর্কে তার বৌঠানের প্রকৃতই কোনো প্রেমের অনুভূতি ছিল কি না, এমন সব প্রশ্নোত্তরেই পাঠক কিংবা দর্শকের মনন বাঁধা পড়েছে। এমন জিজ্ঞাসায় তা কখনোই পৌঁছয় না যে 'নষ্টনীড়' কি কোনো একটি বিশেষ সংসারের কাহিনী? নাকি তেমন নষ্টনীড়ের আখ্যান প্রচ্ছন্ন আছে ইতিহাসের কোনো অধ্যায় ব্যেপে? মানুষে মানুষে সম্পর্ক অথবা সম্পর্কহীনতার এই কাহিনী, আনন্দ-অনুভব-অভিমান-ক্রোধ-জয়-পরাজয়ের এই সুর-বেসুর কি সমাজকে করে তোলে সংসারের দর্পণ, যেমন সংসারকে সমাজের? তিনটি মানুষ সেই দর্পণে কখনো দেখে নিজের বাহির, কখনো দেখে ঘর। দু দিকেই শূন্য বুঝি! তাই কি ভূপতি-চারুলতা-অমল 'নষ্টনীড়'-এর পরিণামে পৌঁছয়? 'নষ্টনীড়' কাহিনীতে নিহিত এই নীরবকে কোন স্বরূপে দেখেছিলেন সত্যজিৎ? সেখানেই শুরু হতে পারে 'চারুলতা' ছবি হয়তো বা 'নষ্টনীড়' কাহিনীরও আলোচনা।

সে সময় দ্বিতীয় আফগানিস্তান যুদ্ধের ঢালাও খরচ বইছে ভারতের মানুষ। বিলেতের রেশম শিল্পের সুবিধার্থে লীটন সাহেব কমিয়ে দিয়েছেন রেশমের উপর আমদানি কব। ফলে ভারতীয় রেশম শিল্পের চরম দুর্দশা। আঠারোশো আটাত্তর সালে হয়েছে অস্ত্র আইন, ভারতবাসীর অনিশ্চিতির বোধ তাতে বেড়েছে আরো। দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইনের দৌলতে বাংলায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির উপব কিছু নতুন নিষেধাজ্ঞা বসেছে। অমৃতবাজার পত্রিকাব মাধ্যম বদলে গেছে বাংলা থেকে ইংরেজিতে। উনিশ শতকের ইতিহাসের এই অধ্যায়ের সঙ্গে তো আমরা পবিচিত। এমন প্রেক্ষাপটে সত্যজিৎ রায়ের ভূপতি বলছে, ইউরোপে নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে ইংরেজ আফগানিস্তানে যুদ্ধ চালাচ্ছে, তাব খরচ ভারতবাসী বইবে কেন। নানা আইনের তাড়নায় তার দেশের মানুষের যে অবস্থা, তা নিয়ে ভূপতি চিন্তিত, ক্ষুব্ধ। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা কি ভূপতিবও পুরো চেনা? সে চিনতে পারে তাদের, আই সি. এস. পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত বয়সের ঊর্ধ্বসীমা কমে গেলে যে-সব ভারতীয়দের অসুবিধা। তবে রেশমের উপর আমদানি কর হ্রাস পেলে ভারতেব যে-সব মানুষ কর্মহীন হয়, তারা বুঝি লীটন সাহেবের কাছে যতটা অচেনা, ভূপতির কাছে তার থেকে কম অপরিচিত নয়। ভূপতির সংবাদপত্রটির মাধ্যম ইংরেজি। রাজনীতির মতো 'রিয়েল', 'প্যালপেবল্' বস্তু নিয়ে বাংলাভাষায় লেখা যেতে পারে, এ হয়তো ভূপতির ধারণার অতীত। দেশীয় ভাষায় পত্রিকা প্রকাশের কথা স্বপ্নেও ভাববে না সে। দেশীয় ভাষায় পত্রিকা তার বাড়িতে আসে, কিন্তু তা পড়বার সময় ভূপতির নেই—ওসব চারু পড়ে।

আসলে ভূপতি সেই মুষ্টিমেয় ভদ্রলোকদের একজন, যে অথবা যার পূর্বপুরুষ বেন্টিঙ্ক-মেকলে প্রবর্তিত ব্যবস্থায় শিক্ষিত হওয়ার অগ্রাধিকার পেয়েছিলেন। রামমোহন রায়ের মতো দেশহিতৈষী মনীষীর বিশ্বাস ছিল, যে ইংরেজ নিজেদের দেশে যুক্তি ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রায সভ্যতাব শিখরে উঠেছেন, তাঁরা সাম্রাজ্য শাসনেও একই আদর্শে পরিচালিত হবেন। রামমোহনের এই বিশ্বাসেই ভূপতিদের বিশ্বাস গড়া। সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা থেকে, 'সংবাদ কৌমুদী'র মতো পত্রিকা সম্পাদনায় যাঁর কীর্তির প্রসার, তিনিও ভাবতেন, ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যেই দেশে মঙ্গল। তাঁর বিবিধ অর্থনৈতিক প্রস্তাবে জড়িয়ে থাকে ভাবতে ইংরেজ বসতি স্থাপনের অনুকূল বক্তব্য, অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থন। আর পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষিত বাঙালি ভূপতি নিজের বৈঠকখানায় বক্তৃতা করে,

'বিলেতে পার্লামেন্টারি ইলেকশানে লিবারাল্‌রা জিতল কি টোরিরা জিতল তা নিয়ে আমাদের কিছু যায় আসে না। তবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাদের কাছে আজকের এই উৎসবের মূল্য অনেক বেশি। আমাদের এই উৎসব, আমাদের পোলিটিক্যাল কনশাসনেস, আমাদের "সেন্টিনেল" কাগজ—এ সবেরই মূলে রয়েছেন ঐ এক ব্যক্তি, রাজা রামমোহন রায়। কাজেই আজকের দিনে যিনি সর্বপ্রথম লিবারাল্ তাঁকেই আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য—"

এই কর্তব্যবোধে গায়ক জয়দেব তার কণ্ঠ উজাড় করে দেয়, 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর।' আর এই গানের আবহে আশ্চর্য গভীরতার দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ফেরেন সত্যজিৎ। বৈঠকখানা থেকে ভেসে আসছে গানের সুর 'গৃহে হায় হায় শব্দ/সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ/দৃষ্টিহীন নাড়ি ক্ষীণ হিম কলেবর!...' 'সেন্টিনেল' পত্রিকার কোষাধ্যক্ষ, ভূপতির আপন শ্যালক—তাঁর একান্তই স্বজন উমাপদ অফিসঘরের সিন্দুক থেকে সরাচ্ছে টাকা। গান শেষ হয়ে আসছে 'অতএব সাবধান, ত্যাজ দম্ভ অভিমান/ বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।' চারুলতার শয়নকক্ষেও সেই সুরের রেশ। সেখানে অমল তার বৌঠানকে শুধোচ্ছে, 'আমাদের দেশের এতবড়ো একজন লোককে সেই বিদেশে গিয়ে মরতে হল। কোথায় সেই ব্রিস্টল? কজন বাঙালি দেখবে তাঁর সমাধি?'

সেই অমল, রাজনীতিব গুরুত্ব অথবা লীটন সাহেবের অনাচার নিয়ে ভূপতি যখন উত্তেজিত, তখন যার হাতে পিয়নো বেজেছিল 'গড সেভ দ্য কুইন।' অমল ভূপতির পিস্‌তুতো ভাই, সে সাহিত্যের ছাত্র। বি এ. পরীক্ষার পববর্তী অবসর কাটাতে দাদার বাড়িতে যখন সে এসেছে, সাহিত্যচর্চাই তাব ছুটি জুড়ে আছে। 'নষ্টনীড়' কাহিনীতে চারু আর অমলের সাহিত্যিক অথবা সাহিতোর বাইরের দেওয়-নেওয়া ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, তার কোনো স্পষ্ট হদিস মেলে না। সত্যজিতের ছবিতে ভূপতির অনুরোধেই অমল চারুর সঙ্গে সাহিত্যিক অলোচনা আর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত করেছে। সেই অনুরোধের রেশ ধরে ভূপতির ঘরের কাহিনী আজ কোথায় এসে ঠেকেছে, 'সেন্টিনেল' পত্রিকার সম্পাদক তা বুঝে নেওয়ার সময়টুকু পায়নি, বোধ করেনি কোনো তাগিদ। গ্ল্যাডস্টোন-এর বিজয়োৎসবের শেষে ভূপতির বন্ধুরা হৈ হৈ করে ওঠে...' "বিশ্ববন্ধু"র মতো কাগজে তোমার বউ-এর লেখা বেরুলো, আর সেটা তুমি বেমালুম চেপে গেলে।' বিস্মিত ভূপতি। কিন্তু তার বিস্ময়, যার থেকে নিরাবরণ সত্য বুঝি আর কিছু নেই, বন্ধুদের কাছে ঠেকে দুর্দান্ত অভিনয়ের মতো। ভূপতিও সত্যটাকে চাপা দিতে চায় অপ্রস্তুত হাসি আর খাপছাড়া সংলাপে, 'ওহো—এ তো পুরনো লেখা—।' 'বিশ্ববন্ধু' পত্রিকাব বৈশাখ সংখ্যায় তার স্ত্রী চারুলতা দেবী লিখেছে 'আমার গ্রাম', এ সংবাদটি যে বন্ধুদের সহযোগিতা ভিন্ন সে পায়নি বা পেত না, সে সত্যটুকু গোপন করে ভূপতিনাথ। যে অনুষ্ঠান গ্ল্যাডস্টোন-এর বিজয় উপলক্ষে রামমোহনকে স্মরণ করে শুরু হয়েছিল, তা শেষ হয় এক নতুন উল্লাসধবনিতে 'থ্রি চিয়ার্স ফর ভূপতিনাথ দত্ত'।

'সেন্টিনেল' পত্রিকার সম্পাদক বড় গর্বিত তার কাগজের মটো নিয়ে—'ট্রুথ সার্ভাইভ্‌স'। তবু আজও সে জানে না কেমন করে, কিসের জোরে, কোন অনুভবে তারই শয়নকক্ষে কিংবা তারই বাড়ির বাগানে, হয়তো বা তারই দেওয়া কাগজে কলমে লেখা হয়েছিল 'আমার গ্রাম'। জানে না সে, এই যে শ্বশুরের অসুখ বলে চলে যাবে শ্যালক

উমাপদ, আর সে ফিরবে না সহসা। ঘরে-বাইরে কতগুলো মিথ্যের আশ্রয়কে নিশ্চিত বিশ্বাসে অবলম্বন করেই নাকি চলবে ভূপতিনাথের সত্যসাধনা! নিজের সংসারে যে প্রবাসী, সে-ই নাকি নিজদেশের চিন্তায় হবে আকুল। এই আয়রনিতেই হয়তো একাকার অমলের প্রশ্নের উত্তর— আমাদের দেশের এতবড় একজন লোককে সেই বিদেশে গিয়ে মরতে হলো কেন। সেই মানুষটি চেয়েছিলেন আচারসর্বস্ব হিঁদুয়ানি থেকে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তকে মুক্ত করতে, শিক্ষিতের ধর্মচিন্তা অথবা সমাজ-সংস্কারকে যুক্তিবাদী ধ্যানধারণায় আশ্রয় দিতে। আশা ছিল তাঁর, ইংরেজ শাসনে এদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হবে, মিলবে উন্নত উৎপাদনের সুযোগ। উপনিবেশের সেই অন্ধকারে রামমোহনের মতো মনীষীর সজাগ মননেও সম্পূর্ণ ধরা পড়েনি দেশের সর্বনাশের যথার্থ স্বরূপ। দেশজ শিল্পের অবনতিতে মর্মান্তিক পরিণাম যে অনিবার্য, এ সত্য তাঁর চিন্তাভাবনার বাইরে থেকে যায় ; এ অবনতির কোনো প্রতিরোধ প্রকল্পও তাঁর মনে ছিল না। বিলাতি নুন আমদানি নিয়ে যখন প্রশ্ন ওঠে যে, দেশের কর্মহীন মলাঙ্গীরা কী করবে, রামমোহন তাই বলতে পারেন, তারা কৃষিকাজে যোগ দেবে, অথবা মালীর কাজ কি গৃহভৃত্যের কাজে। রামমোহনের অনুগামী প্রজন্মও চেনে না উপনিবেশের অভিশাপ, বোঝে না পরাধীনতার গ্লানি। 'সেন্টিনেল' পত্রিকায় ঘাড় গুঁজে সমাজে সংসারে সে হারাতে থাকে নিজবাসভূমিটুকু। নিজের দেশের মঙ্গল চিন্তায় পরদেশী শাসকের উদ্যোগ আয়োজনেই তার একান্ত নির্ভর। সেখানে যদি কোনো বেসুর বাজে, সে চলে যাবে 'ডিজি' থেকে গ্ল্যাডস্টোন-এ। তবু ফিরে আসবে না পরদেশ থেকে নিজদেশে। 'আমার গ্রাম'-এর পৃথিবী আর তার জগতের ভিতরকার ব্যবধান ক্রমশই এক আকাশছোঁয়া অদৃশ্য প্রাচীরে উপমা পেতে থাকে। স্বদেশ-পরদেশ নিয়ে যে বিভ্রান্তির রূপক হয়ে থাকে সুদূর ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু, তারই ধারাবাহিকতায় ভূপতি নিজবাসভূমে পরবাসী।

যে অসামান্য সংলাপ অমলের মুখে আনলেন সত্যজিৎ, সে প্রশ্নের অংশ কি অমল নিজেও নয়? তার জীবনও কি এই জিজ্ঞাসায় একাকার নয়? 'নষ্টনীড়' কাহিনীর মতো চারুলতা ছবিতেও চারু অমলের মনোমালিন্য শুরু হয়েছিল পত্রিকায় রচনা প্রকাশকে কেন্দ্র করে। চারুলতা দেখল অমল তার অজ্ঞাতে লেখা পাঠিয়েছিল 'সরোরুহ' পত্রিকায়, অথচ এ খবর মন্দার জানা। 'সরোরুহ' নিয়েছে অমলের লেখা 'সূর্যের কলঙ্ক', চিঠিতে এ খবর পাওয়ামাত্র অমল যাচ্ছে কুল্‌পি কিনতে— সেইরকমই কথা দেওয়া আছে মন্দা বৌঠানকে। যাওয়ার পথে ভূপতির সঙ্গে দেখা; অমল বলে 'দাদা "সরোরুহ" আমার লেখা নিয়েছে।... "সূর্যের কলঙ্ক"। ভূপতি বলে 'গুড্'। অমল যায় কুল্‌পি কিনতে, ভূপতি আসে নিজের ঘরে। অমলের প্রতি অভিমানে চারুর ভিতর-বাহির তখন থরথর। ভূপতির সামনে কোনোমতে সে খাড়া রাখে নিজেকে। ভূপতি আপন মনে বলে চলে '...বিপিন তো বলছিল, কালীঘাটে গিয়ে গ্লাডস্টোন-এর হয়ে পূজো দিয়ে আসবে!' ভূপতি যখন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, অমলও ফিরছে, তার দুহাত জোড়া তিনটি কুলপি। এবার ভূপতি প্রথম কথা বলে, 'বল, কে জিতবে? ডিজি না গ্ল্যাডস্টেন? অমল শুধোয়, 'তুমি কী বল?' গ্ল্যাডস্টোন লিবারাল্‌স! নিশিকান্তর সঙ্গে ৫০ টাকা বাজি হয়ে গেছে আমার।' ভূপতি উত্তর দেয়। অমল যেন ভূপতির কথা ভূপতিকে ফিরিয়ে দেয়, 'ভেরি গুড—গ্ল্যাডস্টোন লিবারাল্‌স!' অনবদ্য অর্থময়তায় সংলাপের এই আদানপ্রদান নির্মাণ করেছিলেন সত্যজিৎ।

কিছুদিন আগেই চারু অমলকে বলেছে, 'এবার গল্প লেখ। অনেক কিছু তো হল—নদী, আকাশ, মেঘ, চাঁদ—' অমল বিরক্ত হয়েছিল 'অনেক মানে? সাহিত্যের আবার অনেক কী? আর লিখলেই কি গল্প লিখতে হবে না কি! অ্যাডিসন, স্টিল, এমার্সন এঁরা কি সব গল্প লিখতেন?' এই দুটি দৃশ্যের যোগাযোগে 'চারুলতা' ছবিতে যেন এক আয়রনির আরোহণ শুরু হয়।

এ ছবিতে অমলের প্রথম সংলাপ ছিল, 'আনন্দমঠ পড়েছ? আনন্দমঠ পড়েছ?'[১] কিন্তু উনিশ শতকের শেষভাগে ইংরেজের বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের ছাত্র অমল সাহিত্যিক হওয়ার বাসনায় অ্যাডিসন অথবা এমার্সনকে ভাবে। তার অনেক কাছের এক মানুষ, যিনি উনিশ শতকের সামাজিক-ঐতিহাসিক সীমার মধ্যে হলেও, গল্প উপন্যাস প্রবন্ধকে স্বদেশের ভাষায় স্বদেশের মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় করে তুলতে চাইছেন, সেই বাঙালি অমলের তর্কের যুক্তি হতে পারেন না। অমল বোঝে লিবারাল্‌দের জয়-পরাজয় নিয়ে মাতামাতিতে বাংলাদেশের সমস্যার কোনো যথার্থ সমাধান নেই। কিন্তু সে বোঝে না, 'সূর্যের কলঙ্ক' অথবা 'অমাবস্যার আলো'র মধ্যে কোনো কর্মময়তার প্রসাদ নেই, আছে শুধু শৌখিন অবসরের আশ্রয়। যেমন ভূপতি বোঝে না কলকাতার বৈঠকখানায় গ্ল্যাডস্টোন-এর বিজয় উৎসব নিরর্থক এবং বস্তুত অপচয় মাত্র। সে শুধু বোঝে 'অমাবস্যার আলো', 'সূর্যের কলঙ্ক'র অর্থহীনতা। তাই বোঝাতে চায় অমলকে, 'অমাবস্যার আলো' নিয়ে মাতামাতি করার থেকে বর্ধমানের উকিল রঘুনাথ মিত্তিরের ছোট মেয়েকে বিয়ে করা ঢের কাজের—বিয়ের পর শ্বশুর জামাইকে বিলেতে পাঠাবেন। বিলেত শুনে অমল বলে, 'দ্য ল্যান্ড অফ্ শেক্‌সপীয়র।...দ্যা আইল্‌স অফ্ গ্রীস!' ভূপতি বলে, 'বার্ক, মেকলে, গ্ল্যাডস্টোন...আর একমাস পরে ইলেকশান, পার্লামেন্টে গিয়ে বক্তৃতা শুনে আসবে। দ্য ল্যান্ড অফ্ মাৎসিনি অ্যান্ড গ্যারিবল্‌ডি...। ...বিগ্ বেন-এর ঘণ্টা বাজছে... বরফ পড়ছে... রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছ, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, দৃপ্ত ভঙ্গি, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ—ইয়ং বেঙ্গল!' সত্যজিৎ রায়ের অমল অবশ্য ল্যান্ড অফ্ শেক্‌স্‌পীয়র আর ল্যান্ড অফ্ বঙ্কিমের মধ্যে নিজের যথার্থ আকাঙক্ষাটি নির্ধারণ করতে একমাস সময় চেয়েছিল। সেই সময়ের মধ্যেই 'সূর্যের কলঙ্ক' নিল 'সরোরুহ' আর অমলের আনা কুল্‌পি নাচল শেষ অবধি হুলো বেড়ালের কপালে। আরো পরে ভূপতি মাটিতে পড়ে থাকা 'সেন্টিনেল' পত্রিকার কালিমাখা টুকরো দেখিয়ে অমলকে বলল, 'মৃত সৈনিক দেখেছ থিয়েটারে? ঐ দেখ।... অবিশ্যি তারা ড্রপ পড়লেই উঠে পড়ে—এ আর উঠবে না।' ভূপতি ঐ সংলাপে পৌঁছনোর আগে আমাদের যেতে হবে গ্ল্যাডস্টোন-এর বিজয়োৎসবের মধ্য দিয়ে। যে উৎসবের আরেক প্রান্তে অমলের প্রশ্ন...'কোথায় সেই ব্রিস্টল? কজন বাঙালি দেখবে তার সমাধি?' চারু বলে, 'তুমি দেখবে।' 'আমি আর গেলাম কই!' অমল বলে। চারু বলে চলে, 'যাবে আগে বর্ধমান, তার পর বিলেত, তার পর ব্যারিস্টার।' অমল সংশোধন করে, 'উঁহু আগে বর্ধমান, তারপর বিয়ে, তারপর বিলেত, তারপর ব্যারিস্টার।' অমলের কথার রেশ ধরেই চারু বলে 'তার পর?' ব-এর খেলার শেষ চারুকে দেখতেই হবে। 'তার পর ব্যাক্ টু বেঙ্গল—বাপ্ বাপ্ বলে' 'বেঙ্গল? ব্যাস?' আমরা বুঝতে পারি, এ খেলার কোনো পরিণাম চারু অবচেতনে চেয়েছিল। অমল কিন্তু বলে চলে, 'বায়রন টু বঙ্কিম—বাবু বঙ্কিমচন্দ্র।' 'বিষবৃক্ষ' বইটি সে হাতে তুলে নেয়, তাকায়

চারুর দিকে। চারু একদৃষ্টে চেয়ে আছে অমলের দিকে ব-এর খেলার শেষটা আমরা চারুর মুখ থেকেই শুনি, 'আর বৌঠান? বিশ্রী? বেহা—' চারু নিজেকে সামলে নেয়। অমল তখন বলছে, 'যা দেবী মমগৃহেষু— পেত্নি-রূপেণ'।

ব-এর খেলার এই সংলাপ বিনিময়ে 'চারুলতা' ছবিতে নতুন এক মাত্রা ভাষা খুঁজে পায় যেখানে সংসার থেকে সমাজ একই পরিণামে একাকার। চারু আর অমলের সম্পর্কের কোনো বাঁধা ধরা চেহারা এখানে বড় নয়। মুখ্য হয়ে ওঠে একটি প্রশ্ন— যে প্রত্যাশায় চারুলতারা অমলদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তা পূর্ণ হওয়া কি সমাজ সংসার ইতিহাসের আবর্তে একেবারেই অসম্ভব? চারুর প্রত্যাশার কথাই বলছি, কারণ স্যতজিতের ছবিতে অভিমান অথবা অনুভবের ভারে চারুকেই ভারাক্রান্ত দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের অমল কিন্তু বৌঠানের উপর দাবি করত অনেক বেশি। চারুকে পড়াশুনো অথবা সাহিত্যচর্চায় সাহায্য করবার কোনো অনুরোধ তখনো আসেনি ভূপতির দিকে থেকে। অথচ সামান্য পড়া বলে দেওয়ার সুবাদে বৌঠানের কাছে অমলের আবদারের অন্ত নেই—কখনো ফুলতোলা রুমাল, কখনও পশমের চটি, এমন-কি মশারির চালে কারুকার্য। নিজেদের কল্পনার বাগানকে বাস্তবে রূপ দিতে নিত্য চলেছে তাদের আবো জল্পনা-কল্পনা। নিজের রচনার বিষয় চারুকে না জানালেও অমলের চলে না। এমন-কি যে মান অভিমানের পালায়, যে ভুল বোঝাবুঝির দোলায় 'নষ্টনীড়' কাহিনী এগিয়ে চলে, সেখানে অমলের দায় বড় কম নয়। কাগজে অমলের লেখাকে গালি দিয়ে চারুকে প্রশংসা করেছে, এ খববে চারু খুশি হতে পারেনি। পত্রিকা দুটি সামনে খুলে চারু যখন নিজের খাটে চুপ করে বসে আছে, পিছন থেকে ঘরে ঢুকেছে অমল। চারু টের পায়নি। অমল ভেবে নেয়, '"আমাকে গালি দিয়া চারুর লেখাকে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আনন্দে চারুর আর চৈতন্য নাই।" মুহূর্তের মধ্যে তাহার সমস্ত চিত্ত যেন তিক্তস্বাদ হইয়া উঠিল। চারু যে মূর্খের সমালোচনা পড়িয়া নিজেকে আপন গুরুর চেয়ে মস্ত মনে করিয়াছে, ইহা নিশ্চয় স্থির করিয়া অমল চারুর উপর ভারি রাগ করিল। চারুর উচিত ছিল কাগজখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া আগুনে ছাই করিয়া পুড়াইয়া ফেলা। চারুর উপর রাগ করিয়া অমল মন্দার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সশব্দে ডাকিল, "মন্দা-বৌঠান।"'

চারুলতা ছবিতে অবশ্য ভূপতির অনুরোধেই অমল চারুর সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনায় প্রবৃত্ত। একেবারে প্রথমে 'আনন্দমঠ'-এর কথায় চারু অমলের সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় নিশ্চয়। তবে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির অনুরোধ ছাড়া 'নষ্টনীড়'-এ তা যতদূর এগিয়ে ছিল, তেমন কোনো আভাস মেলে না। চারুকে যখন অমলের প্রতি নিজের অনুভবে পূর্ণ আর পূর্ণ বলেই ত্রস্ত, বিপর্যস্ত দেখছি, ল্যাণ্ড অফ্ শেখ্সপীয়র-এর কথা ভাবতে ভাবতেই বুঝি অমল গায় 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।' আর সেই গানের শেষে হঠাৎ স্বরচিত কথা-সুরের কৌতুকে সে নিছকই খুশি—'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও বউঠাকুরাণী।' সতিাই কি চিনেছিল অমল?

"নষ্টনীড়" কাহিনীতে চারুলতার যে রচনাটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সমালোচকের প্রশংসা পেয়েছিল, সেটি দেখে অমল ভাবে, 'গোড়ার দিকটা বেশ সরস হইয়াছে, কিন্তু কবিত্ব শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, প্রথম রচনার পক্ষে লেখিকার উদ্যম প্রশংসনীয়।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই লেখাটিতেই যে চারু প্রথম অমলের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, এমন ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। অমলকে নিয়ে এই তামাশাটুকু সত্যজিৎ রাখেননি। চারুর লেখা পড়ে অমল বিস্মিত, পুলকিত, 'এত সহজ এত স্বচ্ছন্দ—আমি একেবারে বোকা বনে গিয়েছি। তোমাকে আরো লিখতে হবে বৌঠান।' আর চারু ভেঙে পড়ে কান্নায়, 'আমি আর লিখব না—আর লিখব না ঠাকুরপো—'। নিজের লেখাটি হাতে নিয়ে সে যখন অমলের ঘরে ঢুকেছিল, তা যেন কালবৈশাখীর মতো বেপরোয়া। কিন্তু সে দাপট কোথায় মিলিয়ে যায়, অবজ্ঞা ভরে সে ফেলে দেয় 'বিশ্ববন্ধু' পত্রিকা, বর্ষাধারার মতো কান্নায় কালবৈশাখী চাপা পড়ে। মন্দার থেকে সে যে বিশিষ্ট, এই কথা প্রমাণ করতেই তবে চারুর লেখা, সে লেখা অমলের উপর প্রতিশোধ নিতে ; অমল যে মন্দাকে বলে, চারুর অজ্ঞাতে নিজের লেখা কাগজে পাঠিয়েছিল। চারুর সেই আকুলতার মুখোমুখি শিশুর মতো প্রশ্ন করে অমল, '...কী হয়েছে তোমার বৌঠান? তুমি কাঁদছ কেন?' তার পর তার মুখে চোখে দেখি গভীর উদ্বেগ। কোন বোধ অমলের এই উদ্বেগের কারণ? সে বোধে কি সে সত্যিই চিনেছিল বউঠাকুরাণীকে সম্পূর্ণ করে?

চারুর অনুভূতি অমলের কাছে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে আসছে, তাই তাকে চলে যেতে হবে দাদার কাছে বিশ্বস্ত থাকতে। 'চারুলতা' ছবিতে অমল চিঠিতে লিখে গিয়েছিল 'বৌঠান যেন লেখা বন্ধ না করেন।' 'নষ্টনীড়'-এ বৌঠান প্রতি চিঠিতেই অমলের প্রণাম পেত শুধু। সাহিত্য প্রসঙ্গ যেন শেষ করে দিয়ে গেছে অমল। রবীন্দ্রনাথের অমলের মনে অস্বস্তি ছিল যে কোথাও যদি বেমানান কিছু ঘটে থাকে, সাহিত্য কি সম্পর্কের আঙিনায়, তার দায় চারুর একলার নয়। চারুর প্রতি তার আস্থা ছিল না, নিজের উপরেও ছিল না বিশ্বাস। তারা দুজনে যেন কোন ভুলের খেলায় মেতেছে, যার পরিণাম শুভ নয়। তাই চারু যখন অমলকে ডেকে পাঠায় ঠিক তার চলে যাওয়ার আগে, একা আসে না অমল। ভূপতির সঙ্গে আসে। কিন্তু 'চারুলতা'-র অমল অনাস্থার সম্পূর্ণ ভারটা বৌঠানের উপর অর্পণ করেছে। যখন সে চলে গেল, দাদার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় সে বিব্রত। কিন্তু চারুলতার প্রতি, চারুলতার সাহিত্যের প্রতি তার তেমন কোনো দায়িত্ব নেই। কোনো ভয় নেই, কোনো অভিমান নেই তার বৌঠান সম্পর্কে, আছে শুধু করুণা। তাই বৌঠানের বোনা চটি-জোড়া ফেলে রেখে, চিঠির পুনশ্চে বৌঠানকে উপদেশ দিয়ে যায় অমল। অমল কি সত্যিই চিনেছিল বৌঠানকে? বৌঠান কি করুণার পাত্রীই থেকে যাবে! যদি ফিরে আসি সেই ব-এর খেলায়, মনে হবে চারু যেন তার 'আর বৌঠান?' প্রশ্নটির ভিতর দিয়ে এমন কিছু বলতে চায়, যার সমগ্র আয়তন বুঝি তার নিজেরও জানা নয়। সে রাজনীতি বোঝে না ; মানে সেভাবে বোঝে না, যেভাবে বুঝলে ভূপতির জগতে তার জায়গা হবে। সে যেমন জানে না বার্ক, মেকলে, গ্ল্যাডস্টোন, তেমনি জানে না বায়রন, এমার্সন অথবা অ্যাডিসন। অথচ চারু তো পারে ; সে লিখতে পারে 'আমার গ্রাম'। যে রচনার প্রস্তুতিতে তার চোখে মনে ধরা পড়ে গ্রাম, মন্দির, চবকা-কাটা মানুষ অথবা গাজনের সঙ। যে-সব মানুষের দুঃখে ভূপতির রাজনীতিবোধ গর্জে ওঠে, চারুর লেখায় আশ্রয় পায় তাদেরই বাসভূমি। সূর্যের কলঙ্ক কিংবা অমাবস্যার আলোতে নয়, দেশজ অভিজ্ঞতার প্রসাদেই চারুর লেখনী বিষয় খোঁজে। অথচ তার লেখা তৈরি হবে 'অমাবস্যার আলো'র লেখককে মুগ্ধ করতে। শুধুমাত্র লিখতে পারে, লিখতে চায় বলেই তো চারু

লেখেনি! তাই বৌঠানের কী হবে, এ প্রশ্ন বুঝি উত্তরহীন থেকে যাবে। ভূপতির রাজনীতি আছে। অমলের আছে বিয়ে-বিলেত-ব্যারিস্টারের পথ—শুধু একবার তার সম্মতির অপেক্ষা। তবে চারু তার নিঃসঙ্গ অনুভবের পৃথিবী নিয়ে, তার বিশিষ্ট লেখনী নিয়ে কী করবে? কী হবে বৌঠানের? এই জিজ্ঞাসাতেই উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসের সব থেকে মর্মান্তিক হাহাকার, যে ইতিহাস কখনো মেকলের ব্যবস্থায় মাথা খুঁড়েছে, কখনো বা বায়রনের পাতায়। পরদেশের সাম্রাজ্য স্বদেশের প্রাকৃত শক্তিকে ছারখার করে দিয়েছে। কিন্তু দেশের মাটিতে জন্ম নেয়নি কোনো নতুন শক্তি। চারুলতারা তাই অনেক প্রত্যাশায় ভূপতি অথবা অমলের দিকে তাকিয়েই নিজের অবস্থানটা জানতে চায়। কিন্তু সঠিক উত্তর মিলবে না, তাদের কাছে চারুলতারা হয়ে উঠবে ক্রমশই আরো আরো অপরিচিতি।

সত্যজিৎ রায় নিজে অবশ্য লিখেছেন 'কথোপকথন যাতে নিছক প্রেমালাপে পর্যবসিত না হয়, তার জন্য অমলকে দিয়ে "ব"-এর অনুপ্রাসে কথাবার্তা বলার একটা সূত্রপাত করানো হয়েছিল।'[২] সত্যজিৎ শিল্পের আশ্চর্য প্রসাদ সেখানেই, যেখানে শিল্পী নীরবতার ভিতর দিয়েই সব থেকে কঠিন কথাটি বলেন। এই ব-এর খেলাতেও চারু-অমলের সংলাপে যা রইল না-বলা, যা রইল ইঙ্গিতে, তা দর্শককে দিল এক দ্বিতীয় অর্থের সন্ধান। সত্যজিৎও হয়তো নীরবতার সেই গভীর অর্থকে দর্শক অথবা পাঠকের জন্য সরল করতে চাননি। অথবা হতে পারে, চলচ্চিত্রকার-পরিচালকের কাছে যা ছিল প্রেমালাপের বিকল্প, দর্শকের কাছে তাই হয়ে ওঠে সমাজ-ইতিহাস জীবনের সত্য। যথার্থ শিল্পের সার্থকতা এতে কমে না, বরং সম্পূর্ণ হয়। যেমন চারু 'আর বৌঠান? বিশ্রী? —বেহা—' প্রশ্নটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, বলে 'তুমি আজ গাইলে না কেন? অত সুন্দর গলা তোমার—তোমার গাওয়া উচিত ছিল।' সত্যজিৎ চিত্রনাট্যেই বলেন, চারু 'তার মনের আসল ভাব গোপন করার জন্য অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়।'[৩] হতে পারে তাই সত্য, তবে 'নষ্টনীড়' কিংবা 'চারুলতা'-র প্রতিটি প্রসঙ্গই বড় বেশি জড়িয়ে গেছে যেন, তেমন করে আলাদা করা যায় না। হয়তো চারু বুঝতে পেরেছিল, তার শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা অমলের নেই, অথবা চাইতে নেই তেমন কোনো উত্তর। অন্য প্রান্তে গ্ল্যাডস্টোন-এর বিজয়োৎসবে তখন রামমোহনের '...শেষের সেদিন ভয়ংকর'-এর রেশ ঢেকে দিয়েছে নিধুবাবুর টপ্পা, 'এমন যে হবে প্রেম যবে'। অমলের প্রতি নিজের মনোভাব গোপন করতে গিয়ে চারু বলে ওই মজলিসে অমলের গাওয়া উচিত ছিল। চারু কি নিজের মতো করে বুঝতে পারছে যে গ্ল্যাডস্টোন-এর বিজয়োৎসবে অমলকে তেমন বেমানান লাগবে না।

এর পর দাদার কাছে বিশ্বাসভঙ্গের ভয়ে অমল দাদার আশ্রয় ছাড়ে। ভূপতি তখন ভেঙে পড়েছে উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতায়। অর্থচিন্তা কিংবা অর্থদণ্ডের থেকেও মর্মান্তিক ভাবে বেজেছে বুকে স্বজনের যথার্থ স্বরূপ। দাদাকে আবার বিশ্বাস হারানোর যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে, দাদার গলগ্রহ হয়ে থাকা এড়াতে 'চাকুরির সন্ধানে' অমলেব কাছে যথেষ্ট হলো না। কিছুদিন পরে এল আবার চিঠি, 'ভালোই আছি, তবে কদিন থেকে যেন তানপুরার ঝংকারটা কানে বেশি বাজছে। বর্ধমানে একবার লিখে দেখলেও দেখতে পার।' অমল বিয়েতে মত দিল। 'মেডিটেরানিয়ান' নামটা তানপুরার ঝংকার দিত অমলের কানে। সুর যদি বাঁধা থাকে, তানপুরা তো কম মধুর নয়। আর সুর-বেসুরের ফারাক অমলই বা সম্পূর্ণ বুঝবে কেমন করে? উনিশ শতকের বাংলাদেশে অমলেরও তো জানা নেই

তেমন নিজবাসভূমির সন্ধান। বার্ক-মেকলে-গ্ল্যাডস্টোন-এর দেশ যে জিতে নিয়েছে সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলাকে। শৌখিন সাহিত্যের অবসর থেকে কর্মের উদ্যামে আসতে অমলও বাঁধা পড়বে 'বিয়ে-বিলেত-ব্যারিস্টার-'এর ছকে ঢালা স্বরলিপিতে। 'সূর্যের কলঙ্ক' থেকে গ্ল্যাডস্টোন আর 'গুড' থেকে 'ভেরি গুড'-এ যে আয়রনির আরোহণ শুরু হয়েছিল, তার অবরোহণ এখানে সমাপ্ত।

যে চিঠিতে অমল বিয়েতে মত দিল, সে চিঠি হাতে নিয়ে হাহাকার করে কেঁদেছিল চারুলতা। গোটা ছবি জুড়ে চারুকে কখনো এত সরব দেখিনি আমরা। সেই অকূল কান্না শুনতে শুনতেই ভূপতির চৈতন্য হল—এ নীড় তার নষ্টনীড়। চারুর কাছেও অজানা থাকে না স্বামীর এই জেনে ফেলাটুকু। কান্না থামে, সে চিঠি পড়ে, তারপর ছিঁড়ে ফেলে কাগজখানা। তার মুখে এক আশ্চর্য বিষাদের হাসি। এবারে চারু কী করবে? প্রথম দৃশ্য থেকে, অমল ছবিতে আসবার আগে থেকেই তো এ কান্না জমা হয়েছিল। সেই যে দৃশ্যে চারুর কর্মহীন, নিঃসঙ্গ জীবনের স্বরূপ অসাধারণ বিন্যাস পায়। স্বামীর নামের প্রথম অক্ষরটি বিদেশী ভাষায় ফুটিয়ে তুলছে চারু নিপুণ নক্‌শার বাহারে। তারপর শহুরে পাখির ডাক, বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' ; পথ দিয়ে যাওয়া বানরওলা, পাল্কীবাহক, মিষ্টান্ন হাতে একটি স্থূলকায় পথচারী—প্রথমে খালি চোখে, তারপর অপেরা গ্লাস দিয়ে দেখে চারু। আবার গিয়ে বসে পিয়ানোর সামনে। স্বামীর পায়ের শব্দ পায় কিন্তু স্বামী তাকে লক্ষ করবার ফুরসত পায় না। সামনে দিযেই চলে যায়, হাতের বইতে সমস্ত মনোযোগ ন্যস্ত করে। চারু অপেরা গ্লাস দিয়ে দেখে, স্বামী কাছে এসে যায়। কিন্তু চোখের বাইরে যখন কিছু চলে যায়, অপেরা-গ্লাস পারে না তাকে ধরে রাখতে। চারুর অপেরা-গ্লাসেরও সে জোর নেই। ভূপতি চোখের আড়াল হয়ে যায়, অপেরা-গ্লাস ধরা চারুর হাতটি চোখ থেকে নীচে নেমে আসে। চারুর প্রাত্যহিকের এই সীমা, তার সময়ের এই ভার একটি প্রায় সংলাপ-বিহীন দৃশ্যে অসহনীয় করে তোলেন সত্যজিৎ। সন্ধ্যায় খেতে বসে ভূপতি চারুকে বলে 'সুরেন বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা যখন শুনি না চারু—ওঃ। তোমাকে একদিন রাজনীতির ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব।' চারু মেনে নেয়, বলে, 'বেশ তো!' সেই রাত্রেই ভূপতি চারুকে বলে 'তোমার বড়ো একা লাগে, না চারু?' চারু বলে, 'ও আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।' 'নিঃসঙ্গতার অভ্যেসটা তো কোনো কাজের অভ্যেস নয়, চারু।' ভূপতির এই কথার পরে চারু হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'তুমি "স্বর্ণলতা" পড়েছ?' ভূপতি হো হো করে হেসে ওঠে। সত্যজিৎ রায় বলেছেন, 'চারু ঠিক এই মুহূর্তে এই অবান্তব প্রশ্নটি করে তার স্বামী তার নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে কিনা সেটা পরখ করে দেখেছে। এই একটি অবান্তর প্রশ্নেই যদি প্রসঙ্গ চাপা পড়ে তাহলে চারুর কোনো আশাই নেই। এই ধরনের পরীক্ষা চারুর মতো চাপা অথচ sensitive চরিত্রের পক্ষে সংগত বলেই আমার মনে হয়েছিল।'[১] এই প্রসঙ্গের পরেও কিন্তু ভূপতি চারুর নিঃসঙ্গতা দূর করতে তার বৌদি মন্দাকে আনবার কথা বলেছিল। তবে কি চারুর আশা আছে? যে আশাতে সে ছবির শেষে ভূপতির দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়? স্বামী-স্ত্রীর সন্ধ্যা আর রাত্রির সংলাপ মিলিয়ে দেখলে অন্য একটি অর্থও স্পষ্ট হতে পারে। ভূপতি চারুকে একদিন রাজনীতি বুঝিয়ে দেবে, এর থেকে অবান্তর বোধ কবি চারুর প্রশ্নটি নয়। চারুর নিঃসঙ্গ জগতের তো 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', কি 'স্বর্ণলতা'তেই আশ্রয়। তার একাকিত্বের দৈনন্দিনে

ঐটুকুই তার ভালোবাসা না হোক ভালোলাগার আশ্রয়। এমন-কি একান্তই অসম্ভব যে চারুর সঙ্গীহীন পৃথিবীব ভালো লাগাটুকু কোনো স্বীকৃতি খুঁজছে। ভূপতির অবান্তর প্রস্তাব চারু মেনে নেবে! অথচ চারুর অবান্তর প্রশ্ন ভূপতি উড়িয়ে দেবে। এমন করেই বুঝি ভূপতি-চারুলতারা নষ্টনীড়ের পাত্রপাত্রী হয়ে যায়। 'আমার চারুলতা আছে', নিজের মুখের এই কথাটি ভূপতিব নিজের কানেই নিশ্চয় ঠেকে তখন বিদ্রূপের মতো।

অমল চারুকে হাস্যকৌতুকে 'নবীনা' সম্বোধন করেছে। অমল 'বঙ্গদর্শন' পড়ছিল, 'যে স্ত্রী ভূমণ্ডলে আসিয়া, শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণসম্মুখে কেশরঞ্জন করিযা, কার্পেট বুনিযা, "সীতার বনাবাস" পড়িয়া সময় কাটাইলেন—আপনার ভিন্ন কাহারো সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাতি অপেক্ষা ভালো হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক।...' অমলের মুখে এরাই নবীনা। অমল যখন 'বঙ্গদর্শন' পড়ছিল, চারু বুনছিল পশমের চটি ভূপতির জন্য। অমলেব 'নবীনা' সম্বোধনে কোনো প্রতিবাদ সে কবেনি। অন্যেব সুখবৃদ্ধি করবার জন্য চারুর হাতে কি কেবল ফুলতোলা রুমাল, পশমের চটি, বড়জোর অমলের লেখার জন্য বানিয়ে দেওয়া খাতা আর দোয়াত কলম? এমন কোনো স্বপ্ন কি সে দেখে, যেখানে নিজের, অন্যেব—সকলের সুখবৃদ্ধি করতে সে ঘবকন্নাকে পেরিয়ে কোনো নতুন কর্মময়তাকে খুঁজে পাবে?

শেষপর্বে সমুদ্রতীরে ভূপতি চারুকে বলে, 'তুমি আব লিখবে না? তোমাব লেখা এত ভালো লাগে আমার! কেন জান? তোমাব লেখা আমি সব বুঝতে পারি। অন্যের লেখা বুঝতে পারি না।' চারু বলে, 'তুমি কাগজ কব—তাহলে লিখব।' ভূপতি হেসে ওঠে ; সেই 'স্বর্ণলতা' প্রসঙ্গেব হাসি—'আমার কাগজে তুমি লিখবে? রাজনীতি?' চারুর লেখাব ক্ষমতাকে অস্বীকার করে না ভূপতি। কিন্তু তার স্ত্রী চারুলতার জগৎ ঘবকন্না, সংসার। তারই অবসরে, তাবই অলস অবসবে চারু তার সারল্য আর কল্পনাকে উজাড় করে লিখবে। নিজের স্ত্রীব লেখা ছাপার অক্ষরে দেখে ভূপতি খুশি হবে, আবাম পাবে কর্মময় দিনের নামমাত্র অবসবে। তা বলে সাহিত্য নিযে চারু যদি বেরিয়ে আসতে চায় কর্মেব উপমায়, ভূপতিব কাছে তা 'স্বর্ণলতা' পড়া অথবা বাংলায় বাজনীতি আলোচনা করবার মতোই অসম্ভব, অবাস্তব। চারুর জগৎ নির্দিষ্ট হযেই আছে ভূপতির প্রাসাদোপম বাড়ির প্রাচুর্যে একাকাব জনবিহীন অন্দবে। সেখানকাব চারু কিনা প্রকাশ পেতে চায় স্বামীর জগৎ বা তারই সমতুল্য কোনো জগতে! ভূপতি হেসে ওঠে। কিন্তু চারুর কাছে এটা আর অবাস্তব নয, সে মবীযা, 'রাজনীতি কেন? ইংরেজিতে বাজনীতি আর বাংলায় আর সব। একটা তুমি দেখবে, আব একটা আমি।' ভূপতি উত্তেজিত, '...এ যে অদ্ভুত প্রস্তাব! ব্রিলিয়ান্ট। একা না পাবি দুজনে করব, নিশিকান্ত তো রয়েছে।' ঠিকই তো! নিশিকান্তকে নিয়ে দুজন। যেখানে পুরুষ তার কর্মজগতের মুখোমুখি, সেখানে স্ত্রীব উৎসাহ সাহায্য অথবা কর্মকে কি দেখা যায় স্বামীর থেকে আলাদা করে। তবু চারু মনে করিয়ে দেয়, 'তিন জনে।' ভূপতি মেনে নেয়। কিন্তু আবার পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগে চারুর পরামর্শের তো তেমন মূল্য নেই। তাই তক্ষুনি পুরী ছেড়ে কলকাতা—নিশিকান্তর মাথায় অনেক প্ল্যান ঘোবে যে' বাড়ি ফিবে চা অথবা সরবৎ উপেক্ষা করে নিশিকান্তর খোঁজে রওনা হওয়া।

আর চারু? তার ভূমিকা কোথায় নির্দিষ্ট হবে? গত শতাব্দীর সেই বছরটি বেছে

নিয়েছেন সত্যজিৎ, যখন কলকাতার প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের বয়স হয়েছে তিন দশক, সদ্য নাম হয়েছে বেথুন স্কুল। বাংলাব গ্রামে গ্রামে, এমন-কি শহরেও শিক্ষার ব্যবস্থায় মেয়েদের স্থান তখন আদৌ তেমন নিশ্চিত নয়। এ কাহিনীর আরো তিন দশক পরে বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক অধ্যায়ে দেখা গেছে, গ্রামে শতকরা তিনজন মেয়ে নিজেদের নামটুকু লিখতে পারে। চারুলতার শৈশবস্মৃতিতে গ্রাম আছে, আছে গাজনের সঙ, সংক্রান্তির মেলা। সেই চারু আবার বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত। বঙ্কিমের লেখা যে কী গভীর মনোযোগে সে পড়েছে, তার পবিচয় আছে অমলের সঙ্গে তার সাহিত্য আলোচনায়। তৎকালীন আধুনিক লেখকদের সাহিত্যে তার বিরাগে, অথবা নিজের রচনায় চারু সেই উনিশ শতকের বাংলাদেশে একান্তই বিশিষ্ট। এই বিশিষ্টতায় চিহ্নিত চারু যদি নিছক ঘরকন্নার আবর্ত পেরিয়ে আরো কোনো ব্যাপ্ত কর্মেব মোহানায় পৌঁছতে চায়, সে পথে প্রতিকূলতা কম নয়। যে উনিশ শতকের বাংলাদেশে চারুকে দেখছি আমরা, তখনকার বিশ্বসভ্যতার আঙিনায় আঙিনায় সে প্রতিকূলতাব নজির ছড়িয়ে আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় ইংরেজ যখন সভ্যতার শিখবে উঠেছে, তখনকার সেই উনিশ শতকের সমাজেও ঘরের বাইরে একটি ইংরেজ মেয়ের কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব কল্পনা করাই ছিল কঠিন। ঘরের মধ্যেই এক অর্থে বিলীন ছিল তারা। স্বামী যদি বহির্মুখী হয়ে পড়ে, স্ত্রীব একমাত্র কর্তব্য তখন ঘরের আরামকে আবো বাড়ানোর চেষ্টা করা, ঘবকন্না আরো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা আর ঘরকে আবো লোভনীয় করে তোলা, যাতে দুর্বলচিত্ত পুরুষ আবার সেই ঘরের দিকে মুখ ফেরায়। মেয়েমহলেই কাটত মেয়েদের সব থেকে বেশি সময়। নারীশিক্ষা অবশ্যই সুপ্রচলিত ছিল, তবে শিক্ষার ক্ষেত্রেও আদানপ্রদানের সঙ্গী কেবল মেয়েরাই। মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রায় মহিলাদের সান্ধ্য-আড্ডা অথবা নেমন্তন্নে পুরুষের জায়গা সাধারণত থাকত না। যে সব মজলিসে নিমন্ত্রণে নারী পুরুষের মেলামেশার সুযোগ হতো, সেগুলি নিতান্তই আনুষ্ঠানিক।[৫] সেই উনিশ শতককে পিছনে ফেলে বিশ শতকে পৌঁছনোর পরও কয়েকটি দশক কেটে যায়। বিশ্বসংস্কৃতির সব থেকে আলোকিত মানুষদের মধ্যে একজনের মনে হয়, কোনো নারী যদি জগতের মুখ্য সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে চায়, তাকে প্রকাশ করতে চায়, সে যে নারী, এই সত্যটুকুই তার চাওয়ার পথে বাধা হয় দাঁড়াবে। সে মেয়েটি বিশ্বকে জানতে চেয়েছিল সেই প্রকাশের বাধাটাকে অতিক্রম করবে বলে।[৬] সুতরাং নারী যদি তাব মৌলিক অনুভবের জগৎ থেকে জ্ঞান আর চৈতন্যের বিশ্বে নিজেকে মেলে দিতে চায়, বিশ্বজনীন এক সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে তাকে। চারুর ক্ষেত্রে বাড়তি জটিলতার বোঝাটা সত্যজিতের চারুলতার মাবাত্মক সংলাপে ধরা পড়ল, '...ইংরেজিতে রাজনীতি আর বাংলায় আর সব। একটা তুমি দেখবে, আর একটা আমি।' ভূপতি যেমন 'স্বর্ণলতা' পড়ে না, চারুলতাও পড়তে পারে না 'সেন্টিনেল'। গোটা ছবিতে একবার শুধু চারুকে 'সেন্টিনেল' শুঁকিয়েছিল ভূপতি, নতুন কাগজেব গন্ধ বলে। আগেই বলেছি, উনিশ শতকের বাংলাদেশে ভূপতির মতো মানুষদের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান নতুন জীবনের আকর্ষণ নিয়ে আসছে যে সভ্যতা, তাই আবার জীবনের নিবিড়তম সম্পর্কটির কাছ থেকে তাকে সুদূর করে তুলছে। বিশপ হেবার-এর বিয়াল্লিশতম জন্মদিন উৎসবে গিয়ে একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন হরিমোহন ঠাকুর—এরকম মজলিসের মহিমা কত বাড়িয়ে দেয় হেবার-এর দেশের মেয়েরা উপস্থিত থেকে। রাধাকান্ত দেব বলেছিলেন,

এ কথা ঠিক যে মুসলমানরা আসবার আগে ভারতীয় মেয়েদের সামনে এত আড়াল থাকত না। কিন্তু পশ্চিমের মেয়েদের তুল্য স্বাধীনতা পেতে গেলে, আমাদের দেশের মেয়েদের আরো অনেক বেশি শিক্ষিত হতে হবে।[৭] এই শিক্ষিতের উপমা কিন্তু কখনোই চারুলতা হতে পারে না। এ শিক্ষা অর্জন করতে গেলে নিজের দেশের কথা পরদেশী ভাষায় পড়তে হবে। ইংরেজের উপনিবেশে শিক্ষা সংস্কৃতি সব কিছুরই মৌলিক সংজ্ঞা হারিয়ে যাচ্ছে শিক্ষিত বাঙালির মন থেকে। সাম্রাজ্যশক্তির মানদণ্ডে হবে সামগ্রিক জীবনের বিচার। বিদেশী মজলিসে মেয়েদের উপস্থিতি এক পরাধীন শিক্ষিত বাঙালিকে হয়তো মনে করিয়ে দেবে ঘরের কথা, অবচেতনে এক বিচ্ছিন্নতার বোধও আসবে বুঝি। আরেক পরবাসী 'ইউরোপের মতো স্বাধীনতা'র কথা ভাবে, যার জন্য প্রয়োজন 'ইংরেজের মতো শিক্ষা'। নিজের দেশে নিজের মতো করে বাঁচবার ইচ্ছাটাই যেন হারিয়ে গেছে মনন থেকে। পরাধীনতার বোধ নেই তার, নেই স্বাধীনতার প্রেরণা। 'আমার গ্রাম'-এর লেখিকাবা তাই সব বিশিষ্টতা নিয়েও শিক্ষিতের নতুন সংজ্ঞাকে স্পর্শ করতে পারেন না। উনিশ শতকের দেশহিতৈষীরা সকলেই এই ব্যবস্থার কাছে কোনো-না-কোনো ভাবে হাত পেতে দাঁড়ান। ফলে এমন এক জীবনের ডাকে তাঁরা বার বার সাড়া দেন যেখানে তাঁদের কর্ম, তাঁদের মনন ক্রমাগত মানুষগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে তাঁদেরই সংসার থেকে, সম্পর্ক থেকে। নারীশিক্ষার জন্য জীবন দিয়ে দেয় যে মানুষ, তাঁর স্ত্রী থেকে যায় প্রায় নিরক্ষর। বিধবা বিবাহ দিতে সর্বস্ব পণ করে যে মানুষ, নিজের মেয়েকে সে পারে না হিন্দু বিধবার আচার থেকে মুক্ত রাখতে। দেশ যেমন সাম্রাজ্যের উপনিবেশ, তারা তেমন নিজদেশে পরদেশী। চারুর ঐ সংলাপে তাই একাকার হয়ে থাকে জগতের সমস্যা আর উনিশ শতকের বাংলার সমস্যা। যা 'রাজনীতি' আর 'আর সব'-এর ব্যবধান থেকেও করুণ। 'ইংরেজিতে রাজনীতি'র এই বাংলাদেশে চারুলতার মতো পাঠিকা বা লেখিকার শিক্ষিতের অধিকার নেই। এইসব 'না'-এর সঙ্গে যুঝতে যুঝতেই চারুর জীবন, তার নীরব হাহাকার। সমুদ্রতীর থেকে ফিরে এসে তা প্রথম সরব হয়ে ওঠে। অমলকে নিয়ে চারুর অনুভূতির স্বরূপ সত্যজিৎ গোটা ছবি জুড়ে দেখিয়েছেন। সে অনুভবে যে অমলের কাছ থেকে কোনো সাড়া নেই, তা পরিষ্কার। এমন কোনো ভালোবাসা চারু অর্জন করতে পারেনি, যার মুক্ত প্রকাশে বলা যায়, 'কী অর্থ হয় একই ছাদের তলায় থাকবার, যখন গোটা পৃথিবীই আমাদের যৌথ সম্পদ? পরস্পরের থেকে দূরে যেতে কিসের ভয়, যখন কোনো কিছুই আমাদের সত্যি সত্যি বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না?[৮] প্রেমিকের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার তাগিদে সে লেখে, যদি দেখে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি জুড়ে নিয়েছে তাদের ভিতরে খানিকটা জায়গা। প্রেমিকের মুগ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যায় সে রচনার প্রযোজনীয়তা। নাকি চারুর সেই প্রথম কান্নার ছিল কোনো দ্বিতীয় অর্থ? 'আমার গ্রাম'-এর আশ্রয়ে 'অমাবস্যার আলো' অথবা 'সূর্যের কলঙ্ক'-র জগৎকে বাঁধতে চাওয়ার নিষ্ফলতা কি বুঝেছিল সে? তাই কেঁদেছিল 'বিশ্ববন্ধু'টি অবজ্ঞাভরে ফেলে দিয়ে! নাকি তেমন কোনো চৈতন্যকে অর্জন করবার তাগিদ ছিল না চারুর? অমলের জন্য নয় শুধু, নিজের জন্য আর সকলের জন্য লেখার কথা কি সে ভাববে কখনো?

ব-এর খেলায় আড়াল করে সত্যজিৎ চারুকে তেমন কোনো চেতনার কিনারে নিয়ে

যেতে চান। তার পরেই দেখি ভূপতির উপরে বাইরের প্রতিশোধ চেপে বসছে—'সেন্টিনেল' পত্রিকা যখন হয়ে গেছে মৃত সৈনিক। বিশাল বারান্দার এককোণে অমলকে নিয়ে চারুর আকুলতা 'ঠাকুরপো, কথা দাও—যাই ঘটুক না কেন তুমি যাবে না— যাবে না যাবে না। কথা দাও—।' কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভূপতির বিপর্যয়ের খবর পায় চারু। সহানুভূতিতে ভূপতির বুকে মাথা রাখে সে। আর সেখানে থেকেই দেখতে পায়, বারান্দার অন্য প্রান্তে অমল বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এইবার সেই ঘূর্ণাচক্রকে বুঝতে পারি আমরা, যার বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথও দেখিয়েছিলেন, কেমন করে অমলের বিচ্ছেদে জর্জর চারু স্বামী সেবার ব্যর্থ প্রয়াসে মেতে ওঠে। অমল আর সাহিত্য, সাহিত্য আর বৌঠান— এখানে লক্ষ উপলক্ষে কেমন বিভ্রান্তি এসেছিল। তবু ঘরকন্নার অবসরে অমলের জন্য 'অশ্রুমালা সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির' চারুর বানানো রইল। অন্য দিকে ভূপতি চাইল পত্রিকার বিকল্প নেশার মতো করে স্ত্রীকে পেতে। সেখানেও দেওয়া-নেওয়ায় ছিল বিরাট ফাঁক। ফুলের মতো সহজ হয়ে আসেনি তাদের যৌথ জীবনের ভাষা আর ছন্দ। মুখে সামান্য হাসি ফোটাতে চারুকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হতো, অমলের নাম শুনলে চমকে উঠত সে, কথা বলতে বলতে হঠাৎ উঠে যেত কাঁদবার জন্য। এই ঘূর্ণচক্রে ঘুরে মরার যন্ত্রণাই বেরিয়ে আসে 'চারুলতা' ছবিতে, যখন চারু কান্নায় আকুল, 'ঠাকুরপো, কেন তুমি চলে গেলে... আমায় না বলে।' 'নষ্টনীড়' কাহিনীতে চারু বালিশে মুখ গুঁজে বলত 'অমল, তুমি রাগ করিয়া চলে গেলে কেন। আমি তো কোনো দোষ করি নাই। তুমি যদি ভালো মুখে বিদায় লইয়া যাইতে তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না।'

'নষ্টনীড়'-এর শেষ পরিচ্ছেদে ভূপতি যখন মহীশূরে চলে যাচ্ছে, চারু বলেছিল, 'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না।' এ চৈতন্য তখন ভূপতির সম্পূর্ণ যে তার সংসার আজ নষ্টনীড়। সে বুঝল, এই নষ্টনীড় অমলের বিচ্ছেদ স্মৃতিতে ভরা। তাই চারু পালাতে চায়। কিন্তু যে স্ত্রী মনের মধ্যে অন্য পুরুষকে ধ্যান করছে, তাকে স্বামী বইবে কেমন করে! ভূপতি বলেছিল, চারুকে নিয়ে যেতে সে পারবে না। চারুর মুখের সব রক্ত নেমে গিয়েছিল। শুকনো সাদা মুখে সে মুঠো করে চেপে ধরেছিল খাট। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ভূপতি বলে, চলো চারু আমার সঙ্গেই চলো।' কিন্তু চারুর ঘূর্ণাচক্রের অবসানেই নষ্টনীড়ের কাহিনীর শেষ। চারু বলে, 'না থাক্।' অনেকদিন আগে, অমলের বিদায় বেলায় তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল চারু। অমল ভূপতির সঙ্গে ছাড়া আসতে ভরসা পায়নি। অমল সেদিন যখন শুধিয়েছিল 'বৌঠান আমাকে ডাকছ?' চারু বলেছিল এখন আর তার কোনো দরকার নেই। অমল বলে 'তা হলে আমি যাই, আমার আবার অনেক গোছাবার আছে।' 'চারু তখন দীপ্তচক্ষে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিল; কহিল "যাও"।' সেই দীপ্তি থেকে আজকের 'না থাক্' সংলাপটিতে আসতে যে কাহিনীর মধ্যে দিয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের চারুলতা, সেখনে তার আচরণে, তার হাসি অথবা কান্নায়, সংলাপে অথবা নীরবতায়, স্থৈর্যে কি আকুলতায় মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি, কাহিনীর শেষ সংলাপটি উচ্চারণ করবার জন্য সে গড়ে নিচ্ছে নিজেকে। অমলের স্মৃতিতে তখন সে সদাই আকুল, অস্থির। সেই অস্থিরতা ভুলে থাকতেই তার স্বামীসেবা। যন্ত্রণার আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলতে জ্বলতে চারুর মধ্যে নিশ্চিত গড়ে উঠেছিল

আরেক প্রতিমা, যে প্রতিবাদ করবে। বিশ্বকে যে বলবে 'না থাক্।' কিন্তু কেমন করে ভূপতির স্ত্রী, অমলের বৌঠান পেল সেই শক্তি? কীই বা হলো তার এই না-মানার স্বরূপ? রবীন্দ্রনাথ কি এই উত্তর কাহিনী ব্যেপে অনেক অর্থময় নীরবতার রেখে গেছেন? না কি তিনি শুধু উত্তীর্ণ চারুলতাকেই দেখেছিলেন? চারুর উত্তরণের আলেখ্য ছিল তাঁরও নাগালের বাইরে! যে প্রস্তুতির ভিতরে দিয়ে নিজেকে ভেঙে ভেঙে গড়ে গড়ে মানুষ পরিপার্শ্বকে, তার এযাবৎকালের অবলম্বনকে 'না' বলতে পারে, তাকে তিনি চারুর যন্ত্রণার আড়ালে নিঃশব্দ রাখেন। যা তিনি বলেন, তার থেকে অনেক বেশি তাই না বলা থেকে যায়।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে চারুর মতো একটি চরিত্র যদি চৈতন্যের শিখরে উত্তীর্ণ হতে চায়, তবে তার জীবনের অবলম্বন কী হবে? সে পেরিয়ে যেতে পারে ভূপতি অথবা অমলের চৈতন্যকে। সে না মানতে পারে এই দুই পরবাসীর কর্ম ও জীবন। কিন্তু মানবার জন্য, জানবার জন্য সে কি পাবে কিছু? না কি তার চেতনাও হবে নিরালম্ব? এসব প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের কাছে খুব তীব্রভাবেই আসার কথা। সে যুগের বাংলায় জ্ঞানের আলো আর সংস্কৃতির প্রসাদে সব থেকে উজ্জ্বল যে পরিবার, সেই ঠাকুরবাড়ি রবীন্দ্রনাথের পরিপার্শ্ব; সে বাড়ির অন্দরমহলে ছিলেন বাংলার প্রথম আই সি এস-এর সুযোগ্যা সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। যৎসামান্য ইংরেজি বিদ্যের পুঁজি নিয়ে যিনি অসীম সাহসে পাড়ি দিয়েছিলেন বিলেতে। আত্মীয়স্বজনদের জন্মদিন পালন আর বিকেলে বেড়াতে যাওয়া, এই দুটি বিলেতি প্রথা গ্রহণ করেছিলেন। রোমাঞ্চকর বিদেশী কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের পত্রিকা 'বালক'-এর জন্য। জ্ঞানবিজ্ঞানে সংস্কৃতির যে নতুন জগৎ খুলে যাচ্ছিল তখন বাংলাদেশের সামনে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মানুষদের সেখানে স্বভাবতই অগ্রাধিকার। জ্ঞানদানন্দিনী-সত্যেন্দ্রনাথ সেই নতুন সংস্কৃতির কাছের মানুষ, মেজদাদা-মেজবৌঠান জ্যোতি ঠাকুরের আপনার জন। তাঁদের উৎসাহেই মূলত, স্ত্রী কাদম্বরীকে অশ্বারোহণ শেখানো।

কাদম্বরীর মৃত্যু নিয়ে যে কটি কাহিনী প্রচলিত, তার একটিতে দেখি বিরজিতলাওয়ে মেজদাদা-মেজবৌঠানের বাড়ি থেকে এক রাত্রে জ্যোতি ঠাকুর জোড়াসাঁকোয় ফিরতে পারেননি। আড্ডায়, গানে রাত কাবার হয়ে গিয়েছিল। সেদিনই নাকি কাদম্বরী বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন তাড়াতাড়ি ফিরতে। সেই রাত্রির দু দিনের মধ্যেই কাদম্বরী আত্মহত্যা করেন। আবার শোনা যায়, শুধু সেদিনের অভিমান নয়, জ্যোতিরিন্দ্রিনাথের সঙ্গে তখনকার কোনো এক অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠতাই নাকি এই মৃত্যুর কারণ। রবি ঠাকুরের বিবাহ এই আত্মহত্যার হেতু, এমন কথাও এককালে খুবই চালু ছিল। কারণ যাই হোক, কাদম্বরীর মরণের সত্য যে কী মর্মান্তিক ছিল, তা আমরা বারে বারে উপলব্ধি করি। স্ত্রীর মৃত্যুর সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। অনেক অনুরোধেও দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নি তিনি, বলেছেন, 'তাঁকে ভালোবাসি।' আর রবি ঠাকুর, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যখন তুলি-কলম তুলে নিলেন হাতে, তখনো অকপট স্বীকারোক্তি তাঁর, 'নতুন বৌঠানের চোখদুটো এমনভাবে আমার মনের মধ্যে গাঁথা আছে যে মানুষের ছবি আঁকতে বসলে অনেক সময়েই তাঁর চোখ দুটো আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে—কিছুতেই ভুলতে পারিনে। তাই ছবিতেও বোধ হয় তাঁর চোখেরই আদল এসে যায়।'[৯]

কৌতুক করেছেন তিনি শেষ বয়সে, ভাগ্যিস নূতন বৌঠান মারা গিয়েছিলেন তাই আজও তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখছি—বেঁচে থাকলে হয়তো বিষয় নিয়ে মামলা হত।[১০] কৌতুক নিঃসন্দেহে, কিন্তু নিছক কৌতুকই কি শুধু? অনন্য সেই কবিপ্রতিভার এত দীর্ঘস্থায়ী প্রেরণা আর তো কেউ ছিলেন না।

কী ছিলেন এই কাদম্বরী—রবি ঠাকুরের নতুন বৌঠান। সাহিত্য পাঠিকা হিসাবে যাঁর শুনি তুলনা ছিল না, যিনি সু-গায়িকা, সু-অভিনেত্রী, আবার কাছের মানুষদের রোগশয্যায় অপরিহার্য সেবিকা। ঘোড়ায় চড়তে শিখেছিলেন বটে কাদম্বরী, তবে 'ইংরাজিতে রাজনীতি আর বাংলায় আর সব'-এর শূন্যতা তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল বলেই মনে হয়। সেই শূন্যতাকে যথার্থ জীবন বলে মানতে পারেননি কাদম্বরী। অথচ সে দিনের বাংলাদেশে বেঁচে থাকার শূন্যতাকে যদি চৈতন্যের কিনার ধরে কেউ অর্থহীন বলে জানতে পারে, কাদম্বরীদের কাছে মৃত্যু ছাড়া কোনো প্রতিবাদ হয়তো থাকে না। জ্যোতি ঠাকুর অথবা রবি ঠাকুরও নিজেদের সমস্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা নিয়েও কাদম্বরীকে সম্পূর্ণ বুঝে নিতে অক্ষম। ঠাকুরবাড়ির অঙ্গিনায় নতুন বৌঠানের জীবন মরণের কাহিনী চৈতন্যের আশ্চর্য স্বরূপ কিশোর কি যুবক রবিকে দেখিয়েছিল। হয়তো এ বোধ রবীন্দ্রনাথের সেদিন ছিল যে মরণে কাদম্বরী নিশ্চিত জিতে গেল। কিন্তু সেই জয়ে পৌঁছানোর আলেখ্য যে কী, অর্থাৎ যন্ত্রণার কোনো অন্তবিহীন পথ-পরিক্রমায়, রবি ঠাকুরের নতুন বৌঠান, জ্যোতি ঠাকুরের কাদম্বরী মরণকে নির্বাচন করবার জোর পেল, চৈতন্যের মুক্তিতে হলো অনন্ত, তা রবীন্দ্রনাথেরও নাগালের বাইরে তাঁর কাছেও তাই অনেক বড় হয়ে থাকে বৌঠানের মরণের সত্য। হয়তো সত্যিই এই কারণে চারুলতার 'না থাক্' সংলাপটুকুই 'নষ্টনীড়' কাহিনীতে প্রেরণা হয়ে থাকে। চারুর উত্তীর্ণতা নিয়ে লেখক এতটুকু দ্বিধা রাখতে চাননি। অন্যথায় 'নষ্টনীড়'-এর বিংশ পরিচ্ছেদটি লিখবার কোনো প্রয়োজন হতো না। চারুলতা-ভূপতির নীড় যে নষ্টনীড়, এ সত্য উনবিংশ পরিচ্ছেদেই সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু কেমন করে চারু তার পরিপার্শ্ব থেকে 'না থাক্'-এর মুক্তিতে পৌঁছল, সেই জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ শব্দ থেকে পালিয়ে যান।

প্রায় ছয় দশকের ব্যবধানে যখন 'নষ্টনীড়' কাহিনীর চিত্ররূপ দিলেন সত্যজিৎ, কাহিনী জোড়া অনেক নিঃশব্দকে তিনি গভীর অর্থের ব্যঞ্জনায় শব্দময় করে তুললেন সংসার আর সমাজকে, ঘর আর বাহিরকে গেঁথে গেঁথে 'নষ্টনীড়'-এর কাঠামোয় তিনি প্রাণ দিলেন সমাজ-ইতিহাসের ট্র্যাজেডিকে। ভূপতির কাহিনীতে এসে গেল যেন এক নতুন মাত্রা। ইংরেজের সেই উপনিবেশে শিক্ষিত ধনবান বাঙালীর জীবনে তখন ঘরে-বাইরে প্রকৃতির প্রতিশোধ। বিদেশী ভাষায় স্বদেশের দুঃখ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে সে। বোঝেও না, কর্মজীবনের আশ্রয় শূন্য হতে চলেছে। রিক্ত মনে ঘরে ফিরে দেখে, সংসারের পরম সম্পর্কটিও আজ মিথ্যে। অমলের কাহিনীরও মূল সুর অটুট থাকে। এ এমনই দেশ, যেখানে আপন জনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পরদেশকেই আশ্রয় করতে হয়। চারুকে তো দুই পরবাসী আবর্ত থেকে কঠিন পরিক্রমায় বেরোতে হবে। যার শেষে অন্ধকারের নাটক হয়ে উঠবে আলোর নাটক। সুপ্ত অন্ধকার জেগে উঠবে; সুবর্ণ থেকে সপ্তরাজার স্বয়ংবর সভা—সব মুছে ফেলে, রাণীর অহং ঘুচিয়ে, রাণীবেশকে কাটিয়ে ধূলায় ধূসর সেই কঠিন বন্ধুর পথ-পরিক্রমা। যার শেষে আসল রাজাকে একান্ত করে পাওয়া।

সত্যজিতের চারুলতা অমলের চিঠি ছিঁড়ে ফেলে, মুখে তার বিষাদময় হাসি। তার পর সে স্নান করে, চুল আঁচড়ে নেয়, কপালে দেয় টিপ। তার বোনা যে পশমের চটিজোড়া অমল ফেলে দিয়েছিল, তা চারু ফিরিয়ে আনে ভূপতির ঘরে। ঘূর্ণাচক্রের কি তবে শেষ নেই? স্বামী বাড়ী ফিরলে চারু তাকে ঘরে ডাকে, 'এসো'। হাত বাড়িয়ে দেয় তার দিকে, আবার বলে 'এসো'। ভূপতি আসবে। চারুর হাতের দিকে সে হাত বাড়ায়। দুটি হাতের মাঝে থাকে সামান্য ব্যবধান। ভূপতি-চারুর স্থিরচিত্রেই 'চারুলতা'-র সমাপ্তি, আবহে তখন পুরনো দিনের বহু সংলাপ ফিরে ফিরে আসে। সত্যজিতের চারুলতা নষ্টনীড়ের বাস্তবকে মেনে নিয়ে ঐ আবর্তের মধ্যেই বাঁচবার চেষ্টা করবে। নিজের শয়নকক্ষে অমলের সঙ্গে ব-এর খেলা খেলতে খেলতে, সমুদ্রতীরে ভূপতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে চারু তার দেশকালের জটিলতম জিজ্ঞাসাগুলো হয়তো অবচেতনেই উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু সেই অবচেতন থেকে চৈতন্যে মুক্তি পাবে না চারু। 'নষ্টনীড়'-এর চারুর শেষ সংলাপের নীরবতাকে পড়বেন না সত্যজিৎ। অথচ তার ছবির নাম 'নষ্টনীড়' নয়, 'চারুলতা'।

তবে কি সত্যজিৎ মেনে নিলেন বিয়ে-বিলেত-ব্যারিষ্টাব-এর এই বাংলাদেশে, 'ইংরাজিতে রাজনীতি'র এই উপনিবেশে চারুর মতো পাঠিকা আর লেখিকা, তার মতো বৌঠান, তারই মতো বিশিষ্ট কোনো মেয়ে কর্ম মননের কিনার ধরে বহির্জগতে এসে দাঁড়াবে, এ অসম্ভব। লেখকের চারুর মুখের 'যাও' থেকে 'না থাক্' -কে এক অভিন্ন সূত্রে গেঁথে নিতে গেলে সংসার-সমাজ সংস্কৃতি-অর্থনীতি মৌলিকতার যে প্রসাদ আর নিশ্চিতি দাবী করে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে তা থেকে সম্পূর্ণ রিক্ত! ছবিতে তাই চারুর 'না পারার সত্যটুকুকেই মেনে নেওয়া হয়। সত্যজিৎ নিজেও সম্ভবত সচেতন যে 'চারুলতা' নামে যে স্বপ্ন ছিল, তাকে তাঁর শিল্প আশ্রয় দিতে পারে না। যন্ত্রণার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে শেষ সংলাপটি বলবার জন্য চারু যে নিজেকে প্রস্তুত করেছে, সে প্রস্তুতির আলেখ্য কোনো স্পষ্টতর মাত্রা পাবে, এমন আশাও তাই না মেটাই থেকে যায়। 'চারুলতা' ছবির শেযে পর্দায় দেখি লেখা হয় 'নষ্টনীড়'। শব্দ থেকে পালিযে রবীন্দ্রনাথ চারুকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন। শব্দ আর নিঃশব্দের অনেক ব্যঞ্জনার পরেও সত্যজিৎ চারুকে নষ্টনীড়ের সীমান্তেই বেঁধে রাখলেন।

হয়তো এটাই স্বাভাবিক। চারুদের মৌলিকতা ভূপতিদের পরবাসী জীবনকে অবলম্বন করেই ফুরিয়ে যায়। আর চারুর সেই নির্ভরশীলতা পরবাসের হারজিতের মধ্যে এক আত্মতুষ্টির আবরণ তৈরি করে ভূপতির জীবনে। কর্মজীবনে পারা না-পারার দোলায় কেবলি সে আরো দূরের কোনে পরবাসকে নিজবাস বলে ভুল করতে থাকে। ব্যক্তিজীবনে সেই অপ্রিয়টুকুই সত্য, যেটুকু তার জানার মধ্যে। যা তার চৈতন্যের অতীত, এমন কোনো সত্যের সামনে দাঁড়াতে হয় না তাকে।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন 'নষ্টনীড়' কাহিনী শেষ করেন, নতুন কর্মময়তার প্রসাদে পূর্ণ ছিল তাঁর মন। এক মাসের মধ্যে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হলো ব্রহ্মচর্যাশ্রম। রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে দেশের মাটির যোগাযোগ সুদূর ছিল না, অন্তত রবীন্দ্রনাথ তা রাখতে চাননি। আশ্রমের এই কাজে তিনি তাঁর সহধর্মিণীকে পেয়েছিলেন সহকর্মিণী রূপে। আমরা জানি 'বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ছাত্রগণের করণীয় সকল বিষয় তত্ত্বাবধান তিনি (মৃণালিনী দেবী) অবশ্য কর্তব্য মনে করিতেন। পাছে বালকগণের কষ্ট হয়, এই

ভাবিয়াই তিনি তাহাদের খাওয়ার ও জল খাবারের ভার নিজে হাতেই লইয়াছিলেন ও দেখিয়া-শুনিয়া খাওয়াইতেন। ... ভ্রাতৃভাব শিষ্টাচার সংযম নিয়মনিষ্ঠা বিলাসবর্জন প্রভৃতি আশ্রমের আদর্শভূত সদ্‌গুণে বালকগণকে শৈশব হইতে মানুষ করিয়া গড়িয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করার নিমিত্ত মৃণালিনী দেবী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন।'[১১] রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মা পেয়েছিলেন প্রচুর, বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ির পুরানো আমলের ভারী গয়না ছিল অনেক। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের খরচ জোগাতে সব অন্তর্ধান হলো। ... যে বিদ্যালয় তিনি (রবীন্দ্রনাথ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা তাঁর সাময়িক শখের জিনিস ছিল না। বহুদিন ধরে যে শিক্ষার আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে কল্পনার আকারে ছিল তাকেই রূপ দিতে চেয়েছিলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। তিনি কেবল আদর্শবাদী ছিলেন না, আদর্শকে রূপায়িত না করতে পারলে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা, যতই তা কঠিন হোক না কেন, তিনি যথেষ্ট মনে করতেন না। সেই ত্যাগ স্বীকারে মা তাঁর অংশ স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছিলেন।'[১২] ঠাকুরবাড়ির এই সাদাসিধে বধূটি নতুন কিছু গড়ে তুলবার কাজে নিজেকে অনেকখানি প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। অবশ্য ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে আর কারোও স্বামীই 'ইংরেজিতে রাজনীতি'র এই বাংলাদেশে এতখানি দেশজ প্রচেষ্টার কথা ভাবেন নি। 'ইংরেজিতে রাজনীতি'র সেই জগতে নিজের জোরে জায়গা করে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল যাঁদের, সেই সব মহিলারাও সেদিনের বাংলাদেশে নারীকে পরিপূর্ণ মানুষের উপমায় ভাবতে পারেননি। বাংলাদেশের তথাকথিত নারীজাগরণের দর্পণে যার নাম আজও উজ্জ্বল, বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বে মহিলা ঔপন্যাসিকদের অন্যতম যিনি, নিজের লেখা 'কাহাকে' উপন্যাস যিনি নিজেই ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'অ্যান আনফিনিশড সঙ', সেই স্বর্ণকুমারী দেবীকে একবার প্রশ্ন করা হয় মৃণালিনী দেবীর কোনো রচনা আছে কিনা। স্বর্ণকুমারী বলেছিলেন, তাঁহার স্বামী বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, সেই জন্য তিনি স্বয়ং কিছু লেখা প্রয়োজন মনে করেন নাই।'[১৩]

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে মৃণালিনীর স্থান যে কোথায় ছিল তা বোঝা যায়, যখন তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরেও রবীন্দ্রনাথ ঊর্মিলা দেবীকে বলেন, 'তোমাদের ছেলেরা যে যত্নে মানুষ, এখানে কি থাকতে পারবে? এখানে অনেক কষ্ট। আমি তাদের সব দিতে পারি, মাতৃস্নেহ তো দিতে পারি না। রথীর মা সে বিষয়ে আমায় অসহায় করে রেখে গেছেন।'[১৪] রবি ঠাকুরের কবিতার প্রেরণায় ফিরে ফিরে এসেছেন কাদম্বরী। আর কর্মের সমস্যায় মৃণালিনীকে মনে পড়েছে তাঁর। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় গড়ে তুলবার মননে শিল্পী কর্মী ব্যক্তি একাকার হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় চৈতন্যের এক স্বরূপ দেখেছিলেন তিনি জীবনের প্রথম প্রান্তে। মনে কি ছিল তাঁর, এমন কোনো কর্মময় বিশ্ব গড়ে তুলতে হবে, যার আশ্রয়ে তাঁর দেশের একান্ত মৌলিক শিক্ষা সংস্কৃতি রুচি আর জীবন দেশের মাটিতেই প্রাণের খোরাক পাবে? বিশ্বসভ্যতার যা কিছু শুভ তাকে এই মাটিতে মেলাতে হবে — অনুকরণে নয়, সাবালক গ্রহণে। যে চৈতন্যের স্মৃতিতে তাঁর মন আজীবন ভারাক্রান্ত থেকেছে, তা কোনা স্পষ্ট অবয়বে মূর্ত হতে পারত এই আদর্শ মন্দিরে এমন কথা কি ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ! এই সবকিছুই অনুমান মাত্র। তবু 'নষ্টনীড়' -এর শেষ সংলাপটির শক্তি আর সেই সময়ব্যেপে বিদ্যালয় গড়ে তুলতে লেখকের

পরিশ্রম ও আসক্তি এই দুইকে পরস্পরের সম্পূরক ভাবতে বেমানান কিছু লাগে না। ১৯০১ সালে 'নষ্টনীড়'-এর লেখা অথবা ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়ে তুলবার পরেও রবীন্দ্রনাথের জীবনে বাকি থাকে আরো চারটি দশক, সঙ্গে অন্তহীন কর্ম আর শিল্প। শান্তিকেতনের বিদ্যালয় বড় হলো। বিশ্বভারতী তৈরি হলো। কিন্তু আদর্শের সেই শিক্ষানিকেতন, অপার ভালোবাসার সেই প্রতিষ্ঠান, তাঁর অসামান্য জীবনের অনেকখানি দিয়ে যার নির্মাণ, তারই সম্পর্কে জীবনেব শেষ প্রান্তে এসে হতাশায় ক্ষোভে তিনি বলেন 'আমার উচিত ছিল বিশ্বভাবতীর সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য বিশ্বভারতীয় শেষ টাকা ফুকে দিয়ে চলে যাওয়া।'[১৫] তবে কি তেমন কোনো আদর্শে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না আমাদের দেশে মাটিতে। আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখে সাফল্যকে অর্জন করা বুঝি অসম্ভব। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রবীন্দ্রনাথ চারুলতার প্রতিবাদকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। জীবনের বাকি চার দশকে সে আশা কি হারিয়েছিল প্রখরতা? রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর তিন বছর পরে সত্যজিতের চারুলতাকে দেখলাম আমবা। চেতনার কিনারে যে পৌঁছতে চায় বার বার। যার মুখের অসামান্য সংলাপে ভাষা পায় দেশ কালের কঠিনতম প্রশ্ন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিপার্শ্বের সঙ্গে আপসেই তার ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হলো। নকল বেঁচে থাকাকে পেরিয়ে এসে আসল জীবনকে চারু চিনল কেমন করে সে আলেখ্য আড়ালে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর সত্যজিতের ছবিতে হারিয়ে গেল চারুর পেরিয়ে যাওয়ার সত্যটুকু। রবীন্দ্রনাথ যদি দেখতেন তাঁর কাহিনীর এই নতুন চেহারা, তিনিও কি মেনে নিতেন সত্যজিতের চারুলতাকে? ভাবতেন এই সঠিক, চারুর এই মেনে নেওয়া? আর শতাব্দীর শুরুতে যে চারুলতাকে তিনি গড়েছিলেন, তা শুধু জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক স্বপ্নের কবিতা?

যা হয়তো তাঁর নিজেরও অতীত, তাকে নিঃশব্দের অন্তরালে ঘিরে ঘিরে উত্তীর্ণ চৈতন্যের মুক্তিকেই সত্য করতে চেয়েছিলেন মধ্যবয়সী রবি ঠাকুর। চারুর শেষ সংলাপের স্বরূপ কী হবে, এ নিয়ে জিজ্ঞাসা এমন কি যন্ত্রণাও থাকবে আমাদের। তবুও 'না থাক্' -এর সেই জোরে রবি ঠাকুর তার চারুলতাকে পরিপার্শ্ব থেকে এগিয়ে দিতেই চান। কিন্তু এই পরবাসীব দেশে, উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকে এসে, এমন কি আজকের এই তথাকথিত স্বাধীন জীবনেও সমাজ সংসারের স্তরে স্তরে সেই সত্য কোনো সর্বাঙ্গীন উপমা পায়নি। 'নষ্টনীড়' কাহিনীকে যখন নতুন শিল্পমাধ্যমে স্পর্শ করলেন সত্যজিৎ রায়, লেখকের প্রথম উনিশ পরিচ্ছেদ অসামান্য তাৎপর্যে গ্রথিত হলো। কাহিনীতে নিহিত অর্থের সরব- নীরব ব্যঞ্জনা কী বৈভবে ভরে দিল 'চারুলতা' ছবিকে, সে কথা বার বার বলেছি। কিন্তু কাহিনীর প্রথম উনিশটি পবিচ্ছেদের সঙ্গে শেষ পরিচ্ছেদের যোগাযোগ এই নতুন শিল্প মাধ্যমেও গড়ে উঠল না, বরং হারিয়ে গেল বিংশ পরিচ্ছেদটি। যে পরিচ্ছেদের শেষে রবীন্দ্রনাথের চারু হাত বাড়িয়ে দেয় না কারো দিকে, কাউকে ডেকে বলে না সে, 'এসো', হাতদুটি আপনার মুঠিতে তখন শক্ত তার, কোনো করুণায় কোনো অনুরোধে আস্থা নেই আর, সে বলছে, 'না থাক্', কাহিনীর ভিতর থেকে সেই যোগাযোগের যুক্তিকে খুঁজে নেওয়া দুরূহ ছিল। অভিজ্ঞতা কি কল্পনার অযাচিত বৈভবে, সাহিত্যের অতুলনীয় প্রসাদে চারুর উত্তরণই 'নষ্টনীড়' কাহিনীর শেষ সংকেত। কিন্তু ভিন্ন শিল্পমাধ্যমের ভিন্ন ভাষায় কেমন ভাবে 'নষ্টনীড়'-এর শেষকে বুনে দেওয়া যায়, বা আদৌ যায় কিনা, এ জিজ্ঞাসার উত্তর আজও মেলেনি। সত্যজিতের চারু বলে, 'ইংরেজিতে

রাজনীতি আর বাংলায় আর সব। একটা তুমি দেখবে, আর একটা আমি'। স্বামীকে তো শুধোয় না সে, 'তোমাদের রাজনীতি বাংলায় হয় না? কেন?'

যদি বা চারু করত এমন কোনো প্রশ্ন, সত্যজিতের চারুলতা হয়তো আরো এক ধাপ এগিয়ে যেত 'না থাক্' বলবার দিকে। কিন্তু সেই সত্যেরও কি কোনো জায়গা হয়েছে দেশের মাটিতে? পরাধীনতার অন্ধকারে, উনিশ শতকের বাংলাদেশ— রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের নেতৃপদে। তবু সেদিন ইংরেজের জয়পতাকা উড়িয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, বাঙালি তো সেই রথযাত্রার ভিখারী বই কিছু নয়— যেমন ভূপতি, অমল, চারুলতা। সেদিনের গৃহবধূ চারুলতার যদি সন্তান থাকত, তবে তার একাকিত্ব এমন মর্মান্তিক চেহারা নিত কি না, এ প্রশ্ন মনে আসে অনেকেরই। সন্তানের জননী হলে প্রকৃতই কি আসত চারুর সমস্যার সমাধান? যদি ছেলে থাকত চারুর, হতো সে ভূপতির মতো। আর মেয়ে হলে, চারু তার মধ্যে মিশে থাকত খানিকটা। মাতৃত্ব একটা আড়াল আনত চারুর নিঃসঙ্গতায়। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম চারুর উত্তরাধিকারকে এমন কোনো ব্যাপ্ত চেহারা দেবে না, যেখানে দেশের মেয়ে চারুলতার মূল সমস্যা কোনো সমাধান অথবা সম্মান পাবে।

চারু-ভূপতির বেশ কয়েক প্রজন্ম পরে আজও দেখি বাঙালির স্থান সেই ভিক্ষাবৃত্তিতেই চিহ্নিত। চারুলতার যুগে বাংলাদেশের মানুষ যদি হয় রথযাত্রার ভিখারী, ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরতে ঘুরতে আজ সে হয়েছে উল্টোরথের ভিখারী। আর এক শতকব্যাপী এই যাত্রাপথে বাংলাদেশ হারিয়েছে ভারতের মাটিতে নিজের নেতৃপদটুকু। ভূপতি চারুর উত্তরপুরুষ আজ বাংলায় রাজনীতি করে ঠিকই। কিন্তু ঘূর্ণাচক্রের শেষ হয় নি এখনো। 'ইংরেজিতে রাজনীতি আর বাংলায় আর সব'-এর উপনিবেশ থেকে বাঙালি এসে পড়েছে বাংলায় রাজনীতি আর ইংরেজিতে আর সবের স্বাধীন দেশে। ইতিহাস আর বর্তমান জোড়া আমাদের রিক্ততা নিছক অনুকরণের আবরণে আড়াল থাকে। নিরাবরণ সত্যের যন্ত্রণাকে যুঝতে যুঝতে প্রকৃত মুক্তির পথকে খুঁজতে আজও না আছে ভরসা, না আছে ক্ষমতা। অন্ধকারের নাটক এই আবর্তে আলোর নাটক হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ এ দেশের মহত্তম প্রতিভা, আর রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের উজ্জ্বলতম শিল্পী সত্যজিৎ। তবু এ তো সেই দেশ, যে দেশের জীবন পরবাসকে বার বার নিজবাসভূমি বলে ভুল করে।

---

১. 'আনন্দমঠ'-এর প্রকাশের তারিখ ১৮৮২। অমল যদি 'বঙ্গদর্শন'-এও উপন্যাসটি পড়ে থাকে, তাও ১৮৮১-র আগে সম্ভব নয়। অথচ 'চারুলতা'র ঘটনাকাল যে ১৮৭৯-৮০, লীটনসাহেবের শাসনব্যবস্থা, গ্ল্যাডস্টোন-এর নির্বাচন সব মিলে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে ঐতিহাসিক তথ্যের এইটুকু অসংগতি 'চারুলতা'র মতো শিল্পের বিচারে কখনোই মুখ্য হয়ে ওঠে না। সত্যজিৎ রায় ঐ সংলাপের ভিতর দিয়ে একটি যুগকে স্পর্শ করতে চান। সেখানে তিনি সার্থক।

২. সত্যজিৎ রায়, "চারুলতা প্রসঙ্গে", 'বিষয় চলচ্চিত্র', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ ৫৬

৩. সত্যজিৎ রায়, "চিত্রনাট্য চারুলতা", নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত 'এক্ষণ' শারদীয় ১৩৮৯, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ২৪৮

৪. সত্যজিৎ রায়, "চারুলতা প্রসঙ্গে", 'বিষয় চলচ্চিত্র', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ৪৭

৫. Leonore Davidoff, Jean L'esperance and Howard Newby, "Landscape with Figures: Home and Community in English Society" in Juliet Mitchell and Ann Oakley (Ed) 'The Rights and Wrongs of Women'. Penguin Books,1974, pp-155,166.

৬. Simone de Beauvoir, 'The prime of Life', Penguin Books, 1965, p-41.

৭. Reginald Heber, 'Narration of a Journey through the upper provinces of India from Calcutta to Bombay, 1824-25, vol-1. London, 1828, pp-103

৮. Simone de Beauvoir, 'The prime of Life' Penguin Books, 1965, p-25

৯. মনোরঞ্জন গুপ্ত, "মানুষের প্রতিকৃতি", 'রবীন্দ্রচিত্রকলা,' কলকাতা, ১৯৪৯, পৃ৩২

১০. মৈত্রেয়ী দেবী, 'রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে', প্রাইমা পাব্লিকেশন্স্ কলকাতা, ১৩৮৩, পৃ ১০

১১. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "মৃণালিনী দেবী", 'মৃণালিনী দেবী', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলকাতা ১৩৮১ পৃ ১৪

১২. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর "স্মৃতিকথা ৩", 'মৃণালিনী দেবী', বিশ্ব ভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলকাতা '১৩৮১ পৃ ২৩

১৩. মন্মথনাথ ঘোষ, "কবিপত্নী", 'মৃণালিনী দেবী', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলকাতা ১৩৮১ পৃ ১৭

১৪. ঊর্মিলা দেবী, "কবিপ্রিয়া", 'মৃণালিনী দেবী', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ১৩৮১ পৃ ৪৫-৪৬

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পথে ও পথের প্রান্তে', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা ১৩৪৫, পৃ ৬৩

সত্যজিতের ‘চারুলতা’

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

সত্যজিৎ এক সাক্ষাৎকারে জনৈক প্রতিবেদককে জানিয়েছিলেন (এপ্রিল ১৯৯১) সব দিক দিয়ে বিচার করলে ‘চারুলতা’ হয়ত তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি (সাপ্তাহিক বর্তমান, ১১ এপ্রিল ১৯৯২ পৃষ্ঠা ১৮)। এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক আগেও হয়েছিল, পরেও হয়ত হবে কিন্তু ‘চারুলতা’ যে সত্যজিতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি এবং প্রেমিক বাঙালীর মনে একটা রোমাণ্টিক আঁচড় কেটে যায় সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের বৈশাখ-অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ (ইং ১৯০১)-এ রচিত কুড়িটি পরিচ্ছেদের বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী বড় গল্প ‘নষ্টনীড়’-কে চিত্রায়িত করেছেন সত্যজিৎ ‘চারুলতা’ নামে ১৯৬৪ সালে। রবীন্দ্রনাথ এই গল্প লিখেছিলেন বঙ্গ ভঙ্গের আগে, যদিও তখন সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে — এবং সে-হাওয়ায় তাঁর গল্পের নায়ক ভূপতি একটা কাগজ বার করে সম্পাদকীয় ও রাজনৈতিক নেশা মেটাতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘এইরূপে সে যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়াছিল ততদিনে তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদাপর্ণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না। ভারত-গবর্মেণ্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত হইয়া সংযমের বন্ধন বিদীর্ণ করিবার দিকে যাইতেছে, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষের বিষয় ছিল।’

চারুর নিঃসঙ্গতা ও তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রেমিক প্রস্ফুটনের দিকেই আলোকসম্পাত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং সত্যজিৎ সেই পটভূমি থেকেই ছবির এমফ্যাসিস ঠিক করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল। ...দাম্পত্যলীলার সীমান্তনীতি সংসারের সমস্ত সীমা লঙঘন করিয়া সময় হইতে অসময়ে এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। চারুলতার সে সুযোগ ছিল না। কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তার পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল।’ এই নিঃসঙ্গতার থিমের ওপরেই ছবির সূত্রপাত —এবং চলচ্চিত্র যেহেতু দৃশ্যশিল্প সে কারণে খুবই দৃষ্টিসুখকরভাবে মাধবী চক্রবর্তীকে চারুর ভূমিকায় বিকেলে চা-তৈরীর নির্দেশ দিতে দেখা যায়। একটার পর একটা বই খোঁজা, ‘ব-ঙ্কি-ম’ বলে সুর করে বঙ্কিমচন্দ্রের বই দেখা, এবং বাঁদরনাচের শব্দ শুনে জানলার খড়খড়ি খুলে (একের পর এক জানলা থেকে) দেখা ছবির আরম্ভকেই আকর্ষণীয় করে তুলেছে এবং তার নিঃসঙ্গতার একটা প্রতীকী রূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে তার আচরণের মাধ্যমে।

সত্যজিৎ যে অমলকে প্রথম থেকেই আনেন নি তার কারণ তিনি চারুর নিঃসঙ্গতাটাই প্রথমে প্রস্ফুট করতে চেয়েছেন, তাতে প্রেমের মাত্রা যোগ করেছেন পরে রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত পথেই। প্রথম পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের একটু আভাস দিয়েছেন মাত্র ঃ

'সেই গাছের তলায় অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল; সাকী ছিল নবীনা, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহ্নের আলোক দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হইয়া আসিয়াছিল।

চারু বলিল, 'অমল, গোটাকতক আমড়া পেড়ে নিয়ে যেতে হবে, নইলে মন্দাকে কী হিসেব দেব।'

রবীন্দ্রনাথের গল্পে অমলকে প্রথম থেকেই দেখা যাচ্ছে—এবং দ্বৈত প্রেম ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে। সত্যজিৎ অমলকে পরে এনেছেন। এ-ব্যাপারে সত্যজিতের জবাবদিহি তাঁর 'চারুলতার প্রসঙ্গে' রচনাটিতে দেখা যেতে পারে ('বিষয় চলচ্চিত্র')।

রবীন্দ্রনাথের এই বড় গল্পটিকে সত্যজিৎ মূল বক্তব্যকে ঠিক রেখে কিভাবে চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন তা তাঁরই ভাষাতে শোনা যেতে পারে অংশত ঃ

'নষ্টনীড়ের প্রধান সম্পদ হল এর চারটি প্রধান চরিত্রের মনোভাব ও পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম ও দরদী বিশ্লেষণ।' তিনি বেশ ভালভাবে বুঝিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের গল্পে উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতার কোন পূর্বাভাষ নেই, তা ছাড়া ভূপতির খবরের কাগজের গোড়াপত্তন দিয়ে যদি ছবি শুরু করতে হয়, তাহলে বালিকা চারুর যৌবনে পদার্পণ দেখাতে হয়, কিন্তু সেরকম ছবি অবশ্যই দুর্বল হত—সেই জন্য চারুর নিঃসঙ্গতা দিয়েই তিনি ছবি শুরু করেছিলেন।

উমাপদ সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন, 'সিনেমায় অন্য চারটি চরিত্রের মতোই উমাপদও একটি কংক্রিট চেহারা নিতে বাধ্য। সেখানে তার আচরণের অথবা তার সম্পর্কে অন্যান্য চরিত্রের আলোচনায় যদি কোনরকম দুর্বলতার ইঙ্গিত না পাওয়া যায় তবে তার বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য হবে কিভাবে? আর ভূপতি উমাপদর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছে এমন ইঙ্গিত ঘটনায় বা সংলাপে না থাকলে এই বিশ্বাসঘাতকতা দর্শকের মন স্পর্শ করবে কেন?'

'মূল গল্পে চারু-উমাপদর পরস্পরের মনোভাবের কোনো ইঙ্গিত নেই। মন্দা বা অমলের সংলাপেও কোনো উল্লেখ নেই। অথচ যে চরিত্র কাহিনীতে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে, ছবিতে তাকে এতটা অস্পষ্ট, এতটা আড়াল রাখা চলে না'—বলেই চারুর দিক থেকেও একটা ইঙ্গিত দিতে হয়েছিল পরিচালককে। ('দাদা পারবে? ওর তো কোনো কাজেই মন বসে না।')

সত্যজিৎ প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনাকে দৃশ্যচিত্রের উপযোগী করে নিপুণভাবে উপস্থাপনের যে ব্রত নিয়েছিলেন তাতে যোগ্য পরিচালকের কর্মকাণ্ডের পরিচয় আমরা পাই। এই সম্পর্কে তাঁর জবাবদিহি ('চারুলতা প্রসঙ্গে') অবশ্যপাঠ্য। চিত্রনাট্যে সত্যজিৎ ইতিহাসকে বিকৃত করেন নি। তাঁর ইতিহাসচেতনা তৎকালীন সমাজের প্রতি ইঙ্গিত রেখেছে (দ্র. দেশ, ২৮মার্চ ১৯৯২, পৃ. ৮১-৮২)। মূল কাহিনীর (১৯০১) প্রায় দেড় দশক পিছিয়ে 'চারুলতা'র কাল নির্দিষ্ট হয়েছে। সেই সময় সৌখিন রাজনীতি করাটাই ভূপতির মতন লোকদের নেশা ও পেশা ছিল যাদের অর্থাভাব ছিল না— সেকারণে তার পক্ষে কাগজ প্রকাশ করা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তও সাজসজ্জার ব্যাপারে ইতিহাসের আমেজ আনার জন্যে স্বনামখ্যাত এবং পরিচালকের নির্দেশেই তিনি নিশ্চয় চিত্রটির শিল্পনির্দেশনা করেছিলেন। এই শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবদ্ধ পরিবারে স্বাভাবিকভাবেই ডেস্কে বেঠোফেনের মর্মর মূর্তি দেখা যায়, এবং অমল নবাব ওয়াজিদ আলি শা'র ঠুংরি

গুঞ্জরণ করে, আবার বন্দে-মাতরম্-ও গেয়ে ওঠে। ভূপতিও ভালবাসেন রামমোহনের বৈরাগ্য সঙ্গীত শুনতে। চারুর ঘটিহাতা জামা, অলঙ্কারের ঘনঘটা বা ভূপতির ভেস্ট পরিধান সবই তৎকালীন ইতিহাসের আবহ সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসের প্রতি আস্থা রাখার জন্যে অমলকে 'সত্যজিতের নির্দেশে রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা হাতের লেখা শেখার জন্য খাতার পর খাতা মক্‌সো করতে হয়েছিল। সত্যজিৎ বহু পুঁথি এবং হাতের লেখার নমুনা যোগান দিয়েছিলেন তাঁকে।' (দেশ, ঐ, পৃ.১০৯)

আমাদের অনতিদূরে সেই ঐতিহাসিক পরিবেশ আমাদের মনে বর্তমান জীবনের সঙ্গে কন্ট্রাস্টের মাধ্যমে একটা রোম্যান্টিক ভাল-লাগার উদ্রেক করে। পরিচালক তাঁর ইতিহাস সচেতনতার মাধ্যমেই সেই ভাল-লাগা বজায় রেখেছেন। প্রেমিকার ভূমিকায় চারুলতা নিঃসংশয়ে রবীন্দ্রনাথের এক বলিষ্ঠ সৃষ্টি—বিশেষত সেই যুগে-যখন রাজনীতি সচেতনতাই শিক্ষিত বাঙালীর মনোজগত অধিকার করে ছিল, তখন বঙ্গভঙ্গ না হলেও দাবিদাওয়ার রাজনীতি উচ্চবিত্তদের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

তবে 'চারুলতা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে 'ঘরে বাইরে'র বিমলার কথাও মনে পড়ে। সত্যজিৎ দুটো চিত্রেই স্ত্রী-স্বাধীনতার একটা বিশেষ দিক—বিবাহিত নারীর পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম—রবীন্দ্রনাথের মূল সুর বজায় রেখেই প্রকাশ করেছেন।

জনৈক সমালোচক (চতুষ্পর্ণী, বর্তমান, ৯ মে ১৯৯২) 'চারুলতা'য় রবীন্দ্রজীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কাদম্বরী-রবীন্দ্রনাথ এই ত্রিভুজের ছায়াপাত দেখেছেন, সেখানেও বয়সের ব্যবধানের 'চারুলতা' বা 'নষ্টনীড়ের' মতই একটা প্রধান ভূমিকা ছিল বলেছেন, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র চরিত্রের অন্ধকার দিকটার কথা বলেন নি দেখে ব্যাপারটা নেহাৎই সরলীকরণ মনে হয়। অনুরূপভাবে আর একটা সরলীকরণ চোখে পড়ে যখন নিখিলেশ সন্দীপের সঙ্গে বিমলার আলাপ করিয়ে দেয়—যদিও এ-ব্যাপারে তিনি সত্যজিতের সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের বিতর্কিত উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' সম্পর্কেও একটি এপিসোড আছে। সত্যজিৎ নিজেই সেই এপিসোড উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সব দিক থেকেই উদার এবং যথার্থ আধুনিক। একবার তিনি তাঁর এক বন্ধুকে স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বাড়িতে নিয়ে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী তখন বিছানায় মশারির ভিতর। সেখানেই বন্ধুকে তিনি নিয়ে যান এবং স্ত্রীর মশারির মধ্যেই আলাপের জন্য বন্ধুকে ঠেলে দেন। এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথ পরে শুনেছিলেন।' কিন্তু এমন একটা কৌতুকাবহ ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রচিত্রণের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

সে যাই হোক, চারুলতার প্রেমকাহিনী এক নিঃসঙ্গ নবযৌবনার প্রেমকাহিনী, এবং যেহেতু নায়িকা বিবাহিতা এবং সত্যজিতের ভাষায় —'উনবিংশ শতাব্দীর গল্পে Divorce-এর প্রশ্ন আসে না'—তদুপরি বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত তথা পরিপোষিত বঞ্চিত মাতৃজাতি সম্পর্কে নানারকম ধ্যানধারণার প্রচলন ছিল—সে কারণে এই প্রেমের পরিণতি এক অন্ধগলিতে। গল্পের একেবারে শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, '........ভূপতি কহিল, 'চলো চারু আমার সঙ্গেই চলো।' চারু বলিল, 'না থাক।'

রবীন্দ্রনাথ চারুকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে ভূপতির সঙ্গে চারুর মহীশূরে যাওয়ার প্রস্তাব চারুর দ্বারাই প্রত্যাখান করিয়েছেন, সত্যজিৎ 'কিউ' নিয়েছেন প্রাক-সমাপ্তির কয়েকটি

পংক্তি থেকে ঃ 'ভূপতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুষ্টি শিথিল হইয়া ভূপতির হাত হইতে চারুর হাত খুলিয়া আসিল। ভূপতি চারুর নিকট হইতে সরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।'

সত্যজিতের এই অংশটুকু সম্পর্কে বক্তব্য; 'তবে কি চারুকে ভূপতি একা ফেলে রেখে চলে যাবে— যেমন মূল কাহিনীতে সে করেছে? চারুর 'অপরাধ' কি ভূপতির দৃষ্টিতে একেবারেই অক্ষমনীয়, নাকি সে মনে করে যে চারুকে একা থাকতে দিলে সে অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণা ভোগ করবে? চারুর সঙ্গে একটা বিশদ বোঝাপড়ার তাগিদও কি সে বোধ করবে না? বিশেষ করে এ-অবস্থার জন্যে তার নিজের দায়িত্বও যখন কিছু কম নয়?

আমার মতে চারুকে পরিত্যাগ করে মহীশূর যাত্রা রবীন্দ্র-বর্ণিত ভূপতির চরিত্রের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে না।

কিন্তু তাই বলে এ-অবস্থায় নতুন করে সুখনীড় রচনা সম্ভব কি? মিলন সম্ভব কি? দুজনেরই পরস্পরের দোষ ক্ষমা করে একসঙ্গে ঘর করা সম্ভব কি?

'যেটাই সম্ভব হোক না কেন-সেটা সময়সাপেক্ষ। দুজনেই এখন দুজনের কাছে অত্যন্ত বেশি পরিচিত, তাই মনে হয় পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য।

'এ-দৃশ্যে তাই হাতে হাত মিলতে পারে না।.....

আজকের মত ঘর ভেঙে গেছে, বিশ্বাস ভেঙে গেছে, এটাই নষ্টনীড়ের থীম।

'আমার মতে চারুলতায় এ-থীম অটুট রয়েছে।'

সিনেমা যেহেতু দৃশ্যশিল্প সেকারণে এই থীম বোঝাবার জন্যে দুহাতের সাগ্রহ অগ্রগতির দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে কিন্তু দুহাতের মিলন দেখানো হয় নি থীমের প্রতি নজর রেখে। এই অর্থবহ প্রতীকটি নষ্টনীড়ের মূল কথার শেষে যবনিকা টেনেছে শৈল্পিক নিষ্ঠা বজায় রেখে।

'পথের পাঁচালী' ও তৎসংশ্লিষ্ট ট্রিলজিতে যে পরিচ্ছন্ন শিল্পকর্মের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল সেই ধারারই আর একটি সার্থক ছবি এই 'চারুলতা'। ছবিতে উজ্জ্বলতম আলোকসম্পাত ঘটেছে চারুলতার ওপর — যে চারুলতা এক নিঃসঙ্গ যুবতী যার স্বামী তার প্রেমিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি — সে তার বয়সের ব্যবধানের জন্যে যত না তার চেয়ে বেশি তার ঔদাসীন্যে। এই উদাসীন চরিত্রটি ঘরে বাইরে উভয়তই উদাসীন, কাগজে প্রকাশিত স্ত্রীর রচনা সম্পর্কে তিনি অনবহিত, এবং নিজের কাগজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক—টাকাকড়ির ব্যাপারটা —অপরের হাতে (উমাপদর হাতে) তুলে দেন। খুব সঙ্গতভাবেই পরিচালক 'নষ্টনীড়' নামের বদলে ছবিটির নাম রেখেছেন 'চারুলতা'। মাধবী চক্রবর্তীর অবিস্মরণীয় অভিনয় এই ছবিকে গৌরবান্বিত করেছে। পরিচালকের সাফল্য এই চরিত্রের একক অভিনয়েই যথেষ্ট পরিস্ফুট—তাঁর নিঃসঙ্গতা (কিন্তু ভেঙে-পড়া নয়), প্রেমের সঞ্চারে স্বরচিত রচনা মুদ্রিত হওয়ার পর পত্রিকাটি দিয়ে অমলের পিঠে আঘাত করা, 'ঠাকুরপো, ঠাকুরপো' বলে ফুঁপিয়ে ওঠা, অমলের বুকে কান্নায় ভেঙে-পড়া ইত্যাদি নানা ঘটনার মাধ্যমে এই চরিত্রটিকে বাস্তব ও আধুনিক একটি চরিত্র হিসাবে সৃষ্টি করতে পেরেছেন পরিচালক। ব্যক্তিজীবনের হাহাকারকে খুবই সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক— তবে সব কিছুর ওপরে আছে 'পথের পাঁচালী'র

মত এক কাব্যিক সরলতা যা একে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। তা ছাড়া আছে পরিচালকের সংযমের বোধ যা প্রতিটি শটেই পরিস্ফুট — শেষ দৃশ্যের ফিটনের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে গতিময়তা এবং ভূপতির রুমালে চোখ-মোছা এ-সবের পরিকল্পনা শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পক্ষেই সম্ভব। সত্যজিৎ তাঁর প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধে ছবির exposition, development, crisis, resolution প্রভৃতি বিভিন্ন পর্বের শিল্পগত বিভাগ যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে বিবৃত করেছেন, ছবিতে তাই দেখেছি আমরা।

সব দিক দিয়ে বিচার করলে এই ছবি নিঃসংশয়ে সত্যজিতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর প্রথম সৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য এই ছবিতে যেন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে' —তার জন্যে যা যা করতে হয় তা তিনি সহজেই করেছেন।

চারুলতা
নিত্যপ্রিয় ঘোষ

সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' চলচ্চিত্রে অমলের আবির্ভাব 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' ধ্বনি তুলে। বাংলা সাহিত্যে এই গানটি প্রথম যখনই ব্যবহৃত হোক না কেন, বাঙালী পাঠক বা দর্শকের সঙ্গে গানটির প্রথম পরিচয় ঘটে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। অমল যে আনন্দমঠের গানই আওড়াচ্ছে, তার হদিস দেয় তারই কথা, তার বৌঠানের সঙ্গে, 'বৌঠান আনন্দমঠ পড়েছ'?

অর্থাৎ গল্পের সময়কাল ১৮৮১ সালের আগে নয়, কেননা 'আনন্দমঠ' বঙ্গদর্শনে বেরুতে শুরু করে ১৮৮১ সালের মার্চ মাস [illegible]। কিন্তু সত্যজিৎ ঘটনা-সময় নির্ধারিত করেছেন ১৮৭৯ সালে। এই সময়টা আমরা জানতে পারি অমলের আবির্ভাবের দিন ভূপতির কথার মধ্যে দিয়ে। ভূপতি অমলকে টেনে নিয়ে যায় তার প্রেসে এবং সেদিনকার ছাপা সেন্টিনেল পত্রিকার তারিখ পড়ে 29th April 1879 অথচ, ওই ১৮৭৯ সালেই অমল আনন্দমঠের কথা বলে, 'হরে মুরারে' আওড়ায়।

'হরে মুরারে' বা 'আনন্দমঠে'র কথা রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পে নেই, এগুলো সত্যজিতের চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে তৈরী করে নেওয়া। এই প্রসঙ্গে আমরা ১৯৬৪ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় সত্যজিতের 'চারুলতা'-প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি স্মরণ করতে পারি। অশোক রুদ্রের সমালোচনা বেরিয়েছিল ওই 'পরিচয়' পত্রিকাতেই, 'নষ্টনীড়' গল্প 'চারুলতা' ছবিতে বিকৃত হয়েছে এই মর্মে। তার উত্তরে, সত্যজিৎ সাহিত্যের গল্প থেকে ছবি করার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং চিত্রনাট্য কীভাবে করতে হয় তার কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

সত্যজিতের প্রথম দাবিই হলো, চলচ্চিত্রে অস্পষ্টতার কোনো স্থান নেই। স্থান কাল পাত্র নির্দিষ্ট করে দিতেই হয়। বলা বাহুল্য, সত্যজিৎ এখানে সেই সব ছবির কথাই বলছেন যার সঙ্গে আমাদের পরিচিত বাস্তবের সম্পর্ক। ফ্যান্টাসি, অতিপ্রাকৃত, আধিভৌতিক, যেখানে স্থান-কাল-পাত্র ইচ্ছে করেই অস্পষ্ট রাখা হয়, সেই জাতীয় ছবির প্রসঙ্গে এই নির্দিষ্টতার প্রশ্ন আসে না। বাস্তবতার গল্পে আমরা নির্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রই আশা করি, আর এই নির্দিষ্টতার প্রয়োজনেই সত্যজিৎ ভূপতিকে দিয়ে 29th April 1879 বলিয়েছেন, গভর্নমেন্টের সীমান্তনীতি নিয়ে সম্পাদকীয় লেখাচ্ছেন। সীমান্তনীতি নিয়ে কথাবার্তা 'নষ্টনীড়ে'ও আছে, সুতরাং ১৮৭৯ সালে গল্পটা ফেলে সত্যজিৎ অন্যায় কিছু করেন নি এবং তৎকালীন বাঙালি জামাকাপড়, আসবাবপত্র, কথা বলার ধরণ তৈরী করে নিয়েছেন। কিন্তু বিপদ হলো, বঙ্কিমকে আনতে গিয়ে 'আনন্দমঠের' লেখার সময়টা দেখে নেন নি। 'হরে মুরারে' গানটি তাঁর না আনলেই হত, এটা তেমন অপরিহার্য নয়। রবীন্দ্রনাথের গল্পে যে মক্-সিরিয়াসনেস তিনি লক্ষ করেছেন এবং যে মক্-সিরিয়াসনেস তিনি ছবিতে রক্ষা করেছেন, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর গম্ভীর 'হরে মুরারে' গানটি অমলের ছ্যাবলামিতে

পর্যবসিত হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবেই, তবে তার মধ্যে সময়ের গণ্ডগোল ঢুকে গেছে।

বঙ্কিম, আনন্দমঠ, হরে মুরারে ইত্যাদি আনার পিছনে সত্যজিতের অবশ্যই চিন্তাভাবনা ছিল। ছবির প্রথম দৃশ্যেই আমরা চারুকে দেখি বইয়ের শেল্‌ফ থেকে 'কপালকুণ্ডলা' নামাতে, 'বঙ্কিম বঙ্কিম' সুর ভাঁজতে। চারুর সঙ্গে মানসিক সামীপ্য বোঝানোর জন্যই অমলের প্রথম দৃশ্যে বঙ্কিম প্রসঙ্গের অবতারণা। এই রকম চিত্রনাট্য-কল্পনা ভালোই হতো, যদি না সালের গণ্ডগোল হতো।

অবশ্য এ ধরণের ভুল মামুলি। কিন্তু মামুলি ভুল আর মামুলি থাকে না যখন পরিচালকেরা দর্শকদের গণ্ডমূর্খ মনে করেন।

সাহিত্য অবলম্বন করে চলচ্চিত্র সৃষ্টি করতে গেলে, বলাই বাহুল্য, পরিবর্তন বা পরিবর্জন করা দরকার, তবে সাহিত্যকর্মটির মূল সুরটি অবিকৃত রেখে। এখানেই সমস্যা দেখা দেয়। যাঁরা মনে করেন, 'চারুলতা' চলচ্চিত্রে 'নষ্টনীড়ে'র মূল সুরটি অবিকৃত থাকেনি, তাঁরা কেন এমন মনে করেন?

চারুর নিঃসঙ্গতা দিয়ে সত্যজিৎ শুরু করেছিলেন এবং যদিও অমল ভূপতির বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করে তবুও সত্যজিৎ অমলকে আশ্রিত হিসাবে দেখাতে চান নি। যদি অমল ভূপতির বাড়িতেই থাকবে তাহলে চারু নিঃসঙ্গ হবে কী করে, এই ছিল সত্যজিতের সমস্যা। গল্পে রবীন্দ্রনাথের এই সমস্যা ছিল না। অমল যদিও বাড়িতেই আছে, কিন্তু চারু অমলকে পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিল আর আরো পেতে চেয়েছিল, সেটা বয়ঃপরিবর্তনের জন্য, কিশোরী থেকে যুবতী হবার সন্ধিক্ষণে। উপন্যাসে যেমন অনায়াসে এক লাইন দুই লাইনে এই কাল-পরিবর্তন সেরে ফেলা যায়, চলচ্চিত্রে সেই পরিবর্তন আনা দুঃসাধ্য, কেননা তাতে গল্পের গতি লক্ষ্যচ্যুত হয়, গল্পের ভারসাম্য শিথিল হয়ে পড়ে।

এইখানেই ঘটেছে সমস্যা। চারুর প্রতি অমলের মনোভাবের মূল উপকরণ অমলের এই বোধ যে, সে আশ্রিত। আশ্রয়দাতা সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা এবং কর্তব্যবোধ অমলকে বাধ্য করেছিল ভূপতির ব্যবসায়িক সঙ্কটের সময় ভূপতির বাড়ি ছাড়তে, বিয়ে করতে রাজি হওয়াতে, বিলেতে পাড়ি দেওয়াতে। কিন্তু 'চারুলতা' ছবিতে অমল আশ্রিত নয়, ফলে অমলের বাড়ি ত্যাগ ইত্যাদির কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যে কারণ খুঁজে পাওয়া যায় সেই কারণটি অবশ্য গৌণ। গল্পে চারু তাকে প্রণয়িনীর চোখে দেখে, এই সন্দেহ তার একবারই জেগেছিল এবং তার 'কর্ণমূল লোহিত' হয়েছিল। কিন্তু তার জীবনে এই প্রচ্ছন্ন প্রণয় নিতান্তই গৌণ। তার উচ্চাশা সে লেখক হবে, সে বড়ো হবে। গল্পে সেটা স্পষ্ট, কিন্তু ছবিতে প্রেমের হঠাৎ-প্রকাশের ব্যাপারটিই সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে।

অমলের প্রতি চারুর মনোভাবও গল্পে যতটা না প্রচ্ছন্ন প্রেমের, তার চাইতে বেশি আশ্রিতের উপর দখলের দাবি। কর্মব্যস্ত স্বামীর কাছে তেমন সঙ্গ না পাওয়ায় চারু নতুন একটি পৃথিবী গড়ে তুলতে চায়, যে পৃথিবীতে সে-ই অধীশ্বরী, আর সব প্রজা। গল্পের এই সুরকে গৌণ করে, ছবিতে যেটা প্রকট হয়ে উঠেছে এবং শেষের দিকে আর সব সুর ছাপিয়ে যায়, সেটা হলো অবৈধ প্রেম।

'নষ্টনীড়' গল্পটি অবশ্য ভূপতিকে অবলম্বন করে, নীড় নষ্ট হয়েছে তারই। চারুর সঙ্গে তার মানসিক সামীপ্য কমই। সে যাকে তার রাজনৈতিক জগতে, তবে তার বিশ্বাস,

কাজের শেষে সে পাবে চারুর সেবা। সাহিত্যকে সে অনাবশ্যক মনে করে, তবে সাহিত্যে যাদের প্রীতি তাদের অসম্মানও করে না। চারুও ভূপতির খবরের কাগজের জগতের গ্ল্যাডস্টোনের প্রেস অ্যাক্টের, সীমান্তনীতির অর্থ বোঝার চেষ্টা করে না, সে তার ঘরকন্না নিয়েই সময় কাটায়। এখানে প্রেম ব্যাপারটা জরুরি নয়। বাঙালি পরিবারে প্রেম কখনোই উৎকট হয়ে ওঠে না, আর পাঁচটি মনোবৃত্তির মতো প্রেমও স্বচ্ছন্দ এবং অপ্রকট। এই গল্পের বড়ো কথাই শান্তির নীড়, সেটা নষ্ট হলো যখন ভূপতি টের পেল, তার গড়া নীড়ই যথেষ্ট নয়, সে স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে না পারায়, স্ত্রীকে নতুন একটি জগৎ গড়ে নিতে হয়েছে যেখানে তার স্থান নেই।

ভূপতিকে মুখ্য স্থান না দিয়ে সত্যজিৎ চারুকে দেবেন, সেটা ছবির নামকরণেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু অমল চরিত্রে আশ্রিত-ভাবটি ত্যাগ করায়, চারু ও অমলের ব্যবহার বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে, অবৈধ প্রেমই চলচ্চিত্রের মূল সুর হয়ে ওঠে। যেটা উপন্যাসের নয়। সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছেন বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা পরিবর্তন, পরিবর্জন, নূতন পরিবেশ, কথোপকথন, গানে আপত্তি না করলেও, এই সুরের বিচ্যুতিকেই অস্বস্তিকর মনে করেন।

এটা অবশ্যই বলা যাবে না যে সাহিত্যের হুবহু অনুসরণ করলেই সাহিত্য অবলম্বন করে চলচ্চিত্র করা যায়। সাহিত্যের মাধ্যম লিখিত বাক্য, চলচ্চিত্রের মাধ্যম ছবি—দুইয়ের ভাষা ভিন্ন। কিন্তু উদ্দেশ্য একই, ভিন্ন মাধ্যমে একই চরিত্রসৃষ্টি, আবহসৃষ্টি, দর্শনসৃষ্টি।

চলচ্চিত্র সৃষ্টির প্রথম যুগে সাহিত্যকে অবলম্বন করে যখন ছবি করা হচ্ছিল, তখন দর্শকেরা খুশি হতেন তাঁদের চেনা চরিত্রগুলোকে ঘটনাগুলোকে নতুন মাধ্যমে দেখতে পেয়ে। হলিউডের ইতিহাস লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট হবে। চরিত্র, বিষয়, আবহের বিচ্যুতিকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনতেন না। চলচ্চিত্রকে তাঁরা মধ্যে মধ্যে বলতেন ফটোড্রামা বা ফটোপ্লে, অর্থাৎ নতুন মাধ্যম ফোটাতে তাঁরা চেনা গল্প মোটামুটি দেখতে পেয়েই খুশি ছিলেন, ধরেই নিয়েছিলেন তাঁদের জানা গল্প পুরোপুরি ফটোতে আনা সম্ভব নয়, এদিক ওদিক হবেই।

যেমন ১৯২০ সালে তোলা হৈ চৈ তুলে দেওয়া ছবি, 'দি লাস্ট অফ দি মোহিকান্‌স্।' জেমস ফিনিমোর কুপারের জনপ্রিয় উপন্যাস চলচ্চিত্রের পক্ষে দুরূহই ছিল, দীর্ঘ বর্ণনা, প্রচুর চরিত্র, রেড ইন্ডিয়ানদের দিয়ে রোমাঞ্চকর ইতিহাস। উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের চেহারার যে সব বর্ণনা পাওয়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে চলচ্চিত্রের চেহারা মিলছে না, পাঠকদের পছন্দের চরিত্র 'হকি'র প্রাধান্য কমে গেল, বদলে অন্য নায়ক আনকাস্‌ ছবি জুড়ে থাকল, ম্যাগুরা ছবিতে ঠিক তেমন খলচরিত্র হলো না, কিন্তু দর্শকেরা তেমন আপত্তি তোলেন নি। বরং উপন্যাসের চাইতে ছবিটিই তাঁদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল, ইতিহাসের একটি বর্ণাঢ্য অধ্যায় পুরোপুরিই তাঁরা পেলেন। আকাশ, পাহাড়, জঙ্গলের যে ছবি ফুটে উঠল এই চলচ্চিত্রে, আলোছায়ার খেলায় সে আবহ সৃষ্টি হলো, প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের সংস্থানে যে আবেশ সৃষ্টি হলো, অনেকেই বলেছিলেন, মুদ্রিত ভাষায় সেই আবহ আর আবেশ যেন সৃষ্ট হয় নি। কোরার ভূমিকায় বারবারা বেডফোর্ডের সৌন্দর্য, অভিব্যক্তি, চালচলন সাহিত্যের কোরাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

'দি লাস্ট অফ দি মোহিকান্‌স্‌' অবশ্য শিল্প হিসেবে আজ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে

স্বীকৃত নয়। কিন্তু একবছর পরে তোলা 'দি ফোর হর্সমেন অফ দি অ্যাপোক্যালিপস্' শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র বলে স্বীকৃত। এটারও অবলম্বন তখনকার দিনের আদৃত উপন্যাস, ভিনসেন্ট ব্লাঙ্কো ইবানেজের লেখা। উপন্যাসটি ছবিতে তোলার সময় নামীদামী পরিচালক রেক্স ইনগ্রাম কোনোরকম ঝুঁকি না নিয়ে উপন্যাসটি ছবিতে রূপান্তরিত করলেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, জার্মানির যুদ্ধ ক্ষেত্রের যাবতীয় স্থান কাল পাত্র বজায় রেখে। উপন্যাসের পরিচিত চরিত্রগুলো পর্দায় দেখার যে আনন্দ, যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পুনর্নির্মাণের যে উত্তেজনা তা যেমন বজায় রইল তেমনি দীর্ঘায়িত বর্ণনার যে ক্লান্তি, টান টান প্লটের বা স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টির অনুপস্থিতিও তেমন থেকে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ছবির শেষে যুদ্ধ, প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যুর মতো চারটি ঘোড়ার প্রতীকী ব্যবহার দর্শকদের আবিষ্ট করে রেখেছিল, উপন্যাসের সঙ্গে তুলনায় ছবিটি কোনো অংশে ন্যূন না হয়ে।

উপন্যাসের ব্যাপ্তি চলচ্চিত্রে আসতে পারে না, কেননা চলচ্চিত্রের স্থায়িত্ব খুব বেশি হলে তিন ঘণ্টা, যে সময়ে উপন্যাসের শতাব্দী বা যুগ বৎসরকে আনা দুঃসাধ্য। তুলনায় নাটক অবলম্বন করে ছবি তোলা সোজা। তখনকার জনপ্রিয় নাটক অবলম্বন করে গ্রিফিথ তুলেছিলেন তাঁর অনবদ্য ছবি, 'ওয়ে ডাউন ইস্ট'। বরং স্টেজের ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি পেয়ে নাটকটি আরো প্রসারিত হতে পারল, আমেরিকার গ্রামীণ জীবনে সরল গ্রাম্য যুবতীর সঙ্গে প্রেমিকের চতুরালি আরো বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল। নির্বাক ছবির যুগে কল্পনাও প্রসারিত হতে পারল, কথোপকথনের বেড়ায় আটকে না থেকে। ছবির শেষ দৃশ্যে নায়িকা লিলিয়ান গিশ তুষারঝঞ্ঝার মধ্যে অন্ধের মতো দৌড়ে দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও তুষারের মধ্যে ওইরকম দৌড়-ঝাঁপ সম্পূর্ণ অবাস্তব ছিল, যেমন ছিল আরো অনেক দৃশ্য। দর্শকরা আপত্তি করেন নি, সমালোচকরাও।

হলিউডের সেই স্বর্ণযুগে প্রযোজকরা অস্কার ওয়াইল্ডের নাটক নিয়ে ছবি করারও দুঃসাহস দেখতেন, যদিও ওয়াইল্ডের নাটক প্রধানত সংলাপ-নির্ভর আর সেটা নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ। কিন্তু, আর্নস্ট লুবিট্‌শের মতো দক্ষ পরিচালকের হাতে পড়ে সংলাপহীন সেই নাটকও দর্শকদের মনে হয়েছিল ওয়াইল্ডের নাটকের চাইতে বেশি আকর্ষণীয়। ক্যামেরার ব্যবহার, কাটিং, চরিত্রদের অনায়াস চলাফেরা, সেটের সংস্থান ইত্যাদি মুদ্রিত নাটক এবং স্টেজের নাটকের চাইতে ছবিকে বেশি শিল্পগুণমণ্ডিত করেছিল বলে তখনকার সমালোচকেরা রায় দিয়েছিলেন।

১৯২৩ সালে তোলা ভিক্তর উগোর 'দি হাঞ্চব্যাক অফ নতর্‌দাম' অবলম্বনে ছবিটি বিখ্যাত হয়ে আছে কোয়াসিমোদোর ভূমিকায় লনচ্যানির অভিনয়ের জন্য। গল্প পাল্টে গিয়েছিল, চরিত্রগুলো অবিকৃত থাকেনি, কিন্তু সমালোচকেরা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, উগোর সুর ছবিতেও অনুভব করা যায়। লন চ্যানি ঠিক যেন ফরাসি নয়, বরং হলিউডী, কিন্তু প্যারিসটা মনে হচ্ছে প্লাজা, নতরদাম, ভিখারী, অলিগলি, চোর-ছ্যাঁচড় ফটোতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল আর যে দৃশ্যে কোয়াসিমোদো তপ্ত সীসা ঢালতে শুরু করল, সকলেরই মনে হলো, ঠিক হয়েছে, দুস্কৃতকারীদের সাজা দেওয়ার জন্য যেন ক্যাথিড্রাল স্বয়ং সীসা ঢালল।

সবাক যুগের সবচাইতে জনপ্রিয় ছবি ১৯৪০ সালে তোলা 'গন উইথ দি উইণ্ড' ছবিতেও অন্য ব্যাপার ঘটল। এই উপন্যাসের প্রতিটি বর্ণই আমেরিকার পরিচিত, প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি চরিত্র তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ। পরিচালক যদি হুবহু উপন্যাসটি ছবিতে আনতে

চান, তাহলে শিল্প হিসাবে চলচ্চিত্রটি গড়ে তোলা মুশকিল। চলচ্চিত্রের ভাষা, আঙ্গিক, গঠন ইত্যাদির ধার না ধেরে পরিচালক ভিক্টর ফ্লেমিঙ সোজাসুজি গল্প বলে গেলেন। টানটান গল্প কোথাও ঝুলে গেল না, অনবদ্য অভিনয়ে সব চরিত্রই জীবন্ত হয়ে উঠল। এতে তৎকালীন জর্জিয়া ঠিকমতো এল কি গেল, যুদ্ধ আর পুনর্বিন্যাসের ইতিহাস সত্য থাকল কি থাকল না, নৈতিক বা সামাজিক সত্য ফুটল কি ফুটল না, এ নিয়ে কারোর মাথাব্যথা ছিল না। মার্গারেট মিচেলের উপন্যাসের মতো ভিক্টর ফ্লেমিঙের ছবি দীর্ঘ দিন ধরে জনপ্রিয় হয়ে থাকল।

'গন উইথ দি উইণ্ড' বা 'দি হাঞ্চব্যাক অফ নতর্‌দাম' অবশ্য চলচ্চিত্রে শিল্প হিসেবে গণ্য হয় না, সাহিত্যেও এগুলো মনোরঞ্জনের উপকরণ বলেই মনে করা হয়। কিন্তু সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃত এবং চলচ্চিত্রে শিল্প বলেও স্বীকৃত হয়ে আসছে, তেমন একটি উপন্যাস এবং ছবির দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। ১৯৪০ সালে জন ফোর্ড তুললেন 'দি গ্রেপ্‌স্‌ অফ রাথ', জন স্টেনবেকের ওই নামের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বন কবে। উপন্যাসের মূল বিষয়, জোড পরিবারের ইতিহাস। জেল থেকে ছুটি পেয়ে আসামী জোড তার খামারে ফিরে এল। কিন্তু তার পরিবার তখন পশ্চিম দিকে রওনা হয়েছে, কেননা পুরনো খামার ঝড়ে বিধ্বস্ত, নতুন ট্র্যাক্টর-চাষের সঙ্গে মানিযেও নিতে পারে নি। পশ্চিমের দিকে এই যাত্রাকে উপলক্ষ্য করে, ক্ষুধার্ত পরাজিত মানুষদের চরিত্রের দার্ঢ্য, তাদের সংগ্রামের রক্তাক্ত কাহিনী নিয়ে যে মহাকাব্য রচনা করেছিলেন জন স্টেনবেক, চিত্র-নাট্যকার নানালি জনসন তার নির্যাস নিয়ে তৈরী করলেন তাঁর চিত্রনাট্য। মূল বিষয় কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি ছবিতে, এটা মেনে নিয়েছিলেন উপন্যাসেব পাঠকেরা। বরং মুদ্রিত ভাষায় যে বিস্তীর্ণ গ্রামের বিধ্বস্ত ছবি তেমন প্রত্যক্ষ হয় নি বলে মনে হয়েছিল, চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় সেটা মূর্ত হয়ে উঠেছে বলে বলেছিলেন দর্শকেরা। স্বার্থপরতা, নীচতা, পাশবিকতা, গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছিল মানুষের মহত্ত্ব, ত্যাগ, করুণা। আর জন ফোর্ডের পরিচালনায়, দেখা গেল, সংযত করে, সংক্ষেপে, মুহূর্তগুলো বেছে নিয়ে, কাটিঙের সাহায্যে কত বেশি বলা যায়, ছবির মধ্য দিয়ে, বাক্যের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রেখে। আর চরিত্রদের দেখে মনে হয় নি, কেউ অভিনয় করছেন—তাঁদের মধ্যে জোডের ভূমিকায় হেনরি ফণ্ডা স্মরণীয় হয়ে আছেন। পাঠকদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ আপত্তি করবেনই, উপন্যাসের অনেক পরিবারের মধ্যে এক জোড প্রধান্য পেল, এমন আক্ষেপ অনেকেই করেছিলেন। কিন্তু মূল কথা হলো, যদি কাহিনীর মধ্য দিয়ে শুধু নয়, ক্যামেরার সাহায্যে মধ্যে মধ্যে যদি ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পায়, এটা শুধু একটি পরিবারের বিপর্যয়ের কাহিনী নয়, আমেরিকার ইতিহাসেরএকটি পর্যায়ে রিক্ত কৃষকদেরই কাহিনী, তাহলে স্টেনবেক বিকৃত হয়েছেন বলা যাবে না। ক্যামেরার সাহায্যে কীভাবে এটা সম্ভব সেটা বোঝাতে সমালোচকেরা একটি দৃশ্যের কথা বলেন। নড়বড়ে ওয়াগনে করে জোড পবিবার কালিফোর্নিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে, রাস্তায় দেখা হচ্ছে তেমনই অসংখ্য পশ্চিমমুখী পরিবারের সঙ্গে, যারাও নিঃস্ব, পশ্চিমে পাড়ি দিয়েছে নতুন আশ্রয়, নতুন জীবিকা, নতুন জীবনের সন্ধানে। এমনই একটা দৃশ্যে দেখা গেল, একটি ক্যাম্প ভেঙে পড়ছে, ভাঙা ঘর ভেঙে পড়ছে আর তার থেকে ভেঙে পড়া মানুষের দল পিল পিল করে বেরিয়ে আসছে, আবার যাত্রার পথে। শুধু জোড পরিবারই ভাঙছে না। এদের ঠাকুমা-ঠাকুরদাই

একে একে মরছে না, মেয়েরা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে না, সব পরিবারেরই একই অবস্থা। জোডের মায়ের সঙ্গে জোডের শেষ কথাগুলো শুধু একটি মাতা-পুত্রের কথায় না থেকে পরাজিত মানুষের কাছ থেকে আগামী দিনের মানুষের প্রতি আশ্বাস বাণীতে উত্তীর্ণ হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের ব্যাপ্তি চলচ্চিত্রে আনা কষ্টসাধ্য, নাটকের তুলনায়, এ কথা আমরা যখন বলি, তখন নিশ্চয় এ কথা বলি না, নাটকের দৃশ্য পর পর সাজিয়ে গেলেই সেটা চলচ্চিত্র হবে। তাহলে সেটা হবে চলচ্চিত্রায়িত নাটক। চলচ্চিত্রের ভাষা অনুযায়ী নাটকের দৃশ্য, সংলাপও ভেঙে নিতে হয় চলচ্চিত্রের জন্য। কিন্তু সব নাটকই কি চলচ্চিত্রের প্রকাশ করা সম্ভব? জঁ রেনোয়া যখন গোর্কির 'নিচু মহল' চলচ্চিত্রে রূপান্তর করার প্রস্তাব করেন, তখন গোর্কি আঁতকে উঠেছিলেন। এ নাটকে কিছু ঘটে না, পুরোটাই আবহ, সেই আবহ কী করে চলচ্চিত্রে আনা সম্ভব! তা ছাড়া রাশিয়ার গল্প নিয়ে রেনোয়া ফরাসিদের দিয়ে কীভাবে কাজ করবেন! নাটকের সঙ্গে, মস্কো আর্ট থিয়েটারের মঞ্চ প্রযোজনার পর, কেউ কি গ্রহণ করতে পারবেন এর চলচ্চিত্ররূপ? ১৯৩৭ সালে রেনোয়া চলচ্চিত্রটি তুলে প্রমাণ করেছিলেন, সার্থক চলচ্চিত্র সম্ভব। ফরাসি ভাষায়, ফরাসি আবহাওয়ায় রেনোয়া সাজিয়েছিলেন তাঁর ছবি, গোর্কিও স্বীকার করেছিলেন, তাঁর নাটকটিই এসেছে চলচ্চিত্রে, ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন মাধ্যমে। দুর্গতদের মধ্যেও যে মনুষ্যত্ব বর্তমান, তারা কেবল করুণার পাত্রই নয়, শ্রদ্ধারও পাত্র হতে পারে। নিজের দোষে মানুষ যেমন নেমে যায়, নিজের চেষ্টায় তেমন উঠেও আসতে পারে। গোর্কির চোর, বাড়িওয়ালা, বড়লোক, বেশ্যা, জুয়াড়ি রেনোয়ার ছবিতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

নাটক নিয়ে চলচ্চিত্র করা যায় কিনা, তার শেষ পরীক্ষা অবশ্যই হবে শেক্সপীয়ারকে দিয়ে। শেক্সপীয়ারের নাটক অবলম্বন করে পরবর্তীকালে অনেক বিখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্প হয়েছে, রাশিয়ায় তো বটেই, বাইরেও। তবে, মূল প্রশ্ন, এই চলচ্চিত্রগুলোতে মূল শেক্সপীয়ার কতটা আছেন, আর কতটা আছে পরিচালকদের জীবনদর্শন। হলিউডের স্বর্ণযুগে তোলা অন্তত একটি ছবির কথা স্মরণ করা যায়, যেখানে আক্ষরিকভাবে শেক্সপীয়ারকে অনুসরণ করা হয়েছে, কিন্তু সেটা কেবল চলচ্চিত্রায়িত নাটক না থেকে চলচ্চিত্র-শিল্পের পর্যায়ে উঠে আসার চেষ্টা করেছে। ১৯৩৫ সালে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের 'এ মিডসামার নাইটস ড্রীম', যাতে অভিনয় করেছিলেন পাকের ভূমিকায় মিকি রুনি, বটমের ভূমিকায় জেমস ক্যাগনি, ফ্লুটের ভূমিকায় জো ব্রাউন। এই রোমান্স, ফ্যান্টাসি, কমেডির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নাটক নিয়ে, চলচ্চিত্র নিয়ে সবাই খুশি হন নি বটে, কিন্তু যেটা পরীক্ষা করে দেখা গেল, নাটক অবলম্বন করে মূল সুর বজায় রেখে চলচ্চিত্র যেমন করা যেতে পারে তেমনি নাটকের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, দৃশ্য পরম্পরা অটুট রেখেও চলচ্চিত্র হতে পারে। পরিচিত সংলাপ, চরিত্রদের অক্ষুণ্ণ রেখেই। যে মায়ার জগৎ তৈরী হয়েছিল কেবল কথার জাদুতে, সেটাই চোখের সামনে ভেসে উঠল ক্যামেরার কাজে।

হলিউডের এইসব ছবি আমরা দেখতে পেয়েছি কলকাতাতেই। তবে সমালোচক আর দর্শকদের যে সব কথা বলা হলো, সে সব আমেরিকানদের, যা প্রকাশ পেয়েছে ন্যাশনাল বোর্ড অব রিভিউ-এর বিভিন্ন আলোচনায়। সাহিত্য নিয়ে ছবি করা যায় কি

যায় না, ছবিতে সাহিত্য কতটা ক্ষুণ্ণ হয় কিংবা আদৌ হয় কি না, এই সব নিয়ে বহু আলোচনাই হয়েছে সেখানে। বিশাল ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাও হয়েছে। যেমন ন্যাথনিয়েল হথর্নের উপন্যাস 'দি স্কারলেট লেটার' অবলম্বন করে ১৯২৬ সালে তোলা ছবিটি, যেখানে চরিত্রগুলোর মানসিক দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে নি, কেবল ঘটেছে চাঞ্চল্যকর ঘটনা, যেখানে লিলিয়ান গিশ ব্যর্থ হয়েছেন হেস্টার গ্রীনের জটিল অন্তর্দন্দ্বের বহিঃপ্রকাশে। আবার সেই হলিউডেই তোলা সম্ভব হয়েছে ফ্র্যাঙ্ক নরিসের তখনকার দিনের বিখ্যাত উপন্যাস 'ম্যাকটিগ' অবলম্বনে চলচ্চিত্র জগতের এক দিকচিহ্ন, এরিখ ফন স্ট্রোহাইমের ১৯২৫ সালে তোলা, 'গ্রীড'। রূঢ় বাস্তব জগতের এক নিষ্ঠুর ছবি তুলে স্ট্রোহাইম চলচ্চিত্রশিল্পকে মনোরঞ্জনের উপাদান থেকে জীবনাদর্শনের পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন।

হলিউডে যখন স্বর্ণযুগ (১৯২০-১৯৪০) তখন বাংলা সিনেমায়ও উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র করায় বিরাম নেই। বাংলা উপন্যাসের তিন প্রধান পুরুষ চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হবেন, ধরেই নেওয়া গিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন প্রধান উৎস। 'বিষবৃক্ষ' (১৯২২), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৯২৭), 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৯২৭), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৯২৯), 'রজনী' (১৯২৯), 'রাধারাণী' (১৯৩০), 'রাজসিংহ' (১৯৩০), 'মৃণালিনী' (১৯৩০), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৯৩১), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৯৩২), 'কপালকুণ্ডলা' (১৯৩৩), 'রজনী' (১৯৩৬), 'বিষবৃক্ষ' (১৯৩৬), 'ইন্দিরা' (১৯৩৭)। শরৎচন্দ্রও অনুরূপ উৎস। 'আঁধারে আলো' (১৯২২), 'চন্দ্রনাথ' (১৯২৪), 'দেবদাস' (১৯২৯), 'শ্রীকান্ত' (১৯৩০), 'চরিত্রহীন' (১৯৩১), 'স্বামী' (১৯৩১), 'দেনাপাওনা' (১৯৩১), 'পল্লীসমাজ' (১৯৩২), 'দেবদাস' (১৯৩৫), 'গৃহদাহ' (১৯৩৬), 'বিজয়া' (১৯৩৬), 'পণ্ডিতমশাই' (১৯৩৬), 'বড়দিদি' (১৯৩৯), 'পরিণীতা' (১৯৪২)। ততটা প্রধান না হলেও, রবীন্দ্রনাথও চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। 'মানভঞ্জন' (১৯২৩), 'গিরিবালা' (১৯২৯), 'দালিয়া' (১৯৩০), 'বিচারক' (১৯৩১), 'নৌকাডুবি' (১৯৩২), 'নটীর পূজা' (১৯৩২), 'চিরকুমার সভা' (১৯৩২), 'চোখের বালি' (১৯৩৮), 'গোরা' (১৯৩৮)। এই সব ছবিতে উপন্যাসগুলোর সুর বজায় থেকেছে কিনা, এই নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না, কেননা, অদক্ষ পরিচালনার জন্য এর কোনটাই চলচ্চিত্র-শিল্পে উত্তীর্ণ হয় নি। ক্লাসিক অবলম্বনে চলচ্চিত্র করেছেন, শিল্পসম্মতভাবেই, একমাত্র সত্যজিৎ রায়। তাঁর 'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিত'তে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষুণ্ণ থেকেছেন; 'চারুলতা' অনেকের কাছেই গ্রাহ্য হয়েছে রবীন্দ্রনাথ অক্ষুণ্ণ থেকেছেন বলে; 'ঘরে বাইবে' বহুলাংশে বিকৃত হয়েছে, এই অভিযোগ বহু সমালোচকের, বহুতর দর্শকের; আবার 'তিন কন্যা'য় সকলেই মেনে নিয়েছেন, চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ অবিকৃত আছেন। 'ক্ষুধিত পাষাণ' বা 'কাবুলিওয়ালা'য় তপন সিংহ রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবহ রক্ষা হয়নি। যেমন বর্তমান কালের অসংখ্য টেলিভিশন নাটকে রবীন্দ্রনাথের গল্পে রবীন্দ্রনাথকে চেনা যায় না।

কীভাবে একটি গল্পের চেহারা পুরোপুরি পালটে যায়, তার একটা হালের নমুনা— দিব্যেন্দু পালিতের 'সীমানা' গল্প নিয়ে শেখর চট্টোপাধ্যায়ের টেলিভিশন ফিল্ম। দিব্যেন্দুর গল্পে আছে, কলকাতার এক স্বামী-স্ত্রী বাসে দীর্ঘ পথ কাটিয়ে একটি গ্রামে চলেছে, বসতবাটির ভাগ নেওয়ার জন্য। কিন্তু গ্রামে উপস্থিত হওয়ার পর গ্রামীণ জীবনের প্রতিকূলতা এবং তার চাইতেও বেশি, কাকার পরিবারের দুঃস্থতা লক্ষ করে স্বামী নিজের

অংশ কাকার নামে দিয়ে আসে। গল্পটি বলা তির্যক ভঙ্গিতে। নিজের এবং স্ত্রীর দাবির প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ, পিতৃস্মৃতির ক্ষীণ অনুরণন এবং গ্রামের জীবনের সঙ্গে শহুরে জীবনের সার্বিক বিচ্ছিন্নতা ছোট গল্পের মূল সুর। কিন্তু, ফিল্মে পরিচালক স্বামী-স্ত্রীকে বানিয়েছেন অত্যন্ত স্বচ্ছল ফ্যাশনদুরস্ত মানুষ হিসেবে, যার ফলে গ্রামের বাড়িঘরের দাবির ত্যাগটি ত্যাগ বলে মনে হয় না, যেটা গল্পে ত্যাগ বলেই মনে হয়েছিল। ফিল্মে স্ত্রীকে দেখানো হয়েছে লোভী নারী বলে আর পুরুষ প্রায় নির্লোভ। গল্পে স্বামী-স্ত্রী এমন সাদা-কালো ছিল না, স্বামীরও বাড়ির প্রতি লোভ কম ছিল না। পিতৃস্মৃতি, যেটা দু লাইনে বলা, সেটাকে টেনে বিপ্লবী পিতার স্বদেশপ্রেমকে টানা হয়েছে ফিল্মের দীর্ঘ অংশে, যার ফলে গল্পের ভারসাম্য নষ্ট হয়। যেটা ছিল নিচু স্বরের গল্প, সেটা হয়ে দাঁড়াল চড়া স্বরের মোটাদাগের গল্প। পরিচালক হয়তো ভাবছেন, গল্পের সবই তিনি অনুসরণ করেছেন। আসলে গল্পের কঙ্কালটিই আছে, প্রাণ সঞ্চার হয় নি।

সাহিত্যের একমাত্র উপাদান ভাষা, চলচ্চিত্রের উপাদান ছবি, শব্দ, ভাষা। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার সময় পরিচালকের কাছে সাহিত্যের ভাষাই যদি মুখ্য লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তাহলে সেটা আর চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে না। সাহিত্যের উপাদান কম হলেও, তার প্রধান সুবিধা হলো, ভাষা কল্পনাকে যত উদ্দীপ্ত করতে পারে, ছবি ততটা করতে পারে না। সাহিত্যে আমরা যখন সুন্দরী রমণীর সংস্পর্শে আসি, আমরা নিজের ইচ্ছেমতো নিজের পছন্দমতো সুন্দরী কল্পনা করে বিভোর থাকি, কিন্তু সুন্দরী রমণী হিসাবে যখন আমরা সুমিত্রা দেবী বা সুচিত্রা সেনকে দেখি, আমরা সুমিত্রা বা সুচিত্রাতেই আটকে যাই, ছবির এটাই সমস্যা। চলচ্চিত্রকার যদি ছবির সাহায্যেও কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করতে পারেন তাহলে চলচ্চিত্র শিল্পরূপ পেতে পারে। এটা শুধু নারী-পুরুষের অবয়বেই নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্যে, পরিমণ্ডলের সৃষ্টিতেও সেই কল্পনা প্রসারিত হওয়া দরকার। অক্ষম পরিচালকের হাতে যেটা শুধুই ফার্ণিচার, বেশবাস, আলো বা সেট, দক্ষ পরিচালকের হাতে সেটাই হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রের ভাষার, mixe-enscene. সেটা গার্বোর চাহনি বা 'পথের পাঁচালী'র রাত্রি, 'অযান্ত্রিক'-এর গাড়ি আর কেবল চোখের চাহনি বা প্রাকৃতিক পরিবেশ বা যন্ত্র থাকে না, তা থেকে একটা জীবনদর্শন গড়ে ওঠে। বাংলা চলচ্চিত্রের মূল দুর্বলতা—আলো, শব্দ কোনো আবহ গড়ে তোলে না।

গৌতম ঘোষ যখন 'অন্তর্জলি যাত্রা' তোলার সংকল্প করেছিলেন, তখন কমলকুমার মজুমদারের গুণমুগ্ধরা চকিত হয়েছিলেন এবং সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, কমলবাবুর ভাষার কি চিত্ররূপ সম্ভব? অথচ, তাঁরাই বলেন, কমলবাবুর ভাষা চিত্রময়, তাঁর প্রতিটি বাক্যই এক একটা চিত্রকল্প। তাই যদি হবে, তাহলে তো তার চলচ্চিত্ররূপ সম্ভবই। শেষ পর্যন্ত, চলচ্চিত্রটি শিল্পরূপ পেল কি পেল না, সেটি অন্য প্রশ্ন, কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে বাঙালি পাঠক যে এখনও চলচ্চিত্ররূপ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠেন নি, এই সংশয়েই তার প্রকাশ। সিনেমা দেখতে যাওয়ার অনুরোধ এলে আমরা এখনও প্রশ্ন করি, কী বই?

সাহিত্য অবলম্বনে চলচ্চিত্র হয় বলেই যে সাহিত্যিকেরা ভালো পরিচালক এমন কি চিত্র-নাট্যকার হবেন, তার কোনো প্রতিজ্ঞা নেই। বরং বাঙালি সাহিত্যিকেরা যাঁরাই চলচ্চিত্র করতে গিয়েছিলেন তাঁরাই ব্যর্থ হয়েছেন— প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। উইলিয়াম ফকনারও পয়সার জন্য

হলিউডে হাজির হয়েছিলেন, অসংখ্য চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। অধিকাংশই গ্রাহ্য হয় নি। যা-ও বা হয়েছে, শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র হয় নি। ফলে তিনি যখন তাঁর নোবেল পুরস্কার নেওয়ার সময় হলিউডের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে চলচ্চিত্র শিল্পকেই ব্যঙ্গ করেছিলেন, তা থেকে তাঁর উষ্মাই বেরিয়ে আসে, কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরং মনে পড়ে যায় হলিউডের কোনো শুভানুধ্যায়ী তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, চিত্রনাট্যে যেন ফকনার কোনো সুগন্ধির ব্যবহার না করেন, কেননা চলচ্চিত্রে ঘ্রাণেন্দ্রিয় তেমন কাজ করে না। বাংলা চলচ্চিত্রে চরিত্রগুলো বড়ো বেশি কথা বলে, উপন্যাসের বর্ণিত ঘটনা বোঝানোর জন্য। কথার উপর বেশি জোর দেওয়ার ফলে, এর সঙ্গে স্টেজের নাটকের খুব পার্থক্য থাকে না। যে ক্যামেরা চলচ্চিত্রের মূল উপকরণ, সেই ক্যামেরা হয়ে দাঁড়ায় শব্দযন্ত্রের ধারক মাত্র, ক্যামেরার নিজস্ব অবদান গৌণ হয়ে পড়ে। নির্বাক যুগে ছবির মাথায় মাথায় কথার শোভাযাত্রা দেখে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন, ছবিই তো কথা বলবে, তার জন্য যদি কথা লিখতে হয়, সেটা হবে সাহিত্যের চাটুকারিতা। কথা ছবির মাত্রা বাড়াতে পারে, কিন্তু কথা ছাড়া যদি ছবির অর্থ না হয় তাহলে সেটা শিল্প সত্তা পায় না। 'পথের পাঁচালী'তে সর্বজয়া ইন্দির ঠাকরুনের প্রতি সদয় ব্যবহার করে না ফলে সর্বজয়া আমাদের সহানুভূতি হারাতে পারত। কিন্তু .একটি দৃশ্যে আমরা যখন দেখি ইন্দির ঠাকরুণ সর্বজয়ার দিকে একবার ক্রুর দৃষ্টি হানে, আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই—সর্বজয়ার নির্মমতার পিছনে হয়তো আছে বাঙালী জীবনে, বৌয়ের জীবনে ননদের অত্যাচারের স্মৃতি। কোনো কথা নেই, কিন্তু এই চাহনিতেই ফুটে ওঠে এক জটিল পরিস্থিতি, সর্বজয়ার নির্মমতা আর একরেখ থাকে না। এই চাহনি আমাদেব কাছে প্রত্যাশিত ছিল না, এর অকস্মাৎ বিস্ফোরণ আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। বাংলা চলচ্চিত্রে কিন্তু সবই প্রায় প্রত্যাশিত, চরিত্রের, গল্পের আবহের —যেটা সাহিত্যের কঙ্কাল মাত্র।

কাপুরুষ ও মহাপুরুষ
দীপেন্দু চক্রবর্তী

'সদগতি' ও 'পিকুর' মত স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রায়-নিখুঁত ছবির পেছনে আছে ছোট ছবি নিয়ে সত্যজিতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার নিজস্ব ঐতিহ্য। 'তিনকন্যা' এবং 'কাপুরুষ-মহাপুরুষ' দেখলে বোঝা যায় সত্যজিৎ কতটা সতর্কভাবে স্বল্পপরিসরে সীমানা মেনে নিয়ে তার মধ্যে একটি নিটোল সামগ্রিকতা ফোটানোর নানান উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কাজটা কঠিন ছিল তাঁর পক্ষে। কারণ, ছোটগল্পকারের পক্ষে উপন্যাস লেখা যতটা কঠিন বড় ছবির পরিচালকের পক্ষেও ছোট ছবি করাটা ততটাই কঠিন। ছোটগল্পের মতই ছোট ছবিতে দরকার নির্দয় বর্জনের নীতি। যা অপরিহার্য তা বাদে আর সবই পরিত্যাজ্য, আর যা অপরিহার্য তাকেও ফোটাতে হয় অতি সংক্ষিপ্ত সংকেতের সাহায্যে। স্বল্পদৈর্ঘ্যকেই আদ্য-মধ্য-অন্ত এই তিনভাগে ভাগ করে বিষয়ের সম্যক বিন্যাস ঘটাতে হয়। বৃহৎ পরিধির মধ্যে যাঁর বিচরণ তিনি অভ্যস্ত আচরণ ত্যাগ করে ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করলে অঙ্গসঞ্চালনে বিশেষ ক্লেশ বোধ করতে পারেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তাঁর ছোটছবিতে প্রথমেই প্রমাণ করেছেন, ছবির ক্ষুদ্রায়তন তাঁর প্রতিভার চূড়ান্ত সংহতির আহ্বান মাত্র। এই আহ্বানে তিনি যে সর্বত্র সমানভাবে সাড়া দিতে পেরেছেন তা নয়, বিশ্ব চলচ্চিত্রে বা শিল্পের ইতিহাসেও তা কখনও সম্ভব হয় নি, তবে চূড়ান্ত পূর্ণতার দিকে পৌঁছানোর পক্ষে তাঁর প্রথম দিককার ছোট ছবিগুলো ছিল নির্ভরযোগ্য পদক্ষেপ। কিন্তু এর মধ্যেও সাফল্যের মাপকাঠিতে অগ্রগণ্য 'কাপুরুষ', যা আবার দেখে মনে হল সত্যজিতের বড় ছবির সমগোত্রীয়।

বিপন্না প্রেয়সীকে যে-প্রেমিক একদা উদ্ধার করতে ভয় পেয়েছিল, অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে সে একদিন প্রেয়সীর মুখোমুখি হয়ে যায় এবং নিজের কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফিরে আসে। এই ঘটনাকে সত্যজিৎ শুধু একটি কাহিনী হিসেবে উপস্থিত করেন নি, একটি সংবেদনশীল দ্বিধাগ্রস্ত অন্তর্মুখী যুবকের আত্মপরিচয়ের সংকট হিসেবে দেখিয়েছেন। লক্ষ্যণীয় 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ' ও 'জনঅরণ্যে'র দুর্বল ধাতের ভালো মানুষগুলোর প্রটোটাইপ কাপুরুষের নায়ক অমিতাভ। সে রুচিশীল বাঙালী লেখক-বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি, করুণার উচ্চপদস্থ স্থূলকায় স্বামী তার বিপরীত। করুণাকে সে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করে এরকম স্বামী পেয়ে সে সুখী হতে পারে না। করুণার জবাব দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ঃ আপনি ওকে কতটুকু চেনেন? করুণা অমিতাভর এই উন্নাসিকতায় প্রলুব্ধ হয় না। সে বুঝেছে প্রেমের যে-শক্তি প্রেমিককে বীরত্ব দান করে অমিতাভর তা ছিল না। এখনও নেই। করুণা যাকে মন দিয়েছিল সেই মানুষটিকে সে ভেবেছিল একজন বীরযোদ্ধা, তাকে সে এখনও ভুলতে পারে না, কিন্তু অমিতাভ সেই মানুষটি নয়।

তিনটি মানুষের তিনটি দৃষ্টিকোণ এমনভাবে পাশাপাশি রাখা হয়েছে, কখনো বা

এমনভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে এতটুকু ছবিতেই তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এক অর্থবহ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে যা পোলানস্কির 'নাইফ ইন দ্য ওয়াটার'-এ পাওয়া যায়। লক্ষ্যণীয় সেখানে স্বামী ব্যক্তিটি কাপুরুষ, আগন্তুকটি নয়। দুটি ছবির বিস্তারিত তুলনামূলক আলোচনা কোথাও হয়েছে কিনা জানি না। তবে 'কাপুরুষে'র তুলনা একমাত্র 'নাইফ ইন দ্য ওয়াটারে' সঙ্গে চলতে পারে।

ছবির শুরুতে অমিতাভ-করুণার সাক্ষাতের আগে—দুজনেই এই মুহূর্তে দুই অপরিচিত ভূমিকায়—করুণার ঘরে চিত্রাঙ্গদার রেকর্ড বাজছিল, এবং ঠিক সেই জায়গাটায় যেখানে বীর অর্জুনকে পেতে চায় চিত্রাঙ্গদা। সঙ্গীতের অর্থ স্পষ্ট হয় যতই ছবিটি এগোতে থাকে—অমিতাভ অর্জুন নয়, কিন্তু অমিতাভ এখন আড়ালে আড়ালে অর্জুনের অভিনয় করতে চায়। ছবির পরতে পরতে এই irony সাজানো হয়। স্বামী ভদ্রলোকটির অতিথি হিসেবে অমিতাভ করুণার মুখোমুখি হয়, তার অতিথি হিসেবেই বিদায় নেয়। স্বামী ভদ্রলোকটি জানতেই পারলো না তারই সামনে তার স্ত্রী ও পূর্বপ্রণয়ীর একটা নাটক চলছে। এই নাটকীয় irony যেমন পরিস্থিতিভিত্তিক, তেমনি চরিত্রের ভূমিকা নির্ধারণেও কাজ করে। অমিতাভ আড়ালে করুণাকে বলে, এই অভিনয় তার দুঃসহ, কিন্তু আড়াল ভেঙে বেরিয়ে আসার সাহস তার হয় না। যে-ব্যক্তিটির হাত থেকে অমিতাভ করুণাকে এখনও উদ্ধার করতে চায় তাকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করলেও ভয় পায়। তাই নির্জনে তিনজন মুখোমুখি হয়েও অমিতাভ পিকনিকের পর করুণার স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে তবেই করুণাকে পালিয়ে আসতে বলে; সে মনের কথা কাগজে লিখে করুণাকে দেয়। এই আচরণের গোপনীয়তার একটা ব্যাখ্যা মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিতে সহজবোধ্য—অতিথির উচিত নয় গৃহস্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। কিন্তু সত্যজিৎ দেখিয়েছেন এই আপাতভদ্রতার আড়ালে লুকিয়ে আছে দুর্বল অথচ শিক্ষিত মানুষের নির্দয় ভীরুতা। প্রেম করেছে কিনা এই প্রশ্ন উঠলেও আমাদের লেখক নায়ক স্পষ্ট কথা বলে না। এই বিশেষ চরিত্র পাশ্চাত্যের সমালোচকরা অনুধাবন করতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ এটি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর চরিত্র। সত্যজিৎ এরকম চরিত্রকে সূক্ষ্ম খোঁচায় উন্মোচিত করেছেন 'জন অরণ্য'র তরুণ নায়কের ক্ষেত্রেও। দুটি ছবিতেই দুটি নারীর দৃঢ়তা মধ্যবিত্ত পৌরুষের মীথকে নগ্ন করে দিয়েছে—করুণা আর কণার ভূমিকা তাই একটি স্তরে এক। দুজনেই কাপুরুষের ভালোমানুষিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে, শুধু কণার ঘৃণা যেখানে সোচ্চার করুণার সেখানে প্রায় নির্বাক।

গোটা ছবিতেই রাখা হয়েছে নির্জনতার পরিবেশ, যেন তিনটে মানুষের নিঃসঙ্গ তার যোগফল। করুণার কাজ গান শোনা, ছবি আঁকা, এখনও সে সন্তানহীনা। করুণার স্বামীও সঙ্গীহীন, তাই অল্প পরিচয়েই অমিতাভর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ; চা বাগানের বড়বাবু হিসেবে সে চূড়ান্ত অমানবিক বিচ্ছিন্নতায় পদমর্যাদা বক্ষা কবে। অমিতাভর নিঃসঙ্গতা অতীতের ফলশ্রুতি। ব্যঞ্জনাময় সংলাপ দিয়ে সত্যজিৎ এই ত্রিমুখী নিঃসঙ্গতাকে যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যঞ্জনাময় নীরবতার প্রয়োগে। করুণা অতিথির আপ্যায়ন করে চলে নিখুঁতভাবে এবং নীরবে। অমিতাভ তাকিয়ে দেখে, আর ভেতরকার বদ্ধ যন্ত্রণায় কাতর হয়। একবার একান্তে পেয়ে তার যন্ত্রণার কথা বললেও করুণা তার আতিথেয়তার দক্ষতা প্রমাণ করে চলে। ক্লাইম্যাকস আসে রাত্রে। অবিস্মরণীয় সেই শট

যেখানে করুণার ঘরের বন্ধ দরজার তলায় একফালি আলোতে একটা ছায়া চলাফেরা করে। স্মৃতিভারে জর্জরিত অমিতাভর ঘুমের ওষুধ দরকার, ওপাশে করুণাও নিদ্রাহীন। শুধু করুণার স্বামীর উদাসীন নাক ডাকার আওয়াজ আসে পর্দার বাইরে থেকে। এই ঘুমের ওষুধের প্রসঙ্গ ফিরে আসে ছবির শেষে। অমিতাভ আশা করেছিল স্টেশনে করুণা আসবে স্বামীত্যাগী স্ত্রী হিসেবে। আবছা আলোয় করুণার ঝলমলে শাড়ি এগিয়ে আসে, আত্মমগ্ন অমিতাভ তাকায়, করুণা কাছে আসে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য শুধু ঘুমের বড়ির শিশিটি ফিরিয়ে নেয়া। অর্থাৎ মুখে ও আচরণে অমিতাভকে আঘাত দিয়ে তাকে কাপুরুষ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেও কিন্তু করুণা নিজের যন্ত্রণাকে অস্বীকার করতে পারে না। অমিতাভর প্রস্থানে যেন সেই যন্ত্রণার আরম্ভ। ঘুমের প্রশ্নটি তাই ক্রমশ ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। অমিতাভ ও করুণা দুজনেই নিদ্রাহীন, পাশাপাশি করুণার স্বামী একটা আত্মতৃপ্তির ঘুমে সহজেই ঢলে পড়ে। পিকনিকে যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার হাতের জ্বলন্ত সিগারেট ক্রমশ ছোট হয়ে আসে—ইতিমধ্যে অমিতাভ ও করুণার অন্তরঙ্গ আলাপ নতুন বাঁক নেয়—করুণার স্বামী নিজের সিগারেটেই ছ্যাঁকা খেয়ে জেগে ওঠে কিন্তু এই জেগে ওঠা নিতান্তই শারীরিক স্তরে, তার দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত জাগরণ নয়। সিগারেটের ব্যবহারে এখানে সত্যজিৎ এক অসাধারণ টেনশান তৈরী করেন। ছবিতে প্রায় আগাগোড়াই এরকম একটা টান-টান ভাব রাখা হয়। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয় ভেতরের সমস্ত আবেগ যেন ফেটে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তা ঘটে না। সত্যজিতের আগের কোনো ছবিতে এ ধরণের একটানা টেনশান আমরা পাই নি। অথচ রসিকতার হালকা মুহূর্তও আছে ঃ করুণার স্বামী গাড়িকে জল খাওয়ায়, তারপর তারই সামনে পকেট থেকে বোতল বার করে নিজের গলায় ঢালে। ঘটনাটার কৌতুক যেমন উপভোগ্য তেমনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যন্ত্র ও মানুষের অভিন্নতা—চা বাগানের পরিবেশে যা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই স্থূল যান্ত্রিক মানুষটির পাশেও বিদগ্ধ লেখক-নায়ককে তেমন বড় মাপের মানুষ বলে মনে হয় না। অমিতাভর মদে আসক্তি নেই। তদুপরি সে ভাবুক সংস্কৃতিবান, লেখক, মধ্যবিত্ত রুচিশীলতার মানদণ্ডে সে সত্যিকারের ভদ্রলোক। তবু গাড়িতে করুণার হাত স্বামীর কাঁধে (সেদিকে তাকিয়ে সে ছাত্রজীবনের ঘটনা স্মরণ করে মাত্র), সে হাত স্পর্শ করার অধিকার সে পায় না। অথচ করুণার প্রতিশোধে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। তার গৃহিণীসুলভ আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। সত্যজিতের সব ছবিতে যেমন, এখানেও একটা সহজ স্বাভাবিকতার আবরণে তিনি জড়ো করেছেন অগ্ন্যুৎপাতের সমস্ত সম্ভাবনা। ছবি শেষ হয় অমিতাভর মুখের ক্লোজ আপ দিয়ে—নির্বাক মুখের পেছনে অনুভব করা যায় প্রায়শ্চিত্তের আর্তনাদ।

এক কথায় 'কাপুরুষ' এক অসাধারণ ছবি, কিন্তু সত্যজিতের ছবিব আলোচনায় তেমন একটা গুরুত্ব সে পায়নি সেটা আমাদের চলচ্চিত্র চেতনার অগভীরতা, আমাদের সমালোচক মনের অসতর্কতার প্রতি এক করুণ কটাক্ষ হয়ে থাকবে।

হরিসাধন দাশগুপ্তের 'একই অঙ্গে এত রূপ' হয়তো ভিন্ন মেজাজের ছবি হতো যদি 'কাপুরুষ' না হত, এবং হয়তো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ধরা পড়বে, 'কাপুরুষ'-এ মাত্র তিনটি মানুষের ব্যক্তিমানসের অন্তঃশীল জটিলতার যে স্বল্পবাক বহুমাত্রিক প্রতিকৃতি আছে তারই উত্তরসূরী মৃণাল সেনের 'খণ্ডহর'।

পাশাপাশি 'মহাপুরুষ' আশা জাগিয়ে হতাশ করে। বিরিঞ্চিবাবার অসাধারণ ছলনাজাল

ফোটানো হয়েছে প্রথমেই ছবির ভাষাতে —যেমন ট্রেন থেকে তিনি দুহাত দিয়ে 'ওঠ ওঠ' করে সূর্যকে উঠিয়ে দেন, তারপর দুই হাতের অঙ্গুরীয় বিপরীত দিকে চক্রাকারে ঘোরান। বিরিঞ্চিবাবার গুরু-মূর্তির গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে ক্যামেরার একটি বিশেষ কোণ থেকে—ট্রেনের দরজায় তার একটি ঝুলন্ত পা, দরজার ফাঁক থেকে প্ল্যাটফর্মের ভক্তরা ছোটে সেই পা স্পর্শ করার জন্য। ব্যঙ্গাত্মক প্রহসনের স্বার্থে ডকুমেন্টারী ভঙ্গীতে একটি প্রেমের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে চমৎকারভাবে। চিত্রনাট্যে এই সফিস্টিকেশন একটানা থাকেনি। বিরিঞ্চিবাবার স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে নিতান্তই থিয়েটারি ঢঙে। জনসাধারণের উচ্চশিক্ষিত অংশও যে কতটা প্রতারিত হবার জন্য প্রস্তুত তার সামাজিক বিশ্লেষণে সত্যজিৎ যাননি। সংলাপের প্রাধান্য এ ছবির সেই মাত্রাটি কেড়ে নিয়েছে যা সত্যজিতের 'পরশপাথর'-এ আমরা আগেই পেয়েছি। আরো গভীর সমাজ জিজ্ঞাসা ও আঙ্গিকের ভারসাম্য থাকলে 'মহাপুরুষ' আজকের সাঁই-বাবাদের যুগে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ ছবি হত। শুধু মনে হয় সত্যজিৎ যদি আবার এ ছবিটি নতুন করে করেন, তবে বাংলা ছবির স্যাটায়ারের ভাঁড়ার এতটা শূন্য থাকবে না।

সত্যজিৎ রায়ের নায়ক

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল যে, সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টির মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান ক্রমশই সংকুচিত হয়ে আসছে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র পরে আবার সেই নিজস্বতা ও নতুন সৃষ্টির চেহারা পেলাম 'নায়ক' ছবিতে। এইবার প্রত্যয়ের সঙ্গে বলব যে সত্যজিৎ রায় যখনই নিজের লেখা গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরী করেছেন, তখনই তাঁর সৃষ্টি অধিকতর সার্থক হয়েছে। তিনি তখন অতি সতর্ক, অতিশয় সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত। তাঁর কাহিনীবিন্যাসের ধরণ, তখন একটা কেন্দ্রকে ঘিরে —'কাঞ্চনজঙ্ঘা' যা, —পরিবারিক সমস্ত সমস্যা বিধৃত হয়েছে যাকে কেন্দ্র করে, 'নায়ক'-এ নায়ক নিজে। যদিও 'ফর্ম'-এর দিক থেকে 'নায়ক' আরও জটিল, সম্পূর্ণ কতকগুলি চরিত্রের সমস্যার মাঝখানে নায়কের কেন্দ্রীভূত স্থানকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে 'নায়ক'-এর চিত্রনাট্য আরও নিপুণ ও আরও দৃঢ়বদ্ধ হওয়ার দরুণ। যেমন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় তেমনি 'নায়ক'-এ—স্থান-কাল-পাত্র একটা নির্দিষ্টতায় আবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত —যেন একটা ছবির ফ্রেম—এই গণ্ডীর বাইরে অকারণ, অতিরিক্ত, অহেতুক বিস্তৃতির বা বিচ্যুতির কোনো পথ নেই।

এই অসাধারণ সুশৃঙ্খল গণ্ডীর মধ্যে বক্তব্যকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কোন ধোঁয়া নেই, যদিও সূক্ষ্মতা আছে। এয়ারকণ্ডিশনড্ কোচের যাত্রীর পাশাপাশি তিনি তৃতীয় শ্রেণীর (ভিস্টিবিউলড্) যাত্রীকে (স্বামী-স্ত্রী) দেখিয়েছেন সুস্থ বৈপরীত্যের প্রতীক করে। কিন্তু তাঁর আসল বক্তব্য সেই শ্রেণীকেই কেন্দ্র করে যারা বিত্তবান। যারা আমাদের সমাজের উপরতলার লোকসমাজের নায়ক, কর্ণধার। নায়ক অরিন্দম মুখার্জীর জগৎ চলচ্চিত্রের জগৎ। কিন্তু তার সহযাত্রীরা তার থেকে বেশি দূরের লোক নন, চিন্তায় কর্মে ও বাক্যে তাঁরা একই দেবতার পূজারী। যাদের গভীরতা নেই, শোভনতা নেই, বিবেকবোধ নেই, আছে শুধু দুরাকাঙ্খা ও আত্মপ্রসাদের দৈত অভিযান।

'নায়ক'-এর ট্রিটমেন্ট-এর ধরণ আগাগোড়াই সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃশ্য ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন যাত্রীকে যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি অরিন্দমের চিন্তাও টুকরো টুকরো ভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। আগেই বলেছি এ কাহিনী বিন্যাসের কেন্দ্র 'নায়ক' নিজে। তার সহযাত্রীদের চিন্তা ও সমস্যা বিভিন্ন, কিন্তু চরিত্রগতভাবে তারা এক। যেমন শিল্পপতির অপরের স্ত্রীর প্রতি লোভ। বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীর মক্কেল জোগাড়ের লোভ। সে জন্যে সে স্ত্রীকে ব্যবহার করতে প্রস্তুত; শিল্পপতির স্ত্রীর 'গ্ল্যামার'-এর প্রতি লোভাতুর বাসনা, (যার বিপরীতে তাঁর মেয়ের সরল অ্যাডমিরেশন) এবং নায়কের লোভ—অর্থ, প্রতিপত্তি, গ্ল্যামার—সমস্তই একটা বিত্তবান, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব শ্রেণীর প্রতি জ্বলন্ত অঙ্গুলিনির্দেশ। এদের আবার নিজস্ব নীতি শিক্ষা আছে। শিল্পপতি সিনেমা-অভিনেতার প্রতি বিরূপ এবং বিশেষ করে নারীঘটিত স্ক্যাণ্ডাল সম্পর্কে। বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ী স্ত্রীকে নিজের উন্নতির জন্য ব্যবহার করতে প্রস্তুত হলেও সিনেমায় যোগ দেওয়ার নামে আঁতকে ওঠে। এই এস. সি. সি.-

তে আরও একজন আছে, যার ব্যবসা ধর্মের (ডব্লিউ, ডব্লিউ ডব্লিউ), সেও বিজ্ঞাপনের বাজেট তৈরী করে।

এই নীতিভ্রষ্ট, বিবেকহীন, বিত্তবান শ্রেণীর জগতের কেন্দ্র নায়ক স্বয়ং। না, তার সমস্যা গভীর নয়, অতল নয়, জটিল নয়, বরং অগভীর, ইংরেজিতে যাকে বলে'শ্যালো'। কিন্তু নায়ক যে সমাজের কাছাকাছি মানুষ সে সমাজটাই কি শ্যালো নয়, অগভীর নয়? এ সমাজের চরিত্রের সঙ্গে, দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, তাদের মূল্যবোধের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় নেই। সম্ভবত সেই জন্যেই দর্শকের একাত্মবোধ আসা কঠিন। বরং তৃতীয় শ্রেণীর সহজ সুস্থচেতা স্বামী-স্ত্রীকে অনেক কাছের মানুষ বলে দর্শকের মনে হওয়া স্বাভাবিক।

প্রশ্ন ওঠে, 'তবে এমন ছবি করার কি দরকার ছিল?' আমরা সত্যজিৎ রায়ের কাছে অনেক প্রত্যাশা করি, একটা উপরতলার সমাজের ছবি দেখিয়ে তিনি শুধু টেকনিকের বাহার তোলার সুযোগ নিলেন? শুধু ফর্ম? বিষয়-বস্তু যাই হোক? কোথায় গেল তাঁর শিল্পচেতনা, তাঁর চরিত্র চিত্রণের মধ্যে ইমোশনাল ইন্‌টিগ্রিটি?

অথচ 'নায়ক' ছবিতে সে সূক্ষ্ম রসবোধ আছে, যে ব্যঙ্গ আছে, সুস্থ ও অসুস্থ মনের যে বৈপরীত্য আছে, বিত্তবান ও সাধারণ মানুষের যে প্রভেদ-নির্দেশ আছে, তাতে বলা কি যায় না, 'নায়ক' একটা সোশ্যাল স্যাটায়ার'? এইখানে নায়ক ছবির বিষয়বস্তুর গভীরতা। ব্যক্তিগতভাবে নায়ক এই সমাজেরই প্রতীক?

এই পটভূমিতে অদিতি সেন বুদ্ধিজীবী, স্থিরবুদ্ধি মেয়ে, এই ঘুন ধরা সমাজের মধ্যে একটা আলোর দীপ্তি। অরিন্দম মুখার্জির কথা সে তার কাগজে লিখতে চায় না। তার পাণ্ডুলিপি সে ছিঁড়ে ফেলে, ঘৃণায় নয়, বরং সহানুভূতিতে। অরিন্দমের প্রতি তার একাত্মতবোধ নেই, সে 'অন্য জগতের মানুষ', তাই দিল্লী স্টেশনে পৌঁছে একবারের জন্যেও সে পিছনে তাকায় না। কিন্তু অরিন্দম চেয়ে দেখে, যদিও পর মুহূর্তেই তার মুখের মুখোশটা বেঁচে ওঠে। ম্যাটিনি আইডল গ্ল্যামার বয়ের ছকে বাঁধা হাসির উপরে ছবির যবনিকা নামে।

কাহিনী বিন্যাসের ধরণ

চতুষ্কোণগুলো একটার পর একটা বিলীন হয়ে প্রথমেই ফুটে ওঠে নায়কের মাথার পেছন দিক। তাকে দেখতে পাই না পুরোটা। অনেকক্ষণ সে থাকে অল্প-দেখার আড়ালে; দেখেছি তার দামী স্যুটকেস, তার হাতে হাজার টাকার নোট, তার দামী জুতো জোড়া—যতক্ষণ না পরদায় ফোটে তার মুখ। অন্যান্য চরিত্রকে পরিচিত করার ব্যাপারে সত্যজিৎ রায়ের টেকনিক একই। প্রথমেই চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্যকে তিনি তুলে ধরেন। কামরায় অরিন্দমের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপতি পরিবারের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া এবং শিল্পপতিকে দেখামাত্র বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীর প্রতিক্রিয়া এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে মুহূর্তেই বেশ একটা পরস্পর সম্পর্কের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 'স্টেটসম্যান'-এ যে ভদ্রলোক চিঠি লেখেন ও করিডোরে দেখা ছোট্ট মেয়েটি এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই অরিন্দমের একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ। এ সম্পর্কে স্মরণীয়—মাতাল অরিন্দম যখন বৃদ্ধের বিরক্তি উৎপাদন করার পর সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়ায় তখন তার চোখে পড়ে করিডরের অপর প্রান্তের সেই ছোট্ট মেয়েটি। সে খুব সহজে বন্ধুত্বের সুরে জিজ্ঞেস করে 'তোমার নাম কি?' অরিন্দম

তার দিকে এগোতে চায়, মেয়েটি ছুটে পালায়। তখন অরিন্দমের একাকিত্ব সম্পূর্ণ। বৃদ্ধ ও শিশু উভয়ের কাছেই সে বাতিল। এর পরেই তাকে দেখি ট্রেনের খোলা দরজায় লগ্ন হয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রায় নিরালম্ব আত্মহত্যার ভঙ্গিতে।

আবহসংগীত ও শব্দের প্রয়োগ

ছবি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে তীক্ষ্ণ ধাতব ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সেটা যেন অরিন্দমেরই জীবনকে ধ্বনিত করে—একটা চমক, আর চটক—পেশাদারী, যান্ত্রিক, নিষ্ঠুর। ছবি এগোবার পর তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ মুহূর্তগুলিতে আবহসংগীত ব্যবহৃত অতি নেপথ্যে। ট্রেনের আওয়াজকে এত নানা ধরণে, প্রয়োজনানুসারে কখনও জোরে, কখনও আস্তে—বাথরুমে কর্কশ ও এয়ারকণ্ডিশনড় কামরার মধ্যে চাপা মসৃণ আওয়াজ—কামরার মধ্যে স্ট্যাণ্ডে রাখা কাঁচের গেলাসের ঝন্‌ঝনানি—ইত্যাদিকে এত বিশদ ও কল্পনাশ্রয়ীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে ভ্রম হয় আমরা দর্শকরাও ট্রেনের মধ্যে আছি।

অভিনয় ও ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ

'নায়ক' প্রধানত পরিচালকের ছবি। অভিনয়ের স্বল্পাবকাশে ছোট চরিত্রগুলো প্রত্যেকেই অতিসহজ ও অকুণ্ঠ। অবিস্মরণীয় যমুনার কৌতুকদীপ্ত ঘরণীর রূপায়ণ— ভারতী দেবীর আধুনিক ধনী গৃহিণী ও সুস্মিতার শান্তমুখের আড়ালে অশান্ত মনের চিত্রায়ণ। অতিক্ষুদ্র ভূমিকায় কমল মিশ্র (মারোয়াড়ী ভদ্রলোক) মনে ছাপ রাখেন। লালী চৌধুরীর মুখ ও একনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রকাশ খুব সহজেই বিশ্বাস উৎপাদন করে।

শর্মিলা ঠাকুর তাঁর ভূমিকাকে জীবন্ত করেছেন চরিত্রটির সম্যক অনুধাবন করে। অন্তত সেই কথাই মনে হয়। নায়ক উত্তমকুমার কার্যক্ষেত্রেও জনপ্রিয় অভিনেতা হওয়ার দরুণ একদিকে যেমন বিশ্বাস উৎপাদন করা সহজ হয় অন্যদিকে বহুদৃষ্ট মুখে নতুনত্বের স্বাদ আনা কঠিন। সত্যজিৎ রায় এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণের আশ্রয় নিয়েছেন। উত্তমকুমারকে, বেশির ভাগ দেখি—হয় 'প্রোফাইলে' বা তিন-চতুর্থাংশ দৃষ্টিকোণে, এবং যখন সম্পূর্ণ সম্মুখ-দর্শনে, তখন 'মিড-শট'-এ। তাঁর অভিনয় নিঃসন্দেহে এ ছবিতে সর্বোত্তম, ম্যানারিজম-বর্জিত এবং চরিত্র-চিত্রণে জীবন্ত। এবং এই প্রথম মেকআপবিহীন, 'গ্ল্যামার'-বিহীন উত্তমকুমারের মুখে সচল পেশীর প্রকাশ দেখা গেল।

'নায়ক'-এর স্বপ্নের 'সিকোয়েন্সগুলি', বিশেষ করে প্রথমটি— যেখানে অরিন্দম টাকার স্তূপে নিমজ্জিত হয়— সেটির প্রকৃতি, গতি,আলোছায়ার ব্যবহার, ক্ষীণ হতে প্রবল টেলিফোনের ও হরিসংকীর্তনের শব্দশৃঙ্খল—মনস্তত্ত্ব ও রূপকের এক অদ্ভুত সম্মেলন। শুধু পৃথক সিকোয়েন্স হিসেবে নয়, সমস্ত ছবির গতি ও বিন্যাসের সঙ্গে স্বপ্নের সিকোয়েন্সটি এমনভাবে জড়িত যে তার আগমন ও অন্তর্ধান অতি মসৃণ। মনে হয় ট্রেনের ছন্দ ও গতি পুরো এডিটিংকেই প্রভাবিত করেছে, যার দরুন ফ্ল্যাশব্যাক-এর দৃশ্যগুলি কোথাও ছন্দপতন ঘটায় না। ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি পাশাপাশি চলন্ত ট্রেনের শট অতি অভিনব। ডাইনিং কার-এ কথোপকথনরত অদিতি ও অরিন্দমের মুখের উপরে ক্যামেরা সমান্তরালভাবে ট্রেনের গতির ছন্দে যাতায়াত করে। সুব্রত মিত্রের ক্যামেরার কাজ এ ছবিতে আরও পরিণত, আরও সংবেদনশীল।

এই গতির ছন্দোবদ্ধ পুরো 'ইনডোর'-এর কাজ যে 'ব্রান্ড নিউ', এ সি সি ও ভেস্টবিউলড্ ট্রেনে অভিনীত, তার নির্মাণকর্তা হলেন আর্ট ডিরেক্টর বংশী চন্দ্রগুপ্ত। যাঁরাই 'নায়ক' ছবির শুটিং দেখতে গেছেন তাঁরা বংশী চন্দ্রগুপ্ত নির্মিত এই 'সেট' দেখে হতবাক হয়েছেন।

সবশেষে 'নায়ক' সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত চিত্র-সমালোচনা হয়েছে তার উল্লেখ না করে পারছি না। একদল সমালোচক 'নায়ক' ছবির মধ্যে কিছু পাননি, উত্তমকুমারের অভিনয় ছাড়া। সে অভিনয়ও উত্তমকুমারের নিজস্ব ভঙ্গীতে। যেন ডিরেক্টরের কিছু করবার ছিল না। তাঁদের মতে মিউজিক দুর্বল, গল্প কিছু নেই, এ যেন একটা সিনেমার নায়কের 'তথ্য চিত্র'। অপরপক্ষে সে সমালোচনার নায়ক উৎকৃষ্ট টেকনিকের জন্য উচ্চ প্রশংসিত, সেখানেও বিষয়বস্তুর অগভীরতা নিয়ে আক্ষেপ করা হয়েছে।

প্রথমোক্ত মত শুধু মূর্খতাসঞ্জাত মনে করলে ভুল করা হবে; এর পিছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, কারণ এই সমালোচক গোষ্ঠীর অধিকাংশেরই কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। সত্যজিৎ রায়কে আর সোজাসুজি আক্রমণ করা সম্ভব নয় বলেই এরা চোরা আক্রমণের আশ্রয় নেয়। তবু ছবি চলে, এমনকি মফঃস্বলেও।

শেষোক্ত সমালোচনা আমার মতে অসম্পূর্ণ। কারণ 'নায়ক'-এর ফর্মের সঙ্গে বিষয়বস্তু এমনভাবে জড়ানো যে ফর্মকে ভালো বললে কন্‌টেনট্‌কেও ভালো বলা হয়। বস্তুত 'নায়ক'-ছবিতে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র জগতে এক নতুন চ্যালেঞ্জ উপস্থাপিত করলেন, বাংলা ছবি আর-একবার মোড় ঘুরে নতুন পথের সন্ধানে এগোল।

প্রসঙ্গ ঃ নায়ক

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গল্প বলা, এই হল সত্যজিৎ-পরিচালিত চলচ্চিত্রের মূল উদ্দেশ্য। এ-কথাটা অস্বীকার করবার বা এড়িয়ে যাবার তেমন কোনও উপায় দেখছি না। গল্প বলার মধ্যে আসতে পারে নানা ধরণের বৈচিত্র্য, আসতে পারে শৈলীর অভিনবত্ব, চরিত্রায়ণের নতুন মাত্রা, এমন কি অপরিচিত বিষয় উদ্‌ঘাটনও। কিন্তু একটি চলচ্চিত্রকে মূলত একটি গল্প বলতেই হবে—এই ভিত্তিভূমি থেকে অধিকাংশ চিত্রপরিচালকের মত সত্যজিৎ রায়ও সরে দাঁড়ান না।

এবং প্রতিটি চলচ্চিত্রের শুরুতে, স্ক্রিপ্ট লেখার অনেক আগে, সেই বিস্তৃত, পরিশ্রমী পর্বটিকে সত্যজিৎ-ও মেনে নেন, যার নাম গল্প-বাছাই পর্ব। এই প্লট বাছাইয়ের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে সাহিত্য পাঠ। ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে হুজুগে-বেস্টসেলার—এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের যেখানে থেকে খুশি চলচ্চিত্রকার তাঁর ছবির কাহিনী বা বিষয় আহরণ করতে পারেন। কপিরাইটের মেয়াদ চলতি থাকলে চলচ্চিত্রকার বা প্রডিউসার গল্প কিনে নেন নগদমূল্যে। স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও পরিচালক হিসেবে এই প্যাটার্নের মধ্যে পড়েন। যেখানে তিনি অন্যের গল্প নেন নি, সেখানে তিনি নিজেরই প্রকাশিত গল্পের কাছে নিজের ছবিকে ঋণী করিয়েছেন। উল্টোটা কখনই করেনি। অর্থাৎ, তিনি এমন কোনও কাহিনী এখনও লেখেন নি যা তাঁর ছবির কাছে বিষয় ও বিন্যাসের জন্য ঋণী। বার্গম্যানের সেই বিপুল উক্তি, সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোন সম্পর্কই নেই—এই নিরিখে সত্যজিৎ-পরিচালিত প্রায় কোনও চলচ্চিত্রেরই বিচার চলে না। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' আর 'নায়ক' এই দুটি চলচ্চিত্রের কথা মনে রেখেই 'প্রায়', শব্দটি ব্যবহার করলাম। মাত্র এই দুটি ছবিতেই সত্যজিৎ সনাতন কাহিনী-কাঠামো যতদূর সম্ভব বাতিল করে দিয়ে 'থিম্যাটিক ন্যারেটিভ' বা বিষয়ভিত্তিক (ঘটনাভিত্তিক নয়) বিন্যাসের দিকে ঝুঁকেছেন। আগেই বলেছি, 'কাঞ্চনজঙঘা' আর 'নায়ক'-এর জন্ম সরাসরি চিত্রনাট্য হয়েই—অর্থাৎ, চলচ্চিত্রের বাইরে এই দুটি কাহিনীর আর কোনও অস্তিত্ব নেই, কোনও রকম সাহিত্যিক যথার্থ্য এদের টিকিয়ে রাখে না। ন্যারেটিভ স্ট্রাকচার থেকে থিম্যাটিক স্ট্রাকচারে সরে আসার এই প্রচেষ্টা, বিশেষ করে 'নায়ক' ছবিতে, আমাদের বার্গম্যান এবং আন্তোনিওনির কথা মনে করিয়ে দেয়। 'নায়ক' ছবির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, বার্গম্যান এবং অন্তোনিওনির বেশ কিছু ছবির মত 'নায়ক'-এর অন্তর্নিহিত বিষয়ও হল যাত্রা। এই প্রতীকী বিষয়টির ট্রিটমেন্টে সত্যজিৎ বার্গম্যান এবং আনন্তোনিওনির ব্যবধান মেরুপ্রতিম। বার্গম্যান-এর 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি' এবং সত্যজিতের 'নায়ক'—এই দুটি ছবিকে প্রতিতুলনার দাবি মেটাতে পাশাপাশি রাখতেই হয়। 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি' তৈরি হয় ১৯৫৭ সালে। ঠিক এগার বছর পরে ১৯৬৬-তে 'নায়ক'। 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি'র কেন্দ্রীয় চরিত্র এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানী, 'নায়ক'-এর নায়ক এক চিত্রতারকা। দু-জনেই

যাচ্ছে এক শহর থেকে অন্য শহরে, প্রতিভার স্বীকৃতি নিতে। এই আপাত-সাদৃশ্য এমন অনস্বীকার্যভাবে স্পষ্ট যে বলতে লোভ হয়, সত্যজিৎ শুধু উত্তমকুমারকে মনে রেখেই 'নায়ক'-এর চিত্রনাট্য লেখেন নি, তিনি বার্গম্যান-এর ভূতকেও মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি। 'নায়ক'-এর পিছনে 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি' নেপথ্যচারিতা আক্ষরিক অর্থেই হতে পারে ভবিষ্যৎ গবেষণার মৃগয়াভূমি।

'নায়ক'-এর অরিন্দম এবং 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি'র আইজ্যাক—দুজনেই যাত্রী। এই যাত্রার ট্রিটমেন্টেই ধরা পড়ে সত্যজিৎ এবং বার্গম্যান-এর মূল প্রভেদটা। এই পার্থক্য তাঁদের মেজাজের, মানসিকতার, মূল্যবোধের, বিশ্বাসের, এমন কি কমিটমেন্টের। এক কথায়, 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি'র যাত্রা যত দূরপ্রসারী অর্থে প্রতিকী, নায়কের দিল্লী যাত্রার প্রতিকী তাৎপর্য তত গভীর নয় ; নয়, তার কারণ, নায়কের দিল্লি যাত্রার ঘটনাকেই যেন শরীরীভাবে উপস্থিত করা সত্যজিতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এখানেও তিনি মূলত একটা ঘটনাকেই যেন আঁকড়ে ধরছেন। ঘটনা থেকে মনন, বিশ্লেষণ, উন্মোচনের প্রচেষ্টায় সরে যেতে তেমন যেন উৎসাহ বোধ করছেন না। এই অহেতুক জটিলতায় ছবিটার বাণিজ্যিক সম্ভাবনার ক্ষতি হতে পারে, এমন একটা ভয়ও তাঁর মনের মধ্যে কাজ করছে বলে মনে হয় ; ফ্ল্যাশব্যাক সিকোয়েন্সে যতটুকু জটিলতা এসেছে, কিংবা শ্লথ হয়ে পড়েছে ছবির গতি, তার ক্ষতিপূরণ হিসেবেই যেন সত্যজিৎ 'নায়ক'-এ নিয়ে এসেছেন গ্ল্যামারবাহী উত্তম-উপস্থিতির নির্যাস। সামাজিক সাফল্য এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার পিছনেও কিভাবে লুকিয়ে থাকতে পারে হতাশা, ব্যর্থতা, গ্লানি, আত্মহত্যার প্রবণতা, এই বিষয়টি যেন 'নায়ক' এবং 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি' ছবিতে ডালপালা ছড়িয়ে বিচিত্র স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। এবং এই ছড়িয়ে পড়ার বিস্তৃতি অনেকটা এসেছে ফ্ল্যাশব্যাক-এর মাধ্যমে। এই জটিল এবং গম্ভীর বিষয়ের চূড়ান্ত দাবি মেটাতে সত্যজিৎ রায় এবং বার্গম্যান, উভয়কেই একাধিবার দাঁড়াতে হয় প্রবল কিছু প্রশ্নের সামনে। কিন্তু সত্যজিৎ যেন ইচ্ছে করেই বেছে নেন সহজীকরণের পথ, বিশেষভাবে যত্নবান হয়ে পড়েন 'নায়ক'-এর নির্ভার স্ট্রাকচার-এর মেদবিহীন চেহারাটি যতদূর সম্ভব বজায় রাখতে। হয়ত ভারতীয় দর্শকের কথা ভেবেই তিনি 'নায়ক'-এর নির্মেদ দ্রুতিকে কোনওভাবেই বিষয়-জটিলতায় ক্ষুন্ন হতে দিতে পারেন নি। তুলনায় বার্গম্যানকে আমার বেশি দুরাভিসারী ও সাহসী মনে হয়। 'হিউম্যান ফেলিওর' এবং 'পাবলিক সাকসেস'—এক কথায় 'নায়ক' এবং 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি' উভয় ছবিই দাঁড়িয়ে আছে এই কেন্দ্রীয় বিষয়ের ওপর। কিন্তু বার্গম্যান-এর ছবিতে আইজ্যাক-এর ব্যর্থতা তার মানস-শূন্যতা, তার অন্তরের দেউলিয়া অবস্থাটা যেন এক অপ্রত্যাশিত পাতালের অন্ধকার থেকে উঠে আসে। অরিন্দমের মানস-উদঘাটনে স্যতজিৎ কিন্তু ঐভাবে পাতালস্পর্শী হতে চান না। বরং তিনি এক নরম, রোম্যান্টিক অ্যাম্বিভ্যালেন্সের দিকেই যেন ক্রমশ ঝুঁকে পড়েন। এক সময়ে সত্যজিৎ নিজেই বলেছিলেন, 'দ্য সিনেমা হ্যাজ নাউ অ্যাটেন্ডে এ স্টেজ হোয়্যার ইট ক্যান হ্যান্ডল শেকস্‌পিয়ার অ্যান্ড সাইকিয়াট্রি উইথ ইকুয়াল ফেসিলিটি।' কিন্তু 'নায়ক'-এ তিনি যেন এই 'ইকুয়াল ফেসিলিটি'র চ্যালেঞ্জকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলেন। আর বার্গম্যান 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি'র ফ্ল্যাশব্যাক-জটিলতায় এই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সরাসরি পাঞ্জা লড়েছেন। 'নায়ক' এর যে দৃশ্যে চন্দ্রালোকিত ছুটন্ত কঠিন রেললাইনের দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের মনে ক্রমশ ঘনিয়ে আসে আত্মহত্যার ইচ্ছে, সেখানে আমি

শুনতে পাই বার্গম্যান-এর অনস্বীকার্য প্রতিধ্বনি। 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি'তে রয়েছে এমনই এক মৃত্যুময় পূর্ণিমা-রাত। সারা আর সিগফ্রিড পিয়োনোর কাছ থেকে ডিনার টেবিলে চলে যাবার পরেই আইজ্যাক-এর চোখ পড়ে আকাশে ছড়িয়ে যাওয়া চাঁদের আলোর দিকে। এ কোনও পূর্ণচাঁদের মায়া নয়, যা বৃদ্ধ আইজ্যাক-কে স্মৃতিমেদুর করে তুলবে। আকাশজোড়া এই ঠাণ্ডা নীল পূর্ণিমা যে শুধু মৃত্যুর প্রতীক, তাও নয়। তার চেয়ে জটিলতর কিছু। এই ঠাণ্ডা নীল আলোয় যেন ঘোষিত হয় আইজ্যাক-এর যৌন-জীবনের চূড়ান্ত পরাজয়। সেক্সুয়ালিটির শেষ বিন্দুটি যেন নিঃশেষ হয়ে যায় এখানে। 'নায়ক'-এও আছে অরিন্দমের যৌন-জীবনের ব্যর্থতার প্রসঙ্গ—কিন্তু কখনই তীব্রভাবে নয়; আভাসে, ইঙ্গিতে। পূর্ণচাঁদের আলোয় আইজ্যাক দাঁড়ায় জানলার ধারে, দেয়ালের গায়ে একটা পেরেকে লেগে তার হাত কেটে যায়, রক্ত পড়ে চাঁদের আলোয়। চাঁদের আলোয় আইজ্যাক-এর রক্তাক্ত হাত নিঃসন্দেহে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় পাপ এবং মোক্ষ প্রাসঙ্গিক ক্রিশ্চান তর্কের সামনে। অরিন্দমের শূন্যতাবোধ, তার দীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার কোনওভাবেই আইজ্যাক-এর মর্মভেদী দেউলিয়া অবস্থার প্রতিযোগী হয়ে ওঠে না বলেই, 'নায়ক'-এ রোমান্টিকতার সম্পূর্ণা বর্জনও হয়ত প্রয়োজনীয় মনে হয় না সত্যজিতের। পাপ, পুণ্য, যৌনতা, প্রেম—এই সব মানুষী অভিজ্ঞতা ঘিরে 'নায়ক'-এর বিস্তার তাই শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক অ্যাম্বিভ্যালেন্স বা উভয়বলতার মধ্যে বেছে নেয় পরিণতির চরম বিন্দু।

নায়ক

দেবকমল মণ্ডল

সত্যজিৎ রায়ের ছবির জগৎ মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের ঘিরেই নির্মিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভাঙন এবং এই ভাঙনের প্রভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কি ভাবে তাদের মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে এক দোদুল্যমান শ্রেণী-অবস্থানে থমকে দাঁড়িয়েছে তারই সবাক চিত্র সত্যজিৎ রায়ের বেশীর ভাগ ছবিতে আলোচিত হয়েছে সিনেমার নিজস্ব ভাষায়। সত্যজিৎ রায় নিজেই বলেছেন 'My Experience is all middle class and that's rather a limited field...........I can deal with something I do not know at first-hand only with the help of someone who does' তাঁর বিখ্যাত অপু-চিত্রত্রয়ীতেও আমরা দেখি ছিন্নমূল মানুষের এ ভিটে থেকে সে ভিটেয়, গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে আবার অন্যত্র অবিরাম ভেসে যাওয়া। ভাসতে ভাসতে তারা সময় এবং জীবনের নিষ্করুণ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। চরম বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েও এইসব মানুষগুলো তাদের আজন্ম-লালিত নৈতিক মূল্যবোধে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না; পবাজিত হয়ে অনুশোচনায় তারা দগ্ধ হয় কোন-না-কোনভাবে। একটা অভাববোধ, শূন্যতা তাদের গ্রাস করে নেয় অনিবার্য পরিণতিতে। জীবনে আরও নিরাপত্তা, আরও একটু সুখের সন্ধানে মধ্যবিত্ত মানুষগুলো ছিন্নমূল হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তাহীন হতাশায় প্রত্যেকেই আত্মহননের দিকে পা বাড়ায়, কোন-না-কোনভাবে।

সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক'-এ এইরকম কিছু মানবিক মূল্যবোধ হারাতে বসা নিঃসঙ্গ মধ্যবিত্তের মুখোমুখি হই আমরা। অরিন্দম, প্রমীলা, মিঃ বোস, প্রীতিশ সরকার, মালি—এদের মুখোমুখি বসে আমরা যেন নিজেদের মধ্যবিত্ত সত্তার সমস্ত গ্লানি আর অভাবোধকে মুহূর্তে আবিষ্কার করি, নিজেদের তুচ্ছতা আর গ্লানিকে আড়াল করতে, রক্তমাংসের মানুষটাকে বন্দী করতেই প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেবিয়ে যার যার নিজস্ব কালো চশমায় দৃষ্টিকে ঢেকে অন্ধ সাজি।

'নায়ক'-এর শুরুতেই আমাদের চেতনা এক কারাগারের মোটিফের মুখোমুখি হয়। কারাগারের পিছনে দেখা যায় চলচ্চিত্রের প্রথম শ্রেণীর তারকা অরিন্দমের সুদৃশ্য সুনিপুণভাবে কাটা চুলসহ মাথার পেছনদিক। পরে চিত্রনাট্য আমাদের জানিয়ে দেয় নায়ক অরিন্দম মুখার্জি দিল্লীতে এক পুরস্কার গ্রহণ করতে যাবে, তার প্রস্তুতি পর্ব চলছে বাড়ীতে। এই প্রস্তুতিপর্বের মাঝখানেই এক নায়িকার টেলিফোন আসে, তখন নায়ক অরিন্দম কালো চশমা পরে ফোন ধরে, তার চোয়াল এক আতঙ্ক আর নিরাপত্তাহীনতায় শক্ত হয়ে যায়। কেচ্ছার খবর বেরিয়েছে—

'Film Star involved in Brow!'

এবং এই দৃশ্যের ঠিক আগের দৃশ্যেই আমরা দেখি নায়ক হীরালাল নামেব এক

প্রযোজকের সঙ্গে তার নতুন ছবির চুক্তিপত্র নিয়ে কথাবার্তা সারছে। কয়েকটি মাত্র দৃশ্যের সাহায্যে কতকগুলো সত্যের মুখোমুখি সত্যজিৎ রায় আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন। একই সঙ্গে আমরা দেখি একজন সফল চিত্রতারকার নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তাহীনতা, মুখ আর মুখোশের ভয়ঙ্কর খেলা, যে খেলায় আমরা মধ্যবিত্তরা প্রতি নিয়তই নিজেদের নিয়োজিত করতে সচেষ্ট। 'নায়ক' চলচ্চিত্রে মুখ আর মুখোশের এই বিধ্বংসী খেলায় বন্দী কয়েকটি মানুষের আচরণ চলন্ত রেলগাড়ী নামক সময়ের বুকে বিধৃত হয়েছে।

অরিন্দম মুখার্জী রূপালী পর্দার হাতছানিতে গ্রাম থেকে শহরে এসে রাতারাতি বিখ্যাত চিত্রতারকা হয়ে যায়। যত সে ব্যবসায়িক চলচ্চিত্রের মোহে এগোতে থাকে তত সে এর অসারতা ধরতে পারে, কিন্তু সে তার নায়কের ঘেরাটোপ ভেদ করে সাধারণ রক্তমাংসের জগতে আসতে পারে না। অপার বৈভব আর বিলাসিতায় সে টাকার পাহাড়ে বিচরণের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু এক অজানা মৃত্যুঘণ্টার পদধ্বনিতে তার বুক আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। সে বাঁচতে চায়—'শঙ্করদা আমাকে বাঁচান'। অরিন্দম মুখার্জীর এই বাঁচতে চাওয়া 'নায়ক' ছবির প্রতিটি চরিত্রেরই বাঁচতে চাওয়া হয়ে ওঠে। নায়ক অরিন্দম মুখার্জীর মতই ইঁদুর দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে প্রতিটি চরিত্রই নতুন করে বাঁচার আশায় ছটফট করে। সত্যজিৎ রায়ের 'সীমাবদ্ধ' ছবির টুটুলের মত এখানেও 'অদিতি' নামের বিবেক অরিন্দমকে তার জীবনের অসারতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নতুন করে বাঁচার এক আশা সঞ্চার করে চলে যায়। এখানে অদিতি যেন প্রতিটি চরিত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ন্যায় অন্যায় সৎ অসতের ব্যবধান বুঝিয়ে দেয়।

সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথরে'ও মধ্যবিত্ত লোভ আর লালসার শিকার, সেখানেও সে নৈতিক মূলবোধ হারায়। সত্যজিৎ রায় তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'শাখা প্রশাখা'য়ও একই ভাবে 'Honesty is the best policy'র সন্ধানে মগ্ন থাকেন। এখন প্রশ্ন হল মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ কি শুধু ব্যক্তিনিরপেক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধের পতনের পিছনে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কোন ভূমিকা নেই? ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক আর্থসামাজিক-পরিকাঠামোয় একদিকে যেখানে পুঁজির পাহাড় জমা হচ্ছে সেখানে নৈতিকভাবে সৎভাবে থাকা না থাকা কি নিছক ব্যক্তির ইচ্ছায় চালিত হয়, না ইতিহাসের কোন অমোঘ নির্দেশ মানুষের ইচ্ছার অলক্ষে চেতনাকে পরিচালনা করে? তাই সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ব্যক্তির সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়ায় না, আর দাঁড়ায় না বলেই 'নায়ক' শুধু অরিন্দম-অদিতির গল্প হয়েই রয়ে যায়। সত্যজিৎ রায়ের ছবির জগৎ মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক হয়েও, মধ্যবিত্তের মধ্যে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সংকটের আভাস মিললেও, মধ্যবিত্তের শ্রেণী অবস্থানের দোদুল্যমান সংকটের কারণ খোঁজার ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি প্রয়োগে শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তবু 'নায়ক'-এর স্রষ্টার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ যে অরিন্দম, অদিতি, মলি বা প্রমীলা আমাদের নিজেদের শ্রেণীর অসারতা বুঝতে সাহায্য করে এবং এই অসারতার পেছনে যে আর্থ-রাজনৈতিক কারণগুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে অন্বেষণে উৎসাহিত করে।

একটি চিঠি ঃ নায়ক

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সিনেমা নায়কদের আদর করে এক ধরনের 'পাবলিক' কেন চুলটুল ছিঁড়ে দেয় এতদিনে বুঝলাম।

বুঝলাম 'নায়ক' ছবির সমালোচনা পড়ে পড়ে।

পড়ে পড়ে, পড়ে পড়ে এমন হয়েছিল যে 'নায়ক' দেখার আশা আমার ছিল না। 'নায়ক' ফোবিয়া হয়ে গিয়েছিল। শেষে হঠাৎ একদিন আগে সাহস করে ছবিটি দেখে ফেলেছি।

বাংলাদেশের কপাল ভাল যে এখনও আমাদের মতো বেশির ভাগ দর্শকই সত্যজিতের নায়কের ভাষায় 'শালার পাবলিক' হয়ে আছি। ছবি দেখে 'হল' থেকে বেরিয়ে এসে আমরা এখনও 'বাঃ ভাই, হাই ক্লাশ—হায় হায় কি জিনিস দিয়েছে, যেন একেবারে —' অথবা 'এঃ। ইন্টার ন্যাশনাল প্রাইজ পেয়ে বড্ড পৌঁয়াজী হয়েছে যে লম্বুব!' বলে উঠতে পারি। কফিকে এখনও কফি বলেই ভাল লাগে। চা-কে চা। আর পচা ইলিশকে বেশ পচাই মনে হয়।

ছবিখানা যখন দেখেছিলাম তখন, কপাল ভালো, একটাও পড়া-সমালোচনা মনে পড়েনি। আরও আনন্দের কথা, বইটি দেখতে দেখতে এক জায়গাতেও হাই ওঠেনি ইদানীংকালে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'বোর' হয়ে পড়াটা আমাদের একটা স্বভাব হয়ে পড়েছে বলেই এই ভয়।

'নায়ক' এক কথায় গ্র্যাণ্ড লাগছিল। আমার আশে পাশে যে-সব দর্শক ছিলেন তাঁদেরও মুখেচোখে খুশি। তাঁরা বেশিরভাগই মেয়ে। পুরুষ দর্শকের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। ম্যাটিনি শো। টিটকিরি উঠতে পারে, 'হবে না? উত্তম ম্যাটিনি আইডল নয়?' মোটেই সেজন্যে নয়। আমি আর একবার ম্যাটিনিতে উত্তমের বই দেখতে গিয়েছিলাম। তিনটে ফ্লপের দু'নম্বর বই। মেয়েবাই প্রায় সিটি দিতে দিতে বেরিয়ে আসছিলেন। তিন হপ্তাও চলেনি সে বই।

দর্শকের মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ করার মতো লেগেছিল। বইটি যতই এগোচ্ছিল মনে হচ্ছিল দর্শকদের মধ্যে 'নায়ক' ভয়ানকভাবে 'ডিগ্ল্যামারাইজ্‌ড্‌' হয়ে যাচ্ছেন। প্রথম দর্শনেই উত্তমের মুখে প্রচণ্ড মেচেতা আর বোধ হয় ছোটবেলায় ভোগা ফোড়ার দাগ চোখে পড়ে। প্রলেপ-ট্রলেপ কিছুই নেই। খাসা পুরুষমানুষের মতো দেখাচ্ছে তো। তবে কেন উত্তমবাবুকে এতদিন রং টং মাখিয়ে 'মেয়েলি উত্তমকুমার' করে রাখা হয়েছিল 'মেক বিলিফ'? এটাই তাহলে গ্ল্যামারের প্রথম ধাপ।

'নায়ক' যে গ্ল্যামারকে পরতে পরতে গদিচ্যুত করেছে এটা নিশ্চিত। এবং ব্যক্তিগতভাবে সত্যজিৎ আর উত্তম—দুজনেই কিন্তু ভারি একটা মজার পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন। খানিকটা ধাঁধায়।

গালটা বাড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ অপরিচিত কেউ যদি নিচু গলায় বলে—'ভালবাস? তাকে চড় না মেরে বরং ভালবেসে ফেলার ইচ্ছেটাই কিছু প্রবল হয়ে পড়ে। সেই খানে সম্ভবত আমরা আবার সেই 'শালার হুইম্‌জিক্যাল পাব্‌লিক' থেকে যাই।

কিন্তু দর্শকদের মধ্যে যাঁরা লিখতে পারেন, অথবা পারেন বলে মনে করেন— তাঁদেরই হয়েছে দশ দশা। একূল ওকূল দু'কূল ভাসাভাসি। মাঝের থেকে স্বতঃস্ফূ হাসিকান্নাকে নেড়া ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এই হয়েছে যে, কোন ছবি দেখতে বসলেই ওঁদের ভুরু কুঁচকে ওঠে। তারপর যা হবার তাই—বাড়ির নাম কিংকর্তব্যবিমূ —গাড়ুর নাম প্রত্যুৎপন্নমতি। কেমন লাগল?

'ভেবে দেখি!' —ভাল লাগার আবার ভেবে দেখাদেখি কি মশাই?

এই ভেবে ভেবে ভাল লাগার পাঁচটা ইদানীং বেশ রেওয়াজ হয়ে উঠেছে।

ধরুন, একটি সুপুরুষ ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকে বান্ধবীকে বললাম—'দেখেছিস্ কি হ্যাণ্ডসাম?' বান্ধবী তখন যদি বলে ভুরু কুঁচকে, 'আট-দশবার না দেখলে বলতে পারব না' অথবা 'ভেবে দেখা যাক!' তাহলে বান্ধবীটির সৌন্দর্য বোধ সম্পর্কে মনটা খচখচ করে উঠবে।

আসলে অ্যানালিসিস জিনিসটা খানিকটা ধূর্ত হয়ে আমাদের ঘাড়ে বেশ গেঁ বসেছে। অথচ সেই আনাড়ী হাকিম। 'সোফিস্ট্রি' করতে হলে যে 'সোফিস্টিকেশান' দরকা তা যেহেতু আমাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই নেই, সেই হেতু বেশির ভাগ সমালোচ কিন্তু বেজায় স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছে।

আব ফলে খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নায়কের পক্ষ বিপক্ষ দু'পক্ষই, অনেক ক্ষেত্রে আ করে, সত্যজিতের চুলটুল ছিঁড়ে পা-ফা মাড়িয়ে একাকার করেছেন।

যদিও 'পরিচয়ে' করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা আমার ভালো লেগেছে ঠিক মনে ধরছে বলতে পারব না, চিদানন্দ বা অমলেন্দুবাবুদের সমালোচনাও মনে প্রশংশাই হবে। পড়তে ভালোই লাগে। কিন্তু মুশকিল ঐ এক জায়গায়। সবই গোছালো—ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে শেষে জমে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে লেখা। ঐ যা বলে—'সুন্দরে কুচ্ছিৎ' আর কি?

ছবিকে একটু ভালবেসে ফেলে অথবা ঠাস্ করে চড় মেরে লিখলে কেমন হ

চিড়িয়াখানা ঃ একটি হতাশার নাম

রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্র এক উদ্দেশ্যহীনতার শিকার আমরা এ যুগের মানুষেরা। কাজ না করলে পেট ভরে না, তাই কাজ করি ; পাশ না করলে কাজ মেলে না, তাই পাশ করি। বেঁচে না থাকলে মরতে হয়, তাই বেঁচে থাকি। কিছু হবে না, কিছু হচ্ছে না। জড়িয়ে ধরার আঁকড়ে ধরার কিছু নেই, কোনো লক্ষ নেই, কোনো বন্দর নেই। ভীড়ের চাপে এগিয়ে যাও, ভীড় যেখানে নিয়ে যায় যাও। নিজের ইচ্ছেয়, নিজের গতিতে পথ করে নিয়ে কি হবে?

এই উদ্দেশ্যহীনতা নামের রোগ থেকে মনে হয় এ যুগের শিল্পী-সাহিতিকেরাও মুক্ত নন। মনে হয়, এ রোগের জীবাণু তাঁদের চোখ-মুখ-কান অরক্ষিত পেয়ে প্রবেশ করেছে। তাঁদের অভ্যন্তরে, নিমেষে মরুভূমি হয়ে উঠেছে প্রতিশ্রুতিবান সৃষ্টিলোক। আজ থেকে দশ বছর আগেও যে সজল শ্যামল ছায়াদেশ মরুদ্যান বলে মনে হয়েছিল আজ তা মরীচিকার মত অতৃপ্তির আগুনে পুড়িয়ে মারছে রসপিপাসু মনকে। যে বিশাল বটগাছ লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে আসছে আশ্রয়-ব্যাকুল পথিককে, কাছে এসে দেখে সে অন্তঃসারহীন শুষ্ক জীর্ণ আবরণ মাত্র, নিজেই সে যন্ত্রণার শিকার।

সত্যজিৎ রায়ের শেষতম দান 'চিড়িয়াখানা' চিন্তাশীল দর্শকের কাছে এমনই এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সত্যজিৎ রায় অপরাধ-চিত্র তৈরী করেছেন—এ খবরে আশঙ্কিত হবার কিছু নেই, বরং আশান্বিত হবার অনেক কিছু ছিল। যেকোন স্থান থেকে এক তাল মাটি তুলে নিয়ে শিল্পী তাকে দিতে পারেন শিল্পরূপ, আরোপ করতে পারেন ব্যঞ্জনা। যে শিল্পগুণে দাস্যাঁ মহৎ করে তোলেন 'রিফিফি' অপরাধপ্রবণ চরিত্রগুলোকে, যে রসবোধ থেকে হল্যাণ্ডের স্বল্পদৈর্ঘ্য 'বিগ সিটি ব্লুজ' তার মধ্যেকার অপরাধতত্ত্বে মহত্ত্বর তাৎপর্য আরোপ করতে পারে, কিংবা, আরো নীচে নেমে এসে, নিছক গণিতের ছকে রেখে সংশয় উৎকণ্ঠায় আলোড়িত ভয়ংকর রসের চলচ্চিত্র তৈরী করতে পারে হিচ্‌ককের মত। অন্তত বহিরঙ্গের দিক থেকেও হিচ্‌কক-প্রেমিংগার প্রভাবিত করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্‌দেশী চলচ্চিত্র আন্দোলন 'ন্যুভেল ভাগ-'কে। এমনকি উৎপল দত্তের 'মেঘ'-ও এক সময় বিরাট সম্ভাবনাময় দিগন্তের ইঙ্গিত দিয়েছিল। কিন্তু অন্তরে-বাইরে সমানভাবে দীন 'চিড়িয়াখানা' আমাদের হতাশা ছাড়া আর কি এনে দেবে?

'চিড়িয়াখানা'কে যদি অপরাধ-চিত্ররূপে চিহ্নিত করা না হত, তবে অনেকেই হয়ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেন কিন্তু দৈনিক, সাময়িক ও প্রাচীরপত্রের ঘনঘটায় মুক্তির সে পথ অদৃশ্য। এ ছবিকে ক্রাইম-ছবি ছাড়া অন্য কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ক্রাইম-ছবির প্রধান দুটি শর্ত হল রহস্য এবং উৎকণ্ঠা। প্রকরণগত এই দুটি বৈশিষ্ট্যই 'চিড়িয়াখানা'তে অনুপস্থিত। নিশানাথ সেন যে মুহূর্তে খুন হচ্ছেন, সেই মুহূর্তে তিনি ব্যোমকেশের সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনারত, আঘাত পেয়ে তিনি পড়ে গেলেন, টেলিফোন স্খলিত হয়ে ঝুলতে লাগল তার থেকে। অন্য প্রান্তে ব্যোমকেশ শুনতে লাগল সেতারে মালকোষের

আলাপ। সত্যজিৎ রায় যদি এখানেই থামতেন, তবু হয়তো কিছুটা রহস্যময়তা থাকতো। কিন্তু তা হল না। ব্যোমকেশ বক্সী রিসিভারটা অজিতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে— 'শোন তো, সেতার বাজছে না?' দেশী-বিদেশী কয়েকটি রহস্য কাহিনীর সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললেন, সেতারের ওপর এতটা জোর দেওয়ার অর্থ একটাই হতে পারে। রেকর্ড-করা অ্যালিবাই নিয়ে রহস্য গড়ে তোলা আজকের আট-আনা সিরিজের পাঠকের কাছেও অত্যন্ত পরিচিত। তখনও কিন্তু আশা থাকে, বোধ হয় এটা ইচ্ছাকৃত বিভ্রম সৃষ্টি, গোয়েন্দা-কাহিনীর পরিভাষায় যাকে রেড হেরিং বলা হয়ে থাকে। কিন্তু স্পুলের পাকে পাকে ছবি শেষ হয়ে আসে, আমাদের আশঙ্কা সত্য করে তুলে অপরাধ কাহিনীর সব আকর্ষণ মিলিয়ে যায়।

তাতেও ক্ষতি ছিল না। মনে করুন, 'রিয়ার উইণ্ডো'র কথা। সেখানে ছবির শুরুতেই রহস্য শেষ। কিন্তু সাসপেন্স বজায় থাকে শেষ পর্যন্ত। অক্ষম নায়ক কিভাবে অপরাধীর মুখোশ খুলে দেবে তা নিয়ে কৌতূহল এবং সংশয় গড়ে তোলা হয়। এখানেও তার অনেক সুযোগ ছিল, কিন্তু ছবি শেষ হল সেই ড্রইং রুমে, নীহাররঞ্জন গুপ্ত নামক জনৈক গোয়েন্দা কাহিনীর লেখকের হাতে যা স্থবিরত্ব লাভ করেছে। এক আউন্স হুইস্কিতে দশ আউন্স জল মেশালে যে পরিণতি হয়। কোনও উত্তেজনা নেই, সংশয় নেই, শিহরণ নেই, এবং নেই ভাল অপরাধচিত্রের আনন্দ।

এ হল ছবির সামগ্রিক আবেদনের কথা। এখন কয়েকটি বিশেষ ঘটনা-প্রবাহ আলোচনা করা যাক। প্রথমেই ধরা যাক্ জাপানী উদ্যানতাত্ত্বিক রূপে ব্যোমকেশ বক্সীর গোলাপ কলোনী যাত্রার কথা। প্রথমত, তাকে কখনোই জাপানী মনে হয়নি। এমনকি, জাপানী হর্টিকালচারিস্ট না বলে তাকে খামখেয়ালী, অ্যামেরিকান অ্যানথ্রপলজিস্ট বললেও আমাদের চোখ তাতে আপত্তি করত না। দ্বিতীয়ত, উদ্যানতাত্ত্বিকের ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ করতে সে অন্তত কিছুটাও উদ্যানের প্রতি মনোযোগ দেবে এটা আমরা নিশ্চয় আশা করব। কিন্তু ব্যোমকেশ বক্সীর মত ধুরন্ধর গোয়েন্দা এ কথাটা ভুলে গিয়ে শুধু মানুষগুলোর প্রতি অপরিসীম আগ্রহের পরিচয় দিল, তাদের ছবি তুলল এবং অপরাধীকে সম্ভবত এইভাবেই খুনের প্ররোচনা দিল। সত্যজিৎবাবু এক্ষেত্রে অন্তত নিজের বুদ্ধিও তাকে কিছুটা ধার দিতে পারতেন।

বনলক্ষ্মীর মধ্যে অতীতের অভিনেত্রীকে খুঁজে নেওয়ার ব্যর্থতা 'চিড়িয়াখানা'র এক বিস্ময়কর রহস্য। কলকাতার স্টুডিওতে দক্ষ মেক-আপ শিল্পীব অভাব নেই, তাঁদের সাহায্যে বনলক্ষ্মীর মুখের চরিত্রে অনায়াসেই পরিবর্তন আনা যেতে পারত। এবং তাহলেই প্লাস্টিক-সার্জারীর কথা বলে বিলম্বের অজুহাত দেওয়া সার্থক হত। কিন্তু তা না করায় দর্শক হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন যখন ব্যোমকেশ টেপরেকর্ডার গান বাজিযে খুঁজে বেড়ায় অতীতের সুনয়না দেবীকে।

সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে হাস্যকর সিকোয়েন্সটি হল কাবুলিওয়ালা বেশে ব্যোমকেশ বক্সীর ডাক্তারকে অনুসরণ, তার পকেট মেরে চাবি নেওয়া (প্রসঙ্গত বলা যায়, এই ট্রিকটি আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে হিন্দি 'কিস্‌মত' ছবিতে এর চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থিত করা হয়েছিল), ছদ্মবেশ ত্যাগ করে তার ঘরে প্রবেশ করা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণীকে মুখ বন্ধ করে বসিয়ে রাখা, এবং (যেটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে

কষ্টকল্পিত এবং স্থূলভাবে রূপায়িত দৃশ্য তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা ছবিতেও এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

টেপরেকর্ডারের প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক। ছবিতে দুটি টেপরেকর্ডার আছে। একটি খুনীর, অপরটি গোয়েন্দার। প্রথমটির ব্যবহার কাহিনীর প্রয়োজনে। দ্বিতীয়টি ব্যবহারের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট। মনে হয় বাংলা গোয়েন্দা ছবিতে টেপরেকর্ডার দেখিয়ে চমক লাগানো ছাড়া তার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ এই যন্ত্রটি ব্যোমকেশকে কোনভাবেই তার ডিডাক্‌সনের কাজে সাহায্য করেনি। এখানে উল্লেখ্য, ছেষট্টি সালের কলকাতায় পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার ভাষা মিলে মিশে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তাতে 'বাসা' এবং 'বাড়ি' শব্দটির ব্যবহার পৃথক কোনো তাৎপর্য বয়ে আনে না, যা আনতে পারত হয়ত পঁচিশ বছর আগে। এখন কলকাতার কথ্যভাষায় শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক। অন্তত তার ওপর নির্ভর করে কারও জন্মস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত টানা যায় না।

সবশেষে আর একটি কথা বলার আছে। সত্যজিতের কাছে এক সময় আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল। অস্বীকার করব না, এখন আর তা নেই। তবু ডিটেলের কাজে মনে হয়েছিল সত্যজিৎ বাংলাদেশের ব্যতিক্রম হয়েই থাকবেন। 'চিড়িয়াখানা' আমাদের সে ভরসাও কেড়ে নিয়েছে।

দ্যাখরে নয়ন মেলে

আলোক সরকার

সব শিল্পই উপস্থাপনধর্মী। কিন্তু নাটক অথবা চিত্রকলা যে অর্থে উপস্থাপন ধর্মী, উপন্যাস অথবা কবিতা ঠিক তেমন নয়। উপন্যাস অথবা কবিতায় রচয়িতা পাঠককে অনেকাংশে নির্দেশিত করেন, সাহায্য করেন, কিংবা বলা যেতে পারে পাঠককে ব্যক্তিগত ভাবনা প্রকল্পের সঙ্গী করে নিতে অনেক সময় জোরজবরদস্তি করেন—উপন্যাসের চরিত্র মহৎ কাজ করলেও বস্তুত তা মহৎ কিনা উপন্যাস রচয়িতা পাঠককে তা বুঝিয়ে দিতে এগিয়ে আসেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত পাঠককে মাথা পেতে মেনে নিতে হয়। অর্থাৎ উপন্যাসের চরিত্র পাঠকের সামনে ঠিক সেইভাবেই উপস্থিত হয়, যে রকম উপস্থাপন ঔপন্যাসিকের প্রকল্পনা ছিল। কবিতার আবহাওয়া এবং পাঠকের মনে সেই আবহাওয়া সঞ্জাত প্রতিক্রিয়া সাধারণত কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত।

নাট্যকার অথবা চিত্রশিল্পীর কর্মধারা অন্যরকম। নাট্যকার অথবা চিত্রশিল্পী তাঁদের দর্শক অথবা শ্রোতাকে ঘোষিত অর্থে কিছুই বলেন না, প্রকৃতি যেমন নিরপেক্ষ নির্লিপ্ততায় দৃশ্য এবং ঘটনাবলী উপস্থিত করেন, নাট্যকার এবং চিত্রশিল্পীর প্রয়াস ততটুকুই। সব নাটকেব বেলায় হয়তো নয়, সব চিত্রের বেলায় হয়তো নয়, কিন্তু নিরপেক্ষ উপস্থাপনই নাটক তথা সব শিল্পেরই পরমতা। নাট্যকার হিসেবে শেক্সপীয়রের সার্থকতার অন্যতম বড় কারণ যে তাঁরা নির্লিপ্তি, ব্যক্তিত্বের অবগুণ্ঠন এ-কথা কীট্‌সের মতো অনেকেই জানেন এবং আমরা এটাও জানি যে অভিনব গুপ্ত থেকে এলিয়ট পর্যন্ত অনেক কাব্যবিদই ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি নয়, ব্যক্তিত্বের নিরাসক্তিকেই কাব্যরচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। মালার্মে প্রমুখ কবিরা যে বিশুদ্ধ কবিতা, ভাবময় কবিতার কথা বলেছেন, সেই ভাববস্তুর সংযোগসাধনে নির্মাণকর্ম অর্থাৎ উপস্থাপনার সম্পূর্ণতার ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

নাটক অথবা চিত্রশিল্পের মতো চলচ্চিত্রেও রচয়িতা প্রধানত নিরপেক্ষ। সেখানে পরিণত পরিচালক সাধারণত দর্শকদের চিন্তাভাবনাকে পরিচালিত করতে চান না। চান না কোনো উপস্থাপিত সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে বাধ্য করতে, একটা শিল্পকর্মকে একটা সর্বতোশুদ্ধ শিল্পকর্ম করে তোলাই তাঁর একমাত্র কাজ। অন্তত সত্যজিৎ রায়ের প্রসঙ্গে এ সিদ্ধান্ত, আমার মনে হয়, ষোলো আনা সত্য। আমার কাছে তাঁর ছবি একটা শিল্প-সম্পূর্ণতা, একটা অখণ্ডতা। রবীন্দ্রনাথের নাটকের কাহিনী সবসময়েই একটা বক্তব্য, একটা আদর্শ, একটা দর্শন অথবা মতবাদকে স্পষ্ট করে বলতে চায় ; সত্যজিৎ রায়ের ছবির কাহিনীর তেমন কোনো অভীপ্সা নেই। তাঁর ছবির গল্পের যারা একটা গূঢ় তাৎপর্য অন্বেষণ করতে ব্যস্ত সত্যজিৎ রায় তাদের পছন্দ করতেন না।[১] তাঁর ছবির গল্পকে নিছক একটা গল্প হিসেবেই বিবেচনা করা হোক, তিনি সেইরকমই চাইতেন।

যেমন সব নাট্যনির্মাতারই আকাঙ্ক্ষা উপস্থাপিত নাটকের সঙ্গে দর্শকের সংশ্লেষ,

একাত্মতা, একাকার হওয়া, চলচ্চিত্র রচয়িতারও সেইরকম। নাট্যনির্মাতা, চলচ্চিত্র পরিচালকের এর চাইতে বড় প্রার্থনা আর কি হতে পারে। তবু নাটক যেমন একটা কাহিনী বলে, চলচ্চিত্রও সেইরকম একটা গল্প আমাদের শোনায়। সেই গল্প কখনো আমাদের ভালো লাগে, কখনো লাগে না: সেই গল্প কখনো আমাদের উজ্জীবন ঘটায়, কখনো অভিভূত করে কখনো বা কোথাও কণামাত্র দাগটুকুও না রেখে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে হারিয়ে যায়। একই কাহিনীর ভাগ্যে এই দুরকম পরিণতির যে কোনো একটি ঘটতে পারে। এবং বলাবাহুল্য তা নির্ভর করে কাহিনীর উপস্থাপনার নৈপুণ্য, শিল্পসার্থকতার উপর।

কবিতায় আইডিয়ার মূল্য গৌণ, নাটকে চলচ্চিত্রে সেই রকম কাহিনীর। সত্যজিৎ রায়ের অনেক ছবিতেই, বলা যেতেই পারে প্রায় সব ছবিতেই, কাহিনী আর সব উপকরণের মতো অন্যতম উপকরণ মাত্র। সে কাহিনীর বিশ্লেষণই যদি তার শিল্পকর্মের পর্যালোচনার একমাত্র মাধ্যম হয়, তবে তা বলা বাহুল্য বেদনার হবে। সব শিল্পের মতো সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মও এক শিল্পসম্পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে এবং আর কিছুই কবে না। সব শিল্পই যেমন শেষপর্যন্ত আমাদের একটা ভাবময় সম্পূর্ণতায় পৌঁছে দেয়, গুপী গাইন বাঘা বাইনের সামগ্রিক অভিভাবক তাব অতিরিক্ত কিছু করে না। গুপী গাইন বাঘা বাইনের এই সামগ্রিক অভিভাবককে যদি ভাষায় অনুবাদ করতে চাই তবে তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবে-দ্যাখরে নয়ন মেলে জগতের বাহার। আব কিছুই বলবে না।

২

নাটকে একটি কাহিনী থাকে, উপন্যাসে একটি কাহিনী থাকে এবং চলচ্চিত্রও সাধারণত একটি কাহিনী বলতে চায়। বলাবাহুল্য কোনো প্রকরণেই কাহিনী নিছক কাহিনী নয় তা অন্তত একটা আবেগ, একটা আবহাওয়া, একটা জিজ্ঞাসার আলোড়ন ঘটায় যা দর্শকের মনে সেই প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়—যে প্রতিক্রিয়াটুকু নাটকের শ্রোতা, উপন্যাসের পাঠক, চলচ্চিত্রের দর্শক সকলের কাছেই প্রধানতম আকাঙ্খা। আমরা এটাও জানি নাটকের কাহিনী সংলাপের মধ্যবর্তিতা একান্তভাবে অবলম্বন করে, উপন্যাসের কাহিনী সাধারণত রচয়িতা অর্থাৎ ঔপন্যাসিকই আমাদের জানান, চলচ্চিত্রে কাহিনীকথনের প্রধান আশ্রয় একটা উপস্থাপনা। সংলাপ সেখানে ব্যবহার হয় না এমন নয়, কিন্তু মৌল চরিত্রে চলচ্চিত্র নাটকের তুলনায় অনেক বেশি উপস্থাপন-ধর্মী। এবং সেদিক থেকে তার আত্মীয়তা চিত্রশিল্পের বরং অনেক ঘনিষ্ঠ।

চিত্রশিল্প উপস্থাপনধর্মী। তার আন্তর-উদ্ভাস একটি উদ্ভাসই মাত্র। সে সংলাপের সাহায্য পায় না। ঈশ্বরতুল্য কোনো সর্বজ্ঞ বচয়িতা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে তার আন্তর রহস্য আমাদের জানান না—সে মাত্রই একটা উপস্থাপন। দেখ এই একটি সূর্যমুখী ফুল, একে দেখ, এর হলুদ পাপড়িগুলো দেখ, দেখ ওই স্বর্ণিল প্রভাত আলোক অজস্র প্রস্রবণে ঝরে পড়ছে ওর ওপর, ওর চতুর্দিকে। দেখ সকলে, দেখ দেখ— আর কিছুই নয়।

যেমন প্রকৃতি। ভাষাহীন অতলান্ত প্রকৃতি। ঋতুতে ঋতুতে সে বারবার সাজ পাল্টায়, তার ভঙ্গী কখনো মনে হয় হাস্যোজ্জ্বল, কখনো বিষাদবিধুর, কখনো কখনো রঙে রঙে সে উতরোল, কখনো তার বসন গৈরিক-তাপদগ্ধ নিস্তব্ধ তার অঙ্গরাগ এই ভঙ্গীটুকু

আভাসটুকুর ভিতর দিয়েই সে আবহমান কত বিচিত্র, স্পন্দনময়, ভাবময় আবহাওয়া গড়ছে আর আমরা বলে উঠছি তোমার নাম জানি নে, সুর জানি। চলচ্চিত্রের ধর্মও মূলত প্রকৃতির ধর্ম। প্রাকৃতিক মানুষের বহু বিচিত্র কাজকর্ম ও জীবন যাপন সে কিছু সংলাপ এবং প্রধানত ভাব-ভঙ্গিমার ভিতর দিয়ে আমাদের জানাচ্ছে। সেই জানা হয়ে উঠছে একান্তভাবে ব্যক্তিগত জানা, ব্যক্তিগত গ্রহণনির্ভর। সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মকে এ দিক থেকে প্রকৃতির কাছে দীক্ষিত মনে হয়। তার ছবিতে সংলাপ কম, ছবি বেশি—সব শিল্পেরই আদর্শ যেমন বাহুল্য বর্জন এবং ইঙ্গিত নিবেশ। 'সুরে বাজে মনের মাঝে' সেই ভাষাহীন, সেই অব্যক্ত। 'গুপী গাইন বাঘা বাইনে'র কাহিনীকে পাশে রেখে শেষপর্যন্ত যে সুর ঘন হয়ে ওঠে তা আনন্দ সুর। সরল প্রাণময় চিরকালের জীবনছন্দ। সব কিছু ছাপিয়ে সে যা বলে তার ভাষারূপ—দ্যাখরে নয়ন মেলে জগতের বাহার। এবং তার অতিরিক্ত আর কিছুই বলে না।

৩

কবিতায় থিম বা বিষয়বস্তুর মতো প্রধানত অন্যতম একটা উপকরণ হলেও, এটা স্বীকার করতেই হবে, যেমন কবিতায় বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যাবলীর হাত ধরেই আমাদের এগোতে হয়, ঠিক সেই রকম উপন্যাসে গল্পে নাটকে। চলচ্চিত্রেও যে কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমরা এগোই তার গুরুত্ব অবজ্ঞা করার নয়। কাহিনী চলচ্চিত্র নয়, কিন্তু চলচ্চিত্রে কাহিনীর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া তার সংরাগ আবেগ প্রস্তাব ও পরিণতি দর্শকের মানবিক স্বপ্ন কল্পনা আশা-আকাঙ্খা ও মূল্যবোধগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে একটা বড় ভূমিকা নেয় তাতে সন্দেহ নেই। 'গুপী গাইন বাঘা বাইনে'র আলোচনা প্রসঙ্গে তাই তার কাহিনীর ভিতর দিয়ে যাওয়া একান্ত জরুরী।

উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপী গাইন বাঘা বাইনে'র কাহিনী সত্যজিৎ রায় অনেক বাড়িয়েছেন, মাঝে-মাঝে কিছু কিছু অংশ পরিত্যাগ করেছেন, করেছেন অনেক সংযোজন, কিছু ওলোটপালোট ; কিন্তু সবটা মিলিয়ে মূলত উপেন্দ্রকিশোরের কাহিনী থেকে তিনি একচুলও সরেননি। সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইনে' বাঘার পূর্বকাহিনী অবজ্ঞা পেয়েছে, যা পাঠককে জানানো প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। সত্যজিৎ রায়ের গল্পে যুদ্ধ-সংক্রান্ত ঘটনা যতটা বিস্তার পেয়েছে উপেন্দ্রকিশোরের ততটা না। এইরকম অনেক। তবু উপেন্দ্রকিশোরের গুপী-বাঘা যেমন সরল নির্ভেজাল অকপট মানুষ, সত্যজিৎ রায়ের কাহিনীতেও তাই। উভয় উপস্থিতিতেই গুপী-বাঘা নাঈভ, তারা তাদের পরিবেশের সঙ্গেই থাকতে চায়, তাদের কোনো চেঁচামেচি নেই, নেই অভিযোগ, প্রতিবাদ, ব্যক্তিসত্তা, সামাজিক রীতিনীতি বিচার-ভালোবাসা ইত্যাদি প্রশ্ন তাদের মানস জগতে কোনো আলোড়ন আনে না, তবু সত্যজিৎ রায়ের গুপী বাঘা যেমন আমাদের প্রাণের মানুষ ভালোবাসার মানুষ, আমরা মুহূর্তেই যেমন তাদের সঙ্গে এমনকি নিজেদের একাকার করে ফেলতে পারি, উপেন্দ্রকিশোরের গুপী-বাঘা কাহিনীর দুটি চরিত্র মাত্র, তাদের কাণ্ড-কারখানা আমাদের মাতিয়ে দেয়, তাদের ঘিরে যে গল্প তা আমাদের কৌতূহলী করে তোলে, সত্যজিতের গুপী-বাঘার মূল্য আমাদের কাছে দুটি বিশেষ মানুষ হিসেবে। আমরা তাদের দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হই, তাদের সংকটে শিহরিত, তাদের ওপর অন্যায় অবিচারে

ব্যাকুল এবং তাদের সৌভাগ্যে উল্লসিত। আমরা মুহূর্তে তাদের পক্ষ নিয়ে নি। তাদের সঙ্গে আমরা ঠিক সেইভাবেই এক হয়ে যাই যেমন এক হই রূপকথার রাজপুত্রের সঙ্গে, ভবঘুরে চ্যাপলিনের সঙ্গে। উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের তফাত এইখানেই। উপেন্দ্রকিশোর মাত্রই একজন কাহিনীকথক, সত্যজিতের কাহিনীর পিছনে দুটি হৃদয় আছে। আমরা তাদের পরিপ্রেক্ষিতেই কাহিনীকে গ্রহণ করি। তাদের দুঃখ আনন্দ মানবিকতার গন্ধে বর্ণে সমস্ত কাহিনী ভরে ওঠে। প্রত্যক্ষ কাহিনী চলে যায় আড়ালে। সব চেয়ে বড় হয়ে ওঠে দুটি নির্যাতিত অকপট সরল মানুষের মূক বেদনা, অনুচ্চারিত স্বপ্ন সফলতা। কাহিনীকে ঢেকে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় দুটি হৃদয়-স্নিগ্ধ কোমল শুভ্র।

উপেন্দ্রকিশোরের রচনায় যে কাহিনীকে আমরা পাই তা Fancy বা Fantasy, তা উদ্ভট কল্পনা, খেয়াল খুশির খোশগল্প।

সত্যজিৎ রায়ের গল্প যে এই আজগুবি কল্পনাকে এড়াতে চেয়েছে তা নয় কিন্তু তার গল্পের পিছনে কাজ করছে এক সৃষ্টিশীল মন, এক সৃষ্টি উন্মুখ নির্মিত শিল্পের প্রয়াস উপেন্দ্রকিশোরের গল্প কতকগুলি ঘটনাব নিছক সমাহার ; সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টিনিবেশী মন দুটি প্রাণময় প্রেমময় মানুষ তৈরি করেছে। উপেন্দ্রকিশোরে যাদের আমরা খুঁজে পাব না। এই দুটি মানুষের হাত ধরেই আমাদের যাত্রা, তাদের সঙ্গে একাকার হওয়া, উপেন্দ্রকিশোরে যার হাত ধরে আমরা এগোই তা সোজাসুজি একটা কাহিনী মাত্র সে কাহিনীর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত আত্মীয়তা সংযোগ তেমন ঘটে না। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে কাহিনীর চমক নাটকীয়তার চাইতে আমাদের কাছে অনেক বেশি নিটোল হয়ে ওঠে দুটি সরল নির্দ্বন্দ্ব মনের উদ্ভাস-চিরকালের সম্পূর্ণতা, আবহমানের সুন্দর। আমরা তাদের সঙ্গে এক হয়ে বলি, দ্যাখরে নয়ন মেলে জগতের বাহার। সব অপমান সব বঞ্চনা, সব হিংসা দ্বেষ অশুভ। প্রচেষ্টার উর্ধ্বে চিরদিনের পৃথিবী, চিরদিনের সূর্যোদয়, সব অন্ধকারকে হারিয়ে দেওয়া আলো, সহজ মধুর আনন্দ সংবাদ।

৪

অনেক চলচ্চিত্রে, ধরা যাক বার্গম্যানের 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি'তে, প্রত্যক্ষত কোনো কাহিনী নেই, একটা mood, আবহাওয়া আছে, সে দিক থেকে সত্যজিৎ রায়ের অনেক ছবিই কাহিনী নির্ভর, বিশেষ করে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। 'চারুলতা' অথবা 'ঘরে বাইরে'তে একটা কাহিনী পরিণত হয় এবং পরিশেষের দিকে এগিয়ে যায় যেমন নাটকে এবং উপন্যাসেও কখনো কখনো। 'গুপী গাইনে' কাহিনীর ঠিক সেইভাবেই নাটকীয় ক্রমপরিণতি ক্রমপরিশেষ না থাকলেও, ঘটনার ঘনঘটা আছে। সেই ঘটনাবলী দুদিক থেকে আমাদের স্পর্শ করে। প্রথম, দুটি দুঃখী সরল মানুষ নির্যাতিত মানুষ দৈবক্রমে সুখের মুখ দেখল। সব মানুষেরই বুকের ভিতর এই প্রত্যাশা—একদিন দুঃখনিশি ভোর হবে, একদিন মা লক্ষ্মীর রাঙা পায়ের ছাপে ভরে যাবে ঘর-উঠোন। সব মানুষেরই বুকের ভিতর একটা অভাববোধ, একটা স্বপ্ন, একটা আশা। চিরদিন এই রকমই। সব মানুষই দুঃখী, সব মানুষেরই স্বপ্ন ভ্রমণ। ঘুঁটেকুড়ুনীর ছেলে রাজা হলো, বিয়ে করলো রাজকন্যাকে। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ পেল সোনার মোহরের সারি সারি কলসী। এমনও তো হয়। সব লাঞ্ছনা, সব ব্যর্থতা, সব দুঃখের আঁধার শেষপর্যন্ত মুছে গেল, গুপী আর বাঘার সঙ্গে

দৈবাৎ সাক্ষাৎ হলো ভূতের রাজার, আর পাওয়া গেল সেই কাঙ্খিত তিন বর এতো আমাদেরই পাওয়া, আমাদের সাধ, আমাদের স্বপ্ন। গুপী-বাঘাকে আমরা মুহূর্তেই ভালোবেসে ফেলি, তাদের বিপদে আমাদের বুক গুর গুর করে, তাদের সৌভাগ্যে নেচে ওঠে আমাদের মন।

বস্তুত গুপী-বাঘা আমাদের স্বপ্নের সেই চিরন্তন রাজপুত্র, যে শত্রুজয়ী, বন্দিনী রাজকন্যার উদ্ধারকারী, এবং বিজয়ীর জয়মালা শেষাবধি যার গলায় দুলবেই। উপন্যাসে নাটকে অনেক চরিত্র থাকে যাদের আমরা শ্রদ্ধা, সমর্থন অথবা সহানুভূতি জানাতে পারি, কিন্তু একাত্ম হতে পারি, অভিন্ন হতে পারি এমন চরিত্র কদাচিৎ মেলে। 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ আমাদের শ্রদ্ধেয়, অনেক প্রসঙ্গে আদর্শও বটে কিন্তু সন্দীপ কখনোই অপু নয় যে অপুর সঙ্গে নিজেকে একাকার করতে অল্প সময়ের প্রয়োজন হয়। বিভূতিভূষণের অপু এবং সত্যজিৎ রায়ের অপু উভয়ের সম্বন্ধেই একই কথা বলা যায়। যেমন বলা যায় রূপকথার আদলে, যে রূপকথা আমাদের জাতীয় নির্জ্ঞান বা সার্বজনীন নির্জ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোত। সেই নির্জ্ঞানের ভিতর আমাদের আঁধার নির্জন আশ্রয়, তার দিকেই আমাদের প্রবণতা, সমর্থন আর আকাঙ্খাও বটে। গুপী-বাঘাকে যেন আমরা সহজেই চিনে নিতে পারি, সহজেই বাস করতে শুরু করি তাদের সঙ্গে। তাদের ভালো না বেসে আমাদের উপায় নেই তাদের ভালো লাগা যেন সহজ নিঃশ্বাস, স্বাভাবিক, তাদের কাছে যাওয়া আমাদের আঁধার অন্তরলোকের দিকে যাওয়া।

'গুপী গাইন বাঘা বাইনে'র কাহিনীর দ্বিতীয় দিক সমর বিরোধিতা। 'যুদ্ধ নয়, শান্তি ভালো' এই রকম একটা ঘোষণা 'গুপী গাইন বাঘা বাইনে' আমরা শুনতে পেতেই পারি। সত্যজিৎ রায় নিজে অবশ্য তাঁর ছবিতে এইরকম কোনো ঘোষণার উপস্থিতি মেনে নেবেন না। তবু যুদ্ধের একটা উপক্রমণিকা এই কাহিনীতে আছে। কিন্তু সেই যুদ্ধে কোনো রণ হুংকার নেই, রক্তপাত নেই, তা শেষ হয়েছে এক মধুর মিলন দৃশ্যে। বোবারা ফিরে পেয়েছে ধ্বনি, দুই আশ্রয়হীন পেয়েছে রাজাশ্রয়। উপরন্তু রাজকন্যা। সব ষড়যন্ত্র হিংসা মুছে গিয়ে চারিদিকে বেজে উঠেছে আনন্দ সানাই-অন্ধকার কেটে গিয়েছে, চারিদিকে ভরে উঠেছে প্রভাত আলোয়—দ্যাখরে নয়ন মেলে জগতের বাহার।

৫

যেমন গুপী-বাঘার কথাবার্তায় কোনো বক্তব্য অর্থাৎ বিশেষ কোনো বাণী-দর্শন আছে বলা যাবে না ; সত্যজিৎ রায়ের কথায়, তারা শুধু ফাংশন্যাল কথাবার্তা বলে গেছে। গুপীর গাওয়া গানগুলিও নিরপেক্ষ, একান্তভাবে পরিস্থিতি থেকে উঠে আসা-সত্যজিৎ রায় পরিস্কার করে তা আমাদের জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে গান অনেক সময়েই একটা বড় ভূমিকা নেয় অনেক সময়েই তা নাটকের মূল কথা, মূল বলার বিষয়টা আমাদের জানায়, গুপীর গান কখনোই সে রকম নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে বিশু পাগল-ধনঞ্জয়দের গান অনেকটা যাত্রার বিবেক অথবা গ্রীক নাটকের কোরাসের মতো যা আমাদের পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিষয়ে বুঝিয়ে দেয়, আগাম সতর্ক করে, অবধারিত ভবিষ্যতকে চেনায়, গুপীর গান সেরকম কিছুই করে না। 'গুপী গাইন বাঘা বাইনে'র গানের প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় ক্রবাদুরদের কথা বলেছেন।[৮] ক্রবাদুরদের প্রেমের গানে পরিস্থিতির উপর

একটা কমেন্ট, মন্তব্য থাকত যেমন, সেইরকমই গুপী তার গানে ঘটনা, অবস্থার উপর তার অভিমত জানিয়েছে। আমরা বুঝতে পারি কখনো নিছক গান গাইবার আনন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, কখনো বা গানের জাদুতে সকলকে। প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করে রাখার প্রয়োজনে গুপীর গান গাওয়া। সেই গান পরিস্থিতি যে রকম সেই রকমই হয়ে উঠত। এবং সেই হয়ে-ওঠাটাও সহজ হয়ে ওঠা, কোনো ধীর স্থির পরিকল্পনার ফসল নয়। তা কোনো আদর্শ, সত্য অথবা বক্তব্য প্রচারের কথা মাথায় রাখত না। 'হীরক রাজার দেশে'তে যেমন সামনে শৃঙ্খলমুক্ত বাঘ দেখে তাকে মায়া-স্তব্ধ করার প্রয়োজনে গুপী তাকে নিয়ে, উপস্থিত পরিস্থিতি নিয়ে চটজলদি একটা গান বেঁধে ফেলে, গুপী গাইন বাঘা বাইনের গানগুলি সেই ভাবেই এসেছে। সত্যজিৎ রায় এসব কথা খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন।[৫] দরকার নেই গুপী গাইন বাঘা বাইনের শুরুতে ফ্যান্টাসি এবং শেষে ফেবল কিনা যে বিতর্কে। গুপী গাইন বাঘা বাইনের কাহিনী একটা কাহিনী মাত্র, গুপীর গানগুলিও গান হিসেবেই ভাবো। জাজ ইট অ্যাজ ইট ইজ।[৬]

শান্তিপ্রিয় ভালো রাজার সঙ্গে প্রথম দেখা হবার সময় গুপী বলেছিল তারা বাংলা দেশ থেকে এসেছে, তাদের ভাষা রাজা বুঝবেন না কিন্তু বাংলাভাষা ছাড়াও তাদের আর একটা ভাষা জানা আছে, সে ভাষা গানের ভাষা, ছন্দের ভাষা, প্রাণের ভাষা। সেই ভাষাই তাদের পরস্পরের কাছে আনবে। গানের ভাষা প্রাণের ভাষা অর্থাৎ বিশ্বভাষা। কথা দিয়ে তা কিছুই বলে না, কেবল সুরে বেজে ওঠে। আমরাও সেই সুর শুনি, প্রশ্ন করি না নাম, প্রশ্ন করি না অর্থ বলার কথা প্রশ্ন করার কথা মনেই আসে না আমাদের। আমরা কেবল চোখ মেলে দেখি, দেখি জগতের বাহার। দেখি প্রভাতবেলা, শুনি যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট পার-হওয়া প্রভাতবেলার আনন্দসানাই। 'গুপী গাইন বাঘা বাইনে' আর কিছুই দেখি না, আর কিছুই শুনি না আমরা।

---

* ১/২/৩/৪/৫/৬ 'কলকাতা' পত্রিকা/দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ যুগ্ম সংখ্যা ২মে ১৯৭০ 'সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা'। করুণাশঙ্কর রায় গৃহীত সাক্ষাৎকার। এবং 'দর্পণ' সাপ্তাহিক/৯মে ১৯৬৯। গুরুদাস ভট্টাচার্য গৃহীত সাক্ষাৎকার।

গুপী গাইন বাঘা বাইন

শুদ্ধশীল বসু

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' আমি এইমাত্র দেখে ফিরছি—ছবিটি বিষয়ে প্রাথমিক উচ্ছ্বাস মৌলিকভাবে প্রকাশ করবার পূর্বেই আমার হাতে কলম, সামনে সময় বাঁধা—অথচ সমালোচনা লেখার পক্ষে এ এক অসম্ভব সময়, ছবির পর ছবি আমার মাথায়, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে আনাগোনা, বড়ো বেশি কাছাকাছি রয়েছি, নানান কথা মাথায় আসছে, তাদের গুছোবার সময় নেই।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়লো। 'পরশপাথর' প্রকাশিত হয়েছে, আমরা অনেকে একই সঙ্গে কৌতূহল ও শূন্যমনে দেখতে গিয়েছি, শূন্য মন এই কারণে যে ওই জিনিশ চিত্রভাষায় কেমনভাবে দেখবো, কীভাবে দেখানো হয়, এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা বা কল্পনা করতে পারি নি। অথচ সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে কানঘুষো শুনে বইটা এরকম হ'তে পারে একটা ধারণা তৈরি করা সম্ভব, লেখকের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হয় না কারণ, সাহিত্যে এখন আমরা অভিজ্ঞ, এই মাধ্যমের অনেক দিগন্ত উন্মোচিত, অনেক সড়ক নির্মাণ করা হ'য়ে গেছে, সেই সড়ক ধ'রে লেখকের কাছে পৌঁছে আমরা আরো কিছুদূর তাঁর সঙ্গে এগুতে পারি, সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত আর হবো না। কিছু চলচ্চিত্র এখনো এক সম্পূর্ণ নতুন উপলব্ধি—সেখানে কী আশা করতে হয়, কী ভাবে কী করা যেতে পারে, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা আমাদের তৈরি ছিলো না যখন 'পরশ পাথর' দেখতে যাই—মনে আছে আমরা ইন্টারভেলে সিগারেট খেতে বেরিয়ে পরস্পরের দিকে বোকার মত হেসে ছিলাম, কারণ সত্যজিৎ রায় বড় বেশি চমকে দিয়েছিলেন, সমালোচনার কথা অবিলম্বে মাথায় আসেনি।

'পরশপাথরে'র পরে পুনর্বার ঠিক তেমনি শূন্য ও বিভ্রান্ত মন নিয়ে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' দেখতে গিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে সত্যজিতের অনেক ছবি দেখেছি, কয়েকটি ভালো লাগেনি, কয়েকটি দেখে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু মধ্যবর্তী কালীন সব ছবিতেই বলা যায় আমরা অভিজ্ঞ দর্শক হিশেবে যেতে পেরেছি কারণ এর একটিও ঠিক দিগন্তোন্মোচনের ছবি নয়, সেই সব চিত্রের খাত সত্যজিৎ নিজেই নির্মাণ ক'রে রেখেছিলেন—আমরা প্রতিভাবান লেখকের নতুন উপন্যাস যে-মন নিয়ে হাতে নিই সেই সজাগ দৃষ্টি ওপ্রাক্-কল্পনা নিয়ে চিত্রগৃহে প্রবেশ করেছি। 'চারুলতা' অসাধারণ চিত্র, কিন্তু তাও বলা যেতে পারে কোনো বিশেষ বাঁক নয়, পরিচিত ধারায় শ্রেষ্ঠ উপস্থাপনা। কিন্তু 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সত্যজিৎ আবার এক চমক দিলেন ; আমরা পুনর্বার ইন্টারভেলে বেরিয়ে পরস্পরের দিকে বোকার মত হাসলুম। আমরা বিস্ময়ে তাঁর হাতে পুতুল হ'য়ে গেছি। দশ দিন পরে আমি এ-ছবি বিষয়ে কী বলবো জানি না, কিন্তু এ-মুহূর্তে যখন ছবির পর ছবি আমার মাথায় বিস্ময়ের পরে বিস্ময়, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে আনাগোনা, আমার পক্ষে কোনোকূট সমালোচনায় যাওয়া সম্ভব নয়।

উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই'য়ের যে-জগৎ, বৃহত্তর অর্থে লোকগল্পের যে-জগৎ সে-জগতের প্রধানতম ব্যক্তি রাজামশাই। এই রাজা ও রাজ্যের, মন্ত্রী ও সেনাপতির, বিচারসভা ও প্রাসাদের এক কল্পনার ছবি আমাদের মনে গ্রথিত। প্রত্যেক শিশুর কাছে এই জগৎ পরিচিত, প্রত্যেক সাবালকের কাছে এইসব কাহিনী আনন্দের। লোকগল্পের ঘটনা ঘ'টে যায় খুব সহজে, সেখানে কেন ঘটল, কী ক'রে ঘটলো সে-সব প্রশ্ন অবান্তর, কাহিনীকার তার কল্পিত রাজামশাইয়ের জগতের কাঠামোর ঘটনা ঘটিয়ে দেন, সেখানে গল্পের খাতিরে ঘোড়াও যেমন গাছে উঠতে পারে, ভূতেও কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ দিয়ে যেতে পারে উড়ন-চটিজুতো বা সুরহীনের কণ্ঠে গান। এই জগতে প্রবেশ করলে আমাদের সমালোচকের দৃষ্টি আর থাকে না, যে-রাজা ভালো আর যে-রাজা এক কথায় গর্দান নেন, তাঁরা দুইই আছেন, দু'জনকেই দেখা হয় সমান মজার দৃষ্টিতে-স্নেহের দৃষ্টিতে। সব চরিত্রই সেখানে, সব ঘটনাই সেখানে, শিশুর সরল মনের জন্য সরলভাবে উপস্থিত। কিন্তু এ-জগৎ এতদিন আমাদের ভাষাতেই অঙ্কিত ছিল, চরিত্রগুলো গল্পের থেকে আমাদের আনন্দ দিয়েছে, আমাদের মন বা দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়েছে লেখর লেখকের সুরে, মজাব সারল্যে। সত্যজিৎ এই কল্পনার চিরন্তন জগৎ ভাষা থেকে দৃশ্যে তুলে এনেছেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' কল্পনা থেকে বাস্তবে উঠে এসেছেন সেই রাজামশাই ও অমাত্যবৃন্দ।

উপেন্দ্রকিশোরের গল্পে, বা যে-কোনো লোককাহিনীতেই, গল্প বলার সুর পাঠকের এক বিরাট সাহায্য। ভাষার সেই সুরেই, সেই কাঠামোতেই চরিত্র ও ঘটনা এমন সরল, এমন মজার হ'য়ে আবির্ভূত হয়। জল্লাদ এসে খুব সহজেই লোকগল্পে মুণ্ড কেটে দিতে পারে, রাজার আদেশে একশো ঘা বেত মারা হচ্ছে, কিন্তু গল্প বলার যে সুর তাতে যে নির্বিকার ও আমুদে ভাব তাতে বিষয়টা নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠতে পারে না, শিশুর শরীরে এসে তা লাগলে গল্পের মজাই চ'লে যাবে। —কিন্তু চিত্রে যখন যে-জগৎ দেখানো হচ্ছে, এবং কোনো স্টাইলাইজড উপায়ে নয়, তখন সেই সুরটা রাখা পরিচালকের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। —সত্যজিৎ আমাদের অবাক করেছেন, দৃশ্য সাজানো ও উপস্থাপনায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লোকগল্পের সেই হিউমারটা রেখে। —ভালো ও আদর্শ রাজাও সংগীত প্রতিযোগিতার আসরে ঘুমিয়ে পড়েন, শুণ্ডি রাজ্যের অমায়িক বোবা ভালোমানুষ প্রজাদের ভালোত্ব দেখেও আমরা আমুদে-হাসি হাসি। অন্যদিকে 'যুদ্ধ ! যুদ্ধ !' ক'রে যখন হাল্লার রাজা লাফান আমরা হেসে ফেলি, কিংবা জল্লাদ যখন খাঁড়া নিয়ে উপস্থিত, আমরা ত্রাসে পীড়িত হই না। লোকটার পৈশাচিক হাসি মজার বোধ হয়।

গুপী ও বাঘার দেখা হবার দৃশ্যটি ছবিতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃশ্য। ঢোলের ওপর গাছ চুঁয়ে জল পড়ছে, সেই আওয়াজ শুনে গুপীর পা টিপে-টিপে কী হচ্ছে দেখতে আসা, এবং অতঃপর দুইয়ের বাঘ-দর্শন, এক কথায় অপূর্ব। বাঘের দৃশ্যে গুপী ও বাঘার ভয়টা একই সঙ্গে এত বাস্তব ও হাসির, যে সেখানেই ছবির মূল সুরটা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জগতে মৃত্যু জিনিশটাও মজা মেশানো, সত্যিকারের বিভীষিকাময় নয়। বাঘ দেখে ভয়ও পাবে, কিন্তু তার মধ্যে মজাও আছে।

বাঘ বিদায় নিতেই অন্ধকার হ'য়ে এলো, সম্পূর্ণ বিমূর্ত বিন্যাস এবং এক অদ্ভুত সংগীতের মধ্যে মিশে গেলো চিত্র, তারপর ভূতেদের প্রবেশ। আমি নানা দেশের ছবি দেখেছি, কিন্তু খুব কম চিত্রেই, এই ভূতের অংশে যেমন, কোনো পরিচালককে এত

মনে হ'য়েছে। ভূতের দৃশ্য একদিকে যেমন আমাদের গল্পের অলৌকিক কল্পনার জগতের যথাযথ চিত্ররূপ, অন্যদিকে দৃশ্যগত ও ধ্বনিগতভাবে এক অপূর্ব নান্দনিক অভিজ্ঞতা, এবং গল্পের দাবি অনুসারে দৃশ্যটি ভয়াবহ নয়, বেশ হাসির। ভূতের রাজা সত্যজিৎ যা দেখিয়েছেন অকল্পনীয়। তবে এখানে একটু 'তবে।' না এনে পারছি না— ভূতের নৃত্যে পরিচালক মূল নাচটি বড়ো বেশিক্ষণ রেখেছেন। এবং নাচের মধ্যে দিয়ে সমাজের রূপটা 'তুলে ধরা'র চেষ্টা হয়েছে যেটা ওই জায়গায় একটু ছেলেমানুষি ঠেকে। আর তা ছাড়া ব্যাপারটা বড্ড প্রকট হ'য়ে পড়েছে, পাঁচ সেকেণ্ড পরে বলতে ইচ্ছে করে 'বুঝেছি, আর দরকার নেই।' এই অপূর্ব অংশটিতে 'বক্তব্য' এক মস্ত খুঁত।

চিত্রটির বক্তব্য অত্যন্তই স্পষ্ট এবং সত্যজিৎ সাধারণভাবে খুব বেশি, ইংরেজিতে যাকে 'ইনার মীনিং' বলে, দেবার চেষ্টা করেননি। গল্পের সরল বাণী ঃ যুদ্ধ খারাপ, ভালোবাসা ভালো; সরলভাবে ঈশপের গল্পের মতো প্রকাশিত।

অভিনয় প্রত্যেকেরই এত ভালো যে বিশেষ ক'রে কাউকে ধন্যবাদ জানানো উচিত হবে না। গুপী ও বাঘা দু'জনেই সমান ভালো। তেমনি অসাধারণ হাল্লার যাদুকর, আর জহর রায় তুলনাহীন। সত্যজিৎ সাদাকালোর এমন তাৎপর্যমূলক ব্যবহার আগে কখনো করেননি, প্রকরণের দিক থেকেও ছবিটি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অরণ্যের দিনরাত্রি প্রসঙ্গ

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

উনিশ শ পঞ্চান্ন থেকে সত্তর-এই সময়কালের দুই বিপরীত প্রান্তে 'পথের পাঁচালী' ও 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। মধ্যবর্তী ব্যবধান এক চলচ্চিত্রকারের শিল্পোত্তরণের অবতরণিকা। তার শিল্পবিবর্তনেরও বটে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে সত্যজিৎ রায় তাঁর ষোড়শ চলচ্চিত্রে উপনীত। প্রাসঙ্গিক কারণে একবার পিছনে তাকাবার অবকাশ রয়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে শুরু থেকে প্রায় কাঞ্চনজঙঘা অবধি সত্যজিৎ রায় তাঁর আপন দেশে দর্শক ও সমালোচকদের কাছে বহুল প্রশংসিত। যেখানে বাস্তববোধের উল্লেখ ছিল কেবল মৌল। তার শিল্পকলার কথা, আঙ্গিকেব কথা বা মনন বৈদগ্ধ্যের কথা কখনও বিশেষ কিছু বলা হতো না। বাস্তববোধ বলতে মনোরাজ্যের আন্তর বাস্তবও নয়। বর্হিবাস্তবের কিছু ডিটেলস্-এর কথাই উল্লেখ করা হতো বারবার। 'কাঞ্চনজঙঘা'র পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত সত্যজিৎ রায় এদেশে ক্রমাগত সেই দর্শক ও সমালোচকদের দ্বারা অভিযুক্ত হয়ে পড়লেন। এমন কথা শোনা যায় যে তিনি নাকি যথেষ্ট অ-সমকালীন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে পঞ্চাশের দশকে য়ুরোপে নির্মিত হয় 'পিকপকেট্', 'অ্যাশেজ এ্যাণ্ড ডায়মণ্ডস' বা 'ব্রিদলেস' ইত্যাদি। কিন্তু এশীয় ভূখন্ডে 'রশোমন', 'সেভেন সামুরাই', 'উগেৎসু' বা অপু-চিত্রত্রয়ী। কাহিনীব কালবিচারে শেষোক্ত চলচ্চিত্রাবলী ভীষণভাবেই অ-সমকালীন হয়ে পড়ে। যদিও উক্ত সমকালীন পর্বে জাপান ও ভারত (শুধু সত্যজিৎ রায়) সারা দুনিয়ার চলচ্চিত্রের মানসিক বাজ্যে প্রবল ভাবে নাড়া দেয়। মিজোগুচি, কুরোসাওয়া বা সত্যজিৎ রায় দূব বা নিকট অতীতে তাঁদের আখ্যান শুরু করেও সমকাল ও ভাবীকালকে যুগপৎ স্পর্শ করেন। যে কারণে ইদানীং নির্মিত 'রেড বেয়ার্ড' বা 'গুপি..' অত্যন্ত আধুনিক চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আসলে 'কাঞ্চনজঙঘা'র পরের চলচ্চিত্রাবলীতে (দুই বা এক বাদ দিলে) সত্যজিৎ রায় বর্তমানকালের কাহিনীর ওপরই অধিক প্রাধান্য দেন। সেই সব সমস্যাজর্জর যন্ত্রণার কথা বলা হয় যার শিকড় ছিল দেশজ। প্রকৃত পক্ষে সত্যজিৎ রায়, বা যে জাপান অধিক পশ্চিমী ছায়াগ্রস্ত, তার কুরোসাওয়াও 'আমদানী' সমস্যাকে তাঁদের শিল্পে স্থান দিতে নিরাসক্তি প্রকাশ করেন। বস্তুত যা কিনা দেশ কাল মাটির সঙ্গে ছিন্নমূল। শিল্প বাস্তবের মধ্যে মুক্তি, কিন্তু বাস্তব থেকে চ্যুতি নয়। পঞ্চাশের এবং ষাটের দশকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতে সম্ভবত সত্যজিৎ রায় সেই স্বল্পতমদের অন্যতম যাঁর কাছে ঐ শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য জ্ঞাত। তাঁর চলচ্চিত্র ক্যামেরা শয়নকক্ষে অথবা ড্রেসিং টেবিলের আনাচে-কানাচে অনুপস্থিত তার প্রধান কারণ গৃহসমস্যায় পীড়িত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর গৃহে আলাদা করে ঐ কক্ষটির অস্তিত্ব পরিসংখ্যানের অপেক্ষা রাখে। তা ছাড়া আমাদের সমাজজীবনের যৌনতার আটপৌরে ভূমিকা এখনও প্রায়শ অপ্রতিষ্ঠিত। 'লাভেন্তুরা' বা 'পিয়েরো'র প্রতিপাদ্য সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে লভ্য নয় যেহেতু বর্তমান মার্কিন বা

য়ুরোপীয় কনজ্যুমার কিংবা পারমিসিভ সমাজের চেহারা বা চরিত্র কোনটাই এখনও ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত নয়। হয়তো তার ব্যবধান ক্রমবিলীয়মান। সত্যজিৎ যে পরিমাণে উনবিংশ শতকের যুগসন্ধিকাল সম্পর্কে নস্ট্যালজিক, তাঁর আপন সমকাল সম্পর্কেও ততখানি সতর্ক ও জাগ্রত। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'মহানগর', 'নায়ক' বা ইদানীংকালের 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র নাগরিক সমস্যা বা সংস্কার শুধু আধুনিকই নয়, ভারতীয়ও। এবং চরিত্রে স্বতন্ত্র। মহাযুদ্ধোত্তরকাল বা স্বাধীনতা কিংবা দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে তার পাত্র পাত্রীদের মানসিক প্রতিক্রিয়া দেশ-কাল শর্তেই উপস্থিত। তাঁর এ পর্যন্ত চলচ্চিত্রাবলীর পর্যালোচনায় পরিবর্তনের এক বিশেষ ধারা লক্ষ করা যায়। 'দেবী', বা 'চারুলতা'র সৌমিত্রর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'কাপুরুষ' বা 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র সৌমিত্রর সামাজিক প্রতিক্রিয়া একেবারে ভিন্ন। এমনকি নবতম চলচ্চিত্রে তার একাকিত্ব অপুর নিঃসঙ্গতা থেকেও অন্যধর্মী। বিগত বিশ বছরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন এর মূল ভূমিকা রচনা করেছে। সত্যজিৎ একদা তাঁর চলচ্চিত্র রচনা শুরু করেছিলেন গ্রাম বাংলার পটভূমিতে। অপু যেমন গ্রাম ছেড়ে ক্রমে ক্রমে নগর জীবনের বা বৃহত্তর পৃথিবীর আবর্তনে এসে পড়ে তেমনই সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র এক ক্রম বিবর্তনে নগরকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। গোদার বা আন্তোনিওনির শহরের মতো সত্যজিৎ রায়ের শহর একক নয়। বর্তমান ভারতীয় চারিত্রিকতার কথা ভাবা যাক। যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৈদুতিক সুযোগ সুবিধে আমরা যতটা গ্রহণ করেছি তত পরিমাণে ভারতীয় জীবনযাত্রা কী সম-আলোকিত? এদেশের উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত গৃহসজ্জায় এখনও 'যাও পাখী বলো তারে', বাঁকুড়ার ঘোড়া এবং বিকিনি পরনে বিদেশিনী শোভিত তামাক কোম্পানীর ক্যালেণ্ডারের সহাবস্থান। শ্রুতিতে রবীন্দ্রনাথ, রবিশঙ্কর ও বিবিধভারতী। 'অপরাজিত'র নগরজীবনে ফেবিওয়ালার ডাক ততোটা কানে আসে না। সঙ্গত কারণে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' শহুরে সফিষ্টিকেশন-এর শীতল পটভূমিতে repartee-এর প্রাধান্য লাভ করে। 'মহানগর'-এ রেডিওতে খাম্বাবতী রাগে খেয়াল শোনা যায়। 'কাপুরুষ' এ বেঠোফেনের সিম্ফনির এবং 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে বিবিধভারতীর বিজ্ঞাপন কার্যক্রম এবং বোম্বাইয়ের চিত্রসঙ্গীত। এর সবটাই বর্তমানের নগরজীবনের ফসল। এবং ভারতীয় চরিত্র। মিজোগুচি বা ওজুর পক্ষে যতখানি নিরঙ্কুশ জাপানী হওয়া সহজ ছিল সত্যজিৎ রায়ের পক্ষে ততখানি ভারতীয় হওয়া সহজসাধ্য ছিল না।

'অরণ্যের দিনরাত্রি' সত্যজিৎ রায়ের আধুনিক চলচ্চিত্র, যার সময়কাল খুব সমসাময়িক। যদিও আপাতভাবে এখানে শহর অনুপস্থিত, কেননা এখানে শুধু অনেকগুলি শহুরে চরিত্রকেই কিছু সময়ের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর পট মূলত, প্রকৃতি। কিন্তু আসলে এর নায়ক কোন এক মহানগর, যার ভণিতা ও মেজাজে চরিত্রগুলি নির্মিত। যে চার বন্ধুকে নিয়ে এ চলচ্চিত্র তাদের কথা ধরা যেতে পারে প্রথমে। শুরুতে এদের মোটর যাত্রায় কথাবার্তার মধ্যে বোঝা যায় যে যেকোন কারণেই হোক না কেন এরা কিছু দিনের জন্যে নাগরিক পরিবেশ ছেড়ে প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যেতে উৎসুক। এবং সেটা হয়তো কিছুটা আকস্মিক। এর মধ্যে মেমরী কাট-এর দ্বারা অন্যতম বন্ধু হরিনাথের নিকট অতীতের ভালবাসা জাতীয় ব্যাপারের শেষ মুহূর্তটি বলা হয়েছে। যেখানে সে জিল্টেড হচ্ছে। গোটা দৃশ্যটা এক স্বল্পালোকিত শয়ন কক্ষের মধ্যে। তপতী

নামে মেয়েটি জানালার কাছে পিছন ফিরে তার পাঁচ পাতার চিঠির উত্তরে সংক্ষিপ্ত চিঠি পাবার অভিযোগ শোনায় এবং তাঁর চেহারা জানলাপথে দৃষ্ট রাতের কলকাতার আলো আঁধারির মধ্যে মিশে যায়। তপতীর (যার মাথায় নকল চুলের ছদ্মবেশ) কথাগুলো যেন 'Voice of city'-এর মতো শোনায়। আর এই মিথ্যা নর্ম-এর চেহারা আরও প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে যখন শুধু ওই অভিযোগেই হরিনাথকে নাকচ করে দেওয়া হয়। শেষের বাকি কথাগুলো তপতী তার ওয়াড্রোবের ভিতর থেকেও বলে। এক আশ্চর্যজনক পরিমিতির দ্বারা একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত সিকোয়েন্স এ পরিচালক শহরজীবনের একটা বিশেষ দিককে wigs and wardrobe দ্বারা উপস্থিত করে দেন। আর ঐ চার বন্ধু যে শহর থেকে আসে তার কথাও আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

টাইটলস-এ মাদলের ধ্বনি আর কয়্যার এর মতো আদিবাসীদের উচ্চস্বর সঙ্গীতে যে তীব্র আনন্দের উন্মাদনা বা পত্রবহুল শাল অরণ্যের যে প্রাণচঞ্চল প্রতিশ্রুতি তার সঙ্গে বস্তুত এই চারটি চরিত্রের কোন যোগাযোগ ঘটে না। ফরেস্ট বাংলোতে গাড়ি পৌঁছানোর সঙ্গে ল্যাণ্ডস্কেপ পরিবর্তিত হয়। পাতা ঝরা শীর্ণ বৃক্ষরাজি আর শুকনো নদীর ধূ ধূ বালির চড়ায় রিক্ততা প্রকাশ হয়ে পড়ে। চৌকিদারকে জোর করে ঘুষ দেবার ঘটনাটির এগুলো যুক্তিগ্রাহ্য এসট্যাবলিশিং শটসও বটে। এই বিনষ্টি অসামান্য দক্ষতায় বলা হয়েছে চলচ্চিত্রে। অপর্ণার সঙ্গে অসীমের প্রথম আলাপের সূচনায় প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অপর্ণাকে মন্তব্য করতে শোনা যায়, 'তখন চৌকিদারটাকে বেশ honest বলে মনে হয়েছিল।' আর তখনই পুরানো দরজার আওয়াজ যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

বিষয়ানুসারে এ চলচ্চিত্রের থীম মিউজিক-এ জ্যাজ ব্যবহারের যে প্রলোভন ছিল সত্যজিৎ তাঁকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। পরিবর্তে মাদলের ধ্বনিই মোটামুটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর সময়-বিশেষে আদিবাসী লোকসঙ্গীতের অংশ। এর প্রয়োজন ছিল অনেকখানি। এ সঙ্গীতের ফোর গ্রাউণ্ড-এ সব কটি শহুরে চরিত্রই খুব বেশি অ্যালিয়েন হয়ে পড়ে (যেমন মনে পড়ে শেক্সপীয়রওয়ালা চলচ্চিত্রে কয়েকটি বিদেশী চরিত্রের মানসিক সমস্যার একটা জোরালো জায়গায় নেপথ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দের একটি ভজনের খণ্ডিতাংশ মাত্র ব্যবহার করে সঙ্গীত নির্দেশক সত্যজিৎ রায় চরিত্রগুলিকে পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন)। তাই, স্টেটসম্যান কাগজ পুড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না। যেমন বনের মধ্যে টার্জান mimic করার মধ্যে আর ফিরে পাওয়া যায় না হারানো শৈশবকে। সুতরাং অরণ্যে সূর্যাস্তের মহিমার মুখোমুখি হয়ে শহর কলকাতা আর ওয়েস্টার্ণ ছবির প্রসঙ্গ এসে পড়ে (আলোচ্য ফ্রেমের চিত্রময়তার উপর টেলিগ্রাফের তারের রৈখিক ছন্দপতন দারুণ সাজেক্টিভিটিতে পৌঁছয়)। অরণ্যচারণের পথ গিয়ে শেষ হয় ভাঁটিখানায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে নামগোত্রহীন এক ট্রেন তখন তার আপন গন্তব্যপথে চলে যায়। 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'-'অপুর সংসার'-এর ট্রেন, 'নায়ক'-এর ট্রেন 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তেও ফিরে আসে। ককতো-র 'অরফি'র মেসেঞ্জারের মতো এক অন্ধশক্তিচালিত এই যন্ত্রদানব এখানে এক অন্য পৃথিবীর কথা মনে করিয়ে দিয়ে যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় রাতে ভাঁটিখানা থেকে মত্ত অবস্থায় চার বন্ধুর ফিরে আসার দুটি দৃশ্য আছে এ চলচ্চিত্রে। প্রায় একই বনপথ ধরে এবং একই ভাবে। প্রথম রাতে যারা

ইকবালের দেশাত্মবোধক গান ধরে, দ্বিতীয় রাতে তারাই আবার ট্রানজিসটারের বিলিতি বাজনার তালে ট্যুইস্ট জাতীয় নৃত্য শুরু করে। সম্ভবত এদের এক বন্ধুর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের লাইনও শোনা যায়। এ সব ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এবং এর মধ্যে কোনও বিশেষ লজিক অন্বেষণ একেবারেই বৃথা। হয়তো হতে পারে এ কোন ব্যক্তিক অবক্ষয়ের ফলশ্রুতি। যেমন প্রসঙ্গত স্মর্তব্য ঐ বনের অন্ধকারে শুকনো পাতার স্তূপে আগুন জ্বালানোর দৃশ্যকল্প। কিন্তু অন্য এক কারণে এ প্রসঙ্গ তাৎপর্যময়। কেননা এখানে আজকের বাংলার নূতন প্রজন্ম সম্পর্কে পরিচালকের স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ সহজেই চোখে পড়ে। যে জেনারেশন উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রেনেসাঁর উত্তরাধিকার হারিয়েছে বা বর্জন করেছে। যাদের সক্রিয় চেতনায় আজ বিগকালের ভূমিকা অতি নগণ্য। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ হয়তো বাচ্য শব্দে অবসিত। ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গল পুঁথির পৃষ্ঠায় অতীত হয়েছে। চলচ্চিত্রের পরবর্তী অংশে বৃদ্ধ সদাশিব ত্রিপাঠী যখন রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রাঙ্গনে অতুলপ্রসাদের ধর্মসঙ্গীত করেন তখন ঐ চার যুবক দূর থেকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওদের আগন্তুক ছাড়া তখন আর কিছু ভাবা যায় না। অমল, অপু ও অসীমের সৌমিত্র সামাজিক এক নিস্ক্রমণের চিহ্নিত প্রতিনিধি। বস্তুত এখানে সামাজিক মূল্যবোধ প্রাসঙ্গিক। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে স্বাধীনতা উত্তর অর্থনৈতিক সুপারস্ট্রাকচার এর নৈরাজ্যজাত, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের কথাই বলা হয়েছে। যেখানে অস্তিত্বের সমস্যা প্রবল। কিন্তু আজকের ইউরোপের আত্মিক অস্থিরতার সঙ্গে এর তফাৎ অনেকখানি। কেননা সেটা সমাজ বুনোনির প্রভেদেও বর্তায়। বর্তমানে প্রাচীন একান্নবর্তিতা বা পারিবারিক গোষ্ঠীবদ্ধতার অস্তিত্ব বাঁচার সংগ্রামে অর্থনৈতিক 'সিকিয়রিটি'র প্রসঙ্গই বড় করে তোলে। চাকরি ছাড়ার হাজার হাজার কারণ থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ পিতা বা ছোট ভাইয়ের অস্তিত্বের প্রশ্ন সবচেয়ে বড়। মানবিকতা হয়তো এর মধ্যেই বাঁচে। কিন্তু নিরাপত্তার অন্বেষণে পারস্পরিক আন্তর বিচ্ছিন্ন এই চরিত্রগুলির বিকেন্দ্রীকরণ ওভারসাম্যহীনতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়। চার বন্ধুই কম বেশি শহরে সংস্কার ও তন্নিষ্ট মিথ্যাচারণ ও মাঝারিপনার শিকার। এবং শেখরকে বাদ দিলে বাকি তিনজনেই চরিত্রগতভাবে একান্ত posses-sive। 'আইডিয়াটা আমার, তোমার সবাই সেটা accept করেছ অ্যাদ্দুরে যখন এসছি, তখন ত ফিরে যাব না। এটা নাও নিয়ে ঘরগুলো খুলে দাও' 'বক বক না ক'রে স্রেফ আমাকে follow কর' 'আমায় কথা বলতে দে' অসীমের এই সংলাপ অথবা সদাশিবের কাছে অবজার্ভেশন বাংলো কেনার প্রস্তাবের মধ্যে শুধু আধুনিক এগ্‌জিবিসনিজম possessive চরিত্রের ক্ষুদে প্রভুত্বের প্রকাশ। যেমন মেলার মধ্যে সঞ্জয় যখন মানিব্যাগ বার করে অপর্ণাকে অহেতুক দেখিয়ে বলে 'এই যে দেখছেন এ একেবারে ঠাসা' তখন দখলদারী চরিত্রের তন্নিষ্ঠ মিডিয়ক্রিটিরই দেখা মেলে। অর্থ বিনিময়ে আদিবাসী মেয়ে দুলির ওপর হরির কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে একই কথা বলা যায়। আসলে এ সবের পিছনে যে euphorie আত্মপ্রতায় পরিচালক যেন তার প্রতিই দিকনির্দেশ করেন। কেননা ওদের পরিণতির লাঞ্ছনা সেই কথাই বলে দেয় সে স্বরচিত বৃত্ত লঙঘনের অধিকার বনাঞ্চলে ঐ ক্ষুদে প্রভুরা সবাই হারিয়েছে। প্রসঙ্গত সত্যজিতের সেই অনবদ্য চলচ্চিত্র ভাষা স্মর্তব্য। যেখানে এক বিষণ্ণ প্রদোষে ফরেস্ট বাংলোর বারান্দায় অসীম আর সঞ্জয় অতীত স্মৃতিচারণ করছে। সেখানে বর্তমানের লভ্য নিরাপত্তার প্রতিপাদ্যও আভাসিত। নেপথ্যে ঘরে ফিরে যাওয়া

মোষের গলায় ঘণ্টা বাজে। এই বিষণ্ণতা প্রাসঙ্গিক ভাবেই সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ-র লাইনগুলো মনে করায়। যেখান বনের অন্ধকারে দিগভ্রান্তির কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য চলচ্চিত্রের শেষাংশে আরেক দিনান্তে এক বিশেষ মুহূর্তে অসীম অপর্ণাকে বলে 'সে কনফিডেন্স আর নেই, আপনা থেকেই থেঁতলে গেছে।' পরিচালক নেপথ্যে ঐ ঘণ্টাধ্বনিকে ফিরিয়ে এনে সারা সিকোয়েন্সকে এক আশ্চর্য পরিণতির দিকে অগ্রসরিত করেন।

কম্পোজিশন-এর নকশা রচনায় 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে বৃত্তের প্রাধান্য। কিন্তু প্রায়োগিক চরিত্রে 'গুপী'র সঙ্গে তার আমূল ব্যবধান। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে প্রথম iris প্রয়োগের মধ্যে বৃত্ত রচনার সূত্রপাত। এর কেন্দ্রবিন্দুতে একটা নোটিশ থাকে। যেখানে Permission to stay in the Forest Rest House must be obtained in advance from the D. F. O. Daltongunj এই কথাগুলো লেখা রয়েছে। এটা পরবর্তী অংশে একটা মর্যাদার লড়াই হয়ে দাঁড়ায়। আর বোস সাহেব বা সুখেন্দুর মতো সামাজিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ব্যতিক্রমের নজির আদায়ের প্রয়াস সহজ হয় নয়। সামান্য গভীরে এটা সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্ন তোলে। ঐ নোটিশ অনেকখানিই status প্রতীকের মতো কাজ করে। যাকে কেন্দ্র করে এখানে সমকালীন ব্যক্তিক বৃত্তের পরিধি সম্প্রসারিত। এবং যেখানে পরোক্ষ আপসজনিত পরাজয় অপেক্ষমান। কোনও প্যাঁচ পয়জারে খিচুড়িতে না গিয়ে সত্যজিৎ রায় iris এর মতো এক প্রাচীন প্রায় পরিত্যক্ত চলচ্চিত্র আঙ্গিককে শিল্পনৈপুণ্যে আধুনিক ও বৈপ্লবিক করে দিয়েছেন।

চলচ্চিত্রে দ্বিতীয়বার iris প্রয়োগ করা হয় ঘড়ির ডায়ালের ওপর। একই ভাবে এখানে সময়ের বৃত্তও উপস্থিত। যে সময়কে পেরিয়ে যাবার জন্যে একমাত্র অসীম চরিত্রটি কিছুটা সচেতন ও অস্থির। শেখর সর্বকালীন এবং সারা চলচ্চিত্রে একমাত্র টিকে যাওয়া চরিত্র। তার কারণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই চরিত্র আপন আনন্দের মধ্যে মুক্ত ও সম্পূর্ণ। ওব শহুরে অভ্যাস ও প্রিটেনসন বা সময়মতো মিথ্যাচরণ সমস্তই কেবলমাত্র খুশির তাৎক্ষনিক তাগিদে। এই একটি মাত্র চরিত্র যার কোনও stake নেই। সুতরাং সর্বাপেক্ষা বিযুক্ত। যার ঠিক পরোক্ষ ফলে সহজে ও যার তার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। সেই মোটর যাত্রা থেকে শনিবারের রেস সম্পর্ক ওই কেবলমাত্র উৎসাহী ডাক বাংলায় দুপুরের নির্জনতায় এযুগের যান্ত্রিক অগ্রগতির আলোচনার সূত্রপাত করে ওই এবং মেলায় জুয়ার জায়গা খুঁজে নিয়ে ও তাতে মগ্ন হয়ে যায়। তবু এ সবের মধ্যে এক সরল কৌতূহলই জেগে থাকে। তাই সমাপ্তি পর্বে যখন শেখর বলে 'কাল একেবারে হোলসেল লস' তখন মনে হয় আসলে এ চরিত্রটাই জিতে গেছে। কেননা ওর কোন সমস্যা ছিল না। তৎকেন্দ্রিক ভ্যানিটিও নয়। এক ধরনের গ্রামীণ মানসিকতার প্রবণতায় শেখর মাটির অনেক কাছাকাছি।

সময়ের ঐ প্রসঙ্গে হরিনাথ চরিত্রটি স্বভাবত এসে পড়ে। যাকে আপাত নির্বোধ মনে হতে পারে। বুদ্ধিগত স্পন্দন এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। একমাত্র দেববাহিতায় ওকে সক্রিয় মনে হয়। চলচ্চিত্রে প্রথম রিজেনারেশন প্রসঙ্গ ওকে নিয়েই। অরণ্যে মিলনের পর দুলি যখন ওকে সরল বিশ্বাসে আপন স্বামীর মৃত্যু প্রসঙ্গে নবজন্মের কথা বলে তার পরিবর্তে ও দুলিকে 'আর্বানির্টি'র 'প্রমিজ' শোনায়। কলকাতার ক্রিকেট, মেয়েদের খোঁপার জাল, পোষাক আর সেই নকল চুলের মধ্যে বর্তমান সামাজিক মূল্য প্রতিধ্বনিত

হতে থাকে। পূর্ববর্তী পর্যায়ে ত্রিপাঠি পরিবারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কালে জয়া ওকে চার্চ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে নিদ্রাপ্লুত এই আধুনিক ল্যাজারাস যেন অবাক বিস্ময়ে চুপ করে থাকে। এই ল্যাজারাসের পুনরুত্থানের পথ জানা নেই। হরিনাথ ও সঞ্জয় সময়-বৃত্তবন্দী দুই চরিত্র। সঞ্জয় দৈহিক কম্যুনিকেশনেও ব্যর্থ হয়। যদিও দু'য়ের ফলশ্রুতি একই।

সঞ্জয় ও জয়ার একত্রিত মুহূর্তগুলি আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বর্হিবাস্তবে যা একেবারে নিস্তরঙ্গ। কেবল অসীমকে সঞ্জয় নামে ডাকার মধ্যে একটা সাড়া অনুভূত হয় মাত্র। জয়াকে ব্যাডমিন্টন কোর্টে প্রথম যে চিত্রকল্প দ্বারা এসট্যাবলিশ করা হলো তার টোন ঝলসানো সাদায় উদ্ভাসিত। যার মধ্যে একটা অবাস্তবের লক্ষণ থাকে। জয়া তার অতীত অপেক্ষা বর্তমানেই অধিক সত্য হয়ে ওঠে ত্রিপাঠী কটেজে শেষ সন্ধ্যায়। যেখানে জয়ার চিত্রকল্পের টোন একেবারে প্রথমের উল্টো। কি আশ্চর্য শৈল্পিক মেজাজে এখানে স্তব্ধতাকে ব্যবহার করা হয়েছে যে পরিবেশে এবং ধূসর ল্যাণ্ডস্কেপের পটভূমিতে ওরা গেট থেকে কটেজ পর্যন্ত হেঁটে আসে। কটেজের আভ্যন্তরীন নীরব অন্ধকার এবং জয়ার 'কেমন গা ছমছম করে না?' এই জিজ্ঞাসায় বাস্তবের তরঙ্গ সুচিত হয়। তখন স্তব্ধতা ভেঙে সেই ট্রেন যেন পুনরাবর্তিত হয়ে ফেরে। আলো আঁধারির মধ্যে দুই নরনারী অনেকক্ষণ মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কম্যুনিকেশন এ সাড়া দিতে পারে না। সেই নীরবতার মধ্য থেকে শুধু ঘড়ির শব্দ ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। কাছাকাছি বুকের ওপর হাত রেখেও সময়ের গণ্ডী পেরিয়ে যাওয়া চলে না। জয়ার বেপরোয়া প্রচেষ্টা বা সঞ্জয়ের মূল্যবোধের মর্যাদা এই দু-ই 'ইউফোরিয়া'য় নামান্তরিত। টেবিল, কোল্ড কফি, ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট আর ফ্যামিলি অ্যালবাম এক জীবন্ত চরিত্র লাভ করে।

'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে memory game পর্যায় (যে 'মিস অঁ সেন' এ-পর্যন্ত ভারতীয় চলচ্চিত্রে রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ) একদিন দিয়ে পুনরাবর্তনের পালাও বটে। অরণ্যের ঠিক ঐ একই স্থানে এ খেলা আগেও একবার খেলা হয়েছিল এমন কথা জয়া পূর্ব প্রসঙ্গে বলে। এখানে সময় এবং স্পেস অদ্ভুতভাবে সম্পর্কিত হয়ে যায়। ওদের পরিধি রেখায় রেখে ক্যামেরা আপন অক্ষে সম্পূর্ণ তিনশ ষাট ডিগ্রী ঘুরে বৃত্ত রচনা করে দেয়। এই সিকোয়েন্স-এর প্রারম্ভিক শটে বিরাট প্রান্তরে মাদল বাজিয়ে একদল আদিবাসীর শোভাযাত্রা ব্যঞ্জনাময়। কিন্তু এই খেলার মধ্যে কথার পিছনে ওদের কোন অস্তিত্ব বর্তমান। আগের এক দৃশ্যে অপর্ণাকে রবীন্দ্রনাথ পাঠে গভীর মনোযোগী মনে হয়। যদিও রবীন্দ্রনাথের নাম এই খেলায় উচ্চারিত হয় জয়ার মুখে। লেবার অফিসার সঞ্জয়ের গম্ভীর চালে মার্কস বা মাও-এর নাম বলার মধ্যে প্রদর্শনেরই প্রয়োজনীয়তা বেশি। বিপ্রতীপভাবে, খেলোয়াড় হরিনাথ হেলেন অফ ট্রয় এবং অপর্ণা ডন ব্র্যাডম্যানের নাম বলে। অসীম এবং অপর্ণার নামগুলি আরও পরস্পর বিরোধী। এর মধ্যে মনার্কি, ফিউড্যালিজম বা ইমপিরিয়ালিজম ইত্যাদি এলোমেলো ভাবে আসে। টিকে থাকার লড়াইয়ে এখানে কেউই খোলস থেকে বাইরে আসে না। এ খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য শেখরকেও যেন কালো চশমার মুখোস পরে নিতে হয়। নাগরিক ম্যানারিজম এর চূড়ান্ত নিদর্শন এই স্মৃতির খেলার মীমাংসাও ভণিতার সমাপ্ত। এ সময়ে শেখরের মুখে 'একটু ঠাণ্ডা জল খাবেন, কুয়োর জল?' পরিহাসের মতো শোনায়। জলের আরেক নাম জীবন।

২

সত্যজিৎ রায়ের প্রায় সকল চলচ্চিত্রের গঠন-আঙ্গিকের সঙ্গে সঙ্গীতের স্বাজাত্য সর্বাধিক। বিশেষত সময় ও গতির ব্যাপারে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' অনেকটা সিম্ফনির আকৃতির কথা মন করিয়ে দেয়। চলচ্চিত্র এক বিশেষ লক্ষে এগোতে এগোতে মেলার দৃশ্য থেকে অনেকগুলি বৃত্তে ভেঙ্গে যায়। যা variation on a minor scale of the theme। নাগরদোলার বৃত্ত থেকে কাঁচের চুড়ির বহু বৃত্ত সমন্বিত অসীম ও অপর্ণার চিত্রকল্পে চলে যাওয়া হয়। এ মেলার দৃশ্য এমন একটা সিকোয়েন্স যেখানে ইণ্ডিভিজ্যুয়াল ড্রামা প্রথম কালেকটিভ ড্রামার সমান্তরাল আসে এবং দূরে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী অসীম এবং অপর্ণার নির্জন মুহূর্তের সারা অংশ টুকরো টুকরোভাবে মেলার দৃশ্যের সঙ্গে ইন্টার কাট দ্বারা উপস্থাপিত।

এই চলচ্চিত্রে অসীম ও অপর্ণার জীবনার্তি একেবারে নিঃশেষিত মনে হয় না।

সেই কারণে এ চরিত্রদ্বয়ের provocation অপরাপর চরিত্র অপেক্ষা অনেক বেশী। শুরু থেকে ওদের বন্দীত্ব ও বিষণ্ণতা উল্লেখ্য। এখানে দ্বন্দ্ব আসলে আপন দুঃখবোধের বা তন্নিষ্ঠ অবশেসন এর চারিত্রিক বৈষম্যে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের মধ্যে অনুষঙ্গ নিম্নগামিতার চিন্তায় ভাঁটিখানায় বসে আপন দুঃখের মৌতাত করা সম্ভব। কিন্তু খুব কাছাকাছি কতগুলি অসহায় মানুষের দুর্দশা ও অসুখ সহজেই অবহেলা করা চলে। তাই প্রাতরাশের টেবিলে ডিমের অনুপস্থিতির সমস্যাই বড় হয়ে দেখা দেয়। আপন স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দরিদ্র চৌকিদারকে বিপর্যয়ের মুখে রেখে সুবিধা গ্রহণ নৈতিব অন্যায়ের আওতায় পড়ে না। বরং কুয়ো পাড়ে স্নান বা santal twist ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে যাওয়া ভীষণ অন্যায়ের পরাকাষ্ঠা হয়ে দেখা দেয়। এর সবটাই আসে এক শৌখিন দুঃখবোধের প্রকল্প থেকে। সেটা শুধুমাত্র অপর্ণার চোখে সোজাসুজি ফাঁস হয়ে যায়। এখানে গোড়ার সেই প্রিটেনশন এর দ্বন্দের কথা চিন্তা করা যাক। যেখানে সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা বা প্রাথমিক অনীহার জন্য অপর্ণাকে অন্তমুর্খী চরিত্র মনে হয়। তার ঘরে পুস্তক বা রেকর্ড সংগ্রহ, কিংবা দেওয়ালে লোত্রেক চিত্র থেকে চরিত্রের কোন বিশিষ্টতা বোঝার উপায় থাকে না। অসীমের মতো অপর্ণাও মুহূর্তোপযোগী কালো চশমার পিছনে আত্মগোপন করে যেতে পারে। অথচ, ব্যালকনি সংলগ্ন ছোট ঘরে ওদের দুজনের উপস্থিতির দ্বারা চিহ্নিত বৈপরীত্য রচিত। এখানে সত্যজিৎ রায়ের প্রয়োগ ক্ষমতা সম্পন্ন ও সম্ভাবনায় দুটি ফ্রেমের কথা উল্লেখের দাবি রাখে। একটা ফ্রেমে ওদের অবস্থান আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। দুজনার দৃষ্টি দুই ভিন্ন মুখে। অপর্ণা দ্বারপ্রান্তে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গুনগুন করে। কিন্তু অসীম কালো চশমা চোখে ঘরের অভ্যন্তরে অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। এর কিছু পরবর্তী ঐ ঘরেরই অপর এক ফ্রেমে আলোক সংস্থানের মুডকে চূড়ান্ত পালটে দেওয়া হলো। মিড ক্লোজ এ ফোর গ্রাউণ্ড এ অপর্ণা স্নিগ্ধ আলোকস্নাত কিন্তু ব্যাক এ অসীমকে মৃদু অন্ধকারের অন্তরালে যেন অন্য মানুষ দেখায়। সুতরাং অসীম যখন অপর্ণাকে বলে "আপনাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনি রিয়্যাল কি না", তখন গোটা প্যারাডক্সটা লাফ দিয়ে ওঠে। আর ঐ কথার প্রতিক্রিয়াতে অপর্ণার লজেন্স এগিয়ে দেওয়ায অসীমের কটেজ থেকে ব্যালকনি পর্যন্ত "নায়কোচিত" রোমান্টিক অভিযান ধূলিসাৎ হতে আর বাকি থাকে না।

অথচ অপর্ণা এখানে এমন এক চরিত্র যার মধ্যে ব্যক্তিক বেদনার গোপন ক্ষত বিদ্যমান। এবং (একই সঙ্গে) যে তার সংবেদন প্রত্যাশিত নয়। যদিও নিজস্ব দুঃখবোধের গণ্ডীতে সেও ধরনের বন্দীত্ব ও একাকিত্ব বহন করে তথাপি সমগ্র চলচ্চিত্রে এ চরিত্রে কণ্ঠস্বরে আবেগের বাষ্প খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় মেয়েটি নির্লিপ্তভাবে তার ডায়েরীর পাতা থেকে যেন কোন অতীত কাহিনী পড়ছে যার শ্রোতা এমন একজন যাকে কিছু তথ্যের দ্বারা সাহায্য দান নিতান্ত প্রয়োজন। কম্যুনিকেশন-এর এ এক অদ্ভুত যন্ত্রণাবিদ্ধ চেহারা। একজনের দাক্ষিণ্য অপরজনকে অচেনা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে। এখানে নেপথ্যে আদিবাসীদের লোকসঙ্গীতকে ফিরিয়ে আনা হয়। ওদের পাশাপাশি সমষ্টি জীবনের চলমানতা বেঁচে থাকে।

অপর্ণার ফেলে আসা কালো চশমার খোঁজে ওরা আবার চক্রাবর্তিত হয়ে ডাক বাংলোয় ফেরে। মেমারি গেম থেকে যে বৃত্তের শুরু তা প্রায় একই স্থান এসে শেষ হয়। কিন্তু ঐ কালো চশমার বোধ হয় আর কোন ভূমিকা থাকে না। তখন এক শিশুর কান্না শোনা যায়। চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় রিজেনারেশন প্রসঙ্গ এখানে বলা হয়েছে। অপরাধীর ভঙ্গিতে ওরা চুপিচুপি চৌকিদারের ঘরের দিকে এগোয়। একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে যে মানুষগুলো জন্তুর মতো মুক যন্ত্রণায় ধুঁকছে তাদের দিকে ওরা নীরব বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। জানালার গরাদের পিছনে অসীম আর অপর্ণাকে বন্দীর মতো দেখায়। এই অসাধারণ ডাবল-টেকএ মহৎ শিল্পীর মতো সত্যজিৎ রায় ইণ্ডিভিজ্যুয়াল ড্রামাকে কালেকটিভ ড্রামার সঙ্গে মিলিত করেন। অপর্ণার 'এত অসুখ জানতেন?' এই কথাটা যেন ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ থাকেনা। মনে হয় পরিচালক সমস্ত নগরজীবনের দ্বীপকেন্দ্রিক মানসিকতার মুখের ওপর এই জিজ্ঞাসা তুলে ধরেন। চৌকিদারের জন্য অপর্ণার বাবাকে অনুরোধ করার যে আপস তা মানবিক মমত্ববোধে পূর্ণ হয়ে ওঠে। ক্ষণিক এক ছান্দসিক দৃশ্যসঙ্গীতের মতো হরিণের দল অপর্ণা ও অসীমের দৃষ্টিতেই ধরা দেয়। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' কোথাও যদি পস্ট্যারিটির জন্য এগিয়ে থাকে তবে তা এইখানে।

হয়তো অরণ্যের ঐ হরিণের দল চিরদিনের মতো পলাতক। আর হয়তো কারেন্সি নোটের ওপর টেলিফোনের সংখ্যা লিখে যে কম্যুনিকেশন-এর প্রতিশ্রুতি তার মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তি আর মেক্যানাইজেসন-এর অদৃশ্য বিধানই নির্দেশিত। তবুও এটাই সবচেয়ে আশাবাদিতায় প্রোজ্বল কেননা এখানে দুটি মানুষ কাছাকাছি আসার জন্য তাদের মোহাবরণ ঘুচিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

'অরণ্যের দিনরাত্রি' থেকে সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রে এক নূতন অধ্যায়ের শুরু। এমন হতে পারে এ চলচ্চিত্র তার পরবর্তী চলচ্চিত্রের কথামুখ, কিংবা সমসাময়িক কাল ও মানুষ সম্পর্কে কোন ট্রিলজির প্রথম পর্ব। তবুও আর অপরাপর চলচ্চিত্রের মতো এখানেও তিনি সর্বকালীন উত্তরণে প্রয়াসী। এখনও তিনি বিস্ময়কারভাবে সৃষ্টিশীল এবং তিনি বিবর্তিত হয়ে চলেছেন। কেবল ভারতীয় চলচ্চিত্রে নয়, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রেও এটা খুব আশাপ্রদ মনে হয়।

অরণ্যের দিনরাত্রি

বিষ্ণু বসু

'অরণ্যের দিনরাত্রি' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭০-এ। এর আগে সত্যজিৎ সমকালীন যুবকদের নিয়ে ছবি করেছেন সামান্যই। পূববর্তী পনেরটি ছবির মধ্যে মাত্র তিন-চারটিতে তিনি বিষয় হিশেবে বেছে নিয়েছিলেন সমকালকে। সেগুলোর মধ্যেও যে সবসময়ে স্বস্তি বোধ করেছেন তা বলা যায় না। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'কাপুরুষ' এমনকি 'নায়ক'ও ব্যক্তির যন্ত্রণাতে সীমিত থেকেছে, তাদের শিল্পিত চেহারা দর্শকদের নন্দিত করেছে, কিন্তু কখনোই যুগের তীব্রগভীর প্রতিফলন ঘটিয়ে সমষ্টির নিজস্ব হয়ে উঠতে তেমন সক্ষম হতে পারে নি। 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' পর্যন্ত সত্যজিতের সঞ্চরণ, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, আমাদের আকর্ষণ করে ধ্রুপদী মননের গভীরে, সংহত আবেগের সমগ্রতায়। তাই 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর মত ফ্যান্টাসির অনন্য শিল্পকর্মের ঠিক পরেই যখন তিনি প্রবেশ করেন 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র সন্নিহিত বাস্তবতায় আমাদের প্রত্যাশা স্বভাবতই প্রচুর বেড়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন এটাই সে-প্রত্যাশা পরিতৃপ্ত হয় কি?

এ আলোচনায় ঢোকবার আগে খুচরো গুটিকতক তথ্য নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করা যেতে পারে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' সত্যজিতের শিল্পী জীবনের প্রায় মধ্যপর্বে সংলগ্ন। তাঁর নির্মিত আঠাশটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবির মধ্যে এটি ষোড়শ সংখ্যক। পঞ্চাশ ছোঁবার আগেই তিনি পরিচিত বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিশেবে। ভারতীয় চিত্রজগতে তিনি তখনই 'গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান'—বয়সের পরিমাপে নয়, চলচ্চিত্র নামক শিল্প মাধ্যমটির উপর অবিসংবাদিত আধিপত্যের সুবাদে।

রূপনির্মিতিতে সত্যজিতের অপ্রতিহত অধিকার 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে অবশ্যই প্রতিফলিত। এবং সেজন্যই আমেরিকার কোন কোন চলচ্চিত্র শিক্ষালয়ে ছবিটি 'টেক্সট' হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। আমেরিকায় এ ছবির সমাদর দেখে স্মিত ও বিস্মিত হয়েছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎও। পশ্চিমবঙ্গের চারজন যুবক, দুটি যুবতী ও একজন আদিবাসী তরুণী আমেরিকার দর্শকমনে কোন ধরনের তরঙ্গ তুলেছিল তার প্রমাণ রয়ে গেছে 'নিউ ইয়র্কার', 'ফিল্ম কোয়ার্টার্লি', 'সানডে অবজার্ভার' প্রভৃতি পত্রিকার প্রতিবেদনে। 'নিউ ইয়র্কার'-এ পলিন কায়েল এ' ফিল্ম সম্পর্কে লিখেছেন, 'No artist has done more than Satyajit Ray to make us re-evaluate the common place. And only one or two film artists of his generation - he's just past fifty - can make a masterpiece that is so lucid and so inexhaustily rich.' স্টুয়ার্ট বায়রন ও মার্গারেট মিনস্কমানও অন্য দুটি পত্রিকায় প্রায় একই ধরনের উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিলেন। স্টুয়ার্ট বায়রনের অভিমত অনুযায়ী 'অরণ্যের দিনরাত্রি' 'Confirms how far Ray has progressed since the relatively simplistic humanism of the Apu trilogy' এবং মার্গারেট মিনস্কমানের ঘোষণা এ ছবি 'perhaps his masterpiece

to date- certainly the most musical of his films.' প্রসঙ্গত তিনি মোৎসার্টের কথাও উল্লেখ করতে ভোলেন নি।

বিদেশে সত্যজিতের এ সমাদর, বিশেষ করে আমেরিকায়, আনন্দে আচ্ছন্ন করে আমাদের। এবং এ আচ্ছন্নতার ফলেই সম্ভবত লক্ষ রাখিনা আমাদের বোধ যন্ত্রণা সংস্কৃতি থেকে তাঁদের অবস্থান কতটা সুদূরের, শুধু ভৌগোলিক নয় মনস্কতায়ও। তাঁদের নজরে তাই তেমন ধরা পড়ে না কেন চারজন যুবক মেট্রোপোলিস কলকাতার অস্থিরতা থেকে হঠাৎ চলে গিয়েছিল অরণ্যে। সত্যজিতের কাছেও ধরা পড়েছিল কি?

সত্যজিতের এ ফিল্মের অবলম্বন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা একই নামের একটি উপন্যাস। ষাটের দশকের মধ্যভাগে সুনীল লিখেছিলেন এই উপন্যাসটি। সম্ভবত ১৯৬৬ র শারদীয়া 'জলসা' পত্রিকায় বেরিয়েছিল এটি। 'জলসা' একটি সিনেমা পত্রিকা। পরে অবশ্য বই হিসেবে বেরুতে দেরি হয় নি। সুনীলের মূল পরিচিতি তখনো কবি হিসেবেই, ঔপন্যাসিক সুনীল তখনো আজকের মত এতটা খ্যাতিমান হন নি। সত্যজিৎ যে তরুণ লেখকদের সম্পর্কে সচেতন ছিলেন 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র প্রতি মনোযোগ তার প্রমাণ। এ কাহিনীর চলচ্চিত্ররূপ নিয়ে তিনি যখন লেখকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সুনীল বিস্মিত হয়ে লক্ষ করেছিলেন গল্পের খুঁটিনাটিও সত্যজিতের নজর এড়ায় নি। এমনকি চারজন তরুণের পশ্চাৎপট ও মানসিকতা নিয়েও নানা প্রশ্ন তিনি লেখককে করেছিলেন। অ্যান্ড্রু রবিনসনের লেখা সত্যজিৎ-বিষয়ক ইংরেজি বইটিতে চারজনের অবস্থা, প্রকৃতি ও মনোভাব নিয়ে স্বয়ং সত্যজিতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রকাশ পেয়েছে।

এ বিশ্লেষণ প্রমাণ করে মূল কাহিনী ও তার স্পিরিট থেকে কতটা সরে এসেছিলেন সত্যজিৎ। এ সরে আসা লেখক সুনীলের আন্তরিক সমর্থন পায়নি। ইউ. এস. আই. এস-এর লিংকন রুমে এক সভায় সুনীল নাকি বলেছিলেন 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ও 'প্রতিদ্বন্দ্বী' তাঁকে হতাশ করেছে। ক্ষুব্ধ সুনীল মন্তব্য করেছিলেন চলচ্চিত্র যদি এতটাই সাবালকত্ব দাবী করে তাহলে অন্যের কাহিনী অবলম্বন করা কেন? একখানা ক্যামেরা নিয়ে সাদা পর্দার দিকে এগিয়ে গেলেই ত হয়, যেমন চিত্রশিল্পী যান ক্যানভাসের অভিমুখে। অ্যান্ড্রু রবিনসন অবশ্য জানিয়েছেন নিজের কাহিনীর এ ধরনের চিত্ররূপ দেখে shocked হলেও সুনীলের নাকি শেষ পর্যন্ত 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ফিল্মটি ভাল লেগেছিল।

লাগতেই পারে। যেমন লেগেছে দেশিবিদেশি অজস্র দর্শকের। কেননা চলচ্চিত্রের ভাষা ও ব্যাকরণ তথা ফিল্ম টেকনিকের উপর সত্যজিতের অসামান্য অধিকার নিজস্ব নন্দন সৃজনে সক্ষম। এ ফিল্মেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু ব্যাকরণে নিপুণ ও ছন্দে নিখুঁত হলেই গদ্য বা কবিতা শিল্প হয়ে উঠবে তা কি বলা যায়? এ নৈপুণ্য ও পটুত্ব নিশ্চয়ই আমাদের পৌঁছে দেয় ভাললাগার একটি স্তরে, তার বেশি বোধহয় নয়। সত্যজিৎ আসলে সুনীলের লেখার মূল স্পিরিটটিকে অগ্রাহ্য করেছেন। তাই চিত্রনাট্যে কাহিনীর বদল ঘটিয়েছেন এতটাই যাতে লেখকের অভিপ্রায় পুরোপুরি অস্বীকৃত হয়েছে। একজন ফিল্ম পরিচালক শিল্পের দাবী মেনে অবলম্বিত মূল কাহিনীর বদল বা বিস্তার ঘটাতেই পারেন, সে অধিকার তাঁর আছে কিন্তু তার স্পিরিটকে আহত করে নয়। 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত', 'চারুলতা' তার স্বাক্ষর বহন করছে। কিন্তু সুনীলের এ উপন্যাসের প্রতি চিত্রনাট্যের অভিগমন দূরান্বয়ী হয়ে থেকেছে। সুসমঞ্জস যথার্থ্যে তা মণ্ডিত হয়ে উঠতে

পারেনি। মূল কাহিনীর সঙ্গে চিত্রনাট্যটি মিলিয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের অজস্র নজির হাজির করা যায়। বর্তমান পরিসরে সে অনুপুঙ্খ আলোচনায় ঢোকার অবকাশ নেই। এখানে উল্লেখিত হবে শুধু সেসব মৌল অমিল, যাদের জন্য ফিল্মটি কাঙ্খিত অভিঘাত জাগাতে সক্ষম হয় না।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে চারটি তরুণের অনির্দিষ্ট যাত্রা দিয়ে। পয়সা থাকা সত্ত্বেও তারা ট্রেনে টিকিট কাটে নি। কেননা তারা ঠিক করেই রেখেছিল ট্রেনে যেতে যেতে যে জায়গাটি তাদের ভাল লাগবে সেখানেই তারা নেমে পড়বে। অবশ্য রেল কোম্পানীকে জরিমানাসহ ভাড়া দিয়ে। গন্তব্যস্থান স্থির ছিল না বলেই তারা টিকিট কাটে নি। জনৈক সহযাত্রীর আবেগমথিত অনুরোধে এভাবেই তারা নেমে পড়ে ধলভূমগড় স্টেশনে। চার তরুণ অসীম রবি শেখর সঞ্জয় কেউই বেকার ছিল না। তারা বেরিয়ে পড়েছিল শুধু কলকাতা থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও দূরে থাকবার ব্যাকুলতা নিয়ে। অ্যান্ড্রু রবিনসন অবশ্য লিখেছেন মূল উপন্যাসে নাকি চারটি তরুণই বেকার এবং সকলেই ভ্রমণ করছিল টিকিট বিহীন যাত্রী হিশেবে। রবিনসন সাহেব এ তথ্য কোথায় পেলেন কে জানে।

সত্যজিতের চার তরুণ কিন্তু এ ধরনের ভ্রমণে আদৌ বিশ্বাসী নয়। তাদের গন্তব্য ছিল নির্দিষ্ট, সাওতাল পরগণার পালামৌ। তারা বেরিয়ে পড়েছিল - রবিনসনের বক্তব্য অনুযায়ী — অসীমেব নতুন মোটরগাড়িটি ট্রায়াল ও প্রেমে ব্যর্থ হরিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। রবি কেন হরি হল তার অবশ্য কোন কারণ নেই। ফিল্মটি তোলার প্রায় আশি বছর আগে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' ভ্রমনকাহিনী তাদের প্রেরণা। অচেনা ধলভূমগড়ে অকস্মাৎ নেমে পড়ার সঙ্গে 'পালামৌ' পড়তে পড়তে যাওয়া তরুণদের মানসিক কোন সাযুজ্যই খুঁজে পাওয়া কঠিন। আপাত পূর্ণতার মধ্যেও যে অতৃপ্তি তাড়া করে চলছিল সুনীলের তরুণ চারজনকে, সে অতৃপ্তিত' আধুনিকতারই অসুখ। এ অসুখ আরো তীব্র হলেই দেখা মেলে আট বছর আগের একদিন-এর লোকটির। অথবা ঝলসে ওঠে 'লা দোল্‌চে ভিতা'-র সেই আত্মহননকারী পরিবারটি।

নিজস্ব ভরকেন্দ্র থেকে গোড়াতেই চ্যুত হবার ফলে চরিত্রগুলোর বদল ঘটে গুণগত। তারা আত্মবিশ্বাস খুঁজতে বেরিয়েছিল, বিশ্বাসহীনতাকে প্রশ্রয় দেবার জন্য। তারা চৌকিদারের চোখে ধুলো দিয়ে ডাকবাংলোর দরজা খোলায়, উৎকোচের মাহাত্ম্যকীর্তনের মধ্য দিয়ে নয়। চৌকিদারের অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি তাদের অসচেতনতা প্রকাশ পায় না, বরং তার উপরওয়ালাদের সঙ্গে চৌকিদারের চাকরি নিরাপত্তার প্রশ্নে ক্রুদ্ধ বিতণ্ডায় ব্যগ্র হতে তাদের বাধে না। লখা রবিকে মারে শুধু তাকে প্রহারের প্রতিশোধ নেবার জন্য নয়, আদিবাসী তরুণী দুলির সঙ্গে রবির সহবাস লখা ও তার সঙ্গীদের কাছে পৌরুষ ও মানবতার প্রতি অপমান হিশেবে প্রতিভাত হয় বলে। নাগরিক মানুষ ও জঙ্গলের অধিবাসীদের মধ্যে যে শ্রেণীগত মানসিক দূরত্ব তা যে আমাদের রাজনৈতিক নানা প্রকল্প দিয়ে কখনোই বিলুপ্ত করা যাবে না, সুনীল সে বিষয়টি বার বার আমাদের মনে করিয়ে দেন। গভীর মমতা ও বেদনার সঙ্গে সুনীল এ বিভাজন রেখাটিকে স্পষ্ট করে তোলেন। অনেকটা আন্তন চেকভের 'দ্য নিউ ভিলা' গল্পের মত, যদিও দুটি কাহিনীর পারিপার্শ্বিক স্বতন্ত্র। আদিবাসী এ মানুষগুলো সম্পর্কে সত্যজিতের অভিজ্ঞতা ও মনস্কতার

অভাবে লখা হয়ে ওঠে ছ্যাঁচোর, প্রহার-পিপাসু ও ছেন্তাইকারী এবং দুলি শুধুই মাত্র স্বৈরিণী। রবিকে মারবার সময় লখাকে তার সঙ্গীদের থেকে সংলাপ-সহ বিযুক্ত করলে তাদের অন্তর্গূঢ় ক্ষোভকে অগ্রাহ্য করা হয়। ঠিক তেমনি দুলি ও তার সঙ্গিনীদের ভাত খাবার গভীর দৃশ্যটি পরিত্যক্ত হলে দুলির সঙ্গে রবির মিলন মানবিকতা হারায়। দুটি আদিম ক্ষুধা কেন তাড়না করে দুলিকে, তার রহস্য আবৃতই থেকে যায় চলচ্চিত্রটিতে। তাই দুলির ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে স্বভাবত শান্ত তার সগোত্র পুরুষগুলোর উত্তেজনা স্বকীয় তাৎপর্য আহরণ করে নেয় উপন্যাসে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বড় মাপের উপন্যাস নয়। সুনীলও সম্ভবত এমন দাবী করেন না। কিন্তু একজন সংবেদনশীল কবি, যিনি কথাকার হবার জন্য বেরিয়ে এসেছেন, তাঁর কাছে সংসক্ত মানবিকতার ছোট ছোট ঘূর্ণিগুলো অনিবার্য ও অভীপ্সিত সত্য হয়ে ওঠে।

কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক সংস্কৃতির বিকাশে গ্রেট ট্র্যাডিশন ও লিটল ট্র্যাডিশন-কে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁদের অভিমত, উভয়ের সমানুপাত মিশ্রণই কোন দেশের সংস্কৃতিকে উন্নততর হতে সাহায্য করে। ভারতের মত গ্রামভিত্তিক সমাজে স্বভাবতই লিট্‌ল ট্র্যাডিশনের তুলনায় গ্রেট ট্র্যাডিশন পরিমাপের দিক থেকে নিতান্তই সামান্য। তার উপর আর্থনীতিক অসম বিকাশে এ দুটির পার্থক্য ও মিলনের সম্ভাবনা দুস্তর বলে এখনো মনে হয়। সুনীলের উপন্যাসটিতে এ বিভাজন একটি ব্যথাসম্পন্ন অনুভূতি বয়ে আনে। তাই ধলভূমগড়ে আদিবাসীদের সঙ্গে চার তরুণের মনোভাব ও আচরণ আবেগবিবিক্ত ঘটনাপুঞ্জ হয়ে ওঠে না। সুনীল যে খুব সচেতনভাবে তাঁর সৃজন প্রক্রিয়ায় এ পরিপ্রশ্নের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তেমন হয়ত নাও হতে পারে। কিন্তু তাঁর সংবেদনশীল কবিমন নির্ভুলভাবে দুটি ট্র্যাডিশনের ফারাককে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। ফিল্মে সত্যজিৎ প্রায় ঘষে ঘষে এ সূক্ষ্ম কারুকৃতিগুলো তুলে দিয়েছেন। তার ফলে উপন্যাসের মূল প্রেমিস ফিল্মে অনূদিত হবার সুযোগ তেমন পায়নি।

এর পরিণতি ফিল্মে হয়েছে সুদূর প্রসারী। সে আলোচনায় পরে আসা যাবে। তার আগে চারটি তরুণ কেন হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল অরণ্যের সন্ধানে তার খোঁজ খানিক করা যাক। আগেই বলা হয়েছে সুনীল উপন্যাসটি লিখেছিলেন ষাটের দশকের মাঝামাঝি। এটি লেখার তাৎক্ষণিক প্রেরণা হয়ত নিতান্তই বাইরের ছিল কিন্তু কোন লেখক যখন নিমজ্জিত হন সৃজ্যমানতায়, তখন নানাবিধ অবান্তরতা অতিক্রম করে প্রতিফলিত হয় জীবনের সত্য। এবং তা সমকালকে স্বীকার করেই। একটু আগ্রহী হলেই যে-কোন পাঠক এ চারজন তরুণের বাস্তব পরিচয় জানতে পারেন। এখানে অবশ্য তার দরকার নেই। শুধু মনে রাখতে হবে এ উপন্যাসটি লেখার সময় সুনীলের বয়স সবে তিরিশ পেরিয়েছে। তাঁর কৈশোর দেখেছে মন্বন্তর দাঙ্গা দেশভাগ। ওপার বাংলা থেকে এসে তাঁর কৈশোর আস্থা ন্যস্ত করেছিল যেসব মূল্যবোধের উপর, দেড় দশকের মধ্যেই অর্থাৎ তাঁর প্রগাঢ় যৌবনে তাদের ক্রমিক অবক্ষয় তাঁকে নিরাপদ নাগরিক সভ্যতার উপর দ্রুত বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। অথচ জীবিকার টানে ও মানসিকতায় অনেকের মত তাঁর টিকিও কলকাতায় বাঁধা। এখানেও লড়াই কেন্দ্রাতিগ্‌ ও কেন্দ্রাভিগ্‌ শক্তির সঙ্গে। তাই মরিয়া হয়ে তরুণরা বেরিয়ে পড়ে অনির্দেশ্য যাত্রায়। বাস্তবে হয়ত সুনীল ও তাঁর তিনবন্ধুই গিয়েছিলেন ধলভূমগড়ে বা কাছাকাছি অন্য কোন জায়গায় কিন্তু উপন্যাসটি ত' আসলে

সুনীলের আত্মপ্রতিকৃতির চতুর্বিধ প্রতিফলন। নিজেকে তিনি দেখেছেন, দেখিয়েছেন 'নানাখানা' করে। একালের এক অগ্রগণ্য কবির ভাষায় বুকপকেটের একটু নিচেই থাকে হৃদয়। অথচ কলকাতায় বুক পকেট সামলাতে সামলাতে তার কথা মনেই থাকে না।

তাই চার তরুণ ধলভূমগড়ে নেমে পড়ে কোন নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম ছাড়াই। সেখানেও অবশ্য তাদের বুকপকেট ছিল, বুকপকেট তথা মানিব্যাগে টাকাও ছিল এবং সেই সঙ্গে বুকপকেটের নিচে ছিল হৃদয়গুলো। তারা প্রত্যেকেই সেইসব হৃদয়ে বহন করে এনেছিল নিজস্ব অরণ্য। সম্ভবত সুনীলের অভিপ্রায় ছিল হৃদয়ের এ অরণ্যের সঙ্গে ধলভূমগড়ের অরণ্যকে সিন্‌ক্রোনাইজ করিয়ে একটি সিম্ফনি সৃজন করার। অন্তত বর্তমান নিবন্ধলেখকের এটাই মনে হয় 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাসটি পড়ে। সত্যজিৎ এ চার তরুণের ভেতরকার অরণ্যকে অগ্রাহ্য করেছেন। কোন্ যন্ত্রণায় তারা বেরিয়ে পড়েছিল কলকাতা থেকে, ছাড়া পেতে চেয়েছিল কোন্ অনির্দেশ্যতায়, সত্যজিৎ সেসব পরিস্থিতি এড়িয়ে গেছেন সযত্নে। তাই সত্যজিতের 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে চার তরুণ কলকাতা থেকে নির্গত হয় নতুন মোটর গাড়িতে করে সৌখিন যাত্রায় 'পালামৌ' পড়তে পড়তে। হরির প্রেমে ব্যর্থতা ফ্লাশব্যাকে দেখানো হয় তার প্রণয়িনী তপতীর মাথায় পরচুলা ধরে ফেলার পরিণতি হিসেবে। অসীমকে নিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকও বহন করে না তেমন ইঙ্গিতময়তা। সবটাই যেন মার্জিত, পোষাকি ভদ্রতায় মোড়া।

এ হেন মানসিকতার মধ্যে যখন চার তরুণের সঙ্গে দেখা হয় জয়া ও অপর্ণার। অচিরেই তারা হয়ে ওঠে নাগরিক জীবন থেকে খানিক সময়ের জন্য ছিটকে এসেও নাগরিকতার কাছেই আত্মসমর্পনের ব্যাকুলতায়। ব্যাকুল তাই তারা দ্রুত জড়িয়ে পড়ে পিকনিক, মেমারি গেম প্রভৃতি নিতান্ত সাদামাটা ব্যাপারে। মেমারি গেম খেলার সময় অবশ্য সত্যজিৎ ক্যামেরা যে কৌশল প্রয়োগ করেন তার শিল্পগুণ অসামান্য। তবু ফিল্ম টেকনিকের উপর তাঁর অপ্রতিহত আধিপত্যও দৃশ্যটির অকিঞ্চিৎকরতাকে বাঁচাতে পারে না।

চারজন তরুণ ও তিনটি রমণী। উপন্যাসে এ সমস্যার সমাধান সুনীল করেছেন যে পদ্ধতিতে, সত্যজিতের তা পছন্দ হয় নি। .হরি ও দুলিকে নিয়ে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। তাই বাকি রইল একদিকে অসীম সঞ্জয় শেখর, অন্যদিকে অপর্ণা ও জয়া। অপর্ণা ও জয়ার পারিবারিক সম্পর্কের খানিক বদল ঘটানো হয়েছে। তাতে অবশ্য অসুবিধে হয় না। কিন্তু অতিসবলীকৃত সমাধানে বিশ্বাসী সত্যজিৎ গোড়া থেকেই শেখরকে ক্লাউন করে রেখেছেন সম্ভবত রবি ঘোষকে এ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য স্থির করে। তাই তার জন্য কোন রমণীর ব্যস্ত হবার আর সুযোগই থাকে না। অতএব অসীম-অপর্ণা ও সঞ্জয়-জয়া জোড় বাঁধায় আর বাঁধা রইল না। কত সহজে মাত্র দিন দুয়েকের মধ্যেই মসৃণভাবে তাদের মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠল। কোন জটিলতা নেই, টানাপোড়েন যেটুকু আছে তা-ও বাইরের এবং যেন নিয়ম মেনে ; একটির পরিণতি হল বিভেদের ও অন্যটি মিলনের সম্ভাবনা জাগিয়ে।

জয়া সঞ্জয়ের কথাই ধরা যাক। সঞ্জয়ের ভীরু অন্তর্মুখীনতা ও বিধবা জয়ার যৌন আকুতির মধ্যে সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছেন সত্যজিৎ। কিন্তু ফিল্মে এ প্রশ্নের উত্তর নেই যে কোন্ মানসিক অভিঘাতে জয়ার অভিব্যক্তি এবম্বিধ হবে? মোমোরিগেম খেলতে

খেলতে জয়ার হাতে মাথা ঠেকিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়া, তার জন্য সঞ্জয়ের বালিশ এনে দেওয়ার আড়ালে তবু রয়েছে কিছু যুক্তি-শৃঙ্খলা। কিন্তু মেলা থেকে ফিরে পড়ন্ত অপরাহ্নে কফি খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে খালি বাড়িতে এনে জয়ার নিঃশর্ত আত্মনিবেদনের মধ্যে কোন মানসিক ব্যাপারই ছিল না। ছিল শুধু যৌনবুভুক্ষু রমণীর নিঃসংকোচ উন্মোচন। সঞ্জয় অবশ্য তাকে গ্রহণ করতে পারে নি। সে চরিত্রবান অথবা পৌরুষ প্রমাণ করবার জন্য নয়, শুধুমাত্র স্বভাব ভীরুতার জন্য। সঞ্জয়ের এধরনের সংকোচের অভিব্যক্তি অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু জয়া কেন অকস্মাৎ যৌনকামনায় এমন জ্ঞানবিহীন হয়ে উঠল? সে যে সমাজে বিচরণ করে সেখানে কি কাম্য পুরুষ নেই? অথবা সেখানে তেমন সুযোগ পায় না বলে এ অরণ্য নির্জন পরিবেশে দুর্মদ হয়ে উঠল? যে কারণটাই আড়ালে থাক না কেন জয়ার অভিব্যক্তি ফিল্মের এ পরিস্থিতিতে শিকড়বিহীন হয়ে দেখা দিয়েছে। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রম মেনে শারীরিক সংস্পর্শ স্থাপনের জন্য নরনারীর আচরণে যত তির্যকতাই থাক না কেন, তার মধ্যে একান্ত জরুরি হল যুক্তির বুনোট। জয়ার আচরণে যুক্তির এ বুনোট রয়েছে কি?

উপন্যাসে কিন্তু জয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে শেখরের। জঙ্গলের মধ্যে জয়ার কোলে মাথা রেখে শেখর তাকে অনুভব করতে চেয়েছে মজ্জায় ও মননে। নারী হিশেবে জয়ার ব্যর্থতা ও ব্যথার মূল কোথায়, কেন তার স্বামী আত্মহত্যা করেছে প্রবাসে, এতে তার ব্যক্তিত্বের অপমান কতটা, সেসব বিছানায় স্বগত উচ্চারণে স্পর্শ করে গেছে শেখরকে। এখানে পরিবেশ এমনই ছিল শেখর ও জয়াব শরীর সংযোগ অস্বাভাবিক হত না। সুনীল সে পরিস্থিতি অগ্রাহ্য করেছেন যেন অরণ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই। তখন তারা যথার্থই যাপন করছে অরণ্যের দিন, অরণ্যের রাত্রি —প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করার তীব্রতা নিয়ে। অরণ্য-ত এখানে বাইরে নয়, রয়েছে নিজেদেরই অভ্যন্তরীণ সরল গভীর জটিলতায়। সত্যজিৎ এর নির্যাসকে স্পষ্টতই অবহেলা করে গেছেন।

অপর্ণা অসীম-ত আরো উচ্চাবচতাবিহীন। এ যেন সত্যজিতেরই পুরোনো একটি ফিল্মে উপস্থাপিত মনীষা-অশোকেরই পরিবর্ধন। যদিও জটিলতাহীন। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় ছিল ব্যানার্জি-মনীষার কোর্টশিপের মধ্যে অশোকের আগমন, প্রেম ও নিরাপত্তার মধ্যে কোনটা বেশি কাম্য, এ সমস্যা হিমালয় কেমন করে প্রবলপ্রতাপ ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর মত কর্তৃত্ব-পরায়ণ ব্যক্তিত্বকে নামিয়ে আনে অন্যদের স্তরে। এ পরিবেশে অশোককে মনীষার বন্ধু হিসেবে স্বীকার একটি লিরিক্যাল অনির্দেশ্যতা এনে দেয়। তখন আর জিজ্ঞাসা জাগে না কলকাতায় ফিরে অশোক-মনীষার অন্তরঙ্গতা কোন স্থায়ী চেহারা পেয়েছিল কিনা। বিদায় মুহূর্তটি তখন অন্যন্তর সম্ভাবনায় নিমজ্জিত থাকে। অশোক-মনীষার কথোপকথনে ছিল না কোন সযত্নপ্রয়াস, নির্মিতিতেও অনুপস্থিত ছিল কৃত্রিমতার ক্লেশ।

'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে অসীম গোড়া থেকেই অপর্ণাতে আকর্ষিত। যেন দুজনের ঘনিষ্ঠতা পূর্ব নির্ধারিত। গোড়ায় অপর্ণার আপতিক ঔদাসিন্য, আউট হাউসে অপর্ণার ঘরে অসীমের উপস্থিতি, মেমারিগেমে অসীমের কাছে অপর্ণার স্বেচ্ছায় হার স্বীকার, সবটাই যেন সরলতার বিস্তার। তাই তাদের একসঙ্গে মেলায় বেড়ানো, নির্জনতা খুঁজে পরস্পরের কিছু কথা বলা প্রভৃতি প্রায় সবটাই সাজানো মনে হয়। তাই একবেলার মধ্যেই 'রহস্যময়ী' অপর্ণা আপনি থেকে তুমি-তে নেমে আসে অনায়াসে। দাদার আত্মহত্যা,

মায়ের আগুনে পুড়ে মৃত্যু, অতীতের হরিণদের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতির খবরও আর তেমন জৈব হয়ে ওঠে না। রাতের অন্ধকারেও অপর্ণার রহস্য তখন অপসৃত। তাই বিদায় নেবার সময় অপর্ণাকে অসীমের লাইটারের আলোয় রহস্য মেখে নিতে হয়। পাঁচ টাকার নোটে টেলিফোন নম্বর লিখে অসীমকে দেয় ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। তখন অনির্দেশ্যতার কোন ফাঁক দর্শকদের কল্পনার খামতি পূরণ করবার জন্য অপেক্ষায় থাকে না।

এ ফিল্মে অরণ্যের 'দিন' না হলেও 'রাত্রি'-র ঘনিষ্ঠ মুখোমুখি হবার সুযোগ একবার পেয়েছিল অবশ্য চার তরুণ। দ্বিতীয় রাতে মহুয়া খেয়ে ফেরার সময় পথের উপর দিয়ে মাতলামি করতে করতে ফিরছিল তারা। সকলেরই খালি গা। টুইস্ট নাচছিল। এমন সময় তাদের গায়ে পিছলে পড়েছিল জয়া-অপর্ণাদের গাড়ির হেডলাইটের আলো। তরুণরা জানত না গাড়ির মধ্যে রয়েছে সকালে লব্ধ নতুন বান্ধবীরা। তাদের নাচ আরো উদ্দাম হয়ে ওঠে। নাচ দেখে জয়া লজ্জা পায়, জিভ কেটে চোখ বন্ধ করে কুঁকড়ে পিছিয়ে যায় সে। অপর্ণা কিন্তু পুরো দৃশ্যটি উপভোগ করে, গাড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে নাচ দেখতে থাকে। জয়া হুকুম করে 'এই ড্রাইভার, হেডলাইট অফ্ করো—।' অপর্ণা প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'নেহি নেহি, রহনে দেও—।' তাই বাতি জ্বলেই থাকে এবং চার তরুণের মাতলামি চলতেই থাকে। বরং অসীম ভাল করে নাচ দেখাতে দেখাতে চেঁচিয়ে বলে, 'জান্‌তা হ্যায়, হামলোগ কৌন হ্যায়? হামলোক সব ভি. আই. পি. হ্যায়। — ভেরি ইম্‌পোটেন্ট পীপল —।' পুরো দৃশ্যটিতে এমন একটি আবছায়া গভীরতা ও নিস্ফলতার আর্তনাদ রয়েছে যা দর্শকদের বিদ্ধ করবার ক্ষমতা রাখে।

উপন্যাসে পরিস্থিতিটির বিবরণ ফিল্মের অনুরূপ নয়। সেখানে রবি শেখর প্রভৃতি পুরোপুরি নগ্ন হয়ে পথচলতি ট্রাকের আলোর সামনে পড়েছিল। লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্য তারা পথের পাশে ঝাঁপ দিয়েছিল, ফলে আহত হয়েছিল রবি। ফিল্মে পরিস্থিতির পরিবর্তন নতুন মাত্রা এনেছে, ট্রাক ড্রাইভারের বদলে জয়া-অপর্ণার গাড়ির সামনে নাচ অনেক অর্থবহ। কিন্তু এখানেও সত্যজিতের কাছে সুনীলের দাবী বোধহয় সঠিক ছিল। সুনীল চেয়েছিলেন তরুণরা এ পরিস্থিতিতেও নগ্ন হয়েই নাচুক। সত্যজিৎ রাজি হন নি। তাঁর ধারণা ছিল তাহলে দৃশ্যটি সেন্সরে আটকাবে। সুনীলের যুক্তি ছিল এ নগ্নতা-ত পুরুষদের, তাই সেন্সরের আপত্তি থাকার কথা নয়। হয়ত এবিষয়ে সত্যজিতের ধারণা সঠিক আবার সুনীলও সঠিক হতে পারেন। তবু পরখ করে দেখায় ক্ষতি ছিল না। ফিল্ম টেকনিকের উপর আধিপত্য যাঁর অবিসংবাদিত, তাঁর কাছে এ সমস্যার সমাধান তেমন কঠিন ছিল কি? তাহলে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' সম্ভবত ঘনিষ্ঠতর সত্য হয়ে উঠত। নগ্নদৃশ্যকে ভয় পান সত্যজিৎ। নগ্নসত্য প্রকাশেও সাহস ছিল কি? নগ্নসত্য শিল্পজারিত হলেও? বোধহয় না।

যে সব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে —

১। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ঃ জঙ্গলের দিনরাত্রি (শারদীয়া আজকাল ১৩৯৪)

২। Chidananda Dasgupta : Satyajit Ray (film India 1981)

৩। Andrew Robinson : Satyajit Ray - The Inner Eye (Rupa & Co. 1990)

প্রতিদ্বন্দ্বী ঃ তাৎপর্যপূর্ণ ছবি

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম-সময়কে ধরার সফল চেষ্টা করেন সত্যজিৎ রায় 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে (১৯৭০)। এই জন্য তিনি কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করেন এবং তাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্র, যদিও মধ্যবিত্ত মানসিক জমির ওপর দাঁড়িয়েই সমগ্র সমস্যাকে পর্যবেক্ষণ করে, আলোড়িত হয়— তার অংশ হয়ে পড়ে। সে নিপীড়িত হয়, একটা সমাধান খোঁজে অবিরলভাবে, অন্তত একটা বিশ্বাসের স্পর্শ চায়। সোজাসুজিভাবে তার কাছে একটা পথ খোলা থাকে— চরম মানসিকতার পথ। সোজাসুজিভাবে সে পথে যেতে পারে না। কিন্তু তার বেঁচে থাকার সমস্যা চূড়ান্ত হয়ে ওঠে, তাকে টেনে নিয়ে যায় কলকাতা থেকে বালুরঘাট। আর আশ্চর্য, তার এক চরম প্রতিক্রিয়ার পরই। মোটামুটিভাবে বিষয়ের এই স্বরূপকে সত্যজিৎ ধরেন নিপুণ আঙ্গিকে, তাঁর সর্বার্থে আধুনিকতম আলোচ্য ছবিটিতে। যে ভাবেই হোক প্রতিদ্বন্দ্বীকে একটি মহৎ চিত্র মনে করা হয়েছে, এবং এই ছবির বিস্তৃত আলোচনা— পুনরুক্তি না হলে—তাৎপর্যের নতুন নতুন জানালাই খুলে দেয়।

কলকাতাকে কেন্দ্র করেই এই ছবি। সদ্য-পিতৃহীন চাকুরিপ্রার্থী সিদ্ধার্থের কাছে সমস্ত কলকাতা শহর যেন প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা নেয়। তার বাস-ট্রাম-ট্রাফিক-ভিড় সামনের জটিল জমিটাকেই জানিয়ে দেয়। প্রথম ইন্টারভিউ-এর সুযোগে অফিসের ওয়েটিং বেঞ্চে আরও অনেকের সঙ্গে আমরা তাকে দেখি। পরিচালক ক্যামেরাকে তার কাছাকাছি রাখেন অনেকক্ষণ। সে তার প্যান্ট রিফু করে আসে। ইন্টারভিউ-এ নিজের মতামত বুদ্ধিমানের মতো বলে। কিন্তু কিছু পরেই সে বুঝতে পারে যাদের মুখোমুখি সে হয়েছিল সেখানে তার মতামত, নিজের মতো করে ভাবা, কী পরিমাণ অর্থহীন। সে হন্যে হয়ে ঘোরে, কখনও বসে কোথাও ক্লান্তিতে। তার চারপাশে ভিখিরি আর হিপি-কন্টকিত অহেতুক কলকাতা। তার কিছু ভালো লাগে না। সে সিনেমায় যায়। ভারতের আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি, প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ যাতায়াত ইত্যাদি দলিলচিত্রের পর তার ঘুম পায় এবং ঘুম ভাঙে সশব্দ চমকে — সিনেমায় বোমা ফাটে। চরম মানসিকতার কলকাতায় সিনেমাও বুঝি আর কিছুক্ষণের আকাশ-পাতাল কাহিনী রচনা করতে পারে না, বুনতে পারে না কিছুক্ষণের মায়াজাল। সে প্রভাবিত হয়, চকিতে ফিরে আসতে হয় বাস্তবে। তার হাতঘড়ির ক্ষতি হয়। বোঝা যায় সত্তরের সমস্যাজীর্ণ কলকাতার ব্যালান্স ঘড়িটার মতোই বিনষ্ট।

তার ব্যক্তিগত জীবনেও সম-সময় দুঃসহ সংকট নিয়ে আসে। সিদ্ধার্থের কিছু বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সে তার ধনী বন্ধুটিকে ঘরে বসে রেডক্রশের পয়সা চুরি করতে দেখে, সে আহত হয় ; বন্ধুটিও তাকে, একটি বেকারকে, আর বিশ্বাস করে না। আর-এক বন্ধু তাৎপর্যহীন বিদেশি ছবি দেখে কোনো সিনে সোসাইটির সেন্টারে। প্রথম বন্ধুটির সঙ্গে আরও কিছু সময় তাকে কাটাতে হয়। সে সিদ্ধার্থকে নার্স কল-গার্লটির বাড়িতে নিয়ে

যায়; সেখান থেকে সিদ্ধার্থ পালিয়ে আসে। পণ্য-মূল্যের মতো এই সেক্স-জীবনকে সিদ্ধার্থ মেনে নিতে পারে না। সে চায় বন্ধুত্ব, মমত্ব। এইদিক থেকে তার প্রেম তার জীবনের অংশ হয়ে পড়ে।

পারিবারিক জীবনে তার কাছে সমস্যা দুভাবে হাজির হয়। প্রথমত তার বোন দ্বিতীয়ত, তার ভাই। তার বোন কেরিয়্যারিস্ট, নিজের বসকে সঙ্গ দেয়, মডেল হবার বাসনা রাখে। খোলা আকাশের নিচে ছাদে যখন তার বোন, ছোট বোন, তাকে বল-নাচ দেখায়, 'দাদা, আমি নাচ শিখছি,' তখন বোধ করি অসীম শূন্যতা দূরে বসা সিদ্ধার্থকে ছেয়ে ফেলে, আর ছেলেবেলার কথা বৃথাই মনে হয়। সে বোনের বসের বাড়ি যায়। তাকে গুলি করবে ভাবে, অর্থাৎ স্বপ্ন দেখে। সিদ্ধার্থ যা ভাবে তা করতে পারে না। কিন্তু তার ভাই টুনু অন্যরকম। তার পায়ে ক্ষতচিহ্ন, মাথায় চরম ভাবনা চিন্তা, আর চূড়ান্ত কিছু বিশ্বাস। সে-ই সিদ্ধার্থকে সম-সময়ে তার স্থান কোথায় সে-বিষয়ে সচেতন করে দেয়।

সিদ্ধার্থের ক্ষেত্রে এই সচেতনতা আনেন পরিচালক দুর্ধর্ষ কৃতিত্বে, স্বপ্নের সেই দৃশ্যতে। এই দুটি দৃশ্যকে সিদ্ধার্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের ইন্টারভিউ-এর ভূমিকাও বলা যায়। প্রথম স্বপ্নদৃশ্যটিতে ফরাসি বিপ্লবের সময়কার গিলোটিন যন্ত্র যেন সিদ্ধার্থের গলায় চেপে বসে তার অবচেতনের ভয়াবহ যন্ত্রণাকেই জানায়, এস্টাবলিশমেন্ট-অধিকৃত শহরে তার স্থান তার পরিণতিকেই জানায়। দ্বিতীয় স্বপ্নদৃশ্যটিতে তার ভাইকে, বিপ্লবী টুনুকে, সমুদ্র-সৈকতে মৃত্যুর মুখোমুখি দেখা যায়। সারিবদ্ধ একটি সশস্ত্র শ্রেণী একবার, দুবার, তিনবার, বহুবার হয়ে যায়। মৃত্যু আসে টুনুর বুকের ওপর। টুনু পড়ে যায় এবং এক ঝাঁক পাখি ওড়ে। যেন চেতনা ছড়িয়ে যায়। একজন নার্স প্রথমে তার বোন, পরে তারই প্রণয়ী, টুনুর দেহটাকে তুলে নেয়। যেভাবেই হোক, এই স্বপ্নতে সিদ্ধার্থ মুক্তির একটি পথ, বিপ্লবী পথ সম্বন্ধে সচেতন হয় ও তার ভবিষ্যৎ আন্দাজ করার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় ইন্টারভিউ-এর আগে এই স্বপ্নদৃশ্য দুটি আসলে প্রস্তুতি। এই ইন্টারভিউ-এর শেষ পর্যায়েই সিদ্ধার্থের প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া আমরা দেখি। তার আগে পরিচালক দেখিয়ে নেন বস্তি, দারিদ্র, হিপিদের পরস্পর বিরোধী কলকাতা এবং ইন্টারভিউ বোর্ডের সেই অমানবিক আচরণের আগে অপেক্ষমানদের শরীরের কঙ্কাল দেখান। অর্থাৎ, তাদের নূন্যতম মানবিক না-হোক শারীরিক চাহিদাটুকু প্রতিষ্ঠা করেন। বিক্ষোভে ফেটে পড়ার পর সিদ্ধার্থের চলে যাওয়ার পথে আমরা বিপ্লবী চিহ্ন আর ঘোষণার প্রতিবিম্ব দেখি সিদ্ধার্থকেও শেষ পর্যন্ত সেই পথের মধ্য দিয়েই যেতে হয়। যেভাবেই হোক তার বালুরঘাট যাত্রা মিশ্র তাৎপর্য পায়, তার কলকাতা ছেড়ে যাওয়াও। এখানেই তার কাছে মৃত্যু এবং জীবন পরস্পর এগিয়ে আসে দুটি প্রতীকে — রাম নাম সৎ হ্যায়, আর পাখির ডাকে — এবং শেষ পর্যন্ত পাখিই ডেকে যায়। ধরে নেওয়া যেতে পারে মৃত্যুদৃশ্যটি সিদ্ধার্থের কাছে গত জীবনের অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত, আর পাখির ডাক তার বর্তমান তথা বালুরঘাট তথা ব্যাপক বাংলা ও বিশ্বাসের ভূমিকা।

'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে সত্যজিৎ চিত্রনাট্য, ফর্ম, দর্শকের বোধের বিস্তার অপূর্ব কৃতিত্বে তুলে ধরেন। ছবির প্রথমে এবং পরিশেষে দুটি মৃত্যু — দুটি সূচনাই বলে দেয়। মধ্যবর্তী সময়ে দুটি ইন্টারভিউ। প্রথম ইন্টারভিউ-এর পর থেকেই তার ব্যক্তিগত বেঁচে থাকার প্রশ্ন

আঘাত খায় ; তার পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত বোধ বিশ্বাসহীনতা, মূল্যবোধশূন্যতার মুখোমুখি হয় — ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে সাধারণ কিছু ধারণায় সে আসতে চায় এবং একটি বিশেষ পথই তার কাছে স্পষ্ট হয়; সবটাই শহর কলকাতায়। দ্বিতীয় ইন্টারভিউ আর আকস্মিক থাকে না। যেমন আকস্মিক থাকে না শেষ দৃশ্যের পাখির ডাক। এর জন্য সত্যজিৎ সিদ্ধার্থের কাছে সেই পাখি, বিশ্বাস ও জীবনের আকৃতির মূল্যটিকে প্রতিষ্ঠা করেন একাধিক দৃশ্যে।

নিপুণ মুন্সিয়ানার এই রকম অসংখ্য দিক ছাড়াও সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বক্তব্যে, প্রচেষ্টায় এবং সফলতায় ইদানীংকালের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছবি বলা যায়।

সত্যজিৎ রায়-এর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ঃ একটি নবভাষ্য

সুমন্ত চৌধুরী

'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ', 'জন-অরণ্য' — এই তিনটি ছবি নিয়ে সত্যজিতের কলকাতা-ট্রিলজি। ছবিগুলিকে বেঁধে রেখেছে কলকাতার নাগরিক জীবনের একটি তথ্যমূলক থীম্। থীম্‌টি আভাসিত হয়েছে ঘড়ির চিত্রকল্পের মাধ্যমে। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিটিতে সিদ্ধার্থের চাকরি পাওয়ার দশদিনের গল্পটিকে সময়ের বন্ধনীর মধ্যে এনেছে একটি ছোট্ট ঘটনা — হাত থেকে প'ড়ে গিয়ে ইন্টারভিউ-এর সময় সিদ্ধার্থের ঘড়িটি বিকল হ'য়ে গিয়েছিল। শেষের দিকে ঘড়িটি আবার সারিয়ে আনা হয়। 'সীমাবদ্ধে'র প্রথম দিকে টুটুল যখন এলো, তার জামাইবাবু একটি অব্যবহৃত ঘড়ি তাকে ব্যবহার করতে দেয় ; এবং শেষ দৃশ্যে টুটুল তার চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি জানায় ঘড়িটি আস্তে আস্তে টেবিলের উপর খুলে রেখে। 'জন-অরণ্যে' ঘড়ির চিত্রকল্পটি ফিরে আসে একটি স্বচ্ছ ঘড়ির আকারে।

চিহ্নবিজ্ঞানের ভাষায়, ঘড়ির চিত্রকল্পটিকে সময়ের আইকন ও ইন্‌ডে' ব'লে অভিহিত করা চলে। কেননা, যখন চিত্রকল্পটির উপর ন্যারেশনের ওজনটি ন্যস্ত হয়, তখন ঘড়ির চিহ্নটি দ্যোতনাবাহী হয়ে ওঠে। টুটুল সীমাবদ্ধে সত্যজিতের স্পোক্‌স-ওম্যান সে যখন ঘড়িটি তার জামাইবাবুকে প্রত্যর্পণ করে, গল্পের জোরে সেই ঘটনাটি প্রতীকধর্ম্মী হ'য়ে ওঠে। ইতিমধ্যেই, টুটুল জেনে ফেলেছে তার জামাইবাবুর ওপরে-ওঠার কাহিনী, যে কাহিনীতে সে স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছে নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা ঘোষণা ক'রে। শেষদৃশ্যে, টুটুলের ঘড়ি খুলে রাখার মধ্যে যেন সত্যজিতেরই কণ্ঠস্বর ফুটে ওঠে — আমি এই কপটচারী সময়ের কেউ না। 'জন-অরণ্যে' দালালটি (রবি ঘোষ) স্বচ্ছ ঘড়িটি মেলে ধ'রে সময়ের উপরেই একটি বিপ্রতীপ মন্তব্য করে — এই সময়ের ভিতর-বাহিরে কোনো আব্রু নেই, গভীরতা নেই ; কপটাচার এখন সময়ের সুহৃৎ।

ঘড়ির চিত্রকল্পটির মাধ্যমেই যেন আমরা পেয়ে যাই ৬০-এর দশকের শেষ থেকে সত্তরের মধ্যবর্ত্তী সময়ের উপর সত্যজিতের সচেতন মন্তব্য — 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে সময় বিকল, 'সীমাবদ্ধে'-'জনঅরণ্যে' সময় কপটাচারের সুহৃৎ। ঘড়ির চিত্রকল্পটির ধারাবহিকতাই এই চিত্রকল্পটির যাবতীয় সম্ভাবনাকে গল্প বলার মাধ্যমে থীমাটাইজ্ ক'রে চলে।

'প্রতিদ্বন্দ্বী'র নায়ক সিদ্ধার্থ একটা সংকটের মধ্যে আছে, চাকুরি না পাওয়ার গতানুগতিক সংকটকে ছাপিয়ে এই গভীরতর সংকট তার দ্বিধাদীর্ণ মানস-সত্তাকে আভাসিত করে। যখন ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল তখন সত্যজিৎকে সমালোচিত হ'তে হয় সিদ্ধার্থকে তাঁর গল্পের নায়ক নির্বাচন করার জন্যে। কারোর কারোর মতে সিদ্ধার্থের ভাই, যে সম্ভবতঃ কোনো extremist দলের সদস্য, সে-ই সেই সময়ের উপযুক্ত নায়ক। সত্যজিৎ উগ্র বামপন্থীদের ইন্‌ফ্যান্টিলিজমের উপর চমৎকার মন্তব্য করেন যখন দেখান

গ্যেভারার ছবি দেখতে দেখতে কিভাবে সিদ্ধার্থের মানস দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে শ্মশ্রু-গুম্ফ সজ্জিত, গ্যেভারার আদলে, তার নিজের প্রতিবিম্বিত বিপ্লবী-সত্তা। বিপ্লবী ভঙ্গিতে তাকায় সিদ্ধার্থ, যেন গোঁফ গজানো বিপ্লবের চেয়েও আরো জরুরী।

সত্যজিৎ এই ছবিতে উগ্র বাম আন্দোলনের মূল চিত্রটি সযত্নে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন তির্যকভাষণের মাধ্যমে। সিদ্ধার্থ যে কন্‌ফিউজড — চাকরি পাওয়াটা যে কোনো সমাধান নয়, প্রাতিষ্ঠানিকতার কাছেই আত্মসমর্পণ, সে কথা তার ভায়ের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যেই ফুটে ওঠে। উগ্র বামদের আত্মত্যাগের মানসিকতা, দৃঢ় প্রত্যয় সত্ত্বেও, সিদ্ধার্থের স্বপ্ন-দুঃসপ্নের দৃশ্যগুলির মধ্য দিয়ে একটি অভাবিত সমীকরণ ফুটে ওঠে—সিদ্ধার্থের ভাই-এর উগ্রবাম রাজনীতি আর তার বোনের কন্‌জিউমারিজম পরস্পরের উল্টোপিঠ এই দুজনের ইডিওলজিই আশ্রয় ক'রে আছে একই imaginary identitarianism-কে, যা এক অর্থে অপরিণত মানসিকতার নামান্তর। সেই কল্পবিলাস থেকে সিদ্ধার্থও মুক্ত নয় ; গিলোটিনের কথা শুনে তার মনে উদয় হয় একাধারে আত্মধিক্কার আর সযত্নে লালিত আভিজাত্য-প্রীতি — যা প্রকাশ পায় তার দুঃস্বপ্নের ইচ্ছাবিলাসে। বোনের সম্ভ্রমরক্ষার ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে গিয়ে কল্পলোকে সেও বন্দুক ধরে, কিন্তু মসৃণ আদ্দির পাঞ্জাবির উপর সুশোভিত সোনার বোতামে চোখ আটকে যায় তার, খসে পড়ে ছাত্রজীবনের র‍্যাডিকাল নামাবলী, আমতা আমতা ক'রে কথা বলে প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বেব সামনে।

সেও বিদ্রোহ করে, যদিও বিপ্লব নয়। ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে কলকাতা থেকে রেলেব চাকার দুর্মুশে আর্ত্তনাদ করে ওঠে তার চাপা পড়া অসন্তোষ, অভিমান, ক্ষোভ। এবং ফিরে পায় নিজেকে একটি আত্যন্তিক ব্যক্তিগত প্রতীকের মাত্রায় — সেই নাম না জানা পাখীর ডাক যা তাকে বেঁধে দিয়েছিল বাল্যের সোনালী ভোরে ভাই আর বোনের সঙ্গে সহমর্মিতার বন্ধনে। সেই ব্যক্তিগত অনুসঙ্গটি বাস্তবের চাপে অবশেষে স্ফূর্ত্তি পায় বালুরঘাটের হোটেলে। আগের দৃশ্যেই যাকে দেখেছি জানালার গরাদের আড়ালে অন্তরীণ, পাখীর ডাকে সে পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসে; সামনে প্রাকৃতিক সকাল, অনৈসর্গিক আলো আর দূরে ভেসে যাওয়া ধ্বনি ঃ 'রাম নাম সৎ হ্যায।'

উগ্রবামপন্থীরা এই দৃশ্যে সত্যজিতের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁদের চোখ দৃশ্যটির রেফারেন্সিয়াল তাৎপর্যের বেশী আর কিছুই দেখতে পায়নি। সিদ্ধার্থের চিঠির মাধ্যমে আত্মকথন শেষ হয়; সে ফিরে তাকায় ক্যামেরার দিকে। পোজ্ ক'রে ছবি তোলে। পর্দায় ফুটে ওঠে 'ইতি সিদ্ধার্থ'। স্বপ্নভাষ্যে যে তীব্র ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছিল — ক্যামেরাব সামনে পোজ্ করা আর বন্দুকের সামনে পোজ্ করার কোনো মূলগত পার্থক্য নেই, শেষ দৃশ্যে তরাই বন্ধনী বা ক্লোজার। সিদ্ধার্থ শেষ পর্যন্ত ক্যামেরার লজ্জা কাটিয়ে অন্যের চোখে ধরা দেয়। সেই 'অন্য' তারই ইপ্সিত এক নারী যাকে নিয়ে টাটা সেন্টারেব মাথায় চতুর্দিকেব কোলাহল আর রাজনৈতিক হট্টগোলের মধ্যে সে খুঁজে নিতে চায় একটি নিরপেক্ষ, আত্মিক, স্থানিক ঐক্য।

এই নিরপেক্ষ, স্থানিক ঐক্য, নিভৃত একটুখানি ব্যক্তিগত আকাশ যেখানে ব্যক্তি মানুষের সৃজনী একটুখানি ব্যক্তিগত আকাশ যেখানে ব্যক্তি-মানুষের সৃজনী কল্পনার চারণভূমি, সেটুকুই আমাদেব মতো ক্লান্ত মানুষের বরাভয় — আমাদের কাছে সত্যজিৎ

রায়ের ছবি তৈরী করে সেই স্থানিক ঐক্য — একটা neutral idiological space of formal excellence। নিরপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু সেই স্থানিক ঐক্যও রাজনৈতিকভাবে কখনই ইনোসেন্ট নয়। এর মধ্যেও একটা রাজনৈতিক কনটেন্ট আছে। ব্যক্তির সার্বভৌমতা ও শৈল্পিক অভিব্যক্তির স্বাধীনতার জন্য এই নিজস্ব আকাশটুকু আমাদের চাই-ই।

সিদ্ধার্থের মধ্যেই দেখতে পাই সে সময়ের বাঙালী যুবকের চরিত্রের পরাকাষ্ঠা — তার বিদ্রোহী অথচ বিপ্লব-বিমুখ মানসিকতা ; আত্মধিক্কারে দীর্ণ, আপন পৌরুষে সন্দিহান বাঙালী যুবকের আত্মদর্শনের আকাঙ্খা, তার প্রকাশবেদনা। এ ছবিতে সত্যজিৎ অভ্রান্ত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন সঞ্চার মাধ্যমের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য এবং ভোগ্যপণ্যবাদের সঙ্গে স্ত্রী-স্বাধীনতার গাঁটছড়া।

মেডিকেল কলেজে পড়ার সূত্রে, মেডিকেল ডিসকোর্সের মধ্যে যে সুপ্ত হিংসা, মানুষকে তার স্মৃতি-স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের অনুষঙ্গ ভেঙে নিছক এ্যানাটমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাকশন্ হিসাবে ভাবার মধ্যে যে লুকানো ঘৃণা — মনুষ্যত্বের যে প্রচ্ছন্ন অবমাননা তা প্রথম প্রকাশ পায় সিদ্ধার্থের কাছে যখন সে বোঝাতে চেষ্টা করে তার বান্ধবীকে, 'সব মানুষই আদতে এক।' কালো নেগেটিভ্ ব্যবহারের দৃশ্যে মানুষের প্রতি অবিশ্বাস ও বীতরাগ স্পষ্ট; এবং সত্যজিৎ লক্ষ্য করেন এই অবিশ্বাস ও বীতবাগের সঙ্গে মেডিকেল ডিস্‌কোর্সের একটা যোগ আছে। মানব কল্যাণে নিয়োজিত ডাক্তারী শাস্ত্রের ভাষায় — যা মূলত রেফারেন্সিয়াল এবং এ্যাবস্ট্রাক্ট — তার মধ্যে আছে বাস্তবের জটিল ঐশ্বর্য্যের প্রতি একটা লুকানো ঘৃণা ; শরীরের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তির বদরাগী প্রতারণা।

সিদ্ধার্থের দুঃস্বপ্নের কালো নেগেটিভে শরীরী অভিব্যক্তি ও যৌনতার প্রতি অবদমিত আক্রোশই তার Physical Violence-এর সামনে কুণ্ঠার অন্যতম কারণ। সিদ্ধার্থ কি চায়? সে চায় একেবারে অনাড়ম্বব স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বচ্ছ আত্মপ্রকাশ। সে কথা বলার চেষ্টা করে পর্যায়ক্রমে তার বোনের সঙ্গে, তার ভাই-এর সঙ্গে ; কিন্তু দু'তরফেই সে শুনতে পায়, 'বলবো না।' পাখীর স্মৃতি তার ভাই-বোনের মনে কোনো তরঙ্গ তোলে না। সে যায় তার বন্ধুর কাছে যে বন্ধু তাকে 'কোন্ সিদ্ধার্থ?' ব'লে খ্যাপায় ; যে বলে এটা তুই যা ভাবছিস, তা নয়; পাখীর কথায় যার মুর্গির কথা মনে পড়ে। সিদ্ধার্থের চতুর্দিকে একটা নিঃশব্দ চক্রান্ত; স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশের বিরুদ্ধে রেটরিক্যাল ছল-চাতুরী ব্যক্তি আর সমষ্টিগত চেতনার মধ্যে একটা দুরপনেয় বিরোধ। সিদ্ধার্থ ক্ষিপ্ত হ'য়ে চিৎকার করে ওঠে কর্ত্তাব্যক্তিদের প্রতি, 'আপনারা কি আমাদের মানুষ ব'লে মনে করেন না?' এই অভিযোগ তার সমস্ত সমাজের প্রতি, শিলিভূত সামাজিক সত্তার প্রতি।

সিদ্ধার্থের মনুষ্যত্বের ধারণা কিন্তু এই Organic speech relations-এর মধ্যে sense of community-র মধ্যে, যার প্রকাশ 'রাম নাম সৎ হ্যায়' এই ধ্বনির মধ্যে। সিদ্ধার্থ ঃ সিদ্ধ অর্থ, constituted meaning। তারই ইতি হোক। সমস্ত রকম ভাষার উপর অর্থের কর্ত্তৃত্বের অবসান হোক। দৃশ্যকাব্য স্পর্শযোগ্য স্রোতস্বিনী ভাষার মতো সঙ্গীতময় হোক — এই স্বপ্নময় ভোরে জেগে ওঠে সিদ্ধার্থ। সমস্ত ছবিটির আধো অন্ধকারের পটভূমিকায়, কড়া আলোর স্বপ্নদৃশ্যের পরে, কালো নেগেটিভের পীড়াদায়ক দুঃস্বপ্নের পরে, শেষ দৃশ্যের আলো হাওয়ার অবাধ সঞ্চরণে আমরা যে চোখের আরাম

পাই সে অনুভবটা অর্থবহ হয়ে ওঠে। একদিকে শিল্পের মুক্তি, অন্যদিকে ভারতদর্শন — তারই মধ্যে সিদ্ধার্থের উত্তরণ, ব্যক্তিগত অণুষঙ্গ নৈর্ব্যক্তিক প্রতীকি তাৎপর্যে।

কিন্তু শেষ দৃশ্যে সত্যজিৎ স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন ক্লোজারের অবশ্যম্ভাবিতা, অন্যের চোখে ধরা দেওয়ার তাগিদ, রেটরিকের অপরিহার্যতা। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত পথনির্দেশ মানুষকে অঙ্গীভূত সামাজিক সত্তার নিরিখেই প্রতীকি তাৎপর্যে উন্নীত হ'তে বলে।

ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে সিদ্ধার্থের দিবাস্বপ্নটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা যে লেটেন্ট কন্‌টেন্টটি পাই সেখানে সিদ্ধার্থের তার বোনের প্রতি একটি ইন্‌সেসচুয়ার্স আকর্ষণের ইঙ্গিত আভাসিত। এই অবদমিত, অবচেতন কামনা সত্যজিতের ছবির ফর্মাল ডায়ালেক্‌টিক্ অব্ ডিজায়ারের একটি উপমা। সত্যজিতের ছবিতে দৃশ্য-কাব্যের মধ্যে নিহিত যে স্পর্শযোগ্য তৃপ্তি আমরা পাই, সেই ফর্মাল এরোটিক্‌সের মধ্যে আছে এক নরম, রেশমী কোমল আর্দ্র যৌনতার আভাস। আমাদের তথাকথিত 'স্বাভাবিক' যৌনতা, যার ক্লেদে, ঘৃণ্যতার পরিচয় আছে তার বন্ধুটির কুৎসিত যৌন-কাতরতায়, কলগার্লের সম্পর্কের আবিলতায়, তারই বিপরীতে এই অন্য যৌনতা, যেখানে রমণের বদঅভ্যাস সম্পর্কের সূক্ষ্ম মাত্রাগুলিকে বিপর্যস্ত ক'রে তোলে না। তাই তার বোনের 'দাদা' ডাক যেমন ক'রে স্মৃতির উপলখণ্ডে স্মৃতির ফল্গুধারায় উৎসারিত, ঠিক তেমনি করে সত্যজিতের ছবির গল্প বলার স্বচ্ছন্দ ঢং এবং তারই মধ্যে ইতস্তত বিন্যস্ত স্মৃতির বজ্রপাত আমাদের প্রস্তুত ক'রে তোলে শেষ দৃশ্যের অনাবিল কবিতার জন্য, মুক্তিপিয়াসী মনের প্রাকৃতিক যৌনতায় অবগাহনের জন্য।

সত্যজিৎ আমাদের গল্প বলা ছবিব মধ্যে দিয়েই প্রস্তুত করে তোলেন এক ধরনের ইমেজিস্ট সিনেমার জন্য যেখানে ইমেজ শুধুমাত্র দ্রষ্টব্য নয়, স্পর্শযোগ্যও বটে।

স্বপ্নের দৃশ্যে সিদ্ধার্থ যখন নার্সবেশী মেয়েটিকে কলগার্ল ব'লে শনাক্ত করে তখনই ঘটে তার আত্মদর্শন। স্বপ্নের ম্যানিফেস্ট কনটেন্টে মেয়েটি তার বাস্তবে দেখা গাড়ীর ভেতরের কিশোরীটিকে (যার বাবা রাস্তার লোকেদের হাতে লাঞ্ছিত এবং সিদ্ধার্থও যাঁকে অবরুদ্ধ আক্রোশে প্রহারে উদ্যত) সেই কিশোরীটিকে সরিয়ে জায়গা ক'বে নেয়। এই ডিসপ্লেসমেন্টের মধ্য দিয়ে সিদ্ধার্থের সাবালাকত্ব প্রাপ্তিই সূচিত— কিশোরীটি তার বোনের মতো, তার জায়গা অধিকার করে একজন মহিলা যার যৌনতা অবিসংবাদিত। ডাকলেই যে আসে সে-ই তো কলগার্ল। সিদ্ধার্থের স্বপ্নটি এই কঠিন ভাষাতাত্ত্বিক ঠাট্টার প্রকাশ। তার উল্টোদিকে আছে সেই নাম না জানা পাখীর ডাক যার অনুসরণে সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়ায় সমষ্টি-জীবনের দ্বারপ্রান্তে যেখানে প্রকৃতিলালিত মানুষের যৌনতা মৃত্যুর নিষ্ঠুরতার সামনে ঘোষণা করে সহমর্মিতার প্রাচীন বন্ধনকে, অমরত্বের আশ্বাসকে, যে আশ্বাস ঘিরে আছে ভারতবর্ষের সমষ্টি জীবনকে, কৌমচেতনাকে। যৌনতার যথার্থ উত্তরণ শিল্পে, যেখানে অবারিত যৌনতা প্রকৃতি ও মানুষী সৃজনশীলতায় প্রেমবন্ধনে অকৃত্রিম সঙ্গীতময় মুক্তি।

সৃজনশীল কল্পনার মুক্তি, অবারিত প্রাকৃতিক যৌনতা, যা কামতাড়িত বীভৎসা থেকে দূরে, আর এক বিশ্ববীক্ষা যা ব্যক্তিগত হয়েও নৈর্ব্যক্তিক — এই ত্রয়ীর সম্মেলনেই সত্যজিতের ছবির রাজনীতি। কথাটা কখনই রেফারেন্সিয়াল সত্য নয়, কেননা সিদ্ধার্থের আত্মদর্শনের মাধ্যমেই উদঘাটিত হয় সামাজিক সত্তার দ্বিধাদীর্ণ কাঠিন্য — দিবাভাগে

যে সেবাব্রতী নার্স, রাতের আঁধারে সেই যৌন পণ্য; সিদ্ধার্থও সেবাব্রত নয়, গ্রামে যাবে ওষুধ বেচতে কিন্তু কার্যত হবে বৃহৎপুঁজির দালালী। এ আমাদের সকলের জন্যই সত্য। কিন্তু সত্যজিতের ছবি এই বাস্তব দীনতার অতীত এক সম্পন্ন সম্পূর্ণতার প্রতিভাস; গল্পের বস্তুগত তাৎপর্যের উর্দ্ধে তারই ভবিষ্যৎকামী শৈল্পিক রূপ যা প্রতীকিমাত্রায় উৎকীর্ণ।

সীমাবদ্ধ ঃ বিন্দু থেকে বৃত্ত

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

'সীমাবদ্ধ'র পূর্বে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ও 'প্রতিদ্বন্দ্বী' রচিত হবার ফলে আধুনিক যুবমানস সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের একটি বিশেষ বিষয় ভাবনার গতিরেখার সুস্পষ্ট অগ্রগতি চিহ্নিত হতে শুরু করে। যে অগ্রগতি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র শেষে ক্রম প্রসারিত। সুতরাং 'সীমাবদ্ধ'র প্রয়োজনীয়তা আপন কারণেই অনুভূত। প্রাসঙ্গিকভাবেই পরিচালক চেয়েছিলেন তাঁর ভাবনা সকল সামাজিক স্তরগুলিকে ছুঁয়ে যাক। বিশেষত মুদ্রার উলটো দিকটায় আজকের নব্য অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির যে বিশেষ তলার প্রতি যুব সমাজের অনেকাংশের মনে এখনও একটি প্রার্থিত স্বর্ণভূমির মোহ বিদ্যমান। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ও 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র মুখ্য চরিত্রগুলি নানাদিকে বর্তমান উচ্চ বা নিম্ন মধ্যবিত্ত যুবসমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। যারা একটি নাগরিক জীবনের আবহাওয়ায় বাস করছে। সুতরাং তাদের মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে জীবনের অনেকখানিই ঐ পারিপার্শ্বিকতায়। ঐ দুই চলচ্চিত্রে — প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে — একটা ভীষণ শক্তিশালী চরিত্র সেই শহর কলকাতা। বিপর্যস্ত অর্থনীতির নৈরাজ্যের কলকাতা। ভাঙনগ্রস্ত মধ্যবিত্ত মানুষের আশা ও হতাশার কলকাতা। বহুলক্ষ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারের বাসভূমি কলকাতা। ভারতবর্ষ নামক ভূখণ্ডের সুবিধাবাদীদের রাজনৈতিক জুয়াখেলার উপনিবেশ কলকাতা। এবং সত্তরের বোমা ও বন্দুকে গর্জে ওঠা কলকাতা। সেই কলকাতা 'সীমাবদ্ধ'তেও ফিরে আসে তার অপ্রত্যক্ষ উপস্থিতি নিয়ে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলিত 'ভ্যালুজ'-এর প্রতি আজকের তরুণদের প্রতিক্রিয়া বা অসন্তুষ্টি, ক্রোধ কিংবা অস্থিরতা, ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় আসলে একটি সামাজিক ব্যবচ্ছেদে প্রয়াসী হন, যার বুদ্ধিগ্রাহ্য উত্তরণ অনুভব করা যায়। সামাজিকএক বিশেষ সিস্টেম-এর চরিত্র উন্মোচনে 'সীমাবদ্ধ' সেই প্রয়াসের অন্যতম শিল্পকর্ম।

দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা-উত্তর অর্থনীতির মেরুদণ্ড বিধবস্ত মধ্যবিত্ত বাঙালীর আশা-আকাঙ্খা বা স্বপ্ন-আদর্শ মূলত চাকরিকেন্দ্রিক। টিকে থাকার তাগিদে তার অস্তিত্ব শুধুমাত্র জীবিকা বা জীবিকার অন্বেষণের মধ্যেই আবদ্ধ। অসম বন্টন উদ্ভূত সামাজিক অর্থনীতি তার কাছে সিকিয়রিটির মূল্য সব থেকে বড় করে দিয়েছে। 'সীমাবদ্ধ'র নায়ক শ্যামলেন্দু চলচ্চিত্রের এক জায়গায় বলে 'অ্যাম্বিশন তো পাপ নয়। অ্যাম্বিশন না থাকলে প্রগ্রেস হয় না, এক জায়গায় থেমে থাকতে হয়।' এই অ্যাম্বিশন অবশ্যই তার চাকরি জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। যেখানে পরোক্ষভাবে আরো আর্থিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গটাই শুধুমাত্র। আলোচ্য মনোভঙ্গির প্রতি চলচ্চিত্রটির দৃষ্টিকোণ অনেকখানি নিবদ্ধ, যেখানে আপস ও আপন বন্দীত্ব মূল্যে উচ্চাকাঙ্খার চরিতার্থতা ক্রয় করা হচ্ছে। আজকের শ্রেণী বিন্যাসে যে 'বিনিময় প্রথা' প্রচলিত। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র সিদ্ধার্থ শেষপর্যন্ত একটা জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়। সেল্‌স্‌-এর পেশায় আত্মবিক্রয়ের পূর্বে সিকিয়রিটি খাঁচার প্রবেশ মুখে সংশয়ে থমকে

যায়। 'সীমাবদ্ধ'র শ্যামলেন্দু কিন্তু শিক্ষকতার স্বাধীন বৃত্তি পরিত্যাগ করে সেই সেল্‌স্-এর পেশাকে অবলম্বন করে ওপরতলার দিকে পা বাড়ায়। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে সিদ্ধার্থর চাকরি খোঁজা বা একটা সপ্রশ্ন পর্যায়ে পৌঁছনো এবং 'সীমাবদ্ধ'তে শ্যামলেন্দুর প্রথমে অসংশয়িতভাবে চাকরিকে মেনে নেওয়া এবং পরবর্তী পর্যায়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে কোথাও চিত্তস্বাধীনতার 'প্রমিজ্‌ড্ ল্যাণ্ড' খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন প্রচারধর্মী চলচ্চিত্রাপেক্ষা পরিচালকের এই সমাজতাত্ত্বিক কমিটমেন্ট অনেক বেশি জোরালো। এবং যার অপবিহার্যতা অপরিসীম। কেননা পরিচালক এখানে সরাসরি সেই সামাজিক দুর্নীতি-চিত্রে পৌঁছতে চান এবং চলচ্চিত্রটি শুরু করা হয় হিন্দুস্থান-পিটার্স লিমিটেডের ফ্যান ডিভিশনের সেল্‌স্ ম্যানেজার শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জীর চাকরি জীবনের দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পরবর্তী সময়েই।

পরিচয়লিপির পূর্বভাগ

'সীমাবদ্ধ'র পরিচয়লিপি-পূর্ববর্তী সূচনাংশ আগেকার অপর দুই চলচ্চিত্রাপেক্ষা অধিক বিশিষ্ট বলে মনে হয়। কারণ এখানে শুধু চলচ্চিত্রের কেন্দ্র চরিত্রকে পরিচিত করা হচ্ছে না, একটি অন্তর্লীন মানসিকতাকে (যেখানে অতীত ও বর্তমান পাশাপাশি উপস্থাপিত) এমনভাবে বুদ্ধিদীপ্ত এবং সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে যে চলচ্চিত্রের পরবর্তী দ্বান্দ্বিক পর্যায়ে যা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় গ্রাহ্য হতে পারে। আলোচ্য পর্যায়ে শ্যামলেন্দুর আত্মকথামুলক বিবৃতি লিনিয়ার, কিন্তু বিপরীতার্থে তন্নিষ্ঠ চিত্রকল্পগুলি (বা তার সম্পাদনা) আন্তর বাস্তবতার গভীরতার দ্যোতক। সুতরাং দর্শকের একান্ত মনঃসমীক্ষণের দাবীদার। প্রথমে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-এর দৃশ্য এবং পশ্চিম বাংলার বেকার সমস্যা সম্পর্কে সঙ্গত মন্তব্যের উল্টোভাবে জানা যায় যে আত্মবিবৃতিদানকারী শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বেকার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। একজন চাকুরিজীবী তার আত্মকথা বলছে এই স্বীকৃতি গোড়াতেই রয়েছে। কিন্তু 'আমি একটা সওদাগরী অফিসে কাজ করি' এই কথাটার সঙ্গে চিত্রকল্পে একটা আর্কিটেকচারাল মোটিফ ব্যবহার করা হয়। সেখানে কেবলমাত্র এক ধরনের কয়েকটা চতুষ্কোণ দেখা যাচ্ছে। Zoom করে পিছিয়ে আসার সঙ্গে একটি আধুনিক স্থপত্যের স্ট্রীমলাইন্‌ড্ বাড়ী দেখা যায়। পূর্বকার কয়েকটি চতুষ্কোন থেকে অজস্র চতুষ্কোণ প্রাধান্য লাভ করে। এবং আধুনিক স্থাপত্যের মৌচাকের মতো বুনোনির নামগোত্রহীনতার মধ্যে ঐ কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পরবর্তী কমেন্টারীতে আত্মপরিচয় অপেক্ষা হিন্দুস্থান-পিটার্স লিমিটেডের — যাদের সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ এবং আলো আর বাতাস নিয়ে যাদের কারবার — বর্তমান ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড-ই বলা হতে থাকে। এখানে মধ্যপ্রাচ্যে পিটার্স কোম্পানীর পাখা রপ্তানীর লভ্যাংশের হিসেবনিকেশের মধ্যে ('এ ব্যাপারে আমার দায়িত্ব কম নয়') এবং ক্রমে ক্রমে ফ্যাক্টরীর যান্ত্রিক ডক্যুমেন্টেশনের মধ্যে আসল মানুষটাই চাপা পড়ে যায়। বরং একটা সিস্টেমকে চিনিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং এরপরে শ্যামলেন্দুর আইডেন্টিফিকেশনের সময় 'Yours faithfully' কথাটার নীচে স্বাক্ষরদানেব ফ্রেমটি বস্তুত ঐ সিস্টেমের প্রতি তার বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য ঘোষণা করে (এটা চলচ্চিত্রের অন্য জায়গায় আরেকটি অন্য উপায়েও বলা হয়েছে)। কিন্তু শ্যামলেন্দুর বর্তমানের এই জায়গায় পাশাপাশি তার

অতীতকেও ধরা হয়। আসলে 'আমার নাম শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জী' এই কথাটার ওপর ঠিক দুটো ফ্রেম চোখে পড়ে। একটা অফিসের চিঠির নীচে স্বাক্ষর করা এবং অপরটি পূর্ববর্তী পাটনার জীবনের এস্ট্যাব্লিশিং শট। বিপরীতভাবে যেখানে আরেক ধরনের আর্কিটেকচারাল মোটিফ্ ব্যবহৃত। পাটনাকে চেনানোর জন্যে গ্র্যানারীর গম্বুজ সদৃশ গঠন এবং কিছু পরে শ্যামলেন্দুর শিক্ষাজীবনের পাটনা কলেজিয়েট স্কুলের গ্রেকো-রোমান আদলের স্থাপত্যের মধ্যে একটা রোমান্টিক স্পর্শ পড়ে। এবং চলচ্চিত্রে এখানে শ্যামলেন্দুকে প্রথম ফিগারেটিভ দেখা যায়, যে সর্বোচ্চ সাফল্যের সঙ্গে সদ্য তার শিক্ষা জীবন শেষ করছে। তার পড়াশুনার জগৎ বা ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্তিবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রথমত এখানে কিছু বলা হয়নি। বরং কতকগুলি টুকরো ঘটনার গ্রন্থনায় উচ্চাকাঙ্খার জন্যে পরিবর্তনের সূত্রপাত ল্যাকনিক ফর্ম-এ এখানে প্রকাশিত। পিতার ধারাবাহিকতায় শিক্ষকতা দিয়ে শুরু, সার্চলাইট কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির দরখাস্ত দেওয়া, পিটার্সের পাটনা অফিসে বড় সাহেবের কাছে ইন্টারভিয়ু (যাকে চলচ্চিত্রে পরে একটি মৃত্যুচেতনা আভাসিত করার জন্যে নেগেটিভ-এ দেখানো হয়), সিকিয়রিটির ছাতা মাথায় পিওনের আটশ' টাকা মাইনের চাকরির নিয়োগপত্র দিয়ে যাওয়া ইত্যাদির মধ্যে যে পরিবর্তনটি সূচিত হচ্ছে। কিন্তু এই পর্যায়ে চাকরি পেয়ে যাবার পর শ্যামলেন্দুর বিবাহ দৃশ্যে সবশেষে দোলনচাঁপার বাবার পরিচিতিতে বলা হয় 'আমি ওর কাছে শেক্সপীয়র পড়েছিলুম।' এখানে ক্রিয়াপদটি অতীত এবং এর একেবারে পরের শট্-এই দেখা যায় লো-অ্যাঙ্গল্-এ গৃহীত রেলওয়ে ইঞ্জিনের প্রকাণ্ড চেহারা। যা পাটনার সঙ্গে সম্মৃক্ত শ্যামলেন্দুর নিষ্পাপ, সরল, হয়তো লাজুক এবং জ্ঞানসাধনার পৃথিবীর প্রতি যতিচিহ্নের মতো বিদ্যমান। অতঃপর ট্রেনে পাটনা থেকে দিল্লী যাওয়া এবং প্লেনে দিল্লী থেকে কলকাতায় আসার মধ্যে সেই পরিবর্তন দ্রুতাগ্রসরিত ('এই দশবছর হলো আমার উন্নতির ইতিহাস')। কিন্তু দশবছর পরবর্তীকালীন বিমান বন্দর দৃশ্যে শ্যামলেন্দুর বিমান থেকে অবতরণকালীন শটকে প্রথমত ফ্রিজ করে নিষ্প্রাণ করা এবং দ্বিতীয়ত, পর্দায় ad film-এর আঙ্গিকে multiple frames ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সময়কালের পরিধির একদিকে রয়েছে পূর্বদৃষ্ট ট্রেনে যাত্রা এবং অপর দিকে প্লেনে ফিরে আসা। সুতরাং পরিবর্তিত শ্যামলেন্দুর sum total-এর ভগ্নাংশগুলির উপস্থাপনায় ad film বা বিজ্ঞাপনের জগৎ বা আত্মবিক্রয়ের সভ্যতাকে সম্পর্কিত করা এখানে সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য। Multiple frames প্রসঙ্গে এখানে মূলত পরপর দুটো নকশা সাজানো। প্রত্যেকটিতে সচল ফ্রেম একটি করে পাওয়া যায়। প্রথমটিতে চলমান দুটি পা এবং দ্বিতীয়টিতে গলফ্ স্টিক সমেত দুটি হাত শুধু সক্রিয়। অর্থাৎ স্ট্যাটাস-এর জন্য প্রয়াস ও প্রাপ্তি। শ্যামলেন্দুর গলফ্ স্টিক চালনার নির্দেশকে অনুসরণ করেই ক্যামেরা এসে পড়ে একেবারে শহর কলকাতার এরিয়াল দৃশ্যের ওপর। এখানেও পুনর্বার স্থাপত্যের আনঅ্যানিমিটি প্রাধান্য পায়। তবে শহর কলকাতার আলোচ্য পটভূমি এখানে আরো একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ পটভূমিতেই শ্যামলেন্দুর পারিবারিক বিন্যাস প্রসঙ্গ আমরা জানতে পারি। এখানে চলচ্চিত্রকথন বিশেষভাবে স্টাইলাইজড্। যেমন শ্যামলেন্দুর এক্সিকিউটিভ বাসকক্ষ। যেখানে দৃশ্যত শূন্যতা বর্তমান। শ্যামলেন্দুর সঙ্গে তার পিতা এবং সন্তানের সম্পর্ক প্রসঙ্গে চরিত্রগুলিকে যে ধরনের ব্যবধানে নির্দেশ করা হয়। নিখুঁত ডক্যুমেন্টারী ভঙ্গিতে

শ্যামলেন্দুর পিতাকে যেমন শুধু একজন পথচারী ছাড়া আর কিছু মনে হয়না। সন্তান রাজা প্রথম পরিচয়ে ফটোস্ট্যাণ্ডে চিত্রার্পিত। অবশ্য পুনরায় ডক্যুমেন্টারী রীতিতে দার্জিলিঙে তাকে অনেক ছেলের সঙ্গে একটা লাইন অনুসরণ করে হাঁটতে দেখা যায় বা তার ইংরেজী-বাংলা মেশোনে চিঠিতে অ্যাঙ্গলিসাইজড্ কাল্ট্-এর সূত্রপাত শোনা যায়। প্রধানত জেনারেশন গ্যাপ-এর ব্যাপারটা এখানে খুব সংক্ষেপেই পুরোপুরি বলে দেওয়া হয়েছে। এবং পুনর্বার অফিসের ম্যানেজমেন্ট প্রসঙ্গে ফিরে এসে পাঁচটি বৃত্তের অন্যতম বৃত্ত-বন্দী শ্যামলেন্দুর পরিধি রেখা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিচয় লিপি শুরু করার আগের ফ্রেমে ঐ পাঁচটির মধ্যে চারটি বৃত্ত অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং নেপথ্যে কম্প্যুটার যন্ত্রের যান্ত্রিক শব্দ মাত্রায় পুতুল নাচের ভঙ্গিতে শ্যামলেন্দুর বৃত্তটি ক্রমশ সরে গিয়ে একটা মোটরের মধ্যে (বা ফ্রেমের চতুষ্কোণের মধ্যে) তার স্থান নির্দেশ করে দেয়। এবং এইখানেই সব সময়টা পরিচয়লিপি নিবদ্ধ থাকে। তুলনামূলকভাবে মনে পড়ে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' এবং 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র পরিচয়লিপি প্রসঙ্গ। প্রথম চলচ্চিত্রে শহর জীবনের নিয়মের হাত থেকে (যা অনেকটা চাকরিকেন্দ্রিক) ব্যর্থ মুক্তির আশায় কয়েকটি যুবকের প্রকৃতির দিকে যাত্রা। যদিও ক্রেডিট্‌স-এ বনাঞ্চলকে mask করে দেখানো হয়। দ্বিতীয় চলচ্চিত্রে বিপরীতমুখে প্রধান চরিত্রের চাকরির অনুসন্ধানে যাওয়াটাই পরিচয়লিপির পশ্চাৎপট। 'সীমাবদ্ধ'-এ এ প্রবণতা আরো প্রতিষ্ঠ ও কেন্দ্রমুখী। এখানে একজন উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী (যাকে অভিব্যক্তিতে আত্মতৃপ্ত মনে হয়) পরিচয়লিপিকালীন সময়ে তার অফিস যাত্রায় সারাক্ষণ আমাদের চোখের সামনে থাকে। কিন্তু, পরিচয়লিপি অংশে msk-এর চরিত্র একেবারে অন্য। সেখানে একটা টেলিফোন যোগসূত্রহীন অবস্থায় বারে বারে বেজে যায় এবং কম্প্যুটার যন্ত্র থেকে অজস্র গাণিতিক সংখ্যা মুদ্রিত কাগজ বেরিয়ে আসে। যন্ত্রজীবনের এই চরিত্রাকৃতিশূন্যতা ও অনন্বয় নায়কের আত্মতৃপ্ত অভিব্যক্তির সমান্তরাল আরেক বাস্তবের ধারা প্রস্তুত করে দেয়। 'সীমাবদ্ধ'র মূল চলচ্চিত্রাংশের যা অন্যতম উপজীব্য।

পরিচয়লিপির উত্তরভাগ

সুতরাং 'সীমাবদ্ধ'র মূল অংশের শুরুতে শ্যামলেন্দুকে পুরোপুরি পরিবর্তিত চরিত্র হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার পূর্বে দুটো বিষয় মনে রাখা প্রাসঙ্গিক হবে। প্রথমত যদিও এখানে চরিত্রটি একটা ছোটখাটো দুর্নীতিতে হাতে খড়ি করে তার উন্নতির শেষ ধাপে পৌঁছচ্ছে, কিন্তু এই ঘটনাটা তার চাকরিজীবনের যে কোন পর্যায়ে ঘটতে পারতো। তবুও চলচ্চিত্রটি বিশেষ করে এই সময়টাকেই ধরে রাখছে। কেননা যদিও শ্যামলেন্দু অসংশয়িতভাবে তার বর্তমান জীবিকার প্রতি বিশ্বস্ত, তবু এ পর্যন্ত সততা সম্পর্কে এই চরিত্রটির একটা আপন মূল্যবোধ রয়েছে। কিংবা একদিক দিয়ে একটা (মিথ্যা) আত্মাভিমান রয়েছে। টুটুলের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত চলচ্চিত্রে গঠিত বাস্তবের বর্হিভাগ থেকে প্রধান চরিত্রটি যে ঐ আত্মাভিমানের ভঙ্গুরত্ব সম্পর্কে সচেতন একথা দর্শক মনে করতে পারেন না। সম্ভবত ঐ প্রধান চরিত্রটিও নয়। টুটুলের বিশ্লেষণী মানসিকতা যতক্ষণ না সেই দ্বান্দ্বিক পর্যায় উপস্থিত করে বা শ্যামলেন্দুর মূল্যবোধের ভিত্তি নাড়া দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন থাকে। দ্বিতীয়ত, 'বিকামিং'-এর বিপজ্জনক ভূমিকা (যে উপপাদ্য বর্তমান

চলচ্চিত্রটির অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে) যেখানে এ সমাজবিধিতে আপন প্রকৃত মূল্যবোধকে শেষপর্যন্ত দুর্নীতির শিকার করে তোলার অনিবার্যতা ঘটে। সুতরাং উচ্চাকাঙ্খার লক্ষে প্রগতির জন্য যে কম্পিটেন্স বা প্রতিযোগিতা তা চূড়ান্তভাবে একটা (হয়তো সচেতন) পাপবোধে গিয়ে পর্যবসিত হয়। চরিত্রাভ্যন্তরে এই বিলম্বিত বিষক্রিয়াটি আলোচ্য চলচ্চিত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ক্রম-প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত চলচ্চিত্রের এক জায়গায় ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে শ্যামলেন্দু, দোলনচাঁপা ও টুটুলের খানাপিনাকালীন কথাবার্তা মনে করা যেতে পারে। প্রসঙ্গটি ছিল যে ইংরেজ শাসনাধীনকালে ঐ ক্লাবে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার ঘটনা। বর্তমানে যে নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়েছে। টুটুল এই তথ্যটির ওপর প্রশ্ন তোলে 'সেটা ভালো না খারাপ?' এই কথার উত্তরে শ্যামলেন্দুর বক্তব্য লক্ষ্যণীয় ঃ 'আগে একটা কৃত্রিম প্রাচীর ছিল, এখন সেটা তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন যে যার ক্ষমতা মতো জায়গা করে নিক।' কিন্তু এই ক্ষমতার মাপকাঠি কী? এবং কাদের দ্বারাই বা নির্দেশিত? আসলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ জীবনের একজন স্ট্যাটাস সচেতন মানুষের এটা একটা স্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন। এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে তার আপন মূল্যবোধ। চলচ্চিত্রে শ্যামলেন্দুর এই বক্তব্যে টুটুল ক্ষমতার মাপকাঠি সম্পর্কেই তার দ্বিতীয় প্রশ্ন তোলে। কিন্তু তার ভার্বাল উত্তর মেলে না। ফিগারেটিভলি আমরা অকস্মাৎ হিন্দুস্থান পিটার্সের অন্যতম ডাইরেক্টর স্যার বরেন রয়কে দেখি, যিনি মহাযুদ্ধের সময়ে ফিল্ড মার্শাল অকিনলেকের একটা টি.এ বিল কয়েকদিন আটকে রেখে একটা 'প্রকাণ্ড কাণ্ড' করেছিলেন বলে বিশ্বাস করেন এবং যার কর্ম যোগ্যতার নজরানা হিসেবে বৃটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত তাঁকে নাইটহুডে ভূষিত করে যান। সুতরাং, আমরা শ্যামলেন্দু কথিত 'ক্ষমতা'র মাপকাঠি সম্পর্কে সচেতন হই। এবং তার বর্তমান মূল্যবোধ সম্পর্কেও। চলচ্চিত্রের গোড়ায় শ্যামলেন্দুর অফিসে পৌঁছনোর পর খণ্ড খণ্ড ঘটনায় তার যে চরিত্রলক্ষণগুলি প্রকাশিত যেমন য়িমানুবর্তিতাবোধে বেয়ারাকে ভর্ৎসনা বা স্টেনোকে প্রশংসা, অথবা মধ্যপ্রাচ্যে পিটার্স ফ্যান রপ্তানীর বিজ্ঞাপনে ইরাকী মহিলার ছবি না পাওয়ার জন্য দুঃখবোধ (অথেন্টিসিটি প্রশ্নে) কিংবা ডাইরেক্টর'স মিটিং-এ ডাক পাবার আশায় প্রতিযোগী রুণু সান্যালের মুখোমুখি একটা ঠাণ্ডা লড়াইয়ে কম্পিটেন্সের পরিয় ইত্যাদি এসবই আসলে ঐ মূল্যবোধের প্রতি একাগ্রতার পরিচায়ক। যেমন প্রশংসাবাচকভাবে বলেন 'যে রকম অবস্থা দেখছি তাতে আপনাকে আর বেশি দিন এঘরে থাকতে হবে না।' এই সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে কাট করে স্যার বরেনের রোলসরয়েসের প্রতীক চিহ্নে চলে যাওয়া হয় (পরবর্তীকালে শ্যামলেন্দুর ডাইরেক্টর হবার পূর্বমপহূর্তে যে একই শট পুনর্ব্যবহৃত)। যে প্রতীকি লক্ষ্যের প্রতি শ্যামলেন্দুর এ পর্যন্ত কার্যাবলী নিবেদিত। কিন্তু একই সঙ্গে চোখে পড়ে এই চরিত্রটির যান্ত্রিকতা। শ্যামলেন্দুর চরিত্রে জীবিকা অনেকখানি, জীবন অনে কম। সেটা স্বেচ্ছা-আমন্ত্রিত অথবা কোন সিস্টেম নির্দেশিত তা বিতর্কসাপেক্ষ। তবে নগরজীবনের চারিত্রিক নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ আলোচ্য চরিত্রটিকে স্পর্শ করে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে আলোচ্য চলচ্চিত্রে টেলিফোনের প্রয়োগ। যা এখানে শ্যামলেন্দুকে বিভিন্ন 'পরিস্থিতি'র সম্মুখীন করেছে। কিন্তু, কোথাও এই পরিস্থিতিগুলো সরাসরি দৃশ্যমান নয়। এবং এদের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অপরিসীম। এই টেলিফোনে রপ্তানীর জন্য পাখার ডিফেক্টস-এর খবর

লো-অ্যাঙ্গল শট-এ শ্যামলেন্দুর মুখকে ভয়ঙ্কর করে দেয়। এবং পরবর্তীকালে মর্যাদা বাঁচানোর চেষ্টায় দুর্নীতির সরাসরি পদক্ষেপে হরিপদ তালুকদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় টেলিফোন দ্বারাই। আমরা তালুকদারকে দেখিনা কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। এবং পর্দা জুড়ে শুধু টেলিফোনের বাঁকানো তারটাই সর্বস্ব হয়ে ওঠে। অথচ কেবলমাত্র ডাইরেক্টর হবার সংবাদটি দেওয়া ছাড়া শ্যামলেন্দুর বাড়ীর সঙ্গে যোগসূত্রতায় টেলিফোনের ভূমিকা একেবারে অকেজো। এমন কি দোলনচাঁপা ও টুটুলের সঙ্গে একত্র আহারের যে তাগিদ আসে টেলিফোনে, অফিস বৃত্তের বাইরে গিয়ে শ্যামলেন্দুর তাতে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। চরিত্রটির আলোচ্য বন্দীত্বের মধ্যে এস্ট্যাব্লিশমেন্ট-এর একটা বিশেষ চোহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শুরু থেকে চলচ্চিত্রটির একক রৈখিক গতি (সম্পাদনার প্রসাদগুণে যা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ততায় ত্বরান্বিত) টুটুলের আগমনের পর দুটি ধারায় ভেঙে যায়। কিন্তু আয়তনিকভাবে (structure) দুটি ধারাই সমান্তরালভাবে এগোয়। একটি শ্যামলেন্দুর অফিসজনিত সঙ্কট। দ্বিতীয়টি শ্যামলেন্দু ও টুটুলের মধ্যে একটা নবগঠিত সম্পর্কবোধ। টুটুল চরিত্রের পটভূমি কিংবা তার নিকট অতীত একদিক দিয়ে অনেকটা রহস্যাবৃত। চরিত্রটি আসলে তার আচরণের মধ্যেই প্রকৃত প্রতিষ্ঠ। চলচ্চিত্রে তাকে দেখাবার প্রথম শট-এর ঠিক পূর্ব শট-এ শ্যামলেন্দুর নির্জন বাসকক্ষের মধ্যে ক্যামেরা আবদ্ধ থাকে। বাইরে ঝড় ওঠে। শহর কলকাতার ওপর জমা অন্ধকার থেকে ঝড়ের গোঙানির সঙ্গে দুটো বোমা ফাটার আওয়াজ ভেসে আসে। এই অনিশ্চিত যবনিকা টুটুলের আগমনের পূর্বাভাস। কিন্তু, তার বিহ্যাভিয়রিষ্টিক ডিটেলস-এ তাকে বরং স্থিতধী বলেই মনে হয়। এবং বিশ্লেষণধর্মী। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র সিদ্ধার্থের মতো তারও একটা পর্যবেক্ষণের ভূমিকা আছে। এবং অনুরূপ, তার পর্যবেক্ষণ একদেশদর্শী নয়। গোড়ার দিকের কথাবার্তা থেকে জানা যায় যে সে শহরের বিপ্লবীদের সম্পর্কে কৌতূহলী। কিন্তু তার সঙ্গে শ্যামলেন্দুর মতো একজন অ-বিপ্লবীকেও সে 'স্টাডি' করে দেখতে চায়। বস্তুত এই শহরে তার কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে চলচ্চিত্রটির নিউক্লিয়াস রচিত। একটি সিকোয়েন্স মনে করা যাক যখন শ্যামলেন্দুর ফ্ল্যাটে প্রথম আসার পর টুটুল গবাক্ষপথে শহরটাকে দেখছে। সকালের রৌদ্রস্নাত মহানগরীর রূপ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে বলে 'ইস্'। নেপথ্যে সাইরেন বেজে ওঠে। অ্যাটমসফিয়ারিক ডিটেল-এর চমকপ্রদ প্রয়োগে এখানে গোটা শহরটাই আসে। কিন্তু এই সাইরেনের আওয়াজই একটা বিপদ সঙ্কেতের মতো মনে হয় যখন পাশ থেকে দোলনচাঁপা মৃদুস্বরে বলে 'রাত্রিবেলা ভয় করে, দূব থেকে আওয়াজ আসে, বোঝা যায় না কোনটা বোমা, কোনটা বন্দুক।' চোখে মুগ্ধতার রেশ রেখে টুটুল বলে 'কিন্তু এখন তো বেশ peaceful মনে হচ্ছে।' দোলনচাঁপা বোধহয় মনে করিয়ে দেয় 'সেটা আটতলার ওপরে বলেই............।' শহর কলকাতার এই ওপরতলার cross-sectionকে তার কয়েকদিনের স্থায়িত্বে টুটুল বুদ্ধি দিয়ে যাচাই পরখ করে নেয় 'সেটা ভালো না খারাপ?' এরই সমান্তরাল নেপথ্যে আরেক কলকাতায় বোমা ফাটে, বন্দুক গর্জায়, কারা অসন্তোষে ফেটে পড়ে, প্রতিদিন অনেক লোক খুন হয়। আটতলার ওপরে শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ থেকে টুটুল তার ছোঁয়া পায় না। কিন্তু তাদের দূরাগত আভাস ওর মুখে ছায়া ফেলে যায়। আলোচ্য চলচ্চিত্রে টুটুল আজকের অন্যতম youth হিসেবেই আসে। যেমন

সুশান্ত নামে ঐ ছেলেটি যাকে শ্যামলেন্দু চাকরি দেয়। এবং যে মিষ্টি নিয়ে ধন্যবাদ দিতে এসে একটি ব্যবধানে অস্বাচ্ছন্দ্যই বোধ করে ('প্রতিদ্বন্দ্বী'র সান্যাল ও সিদ্ধার্থের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গটি স্মরণ করা যায়)। কিন্তু ক্যান্টিনে পচা মাছ দেবার প্রতিবাদে যখন ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলা হয় তখন সেই মুহূর্তে প্রথম ঐ ছেলেটির চোখেই তীব্র ঘৃণা ফুটে ওঠে। দশ বছর পূর্বকার সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যাগত শ্যামলেন্দুর সারল্য বা সজীবতা নিয়ে টুটুল বর্তমান সময়বৃত্তে প্রবেশ করে। কিন্তু তৎকালীন শ্যামলেন্দুর মতো সে সংশয়হীন নয়। বরং 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র সিদ্ধার্থের মতো তারও একটা জিজ্ঞাসু ভূমিকা চোখে পড়ে। এখানে এস্ট্যাব্লিশমেন্টের চেহারার মধ্যে নিরাপত্তা আরাম বা মোহ বা উত্তেজনায় সে অভিজ্ঞ হয়। কিন্তু তার আপন মূল্যবোধে তার সাড়ামেলে না। দিদির মুখে জামাইবাবুর ডাইরেক্টর হবার পরবর্তী বার্ষিক আয় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার অঙ্কটা শুনে বিস্ময়াহত টুটুল স্বগতোক্তি করে 'রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন টাকাটা।' কিন্তু শ্যামলেন্দু প্রসঙ্গের জের টেনে দোলনচাঁপা বলে চলে 'তার জন্যে ওকে খাটতে, হয়েছে.....।' এই irony টা এখানে অসাধারণ। যা দুই মূল্যবোধের বৈষম্যের প্রতি দিক-নির্দেশ করছে। টুটুলের কাছে এক অনন্য সৃজনশীলতার স্বীকৃতির মূল্য এবং বর্তমান কনজ্যুমার সমাজে বিক্রয় পেশার উপার্জন মূল্য একত্রিত হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্যজনক ঠেকে। যেমন আন্তোনিওনির 'লাভেন্তুরা'র একটি স্থানে বারোক স্থাপত্যের এক চমৎকার নিদর্শন দেখে সান্দ্রো (যে পেশায় স্থপতি) ক্লদিয়াকে বলে 'And who needs beautiful things now, Claudia? How long will they last? Once they had centuries of life befofre them. Now-ten, twenty years at the most.....and then.....' আসলে এখানে আধুনিক সভ্যতার 'মানি-প্লেক্সাস' এবং সেই কারণে অর্থ মানে নির্ধারিত মূল্যের মাপকাঠিটাই প্রাধান্য পায়। যা টুটুলের নান্দনিকবোধের বিপরীতধর্মী। সুতরাং উন্নতির ওপর সিঁড়িতে স্বচ্ছলতাজনিত 'সুখ' সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। 'জীবনে যা চাওয়া যায় তার সব পাওয়া গেলে ভালেই লাগে' টুটুলের এই কথাটার মধ্যে প্রত্যয় নেই। সংশয়ই আছে। কলকাতায় টুটুলের প্রথম দিনে তিনটি অভিজ্ঞতায় এস্ট্যাব্লিশমেন্টের এই পারিপার্শ্বিকতায় তাকে বেমানান দেখায়। প্রথমত যেমন ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে (হাইকোর্টের গথিক স্থাপত্যের পটভূমিতে যা প্রতিষ্ঠিত) স্যার বরেনের 'অ্যাডমায়ারিং' দৃষ্টির সামনে টুটুলের আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়ত কেশ প্রসাধনের দোকানে (যেখানে এস্ট্যাব্লিশিং শট-এ পর পর তারে শুকোতে দেওয়া এক ধরনের তোয়ালের মধ্যে নামগোত্রহীনতা) প্রবেশ মাত্রই zoom-এর এক ধাক্কায় পিছিয়ে আসা। এখানে সমস্ত মুখগুলি এবং নেপথ্য সঙ্গীত তার কাছে একটা অপরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত রেসের মাঠ। যেখানে পুনর্বার গথিক আর্চের আদল ফিরিয়ে আনা হয় এবং সেই অপরিসীম নির্লিপ্ত মুখগুলিও। কিন্তু এখানে টুটুলের অংশগ্রহণের সময় রেসের বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলেন্দু তার কালো চশমাটাকেও তার দিকে এগিয়ে দেয়। অতএব maskএর প্রয়োজনীয়তা আসে। যদিও নগর-সভ্যতার একটি পূর্ণ প্রিটেনশনের রঙ্গভূমিতে টুটুলের রোমান্টিসিজম্ (যেমন চন্দ্রমল্লিকা ফুলের নামে ঘোড়া পছন্দ হয়ে যাওয়া বা গোড়ার সংখ্যার সঙ্গে জন্মদিনের তারিখ মিলে যাওয়া ইত্যাদি) একটা সুন্দর রিলিফ তৈরি করে দেয়। এই একই দিনের সন্ধ্যায় তার জন্যে আয়োজিত পার্টির দৃশ্যে তার ভূমিকা একেবারে

নীরব পর্যবেক্ষকের। এখানে গুরু-বাদ থেকে শুরু করে আজকের অশান্ত যুবমানস পর্যন্ত অলোচনা অথবা আপন সৌন্দর্যের প্রশস্তি সমস্ত কিছুতেই টুটুল যোগসূত্রহীন। বরং অকস্মাৎ আগত শ্যামলেন্দুর পিতামাতার সান্নিধ্য তার কাছে অধিক স্বস্তিবাচক। ক্রমগ্রথিত এই সারা পরিস্থিতিগুলোর প্রতি টুটুলের যে অসম্পৃক্তিবোধ এটা একমাত্র শ্যামলেন্দুর কাছে প্রতিধ্বনিত। তার কারণ টুটুলের উপস্থিতি তার সামনে তার অতীতকে ফিরিয়ে আনে। একই সঙ্গে সে তার বর্তমানে মিথ্যা ও ভঙ্গুর মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রথমে সচেতন ও পরে সতর্ক হতে শুরু করে। যে কারণে টুটুলের সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সামনে শেষপর্যন্ত প্রিটেনশনের পিছনে একটা আশ্রয় গ্রহণের ব্যাপার ঘটে। শ্যামলেন্দুর চরিত্রে যেটুকু আপন সত্তা অবশিষ্ট তার প্রকাশ টুটুলের সঙ্গে একত্র মুহূর্তগুলি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। স্ত্রী দোলনচাঁপার সঙ্গে যান্ত্রিক এবং ফর্মাল সম্পর্ক যার অপরদিকে রয়েছে। দোলনচাঁপা শ্যামলেন্দুর কর্মদক্ষতায় প্রশংসামুখর। তার ফলশ্রুতিতে তৃপ্ত। কিন্তু একমাত্র চলচ্চিত্রের শেষ অংশে শ্যামলেন্দু ডাইরেক্টর হবার পর একবারমাত্র ছাড়া ('তুমি পাখার নীচে বোসো') তার মুখে আন্তর সংবেদনশীল কোনো সংলাপ শোনা যায় না। বরং অফিসের স্টেনো মহিলাটির মধ্যে কাজের বৃত্তের বাইবেও একটা মানবিক স্পর্শ পাওয়া যায়। শ্যামলেন্দুর পদোন্নতির দৌড়ের বাইরে দোলনচাঁপার আর কোন দ্বিতীয় জগৎ নেই যেখানে শ্যামলেন্দু জীবনের স্পন্দন খুঁজে পেতে পারে। আপন সম্পদ সম্পর্কে দোলনচাঁপার বিজ্ঞাপনপ্রিয়তা, সন্তানকে নিরাপত্তার খাতিরে দূরে সরিয়ে রাখার নিশ্চিন্তি বোধ, শ্যামলেন্দুর পিতামাতার প্রতি ফর্মাল আচরণ ('মিষ্টিমুখ না করে যাবেন না কিন্তু') ইত্যাদির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধই মৌল। এই দম্পতির সন্ধ্যাগুলি কাটে রেস্তোরাঁ, ক্যাবারে কিংবা পার্টিতে। সমগ্র চলচ্চিত্রে স্বামী-স্ত্রী কোন অন্তরঙ্গ মুহূর্তে মিলিত হয় না। টুটুলের উপস্থিতি এই শূন্যতাবোধকে স্পর্শ করে। তার একটা স্বাভাবিক রোমান্টিসিজম এই সতর্ক সাজানোগোছানো, ভণিতা যুক্ত, ছকবাঁধা জীবন যাত্রায় প্রাণের চঞ্চলতা নিয়ে আসে। চলচ্চিত্রে খুব অল্প সময়-পরিধিতে শ্যামলেন্দু ও টুটুলের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে তোলা হয় তা মূলত সংলাপভিত্তিক। একটি চলচ্চিত্র একই সময়ে কতগুলি আয়তনিক তলে যে অগ্রসরিত হতে পাবে এটা তার এক সুদক্ষ নজির। শ্যামলেন্দু ও টুটুলের মধ্যে সংলাপকে নিশ্চিত চরিত্রগতভাবে লক্ষণাত্মক সংলাপ (symptomatic) বলা চলে। কিন্তু, গভীরতরভাবে, তার didactic মূল্য আরো বেশি (যেমন চিত্রকল্পের didactic প্রয়োগে 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র ভাটিখানার দৃশ্যে পরিহাসরত পানোন্মত্ত অসীম.ও হরিকে আসলে ক্রুদ্ধ দ্বৈরথে মুখোমুখি বলে মনে হয়)। এই সংলাপ আমাদের মনে করিয়ে দেয় শ্যামলেন্দুর বিগত দশ বছরের যে ব্যবধান তার পূর্বপ্রান্তে টুটুল এবং উত্তরপ্রান্তে সুদর্শনার অস্তিত্ব। তাই, 'সুদর্শনা' সম্বোধনে 'আপনি'র দূরত্ব এবং 'টুটুল' সম্বোধনে 'তুমি'র নৈকট্য দুটি ভিন্ন বাস্তবতার স্তরে চলে আসে। 'সুদর্শনা'কে নতুন পরিচয়ের ব্যবধানে রেখে শ্যামলেন্দু নাগরিক সভ্যতার এই ওপরতলার জীবন-সম্ভোগে তাকে আমন্ত্রণ জানায় ('সেকি, তোমরা রেসে যাও। — 'আপনিও খেলবেন', '...আজ আপনাকে একটা শেরী খেতেই হবে')। 'টুটুলে'র পুরনো পরিচিতির মধ্যে শ্যামলেন্দু কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত একটা স্বস্তি ফিরে পায়, যা অতীতকেন্দ্রিক। যেমন পার্টির পরের দিন নির্জন প্রত্যুষে (যেখানে রেকর্ডে বিসমিল্লা ও বিলায়েৎ খাঁর যুগলবন্দীর গুজরী তোড়ির সুরে ও

আলোকমাত্রায় আসলে একটা বিষণ্ণতা রয়েছে) টুটুল যখন শ্যামলেন্দুকে মনে করিয়ে দেয়, 'আপনার মধ্যে এখনও পাটনা অনেকখানি রয়ে গেছে, কেবল গোঁফটা গেছে, চশমাটা পালটেছে আর মাইনে কিছু বেড়েছে।' তখন টুটুলেরই বিশ্লেষণভঙ্গি শ্যামলেন্দু তুলে নেয়,'সেটা ভালো না খারাপ?' প্রশ্নটা শুধু টুটুলের সামনে রাখা হয় না, সম্ভবত শ্যামলেন্দু নিজের সামনেও রাখে। কারণ তার বর্তমান জীবনের এককেন্দ্রিকতা এখানে এসে পড়ে। ক্যামেরা ইতিমধ্যে দৃষ্টিকোণ পালটে রুম-ডিভাইডার-এর ডেকরের বৃত্তমালার মধ্যে শ্যামলেন্দুকে নিয়ে আসে (texturally বৃত্তের পৌনঃপুনিক ব্যবহার পূর্ববর্তী ad.film-এর মধ্যে বা পরবর্তী লক-আউটের দৃশ্যেও লক্ষিত হয়)। সুতরাং পরিস্থিতির তাৎক্ষণিকতা সম্পর্কেও সচেতন হবার অবকাশ থাকে। এখানে এক আশ্চর্য সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে অতীতের লেখাপড়ার জগতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। 'ঠিক আছে, এরপরে আপনারা যখন পার্টিতে যাবেন, আমি বইগুলো গুছিয়ে রাখবো', এই কথাটা বলাকালীন টুটুল অবহেলিত বইয়ের শেল্‌ফের সামনে চলে আসে এবং বইয়ের মধ্যে উল্টো করে রাখা এক খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলীকে সোজা করে বসিয়ে দেয়। এখানে অতীত উপস্থাপনা শ্যামলেন্দুর প্রতি আবেদনে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছনো হয়, তীব্র বৈপরীত্যের দ্বারা বর্তমানকে আরে উন্মোচিত করে দেওয়া। যেমন চলচ্চিত্রের শেষভাগে শ্যামলেন্দু যখন ডাইরেক্টর'স মিটিং রুম দেখানোর জন্য টুটুলকে নিয়ে আসে তখন ঐ নির্জন বদ্ধ ঘরের প্রতি শ্যামলেন্দুর আকর্ষণ কী ধরনের ('ঘরটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে') সেটা টুটুল ঠিক বুঝতে পারে না। উল্টো পথে সে শ্যামলেন্দুর অতীতের একটি ঘটনা বলে যার মধ্যে আজকের শ্যামলেন্দুর চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না এবং চিত্রকল্পে ব্যাকগ্রাউণ্ডে আউট অব ফোকাস শ্যামলেন্দুকে একটা অদ্ভুত প্রাণীর মতো দেখায়। শ্যামলেন্দু এবং টুটুলের নতুন সম্পর্কের যে রোমান্টিকতা তা তাৎক্ষণিক বলেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। নিজের ঘড়ি টুটুলকে দেবার সময় শ্যামলেন্দু ফিরিয়ে দেবার কথাও মনে করিয়ে দেয়। পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে টুটুল কিছুকালের জন্য শ্যামলেন্দুর সময়-বৃত্তকে মেনে নেয়। রবিবারের সকালের ঐ সিকোয়েন্সের শেষে টুটুল জানতে চায় 'আজ আমরা কি করছি?' শ্যামলেন্দু জানায় 'তোমার যা ইচ্ছে।' অনতিপরেই ঐ ইচ্ছাপূরণ দৃশ্যে একটা দ্রুত গতিবেগের মধ্যে চলে আসা হয়। যেখানে আমরা শ্যামলেন্দুর বেগে ধাবমান মোটরকে দেখি। এখানে ক্যামেরা একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণে ব্যবহৃত। যাকে প্রায় এক জায়গায় পিছনে ফেলে বারংবার গাড়ীটা ছুটে চলে। কিন্তু সমগ্র শটগুলি সম্পাদন চাতুর্যে এমনভাবে সাজানো যাতে মনে হয় গাড়ীটা বুঝি শহর থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু, সেই অসম্ভাব্যতার কারণে চালক যেন একটি বৃত্তের পরিধি পরিক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত পিটার্স ফ্যানের বিজ্ঞাপনের কাছেই ফেরে। পিটার্স ফ্যানের ঐ বিজ্ঞাপন থেকে পরবর্তী অফিস দৃশ্য সম্পর্কিত।

চলচ্চিত্রের আলোচ্য পর্যায়ে পাখাব ডিফেক্টস-সংক্রান্ত সঙ্কট ঘনিয়ে আসা থেকে একটি হীন চক্রান্তে কারখানার লক-আউট ঘটিয়ে মর্যাদা বাঁচানো পর্যন্ত ক্রসকাঠের একটা ঠাসবুনোন প্রস্তুত করা হয়। যেখানে শ্যামলেন্দুর কার্যবিধি হরিপদ তালুকদারের সমান্তরালে চলে আসে। সুতরাং ঐ দুর্নীতিচক্রের সঙ্গে শ্যামলেন্দুর একত্রীকরণ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য চলচ্চিত্র-ভাষার সার্থক প্রয়োগই নয়, এখানে পরিচালকের তীক্ষ্ণ irony

গুলোও উল্লেখ্য হয়ে ওঠে।' যেমন তালুকদার যখন ক্যান্টিনে খাদ্য-সংক্রান্ত গণ্ডগোল ঘটানোর জন্য কারখানার মধ্যে হেঁটে যাচ্ছে (যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো কারখানার লক-আউট), তখন পূর্ববর্তী শট থেকে পিটার্স ফ্যানের বেতারে বিজ্ঞাপন কার্যক্রমের জন্য গানের রেশ চলে আসে '.....সুখের পরশ লাগলো'। অথবা শ্যামলেন্দু ও তালুকদার অফিস করিডোরে দাঁড়িয়ে যখন চুপিচুপি শ্রমিদের ওপর চার্জশীট দেবার পরামর্শ করছে (আলোচ্য চলচ্চিত্রে অফিস-করিডোরের চরিত্র কী আশ্চর্য বস্তুনিষ্ঠ), তখন ওদের পিছনে টয়লেট-রুমের দরজায় লেখা GENTLEMEN শব্দটা। কিংবা রুণু সান্যাল যখন উৎফুল্ল হয়ে শ্যামলেন্দুর কারখানায় লক-আউটের খবর টেলিফোনে তার স্ত্রীকে বলছে তখন ফোরগ্রাউণ্ডে নুয়ে পড়া ভারবাহী মানুষের মূর্তির প্রয়োগ। এই ironyগুলোর শুধু যে অনেকখানি অর্গানিক মূল্য আছে তা-ই নয়, এগুলো এস্ট্যাব্লিশমেন্টের প্রতি পরিচালকের শ্লেষাত্মক মনোভঙ্গিরও পরিচয়। আজকে এদেশীয় সমাজের যে তলা থেকে এস্ট্যাব্লিশমেন্ট অনেকগুলো 'সুবিধাহীন' মানুষের ওপর প্রভুত্ব করেএবং আপন স্বার্থে অনেক মানুষের জীবন নিয়ে জুয়াখেলার জন্যে যেখান থেকে তার চাল দেওয়া হয়, সেই বিশেষ শ্রেণীর গণ্ডীবদ্ধতা, ভণ্ডামি, বা রীতি-প্রণালীকে উন্মোচনের প্রতি 'সীমাবদ্ধ'র একটা সোজাসুজি কমিটমেন্ট গোড়া থেকেই অপ্রচ্ছন্ন নয়। শ্যামলেন্দুর বড়ীতে সেই পার্টির দৃশ্যে কিছু লোকের কণ্ঠে আমরা অথরিটি-র স্বর শুনি, যারা স্বাধীনতাব তেইশ বছর পরেও আজকের তরুণ-সমাজের স্বাধীনতা সম্পর্কে সংশয়ের প্রতি সম্পর্কহীন। কেননা তেইশ বছর পরেও এ সমাজ-ব্যবস্থা থেকে ঔপনিবেশিক চরিত্রেব প্রভুভক্তি মুছে যায় না। যার প্রতিভাস রচনার জন্য আলোচ্য চলচ্চিত্রে সারমেয়-প্রসঙ্গ বাবে বারে ফিরিয়ে আনা হয়। যা প্রতিবারেই শ্যামলেন্দুব জীবিকা প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত। পিটার্স ফ্যানের ad.film-এব মধ্যে কুকুরের ফিগারেটিভ উপস্থিতি এবং হাওড়া স্টেশন থেকে ফেরার পথে মোটরে কথাবার্তায় পিটার্স কোম্পানীব পাটনা অফিসের কথার পিঠপিঠ কুকুর সম্পর্কিত আলোচনার দ্বারা আলোচ্য সংকেতকে এগিয়ে দেওয়া হয়। যা একটি অর্থময় ডিটেল হয়ে ওঠে — শ্যামলেন্দু যখন পাখার ডিফেন্স-এর দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফেরে সে রাত্রের ঘটনায। সেই জায়গাটা চিন্তা করা যাক যেখানে আমরা রাত্রের স্তব্ধতার মধ্যে শ্যামলেন্দু ও টুটুলকে স্ব স্ব কক্ষে বিনিদ্র ও চিন্তারত দেখি। শান্ত ও নিস্তরঙ্গ বর্হিবাস্তবে রচিত আলোচ্য দুটি চিত্রকল্পের আন্তর বাস্তবে তীব্র প্রবাহের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের চারিত্রিকতার স্বক্ষর থাকে। এই বৈপরীত্যেব জন্য বর্হিবাস্তব আগে থেকে প্রস্তুত করা হয় যখন শ্যামলেন্দু টুটুলের সামনে এমন একটা অভিব্যক্তি করে যাতে মনে হয় যে এই সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য দুর্নীতির সঙ্গে আপসে সে কোনরকমেই স্বীকৃত নয়। কিন্তু, আলোচ্য পর্যায়ে আন্তর-বাস্তব সেই দুর্নীতির সঙ্গে আপস পর্যায়টিই নিয়ে আসে। যখন শ্যামলেন্দু আসলে তালুকদারের শরণাপন্ন হবার কথা ভাবে। নেপথ্যে দূর থেকে কুকুরের ডাক শোনা যায়। পাশের কক্ষে যদিও টুটুলকে তাব বয়-ফ্রেণ্ডের চিঠি হাতে চিন্তান্বিত দেখায় কিন্তু আসলে সে শ্যামলেন্দুর সেই সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কেই আশঙ্কা করে। এখানে পুনরায় নেপথ্যে কুকুরের ডাক দুই চিত্রকল্পকে সম্পর্কিত করে। শ্যামলেন্দু যখন শেষ পর্যন্ত তালুকদারকে ফোনে যোগাযোগ করে আমরা ঐ নেপথ্যধ্বনি শুনি। এর পরবর্তী পর্যায়ে কারখানার লক-আউটের ব্যবস্থা সম্পন্ন হবার পর একদিন খাবার টেবিলে

টুটুল সহসা শ্যামলেন্দুকে অফিসের গোলমালের কথা জিগ্যেস করে ('শ্যামলদাকে কদিন বেশ নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে......')। ক্যামেরা শ্যামলেন্দুর মুখের কাছে সরে অসে এবং যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব শ্যামলেন্দু একটি আরোপিত পরিহাসের দ্বারা বজায় রাখে। কিন্তু নেপথ্যে অকস্মাৎ আঘাতপ্রাপ্ত একটা কুকুর আর্ত চীৎকার করে ওঠে। একটা স্বাভাবিক ডিটেলের আশ্চর্য প্রয়োগে মনে হয় যেন টুটুলের অপাপবিদ্ধ সারল্য শ্যামলেন্দুর পরিহাসের মুখোস খুলে দিতে চায়। যার পিছনে সযত্ন পালিত প্রভুভক্তির এক কুৎসিত চোহারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে বোমায় আহত কারখানার একজন সাধারণ কর্মীর মৃত্যু-সঙ্কট নিয়ে তালুকদারের স্থূল রসিকতার সমর্থনে শ্যামলেন্দুর কুৎসিত যে চেহারা বেরিয়ে আসে। শ্যামলেন্দুর ঐ হাসি থেকে ক্যাবারে নর্তকীর নগ্ন হাতে চিত্রকল্প বদলে যায়। টুটুলের কাছে শ্যামলেন্দুর গোটা ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাওয়ার দৃশ্যের সঙ্গে ক্যাবারে নর্তকীর যৌনভঙ্গির ইন্টার-কোট moral prostitution-এর দুই স্বরূপে কোন তফাৎ রাখে না। শ্যামলেন্দুকে ক্যাবারে নর্তকীর মালা পরিয়ে দেওয়া এক আত্ম-বিক্রেতাকে আরেক আত্ম-বিক্রেতার স্বীকৃতি।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে rondo যেমন বারে বারে আবর্তিত হয়ে ফিরে আসে একটি অভিঘাতে, তেমন 'সীমাবদ্ধ'তে সারা চলচ্চিত্রটি আবর্তিত হয়ে যায় শেষভাগে শ্যামলেন্দুর ডাইরেক্টর হবার পর তার ফ্ল্যাটের আটতলা সিঁড়ি বেয়ে ওঠার দৃশ্যে। লিফট্-এর যন্ত্র বিকল হয়ে গেলেও যন্ত্রনির্ভর মানুষের যান্ত্রিকতা কমে না। ওপরে ওঠার প্রথম দিকে আমরা প্রাঙ্গণে শিশুদের কলতান শুনি। সিঁড়ির বাঁকে অলিন্দ পথে ক্রীড়ারত শিশুদেরও দেখা যায়। যাদের পিছনে ফেলে শ্যামলেন্দু উঠতে থাকে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে দূরে ক্রমে ক্রমে শিশুর দল অন্তর্হিত হয়। ওদের কলতান মুছে যায়। আরো ওপরে ভয়ানক এক নৈঃশব্দ্য ঘনিয়ে আসে। যেখানে শ্যামলেন্দুর পদধ্বনি একমাত্র তার সাথী হয়ে ওঠে। অলিন্দপথে অনেক নীচে সীমা নির্দেশকারী একটা প্রাচীব ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। আলোচ্য সিকোয়েন্সটি ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ শ্যামলেন্দুকে চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে পৌঁছে দেয়। যেখানে 'টুটুল' সম্বোধনে সাড়া মেলে না। 'সুদর্শনা'র দূরত্ব ফিরে আসে। মিড-লঙ-এ গৃহীত শেষ দৃশ্যটি এক অসাধারণ সৃজনশীলতার পরিণতি। টুটুলের 'তোমরা যা বলো তাই বলো, আমার লাগে না মনে' গুনগুন করে ওঠাতে যে সংশয়, ঘড়ি ফিরিয়ে দেওয়া এবং নীরব দূরত্বের মুখোমুখি শ্যামলেন্দু আপন মিথ্যা ও ভঙ্গুর মূল্যবোধকে চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করে। ক্যামেরা ক্রমশ ওপরে উঠতে গিয়ে থেমে যায়। মাথার ওপর ঝোলানো পিটার্স ফ্যানের উচ্চতার সীমা সে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। যে মানদণ্ডের নীচে তার সবচেয়ে প্রার্থিত সাফল্য লাভ করেও একটা পরাজিত মানুষ দুই হাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে বসে থাকে। কিন্তু এটাই সব নয়। আলোচ্য দৃশ্যের প্রকৃত মূল্য অন্য জায়গায়। শ্যামলেন্দুর ঘড়ি ফিরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে টুটুল ওপরতলার এই মেকি সভ্যতার সময়-বৃত্তকে পরিত্যাগ করে যায়। দ্রুত ডিসলভ্ দ্বারা ফ্রেমের চতুষ্কোণ থেকে তার সত্বর অন্তর্ধান স্পেস-এর পরিবর্তনও সূচিত করে। যে ভবিষ্যতের দিকে তার যাত্রা সে ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, হয়তো অনিশ্চিত। নেপথ্যে ঝড়ের সংকেত বলে দেয় সে-ও অপেক্ষমান সেই ভবিষ্যতে। এই শেষ পর্যায় শেষ নয়, আবার শুরুও।

অশনি সংকেত

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

'পথের পাঁচালী'র বিশ বছর পূর্তির কিছু আগে সত্যজিৎ রায় পুনর্বার বিভূতিভূষণে ফিরে এলেন। 'অশনি সংকেত' তাঁর ঊনবিংশতম চলচ্চিত্র। যদিও পরিচালকের 'অশনি সংকেত' নিয়ে চিন্তার সূত্রপাত আজ থেকে প্রায় দশবছর পূর্বে এবং 'পথের পাঁচালী'র অব্যবহিত পরে বিভূতিভূষণের আরেকটি কাহিনী 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' সম্পর্কে তাঁর ইচ্ছা আভাসিত, তবুও এক দীর্ঘ শিল্প পবিক্রমার পব এই ফেরা নিশ্চিভাবেই নতুন তাৎপর্যে চিহ্নিত। সত্যজিৎ রায়ের এ যাবৎ উনিশটি চলচ্চিত্রের বিষযের ওপর যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে প্রায দুই তৃতীয়াংশ চলচ্চিত্রের পটভূমিতে রয়েছে শহর কিংবা শহর-চরিত্রের মফঃস্বল, সঙ্গতভাবেই যেখানে অধিকাংশ চরিত্র শহরের মানুষ। কিছুদিন আগে একটি বিদেশী পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ রায়ও নিজেকে বলেছেন নগরকেন্দ্রিক। কিন্তু সেটা মূলত physical স্তরে। সমাজ সত্যে যে কোন মহৎ চলচ্চিত্রকারের মত সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁব শিল্পকর্মেব আনুগত্য বা সমর্থন প্রশ্নাতীত। তাঁর প্রিয়তম বিষয় মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর milieu বচনায় তিনি সন্দেহাতীতভাবে এখনও পর্যন্ত একক। তবুও যেখানে বিশেষভাবে তিনি গ্রামবাংলাকে বেছে নিয়েছেন সেখানে তাঁর চলচ্চিত্র এমন একটি আশ্চর্য সার্বিক ও সুগভীব অনুভূতিসম্পন্ন যা কেবলমাত্র সমকালের গণ্ডীতেই বাঁধা থাকতে পারে না। গ্রাম ও শহর — being এবং becoming — এই দু'য়ের দ্বিমুখী পবিবর্তন এবং মূল্যবোধের দ্বন্দ্বেব কথা সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রে বারংবার বলেছেন। ভারতে একমাত্র তাঁরই চলচ্চিত্রে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সূচিত হয়েছে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতাব বৈপরীত্য। কিন্তু এই দেখা শুধু একজন সমাজতাত্ত্বিকের চোখেই নয, একজন মহত্তম শিল্পীবও। যিনি জীবনের সৌন্দর্য ও ভয়াবহতা দুই সম্পর্কেই সচেতন। তাঁর চলচ্চিত্রেব শ্রেষ্ঠতম মানবিক মুহূর্তগুলি সেই চেতনার মধ্যেই বিধৃত। তাঁর সমস্ত চলচ্চিত্রেই দেশের মাটির ও মানুষের সঙ্গে নিবিড় একটা নাড়ীর টান প্রত্যক্ষ কবা যায়। সেটা কোন পিরিযডপিসেও হতে পারে কিংবা কোন সমকালীন আখ্যানে। তবুও এই involvement অন্তরঙ্গ আবেগের একটা মমত্বপূর্ণ চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসে যখন সত্যজিৎ রায় গ্রামের পটভূমিতে ফিরে যান। যে কোন প্রকৃত জীবননিষ্ঠ শিল্পী জানেন যে শুধুমাত্র বর্তমানই শিল্পের চূড়ান্ত হাইকোর্ট নয়। সময়কে অতিক্রম করার জন্যই শিল্পে উত্তরণের প্রয়াস। Objectly আজকের গিমিক কালকে চালাকি বলে পরিগণিত হতে পারে। বলা বাহুল্য টেলিস্কোপের উল্টো দিকে চোখ রেখে যাঁরা সমাজ-সত্য বা রাজনৈতিক-সত্য আবিষ্কার কবেন সত্যজিৎ রায় তাদের দলভুক্ত নন। তিনি সরাসরি গোটা মানুষের দিকে তাকাতে পারেন এবং তার আদ্যন্ত অর্থও বুঝতে পারেন। তিনি উত্তরণ-প্রয়াসী এবং তিনি জানেন ভাবীকাল তাঁর জন্য অপেক্ষমান। তাঁর সমকালকে সেখানে পৌছে দেবার দায়িত্ব এখনও পর্যন্ত এদেশে একমাত্র তাঁরই। বিশেষভাবে লক্ষীভূত উনিশটি

চলচ্চিত্রের শিল্পবিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে মাটির কাছাকাছি মানুষের নৈকট্যে তাঁর সরে আসার প্রয়াস। তাই, শুরুতে অপু-কাহিনী, মধ্যপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প এবং নবপর্যায়ে গুপি-বাঘা...' ও 'অশনি সংকেত'।

দেশ ও কালের এক সুতীব্র সঙ্কট মুহূর্তে 'অশনি সংকেত' রচিত হল। তিয়াত্তরের দেশজোড়া আকাল, অগ্নিমূল্য ও কালোবাজারীদের সীমাহীন খেয়াল-খুশির আধিপত্যে যখন সাধারণ মানুষ এক অসাধারণ ধৈর্যের পরীক্ষায় রত, তখন সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পদধ্বনির কথা শোনালেন—যে দুর্ভিক্ষের পেছনে অন্তত কোন অনাবৃষ্টি, বন্যা কিংবা কোন অজন্মার ভূমিকা ছিল না। তবুও সেই দুর্ভিক্ষের বলি হয়েছিল এই দেশেরই পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী। এই পরিসংখ্যান বিভূতিভূষণ তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাসে লেখেন নি। সত্যজিৎ তাঁর চলচ্চিত্র রচনার বাস্তববোধের বিস্ময়কর বিশ্বস্ততায় সেই পরিসংখ্যানে পৌঁছেছেন। এই পরিসংখ্যানের জন্য তিনি তিরিশ বছর পিছিয়েছেন কেন? জাপানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর মূল্যবোধের ভাঙন ও মোহভঙ্গের জন্য মিজোগুচি কেন তাঁর 'উগেৎসু'তে চার শতাব্দী পিছিয়ে ছিলেন? হিরোশিমার বিষাক্ত স্মৃতি মনে রেখে সাবজেক্টিভ সত্যে খণ্ডিত মানুষের অসহায়তার কথা বলবার জন্য কুরোসাওয়া কেন নির্ভর করেন রাশোমন-মিথ-এ? তার কারণ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে কৃত্রিম অনুভূতি যেমন সমকালীন সত্যকে অনেক সময়ে প্রহসনে পরিণত করে, তেমন অনুভূতির যথার্থতা ও প্রাখর্য পারে একটি বিশেষ সমাজ-সত্যকে কালোত্তীর্ণ করে দিতে। 'অশনি সংকেতে'র শেষ দৃশ্যে ক্ষুধার্ত মানুষের মৃত্যুর পরিসংখ্যানলিপি আজকের এদেশীয় মানুষের কাছে শুধু একটি বিপজ্জনক সঙ্কটের প্রতি সাবধান বাণীই নয়, অথরিটির প্রতি একটি মূর্ত প্রতিবাদও। 'অশনি সংকেত' যেদিন কলকাতায় মুক্তিলাভ করে,সেইদিন শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দীর্ঘকাল অনাহারের ফলে কয়েকজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। কোন সংবাদপত্রের জনৈক প্রভুভক্ত কেরাণী সমালোচক তার মনিবদের সন্তুষ্ট করার জন্য এই ধরণের ঘটনাবলীর যোগাযোগকে কাকতালীয় বলে ঘোষণা করেছেন। অবশ্য এটাই প্রত্যাশিত। এই প্রদেশের এক বৃহত্তর অঞ্চলে যখন সন্ধ্যায় উনান জ্বালানের উপায় থাকে না তখন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আলিপুর হর্টিকালচারের চন্দ্রমল্লিকার ছবি ছাপা হয়, চিড়িয়াখানার সাদা বাঘের সন্তানসন্ততির বংশ পরিচয় কাব্যিক ভাষায় বিবৃত হয়, মাঠে ময়দানে আলো ঝলমল সাংস্কৃতিক মেলার উপযোগিতা বোঝানো হয়। আমাদের আনন্দ-সংবাদে অনাহারে মৃত্যুর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কিন্তু, চিকিৎসা শাস্ত্রে 'প্রগ্নসিস' বলে একটা কথা আছে। সেটা শিল্পের বেলায়ও কখনও খাটে। ক্রকোয়া সাহেব 'ক্যালিগরী'র নিউরোসিস-এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন জর্মন ফ্যাসিবাদে হিটলারের আগমন সম্ভাবনা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনেক আগে আমাদের 'গুপি গাইন'-এ উচ্চারিত হয়েছে রেজিমেন্টেশনকে অতিক্রম করে দুই বাংলার মিলন কথা। তেমনই অনাগত ভয়ঙ্কর দিনগুলির প্রতি 'অশনি সংকেত' সত্যদ্রষ্টা এক শিল্পীর দিকনির্দেশ। সত্যজিৎ রায় মিশনারী নন। নন সমাজ সংস্কারকও। সমস্যা সমাধানের অতি সরলীকরণ পন্থাও তাঁর কোন চলচ্চিত্রে মেলে না। সঙ্কটের জটিলতা, গভীরতা বা অস্থিরতা প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রের জীবনদর্পণে তিনি যে মানবিকতার দুঃসহ লাঞ্ছনা বা অবমাননার মুহূর্তগুলি আঁকেন তাকে কেন্দ্রবিন্দু রেখে সমস্যা বা সঙ্কট আকৃতি লাভ করতে শুরু করে। তাঁর

চলচ্চিত্রে কমিটমেন্ট-এর জোর এইখানে। কেননা এর মধ্যে রয়েছে তাঁর প্রতিবাদও। লাঞ্ছনা থেকে জন্ম নেয় যে ঘৃণা বা প্রতিবাদের মনোভঙ্গী সে জীবনবোধের মূল্য অপরিসীম, যে লাঞ্ছনার কথা কীটন বা চ্যাপলিন জানতেন। আমাদের সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন। কিন্তু, সর্বোপরি, সত্যজিৎ রায় একজন প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্রকার। এবং সৌভাগ্যবশত তিনি একজন মিডিয়কার রাজনৈতিক প্রচার-সচিব নন। সুতরাং 'অশনি সংকেত' তুলতে গিয়ে তাঁকে লাল বিপ্লব থেকে সবুজ বিপ্লব পর্যন্ত মন রক্ষা করে চলতে হয় না। অতএব, তাঁর চলচ্চিত্রের মুল আবেদন বুঝতে গেলে অসংখ্য দেয়াল-লিখনের ভণ্ডামি ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পঠন পাঠনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু , সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রের শিল্পসৌকর্য এখনও পর্যন্ত এদেশে অনেকের কাছেই একটা সম্পূর্ণ অপিরিচিত অভিজ্ঞতা। প্রেক্ষাগৃহে সত্যজিৎ রায়ের একটি নতুন চলচ্চিত্রের মুক্তিলাভ মানেই দেশের যুগপৎ শাসক ও বিরোধী পক্ষ, নরম ও চরমপন্থী, বাম বা দক্ষিণ দলগত নির্বিশেযে একই শিবিরে শ্রেণীবদ্ধ হওয়া। অর্ধশিক্ষা এই সাম্যবাদের অপর নাম। 'অশনি সংকেত' সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এই কথাগুলি লেখার প্রয়োজন ছিল এই কারণে যে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে একটি চারিত্র্য-শিল্প আছে। যা শিল্পকে লুকিয়ে রাখার শিল্প। আমাদের দেশের দর্শক বা সমালোচক চলচ্চিত্র 'দেখায়' অভ্যস্ত। কিন্তু, চলচ্চিত্র কখনও 'পড়তে'-ও হয় প্রেক্ষাগৃহে বসে। যদিও সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র বাংলা ভাষাতেই রচিত এবং তার জন্য এদেশের দর্শকদের সাব-টাইট্‌ল্ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাঁর চলচ্চিত্র, পুনর্বার, চলচ্চিত্রভাষাতেই রচিত এবং দুঃখের বিষয়, তার জন্য এদেশের দর্শকদের সাব-টাইট্‌ল্ দেওয়া সম্ভব নয়। কলকাতায় 'অশনি সংকেত' সম্পর্কে নানা আলোচনা বা মন্তব্যের মধ্যে অন্তত চলচ্চিত্রে সাক্ষরতার প্রমাণ অপ্রতুল। সেটা নিন্দা হোক অথবা প্রশংসা হোক। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই কয়েকটা একত্রিত শব্দে একটি বৈজ্ঞানিক কার্যাকরণ থাকলেও তার মধ্যে একটি শিল্পবোধও থাকা সম্ভবপর। কিন্তু বর্ণপরিচয়েব রচয়িতা প্রথম ভাগের প্রথম পাতার কিছু পরে ঐ শব্দ কয়েকটা লিখেছিলেন। সকল ভাষাতেই নান্দনিক সমঝদারের জন্য অবতরণিকার অনুশাসন মেনে চলতে হয়। প্রমোদকর মুক্ত চলচ্চিত্রের জন্য একশকুড়িটি পয়সা কিংবা প্রেস কম্প্লিমেন্টারী কেবলমাত্র সম্বল করে সে অধিকার অর্জন করা যায় না। 'অশনি সংকেত' আপন সম্ভাবনাতেই শিল্প শর্তে আলোচনার দাবীদার হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রভাষার সাংগঠনিক তাৎপর্য

'অশনি সংকেতে'র শুরুতে যেখানে পরিচয়লিপি বিধৃত সেখানে নিসর্গ দৃশ্যের পঁচিশটি শট আছে। এই শটগুলিতে মানুষ নেই। প্রকৃতি আছে। রূপে, রঙে, পত্রে-পুষ্পে, ঋতুর আবর্তনে, সকাল সন্ধ্যার পট পরিবর্তনে — সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মহিমায়। এই শটগুলির ক্রমপর্যায়ে আকাশ জুড়ে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। দিগন্তের শেষ আলোকে মুছে দিতে চায়। ধানেব ক্ষেতের নরম সবুজকে কালো ছায়া গ্রাস করে নেয়। 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' এব একটি রেশ bass-এর একটা ভয়ানক গাম্ভীর্যে বেজে উঠে দূরান্তের বজ্র ঘোষণার মধ্যে হারিয়ে যায়। পাশাপাশি 'পথের পাঁচালী'র মধ্যভাগে প্রথম বর্ষার আগমনী মনে পড়ে। সেখানেও মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি। নবজীবনের আশ্বাসে আনন্দিত

প্রকৃতি যেন মাথা নিচু করে প্রণাম করছে। কিন্তু সেই বৃষ্টির আরেক দিকে এক ভয়ানক বৈপরীত্য। নিয়তির অমোঘ বিধানের ফলশ্রুতির মত (দুর্গার মৃত্যু) সেই বৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'র কাহিনীগত এক পরিণতি এনে দিল। 'অশনি সংকেতে'র পরিচয় লিপিকালীন মেঘ গর্জানো আকাশে অশনি সংকেত কাহিনীগত পরিণতির ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু কোন ভূমিকা গ্রহণ করে না। পরিচয় লিপি শেষ হয় বর্ষণ-ক্ষান্ত আকাশে সূর্যাস্তের অপরূপ বর্ণসমারোহে। 'অশনি সংকেতে'র একেবারে অন্তিম শট নির্বর্ণ। সেখানে প্রকৃতি নেই। মানুষ আছে। বহু মানুষে দীর্ঘ এক ভূখা মিছিল। শুরু থেকে শেষ এই ক্রমপরিণতির মধ্যে সত্যজিৎ রায় তাঁর চিত্রনাট্যকে বেঁধে নিয়েছেন। এখানে চিত্রনাট্যের structural বৈশিষ্ট্য বুঝতে গেলে বৈষয়িক গড়নটি বোঝা দরকার।

চল্লিশ দশকের বেশ কিছু পূর্ব থেকে গ্রাম বাংলার সমাজীবনে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন অসে তার ফলে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থ পরিবারগুলির একটি আর্থিক ক্ষয়িষ্ণুতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে পড়ে। কৃষিনির্ভর এই অসংখ্য গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে থাকা বহু সাবেকী যৌথপরিবার ক্রমশ খণ্ডিত হয়ে যায়। রেলপথের বিস্তার ও শিল্পের প্রসারের সঙ্গে অনেক ছোট পরিবার শহরে চলে আসে জীবিকার সন্ধানে। কিন্তু এই পরিবারগুলির একটি বৃহত্তর অংশ একটি নিজস্ব মূল্যবোধে, শ্রেণীকৌলীন্যের হৃতগৌরবের অভিমানে এবং হয়তো বাস্তুভিটার প্রতি একটি আজন্ম নৈকট্যবোধে গ্রামকে আঁকড়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। গ্রামে নারায়ণ পূজা, পালা-পার্বণে পৌরোহিত্যের যে সুপ্রাচীন অধিকারবোধে এরা শ্রেণী শ্রেষ্ঠত্বের সুবিধাগুলি ভোগ করে আসছিল তা-ই জীবন ধারণের শেষ অবলম্বন হয়ে ওঠে। মনে করা যেতে পারে এখানে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীর আর্থিক নির্ভরতা ছিল মূলত প্রাকৃত মানুষদের ওপরই। তারা হয়তো ধান-চালের ব্যবসায় সফল আড়তদার কিংবা মহাজন চাষী। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে একটি জায়গায় নিরুপায় হরিহর সর্বজয়াকে বলে 'আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা — ভদ্দর লোকের'ই হয়ে পড়েচে হা ভাত যো ভাত — ।' এই কথাটার মধ্যে যেমন একটি হতাশ্বাস আছে, তেমন আছে একটি পরনির্ভরতার ইঙ্গিত। সেটা বিভূতিভূষণ যে pretext—এ ব্যবহার করেছেন, সেটা 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। 'অশনি সংকেত' উপন্যাস এবং চলচ্চিত্রে নিরুপায় গঙ্গাচরণ অনঙ্গ বৌকে বলে 'চাষা মাথার ঘাম ফেলে চাষ করে — আর আমরা তার মাথার উপরে বসে খাই। এই ব্যবস্থা, তাই গোলমাল। নিজেরও ত জমি নেই যে চাষ ক'রে খাব।' এখানেও হতাশ্বাস আছে শেষ লাইনে কিন্তু সেই সঙ্গে পরগাছাবৃত্তির স্বীকৃতি (যা একটি প্রবল সঙ্কটের চাপে ক্রমপরিবর্তিত মূল্যবোধের দ্বারা বিশ্লেষিত) আরো স্পষ্ট। কিন্তু, কি 'অপু-ট্রিলজি'তে কিংবা 'অশনি সংকেতে', কি বিভূতিভূষণের রচনায় কিংবা সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে এই পরগাছাবৃত্তিটাই কেবলমাত্র বিষয় নয়। বিভূতিভূষণ যাদের 'ভদ্দর লোক' বলেছেন তাদের বেঁচে থাকার জন্য সিকিয়রিটির একটা ভয়াবহ অন্বেষণ এর থেকে বেরিয়ে আসে। বিভূতিভূষণের শুধু 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' বা 'অশনি সংকেত' রচনাতেই নয়, তাঁর 'দৃষ্টিপ্রদীপ' বা অন্যান্য রচনাতেও দারিদ্রতাড়িত পরিবারগুলির একটা migratory ধরণ চোখে পড়ে। এদের প্রয়োজন অতিরিক্ত নয়, শুধু কোনমতে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে-পরে সংসারটা একটু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা। তারই প্রাণান্ত চেষ্টায় এরা শেষ পর্যন্ত ভদ্রাসন ত্যাগ করে গ্রাম

থেকে গ্রামান্তরে বেরিয়ে পড়ে। শহর অপেক্ষা এই ব্রাহ্মণ পরিবারগুলি গ্রামেই বরং কিছুটা স্বচ্ছন্দ। কেননা সেখানে প্রাচীন শ্রেণীকৌলীন্যে তাদের কিছুটা আর্থিক সংগতির সুযোগ মেলে। 'পথের পাঁচালী' থেকে 'অপরাজিত'র মাঝামাঝি পর্যন্ত (মনসাপোতা পর্যন্ত) অথবা হরিহর রায়ের পরিবার এক টিমাত্র উত্তরপুরুষে অবসিত হওয়া না পর্যন্ত সত্যজিৎ রায় এই transition থেকে চোখ সরান নি। 'অপরাজিত'র প্রায় মাঝামাঝি থেকে ট্রিলজির বাকি অংশ শ্রী অপূর্বকুমার রায়, যে বাল্যকালে তার 'মা ও দিদির মত স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে' এবং যে উত্তরকালে নিশ্চিন্দিপুরের দিগন্ত অতিক্রম করে আপন বৃহত্তর স্বপ্নে প্রবেশ করেছে মূলত তারই উত্তরণের পটভূমি। কিন্তু, 'অশনি সংকেতে'র গঙ্গাচরণ স্বপ্ন দেখেনা। গ্রামের গণ্ডীর বাইরে সিঙ্গাপুর তার কাছে জিলা মেদনীপুরের কাছাকাছি অঞ্চল। তার কাছে জাগতিক বেঁচে থাকার প্রশ্নটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিংবা বেঁচে থাকার নীতিকৌশল। তাই হরিহরপুর থেকে বাসুদেবপুর থেকে ভাতছালা থেকে নতুনগাঁ। কিন্তু নতুনগাঁ থেকে কলকাতা থেকে মধ্যভারতের খনি অঞ্চল থেকে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ নয়। কিন্তু, 'অশনি সংকেত' চলচ্চিত্রে হরিহরপুর থেকে বাসুদেবপুর থেকে ভাতছালা নেই। আছে নতুনগাঁ। গঙ্গাচরণের নতুন আস্তানা। অনেকখানি দুঃখ কষ্টের পথ পরিক্রমার পর একটুখানি নিশ্চিন্তে মাথা গোঁজবার জায়গা। খাওয়া পরার একটু স্বস্তিবোধ। আর্থিক অবস্থার কিছুটা নিরাপত্তা প্রাপ্তি। বিভূতিভূষণ যদিও তাঁর উপন্যাস শুরু করেছিলেন নতুনগাঁ থেকেই, কিন্তু তিনি ন্যারেটিভ-এর ফাঁকে ফাঁকে পূর্ববর্তী গ্রামগুলিকে ছুঁয়েছেন এবং দুর্ভিক্ষ না আসা পর্যন্ত নতুনগাঁয়ের আপাত স্বচ্ছলতার মধ্যে গঙ্গা-অনঙ্গকে পৌঁছে দিয়েছেন। সত্যজিৎ রায় অনঙ্গর কেবলমাত্র দুটি সংলাপের মধ্যে (একটি ছুটকিকে বলা এবং অপরটি মতিকে বলা) সেই ভ্রাম্যমান পূর্বজীবনের দুঃখ-দুর্দশার উল্লেখ করেছেন। কারণ ঐ transition -এ দৃষ্টি রেখেই সত্যজিৎ রায় বুঝেছিলেন যে সিকিয়রিটির সন্ধানে গঙ্গার বর্তমান আস্তানাটির আসলে গুরুত্ব কতখানি। বিভূতিভূষণেব বর্তমান উপন্যাস বর্ণনা ভঙ্গীর জন্য অনেকখানি সিনেম্যাটিক মনে হয়। কারণ উপন্যাসের তথাকথিত কিছু চারিত্রিক বাহুল্য এখানে বর্জিত। কিন্তু, একটি উপন্যাস পাঠের অনুভূতি এবং চলচ্চিত্র রচনার অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুই মাধ্যমে সময় এবং স্পেসের নিয়ন্ত্রণও ভিন্ন। বিভূতিভূষণ 'অশনি সংকেত' সমাপ্ত করতে পারেন নি, সুতরাং এর পরিণতি কাহিনীব বুনোনকে কোন কেন্দ্রে আকর্ষণ করছে তা অনুমান করাও কঠিন। ক্রমাগ্রসরিত দুর্ভিক্ষকে ধরবার জন্য তিনি তাঁর কাহিনীকে বেশ কিছুটা বিলম্বিত লয়ে ধাপে ধাপে প্রসারিত করেছেন। যেখানে বহু চরিত্র বহু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে আকৃতি লাভ করছে। এই ধরণের একটা বিরাট span-এ প্রবেশ ও প্রস্থান একজন সাহিত্যিকের কাছে যতখানি সহজ, ফিজিক্যাল সময় সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন একজন চলচ্চিত্রকরের কাছে ততখানি নয়। চিত্রনাট্য রচনার ব্যাপারে সত্যজিৎ রায়ের একটি আশ্চর্যজনক প্রতিভা আছে, ইংরেজিতে যাকে বলা যায় magpie-talent। গ্রহণবর্জনের দ্বারা কোন মৌলভাবনাকে তিনি স্বমাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করেন। এবং প্রায়শই সে সৃষ্টি শিল্পোৎকর্ষে মূলকেও অতিক্রম ককের যায়। গ্রহণবর্জনের সেই সুচিন্তিত প্রশ্নে 'অশনি সংকেতে'র চিত্রনাট্য গঠনের সময় সত্যজিৎ রায় গঙ্গাচরণের কুটিরকেই চলচ্চিত্রের প্রকৃত pivot হিসেবে বেছে নেন। এবং এখানে কেন্দ্র-চরিত্র দুটির আসা যাওয়ার চরিত্রে সেই সাংগঠনিক তাৎপর্য পাওয়া যায়। প্রথমত,

প্রাসঙ্গিক সূত্রে চলচ্চিত্র থেকে গঙ্গাচরণ ও অনঙ্গর তন্নিষ্ঠ গতিবিধিকে মূলত এইভাবে ভাগ করে নেওয়া যায় ঃ

চলচ্চিত্রের প্রথমাংশ

(এস্টাব্লিশিং শট্‌স-এ অনঙ্গ এবং গঙ্গাচরণ দুজনকেই বাড়ির বাইরে দেখানো হচ্ছে)

ক। স্নানান্তে অনঙ্গবৌ নদী থেকে জল নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

খ। ব্রাহ্মণের সেবায় দেওয়া সিধুচরণের মাছ নিয়ে গঙ্গাচরণ বাড়ি ফিরছে বাড়ি ফিরে যথাক্রমে দুজনের সঙ্গে মতির দেখা হয়। মতি পূর্ববর্তী ভাতছালা গ্রামে অনঙ্গর দুঃখের দিনের সঙ্গিণী।

গ। কামদেবপুর থেকে গ্রামবন্ধন সেরে গঙ্গাচরণ গরুর গাড়িতে বাড়ি ফিরছে পথে অপরিচিত বৃদ্ধ দীনু ভটচাযের সঙ্গে দেখা হয়। দুর্ভিক্ষের প্রথম খবর এল এখানে। গঙ্গাচরণ দীনুকে চালডাল দিয়ে সাহায্য করে।

ঘ। গঙ্গাচরণ খালি তেলের বোতল হাতে বাড়ি ফেরে

বাজারে কোরোসিন দুস্প্রাপ্য এবং চালের দামের উর্ধগতি গঙ্গা জেনেছে। বাড়িতে ফিরে দীনু ভটচাযকে আবিষ্কার করে। যে অনঙ্গর 'অন্ন ধবংস' করেছে।

ঙ। গঙ্গাচরণ খালি থলি নিয়ে বাড়ি ফেরে

গঞ্জের আড়ত থেকে গঙ্গা চাল জোগাড় করতে পারেনি। পবন্তু গ্রামে তার এতদিনের মানসম্মান ধুলিস্যাৎ হয়েছে। বাড়িতে ফিরে অনঙ্গর সঙ্গে দেখা হয়। অনঙ্গ চাল এনেছে সংগ্রহ করে। কিন্তু, তারজন্য গঙ্গাচরণের ভাষায় 'ছোটলোকদের' সঙ্গেই ধান ভাঙতে হয়েছে তাকে।

চলচ্চিত্রের মধ্যাংশ

চ। চাল পাওয়ার জন্য বিশ্বাসমশাইযের বাড়িতে অত্যন্ত তিক্ত পরিস্থিতি থেকে গঙ্গাচরণ বাড়ি ফিরছে

একটা দীঘির পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার হাঁটা থেমে যায়। জনাদশেক স্ত্রীলোক কোমর জলে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে জলের তলায় হাতড়িয়ে গেঁড়িগুগলি তুলে কোঁচড়ে রাখছে। খাদ্যাভাবে ক্রমশ তীব্রতর।

চলচ্চিত্রের শেষাংশ

ছ। গঙ্গাচরণের খিড়কির পথ ধরে দুর্বৃত্ত দ্বারা নিপীড়িত অনঙ্গ ছুট্‌কির কাঁধে ভর করে বাড়ি ফিরছে। পিছনে কাঁধে মেটে আলু নিয়ে মোক্ষদা।

জ। নিবারণ ঘোষের বাড়ি থেকে চাল সংগ্রহ করে গঙ্গাচরণ বাড়ি ফেরে। এখানে গঙ্গচরণ এবং অনঙ্গ দুজনেই সেদিনের খাদ্যান্বেষণে সফল। কিন্তু, অনঙ্গকে অভুক্ত রেখে গঙ্গাচরণ যে নিবারণ ঘোষের বাড়িতে ভাত খেয়েছে এবং অনঙ্গ মেটে আলু আনতে গিয়ে যে দুর্বৃত্ত দ্বারা নিপীড়িত এ কথা পরস্পরে জানাতে পারে না।

ঝ। চলচ্চিত্রের শেষবারের মত গঙ্গা বাড়ি ফিরে নিকটবর্তী গাছের তলায় মতির কাছে চলে আসে

ব্রাহ্মণ গঙ্গাচরণ অন্ত্যজ মতি মুচিনীর মৃতদেহ স্পর্শ করে।

গঙ্গাচরণ ও অনঙ্গর বাড়ি ফিরে আসার উপরোক্ত বিভিন্ন অংশগুলিতে যে ক্রম অভিজ্ঞতা বিধৃত সেগুলিকে যদি operative structure হিসেবে আলোচনা করা যায়

তাহলে বোঝা যাবে যে একটি ক্রমাগত তীব্র ও ভয়ঙ্কর সঙ্কট (এখানে দুর্ভিক্ষ) কীভাবে চরিত্র দুটির মূল্যবোধ পরিবর্তিত করছে। ক ও খ অংশ রয়েছে চলচ্চিত্রের শুরুর দিকে। এখানে গঙ্গাচরণের কিছুটা স্বচ্ছলতা নির্দেশিত। সে এতদিন বাদে মোটামুটি গুছিয়ে বসেছে। গ্রামে তখন সিধুচরণদের মত লোকের অভাব নেই, যারা জালে আটটা মাছ উঠলে একটা ব্রাহ্মণের সেবায় সহজেই দিয়ে দিতে পারে। ম্যালেরিয়া রোগীদের জন্য কবিরাজী পুরিয়ার পরিবর্তে দৈনন্দিন চাহিদা পূরণেরও পাকা ব্যবস্থা সম্ভব। এখানে গঙ্গাচরণ ও অনঙ্গর ব্যবহারিক রীতিতে কিছুটা জয়গর্ব, আত্মসন্তুষ্টি এবং আধিপত্য রয়েছে। এবং একটি শ্রেণীশ্রেষ্ঠত্বের মূল্যবোধও। এই পরিবেশে ভাতছালা গ্রাম থেকে মতি আসে। তার সঙ্গে সৌহার্দ্যের একটু পূর্বসম্পর্ক বিদ্যমান। এই অস্পৃশ্য কন্যাটি চরম দারিদ্র্যের দিনে ব্রাহ্মণ কন্যা অনঙ্গকে খাদ্যের সংস্থান করে দিয়েছে। কিন্তু, অনঙ্গর বর্তমান স্বচ্ছল দিনেও সে তার গাছের একটা ফলকে ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ নিয়ে এসেছ। মতির মধ্য দিয়ে প্রাচীন গ্রামবাংলা ভীষণভাবে আসে। সেই যৌথ অবস্থিতির একটা প্রাণবন্ত অন্বয়ের প্রত্যয়। কিন্তু, এখানে মতি এবং অনঙ্গর অবস্থিতিটা ঠিক এক রেখ নয়। অনঙ্গ যখন ঘরে কাপড় ছাড়বার সময় মতির সঙ্গে কথা বলছে তখন ঘরে ফোরগ্রাউণ্ডে অনঙ্গ এবং উঠোনে ব্যাক-এ মতি এর মাঝের দূরত্বটা শুধু নয়, দুজনের অবস্থিতিটাও রয়েছে দুটি ভিন্ন তলে। এবং এখানে ডীপ ফোকাস ব্যবহার না করে মতিকে ঝাপসা রাখা হয়। ফোরগ্রাউণ্ডে অনঙ্গর যৌবনোচ্ছ্বল অবয়ব স্পষ্ট। কিন্তু দূরত্বের ঐ প্রান্তসীমা থেকে মতি অনঙ্গর সন্তানসম্ভাবনার শুভ কামনা করে বলে 'এবার তোমার হবে ত বামুনদিদি? আমরা সবাই এসে মিষ্টি খাব যে।' Regeneration-এর এই যে গ্রামীণ আনন্দের শরিকীয়ানা-এর সম্পর্কে আছে চলচ্চিত্রে অনেক পরের একটা সিকোয়েন্সে যখন নিবারণ ঘোষের বাড়িতে গঙ্গাচরণ অভুক্ত স্ত্রীর কথা মনে করে ভাত খেতে পারছে না। তখন তাকে স্ত্রীর জন্য চাল দেবার আশ্বাস দিচ্ছে আরেকটি গ্রামের মেয়ে। সে-ও অন্ত্যজ শ্রেণীর এবং তার অবস্থিতিও ঐ ধরণের দূরত্বের প্রান্তসীমায়। যদিও তাকে সেখানে আউট অব ফোকাস করা হয় না, কিন্তু আলোর মুখোমুখি ক্যামেরা বসিয়ে একটা illusory অবস্থায় দেখানো হয়। সঙ্কটের সেই চরম মুহূর্তে ঐ স্বপ্নময় প্রতিশ্রুতি গঙ্গাচরণের মুখকে কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে দেয়। কিন্তু এখানে মতির ঐ কথার প্রতিক্রিয়া অনঙ্গর মুখে একটা তাৎক্ষণিক বিষণ্ণতা আনে। সেটা বিয়ের পর থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে একটা একটানা লড়াইয়ের কারণেও হতে পারে। তবু সেই অনুভূতির সামিল হিসেবেও মতি আসে না। দূরত্বটা থাকে। ঠিক পরেই অনঙ্গ যখন ভিজে কাপড দড়িতে মেলবার সময়ে (চলচ্চিত্রে লাল রঙকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে এখানে) মতিকে পূর্বজীবনের কষ্টের কথা বলছে, তখন ক্যামেরা শুধু অনঙ্গকে ট্র্যাক করছে। কিন্তু 'ভাতছালাতেও ত — মনে নেই? — তুই আম কুড়িয়ে এনে দিতিস — কাঁঠাল এনে দিতিস্' অনঙ্গর এই সংলাপের সঙ্গে ক্যামেরা ফ্রেমে মতিকেও ধরে। অন্বিত এই সময়ে মতি বলে, 'তোমরা ছিলে সে আমাদের কত ভাগ্যি।' পূর্বোক্ত খ ও গ অংশের মধ্যে চলচ্চিত্রে একটি বছরের ব্যবধান রয়েছে। ঋতু আবর্তন এবং গঙ্গাচরণের নানা কাজে প্রতিষ্ঠালাভের মন্তাজের সাহায্যে সে কথা অল্প সময়েই বলে নেওয়া হয়েছে। গ অংশে যেখানে গঙ্গাচরণ গ্রামবন্ধন সেরে ফিরছে সেখানে গরুর গাড়িতে তার সিধের নানা উপাচার। বলা যেতে পারে চলচ্চিত্রে এটাই

তার বৃহত্তর উপার্জন। এবং শেষতম। পূর্ববর্তী গ্রামবন্ধন পুজার দৃশ্যে প্রাপ্তিযোগের ঐ সমারোহের ওপর লাল ও হলুদকে সর্বাধিক বিন্যাসে ব্যাপ্ত করা হয়। চলচ্চিত্রে গঙ্গাচরণের স্বচ্ছলতার প্রথম প্রান্তে আসে মতি এবং শেষপ্রান্তে আসে দীনু ভটচায। নৈবেদ্যের চালডাল ফলমূল বস্ত্র ও প্রণামীর ঐ সমারোহে দীর্ঘকাল অর্ধভুক্ত ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মা অকস্মাৎ দুর্ভিক্ষের সংকেত নিয়ে এসে পড়ে। এখানে মুহূর্তে চলচ্চিত্রে রঙ পালটে যায়। সত্যজিৎ রায় গঙ্গা ও দীনুকে একটি ফ্রেমে সিল্যুটে ধরেন। এবং দুজনেই কোন একটি ভীষণ ও অজানিত বিপদের সম্ভাবনায় চিত্রকল্পে identity হারায়। প্রসঙ্গত 'উগেৎসু'র হ্রদের দৃশ্য মনে পড়ে। যেখানে সেই ভৌতিক নৌকা ভেসে এল। সেই নৌকা থেকে আহত, মুমূর্ষু এক মাঝি অপর নৌকার দুই চাষী পরিবারকে দুর্ভিক্ষজনিত ভয়ঙ্কর অরাজকতার কথা শোনাচ্ছে। মিজোগুচি হ্রদের কুয়াশার মায়াবরণে সব কটা চরিত্রকে একত্রিত করে সেই সঙ্কটের লক্ষ্যভূত করেন। কিন্তু এখানে খোলা মাঠের মধ্যে শুধুমাত্র ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ পাল্‌টে সত্যজিৎ রায় তাঁর অভীষ্ট চিত্রকল্প অর্জন করে নেন। 'অশনি সংকেতে' এটা ছাড়াও আরো দুটি সিল্যুটের প্রয়োগ আছে। কিন্তু যে চারিত্রকতা এখানে ইঙ্গিতবহ তাই পরবর্তীকালে অসাধারণভাবে প্রতিষ্ঠ। এখানে আলো-আঁধারির তীক্ষ্ণ দ্বন্দ্বে দীনুর মুখের সীমারেখা ক্ষুধার্ত জন্তুর মতে দেখায়। তার হাতের লাঠির মাথাটা লুব্ধ শকুনের মুখের মত গাড়ীতে রাখা চালডালের দিকে বারে বারে এগোয়। এই অভিজ্ঞতাটা গঙ্গাচরণের কাছে নতুন। সে যে ক্ষুধার্ত মানুষ আগে দেখেনি হয়তো তা নয়, কিন্তু কোথায় সিঙ্গাপুর নামে তার কাছে এক অজানা জায়গা জাপানীরা যুদ্ধ করে অধিকার করেছে এবং তার জন্য তার গ্রামের আশেপাশে চালের দাম বাড়ছে এই যোগাযোগ তার কাছে অবিশ্বাস্য। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও তার গ্রামের সীমান্তের ওপারে যে পৃথিবী তার কোন কার্যকারণের একটি প্রবাহ প্রথম এখানে এসে আঘাত করছে। এই পর্যায়ের শেষে লঙ শট্‌-এ গঙ্গাচরণের অপসৃয়মান গরুর গাড়ীর দিকে তাকিয়ে দীনু ভটচায ছাতা সমেত হাত শকুনের ডানার মত উপরে তুলে যেন তার ঘোষণা দেয় 'একদিন যাব আপনার গাঁয়ে।' অবশ্যই সে আসে। ঢেঁকিশালের ধানকোটার শব্দ অনুসরণ করেযেন বাতাসে ফসলের ঘ্রাণ পেয়ে ধুলোমাখা ছেঁড়া ক্যাম্বিসের দু'টি জুতো পা'য় পা'য় এগিয়ে আসে। পূর্ববিভক্ত ঘ অংশে গঙ্গাচরণ যখন বাড়ি ফিরে দীনু ভটচাযকে আবিষ্কার করছে, তার আগেই গ্রামে চালের মূল্যবৃদ্ধির খবর এসেছে। এবারে আর তার হাতে সিধুচরণদের দেওয়া কোন সিধে উপাচার নেই। তার হাতে খালি বোতল। বাজার থেকে কেরোসিন উধাও। এখন মূল্যের বিনিময়েও জিনিস পাবার উপায় নেই। দূরাগত সঙ্কট এখন দ্বারপ্রান্তে। পূর্বের গ অংশে যে গঙ্গাচরণ দীনুর ভিক্ষায় চালডাল ঢেলে দেয়, বর্তমানে সে-ই দীনুর প্রতি আচরণে অমানবিক ও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। স্বভাবতই তার এত কষ্টে অর্জিত আর্থিক নিরাপত্তার সুবিধাভোগী হিসেবে এই অবস্থায় সে কাউকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। গঙ্গাচরণের বাড়িতে তার সঙ্গে দীনুর দেখা হয় বিকেলে। এবং ঐ বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত চলচ্চিত্রে এই খুব জোর দশ মিনিট সময়ে দীনু সম্পর্কে অনঙ্গকে বলা 'তুমি অমন ক'রে রাস্তা থেকে লোক ধরে ধরে—' গঙ্গাচরণের এই অর্ধসমাপ্ত সংলাপ দুবার উচ্চারিত। অতিথি যে নারায়ণ এই গ্রামীন বিশ্বাস গঙ্গাচরণের কাছে মূল্য হারায়। ঙ অংশে গঙ্গাচরণ যখন চাল সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে খালি থলে নিয়ে

বাড়ি ফিরছে তখন ক্যামেরার চোখে এই ফেরা বিশেষ হয়ে উঠছে। প্রথমে গঙ্গাচরণের বাড়ির বাঁশের ফটক দেখানো হল ক্লোজ টিল্ট-আপে, যেখানে ঐ বিশেষ দৃষ্টিকোণে ফটকের ওপরের সারির বেড়াকে বর্শা ফলকের মত মনে হয় এবং গঙ্গাচরণেব ক্লান্ত হাত সেই ফলককে ধরে ফটকটা খোলে। এখানে একজন পরিশ্রান্ত মানুষ দিনশেষে বিশ্রামের জন্য বাড়ি ফেরে, না কয়েদখানাব গারদ খুলে একজন পরাজিত বন্দীত্ব বরণ করে নেয় সে প্রশ্ন ওঠে। তবে খ অংশে যে গঙ্গাচরণ বাড়ি ফিরে পত্রপুষ্পে ঘেরা উঠোনের 'শাঁসে-জলে' অবস্থা দেখে গর্বিত হয়, এখানে সে খালি থলি ও ছাতা দাওয়ায় ফেলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বাড়ির বাইরে মেঘাক্রান্ত আকাশ ও মাঠের দিগন্তের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অবস্থানের এই পার্থক্য খুব প্রয়োজনীয়। এর আগের চাল লুটের দৃশ্যে অকস্মাৎ একটা রূঢ় আঘাত নতুন গাঁর 'মাথার মণি' ব্রাহ্মণ গঙ্গচরণের সনাতন ভিত্তিভূমিকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। চোখের জল ফেলে গঙ্গাচরণ প্রথম অভিজ্ঞ হয় যে তার অজানা এমন একটা নির্মম পরিবেশ আছে যেখানে সত্যকথা বলেও অন্যায় অপমানকে ঠেকানো যায় না। 'অশনি সংকেতে'র শেষ দৃশ্যের বিবৃতিতে আছে '১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে মানুষের সৃষ্ট এই মহামারীতে —।' চলচ্চিত্রে সেই মানুষেরা কোথায়? তারা কোথাও নেই সত্যজিৎ রায় অথবা বিভূতিভূষণের বচনায়। দুই স্রষ্টাই প্রয়োজন বোধ করেননি war lords বা মুনাফাখোর মজুতদাবদের এখানে এনে দেখানোয়। এমন কি বিশ্বাস মশাইদের মত গ্রাম্য জোতদার জাতীয় চরিত্রকেও সেই নেপথ্য অথরিটির প্রতিভূ মনে করা ভুল। 'অশনি সংকেতে'ব প্রতিবেদন অন্যখানে। এ চলচ্চিত্র অবশ্যই গঙ্গা, অনঙ্গ, মতি, দীনু বা ছুটকিদের কাহিনী। ক্ষুধার নির্লজ্জ প্রযোজনে এবং মৃত্যুর অনিবার্যতায় সেই পঞ্চাশ লক্ষ লোকের আশা এবং আশা ভঙ্গেব চলচ্চিত্র। কিন্তু, সত্যজিৎ তাঁর রচনায় একটি অদৃশ্য অন্ধশক্তিকে অথবিটিব মত সমান্তরাল রেখেছেন। যা গঙ্গা-অনঙ্গ-মতি-দীনু-ছুটকিদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক। বহুদূর থেকেও গ্রামবাংলার এক নিভৃত কোণে তার নিয়ামক নির্দেশ পৌঁছয়। মানবিকতার ওপর তার নিষ্ঠুর পরিহাস এ চলচ্চিত্রে লভ্য। যে জঙ্গী বিমানগুলো দেখে বকের সারির কথা অনঙ্গর মনে হয় তারই পশুগর্জন ধর্ষিতাপ্রায় অনঙ্গর আর্ত চিৎকারকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। গঙ্গাচরণ যখন মুদিব দোকানে জিনিসপত্রের আক্রার খবব শুনছে তখন পেছনের মাঠে ছেলের দল প্লেন দেখে আনন্দে হল্লা করছে। কিংবা আরেকটি মুহূর্ত — ক্ষুধার্ত ছুটকি দেহ বিনিময়ে চাল সংগ্রহ করতে এসে ইঁটখোলায় যদুপোড়ার মুখোমুখি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। সেই স্তব্ধতাকে আশ্চর্য বিষণ্ণ করে দেয় দূর থেকে আসা প্লেনের শব্দের একটা গোঙানি। এখানে প্লেনকে ব্যবহার করা হয় কিন্তু শুধুমাত্র war motif হিসেবেই নয়। এখানে মাঝে মাঝে আবেকটি অপরিচিত এবং অমোঘ পৃথিবী এসে পড়ে। সেই পৃথিবী 'অপু-ট্রিলজি'তেও আছে অন্যভাবে। 'অশনি-সংকেতে' শান্ত, নিরুপদ্রব ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক গ্রাম্যজীবনে তার আকস্মিক কয়েকটি আঘাত ভীষণ তীব্র। এবং এই তীব্রতা প্রকাশের জন্য পরিচালক চলচ্চিত্রের সাধারণ সমান্তরাল বিহ্যাভিয়রিষ্টিক বুনোনে একটি গতি ব্যবহার করেছেন যা সব সময়ে বহিরাগত ও ক্যামেরা অভিমুখী। চাল লুটের সময় যে অপরিচিত লোকটা চৌকিদারের সঙ্গে এসে গঙ্গাচরণকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে যায়, সে লোকটা হঠাৎ আসে পিছন থেকে সামনে। ধর্ষণ দৃশ্যে (অনঙ্গর কাছে) আরেকটি অপরিচিত লোক পিছন থেকে এগিয়ে এসে

অনঙ্গর মুখ চেপে ধরে (এখানে ক্যামেরা যথাক্রমে লোকটিকে এবং অনঙ্গকে সামনে রেখে দৃষ্টিকোণ পালটায়)। এবং গ্রামবন্ধন শেষে ফিরতি পথে গঙ্গাচরণকে অপরিচিত দীনু ভটচায পেছন থেকে ছুটে এসে দুর্ভিক্ষের আগমনবার্তা শোনায়। এই আঘাতগুলির ফলশ্রুতিতে রয়েছে অনঙ্গ বা গঙ্গাচরণের মূল্যবোধের কেন্দ্রচ্যুতি। ঙ অংশে বাড়ি ফিরে ব্যর্থ গঙ্গাচরণ অনঙ্গর হাতে তার মত-বিরুদ্ধ সংগৃহীত চালকে প্রত্যাখান করতে পারে না। তাকে আপোষ করতে হয়। চলচ্চিত্রের প্রায় মাঝামাঝি চ অংশে গঙ্গাচরণ বাড়ি ফেরবার আগে বিশ্বসমশাইয়ের দাওয়ায় বসে দেখেছে একমুঠো চালের জন্য গ্রামবাসী ক্ষুধার্ত চাষীদের নিস্ফল আকুতি। বর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের সুবিধার জন্য বিশ্বাস মশাইয়ের কাছ থেকে শেষ ভিক্ষার মত ধান নেওয়ার তিক্ততা তার কাছে সম্পূর্ণ অনুভূত। সেই গঙ্গাচরণ বাড়ি ফেরার পথে বিমূঢ় হয়ে দেখছে কয়েকজন অন্ত্যজ শ্রেণীর স্ত্রীলোক খাদ্যের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টায় ও সহিষ্ণু বিচুয়ালস-এর মত। এবং এখানে গঙ্গাচরণের আইডেন্টিফিকেশনও স্পষ্ট। ক্ষুধার কোন জাতিগোত্র নেই।

'আপোষের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ বদলে যাওয়াটা এক ধরণের নৈতিক গ্রহণ এবং সেটা প্রয়োজনমত মানুষকে নিকট জনের কাছেও মিথ্যাচারের পর্যায়ে টেনে নামায়। চলচ্চিত্রে ছ ও জ অংশে যথাক্রমে গঙ্গার জন্য মেটে আলু সংগ্রহ করে ফেরে অনঙ্গ এবং নিবারণ ঘোষের বাড়ি থেকে অনঙ্গর জন্য চাল সংগ্রহ করে আনে গঙ্গাচরণ। এই সফলতার পেছনে রয়েছে কিন্তু দুটি চরিত্রেরই পর্যায়ক্রমে অসীম লাঞ্ছনা। দুই লাঞ্ছনার সমান্তরালরেখা টানবার জন্য গঙ্গাচরণেব শঙ্করপুব যাত্রা ও শেষ পর্যন্ত নিবারণ ঘোষের বাড়িতে অন্নগ্রহণ এবং ছুট্‌কি-মোক্ষদার সঙ্গে অনঙ্গর বনজঙ্গলে অভিযান ও শেষ পর্যন্ত দুর্বৃত্ত দ্বারা নিপীড়নের মধ্যে পরিচালক ক্রস-কাট এনেছেন। এখানে দৃশ্যত অনঙ্গর লাঞ্ছানা শারীরিক এবং গঙ্গাচরণের মানসিক। পাশাপাশি মনে করা যেতে পারে ঙ অংশে অনুরূপ দুই লাঞ্ছনার কথা। যেখানে উল্টোভাবে, দৃশ্যত গঙ্গাচরণের লাঞ্ছনা ঘটছে শারীরিকভাবে এবং অনঙ্গর মানসিক স্তরে (অবশ্য দুই ক্ষেত্রেই লাঞ্ছনার সমগ্রতা ও দুর্গতির চরম পরিচয় স্পষ্ট)। কিন্তু, মনে রাখা যায় ঙ অংশেও একইভাবে দুই ঘটনার ক্রস-কাট ব্যবহার করা হয় না। সেটা সত্যজিৎ রায়ের পক্ষে প্রয়োজনই হয় না। কারণ চলচ্চিত্র-ভাষার ওপর তাঁর অনায়স কর্তৃত্ব তাঁর metaphorকে স্থির নিশ্চিত করে তোলে। এখানে চাল লুটের দৃশ্যে ভূপতিত গঙ্গাচরণের পথের ধুলো থেকে ওঠা থেকেই পরবর্তী দৃশ্যের ঢেঁকির আওয়াজকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং ক্রমে ক্রমে ক্যামেরা সরে গিয়ে ধান ভাঙার কাজে প্রথমে মোক্ষদা, পরে ছুট্‌কি এবং শেষে ঢেঁকিতে পাড় দেওযা অবস্থায় অনঙ্গকে দেখায়। এই দেখানোর বিশেষ ভঙ্গীটা একটি পুনরাবৃত্তি। ঠিক এই ভাবেই চলচ্চিত্রের গোড়ার দিকে গ্রামের একটা ডিটেল হিসেবে ঢেঁকিতে ধান ভাঙাকে দেখানো হয়েছিল। সেখানে সবশেষে ছিল ছুট্‌কি। এখানে সবশেষে অনঙ্গ। বিশেষ দৃষ্টিকোণের শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তি অনঙ্গকে ক্ষুধার সংগ্রামে ছুট্‌কি, মোক্ষদাদের সামিল করে। গঙ্গার ব্রাহ্মণত্বের সম্মান যখন পথের ধুলোয় লুটোচ্ছে, তখন অনঙ্গ গঙ্গার নিষেধ অগ্রাহ্য করে সেদিনের মত অন্ন সংস্থান করল। কিন্তু একটা মুল্যবোধ হারানো হিসেবে সেটা আকস্মিক নয়। তার প্রস্তুতি ছিল পূর্বে। যদিও এখানে অভিজ্ঞতাটা প্রথম। সুতবাং এ ব্যাপারটা গঙ্গার কাছে অনঙ্গর লুকনোর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, চাল লুটের সময় অন্যায় মার খাওয়াকে গঙ্গা তার স্ত্রীর কাছে

প্রকাশ করতে পারে না। 'সেভেন্থ্ সীল'-এ জোফ সরাইখানায় বদমেজাজী লোকেদের পাল্লায় পড়ে অহেতুক লাঞ্ছনা ভোগ করে ফিরে আসে। কিন্তু স্ত্রীর কাছে সে আস্ফালন করে তার বীরত্বের মিথ্যা গল্পটাই বরং বলে। গঙ্গাচরণ বলে না। কারণ সে ফিরে এসে তারই নৈতিক সমতলে তার স্ত্রীকে দেখতে পায়। যদিও অনঙ্গ অপমানে ক্লেদাক্ত নয়, তার হাতের অঞ্জলিতে শুভ্র একরাশ যুঁই ফুলের মত আপন শ্রম বিনিয়োগে অর্জিত একমুঠো চালের স্বান্ত্বনা। মানবিক মুহূর্ত হিসেবে এটা পরিচালকের একটা অসাধারণ জয়। গঙ্গা অনঙ্গর চাল সমেত হাতের মুঠোকে আপন হাতে গ্রহণ করে বলে 'মান যদি যেতেই হয়, দুজনের একসঙ্গে যাওয়াই ভালো।' এই ভঙ্গীটা পূর্ববর্তী পর্যায়ে গঙ্গা-অনঙ্গর আরেকটি ভঙ্গীর সঙ্গে ভীষণ আইডেন্টিক্যল। অনঙ্গ যখন একটি রাতে প্রথম গঙ্গাকে অভাবের দিনে ধান ভেঙে চাল সংগ্রহের এই প্রস্তাব জানায় তখন কুলশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তার স্ত্রীর হাত দুটো ঠিক এইভাবে গ্রহণ করে গর্বের সঙ্গে বলে 'এই গাঁয়ে আমাদের কত সম্মান জান ত? সেই সম্মানটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে ত?' এখানে কম্পোজিশনের পেছনের দেয়ালের কুলুঙ্গীতে লক্ষ্মীর গাছকৌটোর লাল রঙকে বা দেয়ালে সিঁদুর চিহ্নের লালকে সূচিত করা হয়। আশ্চর্য এই যে পরে, সমভঙ্গীতেই গঙ্গা অনঙ্গর হাতে হাত রেখে সেই সম্মান বিসর্জনের স্বীকৃতি দিল। পেছনে অন্ধকারে তুলসী মঞ্চে তখন সন্ধ্যাদীপের লাল শিখাটুকু অনির্বাণ জ্বলছে। সত্যজিৎ রায়েব 'অশনি সংকেতে' প্রত্যয়ের রঙ লাল। আচার্য নন্দলাল যখন সীতার অগ্নিপরীক্ষার ছবি আঁকলেন, তখন এয়োতীর কাপড়ের লাল পাড় দিয়ে সতীর মুখকে ঘিরে দিলেন না। পরিবর্তে তিনি আগুনের লালকে সারা চতুষ্কোণে ছড়িয়ে, দিলেন। এখানে আমরা বর্তমান ছ ও জ অংশে ফিরে আসি। যেখানে প্রকৃতপক্ষে এই প্রত্যয় অবলুপ্ত। অনেক অপমান ও অবনতির পথ মাড়িয়ে একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি। বাহ্যিক এক প্রত্যয়ে তারা পরস্পরের প্রতি সমর্পিতও। কিন্তু, একটি পাশবিক ক্ষুধাব শিকার হিসেবে লাঞ্ছিত অনঙ্গর কান্নার প্রতিক্রিয়ায গঙ্গাচরণের 'আমি চাল এনেছি' এই সান্ত্বনা একটা মর্মান্তিক পরিহাসের মত শোনায়। এই দৃশ্যে কোথাও লালের প্রয়োগ নেই। দৃশ্যটি সঙ্গে সঙ্গে follow up করা হয় মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার পশ্চিম আকাশে। শুধু প্রত্যয়ের রঙই লাল নয়, লজ্জার বঙও লাল। মানবিক ঐ দুঃসহ অবমাননার মুহূর্তে সূর্যাস্তের রঙে আকাশ রক্তিম হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্রে মহত্তম কবিতাগুলি এইভাবেই লেখা হয়ে থাকে। আলোচ্য চলচ্চিত্রে গঙ্গা বা অনঙ্গর বাড়ি ফিরে আসার মধ্যে যে operative structure পরিবর্তনকে সূচিত করছে, সেটা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছে ঝ অংশে শেষবারের মত গঙ্গার প্রত্যাবর্তনে। যেটা দৃশ্যত চলচ্চিত্রে নেই। মতির মৃত্যুর পর তার মৃতদেহের কাছে গঙ্গার সেই প্রত্যাবর্তন। 'অশনি সংকেত' চলচ্চিত্রে মতি আছে প্রথম দিকে, মতি আছে শেষে। এইভাবেও একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। যে মতি এই চলচ্চিত্রের প্রথমে গঙ্গাচরণের পরিবারে একটি নবজন্ম কামনা কবে, সে ফিরে আসে শেষে ক্ষুধা ও মৃত্যুর হাত ধরে। দুর্ভিক্ষ ও মড়কে যখন মুচিপাড়া শেষ হয়ে যায়, তখন শেষ আশ্রয়ের জন্য অনঙ্গর কথা মনে পড়ে মতির। কিন্তু বহুদিনের অনাহারে মুমূর্ষু ও অবসন্নমতি অনঙ্গর আশ্রয় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তার পূর্বে সে পথের পাশে বটগাছের পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে। মৃত্যুর জন্য সেইখানে তার প্রতীক্ষা। আসলে সত্যজিৎ রায় মুমূর্ষু মতিকে ফিরিয়ে আনেন গ্রামবাংলার একান্নবর্তিতার ক্ষয়িষ্ণু ট্র্যাডিশনের প্রেক্ষাপটে।

এখানে গ্রামের বটগাছ সেই ট্র্যাডিশনের ঐকান্তিক চরিত্র। তার কোলে মতির মৃত্যু। 'অশনি সংকেতে' যখনই বিশেষভাবে বটগাছের উপস্থিতি রয়েছে, সেখানে অস্তোন্মুখ ম্লান সূর্যের পটভূমি লক্ষণীয়। এ যেন একটা সুপ্রাচীন গ্রামীণ ঐতিহ্যের শেষ হয়ে যাওয়া। চাল জোগাড়ের চেষ্টায় হৃতসর্বস্ব গঙ্গাচরণ মার খেয়ে দিশাহারা হয়ে নিভৃত আশ্রয় খোঁজে নির্জন প্রান্তরে শাখাপ্রশাখা বিস্তারিত বিশাল বটের শিকড়ে। প্রথমে লঙ-শটে এক অনির্বচনীয় গভীরতায় আমরা দেখি সেই বট দীঘির জলে তার ছায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে বসে গঙ্গাচরণ চোখের জল মোছে (যেমন ধর্ষণ দৃশ্যে দুর্বৃত্তের হাত থেকে কোনক্রমে মুক্ত হয়ে উদভ্রান্ত অনঙ্গ মা'র আশ্রয়ের মত একটা গাছকে আঁকড়ে ধরে)। এখানে গঙ্গার থেকে অনেক দূরত্বে বসে অর্ধভুক্ত চাষী তার পরিবারের ক্ষুধার ইতিহাস শোনায়, দূরে দীঘির পাড় দিয়ে ধামা হাতে কোন এক আগন্তুকের দল জানিয়ে যায় চালের দাম আরও বেড়ে গেল। ক্ষুধার হাঁ করা মুখের সামনে সেই একান্নবর্তিতার প্রশ্ন কী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। মতি পাঁচ দিন ধরে একবিন্দু খাদ্য যোগাড় করতে না পেরে অনেক আশায় অনঙ্গর কাছে আসে। তাকে সিদ্ধ মানকচু দেওয়া ছাড়া অনঙ্গর আর কোন সামর্থ্য থাকে না। তবুও এই ভীষণ সঙ্কট কবলিত গ্রামের নিমজ্জমান মানুষগুলো শেষ আশ্রয়ের মত ক্ষয়িষ্ণু ট্র্যাডিশনে বাঁচার আশ্বাস খোঁজে (একমাত্র ছুটকি যার ব্যতিক্রম)। পরাজিত গঙ্গাচরণ যেখানে ফেরে পরাজিত মতিও সেখানে ফেরে। তবুও এখানে একটা বৈপরীত্য আছে। মতির শারীরিক মৃত্যু এবং গঙ্গার মানসিক বেঁচে ওঠা। মৃতা মতির ধমনীর স্পন্দন গঙ্গা খুঁজে পায় না। কিন্তু আপন জীবনের স্পন্দনে একটা নতুন অর্থমূল্য পায়। চলচ্চিত্রের এই দ্বিতীয় সিল্যুট ফ্রেমে ব্রাহ্মণের গৌরবর্ণ এবং অন্ত্যজের কৃষ্ণবর্ণের পার্থক্য ঘোচে। দুই হাতের ঐক্যবদ্ধতায় একটি কম্যুনিকেশন স্পষ্ট (এখানে কম্যুনিকেশনের আরেকটি চেহারা আছে বাড়ি থেকে বটগাছ পর্যন্ত মতির কাছে অনঙ্গর ছুটে আসার ট্র্যাকিং-এ)। চলচ্চিত্রের শুরুর দিকে গঙ্গা যখন দাওয়ায় দাঁড়িয়ে একহাতে হুঁকো তুলে 'চাষার পো' রামলালের নাড়ী দেখছে সেই কম্পোজিশনের সমান্তরাল হলেও বর্তমান কম্পোজিশন অন্যভাবে বিপরীত। হাতের অবস্থানও ভিন্ন। পূর্ব কম্পোজিশনে গঙ্গার হাত ফ্রেমের ওপর ভাগে, চাষীর হাত নিচে। এখানে দুটি হাত সমান্তরাল। মানবিক সহজ সম্পর্কে স্থাপিত। যদিও এখানে একটি আশ্চর্য বিষণ্ণতা আছে। শেষদৃশ্যে অনঙ্গ নবজাতকের আগমনের কথা বলছে। মতির মৃতদেহের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যে নবজীবনের জন্ম সম্ভাবনা ঘোষিত হল, সেই আনন্দের শরিক মতি বিদায় নিয়েছে তখন। সেই অন্বয়কামী গ্রামও মুছে যাচ্ছে। এখানে ধ্বনির এক সূক্ষ্মতম প্রয়োগে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রভাষাকে অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। এরজন্য পূর্ব তিনটি বিশেষ পর্যায়ে একবার ফিরে যাওয়া দরকার। চলচ্চিত্রে প্রথম দুর্ভিক্ষের খবর আনে দীনু ভটচায গ্রামবন্ধন সেরে গঙ্গাচরণের ফেরার পথে সে দূর থেকে 'ও মশাই, শুনছেন —' বলে গঙ্গাকে ডাক দেয় এবং ছুটে এসে গঙ্গার কাছে পৌঁছয়। এই অবকাশে দূর থেকে একটি পাখি ডেকে ওঠে। সেই পাখির ডাক পুনরাবর্তিত হয় দীনু যখন সেখানে গঙ্গাকে চালের মূল্যবৃদ্ধি এবং যুদ্ধের সংবাদ শোনাচ্ছে। প্রথমত গ্রামের একটি চরিত্র হিসেবে বা লিনিয়ার ডিটেল হিসেবে এই পাখির ডাক প্রাসঙ্গিক দুর্ভিক্ষের শিকাররূপে চলচ্চিত্রে অপর দুটি নারী চরিত্রের (মতি ও ছুটকি) যথানুক্রমিক ভ্রান্ত পরিণতি আছে শেষ দিনটিতে। দুটোই

শেষ হয় মৃত্যু-অভিভাবনে। ছুট্‌কির মৃত্যুর শুরু যখন যদুপোড়া নির্জন গ্রামের পথে চালের বিনিময়ে তার দেহলাভের ইঙ্গিত জানায়। যদুকে তিরস্কার করে তাড়াবার পর ছুট্‌কি বুঝতে পারে যে তার সতীত্ব রক্ষা করতে গিয়ে ক্ষুধার অন্ন হাত ছাড়া হয়ে গেল। ক্ষোভে সে কোঁচড়ের শাক মাটিতে ফেলে দিয়ে নীরবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। এই নীরবতাকে ভেঙে দিয়ে ঐ পাখি আবার ডেকে ওঠে। যে পাখির ডাক মতির মৃত্যুর সময় দুর্ভেদ্য স্তব্ধতাকে পুনরায় ভাঙে। আলোচ্য তিনটি ক্রম পর্যায়ে পাখির ঐ শব্দধ্বনি লিনিয়াব ডিটেল থেকে ক্রমশ একটা impulse লাভ করতে থাকে। সেই ভীষণ সঙ্কটমুহূর্তগুলিতে গ্রামের কণ্ঠস্বর আমরা শুনি। শহরেব মানুষের তৈরী যে দুর্ভিক্ষের ভ্রূকুটিতে এখানে তিলে তিলে গ্রাম মরে যায়, তার একেকটি তীক্ষ্ণাঘাতে ঐ আর্তস্বর আমাদের জানিয়ে যায় তার অস্তিত্ব। গঙ্গাচরণ যখন মতির প্রাণহীন শীর্ণ হাতকে তুলে নিয়ে নাড়ী দেখে তখন সেই পাখির ডাক ধ্বনিত হতে হতে শেষবারের মত হারায়।

'অশনি সংকেতে'র আরেকটি সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যে লক্ষ্য করা যায় যে দুর্ভিক্ষ যখন এগিয়ে আসছে তখন 'গাঁয়ের মাথা' বিশ্বসমশাইয়েব কাছে অসহায় চাষীদের ধানচালেব জন্য আবেদন-নিবেদন পাশাপাশি বা সমান্তরাল (একটি ক্রস-কাটের ব্যবহাব আছে) ছুট্‌কির নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর্যায়টি অঙ্গীভূত করা। ছুট্‌কির স্বামী হীরু কাপালি যখন গ্রামের অন্যান্য চাষীদের সঙ্গে সমবেত হয়ে একমুঠো অন্নের চেষ্টায় নিস্ফল দরবার করছে তখন ক্ষিদের জ্বালায় অনুরূপ চেষ্টায় ছুট্‌কি তাব দেহ বিক্রয়ের পথে এগোচ্ছে। এর শেষ পরিণতিতে ছুট্‌কি খাবাবেব প্রলোভনে শহরে চলে যায়। মানুষের দুটি আদিম চাহিদা hunger এবং libido-র মধ্যে এখানে একটা বফা হয়ে যায়। গ্রাম্য নাবীর সনাতনী সতীত্বের ঐতিহ্য থেকে ছুট্‌কি বাইরে চলে আসে। যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামাবী এইভাবেই মূল্যবোধগুলিকে ভেঙে চুরমার করে। যারা ক্ষিদে সহ্য করতে পারে তারা মতির মত মরে। যারা পারে না তারা ছুট্‌কির মত শহরের দিকে পা বাড়ায়। যাবার সময় ছুট্‌কি অনঙ্গর সতীত্বকে প্রণাম কবে যায কিন্তু ইচ্ছা প্রকাশ করে 'নরকে গিয়েও যেন দুটি খেতে পাই।' সে যখন অনঙ্গর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে তার আগেই গঙ্গাচরণেব বাড়ির কুকুরটা খিড়কিব দরজা দিয়ে উঠোন থেকে বেরিয়ে যায়। ছুট্‌কি তাকে অনুসরণ করে। মন্বন্তর তাড়িত শহরের নরকে গিয়ে ছুট্‌কিদের মত মেয়েরা শেষ পর্যন্ত কীভাবে বাঁচে তাই নিয়ে আলাদা একটি চলচ্চিত্র বচনা করা যায় হয়তো। কিন্তু এখানে অল্প কয়েকটি আঁচড়ে degradation-এর ছবিটা ভয়ঙ্কর। এবং এরজন্য প্রকৃতি নয়, মানুষের দিকেই আঙুল তুলে দেখানো হয়। বিভূতিভূষণ মাঝপথ থেকে ছুট্‌কিকে গ্রামে ফিরিয়েছিলেন। সত্যজিৎ ফেরান নি। তাঁর চলচ্চিত্রে শুধু পর্যবেক্ষণ নেই, অভিযোগও আছে। সেইজন্যই ক্ষুধার উপপাদ্যের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের মোলায়েম ভণ্ডামিকে এত স্পষ্ট চিত্রিত করেন। চাষীদের আবেদনের উত্তবে বিশ্বেসমশাইয়ের তিক্ত রসিকতা বা মিথ্যাভাষণেব তুলনায় ছুট্‌কিকে যদুপোড়ার চাল দেবার আশ্বাস অনেক বিনীত। মনে হয চরিত্রটি এই রকম একটা উপকার করতে পারলে বোধহয় কৃতার্থ হয়। কিন্তু এর পেছনে রয়েছে একটি নির্মম ইঙ্গিত। ক্ষুধার exploitation-এর এই ধরণের প্রতিকৃতি একমাত্র কুরোসাওয়াব চলচ্চিত্র ছাড়া আর কোথাও আছে বলে মনে পড়ে না। 'সেভেন সামুরাই'-এ দুর্ধর্ষ সামুরাই শিমুরা গ্রামবাসীদের অনুরোধে ক্ষুধার্ত চোরকে হত্যা করার জন্য যাজকের মত মাথা

মুগুন করে এবং পোষাকের ভাঁজে উন্মুক্ত তরবাবিকে লুকিয়ে নেয়। তারপরে দুই হাতের তালুর ওপর দুটি ভাতের মণ্ড নিয়ে সে খামার বাড়িতে লুকিয়ে থাকা চোরকে দরজা থেকে বিনীতভাবে ডাক দেয়। দূরে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে সোশ্যাল অথরিটির মত গ্রামবাসীরা অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। এটা একটা অসম্ভব নিষ্ঠুর মুহূর্ত। বহুদিন না খেতে পাওয়া একটা মানুষ লুব্ধ চোখে দেখছে একেবারে নাগালের মধ্যে খাবারের নিশ্চিত আশ্বাস। কিন্তু সে জানে না যাজকের ছদ্মবেশেব আড়ালে ভয়ঙ্কর মৃত্যু তার জন্য ওৎ পেতে আছে। এর পাশাপাশি মনে পড়ে 'অশনি সংকেতে' পর্দা জুড়ে যদুপোড়ার জামার শহুরে চড়া নীলেব আভাস, তার সামনে জন্তুর থাবাব মত কালো একটা হাতে ছড়ানো চালের দানা। এবং একটি নম্রকণ্ঠে আহ্বান 'দেব ত। তুই আয একবারটি। ওই ভাঙা বাড়িটার কাছে — ওখানে কেউ আসে না। কেউ জানতে পাববে না। তোকে চাল দেব আমি। আরো দেব। যখনই আসবি তখনই দেব।' মানবিক অবক্ষয়ের কথা আধুনিক চলচ্চিত্রে এই দুই স্রষ্টাই সব চেয়ে ভাল কবে জানেন। 'অশনি সংকেতে' যদুপোড়ার প্রলোভনে ছুটকি যখন নিজেকে সমর্পণ কবছে তখন সত্যজিৎ রায় মূল সাহিত্যের ইটখোলার পরিবেশকে বদলে দিয়ে একটা পোড়ো বাড়িকে সেখানে রচনা করেন। এবং ছুট্‌কি ও যদুকে কিছুদূর অনুসরণ করার পর ভগ্নস্তূপকে ট্র্যাক করে ফিরে আসায় অনেকখানি বলা হয়ে যায়।

সমান্তরাল, বৈপরীত্য, অনুবর্তন

বর্তমান আলোচনাব পূর্বাংশ 'অশনি সংকেতে' সমান্তবালেব প্রয়োগ প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের এ পর্যন্ত চলচ্চিত্রের মধ্যে গঠনগত সমান্তবালের ব্যবহার সম্ভবত বর্তমান চলচ্চিত্রেই সর্বাধিক। আলোচ্য প্রয়োগের সাফল্যের স্বাক্ষবে 'অশনি সংকেতে'র চিত্রভাষা একটা অভিনব পর্যায়ে পৌঁছয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেকোন চলচ্চিত্রকার এর বিপদ সম্ভাবনাও চিন্তা করে নিতে পারেন। স্পেস ও সময়ের ওপর অপরিসীম দখল না থাকলে একটি চলচ্চিত্রে সমান্তরালের আধিক্য বড় বেশি যান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারে। 'অশনি সংকেতে' সে যান্ত্রিকতা বিন্দুমাত্র চোখে পড়ে না। শিল্পকে সংগোপন রাখার কৌশলশিল্পে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের আগাগোড়া একটা দুর্লভ 'আণ্ডার স্টেটমেন্ট' বেখে যান। তাঁর প্রকাশভঙ্গীর সারল্য যখন আমাদের মুগ্ধ করে তাঁর চাতুর্য সম্পর্কে অবহিত হবার তখন সুযোগ পাওয়া যায় না। 'অশনি সংকেতে' একই ধরণের চিত্রকল্পকে ফিরিয়ে আনার মধ্যে সমান্তরাল আছে। কিন্তু ফলশ্রুতিতে সাজাত্য রচনা করা তার ধর্ম নয়। বরং বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে ন্যারেটিভের একটা আবেগজাত পরিণতিতে পৌঁছনোর স্পর্শ সেখানে লভ্য।

সকালের রোদ মাখা নদীর জলে যে হাত আনমনা হয়ে খেলা করে, সেই হাত অভাবের দিনের জন্য ঢেঁকিতে ধান এলে দেওয়ায় ভঙ্গী দেখায এবং হতাশার সন্ধ্যায় করপুট পূর্ণ করে বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে। এর বিপবীত প্রান্তে আরো একটি হাতের মুঠোয় ধরা ক্ষুধার ফসল। কিন্তু তার বিনিময়ে সেই হাত মেয়েমানুষের দেহটাকে ভোগ্যপণ্য করে ধরতে চায়। আরো একটি ক্লান্ত পরাজিত হাত বিশেষ দৃষ্টিকোণে বর্শা ফলকে লক্ষীভূত। সেই হাত পরম প্রত্যয়ে একটি শীর্ণ মৃত হাতকে অবলম্বন করে।

এখানে শুধু বিভিন্ন চরিত্রের হাত নয়, পুনরাবৃত্তিতে হাতের চরিত্রও পাল্টে যাচ্ছে। 'অশনি সংকেতে' কয়েকটি episodic সমান্তরাল — যার লক্ষ্য মূলত একত্রীকরণ — আবেদনে পরিচালকের তীক্ষ্ণ irony-র সহায়কও বটে। গঙ্গার বাড়িতে দীনু ভটচাযকে নিষ্ঠুরভাবে খালি হাতে বিদায় করে দেবার পর দীনু কাছাকাছি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছাতাটা যেন খুলছে না এমন অছিলায় সময় নিচ্ছে। যদি তাকে ফিরে ডাকা হয়। অনঙ্গর অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গঙ্গা ডেকে আনল। গঙ্গাচরণ পরবর্তীকালে চালের ধান্দায় সাত ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়ে নিবারণ ঘোষের বাড়িতে সোজাসুজি প্রত্যাখাত হয়ে ফিরছে। নিবারণ যখন তাকে ফিরে ডাকল তখন গঙ্গাও দীনুর মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছাতা খুলছে। এই সমান্তরালে humiliation-এর চেহারা সম্পর্কিত। কিন্তু একটি তির্যক দৃষ্টিপাত রয়েছে গঙ্গাচরণের ওপরই। বর্তমান প্রসঙ্গে, 'অশনি সংকেতে' খাদ্য সংকটের মুখোমুখি গ্রামীণ পরিবার-প্রধানদের এক বিড়ম্বনাময় অবস্থার নিখুঁত পর্যবেক্ষণ উল্লেখ্য। 'অশনি সংকেতে' ক্ষুধার মানচিত্রে বয়স্করাই প্রধান। কিন্তু খাবার জোটানোর পারিবারিক দায়িত্ব বিশেষত যাদের মাথায়, সংসারে তাদের একটা অবহেলিত দিক সত্যজিৎ রায়ের চোখ এড়িয়ে যায় না। ক্ষুধার যেমন কোন জাতিগোত্র নেই, তেমন নেই কোন বিশেষ বয়সের বন্ধন। কিন্তু এখানেও একান্নবর্তিতার দায়িত্বের প্রশ্নে একজন বৃদ্ধ বা বয়স্ক পরিবার-প্রধান লজ্জায় কখনও সেকথা জানাতে পারে না। যে দরিদ্র গ্রামবাংলার সমাজজীবনে ইন্দির বা দীনু ভটচায আবর্জনার মত বাঁচে তারই প্রতিধ্বনি থাকে দীনুর সেই সংলাপে 'আমরা না হয় অকেজো মানুষ, আমরা না খেয়ে মরলে কার কি এসে গেল বলুন।' মন্বন্তরের সংকটের সামনে এসে এই চরিত্রগুলি মর্মান্তিক গ্লানির দ্বারা লাঞ্ছিত। ক্ষুধার্ত চাষী যে কথা তার পরিবারে বলতে পারে না সে কথা গঙ্গার কাছে প্রকাশ করে ' .....ছেলেপিলেরা ত শোনবে না—তারা প্যাট ভরে খায়। আর আমরা খাই আধপেটা।' চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যের আগে দীনু ভটচায যে তিনটি পর্যায়ে দৃশ্যমান সেখানে তার একটি সংলাপ 'আমি এই বুড়ো বয়সে এতগুলো পুষ্যি নিয়ে কী করি' তিনবারই কথিত। অর্থাৎ যে দরিদ্র বৃদ্ধের পরিবারে পোষ্য অনেকগুলি সে কখনও সঙ্কটের দিনে সেখানে পেটভরে খাবার কথা বলতে পারে না। তাই গঙ্গার বাড়িতে এসে দীনু কোন ভূমিকা না করে সরাসরি ভাত খাবার প্রস্তাব দেয়। দীনুর এই গোগ্রাসে ভাত খাবারদৃশ্য চলচ্চিত্রের একটি অসাধারণ মুহূর্ত। একটি দৃশ্যেই গোটা দুর্ভিক্ষের অতৃপ্তি ও ক্ষুধাকে সত্যজিৎ রায় বলে দেন। 'মিরাকল্ ইন্ মিলান'-এর বুড়োর মুরগির ঠ্যাং চিবোনোর মত কিংবা 'পথের পাঁচালী'তে ইন্দিরের আঙুলের মাথা থেকে খাবার চেটে খাওয়ার মত এই দৃশ্য চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। এই খাবার দৃশ্যেও আরেকটি সমান্তরাল পাওয়া যায় 'অশনি সংকেতে'। দীনু যখন হাপুসহুপুস করে দুধের বাটিতে চুমুক দিচ্ছে তখন গোঁফে দুধের দাগ নিয়ে গঙ্গা ভ্রূকুটি কুটিল চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। পরবর্তী সময়ে নিবারণের বাড়িতে ভাত খাবার দৃশ্যে গঙ্গার দ্বিধাজড়িত আত্মসমর্পণে একটা humiliation এখানে পুনর্বার সমপর্কিত। এবং বাড়িতে পরিবারকে অভুক্ত রেখে দীনু পরের বাড়িতে তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে এই নিষ্ঠুরতার সঙ্গে অনুরূপ অবস্থায় গঙ্গার অনঙ্গর কথা মনে পড়াতে (টেরাকোটা প্রাচীন মন্দিরের ঐতিহ্যাশ্রয় এবং এয়োস্ত্রীর শবদেহের এস্ট্যাব্লিশিং শট্স্ স্মর্তব্য) একটা বৈপরীত্যও রচিত। কিন্তু গঙ্গার মূল্যবোধ ভাঙারএই দৃশ্যগুলির পাশাপাশি 'ধড়িবাজ' বুড়ো দীনু

ভটচায একটু চচ্চড়ি আর দুমুঠো ভাতের হ্যাংলামোয় আমাদের সংবেদনকে অনেকখানি কেড়ে নেয়।

অনুবর্তিত চিত্রকল্প প্রসঙ্গে 'অশনি সংকেতে' খবরের কাগজের শিরোনামায় দুর্ভিক্ষের সংবাদ এবং গ্রামের পরিবেশ থেকে দুটি প্রজাপতির চিত্রপ্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকৃতি। দর্শকের অনুভূতিকে একটু তীব্রভাবে বিরক্ত করার জন্য কান্‌দিন্‌স্কি যখন তাঁর মঞ্চের প্রয়োগ পরিকল্পনায় content elementsকে সরিয়ে রেখে আংশিক ভূমিকাগ্রহণকারী formal elementsকে ব্যবহার করেন তখন আইজেনস্টাইন তাঁর শিল্পতত্ত্বে সে রীতিকে ফ্যাসিস্ট আখ্যাত করেন। নব্য শিল্পের তৎকালীন নতুন ব্যাকরণে যে সীমিত রীতিকে আইজেনস্টাইন বর্জন করেছিলেন, আধুনিক চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ও তাকে গ্রহণ করেন নি। 'অশনি সংকেতে'র উপরোক্ত প্রয়োগে বরং content elementsকেই সরাসরি ব্যবহারের দ্বারা একটি আঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে। যে আঘাত অনেকটা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ক্রম আরোহণকারী ক্রেসেণ্ডোর মত। সংযত চলচ্চিত্রকথনের বিশিষ্ট আন্তর প্রবাহের শিখরগুলি ছুঁয়ে যা বারে বারে ফিরে আসে। চূড়ান্ত এই প্রয়োগগুলি তন্ময় এবং নিশ্চিতভাবেই পরিচালকের নিজস্ব কমিটমেন্ট তার লক্ষ্য। চিত্রভাষার বর্তমান ধরণের প্রয়োগ সত্যজিৎ রায় পূর্বের চলচ্চিত্রে গ্রহণ করেছেন বলে মনে পড়ে না। চলচ্চিত্রান্তরিত প্রয়োগের ডিপারচার স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায় তাঁর ভাষা কী আশ্চর্য জীবন্ত। এখানে লক্ষ্য কবলে দেখা যাবে সমগ্র চলচ্চিত্রে খবরেব কাগজের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত শিরোনামাসকল ব্যবহৃত হয়েছে দুবাব এবং প্রজাপতির চিত্রকল্প তিনবার। প্রথম বার এই দুই প্রয়োগ একত্রে এবং পরে আলাদাভাবে। চলচ্চিত্রের কাঠামোয় আলোচ্য প্রয়োগগুলি আছে বিশেষ মুহূর্তের যতি চিহ্নে কিংবা পূর্ব চিহ্নে। প্রথমবারের একত্রিত প্রয়োগের ঠিক পূর্ব দৃশ্যের শেষ সংলাপ গঙ্গাচরণের, 'মান যদি যেতেই হয়, দুজনের একসঙ্গে যাওয়াই ভালো।' — গঙ্গা-অনঙ্গর মূল্যবোধের চূড়ান্ত পর্যায়। কাগজের খবরের দ্বিতীয় প্রয়োগে শহরের রাস্তায় পড়ে থাকা দুর্ভিক্ষেব শবদেহের সংবাদচিত্রের ধারানুসারে অনাহারক্লিষ্ট মুমূর্ষু মতির আগমন (এখানে পথের জলকাদার কম্পোজিশনের অ্যাবস্ট্রাকশন প্রসঙ্গে 'পথের পাঁচালী'র পোকায় খাওয়া জীর্ণ দরজা মনে পড়ে।) ছুটকির শহরে চলে যাওয়া এবং মতির মৃত্যুর মাঝের মুহূর্তে প্রজাপতির চিত্রকল্পের তৃতীয় প্রয়োগ। এই প্রয়োগগুলির পূর্বাপর নৈকট্যে বিশেষভাবেই মানুষের লাঞ্ছনা, নিপীড়ন ও মৃত্যু চিহ্নিত। কিন্তু এর সঙ্গে সংবাদপত্রের যোগ কোথায়? 'অশনি সংকেতে'র নতুন গাঁয়ে সংবাদপত্র পৌঁছয় না। কিন্তু দুর্ভিক্ষ পৌঁছয়। সেখানে মানুষ মানুষকে ঠকায়, মানুষ বিক্রীত হয়, মানুষ মৃত্যু বরণ করে। 'হাহাকার' 'অনাহার' 'মহামারি' এই শব্দগুলির পেছনে কী অনুভব করা সম্ভব গঙ্গা-অনঙ্গর যন্ত্রণা, দীনু ভটচায বা ছুটকির একমুঠো অন্নের গ্লানি কিংবা মৃত্যুকালীন মতির মাছেবঝোল আর ভাতেব স্বপ্ন দেখা? চালের দামের ক্রম বর্ধমান সংখ্যার দ্বারা কী পবিমাপ করা সম্ভব গ্রামবাংলার মৃত্যুমিছিলের সংখ্যাহীনতা? সম্ভব নয়। সমগ্র চলচ্চিত্রের বুনোনে ঘররে কাগজের শিরোনামগুলি ভীষণভাবে alienated চিত্রকল্প। মনে হয় পরিচালক সেটাই চেয়েছিলেন। শহরের কণ্ঠস্ববের ঐ অনুভূতিহীন পরিসংখ্যানের তীক্ষ্ণ বৈপরীত্যের জন্য পাশাপাশি দেখানো হয় অগ্নিবর্ণ নৃত্যরত দুই প্রজাপতি — তিনটি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাবা পরস্পর কাছে সরে আসছে। দুই পতঙ্গের মিলনলীলায় প্রকৃতির

জীবনচক্র আভাসিত। 'অশনি সংকেতে' প্রকৃতি অকৃপণ, প্রাণময়, রূপে রঙে সুন্দর। সেখানে ক্ষেতের সবুজ স্বপ্নকে শহরের সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর লোভ মুছে নিয়ে যায়। শহরের রাস্তায় যারা না খেয়ে খবরের কাগজেরছবিতে মরে কাঠ হয়ে থাকে তারা গ্রামের মানুষ। প্রকৃতির কোল থেকে তারা উন্মুল হয়ে ছুটকিদের মত শহরে আসে খাবারের ব্যর্থ আশায়। ঐ দ্বৈত চিত্রকল্পের রচনায় মহত্তম শিল্পী সত্যজিৎ রায় সেই নগর সভ্যতার পাপকে অভিযুক্ত করেন।

রঙের চরিত্র

'ছবির অন্যান্য উপাদানের মতোই রঙের প্রধান কাজও হল কথা বলা।' সত্যজিৎ রায়ের এই মন্তব্য লেখা হয়েছিল 'অশনি সংকেতের' চিত্রগ্রহণের পরবর্তী একটি প্রবন্ধে। চলচ্চিত্র দিনে দিনে যত আধুনিক, চিত্ররচনার বিভিন্ন উপাদানের সমাহারে তার ভাষাও ততখানি বিবর্তিত। চলচ্চিত্রের আধুনিক বৈশিষ্ট্যে লক্ষ্য করা যায় যে নানা উপাদানকে একই সঙ্গে বহুস্তরে প্রয়োগের দ্বারা ঐ কথা বলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রবণতা। 'অশনি সংকেত' দুর্ভিক্ষের ছবি বলে সেখানে রঙের ব্যবহার কেন, সুতরাং, এই সব ছাপোষা অশিক্ষিত অভিযোগের উত্তর দেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এই অভিযোগে বিভূতিভূষণকে কেন অভিযুক্ত করা হয় না সেটাই অশ্চর্য। তিনি তো তাঁর উপন্যাস সাদাকালোয় না লিখে রঙে লিখেছিলেন। কারণ তিনি চেয়েছিলেন বর্ণাঢ্য প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষের কারণে মানুষের দুর্দশাকে alienated করে দেখাতে। সেখানেই 'অশনি সংকেতে'র দুর্ভিক্ষের চরিত্র বলা হয়ে যায়। অবশ্যই সত্যজিৎ রাযও চেয়েছিলেন তাই। কিন্তু একজন চলচ্চিত্রকারের ক্ষমতাবান চোখ থাকলে তিনি আরো একটু বেশি চাইতে পারেন। তিনি রঙ দিয়েও একটি sordid বিষয়ে বলতে পারেন তাঁর চলচ্চিত্রে। 'অশনি সংকেত' রঙের চিবাযত প্রয়োগে বিশিষ্ট এক চলচ্চিত্র। রঙের দেশকাল ভেদ নেই। কিন্তু রঙের ব্যঞ্জনার একটি দেশজ রূপ আছে। সেই কারণে ওজুব রঙীন কোন চলচ্চিত্র দেখলে মনে হয় রঙটা ভীষণ জাপানী। রেনোয়ার 'পিকনিক অন দি গ্র্যাস'-এর রঙ বলে দেয় এর পেছনে একটি ফরাসী মেজাজের কথা। সেজানের হলুদ বা নন্দলালের ভারতীয় লাল শুধু দুই শিল্পীর নয়, দুই দেশের চরিত্রকেও পরিচিত করে। 'অশনি সংকেত' প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যেখানে রঙের একটি নিজস্ব দেশজ রূপ রচিত হল। ঋতু পরিবর্তনের পট মেঘ ও আকাশ, গাছপালা-নদী-মাটি,ক্ষেত-গোলা-কুঁড়ে, ফুল ও ফসল, নানা শ্রেণীর মানুষ এমন করে বঙে জীবন্ত হয়ে ওঠেনি কখনও। তাঁর চলচ্চিত্রকথনের বিশেষ একস্তরের জন্য সত্যজিৎ রায় এখানে কয়েকটি রঙকে বিশেষ দৃষ্টিকোণে নির্বাচন করে নিয়েছেন। 'অশনি সংকেতে'র badic রঙ লাল। কিংবা বলা যেতে পারে, লাল, কমলা, হলুদ পর্যন্ত এই rangeটা। এগুলো গ্রামের রঙ, জীবনেব উত্তাপে ভরা। শুভ প্রত্যয়ে ভরা। 'অশনি সংকেতে' প্রাক দুর্ভিক্ষ অংশে লালের বিশিষ্ট বিন্যাস—অনঙ্গর মুখের সীমা ঘিরে কাপড়ের পাড়ে, দরজার মাথায় অঙ্কিত ধর্মরাজের ঘোড়ার সারিতে, পূজা উপাচারে, ঘরদুয়ারে মাঙ্গলিক চিহ্নে। আরেকটি চমৎকার প্রয়োগ আছে গঙ্গা-অনঙ্গর একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে। কী দুর্লভ সরলতায় বিধৃত সেই পর্যায়টি যেখানে ছুটকির মুখে শোনা আপন রূপের প্রশংসা অনঙ্গ গঙ্গাকে বলতে গিয়ে লজ্জায় আনত

হয়ে পড়ে। পর্দা জুড়ে অনঙ্গর কালো চুলের মধ্যে সিঁথির সিঁদুরের রক্তিম রেখা জীবনের রমণীয়তা নিয়ে বেঁচে থাকে। 'অশনি সংকেতে' লালের প্রাণময়তা অসাধারণ। প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর ছুট্‌কির কাপড়ের রঙ অধিকাংশ সময়ে হলুদ অথবা লাল। নালার জলে ধর্ষণকারীর রক্তের কিংবা বিশ্বাসমশাইয়ের গাল বেয়ে গড়ানো রক্তের লালও violence-এর লাল নয়। আসলে এর কার্যকারণেও রয়েছে জীবনে ঐকান্তিক প্রকাশ (প্রয়োগরীতিতে যা গোদাব বা আন্তোনিয়নির একেবারে বিপরীত)। 'অশনি সংকেতে' এই রঙের বুনোনে নীল রঙকে ব্যবহাব করা হয় intruder হিসেবে। নীল রঙ প্রসঙ্গে, আইজেনস্টাইনকে লিখিত কাবুকি থিয়েটারের মেক-আপ বিশষজ্ঞ মাসারু কোবায়াশির একটি চিঠির কযেকটি কথা স্মর্তব্যঃ 'Blue, the opposite, is the colour of villains, and among supernatural creatures, the colour of ghosts and friends . . ....'। এই ব্যঞ্জনা পাশ্চাত্য বিরোধী, কিন্তু প্রাচ্য ভাবনার স্বাজাত্যবোধে 'অশনি সংকেতে' যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষেব তথ্যের সঙ্গে নীল রঙকে সম্পর্কিত করা যায়। গঙ্গার বাড়িতে দাওয়ায বসে রাতে দীনু যখন গঙ্গাকে দুর্ভিক্ষের কাবণ সরূপ যুদ্ধের খবর শোনায় তখন ঘরের মধ্যে দূরের দেওয়ালেব ক্যালেণ্ডাব থেকে নীল বঙেব ডিটেল্‌স্‌কে সূত্রপাত কবা হল। পরবর্তী পর্যায়ে গ্রামের নির্জন অঞ্চলে ছুট্‌কিকে একা পেয়ে যদুপোড়া যখন অকস্মাৎ পথ অবরোধ করছে তখন তাব বিকৃত, বীভৎস পোড়া মুখের সমান তাব জামাব নীল একটা ভীষণ চমকের সৃষ্টি করছে। এ রঙে এতক্ষণ চোখ অভ্যস্ত ছিল না, এ রঙ গ্রামের রঙ নয। এ রঙ এসেছে বাইবে থেকে, শহর থেকে (যে লোকটা চাল লুট শুরু করে এবং পরে অনঙ্গকে ধর্ষণ কবতে চায় তার জামার খাকি রঙ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য)। এখানে ছুট্‌কি ও যদুপোড়ার confrontation হলুদ ও নীল এই দুই বিপরীত বঙের confrontation ও বটে। এটা একটা তীব্র জায়গায় পৌঁছচ্ছে পরে যখন ক্ষুধাব কাছে হার স্বীকার করে ছুট্‌কি যদুপোড়ার ঘৃণ্য প্রস্তাব গ্রহণ করছে। ছুট্‌কির শাড়িব রঙ পাল্টে গেছে হলুদ থেকে লালে। যেন অস্তিত্বের শেষ উষ্ণতায় ('তোরও দেখছি সহজে মবণ নেই' এটা লক্ষ্যণাত্মক সংলাপের চরিত্রে ব্যবহৃত নয়)। চলচ্চিত্রে এটাই শেষবাবের মত লালের উচ্চপ্রয়োগ। এখান থেকে লাল ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে আসে চলচ্চিত্র থেকে। ছুট্‌কি যখন তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যদুপোড়ার কাছে যাচ্ছে, তখন খিড়কির দবজায় ক্যামেবা খুব কাছে থেকে তার শাড়ির লাল রঙকে ধরে এবং সেই রঙ দুপাশের জীর্ণ বিবর্ণ দেয়ালের মধ্য দিয়ে বিলীন হয়। নিকটবর্তী দেয়ালে তখন শুধু মাঙ্গলিক সিঁদুরের একটি দুটি লালের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকে। কম্পোজিশনের মধ্যে এইভাবে রঙকে ভেঙে দেওয়াও ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম। ছুট্‌কিকে লাল শাড়ি পরা অবস্থায় শেষ দেখা যায় যখন সে তার দেহ বিনিময়ে অর্জিত চালের ভাগ অনঙ্গ কে দিতে এসে ব্যর্থ হযে ফিরছে। অনঙ্গর দৃষ্টিকোণ থেকে ক্যামেরা ছুট্‌কির চলে যাওয়া বিষণ্ণ গভীরতায ধরে। শেষ লালটুকু দুরে কুঁড়ে ঘরের দাওয়ার পাশ থেকে মুছে যায়। শেষদৃশ্যে নীলের ডিটেল যদুপোড়ার জামা থেকে ছুট্‌কির কাপড়ে স্থানান্তরিত। গ্রাম ত্যাগ করে শহরের পথে ছুট্‌কি শহবেব রঙকে গ্রহণ করে। 'অশনি সংকেতে' এই নীল অনঙ্গ কেও ছোঁবার চেষ্টা করে। কিন্তু এখানে প্রয়োগ সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। এবং একটি মাত্র শটেই সীমাবদ্ধ। এটা রয়েছে সেই অংশে যেখানে নিগৃহীত অনঙ্গ জঙ্গল থেকে ফিরে

এসে নির্জন ঘরে দিশাহারা হয়ে ভাবছে কী হল কী হবে। তার চোখ পড়ে যায় তাকের ওপর রাখা লক্ষ্মীর পটে। বাইরের পৃথিবীর একটি অপ্রত্যাশিত কদর্য স্পর্শের পর, শাপলা ফুলের মত অপাপবিদ্ধ গ্রামবাংলার অনঙ্গবৌ যে ঐতিহ্যের নৈতিকবোধে এতদিন বাঁচে তার এক চিত্রপ্রতিমার সামনে এসে সঙ্কুচিত হয় বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধবোধ এবং আয়নার কাছে সরে গিয়ে নিজের মুখের ছবিতে তার মসীচিহ্ন খোঁজে। এখানে ক্লোজ-এ তার মুখের ছায়ার অংশটুকু ছাড়া ফ্রেমের সমস্তটা ধীরে ধীরে নীল হয়ে যায়। এই নীল তার কমনীয় মুখকে ঘিরে ধরে। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের যে শব্দধবনি আগে থাকতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সেটা এখানে এসে সমলয়ে পৌঁছয়। এই আগ্রাসী নীলের থেকে রেহাই পাবার জন্য অনঙ্গর ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে যাওয়া নদীর দিকে, নদীর জলের শুদ্ধতার আশায়। চারিত্রিক তফাতে যে নীল ছুটকির কাছে গ্রহণীয়, সে নীল অনঙ্গর কাছে গ্রহণীয় হতে পারে না। সম্পূর্ণ একটি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে রঙের সার্থক চরিত্রে চলচ্চিত্রে কোন বক্তব্যকে কীভাবে বাঙ্ময় করে তোলা যেতে পারে তার অন্যতম বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত 'অশনি সংকেতে' রচিত হয়ে রইল।

'অশনি সংকেতে' দ্বিতীয় basic রঙ সবুজ।' কিন্তু লাল হলুদ বা নীল এখানে যতখানি functional ততখানি নয়। এর একটি কারণ থাকাও সম্ভবপর। সবুজকে এখানে কিছুটা static রাখা হয় প্রকৃতির চিরন্তন মহিমার জন্য। কিন্তু, বক্তব্যের বা পরিবেশের মুডবদলের সঙ্গে এখানে সবুজের ইনার টোনালিটির প্রতিও নজর রাখা হয়। বর্ষার সবুজ, শরতের সবুজ বা শীতের সবুজ বিভিন্ন। বিভিন্ন নানা গাছের mosaic বা অর্জুন অরণ্যের বিন্যাস (এত সঠিক gradation খুব কম চলচ্চিত্রেই লভ্য)। চলচ্চিত্রে নানা চরিত্রের পটভূমিতেও সবুজের বৈচিত্র। দেহ বিক্রয়ের জন্য ছুটকি লাল শাড়ি পরে এসে দাঁড়িয়েছে অর্জুন বনের স্বপ্নময় সবুজের সামনে। যে লোকটা শিকারী জানোয়ারের মত গাছের আড়ালে সুযোগ খুঁজছে অনঙ্গর ওপর লাফ দিয়ে পড়ার জন্য তার মুখ অন্ধকারে গোপন এবং তার পেছনের স্বল্পাংশে বিবর্ণ সবুজ। অনঙ্গর বাড়ির সামনে আটজন অনাহারক্লিষ্ট ভিক্ষুক নারীর ক্লোজ-আপের পটভূমিতে আউট অব ফোকাসে সবুজ দূরে অন্তর্হিত। ক্রমে ক্রমে সবুজকে এই মুছে দেবার মধ্যে যে সংকেত তার জন্য শেষদৃশ্য পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। যখন সব রঙ নিঃশেষিত। প্রকৃতির প্রাণময় সবুজ থেকে মানুষ চলে আসে ভয়ঙ্কর কালো মৃত্যু মিছিলে। চলচ্চিত্রের শুরুতে ধানের সবুজ ক্ষেতে কালো ছায়ার যে পক্ষ বিস্তার তা সম্পূর্ণতায় পৌঁছয় এইখানে। মৃত্যুর কোন রঙ নেই। তৃতীয় বা শেষ সিল্যুট ফ্রেমে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং অন্ত্যজ চাষী, শূদ্র, বাগদী সকলেই একাকার।

জীবনের সুন্দর ও ভয়ঙ্কর মুহূর্ত

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রে অন্তঃসম্পর্কিত মুহূর্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। প্রাসঙ্গিক সূত্রে 'অশনি সংকেতে'র গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য — সেই মুহূর্তগুলিকে সূক্ষ্মতম গ্রন্থিতে বাঁধার জন্য একবারও ফেডঅফ বা ডিসল্‌ভের সাহায্য না নেওয়া। 'অশনি সংকেতে'র সম্পাদনায় কাট ছাড়া অপর যেকোন punctuation বর্জিত। সেই কারণে ক্যামেরার চলাফেরা অথবা অবস্থান সম্পাদনার সঙ্গে সময়ের অন্তর্লীন ঐক্যে অসাধারণ আনুপাতিক। মানুষের ক্রম পরিবর্তিত মূল্যবোধ অথবা জীবনের পরিবর্তনের কথা (যা

সকল সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের প্রিয়তম উপজীব্য বিষয়) বলবার জন্য 'অশনি সংকেতে' ক্যামেরার গতিবিধি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পূর্বলিখিত আলোচনা ছাড়াও বর্তমান চলচ্চিত্রে এই প্রসঙ্গে দুটি বিপরীত মেরু কীভাবে রচিত হয় তার উল্লেখের প্রয়োজন আছে। একটি নিদারুণ দুর্দশার দুঃসময়ে 'চাষা মাথার ঘাম ফেলে চাষ করে......' এই সংলাপ (কিংবা উপলব্ধি) বিভূতিভূষণ গঙ্গাচরণের মুখ দিয়ে বার করেন। গ্রামের যে মেহনতি মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে গঙ্গাচরণের রুটি রোজগারের চেষ্টা শেষপর্যন্ত তাদেরই প্রকৃত সামাজিক অবস্থিতির প্রতি গঙ্গাচরণের এটা স্বীকৃতি। কিন্তু চলচ্চিত্রে গঙ্গাচরণের এই স্বীকৃতির বহুপূর্বে আরেকটি স্বীকৃতি আছে, যা পরিচালকের আপন দৃষ্টিকোণে রচিত। নতুন গাঁয়ে নতুন গঙ্গাচরণ 'মুখ্যুসুখ্যু' লোকজনের একেবারে সবদিক দিয়ে বেঁধে ফেলার ফন্দী করে যখন গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ে তখন ক্যামেরার চোখ গঙ্গার বীরদর্পে হেঁটে চলাকে বিশেষভাবে দেখায়। যেন একটি অধিকৃত অঞ্চলে করমুদ্রার রাজসিক ভঙ্গিমায় চাষীদের বিনীত প্রণাম গ্রহণ করতে করতে সে অগ্রসর হয়ে চলে। কিন্তু, পথে খেজুর গাছের মাথা থেকে একটি চাষী যেমন গঙ্গাকে অভিবাদন করে তখন ক্যামেরা গঙ্গাকে ছেড়ে ক্রমে ওপরে উঠে দৃশ্যটির যতি পর্যন্ত সেই চাষীর কাছে অবস্থান করে। ক্যামেরার এই উচ্চ অবস্থান 'অগ-মুখ্যু' সরল গ্রামবাসীদের প্রতি পরিচালকের সম্পৃক্তিবোধকেই শুধু পরিচিত করে না, পরের পর্যায়ে অশ্বখুরাকৃতি রেখায় মাটিতে বসা চাষীদের সামনে আটচালার দাওয়ায় গঙ্গার উচ্চাসনের বৈপরীত্যও তৈরি করে। লাঙলের মুঠি ধরে যে লাঙলা চাষার হাত আড়ষ্ট হয়েছে তাদের বিদ্যাদানের দ্বারা গঙ্গাচরণের কোটি অশ্বমেধের ফললাভের প্রকৃত উদ্দেশ্যেও হয়তো গোপন থাকে না। কিন্তু, 'অশনি সংকেতে'র পূর্বের তিনটি চলচ্চিত্রের (আধুনিক নগরজীবনের ট্রিলজি) ক্যামেরার নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের ভূমিকা এখানে পাল্টে যায়। প্রতিবাদের একটি জোরালো ভঙ্গীতেই 'অশনি সংকেতে' সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরা অনেক বেশি সম্পৃক্ত। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন এই সম্পৃক্তি শুধু নিম্নশ্রেণীর চাষীদের নিয়েই নয়। মূল্যবোধের পার্থক্য সত্ত্বেও গঙ্গাচরণ বা অনঙ্গবৌ দরিদ্র সাধারণ মানুষদেরই অন্যতম প্রতিনিধি। 'অশনি সংকেতে' গঙ্গাচরণের ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবিচল মহিমায় নিরক্ষর ধর্মভীরু চাষীদের কাজে লাগানোর ধূর্ততা কিংবা কিছু মিথ্যাচার আসলে একটি জাতপ্রতারকের চেহারা তৈরি করে না। টিকে থাকার এই কলাকৌশলের মধ্যে গ্রামবাংলায় নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের সকরুণ অসহায়তাই বরং ফোটে। সর্বজয়ার 'সুখে থাকা' লেখা বিয়ের বাসন বাঁধা দিয়ে চাল জোগাড়ের চেষ্টা চূড়ান্ত আবেদনে যেখানে নিয়ে যায় এটা তার থেকে খুব দূরে নয়। 'অশনি সংকেতে' গঙ্গা বা অনঙ্গ এই দুই চরিত্রের প্রতিষ্ঠা-মুহূর্তগুলির অনেক সময়ে দুজনের পটভূমিতে বটের ঝুরি ধরে দোল খাওয়া গ্রামের বাচ্চাগুলোকে দেখানো হয়েছে। বিশ্বাসমশাইয়ের দাওয়ায় বসে গঙ্গা যখন 'ধ্যায়ন্নিত্যং রজতগিরিনিভং' শুনিয়ে তার 'চলাচলতি'র ব্যবস্থা পাকা করছে তখনও তার পেছনে বটের কোলে কিৎ কিৎ খেলছে ছেলের দল। এই একত্রীকরণের নেপথ্যে সহজ সারল্যের কিছু positive রেশ রেখে যাওয়া হয় (গঙ্গাচরণও পরবর্তী এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ঝুরি নামা বটের আশ্রয়ে ফেরে)। বাইরে বিশ্বাসমশাইয়ের আড্ডায় সিঙ্গাপুরের ভৌগোলিক অবস্থিতি কিংবা ঘরে অনঙ্গর কাছে 'এরোপেলেনে'র আকাশে ওড়ার রহস্য ম্যানেজ করে নেবার মধ্যে আসলে

একটা ছেলেমানুষিই আমাদের হাসায়। কিংবা অনঙ্গর দিকে তাকিয়ে থেকে 'দেখছি কথাটা সত্যি কি না' বা 'বোধহয় সত্যি' এই সব সিকোয়েন্স 'অপু-ট্রিলজি'র অপু-অপর্ণার ঘরকান্নার নৈকট্যে সরে আসে। মানবিক এই উষ্ণ মুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গার চারিত্র্য-অনুভূতির কিছু অন্যপ্রকাশ এখানে গ্রাহ্য করার কাবণ আছে। যা থেকে চরিত্রের প্লাস্টিসিটি বোঝা সম্ভব এবং সেই কারণে অন্তিম পরিবর্তনের যৌক্তিকতা। স্বাস্থ্যের বই পড়ে ওলাউঠাব নিরাপত্তার কথা গ্রামবাসীদের না বলে গ্রামবন্ধনের ঘটনাটা আদ্যান্ত লোকঠকানো ব্যাপার হতে পারতো, দীনু ভটচার্যকে চালডাল দেবার বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং চাললুটের সময় অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত চাষী প্রসন্নকে উদ্ধার করার চেষ্টা না করে নিরপেক্ষ থাকা চলতো। কিন্তু তা হয়নি। এবং তা হয়নি বলেই গঙ্গাচবণের সামিল হওয়া বা শেষ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে অন্নপান ভাগ করে নেওয়া শুষ্ক তাত্ত্বিক স্তর ছাড়িয়ে জীবনের স্বেদ বা অশ্রুতে লবণাক্ত। আলোচ্য চলচ্চিত্রে অনঙ্গ ও ছুটকি এই দুই নারী চরিত্রের অবস্থিতি সমান্তরাল। দুই চরিত্রই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে শেষ পর্যন্ত শারীরিক নিগ্রহের শিকার। একটি চরিত্র বিশ্বাস আঁকড়ে রখেছে, আরেকজন বর্জন করছে। তবু অনাহারক্লিষ্ট ছুটকি দেহ বিনিময়ে চাল পেয়ে অনঙ্গর সঙ্গে প্রথম ক্ষুধার অন্ন ভাগ করে নিতে আসে। আপন পাপবোধোর পার্গেশন-এ সে তার মানসিক অবনতির দুঃখকেও অনঙ্গের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। জীবন এখানে বেঁচে থাকে। দুর্ভিক্ষ মাত্রই 'রুথ্‌লেস', স্কুলপাঠ্য রচনা পুস্তকের এই মামুলি ধারণায় যারা 'অশনি সংকেতে' ত্রুটি খোঁজেন তারা অবশ্যই পুরুষ পরম্পরায় অশিক্ষার ফলভোগী। 'অশনি সংকেতে' সংবাদ নেই, জীবন আছে। সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকৃতি রচনার প্রথম শর্ত তাই। নিষ্পেষণের অন্ধকার রাত্রিতে মানুষের স্বপ্ন দেখা ফুরিয়ে যায় না, ভালবাসা ফুরিয়ে যায় না। ক্ষয়ক্ষতিব পাশাপাশি সেটা থাকে। দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে আলুর সন্ধানে তিনটি অভুক্ত গ্রাম্য বধু যখন তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে অভিযানে বেরোয় তখন তাদেব তন্নিষ্ঠ হাস্য পরিহাসে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। শিল্পেও না। পশু-হস্তের বর্বর নখ যেখন আক্রমণের জন্য সতর্ক তখন আরেকটি হাত অখ্যাত এক বেগুনী বনফুলকে সমাদরে গ্রহণ করছে। এব সমস্তটার পরিমণ্ডলে যদিও আগ্রাসী সঙ্কট, কিন্তু জীবন বেঁচে আছে সুন্দব ও ভয়ঙ্করেব যুগ্ম প্রবহমানতায়।

'অশনি সংকেতে' যে মর্মান্তিক মুহূর্ত সব থেকে বেশি আঘাত করে তা হল মতির মৃত্যুর প্রাক অংশে মনুষ্যত্বের নিষ্ঠুরতম humiliation-এর চিত্র। চলচ্চিত্রে গোড়ায় যখন সদ্যস্নাত অনঙ্গকে মতি প্রণত হযে প্রণাম করতে যায় তখন অনঙ্গ পিছিয়ে এসে বলে 'দেখিস আমায় ছুঁটে দিসনি — নাইতে হবে!' চলচ্চিত্রের শেযে চলচ্ছক্তিহীন মুমূর্ষু মতির দিকে অনঙ্গ যখন সাহায্যের হাত বাড়ায় তখন মতি প্রথম সংলাপে তার প্রতিধবনি করে, 'ছুঁয়োনি বামুনদিদি — নাইতে হবে!' নিচু জাতেব এই নিরপরাধ মেয়েটি জানে না কাদের কলকাঠিতে পাঁচ দিন তার পেটে ভাত জোটে না, কিন্তু মৃত্যুলগ্নেও তাকে মনে রখতে হয় শ্রেণী চিহ্নে তার সংকীর্ণ অধিকারবোধের কথা। নির্যাতিত মানবাত্মার এই চেহারা আছে ড্রেয়ারের 'প্যাসন অব জোন অব আর্ক'-এ—বধ্যভূমিতে জোনকে যখন তার বন্ধনরজ্জু নিজে হাতে বুকে তুলে নিতে হয। যন্ত্রণা ও নির্যাতনের এই মুহূর্তগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ড্রেয়ার অথবা সত্যজিৎ রায় যখন চলচ্চিত্রে রচনা করেন তখন তার পেছনে আসলে একটি প্রতিবাদী মনোভঙ্গী কাজ করে। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের

মাঝখানে অনেকখানি অপূর্ণ সাধ নিয়ে মতি মরে যায়। তার শেষ চেতনা দিয়ে সে দেখে ঘাসের সবুজ সমারোহে ভাসমান ফড়িং, পশ্চিমের পটে সূর্যাস্তের আকাশজোড়া নীরব-মহিমা। এতখানি পথ হেঁটে আসায় তার ক্লান্তশ্বাস আকাশ ছোঁয় কিনা জানি না। এতদিনের না খাওয়ায় ক্ষয় তার ঘামে মাটি ভেজায় কিনা জানি না। কিন্তু অন্তগামী সূর্যবর্ণ যখন তার শিশুর মত অগোছালোচুলের সীমায় ঘেরা মুখকে স্বপ্নময় করে তোলে তখন মতির ভাত আর মাছের ঝোলের স্বপ্ন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। সে অভিযোগ করে না, বিদ্রোহ করে না, কিন্তু তার চোখে একটি মরণোত্তব জিজ্ঞাসা রেখে যায়। আজ থেকে পাঁচশত বছর পরে চলচ্চিত্র যদি বাঁচে তা হলে তার আলো-অন্ধকারের ইতিহাসে মতি চিরদিন ঐ জিজ্ঞাসা নিয়ে চেয়ে থাকবে। মতির মৃত্যুকালীন চলচ্চিত্রায়ণ এতখানি সম্পৃক্ত করে যে সে মৃত্যুর নিরব সাক্ষী আরেকটি মানুষ সম্পর্কে প্রথমত সচেতন হওয়া যায় না। মোক্ষদার মেয়ে পুঁটি (যাকে শুরুতেই স্নানের ঘাটে এস্ট্যাব্লিশ করা হয়েছে) মতির মৃত্যুর সারা সময়টা একটা ঝোপের আড়ালে সতর্কভাবে অপেক্ষা করে। নির্মম জীবনবোধে মতির মৃত্যুটাই তার কাছে খুব জরুরী, কেননা মতির সামনে রাখা এক টুকরো মানকচু তার অত্যন্ত প্রয়োজন। এক নিমেষে সারা সাবজেক্টিভিটি অবজেক্টিভিটিতে পাল্টায়। মতির মৃত্যুর পরক্ষণেই অভুক্ত ছোট মেয়েটি ঐ খাদ্যবস্তুটুকু দ্রুত তুলে নিয়ে চলে যায়। একটি বাস্তবের স্তরের পরেই আরেকটি বাস্তবের অতি সংক্ষিপ্ত প্রয়োগে সত্যজিৎ রায় মৃত্যুর পাশে জীবনকে আনেন। নিঃসন্দেহে দুর্লভ মহৎ শিল্পের স্বাক্ষর।

সমগ্র চলচ্চিত্র জুড়ে গঙ্গা ও অনঙ্গর বাড়ি ফেরার বিভিন্ন অংশে যে অন্তর্মুখী গতিবিধি সেটা বৈষয়িক বৈপরীত্য লাভ করে শেষ দৃশ্যে, যখন উচ্চ শ্রেণী চেতনার মিথ্যাভিমান বর্জিত গঙ্গা ও অনঙ্গ তাদের উপার্জিত সিকয়রিটি হারিয়ে বাড়ির বাইরে এসে মৃত্যু মিছিলের সামনে দাঁড়ায়। সত্যজিৎ রায়ের একমাত্র 'মহানগরে'র সমাপ্তির সঙ্গে একদিক দিয়ে বর্তমান সমাপ্তি প্রসঙ্গের মিল আছে। এখানেও স্বামীস্ত্রী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি। এবং এখানেও একটা মিথ্যা আশাবাদিতা জন্ম নিচ্ছে। এক্ষেত্রে একটু নতুন প্রাণের জন্ম সম্ভাবনার regenerative প্রত্যয়ে। চলচ্চিত্রের শেষে পর্দায় প্রক্ষিপ্ত বিবৃতিতে যে আগ্রাসী ভয়ঙ্করদিন আভাসিত সেই চিন্তাকে গঙ্গা ও অনঙ্গ সাময়িক কাটিয়ে উঠতে পারছে ঐ আশাবাদিতায়। সেই হিসেবে 'অশনি সংকেত' হয়তো ওপেন এণ্ডেড।

সোনার কেল্লা

প্রলয় শূর

যা হয়, ফেলুদা ছাড়া আর সকলেরই উপেক্ষিত হওয়ার কথা, কারণ তিনিই গোয়েন্দা, যেহেতু সত্যজিৎ রায়ের ছবি, কিশোরের হৃদয়ের পথেঘাটে ঘুরছে তাঁর ক্যামেরা, এখানে সকলেরই ফেলুদার মতো সমান ভূমিকা ; এবং সকলকে নিয়েই ফেলুদার অব্যর্থ সন্ধানে আমাদের আগ্রহ, আমরা বয়স্ক দর্শক, মুকুলের চোখ দিয়েই বেশিরভাগ সময় সব কিছু দেখতে থাকি। মানুষগুলো সকলেই চেনা, তারা আমাদের চারপাশেই আছেন, তাদের কথাবার্তা আচার আচরণের মধ্যে কী সব মজা, অতিরঞ্জন শুধু গল্পটাতেই, এই অতিরঞ্জন ছাড়া ছোটদের জন্য শিল্প হয় না।

ফেলুদা শখের গোয়েন্দা নন, তিনি শুধু এক জায়গায় বসে মস্তিষ্কের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম ব্যবহার করে যাচ্ছেন তা নয়, শুধু ব্যক্তিত্বের দ্বারা অপরাধীকে শায়েস্তা করছেন তা নয়, রহস্য উদ্ঘাটনে কাজ করে তাঁর বুদ্ধি, হৃদয় ও শরীর। ফেলুদা যোগব্যায়াম করেন, রাইফেল কম্পিটিশনে ফার্স্ট হন, যুযুৎসু ও ক্যারাটে জানেন।

লালমোহন গাঙ্গুলী মানে জটায়ু বলেছেন, 'আরে উটে চড়া তো আমার স্বপ্ন মশাই, আশ্চর্য জানোয়ার, নিজের পাকস্থলীর মধ্যে নিজের ওয়াটার সাপ্লাই, এই বয়ে নিয়ে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলেছে।' শুনে ফেলুদা বলেছেন, 'উটের জলটা আসে উটের কুঁজ থেকে ; কুঁজটা আসলে চর্বি, ওটা অক্সিডাইজ করে উট নিজের জল নিজেই তৈরি করে নেয়, পাকস্থলীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। পরের এডিশনে ওটা ঠিক করে নেবেন।'

বিজ্ঞানমনস্ক, কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী, কৌতুকপ্রিয়, সৃজনশীল মনের অধিকারী; শরীরে, মনে, রূপে, গুণে, বুদ্ধিতে, সংস্কৃতিতে এমন আদর্শ বাঙালি যুবক যে সকল বাঙালির প্রিয় হয়ে উঠবে এতে আর অবাক হবার কি আছে?

রহস্যভেদী, সত্যসন্ধানী, বাস্তববাদী, সাহসী, জ্ঞানী, ধর্মসংস্কারমুক্ত এই যুবকটি আমাদের কল্পনার বিস্তারে সহায়তা করেন, অপরাধী ছাড়া নিরপরাধ সম্পর্কেও তাঁর কৌতূহল আছে, শিশুদের কাছে তিনি শিশুর মতো হয়ে যেতে পারেন। দুষমণেব কাছে তিনি নির্মম কঠোর। কোথাও কোনো রহস্যের গন্ধ পেলেই তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। সেখানে রহস্য যতখানি, নতুন একটা জায়গার সৌন্দর্যও ততখানি।

মুকুলের জায়গায় ভুল করে দুষ্টুলোকেরা যে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সে বলেছে একজন লোক আমার মুখটা চেপে ধরল আর কোলে তুলে নিয়ে গাড়িতে উঠল। আর একজন গাড়ি চালালো। একজন বলল, তুমি কোন্ ইস্কুলে পড়ো। আমি বললাম। ওরা বলল, 'সোনার কেল্লা কোথায়?' আমি বললাম, আমি জানি না, মুকুল জানে। ওরা বলল, মিস্টেক মিস্টেক। তারপর বলল, তোমার নাম কি? আমি বললাম। ওরা বলল 'মুকুল কোথায়'? আমি বললাম মুকুল তো রাজস্থান চলে গেছে। তখন বলল জায়গাটার

নাম তুমি জানো? আমি বললাম, জয়পুর।

জয়পুর বললে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

না না যোধপুর হ্যাঁ যোধপুর বললাম।

ফেলুদারা এসেছে সিধু জ্যাঠার কাছে।

সিধু জ্যাঠা বললেন, 'ফেলু যে গোয়েন্দাগিরি করছ। ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের ইতিহাসটা একবার ভালো করে পড়ে নিয়েছ তো? যে কাজেই স্পেশালাইজ কর না কেন, তার ইতিহাসটা জানা থাকলে কাজে আনন্দ আর কন্‌ফিডেন্স দুটোই পাবে।'

এই আনন্দ আর কন্‌ফিডেন্সের জোরে সত্যজিৎ 'দেবী'তে শ্যামাসংগীত লিখেছিলেন, পরবর্তীকালে গুপী গাইনের সব গান তাঁর নিজের লেখা নিজের সুর দেয়া এবং একটি সদ্য তরুণকে দিয়ে সব কটি গান গাওয়াবার সাহসও কেবল সত্যজিৎই করতে পারেন।

সিধু জ্যাঠা জিজ্ঞেস করেন, 'এই যে আঙুলের ছাপ দেখে ক্রিমিনাল ধরার পদ্ধতি এটার আবিষ্কর্তা কে জানো?'

ছোটরা কেন বড়রাও সত্যজিতের এই ছবি দেখতে এসে শুধু যে ছবি দেখার আনন্দ পাচ্ছে তা নয় তারা তাদের অজানা অনেক কিছু জেনেও যাচ্ছে। ফেলুদা জিজ্ঞেস করে, আপনি ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।

বছর চারেক আগের ব্যাপার। কাগজে বেরিয়েছিল। শিকাগোতে এক বাঙালি ভদ্রলোক এক আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয় খুলে বসেছিল। হিপ্‌নোটিজম অ্যাপ্লাই করে দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দেব বলে ক্লেম করেছিল। এইটিন্‌থ্ সেঞ্চুরিতে ইউরোপে আনটন মেসমার যা করে। এর বেলা দু একটা খুটখাট লেগেও গিয়েছিল। সেই সময় হাজরা শিকাগোতে বক্তৃতা দিতে যায়। সে ব্যাপারটা জানতে পেরে চাক্ষুষ করতে যায়। গিয়ে ভন্ডামি ধরে ফেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ নাম নিয়েছিল ভবানন্দ।

রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসের লেখক জটায়ু। 'সাহারায় শিহরণ', 'দুর্ধর্ষ দুষমণ' এসব তাঁরই লেখা। তাঁর হিরো প্রখর রুদ্র। তিনিও এই অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সঙ্গী।

'সোনার কেল্লা' ছবিতে সব কিছুই এগিয়ে চলে এক অদ্ভুত বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে। এখানে উট আছে ট্যাক্সি, আছে অটো রিক্সা আছে আর আছে রেলগাড়ি। গোটা ছবির ঘটনা সেই দ্রুত গতিতেই এগিয়ে চলে।

বাইরে গভীর রাত রেলের জানলায় পিছলে যাচ্ছে, ভিলেন দুটোর একজন সাহেব বিবির জামা পরা লম্বা, অন্যটা বেঁটে, দুজনেরই মাথায় বিরাট টাক, দিনের রোদ ঝলমল সার্কিট হাউস, শূন্য রাস্তায় মটর গাড়ি, বিকট শব্দ করা রঙচঙে অটোরিক্‌সা, কেল্লা, নিস্তব্ধ শহর, ব্যস্ত বাজার, রাত আলোয় রেলকামরায় তোপ্‌সের ঘুমানো, সিধু জ্যাঠার ঘর, 'মানুষের মনের অন্ধকার দিকটা নিয়ে তোমার কারবার,' তোপ্‌সের ফোন নম্বর লেখা, টুথপেস্ট কিনছেন ডাক্তার, তাঁর হাতে আয়না মুখ দেখছেন, ফোলা ফোলা মুখ, হাজারে হাজারে ডক্টর হাজরা, ভ্যানিশ, লাল পাগড়ি মাথায় তোপ্‌সে, লাল সোয়েটার পরা মুকুল, ময়ুর, উট, নিঃসঙ্গ প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে রেলগাড়ি। নীল কাঁচের মতো ঝিলের পাশ দিয়ে লাল চাদরে মুড়ি দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছেন আসল ডাক্তার হাজরা। রহস্য ছবির প্রথাগত সংস্কারকে ভেঙে দিয়ে পরিচালক নিজের কল্পনাশক্তিতে নতুন নতুন রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন। অ্যাডভেঞ্চারের ছবি বলে যা বিজ্ঞাপিত

ছন্দে গতিতে তা চলচ্চিত্রের অখন্ড প্রাণশক্তির লাবণ্যে গ্রথিত হয়েছে। সামান্য একটি ঘটনা সিনেমায় অসামান্য রয়ে গেল, একটা সমগ্রবস্তু। আমরা চলেছিলাম মুকুলের সঙ্গে — উট, ময়ূর, পাথর, 'আমার বাবা তো পাথর কাটতো' মণিকার, ভয়ে ভয়ে জয়শলমীর — কেল্লার উপর দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হাসছে মুকুল, অতীতের এক অদ্ভুত স্মৃতি, পূর্বজন্মের স্মৃতি ছেলেটিব রাতের ঘুম কেড়ে নিয়ে তাকে দিয়ে ছবি আঁকাতো, আর তাকে রাত জাগতে হবে না, দুষ্টু লোকটা খুব বেশি সাজা পেল না, ড্রাইভার ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছে, এই তো বেশ, একপাশে ফেলুদা, একপাশে তোপ্‌সেদা — মাঝখানে আমি, আমি মানে মুকুল।

এদেশে সমালোচক অনেকেই মূল কাহিনী থেকে ছবিতে সত্যজিতের অন্যায়ভাবে সরে যাবার অভিযোগ এনেছেন বারবার। এর আগে নিজের কাহিনী থেকে 'কাঞ্চনজংঘা' ও 'নায়ক' ছবি করেছেন, কিন্তু সে কাহিনী আমরা সিনেমার পর্দাতেই প্রথম দেখি। 'সোনার কেল্লা' তাঁর নিজের কাহিনী থেকে তৃতীয় ছবি এবং কাহিনীটি সিনেমায় দেখার আগে সকলেরই জানা, 'ফেলুদা হাতের বইটা সশব্দে বন্ধ করে টক্ টক্ দুটো তুড়ি মেরে বিরাট হাই তুলে বলল, 'জিয়োমেট্রি'। ছবি হবার তিন বছর আগে কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, 'লক্ষ করলি নিশ্চয়ই — ধোঁয়ার রিংটা যখন আমাব মুখ থেকে বেরোল তখন ওটা ছিল পার্ফেক্ট সার্কল। এই সার্কল জিনিসটা কিভাবে ছড়িয়ে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেটা একবার ভেবে দ্যাখ। তোব নিজেব শরীরে দ্যাখ। তোর চোখের মণিটা একটা সার্কল। এই সার্কলের সাহায্যে তুই দেখতে পাচ্ছিস আকাশেব চাঁদ তারা সূর্য। এগুলোকে ফ্ল্যাটভাবে কল্পনা করলে সার্কল আসলে গোলক — এক একটা সলিড বুদবুদ, অর্থাৎ জিওমেট্রি, হ্যাঁ এই জিওম্যাট্রিটা বুঝতে হয়।

'সোনার কেল্লা' ছবির চিত্রনাট্য তাই এমন সহজ, এমন সরল কৌতুক ছড়িয়ে এগিয়ে যায়। মাকড়সার জাল জিনিসটাতেও একটা জটিল জিওমেট্রি রয়েছে। একটা সরল চতুষ্কোণ দিয়ে শুরু হয় জাল বোনা। তারপর সেটাকে দুটো ডায়াগন্যাল টেনে চারটে ত্রিকোণে ভাগ করা হয়। তারপর সেই ডায়াগন্যাল দুটোর ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট থেকে শুরু হয় স্পাইরাল জাল ;আর সেটাই ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পুরো চতুষ্কোণটাকে ছেয়ে ফেলে।

ছোটদের জন্য তৈরি রহস্য ছবির চিত্রনাট্য রচনাও তাই। এরজন্যে যে দক্ষতার দরকার সেটা আর কজনের থাকে। বড়দের জন্যে ডিটেকটিভ ছবি করার চেয়ে ছোটদের জন্য এরকম রোমাঞ্চকর ছবি তৈরি করার কাজটা আর একটু শক্ত। সব কিছুকেই চলতে হবে একেবারে হিসেব করে। কিডন্যাপ হয়েছে কাল সন্ধ্যেবেলা। ফেরত দিয়েছে আজ সকালে ১০ই। আমরা রওনা হচ্ছি কাল ১১ই সকালে। আগ্রা পৌঁছব ১২ই। সেদিনই বিকেলে ট্রেনে চড়ে সেদিনই রাতে পৌঁছব বান্দিকুই। বান্দিকুই থেকে রাত ১২টায় গাড়ি, মারওয়াড় পৌঁছব পরদিন ১৩ই দুপুরে। সেখান থেকে আবার গাড়ি বদল করে যোধপুর পৌঁছব সেদিনই ১৩ই অর্থাৎ সন্ধেবেলা।

এবার মূলকাহিনী থেকে সরে যাবার প্রসঙ্গটা সেসব সমালোচকরা কেউ আর তোলার সুযোগ পেলেন না। সত্যজিৎ নিজের গল্প ছবি করছেন। এবং হ্যাঁ এখানেও মূল কাহিনী থেকে তিনি সরে এসেছেন, এসেছেন ছবিব প্রয়োজনে, চলচ্চিত্রভাষার

প্রয়োজনে, ভিন্ন মাধ্যমের কারণে।

এই যে জাতিস্মর, পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যাওয়া, ফেলুদা কি এসবে বিশ্বাস করেন? ফেলুদার মতে, আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হলো এই যে, প্রাণ ছাড়া কোনো জিনিস বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করাটা বোকামো। কোপারনিকাস প্রমাণ করল যে সূর্যই স্থির, আর সূর্যকে ঘিরেই পৃথিবী সমেত সৌরজগতের সব কিছু ঘুরছে। কিন্তু কোপারনিকাস ভেবেছিল যে এই ঘোরাটা বুঝি বৃত্তাকারে। কেপলার এসে প্রমাণ করল, ঘোরাটা আসলে এলিপটিক কক্ষে। তারপর আবার গ্যালিলিও.....।

'সোনার কেল্লা' ছবি শেষ পর্যন্ত ওই পূর্বজন্মর স্মৃতি ওই জাতিস্মর তত্ত্বে ছোটদের বিশ্বাস ধরিয়ে দেয় না। কারণ ওই ঘটনার দ্বারা ছবি শুরু হলেও ছবিটা চলে যায় রাজস্থানের নতুন নতুন জায়গায় নতুন নতুন রহস্যের জট ছাড়ানোতে।

অসম্ভব সাহসী এই যুবক ফেলু মিত্তির। তোপ্‌সের বাবা বলেছিল, 'কার ছেলে দেখতে হবে তো, ওর বাবা শিয়ালের গর্ত থেকে ছানা বের করে আনতো।' যারা কোনো না কোনোভাবে সমাজের ক্ষতি করছে তাদের বিরুদ্ধেই ফেলুদার লড়াই। সেই লাড়াই-এ সবচেয়ে বড় অস্ত্র তার বুদ্ধি। কোনো সঙ্কটের সামনেই সে বিচলিত নয়। জটায়ু ও তোপ্‌সের সঙ্গে তার যতখানি বন্ধুর সম্পর্ক, শিশুদের সঙ্গেও ততখানি, শুধু সেখানে সে আরো বেশি মানবিক, আরো বেশি হৃদয়বান হয়ে ওঠে। আর কোনো ডিটেকটিভের সঙ্গে শিশুদের এমন সম্পর্ক আমাদের জানা নেই। রহস্য সন্ধানে চলেছেন এক গোয়েন্দা, তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষণ রয়েছেন জনপ্রিয় রহস্যকাহিনীর একজন লেখক জটায়ু। এরকমটা দেখা যায় না। জটায়ুকে বাদ দিয়ে সাহিত্যে ফেলুদার কাহিনী যদি বা সম্ভব হতো, (হতো কি?) সিনেমায় কিন্তু জটায়ুকে বাদ দিয়ে ফেলুদার কাহিনী কল্পনা করা সম্ভবই ছিল না। সাহিত্যের চেয়ে সিনেমায় জটায়ু আরো জীবন্ত, তার একটাই কারণ, এই কারণটির নাম সন্তোষ দত্ত। সত্যরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারলে অবাস্তবের ছবিও কেমন বাস্তবের মতো মনে হয়। রঙের বিন্যাসে, সঙ্গীতের ব্যবহারে, বিশিষ্ট প্রকাশশীল মুহূর্তকে পরিচালক তুলে এনেছেন, সামান্য একটা পরিবেশের বাস্তবতার পেছনে শ্রম ও কারুকৌশলে, চিত্রনাট্য যে গতিশীলতার সৃষ্টি করে, ঐ সহজ সাবলীলতার পেছনেই ছবির দক্ষতা, ক্যামেরার যে নিশ্চিত দৃষ্টিকোণ থেকে সূক্ষ্ম ডিটেল উঠে আসে, এক তৃপ্তিদায়ক পরিপূর্ণতায়, আলো অন্ধকারের সেই মনোরম নক্‌শা থেকেই এখানে একটা চমৎকার ছবি তৈরি হয়ে যায়। আসত্রুকের কথায়, ক্যামেরা একটু একটু করে ভাষা হয়ে ওঠে।

ফেলুদা আমাদের সত্যের অনুসন্ধান ও অধিকার দেয়, আর সিনেমার কাজ আমাদের এই অনুসন্ধান ও অধিকারকে উন্মোচিত করা। এমন একটা চেতনা চলচ্চিত্রে নিক্ষেপ করা হলো যা কিশোরকে নিজের সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন করে, যা তাদের নতুনতর আগ্রহকে আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে।

পরিচালক আকস্মিক ঘটনাকে নিপুণভাবে নিশ্ছিদ্র ও অপরিহার্য করেছেন। নানা কৌতুক প্রসঙ্গের দ্বারা ছবিটিকে নিয়ে গেছেন এক হাস্যোজ্জ্বল পরিণতির দিকে।

'নায়ক' ছবিতে একটা দৃশ্যে দেখি শ্মশানে চিতা জ্বলছে। অরিন্দম আগুনের দিকে চেয়ে আছে, সিগারেট খাচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্য কী জানেন? মড়া যখন পুড়ছে তখন feel করলাম যে মনের ভেতর

একটা অন্যরকম ভাব আসছে। একটা পরিবর্তন আসছে। জ্যোতি কাছেই ছিল ; ওকে ডাকলাম।

জ্যোতি অরিন্দমের পাশে এসে বসে।

বল্।

তোর পরজন্মে বিশ্বাস আছে?

কার পরজন্ম?

মানুষের .... তোর....

জ্যোতি বলে, আমি যে আমি সেটা আমি পরজন্মে জানছি কি করে। জ্যোতি বাড়ুজ্জে তো আর জ্যোতি বাড়ুজ্জে হয়ে জন্মাচ্ছে না। আর জাতিস্মরও তো সবাই হয় না। কাজেই বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটা উঠছে কি করে?

যা বলেছিস

মার্কস আর ফ্রয়েডের যুগ ভায়া — নো পরজন্ম নো প্রভিডেন্স।

জানি। একটাই জীবন একটাই চান্স।

যেহেতু একটাই জীবন তাই 'অশনি সংকেত' এর পরেই তৈরি হয়ে যায় 'সোনার কেল্লা'। ট্রেনের কামরায় তাং মাৎ করো চোস্ত হিন্দিতে কথা চালিয়ে যায় জটায়ু। জাতিস্মর তত্ত্ব নিয়ে সত্যজিৎ ছবি করেননি, ছবি আঁকার জন্যে নিজের হাতটাকে সত্যজিৎ করে ফেলতে পারেন মুকুলের হাত। এ ক্ষমতা অন্য কোনো দেশে অন্য কোনো চলচ্চিত্রকারের আছে বলে আমাদের জানা নেই। অনুভূতিপ্রবণ ছোটদের হৃদয় সিনেমায় এমন করে কে আর অধিকার করেছে?

প্রতিবাদের ছবি

শঙ্খ ঘোষ

সত্যজিৎ রায়ের 'জন-অরণ্য' থেকে বেরিয়ে আসি মাথা নিচু করে। ভয় হয়, আমাদের তিনি এবার দেখে ফেলেছেন পুরোপুরি। অনেকদিন পর তাঁর এই ছবি দেখে মনে হতে থাকে যে ছবিটির জন্য যেন আলাদা করে ভাবতে হয়নি তাঁকে, যেন গোপন ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে, আর তার ভিতর থেকে সহজেই তুলে এনেছেন আমাদের প্রতিদিনের দলিল। একদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্যজিৎ ঃ 'আজকের দিনটাও যখন সিনেমার পর্দায় তুলতে চেষ্টা করব, তখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটোখাটো ডিটেইলের মধ্য দিয়েই সেটা ফুটিয়ে তুলতে হবে।' এতদিন পরে পুরোপুরি তাঁর কথা রাখলেন তিনি, এ-ছবির চারদিক থেকে উঠে এসেছে আজকের দিনের সামগ্রিক ডিটেইল, খুব কম ছবিতেই পাওয়া যায় এমন।

আর সেজন্যেই এ আমাদের মাথা নিচু করে দেয়, ভয় ধরিয়ে দেয়। জীবনযাপনের প্রায় প্রতিটি স্তর থেকে আমরা যেন ধরতে পারি এখানে ঃ এই যে আমি। সে যে কেবল সোমনাথের মধ্যে তা নয়, সবকটি চরিত্রের মধ্যেই যেন অল্পবিস্তর মিলিয়ে আছি আমরা, হয়তো একটু তির্যকভাবে। পরীক্ষার ঘরে বসে সোমনাথের মুখের ক্ষীণ আত্মপ্রসাদ থেকেই শুরু হয় সেই নিজেকে দেখা, এ তো আমাদেরই নিরপেক্ষতার প্রসাদ। আমরা বুঝতেও পারি না যে ওরই মধ্য দিয়ে, এর হাত থেকে ওর হাতে আমরাও কেবল পৌঁছে দিচ্ছি জীবনযাপনের নকল, আর সেই মুহূর্তেই আমরাও হয়ে উঠছি মিড্‌ল্‌ম্যান, যা এই ছবির ইংরেজি নাম। কোনো প্রতিবাদ না করে দিনের পর দিন কীভাবে আমরা মস্ত এক অজগরের গ্রাসের মধ্যে ঢুকে যাই, ঢুকিয়ে দিই অন্যকে, 'জন-অরণ্য' তারই এক সর্বনাশা ছবি।

কিন্তু এই অজগরটিকে কোথাও দেখানো হয়নি তার বাইরের বিভীষিকায়। বিশুদা বা আদক বা নটবর, সকলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সোমনাথকে, সকলেরই সহজ পরিচিত মধ্যবিত্ত মুখ, কোনো খল আতিশয্য নেই সেখানে। নেই এমন-কী বড়োবাজারের অল্প দেখা মারোয়াড়ী মুখমণ্ডলের মধ্যেও। গোটা ছবিটির এই একধরন ঃ দ্রুত চালে গড়িয়ে চলছে এর পরম্পরা, এক থেকে অন্য মুহূর্তে যাবার জন্য কোথাও নেই বড়ো-রকমের কোনো বাইরের ঝাপ্‌টা, আমরাও এগিয়ে যাই স্রোতের বেগে। অসতর্ক এগোতে এগোতে হঠাৎ এক সময়ে মুখ ফিরিয়ে বুঝতে পারি যে সর্বনাশের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি, ফিরবার পথ নেই আর। তখন আমাদেরও খাবার রুচি চলে যায়, রেস্তোরাঁয় সোমনাথের মতোই। 'জন-অরণ্যে'র বাইরের চাল এই রকমই অপ্রতিহত ঠাণ্ডা, এইরকমই প্রতারক আতিশয্যহীন।

এই ঠাণ্ডাকে অবশ্য একটু পরেই চেনা যায় তার পিচ্ছিলতায়। আর তখন, একটু ভিতর দিকে তাকিয়ে দেখলে এর মধ্যে আমরা আস্তে আস্তে কেঁপে উঠতে থাকব।

তখন আমাদের মনে পড়বে ঃ বিয়ের পিঁড়ির স্মৃতি মনে করিয়ে দিলে দুসেকেণ্ডের জন্য সোমনাথের বৌদিব মুখ কেমন করে নিভে যায়, কতই সহজে প্রাক্তন প্রেমিককে বিবাহের সুখচ্ছবি পাঠানো যায় পালামৌ থেকে। মনে পড়ে, এম্.এল্.এ-টির সামনে বসে অসহায় স্তাবক হাসির ছল করে সুকুমার, পরীক্ষার ঘরে নকল নেবার আগের মুহূর্তে গার্ডের সামনেও ছিল তার ওই বহুব্যঞ্জক হাসি। সোমনাথের বাবাকে আমেরিকার বিলাসী ছবি দেখাচ্ছেন কৃপাময় সুধন্যবাবু, তাঁর ডান পাশে বসে আরেক কৃপার্থী পিতা তাঁকে দেখিয়েছিলেন অনূঢা কন্যার ছবি। অনেকদিন পর সোমনাথকে দেখে লজ্জায় শরীর বাঁকাচ্ছে সুকুমারের কিশোরী কর্মিষ্ঠা বোন, আর পর্দার ফাঁকে দেখা গিয়েছিল থমথমে কণার অভিজ্ঞ মুখ। দাদার কাছে আঘাত পাবার পর কণার চোখে ছোবলতোলা ফনা, সে-ছোবল সম্পূর্ণ হলো দাদার বন্ধুকে যখন সে ঝাপট্ দিয়ে বলছে শক্ত চোয়ালে ঃ আমার নাম যূথিকা! সুকুমারের বাবার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা অপভাষা কি তখনও একবার ছিট্‌কে এসেছিল সোমনাথের কানে? কিন্তু এখন আর উপায় কী! গাড়ি ঘোরাবার কথা সে বলে বটে কয়েকবার, কিন্তু একবারও সে-কথা বলবার সাহস হয় না ড্রাইভারকে। আমাদের মনে পড়ে, গোয়েঙ্কার গাড়িতে লাঞ্চের প্রস্তাব করতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে সোমনাথের। তাই নটবরের পথ জেনে নেবার পর, পর্দাজোড়া অন্ধকারে ছন্দে-ছন্দে কেবল এগিয়ে চলবে একটি মোমের আলো, পিছনে 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে'র সুর, একদিকে বাবার মুখের শাদা পাথর আর অন্যদিকে চশমাখোলা সোমনাথের ধ্বস্ত মুখ, মাঝখানে শুধু গড়িয়ে আসে বৌদির অলীক সান্ত্বনার স্বর। আমাদের চোখের সামনেই সোমনাথের তরুণ মুখ অল্পে অল্পে প্রৌঢ় হয়ে গেল এইভাবে। বাড়ি ঢুকবার সময়ে রোজই এখন নিচু হয়ে যাবে তার শরীর, যেমন ঘটেছে ছবির শেষ মুহূর্তে।

এসব মুহূর্ত যদি আমাদের না বলে কিছুই, যদি এসব পরম্পরা ভিতর থেকে আমাদেব আক্রমণ না করে, যদি আমাদের কিছুমাত্র প্রতিবাদ না জাগায় এই নিঃসাড় নিরুপায় প্রতিবাদহীনতা, তাহলে আমাদেব উদ্ধারের আর আশা নেই কোনো। ঠিক এই অর্থেই, 'জন-অরণ্য' সত্যজিৎ রায়ের প্রথম প্রতিবাদের ছবি।

পরিচালনার একুশ বছর পরে

নবনীতা দেব সেন

অনেকদিন পরে অকাতরে কৃতজ্ঞ হওয়া গেল। মাঝে মাঝেই মন এমন কৃতজ্ঞ হতে চায়, কিন্তু সুযোগ মেলে কই?

হৃদয়-ধৌতির জন্য অবশ্য-জরুরি যে দয়া, তারই জন্য আমরা শিল্পের কাছে উৎসুক অঞ্জলি পেতে থাকি, হঠাৎ যখন তার ছোঁয়া পাই, তখনই প্রস্ফুটিত হয় কৃতজ্ঞতার এই সহস্রদল। শিল্পের সার্থকতা সেইখানে। এই অসম্ভব নিংড়ানো কৃতজ্ঞতা যে-শিল্প কাড়তে জানে, তার ফলশ্রুতি আর যাই হোক [illegible] নিশ্চয় নয়। এমন একটি সৎ, স্বচ্ছ, সুসমঞ্জস, — বিনীত অথচ নির্ভীক, প্রায়-ত্রুটিশূন্য শিল্পকর্ম যে-পৃথিবীতে প্রস্তুত হতে পারে, সেই পৃথিবীর কাছে মানুষের অনেক আশার দাবি আছে।

সত্যজিৎ রায়ের শহর, আমাদেরও শহর। তাই বলে শিল্পী সত্যজিতের চক্ষু, হৃদয়, মস্তিষ্কে আমাদের চোখ, বুক, মাথা খুঁজে পাওয়াটা সোজা কথা নয়। শংকরের নিরভিমান গল্পের মাধ্যমে সত্যজিৎ সাধারণ মধ্যবিত্ত শহুরে বাঙালির দৃষ্টি, অনুভূতি, বোধ-বুদ্ধি, মূল্যবোধ, এমনকি রসনা পর্যন্ত সবিনয়ে আত্মসাৎ করেছেন। এবং পর্দায় সেগুলির যোগ্যতম ব্যবহার দেখতে পাই। ফলে আমরা পেয়েছি শহর কলকাতার ছিমছাম চতুষ্পদী ঃ 'মহানগরে' যার যাত্রারম্ভ, 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ও 'সীমাবদ্ধ'র পথরেখা ধরে এগিয়ে 'জন অরণ্যে' সেই বৃত্তটি পূর্ণতা পেল। নিপুণ শিল্পীর পাকাহাতের কাজ, তাঁর সৃজনীশক্তির পূর্ণ প্রকাশ এই সৎ, জীবনবাদী অকৃত্রিম ছবিটিতে। সত্যজিৎ সেই অতি-দুষ্প্রাপ্য প্রতিভার অধিকারী, যা শিল্পে উচ্চমানের সঙ্গে সঙ্গেই অনায়াসে দখল করে নেয় জনমানস। 'জন-অরণ্য' জনতার ছবি হয়েছে, 'জন-অরণ্য' পরম পাকা শিল্প সমালোচকের কড়া নজরকেও মোহিত করবে। হয়তো মুগ্ধ করবে না কেবল সেই অর্ধপক্ক রসিকম্মন্যদের, যাঁরা শিল্প বলতে অ্যাফেকটেশন বোঝেন, আর্ট বলতে বোঝেন কেবল আর্টিস্টিক্‌পনা, কিছু পরিশীলিত প্রতীক ব্যবহার, কিছু অর্ধস্ফুটতার ললিত বিন্যাস। এই আর্টিস্টিকত্ব সব সময়ে আর্টের বন্ধু নয়, সহায়ও নয়। 'অশনি সংকেতে'র অসামান্য অভিনয়, অতুলনীয় দৃশ্যসজ্জা, অবিশ্বাস্য প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার ও অদ্বিতীয় নির্দেশনা সত্ত্বেও ওই সচেতন আর্টিস্টিকত্বের কারণে ছবিটিকে আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট বলে বোধ হয়েছিল। শিল্পের রসাস্বাদনে সেটা সহায় না হয়ে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

জন-অরণ্যে কোনো ন্যাকামি নেই। আছে নো-ননসেন্স্ ডিরেক্ট্ এ্যাপ্রোচের খাড়া মেরুদণ্ড। কোদালকে কোদাল বলা হয়েছে, শালাবাঞ্চোৎকে শালাবাঞ্চোৎ। এই দুঃখী জগতে ব্যক্তি মানুষের দুর্বলতাগুলি যে নেহাৎই মানুষী, এবং নেহাৎ দৌর্বল্যই মাত্র — সেটিও মেনে নেওয়া হয়েছে। সমাজের বা সমষ্টির দুর্নীতির বিরুদ্ধে এখানে ব্যক্তির বিদ্রোহ দেখানো হয়নি, বরং বলা হয়েছে 'এটা মেনে নেওয়ার যুগ'।

কিন্তু যুগটাকে মেনে নেওয়া হয়নি। পুরো ছবিটাই এই মেনে নেওয়ার যুগকে অমান্য

করার ছবি। 'এ রকমটা চলতে দেওয়া যায় না' এ কথা ছবিতে কেউই বলে না, কিন্তু দর্শকের মানবতাবোধকে দিয়ে পরিচালক এই স্বগতোক্তি কবুল করিয়ে নেন। ছবি দেখে বেরুনোর সময়ে দর্শকের মনে হবে — আমি এরকম যেন না হই। আমি অন্য পথ খুঁজে নেবো। অন্য পথ নিশ্চয়ই আছে। সোমনাথ ভ্রষ্ট। আমি ভ্রষ্ট হতে চাই না।

চাবুকের মতো ডায়ালগ আর সাবলীল অভিনয়ের পাশাপাশি আছে এ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবনার ভিশুয়াল প্রেজেনটেশন — যা প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে ঘটানো হয়নি বলেই বেশি শক্তিশালী, — এই ত্রিবেণীসঙ্গম 'জন-অরণ্য'কে সত্যজিৎ রায়ের পরিণত শিল্পবোধের একটি চূড়ান্ত প্রমাণ হিশেবে দাখিল করবে নিরবধি কালের দরবারে।

এ ছবিতে সত্যজিতের প্রত্যেকটি অভিনেতা নির্বাচন নির্ভুল হয়েছে। বিশেষত সুকুমারের ভূমিকায় নতুন ছেলেটির অভিনয় তো অতুলনীয়। লিলি চক্রবর্তীর চয়ন তাঁর ববিতা-চয়নের অতীত বিভ্রান্তি মুছে দিতে পেরেছে। কণার ভূমিকায় যে-মেয়েটি, তার মুখের হাড়ের কাঠামো অত্যন্ত উপযুক্ত তার ভাবব্যঞ্জনার পক্ষে। ছবিতে সেই bonal structure-এর শৈল্পিক ব্যবহারও খুব ভাল ফুটেছে আলো-ছায়াতে।

শাদা কালো পর্দায়, শাদা কালে-অক্ষরে আমাদের এই শাদা কালো জীবনটা উপস্থিত কবেছেন সত্যজিৎ নিজের নামের অর্থটি সার্থক করে। দেখিয়েছেন এই দুনিয়াদার মানুষগুলোও কেমন শাদায়-কালোয় মেশানো, — শুধু কালো নয়, শুধু শাদাও নয়।

শিল্পস্রষ্টার নিরপেক্ষতা দু'রকমের হতে পারে। একটা জজসাহেবের, অন্যটি সাক্ষীর। এই ছবিতে সাক্ষীর বিনীত কাঠগড়া ছেড়ে পরিচালক কোথাও বিচারকের উচ্চাসনে উঠে বসেননি। এ ছবিতে তিনি বুকে হাত দিয়ে গীতা বাইবেল কোবাণ ছুঁয়ে সত্য বলছেন — সত্য, পূর্ণসত্য, এবং অবিমিশ্র সত্য। রায় দেবার ভার তিনি দর্শকের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজে হাল্‌কা আছেন। অথচ, শিল্পে বিরল এই কাপট্যহীনতার জন্য তাঁর মধ্যে কোথাও ঋতবাদিতার অহমিকা ফোটেনি। ফুটেছে বিদ্বানের যোগ্য বিনয়, গুণী শিল্পীর যোগ্য দুঃখবোধ। এই ছবিতে তাঁর ক্রোধ তাঁর যন্ত্রণার সঙ্গে মিশে গিয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে একটি কঠিন ধাতব পাথরের আকারে, — তরল লাভাস্রোতে নয়। এ উৎসারণ অগ্নিকাণ্ড বাধায় না, আস্তে আস্তে নতুন পাহাড়ের জন্ম দেয়।

জন-অরণ্য ছবির সহজ গতি প্রথম পনেরো মিনিটের মধ্যেই রক্তস্রোতে মিশে যায়। মধ্যবিত্ত কলকাতাবাসীর প্রত্যেকটি প্রাত্যহিক বিপত্তি — যা নেহাৎই অ-শিল্পিক 'ক্রুড' ও কঠোর, — পরিচালক ছবিতে সেগুলির মোকাবিলা করেন খুব স্বাভাবিক ভাবে। প্রথমেই টান দেন মূলধন ধরে, জাতির শিক্ষাব্যবস্থা, চরিত্রগঠন। তারপরে আসে বিদ্যুৎ, টেলিফোন, রাস্তাঘাট, সিভিক সেন্স, চাকরি বাকরির অবস্থা, জেনারেশন-গ্যাপ, প্রেম ও স্থিতির দ্বন্দ্ব, নৈতিকতা, যৌনতা, ব্যবসায় জগৎ — ওদিকে ক্রমেই পালটে যাচ্ছে রাজনীতির চালচিত্র। মুছে যাচ্ছে দেওয়ালের লিখন।

দু'একটা ছোটোখাটো ত্রুটি, যেমন পরীক্ষার খাতায় ১৯৭৫ লেখা, অথচ দেওয়ালে ৫/৬ বছর আগেকার স্লোগান — অথবা, ছেলের যাতে অনার্স আছে, তাকেই তার ষ্ট্রংপয়েন্ট বলা — কিংবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স খাতার পরীক্ষকের একটা চশমা করবার মতো অর্থসামর্থ্য না থাকা — এগুলো মার্জনা করা যায় কতগুলি অমোঘ দৃশ্যের কথা ভেবে ; যেমন, 'কেরাণী দেখবি?' কিংবা 'মশাই, আপনি পাস না অনার্স?'

'মোহনবাগান', — পাড়ার ছেলেদের ভিড় দেখে ছুটে গিয়ে বোনের ঘরের জানলা বন্ধ করা, — প্রথম দৃশ্যে পরীক্ষার হলে ছেলেদের সহাস্যবদন, এবং সেই অনবদ্য সমাপ্তিদৃশ্য এ'দুটি তো আছেই — আরো আছেন মেয়ে জামাইয়ের আমেরিকা প্রবাসের গল্প করতে-আসা রিটায়ার্ড বাবার মধ্যবিত্ত বন্ধু (মধ্যবিত্ত মনটাকে খতিয়ে চিনেছেন সত্যজিৎ), — আছে বড়বাজারের বিভিন্ন ব্যবসায়ের বিচিত্র চেহারা। আমি শংকরের উপন্যাসটি পড়িনি, শুনেছি, ছবিতে সত্যজিৎ বহু বদল করেছেন, কিন্তু তুল্যমূল্য নিরূপণ করা আমার সাধ্য নয়। ছবিতে যা আছে তা বাস্তবতার দিকে প্রায় নিখুঁত, জানি না গল্প কেমন ছিল।

জন-অরণ্যে অনেকগুলি মুখ — আসে, যায়, কিন্তু এগোয় না। কেবল কেন্দ্রীয় চরিত্রটিই প্রস্ফুটিত হয়, পরিণতির দিকে যায় —একটি চারাগাছ বড় হয়ে ক্রমে অরণ্যের মধ্যে মিশে যায়।

এ ছবিতে কোনো তত্ত্বকথা নেই—না আছে রাজনীতির বোলচাল, না সমাজনীতির। তথাকথিত 'শিল্প জিজ্ঞাসা'র অনর্থক ওপর-চালাকিও নেই। আছে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন দেখা। এ ছবিতে ভিশুয়াল এফেক্ট ও ভার্বাল এফেক্ট, কথা ও চিত্র, দুটিই সমান জরুরি। যেমন ছিল তাঁর গুপী গাইন বাঘা বাইন-এ। যে কথক ঠাকুরটি গুপী বাঘার অদ্বিতীয় গানগুলির স্রষ্টা, ভার্বাল এফেক্ট সৃষ্টিতে তাঁর কুশলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বাচালতা মাত্র। এখানে সানন্দে নজর করলাম — সোজাসুজি পদ্ধতিতে তিনি কথাব সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রকে এনেছেন, কথা কমিয়ে দৃশ্যকে প্রাধান্য দেননি তাঁর আগেকার ছবির মত।

আর একটি জরুরি গুণ — সারা ছবিতে সমানেই অশুভ শক্তিকে মানুষের বুকের বাইরে, সামাজিক ঘাত প্রতিঘাতের ঘটনা-সংঘাতেব মধ্যেই রেখে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। খারাপ খারাপ কাজ করছে যে লোকেরা, তারা যে সবাই খারাপ লোক, তা নয়। জগতে বিশুদ্ধ খারাপ লোক বিশেষ নেই, এমন কি যে কাগজব্যবসায়ী নায়কের অর্ডারটি চুরি করে সাপ্লাই দিল, সেও নয়, — সে ব্যবসার স্বধর্ম পালন করেছে মাত্র। যে মেয়েটি বিয়ের লোভে নায়ককে ছেড়ে গেল, সেও খারাপ নয়, সে অ-ধ্রুবর চেয়ে ধ্রুবকেই বেছে নিয়েছে — এতে অশাস্ত্রীয় কিছু নেই। উৎপল দত্ত সন্তোষ দত্ত রবি ঘোষ বা দীপঙ্কর দে— এঁদের বাক্যালাপে বর্তমান যুগে বেঁচে থাকার মন্ত্র ও মন্ত্রণা, মোদ্দাকথা সুবিধাবাদের দর্শন, একটুও বেমানান নয়। বিগতযুগের মূল্যবোধের সঙ্গে চলতিকালের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ঠকে যায় এই ছবির আড়ষ্ট বিবেক, সোমনাথের বাবার মধ্যে। পরাজয়টা অবশ্য ঠিক তাঁর নয়, যেখানে প্রবঞ্চিত বৃদ্ধের ঠোঁটে নিশ্চিন্তির হাসি ফুটে উঠছে সেখানেই নায়কের অধঃপতনসম্পূর্ণতা পাচ্ছে।

কিন্তু সুখের বিষয়, ছবি সেখানেই শেষ হয় না। ছবি শেষ হয়েছে এক যুবতীর অচঞ্চল, কঠোর, সর্বজ্ঞ দৃষ্টির সামনে। সেই বিস্ফাবিত চোখ স্বচ্ছ, আপোষহীন। সে চোখ ঠকেনি, ঠকায়নি। তাতে আছে নির্বাক ভর্ৎসনা। এই ভর্ৎসনা কাকে? এক নরম শিরদাঁড়ার ব্যক্তিমানুষকে, না — ভালোকে ভালো থাকতে দেয় না যে জগৎ, সেই জগৎকে? ছবির সমাপ্তি মুহূর্তে, পর্দা সরিয়ে এই থমকে দাঁড়ানোয়, এই বাঙ্ময় দৃষ্টিতে আছে ভয়ংকর এক চৈতন্যোদয়। পর্দা সরে যাওয়া।

এ ছবির শেষ গত প্রজন্মের প্রতারিত দীর্ঘশ্বাসে নয়, বর্তমানের আত্মধিক্কারে। এই সমাপ্তি মুহূর্তের চোখের ভাষা চিরদিনের মানবিকতার ভাষা — সে ভাষা কোনো দেশ-দল—মতবাদের মুখাপেক্ষী নয়। ওইখানে সত্যজিৎ রায়ের জিৎ হয়েছে, বাস্তবতার চূড়ান্ত জয় ওইখানেই। যা সমকাল থেকে চিরকালে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে সেটাই যথার্থ বাস্তব। বিগতদিন ঠকেছে, কিন্তু বর্তমানকে ঠকানো যায়নি। বিগতদিনের বিবেক না হয় এযুগে অচল— কিন্তু এযুগের বিবেক? জগতের সোমনাথেরা ওই দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়াতে পারবে কি? পিঠ ফিরিয়ে আড়াল দিয়ে লুকিয়ে যাওয়া কতকাল চলবে?

এ ছবির শেষ তারুণ্যের আত্মপ্রবঞ্চনায় নয়, সত্য দৃষ্টিতে। নৈরাশ্যে নয়, ভর্ৎসনায়।

শতরঞ্জ কি খিলাড়ি

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা যখন ক্রমশঃই রাজ্যবিস্তার করছিল সেই সময়ে কি [illegible] সে-বিষয়ে সংবাদপত্রে লিখেছিলেন কার্ল মার্কস। ১৮৬৬ সালে ব্রিটিশরাজের অযোধ্যা গ্রাস করার পর মার্কস নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনে ১৮৫৮ সালের ২৮মে তৎসময়কার দলিল এবং চিঠিপত্র অবলম্বন কবে কী ঘটছিল সে বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মার্কসবিরোধী ঐতিহাসিকেরা মার্কসের তথ্যে কোন ভুল ছিল, এই অযোধ্যাগ্রাস ব্যাপারে, এমন কোনো কথা বলেননি। 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'র ঐতিহাসিক পট বোঝার জন্য আমরা মার্কসের ইতিহাসেব একটি ঘটনা এখানে পেশ করছি।

ক্যান্টনে এবং অযোধ্যায় ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ সরকার একটা আন্তর্জাতিক আইন চালু কবার চেষ্টা করেছিল ; যুদ্ধ না করেও একটি রাষ্ট্র আরেকটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন সংঘর্ষ চালিয়ে যেতে পারে। এই ব্রিটিশ সরকারই অবশ্য ১৮৩১ সালে পোল্যাণ্ডে রুশ সরকারের আচরণের এবং ১৮৫১ সালে ফ্রান্সে লুই নেপোলিয়নের আচরণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড চেঁচামেচি করেছিল, কেননা রুশ সরকার পোলীয় অভিজাতদের ভূমির মালিকানা এবং নেপোলিয়ন অরলিয়ঁদের ভূমির মালিকানা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।

১৭৯৮ সালে স্যার জন শোর একটা চুক্তি করেন অযোধ্যার সঙ্গে, যে চুক্তির ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অযোধ্যার কাছ থেকে পাবে বছরে ৭৬ লক্ষ টাকা, কিন্তু অযোধ্যারাজ দেশের কর কমাতে বাধ্য থাকবেন। এই দুটি শর্ত পরস্পরবিরোধী যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ১৮০১ সালের চুক্তি। এই চুক্তিতে, ১৭৯৮-এর চুক্তি লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত করে অযোধ্যারাজ রাজ্যের একাংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এই চুক্তিটি এতই বিস্ময়কর হয়েছিল যে খোদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এটাকে বলা হয়েছিল ডাহা ডাকাতি এবং লর্ড ওয়েলেসলি তদন্ত কমিটির সামনে হাজিরা থেকে অব্যহতি পান খুঁটির জোরে।

এই ১৮০১-এর চুক্তির জোরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অযোধ্যার কিছু গ্রাস করল, বাকি এলাকা বৈদেশিক এবং ঘরোয়া শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ষা করার 'দায়িত্ব' নিল এবং এই অঞ্চলের মালিকানা চিরকালের জন্য অযোধ্যারাজ ও বংশধরদের জন্য গ্যারান্টি দিল। কিন্তু রাজা প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হলেন, তিনি তাঁর কর্মচারীদের দিয়ে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা চালু করে প্রজাদের সমৃদ্ধি ঘটাবেন। যদি এ বিষয়ে গাফিলতি হয় তখন কোম্পানি আর কী করবে, হয় যুদ্ধ করবে নতুবা নতুন চুক্তি করবে।

১৮৫৬ সালে লর্ড ডালহৌসি কানপুরে একদল সৈন্য সমাবেশ করালেন, অযোধ্যার রাজাকে বললেন, ওটা কিছু নয়, ওটা নেপালের বিরুদ্ধে পর্যবেক্ষণ করার জন্য। এই সৈন্যবাহিনী সহসা অভিযান করে রাজাকে বন্দী কবে এবং লক্ষ্ণৌ দখল করে। ব্রিটিশদের হাতে দেশটাকে তুলে দেওয়ার জন্য রাজাকে তাগাদা দেওয়া হয়। রাজা রাজি না হলে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং অযোধ্যা কোম্পানির এলাকাভুক্ত ঘোষণা করা হয়।

অযোধ্যাগ্রাস যে আকস্মিক ঘটনা নয় তার প্রমাণ, ১৮৩০ সালে লর্ড পামারস্টোন পররাষ্ট্রসচিব হয়ে অযোধ্যা গ্রাস করার হুকুম পাঠান। অধঃস্তন কর্মচারী সেই হুকুম পালন করেন নি। অযোধ্যারাজ রাজার কাছে এই অন্যায় হুকুমের প্রতিবাদ জানান, রাজা চতুর্থ উইলিয়াম পামারস্টোনকে কঠোর তিরস্কার করেন এবং বরখাস্ত করার ভয় দেখান। এই পুরনো ঘটনা সংক্রান্ত দলিল চাওয়া হল আবার ১৮৫৮ সালে, কিন্তু কমন্স সভায় জানান হল দলিল সব হারিয়ে গেছে। ১৮৫৬ সালে অযোধ্যাগ্রাস হল যখন পামারস্টোন আবার ক্ষমতায়। ১৮৩৭-এও পামারস্টোন দ্বিতীয়বার পররাষ্ট্রসচিব হয়ে অযোধ্যাকে বাধ্য করেন নতুন চুক্তি করতে। তখন বলা হয় অযোধ্যারাজের ভালো ভাবে শাসন করার কোনো ক্ষমতাই নেই, অতএব, চুক্তি হল ঃ

'রাজ্যের পুলিশি ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগীয় ও রাজস্ব প্রশাসনের ত্রুটি দূর করার সেরা উপায় অযোধ্যারাজ অবিলম্বে ব্রিটিশ রেসিডেন্টেব সঙ্গে বিবেচনা করবেন, এবং হুজুর যদি ব্রিটিশ সরকারের উপদেশ ও পবামর্শ গ্রহণে অবহেলা করেন এবং অযোধ্যারাজ্যের ভিতর যদি এমন সব স্থূল ও ধারাবাহিক নিপীড়ন, নৈরাজ্য ও কুশাসন চলতে থাকে যাতে জনশান্তি গুরুতর রূপে বিপন্ন হয়, তাহলে যেখানেই এরূপ কুশাসন ঘটেছে অযোধ্যাখণ্ডের তেমন যে কোন অংশের ব্যবস্থাপনায় অল্পাকারে বা বৃহদাকারে এবং যতদিন প্রয়োজন হবে ততদিনের জন্য স্বীয় অফিসার নিয়োগের অধিকাব ব্রিটিশ সরকার হাতে রাখছেন ; এরূপ ক্ষেত্রে সমস্ত খবচ-খরচাবাদে যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা রাজকোষাগারে জমা দেওয়া হবে এবং আয়-ব্যযেব একটা সাচ্চা ও বিশ্বস্ত হিসাব হুজুবের নিকট দাখিল করা হবে।'

এই চুক্তি পূর্ববর্তী কড়া চুক্তির চাইতেও কড়া, বিশেষত ব্রিটিশরাজের বর্ধিত সামরিক বাহিনী বিষয়ে। তবে কোম্পানির সম্মতি না নিয়েই এই চুক্তি করা হযেছে অযোধ্যার সঙ্গে বড়লাটের, এই জন্য এই চুক্তিটি নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু নাকচ যে হযেছে এটা অযোধ্যাকে আর বলা হল না, অযোধ্যারাজ জানলেন নতুন চুক্তিব বলে ব্রিটিশরাজ প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী। ব্রিটিশ সরকার সেই ক্ষমতা কেন প্রয়োগ করছেন না, শাসনে গাফিলতির জন্য অযোধ্যা ও ব্রিটিশ সরকার কেন উভয়েই দায়ী নন, এই প্রশ্ন অযোধ্যা করতেই পারতেন।

এই নাকচ করা চুক্তি চালু থাকল ১৮৫৬ পর্যন্ত। ডালহৌসি হঠাৎ রব তুললেন চুক্তিটা নাকচ করা হয়েছিল, অতএব বৈধ নয়। কেননা এই চুক্তির ফলে অযোধ্যারাজের নামে ব্রিটিশ অফিসাররা যে অংশ শাসন করতেন তার উদ্বৃত্ত আয় যাবে অযোধ্যার কোষাগারে। ডালহৌসির তাতে পোষাবে না, তিনি চান পুরো অযোধ্যা। সুতরাং চালু চুক্তিটি (যদিও আসলে নাকচ) অস্বীকার করে ব্রিটিশ সরকার একটি স্বাধীন ভূখণ্ড গায়ের জোরে দখল করলেন।

মার্কস অযোধ্যাগ্রাস এইভাবে বিবরণ দিয়ে একে আখ্যা দিয়েছিলেন "২০ বছরের পরস্পর সম্পর্কের স্বীকৃত ভিত্তি, যা জুগিয়ে এসেছে সে সব চুক্তির বৈধতা, এই ভাবে অস্বীকার, স্বীকৃত চুক্তিকেও প্রকাশ্য লঙ্ঘন করে স্বাধীন ভূখণ্ডগুলির বলপূর্বক এই দখল, গোটা দেশের প্রতি একর জমির এই চূড়ান্ত বাজেয়াপ্তি" হল "ভারতের দেশীয়দের প্রতি ব্রিটিশেব বিশ্বাসঘাতক ও পাশবিক আচরণ।"

অযোধ্যাগ্রাসের ইতিহাসের এই বিবরণ সত্য হলে মার্কসের সঙ্গে যে কেউই বলতে বাধ্য, এটা ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা ও পাশবিকতার ইতিহাস। 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'তে যদি ব্রিটিশ সরকারের এই বিশ্বাসঘাতকতা ও পাশবিকতা ফুটে না ওঠে, তাহলে আমরা বলতে বাধ্য, ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। কেননা ছবির বিষয় অযোধ্যাগ্রাসের সময় অযোধ্যাবাসীর আচরণ এবং সেই আচরণ বোঝা যাবে না, আচরণের পরিপ্রেক্ষিত না দেখালে। ১৮৫৬ সালে অযোধ্যা কুশাসিত ছিল কি না, জায়গীরদাররা বিলাসব্যসনে মগ্ন ছিল কি না, রাজা নাচেগানে ব্যস্ত ছিলেন কি না, সে সব প্রশ্ন অবান্তর, কেননা ওই কুশাসনের জন্যই, বিলাসব্যসনে মগ্নতার জন্যই, নাচগানের জন্যই ব্রিটিশরাজের আবির্ভাব ঘটে নি, ঘটেছিল ১৭৯৮ সাল থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত পদে পদে চক্রান্ত করে ব্রিটিশের অযোধ্যাগ্রাস। শিল্পকর্ম ইতিহাস রচনা নয়, সন-তারিখের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব হতে পারে না, কিন্তু শিল্পের দায়িত্ব যে যুগকে প্রতিফলিত করা হচ্ছে সেই যুগের মূল সুরটি তুলে ধরা। ১৮৫৬ সালের আক্রান্ত অযোধ্যার মূল সুর দাবাখেলা হতে পারে না, পায়রা ওড়ানো হতে পারে না, মুরগীর লড়াই হতে পারে না, রাজার কৃষ্ণলীলা, নাট্যাভিনয়, মহরমে তাসা বাজানো, নারীপ্রীতি, গজল রচনা বা কত্থকের উপভোগ্যতা হতে পারে না। দাবাখেলা থেকে শুরু করে কত্থক দেখা সবই হয়তো সত্যি ছিল, কিন্তু তা ইংরেজের অযোধ্যারাজ্য দখলকে ন্যায্যও প্রমাণ করে না, ব্যাখ্যাও করে না। সত্যজিৎ ইতিহাস দর্শনের এই মূল নীতি গ্রহণ করেন নি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে মূল লক্ষ্য না করে ইতিহাসকে উল্টোভাবে দেখেছেন। যার ফলে চলচ্চিত্রটির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ইংরেজরা যখন দেশটা গ্রাস করছে, দেখ, আমরা অকর্মণ্য ভারতীয়রা কী করছিলাম। আমরা ভারতীয়রা কী করছিলাম তা আমাদের ব্যাপার, সুখে থাকি বা দুঃখে থাকি, তাতে ইংরেজদের নাক গলানোর কোনো অধিকার নেই। কিন্তু ইংরেজ নাক গলিয়েছিল, সেটাই ইতিহাস এবং সেটা অগ্রাহ্য করা মানে ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা।

যেখানে ইতিহাস দাবি করে বিশ্বাসঘাতকতা ও পাশবিকতার জন্য ইংরেজ সরকারের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করবে 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি', সেখানে সত্যজিৎ রায় ছবি শুরু করেছেন ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা দিয়ে। মীর এবং মির্জা এখানে ব্যক্তিবিশেষ নয়, যদি ব্যক্তিবিশেষই হত তাহলে শিল্পের কোনো প্রয়োজন ছিল না। ব্যক্তি তখনই শিল্পের বিষয হয়ে ওঠে যখন ব্যক্তি একই সঙ্গে তার ব্যক্তিস্বরূপ বজায় রেখেও একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানের ব্যক্তির প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। নাহলে কবি বা পাঠক তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পারে না, শিল্পের শিল্পত্ব বজায় থাকে না। মীর, মির্জা, ওয়াজিদ যেমন সেই সময়কার ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, উট্রাম, ওয়েস্টন, ফায়রার তেমনি সেই সময়কার ইংরেজদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়া অবলম্বন করে দেখা যাক সত্যজিৎ কীভাবে ধাপে ধাপে এই ভারতীয়দের প্রতি শ্লেষের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছেন। ছবিতে একজন ভাষ্যকার আছেন, তাকে ধরা যেতে পারে, ইতিহাসের ভাষ্যকার অথবা পরিচালক নিজেই।

Narrator : Look at the hands of the mighty generals deploying their forces on the checkered battlefield. We do not know if those hands have ever held real weapons. ছবির শুরুতেই এই শ্লেষ আমাদের চকিত

করে তোলে। অযোধ্যার সেনাপতিরা কখনো যুদ্ধ করেন নি, অস্ত্র ধরেন নি, একথা বলা নিতান্তই বাতুলতা। কেননা অযোধ্যার সেনানীরা শক্তিধর, কয়েক দৃশ্য পরে উট্রাম নিজেই সেকথা কবুল করেছেন। অতএব আমাদের ধরে নিতে হবে এখানে এমনই দুজন সেনাপতিকে বেছে নেওয়া হয়েছে যাঁরা নিতান্তই ব্যক্তিবিশেষ, কারো প্রতিনিধি নন। অর্থাৎ পুরো ছবির আবেদন ক্ষীণ হওয়া শুরু হয়েছে, আমরা দর্শকরা জেনে নিলাম, গল্পের যা বিষয় তা নিতান্তই দুই ব্যক্তির ঘটনা, কোনো স্থান কাল পাত্রের হদিশ আমরা এখানে পাব না। এই ধরনের ব্যক্তিরা চিরকাল আছেন, চিরকাল থাকবেন, ভারতবর্ষে থাকবেন, ইংল্যাণ্ডে থাকবেন, এঁদের নিয়ে আমাদের মাথাব্যাথা নেই।

কিন্তু সত্যজিৎ যে এঁদের দুজনকে ব্যক্তিবিশেষই ভাবেন না, প্রতিনিধিও ভাবেন তা ভাষ্যকারের ভাষা থেকে বেরিয়ে আসে।

Narrator : There that is the white king with the crown on its head and it is exposed to an attack from the black rook. Save your king, Meer Roshan Ali for if the king is lost, the battle is lost.

দাবার ভাষার অন্তরালে অযোধ্যা রাজার উপর ইংরেজ বড়ের ধাক্কা আর প্রচ্ছন্ন থাকে নি এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীও থেকে যাচ্ছে রাজা গেলে সবই গেল। অবশ্য রাজাটাকে কালো এবং বড়েটাকে সাদা করলে ব্যাপারটা আবো খোলামেলা হয়ে যেত।

যে জায়গীরদারদের প্রাথমিক কর্তব্য দেশরক্ষা, তারা কর্তব্য তুচ্ছ করে দাবাতে মগ্ন এটা দেখানোর পরই পরিচালক আর এক হাত নিলেন তাদের উপর, এই বলে, এরা কাজ করে না কেননা এরা জায়গীরদার। শুধু এরাই নয় লক্ষ্ণৌ শহরের বিত্তবান লোকেরা কেউই কাজ করে না, শুধু খেলে। এবং সবচেয়ে বড়ো খেলোয়াড়, রাজা স্বয়ং। এবং এই রাজা সম্পর্কে শ্লেষ ক্রমশঃ তীব্র হয়ে ওঠে।

but he had other interests besides administration.. but of course there were times when he sat on the throne. ...if he didn't much like to rule he certainly loved his crown and was proud of it.

অযোধ্যার তদানন্তীন শাসকদের সম্পর্কে পরিচালক কী ভাবছেন এটা আর অস্পষ্ট থাকছে না। পরবর্তী কালে ওয়াজিদ যখন বলেন, তাঁর প্রজারা তাঁকে ভালোবাসে, তিনিও তাঁদের ভালোবাসেন, তিনি উষ্ণীষ দিতে রাজি কিন্তু চুক্তি তিনি সই করবেন না, তখন আমরা দেখি একটি রাজা যিনি রাজত্ব করেন না কিন্তু সিংহাসন ভালোবাসেন, এবং তাঁর প্রজাবিষয়ক যাবতীয় কথা আমাদের কাছে কেবল কথার কথা বলেই ঠেকে।

এই তীব্র শ্লেষের পরিপ্রেক্ষিতে যখন সত্যজিৎ ডালহৌসির চেরীর শ্লেষে আসেন তখন সেই শ্লেষের ধার ভোঁতা হয়ে যায়। কেননা, আমাদের ভারতীয়দের অকর্মণ্যতার স্মরণে আমরা আত্মগ্লানিতে ভুগতে শুরু করেছি, ইংরেজ আগমনকে আমরা ভবিতব্য অবশ্যম্ভাবী বলে ভাবতে শুরু করেছি।

একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকাব। সামন্ততন্ত্রের যুগের অকর্মণ্য বিলাসীদের পতন হওয়াই স্বাভাবিক, এই ভেবে আমরা মনে করতে পারি এখানে সত্যজিৎ ইতিহাস বিকৃত করছেন না। জায়গীরদাররা দাবা খেলে, রাজা নাচে গায়, এটা তো সামন্ততান্ত্রিক যুগের সত্য, এই বলে আমরা হয়তো সিদ্ধান্তে এসে যেতে পারি যে, সত্যজিৎ একটা

ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপন করছেন। এটা যে সত্য নয়, তার কারণ, এখানে পটভূমিকা সাম্রাজ্যবাদী এবং ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ইংরেজদের রাজ্যবিস্তার। একটি সামন্ততান্ত্রিক অকর্মণ্যতা অপর একটি সামন্ততান্ত্রিক শঠতার হাতে পড়ে মার খেল, এতে প্রজাদের কোনো হিতই হয় না, ওয়াজিদ আলির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ইংরেজ সরকারের হাতে পড়ে অযোধ্যার মোক্ষলাভ হয় নি। অতএব অকর্মণ্যতার শ্লেষ এখানে কিছুই ব্যাখ্যা করে না, যদিই আমরা ধরে নিই সেই সময়কার ভারতীয়রা অকর্মণ্য ছিল।

এর পরের দৃশ্য উট্রামের চোখে ওয়াজিদ। এবং ওয়াজিদকে যতটা সম্ভব হাস্যকর প্রতিপন্ন করে উট্রাম অত্যন্ত বিজ্ঞতার সঙ্গে রায় দিলেন A bad king. A frivolous, effeminate, irresponsible, worthless king । এই পর্যন্ত ওয়াজেদ আলির যে পরিচয় আমাদের দেওয়া হল তাতে আমরাও একমত উট্রামের সঙ্গে। উট্রামকে আমরা মনে করছি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, শালীন, সংযত ইংরেজ হিসেবে যিনি ভারতীয় রাজার তুলনায় উন্নততর জীব। এবং তিনি বলেন,

I know he's not the first but he certainly deserves to be the last. We've put up with this kind of nonsense long enough. He can't rule, he has no wish to rule, therefore he has no business to rule.

সত্যজিৎ যেভাবে ছবিটি গড়ে তুলছেন, হাস্যকর রাজা এবং প্রজাবৎসল আংরেজ সরকারকে যেভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, তাতে আমাদের প্রতিবাদের ক্ষমতা লোপ পায়।

লোপ পেত, যদি সত্যজিৎ কথা বলতেন।

আমরা এটা জানি যে চুক্তি কার্যকর করতে হলে বলা দরকার অযোধ্যায় কোনো শাসন নেই। ব্রিটিশ বিশ্বাসঘাতকতার ধারাবাহিক ইতিহাস স্মরণে রাখলে সন্দেহ হয় কর্নেল স্লিম্যান অভিসন্ধি করেই কুশাসনের কথা অবতারণা করেছিলেন এবং উট্রাম এই চলচ্চিত্রে বলেছেন, তিনি স্লিম্যানকে অনুসরণ করেই তাঁর কুশাসনের সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী আলি ঘুষ দিয়ে ভালো রিপোর্ট পাবেন আশা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, ব্রিটিশের ধান্ধা আরো বড়ো আকারে ছিল।

এখানে ইতিহাসের কথাটা আবার বলে নেওয়া দরকার। অযোধ্যার ঐতিহাসিকরা অনেকেই বলেছেন, কুশাসনের কথাটা অভিসন্ধিমূলক অপপ্রচার। মেজর বোর্ডের Dacoitee in Excelsis অথবা কর্নেল ম্যালিসনের ইতিহাস এই কুশাসনের কথা অস্বীকার করেছে, মেটকাফ তাঁর Native Narratives of the Mutiny-তে ওয়াজিদ আলির শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার পরিকল্পনার কথা বলেছেন। ওয়াজিদ আলি শাসন সংহত করতে গেলে ব্রিটিশ সরকার পদে পদে বাধা দিয়েছে। যার ফলে ওয়েলেসলিকেও একবার আপত্তি করতে হয়েছে ব্রিটিশের এই অন্যায় নাক গলানোতে।

আলির জবানিতে হয়ত সত্যজিৎ এই কুশাসনের অপবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এত দুর্বলভাবে যে সেটা স্পষ্ট দানা বাঁধতে পারে নি। প্রধানমন্ত্রী আলি কাঁপতে কাঁপতে বলছেন ঃ

You talk of misrule, when there is so much happiness about. Do our people behave as if they are badly governed ?

এর পরেই আলি ঘুষ দিয়ে ভালো রিপোর্ট পাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আবার বলার চেষ্টা করেন কোম্পানির শাসনে বাংলাদেশের অবস্থাও বড়ো ভালো নয়, অতএব কুশাসনের কথা না তোলাই ভালো।

আলির কথাগুলি যে বাস্তবিক সত্য, তা যে মন্ত্রিত্ব হারানোর আশঙ্কায় কুশাসনের দোষ অস্বীকার নয়, তা বোঝা দুরূহ হয়ে উঠেছে তার কারণ প্রথমেই Narrator আমাদের বলে রেখেছিলেন জায়গীরদাররা, বিত্তবান লোকেরা কাজ করে না, খেলে, ওমরাওরা পায়রার লড়াইতে ব্যস্ত, রাজা রাজা বটেন তবে তাঁর অন্যান্য কাজকর্মও আছে, নাচগানের পর সময় পেলে তিনি রাজত্ব করেন। অর্থাৎ আলির সুশানের সাফাই উট্রামের কেন, দর্শকের মনেও দাগ কাটে না। অর্থাৎ, আমাদের সন্দেহ স্লিম্যানের রিপোর্টে সত্যজিতের আস্থা এবং সেভাবেই তিনি ছবিটা গড়ে তুলেছেন।

উট্রাম যখন আলির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করলেন তখন মরিয়া হয়ে আলি পুরনো চুক্তির কথা তুললেন এবং

This is awkward for Outram.

পরবর্তী দুটি দৃশ্যেও আমরা দেখব উট্রামের বিবেকদংশন ঘটছে। নাকচ চুক্তি-চালু চুক্তির ব্যাপারটা যে অত্যন্ত গর্হিত সে বিষয়ে উট্রামও অবহিত, কিন্তু কী করবেন, কোম্পানির চাকরি অতএব চাকরি করার জন্যই রাজাকে পদত্যাগ করাতে তিনি বাধ্য হচ্ছেন।

মার্কস-বর্ণিত বিশ্বাসঘাতকতা ও পাশবিকতার সঙ্গে উট্রামের এই বিবেকের ব্যাপারটা আদৌ খাপ খায় না।

আমরা অবশ্য দেখেছি মার্কস-বর্ণিত ইতিহাসে অযোধ্যায় কোম্পানির কাজকর্ম ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ডাহা ডাকাতি বলে অভিহিত হয়েছিল, ওয়েলেসলির তদন্ত কমিটির সম্মুখীন হওয়ার অবস্থা হয়েছিল, পামারস্টোনকে বরখাস্ত করার ভয় দেখানো হয়েছিল। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইংরেজদের যে ধাপ্পাবাজ বদমায়েশের চেহারা, ইংল্যাণ্ডে সব সময়েই সেই চেহারা নয়, সেখানে গণতান্ত্রিক নীতিপরায়ণ ইংরেজ শাসকের চেহারা সবসময়ই অদৃশ্য নয়। এটা ঐতিহাসিক সত্য। আমরা এটাও দেখেছি, পামারস্টোনের অযোধ্যাগ্রাসের হুকুম ভারতের ইংরেজ কর্মচারী তামিল করে নি। অর্থাৎ বিবেকবান ইংরেজ দু-চারটি ভারতবর্ষেও ছিল। তাহলে যদি সত্যজিৎ বিবেকবান ইংরেজ হিসেবে উট্রামকে দেখান, আমরা কি বলতে পাবি তিনি ইতিহাসকে বিকৃত করছেন?

এইখানে আমরা ইতিহাস এবং শিল্পের সম্বন্ধের কথায় আবার আসতে পারি। যেহেতু শিল্প ইতিহাস নয়, ইতিহাসের বিরাট সময় বিরাট স্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শিল্পে স্থান পায় না, শিল্প নির্বাচন করে নেয় ইতিহাসের তাৎপর্যময় দিকগুলো। যে কোনো মানুষেরই ভালোমন্দ দিক আছে, একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ফোটাতে গেলে শিল্পের পক্ষে তৎকালীন মানুষের পুরো চরিত্রটা দেখানো অসম্ভব, শিল্পকে নির্বাচন করে নিতে হয় সেই মানুষের সেই দিকটা যে দিক ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে চালিত করছে। অযোধ্যাগ্রাসের নাটকে ইংরেজের তাৎপর্যময় চরিত্র হচ্ছে তার বিশ্বাসঘাতকতা এবং পাশবিকতা। এটা দেখাতে গিয়ে যদি আমরা ইংরেজের বিবেকের দিকটা তুলে ধরি, তবে বিশ্বাসঘাতকতা এবং পাশবিকতা অনেকটা সহনীয় হয়ে ওঠে। এটাই শিল্পের দিক থেকেও আমরা ইতিহাসের

বিকৃতি মনে করি।

এই ছবিতে Narrator মধ্যেমধ্যেই এসেছেন উট্রামের বিবেকদংশনের দৃশ্যে। সত্যজিৎ যদি উট্রামের বিবেকদংশন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করিয়ে নিতেন, তাহলে আমরা বুঝে নিতে পারতাম উট্রাম আসলে অভিনয় করছেন, বিবেকের দংশন আসল নয়। অবশ্য সংশয় হতে পারে, উট্রামের এই দ্বিধা কি নৈতিক বিবেকদংশন না রাজনৈতিক বিবেকদংশন। রাজনৈতিক যে নয়, তা উট্রামের কথাতেই স্পষ্ট। তিনি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সৈনিকের কাজ করছেন, রণকৌশলের চিন্তায় তাঁর কখনোই খিদে নষ্ট হয়নি, কিন্তু আজ হচ্ছে। চুক্তি মানা হচ্ছে কি হচ্ছে না এই দুশ্চিন্তায় তাঁর খিদে নষ্ট হবে তা নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করবেন, এমন উট্রামের পরিচয় ছবি থেকে বেরিয়ে আসে না, আসে যে পরিচয়, তা হলো ইংরেজ শঠতার এই নগ্ন সত্য উপলব্ধি করে নীতিবাদী ইংরেজের আত্মগ্লানি হচ্ছে। এই আত্মগ্লানিতে ভুগে ভুগেই কি ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন করেছিল?

এবার আমরা 'বিবেকবান' ইংরেজের কথায় আসতে পারি। কুচক্রী ধাপ্পাবাজ স্লিম্যান অযোধ্যা সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে অযোধ্যাগ্রাসের রাস্তা প্রশস্ত করেছিলেন, কিন্তু এই স্লিম্যানও যেভাবে অযোধ্যাগ্রাস করা হয়েছিল তাতে হৃষ্ট ছিলেন না, কারণ তাঁর আতঙ্ক ছিল এতে হিতে বিপরীত হবে। তাঁর বক্তব্য ইতিহাসের দলিল ঃ

If our Government interpose, it must not be by negotiation or treaty, but authoritatively on the ground of existing treaties and obligations to the people of Oudh....We must, in order to stand well with the rest of India, honestly and distinctly disclaim all interested motives...were we to take advantage of the occassion to annex or confiscate Oudh or any part of it, our good name in India would undoubtedly suffer and that good name is more valuable to us than a dozen Oudhs ...we suffered from our conduct in Sind ; but that was a country distant and little known, and linked to the rest of India by few ties of sympathy....It will be otherwise with Oudh. Here the giant's strength is manifest and we cannot use it like a giant without suffering in the estimation of all India." (ভিনসেন্ট স্মিথের ইতিহাসে উদ্ধৃত)

উট্রামের গুরু স্লিম্যানের বিবেচনা লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয় যে ভারতবর্ষে ইংরেজদের বিবেকের তাড়না বলে আমাদের যেটা মনে হতে পারে তা আসলে ধাপ্পা। কোম্পানির চাকরদের বিবেক যদি থেকেও থাকে তা চাকরির চাপে এবং নিজের দেশের স্বার্থে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যেত অথবা থাকলেও কাজে লাগত না। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইংরেজের চেহারা বিবেকবানের চেহারা নয়, ইতিহাসে দুটি-একটি এরকম বিবেকবান চেহারার পরিচয় পাওয়া গেলেও যেখানে আমাদের স্বল্প পরিসরে ইংরেজকে তুলে ধরতে হবে সেখানে এই বিবেকের কথা আনলেই আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হব। এখানে বলা প্রয়োজন, আমরা একথা বলছি না, শিল্পে আমার সর্বত্র পাষণ্ড ইংরেজের চেহারা দাবি করব। অন্য প্রসঙ্গে বিবেকবান ইংরেজ আসতেই পারে, কিন্তু যখন প্রসঙ্গ অযোধ্যায় ইংরেজ, যখন প্রসঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী

ইংরেজের পাশবিকতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, তখন চক্রান্তকারী-নির্মম-স্বার্থগৃধ্নু ইংরেজই প্রাসঙ্গিক, বিবেকবান ইংরেজ নয়। এখানে উট্রাম ব্যক্তিবিশেষ হলে কথা ছিল না, কিন্তু প্রতিনিধিস্থানীয় ইংরেজ বলেই তার বিবেকের কথা তোলার অর্থই হচ্ছে আমাদের বিভ্রান্ত করা। বিবেক বনাম শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্বে যেখানে বিবেক কোন স্থান পায় না, সেখানে বারবার বিবেকের কথা তোলা, পুণ্য মানুষের চরিত্রের উপস্থাপনার অজুহাতে, শিল্পের ব্যর্থতা।

ছবির শুরুতে ওয়াজিদ আসেন ভাষ্যকারের তীব্র ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে। তারপর আমরা তাঁকে দেখি তন্ময়চিত্তে কত্থক নাচ উপভোগ করতে। নাচ শেষ হলে প্রধানমন্ত্রী জানালেন ওয়াজিদের আশু সিংহাসনচ্যুতির খবর। এই খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসে ম্যাড়ার লড়াই, সে-লড়াইয়ের কী তাৎপর্য বোঝা মুশকিল। কেননা আমরা পরে জানব অযোধ্যায় ব্রিটিশকুক্ষিগত হওয়ার সময় কোনো লড়াই হয় নি। সোরাব রুস্তমরা সবাই দাবা খেলছিল অথবা অন্দরমহলে অন্য কোনো খেলায় ব্যস্ত। না কি, সত্যজিৎ বলতে চেষ্টা করছেন যে যখন সত্যকারের যুদ্ধের দরকার ছিল তখন সেনাপতিরা ম্যাড়ার লড়াই দেখেই হৃষ্ট ছিলেন? তার কিছু পর আসেন আবার ওয়াজিদ, ছবিতে তাঁর দীর্ঘতম ভাষণ নিয়ে ঃ

Sarkar Bahadur ! Who am I to say no to you ? Who has ever said no to you in our 100-year old dynasty ? Only one man dared to rise up in arms against you and you taught him a lesson. But you tempered your lesson. Sarkar Bahadur ! You didn't take away the masnad from Shujauddowla. You only took some money and some land. You were kind, Sarkar Bahadur, and we have never forgotten your kindness. You have even shown kindness to those of us who ruled badly. All you did was to take some money and some land. And that is why Avadh is now half of what it was before. The price of ruling badly !... So now I have to pay my price too for ruling badly.

এই ভাষণে, প্রায় স্বগতোক্তিতে, যে ওয়াজিদ ফুটে উঠেছেন, তা হল বুদ্ধিমান, সংবেদনশীল অথচ নির্বীর্য এক রাজার, যে রাজার প্রবল শক্তিমান আংরেজ বাহাদুরের সঙ্গে লড়াইয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু এই ভাষণেই নয়, ছবিতে প্রায় গোড়ার দিকে, একটি অ্যানিমেশন আছে, সেটা এরকম ঃ

The Nawab asleep on the throne, the Kingdom of Avadh (Map) lying on the floor beside him. Governor General struts in from R, looking daggers, taps sleeping Nawab on shoulder, Nawab wakes up with a start hangs head in shame. GG points peremptorily at Avadh, Nawab takes out dagger, slices off a piece of Avadh, hands it to GG. GG shows teeth, the two shake hands, embrace, GG struts out.

এরপর অযোধ্যার ইতিহাস সত্যজিৎ কী ভাবে দেখেছেন তা আর তর্কের অবকাশ রাখে না। অযোধ্যার নবাবরা পড়ে পড়ে ঘুমোয়, মধ্যে মধ্যে ইংরেজ সরকার আসে,

ধড়মড় করে উঠে পড়ে সলজ্জ নবাবরা অযোধ্যাকে কেটে কেটে ইংরেজকে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এর মধ্যে শাসনটাসনের কোনো ব্যাপার নেই, ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতার কোনো ব্যাপার নেই, গায়ের জোরের কোনো ব্যাপার নেই। ইতিহাসে কিন্তু অযোধ্যার এই অকর্মণ্যতার, নির্বীর্যতার কথা বলা হয় নি, ১৮৫৬ সালেও স্লিম্যান তাঁর রিপোর্টে আশঙ্কা করছেন, 'here the giant's strength is manifest'. এই ছবিতেও উট্রাম কিছুক্ষণ পরেই বলছেন, 'You know Oudh doesn't lack fighting men. Some of the best lads in our native troops are from here. The king has his own troops and so have other powerful vested interests who stand to lose by our action. If these people rise in defence of their province Wheeler will have no choice but to order his sepoys to fire upon their own brothers. You see this dilemma?'

আমরা এও জানি অযোধ্যায় রক্তপাত ছাড়াই রাজ্যজয় ঘটেছিল। কিন্তু সেটা অযোধ্যার নির্বীর্যতার জন্য নয়, সেটা ইংরেজের শঠতার জন্য, রাত্রির অন্ধকারে কথার ব্যত্যয় করে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য, চিরকাল যেভাবে ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার করেছে।

কিন্তু সত্যজিৎ ওয়াজিদকে দেখিয়েছেন একটি তথাকথিত ভাগ্যবাদী ভারতীয় হিসেবে, যেন ওয়াজিদ জানেনই তাঁর কিছু করার নেই, ইংরেজের বাহুবলের কাছে তিনি একেবারেই অক্ষম এবং আর্তনাদ করা ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার নেই। যাত্রার ভঙ্গিতে অমাত্যদের বকাবকি করে ওয়াজিদ একবারই ফুঁসে ওঠেন, বলেন প্রধানমন্ত্রীকে ঃ

Couldn't you have thrown this paper in the Resident's face? Couldn't you have told him that although the Company has every right to take over the administration, they cannot dispense with the king ?

কিন্তু এই ফুঁসে ওঠা ওয়াজিদ মুহূর্তের জন্য উদিত হয়ে বিলীন হয়ে যান, আবার শুরু হয় তাঁর আর্তনাদ। এবং সেই আর্তনাদে যেটা ফুটে ওঠে সেটা প্রজাবৎসল শাসন-তৎপর রাজার নয়, তা মণিমুক্তালোভী চাকচিক্য জমকপ্রিয় অথচ কর্তব্যবোধবিরহিত এক রাজার। সেই ছবিই ফুটে ওঠে এই দৃশ্যে ঃ

Wajid now turns away from Ali Naqi towards the empty throne.

Wajid : It was my mistake. I should have never sat on throne.

Wajid walks up to the throne, runs his fingers lovingly over the jewels that stud it.

Wajid : But I was young, and I loved the crown, the robe, the jewels....the pomp and the glitter...I couldn't resist them. And when I did sit on the throne, I behaved like a true king. At least for a time I did.

ওয়াজিদের যে ছবি এখানে পাওয়া যাচ্ছে তা কেবলই অলংকারপ্রিয় ওয়াজিদের, তিনি যে কখনও রাজ্যশাসন করেছেন তার কোন ছবিই সত্যজিৎ দেখানোর চেষ্টা করেন

নি। সেইজন্যই মনে হয়, সত্যজিৎ যখন Narrator-কে দিয়ে বলিয়েছিলেন, রাজ্যশাসন ছাড়াও ওয়াজিদের আরও কাজকর্ম আছে, তবে সেই সব কাজ করে সময় পেলে তিনি শাসন করেন বটে, সেটাই ওয়াজিদের পরিচয়, অন্তত সত্যজিতের কাছে। সেইজন্যেই সৈন্যদের কথা স্মরণে আসামাত্রই ওয়াজিদের স্মরণে আসে :

"And my army of women? Pretty girls in pretty dresses on pretty horses ? What a picture they made when they trotted past-eh, Wajir Sahib ?"

রাজার পরিচয় রাজ্যশাসনে। রাজা সৌন্দর্যপ্রিয় হতে পারেন, সংগীতজ্ঞ হতে পারেন, নৃত্যপটীয়ান হতে পারেন, কিন্তু শাসন অবহেলা করে যিনি সৌন্দর্যচর্চা করেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হওয়ার কথা নয়। পরিচালক সত্যজিতেরও আছে কি না সন্দেহ জাগে।

বস্তুত ছবিতে ওয়াজিদকে বরাবরই ভাগ্যবাদী বলে দেখানো হয়েছে। পরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে অযোধ্যার করণীয় কী যখন আলোচনা হচ্ছে, ব্রিটিশকে প্রতিরোধ করার জন্য যখন অর্থমন্ত্রী জানাচ্ছেন অযোধ্যার রাজারা ও জমিদাররা এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে তৈরি, যখন সকলে উৎসুক ওয়াজিদের সিদ্ধান্ত জানার জন্য, তখন ওয়াজিদ গান ধরলেন, 'যব ছোড় চলে লক্ষ্ণৌ নগরী'। ওয়াজিদ ধরেই নিয়েছেন তাঁকে লক্ষ্ণৌ ছাড়তে হবে। এর আগের দৃশ্যে ওয়াজিদ সগর্বে বলেছিলেন, যখন একটি প্রজা তাঁর আবেদন নিয়ে এসেছিলেন তাঁর কাছে, তখন ওয়াজিদের মন সেই আবেদনে ছিল না, ছিল গান রচনায়।

শুধু ওয়াজিদ নন, তাঁর জায়গীরদাররাও ভাগ্যবাদী। মীর ও মীর্জার এক কথোপকথনেও এই অদৃষ্টবাদী আত্মবিসর্জন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। মীর ও মীর্জার খেলার সময় উপদ্রব স্বরূপ নন্দলাল যখন জানালেন একটি দুঃসংবাদ, আংরেজরা অযোধ্যা নিয়ে নেবে বলে গুজব রটেছে, তখন মীর্জা জ্ঞানপাপীর মতো বলছেন :

Listen, Nandlal Sahib – the Angrez took over Avadh a hundred years ago. Didn't you know that? Our Nawabs have ceased to be free agents ever since the time of Shujauddowla.

নন্দলাল আপত্তি করার চেষ্টা করলেন, বললেন তা কী করে হয়, অযোধ্যার আইন আদালত, পুলিশ, মুদ্রা সব অযোধ্যার নিজস্ব, তখন মীর্জা তাঁকে রাষ্ট্রনীতির স্বরূপ বুঝিয়ে দিলেন। অবশ্যই ইংরেজের খেলার ধরন সম্পর্কে মীর্জা সচেতন, কীভাবে অযোধ্যা গ্রাস করা হচ্ছে সে বিষয়েও তিনি একটি বক্তৃতা দিলেন। পূর্বপুরুষরা অস্ত্রশিক্ষায় দীক্ষিত ছিলেন, বর্তমানে তাঁরা কেবল দাবা জানেন — এই একটি আত্মাবমাননার মধ্য দিয়ে এই দৃশ্য শেষ।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, অদৃষ্টবাদী ওয়াজিদ, মীর ও মীর্জাই যদি অযোধ্যার প্রতিনিধি হন, তাহলে একবছর পর অযোধ্যায় যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো, যে যুদ্ধে ইংরেজকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে অযোধ্যার দেড় লক্ষ অধিবাসী বীরোচিত ক্ষাত্রধর্ম পালন করে প্রাণ দিলেন এবং সেই দেড় লক্ষ লোকের একলক্ষ লোকই ছিলেন অযোধ্যার সাধারণ নাগরিক, বাকি পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় সৈনিক, তারা কোথা থেকে এলেন? এইজন্যই ধারণা দৃঢ়মূল হয়, সত্যজিৎ ইতিহাসের চরম বিকৃতি করেছেন।

এই বিকৃতির চরম উদাহরণ ঘটেছে তথ্যের ভুল প্রয়োগে। ছবিতে দেখি, উট্রামের সঙ্গে দেখা করার সময় ওয়াজিদ নিরস্ত্রীকরণের হুকুম দেন ঃ

Dismount all guns and disarm all the guards and inform my people that they must give no opposition to the Angrezı fouj when they enter Lucknow.

এবং তারপরই

The guns on the palace roof are dismounted.

The guns outside the Rumi Durwaja are dismounted.

The King's soldiers are disarmed. The discarded muskets form a heap on the ground

সত্যজিৎ হয়ত বলতে চেয়েছেন, ওয়াজিদ উট্রামের সঙ্গে দেখা করার সময় সৌজন্যমূলক আচরণ বোঝাতে এই নিরস্ত্রীকরণের হুকুম দিয়েছিলেন, কিন্তু এই তুচ্ছ হুকুমের উপর এতটা জোর, ওয়াজিদকে দিয়ে প্রথমে হুকুম দেওয়ানো এবং বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই নিরস্ত্রীকরণের দৃশ্য চললে দর্শকের মনে স্বভাবতই ধারণা হবে, অযোধ্যার নিরস্ত্রীকরণ ঘটে গেল, অতএব ইংরেজদের বিনা রক্তপাতে অযোধ্যাগ্রাস সম্ভব হল।

বিনা রক্তপাতে অযোধ্যাগ্রাস হল, সেটা ঐতিহাসিক ঘটনা। তবে রক্তপাত হল না, সেটা অযোধ্যার নির্বীর্যতার জন্য নয়, অদৃষ্টবাদিতার জন্য নয়। কারণ চোরের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করে অতর্কিতে রাজাকে বন্দী করা হয়েছিল। এই নিরস্ত্রীকরণের ঘটনা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ এই কারণে যে ডালহৌসি এবং ক্যানিঙের এ বিষয়ে মতপার্থক্য ঘটেছিল। ডালহৌসি চেয়েছিলেন অযোধ্যার লোকজনের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিতে, যেমন তিনি নিয়েছিলেন পাঞ্জাবের বেলায়। ক্যানিঙ তা করেন নি। এবং পরে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা হাত কামড়িয়েছিলেন, নিরস্ত্রীকরণ কবা হলে এক বছর পর অযোধ্যায় সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইংরেজদেব ওরকম নাভিশ্বাস উঠত না। অযোধ্যা দখল করার পর ইংরেজ সরকার অযোধ্যার সৈন্যদেব disband করেছিল, এবং সেই disbanded সিপাহীরা সিপাহীবিদ্রোহের সময ইংরেজদের শশব্যস্ত করে তুলেছিল। সত্যজিৎ মনে হয় disbanded আর disarmed শব্দদুটো সম্পর্কে সতর্ক হন নি। যে লক্ষ্ণৌ শহরের ছবি আমরা দেখলাম সত্যজিতের ফিল্মে তা পাযরা ইত্যাদির লড়াই, দাবাখেলা, নাচগান। দাবা যাঁরা খেলেন তাঁরা খেলেন, বাড়িব চাকর-বাকররা কেবল ঘুমোয়, দাবাড়ের স্ত্রীরা সম্ভোগহীনতায় রুষ্ট অথবা অন্যপুরুষেব আঙুল মটকানো দেখে। এই অযোধ্যা থেকে ওই ইতিহাসের নিহত দেড় লক্ষ বীরের আবির্ভাব ম্যাজিক ছাড়া অসম্ভব।

সত্যজিৎ 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' শেষ করেছেন একটি বিরাট ধাঁধা দিয়ে, অবশ্য সন্দেহ থাকে তিনি সেটাকে ধাঁধা বলে জানেন কিনা। ছবির শেষ কী হল? রাজা surrender করলেন, না, করলেন না? ইতিহাসের ওয়াজিদ আমরা জানি surrender করেন নি, চুক্তিতে সই করেন নি, ইংরেজদের একথা বলার সুযোগ দেন নি যে অযোধ্যার রাজা স্বেচ্ছায় সুশাসনের জন্য ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছবিতে কী ঘটল?

নিজের দরবারে ওয়াজিদ আত্মপ্রসন্নভাবে জানালেন প্রজারা তাঁকে ভালোবাসে, তিনি প্রজাদের ভালোবাসেন, প্রজারা তাঁকে মসনদ ছাড়তে বললে তিনি তৎক্ষণাৎ মসনদ ছাড়তে

রাজি, কিন্তু আংরেজদের কথায় তিনি মসনদ ছাড়বেন কেন?

Wajid : They're sending troops, the Company Bahadur, why ? Because they know, they're afraid, that my people may rise against them. They know this. They know that the people of Avadh are capable of fighting, because our badly ruled people are their best soldiers! Isn't that so, Wajır Sahib? A badly ruled people, people who are oppressed, people who starve, are the best soldiers in the Company fouj!

Narrator-এর ভাষণ স্মরণে রাখলে আমরা ধরে নেব এখানে ওয়াজিদ বৃথাই বাগাড়ম্বর করছেন। যাই হোক ওয়াজিদের সিদ্ধান্ত ঃ

Wajid : Wajir Sahıb, please go and tell the Resident that my throne is not theırs for the asking. If they want it, they'll have to fight for ıt.

পরবর্তী এক দৃশ্যে ওয়াজিদ আবার তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন : You can take away my crown, but you cannot take away my dıgnity.

কথাটির মানে কী? কোম্পানি ওয়াজিদের মুকুট এবং রাজ্য বলপূর্বক নিতে পারেন কিন্তু মর্যাদা নিতে পারবেন না? অর্থাৎ ওয়াজিদ আত্মসমর্পণ করবেন না? অর্থাৎ চুক্তি সই করবেন না?

সেটাই ওয়াজিদ শেষ দৃশ্যে বললেন ঃ

Wajid (with great feeling) : Resident Sahib, I can bare my hand for you but cannot sıgn that treaty.

ওয়াজিদ তাহলে আত্মসমর্পণ করলেন না। কিন্তু অযোধ্যার লোকেরা কী জানল? কাল্লু মীর ও মীর্জাকে জানাল ঃ

Kalloo : They say that the king has surrendered, sir. And there wıll be no fıghting, no gun-fire The Angrej will be our king from now on.

বোঝা যাচ্ছে, ইংরেজরা অপপ্রচার চালিয়েছে যে ওয়াজিদ আত্মসমর্পণ করেছেন, অর্থাৎ চুক্তিতে সই করেছেন।

কিন্তু ইতিহাসের ভাষ্যকার কী বলছেন?

Narrator : You're right. Kalloo, there will be no gun-fire and fighting. Wajid Ali Shah has given his word and he will keep it.

ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? ওয়াজিদ তাঁর কথা রেখেছেন মানে? চুক্তিতে সই করেন নি? তাহলে কাল্লু কী করে right হয়? তাহলে অযোধ্যা ইংরেজদের দখলে গেল কী করে? অযোধ্যায় যুদ্ধ হল?

আশ্চর্যের ব্যাপার, অধিকাংশ ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা যে তথ্যটি চেপে গেছেন, সত্যজিৎও সেই তথ্য চেপে গেলেন। রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিতে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজ ওয়াজিদকে বন্দী করল, অযোধ্যাগ্রাসের এই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি

চিত্রকার অবান্তরজ্ঞানে বলা প্রয়োজন মনে করলেন না। বললে পরে অবশ্য পুরো ছবিটি ধ্বসে যায়, কারণ দাবা পায়রা ওড়ানো ঘুড়ি ওড়ানো নাচগান দেখা অকর্মণ্য অযোধ্যার ছবি তাহলে তোলা যায় না, তুলতে হয় চুক্তিতে সই কবতে আপত্তি করা রাজাকে, তুলতে হয় স্বাধীনচেতা অযোধ্যাবাসীর।

প্রেমচন্দও লিখছেন, 'শহরে কোন হৈ-চৈ মারামারি কাটাকাটির লেশমাত্র নেই। এক ফোঁটা রক্তপাত ঘটে নি কোথাও। পৃথিবীর কোথাও আজ পর্যন্ত কোনো স্বাধীন দেশের নৃপতির পরাজয় এবং বন্দীত্ব, এত অনায়াসে, এত অল্পায়াসে এত নির্বিঘ্নে এবং বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হয় নি। এ শান্তি বা অহিংসা দেববাঞ্ছিত সাত্ত্বিক অহিংসা নয়। এ এমন এক তামসিক নপুংসকতা যা দেখে বিশ্বের নিকৃষ্টতম কাপুরুষও লজ্জায় মুখ লুকোয়। অযোধ্যার বিশাল ভূখণ্ডের শেষ স্বাধীন নরপতি বন্দী অবস্থায় শত্রুসৈন্যের সঙ্গে চলে যাচ্ছেন, আর লক্ষ্ণৌ নগরী আরাম আর পরিতৃপ্তির নিদ্রায় অবশ হয়ে শুয়ে আছে। একটা দেশ নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় না পৌঁছলে এমন হয় না।'

প্রেমচন্দ্রের গল্পের বিষয়ও অযোধ্যার নৈতিক অধঃপতন, কিন্তু তিনি পুরো রাজনীতির চেহারাটা দেখাতে চেষ্টা করেন নি, আমাদের চরম বিপর্যয়ের সময় আমাদের নপুংসকতার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ইংরেজদের শঠতা তাঁর বিষয় নয়। কিন্তু সত্যজিতের ছবিতে ছবির অর্ধেক জুড়ে আছেন উট্রাম এবং আছে উট্রাম-ওয়াজিদ দ্বন্দ্ব। ফলে পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে যাচ্ছে এবং সত্যজিতের দায় বেড়ে যাচ্ছে।

প্রেমচন্দ যেমন বিলাসী লক্ষ্ণৌর কথা বলেছেন, তেমনি সাধারণ লোকের কথাও ভোলেন নি।

রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেছে। প্রজাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। দিনদুপুরে লুঠ হচ্ছে। কে আর নালিশ ফরিয়াদ শোনে। পল্লীঅঞ্চলের সব সম্পদ রাজধানীতে এসে জড়ো হচ্ছে। তাই দিয়ে বেশ্যাবাড়ি শুঁড়িখানা আর রঙবেরঙের বেলেল্লাপনার আড্ডায় বেদম ফুর্তি ওড়ানো হচ্ছে। ইংরেজ কোম্পানির কাছে ঋণের মাত্রা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে।'

প্রেমচন্দও বোঝা যাচ্ছে স্লিম্যানের বিবরণ গ্রহণ করছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য পৃথক। স্লিম্যান তাঁর রিপোর্ট রচনা করেছিলেন অযোধ্যাগ্রাসের অজুহাত করে। তাঁর রিপোর্ট হয়ত সত্য কিন্তু তারও বড়ো সত্য তার অজুহাত। একই অবস্থা প্রেমচন্দ দেখছেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, ভারতীয়দের বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিত থেকে ঃ

কোম্পানির ফৌজ লক্ষ্ণৌয়ের দিকে এগিয়ে আসছে। শহরে দারুণ উত্তেজনা, হৈ চৈ, চেঁচামেচি, কান্নাকাটি, হুটোপাটি পড়ে গেছে। লোকে ছেলেপুলে নিয়ে গ্রামাঞ্চলে পালাচ্ছে। কিন্তু এতসব হাঙ্গামা আমাদের দুই দাগাবীরকে স্পর্শও করে না।

এটাই প্রেমচন্দের গল্পের বিষয়। নবাবী আমল, ছোরাছুরি তলোয়ার সবার সঙ্গেই থাকে। বিলাসী হলেও, দুজনের কেউই ক্লীব নয়। রাজনৈতিক চেতনায় অধঃপতন ঘটেছিল — বাদশার জন্যে, সাম্রাজ্যের জন্যে, দেশ জাগে নি। তা বলে ব্যক্তিগত বীরত্বের অভাব হয় নি।

প্রেমচন্দের ঐতিহাসিক কল্পনা, আমরা জানি, অনেক বস্তুনিষ্ঠ। সামন্ততন্ত্রে দেশচেতনা প্রবল থাকে না, না থাকে আত্মমগ্নতা। বাদশার জন্য চিন্তিত না হলেও জায়গীরদারেরা, তালুকদাররা ক্লীব ছিল না। যার পরিচয় এই তালুকদাররা দিয়েছিল ১৮৫৮ সালে অযোধ্যায়

সিপাহীবিদ্রোহের সময়। অযোধ্যার লক্ষ্ণৌ হয়ে ওঠে বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র। সত্যজিতের ছবির সমাপ্তি, ঐতিহাসিক দর্শনে, সেজন্য অসত্য।

অবশ্য এটা বলা চলতে পারে, ফিল্ম দেখতে গিয়ে এত ইতিহাস টিতিহাস পড়া আমাদের পোষায় না। দেখতে আমাদের ভালো লাগে, কী সুন্দর অভিনয়, পুরনো লক্ষ্ণৌর কী সুন্দর সেট, রঙের কী আশ্চর্য বিন্যাস, কী সুন্দর গান, কী সুন্দর নাচ। দাবার চালের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে গল্পের কী আশ্চর্য অগ্রগতি। সেক্ষত্রে আমাদের আর Sipahi, advance! বলা ছাড়া আর কী-ই বা থাকে।

'দাবা খেলোয়াড়' ও আমরা

দীপক মজুমদার

খেলা

হঠাৎ সত্যজিৎ রায় তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণামূলক কাজ 'দাবা খেলোয়াড়' ছবিটি আমাদের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছেন। দ্রুত চোরাবালির টান অনুভব করছি সবাই ইদানীং। আর ঠিক ইদানীংই বা বলি কী ক'রে, বছর দশেক তো হ'তে চললো। তথাকথিত বঙ্গীয় রেনেসাঁস ইতিমধ্যে যতোই ঘোলাজলে পরিণত হয়ে থাকুক না কেন, যতইনা আমরা 'সেই সময় সেই সময়' ব'লে ত্রাহিস্বরে চীৎকার করতে থাকি, বর্তমান সংকটাবস্থা আমাদের এমনই এক প্রাচীর পশ্চাৎ গৌরাঙ্গের অসহায়তা দিয়েছে, যে, এহেন নিরালম্ব লীলা-বিলাসী যুগে সত্যজিৎ রায়-এর 'দাবা খেলোয়াড়' দর্শন প্রায় বিকল্প ব্রহ্মজ্ঞান লাভেরই শামিল। শিক্ষা, দর্শন, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, আনন্দ, সম্ভ্রম ও খিন্ন ইতিহাস তাড়না যে কার্যোপযোগী আত্মশক্তির জন্ম দিতে পারতো তাঁর সম্ভাবনাটুকুও নির্মমভাবে তছনছ গত এক দশকে। কে এর জন্য দায়ী? আমরা? আমাদের অতীত ও বর্তমান? আমাদেরই মধ্যে কোন কোন বিশেষ দল বা শ্রেণীসমবায়? তাদেরও পেছনকার কোনো অতীব নিষ্ঠুর ক্ষমতালোভী ও চক্রান্তজীবী শক্তি-সূত্র? নিশ্চিন্তভাবে এখনও সব জানি বলা যায় না। সম্ভবত এটুকু মর্মান্তিকভাবে জানি যে চামড়ার ওপর বালির টান নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর।

একটা খেলা চলছে। খাঁজ কাটা যুদ্ধক্ষেত্র। খোলাম কুচির যুদ্ধ। গতরের বদলে মনের চর্চা। দুই মালদার লোক স্রেফ গেঁজে যাওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে। শূন্য সিংহাসন। সবসে বড়া খেলোয়াড় নবাব ওয়াজিদ।

১৯৭৮ সালে ভারতবর্ষের কোন্ অনুভূতিশ্রান্ত মানুষ সগর্বেই বলতে পারেন ঃ আমি নিজেকে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত বোধ করছি? যাঁরা পারেন সেই কর্মনিষ্ঠ ভারতীয়দের মধ্যে সত্যজিৎ রায় অন্যতম। আগাগোড়াই তাঁর কাছ থেকে আমরা আত্ম-অনুসন্ধানের এক সজীব শিক্ষা পেয়ে এসেছি। প্রচণ্ড এই দুর্দিনে আরেকবার তিনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এবারের ভঙ্গীটি একটু আলাদা ও বিশেষভাবে রোমাঞ্চকর।

এই সেদিন দেশে যখন 'জরুরি অবস্থা' নামক নরক চলছিলো, দুই বাঙালি বন্ধু তখন সংগ্রাম ও খেলার দ্বন্দ্ব অনুধাবনে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন একটু গভীরভাবেই, সকলের অলক্ষ্যে। এই দুই বন্ধুর নাম ঃ কমলকুমার মজুমদার ও সত্যজিৎ রায়। উভয়েরই স্মৃতি ইতিহাসের সাংকেতিক তাৎপর্যে ভারাতুর, উভয়েরই বর্তমান কালাদর্শ-বিবেচনায় ক্ষুব্ধবিধুর। কমলবাবু যে শুধু 'খেলার প্রতিভা' উপন্যাসটি নিয়ে এই দুর্বিনীত সময়ে কাজ

করছেন তা-ই নয়, 'দানশা ফকির' নামে একটি তুমুল নাটকও নানা নিগ্রহের মধ্যে একদল কিশোরকে নিয়ে অভিনয় করে চলেছেন। কমলবাবুর লেখা খুব কম লোকে পড়েন, তাঁর নাটক আরো কম লোকে দেখে থাকেন। 'দানশা ফকির' এক মর্মবিদারক ঠাট্টা সমগ্র বাহারী তৃতীয় বিশ্ব জাগরণের প্রতি। কেবলমাত্র ঝাড়ফুঁক দিয়ে ওই আকর্ষণীয় গাঙ্গেয় 'ডন কিহোটি' চেয়েছিলো বিদেশী আক্রমণকারী শক্তিকে পরাভূত করতে। তাঁর 'কঙ্কালের টঙ্কার' দেখিয়ে দিয়েছিলো কিভাবে ভূতকে মানুষে পায়, মানুষের কাঁচা খুলে যায় কোন ভৌতিক বিড়ম্বনায়। সেইসব আর্ত ধ্বনিপ্রলাপ আর আত্মবিস্মৃত কোরিওগ্রাফিক লম্ফঝম্প নিয়ে বিষণ্ণ আনন্দ-আবিষ্কারের কোনো অন্ত ছিল না আমাদের।

জরুরি অবস্থার অন্য একটি দৃশ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাজভবনে এসে কিছু শিল্পী -সাহিত্যিককে চা খাওয়ালেন। কলকাতা তখন সদর্পে শাসিত হচ্ছে স্টেডিয়াম-কাল্টের নায়ক-নায়িকাদের দৌরাত্ম্যে। একজনকে বলতে শোনা গেল ঃ সত্যজিৎ রায়-এর মতো বিখ্যাত শিল্পীর তোলা না হ'লে 'জন-অরণ্য' আমরা নিষিদ্ধ করতাম। অত 'হতাশা' আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। এর উত্তরে 'তোওবা' 'তোওবা' বলার মতো সেদিনকার দরবারী চায়ের আসরে কেউ ছিলো না। খেলাটা চলেই চলেছে। চিরাচরিত প্রগতি অউর প্রতিক্রিয়াকো শিবিরমে সর্বভারতীয় অষ্টপ্রহর যাত্রা। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতি ভরে থই থই করছে এক বিপর্যস্ত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। শুনতে বেশ গালভরা। যথারীতি এক ফোঁটা গ্রাম, দু ফোঁটা ক'রে নব্য বৈজয়ন্তীবাদ, মহাভারতের হারজিৎ, চাঁদবণিকের লোকনেতৃত্ব বিলাস, রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ, মায়াপুরের ইসকন দুর্গ, 'শিকাগোয় হঠাৎ খ্রিস্টের আবির্ভাব' নামক তিরিশ বছর আগেকার জোর-বিক্রি মার্কিনী উপন্যাসের ধাঁচে বাঁকুড়ার বটতলায় নবজাগ্রত বোধিসত্ত্বের চোখ মোছা, মধুবনী নুলো জনজগন্নাথ ইত্যাদি জনপ্রিয়তার দমখাওয়া যাবতীয় মিডিয়া-প্রকল্পের ক্ষুদে সংস্করণ, তিন ফোঁটা আরবান কনশাসনেস, আর দু'এক চামচ বিচিত্র বেলোয়ারী তৃতীয়-বিশ্ব-ছাপ-মারা বিপ্লব, কাঁচা কুচকুচে টাকা, ফাউণ্ডেশন, সাংবাদিকতার ভৃত্য ও গলায় চেন বাঁধা বাংলা সাহিত্য, দ্রুত অপসৃয়মান ভারত রত্ন ধর্মনিরপেক্ষতা, বারাণসী আলিগড়ের দাঙ্গা, কলকাতায় বিড়লা মন্দির, শোলে, ববি, এক্সরসিস্ট, সত্যম শিবম সুন্দরম, অর্থাৎ প্রথম বিশ্ব আয়োজিত ডে-ভা-লা-প-মে-ন্ট! বন্যা, খাদ্য, পোশাক-আসাক, গান-বাজনা, প্রেম-মৃত্যু ও শিশুজগৎ ইত্যাদির কথা ভেবে লজ্জা বাড়িয়ে লাভ নেই। আগে ঠিক করি খেলাটা কোন নিয়মে কোন কায়দায় খেলব ; স্বদেশী হিন্দুস্তানী না আন্তর্জাতিক রুশ, মার্কিনী বা চীনী — খেলা যখন খেলতেই হবে। তারপর কোন একদিন চারিদিকে গ্রামপতনের শব্দ শুনতে শুনতে গাওয়া যাবে ঃ আমার খেলা-আ-আ যখন ছিলো তোমা-আ-র সনে/তখন কে তুমি তা কে জা-আ-ন তো/ তখন ছিলো-ও-ও-না ভয় ছিলো-ও-ও-না লা-আ-জ মনে/ জীবন বহে যেত-ও অশা-আ-আ-ন্ত।

আলীশাহ। শব্দ গাথা গান ও অপেরা। ও ব্যাটা মুকুটের মধ্যে ওর মুণ্ডুটা পাঠালেই তো পারতো। আহা, এই চেরীটাও একদিন আমরা মুখের মধ্যে গলিয়ে মিশিয়ে খাবো। মানুষখেকোর জাত নাকি রে বাবা। আমরা কিছু শুনি না শুধু খেলে যাই হাঃ হাঃ হেসে খেলে নাওরে জাদু মনের সুখে।

fragments but active elements:
James Joyce

সিনেমা

Is your satisfaction the final test or must you bow to the verdict of the majority? You cannot be sure. But you can be sure of one thing: you are a better man for having made it.

১৯৬৭ সালে, হ্যারি গেডুল্ড সম্পাদিত এবং আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রকাশিত 'ফিল্ম মেকারস অন ফিল্ম মেকিং' গ্রন্থে সত্যজিৎ রায় এই তালশাঁস স্বচ্ছ উক্তিটি করেন তাঁর 'পথের পাঁচালী'-র অবয়ব বিশ্লেষণের পর। বইটিতে চলচ্চিত্র জগতের প্রায় সব আধুনিক শিক্ষকেরই নিবন্ধ আছে। সিনেমার শেষ বিচারের প্রসঙ্গে অধিকাংশ দর্শকের অভিমত এবং পরিচালকের নিজের তৃপ্তির মধ্যে নিহিত যে টানাপোড়েন, সেখানে সত্যজিৎ-এর এই 'a better man for having made it' কথাটির তাৎপর্য কী? বিশেষত আমাদের দেশে, এখন, এই মুহূর্তে? যখন সিনেমা শিক্ষার 'হাসি খুশি' বা 'বর্ণ পরিচয়' পাঠও আমরা নির্বিঘ্নে শেষ করে উঠতে পারিনি? অন্নপ্রাশন কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই যখন মিডিয়াদৈত্যের তাণ্ডব প্রধানত সিনেমা এবং সিনেমা-উপন্যাসের গদা ঘুরিয়েই যাবতীয় ফিল্ম আন্দোলন আয়োজিত চীৎকৃত সিনেমা-প্রচেষ্টার হাড়গোড় ভেঙে দিতে চাইছে? শুধুমাত্র বাস্তবের বর্ণনা নয়, তার আন্তরিক বিশ্লেষণও যখন এই অসীম ক্ষমতাশালী মাধ্যমটির অন্তর্নিহিত দায়িত্ব হিসেবে আন্তর্জাতিক সিনেমা জগতে স্বীকৃত? এসব প্রশ্ন আধুনিক সিনেমা চর্চা ও সিনেমার সমঝদারির ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি। লেনিন কথিত 'সিনেমার বৈপ্লবিক ক্ষমতা' ইদানিং অনেকেরই মুখে ও কলমের ডগায় নাচতে দেখা যায়। পাশ্চাত্যের বিকল্প সিনেমা, প্রত্যক্ষ সিনেমা, সিনেমা-সত্য, সিনেমার স্বাধিকার, তথ্য ও কাহিনীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ সিনেমা, মূর্ত সিনেমা ইত্যাদি নানা তীব্র সীমান্ত তোলপাড় করা কর্মমুখরতাও আমাদের কারো কারো পরিচিত। এবং এতোই যখন আমরা এগিয়ে আছি তখনও এ-ও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি যে সত্যজিৎ রায় কোনো নার্সিসাস— মনোবৃত্তি থেকে বা মরণশীল বঙ্গীয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে ইদানীং যে অমরত্বগৃধ্নুতার হিড়িক দেখা দিয়েছে সেই আত্মনিনাদী মনোভাব থেকেও এই পূর্ণতর মানুষ হবার ধারণাটিকে রাখেন নি। যে-কোনো বুদ্ধিমান ও সমঝদার সত্যজিৎ-দর্শক একথা মানবেন যে 'পথের পাঁচালী' থেকে 'দাবা-খেলোয়াড়' পর্যন্ত দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়ে এসেছি চলচ্চিত্র চর্চার এক একটি মূল্যবান অধ্যায়। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে সত্যজিৎ-এর কৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সিনেমার ভাষাও পরিশীলিত হচ্ছে তার নিজস্ব ভিত্তি ও আবহের ওপর দাঁড়িয়ে। দর্শককে এইভাবে শিক্ষিত ও স্পর্শশীল করতে পারার আনন্দ, জীবন সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য আবিষ্কারের উত্তেজনা এবং এইসব মিলিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপনের কর্তব্যবোধ — এর থেকেই কি জন্ম নেয় না এক পূর্ণতর মানুষ হ'তে পারার তৃষ্ণা। শুধুমাত্র বিনম্র অর্ফিয়ান নেতৃত্ব-চেতনাই নয়, বা আইজেনস্টাইন প্রবর্তিত ক্রমান্বিত জীবনপাঠই (living text book) নয়, আরো প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ-নন্দলাল-বিনোদবিহারী সহচর সত্যজিৎ-এর এই কেজো

বুদ্ধিজাত উক্তি সমূলে উৎপাটিত করে স্বয়ম্ভু শিল্পীর দর্পিত ধারণাটিকে এবং সরাসরি আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে শিল্পীর ব্যবহারিক অবয়ব-আশ্রিত ভূমিকাটিকে। সমাজের কাজে আসতে পারলেই পূর্ণতর মানুষ হওয়া যায় ; চলচ্চিত্র পরিচালক এখানে নিঃসন্দেহে একজন নিষ্ঠাবান চলচ্চিত্র-কর্মী।

জাতীয় মানসতার যথাযথ কর্ষণ এবং ক্রমান্বিত শিক্ষার ভেতর দিয়ে জাতীয় জীবন-দর্শনকে প্রসারিত করাই যদি সিনেমার লক্ষ্য হয় তাহলে স্বভাবতই সিনেমা জাতীয়তাবোধ এবং আন্তর্জাতিক সহমর্মিতার মধ্যবর্তী এক কঠিন খাঁড়ি পথ দিয়ে হাঁটতে বাধ্য হবে। অন্যান্য শিল্প মাধ্যমকেও এই পথে হাঁটতে হয় কিন্তু সিনেমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো জটিল, উৎপাদন ও প্রয়োগ জনিত নানা অনুষঙ্গের দাবিতে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র কর্মী সোলানাসের একটি উক্তি ফরাসি 'সিনেমা গ্রন্থ' পত্রিকার ২১০ সংখ্যার এক সাক্ষাৎকারে ঃ

"The alienation of our intellectuals is the effect of a more profound cause, the long process of neocolonialism which has affected Argentina. European culture has played a very important role in the inferiorization of our intellectuals.... it is the film itself, it is the praxis of the film that permits to avoid the typical petit-bourgeois paternalism of leftist intellectuals. It is the film which transforms us, which transforms and enriches our ideology, which makes us aware of it, and also which questions it."

বলা বাহুল্য, চলচ্চিত্র চর্চার কেন্দ্র হিসেবে সোলানাস বিষয়ানুগ বিশ্লেষণ বা প্রক্রিয়াগত সমঝদারির কথাই শুধু বলছেন না, চলচ্চিত্র চর্চার ঘাড়ে যে নব্য-ঔপনিবেশিক কুঁজটি অস্বস্তিকর অবস্থায় চেপে বসে থাকে তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছেন। সেই কুঁজটিকে ঝেড়ে ফেলে সোজাসুজি কাজের ভেতর দিয়েই এগোতে পারি আমরা, শোধরাতে পারি নিজেদের। পূর্ণতর মানুষ হবার সেটা অন্যতম উপায়। এই উপলব্ধি আরো প্রখর ভাবে বিদ্ধ করে আমাদের, এই অনগ্রসর দেশে, যেখানে কাজ ফেলে কাজ-দেখানো তাত্ত্বিক লীলা-বিলাস অমার্জনীয় নৈতিক অপরাধেরই শামিল। কেননা কাজ থেকে আরো অগনিত মানুষের অভিজ্ঞতার মানচিত্র তৈরি হ'তে পারে, কেননা কাজ পিছিয়ে রাখার অবকাশ ধনী তথাকথিত অগ্রসর দেশগুলির মতো আমাদের নেই। সময়ের বিরুদ্ধে আমাদের জীবনধারণের কাজ। পাশ্চাত্য মডেলের নির্বিচার ব্যবহারের সেইখানেই বিপদ আবার স্বদেশের-ঠাকুরের সামনেও চোখ-কান বুজে সাষ্টাঙ্গ হওয়া যায় না সেই একই কারণে। খাঁড়ি পথ দিয়ে হাঁটতেই হয়, বিদেশেও সচেতন শিল্পকর্মীরা তা-ই ক'রে থাকেন।

খুরশিদ ঃ নিকুচি করেছে তোমার খেলার। অনেক খেলেছ, এবার গতরের গরমখানা ছাড়ো দেখি মির্জামিয়া।

উটরাম ঃ মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের চিঠিখানা নবাবের চোখ বোলানোর পক্ষে বড়োই জরুরি। খেল খতম পয়সা হজম। বাচ্চে লোক এক দফে তালি বাজাও। রুস্তম। রুস্তম। এই চোতা কাগজখানা তুমি ছুঁড়ে দিতে পারলে না কোম্পানির মুখে?

খেলা

আধুনিক সভ্যতার হাল কী হ'তে পারে এ প্রসঙ্গে অমোঘ ভবিষ্যদ্রষ্টাদের মধ্যে জর্জ অরওয়েল অন্যতম এবং অহো কী সুখের সংবাদ মহাশয় আংরেজও বটেন। তাঁর মন্তব্য শোনা যাক আমাদের খেলোয়াড়-পুরাণ সম্পর্কে ঃ

I am always amazed when I hear people saying that sport creates goodwill between the nations, and that if only the common peoples of the world could meet one another at football or cricket, they would have no inclination to meet on the battle-field. Even if one didn't know from concrete examples (the 1936 Olympic games, for instance) that international sporting contests lead to orgies of hatred, one could deduce it from general principles.

Nearly all the sports practise now a days are competetive. You play to win, and the game has little meaning unless you do your utmost to win. On the village green, where you pick up sides and no feeling of local patriotism is involved, it is possible to play simply for the fun and exercise : but as soon as the question of prestige arises, as soon as you feel that you and some larger unit will be disgraced if you lose, the most savage combative instincts are aroused. Anyone who has played even in a school football match knows this. At the international level sport is frankly mimic warfare. But the significant thing is not the behaviour of the players but the attitude of the spectators : and behind the spectators, of the nations who work themselves into furies over these absurd contests, and seriously believe – at any rate for sport periods – that running Jumping and kicking a ball are tests of national virtue.

খেলাটা যে ক্রমশ যুদ্ধে পরিণত হয় এহেন জমকালো তথ্যও আমাদের মধ্যে তৎপর, সৌভাগ্যবান ও সতর্ক কারো কারো পক্ষে জেনে ফেলা অসম্ভব হয় না। অপ্রীতিকর হ'লেও আমাদের পরম আদরের খেলোয়াড় পুরাণেব সঙ্গে কিঞ্চিত রসিকতার আমেজ মিশিয়ে তাকে সহজপাচ্য করতে আমাদের বাধে না। কিন্তু যখনই দর্শকের ভূমিকার কথা আসে তখনই, সেই চূড়ান্ত অপ্রস্তুতকর অভিজ্ঞতার আঘাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য, কোমরবন্ধ আঁটো ক'রে বাঁধতে হয় কারো কারো। খেলা ততক্ষণে দর্শক-সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। খেলোয়াড় আর দর্শকে তখন আর কোনো প্রভেদ নেই। এমনকি নিষ্ক্রিয়তম দর্শকেরও এই বিড়ম্বনা থেকে রেহাই নেই। ধীরে ধীরে তাঁকে ভাবতে হয় তিনি খেলবেন কিনা, খেললে কোন দলে খেলবেন, নাকি সরাসরি বেরিয়ে আসবেন অন্য কোনো বিকল্প খেলার যুদ্ধে যোগ দিতে? আশ্চর্য এই যে উদ্ভট বাস্তবতাই আমাদের ছুঁড়ে দেয় উদ্ভটতম রণকৌশলের দিকে। অথচ খেলাটা একই স্বাধীনতার খেলা। কুরুক্ষেত্র, গজনী, পলাশী, দাখাউ, মেলাই, তেহরাণ, জেরুসালেম, ঢাকা, নমপেন, লেনিনগ্রাদ, কলকাতা, অবিনাশপুর — সর্বত্র এক।

সিনেমা

"Alas, in the case of Satyajit Ray there seems never to have been any controversy....."

বিখ্যাত চলচ্চিত্র সমঝদার রবিন উড-এর এই পরিহাস-স্নাত খেদোক্তিটি তারিয়ে চেখে ভাববার মতো আজ। উনিশ শতকের মরমী ভাষ্যকার, সোনার বাংলার কি যেন বলে গীতসুধাময় রূপকার, সত্যজিৎ রায় এক ঝটকায় খুলে দিয়েছেন সেইসব মায়াবী প্রাসাদের গুপ্ত কক্ষের দরজা। ঠকাঠক কাঁপতে শুরু করেছে সর্বভারতীয় লবডঙ্কা পরিবারের অন্তর্নিহিত কঙ্কালবাজী। জাতীয় ইচ্ছাশক্তির হাড়মাসমজ্জাহীন সেই নিরেট অস্থিসমাহার। আমাদের মাণিক একী কাণ্ড করেছেন? স্থান, কলকাতা। ভাষা, উর্দু। পরিবেশ, লখনউ। পাত্র-পাত্রী আন্তর্জাতিক। থিম, ঔপনিবেশিক কুঁজটি কিভাবে শুরু হয়েছিল, কিভাবে তা প্রোথিত হয়েছিলো আমাদেরই ভগ্নজানু আনত পৃষ্ঠে তথা নৈতিক বিজয়ের উজ্জ্বল আরম্ভে। এ নিয়ে কি কোনো উদ্দীপনাময় বিতর্ক হ'তে পারে? অসম্ভব। যে নতুন সৃষ্টি অবগাহনের দিকে সত্যজিৎ স্পষ্টতই ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন তাহলে তো সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়? আর তা-ই যদি তাহলে এই 'বাস্তুহারা'-অধ্যুষিত কলকাতায় ঋত্বিক ঘটকের জীবিতকালে, জীবনানন্দ দাশের জীবিতকালে, বিজন ভট্টাচার্যের জীবিতকালে—এইসব পথভ্রষ্টদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁদের দিয়ে নগর সংকীর্তনের মধ্যে যে তাজ্জব অলোকেন্দুবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তার কী হবে? সত্যজিৎ বিশ্বজোড়া নামধাম করেছেন, ওঁর ক্ষেত্রে জীবিতকালে নান্দনিক ভক্তির আতিশয্য বা বালখিল্য চালিয়াৎ নিন্দে-কেচ্ছা চলতে পারে। কিন্তু সুস্থ স্বাধীন বিতর্ক মানেই তো সমসাময়িক তাৎপর্যের গুরুত্ব দেওয়া! সময় কোথা বাওয়া! দক্ষিণ-বাম সব পন্থীই এ ব্যাপারে সমান রক্ষণশীল। হৈহৈ ক'রে বনভোজন-মার্কা বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে ছবির শুটিং-এর, কিন্তু প্রদর্শিত হবার পর নমো নমো স্বল্পাকার শ্রদ্ধানিবেদনই শ্রেয়। দুঃখের মানবতাবাদী চিত্রকর বলা যায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যর্থ এ কথাটাও নাকের সামনে নিয়মিত ঘুরিয়ে যাওয়ার প্রথা চালু রাখতে হবে। ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে বোম্বাই-রাজ সত্য শিব ও সুন্দরের দোহন চালিয়ে ছ্যারারাবারা কুৎসা রটাচ্ছে — তা আমরা কী করতে পারি! আমাদের কাজ চট-জলদি সমাজ পরিবর্তন। আমরা কি বলেছিলাম অমন শক্ত দুর্বোধ্য একটি ছবি করতে? এই আশু স্বেচ্ছা-নির্বাচিত সমাজ-মাতব্বরির কাজে একটা গোপন চুক্তি সুপার পাওয়ারদের মতো আমরাও আমাদের মাইফেল ক্লাবে প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার শিবিরের মধ্যে ক'রে ফেলেছি। আনুষ্ঠানিক প্রশংসা বা নিন্দে চাও তো রেশন-নীতি অনুযায়ী শিল্পী-ফিল্পিদের দিতে পারি। কিন্তু দায়বদ্ধ কর্তব্য উদ্বোধিত বিতর্ক কখনোই নয় বিশেষত তার মধ্যে যদি নীতিগত বা চাঁদিগত ফায়দা না থাকে।

খেলা ও যুদ্ধ

আদর্শবাদী সিনেমা বনাম বস্তুকামী সিনেমা। স্বচ্ছতা বনাম জটিলতা। মুখোশ বনাম মুখ। ইতিহাস বনাম দ্বন্দ্বাভিঘাত। দর্শন বনাম বিশ্লেষণ। পর্দায় প্রতিভাত সত্য বনাম পর্দা ও পর্দার বাইরের সত্যের সম্পর্ক। পুরাণ আরাধিক ক্যামেরা পাওয়ার বনাম পুরাণ-বিধ্বংসী

পর্যবেক্ষণ পাওয়ার। পরীক্ষামূলক প্রয়াস বনাম বৈজ্ঞানিক কৃতি। অদীক্ষিত আপামর গণদর্শক বনাম দীক্ষিত বিশেষ দর্শক সমবায়।

সিনেমা ও খেলা

ইলাস্ট্রেটেড উইকলির রাজবনস খান্না-র মর্বিড ইতিহাস খুনসুটির যথাযথ উত্তর দিয়েছেন প্রথমে আয়ান রশীদ এবং তারপর স্বয়ং সত্যজিৎ। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। 'দাবা খেলোয়াড়' ছবিটি মোটেই ইতিহাসের দাসত্ব করার জন্য তোলা হয় নি। তার নিহিত উদ্দেশ্য সম্ভবত ইতিহাসের প্রভুত্ব। অন্তত বছর তিরিশেক হ'তে চলল দলিল-দস্তাবেজ বা রাজা-রাজড়া জড়ানো ইতিহাসের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে এমনকি ঐতিহাসিকেরাও বেরিয়ে এসেছেন। সত্যজিৎ রায় যদি সমসাময়িক তাৎপর্য না খুঁজে পেতেন তাহলে প্রেমচাঁদের গল্পটি বাছতেন না। অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তিহীন আসমুদ্রহিমাচল দুর্বল অপমানিত ও নিগৃহীত জাতীয় মানসতার তির্যক পর্যবেক্ষণই ছিলো তাঁর ইচ্ছাকৃত নিপুণ ইতিহাস-আক্রমণের প্রধান প্রেরণা। হতাশা-ফতাশা যদি ঔপনিবেশিকতার লাল-নীল-হলুদ-সবুজ বরকন্দাজদের পছন্দ না হয় তো এই হতাশার শেকড় ধ'রেই তিনি টান মারবেন। ওরা ডাকে আমায় পূজার ছলে, এসে দেখি দেউলতলে, আপন মনের বিকারটারে সাজিয়ে রাখে ছদ্মবেশে।

তরপ তরপ সনরি রয়ে গুজরি.....কৌন দেশ গয়ো, সওয়ারিয়া! চুক্তি যুদ্ধ চুক্তি যুদ্ধ শোবার ঘর গৌরব আত্মসম্মান লাগে এ এ গয়ি চোট মেরে লাগে গয়ি চোট....জব ছোড় চলে লখনউ নাগরি....কোম্পানি বাহাদুর মুখ খারাপ করব না এই নাও আমার মুকুট।

সামাজিক প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে এই প্রথম সরব নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল সত্যজিৎ রায়-এর ছবিতে। সরাসরি বস্তুকামী সিনেমার প্রত্যেকটি উপকরণ তিনি ব্যবহার করেছেন। বিশেষ ঝুঁকি নিয়েছেন সীমিত দর্শক গোষ্ঠীর সতর্ক সহযাত্রী সমঝদারির কাছে পৌঁছবার জন্য, একটি সময়োপযোগী বৈজ্ঞানিক গবেষণা উপস্থিত করার জন্য। অব্যর্থভাবে ব্যবহার করেছেন রঙ। চিত্রকলার আশ্চর্য প্রয়োগে নিয়ে এসেছেন উত্তেজক এক সংযোগ-ঝাঁকুনি। অন্ধকার অজ্ঞানতা থেকে উঠে আসছে চরিত্রগুলি বৈজ্ঞানিক শাঁসালো মূর্ততার মধ্যে। মাঝে মাঝে তারা রক্তমাংসের মানুষ মাঝে মাঝে শুষে খেয়ে ফেলেছে কেউ তাদের। আমরা দেখতে পাচ্ছি বুলডগের মতো মুখ-মুখোশের হাঙ্গামা নিয়ে উটরাম ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে সারাক্ষণ, ওয়াজিদের অতীত ও বর্তমান আক্রান্ত উষ্ণ মানবিক মুখ কেঁপে কুঁকড়ে কান্নায়-ক্রোধে এক আর্ত ইয়েরোগ্লিফিক গোঙানিতে পর্যবসিত হচ্ছে, খিরিয়া কী অনবদ্য চোখ মারলো তার ওই খোরাসানী মুখে রতি আছড়ানো ঢেউ তুলে, সব্বনাশ অপসংস্কৃতি ব'লে চেঁচিয়ে উঠবে নাকি কেউ; সামন্ততন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদের সাক্ষাৎকার মানেই নগ্ন যৌন প্রণিপাত পাঠক ভেবে দেখুন চার্চিলের স্থূল শরীর ও চুরুট আর নেহরুর সুকুমার ব্রাহ্মণ্য ও গোলাপ, এই চার্চিলই হিটলারের থাবা থেকে গ্রীসকে মুক্ত ক'রে বৃটিশ সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'Treat Athens as an occupied city', এরকমভাবে যখন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের কামুক প্লেবয়রা হেলেদুলে 'ফোঁস' 'ফোঁস' শুরু করে তখনই চতুর্দিকে মানুষের অপমান ঘটতে থাকে, সে ভেড়ুয়া ব'নে যায়, তরি-তরকারির শামিল হয়, 'পেলে'কে নিয়ে রই রই ক'রে ওঠে ঝড়ের আগেকার কচুরিপানার

মতো, যার যতো পয়সা সে ততো নির্বীর্য, পাঠক এখনকার ওয়াজিদ আলী ও মীর-মির্জাদের দিকে তাকান, যতো তারা গলায় শেকলের চাপ পাচ্ছে ততোই তাদের বাল্মীকি-রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-মানিক বাঁড়ুজ্জে-কামু-কাফকা-আন্তোনিওনি-মায়াকভস্কি আঁকড়ে ধ'রে লালায় কান্নায় একাকার অবস্থা, পাসোলিনির ছবি 'ক্যান্টারবেরি গাথা'য় এইরকম এক চৈতন্য-গ্লানির কাদায়, মল-মূত্র ও বমনের সমাহারে, মানুষকে খাবি খেতে দেখা গিয়েছিলো, ইরাণের দিকে তাকান মোসাদেককে মেরে এই তো সেদিন কিশোর ওয়াজিদকে তখ্ত-এ বসানো হোলো, সে-ও তো শিল্পপ্রিয় সবুজ বিপ্লবী শাহানশা তারই বা কী দশা, আরো প্রত্যক্ষ উদাহরণে আসা যাক্, আমাদের দেশের শিক্ষিত শাসক গোষ্ঠীর শতকরা নব্বই জনের দশা এই, শিক্ষিত শোষিতদেরও তা-ই, স্মৃতি তাড়িত অভ্যাস ও প্রথা লাঞ্ছিত প্রভু-পীড়িত নিধিরাম সর্দারের দুপুর-কার্তিক জীবন, তাদের সকলেই মোটামুটি চালাও পানসি বাজাও বনসি টাইপ, কেউ কেউ নিবিষ্টচিত্তে সময় কাটাচ্ছেন সমাজের শ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভগুলি ঘিরে যদিও চূড়ান্ত সমাজ-বিচ্ছিন্নতার আঘাত তাঁদের প্রত্যেকটি পাঁজর গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ধীরে ধীরে, আর বাকীদের অনেকেই ফুলে পচে ফেঁপে উঠছেন এক বিশাল জনপ্রিয় পণ্যসমুদ্রের ক্রেতাবাহিত অলস পরগাছা-প্রতিম নৌকাবিহারে। নব্য ঔপনিবেশিক কুঁজ এবং নব্য বৈজয়ন্তীবাদ-এর এই ক্রীড়া-কুরুক্ষেত্রে কিন্তু উভয়ই অপপ্রতিভাই একে অপরের পরিপূরক। সুতরাং তৃতীয় যুদ্ধের খাঁড়ি পথটি সর্বদাই খোলা থাকে শিল্পকর্মীদের জন্য। যেমন মহাভারতের প্রথম পার্থের কাছে ছিলো।

'সেমিনার' পত্রিকার ২২২ সংখ্যার (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮) ভূমিকায আঁদ্রে বেতিস-এর উক্তি ঃ

"The threat of nationalism to the pursuit of ideas lies precisely in this, that it puts deeply-rooted passions at the service of State power. Intellectuals may or may not have learnt in the last couple of years how to protest against the abuse of state power; in the years to come they will certainly need to learn how to resist the passions of the people."

আধুনিক চলচ্চিত্র জগতের প্রায় সবকটি উদ্ভাবনী প্রতিভাই স্বদেশে জনপ্রিয় নন গদার, আন্তোনিওনি, গাভ্রাস, কাকোইয়ানিস, পাসোলিনি, বের্তোলুচি, বুনুয়েল ইত্যাদি যতো নামই ভাবা যাক না কেন। রাষ্ট্র তাঁদের পছন্দ করেননি কখনোই, দায়ে প'ড়ে আনুষ্ঠানিক সন্তোষ প্রকাশ করেছেন পুরস্কার বা বহিরাগত খ্যাতি এলে, আর স্বদেশী প্রচার-ব্যবসা-অর্থনীতি-আক্রান্ত জনসাধারণ তো ছুঁতেই পারেননি প্রায় এঁদের কাজ। যাতে এঁরা ছুঁতে পারেন, ভাবতে পারেন, এমনকি প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন, যদি ইচ্ছে হয়, সে ব্যাপারেও সাধারণত রাষ্ট্র পরিকল্পিত নিষ্ক্রিয়তা দেখান। কাদের সমর্থনে, বিশ্লেষণে, আন্দোলনে এইসব স্রষ্টাদের কাজ ছড়াতে পারলো? দীক্ষিত আন্তর্জাতিক দর্শক সমবায়ের প্রচেষ্টায় ক্রমান্বিত ও ক্রমপ্রসারিত সংযোগে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে, ভাগ্য খুললে, রাজনৈতিক মতাদর্শেরও সহায়তায়। এ প্রসঙ্গে লাতিন আমেরিকার মৌলিক সামাজিক ন্যায়নীতির মডেল বা ইওরোপের গণতান্ত্রিক শিল্পাদর্শের মডেলের উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা জানি যে উভয় মডেলই আইজেন স্টাইন থেকে আরম্ভ ক'রে সর্বাধুনিক চলচ্চিত্র-পরীক্ষাগার-কর্মীর কাজের ফসল। উভয় মডেলই ধারাবাহিক সমাজ পরিবর্তনের কাজে

চলচ্চিত্রের বৈপ্লবিক ক্ষমতায় আস্থাশীল, তফাৎটা প্রক্রিয়াগত এবং তা-ও স্বতন্ত্র পরিবেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারাপ্রসূত। আমাদের দেশের বর্তমান সান্ধ্য পরিস্থিতিতে উভয় মডেলেরই বিচক্ষণ ও সতর্ক ব্যবহারের দুরূহ কর্তব্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। অর্থাৎ সামাজিক ন্যায়-নীতি ও চলচ্চিত্র ভাষার আন্তর্সম্পর্কই চলচ্চিত্র বিশ্লেষণের সমসাময়িক মানদণ্ড হ'তে পারে। সমসাময়িক, কারণ সময় ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র আলোচনার অবয়বও স্বভাবতই বদলায়।

দাবা খেলোয়াড় ঃ সত্যজিৎ রায়-এর অপমানিত আইভান

জাঁ রেনোয়া-র 'খেলার নিয়ম' প্রসঙ্গে তাঁর 'বিষয় চলচ্চিত্র' গ্রন্থে সত্যজিৎ রায় ঃ

'ভাষার দিক দিয়ে এটা যে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরি ছবির মধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম সেটা তখনকার সমালোচকরা অনুধাবন করতে পারেনি। মূল্যায়ণের অভাবের একটা কারণ হয়তো এই যে ছবিটির প্রদর্শন খুব অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। রেনোয়া এ ছবিতে ফরাসি উচ্চবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা অপ্রীতিকর বাস্তব চেহারা উদঘাটন করেছিলেন। ফলে চারিদিক থেকে ছবিটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়, এবং সেই কারণে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহ থেকে তুলে নেওয়া হয়। এই ঘটনার বছর দশেক পরে ছবিটি বিদগ্ধ মহলে আবার দেখানো হয়, এবং তখনই সমালোচকরা La Regle du Jeu-এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতন হন।

একটি নতুন ধরনের কাহিনীকে চিত্রোপযোগী উপায়ে ব্যক্ত করার জন্য রেনোয়া এই ছবিতে অনায়াসে একটি নতুন ভাষা আবিষ্কার ক'রে ফেললেন। La Regle du Jeu-এ প্রথম লক্ষ্য করার বিষয় হল যে ওতে কেন্দ্রস্থ চরিত্র বলে কিছু নেই। দশটি কি বারোটি অর্থবান ভোগ-বিলাসী স্ত্রী পুরুষ, তাদের ভৃত্যস্থানীয় কয়েকটি চরিত্র এবং এদেরই সঙ্গে জড়িয়ে পড়া অথচ এই বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে বেমানান একটি আগন্তুককে অবলম্বন করে এর কাহিনী। প্লট বলতে যা বোঝা যায় তা এতে নেই, তবে কাহিনীর একটা পরিণতি আছে এবং কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এই বিশেষ কয়েকটি শ্রেণী সম্পর্কে অসাধারণ তীক্ষ্ণ মন্তব্য আছে।'

এ তো গেল খেলা প্রসঙ্গে সত্যজিৎ-এর পূর্বতন এক অভিজ্ঞতার বর্ণনা যার অনেকটাই তিনি ব্যবহার করেছেন 'দাবা খেলোয়াড়' ছবিতে। পাঠক প্রসঙ্গগুলি মিলিয়ে দেখলে উপকৃত হবেন। কিন্তু খেলাটা যখন যুদ্ধের কূট-চক্রান্তে পরিণত হয়, আগেই উল্লেখ করেছি 'দাবা খেলোয়াড়' তারই বক্র-তামাশা। খেলাটা চলছে, ছবির আরম্ভে এবং শেষেও। মধ্যপথে ঘটে যায় এক খড়ের যুদ্ধ আর তার ফলে খেলার নিয়মটা যায় বদলে। লক্ষ্য করার প্রধান বিষয় হোলো সেই আংরেজি খেলার নিয়ম এখনও আমরা বশম্বদের মতই পালন করে চলেছি। খড়ের যুদ্ধ থেকে খড়ের স্বাধীনতা থেকে খড়ের ভারতবর্ষ থেকে খড়ের মানুষের খড়ের জীবন।

বাচ্চে লোক ফিন এক দফে তালি লাগাও। আংরেজি ফৌজ। আংরেজি ফৌজ! আপকা খানা সাহাব। আর এই আপনার খুচরো। আংরেজি জমানা শুরু হয়ে গেল। দূর থেকে দুই ক্ষুদে বন্ধুকে দেখা যায় শীতের বিকেলে আংরেজি চাল চেলে যাচ্ছে। খেল খতম পয়সা হজম। সিপাহী বাড়তেহি চলে। লেকিন উও তো দুসরা কহানী।

ভাবতেও শিহরণ জাগে যে পরিচিত অনুষঙ্গের রেনোয়া-র থেকে অনেকবেশি কার্যকরীভাবে যে চলচ্চিত্র-স্রষ্টা তাঁর শক্তিশালী মুষ্ঠি উত্তোলিত করলেন সত্যজিৎ-এর উদ্দেশ্যে তিনি হলেন সেৰ্গেই আইজেনস্টাইন, চিত্রভাষার জনক। যদিও এক ধরনের আনুষঙ্গিক মিলের জন্য রেনোয়া-র 'খেলার নিয়ম' মনে আসে কিন্তু সরাসরি উল্টা-সাধনার নাটকীয় তাৎপর্য-তীক্ষ্ণতার জন্য রোমাঞ্চকরভাবে আবিষ্ট করে আইজেনস্টাইনের 'দুরাত্মা আইভান'। 'দাবা খেলোয়াড়' নিঃসন্দেহে সত্যজিৎ রায়-এর 'অপমানিত আইভান'। অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা, আকর্ষক চিত্র-সমাহার থেকে বেরিয়ে আসা এক চতুর ছবির অ্যালবাম, উত্তরাধিকারের বিষ, উদ্ঘাটনমুখী যৌন উপাদান, প্রত্যক্ষ মনোবিকলন — সব মিলিয়ে এক তীক্ষ্ণ ল্যাচাড়ি তথা খরচিত্রভাষা। সত্য শিব ও সুন্দর আহ্লাদিত মিডিয়া মায়াপুরে অর্থাৎ দেশের আনন্দলোকে এ এক রীতিমতো অস্বস্তিকর ছবি। অস্বস্তি আরো বাড়ে যখন দেখি যে এটি কোনো উন্মত্ত বীরের কাহিনীতো নয়ই বরং তার ঠিক উল্টো এক উন্মাদ গৃহান্তরীন নবাবের করুণ গৌরব। উভয় ছবিরই মৌলিক উপাদান ইতিহাস, যুগ সন্ধিক্ষণ, অবচেতনা, অভ্যাস ও চিহ্নবিজ্ঞান। অন্যদিকে তাদের মেরুপ্রমাণ বৈপরীত্যই তাদের সম্পর্কের মূলসূত্র।

আইভান কর্মবীর, ওয়াজিদ কর্মক্লান্ত বেকার। আইভান সামন্ততন্ত্রের অনন্য নায়ক, তার সহচর দুজনও নায়কোচিত, সে তাঁর স্ত্রীকে ভীষণভাবে ভালোবাসে, তার খুড়ি এক জাঁদরেল চক্রান্তসেবী মহিলা আর ওয়াজিদ এক ফোতো সামন্ততন্ত্রের হাত-পা-বাঁধা নায়ক, বাকী দুই প্রধান চরিত্রও দুর্বলতার দুই মণ্ড। ওয়াজিদ নারী শরীরের পাহাড়ে থেকেও ভালোবাসার চিহ্ন খুঁজে পায়নি কোথাও, পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই, তার মা সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন ভগবতী ভিক্টোরিয়ায় বিশ্বাসী। আইজেনস্টাইনের আইভান এক আত্মবিক্ষোভের মহাকাব্য সত্যজিৎ-এর 'দাবা খেলোয়াড়' আত্মবিভ্রান্তির খণ্ডনাট্য। 'দাবা খেলোয়াড়' একটি অ্যান্টি আইভান ছবি। সত্যজিৎ কি আরো বীরত্ব-বিরোধী ছবি অদূর ভবিষ্যতেই তুলবেন? তাঁর বহু উচ্চারিত কৃষ্ণ-গাথা বা মহাভারত প্রকল্প কি এভাবেই সমসাময়িক অত্যাচার-বিরোধী মানসিকতাকে আরো বিচিত্র বহু মানবিশিষ্ট চিত্রভাষায় প্রবল আত্মঅনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করবে? এরকম এক উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা স্বভাবতই জেগে উঠছে সত্যজিৎ-এর দর্শকদের মধ্যে 'দাবা খেলোয়াড়' ছবিটির সার্থক পরীক্ষার পর। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাবার আগে আইভান নিয়ে আরেকটু আলোচনার দরকার।

'আইভান' সম্পর্কে আইজেনস্টাইন তাঁর চিত্রকাহিনীর আরম্ভে বলছেন ঃ

This film is about the man,

who, in the 16th century first united our country, about the Prince of Muscovy, who out of separate, discordant and autonomous principalities created a united, mighty State about the Captain, who spread the military glory of our motherland to east and west, about the Ruler, who to achieve these great tasks, first took upon himself the Crown of Tzar of all Rus.

বেশ। ভালো কথা। আইজেনস্টাইনের শেষ জীবনের মূল্যবান কৃতি এই আইভান গাথার সারাংশটি দেখা যাক। মনে রাখতে হবে তৃতীয় ছবিটি অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে

চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা ও মনোভঙ্গজনিত একাকীত্বে আইজেনস্টাইনের মৃত্যু ঘটে। স্বদেশে জিন্দাবাদ তখন তুঙ্গে। সে কেচ্ছায় গিয়ে লাভ নেই। আইভান কাহিনী ঃ

সতেরো বছর বয়সে মস্কোভির যুবরাজ আইভান জার অভিষিক্ত হলেন। চারপাশে বিরোধিতা গড়ে উঠতে থাকে। ভবিষ্যৎ রাণী আনাসতাসিয়া এবং রাজপরিবারের আইভান সমর্থক দলটি আনন্দিত। খুড়ি ইউফ্রেসিন তার হাবা ছেলে ভলাডিমিরকে সিংহাসনে বসাবার চক্রান্ত শুরু করেন। বিদেশি দূতেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আইভান সম্ভ্রান্ত বয়ারদের আনুগত্য দাবি করেন, চার্চের ওপর কর বসান এবং বিদেশি শক্তি অধিকৃত জমি ফেরৎ চান। আইভান ও আনাসতাসিয়ার বিয়ে। ইউফ্রেসিন তাদের আশীর্বাদ করেন কিন্তু রাজার দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফিদোর আর আন্দ্রে অসন্তুষ্ট। ফিদোর, চার্চ বিরোধী নীতির জন্য আর আন্দ্রে গোপনে আনাস্তাসিয়ার প্রতি আসক্ত ছিলেন বলে। একদল লোকের রাজবাড়ি আক্রমণ। তাদের মধ্যে দুই যুবক ঃ নিকোলা আর মালুটা। আইভানের বন্ধু দুজন বাধা দেয় এবং জনতাও তাদের সমর্থন করে। মুসলিম রাজ্য কাজানের বিদ্রোহ। আইভানের কাজান অধিকার। আইভান অসুস্থ। চক্রান্ত বাড়ে। বয়ারদের ডেকে তাঁর ছেলে দিমিত্রকে উত্তরাধিকার মেনে নিতে বলেন। তারা নিরুত্তর। আইভান ক্রুদ্ধ। সমুদ্রতীরবর্তী দুই শহরের বিদ্রোহ। আনাসতাসিয়া অসুস্থ। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে বাণিজ্যবৃদ্ধির জন্য দৌত্য। জলের বদলে ভুল ক'রে অসুস্থ আনাসতাসিয়াকে আইভান বিষ দেয়। সে শোকগ্রস্ত। কঠোর অপ্রিচনিকি বাহিনী গঠন। নির্জন আলেকজান্দ্রভের মঠে আইভানের বিশ্রাম। দলে দলে জনতা এসে তাকে মস্কোয় ফিরে যেতে অনুরোধ করে।

আইভান মস্কোয় ফেরে। ফেদোরের সঙ্গে মতান্তর। মালুটা ফেদোরের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত। আইভান জানতে পারে যে তার স্ত্রী মারা গিয়েছিল ইউফ্রেসিনের বিষে। ফেদোর এখন অ্যাবট ফিলিপ, একজন পাদ্রী মাত্র। তার কাছে আইভানের নতিস্বীকারে মালুটার রাগ। সে ফিলিপের তিনজন আত্মীয়কে হত্যার পরমার্শ দেয়। বিষণ্ণচিত্তে আইভানের সম্মতি। ক্ষিপ্ত ফিলিপ। সে এখন মেট্রোপলিটান। আইভানকে সে অপ্রিচনিকি ভেঙে দিতে বলে। আইভানের বিভ্রান্ত রোষ;আমাকে তুমি এক ভয়ঙ্কর দুরাত্মা বলো। বেশ আমি তা-ই হবো।

আইভানকে সরাবার ষড়যন্ত্র। ভ্লাডিমির এসব দেখে ভীত। আইভান পাল্টা ষড়যন্ত্রে তাকে রাজভোজে নেমন্তন্ন করে আর ইউফ্রেসিনকে উপহার হিসেবে পাঠায় এক শৌখিন পানপাত্র। জায়ের জন্য বিষ আসে তাতে। ইতিমধ্যে আইভানের শিকার আহ্লাদিত ভ্লাদিমির রাজা রাজা খেলার নেশায় মুকুট মাথায় বিষ খেয়ে ঢলে পড়ে। আইভান আমরা রাশিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক রাশিয়ায় যখন এই অবিস্মরণীয় চিত্রগাথা তৈরি হ'তে থাকে তখন এক উদ্ভট দ্বিরঙ্গ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে রাশিয়া এগোচ্ছে। একদিকে ফ্যাসিস্ট শক্তি-সমূহের বিরুদ্ধে লড়াই-এর ক্ষান্তিহীন দুর্বহ অভিজ্ঞতা, সংহতির দুর্মর প্রয়াস আর অন্যদিকে ধীরে ধীরে গোলাপের মধ্যে নিহিত কীটের মতো এক অলক্ষ্য ভ্রান্তি-উৎক্ষিপ্ত একনায়কতন্ত্র বা দৌরাত্ম্য শক্তির উত্থান। স্বভাবতই 'অর্ণব পোটেমকিন'-এর সূত্রে স্পষ্ট ও শক্তিশালী চিত্রভাষায় বিপ্লব-বন্দনার জন্য আইজেনস্টাইন আদৃত ছিলেন দেশে। ছবিটির অভাবনীয় চিত্রসমাহার পদ্ধতি বা মন্তাজ পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে চলেছে তার পর থেকে। কিন্তু স্বদেশে আইভান চিত্রগাথার শীতল সমাদর বহুদিন পর্যন্ত দুর্বোধ্য ছিলো আন্তর্জাতিক

চলচ্চিত্র সমাজে। আইভান-স্ট্যালিন বা আইভান-হ্যামলেট ব্যঞ্জনা নিয়ে সেদিন যে প্রচণ্ড ধিক্কার ঝ'রে পড়েছিলো আইজেনস্টাইনের ওপর তা খানিকটা বোঝা যায় তৎকালীন রুশী নবজাগরণের উন্মাদনার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু আজ যখন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে শুধু নয় এমনকি খোদ রাশিয়াতেও স্ট্যালিনের বৈপ্লবিক নেতৃত্বের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধানুগত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্খলনের দিকেও তাকানো যাচ্ছে (যাচ্ছে তো না কি?) তখনও যে রুশ সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক মনোভাব আইভান প্রসঙ্গে কেন তেমনই শীতল তা বোধহয় আর ঠিক দুর্বোধ্য ঠেকতে চায় না আমাদের কাছে। আসলে যখন একজন প্রতিভাবান শিল্পী ইতিহাসের কোনো একটি প্রসঙ্গকে অবলম্বন ক'রে কিছু সৃষ্টি করেন তখন তিনি প্রকারান্তরে নতুনভাবে ইতিহাস তৈরি করেন। কতোটা সফল হন তা নির্ভর করে সমসাময়িক তাৎপর্য সেই সৃষ্টির মধ্যে কতোটা প্রতিভাত হয় তার ওপর। সেক্ষেত্রে সমসাময়িক স্বীকৃতি যে তিনি পাবেনই এমন কোনো কথা নেই। ববং সেই তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি তাঁর লক্ষ্যের পথে বাধা হয়েও দাঁড়াতে পারে। সুতরাং, স্বীকৃতি-বিরোধিতার মধ্যপথে ঝুলে থাকাটাই তাঁর পক্ষে মঙ্গল। দীক্ষিত ও বিবেক-ঋদ্ধ বিশেষ দর্শকের সহযোগিতায় এইভাবে তিনি চিত্রভাষার নতুন পরীক্ষার কাজটিকে এগিয়ে নিতে পারেন এবং চিত্র-অনুষঙ্গের সীমাও বাড়িয়ে চলতে পারেন। এভাবেই রেনোয়া-র 'খেলার নিয়ম' বা আইজেনস্টাইনের 'দুরাত্মা আইভান' আজ নতুন চিত্রভাষার আলোচনা, বিতর্ক ও নিবিষ্ট পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাজ পর্যবেক্ষণের দুটি মূল্যবান চিত্রগ্রন্থ হিসেবে গড়ে উঠেছে। দর্শক সমাজেও তাদের সমাদব বেড়েছে। এই সমাদরই শেষ পর্যন্ত আরো সক্রিয় সমাজ-বিশ্লেষণ চিত্রসৃষ্টির কাজে সাহায্য করে। প্রধানত নতুন ধরনের চিন্তাধারা যখন চিত্র-অনুষঙ্গের পরিধিকে বিস্তৃত করে তখনই সমাজ পবিবর্তনের স্পৃহা এবং উদ্দীপনাও বাড়তে থাকে আরও গভীর ও ফলপ্রসূ ইঙ্গিতে। আইজেনস্টাইনের কাছ থেকে আমরা শুধু আন্দোলনের চিত্রভাষা বা agit prop-ই পাইনি সার্বিক সুষমা আদৃত gestalt চিত্রভাষাও পেয়েছি, যেখানে বহুস্তরের দৃষ্টিপাত এসে একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিণত হয়, দেখার পদ্ধতিটাই হ'য়ে ওঠে ঘন। স্ট্যালিনের রাশিয়ায় এই ঘনগভীর চিত্রগ্রন্থ রচনা তাই এক বৈপ্লবিক কৃতি।

সত্যজিৎ রায়-এর 'দাবা খেলোয়াড়' সেই রকমই এক বিনীত চিত্রগ্রন্থ রচনার প্রয়াস। ছবিটির নির্মাণকালীন সমাজ পরিবেশ এবং সত্যজিৎ রায়-এর চরম একাকিত্ব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সরাসরি সমাজ-গ্রাহ্য বক্তব্য রাখা যাকে বলে। বিশেষত বিস্ফারক সামাজিক প্রসঙ্গে, সত্যজিৎ আগাগোড়াই তীব্র অনীহা জানিয়ে এসেছেন। তবু 'অশনি সংকেত' এবং 'জন অরণ্য' ছবি দুটিতে তিনি সহজ-গ্রাহ্য না হ'লেও অনেকটাই সহজ-বোধ্য। সামাজিক অন্যায় প্রসঙ্গে প্রতিবাদ উচ্চারণে তাঁকে এই দুটি ছবিতে কুণ্ঠিত দেখা যায়নি কিন্তু এ প্রসঙ্গে মানুষের সংগ্রাম কাহিনী বর্ণনাতে তিনি তেমন দায়বদ্ধ উৎসাহ দেখাননি। হয়তো এই ধ্বস্ত পরিবেশে মানুষ যে সত্যকার সংগ্রাম করতে পারছে তা তিনি বিশ্বাস করেন না। যাঁরা করেন সত্যজিৎ-এর কাজ তাঁদের কাছে দুঃখের নিছক মানবতাবাদী চিত্র মনে হওয়া স্বাভাবিক। সংগ্রামের হাতিয়ার হিশেবে সত্যজিৎ ব্যর্থ এ ক্ষোভও তাঁরা প্রকাশ করতে পারেন। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করবো সংগ্রামের সার্থক হাতিয়ার সম্পদের জন্য। যদি অবশ্য সংগ্রাম ব্যাপারটার কোনো অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য আমাদের কাছে প্রতিভাত হ'য়ে

থাকে। 'দাবা খেলোয়াড়' ছবিটি সংগ্রাম ও সংগ্রাম-হীনতার মধ্যবর্তী এক ভয়াবহ পরিচিত অক্ষম জগতেরই সক্ষম প্রতিরূপ। এর থেকে কি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় না? আমি কি নোংরা জগতে বন্দী আছি জানলে কি সেখান থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছে আমার হয় না? তা-ও যদি না হয় তাহলে তো এই বন্দীদশা মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তাহলে আর সত্যজিৎ-এর কাছে সংগ্রাম-বর্ণনার জন্য ঝুলোঝুলি কেন? বীরত্ব-বিরোধী যথাযথ পর্যবেক্ষণই তো সংগ্রামের পাঠ, নইলে সংগ্রামটা হচ্ছে কোন বায়বীয় বীরত্বের ওপর ভিত্তি করে? আরাম কেদারায় বসে অ্যাকুয়েরিয়ামের কল্লোলের দিকে তাকিয়ে ঝড় তো অনেকেই দেখে ও দেখিয়ে থাকেন! যে কোনো সত্যকার সংগ্রামের সত্যকার মৌলিক উৎস হোলো দাসত্ব, বন্দীদশা ও শৃঙ্খল-গ্রন্থির চক্রান্ত পর্যায়গুলিকে স্পষ্ট স্বচ্ছতায় জানা—তা যতোই অপ্রীতিকর হোক না কেন। সেই জানার প্রক্রিয়াকে যিনি অস্বীকার করবেন তিনি সংগ্রাম-খেলার দক্ষ খেলোয়াড় কিন্তু কার্যত নিজের নগ্ন পরাজয়কেই তিনি গড়ে তুলেছেন। সংগ্রামের দাবা খেলায় তাঁর হার অনিবার্য। অক্ষমতা, অপমান ও নিগ্রহের মানচিত্র অস্পষ্ট থাকায় সংগ্রামেব কোনো অভিজ্ঞতাই তাঁর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে না।

প্রত্যক্ষ সিনেমা ও যুদ্ধ

---

fragments but active elements : james joyce, when a film claims to be real, I get angry : Richard Leacock.

As research goes on, further relationships between sound and image will be sought equally naturally in the work of the major artists of our time, as well as raw synchronised documents : Louis Marcorelles

---

খোলা চিঠি সত্যজিৎ রায়-এর কাছে

আপনার কাছে আমরা ভাই-বোনের ভালোবাসা শিখেছি শিখেছি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি শিখেছি দাঁত কামড়ে বেঁচে থাকার রাগ তিরিশ বছর হতে চললো ধীরে ধীরে আপনি দেখতে শেখালেন নতুন ভাবে যে কোনো জিনিস যে কোনো চিহ্ন অথচ আপনার কাছে আরো চাই চাই আপনি আমাদের আবো সাহস দিন আমরা চলচ্চিত্রকে নির্বিচারে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই আপনি নবীন চলচ্চিত্র কর্মীদের ঠিক সেই ভাবেই উৎসাহ দিন যেমন দিয়েছিলেন গরম হাওয়ার কুৎসিৎ অভিসন্ধি-পচা সমালোচনার প্রতিবাদ জানিয়ে যেমন আপনি আগাগোড়াই দিয়েছেন আপনার লেখার ভেতর দিয়ে আরো চাই আরো আপনার কাছে আপনি এই ঘুণধরা সমাজ চলচ্চিত্রকে যে অসম্মানের মধ্যে টেনে এনেছে তার বিরুদ্ধে আরো কঠিন আঘাত হানতে শেখান যতো আপনাকে এই সমাজ বাধ্য হ'য়ে তোয়াজ করবে ততো নিষ্ঠুরভাবে আপনি আপনার ক্ষমতা ব্যবহার করুন মহাভারত করুন কৃষ্ণ-গাথা করুন ঋত্বিক আপনাকে অসম্ভব ভালোবাসতো শ্রদ্ধা করতো আপনার কাছে এখনও অনেক পাওয়ার রয়ে গেছে আপনি বলুন আমাদের কাছে কি চান আরো নিষ্ঠুরভাবে বলুন।

‘জয় বাবা ফেলুনাথ’, সংস্কৃতির বিকৃতি এবং আদি-প্রতিমা

সুগত সিংহ

সত্যজিৎ রায়ের ১৯৭৯-তে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘জয় বাব ফেলুনাথ’এ ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, শিল্প এবং তার অধুনাতম বিকৃতি নিয়ে তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ পেয়েছে। এইসব বক্তব্যবাহী মূল গল্পপ্রবাহটির অন্তরালে জায়গায় জায়গায় এসেছে ইয়ুং প্রবর্তিত আদিপ্রতিমামূলক ভাবধারাটির মৃদু মৃদু ছোঁয়া। সুতরাং ছবিটিকে শুধুমাত্র suspense ধর্মী শিশুচিত্র হিসেবে না দেখে এই আলোকে বিচার করাটাও জরুরি। তাঁর এই আপাতপ্রচ্ছন্ন মন্তব্যগুলিকে ধরতে হলে ছবিটির একটি সামগ্রিক অনুধাবন দরকার।

ছবির প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় রাত্তিরবেলায় এক সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ির প্রশস্ত উঠান। আলো আঁধারির মায়াময় নিঝুম নিস্তব্ধ পরিবেশে এক বৃদ্ধ শিল্পী একটি দশভুজা দুর্গামুর্তি গড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেই বাড়িরই ছোট ছেলে রুকুকে অসুর বধের কাহিনী শোনাচ্ছেন। দেবতারা অসুরের দৌরাত্ম্যে তিতিবিরক্ত। ‘তখন দেবতারা বললেন, সর্বনাশ.....। তারপর ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়ে এল তেজ, শিবের মুখ থেকে বেরিয়ে এল তেজ.......।’ আর সেই সব মিলিয়ে সৃষ্টি হল এই দেবীর। এই কথার সাথে সাথেই আসে অসমাপ্ত সুন্দর মাতৃমুখের একটি close-up। এবং এই close-up থেকেই শুরু হল আদি-মাতা (mother archetype) এর ধারণার প্রভাব, যার মূল কথা হল এই বিশ্বচরাচরে মাতৃশক্তিই সর্বপ্রধান শক্তি। বৃদ্ধ শশী পাল বলে যেতে থাকেন, ‘দুর্গা তাঁর বাহনের পিঠে চড়ে.....।’ রুকু জিজ্ঞাসা করে ‘বাহন কি?’ তিনি তাকে বাহন বুঝিয়ে দেন এবং মা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিকের বাহনদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এর সাথে সাথে এক এক করে আসতে থাকে সিংহ, পেঁচা, হাঁস ইত্যাদির close-up। রুকু আবার জিজ্ঞেস করে, ‘এসব সত্যি?’ ‘কি করে বলব, মুনি ঋষিরা বলে গেছেন.......।’ রুকুর কাছে সব সত্যি হয়ে ওঠে। সে ঘোষণা করে দেয় দুর্গা ঠাকুর সত্যি, টারজান সত্যি, অরণ্যদেব সত্যি, মহিষাসুর সত্যি....। এই কথাগুলির সাথে সাথেই তার জগৎটি উন্মোচিত হয়। কিন্তু তার সত্যকথনের তালিকাটি যেভাবে একটি মটরগাড়ির হর্নে বাধাপ্রাপ্ত হয় সেটিও লক্ষণীয়। সে দেখতে যায় কোন অতিথি এলেন। গাড়ি থেকে নামে মগনলাল মেঘরাজ। এ ছবির মূল অপরাধী। সুতরাং মনে হয় পরিচালকের যে কথাটি এখানে উহ্য থেকে গেল সেটি হচ্ছে পৌরাণিক কালের মহিষাসুরদের মত আজকের আসুরি শক্তি মগনলালরাও বেশ সক্রিয়ভাবে সত্যি।

মগনলালের এই ঘোষাল বাড়িতে শুভাগমনের উদ্দেশ্যে হচ্ছে ঘোষাল বংশের সৌভাগ্যের প্রতীক এবং পুরাতন ঐতিহ্যবাহী গণেশ মূর্তিটি হস্তগত করা। বাড়ির সাম্প্রতিক কর্তা উমানাথ ঘোষাল (রুকুর বাবা), মগনলালের এককালীন সহপাঠী, তার

সাথেই এ বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে বৈঠকখানার ঘরে। উমানাথ কিছুতেই সে মূর্তিটি দিতে সম্মত হলেন না (তার দেবার উপায়ও ছিল না। কারণ সেটি ছিল তার পিতা অম্বিকা ঘোষালের জিম্মাগত)। মগনলাল প্রথমত তার ব্যবসার কথাটা তুলে প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখাল। শেষে কিছুতেই রাজি করাতে না পেরে সাবধানবাণী দিয়ে গেল যে সে সব জিনিস চেয়ে নেয় না, দরকার হলে ছিনিয়ে নেয়। একটি table lamp-কে মগনলালের পিছনে রেখে এবং তার ঢাকনির সাহায্যে সমগ্র ঘরটিকে আলোকিত আর অনালোকিত অঞ্চলে বিভক্তিকরণ করে মগনলালের চেহারায় ও কাটা কাটা কথা বলার ভঙ্গীর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ক্রুরতা আনা হয়েছিল। মগনলালের মুখ সব সময়ই ছিল অল্পালোকিত এবং উমানাথের মুখ আলোকজ্জ্বল। সমগ্র sequence-টির গঠনে আর কটি জিনিসও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আলোচনার শুরু থেকে মগনলাল এবং উমানাথকে সংলাপ দেবার সময়ে এককভাবে Midlong Shot-এ ধরা হচ্ছিল। কিন্তু উমানাথ যখনই কথা প্রসঙ্গে জানালেন — শোনা যায় মগলাল যে টাকাটা করেছে সে টাকাটা সোজা পথে আসে নি, সে নাকি দেশের প্রাচীন মূর্তি বহু মূল্যে বিদেশে পাচার করে থাকে — ঠিক তখনই Mid-long Shot ছেড়ে উমানাথের উপর Zoom close-up করে কথাগুলির গুরুত্ব বাড়িয়ে দেওয়া হল। পরে গল্প গড়াতে থাকলে বোঝা যায় এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে ছবির অন্যতম একটি Sub theme প্রকাশিত হয়েছে যা ক্রমশ আলোচ্য। সেই অশুভ রাত্রে এই কথোপকথনের আরো শ্রোতা ছিল। বিকাশ সিংহ। যে রুকুকে দেখার জন্য সর্বক্ষণ এ বাড়িতে থাকে। এবং আরো একজন। যে ছবিতেও পরে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই প্রবন্ধেও যথাস্থানে পরে আলোচিত হবে। বিকাশের এই আড়ি পাতার অপচেষ্টাটি পর্দার পাশে সিগারেটের ধোঁয়া থেকে মগনলালের সদা সতর্ক চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। দুজনের এই আড়িপাতাই আংশিক ভাবে দায়ী হয়ে থাকল এ ছবির একমাত্র হত্যাকাণ্ড শশীবাবুর মৃত্যুর জন্য। এর পরে গভীর রাত্রে গণেশ মূর্তিটি চুরি গেল।

প্রথম দৃশ্যের এই আচমকা উত্তেজনা দ্বিতীয় দৃশ্যে ফেলুদা, তোপসে এবং লালমোহনবাবুর কাশী আগমনের খোলামেলা ছবির মধ্য দিয়ে অনেকটা ছেড়ে যায়। রিক্সা থেকে লালমোহনবাবু বিভিন্ন মন্দিরের উদ্দেশ্যে একনাগাড়ে নমস্কার করে যাচ্ছেন দেখে তোপসে বলে, 'হাতটা আর নামিয়ে দরকার কি? তুলে রাখলেই তো হয়।' উত্তরে লালমোহনবাবু কাশীতে মন্দিরের সংখ্যা জানতে চান। তিনি বোধ হয় পেন্নাম ঠুকতে ঠুকতে হাঁপিয়ে উঠছিলেন। এদিকে সংস্কারপ্রবণ ভীতু মনও বাধ সাধে। তাই মোট সংখ্যাটা জানার ইচ্ছে। ফেলুদার কাছ থেকে জানা গেল সংখ্যাটা বেশ বড়সড় — 'তেত্রিশ কোটি'। এরপর হোটেলের দৃশ্যগুলি লঘুতালে এগোতে থাকে। হোটেল মালিক নিবারণ চক্রবর্তীর কাছ থেকে তারা জানতে পারে যে মছলিবাবা নামক খুব জোরদার এক সাধু সোজা প্রয়াগ থেকে সাঁতরে এসে উঠেছেন কাশীর দ্বারভাঙ্গা ঘাটে। তিনি ভক্তদের মধ্যে একটি করে মাছের আঁশ বিতরণ করে দিচ্ছেন। অতঃপর ফেলুদা সদলবলে নিবারণবাবুর সাথে এল মছলিবাবাকে দর্শন করতে।

মছলিবাবার দৃশ্যটির গঠননৈপুণ্য অনবদ্য। তাকে ঘিরে বসেছে এক চটকদার গানের আসর। অপূর্ব সুরে মীরার ভজন গাওয়া হচ্ছে। কিন্তু পুরো আয়োজনের মধ্যে রয়েছে

কি যেন এক অন্তঃসারশূন্যতা। মূল গায়িকা এবং সেবাদাসীদের গান গাইবার ভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে এক ধরনের দৃষ্টি আকর্ষণী চটুল মাদকতা। বোঝা যায় এখানে গানের মূল উদ্দেশ্য devotion নয়, বরং এক ধরনের stunt, যা ভক্ত টানা যায়। আর এই বেড়াল-তপস্বী ভক্ত কারা? ফেলুদার একটি প্রশ্ন থেকে সেটা বেরিয়ে আসে— এরা কি সব সাজানো ভক্ত না আসলও দু-একটি আছে। উত্তরে নিবারণবাবু বলেন 'বলেন কি? এঁরা সব হচ্ছেন ক্রিম অব কাশী।' এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ইত্যাদি। অর্থাৎ সমাজের এক নধর পুষ্ট শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধর্মীয় মক্ষীচক্র গড়ে উঠেছে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব সদা বিপন্ন। আজ যা সচল কাল তা অচল হতে পারে, আজ যে সচ্ছল কাল সে দরিদ্র আজ যিনি গণ্যমান্য কাল তিনি আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপিত হতে পারেন। নিরাপত্তার এই অভাববোধের ফলে মধ্যবিত্ত পলায়নমুখী মন খোঁজে একটা আশ্রয়, যেন তেন প্রকারেণ। সেটা সে পেতে পারে ঈশ্বর বিশ্বাসে বা কোন ঐশীবাবার অলৌকিক ক্ষমতার মধ্যে। একই মানসিকতা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিমানুষকে ঠেলে দিতে পারে কোন ফ্যাসিস্তবাদের ছত্রছায়ায়। তাই লালমোহনবাবু ঠিক যে রকম ধাঁচে কাশীর মন্দিরগুলির উদ্দেশ্যে প্রণাম ঠুকছিলেন একইভাবে মছলিবাবার তেজোদীপ্ততায় অভিভূত হয়ে পড়েন। আর মগনলাল শ্রেণীর সমাজ বিরোধীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই মানসিকতার সুযোগ নেয়। সুতরাং তার মছলিবাবার সাথে অবিচ্ছেদ্য গাঁটছড়া। সে মছলিবাবার পয়লা নম্বর ভক্ত। ঐশীবাবা এবং এই ধরনের চোরাকারবারীরা একই সমান্তরালশ্রেণীর জীব, যাদের অস্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সুনিপুণ মগজধোলাইএর উপর। ফেলুদার চোখে কিন্তু মছলিবাবার হাতের সন্দেহজনক উল্কি ধরা পড়ে গিয়েছিল। এখানেই নিবারণবাবুর মধ্যস্থতায় আলাপ হল সস্ত্রীক উমানাথ ঘোষালের সঙ্গে। তাঁরাও এসেছেন বাবার দর্শনে। উমানাথ গণেশমূর্তিটি চুরি যাওয়ার ব্যাপারটি ফেলুদাকে জানালেন এবং case হাতে নিতে অনুরোধ করলেন। Irony টা বেশ পরিষ্কার। উমানাথ যে মছলিবাবার পরমভক্ত ছবির অন্তিমপর্বে দেখা যাবে সে-ই গণেশমূর্তি পাচারের ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক। মছলিবাবার দর্শনঘাটকেই উমানাথের ফেলুদাকে Case offer-এর স্থান হিসেবে বেছে নেওয়াটাও পরিচালকের একটি পরম ঠাট্টা। ঘটনাস্থলে মগনলালের উপস্থিতি ব্যঙ্গের সুরকে ত্বরান্বিত করেছে।

এরপর একদিন সকালে উমানাথের অনুরোধমত ফেলুদা, তোপসে এবং লালমোহনবাবু গিয়ে হাজির হল ঘোষাল বাড়িতে। সেখানে তাদের সাথে আলাপ হল অম্বিকা ঘোষাল, মাস্টার রুকু, বিকাশ এবং শশীবাবুর। রাত্রে ক্যালকাটা লজে খাওয়ার সময়ে ফেলুদার টেলিফোন এল। তাকে খাওয়া ফেলে টেলিফোন ধরতে হল। সেটা ছিল মগনলালের ফোন। তার এই ফোনের উদ্দেশ্য হল ফেলুদাকে গণেশমূর্তি চুরি যাওয়ার caseটা থেকে নিরস্ত করা। সে পরদিন দুপুরে ফেলুদাকে আমন্ত্রণ জানায়। ফেলুদা তা গ্রহণও করে। মগনলালের নির্দেশমত তার দেওয়া লোকের সাথে যথা সময়ে তিনজনে এসে হাজির হয় তার বাড়িতে। মগনলাল তাদের খাতির করে বসাল, সরবত খাওয়াল এবং ফেলুদাকে কাজ থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য বোঝাতে সচেষ্ট হল। নানা রকম প্রলোভন এমন কি কাজটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রচুর টাকাও কবুল করল। কিন্তু ফেলুদাকে

তার সঙ্কল্প থেকে এক চুলও নড়ান গেল না। ফেলুদার এই অবুঝ বেয়াদবীতে মগনলাল বিরক্ত হয়ে উঠল। সে তার শক্তির একটা ক্ষীণতম পরিচয় দেওয়ার জন্য হাঁক পাড়ে ছুরি ছুঁড়তে ওস্তাদ তার এক সাগরেদকে। একটি কাঠের পাটাতনের সামনে লালমোহনবাবুকে দাঁড় করিয়ে তার চারপাশে ছুরি ছোঁড়া হবে। একটি ফসকালেই মৃত্যু। ব্যাপারটা আরো উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে ছুরি ছুঁড়িয়েটির অসুস্থ কাঁপা কাঁপা হাত-পা লক্ষ্য করে। ফেলুদা এই ভয়ংকর তামাশার সক্রিয় প্রতিবাদ করে উঠতে গেলে উপরের ঘুলঘুলি থেকে লক্ষ্য রাখা পাহারাদারের বন্দুক থেকে গুলি ছুটে যায় ফেলুদার দিকে। তোপসের তৎপরতায় সে প্রাণে বেঁচে গেলেও পরিস্থিতি হয়ে ওঠে আরো তিক্ত। খেলা শুরু হয়। লালমোহনবাবুর চারপাশে এক এক করে বিঁধে যেতে থাকে আড়াই কেজি ওজনের ছুরিগুলি। লালমোহনবাবু মৃতবৎ কাঠের মত। এক একটি ছুরির খ্যাচ্যাং শব্দে লক্ষ্যভেদের সাথে সাথে মগনলালের উল্লসিত তারিফধ্বনি। ফেলুদার চিন্তিত, অপমানিত ব্যাজার মুখ। তোপসেও গুম। সব মিলিয়ে এক দমবন্ধ করা পরিবেশেব মধ্যে সার্থকভাবে খেলা শেষ হয়।

এখানে যে পাটাতনের উপর লালমোহনবাবুকে দাঁড় করিয়ে খেলা দেখান হল, লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার উপর আঁকা এক লোলজিহ্বা পিশাচী নারীমূর্তি। প্রথম দর্শনে সেটিকে মনে হয় বুঝিবা কালীমূর্তি। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় আমরা প্রচলিত যে কালীমূর্তির সাথে পরিচিত তাঁর সাথে এর পার্থক্য আছে। ইনি চারহাত বিশিষ্ট নন এবং এর হাত দুটিতে প্রচলিত অস্ত্রালংকারগুলিও নেই। সুতরাং সন্দেহ হয় এটি কালীমূর্তি কি না। জানিনা এই চিত্রকল্পটি সত্যজিৎ রায় নিজেই এঁকেছেন অথবা কোথাও থেকে সংগ্রহ করেছেন। হতে পারে এটি প্রচলিত কালীমূর্তির কাশী অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি ঘরানাজাত কোন প্রাকৃত অপভ্রংশ রূপ। যদি তাই হয় তবে পুরো দৃশ্যটি একটি প্রতীক মর্যাদা পায়। কারণ প্রথম দৃশ্যে যে অসমাপ্ত লাস্যমতী শুভ্র দুর্গামুখের close-up দেখেছিলাম, কালিকামূর্তি সেই আদ্যাশক্তিরই ভয়ংকরী রূপ, বিরুদ্ধশক্তির ভয়াল চেহারায় যার আবির্ভাব। 'প্রথম মানুষের যে-শিল্পকলার নিদর্শন আমরা পাই, তা হচ্ছে প্যালিওলিথিকযুগের স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী। পিরেনীজ পর্বতমালার গভীর গুহাগুলিতে, নগ্ন মাতৃকামূর্তি। এবং এই Great mother সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির চেতনায় আজও haunt করছে। এর দুইরূপ, এক হচ্ছে বরাভয়, Sophia আর এক হচ্ছে ত্রাসদাত্রী কালী, চণ্ডীর রূপ। আমাদের পুরাণে এই দেবীকে একত্রে দুইরূপে কল্পনা করা হয়েছে, 'দেবীসূক্ত'। এবং আমাদের সমাজের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে আছে এই মাতৃভাবরূপী archetypeটি। —ঋত্বিককুমার ঘটক।

এর পর রুকুর দেওয়া হেঁয়ালী 'আফ্রিকার রাজা' এবং শশীবাবুর মৃত্যুকালে উচ্চারিত 'সিং' থেকে ফেলুদা রহস্যের সমাধান করে ফেলে। গণেশমূর্তিটি আছে মা দুর্গার বাহন সিংহের মুখের মধ্যে। দুর্গাপূজার ব্রাহ্মমুহূর্তে ফেলুদা ছোটে রুকুকে জেরা করতে তার চিলেকুঠুরির ঘরে। রুকুর জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে সেও সেই রাত্রে মগনলালের সাথে উমানাথের সব আলোচনা শুনেছিল এবং টারজান সত্যি, অরণ্যদেব সত্যি, মহিষাসুর সত্যি কল্পনা করতে করতে সে মগনলালকেও গঙ্গারিয়ার (তার পড়া কোন রোমাঞ্চ গল্পের দস্যু) এক জ্বলজ্যান্ত সংস্করণ হিসেবে ধরে নেয়। তারপর ঠাকুরদাদা অম্বিকা

ঘোষালের কাছে গিয়ে নিজস্ব কল্পনা অনুযায়ী সব জানিয়েছিল যে গঙ্গারিয়া এসেছে এবং সে তার মূর্তিটি নিয়ে নিতে চাইছে। অম্বিকার ভয় ছিল যে ব্যবসার পড়তির দরুন উমানাথ হয়ত লুকিয়ে মূর্তিটি হাতিয়ে নিয়ে বেচে দিতে পারে। অতএব ঠাকুরদাদা নাতিতে দুইজনে মিলে গাদুঠাকুরের বাহন সিংহের মুখের মধ্যে মূর্তিটি লুকিয়ে রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। রুকুকে শিখিয়ে দেওয়া হয় যে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তবে সে যেন বলে সেটা আছে 'আফ্রিকার রাজার কাছে' (অর্থাৎ সিংহ)। সেটা ক্যাপ্টেন স্পার্ক (তার পড়া কোন রোমাঞ্চ গল্পের নায়ক, যার বৈশিষ্ট্য হল মাথায় কোন নতুন idea এলেই সেখান থেকে spark ঝাড়া)। আর নাহলে সেটা চলে যাবে সমুদ্রের তলায় লুপ্ত শহর অ্যাটলান্টিসে (এটিও কোন রোমাঞ্চ গল্প থেকে আমদানি)। রুকুর জেরা শেষ হয়। অম্বিকা ঘোষালও তাঁর কীর্তি স্বীকার করে নেন।

কিন্তু রুকুর থেকে জানা যায় সে মূর্তি আব সিংহের মুখের ভিতর নেই। চোর অবশেষে সফল হয়েছ। গল্প নতুন মোড় নেয়। ফেলুদা দৌড়োয় বিকাশের খোঁজে। তাকে তখন দোকানে মিস্টি কিনতে পাঠানো হয়েছে। সেইখান থেকে ফেলুদা তাকে ধরে আনে কোমরে পিস্তল ঠেকিয়ে। এইখানে একটু details-এর বিচ্যুতি দেখা গেল। ভারতবর্ষ পৃথিবীর একটি অন্যতম জনবহুল দেশ এবং কাশী ভারতবর্ষের একটি অন্যতম জনবহুল শহর। সুতবাং কাশীব খোলা রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে এই রকম রোমহর্ষক দৃশ্য অসম্ভব। ' . বেনাবসেব মাঠে একমাত্র ফেলুদাই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, এদৃশ্য একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য হত না' একথা ভেবে যিনি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বেনারসী লোকজনদের চলাফেবাকে সদ্ব্যবহার কবে ঘাটের দৃশ্যগুলি তুলেছিলেন তাঁর কাছে আলোচ্য দৃশ্যের অবিশ্বস্ততাও বিবেচ্য হওয়া উচিৎ ছিল। যাই হোক তাকেও চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে এসে জেরা শুরু হল। যাই হোক তাকেও চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে এসে জেরা শুরু হল। সে কবুল করল যে সে মূর্তিটি চুরি কবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মূর্তি সেখানে পায়নি। দুর্গামূর্তি গড়ার সময়ে দৈবক্রমে সেটি সিংহের মুখ থেকে খুলে পড়ে গেলে শশীবাবু সেটি কুড়িয়ে পান। দরিদ্র হলেও তিনি ছিলেন সৎ ও সরল এবং এটাই তাঁর কাল হল। বাড়ির কর্তাব্যক্তিদের যদি তিনি মূর্তিটি ফেরৎ দিতে যান তবে তাঁরই উপর সব চোটপাট হবে এবং তিনিই হয়ত দোষী সাব্যস্ত হবেন। তাই তিনি শরণাপন্ন হলেন বিকাশের। Flash back-এ দেখি বিকাশ মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি এবং লোভী কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করছে কোথায় পেলেন। শশীবাবু সব বর্ণনা করে বারবার করুণ মিনতি করে জানালেন যে তিনি নির্দোষ এবং নিরপরাধ, তাঁর প্রতি যেন অবিচার না করা হয়। উপরতলার মানুষের অযাচিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত সন্দেহের আশঙ্কায় দিশেহারা বৃদ্ধের নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থাটা সন্তোষ সিংহের নিখুঁত অভিনয়ে এবং পবিচালকের সুচিন্তিত আলোকপাতে মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

বিকাশ মূর্তিটি পেয়েই পৌঁছে দিল মগনলালেব কাছে বিনিময়ে সঙ্গে সঙ্গে সে তার পারিশ্রমিকও পেয়ে গেল। লেনদেন সব চুকে গেলে মগনলাল জানতে চাইল মূর্তিটি সে কিভাবে হস্তগত করেছে। বিকাশ সরলভাবে জানালো সব ঘটনা। মগনলাল ঠান্ডা কঠিন চোখে জানতে চায় শশীবাবুব সব ঠিকানা। বিকাশ মগনলালের উদ্দেশ্যটা তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলে। এতক্ষণ সে তার বিচারবুদ্ধিকে নির্বিশেষে চাপা দিয়ে বেখেছিল। কিন্তু এইবার

তার মধ্যবিত্ত বিবেকবোধ তাকে পেছন থেকে টেনে ধরল। সে বিব্রত ভীত মুখে তাকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করে — 'উনি খুব ভাল মানুষ, ঠান্ডা মানুষ, ভাল মানুষ'। কিন্তু কোনই ফল হল না। শশীবাবু রাত্রিব অন্ধকারে তাঁর নিষ্পাপ প্রাণটি দিতে বাধ্য হলেন।

রুকু, অম্বিকা এবং বিকাশ ঘোষালবাড়ির অদ্ভুত সব চরিত্র এবং তিনজনই শশীবাবুর মৃত্যুর জন্য কোন না কোন ভাবে দায়ী। রুকু সাত-আট বছরের শিশু, সে তার নিজের তরফ থেকে নির্দোষ এবং নিষ্পাপ। রহস্যোপন্যাসধর্মী বিকৃত শিশুসাহিত্যের চাপে তার সরল ও কল্পনাপ্রবণ শিশুমন অনেকটাই বিষিয়ে গিয়েছিল এবং তার গঠনভঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার নিজেরই চিলেকোঠার ছাদের স্থাপত্যের মত আঁকা-বাঁকা ও জটিল। এই শিশুমগজ চিবানো সাহিত্যাবলীর প্রভাব একটি শিশুমনে যে কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে এবং তদ্জনিত অতিরিক্ত adventure প্রবণতা যে ক্ষেত্রবিশেষে কত বিপদের সৃষ্টি করতে পারে সেটা বেশ স্পষ্ট (সে ক্যাপ্টেন স্পার্কের অনুকরণে ছাতের পাঁচিল দিয়ে হেঁটে বেড়ায় এবং toy pistol ফাটায়)। শশীবাবু অনেক নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে তাকে অসুরবধের কাহিনী শুনিয়েছিলেন, বুঝিয়েছিলেন বাহন। অথচ তার ফল হল বিপরীত। বিকৃত সংস্কৃতি মনস্ক বালক মহিষাসুর, টারজান আর গঙ্গারিয়ার ছবি দেখতে দেখতে মগনলালকেই গঙ্গারিয়া ধরে বসল। দাদুর প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে সব পরিকল্পনা ছকা হয়ে গেল। এই সুযোগে বাহন সম্পর্কে সদালব্ধ জ্ঞানটিকে কাজে লাগিয়ে (মা দুর্গার বাহন সিংহের মুখেব মধ্যে মূর্তিটি লুকিয়ে রেখে) শশীবাবুর চরম সর্বনাশের পথ তৈরি করে দিল।

সিংহের মুখের মধ্যে দুর্মূল্য গণেশ মূর্তি লুকিয়ে বাখাটা অপবিপক্ক শিশুমনের adventure প্রবণতা বলে রুকুকে ছেড়ে দিলেও ঐ একই প্রশ্নে অম্বিকা ঘোষালকে উপেক্ষা করা যাবে না। কারণ তিনি সব কিছুই করেছিলেন খুব সচেনতনভাবে। শুধু উমানাথেব মূর্তি হাতাবার ভয়েই নয় এই কাজের মূলে ছিল তার রহস্যোপন্যাসপ্রিয়তা। তিনি মূর্তিটির অন্তর্ধানের বহস্য যদি সব খুলে ফেলুদাকে জানাতেন তাহলে হয়তো শশীবাবুর প্রাণটা বাঁচত এবং তার যেটা উদ্দেশ্য ছিল যে মূর্তিটি চুবি না গেলেও চোরকে পাকড়াও করা, সেটা সম্ভব হত। কিন্তু তিনি তা করলেন না। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার গোয়েন্দা উপন্যাস গুলে খাওয়ার গর্বে বিস্ফাবিতবক্ষ এই অশীতিপর জাঁদরেল বৃদ্ধ ফেলুনাথকে যাচিয়ে দেখা এবং তৎসহ নিজের aesthetic কেরামতি দেখানোর লোভটা সামলাতে পারলেন না। তার এই উপবচালাকির ভাবটা ফেলুদার সাথে তাব প্রথম সাক্ষাৎকাবের সচেতন গর্বিত আচবণের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত।

এবার বিকাশ। তাকে দেখে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত বলে মনে হয়। তার সম্বন্ধে জ্ঞাত তথ্য হল যে সে অম্বিকা ঘোষালের কোনও প্রাক্তন কর্মচারীর ছেলে, ছোটবেলায় বাপ-মা হারানোর পর থেকে ঘোষাল বাড়িতেই মানুষ। সে বাড়ির কাজকর্ম দেখে এবং কি একটা হিন্দি পত্রিকার অফিসে সামান্য চাকরী করে। তার পোশাক-আশাক থেকেই মোটামুটি ভাবে তার আর্থিক অবস্থাটা বোঝা যায়। এ বাড়িতে পড়ে থাকলে তার কোন ভবিষ্যৎ নেই, আবার এ বাড়ির বাইরে গেলে তার পায়ের তলায় মাটি আলগা হয়ে যাবে। তাই অম্বিকার বদান্যতার এবং শশীবাবুর অসহায়... সুযোগ কাকতালীয়ভাবে

মূর্তিটি পেয়ে গেলে এই চোরাকুঠুরী থেকে উদ্ধার পাবার আশায় সে সেটা নির্দ্বিধায় বেচে দেয় মগনলালের কাছে।

আর এই যে অম্বিকার উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীজাত নিরালম্ব aesthetic delight এবং বিকাশের সুবিধাবাদী চৌর্যবৃত্তি (কিছুটা হয়তো প্রাণ বাঁচানোর তাড়নায়), তাদের পারস্পরিক স্বার্থ সংঘাত এবং নেতিবাচক কাজকলাপ থেকে যে অবক্ষয়ী হিং টিং ছট পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তারই সুয়োগ নিয়ে মগনলাল শ্রেণীর উচ্চকোটির ধুরন্ধর সমাজবিরোধীর নাটকীয় অভ্যুত্থান। শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকেও নিশ্চয় সে উপরের দিকেই আছে। সে কাশীর বিশিষ্ট ডাকসাইটে নাগরিক, কাশীর ঘাট কাঁপিয়ে তার সুশোভিত বজরা ঘুরে বেড়ায়, মছলিবাবাকে রুপোর থালায় সিল্কের রুমাল ঢাকা দেওয়া ভেট দিয়ে যায়। তার স্বার্থসিদ্ধির পথে ঐ ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে শশীবাবুর মত একটি নিঃসম্বল শ্রেণীর মানুষের প্রাণ বলি দিতে আর কতক্ষণ। চামচিকে আর পেঁচারা যত ফস্টিনস্টি করে, মরে শুধু ইঁদুর বেচারা।

শশীবাবুর দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক রূপরেখাটি কিন্তু ছবিতে মোটেই পরিষ্কার নয়। তাঁব দারিদ্র্যেব চেহারাটির আন্দাজ পাওয়া যায় সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ টাইপেজ তৈরির ক্ষমতার মধ্য দিয়ে। বিকাশের মত এক্ষেত্রেও তার দারিদ্রকে চিনে নেওয়ার উপায় ছিল। তাঁর দারিদ্র্য সম্পর্কিত একটি আনুষঙ্গিক তথ্য ছবিতে আছে। তাঁর মৃত্যুর পর ইন্সপেক্টর তিওয়ারিজী ফেলুদাকে টেলিফোন করে জানান যে তিনি শশীবাবুর ছেলেকে গ্রেপ্তার করে রেখেছেন। কারণ শশীবাবুর সাথে তাঁর ছেলের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না, টাকা পয়সা নিয়েও গন্ডগোল ছিল, তাই সন্দেহ সে-ই হয়ত খুনটা করেছে। দারিদ্র, যেটা এছবিতে অনেকটা আড়ালেই থেকে গেছে, কত ভয়াবহ হলে ছেলে বাপকে খুন করার মত পরিস্থিতি সম্ভাব্য তা উল্লিখিত হতে পারে।

বস্তুত শশীবাবুকে একজন মূর্তি গড়িয়ে পটুয়া হিসেবে নির্বাচন করে সত্যজিৎ রায় দুটি উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। প্রথমত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটিকে জোরাল করা এবং দ্বিতীয়ত তাঁকে দিয়ে দুর্গামুর্তি গড়িয়ে তিনি আদি-প্রতিমামূলক ভাবকল্পটি ছবিতে ধরতে চেয়েছেন। এইসব পটো এবং লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শিল্পীরা ভারতবর্ষের আসল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে চলেন। অপরদিকে সংস্কৃতির বিকৃতিটা ছবিতে আছে রুকু এবং অম্বিকা ঘোষালের অসুস্থ রহস্যোপন্যাসপ্রিয়তার মধ্যে, আছে মগনলালের দেশজ সাংস্কৃতিক সম্পত্তিকে অর্থের বিনিময়ে বিদেশে পাচারের মধ্যে (এখানেই মগলাল উমানাথ আলোচনার সেই zoom close-up যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে যায়), সেই উদ্দেশ্যে ভারতের দার্শনিক সাধুসন্তের ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে মছলিবাবর মতে একজন ভণ্ড সাধু খাড়া করার মধ্যে এবং মছলিবাবার আসরে নোংরা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মীরার ভজনের মধ্যে। মীরার ভজনের তির্যক ব্যবহার আরো দুটি জায়গায় আছে। ফেলুদা ঘাটের একজন সন্দেহযুক্ত স্নানার্থীকে অনুসরণ করে বার করে ফেলে মছলিবাবার গোপন আস্তানা। সেখানে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে সেইসব মন্ত্রপুত আঁশ আর বাবার ছদ্মবেশ নেওয়ার সাজ সরঞ্জাম, পরচুলা, লালপরিধান ইত্যাদি। সেগুলিকে লক্ষ্য করে sound track-এ বেজে ওঠে মীরার ভজন। যেন বলতে চায় মীরার ভজনের কি নিদারুণ পরিণতি। তাকেই সম্বল করে কি নিদারুণ ভন্ডামী। শেষ দৃশ্যে মছলিবাবার আসরেও মীরার ভজন ব্যবহৃত

হয়েছে। ভেট নিয়ে মগনলালের বজরা থেকে অবতরণের দৃশ্যে দূরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে 'মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর'। যেন মীরার ভজনের উদ্দেশ্যই পাল্টে গেছে। মীরাকে প্রভু আজ মগনলালরূপী আধুনিক গিরিধারী নাগর। এই বিষাক্ত সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে শশীবাবুর মত সৎ ও দরিদ্র শিল্পপ্রাণ ব্যক্তির বেঁচে থাকাটা প্রায় দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তির দিক থেকে এক্ষেত্রে অনন্ত ফেলুদার কোন ক্ষমতা ছিল না শশীবাবুকে রক্ষা করে। রুকু এবং অম্বিকার সিংহের মুখের মধ্যে মূর্তি লুকিয়ে রাখার পরিকল্পনাটিও একটি রোমাঞ্চ গল্পের আদলে তৈরি। আর উল্লেখ আছে যে রাত্রে ফেলুদা, তোপসে এবং লালমোহনবাবু কাশীর গলিতে বেড়াতে বেরিয়েছিল তখনই। জটায়ুর কাছ থেকে ফেলুদা জানতে পারে যে কোন একটি দুর্ধর্ষ রহস্যগল্পে আছে যে আততায়ী মূল লভ্য বস্তুটিকে (সেটি কি এখন আর মনে পড়ছে না) কুমীরের মুখের মধ্যে টাকরার সাথে আটকে রেখে দিয়েছিল। এই-ধরনের উদ্ভট অলৌকিক কাহিনীর প্রচারক বিকৃত শিল্প সাহিত্যের সাথে শশীবাবুর মত শিল্পীরা জড়িত, সুস্থ সৎ সংস্কৃতির সম্পর্কটা যে কিরকম প্রাণান্তকর রকমের বিধর্মী সেটা প্রকাশ করার জন্য সেই রাত্রেই, জটায়ুর এই তথ্য জ্ঞাপনের কিছুক্ষণের মধ্যেই শশীবাবুর হত্যাকাণ্ডটি ছবিতে এসেছে। ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে — এই nostalgia বোধ জাগানোর জন্যই বোধ হয় title card-এ একটি কাশীর পুরান ধ্রুপদী মানচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে যে চুরি যাওয়া মূর্তিটিকে কেন্দ্রবিন্দু করে রুকু, অম্বিকা, বিকাশ, শশীবাবু এবং মগনলাল এই পাঁচটি চরিত্র আবর্তিত হচ্ছে সেটি কেন গণেশের মূর্তি তার যৌক্তিকতা তুলে ধরা যায়। পৌরাণিক বিবরণ অনুযায়ী গণেশ ছিলেন সংস্কৃতির দেবতা এবং একজন দারুণ শিল্প সচেতন ব্যক্তি, মহাভারত রচনার অন্যতম উদ্যোক্তা। তিনি নৃত্যগীতেরও সমঝদার ছিলেন। নটরাজের পুত্র হিসেবে নাচের ক্ষমতাটা বোধহয় তাঁর সহজাত ছিল। ছোটবেলায় নাকি গণেশের ক্রীড়ার মধ্যে নৃত্যের ছন্দ দেখে স্বয়ং মহাদেবেরও নাচ এসে গিয়েছিল। মহীশূর এবং উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ নৃত্যরত গণেশমূর্তি দেখাটা আজও একটা আনন্দদায়ক অনুভূতি। অথচ তাঁর মূর্তিকে ঘিরেই চলেছে এক কদর্য সাংস্কৃতিক ব্যভিচার। অবশ্য এখানে মনে হতে পারে যে গণেশমূর্তির বদলে যদি একটি নটরাজের মূর্তি ব্যবহৃত হত তাহলে তার আবেদন এই পরিপ্রেক্ষিতে আরো মোক্ষম হত। নটরাজমূর্তি ভারতীয় সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ আবেদন বলে সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু আবার, 'Iconographically the torso of Ganesh resembles Yaksha images found in the country. Some consider Ganesh as an elephant headed Yaksha. That establishes a pre-Aryan origin of the deity as the Yaksha cult is more ancient than the Vedas'. সেইজন্য হয়ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে গণেশের কদর এখনও রয়ে গেছে। তারা অনেকেই গণেশপূজা সাড়ম্বরে সেরে থাকেন। গণেশ উল্টে যাওয়া কথাটাও তাঁদের বিশেষ পছন্দ নয়। সুতরাং গণেশের এই চিত্রকল্পটি মগনলালের অন্যভাবে এসেছে। মগনলালের ফেলুদাকে বাড়িতে ডেকে

---

* দ্রষ্টব্য — Ganesh in Indian folk theatre – by M. L. Varadpande. Journal of the Sangeet Natak Akademi — Jan-Mar 1973 (P-64).

নিয়ে ভীতি প্রদর্শনের পর রহস্য যখন ক্রমেই ঘোরালো হয়ে আসছিল তখন ফেলুদা একবার হতাশায় বলে ওঠে যে এ রহস্যের কুল কিনারা সবই জানেন মা গঙ্গা। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির দৃশ্যটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। Close up-এ রৌদ্র বিকীর্ণ গঙ্গার ঘোলা জল দেখা যায় এবং ক্যামেরা সেখান থেকে সরে এলে দেখি ফেলুদা মাটিতে বসে আছে চিন্তিত মুখে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে কয়েকটি নদীর স্নিগ্ধ প্রশ্রয়কে সম্বল করে এই প্রতিকূল ধরার বুকে প্রথম কৃষিভিত্তিক সভ্যতাগুলির উন্মেষ ঘটেছিল। যেমন নীল সভ্যতা, সিন্ধু সভাতা ইত্যাদি। তাই নদীমাতৃক যে কোন সভ্যতায় নদীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়ে থাকে। এক একটি জাতির উপরে এক একটি নদীর প্রভাব অসামান্য। ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভূগোল নিয়ন্ত্রণে গঙ্গা নদীর বিশিষ্ট স্থান আছে। এই নদীর উপর ভিত্তি করে তার চারপাশে গড়ে উঠেছিল এক শস্যশ্যামলা বাণিজ্যসফল বর্ধিষ্ণু জনপদ। সুতরাং সেই কোন আবহমানকাল থেকেই গঙ্গা হিন্দু জাতিব কাছে পরমারাধ্যা মাতৃরূপী — আদি প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতীয় পুরাণ এবং শিল্প সংস্কৃতিতে এই আদি প্রতিমার প্রভাব চূড়ান্ত। তা ভারতীয় সাংস্কৃতিক হৃৎস্পন্দনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং 'জয় বাবাফেলুনাথ' ছবির মূল প্রতিপাদ্য যখন ভারতীয় সংস্কৃতির সাম্প্রতিক বিকৃতি, দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ যখন দেশেরই এক শ্রেণীর মানুষের অর্থগৃধ্নুতাকে পরিতৃপ্ত কবতে দেশেব বাইরে চলে যাচ্ছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের বলি হচ্ছে যখন ভারতীয় সংস্কৃতির সেবক এক নিরপরাধ দরিদ্র বৃদ্ধ শিল্পী তখন ফেলুদার এই উক্তি অর্থবহ।

এবারে আসে এই অমানবিক অবস্থাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা। প্রতিবাদ ফেলুদা করেছে এবং করেছে নিজের বাস্তববুদ্ধি দিয়েই কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতার শরণাপন্ন না হয়ে। ফেলুদার এই ক্ষমতায় লালমোহনবাবুও অভিভূত হয়ে পড়েন। তাই ছুরির খেলার সময়ে যে লালমোহনবাবু নিরুপায় নিরাসক্তি নিয়ে শরণ নিয়েছিলেন 'জয় বাবা ভোলানাথ', তিনিই শেষ দৃশ্যে ফেলুদার মগনলালকে পর্যদুস্তকারী মগজাস্ত্রের খেল দেখে চেঁচিয়ে ওঠেন 'জয় বাব ফেলুনাথ'। এরপর পিস্তলের গুলির সাথে মগনলালকে ফেলুদার দু-কথা শুনিয়ে দেওয়া বেশ উপভোগ্য — দেশেব সম্পদ যারা অর্থের বিনিময়ে বিদেশে পাচার করে, নিরীহ মানুষের প্রাণ নেয় ইত্যাদ। কিন্তু অম্বিকা ঘোষালের সামনে এসে সে যেন কেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। শশীবাবুর মৃত্যুর জন্য তথা নিতান্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিনষ্টি সাধনে মগনলালের যে অবস্থান, অম্বিকারও যে হরেদরে সেই একই অবস্থান এই কথাটা তাকে সপাটে শুনিয়ে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায়ী মানসিকতার সাথে যুক্ত করে দেওয়া যায় অতি সহজেই (পাঠক স্মরণ করুন ক্যালকাটা লজে রাত্রির ভোজনদৃশ্যে ফেলুদাকে মগনলালের টেলিফোনের সময়ে তাকের উপরে রাখা রক্তাভ গণেশ মুর্তিটি)। এই অর্থে 'জন-অরণ্য' ছবিতে বিশুবাবুর ঘরেও একটি গণেশমূর্তি ছিল।

এবার আদি-প্রতিমার প্রসঙ্গটি একটু বিশদ করব। শশীবাবুর মূর্তি গড়ার দৃশ্য এবং মগনলালের বাড়িতে ছুরির খেলার দৃশ্য প্রসঙ্গে আদি-মাতার প্রভাব আগেই আলোচনা করেছি। ছবির আরো কয়েকটি স্থানে এই ভাবের জের আছে। যেমন ফেলুদার কাছে বিকাশের জবানবন্দীতে flash-back-এ দেখি শশীবাবু দুর্গা মূর্তির চোখ দুটিকে পূর্ণতা

দিচ্ছেন। সেই অনিন্দ্যসুন্দর চক্ষু যুগল নিখুঁত তুলির টানে টানে ফুটে উঠছে। আদ্যাশক্তির চাক্ষুষ প্রতিনিধির তিনিই চোখ ফোটাচ্ছেন তাঁর সমগ্র শিল্পীসত্তাকে উৎসর্গ করে। সৌন্দর্যই এ মূর্তির প্রাণসম্পদ এবং শিল্পীই প্রাণপুরুষ। কতগুলি আচার প্রথার মাধ্যমে যে সব ব্রাহ্মণ পুরুষরা দাবি করে থাকেন যে তারা শিল্পীকৃত মূর্তিতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করেন তারা এই আয়োজনে গৌণ এবং ছবিতেও তাঁরা গৌণই থেকে গেছেন। এখানে মাতার চক্ষুযুগল নিশ্চয়ই একটা দিক নির্দেশক, কারণ এর পরেই শশীবাবু গণেশমূর্তিটি কুড়িয়ে পাবেন, ঘটনা অকস্মাৎ মোড় নেবে এবং ফেলুদার সামনে মূর্তিটি অন্তর্ধানের ও শশীবাবুর দুর্দশার পিছনের রহস্যগুলির অন্যতম চাবিকাঠিটি উন্মোচিত হবে। মূর্তি গড়ার আরেকটি দৃশ্যে শশীবাবুর হাতে একবাটি লাল রং দেখে রুকু বলে ওঠে — তোমাব হাতে রক্ত। অসুরের বুকে বিঁধে যাবে আর গ্যাল গ্যাল করে রক্ত। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মাতৃশক্তির জয়লাভের যে অনবদ্য মুহূর্তটি ভারতীয় দার্শনিকরা কল্পনা করেছিলেন তাকেই শশীবাবু অসীম যত্নে ভাস্কর্যে রূপান্তবিত করেছিলেন। কিন্তু এই কাজের যোগ্য সম্মান এবং পারিশ্রমিক তিনি পাননি। কলকাতা এবং বড় বড় শহরের কিছু দামি পটো এবং শিল্পী ছাড়া উপেক্ষার এই রাজটীকা ভারতবর্ষের প্রতিটি লোক সংস্কৃতি শিল্পীরই ললাটে আজ দগদগে ঘায়ের মত জ্বলছে। শশীবাবুর মৃত্যু এই লাঞ্ছনারই প্রতীক। অথচ সংস্কৃতি নিয়ে ফাটকাবাজাবী করে মগনলাল এবং মছলিবাবা বেশ একটা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। রুকু এবং বিকাশের জবানবন্দীর মধ্যে দিয়েই তাদের এবং অম্বিকার চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটিত হয় এবং তারাই যে শশীবাবুর মৃত্যুর জন্য প্রবলভাবে দায়ী তাও উদঘাটিত হয়। তাই রুকুর জেরার দৃশ্যের শুরুতে দুর্গাপূজার দৃশ্য এবং বিকাশের জবানবন্দীর পরও sound track-এ ঢাকের বাদ্যি শশীবাবুর স্মৃতি-ভারাক্রান্ত মাতৃকল্পের একটি আবহ রচনা করে।

আদি-প্রতিমা ছবিতে একটি ক্ষেত্রে আদ্যা-শক্তির রূপে ছাড়াও সে যেন সেই দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। অম্বিকার কীর্তকলাপেব উপর একটা শহুরে বুদ্ধিদীপ্তির ছাপ থাকে আর মগনলালের শুধু নগ্ন অর্থলোলুপতা, তাদের এইটুকু মাত্র পার্থক্য। নাহলে অম্বিকাও নিম্নবিত্তপুষ্ট লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের কোনও ধার ধারেন না। বড়জোর তাদের তৈরি মূর্তি বাড়িতে সাজিয়ে পুজো করেন। তাদের এই সচেতন বা অসচেতন উদাসীনতা প্রকারান্তরে ঐ ঐতিহ্যের বিরোধিতাই করে চলে। তাই তিনিই যে শশীবাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী এ বিবেকবোধ তার মধ্যে একবারও দেখা যায় না। বরঞ্চ মূর্তিটি উদ্ধারের মধ্যে ফেলুদার যে দারুণ গোয়েন্দাবুদ্ধির প্রকাশ আছে তাকেই তিনি পুরস্কৃত করতে সদা উদ্যত। কিন্তু ফেলুদার মধ্যেও ঐ একই বিবেকবোধের অভাব। সে আগে থেকেই অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছিল যে, যে মূর্তিটিকে নিয়ে অম্বিকা এত কাণ্ড ঘটালেন সেটি আসল মূর্তি নয় তার একটি নকল মাত্র, যার দাম হাজার টাকা হবে। এই মেকি মূর্তিটির জন্য একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল অথচ তার জন্য অম্বিকাকে কোন প্রতিবাদ শুনতে হল না, হাতকড়া পড়ল মগনলালের হাতে, অথচ তিনি তার পূর্ববৎ গাম্ভীর্য নিয়ে যথাস্থানে বিরাজিত রইলেন। ফেলুদা শুধুমাত্র তারই অনুকরণে মূর্তিটি কিভাবে চুরি গিয়েছিল সেটা রসিয়ে রসিয়ে হাতে কলমে প্রদর্শন করে ঘোষালের রহস্যোপন্যাস সমঝদারির কেতাদুরস্তুতার প্রতি কিঞ্চিতৎ কটাক্ষপাত করে প্রথমদিনের সেই ব্যবহারের শোধ নেয়

এবং তারপই নিজস্ব পারিশ্রমিক হস্তগত করে ক্ষান্ত হয়। এরপর রুকুর রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ অনুপ্রাণিত toy pistol এর অভিঘাতে বিশ্বনাথধামের শান্ত পায়রারা ছটফটিয়ে উড়ে যায় আকাশের দিকে। তাদের পিছন থেকে ছবির অন্তিম লেখনী দেখা যায় 'খেল খতম্'।

রহস্যচিত্রের দক্ষতম স্রষ্টা হিচকক প্রায় একক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষার মধ্য দিয়ে এ ধরনের ছবির আঙ্গিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে বার করতে সমর্থ হয়ে ছিলেন। কিন্তু হিচককের নিজের যেটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা হচ্ছে সব রকম সামাজিক দায়বদ্ধতা (commitment)-কে নির্বিকারভাবে এড়িয়ে চলা। যা হরেদরে শিল্পের জন্যই শিল্প হয়ে দাঁড়ায়. এইটুকু সীমাবদ্ধতা মেনে নিতে পারলে হিচককের ছবি উপভোগে আর কোন বাধা থাকে না। সত্যজিৎ রায় কিন্তু সেই প্রান্তে উপনীত হতে পারেন না। তাঁর গোয়েন্দা ছবিতেও সামাজিক দায়বদ্ধতার পিছুটান প্রকারান্তরে ক্ষীণভাবে হলেও অনুভূত হয় (অপরপক্ষে সত্যের খাতিরে একমাত্র বলতে হবে যে হিচককীয় পারিপাট্য সত্যজিৎ রায়ের কোন গোয়েন্দা-ছবিতে দেখা যায় নি, কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য যন্ত্রপাতির সুযোগ সুবিধার ঘাটতিও এ জন্য কিছুটা দায়ী)। এদিকে সাম্প্রতিককালে বিদেশে বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের লাতিন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রাজনৈতিক আবর্ত এবং কেচ্ছা নিয়ে এক ধরনের রহস্যধর্মী ছবি হয়ে থাকে যাদেরকে বলা হয় Political thriller। এদের অনেকগুলি ছবিই স্বচ্ছ রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং স্বদেশে ও বিদেশে উচ্চ-প্রশংসিত। এই ধরনের ছবির স্রষ্টাদের সামনে যে নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যার উদ্ভব হয় সেটা হল, suspense-এর চমককে এমন একটা মাত্রা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা যাতে করে সেটাই না মূল হয়ে উঠে ছবির সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বিপর্যস্ত করে দেয়। এই সমস্যা নিয়ে হিচককে তত উদ্‌ব্যস্ত হতে হয় নি কারণ উদ্দেশ্যটা ছিল একেবারে উল্টো, সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় 'সাসপেন্সের সাহায্যে চিত্ত বিনোদন'। আলোচ্য ছবিগুলির ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার খাতিরে আঙ্গিককে সতর্কভাবে গড়ে পিঠে নেওয়াটা খুব জরুরি। আমার মনে হয় ঠিক এই প্রশ্নে 'জয় বাবা ফেলুনাথ' শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' অবশ্যহ কোন Political thriller নয় এবং সে সব ছবির ক্ষেত্রে সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে যে sharp focus-এ রাখার সুযোগ থাকে তা এ ছবির ক্ষেত্রে ছিল না। কিন্তু সেই সেই প্রেক্ষাপট অন্য মাত্রায়, অন্য ব্যঞ্জনায়, অন্য ঝংকারে উপস্থাপিত হয়ে হৃদয় মন্থনের হদিশ ছিল। এই বীজ ছবির বিভিন্ন অঙ্গে প্রোথিত আছে এবং তার কয়েকটিকে এ প্রসঙ্গে খুঁজে বার করার চেষ্টা হয়েছে। এক্ষেত্রে suspense -এর সাথে বিষয়বস্তুর ভারসাম্য রক্ষা করাটা বা অন্যভাবে বলতে গেলে একটি সামাজিক বিষয়বস্তুর উপযোগী করে suspenseকে ব্যবহার করার হিসেবটা ছিল পূর্বোক্ত ছবিগুলি থেকেও জটিল এবং দুরূহ তা যদি সার্থক ভাবে কার্যকরী হত তবে 'জয় বাবা ফেলুনাথ' রহস্যচিত্রের জগতে একটি ব্যতিক্রম বলে চিহ্নিত হত। কিন্তু সে তার কাম্য অভিঘাত হারিয়েছে। তাই যারা সাধারণ দর্শক, যাদের অনেকের এ ছবি ভাল লেগেছে, তাঁরা ঐ suspense মুখী গতির আনন্দেই মজে গিয়েছেন। ছবির অন্যান্য বক্তব্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের সামনে হাজির হয়নি এবং তাঁদেরও খুব কম অংশেরই ধৈর্য আছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির শাবল চালিয়ে suspense-এর মোহজালের আড়াল থেকে সে সব কথা

টেনে হিঁচড়ে বার করেন। নচেৎ এই দর্শকদেরই কিছু কিছু অংশ সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবির শুধু গল্পাংশটিকেই লক্ষ্য করেন না উপরন্তু নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী তার একটা সামাজিক মূল্যায়নও করে থাকেন। গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে suspense-কে জমিয়ে তোলার অত্যধিক প্রয়াস ছবির সামাজিক প্রেক্ষাপটটিকে জোলো করে দিয়েছে এবং 'জয় বাবা ফেলুনাথ' সত্যজিৎ রায়ের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি তথা বিশ্বচলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির তুলনায় অনেক অনেক কম শক্তিসম্পন্ন মনে হয়েছে।

হীরক রাজার দেশে

(একটি সময়োপযোগী পলিটিক্যাল ফ্যান্টাসি)

উৎপলেন্দু চক্রবর্তী

একজন নবীন চিত্রপরিচালক হিসেবে দর্শকের আসনে বসে এবং সেই সঙ্গে আমার পাশে এক অজানা বালকের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে যে উপলব্ধি আমার হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের অবতারণা। সত্তর দশকের কট্টর বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি এখন পর্যন্ত যে বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করতে পেরেছি তারই নিরিখে 'হীরক রাজার দেশে' সম্পর্কে আমার একান্ত নিজস্ব মূল্যায়ন রাখব। এতে অন্যকারো আপত্তি থাকলেও থাকতে পারে। তবে যেটা বাস্তব সেটা শিল্পের খাতিরে নির্মোহ মনোভাব নিয়ে স্বীকার করাটাই শ্রেয় অন্তত অধুনা সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশেব বাস্তব গতিবিধিব আলোকে।

আমার মনে হয়েছে যে, 'হীরক রাজা' এই দেশেবই 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে'র লেবেল সাঁটা রাষ্ট্রকর্ণধারদেরই চরিত্র উদ্‌ঘাটনের রূপক আব 'দেশটা' এই নয়া রাষ্ট্রকণধারদের দ্বারা পিষ্ট 'ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী'। ঠিক নয়া সিলেবাসে 'India and her people' এই শিবোনামায় যে ইতিহাস রচনার ফরমান ছিল তাবই বিপরীত ব্যাখ্যায় ইতিহাসের আসল স্বরূপটি রচিত হয়েছে এই পলিটিক্যাল ফ্যান্টাসিতে। ইতিহাসের ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে বলতে পারি এমন ধারণা পোষণের বহু নজির রয়েছে এই ছবির দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তবে।

যেমন — (১) রাজা এবং তাঁর পারিষদবর্গ, তাঁদের আলোচনা ও রাজার অবস্থান ও রায় দান-এদেশের পার্লামেন্ট, প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ও অন্যান্য মন্ত্রীদের অবস্থান যা আজ বাইশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। গণতন্ত্রের নামে রাজতন্ত্র যে আজও চালু আছে সে কথা অস্বীকার করবেন কোন্ সচেতন নাগরিক? পিতা, তারপর কন্যা, তারপর তার পুত্রকে সিংহাসন প্রদানের উদগ্র বাসনা ইত্যাদিব নজির এদেশের মাটিতে বড় বেশি বাস্তব।

(২) রাজতন্ত্র-বিরোধী কোনরকম বক্তব্য বা ইঙ্গিত সংগীত-শিল্পসাহিত্য বা শিক্ষায় কোনভাবে ফুটে উঠলে তার পরিণাম যে কি হতে পারে 'হীরকে'র রাজা সেটা দেশবাসীকে হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায় বুঝিয়ে দিয়েছেন — স্মরণ করুন পি. ডি. অ্যাক্ট, মিসা, এই সেদিনকার জরুরি অবস্থার সেন্সবশিপ যার হাত থেকে মায় রবীন্দ্রনাথও বাদ যান নি — সেসব দিনের কথা!

(৩) হীরক রাজার দেশ ভ্রমণ, মূর্তি উন্মোচন ও এতদুপলক্ষে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত বিদেশি প্রতিনিধিদের কাছে নিজের দেশের সুশাসিত ভদ্র-সভ্য সুস্থ নগরসভ্যতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গরিব-মানুষজনের বস্তিগুলিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে তাদের সক্কলকে 'জন্তুব' মতন এক বিশাল আস্তাবলে ঢুকিয়ে দিল রাজার শাস্ত্রীব দল কয়েকদিন আগেই দিল্লির

বস্তিগুলিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সত্তর দশকের রাজপুত্রের আকাঙক্ষায় — তিনি নয়াদিল্লিকে 'নয়া গণতন্ত্রে' সাজাতে চেয়েছিলেন জরুরি নিয়মকানুনের তারকাঁটা ঘিরে। শুধু তাই নয়, ছেলেবেলার স্মৃতি মনে পড়ে। দমদম থেকে বুলগানিন-ক্রুশ্চেভ যখন প্রথম কলকাতায় পদার্পণ করেন বা রানী এলিজাবেথ আসেন 'নয়া স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র' দেখতে, তখন কত না রং-এ রাঙিয়ে তোলা হয়েছিল কলকাতার মূল সড়ক আর রাস্তাগুলো। পাতিপুকুর থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত নানান শামিয়ানা টাঙিয়ে কুৎসিৎ বস্তি আর তার মানুষদের ঢেকে রাখা হয়েছিল। যেন কোন ফাঁক-ফোঁকড় দিয়ে নয়া গণতন্ত্রের আসল ভিখিরিদশাটি উঁকিঝুঁকি না মেরে বসে। আজও সেই Tradition আছে। কেননা গণতন্ত্রের পিছনে রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকলে সেটাই ত অনিবার্য।

(৪) যে কোনো বুদ্ধিজীবী রাজার বিরুদ্ধে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলে এবং রাজা তাঁকে প্রত্যক্ষ নির্যাতনে বাগে আনতে না পারলে তখন তাঁকে ঢুকিয়ে দেন অনেক অর্থ ও বুদ্ধি ব্যয়ে নির্মিত 'যন্তর-মন্তর'-এর ঘরে — মগজ ধোলাইএর কারখানায় এদেশে কে. জি. বি. বা সি. আই. এ-র অদৃশ্য অস্তিত্বর জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত সকলেই জানেন।

(৫) পণ্ডিত মশাইয়ের আপোসহীন চরিত্র শেষপর্যন্ত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তাগিদে তাঁকে নৈতিক দায়িত্বে নিয়ে যায় হীরক খনির শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং সমাজ বদলের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে তিনি তাঁদেরই একজন হয়ে ওঠেন। — ব্যাপক অর্থে বিপ্লব আবার সমসাময়িক ইতিহাসের দিকে তাকালে সত্তর দশকের নকশালবাড়ির রাজনীতির সদর্থক দিকটির এবং style of action-এর কথাও মনে পড়ে।

(৬) কচি ছাত্রদের গুল্‌তি মেরে রাজার মূর্তির নাক টুক্‌রো করে দেওয়ার মধ্যে একটি রাজনৈতিক সত্য অন্তর্নিহিত — 'পৃথিবীটা আমাদের, অবশেষে তোমাদের..... কারণ তোমরা সকাল-বেলার আটটা ন'টার সূর্য, যে সূর্যের উত্তাপের খানিকটা আভাষ আমরা পেয়েছিলাম সত্তর দশকের কিশোরদের মধ্যে — যথার্থ নেতৃত্বের অভাবে যা পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠল না। 'হীরক রাজার দেশে' আমি সেই সমকালীন রাজনীতির Positive Trend-টা লক্ষ্য করতে পেরেছি।

আসলে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রের শ্রেণী চরিত্র এবং তার বিরুদ্ধে দেশের নির্যাতিত মানুষের সামগ্রিক বিদ্রোহকে তুলে ধরার সচেতন প্রয়াসের ফসল হিসেবেই 'হীরক রাজার দেশে'র জন্ম এবং সেই সুবাদেই এই ফ্যান্টাসির প্রয়োজনীয়তা। কেননা, এই রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে থেকে তাদেরই Censor Board-কে স্বীকার করে (সে যত বড় বিপ্লবীই হোন) সরাসরি বিদ্রোহ বা বিপ্লবাত্মক কিছু করা যে সম্ভবপর নয় তা অন্তত এই বাইশ বছরে হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় ভুক্তভোগী দেশবাসীকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যাঁরা অন্তত সেটাও মেনে নিতে রাজী নন তাঁরা যেন Censor Board-এর নিয়মকানুনগুলো ভালমতন পড়ে নেন আর তারপরই যেন নিজেদের দায়ভাগটা বুঝে নিয়ে পরিচালকের ওপর শৈল্পিক দায়িত্ব অর্পণ করেন।

অবশ্য যে ব্যাপারটিতে সত্যজিৎবাবুর প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা আর ভালবাসা আরও গভীরতর হোয়েছে তার মূল কারণ তিনি কোনোদিন জনগণ সম্পর্কে কোনোরকম Commitment-এর ব্যাপারে সোচ্চার হননি। বরং নীরব এবং বিরত ছিলেন। সুতরাং

'হীরক রাজার দেশে'র মতন ছবি যখন তাঁরই শিল্পসত্তা থেকে সৃষ্ট হয় তখন কোনোরকম hypocracy মনে হয় না — মনে হয় এটাই সমাজ ও তার জনগণ সম্পর্কে পরিচালকের consistant দৃষ্টিভঙ্গীর inevitable development — যা এ দেশের Committed Director-দের মধ্যেও প্রায়শই চোখে পড়ে না — কথা এবং কাজের inconsistencyই আজও সেইসব পরিচালকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ হলো নিতান্ত আমার অভিব্যক্তি যখন আমার মন এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ছবির দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। আর ঠিক তখনই আমার মনের ওপর চাপ ফেলছিল আর এক অজানা বালকের চোখ ও তার প্রতিক্রিয়া। আমায় সে বারবার খোঁচাচ্ছিল, —

— 'রাজাটা কি খারাপ দেখেছ। কিভাবে গায়কটাকে...।'

— 'আচ্ছা, এই যন্তর-মন্তরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে কেন?'

— 'পণ্ডিতমশাই শ্রমিকদের মধ্যে লুকিয়ে আছে কেন? রাজাকে মারবে বলে?'

— 'গুল্‌তি মেরে রাজার নাক টুক্‌রো করে দেওয়ার সময় সে হাততালি দিয়ে বলে উঠলো — 'ঠিক করেছে! — তাই না?'

— 'রাজাকেই যখন যন্তর-মন্তর ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হোলো তখন সে আনন্দে উচ্ছ্বাসে বলে উঠলো —'এবার কেমন?'

— পণ্ডিত যখন তাঁর পরিকল্পনাসহ ধরা পড়ে গেল তখন সেই বালক আপ্‌সোসে ভেঙে পড়লো ঃ 'এবার কি হবে! রাজাকে ত আর ঘায়েল করা যাবে না।'

— ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন আর প্রতিক্রিয়া কি এই দশকের অভিভাবককে সুযোগ করে দেয় না তাঁর সন্তান, ছাত্র বা ছোটভাইটিকে কোন্ সমাজে আমরা বাস করছি, মানুষের মতন বাঁচতে চাইলে কি পাচ্ছি আর কি পাচ্ছিনা সে-সব জটিল উত্তরকে সহজ উপায়ে রূপকের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে? আমার ত মনে হয়, এই শতাব্দীর এই দশকের প্রত্যেকটি বাস্তববাদী মানুষের কাছে এই — 'পলিটিক্যাল ফ্যান্টাসি'র শৈল্পিক গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা এইখানেই, সমাজবদলের প্রশ্নে, — 'সিংহদুয়ার' ভেঙে বাস্তবকে চিনিয়ে দেওয়ার চলচ্চিত্রের নৈতিক কর্তব্যের তাগিদে।

ঘরে বাইরে ঃ রবীন্দ্রনাথের, সত্যজিতের

পূর্ণেন্দু পত্রী

'আমাদের দেশে অধিকাংশ ছায়াচিত্রেই ডিটেলের দৈন্য লক্ষ্য করে দুঃখ হয়, কারণ ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যে ডিটেলকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা কমই আছে।'

— ডিটেল সম্পর্কে দুচার কথা/বিষয় চলচ্চিত্র

'বিদেশী সাহিত্যে এমন অনেক ভালো গল্প আছে (চেকভ-মোপাসাঁয় এর নিদর্শন পাওয়া যাবে) যা প্রায় তৈরি চিত্রনাট্যের শামিল। নষ্টনীড় এ-শ্রেণীর গল্প নয়।' — চারুলতা প্রসঙ্গে/বিষয় চলচ্চিত্র

"Books are not primarily written to be filmed, If they were, they would read like scenarios; and if they were good scenarios, they would probably read badly as literature."

মারী সীটনের 'সত্যজিৎ রায়' বই থেকে

'....যেহেতু চলচ্চিত্র ও উপন্যাস উভয়েই কথা ও ইমেজ দুইই ব্যবহার করে, তাই মনে হতে পারে, বুঝিবা উপন্যাস চলচ্চিত্রের ভাষার সৃষ্টিতে অনেকটা সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এখানেই সমস্যা দেখা যায়। আমি জানি না এটা বাঙালি মেজাজেরই পরিচায়ক কিনা, কিন্তু আমাদের অনেক লেখকই লিখতে বসে তাঁদের মনকে কাজে লাগান বেশি, চোখ কানকে এতটা নয়। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। 'ওল্ড গোরিয়' উপন্যাসে মাদাম ভোকে (Vanquer)-র লজিং হাউসের যে বর্ণনা বালজাক করেছেন, তার একটা ছোট্ট অংশ তুলে দিচ্ছি।

(উদ্ধৃতি পর)

এখানে লেখকই শিক্ষানির্দেশকের কাজ সমাধা করে দিয়েছেন। এই ধরনের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ চিত্রনির্মাতার কাজ হালকা করে দেয়। অথচ এ ধরনের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।'

— অমল ভট্টাচার্য স্মৃতি বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ থেকে

অমল ভট্টাচার্য স্মৃতি বক্তৃতায় সত্যজিৎ রায় অত্যন্ত স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তখন রবীন্দ্রনাথের যে উপন্যাসটি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যস্ত, সেই 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তিনি ডিটেল খুঁজে পাননি প্রায় কোনো কিছুরই। না বাড়ি-ঘরের, না আসবাবপত্রের, না চরিত্রদের পোশাকের। ফরাসি বালজাক, আর বাঙালি বঙ্কিমচন্দ্র ও বিভূতিভূষণ ছাড়াও প্রাচীন হুতোম আর আধুনিক কমলকুমারের নামোল্লেখ করে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, এঁরা ছাড়া অন্য বাঙালি লেখকদের রচনায় ডিটেলের দৈন্য। তিনি তাঁর ঐ ভাষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর, বা সতীনাথ ভাদুড়ী কিংবা আর

একটু পরের সমরেশ-অমিয়ভূষণ-দেবেশ রায় প্রমুখ কাবোবই নামোল্লেখ করেন নি। আবার এও এক আশ্চর্য যে বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' থেকে তাঁর ভাষণে তুলে দিয়েছেন যৎসামান্য যে-দৃষ্টান্ত, একটু খুঁজলেই তার জুড়ি মিলে যাবে বাংলা সাহিত্যের অজস্র ছোট গল্পে। এমনকি রবীন্দ্রনাথেও।

তাঁর ঐ ভাষণে 'ঘরে বাইরে'-র চলচ্চিত্রায়ণের সমস্যা সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা এই —

'কিন্তু আমি যে 'মেজর' উপন্যাসটি নিয়ে আবার কাজে লেগেছি — এই নিয়ে দ্বিতীয়বার — রবীন্দ্রনাথের সেই 'ঘবে বাইরে' উপন্যাসে এই ধবনের বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত।'

উপন্যাসে কোথাও নিখিলেশের বাড়ির বর্ণনা নেই। যে দুটি ঘরে অধিকাংশ ঘটনা ঘটে, বাড়ির ভিতরে নিখিলেশের শোবার ঘরে এবং বাইরের বসবাব ঘবে, দুটি ঘরেরই মাত্র তিন চারটি ডিটেলের উল্লেখ আছে, সন্দীপের নিয়মিত বৈঠক হয় তার ছেলেদের সঙ্গে। অথচ কোথায় যে তাদের বৈঠক বসে তা জানা যায় না। কখনও কখনও বিমলার পোশাকের বর্ণনা আছে কিন্তু পুরুষ চরিত্রদের পোশাকেব কোথাও উল্লেখ নেই।

এই আলোচনায় 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ডিটেলের দিকে তাকানোব আগে আমরা যদি একটি বিশেষ দিকে নিবদ্ধ করতে চাই আমাদের অনুবীক্ষণ, আব তা যদি হয় তাঁর চরিত্রদের অন্তর্গত মৌল স্বভাবের উদ্‌ঘাটনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার কবে থাকেন ডিটেল, আমরা পেয়ে যাব নিছক কিছু বর্ণনা নয়, এক ধরনের প্রতীকতাও। অথচ এক ধরনের ছক। আরো বড় পরিসবে ফেলে, শেক্‌সপীয়র বিশেষজ্ঞ আয়ান কটের সংজ্ঞা অনুসরণে যাকে বলা যেতে পারে — 'Grand Mechanism'.

চতুরঙ্গে দামিনীর সঙ্গে আমাদের পরিচযেব প্রত্যূষ পর্বে দেখি, যদিও বিধবা, তবুও রচয়িতার ভাষায় — 'একে তো তার বেশভূষা বিধবার মতো নয়, তার উপরে গুরুর উপদেশ বাক্যের সে কাছ দিয়া যায় না।'

এই সামান্য ইঙ্গিতেই ধরা পড়ে দামিনী চরিত্রের অন্তর্গত বিদ্রোহপ্রবণতা। সে স্বামীব গুরু লীলানন্দ স্বামীব পায়েব তলায় নিজেব স্বাধীন অস্তিত্বকে লুটিয়ে দিতে নাবাজ, এটা জানানোব জন্যেই ধর্মালোচনাব আসব হাঁকিয়ে বসা স্বামীজীব কাছ ঘেঁসে চলে যায় থিয়েটার যাওযার পোশাকে। কিন্তু শচীশের সঙ্গে পবিচিত হওয়ার পব, শচীশকে পাওয়া-না-পাওযার ঘটনাক্রমেব উপব ভর কবে মেঘ আর রোদেব মত বদলে যেতে থাকে তার পোশাক। যখন সে শচীশের বিরুদ্ধে তখন তার পোশাকেব রীতিমত অথবা রীতিবিরুদ্ধ উজ্জ্বলতা। যখন শচীশের প্রতি প্রসন্ন অথবা শচীশেব দিকে আত্মনিবেদনে প্রণত, তখন সর্বাঙ্গ ঘিরে ব্রতচারিণীব বেশ। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীবিলাসের সাক্ষ্য —

'পাথর আবার গলিল। দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল, তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। পূজার অর্চনায সেবার মাধুর্য্যের ফুল ফুটিয়া উঠিল। তার সাজসজ্জারও বদল হইয়া গেল। আবার সে তসরের কাপড়খানি পরিল।'

এইটাই ছক। আত্মনিবেদনের মুহূর্তে দামিনীর পোশাক তসর। আত্মঘোষণার মুহূর্তে তার পোশাক প্রথা-না-মানার উগ্রতায় উজ্জ্বল। খুঁটিয়ে পড়লে এই ছককে ছোঁয়া যাবে তার কেশবিন্যাসেও। যখন ভক্তির দিকে, চুল এলো করা। যখন শক্তির দিকে, তখন

চোখের ভ্রূকুটি আর মেজাজের ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এলোখোঁপা ঘাড়ের উপরে স্পর্ধিত ভঙ্গীতে বাঁধা।

এই ছক তাঁর অন্য উপন্যাসের মত, 'ঘরে-বাইরে'-তেও। ওদের বাড়িতে সন্দীপের যেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ, বিমলা মাথা ঘষে, তার সুদীর্ঘ এলোচুলকে বেঁধে ছিল নিপুণ করে একটা লাল রেশমেব ফিতেয়। গায়ে জরির পাড়ের মাদ্রাসী শাড়ি। আর জরির পাড়-দেওয়া হাত-কাটা জ্যাকেট। বিমলার ঐ সাজ দেখে সন্দীপের উচ্ছ্বাস—

'ঐ যে লাল ফিতেটুকু, ছোট্ট একটুকু, রাশি রাশি ঘষা চুলের ভিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, ও যে কালবৈশাখীব লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা। ঐ পাড়ের এতটুকু ভঙ্গী, ঐ যে জ্যাকেটের এতটুকু ইঙ্গিত আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি তার উত্তাপ।' পরতে পরতে বিমলা তার ঐ জ্যাকেটের মধ্যে পেয়ে গিয়েছিল নিজের সত্তার ভিন্নতর পরিচয়। সন্দীপেব সাড়া পেলে, অথবা তার হাতের ছোট্ট কোনো চিরকূট। হাতের সেলাই অথবা অন্য যে-কোনো ঘরের কাজ ফেলে তক্ষুণি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে ঠিক করে নিত নিজের চুল, শাড়ি পালটাতো না। বদল করে নিত শুধু জ্যাকেট। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে জ্যাকেট-হীন বিমলা সংসারের সকলের। আর একটি বিশেষ জ্যাকেট পরা বিমলা শুধুমাত্র সন্দীপের।

চুলের ব্যাপারেও এমনি এক ছক। মেমসাহেবের কাছে শিখেছিল এক ধরনের ঘাড়-উঁচু-কবা খোঁপা বাঁধা। নিখিলেশের মনে হতো বিমলার ঘাড়টা মশাল আর তার ঊর্ধ্বে জ্বলে উঠেছে কালো খোঁপার কালো শিখা। নিজেদেব বাড়িতে সন্দীপের মধ্যাহ্ন ভোজনেব দিন তার ইচ্ছে করেছিল ঐ ঘাড় উঁচু খোঁপাটাই বাঁধতে পারে নি। কারণ সময়টা ছিল দুপুর আর মাথার চুলটা ছিল ভিজে।

সন্দীপ নামের রাহু তাদের দাম্পত্য-জীবনের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাকে খনির ভিতরকার গহ্বরের মতো উদ্ধারহীন অন্ধকারে মুড়ে দেওয়ার পর, বিমলার যে-খোঁপার স্তাবক ছিল একদা নিখিলেশ, তখন সেটাকেই মনে করছে চুলের কুন্ডলীমাত্র।

'যোগাযোগ-এর আরম্ভে ও শেষে কুমুব পোশাক সরু পাড়েব সাদা শাড়ি। মাঝখানে, যখন থেকে তার আত্মমর্যাদা অর্জনের লড়াই, তখন শাড়ি হয়তো সাদার বদলে ডুরে, কিন্তু পাড়ের বঙ সব সময়েই লাল। মধুসূদন ঐ লালের মধ্যে খুঁজে পায় তার পোষ-না-মানা নূর নগবী গর্ব। ঠিক তেমনি 'ঘবে বাইরে'-য সন্দীপ বিমলার শাড়ির লাল পাড়ে খুঁজে পায় রক্তরণে আলোড়িত দেশেব মাটির শক্তিমাতার প্রতীক। তাই বলে—

'লড়তে লড়তে মৃত্যুবাণ খেয়ে যদি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি তবে বুঝবো, সে কেবলমাত্র ভূগোল-বিবরণের মাটি নয়, সে একখানা আঁচল, কেমন আঁচল জানেন? আপনি সেদিন যে একখানি শাড়ি পরেছিলেন, লাল মাটির মতো তার রঙ, আর তার চওড়া পাড় একটা রক্তের ধারার মতো রাঙা, সেই শাড়ির আঁচল।'

বার্গম্যান তাঁর 'ক্রাইম অ্যাণ্ড হুইসপার'-এ অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করেছিলেন এই লাল রঙ, অসিধার বিদ্যুৎ চমকের মতো। এক লাল রঙের মধ্য তিনি ভরে দিয়েছিলেন একাধিক অর্থময়তা। অন্তর্সংঘাত, মৃত্যু, যৌনতা, অনুষঙ্গ, পাপবোধ আর চেতনার রক্তক্ষরণ।

যদি কোন কাহিনী থেকে উৎসার ঘটে লাল রঙের প্রতীকতা, আর পরিচালক

যদি যথার্থই উৎসুক এবং ইচ্ছুক হন এই জাতীয় অর্থময় ডিটেলকে তাঁর ছবিতে কাজে লাগাতে, তাহলে তাঁকে ভেবে নিতে হবে এবং তিনি ভেবে নিতে পারবেন এমন আসবাব, ঘরের এমন পরিবেশ, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে ঐ লাল রঙটি পেয়ে যেতে পারে তার প্রার্থিত তাৎপর্য, হয়ে উঠতে পারে আকাঙ্ক্ষিত প্রতীক। ছোট্ট একটি রঙের ডিটেল এইভাবেই জোগায় বড় ডিটেলের হদিশ।

২

এবার আমরা আসি সত্যজিৎ রায়-এর প্রসঙ্গে। তাঁর অভিযোগ এই উপন্যাসে কোনো রকমের সাহায্যকারী ডিটেল না পাওয়ায়। অথচ এটা কি সত্যি যে, যতটুকু ডিটেল উপন্যাসে ছিল তা কাজে লাগিয়ে ছিলেন তিনি। শুনতে বিস্ময়কর ঠেকলেও এর উত্তর, না।

প্রথমেই ধরা যাক সময়ের কথা।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নয়, 'ঘরে বাইরে' চলচ্চিত্রে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা নিখিলেশের গায়ে জড়ানো থাকতে দেখেছি দামি দামি শাল। বাদ কেবল ঘোড়ায় চড়ে বাইরে বেরনোর দৃশ্যে। এবং নিখিলেশের জামাকাপড় ঐ শালের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়েই। সর্বদাই সে অভিজাত সম্ভ্রান্ত এক রুচিবান বাবু। এ থেকে দর্শকদের মনে হতে পারে গোটা কাহিনীটাই বুঝি শীতকালের। অর্থাৎ ক্ষুদ্র একটা কালসীমার মধ্যে আটকানো। সময়ের মাপ খাটো হয়ে গেলে ঘটনার মধ্যে এসে যায় একটা অতিরিক্ত গতি। তা থেকে মনে হতে পারে বিমলার চরিত্রের পরিবর্তনটা বুঝি ধাপে ধাপে, দিনে দিনে, তিলে তিলে গড়ে ওঠা নয়। কাঙারুর মতো এক লাফে ঘটে যাওয়া। তখনই, চরিত্রের অন্তর্গত গোপন সংঘাতের স্তরগুলো চাপা পড়ে গিয়ে, তার ব্যবহারের আকস্মিকতায় দর্শকের কাছে স্খলিত হয়ে যায় চরিত্রটির আসল কাঠামো।

অথচ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সময়-সীমা বছর জোড়া। সন্দীপের দ্বিতীয় বারের আত্মকথায় শুনছি —

'আমি ঘরে এসে চৌকিতে বসে একটা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগলুম।'

বোঝা গেল সময়টা গ্রীষ্ম।

নিখিলেশের তৃতীয়বারের আত্মকথার শুরু এই বলে—

'ভাদ্রের বর্ষায় চারিদিক টলমল করছে।'

অর্থাৎ সময়টা বর্ষাকাল।

নিখিলেশের চতুর্থবারের আত্মকথায় পড়ি —

'আমার সেই শোবার ঘরের ভাঙা খাঁচাটির ভিতর থেকে যখন সেই হেমন্ত মধ্যাহ্নের খোলা আলোর মধ্যে বেরিয়ে এলুম........'

অর্থাৎ সময়টা কার্তিক-অগ্রহায়ণ।

এর পর কাহিনীর শেষ পর্যন্ত শীত।

'ঘরে বাইরে' চলচ্চিত্রে প্রায় গোটা ছবিটিকে শীতকাল, শীতের সাজ, শীতের শাল দিয়ে মুড়ে রাখায় হয়তো ছবিতে এসে গেছে একটা বাড়তি ঝলমলানি, কিন্তু পাত্র-পাত্রীদের যথার্থ স্বরূপে চিনে নেওয়ার পক্ষে সেটাই হয়ে উঠেছে প্রবল অন্তরায়।

সেকেলে বনেদি বাড়ির জলসাঘরে গান শুনতে বসার মতো আড়ম্বরময় বহুবর্ণ পোশাকে নিখিলেশকে ক্রমাগত দেখিয়ে যেতে থাকার মধ্যে। নিখিলেশের সমস্ত গভীর সংলাপকেও মনে হতে থাকে মুখস্থ, ধার করা। তার রক্তজাত সমস্যা-সংকট, তার অন্তস্থলের জ্বলুনি-পুড়ুনির ঘূর্ণী ভেদ করে উঠে আসা নয়। নিখিলেশ গায়ের জোরে বিদেশি বস্ত্র পোড়ানোর বিপক্ষে, সুতরাং সে কেতাদুরস্থ ফুলবাবু, এই রকম দুয়ে দুয়ে যোগ করা চার নয় তার চরিত্রের গড়ন। আমাদের মনে রাখা দরকার এই নিখিলেশ যখন দুঃস্বপ্নময় জীবনের অভিজ্ঞতার চাপে ঘুমোতে না পেয়ে জেগে ওঠে রাত তিনটেয় তখন তার মনে হয় — 'যে জগতে আমি একদিন বাস করতুম সে যেন মরে ভূত হয়ে আমার এই বিছানা, এই ঘর, এই সব জিনিসপত্র দখল করে বসেছে।'

প্রশ্ন তোলা যাক খুবই সহজ একটা। এমন মর্মান্তিক অভিঘাতে আক্রান্ত চরিত্র, রাত তিনটের পর সকাল হলে সে কি পরবে? রঙিন পাঞ্জাবি? চওড়া পাড়ের ধুতি?

আমাদের আরো কিছু মনে রাখা দরকার নিখিলেশ সম্বন্ধে, যা উপন্যাসে আছে কিন্তু চলচ্চিত্রে অনুপস্থিত।

নিখিলেশ পরগাছা বা প্যাবাসাইট জাতীয় জীব নয়। তাব হাত-পা নড়ে। সে নিজের হাতে বাগান করে। সে জাভা-মরিশাস থেকে আখ আনিয়ে চাষ করায়, সরকারি কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষের পবামর্শ শুনে সমস্ত রকমের কর্ষণ-বর্ষণ নিয়ে মাতে। সে সরকাবি কৃষি পত্রিকার লেখা তর্জমা করে চাষিদের দোরে দোরে ছোটে। সে দিশি মিল থেকে দিশি সুতো আনিযে হাটে বাখে, অন্য হাটে পাঠায়। সেই সুতোয় জোলাদের দিয়ে কাপড় বোনায়।

স্বদেশী যুগে, দেশেব প্রযোজনের জিনিশ দেশেই উৎপন্ন করার তাগিদে নানান চেষ্টায় উদ্যোগী হয়ে ওঠে সে। তার নানান সব চেষ্টাব মধ্যে একটা ছিল খেজুর গাছ থেকে নলের সাহায্যে এক জাযগায় সমস্ত রস জড়ো করে সেখানেই জাল দিয়ে চিনি বানানো। তাঁতেব কল কিংবা ধান ভানার যন্ত্র বা ঐ জাতীয কিছু তৈরি করার চেষ্টা কবেছে যে যখন, তার শেষ নিষ্ফলতা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য জুগিয়ে গেছে সে। সে জলে ডুবিয়েছে অনেক টাকা, বিলেতি কোম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরী যাত্রার জাহাজ চালানো কোম্পানি করতে গিয়ে। সে তাঁতের ইস্কুল খোলে। তার বাড়িতেই ব্যবহৃত হয় বাক্সো বাক্সো দিশি সাবান। একসময়ে নিজেদের অঞ্চলে স্বদেশী জিনিসের আমদানি তার নেতৃত্বে।

'ঘরে বাইরে' চলচ্চিত্রে নিখিলেশকে আমরা কোনো খণ্ডতম দৃশ্যেও দেখেছি এই জাতীয গ্রামীণ কর্মোদ্যোগের অংশগ্রহণকারী হিসেবে করালেই কিন্তু হিসেব মিলেযেত তাব পোশাকের, এই সব সামাজিক আর সাংগঠনিক কাজেব সঙ্গে সংলগ্নতাব ডিটেল থেকেই আপনি ফুটে উঠতো তার পোশাকের ডিটেল।

এসবকেও অগ্রাহ্য কবি যদি, বিমলাব অমন জলজ্যান্ত সাক্ষ্যটাকেও কি তুচ্ছ কবে দেওযা সম্ভব? যখন গোটা কাহিনীটা ঘটছে, তার আগে থেকেই নিখিলেশের জীবনযাপনের আড়ম্বরহীনতা ও কৃচ্ছ্রসাধনের ছবি তো বিমলা অকপটে শুনিয়ে দিয়েছে আমাদের।

'এখনো আমাব স্বামী তাঁব সেই দিশি ছুরিতে দিশি পেনসিল কাটেন, খাগড়ার কলমে লেখেন, পিতলের ঘটিতে জল খান, এবং সন্ধ্যের সময়ে শামদানে দিশি বাতি জ্বালিয়ে

লেখাপড়া করেন। কিন্তু তাঁর এই অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে আমরা মনের মধ্যে কোনো রস পাইনি। বরঞ্চ তখন তাঁর বসবার ঘরে আসবাবের দৈন্যে আমি বারবারই লজ্জা বোধ করে এসেছি। বিশেষত বাড়িতে যখন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা আর কোনো সাহেব সুবোর সমাগম হতো। আমার স্বামী হেসে বলতেন, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত বিচলিত হচ্ছ কেন?

ওঁর ডেস্কে একটা সামান্য পিতলের ঘটিকে উনি ফুলদানি করে ব্যবহার করতেন। কতদিন কোনো সাহেব আসবার খবর পেলে আমি লুকিয়ে সেটিকে সরিয়ে বিলেতি রঙিন ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে দিয়েছি।

আমার স্বামী বলতেন, দেখ বিমল, ফুলগুলি যেমন আত্মবিস্মৃত আমার এই পিতলের ঘটিটিও তেমনি। কিন্তু তোমার ঐ বিলিতি ফুলদানি অত্যন্ত বেশি করে জানায় যে ও ফুলদানি, ওতে গাছের ফুল না রেখে পশমের ফুল রাখা উচিত।' এই জাতীয় আসবাব পত্রের যার নিয়ত অবস্থান, তার পোশাক ভেবে নেওয়া কি দাবি করে দুঃসাধ্য কোনো কল্পনাশক্তির? অথচ চলচ্চিত্রে যখন দেখি এর বিপরীতটাই বাহুল্যময়, ত্যাগী চরিত্রের গায়ে ভোগীর আবরণ, সর্বদাই সর্বাঙ্গসুন্দর পোশাকে তার চলাফেরা, তখন বেদনার সঙ্গে এই সত্য মনের ভিতরে আছড়ে পড়তে চায় যে সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ডিটেলগুলি পড়েন নি, পড়ে থাকলে মনে রাখেন নি, মনে রাখলেও বিশেষ কারণে ব্যবহার করতে চান নি। চলচ্চিত্রের বর্ণাঢ্য নিখিলেশকে দেখে দর্শকের পক্ষে ভাবা সম্ভব নয় যে নিখিলেশও ভাবতে পারে এতখানি —

'পঞ্চু আমার মাস্টারমশায়ের একজন ভক্ত। কেমন করে এর সংসার চলে আমি জানি। রোজ ভোরে উঠে একটা চ্যাঙারিতে করে পান দোক্তা রঙিন সুতো আয়না চিরুনি প্রভৃতি চাষার মেয়েদের লোভনীয় জিনিস নিয়ে হাঁটু জল ভেঙে বিল পেরিয়ে সে নমঃশূদ্রের পাড়ায় যায়, সেখানে এই জিনিসগুলির বদলে মেয়েদের কাছ থেকে ধান পায়। তাতে পয়সার চেয়ে কিছু বেশি পেয়ে থাকে। যেদিন সকাল সকাল ফিরতে পারে সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাতাসাওয়ালার দোকানে বাতাসা কাটতে যায়। সেখান থেকে ফিরে বাড়ি এসে শাঁখা তৈরি করতে বসে। তাতে প্রায় রাত দুপুর হয়ে যায়। এমন বিষম পরিশ্রম করেও বছরের মধ্যে কেবল কয়েকমাস ছেলেপুলে নিয়ে দুবেলা দুমুঠো খাওয়া চলে। আর আহারের নিয়ম এই সে, খেতে বসেই যে এক ঘটি জল খেয়ে পেট ভরায়, আর তার খাদ্যের মস্ত একটা অংশ হচ্ছে সস্তা দামের বীজে-কলা। বছরে অন্তত চার মাস তার একবেলার বেশি খাওয়া জোটে না।'

গভীর ট্রাজেডির মতো এই সব জীবনযাপনের ডিটেলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই নিখিলেশের স্বদেশবোধ সমৃদ্ধ, স্বদেশীয়ানার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ, আবার অন্য দিকে স্বাদেশীয়ানার যুক্তিহীন মাৎস্যন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণের মতো নৈতিক শক্তিতে দৃপ্ত।

সন্দীপ স্বদেশীয়ানার যে-আগুনে নিজেকে সেঁকেছে, তা পুরোপুরি তত্ত্বের। কিন্তু সে যখন কথা বলে, মনে হয় বুঝি জীবনে জীবন যোগ-করা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার। অন্যদিকে নিখিলেশ যখন কথা বলে, মনে হয় শুকনো তত্ত্ব। অথচ নিখিলেশই পার হয়ে এসেছে আগুনের পথ, মানুষ আর সমাজের মাঝখান দিয়ে, তাদের দুহাতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ কাঁটার মুকুট পরা ক্রুশবিদ্ধ যীশুর বংশধর। কমল কুমার মজুমদার এ-ভাবেই চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন নিখিলেশকে।

'ঘরে বাইরে' চলচ্চিত্রের নিখিলেশ রমনীমোহন এক নায়ক মাত্র, মনে, শরীরে, সাজে সজ্জায় কোথাও যুদ্ধের আঁচড় লাগে নি যার।

৩

চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে নির্ধারিত লেখকের রচনা থেকে একজন পরিচালক কতখানি এবং কি কি ধরনের ডিটেল প্রত্যাশা করতে বাধ্য তা আমার জানা নেই। সম্ভবত সত্যজিৎ রায়েরও জানা ছিল না। এ লেখার শীর্ষদেশে তাঁরই রচনা থেকে যে-কটি উদ্ধৃতি, তা থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় তাঁর নিজের সিদ্ধান্তের অথবা প্রত্যাশারও বৈপরীত্য। তবে কোনো কোনো মহৎ সৃষ্টি থেকে কণামাত্র ডিটেল না পেলেও যে সেই সৃষ্টি অবলম্বনে নির্মাণ করা সম্ভব স্মরণীয় চলচ্চিত্র তার সবচেয়ে জ্বলজ্বলে নিদর্শন শেক্‌সপীয়র। এখানে ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে দিতে ইচ্ছে করছে যে শেকস্‌পীয়রের ছাপা নাটকে আজ আমরা যেটুকু ডিটেল পাই, সে যৎসামান্যটুকুও মূল লেখকের রচনার বাইরের জিনিস। প্রক্ষিপ্ত, পরে সংযোজিত। দৃষ্টান্ত, 'রোমিও জুলিয়েটে' তিনি শুধু লিখেছিলেন 'অঙ্ক এক, দৃশ্য এক।' পরে সংযোজিত হয়েছে —

অঙ্ক এক, দৃশ্য এক, ভেরোনা, একটি উন্মুক্ত চত্বর।

আর এই সামান্যতম সংযোজনকে মেনে নিতে পারেন নি গর্ডন ক্রেগের মত নাট্য-প্রতিভা। তাঁর বিক্ষোভ বচন —

'এর সবটাই মালোন, ক্যাপেল আর থিওবল্ড মহাশয়দের মতো কিছু উঠতি সম্পাদকের মূর্খ উদ্ভাবন মাত্র, যা নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর অন্যায় এবং যার জন্যে আজ প্রকৃত থিয়েটারের লেখকদের কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে।'

'ঘরে বাইরে' রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বিতর্কিত দুটি উপন্যাসের একটি। ৬৭ বছর আগে লেখা লুকাচের পুরনো কিছু রিভিউ-এর সংকলনের মারফৎ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের একটি ভ্রান্ত সমালোচনা আমাদের হাতের নাগালে এসে যাওয়ার পর টের পাওয়া গেল বিতর্কের সীমানা স্বদেশ ছাড়িয়ে আরও কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আর ঐ সমালোচনা চোখে পড়ার পরই হয়তো আমরা কেউ আরও বুক ফুলিয়ে বলবার আগে পেয়ে গেলাম যে উপন্যাস হিসেবে 'ঘরে বাইরে' একটি ব্যর্থ রচনা। একেও ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল কেউ। সে বিবৃতি এই রকম —

উপন্যাসটা বাজে। সত্যজিৎ রায়ই জাতে তুলে দিলেন ফিল্ম বানিয়ে।

উপন্যাস হিসেবে 'ঘরে বাইরে' কতখানি সার্থক অথবা ব্যর্থ, ভবিষ্যৎকালে তা নিয়ে আরো নিবিড় আলোচনা হবে নিশ্চয়ই। অনেকে নতুন করে ভাবতে চাইবেন কেন রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিতে লিখেছিলেন, এ উপন্যাস শুধু ভারতবর্ষকে মনে রেখেই লেখেন নি, জাপানে আর আমেরিকায় ন্যাশানালিজমের পাপের বিরুদ্ধে তাঁর যে-সব ভাষণ, তাঁর আলোয় হয়ত নতুন বাঁক নিতে পারবে অনেক পূর্ব-সিদ্ধান্ত। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসকে নিয়ে ভাবনার সেই উত্তরণ-পর্বে 'ঘরে বাইরে' চলচ্চিত্রও কি নিতে পারবে কোনো দিকনির্ণয়ী কম্পাসের ভূমিকা? এখুনি এর উত্তর দেওয়া সম্ভবত অনুচিত।

এ আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানতে আমরা চলে আসি উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে।

কাহিনী যখন স্পর্শ করে চলেছে তার চূড়ান্ত ট্র্যাজিক বিন্দুকে, বিমলা দেখছে —

'রাস্তায় অনেক আলো। অনেক ভিড়। অন্ধকারে সমস্ত জনতা এক হয়ে জুড়ে গিয়ে মনে হল একটা প্রকাণ্ড কালো অজগর একে বেঁকে রাজবাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকতে চাইছে।' এই প্রথম আমরা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম নিখিলেশের সঙ্গে, জীবিত অথবা মৃত যে-কোনো নিখিলেশের সঙ্গে তার প্রজাসাধারণের আত্মিক সম্পর্কের একটা ঘনবদ্ধ রূপ। পারিবারিক গণ্ডীকে ছাড়িয়ে এই প্রথম কাহিনীর শূন্যস্থানে এসে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল অল্প কিছু মানুষ নয়, হিন্দু-মুসলমানে মেশানো বৃহত্তর জনতা, যাদের বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করেই দুই বন্ধুর মধ্যে মতাদর্শের সংঘাত।

সুস্পষ্টভাবে 'জনতা' শব্দটি বিমলার ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের সংযোজন। উপন্যাস থেকে এমন অভ্রান্ত ইঙ্গিত পেয়েও সত্যজিৎ তাঁর ছবিকে ইন্টারপ্রিটেশনের বদলে টেনে নিয়ে গেলেন নিছক ইলাসট্রেশনে। তাই এ ছবির শেষ দৃশ্যে আমরা দেখলাম বিমলার বৈধব্য আর নিমন্ত্রণ বাড়িতে ভোজ খেতে আসার ভঙ্গীতে নাদুস-নুদুস চালে মুরুব্বি গোছের কিছু মানুষের শোকসন্তাপহীন এগিয়ে আসা।

ইন্টারপ্রিটেশনের মহান গরজে 'কোজিন্ত্সেভ'-এর 'কিং লিয়র' ছবির প্রথম দৃশ্য শুরু হয় শৃঙ্খলিত মানুষের ক্লান্ত করুণ পদক্ষেপে।

ইন্টারপ্রিটেশনের মহান গরজের অভাবেই, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের শিকলে আটকানো স্বদেশী যুগের গ্রামীণ মানুষ তাদের দিশেহারা জিজ্ঞাসা নিয়ে অনুপস্থিত থেকে গেল 'ঘরে বাইরে' চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে।

তাহলে কি বুঝতে হবে রবীন্দ্রনাথ লিখিত এই 'জনতা' শব্দটি চলচ্চিত্রের ডিটেল সন্ধানের এলাকায় মাথা গলানোর পক্ষে যোগ্যতাহীন?*

* রচনাটি ১৯৮৯-এ 'টেগোর ইনস্টিটিউট' আয়োজিত 'ঘরে বাইরে' চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সেমিনারে পঠিত।

ঘরে-বাইরে
নিত্যপ্রিয় ঘোষ

সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' চলচ্চিত্রের তিনটি অংশ মনে করা যেতে পারে। মিস্ গিলবির বিদায়দৃশ্যে বিমলা স্তব্ধ হয়ে মিস্ গিলবির হাত ধরে বসে আছে, মিস্ গিলবিও নিঃস্পন্দ।

সন্দীপের ফটোগ্রাফ বিমলা ফোটোস্ট্যাণ্ড থেকে খুলে সযত্নে এবং গভীর মায়ায় রেখে দেয় নিজের কাছে।

বিমলা জানালা দিয়ে দেখে, প্রায় শোভাযাত্রা করে নিখিলেশকে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং তার পরে পর্দায় ভেসে ওঠে বিমলার বিধাবার সাজ।

এই তিনটি অংশই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস থেকে সরে এসেছে। উপন্যাসে, বিমলার মিস্ গিলবির কাছে ইংরেজি শেখা পছন্দ নয়, কারণ তার মনে তখন স্বদেশী জোয়ার এবং মিস্ গিলবিকে সে ত্যাগ করতে চায়। চলচ্চিত্রে, বিমলা মিস্ গিলবির অপমানে দুঃখিত, স্তব্ধ। উপন্যাসে সন্দীপের ছবি বরাবরই ফোটোস্ট্যাণ্ডে ছিল না, নিখিলেশ-বিমলার যুগল ছবি থেকে বিমলার ফোটো খুলে নিয়ে সন্দীপ নিজেরটা জুড়েছিল। সন্দীপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর বিমলা সেখান থেকে সন্দীপের ছবি রেখে দেয় তার গোপন বাক্সতে। চলচ্চিত্রে, গোড়া থেকেই ছবিটি ফোটোস্ট্যাণ্ডে। উপন্যাসে, নিখিলেশ মৃত বা আহত সে বিষয়ে স্পষ্টতা নেই, ছবিতে স্পষ্টই নিখিলেশ মৃত।

উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার সময় উপন্যাস পরিবর্তিত হতেই পারে। উপন্যাসের তিনটি বাক্যের বর্ণনা চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পনেরো মিনিট চলে যেতে পারে। সুতরাং, উপন্যাসের চলচ্চিত্রে রূপায়ণের সময় বর্জন, পরিবর্ধন, পরিবর্তন ঘটতেই পারে। যেহেতু সত্যজিৎ উপন্যাসটির নাম, চরিত্রগুলোর নাম, ঘটনাস্থলের নাম, সময়সীমা, ঘটনাক্রম অবিকৃত রেখেছেন, আমরা ভেবেছিলাম চলচ্চিত্রটি উপন্যাসেরই দৃশ্যরূপ, যেটুকু পরিবর্তন ঘটবে সেটা লিখিত ভাষা থেকে সেলুলয়েডের ভাষায় পরিবর্তনের জন্য। যে তিনটি অংশ উপরে নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই তিনটির জন্য কিন্তু উপন্যাসের সঙ্গে চলচ্চিত্রটির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। এবার পরিবর্তনের ব্যঞ্জনাটি পুরো পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক।

চলচ্চিত্রে বিমলা চরিত্রটি স্বাধীনচেতা রমণী বলে মনে হয় নি। তাকে কলের পুতুলের মতো সাজগোজ করানো হচ্ছে, গান শেখানো হচ্ছে। সন্দীপের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত তাকে মনে হচ্ছে একটি জমিদারবাড়ির গৃহিণীর মতো, কিছুটা আহ্লাদী, কিছুটা আত্মসর্বস্ব, বিলাসবৈভবে মগ্ন। উপন্যাসের প্রথম ভাগে বিমলাকে আমরা পেয়েছিলাম তীব্র আত্মসচেতন, সঙ্কীর্ণ জমিদারবাড়ির মগ্নজীবনে বিমুখ, স্বদেশীচিন্তায় নিখিলেশের সমালোচক। উপন্যাসে বিমলা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। সন্দীপের আবির্ভাবের পর, ঘাত-প্রতিঘাতে অগ্ন্যুৎসব ঘটল, অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিমলা নিজেকে চিনতে পারল এবং

নিখিলেশের সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করে বৃহত্তর জীবনে পদক্ষেপ করতে যাচ্ছে। মিস্ গিলবির প্রতি তার কোনো সহানুভূতি নেই, সেই সহানুভূতিহীনতা তার স্বদেশী চিন্তারই অংশ। মিস্ গিলবির হাত ধরে বসে থাকা চলচ্চিত্রের যে রূপ, সেই রূপটিতে সেই অগ্নুৎগীরণের সম্ভাবনা নেই, বরং চলচ্চিত্রের বিমলা শান্ত, অভিমানাহত, কোমলপ্রাণ। বিমলার এই রূপটি ফুটিয়ে তোলার জন্যই মিস্ গিলবির হাত-ধরে থাকা। চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে আমাদের বিমুখতার শুরুই হয় এইভাবে, উপন্যাস থেকে বিচ্যুতির জন্য।

যাঁরা চলচ্চিত্রটি ইংরেজী সাবটাইটেলের সাহায্যে দেখবেন, তাঁদের কাছে ছবিটি দাঁড়াবে এইরকম।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে একটি জমিদারবাড়ির তরুণ জমিদার আলোক-প্রাপ্ত হয়ে ঠিক করল, স্ত্রীকে স্বাধীনতা দেওয়ায় দরকার, ঘরের মধ্যে আটকে রাখা ঠিক নয়। অতএব স্ত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও সে বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। পরপুরুষের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর, সে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করল, স্ত্রী বন্ধুটির প্রেমে পড়ে গেছে। কিন্তু সে জবরদস্তি পছন্দ করে না। স্বদেশী করা তারও পছন্দ, কিন্তু জবরদস্তি করে নয়। বন্ধুটির সঙ্গে এই জবরদস্তি স্বদেশী নিয়ে সে যেমন তর্ক করে, তেমনই সে চায় না জবরদস্তি করে বন্ধুকে সে ভাগিয়ে দেবে বাড়ি থেকে বা জবরদস্তি করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনবে। এদিকে স্ত্রীটি বন্ধুর স্বদেশীভাবনায় উদ্দীপ্ত, বাড়ির অন্য বধূর সন্দেহে উত্ত্যক্ত এবং স্বামীর আপাত-অবহেলায় ক্ষুব্ধ; কিন্তু যে মুহূর্তে সে জানতে পারে বন্ধুটির স্বদেশী থেকে আত্মতুষ্টিতে বেশি লোভ, সেই মুহূর্তে সে স্বামীর কাছে ফিরে আসে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অঘটন ঘটল, স্বামী হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে মুসলমানদের হাতে প্রাণ দিল। ফলে সে বিধবা হলো এবং তার সেই বিধবার মূর্তি বাড়ির অন্য বিধবাটির মতো, যে বিধবাটি জমিদার বাড়ির বাইরে কী আছে জানতে চায় না, খেয়ে-ঘুমিয়ে-পরচর্চা করে ঝি-চাকরদের সঙ্গে দিব্যি জীবন কাটায। বাইরে আসার চেষ্টার পর স্ত্রী আবার ঘরে ফিরে যায, তার কূপমণ্ডুক জীবনে।

অর্থাৎ ছবিটি হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে স্ত্রী-মুক্তি আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি ছবি।

আর একটু স্থূলভাবে দেখলে, ছবিটি বাঙালি জমিদারবাড়ির একটি কেচ্ছার কাহিনী, যেটা গড়ে ওঠে জমিদারবাড়ির বউরা জমিদারবাড়ির প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ব্যভিচারে মত্ত, এই সন্দেহের উপর।

ধরা যাক, আমরা উপন্যাসটি পড়ি নি। চলচ্চিত্রটির বিজ্ঞাপন দেখে ছবিটি দেখতে গেছি। চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনে আগুনের ফুলকি। ছবির কাহিনী শুরু করার আগে আগুন, ছবির শেষে আগুন। আগুনের এই ব্যবহারে আমরা যে অগ্ন্যুৎগীরণের অপেক্ষায় থাকি, সেই উৎগীরণ কিন্তু কোনো চরিত্রে ঘটে নি। বিমলা শান্ত, নিখিলেশ শান্ত, একমাত্র সন্দীপের মধ্যে উৎগীরণের লক্ষণ দেখা গেছে। কিন্তু অভিনয়ের দোষে, সৌমিত্রের কষ্টকর বাচনভঙ্গিতে বাগ্মিতার আগুন ছড়ায় নি, উদ্দামতার বদলে এসেছে তৈরি করা কথামালা। সত্যজিৎ হয়তো আগুনকে প্রচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী সন্দীপের জন্য দর্শকের কোনো সহানুভূতি তিনি তৈরি করান নি, ফলে সন্দীপের প্রতি বিমলার আকর্ষণ দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নি। ফলে অগ্নিস্রাবী যে অবস্থার প্রস্তুতি সত্যজিৎ করেছেন,

তার তাপ দর্শকরা কখনোই অনুভব করেন না। কথাটি কী? নিখিলেশের কাছ থেকে সন্দীপের দিকে বিমলা কেন সরে যাচ্ছে, সেটা স্পষ্ট নয়। শুধু মনে হয়, স্তুতিতে অভিভূত বিমলা আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে। এতে বড়ো জোর করুণার উদ্রেক হতে পারে, দর্শকদের মনে কোনো আলোড়ন হতে পারে না। যদি বোঝা যেত নিখিলেশ এবং সন্দীপ দুই জাতের চরিত্র এবং দুজনেই সমান আকর্ষক তাহলে বিমলার দ্বন্দ্বে দর্শক অংশ নিতে পারত। কিন্তু সন্দীপ যেহেতু ভণ্ড, এখানে দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই।

চারিত্র্যের কথা ছেড়ে দিলেও, আদর্শের দিক থেকেও কোনো প্রবল দ্বন্দ্ব নেই। ছবিতে অবশ্য একটি দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে। নিখিলেশ স্বদেশী চায়, সে নিজেও চেষ্টা করেছিল, স্বদেশী ব্যবসা করতে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। সন্দীপও স্বদেশীর প্রচার চায়। স্বদেশীর প্রচারে গরিবদের কষ্ট হচ্ছে, কেননা কিছু স্বদেশী পণ্যের চাইতে বিদেশি পণ্য সস্তা, যেমন জার্মান র‍্যাপার, ম্যাঞ্চেস্টার মিলের কাপড়, নুন ইত্যাদি। সুতরাং গরিবরা স্বদেশীতে, বিদেশি পণ্য বর্জনে অংশ নিচ্ছে না। সন্দীপ চায় ছলেবলে কৌশলে বিদেশি পণ্য বর্জন, গরিবদের সাময়িক কষ্ট সত্ত্বেও। কিন্তু নিখিলেশ এই জবরদস্তিতে রাজি নয়, ছলেবলে কৌশলে তার আপত্তি।

যে কোনো দেশেরই অর্থনৈতিক বিবর্তনে দেখা যায় এমন একটা সময় আসে যখন দেশীয় পণ্য এবং উৎপাদনকে রক্ষা করার জন্য Protective Tariff বসাতে হয়, বিদেশি পণ্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষের বয়কট আন্দোলন ছিল এই Protection-এর জন্য বয়কট, যেহেতু ভারতবর্ষ তখন উপনিবেশ এবং দেশের শাসনভার দেশবাসীর হাতে নেই।

উপনিবেশে Free Enterprise থাকলে দেশবাসীর সমূহ ক্ষতি, দেশবাসীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। সুতরাং স্বদেশী পণ্যরক্ষার জন্য সাময়িকভাবে ক্ষতি এবং কষ্ট সত্ত্বেও বয়কট অপরিহার্য। সুতরাং নিখিলেশ এবং সন্দীপের যে পদ্ধতিগত দ্বন্দ্ব, সেটা কোনো দ্বন্দ্বই নয়, দর্শকের চোখে। চলচ্চিত্রে বলাই হচ্ছে, নিখিলেশ বারে বারে বলছে, পরিচালক চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের বারে বারে দেখাচ্ছেন, প্রায় inventory তৈরি করে যে, নিখিলেশও স্বদেশীর ভক্ত। তাহলে নিখিলেশের স্বদেশী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল কেন? কেননা ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে সে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশপণ্যের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে নি, পারার কথাও নয়। এই প্রতিযোগিতায় বয়কট, অসহযোগিতা, স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার প্রথম কর্তব্য ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বয়কট আন্দোলন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটি দিকচিহ্ন হয়ে আছে। বয়কট আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু এই সময় থেকেই দেশী enterpreneurship-এর শুরু। ছবি দেখার সময় আমাদের সব সময়ে এই কথাটি মনে থাকে, নিখিলেশ-সন্দীপের রাজনীতির, পদ্ধতির দ্বন্দ্ব আমাদের বিচলিত করে না, কেবলই মনে হয় নিখিলেশ ভ্রান্ত।

'ঘরে-বাইরে' চলচ্চিত্রটির সবচাইতে বড় দুর্বলতা তার কাঠামোয়। ছবিটির তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে বিমলা। দ্বিতীয় ভাগে সন্দীপ-নিখিলেশের রাজনীতি। তৃতীয় ভাগে হিন্দুমুসলমানের সংঘর্ষ। এই তিনটি ভাগের পারস্পরিক কোনো যোগ নেই। বিমলা চরিত্রে রাজনীতি অনুপস্থিত, ফলে বিমলাকে দেখতে দেখতে আমরা সন্দীপ-নিখিলেশের রাজনীতিতে অনায়াসে চলে যেতে পারি না। আবার সন্দীপ-নিখিলেশের রাজনীতি

অবধারিত ভাবে আমাদের হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষে উন্নীত করে দেয় না। সন্দীপ-নিখিলেশের রাজনীতির আবর্তে কী হওয়া উচিত ছিল? গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত গরিবদেরই স্বার্থে ঘা লাগার কথা, কেননা বয়কট তাদের ক্ষতি করছে। এটা হতে পারত গরিবদের সঙ্গে স্বদেশীবাবুদের সংঘর্ষ। কিন্তু দেখা গেল দাঙ্গা ঘটছে হিন্দু-মুসলমানে। ধরা যাক, স্বদেশীবাবুরা সবাই হিন্দু, গরিবরা সবাই মুসলমান। কিন্তু ঘটনা তো অন্যরকম, গ্রামের জমিদার স্বয়ং স্বদেশীবাবুদের বিরুদ্ধে। তাছাড়া, বড়ো কথা যেটা, সেটা এই ঃ ঘটনাচক্রে যদি ওই গ্রামটির চেহারা এমনই হতো যে স্বদেশীবাবুরা সবাই হিন্দু এবং গরিবরা সবাই মুসলমান, তাহলে দাঙ্গাটা বোঝা যেত। কিন্তু সেই দাঙ্গা হয়ে থাকত একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। শিল্পে বিচ্ছিন্ন ঘটনার কোনো স্থান নেই, কেমন তাব কোনো পরিপ্রেক্ষিত নেই, ব্যঞ্জনা নেই। সংবাদপত্রের ঘটনা যেমন শিল্পের ঘটনা নয়। শিল্পের ঘটনায় তার নিজস্ব বিশ্ব আছে, তার গতির নিজস্ব যৌক্তিকতা আছে, যেজন্য সেই ঘটনার মধ্যে পাঠক, দর্শক, শ্রোতা সকলেই নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন, যার ফলে শিল্পের আবেদন ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত, যেজন্য লেখক-পরিচালক-শিল্পীর শিল্পকর্ম অন্যাদেব বিচলিত করে। 'ঘরে-বাইরে' চলচ্চিত্রের দাঙ্গাটি আমাদের বিচলিত কবে না, কেননা ওই দাঙ্গা আমাদের অনিবার্য মনে হয় নি, ওই দাঙ্গার জন্য আমাদের নিজেদেব গ্লানি বোধ হয় না, দায়িত্ববোধ আমাদের জাগে না। অন্য কথায়, ওই দাঙ্গা আমাদের সমকালীন রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক মনে হয না, কেবলই মনে হয় কোথায়ও কখনও ওরকম একটা দাঙ্গা হয়েছিল, যা খুবই দুঃখের ব্যাপার। অথচ হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ, প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে, আজো সত্য, সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা ভাবতবর্ষের আজো কলঙ্ক এবং এই কলঙ্ক কীভাবে দূর করা যায়, তার ইঙ্গিত আমরা আজো পাই নি। ইতিহাসের চাইতে শিল্প আমাদের অনেক কাছে। ইতিহাস আমাদের দেয় macro-view, সেখানে পর্বত-সমতল, নদী-উপত্যকা প্রায় একাকার হয়ে যায়, শিল্পে আমরা অনেক কাছাকাছি আসি। মানুষ যে মানুষ বা অপমানব, সেটা স্পষ্ট লক্ষ করি। 'ঘরে-বাইরে' ছবির ব্যর্থতা এইখানে যে দাঙ্গাটি আমাদের নাড়া দেয় না, তার কারণ এই নয় যে মৌলবীদের ছবি, হাটের ছবি, ষড়যন্ত্রের ছবি খুব মোটা দাগে দেখানো হয়েছে। মূল কারণ, গরিব-বড়লোক ব্যাপারটা কীভাবে হিন্দু-মুসলমানে রূপান্তরিত হয়ে গেল, তার কোনো ব্যাখ্যা আমাদের পাই না। আর যে বিমলার প্রস্তুতি দিয়ে ছবির শুরু, তার সঙ্গে তো এর কোনো সংযোগই নেই, ফলে ছবির ভারসাম্য ধ্বংস হয়ে গেছে। এই দোষটি কিন্তু উপন্যাসের নয়। উপন্যাসে বিমলা চরিত্র একরেখ নয়, তার বহুরেখ চারিত্র্যই উপন্যাসের মূল উপজীব্য, সেখানে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ অত্যন্ত সংক্ষেপে এসেছে। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত অংশটি পৃথুল হয়ে 'ঘরে-বাইরে' চলচ্চিত্রটি আকৃতিহীন হয়ে গিয়েছে।

কোনো উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র করতে গেলে পরিবর্তন করতেই হয়, কিন্তু পরিবর্তনের অধিকার কতটুকু? এটা প্রথম প্রশ্ন, তবে হয়তো গৌণ। মূল প্রশ্নঃ পরিবর্তিত হয়ে চলচ্চিত্র যে রূপ পেল, সেই রূপের নিজস্ব শিল্পবিশ্ব কি গড়ে উঠেছে? 'ঘরে-বাইরে' দেখার পর দুটো প্রশ্নই অস্বস্তিকর ভাবে পীড়া দেয়। পরিবর্তিত তো হয়েইছে, কিন্তু পরিবর্তিত রূপটিই কি তার নিজস্ব যুক্তিপরম্পরায় গড়ে উঠেছে? আলোচনার প্রারম্ভে যে তিনটি পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে তার দ্বিতীয়টি

অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তাই কি? উপন্যাসে ছিল, দুই বন্ধুর ফোটোগ্রাফ বরাবরই ছিল না। চলচ্চিত্রে দেখা গেল, সেই ছবিটির ঘরে আছে বরাবর। নিখিলেশের সঙ্গে সন্দীপের বন্ধুত্ব কি তেমনই গভীর? সেই ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকারের কাছে আর একটি মাত্রা যুক্ত করতে হয়, বন্ধুত্ব, প্রণয়, রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু সেই বন্ধুত্বের মাত্রা তেমন গুরুত্ব ছবিতে পায় নি, দুয়েকটি কথাবার্তা ছাড়া। ছবিটি বন্ধুত্বের বিনষ্টির ছবি নয়। অর্থাৎ প্রণয়ের উপর তেমন জোর না দিয়ে বন্ধুত্বের উপর বেশি জোর দিলেই, এই ছবির ব্যাপারটা প্রাসঙ্গিক হতো।

তেমনই অস্বাভাবিক শেষ দৃশ্যে বিমলাকে বিধবার সাজে দেখানো। ঘটনা-পরম্পরায় শেষ পর্যায়ে বিমলা-নিখিলেশের ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে, উপন্যাসেও, চলচ্চিত্রেও। এই অবসানটিই উপন্যাসের এবং চলচ্চিত্রের মূল সুর। সুতরাং উপন্যাসে নিখিলেশ মৃত বা আহত এ বিষয়ে অস্পষ্টতা আমাদের বিচলিত করে না, বিপর্যয়ের নিরসন হয়েছে এতেই পাঠক তৃপ্ত। কিন্তু সেই তৃপ্তি চলচ্চিত্রে সমূলে বিনষ্ট করা হয়েছে, অর্থাৎ বিমলা বিধবা হলো কি না হলো সেটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। ফলে আচমকা বিমলাকে বিধবার সাজে দেখে দর্শকরা হতভম্ব হয়ে যান। ভুল বোঝাবুঝির অবসানের পরিবর্তে মনে হয় বিমলার পাপের শাস্তি হলো। তাহলে কি বিমলা পাপ করেছিল এটাই চলচিত্রের বক্তব্য? কীসের পাপ? এটা কি মধ্যযুগীয় সতীত্ব এবং সতীত্ব বিনাশের শাস্তির গল্প? 'ঘরে-বাইরে'র মতো জটিল মনস্তত্ত্বের উপন্যাসের এই মামুলি সতীত্বহানির চেহারা আমাদের হতাশ করেছে।

ঘরে-বাইরে ঃ ২

'ঘরে-বাইরে' চলচ্চিত্রটির শুরু আগুন দিয়ে। আগুন পর্দা থেকে সরে গেলে ভেসে ওঠে বিমলার বিধ্বস্ত মুখ এবং আরম্ভ হয় তার জীবনবৃত্তান্ত। ছবির শেষে আবার ফিরে আসে এই বিধ্বস্ত মুখ, আস্তে আস্তে কপাল থেকে মুছে যায় সিঁদুরের টিপ, শাড়ি পালটে হয়ে যায় বিধবার থান।

চলচ্চিত্রটির তাহলে বিষয় হলো, বিমলা কেমন করে বিধবা হলো। 'নষ্টনীড়' নামটি পালটে সত্যজিৎ রায় একটি ছবি করে নাম দিয়েছিলেন 'চারুলতা'। 'ঘরে-বাইরে' নামটি পালটে তিনি কেন ছবিটির নাম 'বিধবা বিমলা' করলেন না, রহস্য থেকে গেল।

সত্যজিৎ রায় ছবি করলে প্রচুর কথাবার্তা হয়, যাকে বলে controversy। এই ছবিটি নিয়ে একটু বেশিমাত্রায় হচ্ছে, হবেই। এবার controversy হচ্ছে ঃ বিমলা বিধবা হলো কি হলো না। Controversy-র সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথই করে গিয়েছিলেন, তিনি স্পষ্ট করে বলে যান নি, নিখিলেশ মরল কি মরে নি। তিনি হয়তো ভেবে যান নি, এটা আবার আলোচনার বস্তু হতে পারে। মানুষ যখন, একদিন না একদিন নিখিলেশ মরবেই। বিমলার মতিভ্রম হয়েছিল, চৈতন্যোদয়ের পর বিমলা নিখিলেশের কাছে ফিরে এসেছে, এটা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলে গিয়েছিলেন। 'ঘরে-বাইরে' ট্র্যাজেডি নয়, কেননা ট্র্যাজেডির উৎস হচ্ছে এমন দুই শক্তির দ্বন্দ্ব যে-দ্বন্দ্বের নিরসন মানুষের হাতে নেই। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের দ্বন্দ্ব মোহ এবং মোহমুক্তির, যে-মোহ অবশ্যম্ভাবী নয়, যে-মোহ মতিচ্ছন্নতার পরিণতি, যে-মোহ পাঠককে কষ্ট দেয়, আবার করুণারও উদ্রেক করে। মোহমুক্তিতে পাঠক

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে। সুতরাং উপন্যাসটি পড়ার পর পাঠকের এই চিন্তা ওঠে না, নিখিলেশ যে আহত হয়ে ফিরে এল সে বাঁচবে তো? আত্মিক অর্থে নিখিলেশ বেঁচেই গেছে, মোহ-মুক্তির পর বিমলা ফিরে এসেছে। কিন্তু এই যে অস্পষ্টতা রেখে গেলেন রবীন্দ্রনাথ, এটাই কাল হলো। বাংলা ঔপন্যাসিকেরা concrete details রেখে যান না, তাতে চলচ্চিত্রকারদের খুব অসুবিধে হয়, এমন একটা কথা কোথাও যেন সত্যজিৎ লিখেছিলেন। খুবই অসুবিধে হয়। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, আবার সত্যজিতেরও, তাঁরা বলেছেন, বিমলা বিধবা হয় নি ছবিতেও। স্বামীর আহত হওয়ার খবর পেয়ে বিমলার আতঙ্ক হয়েছিল, সে-ও বুঝি বিধবা হলো, তারও বোধ হয় চেহারাটা হবে মেজো গিন্নীর মতো, যে মেজো গিন্নীর সঙ্গে তার কথা বলার প্রবৃত্তি হয় না। শেষের দৃশ্যে যে বিধবার, সাজ, সেটা বিমলার কল্পনা, দুর্ঘটনার কথা শুনলে যে-কোনো বাঙালি মেয়েরই ওই রকম আতঙ্ক স্বাভাবিক। সত্যজিৎ যে নারীচরিত্র সম্পর্কে অসাধারণ ওয়াকিবহাল, এটা তারই নিদর্শন। হবেও বা। তবে পাল্কিবাহিত নিখিলেশের সঙ্গে সিঙ্গল ফাইলে (সুদৃশ্য আঁকাবাকা হেজের জন্য লঙ শটে সিঙ্গল ফাইল ছাড়া উপায় ছিল না, আর দৃশ্যটি বড়ো নয়নাভিরামও বটে) আসার সময় যে ধীরগতিতে নিখিলেশের অনুগতরা আসছিল, পুরোধা মাস্টারমশাই কোঁচার খুঁটে যেভাবে একবার চোখ মুছলেন, তাতে মনে হয়েছিল, নিখিলেশের 'হয়ে গেছে'। শুধু আহত হলে, চ্যালা-চামুণ্ডাদের দৌড়োদৌড়ি করার কথা, ডাক্তারের খোঁজে। ওই দৃশ্যের পর, বিধবার থান দেখে, আমাদের যদি মনে হয়, মুসলমানেরা নিখিলেশের দফা নিকেশ করে দিয়েছে, তাহলে আমাদের দোষ দেওয়া উচিত নয়। দেখতে হবে, এবিষয়ে British Press কী বলেন, ওঁরা ব্যাপারটা ভালো বোঝেন। Wrong reason-এ সত্যজিৎকে প্রশংসা করা কোনো কাজের কথা নয়।

নিখিলেশকে মুসলমানেরা কোতল করে দেবে এর জন্য সত্যজিৎ ঠিকমতো প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। নিখিলেশ চরিত্রটিকে দেখা যাক। এক সময়ে সে স্বদেশী করতো। এটা মাস্টারমশায় বেশ সজোরে বলেছিলেন, এবং সেটা সন্দীপের মতো আত্মতুষ্টির জন্য নয়, নিঃস্বার্থ ভালোবাসার জন্যই। কিন্তু মাস্টারমশায়রা যে কিছুই বোঝেন না সেটা সত্যজিৎ বেশ সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। আসল কথাটি ফাঁস করে দিয়েছে নিখিলেশ তার বৌদির কাছে। বিমলার ফষ্টিনষ্টিতে আহত সাপের মতো (এই আহত সাপ ফোঁস করে ওঠে না, কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে) ইজিচেয়ারে আসীন / শয়ান নিখিলেশকে যখন বৌদি পুরনো সাবান দিয়ে সান্ত্বনা দিতে যান, তখন নিখিলেশ বলেই ফেলে, ওই সব ছেলেমানুষীর কথা আর কেন? সেই সব ছেলেমানুষী অতীতের কথা। আমরা যে নিখিলেশকে দেখি সে সংযমী পুরুষ, শান্ত মানুষ, নেশা পছন্দ করে না (এই সংযম, শান্তস্বভাব এবং নেশার প্রসঙ্গে আমাদের আবার আসতে হবে), নৌকোয় চেপে কবিতা পড়ে, ভারতীয় নারীর পর্দা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে। সনাতন ভারতবর্ষে পর্দা ছিল না, এটা মুসলমানদের অবদান এবং এই বদ্ অবদান রোধকল্পে সে নিজের স্ত্রীকে পর্দার বাইরে আনবেই। এই আনতে গিয়ে যে ঝামেলা হলো, সেই ঝামেলাটি চলচ্চিত্রটির বিষয়, বিমলার বিধবা হওয়া যার অঙ্গ। বাইরে আনাতে গিয়ে বিমলা সন্দীপের খপ্পরে পড়ল, বিমলাকে পটানোর জন্য সন্দীপ সুখসায়র ছেড়ে যেতে চায় না, ছুতো করে স্বদেশী করে, মুসলমানেরা খচে যায়, দাঙ্গা লাগে, নিখিলেশ গত হয়, বিমলা বিধবা হয়। সুতরাং মুসলমান-দান

পর্দার সংস্কারে নিখিলেশের আত্মাহুতি — এই নিগূঢ় ঘটনাপরম্পরা বোঝার জন্য ছবিটি তিনবার দেখা কর্তব্য, একবার দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না।

নিজের স্ত্রীকে নিয়ে চিন্তা করা ছাড়াও, নিখিলেশ জমিদারও বটে। সত্যজিৎ খুব সুন্দর দেখিয়েছেন, জমিদার হিসেবে নিখিলেশের কোনো হোল্ড নেই। গ্রামের যুবকরা এসে তার কাছে চোখ রাঙায় বয়কট করা নিয়ে। শান্তস্বভাবের নিখিলেশ যুক্তির ভক্ত। ব্যবসায়ীরা মাল বেচাকেনা করছে, তাতে জমিদারের করার কী আছে? দূরদর্শী নিখিলেশ গ্রামের বয়স্কদের বোঝায়, দাঙ্গা হতে পারে। কিন্তু সেখানেও কোন হোল্ড নেই। বয়স্করা গম্ভীরমুখে শোনে, কী বোঝে ভগবান জানেন। অতঃপর নিখিলেশ হ্যাটকোট চাপিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁশঝাড়ে ঢুকে দেখে খুব বিপদ। কিন্তু বিপদে সে ভয় পায় না। শেষের দিকে সে দ্বিতীয়বার ঘোড়া চালায় (এইবার ঘোড়ার খুরের টকাটক শব্দ বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘা দেয়, প্রথমবার ঘোড়ার খুরে সাইলেন্সার ছিল, তিনবার ছবি দেখা না থাকলে এসব বোঝা যাবে না)। কিন্তু ঘোড়া চালালে কী হবে, আমরা তো জানি এই জমিদারের কথা গ্রামের লোকেরাই শোনে না, ঢাকার মৌলবী আর খ্যাপা মুসলমানেরা শুনতে যাবে কোন্ দুঃখে। গ্রামের মুসলমানেরা তো জানে না, তাদের জমিদার তাদের for-এ। খুব কৌশলে, নিখিলেশকে গ্রামের মুসলমানদের সঙ্গে আলাদা করে রাখা হয়েছে, যাতে নিখিলেশকে গ্রামের মুসলমানেরা আবার প্রেমবশত বাঁচিয়ে না দেয়, তাহলে বিমলার বিধবা হওয়া ঘটবে না, গল্পের round-up মুশকিল হয়ে যাবে।

নিখিলেশের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, সে জবরদস্তি করা পছন্দ করে না। জবরদস্তি করে স্বদেশী প্রচারে তার যেমন আপত্তি, তেমনই আপত্তি সন্দীপকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায়। সন্দীপকে জোর করে সে তাড়াতে পারে, কিন্তু তাহলে বিমলাকেও জোর করে ঘরে ফেরানো হবে। তার ইচ্ছা বিমলা নিজের ইচ্ছায় ঘরে ফিরুক, অতএব সে নিঃশব্দে বিমলা-সন্দীপের ফষ্টিনষ্টি সহ্য করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তাকে ধমক দিয়েই সন্দীপকে গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য করাতে হচ্ছে। সেটা অবশ্য সন্দীপের ভালোর জন্যই, নাহলে মুসলমানেরা সন্দীপকে কোতল করে দেবে। সে যাই হোক, জবরদস্তি তাহলে তাকে করতেই হলো। অর্থাৎ উদ্দেশ্য মহৎ হলে জবরদস্তিও করা যায়। তাহলে স্বদেশীর দোষ কী ছিল? স্বদেশী মহৎ নয়? তাহলে সত্যজিতের উদ্দেশ্য ছিল, নিখিলেশ যে একটা গণ্ডগোলে চরিত্র, সেটা দেখানো। সে কী করে আর কী ভাবে, সেটা সে নিজেও জানে না, কুতো বিমলা।

সত্যজিতের নজর অবশ্য সন্দীপের দিকেই। সন্দীপ জানায় রামায়ণের রাম তার কাছে নায়ক নয়, নায়ক রাবণ। 'ঘরে-বাইরে' চলচ্চিত্রে, সত্যজিতের কাছে সন্দীপই নায়ক, নিখিলেশ নায়ক নয়। এবং এটা বলতেই হবে, সন্দীপ চরিত্রে কোনো গণ্ডগোল নেই। সে স্বদেশী করে দেশের জন্য, নিজের জন্য নয়, সুতরাং সে দারিদ্র্যকে পূজা করে না, দিশি সিগারেট খায় না, বিলিতি চিনিতেও আপত্তি নেই। এখানে তার ভণ্ডামি নেই, যে-ভণ্ডামি নিখিলেশে প্রবল। বিমলাকে দেখে তার ভোগলিপ্সা জন্মায় এবং সেটা সে প্রথম দর্শনেই ক্ষুধার্ত নয়নে জানিয়ে দেয়। বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরই সে বন্ধুস্ত্রীর চুলের কাঁটা গাপ করে ফেলে এবং শেষ দৃশ্যে নিখিলেশের নাকে ঝামা ঘষার মতো সেটা দেখাতে দেখাতে exit দেয়। মধ্যে, বিমলার সঙ্গে সাক্ষাতের তৃতীয় সময়ে সে

ঝপ্ করে চুমু খায়। আমরা আগেই জেনেছি তার প্রচুর মেয়েবন্ধু ছিল, তার মধ্যে মেম-সাহেবও ছিল, অতএব আমরা বুঝতেই পারি, চান্স ছেড়ে দেওয়ার পাত্র সে নয়, সে জাপটে ধরে বিমলাকে। নারীচরিত্র বুঝতে সে যে পারঙ্গম সেটা বোঝাই গেল, বিমলার গলে যাওয়া দেখে।

বাঙালি পরিবারে ঘরের বৌ এইভাবে পরপুরুষেব চুমু সহ্য করবে, এটা অনেক দর্শককে পীড়া দিয়েছে। যেমন দিয়েছে বিমলার জ্যাকেট পরার দৃশ্য, জা এবং স্বামীর উপস্থিতিতে। বেঢপ শরীরে জ্যাকেট পরে পরে আয়নার সামনে দাঁড়ানোর গূঢ় অর্থ যেমন দর্শকেরা বুঝতে পারেন নি (তাঁরা সবাই নিশ্চয় চলচ্চিত্রটি তিনবার দেখেন নি), তেমনই বুঝতে পারেন নি স্বামী-জায়ের উপস্থিতিতে জ্যাকেট পালটানোর তাৎপর্য। বিমলা যে খুব একটা সুদৃশ্য নয়, সেই বোধটি বিমলার নেই, যেমন নেই সে নিজে কী চায়। এই ছবিতে আয়নার বহুল ব্যবহার অনেককে অবাক করেছে। আয়নার মতো একটা ক্লিশে সত্যজিতের মতো একজন ফর্ম-বিশেষজ্ঞ ছেলেমানুষের মতো কেন ব্যবহার করলেন বারংবার, এই প্রশ্ন অনেকে করেছেন। এটা তো সবারই জানার কথা, ছোটো ঘরের মাপের আভাস বাড়াতে গেলে আয়না অত্যাবশ্যক। ঘরে বন্দী বিমলা তার ঘরের মাপ বাড়াতে চায় আয়নার মধ্য দিয়ে। কিন্তু আয়না থাকলেই আত্মানং বিদ্ধি হয় না। তাছাড়া আত্মচিন্তার প্রতীকও বটে আয়না। সত্যজিতের ছবির অনেক স্তর, এইসব সেসব স্তর। জ্যাকেটের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। যাঁবা ভাবেন তৃতীয় দর্শনে পরপুরুষের চুমুর কাছে সমর্পণ বা জা-স্বামীব উপস্থিতিতে জ্যাকেট ট্রাই কবাটা অবাস্তব, তাঁরা ভুলে যান, এই ছবি সংস্কার ভাঙাব ছবি। বিমলা সংস্কার ভাঙছে, সন্দীপ সংস্কাব ভাঙছে, ছবিতে একথা স্পষ্ট বলানো হয়েছে। বিমলা আর পাঁচটি বাঙালি মেয়ের মতো নয়, সে পথপ্রদর্শিকা, সংস্কার ভেঙে ফেলছে। আর চুমু? এই চুমু সাধারণ আর পাঁচটা চুমু নয়। মনে করা যাক, কী অবস্থায় চুমু খাওয়া হচ্ছে। প্রথম দর্শনে বিমলার কিছু করার ছিল না, নিখিলেশ মুসলমানদের অবদান (বদ্) পর্দা ভাঙার জন্য বিমলাকে ঘরের বাইরে, আর একটা ঘরে, নিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় দর্শন নিখিলেশের অজ্ঞাতে ঘটে গেছে, সে-বিষয়ে নিখিলেশের মন্তব্য বিমলা খোঁটা মনে করে আর বাইরে যাবে না ঠিক করেছে। তৃতীয় দর্শনে, সন্দীপ চলে যাবে শুনে কাঁদ-কাঁদ বিমলা স্বদেশীর জন্য টাকা দেবে বলে। তখনই সন্দীপ চুমু খেয়ে নেয়। চতুর্থ দর্শনে টাকা দেওয়ার পর আর এক প্রস্থ চুমু। অর্থাৎ এই চুমু স্বদেশী চুমু, এই যৌনতা স্বদেশী যৌনতা। যাঁরা ভাবছেন, 'পিকু' করার পর সত্যজিতের হাত অর্থাৎ ক্যামেরা খুলে গেছে, তাঁরা একটু বাড়াবাড়ি করছেন।

তবে এই চুমুরও অন্য অর্থ আছে, স্তরান্তরে। মনে করা যাক, কীভাবে ছবির শুরু। শুরুতেই বিধবস্ত বিমলা তার জবানিতে জানিয়ে দেয়, ভোগী পরিবারে তার বিয়ে হলেও তার স্বামী সংযমী পুরুষ। এই সংযমী স্বামী স্ত্রী কতটা সংযমী পরীক্ষা করার জন্য সন্দীপের একটি ফটোগ্রাফ ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে দিয়েছে দশ বছর ধরে। স্ত্রী সংযমের পরীক্ষায় পাশ করেছে। এবাব দশ বছর পর স্বামী স্ত্রীকে জ্যান্ত পরপুরুষেব হাতে ছেড়ে দিয়েছে। স্বদেশী যৌনতার জন্য স্ত্রীর পদস্খলন না হলেও ওষ্ঠস্খলন ঘটেছে। কিন্তু বিমলা একেবারে অসংযমী নয়। দুবার ওষ্ঠস্খলন ঘটলেও সে কড়ার করে নিয়েছিল গরিবদের উপর যেন অত্যাচার না হয়। নিখিলেশে তার চরিত্রের দার্ঢ্যের কথা জানতো

বলেই সুতো আলগা দিয়েছিল। যখন দেখল ঘুড়ি কেটে যাবার সম্ভাবনা তখনই সুতো টানা শুরু করল। পঞ্চম দর্শনে সে জানিয়ে দিল বিমলাকে সন্দীপের উপস্থিতিতে, সন্দীপ গ্রামের গরিবদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে, নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে। বিমলা আর সব সহ্য করতে পারে, গরিবদের উপর অত্যাচার সহ্য করতে পারে না, সন্দীপকে সে আর চুমু খেতে দেবে না, দর্শকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এবার নিখিলেশ তাকে চুমু খাবে। নিখিলেশের আক্ষেপ ছিল, বিমলা স্বয়ংবরা হতে পারে নি, এবার তার দুঃখ কিছুটা ঘুচল। বিমলা একটা পরপুরুষকে বাজিয়ে দেখল তার স্বামীটিই খাঁটি। সন্দীপকে শুধু বিমলার চুলের কাঁটা নিয়ে বিদেয় নিতে হল। সন্দীপ অবশ্য মাথা উঁচু করেই বিদেয় নিল। সে যে গোপনে ফষ্টিনষ্টি করে নি, নিখিলেশের সামনে সে চুলের কাঁটা দেখাল এবং নিল। আমাদের অবশ্য একটা সংশয় থেকে গেল। ছবিটিতে কোথাও ঘুড়ি নেই। একটা গ্রামের আকাশে ঘুড়ি নেই তাই কি হয়? ছবিতে সত্যজিৎ আচমকা দুবার ট্রেনের বাঁশি আর ঝমঝম শুনিয়েছেন, সুদুরের ডাক বোঝানোর জন্য, বিমলা যখন সন্দীপের কাছে যায় তখন মেজো গিন্নী পোষা পাখির খাঁচা ধবে দাঁড়িয়ে থাকে। (দুঃখের বিষয়, খাঁচার পাখি আর বনের পাখি কবিতাটি এখানে কিশোরকুমার আওড়ায় নি) , বিমলাকে নিয়ে নিখিলেশ যখন corridor cross করে তখন এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ — গানের সুরের টুকরো বাজে, এই সব ছোটখাট detail-এ সত্যজিৎ অনবদ্য বলে, আমরা ভেবেছিলাম একটা ঘুড়ি এবং লাটাইয়ের ছবি কোন্ এক ফাঁকে আমরা দেখতে পাব। পাই নি। তাহলে কি আমরা ছবিটি বুঝতে ভুল করলাম?

তা কী করে হয়? ছবির শুরুতে ভোগ এবং সংযমের কথা। ইংরেজি গানের বদলে বাংলা কীর্তন গাইতে বললে বিমলার মনে হয় ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি, এবং সেটা সন্দীপের সঙ্গে প্রথম দর্শনের পর, তারপর নিখিলেশের ঠাণ্ডা স্বভাবের কথা, তারপর চুমু, তারপর মনে পড়ে যায় বিমলার প্রথম কথা যে সে আগুনের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে এসেছে, তারপর বিমলার খেদোক্তি যে সে পাপ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে, তারপর বিধবার সাজ। আগুনের মধ্য দিয়ে এসেছে বলেই আমাদের মনে পড়ে যায় সীতার অগ্নিপরীক্ষা। মুসলমান পর্বের আগেকার দিনগুলোর জন্য নিখিলেশের দুর্বলতা। সুতরাং নিখিলেশ যে বিমলাকে একটু পরীক্ষা করিয়ে নিল, ভোগ এবং সংযম, এটাই তো গল্পের বিষয়। এর মধ্যে স্বদেশী, বন্দে মাতরম্, মুসলমান-হিন্দু দাঙ্গা এগুলো তো চাটনির মতো এসেছে। এটা তো আর রাজনৈতিক ছবি নয় যে স্বদেশী, বয়কট, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করতে হবে। এটা 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের চিত্ররূপ নয়, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের ছবি।

ছবিতে নিখিলেশ মধ্যে মধ্যেই ইংরেজি বলে। যদিও সে মনে মনে স্বদেশী। আমাদের আলোচনাতেও লক্ষ করলে দেখা যাবে, ইংরেজি শব্দ ঢুকে গেছে। আমাদের ঔপনিবেশিক দাস মনোভাব এখনও যায় নি, ফরেন বর্জনে আমাদের এখনও অনীহা, সত্যজিতের ছবি এইজন্যই এখনও প্রাসঙ্গিক।

সমালোচনার জবাবে

ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে' ছবির আলোচনায় বেশীর ভাগ সমালোচকই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করেছেন। অথচ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা মণিশংকর-এব উপন্যাস নিয়ে যখন সত্যজিৎ রায় ছবি করেন তখন উপন্যাসের আলোচনা কখনোই সেভাবে হয় না। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যদি আলোচিত হতে পারেন তবে ছবির আলোচনায় এঁদের বাদ যাওয়া বা তেমনভাবে অনালোচিত থাকা উচিত নয়। এখানে classic বলে আলাদা কিছু মানদণ্ড থাকতে পারে না। আমাদের দেখতে হবে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গী towards material that he is getting। সেই material সাহিত্য থেকে নেওয়া হোক বা অন্য কিছু থেকে।

অনেক আলোচনাতেই লক্ষ্য করছি ঘরে বাইরে-কে major film বলার ব্যাপারে সমালোচকদের দ্বিধা বা অনীহা। তাহলে তো major film-এর সংজ্ঞা নিয়েই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। আমি কিন্তু একটু অন্যভাবে দেখছি। ছবি মুক্তি পাওয়ার আগে অনেকের অনেক কিছু প্রত্যাশা ছিল। মুক্তি পাওয়ার পরে কিছু দর্শক এবং ফিল্ম বোদ্ধারা disappointed হয়েছেন। হতেই পারেন। কিন্তু পাশাপাশি আর একটা জিনিসও লক্ষ করার মতো।' সকলেই কিন্তু ছবিটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছেন যেটা এখন কোন ছবি নিয়ে সচরাচর আমাদের দেশে ঘটে না। আমার প্রশ্ন, একটা realatively minor film-কে নিয়ে এত আলোচনা, ঝড় কি ওঠে? এত আলোচনা বোধ হয় ছবিটার একটা বিরাট positive দিক। এ ছবি দেখে আমার একটা জিনিসই মনে হয়েছে। সেটা হল, এই ছবি আমাদের দেশে বোধ হয় অন্য কেউ attempt করতেন কিনা সন্দেহ, সেই সাহস দেখাতে পারতেন বলেই আমার মনে হয় না। আর একটা ব্যাপার মনে হচ্ছে, অনেকেই এই ছবির আলোচনায় অনেক খুঁত দেখিয়েছেন, কিন্তু এই ছবির যা story line বা তার যে structural complexity সেটা ইদানীংকালে খুব বেশী দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এখন তার technical execution যাই হোক না কেন সেখানে comments থাকতেই পারে। অবশ্য technical কথাটার সুত্রেই দু-একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা না করে পারছি না। আমার মনে হয় আমাদের দেশের বেশীর ভাগ সমালোচকই সাহিত্য থেকে এসেছেন। ফলে cinema-র technical দিকটা সম্পর্কে তাঁদের যে বিশেষ জ্ঞান নেই এটা তাঁদের লেখা পড়লেই বোঝা যায়। যতটুকু পড়েছেন সেটাকেই base করে review লিখতে বসে যান, ফলে দু-ধরনের ছবিতে তাঁদের standard-টাও যায় বদলে। তখন এঁদের লেখা পড়লে মনে হয় ছবিতে content-টাই মূল ব্যাপার, তার technical execution যাই হোক না কেন।

'ঘরে বাইরে'-র technical দিকটা এবারে দেখা যাক। ধরা যাক 'অশনি সংকেত' ছবির photography-র কথা। সেখানে আমার মনে হয়েছে উনি যে colour

photography করতে জানেন এটা দেখিয়ে দিয়েছেন। Exposure কী দিলে colour ঠিক আনা যায় এটা উনি দেখিয়েছেন। সেইটুকুই ওঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু 'ঘরে বাইরে'-তে এসে আমার মনে হল এখানে বোধ হয় framing-এ, camera movement-এর মধ্যে দিয়ে visually cinematic করতে চেষ্টা করছেন। অনেকটাই সফল হয়েছেন। তবে আমার মনে হয় উনি নিজে camera operate না করলে যা ভেবেছিলেন সেটা আরো ভালোভাবে realised হতো। আসলে এখানে উনি photography-কে epic style-এ করতে চেয়েছিলেন যেটা হয়তো ওঁর শারীরিক অসুস্থাজনিত কারণে সবসময়ে ফুটে ওঠেনি। হয়তো একটু exaggeration হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় camera movementএর ব্যাপারে Max Ophuls-এর মধ্যে আমরা যে fluidity পাই অনেকটা সেই জাতের movement এখানে আনতে চেয়েছিলেন। নিখিলেশ বিমলার দৃশ্যে যে fluidity-র কথা উনি ভেবেছিলেন সেটা করতে গেলে যে যোগাড়-যন্ত্র করতে হয় সেটা এখানে ছিল না। এখন এই শারীরিক অক্ষমতার ব্যাপারে তো আর বিচার চলে না। একপক্ষে যেমন বলা যায় একজন cameraman থাকলে ভালো হত অন্যদিকে আবার এটাও বলা যায় উনি সেরকম প্রয়োজন অনুভব করেন নি তাই নেন নি। এ ব্যাপারে তো আর value judgement apply করা যায় না।

আসলে আমাদের সমালোচনায় ছিদ্রান্বেষণই আসল কথা। ত্রুটি বার করার এক প্রতিযোগিতা। ছবি থেকে শিক্ষণীয় positive দিকগুলো কিন্তু কখনোই আমাদের সমালোচনায় স্থান পায় না। ধরুন, ওই যে drawing room-এর art direction বা alcove-এর জানালা দিয়ে outdoor-এ কিছু অংশ দেখতে পাওয়া — এইসব কিন্তু সমালোচনায় প্রায় দেখাই যায় না। বোধ হয় আমাদের সমালোচকদের সেই চোখই নেই। এবং তাঁরা সিগারেটের প্যাকেটে কেন zoom করা হল এইসব আলোচনায় আমোদ পান। হতে পারে ওই শটটার কোন প্রয়োজন ছিল না কেননা দর্শককে আগেই দেখান হয়েছে ওটা সেই 19th century-র আসল সিগারেটের প্যাকেট। কিন্তু তাতে কী হল? লোকটা যে খেটেখুটে ওই রকম একটা প্যাকেট জোগাড় করেছেন সেটাই কি more interesting নয়? আসলে আমরা এইরকম অনেক ছোটখাট detail-এ আটকে যাই বলে অনেক broader context আমাদের সামনে থেকে হারিয়ে যায়। Photography ভাল কি মন্দ এই ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা করে বিদেশী লেখায় তেমন থাকে না। যদি না অবশ্য সেটা Bergman-এর 'Fanny and Alexander' হয়। কেননা সেখানে মোটামুটি যে কোন পাতে দেওয়ার মতো ছবিতেও photography-র একটা standard থাকে। সেটা ধরেই নেওয়া হয় যে একজন মোটামুটি major director-এর ছবিতে photography ভালো হবে। কিন্তু তা বলে দু-একটা অসতর্ক শট কি থাকে না? থাকে। ঘরে বাইরেতেও আছে। যেমন সেই প্রথম যখন বিমলা চিকের ভিতর দিয়ে বক্তৃতা শুনছে। হয়ত খুব তাড়াহুড়ো করে শটটা নেওয়া। এই রকম শট যদি, ধরুন, Godfather-এ থাকতো সেখানে ব্যাপারটা হয়তো visually অনেক rich হতো। ওভাবে লঙ থেকে আস্তে আস্তে ধরা কোন শট্ যদি কোন মোটামুটি major বিদেশী পরিচালক ছবিতে রাখতেন তবে অনেক ভাবনা চিন্তা, অনেক art direction, সেট ইত্যাদি করে তুলতেন। এখন তাহলে দুটো রাস্তা থাকে। হয় 'ঘরে বাইরে'-কে Godfather-এর সঙ্গে বা সত্যজিৎ

রায়কে Coppola-র সঙ্গে তুলনা করা আর নয়তো এটা দেখা যে সত্যজিৎ রায় যেটা করতে চেয়েছেন সেটা করতে পারছেন কি না। আমার মনে হয় তুলনামুলক সমালোচনা বোধ হয় ভীষণ ক্ষতিই করে।

চরিত্রায়নের ব্যাপারে অনেকেই দেখছি উপন্যাসের সঙ্গে তুলনাটা বারে বারে আনছেন। উপন্যাসে বিমলা যতটা জটিল একটা চরিত্র এখানে ততটা নয় ইত্যাদি। আমি কিন্তু, প্রথমেই বলে নিই, উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করব না। একজন সাধারণ দর্শক সেটা করেন না। কিংবা করলেও বোধহয় সেটাকে discourage করা উচিত। চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি সেটাকেই criterion করা উচিত। এখন যিনি 'ঘরে বাইরে' বা 'নষ্টনীড়' পড়েছেন তাঁর মাথার মধ্যে কোথাও হয়তো ব্যাপারটা থাকে কিন্তু সেটাকে ধরেই কিন্তু তিনি সব সময় (আমি সাধারণ দর্শকের কথাই বলছি) ছবির বিচার করেন না। বিমলা চরিত্রের কথাই ধরা যাক। আমার কাছে characterisation-এর কাজ হিসেবে বিমলা চরিত্রকে সব থেকে interesting লাগে 'ঘরে বাইরে'-তে। উপন্যাসের প্রতি faithful থাকতে গেলে কিন্তু একটা experiment ছবিতে কবতেই হয় যে experimentটা মানিকদা করেছেন। এবং যা আমার মনে হয় একমাত্র ওঁর পক্ষেই করা সম্ভব। একটা জিনিস ভাবুন সত্যজিৎ রায়ের মাথায় কিন্তু একটা বিষয় সব সময়েই আছে — তা হল তিনি মোটামুটি বেশী পয়সায় ছবি করেছেন এবং এই ছবি তাঁকে বেচতে হবে। সেখানে তাহলে ওঁর কাছে দুটো পথ খোলা ছিল। এক স্মিতা পাতিল জাতীয় কাউকে নেওয়া যাকে conventionally সুন্দরী বলা যায় না কিন্তু box office আছে অথবা সুন্দরী কোন নতুন নায়িকার সন্ধান করা। উনি কিন্তু কোনটাই করলেন না। Consciously করলেন না। বিশ্বস্ত থাকলেন উপন্যাসের প্রতি যেটা নিঃসন্দেহে একটা experiment এবং আমার মনে হয় সেই experiment-এ উনি মোটামুটিভাবে সফল। যেখানে অসফল সেখানে কিন্তু দোষটা স্বাতীলেখার নয়, ওঁর। শুনতে কেমন লাগবে জানি না কিন্তু আমার মনে হয় উনি অসফল in some of his angles of photographing Swatilekha. If he was able to make Swatilekha look like a person with more strength তাহলে বোধ হয় চরিত্রটা অন্য রকম হতো। বলে নেওয়া ভাল এটা একান্তই ব্যক্তিগত মতামত। আর কেউ agreed নাও হতে পারেন।

'ঘরে বাইরে'-তে রাজনীতির ব্যাপারটা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার আছে বলে মনে করি না। সত্যজিৎ রায়ের রাজনৈতিক চিন্তা যা আমরা এতদিন ওঁর নানা ছবিতে পেয়ে এসেছি তারই continution ছাড়া কিছু নেই এখানে নতুন করে। হ্যাঁ এটা বলা যায় যে রাগ বা ঘৃণা সেটা এ ছবিতে আবও তীক্ষ্ণ হয়েছে কিন্তু সন্দীপদের মত রাজনৈতিক চরিত্র, যে system-এ দেখা যায় সেই system-এর ভেতরকার গণ্ডগোলের কথা উনি কিন্তু ওঁর প্রায় প্রত্যেক ছবিতেই অল্পবিস্তর বলেছেন, এবং সেটা প্রত্যেক good film-maker-ই বলে থাকেন in their own ways। আশপাশে যা ঘটছে সেটার প্রতি react না করা অসম্ভব। সেই social consciousness প্রত্যেক বড় পরিচালকেরই আছে যেটা না থাকলে ভাল ছবি করা সম্ভব না। আর এটা বোধ হয় এতদিনে আমাদের দেশে এবং বাইরে প্রমাণ হয়ে গেছে যে ছবি করার ব্যাপারটা as a political act মূল্যহীন। না হলে গুণেকে Paris-এসে ছবি করতে হয় এবং film festival-এ বিক্রী

করতে হয় আর ওঁর নিজের দেশের লোক সেসব ছবি দেখার সুযোগ পান না। গুণের ছবির যা বিষয়বস্তু বা Turkey-র যা পরিস্থিতি তার সঙ্গে আমাদেব দেশের পরিস্থিতির অসম্ভব মিল রয়েছে। কিন্তু এই যে 'Yol' উনি করলেন, তাতে ওঁব দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কী অদলবদল হলো? আমার কাছে এটা অত্যন্ত স্বচ্ছ একটা ব্যাপার। Turkey-র মিডিযার যা পরিস্থিতি আমাদের মতই প্রায়। এখানে যে দু-তিনটে media-র সাহায্যে penetrate করতে পারা যায় যেমন রেডিও, টিভি বা films division-এর documentary এ সবই সরকার হাতে রেখে দিয়েছে, এবং এর বাইরে যত খুশি লাফাও কোন লাভ নেই। পুরোটাই সরকাবী কব্জায় আর এর বাইরে যা আছে তাকে বিদেশ থেকে prize পাইয়ে দেওয়া এই তো নীতি। এটা তো খুবই পরিষ্কার। আমার মনে হয় মানিকদা এটা চিরকালই জানতেন কেউ কেউ ইদানীং সেটা বুঝতে পারছেন। সেদিক থেকে Coppola বা Spielberg যতই escapist ছবি করুন না কেন আমার অন্য কাবণে interesting মনে হয়। সেটা হল সেখানে কিন্তু একটা অন্য চেষ্টা আছে এটা জেনে যে film cannot subvert কিন্তু whether the medium can change the way of looking at things সেই ব্যাপারটা ভাবা হচ্ছে। আমাদের এখানে তো form ভাঙ্গারও তেমন কোন চেষ্টা দেখি না। বেনেগাল, গৌতম, হালের মৃণালদা সবাই আগে form নিয়ে চেষ্টা করলেও এখন যেখানে ফিরে এসেছেন সেটা কিন্তু basically সহজ সরলভাবে narrative sequence বজায রেখে গল্প বলা।

এই পরিবেশে জোর গলায় বলতে কোন দ্বিধা নেই যে 'ঘরে বাইরে' important ছবি, major ছবি এবং তার দোষত্রুটি নিয়েও আমাদেব সিনেমার ইতিহাসে আরেকটি milestone।

একেবারে নতুন সত্যজিৎ ঃ গণশত্রু

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গণশত্রু, একাধিক কারণে, একেবারে নতুন সত্যজিৎ। তিনি এর আগে কখনও নাটক থেকে ছবি করেন নি। বিদেশি গল্প নিয়েও কাজ করেননি এর আগে। এবং এই ধরনের বিষয় এবং চরিত্রও তাঁর ছবিতে আগে কখনও আসেনি। এতগুলো নুতন চ্যালেঞ্জের দাবিতে তাঁর ষ্টাইল এতটাই পাল্টেছে যে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। নাটক থেকে ছবি করা আর কোনও গল্প থেকে বা উপন্যাস থেকে ছবি করা এক জিনিস নয়। নাটকের চলচ্চিত্রায়নে এমন কিছু সমস্যা দেখা দেয় যা চলচ্চিত্রের ভাষার পক্ষে, ইডিয়ামের পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়। এই কারণেই, উপন্যাস-গল্প থেকে যত ছবি হয়, নাটক থেকে তত হয় না। এবং নাটক থেকে যেসব ছবি হয়, তাদের বেশির ভাগই নাট্যভাষা এবং চলচ্চিত্রভাষার দ্বৈধ-নিরসনে অক্ষম। নাটক থেকে চলচ্চিত্র তৈরির প্রাথমিক সমস্যাটি হল চরিত্রগুলির উপস্থাপনা সম্পর্কিত। নাটকে চরিত্রগুলির আসা-যাওয়া যেভাবে ঘটছে। চলচ্চিত্রে সেভাবে ঘটানো সম্ভব নয়। পর্দাকে মঞ্চ হিসেবে ভাবতে পারেন না চলচ্চিত্রকার। চিত্রনাট্যের দাবি আর নাটকের দাবি এক নয়। ইবসেন-এর নাটক 'অ্যান এনিমি অফ দ্য পিপল' অবলম্বনে তৈরি 'গণশত্রু'-তে সত্যজিৎ রায় নাটক থেকে ছবি করার এই প্রাথমিক সমস্যাটি যেভাবে, যত সাবলীলভাবে সমাধান করেছেন, তার নিরিখে তাঁর প্রতিভাকে আবার নতুন করে মাপতে হবে আমাদের। গণশত্রু-তে চরিত্রগুলির উপস্থাপনার এতটুকু মঞ্চধর্মিতা নেই কোথাও, অথচ ইবসেন থেকে খুব বেশি স্বাধীনতা নিয়ে তিনি সরেও যান নি! এই প্রায়-অসম্ভবকে অতি সহজে সম্ভব করে তোলার পিছনে রয়েছে তাঁর নতুন স্টাইলের অবদান। এই স্টাইলের অভিনব মাত্রাটি উঠে এসেছে মূলত ক্যামেরার বিলম্বিত চাল এবং সম্পাদনার চরিত্র থেকে। ঘটনার এক-একটি মুহূর্তকে তিনি যেভাবে ধরেন, যেভাবে ফুটিয়ে তোলেন সেই সব মুহূর্তের পৃথক বার্তা, ব্যঞ্জনা, চরিত্রগুলির দ্যোতনা এবং ক্যামেরা-মুভমেন্টকে যেভাবে উহ্য রাখেন, যা তাঁর ছবিতে আগে কখনও দেখা যায় নি। ইবসেন-এর ঘনতা এবং তীব্রতাকে এইভাবেই তিনি চলচ্চিত্রের ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

নাটক থেকে ছবি করার আরও এক সমস্যা হল, নাটকের ঘটনা সাধারণতঃ ঘটে সীমিত পরিধির মধ্যে। সিনেমা স্বভাবতই বর্হিমুখী। মঞ্চের সীমিত সম্ভাবনার দ্বারা চলচ্চিত্র পীড়িত নয়। সত্যজিৎ রায় ইবসেন-এর নাটকের এই মঞ্চধর্মী সীমান্ত, অন্তর্মুখিতা মেনে নিয়েও চলচ্চিত্রের দাবিকে খর্ব করেন নি তাঁর গণশত্রু-তে। ঘটনাকে তিনি এমনভাবে চালিয়ে নিযে গেছেন, চিত্রনাট্যকে তিনি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন যে কাহিনীবিন্যাসে অন্তর্মুখিতা এলেও চলচ্চিত্রেব নিজস্ব ভাষা ও চরিত্র নষ্ট হয়নি। ডাঃ অশোক গুপ্তর বাড়ি, মন্দিরের চত্বর, কাগজেব দপ্তর, একটি জমিদার বাড়িব নাটমন্দির, মোটামুটি এই গণ্ডির মধ্যেই ক্যামেরা স্থান পরিবর্তন করে। বাইরের জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর ফলে, একটা থিয়েটারি ভাব এবং একঘেয়েমি আসতেই পারত। কিন্তু সত্যজিৎ তা ঠেকিয়ে রেখেছেন মূলত তিনভাবে । এক,

চরিত্রায়ণের প্রসার এবং গভীরতা। দুই, কাহিনী — বিশ্লেষণের তীব্রতা। তিন, সুঠাম, নির্মেদ গতি, যা এসেছে মূলত দৃশ্যভাবনা ও সম্পাদনার মাধ্যমে। কিন্তু ক্যামেরা যেহেতু বেশি নড়াচড়া করতে পারে নি, তাই স্বভাবতই দৃশ্যগুলি দীর্ঘ এবং সংলাপ-প্রবণ। অনেকটা বার্গমানী চালে এই ধরনের দীর্ঘ, আপাত-শ্লথ, গম্ভীর দৃশ্যভাবনা সত্যজিতের আর কোনও ছবিতে আছে বলে মনে হয় না। এই দিক থেকে 'গণশত্রু' নতুন সত্যজিৎ তো বটেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দীর্ঘ সংলাপ-প্রবণ দৃশ্যের দাবিতে সত্যজিৎ এ-ছবিতে এমনভাবে এত 'ক্লোজ আপ' ব্যবহার করেছেন যা আগে তাঁর ছবিতে দেখেছি বলেও মনে হয় না। ক্যামেরার শ্লথগতি, দৃশ্যের অন্তর্মুখিতা এবং দীর্ঘ ক্লোজ আপ — এই ত্রিমাত্রা থেকে উঠে এসেছে 'গণশত্রু'র নতুন শৈলী। নাটক থেকে ছবি করার আরও এক অসুবিধে হল, নাটকে সংলাপ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নেই। ঘটনার কোনও সরাসরি বর্ণনা থাকে না সেখানে। সুতরাং নাটক-নির্ভর ছবি সংলাপে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারে সহজেই। 'গণশত্রু' সংলাপ-নির্ভর হয়েও সংলাপ-পীড়িত নয় একেবারেই। সিনেমার সংলাপ-লেখক হিসেবে সত্যজিৎ অদ্বিতীয়। 'গণশত্রু'র সংলাপ তাঁর প্রতিভার কাছে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দাবি করেছে। এবং সেই দাবি যদি না তিনি সম্পূর্ণ মেটাতে পারতেন তাহলে এই ছবি হত সংলাপের শোচনীয় শিকার। 'গণশত্রু'-তে সত্যজিৎ রায় মূলত একটি বিদেশি গল্প নিয়ে কাজ করেছেন। সুতরাং এমন একটি সমস্যার সামনে তিনি পড়েছিলেন যে সমস্যায় আগে তাঁকে পড়তে হয়নি। সমস্যাটি হল, 'গণশত্রু'-র গা থেকে ভিনদেশীয় গন্ধ সম্পূর্ণ মুছে ফেলা। এবং সেটা তিনি করেছেন অতি সহজে, দু-একটি মৌলিক ভাবনার নির্ভুল সাহায্যে। এমনই একটি কেন্দ্রীয় ভাবনা হল দূষিত চরণামৃত, যে-অমৃতের মধ্যেই মৃত্যুর বীজ লুকিয়ে আছে। চরণামৃতের ভাবনাটি এতদূর ভারতীয়, হিন্দু ধর্মের সংস্কারের সঙ্গে এত শিকড়েবাকড়ে জড়িত যে কাহিনীর ভারতীয়করণের পথে প্রায় সব বাধাই মুহূর্তে দুর হয়ে যায়।

ইবসেন-এর গল্পে শুধু দূষিত পানীয় জলের কথা আছে। সেই দূষিত জল তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করছে এমন একটি জায়গায় যেটিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করে গড়ে উঠেছে একটি অসৎ, স্বার্থান্বেষী, সামাজিক দায়িত্ববোধহীন বাণিজ্যচক্র। এই বাণিজ্যচক্রের বিরুদ্ধে এক ডাক্তারের একক যুদ্ধ এবং অন্তিম পরাজয়কে নিয়েই ইবসেন-এর নাটক। ডাক্তারের নিঃসঙ্গ লড়াইয়ের ট্র্যাজিক মহত্ত্বের প্রতিতুলনা বা 'ফয়েল' হিসেবে কাজ করেছে ডাক্তারের বড় ভাইয়ের কুচক্রী বাণিজ্যবুদ্ধি। সামাজিক মূল্যবোধ, অবক্ষয়, অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত — এইসব কিছু ইবসেন তাঁর নাটকের কাহিনীর মধ্যে বহু পরতে জড়িয়ে ফেললেও ধর্মীয় সংস্কার, বিশ্বাসকে টেনে আনার সাহস পাননি। সত্যজিৎ সেই সাহস দেখিয়েছেন। তিনি এদেশের সামাজিক, মানবিক অবক্ষয়ের সঙ্গে যেভাবে প্রচ্ছন্ন ধর্মীয় সংস্কারকে বুনে দিয়েছেন, যেভাবে আমাদের বিজ্ঞানবিমুখ অজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন এই অবক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ হিসেবে, তাতে হিন্দু-মনের অবগহন স্তরের ভূমিকাটি সাহসী উচ্চারণ পেয়েছে নিঃসন্দেহে। এবং এই উচ্চারণই সত্যজিতের ছবিকে নিয়ে গেছে এমন এক উত্তরণের বিন্দুতে যেখানে ইবসেন পৌঁছুতে পারেন নি তাঁর নাটকে। 'গণশত্রু'-কে মূলত চেম্বার-ফিল্ম হিসেবে অভিহিত করা যায়। এই ধরনের ফিল্ম, যা মূলত চরিত্রায়ণ এবং সংলাপের ওপর নির্ভরশীল, তা সত্যজিৎ রায় আগে করেননি। সুনিয়ন্ত্রিত সংলাপ এবং টুকরো-টুকরো অথচ নিরন্তরভাবে একমুখী ঘটনার মাধ্যমে এমনভাবে চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে, এমন তীব্র সহজতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের

পারস্পারিক সম্পর্কেব ক্রমশ ঘনিয়ে ওঠা 'টেনশন' যে আমাদের অমনস্ক হবার উপায় থাকে না। ইবসেন-এর নাটকের বড় ভাইকে তাঁর ছবিতে ছোট ভাই করে সত্যজিৎ খুব সহজেই পুরনো দিনের আদর্শবাদের সঙ্গে নতুন যুগের বাণিজ্যিক কুচক্রিতার অন্তর্লীন দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন তাঁর ছবিকে একটি অব্যর্থ সমকালীন মাত্রা দেবার জন্য। তাঁর এই চরিত্রনির্ভর চেম্বার-ফিল্ম-এ স্বভাবতই স্পষ্ট রেখার সুনির্দিষ্ট চরিত্রায়ণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। চরিত্রায়ণকে সাহায্য করেছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, মমতাশঙ্কর, ভীষ্ম গুহঠাকুরতা, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র এবং দীপঙ্কর দে'র অভিনয়। অভিনয়-বর্জিত অভিনয়ের এই স্বাভাবিকতা আন্তর্জাতিক নিরিখেও ঈর্ষণীয়। কিন্তু যে-দুজনের কথা আলাদা করে বলতেই হয় তাঁরা হলেন একটি মাত্র দৃশ্যে ভার্গবের চরিত্রে রাজারাম ইয়াগনিক এবং ডাঃ অশোক গুপ্তের (সৌমিত্র) ছোট ভাই নিশীথেব ভূমিকায় ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। ধৃতিমান দৃশ্যের পব দৃশ্য কেড়ে নিয়েছেন, একথা বললে এতটুকু অত্যুক্তি হয় না। সত্যজিতেব চিত্রনাট্য ধৃতিমানকে যে সম্ভাবনা দিযেছে তাব শেষ নির্যাসটুকু পর্যন্ত তিনি নিংড়ে নিযেছেন। তবু, 'গণশত্রু' সম্পর্কে দুটি প্রশ্নও মনেব মধ্যে কিঞ্চিত খটকা জাগায়। এক, সমকালীন পশ্চিমবঙ্গেব কোনও মফঃস্বল শহবেব একটি মন্দিবের জল দূষিত হযে যে মহামারী ঘটতে চলেছে, তার খবর কি শুধু একটি স্থানীয় খবরের কাগজেব পাতায দিনের পব দিন সীমিত থাকতে পারে, যতক্ষণ না একেবারে শেযে ডাঃ গুপ্তেব প্রবন্ধ চলেছে কলকাতার কাগজে প্রকাশিত হবার জন্য? দুই, ইবসেন-এর নাটকে কেন্দ্রীয চরিত্রেব অন্তিম নিঃসঙ্গতাব যে ট্র্যাজিক মাহাত্ম্য, তাব চেযে সত্যজিৎ ডাঃ গুপ্তেব স্লোগানধর্মী বিজযকে বড় বলে মনে কবলেন কেন?

'শাখা-প্রশাখা' ঃ একটি দিক

অরূপ রুদ্র

সত্যজিৎ রায়ের দুটি উক্তি দিয়ে এই আলোচনা শুরু করছি। প্রথমটি, 'The Indian film-maker must turn to life, to reality' এবং দ্বিতীয়টি, 'Indian directors tended to overlook the musical aspect of a film's structure.' জীবন ও বাস্তবতার প্রসঙ্গে ১৯৯০ সালে তোলা 'শাখা-প্রশাখা' ঠিক এখনকার কালের জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি। ছবিটির প্রধান বিষয়বস্তু দুর্নীতি, যা সম্বন্ধে আমরা প্রতিনিয়তই আলোচনা করছি। অথচ যা অসহায়ভাবে মেনে নিচ্ছি। কেউ কেউ হয়ত ভাবতে পারেন 'শাখা-প্রশাখা' সততার উপস্থাপনা, ব্যক্তিগতভাবে আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় সত্যজিৎ রায় আগে সততাকে দুর্নীতির গভীরতার বিপরীতে উপস্থাপনা করেছেন যাতে দুর্নীতি বোধগম্য হয়ে ওঠে। এক অর্থে 'শাখা-প্রশাখা'র musical structure-এর এটি প্রথম ধাপ। অন্য অর্থে 'শাখা-প্রশাখা' আধুনিক যুগের Hamlet.

'শাখা-প্রশাখা' ছবিটি সূক্ষ্মতা আর শক্তির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। অন্যমনস্কভাবে দেখলে ছবিতে যে দুর্নীতির চিত্র পাই তা খুবই বিক্ষিপ্ত আর সাধারণ মনে হতে পারে, অথচ একটু মনোযোগ দিলে এই আপাত-বিক্ষিপ্ততার অন্তরালে যে স্ট্রাকচার গড়ে উঠতে দেখি তা একমাত্র সাঙ্গীতিক স্ট্রাকচারের সঙ্গে তুলনীয়। এবং এই সাঙ্গীতিক স্ট্রাকচার আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন খেয়াল করি ছবিটির প্রতীকী ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য এই স্ট্রাকচারের সঙ্গেই যুক্ত।

সচরাচর আবহসঙ্গীত বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক সেইভাবে 'শাখা-প্রশাখা' ছবিতে সঙ্গীতের ব্যবহার প্রধান বলে মনে হয় না। ছবিতে যেখানে সঙ্গীত ব্যবহার করা হয় তারই বিপরীতে চলে ঘটনা-প্রবাহ, একে অপরের পরিপূরক হিসেবে। এর ফলে সঙ্গীতের এক বিশেষ অর্থ ফুটে ওঠে। 'শাখা-প্রশাখা'তে প্রশান্তর সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রশান্ত কাজের জগতের বাইরে এক গভীর প্রশান্তির জগতে বাস করে। এই প্রশান্তির প্রকাশ ও প্রতীক একই সঙ্গে বাখ্, বিটোফেন্, আর গ্রেগোরিয়ান চান্ট্। প্রশান্তর সঙ্গীতের জগতের মধ্যে এক সাযুজ্য আছে যা আমাদের নিয়ে যায় এক বিস্ময়কর সাবল্যের জগতে যা উর্ধ্বমুখী। প্রশান্ত যখনই সামান্যতম দুর্নীতির জগতের সংস্পর্শে আসে তখনই লক্ষ করি তার অস্থির প্রতিক্রিয়া। ঠিক এখানেই লক্ষ করি কীভাবে সত্যজিৎ রায় একাধিকবার 'Hamlet' নাটকের ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গটা অবশ্যই দুর্নীতি। হ্যামলেটের পাগলামি আর প্রশান্তর পাগলামির সমীকরণে দুর্নীতির জগৎ মূর্ত হয়ে ওঠে। 'শাখা-প্রশাখা' নামটির মধ্যেও ছবিটির প্রধান থীম্ নিহিত হতে দেখি। একটা বিশাল গাছ যা আনন্দের প্রতিমূর্তি হবার কথা, যার ডালপালার অন্তরালে মন ভবানো পাখীর কলতান হবার কথা সেই গাছ অদৃশ্য কীটের

দংশনে জর্জরিত। 'শাখা-প্রশাখা' ছবির আপাতসহজতার অন্তরালে যে সূক্ষ্ম অথচ ঘননিবদ্ধ ইঙ্গিতময়তা রয়েছে তা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা প্রায় — দুঃসাধ্য — হয়ত সেই কারণেই সাঙ্গীতিক স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা শুরু করে থীম্ সম্বন্ধে বক্তব্যের অবতারণা করে ফেলেছি। আপাতত আবার স্ট্রাকচার সম্বন্ধে আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

সত্যজিৎ রায় নানা সময় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীত তিনি ভালবাসেন, শোনেন। এই ভাল লাগার অভিব্যক্তি সমগ্র 'শাখা-প্রশাখা' জুড়ে রয়েছে। প্রথমত চিত্রনাট্যের তৃতীয় অংশে বাখ্ বেজে ওঠে প্রশান্তর ঘরে। সময় রাত। পঞ্চম অংশে একই ঘরে বিটোফেন্ বাজে। সময় সকাল। সপ্তম অংশে একই ঘরে রাত্রে বেজে ওঠে গ্রেগোরিয়ান চান্ট্। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে চিত্রনাট্যের প্রথম অংশে প্রশান্তর উক্তি, 'গানের সুর —ঝাঁকে-ঝাঁকে-সুর—মনে বাসা বাঁধে।' নবম অংশের শেষে উল্লেখ করা হয়—'প্রশান্তর ঘর। প্রশান্ত চুপ করে বসে আছে। আজ আর কোন রেকর্ড চলছে না। বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাক।' সময় অবশ্যই রাত। দশম অংশের তীক্ষ্ণ প্রশান্তির প্রস্তুতি তৈরী করে সঙ্গীতহীন বাঙ্‌ময় নিস্তব্ধতা। সঙ্গীতের ব্যবহারের যে উল্লেখ করলাম তাকেই অবশ্য আমি সাঙ্গীতিক স্ট্রাকচাব বলতে চাইছি না। সমগ্র ছবিটি চিত্রনাট্য অনুসারে ভাগ করলে প্রায় পাশ্চাত্য সিম্‌ফনির একটা আদল পাওয়া যায়। চিত্রনাট্যের প্রথম দুটি অংশকে আমরা প্রস্তুতি বলে ধরে নিতে পারি। এরপর ৩ থেকে ৮ প্রধান অংশ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। নবম অংশ পিক্‌নিক্ পর্যায়ে আমরা একটা ক্লাইম্যাক্স ধরতে পারি। দশম বা শেষ অংশ পরিসমাপ্তি বলে মনে করা যেতে পারে যার রেশ যেন মিলিয়েও মিলিয়ে যায় না। আমার মনে হয় এইভাবে সঙ্গীত ও সাঙ্গীতিক স্ট্রাকচার 'শাখা-প্রশাখা' ছবিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমালোচনার সুবিধের জন্যে একে আলাদা করে দেখা যায়, কিন্তু শিল্প হিসেবে এটা এমন এক সমগ্রতায় গ্রথিত যা শুধু বোধেরই বিষয়।

এবার ছবিটিকে একটু অন্যভাবে দেখা যাক যা মনে হয শিল্পীর অভিপ্রেত। প্রত্যেকবার প্রশান্তর ঘরে বাজনা বেজে ওঠার বিপরীতে কী ভাবে ঘটনাস্রোত উন্মোচিত হচ্ছে। লক্ষ্য কবার বিষয়, যা কিছু সঙ্গীত বাজে তার spiritual overtone -জাগতিক অসঙ্গতি, দুর্নীতি, অনাচারের ঊর্ধ্বে যা জাজ্জ্বল্যমান বাস্তবতা। অর্থাৎ বাস্তবতার দুই মেরু সত্যজিৎ রায় একই সঙ্গে প্রকাশ করেন। এ এক অসাধারণ নৈপুণ্য যার ফলে প্রত্যেকটি অংশ হয়ে ওঠে একই সঙ্গে সরল, সহজ ও সূক্ষ্ম অভিবেদনে পূর্ণ।

চিত্রনাট্যের তৃতীয় অংশের শেষভাগে প্রশান্তর ঘরে গভীর রাতে রেকর্ড প্লেয়ারে বাখ্ বেজে ওঠে। এর আগে প্রশান্তর অন্য সব ভাইয়েরা তাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অসুস্থ বাবাকে দেখতে এসেছে। কারুর মধ্যেই আমরা প্রকট আশঙ্কা দেখিনা। বরং কিছুটা পরিমাণে মনে হয় কলকাতার টেনশনবহুল জগৎ থেকে মফঃস্বলের বাড়ীতে এসে তারা সহজ আয়াসে গা এলিয়ে দিয়েছে। প্রচ্ছন্নভাবে কারো কারো মনে দুশ্চিন্তা অবশ্য রয়েছে। বাখের সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে সত্যজিৎ রায় আমাদের নিয়ে যান বিভিন্ন ভাইয়ের ঘরে। প্রথমেই প্রকট হয়ে ওঠে বাখ্ সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা আর বিরক্তি। এর সঙ্গে আছে বাখ্ যে শোনে তার মানসিক স্থৈর্য সম্বন্ধে সন্দেহ। সত্যজিৎ রায় এখানে প্রশান্তর সঙ্গে বাখের একাত্মতার মধ্যে আমাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যান যখন স্থূল জগতের

বাস্তবতা প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছে করে এলিয়টের ভাষায় 'Human kind cannot bear very much of reality'. এই অংশে প্রবোধের আয়াসপ্রিয়তার অন্তরালে রয়েছে আপাতদৃষ্টিতে সফল জীবনযাত্রার পূর্ণতা যা কিনা মানুষ হিসেবে তাকে করে রেখেছে অপূর্ণ। এটা অবশ্য পরের অংশে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেখানে আমরা দেখবো দুর্নীতিকে সহজভাবে নেওয়ার ক্ষমতাই তাকে মানুষ হিসেবে অপূর্ণ করে রেখেছে। আপাতত প্রবীরের ঘরে ক্যামেরা চলে গেলে দেখি আর এক ধরনের ঘটনা। প্রবীরও বাখের বাজনা শুনে উক্তি করে—'আর আমার priceless মেজদাটির কাণ্ড দেখেছ'! প্রবীর অনেক সাধারণ মানুষের মত বাখের নাম শুনেছে Reader's Digest-এর কল্যাণে। কিন্তু বাজনার বোধ তার নেই। তার স্ত্রী তপতী সেদিক থেকে অন্য মানুষ। সে বোঝে, ভালবাসে অথচ তার দুর্ভাগ্য এই যে, সে এমন একজনের স্ত্রী যে সব অর্থে লোভের প্রতিমূর্তি। এরপর প্রতাপের ঘর থেকেও শোনা যাচ্ছে বাখের সঙ্গীত, কিন্তু প্রতাপ নিজের সমস্যায় এমনই জর্জরিত যে, এই সঙ্গীতেব মূল্য বা মাধুর্য তাকে স্পর্শ করার সামর্থ্য রাখে না।

পঞ্চম অংশে প্রশান্তর ঘরে সকালে বিটোফেন্ বাজতে থাকে। এর বিপরীতে প্রবীরের স্ত্রী তপতী ও প্রতাপের কথোপকথন চলে। ধীরে ধীরে আমরা কাজের জগতের সমস্যার মধ্যে চলে যাই। আসলে দুর্নীতির একটা স্বাভাবিক ছবি আমাদের কাছে ফুটে ওঠে। প্রতাপ -রমেন খণ্ডাংশের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আধুনিক জগতের সাবলীল 'জোচ্চুরি'। রমেনের আচরণে টের পাওয়া যায় এটাই স্বাভাবিক। প্রতাপের মত লোক এ জগতে অবাঞ্ছিত অসঙ্গতি। সত্যজিৎ রায় আমাদের মনে করিয়ে দেন সমাজের বাইরে একটুও চিড় না খেয়ে 'ভেতরে ক্যানসারে ছেয়ে গেছে'। দুর্নীতির ছবি আরও অনেকে হয়ত আরও নির্মমভাবে দেখিয়েছেন কিন্তু শুধু মাত্র বিটোফেনের ব্যবহারে এই আধুনিক দুর্নীতির ব্যাপ্তি আমাদের যে ভাবে ধাক্কা দেয় তা অকল্পনীয়। প্রতাপের পথ যে একমাত্র পথ তা অবশ্য সত্যজিৎ রায়ও মনে করেন না। টেলিবামা পত্রিকায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে তিনি প্রতাপ সম্বন্ধে উক্তি করেন 'অন্যজন কিছুটা নৈতিক শক্তির প্রমাণ রাখলেও কোনরকম লড়াই করে না—সে পালিয়ে যায়। সে তার জীবিকা বদল করে অভিনেতা হয়।' (এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৮, পৃঃ ১০০)

এর থেকে এও স্পষ্ট হয়—শিল্পী হিসেবে কোন সমাধানের কথাও তিনি চিন্তা করেননি। সে প্রশ্ন তোলাটাই অবান্তর হয়ত। শেকস্‌পীয়র তাঁর 'হ্যামলেট' নাটকে দুর্নীতির কী সমাধান দিয়েছেন তাও আমার জানা নেই। পাছে আমরা সমাধান খুঁজে বেড়াই 'শাখা-প্রশাখা'র মধ্যে তাই হয়ত একাধিকবার হ্যামলেট প্রসঙ্গ আনা হয়েছে ছবিতে।

এরপরে ক্যামেরা চলে যায় খাবার ঘরে যখন দুপুরে সবাই খেতে বসেছে। আলোচনা চলতে থাকে রেস থেকে ট্যাক্সে আর অনলস ভাবে ফুটে ওঠে— আজকালকার ভাষায়— দুনম্বরি জীবনধারণ, যার প্রধান ব্যাপার লালসা চরিতার্থ করার নানামুখী প্রতিভা। খেলাচ্ছলে দুর্নীতির উন্মোচন, বিচলিত করে প্রশান্তকে আর প্রবোধের স্ত্রী উমাকে আর হয়ত বিচলিত করে সেইসব দর্শককে যাদের মনে দুর্নীতির প্রতি আস্থা এখনও ঘনীভূত হয়নি। এই অংশে শেষে প্রশান্তর ঘরে বেজে ওঠে গ্রেগোরিয়ান চান্ট্। এই সঙ্গীত একদিক থেকে আয়রনির কাজ করে অন্য দিক থেকে নিয়ে চলে এক সুগভীর আত্মমগ্ন আত্মস্থতায়।

প্রতাপের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রশান্তর আত্মমগ্ন সারল্য আমাদের চমকে দেয়। প্রতাপ জিজ্ঞাসা করে 'তোমার সময় কাটে কী ক'রে?....' ; প্রশান্ত উত্তর দেয়, 'Grass is green.... Sky is blue.... Rose is red....' মনে হয় যেন ব্লেকের কবিতা শুনছি। সমস্ত প্রকৃতি বাজনার মত বেজে উঠেছে আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতির কালো অন্ধকার দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।

শাখা-প্রশাখা ঃ মূল্যবোধের সংকট

অনিন্দ্য চাকী

মূল্যবোধের সংকট ঘুরে ফিরে সত্যজিৎ রায়ের অনেক ছবিতেই প্রধান বিষয় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। 'শাখা প্রশাখা'তেও বিষয়টি ফিরে এলো। প্রতিতুলনায় বিশেষ করে মনে পড়ে 'সীমাবদ্ধ' ছবির কথা এবং 'পিকু'। প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে 'গণশত্রু', এমন কি এই সার্বিক সংকটের বাসিন্দা বলে মনে হয় সত্যজিৎ-এর ব্যাখ্যায় 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ চরিত্রটিকেও। বিষয়টি যে শুধু ঘুরে ফিবে আসছে তাই নয়, আসছে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র জীবনের শেষদিকে, বারবার। এ ছাড়াও, মনে রাখা প্রয়োজন, 'শাখা-প্রশাখা'রগল্প তাঁর নিজের। এতে একটি জিনিস, স্বতঃপ্রমাণিত—সমাজ, জীবন সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণায়, অনুভবে প্রতিক্রিয়াগুলো তীব্রতর হয়ে উঠছে, সমাজমনস্ক শিল্পী সত্যজিৎ ক্রমাগত আরও বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন। এটাই স্বাভাবিক।

সাধারণভাবে সত্যজিৎ রায়ের ছবির প্রধান বৈশিষ্ট—সমাজপ্রসঙ্গ। বিষয়টা তাঁর ছবিতে আসে নিজস্ব ঢঙে। যেমন, কাহিনীর চরিত্রগুলো এক বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বা পরিস্থিতির কেন্দ্রে হাজির হয়। তাদের মধ্যে বিচিত্ররকম সম্পর্কের টানা পোড়েন। কখনো একসঙ্গে, কখনো ছোট-বড় দলে ভাগ করে নিয়ে, তাদের সম্পর্কের চরিত্রের নানা দিক উন্মোচিত হয়, চরিত্রগুলোর বিশেষ বিশেষ মাত্রা আবিষ্কৃত হয়। এই অনুসন্ধানের সূত্রে ধরা পড়ে সমাজের বিশেষ চেহারাটাও। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমাজে যে পরিবর্তনগুলো ঘটে চলেছে, তার প্রভাব যেভাবে কাজ করছে ব্যক্তির উপর। উল্টোদিক থেকে, ব্যক্তির চিন্তা ও কার্যকলাপ সমাজজীবনে যে অভিঘাত ফেলছে—সবকিছু একটা চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে রেখে দেখা এবং বুঝতে চেষ্টা করা — এটা সত্যজিৎ-এর ছবির উল্লেখযোগ্য দিক। ফলে, এমন কি যখন কাহিনীর মূলসূত্র অন্তর্মুখী তখনও ছবিতে তৈরি হওয়া আন্তর বাস্তবতা বা ইনার রিয়ালিটির শিকড় থেকে যায় সমাজবাস্তবের মাটিতে, একে অন্যের পরিপূরক হয়ে। পরিচালক সত্যজিতের লক্ষ্য যেন জীবনকে এমন এক সামগ্রিকতায় ধরতে চেষ্টা কবা যেখানে অভিজ্ঞতা বহুমুখী, দৃষ্টি বহুকৌণিক এবং শিল্পবস্তুটির ব্যঞ্জনাও বহুস্তরী। কোন একটি বক্তব্য হয়তো প্রধান বক্তব্য,তবে সাধারণত সেটাই ছবির একমাত্র বিষয়বস্তু নয়। 'শাখা-প্রশাখা' ছবিতেও একাধিক থীমের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত, বিজড়িত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক বহুস্তর পরিবেশ। ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্ক যার আশ্রয়। এই সম্পর্কের কেন্দ্রে আছে মূল্যবোধের প্রশ্ন। আবার এই প্রশ্নটিকে ঘিরে থাকে আরও বড় এক ফ্রেম, যাক বলা যায় জীবনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। জন্মদিনের উৎসবে অলক্ষ্যে উপস্থিত মৃত্যু, শৈশব-যৌবনের পরিণতি যে অমোঘ জরাগ্রস্ত বার্ধ্যক্য তার ইঙ্গিত। জীবনের যাত্রা বিরতিহীন, তবু জীবন দিশাহীন, মূল্যবোধবিযুক্ত শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য নয়, বাঁচার ভিতরে নিশ্চয় কোন সত্য অর্থের আবেদন আছে। কী সেই গভীর সত্য? —এই বৃহত্তর জিজ্ঞাসার নিরিখেই যেন পরিচালক সত্যজিৎ মূল্যবোধ বা সততার

প্রশ্নটি তোলেন এবং তার উত্তর পাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শুধুমাত্র জরুরি, প্রাসঙ্গিক কোন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, এই কারণেই শিল্পকর্ম উত্তীর্ণ হয়ে ওঠে না। আলোচ্য বিষয়কে শিল্পের এলাকায় নিয়ে আসার জন্য কি ভাবে শিল্প মাধ্যমটিকে কাজে লাগানো হলো, সেটাই বিবেচনার।

ছবির শেষদিকে, মানসিক ভারসাম্যহীন! মেজো ছেলে প্রশান্ত স্বগতোক্তির মতো বলে, 'যতো সহজ, ততো ভালো'। এই কথার লক্ষ্যে সত্যজিৎ যেন এই ছবিটিকে পৌঁছে দিতে চান। সহজ অথচ গভীর, এ এমন এক সরলতা যা প্রজ্ঞার গভীরতা থেকে জন্ম নেয়। যে গভীর প্রাজ্ঞ সরলতার উজ্জ্বল উদাহরণ 'পিকু'। 'শাখা-প্রশাখা'-য় সব কিছুর আয়োজন থাকলেও অকাঙক্ষা শেষ পর্যন্ত অপূর্ণ থেকে যায়।

আয়োজন যে ছিলো, অর্থাৎ আলোচনার শুরুতে মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে যে বস্তুতর ব্যঞ্জনার শিল্পজগৎ সৃষ্টির কথা উল্লেখ আছে, তার প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায় চারপুরুষের কাহিনী বিন্যাসেই। বিন্যাসরেখার প্রান্তবিন্দুতে আছেন আনন্দমোহনের জরাগ্রস্ত, নব্বই অতিক্রান্ত পিতা। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা এই বৃদ্ধ মানুষটির মুখ কিন্তু শিশুর মতো সবল ও লাবণ্যময়। জরাগ্রস্ত, তবে এখনো তার চেতনা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি, কড়া পাহারা এড়িয়ে বারবার ফিবে আসতে চান জীবনের বৈঠকখানা ঘরে, তাঁর প্রিয়স্বজনদেব মাঝখানে। অথচ তারা ওঁকে ভয় পায়। সহ্য কবতে পারে না। পারেনা, তার কারণ জীবনেব এই স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি—বার্ধক্য ও মৃত্যু মেনে নেবার মতো মানসিক প্রশান্তি বা গভীবতা তাদেব নেই। ব্যতিক্রম, সম্ভবত তিনটি চরিত্র। আনন্দমোহনের বড় ছেলে প্রবোধের স্ত্রী, যদিও সে সবার আগে এই বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করে, প্রণাম করে। তাকে আমি ব্যতিক্রমেব দলে বাখছিনা, কারণ তার এই কাজে দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত কোন মাত্রা থাকে না। লক্ষণীয়, দুটি চরিত্র কখনো বৃদ্ধের মুখোমুখি আসে না, এক আনন্দমোহন, দ্বিতীয় মেজোছেলে, মানসিক ভারসাম্যহীন প্রশান্ত। হতে পারে, এর আলাদা কোন গুরুত্ব নেই, পরিচালক নিজস্ব ভাবনায়। কিন্তু এর একটা ব্যাখ্যা সম্ভব বলে মনে হয়। প্রথম সিকোয়েন্স আনন্দমোহনেব সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যাবার কথা উঠতেই প্রশান্ত সেই বিপন্ন ভবিষ্যৎবাণী, চোখের সামনে বাজ পড়তে দেখার মধ্যে দিয়ে আসন্ন হার্ট এ্যাটাকের অভাস দেয় যখন, আনন্দমোহন খুব শান্তভাবে 'জন্মদিনের উৎসবের পোষাকে ফুলবাবু সেজে' বিপর্যয়কে মেনে নেবার কথা বলেন। স্বাভাবিক, কেননা তাঁর মধ্যে তাঁর বৃদ্ধ পিতার সহজ পূর্ণতাব শান্ত মূর্তিটা পাই আমরা। আর প্রশান্ত খানিকটা উন্মাদ হবার (!) সুবাদে, এ-সবের ঊর্ধ্বে রিয়ালিটির ভিন্ন এক মার্গের বাসিন্দা। প্রশান্তর মধ্যে পাওয়া, যায় সেই পরিচিত প্যারাডক্স, প্রকৃত অর্থে জননী সেই 'fool', অন্ধ বলেই যে সবচেয়ে ভালো দেখতে পায় কাজের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও যে সেই জগৎকে সঠিক চিনতে পারে। এই চরিত্রে দুটি বিশেষ মাত্রা আরোপ করেছেন পরিচালক। এক তার ভবিষ্যৎকে আগে থেকে জানার ক্ষমতা, যে ক্ষমতার উৎস সম্ভবত সংগীতের শুদ্ধতম রূপের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া তার সত্তা। দ্বিতীয় মাত্রাটি হলো, এই চরিত্র যেন পরিচালকের প্রতিবাদের অস্ত্র। এই চরিত্রটি প্রসঙ্গে আবার আমাদের ফিরে আসতে হবে। বিন্যাসরেখার প্রান্তে যদি আনন্দমোহনেব জরাগ্রস্ত পিতা, যিনি মৃত্যুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন, শুরুতে তবে আনন্দমোহন নাতি, সবে যে চারদিক সাগ্রহে দেখতে

শুরু করেছে, প্রশ্ন করতে শিখেছে। যে বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে সে প্রপিতামহকে দেখে, সেই একই কৌতূহলে বনে দুটো গিরগিটি দেখতে পাওয়ার কথা চিৎকার করে মাকে জানায়, ফিরে এসে আবার দাদুকে জানায়। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায় পিকুর চিৎকার, 'মা, আমি কালো পেন্সিল দিয়ে সাদা ফুল আঁকছি।' শিশুর অনাবিল আবিষ্কারের জগৎ থেকে নিরীহ 'গিরগিটি' বয়স্কদের আবিল অভিজ্ঞতার বাস্তবে নিয়ে আসে নিষ্ঠুর অর্থ। কিন্তু পিকুর সাদা ফুল কালো রঙে আঁকার কথা মনে পড়ে যায় বলেই, ডিংগোর 'গিরগিটি' নতুন করে আমাদের বিচলিত করেনা। শুধু তাই নয়, 'পিকু'তেও দাদু হার্ট এ্যাটাকে শয্যাশায়ী, এবং দাদু ও নাতির সম্পর্কের নিবিড়তা কিছুটা 'শাখা-প্রশাখা'য় ফিরে আসে। যদিও ডিংগোর মধ্যে পিকু চরিত্রের ব্যঞ্জনা অনুপস্থিত। ডিংগো আমাদের অনতিদূর ভবিষ্যতের প্রতিনিধি। মূল্যবোধের অবক্ষয় বর্তমানকে নামিয়ে দিয়েছে গিরগিটি আর শেয়ালের স্তরে, ভবিষ্যৎ তবে কোন চেহারায় গড়ে উঠবে? খাবার টেবিলে ডিংগোর বাবা আর বড় জেঠু ভদ্রতার মুখোস খুলে ফেলে নর্দমার কাদা ছোঁড়াছুড়িতে মেতে ওঠে, মা ডিংগোকে সেখানে থেকে চলে যেতে বললেই কি ডিংগোর শিশু-জগৎ এই দূষণ থেকে রক্ষা পাবে? ডিংগোর বাবা প্রবীর,বাইশ বছর বয়স থেকে যে ব্যবসা আর মদ্যপান শুরু করেছে, জুয়া খেলে, শুধুমাত্র স্ত্রী সঙ্গে যে তুষ্ট নয়, বাপের অসুস্থতার খবর পেয়ে কর্তব্য করতে এলেও তার আসার আসল উদ্দেশ্য বাপের সম্পত্তির ভাগ পাওয়া। প্রবীরের বড়গুণ সে এ-সব কিছুই প্রকাশ্যে করে, কোন ঢাকাঢাকির তোয়াক্কা করে না। তবে, আশার কথা, সন্তানের মুখ চেয়ে সে নিজেকে পাল্টাতে শুরু করেছে। অবশ্য সন্তানের প্রতি তার হঠাৎ পাওয়া দায়িত্ববোধের কোন ব্যাখ্যা ছবিতে নেই। ছোট ভাই প্রতাপ, প্রবীর ও তার স্ত্রী তপতীকে ঘিরে থাকে টুকরো এক নাটক। বড় ভাই প্রবোধের স্ত্রী-র তুলনায় রুচি পছন্দ সংস্কৃতিবোধের মাপকাঠিতে তপতীর জায়গা আলাদা। স্বাভাবিক, সে ছোট দেওর প্রতাপের মানসিক জগৎ-এর অংশীদার, এবং স্বামী প্রবীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক মূলত শরীরের। কিন্তু সে কি শুধুই প্রতাপের প্লেটোনিক বন্ধু,যা খুব জোর দিয়ে সে স্বামীকে বোঝাতে চায়?

প্রতাপের জীবনে বিশেষ সম্পর্কের টানে চলে আসা মেয়েটির খবর শোনা মাত্র যে ভাঙ্গন চকিতের জন্য ভেসে ওঠে তপতীর মুখে, হাসিতে—প্রকৃত সত্য ধরা পড়ে সেখানেই। বোঝা যায়, প্রতাপ-তপতী সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যভিচারের মাত্রা না থাকলেও সেটা যে নিছক দেওর বৌদির বন্ধুত্ব তা নয়, কামনার একটা উপাদান সূক্ষ্ম ভাবে থেকে যায় তপতীর দৃষ্টিকোণে। প্রতাপের অবস্থান প্রবোধ-প্রবীরের স্থানাঙ্ক থেকে দূরে, এবং দূরে বলেই সংগীতপাগল মেজদা, প্রশান্তর কিছুটা কাছাকাছি সে আসতে পারে। ছবিতে শট কম্পোজিশনেও দেখা যায়, প্রতাপ ভীড় থেকে ঈষৎ দূরে থাকে। আবার এক রাত্রে নিঃশব্দে সে ঢোকে ঘুমন্ত বাবাকে দেখতে। মেজদার ঘরে যায় নিভৃতে কথা বলার জন্য, যেন এই একমাত্র লোক যাকে চাকরী করার যন্ত্রণা আর সেই চাকরী ছেড়ে দেবার যে মুক্তির আনন্দ, স্বেচ্ছায় সে কথা বলা যায়। খাবার টেবিলে ঝগড়ার পরে বড়ভাই প্রবোধ নির্লিপ্ত ও শান্তভাবে স্ত্রীকে বোঝায়, ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া বা ঘুষ নেওয়া এসব নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামায় না, কেননা দুর্নীতিই এই সমাজ ও সময়ের কার্যকরী নীতি। বিরুদ্ধ স্রোতে সাঁতার কাটার চেষ্টা করলে তলিয়ে তলিয়ে যাবার

সম্ভাবনাই প্রবল। বড় বৌ, কম খেয়ে-পরে সৎভাবে থাকার যে মৃদু প্রস্তাব তোলে, বোঝা যায়, সে প্রস্তাবের বা প্রশ্নের বাস্তবতা নিয়ে বেশি ভাবনার দায় তার নেই, কারণ সে মেনে নিতে পেরে খুশী হয় যে, প্রবোধ স্বামীর ভূমিকায় কর্তব্যনিষ্ঠ। এই টুকরোগুলো, ঢেউ-এর মতো একবার উঠে একবার নেমে ধারাবাহিক ওঠা নামার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে একটা জাল বোনার চেষ্টা করে। চমৎকার কয়েকটি সিনেমাটিক সিকোয়েন্স-এর দৃষ্টান্ত এখানে আছে।

তবু 'শাখা-প্রাশাখা'য় প্রতিশ্রুতি যে পূর্ণ হলোনা, তাব প্রধান কারণ চিত্রনাট্যভাবনার স্তবেই খুঁজে পাওয়া যায়। এ ছবি ঘটনাভারহীন, প্লট এখানে চার প্রজন্মের বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়, এগোয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবর্তে চরিত্রগুলির উদঘাটনে, পরিণতি পায় একটি উপলব্ধিতে পৌঁছে। এ ছবির ন্যারেটিভ স্টাইল তাই চরিত্রগুলোর চরিত্রায়ণ গুরুত্বপূর্ণ নয়। এক একটি এ্যাটিটিউডের বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিরূপে চরিত্রগুলোকে প্রতিষ্ঠা কবা। ফাঁক থেকে যায় দৃষ্টিভঙ্গীনির্ভর চবিত্রগুলোর ভিতরেই। আনন্দমোহনের কথা ভাবা যাক। হিসেব মতো ১৯৪৭-এ আনন্দমোহনের বয়স ছিলো ২৭, তখন তাব কর্মজীবন সবে শুরু হয়েছে। অর্থাৎ আনন্দমোহন স্বাধীনতার প্রথম প্রজন্মের মানুষ। সামাজিক আবহাওয়ায সে সময়টাব মধ্যে ছিলো আশা, উদ্দীপনা এবং আদর্শবাদ, এ সবই আছে আনন্দমোহনের চরিত্রেও। পরিশ্রম, সততা এবং বুদ্ধিমত্তা—এই তিনের উপর নির্ভর কবে আনন্দমোহন কর্মজীবনে সাফল্যের শেষ ধাপে উঠেছিলেন। ছবিতে প্রথম সিকোয়েন্স আনন্দমোহন প্রথম সততাব কথা তোলেন, তোলেন মূল্যবোধের সংকটের প্রশ্ন। প্রায-নাটুকে ঘোষণার মতো (সত্যজিতেব ছবিতে দুর্লভ) তিনি বলেন, 'একজন মানুষ সৎ থাকতে চাইলে সে থাকতে পারে না এ-কথা তিনি বিশ্বাস করেন না।' এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই যেন 'জিরো' শব্দটাকে প্রতবিাদের ধারালো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার কবে প্রশান্ত। ১৯৯০ সালের সামাজিক-আর্থিক প্রেক্ষিতে এই বিশ্বাস যে সত্যই নাইভ্ তা ধরা পড়ে এই মুহূর্তে কয়েকের নাটকে। এই নাইভিটি যে শুধু আনন্দমোহনের বিশ্বাসের মধ্যেই আছে, তা নয়। এই নাইভিটি আছে আনন্দমোহনেব প্রতি পবিচালকের ভাবনাতেও। প্রথমত, মূল্যবোধ নিশ্চয় শুধুমাত্র আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে সমার্থক নয়। মূল্যবোধের প্রশ্নটি আরও ব্যাপক। আনন্দমোহনের যে ছবি আমাদের সামনে তুলে ধবা হয়,তা এতোই নিখুঁত যে বিশ্বাসযোগ্য নয়। ১৯৮০ সালে যিনি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এবং অংশীদার হিসেবে অবসর নেন, চাকবী-জীবনে তাঁকে কোনরকম সমঝোতা করতে হয়নি, কোন রকম অন্যায়ের কালি গায়ে মাখতে হযনি, এমন মানুষ শুধু রূপকথার অশ্রয়েই বেঁচে থাকতে পারে। অথচ আনন্দমোহন এ-ছবিতে কাহিনীব কেন্দ্রে আছেন, মানদণ্ডের মতো, তার সাফল্য ও সততার সূত্রেই অন্যান্য চরিত্রেরা পরস্পরকে যাচাই করে। আয়রনির উপাদান এই চরিত্রটির মধ্যে না থাকার কাবণে, আনন্দমোহনের সঙ্গে তার চারপাশের রূঢ়, নষ্ট বাস্তবের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। আনন্দমোহনের পরিবার উচ্চবিত্তের খণ্ড সমাজ, যেখানে প্রকৃত অর্থে সমস্যা তৈরি হয় এক ছেলের বিলেত যেতে না পারাব দরুণ বঞ্চনা থেকে আব একজনের ক্ষেত্রে দু'টো গাড়ির জায়গায় একটা গাড়ী থাকলে, বা স্কচের বদলে হুইস্কি খাওয়ালে লোকে নিন্দে করবে, তা থেকে। 'ব্রিলিয়াণ্ট' ছেলে প্রশান্ত বিলেতে পড়তে গিয়ে গাড়ী দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত

নিয়ে ফিরে, আসে, 'কাজের' জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা বাড়ীতে বসে থাকে, ডুবে থাকে নিজের জগতে, মার্গীয় সংগীতের সাতসুরের সংসারে। এমন এক একস্ট্রাসেন্সরি পার্‌সেপশনের ক্ষমতা তার মধ্যে জন্মেছ যার সাহায্যে সে ভবিষ্যৎকে জানতে পারে সংগীত মগ্নতা তাকে দিয়েছে সৃষ্টির ভিতরকার হারমনির চেতনা। পারিবারিক ও সামাজিক স্তরে সেই হারমনির ভাঙ্গনতাই তাকে ভীষণ ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ণ করে তোলে। সকলের মধ্যে থেকেও সে একা ও দূরের, একা ও দূরবর্তী হয়েও সে সবকিছু সম্পর্কে সবচেয়ে তীব্রভাবে সচেতন। (শেষ দৃশ্যে আনন্দমোহন 'তুই আমার সব' বলে কাছে টেনে নেন প্রশান্তকে, তখনও) এই চরিত্র দুটির সামাজিক ভিত্তি বা চেতনা অস্পষ্ট থেকে যায়। সামাজ যে পথে এগোচ্ছে তাকে এরা কী ভাবে বোঝে, এবং সেই পরিবর্তনের অভিঘাত এদের উপর কী ভাবে কাজ করছে-তার হদিস আমরা পাইনা। পাইনা, যেহেতু, 'শাখা-প্রশাখা'য় নৈতিকতার প্রশ্ন, মূল্যবোধের প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-চেতনার স্তরে বাঁধা পড়ে যায়। এ ছবি কখনো মূল্য-বোধের অবক্ষয়ের পিছনের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার জটিলতাকে ধরতে চেষ্টা করে না।

অতিকায় শাখা প্রশাখা

পার্থপ্রতিম চৌধুরী

প্রস্তাবনা

কত ছোট করে লিখবো নিজের নাম? কতই বা বড়ো করে লিখবো সত্যজিৎ রায়ের নাম? মাণিকদা'র নাম খুব বড় শাখা-প্রশাখায় লিখলে বিজ্ঞাপন ভেবে ভুল করবে না তো কেউ?

দিনটা রোববার। সকালে ঘুম একটু দুষ্টুমি করে দেরিতে ভাঙে। তারপর চা, আনুষঙ্গিক প্রাতঃকৃত্য, কয়েকটা কাকডাকা হাই, অথচ কাকেদের ডাক তখন শেষ। চোখটা ফোকাস পেতেই খবরের কাগজ ঝুলন্ত হাতে রেখে দুলন্ত চিন্তা...... আজ বেলা দেড়টায় টি. ভি.-তে সত্যজিৎ রায়ের 'শাখা প্রশাখা'। বহুদিন পরে টি. ভির.-র বোনাস। নইলে এই বোকাবাক্সর রিলে-রেসে কিছুতেই আমার পিলে চমকায় না! বরঞ্চ খিদে কমে, অম্বল হয়। কিন্তু সেই বোকাবাক্সে যখন হঠাৎ চালাকির একটা বাজ পড়ে, তখন সকাল থেকেই সাজ-সাজ রব। আজ বেলা দেড়টা ... মারো গুলি সব কাজ আর কাজের অকাজ ..... ধ্যেৎ.... নেহী যায়েগা মারকেট.... ডিমের ডালনা আর মুসুরির ডাল কাফি! পাড়ার মুদীখানায়' ট্রাঙ্কল করে দাও দিনি.....!

প্রস্তাব

কিছুদিন আগেই মাণিকদা'র 'গণশত্রু' নিয়ে একটা টেবিলি তর্কে আমি মুখথুবড়ে পড়েছিলাম, তারও আগে 'ঘরে বাইরে'র তর্কে আমি ঘর থেকে বাইরে। সবাই অন্ধভক্ত, অবসলিট্, মাথা কাজ করছে না বলে ঘুঁটে দেওয়ার মতন আমার চারদেওয়ালে গাল পেড়ে চলে গ্যালো। আজ 'শাখা প্রশাখা' ছড়িয়ে যাওয়ার পর সেইসব নাকচশমা বন্ধুদের মুখগুলো মনে পড়ছে। গ্যালো কোথায় সেইসব কফিধ্বংস করা শিল্পের শেষকথা বোঝার বুঝিতত্ত্বের দল?

দেখুন, আমি নাটক, গপ্পো করতে এবং প্রবন্ধ না হলেও কবন্ধ লিখি, মানে 'ক' লিখতে জানি। আমার বোঝাটা যে শিল্পের বোঝা নয়, তা-ও আমি হাল্কা-শরীরে জানি। তবু আধুনিকতা বলতে যখন আমরা এ'ওকে ছোট করা বুঝি, কারুর স্ত্রী'র নামে কিছু রসের আচার আচরণ বুঝি, পরনিন্দা-পরচর্চামুখর কিছু মুড়িচানাচুর আড্ডা বুঝি, তখন আর রাগ হলেও যেন রাগা যায়না, মনে হয় যাক্‌গে যাক্.... ধ্যেৎ তেরিকা .... অথবা আমার বাবার কি! আরও একটু উচ্চমার্গে উঠলে একটু সোডার গলাভাঙ্গা শব্দ, চামচের নৃত্যকালীন টুং-টাং, হুইস্কির হাই-ফাই। এতকথা হয়তো ধান ভানতে শিবের ভজন হয়ে যাচ্ছে। তবু মূল প্রসঙ্গটা যখন শিল্পের শিবদ্যুতি, তখন ভজন দিয়ে শুরু না করে উপায় কি?

শুরু

সত্তর বছরের সত্যজিৎ, আর তাঁর সত্তর বছরের নায়ক আনন্দমোহনের জন্মদিনেই ছবির শুরু। আনন্দমোহন এবং তার মেজছেলে লগ্নচ্যুত মস্তিষ্কের প্রশান্তকে নিয়ে। প্রায়-থিয়েটারীর কথোপকথনে গল্পের পেছনের মাদুরটা খুলছেন সত্যজিৎ; প্রথমে যা বেশ নাটক-নাটক লাগে। একটু-বা বাহুল্য, দুর্বলতাও মনে হয়। কিন্তু প্রথম শট থেকেই যে নাটক, অন্তর্লীন নাটকের চাপা সুঘ্রাণ ওপরের স্তরগুলিতে চিড় ধরাতে থাকে, তখনই আমরা নড়েচড়ে বসি। এ যেন Lazos Egri-র On the Art of Dramatic Writing-এর সেই 'fold and unfold the situation and then consider the razor's edge.......' সত্যিই প্রথম দৃশ্যে যে ব্লেডগুলো মোড়ক থেকে খোলা হলো, পরবর্তী দৃশ্য থেকেই সেগুলোর ধার চক্‌চকিয়ে উঠলো অন্তরের রোদ্দুরে, হৃদয়ের বেপথু বারান্দায়। মানসিক ভারসাম্য হারানো প্রশান্ত এই প্রথম দৃশ্যেই যেন বেয়ারীম্যান-এর আলোছায়ার নাটক হয়ে ওঠে। আমি পৃথিবীর খুব কম ছবিতে এই ধরনের বারুদে প্রথম দৃশ্য অথবা যবনিকা উত্তোলন দেখেছি। সত্যজিৎ তাঁর শেষ সাক্ষাৎকারে যে সিনেমায় নাটকের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন, তার প্রমাণ এই দৃশ্য। অমি প্রথম থেকেই খুশি নাটকের লোক বলে, এবং আমার ধারণা ইংগেমার বেয়ারীম্যানও খুশি হবেন সুইডিশ নাট্য আকাদেমীর অন্যতম কর্মী হিশেবে, খুশি হবেন আকিরা কুরোসাওয়া, 'ম্যাকবেথ' অবলম্বনে যাঁর 'থ্রোন অব ব্লাড' আজও সিনেমার আলমারিতে তুলে রাখা জাপানী হাতপাখা। তারপরের দৃশ্যে আনন্দমোহনের নাগরিক সম্বর্ধনা — যে দৃশ্যে তাঁর হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাক এবং যেখান থেক মূল গল্প শুরু। এই হার্ট-অ্যাটাকই যে মূল নাটকের এবং পরিবেশ ও চরিত্র বিশ্লেষণের নান্দনিক বীজবপন করলো, তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন শ্রীরায়, টাইটেলস অথবা পরিচয়লিপির তলায় কার্ডিওগ্রাফির রেখাচিত্র দিয়ে। এগুলো খুব নিখুঁত শহুরে শিল্পীর কাজ ; যাঁর মনের পলিমাটি গ্রামীণ নদীরেখা দিয়ে আঁকা। যেখানে এক ঘুম থেকে ওঠা অপু বড় হয়, যে অপু শহরে এসে টাকার এক নম্বর-দুনম্বর-তিননম্বর-চার নম্বর চেনে এবং আমাদের চমকে দ্যায়।

শাখা

লো-অ্যাংগেলে পরপর টেলিফোন শট্‌স। বড় ছেলে জানাচ্ছেন সেজ ছেলেকে হঠাৎ বাবার এই হার্ট-অ্যাটাকের কথা, সেজ ছেলে হুইস্কিতে বরফ ঢেলে সদ্য দু'সিপ টেনে এই দুঃসংবাদ জানানোর দায়দায়িত্ব দিচ্ছেন ছোটছেলেকে। বেশ একটা সহজিয়া টেন্‌শান শুরু হয়, এবং চলচ্চিত্রের চালচিত্রে নাটক তার ক্যাঙারু-লাফ শুরু করে।

সবাই সত্তর বছরের বাবার অসুস্থতায় আসে। প্রবাসী তিন ছেলে, তাঁদের দুই বউ এবং এক ছেলে, অর্থাৎ বৃদ্ধ আনন্দমোহনের সোয়েটারী নাতি। এঁদের সবার ঠাকুর্দা, তিরানব্বুই বছরের এক জীবন্ত ফসিল ওপরের ঘরে থাকেন, আনন্দের নাতি যার পুতি। অর্থাৎ, চার জেনারেশনেব গপ্‌পো ফেঁদে বসলেন সত্যজিৎ, চার দেওয়ালের চার আয়নায়। এবং এইবাব মূল গল্পের অন্তস্তন্তুতে, অণু-পরমাণুতে আবিষ্কৃত হতে থাকলেন নতুন করে সাহিত্যিক সত্যজিৎ, যা আমার কাছে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। সংলাপ এবং চলচ্চিত্রেব সংলাপ রচনায় তিনি এক নম্বর যাদুকর, কিন্তু এমন উপন্যাস তিনি আগে

কখনও লেখেননি, ভবিষ্যতেও হয়তো আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে তাঁর এই সহিতত্ত্বের অশ্বক্ষুরধবনিব জন্যে। টেব্‌লে ফেলে প্রতিটি চরিত্রের এই অস্ত্রোপচার, এই যন্ত্রণা, মন্ত্রণা আর মন্ত্রিত্বের কম্পন, যা আসলে কার্ডিওলজির মনিটরেই কার্ডিওগ্রাফের বঙ্কিম-অবঙ্কিম রেখার চলাচল, তা আগে আমরা সত্যজিতের কাছে পেয়েছি কি? আসলে তাঁর কাছে এত পেয়েছি যে কি পাইনি তার হিসেব মেলাতে মন চটজলদি রাজি হয়না।

অপরের লেখা অবলম্বনে হয়তো চারুলতীয় চারুত্ব সত্যজিতের আছে, আছে বিভূতিজনিত পথ ও পাঁচালিতে অপরাজিত পদক্ষেপ, কিন্তু নিজের লেখাকে এভাবে আক্রমণ ও অতিক্রমণ করতে আমিতো তাঁর ছায়াশিল্পের গবেষণায় আগে দেখিনি, এটুকু মানতেই হবে। বেয়ারীম্যান মনে পড়া স্বাভাবিক — 'আজকেব দিনে, সাম্প্রতসময়ে প্রতিটি মানুষের মন, মনন এবং হৃদয়কে যদি মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলা হয় তাহলে দেখা যাবে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত জ্বালায় এবং সমস্যায় প্রপীড়িত।'

এই পীড়িত, একদল মানুষের অস্তিত্বের শাখা প্রশাখাই প্রপীড়িত হয়ে সত্যজিতের ক্যামেরা আর শব্দজব্দে ধরা পড়েছে, কালোত্তীর্ণ এবং যুগান্তকারী রেখাচিত্র আর রঙে। রঙীন ছবি দেখতে দেখতেও প্রতিটি ফ্রেমে যেখানে মানুষ-মানুষীর সাদাকালোটা অস্ফুটে ফুটে ওঠে, নিটোল স্বাভাবিকতায়।

প্রশাখা

'পোল্‌টার জেষ্ট' ছবিতে বিরাট লম্বাটে কাঁচের জানালা ভেঙে একেবারে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ছে সেই অতীন্দ্রিয় গাছের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শাখা-প্রশাখা। প্রশাখাই বলছি, ঢুকে পড়ছে, বাড়তে বাড়তে ঘরের ভেতরে। সেখানেও পরিবারটি ভীত; আর আমাদের সত্যজিতীয় পরিবারটি ও শুধুমাত্র অন্তরে-প্রান্তরে ভীত নয়, সঙ্কুচিতও বটে। তাই আনন্দমোহনের বড় ছেলে ছবিতে বারদুয়েক অন্ততঃ প্রশান্ত অর্থাৎ মেজভাইরূপী বিবেক'কে মুখোমুখি মোকাবিলা না করতে পেরে বলেন — 'ওকে মেন্টাল হস্‌পিটালেই পাঠিয়ে দেওয়া ভালো'। অথবা ঠাকুর্দা, তিবানববুই বছরেব এখনও জীবন্ত আদর্শকে বলেন 'এসব useles existence-এর কোন মানেই হয় না!'

আদর্শ-ন্যায়-নীতি আব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আলুপটলের ডালনায় দু'বার কিংবা তিনবার হঠাৎ করে চমকে দেওয়া অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালার মতন দৃশ্যে এনেছেন প্রমোদ গাঙ্গুলীকে, শতায়ুর দিকে যিনি জ্বলেছেন কম্পমান ঠোঁটের অস্ফুট ভাষায় আদর্শের পারদপ্রতিম হয়ে, তাঁকে চট্‌জলদি কিছু না করতে দিয়ে, কিছু না বলতে দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়াও যেন নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান। এখানেও চিত্রনাট্য রচনায় সত্যজিৎ রায় শুধু চিরন্তনী সত্য, অ্যারিষ্টোটলের নন্দনতত্ত্বের শেষ কথা, কি আধুনিক নাটকের বৃত্তপথ।

সত্যাদর্শ থেকে সামাজিক অবক্ষয়ে আমাদের যে কুন্দ-কুসুম-পরকাল, 'শাখা-প্রশাখা' যেন তারই আগ্নেয় প্রকাশ; জন্মভূমিতে ভূমিকম্প। মনে হয় আকাশের নীচে এখনও কিছু মানুষ চলছে, হাঁটছে, নীরবে, নিঃশব্দে। হৃদ্‌পিন্ডের শব্দ, হৃদয়ের শব্দ, বোধহয় এই প্রথম শুনলাম সত্যজিতীয় এম্‌ব্রয়ড্রীয় কাজে। খুবই নৈর্ব্যক্তিক, নির্লিপ্ত চেতনা থেকে মহাপুরুষ সত্যজিৎ রায় যেন ছবি করছেন — রজার ফ্রাই'এর সেই কথা — 'Art demands complete detachment', হৃদরোগের অসুস্থতা নিয়ে এতবড় হৃদয়ের

মনচিত্র বা মানচিত্র আঁকলেন কিকরে সত্যজিৎ, এই ধূলিরুক্ষ উন্মাদ সময়ে?

উন্মাদসময়ের পটভূমিতে তাই পেন্ডুলামের বারবার দোলার সঙ্গে সাতদিনের সংক্ষিপ্ত দিনযাপনের মন্টাজটা মনে পড়ে। কি সুন্দর, কত সহজ, কত লাবণ্যের দীপ্তি, কত মরমিয়া।

সাম্প্রত সময়ের নীতিহীনতার মুখোশী উপন্যাস খুব স্বল্প আঁচড়ে এবং কখনও কখনও নখরাঘাতে চলচ্চিত্রে লিখেছেন সত্যজিৎ, সম্রাটীয় সংযমে আর আভিজাত্যে। প্রমাণ, মমতাশংকর আর রঞ্জিত মল্লিক অভিনীত দুটি চরিত্রের সুপ্ত সম্পর্কের গভীরতম সামুদ্রিকতায় যেখানে চূড়ান্ত এক আগ্নেয় মুহূর্তে দু'জনে দু'জনের মুখোমুখি এবং রঞ্জিত নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ঘরের দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দিচ্ছে। 'অনেক কথা যাও যে বলি, কোনও কথা না বলি'র এমন উদাহরণ আমরা আর কোন্ বাংলা ছবিতে পেয়েছি? Detailing-এর এই সূক্ষ্ম কারুকাজ, ব্যঞ্জনা সত্যজিতের কাছে যেন ছেলেখেলা হয়ে গেছে। যেমন, দাদুর অসুখ জানার পর শিশুটির হঠাৎ ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলা, প্রায় গাভাসকারীয় ভঙ্গীতে একটা ছক্কা মেরে আবার টুক্‌টুক করে রাজার খেলা খেলতে লাগলেন।

পিক্‌নিক্ দৃশ্যে এখানে Memory games-এর বদলে এসেছে 'জলে চুন তাজা — তেলে চুল তাজা'র প্রসঙ্গ। মানুষ কোথায় তাজা তা ভেবে দেখবার জন্যই — ন্যায়নীতিতে না দুর্নীতিতে? এখানে অন্তাক্ষরী আসতে পারতো — আসেনি — এখানে দুলাইন গান গাইবার পরেও অত্যন্ত বাস্তবসূত্রে গান থেমে গ্যাছে। সিনেমায় এইধরনের উইটের ব্যবহার একমাত্র সত্যজিতেই আছে। কিম্বা ধরুন, তিরানব্বুই বছরের বৃদ্ধকে কামু যখন গরম জামা পরিয়ে দিচ্ছে, তখন good boy ... very good boy বলাটা। এইসব স্বাভাবিক স্কেচের মধ্যে একটা করুণ ব্যাপার আছে, বেদানার মতো বেদনা, যা চোখের জলের মুক্তোর মতোই দামী।

শট টেকিং অসাধারণ। একটা চরিত্রের কাছ থেকে অন্য চরিত্র যে অনেক দূরত্বে চলে গ্যাছে, সেটা সিনেমার ভাষায় বোঝানোর জন্যে প্যানিং-এর বারবার ব্যবহার বারবার মনে পড়ছে। দীপংকর হাতঘড়ি পড়ছে, চুল আঁচড়াচ্ছে, কথা বলছে, ক্যামেরা তার সমস্ত অ্যাক্‌শন্‌সকে ভূতের মতন অনুসরণ করে চলেছে। প্রথম দৃশ্যেও সিনেমায় নাটক জমানোর জন্য লম্বা লম্বা শট্‌স, কাটিং কম, খুব ভালো লাগে — আমাদের ভাবায়, আমাদের শেখায়। 'চারুলতা'র পরে আমি এ ছবিতেই মাণিকদা'র সংযম দেখলাম, একটা বাড়তি শট নেই! একটা বাড়তি শব্দ নেই! কৃত্রিম জুম শটের যত্রতত্র ব্যবহার নেই! কি যে বাঁচোয়া, মনে হয় যেন ভালো বিদেশী সাবানে স্নান সেরে উঠলাম। একটা তৃপ্তির পরিবেশ, চোখ কিংবা মন কোথাও হোঁচট খাচ্ছেনা, অথচ একটা পাথুরে অথবা বারুদে গল্প নিয়ে কারবার। একনম্বর, দু'নম্বর, সাদা টাকা, কালো টাকা নিয়ে যখন আলোচনা, তখন বাচ্চাটিকে চলে যেতে বলা হয়, সে খুবই বাধ্য আর শিক্ষিত ছেলের মতো চলেও যায়। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই তার সেই অবিস্মরণীয় টেনসার্টটি আসে। দরজার পর্দার আড়ালে টয়গান নিয়ে চলতি আলোচনা কান পেতে শোনা এবং মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা। হাতে টয়গান ধরিয়ে দিয়ে শ্রীরায় এখানে এক দ্বিমাত্রিক কাজ করে গেলেন প্রায় নিঃশব্দ নির্লিপ্তিতে — এমন সংখ্যাতীত মহান কাজ রয়েছে এ ছবিতে

শাখা এবং প্রশাখায়। হঠাৎ সৌমিত্র যখন সিম্ফনি শুনছে, তখন মমতাশংকর আলমারিতে শাড়ি তুলে রাখতে রাখতে অত্যন্ত ক্যাজুয়ালি বলে উঠলেন — বাখ্। তখনই চট্‌জলদি চরিত্রটার একটা উত্তরণ হয় এবং শিল্পের পাপড়ি মেলে — দীপংকরের মতোই আমরাও হতবাক্ হই। সিনেমা-করিয়ে কেরানীরা জানেন, বোঝেন, এসব খুব সাধারণ কর্মকাণ্ড নয়। এদেশে সিনেমায় সাহিত্যের যে সূর্যপ্রবেশ ঘটিয়েছেন সত্যজিৎ রায়, এবং একমাত্র সত্যজিৎ রায় — এরপরে সে বিষয়ে কোনে সন্দেহ কারোর থাকা উচিত নয়। রাতে খাবারের টেবিলের দৃশ্যটি, যেখানে দীপংকব তার বড়দাদা হারাধন বাড়ুজ্জে মশাইয়ের মুখোশটা টেনে খুলে ফেলছেন, তখন সৌমিত্র'র টেবিলে অনবরত ঘুষি মারার দরুন প্লেটের ওপর কাঁটা-চামচের কম্পিত শব্দ, যেন হৃদয়েরই শব্দ। এ'শব্দ আমাদের দু'নম্বরী প্রত্যেকটি প্রাণীকেই ঘুঁষি মারে। ছবিতে অন্যান্য আবহের খুবই পরিশীলিত এবং সংযমী ব্যবহারই এই থিমসাউন্ডকে এত শিল্পশোভন আব রাজকীয় করে তুলেছে, করে তুলেছে অনিবার্য দায়বদ্ধ একটা তাগিদ। আবহসংগীত এবং আবহশব্দের সুপরিকল্পিত সংযমী ব্যবহারও সত্যজিতের চলচ্চিত্র-দক্ষতার একটা অনন্য কক্ষপথ রচনা করে। আবহশব্দে পাখির ডাক এবং দু'বার ট্রেনের শব্দ শুনেছি, ঝিঁঝিঁ বা কুকুর-শেয়ালের ডাক শুনিনি, গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজ শুনিনি, কেননা নিঃসন্দেহে তা ছিলো এ'ছবির পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। বাইরে-থেকে-নেওয়া বাড়িরও কোনো মিড্-লং অথবা লংশট দেখিনি — কারণ, তা'ও ছিলো অপ্রয়োজনীয় এবং প্রায় পুরোপুরি ইন্‌ডোর সেট্‌স-এ ছবি তৈরি করা বলেই তফাৎ ধরার সুবিধের জন্যে 'চোখে আঙুল দাদা'র মতা অবাঞ্ছিত।

সব চরিত্রই সুঅভিনীত, কারণ প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যেই অভিনেতা সত্যজিৎ খুবই স্পষ্ট, এত স্পষ্ট কোনো ছবিতেই বোধহয় নন্। তবু তার মধ্যে কৃতিত্ব সর্বাগ্রে মমতাশংকরের। তারপর রঞ্জিত মল্লিক আর দীপংকর দে। সৌমিত্র এখন অনেক পরিপক্ক শিল্পী এবং চরিত্রটিও শতাংশে author-backed, তাই আলাদা করে তাঁর নাম করছি না। খুব অবাক করে দেন হারাধনবাবু, অভিনয়ে যাঁর কৃত্রিমতা আমার কাছে প্রায় কার্বন পেপারের মতো, তিনিও এ'ছবিতে কত স্বাভাবিক। লিলি চক্রবর্তীর করার কিছুই ছিল না— তাঁর চেহারাটাও এতই মধ্যবিত্ত, যে Top Executive-এর স্ত্রী'র চরিত্রে যায় নি। আনন্দমোহনের অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্চর্য রকমভাবে স্বাভাবিক। প্রমোদ গাঙ্গুলীকে ভালো লাগে বেশি, তাঁব কোটরাগত চোখ খুব মন টানে। যেমন, যে দৃশ্যে রঞ্জিত তার বান্ধবীর কথা বলে চলেছে মমতাকে, সেখানে মমতার চোখের কাজ অসাধারণ, আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে এমন ফিল্মিক অভিনয় দেখাই যায় না। কামু মুখার্জীকেও উপস্থাপনার গুণে ভারী মিষ্টি লাগে। Titles বড় দ্রুত চলে যাচ্ছে — নাম পড়া যাচ্ছে না। এটার পুনঃসংস্করণ করা উচিত। সেট্‌স খুবই ভালো, যেমন ভালো মেক্ আপেব কাজ - কিন্তু মাণিকদা'র অন্যান্য ছবিগুলোর মতন ফটোগ্রাফী এখানে কথা বলছে না, বেশ চলনসই। এ'ছাড়াও খুবই উন্নাসিক বিরূপ বার্তা পেয়েছি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র-পরিচালকদের কাছ থেকে। তাঁদের বক্তব্য, আনন্দমোহন, এই যে এতবড় প্রতিথযশা মানুষ, খুব নীচু থেকে ওপরে উঠেছেন, তিনি নিজে সারাজীবন সৎ এবং একনম্বরী থেকেও কি তার নীচের কর্মচারীদের দু'নম্বরী বা তিন নম্বরী দ্যাখেন নি? ঘুষ এবং ঘুষির রাজত্বে থেকেও তিনি কি এতই অচেতন, ঘুষ না নিলেও? ঘুষ এবং দু'নম্বরী কালোটাকার দাপট তো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিশ্বকালীন — তাঁদের জন্যে একটিই উত্তর, সত্যজিৎ এখানে ব্যক্তিগত ইউনিট এবং তারই বৃত্তপথে সততার কথা বলেছেন। বলেছেন, আমরা প্রত্যেকে যদি সৎ হই, তাহলে বৃহত্তর সততা আসতে বাধ্য। তবে এ'ছবির শেষ দৃশ্য একেবারে টেক্কার তুরূপ, শিল্পের প্রায় শেষ কথা। এমন অ্যালিয়েশন, এমন শিল্পজ নান্দনিক উত্তরণ আর কোথায় — বড্ড মন খারাপ হয়ে যায়, পাহাড়ের সামনে মাথা নিচু করে দৈনন্দিন আত্মবিলাপ করতে — কেন যে ছবি করতে এসেছিলাম, এবং কেনই বা আরো করছি।

নাতি যখন আনন্দমোহনকে বললো — 'আমি একনম্বর দু'নম্বর জানি — দাদু তুমি কত নম্বর? তিন নম্বর? চার নম্বর?' — এই হঠাৎ ঘুষিটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এইখানেই সত্যজিৎ, সত্যজিৎ এবং বিচারের শেষ রায়। তারপর স্পষ্ট উচ্চারণে সৌমিত্র অর্থাৎ প্রশান্তর 'বাবা' বলে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসা এবং সেই বাড়ানো হাতদুটিকে নিজের হাতে ধরে কাছে টেনে এনে আনন্দমোহন বলেন — 'শান্তি... শান্তি....শান্তি', যিনি জানেন ছেলেদের অস্তিত্বে তাঁর যে 'Honesty is the best policy' এবং 'Work is Worship'-এর মূলমন্ত্রেব আরকই ছিল মুখ্যসঞ্চালক — কিন্তু তা ভুল, ছেলেরা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং নাতিও তাদেরই উত্তরসূরী, যে সাদা কালো সব এই বয়েসেই চিনে ফেলেছে, তখন আনন্দমোহনের অস্থিরচোখ বোজার সঙ্গেই আমাদের বাপ-পিতেমো'র সততার পেন্ডুলামটি বন্ধ হয়ে যায়। এবং শাখাপ্রশাখা মুহূর্তেই হয়ে যায় 'The best human document'! সংগীতের সুচারু প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই শাখা-প্রশাখার শেকড় অন্যত্র গজিয়ে উঠতে থাকে, তা হয়তো বা আমাদের মনের মাটিতে, বোধ ও বুদ্ধির মেলবন্ধনে — আমাদের অন্যায়, অসত্য ও দুর্নীতির চাদরে — আর সেইখানেই সার্থক শ্রীল শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়, শিল্পের শিলমোহরে।

শাখা-প্রশাখা ঃ অবনত জীবনের ছবি

সোমেন ঘোষ

আমাদের চারপাশের জীবনটা দ্রুত পাল্টাচ্ছে। তিরিশ বছর আগে এখানকার সমাজজীবনের যে চেহারাটা ছিল, তার নানা পরিবর্তন ঘটেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে ইতিমধ্যে অসংখ্য ভাঙচুর হয়েছে। আন্তর্জাতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিভিন্ন ইস্যুগুলো এদেশের মানুষের ওপরেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছে। ষাট দশকের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এই নববই দশকে এসে আমূলভাবে পরিবর্তিত হতে দেখছি আমরা। জীবনজীবিকার বিভিন্ন সূত্র ও উপাদানগুলোর ওপর আমাদের পূর্বতন আস্থা নষ্ট হচ্ছে ক্রমশঃ। এক অদ্ভুত অস্থিরতা আমাদের চারপাশ ঘিরে রেখেছে। জীবনের লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখা দিয়েছে। নৈতিক চেতনার একটা অধোগমন আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজকে ভীষণভাবে গ্রাস করেছে। আমাদের নিজেদের প্রসঙ্গেই আসি। আজ সর্বভারতীয় সমাজ জীবনে মধ্যবিত্ত বাঙালীর বিপন্ন চেহারার কারণটা কি? সঠিকভাবে আমাদের নৈতিক চেতনার অবনতিই আমাদের অস্তিত্ব সংকটকে ত্বরান্বিত করেছে। একই সঙ্গে রক্ষণশীলতা, আপোষকামিতা আর স্থিতাবস্থার প্রতি অন্ধ আনুগত্য আমাদের মধ্যে প্রকট হয়ে বিরাজ করছে। চারপাশের অন্যায়, অনাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো শক্তি আমাদের এখন নেই। সব কিছু বিপ্রতীপ ও ক্ষতিকর সামাজিক অভিঘাত সহজে মানিয়ে নিয়ে, এক অদ্ভুত নিরাসক্ত দূরত্ব বজায় রাখার মানসিকতা বর্তমানে আমাদের মজ্জায় সংক্রামিত। এরই উল্টোদিকে নিজেদেব পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও স্বার্থ সংঘাত মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবন-জীবিকায় মলিনতাব ছাযা ফেলেছে। নীচতা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা মধ্যবিত্ত বাঙালীর সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে কালিমালিপ্ত করেছে। একটা সময় ছিল, যখন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবার জীবনে পারস্পরিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি প্রত্যেকে যত্নবান ছিলেন। আজ একই পবিবারের ঘনিষ্ঠ মানুষের মধ্যে স্নেহ ভালোবাসার কোন স্থান নেই। একই ছাদের তলায় আমরা প্রত্যেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বাস করছি। ন্যূনতম নৈতিক প্রেরণা বা মূল্যবোধের বাঁধন আজ আর মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মধ্যে সক্রিয় নেই। ফলতঃ পাপ, হীনমন্যতা, ঈর্ষা, সামাজিক প্রতিষ্ঠার অদম্য স্পৃহা ও প্রতিযোগিতামূলক আচম্বিৎ স্ট্যাটাস অর্জনের দুরন্ত প্রলোভনে বাঙালী পরিবারের মানবিক সূক্ষ্ম চেতনাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এরই পাশাপাশি নিজেদেব দুর্নীতি ও মানসিক অবক্ষয়ের চারপাশে স্বনির্মিত প্রাচীর তৈরী করে মধ্যবিত্ত বাঙালী নিজেদের নিম্নগামিতা ও ভন্ডামিকে সুচতুরভাবে আচ্ছন্ন কবে বাখার চেষ্টায় মগ্ন। তিরিশ চল্লিশ বছর আগের মূল্যবোধ, ন্যূনতম জীবনাদর্শটুকু নির্দ্বিধায় সরিয়ে রেখে এক আত্মকেন্দ্রিক উচ্চাশা আমাদের নিয়ত বিপন্ন অন্ধকাবের দিকে টেনে নিয়েছে। আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালীর চাওয়ার শেষ নেই। কোনো পাওযাতেই আমরা এখন তৃপ্ত নই। ওপরে ওঠার অবিরাম প্রলোভনে মধ্যবিত্ত

বাঙালীর সৎ মানবিক গুণ ও শুভবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

এমনই এক অস্থির, অন্তঃসারশূন্য ছিন্নভিন্ন সমাজ পরিবেশের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সত্যজিৎ তাঁর ২৮তম ছবি 'শাখা-প্রশাখা' নির্মাণ করলেন। অত্যন্ত সমাজ সচেতন শিল্পীরূপে বরাবরই তাঁর ছবিতে সামাজিক পটভূমিটা ভীষণ প্রতীকী চেতনায় মূর্ত হয়েছে। প্রথম দিকে এবং মধ্যে বিগত কালের কোনো কোনো কাহিনী নিয়ে তিনি একাধিক অসামান্য ছবি উপহার দিয়েছেন। কিন্তু সত্তরের দশক থেকেই অতীতচারিতার বদলে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসায় নিয়তপীড়িত সত্যজিৎ আমাদের আমলের সামাজিক সংকটের অবিসংবাদী রূপকার হিসেবে দেখা দিয়েছেন। কোনোদিনই তিনি কোনো রাজনৈতিক শ্লোগানে বিশ্বাসী নন। অথচ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অভিঘাতের চেহারা তাঁর ছবিতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় ধরা থাকে। প্রবহমান সমাজজীবনের সর্বস্তরের ছবি তাঁর কাজের মধ্যে নানা ইংগিতে ঘুরে ফিরে এসেছে। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ তথা পারিবারিক জীবনে যে ভাঙন গত বিশ-পঁচিশ বছরে ধীরে ধীরে সংক্রামিত হয়েছে, সত্যজিতের শিল্পচেতনায় স্বাভাবিকভাবেই তার একটা প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। স্বকীয় শিল্প অভিজ্ঞান, গভীর মনন ও সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতায় তিনি নানা সমাজিক পরিবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সময়োপযোগী করে তাঁর ছবির কাঠামোয় সাজিয়েছেন। তাঁর ঈর্ষণীয় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় আমাদের চারপাশের জগৎ জীবন নোতুন মূল্যায়ণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত বাঙালীর পারিবারিক জীবনে যে আত্মিক ক্ষয়ে তিনি ভাবিত, মানবিক মূল্যবোধহীনতার যে পঙ্কিল চেহারা তাঁকে পীড়িত করেছে, সেই সব নানাদিকের নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন সত্যজিৎ তাঁর 'শাখা-প্রশাখা' ছবিতে। কেবল বাংলা বা বাঙালীই নয়, আজ গোটা দেশেই নৈতিকতার একটা সার্বিক অধোগমন ঘটেছে। যে বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজ নিয়ে তাঁর ছবি, সেই বাঙালী সমাজেরই এক পারিবারিক জীবনকাহিনীকেন্দ্রিক 'শাখা-প্রশাখা'য় সত্যজিৎ আমাদের নৈতিক অধোগতি চিত্রিত করেছেন। এটা এমনই এক সময় যখন কোনো সুস্থ, সৎ আদর্শের প্রতি আর আমাদের কোন আস্থা নেই, পারিবারিক নিবিড় বন্ধনের সূত্রগুলোও যখন শিথিল হয়ে গেছে, ন্যায়-নীতি, সততা ইত্যাকার ব্যাপারগুলো যখন ক্রমশঃ পারিপার্শ্বিক মেকী আধুনিকতায় একেবারে ধূসর, সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের আর একবার সুস্থ-সুন্দর এবং নিবিড় জীবনবোধের চেতনার দিকে আকর্ষণ করলেন। সত্যজিতের নিজের কথায় ঃ 'সমাজের প্রতিটি স্তরে, জীবনের প্রতিটি ধাপে, প্রত্যেকদিন প্রতিটি কাজে আমরা যে দুর্নীতির মুখোমুখি হচ্ছি এটা তো কেউই ঠিক এই মুহূর্তে অস্বীকার করতে পারবে না, এটা যে তাক করার মতো একটা বিষয় তা আমার মনে হয়েছিল, অন্তত আমার যে কোনো একটা ছবিতে।' 'শাখা-প্রশাখা'য় সত্যজিৎ এমনই বিষয়কে চিত্রায়িত করেছেন। তবু আশাবাদী সত্যজিৎ ছবির অন্তিম দৃশ্যে স্বভাবসিদ্ধ প্রকরণে মানুষের জীবনের ইতিবাচক দিকটির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বিস্মৃত হন নি।

'শাখা-প্রশাখা' ছবির প্রথম চিত্রনাট্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালের শরৎকালে। ১৯৯১ সালের শরতে চিত্রনাট্যটি দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হল কিছু পরিবর্তনসহ। প্রথম প্রকাশিত চিত্রনাট্যের গোড়ায় 'শাখা-প্রশাখা' একটি চিত্রনাট্যের অংশ' এই কথাগুলি লেখা ছিল। অর্থাৎ 'কোনো এক সময় সত্যজিৎ যে এটি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য লিখবেন

এমন একটা আভাস ছিল। পঁচিশ বছর পরে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় রচনাটি তাই 'সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য' এই শিরোনামে মুদ্রিত হয়। প্রথম রচনাটি মুদ্রিত আকারে একুশ পৃষ্ঠা আর পরবর্তী পরিমার্জিত চিত্রনাট্যটির পৃষ্ঠা সংখ্যা সত্তর। কেবল পৃষ্ঠা সংখ্যার ব্যাপ্তিতেই নয়, বিষয়গত ডিটেলের ক্ষেত্রেও প্রথম রচনাটির সঙ্গে দ্বিতীয় চিত্রনাট্যের বেশ কিছু তফাত লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু প্রথম রচনাটি অনেক সংক্ষিপ্ত তাতে চরিত্র সংখ্যাও ছিল কম। পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্যে প্রধান ও গৌণ চরিত্রগুলো মিলিয়ে সংখ্যায় আঠারো। সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় সত্যজিৎ প্রথম রচনার কিছু চরিত্রের নাম পরিবর্তন করার সঙ্গে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোকেও এই মুহূর্তের উপযোগী করে রূপ দিয়েছেন। মূলতঃ ছেষট্টিসালে প্রকাশিত চিত্রনাট্যে তৎকালীন সমাজচেতনার যে বিষয় উপযোগী ছিল, যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উল্লেখ জরুরি ছিল তাকেই সত্যজিৎ তখন গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রায় সিকি শতাব্দী পরে নোতুনভাবে রূপ দিতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ের অনেক রেফারেন্স তিনি অপ্রাসঙ্গিক মনে করে বাদ দিয়েছেন। তাই ষাট দশকের ঐ পর্বের অন্যতম আর্ন্তজাতিক ইস্যু ভিয়েতনামের কোনো উল্লেখ দ্বিতীয় চিত্রনাট্যে নেই। কেবল শিল্পীর রূপান্তরী বিবেক নয়, একজন অত্যন্ত সমাজমনস্ক, আধুনিক বহমান সমাজ বাস্তবতার রূপকার হিসেবে সত্যজিৎ আজকের শিল্প মানসিকতায় চারপাশের অবস্থান থেকে নিজেকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। গত তিরিশ বছরে বাঙ্গালী সমাজ যেভাবে নিয়ত নিম্নগামী হয়ে চলেছে সেই হতাশাব সংকটকে সত্যজিৎ চিত্রনাটোর সংলাপে বেঁধেছেন। তাই আজকের সমাজ বাস্তবতাব অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটাই তাঁর নবতম চিত্রনাট্যে বড় স্থান নিয়ে বিরাজ করছে। ফরাসী পত্রিকা 'টেলিরামা'র এক সাক্ষাৎকারে এ ছবি সম্পর্কে তাই সত্যজিৎ নিঃসঙ্কোচে বলেন 'সোজাসুজি বলতে গেলে ঃ 'শাখা-প্রশাখা' আমার সব থেকে নৈরাশ্যবাদী ছবি, কারণ এতে দেখানো হয়েছে রাস্কেলরাই এখন জীবনে সাফল্য লাভ করছে!' সত্তরের মধ্যপর্বে নির্মিত তাঁর 'জন-অরণ্য' ছবিতেও দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের কথা ছিল। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় কেবল টিকে থাকার জন্য মানুষকে সর্বপ্রকার নীচ, কপট এবং বিরুদ্ধ পরিবেশকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে, কত ছলনা, প্রবঞ্চনা আর দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হচ্ছে, তাকে সত্যজিৎ সে ছবিতে অনবদ্য ভংগিতে তুলে ধরেছিলেন। সে সময়টাতে গোটা দেশজুড়ে যে নৈরাশ্যব্যঞ্জক কার্যকলাপ সর্বব্যাপী হয়ে পড়েছিল তারই রূপক ফুটেছিল 'জনঅরণ্য'তে। নিজে তিনি সে ছবিকে 'ব্ল্যাক কমেডি' আখ্যা দিয়েছিলেন। এত বছর পরে আবার তিনি একালের পাপ ও পতন, আমাদের সংগোপনে লালিত ভ্রষ্টাচার আর নৈতিক মূল্যবোধের অবনতিকে প্রত্যক্ষ করালেন অনবদ্য চিত্রিত ব্যঞ্জনায়, এক পারিবারিক চরিত্রাবলীর কয়েকদিনের সহাবস্থান আর মানসিক দূরত্ব ও সংঘাতের মধ্যে।

আদি চিত্রনাট্যটি সত্যজিৎ যেভাবে কল্পনা করেছিলেন, দ্বিতীয় চিত্রনাট্যে তার অনেক কিছু বজায় রেখেও তিনি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্রের প্রয়োজনে ডিটেলসের প্রতি অনেক গভীর মনোযোগ দিয়েছেন। যদিও দুটি চিত্রনাট্যের বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে যে পরিবার, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতির প্রসঙ্গ আছে তা বলতে গেলে একইরকম। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুত্রদের নামের পরিবর্তন ঘটেছে এবং কোনো কোনো চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে সত্যজিৎ প্রাথমিক রচনার তুলনায় নোতুন দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করেছেন। যেহেতু আদি রচনাটি একটি

পূর্ণাঙ্গ ছবির খসড়া বলে ধরতে পারি, তাই মূল ছবিটির শুরু এবং শেষের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। যে পরিবারকে কেন্দ্র করে 'শাখা-প্রশাখা'র কাহিনী বিস্তার, সেই পরিবারের প্রধান পুরুষ আনন্দমোহনের মেজ ছেলের নাম 'প্রতুল' পাল্টে ছবিতে 'প্রশান্ত' রাখা হয়েছে। আদি রচনায় সেজো ছেলের নাম ছিল 'প্রতাপ'। ছবিতে প্রতাপকে আমরা পরিবারের ছোট ছেলে হিসেবে পাই। ছবিতে সেজো ছেলের নাম প্রবীর। ছবিতে আমরা মেজ ছেলে প্রশান্তকে অকৃতদার চরিত্ররূপে দেখি। আদি চিত্রনাট্যে মেজো ছেলের দুই সন্তান ছিল তনিমা ও ডিঙ্গো। ছবিতে ডিঙ্গোই একমাত্র শিশু চরিত্র রূপে চিত্রিত। সত্যজিৎ মূলতঃ এক পরিবারের চার প্রজন্মের সূত্র ধরে তাঁর কাহিনী সাজিয়েছেন, যার প্রথম প্রতিভূ অভয় মজুমদার এক প্রায় জরদগব অতি বৃদ্ধ মানুষ। তাঁর সুযোগ্য পুত্র কীর্তিমান, ন্যায়নিষ্ঠ আনন্দমোহন মজুমদার এবং আনন্দমোহনের দুই অতি প্রতিষ্ঠিত পুত্র প্রবোধ ও প্রবীর, মানসিক ভারসাম্যহীন মেজো ছেলে প্রশান্ত ও কিছুটা বিবেকসম্পন্ন ছোট ছেলে প্রতাপ। এরা হলেন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের প্রতিভূ। প্রবীরের সন্তান ডিঙ্গো পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের প্রতিনিধি। এই চার প্রজন্মের নানা চরিত্রের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া, জটিলতা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় দৃশ্যের পর দৃশ্যের অদ্ভুত সংযোগে। পিতা আনন্দমোহনের হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হওয়ার সংবাদে কলকাতাবাসী তাঁর তিন ছেলেই তাদের স্ত্রী ও পুত্র নিয়ে উপস্থিত হয়, দূরবর্তী মফস্বলে আনন্দমোহনের বাড়ীতে। মস্তিষ্কবিকৃত মেজো ছেলে প্রশান্ত পিতার সঙ্গেই থাকত। বলতে গেলে সেই প্রৌঢ় আনন্দমোহনের সর্বক্ষণের সঙ্গী। ঘটনাচক্রে বহুকাল পরে মফস্বলের বাড়ীতে চারপুত্র, পুত্রবধূ ও নাতির সমাগমে কাহিনীব নাটকীয় সূক্ষ্ম মুহূর্তগুলো ক্রমশঃ উন্মোচিত হতে থাকে গভীর বাস্তবনিষ্ঠায়। চরিত্রোপযোগী সংলাপের অমোঘ প্রয়োগ আর দৃশ্যগঠনের গভীর নৈপুণ্যে ছবির সবকটি মানুষ যেন তাদের শরীর ও সত্তার সবকিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে ছবির পর্দায় মূর্ত হয়ে ওঠে। আজকের সামাজিক পটভূমিকায় একই পরিবারের লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত, অতি ঘনিষ্ঠ রক্তের শর্তে সম্পর্কিত মানুষগুলো যেন নির্লজ্জতার নির্মম স্বাক্ষর বহন করছে। পিতার অসুস্থতার সংবাদে আপাত বিচলিত মানুষগুলোর চারিত্রিক স্খলন ও নীতিহীনতার কদর্য দিকগুলো যেন অকপট আত্মপ্রকাশে আমাদের সামনে ধরা দেয়। মনুষ্যচরিত্রের একেবারে ভেতরকার রহস্যকে সত্যজিৎ অতি সহজেই ছুঁয়ে ফেলেন। পরিবারের প্রধান পুরুষ, বর্তমানে অসুস্থ আনন্দমোহন নিজের সততা, নিষ্ঠা আর নীতিধর্মী কর্মকুশলতায় ও দূরদর্শিতায় কলকাতা থেকে প্রায় দু'শো মাইল দূরের এক মফস্বলে একক প্রচেষ্টায় এক উপনগর গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরই নামে সেখানকার নামকরণ হয় 'আনন্দনগর'। ছবির মূল ঘটনার বিস্তার ও পরিসমাপ্তি এই আনন্দনগরেই। আনন্দমোহন যে পথের পথিক ছিলেন, যে আদর্শ ও সততায় বিশ্বাসী ছিলেন আজকের মেকী আধুনিকতাসর্বস্ব চলতি জীবনযাত্রায় তা অনেকটাই ধূসরতায় ঢাকা পড়ে গেছে। আজকের দুনিয়ায় আর আদর্শ, ন্যায়নীতি, সততার প্রতি একালের মানুষের তেমন কোনো আগ্রহ বা আস্থা নেই। তাদের কাছে ওসব ব্যাপারগুলো বস্তাপচা পুরোন মূল্যবোধের নামান্তর, ওসব বহন করার কোনো অর্থই নেই। আজকে কেবল নিজেকে গুছিয়ে নেবার যুগ। যে কোনো ছল-চাতুরী আর কপটতায় সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনই একমাত্র কাম্য, আধুনিকভাবে বেঁচে থাকার একমাত্র শর্ত। তাই ন্যায়পরায়ণ পিতা আনন্দমোহনের সঙ্গে

তাঁর প্রতিষ্ঠিত বড় ও সেজো ছেলের আত্মিক ফারাক দুস্তর। একমাত্র মানসিক রোগগ্রস্ত মেজো ছেলে প্রশান্তই যেন পিতার নৈতিক আদর্শের মহৎ সূত্রটাকে ধরে রেখেছে। তাই মেজো ছেলের প্রতি স্নেহ-মমতা আর আস্থাও যেন পিতার একমাত্র সান্ত্বনা।

ছবি শুরু হয়েছে এক স্নিগ্ধ সকাল বেলায়। ছবির সমাপ্তিও ঘটেছে আর এক সকালে যখন আনন্দমোহনের তিন ছেলে, দুই পুত্রবধূ ও নাতি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে অথচ ছবির শুরুর সেই স্নিগ্ধতার আমেজ যেন ছবির পরিসমাপ্তির বিদায়ী সকালের বিষন্নতা ও তিক্ত অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়েছে। ছেলেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও যে মর্যাদার তিনি অহেতুক গর্বিত ছিলেন, আজ তাঁর সেই গৌরব, সেই ভ্রান্ত আত্মতৃপ্তি ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। দুর্নীতি, শঠতা আর সার্বিক অধোগমনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি বিমূঢ়। আশাভঙ্গজনিত গভীর পরিতাপ তাঁকে আজ অশ্রুবিসর্জনে উদ্যত করেছে। সত্তর বছরের প্রৌঢ় আনন্দমোহন ছবির অন্তিম দৃশ্যে বড় বেশী করুণ ও বিষন্নতার প্রতিভূ। তাঁর দীর্ঘকালের বিশ্বাস ছেলেদের কাছে পেয়েও, তাদের নিম্নগামী জীবনযাত্রার পরখে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আজকের বিবেকহীন, ক্লেদাক্ত জীবন জীবিকার সংবাদে তিনি পীড়িত, অবসন্ন। ছবিতে মূল দৃশ্যক্রম মোট দশটি। তারই মধ্যে অসংখ্য খন্ডদৃশ্য গাঁথা হয়েছে। সবকটি সিকোয়েন্স সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত, গভীর রাত ইত্যাদি সময়ের অনুষঙ্গে বিভক্ত। এক অনবদ্য সংহত চিত্রনাট্যের আধারে সত্যজিৎ ছবির বিষয়টিকে বিন্যস্ত করেছেন।

শারীরিক অসুস্থতার কারণেই, তাঁর কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে সত্যজিৎ এ ছবিতে তাঁর কাজের পদ্ধতিকে একটু অন্যভাবে ব্যবহার করেছেন। যে সত্যজিতের ছবিতে আউটডোর সুটিংয়ের চমৎকারিত্ব ও প্রকরণেব অভিনব আঙ্গিক আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করেছে বারবার এ ছবিতে তার পরিবর্তে তিনি অনেক বেশীমাত্রায় বদ্ধ সেট পরিকল্পনায় কাহিনীটি গড়ে তুলেছেন। যদিও এ ছবিতে একটি অনবদ্য বহির্দৃশ্যের পর্ব আছে পিকনিক সিকোয়েন্সে। তবু যেন এখানে তাঁকে অনেকটা সীমিত স্থানিক ব্যবস্থাপনায় কাজ করতে হয়েছে। আর তাই তাঁর চিত্রনাট্যটি অদ্ভুত কুশলতায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুষঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে স্তরে স্তরে। সত্যজি‌‌ৎের ছবিতে অভ্যস্ত দর্শক নিশ্চয়ই এ ছবির পিকনিক দৃশ্যের সঙ্গে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবির 'মেমারী গেম'-এর সাযুজ্য অনুভব করবেন। কিন্তু সে দৃশ্যক্রমের রমণীয়তাকে সত্যজিৎ এ ছবির পিকনিকের দৃশ্যের গভীরতায় অতিক্রম করে গেছেন। এ ছবিতে তিন ভাই, দুই পুত্রবধূ ও একমাত্র নাতিকে নিয়ে তিনি যে সিকোয়েন্স রচনা করেছেন তার মধ্যে প্রকৃতি যেমন একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি চরিত্রগুলো তাদের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত আর সংলাপের পারম্পর্যে আমাদের কাছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। নিজেদের চারিত্রিক দুর্বলতা, প্রতিক্রিয়া আর মৌলিক দিকগুলোর উম্মোচনে আমরা যেন প্রতিটি চরিত্রের ভেতরকার কাঠামোটি অবলোকন করি। দোষে গুণে মেলানো এইসব মানুষগুলো যেন আমাদের করুণার পাত্র হয়ে ওঠে। 'শাখা-প্রশাখা'য় একটি অনবদ্য 'দ্বিপ্রাহরিক আহার দৃশ্য' আছে যা আমাদের 'জণঅরণ্যের' সেই অনবদ্য পারিবারিক খাবার সিকোয়েন্সের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সে ছবিতে বাবা, দুই পুত্র ও এক পুত্রবধূ নিয়ে সত্যজিৎ অসাধারণ দৃশ্যক্রম রচনা করেচিলেন। তবে সে দৃশ্যে চরিত্রগুলোর টুকরো টাকরা দ্বন্দ্ব আর ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে

পারস্পরিক আত্মিক নৈকট্য আর প্রীতির স্পর্শ প্রকাশ পেয়েছিল। 'শাখা-প্রশাখা'র আলোচ্য খাবার দৃশ্যে আত্মসচেতন এই মানুষগুলোর আসল চোহারাটা সত্যজিৎ নির্মমভাবে উন্মোচন করেন। কোথাও যথার্থ সৌহার্দ্যের চিহ্ন নেই, শ্রদ্ধার বালাই নেই। এক সদম্ভ কপটতায় সকলে যেন স্বকীয় স্খলনকে Justify করতেই ব্যগ্র। প্রত্যেকের চারপাশে স্বনির্মিত পাঁচিল যেন তাদের অধোগমনের রক্ষাকবচ।

একমাত্র 'জলসাঘর' ছাড়া সত্যজিতের কোনো ছবিতে প্রতীক বিশেষ মাত্রায় আলাদাভাবে কোথাও চিহ্নিত নয়। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'অশনি সংকেত'-এ প্রতীক কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি বিশেষ কিছু ইংগিত দেবার জন্যে। মূলতঃ তাঁর ছবিতে প্রতীক বা চিত্রকল্পগুলো অবিচ্ছেদ্য উপকরণ হিসেবেই গোটা ছবির বিন্যাসে ছড়িয়ে থাকে, ছবির বিষয়ের ব্যাখ্যার মধ্যেই সেই সব প্রতীক অবশ্যম্ভাবী element হিসেবে কাজ করে। 'শাখা-প্রশাখা'য় দৃশ্য ও চরিত্রের প্রতীক এমনই অপরিহার্যতায় গোটা ছবির প্রবহমানতায় ছড়িয়ে আছে। বৃদ্ধ পিতামহ অথর্ব অভয়চরণকে কোথাও ছবিতে আর পাঁচটা চরিত্রের সঙ্গে দেখানো হয়নি। পরিচারক রামদহিনের অসতর্কতায় হঠাৎ একসময়ে সকলের মধ্যে বেরিয়ে এলে তাঁকে পাঁজাকোলা করে পরিচারক তাঁর নির্দিষ্ট কামরায় নিয়ে চলে যায়। তিনি যেন এক non-entity। বিগতকালের ক্ষয়ে যাওয়া প্রতিনিধি। তাঁর থাকা না থাকায় কারুর কিছু আসে যায় না। তাই তিনি বিশেষ তাৎপর্যে পঙ্গু ও প্রায় মূক চরিত্র রূপে চিত্রিত। তাঁর মুখে তাই নির্দিষ্ট একটিও সংলাপ নেই, কেবল শব্দ উচ্চারণের বিকৃত চেষ্টা আছে মাত্র।

এ ছবিতে আলাদা করে কোনো দৃশ্যে সত্যজিতের অসামান্য সিনেমাটিক দক্ষতা প্রমাণের অবকাশ রাখে না। এক অতি সুগ্রথিত চিত্রনাট্যের সংহতি সমগ্র ছবিটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্মের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে। দীর্ঘকালের অবকাশের পর এ ছবিতে সত্যজিৎ তাঁর পূর্বার্জিত অভিনিবেশ, নৈপুণ্য আর গভীর প্রাজ্ঞতায় উপনীত হলেন আর একবার। মানুষের চিত্তবৈকল্য, দ্বন্দ্ব, সংশয়, নীতিহীনতা, মাধুর্য, সততা আর আদর্শের পারস্পরিক সমন্বয়ে ছবির স্থান-কাল-পাত্র আজকের চারপাশের বস্তুসত্যকে নির্মমভাবে চিনিয়ে দেয়। লক্ষ্য করার মতো যা, অন্যান্য ভাইয়েদের উপস্থিতিতে আনন্দমোহনের মেজো ছেলে প্রশান্তকে কোনো সময় অসুস্থ বাবার ঘরে ঢুকতে দেখা যায় নি। আসলে সত্যজিৎ যেহেতু মেজো ছেলেকেই একমাত্র বাবার আদর্শ ও নৈতিকতার ধারক বলে চিহ্নিত করেছেন ছবিতে, তাই অন্যান্য ভায়েদের পারস্পরিক বিষোদগার আর কালিমালিপ্ত অবস্থিতি থেকে তাকে কিছুটা detach করেছেন। শুধু তাইই নয়, খাবার টেবিলে ভাইয়েরা যখন পারস্পরিক বাক্যবাণে স্বীয় পঙ্কিল জীবনের কথায় মত্ত, তখন তাদের আচরণে ক্ষুব্ধ প্রশান্তর মানসিক বিপর্যয় মুহূর্তের জন্যে প্রকাশ পেতে দেখি। পরিবারের সবচেয়ে মেধাবী আর প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন ছেলে প্রশান্ত কেবল দুর্ঘটনাজনিত কারণেই কিছুটা ভারসাম্যহীন নয়, সে যেন আজকের চলতি দুনিয়ার পাপাচারের মধ্যে অনেকটা বিচ্ছিন্ন প্রতিনিধি। তার অবসর বিনোদনের একমাত্র আশ্রয় পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতে অবগাহন করা। এ ছবিতে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতকেও সত্যজিৎ বিশেষ মাত্রায় প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রয়োগ করেছেন। ছবিতে স্থানে স্থানে বীটোফেন ও বাখের সংগীতাংশ ছাড়াও চার্চের ধর্মীয় মঙ্গলকীর্তন 'গ্রেগরীয়ান

চান্ট' ব্যবহৃত হয়েছে। সপ্তম সিকোয়েন্সে রাতের দৃশ্যে যখন যে যার ঘরে আলাপচারিতায় মগ্ন তখন প্রশান্তর ঘরে রেকর্ড প্লেয়ারে ঐ চান্ট শোনা যাচ্ছে। দৃশ্যের শুরুতেই ক্যামেরা একটা প্রজ্জ্বলিত লাল রঙের বড় মোমবাতি থেকে ট্র্যাক ব্যাক করলে দেখা যায় প্রশান্ত নিবিষ্ট মনে গ্রেগরীয়ান চান্ট শুনছে। একান্ত নাড়ির সম্পর্কে যুক্ত আপন ভাইদের আজকের নীচে তলিয়ে যাওয়ার ব্যথায় বিষণ্ণ প্রশান্ত ধর্মীয় স্তবগানে যেন নিজেকে খানিকটা পরিশ্রুত করে নিচ্ছে। সংগীতের এমন ইংগিতবহ প্রয়োগ ছবির বক্তব্যের মেজাজটিকে ব্যক্ত করে।

চরিত্রচিত্রণে দক্ষ রূপকার সত্যজিৎ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যে স্থানে স্থানে কেবলমাত্র একটি-দুটি অমোঘ সংলাপেই গোটা মানুষটার সার্বিক পরিচয়টা অনাবৃত করে দেন। বড় ছেলে প্রবোধ বলেছে 'বাবা কী বলবেন জানি না — I consider myself successful।' স্ত্রী উমা, প্রবোধকে প্রশ্ন করেছে — 'সততা বলে কি তাহলে আর কিছু নেই?' প্রবোধের উত্তর 'যে অর্থে বাবা সৎ ছিলেন সে অর্থে নেই। কথাটা শুনতে খারাপ লাগবে, মেনে নিতে কষ্ট হবে — কিন্তু just নেই।' এই কথাকটিই প্রবোধের গোটা চারিত্রিক অভিপ্রায়কে চিহ্নিত করে। ছোট ভাই প্রতাপ তার মেজদা প্রশান্তকে বলেছে — 'এক হিসেবে তুমি ভালোই আছো মেজদা। আজকের মানুষ যে কোথায় নেমেছে সেটা তোমাকে দেখতে হচ্ছে না।' খানিকটা বিবেকসম্পন্ন প্রতাপের মানসিক দ্বন্দ্ব, আপোষহীন মনোভাবে চাকরী ছেড়ে দেওয়া ও স্বাধীন সুস্থভাবে জীবিকা অর্জনেব চেষ্টা খুব স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠা পায়।

'গণশত্রু', 'শাখা-প্রশাখা' ও 'আগন্তুক' তাঁর শেষপর্বের এই তিনটি ছবিতেই সত্যজিৎ অনেকটা সীমিত পরিসরে কাজ করেছেন। যতদূর সম্ভব বহির্দৃশ্য পরিহার করেছেন। অথচ কোথাও চলচ্চিত্রের মাধ্যমগত স্বধর্ম এতটুকু ব্যাহত হয় নি। মিডিয়ামের ওপর এমন অসীম নিয়ন্ত্রণ যে কোনো প্রথম শ্রেণীব পরিচালকের ক্ষেত্রেই ঈর্ষণীয়। শব্দ, সংলাপ-আলোকচিত্রের সুগঠিত পারম্পর্যে তিনি যে দৃষ্টিকোণ নির্বাচন করেছেন, তার কোথাও সিনেমার শর্ত ক্ষুন্ন হয়নি। অনেকটা বদ্ধ স্থানে গোটা ছবির বিষয় বিন্যাস করতে গিয়ে যে সুপরিকল্পিত চিত্রনাট্যের আশ্রয় নিয়েছেন তার কোনো একটি অংশও নাটকীয়তায় পর্যবসিত হয়নি। অথচ ছবির দৃশ্যাংশের প্রার্থিত নাট্যমুহূর্ত ও সংঘাত অলক্ষিত থাকে নি। 'শাখা-প্রশাখা'য় মাত্র একবারই পিকনিক পর্বে ক্যামেরা বদ্ধ ঘর থেকে বাইরে এসেছে। যেখানে উজ্জ্বল আলোকিত প্রকৃতির মধ্যে প্রতিটি চরিত্র আপন চারিত্রিক দ্বন্দ্ব আর রুদ্ধশ্বাস অভিব্যক্তিগুলোকে খানিকটা স্বচ্ছন্দে মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছে

এ ছবিতে সত্যজিৎ সিনেমার নির্মাণ কৌশলের সেই আশ্চর্য ক্ষমতাকে আবার প্রমাণ করলেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ছবির ঘটনা প্রবাহিত হয়ে যায়। এক তীব্র সম্মোহনে সময় গড়িয়ে যায়, আমরা টের পাই না। চিত্রনাট্যের এমন মোহিনী আকর্ষণ একমাত্র তাঁর ছবিতেই সম্ভব . এ ছবির নানা চরিত্র রূপদানে প্রত্যেক শিল্পীই তাঁদের যথাযোগ্য ভূমিকাটুকু পালন করেছেন। কারুর ক্ষেত্রেই কোনো অভিযোগের অবকাশ নেই। তবু সেজো ভাই প্রবীরের ভূমিকায় দীপংকর দে'র অনবদ্য অভিনয় যেন তারই মধ্যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত।

সত্যজিৎ যে চোখ দিয়ে জীবনটাকে দেখেন, যে অভিজ্ঞতা ও মননের গভীরতায়

চারপাশের ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করেন তারই বিস্ময়কর প্রতিভাস ফুটে তাঁর ক্যামেরার লেন্সে। আপন শিল্প অভিজ্ঞানের অসংখ্য খন্ড দৃশ্যে আর তাঁর ক্যামেরায় উঠে আসা চিত্রিত ছায়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব বেশী নয়। তাঁর স্বকীয় দেখা ও দেখানোর এই নৈপুণ্যে তাঁকে চলচ্চিত্রের এক মহান রূপকার হিসেবে চিহ্নিত করছে, এদেশে যার কোনো বিকল্প নেই।

যে শিল্প তাগিদ তাঁকে প্রতিনিয়ত অভিনব সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে বারবার আকর্ষণ করে তাকে ভর করেই তিনি ছবির পরতে পরতে মানুষের জগৎ জীবনকে মেলে ধরেন নিবিড় আন্তরিকতায়। আমরা আমাদের প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্বটাকে নোতুন করে চিনতে শিখি। 'শাখা-প্রশাখা' তাঁর এক নৈরাশ্যের অভিব্যক্তির শিল্পিত প্রকাশ। আজকের ক্লেদাক্ত জীবন-জীবিকার এমন দলিল আমাদের বিষণ্ন করে। যে ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের যন্ত্রণায় তিনি পীড়িত ছিলেন, তাকে একান্ত বাস্তবনিষ্ঠায় চিত্রিত কবতে গিয়ে কোথাও এতটুকু সংশয় রাখেন নি সত্যজিৎ। যদিও গোটা ছবিটাই অধঃপতিত ও মানবিকতাহীন মানুষগুলোর কথা ব্যক্ত করেছে, তবু ছবির অন্তিম দৃশ্যে পিতার একমাত্র আশ্রয় ও ভরসা মেজো ছেলে প্রশান্ত শয্যাশায়ী অসুস্থ বাবার হাতে হাত রাখে। সকালের আলো এসে পড়ে ঘরে। নেপথ্যে কেদারায় পেলব আলাপ শ্রুত হয়। 'কেদারা'য় স্বরমূর্চ্ছনা যেন বিশেষ অর্থে অন্তিম ম্লানতার পরিপূরক প্রতীক হিসেবে কাজ করে। দৃশ্যটি পিতাপুত্রের যুগ্ম হাতের দিকে এগিয়ে গেলে Freeze হয়ে যায়। আমাদেব আজকের, এই মুহূর্তের বেঁচে বর্তে থাকার মধ্যে নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এখনও হয়তো কিছুটা আশা আছে। তাই পরিবারের ছোট ছেলে বর্তমান নীতিহীন বিরুদ্ধ অবস্থা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে সাহস পায়। আর তাই মানসিক ভারসাম্যহীন পিতৃনিষ্ঠ, বিবেকসম্পন্ন মেজো ছেলে পিতার হাতে হাত রাখে, 'শান্তি, শান্তি, শান্তি'। ছবির আদ্যন্ত হতাশাময় জীবনযন্ত্রণার অকাট্য দলিল চিত্রিত হলেও, সার্বিক অধোগমনের মধ্যে আমরা কেমনভাবে আছি, কতোটা গ্রহণীয়তায় সেটা কাম্য, আশাবাদী সত্যজিৎ সে ব্যাপারে আরো একবার আমাদের সচেতন করে দিলেন।

সত্যজিতের আগন্তুক

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়ের ১৯৮৯ সালে প্রথম প্রকাশিত বারোটি ছোটগল্পের সংকলনের (আরো বারো) অন্তর্গত 'অতিথি' গল্পটি নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তাঁর সর্বশেষ চলচ্চিত্র 'আগন্তুক' দেখার পর। বিষয়বস্তু এক। তবে 'অতিথি'কে বলা যায় একটি রূপরেখা এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এই সংকলনের অন্যান্য গল্পের তুলনায়, এবং সত্যজিতের অবধারিত ডিটেলের প্রতি দৃষ্টির কথা স্মরণে রাখলে মনে হয় উনি যেন এই কাহিনীতে সেই পরিমাণ মনোযোগ দেননি। বিশেষ করে 'মামা'র চরিত্র উদঘাটনে।

জানি না তখনই তাঁর মনে হয়েছিল কিনা যে এ কাহিনীর একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। বস্তুত 'আগন্তুক'-এও কাহিনীর অংশ অতি সামান্য। ঘটনার উপরে তত জোর নেই, যত আছে ঘটনায় উৎক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া মানুষের পরস্পর সম্পর্ককে কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তার উপরে।

'অতিথি' গল্পে অপরিচিত আগন্তুক হওয়া সত্ত্বেও, মামা বিশেষ কোন বিরূপ ব্যবহারের সম্মুখীন হন না, অতএব তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধ প্রকাশ পায় একেবারে শেষ দিকে, অন্যের কথার মাধ্যমে। 'ভবঘুরে' হলেও তিনি বোঝেন, এক প্রতিষ্ঠিত সংসারজীবনে অচেনা মানুষের আকস্মিক অনুপ্রবেশ কতখানি বিপর্যয় ঘটাতে পারে। সেই বিচার অনুযায়ী তিনি অতি সত্বর আবার বেরিয়ে পড়েন নতুন দেশের সন্ধানে। অপরপক্ষে, 'আগন্তুক'-এ ব্যক্তিসংঘাত অতি তীব্র ও প্রখর, যখন পরিবারের এক উকিল বন্ধু তাঁকে নির্মমভাবে জেরা করে। যার ফলে আমাদের চোখের সামনে এমন একটি মানুষ ক্রমশ প্রতিভাত হয় যে গতানুগতিক নীতি ও মূল্যবোধের পাশাপাশি অপর একটি উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ। ক্রমশ ওথেলোর মত তাঁর বিচিত্র ও চমকপ্রদ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা একটা সম্পূর্ণ অন্য জগতের, অন্য মানুষের, অন্য মূল্যবোধের অবক্ষয় গ্রহণ করে। বিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার এই অবাঞ্ছিত মানুষটির রসবোধ তীক্ষ্ণ শ্লেষে সোচ্চার হয়ে ওঠে, যখন তিনি আদিবাসীর বিবাহপূর্ব যৌনসংসর্গকে অসভ্য, বর্বর আখ্যায় বিভূষিত করে বলেন, সভ্যতা ও টেকনোলজির জয় সেইখানেই, যখন একটিমাত্র বোতাম টিপে পুরো একটা নগর ও নগরবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। উকিল বন্ধু তখন শুধু সেই সভ্য সমাজের প্রতিনিধি নয়, বিশ্বরণাঙ্গনে মানব-সম্পর্ককে যারা ধ্বংস করতে চায়, সে তাদেরও প্রতিভূ।

তিনি কি ধর্ম মানেন? যে ধর্ম মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে প্ররোচিত করে, তাকে তিনি ধর্ম বলতে রাজি নন। ঈশ্বরে বিশ্বাস? সারা দুনিয়া জুড়ে যা ঘটছে তাতে আর ঈশ্বর মঙ্গলময় বলার সুযোগ কোথায়?

অপরপক্ষের জেরা যখন বেশি দূর এগোতে বিফল হয়, তখন সে আশ্রয় নেয় সরাসরি রূঢ় ব্যক্তিগত আক্রমণে। আগন্তুক সে আক্রমণের প্রতিরোধ করতে রাজি নন। তাঁর বেদনাহত অথচ নিশ্চুপ মুখ দেখে মনে হয় সেটা তাঁর মর্যাদাবোধের পরিপন্থী। দূরপাল্লায় পাড়ি দেবার আগে নিঃশব্দে বাড়ি ছেড়ে যান শান্তিনিকেতনে সাঁওতালদের স্নিগ্ধ সান্নিধ্যে।

তাদের একটি নাচ দেখে তাঁর যাত্রা হবে শুরু।

শহরের ড্রইংরুমের সেই ঘনীভূত সন্দেহ ও অভিযোগের কালো ছায়া মিলিয়ে যায় উন্মুক্ত অকাশের তলে। মাদলের বিভিন্ন তালে সাঁওতাল মেয়েদের যৌথ নাচের রীতি ও ছন্দ বদলাতে থাকে। গতি হয় দ্রুততর। ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপ এক নতুন ব্যঞ্জনায় উন্মুখ হয়ে ওঠে। তার প্রতিফলন ভাগ্নীর উদ্দীপ্ত মুখে ও মৃদু দেহসঞ্চালনে। মাদলের বোল যখন উত্তুঙ্গ শিখরে, স্বামীর কাছে উৎসাহ পেয়ে সেও নেমে পড়ে সাঁওতাল মেয়ের হাত জড়িয়ে। কোন কথা না বলেও সে যেন এগিয়ে আসে মানুষের আর একটি মূল্যায়নে।

'অতিথি'-তে বহির্জগতের যে আভাস আছে, 'আগন্তুক'-এ সেটা মূর্ত হয়ে ওঠে। 'কূপমণ্ডুক' শব্দটা হয় গভীর অর্থবহ। জাতি, ধর্ম ও দেশের সমস্ত ব্যবধান সরিয়ে গোটা পৃথিবীটাই মানুষের আপন বাসস্থান হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে, এই ভদ্রলোক যে শুধু একটি গৃহবাসীর গৃহে অবাঞ্ছিত আগন্তুক তাই নয়, তাঁর ভ্রমণের উপলব্ধিজাত বিশ্বমানবতাবোধ আজ আমাদের বর্তমান সমাজেও অবাঞ্ছিত ও বর্জনীয়।

সত্যজিতের শেষ দুটি চলচ্চিত্রের মত 'আগন্তুক'ও সংলাপবহুল ও স্টুডিওতে গৃহীত। আবহসঙ্গীতের ব্যবহার অতি পরিমিত। ধারালো সংলাপে ছবি স্রোতের মত এগিয়ে যায়। তর্ক-বিতর্কে উত্তপ্ত আবহাওয়া মোড় নেয় একটি সুগীত গানের প্রাণভরানো সুরে।

ক্যামেরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। বিশেষভাবে উল্লেখ্য নাটকীয়তার চরম পরিণতির দৃশ্য। ড্রইংরুমে উপবিষ্ট, শুধু বাক্যালাপরত ব্যক্তিদের বা শ্রোতাদের মুখের প্রতিটি ভাববৈলক্ষণ ক্যামেরা তুলে ধরে কখনও প্যান করে, কখনও কাট করে নতুন শটে। উকিল বন্ধুর নিষ্করুণ অভিযোগ, উত্তরদাতার উত্তেজনা, শ্লেষ বা নিস্পৃহতা, গৃহস্বামীর অস্বস্তি ও গৃহস্বামিনীর লজ্জা ও ক্ষোভের অভিব্যক্তিতে মিড-শট, মিড-ক্লোজ শট ও ক্লোজ-আপের ব্যবহার দর্শকমনকে এই জটিলতার সঙ্গে একাত্ম হতে সাহায্য করে।

গৃহস্বামীর উকিল বন্ধু যখন আগন্তুককে নির্দয়ভাবে জেরা করে প্রমাণ করতে চায় যে তিনি একটি ঠগ ও জোচ্চোর, তখন দর্শকের মনেও একটা অস্বস্তিকর টানাপোড়েন চলে। অপ্রস্তুত গৃহস্বামীর মার্জনা চাওয়ার প্রয়াসকে আগন্তুক মধ্য পথেই থামিয়ে দেন একটি হাত তুলে। ক্যামেরা পিছন দিক থেকে ধরে তাঁর উত্থিত হাত। এই ফ্রেমটি নিঃশব্দতার মধ্যে পুরো পরিবেশের একটা সামগ্রিক অনুভূতি দর্শকমনে সঞ্চার করে।

অভিনয়ের দিক থেকে সত্যজিতের পাত্রপাত্রী নির্বাচনেই অর্ধেক কাজ সারা হয়ে যায়। ছোট ছেলেটি আশ্চর্য স্বাভাবিক, অন্যেরা তো অভিনয়-অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত। ওরই মধ্যে উল্লেখ্য মমতাশঙ্কর। তিনি সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বের ব্যাপক পরিধি। সম্ভবতঃ পরিচালকের নির্দেশেই উৎপল দত্তকে কিছুটা প্রথম থেকেই — পরে আরও পরিষ্কারভাবে — মনে হয় রণক্লান্ত সৈনিক। একবার মাত্র দেশ ও ঘরের খোঁজে মানুষটা ফিরেছিল, অসংসারী মানুষটার মনে পড়েছিল তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির কথা ও একমাত্র আত্মীয় ভাগ্নীর কথা। এই একটি মাত্র সাংসারিক কর্তব্যই তাকে টেনে এনেছিল। কিন্তু তাই বলে সে সন্ন্যাসী নয়। তার ধর্ম, তার নীতিবোধ, তার ঈশ্বরে বিশ্বাস — সবই মানুষকে কেন্দ্র করে, তাকে বাদ দিয়ে নয়।

শিল্পের মাধ্যমে, শৈল্পিক চেতনাকে পূর্ণ পরিচিতি দিয়ে, সত্যজিতের মানসলোকের এই 'অসামাজিক' ভাবমূর্তিটি কোনদিন কি আমাদের মধ্যে ফেরার পথ খুঁজে পাবে? জানি না।

'আগন্তুক' অবশ্যই দর্শনীয় ছবি

মৃগাঙ্কশেখর রায়

সত্যজিৎ রায় তাঁর সৃষ্টিপর্বের গোড়া থেকেই উদ্বুদ্ধ ছিলেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থায়। বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতিতে সেই ভঙ্গি গোড়া থেকেই লক্ষণীয়। তাঁর বিশ্বাসে প্রথম চিড় ধরেছিল 'জন অরণ্য'তে। তারপর থেকে 'শাখা-প্রশাখা' পর্যন্ত প্রায় সব ছবিতেই (বিশেষত সমসাময়িক জীবন-কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রকর্মে) কাজ করেছে সত্যজিতের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি। সমাজের সমালোচনায় তিনি অনেক সময়েই সোচ্চার (যেটা আবার তাঁর শিল্পরীতির মেজাজের সঙ্গে সবসময় খাপ খায়নি), কিছুটা সবলীকরণের ছাপও পড়েছে তাঁর এই ধরনের ছবিগুলিতে। কিন্তু, তাঁর তির্যক দৃষ্টি ও বিশ্লেষণের নিষ্ঠুরতা আমাদের চোখ এড়ায়নি।

সত্যজিতের শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এ দেখি আবার সেই মানবিক বিশ্বাসের প্রত্যাবর্তন। তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত এখানেও আছে। কিন্তু তারপরেই এক ক্ষমাসুন্দর প্রশান্তির প্রলেপ। ছবির কেন্দ্রচরিত্র মনোমোহন যখন পঁয়ত্রিশ বছর অজ্ঞাতবাসের পর ঘরে ফেরেন, তখন তাঁকে মনে হয় যেন এক অন্য গ্রহের মানুষ, পৃথিবীতে এসে নানা অসঙ্গতি দেখে মজা পাচ্ছেন, ঠাট্টা করেছেন, কিন্তু সমাপ্তিতে নতুন করে অনুভব করছেন আত্মিক বন্ধন। কিংবা তিনি যেন সেই আলতামিরার গুহাচিত্রকর, তাঁর সারল্য আর আদিমতা নিয়ে উপস্থিত আজকের জগতে। ভঙ্গির এই বৈচিত্র্যে 'আগন্তুক' এক আধুনিক রূপকথার স্তরে উন্নীত।

ছবির শুরুতেই খামের ক্লোজ-আপ থেকে একটা রহস্যের আমেজ আসে। অনিলার (মমতাশঙ্কর) নিরুদ্দিষ্ট মামা মনোমোহন (উৎপল দত্ত)-এর চিঠি আসে—দীর্ঘ প্রবাসের পর তিনি দেশে ফিরছেন ভাগ্নীর সংসারে সাতদিনের অতিথি হয়ে। অনিলা মামাকে মনে করতে পারে না। মনোমোহনের পরিচিত প্রায় সবাই প্রয়াত। অনিলা মনোমোহনকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেও তার স্বামী সুধীন্দ্র (দীপঙ্কর দে) দুলতে থাকে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলায়। মনোমোহনের সঙ্গে সত্যি সত্যিই জমে ওঠে অনিলা-সুধীন্দ্রর ছেলে ছোট্ট সাত্যকি (বিক্রম ভট্টাচার্য)। সে তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে মনোমোহনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্পের রসে মজে ওঠে। কিন্তু সুধীন্দ্র সন্দেহ করতেই থাকে যে একটি জাল লোক সম্পত্তির লোভে জুড়ে বসেছে তার বাড়িতে। অনিলারও মন থেকে সংশয় পুরোপুরি যায় না। যাই হোক, সব সমস্যার সমাধান হয় শান্তিনিকেতনের উদার আকাশের নীচে— সাঁওতাল নাচের সহজ ছন্দের তালে তালে। সমাপ্তিতে সম্পত্তির সমস্ত টাকা অনিলাকে দিয়ে মনোমোহনের আবার পাড়ি নিরুদ্দেশের পথে।

চিত্রনাট্যের কাঠামোয় রহস্য, কৌতূহল, উৎকণ্ঠা আর নাটকীয় সংঘাতের ঠাসবুনোট ছবিকে কখনওই শ্লথগতি হতে দেয়নি। কিন্তু এই উপাদানগুলির প্রয়োগে কোনও আতিশয্য ও নেই। আসলে পরিচালকের নিজস্ব দার্শনিক চিন্তা ছবির সরস গঠনে বিধৃত। শিল্পরীতিতে ঘটেছে হালকা ও গভীর রসের সুষম সংমিশ্রণ। মনোমোহনের চরিত্র এই

শিল্পরীতির স্পষ্ট নিদর্শন। একদিকে তিনি সাধারণ জীবনের অংশীদার, সেখানে তাঁর চলনবলনে সাধারণ ভঙ্গি। আবার কোনও সময় তিনি একেবারেই অ-দৈনন্দিন, ইংরেজিতে যাকে বলে 'লার্জার দ্যান লাইফ'। সেখানে তাঁর বাচনভঙ্গি, সংলাপ সবই সাধারণ মাপের বাইরে।

উৎপল দত্তের অভিনয়ে চরিত্রের এই দ্বৈতসত্তা সার্থকভাবে রূপায়িত। সংশয় ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বকে তাঁদের চরিত্রায়ণে মূর্ত করেছেন দীপঙ্কর দে ও মমতাশঙ্কর। অন্য ছোট চরিত্রের অভিনয়ও ছবির সার্বিক মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। যদিও প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত চরিত্রের বধিরতা-সঞ্জাত কৌতুক একটু দীর্ঘায়িত আর সত্যজিৎ রায়ের অন্য ছবির শিশু-অভিনেতাদের প্রতি তুলনায় বিক্রম ভট্টাচার্য একটু দুর্বল। সমাপ্তির সাঁওতাল নৃত্য কিছুটা আরোপিত মনে হলেও, ছবির পরিণতির সুর কথকের কথকতার শেষে স্বস্তিবাচনের মতোই অর্থবহ। সব মিলিয়ে 'আগন্তুক' অবশ্যই দর্শনীয় ছবি।

সত্যজিতের ছবিতে সময়ের সামাজিক দায় এবং আগন্তুক

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

কোনো বইয়ের ইলাসট্রেশন করতে কিংবা প্রচ্ছদ আঁকতে গেলে যেমন বইটির মূল বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গি বা মানসিকতাকে বুঝতে চেষ্টা করতে হয় তেমনি সেই বইটিকে। যদি চলচ্চিত্রে রূপ দিতে হয় তাহলে তার চিত্রভাষা তৈরি করতে গিয়ে বইটির মূল বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গি কেও একই ভাবে বুঝতে হয়। গল্পকার বা ঔপন্যাসিকের রচনার সঙ্গে যদি দেশের মাটিরযোগ খুব গভীর হয় তাহলে তার চিত্রভাষাও হবে সেই দেশজ ভাষা। সত্যজিৎ যখন চিত্রপরিচালক হন নি অথচ চলচ্চিত্রচর্চা শুরু করেছেন তখন থেকেই তিনি অলীক কু-চিত্ররঙ্গে মজে থাকা ভারতীয়দের জন্যে একটা বিশেষ ধরনের চলচ্চিত্রের আইকোনোগ্রাফির কথা ভাবতেন যা একান্তভাবেই ভারতীয়।

এই জন্যেই পথের পাঁচালী থেকে শুরু করে পরের লেখা বা নিজের লেখা — যে চিত্রনাট্যই তিনি লিখুন না কেন, তার চিত্রভাষায় তিনি একেবারেই ভারতীয় ভঙ্গি টি আনবার চেষ্টা করেছেন। পথের পাঁচালীর মূল কাহিনীতে যাই থাক, প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক শট, ইন্দিরঠাকরুনের খাওয়া-দাওয়া, সস্নেহ হাসি, সর্বজয়ার ভর্ৎসনার প্রতিক্রিয়া, দুর্গার একদৃষ্টে ইন্দিরের খাওয়া দেখা, সামান্য যা কিছু সম্বল নিয়ে হরিহরের বাড়ি থেকে কঠিন মুখে বেরিয়ে যাওয়া, অপুর জন্মের খবর পেয়ে সব অভিমান ভুলে পিসীমার এক গাল হেসে 'খোকা কই' বলে ফিরে আসা, দুর্গা-অপুর হুড়োহুড়ি করে খেলা ও ঘটি গড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে তাদের আত্মমগ্ন চাপল্য এবং তার বৈপরীত্যে গাছতলায় ইন্দির ঠাকরুনের নিষ্প্রাণ দেহটি দুর্গার ধাক্কায় কাত হয়ে পড়ে যাওয়া, দুর্গার মৃত্যুর দিন সকালে জলে ভেসে-যাওয়া ঝড়ে ভেঙে পড়া চালাঘরের পাশ দিয়ে জমে থাকা জল পেরিয়ে আস্তে আস্তে দুটি মহিলার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসার মধ্যে তীব্র বাস্তবকে যে নিখুঁত নগ্নতায় তুলে ধরার চেষ্টা আছে, ভারতীয় চলচ্চিত্রে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ক্যামেরার এইসব দুঃসাহসিক কাজের তুলনা নেই। কাহিনীর মূল 'স্পিরিট'টিকে বজায় রেখে এই 'ইনোভেশন' যে তুলনাহীন তাতে সন্দেহ নেই। এই ছবিতেই সত্যজিৎ ভারতীয় চিত্রভাষা, ভারতীয় চলচ্চিত্রের নিজস্ব আইকোনোগ্রাফি তৈরি করে দিয়েছেন। মূল কাহিনীর ধীর গতি চলচ্চিত্রের শিল্পগত নিয়মে যেমন অনেক দ্রুত, তেমনি শট-নির্বাচনে পরিচালক ভারতীয় জীবনের নির্মম বাস্তবের উন্মোচনে নিঃসংকোচ, নির্ভীক। প্রচলিত ধারার দর্শককে খুব জোর ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছেন পরিচালক। ভারতীয় যে কোন গ্রাম জীবনের জীর্ণ ঘর, দাওয়া, ঘটি-বাটি, মাদুর, ছেঁড়া চাদর. মিষ্টিওয়ালা, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, নির্বিকার কুকুর, ছোটদের ফল চুরি, মালা চুরি, মার কাছে মারধোর, পিসী ও মার ঝগড়া, কিশোরীর মনে বিয়ের কল্পনা, মৃত্যুর আকস্মিক আবির্ভাব, মেয়ের শোকে ভেঙ্গে পড়া

বাবা-মা এসব কিছু যেমন খুঁটিয়ে দেখতে শিখিয়েছেন দর্শককে, তেমনি বৃষ্টি, বৃষ্টির রোমাঞ্চ-শিহরিত লতাপাতা বা কীটপতঙ্গ, এমনকি বৃষ্টিভেজার শারীরিক, বা বলতে পারি, প্রাকৃতিক আনন্দ, পুকুরের জলে সারিবদ্ধ গাছপালা, মিষ্টিওয়ালা, ছেলেমেয়ে, এমন কি কুকুরের প্রতিচ্ছবি—এসবই যে মূল কাহিনী রেখারই অবিচ্ছেদ্য ভারতীয় বা বাঙলাদেশেরই পারিপার্শ্বিক তাকে গভীরভাবে চিত্রকাহিনীরই অঙ্গ হিসেবে বুঝতে শিখিয়েছেন দর্শককে। দুঃখ-শোক আর আনন্দ-রোমাঞ্চের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিক্রিয়াকে দেশীয় চিত্রভাষায় 'শিল্প' করে তোলার ক্ষমতায় সত্যজিতের সাফল্য বিস্ময়কর।

কিন্তু এই দেশজ চিত্রভাষার পাশাপাশি রয়েছে ঘটনা ও পরিবেশ-নির্বাচনে সামাজিক বাস্তবকে তুলে ধরার চেষ্টা। যে কৃষিজীবীর গ্রামে পালালেখক ও যজমান হরিহরের জীবিকা নির্বাহের উপায় নেই, তাকে গ্রাম ছেড়ে যেতে হয় তীর্থক্ষেত্রে, বারাণসী শহরে, আর সেই ছেড়ে যাওয়া যতখানি মর্মান্তিকভাবে মূল উপন্যাসে উপস্থাপিত, চলচ্চিত্রের সংহত চিত্রভাষায় তাকে ততখানি মর্মান্তিক করেই তুলে ধরেছেন সত্যজিৎ। পথের পাঁচালী তার প্রাকৃতিক ও মানবিক সমস্ত রকম সম্পর্ক নিয়ে এক বিশেষ সময়ের গ্রাম থেকে শহরে বিশেষ শ্রেণীর বা বৃত্তির মানুষের জীবনের পালাবদলকে ধরতে চেয়েছে। চলচ্চিত্রেও সেই পালাবদলকে তার নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গি নিয়ে চমৎকারভাবে ধরেছিলেন সত্যজিৎ — এ পর্যন্ত অভাবিত দেশীয় চিত্রভাষায়। বলতে চাইছি, চিত্রনাট্য অন্যের কাহিনীর ভিত্তিতেই হোক বা তাঁর নিজের কাহিনী বা চিত্রনাট্যই হোক সত্যজিৎ তাঁর অসাধারণ শিল্পগত দক্ষতার আড়ালে এক বিশেষ সময়ের সামাজিক বাস্তবকে ফুটিয়ে তোলার দায় থেকে কখনোই সরে আসেন নি।

'আগন্তুক' ছবির আগে পর্যন্ত যতোগুলি ছবি সত্যজিৎ করেছেন খুব সংক্ষেপে তার শিল্পগুণের আড়ালে শিল্পীর সমকালীন সমাজচেতনা সম্পর্কে এখানে ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। পথের পাঁচালীতে-ই যে শিল্পী মূল গল্পলেখকের কাহিনী থেকে অন্যান্য চিত্রগুণের পাশাপাশি সামাজিক রূপান্তরের সূত্রটিকে ছবিতে স্পষ্ট করে দেখিয়েছিলেন, পরবর্তী সব ছবিতেই তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পরুচির সঙ্গে সেই সামাজিক দায়কে তিনি মেনে নিয়েছেন। 'অপরাজিত' ছবিতে গ্রাম শহরের টানাপোড়েন যেমন অপুর মধ্যে ফুটেছে, বিশেষ করে সর্বজয়া অপুর স্নিগ্ধ বেদনাতুর সম্পর্কের চমৎকার খুঁটিনাটি সম্পর্কের চিত্রভাষার মধ্যে দিয়ে, তেমনি আছে দারিদ্র্য ও জীবিকার সংগ্রাম, একটা সংসারকে নানা ঘাটে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ানোর ছবি। আর তারপরে, সামান্য সম্বলটুকু আশ্রয় করে মা-ছেলেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে ছেলের অবধারিত একাত্মতার অনুভবে একই সঙ্গে কীভাবে আনন্দ ও বেদনা পায় সেই ছবিগুলি সামগ্রিকভাবে বাঙালী বা ভারতীয় জীবনের (নাকি বিশ্বজীবনের?) বহুকালের সমাজজীবনের (গ্রাম শহর টানাপোড়েনের) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 'অপুর সংসারে' অপুর কলেজে পড়াশোনা ও মেসের জীবন, দাম্পত্য জীবনের সূচনায় গ্রাম শহবের সম্পর্ক, স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছন্নছাড়া জীবন, তারপর সন্তানের টানে গ্রামে ফিরে দুরন্ত ছেলেকে নিয়ে নতুন জীবনের পথে পা বাড়ানো, এ সবই আমাদের সমাজ জীবনের বহুবার দেখা ছবি — সত্যজিতের নিজস্ব চিত্রভাষায় সংহত হয়েছে। নিপুণ চিত্রভাষায় ও সঙ্গীতে যে কোনো বাঙালী তরুণের এই জীবন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কাঁধে নিয়ে মহাজীবনের দিগন্তরেখা টিকে সামনে রেখে বেরিয়ে পড়ার ছবিটি ভুলবার

নয়। নিজের দেশের জমি থেকেই একটি গরীব সংসারের এই ক্রমিক পরিণতির মধ্যে যে বৈপরীত্যকে ধরা হয়েছে তার চিত্রভাষা ভবিষ্যৎ চলচ্চিত্র শিল্পের পথ দেখিয়েছে। 'অভিযান' ছবির মধ্যেও এক অবাঙালী ড্রাইভার ও তার সাঙ্গপাঙ্গ ও সংশ্লিষ্ট কিছু নিচুতলার হৃদয়বৃত্তি প্রধান মানুষ ও গ্রামীণ পরিবেশ এই বাঙলাদেশেরই এক বিচিত্র জীবিকার অনিশ্চয়তাভরা দ্বন্দ্বময় জীবনের নাটকীয় ছবি। 'জলসাঘরে' ক্ষয়িষ্ণু জমিদার ও উঠতি ব্যবসাদারের সংঘর্ষই চিত্রশিল্পে সংহত হয়েছে। 'দেবী' ছবিতে ওই সংঘর্ষ তৈরি হয়েছে যুক্তিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বনাম সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার ও রক্ষণশীলতাকে ঘিরে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে ব্রিটিশ আমলের গড়ে ওঠা আভিজাত্য ঘা খেয়েছে অভিজাত-অনভিজাত মিশ্রণে গড়ে ওঠা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কাছে। মহানগর, চারুলতা ও কাপুরুষে নারী ব্যক্তিত্বের জোরালো প্রকাশের কাছে পুরুষের পৌরুষ বেশ খানিকটা ম্লান। পুরুষের পক্ষে যে নারী ব্যক্তিত্বকে নানা কারণেই সংসারে সমমূল্য দিতে হয়, কার্যত তার পক্ষে সেই মূল্য দিতে গিয়ে তার আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিত্বহীনতা বা অসহায়তাকে সে বড় বেশি প্রকট করে ফেলে। যদিও, মহানগর এবং চারুলতা দুটি ছবিতেই (বা গল্পেও) পুরুষের আধুনিক চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট পরিচয় আছে কিন্তু তার অনিবার্য ফলাফল বা কর্তব্য সম্পর্কে তারা ততটা সজাগ নয়। এই সচেতনতার অভাবে নারীর ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণভাব প্রতিষ্ঠা পেতে বাধা পাচ্ছে। চারুলতার মনে বাইরে থেকে তারুণ্য ও সাহচর্যের যে হাওয়া লেগেছে তাতে গল্পে যাই থাক, ছবিতে সে স্বামীর সঙ্গে মিলতে পারে নি। মহানগরের ঘটনা প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেকার বলেই সেখানে নারী স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে অনেক বাধার মধ্য দিয়ে। প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানের দুটি গল্পে নারী ব্যক্তিত্বের উন্মোচন ও প্রতিষ্ঠার ছবি পাই। প্রতিষ্ঠার ছবিতেও সামাজিক পরিবেশ পুরোপুরি অনুকূল নয়।

ছবির বিষয় অনেক বদলে গেছে 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে। কিছু শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে নানা পেশা ও নেশার জীবনে ব্যস্ত থাকতো বলে অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে গেছে ছুটি কাটাতে। সমকালীন জীবনেরই প্রতিনিধি এরা। আপাতত শহরকে ভুলে থাকতে চায় খবরের কাগজ পুড়িয়ে। শহুরে জীবনে যে মধ্যবিত্ত সংস্কারে তারা অভ্যস্ত সেই অভ্যাস তারা ভুলতে চায় প্রকৃতির মধ্যে এসে। যে আদিবাসী মেয়েটির প্রতি তাদের লোভ তা যে শহুরে কালচারের প্রলেপ খসে পড়ার ফল তা বুঝতে অসুবিধে নেই। আদিবাসী সারল্যও যে ধাক্কা খাচ্ছে শহরের পণ্য হবার লোভে তাও বুঝতে পারা যায়। কাজেই প্রকৃতি কোনো সমৃদ্ধি আনছে না শহুরে মনে, শুধু শহুরে সভ্যতার বা সংস্কারটুকুর আবরণ খসে যাচ্ছে প্রাকৃতিক নির্জনতায়। প্রকৃতির ভূমিকা এখানে শুধু অবাধ মুক্তির সুযোগ করে দেওয়াতে। অবশ্যই দুচারদিনের জন্য। তারপরেই আবার সেই শহুরে খোলসে ঢুকে যাওয়া। তখন প্রকৃতি শুধু অবাধ আনন্দ আর বাসনামুক্তির ক্ষণিক স্মৃতি। প্রকৃতি যে শহরের 'শিকার' — এইটেই প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন নাগরিকতার আধুনিক পরিণতি। সত্যজিৎ এই তথাকথিত নাগরিকতার ট্র্যাজেডিকেই নির্বাচন করেছেন, চিত্রভাষায় তারই হঠাৎ উদ্বেলিত প্রমত্ত স্মৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা। 'আগন্তুক' ছবির আগন্তুক মিত্রমশাই যে দৃষ্টিভঙ্গিতে আদিবাসী সংস্কৃতির শিল্প-সংবিতকে ধরতে চেয়েছেন, ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরেকার অন্যান্য আদিম সংস্কৃতির শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতা কিংবা নমুনা

সংগ্রহ করেছেন, নানা দেশের প্রচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন — প্রাচীন ও নবীন নানা মুদ্রা সংগ্রহ যাঁর বাতিক, দেশজ সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক মানবসংস্কৃতির একজন প্রতিনিধি হিসেবেই তাঁকে দেখতে পাই। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র মধ্যে আদিবাসীকে যে ঔপনিবেশিক নাগরিকতার চোখে ক্ষণিকের ভোগ্য হিসেবে দেখা হয়েছে, 'আগন্তুকে' ঠিক তার বিপরীত ছবি। আবহমান মানবসংস্কৃতির ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা।

'আগন্তুক' প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত বলার আগে সত্যজিতের আরো দুচারটি ছবির সামাজিক তাৎপর্যের একটু ইঙ্গিত দিয়ে নেওয়া যাক। এমনিতে 'নায়ক' ছবির মধ্যে বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য তেমন নেই! কিন্তু প্রতিভার গুণে এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অনুকুল পরিবেশে যে মানুষ ফিল্‌মের নায়ক হয়ে যায় তার মধ্যে বহু মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা, সহযোগীর ব্যর্থতা, পুরনো বন্ধুর আশাভঙ্গ, নারীর প্রতি গোপন টান, সব কিছু মিলিয়ে এক অদ্ভুত বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতারই অন্য নাম নায়ক, যার মধ্যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ রাখার ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠে না, হওয়া সম্ভব নয়। যেখানে যেটুকু সে আদান-প্রদান করতে পারে সেখানেও ক্ষণিক যোগাযোগের সম্পর্কটুকুই সব, জনতার অভ্যর্থনার ভিড়ে সেই ব্যক্তিগত উন্মোচনের উৎসটুকুও চাপা পড়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতার ট্র্যাজেডিই 'নায়ক' ছবির মূল সুর।

অন্যদিকে 'প্রতিদ্বন্দী' ছবিটি এক ব্যাপক বিপর্যস্ত মূল্যবোধের মাঝখানে এক মধ্যবিত্ত ঘরের বেকার ছেলের কল্পনা, আক্রোশ ও প্রতিবাদের এক বিচ্ছিন্ন পরিণতি। তার ভালোবাসা এবং প্রতিবাদেও যথেষ্ট কল্পনাবিলাসিতা। নিছক 'পোলিটিক্যাল ফিল্ম' বলে কেউ রায় দিলে কোনো রাজনৈতিক আদর্শ বা তার প্রয়োগগত ব্যর্থতা এই ছবির উপজীব্য নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী নানা ধরণের অদূরদর্শী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি ও চরম অন্যায়-অসাধুতা ব্যক্তিকে যে সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে তারই চিত্রভাষ্য এই ছবি। অন্যদিকে উচ্চাকাঙ্খী মধ্যবিত্ত একটি ছেলেকে কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টার-এর সদস্য হবার জন্য মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে দেখি 'সীমাবদ্ধ' ছবিতে। আবার 'জন-অরণ্য' ছবিতে মধ্যবিত্তের ছদ্ম আবরণ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে জীবিকার তাড়নায়। সাহিত্যিকের যে নির্মম শিল্পী-ব্যক্তিত্বের পরিচয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে পাই, চলচ্চিত্রকারের সেই জাতীয় নির্মম শিল্পী-ব্যক্তিত্বই ফুটে উঠেছে মূল্যবোধ বিসর্জনের এই ছবিতে।

এমন কি গুপী গাইন বাঘা বাইনের মত ফ্যানটাসিতেও সারল্য, ব্যর্থতা, আনন্দ, দুঃখবরণ এবং প্রাপ্তির পূর্ণতা ইত্যাদি মানবিক বোধগুলোও জোরালো চিত্রভাষা পেয়েছে। তেমনি আবার ভন্ডামির মুখোশ খুলেছে জয় বাবা ফেলুনাথও। রূপকার্থ ও সাংকেতিক ব্যঞ্জনায় 'হীরক রাজার দেশে' স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিপ্লবেরই ইঙ্গিত দেয়, যে বিপ্লবে রক্তকরবীর রাজার মতো হীরক রাজাকে গণবিদ্রোহেরই শামিল হয়ে নিজেকে বাঁচাতে হয়।

যে সাধুতা সমাজে মূল্য পায় না সেই সাধুতাকে আশ্রয় করতে গিয়ে চিকিৎসক হয়ে যান গণশত্রু এবং শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা মূল্য পায় গণেরই একাংশের সংঘবদ্ধ সমর্থনে — 'গণশত্রু' ছবিতে। ধর্ম যে ব্যবসায়ীর হাতে অর্থকরী লেন-দেনের ব্যাপার এবং সেইজন্যেই চিকিৎসকের বিজ্ঞানসম্মত কর্মপ্রণালী ও কথাবার্তা মূল্য পায় না; বিত্ত

ও ক্ষমতা যে সমাজের সেই মূল্যবোধহীনদের হাতে এটাই 'গণশত্রু' হয়ে যাবার সবচেয়ে বড় কারণ। মৌলবাদীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে হত্যার হুমকি দিয়েই তো বৈজ্ঞানিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি হয়ে।

'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী'তে বিলাসী আরামপ্রিয় নেশাগ্রস্ত মানুষ দেশের ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনে যে কতোখানি নির্বিকার তার চমৎকার ছবি আছে। সমাজ-চেতনাশূন্য মানুষের দেশে রাজনৈতিক হাতবলে নিরুপায় রাজার করুণ মুখশ্রী দাসত্ব-বিলাসী দেশের করুণ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়। আর 'সদ্‌গতি' তো শ্রেণীনির্যাতনের নিষ্ঠুর মর্মান্তিক কাহিনী, কাহিনীর চিত্রভাষার নির্মম নিরাসক্তিকেও অনিবার্যভাবে শ্রদ্ধা জানাতেই হয়। বিশেষ করে কাঠ কাটার শব্দ আর লাশ টানার শব্দ এই ছবিতে চরিত্র পেয়েছে। অন্যদিকে ঘরে বাইরে-তেও 'চারুলতা'র মতোই আর এক নষ্টনীড়ের ছবি। এখানে স্বদেশী যুগের উত্তেজনা অন্দরের বিমলাকে বাইরে এনেছে। আর স্বদেশীর ছদ্মবেশে এক কামুক ব্যক্তির অযৌক্তিক ও উত্তেজক ভাষণ স্বদেশীয়ানার একটি আরোপিত দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।

'গণশত্রু' যেমন ধর্মসংস্কার ও ধর্মব্যবসা-সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাবান লবির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মনস্কতার লড়াই, শাখা-প্রশাখা তেমনি প্রজন্ম-ব্যবধানে মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাবার ছবি। যে সমৃদ্ধি মূল বৃক্ষকান্ড থেকে শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষত শাখায়, তার আড়ালে দুর্নীতি কতোখানি সক্রিয় তা হঠাৎই পারিবাবিক সম্মিলনে প্রকট হয়ে পড়ে, শিশু-প্রশাখার মনের মধ্যেও তার ছাপ পড়ে, এখন অসুস্থ-মস্তিষ্ক 'শাখা'কে তা আলোড়িত করে। অর তারপর সব স্তব্ধ হয়ে যায়। পড়ে থাকে শুধু মূল কান্ড, জরাজীর্ণ তার মূল শিকড়, আর আশ্রিত সেই অসুস্থ মস্তিষ্ক 'শাখা' —নিরুপায়, অসহায়, নিঃসঙ্গ, দগ্ধমূল হয়ে।

বিষয় বা উপকরণ পরের হোক বা নিজের হোক, বিষয় ঐতিহাসিক হোক বা একেবারেই সমকালীন, সাম্প্রতিক হোক, সত্যজিতের চিত্রভাষায় তার মানবিক বা কখনো কখনো একালের পরিপ্রেক্ষিতে তার সামাজিক তাৎপর্য থেকেই যায়। আর সেই গুণেই তার আকর্ষণ অফুরন্ত বার বার দেখেও যার আবেদনে নানামাত্রা বেরিয়ে আসে। তাঁর তথাকথিত শিশুভোগ্যছবির সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। শিশুভোগ্যতাকে অতিক্রম করে সে-সব ছবির বহুমাত্রিক মানবিক বা সামাজিক তাৎপর্য বয়স্ক মনের কাছেও সমান আকর্ষনীয়।

'আগন্তুক' ছবিতে সত্যজিতের সব রকম পূর্ব-চিত্রভাষারই সমাহার ঘটেছে। কাহিনীর শুরুতে আগন্তুকের আগমন নিয়ে একটি ছোট পরিবারে যে বিস্ময়, সন্দেহ, সংশয় ও অস্বস্তি শুরু, যে বিস্ময় ও কৌতূহল পরিবারের শিশু সন্তানটির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে সেই 'জাল দাদু'র আগমন-রোমাঞ্চ শিশু-মনে গেঁথে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানী এক্‌স্‌প্রেসের তীব্র হুইসল্‌-এর একটানা আওয়াজের মাঝখানেই ছবির টাইটল্‌ শুরু হয়ে যায়। আগন্তুক এই চারটি অক্ষর চারদিক থেকে এসে যে শব্দটি তৈরি করে তাতে পৃথিবীর চতুর্দিকের দুনিয়ার যাবতীয় তথ্য সম্পর্কে 'আগন্তুক' মানুষটির সজাগ মানসিকতাটি বড়ই ইঙ্গিতময় হয়ে ফুটে ওঠে। তারপর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অনেক যাত্রীর চলতে থাকার মধ্যে আগন্তুকের শরীরের চলমান নিম্নাংশটি অনেকক্ষণ ক্যামেরায় ধরা থাকে। যেন

আগন্তুকের পুরো চেহারাটিকে দেখবার কৌতূহল জাগিয়েরাখার জন্যেই।

ওদিকে ভাগ্নীর বাড়িতে আগন্তুক উঠবেন বলে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠিটি পড়ার পর থেকেই ভাগ্নী তার এই মামার হঠাৎ আগমন সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলেও তার স্বামী স্ত্রীর এই মামা-র অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন। কতো অচেনা-অজানা মানুষই যে বহুদিনের অদেখা পরিচিত আত্মীয়ের রূপ ধরে এসে প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করে, আতিথ্যের সুযোগ নিয়ে সর্বনাশ করে যায় তার তো ঠিক নেই। নানাসূত্রে এই আত্মীয়ের সঠিক সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা শুরু হয় যা ভাগ্নীর পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। আগন্তুক যখন আসেন, ঠিক তারপরেই টেলিফোনে স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তায় বোঝা যায়, স্ত্রী অর্থাৎ ভাগ্নী মামার সঙ্গে কথাবার্তায় দেশ-ছাড়া মামার সম্পর্কে নানান শোনাগল্প ঝালিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেও স্বামীর সন্দেহ যায় না। ভাগ্নীর বান্ধবী আর তার স্বামী এসে আগন্তুককে নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় টেনে এনে আগন্তুকের সঠিক সম্পর্ককে কৌশলে পরীক্ষা করতে চায়। কিন্তু আগন্তুক তাদের উদ্দেশ্য যে বুঝে ফেলেছেন তা বুঝিয়ে দেন। আড্ডার ছদ্মবেশে তারা যে আগন্তুকের আত্মীয়তার যাথার্থ্যের মাপ করতে এসেছে, প্লেটো-অ্যারিস্টটলের মতো নিছক অ্যাকাডেমিক আলাপ করতে আসেনি তা স্পষ্ট করেই আগন্তুক বুঝিয়ে দেন। তার আগে তো ভাগ্নীর স্বামী যে পাসপোর্ট দেখে আগন্তুকের যথার্থ পরিচয় জানতে চেয়েছিল তা আগন্তুকের কানে গেলে আগন্তুক স্বামীর হাতেই পাসপোর্ট ছুঁড়ে দিয়ে সে প্রমাণটুকুও দিয়ে দিয়েছেন। তবু পাসপোর্ট জাল হওয়া তো খুবই সম্ভব। পাসপোর্ট দেখে তো মানুষ চেনা যায় না। তাই আগন্তুক চলে যেতেই রাজি। কিন্তু ভাগ্নীকে তো সেসব কথা বলা যায় না। তবু স্বামীর যদি সন্দেহ থেকেই থাকে তাহলে তিনি অবশ্যই চলে যাবেন। এই ঘটনার পরেই ভাগ্নীর ওই বান্ধবী তার অভিনেতা স্বামীকে নিয়ে এসে আগন্তুকের পরিচয় জানতে চেষ্টা করতে এসেছে নানা অছিলায়। এবং তা-ও আগন্তুকের চোখে ধরা পড়ে যায়।

তারপর আইনজীবী বন্ধু এসে আগন্তুকের পরিচয় ও নানা প্রসঙ্গে আগন্তুকের মতামত জানতে চাইল। ছাত্রজীবনের পড়াশোনা, ট্রাইবাল সংস্কৃতির প্রতি টান ও তাদের মধ্যে থেকে তাদের সঙ্গে মেলামেশা ও তাদের জীবনাচরণ সম্পর্কে গবেষণা, বিদেশ যাত্রা, বিদেশের অভিজ্ঞতা, দেশে আসার কারণ সবই আগন্তুক তাঁর নিজস্ব জীবনদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বলে যান। স্বামীর আইনজীবী বন্ধুটির প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে অপমানকর খোঁচা ছিল, জেরা করার উদ্দেশ্যও স্পষ্ট ছিল, আগন্তুককে উত্তেজিত করে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যও জেনে নেবার চেষ্টা ছিল। আগন্তুকের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অপমানের। তবু অনেক দেখা-শোনার অভিজ্ঞতা মননশীলতাই যেন আগন্তুকের উত্তর-প্রত্যুত্তরে ফুটে উঠেছিল।

আগন্তুকের সঙ্গে আইনজীবীর কথাবার্তায় অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু এখানে বলা উচিত। সত্যজিতের শেষ জীবনের অনেক পর্যবেক্ষণই এখানে ধরা আছে, যেগুলি শুধু আমাদের সমাজের সম্পর্কে নয়। আধুনিক পৃথিবীর মানবসমাজের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কেও বিশেষ জরুরী —

১. তথাকথিত ধর্ম বা রিলিজিয়ন সম্পর্কে আগন্তুকের কোনো শ্রদ্ধা নেই। যে ধর্ম

মানবজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে ও করছে সে ধর্ম অর্থহীন। শুধু অর্থহীন নয়, অন্যায় ও মারাত্মক। এই ধর্ম মানুষের গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করছে, অন্য গোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা ছড়াচ্ছে, রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে মানবজাতির সর্বনাশ করছে।

২. সারা পৃথিবীতে ড্রাগের ব্যবসা ও ড্রাগের নেশা ভবিষ্যৎ মানবজাতির সর্বনাশ করছে। সামাজিক মানুষকে তথাকথিত উন্নত দেশও নিরাপত্তা দিতে পারছে না। অন্যদিকে তাদের সমাজ-বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। দবিদ্র দেশগুলিতে এই ড্রাগের তরুণ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। সারা পৃথিবীতে মানব সম্পদ নষ্ট করার এই চক্রান্ত আগন্তুককে ক্ষুব্ধ করেছে।

৩. বিজ্ঞান ও কারিগরি-বিদ্যার বিস্ময়কর উন্নতি আমাদের যেমন মহাকাশে-গ্রহান্তরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে বাড়ছে মানুষের উদ্বেগ, সংশয়, ভয়, অবিশ্বাস এবং লোভ। একই সঙ্গে জীবনের প্রতি আস্থা ও অনাস্থার পারস্পরিক সহাবস্থান যে দুর্ভেদ্য জটিলতার সৃষ্টি করেছে তা আগন্তুককে বিস্মিত করেছে। নিউইয়র্কের মতো শহরেও বেঁচে থাকার ন্যূনতম দাবি নিয়ে অসংখ্য মানুষ যে রাস্তায় বসে থাকছে এ অভিজ্ঞতা আগন্তুকের হয়েছে।

৪. বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রচন্ডতা সত্ত্বেও যুদ্ধ ও বর্বরতা এবং অন্যান্য নানা অমানুষিক ও নৃশংস কান্ডকারখানা আগন্তুককে 'তথাকথিত সভ্য' মানুষেব সঙ্গ ছেড়ে তথাকথিত আদিম মানবগোষ্ঠীর সরল ও প্রাণময় জীবনযাপন পদ্ধতির দিকে আকর্ষণ করছে। সুইচটিপে আণবিক বোমা ফেলে মানবজীবন ধ্বংস করে যে মানুষ, আগন্তুকের মতে, তাদের চেয়ে শবমাংস ভোজী জংলীরা বেশি মানবিক। তার মানে, অন্তত আইনজীবী তাই ভেবেছিলেন, 'এইভাবে সভ্য' হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে জংলী হয়ে থাকাটাই আগন্তুক বেশি পছন্দ করেন। নিশ্চয় তা নয়। আসলে, তথাকথিত 'সভ্যতার' মধ্যে জংলীদের চেয়েও বীভৎসতার মাত্রা বেশি দেখেছিলেন আগন্তুক। তার ওপর জংলীদের সারল্য, স্ফূর্তি ও আন্তরিকতার ধারে-কাছেও তথাকথিত সভ্য মানুষকে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু এসব মন্তব্য তো আইনজীবীর জেরার মুখে বলে ফেলা আগন্তুকের ধ্যান-ধারণা, যার সামাজিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে কারুরই কোনো সংশয় থাকতে পারে না।

আগন্তুকের আরো বিচিত্র পরিচয় ছড়িয়ে আছে সমস্ত কাহিনীতেই। এবং সে পরিচয়ও এক অনন্য সামাজিক তাৎপর্যকেই বহন করে। ভাগ্নীর বাড়ীতে এসে প্রথমেই খাওয়ার টেবিলে খেতে বসে আগন্তুকের এমন কিছু ব্যক্তিগত পছন্দ ও রুচি প্রকাশ পেয়েছে যার মধ্যে ভান্ডেরলুসট বা বিশ্বভ্রমণের নেশার আড়ালে দেশজ সংস্কৃতির প্রতি এক গভীর টান লক্ষ্য করবার মতো। খেতে বসে মাংসের চেয়ে আপাতত মাছের প্রতি টান, মেদিনীপুরের লোক সমাজের তৈরি বড়ি (খাদ্য হিসেবে যাকে লোকশিল্পেরই চমৎকার প্রমাণ হিসেবে ধরা যায়) তারিফ করে খাওয়া, পুরোনো শাস্ত্র ও সঙ্গীতের প্রতি টান — যার দু চার কলি গেয়ে শোনাবার মতো ক্ষমতা তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বিদেশে কাটিয়েও ধরে রাখতে পারেন, বিশ্বভ্রমণের নেশার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র লোকসমাজের আদিম সংস্কৃতির লক্ষণগুলি প্রতি তীক্ষ্ণ নজর, তাদের বিচিত্র জীবনাচরণ ও আহার-বিহারের প্রতি আকর্ষণ, জার্মান, ফরাসী ইত্যাদি ভাষার প্রতি গভীর আগ্রহ ইত্যাদি বিচিত্র ও

বহুমুখী কৌতূহল যে খাঁটি আন্তর্জাতিক চেতনা-সম্পন্ন একটি দুর্লভ ব্যক্তিত্বকেই চিনিয়ে দেয় তাতে সন্দেহ নেই। আধুনিক পৃথিবীতে এই রকম সজাগ, সতর্ক, আন্তর্জাতিক মানসিকতার মানুষই যে প্রয়োজন আগন্তুকের মতো বুদ্ধিমান বিশ্বভ্রমণ-লিপ্সু তথ্যনিষ্ঠ দেশজ ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি মনস্ক সব বয়সের মানুষের সমবয়সী একটি চরিত্রের অবতারণাই তা প্রমাণ করে।

৫. আগন্তুকের আরেকটি পরিচয় আছে। সে পরিচয় ওই 'সমবয়সী' কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আগন্তুক শুধু চলচ্চিত্রকারের আদর্শ মানুষ নন বা আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মানুষ নন, তিনি শিশু-কিশোরদের কাছেও সবচেয়ে আকর্ষণীয় মানুষ। পঞ্চাশোর্ধ্বের এই বিশ্ব-ঘোরা মানুষটি তাঁর মনের ভেতরকার শিশুটিকে হারায়নি। যা কিছু দেখেছেন, শিখেছেন এবং কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যা কিছু জেনেশুনে এগিয়ে চলতে চেয়েছেন, তা ভবিষ্যতের শিশু-কিশোরের পক্ষে যে খুবই প্রয়োজনীয় তা যেমন তিনি বোঝেন, তেমনি তাদের কাছে-টেনে নেবার ক্ষমতাও রাখেন। ছোটদের আকর্ষণ করবার ক্ষমতা সব বৃদ্ধ রাখেন না। যাঁরা সে ক্ষমতা রাখেন তাঁদের নিজেদের শৈশবকে কখনো ভুলতে পারেন না বলেই রাখেন। এমনিতে আগন্তুক বাড়িতে আসার আগে, তাঁর চিঠি আসার পর থেকে বাবা-মা-র মনে অস্বস্তি শিশুটির মনে অস্পষ্ট কিন্তু অদম্য এক কৌতূহল তৈরি করেছে। সে কৌতূহলের প্রমাণ 'জাল দাদু'র আবির্ভাবের আগেই বাইরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার শট-টি। মা তাকে বলছে, 'দাদু' এলেই তাকে খবর দিতে। তারপর থেকেই দাদুর সঙ্গে খেতে বসা, গল্প করা, নানা খবরাখবর জানা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দাদু-নাতির সম্পর্ক খুবই হৃদ্য হয়ে উঠেছে। নানা দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত মুদ্রা সংগ্রহের থলি থেকে দু-একটি মুদ্রা নাতিকে দেওয়া (নাতি যে উপহারটিকে অমূল্য সম্পদ বলে মনে করে হাসিমুখে নেয়) গড়ের মাঠে গাছতলায় নাতি ও তার সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে বসে সূর্য গ্রহণের, চন্দ্র গ্রহণের রহস্য বোঝানো — যা ছোটদের কাছে প্রায় ম্যাজিকেরই সমতুল্য, পিঁপড়ে খাওয়া আর্মাডিলোর গল্প, আর্মাডিলোর মাংস খাওয়া উপজাতিদের তৈরি পুতুলের উপহার ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে নাতি যেভাবে দাদুর ভক্ত হয়ে পড়েছে তাতে কটা দিনের মধ্যেই দাদু তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে উঠেছে, এবং দাদু যে চলে যেতে পারে তা সে ভাবতেই পারে না। দাদুর মতো খোলা মনের মানুষের পক্ষেই তাই নাতিকে বলে যাওয়া স্বাভাবিক যে 'কূপমন্ডুক হয়ো না'। কথাটা বোধহয় ভাগ্নীর সন্দিগ্ধ স্বামীর ও তার সংশয়ী বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধেও খাটে। নাতির চোখে যে যে কারণে দাদু আকর্ষণীয়, চলচ্চিত্রকারের আদর্শ ব্যক্তিত্বের পক্ষে সেগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ বলেই ধরতে হবে।

৬. এই আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন সজাগ মানুষটি নিজের দেশের শেকড়ের টানে চলে এসে ভাগ্নীর বাড়িতে উঠে সন্দেহের শিকার হলেন, এবং স্বামীর আইনজীবি বন্ধুর কাছে অপমানিত হয়ে শান্তিনিকেতনে চলে গেলেন তাঁর ট্রাস্টীর কাছে। সেখানে গিয়ে সাঁওতাল পল্লীর মনমাতানো লোকনৃত্য উপভোগ করলেন। লোকনৃত্যে ভাগ্নীর যোগ দেওয়ায় বুঝলেন তাঁর লোকশিল্পের টান ভাগ্নীর মধ্যে আছে বলেই তাঁর মনে এখন আর সন্দেহ নেই যে, সত্যিই সে তাঁর ভাগ্নী। দু'পক্ষের এই আত্মীয়তাবোধ দর্শকের মনেও সঞ্চারিত হয়ে যায় সাঁওতাল নৃত্যের দ্রুত তালের উন্মাদনার মধ্যে।

কিন্তু এই আত্মীয়তাবোধের প্রাথমিক সূচনায় সন্দেহ সংশয় এবং অপমানের যে খাদটুকুর রেশ থেকে গিয়েছিল তা দূর হলো আগন্তুক চলে যাবার ঠিক পর মুহূর্তে। যখন আগন্তুকের সমস্ত প্রাপ্য উত্তরাধিকার আগন্তুক দিয়ে গেলেন তাঁর ভাগ্নীকে। সেই প্রাপ্তির দৃশ্যে স্তম্ভিত স্বামী আর উদ্বেলিত স্ত্রীর (ভাগ্নীর) মধ্যে অনুতাপের অশ্রু-মেশা যে দাম্পত্যমিলন ঘটেছে এবং 'জাল' খসে যাওয়া দাদুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য হারিয়ে যে কষ্ট পাওয়া শিশুটির চোখ জলে ভারি হয়ে উঠেছে তাতেই আগন্তুক আর তাঁর স্বদেশ-স্বজনের সম্পর্কটি অনেক ভুল-বোঝাবুঝি আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভেতর দিয়ে নৈকট্যের গভীরতা পেয়েছে। তাঁর স্বজন-স্বদেশ বুঝলো, কতোখানি নিঃস্বার্থ আর আত্মত্যাগী এই মানুষটি আন্তর্জাতিকতার কোন্ স্তরে পৌঁছে নিছক মন কেমনের টানে দেশজ সংস্কৃতিকে ছুঁয়ে গেলেন, এবং ছুঁতে এসে কূপমন্ডুক এই স্বদেশভূমির চেহারাটি দেখে দুঃখ পেয়ে গেলেন। যে সাংস্কৃতিক মডেল এবং তার ব্যক্তি প্রতিনিধিকে সত্যজিৎ এই ছবিতে দাঁড় করিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশ-স্বজনের আত্মগ্লানিকে ফুটিয়ে তোলাই 'আগন্তুক' ছবিটির লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়। গ্রাম্য বা শহুরে নিতান্ত সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিচিত্র পেশা ও নেশার মানুষ এবং বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও অভিজাত মানুষের যে বৈচিত্র্য সত্যজিতের ছবিতে ছড়িয়ে আছে নাবী-পুরুষ নির্বিশেষে তার তুলনা যেমন খুব কম ভারতীয় চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে পাওয়া যায় (পোষ্টমাস্টাব ছবিতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গ্রাম্য বৃদ্ধদের গানের আসর জামানোর কথা ভাবুন, অন্যদিকে 'সীমাবদ্ধ' ছবির ডিরেকটর বোর্ডের স্যার বরেন কিংবা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে আচার ব্যবহারে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রিটিশ কালচারেব ধারক বৃদ্ধটির কথা ভাবুন।) অন্যদিকে গত দেড়শো বছরের পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার নানা বৈশিষ্ট্য ও অবক্ষয়ের যে চেহারা 'শাখা-প্রশাখা' পর্যন্ত প্রকট তারই আর একটি ইতিপূর্বে অনালোচিত দিক 'আগন্তুকে'র বিষয়ে ও চিত্রভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' থেকে শুরু করে 'শাখা-প্রশাখা' পর্যন্ত যে সব কাহিনী ও চিত্রনাট্য সত্যজিতের নিজের লেখা — সবগুলির মধ্যেই পরিচালক সত্যজিৎ দৃষ্টিভঙ্গিতে ও রুচিতে নানাভাবে ছড়িয়ে আছেন শিল্পী হিসেবে তাঁর প্রচন্ড নিরাসক্তি সত্ত্বেও। কিন্তু 'আগন্তুক' ছবিতে আগন্তুকই তাঁর প্রথম ও শেষ চরিত্র — রুচি ও তথ্যজ্ঞানে, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতায়, আদর্শে ও ঔচিত্যবোধে যে চরিত্র শিল্পী সত্যজিতের সবচেয়ে কাছাকাছি, মুখপাত্র হিসেবে যাকে ধরা যায়।

শুধু স্বদেশ ও সমাজের যন্ত্রণাই যে এই আগন্তুক বহন করে তা-ই নয়। আধুনিক সভ্যতার যন্ত্রণা ও রোমাঞ্চ, সারল্য ও কৃত্রিমতা, বৈচিত্র্য ও অসঙ্গতি, ভিত্তি ও বিকাশ, মূল ও শীর্ষ তার নখদর্পণে। আগন্তুক গ্রহান্তরের জীব নয়, এই গ্রহেরই ভবিষ্যৎ বিবেক। শিশুর সারল্যে সে স্বীকৃতি পেলেও বয়স্কদের সন্দেহ-সংশয়ে সে বিবেককে আমরা দূরে ঠেলে দিয়েছি। কিন্তু তার বিশুদ্ধতাকে সে জানান দিয়ে গেছে। তার অনুপস্থিতিতে তার জন্যে অনুশোচনা করে আমরা তার গুরুত্ব বুঝেছি।

আগন্তুক ঃ প্রান্তিকতা ও সংহতি

ছন্দক সেনগুপ্ত

'আগন্তুক' ছবির প্রেরণা হিসেবে সত্যজিৎ রায় অনেক বারই নৃতত্ত্ববিদ ক্লোদ লেভি-স্ত্রোসের নাম করেছেন। তথাকথিত 'আদিম' মানুষের মানস ও মনন পশ্চিমী ধাঁচের না হলেও তার চাইতে নিচুমানের যে নয় এ কথা লেভি-স্ত্রোস অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন বহুবার, বিশেষত তাঁর সুবিখ্যাত দু'টি বই Tristes Tropiques এবং The Savage Mind-এ। এটা, অতি অবশ্যই, 'আগন্তুক' ছবিরও বাণী। লেভি-স্ত্রোসের মতে, পৃথিবীর সব মানুষই কয়েকটি 'আইন' মেনে চিন্তা করে, যদিও সেই 'আইন'-এর প্রয়োগপন্থা এক-এক সমাজে এক-এক রকম হতে পারে। এবং প্রয়োগের বৈচিত্র্য থেকে স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভব হয় চিন্তার ফলাফলের প্রভেদ। [১]

'আগন্তুক'-এর চরিত্র ও বক্তব্য বুঝতে গেলে লেভি-স্ত্রোস অথবা তাঁর তত্ত্ব সম্বন্ধে এর চাইতে বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই। অথচ অন্য এক নৃতত্ত্ববিদের তত্ত্বের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় থাকলে 'আগন্তুক' ছবি এবং সত্যজিৎ রায়ের শিল্পমানসের বৈশিষ্ট্য অন্য একদিক থেকে বোঝা সহজ হতে পারে।

ভিক্টর টার্নার (১৯২০-৮৩)-এর নাম অনেকেই শুনেছেন। টার্নারের জন্ম ও শিক্ষা ইংল্যাণ্ডে। কর্মজীবন কাটে অবশ্য আমেরিকায়। কর্নেল, শিকাগো ও ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব পড়ান বহুবছর। টার্নারের গবেষণা শুরু হয় কয়েকটি আফ্রিকান উপজাতির আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণ দিয়ে। তাঁর যে-সব তত্ত্বের কথা এই প্রবন্ধে অলোচনা করব সেগুলি উত্থাপিত হয় এই প্রাথমিক গবেষণাতেই; যদিও শেষ অবধি তারা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন, বিচিত্র ক্ষেত্রে। [২]

বহু উপজাতিক সমাজেই এক বিশেষ ধরনের লোকাচার খুব গুরুত্বপূর্ণ। নৃতত্ত্ববিদ আর্নল্ড ভ্যান গেনেপ (Arnold Van Gennep) এ শতাব্দীর গোড়ায় এজাতীয় লোকাচারের নাম দিয়েছিলেন rites of Passage এবং দেখিয়েছিলেন যেকোনো rites of passage-এ সাধারণত তিনটি স্তর থাকে। প্রথম হল গতানুগতিক জীবন অথবা সামাজিক অবস্থান থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের পৃথকীকরণ। এই পৃথকীকরণের সঙ্গে-সঙ্গেই অংশগ্রহণকারীরা প্রবেশ করে দ্বিতীয় স্তরে। এই দ্বিতীয় স্তর প্রকৃত অর্থেই মধ্যবর্তী। এক অবস্থা অথবা অবস্থান (ধরা যাক কৈশোর) থেকে অন্যতে (ধরা যাক যৌবনে) প্রবেশ করার আগে এই দ্বিতীয়, মধ্যবর্তী স্তরে কিছুকাল কাটানো এই সব লোকাচারে আবশ্যক। এই পর্ব সার্থকরূপে সমাপন করবার পরই আসে rite of passage-এর তৃতীয় এবং অন্তিম ধাপ। অংশগ্রহণকারীরা এবার সমাজে পুনঃপ্রবেশ করে, তবে নতুন রূপে, নতুন অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে।

টার্নারের গবেষণায় ভ্যান গেনেপ-বর্ণিত দ্বিতীয় স্তরটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরটির সঠিক বাংলা পরিভাষা পাওয়া মুশকিল। ভ্যান গেনেপ এটির নামকরণ করেছিলেন

limen — এই লাতিন শব্দটির ইংরেজি করা যায় threshold — কিন্তু বাংলা? 'কিনারা' অথবা 'প্রান্ত' বললে মূল অর্থের অনেকটাই বজায় থাকে, কিন্তু পুরোটা নয়। টার্নারের রচনায় limen অথবা Liminal stage অথবা কেবল liminality কথাগুলি ফিরে আসে নানান অনুসঙ্গে। সব সময়ই কিন্তু টার্নার জোর দেন liminality-র পরিবর্তনশীল ও গতিময় প্রকৃতির উপর। এই অর্থটি বাংলায় ধরে রাখা শক্ত। আমি এই প্রবন্ধে liminality-র প্রতিশব্দ হিসেবে 'প্রান্তিকতা' এবং liminal-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'প্রান্তিক' ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি বটে কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিক পরিভাষা এগুলি কখনোই নয়।

যাই হোক, এই 'প্রান্তিক' স্তরে দৈনন্দিন নিয়ম ও রীতিনীতি সবই মুলতুবি থাকে। প্রান্তিক ব্যক্তির সামাজিক অধিকার অথবা কর্তব্য তার পূর্বের এবং ভবিষ্যতের চাইতে ভিন্ন। এর আগে rite of passage-এর উদাহরণ-রূপে কৈশোর থেকে যৌবনে প্রবেশের সময়কার অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছি। সেই সব অনুষ্ঠান — যা বহু সমাজেই প্রচলিত —চলাকালীন কিন্তু অংশগ্রহণকারীরা কিশোর বা যুবক কোনোটাই নয়। একজন কিশোর অথবা একজন যুবকের সমাজে যা অধিকার এবং যা কর্তব্য সেগুলি প্রান্তিক স্তরে অপ্রযোজ্য। কিন্তু এটা ভাবলে ভুল হবে যে প্রান্তিক ব্যক্তিদের কোনো প্রকার নিয়ম মেনে চলবারই প্রয়োজন নেই। তবে সে নিয়ম কেবল প্রান্তিক পর্বেই প্রযোজ্য, তার আগে বা পরে নয়।

তাঁর বিশ্লেষণে ভিক্টর টার্নার প্রান্তিকতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, প্রান্তিক ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো প্রকার শ্রেণীভেদ থাকে না। তাদের মধ্যে বিরাজ করে বিশুদ্ধ সাম্যবাদ ও নিবিড় মৈত্রী। দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ, যেমন সম্পত্তি বা ধনদৌলত, তার কোনো মূল্যই নেই এই পর্বে। অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় থাকা বাধ্যতামূলক। দৈনিক জীবনের আত্মীয়-পরিজন এ সময়ে পর। প্রান্তিকতার সঙ্গে তুলনা করা হয় মৃত্যুর বা জন্মের পূর্বেকার অবস্থার। অদৃশ্যতা অথবা অন্ধকারের অনুষঙ্গও প্রচলিত বহু সমাজে। প্রান্তিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে টার্নার বলেছেন ঃ 'তাদের যেন সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে ফেলে নতুন করে গড়া হয়।

প্রান্তিক অবস্থায় দৈনন্দিন সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে উদ্ভব হয় এক নতুন চেতনার যার টার্নারের-দেওয়া-নাম হল communitas এবং যার নিকটতম বাংলা প্রতিশব্দ 'সংহতি'। প্রান্তিক ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যে যে গভীর মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব বিরাজ করে তা আগেই বলেছি। সমাজিক শ্রেণীভেদের অভাব থেকে জন্ম হয় মানুষে মানুষে নৈকট্য ও সমতার। এরই নাম communitas বা সংহতি।[৩]

টার্নার যদি এখানেই থেমে যেতেন তাহলে তিনি ভ্যান গেনেপের টীকাকার-রূপে নৃতত্ত্বের ইতিহাসে স্থান পেতেন। কিন্তু টার্নার ভ্যান গেনেপ বর্ণিত rite of passage-থেকে প্রান্তিকতার মূল ধারণাটি নিয়ে তার প্রয়োগ করেছেন এত রকমের প্রসঙ্গে যে সেটি আজ এক নতুন গুরুত্ব পেয়েছে নৃতত্ত্বের বাইরে সমাজ ও শিল্প-সমালোচনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। টার্নারের নিজস্ব রচনা তো বটেই, তাঁর অনুগামীদের প্রয়াসও সমালোচনা-সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই প্রভাবের মূলে টার্নারের বিশ্বাস

যে, প্রান্তিকতা কেবলমাত্র কতিপয় লোকাচারের অঙ্গ নয়। সব সমাজেই এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই কিছু মানুষ থাকতে বাধ্য যাঁরা প্রায় স্বেচ্ছায়ই অবস্থান করেন সেই সমাজ অথবা সেই ক্ষেত্রের কিনারায়। এই প্রান্তিকতা বহুভাবে প্রকাশ পেতে পারে। দারিদ্র্য, ভবঘুরে স্বভাব, স্বেচ্ছাচারী আচরণ, অনৈতিকতা এমন কি সমাজবিরোধিতা — এ সবই প্রান্তিকতার বিভিন্ন রূপ। কিন্তু এই সব কেন্দ্রচ্যুত ব্যক্তিরা সবাই 'অসফল' বা 'বিপজ্জনক' নয়। সামাজিক প্রথা বিবর্জিত সংহৃতির স্বপ্ন, সর্বমানবের ভ্রাতৃবন্ধনের কামানাও তাঁদের মধ্যে জন্ম নেয় প্রায়শই। এঁরা প্রথাসিদ্ধ নৈতিকতা মেনে চলতে নারাজ ঠিকই, কিন্তু এঁদের অনেকেই মেনে চলেন এক ভিন্ন (এবং হয়তো উর্ধবতর) নীতি। লোককথা বা সাহিত্যে এ ধরনের চরিত্র প্রায়ই দেখা যায়। বাইবেল-এর 'গুড সামারিটান' ও ডস্টয়ভস্কির 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্টে'র সোনিয়ার উদাহরণ টার্নার নিজেই দিয়েছেন। বাঙালি পাঠক নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের কল্যাণে বহু দেশজ উদাহরণের কথা মনে করতে পারবেন।

সংহৃতির চিন্তা শুধু ব্যক্তির মধ্যে নয়, দলগত ভাবেও আসতে পারে। বহু ধর্মগোষ্ঠীর উল্লেখ এখানে করা যায়। টার্নার এধরনের একাধিক উদাহরণ দিয়েছেন, যাদের মধ্যে বাংলার বৈষ্ণবরাও আছেন। তা ছাড়াও বাউল গানে টার্নার খুঁজে পেয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত সংহৃতির বিশুদ্ধ প্রকাশ।[৪]

প্রান্তিকতা ও সংহৃতির টার্নার-বর্ণিত এই বৃহত্তর অর্থ মনে রাখলে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্ম বিচারে সুবিধা হতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে রচিত সত্যজিৎ-শিল্প কোনো একটি তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস নেহাৎই হাস্যকর। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে, সত্যজিতের শিল্প-সাহিত্যে প্রান্তিক চরিত্রের আগমন ঘটেছে বারে-বারে। জনৈক সমালোচক একবার বলেছিলেন যে সময় চলে শ্রেণী-সংগ্রামের সংঘাতে আর সত্যজিৎ রায়ের চরিত্ররা কক্ষচ্যুত নক্ষত্র মাত্র। এ কথার মধ্যে একটা আংশিক সত্য লুকিয়ে আছে, যদিও ভুয়ো-মার্কসবাদ অবলম্বন ক'রে সে সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। সত্যজিৎ রায়ের 'কক্ষচ্যুত নক্ষত্র'রা শ্রেণীসংগ্রামে জ্ঞানত লিপ্ত হবেনটা কি ক'রে? প্রান্তিক মানুষেরা তো শ্রেণী বা কোনো প্রকার বিভাজনে বিশ্বাসী নন। তাঁরা যে সংহৃতির কল্পনা করেন তা বিশ্বমানবতার নামান্তর। সেখানে শ্রেণী বা শ্রেণীসংগ্রামের কথাই ওঠে না। এ প্রকার ধ্যান-ধারণা সমাজতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকের চোখে যাই হোক না কেন, যথার্থ কোনো প্রান্তিক মানুষের জীবনদর্শনে শ্রেণীসংগ্রামের কোনো স্থানই নেই এবং সে-ধরনের চরিত্রদের উপস্থিত করতে গেলে কি চলচ্চিত্রকার কলমের জোরে তাদের খুদে মার্কসবাদী বানিয়ে ফেলবেন?

সত্যজিৎ রায়ের প্রান্তিক চরিত্ররা কেউই নৈরাজ্যবাদী বা সমাজবিরোধী নন। সত্যজিতের ছবিতে সম্পূর্ণ নেতিবাচক চরিত্র তেমন নেই-ই। যাঁরা খানিকটা অনৈতিক তাঁরা কিন্তু সবাই সমাজের চোখে সফল। যেমন 'সীমাবদ্ধ'র শ্যামলেন্দু অথবা 'জন-অরণ্য'র সোমনাথ। যে চরিত্ররা সত্যি-সত্যিই 'কক্ষচ্যুত নক্ষত্র' তারা প্রায় সকলেই অপেক্ষাকৃত নির্লোভ, চিন্তাশীল, স্পর্শকাতর এবং সৃজনশীল। বর্তমান সমাজে তারা অসফল অথবা খ্যাপাটে অথবা অলস বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু সত্যজিতের চলচ্চিত্রায়নে সেটা সমাজেরই ব্যর্থতা রূপে চিহ্নিত হয়। 'পথের পাঁচালী'র হরিহর, 'অপুর সংসার'-

এর অপু, 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-র সিদ্ধার্থ, অথবা 'শাখা-প্রশাখা'র প্রশান্ত —এরা সবাই বিভিন্নভাবে প্রান্তিক, কিন্তু তারা সমাজিক প্রতিপত্তির বাসনা জলাঞ্জলি দিয়েও (বা জলাঞ্জলি দিয়েই) তাঁদের অন্তর্নিহিত মানবিকতা, সৃষ্টিশীলতা ও নৈতিকতাকে ধরে রাখেন এবং সাধ্যমতো বিকশিতও করেন। সত্যজিতের ছবিতে সাফল্য বা অর্থলাভ বা প্রতিপত্তির বিস্তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৈতিক অধঃপতনের চিহ্ন এবং কারণ।

'সীমাবদ্ধ' ও 'জন-অরণ্য'র নায়কদের উল্লেখ আগেই করেছি। সেই সঙ্গে 'শাখা-প্রশাখা'র প্রবোধ ও প্রবীরের নামও মনে রাখতে হবে।

প্রান্তিকতা না হয় হল, কিন্তু কেবল নিজের ব্যতিক্রমী নৈতিকতা ও সৃজনশীলতাকে বাঁচিয়ে রাখাই কি সংহতি ? অবশ্যই নয়, যদিও বাস্তবে বহু প্রান্তিক ব্যক্তিই শুধুমাত্র এ-টুকুই ক'রে উঠতে সমর্থ হন। এখানে অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে আমরা যে সংহতির আলোচনা করছি তা কেবল একজন ব্যক্তির চিন্তার জগতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। 'শাখা-প্রশাখা'র প্রশান্তর কথাই ধরা যাক আবার। সে অর্ধোন্মাদ, সুতরাং প্রান্তিকতার শেষতম বিন্দুতে তার অবস্থান। কিন্তু তার শিল্পবোধ সুগভীর এবং তার মনে যে সর্বক্ষণ এক নিজস্ব নৈতিকতার বোধ সজাগ সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না দর্শকের। সমাজ তাকে গ্রহণ করে না, নাকি সেই সমাজকে বর্জন করেছে? ছোট ভাই প্রতাপ তাকে বলে ঃ 'এক হিসেব তুমি ভালোই আছ মেজদা। আজকের মানুষ যে কোথায় নেমেছে সেটা তোমাকে দেখতে হচ্ছে না।' উত্তরে প্রশান্ত চিৎকার ক'রে ওঠে ঃ 'জানি! জানি! — অমাবস্যা! অন্ধকূপ! কালো! Black – Black– Black – Black –Black!' উত্তেজনা কমবার পর সে ধীরভাবে বলে — 'একা, একা, একমেবাদ্বিতীয়ম্!' এগুলি কি সমাজের সঙ্গে যুঝতে না পারা 'কক্ষ্যচ্যুত নক্ষত্র'-র বিলাপ, না সমাজকে প্রত্যাখ্যান করেছে এমন একজনের স্বগতোক্তি?[৫]

কিন্তু সমাজকে প্রত্যাখ্যান মানে মানুষকে প্রত্যাখ্যান নয়। এই একই দৃশ্যে মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে প্রশান্ত গুন-গুন করেছে একটি সুবিখ্যাত সুর ঃ সেটি বেঠোফেনের নবম সিম্ফনির 'ওড টু জয়'। এবং তারপর আপন মনে বলেছে — 'Brothers! Brothers! Brothers!' এটাকে যদি কেবলমাত্র তার নিজের ভাইদের প্রতি ইঙ্গিত বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এইই জটিল দৃশ্যের বহুমাত্রিকতা ধারা যাবে না। 'ওড টু জয়' তো কেবল সুর নয়, ফ্রিডরিশ শিলার-এর যে কবিতাকে বেঠোফেন তাঁর শেষ সিম্ফনিতে স্থান দিয়েছিলেন তাকে পশ্চিমী মানবতাবাদের manifesto বললে তেমন কিছু ভুল বলা হয় না। প্রশান্ত গুন-গুন করে যে অংশের সুর তার বাণী হল ঃ

Freude, schoener Goetterfunken,
Tochter aus Elusium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heligthum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Bruder
Wo dein sanfter Flugel weilt.

এ কবিতার বাংলা অনুবাদ আছে কিনা আমার জানা নেই। মানেটা মোটামুটি এই রকম ঃ

আনন্দ, ঈশ্বরের দ্যুতি,
স্বর্গের সন্তান,
এসে তোমার অমর্ত্যভবনে
আমাদের চেতনা আনন্দবিহ্বল।
প্রতিদিনের হাজার বিভেদ
মুছে দেয় তোমার ইন্দ্রজাল।
তোমার ছত্রছায়ায়
মানুষ মানুষের আপন, দোসর।

ইংরেজি অনুবাদে, বলাবাহুল্য, Alle Menschem werden Bruder' ছত্রটি হয় 'All buman beings become brothers' — এর পরেও কি প্রশান্তর 'Brothers! Brothers! Brothers!' বলাটা শুধুমাত্র তার নিজের ভাইদের প্রতি ইঙ্গিত বলে মনে হওয়া সম্ভব? সে দ্যোতনা অবশ্যই আছে এবং সেটাই সত্যজিৎ রায়ের সংলাপ রচনার চিরাচরিত কায়দা। কিন্তু এ দৃশ্যে শিলার / বেঠোফেনের উপস্থাপনার উদ্দেশ্য প্রশান্তর মানবতাবাদের প্রমাণ দেওয়া। এবং ওই বিশ্বমানবিকতাবাদেরই আর এক নাম সংহৃতি।

'গণশত্রু'তে প্রান্তিকতা ও সংহৃতির উপস্থাপনা একটু অন্যরকম। এ ছবি (এবং হেনরিক ইবসেনের মূল নাটক) শুরু হয় যখন, তখন তার নায়ক একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। ইবসেনের নাটক শেষ হয় যখন, তখন নায়ক পুরোপুরি প্রান্তিক, বজায় আছে কেবল তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মবিশ্বাস। একাকিত্বের সেই বিশ্ববিখ্যাত গুণসংকীর্তন ('সেই সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ যে সবচেয়ে একা') কিন্তু স্থান পায় না সত্যজিতের রূপান্তরে। তার বদলে বাইরে থেকে ভেসে আসে সমবেত ধ্বনি ঃ 'ডাক্তার গুপ্ত জিন্দাবাদ!' সেই ধ্বনি শুনে বিস্মিত ও আনন্দিত অশোক বলে — 'আমি তাহলে একা নই!' প্রান্তিকতা মিশে যায় সংহৃতিতে, যা ইবসেনের মূল কল্পনা বজায় রাখলে কখনোই সম্ভবপর হতো না।

প্রশান্তর সংহৃতি-চিন্তার সঙ্গে অশোক গুপ্তর অভিজ্ঞতার প্রভেদ হল যে ডঃ গুপ্তের সংহৃতিসাধন একটি সুনির্দিষ্ট, বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে। বিশ্বমানবতাবাদী সংহৃতির স্থান কি তাহলে শুধু চিন্তার জগতে? তাঁর শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এ এই প্রশ্নের বিচার করেন সত্যজিৎ। 'গণশত্রু', 'শাখা-প্রশাখা' এবং 'আগন্তুক' ছবি তিনটিকে ট্রিলজি আখ্যা দেওয়ার একাধিক যুক্তিসংগত কারণ আছে। তার একটি হল যে তিনটি ছবিরই মূল বিষয় প্রান্তিকতা ও সংহৃতি।

'আগন্তুক'-এ কিভাবে এ দু'টি ধারণার উপস্থাপনা করা হয় সেপ্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে একটা ভূমিকার প্রয়োজন আছে। ভিক্টর টার্নারের তত্ত্বের অনেক দিকই এ প্রবন্ধে আলোচিত রয়েছে — তাদের মধ্যে একটির আলোচনা এখানে না ক'রে নিলেই নয়।

তীর্থযাত্রার অসাধারণ বিশ্লেষণ করছেন টার্নার যার প্রধান বক্তব্য হল যে তীর্থযাত্রা এক প্রান্তিক অভিজ্ঞতা। (আমার পরিভাষার দৈন্য এখানে প্রকট। 'liminality' শব্দে যাত্রা, রূপান্তর বা গতির যে ইঙ্গিত আছে 'প্রান্তিকতা'য় তা নেই।) তীর্থযাত্রা প্রান্তিক

অভিজ্ঞতা শুধু নয়, যাত্রাকালে যাত্রীদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক বিশেষ ধরনের সংহতি যা দৈনন্দিন জীবনে প্রান্তিক ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা যায় না।[৬]

'আগন্তুক'-এর ক্ষেত্রে টার্নারের এই চিন্তা কতটা প্রাসঙ্গিক তা সকলেই বুঝবেন। তীর্থযাত্রার ধর্মীয় দিকটা অবশ্যই বাদ দিয়ে ভাবতে হবে। অন্ততপক্ষে ধর্ম শব্দের প্রাত্যহিক অর্থটা মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। সত্যজিতের নায়ক মনোমোহন পঁয়ত্রিশ বছর গৃহহীন ও ভবঘুরে। বিশ্বময় তাঁর ভ্রমণ এবং তাঁর প্রিয়তম মানুষ যাঁরা তাঁরা কেউই সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি নন। মনোমোহনের সন্ধান মানবতা ও নৈতিকতার সন্ধান। সেখানে জাতি, শ্রেণী বা সমাজিক প্রতিপত্তির কোনোরকম গুরুত্ব নেই। তথাকথিত 'অসভ্য' উপজাতির মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যত নিবিড় হয়েছে, ততই তাঁর মনে জমে উঠেছে, 'সভ্য' সমাজের প্রতি অসন্তোষ। যে সমাজে তাঁর জন্ম সেখানে আজ তিনি সম্পূর্ণ প্রান্তিক ঠিকই কিন্তু তিনি খুঁজে পেয়েছেন সেই সংহতি যা প্রশান্তর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্বপ্ন।

যাত্রা বা গতিময়তা অতি অবশ্যাই, কেবল মানসিক স্তরেই ঘটতে পারে। এবং তাতেও মানবিকতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটা সম্ভব। সেরকম উদাহরণও সত্যজিৎ শিল্পে পাওয়া যায়। 'সোনার কেল্লা'র সিধুজ্যাঠা শুধু বাড়ি বসে বই পড়েন ঠিকই, কিন্তু 'মনের জানলা' তাঁর সব সময়ই খোলা। প্রশান্ত বা সিধু-জ্যাঠাকে কি মনোমোহন অপছন্দ করতেন? বোধ হয় না। কিন্তু মনোমোহনের জীবনে বিশ্বমানবের সংহতি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে দেশ-কাল-ভাষা-বর্ণের উর্দ্ধে। এখানেই মনোমোহন প্রশান্ত, সিধুজ্যাঠা অথবা 'অপরাজিত'র হেডমাস্টারের থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। প্রান্তিকতার সঙ্গে সংহতির বাস্তবায়নের কোনো বাধ্যতামূলক সম্পর্ক নেই, কিন্তু দু'টি যখন একই সঙ্গে ঘটে যায় তখনই মানবতাবাদ তত্ত্ব থেকে সত্যে রূপান্তরিত হয় পরিপূর্ণভাবে। সেই অর্থে মনোমোহন সত্যজিৎ-শিল্পের সবচাইতে পরিণত ও সার্থক চরিত্রসৃষ্টি। তাঁর সারা জীবনের চিন্তা, এষণা ও শিক্ষা সত্যজিৎ মনোমোহনের চরিত্রে ঢেলে দিয়েছেন অকৃপণ হস্তে। এতই সার্থক, এতই পূর্ণাঙ্গ ও বহুমাত্রিক এই চরিত্র যে বলতে ইচ্ছা করে সত্যজিৎ 'পথের পাঁচালী' থেকে 'শাখা-প্রশাখা' অবধি যত স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করেন তারা সবাই যেন এই একজনের মধ্যে উপস্থিত। 'আগন্তুক' সত্যজিতের অন্তিম ছবি হয়ে দাঁড়ায় নেহাতই দৈবচক্রে, কিন্তু এই ছবি দিয়ে তাঁর শিল্পীজীবনের পরিসমাপ্তি একান্তই যথাযথ।

'আগন্তুক' কি আত্মজীবনীমূলক ছবি? যে সব দর্শক সত্যজিতের জীবন-দর্শনের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নন তাঁরাও লক্ষ করবেন যে, মনোমোহনের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৫-এ এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় 'আগন্তুক' ছবিরই হুবহু সমসাময়িক। ছবির প্রথম দৃশ্যে তিনি নেই, কিন্তু আছে তাঁর চিঠি। বহু পরে আমরা দেখি তাঁর পাসপোর্টের সই। সবই সত্যজিতের সুপরিচিত হস্তাক্ষরে। মনোমোহন গান করেন তিনবার — কণ্ঠস্বব সত্যজিতের। এগুলির উপর ভিত্তি ক'রে সমালোচনা বেশি দূর কিন্তু এগোতে পারে না। (মনে পড়ে, কলকাতার এক সমালোচক 'শাখা-প্রশাখা' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সত্যজিতের চেহারাব আদল নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছিলেন।)

সঠিকতর পথের সন্ধান সত্যজিৎ রায় নিজেই দিয়েছেন। ১৯৯১-তে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন ঃ 'আগন্তুক আমি আজ থেকে ৩৫ বছর আগে, সেই 'পথের

পাঁচালী'র সময়ে করতে পারতাম না। গত তিনটে চারটে ছবিতে আমি নিজের বক্তব্য, নিজের বিশ্বাস, নিজের দর্শন, যাই বলুন না কেন তা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। যেমন এবার 'আগন্তুক'-এ আমি উৎপলকে বলে দিয়েছিলাম যে, উৎপল, তুমি কিন্তু আমার স্পোক্‌সম্যান এটা মনে রেখো.....।'

সত্যজিতের 'বিশ্বাস' বা 'দর্শন' নিয়ে কোন বিশদ আলোচনার স্থান এটা নয়। তবে একটা কথা বলা জরুরি ঃ ভবিষ্যতে এই ধরনের আলোচনায় 'আগন্তুক' — এবং একটু অন্যভাবে 'শাখা-প্রশাখা' ও 'গণশত্রু' গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে বাধ্য। 'আগন্তুক' মাত্র একবার দেখে খাপছাড়াভাবে কয়েকটি উপলব্ধি হয়েছিল আমার। সেগুলির উল্লেখ হয়ত খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

মনোমোহনের প্রত্যাবর্তনের পর তার identity নিয়ে সবাইয়ের যে প্রবল সন্দেহ দেখা দেয় সেটাই এই ছবির প্লট — অন্তত আপাতদৃষ্টিতে। সেই সন্দেহের দরুণ যে শুধু মনোমোহন ক্ষুণ্ণ হন তা কিন্তু নয়। তিনি পয়ঁত্রিশ বছর ধরে যা শিখেছেন ও জেনেছেন তা ব্যক্ত করতে বিশেষ সুযোগ পান না ঠিকই, কিন্তু তাতে কার বেশি ক্ষতি হয়? মনোমোহনের, না তাঁর মধ্যবিত্ত আত্মীয়-পরিজনের?

মনোমোহনের উদার মানসিকতা শেষ অবধি একটা প্রভাব বিস্তার করে ঠিকই তাঁর ভাগনি স্বেচ্ছায় সাঁওতালদের নাচে যোগ দেয়, সাত্যকি কথা দেয় যে সে কখনও কূপমণ্ডুক হবে না। কিন্তু তার নিজের চোখে এ প্রভাব তেমন সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। প্রান্তিকতার যা আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি (নতুন রূপে প্রাত্যহিক সমাজে পুর্নভুক্তি) তা মনোমোহনের ক্ষেত্রে কিন্তু ঘটে না। ছবির শেষে তিনি ফিরে যান তাঁর প্রান্তিক অবস্থানে। শিল্পী এবং ব্যক্তিমানুষ হিসেবে বাঙালি সমাজে সত্যজিৎ রায়ের অবস্থান এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে মনোমোহনের কলকাতা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কোনো মিল আছে কিনা সেটা ভাবার বিষয়।

কিন্তু এ ছবি শুধুমাত্র এক প্রান্তিক ব্যক্তির চিত্রায়ণে আটকা পড়ে থাকে না। বিবরণ-এর সঙ্গে স্থান পায় বিচার ও মূল্যায়নের প্রচেষ্টা। হয়ত সেই জন্যেই ছবির কেন্দ্রস্থলে আসে সেই আশ্চর্য জেরার দৃশ্য। অনেকে এই দৃশ্যকে court scene-আখ্যা দিয়েছেন। সে ধারণা আমার মনে হয় সঠিক। কিন্তু ছবি ও তার স্রষ্টার জীবনকে এক ক'রে ভাবলে এ দৃশ্য হয়ে দাঁড়ায় অত্যন্ত জটিল। কে এখানে আসামী আর কেই বা বিচারক? জেরা করছেই বা কে? যে মানুষ সমাজকে বিশেষ পরোয়াই করে না সে এত প্রশ্নের উত্তরই বা দিচ্ছে কেন? চিত্রনাট্যকার যাতে নাটক জমাতে পারেন সেই জন্য? ব্যাপারটা কি এতই সরল?

একটা সম্ভাব্য উত্তর ঃ 'আগন্তুক' প্রথাগত অর্থে আত্মজীবনীমূলক ছবি নয়। এ ছবি আত্মমূল্যায়নের ছবি। একজন 'স্পোক্‌সম্যান'-এর সাহায্যে সত্যজিৎ এখানে তাঁর নিজের প্রান্তিক জীবনের অর্থ ও মূল্য খুঁজে বার করতে প্রয়াসী। তাই তিনি একাই আসামী, প্রশ্নকর্তা এবং শেষ অবধি, বিচারক। সেই বিচারকার্য ও অনুসন্ধান যত অগ্রসর হয় ততই পরিস্কার হয় যে প্রান্তিকতার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। একমাত্র সংহতি-সাধনই পারে প্রান্তিকতাকে অর্থ ও মূল্য প্রদান করতে। এবং সেখানে মনোমোহন পরিপূর্ণভাবে সফল। শিলার/বেঠোফেন/প্রশান্ত-র যা স্বপ্ন, মনমোহনের জীবনে তা বাস্তব। মধ্যবিত্ত

কূপমণ্ডুকদের দৃষ্টিতে সে ভবঘুরে হলেও নিজের বিচারে তার জীবন অর্থময়, মূল্যবান ও প্রকৃত অর্থে মানবিক। পঁয়ত্রিশ বৎসর-ব্যাপী যাত্রা মনোমোহনের বৃথা হয় নি। সেই বিশ্বাস থেকে কিন্তু সন্তুষ্টির উদয় হয় না মনোমোহনের প্রাণে—সঞ্চার হয় নতুন উদ্যমের। যথার্থ প্রান্তিকতায় সংহতির সন্ধানের কোনো শেষ নেই। ছবির শেষে মনোমোহনের যাত্রা তাই শুরু হয় আবার। কোনো মানবতাবাদী শিল্পীই যেহেতু পুরো নৈরাশ্যবাদী হতে পারে না তাই সত্যজিৎ ইঙ্গিত দেন যে সাত্যকি হয়ত ভবিষ্যতে মনোমোহনের জীবনযাত্রা না হলেও জীবনদর্শন গ্রহণ করবে।

'আগন্তুক' সম্বন্ধে আমার ধারণাগুলি সঠিক এমন দাবি আমি কখনোই করছি না। আমার প্রধান উদ্দেশ্য 'আগন্তুক' ছবিকে উদাহরণস্বরূপ নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পের একটি স্বল্প-আলোচিত দিক তুলে ধরা। ভিক্টর টার্নারের 'প্রান্তিকতা' ও 'সংহতি'র তত্ত্ব যদি যত্ন-সহকারে এই কাজে প্রয়োগ করা হয় তাতে সমালোচকদের ও পাঠকের বিশেষ সুবিধা হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

উল্লেখপঞ্জি

১. লেভি-স্ট্রোস সম্বন্ধে আলোচনার কোনো অভাব নেই ইংরাজি সমালোচনা-সাহিত্যে। ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছি যে সূত্রগুলি থেকে এখানে কেবল তাদেরই উল্লেখ করলাম ঃ

Edmund Leach, Claude Le'vi Strauss (New York : Viking, 1970)

E. Nelsón Hayes & Tanya Hayes (eds), Claude Le'vi Strauss : The Anthropologist as Hero (Cambridge, Mass: M. I. T. Press, 1970)

Christopher Tilley, 'Claude Le'vi-Strauss : Structuralism and Beyond', in C, Tilley (ed.), Reading Material Culture : Struturalism, Hermeneutics and Post-Structuralism (Oxford : Basil Blackwell, 1990), pp. 3-81

Ahmed Gurnah and Alan Scott. The Uncertain Science: Criticism of Sociological Formalism (London/New York: Routledge, 1992), Chapter 3 : 'Claude Le'vi Strauss : Universal Categories and the End of Racism,' pp.65-92.

২. টার্নারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সম্পূর্ণ রচনাপঞ্জির জন্য দেখুন ঃ

Frank E. Manning, 'Victor Turner's Carreer and Publicationns', in Kathleen M. Ashley (ed.), Victor Turner and the Construction of Cultural Criticis, (Bloomington, Ind: Indiana University Press, 1990), pp. 170-77.

৩. Victor W. Turner, The Ritual Process : Structure and Anti-Structure (Chicago : Aldine, 1969), Chapter 3 : 'Liminality and Communitas', pp. 94-130, and Chapter 4: 'Communitas: Model and Process', pp. 131-65.

৪ Turner, The Ritual Process, p. 165; and Victor Turner, 'Morality and Liminality', in his Blazing the Trail; Way Mark in the Exploration of Symbols, ed. Edith Turner (Tucson, Arizona: Universoty of Arizona Press, 1992), pp132-62.

৫ সত্যজিৎ রায়, 'শাখা-প্রশাখা' (চিত্রনাট্য), 'এক্ষণ' শারদীয় ১৯৩৮, পৃ ৫৬।

৬ Victor Turner, Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society (Ithaca, NY : Cornell University Press, 1974) Chapter 5 : 'Pilgrimages as Social Process', pp. 167-230.

৭ সত্যজিৎ রায়, 'আমার ছবিতে ...আজকের দিনে' (শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার), 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১ মে ১৯৯১ — এই সূত্রটি আমি নিজে দেখবার সুযোগ পাই নি। আমার উদ্ধৃতিটির উৎস ঃ 'দেশ', ২ মে ১৯৯২, পৃ ঃ ৪৬।

নৃতত্ত্ব, মানুষের ভবিষ্যৎ ও 'আগন্তুক'

ধীমান দাশগুপ্ত

বলা যায়, আর বলা হয়েওছে, যে, রবীন্দ্রনাথের যেমন শেষ বয়সের 'সভ্যতার সংকট', সত্যজিতের তেমনি শেষ জীবনের 'গণশত্রু'-'শাখা-প্রশাখা'-'আগন্তুক' — সংকটের ট্রিলজি। কিন্তু 'সভ্যতার সংকট'-এ অনুভব যেমন শুধু কালকে আচ্ছন্ন করে রাখে না, কালকে অতিক্রম করে যায়, সেই অনুভূতি সংকটের ট্রিলজিতে মেলে না। তার একটা কারণ এই যে, সত্যজিতের ট্রিলজি মূলত শিল্পীর নৃতাত্ত্বিক রচনা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ওই রচনা ক্রান্তদর্শীর দার্শনিক ভাষ্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যজিৎ-ট্রিলজির শেষ ভাগ 'আগন্তুক' ছবিকে বিচার করে দেখা যায়।

'আঠারো বছর বয়সী এক যুবক বাড়ি থেকে চলে গেল। পঁয়ত্রিশ বছর পর তিনি ফিরে এলেন। তিনি এক নৃতত্ত্ববিদ। যে ভাগ্নিকে তিনি চোখেই দেখেন নি তার কাছে এসে আটদিন কাটালেন। ভাগ্নি মামাকে বিশ্বাস করলেও, ভাগ্নির স্বামী করেন না। তাঁর মনে হয় উনি এক প্রতারক। এক সপ্তাহব্যাপী সময়ের মধ্যে এই মানুষটিকে জানা যায়। তাঁর দর্শনকে আবিষ্কার করা যায়, যা মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে এইরকম ঃ সুইচ টিপে পারমাণবিক বোমা ফেলে মানবজীবন ধ্বংস করা মানুষদের চেয়ে নরমাংসভোজী জংলিরা বেশি মানবিক।' — সত্যজিৎ রায়।

মাংস প্রসঙ্গে লেভি স্ট্রাউসের কথা আসবে ও পরমাণু বোমা প্রসঙ্গে গান্ধীর কথা।

কাঁচা মাংস খাওয়া থেকে রান্না করে খাওয়া, নৃতত্ত্বের দিক থেকে অসভ্যতা থেকে সভ্যতায় আসা, লেভি স্ট্রাউস বলতেন। সেই ভাবে বলা যায়, নরমাংস থেকে পশুমাংস খাওয়াও অসভ্যতা থেকে সভ্যতায় আসা। 'আগন্তুক'-এর নৃতত্ত্ববিদ নায়ককে যদি প্রশ্ন করা যেত, তিনি তো সর্বভুক, কিন্তু নরমাংস খেয়েছেন কি এবং উত্তরে তিনি বলতেন, হ্যাঁ, তবে সভ্যতা থেকে অসভ্যতায় এসে একটি চক্র পুরো শেষ হতো। আবার রান্না করা নরমাংস ভক্ষণের মধ্য দিয়ে এক মাত্রার সভ্যতা অন্য মাত্রার অসভ্যতার সঙ্গে juxtapose-ও করতো।

এই প্রকার irony পরমাণু বোমা প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে বসে বোতাম টিপে পরমাণু বোমা বহনকারী ক্ষেপনাস্ত্র চালনা করে পরিচালিত যুদ্ধ ক্রিয়া ও ফলাফলের মধ্যে বিরাট বিচ্ছেদের দরুন আধুনিক যুদ্ধকে আরও বেশি দায়িত্বহীন করে তুলেছে। এর ফলে যুদ্ধ যে আরও অমানুষিক হয়ে পড়ছে তাই নয়, যুদ্ধের মধ্যে ন্যূনতম মানবিক গুণনীয়কও উপস্থিত থাকছে না। এর মোকাবিলা করা হবে কীভাবে?

গান্ধীর মতে, অহিংসা দিয়ে। চরম হিংসার প্রশ্নে পরম অহিংসক উত্তর —

'I would meet it by prayerful action.

'I will not go underground. I will not go into shelters. I will come out in the open and let the pilot see I have not the face of evil against him.

The pilot will not see our faces from his great height, I know, But that longing in our hearts that he will not come to harm would reach up to him and his eyes would be opened......'

এই প্রকার উত্তরের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা কি সভ্য মানুষ বোঝে? অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতে, আমাদের নৈতিক অধঃপতন এতদূর হয়েছে যে অ্যাটেনবরোর 'গান্ধী' ছবির প্রকৃত তাৎপর্য আমরা বুঝিনে। পরমাণু বোমার ভয়ে ভীত পাশ্চাত্ত্য কিন্তু বোঝে।

আজ থেকে একশো, দুশো বা চারশো বছর পর মানুষের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ওপর ততটা নির্ভর করবে না, যতটা নির্ভর করবে মানুষের আবেগের সম্ভাবনা ও ক্ষমতার ওপর।

আর তাহলে একজন নৃতত্ত্ববিদের জিজ্ঞাসা 'আগন্তুক'-এর নৃতত্ত্ববিদ নায়কের তথাকথিত দর্শনের (পরমাণু বোমা নিক্ষেপ বনাম নরমাংস ভক্ষণ) চেয়ে আরও ব্যাপক, গভীর ও গূঢ় হওয়া দরকার। সেই জিজ্ঞাসার একটা সম্ভাব্য রূপ এই হতে পারে — সভ্যতার ভবিষ্যৎ অথবা সভ্যতাহীনতায় পুনরাবর্তন (না, অসভ্যতায় প্রত্যাবর্তনও নয়)।

নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব এই তিনটির প্রতিটি অন্য দুটির মধ্যে অনেকটা ডুবে গিয়ে কিছুটা করে জেগে আছে। এইভাবে সামাজিক নৃতত্ত্ব একদিকে সমাজতত্ত্ব ও অন্যদিকে মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানুষের সচেতনতার তিনটি পর্যায় — ব্যক্তি-সচেতনতা, সমাজ-সচেতনতা ও সার্বিক সচেতনতা। যার প্রথমটি মনস্তত্ত্ব, দ্বিতীয়টি সমাজতত্ত্ব ও তৃতীয়টি নৃতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত। মানবিক মিথস্ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা নিয়ে সমাজতত্ত্বের কাজ, যে মিথস্ক্রিয়ার সামাজিক কম্পোনেন্টকে নিয়ে কাজ করছে নৃতত্ত্ব আর এর ব্যক্তিকেন্দ্রিক কম্পোনেন্টটি হলো মনস্তত্ত্বের বিষয়।

ফলে একজন নৃতত্ত্ববিদকে তথা কোন ছবির নৃতত্ত্ববিদ নায়ককে একই সঙ্গে হতে হবে কিছুটা মনস্তত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীও।

আর এইপ্রকার কোন ছবির পরিচালককে হতে হবে একই সঙ্গে কিছুটা করে নৃতত্ত্ববিদ, মনস্তত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানী।

'আগন্তুক' ছবিরর পরিচালকের অভিগম বা প্রতিন্যাস বোঝা যাবে চিত্ররূপের সঙ্গে মূল গল্পের যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন তার প্রতিতুলনা করলে। আর ছবির নায়কের অবস্থান ও প্রতিন্যাস ধরা পড়বে সংলাপ ও আচরণে মধ্য দিয়ে তার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে।

মূল গল্পে নায়ক ছিলেন 'অতিথি', ছবিতে তিনি হয়েছেন 'আগন্তুক'।

গল্পে নায়ক ছিলেন চুপচাপ, চল্লিশ বছরের উপর নিরুদ্দেশ থাকা সত্ত্বেও তার যেন কিছুই বলার নেই ; ছবিতে তিনি কিন্তু ক্রমাগত কথা বলেছেন, তর্ক করেছেন, যুক্তি সাজিয়েছেন।

গল্পে তাঁর আইডেনটিটি ছিল খান ত্রিশেক বাঁধাই-অবাঁধাই নানারকমের খাতা, পরিষ্কার ঝকঝকে হাতের লেখায় বাংলা পাণ্ডুলিপি; ছবিতে তাঁর আইডেনটিটি

ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট।

গল্পে তাঁর ভ্রমণকাহিনীর জন্য তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, ছবিতে তিনি উইল মারফত পান পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার।

অর্থাৎ গল্পের তুলনায় ছবিতে নায়ক অনেক বেশি তৎপর, অধিক আধুনিক, উল্লেখ করার মতো বিত্তবান।

গল্পে নায়কের আদল ছিল, সাধারণভাবে ভাগ্নির বাড়ির পরিবেশ ছিল, এবং ভাগ্নি, ভাগ্নিজামাই ও নাতি এই চরিত্র তিনটিও ছিল ছবির তুলনায় অধিক ঘরোয়া। সেখানে স্টেশন থেকে নায়ক বাড়িতে এসেছিলেন সাইকেল রিক্‌শা চেপে (ছবিতে কিন্তু ট্যাক্সি করে)।

সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তনটা গল্প থেকে ছবিতে ঘটেছে তা হলো গল্পে ইনি ছিলেন ভূপর্যটক — বাঘের কবলে পড়েছেন, সাপের ছোবল খেয়েছেন, সাহারায় যাযাবর তুয়ারেগ দস্যুদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে এসেছেন, জাহাজডুবির পর মাদাগাস্কারের ডাঙায় সাঁতরে উঠেছেন। উনচল্লিশে ভারতবর্ষ ছেড়ে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে পড়ার পর সারা পৃথিবীটাই হয়ে গেছে তাঁর নিজেব ঘর। ছবিতে তিনি কিন্তু নিছক ভূপর্যটক নন, বিশেষজ্ঞ নৃতত্ত্ববিদ। তাঁর যে লেখাপড়া আছে, বিশেষ জীবনদর্শন, সুনির্দিষ্ট ডিসিপ্লিন; ছন্নছাড়া জীবন নয় তাঁর, পরাশ্রয়ী জীব নন তিনি, তিনি সেল্ফ-মেড ম্যান — এ বিষয়ে তিনি সচেতন ও তা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতেও তিনি দ্বিধা করেন না।

কিন্তু সমস্যাটা এইখানে যে, তিনি যদি নিজেকে পেশাদার নৃতত্ত্ববিদ-ই ভাবতেন যিনি দুর্গম আদিবাসী সমাজে গিয়ে গবেষণাব উপকরণ যোগাড় করেন তাহলে অসুবিধা ছিল না। পরিবর্তে তিনি নিজেকে আধুনিক জীবন ও সভ্যতা বিষয়ে এক ভাষ্যকার রূপেও ভাবেন। আর তাঁর সেই সংলাপপ্রবণ ভাষ্যে তিনি সভ্যতা সম্পর্কে রায় দেন, রায় দেন moral gurdian-এর মতো।

গল্পে নায়ক মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘবকুনো কূপমন্ডুক জীবনের বিরোধিতা করেছিলেন। ছবিতে তিনি আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা ও অসভ্যতার বিরুদ্ধে ভাষণ দেন। তাঁর বিভিন্ন বিবৃতির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় তাঁর সার্বিক রায় এই তথাকথিত সভ্যতার বিরুদ্ধে।

তাঁর এই বক্তব্য ছবিতে ঘুরে-ঘুরে আসে সুসঙ্গত ও পরিশীলিত ভাবে, যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে। তিনি যখন সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণের কথা বলেন, আদিবাসী সমাজের কথা বলেন, প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের কথা, সুসঙ্গত যুক্তির মাধ্যমে আসে তা।

সঙ্গতির প্রশ্ন ও যুক্তির অনুষঙ্গ নিয়ে কিন্তু জংলিসমাজের কোন মাথাব্যথা নেই। সঙ্গতি রাখা শুধু সভ্য মানুষদেরই দায়। চরিত্রে এই সঙ্গতি ও পরিশীলন আছে বলেই 'আগন্তুক'-এর নায়ক যদি বলেনও যে তিনি নরমাংস খেয়েছেন তাকে কথার কথা, কথার পিঠে কথা বলে ধরাই বাঞ্ছনীয় হবে। সভ্য হয়ে ওঠার প্রয়াস ও অসভ্য আচরণ করার অধিকার — এই দুয়ের মধ্যে যে ফাঁক তা বজায় রাখার চাইতে সভ্য মানুষদের কাছে অসভ্যতাকে justify করার দিকেই তাঁর বেশি লক্ষ্য।

তিনি তাই নন টাইলর বা মরগ্যান-এর মতো নৃতত্ত্ববিদ, লোরেঞ্জ বা ডায়ান

ফসি-র মতা এথনোলজিস্ট, গান্ধী বা লেভি স্ট্রাউস-এর মতো দার্শনিক। সুইচ টিপে পারমাণবিক বোমা ফেলে মানবজীবন ধ্বংস করা মানুষদের চেয়ে নরমাংসভোজী জংলিরা বেশি মানবিক — এই প্রকার একটি generalised বিবৃতিকে দর্শন হিসেবে ভাবার মতো সভ্য, শিক্ষিত, ও আধুনিক তিনি। তিনি সব মিলিয়ে পরিচালকের হাতে তৈরি protagonist।

যেমন জংলিদের সঙ্গতির কোন দায় নেই, তেমনি আদিম প্রকৃতির কোন নান্দনিক দায় নেই। তার বিচিত্র ও অনন্ত শিল্পকর্মের অবাধ প্রকাশ চারদিকে, কিন্তু কোন নান্দনিক দায় তাঁর নেই তাই সে বিনিমুক্ত হয়ে কাজ করে।

পরিচালকের কিন্তু এই সব দায় আছে, সঙ্গতির দায়, নান্দনিকতার দায়, তাই সত্যজিতের 'আগন্তুক' সভ্য দর্শকের জন্য সুসভ্য শিল্পীর পরিশীলিত সৃষ্টিকর্ম, সুবিমল মিশ্র যেমন বলেছিলেন, সমাজেব নিচুতলার মানুষকে নিয়ে লিখলেও আমাদের লেখাগুলি হয়ে উঠছে মধ্যবিত্তদের জন্য মধ্যবিত্তদের দ্বারা তৈরি মধ্যপন্থার সাহিত্য, তেমনি।

এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বুনুয়েল বা পাসোলিনি এই ছবি করলে অসভ্যতা-অসঙ্গতি হতো প্রকৃত মাত্রা ও ভিন্ন তাৎপর্য পেত। বুনুয়েল হয়তো বিনিমুক্ত হয়ে সে কাজ করতে পারতেন।

'আগন্তুক' ছবিতে যে তা ঘটেনি, তার প্রমাণ গল্পে যা ছিল দশ হাজার টাকার পুরস্কার পবিচালকের হাতে তা উইলের লাখ টাকায় রূপান্তরিত। অর্থের মূল্য ও প্রয়োজন তো সভ্য মানুষরাই বোঝে। আর বিভিন্ন টাকার মধ্যকার প্রভেদ — তাও। যেমন সত্যজিৎ রায় বলতেন, তাঁর সংসার নাকি চলতো ছবি তৈরির টাকায় নয়, বই বিক্রির টাকায়, ইত্যাদি।

সত্যজিতের নায়ক, গল্পে ও ছবিতে দু-ক্ষেত্রেই, সঙ্গে করে এনেছেন নানান পয়সা — গ্রীস দেশের পয়সা ঃ লেপ্‌টা, তুর্কীর পয়সা ঃ কুরু, রুমানিয়ার পয়সা ঃ বানি, ইরাকের পয়সা ঃ ফিল ও আরও দশ দেশের দশ রকম পয়সা। পয়সা জমানোও কিন্তু সভ্য ও বিত্তবান মানুষদেরই হবি।

পরিচালকের আর যে ব্যাপারটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে তা হলো ছবিতে খাবারের কথা বার বার এসেছে, নানান খাদ্যের কথা। কিন্তু পেটের খিদের পাশে, নায়কের ভাগ্নি ও ভাগ্নি জামাই দুজনেরই ভর-বয়স ও ভরা স্বাস্থ্য সত্ত্বেও, যৌনক্ষুধার কথা একেবারেই আসেনি। প্রচ্ছন্ন শুচিতা এই। মুক্তপ্রাণ জীবন আমাদের কৌম চেতনার লক্ষণ। সভ্য হয়ে ওঠার প্রয়াস তাকে অবদমিত করে দেয়।

জেন কবিতায় বলা হয়েছে — সাগব-পাখির মাছ ধরা ঃ

কী প্রেরণা,

কী যে বিষণ্ণতা!

এতকাল শিল্পীর কাজ ছিল — শিল্পের সমুদ্র থেকে — সাগর-পাখিদের মতোই মাছ ধরা। আজকাল তা দাঁড়িয়েছে — শিল্পের সমুদ্র থেকে — ডুবুরির মতো রত্ন ও প্রত্ন তুলে আনা। ডুবুরির এই আর্কিটাইপের প্রসঙ্গে বলা যায় সত্যজিৎ রায় হলেন সেই ডুবুরি যাঁর আছে আধুনিক পোশাক, অক্সিজেন মুখোশ, সার্চলাইট ও টেস্টার। আমি যে-ছবির কথা বলছি তার জন্য উপযুক্ত হতেন সেই পরিচালক যাঁর আর্কিটাইফ

নেটিভ ডুবুরি, ডুব দেয়া যার খেলা ও অভ্যাস, তলা থেকে কী তুলে আনলো তা নিয়ে যে মোটেই চিন্তিত নয়।

সত্যজিৎ রায় নন মার্গারেট মীড, 'আগন্তুক' নয় 'লুইজিয়ানা স্টোরি'।

এমনিতে আমাদের এখনকার সিনেমা, বলা যেতে পারে, সমাজতাত্ত্বিক নয়, নৃতাত্ত্বিক। তার কেন্দ্রবিন্দু সমাজ নয়, মানুষ। একজন নৃতত্ত্ববিদকে নায়ক করে (যে ব্যক্তি-মানুষের চেয়ে সমাজের কথাই বেশি করে ভাবে) সত্যজিৎ এই ছবিকে সমাজতাত্ত্বিক করে তুলতে পেরেছেন — এখানেই 'আগন্তুক'-এর মহত্ত্ব।

বিজ্ঞানে আমরা স্থূল ও বৃহৎ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পর সূক্ষ্ম প্রসঙ্গের গবেষণায় সচেষ্ট হয়েছি। সভ্যতার অনুশীলনে হয়েছে ঠিক এর উল্টো, অনুপুঙ্খ থেকে যেতে হচ্ছে সামগ্রিকতায়। আমরা সভ্যতার মধ্যে থেকে, সভ্যতার এক অংশ হয়ে, সমগ্র সভ্যতাকে বিশ্লেণষণ করতে চাইছি।

সুদীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণী ও শেষ-পর্যন্ত মানুষের জন্ম সম্ভব হয়েছিল। আজ বলা হচ্ছে, বিবর্তনের পথে মানুষই হয়তো শেষ কথা নয়, নির্দিষ্ট আকারবিহীন কিন্তু উদ্দীপকের প্রতি সুবেদী সরল প্রোটোপ্লাজম থেকে চিন্তাশীল জটিল মনুষ্য-মস্তিষ্ক পর্যন্ত যে এক অবিরাম প্রবাহ, তাতে নাকি মানুষ এক মধ্যবর্তী পর্যায় মাত্র।

আর তা যদি হয়, তাহলে ছবির শেষ দৃশ্যে 'আগন্তুক'-এর নায়ক যখন চলে যাচ্ছেন বিদায় বলে, তিনি এ-কথাও বলতে পারতেন, 'দুই পা গাদে আর আবর্জনায়, এক হাত আগুনে রাখা, আরেক হাত জলে ডোবানো, আর মাথা অনেক উঁচুতে আকাশের মেঘ ছুঁয়েছে, এই ভাবে ধীরে ধীরে আমি হেঁটে চলেছি ভবিষ্যতের দিকে, সামনের পানে আর তা অতীতের দিকে, পেছনের পথেই কিনা কে জানে!'

এ-প্রশ্নের উত্তর হয়তো এখানে আমরা জানতে পারবো না, কিন্তু পরে হয়তো বুঝতে পারবো, যেমন বলা যায়, হয়তো ত্রুফো বা সত্যজিৎ জীবন দিয়ে বুঝেছেন বা যেমন সত্যজিতের শংকু-সিরিজের একটি গল্পের যন্ত্রনায়ক সমাপ্তিতে বলেছিল, মৃত্যুর পরে কী তা আমি জানি — তেমনি।

ছবির কবিতা ঃ টু

সুব্রত রুদ্র

বড়োলোকের ছেলে আর গরীবের ছেলে, এদের দুজনের রেষারেষি, একধরনের আক্রোশ নিয়েই গোটা ছবি।

শুরুটা এভাবে হয়েছে, একদিন সকালবেলা বড়োবাড়ির পোর্টিকো। বড়োলোকের ছেলেটি তার ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে দেখছে। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার মাথায় মিকিমাউস আঁকা টুপি, হাতে কোকাকোলার বোতল। এই হলো বড়োলোকের ছেলেটি।

বাড়ি থেকে একটা গাড়ি ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। গাড়িতে এক মহিলা। ছেলেটিকে হাত নাড়লেন তিনি। ছেলেটিও হাত নাড়ে। গাড়ি চলে যায়।

এবার ছেলেটি কোকাকোলা খায় বড়োদের মদ খাওয়ার ভঙ্গিতে। বারান্দা থেকে এসে রবারের বলে লাথি মারলো। আমরা দেখলুম, তার বাড়ির ড্রইংরুম। গতরাত্রে এখানে কী কোন পার্টি হয়েছিল? অনেক বেলুন। ছেলেটি এসে সোফায় বসে। কোকাকোলাটা খেয়ে ফেলেছে। দেশলাই তুলে কাঠি জ্বালিয়ে বেলুনে আগুন ছুঁয়ে দিল।

উঠে পড়ে। পকেট থেকে চুইংগাম বের ক'রে খায়। অন্য ঘরে ঢোকে। এটা তার নিজের ঘর। ভর্তি খেলনা। মাটিতে প্লাস্টিকের ইটের তৈরি মিনার। ছেলেটি মিনারের মাথায় আর-একটা খেলনার ইট বসিয়ে দেয়। আমরা দেখলুম, ছেলেটিও লক্ষ করলো ঘরের খেলনা — ড্রাম-পেটানো বানর, রোবট, বাঁশিওয়ালা, বেহালাবাজিয়ে—এইসব।

দূর থেকে বাঁশির সুর। ও বাঁশি শুনে তাকিয়েছে, দেখছি। পোড়ো জমি, কুঁড়ে ঘর, দেখছি। এক গরীব ছেলে ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। বড়োলোকের ছেলেটি ওই দৃশ্য দেখেই শেল্ থেকে খেলনা-ক্লারিওনেট নিয়ে এসে বাজায়। গরীব ছেলে চমকে ওঠে। ওমনি বাঁশি বাজানো বন্ধ করে তার নিজের ঘরে চলে যায়। বড়োলোকের ছেলেটি বাজনা বন্ধ ক'রে লক্ষ করে গরীব ছেলেকে।

গরীব ছেলে ঘর থেকে বেরিয়েছে ঢোল নিয়ে। ঢোল বাজতে থাকে। ঘরে চলে যায় বড়োলোকের ছেলে। ফিরে আসে ড্রাম-পেটানো বানর নিয়ে।

গরীব ছেলে ঢোল বাজায়। আমরা চোখে তীর্থ ক'রে ফিরি। বড়োলোকের ছেলে ড্রাম-পেটানো বানরে দম দেয়। সেই ড্রাম বাজছে।

গরীব ছেলে ঘরে দৌড়ে গেল। ফিরে এসেছে মুখে মুখোস পরে। হাতে তার বর্শা নাচছে। তবু বড়োলোকের ছেলেটি দমবার পাত্র নয়। সে ঘরে গিয়ে ফিরে আসে, তারও মুখে মুখোস, তলোয়ার ঘোরাচ্ছে সে। বড়োলোকের ছেলে নানা ভঙ্গিমায় অস্ত্র, মুখোস, আমাদের দেখায়। ভাবখানা, এবার করবে কী?

গরীব ছেলেকে কুঁকড়ে যেতে দেখি। ও সব দেখে ঘরের দিকে ফিরে গেল। বড়োলোকের ছেলে ওর চলে যাওয়ায় বেশ উৎফুল্ল। সে তার শেল্ফের সামনে দাঁড়িয়ে

মুখের চুইংগাম রোবটের কপালে লাগিয়ে দিল। অন্য ঘরে গিয়ে ফ্রিজ থেকে আপেল বের করল। দেখলুম আপেল খাচ্ছে খুশিতে। তার জেতার আনন্দ।

দেখতে পাচ্ছি, ঘুড়ি উড়ছে। গরীব ছেলেটির ঘুড়ি আকাশে। এবার তার হাসির পালা। ঘুড়ি তো উড়ছে। বড়োলোকের ছেলে গুলতি নিয়ে ফিরে এসেছে। গুলতি-ছুঁড়লেও ঘুড়িতে লাগে না। ঘুড়ি উড়ছে। ঘুড়ি উড়ছে। একই আকাশে মুহূর্তে আর এক বিষন্নতা ছুঁয়ে যায়। বড়োলোকের ছেলে এয়ারগান নিয়ে এসেছে। গুলি ছুঁড়েছে, ছিঁড়ে গেল ঘুড়ি।

আবার বাঁশির সুর। এতখানি হারিয়ে দেওয়ার পর বড়োলোকের ছেলে অবাক। বাঁশি বাজছে। একটু-একটু তার রাগ বাড়ছে।

তার খেলনারা হেঁটে যাচ্ছে, খেলনাদের সে গুঁড়িয়ে দেবে। খেলনার ইট সাজানো মিনারকে ভেঙে দেয়। খেলনারা তছনছ হয়ে যায়।

গরীব ছেলের বাঁশি বাজছে।

কবিতা নিজের মাতৃভাষা শুরু করেছিল কয়েক মুহূর্ত এই ছবিতে। এটা মিনিট পনেরোর কবিতা। পনেরো মিনিটের নির্বাক ছবি। সত্যজিৎ রায়ের এধরনের নির্বাক ছবি আর নেই। শুনেছিলুম, তিনদিনে তৈরি করেন এই পনেবো মিনিটের ছবি।

পিকু

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার বয়স হয়েছে। সুতরাং নৈহাটি সিনেমায় 'পিকু' (১৯৮০) এবং 'ফটিকচাঁদ' (১৯৮৩) একসঙ্গে দেখার পথে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারে নি। কোনো অ্যাকাডেমিক দিদিমনি আমাকে বাইরে রেখে 'পিকু' দেখা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন নি। আবার কোনো সাংস্কৃতিক গুরুমহাশয়ও 'পিকু'র ক'ইঞ্চি অপসংস্কৃতি তা আমার মাথায় ঢোকাতে পারেন নি। ফলত, দুটো বই একসঙ্গে দেখে বাঙালি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রায়চৌধুরী পরিবারের পুরুষানুক্রম গড়ে তোলা ইতিহ্যের একটা তাৎপর্য আমার নজরে এল। সে তাৎপর্যটি এই যে, ছোটো ছেলের একটা নিজস্ব অখণ্ড নৈতিক জগৎ আছে। ছোটো ছেলেরা সেটা রক্ষা করতে চায়। জ্যেষ্ঠদের উচিত নয় সেটা ভাঙতে যাওয়া। এটা উপেন্দ্রকিশোর থেকে সন্দীপ রায় পর্যন্ত সমান প্রাবল্যের সঙ্গে বয়ে চলেছে। — অন্তত সন্দীপ রায়ের 'ফটিকচাঁদ' দেখে এ আশ্বাসের কারণ আমার আছে। কিন্তু যদি কেউ এই আপত্তি তোলেন যে, 'পিকু'র এফেক্ট এবং 'ফটিকচাঁদে'র এফেক্ট ভিন্ন ভিন্ন স্বর ও মাত্রার ব্যাপার, তাহলে আমি কথাটা মেনে নিতে পারি- দুখানা বই একসঙ্গে না দেখাই ভালো। 'পিকু'র দমবন্ধ করা টেন্‌শনের পর 'ফটিকচাঁদে'র গড়ের মাঠের মুক্তাঙ্গনও প্রথমের কালো ছায়া মুছে দিতে পারছিল না। বস্তুত 'পিকু' এমনই একখানি শর্ট ফিল্ম যা ছোট্ট তীরের মতোই মর্মভেদী অথচ সংক্ষিপ্ত। কেন যে পিকুর মায়ের প্রসঙ্গে বিমলা বা চারুর কথা উঠছে আমি জানি না। কেন-না 'চারুলতা' চারুকে নিয়ে, 'ঘরে বাইরে' বিমলাকে নিয়ে—কিন্তু 'পিকু' তো পিকুর মাকে নিয়ে নয়, সে গল্প তো আদ্যন্ত পিকুর গল্প। পিকুর বিশ্বাসের জগৎ কোনো প্রচণ্ড ভয়ংকর ভূমিকম্পে ভেঙে খান খান হয়ে গেল, এ ফিল্মে তারই গল্প বলা হয়েছে। সুতরাং পিকুর মাকে অযথা বাংলা সাহিত্যাকাশের দুটি উজ্জ্বল নারী জ্যোতিষ্কের পাশে আমি রাখতে যাব কেন?

কিন্তু এটাও বলি, পিকুকে প্রথম দুটি তিনটি 'শট'-এ দেখে আমার তো 'চারুলতা'র (১৯৬৪) প্রথম দুটো, তিনটে 'শট ' মনে পড়ছিল। চারুলতা যেমন অত বড়ো বাড়িতে, অত উপকরণের মধ্যেও সম্পূর্ণ একলা, পিকুও তেমনি সাজানো-গোছানো আর প্রাচুর্যপুষ্ট ওই বিশাল বাড়িতে একান্ত একলা। বাইনাকুলার দিয়ে চারু একা দেখে পথের দৃশ্য। পিকু দেখে গেটের বাইরের রাস্তা দিয়ে গাড়ি যায়, রিক্সা যায়। চারুর যেমন মন মেলে দেবার কেউ ছিলনা (অমল আসার আগে পর্যন্ত), পিকুরও তেমনি নির্জন দুপুর ভারি এবং দুর্বহ। তবু এরই মধ্যে আমরা লক্ষ না করে পারি না অতটুকু ছোটো ছেলে তার নিজস্ব লজিকে গড়া নৈতিক জগৎ সম্বন্ধে কত সচেতন। রাত্রিবেলায় মা ও বাবার মধ্যে 'ফাইট' হলে সেটা যে একটা সমীচীন ঘটনা নয়, অতটুকু ছোটোছেলে ছোটোছেলের বুদ্ধিতেই সেটা বোঝে। এই ছোট্ট ছেলেটিকে ভালো করে বুঝে নিতে গেলে একটু তলিয়ে বোঝা দরকার তার পারিবারিক পটভূমি। এই স্বাচ্ছন্দ্যে সমৃদ্ধ পরিবারটির বাইরের দিকে

কোথাও কোনো অসংলগ্নতা নেই। কিন্তু ভিতর দিকে এগিয়ে গেলেই দেখা যায়, অধিবাসীরা এক-একটা দ্বীপে বাস করছে। প্রত্যেকটি চরিত্রপাত্র প্রত্যেকের থেকে বিচ্ছিন্ন। পিকুর বাবা বোধ করি তাঁর উচ্চাশা নিয়েই ব্যস্ত। পিকুর দাদু করোনারি রোগে শয্যশায়ী। পিকুর ঠাকুমার ছবিটির দিকে তাকিয়ে পুত্র-পুত্রবধূর সংসারে অবাঞ্ছিত অস্তিত্ব নিয়ে তিনি প্রহর গুনছেন। পিকুর মা তার নিঃসঙ্গ দুপুর হিতেশকাকুকে দিয়ে ভরাট করে নিতে চান। এমন অবস্থায় পিকুর জীবন যতটা স্বাভাবিক হবার ততটাই স্বাভাবিক। একমাত্র আমার পক্ষে বোঝা অসুবিধে হয়েছে হিতেশকাকুকে। ইনি দুপুরবেলায় পিকুদের বাড়ি চলে আসেন। ফোনে তাঁর কথাবার্তা এবং পিকুর মায়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম উক্তিতে মনে হয় ইনি দুপুর কাটানোর একটিমাত্র উপায়ই জানেন। তাঁর দুপুরটা কী করে খালি পড়ে থাকে সেটাও আমি বুঝতে পারি না। আর এই সামান্য শিথিল গাঁথনির জন্য একটি বড়ো অসুবিধে নজরে পড়ে। পিকুর মায়ের ব্যাপারটা পয়েন্টলেস্ প্রতিপন্ন হয়ে গেল। অথচ এখানে বইখানির আর এক ডাইমেন্‌শন পাওয়ার প্রচুর অবকাশ ছিল। পরিচালক অবশ্য বলতে পারেন, সেক্ষেত্রে ফিল্মটির নাম হাওয়া উচিত হত 'পিকুর মা'। কেন না তখনই গল্পখানি হয়ে যেত পিকুর মায়ের গল্প। তখনই, একমাত্র তখনই চারু ও বিমলার তুলনা অনিবার্য হত।

কিন্তু লেখক বলতে চাইছেন পিকুর গল্প। সে তার চারিদিকের একটা শান্ত ছন্দের জগতের প্রত্যাশী। বাবাকে 'টা টা' করতে সে ভোলে না, কুকুরদের চিৎকার সে 'চোপ' বলে থামিয়ে দেয়, দাদুর কাছে গিয়ে সে গল্পগুজব করে, দারোয়ানজীর বিচিত্র স্বাদের দ্বিপ্রাহরিক ভোজন দেখবার জন্য সে ছুটে যায়, হিতেশকাকু এলে অভ্যর্থনায় সে মুখর হয়ে ওঠে। মা যখন তাকে কৌশলে বাগানে পাঠিয়ে দেয় তখন সে রঙের পরে রঙ ঢেলে ছবির পরে ছবি আঁকে। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এ-জগৎ পিকুর জগৎ। কিন্তু পিকুকে উপলক্ষ করেই আমরা আরও কিছু কিছু দেখে ফেলি। মায়ের বয়ফ্রেণ্ডের মাথার চুল বাবার বালিশে, পাওয়া যায়, বাবা কাজে বেরিয়ে যায়, কিন্তু মায়ের সঙ্গে কোনো বিদায় সম্ভাষণ হয় না, হিতেশকাকুকে ফোনে 'এসো' বলবার সময়ে মা সযত্নে আহ্বান এবং হুঁশিয়ারী দুইকেই বুদ্ধির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। শ্বশুরের কাছ থেকে পিকুকে দশটার মধ্যে টেনে নেওয়ায়, 'দরোয়ানের খাবার সময় তাকে জ্বালাতন কোরো না' বলে পিকুকে ঘরে ফিরিয়ে আনায় বোঝা যায় মা প্রস্তুত হচ্ছে হিতেশকাকুর জন্য। মায়ের গম্ভীর মুখ দেখে মনে হয়—ওই কালো চুলটা একটা কালো ছায়া হয়ে মায়ের মনে একটু ভাবান্তর সৃষ্টি করেছে। কিন্তু হিতেশকাকু সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা যত সহজে সেলাইয়ের সুতোটা ছিঁড়ে সরিয়ে রাখে ভাবান্তরের সুতোটাও বুঝি তত সহজেই সারিয়ে রাখে। দ্বিধা ছিল যেন সুতোর মতোই কমজোর—ক্ষীণ। পিকুকে বাগানে পাঠিয়ে মায়ের অস্ফুট কান্না সে জন্যই বড়ো ভূমিকা নিতে পারে না।

শুধু পিকু নয়, পরিচালকও এ ফিল্মে অশান্তির কালো রঙ দিয়ে সাদা ফুল আঁকতে চেয়েছেন—অথচ দুজনের হাতেই রঙ কত অঢেল। সাদা ফুলটা পিকুর মন—জলের ফোঁটা পড়ে ছবি ধেবড়ে যায়—চোখের জলের ফোঁটায়, দাগে পিকুর মনটাও এক্ষুণি সেই রকমই ধেবড়ে চুপসে যাবে। আকাশের মেঘ যেমন সুন্দর বাগানের ওপর ডেকে উঠল, রঙ পাল্টে দিল, দাদুর নিঃসঙ্গ মৃত্যুর ঘটনা পিকুর মনটাকে তেমনি জোর ঝাঁকুনি

দিয়ে পাল্টে দিল। দাদু মরে গেছে বলে পিকুর চোখের জল—সে তো বটে কথাই—তার থেকে বড়ো কথা হল—আগের রাত্রে মা-বাবার ফাইট দেখে ছন্দোপতনে পীড়িত পিকুর সামনে ছন্দের গোটা স্ট্রাকচারটাই ভেঙে পড়ল। দাদু একা একা মরে গেছে একথা বোঝার মতো বয়স তার হয়েছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু পিকুর এই ব্যক্তিগত শোকের মুহূর্তে সে যে ভয়ানক ভাবে একলা— এটা সে বুঝেছে। মায়ের ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতর থেকে মা আর হিতেশকাকুর ঝগড়া শোনা যাচ্ছে। কালরাত্রে সে মা-বাবার ফাইট শুনেছে। তখন যে ইচ্ছেটা তার হয়েছিল কিন্তু উচ্চারণ করতে পারে নি, কুকুরটার চিৎকার শুনে যে ইচ্ছেটা তার গলায় উচ্চারিত হয়েছিল, সেটা অবার শিশুকণ্ঠে সর্বশক্তিতে মুখর হল—'চোপ'। গতকাল রাত্রি থেকেই এই ছেলেটি তার লজিক ধরে জোড় খুলে যাওয়া (Out of joints) সংসারটিকে পুনরায় 'সেট' করতে চেয়েছে। তার শেষ 'চোপ' সেই সক্রোধ সংকল্পের অভিব্যক্তি।

ছোটো ছেলে কি নীতিশাস্ত্র পড়ে বিচার করে ? —নিশ্চয় না। এখানে পিকুও তা করে নি। কিন্তু ছোটো ছেলের একটা শোভন-অশোভন জ্ঞান থাকে। এটাই তার নিজস্ব মর‍্যাল ওয়ার্লড্। এখানটায় ভাঙচুর সে সহ্য করতে পারে না। তার একান্ত মাত্রাজ্ঞানে সে বিচার করে দেখে নিতে চায় কোনটা কতখানি বেমাত্রার ব্যাপার। দাদুর মরে যাবার ধরনটায় যে কোথাও একটা অসঙ্গতি থাকল এটা তাকে ধাক্কা দিয়েছে। ওল্ডম্যানকে নিয়ে আগের রাত্রে মা-বাবার ঝগড়ার ঘটনাটাও তার সঙ্গতি বোধকে পীড়িত করেছে। মা তার শোকার্ত মুহূর্তে তার চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্য তাকে কাছে টেনে নেবার জন্য নেই—এই অসহায় অবস্থায় সে একেবারে একা। মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু মায়ের দুপুরের জগৎ ভেঙে যাচ্ছে—ছেলে বন্ধ দরজা থেকে ডেকে ফিরে গেছে—খুব সাদা বাংলায় মায়ের তখন জাতও গেছে পেটও ভরে নি। এমন অবস্থায় সামনের বেঞ্চে বসে থাকা ছেলের দিকে মা ভালো করে তাকাতে পারে না। ছেলেও বিপুল অভিমানে নিজের জায়গায় বসেই রইল। মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল না। এ এক অদ্ভুত দুপুর। এক দুপুরের মধ্যে আমরা জানলাম, এবাড়িতে বাবা মাকে বিশ্বাস করে না, দাদু মানসিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে মৃত, মায়ের বয়ফ্রেণ্ড মাকে ফেলে রেখে যায় ফ্রাস্‌টেশনের মধ্যে। এক দুপুরেই সমস্তটা হয়ে গেল আর এক নষ্টনীড়। এর প্রতিক্রিয়া কিন্তু আরও মোক্ষম আঘাত হানে। সে বেদনার স্নায়ুকেন্দ্র পিকু। এ আর কেবল মাত্র তিন নরনারীর উপলব্ধির ভুলভ্রান্তির উদ্‌ঘাটন নয়। পিকুর জন্য গোটা ব্যাপারটা একটা সামাজিক নৈতিক তাৎপর্য পায়। একটা সমাজ সমালোচনা, জীবনভাষা—যা যে কোনো বড়ো শিল্পকর্মের লক্ষণ তা এই কুড়ি মিনিটের ছোটো গল্পে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

আমি চলচ্চিত্র সমালোচক নই। আমার যথাশক্তি চলে বেড়ানোর ক্ষেত্র সাহিত্য। ঘটনাচক্রের বিচিত্র সংযোজনের ফলে 'পিকু' এবং 'ফটিকচাঁদ' একসঙ্গে দেখেছি। সেজন্য আমি এই দুই গল্পের লেখকের কথা আলাদা করে ভাবতে পারছি না সেই লেখকের এই দুই গল্পের পৃথক পটভূমি, পৃথক দৃষ্টিকোণ, পৃথক প্রকাশ প্রকরণ পৃথক ভাবেই উপভোগ্য। একসঙ্গে দেখার ফলে একটা কথা বেরিয়ে আসে। ছোটো ছেলের জগৎ মুক্তির জগৎ। সে জগতের সহজ নিঃশ্বাসে সে বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পায়। আমরা বড়োরা নিজদের কৃত্রিমতায়—বিশেষ করে ওপর তলার ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসা

জীবনবৃত্তের নানা আড়ষ্টতায়, তাদেরও সংকীর্ণ করে তুলতে চাই। এটাতে তারা ভীষণ ব্যথা পায়। আর, তাদের নির্বোধ ভাবতে নেই, তারা বড়োদের যাবতীয় অসঙ্গত আচরণের বিচারক। সে বিচারের বুদ্ধি তারা রাখে—একথাটা মনে রাখলে তারা সুখী হয়—আমরা ভগ্নাংশিকতা অতিক্রম করে একটা অখণ্ড মান খুঁজে নেবার মনোযোগ অর্জন করি।

সদগতি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেমচাঁদের দুটি কাহিনী এ পর্যন্ত সত্যজিৎ রায় বেছে নিয়েছেন তাঁর চলচ্চিত্রের জন্য। একটির বিষয়বস্তু ইতিহাস, অন্যটির বিষয়বস্তু ইতিহাসে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। এতে কাহিনীকার হিসেবে প্রেমচাঁদের বিরাটত্ব যেমন বোঝা গেছে, তেমনই আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে যে চলচ্চিত্রস্রষ্টা হিসেবে সত্যজিৎ রায় সব্যসাচী।

কলকাতায় সদ্য অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সময় নানান দেশের ছবি দেখতে দেখতে অকস্মাৎই একদিন সত্যজিৎ রায়ের নতুনতম ছবি 'সদ্গতি' দেখার সুযোগ জুটে যায়। তখন মনে হয়, অন্য সব ছবির নানান কায়দা-কানুন, কথার কচকচি, নগ্নদৃশ্য বা নৃশংসতা—এসব কিছুই কিছু না, নিপুণ ছায়াছবি হলেই শিল্প হয় না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অন্য ছায়াছবির অনেক ঝকমকে দৃশ্যই আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে যায়, কিন্তু 'সদ্গতি' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে।

প্রথমেই বলে রাখি, সার্থক চলচ্চিত্রে যাঁরা কাহিনীর ভূমিকা নগণ্য বা অবান্তর মনে করেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। কাহিনীহীন শিল্প একমাত্র সঙ্গীতই হতে পারে। সার্থক কবিতার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন কাহিনীর সূত্র থাকে, কাহিনীহীন শিল্প হতে গিয়ে সমকালের চিত্রকলা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে। চলচ্চিত্র জগতে যাঁরা মিডিওকার, তাঁরাই শুদ্ধ কাহিনীকে অগ্রাহ্য করে শুদ্ধ আঙ্গিক সৌকর্য নিয়ে বেশী মাতামাতি করেন। কিন্তু চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যে-কয়েকজন পরিচালক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হিসেবে অবিসংবাদিত ভাবে পরিগণিত হয়েছেন, তাঁদের সৃষ্টি সব সময়ই গভীর অনুভূতি-সম্পন্ন কাহিনী নির্ভর। আঙ্গিক ও কাহিনী যেখানে সম্পূর্ণ মিশে যায়, মাঝখানের অ্যালাইমেন্টের চুলের দাগটুকুও বোঝা যায় না, সেই সব সৃষ্টিও বহুকাল মনে থেকে যায়।

যেমন, 'সদ্গতি' দেখার সময় মনেই পড়ে না যে এর মধ্যে সিনেমা শিল্পের কোনো কৌশল আছে। অত্যন্ত সহজ, সরল বর্ণনাভঙ্গিতে শুরু হয় কাহিনী। একটি সাধারণ গ্রীষ্মের সকাল, আলো তখনও প্রখর হয়নি, এ সময় সাধারণ মানুষের গলার আওয়াজ নরম থাকে, এবং ভুরু কুঁকরে যায় না। দুখী চামারের কিশোরী মেয়ে ধানিয়া উঠোন ঝাঁড় দিচ্ছে, আজ তার জীবনের একটি বিশেষ দিন। আজ পণ্ডিতমশাই তাদের বাড়িতে আসবেন, তিনি ধানিয়ার বিয়ের শুভদিন ঠিক করে দেবেন। তার মা ঝুরিয়ার মুখেও খুসিমাখা ব্যস্ততা। পণ্ডিতমশাইয়ের মতন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসা হবে, সেজন্য আলাদা রকম সব ব্যবস্থা করতে হবে তো। একটি নিষ্পাপ লাবণ্যময়ী কিশোরী মেয়ের বিবাহের প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু, এর চেয়ে চমৎকার বিষয় আর কী হতে পারে। যতই গরিব হোক কিংবা ছোট জাত হোক, সেই মুহূর্তে ওরা একটা সুখী পরিবার।

পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে কিছু নজ্রানা নিয়ে যেতে হয়, সেই

জন্য দুখী চামার মাঠে ঘাস কাটছে। এক বোঝা ঘাস সে নিয়ে যাবে। সদ্য সে জ্বর থেকে উঠেছে, শরীর দুর্বল, তা হোক, ঘাস কাটতে তার কোনো আপত্তি নেই, ঘাসকাটাই তার জীবিকা, ও কাজ সে যন্ত্রের মতন পারে।

প্রথম সমস্যা দেখা দেয়, পণ্ডিত এলে বসবেন কোথায় ? ওরা তো অস্পৃশ্য, ওদের বাড়ির কোনো জিনিসে তো তিনি বসবেন না। একমাত্র কৈশোরের সারল্যই এর সহজ উত্তরটি জানে। কেন, মোড়লের কাছ থেকে তাঁর খাটিয়াটা ধার করে আনলে হয় না? তখন সেই কিশোরী মেয়েটিকে এই কঠোর সত্য শিক্ষা দেওয়া হয় যে, খাটিয়া তো দূরের কথা, মোড়ল তাদের এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লাও ধারে দেবে না। বরং মহুয়া গাছেরপাতা ছিঁড়ে এনে একটা টাটকা আসন বানানো হোক। পণ্ডিত এলে তাকে উপঢৌকনও তো দিতে হবে নিয়ম মতন। এক সের আটা, আধ সের চাল, এক পোয়া ডাল, আধ পোয়া ঘি আর নুন আর হলুদ। এ সবও জোগাড় ক'রে রাখতে হবে ঝুরিয়াকে, তবে ঝুরিয়া যেন ওসব নিজে না ছোঁয়, কোনো জল্-চল মহিলাকে অনুরোধ করে, তাকে দিয়ে আনিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। আর রাখতে হবে চার আনা পয়সা। একমাত্র হরিজনদের পয়সাটাই পণ্ডিতেই কাছে অস্পৃশ্য নয়।

সকাল থেকে কিছু খায়নি দুখী চামার, তাতে কী হয়েছে, এই তো এখুনি সে পণ্ডিতকে নিয়ে ফিরে আসবে। তারপর শুভ কাজটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে তারপর সে খাওয়ার অনেকসময় পাবে। ঘাসের বোঝাটি মাথায় করে সে টলমলে পায়ে এগিয়ে যায়।

এ পর্যন্ত কোনো অশুভ ইঙ্গিত নেই। পণ্ডিতকে তোষামোদের ব্যবস্থাপনায় আমরা শহুরে দর্শকরা কিছু বিচলিত হই বটে, কিন্তু দুখী চামার এবং তার স্ত্রী-কন্যা তো এসব স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে। তাদের সাধ্য মতন ব্যবস্থার তো কোনো ত্রুটি রাখেনি। পণ্ডিতের না আসার কোনো কারণ নেই।

দুখী চামারের প্রস্তাব শুনে পণ্ডিত আপত্তিও করলো না। যাবে না কেন, নিশ্চয়ই যাবে। তবে যে-কেউ যখন তখন এসে হুট করে ডাকলেই তখুনি তাকে ছুটে যেতে হবে? তার নিজস্ব সময় আছে। ছাত্র পড়ানো, দুপুরের আহার, দিবা নিদ্রা, তারপর একটু বিশ্রাম,এরপর তো সময় হবে। বাড়িতে বউ ও মেয়ে আগ্রহ করে বসে আছে বলে দুখী চামার ফিরে যেতে চায়না, সে অপেক্ষা করতে চায়, একেবারে পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। অপেক্ষাই যখন করবে সে, ততক্ষণ পণ্ডিতের কিছু কাজ করে দিক না। দাওয়া ঝাঁড় দিক, কুঁড়োর বস্তা বয়ে আনুক, একটা পুরোনো গাছে গুড়ি চিরে চ্যালা কাঠ করে দিক।

পুরো কাহিনীটি আর সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। সকালের সেই নরম ভাবটা কেটে গিয়ে ক্রমশ কঠোর দুপুর আসে, তারপর ম্লান রকমের সন্ধ্যা ও দম-চাপা ধরনের রাত্রি। দুখী চামারের মৃত্যু, তার মৃতদেহ সারানোর সমস্যা ও সমাধান নিয়েই 'সদ্‌গতি'।

আপাতত মনে হয় চলচ্চিত্রকার একটি জীবন কাহিনী নির্লিপ্তভাবে বর্ণনা করে গেছেন। শুধু নির্লিপ্ত নয়, নির্মমও। সত্যজিৎ রায় তাঁর আর কোনো ছবিতে এমন হননি। প্রকৃতির কোনো স্থান নেই এখানে, জীবনের প্রবহমানতার কোনো চিহ্ন নেই। কেউ কেউ বলেন, সত্যজিৎ রায়ের বাস্তবধর্মী ছবিতেও কবিত্বের ভাব বেশী থাকে, আমি

মনে করি সেটাই মহৎ শিল্পীর প্রকৃত লক্ষণ, যেমন টলস্টয়ের উপন্যাস, কিন্তু তিনি কি সেটাকেই অভিযোগ মনে করে এবারে বললেন, তবে দ্যাখো, কী ভাবে শুধু রূঢ় বাস্তবকেই চলচ্চিত্রের ভাষায় উত্তরিত করা যায়।

অন্যান্য সব কাজ সেরে ফেলার পরও তিনি যখন দুখী চামারকে বিশাল প্রাচীন গাছের গুড়িটার সামনে ভোঁতা কুড়ুল হাতে দাঁড় করান, তখন আমরা আঁৎকে উঠে। পণ্ডিতের বাড়ির সামনে রাবণের মুর্তি, কিন্তু ক্যামেরা দিয়ে তিনি কখনো সেটার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আরোপ করাননা। পণ্ডিতের বাড়িতে সব কিছুই ধীরে গতিতে চলে, তার পাশেই দুখী কাঠ চেরার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যায়। সে ঘাস কাটতে জানে, সে কাঠ কাটতে জানে না। সে যে কিছু খায়নি সেটা তীব্র মর্মান্তিক ভাবে মনে করিয়ে দেয়া হয় পণ্ডিত ও তার গৃহিণীর আলোচনায় ঃ ওকে কিছু খেতে দিলে হয় না? কিন্তু ওরা চামার, অনেক না খেলে ওদের পেট ভরে না, একটা-দুটো রুটির বেশী নেই, সুতরাং তা আর ওকে দিয়ে কী হবে? এই ভেবে পণ্ডিত ও গৃহিণী বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে তারপর নিজেরা শুতে যায়। একটা সময় দুখী চামারের কুড়োলে আলো ও ছায়ার সাঙ্ঘাতিক খেলা দেখে শিহরণ জাগে। বোঝা যায়, চলচিত্রের ভাষা কতরকম সময়ে কত বেশী কথা প্রকাশ করতে পারে।

'সদগতি'তে দর্শক হিসেবে একটা মাত্র অসংগতির কথা আমার মনে এসেছে। মাঝ রাতে দুখী চামারের স্ত্রী ঝুরিয়া কোথায় ছিল ? এক সময় মৃত স্বামীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে, তারপর কি সেই মৃতদেহ সেই কুয়োর ধারে ফেলে রেখে সে নিজেই চলে গেল? সাধারণত কেউ জোর করে টেনে তুলে নিয়ে না গেলে, ভারতীয় মেয়েরা তো যেতে চায় না। মূল কাহিনীতেই কি এ প্রসঙ্গ নেই? এক প্রেস কনফারেন্সে সত্যজিৎ রায় বলেছেন যে, এই ছবিতে তিনি কাহিনীকারকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন। হয়তো ঝুরিয়া আর তার মেয়ে আরও কোনো ভয়ানক অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, কিন্তু সেটা অন্য গল্প।

স্মিতা পাতিল ও ওম পুরী কেমন অভিনয় করেছেন সে কথা মনেই পড়ে না। এঁদের দু'জনেরই জোরালো অভিনয় ক্ষমতার অনেক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু বিষয়ের প্রয়োজনে 'সদ্গতি'তে এঁদের অভিনয় আগাগোড়া অতি মসৃণ ভাবে অনাটকীয়। এঁদের দুজনকে তো আমরা চিনি, কিন্তু ঘাসীরাম ব্রাহ্মণের অভিনেতাটিকে আমি অন্তত আগে কোনো ছবিতে দেখিনি। কিন্তু তাঁর বিশ্বাসযোগ্য জীবন্ত অভিনয়কে মনে হয় পরিচালকেরই পুরোপুরি কৃতিত্ব। শিল্প যেন এখানে অনুকরণ করে বাস্তবকে।

'সদ্গতি'র কাহিনী রচিত হয়েছিল কুড়ির দশকের পটভূমিকায়। আজও যে এ ঘটনা কত সত্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছবিতে সত্যজিৎ রায় কোনো উচ্চারিত প্রতিবাদ কিংবা নিজস্ব বক্তব্য রাখেননি। কিন্তু তাঁর পরিষ্কার শিল্প ভাষা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের সংবিধান, গণতন্ত্র নিয়ে চ্যাঁচামেচি এখনও কত অসার ব্যাপার। মানুষই মানুষকে বাঁচতে দেয়না, এই হলো এ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস।

সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ'

কমল সরকার

কবিদের সম্পর্কে অনেকের মনে একটা ভুল ধারণা আছে। কবিরা নাকি বাস্তব জীবনের অনেক উর্দ্ধে থেকে আকাশচারী হয়ে পৃথিবীকে সুন্দর দেখেন আর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেন। এই ধারণার তীব্র প্রতিবাদে একজন মহৎ কবি বলেছিলেন, 'Poets are unacknowledge' legislators of the world.' রবীন্দ্রনাথ নিরলস কর্মকাণ্ডের মধ্যে জাতি গঠনের সম্যক পথের নির্দেশ দিয়ে অন্যায় করা আর সহ্য করার বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রতিবাদ জানিয়ে, উগ্র জাতীয়তার অপদেবতাকে ধিক্কার দিয়ে, সবার উপরে 'মানুষেব প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ', এই সুদৃঢ় ঘোষণার ভেতর দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করেছেন জাতিকে —সত্যজিৎ-সৃষ্ট মানুষ রবীন্দ্রনাথ আমরা ভুলবো না।

এ ছবি নির্মাণে সত্যজিৎ বাবুকে পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে। বৃটিশ ও রাশিয়ান মিউজিয়াম, পুরনো সংবাদপত্রের অংশবিশেষ, রবীন্দ্রনাথ যে সব স্থানে ভ্রমণ করেছেন সেইসব স্থান, কয়েকটি অভিনীত চরিত্র, পুরনো কলকাতার ছবি, রবীন্দ্রনাথের বহুসংখ্যক প্রতিকৃতি ইত্যাদির সুষ্ঠু নির্বাচন শ্রীরায়ের সম্মুখে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথের মত বিচিত্রগামী জীবন মাত্র পাঁচ হাজার ফুট দৈর্ঘ্যর মধ্যে বিধৃত করতে গেলে এই বিপুল উপাদান সাধারণত এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। সত্যজিৎ রায় এই পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ। উপরন্তু সত্যজিৎ বাবু যেন নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন কমেন্টাবী রচনা ও পাঠের ভার নিজে নিয়ে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কণ্ঠস্বর ও সুন্দর উচ্চারণ ভঙ্গি ছবির মুড প্রকাশে অপরিসীম সাহায্য করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন বাংলা কমেন্টারী অনেক স্থানে ছবির ভাবকে সুসংগত ভাব প্রকাশ করতে পারেনি।

সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথকে অর্ঘ্য দিয়েছেন বিশ্বমানবমৈত্রীর পূজারীরূপে। কবির এই বিশ্বমানবতার রূপায়ণে সত্যজিৎ আলোকপাত করেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর রেনসাঁস্ বাংলার সমুজ্জল ঐতিহ্যের ওপর—যে ঐতিহ্যের ধর্মীয়,সামাজিক, সাহিত্যিক প্রকাশের পরাকাষ্ঠা রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রে মধ্যে। একদিকে জাতির মানসিক ক্লেদ আর অনার্যতা, সতীদাহ প্রথা ইত্যদির মধ্যে, অন্যদিকে উপনিষদের 'জ্যোতির্গময়' মন্ত্রে দেশকে উদ্বুদ্ধ করার ব্রতে মনীষীদের নির্ভীক নিরলস সংগ্রামে।

পূর্বসূরীদের এই মহান সংগ্রামী বিচিত্রধারার যুক্তিসংগত পরিণতি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথ বহুতন্ত্রী বীণা। বিভিন্ন তন্ত্রীতে বিচিত্র সুরের ঝঙ্কার—সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ঝঙ্কৃত সে বীণায়। বিদেশী মনীষীর উক্তি Tagore's only fault is that he is too consistently beautiful, আমাদের মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের বিশালতা ও বিচিত্রতা।

রবীন্দ্রনাথের কৈশোর থেকে শুরু করে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত ছবি এঁকেছেন সত্যজিৎ

রায় ক্যামেরার নিপুণ তুলিতে। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কিশোর রবীন্দ্রনাথ, উচ্চাঙ্গ সাংগীতিক পরিবেশে সংগীত শিক্ষা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে পাশ্চাত্য সংগীত শিক্ষা, 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনা ও শান্তিনিকেতনে অভিনয়, সংগীত নৃত্য সাহিত্যের ত্রিবেণী প্রকাশ, পরাধীন জাতির অবমাননায় অন্তর্বেদনা; নৃশংসতায় 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে ভাইসরয়ের কাছে জ্বালাময় পত্র প্রেরণ, রাজনৈতিক সংগ্রাম, একদিকে গান্ধীজী অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে মতান্তর, রোলাঁ, আইনষ্টাইন, ইয়েট্স প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে আত্মিক যোগযোগ, শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচারে পুরোধার ভূমিকা গ্রহণ, পিতৃদেব-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনকে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত করে বিশ্ব মানব মৈত্রীর স্বপ্নের বাস্তব রূপদান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফ্যাসিবাদী বর্বরতায় দুঃসহ মর্মজ্বালা সত্ত্বেও মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অটুট বিশ্বাস—এই বিরাট কর্মমুখর জীবনের চিত্রায়ন হয়েছে এই ছবিতে।

'রবীন্দ্রনাথে'র দুটি সিকোয়েন্স বিশেষভাবে উল্লেখ্য বলে আমার মনে হয় ঃ শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথের ছবি। রবীন্দ্র জীবনের বিশেষ দিক নিয়ে এককেটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্র নির্মিত হতে পারে। তার মধ্যে আবার এই দুটি বিষয়ের পৃথকভাবে চিত্রায়িত হবার দাবি যেন বেশী। শিলাইদহে গ্রামীন বাংলার সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয়— এ পরিচয়ের ফলশ্রুতি বাংলা সাহিত্যের অনুপম সম্পদ ঃ ছিন্নপত্র, গল্পগুচ্ছ ও সোনার তরী। তাই শিলাইদহের গুরুত্ব রবীন্দ্র জীবনে অপরিসীম। মাত্র কয়েকটি শটে শিলাইদহের তথা পল্লীবাংলার যে ছবি আমরা দেখলাম তা অনবদ্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ বর্ষাঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু— তাহার অধিকার ছুটিতে— কর্ম হইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি। রবীন্দ্রনাথের কর্মমুখর জীবনের মাঝে এই অবকাশের জীবন দৃশ্যগীতসুধারসে উপস্থিত আমাদেব সামনে। বর্ষার অনন্যসাধারণ রূপকার প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয় বিশ্বজন সমক্ষে এমন দৃশ্যগীত সুষমায় উপস্থাপনা সত্যজিৎ রায়ের প্রামাণিকতা ওসৌন্দর্যসৃজনক্ষমতার উজ্জল উদাহরণ।

কয়েকমিনিটের অতি সংক্ষিপ্ত সিকোয়েন্সে রবীন্দ্র-চিত্রকলার পরিচয় প্রদান খুব উঁচুদরের মুনসীয়ানার নির্দশন। তুমি কি কেবলই ছবি, শুধ পটে লিখা? রবীন্দ্র চিত্রকলা সম্পর্কে এ জিজ্ঞাসা এখনও রয়েছে এ দেশের বহু প্রাজ্ঞজনের মধ্যে। বিদেশের অনেক চিত্রকরের চিত্রকলার রীতি-প্রকৃতি আমরা জানি বা জানার চেষ্টা করি। কিন্তু বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথের পাশে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ আমাদের অগোচর। কেমন করে কবিতার কাটাকুটির ভেতর দিয়ে এক চিত্রকরের আবির্ভাব হলো, তুলি আর রঙে কী করে অন্তরের গভীর আর্তি আর ভাবনা-ধারণার প্রকাশ ঘটল তার ক্রমবিকাশধর্মী চলচ্চিত্ররূপ সত্যজিৎ রায় দিয়েছেন রবীন্দ্রচিত্র ও রবীন্দ্র সংগীতের সুমধুর ও সুসংগত ঐকতানে। রঙ আর তুলির শিল্পী না হলে এত স্বল্প পরিসরে চিত্রকরের এমন লাবণ্যময় উপস্থাপনা বোধহয় সম্ভব হতো না। রবীন্দ্র চিত্রকলা নিয়ে একটি রঙিনচিত্র সত্যজিৎ রায় আমাদের উপহার দেবেন শুনেছিলাম। এ পরকিল্পনার রূপায়ণের প্রতীক্ষায় থাকবে বাংলার সমস্ত শিল্পরসিক।

প্রামাণিকতা, দৃশ্যসৌন্দর্য ও অর্থময়তায় পুরো ছবিটি অপরূপ। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের চিতাগ্নির সংগে সূর্যের মিক্সিং, জোড়াসাঁকোর বাড়ীর বারান্দায় কিশোর

রবীন্দ্রনাথ, খড়খড়ির ভেতরে দিয়ে বাইরের প্রকৃতির ওপর দুটি চোখের উৎসুক দৃষ্টি, ডালহৌসি পাহাড়ে প্রত্যুষে প্রকৃতির মাঝখানে বালক রবীন্দ্রনাথ, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রচনার পূর্বে সদর স্ট্রীটের বাড়ীতে মিষ্টিক অনুভূতি, শিলাইদহে পদ্মাবক্ষে বর্ষার মনমাতানো রূপ, বাংলার মানচিত্রের পিছনে কার্জনের মুখ, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সিকোয়েন্সে সংবাদপত্রের উপর কম্পমান অগ্নিশিক্ষার সুপার-ইম্‌পোজিশান, মৃত্যুর অল্প কিছুকাল আগে কবির শান্তিনিকেতন ত্যাগ প্রভৃতি দৃশ্য অবিস্মরণীয়।

শব্দ প্রয়োগের অসাধারণত্ব এছবির আর এক সম্পদ। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যালীলার বীভৎসতার ইংগিত দেওয়া হয়েছে ড্রামের অবিরাম ধ্বনির মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনচিত্রে সংগীতের ভূমিকা নিয়ে দুচার কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'গান গেয়ে যে আনন্দ পেয়েছি, সে আর কিছুতে পাইনি। ' এই আনন্দের শিল্প সংগত প্রকাশ হয়েছে এ-ছবিতে। রবীন্দ্রসংগীতের সাহায্যে আবহ-সংগীতের এমন সুমিত ও মনোরম প্রয়োগ আর হয়নি। ডালহৌসি পাহাড়ের দৃশ্যের আবহে এস্রাজের ব্যবহার; 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গান দিয়ে শিলাইদহ সিকোয়েন্‌স্ শুরু করা, 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু'র সাথে দিগন্ত-বিসারী বর্ষার আগমন, নাইট্ উপাধি ত্যাগের সময় 'মোর বীণা আজি কোন্ সুরে ওঠে বাজি', চিত্রকলা সিকোয়েন্‌সে আবহসংগীতের অবনদ্য ব্যবহার ('বেদনা কী ভাষায় রে' গানের সুরেব ব্যবহার স্মরণীয়),'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় উচ্চাঙ্গ রাগ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত, শান্তিনিকেতনে আলো ঝলমল আম্রকাননে ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথের পশ্চাৎপটে 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' সংগীত, কবির স্বকণ্ঠে গাওয়া 'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে'র সাহায্যে হৃদয়বিদারী pathos-এর সৃষ্টি আর সবশেষে উত্তাল সমুদ্রতরংগের সংগে বহুজনকণ্ঠে 'ঐ মহামানব আসে' সংগীতে একদিকে যেমন ছবির আবেদন সুস্পষ্ট ও গভীর হয়েছে অন্য দিকে তেমনি রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ ও ধ্বনিমাধুর্য নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

চলচ্চিত্র যতটা না শিল্প, তার বেশি ব্যবসা। ঘরের খেয়ে চলচ্চিত্র করা যায় না বেশিদিন, যদি না ব্যবসা জমে। চলচ্চিত্র নিয়ে যত বড়ো বড়ো কথাই বলা হোক না, আমাদের দেশে কোনো সংস্থার সাহায্য ছাড়া, ছবি তোলার আগে বা পরে, পরিচালকেরা চলচ্চিত্র বড়ো বেশি করেন না, বিশেষ করে তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে। আর সাহায্য নেওয়া মানেই সেই সংস্থার অধীনতা স্বীকার করা।

এই প্রসঙ্গে, সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' ছবিটি আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে। সেই ছবি তুলিয়েছিলেন ফিল্মস ডিভিশন, রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে। মনে করা যেতে পারে, সত্যজিতের রবীন্দ্রদর্শন সেই ছবিতে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না সরকারি ব্যবস্থাপনায়, রবীন্দ্রনাথের জীবনের সর্বজনস্বীকৃত কিছু তথ্য অবলম্বন করে, রবীন্দ্রনাথের আশি বছরের জীবনকে পঞ্চান্ন মিনিটে ধরার চেষ্টা তাঁকে করতে হয়েছিল। আশি বছরকে পঞ্চান্ন মিনিটে ধরার প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রজীবন থেকে কিছু কিছু মুহূর্ত সত্যজিৎকে নির্বাচন করতে হয়েছিল; সেই নির্বাচনেই সত্যজিৎ যেটুকু স্বাধীনতা নিতে পেরেছিলেন এবং সেই স্বাধীনতাতেই যেটুকু রবীন্দ্রদর্শন সম্ভব, তা প্রকাশ পেয়েছিল। তবে, ছবিটি দেখলে, এটা স্বীকার করা অসম্ভব, যে সত্যজিৎ মন দিয়ে রবীন্দ্রচর্চা করেছেন।

ছবির শুরুতে সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছেন, আক্ষরিক অর্থে। সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি। মিনিট পনেরো বাদে, পঞ্চান্ন মিনিটের ছবিতে, রবীন্দ্রনাথ এসেছেন শিশু রবীন্দ্রনাথের ভূমিকায়। লেখক-রবীন্দ্রনাথ যখন এলেন মিনিট কুড়ির মাথায়, রবীন্দ্রপাঠককে হতভম্ব করে দেওয়ার মতো আসে কয়েকটি তথ্য। তথ্যের পরিবেশন ছবির মাধ্যমে সম্ভব নয়, দরকার ভাষ্যের। আমরা তথ্যচিত্রটির ইংরেজি ভাষ্য থেকে নমুনা দিচ্ছি। ভাষ্যটি ছাপা হয়েছে কলকাতার স্টেটসম্যান দৈনিক পত্রিকার ১৯৮০ সালের রবীন্দ্র জন্ম সংখ্যায়। শুনতে ভুল হতে পারে, পড়তে ভুল হবে না, যদি স্টেটম্যান ছাপাতে ভুল না করে থাকে।

Rabi was 13 when his first book of verse, Kabikahini, came out.

কবিকাহিনী কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স তের নয়, সাড়ে সতেরো। সাড়ে তেরো বছর বয়সে তাঁর কবিতার প্রকাশ অবশ্য হয়েছিল, সেই কবিতাটি ছিল হিন্দুমেলায় উপহার।

In 1901, Rabindranath was 40. His already enormous output of poems and plays had been gathered in one big volume. It comprised 21 books and included Sonar Tari, his first masterpiece.

একটি খণ্ডে কাব্য ও নাটকের সংকলন, যাতে ২১ টি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে,

সেটি কবে, কোথায় প্রকাশিত হলো? সত্যজিৎ ১৯০১-এর আগের কথা বলেছেন, অতএব এটি হবে কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬), কেননা ১৯০১-এর আগে এই একটি সংকলনই বেরিয়েছিল। কিন্তু সত্যজিৎ এই গ্রন্থে ২১ টি পুস্তকের সন্ধান কী ভাবে পেলেন? সংকলনটিতে অবশ্য ২১ টি ভাগ বা পর্যায় ছিল, সেগুলো এই ঃ কৈশোরক, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, বাল্মীকি-প্রতিভা, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, কড়ি ও কোমল, মায়ার খেলা, মানসী, রাজা ও রানী, বিসর্জ্জন, চিত্রাঙ্গদা, সোনার তরী, বিদায় অভিশাপ, চিত্রা, মালিনী, চৈতালি, গান, ব্রহ্মসঙ্গীত, অনুবাদ।

আশঙ্কা হচ্ছে, সত্যজিৎ কৈশোরক-কে একটি পুস্তক ভেবেছেন। কৈশোরক আসলে ছিল, বনফুল, কবিকাহিনী, রুদ্রচণ্ড, ভগ্নহৃদয় এবং শৈশবসঙ্গীত, এই পাঁচটি গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ। তেমনি আশঙ্কা হচ্ছে, সত্যজিৎ গান, ব্রহ্মসঙ্গীত এবং অনুবাদ অংশগুলোও গ্রন্থ বলে গুনে নিয়েছেন।

তাছাড়া এই সংকলনে রবীন্দ্রনাথের সব নাটকও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলা যায় না, কাব্যগ্রন্থাবলীতে শুধু কাব্যগ্রন্থই ছিল, পুরো গদ্যে লেখা নাটকগুলো ছিল না।

In December 1903, was published the decision of the Governor-General, Lord Curzon to split up Bengal into two provinces.

এই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ বঙ্গদেশের মানচিত্র দুবার দেখিয়েছেন। দুঃখের বিষয়, দুবারই ভুল মানচিত্র দেখিয়েছেন তিনি। ১৯০৩ বা ১৯০৫-এ বঙ্গদেশের মধ্যে ছিল পরবর্তীকালে যা পরিচিত হয়েছিল বিহার আর উড়িষ্যা বলে, আর সত্যজিৎ দেখিয়েছন যে বঙ্গদেশ সেটা ১৯৪৭-এর পূর্ববর্তী বঙ্গদেশ, যা থেকে আগেই বিহাব আর উড়িষ্যা বিযুক্ত হয়েছিল। মানচিত্রের প্রসঙ্গটি গুরুত্বপুর্ণ, কেননা সরকারি মতলব যাই থাক না কেন, প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়েছিল, বিহার উড়িষ্যা যুক্ত বঙ্গদেশের ১৮৯,০০০ বর্গমাইল এবং ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ লোক শাসন করা একটি লেফটেনান্ট গভর্নরের পক্ষে সম্ভব নয়।

স্বদেশী আন্দোলন প্রসঙ্গে সত্যজিৎ বলছেন ঃ

While admitting the bravery and partriotism of those who killed or were killed in a reckless bid for freedom, Rabindranath could not condone terrorism. The path of violence was not for India.

এই ভাষ্যের সঙ্গে দেখানো হচ্ছে, হাতের মুঠোয় বোমা। মর্মার্থ, স্বদেশী আন্দোলনের পরিণতি হলো বোমার আন্দোলন, এবং হিংসা বরদাস্ত করতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি থেকে সরে এলেন।

ব্যঞ্জনাটি ভ্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে সরে আসেন ১৯০৬ সালের গোড়াতেই এবং তার সঙ্গে রাজনীতির উগ্রপন্থার কোনো সম্বন্ধ নেই। রুদ্রপন্থা পরিস্কার রূপ নেবে দুবছর পর। বস্তুত, তদানীন্তন কালে, ১৯০৫-৬ সালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই চরমপন্থীরূপে গণ্য হতেন, তবে সেই চরমপন্থা বোমাপন্থা ছিল না।

বঙ্গভঙ্গের পর সত্যজিৎ দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাবর্শ পূর্তি, ইল্যাণ্ড গমন, নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি, বিশ্বভারতীয় উদ্বোধন। তারপর আবার রাজনীতি, এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা, যার details of it filtered through to other parts

of the country and even to the abode of peace.

even ? মনে হবে ১৯০৪-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ পর্যন্ত তাঁর abode of peace-এ সমাহিত ছিলেন, যেখানে রাজনীতির স্পর্শ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি বিষয়ে সত্যজিৎকে ওয়াকিবহাল বলা যাচ্ছে না।

But the Defence of India Act was still in force and no leaders would support him in a plea for a meeting of protest.

আগের মুহূর্তে সত্যজিৎ যেমন রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সম্পর্কে তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ দেন নি, হয়ত অনিচ্ছাকৃতভাবেই, এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তিনি আবার রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাই শেষ কথা বলে মনে করে নিয়েছেন। সেই সময়ে আইনের ভয়ে গান্ধী বা চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সভা করতে রাজি হন নি, এই কথা অবশ্য রবীন্দ্রনাথই বলেছেন। কথাটি যদিও অশ্রদ্ধেয়। জেল বা দ্বীপান্তরের ভয়ে গান্ধী বা চিত্তরঞ্জন সভা করেন নি, এ কথা ইতিহাসের সাক্ষ্য মানে না।

It was also on this last tour that Rabindranath went to Soviet Russia for the first time.

রবীন্দ্রনাথ তাহলে রাশিয়াতে পরেও গেছেন?

এই সমস্ত ত্রুটি অবশ্য তেমন গুরুতর নয়। যেমন গুরুতর নয়, বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে কেবল হিন্দু-মুসলমানের কোলাকুলি দেখানো (যেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার করা। করলে অবশ্য ভালোই হতো, তবে বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথ ' বাঙালী' নিয়ে যতটা ভাবিত ছিলেন, ততটা হিন্দু-মুসলমান নিয়ে ছিলেন না, কেউই না।) তেমনই গুরুতর নয় সত্যজিতের এরকম ভাষ্য ঃ If the plan was to provide the boy with a proper education, it came to nought, for Rabi returned a year later without completing his course of studies at London University (লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিই proper education)-এ কথা শুনলে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ পেতেন নিশ্চয়)। এই ত্রুটিও তেমন গুরুতর নয় : His essays included pieces on European poets like Dante and Petrarch ('ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কেবল দান্তে পেত্রার্কের কথা বলাতে মনে হতে পারে দান্তে পেত্রার্ক রবীন্দ্রকাব্যে কোন বিশেষ ছায়াপাত করেছিল, অথবা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য পাঠে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসুক ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে আগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ কখনই বিখ্যাত হন নি তেমন।)

বরং এই ত্রুটিগুলো চোখেই পড়ে না, কেননা ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে নিউজ রীল থেকে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি ছবি, যে ছবি দেখলে যে কোনো বাঙালি বা রবীন্দ্রানুরাগী বিচলিত হবেন। তার উপরে আছে বেশ কয়েকবার সুপ্রযুক্ত রবীন্দ্রসংগীত। আর সত্যজিৎ মন দিয়ে সাজিয়েছেন বাল্মীকি প্রতিভা এবং মায়ার খেলা কাব্যনাট্যের স্টেজ, রবীন্দ্র সমকালীন স্টেজের আভাস দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি ব্যবহার তাঁর সাহিত্য রচনার বিশালত্বের আভাস দেওয়ার চেষ্টা এবং রবীন্দ্রচিত্রকলার পরিচয়ও বেশ ভালো ফুটে উঠেছে এই তথ্যচিত্রে।

কিন্তু কথা থাকে। ওঠে ছবিটির অগ্রপশ্চাৎ নিয়ে। অত্যন্ত খাপছাড়া লাগে ছবিটির বিন্যাস। কেবলই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করে চলচ্চিত্রকার কিছুই দাঁড় করাতে পারলেন না। খণ্ড খণ্ডই রয়ে গেল রবীন্দ্র জীবন, সূত্রের অভাবে পূর্ণ রূপ পেল না এই বিচিত্র বিশাল মনীষা। তার কারণ, চলচ্চিত্রকার মনস্থির করতে পারেননি, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের কোন্ বা কোন্ কোন্ অংশের উপর বেশি আলোকপাত করা দরকার।

ছবিটির ভূমিকার কথা মনে করা যাক। পঞ্চান্ন মিনিটের ছবিতে পনেরো মিনিটের ভূমিকা অত্যন্ত বিরক্তিকর লাগে, অযথা মূল্যবান সময় অপচয় করা হচ্ছে বলে। কাঁচা পরিচালকেরাই এত সময় নেন establishing shots-এর জন্য। অথবা দ্বিধান্বিত পরিচালকেরা।

Founded in 1690 by an Englishman named Job Charnock - রবীন্দ্রনাথের জীবনের গল্প বলার সময় একেবারে জোব চার্নক দিয়ে শুরু? এ গল্পের কি তাহলে কোনদিন শেষ হবে? Calcutta, one hundered years ago, was a thriving metropolis বলার পর দেখানো চলতে থাকে পুরনো কলকাতার নানান ছবি। এই পর্যায়টি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠত যদি আমরা ভাবতে পারতাম রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল কলকাতা শহর। যেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে পরে হিমালয়ের কোলে দেবেন্দ্রনাথ এবং শিশু রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে উপনিষদের আবহ। কলকাতার ছবির পরে আসে কানৌজের ব্রাহ্মণদের কথা, যাঁরা অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে এসে বসবাস শুরু করেন। তার পর পঞ্চানন। তার পর নীলমণি। যে সত্যজিৎ পরিমিতিবোধের জন্য বিখ্যাত, সেই সত্যজিৎ যে ধান ভানতে শিবের এত গীত গাইবেন আশঙ্কা করা যায় নি। এই সবে শুরু। তারপর দ্বারকানাথ। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল রানী ভিক্টোরিয়ার, মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের, মনীষী ম্যাক্সমুলারের, ঔপন্যাসিক থ্যাকারে, ডিকেন্সের। তারপর দেবেন্দ্রনাথ। এবার দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকায় একজনের অভিনয়। শ্মশানঘাট। নদীতীর। ঘোড়ার গাড়ি। লক, হিউম, বেন্থাম। সংস্কৃত, মহাভারত পুঁথির ছেঁড়া পাতা উড়ে আসে বাতাসে। এবার গল্প পিছন ফেরে রামমোহনের দিকে। দর্শকের এমন সময় মনে হতেই পারে Documentary time is short, Rabindranath's life is long। সত্যজিৎ কখন রবীন্দ্রনাথে পৌঁছবেন। পঞ্চান্ন মিনিটের পনেরো মিনিট পার। আগে কহ আর। কিন্তু না, এর পরেও আসবে দীর্ঘ বংশলতিকা। তাতে সত্যজিৎ না বলে থাকতে পারলেন না, রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে সারাদামণির বয়স তেত্রিশ.....

অবশেষে রবীন্দ্রনাথ এলেন। শিশু রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বিশাল বাড়ির জানালায়, বারান্দায়। স্কুলে পড়ান চলছে, শিশু রবির দৃষ্টি আকাশে, ব্যাকগ্রাউণ্ডে 'আমি সুদূরের পিয়াসী'। আশঙ্কা হয়, এবার বুঝি দেখান হবে, আকাশে এই মেঘ, এই রৌদ্র, ধানের ক্ষেতে ছুটোছুটি খেলা, নিদেন পক্ষে গাঁয়ের রাঙা মাটি, দুহাত তুলে নাচতে নাচতে চলবে বৈরাগী , মধ্যে মধ্যে এক হাত নামিয়ে একতারা, ব্যাকগ্রাউণ্ডে যথোপযুক্ত রবীন্দ্রসংগীত।

তথ্যচিত্রটির অগ্রভাগ যে-বিলম্বিত লয়ে এগিয়েছে তার কারণ যেমন অনুধাবন করা কষ্ট, পশ্চাৎভাগটিও তেমনি অস্বস্তিকর। রবীন্দ্রনাথের আশি বছর পূর্ণ হয়েছে এবং

জগতের কাছে তাঁর শেষ বাণী ঃ সভ্যতার সংকট।

It Concerned itself with the state of so—called modern civilization, a civilization that was being shaken to its very roots by barbaric wars of aggression.

সত্যজিৎ এই কথা বলবার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দৃশ্যাবলী দেখিয়েছেন দীর্ঘ দু'তিন মিনিট ধরে। তারপর আবার 'সভ্যতার সংকট'-এর অনুবর্তন।

'সভ্যতার সংকট' রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দলিল, এই কারণে যে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে কবুল করেছেন যে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তিনি চিরকাল যা বলে এসেছেন তা সবই ভ্রান্ত। 'সাম্রাজ্যমদমত্ত' ইংরেজ এবং তার মতই আরও কয়েকটি ইউরোপীয় সভ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, 'যুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল।' এটাই রবীন্দ্রনাথের কাছে 'সভ্যতার সংকট'। এই প্রসঙ্গেই হঠাৎ এসেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। 'সভ্যতার সংকট' রবীন্দ্রনাথের কাছে ঘটেছে ভারতীয়দের এবং প্রাচ্যজাতির প্রতি ইংরেজদের বিশ্বাঘাতকতার জন্য। সত্যজিতের ছবির পরিণতি দেখে মনে হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে সেই অর্থে নাড়া দেয় নি এবং রবীন্দ্রনাথ উদ্‌ভ্রান্ত ক্ষুব্ধ তিক্তভাবে (যেভাবে ছবিতে দেখানে হয়েছে, দুহাত তুলে তিরস্কার করার ভঙ্গিতে) সভ্য দেশগুলোকে অভিশাপ দেন নি। রবীন্দ্রনাথ মিত্রশক্তির পক্ষেই ছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়ই চেয়েছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উপলক্ষ করে সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তিরস্কার করার কথা ওঠে না। তার চেয়েও বড়ো কথা, 'সভ্যতার সংকটে'র মূল বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ জাতিতে বিশ্বাস হারানো। সেখানে মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে একেবারে প্রক্ষিপ্তভাবে। সত্যজিৎ সেই রচনাটিকেই অবলম্বন করে হঠাৎ মহাযুদ্ধের দৃশ্যবলীর অবতারণা করলেন কেন, বোঝা দুষ্কর। তার চেয়েও বড়ো কথা, এই প্রসঙ্গের উপর ছবিটি শেষ করার অর্থ, রাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় এই ধারনাটি জন্মিয়ে দেওয়া। আপত্তি নেই, যদিও রাজনীতিতে উৎসুক কিন্তু রাজনীতি চর্চা করার ধৈর্য স্থৈর্য এবং চরিত্র রবীন্দ্রনাথের কখনই ছিল না বলে বারেবারে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক পটভূমি থেকে পালিয়ে এসে বলেছেন, আমি কবি, রাজনীতিক নই। আপত্তি থাকত না, যদি রাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই সত্যজিৎ ছবিটি সাজাতেন। ছবিটির বেশ বড়ো বড়ো অংশগুলো অবশ্য রাজনীতি অবলম্বন করেই ; বঙ্গভঙ্গ, জালিয়ানওয়ালাবাগ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তবে সন্দেহ থেকে যায়, রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে, রাজনীতির দৃশ্যাবলী সাজানো সহজ বলে, রাজনীতিই সত্যজিতের উপজীব্য বলে নয়। রাজনীতি উপজীব্য হলে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির মূল প্রসঙ্গগুলো, আত্মশক্তি এবং রাষ্ট্রশক্তি বিষয়ে, দেশপ্রেম এবং আন্তর্জাতিকতা বিষয়ে, হিংসা এবং অহিংসা বিষয়ে তাঁর বিপিনচন্দ্র পাল থেকে শুরু করে গান্ধী পর্যন্ত যাবতীয় দেশনেতার সঙ্গে মতবিরোধ বিষয়ে, তাঁর ইংরেজশাসনের অনুকূলে বক্তব্য থেকে 'সভ্যতার সংকটে' পৌঁছনোর কাহিনী তাহলে বলা দরকার ছিল। কিন্তু সত্যজিতের ছবিতে দেখা গেল রাজনীতি এসেছে আচমকা, দমকা হাওয়ার মতো।

রাজনীতি বিষয়ে সত্যজিতের সত্যসত্যই কৌতূহল থাকলে তাঁর পক্ষে বলা মুশকিল হতো ১৯১৯ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত যখন রবীন্দ্রনাথ দেশভ্রমণ করছেন তখন the West as much as the East welcomed him with open arms। ইংল্যান্ডে, আমেরিকায়, জাপানে, চীনেও? তাহলে আর এই সময়ে ইংল্যান্ড-আমেরিকার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপের আশ্রয় নিতে হতো না।

রবীন্দ্রনাথের উপর যদি একটি ছবি করতে হয়, তাহলে অবশ্য রাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথের উপর জোর দেওয়া চলে না। কোন্ রবীন্দনাথের উপর দেওয়া চলে, সেটা অবশ্য সমস্যা। ছবিটিতে আইনস্টাইন তাঁব সামান্য পরিচয়ে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সহস্র সত্তার কথা। তবে সত্যজিতের ছবিতে রবীন্দ্রনাথের যে অংশটি উপেক্ষিত হয়েছে তা হলো, রবীন্দনাথের সাহিত্যিক সত্তা। ছবিটিতে রবীন্দ্রনাথের গান ছিল, ছবি ছিল, নাটক ছিল—থাকবেই, এগুলো সহজেই চিত্তাকর্ষক, দৃশ্য সাজানোও সহজ—উপেক্ষিত যেটা হয়েছে সেটা কবি রবীন্দ্রনাথ।

আর যেটা লক্ষনীয়, সত্যজিৎ এই ছবিতে নিজের কোন মতামত দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। দুয়েক জায়গায় অবশ্য করে ফেলেছেন, তবে খুবই গৌণভাবে। যেমন, একজায়গায় বলেছেন, সোনার তরী রবীন্দ্রনাথের প্রথম মাস্টারপীস। আগেকার মানসী বা পরেকার চিত্রাকে না বলে সোনার তরীকেই তিনি প্রথম মাস্টারপীস বলছেন, এটা শুনতে ভালো লাগে, ভাবতে ভালো লাগে সত্যজিৎ রবীন্দ্রকাব্য বিষয়ে একটা মতামত দিচ্ছেন। আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, The object of Rabindranath's visit to England in 1912 was to study the educational methods of the West and also to acquaint the West with his work at Santiniketen। রবীন্দ্রনাথ যে কেন মাঝে মাঝেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়তেন, তা অবশ্য গবেষণার বিষয়। অনেকেই এ নিয়ে কৌতুক করেছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ তিরস্কার করেছেন, রলাঁ্যা বিরক্ত হয়েছেন, আত্মিয়স্বজন উত্ত্যক্ত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বুঝতেন না, কেন ক্ষণেক্ষণেই ঘরছাড়ার তাগিদ আসত তাঁর। ১৯১২ সালের বিলাত ভ্রমণ বিষয়ে তিনি কখনো বলেছেন, ছুটিতে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ইংল্যান্ড যাচ্ছেন; কখনো বলেছেন শরীর সারানোর জন্য; কখনো বলেছেন, ঘরে মন টিকছে না বলে। ইংল্যান্ড থেকে অবশ্য তিনি দু'তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন শিক্ষা বিষয়ে। সেটাকেই ১৯১২ সালের বিলাতভ্রমনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে সত্যজিৎ স্বীকার করেছেন, এবিষয়ে সত্যজিৎ খুব বিচার বিবেচনা করেছেন, তাও ভাবতে ভালো লাগে। আর পাশ্চাত্ত্যজগতে তিনি শান্তিনিকেতনকে তুলে ধরতে চান ১৯১২ সালে, এটাও সত্যজিৎ জেনে নিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের স্বীকৃতি থেকে মোটামুটি অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে চলচ্চিত্রকার নিষ্ঠাভরে চর্চা করেছেন। দুঃখের কথা, এই ধরনের নমুনা, সত্য হোক, মিথ্যা হোক, গুরুত্বপূর্ণ হোক, অকিঞ্চিৎকর হোক, সত্যজিতের ছবিতে বিরল। চলচ্চিত্র ইতিহাস নয়, শিল্প — সেখানে চলচ্চিত্রকার নিজেকে অনুপস্থিত রাখতে পারবেন না। রবীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে চলচ্চিত্র করার সময়, চলচ্চিত্রকারকে বলতেই হবে, রবীন্দ্রনাথকে তিনি কীভাবে দেখেছেন, negative capability-র প্রশ্ন এখানে আসেই না।

সত্যজিৎ রায়ের নিষিদ্ধ চলচ্চিত্র 'সিকিম'

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়ের 'সিকিম' চলচ্চিত্র থেকে ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন এটা কিছুটা সাম্প্রতিক সংবাদ। এই প্রাসঙ্গিকতায় কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রক সূত্রে কিংবা সংবাদ বা সাময়িকপত্রে কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। একটি দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় কলমে জল না ছুঁয়ে মাছ ধরার সাধু উদাহরণওদেখা যায় এ বিষয়ে। আশঙ্কা হয় সত্যজিৎ রায়ের চিরকালীন অনুপস্থিতির সুযোগ নেবে তাঁর সম্পর্কেই নানা অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির পল্লবগ্রাহিতা, যেটা এই মুহূর্তে ব্যবসায়িকপণ্যের চেহারা নিচ্ছে ক্রমশ। অন্তরীণ ও প্রায়-বিস্মৃত এই সত্যজিৎ-চলচ্চিত্র ঘিরে কিছু তথ্য ও কিছু প্রশ্ন আজ সেই কারণেই উপস্থিত এখানে।

সত্যজিৎ 'সিকিম' নির্মাণ করেন উনিশ শ' একাত্তরে,'প্রতিদ্বন্দ্বী' ও 'সীমাবদ্ধ'-র মাঝের সময়ে। চলচ্চিত্রটার পিছনে এক মার্কিন যুবতীর বিশেষ উদ্যোগ ছিল। সিকিম নিয়ে সত্যজিতের ছবি পর্যটক আকর্ষণে সহায়ক হবে এমন একটা উদগ্রীব আশা হয়তো তিনিপোষণ করেছিলেন । তিনি সিকিমের তৎকালীন রাণী হোপকুক। পর্যটনই একমাত্র বিদেশীমুদ্রা আয়ের পথ ছিল সিকিমের। 'সিকিম' সত্যজিতের দ্বিতীয় তথ্যচিত্র, দ্বিতীয় রঙীন চলচ্চিত্র, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মতো হিমালয়ের আকর্ষণে রঙের আশ্রয়ে ফেরা এখানেও। তবে তথ্যচিত্রের মেজাজমাফিক রঙের পরীক্ষানিরীক্ষা এখানে অনেকটা তন্ময়।

ঘন কুয়াশার মধ্যে একটি রক্তিম সূর্যোদয়— এই ছিল 'সিকিম'-এর শুরু। ওয়াশের ছবির মতো হালকা ছোঁয়ায় টেলিগ্রাফের তারের দুই জলবিন্দু ধরে রাখে প্রথম আলোর প্রকাশ। দূরথেকে রোপওয়েতে সঞ্চারমান ঝুলন্ত ট্রলির যান্ত্রিক শব্দ ভেঙ্গে দেয় ভোরের স্তব্ধতা, জলকণা ঝরে যায়। সত্যজিৎ ক্যামেরা নিয়ে যান অরণ্যের আলো-আঁধারিতে, যেখানে অর্কিডের স্বর্গরাজ্য। বর্ণের সুষম প্রয়োগ ও বিন্যাস বৈচিত্র্যে প্রায় প্রতিটি ফ্রেম রচিত হয় চিত্রকলার লাবণ্যে। পরবর্তী পর্যায়ে রাজপ্রাসাদের গবাক্ষ থেকে দূর তৃণভূমিতে দৃশ্যমান একটি অশ্ব নিয়ে 'ছবির মত' ইল্যুশনও বানিয়ে দেন সত্যজিৎ। কিন্তু, 'ল্যান্ড অ্যান্ড পিপ্‌ল' সিরিজ-এর বিশুদ্ধ ভৌগোলিক সৌন্দর্যচারণ এ-চলচ্চিত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না। 'ছবির মত' সুদৃশ্যাবলী থেকে চলচ্চিত্রকার সরে আসেন সাধারণ মানুষের কাছে। মেহনতী পাহাড়ী মানুষের কৃষ্টি ও কর্মের প্রবাহে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় 'অস্ত্র-নৃত্যে' টাইপেজ মুখগুলির চয়ন ও প্রতিকৃতি প্রস্তুত হয় আঞ্চলিক লোকশিল্পের নানা মুখোশের আদলে। কিন্তু, বুদ্ধের সহজ, অনাড়ম্বর উপাসনাগৃহে গাছ বসানো পন্ড্‌স্ ক্রিমের প্রসাধনী পাত্র সত্যজিতের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এড়িয়ে যায় না। ক্রমশ এই পর্যবেক্ষণ বাস্তবের এক বিশেষ স্তরকে ধরে। স্পন্দনশীল হয়। চলচ্চিত্রটি তৃতীয় পর্যায়ে

রাজপ্রাসাদে চলে আসে। দেখা গেল প্রাসাদের বর্ণাঢ্য কারুকার্যের পটে রাজারাণীর সাদাকালো ছবি। এই দৃষ্টিভঙ্গী রাজা-রাণীর কাছে তেমন সুখপ্রদ হল না। কোন এক রাজকীয় অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সত্যজিৎ প্রাসাদের একটি এলাহী খানাপিনার দৃশ্যকে উপস্থিত করেন। সেখানে অজস্র রাজ অতিথির সমাগম, প্রয়োজনের ঢের অতিরিক্ত খাদ্যবস্তুর অপচয়। অপরিচিত খাবারের পাহাড় জমে প্রাসাদের বাইরে অন্ধকার আস্তাকুড়ে। সত্যজিতের ক্যামেরা সেই অন্ধকারে চলে আসে। যেখানে মাথা নিচু করে চোরের মত নিরন্ন মানুষ খাবার খোঁজে। প্রাসাদের বিলাসের তীক্ষ্ণ বৈপরীত্যে শেষদৃশ্যে শীতের রোদে একপাল বস্তির ছেলের দেখা মেলে রাস্তায়। ছেঁড়া জামা, রুক্ষ চুল, গালে ময়লার ছোপ। হাড়-কাঁপানো ঠান্ডায় শালপাতার চুট্টি ভাগাভাগি করে টানছে। কিন্তু, ওরা সবাই হাসে। চলচ্চিত্রের শুরুতে আমরা একটা সূর্যোদয় দেখেছিলাম। শেষের এই অপরাজিত মুখগুলির প্যানিং-এ কোন্ প্রতিবাদী ভাষা খুঁজেছিলেন সত্যজিৎ?

এই সব দৃশ্য, বলা বাহুল্য, পৃথিবীর কোন দেশেরই রাজবাড়ি বিশেষ পছন্দ করেনা। সিকিমের রাজপুরুষ আপত্তি তুললেন। চলচ্চিত্রের বহু অংশ বাদ দিতে বলা হল, সত্যজিৎ-কৃত ধারাভয্যেরও কিছু বদল চাইলেন চোগিয়াল। সত্যজিৎ এক ইঞ্চি আপস করেননি। শুধু সামান্য কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। ফলে রাজকবলিত 'সিকিম' মালিকানা সূত্রে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। সেখানে চোগিয়ালের নির্দেশে প্রস্তুত হল 'সিকিম'-এর একটি ফরমায়েসি কাটছাঁট সংস্করণ। সত্যজিৎকে দেখানো হয়নি সে ছবি। তবে শুনেছিলেন মূলের আর ষাটভাগ অবশিষ্ট আছে। এই সংস্করণই কী চার বছর পরে নিষিদ্ধ করেন ভারত সরকার? কোন কারণ দর্শানো হয়নি। উনিশশ'পঁচাত্তরে কারণ দর্শানোটা রীতি ছিল না। কিন্তু, এ পর্যন্ত কেন্দ্রের কোন সরকারী মন্ত্রকই 'সিকিম' নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কোন আলোচনার প্রয়োজন মনে করেনি কেন জিজ্ঞাসা সেখানেই। চলচ্চিত্রটিকে হয়তো বাঁচানো যেত। এ চলচ্চিত্রের নেগেটিভ সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এমনএকটা জনশ্রুতিও ছিল রাজতন্ত্রী সিকিমের শেষের দিনগুলিতে। চলচ্চিত্রটির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হল সিকিম ভারতের অঙ্গরাজ্য হবার পরে। পবিত্র কাজটি সেরে ফেলে সরকার আশ্চর্য উদাসীন হয়ে পড়লেন। আর কোন অনুসন্ধানের দরকার হল না। এই ঔদাসিন্যের কারণ কী এমার্জেন্সীর সমকালে 'জন-অরণ্য' চলচ্চিত্রে সত্যজিতের নির্ভীক সত্য উচ্চারণ? দিল্লী থেকে ছুটেআসা শাসকগোষ্ঠীর কিছু নেতা 'জন-অরণ্য' দেখে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু 'জন-অরণ্য' নিষিদ্ধ করার সাহস তৎকালীন সরকারের ছিল না। মেঘ জমে ছিল ক্রমশ। সিকিম চলচ্চিত্রটিকে বিলুপ্ত হতে দেওয়া তারই পরোক্ষ হাসিল কিনা জানা যায় না। তবে কর্তৃপক্ষের যে-বিচারবুদ্ধির নিরিখে 'সিকিম'-এর উপর নিষেধাজ্ঞা আজও বহাল তার উত্তর জানার অধিকার শুধু সারা দেশবাসীর নয়, হয়তো বিশ্ববাসীরও আছে।

'সিকিম'-এর মূল চলচ্চিত্রটি সম্ভবত চিরকালের মত হারিয়ে যাবে। বর্তমান বা আগামী প্রজন্ম জানতে পারবেন না চলচ্চিত্রটির কথা। কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রকও সম্প্রতি স্বীকার করেন যে চলচ্চিত্রটির হাল হদিশ তাঁদের অজানা। আমেরিকার মিউজিয়াম অব মডার্ণ আর্টস বা লন্ডনের ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটার বা য়ুরোপের অন্যত্র 'সিকিম'-এর যে দু' তিনটি প্রিন্ট রক্ষিত আছে তা চোগিয়াল-সংস্করণই হওয়া সম্ভব। রাজনীতির আবর্তে

চলচ্চিত্রের শিল্পসম্পদ বিনষ্ট করে দেবার প্রয়াস নতুন ঘটনা নয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে। আইজেনস্টাইন, কিনুগাসা, বুনুয়েল ও আরো অনেকেই এর শিকার। সত্যজিৎও সামিল হলেন। তবে কোন চলচ্চিত্রকারের শিল্পকর্মকে শৃঙ্খলিত করে তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানের স্বীকৃতি জ্ঞাপনের ঘটনা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ঘটেছে কিনা তা-ও অবশ্য জানা যায় না।

দি ইনার আই

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যজিৎ বাযেব 'ববীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে ববীন্দ্রনাথেব ছবিব অংশে এসেই ধাবাভাষ্যকাব সত্যজিৎ বায় নীবব হযে যান। আসলে আঁকা ছবিব বঙ ওবেখাব বিন্যাসেব যে নিজস্বভাষা আছে, শব্দেব ভাষা এমন কি চলচ্চিত্রেব ভাষাব চিবাচবিত গভীবতাব সঙ্গে তাব প্রভেদ মৌলিক। শিল্পীদেব জীবন বা শিল্পকর্ম নিযে ছবি তুলতে গিযে চিত্র পবিচালকেবা এই কথাটা সব সময মনে বাখেন নি। তাই প্রাযই বর্ণনা বা বিশ্লেষণেব বাহুল্য আঁকা ছবিব স্বকীয আবেদনকে ব্যাহত কবেছে, দৃশ্যগুণকে শব্দভাবে পীড়িত কবেছে, নযতো স্থানু ছবিকে চলমান ক্যামেবাব ক্রিযাকলাপে গতিময কবে তুলে তাব বসকে বিনষ্ট কবেছে। বস্তুত কোন বড় আকাবে ছবিব ডিটেল দেখাতে গিযে প্রথমে খানিকটা দূব থেকে মিড শটে ছবিটি দেখিযে তাবপব ক্যামেবা কাছে এনে প্যানিং-এব বহু প্রচলিত ও প্রায অপবিহার্য পদ্ধতিটিও সম্পূর্ণ নিবপবাধ নয — প্যানিং-এব সমযে বড় বেশি কাছে এসে পড়লে কিংবা গতি অনাবশ্যক দ্রুত হযে পড়লেই আঁকাছবিব নিজস্ব স্থৈর্য ভেঙে যাবাব আশঙ্কা থাকে। শ্রীবায যখন বিনোদবিহাবী মুখোপাধ্যাযকে নিযে তথ্যচিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হন তখন এই আঙ্গিকগত প্রশ্নটিই আবেকবাব মনে এসেছিল। আঁকা ছবিব মূল্য সম্পর্কে অবহিত এবং সক্রিয সত্যজিৎ বায 'ববীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে একবাব উভয শিল্পেই তাঁব সমান আস্থাব পবিচয দিযেছিলেন, উভয শিল্পেব মধ্যে ভাবসাম্য বচনা কবে, উভয শিল্পেবই কুল বাঁচিযে।

বিনোদবিহাবীব জীবন ও শিল্পকর্ম বিষযে বচিত 'দি ইনাব আই' ছবিতে আবো একবাব সেই ঘটনাই ঘটল। শিল্পী বিনোদবিহাবীব জীবনে অন্ধত্ব প্রতিবন্ধক নয, ববং একটা অভিজ্ঞতা — যে অভিজ্ঞতায বঙ ও বেখাব স্মৃতি অন্ধ শিল্পীব চেতনায তীক্ষ্ণতব ফর্ম হযে ওঠে — প্রথম দিকেব সাবলীল বেখাব ধাবা সাম্প্রতিক মিউবালে কিংবা বঙিন কাগজেব কাটআউটে যেন আবো নির্বস্তুক কাঠামো হযে ওঠে। ধাবাভাষ্যে অপবিহার্য তথ্যেব ন্যূনতম বিবৃতিব পবেই নিখিল বন্দ্যোপাধ্যাযেব সেতাব ছবিব একমাত্র ধ্বনি সহযোগ। শান্তিনিকেতনেব পবিবেশে আজকেব বিনোদবিহাবীকে নিযেই ছবিব শুরু। ঘবে একা প্রবেশ কবে অটল আত্মনির্ভবতায নিজেব কাজ কবে নেওযাব মধ্যে যে হিউম্যান ড্রামা আছে, তাবই পবিপূবক সিকোযেন্স পবে—অন্ধ বিনোদবিহাবীব দ্রুত স্কেচিং-এ। বিনোদবিহাবীব বর্তমান শিল্পকর্ম ঐ আত্মনির্ভব জীবনধাবণেবই এক্সটেন্শন। দ্রুত কাটিঙে সত্যজিৎবাবু বাস্তব নিসর্গেব পবপবই বিনোদবিহাবীব আঁকা সেই নিসর্গেবই প্রতিরূপ দেখিযে শিল্পীব প্রথম দিকেব ছবিব প্রেবণা ও বীতিব চবিত্র ধবিয়ে দেন — ছবি যখন চোখে দেখা পবিবেশেব প্রতিফলন, পবিবেশেব বৈচিত্র্যই তাব বৈচিত্র্য — তাই বীবভূম থেকে নেপাল, নৈসর্গিক বৈচিত্র্যেব বিবাট ক্ষেত্র উন্মোচিত কবে। বীবভূমেব গ্রাম, নেপালেব বাস্তা, ছোট ছোট শট, তাবপবই কাট কবে বিনোদবিহাবীব ছবি — গতি

থেকে স্থিতি, বাস্তব থেকে ছবির এই বিবর্তনের একটা ছন্দ আছে।

পূর্ণ অন্ধত্বের অন্ধকার নেমে আসাটা যেন এই ছবির ক্লাইম্যাকস্ — কালো চশমার একটা চোখ ক্লোজ আপ থেকে আরো ক্লোজ করে ফেড আউট করার সহজতম আঙ্গিকেই সত্যজিৎবাবু এই ঘটনাটি প্রতিষ্ঠা করেন। অন্ধ শিল্পীর ছবি আঁকার সিকোয়েন্সটির ক্রিয়েটিভ ড্রামার বাইরেও একটি ইঙ্গিত আছে — ছবি আঁকার রীতিটাই পালটে গেছে, কাগজের আয়তক্ষেত্রের সীমার আন্দাজ নিয়ে রেখার বিন্যাসে — বাইরের দৃশ্যলোকের জায়গায় কাগজের জমিটাই এখন ছবির পরিকল্পনার উৎস — বিনোদবিহারীর নতুন মিউরালেও ঐ একই মানসক্রিয়া, ঐ হাতড়ে হাতড়ে জমির আদল নেওয়া থেকে রেখার ও রিলিফের পরিকল্পনা। সত্যজিৎবাবু সিনেমাকে ব্যবহার করেছেন একজন শিল্পীর স্বকীয় শিল্প কল্পনার সারাৎসার প্রকাশ করার কাজে — এমন সযত্নে ব্যবহার করেছেন যেকথার প্রয়োজন হয়নি এমনকি বিনোদবিহারীর যে কথাগুলি ছবির শেষক্রমে জায়গা নেয় সেগুলি উচ্চারিত হয়নি, ভিজুয়াল হিসেবেই ছবিতে স্থান পেয়েছে, বাণীও ছবিতে পরিণত হয়েছে।

মাত্র কুড়ি মিনিটের এই ছবিটি বিনোদবিহারীর বাল্য ও যৌবনকে দেখিয়েছে কিছু পুরনো স্থিরচিত্র ও অরোরার একটি নির্বাক তথ্যচিত্রের অংশ বিশেষের মাধ্যমে। বাকিটা বিনোদবিহারীর পরিণত শিল্পীজীবন নিয়েই। একজন শিল্পীকে নিতান্ত তথ্যের মাত্রায় উপস্থিত না করে তাঁর শিল্পকর্মের মাত্রায় তাঁকে উপস্থিত করে সত্যজিৎবাবু এই ধরনের তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রেও একটা নতুন মান ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করলেন।

বালা

স্বপন সাহা

১৯৭৬-এ সত্যজিতের চতুর্থ তথ্যচিত্র 'বালা' তৈরি হল। দক্ষিণ ভারতের ধ্রুপদী নৃত্যশৈলী ভারতনাট্যম-এর রূপকার বালা সরস্বতীর লোকশ্রুত নৃত্যভঙ্গি এছবির প্রতিপাদ্য। ফেনিল সমুদ্র সফেন তটবেলায় বালার নৃত্য, মন্দির ও ভাস্কর্যের পরিবেষ্টনে তাঁর ছন্দময়নৃত্যলীলা 'বালা' তথ্যচিত্রে অসাধারণ সব ফ্রেমে নিবদ্ধ। এছবিতে সত্যজিতের ক্যামেরা নিপুন উৎকর্ষের নিদর্শন রেখেছে। বালা সরস্বতীর নৃত্যমুদ্রাকে তুলে ধরতে ক্যামেরার ক্লোজ-আপ শট, সেইসঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের মাধুর্য ছবিতে এমন সূক্ষ্ম রূপটানের মুহূর্ত রচনা করেছে, যা প্রায় অবিশ্বাস্য।

কিন্তু সত্যজিতের 'বালা' মনে হয় যেন অসম্পূর্ণ। গুরুকুল আশ্রিত ভারত নাট্যম এক পুরুষালি ধ্রুপদী ও পরম্পরাগত নৃত্যশৈলী। বালা সরস্বতী শৈশব থেকেই এই নৃত্যধারার অন্যতম গুরু, তাঁর নিজের পিতার স্নেহচ্ছায়ায় আয়ত্ত করেছিলেন ভরতনাট্যম। দক্ষিণ ভারতের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য পরিমন্ডল ও পুরুষ শাসিত সমাজে এটা মেনে নিতে পারেন নি যে, কোনও মেয়ে ভারত নাট্যম নাচবে। বালা সেই প্রথাকে উপেক্ষা করেছেন। এ জন্যে সমাজের রোঁষচক্ষুর আগুনের ফুলকি ঠিকরে পড়েছিল বালার উপরে। যোদ্ধা বালা সমস্ত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে হয়েছিলেন প্রবাদপ্রতিম শিল্পী 'বালা সরস্বতী'।

সত্যজিতের তথ্যচিত্র 'বালা' কিন্তু সেই প্রতিবাদ মুখরা সংগ্রামী বালাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারেনি। আর পারবেই বা কী করে? সত্যজিতের মানস প্রকর্ষ যে লালিত হয়েছে উনিশ শতকের ব্রাহ্মসমাজ নির্ভর লিবারেল হিওম্যানিজম-এর সুতোর টানে। সংঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রতিবাদী রূপ, স্বেদাক্ত দুপুর, দিন বদলের স্বপ্নে আবিষ্ট অধ্যায়, এ সবের কোনওটাই স্পর্শ করেনি বিশপ লেফরয় রোডের স্বেচ্ছাবন্দী সত্যজিতের শিল্পসত্তাকে। হয়তো বা তিনি মানসী 'বালা'-র চাইতেও শিল্প 'বালা'কে বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন......।

সুকুমার রায়

প্রলয় শূর

'আজ্ঞে আমি ছানটান করেই পুঁইশাক চচ্চড়ি আর কুমড়ো ছেঁচ্কি দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েই অমনি বেরিয়েছি, অবিশ্যি আজকে পাঁজিতে কুষ্মান্ড ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিল, কি হলো জানেন? আমার কুমড়োটা পচে যাচ্ছিল কিনা.........।'

অনেকের ধারণা, 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকের এই দৃশ্যটি ছোটদের দিয়েই অভিনয় করানো যেত। আমাদের ধারণা, সেটা মঞ্চে সম্ভব ছিল, যেহেতু এই শিল্পটির নাম সিনেমা, এটি একস্থানে অভিনীত হয়, অন্যস্থানে একটি পর্দার উপর আমরা তা দেখে থাকি, সেজন্যে, মঞ্চ ও পর্দা, দুই মাধ্যমগত ভিন্নতার জন্যেই পবিচালক অভিনয়ের এই অংশে শিশুদের রেখেও প্রধান চরিত্রগুলিতে বয়স্কদের অভিনয় করিয়ে নাটকের মজাটা এনেছেন। গেরুয়া বসনপরা রামরূপী রূপবান সৌমিত্রকে দেখে ও তার সংলাপ শুনে আমাদের হাসি পায়, রামচন্দ্রের এ আর এক চেহারা, আর ঐ চেহারাটা যখন চোখ পাকিয়েছোট্ট একটা শব্দে সুর লাগিয়ে জানতে চায় 'ততঃ কিম্' দূতের গলায় গান শোনা যায়, বীরদর্পে সবে করে কোলহল/মহা আস্ফালনে কাঁপে ধরাতল/তাহাদের রুদ্র দাপটের চোটে/ভয়ে প্রাণ উড়ে পিলে চমকে ওঠে। রাম লক্ষ্মণ জাম্বুবান সুগ্রীব সকলে একসঙ্গে জানতে চায়, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম? এ আমাদের কোনো কল্পনার সঙ্গেই মেলে না, মেলে না বলেই মজাটাও এমন অদ্ভুত মজা। সেই ছবিটা তো অনেকেরই মনে আছে, যেখানে রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজার ওপর উঠে বসল রাজা, সে খাচ্ছে ঠোঙা ভরা বাদামভাজা, 'খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।'

রবার্ট ফ্লাহার্টির Moana -সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে জন গ্রীয়ারসনই প্রথম ডকুমেন্টারি এই শব্দটি ব্যবহার করেন। গ্রীয়বসন মনে করেন, ডকুমেন্টারি হলো বাস্তবের একটা সৃজন ধর্মী রূপায়ণ। পারে লোরেঞ্জ-এর ধারণা, ডকুমেন্টারি হচ্ছে তথ্য ভিত্তিক একটা সত্যিকারের ছবি, যা নাটকীয়। বেসিল রাইট মনে করেন, ডকুমেন্টারি এই ধরণের ছবি ওই ধরণের ছবি এসব বলার কোনো মানে হয়না, but simply a method of approach to public information. রিচার্ড ম্যাক্কান স্পষ্ট করেই বলেছেন ডকুমেন্টারি উপাদানের প্রামাণিকতা নয়, ফলাফলের সত্য, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত পরিচালব যা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন তাই ডকুমেন্টারি। রিচার্ড ম্যাক্কানের কথাটা এইভাবে বুঝলেই হয়তো ঠিক হবে, কোনো ছবি থেকে উদ্ভূত বস্তুটা যদি সত্য হয়, তাহলেই তাকে আমরা ডকুমেন্টারি বলব।

নিউজরীল থেকে শুরু করে দূরদর্শনের সাক্ষাৎকার পর্যন্ত সব কিছুকেই আমরা যে ডকুমেন্টারি বলি, সেটা ভুল করি। ডকুমেন্টারি একটা সৃজনকর্ম। জন গ্রীয়ারসন বলেছেন, চলচ্চিত্রে যাঁরা নূতন কিছুর প্রবর্ত্তন করেছেন তেমন পাঁচজন মহৎ চলচ্চিত্রকারের একজনের নাম রবার্ট ফ্লাহার্টি।

চলচ্চিত্রের শিল্পগুণ নিয়ে এ দেশে প্রথম খাঁটি তথ্যচিত্র, সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ'। কারো কারো ধারণা, 'রবীন্দ্রনাথ' ছবিতে তাঁর বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে সত্যজিৎ অযথা অনেকখানি সময় নষ্ট করেছেন। আমাদের তা মনে হয়না, হয়না তার কারণ, তথ্যচিত্র শুধু আবেগের উপর নির্ভর করে না, করে জ্ঞান ইতিহাস আবেগ ও সত্যসন্ধানের উপর। আসলে পরিচালকের বিশিষ্ট মনোভঙ্গি না চেনার ফলেই এই সব অবান্তর প্রশ্ন দেখা দেয়। আমরা যারা দর্শক তাদেরও বুঝতে হয় পরিচালকের নির্বাচনী ক্ষমতা।

ছোটগল্পকে যেমন ছোট হতে হয় এবং তাতে একটা গল্প থাকত হয়, তথ্যচিত্রেও তেমনি তথ্য থাকতে হয় এবং তাকে চলচ্চিত্র হতে হয়। — আমরা তা 'রবীন্দ্রনাথ', 'ইনার আই' কিম্বা 'বালা'তে দেখেছি। 'সুকুমার রায়' সব দিক থেকেই খাঁটি তথ্যচিত্র, এককথায় চমকপ্রদ। 'রবীন্দ্রনাথ'-এ যেমন সামন্য কিছু অভিনয়ের অংশ ছিল, এখানেও তাই, এর বেশি হলেই ছবিটি আর তথ্যচিত্র থাকেনা, তাই বাদ গেল চলচ্চিত্তচঞ্চরী। অবশ্য 'রবীন্দ্রনাথ' ও এখানকার অভিনয় অংশে কিছুমাত্র যোগ নেই। সেখানে বাল্যকালেও সদর স্ট্রীটের বাড়ির বারান্দায় আমরা যা দেখি, এখানে তেমন কিছু দেখার কথা ভুলেও ভাবিনা। সুকুমারের লেখার মজাটা অভিনয়ে ধরার জন্য দক্ষ অভিনেতারই দরকার হয়, যেমনটি দেখা যায় অনুপের গাওয়া চমৎকার গানের সঙ্গে তপেনের আশ্চর্য অভিনয়ে, উৎপল দত্তের অপূর্ব সংলাপ উচ্চারণে সকলের চেনা প্রিয় এক অভিনেতাকে সিলুটেটে বাখায়। এখানে মঞ্চ সাজাবার কোনো দরকারই পড়েনা। দৃশ্য পরিকল্পনার নানাবিধ কৌশল প্রয়োগর জায়গা এটা নয়। আমরা জানি তাঁর প্রথম ছবিতেই যাত্রা ছিল, অপু অপর্ণা বায়োস্কোপ দেখে ঘোড়ার গাড়িতে ফিরে আসছিল, 'দেবী'তে নাটক ছিল, মণিমালিকার বিদায়ের দিনে দূর থেকে ভেসে আসছিল গ্রামের যাত্রা, 'রবীন্দ্রনাথ'-এ বাল্মীকি প্রতিভা ছিল, 'গুপীগাইনে' ভূতের নাচ ছিল, নরসিঙের ছবিতে হিন্দী সিনেমা ছিল, 'সীমাবদ্ধে' বিজ্ঞাপন চিত্র ছিল, 'নায়কে' ভালোবাসার তুমি কি জানো, অতএব 'সুকুমার রায়' তথ্যচিত্রে পরিচালকের রঙিন তুলি সামান্য আঁচড়ে অনেক কিছু ঘটিয়ে দিত। এ ছবি সেজন্যে তৈরি হতে পারে না। এখানে রামচন্দ্রের মুখে শোনা যায় 'কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি রাবণ ব্যাটা একটি লম্বা তালগাছে চড়ছে। চড়তে চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে — পপাত চ মমার চ আর দূত গান গেয়ে জানায় ঃ আসিছে রাবণ বাজে ঢক্ক ঢোল, মহা ধুমধাম মহা হট্টগোল। বড়রা ছোটদের মতো করেই বলছে, তাই আনন্দ পাচ্ছে ছোটবড় সকলেই। আমাদের যে চোখদুটো ডকুমেন্টারি দেখছে সেই ফ্রেমের মধ্যে মঞ্চটা এখানো ধরানো যায় না।

শব্দ ছন্দ ছবির এক অদ্ভুত অনুভূতি আমাদের নিয়ে আসে এক আশ্চর্য জগতে, বিচিত্র সব প্রাণীর সামনে, ওরাং ওটাং-এর সঙ্গে ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং। কাঠবুড়ো, খুড়োর কল, কুমড়ো পটাশ, ট্যাঁশ গরু, হুঁকোমুখো হ্যাংলা— সুকুমারের আঁকা আরো সব ছবি দিয়ে শুরু হয় ছবিটা, নেপথ্যে শোনা যায়, 'এইসব চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন বাঙালী খুব কমই আছে।' ক্যামেরার দৃষ্টিতে এই নূতনত্ব এনে দেয় তথ্যচিত্রে স্বাদ ও অভিনবত্ব। এ ছবির বেশ খানিকটা জায়গা জুড়েই আছেন উপেন্দ্রকিশোর, থাকারই কথা, লেখায় গানে বিজ্ঞানে আঁকায় সম্পাদনায় ছড়িয়ে আছে তাঁর বহুমুখী

প্রতিভা, উপেন্দ্রকিশোরকে না জানিয়ে সুকুমারের কথা বলা যায় না। এ ছবিতে আছেন অনেকেই, ঐ যে যুগটা, ঐ যে রোমাঞ্চ জাগাবার মতো সময়টা এই মুখগুলো দেখলেই ফিরে আসে ঐ সৃষ্টিসুখের উল্লাস, — সারদারঞ্জন, প্রমদরঞ্জন, মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন, সুখলতা, পুণ্যলতা, শান্তিলতা, সুবিনয়, সুবিমল, সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার, অতুলপ্রসাদ, সুনীতি কুমার, হিরণকুমার, কালিদাস এঁদের সকলের মুখগুলো দেখি আমরা, এঁদের মাঝখানে ছিলেন সুকুমার।

বিখ্যাত কবি ও সমালোচক বলছেন ঃ পূর্বসুরিরা জঙ্গল কেটে সাফ করলেন, তৈরি করলেন পথ, নানা দেশের নানান বীজ ছড়িয়ে দিলেন মাটিতে — আর এমনি করে ঘটিয়ে দিলেন, ফুটিয়ে তুললেন সুকুমার রায়ের সুপরিণত ব্যক্তিস্বরূপ। এই তথ্যচিত্রের পরিচালকও তুলে ধরেছেন পিতৃদেবের কি উৎসাহে, কোন্ পরিবেশে, কোন্ বন্ধু মন্ডলীতে, কোন্ ঐতিহ্যে তৈরি হয়েছে এই বিদগ্ধ মানুষটি, এই প্রতিভাবান লেখকটি, এই কল্পনাপ্রবণ মনটি, এই বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কটি — এরই নাম সুকুমার রায়। পরিচালক জানিয়ে দিলেন ভাষা ব্যবহারে কোথায় অসামান্য তাঁর নৈপুণ্য। ছবিটির আগাগোড়া উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের শৃঙ্খলা।

রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় ডবল অনার্স নিয়ে বি. এস. সি পাশ করার পাঁচ বছর পর ১৯১১ সালে সুকুমার বিলাত যাত্রা করেন। গিয়েছিলেন তিনি মুদ্রণশিল্পে উচ্চ শিক্ষার জন্যে। একবছর পর রবীন্দ্রনাথও লন্ডনে যান, সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদের পান্ডুলিপি, এই সময় বিলাতের 'কোয়েস্ট' পত্রিকায় 'দি স্পিরিট অফ রবীন্দ্রনাথ' নামে সুকুমার একটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভাব সঙ্গে ইংলন্ডের সুধীসমাজ তখনও পরিচিত হয়নি। সুকুমারের লেখাটি এই পরিচয়ের পথ কিছুটা সহজ করে দেয়।

কে প্রথম রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে বিলাতের পরিচয় ঘটান সে নিয়ে তর্ক তুলে কোনো লাভ আছে বলে আমাদের মনে হয় না। এ খবরটা তো রবীন্দ্রনাথের জন্যে দরকার হয় না, রবীন্দ্রনাথের ভক্তমন্ডলীতে যাঁরা ছিলেন সুকুমার বায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম, সুকুমার রায়কে চেনার জন্য অবশ্যই খুব জরুরী এই সংবাদ।

সুকুমারের ননসেন্স ক্লাবের একটা হাতে লেখাপত্রিকা ছিল ৩২। ভাজা। এই তথ্যচিত্রে পরিচালক সুকুমার রায় নামক বিস্ময়কর এক প্রতিভার সব দিকগুলি ছুঁয়েছেন, ছুঁয়েছেন সামান্য সময়ের মধ্যে, খুব সহজ করে। তাঁর আড়াই বছরের বয়সের সময় যে পিতার মৃত্যু, স্বাভাবিক সে পিতার সান্নিধ্য তিনি পাননি, কিন্তু তিনি জানেন কতো বিষয়ে ছিল তাঁর কৌতূহল, সুকুমার কবি ছিলেন, রসিক ছিলেন, চিত্রকর ছিলেন, বিজ্ঞানচেতনাসম্পন্ন একজন আধুনিক মানুষ ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা চেয়েছিলেন, যাঁরা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই', ভোটের মাধ্যমে যারা রবীন্দ্রনাথকে জিতিয়েছিলেন, সেই তরুণ দলেরই একজন সুকুমার। ছোটদের জন্য পদ্যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস 'অতীতের ছবি' নামক রচনায় সুকুমারই লিখেছেন ঃ ফুরাল কি সব হেথায় আসি?/আসিবে না প্রেম জড়তা নাশি/জাগিবেনা প্রাণ ব্যাকুল হয়ে/নব নব বাণী জীবনে লয়ে?/জ্বলিবে না নব সাধনশিখা? নব ইতিহাস হবে না লিখা?'

সন্দেশের জন্য সুকুমারের প্রথম কবিতা 'খিচুড়ি' — হাঁস ছিল সজারু (ব্যাকরণ মানিনা)/ হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানিনা/বক কহে কচ্ছপে—বাহবা কি

ফূর্তি/ অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি। 'রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রিম্বদা দেবী কে লেখেননি সন্দেশে? কিন্তু সন্দেশ প্রকাশের দু বছরের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর পরলোকগমন করেন। ফলে, সন্দেশের সম্পাদনার ভার পড়ে সুকুমারের উপর। শুধু যে চমৎকার সব লেখা ছাপা হয়েছে সন্দেশে তা নয়, মুদ্রণের কাজটা যে শিল্পের কাজ, সন্দেশের প্রতিটি সংখ্যায় তা প্রমাণিত। মুদ্রণের কাজটা জানতেন উপেন্দ্রকিশোর, কাজটা হাতে কলমে শিখে এসেছেন সুকুমার, মুদ্রণের বিদ্যাটা বিদ্যার ভারহয়ে থাকেনি, সন্দেশে তা আলোর দীপ্তি নিয়ে প্রকাশিত। এই তথ্যচিত্রে সন্দেশ পত্রিকা তাই এতখানি গুরুত্ব পায়।

মন্ডা সম্মেলনের নোটিশ কিম্বা আমন্ত্রণলিপিগুলিও পর্দায় উঠে আসে, কারণ এই কবি তাঁর পুস্তকের ভূমিকায় এমন কথাই বলেছেন, যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে রস যাহারা উপভোগ করিতে পারেননা, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।'

আর কোন লেখক বোধহয় নিজের লেখা সম্বন্ধে ঐ 'কারবার' শব্দটা ব্যবহার করেননি। মন্ডা ক্লাবের বিজ্ঞপ্তি সুকুমারের লেখা। একবার সভ্যদের কাছে পোস্টকার্ড এলো ঃ সম্পাদক বেয়াকুব কোথা যে দিয়েছে ডুব/এদিকেতে হায় হায় ক্লাবটি যে যায় যায়/তাই বলি সোমবারে মদ্‌গৃহে গড়পারে/দিলে সবে পদধূলি ক্লাবটিরে টেনে তুলি/রকমারি পুঁথি যত নিজ নিজ রুচি মত/ আনিবেন সাথে সবে কিছু কিছু পাঠ হবে/ করজোড়ে বার বার নিবেদিছে সুকুমার।

ডকুমেন্টারি ছবি তৈবিতে অনেক নতুন টেকনিক এনেছিলেন আলবার্তো কাভালকান্তি।

তরুণ চলচ্চিত্রকারদের তিনি চোদ্দটি উপদেশ দিয়েছিলেন [Alberto Cavalcanti : His advice to Young Producers of Documentary : Film Quartely, 9 (Summer 1995.)] সেই চোদ্দটি উপদেশ থেকে সাতটি আমি এখানে তুলে দিচ্ছি। তুলে দিচ্ছি নবীন পরিচালকের জন্য নয়, ডকুমেন্টারি ছবির দর্শকদের জন্য। কাভালকান্তির ঐ চোদ্দটা নির্দেশের সব কটা আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক না হলেও, আমরা যারা দর্শক আমাদেরও বোধ হয় কয়েকটা কথা মনে রাখার দরকার। কাভালকান্তি বলছেন ঃ

(১) চিত্রনাট্যটাকে অবহেলা করবে না, চিত্রনাট্য লেখা যখন শেষ হয়েছে তোমার ছবিও তখন তৈরি হয়ে গেছে ; তারপর যখন তুমি শুটিং শুরু করো, তুমি আসলে আবার আরম্ভ করো।

(২) যখন শুটিং করছ ভুলে যেও না, প্রতিটি শট্ একটা সিকোয়েন্সের অংশ, প্রতিটি শট্ একটা সমগ্রের অংশ।

(৩) অপ্রযোজনে ক্যামেরা এ্যাংগেল আবিষ্কার করতে যেও না।

(৪) দ্রুত অজস্র কাটিং-এর অপব্যবহার কোরো না।

(৫) প্রচুর পরিমাণে মিউজিক ব্যবহার কোরো না।

(৬) অপটিকাল এফেক্ট এর উপর খুব বেশি নির্ভর কোরো না, কিম্বা সেগুলোকে খুব জটিল করে তুলো না।

(৭) কাহিনীতে অস্পষ্ট থেকো না, একটা সত্যিকারের বিষয়কে বর্ণনা করতে হবে সহজ ও সরল করে, স্বচ্ছ ও স্পষ্ট করে।

এই কথাগুলো মনে রাখলে ডকুমেন্টারি ছবির বাইরের চাকচিক্য বা আড়ম্বর আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে না। অথচ এমনও দেখেছি প্রয়োজনে খুব চড়া মিউজিক-এর দরকারও হচ্ছে, আসলে সবটাই নির্ভর করছে ছবির বিষয়টির উপর। কিছুদিন আগে হো-চি-মিন সম্পর্কে আলভারেজ-এর একটি অসামান্য ডকুমেন্টারি আমরা দেখেছি, হো-চি-মিনের লেখাগুলো কালো কালো অক্ষরে পর্দায় উঠে আসে, পরিচালককে মিউজিক-এর উপরও অনেকখানি নির্ভর করতে হয়।

সত্যজিৎ যখনই তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন তিনি এমন একজন শিল্পীকে বেছে নিয়েছেন যাঁকে তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন ভালোবাসেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার পর্বটা পর্দায় যেভাবে উঠে এসেছিল, সে পদ্ধতি বিনোদবিহারীর ছবি আঁকায় আমরা দেখব না অবশ্য সুকুমারের আঁকা ছবি পর্দায় উঠে আসে আর একভাবে। এই আর একভাবে তথ্যচিত্র সাজাতে হয় তাঁর ছবি থেকে এই শিক্ষাটাই আমরা লাভ করি। প্রতিটি তথ্যচিত্র আমবা দেখি একজন শিল্পী আর একজন মহৎ শিল্পীকে দেখছেন, দেখি তো আমরাও, তা তিনি বিনোদবিহারী কিম্বা সুকুমার যেই হোন না কেন, সত্যজিৎ নিজে দেখেন অন্যকে দেখান। এই দেখানোটাই হোলো শিল্পীর কাজ। দেখাতে যিনি পারেন, তিনিই চিত্রকর, তিনিই কবি, তিনিই চলচ্চিত্রকার।

শুধু চিত্রকর কিম্বা নৃত্যশিল্পীর প্রতিভার বাইরের দিকটা নয়, প্রকাশিত হয় তাঁর অন্তরতম সত্তাটি। পরিচালক নিজে শুধু চমৎকৃত হলেই হয় না, একটি ব্যক্তিত্ব একটি প্রতিভাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করাব মতো পরিচালকের প্রকাশশক্তি থাকার দরকার। এ প্রকাশশক্তিটাই তথ্যচিত্রের চিত্রনাট্য, ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে সবকিছু বাছাই করে সেই মানুষটিকে রূপ দেবার শক্তি, প্রতিভার অন্তস্থল উন্মুক্ত করে তাঁকে ব্যক্ত করা, বাস্তবের চেয়েও আরো সত্য হয়ে ওঠে। পরিচালক এ দুরূহ কাজটি করতে সক্ষম হয়েছেন। সত্যজিৎ জানেন সুকুমারের দুটি দুর্লভ গুণের একটি তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অন্যটি তাঁর অফুরন্ত কল্পনাশক্তি। সুকুমারের একটা খেরোর খাতা ছিল, ফালতু খাতা, হিজিবিজি খাতা, উড়ো খাতা, বাজে খাতা, জাবেদা খাতা এরকম সাতটি নাম পাওয়া যায় ঐ খাতার। পরিচালক এখানে সুকুমারের কবিতার ছন্দ গন্ধ যেমন আনেন, তেমনি তুলে ধরেন তাঁর বিচারবুদ্ধি দীপ্ত আধুনিক মনটি, তাঁর নানা অসম্পূর্ণ পরিকল্পনা, সেই খাঁটি ননসেন্স যা কেবল এক জিনিয়াসই বানাতে পাবে, এই জিনিয়াস সুকুমার রায়। একটি নোটবুকে তাঁর আবিষ্কৃত কয়েকটি মুদ্রণ পদ্ধতির তালিকা রয়েছে।

দুটি আশ্চর্য বই 'আবোলতাবোল' আর 'হ-য-ব-র-ল', একটি আশ্চর্য গল্প 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'। 'হ-য-ব-র-ল'র জগৎ হোলো স্বপ্নের জগৎ। একেবারে খাঁটি বাংলা রচনা, যেন শুধু বাঙালীর জন্যেই লেখা। বয়েস আবার কমবে কি ? তা নয়ত কেবলি বেড়ে চলবে নাকি। কোনদিন দেখব বয়েস বাড়াতে বাড়াতে একেবারে যাট সত্তর আশি পার হয়ে গেছে। শেষটায় বুড়ো হবে মরি আর কি !

অসুস্থ হয়ে পড়েন সুকুমার।

সূর্যাস্তের রঙ লাগা ছবিতে চিত্র ও সংগীত পর্দাজুড়ে কবিতার বিষন্ন রঙ ধরিয়ে

দেয়। ছবিতে যা নেই, তাই আমাদের মনে পড়ে, মনে পড়ে আজব খেলা ঃ ভোরের ছবি মিলিয়ে দিল দিনের আলো জ্বেলে/সাঁঝের আঁকা রঙিন ছবি রাতের কালি ঢেলে/ আবার আঁকে আবার মোছে দিনের পরে দিন/আপন সাথে আপন খেলা চলে বিরামহীন।

খেলা একদিন শেষ হয়ে আসে। ঘনিয়ে আসে ঘুমের ঘোর।

কালাজ্বরে আক্রান্ত সুকুমার। দিন দিন অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে কিন্তু লেখার বিরতি নেই। ছাপা 'আবোলতাবোল' তিনি দেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু শয্যাশায়ী অবস্থায় এ বইয়ের সবই তিনি করে গিয়েছিলেন। বইয়ের তিন রঙা মলাট তিনি করে গিয়েছেন, বইয়ের অঙ্গসজ্জা, পাদপূরক ছড়া, টেল্‌পিসের ছবি, এক কথায় ডামি কপিটা তিনি তৈরি করে গিয়েছিলেন, সবই করা ঐ কঠিন অসুখের মধ্যে।

১৯২৩-এর ১০ ই সেপ্টেম্বর সকালে কলকাতায় ভূমিকম্প হলো। ঐদিনই সুকুমারের মৃত্যু হয়। 'আদিমকালের চাঁদিম হিম/তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ায় ডিম'। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে এই পৃথিবীতে তাঁর দিন ফুরিয়ে এলো, 'আবোলতাবোল'-এর শেষ কবিতায় লিখছেন কবি —

আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে —
নাই বা তাহার অর্থ হোক্
নাইবা বুঝুক বেবাক লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।
ছুটলে কথা থামায় কে ?
আজকে ঠেকায় আমায় কে ?

এ দেশে কোনো তথ্যচিত্রে মৃত্যু আর কখনো এমন করে আমাদের এত কাছে আসেনি। শান্তিনিকেতনে সুকুমার রায়ের মৃত্যু নিয়ে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বেদনাভরা হৃদয়। হল থেকে বেরিয়ে আসার সময় আধুনিক কবির একটা কথা মনে পড়ল,'সোনার খাতায় নতুন একটি নাম উঠলো, নতুন একটি তারা ফুটলো আকাশে ঃ সুকুমার রায়।'

সত্যজিৎ রায় ঃ
তথ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র
সুনেত্রা ঘটক

'সিকিম' ছবিকে একপাশে সরিয়ে রাখলে সত্যজিৎ রায় এ পর্যন্ত আর যে চারটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন তার প্রতিটির কেন্দ্রে আছেন মানুষ। এবং তাঁরা প্রত্যেকেই শিল্পী। এই জীবনীমূলক বা বায়োগ্রাফিকাল তথ্যচিত্রগুলি যথাক্রমে ১৯৬১-তে 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর' (৫৪ মিনিট), ১৯৭২-এ 'দ্য ইনার আই' (২০ মিনিট প্রায়, শিল্পী বিনোদবিহারীকে নিয়ে) , ১৯৭৬-এ 'বালা' (৩৩ মিনিট, নৃত্যশিল্পী বালা সরস্বতীকে নিয়ে) এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৮৭-তে 'সুকুমার রায়' (৩০ মিনিট)। সুতরাং সব মিলিয়ে সত্যজিৎ রায়-নির্মিত তথ্যচিত্রের সংখ্যা পাঁচ। কিন্তু পাঁচ বললেই হয় না। কারণ এখনও হাতে থেকে যায় 'টু' ও 'পিকু'। এ দুটি ছবিতে কাহিনীচিত্রের বিস্তৃতি নেই আবার তথ্যচিত্রের কাহিনীহীন তথ্যনির্ভরতাও এর মূল সুরটিতে ঠাঁই পায়নি। তাহলে এ ছবি দুটির গোত্র কি হবে? চলতি কথায় স্বল্প দৈর্ঘ্যের কাহিনী চিত্রকে বলা হয় 'ছোট ছবি'বা 'শর্ট ফিল্ম'। এই ছবি দুটি তাহলে 'ছোট ছবি'।

ছোট ছবি, কিন্তু কী অর্থে। বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তিতে ও সামাজিক অভিঘাতের নিরিখে 'টু' ও 'পিকু' কি কোন দেড় দু-ঘন্টার কাহিনীচিত্রের তুলনায় কমজোরি। হলোই বা তার সেলুলয়েড শরীর ১৫ ও ২৬ মিনিটের। কাহিনীচিত্রের গরিমা কি কেবল সময় সীমা অনুসারী। সুতরাং 'টু'ও 'পিকু'কে যদি তথ্যচিত্র বলা হয় তাহলেও খুব ভাল হয় না। তথ্যসর্বস্ব না হলেও এ দুটি ছবি নিঃসন্দেহে তথ্যনির্ভর ত'বটেই।

'টু (১৯৬৪)

১৯৬৩/৬৪ নাগাদ আমেরিকান টেলিভিশন 'ওয়ার্ল্ড থিয়েটার' নামে একটি সিরিজ বানাচ্ছিলেন। ভারত থেকে তাঁরা চাইলেন তিন অংশে তৈরি একটি এক ঘন্টার ফিল্ম। প্রথমটি ছিল 'বম্বে লিট্‌ল ব্যালে ট্রুপ'-এর ব্যালে, তৃতীয় অংশটিতে ছিল রবিশংকর কয়েকটি রাগ বাজাচ্ছেন এবং তাকে ব্যাখ্যা করছেন। সেই অংশের পরিচালক রবিন হার্ডি নামে এক ইংরেজ। মধ্যের অংশটির কাহিনী বা বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং পরিচালনার ভার ছিল সত্যজিৎ রায়ের ওপর। রবিন হার্ডি তাঁকে ইংরিজি সংলাপ সহ একটি বাংলা ছোটগল্পের চিত্ররূপ নিতে অনুরোধ করেন। সত্যজিৎ রায় তাঁকে সংলাপহীন একটি ছোটগল্পের কথা বলেন। রবিন হার্ডি এক বাক্যে রাজি হয়ে যান। জন্ম নেয় 'টু' ছবি। সময় সীমা আগেই বলা হয়েছে ১৫ মিনিট। জন্মকাল ১৯৬৪। ওই একই বছরে, এমনকি সত্যজিৎ রায়ের মতেও, তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি 'চারুলতা' নির্মিত।

শৈশব বিষয়ে বা বলা ভাল ছোটদের নিয়ে তোলা ছোটদের জন্য এমন মানের

ছবি সারা পৃথিবীতেই খুব কম হয়েছে বলা যায়। সত্যজিৎ রায় নিজেও বলেছেন ' এ ছবি আমার খুবই পছন্দের।' এবং ছবি যেই দেখেছে তারই ভাল লেগেছে।

'পিকু' (১৯৮০)

এরপর 'পিকু'। ষোল বছর পর আবার একটি 'ছোট ছবি'। তবে সময়সীমা আগের তুলনায় বেশি। ২৬ মিনিট। এ ছবিও টেলিভিশনের জন্য তবে আমেরিকান নয়, ফরাসী টেলিভিশন। ফ্রি-লান্স প্রয়োজক আঁরি ফ্রেইজের উদ্যোগে ছবিটি নির্মিত হয়। শোনা যায়, ফ্রেইজ তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি যা হোক কিছু একটা আমাদের জন্য বানান। যদি আপনার জানালার ওপর ক্যামেরা রেখে পাশে বাড়ির ছবি তুলেও পাঠান আমরা তা গ্রহণ করব।' সেই সময় সত্যজিৎ রায় 'হীরক রাজার দেশে' ছবিটি নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন, চারপাশের নানা ঝামেলায় হয়তো বা খানিকটা বিষণ্ণও ছিলেন। 'পিকু'-ই তাঁব একমাত্র ছবি যেখানে তাঁর নায়ক একটি বছর দশেকের শিশু কিন্তু তার মূল আখ্যান বড়দের নিয়ে এবং ছবিটির মূল স্বাদটি তিক্ততায় ভরা।

মনে রাখতে হবে এর আগে তিনি ছোট বড় মিলিয়ে উনত্রিশটি ছবি করেছেন। এমনকি নারীর বিবাহোত্তর প্রেম নিয়েও (চারুলতা) ছবি করেছেন। কিন্তু দেখানোর গুণে এবং তাঁর বিশ্লেষণী ভঙ্গির প্রসাদে 'পিকু' ছবিতে আধুনিক পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেব প্রেমহীনতা ধরা পড়ে এবং স্ত্রীব অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ককে ব্যাভিচারী আচরণ বলে মনে হয়। এই নির্মমতা এমনকি 'প্রতিদ্বন্দ্বী' কিংবা 'জনঅবণ্য' ছবিতেও লক্ষ্য করা যায় না। পরিচালক সেখানেও অনেক নৈর্ব্যক্তিকভাবে পবিস্থিতির নীতিহীনতাকে তুলে ধরেছেন।

ছোটদের বোঝাব কাজে সত্যজিৎ রায় যে কত মনোযোগী পিকু চরিত্রচিত্রণ তা নতুন করে প্রমাণ করে। 'টু' ছবির আগে 'পথেব পাঁচালী'-তে তিনি গ্রামের দুটি শিশুকে পরম বিশ্বস্ততায় এঁকেছিলেন আমাদেব সামনে। 'সোনার কেল্লা'-র মুকুল ঠিক যে-কোন শিশুর মত নয় তবু তার আচরণ এবং তাকে ঘিবে অন্য শিশুর আচরণ এক মুহূর্তের জন্যেও অবাস্তব ঠেকেনি আমাদের চোখে। কিন্তু এদেব সকলের তুলনায় 'পিকু' ছবিতে পিকুর জগৎ আধুনিক জটিলতায় ভরা। পিকু তবু শিশুই থাকে। তার একার জগৎ, একার খেলা তাকে সর্বকালের এবং পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের শিশুর সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে দেয়। নিজের ছেলেবেলায় সত্যজিৎ রায় নিজে যা করতেন বা বলা ভাল করতে ভালবাসতেন, 'যখন ছোট ছিলাম' গ্রন্থে সত্যজিৎ রায় তা লিখেছেন। সেই সব টুকরো-টাকরা করে তিনি পিকুর অভ্যাসে বা খেয়ালখুশিতে মিশিয়ে দিয়েছেন। সম্ভবত এই প্রথম চলচ্চিত্রে এমন একটি শিশুর ছবি তিনি আঁকলেন যার সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলার টুকরো স্মৃতি মেলানো সম্ভব হোল। কারণ চারপাশ যত যাই হোক পিকুই প্রথম শহুরে, অপেক্ষাকৃত বিত্তবান, পরিবারে বেড়ে ওঠা, স্বাভাবিক ও কল্পনাপ্রবণ একটি শিশু। প্রায় তাঁরই শৈশবের মত তার শৈশব। তফাত এই যে অপুর মত দারিদ্র্যপীড়িত না হলেও পিকুর পরিস্থিতি আধুনিকতার দায় লাঞ্ছিত স্বামী-স্ত্রীর চাপা ঝগড়া, স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে, শিশুর নিঃসঙ্গতা ও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু পিকু ছবিকে একদিকে যেমন নির্মম করেছে তেমনি খেলাচ্ছলে উপস্থিত করেছে অদ্ভুত অমোঘ এবং কাব্যিক

সব দৃশ্য। ভাবা যায়, একটি শিশু তার রঙের বাক্সে সাদা রঙ পায় না বলে পরিবর্তে রঙ হিসেবে বেছে নিচ্ছে কালোকে। কিংবা বৃষ্টির ফোঁটা তার আঁকার-খাতায় আঁকা ফুলের ওপর পড়ে ছবিকে নষ্ট করে দিচ্ছে যখন, তখনই তার মা ও তাঁর বন্ধু হিতেশকাকুর মধ্যে শুরু হচ্ছে ঝগড়া। একদিকে এই যোগাযোগ যেমন শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপিত তেমনই আবার তা চিত্রনাট্যের ঘটনার দাবী মেটানোতেও চমৎকারভাবে ববহৃত। পিকু উঠে আসে বাগান থেকে এবং আবিষ্কার করে মা ও হিতেশকাকু বন্ধ দরজার ওপাশে এবং তাঁরা ঝগড়া করছেন।

তথ্যচিত্র কাকে বলব

তথ্যের দিক থেকে 'টু' ছবির মতই 'পিকু'-ও আমাদের অনেক কিছু জানায়। এমন জানানোর কাজটা কাহিনীচিত্রও করে। বিশেষত সত্যজিৎ রায়ের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিগুলি কাহিনীর নিজস্ব তথ্যের বাইরেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর আমাদের সামনে উপস্থিত করে। যেমন 'পিরিয়ড পিস' হলে সেই বিশেষ সময়ের আসবাবপত্র, খুঁটিনাটি জিনিস, বাচনভঙ্গি, যানবাহন এমনকি সঙ্গীতের ব্যবহার পর্যন্ত কাহিনীর আশপাশ দিয়ে আমাদের 'জানাবোঝা'-র জগতে জায়গা করে নেয়। একই কথা প্রযোজ্য তাঁর সমসাময়িক ছবিগুলি সম্পর্কেও। সাম্প্রতিককালের যে সব 'ইস্যু' তিনি গল্পচ্ছলে এনেছেন এবং সেগুলি স্পষ্ট করে তুলতে যে ধরনের আবহ তিনি ব্যবহার করছেন, তার কোনটাই স্বকপোলকল্পিত নয় বরং বড় বেশি তথ্যশুদ্ধ। কাজেই সেই অর্থে অর্থাৎ বাস্তবের বিশ্বস্ত চিত্রণে তাঁর সব ছবিই তথ্যচিত্রের স্পর্শধন্য।

'তথ্যচিত্র' বলতে তবুও যে-ছবিগুলিকে আলাদা করতেই হয় তাতে কোন তথাকথিত কাহিনীর বাতাবরণ থাকে না। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তথ্যচিত্রেও হয়তো এক ধরনের 'ন্যারেটিভ'-এর সন্ধান মেলে তবে আপাত বিচারে তা মেলে না।

সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্রের বৈশিষ্ট্য

সত্যজিৎ রায়ের পাঁচটি তথ্যচিত্রকে আলাদা কবে নেওয়া গেলে প্রথমেই যে বৃত্তান্ত দিয়ে এ লেখা শুরু করা গিয়েছিল তার রেশ টেনে বলতে হয় 'সিকিম' বাদে আর চারটি ছবিই জীবনীমূলক। এই চারটি ছবির মধ্যে একটি সাধারণ গুণ আছে। আবার সেই একটি সাধারণ গুণই তাঁর কহিনীচিত্রের থেকে তথ্যচিত্রকে চারিত্রিকভাবে পৃথক এক বৃত্তে এনে ফেলেছে।

সাধারণ মানুষকে পেয়েছি, ধনীই হোক আর দরিদ্রই হোক, তাদেরকে অপরিচিত মনে হয়নি। তাদের ভাবনা-চিন্তা, আনন্দ উদ্বেগ সাধারণ মানুষের বলেই মনে হয়েছে। তাঁর তথ্যচিত্রগুলি কিন্তু সব সময়েই 'দূরের মানুষ' নিয়। রবীন্দ্রনাথ ত' বটেই বিনোদবিহারী, বালা, সুকুমার রায় এঁরা সকলেই 'বিশেষ মানুষ'। ফলে বিশেষ তথ্যচিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বিশেষ ব্যক্তিত্বের দ্বারা। তবে কী তথ্যচিত্র কী কাহিনীচিত্র, সব মিলিয়ে তাঁর মোট ৩৬ টি চিত্রকর্ম গম্ভীর মানবতাবোধেরই পরিচয় দেয়। এবং এলিগ্যান্স বা সম্ভ্রান্তির প্রশ্নেও ছবিগুলির সবকটিই যে সত্যজিৎ রায় কৃত তা বলে দিতে হয় না। কোথায় যেন তারা এক হয়ে যায়।

সাম্প্রতিককালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'ভারতীয় সিনেমার আজ চমকদারী দরকার নেই। যা দরকার তা হোল আরও কল্পনা, আরও সংহতি, যে মাধ্যমে কাজটি হচ্ছে সেই মাধ্যমের সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখে আরও বুদ্ধিদীপ্তভাবে তাকে বুঝতে পারা....এবং বিষয়বস্তু ও শৈলীকে চূড়ান্ত রকমের সরল করে ফেলা।' তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বীজমন্ত্র হিসেবে ধরে নেওয়া যায় এই মন্তব্যকে। সেখানেই আরও অনেক মহৎ ব্যক্তিত্বের মত তিনি একা ও অনন্য। তাঁর কাজ ও স্বভাবের 'ক্লাসিসিজম' নিয়ে আমরা একমত হতে দ্বিধা করি না কিন্তু পরিস্থিতি বা ঘটনা পরম্পরাও যে তাঁর ক্ষেত্রে কিভাবে ক্লাসিক হয়ে উঠেছে তাও লক্ষণীয়। 'পথের পাঁচালী' তাঁর জীবনের প্রথম চিত্রকর্ম এবং প্রথম কাহিনীচিত্র 'অথরিটি' দ্বারা স্বীকৃত, তার প্রমাণ ডাঃ বিধানরায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এব্যাপারে গৃহীত ভূমিকা। আবার প্রথম তথ্যচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ' নির্মাণের সময় জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাও লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথ টেগোর (১৯৬১)

১৯৫৫ থেকে ৬০ এই পাঁচ বছরে ছটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি সম্পূর্ণ করার পর ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভারত সরকাররের ফিল্মস ডিভিশন সত্যজিৎ রায়কে রবীন্দ্রনাথের উপর একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ কবার আমন্ত্রণ জানান। যদিও ১৯৫৯-এ যে কমিটি গঠন করা হয় সেখানে একজন বাঙালি কৃতী পরিচালক হিসেবে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হলে,তিনি ঐতিহাসিক নন কাজেই তিনি এ ছবির যোগ্য পরিচালক হতে পারবেন না-এমন অজুহাত তোলেন কোন এক চলচ্চিত্র অনভিজ্ঞ কমিটি সদস্য। অথচ ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায়ের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে প্রতি ফুট ফিল্ম-এর জন্য তিনি কত নেবেন। শ্রীরায় জানিয়েছেন সেই অঙ্ক, পাঁচিশ টাকা। অথচ কমিটি সদস্যের মন্তব্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সব অনিশ্চয়তাব অবসান ঘটে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে। তিনি জানান, 'ঐতিহাসিক দরকার নেই আমাদের। আমাদের দরকার একজন শিল্পীর। সত্যজিৎ রায় তেমনিই একজন শিল্পী। আমার মনে হয় না কোন ঐতিহাসিকের এতে হস্তক্ষেপ করা উচিত।'

নেহরুর দূরদর্শিতা প্রমাণ করার জন্য না হলেও সত্যজিৎ রায়এই ৫৪ মিনিটের তথ্যচিত্রে স্পষ্টত বুঝিয়ে দেন তিনি যথার্থই একজন শিল্পী। এ ছবির ভাষ্যকার, স্বয়ং পরিচালক, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আগাগোড়া এক অদ্ভুত শৈল্পিক নির্লিপ্তি লক্ষ করা যায় এ ছবিতে। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ এবং তার প্রকাশ সাধারণত কোন ঐতিহাসিকের দ্বারা সম্ভব হয় না। ১৯৬১ সালের ৫ মে দিল্লীতে যখন 'রবীন্দ্রনাথ' ছবির প্রিমিয়ার শো হয় সত্যজিৎ রায় সেখানে বলেন, 'তিনটি কাহিনীচিত্র নির্মাণের সমান কাজ করতে হয়েছে আমাকে এ ছবির জন্য। এই জীবনীমূলক ছবিটি নির্মাণে রবীন্দ্রনাথকে একজন মানুষ এবং দেশপ্রেমী হিসেবে দেখানোই আমার লক্ষ্য ছিল।'

আসলে সে ছিল এক দুরূহ কাজ। রবীন্দ্রনাথের উপর তথ্যচিত্র তাঁর শতবার্ষিকীতে তৈরি হচ্ছে এবং তার প্রযোজক আবার ভারত সরকার। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ জাতির

একান্ত সেন্টিমেন্ট এমনকি জাতির সম্পত্তি প্রায়। এ ছাড়াও মনে প্রাণে শিল্পীহওয়ায় একদিকে তাঁর নিভৃতি যেমনভাবে দৃশ্যত ফুটিয়ে তেলা দরকার তেমনিই তিনি আবার অসাধারণ কর্মী হওয়ায়, এক জীবনে তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকর্মের কোন্‌দিকটি তথ্যচিত্রে আসবেএবং কোন্ দিকটি আসবে না, সেও নির্বাচন করা দরকার সঠিকভাবে।

শান্তিনিকেতনে থেকে মাসখানেক গবেষণা করে সত্যজিৎ রায় যা কিছু পেলেন তার সবকিছু স্থিরচিত্রের বিষয়। পাণ্ডুলিপি, বই বিভিন্ন সময়েতোলা বিশেষ ভঙ্গির আলোকচিত্র, এমনকি রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা ছবিও তিনি পেলেন। কিন্তু তাঁর করার কথা একটি 'তথ্যচিত্র', যার গতি থাকতেই হবে। এ কাজে যে তাঁকে যথার্থই সাহায্য করতে পারতো তা হল ফিল্ম-ফুটেজ, যা হয়তো কোন বিশেষ, উপলক্ষ্যে তোলা নিউজ রিলের অংশ বিশেষ। তার সন্ধানও তিনি করলেন কিন্তু বহু আর্কাইভে সন্ধান চালিয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের উপর প্রায় কিছুই পেলেন না। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সামান্য যে-ফুটেজটুকু পান সত্যজিৎ তা তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরের সময়ের। কলকাতার পথ ধরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ হাজার হাজার মানুষের অশ্রুপথ ধরে অন্তিমযাত্রারদিকে চলেছেন। পাঁচটি শট তিনি উদ্ধার করেন এই সময়ের। এবং এই পাঁচটি শটই নির্ধারণ করে 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্র প্রচলিত প্রথা অনুসারে সময়ের প্রথম থেকে শেষের দিকে যাওয়ার ক্রমকে মানবেনা। বরং চলবে উল্টো পথে। অন্তিমযাত্রার দৃশ্যটি দিয়ে ছবি শুরু হয়। 'যেহেতু তাঁর ছবিতে রবীন্দ্রনাথের মানবিকবাদের উপরই জোর পড়েছে, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', বাংলার গ্রামকে আবিষ্কার, জালিয়ানওয়ালাবাদ (এই সিকোয়েন্সে-এ মানসিক উত্তেজনার ও বিক্ষোভের তীব্রতা আরকাইভাল-এর সীমা ভেঙে হঠাৎ বেরিয়ে আসে এক জীবন্ত নাটকীয় পদচারণায়), শান্তিনিকেতনে নতুন শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা এবং 'সভ্যতার সংকট' এই ছবির সবচেয় নাটকীয় পর্ববিন্দু, তাই মৃত্যু থেকে শুরু করে তার পিছনের জীবনে ফিরে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুকে উত্তরণের একটা রূপকও যেন এই ছবির গঠনের অন্তর্গত হয়ে যায়। অথচ এই ধরনের কোন রূপকের মায়ায় সত্যজিৎবাবু আচ্ছন্ন হয়েপড়েন না। বরং বারবারই তিনি খোঁজেন শিল্পের মহত্তম প্রতিমার আড়ালে তার খড়-মাটির অত্যন্ত বাস্তব শরীর; তাই ঋতুরঙ্গের যে-বৈভব সুরে ও গানে এমন প্রাণময়, তার উৎস পান তিনি জমিদারি তদারকির বাস্তব দায়পালনের দিনানুদৈনিকতার, পুরনো আলোকচিত্রের বিবর্ণ বিন্যাসে। অস্পষ্ট রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রকৃতির চিরন্তন বাস্তবের উজ্জ্বলতর প্রতিলিপির উপর যখন রবীন্দ্রসংগীত আছড়ে পড়ে, তখন শিল্পের অহরহ রূপান্তর সৌকর্যের একটা আদলও গড়ে ওঠে, সিনেমার রীতির মধ্যে। ঠিক তেমনিই পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি থেকে ডিজাইন-এর উন্মেষ ও সেই ডিজাইনকে ধরেই রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার বিকাশ এই বিবর্তনও সত্যজিৎবাবুর ছবির আরেকটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এই অংশে সত্যজিৎ বাবুর ধারাভাষ্য নীরব হয়ে যায়, দর্শকের চোখ একাগ্র কৌতুহলে অনুসরণ করে যেতে পারেরেখার নিজস্ব খেলা, রেখায় রেখা জড়িয়ে ছবির জন্ম।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি কিন্তু ছবিতে একটিও আবৃত্তি শোনা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এমন কেউ কেউ সেই ১৯৬১-তে আজকের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় জীবিত ছিলেন কিন্তু ছবিতে একটিও সাক্ষাৎকার নেই। ছবিতে সাধারণভাবে কোন অভিনেতা ব্যবহার করা হয়না রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে। কেবল কিভাবে একটি শিশু

তথাকথিত চার দেওয়ালে বদ্ধশিক্ষায়তনের বাইরে মুক্ত প্রকৃতির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, কিভাবে তার অন্তঃস্থল থেকে সংগীত উঠে এসে প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করছে (ভঙ্গিতে যেন মিশে থাকে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত 'আকাশ আমার ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে') সেইটি স্পষ্ট করতে এবং নিঃসঙ্গ শিশুর নিজের জগৎ বোঝাতে আলোকচিত্রের বাইরে একটি শিশুকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে নিতে হয়।

'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রটি রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সোনার মেডেল পায় ঐ বছরই এবং সেই ১৯৬১-তেই লোকার্নো থেকে পায় গোল্ডেন সিল।

ওই একই বছরে রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প নিয়ে সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন 'তিন কন্যা'। এরপর ১৯৬৪-তে 'চারুলতা' ও ১৯৮৪-তে 'ঘরে বাইরে' ছবি নির্মাণের মধ্যে দিয়ে তার চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রচর্চা সম্পূর্ণ হয়। রায়-পরিবারের পারিবারিক সুহৃদ রবীন্দ্রনাথকে, পরবর্তী জীবনে সত্যজিৎ রায়ের শান্তিনিকেতনে পড়ার মূলে যাঁর অবদান অনেক খানি, এইভাবেই হয়তো তর্পণ করলেন তাঁব সন্তান প্রতিম চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়।

এরপর ১৯৬২-তে এই চলচ্চিত্রকারকেই ফিরিয়ে দিতে হয় একটি সরকারী প্রস্তাব। প্রস্তাবটি ছিল চীনের বিরুদ্ধে একটি প্রচারমূলক তথ্যচিত্র নির্মাণের। তাঁর মানবতাবাদ অর একবার প্রমাণিত হয়। কাজ করা এবং কাজ না করা বিষয়ে শিল্পীর স্বাধীনতাবোধও প্রতিষ্ঠিত হয় এই ঘটনার মাধ্যমে।

'দ্য ইনার আই' (১৯৭২)

'রবীন্দ্রনাথ'-এর প্রায় দশ বছর পর নির্মিত হয় 'সিকিম'। এই প্রসঙ্গ পরে। কিন্তু তার পরের বছরই তিনি নির্মাণ করেন আর এক অবিস্মরণীয় তথ্যচিত্র 'ইনার আই'। ১৯৭২-এ ভারত সরকারের সংস্থা ফিল্মস ডিভিশনের প্রয়োজনায় সত্যজিৎ রায় আর এক মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগকে আবারও অদ্ভুত এক নির্লিপ্ত চলচ্চিত্রভাষায় রূপ দিলেন। সেই মানুষটি হলেন তাঁর শিল্পশিক্ষক বিনোদহিারী মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু যে যুক্তিতে বা কার্যকারণে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণ করা চলে, সেই একই যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে শিল্পী তথা ভাস্কর বিনোদবিহারীর ক্ষেত্রে কার্যকারী হয় না। তবে কিসের আকর্ষণে সত্যজিৎ 'ইনার আই' নির্মাণ করেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ যত্নের চাইতেও কিছু বেশিযত্ন ও নিষ্ঠা দিয়ে? 'দেশ, বিনোদন সংখ্যায়' ১৯৭১ সালে 'বিনোদ-দা' প্রবন্ধে সত্যজিৎ রায় লেখেন ঃ

'১৯৪০ সালের আগে বিনোদবিহারী মুখোপ্যাধ্যায়কে চিনতাম না। তাঁর নামেও না কাজেও না।..... আশ্রমে পৌঁছানর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাঁর ছবি চোখে পড়ল তিনি হলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। কলাভবন হোস্টেলে একটি তিন-কামরা বিশিষ্ট নতুন ছাত্রাবাসে আমার থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে বাড়ির সামনের বারান্দায় পা দিতেই দৃষ্টি আপনা থেকে উপর দিকে চলে গেল। সারা সিলিং জুড়ে একটি ছবি। গাছপালা মাঠ পুকুর মানুষপাখি জানোয়ারে পরিপূর্ণ একটি স্নিগ্ধ অথচ

বর্ণোজ্জ্বল গ্রাম্য দৃশ্য। বীরভূমের গ্রাম। দৃশ্য না বলে ট্যাপেস্ট্রি বলাই ভালো। অথবা এনসাইক্লোপিডিয়া।....'

'আড়াই বছর শান্তিনিকেতনে থেকে বিনোদবিহারীর শিল্পকর্ম ও চিন্তাধারার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়। শিল্পজগতে তাঁর 'একাকিত্বেরচেহারাটাই ক্রমে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। নব্য ভারতীয় শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর একনিষ্ঠ মননশীলতা, চিত্রশিল্পের রীতিনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা বিস্ময়কর বলে মনে হয়।'

এই বিস্ময়বোধ ও গভীর শ্রদ্ধাই হয়তো তাঁকে 'দ্য ইনার আই' নির্মাণে আগ্রহী করে। ফিল্মস ডিভিশনের কাছে তিনি ছবিটি করার প্রস্তাব দেন এবং তাঁরা গ্রহণও করেন। রঙিন এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্রটি সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের অর্থাৎ স্রষ্টার নিজের মন্তব্য 'হয়তো এইটিই আমার সব চাইতে ভাল তথ্যচিত্র কারণ এ ছবি নির্মাণ করেছি আমি আমার গভীর এক অনুভূতি থেকে।'

বিনোদবিহারী দৃষ্টিশক্তি জন্ম থেকেই ক্ষীণ ছিল। 'প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে কতকগুলো ছায়া ঘুরে বেড়ায় — মৃত্যুর ছায়া, রোগশোকের ছায়া, অপমান-লাঞ্ছনার ছায়া ইত্যাদি নানা ছায়া সদা সাথীর মতো সর্বদা আমাদের অনুসরণ করছে। আমি জন্মেছিলাম সামনে, লম্বা অনিশ্চিতের ছায়া নিয়ে।' — বিনোদবিহারী লিখেছেন। ১৯৫৭ সালে চোখের এক অপারেশনের পর তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। সেই সময়ে তাঁর বয়েস ৫৪ এবং তারই মধ্যে তিনি বহু কাজ করেছেন। এই কাজের বেশির ভাগই দেওয়াল জোড়া মুরাল। শান্তিনিকেতনের বহু বাড়িতেই এই মুরাল ছড়িয়ে আছে। শিল্পসৃষ্টি ব্যস্ততম মুহূর্তে একজন শিল্পীর এই অন্ধত্ব তাঁকে সম্পূর্ণ বিষণ্ণ করে ফেলতে পারত, করে ফেলতে পারত অক্ষম কিন্তু 'তিনি এই অবস্থাকে গ্রহণ করেছিলেন যেন একঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার পথ হিসেবে, তাঁর ছাত্র কে. জি. সুব্রমনিয়ান একথা বলেন। শিল্পী চক্ষুষ্মানতাই যাঁর প্রধান সম্পদ অথচ 'চিত্রপটের এক বিঘৎ দূরে চোখ রেখে ছবি দেখতে ও আঁকতে হত তাঁকে। পরে সামান্য দৃষ্টিও চলে যায় তবু 'অন্ধ অবস্থাতেই তিনি ... একটি নতুন মিউর‍্যালের পরিকল্পনা করেছেন' এবং তিনি বলতে পারেন জীবনের অভিজ্ঞতা প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র। তবু কতকগুলো সাধারণ অভিজ্ঞতা ঘটেছে যার তুলনা সহজে পাওয়ায় যায় না। আলোর জগৎ থেক অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে আমার শিল্পী জীবনের এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়েছে।

সত্যজিৎ রায় তাঁর 'দ্য ইনার আই' তথ্যচিত্রে এই অসামান্য মানুষ তথা শিল্পীর জীবনযাপন, বাচনভঙ্গি, শিল্পরীতি প্রকাশ, শিল্পসৃষ্টিকে এমন এক সহজ ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন যে শুধু 'বিনোদনদা' নন, শুধুই তাঁর দৃষ্টিহীনতা নয় বরং এক অন্তর্দৃষ্টি তা প্রকাশ করেছে যা একাধারে শিল্পীর নিজের এবং চলচ্চিত্রকারেরও। এ ছবির নাম তাই 'দ্য ইনার আই' ছাড়া আর কিছুই হওয়া সম্ভব ছিল না। এই ছবিও তার নির্মাণের বছরটিতেই অর্থাৎ ১৯৭২-এ রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে।

বালা (১৯৭৬)

এর চার বছর পর 'বালা'। এ ছবির প্রযোজক 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর পারফরমিং আর্টস' বিখ্যাত ভাবতনাট্যম শিল্পী বাল সরস্বতীকে নিয়ে যে ছবি ১৯৭৬-এ তৈরি হয় তা হতে

পারত ১৯৬৬ সালেই কিন্তু কোন কারণে তা হয়নি। বালাকে সত্যজিৎ রায় এক অসামান্য শিল্পী বলে মনে করেন। চলচ্চিত্রটি নির্মাণের ৪১ বছর আগে, সত্যজিৎ রায় তাঁর চোদ্দবছর বয়সে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে সতেরো বছরের বালা-র ভারতনাট্যম দেখেন। 'সেই স্মৃতি আজও আমার মনে সমান সতেজ আছে। সে এক এমন নাচ যে নাচে নারীর অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে।' মনে রাখতে হবে সত্যজিৎ রায় যে বয়সে এ ছবি দেখেন সেই সময়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীত তাঁর চেতনার একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল। তবু একান্তভাবেই প্রাচ্যের এই শিল্প তাঁকে এতটাই মুগ্ধ করে যে প্রথমে '৬৬ সালে অর্থাৎ প্রথম দর্শনের পঁচিশ বছর পর এবং শেষপর্যন্ত '৭৬-এ তাঁকে এক নৃত্যধারা ও বিশেষ, করে তাঁর মতে তার শ্রেষ্ঠ ধারক 'বালা'-কে নিয়ে তথ্যচিত্র করতে বাধ্য করে।

সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট যে-কোন ছবির মতই 'বালা' ছবিতেও গভীর পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার প্রভাব স্পষ্টতই বোঝা যায়। কিন্তু সাধারণ দর্শকের পছন্দসই দৃশ্য পরম্পরা যা তার ছবির শিল্পিত সম্পাদনা জন্ম দেয় তা এ ছবিতে পাওয়া যায় না। ছবির বিষয়বস্তুর প্রয়োজনেই এমন হয়েছে কারণ একাধারে তা আর্কাইভের জন্য নির্মিত এবং অন্যদিকে ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যে যতটা ব্যক্তির নিজস্বতা প্রকাশের সুযোগ থাকে পরম্পরার উত্তরাধিকারকে সাধনার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্টা করার। সত্যজিৎ রায় নিজে বলেছে এ ছবিতে ধ্রুপদী নৃত্যের দীর্ঘ দৃশ্য আছে, বিশেষত শেষ, বারো মিনিট ধরে 'অভিনয়ম'-এর একটি মাত্র নাচ আছে। কিন্তু একজন মহৎ নৃত্য শিল্পী, সম্ভবত ভারতের শ্রেষ্ঠ ভারতনাট্যম শিল্পীর কাজের রেকর্ড হিসেবে এর গুরুত্ব অসীম বলে আমি মনে করি।'

সুকুমার রায় (১৯৮৭)

১৯৮৭-তে হয় 'সুকুমার রায়' তথ্যচিত্র। পিতার উপর পুত্রের তথ্যচিত্র নির্মাণের এমন একটি ঘটনা বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসেই বিরল। ১৯৮৭ সালে সুকুমাররায় জন্ম শতাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় সত্যজিৎ রায় এছবি নির্মাণ করেন।

বিশ্বকবি এবং পিতৃবন্ধু রবীন্দ্রনাথ প্রথমে তাঁর তথ্যচিত্রের বিষয়। তারপর শিল্পী ও তাঁর শিক্ষক বিনোদবিহারীকে সত্যজিৎ রায় তথ্যচিত্রের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেন। নৃত্যশিল্পী বালা সরস্বতীর পর শেষ পর্যন্ত জীবনীমূলক ছবি করতে হয় তাঁকে, নিজের শিল্পী সাহিত্যিক পিতা সুকুমার রায়কে নিয়ে। শিল্পী, শ্রদ্ধেয় ও বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি একজন চলচ্চিত্রকার আর কীভাবে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনা করতে পারেন আমাদের জানা নেই।

১৯২৩-এ মারা যান সুকুমার রায়। কোন ফিল্মফুটেজ নেই, তার উপর তিনি তাঁর পিতা এবং তৃতীয়ত তিনি 'ননসেন্স রাইম'-এর স্রষ্টা। তাঁকে চিত্রভাষায় গড়ে তোলা তাঁর মৃত্যুর ৬৪ বছর পর কম কথা নয়। যতটা সম্ভব আলোকচিত্র এবং পান্ডুলিপি ব্যবহার করতে হয় সত্যজিৎ রায়কে। কোন অভিনেতাকে সুকুমার রায় সাজিয়ে 'ডকুড্রামা' ধরনের তথ্যচিত্র করায় তিনি আদৌ আস্থা রাখতে পারেননি। এমনকি এ ছবির কোন ইংরিজি সংস্করণেও তিনি বিশ্বাস করেননি। বিষয়ের প্রতি অবিচার করা হতে পারে তাতে,

হয়তো এই আশংকায়। তবে সুকুমার রায়ের নাটকেও ত' কম মজা নেই তাই পরিচালক যখন 'সুকুমার রায়' তথ্যচিত্রে তিনটি নাটকের অংশ বিশেষ অভিনয়ের মাধ্যমে দেখান, তখনই সুকুমার শব্দ ব্যবহারের মজা বোঝা যায়। ঝালাপালা, হযবরল ও লক্ষণের শক্তিশেল — এই তিনটি নাটকের তিন অব্যর্থ মুহূর্ত এই তথ্যচিত্রে অভিনয় করেন উৎপল দত্ত, সন্তেষ দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতা। কিন্তু এ ছবিরও প্রধান গুণ সেই একই — শিল্পীর নির্লিপ্তি। বিষয়ের প্রতি বা মানুষের প্রতি অবোগ আপ্লুত হওয়া সত্যজিৎ রায়ের কোন তথ্যচিত্রেই পাওয়া যাবে না। নিজের পিতার উপর ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি সমানভাবে সেই দূরত্ব বজায় রাখতে পেরেছেন এমনকি নিজের প্রসঙ্গমাত্র একবার, মাত্র একবারই আসে এই আধঘন্টাব তথ্যচিত্রে একটি তথ্য হিসেবে। সেটি তাঁর জন্মদিনেব প্রসঙ্গ।' ১৯২১-এর ২রা মে তাঁর একমাত্র সন্তানের জন্ম।'

সিকিম (১৯৭১)

জীবনীমূলক বা বায়োগ্রাফিকাল এই তথ্যচিত্রগুলির বাইরে অন্য যে তথ্যচিত্রটি তিনি নির্মাণ করেন তার নাম 'সিকিম'। ১৯৭১-এ নির্মিত এ ছবিটি কেউই প্রায় দেখেননি। ছবির উপাদান ও গঠন নিয়ে সত্যজিৎ রায় নিজে খুব সন্তুষ্ট নন বলে জানা যায়। ছবিটির নির্মাণের জন্য সবধরনের উদ্যোগ নেন সিকিমের তৎকালীন মহারাজা বা চোগিয়াল এবং তাঁ স্ত্রী। ১৯৭৫-এ সিকিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে ভারত সরকার কোনো কারণে ছবিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তবে এ ছবি নির্মাণের আগে যে পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া যাবে বলে সত্যজিৎ রায়কে ছবির প্রযোজক আশ্বাস দিয়েছিলেন, কার্যত তা হয় না। তাঁর নিজের পরিচালিত তথ্যচিত্র বিষয়ে লিখিত একটি নিবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য — 'আমি একটি ছবি করি যাকে সিকিম বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বলা চলে। কিন্তু তখন তাঁরা (চোগিয়াল ও তাঁর স্ত্রী) কতগুলি পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। ছবিতে কতগুলি নতুন জিনিস আনতে ও কতগুলি জিনিস বদলানোর জন্য জোর দিতে থাকেন। কারণ আমার বক্তব্যর সঙ্গে তারা অফিসিয়াল দিকও রাখতে চাইছিলেন। সুতরাং আমার ভাল লাগে না এমনভাবে দুদিকের ভারসাম্য রাখতে হয় আমাকে। 'সিকিম' ছবির প্রায় ষাট শতাংশ যদি আমার হয় তাহলে চল্লিশ শতাংশ সিকিমের চোগিয়ালের। কিন্তু তবুও এ ছবি দেখানো হয়না, কোন দিন দেখানো হবে কিনা আমি জানি না। তবে যদি কখনও দেখানো হয় আমি তাহলে আমার মৌলিক ধাঁচ অনুসারে আবার এ ছবির সম্পাদনা করতে চাই।'

'সিকিম' ও ভারত সরকার

মাত্র কিছুদিন আগে সত্যজিৎ রায়ের অস্কার পুরস্কার প্রাপ্তি সংবাদ ঘোষিত হলে কলকাতার ফিল্ম ক্লাবগুলির অন্যতম একটি ক্লাব কেন্দ্রের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী অজিত পাঁজা-র কাছ 'সিকিম' ছবিটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আবেদন জানান। ছবিটি যাতে দূরদর্শনে দেখানো হয় সেই মর্মে একটি অনুরোধও রাখা হয়। ডিসেম্বরের একুশ তারিখে এ-খবর টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সাতাশে ডিসেম্বরে ঐ একই পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য একটি খবরের সূত্রে জানা

যায় সত্যজিৎ রায়ের 'সিকিম' ছবির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হতে পারে। শ্রী পাঁজা বলেছেন যে, 'ছবিটি আমরা সত্যজিৎ রায়ের কাছে নিয়ে যাব। যদি উনি মনে করেনযে 'সিকিম' এখন ভারতে দেখানো যেতে পারে, নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁর মতামতের মূল্য দেব। শ্রী রায় ঐতিহাসিক পরিবর্তন বিষয়ে সচেতন এবং আমাদের বর্তমান চলচ্চিত্র দর্শকদের মূল্যবোধ বিষেয়ও তিনি জানেন।'

'সিকিম' ছবির একটিমাত্র কপি জমা আছে আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে। সরকারী উদ্যোগে একদিন হয়তো এ ছবি দেখার সুযোগ আসবে আমাদেরও। এবং তখনই আমাদের সত্যজিৎ রায়-সৃষ্ট সব কটি তথ্যচিত্র দেখার সুযোগ মিলবে।

যে ছবি করা হয়নি

নিজের ছবির বাইরে হরিসাধন দাশগুপ্ত ও বংশী চন্দ্রগুপ্তের একাধিক তথ্যচিত্রে সত্যজিৎ রায় চিত্রনাট্যকার হিসেবে কাজ করেছেন। কোন সময় সঙ্গীত রচনার দায়িত্ব নিয়েছেন বা আরও কোন ভূমিকায় এসেছেন। সুতরাং কার্যকারণে কাহিনীচিত্রের তুলনায় তথ্যচিত্রের সঙ্গে সংশ্রব তাঁর কোন অংশে কম নয়। তাঁর তথ্যচিত্র প্রধানত শিল্পীকে নিয়ে হলেও তার মধ্যে কখনও কোন সঙ্গীত শিল্পীনেই। কিন্তু ফরাসী টেলিভিশনের তরফ থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের উপর একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রস্তাব তাঁর কাছে এসেছিল বলে জানা যায় তাঁর নিজেরই লেখা থেকে। এই ছবিটি তিনি করতে চেয়েছিলেন রাজস্থানী লোকসংগীতের উপর। 'পশ্চিম রাজস্থানের অনেকটা জুড়ে মরুভূমি। মানুষের জীবনযাপনএখানে খুবই কঠোর। খুবই দরিদ্র তাঁরা। কিন্তু এখানকার লোকসংগীত অসাধারণ রকমের সমৃদ্ধ। এই বিষয়টির উপরই আমি ছবি করতে চাই।'

সত্যজিৎ রায় নির্মিত যে-কোন সংগীত বিষয়ক তথ্যচিত্রের সম্ভাবনাই আমাদেব উৎসুক করে। এমনকি এমনও মনে হয় যে কাহিনীচিত্রে ব্যবহৃত তাঁর সঙ্গীত রচনাগুলকে পাশাপাশি রেখেও অসাধারণ অডিও ডকুমেন্টারি হতে পারে।

রাজস্থানী লোকসংগীত বিষয়ক তথ্যচিত্র না হলেও সুস্থ হয়ে উঠে সংগীত-বিষয়ক একটি তথ্যচিত্র তিনি নির্মাণ করবেন আপাতত এই আশায় বর্তমান রচনার ইতি টানা গেল।

১। দ্য টেগোর ফিল্মস / পোট্রেট অফ আ ডিরেক্টর : সত্যজিৎ রায় / মারীসীটন/ ১৯৭১ / পৃ১৬৭-১৭২

২। ডকুমেন্টারিজ.... / সত্যজিৎ রায় : দা ইনার আই / অ্যান্ড্রু রবিনসন / ১৯৮৯/ পৃ ২৭৪-২৮২

৩। শান্তিনিকেতন অ্যান্ড টেগোর ১৯৪০ - ২ / ঐ / পৃ ৪৬-৫৫

৪। নিবেদন / চিত্রকর / বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় / ১৯৭৯ / পৃ —৮

৫। বিনোদদা / বিষয় চলচ্চিত্র / সত্যজিৎ রায় /১৯৮৯/ পৃ ১১৮-১২৩

৬। আনন্দবাজার পত্রিকা / ২৮.৬.৭৬

৭। অ্যান্ড ডকুমেন্টারিজ টু ঃ ইন হিজ ওয়ার্ডস—ইন আওয়ার ওয়ার্ডস / সত্যজিৎ রে'জ আর্ট/ ফিরোজ রঙ্গুনওয়ালা / ১৯৮০ / পৃ ৯৪-১০০

৮। সত্যজিৎ রায় ঃ তথ্যচিত্র / শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় / সত্যজিৎ রায় ভিন্ন চোখে/ সম্পাদনা শীতলচন্দ্র ঘোষ ও অরুণকুমার রায় / পৃ ৪১-৪৪

৯। ওয়াকিং টল ঃ অন সত্যজিৎ রে অ্যান্ড হিজ স্টাইল/ গৌরী রামনারায়ণ /ফ্রন্টলাইন, ডিসেম্বর ২০ ১৯৯১ / পৃ ৮৩-৮৫

১০। দ্য টেলিগ্রাফ / ২১ ও ২৭.১২.৯১

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা গড়পারের বাড়ি

সত্যজিতের আঁকা ডি. ডব্লু গ্রিফিথ

সত্যজিতের আঁকা আকিরা কুরোশোয়া
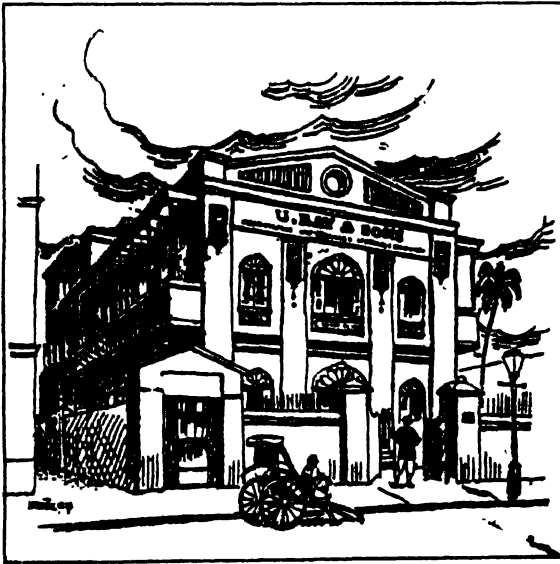
সত্যজিতের আঁকা আইজেনস্টাইন

সত্যজিতের আঁকা ডি. জে. কিমারের ম্যানেজার
জে বি. আর নিকলসন

৩
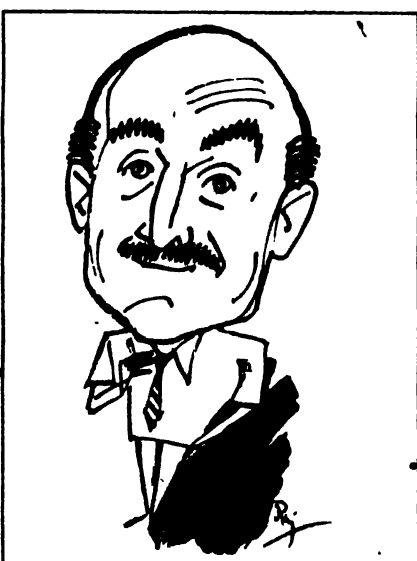
সত্যজিতের আঁকা পাবলো পিকাশো
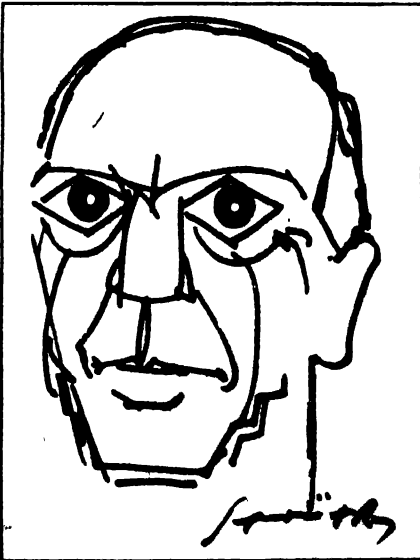
সত্যজিতের আঁকা নন্দলাল বোস
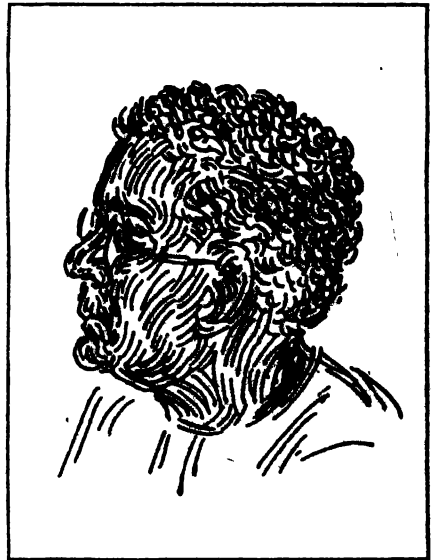
অন্নদা মুন্সির আঁকা সত্যজিৎ রায়

একমাত্র সত্যজিৎ রায়

ঋত্বিক কুমার ঘটক

পনের ষোল বছর আগে, 'পথের পাঁচালী' যখন বেরল, আমি তখন বোম্বাইতে একটি অতি নিম্নস্তরের ছবি-করিয়ে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি অতি নিম্নশ্রেণীর কাজের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। তার আগেই প্রাণ মন এবং আর্থিক সমস্যার দিক থেকে, আমার প্রথম সম্পূর্ণ ছবি করে এবং censor এর ছাড়পত্র পেয়েও বাজারে বের করতে না পেরে, চূড়ান্ত হতাশায় মগ্ন হয়ে বোম্বাই গিয়ে গুমরোচ্ছি। যত সামান্য মাইনে, কাজের দাবিও তত কর্তাদের প্রচন্ড। কাজেই কলকাতায় আসা হয়ে ওঠে না। তার ওপরে দৃঢ় ধারণা যে, এদেশে সমাজব্যবস্থাকে না পাল্টালে কিছু হবেটবে না। অর্থাৎ উৎসাহেরও অভাব।

এই সময় কানাঘুঁষোয় খবর পেলাম কলকাতায় 'পথের পাঁচালী' ছবিটি বেরিয়েছে এবং যাঁদের মতামতকে আমি শ্রদ্ধা করি তাঁদের কাছে শুনলাম যে, একটা চূড়ান্ত কান্ড ঘটে গেছে।

'পথের পাঁচালী' ছবিটা যখন সত্যজিৎবাবু করছিলেন তখন আমিও আমার উপরি-উক্ত ছবিটা শেষ করে laboratory-তে কাজ করছিলাম। আমার এবং ওঁর দুজনের কাজই একই Lab-এ হচ্ছিল। কাজেকাজেই টুকরো-টুকরো খবর উড়োউড়োভাবে কানে আসত। যেহেতু তাঁদের গোষ্ঠীও গতানুগতিকতার বাইরে থেকে কাজ করার চেষ্টা করছিলেন তাই কৌতূহল একটু ছিল। তারপরে আমার ছবিটা শেষ censor-এর পরে বিপর্যয়। চূড়ান্ত হতাশার মধ্যে বোম্বের চাকরি পাওয়া এবং আমার চলে যাওয়া। তবু, ভদ্রলোক তারপরেও বেশ কিছুদিন কত কষ্ট ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে ছবিটি শেষ করার চেষ্টা করছিলেন সে-খবর পেতাম। কাজেই এখন যখন শুনলাম ছবিটা উতরিয়েছে এবং প্রায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে, তখন যুগপৎ আনন্দিত এবং খুবই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম।

আনন্দিত কারণ, তাহলে বোঝা গেল যে, বিভিন্ন কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়ে এবং সঠিক যোগাযোগের পথ বেয়ে যদি শেষ অবধি মানুষের সামনে গভীর চেষ্টাকে তুলে ধরা যায় তাহলে এই অবস্থার মধ্যেও বদল আনা যায়।

আর, সন্দিগ্ধ এইজন্যে যে, ভদ্রলোককে, তখন আলাপ না থাকলেও, যেটুকু শুনে-দেখে বুঝেছিলাম, তাতে মনে হয় নি যে, বিভূতিভূষণের অপরূপ গ্রামীন রূপকথাকে উনি সত্যিকারের দরদ দিয়ে তুলে ধরতে পারবেন। কারণ ওঁর জগৎ, আমি যতটুকু জানতাম, অপুর জগৎ থেকে একেবারেই বিভিন্ন।

তারপরেই ঘটনাচক্রে কলকাতায় এলাম এবং ছবিটি দেখলাম। একবার নয়, পরপর সাতবার। অবাক হয়ে গেলাম, আমার সন্দেহ একেবারে অলীক প্রমাণিত হল। এখানে-ওখানে নানারকম আপত্তি থাকলেও সব মিলিয়ে অপুদুর্গা একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠল, আমার সামনে ফুটে দাঁড়াল। মনে আছে তখন বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে

বারবার একটা কথাই বলেছিলাম যে, 'পথের পাঁচালী'তে এমন কিছু নেই যা আমরা হাজারবার ভাবি নি এবং স্বপ্ন দেখি নি। 'পথের পাঁচালী' ছবি চিন্তার দিক থেকে বা রচনাশৈলীর দিক থেকে এমন কিছুই আনে নি আমার কাছে; যা আমি হাজারবার কল্পনা করেছি, স্বপ্ন দেখেছি, উনি সেটা গুছিয়ে-গাছিয়ে খেটে তৈরী করে ফেলেছেন।

মারাত্মক এবং প্রচন্ড বৈপ্লবিক তফাৎ। যে তফাৎ ওঁকে আমাদের নবযুগের স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দিল, যে-আসন থেকে ওঁকে সরাতে কোনোদিনই কেউ পারবে না।

দু একটা টুকরো-টুকরো কথা, ভালো এবং খারাপ, 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে এখানে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন, ইন্দির-ঠাকরুণ অধ্যায়টি। একমাত্র ইন্দির-ঠাকরুণের মৃত অবস্থায় বসে-থাকার দৃশ্যটি বাদ দিয়ে বলা যায়, ভারতীয় চলচ্চিত্রে, খন্ডভাবে দেখতে গেলে, এর থেকে ভালো ছবি করতে আজ পর্যন্ত কেউ পারে নি। তিনিও না, অন্যরা তো না-ই। ইন্দির-ঠাকরুণ সম্পূর্ণ গ্রামবাংলার আত্মার প্রতিমা। এখনো ভাবলে এক-একটি দৃশ্য আমাকে তাড়া করে ফেরে। যেমন, যে-দৃশ্যে বুড়ি ঝরা শুকনো নারকোল ডাল টানতে-টানতে উঠোনে ঢুকে সর্বজয়ার কর্কশ কণ্ঠে ঝগড়া শুনে সবাইকে জিজ্ঞেস করছে যে, কী হয়েছে। কেউ তার প্রশ্নের উত্তর-দেওয়া দরকার মনে করছে না। 'দুত্তেরী' জাতীয় একটি ভংগি করে বুড়ি আবার বেরিয়ে গেলো। এ-দৃশ্যটি স্বপ্নের মতো বারেবারে চেতনায় এসে ঘা দেয়; এ-দৃশ্যটি জীবনের একটি গভীর সত্যকে, কেমন করে জানি না, উদঘাটিত করে দিয়েছে, পৌঁছে দিয়েছে একটা উপলব্ধিতে । এমন আরো দৃশ্যের কথা মনে পড়ে।

ভালো লাগে না বুড়ির মারা-যাওয়ার দৃশ্য, বরং বলা চলে, মৃতা বুড়িকে অপুদুর্গার আবিষ্কার করার দৃশ্য। এখানে একটি বিখ্যাত বিদেশি ছবির ছায়া এসে পড়েছে বলে মনে হয়।

কিন্তু আবার মনে পড়ে, কাশবনে অপুদুর্গার ট্রেন দেখার দৃশ্য। অনবদ্য। মনে পড়ে সন্দেশওয়ালার বাঁক-কাঁধে যাবার দৃশ্য। অপূর্ব। মনে পড়ে পাঠশালায় মুদি-গুরুমশায়ের বেত-তাড়নার দৃশ্য। স্নিগ্ধ মধুর, পরমসত্য হাস্যরস।

তেমনি ভালো লাগলো দুর্গার মৃত্যু দৃশ্য বা, কানু বাঁড়ুজ্জের মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে অতি-অভিনয় এবং করুণা ব্যানার্জীর সেই দৃশ্যে কান্নার বদলে তার সানাইয়ের ব্যবহার।

তেমনি ভালো লাগে বাঁশিতে পাগল-করা, পাকড়ে-ধরা, মূল-তানটির (theme) ব্যবহার, যেটা মোক্ষম সব জায়গায় ঠিক মনস্তত্ত্বগত উচ্চাবচ-গ্রামে কানে এসে বাজে। এই মূলতানটি একেবারে ছবিটির প্রাণস্বরূপ।

এই সুবাদে বলে রাখি, 'অপরাজিত' তে এই সুরটি একবারমাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে সর্বজয়া অপুকে নিয়ে ট্রেনে করে কাশী থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসছে, সেখানে জানলা দিয়ে যেই দেখা যায় যে, ট্রেনটি বাংলাদেশ ঢুকছে, তখন একবার মাত্র এটি বেজে ওঠে। ফল হয় ঠিক আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মতো। হঠাৎ বাংলাদেশ তার সমস্ত শ্যামলিমা নিয়ে আছড়ে পড়ে আমাদের বুকের ওপরে। এটা যে ঘটে, তার কারণ হচ্ছে ঐ 'পথের পাঁচালী'তে এই-সুরটি সঠিক জায়গায় ব্যবহৃত হয়ে নিজেকে নিশ্চিন্দিপুর

আর বাংলাদেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে নিয়েছে। কাজেই দুচোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র শেষ আমার ভালো লাগে নি। বড় অবুদ্ধভাবে ব্যাপারটা শেষ করা হয়েছে বলে মনে হয়। মূল বইয়ের উদার, ভবঘুরে-যাত্রীর সুরটা বাজেনা। তার কারণ, আঙ্গিকগতভাবে, আমার ধারণায়, ব্যাপারটাকে ভদ্রলোক অন্যরকম করে চিন্তা করলেও পারতেন।

যাইহোক, এটা সত্যজিৎবাবুর শিল্পকর্মের পুংখানুপুংখ আলোচনা যখন নয়, বরং ছবিটি আমাদের বা আমাকে কী ভাবে অনুবুদ্ধ করেছিল তারি একটা ইংগিতমাত্র, কাজেই, এ-নিয়ে আর বাড়ানোর অবকাশ নেই।

'অপরাজিত' যখন হচ্ছে, ততোদিনে আমি আবার কলকাতায় ফিরে এসে ছবি-করতে আরম্ভ করেছি এবং সত্যজিৎবাবুর সংগে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই আলাপ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। 'অপরাজিত' আমার মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি, মানে অখন্ড একটি ছবি হিসেবে এরও যে জায়গা-জায়গা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নেই তা নয়, কিন্তু সব মিলিয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয়েছে , এটাতে উনি উতরেছেন — 'পথের পাঁচালী' বা পরেকার সব ছবির থেকে অনেক উঁচুতে। 'কাঞ্চনজঙঘা'কে তাঁর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি বলে আমি মনে করি।

তারপরে তাঁর অনেকগুলি ছবি তো দেখা গেল। যদিও তাঁর সব ছবি আমি দেখি নি। 'অপুর সংসার' আমার ভালো লাগে নি। বৌ-এর মৃত্যুর খবর শুনে শালাকে ঘুষি মারার কথা ছেড়েই দিলাম, একেবারে ছবির শেষটা, আমার মনে হয়, একটা মারাত্মক প্রমাদে ভুগছে। বিভূতিবাবুর 'অপরাজিত' বইটির শেষ আটদশ পাতা পড়লে হয়তো অনেকে ধরতে পারবেন। অন্তত আমার ত মনে হয়, কাজল নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে এসে ঠাকুর্দা হরিহরের ভিটের কাছে দাঁড়িয়ে যে-কথাগুলো ভেবে চলেছে : যেমন, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, দেবী বিশালাক্ষী, ঠাকুমা সর্বজয়া, পিসি দুর্গা থেকে আরম্ভ করে বাঁশবনের পাশের ভিটেয় মহাভারতের চরিত্রদের লড়াই পর্যন্ত। এগুলো বোধহয় অপরিহার্য ছিলো। আর সেই মারাত্মক শেষ পংক্তিটি — 'অপু, নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া যায় নাই। সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।' বইয়ের প্রাণবস্তু বোধহয় এখানেই ছিলো।

এরপরে তাঁর সবছবি, মানে, যা আমি দেখেছি, কিছু-না-কিছু জায়গায় হতবাক করে দিয়েছে। যদিও আমি নিজে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের জীবনদর্শনে বিশ্বাসী এবং আমার ছবি-করার ঢংটাও বোধহয় সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির — তবু তাঁর কাজের জায়গায় বিরাট প্রতিভার স্ফুরণ দেখে অনেক সময় স্তম্ভিত হয়ে গেছি। সবচাইতে যেটা আমার মনে হয়েছে, যে, তাঁর একইসঙ্গে প্রচন্ড শক্তির-উৎস এবং দুর্বলতার কারণ বোধহয় তিনি নানারকম বিষয়ের মধ্যে নানা প্রকার আঙ্গিক প্রয়োগের চেষ্টা করে চলেছেন আজো। এটা করলে সবকাজ যে, সমানভাবে উতরোবে সেটা আশা করাও বোকামি।

তবু, আমার কেমন যেন মনে হয় নিজের চিন্তাধারাটিকে এমনভাবে বহুমুখী করে ছড়িয়ে- দেওয়াটি তিনি না করলেই পারতেন। তাঁর একজন পরমগুণমুগ্ধ হিসেবেই বলছি যে, এতে যেন অনেকটা শক্তির অপচয় ঘটে গেলো। অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে।

এই কথাগুলো আমি একজন ছবি-করিয়ে হিসেবে বলি নি, বলবার চেষ্টা করেছি

একজন শিল্পপ্রেমিক হিসেবেই। আমি ছবি করি আর না করি, বিশেষ করে চলচ্চিত্রটাকে নিয়ে প্রাণপণ ভাবি এবং বুঝতে চেষ্টা করি।

এই-সুযোগে কথাগুলো বলার একটা কারণ হচ্ছে, আমি মনে করি ভারতবর্ষে ছবির মাধ্যমটাকে যদি কেউ বোঝে তবে, তিনি হচ্ছেন একমাত্র সত্যজিৎ রায়। দেখুন, মেজে-ঘষে পড়াশুনো করে একটা-স্তর পর্যন্ত রগড়াতে-রগড়াতে পৌঁছনো যায়, এমন কি হয়তো প্রবন্ধকার বা ইশকুল মাস্টারের স্তর ছাড়িয়ে এক-ধরণের শিল্পীতেও পরিণত হওয়া যায়। কিন্তু জাতশিল্পী হতে গেলে অন্য আরেকটা এলেম লাগে। দেশবিদেশের নতুন-নতুন ধারার ছবি-টবি দেখে আর নানা লেখা-টেখা পড়ে, আলোচনা-টালোচনা করে পাণ্ডিত্য ফলানো যায়, কিন্তু রসোত্তীর্ণ হওয়া যায় না। লোকের হাততালিও পাওয়া যায় হয়তো সময়-সময়, কিন্তু যে কোন খাঁটি সমজদারের কাছে ভাবের-ঘরে-চুরিটা ধরা পড়তে বেশি সময় লাগে না। পড়াশুনো, ছবি দেখা, চর্চা করা, আলোচনা করা, ভাবা, নিজেকে সবদিক দিয়ে তৈরি করা—এবং প্রভূত পরিশ্রম করে একাগ্রভাবে করা — এগুলো অপরিহার্য। এগুলো ছাড়া কোনো সৎ-শিল্পী স্বভাবকবির চেহারা নিয়ে বসে থাকলেও চিঁড়ে ভেজাতে পারবেন না, একথা ঠিক।

কিন্তু এই-যা বললাম, তার-ওপরেও একটা ব্যাপার থাকে। যেমন ক্লাস করে রবি ঠাকুর হয় না, ইশকুল মাস্টার হয়। যেমন, আর্ট ইশকুলে রগড়ে-রগড়ে পিকাসো বের-করা যায় না। যেমন, ওস্তাদ করিম খাঁর সব ছাত্রছাত্রীই হীরাবাঈ বরোদেকার হয় না। ওটা সেই-আরেকটা কিছু, বিশেষ-একটাকিছু, এসে যখন খেলা করে তখনই জন্মগ্রহণ করে। সেটা যে কী, সেটা নিয়ে ভবিষ্যতে লেখার ইচ্ছে রইলো। এখানে তার স্থান নেই, কারণ, সেটা অত্যন্ত গভীর শান্ত ধ্যানের সামগ্রী।

সেই বিশেষ-কিছুটা সত্যজিৎবাবুর মধ্যে ভীষণভাবেই আছে, সেটা তাঁর গোড়ার-দিকের কাজে লক্ষ করা গেছে। ভবিষ্যতে লক্ষ করা যাবে কি?

সত্যজিৎ রায় কি ভারতীয় রেনেসাঁসের ফসল

উৎপল দত্ত

ওঁরা সত্যজিৎ রায়ের নামের সঙ্গে লাগানোর মত এখন দুটি লেবেল খুঁজে পেয়েছেন। এক, সত্যজিৎ রায় হলেন ভারতরত্ন এবং দুই, তিনি একজন রেনেসাঁসের (নবজাগরণের) মানুষ। এই সেমিনারের জন্য যে পেপার তৈরি করা হয়েছে তাতেও বলা হয়েছে সত্যজিৎ রায় হলেন ভারতীয় রেনেসাঁসের ফসল। কলকাতায় তাঁব মরদেহ শায়িত ছিল। এবং দূরদর্শনের ধারাভাষ্যকার বারে বারে বলে যাচ্ছিলেন সত্যজিৎ রায় হলেন ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রতিনিধি। আচ্ছা, বলুন তো এই ভারতীয় রেনেসাঁস বস্তুটি কী? ইতিহাস কিন্তু এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। এক সময়ে আমরা ঐতিহাসিকদের বলতে শুনেছিলাম বাংলার রেনেসাঁসের কথা। কিন্তু এই ভারতীয় রেনেসাঁস ব্যাপারটি নয়া দিল্লি সরকারের এক সাম্প্রতিক আবিষ্কার। এই কল্পিত ভারতীয় রেনেঁসাসের শুরু কবে? এবং এর শেষই-বা কবে হয়েছিল? হয়ত বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে রামমন্দির তৈরি করার মধ্য দিয়ে গোপনে গোপনে এই রেনেসাঁসের ধারা এখনো বয়ে চলেছে। অথবা রাজস্থানে সাম্প্রতিক সতীদাহের ঘটনায় কিংবা পণের জন্য বধূহত্যার মত মহান ভারতীয় ক্রীড়াযজ্ঞের মধ্যেই বোধহয় ভারতীয় রেনেসাঁসকে খুঁজে পেতে হবে। সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার যা কিছু সবই মূলগতভাবে ভারতীয় এ কথা বলা এক নির্লজ্জ ধাপ্পাবাজি। হোমারের মৃত্যুর পর প্রতিটি গ্রীক শহর হোমারকে নিজেদের লোক বলে দাবি করত। যথারীতি ভারত সরকারের ঘুম ভেঙ্গেছে দেরিতে, তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে কলকাতায় প্রতিভাধর ব্যক্তি আছেন এবং তড়িঘড়ি করে তাঁকে 'ভারতরত্ন' নামে একটি বস্তু প্রদান করলেন। করা হলো তার কারণ আমেরিকানরা তাঁকে অস্কার দিয়েছেন যে। যদিও এর আগে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম দুনিয়া থেকে পাওয়া যেতে পারে এমন সব পুরস্কারই পেয়েছেন। কান, ভেনিস, বার্লিন কোনটাই বাদ নেই। অবশ্য এগুলি ইউরোপীয় পুরস্কার। অতএব তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট দিল। অবশ্য এর গুরুত্ব বুঝতে হলে কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি থাকা চাই তো। ফরাসী সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি কলকাতায় উড়ে এসে রায়ের জামায় লিজিওন অব অনার লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের কোনও সপ্তম নৌবহর নেই যে ভারতীয় মহাসাগরে চক্কর দেবে এবং আমরা তাদের সঙ্গে কোনও যৌথ নৌমহড়াও করছি না। কিন্তু আমেরিকান পুরস্কারের ব্যাপারটাই যে আলাদা তা সকলেই জানেন। সুতরাং সত্যজিৎ রায়ের গৌরবেব ভাগীদার হতে দিল্লিতে ছোটাছুটি পড়ে গেল এবং মানুষটি ইতোমধ্যেই কোমায় আচ্ছন্ন, সেই হেতু তাঁর উপর ভারতরত্ন চাপিয়ে দেওয়াটা নিরাপদও বটে। কোমায় আচ্ছন্ন মানুষের পক্ষে কোনও পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। সুভাষচন্দ্র বসুকে ভারতরত্নেব তালিকায়

ঢোকাতে খুবই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাই এক সংজ্ঞাহীন মানুষকে অনুগ্রহ করে 'ভারতরত্ন' দেওয়া হলো। কিন্তু দিল্লির কর্তাব্যক্তিদের কাজকর্ম দেখে না হেসে পারা যায় না। তাঁরা সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে জে আর ডি টাটাকেও ভারতরত্ন দিলেন। তাহলে আমরা একটা প্রশ্ন করতে চাই, আহা মিস্টার বিড়লা, মিস্টার বাজাজকে সত্যজিৎ রায়ের মত গণমান্যদের সঙ্গে জায়গা করে দেওয়া হলো না কেন?

একদিকে ভারতীয় রেনেসাঁস নামক মিথ-এর আবিষ্কার এবং সত্যজিৎ রায় হলেন তাঁর প্রতিনিধি এই বক্তব্য। অপরদিকে দীর্ঘদিন ধরে সারা পৃথিবী থেকে তাঁর উপরে বর্ষিত সম্মানের ভাগীদার হওয়ার এই শেষ মুহূর্তের প্রচেষ্টা। দুটো ব্যাপারই একরকম। পরিহাসের বিষয় হলো আমেরিকাই একমাত্র দেশ যারা সত্যজিৎ রায়ের কোনও গুরুত্বপূর্ণ ছবি বাণিজ্যিক ভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেনি। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন জনসাধারণ জানেনই না সত্যজিৎ রায়ের ছবি কীরকম। অস্কার পুরস্কার এসেছে চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের এক ছোট গোষ্ঠীর উদ্যোগে। অর্থাৎ খেলাটা পরিষ্কার : আমরা আপনাকে সম্মান করি, আপনাকে পুজো করি, কিন্তু আপনার সৃষ্টি আমাদের এখানে কেউ চায় না। আমাদের দর্শকদের দেখানো হবে মার্কিন বস্তাপচা ছবি এবং কেবলই বস্তাপচা। আমরা এখানে কোনও ব্যবসায়ী প্রতিপক্ষ চাই না।

ভারত সরকারও একইরকম নির্লজ্জ ভন্ডামি করে চলেছে। লজ্জার কথা যে একদিকে তারা সত্যজিৎ রায়কে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দিচ্ছে, অপরদিকে তাঁর তৈরি সিকিমের উপর চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ করে রেখেছে।

ভারতীয় টেলিভিশনকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে সেই দুর্নীতিপরায়ণ গোষ্ঠীটির হাস্যকর আচরণের সঙ্গে আমরা সকলেই ভালভাবে পরিচিত। যেহেতু তাঁদের কর্তাব্যক্তিরা অনেক দেরিতে বুঝলেন যে সত্যজিৎ রায় হলেন 'ভারতীয় রেনেসাঁসের শেষ প্রতিনিধি' সেহেতু তাঁদের নিজেদেরও হঠাৎ টনক নড়ল। এবং রায়ের মৃত্যুর পরে তাঁর কিছু ছবি দেখানো হলো। কিন্তু ছবিগুলি যথেচ্ছভাবে কাটছাঁট করা হলো। সেন্সর করা হলো সংলাপ। এঁদের অলৌকিক হস্তক্ষেপের সুবাদে সত্যজিৎ রায়ের 'তিনকন্যা' ছবিটি 'দুইকন্যা' হয়ে গেল। অর্থাৎ একটি কাহিনী পুরোপুরি বাদ চলে গেল। এঁরা 'সদ্‌গতি' ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, কারণ এই ছবিতে 'চামার' শব্দটি বারে বারে ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষ করুন 'সদ্‌গতি' ছবিটি তৈরি করা হয়েছিল কেবলমাত্র টেলিভিশনের জন্যই। সুতরাং সেটির সংলাপকে চ্যালেঞ্জ করার অর্থ হলো সত্যজিৎ রায় এবং লেখক মুন্সী প্রেমচন্দ্র দুজনের উপরই আক্রমণ করা। টিভি-র পক্ষে এক দুঃসাহসিক কাজই বলতে হবে। তবে ওঁদের হাতে কেউই পার পেতে পারে না।

সুতরাং সিনেমা সম্পর্কে ভারত সরকার এবং মার্কিন আকাদেমির দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ একই। এরা চলচ্চিত্র নির্মাতার প্রতি ব্যক্তিগত স্তুতি করবে। কিন্তু তাঁর চলচ্চিত্রকে অবহেলা করবে, এমনকি বিরোধিতা করবে। শুধু সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রেই নয়, যেসব তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালক পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র তৈরী করছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। ফিল্মজগতের মাফিয়া এবং ধনকুবের যারা ছবির পরিবেশনা প্রযোজনা সহ চলচ্চিত্র নির্মাণের সব দিকই নিয়ন্ত্রণ করছে, তাদের হাত থেকে এইসব পরিচালকদের রক্ষা করা দরকার। ভারত সরকার মনে করে যে, চলচ্চিত্র শিল্প হলো একটি বিরামহীন

কর আদায়ের উৎস এবং তারা এটাও মনে করে যে, মুমূর্ষু সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে গোল্ডেন হ্যান্ডসেক করে নিজেদের সব দাগ ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবে। ভারতের সাংস্কৃতিক জগৎ দিয়ে বিচার করতে গেলে বলতে হয় ভারত সরকার যেন আই এম এফ-রই শাখা অফিস। এই মুহূর্তে তারা বাজার অর্থনীতি এবং অবাধ পুঁজিবাদী বিকাশের ধারণায় উদ্বুদ্ধ। অন্যদিক দিয়ে বলতে গেলে এরা তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালকদের সিনেমা শিল্পের বৃহৎ পুঁজিপতিদের দয়ার কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করাচ্ছে। এবং এই তরুণ পরিচালকরা যখন ছবি রিলিজের সুযোগ না পেয়ে বিতাড়িত হচ্ছে, তখন এরা আনন্দে তা স্বাগত জানাচ্ছে। অবাধ প্রতিযোগিতাই হলো মূল কথা। কোটিপতিদের সঙ্গে নিঃস্বদের প্রতিযোগিতা। যদি নিঃস্বরা টিকে থাকতে না পারে , তবে তারা অন্য কোথাও গিয়ে কাজ দেখুক। এই হলো সাংস্কৃতিক দুনিয়ার বিদায়নীতির সার কথা। সিরিয়াস চলচ্চিত্র পরিচালকদের জোর করে বিদায় দেওয়া হচ্ছে, এবং বস্তাপচা ছবির সীমাহীন সরবরাহের জন্য পড়ে থাকছে খোলা ময়দান। শিল্পের জগতে বরাবরই ক্লাসিকসের থেকে বস্তাপচা বিকোয় বেশি। বটতলার বই বরাবরই টলস্টয়কে কোণঠাসা করে রাখে। এইখানে সরকারের ভূমিকার কথা আসছে— যদি তারা জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে চায়। শিল্পের জগতে কোনও অবাধ বাজার থাকতে পারে না। যেমন সরকার হেরোইন বিক্রি বন্ধ করা থেকে নিজেকে বিরত করতে পারে না, একইভাবে সরকার চুপচাপ বসে থেকে বলতে পারে না যে সত্যজিৎ রায়কে অবশ্যই বোম্বাইয়ের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। যদি ভারত সরকার একগুচ্ছ শাইলকের সমষ্টি না হতো, তবে তারা উপলব্ধি করত যে, যদি জনসাধারণকে কিছু দিনের জন্য সিরিয়াস চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ করে দেওয়া হতো, তবে তাঁরা বাণিজ্যিক সিনেমার ভয়ানক অর্থহীন মারদাঙ্গাকে প্রত্যাখান করতেন এবং আরো বেশী বেশী করে সমাজ-সচেতন চলচ্চিত্রের দাবি করতেন। একথা সত্যি যে, গোড়ার দিকে সত্যজিৎ রায়ের ছবি কলকাতায় উল্লেখযোগ্য সমাদর পায়নি। কিন্তু তিনি যত চলচ্চিত্র সৃষ্টি করতে শুরু করলেন ততই সত্যজিৎ রায়ের অনুগ্রাহীরা বিরাট সংখ্যায় বাড়তে লাগল। এবং শেষপর্যন্ত সত্যজিৎ রায়ের একেকটি নতুন ছবি পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্যিক সিনেমাকে বিপদসঙ্কেত দেখিয়ে দেয়। এর থেকেই ভারত সরকারকে শিক্ষা নিতে হবে যে, ক্লাসিক ছবি রিলিজের নিজস্ব ব্যবস্থা করা দরকার। যে করে হোক তা মানুষের কাছে পৌঁছানো দরকার। তাহলে সেগুলি অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়বে। অবশ্য যে সরকার টাকার থলি দিয়ে কেনা যায় তারা এই অবাধ বাজারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং বস্তাপচা ছবির প্রতিপক্ষ হিসাবে নতুন চলচ্চিত্রকে দাঁড় করাতে পারে না। এই বস্তাপচা ছবির এখন একটি সুন্দর নাম হয়েছে, তা হল 'মেইনস্ট্রিম সিনেমা' বা 'মূলধারার সিনেমা।' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে ভারতীয় শিল্পের মূল ধারা এই মূর্খামির স্রোতে বইছে।

এসবের শুরু 'পথের পাঁচালি' দিয়েই। ভারত সরকারের সর্বপ্রধান ব্যক্তিটি কলকাতায় ছবিটি দেখেছিলেন এবং দেখেই তাঁর মুখ আরক্তিম হয়ে যায়। কিছুটা উত্তেজিত স্বরে তিনি সত্যজিৎ রায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সেলুলয়েডে এইভাবে দারিদ্র দেখালে কি বিশ্বের কাছে ভারতের দুর্নাম হবে না? এ হলো এক প্রকৃষ্ট ভারতীয় প্রশ্নের নমুনা যা সব ভারতীয় শাসকই বিশ্বাস করেন। সত্যজিৎ রায়ের উত্তর তৎক্ষণাৎ

সেই সর্বপ্রধান ব্যক্তিটির মাথা নিচু করে দিয়েছিল। সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, দারিদ্রকে বজায় রাখা যদি আপনার পক্ষে দুর্নামের না হয়, তবে অমি তা দেখালে দুর্নামের হবে কেন?

এই চিৎকার বারে বারে উঠেছে যে, ভারতীয় সমাজের কঠিন বাস্তবকে চলচ্চিত্র যেন না দেখায়, বরং তা যেন মূল ধারার চলচ্চিত্রের মত চুনকাম করে দেখায়। অর্থাৎ প্রত্যেক ভারতীয় একটি মার্সিডিজ চালায়, একজন ট্যাক্সি-চালক বাড়ি ফিরে শুতে যাওয়ার আগে এয়ারকন্ডিশন মেসিন চালায় এবং প্রত্যেক ভারতীয় তরুণ উত্তেজক কেশ বিন্যাস করে। একমাত্র এই ভাবেই বিদেশে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি হতে পারে। এই চিৎকার যেমন শোনা গেছে পুঁজিপতিদের থেকে তেমনি বোম্বাইয়ের ক্ষুব্ধ, হতাশ অভিনেত্রীদের থেকেও। কলকাতায় আমেরিকান ফিল্ম 'সিটি অব জয়'-এর সুটিঙের সময় কলকাতার একটি বৃহৎ সংবাদপত্র লিখেছিলেন ঃ যদি সত্যজিৎ রায় কলকাতার নিদারুণ দারিদ্রকে দেখাতে পারেন, তবে এই বিদেশী পরিচালককে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে কেন ? যুক্তিটা অনেকটা এই রকম ঃ যেক্ষেত্রে শেক্সপীয়র অবাধে হিংসা ও ধর্ষণ বর্ণনা করেছেন, তখন বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রকে সেই সুযোগ দেওয়া হবে না কেন ? বৃহৎ পুঁজিপতিদের এই মুখপত্রগুলি সত্যজিৎ রায় ও নব্য ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করে এসেছে। তাদের বক্তব্য যে এইসব ছবি আপনাকে আনন্দ দেবে না, বরং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে দুশ্চিন্তায় ফেলবে। অতএব যেভাবে হোক এগুলি এড়িয়ে চলুন। আপনি সেইখানে চলুন যেখানে এক বর্ষণসিক্ত সুন্দরী তরুণী নেচে নেচে গান গাইছে, এবং একটি সুঠাম তরুণ এক হাতে দশজন শক্তিধরকে ধরাশায়ী করছে। এই হলো প্রকৃত ভারতবর্ষ যেখানে মুদ্রাস্ফীতি নেই, নেই কোন কষ্ট।

সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় শিল্পীদের সামাজের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা আছে। তাঁদেরকে অবশ্যই সত্যবাদী হতে হবে। দারিদ্রকে অনুসন্ধান করা, তার স্বরূপ উন্মোচিত করা এবং অমানবিকতার দিকটি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা শুধু সেই শিল্পীর অধিকার নয়, এ তার কর্তব্যও বটে। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে 'সিটি অব জয়' ছবির পরিচালককে এক পর্যায়ে ফেলাটা একধরণের ইতরামি। 'সিটি অব জয়' সম্পর্কে আপত্তির কারণ এটা ছিল না যে, সেখানে কলকাতার দারিদ্র দেখানো হচ্ছে। আপত্তি এই জায়গাতেই যে, সেখানে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। দেমিনিক ল্যাপিয়ের কলকাতার অন্ধকার জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এক লাইনও বাঙলা বা হিন্দি জানতেন না। ফলতঃ তিনি অবিষ্কার করলেন সুন্দরবনের বাঘ কলকাতায় ঘুরে বেড়ায়। তিনি বললেন, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় একদল উদ্বাস্তু হিমালয় থেকে পালিয়ে কলকাতায় আসে এবং সেইজন্যই নাকি এখন কলকাতায় এত ভিড়। তিনি বলেছেন কলকাতায় একবার নাকি এমন বন্যা হয়েছিল যে, কলকাতার প্রতিটি বাড়ির একতলা—হ্যাঁ প্রতিটি বাড়ির একতলা ডুবে গিয়েছিল এবং কিছু কিছু জায়গায় এত মৃতদেহ ভাসছিল যে জল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। জনগণের আপত্তি ছিল যে ঐ ছবিতে কলকাতার এক তথাকথিত মাফিয়াকে দেখানো হয়েছে। হিন্দী ছবির আমজাদ খান ও ওমরীশ পুরীর আদলে একে বানানো হয়েছে, যার সঙ্গে ভারতীয় বাস্তবতার কোনও মিল নেই। 'সিটি অব জয়' হলো ভারত তথা কলকাতার সাম্রাজ্যবাদ

বিরোধী শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করতে সাম্রাজ্যবাদের নির্বোধ প্রচার।

তাই সত্যজিৎ রায়ের কাজের মূল্যায়ন করার আগে রেনেসাঁসের সঙ্গে 'ভারতীয়' শব্দটি বাদ দেওয়া যাক। ইতিহাসে এ ধরণের কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। ঐতিহাসিকরা একটা সময় বাংলার রেনেসাঁসের কথা বলতেন। সেটা হলো ১৮২০ সালে শিক্ষক ডিরোজিও-র অর্বিভাব থেকে শুরু করে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্তের কীর্তি হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কাল পর্যন্ত। কিন্তু ঐতিহাসিকরা এখন এই প্রগতিশীল ধারনার জোয়ার থেকে রেনেসাঁস শব্দটি বাদ দিয়েছেন। তাঁরা এটিকে শুধুই বাংলার সংস্কার আন্দোলন বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এখন সঠিকভাবেই যুক্তি দেখান যে, রেনেসাঁস বলতে বোঝায় একটি বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব যারা রেনেসাঁস মতবাদের জোয়ারে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভবে বাধা দিতে চেয়েছিল। সুতরাং ভারতে 'রেনেসাঁ'সের কথা বলা অর্থহীন।

তবে সম্ভবতঃ সরকার থেকে "রেনেসাঁস" শব্দটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অন্য একটি উদ্দেশ্যে। তা হলো ওপর ওপর এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পের কিছু বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করা। ইতিহাস নিয়ে দিল্লির আমলাতন্ত্র সঠিক ভূমিকা পালন করেছেন, একথা কখনোই বলা যাবে না। তাঁরা যেভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পাদনা করিয়েছেন তা দেখলে আতঙ্কিত হতে হয়। তা পড়লে মনে হবে দেশ স্বাধীন হয়েছে কারণ এই দেশ আনুগত্য সহকারে খদ্দর পরেছে এবং ছাগলের দুধ খেয়েছে। এই ইতিহাস অনুসারে বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহ কখনোই সংগঠিত হয়নি, সুভাষচন্দ্র বসু ও আই এন এ-কে সন্দেহজনক ভাষায় পাঁচ লাইনে সেরে ফেলা হয়েছে এবং ভগৎ সিং-কে প্রকৃতপক্ষে একজন পাঞ্জাবী উগ্রপন্থী হিসাবেই সমালোচনা করা হয়েছে।

যদি রেনেসাঁস শব্দটি আলগাভাবেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তবে তাঁর কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। দেখতে হবে রেনেসাঁসের চিন্তাভাবনা তাঁর মধ্যে কতটা ছিল এবং কীভাবে সেগুলি তাঁর ছবিতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু হায়! এটা করতে হলে শুধু চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে জানলেই হবে না, রেনেসাঁসের সাহিত্য বিস্তৃত ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করছেন সেই অসংখ্য সচিবদের কাছে দুটোর কোনটিই নেই। যখন সত্যজিৎ রায় মুমূর্ষু, তখন তাঁরা সেই ব্যক্তিটির পবিচয় জানার চেষ্টা করছিলেন যিনি সোলাঙ্কিকে ব্যবহার করেছিলেন ফেবলারকে চিঠি পাঠানোর জন্য। তাঁরা আরো ব্যস্ত ছিলেন সেই পরিচয়টি গোপন করার জন্যই। এই রাস্তা দিয়ে তো রেনেসাঁস সাহিত্য ঢুকতে পারে না। টিভিতে শুধু একটা কথাই শোনা গেছে তা হলো সত্যজিৎ রায় ছিলেন আশ্চর্য বহুমুখী প্রতিভা, অর্থাৎ একজন মানুষ একইসঙ্গে চলচ্চিত্র পরিচালক, ডিজাইনার, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীত রচয়িতা, সুরকার, বইয়ের চিত্রকর এবং মুদ্রণ শিল্প ও তার ইতিহাস সম্পর্কে অথরিটি হতে পারেন এটা তাঁদের কাছে ব্যাখ্যার অতীত। সুতরাং এঁরা সত্যজিৎ রায়ের এই বহুমুখিনতার একটা লেবেল লাগিয়ে দিলেন। যেন রেনেসাঁসের মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো তাঁদের বহুমুখী প্রতিভা। কিন্তু লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চিকে বিশ্বের রেনেসাঁস প্রতিভার

মডেল বলে মনে করা ভুল। বরং তিনি ছিলেন সে যুগের এক ব্যতিক্রম। রেনেসাঁস মতবাদের অন্যান্য মহান প্রবক্তারা অনেকেই কেবলমাত্র একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এবং তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের সমকালে অন্যান্যদের ধারণাকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। কেউ কখনও শোনেননি যে মিকেলাঞ্জেলো ছবি আঁকা ও ভাস্কর্য ছাড়া অন্য কিছু করেছেন অথবা শেকস্‌পীয়ার নাটক লেখা ছাড়া অন্য কিছু করেছেন কিংবা মাকিয়াভেলি তাঁর রাজনৈতিক পুস্তিকা লেখা থেকে সময় বাঁচিয়ে বসে বসে হার্প নিয়ে গৎ তৈরী করেছেন। শিল্পের একটি দিক নিয়ে একাগ্র সাধনা করলেই কেউ রেনেসাঁস মানুষের সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়তে পারেন না।

ইউরোপে রেনেসাঁস এক বন্যার সৃষ্টি করেছিল যা পরিবর্তিত করেছিল সামাজিক সম্পর্ককে, মানুষের উপর চার্চের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে বড়ো রকমের আঘাত করেছিল, মানুষের সৃজনশীল শক্তিকে বাধামুক্ত করেছিল। অভিজাত ও সামন্তপ্রভুদের সামাজিক আধিপত্য থেকে বিতাড়িত করেছিল এবং সাধারণভাবে বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই ঝোড়ো পরিস্থিতির মধ্য থেকে যেসব ধারণার উদ্ভব হয়েছিল সেগুলিকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সত্যজিৎ রায়ের নামের সঙ্গে লেবেল লাগানোর আগে দেখতে হবে তাঁর ছবিতে সেগুলি কতটা প্রাসঙ্গিক। এখনই এ বিষয়ে কিছু করে ফেলার মত সময় আমাদের হাতে নেই। সুতরাং আমরা যেটা করতে পারি তা হলো সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি সাধারণ প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করতে। এবং সেইসঙ্গে এটাও দেখতে পারি যে তার সঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ধারণা কিছু মিলছে কিনা। অবশ্যই ভারতীয় রেনেসাঁস নয়, কারণ সেরকম কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

রেনেসাঁসে মানুষই এসে গেল পাদপ্রদীপের আলোয়। মানুষই হয়ে দাঁড়ালো মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। রেনেসাঁসের আগে মানুষ বলতে বোঝাতো একজন খ্রিষ্টানকে, যে আদিম পাপের দ্বারা অত্যাচারিত এবং ঈশ্বরের হাতের পুতুল। রেনেসাঁস তাকে এই বৌদ্ধিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিল এবং মানুষকে চিত্রিত করলো এমন একজন হিসাবে যে তার নিজের ইচ্ছা ও আবেগ দ্বারা নিজের ভাগ্য গড়তে পারে। যদি ভারতীয় রেনেসাঁস বলে কিছু ঘটে থাকত, তবে এতদিনে ভারতীয়রা ভাগ্যের দোহাই দেওয়া থেকে, তেত্রিশ কোটি দেবতার হাত থেকে, বিগত জন্মের পাপের বোঝা থেকে মুক্তি পেত।

পথের পাঁচালী ছবিতে সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছেন, তাঁর চরিত্রগুলি কষ্টভোগ করছে ভগবানের ইচ্ছায় নয়, বরং মানুষেরই সৃষ্টি দারিদ্রের কারণে। ভগবানের থেকেও ক্ষমতাশালী এক শক্তি তাদের ভিটে থেকে তাদের উচ্ছেদ করেছে — এই শক্তি হল এক সামাজিক ব্যবস্থা যা শোষণকে ক্ষমা করে।

মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী এই 'ঈশ্বর' ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চিত্র সাফল্যের সঙ্গে ধরা পড়েছে "দেবী" চলচ্চিত্রে। সেখানে একটি মেয়েকে দেখানো হয়েছে, সে এক সাধারণ গৃহবধু, ঘোষণা করা হয় সে দেবীর অবতার এবং সমস্ত অসুস্থ গ্রামবাসীকে সুস্থ করে তুলতে পারে। শেষে যে শিশুটিকে সে নিজের প্রাণের থেকেও বেশি ভালবাসে সে মুমূর্ষু হলে তার পায়ের সামনে হাজির করা হয়। অর্থাৎ যদি সে সেই ছেলেটিকে সুস্থ করে তুলতে পারে। কিন্তু মেয়েটি শিশুটির জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে সাহস

পেল না এবং সে পালাতে চেষ্টা করে। তার শাড়ি শতচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং কাজলের কালিতে মুখ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই ছবির সঙ্গে এদেশের সিনেমা মেশিন থেকে উদ্ভূত কয়েক ডজন ছবির তুলনা করা যেতে পারে। সেইসব ছবিতে দেখা যাবে একটি মুমূর্ষু শিশুকে দেবী মূর্তির সামনে রাখা আছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান তাকে মরবে বলেই জানিয়ে দিয়েছে। এবং এরপর অবশ্যই দেবীর ভজনা কবে এক লম্বা গান হবে। সেই দেবী সন্তোষী মা হতে পারেন অথবা স্থানীয় পর্যায়ের কোনও ভুলে যাওয়া দেবতা হতে পারেন। এরপর দেখা যাবে সেই পাথরের মূর্তি একটু হাসতে শুরু করল, শিশুটির দেহের উপর কয়েকটি ফুল ছড়িয়ে পড়ল। তারপর আহা সে কি দৃশ্য। সেরা সেরা ডাক্তাররা যা পারেনি, এক টুকরো পাথর তা করে দিল কয়েক সেকেন্ডে। শিশুটি চোখ মেলে চাইল এবং উঠেও বসল। এরপর ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরও একটি গান, যা শেষ হতে চায় না অথবা শিশুটির বাবা-মা আনন্দে কৃতজ্ঞতায় কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। এই ধরণের নির্লজ্জ কুসংস্কার প্রতি বছর একের পর এক ছবিতে দেখানো হয়। এগুলি কি ড্রাগসের থেকে কম বিপজ্জনক? যদি ড্রাগস আমাদের তরুণ প্রজন্মের শরীর নষ্ট করে থাকে, তবে এইসব চলচ্চিত্র নষ্ট করে তাদের মনকে। এই ধরণের বাজে ছবি তৈরি করা যদি অসম্ভব করে তোলা যায় এবং তার পরিবর্তে যদি সারা দেশে কম দামে "দেবী" দেখানোর ব্যবস্থা করা যায় তবেই সত্যজিৎ রায়ের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দেখানো হবে।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিচার করলে "দেবী" একটি বিপ্লবী চলচ্চিত্র। শত শত বছরে ভারতীয় গ্রামগুলির প্রত্যন্ত অঞ্চলে ধর্মকে যেভাবে মেনে আসা হয়েছে, এই ছবিতে সেই ধর্মকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। এদেশে ধর্মশাস্ত্র বলে কথিত সেই তন্ত্রমন্ত্রকে সরাসরি আঘাত হেনেছে। রামায়ণ ও মহাভারতের কদর্য প্রযোজনা না দেখিয়ে ভারতীয় টেলিভিশনের উচিত ছিল "দেবী" বারে বারে দেখানো। তাহলে হয়ত আজ অযোধ্যায় হনুমান বাহিনীর কীর্তিকলাপ দেখতে হতো না। গোড়ায় সত্যজিৎ রায় ভেবেছিলেন মহাভারতের পাশা খেলার দৃশ্য নিয়ে একটি বড় বাজেটের ছবি করবেন। তাতে তোশিরো মিফুনে-র মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতারা থাকতেন। তিনি এজন্য ভারত সরকারের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছিলেন। আমলাতন্ত্র সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তারা তখন অ্যাটেনবরোর "গান্ধী" ছবির জন্য কোটি কোটি টাকা জলে দিতে প্রস্তুত ছিলেন, যে ছবিতে তিনি ভারতে ইংরেজ শাসকদের সম্পর্কে অভিযোগগুলি স্খালন করতে দুঃসাহসী প্রয়াস নিয়েছিলেন।

রেনেসাঁসের মতাদর্শ ছিলো মূলতঃ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মতাদর্শ। সুতরাং তা সামন্ততন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের আত্মহননকারী অপরিমিতির মৃত্যু ঘোষণা করেছিল। সত্যজিৎ রায়ের "জলসাঘর" ছবিটি একটি অনন্য সৃষ্টি এই অর্থে যে, সেখানে জনৈক নিঃসঙ্গ-মদ্যপ অভিজাত তার বিরাট প্রাসাদে একা রয়েছে, জীবন থেকে এবং আশপাশের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। জমিদারের ক্লেদাক্ত মুখাবয়বে যেন তার বিনাশের ভবিতব্যই লেখা। তার দেমাক এবং আর্থিক দেউলিয়াপনা একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে। এই ছবিতে সামাজিক সম্পর্কগুলির ওলটপালটের ইতিহাস নিখুঁতভাবে ধরা আছে। এর তুলনা চলে শেকস্‌পীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলির সঙ্গে। ছবিতে সামাজিক প্রশ্নটি গুরুত্ব

পেয়েছে যখন জনৈক ছোট বুর্জোয়া সেই জমিদারের বাড়িতে ঘুরতে এল। সে শিল্প ও সৌন্দর্য সম্পর্কে উদাসীন। কিন্তু ধনী ও উদ্ধত। সে জমিদারের বাঈজির সামনে পয়সা ছুঁড়তে চেষ্টা করে, কিন্তু জমিদার তার ছড়ি দিয়ে বুর্জোয়াটির হাত টেনে ধরে। এর সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের জমিদার চরিত্রগুলির তুলনা করা যাক। সেখানে গ্রাম থেকে আসা এক গরিব ঘরের শিশু ছবির তরুণ হিরোয় পরিণত হয়েছে। এবং বাজি রেখে বলা যায় ছবিটির শেষে দেখা যাবে সে আসলে জমিদারের অনেক দিন আগে হারিয়ে যাওয়া সন্তান। তার বংশ পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি কৃষকের সন্তান ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করে তো আর শেষ পর্যন্ত কৃষকের সন্তান থাকতে পারেনা। বিষয়টি মণ্ডল কমিশনের বিরুদ্ধে ভাল প্রচার হিসেবে কাজে লাগতে পারে।

"শতরঞ্জ কি খিলাড়ী" ছবিতেও একইভাবে দেখানো হয়েছে যে মুঘল সামন্ত প্রভুদের দেশপ্রেম এতই শূন্য যে তারা দাবা খেলতে থাকল এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের মনিবকে জেলে বন্দী করল। দেশ অবদ্ধ হলো দাসত্ববন্ধনে।

সত্যজিৎ রায় নিজের সমসাময়িক জীবনকে তুলে ধরতে গিয়ে রেনেসাঁসের মতাদর্শকেও ছাড়িয়ে গেছেন। যেমন "সদ্‌গতি"। সম্ভবতঃ ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই প্রথম আমরা দেখতে পেলাম এক শ্রমজীবী মানুষের যন্ত্রণা জর্জর মুখচ্ছবি। আমরা এতদিন ভারতীয় সর্বহারাকে দেখতে পেয়েছি স্লোগান দেওয়া ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে। তারা সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একজন অমিতাভ বচ্চনের আশায়, যে নিজের ঘুসির আঘাতে শোষকদের কুপোকাৎ করবে। মুলধারার ছবি বরাবর শ্রমিকদের দেখিয়ে এসেছে মধ্যবিত্ত হিসাবে, যারা অপেক্ষা করছে এক পরিত্রাতার জন্য। সেই পরিত্রাতা আসবে এবং তাদের মুক্ত করবে। "সদ্‌গতি" হলো প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যা এক প্রকৃত ভারতীয় শ্রমিককে তুলে ধরল। এই শ্রমিক দুভাবে শোষিত। শ্রমিক হিসাবে শোষিত এবং নিচু জাতের মানুষ বলে শোষিত। প্রকৃতপক্ষে "সদ্‌গতি" হলো বর্তমান ভারতীয় সর্বহারা আন্দোলনের প্রাক্ ইতিহাস যা শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মণদের ঘৃণা ও ঔদ্ধত্যের পরিবেশে। "সদ্‌গতি" ছবির সত্যজিৎ রায় অবশ্যই একজন রেনেসাঁস চিন্তাবিদ নন। বরং সমসাময়িক বিশ্ব যে শ্রেণী-সংঘাতের মুখোমুখি হচ্ছে, তারই এক কবি সত্যজিৎ রায়।

আমরা তাঁর শেষ দিককার ছবিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি-তাহলে দেখব তাঁর অসাধারণ সমসাময়িক মননে একই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কাজ করছে। ইবসেনের "এনিমি অব দি পিপল" অবলম্বনে তৈরী "গণশত্রু" ছবিটি ইবসেনের নাটকের মত শেষ হয়নি। সেখানে ডঃ স্টকম্যান সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছেন যে, ব্যক্তি মানুষই সব সময়ে সঠিক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সব সময়ে ভুল। রায় জানতেন আজকের বিশ্বে একথা আর সত্য নয়, সেখানে ব্যাপকতম জনগণ সমাজের রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ। "গণশত্রু"-র সমাপ্তি ঘটছে এক শ্রমজীবী জনগণের মিছিল দিয়ে যারা স্টকম্যানকে তাঁর সংগ্রামে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে।

অথবা "শাখা-প্রশাখা"র দিকে তাকান। সেখানে সত্যজিৎ মধ্যবিত্তের অনৈতিকতাকে কশাঘাত করেছেন। এই মধ্যবিত্ত এখন পুঁজিবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্থোপার্জনের জন্য ছুটছে। অথবা "আগন্তুক" ছবিটি দেখুন। সেখানে সত্যজিৎ রায় তথাকথিত

সভ্যতাকে ভৎর্সনা করেছেন, যে-সভ্যতা বোতাম টিপে একটা শহর ধ্বংস করে দিতে পারে এবং যে-সভ্যতা আদিবাসীদের অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে। কারণ তারা খুন করার শিল্পটি করায়ত্ত করতে পারেনি।

সব দেখেশুনে একটা সন্দেহ জাগছে। এই রেনেসাঁসের ধারণাকে তুলে ধরার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ সত্যজিৎ রায়ের সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনাকে চোখের আড়ালে নিয়ে যাওয়া। এবং তাঁকে এক প্রাচীন খোদাই মূর্তির যাদুঘরে স্থান দেওয়া, যা নিয়ে আমরা আদৌ চিন্তাভাবনা করি না। এই সন্দেহ আরো জোরদার হয় যখন আমরা তাঁর "হীরক রাজার দেশে" ছবিটি বিশ্লেষণ করতে বসি। ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই ছবিটি তৈরি হয়ে ছিল। রূপকথার আড়ালে তৈরি এই ছবিটি সব ধরণের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এক বিস্ফোরণ। যারা চিন্তার কণ্ঠরোধ করে, শ্রমিকদের কারাগারে নিক্ষেপ করে, গ্রেপ্তার করে এবং নির্বাসনে পাঠায় তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়তে থাকে।

রেনেসাঁস শব্দটি সত্যজিৎ রায়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তিনি ছিলেন মানবজাতির বিবেকের একটা মুহূর্ত।

(১৫ই মে ১৯৯২, দিল্লীতে সাহিত্য আকাদেমি আয়োজিত সত্যজিৎ স্মরণসভায় পঠিত)

অনুবাদ ঃ অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

অপুর অন্তহীন যাত্রাপথে

মৃণাল সেন

টুকিটাকি লিখি, ছিনিবিনি আঁকি, কাটা ছেঁড়া করি, আবার ফিরে আসি সেই শুরুতেই। বার বার, প্রতিবার। ফিরে আসি সেই অপুতেই। অপুকে এড়িয়ে চলার উপায় আমার নেই। আমি কেন, কারুরই নেই। অপু যেন আমাদের সর্বাঙ্গে কেমন লেপটে আছে। আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে আমাদের, মনের মণিকোঠায় জাঁকিয়ে বসে আছে। অপুকে একটু ছুঁয়ে নিলে, ওর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটালে , খানিকটা অন্তরঙ্গ হলে কত সহজেই না সত্যজিৎ রায়কে নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়। তা ছাড়া অপুকে নিয়েই তো সত্যজিৎ-এর যাত্রা শুরু, ওঁর হাতেখড়ি এবং বিশ্ব জয়।

অপু, অপূর্বকুমার রায়, বিভূতিভূষণের সৃষ্টি, সত্যজিৎ যাকে উজ্জ্বল স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে তুললেন, বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলেন।

অপু! চিরকালের অপু। প্রতিদিনের অপু। অপু জন্মায়, অপু দোলনায় দোল খায়, ভরা শৈশবে উঠে আসে, প্রায় বালকত্বে পৌঁছয়, দিদির হাত ধরে পাড়া বেড়ায়, পাড়া ছাড়িয়ে বনবাদাড় চষে ফেলে, চলে আসে কাশবনে। নতুন এক পৃথিবী আবিষ্কার করে, টেলিগ্রাফের পোস্টে কান ঠেকায়, ছোটে কাশবন ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে, রেল লাইনের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, দেখে রাশ রাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। কোথায় যায় অপু জানে না, দিদিও না। শান্ত পুকুরে ছোট ছোট পোকার স্বচ্ছন্দ অস্থিরতার পাশাপাশি চলে ভাইবোনের ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি আর অফুরন্ত দস্যিপনা। অভাব অনটনে দুমড়ে পড়া সংসারের চাপ ওদের স্পর্শ করে না। ওসব নিয়ে ভাবে না—না অপু, না দিদি।

তারপর ..... একদিন... দিদিকে চিরকালের মতো হারিয়ে একেবারে একা হয়ে যায় অপু। সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি কেমন যেন 'বড়ো' হয়ে ওঠে ছেলেটা। অপুরা দেশ ছাড়ে।

এই কি সব? এই কি 'পথের পাঁচালী'র সব কথা? আর কিছু নেই? আছে, আরও অনেক কিছুই আছে, আছে সর্বংসহা সর্বজয়া ও হরিহর আর ইন্দির ঠাকরুণ, আছে প্রকৃতির অকৃপণ মাধুর্যের সঙ্গে নালেঝোলে মেশানো দারিদ্র্যের হাহাকার, আছে ছোট ছোট সংকীর্ণতা ও মহত্ত্বের সহ-অবস্থান। এবং 'পথের পাঁচালী'র মুখ্য চরিত্র কে বা কী, তা নিয়ে হয়তো তর্ক বা মতান্তরের জায়গা আছে অনেকটাই। তবু, অন্তত আমি তাই বলবো, অপু যেন জড়িয়ে আছে সর্বত্র এবং প্রতিটি মুহূর্তে, যে দৃশ্যে অপু অনুপস্থিত সেখানেও। এ যেন অপুরই অন্তহীন যাত্রাপথের পূর্বাভাস, এবং অবশ্যই আরও কিছু—অনাস্বাদিত, অভূতপূর্ব, অনির্বচনীয়।

প্রচন্ড বিক্রমে বিশ্বচরাচর কাঁপিয়ে রেলগাড়ি ছুটে যায় গঙ্গার ওপর দিয়ে। ওপারে বারাণসী—কাশী।

অপু বাপ-মা-র সঙ্গে চলে আসে কাশীতে। সেখানে বাবার মৃত্যু, এক সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়িতে মা-ছেলের আশ্রয়, মা রাঁধুনি, অপু ফাইফরমাশ খাটিয়ে। মা দেখে অবসর সময়ে গৃহকর্তা অপুকে দিয়ে তাঁর মাথার পাকাচুল বাছিয়ে নিচ্ছেন। মা ভয় পায় এবং একদিন সুযোগ বুঝে ছেলেকে নিয়ে ফিরে আসে সেই বাংলায়। মনসাপোতায়। এখানে কাশবন নেই। আছে বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেত। ধান ক্ষেতের ওপারে আকাশ যেখানে মাটি ছুঁই ছুঁই করছে, সেখানে রেললাইন। রেলগাড়ি চলে যায়। অপু মাকে দেখায়, মুহূর্তের জন্য অপু আর মায়ের সঙ্গে দর্শকও হয়তো কিঞ্চিত অবশ হয়ে পড়ে।

অপু কি তা হলে পুরুতগিরিই করবে? পৈতৃক পেশা? তাই করে দু-চার দিন, মন বসাতে পারে না। না, অপু লেখাপড়া করবে। কৈশোর ডিঙিয়ে যৌবনের কাছাকাছি আসার আগেই অপু একদিন সাবালক হয়ে ওঠে, অপুর জগৎটা একটু একটু করে 'বড়ো' হতে থাকে। ঐ মনসাপোতাতেই। বৃহত্তর জগতের টানে ঘরের টান আলগা হয়ে আসে আস্তে আস্তে। সত্যিই কি আলগা হয়ে আসে, না, অপুর সাবালাকত্ব আরও সম্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে! মা ও ছেলের সম্পর্কটা অনিবার্যভাবে জটিল হয়ে পড়ে, জটিলতা বাড়তে থাকে।

কলকাতায় অপু আর মা মনসাপোতায়। অপু অশান্ত, মা ধীরস্থির। মনোজগতে চিরকালের জটিলতা আধুনিক হয়ে ওঠে।

মা জানায় না, জানাতে চায় না যে মা অসুস্থ। নতুন আদলে মুখর হয়ে ওঠে অব্যক্ত জটিলতা। কোথায় যেন আমরা সেই মুহূর্তে এক নিষ্পাপ প্রতিশোধের আমেজ পাই মায়ের চোখে মুখে, মায়ের সমস্ত অস্তিত্বে।

তবু মায়ের অসুখের খবর পায় অপু। ছুটে আসে কলকাতা থেকে। সেই অপু যে ছুটিতে মায়ের কাছে যায়নি, যেতে চায়নি, পড়াশোনার ব্যাঘাত হবে বলে, সামান্য কটা টাকা পাঠিয়ে 'ম্যানেজ' করেছিল। সেই অপু যে একবার ট্রেন ধরতে না পারার ভয়ে একটু বকাঝকা করেই ছুটে গিয়েছিল স্টেশনে ট্রেন আসার আগেই এবং ট্রেন আসতে কি ভেবে উঠবো উঠবো করেও না উঠেই ফিরে এসেছিল মায়ের কাছে এক অপ্রতিরোধ্য টানে।

অপু ফিরে আসে মনসাপোতায়। এক ভয়ঙ্কর শূন্যতা মনসাপোতার বাড়িটাকে তখন গ্রাস করে থাকে। নেপথ্যে থেকেও মায়ের মৃত্যু পাঁজর-ভাঙা হাহাকার তোলে। অপু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। পরের দিন ভোর হতেই মায়ের সামান্য যা কিছু স্মৃতি অবশিষ্ট ছিল তাই তুলে নেয় স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতায়, স্টেশনের পথে বেরিয়ে পড়ে। মায়ের শ্রাদ্ধ সে কলকাতায় কালীঘাটেই সেরে ফেলবে এটুকুই আমরা জানতে পারি। এই মুহূর্তে সারা জীবনের মতো একা হয়ে পড়ে অপু। বন্ধনহীন এক মুক্ত (?) পুরুষ। একা, কিন্তু শক্ত, কঠিন, দৃঢ়। অপরাজেয় অপু।

কলকাতা। যে-কলকাতার সঙ্গে অপুকে আজ পাঞ্জা লড়তে হবে।

ভরা যৌবনের দরজায় এসে দাঁড়ালো অপু। অর্থের অভাবে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে অধ্যাপকের সার্টিফিকেট হাতে জীবনযুদ্ধে বেরিয়ে পড়ে অপু। বাইরে তখন ছাত্রদের মিছিল, দাবি-দাওয়ার মিছিল। যেমন তেমন একটা কাজ জোটায় অপু, কিন্তু গরিব হয়েই থাকে। কাজ করে, ঘরের ভাড়া মেটায় অথাবা মেটায় না, আর স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্ন দেখে যে সে লেখক হবে, উপন্যাস লিখবে। হোক না কিছুটা আত্ম-জৈবনিক, কিন্তু সেখানে থাকবে জীবনের কথা, বেঁচে থাকার কথা, পালিয়ে যাওয়ার নয়। অপু ঘরে বসে বাঁশি বাজায়, লেখা তৈরি করে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে সামান্য একটা কাজ করে।

তারপর সব যেন কেমন আকস্মিক ঘটে গেল, তরতরিয়ে, যেন নিজেরই অজান্তে —অপুর বিয়ে, আচমকা এক বিয়ে, কিছু দিনের দাম্পত্যের চাপা উত্তেজনা, পুত্রের জন্মলগ্নে স্ত্রীর মৃত্যু, অপুর নিরুদ্দেশ যাত্রা, গোটা পাণ্ডুলিপিটাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া, ডুবিয়ে দেওয়া এবং একদিন, বেশ কিছু পরে, ফিরে আসা নিজের সন্তানের কাছে। বছর চারেক বয়স তখন কাজল-এর। (বিয়ের কিছু পরেই নতুন বউয়ের চোখে চোখ রেখে অপু জিজ্ঞেস করেছিল ঃ তোমার চোখে কি? বলেছিল ঃ কাজল)

একদিন। কেউ তখন আশেপাশে নেই। অপুর সঙ্গে কাজলের এক আশ্চর্য সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অপু দুহাত বাড়ায়, কাজল প্রথমে একটু থেমে থেমে ভয়ে ভয়ে এগোয়, তারপর ছুটে আসে অপুর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে অপু তুলে নেয় ছেলেকে, কাঁধে চাপায়। কাঁধে চাপিয়ে অপু চলতে থাকে, যেন এতোদিনে সে তার পথ খুঁজে পেয়েছে।

অপু চলেছে নদীর কোল ঘেঁষে। কাঁধে কাজল। কিন্তু কোথায় চলেছে অপু? নদী বয়ে যায়। আর পার ঘেঁষে চলেছে অপু। কাঁধে কাজল-পরা মেয়ের ছেলে কাজল।

'পথের পাঁচালী'র সেই জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে এ যেন এক বিরামহীন পরিক্রমা, এক আশ্চর্য ইতিহাস, শুরু আছে, শেষ নেই। শুধু অপুরই নয়, শুধু গ্রাম বাংলারই নয়, এ যাত্রা গোটা বাংলার, গোটা ভারতের , সারা পৃথিবীর, মনুষ্যত্বের।

সত্যজিৎ

রবিশঙ্কর

সত্যজিতদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের আলাপ— আমার আর দাদা উদয়শঙ্করের — সেই তিরিশের দশকের গোড়া থেকেই। এরপর তো আমি মাইহারে বাবা আলাউদ্দিনের কাছে দীর্ঘ দিনের জন্য থাকলাম আর তালিম নিলাম। সেই তালিম শেষে বাজনার কেরিয়ার তৈরি করার জন্য চুয়াল্লিশ সালে বোম্বাই এলাম। চুয়াল্লিশের শেষ দিকে। তার আগে বছর কয়েক ধরে এখানে-ওখানে বাজাচ্ছি। তো বোম্বাই এসে বৌদি লক্ষ্মীশঙ্করদের মালাদের বাসার পাশেই একটা বাড়ী নিয়ে থাকছি আমরা। আমি, অন্নপূর্ণা আর পুত্র শুভ। মাইহারে থাকতেই একটা কঠিন রোগ ধরেছিল আমার— রিউম্যাটিক ফিভার। থিতু হওয়ার জন্য এইচ এম ভি-তে কিছু দিনের জন্য চাকরি নিয়েছিলাম; তারপর সরাসবি আই পি টি এ-র কালচারাল স্কোয়াডে যোগ দিই। ওদের সঙ্গে ছিলাম বছরখানেক। এসব নিয়ে বিশদ করে লিখেছি 'রাগ-অনুরাগে'-এ। সেই মালাদে থাকার সময়ই সতীদিদেব সঙ্গে আলাপ। সতীদি মানে সতী দেবী, রুমা গুহঠাকুরতার মা। রুমা তখন আট কি ন' বছরের বাচ্চা মেয়ে। সেই সময়ই সতীদিদের যোগাযোগে কোন একটা বাড়িতে প্রথম দেখি সত্যজিৎকে। লম্বা, ছিপছিপে— যাকে বলে lanky — লাজুক তরুণ (আমি নিজেও অবিশ্যি তরুণ তখন) ; প্রথম দর্শনেই খুব ভাল লেগে গিয়েছিল ওঁকে।

এবপর পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যে যখনই কলকাতায় গেছি এখানে-ওখানে দেখা হত ওঁর সঙ্গে। আমার তখন বেশ নাম হয়েছে সেতার শিল্পীহিসেবে, বেশ জনপ্রিয়তাও। সাধারণত উঠতাম গিয়ে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে, সত্যজিৎ তখন ডি জে কিমার বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করছেন; ওই পাড়া দিয়ে যেতে আসতে দেখতাম। কলকাতায় আসা-যাওয়ার ফাঁকেই জানতে পেরেছিলাম যে সত্যজিতেরও গভীর জ্ঞান ও আগ্রহ আছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিষয়ে। ভাল আঁকেন এবং নামও হয়েছে বিজ্ঞাপন জগতে। আর গোড়া থেকে যেটা জানতে বাকি ছিল না তা হল যে উনি হলেন আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখক, 'হ য ব র ল'-র রচয়িতা সুকুমার রায়ের পুত্র। বড় বাপের ছেলে শিল্পী হিসেবে নিজেও নাম করছেন এই খবরও তখন পাচ্ছি। একবার শুনলাম বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজে বিলেত ঘুরে এসেছেন। আরেকটা ব্যাপার যেটা ওঁর ছিল তা হল চল্লিশের দশকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ওঁর নিয়মিত যাতায়াত ; শুধু আমার অনুষ্ঠানই নয়, কোনও গুণী শিল্পীরই অনুষ্ঠান বলতে গেলে উনি মিস করতেন না।

এরপর যেটা হল সেটা এ রকম। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় জ্ঞানদা'র (জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ) ২৫ নং ডিক্সন লেনের বাড়িতেই উঠি তখন আমি কলকাতায় এলে। বেশ মনে আছে একদিন দুপুরে সত্যজিৎ সেখানে হাজির। ততদিনের জনরবে আমিও জেনেছিলাম যে উনি একটা নতুন ধরনের বাংলা ছবি তুলছেন। বিভূতিবাবুর 'পথের পাঁচালী' বই

নিয়ে ছবি। তো সেদিন দুপুরে উনি নিজের ছবির বিষয়ে একটু বলে তাতে সুর করার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। বললেন, আমি খুব কষ্ট করে ছবিটা করছি, আপনি এতে সুর করলে ভাল হয়। আপনি চান তো আপনাকে রাশ দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারি।

বোধ হয় তার পরের দিন টালিগঞ্জের 'ভবানী' সিনেমাতে রাশ দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। কী আর বলব। সেই রাশ দেখে আমি তো আবেগে, বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম। আমি ওঁকে মন উজাড় করে অভিনন্দন জানিয়ে বললাম, এ ছবির সুর আমি করছিই। বলতে নেই, রাশ দেখতে দেখতেই ছবির থিম মিউজিকটা যেন গুনগুন করে ভেতরে ভেতরে পাক দিয়ে উঠছিল। আমি রাজী আছি জেনেই উনি শহরের একটা লজ্ঝর স্টুডিয়োও বুক করে ফেললেন। এবং মাত্র এক রাত সময়ে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে যেভাবে 'পথের পাঁচালী'-র সুর আমি করতে পেরেছিলাম তা তো এক কথায় ইতিহাস।

'পথের পাঁচালী'-র সঙ্গীতের অমনটা হয়ে ওঠার একটা কারণ আছে। সত্যজিতের প্রথম ছবিতে অন্তরের যে নির্মল আবেগ, নিষ্পাপ সরল অনুভূতি খেলা করে সেটা যেন আমাকেও উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। বিভূতিবাবুর বইটিকে — তার গল্প, চরিত্র, পরিবেশ সব — যেন জলজ্যান্ত দেখেছিলাম চোখের সামনে। আমারও ভেতর থেকে যেন তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া, response হিসেবে সুরগুলো সব ঠেলে বেরিয়ে এল। অনেককেই পরে বলতে শুনেছি যে কী ভাবে, ওই পরিস্থিতিতে এটা, সম্ভব হল। আমি কিন্তু, সত্যি বলতে কি, মোটেই অস্বচ্ছন্দ বোধ করিনি। আমি তো ঘড়ি ধরে, মেপেজোকে, বাড়ি বসে হিসেবি কম্পোজিশন কোন দিনই করিনি, ফলে সেদিনের ওই কাজের ধরনে কোন সমস্যাই হয়নি। উপরন্তু ওই দুর্ধর্ষ ছবি, যা সমানে মগজে নড়াচড়া করছে।

সত্যজিতের পরের তিন-তিনটি ছবিতে সুর করেছি— 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার', 'পরশ পাথর' — লোকের ভালও লেগেছে, কিন্তু 'পথের পাঁচালী' 'পথের পাঁচালী' -ই। ইউনিক, অনন্য।

সত্যজিতের ছবিতে কয়েকটা জিনিস আমাকে সারাক্ষণ টানে— এক, ওঁর ডিটেলের চোখ। এত নিখুঁত করে কোনও দৃশ্য উনি ধরেন যার থেকে এক আঁচড় কমানো বা বাড়ানোর কথা ভাবা যায় না। দুই , ওঁর পরিশীলন, Sophistication. পরিচ্ছন্ন মনটারই ছাপ ছবির সর্বত্র। কাহিনী বিন্যাস, সংলাপ, পরিচালনা, সম্পাদনা, সঙ্গীত। তিন, একটা টেকনিকাল ফিনিশ। যার অভাবে অন্য অনেকেরই ছবি শেষ অবধি কী রকম অপরিণত থেকে যায়। এর মধ্যে ধরব ওঁর অভিনেতা অভিনেত্রীদের দিয়ে তাদের সেরা কাজ করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। এ ব্যাপারে উনি অতুলনীয়। পাঁচ বছরের বাচ্চা থেকে আশি বছরের বুড়িকে দিয়ে উনি যে কাজ করান তা দেখে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এর পর, চার নম্বর ব্যাপারটা হল, ফিল্ম তৈরির সমস্ত বিভাগের ওপরই ওঁর ওই কর্তৃত্ব , mastery. পৃথিবীর সেরা পরিচালকদের মধ্যে উনি এই কারণেই — he is, what they call, an auteur. ওতর। এর বাংলা কী, জানি না।

'পথের পাঁচালী' ছবি যেমন ভোলা যায় না, তেমনই কোনও দিনই ভুলব না বৃদ্ধা চুনীবালার অভিনয়। ওরকম অভিনয় বেশী দেখিনি । ভুলতে পারব না

'চারুলতা'-র মাধবীকে, অসাধারণ। আমার কাছে সত্যজিতের তৈরী শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্র। শ্রেষ্ঠ পুরুষ চরিত্র 'জলসাঘর' আর 'দেবী'র ছবি বিশ্বাস। আমার চোখের সামনে আজও ভাসে এই সব চরিত্র। এ ছাড়াও অসম্ভব সুন্দর কয়েকটি নারী চরিত্র তৈরী করে গেছেন সত্যজিৎ । এটা ওঁর এক সহজাত ক্ষমতা। আমার ভাল লেগেছিল ফরাসি টিভি-র জন্য করা ওঁর 'পিকু' ছবির মিউজিক, সামান্য 'ফু-ফা' ধ্বনি দিয়েই বানানো, কিন্তু ভীষণ যথাযথ appropriate, দৃশ্যগুলোর সঙ্গে মিশে যায়। দেখা হতে বলেওছিলাম ওঁকে।

সত্যজিতের ছবিতে নারী চরিত্র নিয়ে আরেকটা কথাও মনে আসছে এই প্রসঙ্গে। 'পথের পাঁচালী'তে চুনীবালা দেবী ও সর্বজয়ার ভূমিকায় করুণা বন্দোপাধ্যায়ের ওই অভিনয় সৃষ্টি ছাড়া, 'অপুর সংসার'-এ শর্মিলার ওই মধুর, নিষ্পাপ অভিনয় তুলে ধরা ছাড়া আরেকটি মহৎ চরিত্র তৈরি করেছিলেন 'চারুলতা'য় নায়িকার ভূমিকায় মাধবীকে দিয়ে কাজ করিয়ে। মাধবীর অভিনয়ে এই চারুলতার চরিত্র নিঃসন্দেহে ওঁর এবং ভারতীয় এবং দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্রে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। ক্যামেরার লেন্সের ভেতর দিয়ে যেভাবে চারুলতাকে এক রক্তমাংসের মনস্তাত্ত্বিক মানুষ হিসেবে দেখা হয়েছে — মানুষটিকে যেন লেন্স দিয়ে স্পর্শ করা হচ্ছে— কোনও প্রশংসাই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইঙ্গমার বার্গম্যান যেমন তাঁর ছবিতে লিভ উলম্যান বা বিবি অ্যান্ডার্সনের মতো নায়িকাকে একটা মস্ত প্যান দিয়ে জাগ্রত সত্তা (নিছক অভিনেত্রী নয়) করে তোলেন, সত্যজিৎও তেমনই একটা জীবন্ত নারী চরিত্র আমাদের উপহার দিয়েছিলেন 'চারুলতা'-য়। আমার আশা ছিল এরকম আরও মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র ও ছবির দিকে তিনি এগোবেন এর পর। কিন্তু তিনি হঠাৎই মোড় বদলালেন এবং এরকম ছবি আর আমরা পেলাম না ওঁর হাত থেকে। 'চারুলতা'ই তাই থেকে গেল, 'অপু' ত্রয়ী, 'দেবী', 'জলসাঘর' ও 'কাঞ্চনজঙঘা'র পর আমার শেষ প্রিয়তম ছবি।

তবে যে কারণে সত্যজিৎ শিল্পী হিসেবে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ উনি ষোল আনা বাঙালি, ষোল আনা ভারতীয়, অথচ সাঙঘাতিক রকম অন্তর্জাতিকও। ওঁর একটা জগৎ-ধারণা, জগৎ-দৃষ্টি আছে। ইংরেজিতে যাকে বলা যাবে an approach toward the universal. 'পথের পাঁচালী'র দৃশ্য, চরিত্র, কাহিনী, সুর যে ভাবে বাংলার গ্রামের হয়েও সারা জগতের। যেটা ছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, ছিল দাদা উদয়শঙ্করের মধ্যে। ওঁদের মতন সত্যজিতের আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার শক্তিটা এইখানেই। দেশের মাটিতে পা গেঁথে দাঁড়িয়ে দেশ-কালের সীমার বাইরে ছড়িয়ে পড়ার মনোভঙ্গিটাই আমি বরাবরই সমীহ করে এসেছি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। দাদার মধ্যে। বলতে পারি সত্যজিতের মধ্যেও। এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই আমাকে চিরকাল প্রেরণা দিয়েছে।

ভেসে আসে কণ্ঠস্বর

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি বড় হয়েছি সন্দেশ, মৌচাকের পরিবেশে। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায় এই দুটি নাম আমার শৈশবের সঙ্গে জড়ানো। ওঁদেব গল্প ও কবিতার নির্ঝর, দাদাদের সঙ্গে আমাকেও এক অপূর্ব রসের সন্ধান দিয়েছে। সে সব দিনগুলো ভোলার নয়। অনেক পরে, তাঁদেরই উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে যে আর এক নতুন জগতের সন্ধান পাব, এ ছিল কল্পনার অতীত।

এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে উল্লেখ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,যাঁর সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'র সর্বজয়াকে রূপায়িত করার জন্যে আমার ডাক পড়েছিল অপ্রত্যাশিত ভাবে । সর্বজয়াকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। যখন 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক উপন্যাস ছাপা হচ্ছে, সেই সময় থেকেই। মধ্যপ্রদেশের সুদূর এক পার্বত্য শহর বৈকুণ্ঠপুর। রাজ এস্টেটে বাবা এলেন ডাক্তার হয়ে। আমার মা সবরকম বাংলা মাসিক পত্রিকা রাখতেন। কলেজ পড়ুয়া আমার দাদারা আসতেন ছুটিতে। তাঁদের মধ্যে নানা আলোচনায় সর্বজয়াকে চিনে ফেললাম। কী বুঝেছিলেন জানি না অবশ্য। মনে আছে একদিন বাগানে এক পেয়ারা গাছের উপরে চড়ে বসে আছি, দাদা আমাকে ডাকছেন নেমে আসতে। আমি নিরুত্তর। তারপরে বললাম আমার নতুন শেখা অপূর্ব হিন্দিতে, 'হম করুণা নেই হ্যায়।' দাদা শুধোলেন 'তবে তুমি কে?' বললাম, 'হম সরব্‌জয়া।' সেই 'সরব্‌জয়া'কে প্রতিফলিত করার কথায় সর্বপ্রথম আমার শৈশবেরএই দৃশ্যটি মনে পড়েছিল ছবির মত। কত কথাই তো ভুলে গেছি। এটা কেন মনে রইল কে জানে!

আমার বিয়ের আগে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কোন যোগাযোগ হবার সুযোগ হয়নি। সেটা ঘটল বিয়ের কিছু পরে আমার স্বামী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে, তাঁর ইস্কুলজীবনের বন্ধু হিসেবে। তাছাড়া ওঁর স্ত্রী ও আমি একই কলেজে সমসাময়িক ছাত্রী। 'পথের পাঁচালী'র সর্বজয়া হবার ডাক যখন এল, তখন আমি মোটেই উৎসাহে নেচে উঠিনি। আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। সিনেমাজগৎ সম্পর্কে একটা ভীতি ও সংস্কার আমার মধ্যে পুরোপুরি ছিল। যদিও ইতিপূর্বে আমি আড়াই বছরের উপরে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে অভিনয় করেছি। অভিনয়ে আমার হাতে খড়ি সেখানেই। তবু, এ মঞ্চ যেমন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ থেকে আলাদা, সিনেমাও যে সেরকম হতে পারে, এ ধারণা বা বিশ্বাস কোনটাই আমার ছিল না। বাড়ি ফিরে এসে সত্যজিৎকে একটি পোস্টকার্ড ছাড়লাম। পারব না, করব না।

আমার কোনো আপত্তি অবশ্য টিকল না। সে জন্যে দায়ী আমার স্বামী ও স্বর্গত শ্বশুর-শাশুড়ী। এঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ ছবি একটা নতুন ধরনের সৃষ্টিধর্মী ছবি হবে। আমি পস্তাব না। কোন ভাল পরামর্শ গ্রহণ করা আমার ধাতে ছিল না। প্রায় উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত গেলাম কিছুটা সন্দিগ্ধ মনে। ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঠেলাঠেলির মধ্যে।

একটা গ্রাম, সে গ্রামের নামও আবার বোড়াল-নিশ্চিন্দিপুর। বাড়িটা ভাঙা, সেখানে উঠোনের একদিকে মাটির রান্নাঘর আর দাওয়া, উল্টোদিকে ইন্দির ঠাকরুণের ঘর। ঘরের সামনেই একটা ছোট্ট লেবুগাছ। শিকহীন কাঠের জানলা, তার পিছনে পুকুর; অগোছাল ঝোপ-ঝাড় ঘিরে আছে বাড়িটাকে। আছে আমবন, বাঁশবন আর মেঠোপথ। গোয়ালঘরে গরু ডাকে হাম্বারবে। সন্ধ্যেবেলা সেখানে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালে সর্বজয়া।

ভাঙ্গা পাঁচিল ঘেরা, দাঁত বের করা বাড়িটা মুহূর্তে আমার প্রাণ কেড়ে নিল। তার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেল পরনে লালপাড় আধময়লা শাড়ি সেমিজ, গলায় মাদুলি, হাতে শাঁখা, মস্ত সিঁদুর টিপ পরা সর্বজয়া। সে আমি নয় । আমি কে জানি না। আমার চারিধারে নতুন মুখের মেলা। ক্যামেরাম্যান ও অন্যান্য টেকনিশিয়ানরা । আছে ছোট ছেলেমেয়েরা। একটা সময়ে আমার পাঁচ বছরের মেয়ে রুণকিও (ছোট দুর্গা) সে মুখের মেলায় যোগ দেয়। ইন্দির ঠাকরুণ ভাঙা কোমর, অসহায়। হরিহর আগামী দিনের স্বপ্নে মসগুল। শুধু লড়াই করে যায় একা সর্বজয়া- দারিদ্রের সঙ্গে, অকরুণ, প্রকৃতির সঙ্গে।

এই মায়া, এই তিক্ত-মধুর জীবনের যাদু যিনি দৃষ্টিপথে তুলে ধরেছিলেন,তিনি সত্যজিৎ রায়। এর আগে কখনো শুটিং দেখিনি, একমনে কর্মরত এক জায়গায় এত মানুষ দেখিনি, সবাই ব্যস্ত-সমস্ত। শুধু একজন লোক, স্বল্পবাক। হাতে একটা লাল খেরোর খাতা (যেখানে অনেক ছবি আঁকা আছে ফ্রেম করে) তিনিই এই যজ্ঞের হোতা। তাঁকে দেখা যায় ক্যামেরার পিছনেও, যেখানে অধিষ্ঠিত নবাগত সুব্রত মিত্র।

বংশী চন্দ্রগুপ্ত ব্যস্ত তাঁর নিজস্ব ভাঙা-চোরা-ছেঁড়ার কাজে। জানলাম তাঁকে বলে আর্ট-ডিরেক্টর। (বংশী আমাদের 'অ্যারালডাইট' দিয়ে নাকছাবি পরাতেন, বহুকাল পর্যন্ত ওই গন্ধ নাকে এলেই মনটা উতলা হয়েছে, সেইসব দিনগুলোর কথা ভেবে।) প্রকৃতির আলোকে 'রিফ্লেক্টার' দিয়ে স্পষ্টতর করার কাজে যাঁরা হাত লাগাতেন, তাঁরা তখন ছিলেন সুব্রত মিত্রের সহকর্মী, পরে নাম করা লোক, কেউ ডিরেক্টর, কেউ ক্যামেরাম্যান। তাছাড়া, আরও কত মানুষ, যেন একসূত্রে গাঁথা আমরা সবাই, একই লক্ষ্যের যাত্রী। সেই পথের যিনি প্রদর্শক, তাঁর সম্পর্কে দেখি সকলেরই দৃঢ় প্রত্যয়।

এই প্রত্যয়ের মূলে কী ছিল, তাঁর ব্যক্তিত্ব, অথবা অন্য কোনও গুণ? চলচ্চিত্র জগতে কোন পরিচিতি না থাকার দরুন অর্থাভাবে 'পথের পাঁচালী'র কাজ স্থগিত রাখতে হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এ সব কাহিনী আজ সকলেরই জানা। আমার নিজের যে-কথা মনে দাগ কেটেছিল, তা হল অন্য এক উপলব্ধি। সত্যজিৎ কী চান, সে ধারণায় উনি সুনির্দিষ্ট।

'পথের পাঁচালী'র কোন 'স্ক্রিপ্ট' বা স্ক্রীন-প্লে আমি হাতে পাইনি। মুখের কথায় ও লিখিত 'ডায়লগ' দিয়ে পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিতেন পরিচালক। মনে পড়ে প্রথম দিন দাওয়ায় বসে আমাকে একটা ডায়ালগ পড়তে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের গোষ্ঠীর একজনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সরবে— "বড্ড গোটাগোটা কথা, বড্ড স্পষ্ট উচ্চারণ, এ চলবে না।" কিন্তু ধন্য পরিচালকের ধৈর্য। আমি তারপরে শিখলাম সর্বজয়ার নিজস্ব বাচনভঙ্গি ও ঈষৎ জড়ানো উচ্চারণ।

ঘন বাঁশবন ও আমবন ঘেরা বাড়িটায় বেশীক্ষণ সূর্যের আলো থাকত না। বড়জোর বিকেল চারটে পর্যন্ত। তারপরে আর বাড়ির ভেতর কাজ করা সম্ভব হতো না প্রায়ই। সেই পাতার ফাঁকে মেঘ আর নীল আকাশের লুকোচুরি খেলার মধ্যে ধরতে হত সঠিক আলো। সত্যজিতের 'বাস্তবতা' সম্পর্কে আমার নতুন কিছু বলার নেই, ছবিতেই তার পরিচয়। কিন্তু আমি অনেকসময় সেই বাস্তবতার শিকার হয়েছি। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। সর্বজয়া রান্নাঘরে উনুনের সামনে বসে। হরিহর এসে ঢোকে, বলে কী রাঁধছ? ইত্যাদি। শট আর হয় না, সমস্ত যখন রেডি, তখন একটা মেঘ এসে আলোকে ম্লান করল, বা ঠিক সেই সময়ে ডায়ালগের মধ্যে কোকিল ডেকে উঠল, বা ফোড়নের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠলো মুখের কথার আওয়াজকে। আমি বসেই আছি জ্বলন্ত কাঠের চুলোর সামনে, আগুনের হলকায় লাল মুখ করে। বারকয়েক শট বন্ধ হওয়ার পরে সাঙ্ঘাতিক বদমেজাজী আমি 'রিয়ালিজম'কে গাল দিতে দিতে উঠে চলে গেলাম। কেউ আমায় কিছু বলল না। পরিচালকও নিশ্চুপ। কিছুক্ষণ পরে অনুতপ্ত আমি ফিরে এসে বসলাম পিঁড়িতে। (বলে রাখি, সে বয়সে আমার মেজাজটাই আমাকে নিয়ন্ত্রণ করত, আমি মেজাজকে নয়।) এই ঘটনা আমাকে কিছুটা চিন্তার খোরাক দিল। খুশি হতাম যদি বকুনি খেতাম, তাহলে আমার রাগটা সার্থক হত। এ যেন রাগ করে আমিই দোষী।

'অপরাজিত'র কাজ শুরু হয় 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পাবার অল্প কিছুদিন পরেই। এ গ্রামে সম্পূর্ণ ভিন্ন পবিস্থিতি। কোথায় সেই বাঁশবন, যার ছায়ায় ইন্দির ঠাকরুণকে কোলে তুলে নিলেন হরি, বা সেই ঘন আমবনের অলো আঁধার। এখানে শুধু ধু ধু মাঠ, দূরে রেললাইন, যেখানে খেলনার মত রেলগাড়ি যায় শূন্য আকাশে ধোঁয়া উড়িয়ে। সর্বজয়ারই মত রিক্ত এই গ্রামের চেহারা। জীবনে সম্বল অপু, সেও চলে গেল দূরের হাতছানির টানে।

'অপরাজিত'র সময়ে আমাকে একটা লিখিত রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল। সর্বজয়া ততদিনে আমার সঙ্গে একাত্ম। পরিচালক আমার অভিনয়ের স্বাধীনতায় কোনদিনই হস্তক্ষেপ করেননি, জায়গাটা বুঝিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'দেখি তো কর একবার', মনঃপূত হলেও কখনও তাঁর প্রশংসাবাণীতে আত্মপ্রসাদ লাভ করার সুযোগ পাইনি। শুধু একবার মনে আছে মনসাপোতা গ্রামে অপু এল ছুটিতে; সর্বজয়া কুয়ো থেকে জল তুলছিল। সাড়া পেয়ে দড়ি বালতি ফেলে কাছে এল ছেলের। গালে হাত বোলাল, একবার এ চোখের দিকে, আর একবার অন্য চোখের দিকে তাকাল। ডায়ালগ— 'তুই কি রোগা হইচিস না আরও লম্বা হইচিসরে?' এ শটের শেষে পরিচালক হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন 'ফার্স্ট ক্লাস'। অসম্ভব আনন্দ হয়েছিল মনের ভিতরে।

পূর্ব নির্ধারিত শটের ফ্রেমের মধ্যে নতুন কিছু ঘটলে সত্যজিৎ ছোট্ট কারণেও উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। যেমন 'পথের পাঁচালী'তে বৃষ্টির মধ্যে যখন হঠাৎ একটা কুকুর দৌড়ে উঠান পেরিয়ে দাওয়ায় আশ্রয় নেয়, ঘুমন্ত সর্বজয়ার মুখের উপরে একটি মাছি যখন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তাতেও তিনি মহা খুশি। বেনারসে 'অপরাজিত'র একটি শটে দেখি উনি শব্দ ও কথার আওয়াজ-এর সমস্যা খুব সহজেই সমাধান করে ফেললেন। সর্বজয়া মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে উঠোন ধুচ্ছে। সেইসঙ্গে নিজের মনে বকবক করছে। দেখা গেল ঝাঁটার আওয়াজে ডুবে যাচ্ছে কথাগুলো। কী করা যায়? একটু ভেবেই উনি

বললেন 'ঠিক আছে, নিজের মনে বকবক করছে যখন সর্বজয়া , সে কথাগুলো কারও না বুঝলেও চলবে।' ওই 'সেট'-এ একটি তৃষ্ণার্ত বাঁদর সর্বজয়াকে তাড়া করে। বাঁদর তাড়ানোর একটা শট আগেই ঠিক করা ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যাপার দাঁড়াল অন্য। সবাই হতভম্ব। এই ঘটনার কিছুটা ক্যামেরায় এসেছিল,কিন্তু সুব্রত ক্যামেরা 'প্যান' না করলে বাকিটা আসার কথা নয়। সত্যজিতের কী আফশোষ। আর আমি বাঁদরের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে করতে ভাবছি ও যদি আমার মুখটা আঁচড়ে দেয়, তাহলে তো শুটিং-এর এখানেই ইতি।

আর একবার ফিরে যাই 'পথের পাঁচালী'র একটি বিশেষ দৃশ্যে, যেখানে হরিহর দুর্গার জন্যে আনা শাড়ি তুলে দেয় সর্বজয়ার হাতে। এ দৃশ্যের জন্যে পুরো ঘটনাটা লিখে আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'তৈরী হয়ে এসো'। যথাসাধ্য তৈরী হয়ে গিয়ে দেখি, আমার জন্যে যেন সবাই সব কিছু তৈরী। এমন কি প্রকৃতিও। ঘোলাটে আকাশ, ঝড়ে পাঁচিলটা ধসে পড়েছে। ধসে পড়েছে ভাঙা গোয়াল ঘরটাও। উঠোনে থৈ থৈ করছে জল। টেকনিশিয়ানরা স্তব্ধ পাথরের মত। যেন এক অজানা অঘটনের আশঙ্কায় সবাই বিমূঢ়। এ সবই আমাকে অদ্ভুতরকম সাহায্য করেছিল সর্বজয়ার পুঞ্জীভূত বেদনার প্রস্ফুটনে। তখন অবশ্য আমার এত বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ছিল না, তবে অনুভূতি দিয়ে সমস্ত পরিবেশটাকে গ্রহণ করেছিলাম। এই শটের জন্য (যার retake হওয়া সম্ভব নয়) পরিচালকের কাছে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ। একটা কথা উনি আমাকে প্রথম দিনই কাজের সময় বলেছিলেন সেটা আমাকে সমস্ত সময় সাহায্য করেছে। বলেছিলেন 'ক্যামেরাকে ভুলে যাও।' এ কথাটা আমি অন্তরের সঙ্গে মেনেছি।

আমি যে দিনগুলির কথা বলছি, সে দিনগুলো আজ শুধু আমারই সম্পত্তি। আজকে সত্যজিৎ রায় সে সব দিনের সীমানা পেরিয়ে অন্য আর এক লোক। প্রথম ছবির কয়েক বছরের মধ্যে 'দেবী' ও 'কাঞ্চনজঙঘা'য় কাজ করতে গিয়ে তাঁর উন্নততর পরিচালনার পার্থক্য চোখে পড়েছে। শিল্পীদের কাছে ওঁর প্রত্যাশাও অনেক বেশী অথচ ক্ষিপ্রতর, কারণ ইতিমধ্যে তিনি পেশাদারী অভিনেতা, অভিনেত্রী নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত। তাই কাজ এগোয় অনেক বেশী দ্রুত। আমি তাতে অভ্যস্ত নই। আমার অভিনয় অভিজ্ঞতায় আধো-ঘুমন্ত গ্রামের মত 'শট'ও চলত রোদ আর মেঘের খেয়ালখুশির সঙ্গে তাল রেখে। মাঝে মাঝে কানে আসে সুব্রত মিত্রর অসহিষ্ণু চিৎকার, 'সুবীরবাবু এটা কি থাকবে?' অর্থাৎ এই আলোটুকু কতক্ষণের? আর একটা মেঘ ধেয়ে আসছে না তো? মনে হয় আকাশের তলে কাজ করতে যতটা আনন্দ, স্টুডিওতে যেন ততটা নয়— সময়সীমা যেহেতু খুব সংকীর্ণ।

একটা মজার কথা মনে পড়ল। খুব অপ্রাসঙ্গিক নয়, আমার অজ্ঞানতার পরিমাণটা বোঝা যাবে। 'জলসাঘর'-এর শুটিং দেখতে গিয়ে বিরাট ক্রেনে ক্যামেরা শুদ্ধ সুব্রত ও সত্যজিৎকে বহু উঁচুতে নিমেষে উঠে যেতে দেখে পার্শ্ববর্তিনীকে সবিস্ময়ে জিগ্যেস করেছিলাম, 'ওটা কি?' উত্তরদাত্রী আমার চেয়েও বিস্ময়াহত। বললেন, 'তুমি জান না, তুমি সিনেমায় কাজ করেছ না?' তা করেছি, কিন্তু 'পথের পাঁচালী'তে দেখেছি 'টপ শট 'এর জন্যে বাঁধা হয়েছিল একটি অনেক উঁচু বাঁশের মাচা।

অভিনয়ের আনন্দ ছাড়াও আমার একটা মস্ত বড় উপরি লাভ হয়েছিল। এমন

কিছু মানুষের কাছাকাছি এলাম যাঁদের সঙ্গে এই পরিবেশ ছাড়া ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কোনরকম সম্ভাবনা ছিল না। যেমন চুনীবালা দেবী ওরফে ইন্দির ঠাকরুণ ওরফে আমার মাসিমা। আশ্চর্য স্নেহ করতেন আমাকে। খাবার সময় পেরিয়ে গেলেও উনি আমার অপেক্ষায় থাকবেন, আমি শুটিং সেরে এসে খাবাব দিলে তবে উনি খাবেন। যে রোগশয্যা থেকে তিনি আর উঠলেন না,তারই প্রথম দিকে আমি ও আমার স্বামী ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম পাইকপাড়ায়। এত খুশি হয়েছিলেন, মেয়েদের ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, "ওরে করুণা এয়েচে, জামাই এয়েচেন, তোরা আয় ইদিকে।" তখনও ভাবিনি এই ওঁর সঙ্গে শেষ দেখা।

তেমনি অযাচিতভাবে সৌহার্দ্য ও স্নেহ পেয়েছি বেবাদি ও অপর্ণাদির কাছ থেকে। এই দুজনের কেউ আজ নেই। নেই ছবিদা, নেই পাহাড়ীদা, নেই অনুভা। কেমন করে ভুলি এঁদের স্নেহ ও বন্ধুত্ব। বড় তাড়াতাড়ি সবাই চলে গেল। পঙ্গু হয়ে গেল বাংলা ছবি বেশ কিছুদিনের জন্য। ছবিদা ছাড়া কি 'জলসাঘর'-এর কথা ভাবা যায়, বা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'?

সত্যজিতের যে বাস্তবতা অনুরাগ বাংলা ছবিকে এক ধাক্কায় ভিন্নতর শিল্পবোধে উন্নীত করল, তার একটা দিক হচ্ছে মেক-আপের অবসান। এমন কি আমার যে নিজস্ব মেক-আপ ছিল, চোখে কাজল আর মুখে পাউডার, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। অপর্ণাদির কাছে শুনেছি ওঁদের শুভানুধ্যায়ীরা সত্যজিতের ছবিতে বিনা মেক-আপে কাজ করার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন, তাতে নাকি পর্দায ওঁদেব দেখাবে ভূতের মত, এবং ওঁদের পেশাদারী কর্মজীবনের ওইখানেই শেষ অঙ্ক। তবু ওঁরা এসেছিলেন নতুনের সন্ধানে।

'কাস্টিং'-এর ক্ষেত্রে সত্যজিতের নির্বাচন মনোহাবিত্বের দিকে ততটা যায় না, যতটা যায় চরিত্রানুগ চেহারার দিকে। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। দুর্গার মৃত্যুর পরে হরিহরের কাছে ভেঙে পড়ার দৃশ্যের জন্য ওঁর নির্দেশ ছিল, 'কাঁদতে গিয়ে তোমার মুখ যতই বিকৃত হোক, হতে দাও।' আবার খুঁটিনাটি বিষয়েও প্রখর দৃষ্টি। দুর্গাকে চুলের মুঠি ধরে বার করে দিয়ে সর্বজয়া বিফল আক্রোশে অপমানে কেঁদে ফেলে। তারপরে সামলে নিয়ে চোখ মোছে। এ শট্‌টা উনি বাতিল করলেন। বললেন, 'তুমি যে ভাবে চোখ মুছলে, ওটা গ্রামের নয়, শহরের।' আমায় দেখিয়ে দিলেন চোখ মোছার ধরণের তফাৎ। হাস্যরসকেও নিয়ে গেলেন অন্য স্তরে। কাতুকুতু না দিয়েও যে মানুষকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হাসানো যায়, স্বাভাবিক কার্যকলাপের সাহায্যেই, বাংলা চলচ্চিত্রের এও একটা নতুন দিক।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতীন্দ্রিয়বাদকে স্পর্শ না করে, শুধু তাঁর গীতিকাব্যের মূর্ছনায় সত্যজিৎ উত্তীর্ণ কবলেন 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রকে। অনেক সাধারণ দর্শকের কাছে শুনেছি, যে-সুর 'পথের পাঁচালী' মনের মধ্যে বণিয়ে দিল, সত্যজিতের অন্য কোনও ছবিতে সে সুর পাওয়া যায় না। অতএব তাঁদের মতে 'পথের পাঁচালী'ই সত্যজিতের শ্রেষ্ঠ ছবি।

দর্শকসাধারণের প্রত্যাশার বিপরীতধর্মী ছবি 'অপরাজিত'। ছেলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা ও ছেলের মধ্যে একটা দূরত্ব গড়ে ওঠে। এ শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র মানবচরিত্রের চিহ্ন। শেষ সম্বল অপুর সঙ্গে বিচ্ছেদেব চিন্তায় সর্বজয়া আকুল,

অপুর দৃষ্টি বৃহত্তর পৃথিবীর দিকে ধাবমান। ছুটিতে গ্রামে এলে, সর্বজয়া ওকে ট্রেন ধরার জন্যে সময়মত না জাগিয়ে আটকাবার চেষ্টা করে, রুষ্ট অপু কোনমতে ট্রেন ধরার জন্যে স্টেশনে চলে যায়, কিন্তু ট্রেন পেয়েও সে আবার বাড়ি ফিরে আসে, মায়ের কাছে। সুতরাং সে যে মাকে ভালবাসে না বা মার কথা একেবারে ভাবে না, তা নয়। মা ছেলের এই টানাপোড়েনের মধ্যে মা তাকে পথ ছেড়ে দেয়। কিন্তু অসুস্থ শরীরে আর একবার ছেলেকে কাছে পাওয়ার আশা মরে না শেষ পর্যন্ত। বাইরে ধু ধু মাঠের ওপারে ট্রেন যায় বাঁশী বাজিয়ে, ধোঁয়া উড়িয়ে। ওতে অপু এল বুঝি। মা বলে কে ডাকল? না, দরজার ওপারে কেউ নেই। অন্ধকার শূন্যতায় শুধু জোনাকির আলো।

'পথের পাঁচালী' দেখে কান্না আসে বুক ভবে। সেই কান্না আনে catharsis, অশ্রুজলে মন হালকা হয়। 'অপরাজিত' দেখে চোখে জল আসে না, কিন্তু মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। 'পথের পাঁচালী'তে ঘটনা ও চরিত্রের প্রাচুর্য। জন্ম থেকে (অপুর জন্ম) মৃত্যুর (ইন্দির ঠাকরুণের, দুর্গার) দোলার মাঝে গ্রামজীবনের ছবি বিধৃত। 'অপরাজিত'য় বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের বিস্তীর্ণতার পরে হরিহরের মৃত্যু সর্বজয়ার সংসার জীবনে ছেদ আনে। কাহিনী বিন্যাসের কেন্দ্র অবশেষে জনবিরল গ্রাম মনসাপোতা ও মাতাপুত্রের মধ্যে মানবসম্পর্কের আনন্দবেদনার পরিক্রমণ।

কিন্তু এ তো প্রাত্যহিক। এ তো সকলের জানা। এ তো অবশ্যম্ভাবী। একেই তো আধুনিক ভাষায় বলে generation gap। এ নিয়ে ছবি করার তাৎপর্য কী? কোথায় এতে নাট্যরস?

'অপরাজিত'কে বাংলার চলচ্চিত্রসমালোচকরা ও দর্শকসাধারণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। 'পথের পাঁচালী' দেশে আলোড়ন তুলেছিল, 'অপরাজিত' পেল সম্পূর্ণ বিমুখতা। সেই বিমুখতায় ধাক্কা দিল এসে পশ্চিমী দেশের অপ্রত্যাশিত মূল্যায়ণ। হাতের কাছে একটাই পাচ্ছি, বেরিয়েছিল লণ্ডনের 'Times',-এ

''Mr Ray's new film ... reveals again the young director's power to endow even trivial everyday happenings with poetic beauty and to integrate his haunting images into sequences of such perfect rhythm that even monotony becomes entrancing. The film may never be a box-office hit, but it is a superb example of that poetic realism which seems to be Ray's distinctive, inimitable style.''

সত্যজিতের পরবর্তী ছবিগুলির মধ্যে প্রথমেই লক্ষণীয় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য। ১৯৫৮ সালের দুটি ছবি,'পরশ পাথর' ও 'জলসাঘর' সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। প্রথমটি রাজশেখর বসুর হাস্যকরুণ রসে টইটম্বুর, দ্বিতীয়তে বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের বিয়োগান্ত শেষ পরিচ্ছেদ ও যন্ত্রশিল্পের অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক পদধ্বনি। ১৯৬০ সালে 'দেবী'। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি ছোটগল্পের মধ্যে যা বলতে চেয়েছিলেন, চলচ্চিত্রে তার প্রতিভাস বক্তব্যকে তুলে ধরল নির্দয় অঙ্কুশের মত। ধর্মান্ধতা বিচারবুদ্ধিকে কতখানি ঘোলাটে করে তুলতে পারে ও একটা হতে-পারত সুখী পরিবারকে সমূলে বিনষ্ট করতে পারে, তার সাক্ষ্য 'দেবী'। এই পরিবারে ব্যতিক্রম হরসুন্দরী (দেবী'র বড় জা) যে তার দেবরের মতই একটা সুস্থ চেতনার অধিকারী। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল হরসুন্দরীর

ভূমিকায় অভিনয় করার।

হরসুন্দরীর স্বাতন্ত্র্যবোধ, অবিশ্বাস, জেদ ও সেই সঙ্গে অসহায়তা আমাকে স্বল্পপরিসরে একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি দেবার সুযোগ দিয়েছিল।

সত্যজিৎ নির্মিত চলচ্চিত্রগুলি প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে বিস্তৃত হয়েছে এ বিষয়ে বিতর্কের প্রশ্ন নেই। চলচ্চিত্র মাধ্যম তাঁর কাছে এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র। ব্যবসার ও দর্শক-প্রত্যাশাকে অগ্রাহ্য করা কোন চলচ্চিত্রকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। সত্যজিতেরও নয়। কিন্তু তবু আজকের ভাষায় বলা চলে সত্যজিৎ আনলেন 'গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা' একসঙ্গে, বিধেনিষেধের বেড়া ভেঙে। তাঁর অবদানের সংখ্যা অনেক। কিন্তু সংখ্যা দিয়ে গুণগত বিচার চলে না। সেক্ষেত্রে তাঁর পরবর্তী ছবিগুলির সঙ্গে 'পথের পাঁচালী'র দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কতখানি? তিনি কি তাঁর প্রথম সৃষ্টির গীতিকাব্যকে অস্বীকার করে তাকে পথিমধ্যে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলা ধরলেন? যদি তাই হয়, তবে তার যুক্তিটা কী?

'পথের পাঁচালী' বাংলা ছবির মোড় ঘুরিয়েছিল। চলচ্চিত্রেব নির্মাণের শৈলী ও বক্তব্যসংক্রান্ত যে ধারার পথপ্রদর্শক সত্যজিৎ, তার অঙ্কুর তাঁর পূর্বসুরীদের নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যে ছিল এই কারণে যে বাংলা ছবি প্রধানত সাহিত্যভিত্তিক, শুধু নাচ, গান, অবাস্তব ঘটনার সমাবেশ বা কলাকৌশলের চমকচটক দিয়ে দর্শকের মনোরঞ্জনের যন্ত্র ছিল না।

কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্র তখনও রঙ্গমঞ্চের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি। যুদ্ধোত্তর পশ্চিম জগতের, বিশেষ করে ইতালীর ছবি গতানুগতিক স্টুডিওর সাজগোজ থেকে বেরিয়ে এল পথে, এলোমেলো ভাঙা জীবনের রুক্ষ চেহারাকে তুলে ধরল নতুন বাস্তবতায়। সত্যজিতকে বলা যায় এই চলচ্চিত্রভাবনার উত্তরসূরী। 'পথের পাঁচালী'তে চিত্রকল্প ও আঙ্গিকের যুগ্ম নবকলেবর বাংলা ছবিকে দিল তার নিজস্ব চিত্রভাষা ও শৈলী। শুধু মনোরঞ্জনের মাধ্যম থেকে চলচ্চিত্র উত্তীর্ণ হল শিল্পকলার স্তরে।

বদলে গেল অভিনয়ের চরিত্রও। রঙ্গমঞ্চের উঁচু তারে বাঁধা সুরে 'গ্যালারী'র জন্যে গলা ওঠাবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। overacting এর বদলে এল under-acting. (প্রসঙ্গত আমার খুব সুবিধে হয়েছিল এই পরিবর্তনে। রঙ্গমঞ্চে দর্শকের মধ্যসারি ছাড়িয়ে আমার গলা কোনওদিনই এগোত না। এ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছি বারবার। তাই পর্দায় অভিনয় আমার কাছে আশীর্বাদের মত, বিশেষ করে underacting।

এই আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সমন্বয় তাঁর প্রথম ও পরবর্তী সমস্ত চলচ্চিত্রসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বিষয়বস্তুর চরিত্রকে তিনি দৃষ্টিগ্রাহ্য সামগ্রিক রূপ দিয়েছেন ক্যামেরার গতিশীলতায়, নৈকট্য বা দূরত্বে, আলো ছায়ার ব্যবহারে, শট্-এর ফ্রেমিং-এ ও শব্দের ও স্তব্ধতার ব্যঞ্জনায়, সম্পাদনায়, আবহসঙ্গীতে, সংলাপ ও অভিনয়ে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তাঁর গীতিকাব্যের সুর কখনও উচ্চগ্রামে, কখনও ক্ষীণ, কখনও অনুপস্থিত।

সত্যজিতের বিষয়বস্তু নির্বাচনে দুটি ধারার প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁর সমাজসচেতনতা ও গভীর মানবতাবোধ। লক্ষণীয় মানবসম্পর্কের সংঘাতে তাঁব অপার কৌতূহল। এই মানবতাবোধের নিদর্শনস্বরূপ তাঁর নায়ক হতে পারে এক পড়ন্ত সামন্ততান্ত্রিক জমিদার, ইতিহাসের অমোঘ গতি যাকে যন্ত্রশিল্পের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করে।

তারই মানবিক দিক। তার অর্থ এই নয় যে তাঁর সহানুভূতি ছিল সামন্ততন্ত্রের প্রতি। এ সম্পর্কে তখনকার দিনে এটি একটি বিতর্কমূলক ছবি।

সত্যজিৎ যে যুগে জন্মেছেন, বড় হয়েছেন (বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায়) সেটা ছিল দেশপ্রেমের উত্তাপে উত্তাল। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর মনের মধ্যে সারা পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের করাল হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা জমে উঠেছিল। যখন বেশীরভাগ সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্র কাব্যভাবনার মধ্যে শুধু অতীন্দ্রিয়বাদ প্রত্যক্ষ করেছেন, সত্যজিৎ তাঁর তথ্যচিত্রে কবির মনোজগতের বহুধা ব্যাপ্তিকে স্পর্শ করেছেন, ও রবীন্দ্রনাথের মানবিক দিককে তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট রূপে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়বাদ তাঁকে সাধারণ মানুষের বেদনাযন্ত্রণা থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি। তাঁর সুপরিণত বয়সে, যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা আরও ক্ষুরধার ও গীতিকাব্যরসহীন ভাষায় উচ্চারিত হয় তাঁর কবিতায়, তাঁর আঁকা ছবিতে। সত্যজিৎ এই সত্যটাকেই ব্যক্ত করেছেন তাঁর তথচিত্রে।

অভিনব হাস্যরসেব 'গুপী গায়েন, বাঘা বায়েন'-এর কল্পজগতেও সত্যজিতের স্বভাবজ যুদ্ধবিরোধিতার প্রকাশ। 'হীরক রাজার দেশ'-এ, মুক্তচিন্তার কণ্ঠরোধকারী একনায়ক প্রভুত্বের শিকল ভাঙে সাধারণ মানুষ একজোট হয়ে। এর আগে 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' ছবিতে ওয়াজেদ আলি শা সাম্রাজ্যবাদের অনুচরদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেও শত্রুর কাছে নতি স্বীকার করেন নি। তাঁর ধীর, শান্ত মর্যাদাবোধের কাছে ব্রিটিশ আক্রমণকারীর অমার্জিত ঔদ্ধত্য আবরণহীন।

সত্যজিতের সমাজ সচেতনতা এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোন রাজনীতির প্রতি আনুগত্যে নয়। মধ্যবিত্ত সমাজের (যে সমাজ তাঁরও) নৈতিক মান ও মূল্যবোধের ক্রম নিম্নগতি তাঁকে উৎকণ্ঠিত করেছে। ধরা যাক তাঁব শহর-কেন্দ্রিক কয়েকটি ছবির কথা।

'সীমাবদ্ধ'-এ দেখি যে কোন উপায়ে পদোন্নতির উর্ধ্বতম সোপানে পৌঁছবার উগ্র আকাঙক্ষা। 'জন-অরণ্য'তে বাঁচার তাগিদে সুস্থ মূল্যবোধ পরিত্যক্ত। আজকের মধ্যবিত্ত সমাজ এমন জায়গায় পৌঁচেছে যে তার দুই প্রান্তিক স্তরেই সুস্থ মূল্যবোধ অবক্ষয়ের শিকার। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' আনে শহর ও গ্রামের মূল্যবোধের বৈপরীত্য।

ইতিপূর্বে দেখেছি 'দেবী'তে অন্ধবিশ্বাসের পরিণতি। আবার 'কাঞ্চনজঙঘা'য় পরাক্রান্ত স্বামীর অনুজ্ঞাকে নিঃশব্দে অতিক্রম করে সর্বদা পিছিয়ে থাকতে অভ্যস্ত এক নারীর অনুচ্চারিত স্বাতন্ত্র্যবোধ।

সত্যজিৎ-পরিচালনায় আমার অভিনয় পরিক্রমা, 'পথের পাঁচালী'র জীবন-সংগ্রাম থেকে শুরু করে, 'অপরাজিত'য় সর্বজয়ার নিঃস্বার্থ পুত্রস্নেহের ও বিচ্ছেদব্যথার দ্বিমাত্রিক দ্বন্দ্ব পার হয়ে, 'দেবী'তে হরসুন্দরীর যুক্তি ও প্রশ্নাতীত বিশ্বাসের লড়াইয়ের ময়দান ছাড়িয়ে, পূর্ণ হল এসে 'কাঞ্চনজঙঘা'য় লাবণ্যর দুর্জ্ঞেয় ব্যক্তিত্বের উদ্‌ভাসনে। পুঞ্জীভূত মেঘের আড়ালে ঢাকা কাঞ্চনজংঘার আত্মপ্রকাশের মত।

মানব সম্পর্কের রহস্যে অলঙ্কৃত তাঁর প্রিয় চলচ্চিত্রসৃষ্টি 'চারুলতা'। তাঁর মতে এতে তিনি সবচেয়ে কম ভুল করেছেন। তার অর্থ কী জানি না। 'চারুলতা'-র ত্রয়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের সন্ধানে কোন পথ খোলা নেই। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সে শুধু পাথরে আছড়ে পড়ে।

'জন-অরণ্য' ও 'চারুলতা'র দুটি দৃশ্যে ক্যামেরা ও নিঃশব্দতার ব্যবহার স্মরণীয়। 'জন-অরণ্যে'র শেষ দৃশ্যের কথা ধরা যাক। রাত্রির আধো অন্ধকারে একদিকে ছেলের অপেক্ষারত বাপ, অপর দিকে বিবেক-ভারাক্রান্ত ছেলে। বাপের মুখের একদিক অন্ধকারে পুরো অদৃশ্য। ছেলে একবার সেইদিকে তাকিয়ে ধীরে এগোয় মাথা নিচু করে, বাপকে এড়িয়ে। এখানে আলো-আঁধারের তীক্ষ্ণ বৈপরীত্য একটা কর্কশ, কঠোর সত্যের আবরণ উন্মোচন করে নির্মমভাবে। গীতিকাব্যের কোন স্থান নেই এই বিষয়বস্তুর মধ্যে।

'চারুলতা'য় আর একটি উদাহরণ। একই ফ্রেমে ক্যামেরার কাছে ভূপতি ও অমল। দূরে ছায়ার মত চারু। ওদের কথা চারুর কানে যায়, সে আর এগোতে পারেনা। সেই দূরত্বে থেকেই আরও দূরে টেনে নিয়ে যায় নিজেকে চুপিসাড়ে। শুধু চরিত্রগুলির স্থিতিবিন্যাসই ক্যামেরার চোখ দিয়ে ঘনায়মান অন্ধকারের আভাস আনে।

সম্প্রতি তাঁর Oscar পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে উনি বলেছিলেন এই মর্মে যে, যুগ-প্রতিচ্ছবির প্রতি আমার আর আকর্ষণ নেই, আমার চারিপাশে যা ঘটছে আমি সেই সম্পর্কে বেশি আগ্রহী। এই বোধহয় তাঁর নিজের বক্তব্যে সমাজ-সচেতনতার প্রথম স্বীকৃতি।

বাইপাস সার্জারির পর প্রথম পদক্ষেপেই এল 'গণশত্রু'। 'শাখা-প্রশাখা' দেখে মনে হয়েছে 'জন-অরণ্য'-তে মধ্যবিত্ত সমাজের যে অধোগতি তিনি দেখেছেন পর্যবেক্ষক হিসেবে, সেই অধোগতি আরও নগ্ন ও প্রকট 'শাখা-প্রশাখা'য়। অর্থাৎ এই সামাজিক বোধে তিনি আর শুধু পর্যবেক্ষক নন। এক বৃহত্তর দায়িত্ববোধে তিনি যেন প্রতিশ্রুত। এই প্রথম ছবির ভেতরেই পাই এমন এক চরিত্র যে গ্রীক কোরাসের মত প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করে তার ভাইদের অমানবিক কার্যকলাপকে। তাই সে অস্বাভাবিক হয়েও স্বাভাবিক, এবং যারা সমাজে স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত, তারাই অসুস্থ।

সময়ের অপসৃতির সঙ্গে তাই তাঁর সৃষ্টিতে গীতিকাব্যের স্থান শূন্য, কারণ তিনি এক কঠোর, কর্কশ ও তিক্ত সত্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিশীল সাহিত্য ও শিল্পের ইতিহাসে, সামাজিক আলোড়ন-প্রসূত যন্ত্রণা, প্রত্যেক সংবেদনশীল শিল্পীর সৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হয়। সেই অমরপ্রতিভাকে আমার প্রণাম।

সত্যজিৎ রায় ঃ মানুষ ও শিল্পী

দেবীপদ ভট্টাচার্য

সত্যজিৎ রায় আমার চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে এমনই প্রাণপ্রাচুর্য, জীবনতৃষা আর কর্মোদ্যম দেখেছি যে তাঁকে বৃদ্ধ বা প্রয়াত বলে কল্পনা করার কোনো কারণ ১৯৮২/৮৩ সাল পর্যন্ত আমার মনে হয়নি। তিনি বছরের পর বছর আমাদের মধ্যে থাকবেন, ছবির পর ছবি করে যাবেন, হয়তো তাঁর করা বিভিন্ন ছবির শিল্পগত মানের ইতর বিশেষ হবে, কিন্তু প্রত্যেকটি ছবিই আমাদের চিন্তাকে জাগিয়ে তুলবে, নানা আলোচনা ও বিতর্কের বিষয় হবে — এইরকম একটা ধারণা অন্তত আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। মৃত্যুর অনিবার্যতা, জরা ও রোগের অমোঘ ধ্বংসকারিতা আব মানুষের জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে একধরনের অসচেতনতা অন্য দশজনের মতো শ্রীরায়ের জীবনের ভঙ্গুরতা বিষয়ে আমাকেও পেয়ে বসেছিল। ১৯৮৩ সালে তাঁর হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের পরেও সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে, কয়েকবার পত্র বিনিময়ও হয়েছে। হয়তো একটু বয়সের আর রোগের ছাপ তাঁর যুবাসুলভ জীবনপ্রেমের মধ্যে চোখে পড়েছে , তবু কখনও তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্য, উৎসাহ আর অতিথি প্রীতির এতটুকু অভাব লক্ষ করিনি। আর সবচেয়ে বড় কথা তাঁর প্রিয়তম শিল্প চলচ্চিত্র নিয়ে তাঁর উৎসাহ আর উদ্দীপনা শেষ পর্যন্ত অক্ষত দেখেছি। 'Never say die'—যেন ছিল তাঁর জীবনের মন্ত্র। ঐহিক জীবনে অমরতা পাওয়া যায় না তিনি জানতেন, কিন্তু জীবনের নশ্বরতাকে অতিক্রম করে কর্মোৎসাহ বেঁচে থাকুক, এই যেন ছিল তাঁর অস্তিত্বের সঞ্জীবনী মন্ত্র।

শিল্পী সত্যজিতের মহত্ত্বকে এতটুকুও খর্ব না করে আমি মানুষ সত্যজিৎকে আজকে বেশি করে মনে রাখতে চাইছি। আমি অনেক লোকের সান্নিধ্যে এসে তাঁদের মধ্যে নানা মহৎগুণের সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সত্যজিতের মতো এমন একটা মুক্তমনা পুর্ণপুরুষ আমি খুব কেন, একেবারেই দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সঙ্গে পরিচয়কে আমার একটা খুব উঁচুদরের অভিজ্ঞতা বলে আমি সযত্নে স্মৃতির কন্দরে তুলে রেখে দিতে চাই।

পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকের কথা — আমার এখনও পরিষ্কার মনে পড়ে কি ভাবে শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মাধ্যমে সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল। দাশগুপ্ত মশায় 'স্টেট্‌সম্যান' কাগজের রবিবারের Magazine ক্রোড়পত্রে বিখ্যাত মার্কিন ডকুমেন্টারি পরিচালক Robert Flaherty -কে নিয়ে একটা চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমার বয়স তখন কুড়ি-একুশ হবে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের বিখ্যাত সব পরিচালকদের ছবি দেখা, তাঁদের সম্বন্ধে আকুল আগ্রহে পড়া আর আলোচনায় তদানীন্তন অনেক যুবার মতো আমিও তখন মত্ত। আমাদের অনেকের কাছে হলিউড তখন প্রায় একটা শিক্ষায়তনের ভূমিকা নিয়েছিল বলা চলে। Alexander Dumas

-রচিত নানা ঐতিহাসিক উপন্যাস; জিঞ্জার রজার্স, ফ্রেড্ অ্যাস্ট্যার, ডিয়ানা ডুরবিন, হোজে ইটারবি, জেভিয়ার কুগার্ট, জিন কেলির অসংখ্য উচ্চমানের নাচগানের ছবি; পল মুনি অভিনীত আর উইলহেল্ম্ ডিটারেল পরিচালিত নানা জীবনমূলক কাহিনী (Emile Zola, Juarez, A Song To Remember), জন ফোর্ডের মার্কিন মুলুকে নতুন উপনিবেশ স্থাপনে সংগ্রামের নানা কাহিনী ঃ তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে কল্পিত নানা রাজনৈতিক আর মানবিক কাহিনীর চিত্ররূপ — কত বলব, বলে শেষ করা যায় না- তখন সারা পৃথিবীকে হলিউডের সাংস্কৃতিক উপনিবেশ করে তুলেছিল বলা যায়। আসলে ত্রিশের দশক থেকেই য়ুরোপে প্রথমে ফ্রাঙ্কো আর মুসোলিনির ফ্যাসিজ্‌ম্, তারপর হিটলারের নাৎসি অত্যাচার নানা দেশের অসংখ্য প্রতিভাধর শিল্পীকে আমেরিকা আর বৃটেনে আত্মরক্ষার জন্য পালাতে বাধ্য করেছিল। ফলে এই দুটি দেশ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই পটভূমিতে ভারতেও অনেকে শুধু চলচ্চিত্র দেখে ক্ষান্ত হননি, এই শিল্পটি সম্বন্ধে যা কিছু জানার আছে তা জানতে, এমন-কি উঁচুজাতের চলচ্চিত্র তৈরির ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তখনও পর্যন্ত আমাদের অধিকাংশ চলচ্চিত্র পরিচালকেব ধারনা ছিল চোখা চোখা সংলাপের মালা গেঁথে একটা নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি করে তাকে movie camera দিয়ে চিত্রীকৃত করা মানেই হলো উঁচুজাতের চলচ্চিত্র তৈরি করা। মনে পড়ে এরই জোরে বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' হৈ হৈ করে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে একটা আলোড়ন এনেছিল। কিন্তু য়ুরোপীয় আর মার্কিন চলচ্চিত্র অনুধাবন করে অনেক নবীন চলচ্চিত্র রসিক বুঝতে শুরু করেছিলেন যে চলচ্চিত্র ব্যাপারটা শুধু নাটকের ফটো তোলা নয়, চলচ্চিত্রের নিজের একটা বাচনভঙ্গী আছে, যেখানে উচ্চাবিত সংলাপের চেয়ে ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ দৃশ্যনিচয়ের পারম্পর্যসমন্বিত গ্রন্থন অনেক বেশী মূল্যবান। এই সময় কলকাতার বইয়ের বাজারেও চলচ্চিত্র শিল্প সম্বন্ধে অনেক উল্লেখযোগ্য বই অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের স্যহায্য করেছিল Eisenstein-এর *Film Sense* আর *Film Form* Pudovkin -এর *Flim Technique*, Rudolph Arnheim -এর *Film*, Bela Balaz -এর *Film*, Paul Rotha-র *History of Documentary Cinema*, Lewis Jacobs -এর *History of American Films*, *Lessons With Eisenstein* এবং আরও অনেক বই। তরুণ চলচ্চিত্র রসিকদের মধ্যে অনেকেই এখন শুধু যথার্থ চলচ্চিত্র দেখা নয়, সম্ভব হলে তৈরি করার আশাও পোষণ করতেন।

এই ধরনের পটভূমিতে সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়। 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় চিদানন্দবাবুর Flaherty সম্বন্ধে প্রবন্ধের কয়েকটি তথ্য নিয়ে আমার বক্তব্য সমন্বিত একটি চিঠি আমি ঐ পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশের জন্য পাঠাই। সম্পাদক একটি চিঠিতে আমাকে জানান যে আমার চিঠিটি সরাসরি শ্রী দাশগুপ্তের কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি নিজেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কয়েকদিনের মধ্যেই দাশগুপ্ত মহাশয়ের কাছ থেকে তাঁর তখনকার পন্ডিতিয়া প্লেস-এর বাসায় দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ পেলাম। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আমার উৎসাহ দেখে তিনি নতুন প্রতিষ্ঠিত Calcutta Film Society-র সদস্য হবার জন্য আহ্বান জানালেন, এবং বললেন আমি যদি তাঁর কর্মস্থল D. J. Keymer-এর গাষ্টিন প্লেস্-এর অফিসে দেখা করি একজন প্রকৃত

চলচ্চিত্রবোদ্ধার সঙ্গে আমার কথা হতে পারে। গাষ্টিন প্লেস্-এ চিদানন্দবাবুর অতিক্ষুদ্র cubicle-এ সেই মানুষটির সঙ্গে আমার সেই প্রথম দেখা হওয়ার অভিজ্ঞতা আমি কোনদিন ভুলবো না। সেই ছোট্ট ঘরটিতে এসে মানিকবাবু বা সত্যজিতের প্রবেশ প্রায় Lilliputian-এর ঘরে Brobdingnag-এর প্রবেশের মতো। প্রায় সাড়ে ছ-ফুট উচ্চতার সেই অসাধারণ সুন্দর মানুষটিকে দেখেই আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল যে ইনি সাধারণ মানুষ নন। তারপর দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হয়েছে তাঁর বিভিন্নমুখী প্রতিভার যত পরিচয় পেয়েছি ততই বিস্মিত ও চকিত হয়েছি। বুঝতে পেরেছিলুম যে শুধু চেহারায় নয়, এই লোকটি নানাদিক থেকেই অসাধারণ। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য আর আগ্রহের সততা দেকে সত্যজিৎবাবুর কি আনন্দ । সত্যজিৎ রায় তখন থাকতেন তাঁর lake Avenue-এর ভাড়াবাড়িতে। এই সময় তিনি প্রায় সহোদর ভাইয়ের মতো আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তাঁর নানা আশা ও ইচ্ছা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা বিরল এবং তা সম্ভবপর হয়েছিল চলচ্চিত্র সম্বন্ধে দু'জনেরই অত্যন্ত গভীর মনোভাবের ভিত্তিতে। চলচ্চিত্রের শিল্পগত সম্ভাবনা এবং সামাজিক দায়িত্বপালনের ক্ষমতা নিয়ে যে ভেবেছে সে-ই সত্যজিৎবাবুর কাছে উৎসাহ আর প্রেরণা পেয়েছে। তখন অমি অদক্ষ এবং অশিক্ষিত পটুত্বের সঙ্গে দু'একটা চিত্রনাট্য লিখে ধৃষ্টতাবশত সত্যজিৎবাবুকে পড়ে শুনিয়েছি, এখন ভাবলে বিস্ময়বোধ হয় পরমবন্ধু আর প্রকৃত গুণগ্রাহীর মতো ঘন্টার পর ঘন্টা ধৈর্য ধরে তিনি সেগুলো শুনেছেন, সুচিন্তিত মত দিয়েছেন। আর যদি প্রকৃতই কিছু ভালো জিনিস তার মধ্যে চোখে পড়েছে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। একদিনও দেখিনি কোন কাজের অছিলায় তিনি অনাহুত আর অনাকাঙিক্ষত মানুষ ভেবে আমাকে এড়াবার চেষ্টা করেছেন। অথচ চলচ্চিত্রে পুরোদস্তুর পরিচালক হিসেবে নামবার আগেও তাঁর কাজ একেবারেই কম ছিল। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির বেশির ভাগ শো তখন হতো টালিগঞ্জের ভবানী সিনেমা হলে, রবিবার কিংবা কোন ছুটির দিন সকালে। ঐখানেই আমার পরিচয় হয় শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী, রাম হালদার, হরিসাধন দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু পত্রী, ধ্রুব গুপ্ত প্রমুখ নানা চলচ্চিত্ররসিক মানুষের সঙ্গে। ঐসময় কলকাতার অধিকাংশ হলে হলিউড বা বৃটেনের তৈরী ছবি দেখানো হতো। কিন্তু ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আমরা অনেক য়ুরোপীয় ছবি দেখবার সুযোগ পেয়েছি। পোলিশ, সোভিয়েত, চেক, ফরাসি বহু ছবি দেখাবার আয়োজন করেছেন এই সোসাইটি। ছবিগুলো শুরু হলে দেখতাম সত্যজিৎবাবু একদম হলের প্রথম সারিতে একটি আসনে বসতেন। সিনেমার পর্দা আর তাঁর দৃষ্টিপথের মধ্যে অন্য কোনো বাধা থাকত না। বোধহয় ছবিটিকে একেবারে অনন্যচিত্ত হয়ে দেখাব জন্যই তিনি তখনকার দিনের ঐ ছ'আনা দামের আসন বেছে নিতেন।

আর একটা জিনিস লক্ষ করতাম তাঁর চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি ভালোবাসার লক্ষণ হিসেবে। কোনো সভায় গিয়ে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি আলোচনা করতেন বাড়িতে। আর চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তাঁর যাবতীয় জ্ঞান-উপলব্ধি প্রকাশ পেত তাঁব নিজের তৈরী চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে। আর একটা তাঁর বিশেষ আগ্রহ

চোখে পড়ত—সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে ভালো কি প্রকাশিত হচ্ছে তা জানবার জন্য নিজে যেমন তিনি গোগ্রাসে প্রকাশিত গল্প, উপন্যাস, নাটক পড়তেন, সেই সঙ্গে তাঁর পরিচিতদের কাছ থেকেও তিনি সব সময় জানতে চাইতেন তাঁরা নতুন কি ভাল বাংলা রচনা পড়লেন। সত্যজিৎ সাহেবি কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সাহেবদের মতো ইংরেজি বলতেন, তাঁর মতন পাশ্চাত্য মার্গসঙ্গীতের সমঝদার দুর্লভ। কিন্তু যারা খুব কাছ থেকে তাঁকে দীর্ঘদিন দেখেছেন তাঁরা বুঝেছেন মনেপ্রাণে ও রুচিতে তিনি কিরকম নির্জ্জলা বাঙালি ছিলেন। যে লোক ছোটবেলা থেকে শহরে মানুষ, যাঁর কর্মজীবনের অনেকটা সময় বিদেশিদের সান্নিধ্যে কেটেছে, তাঁর মনের ভেতরটা এত নির্ভেজাল বাঙালি সংস্কৃতিতে ভরপুর ছিল বলেই তাঁর পক্ষে 'অপু-ত্রয়ী', 'পরশপাথর' আর 'দেবী'র মতো চলচ্চিত্র তৈরী করা সম্ভবপর হয়েছে।

'পথের পাঁচালী' ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৫৫ সালে। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই সত্যজিৎ বিভূতিভূষণের এই অসামান্য কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণের কথা ভাবছিলেন। যখন ফরাসী পরিচালক Jean Renoir (ইনি বিখ্যাত Impressionist চিত্রশিল্পী Pierre Renoir'র পুত্র) কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে এক চটকলের ইংরাজ ম্যানেজার ও তাঁর পরিবারকে কেন্দ্র করে তাঁর The River ছবিটি করতে আসেন তখন সত্যজিতের ভাবনা আরও দানা বাঁধে। সত্যজিতের নিজের মুখেই শুনেছি, তখনকার খ্যাতিমান ও সন্মানিত চিত্রপরিচালক শ্রী দেবকীকুমার বসুও যখন 'পথের পাঁচালী'র চিত্রস্বত্বের জন্য বিভূতিভূষণ-পত্নী রমাদেবীর কাছে আবেদন করেন তখন সত্যজিৎ চিন্তিত হয়ে ওঠেন এবং শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন যেন 'পথের পাঁচালী'র চলচ্চিত্রস্বত্ব তাঁকে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া না হয়। সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের পর তাঁর সঙ্গে কথা বলে, চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব শুনে আমার একটা দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে এই লোক যদি সত্যিই কোনোদিন বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নামেন, এদেশের চলচ্চিত্রে একটা যুগান্তর ঘটবে। এই ধারনা যে কতটা সত্য তা প্রমাণিত হয়েছে, সত্যজিতের চলচ্চিত্রকীর্তি তার জীবন্ত প্রমাণ।

'পথের পাঁচালী' উত্তর কলকাতার বীণা সিনেমা হলে মুক্তি পায়—আমি প্রথম শোতে সবশুদ্ধ জন পঁচিশের বেশী দর্শক সমাগম দেখিনি। নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রী নেই, রংচঙে পোষ্টার পর্যন্ত জোটেনি, এই নতুন পরিচালকের নাম পর্যন্ত তখন সকলের কাছে অজানা। এ-হেন ছবি দেখার আগ্রহ না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু পর্দায় প্রতিফলিত এই ছবির প্রথম shot থেকেই আমি বুঝেছিলাম যে শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই প্রথম তার নিজস্ব ভাষা বা idiom খুঁজে পেয়েছে। তখন একটি অজ্ঞাত অবহেলিত মাসিকপত্রে আমি লিখেছিলাম, 'পথের পাঁচালী' শুধু সে দিন পর্যন্ত তৈরি যাবতীয় ভারতীয় চলচ্ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নয়, ঐ ছবি হল প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যা চলচ্চিত্রের নিজের ভাষায় কথা বলেছে। তারপর সত্যজিৎ রায় অনেকগুলো ছবি করেছেন—'অপু-ত্রয়ী' থেকে 'আগন্তুক' পর্যন্ত, প্রতিটি ছবিকে তিনি জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আমাদের দেশে সমালোচকের অভাব নেই এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন সত্যজিতের চলচ্চিত্রে কিসের অভাব; সত্যজিৎ বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের মরা গাঙে যে হঠাৎ বান

ডাকিয়ে দিলেন এ-কথাটার প্রতি সেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা খুব কম সমালোচকই করেছেন বলে আমার ধারনা। কিন্তু আজ সময়াতিপাতের সঙ্গে সঙ্গে সব জিনিষ যথার্থ perspective নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার খানিকটা সুযোগ যখন আমরা পেয়েছি তখন বাংলা এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের মানচিত্রে সত্যজিতের যথার্থ স্থান কোথায় হওয়া উচিত তা ঠিক করা খুব দুরূহ হবে বলে মনে হয় না।

সাহিত্য, নাটক ও চলচ্চিত্র যে কোনও শিল্পে শিল্পীর জীবনবোধ ও তার প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রশ্নটা বোধহয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। কথাটা নতুন কিছু নয়, কিন্তু কোনো শিল্পী ও তাঁর কাজের মূল্যায়নে বারবারই এই মৌল প্রশ্নটা আমাদের মনে রাখতে হবে, নইলে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। কিছু শিল্পী আছেন যাঁরা কোনো একটা বিশেষ ব্যক্তিগত যন্ত্রণাবোধ থেকে শিল্প সৃষ্টিতে নামেন আর প্রচণ্ড শক্তিতে সেই যন্ত্রণাকে হয় ভাষায়, নয় সংলাপে, নয় ঘটনার মাধ্যমে কিংবা চলচ্চিত্রের দৃশ্য পবম্পরায় বেঁধে ফেলতে সচেষ্ট হন। কখনও কখনও সফলও হন। ঐ ভাষা, ঐ সংলাপ, ঐ ঘটনা বা চিত্রকল্পগুলির তীব্রতাব ভিত্তিতেই এই সব শিল্পীর সৃষ্টির সার্থকতা নিরূপিত হয়। বাংলা চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঘটক ছিলেন ঐ ধরনের এক শিল্পী, তাঁর ছবিগুলির তীব্রতা আর গভীরতা আসে ঐ ব্যক্তিগত যন্ত্রণাবোধকে জোরালো প্রকাশ দেবার দুর্নিবার বাসনা থেকে। তাঁর ছবি নিয়ে বর্তমান আলোচনায় আর এগোবার দরকার নেই। অন্য আর-এক শ্রেণীর শিল্পী আছেন যাঁরা মুলত জীবনপ্রবাহকে অপেক্ষাকৃত পূর্ণভাবে তাঁদের শিল্পে ধরতে চান। অবশ্যই এই প্রবাহের মধ্যে নাটকীয় আবর্ত আছে, নিমজ্জন আছে — সেগুলিকে তাঁরা অস্বীকার করেন না বা সেগুলির রূপায়ণে তাঁদের অনিচ্ছা, অক্ষমতা বা আলস্য নেই—কিন্তু তাঁদের শিল্পের বক্তব্য জীবনেব চলমানতাব নিত্যতা; এই প্রবাহকে গৌণ না করে, তার মধ্যে ক্রিয়াশীল আনন্দ, বেদনা, দুঃখ আর আশা-নৈরাশ্যকে রূপ দেওয়ার বাসনাই বোধ হয় তাঁদের শিল্পচেতনাকে বেশী করে সক্রিয় করে তোলে। আমার বিশ্বাস সত্যজিৎ ছিলেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী। তাঁর কাছে ব্যক্তিমানুষের দুঃখ-আনন্দ-যন্ত্রণার কাহিনী নিশ্চয়ই তুচ্ছ ছিল না — কিন্তু ব্যক্তিকে নিয়ে যে সমগ্রের প্রবাহ তাকে রূপ দেওয়ার আগ্রহ ও প্রয়াস ছিল তাঁর যেন একটু প্রবলতর। 'পথের পাঁচালী' থেকে সত্যজিৎ যে শিল্পপরিক্রমা শুরু করেছিলেন তার মধ্যে কোনো ছবিতেই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত যন্ত্রণার কথা বলেন নি, বলেছেন বা বলবার চেষ্টা করেছেন পুরো সমাজের যন্ত্রণার কথা; অবশ্যই এই যন্ত্রণার গাথা কোনো বিশেষ চরিত্র, পরিবার বা সামাজিক পটভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সত্যজিতের কাছে জীবনের বিচিত্র সব অর্থনৈতিক আর সামাজিক টানাপোড়েনের মধ্যে ব্যক্তিমানুষের সত্তা আর তার প্রতিক্রিয়ার যে চলমান কাহিনী তার রূপায়ণটাই ছিল সবচেয়ে বড় কথা।

যাঁরা সত্যজিতের এতগুলো ছবির মধ্যে তাঁর তীব্র জীবনচেতনার অভাব নিয়ে অনুযোগ করেন আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি না, কারণ আমার ধারণা সত্যজিতের ছবির মধ্যে শাশ্বত শিল্পের যে সংযম আছে তাকে তাঁরা তীব্র অনুভূতির অভাব বলে ভুল করেন। যাঁদের ধারণা 'জলসাঘর' ছবিতে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তপ্রথার প্রতি সত্যজিৎ উঠতি মধ্যবিত্ত সমাজের চেয়ে বেশি সহানুভূতি দেখিয়েছেন, তাঁরা একথা

নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন না যে শিল্পী যদি সত্যের অপলাপ না করে থাকেন, যদি তিনি সঠিক ধরে থাকেন যে রায়বাড়ির ঐশ্বর্যের পতনের মূলে আছে জমিদারের বিলাসিতা আর নিন্দনীয় অমিতব্যয়িতা, তাহলে কাহিনীর প্রধান চরিত্রের যন্ত্রণার অনুশীলনে তাঁর আগ্রহকে অশিল্পীসুলভ ত্রুটি বলে আক্রমণ করার কোনো কারণ থাকার কথা নয়। যদি বিশ্বম্ভর রায়কে আরও কঠিনভাবে আঘাত না করার জন্য আমরা সত্যজিতের শিল্পী হিসেবে দুর্বলতার নিন্দে করি, তাহলে আমরা শিল্পের চেয়ে নৈতিকতাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি ভাবতে হবে। এই প্রসঙ্গে Dostoevsky-র কথাগুলি মনে পড়ে — 'when I portray a horse-thief. I become a horse-thief, and do not sit in judgment over him'. ক্ষয়িষ্ণু কোনো জমিদার পরিবারের, বিশেষ করে তার কেন্দ্রীয় চরিত্রের রূপক হিসেবে 'জলসাঘর' ছবিটিকে দেখা মানে, সেই জমিদারকে সত্যজিতের চিন্তা জগতের নায়ক হিসেবে ধরার কোনো কারণ থাকার কথা নয়। সে ছবির নায়ক, কারণ তার মানসিকতাকে কেন্দ্র করে ছবিটির কাহিনী গড়ে উঠেছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আর্থসামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সত্যজিৎ তার প্রতি সহানুভূতিশীল।

সত্যজিতের সমাজচেতনা যে কোনোক্রমেই দুর্বল বা প্রতিক্রিয়াশীল ছিল না তার প্রমাণ পাই 'দেবী', 'গণশত্রু' প্রভৃতি ছবির মাধ্যমে। প্রথম ছবিটিতে সত্যজিতের বক্তব্য ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষের জীবনে চরম অভিশাপের মতো কাজ করে, আর দ্বিতীয় ছবিতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন মান ও অর্থলিপ্সা কিভাবে কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়েছে। এখানে আমরা সত্যজিতের ছবিতে সমাজচেতনার প্রশ্নটি নিয়েই শুধু কথা বলছি, শিল্পকর্ম হিসেবে এই ধরনের ছবির ত্রুটি কোথায় বা কি ধরনের তা নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা এখানে করার চেষ্টা আমরা করব না।

অনেক সমালোচক বহুক্ষেত্রে নিজের অভিরুচির আর প্রত্যাশাকে অভ্রান্ত মনে করে শিল্পের বিচারে এগোন। সেখানে শিল্পের পটভূমি, ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা এবং শিল্পী নিজে কি করতে চেয়েছেন এবং সেই প্রয়াসে কতটা সফল হয়েছেন এ-সব প্রশ্ন গৌণ হয়ে পড়ে, শিল্পবিচারে একেবারে নিজের তৈরি নিরিখ দিয়ে বিচার করে অনেক সফল শিল্পীকেও নস্যাৎ করে দিতে তাঁরা দ্বিধা করেন না। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ বাঙালি ও ভারতবাসীকে কি নতুন জিনিস দিয়েছেন, তার চেয়ে তাঁদের কাছে বড় হয়ে ওঠে এঁদের ত্রুটিগুলো। সত্যজিৎ সম্বন্ধেও অনেক 'সমাজ সচেতন' সমালোচকের মানসিকতার মধ্যে এই ছিদ্রান্বেষণের প্রয়াসটা খুব বেশি। সত্যজিৎ প্রায় একক প্রয়াসে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে মর্যাদা দিয়েছেন শুধু আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রজগতে নয়, ভারতীয় মানসিকতার সূচক হিসেবে। Cannes Film Festival- এ 'পথের পাঁচালী'র Citation ছিল 'Best Human Document' হিসেবে। অন্য এক সমালোচক এই ছবি দেখে বলেছিলেন, 'You cannot make a film like this with a big budget and in a big modern studio; you have to go down on your knees onto the dust to make such a film possible.' সত্যজিৎ ভারতীয় চলচ্চিত্রকে শুধু আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে মর্যাদা দেননি, তাকে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষের অন্যতম দৃষ্টান্ত করেছেন।

'মহানগর', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ' ও 'জন-অরণ্য'র মত ছবিগুলিতে আজকের মধ্যবিত্ত সমাজের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে তার মানবিক মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামও কিভাবে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তা সত্যজিৎবাবু গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। আবার তাঁর আপাতভাবে রূপকথার গুপী-বাঘার অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীতেও রূপকের সাহায্যে তিনি যুদ্ধ, স্বৈরাচার ও সাধারণ মানুষের ওপর ক্ষমতাবান ও ক্ষমতালিপ্সুদের নিপীড়নকে অতি শক্তিশালীভাবে রূপ দিয়েছেন। কোনো মানবতাবিরোধী, অবক্ষয়ী এবং নীতি-বিগর্হিত ব্যাপারকে সত্যজিৎ কোনোদিন কোনো ছবিতে হালকাভাবে যেমন দেখান নি, তেমনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বড় বড় টপ্পাগানও আওড়াননি। দুর্নীতির উদঘাটন শিল্পীর কাজ, তার অপনোদনের পদ্ধতি নিরূপণ করবেন সমাজ সংস্কারকরা। 'পরশপাথর' একাধারে মানুষের দুর্বলতা আর তার মৌল সততার ওপর একটা জোরালো Fantasy। মধ্যবিত্তসমাজেও দরকার হলে ঘরের বৌকে জীবিকা অর্জনের জন্য সংস্কারের বাধা অতিক্রম করে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে — তার জন্য প্রচলিত অনেক মূল্যবোধকে বর্জন এবং তাদের পরিবর্তন করতে হ'বে এই মানসিক প্রগতিশীলতার দ্যোতক 'মহানগর'। শিক্ষা, সুরুচি, শিল্পবোধ, নীতিবোধ — মোটকথা গোটা মানবিকতা কিভাবে আজকের জগতের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে পদদলিত এবং অবহেলিত 'সীমাবদ্ধ' কাহিনীর চলচ্চিত্ররূপ দিয়ে সত্যজিৎ রায় আমাদের তা দেখিয়েছেন। অর্থাৎ, সত্যজিৎবাবুর চলচ্চিত্রকে শুধু তার উপস্থাপনায় ত্রুটিবিহীন চারুতার জন্যই দাম দিলে চলবে না, আমাদের লক্ষ করতে হ'বে কিভাবে তিনি বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতাকে কখনও অমর্যাদা করেননি। কিন্তু মজার কথা হলো বহুক্ষেত্রে তাঁর শিল্পের উপস্থাপনার (form) সৌকর্য অনেকের চোখে বিষয়বস্তুর গভীরতা ও সমাজনিষ্ঠতার চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে।

শিল্পী হিসেবে সত্যজিৎ অবিস্মরণীয়। কিন্তু যে মাধ্যমটি তিনি বেছে নিয়ে ছিলেন তাঁর সৃষ্টির উপায় হিসেবে, তার নিজস্ব কতকগুলি ত্রুটি আছে। সাহিত্য, নাটক, এমন-কি সঙ্গীত এবং চিত্রকলাকে স্থায়িত্ব দেওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করা তেমন কঠিন নয়, চলচ্চিত্রের print-কে রক্ষা করা যত কঠিন। ইচ্ছে হলেই আমরা শেকস্‌পীয়র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস আলমারি থেকে নামিয়ে চোখ বোলাতে পারি; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্র বা ভাস্কর্যের প্রতিরূপ বইয়ের পাতায় রঙিনরূপে দেখতে পারি। কিন্তু Bergman, De Sica বা সত্যজিতের কীর্তির উপভোগ সেগুলির মাধ্যমগত ত্রুটির দ্বারা সীমিত। আজ সত্যজিৎকে নিয়ে যে উন্মাদনা এবং হৈ চৈ, তা ভবিষ্যতে কতটা থাকবে এ চিন্তা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়তো নয়। আর তার মূলে তাঁর শিল্প-মাধ্যমের ত্রুটি বোধহয় একটা বড় কারণ।

সত্যজিতে ফিরে তাকান

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র যে একটি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম তা আমরা সত্যজিতের ছবি দেখেই জেনেছি। বাংলা চলচ্চিত্রের ভাষা তাঁরই সৃষ্টি। আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্রের তিনিই জনক, তিনিই ধাত্রী। চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কিত সবকিছুই তাঁর পরশ পাথরের ছোঁয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বাংলা 'বায়োস্কোপ' জগৎ 'পথের পাঁচালী'-কে আঁতুড়েই মারতে চেয়েছিল। তদানীন্তন বাংলা ও হিন্দী ছবি দেখতে অভ্যস্ত দর্শক সাধারণের কাছে 'পথের পাঁচালী'র বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে পশ্চিমবাংলার মাস্ মিডিয়া যথোচিত দায়িত্ব পালন করেনি। কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন তরুণশিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সেদিন এ-কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সিনেট হলে এক প্রকান্ড সংবর্ধনা সভার আয়োজন হয়। মনে পড়ছে আমি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টিন থেকে চেয়ে আনা একটা ছোট ডেকচি হাতে দাঁড়িয়ে, তাতে সাদা চকের গুঁড়ো পিটুলির মতো গোলা। বেশ কয়েকটা চক চুরি করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। একটুকরো ন্যাতা হাতে পূর্ণেন্দু পত্রী ধনুকের মতো সামনে ঝুঁকে আল্পনা আঁকছে। সিনেট হলের সামনের বারান্দা, সিঁড়ি শেষ করে উৎসাহের আধিক্যে সামনের ফুটপাতটুকু চিত্রিত করা হচ্ছে। লোক ভীড় করে দেখছে। তাদের বোঝানো হচ্ছে যে কে সত্যজিৎ রায়, 'পথের পাঁচালী' ব্যাপারটা কি।

হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টিতে সিঁড়ি আর ফুটপাতের আল্পনা ধুয়ে মুছে যায়। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা মানুষের ভীড়ে সিনেট হল উপচে পড়ে। সত্যজিৎ রায়ের জীবনে সংগঠিত বৃহৎ জনসংবর্ধনা সেই প্রথম।

তাছাড়া কলেজে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে, শিক্ষক-অধ্যাপকদের মধ্যে মুখে মুখে প্রচার চলে যাতে তাঁরা টিকিট কেটে 'পথের পাঁচালী' দেখেন। 'স্বাধীনতা', 'পরিচয়' ও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন অন্যান্য পত্র-পত্রিকা 'পথের পাঁচালী'র পক্ষে সৈনিকের মতো কলম ধরে। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে— তার মূল সংগঠক ছিলেন সহযাত্রী সহ-কমিউনিস্টরা, গণতন্ত্রীরা।

'পথের পাঁচালী'র আবেদন অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল। বুর্জোয়া সমালোচকদের অনেকের ভুরু কুঁচকোল 'অপরাজিত' দেখে। এই মহৎ চলচ্চিত্রটি প্রথম প্রদর্শনের সময় তেমন দর্শকই পেল না। তারপর 'দেবী'। সত্যজিৎ তখন অনেকগুলি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু বাংলা মনোপলি প্রেস তাঁকে সেদিন একই সঙ্গে ভর্ৎসনা করে ও চলচ্চিত্রের ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়।

প্রকৃত সৃজনশীলতা এই সমালোচনা ছাপিয়ে সমকালকে অতিক্রম করে যায়। তার আত্মা অক্ষতই থাকে। কিন্তু ক্ষতি হয় সমকালের, সাধাবণ রুচির।

আমাদের, শিক্ষাভিমানী বাঙালিদের, এ ব্যাপারে পরম্পরাগত পারদর্শিতা আছে।

বর্তমান প্রজন্মের পিতৃ-পিতামহ অনেকরই সমালোচক-শিং গজিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ক্রমাগত টুঁ মারার সুযোগ সৃষ্টি করে।

পঞ্চাশের দশকে আক্রমণের এক নতুন লক্ষ পাওয়া গেল—সত্যজিৎ রায়। ভারতের সংস্কৃতির জগতে এই অসামান্য আবির্ভাবকে চলচ্চিত্র সমালোচক রূপে অনেকেই তৎক্ষনাৎ, এবং ক্রমাগত টুঁ মারতে লাগলেন।

সত্যজিৎ রায়ের প্রথম জীবনের সেই সংগ্রামকে কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রীরা সেদিন পাশে থেকে খানিকটা সহজ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

শিল্পবিচারে কমিউনিস্টরা কোনো বাঁধাধরা ছকে বিশ্বাসী নয় বলেই কোনো বিশেষ সৃষ্টির মূল্যায়ণের প্রশ্নে অনেক সময়ই তাদের মধ্যে মতভেদ হয়। দুনিয়া জুড়েই হয়।

বুর্জোয়া সমালোচকরা কমিউনিস্ট শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের যতই না কেন রোবট হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করুন, যতই না কেন তাদের রসাস্বাদন, ভাবনাচিন্তা ও সৃষ্টি করার স্বাধীনতার অভাব সম্পর্কে কাঁদুনি গান—পৃথিবীর সব দেশের কমিউনিস্টদের মধ্যেই সৃজনশীলতার মূল্যবিচারে মত-পার্থক্য ছিল, আছে, থাকবেও। ভুল হয়েছে, আবার তা ধরাও পড়েছে। মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস সত্যের অভিমুখে নিরন্তর অভিযানেরই ইতিহাস।

পরিচালক সত্যজিৎ রায়

সেবাব্রত গুপ্ত

চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে কোন আলোচনাই খুব সংক্ষেপে সেরে ফেলা কঠিন। ফিল্মে তাঁর কাজের অন্যান্য দিকগুলোও এই আলোচনায় এসে যাবে। তবু পরিচালক হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলির একটা রূপরেখা বা আউটলাইন তৈরি করা যায়।

এক ঃ সত্যজিৎবাবু ফিল্মে গল্প বলতে চান। গল্প বলতে ভালবাসেন। তিনি নিজেও গল্পকার, যদিও ছোটদের জন্যই লেখেন। পরিচালক সত্যজিৎবাবু বিশ্বাস করেন, সিনেমার স্বভাবধর্ম বজায় রেখেও ছবিতে গল্প বলা যায়।

আপসহীন ফিল্ম-বাদী পরিচালক ও সমালোচকরা বলেন, সিনেমা গল্প নয়। তাঁদের মতে, সিনেমায় একটা কাহিনী হয়ত থাকবে কিন্তু সেটা গল্প পড়ার সুখ বা উত্তেজনা পরিবেশন করবে না। ওই কাহিনী বা চরিত্র বিশ্লেষণ কিংবা পরিবেশ ও সময়-সমীক্ষা যা-ই চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু হোক না কেন সেটা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত বা বিকশিত হবে সিনেমার নিজস্ব ভাষায়। ভিসুয়াল ইমেজে সেটা অনেকখানি রূপ পাবে। সত্যজিৎ বাবু সিনেমার এই স্বকীয় শিল্প-রীতিতে বিশ্বাসী, যদিও তিনি মনে করেন সিনেমা স্বচ্ছ ও সংযতভাবে একটি গল্প বলতে পারে।

দুই ঃ সত্যজিৎ রায়ের সব ছবির চিত্রনাট্য বা কাহিনী একটি ছোট গল্পের রূপ নেয়। এমন কি, কোন বড় উপন্যাস নিয়ে ছবি করলেও সেটা শেষ পর্যন্ত ছোট গল্পের আকারই ধারণ করে। ছোট গল্পের ধর্ম অনুযায়ী ছবির শেষ মজাটা পাওয়া যায় ক্লাইম্যাক্সে। তিনি সংযত চিত্রনাট্যে বিশ্বাসী বলেই উপন্যাস বা বড় গল্পও তাঁর হাতে ছোট গল্প হয়ে ওঠে। আবার বিখ্যাত ছোট গল্পও তিনি কাট-ছাঁট করেন, নিজের মনের মতো সাজিয়ে নেন। সিনেমায় বিখ্যাত গল্পের পরিবর্তনও যদি তিনি করেন সেটাও একটি নতুন গল্পের রূপ নেয়। অবশ্যই মূল রচনার রস বা বক্তব্যকে তিনি খর্ব করেন না। তাঁর নিজের লিখিত উপন্যাসেও তাই বড় অথবা ছোট গল্পের স্বাদ মেলে।

তিন ঃ পরিচালক হিসাবে শিল্পীর অভিনয়ের উপর তিনি খুব গুরুত্ব দেন। প্যারালাল সিনেমাকে অনেকেই 'ডিরেকটরস মিডিয়ম' আখ্যা দেন, এবং অভিনয়কে মনে করেন গৌণ। সত্যজিৎবাবুও সিনেমাকে ডিরেকটরস মিডিয়ম ভাবেন, কিন্তু এটাও মনে করেন যে শিল্পীর সুঅভিনয় পরিচালকের কাজকেই সফল করে।

চার ঃ ভিসুয়াল গিমিক-এ সত্যজিৎ রায় বিশ্বাসী নন। ফ্রিজ শট তাঁর ছবিতে কমই ব্যবহার করা হয়েছে। 'চারুলতা'-য় শেষের ফ্রিজ শটটি খুবই অর্থবহ। 'জলসাঘর'-এ মদের গ্লাসের উপর ঝাড়লণ্ঠনের ছায়া ক্লোজ-আপে দেখে দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠতেন। সেটাও ঠিক গিমিক নয়। বেলোয়ারি ঝাড়ের ছায়া দেখে ছবি বিশ্বাসের মনে বাড়ির ঐতিহ্য ও আভিজাত্যে সম্পর্কে যে আত্মতুষ্টির ভাব ফুটে ওঠে সেটা তাঁর

চরিত্রেরই প্রকাশ।

পাঁচ ঃ কোন সোচ্চার বক্তব্য পরিবেশন তিনি অপছন্দ করেন। তাঁর যদি কিছু বলবার থাকে ছবিতে সেটা তিনি আকারে-ইঙ্গিতে জানাতেই পছন্দ করেন। যে ইঙ্গিত-ধর্মিতা শিল্পের লক্ষণ সেটাই তাঁর বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায়। রাজনীতিক মানসিকতা তাঁর ছবিতে বিশেষ প্রকাশ পায়নি। রাজনীতিক ভাবনা অথবা সমসাময়িক প্রসঙ্গ তাঁর ছবিতে থাকলেও সেটা গল্পের গতির সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মিশে যায়। কখনও মনে হয় না সমকালীন জীবনের এই সমস্যাটির জন্যই তিনি এই সব দৃশ্য বা সিচুয়েশন বেছে নিয়েছেন। তবে কি সোশ্যাল কমিটমেন্ট বলে কিছু তাঁর নেই? আছে, তবে তার প্রকাশ সূক্ষ্ম। 'সদগতি' চিত্রে দারুণ সামাজিক বক্তব্য রয়েছে। ন্যায়-অন্যায়ের সংঘাতও আছে। কিন্তু সেসব দেখাবার জন্য ছবিটি নয়। ছবিটি আদ্যন্ত শিল্প হয়ে উঠেছে। অথচ ছবিটি ভাবায়।

ছয় ঃ সত্যজিৎ রায় নিজেও জানেন সিনেমায় সংগীত বা গান একটি অবাস্তব ব্যাপার। গান কখনো বাস্তবসম্মত হতেও পারে। সত্যিকারের জীবনে মানুষ কখনও-সখনও গান গায়। কিন্তু বাস্তব ঘটনার নেপথ্যে সংগীত বেজে ওঠে না। চলচ্চিত্রে আবহ-সংগীতের অস্তিত্ব বাস্তবসিদ্ধ নয় জেনেও সত্যজিৎবাবু সেটা ব্যবহার করেন। এদেশের ঐতিহ্যকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে পারেন না। কারণ তিনি এদেশেই, এদেশের লোকের জন্যই ছবি করেছেন। এটা ঠিক আপস নয়, এদেশে চলচ্চিত্র তৈরির একটি অলঙঘনীয় শর্ত মেনে নেওয়া। সংগীতের চল অবশ্য অন্য দেশের সিনেমাতেও আছে। আর্টধর্মী ছবিতে বড় পরিচালকরা সংগীতকে তেমন আমল দেন না। সত্যজিৎ বাবুও সংগীতকে সাধারণত এফেক্ট মিউজিক বা ধ্বনির মধ্যেই আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন। পরিবেশের কিছু স্বাভাবিক শব্দও সংগীতের কাজ করে।

সাত ঃ মুখ্যধারার সিনেমায় কতকগুলি চিরাচরিত সংলাপ থাকে। সেগুলি বদলায় না। কোন্ সিচুয়েশনে কে কখন কী বলবে সেটা দর্শকরা জানেন। পরিচালকরা গতানুগতিকতা বিসর্জন দিতে পারেন না। সত্যজিৎ বাবুর ছবিতে মামুলি বা চিরাচরিত সংলাপ পাওয়া যাবে না। অথচ কোন আলংকারিক বা চটকদার সংলাপও তিনি ব্যবহার করেন না। আবার কখনও সাধারণ কথাও মনে বিঁধে যায়, খুবই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন 'সীমাবদ্ধ' ছবিতে শর্মিলা ঠাকুরের মুখে —এটা ভাল, না খারাপ। সামান্য ক'টি শব্দে ছবির বক্তব্যও যেন প্রকাশ পাচ্ছে।

আট ঃ লোকের ভিড়, 'ক্রাউড' বোধহয় পরিচালক সত্যজিতের খুব একটা পছন্দ নয়। তাই মাঝে-মাঝে তাঁর ছবিতে দেখা যায়, ঠিক যেই চবিত্রদের নিয়ে কাজ দৃশ্যে একমাত্র তারাই রয়েছে। আউটডোরের দৃশ্য হলেও তাই। অবশ্য যদি বাজারের পটভূমি (যেমন 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে) হয় তবে অন্য কথা। থিয়েটারের স্টেজে যেমন বাড়তি লোক থাকে না, তাঁর কোন কোন ছবির দৃশ্য ঠিক সেই রকম। 'পথের পাঁচালী'-র কথাই ধরা যাক। মুদির দোকানের লোক ও ফেরিওয়ালা ছাড়া ওই গ্রামে একমাত্র তাদেরই দেখা যায় যারা ছবির চরিত্র। ছবির শেষে একবারই মাত্র কয়েকজন জড়ো হয়েছে হরিহরকে গ্রাম ছাড়তে নিষেধ করার জন্য। যাত্রার আসরে শিল্পীদের যতটা দেখা গেল, গ্রামের দর্শকদের ততটা নয়। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখার মজাটা পাওয়া গেল না।

অবশ্য ছবির নির্দিষ্ট শিল্পীকে দেখা গেছে। 'ক্রাউড সিন' সত্যজিৎবাবুর ছবিতে প্রায় থাকেই না। এরও কারণ ঐ একটাই। বাহুল্যবর্জন বলে শিল্পের যে বিশেষ ধর্ম বা শর্ত সেটাই সত্যজিৎবাবুর বেশি পছন্দ। বাহুল্য নিশ্চয়ই থাকবে না কোন শিল্পকর্মে, তবু বাস্তবের চাহিদা তো মেটাতেই হবে। যদিও পরিচালকের এই মানসিকতার জন্য ছবি কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

নয় ঃ ফটোগ্রাফিকে সব পরিচালকই ছবির প্রধান অঙ্গ মনে করেন। সত্যজিৎবাবুও বাদ যান না। তাঁকে একবার বলা হয়েছিল 'রাইটার উইথ এ ক্যামেরা', পৃথিবীর আরও কয়েকজন বিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে। কথাটি যে কত সত্য সেটা তাঁর প্রথম দিকের ছবি দেখলেই আরও বেশি বোঝা যায়। ক্যামেরা দিয়ে সিনেমার ভাষাকে প্রাঞ্জল করে তোলার অসাধারণ নজিব রয়েছে তাঁর ছবিতে। আবার পরিবেশ ও প্রকৃতির বিভিন্ন রূপও ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। এমনও দেখা গেছে তিনি শুধু ফটোগ্রাফির মধ্য দিয়ে, বিনা কথায়, একটি পুবো ঘটনা ও পরিণতির কথা জানিয়ে দিচ্ছেন। 'অশনি সংকেত' ছবির শেষ দৃশ্যটির কথা মনে করা যেতে পারে। সারি সারি কয়েকটি লোক এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি বড় বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিল ক্যামেরা।

দশ ঃ পৃথিবীর কোন কোন বড় পরিচালকের নিজস্ব দার্শনিক চিন্তা ও ভাবনা আছে। তাঁদের ছবি সেই চিন্তা ও ভাবনার বাহন। সত্যজিৎ রায়ের ছবি তেমন কোন নির্দিষ্ট দার্শনিক উপলব্ধির এবং রাজনীতিক ও সামাজিক ভাবনার বাহন নয়। যখন যে গল্প নিয়ে তিনি ছবি করেন সেই গল্পের বক্তব্যটা শিল্পের শর্তের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। তবে তাঁর সব ছবিতেই থাকে, কখনও অস্পষ্টভাবে, এক ধরনের মানসিক বোধ, যা অন্তরকে ছুঁয়ে যায়।

বাংলা ছায়াছবির নবযুগ ও সত্যজিৎ রায়

স্বপন মজুমদার

'পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি—কোথায় গেল সেই 'বিজয়বসন্ত', সেই 'গোলেবকাওলি', সেই বালকভুলানো কথা —কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।'[১]

'বঙ্গদর্শন' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সমীক্ষণের কয়েকটি শব্দ পাল্টে নিলে কথাগুলি যেন অবিকল প্রয়োগ করা যায় 'পথের পাঁচালী' বিষয়েও। সাহিত্যে যা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, চলচ্চিত্রে যেন তাই করলেন সত্যজিৎ রায়। 'পথের পাঁচালী' বাঙলা চলচ্চিত্রের 'বঙ্গদর্শন'।

দূরাগত এক সংস্কৃতির উজানধারার সঙ্গম উনিশ শতকের সূচনা থেকে তার দেড়শো বছর ধ'রে যে-বেদনা জাগিয়ে তুলেছিল বাঙালির অন্তরে, তার প্রধান প্রকাশ ঘটেছিল সাহিত্যের পাশাপাশি প্রদর্শশিল্পেও। কাকতাল মনে হলেও লক্ষ করবার মতো, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উপনিবেশি পশ্চিমের প্রথম পারিতোষিক নাটক, শেষ সওগাত চলচ্চিত্র। সম্ভবত যাত্রার সঙ্গে লক্ষ্যগত সমীপতার কাবণেই নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এদেশীয়রা; এতটাই অভিভূত যে, দুইয়ের বাইরের সাদৃশ্য তাদের আন্তরিক অমিলটুকু বোঝবার পক্ষে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর তারই ফলে য়ুরোপীয় থিয়েটারের আয়োজনের তলে-তলে মনে ঢেউ দিয়ে যেত যাত্রার আসর। যাত্রা এসে পৌঁছেছিল 'বিলাতি যাত্রা'য় । নাট্যপ্রকরণে কোন ক্রটি ছিল না, কিন্তু সেখানেও যেন মঙ্গলপাঁচালীর স্বর্গখণ্ডের দেবদেবীদের অথবা পৌরাণিক বীরগাথার নায়ক-নায়িকাদেরই আনাগোনা। মধুসূদনের প্রতিবাদ, দীনবন্ধুর আন্তরিকতা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রকে তাই ফিরে যেতে হয়েছিল পুরাণ-বিশ্বাসে—যা তাঁর মনে হয়েছিল জাতির, দেশের মর্মমূল।

বাঙলা চলচ্চিত্রের সূচনা হয়েছিল এই নাট্যমঞ্চেরই উত্তরাধিকারসূত্রে। প্রদর্শশিল্পের নতুন প্রযুক্তি মঞ্চের মানুষদের আকৃষ্ট করেছিল। নতুন শিল্পকলার প্রয়োগে তাঁদের জীবিকা কঠিনতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে জেনেও তাঁরা কিন্তু মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি, বরং বরণ করে নিয়েছিলেন এই নবীন শিল্পমাধ্যম। বাঙলা চলচ্চিত্রের উপক্রমণিকাপর্বে এঁরাই ছিলেন প্রধান প্রযোজক, এবং তার কুশীলবেরাও অধিকাংশ এসেছিলেন মঞ্চের পাদপ্রদীপ থেকে। রঙ্গমঞ্চ থেকে ছবিঘরে চলে আসায় নাট্যাভিনয়ের অভ্যাস অবশ্যই এসে পড়েছিল নির্বাক চলচ্চিত্রে । কিন্তু দর্শকের নাট্যরুচির অভ্যস্ততায় ও অনুকম্পায় সে-বাধা অনতিক্রম্য হয়ে থাকেনি। অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে দুই মাধ্যমের চাহিদা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল নির্মাতা ও দর্শকদের কাছে। সমসময়ে প্রকাশিত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিনয়-শিক্ষা' বইতে এ-দুয়ের প্রভেদ বিশদ ক'রে তুলেছিলেন সমালোচক।[২] প্রকাশের আঙ্গিক নতুন হ'ল বটে কিন্তু বিষয়বস্তু প্রায় অপরিবর্তিতই রইল;

অধিকাংশই পৌরাণিক, অবশিষ্ট সামাজিক রঙ্গ। মঞ্চের পৌরাণিকতার সঙ্গে তার তফাত এই যে, সেখানে বিশ্বাস থেকে তাঁরা পৌঁছেছিলেন পুরাণেতিহাসে। থিয়েটারি ছায়াছবিতে ঔপনিবেশিক বিশ্বাসের সংকট থেকে, রূঢ় বাস্তবের বিপন্ন প্রশ্নাতুরতা থেকে নিষ্ক্রমণের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন পুরাকথার দ্বিরালোক অথবা ইচ্ছাপূরক কল্পবৈভব। মঞ্চ তার প্রায় একশো বছরের প্রতিষ্ঠায় নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন সত্ত্বেও স্বাদেশিক নাট্য প্রযোজনার ঝুঁকি নিতে পেরেছিল। কিন্তু চলচ্চিত্র সংখ্যায় অল্প বলে বা উপকরণ আমদানির সূত্রে প্রত্যক্ষত সরকারের মুখাপেক্ষী বলে অথবা নিয়ন্ত্রণবিধি অস্বীকার করবার মতো সাহস ছিল না বলেই হোক, দেশব্যাপী জাতীয়তা আন্দোলনের ব্যাপকতা সত্ত্বেও স্বাদেশিক ভাবের চলচ্চিত্র নির্মাণের সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি প্রযোজকেরা।

ছায়াছবি যখন হয়ে উঠল কথাছবি, আঙ্গিক থেকে বাচিক অভিনয়শৈলীতে পৌঁছনর পথে প্রকাশগত তারতম্য বিষয়ে তাত্ত্বিক ধারণা আদৌ অস্পষ্ট ছিল না সে-যুগের চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট শিল্পীকুশলীদের। এর মধ্যে অভিনয়ের মুক্তির অমিত সম্ভাবনা লক্ষ করলেও, চলচ্চিত্রের উপকরণধর্মই যে হয়ে উঠতে পারে অনড় এক পরিসীমা, আপেক্ষিক স্থায়ীতাই তার স্থবিরতার চিহ্ন অথবা কথা এসে যে ভেঙে দিতে পারে ছবির গতিময়তা, ব্যাহত করতে পারে তার ছন্দোসমগ্রতা, এ-আশংকা তাঁদেরও ছিল। ১৯৩২ সালেই 'অভিনয়-শিক্ষা'য় লেখা হয়েছিল, 'কথা সবাক চিত্রে একটি প্রধান বাহন হলেও তার মেরুদন্ড নয়। সবাক চিত্রের প্রথমযুগে চিত্র-নির্মাতারা এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। ফলে প্রথম যুগের সবাক চিত্রগুলি এত বেশী কথাবহুল হয়ে পড়েছিল যে ছবি হিসাবে তার দাম যাচ্ছিল কমে। সুখের বিষয় এদিকে ওদেশের চিত্র-নির্মাতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাঁদের চেষ্টার ফলে আজকালকার সবাক চিত্রগুলি অপ্রয়োজনীয় কথার দৌরাত্ম্য থেকে ক্রমশ মুক্তি পাচ্ছে। একজন নামজাদা নাট্যকারের মতে, 'স্টেজের নাটকে যত কথা থাকে ছবির নাটকে তার সিকি ভাগের বেশী কথা সন্নিবিষ্ট করা উচিত নয়। ছায়াচিত্রের যেটি প্রধান বাহন সেই pantomime বা মূক অভিনয়ের সাহায্যেই কথার বাইরের কাহিনীকে ছবির পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে হয়।'[১]

এই সচেতনতা সত্ত্বেও অপ্রস্তুত ছিল বাংলা চলচ্চিত্র নতুন প্রযুক্তিকে শিল্পসিদ্ধ ক'রে তুলতে। চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত, ঘটনার অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন, তখনও মনে করা হচ্ছে ছবির প্রাণবস্তু আর তেমন ছবি তৈরী করতে গিয়ে তাঁরা বানিয়ে তুলেছিলেন সংলাপ, নিয়ে আসছিলেন অতিনাটকীয় গান, সাজিয়ে তুলেছিলেন দৃশ্য, আরোপ করছিলেন জটিলতা। নির্মাণের সেই কৃত্রিমতা অতিক্রম করবার মতো যাদু তখনও লাগেনি তাঁদের কাজে। অভিজ্ঞতার অভাবে ভুলও ক'রে বসেছিলেন তাঁরা, বাঙলা সাহিত্যের সম্পন্ন সংগ্রহ সরিয়ে রেখে ইঙ্গ-মার্কিন ধারার অমূল অনুকরনে নিজেরাই রচনা ক'রে নিয়েছিলেন চিত্রোপযোগী কাহিনী। সিনেমার উপযোগী ভালো গল্প বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন ঘটনাবহুল আখ্যান; সাহিত্যগুণ থাকাটাই অন্তরায় ভাবছিলেন তাঁরা, যা চলচ্চিত্রে অনুবাদের অতীত অথবা অনুপযুক্ত। একটি বস্তুনিষ্ঠ শিল্পমাধ্যম শিল্প-অতিরিক্ত কারণে বিযুক্ত হয়ে পড়ছে পারিপার্শ্বিক থেকে, এই দুর্বলতা গোপন করতেই বাঙলা ছায়াছবি যেন স্বীকার ক'রে নিল প্রতীচী চলচ্চিত্রের বস্তুতান্ত্রিকতার আদল।

চলচ্চিত্র তৈরীর কারখানাঘরের পরিবেশও কাপ্তেনি থিয়েটারের আবহাওয়া থেকে বিশেষ ভিন্ন ছিল না। 'চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে ননীগোপাল সান্যাল লিখেছিলেন,' আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের গোড়া হইতে আজ পর্যন্ত — কি প্রদর্শনী ক্ষেত্রে —কি প্রস্তুত-কার্যে কি রকম বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহা অনেকে ধারণা করিতেও পারিবেন না, কাজেই সেখানকার শিল্প ও বাণিজ্য অজও পর্যন্ত একটা শৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতে পারিল না, সেখানকার শিল্প ও বাণিজ্য যে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি ?'[৪] এই বিশৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নৈতিক অপচয়। শ্রীমতী কানন দেবীর স্মৃতিকথাতেও পরিচয় পাওয়া যায় তার।[৫] অর্থাৎ একদিকে নতুন প্রযুক্তিগত বিষমতা, অন্যদিকে বিনোদনজগতের স্খলিত মূল্যবোধ বাঙলা চলচ্চিত্রকে তার আত্মসন্ধান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে যখন ছবি করতে এসেছেন সত্যজিৎ, বাঙলা সবাক ছবির বয়স দু-দশক ('জামাইষষ্ঠি' ১৯৩১) পেরিয়ে গেছে নির্বাক পর্ব থেকে ধরলে আরও একযুগ বেশী ('বিল্বমঙ্গল' ১৯১৯)। সময়ের বিচারে তখন হওয়া উচিত ছিল তার ভরা যৌবন,কিন্তু স্বভাবে তখন কৈশোরের অপরিণত চপলতা কাটেনি। তার ওপর একটি উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প সম্পূর্ণ আয়ত্ত্ব করতে গেলে যে সংগঠন, নিয়মানুবর্তিতা ও অনুশীলনের প্রয়োজন, প্রকৌশলগতভাবে তার অভাবই ছিল প্রকট, যদিও ব্যক্তিগত স্তরে ব্যতিক্রম ছিলেন এবং বিচ্ছিন্নভাবে ভালো ছবিও করেছিলেন কয়েকজন। অন্যভাবে বলতে গেলে, সৃষ্টির যে-শক্তি থাকলে অতিক্রম করা যেত এইসব অন্তরায়, তার পরিচয় কদাচ মিলেছে সে-যুগে। ক্ষীণ হয়ে এলেও ব্যবহারে বা ভাবনায় পূর্বানুক্রমিক শিথিলতার জের তখনও চলছিল স্টুডিও চত্বরে, যদিও তার বিরুদ্ধে অতৃপ্তির চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল ক্রমে-ক্রমে। থিয়েটারে প্রগতি আন্দোলন একটা সুস্থ ও বিকল্প ধারার সূচনা করতে পেরেছিল সাধারণ রঙ্গশালার মূল প্রবাহের বাইরে। চলচ্চিত্রে সেরকম কিছু ঘটেনি সত্যজিতের আগে পর্যন্ত। টালিগঞ্জের বাঙলা চলচ্চিত্রে তিনি বহিরাগত এবং — হয়ত সেইজন্যেই হ'তে পেরেছিলেন — বিকল্প ধারাটির স্রষ্টা । তাঁর আগে গুণী যাঁরা এসেছিলেন এ-পথে, তাঁদের চলতে হয়েছিল স্টুডিও জীবনের হাল-হকিকৎ মেনে নিয়ে। পেশাদারী প্রযোজক যে প্রথমেই পেয়ে যাননি সত্যজিৎ, তাও সুকৃতি ব'লে আজ মানতে হয় আমাদের। আর এটাই একটা প্রধান কারণ যে ছবি তুলতে গিয়েও তিনি নিজস্বতা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাহিনী, কলাকুশলী বা শিল্পী নির্বাচনে যে সাহসী স্বাধীনতা নিতে পেরেছিলেন তিনি, তা যে সম্ভব হ'ত না কোন ব্যবসায়িক লগ্নীকারের পোষকতায়, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল 'পথের পাঁচালী' তৈরির উপক্রমে; প্রযোজক সন্ধান অভিযানে। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে যা মনে হয়েছিল বাধা, পরিণতিতে পৌঁছে তাই মনে হ'ল উজ্জ্বল উদ্ধার। তবে এই রূপান্তর ঘটাবার জন্য প্রয়োজন ছিল এক বৃষস্কন্ধ অভিযাত্রী পুরুষের, যাঁর দক্ষতার সঙ্গে মিলবে কল্পনার সৌকর্য।

'পথের পাঁচালী' মুক্তির (১৯৫৫) আগের পাঁচ বছরের বাঙলা ছবির শুমারি নিলে বোঝা যাবে কোন্ পটভূমিতে এ-জগতে প্রবেশ করেছিলেন সত্যজিৎ। এর মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, ছবি করতে এসেছেন বেশ কয়েকজন কৃতী সাহিত্যিক আর তাঁদের রুচি

পাল্টে দিয়েছে চলচ্চিত্রের কাহিনীগত কাঠামো। বিষয়ের বিস্তৃতি অবশ্যই দেখা যাচ্ছে তাঁদের কাজে ; কিন্তু গতানুগতিক ছকের প্রলোভন—সে ধনী-দরিদ্র, পূর্ববঙ্গীয়-পশ্চিমবঙ্গীয় নায়ক-নায়িকার প্রেমেরই হোক্ অথবা 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ' জাতীয় ভক্তিরই হোক্—থেকে মুক্ত করতে পারছিলেন না চলচ্চিত্রকে। তবে প্রবণতা দেখা দিচ্ছে সাহিত্য গুণসম্পন্ন রচনা, বিশেষত বিখ্যাত উপন্যাস নির্ভর ক'রে ছবি তৈরির। বঙ্কিম, শরৎ—থিয়েটারের মতো চলচ্চিত্রেও দর্শক আর্কষণ করছেন সমানভাবেই। যদিও সম্ভ্রমযোগ্য দূরত্বে আছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রভাতকুমার, অনুরূপা দেবী, সৌরীন্দ্রমোহন, প্রভাবতী দেবী, স্বর্ণকমল, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, ফাল্গুনী, বনফুল, প্রেমেন্দ্র, প্রবোধ, মনোজ, আশাপূর্ণা দেবী বা প্রতিভা বসু প্রমুখের উপন্যাস নিয়ে ছবি করতে উৎসাহী হচ্ছেন পরিচালকেরা। থিয়েটার থেকে অপরেশচন্দ্র, যোগেশ চৌধুরী, তুলসী লাহিড়ী, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সলিল সেনের নাটকও চিত্রায়িত হচ্ছে। এ ছাড়া সংলাপ রচনার দায়িত্ব নিচ্ছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতা ক্ষুরবাক্ লেখকরা। এঁদের আগে থেকেই ছিলেন জ্যোতির্ময় রায়। তাঁর 'উদয়ের পথে'র শাণিত সংলাপগুলো হয়ে উঠেছিল এঁদের আদর্শ। বিশেষ ক'রে এরই সমসময়ে উত্তম-সুচিত্রার জোড়বাঁধা ছবিগুলোতে কথাই আবার ফিরে এল অসপত্ন অধিকার নিয়ে।

এই হ'ল সত্যজিতের চলচ্চিত্রে আসার সময়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কয়েকজন তাঁর পূর্বসূরী হলেও শিশিরকুমারের থিয়েটারে যোগদান যেমন সম্মানযোগ্য ক'রে তুলেছিল অভিনয়জীবনকেই, সত্যজিতের চলচ্চিত্রজীবনে প্রবেশ তেমনি মর্যাদা দিয়েছিল এই নবীন শিল্পকে। শিশিরকুমার দুর্ভাগ্যবশত তার মর্যাদা রাখতে পারেন নি; সত্যজিৎ অসীম নিষ্ঠায় মূলত প্রাদেশিক ভাষার চলচ্চিত্রকার হয়েও এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। যোগ্য পরিচালক হয়ত তাঁর আগেও কেউ-কেউ এসেছেন বাঙলা ছবির জগতে, কিন্তু ছবি তুলতে গেলে ঠিক যেসব বিষয়ে দক্ষতার প্রয়োজন, একজন ব্যক্তিতেই তার এতগুলির সমাবেশ সম্ভবত এর আগে আর কখনও ঘটেনি। ছবি তোলার কাজে তাঁর উৎসাহ আবাল্য, বড়ো হয়ে তিনি রং-তুলির পেশাদার শিল্পী; এর মধ্যেই বহু সাহিত্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকে খ্যাতি পেয়েছেন। অর্থাৎ সাহিত্য আর চিত্রকলার পারস্পরিক সম্পর্ক তাঁর অনুভবের, অধিকারের ক্ষেত্র। পারিবারিকসূত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিমণ্ডলের মধ্যেই মানুষ হয়েছেন তিনি; নিজে রুচি গড়ে তুলেছেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতে। আর অসাধারণ পরিশ্রমী। তিনি যা জানেন, তার শিল্প ও বিজ্ঞান দুই-ই তিনি আদ্যন্ত জানেন। যা জানেন না, জানা প্রয়োজন মনে করেন, শিখে নেন অবিলম্বে। এইভাবেই জেনে নেন পাশ্চাত্য স্টাফ ও বাঙলা নোটেশন, তৈরি ক'রে নেন বাঙলা নোটেশনের নিজস্ব পদ্ধতি ; ক্যামেরার কাজও রপ্ত ক'রে নেন স্বয়ম্ভর ব্যবহারের মতো। আর যে-কোন সফল মানুষের মতোই তাঁরও আছে অগাধ আত্মবিশ্বাস। প্রথম কাজ করতে গিয়ে অনভিজ্ঞতার দ্বিধাটুকু তিনি কাটিয়ে ওঠেন অচিরেই। নিজের লক্ষ, বিষয় ও উদ্দেশ্য তাঁর কাছে অতি স্পষ্ট আর এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হয়েছে তাঁর প্রতিভা—অলৌকিক ছাড়া যার আর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি কেউ। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সমাহার তৈরি করেছে সত্যজিতের শিল্পীব্যক্তিত্ব।

বিষয়গত ভাবে সত্যজিতের ছবির যেন দুই বিশ্ব। উনিশ শতক থেকে ক্ষয়িত হয়ে- আসা জীবন-গ্রাম থেকে চলেছে শহরের পথে। আভিজাত্যের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠছে নব্যধনী— ঐতিহ্যের পাশে যান্ত্রিকতা উনিশ শতকের নবজাগরণের অস্তরাগের আভা তারন পটে। অন্যদিকে শহর মানেই নাগরিকতা নয়, আধুনিকতা নয়,ডিগ্রি মানেই শিক্ষা নয়। এর পটভূমি সমকাল— বিশেষ সময়ে তার সৃষ্টি কিন্তু সময়হীন তার সমস্যা, যতদিন সমাজ না সংশোধন ক'রে নেবে এর মূল কারণ। প্রথম ধারার ছবিতে যেন বিস্ময়ভরে নানা দিক থেকে লক্ষ করা হয় এই জীবন— তার ছন্দ বা ছন্দোপতন। দ্বিতীয় ধারায় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সন্ধান, সংশয়-বিক্ষত এক সমাজ তার লক্ষ। এই দুই জগৎকে কখনও কখনও তিনি মিলিয়ে দেন তৃতীয় নেত্রে, তাঁর কল্পকাহিনীচিত্রে ঃ 'পরশপাথর' বা 'গু. গা. বা. বা.'-য়। আশা আর বিষাদ, প্রসন্নতা আর তির্যগতা, দর্শন আর ব্যঙ্গ ঃ এই দুই প্রসৃত প্রান্তে বাঁধা হয় তাঁর ছবির পট। সেদিক থেকে দেখলে, সত্যজিতের সমগ্র চিত্রকৃতি বিংশ শতাব্দীর 'বঙ্গদর্শন'।

কেনো পরী-পয়জার পায়ে চলচ্চিত্রের জগতে এসেছিলেন সত্যজিৎ, এমনটা ভাবলে ভুল হবে। অন্য কোন নবাগতের মতোই তাঁকেও ছবি তোলার হাজারো সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। অর্থাভাব, উপকরণের অপ্রতুলতা অন্য অনেকের মতো তাঁকেও মেনে নিতে হয়েছে। 'পথের পাঁচালী' করার আর্থিক অনটনের ইতিহাস তো গল্প হয়ে আছে। তারপরেও সঙ্গতির অভাবে অনেক পরিকল্পনা বর্জনের ঘটনা ঘটেছে তাঁর জীবনে। কিন্তু কল্পনাশক্তির নিঃস্বতা ঘটেনি কখনও। সেই জোরেই তিনি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন নানা বাহ্যিক অপূর্ণতা। উদ্ভাবনের এমন নজির বহু আছে সত্যজিতের ছবিতে। 'গু.গা.বা.বা.'র চার সারি —রাজা, প্রজা, বেনে, সাহেব—ভূতের নাচে দৃশ্য ও ধ্বনির সেই অনুপম মিলন অনেকেরই মনে পড়বে। তার করণকৌশল সত্যজিৎই জানিয়েছেন আমাদের; 'প্রত্যেকটির কোন প্রিসিডেন্ট নেই বলে ভেবে বার করতে হয়েছে ..... চার সারির ভূত যদি সত্যি ক'রে মানুষকে সাজাতে হ'তো, তা হলে আমার একটা তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু শটের দরকার হতো—যে-রকম ফ্লোর এখানে নেই, ওদের দেশে হয়তো আছে। অর্থাৎ আমাকে করতে হয়েছে—একবার দু-সারির ফটোগ্রাফ নিতে হয়েছে— ওপরটাকে মাস্ক ক'রে নিয়েছি। তারপর ক্যামেরার ফিল্মটাকে রিভার্স ক'রে নিয়ে তলাটাকে মাস্ক ক'রে আবার দু-সারির —ঐ একই পজিশনে ওরা দাঁড়িয়ে নাচছে, কিন্তু ঐ টপ হাফ অব দ্য ফ্রেম— ওদের অকুপাই ক'রে আবার প্রিসাইজ মোমেন্ট ইন দ্য মিউজিকে আবার জুম ব্যাক ক'রে যেতে হয়েছে।'[৬] 'একেই বলে শুটিং'য়েও এমন কয়েকটি প্রযুক্তিগত প্রয়োগপরীক্ষার গল্প শুনিয়েছেন তিনি নিজে। সঙ্গীত নিয়েও এমন অসংখ্য নিরীক্ষার নিদর্শন রয়ে গিয়েছে 'গু.গা.বা.বা.'য়। নিজেরই ভরাট গলা এক স্পিডে টেপ ক'রে স্পিড বাড়িয়ে চালিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন ভূতের রাজার বরদানের ভৌতিক স্বর। বিচিত্র রস সৃষ্টিতে হিন্দুস্থানী আর কর্ণাটি রাগসঙ্গীতের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের ও তার আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্রের মিশ্র প্রয়োগের সংশ্লেষ ঘটালেন কোন সঙ্গীতশাস্ত্রী নন, চিত্রকার সত্যজিৎ।

চিন্তার প্রখর স্বাতন্ত্র্যে প্রথম থেকেই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর ছবি। পশ্চিমী ছবির একাগ্র দর্শক তিনি ঃ কিন্তু নিশ্চিত জেনেছিলেন, হলিউড চিত্রধারায় বা পৌরাণিক

ছবির বিশ্বাস-বিভ্রমে সম্ভাবনা নেই এদেশের ছবির বিকাশের। শান্তিনিকেতনের তিন শিল্পশিক্ষক নন্দলাল, বিনোদবিহারী আর রামকিঙ্কর সম্ভবত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। নন্দলালের কথা মনে করেছেন সত্যজিৎ, যিনি বলেছিলেন, 'গরু মানে শুধু একটা রেখা নয়। এর মাস্‌ল্ আছে, মাংস আছে। তাই যখনই গরু আঁকবে তখন শুধু আউটলাইন ড্রইংয়ে মনোনিবেশ কোর না, কেন না তাতে এই প্রাণীটিকে একেবারেই ধরা যাবে না। কেবলমাত্র অস্পষ্ট একটা ধারণা পাওয়া যাবে। ওর ফর্মটাকে ফিল করার চেষ্টা কয়ো, অনুভব করার চেষ্টা করো ওর ওপরের চামড়ার তলাটা। আর সেই পেন্সিল দিয়ে সেটা ড্রইংয়ে বোঝানোর চেষ্টা করো। শুধুমাত্র আউটলাইনে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখো না।'[৭] আর রামকিঙ্কর 'বলতে চেয়েছিলেন নেচারালিজম এবং রিয়ালিজম-এর পার্থক্যের ব্যাপারে। বিনোদবিহারীবাবুও নেচারালিজম এবং রিয়ালিজম-এর ফারাকের ব্যাপারটা সব সময় মনে রাখতে বলতেন। আমরা যা করি তা হল নেচারালিস্টিক। কিন্তু রিয়ালিজম হল তার চেয়েও বেশি কিছু, এবং সেটার দিকেই আরও বেশি নজর দেওয়া উচিত। তখন থেকে তাই আমি ফোটোগ্রাফিক নেচারালিজম-এর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করা শুরু করলাম।'[৮] এই অনুভব, যাকে সত্যজিৎ বলেছেন 'ভারতীয় শিল্পবোধ',[৯] প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রথম ছবির কাজ থেকেই। অপু ত্রিচিত্রের নির্বাচনই ধরিয়ে দেয় প্রচলিত সিনেমার বাস্তবতা বিষয়ে তাঁর অতৃপ্তি এবং তাঁর স্বকীয়তা। আর এইভাবেই বাঙলা ছবির অনুসৃত ছকগুলিকে পরিহার ক'রে যান তিনি।

চিত্রকাহিনী হিসেবে 'পথের পাঁচালী' বাছাই করাই ছিল এক তেজি জেহাদ। শিল্পী মনের এক বালকের বড়ো হয়ে ওঠার এই কাহিনী উপন্যাস হিসেবে বুদ্ধিজীবীমহলে সম্মান পেয়েছিল। এই গল্পবিরল আখ্যান প্লটজটিল রমন্যাসের বাঙালী পাঠক সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করতে পারে নি। কিন্তু তার মধ্যেই সত্যজিৎ আবিষ্কার করেছিলেন এক মহৎ ছবির উপকরণ। লক্ষ করেছিলেন, যৎসামান্য সম্পাদনা করেই চিত্রনাট্য রচনা করা যায় এই উপন্যাস থেকে, এতই জীবন ঘনিষ্ঠ সংলাপ বিভূতিভূষণের। তাই 'পথের পাঁচালী'তেই সম্ভবত সব থেকে কম স্বাধীনতা নিতে হয়েছিল পরিচালককে। তার মানে কি তবে এই যে উপন্যাসের অবিকল প্রতিরূপায়ণ ছিল চলচ্চিত্র ? রূপান্তর শুধু বাক্য থেকে দৃশ্যে? মিলিয়ে নেওয়া যাক্ দু-একটি চিত্রমূহূর্ত। যেমন, বল্লালী বালাই ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু। উপন্যাসের তুলনায় চলচ্চিত্রে বিলম্বিত এই মৃত্যু। উপন্যাস অনুযায়ী অপুর স্মৃতিতে আঁচড় পড়ার বয়সই হয়নি তখন। তাই দুই ভাই-বোনে মিলে পিসির মৃতদেহ আবিষ্কার করার কথাও ছিল না উপন্যাসে। কিন্তু ছবিতে দেখি।

অপু-দুর্গা খেলতে খেলতে বাঁশঝাড়ের মধ্যের পথ দিয়ে এগিয়ে আসে। (নেপথ্যে কাঁসরঘন্টার শব্দ) । দুর্গা ইন্দিরকে দেখতে পেয়ে তার কাছে আসে, ভাবে পিসি ঘুমিয়ে পড়েছে। পিসির মাথাটা হাঁটুর ওপর নুয়ে পড়েছে। দুর্গা আস্তে মাথাটা তোলার চেষ্টা করে, পারে না। তখন দুর্গা পিসির হাঁটু ধরে ঝাঁকায়। অপু পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

দুর্গা— পিসি! ও পিসি!

(কাঁসর ঘন্টার শব্দ শেষ)। দুর্গা, পিসিকে জাগাবার চেষ্টা করে।

দুর্গা— পিসি! পিসি!

পিসির দেহটা গড়িয়ে একপাশে পড়ে যায়। মাথাটা ঠক্ ক'রে মাটিতে লাগে। দুর্গা ভয় পেয়ে নিচু হয়ে পিসির মুখটা দেখার চেষ্টা করে।

দুর্গা— (ফিস ফিস ক'রে) পিসি।

ভয়ে দুর্গা পিছিয়ে যায়। তার পায়ে লেগে ইন্দিরেব ঘটিটা পুকুরপাড় দিয়ে গড়িয়ে ডোবায় পড়ে যায়। দুর্গা-অপু ডোবার উপর দিয়ে দৌড়ে চলে যায়। দূরে দেখা যায় অপু-দুর্গা ছুটে পালাচ্ছে, সঙ্গে বাছুর। ক্যামেরার দৃষ্টি নিচে নেমে ইন্দিরের মুখের উপর থামে। মৃত ইন্দিরের মুখের উপর একটা মাছি খেলা ক'রে বেড়ায়। (নেপথ্যে ইন্দিরের গলায় 'দিন ত গেল সন্ধ্যা হল' শোনা যায়)।[১০]

মূল থেকে এই সরে আসা কি নিতান্তই অকারণ? অপুর বয়স বাড়িয়ে, নিশ্চিন্দিপুরের সেকালের সঙ্গে একালের পবিচয় কি স্থায়ীভাবে এঁকে দিলেন না পরিচালক, ইন্দিরের মৃত্যুর সূত্রে? অথবা গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার আগের দিন দুপুরে তাক পরিস্কার করতে গিয়ে অপু যখন খুঁজে পায় দুর্গাব চুরি করা পুঁতির মালা (উপন্যাসে সোনার কৌটো), সে গল্পের মতো বাঁশবনে না-ফেলে ফেলে পানাপুকুরে। ঘটনাসূত্র অবশ্যই উপন্যাসে ছিল, কিন্তু যে-অভিঘাত নিয়ে এল ছবিতে তার মধ্যে অনুভূতির এক আশ্চর্য সমান্তরলতা সৃষ্টি হ'ল। ঐ-মালা একদিকে দুর্গার তুচ্ছ লোভের প্রমাণ, অন্যদিকে অপুর কাছে আজ তার মহার্ঘ স্মৃতি। প্রমাণ সে রাখতে চায় না, আবার দিদির স্মৃতির প্রতি তার দুর্বলতা আছে। অপু দুর্বলতা জয় করে। প্রমাণের সঙ্গে বাহ্যস্মৃতিও লুপ্ত হয়ে যায়। বিন্যাসের গুণে মুহূর্তে দর্শকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অপুর শিল্পীস্বভাব, যে কোন-কিছুই আহবণ করে না, আত্মীকবণ করে। অন্য ছবিতেও ছড়ানো রয়েছে এমন অনুভূতিঘন চিত্রভাষা রচনা। 'জলসাঘরে' ঝড়েব রাতে সালামৎ আলি খাঁর গানের মেহফিলের দৃশ্য মনে পড়বে অনেকেরই, যখন স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুর অজানা আশংকায় উন্মনা হয়ে যান বিশ্বম্ভর।

ওস্তাদজী গান গাইছেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা শোনা যায়। বিশ্বম্ভর মদের গ্লাসে মুখ দিতে যাবেন, এমন সময় তাঁর চোখে পড়ে জলসাঘবের জানলা। সেখান দিয়ে বাইরের বিদ্যুৎ চমকানো দেখা যায়। তিনি চিন্তিত মুখে গ্লাসটা নামিয়ে রাখেন। গড়গড়ার নলটা তুলে নেন হাতে। মনোযোগী হবার চেষ্টা করেন গানে।

সম্পূর্ণ জলসাঘর দেখা যায়। ওস্তাদজী গান গাইছেন। বিশ্বম্ভর চেষ্টা করেও গানে মন বসাতে পারেন না। তাঁর চোখ চলে যায় উপরেব দিকে। হাওয়ায় ঝাড়বাতিটা দুলছে। বিশ্বম্ভর চোখ নামিয়ে নেন। গানে মন বসাবার চেষ্টা করেন।

ওস্তাদজীকে গাইতে দেখা যায়। যন্ত্রীরা পাশে বসে সঙ্গত করে যাচ্ছেন। বিশ্বম্ভর গড়গড়ার নলটা মুখে দিতে যান। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে মদের গ্লাসে। গ্লাসের মদে একটা পোকা। পোকাটা পাখার ঝাপট দিয়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। বিশ্বম্ভর পোকাটাকে দেখে একটু আতঙ্কিত হন। কিছুক্ষণ পোকাটাব দিকে তাকিয়ে আবার গানে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করেন।

ওস্তাদজী গাইছেন এবার দ্রুতলয়ে। বিশ্বম্ভরের দৃষ্টি আবার গ্লাসের দিকে। পোকাটা মৃত। নিস্পন্দ হয়ে গ্লাসের মদে ভেসে আছে। বিশ্বম্ভর চোখ তুলে ওস্তাদজীর দিকে তাকালেন। তাঁর মুখ চোখে আতঙ্কেব ভাব।

ওস্তাদজী দ্রুতলয়ে গাইছেন। পাশের যন্ত্রীরা সঙ্গত করে যাচ্ছেন।[১১]

মূল গল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিশ্বম্ভরের 'সব শেষ' হয়ে 'নতশিরে মৃত্যুর অপেক্ষা' ক'রে থাকার কথা বলা হয়েছিল। মেহ্‌ফিলের সঙ্গে এই দুর্ঘটনার রাত্রি মিলিয়ে দিয়ে জলসাঘরকে আরও একটি বিধুর মুহূর্তের সাক্ষী ক'রে তুললেন চিত্রনাট্যকার। বিশ্বম্ভর নয়, মহিম নয়, আভিজাত্য বা হঠাৎ ধনী নয়, জলসাঘরই হয়ে উঠল ছবিটির কেন্দ্রচরিত্র।

বিশ্বাস করা কঠিন হলেও সত্যি, এত অনুপুঙ্খ চিত্রভাষা অসামান্য অধ্যবসায়ে তিনি বুনে যান তাঁর চিত্রনাট্যের মধ্যেই। অথবা বলা যায়, চিত্রনাট্যই তাঁর হাতে হয়ে ওঠে অসংখ্য স্কেচে ভরা এক নাট্যচিত্র। তাঁর চলচ্চিত্রের বহু দৃশ্যই অবিকল মিলিয়ে নেওয়া যায় এইসব নাট্যচিত্রের সঙ্গে। অর্থাৎ স্কেচগুলো তিনি আঁকেন ঐ ক্যামেরা দৃষ্টিকোণ থেকেই। প্রায় সম্পূর্ণ 'পথের পাঁচালী'র নাট্যচিত্র, 'দেবী'তে দয়াময়ীর দেবী হয়ে ওঠার মুহূর্তগুলো, 'কাপুরুষে' রেস্তরাঁয় করুণা ও অমিতাভ, 'সমাপ্তি'তে মৃণ্ময়ীর বাঁশের মাঁচায় বসে আখ খাওয়া অবিকল যেন আঁকা পাতা থেকে উঠে আসে পর্দায়। কিন্তু চিত্রনাট্যের এতটা পূর্বপ্রস্তুতি কি ক্ষুণ্ণ করে তাঁর চলচ্চিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ? একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, চিত্রনাট্যকে প্রায় স্বরলিপির মতো ব্যবহার করেন সত্যজিৎ। স্বরলিপি যেমন গায়কীর প্রতিবন্ধক নয় কখনই, তেমনি কল্পনার অন্তরায় নয় তাঁর চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্যে আছে, চলচ্চিত্রে নেই, এমন উদাহরণও নগণ্য নয়। বিখ্যাত দুটি হ'ল 'পথের পাঁচালী'তে অপুর স্ফটিক পাওয়া ও 'অপরাজিত'য় লীলা-প্রসঙ্গ। আবার কাজ করতে-করতে হঠাৎ-পাওয়া অনুপুঙ্খও তিনি অবলীলায় গেঁথে নেন চলচ্চিত্রে। যেমন, 'পথের পাঁচালী'তে রেল চলে যাওয়ার পরে কাশের বনের ওপর দিয়ে ধোঁয়ার মেঘ ভেসে যাওয়ার বা পানাপুকুরে দুর্গার চুরি-করা পুঁতির মালা ফেলার পর পানা সরে যাওয়া আর ফিরে আসার দৃশ্য। চলচ্চিত্র নির্মাণের স্তরে-স্তরে কল্পনার এমন আনন্দেই তিনি ভরিয়ে তোলেন তাঁর সৃষ্টি। এই আনন্দের সন্ধানেই বাঙলা ছবি পেয়ে গেল তার স্বপ্নলোকের চাবি, তার নতুন ডানার শিকড়।

ছবি আর কথা দুই স্বয়ম্ভর শিল্প। অন্য যে-কোন শিল্প-মাধ্যমের মতো তাদেরও আছে নিজস্ব আয়তন, আভূষণ ও আয়োজন। প্রাথমিকভাবে আশ্রয় করতেই পারে একে অপরকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককেই চলতে হয় স্বধর্মের পথে। এ-কথা জানেন বলেই শিল্পীর স্বাধীনতা নিতে দ্বিধাও নেই সত্যজিতের। 'চারুলতা'র শেষ দৃশ্য তার প্রমাণ ঃ চারু-ভূপতির এগিয়ে আসা হাতদুটি নিথর হয়ে যায় অনন্তের জন্যে। একদিকে অধরা অনুভূতিকে তিনি যেন বাঁধতে চান চিত্ররূপে, অন্যদিকে কথা থেকে নৈঃশব্দ্যের ব্যঞ্জনায় সরিয়ে নিয়ে যেতে চান চিত্রাতীত অনুভবকে। অবশ্যই এ এক ব্যাখ্যা। কিন্তু সৃষ্টিগর্ভ ব্যাখ্যা। আমাদের মনে পড়ে সিস্টিন চাপেলে মিকালেঞ্জেলোর 'আদমের সৃষ্টি'তে চিরকালের মতো অমিল দুই হাত অথবা কীট্‌সের কবিতায় গ্রিসিয় পানপাত্রের গায়ে চিরায়ু পাওয়া 'স্টিল আন্‌র‍্যাভিশড্‌ ব্রাইড অফ কোয়ায়েটনেস/দাউ ফস্টারচাইল্ড অফ সাইলেন্স অ্যান্ড স্লো টাইম'।

চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ এই নৈঃশব্দের কবি। গল্প নয়, কথা নয়, না-বলা কথার ছবি আঁকেন। শুধু রং-রেখার ছবি নয় তা। তাঁর দৃশ্য ছবি, কথা ছবি, সুর ছবি, শব্দ ছবি, নৈঃশব্দ্য ছবি, অনুপুঙ্খ ছবি, চলায় ছবি, স্থিরতায় ছবি, গঠনে ছবি, কৌণিকতায় ছবি,

এমন কি অনুভূতিকেও তিনি ছবি ক'রে তুলতে পারেন। কাছ থেকে দেখলে মনে হয় বিচ্ছিন্ন, এলোমেলো, অযুক্ত। কিন্তু যখন তিনি গেঁথে দেন এই বিচিত্রকে এক পরম্পরায়, তখনই ছবি হয়ে ওঠে গান। সেই ধ্রুবপদে বাঁধা হয়ে যায় তাঁর অণুবিশ্ব, সে-বিশ্বতানে ভরে ওঠে জীবনগান।

উদ্ধৃতিসূত্র ঃ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বঙ্কিমচন্দ্র". 'আধুনিক সাহিত্য', রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯,(বিশ্বভারতী ১৩৮৫), পৃ ৩৯৯-৪০০।

২. চন্দ্রশেখর, "ফিল্ম-অভিনয়", ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অভিনয়-শিক্ষা' (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স ১৩৩৯), পৃ ২৫১-৫৫।

৩. চন্দ্রশেখর, "সবাক চিত্র", তদেব, পৃ ২৬২-৬৩।

৪. ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ ২৮২।

৫. 'সবারে আমি নমি' (এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স ১৩৮০)।

৬. শ্রীকরুণাশঙ্কর রায় গৃহীত সাক্ষাৎকার। প্রাসঙ্গিক পুনর্মুদ্রণ ঃ 'এক্ষণ', বর্ষ ১৮/৩-৪ সংখ্যা, ১৩৯৫ শারদীয়, পৃ ৮৭।

৭. শ্রীধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় গৃহীত সাক্ষাৎকার, 'আনন্দলোক', বর্ষ ১৮/১ সংখ্যা, ১৮ জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ ২৩।

৮ তদেব।

৯. তদেব।

১০. "চিত্রনাট্য ঃ 'পথের পাঁচালী' ", 'এক্ষণ'. বর্ষ ১৬/৩-৪ সংখ্যা. ১৩৯০ শারদীয়, পৃ ২৭২-৭৩।

১১. "চিত্রনাট্য ঃ 'জলসাঘর' ", 'এক্ষণ', বর্ষ ১৮/৫-৬ সংখ্যা, ১৩৯৬ শারদীয়, পৃ ২৮৫-৮৬।

পরিচালক সত্যজিৎ রায়
রবি ঘোষ

শিশু চলচ্চিত্র ভারতবর্ষে ভালো করে আজও তৈরি হয় না। সেদিক থেকে সত্যজিৎ রায় একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর প্রত্যেকটি শিশু চলচ্চিত্রই এক একটি কিংবদন্তী হয়ে গেছে। মানিকদার বাড়িতে একটা ট্র্যাডিশনাল এডুকেশন বা কালচার আছে তো শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে। সেটা মানিকদার মধ্যে রয়েছে। শিশুর মনস্তত্ত্ব, বোধহয় মানিকদার স্পেশাল সাবজেক্ট। আমি নিজে একটা ছবি করেছিলাম বাহাত্তর সালে। 'সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা' । তাতে একটা বাচ্চা ছেলের চরিত্র ছিলো। তখন আমাকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোমার ছবিতে একটা বাচ্চাছেলের চরিত্র আছে?' আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।' তখন আমাকে বললেন, 'দ্যাখো, তোমাকে একটা কথা বলে দিই। বাচ্চাদের যখন ট্রিট করবে কখনো বাচ্চাদের মতো করবে না। ওদেব একেবারে অ্যাডাল্ট হিসাবে ট্রিট করবে। কারণ বাচ্চাদের মতো ট্রিট করতে গেলেই ওরা কিন্তু চটে যায়। যে মুহূর্তে দেখবে বাচ্চারা ইরিটেটেড হয়ে যাচ্ছে, তখনই সুটিং বন্ধ করে দেবে। কারণ ওদেব দিয়ে সব সময় খেলাচ্ছলে হোল কাজটি করাতে হয়।' পরবর্তীকালে, অথবা আগেও আমি দেখেছি—শুটিং করাকালীন সময়ে, মানিকদা 'সোনার কেল্লা' 'আগন্তুক' বা 'পিকুর ডায়েরি' যখন করেছেন, যে ট্রিটমেন্ট মানিকদা বাচ্চাদের নিয়ে কবতেন, সেইবকম ট্রিটমেন্ট করতে এক বিশেষ ক্ষমতাব দরকার। 'শাখাপ্রশাখা'ব সময় মানিকদা অজিত বাঁড়ুজ্জে বা সৌমিত্রর সঙ্গে যে টোনে কথা বলছেন বা ডিরেকশন দিচ্ছেন বাচ্চাটাকেও একই টোনে ডিরেকশন দিচ্ছেন। মানিকদাকে আমি কখনোই দেখিনি যে, ফ্লোরের মধ্যে বাচ্চাটাকে বাচ্চার মতো ট্রিট করছেন। হয়তো বাচ্চাটা ফল্টার করলো। কি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন। ক্যামেরা চলছে তখন। বলতেন ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই জায়গাটা তোমার একটুখানি আটকে গেল, না? ঠিক আছে। একটু থামো। এইবার আবার বলতে শুরু করো।' মুহূর্তের মধ্যে আমরা বুঝতে পারি, যে বাচ্চাব নার্ভের ওপর কোন স্ট্রেইন পড়লো না। হ্যাঁ, বাচ্চাটাকে বুঝতেও দিলেন না যে, ভুল করার জন্য তার লজ্জা পাওয়া উচিৎ; এবং টেকনিক্যালি মানিকদা কিন্তু ক্যামেরা চালিয়েই রাখলেন। বাচ্চাটা একটু থেমে আবার ডায়ালগগুলো বলতে শুরু করলো। একবার ধরিয়ে দিলেই তো হয় বাচ্চাদের। একটা খেই হারিয়ে ফেলেছিলো শুধু। যেই ধরিয়ে দিলেন, আবার বলতে আরম্ভ করলো। কি করে বলবে সেটা কিন্তু কখন-ই মানিকদা ডিরেকশন দিতেন না। রিডিংটা ওর সামনে দিয়ে দিতেন। দিয়ে বলতেন 'তুমি বলো তো কথাগুলো।' স্বতঃস্ফূর্ত্ত যদি হয়, মানিকদা সেটাকেই তুলে নিতেন। বিশেষ চর্চা না করলে কিন্তু এই ব্যাপারটা দাঁড়ায় না। তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটা দেখেছি। যে রেটে বাচ্চারা মানিকদার বই কেনে। আমরা যে অনেকের বাড়ি উপনয়ন বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে যাই, তা আমার গিন্নি বলেন যে 'মানিকদার সিরিজগুলো দেবো?' আমার পাশের বাড়িতেই একটা বাচ্চা

ছেলের পৈতে হলো। তার বাবা-মা এসে বললো, 'বেস্ট প্রেজেন্টেশন আপনারটা হয়েছে।' আমি মানিকদার এন্টায়ার সিরিজটা দিয়ে দিয়েছিলাম। নতুন যেটা বেরিয়েছে। ফেলুদার সিরিজ, অমুক-তমুক, এককালে যেমন মানিকদার বাবার ছিলো। সুকুমার রায়ের সিরিজ প্রেজেন্টেশন দেওয়া হতো। এই জিনিসটা কিন্তু একটা বিশেষ চর্চা, এখন আমি যেটা জানি, তুমি নিজেকে যখন বাচ্চার সঙ্গে ট্রিট করবে, তোমাকে একটু আনলার্ন করতে হবে। ওর থেকে আমি অ্যাডাল্ট, আমি ওর থেকে অনেক কিছু বেশি জানি, —এটা একদম ভুলে যেতে হবে। নামতে হবে কিন্তু বাচ্চার লেভেলে। বাচ্চা যে-মুহূর্তে মনে করবে যে, তুমি তার ইকুয়াল, ওই বাচ্চা চটবে না। এবং তোমাকে ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ করবে। আমি বহু বাচ্চাকে শুটিং করার সময়ে দেখেছি, চটে যায়, রেগে যায়। বাচ্চাকে লজেন্স দিতে হয়। মানিকদাকে কিন্তু ফ্লোরে এসব কখনো কিছু করতে হয় নি। তাঁকে লজেন্সও দিতে হয় নি, আইসক্রিমও দিতে হয় নি, বা তার মাকেও দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় নি। এমন-কি এটা ইভ্‌ন বাবুর ক্ষেত্রেও দেখেছি। মানিকদার ছেলে। এই ট্রেনিংটা মানিকদাই দিয়েছেন। আমাদের এই 'গুপী বাঘা ফিরে এলো'তে একগাদা বাচ্চা ছিল তো। তাদের জন্য ফুটবল কিনে দেওয়া হলো। তারা অবসর সময়ে খেলতো। অর্থাৎ, খেলার ছলে তুমি যদি তাদের দিয়ে কাজ করাতে পারো, তবে তাদের থেকে তুমি বেস্ট কাজটি বের করে আনতে পারবে। যে-ই কাজটা তুমি তাদের ঘাড়ে চাপাবে, বাচ্চা চটে যাবে। এইটে মানিকদার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো। বহু মনস্তত্ত্ববিদকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেসও করেছি। তাঁরা বলেছেন ঃ 'দ্যাখো, শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যদি ভালোমতো জানা না থাকে, তবে বাচ্চাদের ওই ভাবে ট্রিট করতে পারা যায় না।' আমার মনে হয় মানিকদার সেটা বোধ হয় খুব ভালো করে জানা ছিল।

উইট এবং হিউমার মানিকদাদের পরিবারের ট্র্যাডিশনাল ব্যাপার। প্রথমত তো একটা বাড়ির ব্যাপার আছে। মানিকদা যে সার্কেলে ছোটবেলা থেকে মানুষ, যে আড্ডাতে মানুষ, তাদের মধ্যে অনেককেই আমি চিনতাম। উইট, হিউমার—যেটা মানিকদা প্রচুর সিরিয়াস ছবির মধ্যেও পাওয়া যায়, সেটা আসলে রসবোধ। যেমন মানিকদার ব্যক্তিগত জীবনেই এমন এমন এক একটা কমেন্ট করতেন—আমরা নিজেদেরকে অনেক সময় মনে করি আমাদের কি বুদ্ধি ! —কিন্তু মানিকদাব মতো অতো সাট্‌ল বুদ্ধি কিন্তু আমাদের নেই। একটা গল্প বললেই বোঝা যাবে কত সাট্‌ল হিউমার ছিলো মানিকদার। কমলকুমার মজুমদার, বিখ্যাত লেখক, মানিকদার খুবই বন্ধু ছিলেন। একদিন কমলদার সঙ্গে মানিকদার দেখা। আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে। মানিকদা বললেন; 'আসুন না। বহুদিন আসেন না আমাদের বাড়িতে। একটু আড্ডা মারতে আসুন।' কমলদা যেমন কস্টিক রিমার্ক করেন— কমলদা বললেন, 'না, আপনার বাড়িতে বড্ড ভদ্রলোকেরা আসে আজকাল। ওখানে গিয়ে আমার ঠিক জমবে না।' মানিকদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমি চাড্ডি ছোটলোক আনিয়ে রাখবো।' এই যে মুহূর্তের মধ্যে এই যে সাট্‌ল্‌টি, এগুলো এসেছে নাইনটিন্‌থ্ সেঞ্চুরির রেনেসাঁস্ পিরিয়ডের থেকে— মানিকদা হচ্ছেন লাস্ট রেপ্রেসেনটেটিভ অব দ্য রেনেসাঁস্। রেনেসাঁস পিরিয়ডের চরিত্রের মধ্যেই রসবোধ থাকবে।

মানিকদার 'পরশ পাথর' ছবিটিতে প্রতি মুহূর্তে ব্যঙ্গের মধ্যে রয়েছে উইট অ্যান্ড

হিউমার। হি ইজ নেভার ক্রুড, ইভন 'জন অরণ্যে'র মতো ছবিতে— যেখানে আমি অভিনয় করেছি। সেখানে আমি একটা পিম্প, —সেখানে একটা জায়গায় যে মেয়েদের কাছে নিয়ে গেছি তার মা বলেছে ঃ 'এবার আমার মেয়েরা বেশ বড় হয়ে গেছে'— এগুলো ব্ল্যাক হিউমার কিন্তু। —হ্যাঁ, 'বড় হয়ে গেছে। তা আসুন না আপনি একদিন।' এই সিনটা আমার এখনো মনে আছে। এই 'আসুন না, আপনি একদিন' বলতে গিয়ে আমার এমব্যারাসমেন্টটা কি হবে, মানিকদা সেটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে শুধু 'আমি' 'আমি' 'আমি' বলে। 'আমি মানে, আমি মানে, আ-আমি তো এসব ব্যাপারে নেই— আমি তো যোগাড় করি।'। এই তিন-চারটি 'আমি' বলা মানিকদা দেখিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। এগুলো চর্চা, রসবোধ, ব্রিটিশ হিউমার, ফ্রেঞ্চ হিউমার, আমাদের রবীন্দ্রনাথের হিউমার, বা তার পরবর্তীকালের যে সব হিউমার বা মানিকদার বাবার হিউমার— এই সব মিলিয়ে মানিকদার হিউমার। তাছাড়া, রেনেসাঁস্ পিরিয়ডের লাস্ট লোক বলে এঁরা রসবিহীন হবেন না। এঁরা সবাই রসসিক্ত। এবং সর্বদাই রসের সন্ধান করে বেড়ান। সবসময়ে মজাদার মজাদার সব কথা বলেন। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে আরেক ধরনের হিউমার ঃ একটা 'গে' হিউমার। কতগুলো ছেলে বাইরে বেড়াতে গেছে। বেড়াতে গিয়ে সেখানে নানারকম পরিবেশের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে কিন্তু টিন্জ্ অফ হিউমার লুকিয়ে রয়েছে। ইভ্ন ওই মেয়েটাকে — শমিত ভঞ্জ যে পার্টটা করেছিলো — টাকা দিচ্ছে যখন, তখন যে ডায়ালগটা আমার মতো বেকার ছেলের মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছে। 'তিরিশ টাকা দিচ্ছে। হি ইজ গোয়িং টু পে হিম থার্টি চিপস্।' তার মধ্যেও কিন্তু হিউমার লুকিয়ে রয়েছে। তারপর যেমন; ' নাঃ! দাড়ি আর কামাবো না। নো পেপার, নো দাড়ি কামানো।' দু'টি গ্রাম্য ছেলে 'গুপী গাইন বাঘা বাইনে'— রাজপ্রাসাদে প্রথম ঢুকলো। ঢুকে চারিদিকে দেখতে দেখতে, ময়ূর-টয়ূর দেখতে দেখতে এসে জলে হাত দিয়ে— এবার যে কোন পরিচালক এখানে, একগাদা কথা দিতো। মানিকদা একটি ডায়ালগ দিলেন, বাঘার মুখ দিয়ে। গুপী জিজ্ঞেস করলো, 'বাঘাদা। কিরকম?' বললো, 'ব্যবস্থা ভালোই'! এই 'ব্যবস্থা ভালোই' তে বোঝা গেলো, দে আর হ্যাপি। আবার আর একটা দিক মনে হবে, যেন এরা বহুদিনই এরকমভাবে থেকেছে-টেকেছে। তাতো না। এই প্রথম থাকছে। এগুলো কিন্তু সাঙঘাতিক। এই হিউমার প্রথমত পারিবারিক ব্যাপার। তারপর নিজের চর্চা। তারপর যে সার্কল অফ আড্ডা মানিকদাদের ছিলো, সে তো কলকাতার একেবারে অত্যন্ত বিদগ্ধ ক্লাস, যাঁরা প্রথম ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি তৈরি করেন।

আমাদের চিদানন্দবাবু ছিলেন। আরো অনেকেই ছিলেন। এঁরা কিন্তু কেউই টিপিক্যাল ক্রুড মধ্যবিত্ত বাঙালী নন। এঁরা সবাই কিন্তু উন্নতশীল লোক। উন্নতশীল লোক রস খুঁজে বেড়ায় জীবনে। আমাদের মধ্যে একরকম ক্যারেকটারের মধ্যবিত্ত বাঙালী আছে, যারা শুধু মাছ খুঁজে বেড়ায়। কি করে সস্তায় মাছ কেনা যায় ওঁরা তা চিন্তা করেন না। পৃথিবীর কোথায় কোন রসের সন্ধান পাওয়া যাবে। যেমন মানিকদা গল্প বলতেন আমাদের। কত রকমের গল্প বলতেন। সেই সময়ে, চ্যাপলিনের টাইমে, আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন চ্যাপলিনের সমসাময়িক। বাস্টার কীটন। তারপর লরেল হার্ডি— এঁদের মোমেন্টসগুলো মানিকদা ডেসক্রাইব করতেন যখন বসে বসে, সে

সাঙঘাতিক লাগতো শুনতে। তারপর বলতেন, 'মুশকিল কি জানো। আমাদের এখানে এসব ক্রুড করে ফেলে।' ক্রুড বলতে বোঝায় ওভারডুইং। আমি তো কমেডি রোল মানিকদার ছবিতেও করেছি। আবার অন্য ছবিতেও করি। সেখানে করতে চাই না যেটা, সেটা আমাকে দিয়ে ইনসিস্ট্ করিয়ে করানো হয়। মাঝে মাঝে পরিচালকের সন্তুষ্টির জন্য করতে হয়। কিন্তু আমি বলি তাঁদের ঃ 'দেখুন, ওভারডুইংটা ভালো জিনিস নয়।' কলাপাতায় পা হড়কে একবার পড়ে গেলে লোকে হেসে ওঠে। একবার পড়ে গেলে লোকে হাসবে, দু'বার পড়ে গেলে কিন্তু হাসবে না। আমরা কিন্তু দু'বার পড়ে যাই। পরিমিতিবোধের অভাব। ব্রেভিটি বলুন, পরিমিতিবোধ বলুন, সেন্স অব প্রোপোরশন বলুন, এসব মানিকদার ছিলো। তিনি ওভারডুইং একদম বর্জন করতেন। বিশ্বাস করতেন না।

অনেক সময়ে প্রশ্ন করা হয় যে মানিকদা অভিনেতাদের থেকে কিভাবে মনোমতো অভিনয় বার করে আনতেন ? এখানে জানতে হবে যে, ডেফিনিটলি প্রফেশনাল অ্যাক্টারদের ক্ষেত্রে একরকম নিয়ম, আর নন-প্রফেশনাল যাঁরা, যখন নতুন কেউ এলো, নতুন ছেলে বা মেয়ে— মানিকদা অন্য টেকনিক অ্যাপ্লাই করতেন। সেটা কিন্তু আমরা স্তানিস্লাভস্কির মেথডে পড়েছিলাম। উইদাউট দ্য নলেজ অব দ্য অ্যাক্টর, তাঁর বেস্ট অব দ্য কোয়ালিটিজ কি আছে উনি তা বের করে আনতেন। সে টেকনিক কিন্তু উনিই জানেন। আর কেউ জানেন না। মানিকদা যে ধরনের অভিনয়ে বিশ্বাস করতেন তা হলো ইনট্রোস্পেকটিভ অ্যাকটিং। অন্তর্মুখী অভিনয়। উনি কিন্তু বহিরঙ্গের অভিনয় পছন্দ করতেন না। রিয়ালিস্টিক ছবির যে অভিনয় মানিকদাই তা প্রথম দেখান ফিল্মে, 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে এবং সেখানে মিনিমাম অব বিহেভিয়ারিজম, মিনিমাম অব মুভমেন্ট করে, ম্যাকসিমাম অব ইমপ্যাক্ট অন দ্য অডিয়েন্স কি করে আনতে হয় তা একমাত্র উনিই জানেন। আমি একজন প্রফেশনাল অ্যাক্টর, আমি জানিনা কিন্তু। মানিকদা যে রিডিংটা দেন অভিনেতাদের কাছে, তা থেকে আমরা বুঝতে পারি, উনি চরিত্রের কালারটা কোন অ্যাঙ্গেল থেকে চাইছেন। একজন প্রফেশানাল অ্যাক্টর হলে সেটা টক্ করে তুলে নিতে পারে। আমাদের চেয়ে অনেক ভাল তুলতে পারতেন ছবিবাবু বা তুলসী চক্রবর্তী। ওঁদের সে ক্ষমতা ছিলো। নতুন অভিনেতা যাঁকে মানিকদার পছন্দ হতো, ওঁর ডায়াগ্রাম অনুযায়ী, ছবি অনুযায়ী, মানিকদা কিন্তু তাঁকে ডেসক্রাইব করে দিতেন মূল ব্যাপারটায় বিহেভিয়ার সব ডেসক্রাইব করে বলতেন, 'তুমি এই সময় চোখটা তুলবে, এই ডায়ালগের পর চোখটা নামাবে এই ডায়ালগটা বলবে, বলে একটু থামবে, থামার পর এই করবে এইবার।' আমি নিজেই দেখেছি মানিকদা অন্য ছবিতে শুটিং করছেন,আমি পেছনে দাঁড়িয়ে, একজন নামকরা অভিনেতা, নাম বলবোনা, স্ক্রীনে তাঁর সাঙঘাতিক ইমপ্যাক্ট। তাঁকে মানিকদা ঠিক এইভাবে ডেসক্রাইব করে গেছিলেন— বারেবারে বলছিলেন 'টোটাল ব্যাপারটা এই করো। এইগুলো বিজনেস করতে হবে।' তিনি করতে পারছিলেন না । বিজনেস করা মানে মানিকদা বলতে চাইছিলেন, একটা হারমনিক ব্যাপার হবে। তার থেকে একটা ইমপ্যাক্ট আসবে অডিয়েন্সের মধ্যে। তাতে অডিয়েন্স কাঁদবে বা হাসবে, যা খুশি হবে। এখানে কান্নার ব্যাপার ছিলো। দুঃখের ব্যাপার। দেখলাম, মানিকদা দু'তিনবার বলার পর কি সুন্দর করলেন। তাঁকে পরপর

বলে গেলেন 'আচ্ছা এবার নিচে তাকাও, এইবার রুমালটা হাতে ধরো, রুমালটা আস্তে আস্তে মুখে নাও। এবার চোখটা উপরে তাকাও, এবার রুমালটা মুখে চেপে, মুখটা চেপে ফেলো। চেপে একটুখানি কাঁপাও।' মানে ভিতরে কান্নাটা এসে গেছে। এর পর দর্শক যখন দেখল তারা ভাবল কী সাঙঘাতিক অভিনয় করেছে। তাই ফিল্মকে বলা হয় ডিরেক্টরস মিডিয়াম। আমি কিন্তু ক্যামেরার পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম। পুরো ব্যাপারটা দেখলাম। কেন ফিল্মকে ডিরেক্টরস মিডিয়াম বলে— অভিনেতা বারেবারেও করে পারছে না — কিন্তু ডিরেক্টর করাবেন-ই সেটা। আমরা ভাবছিলাম, কি করে করাবেন? কিন্তু মানিকদা ঠিক করিয়ে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। আমরা তো স্তম্ভিত। এবং অন দ্য স্ক্রীন আমি যখন দেখলাম তখন আমার বুকটা কেমন করে উঠেছিল। দিজ আর অল টেকনিকস্। এই যে টেকনিকগুলো, পৃথিবীতে যে কোন মাস্টার ডিরেক্টর জানেন। মেনইলি তাঁরা সবসময় উইদাউট স্ট্রেইনিং দ্য অ্যাক্টর, সে প্রফেশনাল হোক আর নন-প্রফেশনাল হোক, তাঁদের অজান্তে ভেতরকাব বেস্ট অব দ্য কোয়ালিটিজ তাঁরা বের করে নিয়ে চলে আসেন। আমরা বিহেভিয়ারিজম মানিকদার মোটামুটি পছন্দ। মানিকদা কখনো কিন্তু ইমপ্রোভাইজ করতে বাধা দেননি। এমনও হয়েছে, মানিকদা দু'সেকেন্ড কাট্ করতে দেরী করেছেন, অমি তার মধ্যে কোন একটা বিজনেস করে ফেলেছি। 'জন অরণ্যের' সময় কিন্তু স্পেসিফিকালি ডেকে আমায বলে দিলেন যে 'একটাও ইমপ্রোভাইজেসশন করবেনা। এগজ্যাক্টলি যা ডায়ালগ, যা ফুলস্টপ, কমা, তাই বলবে কারণ তুমি কিন্তু একটা পিম্পেব রোল করছো।' তখন আমাকে ডেসক্রাইব করলেন রোলটা। পিম্প যে, সে কিন্তু দালাল। সে অপবের মেয়েমানুষ যোগাড় করে দেয়। তার কিন্ত স্ট্যামারিং, স্টাটারিং, ফল্টারিং চলবে না, তা হলে ক্লায়েন্ট ভেগে যাবে। সে কিন্তু ইম্যাকুলেট। সুন্দর টাই তার, বিউটিফুল গোঁফ। পরিস্কার-পবিচ্ছন্ন, ধোপদুরস্ত। সে নিজে পিম্প ব্যক্তিগত জীবনে। কিন্তু অপরেব ক্ষেত্রে, তাব ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে সে কখনো স্ট্যামারিং করবে না। কোন ফল্টারিং হবে না। একবার বলতেই আমি বুঝতে পারলাম। এখানে আমি না হয়ে অন্য কোন নতুন অ্যাক্টার হতো, তাকে দিয়ে কিন্তু মানিকদা প্রায় আমার মতই অভিনয় করিযে নিতেন। কিন্তু তাঁকে খাটতে হতো। ডেসক্রাইব করতে হতো। খাবার সিন যেখানে আমি করেছিলাম সেখানে হয়তো বলতে হতো, 'এবার ওমলেটটা খাও। হ্যাঁ এবার বলো ডায়ালগটা। আচ্ছা এবার একটু চিবিয়ে নাও। আবার ডাযালগটা বল!' এটুকু আমাদেব ক্ষেত্রে বলতে হয় না।

এইসব আলোচনা করতে গিয়ে মানিকদার ছবিতে আমার প্রথম অভিনয়ের কথা মনে পড়ছে। ছবির নাম 'অভিযান।' ফার্স্ট শট্ টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে হচ্ছে। প্রথম দিনই কিন্তু কঠিন শট্ ছিলো। রেস্টুরেন্টে খাওয়াব সিন। মানিকদা শুধু একবার বললেন, 'খেতে খেতে কথা বলতে পারো ?' আমরা তো বেসিক কাইন্ড অব অ্যাকটিংটা শিখেই এসেছিলাম। থিয়েটার থেকে। আমি একটা জিনিস বলে দিয়েছিলাম যে, আমি কিন্তু থিয়েটারের লোক। বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, অভিনয়টা তো জানো ? আমি বুঝবোখন।'

তখন আমার ধারনা ছিল সিনেমাব অ্যাক্টিংটা বোধহয় আলাদা। এটা মাথায় ছিলো, বাড়াবাড়ি না করলে বোধহয় তেমন কিছু হবে না। খাওয়ার সিনটায় ওই ফলস্লি

খাওয়া দেখিয়ে তার টাইমিংগুলো করলাম। টেকের সময় কিন্তু ভাত, মাংসের ঝোল, মাংস সমস্ত নিয়ে খেতে খেতে টেক করলাম। আমার কনসাসলি মনে আছে, মানিকদা যে গ্যাপ পয়েন্টগুলো বলেছিলেন, ওটা কিন্তু মাথায় আছে। আমি কোন্ সময় মুখে ভাত কম রাখবো, আর কোন সময় গিলবো, সব আমি ক্যালকুলেট করে রেখেছি আগে থেকে, বিকজ আই অ্যাম এ প্রফেশনাল। আমি জানি এটা না হলে মানিকদা কাট্ বলে দেবেন। এবং আই ডিড ইট্ থরোলি। এক শট্। ওকে। মানিকদা 'ফাইন' বললেন। তাতে আমার কনফিডেন্সটা বেড়ে গেল। ওঃ, ফিল্ম অ্যাকটিং তা হলে আহামরি কিছু নয়। আমি যেমন মোটামুটি কথা বলি ঘরের মধ্যে বসে, এই লেভেলে যদি কথা বলতে পারি, বা এরকম একটু ইনার ব্যাপারটা প্রকাশ করতে পারি, প্রোজেকশনটা কম করে গলার, তাহলেই বোধহয় হয়ে যাবে।

আমি টোটাল সাতটা ছবি করেছি এবং শেষের ছবিটাতেও কাজ করেছি। তাঁর শেষ যে গোটা তিনেক ছবি— 'গণশত্রু', 'শাখাপ্রশাখা', ' আগন্তুক' করার সময় মানিকদা স্বাস্থ্যের দিক থেকে অনেক ভেঙে পড়েছেন। ডাক্তারের অনেক বাধানিষেধ ছিলো। অনেকে বলেছেন যে শেষের দিকে মানিকদা আগের মতো ছবি করতে পারছিলেন না, স্বাস্থ্যের কারণেই এবং ডাক্তারদের ওই নিষেধের জন্য। এ বিষয়ে আমার মতামত একটু অন্যরকম। সিক্সটিতে সত্যজিৎ রায় বা 'গুপী গাইনে' সত্যজিৎ রায় ঃ তখন তাঁর প্রচন্ড একটা ইয়ুথফুল এনার্জি ছিলো। 'গুপী গাইনে'র সেই এনার্জি, আমি বলতে পারবো না। কি অসাধারণ এনার্জি! 'গণশত্রু'-র সময় থেকে অসুস্থতার জন্য সেই এনার্জি ছিল না। তবে আমার যেটা মনে হয়েছে , ডাক্তার তাঁকে অনেকগুলো নিয়মের মধ্যে বেঁধে দিলো। আউটডোর কমিয়ে দিলো, কিন্তু লোকটার চিন্তা তো কমেনি। অনেকে হয়তো ক্রিটিসিজম করেছে অমুক তমুক। এটা একটা প্রসেসের সঙ্গে জড়িত না থাকলে তো চিনতে পারবে না। একটা মানুষ, তাঁর ডেভেলপমেন্ট হয় গভীরতায়, 'গণশত্রু' থেকে 'আগন্তুক' পর্যন্ত মানিকদা অনেক গভীরতায় বলে গেছেন. কাহিনীর ক্ষেত্রে, অভিনয়ের ক্ষেত্রে, সিনারিওর ক্ষেত্রে বা ডায়ালগের ক্ষেত্রে—মানিকদা তখন অনেক গভীরে চলে গেছেন। এ গভীরতা মানিকদার আগে ছিলো না। মানিকদা তখন সাঙঘাতিক। মানিকদা তখন ক্যামেরায় বাবুর ওপর ডিপেন্ড করতেন, তবে এটা বোঝা দরকার যে মানিকদা এগজ্যাক্টলি যে অ্যাঙ্গেলটা দেখতেন, বাবু সেটা দেখতে পেতো। মানিকদা নিজের মুখেই একথা বলেছেন। সেইজন্য মানিকদা নিশ্চিন্তমনে ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে কাট্ বলতেন। আমার ব্যক্তিগত মত একটি ইন্টারভিউ-তে আমি বলেছিলাম ঃ সত্যজিৎ রায়কে আপনারা ফিল্ম মেকার বলছেন কেন? ফেল্ম মেকার তো ভারতে অনেক আছে। উনি আর 'ফিল্ম মেকার' নন। উনি একজন ফিলজফার। একটা মিডিয়াম ধরে মানুষ যখন জীবন দর্শন বলে, তখন তাঁকে ফিলজফার বলবো। কেউ কলম ধরে বলে, কেউ ক্যামেরা ধরে বলে, কেউ পেইন্টিংয়ের থ্রু দিয়ে বলে, আবার কেউ সঙ্গীতের মাধ্যমে বলে। তা মানিকদার কাছে ক্যামেরাটা হয়ে গেছে এখন কলমের মতন। সেই কলম দিয়ে 'আগন্তুক'-এর মধ্য দিয়ে তিনি যে বক্তব্য প্লেস করেছেন, ভারতে আজ পর্যন্ত কোন আধুনিক ছবিতে এরকম বক্তব্য প্লেস করতে দেখিনি। বার্ধক্যে তাঁর শারীরিক ক্ষমতা কমে গেছে, কিন্তু চিন্তাক্ষেত্রে তাঁকে কেউ বাধা দিতে প্যারেনি। তিনি ক্রমশ

সেই রবীন্দ্রনাথের কথায় উত্তীর্ণের পর উত্তীর্ণ হয়েছেন। এটা আমার বিশ্বাস। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর দু'মাস আগেও তিনি বাবুকে বলেছেন পরের ছবিটা তিনি কি করবেন। বলেছেন, ভালো হয়ে গেলেই শীতকালেই কাজে হাত দেবো। ওই অবস্থায় শুয়ে শুয়ে ডাক্তারদের ব্যাপার দেখতে দেখতে ওই নিয়ে গল্প এসে গেছে মাথায়। একটা লোক রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছেন, এই যে ক্রাইসিস — এইরকম রোগ যদি একটা সাধারণ মানুষের হয় তো কি হবে । তাহলে ভাবুন, কেউ কি তাঁর চিন্তা আটকাতে পেরেছে ? ডাক্তাররাই বলেছেন, 'অদ্ভুত ! আমাদের অঙ্কে আসেনা, লোকটির চিন্তাশক্তি কখনোই কমে যাচ্ছে না। বেড়েই যাচ্ছে ক্রমশ।' ওই বয়সে! ওই রোগশয্যায়! আমেরিকা থেকে যাঁরা 'অস্কার' দিতে এসেছিলেন, তাঁরা তো চমকে গেছেন। তাঁরা বললেন, 'কোথায় ক্যামেরাটা রাখবো?' তিনি বললেন 'হিয়ার আই অ্যাম নট দ্য ডিরেক্টর। ইউ আর দ্য ডিরেক্টর।' ওঁরা ঘাবড়ে গেলেন। তাই যাঁরা এসব ক্রিটিসিজম করেছেন আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। কারণ তাঁরা তো মানিকদার একটা কিছু দেখে বা একটা ছবি দেখে বিচার করছেন। আর আমি দীর্ঘ তিরিশ বছর কন্টিনিউয়াসলি তাঁকে দেখেছি। আমরাও রবীন্দ্রনাথের কথায় বিশ্বাস করবো । যে মানুষ ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হয়, তাঁকেই আমরা শ্রেষ্ঠ লোক বলি। উত্তীর্ণ না হতে পারলে জীবনে কিছু হবে না। যা রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন।

অনুলিখন ঃ ঘনশ্যাম চৌধুরী

সত্তরের দশকের সত্যজিৎ রায়

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

খুব সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে আমি সত্যজিৎ রায়কে জিজ্ঞাসা করি : 'সত্তরের দশকে আপনি যে ছবিগুলি তৈরী করছিলেন,তাতে কলকাতার মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যাগুলির মধ্যে কয়েকটির গভীরে আপনি প্রবেশ করেছিলেন। অপনি কি মনে করেন এই সমস্যাগুলির সমগ্র ভূমিই আপনি (এক ভাবে দেখতে গেলে) পরিক্রমা করে ফেলেছেন ? আপনি কি বলবেন এই মুহূর্তে আপনি অমনি তাৎপর্যময় এমন কোন সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন না সিনেমায় যার প্রতিফলন অবশ্যকৃত্য মনে হয় ?'

তিনি উত্তরে বলেন : 'এই মুহূর্তে দেখছি না, খুঁজে পাচ্ছি না। আমি অনেক গল্প পড়ি। অথচ তার মধ্যে কোনটাই আমাকে সেভাবে নাড়া দেয়নি। কিন্তু আমি যখন আমার আগের ছবিতে যেসব মৌল সমস্যার মধ্যে গেছি সেইগুলোর কথা ভাবি, তখন কলকাতা-ভিত্তিক অমনি কোনো সমস্যার চ্যালেঞ্জ আমি দেখছি না।'[১]

সত্তরের দশকে পশ্চিম বাংলার যে রাজনৈতিক আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল তাঁর কেন্দ্রে ছিল নকশালবাদী অন্দোলন, যে অন্দোলনের ভিত্তি ও প্রথম লক্ষ নিহিত ছিল কৃষিব্যবস্থার শোষণের মূল উৎপাটনে, অথচ যার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল শহরের যুবসমাজের অন্য কারণজাত বিক্ষোভ। শিক্ষিত বেকার তরুণদের বিক্ষোভ যেখানে নকশালবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, সেই সন্ধিবিন্দুতেই সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টি পড়ে। উক্ত সাক্ষাৎকারে আমার অরেকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি মানেন যে তাঁর প্রায় সব ছবিরই মূল নিহিত রয়েছে কলকাতায়। 'পথের পাঁচালী', ' অপরাজিত' ও 'দেবী'-র ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠা গ্রামে হলেও আসলে কলকাতা শহরের মানসিকতায় যে গ্রাম ও গ্রামীণতা জড়িয়ে রয়েছে তারই উৎস সন্ধান চলে ঐ গ্রামের ছবিগুলিতে। সাক্ষাৎকারের মধ্যে আমার কথায় বাধা দিয়ে সত্যজিৎবাবু মনে করিয়ে দেন যে, 'অরণ্যের দিনরাত্রি'ও কলকাতার ছবি। কলকাতা কোন্ দৃষ্টিতে অদিবাসি সমাজকে দেখে, সেই সমাজের সান্নিধ্যে এসে কি ভাবে নিজেদের প্রকাশ করে, তার ছবি।

কলকাতার যে চরিত্রচিত্রণ ঘটেছে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে, তাতে গ্রামীণ কুসংস্কার ও জাত-পাতের ভয়াবহ শাসন থেকে কলকাতা ক্রমশ মুক্ত হয়েছে পশ্চিমী শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোকে। 'অপরাজিত', 'অপুর সংসারে' অপু যখন এই শিক্ষার অভিজ্ঞতায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, তখন আবিস্কারের উত্তেজনা তার প্রতি পদক্ষেপে জড়িয়ে থাকে। পশ্চিমী শিক্ষার রেনাইসান্স্-মুখী যে চেতনা গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টারের সস্নেহ উৎসাহ ও শিক্ষাদানে স্পষ্ট, তার প্রতি সত্যজিৎবাবুর শ্রদ্ধা বহুবার বহু ছবিতেই প্রকাশ— 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে, 'চারুলতা'য় 'দেবী'তেও। মধ্য উনবিংশ শতকের কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার অভিঘাতে 'নবজাগরণ' ঘটেছিল কি না, প্রশ্নটাই অবাস্তব। কারণ

'রেনাইসান্‌স্' কথাটাই একটা ঐতিহাসিক কনসেপ্ট নয়, একটা 'সাহিত্যিক' স্বপ্নবিলাস। রেনাইসান্‌স্ হোক বা না হোক, কলাকাতায় তখন যা ঘটেছিল তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতা শহরের চারিত্রকে প্রভাবিত করে চলেছে। মধ্য উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় যে উদারনৈতিক মানবিকবাদী মূল্যবোধ জন্ম নিয়েছিল তার মূল্য এখনও ফুরোয়নি। শ্রেণীহীন সমাজ ও সাম্যবাদের যে মহত্তর বিশ্বাস মার্কসবাদী চিন্তার অন্তর্গত, তা ভারতবর্ষে আজও সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে, কিন্তু তার দার্শনিক ভিত নানা কারণে এবং বিশেষ করে আন্দোলনের মজ্জাগত দ্রুত ফললাভের আশায় মর্মান্তিকভাবে দুর্বল ও শিথিল থেকে গেছে। যত দিন না মার্কসবাদী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তত দিন মানবিকবাদী মূল্যবোধ একটা সমাজকে সুস্থ জীবনচিন্তায় একটা আস্বাদ দিতে পারে। বস্তুত মার্কসবাদী মূল্যবোধ মানবিকবাদী মূল্যবোধকেই আত্মসাৎ ক'রে তাকে ঐতিহাসিক মাত্রায়। পুনঃসঞ্জীবিত করেছিল।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন , বুর্জোয়া পার্লামেনটারি পদ্ধতির কৌশলী জটিলতায় আন্দোলনের মূল ধারার আত্মনিমজ্জনে মার্কসবাদী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আরো দূরপরাহত হয়ে পড়ে। ষাটেব দশকের এই মূল্যসংকটে সত্যজিৎ রায়ের ছবি মানবিকবাদী মূল্যবোধেব অন্যতম শেষ বাহন হয়ে দাড়ায়। মানবিকবাদী মূল্যবোধ সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কাবকে ঘৃণা করে, গণতন্ত্রে ও শ্রেণীসাম্যে বিশ্বাস করে, মানবিক অধিকার রক্ষায় আগ্রহী, সুস্থ বিতর্কে উৎসাহী। চল্লিশেব দশকে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেও মানবিক অধিকার ছিনিযে নিয়ে অগণতান্ত্রিক দমননীতি আশ্রয় কবে জাতীয সরকার যখন কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পিষে মারবার চেষ্টা করেছে, সাম্প্রদাযিক বিদ্বেষেব বিষবাষ্প ছড়িয়ে আন্দোলনের শিবদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে, তখন মানবিকবাদী বুদ্ধিজীবীরাই এগিয়ে এসেছিলেন আন্দোলনেব পাশে— এই আন্দোলনের লক্ষ্যে পূর্ণ আস্থা থেকে নয়, কেবলমাত্র এই আন্দোলনের অধিকাব প্রতিষ্ঠাব তাগিদেই। ষাটেব দশকের শেষ দিকে পার্লামেনটারি পদ্ধতিতে কমিউনিস্ট আন্দোলন ক্রমশই তার চরিত্র হারাতে থাকে, মানবিকবাদী মূল্যবোধ কখনও কখনও এই রাজনীতির প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে থাকে। ফলে যে মানবিকবাদী এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বহুদিন সাহায্য করে এসেছে, সত্তরের দশক থেকে তার সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরোধ ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠতে থাকে।

এই পবিপেক্ষিতেই সত্যজিৎ রায়ের সত্তরেব দশকের ছবির মানবিকবাদী মাত্রা বিচার্য। মার্কসবাদী মূল্যবোধের বিকল্পটি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা না করেই মানবিকবাদী মূল্যবোধের ক্ষয়কে স্বাগত জানিয়ে তাকে তাত্ত্বিক সমর্থন যোগাবার ক্লেদাক্ত আপসরফার যে দৃষ্টান্ত শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য এনেছিল, তা সত্যজিৎ রায়ের মানবিকবাদী বিশ্বাসের ভিতকেই কাঁপিয়ে দিয়েছিল। অপুর বড় হয়ে ওঠার ইতিহাসে যা স্পষ্ট, পরে 'সাইট অ্যান্ড সাউন্ড' পত্রিকার সাক্ষাৎকারে তা ব্যক্ত ঃ 'সব কিছুই' নির্ভব করছে শিক্ষা ও শিক্ষার প্রসারের উপর। যদি তা কখনও ঘটে... তবে তা কেবল শিক্ষার মধ্য দিয়েই ঘটতে পারে।' সত্যজিৎবাবু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব সম্ভাবনা বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন।'

শিক্ষার এই ভাঙনের ছবি 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ও 'জন-অবণ্য' দুটি ছবিরই শুরুর বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। পরীক্ষার হলের কেলেংকারির উত্তেজক দৃশ্য দেখিয়ে সত্যজিৎ রায় ক্ষান্ত থাকেন না, পরীক্ষকদের অক্ষমতা নিয়ে একটি ছোটখাট নাটকও তৈরি

করেন। পাশাপাশি ব্ল্যাকবোর্ডের চারপাশে দেয়াল জুড়ে স্লোগানের কারুকার্যে ধরা পড়ে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষয়ক্ষতিও কিভাবে রাজনীতি কাজে লাগাচ্ছে। বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা এক্ষেত্রে বামপন্থী আন্দোলনের সচেতন আঘাতে ভাঙেনি, ভেঙেছে আন্তর্নিহিত দুর্নীতি ও ব্যাধির আক্রমণে। অথচ এই সংকটকেই স্বাগত জানালেন বামপন্থী আন্দোলনের একাংশ, ত্বরান্বিত করলেন সংকটকে, অদ্ভুত হাস্যকর এক তাত্ত্বিকতায় মধ্যবিত্তসুলভ মূর্তি ভাঙার খেলায় যার সবচেয়ে ক্লীব আত্মপ্রকাশ। সত্যজিৎ রায় স্মরণ করিয়ে দেন, এই বুর্জোয়া শিক্ষার মধ্যেই এমন একটা শক্তি ছিল যা মানবিক মূল্যবোধকে শক্তি দিত। সেই শিক্ষাব্যবস্থার ভেঙে পড়া থেকেই যখন সত্যজিৎবাবু সামগ্রিক সামাজিক অবক্ষয়ের সূত্র টানেন, তখন সত্তরের দশকে সত্যজিৎ রায়ের সমাজচিন্তার একটা আদল পাওয়া যায়।

লিবারাল হিউম্যানিস্ট দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবোধেরই অবক্ষয়ের যে ছবি সত্যজিৎবাবু ১৯৬৯ এর 'অরণ্যের দিনরাত্রি' থেকেই দেখতে শুরু করেছেন, 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে সেই ছবির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র মানুষের ছবি এসে পড়ে। সত্যজিৎবাবু বলেন, সিদ্ধার্থের দ্বন্দ্বের মূল কারণ হল এই যে সে একটা ইউথফুল কনভিকশনের অবস্থা থেকে একটা অস্থির কোয়েস্চনিঙ-এর অবস্থায় এসে পড়েছে—হয়ত কিছুটা প্রিম্যাচিওর ভাবেই। তার কারণ সে আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত তরুণের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র! সে চারিদিকের মূল্যবোধের ভাঙনটাকে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারে না। টুনু এবং সুতপা যে রাস্তাগুলো বেছে নিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে তাদের দুজনের মনে কোন সংশয় নেই। সিদ্ধার্থের সামনে কিন্তু কোন পরিষ্কার রাস্তা নেই। তার ফলে তার যে ঘোলাটে ভ্যাসিলেটিং মানসিক অবস্থা সেটাই এ কাহিনীতে তার গতিবিধি নির্ধারিত করেছে।' 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র চরিত্রদের সম্পর্কে পরিচালকের কোন মমতা নেই। বরং কলতলায় কিংবা রাতের রাস্তায় গাড়ির আলোয় 'সাঁওতাল টুইস্ট'-এব বেইজ্জতি তাদের নিজেদের কাছেও নিজেদের হাস্যকর করে তোলে। একদা আদর্শবাদ ('আমাদের ত্রৈমাসিকটার কথা মনে পড়ে? ... কী খাটনি খাটতুম বলত — দিনে ষোল ঘন্টা — কিন্তু একটাও বাজে লেখা ছাপাই নি — এটা মানতেই হবে।'), তারপর সুখের চাকরির জন্য 'যত উঠব, তত নামব', তারপর মাঝে মাঝে শৌখিন অপরাধবোধ—এই ছকটা একান্তভাবেই কমেডি অফ ম্যানার্স-এর। তাই 'অরণ্যের দিনরাত্রি' সেই স্তর থেকে ওপরে ওঠে না।

লিবারাল হিউম্যানিস্ট জীবনদর্শনের সঙ্গেই উপন্যাসধর্মের একটা গভীর যোগ আছে। সত্যজিৎ রায়ের এই জীবনদর্শন তাঁর ছবির ধরনকে অনেক দূর পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে। ব্যক্তিমানুষ এই জীবনদর্শনের কেন্দ্রে—এই ব্যক্তিমানুষ নিজের ব্যক্তিত্বের ও তারই মধ্য দিয়ে তার সমাজের পূর্ণতম বিকাশ সাধনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই ব্যক্তিমানুষের অন্তরপীড়িত বিবর্তনের কাহিনী ধরেই পশ্চিমী উপন্যাসের বিবর্তন। সত্যজিৎবাবুর প্রায় সব ছবিরই আরম্ভ ঐ ব্যক্তিমানুষ থেকেই; বংশগতি ও পরিবেশের টানা-পোড়েনে তার চরিত্র যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তা-ই শেষ পর্যন্ত ছবির বিন্যাস নির্ধারণ করে। মার্কসবাদ বা এই ধরনের যাবতীয় র‍্যাডিক্যাল জীবনদর্শন অনেক বেশী নাটক-মুখী, পরিস্থিতির অ্যাবস্ট্র্যাকশনের মূল্যায়নে এবং বিশ্লেষণে অনেক বেশী আগ্রহী। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র চরিত্রেরাই তাদের সীমাবদ্ধতায় এই ছবিকে ম্যানার্স-এর সীমাবদ্ধতায় আটকে দেয়। বৃটিশ চলচ্চিত্র সমালোচকেরা এই ছবিটি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, তার কারণও অনুমেয়।

সুয়েজে পরাজয়ের পর বৃটেন সাময়িকভাবে আত্মসমালোচনা ও আত্মধিক্কারের যে পর্বে প্রবেশ করেছিল, ষাটের দশকে আইরিশ অভ্যুত্থানের তীব্রতায় তা থেকে তখন পিছিয়ে আসতে শুরু করেছে। বৃটিশ থিয়েটার ও সিনেমার ঘোর সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে, নানা ধরনের বিক্ষোভের মধ্যে বৃটিশ সমালোচকেরা যেন খুঁজছিলেন কমেডি অফ ম্যানার্স-এর স্নিগ্ধতা। বাকি পৃথিবীর চলচ্চিত্র তখন তাঁদের কাছে ক্রমেই বিপদজনক হয়ে উঠছিল।

কমেডি অফ ম্যানার্স-এর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক আছে, একটা মেনে নেওয়া আছে, আর সমালোচনার একটা মাত্রাও আছে। তাই 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র পরই কি দরকার পড়ল 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র, যেখানে সমস্ত ব্যাপারটাই সীরিয়স হয়ে ওঠে? তবুও কিন্তু সংকটের সমগ্র রূপের উদ্ঘাটন সত্যজিৎ রায়ের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য একটি সেনসিটিভ যুবকের যন্ত্রণার প্রকাশে।'মেমরিজ অফ আনডারডেভেলপমেন্ট'-এর সঙ্গে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র একটা মিল আছে, শুধু কেন্দ্রচরিত্রের দোলাচলতা ও আত্মজিজ্ঞাসাতেই নয়, ছোট ছোট অতর্কিত ফ্ল্যাশব্যাকের স্মৃতিবিদ্ধ অনুরণনের ষ্টাইলেও বটে। অথচ 'মেমরিজ'-এ ইতিহাসই প্রধান, 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে সিদ্ধার্থ। এবং সত্যজিৎ রায়ের ছবির বিন্যাসের মাধুর্যই বিক্ষুব্ধ, ক্ষয়িত সমাজচিত্র, অশ্লীল অবচেতনের খুনসুটি, অক্ষমতার গ্লানি থেকে প্রকৃতিমুগ্ধ, বিরহমুগ্ধ এক স্বচ্ছন্দ অবকাশে আত্মনিমজ্জনে। এ আত্মনিমজ্জন, এ আত্মসংকোচন কেবল সিদ্ধার্থ নামে একটি তরুণের নয়, সমগ্র ছবিটিরই। টাটা সেনটারের ছাদের দূরত্ব থেকেই (ধ্বনি ও চিত্র দুই মাত্রাতেই যে দৃশ্যটির ব্যঞ্জনা অসাধারণ) এই দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। পাখির ডাক এবং 'রাম নাম সৎ হ্যায়'-এর ধ্বনিগুণে এই দূরত্বে আত্মাপসরণ যেন সম্পূর্ণ হয়। লিবারাল মানবিকবাদী দৃষ্টিকোণের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া গ্লানিবোধ কিংবা শক্। এই শক্ খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত কবিতায় পলায়ন।

সিদ্ধার্থ বড়ই মধ্যবিত্ত বাঙালী তরুণ। মূল্যবোধের অবিরত অবক্ষয়ে শক্ খেতে খেতে যে ইমিউনিটি আসে, তারই প্রতিভূ 'জন অরণ্যের' সোমনাথ। অর্থাৎ সত্যজিৎ রায় আরো এগিয়েছেন। লিবারাল হিউম্যানিস্ট সত্যজিৎ রায় মানবিকবাদী মূল্যবোধের অমোঘ পতনকে যখন 'জন অরণ্যে' নির্মম হয়ে মেনে নেন, তখন কিন্তু সত্তর দশকের চেতনার একটা দিক তাঁর রচনায় তীব্র হয়ে ওঠে। বহুধাবিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত বামপন্থী আন্দোলন যখন কার্যত আত্মহননে মত্ত, লিবারাল হিউম্যানিস্ট তখন বামপন্থার সহজাত মূল্যবোধেও আর আস্থা রাখতে পারেন না। রুশ বিপ্লবের পর, এবং পরে চীনে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠায় ও কিউবায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিংশ শতাব্দীর মানবিকবাদী চেতনা ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের মধ্যে এক আত্মিক যোগ স্থাপিত হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের শান্তি আন্দোলনে এই যোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের প্রবল শক্তির মুখে মানবিকবাদী মূল্যগুলি যখন চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ছে, তখন আধুনিক মানবিকবাদীরা কমিউনিস্টদের উপরই ভরসা রেখে ছিলেন। ষাটের দশকে যখন কমিউনিস্ট আন্দোলনও ভেঙে গেল অন্তর্বিরোধে, তখন মানবিকবাদীদের সঙ্গে এই যোগও ভাঙতে লাগল। কমিউনিস্ট আন্দোলনেও দেখা গেল নীতিহীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হতে থাকল, মার্কসবাদের অতিযান্ত্রিক এক ব্যাখ্যার দোহাই দিয়ে। ১৯৫৮ সালে জন লিউইস, ১৯৬৫ সালে মার্টিন মিলিগান 'মার্কসিজম্ টুডে' পত্রিকায় এই প্রবণতার প্রতিবাদ করে নীতি বিষয়ে মার্কসীয় তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছিলেন।[৫] বস্তুত কমিউনিস্ট আন্দোলন

মানবিকবাদী মূল্যবোধ অবলম্বন করে মানবিকবাদীদের সমর্থন লাভ করেই জনমনে তার প্রভাব ছড়াতে সমর্থ হয়েছে। এই সত্যকে অস্বীকার করে ষাট-সত্তরের দশকে মার্কসবাদী আন্দেলন তার গণভিত্তি হারিয়ে সাময়িক লক্ষ্যলাভে প্রয়োজনীয় উপকরণরূপেই ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই 'জন অরণ্যের' নির্মম পরিণতি অনিবার্য। বামপন্থী আন্দোলনের অবক্ষয়ে লিবারাল হিউম্যানিস্টরা সামাজিক অবক্ষয়ের ভয়ংকর রূপকে উলঙ্গভাবে প্রকাশ করা ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পান না। সত্যজিৎ রায় 'জন অরণ্যে' সেই বিন্দুতে পৌঁছলে তা অভিনন্দনযোগ্য। যাঁরা বললেন, এ বড় নৈরাশ্যবাদী, কিংবা বললেন, এরও বাইরে আছে প্রতিরোধের ও বামপন্থী আন্দোলনের পথ, তাঁরা বাস্তব থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে কল্পবিলাসে মজতে চান। ভারতবর্ষের দিকে তাকালে বামপন্থী আন্দোলনের কর্মপ্রয়াস কত সীমিত কত সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। সেই ভ্যাকুয়ামেরই অন্য নাম 'জন অরণ্য'। বস্তুত 'জন অরণ্যে'র আয়রনির অন্যতম লক্ষ্য, নীতির প্রশ্নে এবং রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রশ্নে জনসাধারণের বিপুল বৃহদংশের ভয়াবহ উদাসীনতা।

সেই উদাসীনতারই উৎস সন্ধানে সত্যজিৎ রায়ের অভিযান 'শতরঞ্জ'-এ। মধ্যবিত্তের উদাসীনতার যে ছবি ভারতে উপনিবেশবাদের ভিত্তিস্থাপনার যুগে সত্যজিৎবাবু দেখেছেন, তার উত্তরাধিকার আমরা বহন করে চলেছি। সত্তরের দশকে নকশালবাদী আন্দোলন প্রতিরোধে রাষ্ট্রযন্ত্রের সবচেয়ে বড় সহায় হয়েছিল এই উদাসীনতা। মানবিকবাদের প্রথম ভিত্তিই সচেতন মানবমন। সেই চেতনার দায়বদ্ধতাই যখন স্খলিত হয়, তখন এক নারকীয় আশাহীন অবক্ষয়ের ছবিই কেবলমাত্র সত্য হয়ে ওঠে। যাঁরা সেই ছবিকে মানতে চান না, তাঁরা প্রকারান্তরে সেই ছবিটিকেই স্থায়ী ও সর্বগ্রাসী করে তুলতে চান।

লিবারাল মানবিকবাদ এধরনের ধাক্কা খেলেই এই জীবনদর্শনের অমোঘ যুক্তি বন্ধেই শিশুশিক্ষায় আগ্রহী হয়। পূর্ণবয়স্করা যখন সর্বতোভাবেই নিজেদের নষ্ট করে বসে আছেন, তখন এক নতুন প্রজন্মকে পুরনো মূল্যবোধে নতুন করে শিক্ষিত করার সাধ মানবিকবাদীদের আগেও অনুপ্রাণিত করেছে। তাই কি সত্যজিৎ রায় ছোটদের ছবি করার কথা বলতে গিয়ে প্রায়ই 'শিক্ষামূলক' শব্দটি ব্যবহার করেন?

উল্লেখপঞ্জী

১) 'সিনেওয়েভ', কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৮১ সংখ্যা। সাক্ষাৎকারের তারিখ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮০

২) উদ্ধৃতি শুভেন্দু দাশগুপ্তের 'সত্যজিৎ রায় ঃ নিজের কথায়' শীতলচন্দ্র ঘোষ ও অরুণকুমার রায় সম্পাদিত 'সত্যজিৎ রায় ঃ ভিন্ন চোখে', কলকাতা ১৯৮০, গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত থেকে গৃহীত।

৩). সত্যজিৎ রায়, 'প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে পরিচালকের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর', 'আন্তর্জাতিক আঙ্গিক', শরৎকালীন সংখ্যা ১৩৭৮।

৪) Martin Miligan, 'Marxism and Morality', Marixism To day, January 1965.

সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে একটি লেখার খসড়া

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

ঠিক মনে নেই তারিখটা, তবে সেটা ১৯৫৫র মাঝামাঝি এক গ্রীষ্মের দুপুর, যখন বাবার অনুমতি মিলল তাঁর এক সহকর্মীর সঙ্গে আমরা সব ভাইয়েরা মিলে 'পথের পাঁচালী' সিনেমা দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে। তার দু'তিন দিন পরে বাবা-মার কাছ থেকে জানতে পারলাম পরিচালকের নাম শ্রী সত্যজিৎ রায়। সবচেয়ে যেটা আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছিল তা হলো উপেন্দ্রকিশোর তাঁব দাদু এবং সুকুমার রায় তাঁর বাবা। আনন্দের আরো বাড়তি কারণ হলো আমাব ছোটভাই তার কয়েকদিন আগেই স্কুলে 'আবোল তাবোল'-এর সমস্ত কবিতা গড়গড়িয়ে মুখস্থ বলার প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়ে বিশাল বড় একটা কাপ পেয়েছে, তার ওপর খোদাই করা আছে সুকুমার রায়ের নাম। তাঁর ছেলে সত্যজিৎ আর 'পথের পাঁচালী'র রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটা আমরা রোজই দেখি মা'র বই রাখার আলমারির বাইরে থেকে। 'পথের পাঁচালী' আমার সবে পড়া শেষ হয়েছে। ছোট্ট বোন হাত বাড়িয়েছে 'আমের আঁটি'র দিকে এবং দুপুরবেলা। স্কুল নেই। আমি চিলেকোঠার ঘরে প্রায় কাউকে জানান না দিয়েই পড়ে চলেছি 'অপরাজিত'। অপুর জন্য বুকের ভেতরটা সুড়সুড় করছে। মনে হচ্ছে অপুর ব্যথা-বেদনা আমি বুঝতে পারছি।

সত্যজিৎ রায়-কৃত 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' যখন দেখা শেষ হয়েছিল, আমার কৈশোর তখনো শেষ হয় নি। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারটা অস্পষ্টভাবে বুঝতে শিখেছি। প্রেমিকা কবে ফেলছি এক তবফাভাবেই পড়া গল্প-উন্যাসের নারী চরিত্রদের। তেমনই একজন 'লীলা'। 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' সিনেমায় ভালো লেগেছিল এক অসামান্য অভিজ্ঞতার মতন করে। কিন্তু লীলার অনুপস্থিতি সেই কৈশোরে বেদনা জাগিয়েছিল। মনে হয়েছিল, কি এমন ক্ষতি হতো থাকলে!

এ সবের অনেক পরে 'চারুলতা' দেখি এবং শ্রী অশোক রুদ্র ও সত্যজিৎ রায়ের প্রশ্ন-উত্তরের বিশাল প্রবন্ধ-সদৃশ চিঠি পড়ি। ততদিনে সিনেমাকে ভালোবেসে ফেলার পাগলামি মাথায় চেপে বসেছে। সবটাই যে না-বোঝায় থেকে যাচ্ছে তা নয়। পরিচয়-এ প্রকাশিত সত্যজিৎ রায়-এব সেই উত্তরই আমাকে এবং আমার মতো অনেককে নতুন করে ভাবতে শেখালো। অনেক কিছু সম্পর্কে শিখলাম। সিনেমার সত্যিই কোনো দায় নেই আদুরে ছেলে বা নাতির মতো সাহিত্যের কাঁধে চেপে ঘুড়ে বেড়ানোর। এখনো মনে হয়, এখানকার তাবৎ চলচ্চিত্রকারদের পক্ষে বহুকাল ও বহুবার সওয়াল করে যাবার জন্য এক প্রখর অস্ত্র তাঁর ঐ প্রবন্ধটি।

সাহিত্য থেকে বিষয় আহরণ করেও চলচ্চিত্র যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে এবং শেষ পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণ চলচ্চিত্রের আকার নিতে পারে— ভারতবর্ষে তাঁর আগে তাঁর মতন করে কেউই বোঝাতে পারেন নি। চলচ্চিত্রে চরিত্র নির্বাচনে আমাদের ভ্রান্তি

পদে পদে হয়েছে, এদেশে চলচ্চিত্রের শুরুর দিন থেকেই এ ঘটনা বারবার ঘটেছে— আমরা আমল দিই নি বা ভেবেছি তাতে আর কি। তাই প্রমথেশ বড়ুয়া বা যমুনা দেবীর কৃত্রিম বাক্‌রীতি একসময় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সদ্য যুবা ও যুবতীরা অনুকরণও করেছেন নির্দ্বিধায়। 'পথের পাঁচালী' থেকে এ ভুল ভাঙতে শুরু করেছে। অপু, দুর্গা, সর্বজয়া, বা হরিহরেরা আমাদের কল্পনার অপু-দুর্গা-সর্বজয়া হরিহরের মতই। আমরা স্বপ্নেও এদের অন্য কোনো চেহারায় দেখি নি বা দেখতে রাজী হই নি। চরিত্র নির্বাচনে তাঁর এই অসীম ও অনায়াস দক্ষতা ভারতীয় ছবিতে যারা শিখতে চেয়েছেন, শিখিয়েছে অনেক কিছু। যদিও 'ঘরে বাইরে' বা আরো দু'একটি ছবির ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, তাঁর এ গুণের বিস্ময়কর বিচ্যুতি লক্ষ্য করেছি।

আরো একটা জায়গায় গড়াতে থাকা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে তিনি উঠে দাঁড় করিয়ে একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব দিয়েছেন তা হলো চলচ্চিত্রের আবহ সংগীত। চলচ্চিত্রের আবহ-সংগীত ও শব্দ যে কত বড় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং তা যে শুধুই কিছু শব্দ বা সুর ও গানের বৃত্তের মধ্যে ঘোরাফেরা করে না সেটা সত্যজিৎ রায় না জানালে হয়তো আরও অনেককাল না-জানা থেকে যেতো। তাঁর যে কোনো ছবিতেই আবহ এক বিশেষ চরিত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিশেষে এক অসাধারণ ব্যঞ্জনা তৈরি করে। যদিও এ ক্ষেত্রে তাঁর পরিধি ছিল ছোট, বিশেষ কয়েকটি সুর, কিছু পরিবর্তিত চেহারা ও ভঙ্গি বদলে উপস্থিত হয়েছে বারবার— তাকে ছেড়ে দূরে যেতে পারেন নি তিনি কখনো।

মনে আছে একসময় তাঁকে নব্য ফরাসী চলচ্চিত্র সম্পর্কে অসম্ভব আগ্রহী লক্ষ্য করেছি। সেটা সত্তরের মাঝামাঝি সময়। গদার, তাঁর ছবি, সে সব ছবির নির্মাণ, শব্দ ও দৃশ্যের ব্যবহার নিয়ে বিভন্ন আড্ডায় কথা বলতে ভালোবাসতেন। বাংলা সাহিত্যেও তাঁর অল্প কিছু আগেই শুরু হয়ে গেছে নতুন ভাবনা, চিন্তা, প্রকরণ, ভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শুরু হয়েছে তিরিশ দশকের পরে আরো একবার প্রতিষ্ঠান-বিরোধী আঙ্গিক এবং বিষয়। গল্প বলার চাইতেও গল্প ভাঙার চেষ্টা, কবিতায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবার সতত চেষ্টায় সবাই নতুন ভাবে লিখছেন, মুখ থুবড়েও পড়ছেন অনেকেই অযোগ্য হিসেবে। ছবির দিক থেকেও আসছে নতুন এক চেতনা এবং গণেশ পাইন ও বিকাশ ভট্টাচার্যরা নতুনভাবে ক্যানভাসকে ভরিয়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন। তাই, আমরা ভেবেছিলাম সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রেও এবার নতুন করে ভাববেন। কেননা, আমাদের অনেকেরই তখন মনে হয়েছিল সিনেমাও কেন প্রথা ভেঙে নতুনভাবে কথা বলার চেষ্টা করবে না। আমরা তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তাকিয়েই ছিলাম। আস্তে আস্তে সময় বদলালো, সাল বদলালো, আর তাতে ছোপ লাগলো নানান সামাজিক-রাজনৈতিক-মানবিক সম্পর্কের টানা-পোড়েনের অনুষঙ্গের। আমাদের তাকিয়ে থাকা শেষ হলো না। কিন্তু এক্ষেত্রে শেষাবধি আমাদের নিরাশ হতে হয়েছিল। একটা সময় পর্যন্ত অবিশ্বাস্য দক্ষতায় তিনি চলচ্চিত্রের ধর্ম মেনেই এবং অসাধারণ দৃশ্য একের পর এক জুড়ে শেষ পর্যন্ত গল্প বলে গিয়েছিলেন। সেটাও অবশ্য ভারতীয় ছবিতে আগে কেউই তাঁর মতন করে পারেন নি। কিন্তু চলচ্চিত্র যে গল্প বলার বেড়া টপকেও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। পৌঁছতে পারে অন্য এক আকাশে সে চেষ্টা পর্যন্ত তিনি কখনোই

তেমনভাবে করেন নি।'প্রতিদ্বন্দ্বী' বা আর এক-আধটা ছবিতে তাঁকে মনে হচ্ছিল বোধহয় এবার তিনি অন্যভাবে ভাববেন এবং ভাবাবেন আমাদের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার গল্পই তাঁর ছবির মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

কেউ যদি বলেন কেন এমনটা হলো এবং কেনই বা শেষ পর্যন্ত ভেঙে বেরিয়ে এলেন না নিজের তৈরী বৃত্তকে, তাহলে হয়তো শুরু করতে হয় একেবারে শেষ থেকে। তাঁর শেষ দিকের বেশ কিছু চলচ্চিত্র,'ঘরে বাইরে' থেকে ' আগন্তুক' পর্যন্ত তো বটেই, তাঁকে স্বমহিমায় প্রকাশিত হতে দেয় নি। তিনি বারবার বিভিন্ন লেখায়, চিঠিতে, সাক্ষাৎকার-এ চলচ্চিত্রকারের তার দর্শকের প্রতি দায়িত্বের কথা বলেছেন, বলেছেন ছবিকে বাণিজ্যিকভাবে সফল করে তুলতেই হবে— এই কথা। দর্শক না দেখলে টিকিট বিক্রি হয় না, আর অনেকানেক দর্শক একাধিকবার না দেখলে ছবি সেই অর্থে বাণিজ্যিক সাফল্যও পায় না। কয়েকটি ছবি বাদ দিয়ে, যেমন গুপী বাঘা ছবিগুলি বা ফেলুদাকে মূলে রেখে ছবি কয়েকটি বাদ দিলে। সেই মাপে তাৎক্ষণিক বাণিজ্যিক সাফল্য তাঁর কোন ছবিরই হয় নি। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সাহিত্যেও এটা সত্যি। বটতলার বই অনেক বেশী বিক্রি হয়েছে। এমন কি, আজো মনে পড়ে, আমাদের হাতের নাগালের মধ্যে বড়সড় যে লাইব্রেরী ছিল — সেখানে রমা-ময় বা রমা-হারা দস্যু মোহনেরাই একা একা রাজত্ব করে গেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' পড়তে চাই বলাতে লাইব্রেরিয়ানের ধমক খেতে হয়েছিল। ছবিতে, কবিতায়, গানে — সবক্ষেত্রেই ব্যাপারটা সত্যি। অনেককে একযোগে টেনে আনার ইচ্ছা প্রত্যেক শিল্পীরই থাকে — কিন্তু অনেক সময় সেটা স্বপ্নই থেকে যায়। সত্যজিৎ রায়ের ছবি বিদেশের বাজারে বিক্রি হয়েছে বেশী— এবং আরো বহুকাল ধরে অস্তে আস্তে হবে। তাঁর ছবির প্রযোজকরাই শেষ হাসি শেষ পর্যন্ত হেসেছেন। হাসবেন আরো অনেককাল ধরে। যদিও শুরুতেই তাঁকে দিয়ে বারবার ছবি করান নি, কেন না সেদিন বক্স-অফিস দাঁত বার করে হাসতেও পারে নি তাঁর ছবিগুলির দিকে। ফলে, দর্শকের কোল আলো করে বসে থেকেছে অন্য ছবি — যার জাতই আলাদা। আরেকটা ব্যাপারও হয়ে থাকতে পারে, সত্যজিৎ রায় নতুনকে বারবার স্বাগত করলেও নিজে কোথাও হয়ত প্রথা ভাঙার রাস্তায় হাঁটতে গররাজি ছিলেন। প্রসঙ্গত মনে আছে আমার প্রথম ছবি 'দূরত্ব' তে সে অর্থে গল্পের বোল-বোলাও না থাকলেও তিনি ছবিটির স্বপক্ষে বারবার বলেছেন। আসলে দর্শক আনুকুল্যের ভাগ্য সত্যজিৎ রায়-এর সমসাময়িক ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেনদের ক্ষেত্রে আরো কম ঘটেছে। তাঁদের পরপরই যাঁরা এলেন, সেই আমাদের ক্ষেত্রেও কোনো তারতম্য ঘটে নি। কিন্তু দর্শক সবাই চেয়েছেন। চেয়েছেন কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, চেয়েছেন তাঁদের আয়নায় নিজেদের দেখে নেওয়ার জন্য। কিন্তু শুধুই আমুদে দর্শক, এঁরা অনেকেই চান নি। কেননা, দর্শকের কোন স্তরকে ছুঁতে পারলে তাদের আমোদিত করা যায় তার রহস্য সবার জানা নেই বা জানার আগ্রহও সবার নেই। প্রসঙ্গত Tarkovsky- র একটা কথা মনে পড়ছে, 'If you try to please audiences, uncritically accepting their tastes, it can only mean that you have no respect for them : that you simply want to collect their money : and instead of training the audience by giving them inspiring works of

art, you are merely training the artist to ensure his own income.'

এসব কথার মানে কখনোই এই নয় যে ফিল্মের narrative structure কে ভাঙতেই হবে এবং না ভাঙলে তা যথার্থ সিনেমা হবে না। কেননা ওই structure-কে মেনে নিয়েই পৃথিবীতে অসাধারণ অনেক ছবি তৈরী হয়েছে যা আগামী সময়েও ইতিহাস হয়ে থাকবে। কিন্তু নিজেকে ভাঙার, নতুন করে গড়ে তোলার এবং পরিশেষে ছাপিয়ে যাবার যে অন্বেষণ থাকে, তা-ই তাকে নিজের নিজের সৃষ্টির মুখোমুখি একজন সমালোচক হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। পরিশেষে,কখনো কখনো সন্ধান দেয় নতুন পথেরও। তা না হলে, একজন অসম্ভব প্রতিভাও এক সময় নিজের সৃষ্টিকে অনুসরণ করতে থাকে, ব্যবহার করতে থাকে, বারবার সেই অস্ত্রকেই যা একসময় ঝলসে উঠেছিল, অন্য অনেকের চেতনাকে মুঠি ধরে নাড়া দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান এবং গদ্যলেখালেখির একেবারে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর ছবি, যার রং বিষয় এবং বিষয়ের বিমূর্ত রূপ নব্যভারতীয় চিত্রকলার পেলব ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছিল। এই জায়গায় তাঁর ছবি ভারতীয় চিত্রকলা থেকে সম্পূর্ণভাবে এক আলাদা দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকবে চিরকাল। তাঁর ছবি যে রামকিঙ্করকে স্বমহিমায় অবনীন্দ্র-নন্দলালের ধারা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হতে সাহায্য করেছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। সত্যজিৎ হয়তো পারতেন আরো এক মেরুতে ভারতীয় ছবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তা হলে হয়তো তাঁর সময় এবং পরের অনেক ছবিই এমন বর্ণহীন, ভাবহীন, অন্বেষাহীন, স্বকীয়তাহীন কিছু দৃশ্যের সমাহার হতো না।

সত্যজিৎ রায় সত্যিই রেনেশস্-এর শেষ ফসল কি না এ বিতর্কে অনাবশ্যকভাবে জড়িয়ে না পড়েও বলা যায় তাঁর অনন্যসাধারণ সৃষ্টি সমসাময়িক সময়ের জটিল আবর্তকে অধিকাংশ সময়েই দূরে সরিয়ে রেখেছে। যে 'বিপন্ন বিস্ময়ে'র সময় আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে, আমাদের ক্লান্ত করে যাচ্ছে তাঁকে, সত্যজিৎ বায়কে তা হযতো স্পর্শ করেনি। 'নায়ক' ছবির দুটি স্বপ্নদৃশ্যই মনে হয় আমাদের স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নের মত নয়, যা শুধু শট্ গেঁথে গেঁথে তৈরী করা।

২৪শে এপ্রিল নন্দন-এর চত্বরে যখন শুইয়ে রাখা হয়েছিল সত্যজিৎ রায়কে, যখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল অসংখ্য মানুষের ভীড়ের মধ্য দিয়ে সেই শেষ যাত্রায়, আমার তাঁকে মনে হয়েছিল অনেকখানি একা। ওই অশেষ মাথার মধ্যে কতজন মানুষ তাঁর ছবি বা সেই ধারর ছবির দর্শক তা নিয়ে বিভ্রম জেগে ছিল মনে। অনেক মুখেই ছিল শুধু কৌতূহলের ছায়া।

সিনেমা যদিও পাশচাত্য থেকে আহৃত একটি শিল্প মাধ্যম, সত্যজিৎ রায়ই সেখানে এনেছিলেন একটি জাতীয় ঐতিহ্য এবং তা করেছিলেন আমেরিকা ও ইউরোপের মডেলটিকে সামনে রেখেই। তাঁর বিচরণভূমির সীমারেখা তিনি নিজেই টেনে নিয়েছিলেন। ফলে যে আত্মপবিচয়ের সন্ধান একজন শিল্পীকে তার নিজের চেনাজানা বৃত্তের বাইরে সচেতন বা কখনো অসচেতন ভাবেই টেনে নিয়ে যায়— সত্যজিৎ রায় সিনেমা মাধ্যমটির প্রতি তাঁর অবিসংবাদী দক্ষতা নিয়ে সে জায়গা থেকে নিজেকে শেষ পর্যন্ত সরিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি বেশী মিল খুঁজে পাই অবনীন্দ্রনাথের। বিস্ময়ের সঙ্গে

অবনীন্দ্রনাথ দেখছেন যে চিত্রকলায় সমস্ত ভারতীয় প্রথার মূল ধরে নাড়া দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, গড়ে তুলছেন রং দিয়ে অন্য এক আলো এবং অন্ধকার। কিন্তু নিজে ডুব দিচ্ছেন সেই কোমল মেজাজের বিষয় আশ্রিত কাজে— যা শিল্পকলায় অসম্ভব সুন্দর হলেও আত্ম-অনুসন্ধানের প্রয়াস নেই।

সত্যজিৎ-পরবর্তী আমরা যারা আজ প্রায় দেড় -দু দশক ধরে ছবি করে যাচ্ছি, সেই আমাদের প্রায় অনেকেই তাঁর টেনে দেওয়া অদৃশ্য সীমার বৃত্তেই ঘুরে যাচ্ছি কম-বেশী সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে। এরও পরের যে সময় সেখানে তা কতখানি তাৎপর্য নিয়ে ধরা পড়বে, তা সত্যিই ভেবে দেখার সময় এসেছে। নতুন কথা হয়তো সব সময় খুঁজে না-ও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নতুন করে বলার চেষ্টাটা তো অন্তত থাকতে পারে। আর, সেই চেষ্টার মধ্য দিয়েই নতুন ভাবে নিজেকে দেখার প্রচেষ্টাটি যে গড়ে উঠবে না আস্তে আস্তে তা কে বলতে পারে? না হলে টাল-মাটাল যে নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে যুঝে যাচ্ছেন স্বল্প কয়েকজন, যে কোনও বিশাল ঢেউ-এ সেটা ডুবে গেলে যে ষোলো আনাই মাটি!

নগরজীবনের শব্দ ঃ সত্যজিতের ছবিতে

উজ্জ্বল চক্রবর্তী

সত্যজিতের কলকাতা শুধুই ইমেজের কলকাতা নয়। তাঁর কলকাতা শব্দ দিয়েও গড়া। কেমন সেই শব্দের কলকাতা? 'মহানগর' থেকে তিনটি উদাহরণ ঃ

নেপথ্য-শব্দ ১) বৃদ্ধ মাস্টার মশাই পুত্রবধূকে বললেন, 'কলকাতাটা যে এত চেন্‌জ্‌ করে গেছে — এ কথা ভাবতেও পারিনি বৌমা।' তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই পাশের বাড়ির রেডিওতে বেজে উঠল 'চণ্ডালিকা'র গান— 'মাটি তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয়......'

নেপথ্য-শব্দ ২) রাত এগারোটা বাজল। রেডিওতে সবে শেষ হয়েছে শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুষ্ঠান। শোবার ঘরে আরতি-সুব্রতর আলোচনা চলছে— আরতি বাড়িতে থেকেই ঘরকন্না করবে, না, চাকরি নেবে কোনও অফিসে। নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছে না ওরা। তখনই একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসতে লাগল পাশের বাড়ি থেকে— ক্যাঁও কীঁ-ই-ই-ই-ই কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ.... রেডিওর কাঁটা ঘুরিয়ে নতুন স্টেশন ধরার চেষ্টা করছে কেউ। অথচ কোনও স্টেশনই খুঁজে পাচ্ছে না।

নেপথ্য-শব্দ ৩) আজই চাকরি পেল আরতি। এবার সুব্রত বাবাকে জানাবে পুত্রবধূর চাকরিতে যোগদানের খবর। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত আটটা ছুঁই ছুঁই। ঠিক সেই সময়, পাশের বাড়ি থেকে রেডিওর খবরে ভেসে এল এই কথাটা ঃ 'সারা দেশে আজ প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ঐতিহাসিক মে-দিবস পালিত হয়েছে।'

আপাতভাবে মনে হয় এই তিন শব্দ আসলে বাস্তব জীবনেরই অঙ্গ। পরিভাষায় যাকে বলে ইন্‌সিডেন্টাল সাউন্ড। ছবির পরিবেশ বাস্তবানুগ করে তোলাই এদের একমাত্র কাজ। অথচ, আশ্চর্য হয়ে আমরা দেখি, ছবিতে এদের ভূমিকা বাস্তবতার গন্ডিতেই সীমিত নয়। গভীরতর অর্থ বহন করে প্রতিটি শব্দ। দেখা যাক, কী সেই অর্থ ঃ

ব্যাখ্যা ১) পূর্ব বাংলার গ্রামের বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছেন এক বৃদ্ধ মাস্টারমশাই। এখানে এসেই তাঁর স্বপ্নভঙ্গ। ক্রমেই তিনি আবিস্কার করেছেন— আমূল বদলে গেছে ছাত্রজীবনে দেখা সেই কলকাতা। তাঁর মতো আদর্শবান শিক্ষকের স্থান খুঁজে নেওয়া শক্ত উকিল-ডাক্তার ভরা এই পেশাদারী শহরে। একথা বুঝতে পেরেই নস্টাল্‌জিয়ায় ভারাক্রান্ত তাঁর মন। সেই সময় নিশ্চয়ই তাঁর মনে আসে, পূর্ব বাংলার গ্রামের বাড়ির কথা। মনটা যেন গ্রামে ফিরে যেতে চায়। তাই, কলকাতার পরিবর্তন-বিষয়ে সংলাপ উচ্চারণের মুহূর্তেই নেপথ্যচারী শব্দে শোনানো হয়—'ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে মরি হায় হায় হায়......।' শুনেই আমরা টের পাই, অতীতের কোন্ বরাভয়-পূর্ণ ইমেজ ফিরে ফিরে আসছে কলকাতায় নির্বাসিত এই বৃদ্ধ শিক্ষকের মনে।

ব্যাখ্যা ২) এই দৃশ্যে আরতি সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না শেষ পর্যন্ত কোথায় সে অধিষ্ঠিতা (stationed) হবে-ঘরে না বাইরে। ঠিক তখনই, নেপথ্যচারী শব্দেও শুনছি আমরা, রেডিওতে কোনও স্টেশন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেবলই এলোমেলো ঘুরে চলেছে কাঁটা। ঠিক আরতিও যেমন সন্ধানরতা। জানে না কোথায় স্থিত হবে।

ব্যাখ্যা ৩) মে দিবসে আরতির চাকরি পাওয়া 'মহানগর' ছবির পরিপ্রেক্ষিতে এক তাৎপর্যময় যোগাযোগ। কেননা, ছবির শেষ, বরখাস্ত সহকর্মিনীর পক্ষে প্রতিবাদ জানিয়েছিল আরতি। মে-দিবসে চাকরি পাওয়া যেন সেই প্রতিবাদেরই পূর্বাভাস।

সুতরাং 'মহানগর' কাহিনীর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ— এই তিন কালই বিধৃত শুধু নেপথ্যচারী শব্দে। বৃদ্ধ শিক্ষকের অতীতের কথা শুনিয়েছে প্রথম শব্দ। দ্বিতীয় শব্দটি আরতির বর্তমান মুহূর্তে দ্বন্দ্বময় অনুভূতিরই ব্যঞ্জনা। আর, তৃতীয় শব্দ আরতির চরিত্রের ভবিষ্যৎ পরিণতির সংকেত। সুতরাং তিন শব্দই 'মহানগর'-এর মুখ্য চরিত্রদের জীবনে আমূল প্রোথিত।

এতেই প্রমাণ হয়, শুধু ছবির পরিবেশকে বাস্তবানুগ করে তোলাই সত্যজিতীয় শব্দের একমাত্র কাজ নয়। সত্যজিতের সাউন্ডট্র্যাক, গভীরতর অর্থে, এক চারুশিল্প। তাই, যে কোনও চারুকলার মতোই, তাঁর শব্দশিল্পেরও বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

কিন্তু গত পঁয়ত্রিশ বছরে বিরাট শব্দভান্ডাব গড়ে তুলেছেন সত্যজিৎ রায়। বিনা আয়োজনে শব্দের সেই জগতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। তাই, সঙ্গে নিতে হবে এমন একজন গাইড, যে এই জগতের নাড়িনক্ষত্র জানে। আমাদের অনুসন্ধানে গাইডের কাজ করবে শ্রীমান তপেশরঞ্জন মিত্র ওবফে তোপসে, গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরেব সহকারী। কারণ, কী ভাবে শব্দের জগৎকে বিশ্লেষণ করে সত্যজিতের চেতনা— তার সূত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে ফেলুদার রহস্য-অ্যাডভেঞ্চারেব গল্পগুলোতে। সত্যজিতের শব্দের জগৎকে তোপসে্ রেকর্ড করেছে নিরলংকার ভাষায়। তাই, আমরা বার বার তারই দ্বারস্থ হব এই অলোচনায়।

১) কলরবের নকশা

লোকেশানে রেকর্ডার চালিয়ে যে কলরব আপনিই রেকর্ড হয়ে যায়, সেই শব্দকেই কি সরাসরি প্রয়োগ করেন সত্যজিৎ?

কলরবকে এভাবে প্রয়োগ করলে সাউন্ডট্র্যাকের ওপর পরিচালকের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অথচ সত্যজিৎ অনেক বেশি কর্তৃত্ব চান নিজের শিল্পের ওপর। তাই, এমনকি কলরবের বেলাতেও তাঁর সাউন্ডট্র্যাক সুপরিকল্পিত। কলরবকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করেন সত্যজিৎ তার প্রমাণ আমরা খুঁজে নিতে পারি একটি ফেলুদার উপন্যাস থেকে। রহস্যের সন্ধানে ছোট্ট শহর খুল্‌দাবাদে এসে তোপ্‌সে লিখছে—

'....হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। দূরে দক্ষিণ দিকে নীচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওরই গায়ে বোধহয় বৌদ্ধ গুহাগুলো। কাছেই একটা পানের দোকান থেকে ট্রানজিসটারে হিন্দি ফিল্মের গান বাজছে। রাস্তার উল্টোদিকে একটা বন্ধ দোকানের সামনে দুটো লোক একটা বেঞ্চিতে বসে গলা উঁচিয়ে তর্ক করছে— কী নিয়ে সেটা বোঝার উপায় নেই, কারণ ভাষাটা বোধহয় মারাঠী।.... দূব থেকে একটা

ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ শোনা গেল, একটা পাগড়ি পরা লোক সাইকেল করে বেল বাজাতে বাজাতে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল, কোত্থেকে জানি একটা লোক 'এ মধুকর— এ মধুকর!' বলে চেঁচিয়ে উঠল—সবই যেন কেমন নতুন নতুন.........'

(কৈলাসে কেলেঙ্কারি। পরিচ্ছেদ পাঁচ)

এটা কিন্তু আসলে কলরবেরই বর্ণনা। অর্থাৎ, অনিয়ন্ত্রিত শব্দের বর্ণনা। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, এমন জাতের শব্দ পর পর বেছে নিয়েছে তোপ্‌সে যেগুলো পরস্পর বিপরীতধর্মী।

কোনও শব্দ খুব দূর থেকে ভেসে আসছে ঃ ট্রেনের হুইস্‌ল্‌।

কোনও শব্দ হচ্ছে খুব কাছে ঃ ট্রানজিস্টারের গান, দুটো লোকের তর্কাতর্কি।

কোনও কোনও শব্দ সুরেলা ঃ ট্রেনের হুইস্‌ল্‌, হিন্দি ফিল্মের গান।

কোনও শব্দ বেসুরো ঃ তর্ক।

কোনও শব্দ তীক্ষ্ণ ঃ ট্রেনের হুইস্‌ল্‌।

কোনও শব্দ নরম ঃ 'এ মধুকর' বলে ডাক।

এখানে আমরা প্রমাণ পেয়ে যাই—সত্যজিতের সাউন্ডট্র্যাকে খুব কাছের কোনও শব্দ থাকলে, সঙ্গে একটা খুব দূরের শব্দ থাকবেই। কোনও সুরেলা শব্দ থাকলে, সঙ্গে বেসুরো শব্দ বাজবেই। যদি কোনও তীক্ষ্ণ শব্দ শুনি, তাহলে একই সঙ্গে নরম শব্দ শুনবই।

সিনেমার সাউন্ডট্র্যাকে কলরব রচনার সময়, সচেতন ভাবেই এই প্রত্যেকটি কৌশল ব্যবহার করেন সত্যজিৎ। 'অপুর সংসার'-এর কলকাতাকে আমরা বেছে নিতে পারি এর দৃষ্টান্ত হিসেবে। মনে করুন সেই দৃশ্য ঃ সকালে ঘুম থেকে উঠে অপর্ণা ছাদে উনুন ধরাচ্ছে। ছোট্ট ছাদের বাইরে কর্মচঞ্চল কলকাতার বিস্তার । শহরের চঞ্চলতা বোঝাবার জন্য সাউন্ডট্র্যাকে অনিয়ন্ত্রিত কোলাহল শোনাতে হয়নি সত্যজিৎকে। তার বদলে মাত্র কয়েকটি বিপরীতধর্মী শব্দ তিনি বেছে নিয়েছিলেন। পর পর কী কী শব্দ এসেছিল সেই দৃশ্যে, তা এখানে বলা যাক ঃ পাখির কূজন, কয়লা ভাঙা, ট্রেনের হুইস্‌ল্‌, ট্রেনের ঝুকঝুক, অপুর বাঁশি, মেঝেতে ঝাঁটার বাড়ি, আবার ট্রেনের তীব্র হুইস্‌ল, সেতার, রেল ইঞ্জিনের বাষ্প ছাড়ার ফোঁস-ফোঁসানি। তালিকায় চোখ বোলালেই বোঝা যায়, কী সচেতন যত্নে তৈরি হয়েছে এই সাউন্ডট্র্যাক। পাখির নরম ডাক আছে বলেই তার বিপরীতে এসেছে ট্রেনের হুইসেলের তীব্র শব্দ। বাঁশিতে সুরেলা গান বেজেছে বলেই, একই সঙ্গে শোনানো হয়েছে ঝাঁটা আছড়ে আরশোলা মারার বেসুরো আওয়াজ। পরক্ষণেই আবার বাঁশির নরম সুরের বৈপরীত্য রচনা করেছে ট্রেনের তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল। যে সময় অপু বাঁশি বাজাচ্ছে, ঠিক তখনই মেঝেতে ঝাঁটা আছড়ে আরশোলা মারে অপর্ণা। বাঁশির সুর আর ঝাঁটার আওয়াজ একই সঙ্গে শুনেছি আমরা। প্রচন্ড বিপরীতধর্মী দুটি শব্দ। ঝাঁটার আওয়াজের বৈপরীত্যে বাঁশির ধ্বনি আরো সুরেলা মনে হয়েছে।

এই দৃশ্যের পরিণতি পর্যায়ে সেতার বেজেছিল। আবহ অতি-সংবেদনশীল হয়ে উঠেছিল রবিশংকরের আঙুলে-টানা-মীড়ে। তাই সেতারের সঙ্গে শোনানো হল রেল ইঞ্জিনের বাষ্প ছাড়ার শব্দ—ফোঁস্‌ ফোঁস্‌। সুতরাং, প্রমাণ পাচ্ছি বাঁশি আর সেতারের সুরেলা শব্দ যেই দর্শকদের কানে গেছে, ঠিক তখনই জুড়ে দেওয়া হয়েছে দুটো বেসুরো

আওয়াজ— ঝাঁটা আছড়ানো আর রেল ইঞ্জিনের ফোঁস্ ফোঁস্। ঠিক যে ভাবে 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' উপন্যাসে, ট্রানজিস্টারে বাজা সুরেলা গানের সঙ্গে তোপ্সে জুড়ে দিয়েছিল দুটো লোকের বেসুরো তর্কাতর্কি।

লাবণ্যময় আবহসংগীতের সুষমাকে ভাঙতে গিয়ে, সত্যজিৎ কখনো কখনো নগরজীবনের টুকরো শব্দ জুড়ে দেন সংগীতের সঙ্গে। সেতারে দীর্ঘ ঝালা বেজেছিল 'অপুর সংসার'-এর আর একটি মন্তাজ সিকোয়েন্সে—অপু অফিস থেকে বাড়ি ফেরার আগে অপর্ণাব প্রস্তুতি। যেই অপর্ণার টিপ পরা শেষ হয়েছে, অমনি ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠল। অর্থাৎ, অপুর ফেরার সময় হয়েছে। অ্যালার্ম শুনেই অপর্ণা ফুঁ দিয়ে একটা ঠোঙা ফুলিয়ে দরজার পাশে গিয়ে চুপটি করে দাঁড়াল। অপু অন্যমনস্কভাবে ঘরে ঢুকতেই অপুকে অপর্ণা চমকে দিল ফটাস্ করে ঠোঙা ফাটিয়ে। এই পুরো দৃশ্য জুড়েই সেতার বেজেছে। কিন্তু সেতারের লাবণ্যময় শব্দের সরাসরি বিরোধিতা করেছে দুটো বেসুরো শব্দ — ঘড়ির একঘেয়ে কর্কশ অ্যালার্ম আর ঠোঙা ফাটানোর ফটাস্।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠেছে। 'অপুর-সংসার'-এ ছাদের দৃশ্যে ঝাঁটা, বাঁশি, পাখি, সেতার —সব শব্দই স্ট্যাটিক। অর্থাৎ, শব্দের উৎপত্তি যে স্থানিক বিন্দুতে, সেই বিন্দুতেই তাদের বিলয়। যেমন আরশোলা মারতে গিয়ে ঝাঁটা-আছড়ানোর শব্দ যে বিন্দুতে সৃষ্টি হচ্ছে, আবার সেই বিন্দুতেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। পাখিও ডাকছে কোথাও বসে বসে। এই ভাবে দৃশ্যের প্রতিটি শব্দই নিজস্ব বিন্দুতে স্থির। তাই স্পেসের দিক থেকে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। টুকরো শব্দের এই স্থিরতা ও পরস্পর-বিচ্ছিন্নতার ফলে কি স্পেসের গভীরতা কমে যাচ্ছে না? অর্থাৎ শব্দসৃষ্টিকারী কোন চলমান বস্তু যদি দৃশ্যে থাকে, তাহলে স্পেসের গভীরতা বেড়ে যাবে। কারণ, তখন সেই বস্তু শব্দ সৃষ্টি করতে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে চলাচল করবে। ফলে, চমৎকার বৈপরীত্য রচিত হবে দৃশ্যের অন্যান্য শব্দের স্থিরতার সঙ্গে। 'অপুর সংসার'-এ ছাদের দৃশ্যে এই ভূমিকা পালন করেছে দূর থেকে কাছে এগিয়ে আসা ট্রেনের হুইস্‌ল্। 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' উপন্যাসের শব্দ-বর্ণনায় ঠিক এই কাজ করেছিল দূর থেকে কাছে এগিয়ে আসা সাইকেলের বেল।

আমরা প্রমাণ পেলাম, নানান্ বিপরীতধর্মী শব্দকে ওভারল্যাপ করিয়ে করিয়ে সিনেমার কলরব রচনা করেন সত্যজিৎ। 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' আর 'অপুর সংসার' থেকে নানান্ শব্দ নিয়ে একটা টেব্‌ল তৈরী করলেই আমরা দেখব, দুটোর বেলাতেই কাজ করেছে একই পদ্ধতি—

	নরম শব্দ	তীক্ষ্ণ শব্দ	সুবেলা	বেসুরো	দূরের	কাছের
কৈলাসে	'মধুকর'	ট্রেনের	হিন্দি	চেঁচিয়ে	ট্রেনের	রেডিওর
'মধুকর'	ফিল্‌মের	কেলেঙ্কারী	ডাক	হুইস্‌ল্	গান	তর্ক	হুইস্‌ল্	গান
অপুর	পাখির	ট্রেনের	বাঁশীতে	ঝাঁটা	ট্রেনের	কয়লা
সংসার	কূজন	হুইস্‌ল্	গান	আছড়ানো	হুইস্‌ল্	ভাঙা

'কৈলাসে কেলেঙ্কারি'র খুল্‌দাবাদ্ কিংবা 'অপুর সংসার'-এর কলকাতা — নানান্ শব্দ ওভারল্যাপ করার সময় সত্যজিতের কাছে দুই শহরই এক।

২) ধাপে ধাপে শব্দ

মিলিত শব্দ রচনা করার সময় সর্বদাই কি সত্যজিৎ শব্দগুলো ওভারল্যাপ করেন? না, এছাড়াও অন্য কৌশল তাঁর আছে। সেই অন্য কৌশলটা বোঝা যাবে 'জয় বাবা ফেলুনাথ' উপন্যাসের এই অংশটা পড়লে—

......এতক্ষণে এ-মোড় ও-মোড় ঘুরে আমরা যে গলিটায় পৌঁছেছিলাম সেটা একটু বিশেষ রকম নির্জন। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আশেপাশের বাড়িগুলোর ভিতর থেকে মানুষের গলার সুর পেয়েছি, বাচ্চার কান্নার শব্দ পেয়েছি, রেডিও থেকে গানের আওয়াজ পেয়েছি। এবারের গলিটায় দূর থেকে ভেসে আসা মন্দিরের ঘন্টা ছাড়া আর কোনো শব্দই নেই। একটু এগোতে শোনা গেল তার সঙ্গে আরেকটা শব্দও একটানা একতালে হয়ে চলেছে — ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্........

লালমোহন বাবু আমাদের দুজনের মাঝখানে হাঁটছিলেন; শব্দটা শুনে দুদিকে হাত বাড়িয়ে আমাদের কোটের আস্তিন ধরে মৃদু টান দিয়ে হাঁটার স্পীড কমিয়ে দিলেন। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'হাইলি সাস্‌পিশাস'।

ফেলুদা নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ওটা সাস্‌পিশাস কিছু না; পানের তবক তৈরি হচ্ছে।'...... (জয় বাবা ফেলুনাথ। পরিচ্ছেদ আট)

এখানে শব্দের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দিক, রাস্তার মোড় বদলের সঙ্গে সঙ্গে শব্দও পালটে পালটে যাচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে মানুষ-রেডিও-বাচ্চা মেশানো কলরব। দ্বিতীয় পর্যায়ে শুধুই মন্দিরের ঘন্টা। রাস্তা দিয়ে আরও এগিয়ে নতুন একটা শব্দ যোগ হল ঃ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্। অর্থাৎ, যতবার মোড় বদল হচ্ছে— ততবারই আগের শব্দ ফেড আউট করে নতুন একটা শব্দ ফেড্ ইন করছে। শুধু তোপ্‌সের লেখা কাশীর বর্ণনাতেই নয়, 'অপরাজিত' ছবিতেও একই ব্যাপার। কাশীর ঘাট থেকে হরিহর বাড়ি ফেরার পথে শব্দ ঠিক এই ভাবেই পাল্টে পাল্টে গিয়েছিল। কলকাতাকে চিত্রিত করার সময়ও একই কৌশল অবলম্বন করেন সত্যজিৎ। মনে করুন 'চারুলতা'-র প্রথম দৃশ্য। জানালা দিয়ে চারু দেখছে তাদের বাড়ির ঠিক বাইরের রাস্তাটা। রাস্তার কলরব কিন্তু চারু একসঙ্গে শুনছে না।

বাঁদরওয়ালার ডুগডুগির শব্দ ভেসে আসছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

পালকি বেহারাদের সমবেত হাঁক ভেসে আসছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

বাসনওয়ালার কাঁসার বাসনের ঘন্টা ফেড্ ইন্ করছে, আবার ফেড্ আউট করে যাচ্ছে।

এই তিনটি শব্দ ছবিতে এসেছিল ধাপে-ধাপে, একের পর এক। ঠিক যে ভাবে 'জয় বাবা ফেলুনাথ' উপন্যাসে একের পর এক এসেছিল মানুষের শব্দ, তারপর ঘন্টাধ্বনি, তারপর রূপোর তবক তৈরির ধুপ্ ধুপ্......।

শুধু 'চারুলতা'র কলকাতা নয়, এরকম পর্যায়-ক্রমিক শব্দে এস্ট্যাব্লিশ করা হয়েছিল 'অপুর সংসার'-এর কলকাতাকেও। বিয়ের পর অপর্ণা যখন কলকাতায় আসছে, তখন শহরের কোনও দৃশ্য দেখানো হয়নি। তার বদলে কয়েকটি শব্দকে ধাপে ধাপে শুনিয়ে অপর্ণার কাছে উন্মোচন করা হয়েছিল কলকাতাকে। সদ্য বিয়ে করে অপর্ণা শহরে এসেছে, লজ্জায় আনত তার মুখ। সুতরাং, খুব বেশি এদিক ওদিক চেয়ে সে কলকাতার

দৃশ্য দেখবে না, এটাই স্বাভাবিক। দৃষ্টি যখন ব্যাহত, কান তখন অনেক বেশি সজাগ। এই দৃশ্যে তাই অনেক বেশি শুনতে পাচ্ছে অপর্ণা, এবং শব্দগুলোও স্পষ্টতর হয়ে উঠছে তার কাছে। দৃশ্যটি এই রকম—ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে, সিঁড়ি দিয়ে সোজা তিনতলার ছাদে অপুর ঘরে উঠে গেল অপর্ণা।

ধাপে ধাপে কয়েকটি শব্দ এসেছে এই দৃশ্যে। প্রথমেই রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ। তারপর বিরাট ভাড়াবাড়ির উঠোনে পৌঁছে যায় অপু আর অপর্ণা। উঠোনের এক কোণে এঁটো বাসন রাখা আছে। তার ওপর কল খোলা। কল থেকে টুপ্‌টাপ্ জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। অপর্ণা সেই জলের ফোঁটার শব্দ কান পেতে শোনে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আসে অপু-অপর্ণা। এবার নতুন শব্দ। সেলাই কলের ঘড় ঘড় আওয়াজ। একটা খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল, পেছন ফিরে একজন প্রৌঢ় মহিলা সেলাই কল চালাচ্ছেন। তারপর ওরা পৌঁছে গেল তিনতলার ছাদে। আবার নতুন শব্দ। ট্রেনের হুইস্‌ল্, আর ইঞ্জিনের ফোঁস্-ফোঁস্। এইভাবে আস্তে আস্তে একটি শব্দ চলে যায়, নতুন শব্দ ফেড ইন্ করে তার জায়গায়। যেন অপর্ণার কাছে কলকাতার জীবনটাই একটু একটু করে উন্মোচিত হয়।

১ম ধাপ ঃ ঘোড়ার খুর থেকে কলের জলের টুপ্ টাপ্,

২য় ধাপ ঃ জলের ফোঁটা থেকে সেলাই কলের ঘড়ঘড়,

৩য় ধাপ ঃ সেলাই কল থেকে রেলের হুইস্‌ল্।

শব্দগুলো পর পর এসে, কলকাতায় অপর্ণার এক বছরের জীবন-কথা লিখে দিয়ে যায়। কী ভাবে?

ঘোড়ার খুরের শব্দে যেন বলা হয়েছিল, অপর্ণার স্বপ্নের পুরুষ তাকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এল ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে। এখানে ঘোড়ার খুরের শব্দ দুঃসাহসী প্রেমিকের চিরকালীন বাহনের আর্কিটাইপ। অপর্ণার চোখে নিঃসন্দেহে অপু দুঃসাহসী প্রেমিক। কারণ, নিজের দারিদ্র সত্ত্বেও সে অপর্ণাকে নিয়ে এসেছে কলকাতায়। প্রেমের জন্য যে কোনও ফলাফলের মুখোমুখি হতে ভয় পায়নি অপু। এই দুঃসাহসের জন্যই অপুর সঙ্গে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ মানিয়ে যায়।

তারপরেই এল বাসনের ওপর জলের ফোঁটার শব্দ। যদি একলা আসত জলের শব্দ তবে হয়ত বলা যেত সেই শব্দ অপর্ণার চোখের জলের প্রতীক। তা কিন্তু আসেনি। যেহেতু জলের ফোঁটা পড়েছে কাঁসার বাসনের গায়ে, তাই এখানে জলের শব্দ হয়ে উঠেছে ঘরকন্নার প্রতীক। বাঙালী সংসারের প্রতীক। কারণ, কলকাতায় সে আর জমিদারের মেয়ে নয়। শহরে এসে নিজের রান্না তাকে নিজেই করতে হবে। স্বামী অফিসে বেরোনর পরে, বাসন মেজে নিতে হবে নিজেকেই। সুতরাং, এখন থেকে তার জীবনটা (literally) বাসনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত হয়ে গেল। তাই বাসনের গায়ে জলের ফোঁটার শব্দ।

তারপর ফেড ইন্ করে সেলাই কলের ঘড়ঘড় আওয়াজ। সেলাই বিশেষ ভূমিকা পালন করে বাঙালী পরিবারে। 'পথের পাঁচালী'তে রাতের দৃশ্যে দেখানো হয়েছিল, সর্বজয়া সেলাই করছে আপন মনে। আর দীর্ঘ সময় ধরে ছুঁচে সুতো পরানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে ইন্দির ঠাকরুণ। বাব বার যাবা নতুন কাপড় কিনতে পারে না,

সেলাই তাদের নিত্যসঙ্গী। অর্থাৎ, সেলাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়, একটা বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। তাই, বিয়ের পর অপর্ণার জীবনে বিশেষ অর্থ বয়ে আনে সেলাই কলের শব্দ।

কলকাতায় প্রথম এসে ঘোড়ার খুরের শব্দে যে রোমান্স—তা পর পর দুটো শব্দে ভেঙে দেন সত্যজিৎ। এঁটো বাসনে জলের ফোঁটা, আর সেলাই কলের ঘড়্ঘড়ানি। তাঁর পক্ষে এই দুটো শব্দই যথেষ্ট ছিল ঘোড়ার রোম্যান্টিকতাকে ভাঙবার জন্যে।

একেবারে শেষে আসছে, ট্রেনের হুইস্ল্। এই হুইস্ল্ কিন্তু অপর্ণার বিদায়ের আভাস। কারণ, একমাত্র ট্রেনই কলকাতার সঙ্গে অপর্ণার গ্রামের বাড়ির যোগাযোগ রক্ষা করছে। একমাত্র ট্রেনই পারে অপর্ণাকে নিজের গ্রাম ফিরিয়ে দিতে। তাই অপর্ণার কাছে ট্রেনের হুইস্ল্ যেন গ্রামে ফিরে যাবার নিগূঢ় আহ্বান। সে যখন সন্তানের জন্য ট্রেনে করে চলে গিয়েছিল কলকাতা থেকে, জোরালো হুইস্ল্ শোনানো হয়েছিল তখনও। সেই তার শেষ যাওয়া। তারপর সে আর কলকাতায় ফিরে আসেনি।

সুতরাং, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার দৃশ্যে, একের পর এক নতুন শব্দ সাউন্ডট্র্যাকে এসেছে, আর অপর্ণার পরিণয় জীবনের এক-একটি নতুন পর্যায়কে প্রকাশ করে গেছে। কলকাতায় তার রোম্যান্টিক আগমন থেকে শুরু শেষ বিদায় পর্যন্ত। এমন কী শেষ যাওয়ার কারণটাও আভাসিত হয়েছিল শব্দেরই সাহায্যে। ছাদের ঘরে একলা বসে থাকতে থাকতে অপর্ণা শুনেছিল, নিচ থেকে একটা বাচ্চার খিলখিলে হাসি ভেসে আসছে। তার নিজের কান্না থেমে গিয়েছিল এই হাসির শব্দে। শিশুর হাসির শব্দেই ইঙ্গিত করা হয়েছিল অপর্ণার কলকাতা ছেড়ে যাবার কারণ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শুধু বাস্তব শব্দের সাহায্য নিয়েই চরিত্রের জীবনকাহিনী রচনা করতে পারেন সত্যজিৎ। এটা আরো সহজেই সম্ভব কলকাতা-নির্ভর ছবিতে। কারণ, বিপরীত-ধর্মী অনেক শব্দ কলকাতায় খুব কাছাকাছি সৃষ্টি হয়। তাই, বিপরীত-মেরুর অনেক ভাবনাকে একই সঙ্গে মনে এনে দিতে পারে কলকাতার শব্দ। 'চারুলতা'র কথাই ধরা যাক। বাঁদরওয়ালার ডুগডুগি যেভাবে দূর থেকে চারুর কানে ভেসে এসে আবার মিলিয়ে যায়—ঠিক সে ভাবেই স্বামীব পদশব্দ চারুর কাছে এগিয়ে এসে আবার দূরে মিলিয়ে যায়। এই ভাবে শুধু শব্দ দিয়েই চারুর জীবনের মূল সংকট বলা হয়েছিল। গ্রামের ছবিতে বাঁদরের ডুগডুগি আর ভূপতির বুটের শব্দ এত কাছাকাছি এনে ফেলা যেত না। কারণ, গ্রামের স্পেস অনেক গভীর ও বিস্তৃত।

৩) শব্দে স্পেসের গভীরতা

সিনেমার শব্দের সবচেয়ে সহজ ভূমিকা স্পেস্কে অনেক বিস্তৃত করে দেওয়া। বাস্তব জগৎ পর্দার ছবির বাইরেও বিস্তৃত—দর্শকদের তা জানিয়ে দেয় অফ্স্ক্রিন সাউন্ড। অফ্স্ক্রিন শব্দের বিষয়ে সত্যজিৎ রায়ের কী ধারণা, সেটা বোঝার জন্যে তোপ্সের লেখা থেকে আবার দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক ঃ

....খুব মন দিয়ে শুনলে দূর থেকে হারমোনিয়াম আর ঘুঙুরের শব্দ পাওয়া যায়। আকাশের দিকে চাইলাম। এত তারা কলকাতার আকাশে কোনদিন দেখিনি।.....

(গোলাপী মুক্তা রহস্য।। পরিচ্ছেদ নয়)

ঘটনাটি এই রকম ঃ— নিষুতি রাতে কাশীর একটি পাড়ায় ফেলু-তপেশ-জটায়ু হাজির। এখান থেকে ওরা মগনলাল মেঘরাজের বাড়িতে অভিযানে যাবে। মাঝরাতের নির্জন কাশী। এখন এ পাড়ায় যা ঘটবে, শুধু সেটুকুরই বর্ণনা দেওয়া হবে গল্পে। কিন্তু এ পাড়ার বাইরেও অনেক দূর ছড়িয়ে আছে শহর কাশী। কাশীর বিস্তারকে প্রকাশের দায়িত্ব নিল অফ্‌স্ক্রিন সাউন্ড ঃ দূর থেকে ভেসে আসা হারমোনিয়াম আর ঘুঙুরের শব্দ। যে পাড়ায় ফেলুদারা এসে দাঁড়িয়েছে, সেই পাড়া নিস্তব্ধ বলে যেন এটা না মনে হয়—সারা শহর জুড়ে সবাই ঘুমোচ্ছে। দূরের হারমোনিয়াম আর ঘুঙুর বলে দিচ্ছে, কাশীতে কেউ কেউ মাঝরাতেও জেগে থাকে। মাঝরাতে আজও নাচের আসর বসে।

শুধু এইটুকু দৃষ্টান্ত থেকেই আমরা বুঝে নিলাম, ভিসুয়ালে যা নেই—তাকে শোনানো যায় দূর থেকে ভেসে আসা শব্দে। ফলে, দর্শকদের মনটা ভিসুয়ালের ক্ষুদ্র পরিসীমায় আর বন্দী হয়ে থাকেনা।

'গোলাপী মুক্তা রহস্য'-এর এই ছোট বর্ণনা পড়লেই সোজাসুজি আমাদের মনে পড়ে যায়, 'জলসাঘর'-এর একটি দৃশ্য। নির্জন জমিদারপুরীতে একলা অন্ধকারে ডুবে আছেন বিশ্বম্ভর রায়। দুরে মহিম গাঙ্গুলীর বাড়ি থেকে ভেসে আসছে হারমোনিয়ামের সুর, ঘুঙুরের ঝংকার আর তবলার বোল। খুব মন দিয়ে শুনলে স্পষ্টই শোনা যায়। শুধু ভেসে আসা শব্দেই বোঝানো হয়েছিল, একটা নতুন ইমারত গড়ে উঠেছে জমিদারপুরীর কাছেই। এই নতুন ইমারতের দূরত্ব আমাদের অনুভবের মধ্যে নিয়ে এসেছিল দূরের তবলা-ঘুঙুর-হারমোনিয়াম।

'জলসাঘর'-এর শুটিং হয়েছিল 'গোলাপী মুক্তা রহস্য' লেখার বত্রিশ বছর আগে। অথচ, 'গোলাপী মুক্তা'য় কাশীর রাতের এই ছোট্ট বর্ণনা পড়লে মনে হয়, যেন 'জলসাঘর'-এর চিত্রনাট্য থেকেই সোজাসুজি তুলে নেওয়া হয়েছে লাইনগুলো। এখানেই প্রমাণ হয়, অফ্‌স্ক্রিন সাউন্ড সম্পর্কে সত্যজিতের ধারণা একটুও পাল্টায়নি গত বত্রিশ বছরে। তাই তোপ্‌সের লেখায় আজও বারবার ফিরে আসে অফ্‌স্ক্রিন সাউন্ডের বর্ণনা। একটা শহরের ইমেজ প্রাণবান করে তুলতে পারে শুধু অফ্‌স্ক্রিন সাউন্ডের সাহায্যেই ঃ

.....অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে, এখন চারিদিকে চাইলে বট, অশ্বথ, আমগাছ, বাঁশ, ঝাড়—এসব বেশ তফাৎ করা যায়। ঝিঁঝির শব্দ ছাড়াও যে অন্য শব্দ আছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। ট্রেনের আওয়াজ, সাইকেল রিক্সার চড়া হর্ণ, রাস্তার কুকুরের ঘেউ ঘেউ, এমন কী দূরের কোনো বাড়ি থেকে ট্রানজিস্টারের গান পর্যন্ত। ফেলুদার ঘড়িতে রেডিয়াম ডায়াল, তাই অন্ধকারেও টাইম দেখতে পারে।.........

(নেপোলিয়ানের চিঠি।। পরিচ্ছেদ পাঁচ)

উদ্ধৃত অংশের অফ্‌স্ক্রিন সাউন্ডই বলে দেয়, ঘটনা ঘটছে কোনও মফঃস্বল শহরে। যদিও শহরের কোনও ভিসুয়াল বর্ণনা এখানে নেই। ঠিক তেমনই, 'মহানগর'-এ সুব্রতদের পাড়ার অন্য কোনও বাড়ি দেখানো হয়নি। কিন্তু ওদের পাশের বাড়িটা যে বেশ গা-ঘেঁষাঘেঁষি, সেটা ধরা যায় শুধুই অফ্‌স্ক্রিন সাউন্ডের স্পষ্টতায়। সুব্রতর বাড়িতে রেডিও ছিল না। কিন্তু পাশের বাড়িতে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার খবর শুরু হলে, সুব্রতর বাড়ি থেকে স্পষ্ট শোনা যেত সেই খবরের প্রতিটি শব্দ ঃ '.......অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতা, প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহেরু আজ বলেছেন—বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক,

এটাই কোটি কোটি মানুষের ঐকান্তিক কামনা......'

শিল্পের প্রতিটি উপাদানের একাধিক ভূমিকা থাকে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে ; ভেসে-আসা এই রেডিও-সংবাদও আর কোনও ভূমিকা পালন করেছে কি? হ্যাঁ, শুধু পাশের বাড়ির দূরত্বকে অনুভবক্ষম করে তোলা ছাড়াও, রেডিওর খবরের আর একটি মূল্যবান ভূমিকা ছিল 'মহানগর' ছবিতে। সুব্রতর মতো কলকাতার কত মানুষ যে বিবৃতিমূলক ভারতীয় রাজনীতির ওপর আস্থা হারিয়ে ছিল, সে কথা সহজে বুঝিয়ে দিয়েছে অফস্ক্রিনে রেডিওর খবর। কী করে বুঝিয়েছে, সেটা দেখার জন্য অবশ্য 'মহানগর'-এ শোনা খবরটুকু উদ্ধৃত করা দরকার ঃ—

'.....কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ বলেছেন, গান্ধীজী ও কংগ্রেসের আদর্শে দেশকে গড়ে তুলতে হলে, গ্রামের যাঁরা প্রকৃত কৃষক তাঁদের ভূমি-সমস্যার সমাধান করতে হবে। বিধানসভায় আজ বিরোধীপক্ষের সদস্যরা কৃষিপণ্যের ওপর লেভি ধার্য করার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এর ফলে গ্রামের দরিদ্র কৃষকরা আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন অবশ্য এর বিরোধিতা করে বলেন, আসলে খুব কম সংখ্যক কৃষকই এই লেভির আওতায় পড়েন।......'

ঠিক এই খবরগুলোই শোনানো হয়, আরতি-সুব্রতর সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি, এই সব খবর নিয়ে একবারও একটিও মন্তব্য করে না আরতি-সুব্রত। কিম্বা সুব্রতর বাবা। এতেই প্রমাণ হয়ে যায়, ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সব কথাকেই মিথ্যে প্রতিশ্রুতি বলে ওরা জেনে গেছে। আর সেটাই স্বাভাবিক। আজকের দিনে এই খবর যখন আমরা 'মহানগর'-এ শুনি, তখন হাসিই পেয়ে যায় আমাদের। বিশেষ করে উদ্ধৃত সংবাদের প্রথম বাক্যটা শুনলে। খবরে সুব্রতর অনীহার কারণ বাড়িতেই সশরীরে বিরাজমান। তিনি হলেন সুব্রতর বাবা। সব সম্মান বিসর্জন দিয়ে তিনি পাবনা থেকে চলে এসেছেন। হাজার প্রতিশ্রুতি দিয়েও, সুব্রতর বাবার মতো উদ্বাস্তু মানুষের জন্যে কিছুই করেনি রাজনৈতিক নেতারা। তাই রেডিওর খবরে একবারও কান দেয় না সুব্রত। রাজনৈতিক নেতাদের বাণীর প্রতি সুব্রতর অবজ্ঞা বোঝানোর জন্য, শুধুই অফস্ক্রিন সাউন্ডের সাহায্য নিয়েছেন সত্যজিৎ। নতুন কোনও ঘটনার অবতারণা করতে হয়নি তাঁকে।

'চারুলতা'য় ভূপতি যখন চারুর কাঁধে হাত দিয়ে লেখার ঘর থেকে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই নাদস্বরে মার্গ সংগীত ভেসে আসছিল পাড়ার অন্য বাড়ি থেকে। কিন্তু 'মহানগর'-এর রেডিওর খবরের মতো এত স্পষ্ট ছিল না এই গান। স্পষ্টতার এই তফাৎ দিয়েই টের পাওয়া যায়, ভূপতির পাড়ায় বাড়িগুলো নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ 'মহানগর'-এর বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি। সুতরাং শুধু অফস্ক্রিন সাউন্ড যথেষ্ট ছিল দুই পাড়ারই অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝাতে। তার জন্যে গোটা পাড়ার লং শট দেখাতে হয়নি।

'চারুলতা'য় ভূপতির অট্টালিকা যে কত বড়, সেটা বোঝানোর জন্যও অফস্ক্রিন গান শোনানো হয়েছিল। ভূপতির বৈঠকখানায় তাঁর বন্ধু নিশিকান্ত তানপুরা নিয়ে ঘোর গম্ভীর গলায় গাইছেন—'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর......' আর ঠিক তখনই বাড়ির

দুই আলাদা অংশে ঘটছে দুটো অন্য ঘটনা। অফিস ঘরে সিন্দুক খুলে টাকা সরাচ্ছে উমাপদ। আর দোতলায় শোবার ঘরে গল্প করছে অমল আর চারু। সেই গান ভেসে আসছে বাড়ির এই দুটো আলাদা অংশে। সিন্দুকের কাছে গানটা বেশ জোরালো। কিন্তু দোতলায়, অমল আর চারুর ঘর থেকে, গানটা শোনা যাচ্ছে তুলনায় অনেক চাপা-স্বরে। এই সিকোয়েন্সে পর পর দেখানো হয় উমাপদর লুন্ঠন, আর, অমল চারুর কথোপকথন। কিন্তু অফস্ক্রিন সাউন্ডে গানের তীব্রতার তফাৎ থেকেই আমরা বুঝে ফেলি, চারুর ঘর থেকে চুরির জায়গার দূরত্ব অনেক। সুতরাং, তহবিল ভাঙার মধ্যে হঠাৎ যে অমল গিয়ে হাজির হবে, এমন সম্ভাবনা নেই। তছরূপ হচ্ছে একরকম বাধাহীন-ভাবেই। শুধুই অফস্ক্রিন শব্দকে অবলম্বন করা হয়েছে চারুর ঘর আর সিন্দুকের ঘরের দূরত্ব বোঝানোর জন্যে। শূন্য বারান্দার লং শট দেখিয়ে বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়নি এই দুটো ঘরের মধ্যে দূরত্ব কত বেশী।

এইভাবে, দূর থেকে ভেসে আসা গানের সাহায্য নিয়ে 'আর্কিটেকচারাল স্পেস্'কে অভিব্যক্ত করা সত্যজিতের এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। তোপ্‌সের লেখাতেও বারবার ফিরে এসেছে এ রকম অফস্ক্রিন গানের কথা। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবি তৈরির সময় লেখা 'গ্যাংটকে গন্ডগোল' উপন্যাস থেকে ছোট্ট এক অংশ পড়া যাক ঃ

....দোতলায় উঠে দেখি সামনে একটা ঘর রয়েছে, তার দরজা বন্ধ। এটাতেই কি সেই হাই পজিসনের লামা থাকেন নাকি? বাঁ-দিকে খোলা ছাত, এখানে ওখানে নিশান ঝুলছে। একতলা থেকে নাচের বাজনার শব্দ আসছে—ভোঁ ভোঁ ভোঁ ঝ্যাং ঝ্যাং। এদের নাচ নাকি একবার শুরু হলে সাত আট ঘন্টার আগে থামে না।....

(গ্যাংটকে গন্ডগোল।। পরিচ্ছেদ ছয়)

তোপসে এখন তিব্বতী মঠের ছাদে। কিন্তু ভিসুয়ালে আছে শুধুই ছাদের বর্ণনা। অফ্‌স্ক্রিন সাউন্ডে আমরা বুঝতে পারি, মঠের অঙ্গনে কী ঘটছে এই মুহূর্তে! অফ্‌স্ক্রিন সাউন্ড এখানে সবচেয়ে বড় যে ভূমিকা পালন করল, তা হচ্ছে, ছাদ থেকে অঙ্গনের দুরত্ব পাঠকের অনুভবের মধ্যে নিয়ে আসা।

এইভাবেই, সত্যজিতের শিল্পে ভেসে আসা শব্দ আসলে আর্কিটেক্‌চারাল স্পেসেরই বাহন।

৪) হৃৎস্পন্দনের শব্দ

এতক্ষণ আমরা যে সব শব্দ নিয়ে আলোচনা করলাম, সেগুলো বড়ই বাস্তব ঘেঁষা। সত্যজিৎ কিন্তু মাঝে মাঝেই আরো অন্তর্মুখী হয়ে ওঠেন শব্দের প্রয়োগে। যেমন, হৃদয়ের শব্দকে অবলম্বন করা। তাঁর ছবিতে আমরা অনেক সময়েই হার্টবিট শুনতে পাই। অবশ্য, সোজাসুজি হার্টবিট্ রেকর্ড করে শোনানোর পক্ষে তাঁর শিল্পীমনে সাংকেতিকতা অনেক বেশি। তাই তিনি হার্টবিটেরই সমতুল্য কোনও শব্দ খুঁজে নেন বাস্তব জগৎ থেকে। কখন কী ভাবে সত্যজিৎ এটা করেন— তার ব্যাখ্যা পেয়ে যাই তোপ্‌সের লেখায় ঃ

'......কোথ্‌থেকে যেন একটা ঢোলকের শব্দ আসছে, ঘরের দেয়ালে ঘড়ি টিক্ টিক্ করছে নাকে রান্নার গন্ধ এসে ঢুকছে, আমরা চুপচাপ বসেই আছি ত বসেই আছি।

(গোলাপী মুক্তা রহস্য।। পরিচ্ছেদ সাত)

.....লম্বা বারান্দাটা এখন খালি। মন্দারবাবু উঠে গেছেন। দূরে একজন মেমসাহেব বসেছিলেন, তিনিও উঠে গেছেন। একটা ঢোলকের আওয়াজ ভেসে আসছে, এবার তার সঙ্গে একটা গান শুরু হল। ....পশ্চিম দিকের ছাতটায় গিয়ে দেখি যোধপুরের কেল্লাটা দারুণ দেখাচ্ছে সেখান থেকে। নীচে ভিখিরির গান হয়ে চলেছে।.....'

(সোনার কেল্লা।। পরিচ্ছেদ সাত)

.....রাত্রে বিছানায় শুয়ে এইসব রহস্যের কথাই ভাবছিলাম। ফেলুদা একটা নীল খাতায় কী যেন সব লিখল। তারপর সাড়ে দশটায় শুয়ে পড়ল, আর শোবার কিচুক্ষণ পরেই জোরে জোরে নিশ্বাস। বুঝলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

দূর থেকে রামলীলার ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে। একবার একটা জানোয়ারের ডাক শুনলাম—হয়ত শেয়াল কিংবা কুকুর, হঠাৎ কেন জানি হাইনার হাসি বলে মনে হয়েছিল।

(বাদশাহী আংটি।। পরিচ্ছেদ পাঁচ)

কোন শব্দ ওপরের তিনটি উদ্ধৃতিতেই আছে?

ঢোলকের শব্দ।

ফেলুদার যে তিনটি উপন্যাস থেকে এই সব দৃষ্টান্ত বেছে নেওয়া হয়েছে, সেই তিন উপন্যাস লেখা তেইশ বছরের সময়সীমায়। 'গোলাপী মুক্তা রহস্য' লেখা এ বছর ১৯৮১ সালে। আর, 'বাদশাহী আংটি' ১৯৬৬ সালে। মাঝখানে তেইশ বছর পার। তবু আজও ঢোলকের শব্দ একই ভাবে বেজে চলেছে তোপ্সের লেখায়। আর সেই ঢোলকের শব্দ সব সময়ই ভেসে আসে দূর থেকে। আমরা যদি এই তিনটি সিচুয়েশনকে মূল উপন্যাস থেকে আবার পড়ে দেখি, তাহলে এই তিনের মধ্যে আশ্চর্য মিল খুঁজে পাব। তিনবারই ঢোলক বেজেছে রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে।

'গোলাপী মুক্তা রহস্য' উপন্যাসে ফেলু-তপসে-জটায়ু তাদের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী মগনলাল মেঘরাজের বসার ঘরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল, তখনই দূর থেকে ভেসে আসছিল ঢোলকের শব্দ। তোপ্সের কাছে মগনলাল মানেই বিপদ। জটায়ুর কাছে মগনলাল মানেই অপমান। মগনলালের ঘরে বসে থাকা মানে প্রাণ হাতে নিয়ে বসে থাকা। ঠিক এই সময় যদি দূর থেকে ঢোলকের শব্দ শোনা যায়-তাহলে মেনেই নিতে হবে—ঢোলকের শব্দ তোপ্সের কাছে রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের দ্যোতনা। ঢোলকের শব্দ প্রতীক্ষমান চরিত্রের মনে রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের সাস্পেন্স বাড়িয়ে তোলে।

অন্য দুটি দৃষ্টান্তেও দুই রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের বর্ণনা। 'সোনার কেল্লা'র এই দৃষ্টান্তে ঢোলকের শব্দ শুনতে শুনতেই ছাদ থেকে তোপ্সে দেখল, বিরাট লাল পাগড়ী পরা একটা লোক বাড়ির পেছনের বাগান দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে ফেলুদার ঘরের দিকে। তার হাতে একটা চক্‌চকে কী যেন ধরা আছে। আর তৃতীয় উদাহরণে ঐ ঢোলকের শব্দ শোনার পরেই জানলা দিয়ে একটা লোক ক্লোরোফর্ম ঢুকিয়ে দিয়েছিল তোপ্সেদের ঘরে। সুতরাং, দেখতেই পাচ্ছি, তিনবারই যখনই ঢোলক বেজেছে, তার পরই ঘটেছে একটা মারাত্মক ঘটনা। প্রত্যাশিত কোনও অমঙ্গলকর ঘটনার আগে ঢোলকের শব্দ ভেসে এসেছে দূর থেকে। তেইশ বছর ধরেই শব্দটা যেন তোপ্সেকে পেয়ে বসেছে। সুতরাং, পরিচালক সত্যজিৎও যে এই শব্দ একই প্রসঙ্গে প্রায়োগ করবেন,

এটাই স্বাভাবিক। এবং ঘটেছেও তাই। একই জাতীয় সিচুয়েশনে তিনিও শুনিয়েছেন দূর থেকে আসা ঢাকের শব্দ।

তাঁর সমস্ত ছবি মিলিয়ে সবচেয়ে রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত কোন্‌টি ? সেই দৃশ্যেও কি দূর থেকে ঢোলক বেজেছিল?

একদিন অফিস থেকে ফিরে ছাদের ঘরে উঠে অপু দেখল, তার ছোট শ্যালক একলা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের সামনে । মুখে হাসি নেই। ওকে দেখেই এক পলকে অপু বুঝে নিয়েছিল। সে কোনও দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই সংবাদ কত নিদারুণ, অপু তখনও অনুমান করতে পারেনি। কয়েক মুহূর্ত অপু রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল, সেই সংবাদ আঁচ করার জন্য। চূড়ান্ত খবরটা ছোট শ্যালকের মুখে উচ্চারিত হবার আগে যে কয়েক মুহূর্তের নিঃস্তব্ধতা-সেই রুদ্ধশ্বাস সময়কে ভরিয়ে রেখেছিল দূর-থেকে-ভেসে-আসা মৃদু ঢাকের শব্দ।

এই ঢাকের আওয়াজ অবশ্য শুধু প্রতীকী নয়। কারণ, অপর্ণার চিঠিতে স্পষ্টই বলা হয়েছিল দুর্গা পুজো আসছে। কলকাতায় আরো একবার ঢাক বেজে ওঠে পুজোর সপ্তাহ দু-এক আগে—বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। সুতরাং, এই দৃশ্যে যে ঢাকের শব্দ সত্যজিৎ শুনিয়েছেন, তা আর্টের দাবিতে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নয়। কলকাতার শরৎকালীন জীবন থেকে অতি স্বাভাবিক এক শব্দকেই বেছে নিয়েছেন তিনি। শুধু ছবির সেই মুহূর্তে অন্যান্য সব আওয়াজ বর্জন করেছেন। দৃশ্যটিতে শব্দগত অবাস্তবতা শুধু এইটুকুই। রেল লাইনের পাশে থাকা সত্ত্বেও আমরা ট্রেনের হুইস্‌ল শুনি না সেই মুহূর্তে। ঢাকের শব্দ একলা বেজেছিল। রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে, অগণিত পরিচিত শব্দের কোলাহল থেকে শুধু ঢাকের শব্দকে এইভাবে ছেঁকে আলাদা করে নেওয়া পরিচালক সত্যজিতের একান্ত নিজস্ব অভিভাবনাকে চিনিয়ে দেয়। এই কৌশলই আজও রয়ে গেছে তোপ্‌সের কলমে।

'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে বিকাশ সিংহকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা ফেলুদা যখন বসিয়ে রেখেছে কাশীর নির্জন মানমন্দিরে — তখনও দূর থেকে ভেসে আসছিল ঢাকের শব্দ। ছবির এই দৃশ্যেই বিকাশের স্বীকারোক্তি। কি করে শশী পাল খুন হল, সে কথা এই দৃশ্যেই বলবে অপরাধীর সহায়ক বিকাশ সিংহ। যেহেতু স্বীকারোক্তি দৃশ্য, তাই এই সিচুয়েশানে একটা দমবন্ধ প্রতীক্ষা ছিল গোয়েন্দার দিক থেকে। গোয়েন্দার মনের এই নিরুদ্ধ অবস্থা দারুণ প্রকাশিত হয়েছিল দূর থেকে ভেসে আসা ঐ ঢাকের বোলে। 'অপুর সংসার'-এর মতোই, এই শব্দটাও কিন্তু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নয়। কারণ, সেদিন ছিল দুর্গাপুজোর সপ্তমী। দু' একটা দুর্গাপুজো হয় কাশীর মানমন্দিরের কাছেই। সেখানে সকাল দশটায় ঢাক বাজবে, আর সেই ঢাকের শব্দ দূর থেকে ভেসে আসবে মানমন্দির পর্যন্ত। সুতরাং, আবার আমরা দেখছি, বাস্তব পরিবেশ থেকে একটি মাত্র শব্দকে সত্যজিৎ ছেঁকে নিয়েছেন চরিত্রের মানসিক অবস্থা প্রকশের জন্যে। 'অপুর সংসার' তৈরীর ঠিক কুড়ি বছর পর 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবির সাউন্ড চ্যানেলিং হয়েছিল —১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে। এতদিন পরেও, তিনি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের জন্য ঢাকের শব্দই বেছে নিয়েছিলেন।

কিন্তু সত্যজিতের ছবিতে হৃৎস্পন্দনের সমতুল্য বাস্তব শব্দ মানে কি শুধুই

ঢোলকের শব্দ।

না, এমন শব্দ আরো আছে। ঘড়ির শব্দকেও তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেন মাঝে মাঝে। কখন? চরিত্রের মন যখন মৃত্যুচিন্তায় ডুবে যাচ্ছে, তখন তার মুখের কথা আপনিই বন্ধ হয়ে আসে। সেই মুহূর্তের নিস্তব্ধতায়, মৃত্যুচিন্তা-উদ্ভূত হৃৎস্পন্দনের গতিবৃদ্ধিকেই যেন এক্স্‌টার্নালাইজ করে ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ। যেমন, 'লন্ডনে ফেলুদা' উপন্যাসে যে মুহূর্তে উন্মোচিত হচ্ছে পিটার ডেক্স্‌টারের মৃত্যুরহস্য—ঠিক তখনই আমরা শুনতে পাই ঃ

'....হুকিন্‌স্ চুপ। ঘরে একটা টেবিল ক্লকের টিক টিক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

ফেলুদা বলল, 'আমার ধারণা তুমি একটা কিছু লুকোচ্ছ। সেটা কী দয়া করে বলবে?...'

(লন্ডনে ফেলুদা।। পরিচ্ছেদ নয়)

যেই হুকিন্‌স্ চুপ করে ভাবতে শুরু করল চল্লিশ বছর আগে কেমব্রিজের ক্যাম্ নদীতে দেখা এক মৃত্যুর দৃশ্য—তখনই তার হার্টবিট বেড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। এই হার্টবিট্‌কেই প্রকাশ করেছে টেবিল ক্লকের টিক্ টিক্। ঘড়ির এ রকমই ব্যবহার পাই 'লন্ডনে ফেলুদা' লেখার ত্রিশ বছর আগে তৈরি ছবি 'অপুর সংসার'-এ। অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অপু শয্যা নিয়েছে। পাশেই পড়ে আছে দু'দিনের অভুক্ত খাবার । সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে, অপু এসে দাঁড়ায় আয়নার সামনে। যেন অপুর মনে হয়, অপর্ণা নেই বলে তার নিজের বেঁচে থাকাও মূল্যহীন। ফলে, আত্মহত্যার চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। আর, ঠিক তখনই, সাউন্ডট্র্যাকে আমরা স্পষ্ট শুনতে পাই—অপুর অ্যালার্ম ক্লকের টিক্ টিক্ শব্দ। থম্‌থমে ঘরের হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। আসলে মৃত্যুচিন্তা এসে চাপা উত্তেজনা সঞ্চার করেছিল অপুর মনে। ফলে তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল। সেই ত্বরান্বিত হৃৎস্পন্দনই আমরা টের পেয়েছি ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দে।

'অপুর সংসার'-এ ঘড়ির যে কাজ, 'অশনি সংকেত'-এ সেই একই কাজ করেছে ঢেঁকি। দৃশ্যটা এই রকম ঃ বিরাট বটগাছের আঁকাবাঁকা শেকড়ে বসে আছে গঙ্গাচরণ। তার মাথা এখন নুয়ে আসছে অপমানে। আজই সকালে এক গ্রাম্য পেয়াদা গঙ্গাচরণের কাঁধে ধাক্কা দিয়ে তাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। এখানেই শেষ নয়। চালের দামও আজ কুড়ি টাকা মন। অথচ এই ক'দিন আগেই ছিল চার টাকা। সুতরাং, শুধুই সম্মানহানি নয়, অন্নাভাবে মৃত্যুর সম্ভাবনাও মনে মনে এই প্রথম টের পাচ্ছে গঙ্গাচরণ। এই দ্বিমুখী চাপে এখন তার রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। ঠিক এই সময় আমরা শুনি, ফাঁকা মাঠ আর মেঘলা আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানার শব্দ—ঢিব্ ঢিং ....ঢিব্ ঢিং.....ঢিব্ ঢিং.....। আর কোনো শব্দ নেই। পাতার মর্মর স্তব্ধ। একটি পাখিও ডাকছে না কোথাও। শুধু ঢেঁকির শব্দে যেন গঙ্গাচরণেরই হৃৎস্পন্দন ভেসে বেড়াচ্ছে গ্রামের হাওয়ায়।

কিন্তু ঢাক যখন বাইরে থেকে শোনা যায় না, তখন কী হয়? তখন চরিত্রের বুকের মধ্যেই আপনা-আপনি বেজে ওঠে এই শব্দ ঃ

'....আমি এক দৌড়ে বসবার ঘরে গিয়ে ফোনটা তুলে নিলাম।

'হ্যালো!'

কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলল না, যদিও বেশ বুঝতে পারছিলাম ফোনটা কেউ ধরে আছে। আমার বুকের ভেতরটা টিপ টিপ করতে শুরু করল।....' (শেয়াল দেবতা রহস্য)

.....আমার বুকে আবার ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

মন বলছে, হয়ত শেষ পর্যন্ত সিমলাটা যেতেই হবে।....'

(বাক্স-রহস্য।। পরিচ্ছেদ চার)

এইভাবে বুকের মধ্যে বেজে ওঠা ঘোড় দৌড়ের শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছিল 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তেও। মনে করুন সেই দৃশ্য, যেখানে চে গুয়েভারার মতো জ্বলে উঠতে চাইছে সিদ্ধার্থ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ—তার জ্বলন্ত চোখ আর ঘর্মাক্ত মুখের প্রতিফলন আয়নায়। হঠাৎ একটি ছোট মিক্সের মাধ্যমে দেখানো হয়, তার গালে দাড়ি গজিয়ে উঠেছে—ঠিক চে গুয়েভারার মতো দাড়ি। যে কয়েক মুহূর্তের জন্য সিদ্ধার্থ চেগুয়েভারার মতো ক্রোধী হয়ে উঠতে চেয়েছিল—সাউণ্ডট্র্যাকে ঠিক সেই কয়েক সেকেন্ড আমরা শুনতে পাই তীক্ষ্ণ ড্রাম বাজার শব্দ। 'শেয়াল দেবতা রহস্য', 'বাক্সরহস্য' আর 'প্রতিদ্বন্দ্বী'— এই তিন দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা গেল, শুধু বাস্তব ঢাকের শব্দ নয়— সাবজেক্টিভ তালবাদ্যও ব্যবহার করেন সত্যজিৎ। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির শুটিং-এর সময় লেখা ছোট গল্প 'শেয়াল দেবতা রহস্য'র বিষয় 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র আমুল বিপরীত। একটি রাজনৈতিক ছবি, অন্যটি ছোটদের রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার। এই তুমুল বৈপরীত্য সত্ত্বেও, সাবজেকটিভ্ তালবাদ্যের প্রয়োগ দুই শিল্পকর্মে আশ্চর্যভাবেই এক।

আসলে রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে সত্যজিতের চরিত্ররা মৌনী হয়ে যায়। তখন তার বাইরের অ্যাকশানও কমে আসে। অথচ তখন আকুল উদ্বেগে চরিত্রের নিজের হার্টবিট বেড়ে গেছে। তার মুখে এখন কথা নেই, তাই নিজের হার্টবিট্‌টাই যেন সে অনুভব করতে পারে আরো স্পষ্ট । তালবাদ্যের একটা ভাবগত সম্পর্ক আছে হার্টবিটের সঙ্গে। এই কারণেই, তালবাদ্যর যে কোনো বিট্ অসচেতন ভাবে হার্ট বিটের কথাই মনে করিয়ে দেয় আমাদের। ঢাক কিংবা ঢোলকের বিট্‌ও আসলে চরিত্রের হার্ট বিটের কথাই বলে। তাই সত্যজিৎও চরিত্রের হার্ট বিটের ব্যঞ্জনা রূপেই বার বার ঢোলক, ঢাক কিংবা ড্রাম নিয়ে আসেন রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে।

কখনো সত্যজিৎ ড্রামের সাহায্য নিয়ে প্রায় সত্যিকারের হার্টবিট্‌ও শুনিয়েছেন। যেমন 'মহানগর'-এ। তখন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আরতি সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। রেজিগ্‌নেশান লেটার দেবার মুহূর্তে, আবেগের বশে সে ভরেও দেখেনি, এবার কী হবে তার পরিবারের। এমন কি সিঁড়ি দিয়ে যখন সে দ্রুত পায়ে নেমে আসছে, তখনো তার মনে আসেনি এই বিপদের কথা। কেননা, তার মন তখনো আবেগমথিত। আবহে তখন অর্গ্যান-বেহালা মেশানো ভারি সুর। সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা নামার পর, হঠাৎই আরতির যেন মনে পড়ে যায়, আসন্ন বিপদের কথা। সঙ্গে সঙ্গে আবেগঘন ভারী আবহসংগীত ফেড আউট করে যায় সাউন্ড ট্র্যাক থেকে। তার বদলে, শুধুই একটা তালবাদ্য একলা বাজতে থাকে, মানুষের হৃৎস্পন্দনের তালে তালে ঃ ঢুপ্-ধুপ্। ঢুপ্-

ধুপ্। টুপ্-ধুপ্...শুনলেই মনে হয় হার্টের ধুক্-পুক্। বাস্তব-জীবনের ভয়টা আরতির মনে যত বেশী ফিরে আসতে থাকে, ততোই কমে আসতে থাকে সিঁড়ি দিয়ে তার নামার গতি। আর একই সঙ্গে কমে আসতে থাকে আবহে তালবাদ্যের লয়ও। এখন অনেক টেনে টেনে বাজছে ঃ টুপ্—ধুপ্। টুপ্—ধুপ্। টুপ্। একেবারে শেষের বিট্‌টা আর বাজেনি। ফলে, হৃৎস্পন্দনের ধুক্-পুক্ যেন সম্পূর্ণ হল না। শেষ পদে শুধু 'ধুক্'টা বেজেই আবহসংগীত ফুরিয়ে গেল। শুনলে মনে হয়, যেন কোনো মানুষের হৃৎস্পন্দন থেমে গেল হঠাৎ ভয়ে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, ভিসুয়ালে দেখা গেল, সিঁড়ির মধ্যেই আরতি সিঁটিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'মহানগর' থেকে নেওয়া এই দৃষ্টান্ত সত্যজিতের শিল্পকর্মে তালবাদ্য-ব্যবহারের চিরাচরিত প্রথাকে আবার প্রমাণ করে। সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে বাস্তব পৃথিবীতে পা রাখার আগে, এক রুদ্ধশ্বাস অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল আরতির মনে । তাই আবহসংগীতে এই তালবাদ্য। তাই আবহসংগীতে হার্টবিটের অনুকৃতি।

ঠিক এই কারণেই, 'অশনি সংকেত'-এর রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তেও আবাহসংগীতে ঢাক বাজনো হয়েছে। গঙ্গাচরণের কাছে সবচেয়ে রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত কী ? যখন সে রোদ মাথায় করে চাল আনতে চলেছে সাত ক্রোশ পথ হেঁটে। চাল পাবে কি না ঠিক নেই। কারণ, দুর্ভিক্ষ দোরগোড়ায়। এই সময় ঘরের চাল বিক্রি করতে সত্যিই কেউ রাজি হবে কিনা, গঙ্গাচরণের পক্ষে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ, যদি চালের সংস্থান না হয় — তাহলে অনাহারে শুরু হয়ে যাবে তার নিজের ঘরেই। তাই সকাল থেকেই গঙ্গাচরণের রুদ্ধশ্বাস দিন। সেই কারণে, চাল আনতে যাবার দৃশ্যে যে আবহসংগীত — তাতে বাঁশির চেয়ে অনেক বেশী জোরালো ভাবে শোনা গেছে ঢাকের আওয়াজ। তবে ঢাকের এই শব্দ 'অপুর সংসার' বা 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর মত পরিবেশ নেওয়া বাস্তব ঢাকের শব্দ নয়। এই ঢাকের শব্দ সাবজেক্টিভ। গঙ্গাচরণের বুকের মধ্যে উৎকণ্ঠার যে ঢাক বেজে উঠেছে, আবহসংগীতের মাধ্যমে তাকেই এক্স্টার্নালাইজ করা। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে নিজেকে চে গুয়েভারা মনে করার সময় সিদ্ধার্থর বুকের মধ্যে ঠিক যেভাবে ড্রাম বেজে উঠেছিল।

সত্যজিতের ছবিতে হার্টবিটের এই আধিক্য প্রমাণ করে তাঁর শিল্পে অনেক নিস্তব্ধ মুহূর্তে আছে। তাই কান পেতে শোনার অবকাশ আছে তাঁর। নইলে কি আর হার্টবিটের শব্দ তিনি এত বার শুনতে পেতেন? না, আমাদেরই শোনাতে পারতেন?

৫) শব্দের দৈব-যোগাযোগ

এতক্ষণ বারবার প্রমাণিত হয়েছে — সত্যজিতীয় শব্দের জগৎ বাস্তবতার অনুকৃতি নয়। আমূল পরিকল্পিত এই জগৎ। বাস্তব জগতে শব্দের যে অবিন্যস্ত প্রকৃতি — সত্যজিতের শব্দে সেই বিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ অবিদ্যমান। কাহিনী-শিল্পে পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রকাশ কিসে ? তা হল, কো-ইন্সিডেনসের মধ্যে। সুতরাং, সত্যজিতীয় শব্দের জগতেও যে দৈব যোগাযোগ নিয়ত ঘটবে — এটাই স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ ঃ—

'.... চৌধুরীর রিভলবারের গুলি তাকে হাত দু-একের জন্য মিস করে দরজার বাঁ দিকের একটা দাঁড়ানো ঘড়ির কাঁচের ডায়াল খান খান করে দিল আর সবাইকে

অবাক করে সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সেই জখম ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি। ...

(গোরস্থানে সাবধান ।। পরিচ্ছেদ বারো)

এই দৃষ্টান্তে শব্দ কোন্ ভূমিকা পালন করেছে দেখা যাক। রিভলবারের গুলি যে কোনও কাহিনীতেই একটি ক্লাইম্যাক্স। তাই, তোপসে রিভলবারের শব্দকে একলা শোনেনি। পরমুহূর্তেই আর একটি শব্দ শুনিয়ে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে নেয়া হয়েছে রিভলবারের শব্দকে। লিখতে গিয়ে ঠিক যে ভাবে আমরা আন্ডারলাইন করি জরুরী কোনও কথার নিচে। এখানে আন্ডারলাইনের কাজ করেছে হঠাৎ-বেজে-ওঠা ঘড়ির শব্দ। ঐ ঘড়ির আওয়াজই বলে দিয়েছে রিভলবারের গুলি এই উপন্যাসের জরুরী নির্বন্ধ। শব্দের দৈব যোগাযোগের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত এই ঘটনা।

'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী'তে পিস্তলকে আন্ডারলাইন করা হয়েছিল ঠিক এমনই এক শব্দ দিয়ে। দৃশ্যটি এই রকম ঃ জনশূন্য প্রান্তরে বসে খেলছে দুই দাবাড়ু— মির্জ্জা সাজ্জাদ আর মীর রৌশন। খেলতে খেলতেই হঠাৎ তুমুল তর্কাতর্কি দুজনের মধ্যে। তর্কের ফাঁকে মীর রৌশন পাশে রাখা পিস্তলটা আচমকা নিজের হাতে তুলে নেয়। নলটা ঘুরিয়ে দেয় তার বন্ধু সাজ্জাদের দিকে। তার ঠিক সেই মুহূর্তে তীব্র স্বরে একটা কাঠঠোকরা ডেকে ওঠে। যাকে বলে 'কাঁটায় কাঁটায়'। এ যেন কাঠঠোকরার ডাকের সাহায্যে মীরের পিস্তল তুলে ধরার অ্যাকশানকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা। এখানেই শেষ নয়, আরও আছে।

দুই বন্ধুর মধ্যে তর্কাতর্কি চলতে চলতে, মীর রৌশনের হাত ফসকে হঠাৎ গুলি বেরিয়ে যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে মিশে গিয়ে, ইংরেজ সৈন্যদলের কুচকাওয়াজের ড্রামের বাজনা ফেড ইন্ করে। এবং সেই ড্রামবিট বেজেই চলে। এইভাবে পিস্তলের শব্দকে আন্ডারলাইন করা হয় ড্রামবিটের সাহায্যে।

'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী'তে ড্রামবিটের এই প্রয়োগ আমাদের মনে করিয়ে দেয় 'গোরস্থানে সাবধান' উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্সে বেজে-ওঠা ঘড়ির শব্দকে। 'গোরস্থান'-এ শব্দের প্যাটার্ন ছিল এ রকম ঃ

- ★ মহাদেব চৌধুরীর রিভলবারের শব্দ,
- ★ তৎক্ষণাৎ কাঁচ ভেঙে পড়ার ঝন্ঝন্ আওয়াজ,
- ★ সেই মুহূর্তে ঘড়ির বাজনা।
- ★ আর 'শতরঞ্জ'-এ শব্দের প্যাটার্ন ঃ
- ★ মীর রৌশনের পিস্তলের শব্দ,
- ★ তৎক্ষণাৎ ইংরেজ সৈন্যদলের ড্রামবিট,
- ★ তারপর কুচকাওয়াজের ট্রামপেট।

উপন্যাস ও সিনেমার এই সমকেন্দ্রিক দুটি উদাহরণ থেকেই অনুমান করা শক্ত নয়, জরুরী ঘটনাকে স্বতন্ত্র একটি শব্দ দিয়ে আন্ডারলাইন করা সত্যজিতের বিশেষ প্রবণতা। এবং শব্দের এ রকম একটি প্যাটার্ন আবিষ্কার করলেই, বার বার তা প্রয়োগ করেন সত্যজিৎ। যেমন 'গোরস্থানে সাবধান' উপন্যাসটি তিনি লিখেছিলেন 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী'র এডিটিং এবং রি-রেকর্ডিং করার মাস খানেকের মধ্যেই। সুতরাং 'শতরঞ্জ'-এ পিস্তল-ফায়ারিংকে কুচকাওয়াজের ড্রামবিট দিয়ে আন্ডারলাইন করার কৌশল তখনও

জীবন্ত ছিল তাঁর মনে। তাই, 'গোরস্থানে সাবধান' লিখতে গিয়েও, তিনি একইভাবে আন্ডারলাইন করলেন রিভলবারের শব্দকে। লক্ষ্ণৌ শহরের বাইরে ফাঁকা মাঠে রিভলভারের শব্দ শোনানোর যে কৌশল প্রায় সেই একই পদ্ধতি তিনি আমদানী করলেন কলকাতার ধনী গৃহের অন্দরমহলে। শব্দের প্যাটার্ন সেই একই। সেখানে ছিল পিস্তলের পরই ড্রামের বাজনা, আর এখানে পিস্তলের পরই ঘড়ির বাজনা।

এই ভাবে কোনও বিশেষ ঘটনাকে তাৎক্ষণিক শব্দ দিয়ে আন্ডারলাইন করা যেন সত্যজিৎ রায়ের অব্‌সেশান। যেন কিছুতেই তিনি ভুলতে পারেন না তাঁর শিল্পের এই সুছাঁদ অলংকার। তাই, মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যজিতের শব্দের জগৎ যেন প্রায় দৈব-যোগাযোগের জগৎ। মূল্যবান ঘটনা ঘটার সময়ে, ঠিক মুহূর্তে সঠিক শব্দ বেজে উঠে আন্ডারলাইন করে ঘটনাকে। তোপসেও ভুলতে পারে না এই প্রথা। ফেলুদার কলকাতা-নির্ভর উপন্যাস 'গোরস্থানে সাবধান' থেকেই আরো একটা উদাহরণ ঃ—

'.....বাজা-ঘড়ি বা চাইমিং ক্লক অনেক শুনেছি, কিন্তু মহাদেব চৌধুরীর বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতে ছ'টা বাজার যে সব অদ্ভুত শব্দ একটার পর একটা ঘড়ি থেকে আমাদের কানে আসতে লাগল, সেরকম ঘড়ির বাজনা আমি কোনোদিন শুনিনি। লালমোহনবাবু বললেন, 'এ যেন স্বর্গদ্বার দিয়ে ঢুকছি মশাই। মাঙ্গলিক বাজছে। এ রিসেপশন ভাবা যায় না।'......'

(গোরস্থানে সাবধান।। পরিচ্ছেদ নয়)

এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, মহাদেব চৌধুরীর বাড়িতে ফেলু-তপেশ-জটায়ুর আগমনকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন লেখক সত্যজিৎ। তাই তিনি সমবেত ঘড়ির শব্দে আন্ডারলাইন করলেন এই ঘটনাকে। ফলে, ঘটনাটি আর মামুলি হয়ে রইল না। স্মরণীয় হয়ে উঠল আমাদের কাছে।

'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী'-তে , জেনারেল উট্রাম যখন দেখা করতে আসছেন নবাব ওয়াজেদ আলি শা-র দরবারে, তখনও এভাবে তাঁর আগমনকে আন্ডারলাইন করা হয়েছিল চাইমিং ক্লকের বাজনা দিয়ে। বুক চিতিয়ে, মাপা পা ফেলে উট্রাম নবাবের দববারে ঢুকছেন—এই দৃশ্যে তাঁর বুটের শব্দটা কিন্তু একলা ছিল না। একই সঙ্গে, নেপথ্যে নিরবচ্ছিন্ন বেজে চলেছিল চাইমিং ক্লকের ঘন্টাধ্বনি।

শব্দের এমন দৈব-সন্নিবেশ ঘটানো কলকাতা-নির্ভর ছবিতে তুলনায় সোজা। কারণ, যে শহরে শব্দ বেশী, সেখানে শব্দের আকস্মিক মিলন যে বেশী ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। প্রথমে তোপসের কলম থেকে একটা ছোট্ট বর্ণনায় দেখা যাক, কলকাতায় শব্দের কাকতালীয় যোগাযোগ কেন অনেক বেশি প্রত্যাশিত ঃ

'.....পিন্টুদের বাড়ির লাউডস্পীকারে সবেমাত্র 'জনি মেরা নাম'-এর একটা গান দিয়েছে, ফেলুদা অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড কাগজটা হাতে নিয়েছে, আমি একবার রাস্তায় বেরোব কিনা ভাবছি, এমন সময় আমাদের বাইরের দরজার কড়াটা কে যেন সজোরে নেড়ে উঠল।...'

(সোনার কেল্লা।। পরিচ্ছেদ এক)

যে মুহূর্তে লাউডস্পীকারে নতুন গান বাজল, ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার কড়া সজোরে নেড়ে-ওঠা একটু অস্বাভাবিক সংযুক্তি নিশ্চয়ই। কিন্তু কলকাতায় শব্দের সংখ্যা

অনেক বেশী। তাই, কোন্ ঘটনার সঙ্গে যে কোন্ শব্দ বেজে উঠছে, বাস্তব জীবনে সেটা খেয়াল করা খুবই শক্ত। অতএব, সাহিত্যে বা সিনেমায় যদি ইচ্ছে করেই শব্দের এ জাতীয় সংশ্লেষ ঘটানো হয়—তাহলে তাকে অস্বাভাবিক বলে এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারে না কেউই। কারণ, দু-তিনটে অভাবনীয় শব্দকে পর পর জুড়ে প্যাটার্ন রচনা করেন সত্যজিৎ। এবং তাঁর ছবিতে শব্দের এই কাকতালীয় সমাবেশকে অবাস্তব বলে আজ পর্যন্ত কেউই দোষ দেয়নি। তবে তাঁর পুরো সিনেমা জুড়ে, কিংবা তাঁর লেখা বইয়ের প্রতিটি পাতায় যে শব্দের এমন অদ্ভুত সংযোগ ঘটে তা নয়। এই সংশ্লেষ ঘটে শুধু বিশেষ মূল্যবান ঘটনার সঙ্গেই। যেমন, 'সোনার কেল্লা' উপন্যাস থেকে যে উদাহরণ এক্ষুনি নেওয়া হল —সেটা ফেলুদার মক্কেল আসার মুহূর্ত। মুহূর্তটি বিশেষ মূল্যবান একজন পেশাদার গোয়েন্দার কাছে। তাই, মক্কেলের কড়া নাড়ার শব্দের সঙ্গে লাউডস্পীকারের বেজে-ওঠা নতুন গানের দৈব যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া হল— ফলে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হল এই কড়া নাড়ার শব্দ। পাঠকরা বুঝে নিল, এবারে বিশেষ কেউ এসেছে ফেলুদার কাছে।

তাঁর কলকাতা-নির্ভর ছবিতে সত্যজিৎ শব্দের এই আকস্মিক মিলন ঘটাচ্ছেন সেই 'অপুর সংসার' থেকেই। 'অপুর সংসার'-এর একটা ঘটনা মনে করি। চাকরির সন্ধান করে বাড়ি ফেরার পথে, ব্রীজ থেকে নেমে রেললাইন পেরিয়ে অপু যে মুহূর্তে নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় পা দিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে মন্দিরের ঘন্টা বেজে উঠল। ফলে, দর্শকদেরও মনে হল, সারা দিনের শেষে বাড়ি ফিরে এলেই অপুর মনটা ভালো হয়ে যায়। এমন কী চাকরির দিশা না পেলেও। মন্দিরের এই ঘন্টাধ্বনি শুরু হতে পারত অনেক আগে থেকেই। সময়টা সন্ধ্যে। সুতরাং, অপু বাড়ির কাছে পৌঁছবার অনেক আগেই যদি সাউন্ডট্র্যাকে মন্দিরের ঘন্টা বাজত, তাহলেও অস্বাভাবিক হত না, কিন্তু, সিঁড়ির মুখে অপুর পৌঁছনোর মুহূর্তটা ঘন্টা শুরুর মুহূর্ত হিসেবে বেছে নিলেন সত্যজিৎ। যাতে অপু বাড়ি ফিরে আসার মুহূর্তটি আন্ডারলাইন করা হয় মন্দিরের ঘন্টার শব্দে। বাস্তব জীবনে যে শব্দ অনেক আগে থেকেই শুরু হওয়া উচিত, সেই শব্দকে নিরবচ্ছিন্ন না বাজিয়ে, বিশেষ একটা মুহূর্ত থেকে শুরু করলেই বিশেষ গুরুত্ব পায় সেই শুরুর মুহূর্তটি। ঠিক যেভাবে, ফেলুদার কাছে মক্কেল আসার মুহূর্তেই লাউডস্পীকারে নতুন গান বেজে উঠেছিল 'সোনার কেল্লা' উপন্যাসে।

কলকাতার মতো জটিল শহরে কখন কোন্ শব্দ হবে না —এটা নিশ্চিত বলা শক্ত। এই বিরল সম্ভাবনার সুযোগ নিয়ে, শব্দ ও ঘটনার এমন আপতিক (coincidental) যোগাযোগ ঘটান সত্যজিৎ।

'মহানগর'-এ বৃদ্ধ মাস্টারমশাই যে মুহূর্তে জানতে পারলেন তাঁর পুত্রবধূ চাকরি নিয়েছে—ঠিক তক্ষুনি ঘরের লাগোয়া গলি থেকে চলন্ত গাড়ির কর্কশ আওয়াজ তাঁর নিস্তব্ধ ঘরে এসে ধাক্কা দিল। আমরা তাঁর মানসিক আঘাত টের পেয়ে গেলাম।

হঠাৎ ঝড় এসেছিল 'চারুলতা'র শেষ দৃশ্যে। চারু তখন অমলের শেষ চিঠি হাতে নিয়ে একলা ঘরে বসে আছে। ঝড়ের দাপটে জানলার একটা পাল্লা এক ঝাপটায় খুলে দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল। ফলে ঝন্ঝন্ করে কাঁচ ভেঙে পড়ল পাথরের মেঝেতে। সেই ঝন্ঝন্ শব্দ হবার মুহূর্তেই, কান্নায় ভেঙে পড়ল চারু। যেন, চারুর শেষ কান্নাকে

আন্ডারলাইন করা হল ঐ কাঁচ-ভাঙার ঝন্‌ঝন্ দিয়েই।

'সীমাবদ্ধ'র প্রথম পর্বেই, এক সন্ধ্যেবেলা পার্টিতে গেল শ্যামলেন্দু আর দোলনচাঁপা। পেছনে পড়ে রইল ওদের নির্জন ফ্ল্যাটের নির্জন ড্রইংরুম। ক্যামেরা অতি ধীরে ধীরে বাঁ দিকে প্যান করতে থাকে। ক্রমে দেখা যায়, বিশাল ড্রইংরুম খাঁ খাঁ। শুধু বড় বড় পর্দাগুলো উড়ছে আবছা আলোর মধ্যে। হঠাৎ নিচ থেকে এই আট তলায় ভেসে আসে বোমার শব্দ— এক বার নয়, দু'বার। বোঝা যায়, এই নির্জনতাকে বোমার শব্দে চিহ্নিত করে, নিদ্রালু আবছা ড্রইংরুমটার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন সত্যজিৎ। যেন বলছেন, সত্তরের কলকাতা যখন আন্দোলনে উত্তাল, তখন নিদ্রালু হয়ে আছে এই মানুষগুলো।

শীতের কলকাতার নিষুতি রাত। 'সোনার কেল্লা'র প্রথম দৃশ্যে, মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে ছবি আঁকছে মুকুল। টেব্‌ল্ ল্যাম্পের আলোয়, রঙিন প্যাস্টেল দিয়ে আঁকা ময়ূর। যে মুহূর্তে ময়ূরের পেখমের পালকে মুকুল রং দিতে শুরু করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেয়াল ঘড়িতে তিনটে বাজল—ঢং ঢং ঢং। যেন তার অঙ্কনকে আন্ডারলাইন করা হল ঘন্টাধ্বনি দিয়ে। ফলে, তার পূর্বজন্মের স্মৃতিও বিশেষভাবে চিহ্নিত হল। কারণ, মুকুলের এই অঙ্কন উঠে আসছে হয়ত পূর্বজন্মের স্মৃতি থেকেই।

এইভাবে, সঙ্গীতের সাহায্যে ছাড়াই, সত্যজিৎ বিশেষ ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখেন শুধুই শব্দকে অবলম্বন করে।

৬) দীর্ঘস্থায়ী শব্দ

চিহ্নিতকারী শব্দের যে কটা উদাহরণ এতক্ষণ এসেছে, সবই একটা বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ-বেজে-ওঠা টুকরো শব্দ। কিন্তু কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যদি অনেক সময় নিয়ে ঘটে, তাহলে হঠাৎ বেজে ওঠা বিচ্ছিন্ন এক শব্দ দিয়ে সেই দীর্ঘস্থায়ী ঘটনাকে চিহ্নিত করা যাবে কি? তখন দীর্ঘ শব্দ ব্যবহার না করে উপায় নেই। যেমন, 'সদ্‌গতি' ছবিতে। সকালবেলা দুখী চামার যখন ব্রাহ্মণ পাড়ার পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই ছবিতে পুজোর ঘন্টা বাজতে শুরু করেছিল। তারপর ব্রাহ্মণ পাড়ার পথ দিয়ে দুখীর হাঁটা, ব্রাহ্মণের দোরগোড়ায় পৌঁছনো, ব্রাহ্মণের দরজা ঠেলে ঢোকা, ব্রাহ্মণের উঠোনে বসে থাকা—এতগুলো ঘটনা জুড়ে একটানা বেজেছিল ব্রাহ্মণের পুজোর ঘন্টা। ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঢোকাই দুখীর মৃত্যুর কারণ, তাই দুখীর জীবনে এই ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ রকম ঘটনাকে বিশেষ কোনও শব্দে চিহ্নিত করা সত্যজিতের নিজস্ব স্টাইলের অঙ্গ। সুতরাং, ঘটনাটিকে তিনি আন্ডারলাইন করেছিলেন ঘন্টাধ্বনি দিয়ে।

'জন অরণ্য' ছবিতে নটবর মিত্তিরের সঙ্গে সোমনাথের ষড়যন্ত্র হয়েছিল ভজন শুনতে শুনতে। সোমনাথ কী ভাবে কেমিক্যাল সাপ্লাইয়ের অর্ডারটা কনফার্ম করবে —সেই আলোচনার দৃশ্য জুড়ে বেড়েছে ভজন—'জগদানন্দ সচ্চিদানন্দ আনন্দ হৃদয় গোপাল...।' নেপথ্যে এই ভক্তিমূলক গান দিয়ে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হয়েছে দুই দালালের ষড়যন্ত্র।

দীর্ঘস্থায়ী শব্দ বলতে অবশ্য শুধুই কোনও গান বা ঘন্টাধ্বনি নয়। প্রকৃতি থেকেও দীর্ঘস্থায়ী শব্দ খুঁজে নেন সত্যজিৎ। সত্যজিতের ছবিতে অনেক সময়ই গুরুত্বপূর্ণ অথচ

দীর্ঘস্থায়ী ঘটনাকে চিহ্নিত করার জন্যে মেঘের গুমরে-ওঠা ডাক শোনানো হয়। তাঁর অনেক ছবির ক্লাইম্যাক্সের সঙ্গে মেঘের গর্জন যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। এমন কি গল্প লিখতে গিয়েও তিনি মেঘের গর্জনকে ভুলে থাকতে পারেন না ঃ

'...বারোটার পর থেকেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হল, আর তার মেঘের গর্জন। ফেলুদা বলে গেছে আজকেই ক্লাইম্যাক্স, আর তাতে আমাদের হয়ত একটা ভূমিকা নিতে হবে। আমার কাছে সবই অন্ধকার, লালমোহনবাবুর কাছেও তাই।...'

(কৈলাসে কেলেঙ্কারি।। পরিচ্ছেদ দশ)

এই ছোট্ট উদ্ধৃতিতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্লাইম্যাক্স আর মেঘের গর্জনকে কী ভাবে সত্যজিৎ একই সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। ঠিক এই ভাবে, তাঁর ছবিতেও ক্লাইম্যাক্সকে অনেক সময়ই আন্ডারলাইন করা হয় মেঘের গর্জন দিয়ে। 'সদ্‌গতি' ছবিতে সারা রাত জেগে ব্রাহ্মণ ভেবেছিল, দোর গোড়ায় পড়ে থাকা দুখী চামারের মৃতদেহ সে সরাবে কী করে। এই সিদ্ধান্তটাই ছবির ক্লাইম্যাক্স। চামার বস্তি থেকে লোক ডেকে আনবে, না পুলিশে খবর দেবে, না নিজেই নেবে মৃতদেহ সরানোর দায়িত্ব— এটাই ছিল আসল প্রশ্ন। সারা রাত ব্রাহ্মণ এই কথাটাই ভেবেছে। এবং সেই সঙ্গে আমরা মেঘের গর্জন শুনেছি সারারাত ধরে।

এবারে আবার চলে আসি কলকাতা নির্ভর ছবির প্রসঙ্গে। 'মহানগর' ছবিতে, আরতির বস্‌ মিস্টার মুখার্জির মাথার পেছনে একটা বড় কাঁচের জানলা ছিল। কলকাতার একটা অস্থির রাজপথ দেখা যেত সেই জানলা দিয়ে। সারা ছবি জুড়েই রোদে ঝলমল করেছে জানলাটি। শুধু জানলার এই ঝলমলানি হারিয়ে গেল ক্লাইম্যাক্সের দিন। যেদিন আরতি সোজাসুজি বসের ঘরে এসে, বসের কাছে জবাবদিহি চাইল—কেন বরখাস্ত করা হয়েছে এডিথ সিমন্‌স্‌-কে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলোচনা পৌঁছে গেল তর্কাতর্কির স্তরে। আমরা বুঝলাম, আরতির চাকরি থাকবে না এই অফিসে। এদিকে, এখন তার স্বামীরও চাকরি নেই। যদি আরতিরও চাকরি যায়, তাহলে ওদের সংসারের পায়ের নিচে আর মাটি থাকবে না। অর্থাৎ বসের সঙ্গে এই তর্কই ছবির ক্লাইম্যাক্স। এবং, এই দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই, বসেব পেছনেব জানলার আলো মুছে গেছে। সেখানে ঘনিয়ে এসেছে ঘন কালো মেঘ। আমরা শুনতে পেয়েছি মেঘের গুমরে-ওঠা চাপা গর্জন।

এখানে প্রাকৃতিক শব্দে চিহ্নিত হল নাগরিক জীবনের ক্লাইম্যাক্স।

৭) একক শব্দ

সত্যজিতীয় শব্দ নিয়ে ভাবতে ভাবতে, একটা বিষয় লক্ষ্য করছি। সেটা হল, ক্রমেই শব্দের ভিড় থেকে বেরিয়ে আসছি আমরা। যেন নিজেদেরই অজান্তে। কলরবের বিশ্লেষণ থেকে আমাদের ভাবনা শুরু হয়েছিল। তারপর এগিয়ে চলতে চলতে, ঠিক আগের দুই পরিচ্ছেদে যে আলোচনা হল, তা মূলত একক শব্দেরই অভীক্ষণ।

এবার আমরা পৌঁছে যাব সিনেমার আরো নির্জন পরিবৃত্তে। এবার, সচেতনভাবে শুধু একক শব্দেরই মূল্যানুমান করা হবে। আমরা শুধু এমন মুহূর্তের কথাই স্মরণ করব, যখন অন্য সব শব্দ থেমে গেছে। শুধু একটি শব্দ প্রকাশ কবছে সমস্ত ভাবকে। মনে করুন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর সেই দৃশ্য, যেখানে গাধার পিঠ থেকে নেমে গুপী

একলা বনে ঢুকছে। সন্ধ্যেবেলার নিঝুম বন। শুধু গাছ থেকে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে বাঘার ঢোলের উপর। সারা বন চুপচাপ। অনেক শব্দের ভিড়ে জলের ফোঁটার এই শব্দ হারিয়ে যায় নি। তাই, জলের শব্দের অর্থ খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। নিজের গ্রাম থেকে নির্বাসিত হয়ে গুপীর বুকে যে কান্না জমে উঠেছিল, সেই কান্নাকে ব্যঞ্জনা দিয়েছে এই জলের ফোঁটার শব্দ।

এই উদাহরণ থেকেই বুঝতে পারছি যখনই নিস্তব্ধতার মধ্যে কোনও একক শব্দ ভেসে আসে, তখনই যেন হারিয়ে যাবার অনুভূতি হয় দর্শকদের মনে। একক শব্দ শুনে মনে হয়, কেউ যেন কোথাও হারিয়ে গেছে। কেউ যেন একলা হয়ে গেছে। যেন তার মনের কথা বোঝার মত আর কেউ তার কাছে নেই। এই ভাব প্রকাশ করাই গহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে শুনতে পাওয়া একক শব্দের মূল ভূমিকা। তোপ্‌সের লেখা থেকে একটা প্রমাণ দেওয়া যাক ঃ

'......আমরা তিনজনেই চুপ, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, এমন সময় শোনা গেল — বেশ দূর থেকে, তাও গায়ের রক্ত জল করা — বাঘের গর্জন। একবার, দুবার, তিনবার।

সুলতান ডাকছে।

কোনদিক থেকে, কতদূর থেকে, সেটা বুঝতে গেলে শিকারীর কান চাই।.....'

(ছিন্নমস্তার অভিশাপ।। পরিচ্ছেদ দুই)

'সুলতান' নামে এই বাঘটাও একলা হয়ে গিয়েছিল 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' উপন্যাসে। সে না ফিরে আসতে পারছিল সার্কাসে, না চলে যেতে পারছিল বনে। দ্বিধাগ্রস্ত মনে সুলতান একলা ঘুরে বেড়াচ্ছিল শহর হাজারিবাগের আশেপাশে। সুলতানের এই যে একলা হয়ে যাওয়া— তারই আভাস সুলতানের এই নিঃসঙ্গ গর্জনে।

'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতে সন্ধ্যার কলকাতায় সিদ্ধার্থ নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে — এটা বোঝানোর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছিল স্কুটারের আওয়াজ। সিদ্ধার্থ, সেই দৃশ্যে, দেহোপজীবীনীর কৌতুকশিঞ্জিত কক্ষ থেকে পালিয়ে একলাই হাঁটছিল অন্যমনস্কভাবে। সিদ্ধার্থর ভবিষ্যৎ তখনও অনিশ্চিত। এ ছাড়াও, সিদ্ধার্থ আদর্শবাদী, তার মন চে গুয়েভারার প্রতি আকৃষ্ট। বার্ট্রান্ড রাসেলের 'হিস্ট্রি অফ ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি'র ঠিক ওপরেই রাখা থাকে তার সার্টিফিকেটের বান্ডিল। সুতরাং, জীবনে যারা নিশ্চয়তার স্বাদ পেয়ে গেছে—সেই শিশ্নোদরপরায়ণ হবু-ডাক্তার বন্ধুদের মত মদ খেয়ে গণিকা-পল্লীতে বেড়িয়ে বিকেল কাটানো সম্ভব নয় তার পক্ষে। একথা বুঝতে পেরে মনে মনে সঙ্গ বিমুখ হয়ে গেছে সিদ্ধার্থ। বারাঙ্গনার ঘর পেছনে ফেলে, একলা ধীর পায়ে সে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে — তখন আমাদের শোনানো হয় একটি স্কুটারের শব্দ। দূর থেকে কাছে এগিয়ে এসে, শব্দটা আবার দূরেই মিলিয়ে যায়। দুটো নয়, তিনটে নয় — একটাই স্কুটার। সঙ্গে আর কোনও শব্দ নেই। সিদ্ধার্থর একাকিত্বকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করেছিল একলা-স্কুটারের এই শব্দ।

একক শব্দের নিখিলে বিশদ স্থান করে নিয়েছে একলা-পাখির ডাক। একলা-পাখির ডাকে হারিয়ে যাওয়ার যে অনুভূতি আমরা পেয়েছি তোপসের লেখায় ঃ

'....বাঁ দিকের দেয়ালে প্রায় দেড় মানুষ উঁচুতে একটা ছোট্ট জানলা, তাই দিয়ে

ধোঁয়া মেশানো একটা ফিকে আলো আসছে। বোঝা যাচ্ছে দিনের আলো এখনো ফুরোয়নি। ডাইনে আর সামনে দুটো দরজা, দুটোই বন্ধ। শব্দের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি। চীনেবা খাঁচায় পাখি রাখে এটা অনেক জায়গায় লক্ষ্য করেছি, এমন কি দোকানেও।.......' (টিনটোরেটোর যীশু।। পরিচ্ছেদ এগারো)

এই দৃশ্যে ফেলুদারা একটা ঘরে বন্দী। শহরটা হংকং। গোটা বাড়িতে কে কোথায় আছে জানা নেই, কী করে এই ঘর থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাও ভেবে বার করা অসম্ভব। এও বোধ হয় এক ধরনের হারিয়ে যাওয়া। ফেলুদারা হারিয়ে গেছে। অর্থাৎ, লোক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। এবং, আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি, এমন কী উপন্যাসের এই হারিয়ে যাওয়া দৃশ্যেও একক শব্দের ব্যবহার—'মাঝে মাঝে একটা পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি।' আর কোনও শব্দ নেই। যদি থাকত, তবে পাখির ডাকটা আর একলা হত না। তাহলে পাঠকদের এই অনুভূতি হত না যে ফেলুদারা একলা হয়ে গেছে।

এই উপন্যাসের মতোই, একক পাখির ডাক শুনিয়ে একাকিত্বের ব্যঞ্জনা এসেছে সত্যজিতের কলকাতা-নির্ভর ছবিতেও। হাতে এমব্রয়ডারি নিয়ে বারান্দায় একলা হাঁটছে চারু, হঠাৎ অফস্ক্রিনে একলা কাকের ডাক। চারু দাঁড়িয়ে যায়। তারপর 'অ্যাই, হুশ' বলে হাতের এমব্রয়ডারির ফ্রেম নেড়ে উড়িয়ে দেয় কাকটাকে। 'চারুলতা'র যে দৃশ্যে এইভাবে একলা কাক ডেকে উঠেছে — সেই দৃশ্যে চারুও ছিল সম্পূর্ণ একলা। বিশাল দোতলায় একলা।

ফেলুদার নির্জনতম গল্প 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা'। এই গল্পে নির্জন জমিদারপুরীতে একলা বাস করছে এক খুনী। আর কেউ কোথাও নেই। তখনই ফেলুদা অকুস্থলে গিয়ে হাজির। নিরুপায় খুনী একাই অভিনয় করছে কখনো খুন-হওয়া জমিদারের ভূমিকায়, কখনো তাঁর গোমস্তার ভূমিকায়, আবার কখনো তাঁর ছেলেব ভূমিকায়। বাস্তবে কিন্তু এরা কেউই নেই। জ্যোৎস্না-রাতে থমথমে জমিদারপুরী আসলে খাঁ খাঁ। শুধু খুনী একলাই মেক আপ বদল করে বার বার এসে দেখা দিচ্ছে। এই সারাংশ থেকেই বোঝা যায়, এটা ফেলুদার নির্জনতম গল্প। যাতে এই নির্জনতা নষ্ট না হয়, তাই জটায়ুও বাদ এই গল্প থেকে। অবাক হয়ে আমরা দেখি, এই নির্জনতা অনুভবক্ষম করে তোলার জন্য, এখানেও শোনানো হয়েছে একলা পাখির ডাক। সেই ডাক যেমন এই মৃত্যুপুরীতে ফেলুদাদের হারিয়ে যাওয়ার দ্যোতনা আনছে, তেমনি আবার একলা খুনীর অমোঘ নিঃসঙ্গতাও প্রকাশ করছে ঃ

'....বেড়ালটা কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে একটা হাই তুলে উলটো দিকে ফিরে হেলতে দুলতে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কিছু পরেই শুনলাম কর্কশ গলায় টিয়ার ডাক। তারপরেই আবার সব চুপচাপ।....' (ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা)

দৃশ্যে যাই থাকুক, শব্দ শুধু একটাই। একলা পাখির ডাক।

এই অংশটা পড়লে 'দেবী'র কথা মনে পড়ে যায়। নির্জন জমিদারপুরীতে, নিচের মন্দির থেকে একলাই দোতলায় উঠে এসেছে দয়াময়ী। নিঝুম নিথর দোতলা। নিঃসঙ্গ দয়াময়ী অলিন্দে হেঁটে বেড়ায়। আর, একটা কাকাতুয়া কর্কশ গলায় ডেকে ওঠে।

'দেবী' আর 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' —থিমের ব্যবধান যাই হোক, দুই শিল্পকর্মই এক একলা পাখির ডাকের প্রয়োগে।

সত্যজিতের ছবিতে নির্জনতম মৃত্যু 'অশনি সংকেত'-এর মতি মুচিনীর। মুচিপাড়ার গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে আগেই চলে গেছে শহরের দিকে। একলা পেছনে পড়ে ছিল শুধু মতি। অনাহারে পাঁচ দিন কাটিয়ে, নিঃসঙ্গ মতির মৃত্যু হয় শূন্য প্রান্তরে শুয়ে। তখন তার নিজের গ্রামের কেউ ছিল না। আবার অনঙ্গ বৌও পাশে নেই সেই মুহূর্তে। এমন নিঃসঙ্গ মৃত্যুলগ্নে, শুধুই শোনা গিয়েছিল একলা-পাখির ডাক। ঠিক মৃত্যুর মুহূর্তে — যেই মতির চোখের মণি নিথর হয়ে গেল — তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল একটা কাঠঠোকরা। যদিও গ্রামের সন্ধ্যা, তবু আর একটি পাখিও ডাকেনি সেই দৃশ্যে। সেই একলা-পাখি ছাড়া।

৮) শব্দের আঘাত

'প্রতিদ্বন্দ্বী'র একলা স্কুটার কিংবা 'চারুলতা'র একলা কাক — এ তো গেল একক শব্দের স্বাভাবিক প্রয়োগ। সত্যজিতের ছবিতে একক শব্দের অতি-নাটকীয় প্রয়োগের দৃষ্টান্তও পেয়েছি আমরা। মনে করুন 'মণিহারা'র সেই দৃশ্য। মণিমালিকার প্রেতিনী জমিদারপুরীর দিকে এগিয়ে চলেছে জ্যোৎস্নায় আপ্লুত মাঠের মধ্যে দিয়ে। তারপর লম্বা টানা বারান্দা পেরিয়ে, ফণিভূষণের ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রেতিনীর দীর্ঘ আগমনের সময়, শুধুই গয়নার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ ছিল না। সুতরাং, দর্শকদের কান অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল একঘেয়ে গয়নার শব্দে! হঠাৎ সেই অভ্যস্ততা ভেঙে খান খান করে দেয় প্রেতিনীর অট্টহাসি। ঠাণ্ডা শিহরণ খেলে যায় দর্শকদের মেরুদন্ড দিয়ে। আমরা এজাতীয় দৃষ্টান্ত পেয়েছি তোপ্‌সের লেখাতেও ঃ

'....আকাশে মেঘ বাড়ছে। গাড়ির আওয়াজ হাওয়া। হাওয়ার আওয়াজ হাওয়া। সব সাড়া, সব শব্দ শেষ। কাছের ঝিঁ ঝিঁ ঠাণ্ডা। আমার শরীর ঠাণ্ডা, গলা শুকনো। ঠোঁট চেটে ঠোঁট ভিজল না।

চী-এর পরে একগাদা ঋ-ফলা দিয়ে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল।....'

(গোরস্থানে সাবধান।। পরিচ্ছেদ এগারো)

পার্ক স্ট্রীট কবরস্থানে নিষুতি রাতে বসে আছে ফেলু-তপেশ-জটায়ু। চারিদিক নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ বলেই যে শান্তির পরিবেশ নয় — তা বোঝানোর জন্যে, নির্জনতাকে ভেঙে হঠাৎ তীব্র স্বরে শোনানো হল প্যাঁচার চিৎকার। ফলে, পরিবেশের শান্ততা এক নিমেষে ভেঙে খান খান।

আবার আমরা ফিরে আসি কলকাতা নির্ভর ছবির কথায়।

একক শব্দের এ রকম নাটকীয় প্রয়োগ পাই 'অপুর সংসার'-এও। স্ত্রী বিয়োগের পর আত্মহত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে অপু যখন রেললাইনের পাশে এসে দাঁড়াল, সেই দৃশ্যে দর্শকদের অনেকক্ষণ ধরে শোনানো হয়েছিল আগুয়ান ট্রেনের শব্দ। শুনতে শুনতে ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল দর্শকদের কান। এই দৃশ্যে এমন একটা সময় এসেছিল, যখন সচেতন ভাবে ট্রেনের অভ্যস্ত শব্দটাকে আর খেয়ালই করছিল না দর্শকরা। রেললাইনের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অপু, আর ট্রেন এসে পড়েছে প্রায় গায়ের ওপর। ঠিক এই সময়, দর্শকদের মেরুদন্ড শীতল হয়ে যায় একটা ব্যাকুল আর্তনাদে। হঠাৎ আমরা দেখি, অপু জীবন্ত দাঁড়িয়ে আছে — ট্রেনের নিচে কাটা পড়েছে একটা

শুয়োর। এই ভাবে, হঠাৎ কাটা-পড়া শুয়োরের চিৎকার 'অপুর সংসার'-এর লিরিক্যাল নিশ্চয়তা ভেঙ্গে দেয়। শুয়োরের আর্তনাদের প্রচন্ড অভিঘাতে আমরা 'অপুর সংসার'-এর কাব্যিক পরিমন্ডলের আশ্রয়চ্যুত হই। টের পাই, এবার অন্য দিকে মোড় নেবে অপুর উপাখ্যান।

প্রয়োজনে, দর্শকদের ভাবলেশহীনতা ভেঙে দিতে এই হঠাৎ বেজে-ওঠা তীব্র শব্দ মূল্যবান ভূমিকা নেয় সত্যজিতের ছবিতে।

৯) শব্দে ছবির গূঢ়মর্ম

আবার আমরা ফিরে যাব নির্জন একক শব্দের কথায়। নির্জন একক শব্দের বাঙ্ময়তম প্রয়োগ আমরা পাই 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে। বালুরঘাটে পৌঁছে, হোটেলের ঘরে ঢুকতেই সিদ্ধার্থ একটা পাখির ডাক শুনতে পেল। এই তো ছেলেবেলায় হারানো সেই পাখির ডাক। যে ডাক খুঁজে পাবার জন্যে সে অপেক্ষা করেছে অনেক বছর। পাখিটা দেখার জন্যে সিদ্ধার্থ বেরিয়ে আসে হোটেলের ছাদে। পাখির বদলে দেখতে পায়, মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন। মৃদু বিষণ্ণ স্বরে বাহকরা বলছে — রাম নাম সত্ হ্যায় ......রাম নাম সত্ হ্যায়....

মৃতদেহ দেখিয়ে অবশ্যই এক মৃত্যুর ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কিন্তু কার মৃত্যু?

কিসের মৃত্যু?

এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যেই যেন, ছেলেবেলায় হারানো সেই পাখি আবার ডেকে ওঠে। হঠাৎ আমরা অনুভব করি — সিদ্ধার্থর সংবেদনশীলতার প্রতীক এই পাখির ডাক। যে সংবেদনশীল মন সে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত। হয়তো সেই অনুভবক্ষমতার বিনাশ হবে এবার। মৃতদেহ-বাহকদের বিষণ্ণ উচ্চারণের সঙ্গে নির্জন পাখির ডাক মিশিয়ে — সিদ্ধার্থর সংবেদনশীলতার মৃত্যুকেই ইঙ্গিত করা হয়। যেন আভাসে বলা হয় — সিদ্ধার্থ তার সংবেদনা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না কলকাতার জীবন স্রোতের বাইরে গিয়ে। কারণ, তার সব ইতিবাচক মূল্যবোধ সিদ্ধার্থ পেয়েছে কলকাতার জীবনধারা থেকেই। আজও তাকে অনুভবক্ষম রেখেছে সেই মূল্যবোধ। সুতরাং, তার সংবেদনশীলতার মৃত্যুরই সম্ভাবনা কলকাতার বাইরে চলে গেলে। একাকিত্ব-জাত এই ক্ষয় বোঝাবার জন্যে, শুধুমাত্র নির্জন এক পাখির ডাক শোনানো হয়।

আধুনিক পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত সংবেদনার বিনাশ অনিবার্য — এই অমোঘ মন্তব্যটি করার সময়ও, শুধুই নির্জন পাখির ডাক ছাড়া আর কোনও অবলম্বন প্রয়োজন নেই সত্যজিতের। তাঁর ছবিতে শব্দের ভূমিকা এতই অতলস্পর্শী।

১০) সংগীতে শব্দের গুরুভার

তবু শব্দ কি সবই পারে?

হয়তো অনেকটাই পারে। একটা বিষয় বাদে। সেটা হল, আবেগসৃষ্টি। কারণ, বাস্তব শব্দের আবেদন শুধুই বিশ্লেষণী-বুদ্ধির কাছে। উত্তীর্ণ হৃদয়ের কাছে শুষ্ক শব্দের

প্রায় কোনও মূল্যই নেই। কারণ, আবেগ সৃষ্টির প্রধান আয়ুধলয়ের ধাবমানতা, সুরের বৈচিত্র্য এবং স্কেলের ওঠানামা। এগুলো বাস্তব জগতের শব্দে নেই। তাই, আবেগই যে দৃশ্যের উদ্দেশ্য সিনেমার সেই দৃশ্যে, শব্দ-কুশলী সত্যজিৎও সংগীতেরই শরণাগত হন।

তাঁর সংগীতের নিজস্ব স্টাইলের সঙ্গে নাগরিক জীবনকেই বেশি মানায়। কেননা, তিনি ব্যবহার করেন এমন জাতের বাদ্যযন্ত্র, যা ভারী আওয়াজের উৎস। যেমন, চেলো, সরোদ, অর্গ্যান, মৃদঙ্গ বা সমবেত বেহালার ঐকতান। কিংবা, মোটা আড়বাঁশি। তাঁর রচিত আবহসংগীতে সেতার কখনও একলা বাজে না। যখনই সেতারে কোনও সুর বেজে ওঠে, পর মুহূর্তেই সরোদের ভারী আওয়াজে সেই সুরের প্রত্যুত্তর শুনতে পাই। যেমন, বাগানে ফুলের ছবি আঁকছে পিকু। প্রথমেই সেতারে বেজে উঠল সুরের ছোট্ট এক পংক্তি। তারপর, সেই সুর কিন্তু টানা সেতারেই বেজে চলল না। সেতারে বাজা ঐ সুরই পরমুহূর্তেই আবার বেজে উঠল সরোদের ভারী আওয়াজে। এই অবহসংগীতের শুরুতেই সেতার শুনে হয়তো অনেকের মনে হয়েছিল —এই সুর সেতারের নরম আওয়াজে বেজে চলবে। কিন্তু, সেতার শুরু হবার ঠিক দু সেকেন্ডর মধ্যেই সরোদ বেজে উঠে অনেক বাড়িয়ে দেয় আবহসংগীতের ওজন। এতেই প্রমাণ হয়, এমন সংগীতই সত্যজিতের অবলম্বন, যা ওজনে ভারী। তাই, তাঁর সংগীতে চেলোর মতো ভারী আওয়াজের যন্ত্রের প্রয়োগ এত বেশি। একই কারণে, বেহালাও তাঁর ছবিতে একলা বাজে না। কারণ, একক-বেহালার আওয়াজে তারের মৃদু কম্পন টের পাওয়া যায় — যে কম্পন আবহসংগীতকে অতি সেন্টিমেন্টাল করে তোলার আশংকা থাকে। তাই, আবহে বেহালার প্রয়োজন হলেই, একসঙ্গে তিনি বাজান অন্ততঃ চারটি বেহালা। কখনও আটটা বেহালা। আবার কখনও দশটা-বারোটা। একক বেহালার অতিসংবেদী তারের কম্পন চাপা পড়ে যায় বেহালার ঐকতানের নিচে। ফলে, সেন্টিমেন্টাল কম্পনের পরিবর্তে তাঁর সংগীতে সঞ্চারিত হয় গভীর ব্যক্তিত্বময় এক গুরু-ওজন। এটাই সত্যজিতের লক্ষ্য আবহ রচনার সময়।

এই ওজনের জন্যই, আওয়াজের দিক থেকে সত্যজিতের সংগীত অনেক বেশি নাগরিক। এই ভারী আওয়াজকে তিনি নাগরিক জীবনের সঙ্গেই অন্বিত করেন। তার প্রথম দৃষ্টান্ত পাই 'অপুর সংসার'-এ। সেই ছবির সংগীত তিনি নিজে রচনা করেননি। তবু, সে বারই প্রথম তাঁর ছবির টাইট্‌ল্ মিউজিকের শুরুতেই বেজে উঠেছিল অত্যন্ত ভারী নাগরিক সংগীত। আর, সে বারই প্রথম তাঁর ছবিতে এসেছিল জোট-বাঁধা-জনতার রাজনৈতিক স্লোগান, রোদজ্বলা মানুষের মিছিল। এই মিছিল, এই স্লোগান আসলে বিরাট কলকাতারই প্রতিনিধিত্ব করেছিল 'অপুর সংসার'-এর শুরুতে । আর স্লোগানের সূত্র ধরে, পরমুহূর্তেই আবহে ফেড ইন্ করেছিল ভারী আবহসংগীত। এই দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণ হয়, কলকাতার নিত্য জীবনযাত্রা এক ভারী আবহসংগীতের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে সত্যজিতের মনে। না হলে, তাঁর ছবির ইতিহাসে প্রথম মিছিলের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁর ছবিতে প্রথম ভারী সুরটি বেজে উঠত না। এই ভাবে, প্রথম মিছিল আর প্রথম ভারী সুরের যোগাযোগ নিতান্ত কাকতালিয় নয়। এতেই নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়, ভারী আওয়াজ-সম্পন্ন স্ট্রিং-ইনস্ট্রুমেন্টের এক সহজিয়া আত্মীয়তা আছে নাগরিক জীবনের সঙ্গে। কারণ,

'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' বা 'সদ্‌গতি' ছবিতে অত ভারী সুর বাজেনি।

শুধু নাগরিক জীবন নয়, যা কিছু আধুনিক নাগরিক সভ্যতার পরিণাম তাকেই সত্যজিৎ সাবলীলতায় প্রকাশ করেন চেলো-বেহালার ভারী ঐকতানে। যেমন, 'অশনি সংকেত'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যই আধুনিক নগরসভ্যতার বাজার দখলী প্রতিযোগিতারই ফল। এবং, 'অশনি সংকেত' ছবির পশ্চাৎপট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তাই, টাইট্‌ল্‌-মিউজিকের শুরুতেই প্রচন্ড ভারী আওয়াজে চেলো-বেহালার ঐকতান শুনি আমরা। কারণ, ছবির ভিসুয়ালে যদিও গ্রাম দেখছি, তবু ছবির কেন্দ্রিয় বিষয়টি মূলত নাগরিক। বলা যেতে পারে, সত্যজিৎ রায়ের সবচেয়ে তাৎপর্যময় নাগরিক ছবি 'অশনি সংকেত'। কারণ, নগরসভ্যতার ভয়ংকরতম পরিণাম নিয়ে গড়ে উঠেছে এই ছবি। তাঁর অন্য কোনও ছবিতেই নগরসভ্যতার গ্রাস এত নির্লিপ্ত দংশন করেনি। সুতরাং, এই গ্রামীণ ছবিতে যদি আমরা সত্যজিতের সবচেয়ে ভারী সুর শুনতে পাই, তবে ধরেই নিতে হবে — সেই ওজন দিয়ে তিনি আসলে নগরসভ্যতারই বিপুল পদধ্বনি ব্যক্ত করেছেন।

আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ, কলকাতায় মানুষের বসবাসের ঘনত্ব কলকাতার আর্কিটেকচার, কলকাতার ক্রমিক বিস্তার — সবই এমন ভারী। মুলতান রাগের যে উদাসীন বাঁশি রবিশংকর আমাদের শুনিয়েছিলেন 'পথের পাঁচালী'তে সেই একক বাঁশি শোনার অবকাশ 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র সিদ্ধার্থব ছিল না। সেই বাঁশির সুর ভুলতে বাধ্য হয়েছিল 'অশনি সংকেত'-এর অনঙ্গ-বউ। বাঁশি বেজেছে 'অশনি সংকেত-এও। বেজেছে, স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে অনঙ্গ-বউয়ের অঝোর কান্নার সঙ্গে। কিন্তু সেই বাঁশি 'পথের পাঁচালী'র বাঁশির মত মিষ্টি আওয়াজের বাঁশি নয়। 'অশনি সংকেত-এর বাঁশি আমাদের ভারি আওয়াজ শোনায়। 'অশনি সংকেত'-এর বাঁশি আমাদের নগরসভ্যতার কথাই বলে।

এই ক'টা দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ হল, ভারী আওয়াজের সঙ্গে সত্যজিতের সংগীতের রক্ত-সম্পর্ক। সত্যজিতের নাগরিক সংগীতের কথা ভাবলেই আমাদের মনের মধ্যে আপনা থেকেই ভারী সুর বেজে ওঠে। প্রায় তিরিশ বছর আগে 'অভিযান'-এ যেমন, আজকের 'গণশত্রু'তেও তেমনই ভারী সুর বেজেছে।

১১) পথে চলার শব্দ-সুর

গায়ে গায়ে ঘন হয়ে লেগে থাকা বাড়ি, অগণিত মানুষের ভিড়ে ভারী হয়ে আসা ট্রাম বাস, ঘনবদ্ধ মিছিল — এ সবই কলকাতার ওজনকে শতগুণে বাড়িয়ে তোলে। ওজনের এই অনুভব হতে পারে না গ্রামের খোলা মাঠে। তাই, স্বভাবতই, 'পথের পাঁচালী'তে ভারী কোনো স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট শোনা যায় নি। এমন কী, 'অশনি সংকেত'-এও যখন খোলা মাঠের পায়ে-চলা-পথ দিয়ে গঙ্গাচরণ হেঁটে চলেছে, তখন কিন্তু আমরা ভারী বাজনা শুনি না। সেই দৃশ্যের আবহসংগীত রচিত হয়েছিল মূলত বাঁশি আর সেতারের ঐকতানে। এই সেতার-বাঁশির পশ্চাৎপটে। চাপাস্বরে বেজেছিল খুবই উঁচু-স্কেলে-বাঁধা একাধিক বেহালা। যে বেহালা শুধুই সেতার আর বাঁশির কোমল পশ্চাৎপট রচনা করেছিল। কিংবা, মনে করুন 'সদ্‌গতি'র সেই দৃশ্যটি, যেখানে পিঠে ভুসির বস্তা বয়ে নিয়ে শুকনো ধুলো ওড়া পথে চলেছে দুখী চামার। সেই দৃশ্যে, শুধুই একক বাঁশির সুর শুনেছিলাম আমরা। চেলোর মত কোনও ভারী ইনস্ট্রুমেন্টও ছিল না সঙ্গে।

শহরের একই জাতীয় দৃশ্যে চেলো-বেহালা জাতীয় ভারী ইন্‌স্ট্রুমেন্টের ঐকতান যুক্ত হয়। মনে করুন 'জন অরণ্য'র সেই দৃশ্য, যেখানে একের পর এক যুবক হেঁটে এসে চাকরির অ্যাপ্লিকেশান পোষ্ট করছে। এও কিন্তু এক রকমের পথ চলার দৃশ্য। তবু, এখানে চেলো-বেহালার ঐকতানে ভারী সুর বেজে উঠেছিল। 'অশনি সংকেত'-এ গঙ্গাচরণের পথ-চলার মত বাঁশি-সেতার বাজেনি।

এই ভাবে, 'অশনি সংকেত', 'সদ্‌গতি', এবং 'জন অরণ্য' — এই তিনটি ছবির পথে চলার দৃশ্য তুলনা করলেই আমরা বুঝতে পারি, গ্রামের ছবিতে যে দৃশ্যে মূলত বাঁশি আর সেতারের সংগীত শুনি, শহরের ছবিতে সেই একই দৃশ্যে বেজে ওঠে ভারী বাজনা—চেলো-বেহালার ঐকতান। 'অশনি সংকেত'-এর শুধু সেই দৃশ্যেই ভারী সংগীত বেজেছে, যেখানে গ্রামজীবনের ওপর নগরসভ্যতার সরাসরি ছায়াপাত। যেমন, শেষ দৃশ্যে। যখন গ্রাম ছেড়ে কলকাতার দিকে চলেছে মানুষের মিছিল। নাগরিক হানাহানির প্রভাবেই ১৯৪৩-এ গ্রামের মানুষ বাস্তুহারা। নগরের সেই প্রভাবকে ব্যক্ত করার জন্যই 'অশনি সংকেত'-এর শেষ দৃশ্যে ভারী সুর না বেজে উপায় ছিল না। আবার 'অশনি সংকেত'-এর টাইট্‌ল্ মিউজিকেও আমরা শুনেছিলাম শেষ দৃশ্যের ভারী সুরটাই। যখন গ্রামীণ প্রকৃতির মাথার ওপর 'দুর্ভিক্ষের কালো মেঘ' ঘনিয়ে আসছে। 'দুর্ভিক্ষের মেঘ' যেহেতু নগরসভ্যতারই পরিণাম — তাই 'অশনি সংকেত'-এর টাইট্‌ল্ মিউজিকেও আমরা শুনি চেলো-বেহালার গুরুগম্ভীর ঐকতান। কিন্তু যে সব দৃশ্যে শহরের সরাসরি প্রভাব নেই, 'অশনি সংকেত'-এর সেই সব দৃশ্যে ভারী সুর বাজেনি। সেতার-বাঁশি-ঢাক বেজেছে। আর বেহালা যদিও বা বেজেছে — বেজেছে উঁচু স্কেলে, যাতে বেহালার সেই সুরে কোনও ওজন না থাকে। আর তখনই সেটা গ্রামের সুর হয়ে গেছে।

১২) সংগীতের প্রবেশ

অবশ্য শহরের ছবিতে ভারী ইন্‌স্ট্রুমেন্ট বাজানো সহজ। কারণ, সাউন্ড ট্র্যাকে ভারী ইনস্ট্রুমেন্টের আওয়াজ ফেডইন্ করার মতো রেফারেন্স (উপলক্ষ্য) স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই থাকে শহরের ছবিতে। 'জন অরণ্য'র সেই দৃশ্যটার কথা ভাবুন। যেখানে সোমনাথ চাকরির অ্যাপ্‌লিকেশান্ টাইপ করাচ্ছে রাস্তায় বসে। প্রথম দু-সেকেন্ড আমরা শুধুই টাইপরাইটারের শব্দ শুনি। তারপর হঠাৎ লক্ষ্য করি, বসে-থাকা-টাইপিস্টের ব্যাক্‌গ্রাউন্ডে, একটা ডাবল্ ডেকার বাস যাচ্ছে। কিন্তু এই বাসের আওয়াজ শোনানো হয় না আমাদের। তার বদলে সাউন্ড ট্র্যাকে ফেড ইন্ করে চেলো-বেহালার ভারী ঐকতান।

সংগীতের প্রসঙ্গে, এই চলমান বাসের ভূমিকা কী?

আসলে, ঐ বাসটা দেখা মাত্রই দর্শকদের মন অসচেতনভাবে বাসের ভারী শব্দই শুনতে চায়। সুতরাং, বাসটি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ভারী শব্দের স্বাভাবিক প্রত্যাশা তৈরী হয় এই দৃশ্যে। এবং, সেই প্রত্যাশা পূরণের সুযোগ নিয়েই ভারী সুর বেজে ওঠে। ফলে, কখনোই দর্শকদের মনে হয় না—এই সুর হঠাৎ বেজে-ওঠা বেমানান কোনও শব্দ। আসলে ডাবল ডেকার বাসের মতো ভারী রেফারেন্স খুব সহজেই পাওয়া যায় নাগরিক জীবনে। সুতরাং, তার সুযোগ নিয়ে ভারী সুর সাউন্ডট্র্যাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ফেড ইন করতে পারে, এতে আর আশ্চর্য্য কী।

কোনও রেফারেন্স ছাড়াই সাউন্ড ট্র্যাকে আবহসংগীত ফেড ইন্ করানো সত্যজিতের চোখে অশৈল্পিক। 'অশনি সংকেত'-এ ক্রেডিট টাইটল্-এর প্রথম চার-পাঁচটি শটে ছিল শুধুই পাখির কূজন। সরাসরি পাখির ডাক থেকেই চেলোর ভারী সুর ফেড ইন্ করেনি। এক ঝাঁক পাখির কলরবের পর ছবিতে এসেছিল মেঘের গর্জন। আর এই মেঘ-গর্জনের গম্ভীরতার রেফারেন্স ধরেই ছবিতে ভারী সংগীতের অনুপ্রবেশ।

সুতরাং, সত্যজিতের আবহসংগীত কখনও একলা আসে না। হঠাৎ আসে না।

তবে, সব সময় শুধু কোনও শব্দের রেফারেন্সেই যে আবহসংগীত আসবে, তার কোনও ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। অনেক সময় কোনও অ্যাকশানের সূত্র ধরেও সাউন্ডট্র্যাকে ফেড ইন্ করতে পারে আবহসংগীত। আর কলকাতার মত ঘন মানুষপূর্ণ শহরে এই রকম অ্যাকশানের রেফারেন্স পাওয়া অনেক বেশি সহজ। যেমন, ধরা যাক, 'সোনার কেল্লা'য় হাওড়া স্টেশনের দৃশ্যে সেই অনন্দময় সুরের কথা। দৃশ্যটা এই রকম ঃ ফেলুদা আর তোপ্সে অ্যাডভেঞ্চারে বেরোচ্ছে। তোপ্সের মা-বাবা হাওড়া স্টেশনে এসেছেন ওদের ট্রেনে তুলে দিতে। সবার মন আজ খুশি। তাই এই দৃশ্যে স্বভাবতই খুশির সুর বেজে উঠেছিল। কিন্তু এই সুরও বিনা নোটিশে হঠাৎ বাজেনি। যখন তোপসে আর ফেলুদা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে মা-বাবার সঙ্গে গল্প করছে, ঠিক তখনই একজন ম্যাগাজিন ভেন্ডার তার চাকা লাগানো বুক স্টল ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল ঐ চারজনের ঠিক পেছন দিয়ে। ফলে, ওদের ব্যাকগ্রাউন্ডে, আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকে অনেক রঙিন পত্রিকার ঝলমলে মলাট। আর এই মুভমেন্টের সূত্র ধরেই ফেড ইন্ করে আবহসংগীত।

শহরের ছবিতে এ রকম টুকরো টুকরো অ্যাকশান পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। গ্রামের খোলা মাঠে এই জাতীয় টুকরো অ্যাকশান তুলনায় বিরল। যে কারণে, আবহসংগীত ফেড ইন্ করানো অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল 'জন অরণ্য' ছবিতে। সোমনাথ যখন উদ্দীপনার সঙ্গে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে নেমে পড়েছে, তখন তার নতুন উদ্যমকে প্রকাশ করার জন্য একটি আবহসংগীত রচিত হয়েছিল। এবং সেই সংগীতও হঠাৎ ছবিতে আসেনি। এসেছিল টুকরো অ্যাকশানের রেফারেন্স ধরেই। রাস্তায় দেখানো হল, কাটারী দিয়ে ডাব কাটছে ডাবওয়ালা। দ্রুত ওঠানামা করছে কাটারী। আর, ডাবটা একটু একটু করে স্পিন করে যাচ্ছে ডাবওয়ালাব বাঁ হাতে তালুর ওপরে। কাটারীর ওঠা-নামার তালে তালে সাউন্ড ট্র্যাকে একতারা বেজে ওঠে। পরমুহূর্তে, সেই একতারার ধ্বনি অনুসরণ করে বেজে ওঠে সমবেত বেহালার ঐকতান।

১৩) সংগীতের বিলয়

শুধু সংগীতের শুরুতেই নয়, সংগীতের শেষেও এভাবে অ্যাকশান আর শব্দ দিয়ে সংগীতের ছেদ টানার ঝোঁক আছে সত্যজিতের। এর নাগরিক দৃষ্টান্ত, জন অরণ্য'র সেই মন্তাজ সিকোয়েন্স—যেখানে একদল যুবক পর পর নিজেদের চাকরির অ্যাপ্লিকেশান ডাকবাক্সে পোষ্ট করছে। অ্যাপ্লিকেশান পোস্টিং দেখানো হয় স্বল্পদৈর্ঘ্যের টুকরো টুকরো শটে। সমবেত বেহালার ঐকতান শোনা গিয়েছিল এই মন্তাজ সিকোয়েন্সে। কিন্তু আপনা থেকেই ফেড আউট করে যায়নি এই সংগীত। ছবির ঐ সিকোয়েন্সের শেষ শটে

একটি মেইল ভ্যান এসে দাঁড়ায়। বিরাট সব চিঠির বস্তা নামানো হতে থাকে ভ্যানের পেছনের দরজা খুলে। মন্তাজ সিকোয়েন্সের আবহসংগীতকে ওভারল্যাপ করেছিল মেইল ভ্যান এসে দাঁড়ানোর আওয়াজ। সুরকে যেন আবৃত করে থামিয়ে দিয়েছিল।

এই পদ্ধতিতে, অন্য কোনও বেসুরো শব্দ দিয়ে সংগীতকে আচ্ছন্ন করে থামিয়ে দেওয়া সত্যজিতের সিনেমায় এক মূল্যবান শৈলী। 'অশনি সংকেত' ছবিতেও, এক কর্কশ আওয়াজ দিয়ে আচ্ছন্ন করা হয়েছিল একটি মন্তাজ সিকোয়েন্সের আবহসংগীত। এই সিকোয়েন্সের শটগুলি ছিল এ রকম ঃ গঙ্গাচরণ গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে...গঙ্গাচরণ রুগীর নাড়ি ধরে বসে আছে গম্ভীর মুখে... উঠোনের বাগান থেকে একটা বড় লাউ কাটছে তার স্ত্রী অনঙ্গ.... ইত্যাদি। এই মন্তাজের শেষ শট — বৃষ্টি, গ্রামের পথে জল জমেছে, আর সেই জল-জমা পথে হেঁটে চলছে গঙ্গাচরণ। জমে থাকা জলে পা ফেলে হাঁটতে গিয়ে বেসুরো শব্দ হচ্ছে ছপ্-ছপ্-ছড়াৎ-ছড়াৎ। সেই শ্রুতিকটু শব্দেরই নিচে চাপা পড়ে যায় সেতারে বাজানো মধুর আবহসংগীত।

প্রতিটি সংগীতকেই যে সত্যজিৎ অন্য কর্কশ আওয়াজ দিয়ে আবৃত করে মুছে ফেলেন -এর কোন নিশ্চয়তা নেই। সাধারণত দীর্ঘ মন্তাজ সিকোয়েন্সের সংগীতের শেষাংশকেই এই ভাবে অন্য তানলয়হীন বিস্বর আওয়াজ দিয়ে বিলোপ করেন তিনি।

১৪) একই সুর, অন্য অর্থ

হয়তো কখনো দুটি সুর এক। কিন্তু বাদ্যযন্ত্র আলাদা । শুধু বাদ্যযন্ত্রের ভিন্নতাই শহরের সুর থেকে স্বতন্ত্র করে দিতে পারে গ্রামের সুরকে। সত্যজিতের আবহসংগীতে এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাদ্যযন্ত্র। একই সুরকে অন্য যন্ত্রে অন্য লয়ে বাজালে, সেই সুর আমূল ভিন্ন দ্যোতনা বহন করে।

হিমালয়ের উদারতা আর ভ্রমণের আনন্দকে প্রকাশের জন্য একটি সুর প্রয়োগ করা হয়েছিল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র টাইট্‌ল্ মিউজিকে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র এই সুর শুনলেই যেন মনে পড়ে যায়-হিমালয়ের ঔদার্য, প্রকৃতির বিশালতা আর সেই সঙ্গে শান্ত চিত্তে ভ্রমণের আনন্দ। এই আবহসংগীতে নেতৃত্ব দিয়েছিল ভারী আওয়াজের একটি পাহাড়িবাঁশি।

কিন্তু পরের ছবিতে অবাক কান্ড।

এই একই সুরকে 'অভিযান'-এ ষড়যন্ত্রের সুর হিসেবে প্রয়োগ করলেন সত্যজিৎ। চোরাই কারবারী সুখন্‌রাম যখন বলছে, আফিমের টিন চালান দিলে নরসিঙের কেরিয়ারে কী কী সুবিধে হবে — সেই দৃশ্যে বেজে উঠল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র টাইট্‌ল্ সুর। কিন্তু এবারে আর পাহাড়ি বাঁশিতে নয়। নিচু স্কেলে চাপা আওয়াজের চেলো-বেহালার ঐকতানে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় এই সুর বেজেছিল মধ্য-বিলম্বিত লয়ে। 'অভিযান'-এ সেই একই সুর বাজল মধ্য দ্রুত-লয়ে। ফলে 'অভিযান'-এ যে শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল, তাকে বলা চলে 'মাফ্‌ল্‌ড সাউন্ড'। রুদ্ধশ্বাস নিরুদ্ধ শব্দ। আর এই চেলো-বেহালার প্রত্যুক্তি রূপে, সেই একই লাইনের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল খুবই উঁচু স্কেলে বাজানো তীক্ষ্ণ আওয়াজের বাঁশিতে। কিন্তু সুর সেই একই। পালটে গেল শুধু লয়, আর যন্ত্র। ফলে, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় যা ছিল উদার আনন্দের সুর—'অভিযান'-এ তাই হয়ে গেল

লোভের সুর, ষড়যন্ত্রের সুর। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় যা লোকসংগীতের আবেশ মাখা ভাবালু উদাসীনতার সুর—'অভিযান'এ তাই হয়ে গেল দুর্নীতিপূর্ণ নাগরিক মনের অ্যামবিশানের সুর। এই আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল শুধুই লয় আর ইনস্ট্রুমেন্ট বদল করে।

এই ভাবে, একই সুরের হৃদয় থেকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ খনন করে আনা সত্যজিতের নিজস্ব এক চিহ্ন। যে সুর একবার কলকাতার চরিত্রদের দ্যোতক—সেই সুরই গ্রামের সুর হয়ে ফিরে আসে পরে কখনো।

'নায়ক'-এ যে দৃশ্যে অরিন্দম প্রথমবার অদিতির সহানুভূতি পায়, সেই দৃশ্যের সুর আশ্চর্যভাবে আবার ফিরে আসে 'সদগতি' ছবিতে — দুখী চামার যখন ধীর ক্লান্ত পায়ে হাঁটছে ভুসির বস্তা কাঁধে নিয়ে। 'নায়ক'-এর ঐ সুরে ছিল অভিনেতার গোপন ক্লান্তি আর নির্জনতা। সেই সঙ্গে দরদী নারীর সমবেদনার মিশ্রণ। 'সদগতি'তে এসে, সেই একই সুর সামান্য একটু বদলে, হয়ে গেল চূড়ান্ত ক্লান্তির সুর। 'নায়ক'-এ সুর বাজানো হয়েছিল চার-পাঁচটি বেহালার ঐকতানে— বিলম্বিত লয়ে। আর 'সদগতি'তে প্রায় সেই একই সুর বাজানো হল মোটা আড় বাঁশিতে- মধ্যলয়ে। শুধু এটুকু তফাতেই সাফল্যের চূড়ায় আসীন নাগরিক চরিত্রের নির্জনতার সুর হয়ে গেল গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের ক্লান্তির সুর।

এর থেকে অন্তত একটি ভাবনা মনে আসে। নির্দিষ্ট অ্যাকাডেমিক অর্থের শৃংখল থেকে নিজের সংগীতকে মুক্ত রাখেন সত্যজিৎ। তাই তিনি শুধু ইনস্ট্রুমেন্ট আর লয় বদল করেই গ্রামীণ ছবির সংগীতকে নাগরিক সংগীতে রূপান্তরিত করে নিতে পারেন।

১৫) সুরের মধ্যে শব্দ

সত্যজিতের নগরভিত্তিক ছবির সংগীতে আর একটি বিশেষ চিহ্ন— সংগীতের সঙ্গে বাস্তব জীবনের শব্দকে তিনি মিশিয়ে দেন সহজেই। বাস্তব জীবনের বাস্তব শব্দ যতি চিহ্নের কাজ করে যন্ত্রসংগীতের মাঝে মাঝে। যেমন, 'সীমাবদ্ধ'র টাইট্‌ল্ মিউজিকে টেলিফোনের শব্দ।

যে সুর বেজেছিল 'সীমাবদ্ধ'র টাইট্‌ল্ মিউজিকে, ক্লান্তি আর বিষণ্ণতাই তার প্রধান বাণী। ছবির চূড়ান্ত বক্তব্য যেন আগেই ব্যক্ত হয়েছিল টাইট্‌ল্ মিউজিকে। প্রারম্ভিক বাঁশির সুরে শুধুই ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা ছিল বলে, একটা তথ্যগত অপূর্ণতা রয়ে যাচ্ছিল ছবির শুরুতে। আসলে যে শ্যামলেন্দু ব্যস্ত মানুষ, তা বোঝার উপায় ছিল না টাইট্‌ল্-এর সুর শুনে। তাই, সংগীতের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল টেলিফোনের টিংক্‌ল্। শুধু এটুকু শব্দ যোগ করা মাত্রই আমাদের চেনা হয়ে গেল শ্যামলেন্দুর সফলতার জগৎটা। আমরা জেনে গেলাম, তার জগৎ ব্যস্ততায় পূর্ণ। যেখানে টেলিফোনের ডাকে সাড়া দিতে হয় বার বার।

আরও দুটি কলকাতা-নির্ভর ছবিতে, দীর্ঘ আবহসংগীত ফেড ইন করার রেফারেন্স (উপলক্ষ। উৎস) হিসেবে টেলিফোনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন সত্যজিৎ। যেমন, 'চিড়িয়াখানা' ছবির টাইট্‌ল্-এ। প্রথম দৃশ্যে, গোয়েন্দা ব্যোমকেশের বসার ঘরটি দীর্ঘ সময় ধরে দেখানো হয়। ঘরের জানলা, জানলার বাইরে ব্যস্ত কলকাতা, ঘরের মধ্যে টেবিল, ইজিচেয়ার, দেয়ালে সাঁটা হাতে-লেখা-স্টিকার, এমনকি ঘরের কোণে ঝুলন্ত

একটি আস্ত কংকাল—সবই দেখানো হল ঘরের বাসিন্দাদের বাদ দিয়ে। এবার দর্শকদের মনে প্রশ্ন, ঘরের বাসিন্দা কারা? এখন তারা কোথায়? দর্শকরা যখন একথা ভাবতে শুরু করেছে—ঠিক তখনই টেলিফোনের ঝনঝনানি শোনা গেল। কোনও মানুষ দেখার আগেই বোঝা গেল—আসলে বেশ ব্যস্ত মানুষ এই ঘরের বাসিন্দা। টেলিফোনে মাঝে-মাঝেই তাঁর ডাক আসে। টেলিফোনের শব্দ কয়েক মুহূর্ত চলার পর, নেপথ্যে একজন রিসিভার তুলে নেয়। এবং, অফস্ক্রিনে আমরা ভরাট গলায় শুনতে পাই ঃ 'হ্যালো, আমি ব্যোমকেশ বকসি বলছি.....'

'চিড়িয়াখানা'য় এই টেলিফোনের আওয়াজটাই ছিল টাইট্‌ল্ মিউজিকে বাস্তব শব্দের পাংচুয়েশন। এখানেও, 'সীমাবদ্ধ'র টাইট্‌ল্ সুরের মতোই, অপূর্ণতা পূরণের দায়িত্ব নিয়েছিল টেলিফোনের শব্দ। আসলে, ভিসুয়ালে যা যা দেখেছিল দর্শকরা, তাতে বোঝার উপায় ছিল না— এই ঘরের বাসিন্দা একজন পেশাদার মানুষ। ছোট ঘর, তার ওপর সারা দেয়াল-জুড়ে খাম-খেয়ালিপনার চিহ্ন। যে লোক ঘরের কোণে নরকংকাল টাঙায়, কাঁচের জারে সাপ পোষে— সে আবার কেমন লোক ? আধপাগলা নয় তো? দর্শকদের এই সন্দেহ এক ধাক্কায় ভেঙে দেয় টেলিফোনের আওয়াজ। বোঝা যায়, ঘরের বাসিন্দা প্র্যাকটিকাল এবং সামাজিক। সামাজিক দাবিতে সে সাড়া দিতে জানে। 'সীমাবদ্ধ'তেও টেলিফোনের একই ভূমিকা। টাইট্‌ল্-এর উদাস বাঁশি বুঝতে দেয়নি শ্যামলেন্দু সফল মানুষ। সেটা বুঝিয়েছিল টেলিফোনের শব্দ।

একটি দীর্ঘ সুর বেজেছিল 'নায়ক'-এর প্রথম স্বপ্ন দৃশ্যে। রাশি রাশি কারেন্সি নোটের ওপর স্লো মোশানে হাঁটছে নায়ক। সেই সময় চাপা উদ্দীপনাময় সুখের সুর বেজেছে। তারপর, টাকার পাহাড়ের পশ্চাৎপটে আকাশে মেঘের ছায়া ঘনিয়ে আসে। এবং মেঘ জমার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় স্বপ্ন দৃশ্যের সুখের সুর। কারণ, ততক্ষণে টাকার পাহাড় ফুঁড়ে অসংখ্য কংকাল-হাত বেরিয়ে এসেছে। তার মধ্যে অনেক কংকাল-হাতেই ধরা আছে একটা করে টেলিফোনের রিসিভার। চরিদিক ঘিরে ধেয়ে আসছে টেলিফোনের আওয়াজ। এই টেলিফোনের ঝন্‌ঝন্ তীব্রতর হবার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার গতি একটু বেড়ে যায়। কয়েকটা নোট ভেসে ভেসে উড়তে শুরু করে টাকার পাহাড়ের ওপরের স্তর থেকে। এই টেলিফোনের রেফারেন্স ধরেই আবহসংগীত পালটে যায়। টেলিফোন-টিংক্‌ল্ ফেড আউট হবার আগেই, খোল-করতাল সহযোগে কোরাসে হরিধ্বনি ফেডইন্ করে সাউন্ডট্র্যাকে।

সুতরাং, 'নায়ক'-এর এই দীর্ঘ আবহসংগীতের প্রথম ও দ্বিতীয় মুভমেন্টের মাঝখানে যতিচিহ্নরূপে ছবিতে এসেছিল সমবেত টেলিফোনের আওয়াজ। ঠিক 'সীমাবদ্ধ' বা 'চিড়িয়াখানা'র মতোই।

বাস্তব শব্দের সবচেয়ে বেশি অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তাঁর কোন্ নাগরিক ছবির আবহসংগীতে?

সেই ছবির নাম 'টু'।

'টু'-এর আবহসংগীত থেকে বাস্তবজীবনের শব্দকে ছেঁকে আলাদা করা চলে না। তাহলে আর সুরকে 'সুর' বলে চেনা যাবে না। কারণ, বাস্তব শব্দই তাল এবং ছন্দ রক্ষার কাজ করেছে সুরের মধ্যে।

'টু'তে কোন সংলাপ ছিল না। তাই সেখানে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংগীতের ভূমিকা। ছেলেকে রেখে মা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন — এখানেই 'টু'-এর শুরু। তারপরেই গোটা বাড়িতে ছেলেটি একলা। তাকে ঘিরে খেলনার জগৎ। বেশির ভাগই দামী বিদেশী খেলনা। তার মধ্যে অনেকগুলোই মেশিনগান, সৈন্য আর যুদ্ধের ট্যাংক্। আবার দম দেওয়া রোবটও আছে। বেশির ভাগ খেলনাই সশব্দ, অর্থাৎ দম দিলেই এরা সশব্দে সচল হয়ে ওঠে। ছবির শুরুতেই সত্যজিৎ ঐ ছেলেটির একাকিত্বের সুর শুনিয়েছেন। কিন্তু সেই সুর শুধুই বাদ্যযন্ত্রে বাজেনি—ছেলেটির একাকিত্বের সংগীতের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়েছিল অনেক সচল খেলনার আওয়াজ। তাদের ধাতব পদশব্দ। তাদের স্প্রিঙের কর্কশ কির্ কির্। যাতে বোঝা যায়, এত খেলনার মধ্যে থেকেও ছেলেটি একলা। কিংবা হয়তো এত খেলনার ভিড়ই ওর একাকিত্বের কারণ।

আসলে 'টু'-তে সুর একটি প্রশ্ন তুলেছিল। ছেলেটি কেন এত একলা? সুরেরই মধ্যে মেশানো ছিল এই প্রশ্নের জবাব। অর্থাৎ, আমরা জবাব পেলাম অগণিত খেলনার কলরবে ঃ উপকরণের প্রাচুর্যই ওর একাকিত্বের কারণ।

তাই, বিষণ্ণ সুরের হৃদয়ে মেশানো ছিল এত খেলনার শব্দ।

১৬) মিলন-মুহূর্তে মৃত্যুর সুর

একই সুর দুটি ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করার সবচেয়ে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত কোন্‌টা?

একই সুর যদি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী রসের প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হয় — তাহলে বিস্ময়কর মনে হবে নিশ্চয়ই। চিরবিচ্ছেদের সুর যদি মিলনের দৃশ্যেও আবার বেজে ওঠে — তবে নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত সেই প্রয়োগ।

'পথের পাঁচালী'তে দুর্গার মৃত্যুর কথা স্বামীকে বলতে গিয়ে সর্বজয়ার কান্নায় ভেঙে পড়ার মুহূর্তে যে সুর বেজে উঠেছিল — সেই একই সুর আবার ফিরে এসেছে কাজলের সঙ্গে অপুর মিলন দৃশ্যে—'অপুর সংসার'-এ। দূর থেকে ছুটে এসে কাজল বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর হঠাৎ আমাদের বিমূঢ় করে দিয়ে, বুক মুচড়ে বেজে ওঠে, 'পথের পাঁচালী'তে শোনা দুর্গার মৃত্যু-সংগীত। প্রথা অনুসারে, পৃথিবীর যে কোনও পরিচালক মিলনের সুরই ব্যবহার করতেন এই দৃশ্যে। কিন্তু মৃত্যু-সংগীতের এই অপ্রত্যাশিত প্রয়োগ, সন্তানের সঙ্গে অপুর মিলন দৃশ্যকে আরো বেশি অতলস্পর্শী করে তোলে। হঠাৎ আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দেয় মানুষের যাবতীয় মিলনের চিরকালীন রহস্যকে।

মিলনের মুহূর্তে সব মানুষেরই কি মনে পড়ে না, সারা জীবন সঞ্চিত সমস্ত বিচ্ছেদ-বেদনাকে?

মিলনের মুহূর্তে অকস্মাৎ মনে পড়ে যায়, বিচ্ছেদের আঘাত কতবার এসেছে জীবনে। আমরা হঠাৎ টের পাই, আগের প্রতিটি বিচ্ছেদ এমন পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যেই শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু বার বার তা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। মনে পড়ে, জীবন থেকে কোন্ পরিপূর্ণতার স্বাদ কেড়ে নিয়েছে আগের প্রতিটি বিচ্ছেদ। সার্থক মিলন-মুহূর্তে বোধশক্তির হঠাৎ-আসা জোয়ার আমাদের বুঝতে সাহায্য করে—আগের নানান্ বিচ্ছেদে ঠিক কতটা ক্ষয় হয়েছে আমাদের।

সুতরাং, মিলনের মুহূর্ত যেন অগণিত বিচ্ছেদ-স্মৃতির মন্তাজ।

সন্তানের সঙ্গে মিলনের মুহূর্তে, বোনের মৃত্যু-সংগীত অতর্কিতে প্রায়োগ করে, জীবনের এই সত্য আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন সত্যজিৎ। 'অপুর সংসার'-এর শেষ দৃশ্যে এই সুর ক্ষণিকের জন্যে কাজলকে মুছে দেয় আমাদের চোখের সামনে থেকে। মনে পড়ে—ইন্দির, দুর্গা, সর্বজয়া, হরিহর এবং অপর্ণার মৃত্যুর কথা। সবারই তো অপুর পাশেই বাঁচার কথা ছিল আজও। থাকার কথা ছিল অপুর কাছেই। মিলনের দৃশ্যে, মৃত্যু-সংগীত বেজে উঠে আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই কথাই।

'অপুর সংসার' দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়, কলকাতার জীবন বুঝি অপুকে আচ্ছন্ন করেছে। কারণ, একবারও সে মা-বাবার কথা বলে না, বলে না পিসি বা দিদির কথাও। প্রিয় বন্ধু পুলুকেও বলে না, স্ত্রী অপর্ণাকেও নয়। দিদির কথা শুধু একবারই সে অপর্ণাকে বলেছিল। বিয়ের রাতে। তারপর আর একবারও নয়। ফলে, আমাদের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়—কলকাতার উচ্চাশার কল্পলোক ভাবালু অপুর সমস্ত বেদনাহত স্মৃতিকে গ্রাস করেছে। প্রথমে ফিজিক্স্ ল্যাবরেটরি, তারপর ঔপন্যাসিক হবার স্বপ্ন।

কিন্তু দুর্গার মৃত্যু-সংগীত সহসা 'অপুর সংসার'-এ ফিরে এসে আমাদের জানিয়ে দেয় কোথায় অপুর নাড়ির টান। অতীত সমস্ত বেদনাই তার বুকে লুকোন ছিল। অপুর চিরকালীন সত্তাকে আমূল আত্মসাৎ করেনি কলকাতা।

'পথের পাঁচালী'র সংগীতের এই আকস্মিক প্রয়োগ, আসলে কলকাতা বিষয়ে সত্যজিৎ রায়ের ইতিহাস-ভাষ্য। অপুর মতোই, তিনশ' বছর কলকাতায় বাস করেও বাঙালী তার দরদী সত্তাকে হারিয়ে ফেলেনি, যা পৃথিবীর অন্য সব বড় শহরের বৃত্তান্ত। সংগীতে অপুর বেদনার পুনরুজ্জীবন, কলকাতার মানুষের দরদী মনের অক্ষয়তার সাক্ষ্য বহন করে।

কলকাতার মন ঃ সত্যজিৎ রায়ের ছবি

অহস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বদেশের ও বিদেশের সচেতন সমালোচকের কাছে সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের চেহারা মোটামুটি স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। যদি আমরা একটা সময়ের হিশেবে দেখি তাহ'লে দেখা যাবে, যেমন ধরা যাক, 'দেবী' ছবিতে, আধুনিক যুগের প্রথম অধ্যায়ে, বা বাঙলা রেনেশাঁসের শুরুতে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ ছবির কাহিনী, মধ্যযুগীয় ঈশ্বর বিশ্বাসে নিরর্থক কুসংস্কারাচ্ছন্ন জমিদার কালীকিংকর স্বপ্নে তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী পুত্রবধূকে কালীমূর্তি রূপে দেখলেন। পুত্রবধূ দয়াময়ীর পক্ষে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে ভাগ্যের এই পরিহাসকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হলো। তার স্বামী কলকাতায় লোখাপড়া শেখা নব্য শিক্ষিত যুক্তিবোধসম্পন্ন মানসিকতায় পুষ্ট উমাপ্রসাদ, তাঁর জমিদার পিতা এবং স্ত্রীকে সংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে চাইলেন। দয়াময়ী কিন্তু প্রচলিত সংস্কার ও নিজের নির্দোষ, সুন্দর মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ল। এমন কি কলকাতায় স্বামীর সঙ্গে চলে যাওয়ার ব্যাপারেও তার দ্বৈধতা— সত্যই সে কি তার শ্বশুরের ধারনায় দেবী কালী স্বরূপিনী রূপে ধরায় অবতীর্ণা হয়েছে? উমাপ্রসাদ কিন্তু তাঁর পশ্চিমী এজ্ অফ রিজনের মানসিকতায় তৎকালীন কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। এবং সেই কারণেই সেদিনেব এই কলকাতা শহরে সংস্কারমুক্ত বিদ্যোৎসাহী শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের কাছে পরামর্শ নিতে এসেছিলেন। অবিশ্যি অতল অন্ধকারে নতুন চিন্তার আলোকে তাঁর এই পরিবেশকে পালটে দেবার সামর্থ ছিল না ; তবুও সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রচেষ্টা ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় পুষ্ট সেদিনের যুব সম্প্রদায়কে নতুন সমাজ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখা যায়। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী ঐতিহ্য এবং ইউরোপীয় সমাজতাত্ত্বিকদের ধারণাজাত যুক্তিবোধ মিলিয়ে একটি নতুন মানবিক বোধ সম্পন্ন সমাজ গঠনের পরিকল্পনা করেন। কারণ আধুনিক বলতে যা কিছু তার অনেকটাই ইউরোপ থেকে আমদানী। ওদেশে ফরাসী বিপ্লবের আগে ও পরে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে। মতেঁগ, রুশো, ভলতেয়ার, দিদেরো, ব্রাহে, কোপার্নিকাস, বেন্থাম, মিল, অ্যাডাম স্মিথের চিন্তাধারা এবং রচনাবলী সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক হয়েছিল।

সত্য চক্ষুষ্মান বলেই, এবং গোঁড়ামি শেষ কথা নয় বলেই একথা অস্বীকার করা যায় না, রামমোহন, বিদ্যাসাগর মশাই-এর চিন্তাধারায় এবং উৎসাহে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়। যদিও প্রতিকূল আবহাওয়া প্রবল ছিল।

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে 'চারুলতা' ছবিতে আধুনিক ইন্টেলেকচুয়াল

ভূপতি ও অমল এবং নতুন রুচিবোধসম্পন্ন পরিবারের গৃহিনীরূপে চারুলতাকে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখি। এই কাহিনী রবীন্দ্রনাথের অন্যতম আধুনিক রচনার নিদর্শন। ভূপতি তার সেন্টিনেল পত্রিকা এবং আধুনিক সমাজ রচনার পরিকল্পনায় ব্যস্ত; আর অমলের মানসতা সেদিনের যুগ চেতনায় আচ্ছন্ন, তথাকথিত ঐতিহ্য এবং প্রচল নিয়ম অতিক্রান্ত মননের আলোয় উদ্দীপ্ত। অমল ইয়ংবেঙ্গলের মডেল কিশোর। ভূপতি আত্মমগ্ন বলেই তাঁর উদাসীনতা চারুলতার নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি করে। নিঃসঙ্গ চারুলতার অলস সময়ের একটানা দুপুর কাটানো, ভূপতির ঔদাসীন্যের কারণে একটা অস্বস্তিকর দূরত্ব নির্মাণ করে। এই ব্যাপারটিকে গড়ে তুলতে পরিচালকের অসাধারণ ট্রিটমেন্ট মনে রাখার মতোঃ ভূপতির একটি বই নিয়ে অন্দরমহলে আসা এবং চলে যাওয়ার দৃশ্যে, ভূপতির চলে যাওয়ার দূরত্বকে চারুলতার অপেরা গ্লাশ দিয়ে দেখা, অসাধারণ প্রয়োগ নৈপুণ্যে উভয়ের সম্পর্কের দূরত্বকে দর্শক মানসে ফুটিয়ে তোলা এক চমৎকার দৃশ্য রচনা করা হয়েছে।

মন্দাকিনী চারুলতার নিছক সময় কাটানোর সঙ্গিনী মাত্র, কিন্তু চারুলতার সচেতন মনের জগতে অমলের হঠাৎ আবির্ভাব ঝড়ের মতোই । চারুলতা আর অমল উভয়েই মনের দর্পণে বিম্বিত ছবি হয়ে ওঠে ; দুজনে মানসিকতার প্রশান্ত মহাসাগরের নতুন দ্বীপ আবিষ্কারে মেতে যায়। মন্দাক্রান্ত সময়ের প্রবাহে চারুলতার স্তিমিত একঘেয়ে জীবন অনেকদিনের শূন্যতায় এমনই একটি দিনের প্রত্যাশায় ছিল। অমল তার মনোজগতে আবেগের জোয়ার আনল। অনতিপরে ভূপতি আবিস্কার করেন তাঁর ঔদাসীন্যের কারণে চারুর মনে অমলের অনুপ্রবেশ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। মন্দাকিনীর স্বামীর চক্রান্তে অর্থকরী বিপর্যয়ে, সমাজ হিতৈষী ভূপতি জানলেন তাঁর জন্যই একটি প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়েছে। এই দুঃসহ ট্রাজেডির কারণ তিনি নিজে। আত্মআবিস্কারে বুদ্ধিমতী চারুকে অমল মূর্তিময়ী নারী-রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অমলের রোমান্টিক চেতনা এবং প্রখর রুচিবোধ চারুর হৃদয় রহস্যকে জানতে সাহায্য করেছিল। কারণ অমল দেখত দূরকে আবিস্কার করার স্বপ্ন। রবীন্দ্রনাথের এই কাহিনীর পরিবেশ এবং তিনটি প্রধান চরিত্রের বিশ্লেষণ প্রাক্-বাঙলা রেনেশাঁসের যুগের অন্যতম সার্থক রূপায়ণ। আর যুগভাবনায় সমৃদ্ধ চিত্র পরিচালকের শিল্প চেতনা ছবিটিকে অনন্য সাধারণ করেছে, ধ্রুপদী করেছে।

আর 'সমাপ্তি'র নায়ক অমূল্য শহুরে পোষাকে—সক্স আর অক্সফোর্ড শু'তে, টেবিলে সাজানো নেপোলিয়নের পোর্ট্রেটে, ইংরেজি শিক্ষায়, ইয়ং বেঙ্গলের ফ্যাশন মডেল হয়ে ওঠে। আর অপুকে এই কালস্রোতে ইটারন্যাল ম্যান এক্সপ্লোরার বলে মনে হয়। 'পথের পাঁচালী'তে, অবাক বিস্ময়ে অপুর নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যাওয়া, কাশবনে দুর্গার সঙ্গে টেলিগ্রাফ পোস্টে কান পেতে শোনা, প্রথম রেলগাড়ি দেখা, বেনারসে আসা এবং সেখানে গঙ্গার ঘাটে ঘুরে বেড়ানো, হরিহরের মৃত্যুর পরে মনসাপোতায় ফিরে আসা এবং জীবিকার দায়ে পুরোহিতের কাজ করা, তারপরে ইস্কুলে যাওয়া—ছবির পরে ছবির সারি, নিপুণ হাতে আঁকা মানব দরদী শিল্পীর পরিচয় পাওয়া গেল।

অন্বেষণের নেশায় অপু যখন চোখের আড়ালে এমন একদিন সকালে সর্বজয়া যখন তাকে এখানে ওখানে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, দরজা খুলতেই দেখেন জুলুদের সাজে অপু 'হা-হা আফ্রিকা' বলে বাগানের কোনাকুনি অনেকদূরে মিলিয়ে গেল। পরবর্তী দৃশ্যেই হেডমাস্টার মহাশয় বড় অপুকে আহ্বান করছেন, তাকে গ্লোব এবং অনেক বই উপহার

দেওয়ার শেষে এমারসনের একটা বিখ্যাত উক্তি করেন। 'অপরাজিতে'র অপু কলেজে পড়তে, পুঁথির জগত গ্রাম ছেড়ে ছাপাখানার বিদেশি শহর কলকাতায় আসে। মায়ের মৃত্যুর পরে শেষ দৃশ্যের আগে রাত্রিবেলা ঘরের সামনে দাওয়ায় বসে পুকুরের জলে কালপুরুষের ছায়া দেখে তার দুঃখের ভার লাঘব হয়। অনুচ্চারিত সিদ্ধান্ত মনে রেখে ভোরবেলায় দুর্যোগের মেঘ মাথায় নিয়ে অপুর চলা শুরু হয়।

'রবীন্দ্রনাথ' ছবিতে কিশোর রবীন্দ্রনাথের ডালহৌসি পাহাড়ে প্রতিধ্বনি শোনার দৃশ্যে শিশু এবং কিশোর অপুর প্রকৃতি আর মানুষের চিরন্তন সম্পর্কের অনেকটা মিল পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপুকে, বিশেষ করে 'অপরাজিত' এবং 'অপুর সংসার' ছবিতে বাঙলার রেনেশাঁসের ধাঁচে তৈরী করেছিলেন। 'অপুর সংসার' ছবিতে, অপুর অপর্ণার সঙ্গে বিয়ে, অপর্ণার মৃত্যুতে মর্মান্তিক দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়া, সমাজ এবং মানুষ থেকে অনেক দূরে চলে এসে একান্তভাবে আত্মানুসন্ধান, একটা আত্মসংকোচ ভাব—কিছুটা যেন মেটাফিজিকাল সার্চের মতো। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে পাহাড়ের ওপর থেকে পাণ্ডুলিপির পাতা হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় সে। বন্ধু পুলু তাকে অনেকদিন পরে আবিষ্কার করে। তার কাছে ছেলে কাজলের কথা শুনে পিতৃত্বের স্নেহ অনুভব করে। এ যেন সমাজ এবং সভ্যতার কাছে ইন্টারন্যাল এক্সপ্লোরারের বিরাট দায়িত্ব। দুরন্ত কাজলকে ভুলিয়ে দু'হাতে কাছে টেনে নেয় অপু, তারপর কাজলকে কাঁধে তুলে অপু যাত্রা শুরু করে সভ্যতার ইতিহাস তৈরি করতে।

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি 'জলসাঘর' সামন্ত যুগের পতন এবং বাণিজ্যের প্রসারের কারণে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের ঘটনায় চিত্রিত। ক্ষয়িষ্ণু , সামন্ততন্ত্রের জমিতে শহর থেকে রাইজিং ক্যাপিটালিস্ট ক্লাসের আগমন হয়। এটি ইতিহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণের সময় যা একালের সামাজিক অর্থনেতিক কাঠামোকে এক নতুন চেহারা দেয়। পরিচালকের অপর ছবির উনিশ শতকের নায়কদের থেকে একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্র বিশ্বম্ভর রায়ের, যিনি সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য এবং পুরোনো কার্পেটের কারুকার্যের মতো রুচি এবং মেজাজ নিয়ে, স্ত্রী-পুত্রের নৌকাডুবিতে মৃত্যুর দুঃখবহ স্মৃতিচারণায় বংশের শেষ প্রদীপের মতো অপেক্ষা করেন। তাঁর পক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধ দিয়ে এই পরিবর্তনকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। একটি দৃশ্যে লঙ্ শটে উঠতি বড়োলোকটির লরি ধুলো উড়িয়ে জমিদারের হাতিকে ঢেকে দিয়ে দ্রুতগতিতে চলে যেতে দেখা যায়। ছাদের ওপর থেকে বিশ্বম্ভর রায় ঘটনাটিকে প্রত্যক্ষ করেন।

ভিসকন্তির ছবি 'লেপার্ড'-এর বিদ্যোৎসাহী নায়ক কাউন্ট কিন্তু ইতিহাসের এই নিশ্চিত পরিবর্তনকে তাঁর যুক্তিবোধ দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের বিপ্লব এবং বুর্জোয়া অর্থনৈতিক কাঠামোয় বাণিজ্য প্রসারের কারণে, বিত্তবান শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে ডন ক্যালোজেরোরা প্রচুর অর্থ উপার্জনের ভিত্তিতে স্টেটাস দাবি করেন। এ কাহিনীর কাউন্ট তাঁর রুচি এবং মেজাজ ছাড়তে পারেন নি। তাই নতুন সিনেটের সভ্য পদের আমন্ত্রণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল। সম্ভবত তাঁর বহুদিনের অভ্যাস এবং পরিবেশ ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু নতুন সরকারকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। একটি দৃশ্যে সারারাত ব্যাপী বল নাচের জমজমাট অনুষ্ঠান দেখা যায়। সেদিন উঠতি বড়োলোকটিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাত্রিশেষে একটি বিরাট অয়েল

পেন্টিং-এর সামনে এসে কাউন্টের মৃত্যুর কথা মনে আসে। ইনএভিটেবিলিটিকে মেনে নিয়ে শুধু অপেক্ষা করে যাওয়া। ক্রমশ ভোর হয়ে আসে, তিনি পথে বেরিয়ে পড়েন। এক রকমের রিলিজিও-মেটাফিজিক্যাল স্তরে নিজের মতো করে জীবনের অর্থ খুঁজে পান।

জলসাঘরে বিশ্বম্ভর রায়, ধনী ব্যক্তিটির তাঁর ওপরে টেক্কা দেওয়া সহ্য করতে না পেরে নিজের শেষ সম্বল দিয়ে সারা রাতের এক জলসার আয়োজন করেন। ভোরের আলোয় রাজকীয় সাজে তিনি ঘোড়ার পিঠে চেপে মৃত্যু পথে যাত্রার সওয়ার হলেন। ঘোড়ার রাশ তিনি টেনে রাখতে পারলেন না। পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হলো। মাথার পাগড়ি ধুলোয় গড়িয়ে পড়ে। রাইজিং ক্যাপিটালিস্ট ক্লাসের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি সম্প্রদায় নিজের সুবিধা মতো গড়ে নিল — 'পরশপাথর' ছবিতে একুইজিটিভ সোসাইটির অন্তহীন লোভের পরিমাণ ও স্টেটাস নিয়ে সুতীব্র এক স্যাটায়ার রচনা করা হয়েছে। কোনো তথাকথিত সেন্টিমেন্টকে আশ্রয় না করে অথচ সমস্ত ছবিতে পরেশবাবুর একটা বিশিষ্ট মেলানকলিকে ফুটিয়ে তুলতে এমন দক্ষতা সত্যিই অবিস্মরণীয়।

ছবির আরম্ভ পরেশবাবুকে ফেলে রেখে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে লিফট্‌টি চলে যায়। অপর আরো অনেকের মতো তিনি চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছেন। বিকেলের ডালহৌসি স্কোয়ার—দম দেওয়া পুতুল মানুষ চলেছে। জমাট মেঘ ঝরে বৃষ্টি আসে। ফুটো ছাতা খুলে পরেশবাবু কার্জন পার্কের ছাউনির নিচে আশ্রয় নেন। বৃষ্টির জলে পরশপাথর গড়িয়ে পড়ে। সেটি সংগ্রহ করে তিনি যাতেই ছোঁয়ান লোহা সোনায় পরিণত হয়। দরিদ্র অপুত্রক পরেশবাবু আহ্লাদে আটখানা। ট্যাক্সি চড়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দিবাস্বপ্ন দেখেন। রাতারাতি তিনি দেশনেতা সাংস্কৃতিক ধারক দানবীর মহাপ্রাণ পরেশ দত্তয় পরিণত হন। শেয়ার বাজার এবং ককটেল পার্টির দৃশ্যে সমাজের উপর তলার মানুষদের এক ব্যঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পরিচালক যথেষ্ট মুনশিআনার পরিচয় দিয়েছেন। পরেশবাবু এবং তাঁর স্ত্রী এ শহরে সব চেয়ে নিরীহ এবং নির্দোষ মানুষ, যারা শুধু একটু সুখের গ্যারান্টি নিয়ে ভেংচে থাকতে চান। সেক্রেটারির পাথর খেয়ে ফেলা, পরেশবাবুর পুলিশ স্টেসনে স্বীকারোক্তি এবং সেখানে সমস্ত কিছু মিটে যাওয়ার পরে তাঁর স্ত্রীর একগাল সোয়াস্তির হাসি, নিটোল দৃশ্য রচনায় অভিনব।

'অভিযান' ছবিতে রাজপুত বংশজাত নরসিং জীবন ধারণের দায়ে একজন অর্থলোভী মানুষের কবল থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টায় সংগ্রামী। চারদিকের একটু সাদা দেওয়াল, সবুজ জানালার একটু নিরাপত্তার জীবন পাওয়া তার একমাত্র আকাঙক্ষা। অবিশ্যি শেষাবধি সে তার রাজপুত নস্টালজিয়া দিয়ে রূপকথার রাজপুত্রের মতো অপহৃতা নায়িকাকে উদ্ধার করে।

উনিশ শতকেব নবজাগরণের প্রভাব পুরোনো কলকাতার বেশ কিছু বনেদী পরিবারের প্রচলিত নিছক ধারণা বা অজ্ঞতাকে পালটে দিতে পারে নি। তারা চিৎপুর কিংবা নতুন বাজারের বাড়িগুলির মত তেমনিভাবেই রয়ে গেছে। পুরোনো কলকাতার এই বনেদী সম্প্রদায় সে সময় ইংরেজির প্রভাবে ভিক্টোরিয়ান ভাবধারার সঙ্গে ভাটপাড়ার নীতিবোধের একটা সমন্বয় করেছিলেন। এই সমাজের মানুষেরা কালের পটপরিবর্তনে

'মহাপুরুষ' ছবির কর্তা হয়ে ওঠেন। কারণ মহাপুরুষের মতো ভন্ড সাধুর আবির্ভাব, এঁদেরই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আসে। পুরোনো কলকাতার বনেদী এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানসিকতার আজও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। অবশ্য একালের এই মানুষেরা একটা দোটানার মধ্যে পড়ে গেছেন। কারণ সচেতন মনের অভাবে তাঁরা নিজেদের মতো করে কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছেন না। কেমন একটা ধোঁয়াটে স্ট্যাগন্যান্ট অবস্থা প্রাপ্তি ঘটেছে।

সংসারে আর্থিক সচ্ছলতার অভাবের জন্য মোটামুটি রক্ষণশীল পরিবারের বউ আরতিকে মহানগরের পথে চাকরি করতে বের হতে হয়েছিল। চাকরির জীবনে নতুন পরিবেশ, এডিথ নামে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটির সঙ্গে তার ঘনিষ্টতা, নানান মানুষের সংস্পর্শে আসার অভিজ্ঞতা, তাঁর আর্থিক স্বাধীনতা, সমস্ত কিছু মিলিয়ে সে শুধু মাত্র সেদিনের ঘরের বউ আরতি ছিল না, আর এক নতুন ব্যক্তিত্বে নিজেকে আবিষ্কার করেছিল। শুধু নিজেকে সেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয় নি, অনেক উদার করেছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আরতি, তার এ্যাংলো ইন্ডিয়ান বন্ধুটির অসুখে তার বাড়িতে যাওয়া, তার প্রতি সমবেদনা দেখানো, এমনকি অন্যায় ভাবে মেয়েটিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করায়, ভীষণ প্রতিবাদে নিজে চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়। আরতির এই জেশ্চারকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার পক্ষে একটা লজিক্যাল ডেভেলাপমেন্টের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা আরতির চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশ, যা তার গৃহবধূর আড়ষ্টতাকে কাটিয়ে সহজ সচেতন করেছিল। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আরতি তার আর্থিক স্বাধীনতা হারালো। হয়তো সে আবার একটা চাকরি পেয়ে যাবে; আবার তাকে অনেক ইন্টারভিউ দিতে হবে। কিন্তু একটা ভীষণ অন্যায় সিস্টেমের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানাতে পারলো। যে সিস্টেমে টেবিলের ওপার থেকে বস মেয়েটিকে বরখাস্ত করতে পারে, টেবিলের এ পার থেকে আরতির মত তো কেউ এ ধরনের এত মহৎ, এত মানবিক প্রতিবাদে অন্যায় সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, তা' যথেষ্ট মূল্যবান।

করুণা তার অস্বস্তি অবসানের প্রত্যাশায় হঠাৎ এক রাত্রে অমিতাভের কাছে এসেছিল। কিন্তু সমস্যার সপক্ষে ও বিপক্ষে বা আজকের জীবনে বাস্তবিক নিরাপত্তার অভাবে, অল্পবিস্তর রোম্যান্টিক আত্মসচেতন যুবক অমিতাভের কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। এই পরিস্থিতিতে অমিতাভের এ ধরনের জেশ্চারকে স্বার্থপরতা ছাড়া কিছুই বলা যায় না। 'কাপুরুষ' ছবির শুরুর কিছু পরেই খুবই আকস্মিকভাবে অমিতাভের পূর্ব প্রণয়ী বর্তমান চা-বাগানের ম্যানেজার স্ত্রী করুণার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, করুণা ম্যানেজার স্বামীর পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছে। তার পেশেন্স খেলা, রেডিওগ্রামে চিত্রাঙ্গদার রেকর্ড শোনা, নিখুঁতভাবে সাজানো দালানে বসে বই পড়া ইত্যাদি, প্রতিদিনের গড়ে তোলা পরিণত অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। অমিতাভের উপস্থিতি তার কোনো কিছুই পালটাতে পারলো না। সে সম্পূর্ণ ডিসইল্যুশনড্। রোম্যান্টিক এবং মধ্যবিত্তিয় ধারণায় তৈরী অমিতাভকে জলপাইগুড়ির বাংলো, ম্যানেজার স্বামীর উপস্থিতি, মোটর ভ্রমণ (এই সমস্ত পরিবেশে নানানভাবে করুণা নিজেকে দেখালো) ইত্যাদি দৃশ্যগুলি সেদিনের স্মৃতি রোমন্থন করা ছাড়া যেন আর কিছু নয়। বাঙলা রেনেশাঁসের চিন্তাধারা, সূক্ষ্ম বারোক মানসিকতার চরিত্র উমাপ্রসাদ, অমল, অপু বেশ অনেকদিন

হলো অদৃশ্য হয়েছে। আজকের যুব সম্প্রদায় থেকে তারা অনেক দূরে, ইতিহাস কিংবা কোনো মধ্যযুগীয় লেজেন্ডারি ফিগারে পরিণত হয়েছে।

কোন বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অসুস্থ অর্থনৈতিক অবস্থা, পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক রাহাজানি, আত্মক্ষমতা প্রচারকল্পে পারমাণবিক বিস্ফোরণ সমস্ত আবহাওয়া দূষিত করে তুলেছে। আজকের মানুষের অস্বস্তির অন্যতম কারণ সে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। নানান ধরনের কৃত্রিম পুরুষ মহিলা বেড়াতে এসেছে যাদের কাছে দার্জিলিং-এর প্রকৃতি রেলওয়ে পোস্টার বা ডাক পোস্টকার্ডের থেকে বেশি কিছু নয়। প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সূত্রটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন পক্ষী সন্ধানী। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে মধ্যবিত্ত গ্র্যাজুয়েট ছেলেটির তার অতীতের জন্য কোনো নষ্টালজিয়া নেই। কোনো রোমান্টিক আইডিয়াল নেই। সে আজকের চিন্তাধারায় পুষ্ট । অতি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও রায় বাহাদুরের চাকরি সে প্রত্যাখ্যান করে। কলকাতার মানুষ বলেই অনেক ভিড় আর বাস্তবতার মধ্যে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলে। সম্ভবত সেই কারণেই রায় বাহাদুর পরিবারের কয়েকজন কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে দার্জিলিং-এর পরিবেশে নিজেদের জমাট বাঁধা অস্বস্তি থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

রায় বাহাদুরের স্ত্রী এতদিন পরে উপলব্ধি করেন যে এ পরিবারে তিনি অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত। তার বড়ো মেয়ের দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার জন্য, ছোট মেয়েকে তিনি নিজের পছন্দ মতো পাত্র নির্ধারিত করতে বলেন। দার্জিলিং-এর ছুটি কাটানো শৌখিন নারী পুরুষের ভিড় থেকে নিরিবিলিতে রায় বাহাদুরের ছোটো মেয়ে মনীষা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই গ্র্যাজুয়েট ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে। কোথায় যেন একটা মানসিক সঙ্গতি খুঁজে পায়। বিলেত-ফেরত ব্যানার্জীর প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করে। আজকের জীবনে কিন্তু সিকিউরিটির প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। দার্জিলিং-এর অনন্য সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশে তা বোঝা যায় না। কলকাতায় ফিরে গেলেই বোঝা যায় যে একমাত্র আর্থিক নিরাপত্তা ছাড়া সমস্ত কিছুই মূল্যহীন। গ্র্যাজুয়েট ছেলেটির ভবিষ্যতে মনীষার সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকবে কিনা বা কলকাতায় আবার দেখা হবে কিনা, এ সম্পর্কে সে কোন আশা পোষণ করে না। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে আত্মিক সংকটের শিকার সকলেই। নিজেদের জীবনের জটিলতায় তারা ঘুরছে, তাই কুয়াশামুক্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সুযোগ কারো হয় না। কিন্তু সরলতার প্রতীক নেপালী ছেলেটি তার হাসি গানে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে। রায় বাহাদুরের সাম্রাজ্যের সূর্য তখন অস্তমিত। চীৎকার করে ডাকলেও নিজের জনকে কাকেও কাছে পান না।

টেকনোলজিক্যাল প্রগতির অবদান কনজুমার সোসাইটি আর তার এ্যাডভ্যার্টাইজিং এর মেক-বিলিভ নারকটিকের কাছে মানুষ শুধু একরকম শিকারই নয়। নিজেই একরকম হৃদয়হীন যন্ত্র আর চলচ্চিত্র শিল্পের বেশির ভাগটাই নারকটিকের অন্যতম ম্যানুফ্যাকচারার। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের ম্যাগনেটের উৎপাদন যন্ত্র হলো ম্যাটিনি আইডল, সে দর্শকদের জন্য মেক-বিলিভ নারকোটিক তৈরি করে। পরোক্ষভাবে যাকে দর্শকেরা তাদের দিবা স্বপ্ন দিয়ে তৈরি করে। দর্শক সমাজ হচ্ছে মাদক নেশাক্রান্ত জনতা। এয়ারকণ্ডিশনার, ফ্রিজ, অটোমোবিল, ডানলোপিলো এই সমস্ত কিছুর মতো ম্যাটিনি আইডল কনজুমার গুড্‌স্‌ প্রচুর ঐশ্বর্যলাভ করেও ম্যাটিনি আইডল শুধু মাত্র একটা

কমোডিটি। পাড়ায় মোশান মাস্টার শংকরদার কাছে তালিম নিয়ে শখের অভিনয় করত যে অরিন্দম, কেমন করে কনজুমার গুড্‌স ম্যাটিনি আইডল হয়ে গেল।

সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবির কাহিনী একালের সমাজতাত্ত্বিকের এফরিজিমের অভিধান বলা যায়। ছবির ক্রেডিট আরম্ভ হয়, কতকগুলি কালো হরাইজেনটাল, ভার্টিক্যাল বর্ডার দিয়ে; এরপর চিরুনির দাঁড়, পেছন দিক থেকে মাথা আঁচড়াচ্ছে, তারপরে শরীরের অংশকে খণ্ডভাবে দেখানো হলো। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রেলের প্রথম শ্রেণীর রেকট্যাঙ্গুলার কামরা আজকের এয়ার কণ্ডিশন নাইট মেয়ার। শহরের সমস্ত সমাজ ঐ দিল্লীগামী ট্রেনের মধ্যে। একজন শিল্পপতি স্ত্রী-কন্যা নিয়ে চলেছেন, সস্ত্রীক এ্যাডভার্টাইজিং এজেন্ট যিনি সোস্যাল ক্লাইম্বার হবার উদগ্র বাসনায় ব্যবসার বিশেষ টেকনিক্যাল নো-হাউ অনুযায়ী স্ত্রীকে নানানভাবে বোঝান শিল্পপতির ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য, এক বেশি বক্তার রক্ষণশীল বৃদ্ধ ভদ্রলোক, এক অখ্যাত ধর্মীয় মতের স্বামীজী যার সারাক্ষণ আপেল খাওয়া আর গলায় স্প্রে করা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজ নেই। ভেস্টিবিউলের আর একটি কামরায় মধ্যবিত্ত স্বামী-স্ত্রী; স্ত্রী ভদ্রমহিলা নায়ক অরিন্দমের ভীষণ ফ্যান, আধুনিকা কাগজের সম্পাদিকা অদিতি সেনগুপ্ত প্রভৃতি যাত্রীরা এই ছবির চরিত্র। অদিতির সঙ্গে অরিন্দমের পরিচয় হয় নায়কের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। পাণ্ডববর্জিত ছোট্ট স্টেশন খান্নানে হঠাৎ গাড়ী থেমে যায়। নায়ক অরিন্দম একটু স্বাভাবিক হওয়ার সুযোগ পায়।

একটুখানির জন্য ভীষণ ভালো লাগে এই গ্রাম্য পরিবেশ, নির্জন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে চা খেতে। কিন্তু আবার সেই কাঁচের জানালা, ডাইনিং কার থেকে কাঁটা চামচ হাতে অদিতি হাত নেড়ে ডাকে। নায়ক তার সাক্ষাৎকারে কেমন করে নায়ক হলো অর্থাৎ কনজুমার সোসাইটির গুড্‌সএ পরিবর্তিত হলো বলতে গিয়ে অতীতের স্মৃতি চারণা করে, তার হৃদয়ের বিরাট শূন্যতা জনিত ভীষণ নিঃসঙ্গতার কাহিনী বলে। শিল্পপতি প্রচুর মদ্যপানের পর মাঝ-বৃদ্ধ বয়সেও অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্ট ভদ্রলোকের তরুণী স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাবার লোভে শিকার খোঁজার মতো ভেস্টিবিউলের করিডরে অপেক্ষা করেন এবং এ বিষয়ে এজেন্ট ভদ্রলোকও তৎপর হয়ে ওঠেন। শিল্পপতির স্ত্রী তাঁর রুগ্ন মেয়েকে নিয়ে ট্রেনের কামরায় নিশি যাপন করেন। ঘুমের মাঝে অরিন্দম দুঃস্বপ্ন দেখে অনেক কারেন্সি নোটের সমুদ্রে সে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে, যে দিকে চায় শুধু কংকালের হাতে ধরা টেলিফোন, বেজে চলেছে। হাত বাড়ালে ছোয়া যায় না। হরিবোলের শব্দ শোনা যায় এবং মৃত শংকরদাকে দেখা যায়। ননকম্যুনিকেশনের এই স্বপ্ন দৃশ্য সুর-রিয়ালিজমের শৈলীতে রচিত।

আরো একটি স্বপ্ন দৃশ্য ঃ স্টেশনে ট্রেন ছাড়ার ঘোষণা, চকখড়ির লাইন ধরে অরিন্দমের এগিয়ে যাওয়া, সিনেমার শ্যুটিং জোন, মরা গাছ, তারই মাঝে প্রণয় দৃশ্যের লুকোচুরি খেলা। এরপরে বাগানের ধারে শাদা বন্ধ দরজা। দরজা ঠেলতেই রাত বারোটার ঘড়ি বাজার শব্দ। একটা ককটেল পার্টিতে অনেকেই উপস্থিত রয়েছে, প্রত্যেকের চোখেই কালো চশমা। সকলেই ঘুরে বসে। আর অরিন্দম প্রহৃত হয়।

দিল্লির স্টেশনে সকালে ট্রেন থামে অরিন্দম নামে, চোখে কালো চশমা পরে। ফুলের মালা আর প্রেস ফটোগ্রাফারের ভিড়ে তাকে সেই মাপা হাসি হাসতে হয়। সে

দেখে অদিতিকে। অপেক্ষমান প্রৌঢ় ভদ্রলোককে প্রণাম করে অদিতি তার সঙ্গে এগিয়ে যায়। এই ট্রেন থেকে, এই ভিসিয়াস সার্কেল থেকে অরিন্দমের এ জীবনে মুক্তি পাওয়ার কোনো পথ নেই। আজকের কলকাতার মানুষ মেট্রোপলিটান সময় দিয়ে ভাগ করা যান্ত্রিক জনতায় পরিণত হয়েছে। সাপ্তাহিক ছুটি কাটানোও একটা প্রচলিত নিয়ম হয়ে গেছে। আর জনতা থেকে ব্যক্তি মাঝে মধ্যে বেরিয়ে এসে ভীষণ নিঃসঙ্গতার অসহ্য স্নায়বিক অস্বস্তি বোধ করে। সচেতন ব্যক্তি বুঝতে পারে তার আত্মিক শূন্যতা, তার হৃদয়হীনতা। স্টেটাস অনুযায়ী শেয়ার বাজারের দরে মানুষের দর ওঠা নামা করে। শুধু শহরের সময় ও অর্থজনিত স্টেটাসের মূল্য আছে, আর সমস্ত কিছুই মূল্যহীন।

একালের প্রেম এবং বন্ধুত্বের সম্পর্কের জটিলতা হরির মতো মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিতে চৌকশ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের তপতীর সফিস্টিকেটেড মানসিকতাকে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। হয়তো হরির ক্রিকেট খেলার ভঙ্গি কোন বিশেষ পরিবেশে তার প্রতি তপতীর মন আকৃষ্ট করেছিল। হরির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে কোনো 'র‍্যাপোর্ট' তপতী খুঁজে পায়; তার পাঁচ পাতার চিঠির উত্তর হরি তার মতো করে এক পাতায় লিখে জানায়। তপতী হরির সম্পর্ককে আর চালিয়ে নিয়ে যেতে চায় না। সে একটা নিষ্পত্তি চায়। কারণ রুচি এবং প্রকৃতির দিক থেকে তাদের মধ্যে ভীষণ তফাৎ রয়ে গেছে। হরির মধ্যে একটা আদিম সতেজতা আছে। আজকের জীবনে সে ভীষণভাবে বেমানান। ততার বন্ধুর কথায় সে শুধু স্ট্রেট ব্যাটে খেলে। এই জটিলতার কোনো অর্থোদ্ধার করতে না পেরে সে ভীষণ ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ। ছবিতে তাকে অনেক সময়ে হাস্যকরভাবে ঝিমোতে বা ঘুমোতে দেখা যায়, ওটা বোধহয় তার এইসব জটিল চিন্তাধারা থেকে রেহাই পাবার ইঙ্গিত। অসীম, সঞ্জয়, হরি — এরা সকলেই আজকের নাগরিক জীবনের শিকার। শহর থেকে পালিয়ে তারা নিজেদেরি মতো করে কয়েকদিন ছুটি কাটাতে পালামৌ বনাঞ্চলের একটা বাংলোর সামনে এসে থামে। এখানেও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সামনের নোটিশ বোর্ডে লেখা ঃ এখানে থাকতে হলে ডি-এফ-ও'র অনুমতি প্রয়োজন। অথরিটি তার জাল বিস্তার করে রেখে দিয়েছে। আমাদের সমাজে যে সিস্টেমে অসীম চৌকিদারকে দুটো দশ টাকার নোট ঘুষ দিয়ে বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা করে নেয়, ঠিক সেই সিস্টেমই চৌকিদারকে টাকা নিতে বাধ্য করায়। এই ব্যবস্থাকে সঞ্জয়ের মৃদুস্বরে মন্তব্য, Thank God for Corruption বলে পরিহাস করা যায় মাত্র। কোম্পানী একজিকিউটিভ অসীম, সঞ্জয় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার; একালের আর্কিটাইপ। এক সময়ে যারা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতে ষোলো ঘন্টার বেশি পরিশ্রম করতো, সঞ্জয়ের কাছে সেদিনের স্মৃতি তাই আজকের একমাত্র সান্ত্বনা। সে বলে, তাদের মনোনীত লেখা ছাড়া অন্য কোনো বাজে লেখা কখনও ছাপেনি। ভোগক্লান্ত, আত্মম্ভরী অসীমের কাছে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনের কোনো দাম আছে কিনা, বেঁচে থাকার যুক্তিপূর্ণ অর্থ ছাড়া জীবনের আয়ু বাড়ানোর আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কিনা, এইসব চিন্তা তাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়।

সন্ধ্যেবেলা ভাঁটিখানার দৃশ্যে অসীম, হরি, সঞ্জয় মদ্যপান করছে। ধূসর আকাশ দৃশ্যে চারদিকে ঘন অন্ধকার নেমেছে। পর্দার বাঁ দিক জুড়ে কালো অন্ধকারের মধ্যে একটা মাল গাড়ি চলে যায়। তার ফলে দৃশ্যটিতে একটা বিশেষ ম্যুড তৈরী হয়। তারা

যেন আর একটি পরিবেশে স্থানান্তরিত হয়। অসীমকে বলতে শোনা যায়, What a life! ফ্ল্যাশ ব্যাকে একটা নরম আলোয় এক ককটেল পার্টির দৃশ্যে অসীমকে দেখা যায়। একটি মেয়ের প্রোফাইলের সামনে আলাপরত অসীম, আর চারপাশে নানান গ্রামে ফিস্‌ফাস গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। ফ্ল্যাশ ব্যাক শেষ হলে, আবার অসীমের মুখ, ভাঁটিখানা আর তার পরিবেশ ফুটে ওঠে।

মহানগরের যান্ত্রিক আবর্তনে সকলেই ঘুরছে। পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, ভালবাসা কিছুই এখানে নেই। নিদারুণ বিচ্ছিন্নতায় প্রতিজনে এক একটি নির্জন দ্বীপের মতো। তাই নগরের ফসল চার মানবক রাত্রির অন্ধকারে বন পথ মাড়িয়ে ফেরে। দারুণ মত্ত অবস্থা তাদের, জড়িত কণ্ঠস্বরে গান গায় তারা, সারে জঁহাসে আচ্ছা। প্রেম এবং বন্ধুত্বের প্রচলিত সম্পর্কগুলি আজকের জেনারেশনের কাছে, কোনো মূল্যবোধের নিরিখে স্থিতিলাভ করে না। কারণ সত্যের ধারণা বড়ো বেশি চোখের এবং কানের ওপরে নির্ভরশীল। আর এইসব কারণেই অস্বস্তি এবং উন্মত্ততা বেড়ে গেছে। এলিঅটের কথায় ফাঁপা মানুষের চেহারা যেন প্রকট হয়ে উঠেছে।

সদাশিব ত্রিপাঠির কটেজে অপর্ণার পোষাক বিচিত্র। সে 'দুইবোন' পড়ে আবার ওয়েষ্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট খেলার রেজাল্টও বলে। সদাশিবের কথায়, তার কোন দিকে উৎসাহ, তিনি বোঝেন না। অপর্ণার পিছনে চলে অসীম বাগানের আর এক প্রান্তে কাঠের সেতু পেরিয়ে, অপর্ণার মেডিটেশান ঘরে পৌঁছয়।

অসীম যখন ঘরের মধ্যে পেঙ্গুইন মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস, সারভাইভ্যাল অফ গড্‌স ইন দি সায়েন্টিফিক এজ, আগাথা ক্রিষ্টি প্রমুখের বইয়ের সংগ্রহ এবং ইতঃস্তত ছড়ানো বিটল্‌স, জোয়ান বায়েজ, বিলায়েত এবং মোৎসার্টের রেকর্ডের বিচিত্র সমাবেশ দেখে, তখন চোখের কালো চশমা খুলে, বনাঞ্চলের দিকে মুখ ফিরিয়ে, অপর্ণাকে গুন গুন করে গাইতে শোনা যায়, 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ।' অপর্ণা আজকের লস্ট জেনারেশনের চরিত্র। তাকে ঠিক বোঝা যায় না। সে নিজেও নিজেকে বুঝে উঠতে পারে না।

বর্তমান জীবনে সদাশিব ত্রিপাঠি খানিকটা রিজাইন্‌ড। তাঁর অতীতকে জানা যায় না। নাতি টুবলুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বেশি। আর প্রাণোজ্জ্বল বধূ জয়া। অপর্ণা আর জয়া চরিত্র দুটিকে পরিচালক চমৎকারভাবে পরিচিত করেছেন। চার বন্ধু যখন সদাশিব ত্রিপাঠীর কটেজের সামনে উপস্থিত, তখন জয়া এবং অপর্ণা ব্যাডমিন্টন খেলছে। জালের আড়ালে অপর্ণার মুখ দেখা যায় এবং জয়ার মুখ জালের বাইরে রৌদ্রালোকিত।

মেমারি গেমের দৃশ্যে প্রত্যেকের মনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় সামাজিকতার দিক থেকে। সঞ্জয় বাঙালি মধ্যবিত্ত, লেবার ওয়েল ফেয়ার অফিসর। এই সিস্‌টেমের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও মনে মনে সে বৈপ্লবিক আশা পোষণ করে বা তার বন্ধুদের কাছে অন্য ধারণায় নিজেকে হাজির করতে চায় — এরকমের কোনো কারণেই মার্কস, মাও-সে-তুঙ-এর নাম বলে। মেমারি গেমে পালা পরিবর্তনে একরকম জোর করে বসানো হরিকে হেলেনের নাম বলার পরে চলে যেতে দেখি। বোধহয় ওকে খানিক সহজ হবার জন্যই অপর্ণা ডন ব্র্যাডম্যানের নাম বলে। এই খেলাটির কিছুক্ষণ আগে অসীমকে অপর্ণার কটেজের ব্যালকনি থেকে হাত বাড়িয়ে 'It is the east. Jullett is the

sun' বলতে, মেমারি গেমে শেক্সপীয়রের নাম বলতে শোনা যায়। নাম বলতে অসীমের শিল্পসাহিত্যের প্রতি আসক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খুব সুন্দর, লাবণ্যে উজ্জ্বল এক মহিলা রূপে জয়াকে ছবিতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের নাম বলেই সে খেলা শুরু করে। জয়ার প্রতি সঞ্জয়ের আকর্ষণ মৃদু ও অনুচ্চারিত। আলস্যে গা ঢেলে দেওয়ার কারণে, তার বাংলো থেকে বালিশ আনতে যাওয়া, গুন গুন সুরে 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' গাওয়া এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার চুলটা ঠিক করে নেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ। অসীম তার স্মার্টনেস বজায় রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত মেমারি গেমে সারেণ্ডার করে। মেলার দৃশ্যে চার বন্ধু আলাদা হয়ে যাওয়া জয়ার সঙ্গে সঞ্জয় এবং অপর্ণার সঙ্গে অসীমকে ঘুরে বেড়াতে দেখি। নিজের আনন্দে শেখর জুয়ার আসরে জমে ওঠে।

'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে, বহিরঙ্গ চেহারায় অরণ্যের ছবি নেই বললেই চলে এবং এই ব্যাপারটিকে প্রকট করে তোলার ব্যাপারেও পরিচালকের কোনো ইচ্ছেই ছিল না। এই ছবির চরিত্রদের মনের মধ্যে Bulls eye lantern -এর মতো বা হঠাৎ একরাশ আলোকপাতে মনের কোনো ল্যাণ্ডস্কেপকে যেন প্রত্যক্ষ করায়। আর তা'ছাড়া অরণ্য তার অরণ্যত্ব ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। শহরের যত কিছু বিষ আর জটিলতা অরণ্যে অনুপ্রবেশ করছে। অটোমবিল, ট্রানজিস্টর, রেকর্ডপ্লেয়ার সব কিছুই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে খান্ খান্ করে দিতে চাইছে।

বাড়ির দূরত্ব প্রসঙ্গে সঞ্জয়কে যখনি জয়া বলে ঃ আমার পুত্র মশায় — সংলাপটি জয়ার চরিত্রকে যথেষ্টভাবে প্রকাশিত করে। একটি দৃশ্যে, সন্ধ্যের আলো আঁধারিতে জয়া আর সঞ্জয় পাশাপাশি হাঁটছে। পশ্চাদভূমিতে ঘন ধূসর আকাশ, নিস্পত্র গাছগুলি এমনই ভাবে স্থানটুকুতে মিলে রয়েছে, পোস্ট-এক্সপ্রেশানিষ্ট পেন্টিং-এর মতো এই নিস্তব্ধ পরিবেশে জয়ার দম আটকে আসে। মেলায় সাঁওতালী গয়না কেনা আর সঞ্জয়ের সঙ্গে কটেজে ফিরে এসে, সন্ধ্যেবেলা তার সামনে নিজেকে সাজিয়ে এনে দাঁড় করানো সমস্তটাই জমাটবাঁধা অন্তর বেদনা, একটু সমবেদনার আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা। তার স্বামী বিলেতে আত্মহত্যা করেছে, কোনো কারণ তার জানা যায়নি, তার ধারণা মতো, স্বামীর হয়তো অন্য কেউ ছিল। সঞ্জয়ের বিস্ময় এবং ভয় তাকে নার্ভাস করেছিল। পরিস্থিতির এই হঠাৎ পরিবর্তনে তার প্রস্তুতি যেমন কিছু ছিল না, কিছু করারও ছিল না।

বাইরে আলো কমে আসছে, দিগন্ত বিস্তৃত শূন্য প্রান্তরে একটা নিস্পত্র গাছের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম আর অপর্ণা। আহত আত্মসম্মান, চৌকিদারের চাকরির ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ববোধ ইত্যাদি নিয়ে তাদের মানসিকতা ভারী হয়ে ওঠে। শিশুর কান্নায় তারা যখন চৌকিদারের ঘরের জানালার সামনে আসে ঘরের মধ্যে একটা জমাট বাঁধা অন্ধকারে, অনেকগুলি ছেলেমেয়ের জননী চৌকিদারের স্ত্রীকে অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। এরপরে যখন ক্যামেরা ঘরের মধ্যে আসে, জানালার গরাদের সামনে অসীম আর অপর্ণাকে দেখানো হয়। তাদের যাতনায় তারা বন্দী। আবার নিজেদের সাজানো সমাজে ফিরে যাওয়ার পালা, বেরিয়ে আসার পথ নেই। ফিরে দাঁড়িয়ে পথ চলা, অনতিদূরের বনাঞ্চলে যুগল হরিণ লাফিয়ে চলে যায়। রুক্ষ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে অসীমের চেষ্টা সত্ত্বেও দু'জনের সম্পর্কের একটা মানসিক সঙ্গতির নির্মাণ সম্ভব হয় না। শেষ পর্যন্ত কাগজ না থাকায় কারেন্সি নোটের ওপর অপর্ণা তার টেলিফোন নাম্বার লিখে

দেয়। এই প্রসঙ্গে মার্কস-এর একটা কথা মনে পড়ে যায় ঃ 'every thing is related to cash nexus.'

সাঁওতালী মেয়ে দুলি এ ছবিতে ভাস্কর্যের ভঙ্গিমায় দৃশ্যমান। দারিদ্র তার সরলতা, বিস্ময়কে আহত করতে পারেনি। সভ্যতার গিলোটিন থেকে এখনো সে মুক্ত। তার আদিম সতেজতার আকর্ষণ কম ছিল না। মুগ্ধ হরি তার শরীরের সান্নিধ্যে তৃপ্তি খোঁজে। বনের মেয়ে দুলি রিজেনারেশনের কাহিনী শোনায়। দুলির স্বামী কাঠ কাটতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা যায়। তার ধারণা, সে হয়তো এতোদিনে কার ঘরে খোকা হয়ে জন্মেছে। কিন্তু হরির সে কথা শোনার মন নেই। সে শহরের কথা শোনায়। দুলি বলে, ফুলমণি কলকাতায় গেছে, ব্লাউজ আর খোঁপার জাল পরেছে। তার কথায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে শহুর সভ্যতার কনজ্যুমার সোসাইটির নারকোটিক-অক্টোপাশ একদিন তাকেও গ্রাস করবে। ফেরার পথে বনের মধ্যে লখা হরিকে আহত করে।

জুয়ার পাট চুকিয়ে শেখর ফেরে ছোটো ছেলের পোষাকে। হাতে তার সপত্র গাছের ডাল, মুখে গুন গুন গান ঃ খুঁজে দেখা পাইনে তোমায়।

এই ছবিতে শেখর একমাত্র চরিত্র, যে সারভাইভ করবে। তার মানসিকতা সরলরেখায় অবস্থিত। জিজ্ঞাসা, সংশয়, দ্বিধা ইত্যাদির ব্যাপারে তার কোনো চিত্তচাঞ্চল্য নেই। নিজের আনন্দে সে মেতে থাকে। অপর তিন বন্ধুর মতো সে কালো চশমায় নিজেকে 'মাস্ক' করে না। মেমারি গেমে নিছক কৌতুকের দায়ে সে একবার কালো চশমা ব্যবহার করে। তার কোনো 'ইগো' নেই। আজকের জীবনের অস্বস্তি থেকে অনেকটা সে মুক্ত। তার সাজে পোষাকে, আচার-আচরণে, কথাবার্তায় ছেলেমি স্পষ্ট। একটা নস্টালজিয়ার অবচেতনায় সে হরিকে টার্জনের কথা বলে, ক্রিকেট খেলার জন্য হরির লেখাপড়া হল না, হরির খেদের উত্তরে সে তাকে আবার নতুন করে লেখাপড়া শেখাবে বলে। মজা করে C-A-T, M-A-T বলে। জুয়ার ছেলের সঙ্গে সেই-ই এক মাত্র কম্যুনিকেট করতে পারে। সঞ্জয়কে সে মোটরট্রিপে যাওয়ার ব্যাপারে বলে, এই মুহূর্তে তার ছুটি নেওয়া সম্ভব নয়, জানা যায় আসলে তার চাকরিই নেই। তাদের স্নানের সময় জয়াদের গাড়ি এসে থামে। অসীম আর শেখর সামনে পড়ে যায়। সঞ্জয় কুয়োর পিছনে লুকিয়ে পড়ে। ওয়ালেট আর ট্রানজিস্টর নিতে সাবান মাখা চেহারায় শেখরই গাড়ির সামনে চলে যায়, হাস্যকর রকমের সাহেবি ইংরেজিতে ধন্যবাদ দেয়। গাড়ি চলে যাবার পরে সঞ্জয় কুয়োর পিছন থেকে উৎফুল্ল হয়ে লাফিয়ে ওঠে, কারণ সে জয়াদের দৃষ্টির বাইরে ছিল। অসীম বিষণ্ণ হয়ে পড়ে—প্রচলিত নীতিবোধ আর লোকলজ্জার ভয়ে অসীম আর সঞ্জয় বিমূঢ়। তারা status seeking society-র মানুষ। তাদের অনেক ভয়।

কিন্তু শেখর সারভাইভ করে। ছোটো ছেলের গ্রাশবিডস বা রাঙতা পছন্দ করার শুদ্ধতায় এবং সারল্যে সে তার নীতিবোধকে তৈরি করে নিয়েছে। সে কল্পনা করে নেয়, ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার সুইমিং ট্যাঙ্কে শুয়ে আছে। শেখরের হয়তো কোনো angst নেই, যা এক ধরণের উদাসীনতা — তাকে হয়তো মুক্ত থাকার সুযোগ দিয়েছে। মনের মধ্যে দম আটকানো পরিবেশে শেখর যেন দমকা বাতাস নিয়ে আসে। প্রাতঃরাশের নিমন্ত্রণে সে ডিম খাওয়ানোর আবদার রাখে। এ ছবির চার বন্ধুকে একটা সূর্যাস্তের

দৃশ্যের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। এ রকম সূর্যাস্ত কোথায় দেখা যায় জিগগেস করায় সঞ্জয় বলে, পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, এমন কি কলকাতাতেও। শেখর বলে ওয়েষ্টার্ন ছবিতে। হরির পুরুষোচিত সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ থাকার মানসিকতায়, বার্ট ল্যাঙ্কাষ্টারের নাম বলে। শেখরের মনে স্বপ্নের আভাস কখনও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। অসীমের বাড়ি তৈরির ইচ্ছা এবং কুয়ো প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে শেখর বলে ওঠে, 'আমরা সেখানে চান করবো।'

মেলার দৃশ্যে চার বন্ধুর গতিবিধি আলাদা হয়ে যায়। তাদের অভিজ্ঞতা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছেই গোপন রাখার চেষ্টায় যত্নবান। অসীম সঞ্জয়কে বলে, অপর্ণার বাবা কনজারভেটরের বন্ধু, অতএব চৌকিদারের চাকরি যাতে না যায় সে জন্য তাকে বলতে বলেছিল। সঞ্জয় তার কফি খাওয়ার কথা বলে। হরি বলে, ডাকাতে তাকে মেরেছে। শেখরও বেকার জীবনে অর্থাভাবের জন্য ঠিক কথা বলে না। বলে, জুয়ায় সে একদম হেরে গেছে। ছবির শুরুতে, একেবারে ভুলে গেছি বলে, সঞ্জয়ের কাছ থেকে সে ব্লেড চায়, আবার চলে যাওয়ার সময় নিজের সেফ্‌টিরেজার নিয়ে যেতে ভুলে যায়। শেখরের জীবনে কোনো পরিকল্পনা, কোনো কর্মসূচী নেই। কোনো কমিটমেন্ট কিংবা প্রমিস-এর দায়ে সে জড়িত নয়। তার সামর্থ নিয়ে সকলের জন্য সে প্রস্তুত। যখন তারা কলকাতায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, হরিকে শেখর বলে, কলকাতায় গিয়ে বলবি ওয়াইল্‌ড বাফেলো চার্জ করেছিল। মোটরে ডিম হাতে করে যদিও অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের সৃষ্টি করে, তবু যেন মনে হয় রিজেনারেশনের ইঙ্গিত রয়ে গেছে। এবং তা 'সারভাইভ্যাল' চরিত্রেই সম্ভব।

'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবি প্রেম ও বন্ধুত্বের সম্পর্কে, আজকের মহানগরে মানুষের নিঃসঙ্গতা, ক্লান্তি এবং অবসাদের আন্তর চেহারার এক সমীক্ষা। শেখরের নাটকীয় ভঙ্গিতে সভ্যতার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার পরেও, আবার তাদের কলকাতায় ফিরে যেতে হলো। সেই মহানগর কলকাতা — যেখানে বিনয় ঘোষের কথায় জন কুণ্ডলী কিংবা ব্যস্ততার চেতনা ছাড়া আর কিছুই নেই। যেখানে মামফোর্ডের কথায় মহানগরের তিনটি লক্ষণ ঃ aimless aquisition, reckless expansion এবং progressive disorganisation ছাড়া আর কিছুই নেই।

'what a life!' একথা শহর কোলকাতায় সারি সারি অনেক চেনামুখকে সন্ধ্যার সময় বলতে শোনা যায়। তাদের মধ্যে শ্রেণী ও বৃত্তি ভেদ থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞাপন সংস্থার ডিজাইনার, বাণিজ্যিক সংস্থার একজিকিউটিভ, সাহিত্যিক, কবি, সংবাদপত্রের ফিচার লেখক, কেরানি, রিসেপশানিস্ট, টেলিফোন অপারেটর সকলেই — একই মানসিক পরিমণ্ডলে আবর্তিত।

হয়তো এই সিস্টেম কোনোদিন পালটাবে, বিপ্লবের আগুনে নতুন সমাজের জন্ম হবে। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের সমাজ আসন্ন কি দূরাগত, এই চিন্তার ফাঁকে বর্তমানের মহানগরের কথা বলতে গেলে বিনয় ঘোষের 'মেট্রোপলিটান মন' প্রবন্ধে জেমস জয়েসের ইউলিসিস উপন্যাসের কথা মনে আসে, সন্ধ্যাবেলা মহানগরের কোনো এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম, 'Vast manless, moonless, womoonless marsh, lugugugubrious.'

সত্যজিৎ রায়, বাঙালি সমাজ ও (অবশ্যম্ভাবীরূপে) রবীন্দ্রনাথ

জ্যোতির্ময় দত্ত

সত্যজিৎ রায় যেকোনো দেশ ও কালেই এক বিশেষ ব্যক্তি ব'লে পরিচিত হতেন, কিন্তু আমাদের সময়ে ও দেশে তিনি বিশেষ শুধু নন, তিনি এক বিপুল ব্যতিক্রম। তাঁর তুলনায় আমরা কেবল বেঁটে নই, আমরা ছোটো। আমরা অলস ও তার্কিক ও ভয়ানক রাজনীতিবিশারদ। এই আবহাওয়ায় সত্যজিৎ-এর কর্মক্ষমতা এতোই বিস্ময়কর যে তার কোনো সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা সম্ভব ব'লে বিশ্বাস হয় না। তিনি যেন স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির এক খামখেয়াল। ছবি, সংগীত, পত্রিকা, রহস্য-গল্প, চলচ্চিত্র, প্রচ্ছদ তিনি সর্বক্ষণই কিছু-না-কিছু করছেন, এবং যখন যা-কিছুই করুন, তা বিপুলভাবে উপভোগ করেন। গত দশকে তিনি বছরে ন্যূনপক্ষে একটি ক'রে ছবি করেছেন। গত বছর এমন একটা সময় গেছে যখন কলকাতায় তাঁর দু-দুটো নতুন ছবি এক সংগে দেখানো হচ্ছিল — যা অন্য কোনো পরিচালকের ভাগ্যে ঘটেনি। কিন্তু এও যেন যথেষ্ট নয়; সেই সময় 'বাদশাহী আংটি' প্রকাশিত হচ্ছিলো প্রতিমাসে নতুন সংস্করণ, এবং — যেটা লক্ষ্য ক'রে সুখের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঈর্ষাও অনুভব করেছি — আমাদের এক প্রতিযোগী তাঁরই রচিত চিত্রনাট্য-পুষ্ট কলেবরে, তাঁরই অংকিত প্রচ্ছদ পরিধান ক'রে, আলোকিত করছিলো পত্রিকার স্টল। সত্য, 'বাদশাহী আংটি' কোনো 'পাগলা দাশু' নয়। ঠিক, তাঁর প্রচণ্ড কর্মকাণ্ডে উৎক্ষেপিত বস্তুসমূহ যেমন প্রকারে বিচিত্র তেমন গুণেও অত্যন্ত অসম। কিন্তু এসবই তাঁর প্রবল জীবনশক্তির প্রমাণ। বিশ্লেষণের চেয়ে নির্মাণ, সমালোচনার চেয়ে সৃজন, তাঁর পক্ষে অধিক স্বাভাবিক।

তাঁর স্বাস্থ্য, তাঁর 'স্বাভাবিকতা', তাঁর সাধারণ মানবতা তাঁকে তাঁর সমসাময়িক বিদেশী শিল্পীদের থেকেও ভিন্ন করেছে। মনের দিক থেকে তিনি উনিশ শতকের 'বাস্তববাদী' ঔপন্যাসিকের আত্মীয়। তিনি তাঁদের মতোই হৃদয়বান ও সদ্বিবেচক, তাঁদের মতোই এক সামাজিক ও সভ্যভাষায় বিশ্বাসী, তিনি যেন জানেন যে কোনটা বাস্তবিকই সত্য আর কোনটা ব্যক্তিগত দুঃস্বপ্ন। তিনি তাঁর শিল্পকে ভালোবাসেন; চলচ্চিত্রের ভাষা নিয়ে তিনি মুগ্ধ, এই ভাষা প্রয়োগে তিনি জাদুকর। কিন্তু তাঁর শিল্পের গুণই এই যে তাঁর আধার কখনো নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তাঁর ভাষা আশ্চর্য স্বচ্ছ। তিনি এই ভাষার যাবতীয় সুযোগ গ্রহণ করেন কিন্তু নিজেকে তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হ'তে দেন না। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে তাঁর ভাষা কখনো সূক্ষ্ম ও অনুপুঙ্খবহুল, কখনো সামাজিক চিত্রণের জন্য আক্ষরিক, কখনো প্রকৃতির সঙ্গে একতাল ও গীতিময়, কখনো উদ্ভট ও খামখেয়ালি। 'পথের পাঁচালী' ও 'পরশপাথর', 'অপরাজিত' ও 'অভিযান', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'কাপুরুষ' ইত্যাদির প্রকরণবৈচিত্র্য, এমন কি বৈপরীত্য,

আজ এতোদিন পরে, পুনর্বিবেচনায়, হঠাৎ বিস্ময়কর মনে হচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও যা বিস্ময়কর তা হ'লো ঐ ছবিগুলি দেখাব সময় এই বৈচিত্র্য চোখ ধাঁধাঁনো তো দূরের কথা, প্রায় চোখেই পড়েনি। তার কারণ বিষয়ভেদেই সত্যজিৎ-এর প্রকরণভেদ।

তাঁর স্টাইলের এই মেরু থেকে মেরু দোলা কারো কাছে সন্দেহজনক ঠেকে। একদা এঁরাই সত্যজিৎকে অন্য কারণে সন্দেহ করতেন ঃ ইনি সত্যভাষী ও অনুভূতিপ্রবণ বটেন, কিন্তু মহাশয়ের ছবিতে ফিল্মীয় কসরৎ তেমন নেই। এখন, একের পর এক এতো ঢঙের ছবির পর উল্টো কথা শোনা যাচ্ছে ঃ ইনি এতোগুলি ভাষা জানেন, এঁর এতোরকম ঢঙ, এঁর কৌশল ঢের আছে কিন্তু উপলব্ধি কম। এই যে সচ্ছন্দে ভাষা থেকে ভাষান্তরে গমন, এটা প্রমাণ করে যে তাঁর নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই, তিনি দোভাষী মাত্র। এঁর কোনো আপন ভাষা নেই ব'লেই ইনি অনুবাদে এতো পটু। এতো ব'লেও কেউ কেউ সন্তুষ্ট হননি। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর কাযদা কেরামতি, প্রকরণের খেলা, ক্যামেবার ভোজবাজি, অনেকের চোখ এতোই ধাঁধিয়ে দিয়েছে যে তাঁরা বলছেন এটা সত্যজিৎ-এর আগেব ছবিগুলি থেকে এতোই ভিন্ন যে সন্দেহ হয় এটা তিনি শিল্পের তাগিদে করেন নি, 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' করেছেন নিতান্তই ব্যবসায়িক তাগিদে।

অথচ 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর গর্ভ ও প্রসূতি পর্বে উল্টো সন্দেহই প্রকাশ করেছিলো সবাই। এই গল্প নিয়ে সত্যজিৎ দীর্ঘকাল আঁকিবুকি কাটছিলেন, জল্পনা-কল্পনা কবছিলেন, নিতান্তই নিজের খেয়ালে, সৃষ্টির আনন্দে। কিন্তু এটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়ণ এতোই অবাস্তব একটি ব্যবসায়িক প্রস্তাব মনে হয়েছে যে প্রথম প্রযোজক প্রস্তুতির মধ্যপথ থেকেই পশ্চাদপসবণ করেন, এবং দীর্ঘদিন এই ছবির আর্থিক ঝুঁকি নিতে আর কেউ সাহস করেন নি। ছবিটি যখন নির্মীয়মাণ, স্টুডিও মহলে সেই অল্পকালের মধ্যেই 'গু গা বা বা'-র অবাস্তবতা, ব্যয়বাহুল্য, বাঙালি দর্শকের রুচি বিষয়ে অজ্ঞতা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছিলো।

এবং প্রদর্শনেব প্রথম দু-তিন সপ্তাহে না-সত্যজিৎ, না-তাঁর প্রযোজক, না-অন্য কেউ ছবিটির বিপুল সাফল্য হৃদযঙ্গম করতে পেরেছিলেন। এটি যে একটি ক্ল্যাসিক, এটি যে বছবে-বছরে, পুরুষানুক্রমে দেখতে হবে, গুপী ও বাঘা যে বাঙালি শিশু মানসে শেয়াল পণ্ডিত কি বোকা কুমিরের মতোই একটি শাশ্বত স্থান ক'রে নিলো, তা তখন এর নির্মাতারাও ভাবতে পারেন নি। যেমন 'পথের পাঁচালী', যেমন 'চারুলতা', তেমন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-ও সত্যজিৎ করেছেন নিজের খেয়ালে, আনন্দের জন্যে, ঠিক তাঁর মেজাজের সঙ্গে বিষয়টি খাপ খায় ব'লে। মানুষটা তিনি যেমন, যেমন তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, মনেব জগৎ, পরিবারের প্রবণতা, তাতে এই রকমই একটি ছবি করার তাঁর যে প্রবল লোভ হবে তা অনুমান করা যায়। এর পশ্চাতে কোনে নীচ বাণিজ্যিক অভিসন্ধি অনুসন্ধানেব প্রয়োজন নেই। সুকুমার রায়কে যেমন কোনো উচ্চ সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে অবতরণ করে লক্ষ্মণের শক্তিশেল কি খাই খাই লিখতে হয়নি, নবপর্যায় সন্দেশ-এর সম্পাদক এবং স্টীল-মানে-হরণ-মানে-সিঙ-মানে-গান ইত্যাদি উদ্ভট শব্দমালার রচয়িতা সত্যজিৎকেও তেমন গুপী গাইন বাঘা বাইন' সৃষ্টিতে স্বভাববিরুদ্ধ কিছু করতে হয়নি।

২

কিন্তু বস্তুতই কি সত্যজিৎ-এর অন্য ছবিগুলির ঢঙ থেকে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এতো ভিন্ন? সত্যজিৎ-এর শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে যে তিনি কোনো বিগত কালের, কিংবা চিরকেলে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে এমন প্রত্যক্ষ ক'রে তোলেন, এমন বিশ্বাস্য ও অনুপুঙ্খে ধনী, ভাবনাকে এমন স্পষ্ট দেহ দিতে পারেন, যে আমরা তাকে প্রায় তথ্যচিত্রের মর্যাদা দিয়ে ফেলি। আসলে, এটা যে কল্পিত, ঐ অঙ্গভঙ্গি কি ঐ চোখের তাকানো যেমন সত্যজিৎ-এর কল্পিত — চারুর হাসি কি অমলের গান যেমন রবীন্দ্রনাথ কি সত্যজিৎ-এর কল্পনায় ছাড়া কোথাও ছিলো না, কোনো জাদুঘরে তাদের চিহ্ন নেই, তেমন সেকালের পোশাক, কি সংবাদপত্র, কি রাজনীতির আলোচনা, সবই সত্যজিৎ কল্পনা করেছেন — নানা তথ্য ও দলিলের সঙ্গে মিলিয়ে, সঙ্গতি রক্ষা ক'রে কল্পনা ক'রেছেন, ঠিকই, কিন্তু উনিশ শতক, কি অপুর গ্রাম চিরকালের জন্য বিলীন হয়েছে এবং সত্যজিৎ-এর ছবিতে যা দেখি তা তাঁর কল্পনার জারকে রূপান্তরিত। অপুর গ্রাম কোনো বাস্তব গ্রাম নয়, তার জীবন কোনো রক্তমাংসের কিশোরের নয়। যেমন কোনো-কোনো শিল্পী ব্যবহারিক ও প্রাত্যহিককেও সুদূর কি আজগুবি রূপে উপস্থিত করতে পারেন, সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভা কল্পিতকে তথ্যের ঘনতা দানে সক্ষম। গুপী গাইন ও বাঘা বাইনের জগৎ ঘোষিতভাবেই অলীক ; কিন্তু সত্যজিৎ-এর স্বাভাবিকতা ও আক্ষরিকতা আমাদের মনে সত্যের প্রত্যয় সৃষ্টি করে। বাঁশবাগানের বাঘ কি মরা নদীর বুকে ওস্তাদজির পাল্কি প্রায় এক ডকুমেন্টারি প্রতীতি আনে। কিন্তু এটা কি সত্যজিৎ-এর চিরকেলে ঢঙ নয়? চারুর খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দূরবীন দিয়ে দেখা ঠিক এরকমই আক্ষরিক। কিংবা দুর্গা ও অপুর প্রথম ট্রেন-দর্শন।

৩

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' অনেক অর্থেই একেবারে খাঁটি পারিবারিক ছবি। দর্শকদের পক্ষে তো বটেই; 'গু-গা-বা-বা' তিন পুরুষ একত্রে উপভোগ করার একমাত্র 'ফ্যামিলি পিকচার'। এবং এর নির্মাণে কোনো আদর্শ কুটির শিল্পের মতো পুরো রায় পরিবার নিয়োজিত ছিলেন। পরিচালকের স্ত্রী ও পুত্র এই ছবিটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রতি পর্যায়ে কেবল উৎসাহ নয়, কয়েক ক্ষেত্রে পরামর্শও দিয়েছেন। কিন্তু এই দুই অর্থ ছাড়াও, ছবিটিতে ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স-এর পারিবারিক স্বাক্ষর স্পষ্ট। সত্যজিৎ যখন কেবল ট্রামে যে লোকটার মাথা ছাদে ঠেকে যায় ব'লে পরিচিত ছিলেন, কিংবা যখন কবিতার বই-এর মলাটের জন্য খ্যাত হলেন, তখনও যেমন, তেমন আজও, যখন পৃথিবীর কাছে তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত ভারতীয়দের অন্যতম, তিনি কেবল সত্যজিৎ রায় নন, তিনি উপেন্দ্রকিশোরের পৌত্র সুকুমার রায়ের ছেলে। মানুষটি ও তাঁর বিচিত্র কর্মগুলি নানা পথে ঘুরে ঘুরে যে জাল বুনছিলো — যাতে কৌতূহলী দর্শকের কথনো মনে হয়েছে যে সুকুমার রায়ের পুত্র তবে কি [illegible] পণ্যের ঠুনকো বিজ্ঞাপন এঁকে পবিত্র মানবজন্ম অতিবাহিত করবেন? কখনো মনে হয়েছে এই ঘোড়া সিপাহীর চেয়েও উৎকৃষ্ট। — সেই সূত্রগুলো হঠাৎ যেন এখানে এসে, 'গুপী গাইন বাঘা বাইনে', গ্রন্থিবদ্ধ হ'লো। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিৎ-এর যে কয়টি গভীর মিল আছে, এই আপতিক

পারিবারিক মিল সে তুলনায়ও কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। বাঙালির সামাজিক সাংগঠনিক প্রতিভা বড়ো ক্ষীণ; সব প্রতিষ্ঠান, দল, আখড়া, বিশ্ববিদ্যালয়, পত্রিকা, প্রেস সব কিছুই প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র ক'রে বেঁচে থাকে, এবং তাঁর লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমাদের দীর্ঘদিন কোনো ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবোরেটরি, কোনো কনকর্ড গ্রাম, কোনো সালোঁ কি সর্বন নেই; আমাদের প্রতিযোগিতা ও উৎসাহদান, সমালোচনা ও পরামর্শের কোনো আবর্তময় পরিবেশ নেই। এমতাবস্থায়, যে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ও সালোঁ কোনো প্রতিভাবান শিল্পী পেতে পারেন তা হ'লো আত্মীয়মণ্ডল, কিংবা একমাত্র যাঁর সঙ্গে রেশারেশি করা যায় তিনি হলেন খ্যাতিমান পিতা। সত্যজিৎ খুব অল্প বয়সে তাঁর রক্তমাংসের বাবাকে হারিয়েছিলেন; কিন্তু — এটা ফ্রয়েডীয় অন্তর্দৃষ্টি ছাড়াও অনুমান করা যায় — হয়তো সেজন্যেই তাঁর জীবন তাঁর পূর্বপুরুষের দ্বারা এমন অধিকৃত। জ্ঞানোন্মেষ থেকেই গান, ছাপাখানা, ব্লকের অ্যাসিড-এর গন্ধ, কবিতা, উদ্ভট গল্প ইত্যাদি সত্যজিৎ-এর সহচর, এইসব নিয়েই জগৎ। এইগুলি তাঁর ইন্দ্রিয়ের সম্পদ। আর তাঁর ব্যক্তিত্বের পেছনে তাঁর হাসি আর বন্ধুতা আর ঢিলেঢালা মেজাজের কেন্দ্রে, এক উদগ্র আকাঙ্খা : উদ্ভটের জাদুকর সুকুমার রায়ের উপরও টেক্কা দেওয়ার, মৃত পিতাকে নিজের খ্যাতির দ্বারা অমরত্বদানের।

এই আকাঙ্খাগুলি যদিও তাঁর অন্য ছবিতে ও কর্মেও নিহিত ছিলো, গুপী ও বাঘার কীর্তি কাহিনীতে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। এমন কি, টুনটুনির বই-এর টুনুটনি-খেকো রাজা একেবারে তার ডোরাকাটা জামাশুদ্ধ এই ছবিতে ঢুকে পড়েছে। এই ছবি দেখে সমালোচকরা অবাক ? এই ছবির মেজাজ তো, বরং, হ্যাব্‌সবর্গ ওষ্ঠের মতো, বংশের তৃতীয় পুরুষে প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী ছিলো।

৪

চলচ্চিত্র-রসিকেরা পরিবারের প্রতি আমার মনোযোগ অপ্রাসঙ্গিক ভাববেন। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য চলচ্চিত্র সমালোচনা নয়, আমার চিন্তার বিষয় বাঙালি সমাজ। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে আমাদের সামাজিক প্রতিভা বড়ো দুর্বল। আমরা খুব কম প্রতিষ্ঠানই গড়তে পেরেছি; এবং যা-কিছু গড়ি তাও অল্পদিনে, রাজনীতির প্রাদুর্ভাবে, বন্ধ্যাত্বপ্রাপ্ত হয়। এমন কি রাজনৈতিক দল পর্যন্ত এই মানসিক মাটিতে বাড়তে পারে না; বৃক্ষরূপ দলের চেয়ে লতা ও গুল্মরূপ গোষ্ঠীই বেশি। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কি জমিদারি, দাতব্য হাসপাতাল কি গ্রন্থাগার, প্রত্যেকেরই জীবনশক্তি বড়ো ক্ষীণ, প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় এগুলির অবনতি শুরু হয়। এর মধ্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়-কি-তৃতীয়-পুরুষ পর্যন্ত উর্ধ্বারোহী পরিবার কয়টি পরম বিস্ময় ও কৌতূহলের বিষয়। প্রতিভা স্বভাবতই দৈব, এবং সমাজের যে-কোনো স্তরে, যে-কোনো কোণায়, এর আবির্ভাব ঘটতে পারে। কিন্তু আবির্ভাব এক জিনিশ, বিকাশ সম্পূর্ণ আরেক ব্যাপার। পৃথিবীর চতুর্দিকে ইতস্তত তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়ানো ; কিন্তু সেগুলি এতো ক্ষীণ ও বিক্ষিপ্ত ভাবে আছে ব'লেই তারা রশ্মি বিকিরণ করতে করতে নিঃশেষিত হ'য়ে যাচ্ছে, কোনো বিশাল, বিধ্বংসী বিস্ফোরণ, কি শান্ত ধীর সৃষ্টিশীল বিস্ফোরণমালায় পরিণত হচ্ছে না। অনেকখানি তেজস্ক্রিয় পদার্থ স্বল্প পরিধির মধ্যে একত্র করলে তবেই আণবিক বিস্ফোরণমালার সূচনা

হয়। ঠিক তেমনই, কোনো নির্বোধ সাংস্কৃতিক পরিবেশে গুণ ও প্রতিভা যেমন নিষ্ফলভাবে বিকিরণ করতে-করতে ফুরিয়ে যায়, অনন্ত শূন্যে হারিয়ে যায়, আবার অন্য কোনো সংবেদনশীল, প্রতিক্রিয়াময় পরিবেশে যে কেবলি বুদ্ধিমান সেও গুণী এবং যে গুণী সে প্রতিভাবান হ'য়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের এই বন্ধ্যা মরুভূমির মধ্যে শ্রীহট্ট কি নবদ্বীপে কখনো-কখনো এই রকম পরিবেশ গ'ড়ে উঠেছিল। এবং ইদানীংকালে এই রকম পরিবেশের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। ঐ পরিবার তার স্বগন্ডির মধ্যে যেন এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ জগৎ। দার্শনিক ও ধর্মনেতা , সংস্কৃতজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ, ভাষাবিদ ও অনুবাদক পরস্পরের সান্নিধ্যে বিকাশ লাভ করতে পেরেছিলেন। মানুষ একা এই পৃথিবীর দুর্বলতম প্রাণীদের মধ্যে একটি ; পরস্পরের স্কন্ধে ভর ক'রে, যুগ-যুগ ধ'রে জ্ঞান ও স্মৃতির সঞ্চয়ে, সে এই সভ্যতাব বিপুল পিরামিড নির্মাণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরকম একটি পিবামিড-এর শীর্ষস্বরূপ। তুলনায় অনুচ্চ হ'লেও, সত্যজিৎ রায়ও তাঁর গুণবান পূর্বসূবিদের উপর দন্ডায়মান একটি শৃঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিৎ-এর তুলনা অবশ্যম্ভাবী। দুজনেরই চরিত্রে অন্ধকারের চেয়ে আলোক, অধীরতার চেয়ে তৃপ্তি, সংশয়ের চেয়ে বিশ্বাস বেশি। দুজনের শিল্পই সহৃদয় সপ্রেম; দুজনের ভাষাই স্বচ্ছন্দ ও বেগবান; তা সাংকেতিক কি তির্যক নয়। আত্মার যে যন্ত্রণা, জড়ত্বের যে পেষণ, কখনো-কখনো শিল্পীকে ভাষাহীন ক'রে দেয়, তা যেন এঁদের অপরিচিত। এঁরা সর্বদা সৃষ্টিশীল; একের পর এক পবীক্ষা ক'রে চলেছেন। কিন্তু এই পরীক্ষা প্রধানত আধার ও মাধ্যমের তাঁর শিল্পের কেবল বহির্ভাগ এর দ্বারা স্পৃষ্ট। যে মুহূর্ত থেকে সত্যজিৎ তাঁর প্রকাশের পথ চিনে নিয়েছেন, সে-মুহূর্ত থেকে তাঁর কর্ম বিরামহীন। রবীন্দ্রনাথের যখন বয়স তিরিশ তখনই তিনি এতো লিখেছেন, এতো বিচিত্র বিষয়ে ও বিভাগে, যে কোন ইতিহাসচেতন পাঠকের এই বোধ হ'তে বাধ্য যে বাংলা সাহিত্যের আদি থেকে এযাবৎ যা-কিছু হয়েছে তাব মধ্যে রবীন্দ্রবাবু হলেন প্রধান ঘটনা। এবং যদিও এরকম একটি কুসংস্কাব বাংলার বাইরে প্রচলিত যে নোবেল পুরস্কার তাঁর স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠাকেও দৃঢ় করেছিলো, তাঁর দেশবাসী তাঁর প্রতিভার বৈদেশিক স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখেনি। বাঙালি লেখকগণ যতোই ঈর্ষা ও দ্বেষপরায়ণ হোন না-কেন, তাঁরা পঞ্চাশ বর্ষীয় রবীন্দ্রনাথকে সভা ডেকে, প্রদীপ জ্বালিয়ে ও মাল্যদান ক'রে , তাঁকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব'লে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। সত্যজিৎ-এর পঞ্চাশ বর্ষপূর্তির আর এক বছর আছে, এবং এব মধ্যে বহু সভা-সমিতির আয়োজন হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু বাঙালি দর্শক ইতিমধ্যেই তাঁকে বাবংবার, পন্ডিতদের সব প্রতিকূল সংশয় সত্ত্বেও সংবর্ধিত করেছে। সত্যজিৎ-এর ছবিব ভক্ত পৃথিবীর সর্বত্র, কিন্তু তিনি পৃথিবীর সেই মুষ্টিমেয় সৃজনশীল পরিচালকগণেব একজন, যাঁর শিল্পের দৃঢ় আর্থিক ভিত্তি তাঁর স্বদেশেই।

৫

কিন্তু এগুলি বাহ্য লক্ষণমাত্র; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একটি গভীর মিল আছে—যে-মিল প্রথম দৃষ্টিতে বরং ভিন্নতা ব'লে বোধ হয়। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে কখনোই কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাজারে-প্রতিযোগিতায় নামতে হয়নি। তাঁর অন্য সব কিছুর চাইতেই

নাটক বড়ো বেশি পারিবারিক। জোড়াসাঁকোর ক্ষুদ্র ও স্বয়ংম্ভর বিশ্বের মধ্যেই তিনি তাঁর মঞ্চের অভিনেতা থেকে শুরু ক'রে দর্শক সবই পেয়েছিলেন। পেশাদার মঞ্চের মান ছিলো নিচু, দর্শকগণ শিল্পে অনভিজ্ঞ ও রুচিহীন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে আর সেকালের পেশাদার মঞ্চে অভিনীত নাটকের জাত আলাদা। তাঁর নাটকের সূক্ষ্মতা ও প্রতীক-নির্ভরতা, তাঁর নাটকের উৎকণ্ঠার অভাব ও তত্ত্বের অতিশয়তা, তাঁর মৃদু ও অনুত্তাল গান ও নৃত্য—এসবই বৃহৎ দর্শকসমাজের অনুপযুক্ত। যদি এই মঞ্চের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হ'তো, তবে ক্রমান্বয়ে এই ধরণের নাটক লেখা এমনকি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও সম্ভব হতো না। কলকাতার মঞ্চকে পরিবর্তিত কি সংস্কারের প্রচেষ্টা না-ক'রে তিনি জোড়াসাঁকোয় তাঁর নিজের পারিবারিক গণ্ডি ও শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের নিয়ে নিজের ইচ্ছানুরূপ নাট্যপরিবেশ সৃষ্টি করলেন।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কেবল নাটকরচনাতেই এই বৃহৎ ভারতীয় সমাজের স্থানুত্বের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হননি। ভারতীয় সমাজ বড়ো বিশাল ও অনড়, বড়ো নিরানন্দ, বিধিনিষেধে অর্ধমৃত, যে-কোনো প্রাণবান ও অনুভূতিপ্রবণ চিত্তের কাছে ভয়াবহ। রবীন্দ্রনাথ এই বিশাল মরুভূমির মধ্যে শান্তিনিকেতনে আনন্দ ও প্রাণের ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ রচনা করার চেষ্টা করেছিলেন; ভারতীয় সমাজের বিশালতায় ও জড়ত্বে পীড়িত হ'য়ে আগেও যেমন মরমী মানুষ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আশ্রম কি গুপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কেবল প্রতিভা ছিলো না, ছিলো অর্থবল, তাঁর পশ্চাতে ছিলো ঠাকুর-সাম্রাজ্যের সমগ্র শক্তি। সেহেতু তিনি কেবল নাটক রচনাতেই নয়, এমন কি জীবন প্রণালীতেও বাঙালিসমাজ থেকে কিঞ্চিৎ স্বাধীন হ'তে পেরেছিলেন।

সত্যজিৎ-এর পশ্চাদ্‌ভূমিতে কোনো শান্তিনিকেতন নেই। আপাত দৃষ্টিতে তিনি বাংলা ছবির বাজারে শত প্রতিযোগীর মধ্যে একজন। এবং এই প্রতিযোগিতায় তিনি জয়ী। কিন্তু টালিগঞ্জের সঙ্গে যাঁর ক্ষীণতম পরিচয়ও আছে তিনিই জানেন সত্যজিৎ ঐ মহলে কতো বড়ো ব্যতিক্রম, তাঁর চতুর্দিকে কী বিশাল শূন্যতা। সত্যজিৎকে তাঁর সহকর্মীরা ভক্তি করেন, কেউ কেউ প্রায় দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভা তো দূরের কথা, তাঁর শিক্ষার কি রুচির কণামাত্রও তাদের নেই। অবশ্য এটা কেবল তাঁর সহকর্মীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়; তাঁর না-আছে উপযুক্ত সমালোচক, না-আছে প্রস্তুত দর্শক। 'পথের পাঁচালী', কি 'চারুলতা,' কি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'—যেগুলি তাঁর আর্থিকভাবে সবচেয়ে সফল ছবি, সেগুলি প্রত্যেকটিই একেকটি ট্যুর দ্য ফোর্স, তাঁর দর্শকদের চিত্ত তিনি চলচ্চিত্রের অতিরিক্ত নানা গুণ দিয়ে জয় করেছেন। এই পরিবেশ-এর দুর্বলতা তাঁকে সম্পূর্ণ বিকশিত হ'তে দিচ্ছে না; তাঁর পক্ষে যে-ধরনের মুক্ত ও শিক্ষিত সমালোচনা ও সফল প্রতিযোগিতা প্রয়োজন, তার অভাবে ছবির পর ছবিতে অসাবধানতা, চিন্তার শৈথিল্য ও প্রেরণার এবং উদ্ভাবনার অভাব থেকে যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসায়িক নাগরিক জীবন নিয়ে প্রহসন লিখেছেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রধান নাটকগুলির স্থান-কাল অনির্দিষ্ট এবং চরিত্রগুলি প্রতীক। কলকাতার মধ্যবিত্ত, সাধারণ, অকাব্যিক জগৎ থেকে তিনি নানাভাবে স'রে গিয়েছিলেন। আমাদের জীবনযাত্র'র মালিন্য ও দীনতা তাঁকে পীড়িত করেছিলো, সেহেতু তিনি আসবাব, গৃহসজ্জা, খাদ্য পরিবেশন, পোশাক থেকে শুরু ক'রে উৎসব, নারী-পুরুষের মেলামেশা,

শিক্ষাপ্রণালী সবই নিজের ইচ্ছেমতো উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি তাঁর কালের বাস্তব কলকাতা কিংবা মধ্যবিত্ত বাবুটিকে বিশেষ ভালোবাসতে পারেনি; তাই তিনি এমন এক কল্পনার ভারতবর্ষ সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিলেন যা উপনিষদের তপোবনের কিংবা কালিদাসের রাজসভার। এই কল্পনা সুন্দর। কিন্তু মানতেই হয় এতে কেবল বিষ্ঠার নয়, রক্ত-মাংসেরও অভাব আছে।

তাঁর নাটকে এই রক্তাল্পতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কিন্তু তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যেও অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ অভাব আছে। তাঁর জীবন বড়ো বেশি অন্দরমহলে কেটেছে; তাঁর ব্যক্তিত্ব বড়ো বেশি পরিবার-আশ্রয়ী। শুধু রবীন্দ্রনাথেরই নয়। উচ্চবর্ণ-বাঙালি-সমাজে পরিবারপ্রথা এমনই যে মানুষের পক্ষে তার ক্রোড় ছেড়ে স্বাধীন ও অনাশ্রিত ব্যক্তি হ'য়ে ওঠা কঠিন। শিশুকাল থেকে আমরা অতিরিক্ত স্নেহে ও সেবায় লালিত; পরিবার ও আত্মীয়মণ্ডল প্রত্যেকটি আঘাতকে মৃদু ও মসৃণ ক'রে দেয়; আমরা জীবনকে রক্তে ও স্বেদ ও সংশয়ের মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করতে বাধ্য হই না। পাশ্চাত্য ব্যক্তির তুলনায় মধ্যবিত্ত বাঙালি কতো সংযত ও ভদ্র, কতো বেশির সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নেয়, সংঘাত এড়াবার আশায় কতো জোড়াতালি দিতে সে প্রস্তুত! এবং আমাদের সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশি শোভন ও বানানো। আমরা সংঘাতের চেয়ে সমন্বয়কে এবং উপস্থিতের চেয়ে আদর্শকে ভালোবাসি।

এবং এই প্রবণতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ উনিশ শতকের বৃহৎ ও গুণবান বাঙালি পরিবারগুলি। বাইরের জগৎ হয়তো নিষ্ঠুর ও নিয়মহীন; সেখানে হয়তো কোনো বিশ্বপিতার স্নেহ ও শাসন নেই। কিন্তু এই পরিবারগুলির মধ্যে ছিলো শৃঙ্খলা ও প্রেম, ন্যায়বিচার ও আত্মত্যাগ। বাইরে যখন অন্যায় ও অপমান ও কুশ্রীতা সব কিছুকে প্লাবিত করেছে, স্বপ্নবিলাসী বাঙালী তার আত্মীয়-পরিজন নিয়ে একটুখানি সৌন্দর্য, একটু শিল্প, একটু কল্পনার মোহময় মণ্ডল রচনা করেছে।

কোনো কোনো গুণ ও ক্ষমতার—যেমন সংগীতপ্রতিভার—বিকাশের পক্ষে এই পরিবেশ হয়তো অনুকূল। কিন্তু জগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের পক্ষে বোধ হয় নয়।

৬

উপরের মন্তব্যগুলি সত্যজিৎ-বিষয়ে প্রযোজ্য কিনা তা ক্রমশ বোঝা যাবে। তাঁর নির্মীয়মাণ ছবিটির নায়ক নাকি একজন সমাজচ্যুত যুবক এবং পরিবেশ হচ্ছে আজকের কলকাতা। যদি সত্যজিৎ এই যুবককে স্বেদ ও শোণিতদান করতে পারেন, আমরা সবাই আনন্দিত হবো। স্পষ্টতই তিনি এই কাল ও সমাজকে তাঁর শিল্পের প্রদেশভুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। এমন ইচ্ছা প্রবীণ রবীন্দ্রনাথকেও অধিকার করেছিলো, এবং তা থেকেই 'শেষের কবিতা' কতোটা বাস্তব তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু বাংলা গদ্যের, বাংলা ভাষার এটি একটি বিস্ময়। সত্যজিৎ রায়ও তাঁর ভাষার জাদুকর। তিনি আধুনিক বাঙালি যুবকের ছবি করতে গিয়ে হয়তো ছবির ভাষাকে নায়কের স্থানে অভিষিক্ত করবেন। যাই করুন, কোনো প্রতিকৃতি, কোনো মুখের রেখাচিত্র ফুটে উঠুক আর না-উঠুক, তা চলচ্চিত্রভাষার সীমা অন্তত নির্দেশ করবে।

শিল্প, সমকালীনতা ও সত্যজিৎ রায়

আশীষ বর্মন

সত্যজিৎ রায়ের ছবি আমায় মুগ্ধ করে। তার প্রাথমিক কারণ সম্ভবত তাঁর ছবির তন্ময়তা ও প্রকাশভঙ্গীর শ্রী। ছবির তন্ময়তা বলতে আমি বুঝি পরিচালক চিত্রনাট্যকারের, অথবা ক্ষেত্র বিশেষে পরিচালকেরই, ব্যক্তিচরিত্র রূপায়নের ক্ষমতা ও স্বাচ্ছন্দ্য। অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্র-সমষ্টি নিয়ে যে ছবি তৈরি হল সেই ছবিতে তারা এক একটি ব্যক্তিত্ব অর্জন করল কি না। যদি করে থাকে, এবং চরিত্র-সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাৎপর্য পায়, তাহলে বলব ব্যক্তিস্বরূপ উদ্ঘাটনে পরিচালক দক্ষ। এই দক্ষতা অনুযায়ী তাঁর প্রতি আমার কম-বেশি শ্রদ্ধা।

ব্যক্তিস্বরূপ উদঘাটনের প্রশ্নেই আসে চলচ্চিত্রে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার কথা; যেটা সত্যজিৎ রায়ের ছবির একটি মৌল সম্পদ। অর্থাৎ দুটি চরিত্রের স্বকীয়তা, যা এক থেকে অন্যকে ভিন্ন ছাঁচে গড়ে, যার মারফৎ আমরা বুঝি রামের স্বভাব শ্যামের বিপরীত অথবা অন্তত পৃথক, তা প্রকাশিত হয় চরিত্রাবলীর সূক্ষ্ম মোটা কিন্তু ক্রমশ প্রকাশিত অভিব্যক্তির মাধ্যমে, এবং এই অভিব্যক্তিই অন্য ভাষায় ব্যঞ্জনা। যেমন কে কি ভাবে কথা বলে, কি বলে, কখন তাকায়, বসে হাঁটে থামে—এমন কি, কথা বলতে বলতে সিগারেট ধরায় কোন ধারায়, কিংবা স্বামী বা প্রেমিকের সঙ্গে কাজের মধ্যে, খাবার দিতে অথবা বিরক্তিতে কোন মেয়ে কেমন চায় বা থমকায়। এই যে অফুরন্ত খণ্ডে খণ্ডে ব্যঞ্জনার প্রকাশ এই প্রকাশের রকমভেদেই—বাক্যের বিভিন্ন ছাঁচে—প্রধানত ব্যক্তি স্বরূপের উদ্বোধন।

তার অর্থ এ নয় যে কয়েকটি অভ্যস্ত ভঙ্গিমাকে পৃথক পৃথক দৃশ্যে খণ্ড খণ্ড ভাবে রূপায়িত করলেই একটি ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হলো—যদিচ এটাই সাধারণ ভারতীয় ছবিতে তথাকথিত চরিত্র রূপায়নের কেতা। এই কেতাকেই ব্যবসায়িক সিনেমা জগৎ-এ টাইপ কাস্টিং বলে। অনুপকামারের টাইপ অথবা উত্তমের কিংবা সৌমিত্রের। এ-হেন, প্রচেষ্টার বা কায়দার সঙ্গে চরিত্রসৃষ্টির কোনো সম্বন্ধ নেই।

নেই কেননা খণ্ড খণ্ড ভঙ্গিমা নিছক তাৎক্ষনিক তাৎপর্যে নিঃশেষিত ; কারণ অভিজ্ঞ অভিনেতার ক্ষেত্রে এধরনের অভ্যস্ত মুদ্রা, হাত-পা নাড়া চলা বসা শুধু একটি দৃশ্য বিশেষকে সিনেমাটিক করার আপাতকৌশল হয়ে দাঁড়ায়। আর অভ্যস্ত কৌশলের হেরফেরের মধ্যে দিয়ে চারিত্রিক ব্যঞ্জনা ফোটে না; কারণ সে অভিব্যক্তির উৎসে কোনো মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া বা আবেগ অনুপস্থিত। অথবা বলা ভালো, এ ধরনের ভঙ্গিমার অন্তরালে শুধু একটা তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া থাকে, আকস্মিক আগুনের ছ্যাঁকায় যেমন সবাই চমকাই। এ-হেন পেশাদারী অভিনয় দক্ষতাকে চলচ্চিত্রে বলে সেনস অফ টাইমিং। এ দক্ষতা খণ্ড মুহূর্তকে সিনেমায় আপাত চিত্রময়তা দিতে পারে নিঃসন্দেহে, কিন্তু নিছক অভ্যস্ত কৌশল বলেই তা ব্যক্তিস্বরূপ সৃষ্টি করতে অক্ষম। কেননা ব্যক্তিত্বের

একটা সামগ্রিক রূপ বর্তমান, যে রূপ প্রকাশ পায় ঘটনা ও চরিত্রের মেজাজের কার্যকারণ সম্পর্ক সূত্রে, ক্রমশ —আপাত সবল কিংবা কঠিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সুতরাং ব্যক্তিস্বরূপ সৃষ্টির প্রাথমিক শর্তই হলো তার বাহ্য ব্যবহারের উৎসে যাওয়া। খুঁটিনাটি আচার ব্যবহারের গভীরে যে মনস্তত্ত্ব, যে বোধ-বুদ্ধি, যে পটভূমি তার সম্যক উপলব্ধি; এবং কেবল উপলব্ধি নয় সেই উপলব্ধিকে সিনেমা আঙ্গিকে মূর্ত করার শিল্পবোধ।

আলোচ্য শিল্পবোধের কল্যাণেই 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-র সর্বজয়া-হরিহর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিস্বরূপ হয়ে ওঠে। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ক্ষমতা অত্যন্ত নগণ্য, যখনই তিনি ক্লোজ শটে মূর্ত তখনই তাঁর পেশাদারী অভিনয় রীতি পরিষ্কার, অন্য সময়েও তাঁর অতি ব্যঞ্জনার অভ্যাস চোখে পড়ে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও হরিহরের ব্যক্তিত্ব সত্য হয়ে উঠেছিল এ-জন্যেই যে সত্যজিৎ রায় এ-চরিত্রের পটভূমি ও মনস্তত্ত্বকে একটা সার্বিক কার্যকারণ সূত্রে বেঁধেছিলেন; বেঁধেছিলেন সরল ব্যবহারের, বাক্যের এবং পরিবর্তমান ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় যে সহজ কিন্তু শিল্পময় ব্যঞ্জনা ফোটে তারই মাধ্যমে। সর্বজয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য—যদিচ অভিনয় দক্ষতায় তিনি কানুবাবুর উর্ধ্বে। অর্থাৎ 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' দুটি ছবিতেই সার্বিক ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনেই এঁরা স্মরণীয়, খণ্ড-খণ্ড তথাকথিত সিনেমাটিক অভিনয়ের কৌশলে নয়। আর এই ব্যক্তিস্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল এ-জন্যেই যে সত্যজিৎ রায় চরিত্রগুলির আচার-আচরণের উৎসে যে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল, এবং সে মনস্তত্ত্বের গভীরে যে ঘটনাবলী ও দেশকালের সত্য ছিল, তা তাঁর চরিত্রগুলিতে বিধৃত করেছিলেন।

একই কথা খাটে অপু-অপর্ণার সম্পর্কের ছবি সম্বন্ধে। অর্থাৎ অপুর বিয়ে, বৌ আনার দৃশ্য, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের সূচনা ও তার স্বরূপ। কিংবা, অপুর সংসারেই, অপু-কাজলের দূরত্ব-নৈকট্যের রকমফেরে। অপুর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট ধাঁচের বাইরে, তার সহজ তারুণ্যের অন্যথায়, অপর্ণার সঙ্গে তার সম্পর্কপাতের দৃশ্যগুলি নিশ্চয়ই বেমানান হত। তার সংবেদনা, শিক্ষা , মূল্যবোধ ও সময়ের পটভূমিতেই স্ত্রীর সঙ্গে অপুর সম্পর্কের ছবিটুকু জীবন্ত ও স্নিগ্ধ দেখায়। একটা খণ্ড চিত্র হলে এ-সম্পর্কটুকুই মনে কোনো ছাপ রাখতনা, বড়জোর হয় তো তাৎক্ষণিক মানসিক প্রসাদ বিলোতো। তখন-তখন দেখতে ভালো লাগত।

যেমন লেগেছিল 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র চার বন্ধুকে। আমি তদ্‌গত হয়েছিলুম তাদের ভাব প্রকাশের খুঁটিনাটি রকমফেরে। তাদের আচার আচরণের সূক্ষ্ম, তাৎক্ষণিক পার্থক্যে। কিন্তু এ পার্থক্য, আলোচ্য চিত্রে তাৎক্ষণিক সুষমাতেই ফুরোয়। চার বন্ধুই ব্যক্তিত্বের দিক থেকে মূলত থেকে যায় অভিন্ন, চারটি পিক্‌নিক্‌-মেজাজী যুবা, হাল্কা ও ভাসা-ভাসা। তার ফলে কারুরই কোনো স্বকীয় ব্যক্তিস্বরূপ ফুটলো না; চারজনেই হাসি-ঠাট্টা শেষে কাদার পুতুলের মত একটি অখণ্ড ভেলা হয়ে গেল। যতক্ষণ তারা হাসি-তামাসা করল ততক্ষণ ভালো লাগল, সঙ্গে রইলুম সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়; কিন্তু অবশেষে, নাটকের অন্তে, মনে কোনো দাগ রইল না।

এর একটা কারণ অবশ্যই গল্পের কাঠামো, চার যুবার বেড়ানোর মেজাজ। কিন্তু এই মেজাজের আড়ালে যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের উপনিবেশ, সেগুলি রয়ে গেল অনাবিষ্কৃত। অন্তত একটি চরিত্রও যদি ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হত, পৃথক নক্ষত্রের

মত ভাস্বর, তাহলেই অন্য তিনটি চরিত্রও তাদের সাধারণ্যে ও অগভীরতায় ভিন্ন তাৎপর্য অর্জন করত। চারিত্রিক বৈপরীত্যে, বোধ, প্রত্যাশা ও অন্বিষ্টের পার্থক্যে তাদের সাধারণ ব্যক্তিত্বগুলি একটা যোগ্য বিচারের মানদণ্ড বা পটভূমি পেত। চারিত্রিক এ-পার্থক্য টানার চেষ্টাও সত্যজিৎ রায় করে-ছিলেন সৌমিত্র ও শুভেন্দুর মাধ্যমে। কিন্তু সে পার্থক্য টুকরো সংলাপেই আবদ্ধ, কখনো বিলীয়মান তাৎক্ষণিক মেজাজের সুরে সামান্য কম্পন তুলেছে মাত্র। কোনো মূল্যবোধের বৈপরীত্যে এ-পার্থক্য প্রয়াস দানা বাঁধেনি। তাই মেজাজের খুচরো পার্থক্যের সুর যেখানেই ঈষৎ বেজেছে সেখানেই তা শুনিয়েছে শৌখিন—এমন কি ক্বচিৎ বেসুরো। আসলে চরিত্রগুলি তাদের সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, পিক্‌নিকের মেজাজে, স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল। পিকনিকের যা একটা ধর্মই।

সুতরাং এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ যে ব্যক্তিস্বরূপ চেহারা পায় সমাজ-সংসারের টানাপোড়েনের আবহাওয়াতেই, নিরালম্ব অবস্থায় নয়। কেননা মানবিক প্রকাশ ব্যঞ্জনার মাটিই হলো দেশ ও কাল, মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ ও সামাজিক মানুষের নিজের অন্বিষ্টের ওঠা পড়া। এ-কথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রসঙ্গে। আলোচ্য ছবিতে নায়ক, ভাই ও বোন তিন জনেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিস্বরূপের অধিকারী; এমন কি স্বল্প দাগে আঁকা নায়কের বন্ধুরাও। এটা সম্ভব হলো কারণ এদের সবারই ভাব ব্যঞ্জনা একটি বৃহত্তর পটভূমিতে সংলগ্ন মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত অর্থাৎ এদের বিরোধ ও পার্থক্য যেমন ব্যক্তিগত তেমনি দেশ কালে বিধৃত। এখানে পার্থক্যের চেহারা বা আকর্ষণ-বিকর্ষণ কেবল তাৎক্ষণিক মেজাজ-ঘটিত নয়, মৌলিক মূল্যবোধের ও বিভিন্ন প্রয়াসের উৎসে তার উৎপত্তি। এবং এ মূল্যবোধ যেহেতু স্বয়ম্ভু নয়, দেশ কালের জল-হাওয়ায় লালিত, তাই এর মূল সুর বৃহত্তর সত্য-মিথ্যায় সংযুক্ত, অর্থাৎ সামাজিক। অথচ সামাজিক মূল্যবোধের বা অন্বিষ্টের প্রকাশও যেহেতু শিল্পে হয় ব্যক্তি-চরিত্র মাধ্যমেই তাই এই মূল্যবোধের দ্বন্দের চেহারা এক ব্যক্তি থেকে অন্য বক্তিতে ভিন্ন; এবং অগত্যা তার প্রকাশভঙ্গী অর্থাৎ আকার ব্যক্তিগত, নানা প্রকার, ও ব্যক্তি দ্বন্দ্বে সংক্ষুব্ধ। এই দ্বন্দ্বময়তার মধ্যেই ব্যক্তি ও সমাজের অঙ্গাঙ্গী সংযোগ ও প্রগতি; এবং আলোচ্য সমন্বয় ও সংযোগের দরুণই শিল্পে, শেষ পর্যন্ত, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-ভালোবাসা সার্বিক অথবা সামাজিক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ শিল্পে, ব্যক্তির কার্যকলাপ ও মূল্যবোধের বিভিন্ন রূপেই, সমাজ-সংসারের চেহারা প্রতিফলিত।

অবশ্য প্রতিফলিত বলাও ভুল, সর্বাংশে সঠিক নয়। কারণ দর্শনের মত শিল্পেও যা ঘটে সেটা পুনর্নির্মাণ, ঠিক প্রতিফলন নয়। নাটক-উপন্যাস বা সিনেমায় সমাজ সংসারের; বাহ্য রূপটিই বহুলাংশেই প্রতিফলিত, কিন্তু একটি বিশেষ কালে মনুষ্যত্বের অন্বিষ্ট যা, সেটা তার মূল্যবোধ ও আদর্শ, তার কোন বাহ্যিক রূপ থাকে না। এবং বহু ক্ষেত্রেই সাম্প্রতিক বঙ্গভূমে যেমন, আদর্শের বাহ্যিক রূপই যে শুধু অনুপস্থিত থাকে তা না, সে অন্বিষ্টে পৌছনোর পথও থাকে চৈতন্যে অপরিষ্কার, নানান বিভ্রান্তিতে জড়ানো। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতেও সৎ শিল্পীর প্রয়াস হয় সত্যে পৌঁছনো। অর্থাৎ যে সত্য তাৎক্ষণিকে অনুপস্থিত বর্তমানে বিভ্রান্তিতে ভ্রষ্ট, তাকেও শিল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ মূল্যবোধের পরিচ্ছন্ন দ্বন্দ্বে ভ্রষ্ট বিভ্রান্তির উর্দ্ধে যে মৌলিক সত্য আছে তাকে জীবন্ত কসর। সে জন্যেই শিল্পে সমাজ সংস্কার ঠিক প্রতিফলন নয়, মূল্যবোধের

দ্বন্দ্বে পুনর্নির্মিত আধার।

শিল্পে এই পুনর্নির্মাণ ক্বচিৎ কখনো সরাসরি হয়। অর্থাৎ যখন অসতর্ক রসিকের মনে হতে পারে যে নাটক, উপন্যাস, সিনেমার শুধু সমাজসত্য প্রতিফলিত। এ হেন অসতর্ক মনের ধারণা হতে পারে গর্কীর মা বা টলস্টয়ের যুদ্ধ ও শান্তি কেবল প্রতিফলন। যদিও উভয়েরই অধিকাংশ সৃষ্টি অন্য কথা বলে। আসলে শিল্পে সমাজসত্য মূর্ত হয় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ায়, এবং মুখ্যত বক্র ভঙ্গিমায় যেমন ব্রেখটে ; অথবা মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে যেমন চেকভ, তুর্গেনিভ, টলস্টয় বা বিংশ শতকে টমাস মান-এ। এরই রকমফের ইবসেন বা শ-এ। কিংবা যতই পিছিয়ে যাওয়া যাক সেই একই কথা—দান্তে, শেক্সপীয়র ইত্যাদি। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পে সত্য উদ্ভাসিত মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে সরাসরি শ্রেণী সংঘাত বা বিপ্লবে নয়। কিন্তু, representational শিল্পআঙ্গিকে অন্তত, যোগ্য শিল্পীমাত্রেই সমাজ-আশ্রয়ী। কেননা মানুষ নিয়েই তাঁদের কারবার। আর সেজন্যেই তাঁরা একাধারে সমকালীন এবং কালোত্তীর্ণ, এবং আলোচ্য অর্থেই সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' ও 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সমকালীন ও কালোত্তীর্ণ।

আসলে সার্থক গল্প উপন্যাস বা সিনেমা-থিয়েটারে নিছক সমকালীন বা নিছক কালোত্তীর্ণ বস্তু বলে কিছু নেই। শৌখিন সৃষ্টি নিছক সমকালীন হযতো হতে পারে, যেমন সত্যজিৎ রায়ের মহানগর অথবা এরেনবুর্গের প্যারিসের পতন। অনেক নীচুস্তরে রয়েছে দেওয়াল পোষ্টার কিংবা আপাত সমসামযিক, তপন সিংহের সাগিনা মাহাতো বা এখনি। কিন্তু এ-গুলি শিল্প বিচারে পড়ে না। আদ্য কথা, সমকালীনতা শুধু পোশাকে-আশাকে, বাক্যের ঝড়ে বা ধর্মঘটের বিচ্ছিন্ন ছবিতে ফোটে না; ফোটে সমকালের মর্মযন্ত্রণার ভিত্তিতে তাৎপর্যময় করতে পারলেই। এই মর্মযন্ত্রণা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক আনন্দবিরোধের ছবিতে যেমন প্রতিভাত, তেমন, বৃহৎ পটভূমে, যুদ্ধ বিপ্লবেও; আবার প্রাত্যহিক জীবনের অন্তরালে মূল্যবোধের যে নিরন্তর সংঘাত-সমন্বয় সেখানেও তার অবস্থান। কোন অবস্থান থেকে কোন শিল্পী মানবিক এ-অন্বিষ্ট বা মর্মযন্ত্রণাকে তাঁর সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা করবেন তা বলা দুষ্কর।

শুধু বলা চলে শিল্পী সমকালীনতার ভিত্তিতেই—অন্তত সাহিত্যে সিনেমায়—কালোত্তীর্ণ হন; কেন না তিনি এবং তাঁর চরিত্রাবলী দেশকালের স্পন্দনেই মূলত আবদ্ধ। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি মনুষ্যত্বের মর্মযন্ত্রণা বা অন্বিষ্টকে প্রতিষ্ঠা করেন, তখনই সেই সমকালীন অন্বিষ্ট বা মর্মযন্ত্রণা মানবিক তথা কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে।

এ-ক্ষেত্রে শিল্পের জাদু বিস্তার ঘটে দুই অঙ্গাঙ্গী কিন্তু পৃথক স্তরে। মূল্যবোধ ও অন্বিষ্টের একটি স্তর, অন্যটি মৌল মানবিক প্রকৃতির। মূল্যবোধ ও অন্বিষ্টের যে স্তর সেটা মূলত—কিন্তু সর্বাংশে নয়—দেশ কালে বিধৃত; বিশেষ স্থানকালে মানুষেব জ্ঞান ও বোধের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু মানুষের মৌল প্রকৃতির যে স্তর—অর্থাৎ মানবিক হিংসা প্রেম ও সুখস্বপ্নের যে অন্বিষ্ট—তা দেশকালের রীতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও, আবহমানকাল অটুট।

অর্থাৎ য়ুরোপীয় সিনেমা সাহিত্যে বামুন-কায়েতের পার্থক্যে প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদ ঘটানো অসম্ভব; কিংবা নিছক নীচুজাত বা হরিজন বলে এদেশে যে অজস্র মানুষের অকথ্য দুর্দশা সেটা ওখানে অলীক। আবার এদেশেও আজকে—বামুন-কায়েতে

বিচ্ছেদ হলেও—অন্তত জমিদার নন্দনের, যক্ষ্মার বিলম্বিত শৌখিনতায় দেবদাস হওয়া অচল। আজকের দেবদাস হয় চিকিৎসায় অচিরে সুস্থ হয়ে পারুলকে গ্রহণ করবে; নয়, বাঈজী-বিলাসে স্বচ্ছন্দে উড়বে, প্রেমের ভনিতা আত্মহননে অপারগ।

কিন্তু নারী পুরুষের যে টান, তার সভ্য ও গভীর সংজ্ঞা প্রেম; সেই মৌল মানবিক প্রকৃতি—রীতিনীতির পার্থক্য সত্ত্বেও—আবহমানকাল অটুট। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে, সাহিত্য-সিনেমায়, সমকালীনতার ছাপ পড়ে রীতিনীতির ভেদে, প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্যে, প্রেমঘটিত মূল্যবোধের রকমফেরে। যেমন সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙঘায় প্রেমের প্রকাশভঙ্গীতে, মূল্যবোধে রয়েছে সমকালীনতার ছাপ; অথচ রোমিও জুলিয়েটের প্রকাশরীতিতে নয়। এমন কি—আলোকপ্রাপ্ত শহুরে মানদণ্ডে—চারুলতার প্রেমবিষয়ক প্রকাশভঙ্গীও অপেক্ষাকৃত অতীতমুখীন। কিন্তু তবু চারুলতা ও রোমিও জুলিয়টের প্রেমের মৌল আবেগ—পরস্পরের তুলনা ব্যতিরেকেই সমকালেও নাড়া দেয়। দেয় কেন না প্রেমের মৌল প্রকৃতি, মানবিক আবেগ আজো অটুট। এবং তার প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য সমকালের চোখে পড়লেও তার মৌল বোধটুকু— শেষের কবিতা বা দেবদাসের মত সৌখিন রচনায় নয়— সার্থক শিল্পে, আমরা অস্বীকার করতে অক্ষম। একই রকম অক্ষম আমরা জীবন-মৃত্যুর ট্র্যাজিক্ বোধ পায়ে ঠেলতে।

এবং আলোচ্য ট্র্যাজিক বোধ-এর কল্যাণেই আজো গ্রীক ট্র্যাজেডি দেশে দেশে নন্দিত। যদিচ গ্রীক ট্র্যাজেডির মিথ বা মূল্যবোধ সমাজবাদী থেকে ধনবাদী সব দেশেই আজ অচল, তবু তার নিছক ট্র্যাজিক বোধই মানবিক অন্বিষ্টের ব্যর্থতায়, হিংস্রতায়, এমনকি বীভৎসতায় আমাদের ভারাক্রান্ত করে। কেননা গ্রীক মিথ-এর দেবদেবী সাহিত্যের জাদুতে—ইউরিপিডিসে নয়, অন্যদের কলমেও মনুষ্যত্বের হাহাকারের নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পের এই মৌল রূপ লক্ষ্য করেই নিশ্চয়ই মার্ক্স লিখেছিলেন ঃ গ্রীক ট্রাজেডি কোন্ শ্রেণী ব্যবস্থায় কোন্ শ্রেণীর লেখক লিখেছিলেন তার সহজেই বলা যায়। কিন্তু তাতে যে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না সেটা হল কেন ভিন্ন সমাজব্যবস্থায় ভিন্ন শ্রেণীর লোকের কাছেও তার অমূল্য আবেদন থেকে যায়।

সম্ভবত সাহিত্যের উপর তাঁর পরিকল্পিত পুস্তক রচনা করার সময় পেলে মার্ক্স নিজেই তাঁর প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতেন। আর তাহলে অন্তত অনেকেই মাছিমারা মার্কসবাদী ও মার্কসবাদ বিরোধীদের বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেতেন—চ্যাপলিন বা ব্রেখ্ট তো বটেই, এদেশে সত্যজিৎ রায়ও।

সত্যজিৎ রায়ের কলকাতা

প্রলয় শূর

কলেজে গণেশ পূজার ছুটি থাকে না

'এর নাম গ্লোব। এই হচ্ছে পৃথিবী, আমাদের পৃথিবী, এই দাগগুলো দেখছো না, এগুলো দেশ, আর এই যে নীল, এগুলো সমুদ্র। কলকাতা কোথায় জানো মা, এই যে এইখানে.......' প্রবল উৎসাহে অপু তার মাকে গ্লোবটা দেখাচ্ছিল, কারণ সে কলকাতায় পড়তে যাচ্ছে। তার চোখে লেগে আছে স্বপ্ন, পুরুতের ছেলে ঠাকুরপুজো ক'রে সে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায় না। এই কলকাতা যাওয়া নিয়েই রাগ করেছিল মা সর্বজয়া। মা তাকে সেই প্রথম চড় মেরেছিল, চড় মেরে পর মুহূর্তেই মা অনুতপ্ত। সর্বজয়া রাগ করেই বলেছিল, 'আমি কি গাঙের জলে ভেসে এয়েচি। তুই পুজো-আচ্চা বন্ধ করে চলে যাবি, আর এরা আমাকে মাথায় তুলে রাখবে, না?' অপু বলেছে, 'তাই বলে কি আমি পড়ব না নাকি? বসে বসে ঠাকুরপুজো করব?'

গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল অপু। মা তাকে ডেকে আনে, 'চল, ছেলেমানুষি করিসনি অপু, বলছি তো যাস কলকাতা।' সর্বজয়া ট্রাঙ্ক খুলে টাকার থলে বার করে খাটে বসে। টাকাগুলো বিছানায় বার ক'রে গুণতে থাকে। অপু অবাক হয়। জিজ্ঞেস করে, 'কার টাকা মা?' সর্বজয়া বলে, 'চাকরি করতাম না কাশীতে? মনে আছে? কত জমিয়েছি জানিস? বত্রিশ।'

কলকাতা যাবার সময় মা তার জিনিস গুছিয়ে দিয়েছে 'এই দ্যাখ্, এই তোর গেলাস, এই তোর তেলের বাটি। এতে নারকোল নাড়ু আছে। এইখানে তোর মশলা দিয়েছি। সরের ঘি করেছিলাম বাড়িতে, এই দিলাম। এইখানে তোর ফতুয়া আছে, জামা আছে। আর ধুতিটা বিছানার মধ্যে দিয়েছি। বইয়ের মধ্যে দুটো পোস্টকার্ড আছে, গিয়েই চিঠি দিবি।'

হেডমাস্টারমশাই চিঠি দিয়েছিলেন। দিয়ে বলেছিলেন, 'শেয়ালদা স্টেশন থেকে বেরিয়ে হ্যারিসন রোডে পড়েই যে কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করলেই পটুয়াটোলা লেনটা বলে দেবে।' 'পথের পাঁচালী'তে বালক অপু নির্ভর করে আছে মা বাবা আর দিদির ওপর। দুর্গার মৃত্যুর পর অবশ্য সেই বালকটি সচেতন হয়ে উঠেছে। কেরোসিনের বোতল নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে, একবার ওপর দিকে চেয়ে আকাশের অবস্থা দেখে, ঘরে ঢুকে ছাতা নিয়ে বেরিয়েছে। তার দিদি যে চুরি করেছিল তার চিহ্ন সে মুছে ফেলেছে। আর যেদিন থেকে অপু একাই চলেছে নিজের জীবনের পথ খুঁজে নিতে, সেদিন সে তার গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে।

সে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। হ্যারিসন রোডে এগিয়ে চলেছে ঠিকানা অনুসন্ধান ক'রে। আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে।

একটি ছেলে কলকাতায় পড়তে এসেছে। মা তিরিশ টাকা দিয়েছিল। দশ আনা

রেল ভাড়া দিয়ে, ঊনত্রিশ টাকা ছ আনা আছে। দিনের বেলা কলেজ ক'রে রাত্তিরে সে প্রেসের কাজ করবে, তবু সে পুরুতগিরি করবে না, সে একালের ছেলে, সে কষ্ট করবে, লড়াই করবে, জীবনবিমুখ হবে না। মাকে সে ভালোবাসে। একদিকে মা, অন্যদিকে তার লেখাপড়া শেখার শহর কলকাতা। সে চলেছে এ দুয়ের মাঝখানে। এই শহরটা তার মার কাছ থেকে অনেক দূরে।

হেডমাস্টারমশাই তাকে বলেছিলেন, 'সত্যিকারের যদি ভালো স্টুডেন্ট হতে চাও তাহলে পরিশ্রম করতে হবে। এই ধরো ট্রাভেল, গ্রেটম্যানদের জীবনী, কিম্বা সায়াম্স-এর বই খুব সহজ ভাষায় লেখা, এসব বই যদি দি, পড়বে তুমি?' অপু তার হেডমাস্টারের কাছেই জেনেছিল বই না পড়লে মনের প্রসার হয় না। বাংলাদেশের একটা রিমোট কর্নারে পড়ে আছি বলে যে মনটাকেও কোণঠাসা করে রেখে দিতে হবে এমন তো কানো কথা নেই। হেডমাস্টারমশাই আলমারি থেকে বই বার করে অপুব হাতে তুলে দেন—এই বইটা হচ্ছে নর্থ পোল সম্বন্ধে। যদি কেউ জানতে চায়—অরোরা বোরিয়লিস কাকে বলে—কিম্বা এস্কিমোরা কি খেয়ে বেঁচে থাকে, এ বইটা পড়লেই জানতে পারা যাবে। লিভিংস্টোনের ভ্রমণবৃত্তান্ত—এতে আফ্রিকা সম্বন্ধে জানতে পারবে। স্টোরি অফ ইনভেনশান—এটা হচ্ছে বিখ্যাত Scientist-দের জীবনী, গ্যালিলিও, আর্কিমিডিস, নিউটন, ফ্যারাডে।'

অতএব হরিহর রায়ের ছেলে এই তার একমাত্র পবিচয় হতে পারে না। তাকে জানতে হবে জগতের অনেক কিছু। কলকাতায় পড়তে গিয়ে অপু একই সঙ্গে কলেজ করেছে, প্রেসে কাজ করেছে। মনসাপোতায় অপু যখন তার মার কাছে ইস্কুলে পড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল, তার মা জিজ্ঞেস করেছিল 'তোর কাজের কি হবে?' অপু বলেছিল, 'কাজ তো সকালে, ইস্কুল দুপুরে।'

'দুটো একসঙ্গে চালাতে পারবি?'

'হ্যাঁ।'

'পয়সা লাগবে না? কে দেবে?'

'তোমার পয়সা নেই মা, পয়সা নেই মা তোমার?'

অপু আড়বোয়ালের ইস্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখেছিল, পুরুতগিরির কাজও করেছিল, সেও একটা কাজ নিশ্চয়ই, এই লেখাপড়ার জন্যে শুধু যে শহরে এসেই তাকে কষ্ট করতে হয়েছে তা নয়।

'এটা সূর্য, এটা ত পৃথিবী, আর এটা ত চন্দ্র—চাঁদটা পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে তো? ঘুরতে ঘুরতে যখন এইখানে আসে....' সর্বজয়া মন দিয়ে দেখছে, 'তখন এই ছায়াটা যখন এখানে পড়ে, তখন গ্রহণ হয়।' সর্বজয়ার মুখে আমরা দেখি নিজের অজ্ঞানতার বেদনা ও লজ্জামিশ্রিত নিজের ছেলের এত জ্ঞানের পরিচয়ে সৌভাগ্যমিশ্রিত আনন্দ। রাংতার মুকুট পরা পথের পাঁচালীর গ্রাম্য পালা দেখে উদ্বুদ্ধ অপু অপরাজিততে 'আফ্রিকা' 'আফ্রিকা' চিৎকার ক'রে নতুন কিছু আবিষ্কারের ছেলেমানুষী আনন্দে উল্লসিত।

হেডমাস্টার অপুকে বই দেখিয়ে বোঝাচ্ছেন, 'এই পেয়েছি কন্সটেলেশন অফ দি গ্রেট বেয়ার।' এই দেখ।' বইয়ের পাতায় অপুকে ছবি দেখান তিনি। সপ্তর্ষিমন্ডল। তাকে

জানালার কাছে এগিয়ে নিয়ে যান, 'ঐ দেখ।' হেডমাস্টার আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখান। 'আর একটা wonderful কন্সটেলেশন হচ্ছে এই দেখ, ওরিয়ন, কালপুরুষ।'

'এই বইটা তুমি নাও। এতে অনেক কিছু মজা পাবে।'

কলকাতায় আসার আগে পরিচালক ধীরে ধীরে প্রস্তুত করেন সেই অপুকে যে শিক্ষালাভের ভিতর দিয়ে জগতটাকে চিনতে শিখছে। তার এই লেখাপড়া শেখার প্রবল ইচ্ছাকে চলচ্চিত্রকার দর্শকের সামনে তুলে ধরছেন অজস্র ডিটেলে, সিনেমার ভাষায়। মনসাপোতা গ্রামের পথ ধরে যে অপু নারায়ণ শিলা নিয়ে পুজো সেরে ফিরে আসছিল, সে অপু পুরুতগিরিতে খুশি থাকতে পারে না, কারণ দূরে স্কুল বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল। সর্বজয়া বুঝতে পারে ছেলের মন খারাপ ; কি জন্যে মন খারাপ সেটা বুঝতে তার অসুবিধে হয়, তাই জিজ্ঞেস করে, 'কাশীর জন্যে মন কেমন করছে?' 'নিশ্চিন্দিপুরের জন্যে?' অপু মাথা নেড়ে জানায় 'না'। 'মনসাপোতা ভালো লাগছে না? বল্ না কি হয়েছে? ওরা কিছু বলেছে তোকে?' না কেউই কিছু বলেনি, সে ইস্কুল যেতে পারছে না তাই সমস্তদিন তার মন খারাপ হয়ে আছে।

আইজেনস্টাইন শিখিয়েছিলেন সিনেমার ব্যাকরণ, হলিউড শিখিয়েছে কি ক'রে সিনেমায় গল্প বলতে হয়, ইতালিয় নিওরিয়ালিজম শিখিয়েছে কি করে সিনেমায় সমাজের বাস্তব চেহারাটা তুলে আনতে হয়, কিন্তু কেউই শেখায়নি ইস্কুল যেতে পাবছে না ব'লে একটি বালকের মন খারাপকে কি ক'রে পর্দায় রূপ দিতে হয়।

অপুর সংসারে বাড়িওয়ালা বলেছিল, 'এটাও কি কথা ছিল যে দিনের বেলায় বাতি জ্বালিয়ে আপনি কারেন্ট পোড়াবেন?' বিরক্ত অপু বাড়িওয়ালা চলে যাবার পর সুইচ টিপে আরো দুটো আলো জ্বালিয়ে দেয়। 'অপরাজিত' ছবিতে বৈদ্যুতিক আলো প্রথম দেখেছিল অপু কলকাতা শহরে এসে। অপু তার ঘরে এসে ইলেকট্রিক সুইচ একবার জ্বালায় একবার নেভায়। এ জিনিস সে আগে কখনও দেখেনি। মাকে চিঠিতে লিখেছিল, 'আমার ঘরে একটি বৈদ্যুতিক আলো আছে।'

একদিন স্কুলের ইনস্পেকটারের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল অপু, কিশলয় মানে কচিপাতা। শুনিয়েছিল, কোন্ দেশেতে তরুলতা/সকল দেশের চাইতে শ্যামল/কোন্ দেশেতে চলতে গেলে/দোলতে হয়রে দূর্বা কোমল।

আজ সে মনসাপোতা ছেড়ে এসেছে। এসেছে কলকাতায়। ইস্কুলের হেডমাস্টার তার মনটা খুলে দিয়েছিলেন। গ্যালিলিও, আর্কিমিডিস, নিউটনের জীবনকাহিনী জানলেই শুধু চলবে না, তাঁদের কাজের সঙ্গেও যে পরিচিত হ'তে হবে। এখন আর, কোথায় ফলে সোনার ফসল/ সোনার কমল ফোটে রে—এই স্বদেশপ্রীতির বালকীয় মুগ্ধতা নয়, জানার আছে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। Synecdoche. সিটি কলেজে পড়ছে অপূর্ব কুমার রায়।

Synecdoche is a figure of speech based on association. Here we have an instance of a more comprehensive term used for a less comprehensive one, and vice versa.

কলকাতা থেকে গ্রামে গিয়ে মার প্রশ্নের উত্তরে অপু বলেছে, কতো কি দেখেছে কলকাতায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হগ মার্কেট, চিড়িয়াখানা, কালিঘাটের মন্দির,

কেওড়াতলা Burning ghat। রাত্তিরে সর্বজয়া বলেছে, 'এবার যখন আসবি গোটাকতক ঝিনুকের বোতাম আনবি তো।'

এরপর কিছু শটে দেখা যায়, প্রোফেসর নাম ডাকছেন, অপু পরীক্ষার খাতায় লিখছে, প্রোফেসর পড়াচ্ছেন, ব্ল্যাকবোর্ডে লিখছেন, ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক পরীক্ষা চলেছে, অপু লেকচার শুনছে, অপু প্রেসে মেশিন চালাচ্ছে।

সর্বজয়ার চিঠি আসে, 'তোমাদের কি গণেশ পূজার ছুটি থাকে? যদি থাকে তো একবার এখানে আসিও। দুই মাস তোমাকে দেখি নাই, বড় দেখিতে ইচ্ছা করে।' অপু উত্তর লেখে 'কলেজে গণেশ পূজার ছুটি থাকে না। তাছাড়া আগামী মাসে আমার পরীক্ষা, এই সময় কলিকাতায় না থাকিলে পড়াশুনার ক্ষতি হয়।'

সর্বজয়া ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। উঠোনে বসে থাকে গাছের নিচে। ট্রেনের হুইসেল শোনা যায়। দূরে ট্রেন যাচ্ছে। বাঁশের খুঁটি ধ'রে ধ'রে এগিয়ে আসে দরজার কাছে।

বাইরে অন্ধকারে জোনাকি জ্বলছে।

গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসে অপু। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়। সর্বজয়ার ঘরের দিকে তাকায়। 'মা' 'মা' ব'লে ডাকে! উঠোনে দেখতে না পেয়ে বাইরে আসে। 'মা' 'মা' ব'লে ডাকে। দেখতে পায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে দাদু। দাদু কোনো সাড়া দেয় না। কি ঘটেছে অপু বুঝতে পারে। সে গাছতলায় বসে পড়ে। কাঁদে।

রাত্তিরে ভবতারণ তাকে বলে ঃ যা হবার তো হয়েই গেছে, এখন শ্রাদ্ধটা কোনোরকমে কর—যজমানি করলে পরে তোর ভালোরকমে চলে যাবে।'

সকালবেলা অপু দাওয়ায় বসে জিনিসপত্তর গুছিয়ে নেয়। পথের পাঁচালী-র শেষে দুর্গার মৃত্যুর পর যে বালকটি একা হয়ে গিয়ে বুঝেছিল এখন থেকে তাকেও কিছু করতে হবে, অপরাজিত-তে কলকাতা যাবার আগে যে কিশোরটির জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়েছিল তার মা, ছবির শেষে মায়ের মৃত্যুর পর সেই ছেলেটিই এবার জিনিসপত্র নিজেই গুছিয়ে নিচ্ছে। যৌবনকালে সে তার সংসারটাও গুছিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু যুবক জানেনি, এই পৃথিবী এই বিশ্বপ্রকৃতি কোনো কিছুই গুছিয়ে রাখতে দেয় না।

ভবতারণ দাওয়ার কাছে এসে দাঁড়ায়। অপুকে দ্যাখে। ভবতারণ জিজ্ঞেস করে, 'যাচ্ছো কোথায়'? অপু আস্তে আস্তে জবাব দেয়, 'কলকাতায়।' ভবতারণ জানতে চায় ঃ 'কলকাতায় কেন?' অপু উত্তর দেয়, 'পরীক্ষা আছে।' ভবতারণ বলে 'তোর মায়ের শ্রাদ্ধ।' অপু বলে, 'কলকাতায় করব, কালীঘাটে.....' অপু উঠে দাঁড়ায়। দাওয়া থেকে নেমে দাদুর কাছে এগিয়ে যায়। দাদু আশীর্বাদ করে। অপু বেরিয়ে আসে। সদর দরজা পেরোয়। চেয়ে থাকে দাদু। অপু তার গ্রাম ছেড়ে চলেছে।

পিসি নেই, দিদি নেই, বাবা নেই, মা নেই!

পিছুটান কিছু নেই। অপু গ্রামের পথ ধ'রে হেঁটে চলেছে।

একদিন ঠাকুর ঘরে বসে পুজো করেছিল সে। ভবতারণ তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল কি করে পুজো করতে হয়, বলেছিল, 'নারায়ণের উপরে দুটো সচন্দন তুলসীপত্র দাও,' 'ফুল দাও' অপু পুজো সেরে বিগ্রহের সামনে নতজানু হয়ে নমস্কার করে, মন্ত্র উচ্চারণ করে, 'নমো গোব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায়/কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।' কিন্তু এই

মন্ত্র আউড়ে সে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে না, নিশ্চিন্দিপুরের ভিটের জন্যে তার মনকেমন করার কথা নয়। কাশীর ঘাটে আমরা দেখেছিলাম হরিহর কাশীখণ্ডের পাঠ ও ব্যাখ্যা করছে, 'হে শংকর তোমাকে নমস্কার, হে শান্ত তোমাকে নমস্কার, হে শম্ভু তোমাকে নমস্কার, হে পিণাকপানি তোমাকে.....' অপু চাতালের উপর শুয়ে হরিহরের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনছে। কিন্তু মনসাপোতার ইস্কুল তার সব কিছু বদলে দিয়েছে। হেডমাস্টারমশাই বলেছিলেন, 'আমাদের দিক থেকে তোমার পড়াশুনার যতটা করা সম্ভব তা আমরা করব...' পরে দেখেছি হেডমাস্টার তার কাছ থেকে জেনে নিচ্ছেন, সে আর পড়বে কিনা, সে কলকাতায় পড়তে যাবে কি না, কি পড়বে আর্টস না সায়েন্স, কলকাতায় থাকবার মতো ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা কিছু আছে কি না, কোনো রিলেটিভ-টিলেটিভ কি থাকে সেখানে, মাকে রাজি করানো সম্ভব হবে কিনা।

তাই যজমানি করা তার মানায় না। কলকাতা ছাড়া আর কোথাও তখন যাওয়া যায় না।

বিষণ্ণতা বিচ্ছিন্নতা শোক সব কিছু ছাড়িয়ে চলেছে সে। সেই পুরোনো ডোবা, কলাগাছের পাশ দিয়ে, গ্রামের কাঁচা মাটির রাস্তা পার হয়ে চলেছে সে। মায়ের শ্রাদ্ধের কাজটাও সে কলকাতায় ক'রে নেবে। অনেককাল ধ'রে আছে ঐ দরজাটা, ঐ দরজাটার মতোই দাদু ভবতারণ এখানে থেকে যাবে, অপুর জীবনের পথ চলে গেছে সামনের দিকে, ট্রেনের রাস্তায়, কলকাতার দিকে, অপরাজিত জীবনের পথে চলেছে অপু।

To my Wife :

এই বালক সাধারণ আর 'পাঁচটা ছেলের মতো নয়।

অপু কল্পনাপ্রবণ অনুভূতিপ্রবণ বুদ্ধিমান উজ্জ্বল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সত্যজিতের ছবিতে আমরা বিবেকসম্পন্ন হৃদয়বান নানা স্তরের মানুষকে দেখেছি, যারা সব গুণ সত্ত্বেও বারবার জড়িয়ে পড়েছে নানা সমস্যায়, লড়াই করার চেষ্টা করেছে সংকটের মুখে। বিপন্ন হয়েছে তারা, মুক্ত হবার চেষ্টাও করেছে। তারা তাদের নিষ্ঠা, আদর্শ, কর্মক্ষমতা, বিদ্যাবুদ্ধি, বোধ ও হৃদয় নিয়ে জীবনটাকে দেখেছে, চারপাশটাকে দেখেছে, সংসার সমাজ ও স্বদেশকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে। পর্দায় সত্যজিৎ ভূপতি এবং নিখিলেশকে নিয়ে এসেছেন। সত্যজিৎ প্রেরণা লাভ করেছেন মানবমহিমার নূতন মূল্যবোধে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত দুঃখ দৈন্য মালিন্য দ্বন্দ্ব বিরোধ বিক্ষোভের ভিতর দিয়েই গিয়েছে জীবনের পথ।

অপু সত্যজিতের মহত্তম সৃষ্টি। মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পর্কে পরিচালক দর্শকের মনে একটা বিশ্বাস জাগিয়ে দিলেন। ভারতীয় ছবিতে অপুর মতো আর কোনো চরিত্র লাভ করেনি জীবনের এমন গভীব অভিজ্ঞতা। চরিত্রের এই অন্তর্গত সৌন্দর্য আর কোনো মানুষের মধ্যে আমরা দেখিনি। মানবিক দুর্বলতাও রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু সে ভাবালুতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি। একের পর এক প্রিয়জনের মৃত্যুও তার জীবনীশক্তিকে নষ্ট করেনি। নানা কঠিন অবস্থার মধ্যে সে বুঝে নিয়েছে জীবনের গূঢ় তাৎপর্য। দুর্গার মৃত্যুর পর তাকে চলে যেতে হয়েছে নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে। মায়ের মৃত্যুর পর সে আবার যাত্রা করেছে কলকাতার উদ্দেশ্যে' অপর্ণার মৃত্যুর পর সে এই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে। বেঁচে

থাকার অর্থ এই শহরে সে খুঁজে পায়নি।

শিয়ালদা ইস্টিশনের কাছে পুরোনো বাড়ির ছাদের ওপরে তার ঘর। জানালায় নোংরা পর্দা, ছেঁড়া পর্দা। বিছানায় ঘুমোচ্ছে অপু, ময়লা গেঞ্জি। রেলওয়ে ইয়ার্ড থেকে শব্দ আসে। বৃষ্টি পড়ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে এসে অপু বৃষ্টিতে ভেজে, হাত পা ছড়িয়ে বৃষ্টিতে ব্যায়াম করে। পথের পাঁচালীতে আমরা দেখেছি দুর্গাই অপুকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে আসে। গাছের নিচে দুজনে বৃষ্টিতে ভিজছে। আজ দুর্গা নেই। কিন্তু বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দটা রয়ে গেছে। মহানগরের এই যান্ত্রিক পরিবেশে ট্রেনের বিশ্রী শব্দ আর ধোঁয়ার মাঝখানে ছাদের এই সামান্য জায়গাটুকুতে খোলা আকাশের নিচে যে বৃষ্টিতে ব্যায়াম করছে, সেই যুবকটি এই অস্বাস্থ্যকর যান্ত্রিকতার কাছে হার স্বীকার করে না। প্রতিদিনের বেঁচে থাকার মধ্যে একটা স্বাস্থ্যকর অর্থ খুঁজে পায়।

সে লেখক হতে চায়, বড় হ'তে চায়, গল্প লেখে, উপন্যাস লেখে, চাকরি খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয়ে বাড়ি ফেরে। তার লেখা গল্প 'মাটির মানুষ' 'সাহিত্যিক' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় ছাপার জন্যে মনোনীত হয়। চাকরি না পাওয়া ছেলেটি যৌবনের সার্থকতা খুঁজে পায় তার সাহিত্য চর্চায়। তার বাড়ি ফেবার পথে রেলওয়ে ট্রাকের পাশে শুয়োর ঘুরে বেড়ায় খাবারের সন্ধানে, ব্রিজের ওপারে সূর্য অস্ত যায়, ধোঁয়া আর ধুলোয় ভবিষ্যৎহীন শিশুরা খেলা করে। এই তার শহর। ভাঙা ঘরের একলা বিছানায় নিঃসঙ্গ অপু তার বাঁশি বাজায়। এই চিলেকোঠা যে কোনো মানুষের দম বন্ধ ক'রে দিতে পারে, পারে না অপুর আকাঙক্ষা ছিঁড়ে ফেলতে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। পুলু আসে। অপুর বন্ধু পুলু। অপু তার এই ঠিকানা কাউকে জানাতে চায়নি। কেউ জানে না। বেকার ছেলেটি একা একাই থাকতে চেয়েছে সকলের কাছ থেকে দূরে, কে আর আসে এখানে? আমরা দেখেছি দুটি লোককে। তিন মাসের ভাড়া বাকি, বাড়িওয়ালা তাগাদা দিতে আসে, একতলায় দরজার গোড়ায় বসে থাকা লোকটি কথা বলে। অপুর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু পুলু। পুলু শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, প্রতিষ্ঠিত। সে অপুকে রেস্টুরেন্টে খাওয়ায়, তার মামাতো বোনের বিয়েতে তার সঙ্গে যেতে বলে। খুলনায়।

রাত্তিরে তারা 'সধবার একাদশী' দেখে ফিরছে। শিয়ালদা ইস্টিশনের ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে আসছে। অপু নাটকীয় ভঙ্গিতে দুহাত ছড়িয়ে আবৃত্তি করছে, 'আমারে ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে... হিল্লোলিয়া মর্মরিয়া কম্পিয়া স্থলিয়া...' হঠাৎ পুলিশ দেখা যায়, অপু তাকে বলে, 'আমি হিমাদ্রিনন্দন মৈনাক পাখার জ্বালায় ডুবে আছি, পাখার জ্বালায়...।' একটু দূরে এসে পুলুকে সে বলে, 'জানিস পুলু ঐ চাকরিটা আমি নেব না, কেরানিগিরি করব কেন?' সে পুলুকে বোঝাতে চায়, যাদের সত্যিকারের ট্যালেন্ট আছে যেমন—ডিকেন্স, কীটস্, লরেন্স, দস্তয়েভ্স্কি — পুলু যোগ করে, অপূর্বকুমার রায়। পুলু জিজ্ঞেস করে, 'কিছু লিখছিস?' অপু উত্তর দেয়, 'একটি আশ্চর্য উপন্যাস।' তারপর বলতে থাকে, 'একটি ছেলে, গ্রামের ছেলে, দরিদ্র কিন্তু sensitive, তার অনুভূতি আছে, বাপ পুরুত, মরে গেল, ছেলেটি শহরে এলো, কিন্তু সে পুরুতগিরি করবে না, সে লেখাপড়া শিখবে, সে বড় হবে, শিক্ষার ভিতর দিয়ে, struggle- এর ভিতর দিয়ে কেটে যাচ্ছে তাব সব কুসংস্কার, তার গোঁড়ামি। সে কোনো কিছুকে অন্ধের মতো মেনে নেয় না। তার কল্পনাশক্তি আছে, তার অনুভূতি আছে..... সে জীবন বিমুখ

নয়, সে জীবন থেকে পালাচ্ছে না, সে বাঁচতে চায়, সে বলছে বেঁচে থাকার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। হয়তো তার ভেতরে মহৎ একটা কিছু করার সম্ভাবনা আছে।'

অপুর 'বসুন্ধরা' আবৃত্তি থেকে তার উপন্যাসের বর্ণনা পর্যন্ত যে শহরকে আমরা দেখি সেই শহরটা আজ অনেক বদলে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু আর কোনো দেশের সিনেমায় আর কোনো শহরে যৌবনের স্বপ্নের সাথে ক্যামেরা এভাবে আর চলেনি কখনও।

ছবির টাইটেল শুরু হওয়ার আগে এখানেও আমরা অপুর লেখাপড়ার কথাই জানতে পারি। This is to Certify that Apurba kumar Roy was a student of mine in the Intermediate Science class in the City College, Calcutta.

পুলু বিস্মিত হয়ে বলে, এ তো আত্মজীবনী, এতে উপন্যাসটা কোথায়? অপু বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করে। এর খানিকটা আত্মজীবনী ঠিকই, কিন্তু এটা উপন্যাস, এতে কাল্পনিক চরিত্র আছে, এতে প্লট আছে, এতে প্রেম আছে, প্রেমের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও কোনো ক্ষতি হয় না, কল্পনাশক্তিটা কি কিছু নয়, যদি প্রতিভা থাকে....... ইত্যাদি।

খুলনার একটা ছোট নদীতে নৌকো ভেসে যায়। অপু বাঁশি বাজাতে বাজাতে চারপাশটা দেখে। বাংলাদেশের সবুজ সোনালি শান্ত সুন্দর গ্রাম। অপু আবৃত্তি করে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। নৌকোয় বসে পুলু পড়ে যাচ্ছে অপুর উপন্যাস। একটা সময় পড়া শেষ হলে সে শুধু বলে, 'দে তো দেখি হাতটা, দে না ইডিয়েট।'

অপর্ণার জন্যে যে বর এসেছিল সে পাগল। মেয়েটা লগ্নভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

গাছের নিচে শুয়েছিল অপু। মাথার নিচে সঞ্চয়িতা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সন্ধে নামছে। পুলু এসে অপুকে জাগায়। বলে, এখন সব কিছু তোর ওপর নির্ভর করছে।

একজন বৃদ্ধ জানায়, সকাল হয়ে গেলে মেয়ের আর বিয়ে হবে না। অপু অবাক হয়, 'কিন্তু আমি কি করতে পারি? এটা কি নাটক না নভেল? কোন্ যুগে তোরা বাস করছিস?' পুলু সকলকে নিয়ে ফিরে যায়। অপু গাছের নিচে একা পায়চারি করে, বই থেকে ধুলো ঝাড়ে। পড়ন্ত আলোয় সে বাড়িটাকে দেখে। নিচের পথ দিয়ে পাগল বর নিয়ে বরযাত্রী চলে যাচ্ছে। শানাইবাদকরা নেমে আসছে। অপু ধীরে এগিয়ে আসে বাড়ির ভেতরে। পুলুকে ডাকে। পুলু এগিয়ে যায়। অপু জিজ্ঞেস করে, 'ঐ চাকরিটা কি পাওয়া যাবে?' পুলু বলে, 'কি বলছিস তুই?' অপুর গলা অপরাধীর মতো শোনায়, 'দাড়িটাও কাটা হয়নি।'

ফুলশয্যার রাতে অপু অপর্ণাকে জিজ্ঞেস করে, 'আমার সম্পর্কে কি জানো তুমি, পুলু কিছু বলেছে তোমাকে ? কি বলেছে ও? আমার চাল নেই চুলো নেই। দশ বছর বয়েসে বাবা গেলেন, সতেরতে মা। আমার একটা বোনও ছিল, দিদি। কি বলেছে সে?' অপর্ণা বলে, 'আপনি ভালো লেখেন।' অপু খুশি হয়, 'ওঃ, সেটাও বলেছে? তুমি পড়তে পারো?' অপর্ণা উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, বাংলা।' অপুর কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস, 'আমি একটা উপন্যাস লিখছি, বাংলায়।' অপর্ণা বলে, 'জানি।' অপু ঘুরে দাঁড়ায়, 'তুমি এটাও জানো? আর কি বলেছে?'

'আর কিছু না।'

'তাহলে তো সে কিছুই বলেনি। আসল কথাটাই বলেনি। তুমি তো জানোই না কার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। কনের বাড়িতে ফুলশয্যা হয় কখনো শুনেছো তুমি? আমার নিজের কোনো বাড়ি নেই, ঘর নেই, কিচ্ছু নেই। নিয়মিত কোনো রোজগার নেই। কোথায় তোমাকে নিয়ে যাব আমি? তাছাড়া যেভাবে তুমি বড় হয়েছ, এই বিরাট বাড়ি, এই সুন্দর সুন্দর ঘর। তুমি বিশ্বাস করো, বিয়েটা আমার ওপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি চাইনি। আমি আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু আমাকে এমনভাবে অনুরোধ করা হলো, মনে হলো বিরাট একটা কিছু ক'রে ফেলছি। সব কি রকম গোলমাল হয়ে গেল! তুমি কিছু বলছো না কেন? তোমার মন না জানলে তো আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। অপর্ণা, তুমি দারিদ্র সহ্য করতে পারবে? গরীব স্বামীর সঙ্গে বাস করতে পারবে?'

'পারব।'

'সত্যি পারবে? তাহলে আমি তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো। তোমার বাবা হয়েতো আপত্তি করবেন। কিন্তু আমি শুনব না। তোমার কোনো আপত্তি আছে?'

'জানি না।'

'ভাবছি, ওরা কি ভাববে?'

'কারা?'

'আমার প্রতিবেশীরা। আমি বলে এসেছি একটা বিয়েতে যাচ্ছি, এখন আমি বৌ নিয়ে ফিরছি।'

খুলনা থেকে কলকাতা।

অপু অপর্ণাকে নিয়ে কলকাতায় আসে। তার সেই ভাঙা ঘরে।

জানালার পর্দাটা ছেঁড়া। পর্দার সেই ফুটোতে অপর্ণার জলভরা চোখ। নিচের বস্তি এলাকা থেকে একটি শিশুর হাসির শব্দ উঠে আসে। ফুটোর ভেতর দিয়ে অপুর ঘরের বাইরে নিচের শহরটাকে দেখে অপর্ণা। খিলখিল ক'রে একটি শিশু চলে যায় তার মায়ের কাছে। অপর্ণা ভুলে যায় চোখের জল। মুছে নেয় শাড়ির আঁচলে।

বাড়ির সবাই নতুন বউকে দেখার জন্যে ভিড় করে। জানালায় দেখা দেয় নতুন পর্দা। জানালাব সামনে ছোট্ট একটা টবে একটা চারাও রাখা হয়। অপর্ণা তার সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিছুই নেই তাদের, ছাদের ঐ চিলেকোঠায়, শহরের ক্ষুদ্রতম স্থানে, তবু দুটি হৃদয় পরস্পরকে অনুভব করে, এই শহরে অপু-অপর্ণার সংসার হয়ে ওঠে জগতের সবচেয়ে সুখী সংসার। অপু বুঝতে পারে এই শব্দে এই ধোঁয়াতে এই ছোট্ট জায়গাটুকুতে অপর্ণার কষ্ট হচ্ছে। বুঝতে পারে অপর্ণা তার কষ্ট ভুলে থাকছে। তাই সে একটা কাজের লোকের সন্ধানে বেরোবে ব'লে ঠিক করে। অপর্ণা তার কাঁধে মাথা রাখে। এইখানে তার ভরসা তার ভালোবাসা তার নির্ভরতা। অপর্ণা জিজ্ঞেস করে, 'কে দেবে চাকরের মাইনে?' অপু বলে, 'আর একটা টিউশানি নেব।' অপর্ণার কণ্ঠে অভিমান, 'তাহলে আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।' কারণ সারাদিন তো বাইরে বাইরেই থাকে অপু। কতটুকু সময় সে অপুকে পায়। আর একটা টিউশানি নিলে....।

অপু জানতে চায়, তাহলে আর কি করার আছে? অপর্ণা সমস্যার সমাধান করে দেয়, 'যে টিউশানিটা করছ সেটাও ছেড়ে দাও। তাহলে আমার গরীব স্বামী সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরে আসবে, আর আমার কোনো অনুশোচনা থাকবে না।'

সিনেমা দেখে ঘোড়ার গাড়িতে ফিরছিল দুজনে। অপর্ণা বলে আমি কি বাসে ট্রামে চলতে পারি না। কতো খরচ হয়ে যায়। অপু জানিয়ে দেয়, মাত্র সাত আনা। তাছাড়া তুমি যখন বাপের বাড়ি চলে যাবে খরচ তো অর্ধেক হয়ে যাবে।

দুমাসের জন্যে অপর্ণা বাপের বাড়ি যাবে। এই সময়ের মধ্যে অপু তার উপন্যাসটা শেষ ক'রে ফেলবে। এই উপন্যাস জড়িয়ে আছে তার জীবনের সঙ্গে। এটা সে উৎসর্গ করবে অপর্ণাকে। অপর্ণা জিজ্ঞেস করে, কি সর্গ? অপু বলে, 'To my Wife। আমার লেখা আমার কাছে কত বড় জানো, তুমি তার চাইতেও বড়।'

অপর্ণার মৃত্যুর পর অপু এই শহর ছেড়ে চলে যায়। কোথায় যাবে সে জানে না। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে চলেছে। সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়ায় অপু। ঢেউ আছড়ে পড়ে। মুছে যায় পদচিহ্ন। আবার সে সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে দিগন্তে, দিকচিহ্নহীন শূন্যতায়। ঢেউয়ের শব্দে মিশে যায় সমুদ্র-পাখির স্বর। পাহাড়ে পাইন বনের ভিতর দিয়ে একা চলেছে অপু। আকাশ জুড়ে প্রথম প্রভাতের আলো প্রকাশিত হচ্ছে। সূর্যোদয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অপু। কাঁধের ঝোলা থেকে বার ক'রে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলি সে উৎসর্গ করে বিশ্বপ্রকৃতিকে। বাতাসে উড়ে যায় উপন্যাসের পাতা।

রোপওয়ের ধারে পাহাড়ী রাস্তায় একা হেঁটে যাচ্ছিল অপু। সিগারেট ধরাবার জন্যে দাঁড়ায়। সাইরেন শোনা যায়। অপু তার ঘড়িটা মিলিয়ে নেয়। একটা ঝরনার দিকে এগিয়ে যায়। দুই হাত জড়ো করে ঝরনার জল পান করে। হঠাৎ দেখতে পায় পুলুকে। দুই পুরোনো বন্ধু এগিয়ে আসে দুজনের মুখোমুখি। চাকরির জন্য এখানে আসেনি অপু। ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে। পেট তো চালাতে হবে। তাই একটা চাকরি নিয়েছে। এখানেও সে থাকবে না। কোথায় যাবে সে জানে না। একাই যাবে সে। আর কে আছে তার? পুলু মনে করিয়ে দেয়, কেন কাজল? কে কাজল, অপু তাকে চেনে না। পুলু তাকে ফিরে যেতে বলে। ছেলেটাকে মানুষ করবে কে? ছেলেটাকে দেখার তো কেউ নেই। তাছাড়া অপু তো তার বাবা। কর্তব্য ব'লেও তো একটা ব্যাপার আছে।

অপু ছেলের জন্যে টাকা পাঠাচ্ছে। পুলু মনে করে, টাকা পাঠালেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। অপু জানায় এর বেশি আর কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ছেলেটির জন্যে তার মায়ামমতা তৈরি হবে কি ক'রে? সে তো দেখেইনি কখনো। তার কাছে একেবারে অলীক, অবাস্তব।

সে পুলুকে বলে, কাজলের জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা সে ক'রে দিক। কোনো বোর্ডিংয়ে ওকে ভর্তি করিয়ে দিক। পুলু তাকে বলে, এ কাজটা তো সে নিজেও করতে পারে। না তা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়? কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে যায় অপু, 'একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না' অপু ব'সে পড়ে, তাকিয়ে থাকে, পুলু এগিয়ে যায় তার দিকে, কথা বলতে কষ্ট হয় অপুর, যেন চোখে জল চলে আসে, 'কাজল আছে তাই অপর্ণা নেই।'

খুলনায় চলে আসে অপু। শ্বশুরমশাইকে সে জানিয়ে দেয়, আমি সব ব্যবস্থা করে

এসেছি। আমি ওকে নিশ্চিন্দিপুরে রেখে আসব।

পরদিন সকালে অপু একটা কাপড়ের পুঁটলিতে মোড়ানো অপর্ণার গহনাগুলো তুলে দেয় শ্বশুরমহাশয়ের হাতে। আবার সে চলে যাচ্ছে একা, কাজলকে ছাড়াই সে চলে যাচ্ছে—গয়নাগুলো আপনার কাছেই রেখে দিন। কাজলকে যদি কোনো বোর্ডিংয়ে পাঠাতে হয়।

বাড়ির পেছনে নদীর ধারে নিচের পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে অপু। সে কাজলকে দেখতে পায়, তার পথের দিকে চেয়ে আছে। ঢলঢলে হাফপ্যান্টের দুই পকেটে দুটো হাত রেখে কাঁধটা বেঁকিয়ে কাজল দাঁড়িয়ে আছে দুটি বিষণ্ণ চোখ মেলে।

কিছু বলবে কাজল?

তুমি কোথায় যাচ্ছো?

তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

তুমি কলকাতা যাচ্ছ?

যদি যাই, আসবে তুমি?

আমাকে আমার বাবার কাছে নিয়ে যাবে?

হ্যাঁ নিয়ে যাবো।

বাবা আমায় বকবে না?

কেন বকবে?

আমায় ছেড়ে চলে যাবে না?

কক্ষনো না।

তুমি কে?

তোমার বন্ধু, আসবে আমার সঙ্গে?

....

কাজল, চলো এসো, এসো.....চলে এসো।

দিদি তুই রেলগাড়ি দেখেছিস?

রাত্তিরে সর্বজয়া দুর্গার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। সুচে সুতোটা ঢোকাবার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে ইন্দির। সর্বজয়া চুল আঁচড়াতে গিয়ে বকে যাচ্ছে, চুলের কি ছিরি করেছিস, না তেল না কিচ্ছু। দুর্গা মাকে খবর দেয়, ওরা রাণুদিকে দেখতে আসছে। হরিহর পাতা ওলটায়। ইন্দির এখনও চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে। হরিহর লেখাপড়া করাচ্ছে তার ছেলেকে। অপু শ্লেটে লিখছে। দূর থেকে ট্রেনের বাঁশি ভেসে আসে, অপু শ্লেট থেকে মুখ তুলে তাকায়, ট্রেনের শব্দ শোনে। মার কাছে বসে থাকা দুর্গাকে জিজ্ঞেস করে, 'দিদি তুই রেলগাড়ি দেখেছিস?' দুর্গা উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ'। সর্বজয়া বলে, 'ফের মিথ্যেকথা?' অপু জানতে চায় রেললাইনটা কোথায়? দুর্গা বলে, 'সোনাডাঙার মাঠ, মাঠের ধারে ধানক্ষেত, তার পাশেই তো রেলের লাইন।' অপু বলে, 'একদিন যাবি?' হরিহর ছেলের লেখার প্রশংসা করে।

অপু ট্রিলজিতে বারবার দেখেছি আমরা রেলগাড়ি। প্রথম এসেছে রেলগাড়ির শব্দ, এই শব্দকে ধরা হয়েছে অপুর লেখাপড়া করার সময়টিতে।

কাশবনের ভেতর দিয়ে চলেছিল দুর্গা। আকাশে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে টেলিগ্রাফ পোস্ট। অপরাহ্নের বাতাসে শব্দ জাগে টেলিগ্রাফের তারে। অচেনা অজানা এই শব্দ। কোথা থেকে আসছে এই শব্দ, দুর্গা মুখ তুলে চায়, মাথা নামিয়ে দেখতে চায়, যেন এই অদ্ভুত শব্দের উৎস খুঁজে বেড়ায়। অপু এগিয়ে আসে। দুর্গা শব্দে কান পাতে। খুঁজে পায়। শব্দ শোনে। অপুও শুনেছে। দুর্গা অপুকে আখ ছুঁড়ে দেয়। অপু আখ চিবোয়। অপু দুর্গা কেউই জানে না কোথায় এসেছে তারা। ইঞ্জিনের মাথা দেখা যায়। সাদা কাশবনের বোদ ঝলমলে আকাশে কালো ধোঁয়া। কাশবনের ভেতর দিয়ে দুজনে দৌড়ে যায়, জীবনে কখনো যা দেখেনি, তা দেখার জন্যে তারা ছুটে আসে। ট্রেন তখন দূরে। এবড়ো খেবড়ো জঙ্গলে দুর্গা হোঁচট খায়, আবার উঠে দাঁড়ায়, অপু তার কাছ থেকে অনেকটা এগিয়ে গেছে। প্রচণ্ড শব্দে ট্রেন এগিয়ে আসে, দ্রুত চলে যায় ইঞ্জিন, কাশবনের ধারে এক আশ্চর্য শব্দ জাগিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে যাচ্ছে ট্রেনের চাকা। কাশের আকাশে মিলিয়ে যায় ধূসর ধোঁয়া।

'অপরাজিত' ছবির শুরুতেই দেখি ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। গঙ্গা দেখা যায়। পর্দায় লেখা পড়ে, 'বারাণসী ১৩২৭ সন।' হরিহরের মৃত্যুর পর লাহিড়ী গিন্নির বাড়িতে কাজ কবছিল সর্বজয়া। গিন্নি বলেছিলেন সর্বজয়াকে দেওয়ানপুরে সঙ্গে ক'বে নিয়ে যাবেন। ভবতারণ তাকে নিয়ে যেতে চায় মনসাপোতায়, 'তোদের এরকম দশা তা কি আমি জানি?' সর্বজয়া বুঝতে পারছে না কোথায় যাবে। জ্যাঠামশায়ের ইচ্ছে 'আমার ওখানে গেলে ভিটেয় সন্ধ্যেটা পড়বে। আর তোদের কোনো অসুবিধে হবে না, তুই ভেবে দেখ।' সর্বজয়া চিন্তিত। অপু লাহিড়ীবাবুর পা টিপছে। লাহিড়ীগিন্নি সর্বজয়াকে ডেকে বলেন, 'আমরা সামনের মাসে দেওয়ানপুব যাচ্ছি। এখন তুমি রাজি হলেই হয়।' সর্বজয়া নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল। সিঁড়ি দিযে নেমে আসছে। হঠাৎ কি দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অপু বারান্দায় দাঁড়িয়ে তামাকে ফুঁ দিচ্ছে। ফুঁ দিতে দিতে এগিয়ে যায়। সর্বজয়া সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে। ক্যামেরা সর্বজয়ার মুখের দিকে এগিয়ে যায়। মুহূর্তে সে মনস্থির ক'রে ফেলে। দেখা যায় চলন্ত ট্রেন। কামরায় বসে আছে সর্বজয়া অপু ভবতারণ। পেছনে শহরটা দেখা যাচ্ছে। সর্বজয়া গালে হাত রেখে বসে আছে। গঙ্গার ওপরে কাশীর ব্রিজ পেরিয়ে রেলগাড়ি চলেছে। আকাশে মেঘ। বাইরের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। রেলগাড়ি এসে পড়ে বাংলার মাটিতে। মনসাপোতার বাড়িতে ঢুকেই অপু দেখতে পায় বাড়ির পেছনে ধু ধু মাঠের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে। অপু চেঁচিয়ে বলে 'মা ট্রেন' ট্রেন দেখে তার আনন্দ হয়, কিন্তু মুহূর্তে মুখটা কালো হয়ে যায়, দিদির কথা মনে পড়ে।

অপু কলকাতা যাবে। সদব দরজা দিয়ে বেরোয়। সর্বজয়া দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। অপু চলে যাচ্ছে। একবার পেছন ফিরে তাকায়। বিষণ্ণ সর্বজয়া ভেতরে চলে যায়। রেলগাড়ির কামবায় এক ক্যানভাসার চিৎকার করে, দাদারা ভায়েরা আপনারা কি কেউ হোঁচট খেয়েছেন ..... অনেক সুযোগ সুবিধা আসবে হোঁচট খাবার, তখন এই আশ্চর্য মলম পরম হিতৈষী বন্ধুর মতো কাজ করবে।

ট্রেন আসছে। অজস্র লাইনের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ট্রেন ঢুকছে শিয়ালদায়। কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অপু। জিনিসপত্র নিয়ে নামে। শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে

অপু। আমাদের মনে পড়ে অপু যখন মাকে তার স্কলারশিপ পাবার কথা বলছিল, যখন কলকাতায় গিয়ে পড়তে হবে এটা বলছিল, তখন ব্যাকগ্রাউণ্ডে ট্রেন যাবার শব্দ আমরা শুনেছিলাম।

এই ট্রেন এখন তাকে তার মার কাছ থেকে দূরে নিয়ে আসে। মনসাপোতায় লেখাপড়ার পাঠ শেষ হয়ে গেছে। লেখাপড়া তবু সবই তো বাকি রয়ে গেছে। লেখাপড়া শিখতে হলে ঐ গ্রাম ছেড়ে তো যেতেই হবে।

সর্বজয়া বাড়ির বাইরে মাঠে মাদুর পেতে সেলাই করে।

দূরে ট্রেন চলে যাচ্ছে। এই ছবিতে আটবার আমরা ট্রেন দেখতে পাই।

অপু আসে। আবার ফিরেও যায়। অপু মাকে বলে, 'কাল সোয়া ছটায় সূর্যি উঠবে মা, ঠিক সময়ে তুলে দিও।' আকাশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে প্রথম সূর্যের আলো। সর্বজয়া সেদিকে তাকিয়ে থাকে। উঠোন পেরিয়ে দাওয়া ঘুরে ঢোকে। ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অপুর দিকে চেয়ে থাকে। তার অপুকে তুলে দেয়ার কথা। সে দ্বিধাগ্রস্ত। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে ঘুমন্ত অপুর গায়ে পড়ে। অপু জেগে যায়। দ্রুত তৈরি হয়ে নেয়।

সর্বজয়া ভারাক্রান্ত মনে অপুর পথের দিকে চেয়ে থাকে।

দূর থেকে অপু লাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে আসে। প্ল্যাটফর্মে উঠে টিকিট কাটে।

ট্রেন আসছে।

অপু ফিরে তাকায়।

ট্রেন আসে।

অপু যাবার জন্যে তৈরি হয়। ট্রেন চলে যায়। অপু ওঠে না।

অপুকে দূর থেকে আসতে দেখে সর্বজয়া হাসিমুখে এগিয়ে আসে।

সূর্যঘড়ি। মনসাপোতা গ্রাম। গাছের তলায় সর্বজয়াকে দেখা যায়। অসুস্থ সর্বজয়া বসে আছে। আস্তে আস্তে মাদুরটা নিয়ে উঠে যায়। দাওয়াতে বাঁশের খুঁটি ধ'রে দাঁড়ায়। দূর থেকে ভেসে আসে ট্রেনের হুইসেল। সর্বজয়া বাইরে তাকায়। দূরে ট্রেন চলে যায়।

ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। 'মা' অপুর গলার স্বর শোনা যায়। সে চোখ তুলে তাকায়। দরজার মুখে এসে দাঁড়ায়। আশায় এবং হতাশায়। কেউ নেই বাইরে। কেউ ডাকে না। দ্রুত অন্ধকার নেমে আসে। অন্ধকারের শূন্যতায় সব ঢেকে যায়। শুধু জোনাকি জ্বলে।

'পথের পাঁচালী'তে ট্রেনের বাঁশি ভেসে এসেছিল অনেক দূর থেকে, বালক বালিকার কাছে ট্রেন দেখা দিয়েছিল স্বপ্নের মতো, অপরাজিততে সেই ট্রেন অপুকে নিয়ে আসে কাশী, কাশী থেকে মনসাপোতা, মনসাপোতা থেকে কলকাতা। এই ট্রেন তাকে নিয়ে আসে তার শিক্ষার জগতে, তার জ্ঞানলাভের বিপুল আকাঙক্ষায়, এই পৃথিবীর সামনে। এই ট্রেনের দিকে পথ চেয়ে বসে থাকে তার মা।

মা জানেও না ট্রেন কতো দূরে নিয়ে যায় মানুষকে।

রেললাইন পার হয়ে প্রতিদিন ঘরে ফেরে অপু।

রাতে বন্ধুর সঙ্গে ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে যেতে যেতে সে আবৃত্তি করে, 'দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া বসন্তের আনন্দের মতো।' বেকার যুবকটি ছাদের ওপর যে ঘরটিতে বাস করে সেখানে সর্বক্ষণ, রেলগাড়ির কর্কশ শব্দ আসে।

স্টেশনের ঘড়িতে তখন রাত পৌনে আটটা। প্ল্যাটফর্মে কুলি মাল ঠেলে নিয়ে চলেছে। অপু দাঁড়িয়ে আছে একটা কম্পার্টমেন্টের দরজার পাশে। অপর্ণা ভেতরে বসে আছে, জানালার ধারে।

অপর্ণার ভাই মুরারী অপুকে বলে, পুজোর ছুটিতে আসছেন তাহলে। অপু তাকে বলে, পৌঁছেই চিঠি দিও। চিঠি আসতে দিন তিনেক লেগে যায়।

অপু জানালার ধারে আসে, যেখানে অপর্ণা বসে আছে। তাকে অস্থির, এলোমেলো, বিষণ্ণ দেখায়। গার্ড বাঁশি বাজিয়ে দেয়। অপু অপর্ণা দুজন দুজনকে দেখে। ইঞ্জিন নড়ে ওঠে। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ছে, ধীরে এগোচ্ছে। ট্রেন গতি লাভ করা পর্যন্ত অপু ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে চলে ট্রেনের সঙ্গে অপর্ণার সঙ্গে। অপর্ণা জিজ্ঞেস করে, 'তুমি আসবে তো? চিঠি লিখবে, সপ্তায় দুটো।'

তুমিও লিখবে, লিখবে তো?

তুমি না লিখলে লিখব না।

শোনো, আমার অফিসের ঠিকানায় লিখবে, না হলে রায়মশায় খুলে পড়ে ফেলবে।

শোনো

কি

ওঃ আমি সব ভুলে যাচ্ছি, মুদির দোকানে কিছু টাকা বাকি আছে, দিতে ভুলো না যেন

ঠিক আছে

আমার কিছু গয়না রেখে গেছি, সাবধানে রেখো ওগুলো

ট্রেন গতি লাভ করে, স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

অপর্ণার চিঠি আসে।

অষ্টমীর দিন আসবে কথা দিয়েছ। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব। যদি না আসো তোমার সঙ্গে আর কখনো কথা বলব না। তুমি একটা মিথ্যেবাদী। গত মাসে তুমি সাতটা চিঠি দিয়েছ। কথা ছিল আটটা। এখানে আসার পর থেকে দিন গুনছি।

ট্রামে দাঁড়িয়ে অপু চিঠিটা আবার বার করে পড়তে থাকে।

আর পাশের বাড়ির মেয়েটা, ওকে আমি হিংসে করি, কেন জানো? কারণ রোজ সকালে রোজ সন্ধেবেলা ও তোমাকে দেখে। আর আমি দেখতে পাই না। জানালাটা বন্ধ ক'রে রেখো।

বাড়ির কাছে ওভারব্রিজের পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে অপু নেমে আসে। আবার চিঠিটা বার করে রেললাইন ধরে এগিয়ে আসার পথে আবার চিঠিটা পড়তে থাকে।

অনেক বানান ভুল হয়ে গেল। আমি জানি তুমি হাসবে।

অপু চিঠি বন্ধ করে। রেলওয়ে ট্রাক ধরে এগিয়ে আসার পথে, বাড়ির পেছনে ঝুপড়ির একটা বাচ্চাকে লাইনের ধারে ব'সে থাকতে দেখে, অপু তাকে তুলে নেয়, এনে খাটিয়ার ওপর বসিয়ে দেয়।

অপর্ণার মৃত্যুর পর অপু আবার একদিন এসে দাঁড়িয়েছে রেল লাইনের ধারে, দাঁড়িয়েছে আত্মহননের জন্যে। যে রেলগাড়ি তাকে তার গ্রাম ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে অনেক দূরে, গিয়েছে জীবনের দিকে, সেই রেলগাড়ি তাকে নিয়ে যাবে মৃত্যুর কাছে।

দেয়ালে পিঠ রেখে সে আয়নায় নিজের মুখ দেখে, সর্বস্ব হারানো এই মুখ সে চেনে না, ইঞ্জিনের হুইসেল শোনা যায়, রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশে এসে দাঁড়ায়, ট্রেন এগিয়ে আসে।

ঝুপড়ি থেকে কিছু লোক রেললাইনের দিকে ছুটে যায়, ট্রেন চলে যায়, কাটা পড়া একটা শুয়োর লাইনের ধারে পড়ে আছে।

আপনি খোকাকে হত্যা করেছেন বাবা

স্ত্রী দয়াময়ীকে রেখে উমাপ্রসাদ কলকাতায় চলে গিয়েছিল কলেজে পড়তে। যাবার আগে খামের ওপর ঠিকানা লিখে দিয়ে গিয়েছিল, ৩/১, কাশীরাম দাস লেন, পোস্ট অফিস শ্যামবাজার, কলকাতা। বলেছিল, বড়দিনের ছুটি অব্দি রোজ একখানা করে। দয়াময়ীর ধারণা 'ইংরেজী পড়ে লোকে চাকরির জন্যে। চাকরি মানে রোজগার। রোজগার মানে টাকা।' উমাপ্রসাদ বলেছিল, 'বড়লোকেরা বুঝি ইংরেজি পড়ে না, রাজা রামমোহনের কি টাকার অভাব হয়েছিল?'

উমাপ্রসাদের পিতা শাক্ত জমিদার কালীকিংকর। অন্ধ ভক্ত তিনি। মনে করেন বিশ্ব সংসারে সকলই মায়ের কৃপা। রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, তিনটে চোখ এগিয়ে আসছে। সেই চোখের সঙ্গে দয়াময়ীর চোখ মিশে যায়। দয়াময়ীর মুখে হাসির আভাস। সে দৃশ্য মিলিয়ে গিয়ে পঞ্চপ্রদীপের আরতি দেখা যায়। প্রদীপ ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। কালীকিংকরের ঘুম ভেঙে যায়। বিছানায় উঠে বসেন। মশারি থেকে বেরিয়ে আসেন। দেয়ালে টাঙানো মা কালীর ছবির দিকে তাকিয়ে মা মা ক'রে ডেকে ওঠেন।

ভোরবেলা কালীকিংকর হাঁটু গেড়ে প্রণাম করেন পুত্রবধূ দয়াময়ীকে। তিনি স্বপ্নযোগে আদেশ পেয়েছেন পুত্রবধূ দেবীর অবতার।

তারপর থেকে নাটমন্দিরে দয়াময়ীর আরতি চলে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে। কালীকিংকরের বিশ্বাস, মা আদ্যাশক্তি বৌমার রূপ ধরে তাঁর ঘরে এসেছেন।

কলকাতায় লেখাপড়া শিখছিল উমাপ্রসাদ। নবজাগরণের আলোয় উদ্দীপ্ত সে। বিদ্যাসাগরের যুক্তিগুলো তার নখদর্পণে। কলকাতা থেকে গ্রামে এসে সে তো অবাক হয়ে যায়। পিতা তাকে বলেন, 'দয়াময়ী তোমার স্ত্রী, দেবীর অবতার।' উমাপ্রসাদ বলে, 'আপনি পাগল হয়ে গিয়েছেন বাবা। নিশ্চয়ই আপনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, নইলে এমন অদ্ভুত ধারণা আপনার হলো কী করে?' সে যে দেবীর অবতার এর জন্যে তো কালীকিংকরের প্রমাণ পাবার দরকার নেই। উমাপ্রসাদ বিশ্বাস করে না এ সবে। এমন নিশ্চিত স্বপ্নাদেশ এটাই তার পিতার কাছে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। দয়াময়ী দেবী। উমাপ্রসাদ বলে, 'এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না।... এ পূজা আমি কিছুতেই হতে দেব না।' বাধা দেবার জন্য সে এগিয়ে যায়। কিন্তু পারে নি। সেই মুহূর্তে দেবীর চরণামৃত পানে বেঁচে ওঠে নিবারণের মুমূর্ষু নাতি। নাটমন্দিরে ভক্তজন জয় মা জয় মা ব'লে তখন গড় করছে। কালীকিংকর বলেন, এ দয়াময়ীর কৃপা না হলে সম্ভব?

উমাপ্রসাদের কলকাতার শিক্ষা তাকে অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই শিখিয়েছিল। তাই সে দয়াময়ীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। বুঝেছিল এখানে থাকলে দয়াময়ীর

সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই শঙ্খ, ঘণ্টা, মন্ত্র আর চরণামৃত থেকে উদ্ধার পাবার কোনো রাস্তা নেই। একমাত্র রাস্তা এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া। সব বন্দোবস্ত করে এসেছিল সে। সে দয়াকে নিয়ে কলকাতায় চলে যেতে চেয়েছিল। কাশবনের ভেতর দিয়ে দুজনে নদীর ধারে চলেও এসেছিল। কিন্তু যেতে পারে নি। দয়াময়ী থমকে দাঁড়ায়। নদীর ধারে পড়ে আছে একটা প্রতিমার কাঠামো। চিন্তিত দয়া। তার মনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় ঃ 'যদি দেবী হই'। এইভাবে চলে গেলে যদি তার স্বামীর অমঙ্গল হয়। সে ভয় পেয়ে যায়।

কলকাতায় উমাপ্রসাদের প্রোফেসর তাকে বলেছেন, 'তুমি কি অসহায়? যে জিনিসটাকে এত জোর গলায় তুমি মিথ্যে বলছো, সেটাকে প্রতিরোধ করার শক্তি বা সৎ সাহস তোমার নেই?' উমাপ্রসাদের বুদ্ধি, বিবেক, চেতনা যেটাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারছে না, সেটাকেই তার মানতে হচ্ছে, হচ্ছে তার কারণ শুধু পিতা কালীকিংকরের অন্ধবিশ্বাস নয়, দয়াময়ীও যে দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো দেখে ভয়ে পিছিয়ে গেল, স্বামীর ক্ষতি হবার ভয়।

প্রোফেসর বলেন, 'তোমাকে একটা Decision নিতে হবে এবং তোমাকেই নিতে হবে।' উমাপ্রসাদের দাদা তারাপ্রসাদের ছেলে খোকার যখন অসুখ করল, কালীকিংকর খোকাকেও তুলে দিলেন দেবীর কোলে। বললেন, 'আমি জানি মা তোমার সাধ্যাতীত কিছুই নেই। তুমি ওকে রোগমুক্ত কর মা।' তাবাপ্রসাদকে বললেন, 'খোকার চরণামৃত সেবনের আয়োজন কর।' খোকাকে চরণামৃত সেবন করানো হচ্ছে। ক্যামেবা খোকা থেকে পুরোহিত, পুরোহিত থেকে হরসুন্দরী, হরসুন্দরী থেকে দয়াময়ীকে দেখায়। আশংকা সকলেরই চোখে মুখে।

কলকাতা থেকে উমাপ্রসাদ আসে। Decision নিয়েই সে এসেছে। তখন নাটমন্দির জনশূন্য দেবীর আসন শূন্য। ক্যামেরা পিছিয়ে এলে কালীকিংকবকে দেখা যায়। কালীমুর্তিব দিকে চেয়ে খাঁ খাঁ করছে তাঁর রাজকীয় রূপ ও বিশ্বাসের অন্ধতা। তাঁরই জন্য খোকা মরে গেল। উমাপ্রসাদের গলা শোনা যায় 'কী হয়েছে বাবা।' কালীকিংকর বলেন, 'যাঁর কৃপায় এত রোগ সারলো তাঁর কোলেই তুলে দিয়েছিলাম। সে আর ফিরিয়ে. দিলে না।' কলকাতার শিক্ষায় শিক্ষিত উমাপ্রসাদের মনে কখনও কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। সে শুধু স্ত্রীর অসহায় মুখের দিকে চেয়ে ফিরে গিয়েছিল। সে মুখে সে দেখেছিল স্বামীর অমঙ্গলের জন্য দুশ্চিন্তার সুবর্ণ অন্ধকার। আজ আর কোনো ভয় নেই। উমাপ্রসাদ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে, 'আপনি খোকাকে হত্যা করেছেন বাবা।.. আপনার অন্ধ বিশ্বাস তার মৃত্যুর কারণ.... আমার স্ত্রীর উপর দেবীত্ব আরোপ করে তার বুকে পাথর চাপা দিয়েছেন আপনি,.... তাতে আপনার কি স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে জানি না, তার জীবন নষ্ট হতে চলেছে আজ আমি তাকে বাঁচাবো।'

ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে গিয়েছে। উমাপ্রসাদ বাঁচাবার চেষ্টা করেছে স্ত্রী দয়াকে। পারে নি। বাঁচাবার এই যে চেষ্টা, এই যে অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের যুক্তি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হওয়া এটা সে লাভ করেছে জমিদাবীর সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে, কলকাতায় শিক্ষালাভ কবতে যাওযার জন্যই।

এত বড় শহর, এত রকম চাকরি, দুজনের একজনও কি পাবো না একটা
সুব্রত Sunday Statesman-এর Wanted Column দেখছিল। Wanted an M.Com... Wanted a B. A.... Wanted a lady doctor, খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যায় Wanted Sales girls to Serve। প্রথমে স্ত্রীর চাকরি করা ব্যাপারটা মাথা ঘামাবার মতো তেমন কিছু মনে করেনি সে। বরং এ নিয়ে মস্করা করেছে, 'তোমার মতো মেয়ে যদি অফিসে কাজ করে তাহলে কর্মচারীদের কাজের ব্যাঘাত হতে পারে। কাজের output কমে যেতে পারে।' সেলস্ গার্লস-এর কাজ সম্পর্কে আরতির মনে কোথায় যেন একটা দ্বিধা ছিল। সুব্রত জিনিসটাকে সহজ করে দিয়েছে, 'তুমি কি ভাবছ তোমায় হকার্স কর্নারে গিয়ে বসতে হবে? Starting Salary Rs.100-আমার Starting Salary কত ছিল মনে আছে?

সুব্রতর বাবা শিক্ষিত মানুষ, MABT. অবসর নিয়েছেন, Crossword নিয়ে বসে থাকেন, অর্থের বড়ই অভাব, পার্কে যান না, কারণ সেখানে কেবল বাজে লোকের আড্ডা, বুড়োরা পর্যন্ত কেবল গসিপ আর পরনিন্দা করে, আরতিকে বলেছেন, 'এই কলকাতা যে এত চেঞ্জ করবে তা ভাবিনি বৌমা।' তাঁর স্ত্রী সরোজিনীর মনে হয়, ছেলের ঘাড়ে বসে অন্ন ধ্বংসাচ্ছি, প্রিয়গোপালের তা মনে হয় না, কারণ 'ছেলের ওপর তো আমাদের একটা claim আছে।' ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভাবলে কষ্ট হয় তাঁর, অনেক কিছুই তো করেছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে দুর্ভোগ ছাড়া কি জুটলো কপালে। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন, ভেতরে জমে থাকা কতো কথাই না ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে, 'তুমি আজীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছাত্তর তৈরী করলে, তাদের মনের মধ্যে জ্ঞানের বীজ বপন করলে — আর তারা তোমার নাকের সামনে দিয়ে গট্‌গটিয়ে হেঁটে গিয়ে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গেল,- আর তুমি যে ঘানির বলদ, তা-ই রয়ে গেলে।'

আরতি ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পায়। সুব্রত সে খবরটা বাবাকে জানায়, জানায় ভয়ে ভয়ে, জানে বাবা পুত্রবধূর চাকরি কবাটা পছন্দ করবেন না, 'খুব ভালো ফার্ম, apply করেছিল, interview দিয়েছিল, আজ appointment letter টা এসে গেছে; sales girl -এর কাজ।' পিতৃদেব প্রিয়গোপালের কণ্ঠ শোনা যায় দীর্ঘশ্বাসের মতো, 'বৌমা sales girl', সুব্রত জানিয়েছে, 'সে ইচ্ছে ক'রে নেয়নি—দায়ে পড়ে। আমার একটা part time কিছু হলেই ও ছেড়ে দেবে।' বৃদ্ধ বুঝতে পারেন বৌমাও চেঞ্জ ক'রে গেছে।

সুব্রতর ধারণা, দিন বদলেছে, সেই সঙ্গে লোকের মতও বদলেছে। চেঞ্জ আসে কতগুলো necessity থেকে। তখন আর একার রোজগারে সংসার চলে না। সুব্রত জানে বাবা মা এটাকে মেনে নেবে না, একটা সময় অবশ্য আসবে যখন এই ক্ষোভটা আর তাদের থাকবে না, যেদিন প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে আরতি তার শ্বশুরমশাইয়ের হাতে চশমার টাকাটা তুলে দেবে সেদিন কোনো অভিযোগ আর থাকবে না।

আমরা দেখি মিস্টার মুখার্জী তাঁর অফিস চেম্বারে সেলস গার্লদের 'অটোনিট' মেশিন কিভাবে বিক্রি করতে হবে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঃ শেখা হয়ে গেলে আপনাদের কাজ হবে পার্সোনালি লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই মেশিন সম্পর্কে ক্যানভাস্ করা।...

দুপুরে ক্যানভাসাররা বাড়ির কর্ত্রীদের দেখিয়ে মেশিনকে লোভনীয় করে তুলতে পারলে ভালো কাজ হবে।.... ক্যানভাসার জাতটাকে কেউই পছন্দ করে না। কিন্তু একবার যদি মেশিনটার গুণপনা প্রচার করে লোভনীয় করে তোলা যায় তা হলে এই অটোনিট এর গুণ ও আপনাদের গুণ এই দুইয়ে মিলে যে এক আধটা Successful transaction হবে না এ কে বলতে পারে।

একমাস কাজ হয়ে যাবার পর আরতি মাইনের টাকা থেকে বাড়ির সকলের জন্যে জিনিস কিনে আনে — শাড়ি, জর্দা, খেলনা, ফল, সিগারেটের টিন। স্বামীকে বলে মিস্টার মুখার্জীর কথা। লোকটা রসিক কিন্তু Strict, কাজেই Slackness মোটেই পছন্দ করেন না, কড়া কথা শুনিয়ে দেন। স্বামী জানতে চায় কি এত কাজ আরতির। আরতি তার কাজের বিবরণ দেয়, দশটায় অফিসে ঢুকে Log Book- এ সই করি, তারপর কোন পাড়ায় যেতে হবে সেটা ঠিক করে নি, সাড়ে দশটায় ক্যানভাসিং-এ বেরোই, ঠিকানা দেখে দেখে বাড়ি বাড়ি যাওয়া, গিন্নিদের সঙ্গে দেখা করা, appointment করা, মেশিন নিয়ে যাওয়া, হিসেব, টাকা।

কাজের সময় সে একেবারে অন্য মানুষ।

অথচ ঘরের বউ আরতি। কলকাতা শহরে ঘরের বউ এই কথাটার আজ আর তেমন কোনো পবিত্র অর্থ নেই। সেদিন ছিল, পঁচিশ তিরিশ বছর আগে কথাটার ওজন ছিল, মান ছিল, মূল্য ছিল। আজ আর ঐ কথাটার তেমন বৃহৎ কোনো তাৎপর্য নেই। ফার্স্ট ইয়ার অব্দি পড়া আরতি সংসারের প্রয়োজনে চাকরি করতে গিয়েছিল, প্রয়োজনে চাকরি করতে গিয়ে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ইংরেজি বলতে পাবে না, তবু তার সহকর্মী একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে ইডিথ তাব প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। ইডিথ তাকে একটা লিপস্টিক দেয়।

টিকে থাকার জন্যে টাকার দরকার। টাকাটা রোজগার করতে হয় । চাকরি করে ব্যবসা করে শিল্প সৃষ্টি করে, যে কোনো ভাবেই হোক মানুষ তার প্রয়োজনের জন্যই অর্থ উপার্জন করে। একটু ভালো থাকার ইচ্ছে তো সকলেরই। আজই দূরদর্শনে এখনকার বিখ্যাত যাত্রাশিল্পী বীণা দাশগুপ্তা, 'যাত্রাকে পেশা হিসেবে বেছে নিলেন কেন', এই প্রশ্নের জবাবে এক সেকেণ্ডও না ভেবে বললেন, 'নিলাম সংসারের প্রয়োজনে।' এই প্রয়োজনটার জন্যই এক এক কালে এক এক রকমের সমস্যা তৈরি হয়। ঘর থেকে বিমলার বাইরে বেরিয়ে আসা নিয়ে তৈরি হয়েছে 'ঘরে বাইরে'র কাহিনী। বিমলার তো অর্থের অভাব ছিল না। একালের নারী যখন অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিচ্ছে, টাকার জন্যেই নিচ্ছে, টাকার প্রয়োজন এবং শিল্পের তাগিদ দুটো এক হয়ে যাচ্ছে। নিখিলেশ কোনোদিন তার স্ত্রীকে মন্ত্রবন্ধনের অধিকারে বাঁধতে চায় নি। সন্দীপের দীপ্ত বাণীর দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে বিমলার মন নিখিলের পরিপূর্ণতা থেকে সরে গেল। নিখিলেশ বিমলাকে বলেছিল, তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও।

শুধু ঘরের মধ্যে থেকে সংসারটা সুন্দর রাখা যায় না, বাইরে বেরিয়ে আসতেই হবে। ঘরে বাইরের পঞ্চাশ বছর পরেও সমস্যাটা শুধু রয়ে গেছে তা নয়, আরো তীব্র হয়েছে। যে আরতির মুখের জ্যোতি ছিল নম্রতায় পরিপূর্ণ, সে মুখটা বদলে গেল, সে বাইরে বেরিয়ে এসে মানুষের একটা অন্যরকম চেহারা দেখল, এই দেখাটাই

বড়, কারণ এই দেখা থেকেই মানুষ খুঁজে পায় তার প্রতিবাদের ভাষা, নিখিলেশ বিমলাকে বলেছিল, এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরনাটুকু ক'রে যাওয়ার জন্যে তুমিও হওনি, আমিও হইনি।

সংসারটা ভাল ক'রে করার জন্যই আসতে হয় সংসারের বাইরে। চারদেয়ালের বাইরে ছড়িয়ে আছে হাজার সংসার, জানতে হয় আরো অনেক সমস্যা। চারদেয়ালের ফাঁকির মধ্যে আটকে থাকেনি আরতি, আটকে থাকে না একজন যাত্রার অভিনেত্রী।

আরতির চাকরিটা সহজে মেনে নিতে পারছিল না সুব্রত। সে আরতিকে বলে, 'চাকরিটা ছেড়ে দাও, আমি একটা পার্টটাইম পাচ্ছি।' তখন তার মনে হচ্ছে টাকার চেয়েও সংসারে শান্তিটা বড়। অথচ আরতি ভালো কাজ করছে, কাজ ভালো লাগছে তার, সমস্তদিন খাটাখাটনি করেও সে ক্লান্ত বোধ করে না। তবু স্বামী চায় না সে চাকরি করুক, 'আমি চাই না, বাবা চান না, মা চান না, এতগুলো লোককে অখুশি করে তুমি চাকবি করবে?' সে আর কারুর কথাই ভাবতে চায় না, স্বামীর ইচ্ছে-অনিচ্ছেটাই তার কাছে বড়, তাই আরতি চিন্তিত হয়ে পড়ে। সুব্রতর ধারণা একটা পার্ট টাইম জোগাড় করতে পারলে সে একাই সামলাতে পারবে, অভাব এতটা থাকবে না। সে বোঝে না স্বামীর পার্ট টাইম ফুল টাইম কোনো টাইমের সঙ্গেই স্ত্রীর চাকরির কোনো সম্পর্ক নেই।

আরতি রেজিগনেশান লেটার নিয়ে বেরিয়েছিল। ব্যাগের মধ্যে চিঠিটা রয়েছে। দেবার জন্যে অপেক্ষা করছে। তখন সুব্রতর ব্যাংকে তালা পড়ছে, তখন মিস্টার মুখার্জী আরতিকে বলেছেন, 'আপনার একজন কলিগ আজ আসছেন না, মিস সিমন্‌স। তার একটা demonstration আছে রয়েড স্ট্রিটে, আপনাকে এ ভারটা নিতে হবে। আমার কতকগুলো plans আছে অদূর ভবিষ্যতে। আরো দু-একটা জিনিস আনাচ্ছি। যেমন Washing machine, এসবের জন্যেও house to house ক্যানভাসিং লাগবে। কিছু নতুন sales girls নিতে হবে, আর আপনিই হবেন তার ইনচার্জ।'

সুব্রতর ফোন আসে, চিঠিটা দিও না... আমার চাকরি নেই.... তুমি চিঠিটা দিও না। আরতি আবার ফিরে আসে মুখার্জীর ঘরে, 'আপনি আমার মাইনে বাড়িয়ে দিন... নইলে আমায় অন্য রাস্তা দেখতে হবে।' মুখার্জী এটা জানেন যে আরতি একটু অতিরিক্ত impulsive. বলেন, 'অন্য কি রাস্তা আপনি দেখবেন মিসেস মজুমদার? রাস্তা কি চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে যে একটা দেখে নিলেই হলো?' সহকর্মীরা যেন কেউ টের না পায়, সাবধান ক'রে দিয়ে মুখার্জী তাকে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেন।

তার ফিরিঙ্গি বন্ধু ইডিথকে মুখার্জী অপমান করেছে, তাকে ডিস্‌মিস করেছে, কিন্তু আরতি তার কর্মচারী, তাই অপমান করেছে কি করেনি তার কাছে সে কৈফিয়ৎ দিতে তিনি বাধ্য নন, 'দেখুন মিসেস মজুমদার, আমার অফিসে কর্মচারীদের আমি কী বলি না বলি , কী করি না করি that is my business and mine alone.' আরতি ইডিথকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে, সে তার বন্ধু, সে তার বাড়িতে গিয়েছে, নিজের চোখে দেখে এসেছে তার অসুখ। ফিরিঙ্গি মেয়েদের সম্পর্কে তার কতোটা জ্ঞান আছে মুখার্জী জানতে চান। আরতি অন্য কোনো ফিরিঙ্গি মেয়েকে জানে না, ইডিথকে শুধু জানে, সে মনে করে মুখার্জী ইডিথকে যে অপমান করেছেন সেটা ও মোটেই ডিজার্ভ

করে না। মুখার্জী বলেন, 'আমি যে আপনার কথা ভেবেই ওকে ডিসমিস করেছি সেটা বুঝেছেন কি ? আমি যেদিন বুঝেছি আপনি ওর জায়গায় কাজ চালাতে পারবেন, সেইদিনই ডিসাইড করেছি যে ওকে রাখব না। এতদিন দায়ে পড়ে রেখেছি, আজ দায়মুক্ত হয়েছি। ব্যাস্, Simple. এ নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? এতে তো আপনার position আপনি নিজেই Jeopardise করছেন।' তরতর ক'রে উঁচুতে উঠে যাবার এই সুযোগের সামনে দাঁড়িয়ে তবুও আরতি বলে, 'ওর চরিত্র সম্বন্ধে যা বলেছেন সেটা বলার কোনো অধিকার আপনার নেই। এটা ভুল এটা অন্যায়।' মুখার্জীর গলা কেঁপে ওঠে, 'মিসেস মজুমদার আপনাব কথাগুলো টেবিলের এদিক থেকে বলা যায়, ওদিক থেকে নয়।' আরতি তাঁকে ইডিথের কাছে ক্ষমা চাইতে বলে। মুখার্জী আরো রেগে যান, 'মিসেস মজুমদার আপনি বুঝতে পারছেন না আপনার এ attitude এর ফল কতো Serious হতে পারে। ...আজ যদি আপনার চাকরি যায়।' আরতির হাতে ব্যাগ। ভেতরের থেকে সে কাগজটা বার করে।

'এই নিন্।'

'কি ?'

'আমার রেজিগনেশান। ডেটটা পাল্টে নেবেন।' আরতি বেরিয়ে আসে। আরতি হনহন করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। ঝড়ের মতো নেমে আসে। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাঁড়ায়। সুব্রতকে দেখা যায়। সে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে। আরতি কিছু বলতে পারে না। অফিসের পেছন দিকে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।' সুব্রত অবাক হয়ে যায়, 'ছেড়ে দিয়েছ!'

সুব্রত বলে, 'তুমি যা পেরেছ তা হয়তো আমি পারতামই না—আমার সে সাহসই হতো না। রোজগারের তাগিদে আমরা ভীতু হয়ে গেছি আরতি। আমি রাগ করেছি, এ তুমি কি বলছ? কেঁদো না, এখন শক্ত হওয়ার সময়।'

আরতি বলে 'এত বড় শহর,.....এত রকম চাকরি...দুজনের একজনও কি পাবো না একটা?'

প্রতিবাদের এই শক্তি আরতি পেয়েছে এই শহর থেকে, এই কলকাতা থেকে, ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে। স্বামীর চাকরি নেই, সংসারে ছটি প্রাণী, কাল কিভাবে চলবে সে জানে না, এই অবস্থায় সে চাকরি ছেড়েছে, এবং তাকে কেউ অপমান করে নি, এক বন্ধুর বিরুদ্ধে একটা অন্যায় হয়েছে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়িয়েছে, নিজের কথা, স্বামী কিংবা ছেলের কথা তার একবারও মনে হয় নি, বিরাট একটা ঝুঁকি নিয়েছে সে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বিপদের সামনে দাঁড়াবার মতো মনের জোর তৈরি হয়েছে তার। নিজের স্বার্থের কথা সে একবারও ভাবেনি, ভেবেছে একজন মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আর একজন মানুষ তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছে, দুর্নীতি করছে। শুধু আবেগের বশে এ কাজটা সে করেনি, যদি করে থাকে তাহলেও জীবনে এই আবেগটার দামই সবচেয়ে বেশি, নিজেকে সে আধুনিক মানুষের মতো প্রতিষ্ঠা করেছে নীতির দ্বারা, বিবেকের দ্বারা। এই শহর নিশ্চয়ই দিতে জানে এই নীতি ও বিবেকের দাম, দুর্দিনেও এই শহরই বেঁচে থাকার জন্য সামান্য একটা চাকরির আশা জাগিয়ে রাখে।

আমি কিন্তু নিজের জন্যে বলতে আসিনি

একটি ছবি শুরু হলো নেগেটিভ্-এ

চিতাশয্যায় শায়িত এক ব্যক্তির শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক। মৃত্যু এল অন্যরূপে। পিতা পেছনে রেখে গেলেন একটি মধ্যবিত্ত সংসার, আর কিছু নয়। এ এক কঠিন সময়। নিজেকে চিনে নিতে হবে। ছবির পজিটিভ অংশ শুরু হলে দেখি দোতলা বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক, প্রখর দৃষ্টি, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, খানিকটা চিন্তিত। এই যুবকের নাম সিদ্ধার্থ।

যেহেতু ছবির শুরুতেই মৃত্যু, তাই, সত্যজিৎ বলেছেন, Now I feel that if I had the normal positive image, people would look for signs of life immediately and it would be very difficult to make a convincing dead man. So since I had used negative in the opening sequences, I found reasons for using it as part of the language of the film in three or four other sequences.

বাবার মৃত্যুতে মায়ের শোকার্ত কণ্ঠ সবটা স্পষ্ট শোনা যায়নি, 'আমার সব চলে গেল' এরকম কিছু বলেছেন। ঘর থেকে মৃতদেহ আনা হয়েছিল বাইরে। মৃতদেহের উপরে নামাবলী, ফুলের মালা, মৃতদেহ পুড়ছে। নেগিটিভে চিতার আগুন নেভার পরেই শুরু হয়েছে ছবির পজিটিভ অংশ।

শ্মশান থেকে ফিরে আসা সিদ্ধার্থকে পরিচালক ঘরে আনেন নি। নিজের দায়িত্ব, সংসারের দায়িত্ব এবার তাকেই নিতে হবে, লেখাপড়া তারও সমাপ্ত হলো না, শিক্ষার মাঝরাস্তা থেকেই খুঁজে নিতে হবে জীবনের রাস্তা, বাঁচতে তো হবে, তার জন্য দরকার একটা চাকরি।

একালের কলকাতা। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি নানারকম যানবাহনের কলকাতা, বিশ্রী, বিকট শব্দে দূষিত হচ্ছে আকাশ বাতাস। ভিড়ের বাসে কনডাকটার পয়সা গুণে টিকিট দিচ্ছে। 'মহানগর'-এ একটি নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের মধ্যেই পরিচালক এই শহরের একটা বড়রকম সমস্যাকে ধরেছেন। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে ক্যামেরা বারবার বেরিয়ে এসেছে বাইরে, পথে ঘাটে, টাটা সেন্টারের ছাদে, জেব্রাক্রসিংয়ে, ধর্মতলার দিঘির ধারে, বাস ড্রাইভারের শক্ত হাতে ধরে থাকা স্টিয়ারিং-এ, মন্দিরের পথে কপালে হাত ঠেকিয়ে কি যেন আশা করা অফিসের বাবুতে, নিউমার্কেটের মুরগির খাঁচায়, হর্টিকালচারের বাগানে, রেস্তোরাঁয়, ইনটারভিউ বোর্ডের বিদ্যুৎচালিত বোতামে, হিপিদের উল্লাসে, ফিল্ম সোসাইটির শোয়ে, সুইডিশ ছবিতে, ট্রাঙ্ককল্-এ, টেলিফোন গাইডের ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে, কলিংবেল-এ, সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে, ময়দানের মিটিংয়ে, সারি সারি বন্দুকের দিকে, আলো ঝলমল আকাশ' ছোঁয়া বাড়িতে, চে গুয়েভারায়, A History of Western Philosophy তে, অথরিটির হাতে, হুইস্কির গেলাসে।

সবই বদলে গিয়েছে।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে তার বোন তপু। সে আরো ভালো থাকতে চায়। চরিত্রের কতখানি অবনতি ঘটছে সে নিয়ে সুতপা আদৌ ভাবিত নয়। অবক্ষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময়ই তার নেই। অফিসের কাজের পর সে তার মনিবকে সঙ্গ দিলে যদি তার খানিকটা উন্নতি হয় সেই সুযোগটা সে ছাড়বে কেন, সে জানে

কেরিয়ার করতে গেলে শরীরটাকে সুন্দর রাখতে হবে। নিজেকে সে আয়নায় দেখতে থাকে। একটু পিছিয়ে দ্যাখে একটু এগিয়ে দ্যাখে। নিজেকে দ্যাখে মানে, অন্যর চোখে তাকে কেমন লাগে সেটা দেখে নেয়া। সে মডেল হতে চায়। তপু দাদাকে ছাদে ডেকে আনে। অফিস ছুটির পর সে বিলিতি নাচ শিখতে যায়। ছাদের ওপর দাদাকে সেই নাচ দেখায়। সুতপার ভবিষ্যৎ ভেবে সিদ্ধার্থ বিষণ্ণ হয়। চোখের জল নিয়ে মনিবের স্ত্রী সুতপার নামে তার মায়ের কাছে নালিশ করে যায়। মা ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে নিজের মেয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনেন। রাত দশটার পর বাড়ি ফিরে তপু দাদার ইন্টারভিউর খবর নিয়েছে প্রথমেই। দাদার মুখে বসের স্ত্রীর অভিযোগ শুনে সে একটু বিচলিত হয়নি। এ তো স্বাভাবিক। হতেই পারে।

'তুই বদলে গেছিস'

'সবাই বদলায়, তুইও তো বদলেছিস।'

'মার কথাটাও তো ভাবতে হবে।'

'মা কি চায় চাকরিটা ছেড়ে দি?'

'দরকার হলে তাও করতে হবে।'

'আমি বস্-এর পি. এ. হচ্ছি, দুশো টাকা ইনক্রিমেন্ট।'

এই তপু একদিন তাকে একটা অচেনা পাখির গান শুনিয়েছিল। সেই বালক বয়সটা ফিরে আসে তার স্মৃতিতে। ফিরে আসে নাম না জানা একটা পাখির ডাক। তপু দাদাকে ডাকছে সেই পাখির ডাকের কাছে। ছোটভাই টুনু ডাকছে মুরগি কাটা দেখতে। এখন সেই তপু বসের সঙ্গে নবেন্দ্রপুবে বেড়াতে যায অফিস ছুটিব পর। ভাই টুনু হাঁটুর নিচে ওষুধ লাগাতে লাগাতে দাদার কথার জবাব দেয়। দাদার দিকে ফিরেও তাকায় না। কেবলই দূরত্ব বাড়ছে।

তপুর বস্ মিস্টার সান্যালের সঙ্গে দেখা করার জন্যে সিদ্ধার্থ গিয়েছিল তার নিউ আলিপুরের বাড়িতে। বাড়ির চাকর গিয়েছে ভেতরে খবর দিতে। হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের এক কোণে। গেট পার হয়ে একদম ভেতবে ঢুকে যায় একটা মোটর গাড়ি। ঐ গাড়ি থেকে নেমে মার্কেটিং থেকে ফেরা দুটি কিশোরী সিদ্ধার্থর পাশ দিয়ে ভেতবে চলে যায়। তার উপস্থিতিকে গ্রাহ্যও করে না। বেয়ারা এসে ভেতরে বসতে বলেছে। সে বসেছে। চারপাশে সাজানো আধুনিক আসবাব। নিঃশব্দ বাড়ি। দেয়ালে লেগে আছে ঐশ্বর্যের রঙ। মিস্টার সান্যাল আসেন। ঘরে ঢোকার আগে শোনা যায় জুতোর শব্দ। ক্যামেরা মিস্টার সান্যালের দুই চোখ থেকে গলার চর্বির ওপর দিয়ে নেমে পাঞ্জাবীর সোনার বোতাম ছুঁয়ে বোতাম ঘরেব নক্সা থেকে চলে আসে তাঁর হাতেব মূল্যবান সিগারেটে। এরকম একটা পরিবেশই সুতপা চায়। এরকম একটা পবিবেশকে গুলি ছুঁড়ে ধ্বংস করে দিতে চায় সিদ্ধার্থ। বাস্তবে তা ঘটে না। জীবনের সম্ভাবনাময় দ্বন্দ্বকে সত্যজিৎ খুঁজছেন সিদ্ধার্থর চরিত্রে।

ছোটবেলাব সেই পাখি শহর কলকাতার আকাশে ওড়ে না। হারিয়ে গিয়েছে সূর্যালোকিত বেলাভূমি। ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিল সে, এক মহৎ পেশা, যেখানে কঠিন ব্যাধি থেকে মানুষই মানুষকে মুক্ত করে। পড়া হয়নি তার। গোটা সমাজটাই ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে চলেছে। ছাত্র জীবনে সে ইউনিয়ন করেছে। একদিকে বাড়ছে বুরোক্র্যাসির

ক্ষমতা, অন্যদিকে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতারা দলের স্বার্থে ব্যবহার করছে যুবসমাজকে, বিপন্ন মানুষকে। চায়ের দোকানে নরেশদার সঙ্গে সিদ্ধার্থর দেখা হয়। তাকে দেখা যায় না। তার কণ্ঠ শোনা যায়। দেখা যায় না তার কারণ এই রাজনৈতিক কর্মীদের আসল চেহারা চেনে না এই সমাজ ও সময়ের মানুষ। সিদ্ধার্থর সব খবর নরেশদা রাখেন, তাদের দলের লোকদের এসব খবর রাখতেই হয়, কারণ এসব যুবকদের দরকার তাদের পার্টির। মানুষের চেয়ে পার্টির দাম তাদের কাছে অনেক বেশি। শুধু উপদেশ দিয়েই তিনি চলে যান না, চাকরির সন্ধানও দেন। পার্টির কাজে সিদ্ধার্থকে লাগানোর ইচ্ছেটা তিনি গোপন করেন না। অত্যন্ত সচেতন এই যুবক। খুব সহজে কোনো কিছু সে মেনে নেয় না। তার মাথায় যুক্তি বুদ্ধি বেশ ভালোরকমই কাজ করে। বরং বলা যায়, এতখানি হৃদয় ও মেধাসম্পন্ন যুবক সহজে চোখে পড়ে না। ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধার্থর দৃষ্টিকোণই ব্যবহৃত হয়েছে। ভাবনার অন্তর্গূঢ় পথ বেয়েই তার যৌবনের দিনগুলি এই শহরের এই সময়ের স্বরূপ খুঁজেছে। শুরু হচ্ছে একটা নতুন দশক, একটা অস্থির সময়ের সামনে এই কলকাতা। আধুনিক জটিল জীবনবোধের এই প্রকাশ সত্তরের ছবিতে 'জন অরণ্য' ছাড়া আর কোথাও নেই। এই সময়টাই বাব বার বিদ্ধ করে তার চেতনাকে। দস্যুর রোমশ হাতে নেমে আসে প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর গিলোটিন। এই সময়ের সংশয় দ্বিধা ও বিচ্ছিন্নতাকে পরিচালক এনেছেন অসামান্য দক্ষতায়। জানি অরণ্যেব দিনরাত্রি সত্যজিতের অন্যতম প্রিয় ছবি। একথা ঠিক অরণ্যের দিনরাত্রি সিনেমাটিক্যালি অসাধারণ, গঠনভঙ্গির দিক থেকে খাঁটি অর্থে আধুনিক চলচ্চিত্র। কিন্তু সময়েব যে বাস্তব সংকটকে ধরার চেষ্টা আছে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতে, 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে তা নেই। বেকার সমস্যাটাকে পরিচালক এক নির্মোহ বাস্তবতায় ধরেছেন। তাই ছবির নায়ক সিদ্ধার্থকে করেছেন অন্তর্মুখী। অরণ্যের দিনরাত্রি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিন্যাসে পরিচালক চলে এসেছেন। আমাদের মনে রাখতে হয়, 'বিষয়-বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজম নয়, বিয়ালিজ্‌ম ফুটবে রচনার জাদুতে।' পরিচালক গল্প তৈবির চেষ্টা করেননি। একটা চাকরি পেতেই হবে, এই প্রসংগে এই সময়েব কলকাতা উঠে এসেছে এই ছবিতে, 'আবার কলকাতা। সকালে কুয়াশা দুপুরে ধুলো, বিকেলে ধোঁয়া। বস্তি না আস্তাকুঁড়। সমাজেব তলানিদের অতল সমুদ্র। ভিড়ে গেছি। সমস্তই সস্তা এখানে—প্রেম আনন্দ মৃত্যু।' —এই দৃষ্টিতে সত্যজিৎ কলকাতাকে দেখতে চাননি। সিদ্ধার্থকে এনেছেন তিনি ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে, এনেছেন জন অরণ্যের নায়ককে। 'সমস্তই সস্তা এখানে' এই ব'লে থেমে থাকে না একালের মানুষ, টিকে থাকার জন্যে তাকে পরিশ্রম কবতে হয় প্রতি মুহূর্তে লড়াইটা তার নিজেকেই চালিয়ে যেতে হয়। এই গূঢ় সমাজদৃষ্টি থেকেই পরিচালক পেয়ে যান তাঁর বৃহত্তর বাস্তব দৃষ্টি। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ব্যক্তিমানুষের ছবি ফুটিয়ে তুললেন তিনি। আমরা দেখতে পাই নায়কের অন্তর্লীন আত্মকথনের ছবি, এক একটি সিকোয়েন্স তৈরি হয়েছে বাস্তবের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রে।

দুটি আশ্চর্য স্বপ্নদৃশ্য আছে এই ছবিতে। দুটির সঙ্গেই জড়িত মৃত্যু চেতনা। প্রথম স্বপ্নের গিলোটিনে বিকৃত সিদ্ধার্থের মুখ। দ্বিতীয় স্বপ্নের আরম্ভে ইন্টারভিউ বোর্ড-এ তিনজন কর্তা। সমুদ্র তীরে উড়ে যায় আবেদনপত্রগুলি। সমুদ্র। আবার

তিনজন। চেয়ার টেবিলে আবেদনপত্রগুলি তারা পরীক্ষা করেছিল। মৃত ভ্রূণ। সুইমিং কস্টিউমে তপু। মডেলের ভঙ্গিমা। সামনে ক্যামেরাম্যান। বন্দুক হাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের বাহিনী। ছোটো ভাই টুনু। বন্দুকের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে। বালিতে লুটিয়ে পড়ে টুনু। সুতপার পরনে নার্সের পোশাক। সে ছুটে আসে। ছুঁতে যায় টুনুর মৃতদেহ। যেন তাকে গ্রহণ করতে পারে না সিদ্ধার্থ। তপুর মুখটা বদলে যায়। প্রেমিকা কেয়ার মুখে পরিবর্তিত হয়।

নার্সের ফ্ল্যাট থেকে ছুটে বেরিয়ে আসার পরেই একটি অন্ধকার বাড়িতে সে আবিষ্কার করে একটি আলোকিত মুখ, এক যুবতী। তার নাম কেয়া। সিদ্ধার্থ মেয়েটির সঙ্গ পেতে চায়, মেয়েটিও। তাদের দুজনের চারপাশেই একটা বিরুদ্ধ পরিবেশ। সেই পারিপার্শ্বিক থেকে দুজনেই বেরিয়ে আসতে চায়। কেয়ার সারল্যে সিদ্ধার্থ জীবনের একটা অন্য অর্থ পেয়ে যায়। কিন্তু সে সত্তরের কলকাতার এক শিক্ষিত যুবক। তার চারপাশটাকে সে বুঝে নিতে চায়। ষাট দশকের শেষের দিক থেকে একটা পরিবর্তন আসছিল গোটা রাজ্য জুড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন একটা নতুন চেহারা নিচ্ছিল, পুরোনো ছাত্র সংগঠন ভেঙে তৈরি হচ্ছিল নতুন সংগঠন। কলকাতা শহরে ছাত্র সমাজই সেদিন মানুষকে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা শুনিয়েছিল।

ইন্টারভিউতে সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'Who was the Prime Minister of England at the time of Independence?' সিদ্ধার্থ জানতে চায় 'কার স্বাধীনতা?' ওঁরা বলেন, Our independence. সিদ্ধার্থ উত্তর দেয়, Attlee বোর্ডের অন্য মেম্বার জিজ্ঞেস করেন, 'What do you regard as the most outstanding and significant event of the last decade?' ক্লোজআপে সিদ্ধার্থ ভাবছে। সিদ্ধার্থ এখনও ভাবছে। বোর্ড মেম্বারের ক্লোজআপ। অন্য মেম্বারের ক্লোজআপ। সিদ্ধার্থ উত্তর ঠিক করে ফেলেছে, 'ভিয়েৎনামে যুদ্ধ স্যার।' বোর্ড সদস্যের মুখে শঙ্কামিশ্রিত বিস্ময় 'More Significant than the landing on the moon?' উত্তর আসে, 'আমি তাই মনে করি, স্যার।' সিদ্ধার্থর ক্লোজআপ। 'Could you tell us why you think so?' ক্যামেরা বোর্ড মেম্বারদের পেছনে গিয়ে সিদ্ধার্থকে top shot- এ ধরে, সিদ্ধার্থ তার এই উপলব্ধিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, এক আশ্চর্য সততায় সে তার এই বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, 'Because the moon landing—you see.....we.....we weren't entirely unprepared for the moon landing. We knew it had to come some time. We knew about the space flights, the great advances in space technology. So we knew it had to happen. I am not saying it wasn't a remarkable achievement, but it wasn't unpredictable, the fact that they did land on the moon.

ক্যামেরার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বোর্ড মেম্বারদের ওপর, ফ্রেমের বাঁ দিকে সিদ্ধার্থ ব্যাক্ টু ক্যামেরা। 'Do you think that the war in Vietnam was unpredictable?' সিদ্ধার্থর ক্লোজআপ! সে বলতে থাকে, 'Not the war itself, but what it has revealed about the Vietnamese people, about their extraordinary power of resistance. Ordianry people, peasants.....no one knew they had it in them. It isn't a matter of technology...it's ...it's Just plain human

courage, and it....it takes your breath away.' সান্তিআগো আলভারেজের ছবি দেখেনি সিদ্ধার্থ, সত্যজিৎ তার মুখে শুনিয়েছেন আলভারেজের কথা। সিদ্ধার্থর এই উত্তরের মধ্যেই আছে সত্তরের কলকাতা, সত্যজিতের কলকাতা। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'Are you a Communist.' সিদ্ধার্থ উত্তর দেয়, 'I don't think one has to be a Communist in order to admire Vietnam, Sir.' এ চাকরি অতএব সে পায় না। তার ভাই টুনুর ধারণা এই সময়ের সংকট আসলে রাজনৈতিক সংকট। মধ্যপন্থাকে সে ঘৃণা করে। এবং সিদ্ধার্থ বলে, 'এক এক সময় মনে হয় টুনু ঠিকই বলে।'

১৯৬৭-তে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা একদিন ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায়। কলকাতা তো বটেই। কলকাতার যুবক সিদ্ধার্থ নকশাল না হয়েও তাই পাল্টা প্রশ্ন করার সাহস দেখিয়েছে, 'কার স্বাধীনতা'? দোসরা মার্চ ১৯৬৭, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা লাভ করে। পরদিন তেসরা মার্চ আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ। এরপর আড়াই মাসে গোটা ষাটেক ঘটনা ঘটে। জমিদখল, ধানলুঠ, এইসব। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের পটোত্তলন হয় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ার পর ১৯৬৯-এ। প্রথম ঘটনা ঘটে মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার ধরমপুর গ্রামে। ১৯৬৯ এর পয়লা মে কলকাতায় মনুমেন্টের নিচে নকশালদের প্রথম প্রকাশ্য সভা হয়। মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট পার্টির জন্ম ঘোষণা করলেন কানু সান্যাল। পার্টির লক্ষ্য গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র কৃষক বাহিনী গড়ে তোলা। মাও জে দং-এর আদর্শে তাঁরা অনুপ্রাণিত। সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। রাজতন্ত্র জমিদারতন্ত্র আর পুঁজিবাদ কমিউনিস্টদের এতদিন ঠিক পথে এগোতে দেয় নি। সেই পথটা খুঁজছে এই আন্দোলন। দেশব্রতী কাগজে চারু মজুমদার ছাত্রসমাজকে, যুব সমাজকে নকশালবাড়ির এই আন্দোলনে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানালেন। কলকাতার স্কুল কলেজের দেয়াল সমস্ত বাড়ির দেয়াল সেদিন ভরে গিয়েছিল মাও জে দং-এর মুখে, তাঁর উদ্ধৃতিতে। কলকাতার পথে পথে সেদিন সবচেয়ে বেশি বিক্রি হলো রেডবুক। Students organisation must be a Red guard organisation and it should follow up the path of Mao-Tse-Tung ; guerrila warfare is a higher form of peasants struggle. Under political leadership, there are four weapons, namely, class analysis, investigation, Study and class struggle.

সিদ্ধার্থ আর টুনু এই সময়ের কলকাতায় খুঁজে নিচ্ছে নিজেদের পথ। সত্যজিৎ বারবার নিজেকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সময়ের নানা শ্রেণীর মানুষের অজস্র চেহারা তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন, অপু চিত্রত্রয়ীর পরিচালক বিশ বছর পরে ওয়াজিদ আলী শাকে নিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ইতিহাস ও মানব উভয়কে একত্রিত করেছেন, সৃষ্টি করেছেন শতরঞ্জ কি খিলাড়ীর মতো অবিস্মরণীয় ছবি।

'নানা লোভে ক্রুরতায় আজ আমরা ক্ষতবিক্ষত।....অনাবশ্যক মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলিও ছত্রভঙ্গ। তাই ঐকতান ছিন্নভিন্ন, অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায় গলিতে। কিন্তু জীবন তবু হার মানে না, তার শেকড় আমাদের মনের গভীরে, দুর্মর

প্রাণ নৈর্ব্যক্তিক আবেগে নির্নিমেষ চোখ মেলে থাকে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দেশ, আসন্ন সমাজ কাঁপে চৈতন্যের সম্ভাবনায়...।'

কি করে ছবিতে টেনশান তৈরি করতে হয়, চলচ্চিত্রে তা আমরা নানাভাবে দেখেছি, কিন্তু একটা ইন্টারভিউকে ঘিরে টেনশান তৈরি করা যায় এভাবে, 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছাড়া আর কোথাও তা দেখিনি। প্রতিটি সেকেণ্ডে ক্যামেরা তৈবি করেছে দর্শকের স্নায়বিক উত্তেজনা, অথচ ইন্টারভিউ যারা দিতে এসেছে তাদেব মুখের সংলাপে কোনো উত্তেজনা ছড়ানো হয় নি। সকলেই অপেক্ষা করছে একটা অনিশ্চয়তার সামনে।

'এটা কি আপনার প্রথম ইন্টারভিউ।'

'নাঃ।'

'আচ্ছা প্রশ্ন কি ইংবেজিতে কববে?'

'Chance আছে।'

'Naturally'.

এই ছেলেটি থেকে শেষ ইন্টারভিউতে স্যুটটাই পরে জুতো মচমচিয়ে গম্ভীর মুখে পায়চারি করা যুবকটি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ছেলেটি, অথবা যে বলল, আচ্ছা Selection কি ভেতরে ভেতরে হয়ে গেছে,—প্রতিটি ক্যাণ্ডিডেটকে আমাদের মনে থাকে। সিদ্ধার্থ যখন প্রথমবার প্রতিবাদ জানাতে ঘরে ঢুকলো তখন ইন্টারভিউ বোর্ডেব একজন বলল,

কেন সকলে মিলেমিশে বসা যায় না?

একজন তো এইমাত্র ফেইন্ট করল

এ কাজে তো আরো অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে

চাকরিতে পরিশ্রম' করা আর ...

তোমার কি নাম,. Position কত

আমি কিন্তু নিজের জন্যে বলতে আসিনি।

টুনু তার দাদা সম্পর্কে বলেছিল, সে যে জায়গায় এসে আটকে গেছে সেখানে থেকে সে এগোতে পারবে না পেছতেও পারবে না। তার এই দাদা একদিন তাকে জন্মদিনে চে গুয়েভারার বইটা উপহার দিয়েছিল।

এখন সিদ্ধার্থ দেখছে, যারা ইন্টারভিউ দিতে এসেছে, তার চারপাশে সেই ছেলেরা এখন জীবনহীন কিছু কঙ্কালমাত্র। যে সমাজে, যে দেশে, যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমরা বাস করছি সেখানে যোগ্যতাসম্পন্ন যুবকরাও এভাবে শোষণের শিকাব হয়ে যায়। জীবিত অবস্থাতেও শরীর এখানে শরীরের রক্তহীন প্রাণহীন কাঠামো।

কর্তৃপক্ষের সামনে চিৎকার করে ওঠে এক যুবক, 'আমরা কি জানোয়ার?' সমস্ত তছনছ ক'রে সে বেরিয়ে যায়। ছবির পজিটিভ অংশ শুরু হলে ক্যামেরা সিদ্ধার্থকে ঘর থেকে অনুসরণ করেনি, ছবির শেষেও ক্যামেরা সিদ্ধার্থর ঘরে ফিরে আসে নি। শহর কলকাতার দেয়ালে অজস্র শ্লোগানের ওপর দিয়ে ছুটে আসে ক্যামেরা। কলকাতা ছেড়ে চলে আসে সিদ্ধার্থ। বালুরঘাটে চাকরি নিয়ে সিদ্ধার্থ একটা হোটেলে এসে ওঠে।

মুছে গেল দেয়ালের রাজনৈতিক শ্লোগান। তার কাছ থেকে অনেক দূরে কলকাতার দেয়ালে পড়ে রইল বিপ্লবের বাণী। সেইসব লিখনের উপর দিয়ে ক্যামেরা চলে আসে বিস্তীর্ণ মাঠে দিগন্তে গাছের সারিতে, ট্রেনের জানালায় সিদ্ধার্থর হাতে।

বালুরঘাটে হোটেলে ফিরে আসে ছোটবেলার সেই অজানা পাখিটার ডাক। শোনা যায় শববাহকদের ধ্বনি, 'রাম নাম সত্ হ্যায়।' সত্যজিৎ তাঁর জীবন অভিজ্ঞতাকে বাস্তবতার এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ করেছেন, ছবির শেষ দৃশ্যে আমরা পৌঁছে যাই এক মায়াবী বাস্তবতায়, এই 'বাস্তবতার মায়া সৃজনের' কথা মনে রেখেই লেখক বলেছিলেন.... the high order of Realists should call themselves illusionists, প্রখর বাস্তবের উপর দিয়েই সত্যজিতের ক্যামেরা চলে আসে জীবনের গূঢ় রহস্যচেতনায়। আধুনিকতার শিল্পিত লক্ষণ ছড়িয়ে আছে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিটি ফ্রেমে। You can see my attitude in 'The Adversary' where you have two brothers. The younger brother is a Naxalite. There is no doubt that the elder brother admires the younger brother for his bravery and convictions, the film is not ambiguous about that. As a filmmaker, however, I was more interested in the elder brother because he is the vacillating character. As a psychological entity, as a human being with doubts, he is a more interesting character to me. —'Art Politics Cinema.' The cineaste Interviews Edited by Dan Georgakas and Lenny Rubenstien.

অর্ডারটা পেয়ে গেলাম

'স্বাধীনতা দিবসে জন্মগ্রহণ করে তুমি গোলামীর ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছ?' বিশুদা সোমনাথকে বলেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীর পাঁচবছর পরের ছবি 'জন-অরণ্য।' বেকার সমস্যা এখন আরো তীব্র, আরো ভয়াবহ। সিদ্ধার্থ যেমন কর্তৃপক্ষের মনের মতো জবাব দেয়নি তার ইন্টারভিউতে, সোমনাথও তেমন খুশি করতে পারেনি অথরিটিকে। সিদ্ধার্থ প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

এর মধ্যে আরো কিছু সময় কেটে গিয়েছে। ইন্টারভিউ যারা নিচ্ছে তাদের সামনে প্রশ্ন তখন আরো জটিল, তখন হাজার হাজার প্রশ্নের ভেতর থেকে শুধু শোনা যাচ্ছে who is the....? What is the....? where is the....? when was the ? How was the...? পরে is the, was the ও আর শোনা যায় না। বিদ্ধ করে কিছু Who, What, Where, When, How.

যে ছেলেটি পরীক্ষায় নকল করে না, যখন সবাই টুকছে, সে মাথা নামিয়ে লিখে যায়, যে ছেলেটির মধ্যে নীতি ও বিবেক কাজ করে, সৎ শান্ত বুদ্ধিমান সেই যুবক সোমনাথ এই ছবির নায়ক। একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। যাকে সে ভালোবাসত তার বিয়ে হয়ে গেল। পুরনো প্রেমের স্মৃতি আঁকড়ে সময় নষ্ট করার মত সময় তার নেই। সে আনার্স পায় নি। অথচ তাব preparation ভালো ছিল, প্রশ্ন সহজ হয়েছিল, উত্তর ঠিকমতো লিখেছিল, revise করেছিল। মুক্তোর মতো তার হাতের লেখা, কিন্তু এত ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর যে, পরীক্ষক তার খাতা দেখতে দেখতে স্ত্রীকে বলেছিল, 'আমি কি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খাতা দেখব, তার জন্যে বাড়তি পয়সা দেবে আমাকে?' পরীক্ষক জীবনবাবুর চোখের পাওয়ার বেড়েছিল, আর একজনের কাছ থেকে চশমাটা আনার জন্যে তিনি ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন। পান নি।

সোমনাথের বাবা দ্বৈপায়ন চেয়েছিলেন ছেলের খাতা Scrutiny করাতে, বড়

ছেলে সুব্রত ভালো চাকরি করে, সে তার বাবাকে বলেছে, 'ওতে কোনো লাভ নেই বাবা, খাতা তো আর তোমাকে দেখতে দেবে না। তারা টোটাল করে দেখিয়ে দেবে কোনো ভুল হয়নি।' 'প্রতিদ্বন্দ্বীর' প্রায় শুরুতেই দেখেছিলাম সিদ্ধার্থ ইন্টারভিউ দিতে চলেছে। 'জন-অরণ্য' ছবির ক্রেডিট টাইটেল থেকেই দেখতে পাই একটা শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, পরীক্ষার হলে ছাত্ররা চরম উচ্ছৃঙ্খলতায় মত্ত। চারপাশের এক অরাজক অবস্থার মাঝখানে টাইপ না শেখা ছেলেটি নিজের দরখাস্ত নিজেই টাইপ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অদ্ভুত মজার সব ভুল হ'তে থাকে। সে হাল ছেড়ে দেয়। রাস্তার ধারে টাইপিস্ট-এর কাছে সোমানাথ application type করে। পোস্টঅফিস থেকে পোস্টাল অর্ডার কেনে সোমনাথ। application এর সঙ্গে Postal order, Certificate এসব পিন্ ক'রে ভাঁজ ক'রে খামে পোরে। ডাকবাক্সে ফেলে। অজস্র চিঠি ডাকবাক্সে জমা পড়তে থাকে। ঠিকানা সব এক । হাজার হাজার চিঠি চটের থলিতে ভরা হচ্ছে।

দ্বৈপায়ন অবাক হয়ে যান, এক লাখ! সোমনাথ জানায়, তিনটে লরি বোঝাই এ্যাপ্লিকেশন গেছে। দ্বৈপায়ন বলেন, 'সাধে কি এরা বিপ্লব করতে চায়।' সুব্রত তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, 'বিপ্লব আব বেশিদিন নেই বাবা। সব মেরে ধরে শেষ করে দিচ্ছে। আজ তো একটা পুরো দলকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে শুনলাম।' বাবা জানতে চান, 'কোথায়?' সুব্রত জানায়, 'টালিগঞ্জে।' দ্বৈপায়ন অস্থির হয়ে ওঠেন, 'যা অবস্থা দেখছি দেশের-এ তো যে কেউ বিপ্লব কবতে পারে। আর এখানে তো একটা বয়সের ব্যাপার আছে। ১৯৩০-এ আমার বয়েস ছিল সতের। মহাত্মাজীর call-এ আমরাও সাড়া দিয়েছিলাম। কিসে কি হয়, তখন কি অত বুঝতাম? কেবল একটা উত্তেজনা। অথচ দেশের অবস্থা তখন এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল।' পুত্রবধূ কমলা এসে টেবিলে একটা পানীয় রাখে, 'আপনি এসব বলছেন, আর খোকন যদি সত্যি ওসব দলে গিয়ে যোগ দিত তাহলে আপনার ভালো লাগত?' দ্বৈপায়ন বলেন, 'সন্তানের প্রাণ সংশয় হলে কার ভালো লাগে বৌমা। একটু আশার আলো যেদিন দেখতে পাব, সেদিন তো আর এসব দুশ্চিন্তা মাথায় আসবে না।' বইপত্র পড়ে আজকের আন্দোলন কি ও কোন্ পথে তিনি জানতে চাইলে বড়ছেলে জিজ্ঞেস করেছে, 'তুমি আবার বুড়ো বয়সে ওসব কেন জানতে চাও বাবা?' দ্বৈপায়ন উত্তেজিত হন, 'বুড়ো? দ্যাখ্ ভোম্বল বুড়ো কাকে বলে তুই জানিস না? বুড়ো দেখতে হলে সকাল সন্ধে লেকের ধারে বেঞ্চিতে গিয়ে বস। ভীমরতি জিনিসটা যে কী- আব সেটা যে কী shocking চেহারা নিতে পারে সেটা তাদের কথাবার্তা শুনলেই বুঝতে পারবি।'

সোমনাথ চাকরি পায় না। বিশুদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, বিশুদা তাকে ব্যবসায় অনুপ্রাণিত করে। ছবিতে কলকাতার ফুটপাতের ব্যবসা থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে বৃহত্তম ব্যবসার একটা চেহারা ফুটিয়ে তোলা হয়। তারা একটা প্রকাণ্ড পুরনো বিল্ডিং-এর সামনে এসে দাঁড়ায়। সেখানেই বিশুদার অফিস।

শিক্ষিত মানুষ হলেও, মহানগরে পুত্রবধূর চাকরি করাটা মেনে নিতে পারেন নি সুব্রতর বাবা। জন-অরণ্যে সোমনাথের বাবাও ছেলের ব্যবসা করাটা প্রথমে পছন্দ করেন নি, 'ব্যবসা আমাদের বংশে কেউ করে নি' এক মুহূর্ত পরেই তাঁর মনে হচ্ছে, 'অবশ্যি

আমার দুপুরুষ আগে কেউ চাকরিও করে নি' তাই ছেলেকে তিনি তার নিজের পথে চলতে দিলেন, 'তুই ভুল বুঝিস না। আমি রাগ করিনি। এটা যখন মেনে নেওয়ারই যুগ, তখন তুই ব্যবসা করলেও মেনে নেব।' সোমনাথ দেখতে পায়, তার চোখের সামনে লোকটা এই বয়েসে কিরকম change ক'রে যাচ্ছে।

বিশুদাব অফিসে ওঠার পথেই লিফ্‌টে হীরালাল সাহার সঙ্গে আলাপ হয়, সোমনাথ South-এ থাকে শুনে তিনি বলেছেন, 'হুঁ, ওদিকে অবিশ্যি খুব বেশী নেই' সোমনাথ জিজ্ঞেস করে, 'কি নেই?' হীরালাল উত্তর দেয়, 'সাহেব বাড়ি।' সোমনাথ অবাক হয়, 'সাহেব বাড়ি?' হীরালাল বলে, 'সব তো ভেঙে ফেলছে দেখেন নি? সব বড় বড় apartment উঠছে সেই জায়গায়। চোখে পড়লে বলবেন তো। not just any সাহেব বাড়ি। দেখবেন বাড়ির সামনে Sign board টাঙিয়ে দেয়- Site for অমুক। তার মানেই বুঝবেন বাড়িটা ভাঙা হবে।....ভালো সন্ধানেও কমিশন আছে।'

কত হাজার রকম ব্যবসা হয়। বিশুদার অফিসে এসে সোমনাথের চোখ খুলে যায়। যে বাড়ি ভাঙা হচ্ছে তার ভেতরকার জিনিসপত্র সব বিক্রি হয়। কারণ ওসব জিনিস আজকাল আর পাওয়া যায় না। সেই বাড়ি ভাঙার খবর দিলেও কমিশন পাওয়া যায়। বিশুদার অফিসের বেয়ারা ফকিরচাঁদ, তারও চাকরির বাইরে অন্য রোজগার আছে। বিশুদা বলেছেন, 'তোমার যদি ঘটি বাটি বাঁধা দেবার অবস্থা হয় কখনো, তবে ওর কাছে দিতে পার—বন্ধকী কারবার?' এবং বিশুদা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, দুনিয়ার যত রকমের ব্যবসা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ হলো order supply 'মালের খোঁজ করবে তুমি। দামটা জেনে নেবে, নিয়ে একটা খদ্দের খুঁজে বের করবে যে নাকি একটু বেশি দামে মালটা নিতে রাজি হবে। তুমি তার order নেবে, নিয়ে মালটি সাপ্লাই করবে। তার থেকে তোমার কমিশন, আর সেই হবে তোমার income.'

'একদিকে ক্রেতা, অন্যদিকে বিক্রেতা— মাঝখানে তুমি—যাকে বাংলায় বলে দালাল।' বিশুদা সোমনাথকে তিনটে কোম্পানির নামে ভিজিটিং কার্ড লেটারহেড তৈরি করতে বলেন। বিস্মিত সোমনাথ। দূরের টেবিলে বসা একটি লোককে দেখিয়ে বলেন, ওর একার নামে এগারোটি কোম্পানি। এগারো রকমের রসিদ, এগারো রকমেব বিল এগারো রকমের লেটারহেড। অন্তত তিনখানা কোম্পানি না হলে কোটেশান দেওয়া যাবে না। নিজেরটায় কম, অন্য দুটোয় একটু বেশি। এখানেই আলাপ হয় হরিশচন্দ্র আদক-এর সঙ্গে। Sales tax এর লোক। এখানেই আলাপ হয় নটবর মিত্রের সঙ্গে। এর কাজটা জনসংযোগ।

অর্ডার সাপ্লাই-এ সোমনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ায়। সোমনাথের হস্তাক্ষর আগের চেয়ে বড় হয়। সোমনাথ কোনো একটা জিনিসের Sample বার করে Purchasing officer কে দেখায়। তার লেটারহেডে লেখা কোটেশান দেখায়। কমিশন গুনে নেয়। অফিসের ডেস্কে বসে খাতায় হিসেব লেখে। জনবহুল রাস্তা হেঁটে আসে। মাল নিয়ে চলেছে সোমনাথ।

খাবার টেবিলে বসে সোমনাথ জানায় chemicals- এর একটা বড় order পাবার চান্স আছে তার। কাপড়ের মিলে জিনিসটা যাবে। Optical whitener। তার পিতা জানতে চান কিসের basis-এ সে orderটা পাবে? ব্যবসায় সাফল্যের basis

টা কি ? 'তুই যে order পাবি সেটা কি তোর মালটা ভালো বলে, না rate টা ভালো বলে, না কি তুই মানুষটা ভালো বলে?' দাদা সুব্রত বলে, 'ঘুষটা ভালো বলে।' অল্পবিস্তর ঘুষ অনেক ব্যাপারেই দরকার হয়, দিতেও হয়, সুব্রত এসব খুব সহজভাবেই বলতে থাকে। দ্বৈপায়ন ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, 'তোদের মা যখন গেল আর যে ভাবে গেল, এত কষ্ট সে তো চোখে দেখা যায় না—তারপর থেকেই আমার কাছে ঈশ্বর টিশ্বর সব meaningless হয়ে গেছে।...তোরা দুজন দূরে সরে গেলে, মনের মধ্যে সব সংশয় এসে বাসা বাঁধে।'

এই সময়ের কলকাতাকে খুঁজতে গিয়ে সত্যজিৎ ব্যবহার করলেন চলচ্চিত্র আঙ্গিকের ভাঙাগড়া। এখানেও ব্যবসারই জগত। সীমাবদ্ধর টেকনিক ভাঙলেন পরিচালক, তৈরি করলেন গল্প বলার আর একটা নতুন টেকনিক। কাহিনীর প্রতি টান সেখানে আসল কথা নয়, লক্ষ্য হলো চাকরি না পাওয়া একটি ছেলে তার একটা কাজে সফল হতে গিয়ে কিভাবে বাধ্য হলো তার সমস্ত বকম ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা অসৎ পথের আশ্রয় নিতে, অর্ডার পেলো সে, পেয়ে আনন্দ পেল না, হেরে যাওয়ার যন্ত্রণায় মাথা নিচু করে চলে গেল সে নিজের ঘরের দিকে। সত্যজিতের কলকাতার নায়করা অপু থেকে, ভূপতি থেকে, সিদ্ধার্থ, শ্যামলেন্দু, সোমনাথ, সকলকে সত্যজিৎ এনেছেন নানা পবীক্ষার ভিতর দিয়ে। চলচ্চিত্রে কোনো পরিচালক বিষযবিন্যাস ও শিল্পরীতিতে নিজেকে এতখানি বদলেছেন আমাদের জানা নেই। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের সঙ্কট জন-অরণ্যে চূড়ান্ত রূপ নিল। দেশে দেশে সিনেমার কথনরীতিতে প্রত্যেক যুগেই নানা পরিবর্তন সাধনের চেষ্টার কথা আমরা জানি, কিন্তু সত্যজিৎ রাযের মতো কোনো একজনের ক্ষেত্রে এতখানি পরিবর্তন বোধহয় ঘটে নি। স্বভূমি ও পরিবেশ সম্বন্ধে এক গভীর জিজ্ঞাসায় দর্শকের অন্তস্থলটিকে আলোকিত কবা হয় সিনেমার সাদা কালো অথবা রঙিন আলোছায়ায়। ফেলুদা চলচ্চিত্র বাদ দিলে, যদিও কলকাতা বিষয়ক ছবিতে রঙ একবারই সত্যজিৎ ব্যবহার করেছেন, সে ছবি 'পিকু,' সত্যজিৎই আমাদের মনে করিয়ে দেন, সাদা কালোটাও দুটো রঙ নিশ্চয়ই। শহরের যন্ত্রণাহত স্বাভাবিক মানুষ সত্যজিতেব নায়ক। সত্যজিতের জীবন বিষযক বক্তব্য থেকেই বদলেছে সত্যজিতের ক্যামেবাব দৃষ্টিকোণ, অপুর সংসারে শিয়ালদা স্টেশনের ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে রাত্রিবেলা অপু এবং পুলুর হেঁটে যাওয়া থেকে বন্ধুর সঙ্গে সিদ্ধার্থের হেঁটে যাওয়া থেকে সুকুমারের বাড়ির পথে সোমনাথের আসা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে আলোকচিত্র। চোখের দেখায় যা মেলে শুধু সেটুকু নয, কলকাতা বিষয়ক বিষয়বস্তু ও বক্তব্য নির্মাণের জন্যই সত্যজিৎ তাঁর ক্যামেরায চোখ বেখেছেন। ব্যক্তিমানসের সঙ্গে সমাজ ও সময়ের যোগটা তাই কখনো হারায়নি। অপরাজিতর শেযে অপুব কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা, অপুর সংসারের শেযে কাজলকে কাঁধে নিয়ে অপুর জীবনের পথে যাত্রা, চাকরিতে রিজাইন করে আরতির আবার এই মহানগবেই চাকরি পাবার আশা থেকে জন-অরণ্যর শেযে সোমনাথের অর্ডারটা পেয়ে যাওয়া, সব কিছুতেই জীবনের প্রতি মানুষের পরম মমতা, সব কিছুতেই মানুষের বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে বেড়ানো। শুধু জন-অরণ্যের কলকাতা, অন্ধকারের কলকাতা, এই কলকাতায় হাবিয়ে গেছে মানুষের মুখেব উজ্জ্বলতা।

নটবর মিত্তির সোমনাথকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি আদর্শের জন্যে প্রাণ দিতে

পারেন' সোমনাথ উত্তর দিয়েছিল, 'মনে হয় না।' নটবর আবারো জিজ্ঞেস করেছে, 'একটা আপিসে বেয়ারার চাকরি নিতে পারেন?' নটবর জানে, সোমনাথ সেটাও পারে না। তাই বলেছে, 'কারখানার মজদুরি করার হিম্মত আপনার নেই। সে স্বাস্থ্যই নেই। অর্থাৎ গায়ের জোরও নেই মনের জোরও নেই।' গোয়েঙ্কা কলকাতায় আসছে। সন্ধে সাড়ে সাতটায় Great Indian হোটেলে উঠছে। নটবর সোমনাথকে বলেছে, 'মাল আমি সংগ্রহ করে দেব। আপনার হাতে তুলে দেব। উনি যে টাইম দেবেন, সে টাইমে আপনি মালটি নিয়ে গিয়ে ওর হাতে তুলে দেবেন। আপনি কেমিক্যাল Supply করতে যাচ্ছেন তো, এটা হলো Physical.' বাড়িফিরে বৌদির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সোমনাথের মনে হয়, কি সব ভেবেছিলাম আর কি সব হয়ে গেল। order supply তো নয়, দালালি। সে কোনো দিন দালালি করবে, সে কল্পনাও করেনি। তাই করতে হচ্ছে তাকে। নটবর তাকে বুঝিয়েছিল, 'আপনি এই যে সৎ হবার জন্যে ছটফট করছেন, এর থেকে কি আশা করছেন আপনি? স্রেফ চরিত্র ভালো বলে খেতাব পেয়েছে একজন লোক এরকম কোনো উদাহরণ আপনার জানা আছে? আজকের দিনে আপনি এমন একটা লোকের নাম করুন পাবলিক ফিগার, একেবারে টপ থেকে ধরুন, যার নামে আজ পর্যন্ত একটাও কলঙ্ক রটেনি।...'

দুজনে মিলে গোয়েঙ্কার জন্যে একটা মেয়ে খুঁজতে বেরোয়। সমস্ত উৎসাহটাই নটবর মিত্তিরের। তার মনে কোনো অনুতাপ নেই। একটি স্ত্রী, তিনটি সন্তান। ছেলেকে ভালো এডুকেশন দিচ্ছে, happily married.লোকে যাই বলুক নিজেকে সে অসৎ বলে মনে করে না। তার মধ্যে কোনো হিপোক্রেসি নেই, কোনো স্নবারি নেই। কিন্তু সোমনাথ কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না। বারবারই সে পিছিয়ে আসতে চেয়েছে। তার বিবেক, তার নীতিবোধ এরকম একটা কাজের মধ্যে কখনোই নিজেকে জড়াতে চায় নি।

মিসেস মলিনা গাঙ্গুলীব বাড়ি থেকে তারা মিসেস বিশ্বাসের বাড়িতে আসে, কোথাও কোনো সুবিধে হয না, তাই এসে হাজির হতে হয় দালাল চরণদাসের কাছে। সোমনাথ আর চরণদাস, দুজনের কাজের মধ্যে তখন আর কোনো তফাৎ থাকে না। দুজনেই দালাল।

শেষ পর্যন্ত একটি মেয়েকে পাওয়া যায়। যূথিকা। আসলে সুকুমারের বোন কণা। সে সোমনাথকে চিনতে পেরেছে। সোমনাথের দিক থেকে সে ঘুরে দাঁড়ায়। কণা সোমনাথের দিকে পেছন ফিরে আছে। কঠিন চোখে চেয়ে আছে। ট্যাক্সি আসে। ট্যাক্সিতে উঠতেই কণাকে সে চিনে ফেলে। গাড়ি স্টার্ট করে। জানলা দিয়ে কণা বাইরে চেয়ে আছে। লজ্জায় ঘৃণায় সোমনাথের মাথা নিচু হয়ে গেছে । এ কি করছে সে? কোথায় নেমে যাচ্ছে সে?

'তোমার টাকাটা পেলেই হবে তো।' কণা সোমনাথের কথা যেন শুনতেই পায়নি, এভাবে বাইরে তাকিয়ে আছে। 'হোটেলে যাবো না, যাবার দরকার নেই।' কণা মুখটা সামান্য ঘোরায়। 'আপনার পার্টি?' 'সে আমি বুঝব, তোমায় ভাবতে হবে না।' কণা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। 'আমি হোটেলে যাব না। কণা....।' কণা সোমনাথের দিকে ঘুরে তাকায়, সরাসরি, স্পষ্ট উচ্চারণ করে, 'আমার নাম যূথিকা।' 'তুমি ছেলেমানুষি করছ।'

'আমি না, আপনি করছেন।' 'আমি গাড়ি ঘুরিয়ে নিচ্ছি, হোটেলে যাবো না, যাবার দরকার নেই।' কণার গলায় বেদনার সামান্যতম চিহ্নও লুপ্ত হয়ে গেছে, 'যাবার জন্যই তো এসেছিলেন।' 'সেটা তো অস্বীকার করছি না।' কোনোরকম আবেগ কাজ করে না কণার কণ্ঠে, পেশাদারি কণ্ঠে শোনা যায়, 'দরকার ছিল নিশ্চয়ই।' 'ছিল, কিন্তু...।' 'তাহলে ছেলেমানুষী করছেন কেন? এতে কার লাভ হচ্ছে?' 'শোনো কণা তোমার যা—' আবার কণার কঠিন কণ্ঠ, 'আমার নাম যূথিকা।'

সব কিছুই এলো কার্যকারণের অনিবার্যতায়। কোথাও কোনোরকম আতিশয্য যে দেখা গেল না তার কারণ পরিচালক শহরের এই সময়টাকে দেখলেন এক নিরাসক্ত বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে। প্রতিদ্বন্দ্বীর সমাপ্তি দৃশ্যে বাস্তবতা যে নতুন ডাইমেনশান লাভ করে, জন-অরণ্যের শেষে পরিচালক সেখান থেকেও সরে আসেন। আমাদের সিনেমায় ঘটনা চরিত্র ও পরিবেশগত বাস্তবতা আরও একটা ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যায়। এই বাস্তবচেতনায় দর্শকের মাথায় আরও একটা বোধ কাজ করতে থাকে। সত্যজিৎ রায়ের শিল্পীসত্তার আশ্চর্য গতিশীলতাই তাঁকে নিয়ে আসে 'অশনি সংকেত' থেকে 'জন-অরণ্যে', গ্রাম থেকে শহরে, কিম্বা শহর থেকে গ্রামে, 'জন-অরণ্য' থেকে 'সদগতি'তে। 'সচ্ছল সফল সময় ব্যথা, বাচালতা, সরসতা, নষ্টামি, ভয়, রক্ত, রিরংসা, অনাথ অন্ধকার ও গভীরতার ভেতর মৃত্যু নয়, শূন্য নয়, ব্যক্তিজীবন নয়, অফুরন্ত অনির্বচনীয় সময়—সময় শুধু।' The only bleak film I have made is 'The middleman.' I felt corruption, rampant corruption, all around. Everyone talks about it in Calcutta. Everyone knows, for instance, that the cement alloted to the roads and underground railroad is going to the contractors who are building their own homes with it. 'The Middleman' is a film about that kind of corruption and I don't think there is any solution. (Art Politics Cinema. The Cineaste Interviews. Edited by Dan Georgakas and Lenny Rubenstien.

আমি তো আছি, isn't that enough

ম্যাটিনি আইডল অরিন্দম, বাংলা সিনেমার নায়ক সে, কলকাতায় সে বড় হয়েছে, একেবারে সাধারণ অবস্থা থেকে সে উঠে এসেছে, তার সমস্ত চিন্তাভাবনা সাধ ও উচ্চাকাঙ্খার মধ্যে লেগে থাকে কলকাতা। সে দিল্লি যাচ্ছে পুরস্কার নিতে। যাচ্ছে ট্রেনে। এই ট্রেনের কামরাতেই 'আধুনিকা' পত্রিকার সম্পাদক অদিতি সেনগুপ্তর কাছে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে সে তার জীবনের অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে থাকে, সেই সূত্রে আসে ফ্ল্যাশব্যাক, মোট ৭ টি ফ্ল্যাশব্যাক আছে এই ছবিতে। অদিতি তার সম্পর্কে যেটুকু জানতো তা হলো অরিন্দম ছেলেবয়সে বাবা মাকে হারিয়েছে, কাকার বাড়িতে মানুষ হয়েছে, বঙ্গবাসী কলেজে পড়েছে, কিছুদিন একটা অফিসে চাকরি করেছে, ২৭ বছর বয়েসে তার প্রথম ছবি। কিন্তু এটুকু জানলেই তো চলে না। তার জানার ইচ্ছে, এই যে এত বেশি করে পাওয়া, এর মধ্যে কি কোনো ফাঁক নেই, কোনো অভাববোধ নেই, কোনো regrets নেই? অরিন্দম শুধু যে বাংলা ছবির সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়ক তাই নয়, বাঙালি দর্শক, সব বয়সের বাঙালি দর্শক তাদের ভালোবাসা উজাড়

করে দিয়েছে এই রূপবান পুরুষটিকে। অরিন্দম অদিতিকে বলেছে, 'আমরা ছায়ার জগতে বিচরণ করি কিনা, তাই আমাদের রক্তমাংসের চেহারাটা জনসাধারণের সামনে তুলে না ধরাই ভালো।' সে ফিরে আসে নিজের কামরায়। ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্ন দ্যাখে। আকাশ থেকে হাজার টাকার নোট ঝরে পড়ছে। অরিন্দম নোটের ঢিপির ওপর দিয়ে দুহাত ছড়িয়ে ছেলেমানুষের মতো ছুটে বেড়ায়। দুহাতে মুঠো করে নোট তুলে নেয়। চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। অন্ধকার নেমে আসে। অন্ধকার আরো বাড়ে। টেলিফোন বাজতে থাকে। অরিন্দম ছুটতে থাকে। হঠাৎ সে দেখতে পায় টাকার স্তুপের উপর একটা কঙ্কালের হাত উঁচিয়ে রয়েছে। সেই হাতে একটা টেলিফোন। অরিন্দম দ্যাখে চারদিকে ঢিপির ভেতর থেকে কঙ্কালের হাত বেরিয়ে আছে। অনেক হাতেই টেলিফোন। সব টেলিফোন একসঙ্গে বেজে চলেছে। সে একটা গহ্বরে পা দেয়। প্রাণপণে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। একটি লোককে দেখা যায়। অরিন্দমেব দিকে লোকটি এগিয়ে আসে। অরিন্দম লোকটার দিকে তার হাতটা বাড়িয়ে দেয় 'শঙ্করদা, বাঁচান, শঙ্করদা।' লোকটি এগিয়ে এসে হাত বাড়ায়। অরিন্দম সে হাত ধরার চেষ্টা করে। লোকটি পিছিয়ে যায়, অরিন্দম তলিয়ে যায়...।

ঘর্মাক্ত অবস্থায় অরিন্দমের ঘুম ভাঙে। টাকার চোরাবালির মধ্যে ডুবে যাওয়া লোকটা, অদিতির কাছে এসে বলে, 'শঙ্করদা ইচ্ছে করলে আমায় টেনে তুলতে পারেন কিন্তু তুললেন না।' অদিতি জানতে চায়, শঙ্করদা কে? অরিন্দম জানায়, শঙ্করদা পাড়া সম্পর্কে দাদা। বলতেন, আর যাই করিস সিনেমায় নামিস না। পাড়ার ক্লাবে থিয়েটার হতো। শঙ্করদা ছিলেন কর্ণধার। ঐ থিয়েটারে হিরোর পার্ট কবত অরিন্দম। সিনেমায় চলে গেলে অরিন্দম তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাবে এটা জানতেন শঙ্করদা।

এখান থেকেই তৈরি হয় ছবির প্রথম ফ্ল্যাশব্যাক।

ফ্ল্যাশব্যাকে আমরা শুনতে পাই শঙ্করদা বলছে, 'দ্যাখ্ অরিন্দম ফিল্মের একটা গ্ল্যামার আছে আমি জানি কিন্তু তার সঙ্গে আর্টের কোনো সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না। বিশেষ করে ফিল্মের অভিনেতার কোনো স্বাধীন বা sustained contribution বলে কিছু থাকতে পারে না A film actor is a puppet, পুতুল। পরিচালকের হাতে সে পুতুল, ক্যামেরাম্যানের হাতে সে পুতুল...।'

শঙ্করদা কলকাতার থিয়েটারের মানুষ। কলকাতা যেমন কবিতা গল্প উপন্যাসের শহর, সিনেমার শহর, রাজনীতির শহর, পত্রপত্রিকার শহর, ট্রামবাসের শহর, গান বাজনার শহর, তেমনি 'অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হেরাসিম লেবেডেফ নামে এক রুশ দেশবাসী নানা দেশ ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়েন এবং ২৫ নং ডুমতলাতে (বর্তমান এজরা স্ট্রীটে) এক নাট্যশালা স্থাপন করেন,' বাঙালির উদ্যোগে বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছে কলকাতায়, এই নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা নবীনচন্দ্র বসু, এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো', সেখানেই নবীনচন্দ্রের বাড়ি ছিল, তাঁর বাড়িতে এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়,'১৮৫৭ সনে কলিকাতায় একাধিক নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। বঙ্গীয় নাট্যশালার সত্যকার গোড়াপত্তন এই সময় হইতেই হইল বলা চলে', (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), কলকাতা থিয়েটারের শহর। শঙ্করদা বলেন, 'মঞ্চের অভিনেতার যেটা আসল প্রেরণার উৎস, এই যে ফুটলাইটের সামনে কালো কালো

মাথাগুলো দেখিস— যেটার থেকে এনার্জিটা আসে, উৎসাহটা আসে, সেটা বাদ দিলে অ্যাক্টিঙের যে আসল থ্রিল—সেটা থাকে? ফিল্মে সেটা কোথায়?'

বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা কাঁধে তোলার সময় শঙ্করদা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অতবড় জোয়ান লোকটা চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল। মৃত্যু সম্পর্কে একটা callous ভাব এসে গিয়েছিল অরিন্দমের মনে। কিন্তু শঙ্কবদার মৃত্যুটা সে মেনে নিতে পারেনি। খালি মনে হতে থাকে, 'যার মধ্যে এত লাইফ—তার প্রাণটা ফস্ করে এভাবে যায় কি করে?'

১ নম্বর ফ্ল্যাশব্যাকে শঙ্করদা,

২ নম্বর ফ্ল্যাশব্যাকে শঙ্করদার মৃত্যু, জ্যোতি অরিন্দম

৩ এবং ৫ নম্বব ফ্ল্যাশব্যাকে পুরানো দিনেব অভিনেতা মুকুন্দ লাহিড়ী

৪ এ জ্যোতি অরিন্দম

৬ নম্বর ফ্ল্যাশব্যাকে অরিন্দমেব বন্ধু বাজনৈতিক কর্মী বীরেশ

৭ নম্বর ফ্ল্যাশব্যাকে নায়িকার বোল চাইতে আসা প্রমীলা

শঙ্করদার ধাবণা সিনেমায় অভিনেতার কিছু করার নেই। আর মুকুন্দ লাহিড়ী বলেন, 'মনে রেখো একমাত্র অভিনেতাই ইনডিসপেন্সেবল। তাকে ছাড়া কাজ চলবে না। কারণ একমাত্র তারই সহকারী বলে কিছুই নেই, যে কাজ চালিয়ে নেবে।' অরিন্দম একালেব অভিনেতা, সে মনে মনে জানত, তার অভিনয়ের ঢঙটাই শেষ পর্যন্ত টিকে যাবে, কারণ সেটা আরো আধুনিক, সিনেমাটা সিনেমাই থিয়েটার নয়, তাব অভিনয়টাই সিনেমার উপযোগী। সিনেমায় যে কাহিনীটা বর্ণনা কবা হয়, সেই কাহিনীতে যে চরিত্র থাকে, এক একটা কাহিনীতে এক এক বকম চরিত্র মুকুন্দ লাহিড়ীবা ওসব নিয়ে মাথা ঘামান না, যে কোনো পার্ট একই ছাঁচে ওরা ঢেলে নেয়, একই গলা একই উচ্চারণ একই mannerism. ওটা ফিল্মের অ্যাকটিং নয়। পঞ্চাশ দশক থেকে কলকাতার সিনেমায় অভিনয় অনেকখানি বদলে গেছে। তখন সিনেমার নায়ক জেনে গিয়েছে, 'বাড়াবাড়ি জিনিসটা ক্যামেরার সামনে স্রেফ চলে না।' তখন কাজ পায় না মুকুন্দ লাহিড়ী। ছবির ৫ নম্বর ফ্ল্যাশব্যাকে আমরা দেখি অনেক বাতে মুকুন্দ লাহিড়ী এসেছে অরিন্দমের বাড়ি। একটা হুইস্কি খেতে এসেছে। সে চাইছে না, চাইছে তার soul. ১৯২৩ সালে তিনি প্রথম ছবি করেছেন কপালকুন্ডলা। এলো টকি। মুকুন্দ বলছেন, 'এলো যেন আমারই জন্যে। I went straight to the summit. একদিন দেখলুম হড়কে গেছি।.... দেখলুম যে throneটি আছে but I have been overthrown... এই যে stagnation এটা বড় সাংঘাতিক। দুটো পলিসি ছিল, ল্যাপ্স হয়ে গেছে। four years...no work' অরিন্দমের কাছে তিনি ছোটখাটো একটা রোল চান, দারোয়ান-টারোযান যে কোনো রোল, তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছে, কিন্তু তাঁর ধারণা কণ্ঠস্বর তো তাঁর ভেঙে যায়নি, তিনি বোঝেন না, শুধু voice-এ সব কিছু হয় না, মরা হাতির প্রবাদটা আঁকড়ে পড়ে থাকেন মুকুন্দ লাহিড়ী।

যে বীবেশের সঙ্গে দশ বছর একসঙ্গে পড়েছে অরিন্দম, সেই বীরেশ জেল থেকে বেরিয়ে এসে একদিন বন্ধুর বাড়িতে আসে, ততদিনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে নায়ক অরিন্দমের, অনেক ওপরে উঠেছে সে, ফ্ল্যাট হয়েছে, গাড়ি হয়েছে, হবারই কথা, এটাই

জগতের নিয়ম, অরিন্দমের ভাষায় Dialectics. বীরেশ একটা লিফট চায়। অরিন্দম জানতে চায়, কোথায় যাবে? বীরেশ উত্তর দেয় 'এ প্রশ্ন তো করার কথা নয়।'

অরিন্দম লিফট দেয়। বীরেশ তাকে একটা কারখানার সামনে নিয়ে আসে। একুশ দিন হলো সেখানে স্ট্রাইক চলছে। বীরেশ বলে, 'নামবি, গিয়ে দাঁড়াবি, দুটো কথা বলবি, ব্যাস,.... তোকে দেখলে ওরা মনে জোর পাবে।' অরিন্দমেব পক্ষে সেটা অসম্ভব। সে বলে, 'তুই টাকা চাস, আমি টাকা দিতে পারি, এনি এ্যামাউন্ট, কিন্তু এই ভাবে —অসম্ভব।' কালো চশমা পরা অরিন্দমের কপালে ঘাম জমতে থাকে। অরিন্দম গাড়িতে স্টার্ট দেয়। বীরেশকে দেখা যায় সে মাথা হেঁট করে স্ট্রাইকারদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা অরিন্দমের কণ্ঠ শুনতে পাই, 'বীরেশের অনুরোধ রাখতে পারলাম না। কেন পারলাম না, ভয়টা যে ঠিক কিসের ভয়, সেটা বলা শক্ত। তবে এটা বুঝতে পারলাম যে আমি বীরেশের চোখে ছোট হয়ে গেছি। আমার ছবি হয়ত সে আর কোনোদিনও দেখবে না।'

এই উপলব্ধি, এই বোধ, এই যন্ত্রণা এই আত্মগ্লানি নায়ক অরিন্দমকে একালের কলকাতার মানুষ কবে তোলে। জনতার কাছ থেকে অনেক দূবের একজন মানুষ, ভেতরে ভেতরে মানুষের খুব কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। সেজন্যেই 'আধুনিকা' পত্রিকার সম্পাদক একটি বুদ্ধিদীপ্ত মেয়ে তাকে বলতে পারে, 'আপনি ধরে নিন যে আপনার সব বলা হয়ে গেছে। যেটুকু বলেননি, তা আমি অনুমান ক'রে জেনে নিয়েছি।' বাংলা সিনেমার এক নম্বর স্টার সে, বাঙালি দর্শকের মনের মানুষ সে, এমন তারকা আর কখনো হয়নি, হয়তো হবেও না, এমন ক'রে কেউ কখনো চুল আঁচড়ায়নি, এমন হৃদয়-আলো-করা হাসি কেউ হাসেনি, তবু এই মানুষটি বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ এই রূপ এই অর্থ এই যশ। করিডরের দরজা খুলে সে বাইরের দরজার কাছে আসে। সে এখন বেসামাল। বাইরেব দিকে মাথাটা বার ক'রে ঝুঁকে দাঁড়ায়। চলন্ত ট্রেনের প্রচন্ড শব্দে কান পাতা যায় না। অদিতি অরিন্দমকে তার কামরায় যেতে বলে। অরিন্দম বলে, 'দেখলেন তো আপনার দেবতুল্য নায়ক।'

এ ছবির ক্যামেরা কত সহস্র দৃষ্টিকোণ থেকে কত মাত্রাব আলো আঁধারিতে কত ইমেজ তৈরি করেছে, ক্যামেরা সরে-না-সরে জানালার ফ্রেমে অরিন্দম অদিতিকে একত্রে বা এককে কেমন ক'রে বিন্যস্ত করেছে বা কী গভীর দ্যোতনায় হাতলে ভর করা অবসাদদীর্ণ অরিন্দমকে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশে চলা শূন্য রেলপথ দেখিয়েছে, সংগীত কতটা সংযত সংগতভাবে সংযোজিত, কী আশ্চর্য নিপুণতায় শুধু হরিবোল ধ্বনিতে তৈরি হয় নাটকীয় বেদনা, অভিনয়ে কোন পরিণত পর্যায়ে অপূর্ব স্বপ্নিল মুখমন্ডল নিয়ে টাকার হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে বেড়াতে তারই চোরাবালিতে নিমজ্জিত মানুষের মুখ বিভীষিকায় ছেয়ে যায়, দাঁতে দাঁত চেপে বেনামীতে টাকা দেবার প্রস্তাব করার সময় অভিনয় কোন্ পর্যায়ে চলে যায়, এসবের বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

রায়বাহাদুরের দেয়া চাকরিটা নিলো না বেকার যুবকটি

যাঁরা মনে করেন সত্যজিৎ রায় এতরকম বিষয়ের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে না দিলেই ভালো করতেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের মতের কোনো মিল নেই; তার কারণ যে কোনো বিষয়ের মধ্যেই সত্যজিৎ খুঁজে পান একটা জীবন বিষয়ক বক্তব্য, সেই বক্তব্যকে তিনি

শিল্পময় করে তুলতে পারেন, ব্যক্তি, সমাজ ও সময়ের সম্পর্ককে এক অসামান্য দক্ষতায় তিনি রূপ দিতে পারেন। সময়প্রবাহ সম্পর্কে সত্যজিতের মতো এমন তীব্রভাবে সচেতন শিল্পী চলচ্চিত্রে খুব কমই আছেন, এক একজন মানুষের অভিজ্ঞতার স্বরূপকে কলকাতা শহরের চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে তিনি যুক্ত করে নিয়েছেন এটা বললেও অনেক কিছুই বাকি থেকে যায়— তাঁর ছবিতে শহর এসেছে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে বৃহত্তর তাৎপর্য দানের জন্য। কলকাতা শহরের যে শ্রেণীর মানুষকে তিনি সব দিক থেকে চেনেন, সেই মানুষকেই তিনি ছবিতে এনেছেন, সেই মানুষের সমগ্র সত্তাকে উপলব্ধি করতে চায় তাঁর ক্যামেরা।

একটা আধুনিক শহরকে বুঝে নেওয়ার এই মনোভঙ্গি সত্যজিতের নিজেরই, তা আন্তোনিওনির নয়, ক্রুফো-গদারের নয়। চারুলতায় সত্যজিতের মনোভঙ্গি কাজ করেছে একভাবে, প্রতিদ্বন্দ্বী, সীমাবদ্ধ, জন-অরণ্যে আর একভাবে আরও অন্যভাবে। সত্যজিতের মননদীপ্ত কাহিনীবিন্যাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জীবনবোধ, এসেছে কলকাতার একালের মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতা ও জীবন জিজ্ঞাসা।

এবং শহরের মানুষকে তিনি শহরের মধ্যেই শুধু দেখেননি। 'কাঞ্চনজঙঘা' ও 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে আমরা দেখেছি শহবের মানুষ, যাদের ভাবনাচিন্তা জীবনযাপন পদ্ধতি সবই তৈরি হয়েছে এই কলকাতা শহরে, তারা যখন শহরটা ছেড়ে বাইরে এলো, এলো পাহাড়ের কাছে কিম্বা অরণ্যের গভীরে, তখন ঐ মানুষগুলোর ভেতরকার অন্য একটা চেহারা আমরা দেখতে পেলাম, কলকাতা শহরে তাদের ঐ চেহারাটা আমাদের চোখে পড়াব কথা নয়। আজকের আধুনিক শহরের মানুষ নগরের সভ্যতা থেকে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেকে, টেকনোলজির উন্নতি থেকে যে মানুষ নির্মাণ করছে তার ভবিষ্যৎ, সেই মানুষ যখন নগরের এই প্রতিদিনের সমস্যাজর্জরিত দিনরাত্রি থেকে বেরিয়ে অরণ্যের দিনরাত্রির কাছে আসে, পাহাড়ের রোদ আর মেঘ আর কুয়াশার কাছে এসে দাঁড়ায় কেমন দেখায় সেই মানুষগুলোকে, এই ছবি দুটি তৈরি হয় সেই বিষয় নিয়ে। যে মেয়েটির সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটির বিবাহ হবার কথা, যে মেয়েটি আজ সিদ্ধান্ত নেবে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সেই ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটিকে সে বিয়ে করবে কিনা, সেই মনীষা ছবির শুরুতেই তার মাকে বলে দেয়, 'মা আমি কিন্তু আজ বেশি সাজগোজ করছি না।' ইংরেজের দেয়া একটা খেতাব আছে তার পিতার, সে রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর কন্যা, সে প্রেসিডেন্সির ইংরেজি অনার্সের ছাত্রী। দার্জিলিঙের ম্যালে ইঞ্জিনিয়ার যুবকটির সঙ্গে সে একা ঘুরে বেড়ায় সেই বিকেলে। যুবকটি তার কাছে নিজের গুণপনার বিবরণ দেয়, ১৯৬২ সালে তার মাইনে তখন বারোশ টাকা, সে মনীষাকে জিজ্ঞেস করে, 'আর কি গুণ থাকলে চলে' মনীষা জবাব দেয়, 'আব কোন গুণ না থাকলেও বোধহয় চলে,' এ কথাটা কলকাতা শহরে বলা যেত না, বলা যায় না, যুবকটি তার কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার সময় বলে যায়, 'কলকাতা গিয়ে যদি মনে হয় প্রেমের চেয়ে security বড় কিম্বা security থেকেও একটা Love grow করতে পারে তাহলে আমাকে খবর দিও।' মনীষার জন্যে আনা ক্যাডবেরিটা মনীষাকে দেয়া হয় না, গরিব পাহাড়ী শিশুটির হাতে ক্যাডবেরিটা তুলে দিয়ে সে বলে, 'নে তোরই জিৎ'।

'কাঞ্চনজঙঘার' সম্পর্কে সত্যজিৎ বলেছেন, 'a very personal film.' বলেছেন, Kanchenjungha told the story of several groups of characters and it went back and forth. You know, between group one, group two, group three, group four, then back to group one, group two and so on. It's a very musical form. ছবির এই কাঠামো থেকে রসগ্রহণ করার মতো প্রচুর দর্শক তখনো তৈরি হয়নি, 'It was a good ten to fifteen years ahead of its time.'

অণিমার স্বামী শঙ্কর মনীষাকে ছবির শুরুতেই বলেছিল, 'প্রেমে না পড়ে বিয়ে করিস না।' মনীষাব দিদি অণিমা। মনীষা কারো প্রেমে পড়েনি এখনও। ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার ব্যানার্জিকে পছন্দ করার দায়িত্ব তাকে দিয়েছিল তার পিতা, His Majesty ইন্দ্রনাথ। যুবকটি অনেক কথা ব'লে যায় মনীষা কোনো কথা বলে না, একদমই বলে না, না শুনে তার উপায় নেই, শুনে যাচ্ছে তাই। অনেকক্ষণ পরে, মনীষা যখন একটা কথা বলে, 'আমার কি মনে হয় জানেন' যুবকটি সেটা শোনার জন্য প্রবল আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে, মনীষা উত্তর দেয়, 'আমার মনে হয় আজ Mist দেখা যাবে।' তাদের দুজনের মনের জগতটা একেবারে আলাদা। বন্ধুত্ব নিযে কথা বলতে গিয়ে মনীষা যখন সন্দীপ নিখিলেশের কথা তোলে ভদ্রলোক প্রসঙ্গটা ধবতে পারে না। সেটা প্রধান সমস্যা নয়, তা হয়ও না। আসলে একটা মানুষ যদি নিজেকে এত বেশি করে জাহির করে, যদি এত বহির্মুখী হয়, বাইরের Successটাই যার কাছে এত মূল্যবান, মনীষার মতো একটি অন্তর্মুখী মেয়ে, যে মেয়েটি অশোককে তাদের কলকাতার বাড়িতে যেতে বলে, যে মেয়েটির মুখ শিক্ষা ও নম্রতার আলোয় এমন স্নিগ্ধ, সে মেযেটি কেমন করে এই প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার সমস্ত জীবনের সঙ্গী হিসেবে মেনে নেবে এই লোকটিকে? তাছাড়া লোকটিকে তো তার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অশোক একটা বেকার যুবক। টিউশানি করে তার দিন চলে। তবু রায়বাহাদুরের কাছে চাকরির কথাটা তুললে যে তার মান থাকে না সে নিয়ে সে খুবই বিব্রত বোধ করে। অপুর সংসারের যুবকটি একটা সামান্য কেরানিগিরির মধ্যে গোটা জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলতে চায় নি, অশোকও রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথের দেয়া চাকরিটা প্রত্যাখ্যান করে এক অদ্ভুত আনন্দ লাভ করে, এই আনন্দের মধ্যে জয়লাভের একটা পাহাড়ী রঙ ধরে যায়, এই জয়টা নিয়েই সে ফিরে যাবে কলকাতায়, বলেওছে, 'কলকাতায় হ'লে হয়তো চাকরিটা নিয়েই নিতাম।' অশোক বুঝতে পারে, 'এখানে এলে নিজেকে কেমন একটা কেউকেটা মনে হয়।' অপু যখন বলেছে 'সে কেরানিগিরি করবে কেন' সেটা কলকাতায় বলেছে ঠিকই, কিন্তু কোন্ কলকাতায়, শিয়ালদা স্টেশনের পাশে সেই রাতের কলকাতায়, যখন সমস্ত শরীর জুড়ে খেলা করে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, যখন পুলু ছাড়া চারপাশে কেউ কোথাও নেই, ঐ পরিবেশে ঐ বন্ধুর কাছেই মনের এই আকাঙক্ষাটা প্রকাশ করা যায়। তেমনি রায়বাহাদুরের দেয়া চাকরিটা রিফিউজ ক'রে মনীষার মতো একটা মেয়ের সামনে এসে নাটকীয় উল্লাসে হাত পা ছড়িয়ে সে সংবাদটা জানানোর মধ্যে সম্ভ্রান্ত যৌবনের একটা সরল অহঙ্কার প্রকাশ পায়। এই অহঙ্কারের মধ্যেই আছে কলকাতা শহর। অথচ দুজনের প্রথম আলাপে পাঁচ ছটার বেশি শব্দ আমরা শুনিনি, 'বঙ্গবাসী' 'বাংলা' 'ইতিহাস' 'প্রেসিডেন্সি' 'ইংরেজী'। এই অশোক মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে এবং সর্বক্ষণ

সিগারেট খায়, পঞ্চাশটা টাকা ধোঁয়ার মতো উড়ে যায়। ছবির শেষে যখন সে বিকেলের আলোয় পাহাড়ের সোনার মতো রোদে স্মৃতি-মেদুর-ছায়ায় মনীষার কাছে নিজেকে প্রকাশ করছে তখন কলকাতা শহরের একটি যুবকের অফুরান প্রাণশক্তির কথাই ধ্বনিত হয়েছে।

অরণ্যের খেলায় কলকাতার মানুষ

'অরণ্যের দিনরাত্রি'র 'মেমারি গেম' এর মধ্যেই রয়েছে ছটি চরিত্রের ব্যক্তিক ভূমিকা। এক একজনের এক একটি নাম উচ্চারণের ভেতর দিয়েই ফুটে উঠেছে তাদের ভাবভঙ্গি বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য। ঘাসের উপর বৃত্তাকারে সকলে বসেছে। এই মেমারি সিকোয়েন্সটির মধ্যেই আছে আধুনিক মানুষের মুখগুলি। জয়া জিজ্ঞেস করে, আমি আরম্ভ করব? শেখর বলে, হ্যাঁ। জয়ার ক্লোজআপ। নিজের পছন্দের নাম, 'রবীন্দ্রনাথ' বলেই পরবর্তী নামটি শোনার জন্য পাশের ব্যক্তিটির প্রতি উন্মুখ হয়। ক্যামেরা সঞ্জয়ের ওপর অপেক্ষা করে, সে খানিকটা সময় নেয়, আস্তে করে বলে, 'কার্ল মার্কস'। মিডিয়াম ক্লোজ শটে অপর্ণা, 'ক্লিওপেট্রা'। ফ্রেমের ডানদিকে অপর্ণা, ক্যামেরা শেখরের ওপর 'রবীন্দ্রনাথ, কার্ল মার্কস, ক্লিওপেট্রা, অতুল্য ঘোষ'। এবার হরি, 'রবীন্দ্রনাথ, কার্ল মার্কস, ক্লিওপেট্রা, অতুল্য ঘোষ।' শেখর তাকে তার পছন্দের নামটা শোনাতে বলে, হরি উচ্চারণ করে, 'হেলেন' শেখর জিজ্ঞেস করে, হেলেন অফ ট্রয় না বম্বে। হরি উত্তর দেয়। মিডিয়াম শটে অপর্ণা, 'তাহলে হেলেন অফ ট্রয়।' এবার অসীম,'রবীন্দ্রনাথ, কার্ল মার্কস, ক্লিওপেট্রা, অতুল্য ঘোষ, হেলেন অফ ট্রয়, শেক্সপীয়ার।' অপর্ণা তার দিকে তাকায়, মুখে অল্প হাসি। জয়ার টার্ন আসে। গোটা দলটাকেই দেখানো হয়ে গেছে। জয়ার সব গুলিয়ে যাচ্ছে সে চেষ্টা করে এবং ভুল করে, 'অতুল্যর' জায়গায় 'প্রফুল্ল' বেরিয়ে আসে। শেখর চেঁচিয়ে ওঠে ভুল শুনে, 'আউট আউট '। মিডিয়াম শটে লজ্জিত বিব্রত জয়া। ছি ছি, কি করে এরকম ভুল হলো। সঞ্জয়ের টার্ন। চুপ চুপ, গুলিয়ে দিও না। যখন সে রবীন্দ্রনাথ, কার্ল মার্কস..... নামগুলো একে একে উচ্চারণ করতে থাকে, ক্যামেরা একজনের মুখ থেকে অন্যজনের মুখের ওপর দিয়ে যায়. সঞ্জয়ের মুখে নয়, কারণ অন্যদের মুখগুলো দেখতে দেখতে সে প্রত্যেকের নামগুলো মনে করতে চেষ্টা করে। সবকটি নাম ঠিকমতো বলার পর যোগ করে, মাও-সে-তুঙ। অপর্ণার এক মুহূর্ত ভাবতে হয় না, একটি সুপ্রতিভ মুখ থেকে সবকটি নাম জলের মতো সহজেই চলে আসে, নতুন নাম শোনা যায়, ডন ব্র্যাডম্যান। এখন শেখর। হরি তার দিকে তাকিয়ে হাসে। শেখর তৈরি হচ্ছে। গোটা গ্রুপটাকে লঙশটে ধরা হয়। হেলেন অফ ট্রয় পর্যন্ত ঠিক বলার পর সে মাও-সে-তুঙ্ বলে। ভুল হয়ে গেছে, জয়া আর সঞ্জয়ের গলা একসঙ্গে শোনা যায়। শেখর কিছু বুঝতে পারে না, কি ভুলটা হয়েছে তার । হরি উঠে পড়ে, হরি নার্ভাস, আর খেলতে চায় না সে। ক্লোজআপ-এ অসীম। নামগুলো ঠিক ঠিক বলে যায় । ক্যামেরা সকলের মুখের ওপর দিয়ে ঘোরে, অসীমের গলা শোনা যায়, নতুন নাম যোগ করে 'রানী রাসমণি'। সঞ্জয় ক্যামেরার সামনে, অপর্ণা ফ্রেমের বাঁ দিকে, শেখর ব্যাক টু ক্যামেরা। মাও-সে-তুঙ্ পর্যন্ত বলার পর সঞ্জয় থেমে যায়, মনে করতে পারে না। মিডিয়াম ক্লোজ শটে জয়া, তার ঠোঁটে হাসি, সঞ্জয়ের ভুলের জন্যে অপেক্ষা করছে, 'মনে করতে পারছেন

না?' সঞ্জয়ের এই অস্বস্তির দিকে চেয়ে অপর্ণা কৌতুক বোধ করে। ফ্রেমের বাঁ দিকে অসীম। দেখছে। ফ্রেমের ডানদিকে হরি, উদ্বিগ্ন মুখ। শেখর জানতে চায়, কোনো টাইম লিমিট আছে কি না। অসীম জানিয়ে দেয় আছে, দশ সেকেন্ড। শেখর ঘড়ি দেখে। সঞ্জয়েব পতনের অপেক্ষায় ফ্রেমের ডানদিকে জয়া। শেখর গুণছে, এক-দুই-তিন। শেখর তার গোনা শেষ করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আউট আউট '। ক্যামেরা ফিরে আসে অপর্ণার মুখে। সময় যত পার হয়, নামের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, অপর্ণার স্মৃতিতে সব আরো সহজ হয়ে আসে। যোগ করে 'কেনেডি'। অসীম জানতে চায়, 'কোন কেনেডি'? অপর্ণা উত্তর দেয় ঃ 'ববি'। অসীমকে ধরা হয়। তারপর অপর্ণা। অপেক্ষায় রয়েছে। অবিচলিত অসীম আরম্ভ করে, অত্যন্ত ধীর স্থির তার ভঙ্গি। কে বলবে এই অসীমের মধ্যেই আছে এত উচ্ছ্বাস, এত আবেগ, এত আনন্দ। মিডিয়াম ক্লোজশটে জয়া। কনুইয়ে ভর দিয়ে আয়েস করার চেষ্টা করছে। শোনা যাচ্ছে অসীমের মেধাবী কণ্ঠ। ক্যামেরা অসীমে ফিরে আসে, সব কটা নাম স্পষ্ট উচ্চারণ করার পর নতুন নাম শোনা যায়, টেকচাঁদ ঠাকুর। এক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবে বলে সঞ্জয় উঠে যায়। ক্যামেরা অপর্ণার মুখে । অপর্ণা শুরু করে।....

ক্যামেরা অসীমে ফিরে আসে। 'কেনেডি' পর্যন্ত বলার পর অসীম একটু চিন্তা করে। মনে করার চেষ্টা করে। মনে পড়ছে না। শেখর পুলকিত। অসীম তা‌ুকে চুপ করতে বলে। হারিয়ে যাওয়া নামটি ফিরে আসে, টেকচাঁদ ঠাকুর, নেপোলিয়ন, মমতাজ মহল। শেখর অপর্ণাকে উৎসাহিত করে। কুয়ো থেকে ঠান্ডা জল এনে দেব? অপর্ণা মুখ তুলে তাকায়, হাসে, মুখ নামিয়ে নেয়। অসীম অপেক্ষা করে ওর আরম্ভের জন্যে, ওর ব্যর্থতার জন্যে। অপর্ণা বলে, মনে হচ্ছে আমি পারবো না। জয়া বিস্মিত, তা কি করে হয়? জিজ্ঞেস করে, 'কেন'। অপর্ণা উত্তর দেয় না । জয়া অবাক হয়ে বলে, তুই পারবি না কিরে? অপর্ণা জানায়, তার অবস্থাও এখন হরিবাবুর মতো। অসীম বুঝতে পারে অপর্ণা ছেড়ে দিতেই চায়। অপর্ণার গলা শোনা যায়, 'না, আমি পারব না'।

একটা মেমারি গেম থেকেও কি উত্তেজনাময় ঘটনাক্রম সাজানো যায় তার একটি উদাহবণ এই সিকোয়েন্স। সিনেমার প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলি সত্যজিৎ বারবার লঙ্ঘন করেছেন, ক'রে একটা নতুন কিছু সৃষ্টি করেছেন, আর তা তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র ভাষায়, যেখানে মানুষের মনের গূঢ়তম বাসনা ও রহস্য উদ্‌ভাসিত হয়েছে।

সত্যজিতের রবীন্দ্র - অন্বেষা

পল্লব সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতাব্দী উপলক্ষে সত্যজিৎ তাঁকে নিয়ে যে তথ্যচিত্রটি করেছিলেন, তার শুরু হয়েছিল এইভাবে ঃ '১৯৪১ সালের আগস্ট মাসের সাতুই, কলকাতায় একজন মানুষ মারা যান। তাঁর নশ্বর দেহাবশেষ লুপ্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু এমন একটা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী তিনি পিছনে ফেলে রেখে গেছেন, যা আগুনে পুড়ে ছাই হবার নয়।

সেই ঐতিহ্য শব্দের, সুরের এবং কবিতার ; ভাবনার এবং ভাবাদর্শের — যা আজো আমাদেরকে সচকিত করে তোলাব ক্ষমতা রাখে ; আর অনাগত দিনগুলিতেও সেই ঐতিহ্য সক্ষম থাকবে ঠিক ঐ একই ভাবে....'।

(অনূদিত)

এ ধারাভাষ্য, সত্যজিতের নিজেরই জবানিতে। এর পটভূমিতেই রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সত্যজিতের সৃষ্টিতে কতখানি, কিভাবে বর্তেছে— সেটা বিচার করা হয়ত ভাল।

রবীন্দ্রনাথের যে পাঁচটি কাহিনী সত্যজিৎ নতুন কিছু শিল্পকৃতি হিসাবে গড়ে তুলেছেন, তাদের সাহিত্যরূপ এবং চলচ্চিত্ররূপ কতখানি পরস্পর সাপেক্ষ এবং কতখানি অন্য নিরপেক্ষ, এই নিবন্ধ সেটিরই অনুসন্ধিৎসু. যে, এটুকু শুরুতে বলে রাখা সঙ্গত। সত্যজিতের সৃষ্টির এককভাবে মূল্যায়ন অথবা, তাঁর রবীন্দ্র-নির্ভরতা কতখানি, সেটা দেখা বা দেখানো এ-আলোচনার অভীপ্সিত নয়। উত্তরাধিকারের নূতন অভিব্যক্তি কী ঘটেছে, সেটাই এখানে বিচার্য।

'পথের পাঁচালী' করার অনেক আগেই সত্যজিৎ যে কাহিনী নিয়ে ফিল্ম তৈরি করতে আকাঙক্ষা পোষণ করতেন, তা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে', যার চিত্রনাট্যের খসড়া পর্যন্ত সে সময়ে তিনি তৈরি করে ফেলেছিলেন। সেটা ১৯৪৮ সালের কথা— সুহৃদ হরিসাধন দাশগুপ্তের সঙ্গে নানা সময়ে এ' নিয়ে তিনি আলোচনা-পত্র করেছেন; শেষে অবশ্য পরিকল্পনাটি আর বেশীদূর এগোয়নি। পরে, সাড়ে তিন দশকের চেয়েও বেশি কেটে গেলে, সম্পূর্ণ নতুনভাবে চিত্রনাট্য সাজিয়ে তবেই তিনি ঐ কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ন করেছেন। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরে আকাডেমী অব ফাইন আর্টস সভাগৃহে নিজের চলচ্চিত্র-সাধনা সম্পর্কে একটি বক্তৃতার মধ্যে ঐ ব্যাপারটির উল্লেখ করে সত্যজিৎ বলেছিলেন, 'তখন 'ঘরে বাইরে' না করতে পারার জন্য একটা 'কাঁটাবেঁধার মতো' অস্বস্তি তাঁর থেকেই গেছে। অবশ্য এই 'পিন্—প্রিক্' সত্ত্বেও, তাঁর এ-ও মনে হয়েছে যে, তখনকার প্রেক্ষিতে ছবিটি না হওয়াটাই তাঁর পক্ষে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার!'

এটা তিনি কেন বলেছিলেন, সেটা সম্প্রতি আমাদের আলোচ্য নয়। এ-নিবন্ধের

পক্ষে বাঞ্ছিত হল সেই তথ্যটুকু যে প্রায় ৩৪—৩৫ বছর ধবে একটি রবীন্দ্র কাহিনী তাঁকে 'স্বস্তি দেয়নি'। আকাডেমির ঐ বক্তৃতারও বছর দুই বাদে সত্যজিৎ 'ঘরে বাইরে' সম্পূর্ণ করেন। একজন বিশাল মাপের স্রষ্টার ওপর এতোখানি দীর্ঘস্থায়ী একটা প্রভাব গাঢ়বদ্ধ হয়ে থাকাটা, তাঁর সৃষ্টিমানসতার একটা বিশেষ দিককেই উদ্‌ঘাটিত করে নিঃসন্দেহে।

কথাটা জরুরি এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিচেতনার সঙ্গে সত্যজিতের মানসিক সংযোগ অলক্ষ্যচারী হয়েও যে কতটা নিবিড় ছিল, এটা তারই দ্যোতনা বহন করে। সত্যজিৎ নিজেই একাধিকবার বলেছেন যে 'চারুলতা' তাঁর নিজের বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি। 'ঘরে বাইরে'র মতো বড়ো মাপের উপন্যাস কিংবা 'নষ্টনীড়' (ওরফে, 'চারুলতা') —এর মত নভেলেটই হোক, আর 'পোস্টমাস্টার', 'মণিহারা', 'সমাপ্তি' (তথা, তিনকন্যা')—র মতো ছোটগল্পই হোক, রবীন্দ্রনাথের কাহিনী তাঁকে সবক্ষেত্রেই একটু বিশেষমাত্রায় অনুপ্রাণিত করেছে, বিশেষত শিল্পগত মাত্রবিন্যাসের ব্যাপারে। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, পরশুরামের মত সর্বোত্তমবর্গীয় অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে ছবি করতে গিয়ে যেসব নতুন মাত্রা অঙ্কিত করেছেন সত্যজিৎ, অনুপ্রেরণার ব্যাপারটি সেখানেও নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু উপজীব্য যেখানে ববীন্দ্রনাথ, সেখানে তার গাঢ়তা অন্য ধরণের। ভিন্নতর শিল্পমাধ্যমে রবীন্দ্র- সৃষ্টির নতুন রূপায়ণের ক্ষেত্রে সত্যজিতের একটা বি'শেষ কিছু মনস্কতা কাজ করত, সেটা অবশ্য বুঝে নেওয়াই বাঞ্ছিত।

একটু পরিহাসের ঢঙে বললেও, নিজের ওপর রবীন্দ্র প্রতিভাস কিভাবে পড়েছে এবং রবীন্দ্র সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্বরূপটি কি, সেটা বোঝাতে সত্যজিৎ দুটি বিচিত্র অর্থব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যথাক্রমে তারা হল 'থেরাপিউটিক' এবং 'অ্যাম্‌বিভ্যালেন্ট' (সূত্র ঃ আকাডেমীর ওই বক্তৃতা); অর্থাৎ 'আরোগ্যবিধায়ী' এবং 'দো-রোখা' মূল্যবোধের প্রতিবেশিত্বমূলক'। এদেরই অনুষঙ্গে তাঁর আর একটি আত্মনিরুক্তিকে যদি মিলিয়ে দেখি, তাহলেই সত্যজিতের নিজের বিচারে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর মানস সম্বন্ধের ঠিকমতো হদিশটুকু বোধহয় মিলে যাবে ঃ 'রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ হয়েই জন্মেছেন আমাকে তা হতে হচ্ছে, তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠছি।'

('বিষয় চলচ্চিত্র')

ঐ 'অ্যাম্‌বিভ্যালেন্ট' 'থেরাপিউটিক' সম্বন্ধের পটভূমিতে সত্যজিৎ, রবীন্দ্রকাহিনী অবলম্বন করে যেভাবে 'রবীন্দ্র-ত্ব' অর্জনে প্রয়াসী হযেছিলেন, অতঃপর তার অনুসন্ধান করা চলে। যেহেতু দশটি বাংলা চলচ্চিত্রের মধ্যে ন-টিই একান্তভাবে কাহিনী-নির্ভর (এ হিসেবও সত্যজিতেরই, ঐ বক্তৃতায় দেওয়া), তাই বাঙালী দর্শকের ক্ষেত্রে 'চলচ্চিত্রকারের অনিবার্য দায়িত্ব হল, কাহিনীর মুখ্য ভাবনাটিকেই ব্যঞ্জিত করে তোলা নানাভাবে।' এর ফলে কাহিনী যখন ছবিতে পরিণত হয়, তখন সেটাকে হতে হয় 'ট্র্যানস্‌ক্রিয়েশন' (অবশ্যই বড় মাপের পরিচালকের ক্ষেত্রে, অন্যদের নয়।) অর্থাৎ সৃষ্টির নবতর উদ্ভাসন। মুখ্যভাবনার ব্যঞ্জনা এবং দুযের ভবসম সুস্থিতিতেই তৈরি হতে পারে রবীন্দ্র—সত্যজিতেব শিল্পকৃতির যুগলবন্দী। সেটা সম্ভব হয়েছে কতখানি?

।। ২।।

রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সত্যজিৎ এমন কিছু মাত্রা আরোপ করেছেন ছবি তৈরির সময়ে, যার ব্যঞ্জনা মূল কাহিনীতে হয়ত খুব মৃদুভাবে অনুভব করা যায়। আবার কোনও কোনও সময়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন-কিছু ভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন, কাহিনীর মূল চেহারাটাকে বাইরের দিকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেই। প্রথম ক্ষেত্রের উল্লেখ্য উদাহরণ 'চারুলতা'; দ্বিতীয়ের, 'ঘরে বাইরে'। 'তিনকন্যা'-সিরিজে স্বল্পতরভাবে দুয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ধরুন, 'চারুলতা'-র কথাই। 'নষ্টনীড়' কাহিনীতে যে-ত্রিকৌণিক জটিলতা রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন, সত্যজিৎ তাকেই রূপায়িত করেছেন মূলের পরিকাঠামোটা অক্ষুণ্ণ রেখেই। অমলের চরিত্রের গভীরতা তিনি কমিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু চারুর নৈঃসঙ্গের যন্ত্রণাটুকু যেভাবে সত্যজিৎ 'হাইলাইট' করেছেন, তাতে তার সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্বটা অনেক বেশি বেড়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে মূল কাহিনীব ভরসমতা অক্ষুণ্ণই থেকেছে। পক্ষান্তরে, মূলে বর্ণিত বেশ কিছু ঘটনা সিনেমায় বাদ পড়েছে সঙ্গতভাবেই, কেননা দৃশ্য—শ্রাব্য মাধ্যমে সেগুলি বড় বেশি অতিনাটকীয় হয়ে উঠতঃ যেমন, ক্রুদ্ধ ভূপতির আকস্মিকভাবে নিজের লেখার খাতাগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া। প্রি-প্রেড টেলিগ্রামের জবাব হাতে পেয়ে চারু-অমলের সম্পর্কটার স্বরূপ সহসাই যেভাবে ভূপতির কাছে উদ্‌ভাসিত হয়েছিল, সাহিত্যিক-মাধ্যমে তার প্রয়োগ অত্যন্ত সুষ্ঠু হলেও সিনেমা-ম্যাধ্যমে তার অভিব্যক্তি কিছু পরিমাণে অতিনাটকীয় না হয়েই পারত না। অথচ সমগ্র কাহিনীর স্বরগ্রামই মন্দ্রসপ্তকে বাঁধা; ভাবনায় সেই মৃদু—অথচ—গম্ভীর আবেদন সিনেমার মূল-উপজীব্যের মধ্যেও যথাযথ বজায় থেকেছে। সেখানে ঐসব ধরনের অতি-নাটকীয়তা,শিল্পের রসপ্রতীতিকে ক্ষুণ্ণ করত। সত্যজিৎ তা হতে দেননি রবীন্দ্রনাথের ভাবনার পরিবৃত্তকে নিটোল রাখার প্রয়োজনেই।

সাহিত্যে একটা বিশেষ সুবিধা আছে; লেখক সেখানে একটা সূক্ষ্ম-অনুভবকে, একটা জটিল গ্রন্থির মানসিকতাকে নানান উপমা-রূপক-সংকেত ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙ্ময় করে তুলতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের মত মহাস্রষ্টার কলমে তো তার সম্ভাবনা দিগন্তস্পর্শী। কিন্তু চলচ্চিত্রে তো বর্ণনার অবকাশ নেই। দেখবার এবং শোনবার মাধ্যমেই দর্শক-শ্রোতাকে নিজের মনের গভীরে (হয়ত অজ্ঞান্তেই) অনুভব করতে হয় সবটুকু ভাবনার সংকেতকে। বারংবার পড়ে নেবার সুযোগ সেখানে নেই, প্রতিনিয়ত ক্যামেরার রীল সেখানে ঘূর্ণায়মান যেহেতু।

অতএব ছবির মাধ্যমে নানান কোণ থেকে শট্ নিয়ে খুঁটিনাটি অজস্র বিষয়ক পরের-পর (অথবা, আপাত-অসংলগ্নভাবেও) না-দেখলে চলে না। তাই, 'চারুলতা'-র প্রথম সাত-আট মিনিটে তার যে নিঃসঙ্গতা দেখানো হয়েছে, সেটা কাহিনীর প্রায় পাতাকুড়িক পরিমাণের বিবরণের সঙ্গে খাপ খাইয়েই। প্রথম থেকেই আমি যা মুখ্য বলে বুঝেছিলাম, তা হল চারুর নৈঃসঙ্গ্য। সে নিঃসঙ্গতার রূপটা কী রকম?কোনো সঙ্গীর অভাব, অর্থাৎ কোনো-ধরনের মানসিক যোগাযোগের অনুপপত্তি। চারুলতার সেই নিঃসঙ্গতার চলচ্চিত্র রূপটা যদি ধারাবিবরণী-ব্যতিরেকে বোঝাতে হয়, তাহলে শুধু দেখানোর মাধ্যমেই কিন্তু সেটা করতে হবে। নিঃসঙ্গ একটি নারী কী-কী করতে পারে? সে তার সময় কাটায়

কেমনভাবে? তখনও কী তার কোনো রকমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? নিঃসঙ্গতা দু'ধরণের ঃ একটা হল বার্দ্ধক্যের আর একটা যৌবনের, যখন মানুষের মনে সঙ্গ পাবার আকাঙক্ষাটা অটুট থাকে।" ('ফিল্ম্ আই'/ সত্যজিৎ রায়; রুইয়া কলেজ ফিল্ম্ সোসাইটি জুর্নাল; অনূদিত)

সুতরাং গল্পের প্রথম কুড়িপাতার বিকল্পে যে-মিনিট সাতেকের দৃশ্যায়ন করা হয়েছে, তার 'ডিটেইলিং'-টার মাধ্যমেই সত্যজিৎকে চারুর চরিত্রের কতকগুলি বিশিষ্টতার ইঙ্গিত দেওয়া, ভূপতির সঙ্গে তার সম্পর্কের একটা হাল্কা-আভাস জানানো- ইত্যাদি আরও নানারকম বিষয়কে নিয়ে আসতে হয়েছে। আর আনতে হয়েছে কয়েকটি বিশেষ দ্যোতনাগর্ভ প্রতীক—যাদের মাধ্যমে ঐ সমস্ত ব্যাপারগুলিকে দৃঢ়সন্নদ্ধ করতে চেয়েছেন সত্যজিৎ।

রবীন্দ্রনাথে যেখানে 'ফল-পবিণামহীন ফুল', 'বাল্যকালের কল্পনা ভয় ঔৎসুক্য', 'কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল', 'সহস্র হস্ত গভীর গহুর' ইত্যাদি আলঙ্কারিক কথার সংকেত যেমন (যথাক্রমে) চারুর সন্তানবিহীন যৌবন, তার মনের অন্তর্গূঢ় অভীপ্সা, অমলের ঘোর কেটে যাওয়া এবং তার মগ্নচৈতন্যে অবলীন সংরক্ত জৈব-আকাঙক্ষা ইত্যাদি ব্যঞ্জিত হয়েছে, চলচ্চিত্রে সেটা আদৌ কৃতসাধ্য নয় যেহেতু, তাই সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু উপকরণের, ভিন্ন কিছু ঘটনার মাধ্যমে সেটা কবতে হ'য়েছে। অতএব এসেছে চোখে অপেরা গ্লাস লাগিয়ে পাশের বাড়ির-মা-ও ছেলেকে দেখা, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে পথেব মানুষজনকে (এবং একবার বারান্দায় হেঁটে-যাওয়া ভূপতিকেও) নানান্ দিক দিয়ে দেখে সময় কাটানোর দৃশ্য; অবসন্ন, শঙ্কিত, বিশুষ্কমুখে চারুর শূন্যচোখে তাকানোর 'সেমি-ক্লোজআপশট্'; অমলের আচরণের একটু লোভী, একটু সতর্ক-একটু সন্ধিগ্ধ অস্বস্তির ভাব; এবং তাব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে মুহূর্তের জন্যেও এসে চারুর কান্নায় আচমকা ভেঙে-পড়া।

এখানে কয়েকটি সংকেতবহ মোটিফের ব্যবহারের কথা সত্যজিৎ নিজেই উল্লেখ করেছেন তাঁর সেই বক্তৃতায়। যেমন রুমালে ভূপতির নামের আদ্যক্ষর এমব্রয়ডারি করছে চারু: পর্দাজোড়া এই সেলাইযে ব্যস্ত মেয়েলি হাত দুটি নিয়ে ছবির শুরু। ছবির শেষে (সত্যজিতের ভাষায়) ভূপতি যে মুহূর্তে এক 'মর্মন্তুদ আবিষ্কার' (চারুর অমলের প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রেম), তখন তার কপালেব. গালের বিন্‌বিন্ করে জমে ওঠা ঘাম মুছতে গিয়ে ঐ 'বি' লেখা রুমালটা হাত থেকে পড়ে যাওয়ার একটা সূক্ষ্ম সাংকেতিক তাৎপর্য আছে, যার শুরু প্রথম দৃশ্যেই। সেকেলে একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজছে; বঙ্কিমের উপন্যাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে সে সময় কাটাচ্ছে; এরই মধ্যে আবহসংগীত হিসেবে বাজছে 'হাসি—কান্না, হীরা-পান্না দোলে ভালে', তারই মধ্যে একবার ভূপতির মস্‌মস্ বুটের শব্দ— সব মিলিয়ে যে দৃশ্য-শ্রাব্য 'কোলাজ', ঐ সংকেতবহ মোটিফগুলি সুসংহত হয়ে উঠেছে তারই ভাবানুষঙ্গে।

ঠিক একই প্রক্রিয়ায় চারু—অমলের সম্পর্কের মধ্যে বাঙালীর মধ্যবিত্ত-সংস্কারের প্রথাসিদ্ধ দেওর-বৌদির নৈকট্য-ব্যবধানের দ্বান্দ্বিকতা অলক্ষ্যে কখন গাঢতর এব আবেগে রূপান্তরিত হয়ে গেছে— জটিল একটি গ্রন্থির গূঢৈষণাকে চলচ্চিত্রে বোঝাতে গিয়েও সত্যজিৎকে নানান্ দৃশ্য/শ্রাব্য উপকরণ ব্যবহার করতে হয়েছে। চারুর মনেব

অন্তর্বিলীন কৈশোরের বিলীয়মান সংকেতের দ্যোতনা বাগানে দোলনায় দুলতে দুলতে তার মুখে 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কি বা মৃদু বায়'' গানের মাধ্যমে সত্যজিৎ করেছেন, এটা তার 'কালীতলা' নামের প্রবন্ধটির মধ্যে প্রতিফলিত বাল্যস্মৃতি-রোমন্থনের বিকল্পে (ফ্ল্যাশব্যাকে তার ছোটবেলার ছবি দেখানো— অন্তত এক্ষেত্রে, সত্যজিতের মাপের চলচ্চিত্রকারের পক্ষে যেহেতু সম্ভব নয়।); ঠিক তেমনই অমলের লঘুতা এবং আত্মসর্বস্বতাও 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' গানটির অনুষঙ্গে অত্যন্ত একটি সূক্ষ্ম দক্ষতায় তিনি দেখিয়েছেন। শেষ চরণে শব্দ পরিবর্তন করে 'ওগো বৌদিমণি' বলার মধ্যে লঘুতার সেই ব্যঞ্জনা স্পষ্টতর। দোলনায়-বসা চারুর মুখটিকে কেন্দ্রে রেখে পিছনের পটভূমিটাকে দোলাচল দেখিয়েও সত্যজিৎ চারুর অন্তর্জীবনের অস্থির-প্রেক্ষিতটাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। এই 'সিনেমাটিক টেক্‌নিক' আবার লেখার মধ্যে অলভ্য; অথচ কাহিনীর বক্ষ্যমাণ-প্রতীতি ঠিক সেটাই। সত্যজিৎ তার মাত্রাটাকে গাঢ়তর করেছেন।

চলচ্চিত্র-নির্মাণের সময়ে এই সমস্ত মাত্রান্তরের চূড়ান্ত সাফল্য সত্যজিৎ দেখিয়েছেন শেষ দৃশ্যে। কাহিনীতে ভেঙে যাওয়া 'নীড়'-এর যন্ত্রণা অভিব্যক্ত হয়েছে একটি মর্মান্তিক বর্ণনায় ঃ 'আরও কত বৎসর প্রত্যহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে! যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেছে তাহার ভাঙা ইঁটকাঠগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?' . এই দুঃসহ, অনতিক্রম্য ব্যবধান সত্যজিৎ একটি 'ফ্রিজ্ শট্'—এর সাহায্যে সূচিত করেছেন—চারু এবং ভূপতি পরস্পরের দিকে করুণভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু ক্যামেরা রুদ্ধ গতি হয়ে সেই হাত দুটিকে চিরন্তনভাবে ব্যবধানেই রেখে দিল। যে-জিজ্ঞাসা ভূপতির গল্পে একার ছিল, তাকে দুজনেরই প্রশ্ন করে তুলেছেন এভাবে সত্যজি; ভাবনার গাঢ়বদ্ধতা যা রবীন্দ্রনাথ বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন ছবিতে সেটি এভাবেই অঙ্কিত।

এই কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনাগুলিকে যে স্বরসপ্তকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, 'নষ্টনীড়'-কে 'চারুলতা'- প্রণতি দিতে গিয়ে সত্যজিৎ তার ব্যত্যয় ঘটাননি। প্রকাশের মাত্রান্তর ঘটিয়ে যে অদলবদলটুকু করেছেন, তাতে কাহিনীর অন্তর্কাঠামো (ডীপস্ট্রাকচার) অটুট থেকেছে; রসের প্রতীতিতেও তাই।

।। ৩ ।।

এর বিপরীতটা যেখানে ঘটেছে, অর্থাৎ 'ঘরে-বাইরে'র চলচ্চিত্র-রূপায়ণে, সেখানে সত্যজিতের মাত্রাবিন্যাস মূলের রূপরেখার নির্দেশকে অতিক্রম করে গেছে। সন্দীপ-বিমলার সম্পর্কের যে-উপলব্ধি উপন্যাসের পাঠকের মনে সঞ্জাত হয়, চলচ্চিত্রের দর্শকের বোধের প্রেক্ষিতটা তার থেকে পৃথক। সেখানে সত্যজিৎ নিজস্ব ভাবনার কিছু মাত্রাকেই মুখ্যতর করে তুলেছেন।

একথা অবশ্য ঠিকই যে, 'নষ্টনীড়'-এর তুলনায় 'ঘরে-বাইরে'-র ক্যানভাসটা অনেক বড়, শুধুমাত্র অন্তর্লোকের দ্বন্দ্বটাকেই ফুটিয়ে তোলা নয়, সমকালের সামাজিক—রাজনৈতিক ক্রান্তিকালের প্রতিভাসও তার মধ্যে একটা খুব বড় জায়গা জুড়েছে। বস্তুত, কাহিনীতে সন্দীপের উপস্থিতিও ঘটেছে তারই অনুসূত্রে। কিন্তু ঐ প্রেক্ষাপট, বিশেষত

তার অন্তর্গত রাজনৈতিক অংশটি, চলচ্চিত্রে তুলনামূলকভাবে অনেক কমই গুরুত্ব পেয়েছে। এর ফলে ছবিতে ত্রিকৌণিক দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনটা হয়ত বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু সবটা মিলিয়ে, উপন্যাস এবং চলচ্চিত্রের ভরকেন্দ্র পৃথক হয়ে গেছে। সত্যজিৎ এখানে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার পরে তিনি চলে গেছেন নিজস্ব-সৃষ্টির পরিমন্ডলে। সন্দীপ-বিমলার সম্পর্কের কথাটা উপরে উঠিয়েও, তার থেকে সরে গেছি। সেখানেই আপাতত ফেরা দরকার।... উপন্যাসের সন্দীপ একই সঙ্গে ভিলেন এবং পরিণামে-বিবেকদগ্ধ প্রেমিক। বিমলার সঙ্গে তার সম্পর্কটা পরিপূর্ণভাবেই দুই বিপরীত অভিমুখী দ্বান্দ্বিকতার লব্ধফল (এও কী সেই 'অ্যমবিভ্যালেন্ট' সম্পর্ক।) বলেই গণ্য। রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথায়: 'বিমলার struggle নিজেরই শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের—সন্দীপ নিজের মধ্যে নিজের কর্তব্যের adjustment করেছে।' ('প্রবাসী'/বৈশাখ, ১৩৪৮)

সত্যজিতের ছবিতে বিমলা কিছুটা, এবং নিখিলেশ মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিশ্লেষণের সমধর্মী হলে সন্দীপের ক্ষেত্রে সেটা ঘটেনি। তার অবচেতনার বিবেকবুদ্ধি উপন্যাসে শেষ অবধি যে-গভীর সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে, ছবিতে সেটা দেখাননি সত্যজিৎ। উপন্যাসের সন্দীপের দ্বন্দ্ব, সিনেমায় প্রতিফলিত হয়নি। পরিণামে তাই বিমলার সঙ্গে তার দৈহিক ঘনিষ্ঠতাও অনায়াসে দেখানো সম্ভব হয়েছে সত্যজিতের পক্ষে। মূল কাহিনীতে সন্দীপকে দিয়ে বলিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—রাবণ পৌরুষদৃপ্তভাবে কাছে টানলে সীতা স্বেচ্ছায় তাঁর অঙ্কশায়িনী হতেন (যে কথার জন্য রবীন্দ্রনাথ গোঁড়া ভক্তদের কাছে নিন্দিত, তিরস্কৃত হয়েছেন), তার মধ্যেই অনচ্ছ হয়ে থেকেছে সন্দীপের জৈব আকাঙক্ষা; সত্যজিৎ সেটাকে ব্যবহার করেন নি (একবার শুধু তাকে দিয়ে বলিয়েছেন যে, সে 'রাবণের চেলা')। বিকল্পে, সন্দীপের প্রবল দুর্দম টেনে-নেওয়ার মুহূর্তে বিমলার নিষ্প্রতিবাদ আত্মসমর্পণই তিনি দেখিয়েছেন স্ক্রিন জুড়ে। এটার প্রয়োজন সত্যজিতের কাছে ছিল। কেননা, তাঁর দৃষ্টিকোণে বিমলার পরবর্তী পাপবোধটাকে সহজগ্রাহ্য করার এটা একটা সুন্দর চলচ্চিত্র মাধ্যম নিঃসন্দেহেই।

ঠিক এই ব্যাপারটি নিয়ে সত্যজিতের কাছে সপ্রশ্ন আপত্তি যখনই তোলা হয়েছে—তিনি সেটার গুরুত্ব নিরূপণ করেছেন নিজের বিচারের তৌলদন্ডে, রবীন্দ্র-কাহিনীর মাপকাঠিতে নয়। দু'চারজন নির্মম দর্শকের অভিমতে 'Satyajit's Bimala seemed to somewhat of a sexkitten!'-এটা কিঞ্চিৎ অতিকথন হলেও, এটাও ঠিক যে, উপন্যাসের সঙ্গে চলচ্চিত্রের এই ভাবগত যে-বদলটা চলচ্চিত্রে ঘটেছে সেটা কিন্তু প্রায় মৌলিক। নায়িকা-চরিত্রের এই ভাবগত রূপান্তর, উপন্যাসের সঙ্গে চলচ্চিত্রের তফাৎটা ব্যাপকভাবে ঘটিয়ে দিয়েছে।

এ-কাহিনীর সাহিত্যরূপে বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্বটা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে ফুটিয়েছেন; কিন্তু চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ সেটি একটি সুন্দর প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেনঃ সন্দীপের স্বরূপ একটু-একটু করে উদ্‌ঘাটিত হতে আরম্ভ করেছে যখন বিমলার কাছে, তখন আয়নার সামনে তার কান্নায় ভেঙে পড়ার দৃশ্যটা দারুণ ব্যঞ্জনাবহ একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। পর্দার বুকে রোরুদ্যমান 'দুটি' বিমলা, মুহূর্তের মধ্যে তার দ্বিধা হওয়া মানসিকতার প্রতিভায় ফুটিয়ে তোলে। বিমলার ক্ষেত্রে যতখানি অবধি সত্যজিৎ

রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবনার অনুসরণ করেছেন, তার মধ্যে এই দৃশ্য—উপাদানটি নিঃসন্দেহে সেরা।

এরকম আরেকটি প্রতীকও 'ঘরে-বাইরে'-র চলচ্চিত্র রূপায়ণে ব্যবহৃত হয়েছে। স্মৃতি হিসেবে বিমলার চুলের কাঁটাটি কোটের বুক পকেটে রেখে সন্দীপের সুখসায়র থেকে চলে যাবার দৃশ্যটিও নিঃসন্দেহে অত্যন্তই তাৎপর্যময়। মাত্র এই একটি ক্ষেত্রেই সন্দীপের চিত্রায়ণে সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের ভাবনার অনুবর্তী; গোটা ছবিতে এই একবারেই তাকে বিবেকপীড়িত প্রেমিকরূপে দেখা গেছে। গয়না—মোহর ইত্যাদি ফেরৎ দেবার ব্যাপারটা উপন্যাসের অনুসারী শুধুমাত্র বহিরঙ্গেই। যেখানে সন্দীপের জবানীতে রবীন্দ্রনাথ বিবেক—যন্ত্রণার একটা আভাস সৃষ্টি করেছেন, ছবিতে তার কোনও হদিশ নেই।

কাহিনীর শুরুতে শেষে রবীন্দ্রনাথ বিমলার জবানিতে মায়ের সিঁথির সিঁদুরের স্মৃতির প্রতীকে তার বৈধব্যের সম্ভাবনা সূচিত করেছেন। ছবির শেষ দৃশ্যে তাকে বিধবার বেশে 'ক্লোজ—আপ' শটে দেখিয়ে সত্যজিৎ কোনও প্রতীকী সঙ্কেতের অবকাশ রাখেননি। এতে ট্র্যাজিক আবেদন সরাসরি এসে পৌঁছুলেও মূলের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাটুকু হারিয়ে গেছে যে, সেটি মানতেই হবে।

আসলে, 'ঘরে-বাইরে' যখন বই হিসেবে আমরা পড়ি, তখন এক-একবার এক-একজনের চোখ দিয়ে কাহিনীর সঞ্চরমাণ ঘটনাপ্রবাহকে আমরা দেখি। পক্ষান্তরে, ছবিতে সেইসব বিভিন্ন-মানসতা, বিভিন্ন-দৃষ্টিকোণকে অবলম্বন করে ভাবনাবিস্তারের কোনও অবকাশ মেলেনা স্বাভাবিকভাবেই। দ্বিতীয়ত 'চারুলতা'/'নষ্টনীড়'-কে সুনির্দিষ্ট একটা সময়কালের সীমায় বাঁধা হয়ত চলে, কিন্তু সে-বাঁধনটা হবে নেহাৎই ঢিলে-ঢালা ঃ ১৯শ শতকের শেষ দিকের যে-কোনও সময় হতে পারে এর পটভূমি। পক্ষান্তরে, 'ঘরে-বাইরে'-র সময়নির্দেশ অনেক বেশি সুনিশ্চিত ঃ সরাসরি, সশস্ত্র-সংগ্রাম-কেন্দ্রিত স্বাধীনতা-আন্দোলনের সেই সময়কালটাই এর মধ্যে চিহ্নিত, যখন তার পাশাপাশি দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষও সামাজিক মননে বেশ খানিকটা ঢুকে গেছে।

এর ফলে 'ঘরে-বাইরে' সুনিশ্চিতভাবেই একটি 'পিরিয়ড্ স্টোরি'। এই কালসাপেক্ষতা, বইতে 'ঘরে' এবং 'বাইরে'—দু জায়গাকেই অনোন্যনির্ভর করে বেঁধেছে। চলচ্চিত্রে এ-দুটো সমান্তরাল হয়ে হাজির, পারস্পরিক-অনিবার্যতা সেখানে উপন্যাসের মতন নয়। সন্দীপের ওজস্বিতা, তীব্রতা, দাবী জানানোর অকুণ্ঠ অসঙ্কোচ বিমলাকে এখানেও মোহাচ্ছন্ন করেছে ঠিকই, কিন্তু, রাজনীতির অনবচ্ছিন্ন সূত্রে ছবিতে তা ঘটেনি। এখানে বারংবার আগুনের যে-মোটিফ এসেছে, একমাত্র তাকেই 'ঘর' এবং 'বাইরে', দুয়েরই মধ্যে সমানভাবে বিম্বিত হতে দেখি—কিন্তু ওটা ছাড়া আর কোনও অপরিহার্য যোগসূত্র সেখানে নেই।

সন্দীপের গলার 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' গান এবং সুখসায়রের আশেপাশের গ্রামগুলির হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে নিজস্ব জোট বাঁধবার ছবি, 'পিরিয়ডফিল্‌ম' হিসেবে একে উপকরণ জুগিয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই পিরিয়ডের ঘটনা-পরিণামের অনুষঙ্গে এখানে ত্রিভুজ দ্বন্দ্বটা গড়ে ওঠেনি। বরং, একটা পাপবোধই এখানে বিমলাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে ছবির শেষ দিকে, সে কথা ওপরে এখনি বলেছি।

হয়ত এমনটাই সম্ভাব্য। সুদীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে যে-কাহিনী সত্যজিৎকে 'কাঁটা ফুটিয়ে এসেছে', সেটি সত্যিই ছবিতে যখন পরিণতি পেল, তখন তাঁর নিজের মনের গভীরে জমিয়ে রাখা অজস্র উপলব্ধি, অনুভূতি, অভীপ্সা এবং আরও অনেক কিছুই একত্রে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে; রবীন্দ্রনাথের কাহিনীটা এর ফলে 'ট্রানসক্রিয়েটেড' হয়ে গেছে আগেই। রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই সত্যজিৎ তাই অনায়াস-স্বাচ্ছন্দ্যে রবীন্দ্র সৃষ্টির অভিপ্রেরণাকে অতিক্রম করে নতুন সৃষ্টির প্রেক্ষিতকে আত্মস্থ করেছেন।

॥ ৪ ॥

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু সত্যজিৎ এভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে অবলম্বন করে 'ট্রানস্‌ক্রিয়েট' করেন নি। এগুলি নিয়েই তিনি শুরু করেছিলেন কবির জন্মশতবর্ষে; তাব তিন বছর পরে 'চারুলতা', আর তারও বিশ বছর পরে 'ঘবে বাইরে'। ছবির প্রয়োজনে সংযোজন-পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন এই কাহিনীগুলিতে তিনি যে করেন নি, এমনটা নয়; কিন্তু তাতে কাহিনীর-বা-চরিত্রের মূলগত কোনও ফারাক্ ঘটেনি। বরঞ্চ, প্রায় ক্ষেত্রেই এর ফলে কাহিনীব মৌল প্রবণতাটুকু গাঢ়তরই হয়েছে, একমাত্র 'মণিহারা'-র শেষ অংশটুকু ছাড়া।

'মণিহারা' নিয়েই বরং এই পর্বের আলোচনাটা শুরু করা যেতে পারে। সাহিত্যরূপে অতি প্রাকৃত এক রসের যে-সংকেত কাহিনীর শেষের দিকে একটু-একটু করে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, তার ব্যঞ্জনা কতটা অলৌকিক, আর কতটা মগ্নচৈতন্যজাত 'হ্যালুসিনেশ্যন'—সেটা সংশয়িত করেই রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঃ এ-গল্পের শিল্পরূপ তাতেই ঋদ্ধিমান হয়েছে। কিন্তু ঠিক এই জিনিসটা চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করে গেলে সত্যজিতের চেয়ে কম-প্রতিভাধর কোনও পরিচালক হলে হয় একটা পুরোদস্তুর ভূতের গল্প বানিয়ে ফেলতেন, কিংবা উদ্ভট্ একটা কিছু গড়ে তুলতেন। মূল গল্পে একটা 'জার্ক' বা ধাক্কা লাগে ফণি-এবং-মণির গার্হস্থ্য কাহিনীটায় হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর-অলৌকিক অনুভূতি সঞ্জাত হবার ফলে। এই নাড়া দেওয়াটা, সত্যজিতের ছবিতে অনুপস্থিত, সেটাকে তিনি সযত্নে মূলতবি রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ শেষ অবধি নিগূঢ় একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা কাহিনীর পরিণামে সূচিত করেছেন তার ফলে স্বয়ং কথকই ফণিভূষণ হিসেবে হাজির হন; এবং তাঁর স্ত্রীর নাম মনিমালা নয়, নৃত্যকালী ছিল এটাও জানা যায়। অর্থাৎ সমস্ত ঘটনাই হল মনস্তত্ত্বের ভাষায় 'figments of eerie fantasy' যা মানুষের মগ্নচৈতন্য থেকে উঠে আসে। এটাকে সত্যজিৎ উপলব্ধি করিয়েছেন ঃ সুমিষ্ট অথচ তীক্ষ্ম সুরে 'বাজে করুণ সুরে'-র মতো শ্রাব্য উপাদানে কিংবা গহনা-সজ্জিত অস্থিকঙ্কালের হাতটি ঝন্ করে পর্দায় আবির্ভূত হবার মতো দৃশ্য উপকরণ ঐ স্তরের গভীরে নিয়ে যায় শ্রোতা/দর্শকের অজ্ঞেয় অনুভূতিকে। সত্যজিৎ ভয়ের, অস্বস্তির আবহ তৈরি করেছেন, কিন্তু ভূতের গল্প করে তোলেননি 'মণিহারা'কে; মনস্তাত্ত্বিক জটিল গ্রন্থির প্রতিভাস ঘটানোই তাঁর অভিপ্রেত ছিল। নানান্ বাড়ানো-কমানো সত্ত্বেও তাই তিনি রবীন্দ্রনাথ-কাহিনীব মৌল সত্তাটিকে নিটুট রেখেছেন; রাখতে চেয়েছেন, পেরেছেনও।

কিন্তু এই সবটুকু কথা মেনে নিয়েও, কিছু অসম্মত হবার মত ব্যাপার থেকেই যায়। সমস্ত ছবিটার আবহ সুর হিসেবে 'বাজে করুণ সুরে' গানটির নানা অংশ, নানান্ সপ্তকে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার-সপ্তকে, রণিত হয়েছে। মণিমালার সুখেও গানটা একবার শোনানো হয়েছে। এর ফলে, এর বিশেষ-সুরপ্রযুক্তির সূত্রে একটা হতাশ-হাহাকারের দ্যোতনা শ্রোতা/দর্শকের অবচেতনাকে স্পর্শ করে ; তার ফলে ছবিটার মধ্যে একটা সংগোপন-ট্রাজেডির ভাবও এসে পড়ে নিঃসন্দেহে। বস্তুত, মূল কর্নাটকী সুরটির মধ্যেই সে-ভাবটার অবস্থিতি—রবীন্দ্রনাথ গানটিকে বাংলা করবার সময়েও যে, সেটাই বজায় রেখেছিলেন এগানের লিরিকই তার প্রমাণ। 'হায়', 'নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে' প্রভৃতি শব্দের ব্যঞ্জনা অবশ্যই নিষ্প্রয়োজন। গল্পটার অন্তর্লীন ট্রাজিক যে অনুভবটুকু আছে, সত্যজিৎ সেটিকে মুখ্য বলে ধার্য করেছেন। কাহিনীর রবীন্দ্র-অভিপ্রেত মৌল সত্তাটি সত্যজিৎ তাহলে ততটা অবধি নিটুট রেখেছেন। (যা ওপরে এখনি বলেছি), যতটা ঐ ট্রাজিক অনুভবে স্পন্দিত।

এতে আপত্তিকর কিছু নেই। এ স্বাধীনতা চলচ্চিত্রকারকে দিতেই হবে ঃ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সেই সুদূর ১৯২৯ সালে লেখা একটি চিঠিতে তা দিয়ে গেছেন। কিন্তু, ট্রাজিক অনুভবের রস প্রতীতি আচমকা থিতিয়ে যায়—ভূতের ভয় পাবার মতই এক অনির্দেশ্য আতঙ্কে স্কুলমাস্টারকে যখন পালিয়ে যেতে দেখেন দর্শক, আব পড়ে থাকতে দেখেন তার খাতা, ছাতা এবং গাঁজার কল্‌কে! এখানে ঐ গাঁজার কলকের হাজিরাটা বোধহয় অনভিপ্রেতই ঃ 'বাজে করুণসুরে'-র সবটুকু ব্যঞ্জনা এর ফলে হারিয়ে যেতে পারে অধিকাংশ দর্শকের অনুভূতি থেকে। গোটা গল্পটার মধ্যে চূড়ান্ত এক মোচড় যেভাবে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন মণিমালিকাকে নৃত্যকালীতে পরিণত করে, তাও এখানে অ-প্রাপ্ত ঃ আর সত্যজিৎ 'নিজে যেমন করে রবীন্দ্র-ভাবনার একটি বিশেষ স্বরগ্রাম (ট্রাজেডি)- কে বেছে নিয়ে পুরো কাহিনীটা দাঁড় করালেন ছবিতে, সেটাও সহসা মিলিয়ে গেল। রসপ্রতীতির এই বাজে খরচ কিসের জন্যে যে, কেন যে—তার কোনও ব্যাখ্যা সত্যজিৎ দেননি কোথাও।

॥ ৫ ॥

'তিনকন্যা' সিরিজের যে-ছবিটি নিয়ে পক্ষান্তরে সত্যজিৎ প্রচুর কিছু বলেছেন, তা হল 'পোস্টমাস্টার'। সে আলোচনা একটু পরে।....'পোস্টমাস্টার' কাহিনীতে সত্যজিৎ অবশ্য মূলের লিরিকটাকে প্রথমে রাখেননি। ঘটনায় তেমন কিছু প্রাচুর্য দেখাননি বটে, কিন্তু চরিত্র অনেকগুলি এনেছেন। ফলে রতন এবং পোস্টমাস্টার এরা দুজনে যে একটা নিজস্ব-নির্জন পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে গল্পের অনুভূতিপ্রবণ সংবেদনশীল দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছিল, সিনেমায় সেটা শেষ দৃশ্যের আগে অবধি গরহাজির। কিন্তু মূল গল্পে ঐ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিময় বেদনাটিব বাঙ্‌ময় রূপ অত্যন্ত বাস্তব হয়ে ব্যক্ত হয়েছে শেষ বর্ণনার ঠিক আগে ঃ রতনের কান্না এবং বখশিস্ ফিরিয়ে দেবার চিত্রে। এটা সত্যজিৎ বাদ দিয়ে দিয়েছেন এবং নীরবে মলিন, বিশীর্ণ মুখে বাল্‌তি হাতে রতনের চলে যাওয়ার ছবিটি সন্নিবিষ্ট কবেছেন তার বিকল্পে। পোস্টমাস্টারের বেদনা এবং রতনের বেদনা একই সঙ্গে ব্যঞ্জিত হয়েছে দুই-মূক-হয়ে-থাকা চরিত্রের পর্দায় উপস্থিতির

মাধ্যমে। আর ঠিক তারই সঙ্গে, গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথ যে-বেদনার সর্বস্বর উপলব্ধিকে বর্ণিত করেছেন, সেটারও চকিত দেখা মেলে সিনেমার পর্দায়। ....অনেক কিছুর বদল করেও মূলের ভাবপ্রতিমা শেষ অবধি সত্যজিৎ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এখানে।

এই বদল করার সপক্ষে সত্যজিৎ যে-কারণগুলো দেখিয়েছেন, তা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। তিনি লিখেছেন ঃ 'রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প আছে, যা অনুভূতির ক্ষেত্রে একান্তভাবে ভিক্টোরীয় যুগের। ধরুন 'পোস্টমাস্টার' গল্পটির কথাই। এর সমাপ্তিটা.... আমার কাছে বড্ড আবেগপ্রবণ বলে মনে হয়েছে। সেটা আমার পক্ষে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব, কেননা আমি তো বিংশ শতাব্দীর মানুষ, বিশেষ একটা পরিবেশে মানুষ হয়েছি, বিশেষ ধরনের কিছু প্রভাব আমার ওপর পড়েছে। কাজেকাজেই গল্পের পরিসমাপ্তিটা আমি ঘটালাম খানিকটা বিরসতা সৃষ্টি করে, তবে পরিণামটাকে নিজের পথেই আমি চলতে দিয়েছি। ছবিতে মেয়েটি তার বেদনাকে প্রকাশ করার বদলে বরং গোপনই করেছে।... শুধু কুয়ো থেকে জল তোলবার সময়ে তাকে আপনারা কাঁদতে দেখেছেন। কিন্তু যেই তার ডাক পড়েছে, অমনি সে চোখেব জল মুছে ফেলেছে।....১৯৬০ সালে দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন এমন একজন বিংশ শতকীয় শিল্পীর—আমার, এইটেই হল ব্যাখ্যা। গোঁড়ারা এসবে আপত্তি করবেন জানি, কিন্তু আমি এটা করেছি শিল্পী হিসেবে নিজের অনুভব ব্যক্ত করবার জন্যই। রবীন্দ্রনাথের গল্প আমি নিয়েছি সেটার প্রকাশমাধ্যম রূপেই; ব্যাখ্যা আমার নিজস্ব।' ('ফিল্ম আই'; অনূদিত)

এমন একটা কথা তাহলে হয়ত 'মণিহারা'-র সম্পর্কেও বুঝে নিতে হবে। কিন্তু সমস্যা একটা আছে তাতেও। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের ক্ষেত্রে বিপরীত এক পথ দিয়ে হেঁটে এলেও, পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথের অভীপ্সিত দিগন্তেই পৌঁছেছেন সত্যজিৎ। কিন্তু 'মণিহারা'-র ক্ষেত্রে জটিল মনস্তাত্ত্বিক গ্রন্থির প্রতিভাস এবং ট্রাজেডির স্পন্দন ঠিকই সৃষ্টি করেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে ট্রানস্ক্রিয়েট করে; কিন্তু খাতা এবং গাঁজার কলকের সমান্তরাল সহাবস্থান সেই নবনির্মিতের অনুভবসংবেদ্যতাকে হঠাৎ এসে ধাক্কা মারে— যে 'জার্ক' মণিমালিকার নৃত্যকালীতে পরিণত হবার সঙ্গে আদপেই এক গোত্রবর্গের নয়। 'পোস্টমাস্টার' এবং 'মণিহারা'-র মধ্যে মূল পার্থক্যটা এখানেই। নতুন কিছু চরিত্র, ঘটনা এবং ব্যাখ্যান সংযুক্ত করা সত্ত্বেও সত্যজিৎ 'পোষ্টমাস্টার' ছবিতে রবীন্দ্র-বলয়কে মান্য করেই ট্রান্সক্রিয়েট করেছেন ঃ মোটামুটি তেমন কিছু না বাড়ানো সত্ত্বেও কিন্তু 'মণিহারা'-র ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বিপ্রতীপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

।। ৬।।

'তিনকন্যা'-র তৃতীয় অর্থাৎ 'সমাপ্তি'-র ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রবীন্দ্রকাহিনীর মোটামুটি মূলানুগত রূপায়ণই করে এসেছেন আগাগোড়া—একমাত্র শেষের মিলনদৃশ্যটি ছাড়া। গল্পের মৃন্ময়ীর চারিত্র-বৈশিষ্ট্য সিনেমাতেও পুরোপুরি বজায় রয়েছে, অপূর্ব (সিনেমায়, অমূল্য) র ক্ষেত্রেও তাই, তার মায়ের ক্ষেত্রেও। বাদ গেছে মৃন্ময়ীর স্বামীসহ বাবার কর্মস্থল কুশীগঞ্জে যাবার ব্যাপারটা। তাতে ক্ষতি হয়নি; গল্পের মূল বর্ণবিন্যাস আরও কেন্দ্রীভূত হয়েছে; শেষ দৃশ্যে, অপূর্বর বোনের বাড়ির পরিবেশের বদলে তার নিজের বাড়িতেই সমস্যার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন যেভাবে, সে-সম্পর্কেও ঐ একই কথা। গল্পের

মধ্যে মৃন্ময়ীর যে-রূপান্তরকরণ ঘটেছে, তার পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য ননদ-নন্দাই প্রমুখের সহায়তার ব্যাপারটা সত্যজিৎ বজায় না রেখে সবটুকু মৃন্ময়ীর নিজের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। 'হিউমার'—যা ছিল মূল কাহিনীর পরিসমাপ্তির অন্যতম প্রধান উপকরণ, তাকে সিরিয়াস-অথচ স্নিগ্ধ একটি দ্যোতনায় রূপান্তরিত করে সত্যজিৎ প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে চলচ্চিত্রের ইডিয়মে সঠিকভাবেই ব্যক্ত করেছেন। বোন-ভগ্নীপতির মাধ্যমে স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলন যদি ঘটত অপূর্ব/অমূল্যর, তাহলে সেটা হয় অত্যন্ত সিরিয়াস অথবা অত্যন্ত-হালকা ভঙ্গিতে করতে হত। যার কোনওটিই রবীন্দ্রনাথের কাহিনীতে সূচিত হয়নি। সেরিওকমিক ওই ভাবটাকে সত্যজিৎ খেয়াল করেছিলেন বলেই খাবার হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকবার মুখে মৃন্ময়ীর শাশুড়ি-ঠাকুরাণীর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যটা তিনি সংযোজন করেছেন। রবীন্দ্রনাথে অবশ্য নেই এ ঘটনা ঃ কিন্তু এই হতভম্ব ভাবটা জাগিয়ে তোলার আগ্রহটা তাঁর একান্তভাবেই ছিল তো। সেটা সত্যজিৎ জাগাতে পেরেছেন সুষ্ঠুভাবেই।

'মোটিফ' ব্যবহারের যে-প্রবণতা 'চারুলতা' ছবিতে খুব বেশি পরিমাণেই দেখা গেল পরিবর্তীকালে, সমাপ্তি-র মধ্যেও তার প্রারম্ভিক কিছু ইঙ্গিত আছে। 'চরকি' নামে একটি কাঠবেড়ালি একটা বিশেষ প্রতীক হিসেবে নানা সময়ে হাজির হয়েছে। এই 'চরকি' -আসলে মৃন্ময়ীর নিজেরই অস্থির কৈশোরের প্রতীক বলতে পারেন। হবু শাশুড়ি, তাকে একবার 'চরকি' বলে তিরস্কারও করেছেন। এই চরকিই একবার অমূল্যর 'মেয়ে-দেখা' ভণ্ডুল করে দেয়; আবার 'শ্বশুরবাড়ির 'বন্দীদশা' থেকে 'পালিয়ে' মৃন্ময়ী সব আগে ঐ 'চরকি' -র কাছেই ফিরে যায়। আবার অন্তরের মধ্যে যখন সে প্রোষিতভর্তৃকার বেদনা অনুভব করছে, অর্থাৎ সে বড় হয়ে উঠেছে—তার দুরন্ত, অবাধ্য কৈশোরের পরিসমাপ্তি ঘটছে, ঠিক সেই সময়েই আসে 'চরকি' -র মৃত্যুর সংবাদ। সে-খবরে তখন আর তার আগ্রহ নেই। তার 'স্বভাবের চরকি' আর 'খেলনা চরকি' এক সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ওপর এই সংযোজনটুকু, রবীন্দ্রভাবনাকেই সার্থকভাবে ব্যক্ত করেছে নিশ্চয়ই।

কথাসাহিত্য এবং চলচ্চিত্র দুই সম্পূর্ণ-পৃথক শিল্প মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও, দুয়ের মধ্যে একটা বিরাট মিলও রয়েছে; উভয়ের ক্ষেত্রেই কাহিনী এবং চরিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুধু পড়ে যা অনুভব করা যায়, তার চেয়ে যা একই সঙ্গে দেখে এবং শুনে মর্মস্থ করার সম্ভাবনা — তার আবেদন, অনেক বেশি সবল, যদিও পড়ার ব্যাপারটা বারংবার করা যায় বলে, তার ব্যঞ্জনা নানাভাবে, নানান্ সময়ে খুঁজে পাওয়ার খুবই বেশি সম্ভাবনা থাকে। চলচ্চিত্র তার জঙ্গমতার জন্যই এই মর্যাদা থেকে বঞ্চিত।

এই সমস্ত কারণে যখনই কোনও বিখ্যাত লেখা সিনেমায় রূপান্তরিত হয়, তখনই রসিকজনেরা প্রত্যাশা এবং আশঙ্কায় দোদুল্যমান হন। বইয়ে যা আছে সিনেমায় তা হয়নি। হুবহু যদি দেখানো হয়, লেখকের প্রতি প্রায়শই তার ফলে অবিচার ঘটবে। পরিচালকের স্বাধীনতারও একটা সীমানা রয়েছে, সেটাও ভুললে চলবে না। রবীন্দ্র-সত্যজিৎ যুগলবন্দী যখন চলচ্চিত্রের মধ্যে নিবেদিত হয়, তখন এই কথাগুলো আরও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে দুজনের বিরাটত্বের কারণে। সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের নিজস্ব দাবি মিটিয়েও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ওপর প্রায় সবসময়েই সুবিচার করেছেন। এ নিবন্ধের সেটাই মুখ্য প্রতীতি।

সত্যজিৎ রায়ের ভাবনায় বন্ধুতা প্রেম ও মহিলারা

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মিহি কালো কিছুটা ক্যালিগ্রাফিক ধরনের ঘেঁষাঘেঁষি অক্ষরে নিরেট-ভরা লাল বাঁধানো বৃহদাকার খাতাগুলির ওপর আমার দীর্ঘ দ্বিপ্রাহরিক গোয়েন্দাগিরি এইমাত্র শেষ হলো। আমি আরো নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম কি নিশ্ছিদ্র পরিশ্রম আর বিরামহীন ভাবনা থেকে তৈরি হতে পারে 'মহানগর' এবং 'সীমাবদ্ধ'র মতো ছবি, এবং কেমন করে অনুপ্রেরণার বীজটি উড়ে আসা থেকে তার নিটোল পরিণতি পর্যন্ত এক একটি সার্থক চলচ্চিত্র কতো বিভিন্ন স্তরে পরিচালকের কল্পনায় বিন্যাসিত হয়ে থাকে। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যগুলির সবচেয়ে বড় আশ্চর্যতাটা থাকে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত জায়গায়, মার্জিনাল নোটস বা পার্শ্বলেখনের প্রক্ষিপ্ত ঠাস বুনন বৈচিত্র্যে। সত্যজিতের প্রায় প্রতিটি চিত্র-নাট্যকে তার আদিরূপ থেকে একেবারে পরিণত শুটিং স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে। আর যে টুকরো-টুকরো ভাবনাগুলি তাদের অসংলগ্ন বিক্ষিপ্ততা থেকে ক্রমে ঘনিয়ে এসে চিত্রনাট্যটিকে তার সংহত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে সেগুলিকে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে আবিষ্কার করি পাশ্বলেখনের অসংখ্য বন্ধনীর মধ্যে, প্রথমে হয়তো কিছুটা অমনস্ক আলগা দৃষ্টিতে কিন্তু একটু পরেই আমরা বুঝতে পারি এইসব এলোমেলো, অসংলগ্ন পার্শ্বকথনের মধ্যেই রয়েছে একটি বিশাল, বিচিত্র সৃষ্টিশীল মনের জটিল দীপ্যমান বিন্যাস। আমাদের চোখের সামনে খুলে যায় ভাবনার এমন সব আশ্চর্য জানলা যা আমরা কোনো চিত্রনাট্যে কখনই আশা করি না, এবং অনেক অপ্রত্যাশিত উদ্ঘাটন আমাদের গভীরভাবে ধাক্কা দেয়। আমরা বুঝতে পারি এই সব বন্ধনীধৃত ছোটো ছোটো মন্তব্যের শিকড় আসলে জীবন, বন্ধুতা, ভালোবাসা, প্রেম বিষয়ক ভাবনার অনেক গভীরে প্রোথিত। সবচেয়ে যা ভাল লাগে তা হল এইসব বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রায়তন লেখনের কোথাও সাহিত্যিকতা সহজ সত্যকে বর্ণাঢ্য করে তোলেনি। আমাদের বুঝে নিতে একটুও কষ্ট হয় না যে সত্যজিৎ রায়ের জীবনবোধে আগাগোড়া বিস্তৃত রয়েছে এক অস্পষ্ট বিধুর রোম্যান্টিকতা, যেমন আছে বার্গম্যান-এর গভীর চেতনায় কিংবা ডে-সিকার মধ্যে হয়তো। চারধারের স্খলন, পতন, মূল্যবোধের ভাঙচুর; মানসিক স্বাস্থ্যহানি ও আধুনিক মানুষের ঘনিয়ে আসা ব্যর্থতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধকে তিনি যন্ত্রণার সঙ্গে স্বীকার করে নিচ্ছেন না এমন নয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে একজনও যে অন্তত সেটাকেই চরম বলে মেনে না-নেবার মতো রোম্যান্টিক ভবিষ্যত-ধর্মিতা দেখাতে পারছেন সেটা বুঝতে পেরে আমাদের কৃতজ্ঞ না-হয়ে উপায় থাকে না। এই টুকরো-টুকরো পার্শ্বলেখনগুলি পড়তে পড়তে আমাদের ধারনায় যেটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো এই বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত আধুনিক পৃথিবীতে সত্যজিৎ বিশ্বাস করেন যে

বন্ধুতার মতো অঘটন আজও সম্ভব, আজও হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগে জন্ম নেয় ভালোবাসা, পৃথিবীতে কেউ-কেউ কখনো-কখনো কাউকে-কাউকে স্পর্শ করে অনেক গভীরে আর মেয়েরাই হয়তো এ-পৃথিবীতে বিলীয়মান আত্মিক শান্তি আর সৌন্দর্যের অন্তিম আধার।

সত্যজিতের প্রতিটি চিত্রনাট্যে আমরা লক্ষ্য করি জীবনের বিচিত্র টানাপোড়েন, অনেক সমাধাহীন সমস্যা আমাদের দীর্ণ করে এবং আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অন্তত সুব্রতর ব্যর্থতাবোধ (মহানগর), সোমনাথের নৈরাশ্য (জন-অরণ্য) কিংবা শ্যামলেন্দুর বিচ্ছিন্নতা-বোধের (সীমাবদ্ধ) সঙ্গে গভীর সংলগ্নতা উপলব্ধি করি। আধুনিক জীবনের একটা পুরোপুরি চেহারাই তো সত্যজিতের ভাবনায় আমরা ধরা পড়তে দেখেছি। এসেছে আধুনিক প্রেমিকের কাপুরুষতা, আধুনিক সার্থক চকুরিজীবীর শঠতা, দেখেছি আদর্শের পরাজয়, যৌবনের ব্যর্থ নিষ্ক্রান্তি। আর 'জন-অরণ্য'তে তো নিঃশেষিত সমাজের দমবন্ধ হয়ে আসা আবহাওয়াব কোথাও আশা করার মতো, ভালোবাসার মতো, ভালোবেসে বেঁচে থাকার মতো কিছুই প্রায় দেখানো হয়নি। কিন্তু চিত্রনাট্যগুলি পড়তে-পড়তে যখন আমাদের বুকের কাছে চাপ ধরে, নৈরাশ্যে, ব্যর্থতাবোধে, একাকিত্বে আমরা যন্ত্রণা পেতে থাকি, ঠিক তখুনি কোনো ঠাস-লেখায় আবৃত পৃষ্ঠার কোনায় একটি স্বল্প-পরিসর বন্ধনীর মধ্যে একটি বা দুটি মন্তব্য আমাদের আচমকা প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়, আমরা বুঝতে পারি পৃথিবীতে ভালোবাসার মতো এখনো কিছু আছে এবং বেঁচে থাকতে গেলে ভালোবাসার একান্ত প্রয়োজন। যেমন 'কাপুরুষ' চিত্রনাট্যের একটি পাতার পার্শ্বলেখনে এই মন্তব্য লক্ষ্যনীয় ঃ 'করুণার (মাধবী মুখোপাধ্যায়) চুলে কাঁধে বৃষ্টির জল-অল্প।' কিংবা 'করুণা দরজার একটা পাল্লা খুলে দেয়। তার গরম লাগছে।' আর একটি জায়গায়, 'করুণা জল খেয়েছে। ঠোঁটের দুপাশে লেগে থাকবে কি?'

এই তিনটি মন্তব্যের অভিঘাতে আমার কাছে অন্তত একটি দীর্ঘ বাতায়ন খুলে যায়। 'কাপুরুষ'-এর সমস্ত গল্পটি জুড়ে যখন সত্যজিৎ দুটি ভিন্ন-জাতীয় পুরুষের নৈতিক ও আত্মিক দারিদ্রের দিকটা আমাদের কাছে খুলে দিচ্ছেন, তখন প্রায় যেন নিজেরই অজান্তে তিনি করুণার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এবং আমাদেরও পাইয়ে দিচ্ছেন এমন এক ঐশ্বর্যের আভাস যা এই দুটি পুরুষের পৃথিবী থেকে একেবারে বিলুপ্ত। করুণা এসে দরজার একটা পাল্লা খুলে দেয়—তার প্রেমি .কর (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) ঘরের দরজার একটি পাল্লা কেননা তার গরম লাগছে, সে হাঁফিয়ে উঠেছে সত্যিকার বন্ধুতার জন্যে, ভালোবাসার জন্যে। কিন্তু তার স্বামী কিংবা তার প্রেমিকের মতো সেও কি ভিতরে-ভিতরে সাড়া দেবার সাহস বা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেনি, তার অন্তরের ঐশ্বর্য কি এখনো অক্ষত? 'করুণার চুলে কাঁধে বৃষ্টির জল' —এই একটি মাত্র মন্তব্যে করুণার অন্তরের ঐশ্বর্য, তার চরিত্রের লাবণ্য ও কমনীয়তাটি আভাসিত হয়। চুলে কাঁধে বৃষ্টির জল করুণা চরিত্রের কারুণ্যটুকুই যে শুধু ফুটিয়ে তোলে তা-ই না, আমাদের কাছে ঐ একটি মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে তার হৃদয়ের ভিজে-ভিজে অবস্থার ছোঁয়াচ এসে পৌঁছয়। আর জল খাওয়ার পর করুণার ঠোঁটের দু-পাশে জলের রেখা লেগে থাকবে কিনা? — এই আপাত-সামান্য প্রশ্নে সত্যজিতের সৌন্দর্য-চেতনার এমন একটি দিক আমাদের সামনে মুহূর্তে খুলে যায় যা হয়তো অনেক তর্ক-আলোচনাকে উপেক্ষা করে অনুদ্ঘাটিত

থাকতে পারতো। ঐ ঠোঁটের দুপাশে জল লেগে থাকার ধারণাটা শুধু যে নিছক বাস্তববোধ থেকে এসেছে তা-ই নয়। এ প্রশ্নের মধ্যে যে একটা ইন্দ্রিয়মগ্নতা আছে তাতে সন্দেহ নই। করুণা সুন্দরী কিনা সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু সত্যজিতের সব নারী চরিত্রের মতো তারও আবেদনটা লিরিকাল এবং সেনশুয়াস। ভিজে ঠোঁট এই জাতের আবেদনের একটি নির্ভুল অস্ত্র মাত্র। 'কাপুরুষ' ছবির অন্তিম দৃশ্যে যখন করুণার কাপুরুষ প্রেমিক তাকে দ্বিতীয়বার প্রত্যখ্যান করলো, তখন করুণা আঘাত পেল কিনা বুঝলাম না, কেননা সে স্টেশনে সত্যিই ঘুমের ওষুধের শিশিটি ফিরিয়ে নেবার জন্যে এসেছিলো, না প্রেমিকের সঙ্গে স্বামীকে ছেড়ে ঘর ভেঙে চলে যাবার জন্যে এসেছিলো এই চূড়ান্ত প্রশ্নটির কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। কিন্তু গল্পের এই অন্তিম অ্যামবিভ্যালেনসটি তাৎপর্যময়, কেননা এটাই করুণার চরিত্রে বিচিত্র সম্ভাবনার একটি সম্ভাব্য আয়তন এনে দেয়। এবং সত্যজিৎ রায়ের মহিলা-বিষয়ক ভাবনার এটি নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ দিক। পুরুষদের বিষয়ে তাদের ধারণার সবটুকু তারা কখনই ব্যক্ত করে না। আসলে এ-কথা বললেও ভুল হবে না যে সত্যজিতের ভাবনার একটি বৃহৎ স্থান নিয়ে আছে চাপা স্বভাবের ইনট্রোভার্ট মেয়েরা। কেননা তাদের চাপা স্বভাবটা আসছে তাদের সাহস ও মানসিক সংহতি থেকে, যেটা পুরুষের মধ্যে ঠিক তুল্য পরিমাণে বিরল।

সত্যজিতের ভাবনায় মেয়েদের যেদিকটার আকর্ষণ সবচেয়ে জোরালো—তাদের সাহস, সততা ও মানসিক দৃঢ়তার দিকটা—সেটা 'মহানগর' ছবির আরতির (মাধবী) চরিত্রে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। চিত্রনাট্যের এককোণে একটি পার্শ্বলেখন আমায় চমকে দিলো। মন্তব্যটি আরতির স্বামী সুব্রতর (অনিল চট্টোপাধ্যায়) ছোট বোন বাণী (জয়া ভাদুড়ি) সম্পর্কে। সত্যজিৎ লিখছেন, 'ঝগড়ার সময় বাণী পিন্টুকে (সুব্রত-আরতির পুত্র) সরিয়ে নিয়ে যায়।' বাণীর নিজের বয়সই অল্প, সে নিজে এখনো ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেনি। এবং তাব বয়েস অল্প বলেই এই মন্তব্যের তাৎপর্যটা আমাদের কাছে আরো বেড়ে যায়। কেননা আমরা বুঝতে পারি মেয়েদের মধ্যে প্রোটেক্ট করার, আশ্রয় দেবার প্রবণতা প্রায় ইনসটিংটিভ, ওটা বয়েস বা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। এবং সত্যজিতের ভাবনায় এটাই মেয়েদের বন্ধুতা আর প্রেমের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞান। মনে করে দেখুন, সত্যজিতের ছবির প্রায় প্রতিটি নারী চরিত্রের মধ্যে অল্পবিস্তর এই প্রোটেকটিভ ইনসটিংক্টটা আছে। যে-দুটি চরিত্রে এই দিকটাই সবচেয়ে বড় হয়ে এসে আমাদের মুগ্ধ করে তারা হলো 'নায়ক' ছবির অদিতি (শর্মিলা ঠাকুর) ও 'সীমাবদ্ধ' ছবির টুটুল (শর্মিলা)।

এখানে 'নায়ক' ছবিটির চিত্রনাট্য থেকে খানিকটা উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে, কেননা মেয়েদের বন্ধুতা বলতে সত্যজিৎ ঠিক কি বোঝেন, তার আবেদন এবং সৌন্দর্যটা ঠিক কোথায় সেটা ঐভাবে পরিষ্কার হতে পারে ঃ

অরিন্দম ঃ কোথায় যেন একটা ফাঁক, একটা অভাববোধ.....

অদিতি ঃ কেন?

অরিন্দম ঃ মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না। আপনি তো আর আমাদের লাইনে আসবেন না।

অদিতি ঃ তা আসব না। জানেন, আমাদের জগতটাই আলাদা। আমরা ট্রামে বাসে

চড়ি, রাস্তায় ঘাটে ঘোরাফেরা করি.......

দুজনে পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। অরিন্দমের চাহনিতে এখন ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই। অদিতির দৃষ্টিতে রয়েছে একটা সহজ সংবেদনশীল সৌহার্দ্য।

অরিন্দম ঃ পর পর তিনটি ছবি মার খেলেই কিন্তু আমিও ওজগতে ফিরে যেতে পারি।

অদিতি ঃ তা হবে না। নিশ্চয়ই হবে না। আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন। অনেকদিন। আপনার বাজার ঠিকই থাকবে।

অরিন্দম মৃদু হাসে।

অদিতির ব্যাগ খোলাই ছিল, সে তার ভিতর থেকে একতাড়া কাগজ বার করে।

অদিতি ঃ আপনার ইন্টারভিউ.....

অদিতি কাগজগুলো একসঙ্গে কুণ্ডলী পাকিয়ে সামনে রাখা জলের গেলাসের ভিতর গুঁজে দেয়।

অরিন্দম ঃ ওকি। আপনি কি মন থেকে লিখবেন নাকি?

অদিতি ঃ মনে রেখে দেব। চলি।

বন্ধুতা, প্রেম ও মহিলাদের প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের ভাবনাগুলি রোম্যান্টিকতাকে কতদূর প্রশ্রয় দেয় সে-প্রসঙ্গে তাঁকেই সরাসরি প্রশ্ন না করে শেষ পর্যন্ত পারিনি। উত্তরে বললেন, 'হয়তো তুমি ঠিকই বলছো, মহিলাদের বিষয়ে আমার ধারণাটা শেষ পর্যন্ত রোম্যান্টিক-ই হয়তো। সেই কারণেই আমার অধিকাংশ ছবিতে মূল কাহিনী থেকে তাদের আমি একটু সরিয়ে রাখি। তার মানে এই নয় যে তারা গল্পের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। আমি পুরুষদের সঙ্গে তাদের মূল পার্থক্যটা দেখাতে চাই। পুরুষদের কাজের পরিধিটা অনেক বড়, তাদের কমিটমেন্টস, ইনভলভমেন্টস অনেক বেশি। পুরুষদের কাজের জগৎ থেকে মেয়েরা স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন। সুতরাং মেয়েদের মধ্যে—অন্তত আমার ছবিতে আমি যে-সব মেয়েদের এনেছি তাদের মধ্যে—একটা নির্লিপ্তি, একটা ডিট্যাচমেন্ট আছে। মেয়েদের ঐভাবে একা, নিঃসঙ্গ, আত্মমগ্নরূপে ভাবতে আমার ভালো লাগে। তাতে মেয়েদের চরিত্রে শক্তি আর সৌন্দর্যের দিকটা আমি সহজে বুঝতে পারি। আমার মনে হয় মেয়েদের মনের জোরটা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি, তাদের এক ধরনের সততা বা ইনটিগ্রিটি আছে যেটা পুরুষদের মধ্যে সচরাচর পাওয়া যায় না। এবং বলতে পারো মেয়েদের মনের ঐশ্বর্য আমাকে মুগ্ধ করে। সেজন্যে দেখবে আমার ছবিতে মেয়েদের সঞ্চরণ কাজের জগতের চেয়ে ভাবনার জগতে অনেক বেশি। তাদের আমি কাজের একটা প্রসেস অফ ইনটেকলেকশন-এর মধ্যে দিয়ে দেখাই। অর্থাৎ তাদের মনটা আমায় ফ্যাসিনেট করে এবং সেটাকে নানা দিক থেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করি।'

'মহানগর' ছবির চিত্রনাট্যে আরো দুটি মার্জিনাল লেখনের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমটি হলো, 'বাণী মাটিতে শোয়।' দ্বিতীয়টি, 'পরের দিকে আরতি ঘুমুচ্ছে, সুব্রতর ঘুম নেই।' বাণী মাটিতে শোয়—এই ছোট্ট উক্তিটির মধ্যে ঐ ছোট্ট মেয়ের ত্যাগের দিকটা বোঝা গেল। তার মাটিতে শোবার কারণ সে অন্যদের জায়গা

ছেড়ে দিয়েছে এবং তার কাছে এই কাজটা এতো স্বাভাবিক যে সেজন্যে তার মধ্যে কোনো দুঃখবোধ বা পরশ্রীকাতরতা নেই। কিন্তু বাণীর এই ক্ষুদ্র মহত্ত্ব, এই আপাত-সামান্য স্বার্থ ত্যাগ সত্যজিৎকে এতোটাই মুগ্ধ করলো যে বাণী মাটিতে শোয় এই খবরটি তাঁর দর্শকদের কাছে আলাদা করে পৌঁছে দেবার তাগিদ অনুভব করলেন।

এই ছোট্ট ঘটনায় সত্যজিতের ধারণায় মেয়েদের জায়গাটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়। তিনি বাণীর ত্যাগের দিকটা দেখালেন, কিন্তু সেটাকে চিরাচরিত বাঙালী পুরুষের প্রথায় সেন্‌টিমেনট্যালাইজ করলেন না। ছোট্ট মেয়ের মানসিক দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় পেলাম আমরা, বয়েসে ছোটো হয়েও সে যে ভেতর-ভেতর অনেক বড় হয়ে উঠেছে সে-কথা বুঝতে পারলাম, কিন্তু কোথাও এই ঋজু রেখার স্বল্প-পরিসর চরিত্রায়ণ ভাবালুতায় ঝাপসা বা অবিশ্বাস্য হয়ে উঠলো না। এর থেকে দুটো জিনিস পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রথমত, মহিলা-প্রাসঙ্গিক ভাবনায় সত্যজিৎ বাঙালী-পুরুষের সেনটিমেন্ট্যালিটিকে এড়িয়ে চলেন। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের বিষয়ে ভাবালুতা তিনি পরিহার করতে পারেন, তার কারণ তিনি মেয়েদের কখনই কৃপার বা করুণার দৃষ্টিতে দেখেন না।

তাঁর নিজের উক্তিতে, 'দৈহিক শক্তিতে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে নিশ্চয় দুর্বল। কিন্তু বুদ্ধিতে কিংবা মানসিক শক্তিতে তারা কোনো ভাবে পুরুষদের চেয়ে কম নয়। সুতরাং আমি শেষ পর্যন্ত মেয়েদের প্রতি বিশ্বাস হারাতে পারি না। পুরুষদের চেয়ে তারা অনেক বেশি যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করতে পারে।' মেয়েদের মানসিক শক্তিকে সত্যজিৎ এমনি অকপটে স্বীকার করেন বলেই মেয়েদের প্রসঙ্গে তাঁর পক্ষে ভাবালু হয়ে ওঠার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

মেয়েদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি যে বাঙালী মধ্যবিত্ততায় আক্রান্ত নয় সেটা সহজেই বোঝা যায়। সত্যজিৎ যে মেয়েদের সেনটিমেন্টালাইজ করছেন না এখানেই অধিকাংশ বাঙালী চলচ্চিত্র-পরিচালকের সঙ্গে তাঁর মূল পার্থক্য। তাঁর ধারণায় মেয়েদের বন্ধুতা, প্রেমের রূপটা শরৎচন্দ্র-পুষ্ট ধারণার সঙ্গে মেলে না। এবং মেলে না বলেই তাঁর ছবির মেয়েরা বাংলা-চলচ্চিত্রের সাধারণ নারী চরিত্রগুলির তুলনায় একেবারে অন্য জাতের, কেননা বাংলা সাহিত্যের মেয়েরা শরৎচন্দ্রীয় ছাঁচে ঢালা না হলেও, আজও বাংলা-চলচ্চিত্রের মেয়েরা কম-বেশি সেই আদর্শে আশ্রিত। বাংলা ছায়াছবিতে সাজে-কথায়-গানে আর প্রেম করার ঢঙে মেয়েদের আধুনিক উগ্রতা আমাদের মাঝে মধ্যে হয়তো প্রবাক করে দেয়, কিন্তু এই আধুনিকতা কখনো তাদের মূল্যবোধের শিকড় ছুঁয়ে সেখানে পুষ্টি যোগায় না। ফলে একদিকে যেমন বাংলা-চলচ্চিত্রে মেয়েদের আধুনিকতার একটা মেকী রূপ ধরা পড়ে, অন্যধারে তেমনি সেই অলীক আধুনিকতার রঙচঙে বোতলে পুরোনো সেনটিমেন্টাল মদ ঢালতেও পরিচালকের বাধে না। এবং ছবির পর ছবি দেখতে-দেখতে আমাদের ধারনা হয় যে বাঙালী-মেয়ের-আধুনিকতা মানে প্রগলভতা, বাচালতা,বুদ্ধিহীন ভাবালুতা, নিজের পছন্দমত ছেলেটিকে বিয়ে করার জন্যে বাবা-মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (সে কিন্তু আর কোনো ব্যাপারে কনভেনশন ভাঙতে কখনো চেষ্টা করে না), 'প্রেম করেছি বেশ করেছি' বলে নিতম্ব দুলিয়ে চিৎকার করা এবং সবশেষে সেই নিতান্ত পুরোনো প্রথায় একটা বিয়ে করে ফেলা।

এসব মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গিতে, জীবনবোধে (থুড়ি, জীবনবোধ বলেই কিছু নেই

এদের) কোথাও সত্যিকারের আধুনিকতার পরিচয় নেই। যেমন, তাদের সোশিওইকনমিক কনশাসনেস বলে কিছু নেই। এ-বস্তুটি অবশ্য বাংলা-ছবির নায়কেরও কদাচিৎ থাকে। তারপর ধরুন, প্রেম করার ব্যাপারটা ছাড়া আর সবক্ষেত্রে তাদের রিঅ্যাকশনস্ বা প্রতিক্রিয়াগুলো খুব কনভেনশানাল। এবং সর্বোপরি পুরুষদের সঙ্গে তাদের প্রেম বা বন্ধুতার সম্পর্কের মধ্যে দিয়েও তাদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রথমত, মেয়েদের প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুতার নরম মৃদু অনুপুঙ্খগুলি কদাচিৎ বাঙালী পরিচালকের কল্পনায় ধরা পড়ে। বাংলা চলচ্চিত্রে কিছু নর-নারী রোকেট-এর মতো প্রেম করে, জড়াজড়ি করে, এই পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত, বাংলা চলচ্চিত্রের মেয়েরা সেকশুয়ালি খুব নাঈভ—তারা কখনই পুরুষদের খুব গভীরভাবে বোঝে না, ভালোবাসে না, বন্ধুতা দেয় না এবং তাদের চরিত্রায়ণে পুরুষদের ভঙ্গুরতার পাশে মেয়েদের সাহসিকতা কখনই ধরা পড়ে না। এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে অধিকাংশ বাঙালী পরিচালকের ভাবনায় মেয়েদের রূপ। আশ্চর্যের বিষয় আমাদের দেশের আধুনিকারা এই স্থূল-আঁচড়ের ছবিটিকে বছরের পর বছর মেনে নিয়েছেন।

এখানে বাংলা-চলচ্চিত্রে কয়েকটি নারী-চরিত্রের কথা না বললে সত্যজিতের একক অভিঘাতে চলচ্চিত্রে মেয়েদের চরিত্রায়ণে যে ভূকম্পনটি ঘটলো তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যটা ঠিক বোঝা যাবে না। আগেই বলেছি বাংলা চলচ্চিত্রে মেয়েদের চরিত্রায়ণের মূল কাঠামোটা শরৎচন্দ্র করে দিয়ে গেছেন। তাঁর ষোড়শী, অচলা, পার্বতী, চন্দ্রমুখী, বড়দিদি, মেজদিদি, বিজয়া আর ভারতীর প্রভাব দূর বিস্তৃত। বাঙালী পরিচালক তাই চলচ্চিত্রে অধিকাংশ সময়ে মেয়েদের দুঃখ-জর্জর রূপটি দেখিয়েছেন। তারা পুরুষ-শাসিত সমাজে নিজেদের অস্তিত্বের ঔচিত্য সম্বন্ধে যেন নিজেরাই সন্দিহান। আর সেই কারণেই নিরন্তরভাবে পুরুষের কৃপা নিয়ে তারা বেঁচে থাকে। অপরদিকে, মেয়েদের বড় করার নামে চলচ্চিত্রেব পর চলচ্চিত্রে তাদের সেন্টিমেন্টালাইজ করা হয়েছে মাত্র। দেখানো হয়েছে সাংসারিক ব্রতপালনে তারা কেমন করে নীরবে সবছি সহ্য করে, সব সম্ভবপরতার সীমা ছাড়িয়ে দুর্বহ বোঝা কত সহজে তারা বয়ে নিয়ে চলে এবং মানুষিক দুর্বলতার কত অংশভাগী তারা। 'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এ আমরা দেখলাম গৃহস্থের ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে নারীর আত্মত্যাগ; 'রিক্তা', 'মায়ের প্রাণ', 'রাত্রির তপস্যা' প্রভৃতি ছবিতে পরিচিত হলাম সাংসারিক ঘূর্ণনে অসহায় নারীর সঙ্গে। 'জীবন সঙ্গিনী' ছবিতে নায়িকার মধ্যে কিছুটা আপোসহীন আত্মসচেতনতাও দেখলাম। কিন্তু রিক্তা থেকে রত্নদ্বীপ পর্যন্ত চলে এলে নারীচরিত্রায়ণের যে দিকটা আমাদের সবচেয়ে বিরক্তিকর মনে হয় সেটা হলো ভাবালুতার বাড়াবাড়ি। এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে মেয়েদের এই বড়-করে দেখানোর পিছনে পুরুষ পরিচালকের বদান্যতাটাই শেষপর্যন্ত বড় হয়ে দেখা দেয়। অর্থাৎ মেয়েদের চরিত্রায়ণে অধিকাংশ বাঙালী পরিচালক তাঁদের মধ্যবিত্ত কমপ্লেকস্ থেকে বেরিয়ে এসে দেখাতে পারেন না যে পুরুষেরা যেখানে সংশয়ী, মেয়েদের মনে সেখানে কেমন করে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই, পুরুষেরা যেখানে সবচেয়ে ভঙ্গুর, মেয়েরা হয়তো সেখানেই নিশ্চিন্ত ও নির্ভরযোগ্য, এবং পুরুষেরা যখন জাগতিক দায়িত্বের বোঝা বইতে বইতে আধ্যাত্মিকতায় একান্ত অপারগ, মেয়েরা তখনো তাদের প্রাত্যহিক ছোটো ছোটো দায়িত্বগুলি পালন করেও উন্মীলভাবে সচেতন।

সবচেয়ে জরুরী কথাটা হলো সত্যজিৎ রায়ের নারী-চরিত্রায়ণের মধ্যে মেয়েদের সম্পর্কে মধ্যবিত্ত বাঙালী কমপ্লেক্সটা নেই। সুতরাং মেয়েদের বড় করতে গিয়ে তিনি অযথা ভাবালু হয়ে ওঠেন না, কিংবা বদান্যতা দেখান না। প্রসঙ্গত তাঁর নারী চরিত্রগুলি সম্পর্কে মারী সীটন-এর উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত হতে পারে, 'সত্যজিৎ রায়ের নারী চরিত্রগুলির একটিকেও সরাসরি ফেমিনিস্ট বলা চলে না। কিন্তু ছবিগুলি দেখতে দেখতে আমরা আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করি কীভাবে ফেমিনিস্ট অ্যাটিটিউডটা গড়ে উঠেছে। আসলে সত্যজিতের পুরুষ এবং নারী চরিত্রগুলি সেই সহজাত সৃষ্টিশীলতা থেকে জন্ম নিয়েছে যেটা কোনোভাবেই পুরুষের সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স-এ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। ১৯৬১ সাল থেকে এই ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে বোঝা যায়। 'কাঞ্চনজঙঘায়' মণীষা চরিত্রে এই নতুন মোড় নেওয়াটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। তারপর 'অভিযান' ছবিতে গুলাবী তার নিজের কলঙ্কিত অতীত সত্ত্বেও নরসিংহকে পাপের পথ থেকে সরে আসবার অনুপ্রেরণা দেয়। 'মহানগর' ছবিতে আরতি একার সাহসে শেষপর্যন্ত যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তখন কিন্তু সে তার স্বামীকে মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার জন্যে পরিত্যাগ করে না। 'চারুলতা' তো এমন একটি সময়ের পটভূমিকায় তৈরি যখন সমস্ত পৃথিবীতেই মেয়েরা নিজেদের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা করছিলো। চারু স্বভাবতই গল্পের মধ্যে সাহিত্য রচনায় এবং ভালোবাসায় তার সাহসের পরিচয় দেয়। আর 'কাপুরুষ' ছবির যে-মেয়েটি একদা তার যৌবনে এক কাপুরুষ প্রেমিকের জন্যে সবকিছু ত্যাগ করতে চেয়েছিলো, সেই শেষপর্যন্ত আপাত-মধুর রোমানস্-এর লোভ সংবরণ করে তার নির্বোধ স্বামীর সঙ্গে বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দেবার সাহসী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যদিও এই স্বামীর সঙ্গে সহবাসে তার মাথা ধরে।'

মেয়েদের চরিত্রায়ণে যে সত্যজিৎ কোনোরকম কমপ্লেক্স-এ ভোগেন না সেটা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় তিনি যখন নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের উন্মোচনে সংকীর্ণ অর্থে নৈতিক হয়ে পড়েন না। দ্যাওরের সঙ্গে চারুলতার প্রেমের সম্পর্কটি তাঁর ছবিতে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসে, কিন্তু সেই সঙ্গে চারুর ওপর তিনি কোনো নৈতিক শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করেন না দেখে আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। আবার 'অরণ্যের-দিনরাত্রি' ছবিতে আমাদের সমাজে মেয়েদের সেক্সুয়াল স্টারভেশন-এর ফলে রিপ্রেশন-এর যে করুণ মূর্তিটা আচমকা চোখে পড়তে পারে সেটি একটি দৃশ্যে অসংকোচে ধরা দেয়। অথচ কোথাও তিনি অস্পষ্টভাবেও তিরস্কার করলেন না। আবার দৃশ্যটির মর্মস্পর্শী কারুণ্যে কোথাও সেনটিমেন্টালিটির ছোঁয়াটুকু পর্যন্ত লাগলো না। অহেতুক নৈতিকতা বা ভাবালুতা আমাদের সংবেদনকে অস্পষ্ট করে দেয় না বলেই আমরা এই দৃশ্যে রিপ্রেসড যৌনচেতনার এমন একটি ট্র্যাজিক অভিব্যক্তি দেখতে পাই, যা বাংলা ছবিতে আগে বা পরে কখনো দেখিনি।

এখানে একটা কথা জোরের সঙ্গে বলা প্রয়োজন। সত্যজিতের মূল নারীচরিত্রগুলি কখনোই উগ্রভাবে শরীরী নয়। তাদের সৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়স্পর্শিতা কিন্তু ইঙ্গিতে ইশারায় এবং ক্যামেরা-অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে অবশ্যই পৌঁছয়। কেমন মেয়েরা তাঁর ধারণায় সুন্দর?—এই প্রশ্নের উত্তরে সত্যজিৎ বললেন ঃ

'আমার ছবি থেকেই এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। আমার কাছে মেয়েদের

সৌন্দর্যের রূপটি মূলত ইন্‌টেলেকচুয়াল। এক ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্য-ও বলতে পার। অর্থাৎ আমার কাছে সৌন্দর্যটা পুরোপুরি দেহের ব্যপার নয়। বুদ্ধির সঙ্গে তার সম্পর্কটা গভীর। মেয়েদের যে গুণগুলো আমার বিশেষ ভালো লাগে সেগুলো হলো ইন্‌টেলিজেন্‌স্‌, গ্রেস আর সফিসটিকেশন। তার মানে এই নয় যে আমার ছবির সব মেয়েরাই কালচার্ড বা লেখাপড়া জানে। যেমন ধর, অভিযান-এ গুলাবী (ওহায়িদা রেহমান) কিংবা অরণ্যের দিনরাত্রি-তে ঐ সাঁওতাল মেয়েটি (সিমি), ওরা তো একেবারেই লেখাপড়া জানে না। ওদের মধ্যে কোনো রকম শহুরে সফিটিকেশন-ও নেই। কিন্তু ওদের ফিলিংসগুলো খাঁটি, জেনুয়িন। এবং ওরা যে ভাবে ভালোবাসা, প্রেম ঘৃণার প্রতি একেবারে স্বাভাবিকভাবে রেসপনস্‌ করে সেটা আমার খুব ইন্টারেসটিং মনে হয়। আর এই রেসপনস্‌-এর মধ্যেই ওদের চরিত্রের সৌন্দর্যটা প্রকাশিত হয়।

'আবার চারুলতার মতো মার্জিত, সেন্‌সিটিভ মেয়ের সৌন্দর্যের মূল ব্যপারটাও কিন্তু ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল। চারুর সৌন্দর্যের অনেকটাই তার মনের ঐশ্বর্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আমার ছবিতে চারুলতার মনটাকে যতোটা পেরেছি খুলে দিয়েছি। সেটা দেখাতে গিয়ে অমলের প্রতি তার অবৈধ প্রেমটাকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে হয়েছে। অমলের সঙ্গে চারুর ভালোবাসার সম্পর্কটা অসামাজিক। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই চারুর মনের ঐশ্বর্যটা প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং সেটাও আমার কাছে সুন্দর।

'আমার মনে হয় মেয়েদের সৌন্দর্যের অনেকটাই তাদের ধৈর্য আর সহনশীলতার মধ্যে ধরা দেয়। মেয়েদের প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুতার মধ্যে তাই আমি একটা বেসিক অনেষ্টি দেখতে পাই। মেয়েদের চেয়ে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পুরুষেরা অনেক বেশি ভঙ্গুর। সেখানে মেয়েরাই পুরুষকে প্রোটেক্ট করতে পারে। নারীর চেয়ে পুরুষের সামাজিক প্রতিপত্তি, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, দৈহিক শক্তি অনেক বেশি, অন্তত আমাদের সমাজে। সেক্ষেত্রে পুরুষ যে নারীকে প্রোটেক্ট করবে সেটা আমার কাছে খুব কিছু ইন্টারেস্টিং লাগে না। তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়কর মেয়েদের অন্তরের ঐশ্বর্য—যেখানে তার আসল সৌন্দর্য—যা দিয়ে সে পুরুষকে প্রোটেক্ট করতে পারে, অনুপ্রেরণা দিতে পারে।'

'নায়ক' ছবিটির নায়ক অরিন্দম ও নায়িকা অদিতির মধ্যে যে বন্ধুতা ও অস্ফুট প্রেমের সম্পর্কটি আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে সেটির চরিত্র-বিশ্লেষণ করে সত্যজিৎ মারী সীটনকে একদা একটি পত্র লেখেন। চিঠিতে নারী-পুরুষের প্রেম-ভালোবাসা-বন্ধুতা বিষয়ে সাধারণভাবে সত্যজিতের ধারণাটি স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। বঙ্গানুবাদে চিঠিটি এইরকম দাঁড়ায় ঃ

'ম্যাটিনি আইডল অরিন্দম ও অদিতি বলে ঐ মেয়েটির মধ্যে ট্রেনে যেতে যেতে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠুক এটা আমি চেয়েছিলাম। ঐ সময়টুকুর মধ্যে রোমান্স-এর কোনো সম্ভাবনা ছিলো না—কিন্তু আমি ওদের সম্পর্কের একটা চিত্তাকর্ষক ক্রমবিকাশ চাইছিলাম। মনে হলো, এক ধরনের অনীহা বা নিঃসাড়তা থেকে কিভাবে ওরা দুজন পরস্পরের প্রতি ক্রমশ সংবেদনশীল হয়ে পড়লো সেটা দেখাতে পারলে তার মধ্যে একটা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আছে। সুতরাং আমি অদিতিকে কিছুটা উন্নাসিক, যুক্তিবাদী, তার্কিক স্বভাবের করে সৃষ্টি করেছি যে ঐ চলচ্চিত্র-নায়কের সহজ ব্যবহারিক লাবণ্য,

দৈহিক সৌন্দর্য ও উদাসীন ঔদ্ধত্যের আবেদনে সহজে সাড়া দেয় না— অন্তত ততক্ষণ যতক্ষণ না সে বুঝতে পারছে এই পুরুষটি কোনো এক জায়গায় নিঃসঙ্গ, অসহায়, যার পক্ষে বন্ধুতার প্রয়োজন আছে। যে-মুহূর্ত থেকে এই মানুষটি নিজেকে অকপটে প্রকাশ করে মনের ভার হালকা করতে শুরু করলো তখন থেকেই অদিতি বুঝতে পারলো ঐ পুরুষটির ওপরের রূপটা দেখার আর কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা তার অন্তর্নিহিত জীবনের আভাস সে ইতিমধ্যে পেয়েছে। প্রথমে পুরুষটির প্রতি তার মনোযোগ একান্তভাবে সাংবাদিকের, কিন্তু কিছু পরেই অরিন্দমের স্বীকারোক্তি এমন একটি বিন্দুতে এসে পৌঁছয় যে অদিতি বুঝতে পারে এরপর সেটাকে সাংবাদিকতার কাজে লাগানো অনৈতিক হবে। অদিতির দিক থেকে এবার যেটা আসছে তা হলো সংবেদনশীলতা ও সাহায্য করার ইচ্ছে। ওদের দুজনের পারস্পরিক সম্পর্কটা হয়তো খুব গভীর নয়, কিন্তু একেবারে খাঁটি। অরিন্দমের তুলনায় অদিতি অনেক বেশি বিদগ্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের মধ্যে একটি স্বল্পপরিসর পারস্পরিকতা গড়ে উঠতে পারে অদিতিরই প্রচেষ্টায়।'

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অদিতির মধ্যে সেই গুণগুলি বর্তমান যার আবেদন সত্যজিতের কাছে সবচেয়ে বেশি। সে ভাবপ্রবণ, সেন্টিমেন্টাল কিংবা নির্বোধ নয়। সে যুক্তি দিয়ে বিচার করে, তলিয়ে দেখে, এবং বুদ্ধি দিয়ে সাড়া দেয়, ভাবালুতার বশবর্তী হয়ে নয়। তার চরিত্রের উচ্ছ্বাসহীন সংহতির মধ্যেই তার আধুনিকতা। বলা যেতে পারে অদিতির মধ্যেই বাংলা-চলচ্চিত্রের আধুনিক নারী তার সম্পূর্ণতা পেয়েছে। কিন্তু যে-কথাটা এখানে খুব প্রয়োজনীয় তা হলো অদিতির এই ভাবালুতাহীন অনুচ্ছ্বাস তার স্বভাবে কোনোভাবে কাঠিন্য বা শৈত্য এনে দেয়নি। ঠিক যেমন তার সাজ পোশাকের ঋজু কাঠিন্য তার সৌন্দর্যের নারীসুলভ নম্রতাকে নষ্ট করে না। সে আধুনিক হয়েও উগ্র নয়, বাচাল নয়, প্রগল্‌ভ নয়। তার বাংলা ইংরেজির ক্রাচে ভর দিয়ে চলে না। সে সিগারেট খায় না। ড্রিংক করে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'সীমাবদ্ধ'র সুদর্শনা আর একটি সত্যজিৎ-ধর্মী আধুনিকা যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব শ্যামলেন্দুর পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। 'সীমাবদ্ধ'র চিত্রনাট্যে একটি মার্জিনাল-মন্তব্যে সত্যজিৎ লিখছেন, 'শ্যামলেন্দু অ্যাভয়েডস ড্রিংকিং টু মাচ ফর দ্য সেক অফ সুদর্শনা।' এখানেই দোলনের সঙ্গে সুদর্শনার মূল পার্থক্য। কোমর দুলিয়ে সে একবারও গান করে না। এবং নিজের শরীরের অধিকাংশ আঢাকা রাখে না। অথচ অদিতির বন্ধুতা, সমবেদনা যেমন নির্বোধ উচ্ছ্বাসপ্রবণ নয়, ঠিক তেমনি তার ব্যবহারিক ঋজুতা তার নারীসুলভ লাবণ্যকে কোনোভাবে লুপ্ত করে দেয়নি। এবং সে-ই সত্যজিরে নারী প্রাসঙ্গিক ভাবনার একটি বড় আশ্রয়।

'সীমাবদ্ধ'র সুদর্শনার (টুটুল) সঙ্গে অদিতির চারিত্রিক নৈকট্যের কথাটা উল্লেখ করেছি বলেই ওদের মধ্যে মূল পার্থক্যটা কোথায় সেটাও বলা প্রয়োজন, কেননা সে ভাবেই সত্যজিতের নারী প্রাসঙ্গিক ভাবনার আর একটি দিক আমরা দেখতে পাব। 'নায়ক'-এর কাহিনীতে আমরা অরিন্দম আর অদিতির মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ বন্ধুতাকে গড়ে উঠতে দেখছি, যার মূলে আছে সংবেদনশীলতা, পরস্পরকে বুঝে নেবার ক্ষমতা। উল্টো দিকে 'সীমাবদ্ধ'র কাহিনীতে দেখছি কিভাবে শ্যামলেন্দু আর সুদর্শনার মধ্যে সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কিভাবে আস্তে-আস্তে কিছু অভিজ্ঞতা আর ঘটনার উন্মেষে

সুদর্শনা শ্যামলেন্দুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কেন এমন হচ্ছে সেটা বুঝতে পারবো যখন অরিন্দমের প্রতি অদিতির, আর শ্যামলেন্দুর প্রতি সুদর্শনার রেসপনস্-এর তফাতটা বুঝতে পারবো। অরিন্দম-বিষয়ে অদিতির ডিসিলিউশান্‌মেন্ট বা স্বপ্নভঙ্গের কিছু নেই। অরিন্দমের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় একটি দিল্লিগামী ট্রেনে এবং দিল্লি পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে এ কাহিনীর শেষ। চলতি পথে সে সমবেদনা ও বন্ধুতা দিয়ে নায়কের মুখোশের আড়ালে অরিন্দমের মধ্যে আসল মানুষটিকে আবিষ্কার করে মাত্র। অন্য ধারে 'সীমাবদ্ধ'র ছবি কাহিনী শুরু হওয়ার আগেই শ্যামলেন্দুর প্রতি সুদর্শনার শ্রদ্ধা, ভালবাসা কয়েকটি নির্ধারিত ধারণাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল যেগুলো শ্যামলেন্দুকে কিছু ঘটনার মধ্যে দিয়ে আবিষ্কারের উন্মেষে তার চোখে মিথ্যে প্রমাণিত হলো। অর্থাৎ অরিন্দম তার মিথ্যে-জগৎটা থেকে কিছুক্ষণের জন্যে পালিয়ে এলো বলেই নারীর বন্ধুত্বের মধ্যে আশ্রয় পেলো। অন্য ধারে শ্যামলেন্দু তার কাজের জগতের জমে-ওঠা মিথ্যের বোঝাটাকে কিছুতেই ঘাড় থেকে নামাতে পারলো না বলেই সত্যিকারের ভালোবাসা, প্রেম, বন্ধুতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। তার স্ত্রী দোলনের নির্বোধ মেনে নেয়ার মধ্যে তার তথাকথিত আশ্রয়টা হয়তো রইলো, কিন্তু সুদর্শনার মতো সংবেদনশীল মেয়ে তার কাছ থেকে চলে যেতে বাধ্য হলো। আর এটিও কিন্তু সত্যজিতের ভাবনায় মেয়েদের বন্ধুতার, ভালোবাসার আর একটি দিক।

'যে সব মেয়েরা খুব সেন্‌সিটিভ তাদের মধ্যে এমন একটা সততা, একটা ইন্‌টিগ্রিটি আছে যে তারা যখন ইমোশানালি ইন্‌ভলভ্‌ড হয়, তখন পুরুষের কাজেব জগতের হাজার নীচতা, স্বার্থপরতা তাদের আঘাত করতে থাকে এবং তারা ক্রমশ এলিয়েনেটেড্ হয়ে যায়। চারুলতাও তো তাই। সে তার স্বামীর কাজেব পৃথিবীতে ইন্‌ভল্‌ভড হতে পারলো না। যে সব মেয়েরা খুব সেনসিটিভ, বা চাপা, ইনট্রোভার্ট ধরনের, তারা কিন্তু এই কারণেই খুব নিঃসঙ্গ এবং পুরুষেব কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন। মেয়েদের আমার ওইভাবে দেখতে ভালো লাগে। ওদের মনের গভীরতাটা, সৌন্দর্যটা ঐ অবস্থায় সহজে বোঝা যায়,' বললেন সতজিৎ রায়।

আশ্চর্যের বিষয় যে মেয়েদের বন্ধুতা, ভালোবাসা, প্রেম প্রাসঙ্গিক সত্যজিতের এই দীর্ঘ ভাবনার তলানিটুকু পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই না তাঁর 'জন-অরণ্যে'। ভালোবাসা-বন্ধুতা-প্রেম ঃ না, স্বর্গীয়, সুরভিত ত্রয়ীর একটিও পলাতক ছায়া পর্যন্ত ফেলে না। কিংবা মাত্র একবাব প্রতারক প্রেমের হাস্যকর প্রহসন দেখি আমরা। আর ভালোবাসা-বন্ধুতার একটি ছোট্ট শ্যামলিম দ্বীপ আমরা আবিষ্কার করি সোমনাথ ও তার বউদির পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে। এর বাইরে এ-ছবিতে নারী শুধু আদি রসের উৎস। তবে কি সত্যজিৎ রায় শেষ পর্যন্ত এক বিশ্বজোড়া স্খলন ও অনৈতিকতার সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, বিশ্বাস হারাতে বাধ্য হলেন? এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ঃ

'জন-অরণ্য'কে এক ধরনের ব্ল্যাক কমেডি বলতে পারো, যার উদ্দেশ্য—আমাদের সমাজের দুর্নীতি ও নৈতিক স্খলনকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখানো। সুতরাং মেয়েদের বাদ দিয়ে তো সমাজটাকে দেখানো সম্ভব হতো না। আমি দেখিয়েছি যে এই পরিব্যাপ্ত দুর্নীতির শিকার মেয়েরাও। আমার দায়িত্বটা কিন্তু নীতিবাগিশের নয়। আমার ছবিতে

আমি যেমন নীতিকথা বলিনি, তেমনি আবার মেয়েদের স্খলনের কথা বলতে গিয়ে অযথা ভাবালু হয়ে পড়িনি। আমার ছবির একটা জরুরি কথা হল এই যে আজকের পৃথিবীতে টিঁকে থাকতে গেলে মূল্যবোধের পরিবর্তন প্রয়োজন। সুতরাং এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই যে নেহাৎ জীবনধারনের তাগিদে মেয়েরাও যদি তাদের মূল্যবোধ পরিবর্তনে বাধ্য হয়, তাহলে তাদের ঘাড়ে অনৈতিকতার দোষটা সম্পূর্ণ ভাবে চাপিয়ে দিলেই আমাদের কর্তব্য সম্পূর্ণ হবে। অন্তত তারা পুরুষদের চেয়ে অন্যায়টা বেশি করেনি। এবং তাদের বেলায় অহেতুক কঠোর হওয়ার কোনো কারণ নেই।

'যাই হোক, আমার কিন্তু মনে হয় না যে, আমার সাম্প্রতিক ছবি থেকে মেয়েদের প্রতি আমি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা হারিয়েছি এ-ধারনাটা করা ঠিক হবে। আমার মধ্যে একটা সিনিসিজম এসেছে—হয়তো এই পর্যন্ত বলতে পারো। কিন্তু মেয়েদের বিষয়ে আমার ধারনার আমূল পরিবর্তন হয়েছে ভাবাটা ভুল হবে। না, আমি মিসোজিনিস্ট হয়ে পড়িনি (হাসতে হাসতে), সে-অবস্থা থেকে এখনো অনেক দূরে আছি।

'মেয়েদের প্রতি আমি নিশ্চয় আমার বিশ্বাস হারাইনি। মেয়েদের সততা, সিন্‌সিয়ারিটিটা আমার কাছে এখনো খুব বড় বলে মনে হয়। তার প্রমাণ 'জন-অরণ্যে'ই পাবে। একটা ঘুণধরা সমাজে টিঁকে থাকতে গিয়ে তারা হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে, কিন্তু তখনো তাদের অনেকের মধ্যে একটা আশ্চর্য মানসিক জোর এবং এক ধরনের সততা রয়েই যাচ্ছে। যেমন ধরো, ঐ মেয়েটি যাকে সোমনাথ একটি সেক্স-স্টারভড্ প্রৌঢ় ব্যবসায়ীর কাছে একটা অর্ডার পাবার জন্যে নিয়ে যেতে যেতে ট্যাক্সিতে তার বন্ধুর বোন বলে চিনতে পারছে। এবং চিনতে পারার পর সে মেয়েটিকে নিয়ে ফিরে যেতে চাইছে। কিন্তু আসল কথাটা হলো সোমনাথ খুব জোরের সঙ্গে ফিরে যেতে চাইছে না। তার চরিত্রে সেই জোরটারই অভাব। অন্য ধারে মেয়েটি কিন্তু একবারও সেন্‌টিমেন্টাল হয়ে পড়ছে না। সোমনাথের মতো সামাজিক মর্যাদার কোনো প্রিটেন্‌শানস্ তার নেই। এখানেই তার সততা।

'আমার ছবিতে অবিশ্যি কল-গার্লস এবং বেশ্যারা কখনো কখনো গল্পের প্রয়োজনে এসেছে। সাধারণত বাংলা ছবিতে এ-ধরনের চরিত্রকে সেন্‌টিমেন্টালাইজ করা হয়। আমি সেটা করি না। তার মানে এই নয় যে, আমি খুব সিনিকাল। বলতে পারো, আমি বাস্তববাদী। কোনো মেয়ে যখন কল-গার্ল বা বেশ্যা হয়ে যায়, সে সব সময়ে যে দুঃসহ অভাব থেকে সেটা হচ্ছে তা কিন্তু নয়। সাইকোলজিকাল ও বায়োলজিকাল কারণেও তো একটি মেয়ে বেশ্যাবৃত্তিতে যেতে পারে। কোনো কোনো মেয়ের মানসিক গঠনই তাকে ঐ পথে নিয়ে যায়। এবং তাদের বুঝতে গেলে ঐ ভাবেই বুঝতে হবে, সেন্‌টিমেন্টালাইজ করলে চলবে না।

'জন-অরণ্যে' আমি আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের রূপটা দেখাতে চেয়েছি। এবং যতদূর সম্ভব সেন্টিমেন্টালিটি এড়িয়ে চলেছি। সুতরাং, তার মানে এই নয় যে, মেয়েদের মনের, তাদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক আজও আমায় করে না। আমি এখনো বিশ্বাস করি আমাদের চারপাশের মেয়েদের অনেকেই আমাদের ইমোশানালি বাঁচিয়ে রাখে। এবং 'জন-অরণ্যে'র পরেও তা-ই চারুলতার মতো ছবি করার সম্ভাবনাটা কোনোভাবেই লোপাট হয়ে যায়নি।'

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সমাজ বাস্তবতা

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিকদা, অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়ের সংগে আমার চাক্ষুষ পরিচয় সেই পাঁচের দশকে, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের কফি হাউসে। উনি যাঁদের সংগে আড্ডা দিতেন, তাঁদের মধ্যে দু একজন ছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম। আমি তাঁদের পাশে অনেক সময় একটা চেয়ারে প্রায় আত্মগোপনের ভঙ্গীতে ওঁদের আলোচনা শুনতাম উৎকর্ণ হয়ে; রাজনীতি থেকে জীবনানন্দ ঐ টেবিলে সব কিছুই আলোচনা হত বেশ দাপটে। তখন তার অনেক কিছুই বুঝতাম না তবে বোঝার উৎসাহে কখনও ভাঁটা পড়ত না। আরেকটা আকর্ষণ অবশ্যই ছিল, ঐ টেবিলে বসলে আমার কফির পয়সা লাগতোনা। সে ছিল এক অন্য যুগ। এখন যেমন ঐ কফি হাউসে রেসুড়ে আর ফাটকাবাজদের দৌরাত্ম্য, তখন ওটা ছিল পুরোপুরি বাংলার বুদ্ধিজীবীদের দখলে। ঐখানেই প্রথম দেখি শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলি, কলিম শরাফি, সমর সেন, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, ধরণী গোস্বামী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে। এখনকার বুদ্ধিজীবীদের সংগে তখনকার মানুষদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য ইদানিং বড় বেশী চোখে পড়ছিল প্রয়াত সত্যজিৎ রায়ের সদ্য সমাপ্ত একাধিক স্মরণসভায় যোগ দিতে গিয়ে। এখনকার অনেকেই মানিকদার কত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, কত বেশী ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল তার ফিরিস্তিতে বড় বেশী মুখর। কিন্তু তখন দেখেছিলাম তাঁরা নিজের কথা প্রায় বলতেনই না, বলতেন দেশের কথা, দেশবিভাগের বিপর্যয়ের কথা, বিশ্বের শিল্পসাহিত্যের অগ্রগতি বা পশ্চাৎপসরণের কথা।

যে সময়ের কথা বলছি তখন মানিকদার সংগে ব্যক্তিগত পরিচয়ের কোনো সুযোগ বা কারণ ঘটেনি। তারপর উনি 'পথের পাঁচালী' ছবি করে যখন জগৎজোড়া খ্যাতি ও পরিচিতি পেলেন তখন আমাদের লিটল থিয়েটারের তৎকালীন সভাপতি প্রয়াত সতীকান্ত গুহ-র উৎসাহ এবং উদ্যোগে আমরা স্থির করি 'পথের পাঁচালী' ছবির সংগে যুক্ত সকলকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবো। সেখানেই মানিকদার মুখে শুনি ঐ ছবি করার পিছনে কত রকমের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে।

বৈশিষ্ট্যহীনতাই যেখানে বাংলা ছায়াছবির একমাত্র বৈশিষ্ট্য সেখানে সত্যজিতের ছবি আমাদের কাছে মনে হয় যেন একতাল কাঁচা দগদগে জীবন। বাংলা চলচ্চিত্রে বাস্তবতার যে সংকট সেখানে মানিকদার ছবি যেন অনবরত টেনে নিয়ে যায় তার ঐতিহ্যের দিকে, তার শিকড়টাকে চিনিয়ে দেওয়ার এক আন্তরিক প্রচেষ্টায়। আত্মপরিচয়ের যে সংকট ক্রমশ বাংলা ছবিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে তাকে সব সময় ধরিয়ে দেওয়ার একত সচেতন প্রয়াস তাঁর প্রত্যেকটি ছবি। ১৯৪৮ সালে, নিজে ছবি করার অনেক আগে তিনি লিখলেন—

'এখনও পর্যন্ত কোনো ভারতীয় ছবি নেই যা আপাদমস্তক ভারতীয়। অন্যান্য দেশ যা করেছে, আমরা সে ব্যাপারে একটা প্রচেষ্টা করেছি বলা যায়, এবং তাও সব সময়

খুব সততার সংগে নয়।' (হোয়াট ইজ রং উইথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম) ভারতীয় চলচ্চিত্র কি হওয়া উচিৎ এ সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি হলো—'সিনেমার কাঁচা মাল হল খোদ জীবনটাই। একথা অবিশ্বাস্য যে দেশ এত অসংখ্য চিত্রকলা, সংগীত ও কবিতার প্রেরণা জুগিয়েছে তা ছবির নির্মাতাকে নাড়া দেবে না। যেটা দরকার সেটা হল চোখ কান খুলে রাখা।' (ঐ)

আমাদের চলচ্চিত্রের সংকট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখলেন ঃ 'সবার আগে আমাদের সিনেমার যেটা প্রয়োজন তা হলো একটা ষ্টাইল, একটা ইডিয়ম, সিনেমার এক ধরনের আইকনোগ্রাফি, যা একেবারেই, অদ্বিতীয়ভাবে; স্পষ্টভাবে ভারতীয়।'

'পথের পাঁচালী'র কবিতা তিনি সেলুলয়েডে ফুটিয়ে তোলেন, সেখানে ভারতীয় গ্রাম্য জীবনের জরাগ্রস্ত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায়, জমিদার মহাজনের শোষণ, উৎপীড়নের জাল ও তার অনুষঙ্গ নানা কুসংস্কারের কোনো পরিচয় আমরা পাই না। এ ছবি গ্রামীণ ভারতের সাধারণ বাস্তবতার প্রতিরূপ নয়। 'পথের পাঁচালী'র বাস্তবতায় সত্যজিৎ রায় কখনও রঙচঙে মোড়ক অমাদানি করেন না। মলিন রুক্ষতাকে ঢাকতে মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেন না।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি ছবির জন্য বেছে নেওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এখানে রয়েছে মানবতা, লিরিকধর্মিতা এবং সত্য; পাশাপাশি রয়েছে তুলনামূলক বৈপরীত্য—দৃশ্যগত ও আবেগগত; বড়লোক, গরীবলোক, হাসি, কান্না, গ্রামের সৌন্দর্য ও দারিদ্র্য। উপরন্তু দুটি অংশে রয়েছে দুটি মৃত্যুর ঘটনা—একজন চিত্রনাট্যকার এর বেশী কি দাবী করতে পারেন? এ ছবি করার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লেখেন...'আমাদের কাজের সূত্রপাত হবে...মাটি থেকে...নিজের দেশের জমি থেকে...অর্থাৎ শিল্পের শিকড় থাকবে নিজস্ব ভূমিতে।'

(এ লংটাইম অন দি লিটল রোড)

সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা ঐখানে—ঐটুকুই। তাঁর ছবিতে শিল্পীর শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থাৎ তিনি যে সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তা হলো ভারতীয় ও পশ্চিমী ঐতিহ্যের গাঢ় মিশ্রণ, এই ঐতিহ্য আরো উন্নত হয় ঠাকুর পরিবারের সান্নিধ্যে এবং তাঁর পিতৃপিতামহের সৃষ্টিশীল প্রতিভার মাধ্যমে। দুশো বছরে ভারতে যা কিছু প্রগতির চিহ্ন চোখে পড়ে তা হলো প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সচেতন সংমিশ্রণের ফল। কিন্তু এই সংশ্লেষ বা সমন্বয়ের ফল আপামর জনসাধারণের কপালে জোটেনি। এ দুয়ের টানাপোড়েনে, শিল্পী সাহিত্যিকরা বিশেষভাবে আত্মপরিচয়ের খোঁজে ধাবমান। এ সংকট সবচেয়ে বেশী প্রকট শিল্পসংস্কৃতিতে— বিশেষভাবে পশ্চিম থেকে আমদানি করা চলচ্চিত্র শিল্পে। নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের শিক্ষানবিশী ইউরোপে এবং বেশ কয়েকবছর তিনি প্যারিসে পাভলোভার-র সহশিল্পী ছিলেন; আধুনিক ভারতীয় থিয়েটার ব্যাপক অর্থে, ভঙ্গীগতভাবে পশ্চিমী থিয়েটারের চিন্তাপুষ্ট শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে লোকনাট্যের পাশাপাশি বিদেশী থিয়েটার প্রভাবিত ভারতীয় থিয়েটার সজীব রাখার প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য।

সিনেমা মূলত বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ফসল, যার বিকাশ ভারতে কখনই সম্ভব

ছিল না; ভারতীয় সিনেমা পশ্চিম থেকে আমদানি করা শিল্পোন্নত সমাজের প্রযুক্তিগত শিল্পমাধ্যম। সিনেমা এ দেশে ঐতিহ্যবাহী শিল্পমাধ্যম না হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এর শিকড় ছিল না। তাই শিল্পের ভাষা হিসেবে এর কোনো স্বীকৃতি ছিল না। পশ্চিমী অনুকরণেই এর নাড়ি সচল থাকে। সত্যজিতের আধুনিক পশ্চিমী মূল্যবোধের অভিজ্ঞতাই তাঁকে সিনেমা সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছে। ব্যবসায়িক হিন্দী সিনেমা সম্পর্কে তাঁর বিদ্রুপ, ভারতীয় নবতরঙ্গ সম্পর্কে তাঁর সংশয় ইত্যাদি থেকে তাঁর রুচি, মানসিকতা এবং ভালো ছবি বিচারের মাপকাঠির একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। —১৯৭১ সালে তাঁর 'অ্যান ইণ্ডিয়ান নিউ ওয়েভ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন ঃ '.....চলচ্চিত্রে আমাদের যে ধরনের আন্দোলন প্রয়োজন অবশ্যই তার লক্ষ্য হবে বর্তমান, ভবিষ্যৎ নয়। তাই চিত্রনির্মাতাকে অবশ্যই তৈরী থাকতে হবে সমষ্টির মন নিয়ে, সমষ্টির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে।' আবার ১৯৭৪ সালে 'ফোর অ্যান্ড এ কোয়ার্টার' প্রবন্ধে নতুন পরিচালকদের ছবি সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ দেখি 'গরম হাওয়া' ও 'অঙ্কুর' সম্পর্কে ; পাশাপাশি 'মায়াদর্পণ' ও 'দুভিধা' সম্পর্কে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন পরিচালকদের ছবিতে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ঔদাসীন্যের কারণে। এসব আলেচনা থেকে ভারতীয় ছবি বলতে কি ধরনের ছবি তাঁর প্রত্যাশা তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

বিভূতিভূষণের দু খণ্ডের উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিতের যে তিনটি ছবি সেখানে প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে, ঘটনা বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে; খুবই কাছ থেকে লক্ষ্য করে কিন্তু বাস্তবকে স্পর্শ করে না। তিনি বিভূতিভূষণের বাস্তবকে করে তোলেন অনেক ভয়াবহ, আরো সমসাময়িক ; পাশাপাশি বজায় রাখেন ঐ ঔপন্যাসিকের দৃষ্টির বিশুদ্ধতা।

'পথের পাঁচালী' হল প্রাক স্বাধীনতা যুগেব ইংবেজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলাব অর্থনৈতিক পটভূমিকায় একটি ব্রাহ্মণ পরিবাবের কাহিনী। হরিহর যজমানী করে জীবনধাবণ করে; এ গ্রামে তাঁর কাজ নেই কারণ গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের শিক্ষাব্যবস্থা নেই; যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে কেরাণীকুলের সৃষ্টি তাদের শিক্ষাব্যব্যস্থা শহরে। জমিদারী সেরেস্তায় আট টাকা মাইনে বা পুরুতগিরি যার সম্বল সেই হরিহর এ ধরনের অর্থনৈতিক অবস্থায় উদ্বৃত্ত শ্রেণীতে পরিণত। লর্ড কর্ণওয়ালিসের ভূমিব্যব্যস্থা মধ্যবিত্তকে শহরে পাঠিয়েছে, ভূমিহীন চাষীকে গ্রামছাড়া করেছে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে গফুর যে অর্থনৈতিক কারণে মেয়েকে নিয়ে চটকলে যেতে বাধ্য হল জীবিকার তাগিদে হরিহর সমাজবিজ্ঞানের সেই অমোঘ নিয়মে গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। সমাজবিজ্ঞানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান— নগরায়ণ; পথের পাঁচালীতে দেখি গ্রাম ও শহরের মধ্যে টানাপোড়েন, এখানে দেখতে পাই গ্রামের চৌহদ্দির বাইরে রয়েছে 'আশা'-র শহর।

বিভূতিভূষণের অপু আদর্শ নায়ক— একইসঙ্গে বাস্তব এবং বিমূর্ত ; সত্যজিতের অপু ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার গ্রাম থেকে বেনারস, তারপর কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে। এইভাবে সে হয়ে ওঠে সামাজিক পরিবর্তনেব ঘটনাপঞ্জীর সাক্ষী। ছকে বাঁধা প্রচলিত গল্পের মত 'পথের পাঁচালী'তে নায়ক, খলনায়ক, নায়িকা ইত্যাদির পদচারণা নেই; আছে শুধু মানুষ; প্রত্যেকেরই এই থাকাব পিছনে নিজস্ব যুক্তি

আছে। এ কাহিনীতে রয়েছে জীবনের এক অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা—লাভ, লোকসান, জন্ম, মৃত্যু—দুই-ই আছে। 'অপরাজিত' ছবির কাঠামোই হল অপুর গ্রাম ও শহরের মধ্যে যাতায়াতে; এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন সর্বজয়া—হরিহরের মৃত্যুতে যার সূত্রপাত, শেষ হয় সর্বজয়ার মৃত্যুতে। মা বৃথাই অপেক্ষা করে থাকেন অপুর প্রত্যাবর্তনের আশায়। 'অপরাজিত' ছবির গল্পটা মহাযুদ্ধের আগের সময়ের হলেও অপুর সংগে বৃহত্তর জগতের পরিচয়, মায়ের সঙ্গে ভালোবাসা-বিচ্ছিন্নতার জটিলতা, আধুনিক জীবনের সংকট ও মূর্তিকে ছুঁয়ে যায়, তাই অপরাজিত আমাদের কাছে আধুনিক।

অভিযান অবধি সত্যজিতের সব ছবিরই মুখ্যচরিত্র পুরুষ। জলসাঘর ছবিতে ঔপনিবেশিক সমাজে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র ও উঠতি বুর্জোয়ার মূল্যবোধের সংঘর্ষ। 'দেবী' ছবিতেও ঐ মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব যুক্তিবাদী বুর্জোয়ার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সামন্ত্রতান্ত্রিক ধর্মীয় কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব। আবার 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় দেখি পুরোনো অভিজাত উচ্চবিত্ত, যা বৃটিশ শাসনের ঔদার্যে সজীব ছিল তা ক্রমশ নবাগত মূল্যবোধের কাছে অস্তগামী। এই প্রত্যেকটি ছবিতে সত্যজিৎ একই সংগে দুটি জিনিস করেন; মানুষের পারস্পরিক ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি সেই বিশেষ সময়ের সামাজিক বাস্তবতাকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। এরই পাশাপাশি তাঁর পরবর্তী তিনটি ছবি মহানগর, চারুলতা, ও কাপুরুষে তাঁর মূল আগ্রহ নারী; এ নারী পুরুষের ছায়ামাত্র নয় বরং তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। মহানগর ছবিতে আমরা প্রথম এমন এক নারীর মুখোমুখি হই যে নিজেই নিজের জীবনের গতিপ্রকৃতি নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনী হিসেবে স্বাভাবিকভাবে এই জেগে ওঠার প্রেরণা আসে স্বামীর কাছ থেকে, কারণ প্রথাগতভাবে পুরুষ এখানে মুক্ত, নারী তার দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। সংসারের অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করার জন্য স্বামীই আরতিকে চাকুরির প্রস্তাব দেয়। আরতি স্বামীর এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সফল হয় ; বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের বৌয়ের, সংসারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার খাতিরে টাকা রোজগারের চেষ্টায় সংসারের বাইরে বৃহত্তর জগতে বেরুবার এ প্রচেষ্টা এক সংবেদনশীল অগ্রগতি। সত্যজিৎ রায় তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন ঃ '......সত্যিকার সচেতন চিত্রনির্মাতার কাছে, দীর্ঘকাল ফ্যান্টাসির জগতে নিজেকে গুটিয়ে রাখা যেতে পারে না। তাকে অবশ্যই সমসাময়িক বাস্তবের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে, ঘটনাসমূহকে বিচার করতে হবে, তার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতে হবে, বদলাতে হবে এবং সেখান থেকে সিনেমার উপযোগী উপাদান বেছে নিতে হবে।' (প্রবলেম্‌স অফ এ বেঙ্গল ফিল্‌মমেকার) 'মহানগরে' আরতির স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশ আরো বেশী ফুটে ওঠে যখন তার কর্তৃপক্ষ আরতির অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সহকর্মিনীকে মিথ্যা অজুহাতে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে, আরতি স্বাতন্ত্র্যবোধের চেতনায় পদত্যাগ করতে দ্বিধা করে না।—'মহানগর' হল মানুষের জীবনে নগরসভ্যতার প্রবেশে মানবিক সম্পর্কের জটিলতার ছবি।

'চারুলতা'র কাহিনী ঘটছে ১৮৭৯ সালে যখন বাংলার রেনেশাঁস আন্দোলন তার চরম পর্যায়ের দিকে ধাবমান। পশ্চিমী স্বাতন্ত্র্যবোধের যে প্রকাশ তা আমাদের নিস্তরংগ সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সবাই এ চিন্তায় অনুপ্রাণিত, ফলে সমাজ তাঁদের প্রেরণায় নতুন গতিশীলতা অর্জন করে। নারীমুক্তি

আলোচ্য বিষয় হলেও তা ব্যাপক নয়। চারু হলো ভারতীয় নারীর প্রতিমূর্তি যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে ভারসাম্যে বজায় রেখে চলেছে। চারুর মনে বাইরের ঢেউ এসে ধাক্কা দেয়। বাইরের জগৎ বদলে যাচ্ছে, চারুর বাড়ির বৈঠকখানায় ব্রিটেনের উদারনীতিবাদের জয়ের উৎসব পালিত হচ্ছে। রামমোহনের মতাদর্শ অপ্রতিহতভাবে নারীমুক্তির ঢেউ তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পের শেষে আমরা দেখি ভূপতি স্ত্রীকে তার যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে; সত্যজিৎ রায় বাস্তববাদী সমাধান হিসেবে ছবির শেষে তাদের পুনরায় কাছে আনেন দোদুল্যমান জীবনযাপন করতে। ছবিতে হঠাৎ ফ্রিজের মাধ্যমে তাদের গতি থেমে যায়—স্বামীস্ত্রীর মানসিক বিচ্ছেদ চিরন্তন হয়ে থাকে। 'মহানগর' ছবিতে আরতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে নিজের স্বাতন্ত্র্যের আস্বাদ পায়; 'চারুলতা'-য় অমল বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার মত এসে চারুর মনকে কেবল সাহিত্যের আনন্দের দিকে তার মন উন্মুক্ত করে না, তাকে তারুণ্য ও সাহচর্যের আস্বাদ দেয়। এ আস্বাদ চারু ভূপতির কাছ থেকে পেতে পারে না। দুটি ছবিতেই স্বামীরা চিন্তাগতভাবে আধুনিক কিন্তু বাস্তবে তাদের কাজের ফলাফল সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাদের উৎসাহ বা মদতে তাদের নিজেদের পারিবারিক স্থিতাবস্থা বানচাল হবে—নারীরা নিজের হাতে নিজের সুখ গড়ে তোলার আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ হবে এ সম্বন্ধে স্বামীরা অবহিত নয়।

'চারুলতা' পর্যন্ত সত্যজিতের ছবিতে সামাজিক তাৎপর্য এক সুস্পষ্ট মানবিক দৃষ্টিভংগী বজায় রাখে। কিন্তু সত্তরের দশক শিল্পীর কাছে এক নতুন মানদণ্ডের দাবি নিয়ে হাজির হয়। তাই 'অরণ্যের দিনরাত্রি' থেকে সত্যজিৎ তাঁর ছবিতে সময় ও কালকে যথাযথ অনুধাবন করার প্রচেষ্টায় ব্রতী হন।

এই দশকে শহরে জীবন নিয়ে সত্যজিতের তিনটি ছবি, ব্যবসা ও চাকুরীজগতকে ঘিরে গড়ে উঠছে—যেখানে তিনি মূল্যবোধের গভীর বিপর্যয় লক্ষ্য করেন। এ যুগের ছবির নায়করা, বিভূতিভূষণ, রবীন্দ্রনাথ, তারাশংকরের নায়কের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব ছবিতে সত্যজিৎ তাঁর নায়কদের সংগে কোনোভাবেই একাত্মতার অনুভূতি অনুভব করেন না, তিনি তাঁদের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাদের অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরতে চান।

১৯৭০ সালে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' মুক্তি পায়। '৬৭ সাল থেকেই পশ্চিমবংগের রাজনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যায় ফলে শহুরে জীবনযাত্রায় চরম নাড়া লাগে।

'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিতে দেখি চারটি যুবক ছুটি কাটাতে আসে পালামৌর অরণ্যে। এদের সামাজিক অবস্থিতির পরিচয়ে দেখি অসীম অবস্থাপন্ন অফিসার, সঞ্জয় লেবার অফিসার, শেখর জুয়াড়ি, হরি একজন খেলোয়াড়। এরা শহুরে মধ্যবিত্তের যে অংশের প্রতিনিধি সেখানে মূল্যবোধ অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের টানে বিপর্যস্ত। পালামৌ পৌঁছেই তারা অতিথিশালার চৌকিদারকে ঘুষ দিয়ে বশ করার চেষ্টা করে থাকার জায়গা পেতে; চৌকিদারের দারিদ্রের সুযোগ নেই, এবং তার চাকুরীর নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করে। লেবার অফিসার সঞ্জয় বলে—Thank God for corruption. এই চার যুবককে কোনোমতেই সমকালীন জীবনের প্রতিনিধি বলে গণ্য করা যায় না; তারা খবরের কাগজ পুড়িয়ে সাময়িকভাবে শহুরের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলে, কিন্তু তাদের

আলোচনা সীমিত থাকে আপিসের কর্তৃপক্ষ, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি, শুধু জানেনা বা মনে রাখেনা শহুরে সমকালীন জীবনের অস্থিরতার কথা। ছবিতে দুটি আদিবাসী চরিত্র লখা ও দুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো বাস্তব অরণ্য পটভূমি নেই। শহুরে যুবক হরি শেখর দুলির দিকে লোভের হাত প্রসারিত করে এবং দুলি অনায়াসে সে হাতছানিতে সাড়া দেয়। আদিবাসী মেয়েরা সমাজ ব্যবস্থার চাপে পণ্য হয়ে উঠেছে তাদের স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। অসীমদের শ্রেণীগত দুর্নীতির চেহারা আমরা চিনি—সে দুর্নীতি সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট মধ্যবিত্ত বাবুশ্রেণীর মূল্যবোধের পরিচয়। এ মূল্যবোধের অবক্ষয় নেই সত্যজিতের আগের ছবির নায়কদের মধ্যে। এর ফলে অসীমরা প্রকৃতির কোল থেকে পুনরায় ফিরে আসে শহরের জঙ্গলে—কোনো প্রাপ্তি ছাড়াই, শূণ্য হাতে। —সত্যজিতের এ যুগের ছবিতে নারীরা অনেক স্পষ্ট, বাস্তব। বিখ্যাত সমালোচিকা Pauline kael এ ছবির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ 'the most Pungent study of the cultural tragedy of imperialism the screen ever had'।

'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির পটভূমি কলকাতা; নায়ক সিদ্ধার্থ 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র চরিত্রদের মত কলকাতা থেকে সরে যায়নি, সে কলকাতার সংগে বাঁধা কিন্তু কলকাতায় থেকেও সে কলকাতার মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। সিদ্ধার্থর চারপাশেও মূল্যবোধের ভাঙন—বন্ধু আদিনাথ থেকে বোন সুতপা সবার মধ্যে। আদিনাথ রেডক্রশের চাঁদার বাক্স থেকে পয়সা বার করে নেয় সুতপা বড় সাহেবের অনুগ্রহ লাভের জন্য অনেক দূরে যেতে প্রস্তুত, নার্স যে সেবাশুশ্রূষার প্রতীক সে একজন দেহোপজীবিনী। এসবের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিদ্ধার্থ—এক বেকার যুবক। সিদ্ধার্থ শহর কলকাতার মানুষ কিন্তু প্রেমিকা কেয়াকে নিয়ে সুউচ্চ প্রাসাদোপম অট্টালিকার ছাদ থেকে কলকাতা শহরকে দেখে; অত উচ্চকোটি থেকে কলকাতাকে দেখলে তার প্রাণস্পন্দন অজ্ঞাত থাকতে বাধ্য। এক আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা ঔপনিবেশিক দেশের বিচ্ছিন্ন, শিক্ষিত মানুষের প্রতিনিধি। এই বিচ্ছিন্ন যুবকের প্রতিনিধি হিসেবে রোম্যান্টিসিজম্-এর কল্পনাবিলাসে আয়নার সামনে নিজেকে চে গুয়েভারা ভাবে; সুতপার আপিসের কর্তৃপক্ষের সামনে সিদ্ধার্থ নিজেকে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে বলে কল্পনা করে। ইন্টারভিউ বোর্ডের সব তছনছ করে যখন যে বেরিয়ে আসে সেটাও মধ্যবিত্তের রোম্যান্টিকতা কারণ ঐ প্রতিবাদের ফলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় কোনো আঘাত লাগে না। সিদ্ধার্থ কলকাতা ছেড়ে চাকরি নিয়ে চলে যায় বালুরঘাটে; ছবি শুরু হয় এক মৃত্যু দিয়ে, শেষ হয় রাম নাম সত্ হ্যায় দিয়ে। বিচ্ছিন্ন সিদ্ধার্থর কাছে মনে হয় মৃত্যুই একমাত্র সত্য। প্রতিদ্বন্দ্বী সম্বন্ধে সমালোচনায় প্রখ্যাত সমালোচিকা ভিলিস পাওয়েল বলেন—It is a political film—not a film about politics'।

'সীমাবদ্ধ' ছবির নায়ক উচ্চাকাঙ্ক্ষী শ্যামলেন্দু, কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের একজন হবার জন্য নিজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পণ্য করতে কুণ্ঠিত নয়। তার কলকাতার বহুতল প্রাসাদের আবাস থেকে আপাতদৃষ্টিতে ক'লকাতাকে শান্তিপূর্ণ বলে মনে হয়—শ্যামলেন্দু ব্যক্তিগত উন্নতির তাড়নায় প্ররোচনা সৃষ্টি করে কারখানায় গণ্ডগোল বাধিয়ে লকআউট করায়, শ্রমিকদের সর্বনাশ করে।

১৯৭৫ সালে 'জন অরণ্য' ছবিতে সরাসরি আক্রমণ করেছেন সত্যজিৎ।—এ ছবিতে তিনি মধবিত্ত শ্রেণীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে যে আবরণের প্রচেষ্টা তাকে যেন একটানে খুলে ফেলে তাদের নগ্ন চেহারা মেলে ধরেছেন। ছবিতে এ ঘটনা—সোমনাথ, সুকুমার, দ্বৈপায়ন, কণা—প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। এ ছবিতে মধ্যবিত্তের ভয়াবহ চেহারা আমাদের শ্বাসরোধের উপক্রম করে। এ ছবিতে নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ড পিতা দ্বৈপায়ন; তিনি বলেন নীতি ও প্রতিবাদের কথা; ফলে ছেলেদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার আদানপ্রদানে প্রাচীর গড়ে ওঠে।

'গণশত্রু' ছবির আখ্যানভাগ বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার ইবসেনের নাটক অবলম্বনে গড়ে উঠলেও বক্তব্যের দিক থেকে সত্যজিতের দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষবভাবে উল্লেখযোগ্য ইবসেনের নাটক রচিত হয় এমন এক যুগে যখন ইওরোপে বুর্জোয়া বিকাশের ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের উন্মেষ দেখা যায়। আজকের যুগে সত্যজিৎ রায় সেই একক ব্যক্তির ভূমিকাকে মুখ্য করে না দেখিয়ে ছবিব শেষে সমষ্টির প্রতিরোধের আভাষ দিয়ে সঠিক, সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর বহন কবেন। সর্বোপরি এ ছবিতে ধর্মও যে ব্যবসায়ীর হাতে ব্যবসার এক উপাদান তা তুলে ধরতে গিয়ে সমসাময়িক ভারতের মৌলবাদী রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। 'শাখাপ্রশাখা' ছবি তাঁর অতীত ছবির বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি হলেও, তিনি তাঁর সর্বশেষ ছবি 'আগন্তুক'-এ এই বিকৃত সভ্যতার প্রকৃত সংকটকে সুচারু ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন যা বোধকবি ভারত কেন বিশ্বের অন্যতম চিত্রপরিচালকদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই বিকৃত সভ্যতার খাঁজে খাঁজে যে যন্ত্রণা ও নিরর্থক রক্তস্রোত বয়ে গেছে তার চেতনা আমাদের শিহরিত করে। বর্তমান সভ্যতা জটিলত্বে ও মন্দের গভীরত্বে যে এত তীব্র 'আগন্তুক' ছবিতে সত্যজিতের হাতে তা আমাদের সকলের আর্তনাদ হিসেবে ফুটে ওঠে।

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা দুটি প্রচ্ছদ

হলিউডে যে তিনটি ছবি সত্যজিৎ করতে পারলেন না

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

১৯৫৮ সালে প্রথম হলিউডে যান সত্যজিৎ রায়। প্রথম দর্শনেই সত্যজিৎ আবিষ্কার করেছিলেন যে হলিউডের চরিত্র বদল হচ্ছে। হলিউড আর আরব্যোপন্যাসের বাগদাদ নয়। বরং অনেক বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাল মেলাবার চেষ্টা করছে সে। এর কারণ অবশ্যই টেলিভিশনের আবির্ভাব। এই নতুন মাধ্যমটির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে হলিউড যেমন একদিকে নিত্যনতুন কারিগরী উদ্ভাবন করছে, তেমনি আবার কম খরচে ছবি তোলার তাগিদে স্টুডিও ছেড়ে হলিউডের প্রযোজক, পরিচালকেরা বেরিয়ে পড়েছেন ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে। এইরকম একটা সময়ে হলিউডে গিয়ে সত্যজিৎ খুব একটা হলিউডের প্রেমে পড়েননি, বরং খানিকটা মজাই পেয়েছিলেন। যদিও এটা ঠিক সত্যজিৎ ছোটবেলা থেকেই ছিলেন হলিউডের ভক্ত। সত্যজিৎ রায় অবশ্য এই প্রসঙ্গে পরিষ্কারই বলেছেন, হলিউড ছবির যে জিনিসটা তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ছিল তা হল ছবির বহিরঙ্গের পালিশ, কাহিনী বা ট্রিটমেন্ট নয়। এই টান থেকেই সত্যজিৎ দেখতেন হলিউডের ছবি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছবি দেখার সুযোগও কলকাতায় তখন খুব একটা ছিল না।। ব্যাপারটা এতই সত্যি যে জাঁ রেনোয়া যখন রিভার ছবি তৈরি করার জন্যে কলকাতায় আসেন, সত্যজিৎ তার সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন রেনোয়া বলতে সত্যজিতের কাছে আমেরিকান রেনোয়াই। কেননা তখনও অবধি তিনি হলিউডে তৈরি রেনোয়ার ছবিগুলো ছাড়া রেনোয়ার ফরাসী ছবিগুলো দেখে ওঠার সুযোগ পাননি। সেই সুযোগ আসে সত্যজিতের কাছে রেনোয়ার ভারত ভ্রমণের ঠিক এক বছর পর ১৯৫০-এ। কেমার কোম্পানী তাঁকে ইউরোপ পাঠায়। সেই সময় তিনি সাড়ে চার মাসে ৯৯টি বিদেশী ছবি দেখেন, যেগুলো তথাকথিত হলিউডের ছবি নয়। যাই হোক, এসব গল্প প্রায় সকলেরই জানা। তবু অন্তত যে তিনটে ছবি সত্যজিৎ তৈরি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু করতে পারেননি, সেই তিনটি ছবির প্রসঙ্গে আসতে গেলে সত্যজিৎ ও হলিউড প্রসঙ্গে এইটুকু ভূমিকার প্রয়োজন ছিল। ক্রুফো, আন্তোনিওনি, পোলানস্কি, কুরোসাওয়া, আন্তর্জাতিক মানের এইসব পরিচালকই প্রবাসে হলিউডে ছবি করেছেন। সত্যজিতের ইচ্ছে ছিল হলিউড পালিশে অন্তত একটি ছবি করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি এই নিয়ে ভাবনাচিন্তাও করেছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনি এগিয়েছেনও অনেকদূর। কিন্তু নানা প্রতিকূলতার জন্যেই শেষ অবধি তাঁকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে।

চলচ্চিত্র পরিচালনা শুরু করার পর থেকেই সত্যজিতের স্বপ্ন ছিল 'মহাভারত'কে নিয়ে ছবি তৈরি করার। সেই স্বপ্ন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সত্যজিতের মধ্যে ছিল। তবে হলিউড ভ্রমণের সময়ই 'মহাভারত' করার চিন্তা সত্যজিতের মধ্যে রীতিমত মাথা

চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কেননা সত্যজিৎ ভেবেছিলেন মহাভারতের মত বিশাল ক্যানভাসের ছবি করতে হলে হলিউডের কারিগরী সাহায্য তাঁর একান্ত দরকার। কেননা পরিবর্তীকালে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি পরিষ্কারই বলেছেন, যদি তিনি মহাভারত করেন তবে তার ভাষা হবে বাংলা বা হিন্দি নয়, অবশ্যই ইংরাজি। আন্তর্জাতিক দর্শকদের জন্যেই তৈরি হবে তাঁর মহাভারত। 'অভিযান' ছবি তৈরি করার পর সত্যজিৎ 'মহাভারত' নিয়ে আবার ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। এডওয়ার্ড হ্যারিসনকে তিনি 'মহাভারত'-এর একটি মৌখিক খসড়াও শোনান। ঠিক ছিল দুটি পর্বে তৈরি হবে এই ছবিটি। 'মহাভারত'-এ অভিনয় করার জন্যে আকিরা কুরোসাওয়ার 'রশোমন' ছবির প্রধান অভিনেতা তোশিরো মিফুনের কথা ভাবাও হয়। ১৯৫৮ সালে এক চিঠিতে লেস্টার পেরিসকে তিনি জানান, তিনি এই মহাকাব্যটি বার বার পড়ছেন। তিনি মনে করেন এই মহাকাব্যটির মধ্যে চলচ্চিত্রগত যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। 'মহাভারত' ছবিটি সত্যজিৎ ভেবেছিলেন আধুনিক মনস্তত্ত্বগত মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই। তিনি বলেছেন, তিনি সমস্ত চরিত্র নিয়ে ছবি করতে যেতেন না। বেছে নিতেন বিশেষ কয়েকটি চরিত্র, যাঁদের কেন্দ্র করেই তৈরি হত সত্যজিতের 'মহাভারত'। পাশা খেলার দৃশ্যটি সত্যজিতকে ভীষণভাবে টেনেছিল। তিনি মনে করতেন, শুধু এই দৃশ্যটার মধ্যে দিয়েই মহাভারতের প্রধান অনেকগুলি চরিত্রেরই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব। কিন্তু 'মহাভারত' তৈরি হয় নি। হলিউড সত্যজিতের কাছে এগিয়ে আসে নি। এডওয়ার্ড হ্যারিসনের নীরবতার অর্থ সত্যজিতের বুঝতে অসুবিধা হয় নি। সত্যজিৎ 'অভিযান'-এর পর তৈরি করতে শুরু করেন 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'।

ই. এম. ফর্স্টারের 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' ছবি করার কথাও ভেবেছিলেন সত্যজিৎ। ১৯৬০ সাল থেকেই সত্যজিতের চলচ্চিত্র চিন্তায় দানা বেঁধেছিল 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'। হলিউডের বিভিন্ন মানুষজনের কাছ থেকে তিনি এই ছবি করার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহও পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বয়ং লেখক ই. এম. ফর্স্টার সত্যজিতের এই চিন্তায় একদমই উৎসাহ দেননি। ১৯৬৬ সালে ফর্স্টারের মৃত্যুর বছর তিনেক আগে সত্যজিৎ ও ফর্স্টারের মধ্যে এক আলোচনা হয়। ফর্স্টার সরাসরি সত্যজিতকে এই ছবি করবার ব্যাপারে নিরুৎসাহ করেন। ফর্স্টার মনে করেন 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'কে চলচ্চিত্র রূপ দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। লেখক ফর্স্টারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রিচার্ড মার্কোন্ড, যিনি সত্যজিতকে ফর্স্টারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, ফর্স্টারকে যথেষ্ট বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বৃদ্ধ তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল। লেখক ফর্স্টারের মৃত্যুর পর, ১৯৮০ সালে ফর্স্টারের সমস্ত গ্রন্থস্বত্ত্বের মালিক 'কিং কলেজ'-এর পক্ষ থেকে সত্যজিৎ এক চিঠি পান, যাতে তাকে 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'র ছবি করার জন্যে অনুরোধ জানান হয়। সত্যজিৎ এই চিঠির উত্তরে সরাসরি জানান, তিনি আর 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' সম্পর্কে আগ্রহী নন। সত্যজিৎ রায় তখন ব্যস্ত 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী' ছবির কাজে। এর আগেই অবশ্য মারী সিটনকে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানান,' 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'ছবি না করতে পেরে ভালই হয়েছে। কেননা আমি দেখেছি এই বইয়ের চরিত্রগুলোর মধ্যে ফিল্ডিংকে যত ভাল বুঝতে পারি, আজিজকে আমি ততটা পারি না।' পরবর্তীকালে 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' ছবি করেন ডেভিড লীন। তখন তিনি লীনের কাছে আজিজের চরিত্রের জন্যে ভিক্টর ব্যানার্জীর নাম সুপারিশ করেন। ভিক্টর তখন রায়ের 'ঘরে বাইরে' ছবিতে নিখিলেশের চরিত্রে

অভিনয় করবেন বলে পাকা কথা হয়ে রয়েছে।

'এলিয়েন' ছবি করার ব্যাপারে সত্যজিৎ যথেষ্ট আঘাত পান হলিউড থেকেই। 'এলিয়েন' ছবির চিত্রনাট্য লেখেন সত্যজিৎ ১৯৬৭-এ। 'এলিয়েন' ছবির কাহিনীর উৎস অবশ্যই ১৯৬২ সালে 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'। তবে 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' ও 'এলিয়েন'-এর কাহিনীগত অমিলও অনেক। বরং বেশিই। 'এলিয়েন' ছবির প্রধান চরিত্র হল এক অনাথ শিশু হাবা। তার আশেপাশে আরও যেসব চরিত্র রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী বাজোরিয়া, এক মার্কিন ইঞ্জিনীয়ার ডেভ্লিন ও সাংবাদিক মোহন। এক গ্রামে এসেছেন এরা। এই গ্রামেরই পদ্মপুকুরে এসে নামে এক ভিন্ন গ্রহের মহাকাশযান। সেই মহাকাশযান থেকেই নামে এলিয়েন, যার উদ্দেশে পৃথিবী থেকে নমুনা সংগ্রহ। এলিয়েনের সঙ্গে আলাপ হয় হাবার। এই নিয়েই 'এলিয়েন' ছবির চিত্রনাট্য। যা তিনি লেখেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থার সি ক্লার্কের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরেই। ১৯৬৪ সালে আর্থার সি ক্লার্কের সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে প্রথম সংযোগ হয় সত্যজিতের। শ্রীলঙ্কায় থাকেন আর্থার সি ক্লার্ক। সত্যজিৎ তাঁদের সায়েন্স ফিকশান ক্লাবের জন্যে শুভেচ্ছা বাণী চেয়ে পাঠান ক্লার্কের কাছে। ক্লার্কের সঙ্গে সত্যজিতের সেই বন্ধুত্বের শুরু। যা আরও ঘনিষ্ঠ চেহারা নেয় হলিউডে স্টানলি কুবরিকের 'স্পেস ওডিসি ২০০১' ছবির শুটিংয়ে, যা সত্যজিৎ দেখতে গিয়েছিলেন। '২০০১'-এর লেখক আর্থার সি ক্লার্কও ছিলেন সেখানে। এই ক্লার্কের মাধ্যমেই প্রযোজক কলিন উইলসনের সঙ্গে আলাপ হয় সত্যজিতের। 'এলিয়েন' ছবি প্রযোজনা করতে আগ্রহ দেখান উইলসন। ঠিক হয় হলিউডের কলোম্বিয়া পিক্চার্সের ব্যানারে ছবিটি প্রযোজনা করা হবে। কলোম্বিয়ায় উইলসন 'এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্য জমাও দেন। উইলসন এই বাবদ ৯০ হাজার ডলার পেলেও সত্যজিৎ কিন্তু এক পয়সাও পান না। কলোম্বিয়া সত্যজিতকে চিঠি দেয় ছবিটি প্রযোজনা করবেন বলে। সমস্ত ঠিক হয় ১৯৬৮ -এর জানুয়ারিতে বোলপুরে ছবিটির কাজ শুরু হবে। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী বাজোরিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করবেন পিটার সেলার্স। এই সময় আবার হলিউড যান সত্যজিৎ। আমেরিকায় রবিশঙ্করের বাড়িতে পিটার সেলার্সের সঙ্গে দেখা হয় সত্যজিতের। সেখানে পাকা কথাও হয়। কলোম্বিয়ার পক্ষ থেকে সত্যজিতকে তখন জানান হয়, তুমি এই ছবির জন্যে যত ইচ্ছে খরচা করতে পারো, তার জন্যে আমরা প্রস্তুত। এই ছবির স্পেশাল এফেক্টস-এর জন্যে মৌখিক চুক্তি করা হয় সলবাসের সঙ্গে। ডেভ্লিনের ভূমিকায় অভিনেতা হিসেবে ভাবা হয় মার্লোন ব্র্যাণ্ডোর নাম। সমস্ত যখন ঠিকঠাক, প্রযোজক কলিন উইলসন হঠাৎ পিছিয়ে যান। কলোম্বিয়ার পক্ষ থেকে অবশ্য তখনও জানান হয় তাঁরা এই ছবিটি প্রযোজনা করবে। তবে ৬৮-র জানুয়ারিতে শুটিং শুরু হয় না। ১৯৬৮-এর জুলাইয়ে হঠাৎ পিটার সেলার্সের কাছ থেকে একটা চিঠি পান সত্যজিৎ। তাতে সেলার্স জানান, বাজোরিয়ার ভূমিকাটি খুব ছোট, এটা আমায় ঠিক মানায় না। এর উত্তরে সত্যজিৎ কবিতায় পিটার সেলার্সকে এক চিঠি দেন। অনুবাদে যার মূল সুর ক্ষুণ্ণ হতে পারে মনে করেই, হুবহু চিঠি তুলে দেওয়া হল।

Dear Peter, if you had wanted a bigger part
why, you should have told me so right at the start.

By declaring it at this juncture
You have simply punctured.
The Alien ballon,
Which I can say will now be grounded soon
causing a great deal of dismay,
To Satyajit.

এসব যখন ঘটছে, কলম্বিয়া তখন শুধু সত্যজিতকে আশ্বাস বাণী দিয়ে যায় যে ছবিটি তারা করছে। 'এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্য কলোম্বিয়ার কাছে। সত্যজিতের চিত্রনাট্যে ছিল এলিয়েনের সমস্ত স্কেচ। ভিন্ন গ্রহবাসী এলিয়েনের চেহারা কেমন হওয়া উচিত তার সমস্ত ডিটেলস্। সেই চিত্রনাট্য সত্যজিতকে ফেরৎ দেওয়া হল না, পরিবর্তে শুধু আশ্বাস বাণী। সত্যজিৎ বসে থাকার লোক নন। তিনি এদিকে শুরু করে দিলেন 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'।

ইতিমধ্যে ১৯৭৭ সালে হলিউডে স্পিলবার্গ তৈরি করলেন 'ক্লোজ এন কাউন্টার অফ দি থার্ড কাইণ্ড।' যা দেখে চমকে উঠলেন মারী সিটন। যিনি 'এলিয়েন' -এর চিত্রনাট্য ও গোটা পরিকল্পনাটি জানতেন। মারী সিটন লিখলেন স্পিলবার্গের 'ক্লোজ এন কাউন্টার অফ দি থার্ড কাইণ্ড' দেখে আমরা সন্দেহ হয় পরিচালক স্পিলবার্গ নিশ্চয়ই সত্যজিৎ রায়ের 'এলিয়েন' ছবির চিত্রনাট্য, কলোম্বিয়ার কাছ থেকে দেখেছেন। স্পিলবার্গ সত্যজিতের চিত্রনাট্য থেকে অনেক কিছুই ব্যবহার করেছেন। ১৯৮০ সালে স্পিলবার্গ 'ক্লোজ এন কাউন্টারে'র আরেকটি সংস্করণ তৈরি করেন। যাতে সত্যজিতের চিত্রনাট্য থেকে আরও অনেক কিছুই ব্যবহার করা হয়। এরপর আসল ঘটনাটি ঘটে ১৯৮২-তে। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে স্পিলবার্গের নতুন একটি ছবি 'ই. টি.' দেখান হয়। সেখানে ছিলেন সস্ত্রীক সত্যজিৎ। যেটি দেখে চমকে ওঠেন সত্যজিৎ। তিনি আবিষ্কার করেন 'এলিয়েন' এর চিত্রনাট্য থেকে অনেক দৃশ্য ভাবনা, হুবহু তুলে নেওয়া হয়েছে। 'ই. টি.' আকৃতির মূল আইডিয়াটাও। সত্যজিৎ বুঝলেন আর কোনদিনই তিনি 'এলিয়েন' করতে পারবেন না। হলিউডের কাছ থেকে প্রতারিত তিনি। ১৯৮৪ সালে স্বয়ং আর্থার সি ক্লার্ক সত্যজিতকে সমর্থন করে এক প্রবন্ধ লেখেন 'লণ্ডন টাইমস'-এ। এই প্রবন্ধ পড়ে স্পিলবার্গ জানান, সত্যজিতকে বলবেন, 'এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্য যখন হলিউডের প্রযোজকদের হাতে তুলে দেন তখন আমি স্কুলের ছাত্র। কিন্তু যে কারণেই হোক 'ই. টি.' দেখে, একথা সকলেই বলবেন 'ই. টি' 'এলিয়েন'-রই সরাসরি অনুকরণ।

অন্তত এই তিনটি ছবি 'মহাভারত', 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' ও 'এলিয়েন' বিষয়ে সত্তজিতের যথেষ্ট ইচ্ছে থাকলেও তিনি তা করে উঠতে পারেন নি। এতে সত্যজিৎ রায়ের কোন্‌ও ক্ষতি হয়নি, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পৃথিবীর চলচ্চিত্রই।

একে অনেক

নবনীতা দেব সেন

সত্যজিতের সত্তর? শুনেই বলি : ধুত্তোর!
সত্যজিৎ তো চিরযুবক, বয়েস কে তাঁর গুনছে?
যা ইচ্ছে তাই বলে দিলেই গুলবাজি কে শুনছে?
কী করে হয় সত্তর, সত্যজিতের সত্তর?

সত্যি বলতে কি শ্রী সত্যজিৎ রায় আমাদের এক মহান এবং অদ্বিতীয় সমস্যা। তাঁকে আমরা প্রায় দেবতা বানিয়ে ফেলেছি, আর দেবতার তো বয়েস বাড়ে না। সত্যজিৎ রায়ের সত্তর বছর বয়েস হচ্ছে, এটা যেন মনে মনে ঠিক মানতে ইচ্ছে করছে না। আবার শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমাদের সত্যজিৎ দাপটে ('কী দাপট!') অন্তত একশো বছর বাঁচুন, এটাও ভাবতে খুবই ইচ্ছে করে। অনন্তকাল ধরে সমানভাবে কর্মক্ষম থেকে, হাসিখুশি মনে তিনি প্রোফেসর শংকু আর ফেলুদার কর্মকাণ্ড ফেঁদে চলুন, আর মনের সুখে নিত্যি নতুন চলচ্চিত্রীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান—এটাও তো প্রত্যেকটি শিক্ষিত বঙ্গসন্তানেরই মনে ইচ্ছে। সবারই মনে এক ইচ্ছে, কেননা সকলেই একটামাত্র লোককে নিয়ে জগৎ জুড়ে গর্ব করি। কুমিরছানার গপ্পোর মতন ওই তো একটাই ব্যক্তিত্বকে বারবার তুলে ধরি পৃথিবীর সামনে।

সেই সত্যজিতের সত্তর হল। বেশ। হলো তো হল। এত ধুমধাড়াক্কা করে মনে করিয়ে দেবার দরকারটা কী, তা তো বুঝি না। দুদ্দুর—সত্তর আবার শিল্পীর জীবনে একটা বয়েস? রবীন্দ্রনাথ, চ্যাপলিন, পিকাসো প্রত্যেকেই আশিতেও যুবক ছিলেন, সৃষ্টিশীল ছিলেন, আমাদের সত্যজিৎও থাকবেন। তবু, সত্তর নিয়ে হৈ চৈ বাধানো নশ্বর সত্যজিৎ তো নট নন যে দেহপটই তাঁর ম্যাজিকের উৎস। তাঁর ম্যাজিক মাথার মধ্যে। মাথার মধ্যে সত্তর বছরকে পৌঁছুতেই দেননি সত্যজিৎ রায়, কোনও শিল্পীই দেন না। কতরকমের সত্তরই তো দেখছি। সত্তরের কাছে পৌঁছুনোর আগেই দেখছি তরুণ তুর্কীদের খিটখিটে বৃদ্ধ হয়ে যেতে। আর আশির কাছে পৌঁছেও তরুণ শিল্পীকে দেখছি সাদা চুলদাড়ি নিয়ে খালিপায়ে দাপিয়ে বেড়াতে। সত্যজিৎ চিরদিনই আত্মস্থ, স্থিতধী, শান্ত। বিদ্রোহী রণক্লান্ত হওয়ার ধরনই তাঁর নয়। তিনি ঠিক সেইভাবে রণহুংকার ছেড়ে 'যুদ্ধ' করেন নি কোনওদিন। তাঁর শিল্পকে তিনি দ্বৈরথের মাঠ করে তোলেননি, বরং করেছেন ধ্যানের তপোবন, বা একটি উচ্চস্তরের ল্যাবরেটরি। যেখানে একটি তীক্ষ্ণ মেধাবী মানুষ নিজস্ব নিয়মমাফিক আপনমনে শিল্পের বিচিত্র ক্ষেত্রে সাহসী পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যান। চিত্রনাট্য তৈরিতে, ফোটোগ্রাফিতে, সঙ্গীত ব্যবহারে, অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাজসজ্জায়, মেকআপে, তাদের অভিনয়ের মাত্রা নির্দেশ করায়, বহিঃপ্রকৃতির ডিটেলে এবং অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার ডিটেলে সমানভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর দিয়ে, ক্যামেরা

ব্যবহারের নতুনত্বে, একসঙ্গে একশোটা দিকে নজর দিয়ে, আস্তে, আলতো হাতে, পুরনো খোসাটা ছাড়িয়ে ফেলে চলচ্চিত্রের এক নতুন রূপকে তিনি সাবধানে, ভালবাসার সঙ্গে বের করে এনেছেন একের পর একটা ছবিতে।

ভাঙায় নয়, গড়ার দিকেই তাঁর নজর। গড়তে গিয়ে আপনা আপনিই ভেঙে গেছে অনেক কিছু, যার দিন ফুরিয়েছে। ঝড়ের রাত্রে মৃত্যুদৃশ্যে প্রদীপ নিবু নিবু হয়েও নিবে যায় না, শোকের কান্নার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে করুণ বেহালা বাজে না। বরং মানুষের কান্নার পরিবর্তে শোনা যায় আর্ত তারসানাইয়ের তীব্র সুর। বিনা মেকআপে অভিনেতা অভিনেত্রীরা ক্যামেরার সামনে আসেন, ক্যামেরাতে চুনিবালার প্রতিটি বলিরেখা যেন কথা কয়ে ওঠে। পুকুরে জলফড়িঙের সেই প্রসিদ্ধ লাফ থেকে শুরু করে বনের মধ্যে ঢাকের ওপর একফোঁটা জল পড়ার সুরেলা শব্দ—প্রত্যেকটি নিখুঁত পরিকল্পনার মধ্যে তিনি আস্তে আস্তে বদলে দিয়েছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের মুখচ্ছবি। কিন্তু তাঁর স্টাইলটা চীৎকৃত নয়, বুক চাপড়ে চ্যালেঞ্জ জানানো নয়, নাকাড়া বাজিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা নয়।

তুলিতে, মলাট আঁকার জগতেও তিনি এমনই শান্তভাবেই রুচির পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। আর কলমেও তিনি যে অভিনবত্ব এনেছেন, তা এমনই নিঃশব্দে যে, খেয়ালই হয় না যে তিনি কোনও ঐতিহ্যকে ভেঙে গড়ছেন। হোম্‌স-ওয়াটসন, বিমল-কুমার, জয়ন্ত-মানিক, ব্যোমকেশ-অজিত— সর্বত্রই সমবয়সী যুবক-জুটির দেখা পাই। কিন্তু সহকারীটি বয়সে যুবক হলেও কার্যত বালকপ্রায়। কিন্তু তোপসের বেলায় সে ঠিক যা, তাই-ই। যুবক গোয়েন্দার এই প্রথম এল কিশোর সহকারী আর পুরো ঘটনাটা দেখা হতে লাগল সেই স্কুলপড়ুয়া চোদ্দ বছরের ছেলের চোখে। তাদের সঙ্গে জুটে গেলেন চল্লিশ বছরের লালমোহন গাঙ্গুলি। এমন অসমবয়সী তিনজনের দল আগে আমরা দেখিনি। বালক, যুবক, প্রৌঢ়। মানব জীবনের প্রায় সবটা জুড়েই বিছিয়ে আছে তিনজনে (আছেন এক বৃদ্ধ, এনসাইক্লোপিডিয়াও, অন্তরালে)। নেই শুধু কোনও নারী। ফেলুদা এবং অধ্যাপক শংকুর জগৎ নারীবিবর্জিত। আমার কাছে এটা একটা মস্ত ধাঁধা। সত্যজিতের চলচ্চিত্র প্রায়ই নারীকেন্দ্রিক (দৃষ্টিটা যদিও নিতান্তই পুরুষের) অথচ তাঁর সাহিত্যে কোনও নারীকে তিনি সৃষ্টি করেননি। কেন এমন? যাই হোক, গোয়েন্দা গল্পের তিনবয়সী তিনজনের মধ্যেই সত্যজিৎ কিছুটা করে নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছেন।

'জটায়ু' পেশায় গোয়েন্দাকাহিনী রচয়িতা, যদিও ফেলুদার গল্প শোনায় তোপসে। 'জটায়ু'র মধ্যে কি সত্যজিৎ নিজেকে নিয়েই একটু হাসিঠাট্টা করেননি? 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' কি 'ভ্যাঙ্কুভারের ভ্যামপায়ারের' চেয়ে কম? তোপসের লেখকের চোখ তো তাঁরই কাছে ধার করা। আর ফেলুদার (ভাল ছবিও আঁকে ফেলুদা, আর ইনডোর গেম্‌স খেলতে ভালবাসে, ঠিক সত্যজিতের মতো, আর গান বাজনাও খুব ভালো বোঝে!) মধ্যেও তো ঢুকে বসে আছেন খানিকটা। তোপসের মধ্যে যেমন সব ছোট ছেলেই নিজেকে দেখতে পায়, লালমোহনের মধ্যে আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত মাঝবয়সী বাঙালিরা আমাদের ভিতরের মুখের ছায়াটি দেখি। একটু ভীতু, একটু লোভী, একটু টেকো, মোটামুটি হার্মলেস। ফেলুদার মতো অলরাউণ্ডার 'হিরোয়িক হিরো'কেও দুপাশে জটায়ু আর তোপসেকে দিয়ে স্যাণ্ডুইচ বানিয়ে অনেকটাই বিশ্বাসযোগ্য ঘরোয়া করে

ফেলেছেন সত্যজিৎ। এখন জটায়ু-তোপসেকে বাদ দিলে ফেলুদাকে আর চেনা যাবে না। বাংলা গোয়েন্দাকাহিনীকে এই নতুন 'ত্রিমাত্রিক' ছাঁচে ফেলার কৃতিত্ব সত্যজিতের।

তাঁর সমস্ত কাজেই নিশ্ছিদ্র-মনোযোগ, ত্রুটিহীন-অনুপুঙ্খের দিকে নজর, জ্ঞান, বুদ্ধি, পরিশ্রম ও কল্পনার সুসমঞ্জস মিশ্রণের স্পষ্ট ছাপ। ক্ষেত্রটা যাই হোক, বিজ্ঞাপন বা মলাট, চিত্রনাট্য, বা সঙ্গীত পরিচালনা, গোয়েন্দা গল্প। বা চলচ্চিত্র নির্দেশনা। অতিরিক্ত আত্মসচেতন শিল্পী সত্যজিতের কাজের ধরনই অমনি নিখুঁত। দান্তের মতো 'জীবনের মধ্যপথে' পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি 'পথের পাঁচালী' উপস্থিত করেছিলেন। এখন তো এমন অবস্থা স্বদেশ আর বিদেশ থেকে যেখানে যার যা কিছু দেবার বস্তু ছিল, পুরস্কার-তকমা-ডিগ্রি-ডিপ্লোমা-মেডেল অ্যাওয়ার্ড সবাই সবকিছু নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে কলকাতাতে এসে সত্যজিৎ-এর যোগ্য হাতে তুলে দিয়ে তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে নিজেরা উদ্দীপ্ত হয়ে ফিরে যান। ফিল্মের দৌলতে তিনি ভারতের দোরে হাতি না হোক সোনারূপোর ভল্লুক বেঁধেছেন। কলকাতার দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে (বিদেশীদের তালিকায়) মাদার টেরিজা, আর সত্যজিৎ রায়কে গোনা হচ্ছে অনেকদিনই।

অবাক লাগে এত যশ এই দোর্দণ্ড প্রতিপত্তি পাবার পরেও সত্যজিতের সহজ আত্মস্থতা সামাজিক ব্যক্তিত্বকেও অসামান্য করে তুলছে। সারা পৃথিবীর এই প্রশ্রয়ে প্রশংসায় একটুও আত্মহারা হননি। এখনও টেলিফোন ডিরেক্টরিতে আনলিস্টেড নয় সত্যজিৎ রায়ের নাম। অথচ সিনেমা লাইনে চুনোপুঁটিরাও চটপট আনলিস্টেড হতে পছন্দ করেন। নিজের কাজের প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে? কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার জন্য নিজেকে লোকোত্তর প্রাণী বলে মনে করতে শুরু করেননি সত্যজিৎ। চেষ্টাকৃত কৃত্রিম দূরত্বের বেড়াজালে বন্দীও করেননি নিজেকে।

এবার সম্পাদক সত্যজিৎ রায়কে দেখি। এত বিখ্যাত এবং এত কর্মব্যস্ত হয়ে পড়লেও তিনি 'সন্দেশ' সম্পাদনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে যেভাবে জড়িয়ে রেখেছেন, এটা সত্যিই পরম আশ্চর্য। মাত্র দু-চার বছর আগেও পুজোর আগে, এবং বৈশাখ সংখ্যার আগে, নিজে ফোন তুলে লেখকদের অনুরোধ জানাতেন, 'লেখা দিতে হবে কিন্তু।' এত অসুস্থতার পরেও তিনি প্রতিটি লেখা নিজে পড়তেন, এবং সঙ্গের ছবি এঁকে দিতেন, যেগুলোতে ওঁর ইচ্ছে করত। সম্পাদকীয় সৌজন্যে তাঁর তুলনা হয় না।

একবার একটা রুশ রূপকথা অবলম্বনে গল্প দিয়েছিলাম 'সন্দেশে'। সম্পাদকের ফোন এল, 'বাবা য়াগা শব্দটা উচ্চারণ করতে ছোটদের হয়তো অসুবিধে হবে, 'বাবা ইয়াগা' লিখলে আপত্তি আছে?' এই সামান্য ই-কার যোগ করার জন্য কষ্ট করে লেখকের অনুমতি নেওয়ার যে সৌজন্যবোধ, এই সত্যজিৎ রায়ের বৈশিষ্ট্য। ওই মাসেই অন্য একটি ছোটদের কাগজে আমার একটি রূপকথার শিরোনাম পালটে দেওয়া হয়েছিল, আমাকে কিছুই না জানিয়ে। তাতে আমার গল্পের রসভঙ্গও হয়েছিল। ওই পরিবর্তনের প্রয়োজনটাও ঠিক বোঝা যায়নি। সম্পাদনার খেয়ালখুশি!

তরুণ কবি শিল্পীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি আছে সত্যজিতের। যখন হাতে সময় থাকে তখন তাদের সময় দেন, উৎসাহ দেন। উন্নাসিক, অহংকারী, অমিশুক বলে তাঁর সম্পর্কে ধারনা আছে, যেহেতু তাঁর শিল্পকর্ম উন্নাসিক, শিল্পের অহংকারে ভরা। অথচ

জয়ন্ত, শিশির, গৌতম ইত্যাদি অনেক ছেলেকেই আমি চিনি যাঁরা একপাতার লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক হিসেবেই তাঁর কাছে প্রশ্রয় পেয়েছে, অন্য কোনও পরিচয়ে নয়।

তুচ্ছ মেয়ে আমাকেই তো কত সহজে সস্নেহে পারিবারিক বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন ওঁরা দুজনে। মংকুদির আর আমার বিকট হাঁপানি আমাদের একটা মুখ্য যোগসূত্র অবশ্য। এত রকম-বেরকম অসুখ শরীরে পুষেও আমি কেমন করে এত লম্ফঝম্ফ করে বেড়াই এ নিয়ে ওঁদের দুজনের যেমন বিস্ময় তেমনি আহ্লাদ। আমার একা একা কুম্ভমেলায় যাওয়া, র‍্যাশনট্রাকে হিচ হাইক করে তাওয়াং যাওয়া, তেল কোম্পানির এরোপ্লেনে ফ্রি রাইড (হিচহাইকিং?) নিয়ে উত্তর মেরু ভ্রমণ, এই সব পাগলামির গল্প প্রত্যেক বার ঘুরে আসার পর যখন বলি, ধৈর্য ধরে বসে মন দিয়ে প্রশ্ন করে করে শুনেছেন সত্যজিৎ, আর হাসতে হাসতে বলেছেন : 'এই মেয়েটাকে আমার হিংসে হয়।' ওই কথাটি আমার জীবনে সবচেয়ে বড় কমপ্লিমেন্ট। বিশ্বসুদ্ধ লোক যে-মানুষটাকে অনাবিল হিংসে করে থাকে, সেই মানুষটি স্বয়ং ঠাট্টা করে হলেও আমাকে তো হিংসে করেছেন বাপু? হলই বা তা স্রেফ উড়নচণ্ডেপনার 'গুণে'?

মজা হয়েছিল আমার বাবার একশো বছরের জন্মদিনে, যখন সত্যজিৎ নত হয়ে আমার মাকে নমস্কার জানালেন। মায়ের বয়স তখন পঁচাশি, দুই চোখে ছানি পড়ছে। মা বললেন, 'এই ছেলেটি কে খুকু? চিনতে পারলুম না তো?' ১৯৮৮তে কলকাতা শহরে সত্যজিৎ রায়কে কেউ 'এই ছেলেটি' বলে উল্লেখ করবে, এবং মোটে চিনতেই পারবে না, এই দুটি ঘটনাই বাস্তবে প্রায় অবিশ্বাস্য। আমি তো লজ্জায় মরে যাচ্ছি। নামটা বলতেই মা একগাল হেসে সত্যজিতের হাতদুটি সস্নেহে ছোট ছেলের মতো করেই নিজের হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন— 'ওমা, তুমি অমুকদির ছেলে? তোমার মা অতি মহৎ মানুষ ছিলেন, তাঁর মতো গুণী আর সাহসী মহিলা খুব কমই দেখেছি। জানো, আমরা ছেলেবেলায় তাঁর কাছে এমব্রয়ডারি শিখতে যেতুম?'—তারপরে, হঠাৎই বোধ হয় বর্তমান ব্যক্তিটির আরেকটি পরিচয় মনে পড়ে গেল মার তখন,—'আর তুমি তো বাবা আমাদের দেশের গৌরব'— ইত্যাদি। সেই মুহূর্তে, যখন 'তরুণ' সত্যজিৎ সযত্নে কানপেতে হেঁট হয়ে আমার শুভ্রকেশী মায়ের মুখে, নিজের পরলোকগতা মায়ের অল্প বয়সের গল্প শুনছিলেন, তখন তাঁর চোখমুখের নরম ভাবটিতে তাঁকে সত্যিই মনে হচ্ছিল যেন, ছেলেটি। আজকে মা নেই। থাকলে দেখতেন, সেই ছেলেটিরও সত্তর হল।

চলচিত্রের জাতীয় স্বরূপ ও সত্যজিতের চিন্তাসূত্র

শতদ্রু চাকী

নিজের নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে, বিভিন্ন উপলক্ষে, চলচ্চিত্রের নানা দিক নিয়ে অনেক লেখাই লিখে গেছেন সত্যজিৎ রায়। এই সূত্রেই চলচ্চিত্রের জাতীয় স্বরূপ প্রসঙ্গেও ব্যক্ত হয়েছে তারই নিজস্ব কিছু মত, অভিমত। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যে-সব মন্তব্য মতামতগুলিকে মোটামুটি সাজিয়ে নিলে, অনেকটা অনুধাবনীয় কোনো চিন্তাসূত্রেরও হদিশ মেলে। স্পষ্ট, প্রাঞ্জল আর দ্ব্যর্থহীন।

এইখানে বলে রাখা যাক, যে-কোনো দেশের ছবিতেই কিছু মালমশলা থাকে, যা একেবারে স্বপ্রকট। যেমন অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ, তাদের কথাবার্তা, পোশাক-আশাক, চলন-বলন ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্গে দৃশ্যমান বাড়িঘর, পথঘাট নদীপাহাড়, আকাশ দিগন্ত আরো কি কি সব। যে দেশের ছবি, বিশেষ কোনো ব্যতিক্রমের কারণ না ঘটলে, এ সব তো স্বভাবতই হবে সে দেশের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। একটু কম অনুসন্ধানী পরিচালক যারা, বলা ভালো অনেকটা কম বদ্ধপরিকর, তারা হয়তো জাতীয় স্বরূপের ব্যাপারটা এগুলোর মাঝখানেই যা থাকার থাকে বলে গা ছেড়ে দিতে পারেন। কিন্তু ছবি বলতে তো শুধু ঐ সবই নয়। তার একটা বুননের দিক থাকে। আর থাকে একটা নির্যাসের দিক। যাকে বলে, টেক্সচার এণ্ড এসেন্স। আর শেষপর্যন্ত এগুলোর ভিতর দিয়েই স্ফুট হয়ে ওঠে—প্রায় যেন ভিতরে গিয়েই ঘা মারে— আকাঙ্খিত ঐ জাতীয় স্বরূপ। আসলে যাকে চিহ্নিত করা যায়, কোনো জাতির মর্মমূল থেকেই উঠে আসা—বিলক্ষণ কোনো সত্তা হিসেবে।

কেউ কেউ অবশ্য বলেন অন্য কথা। আজকের যে পৃথিবী, সে হলো একজাতীয়তার দিকে। সাংস্কৃতিক এক অভেদতন্ত্রের দিকে। তাছাড়া সিনেমার আঙ্গিকটাও হলো আন্তর্জাতিক আঙ্গিক। ওর কোনো জাতীয় শিকড়টিকড় বলে কিছু নেই। আবার ভারতের মত কোনো দেশে জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় স্বরূপের নাম করে, আসলে সবাইকে একই জামার তলায় ভিড়াবার প্রাতিষ্ঠানিক স্পর্ধাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় কিনা, এ আশঙ্কাও করেন কেউ কেউ। এই রকম একটা স্পর্ধা তো হরবকতই দেখছি আমরা, সর্বভারতীয়তার নাম করে তথাকথিত ঐ বোম্বাই ছবিগুলির দৌলতে। এসব বিতর্কের জায়গা অবশ্য এটা নয়।

যেটুকু বলার তা এই যে, বাংলাকে ভুলে গিয়ে কোনো ভারতীয়তা, অথবা ভারতকে ভুলে কোনো বিশ্বমুখিনতার ভাবনা সত্যজিৎ কোথাও ভেবেছেন বলে জানা নেই আমাদের। বা জাতীয় স্বরূপের নাম করে লোকজীবন ও সংস্কৃতির জায়গা থেকে, বুদ্ধি দিয়ে ছেঁকে আনা মৌসুমি কোনো ঝোঁককেই অনুসরণ করার কথা ভেবেছেন বলেও

কোথাও তেমন কিছু শুনিনি আমরা। বরং যা মনে হয়, তার ঐ সব চিন্তার পশ্চাৎপটে অনেকটা বড় আকাশের মতই ছিল যেন একটা প্রশস্ত অবলম্বন, একটা বিশেষ বোধ, যা রবীন্দ্রানুগ—'যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন, তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরী... বিলেতে গেলেম, ব্যারিষ্টর হইনি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মত ধাক্কা পাইনি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্বপশ্চিমের হাত মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।'[১]

বস্তুত, যে যুগে কাজ শুরু করেন সত্যজিৎ ও তার প্রজন্মের শিল্পী-সাহিত্যিকরা তখন রবীন্দ্রভাবনার মাধ্যাকর্ষণকে এড়িয়ে কিছু করতে যাওয়াটাও, সে অর্থে, খুব একটা অবশ্যম্ভাবী কিছু ছিল না। বৈচিত্র, বিভিন্নতা, এমনকি বৈপরীত্য সত্ত্বেও তার যে একটা প্রয়োগমূল্যও রয়েছে, এটা কম-বেশি প্রায় সকলেরই জানা ছিল।

এগুলো মনে রেখেই আজকের প্রসঙ্গে যাবো আমরা।

২

'আমাদের সিনেমার জন্য প্রথম যা দরকার, তা হলো বিশেষ একটা রচনারীতি, ভাবপ্রকাশের নিজস্ব একটা শৈলি, বিশেষ একটা চিত্রছাঁচ, একই সঙ্গে যা কিনা চলচ্চিত্রানুগও বটে। এমন একটা রীতি, শৈলি, ছাঁচ— বিশিষ্ট আর সুস্পষ্ট অর্থেই যাকে ভারতীয় বলে সনাক্ত করা যায়।'[২]

১৯৪৮ নাগাদ প্রকাশিত, চলচ্চিত্র বিষয়ক নিজের প্রথম লেখায় এই ছিল তরুণ সত্যজিতের ঘোষিত অভিপ্রায়। বলাবাহুল্য, তখনকার বাংলার শিল্পসাহিত্যের— একই সঙ্গে যা ছিল উত্তাল আর গৌরবময়— পুরো প্রেক্ষিতটাকে মনে রেখে দেখলে ঘোষণাটা মোটেও আকস্মিক মনে হয় না।

সত্যজিতের নিজের জবানীতেই পেয়েছি আমরা, শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থী হিসেবেই কিভাবে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি, অবশেষে,—'নিজের শিকড়।'[৩]

বিজ্ঞাপনের জগতেও তখন ভারতীয় ধাঁচে একটা কিছু করার চেষ্টা চলছে। যার এক দায়বদ্ধ শরিক সত্যজিৎ নিজেও। এবং এই দায়বদ্ধতাকে চলচ্চিত্রের জায়গা পর্যন্ত প্রসারিত করে দেওয়ার ইচ্ছেটাও, তাই, তার কাছে মোটেও অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। যে ইচ্ছারই প্রথম সার্থক ফলশ্রুতি 'পথের পাঁচালী'।[৪]

'পথের পাঁচালী'রও প্রায় বছর তিরিশকাল পূর্বের কথা। হলিউডের বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক জন ফোর্ড বলেছিলেন তাঁর একটি লেখায়— 'সর্বজনীনতার খাতিরেই সর্বজনীনতা গুণটি আসলে একটা বিচ্যুতি মাত্র। মানুষকে সর্বমানুষের প্রতিভূ করে ফুটিয়ে তোলার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান সব পরিচালকেরা। আর তা করতে গিয়ে, চরিত্রের আকাঁড়া কিনারগুলোকেও ঘষেমেজে প্রায় একেবারে পালিশ করে নেন। ফলে কি ব্যক্তিগত বা কি জাতিগোষ্ঠীগত লক্ষণাবলী বলেও তখন আর তাদের কিছুই বজায় থাকে না। তারা হয়ে যায় নিতান্তই নীরক্ত আর বৈচিত্র্যহীন। বিরাট কোনো সাফল্য বা ব্যাপক কোনো স্বীকৃতি, এ যদি সিনেমাকে বস্তুতই আদায় করতে হয়, ভাবের দিক দিয়ে তার পক্ষে সার্বজনীন হওয়াই কাম্য হবে। কিন্তু তার চরিত্রগুলিকে হতে হবে, অবশ্যই, বিশদ আর জ্বলজ্যান্ত। নিজস্ব পরিবেশ পটভূমির সঙ্গে একান্তই সঙ্গতিপূর্ণ।....

এর একটা সীমা নিশ্চয় আছে, কিন্তু ব্যাপারটা যে আগামী দিনের সিনেমার জায়গায় খুবই জরুরী হয়ে উঠবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।'[৫]

এটাই হয়েছিল ঠিক, 'পথের পাঁচালী'র জায়গায়। মানুষগুলোকে দিতে সক্ষম হন তার রচয়িতা, যাকে বলে সেই 'লোকাল হ্যাবিটেশন এ্যাণ্ড নেম'। আর এই জন্যই এই প্রামাণিকতাটুকু থাকে বলেই, একই সঙ্গে তা হয়ে উঠতে পারে জীবন্ত এক মানবিক অভিজ্ঞতারও উৎস। নন্দিত হয় দেশে দেশে, হবার মত বলেই।

৩

তবে শুধু চরিত্রের প্রামাণিকতাই নয়। শৈলির প্রামাণিকতার ভূমিকাটিও এখানে বড় কম নয়। তা কি করে অর্জনীয়, সত্যজিতের চিন্তাসূত্র থেকে তারও কিছু নিশানা পেয়ে যাবো আমরা। যার একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটে এইখানে, 'ছবিঘরের পর্দার মাপ বা ছবি তৈরীর সাজ-সরঞ্জামগুলো সব দেশেই আজ প্রায় একই নমুনার অনুসারী। তার মানেই কিন্তু এ নয় যে, শিল্পের অন্যান্য শাখায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যতটা মিল না দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি মিল দেখা যায়—সিনেমার জায়গায়। ব্যাপারটা বরং উল্টো। সিনেমাটা যেহেতু আংশিক নিরিখেই একটা বিমূর্ত শিল্প, তাই মূর্ত হবার জন্য দেশজ প্রায় সমস্ত উপায়-উপকরণের উপরেই নির্ভর করতে হয় তাকে। কথাবার্তা, আচার-আচরণ, জীবনের একেবারে গভীরে গুপ্ত নানা সংস্কার, মূল্যবোধ, অতীতের পরম্পরা, চলতি যুগেব হাওয়া—এমনি আরো সমস্ত উপায়-উপকরণ। রূপকার হিসেবে একজন পরিচালকের দৃষ্টি যত গভীর হবে, এইসব উপায় উপকরণগুলি বিষয়েও ততটাই সজাগ হবেন তিনি। এবং ততটা সার্থকভাবেই একাত্ম করে নিতে পারবেন তিনি সেগুলিকে, তার পুরো সৃষ্টিকর্মের বুনোটের সঙ্গে।'[৬]

এই একাত্মতার ব্যাপারটা তেমন করে চোখে পড়ে না বলেই তার মনে হয়, অতীতের বাঙলা ছবির প্রসঙ্গে—'এইসব ছবির বাঙালীত্ব, কেবলমাত্র বিষয়বস্তুতেই নিবদ্ধ। এর চিত্রভাষায় এমন কোনো সজীব জাতীয় বৈশিষ্ট্য নেই যাতে মনে হতে পারে এই ভাষার শিকড় রয়েছে বাঙলার মাটিতে।'[৭]

ফলত, রচনারীতির মধ্যেও সজীব ঐ জাতীয় বৈশিষ্ট্য সঞ্চারের কাজটি আবার দেশের অপরাপর শিল্পের ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে নিতে পারার উপরেও বহুলাংশেই নির্ভরশীল। কারণ, 'চলচ্চিত্রকে একান্তভাবে বিংশ শতাব্দীর শিল্পকলা বলা হলেও তার রচনারীতি যে আংশিকভাবে প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'[৮]

'আমাদের চিত্রকলার একটা বৈশিষ্ট্যই হলো দুটি একটি রেখার আঁচড়ে, মূল মূল কয়েকটি রঙের পরশে— অনেক কিছুই ফুটিয়ে তোলা। মিতব্যয়িতা। বাস্তবতার চেয়েও বস্তুর মর্মসত্য উদঘাটনের দিকেই অধিক মনোযোগ স্থাপন করা। প্রকৃতির থেকেই যাত্রা করেন আমাদের শিল্পীরা। কিন্তু পৌঁছতে চান ব্যক্তিগত একটা দর্শনের দিকে। আবার তারই সঙ্গে থাকে, তাকে রীতিবদ্ধ করার প্রয়াস। অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যান্টা, কোণারক। এসবের দিকে তাকালে বোঝা যায় ব্যক্তিগত দর্শন ও রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ শৈলির ঐ সমন্বয়টাও কি হতে পারে।'[৯]

অন্যদিকে ডিটেল। 'ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যে ডিটেলকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা খুবই কমই আছে।'[১০] আমাদের সঙ্গীতেও এমন কিছু রাগ-রাগিণী আছে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি প্রাকৃতিক অবস্থা ও মানসিক ভাব ফুটিয়ে তুলতে যা একেবারে 'অদ্বিতীয়'।[১১] আছে কথাকলির ঐ সুমহান এক মূকাভিনয় শৈলি ও তার ঐতিহ্য। এমনকি জাপানীরা যা করেছে তাদের 'নো', 'কাবুকি' নিয়ে, সেইরকম আমাদের ঐসব নিয়েও সিনেমার জায়গায় অনেক কিছু করার একটা সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে।[১২]

এইভাবেই চলচ্চিত্র-পূর্ব প্রায় সমস্ত শিল্প-সাহিত্যকে, পরখ করে করে দেখার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় সত্যজিতের নানা লেখায়। উদ্দেশ্য যার একটাই, সে হলো জাতীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটা চলচ্চিত্র ভাষার সন্ধান। যার কিছু নিরতিশয় প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করা যায় 'পথের পাঁচালী' সহ তার প্রায় সমস্ত ছবির জায়গায়। তাই দর্শক-হৃদয়ের সঙ্গে সাঁকো বাঁধতেও ব্যর্থ সেগুলি কদাচিৎ।

৪

আলোচনার প্রান্তে এসে, অতঃপর, শুধু একটি ছবির কথাই একটু উল্লেখ করবো আমরা। সে হলো 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। বাইরের দিক দিয়ে দেখলে, যাকে বলে 'সার্ফেস লুক'-এর নিরিখে এ ছবিকে প্রায় একটি 'ইংরেজি ছবি' বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়, যেন অবলীলায়। অথচ এর পরতে পরতে রয়েছে দেশজ শৈলির ছোঁয়া। এ-ছবির বাহুল্যবর্জিত কমপোজিশন, রঙের ব্যবহার, সম্পাদনার ছন্দ, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের সমপর্কের ধরন তাদের মানসিক পরিমণ্ডল—সব কিছুর মধ্য দিয়েই জ্যান্ত হয়ে ওঠে যেন তাদের ঐ উৎসগত শিকড়। সঙ্গে থাকে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি, যা বিলক্ষণ রূপেই বাঙালি। যার মূল কথা—প্রাণের দাবিকে স্বীকার করে নেওয়া ।

ইঙ্গবঙ্গ সভ্যতার গর্বে বুঁদ হয়ে থাকা রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ চৌধুরী যতই না কেন ফরমান জারি করুন, মেয়ে মনীষা যে তার বাছাই করা ঐ সফল পুরুষটিকে মেনে নিতে প্রাণের সায় পায় না এও তো সত্যি। মেনে নিলে জীবনের দিক দিয়ে বদ্ধ হয়ে থাকাকেই তার ভবিতব্য বলে যে মেনে নিতে হয়। কিরীটমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার চূড়াটি তখনই ঝলমল করে ওঠে, যখন ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন তার পরাজয় ঘটেছে। মনীষা বোধহয় বেরিয়ে গেল, ডাকসেঁটে বাবার ঐ বরাদ্দ 'রণনীতি'র মাধ্যাকর্ষণ থেকে।

এই সেই ছবি যা মনে পড়িয়ে দেয়, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের অনুলেখনে ধরা ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই আশ্চর্য কথোপকথনের স্মরণীয় সেই অংশটি—'বাংলাদেশ বিধাতার আশীর্বাদে পুরাতনের ভারমুক্ত। তবে জীবনসাধনার দায় বিধাতা তাকে বেশি করেই দিয়েছেন। তার দেশ যে পলিমাটির উর্বরভূমি। প্রাণ এখানে ব্যর্থ হতে পারবে না। পুরাতনের মৃত পাষাণভার এখানে না সইলেও জীবনের দাবী-দাওয়া এখানে পুরোপুরি সফল হবে।'[১৩]

সত্যজিতের চলচ্চিত্র-ভাবনাও, মনে হয়, এই জীবন-ভাবনারই জারক-রসে জারিত। যার শিকড়টি রয়েছে তারই দেশের মাটিতে।

সূত্রাবলী

১. ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২. হোয়াট ইজ রঙ উইথ ইণ্ডিয়ান ফিল্মস? সত্যজিৎ রায়। আওয়ার ফিল্ম দেয়ার ফিল্মস গ্রন্থে সংকলিত।
৩. সত্যজিৎ রায় প্রদত্ত অমল ভট্টাচার্য স্মৃতি বক্তৃতামালা। ২৮.৯.৮৪-র টেলিগ্রাফ পত্রিকায় মুদ্রিত পর্ব।
৪. চলচ্চিত্রের ভাষা : জাতীয় না নির্বিশেষ জাতীয়? শতক্র চাকী। ১৯৮৩-তে প্রকাশিত চলচ্চিত্র নামক রচনাসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।
৫. জন ফোর্ডের এই উক্তিটির মূল ইংরেজি বয়ানটিও এইখানে দিয়ে দেওয়া হলো : 'The quality of universality in pictures is in itself a pitfall, for the director who strives too hard to represent humanity by rubbing down the rough edges of racial and personal traits is likely to make his work drab and colorless. The picture likely to attain great and wide success must have its theme of universal appeal but its people vivid. Its my belief that it should be true to its setting... ... ... the relationship of background to character and picture development will be increasingly important in the future of the film'.—from New York Times, June 10, 1928. Collected As Veteran Producer Muses, by John Ford in Holly wood Directors (1914-1940), by Rrichard Koszarski O.U.P., 1976.
৬. কাম উইদাউট, ফায়ার উইদিন। আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস।
৭. অতীতের বাঙলা ছবি। বিষয় চলচ্চিত্র।
৮. ডিটেল সম্পর্কে দু-চার কথা। ঐ।
৯. অমল ভট্টাচার্য বক্তৃতামালা।
১০. ডিটেল সম্পর্কে দুচার কথা। বিষয় চলচ্চিত্র।
১১. আবহসঙ্গীত প্রসঙ্গে। ঐ।
১২. কাম উইদাউট, ফায়ার উইদিন। ঐ।
১৩. বাংলার সাধনা। ক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : ৪২। বিশ্বভারতী। প্রথম প্রকাশ ১৩৫২

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা গুপী গাইন বাঘা বাইন-এর পোস্টার

সত্যজিৎ ঃ বিষয় রাজনীতি

বিষ্ণু বসু

সত্যজিৎ রায় প্রয়াত হয়েছেন প্রায় পাঁচ মাস হল। তাঁকে নিয়ে আবেগ উচ্ছ্বাস এখন অনেকটাই স্তিমিত। এখন তাই দরকার তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে কিছু নির্মোহ আলোচনা।

বিগত সাঁইত্রিশ বছরে তিনি সৃষ্টি করেছেন আঠাশটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ও তিনটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র। তাছাড়া কয়েকটি তথ্যচিত্র। ১৯৫৫ থেকে ১৯৮০র মধ্যে চব্বিশটি এবং শেষ এগার বছরে মাত্র চারটি ফিল্ম তিনি রচনা করেছিলেন। অবশ্য ১৯৮২-তে 'পিকু' ও 'সদগতি' নামে দুটি টেলিফিল্ম শেষ এগার বছরের সময় সীমার মধ্যেই পড়ছে।

সত্যজিতের শিল্পকর্ম নিয়ে তাঁর জীবৎকালেই দেশে বিদেশে বহু আলোচনা হয়েছে। বস্তুত কোনও জীবিত চলচ্চিত্র স্রষ্টাকে নিয়ে এত আলোচনা পৃথিবীতে বোধহয় খুব কমই হয়েছে। তাঁর প্রাপ্ত সম্মানের তালিকাটিও বেশ দীর্ঘ। স্বভাবতই তাঁর গৌরবের দীপ্তিতে বাঙালি হিসেবে আমরাও আলোকিত।

১৯৫৫ থেকে ১৯৯১ সময়সীমাটি কম দীর্ঘ নয়। সারা পৃথিবীতে এবং সেইসঙ্গে ভারতেও এ সাঁইত্রিশ বছর ধরে চলেছে নানা ভাঙাগড়া। তবে গড়ার তুলনায় ভাঙার ভাগটাই বোধহয় বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সমাজতন্ত্রের অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা, ভারতের স্বাধীনতা, সাম্যবাদী চীনের আবির্ভাব এবং নানা দেশে উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তির জন্যে সংগ্রাম ও বিজয় বর্তমান শতকের প্রথম অর্ধে জন্ম দিয়েছিল যে প্রবল প্রত্যয় ও প্রত্যাশার, তার স্খলন ঘটতে থাকে পাঁরে দশক থেকেই। তারপর চার দশক ধরে চলেছে আদর্শের অপচয় ও বিশ্বাস ভঙ্গের পালা। ১৯৫৬-তে সোভিয়েতের বিংশতি কংগ্রেসে নিস্তালিনীকরণ প্রক্রিয়ায় সাম্যবাদী শিবিরে জটিলতার সৃষ্টি, আমেরিকার অপ্রতিহত আগ্রাসন, নতুন অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্বের বাজারে জাপানের বিদ্যুৎপ্রভ উত্থান এবং সব শেষে ষাটের দশকের উপান্তে এসে ইউরোপে ঘটল সমাজতন্ত্রের সমূহ বিপর্যয়। ভারতের অর্থনীতিতেও ঘনিয়ে এল অস্থিরতা, তার ফলে গুলিয়ে গেল রাজনীতি। ধনী আরও ধনী হল, গরীব হল আরও গরীব। বাড়ল বেকারি, দেখা দিল আঞ্চলিকতাবাদ। সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাত নিয়ে ক্রমশই বিব্রত হল ভরত নামক তথাকথিত মহান দেশটি। পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু ভারতেরই একটি অঙ্গ রাজ্য তাই দূষণ স্পর্শ করল তাকেও। স্বাধীনতা তথা দেশ ভাগের পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রথম ত্রিশ বছর প্রধানত কংগ্রেস এবং তার পরের পনের বছর বামফ্রন্ট সরকার স্বভাবতই স্বস্তি দিতে সক্ষম হল না।

পরিস্থিতির এ উচ্চাবচতা বিশেষ করে বাঙালির কাছে প্রীতিপ্রদ হল না। রামমোহন বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবহমান সাংস্কৃতিক সমারোহ জন্ম দিয়েছিল যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের তার পচনক্রিয়ার পর্ব দেখা দিল এ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ

থেকে। অস্থিরতা তাই আজ আমাদের সমাজ শরীরের প্রায় সর্বাংশে।

সত্যজিৎ তাঁর শিল্পকর্ম শুরু করেছিলেন বাঙালি রেনেসাঁস থেকে অর্জিত এ মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের উত্তরাধিকার নিয়ে। কিন্তু সময় তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ থাকতে দেয় নি। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিতে সমকাল স্বাক্ষর রাখবেই। সত্যজিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর শিল্পকর্মও তাই বিশ্বাস থেকে ক্রমে সরে এসেছে সংশয়ে, মূল্যবোধের অপচয় নাড়িয়ে দিয়েছে দীর্ঘদেহী মানুষটির মননকেও। 'পথের পাঁচালী'র পরিণতি তাই অনিবার্য ভাবে এসে পৌঁছেছে 'শাখা প্রশাখা'য়। অপুর বিশ্বাসের জগৎ শেষ পর্যন্ত করে তুলেছে 'আগন্তুক'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ প্রবন্ধে (১লা বৈশাখ, ১৩৪৮) ঘোষণা করেছিলেন দৃঢ় প্রত্যয় 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। এ ঘোষণার দু'মাসের মধ্যেই ঘটে গেল ইতিহাসের দুর্মর বিশ্বাসভঙ্গের অপঘাত। সোভিয়েত আক্রান্ত হল ফ্যাসিবাদী জর্মানীর হাতে। বেদনাহত হলেও মনুষ্যত্বের প্রতি বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের বিচলিত হয় নি। কেননা তিনি জানতেন, 'মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।'

'পথের পাঁচালী' ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ। দারিদ্র ও বঞ্চনার মধ্যেও মুগ্ধতার বিন্যাস। এ ফিল্মটি নির্মাণের আগের দশকে অবিভক্ত বাংলায় ঘটে গিয়েছিল যেসব বিপর্যয়—মন্বন্তর, দাঙ্গা ও দেশভাগ—তার কোনও অভিঘাতের চিহ্নই নেই এ ছবিতে। সত্যজিৎ প্রবলভাবে নিজেকে প্রোথিত রেখেছেন বাঙালির নিজস্ব অতীতে। অপুর বিস্ময় তাঁর কাছে বিশ্বেরও বিস্ময়। তিনি যেন জানেন 'অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে।' তাঁর সৃষ্ট বিশ্বজয়ী দ্বিতীয় ফিল্মটি কি সে কারণেই 'অপরাজিত'? এ সংঘটনা নিতান্তই সমাপতন?

আপাতত বক্ষ্যমান নিবন্ধে এ বিস্তৃতিতে যাবার অবকাশ নেই। আমাদের লক্ষ্য হবে এ বিশ্বাস ও মুগ্ধতা থেকে যাত্রা শুরু করেও সত্যজিৎ কেমন করে তাঁর শিল্পজীবনের উপান্তে এসে উপনীত হলেন সংশয় ও জিজ্ঞাসায়। সমকালের দাবী তাঁকে কীভাবে বিচলিত করল এবং রাজনীতির প্রতি কিছু বিরাগ সত্ত্বেও আটের দশকে নির্মাণ করলেন যে কটি ফিল্ম তার সবগুলোই মূলত রাজনৈতিক।

রাজনীতি যে তাঁর তেমন পছন্দ নয় একথা সত্যজিৎ নিজেই জানিয়েছেন প্যারিসের 'টেলিরামা' পত্রিকার প্রতিবেদককে গত বছরের এক সাক্ষাৎকারে, '—আমি রাজনীতি নিয়ে (অহেতুক) কথা বলা পছন্দ করি না।' তাঁর বিবৃতি অনুযায়ীই জানা যায় যে, ব্রাহ্ম বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ এক পর্বে এসে কম্যুনিস্ট হয়ে গেলেও তিনি নিজে তা হন নি। 'টেলিরামা'র প্রতিবেদক তাঁকে প্রশ্ন করেছেন সত্যজিৎও কম্যুনিস্ট কি না। উত্তরে সত্যজিৎ বলেছেন, 'না, আমি একজন চিত্রপরিচালক ঃ আমি ছবি তৈরি করি।'' অবশ্য সেইসঙ্গে একথাও স্বীকার করেছেন, 'কিন্তু আমার সব বন্ধুই মার্কসবাদী। আপনি হয়ত জানেন (পশ্চিম) বাংলায় বেশ কিছুকাল হল একটি কম্যুনিস্ট সরকার রাজ্য চালাচ্ছে। আমি (কয়েকজন) মন্ত্রীকে জানি, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা যায়

এবং তাঁদের যথেষ্ট শুভবুদ্ধি আছে বলেই মনে হয়েছে।' তবে তিনি একথাও বলেছেন, 'ইউরোপে হঠাৎ কম্যুনিস্ট সরকারগুলির পতনে এখানে আমরা অবাক হয়েছি। মনে হয়, এটা একটা সংক্রামক রোগ। কিন্তু হয়ত মার্কসবাদের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। হয়ত ভস্মরশ্মির মধ্যে থেকেই আবার তার নবজন্ম হবে।'

রাজনীতি নিয়ে কথা বলা পছন্দ না করলেও একজন মনস্ক মানুষের মত সত্যজিৎ সমকালের প্রতি সাড়া দিয়ে থাকেন, তাঁর সংলাপে সে সত্য অপ্রত্যক্ষ থাকে নি। এবং একথাও বোধহয় সঠিক যে কোনও শিল্পীর সৃজনে রাজনীতি থাকতেই হবে এমন বাধ্যতার বশীভূত হওয়া সবসময়ে সম্ভবও হয় না, দরকারও নেই। ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেন রাজনীতির মধ্যে যতটা স্বচ্ছন্দ থাকেন, সত্যজিতের মানসিকতা হয়ত তাতে সাড়া দেয় না। তবু একজন সচেতন মানুষ সমকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারেন না। সত্যজিৎকেও তাই বারে বারে নিজস্ব সময়ের প্রতি দৃষ্টি ফেলতে হয়েছে। হতে পারে এ দৃষ্টিপাত কখনও ঘটেছে অতীতের কাহিনীকে বুঝে নেবার চেষ্টা দিয়ে, কখনও বা সরাসরি সমকালের মধ্যে প্রবেশ করার অভীপ্সার মাধ্যমে। বস্তুত তাঁর শিল্পকর্মকে উনিশ শতকী বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে বর্তমানের সংশয় সমৃদ্ধ সংঘাত হিসেবেই হয়ত চিহ্নিত করা যায়।

বর্তমানে লেখক সত্যজিতের শিল্পকর্মকে দুটি ভাগে বিভক্ত করার পক্ষপাতী। প্রথম অংশে রয়েছে ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত পনের বছরের সময়সীমা। এ পর্বে পড়ছে 'পথের পাঁচালী' থেকে 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' পর্যন্ত মোট পনেরটি ফিল্ম। পরের পর্ব ১৯৭০ থেকে ১৯৯১ যাতে রয়েছে তেরটি পূর্ণ ও তিনটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ফিল্ম। আরও নির্দিষ্ট করে বললে একদিকে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' এবং অন্যদিকে 'আগন্তুক' —এ পরিসীমার অন্তর্গত বর্তমান আলোচনায় তথ্যচিত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না।

এ বিভাজন-রেখাটি গুটিকতক বিষয় স্পষ্ট করছে। প্রথম পর্বে প্রায় প্রতি বছরই একটি করে ফিল্ম নির্মিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে বছরের তুলনায় ফিল্মের সংখ্যা বেশ কম। হতে পারে তখন বয়স অথবা অসুস্থতা সত্যজিতের শরীরে এসময়ে থাবা বসিয়েছে। অন্তত আশির দশকে তো বটেই। এ দশকে মাত্র তিনখানি ছবি তিনি পরিচালনা করেছেন। সে যাই হোক, দ্বিতীয় পর্বে বাইশ বছরে তাঁর পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ফিল্ম মোট তের।

কিন্তু সংখ্যার ব্যাপারটা এখানে বড় নয়। লক্ষ্য করার বিষয় এটাই যে প্রথম পর্বের ফিল্মগুলোতে সরাসরি রাজনীতির প্রসঙ্গ প্রায় নেই। 'অপু ত্রয়ী'তে ব্যক্তি মানুষের প্রাণনার বিচিত্র বিকাশ ঘটেছে। 'দেবী' ও 'মহাপুরুষ' ফিল্ম দুটিতে দেখানো হয়েছে ধর্মীয় সংস্কারে আচ্ছন্ন মানসিকতার ট্র্যাজিক ও কমিক চেহারা। 'জলসাঘর' প্রকাশ করছে ধ্বস্ত সামন্ততান্ত্রিকতার করুণ বিভ্রান্তি ও নবোত্থিত বাঙালি বুর্জোয়ার হাস্যকর রূপ।। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'মহানগর' উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকটকে নানাভাবে দেখেছে! এসব ফিল্মে সমস্যার শিল্পিত অভিব্যক্তির উপর জোর দিয়েছেন সত্যজিৎ, কোনও সমাধান বাৎলে দেবার পথে যান নি। বস্তুত সচেতন শিল্পী সমস্যার মূল ও তার শাখা-প্রশাখার প্রতি নজর দেবেন, চিনিয়ে দেবেন তাদের যথার্থ স্বরূপ, কোনও সরলীকৃত সমাধানকে প্রশ্রয় দিয়ে আমাদের বোধকে অপমান করবেন না—এ প্রত্যাশাই স্বাভাবিক।

সেদিক থেকে সত্যজিৎ এ পর্বের ফিল্মগুলোতে সমষ্টি ও ব্যষ্টির অন্তরঙ্গ সরলতা ও জটিলতার উন্মোচন ঘটিয়েছেন, নানাভাবে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন মনুষ্যত্বকে। অবশ্য এসব সত্ত্বেও রাজনীতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা সম্ভব হয়নি। সত্যজিতের। অন্তত 'চারুলতা' (১৯৬৪) ছবিতে ভূপতির একটি সংলাপে তার প্রকাশ ঘটেছে। ভূপতির মাধ্যমে সত্যজিৎ প্রশ্ন তুলেছেন, 'পলিটিকস ইজ ডিফারেন্ট—পলিটিকস একটা জ্যান্ত জিনিস—রিয়েল—প্যালপেব্‌ল। একটা অন্যায় ট্যাক্‌স যখন বসছে—অবিশ্যি লিটন সাহেবের দৌলতে তা প্রায়ই ঘটছে—তা সে যে ট্যাক্‌সই হোক না কেন—তখন তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এই গবীব দেশের লোকগুলো কিভাবে অ্যাফেক্‌টেড হচ্ছে—কষ্ট পাচ্ছে —সাফার করছে। এটা বড় ট্র্যাজেডি, না তোমার ঐ রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট বড় ট্র্যাজেডি?'' লিটন সাহেবের প্রসঙ্গ বাদ দিলে এখানে যে মূল প্রশ্নটি তোলা হয়েছে তার যথার্থ্য একালেও সার্বিক সত্য বলে চিহ্নিত হতে পারে। মনে রাখা দরকার এ সংলাপটি সত্যজিতের সৃষ্টি, 'নষ্টনীড়'-এ এ ধবনেব পবিস্থিতি এবং এ সংলাপটি নেই। পুরোপুরি না হলেও ভূপতির এ সংলাপে সত্যজিতের প্রবণতা খানিক প্রকাশ পেয়েছে—এমন সিদ্ধান্ত সম্ভবত অযৌক্তিক হবে না।

তবু 'চারুলতা'র মূল বিষয় রাজনীতি নয়। দুটি পুরুষের মাঝখানে পড়ে একটি নারীর দীর্ণ দ্বন্দ্বের প্রতিফলন এ ফিল্ম। বরং তাঁব শিল্পীজীবনেব গোড়ায় রচিত 'পরশপাথর' (১৯৫৮) অর্থনীতি ও রাজনীতিব টানাপোড়েনে সৃষ্ট একখানি শিল্পিত স্যাটায়ার। স্বর্ণমানেব অবনমন, শেয়াব বাজার তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে কতটা বিপর্যস্ত কবতে পারে, বিশেষ করে অর্থই যে কোনও ব্যক্তিকে রাজনৈতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে থাকে, পবেশবাবুর চমকপ্রদ উত্থান ও তার হাস্যমুখর পরিণতি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে দেখিয়েছেন সত্যজিৎ। এ সব সত্ত্বেও আমাদেব প্রস্তাবিত প্রথম পর্বে সত্যজিৎ রাজনীতি সম্পর্কে বেশ উদাসীন। বিষয় হিসেবে তখনও তা তাঁব শিল্পকর্মেব মধ্যে সম্পৃক্ত হতে পারে নি।

শুধু এ পর্বের শেষ ফিল্ম 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' কিছুটা ব্যতিক্রম। এ ছবির বিষয় অবশ্যই প্রত্যক্ষত রাজনীতি নয়। কিন্তু যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে, শোষণ ও পীড়নের বিপক্ষে, সরল সুস্মিত মানবিকতাকে কেন্দ্রে রেখে সত্যজিৎ বচনা করেছেন যে অনবদ্য ফ্যান্টাসি তাব জুড়ি ভারতে নেই, সম্ভবত বিশ্বের চলচ্চিত্রেও দুর্লভ। হাল্লার রাজা তার মিকিমাউস-সুলভ আস্ফালনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছে টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রনায়কের বিকৃত ভঙ্গি, ফ্যাসিবাদী মনোভাবের উদগ্রতা। হাল্লাব আগ্রাসন ধ্বস্ত ও পরাজিত হতে পারে গুপী-বাঘার আবিলতা মুক্ত মহৎ মানসিকতাসমৃদ্ধ যাদুর কাছে। মনে রাখতে হবে সত্যজিৎ যখন ফিল্মটি রচনা কবেছিলেন সে সময়ে ভিয়েতনামে চলছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেব নির্লজ্জ অভিযান। সে দেশেব সাধারণ মানুষ তখন সংঘবদ্ধ হচ্ছে মূলত মনের জোরকে অবলম্বন করেই। পৃথিবীব মানুষ সেদিন বিস্মিত হয়ে দেখেছিল দানবের বিরুদ্ধে সহজ মানুষের দারুণ লড়াই, তাদের মনের যাদুর জোর। তাছাড়া এ দেশেও তখন তৈরি হচ্ছিল তানাশাহীর ভিত, যা সত্তর থেকে সাতাত্তর পর্যন্ত রুদ্ধ করে রেখেছিল এ দেশেব গণশক্তিকে। হাল্লার বাজাব বিপরীতে গুপী-বাঘার উপস্থাপন ও তাদের 'বিস্ময়কর' বিজয় যেন আগামী দিনের সম্ভাবনার ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে অভিব্যক্ত

হয়েছে।

সত্তরের দশক ছিল না কি মুক্তির দশক। অন্তত কিছু রাজনৈতিক কর্মীর ঘোষিত শ্লোগান ছিল এটি। কিন্তু স্মৃতিসমৃদ্ধ মানুষের নিশ্চয়ই মনে আছে পশ্চিমবঙ্গে এ পর্বেই নেমে এসেছিল এক 'অদ্ভুত আঁধার'। বিশেষ করে সত্তর থেকে সাতাত্তর পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের নিজের সরকারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন ও শোধনবাদীদের ষড়যন্ত্র এবং পরিণামে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন, বাহাত্তরের সন্ত্রাসযুক্ত নির্বাচন, পঁচাত্তরের জরুরি অবস্থা ঘোষণা ছিল যেন একই অর্কেস্ট্রার বিবিধ বাদ্যযন্ত্র। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীদের প্রতি অকুণ্ঠ আক্রমণ। নির্বিচার ও নিষ্করুণ হত্যা, নিষ্কারণ বিতাড়ন ও উৎপীড়ন তখন ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। বর্তমান প্রজন্ম এ দিনগুলোর কথা বোধহয় অনেকটাই ভুলে গেছে। যাঁরা সেদিন ছিলেন আক্রান্ত তাঁদের স্মৃতিও কালের ব্যবধানে বেশ ম্লান। সেদিনের সংবাদপত্রে, সাহিত্য ও শিল্পের নানা শাখায় চিহ্নিত রয়ে গেছে তার ঐতিহাসিক হলরেখা। সেদিন কলকাতাই শুধু ছিল না 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। সারা পশ্চিমবঙ্গ আতঙ্কে কাঁপছিল লাগামছাড়া সন্তাপহীন সন্ত্রাসে। ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি-তক্ক-গপ্পো'তে রয়ে গেছে তার কিছু তির্যক প্রতিভাস।

সত্যজিৎ এসময়ে তাঁর অভ্যস্ত স্থিতি থেকে স্খলিত হয়ে প্রবেশ করেছিলেন সমকালের অস্থির বাস্তবতায়, ক্রুদ্ধ সময়ের অপাবৃত অশান্তিতে। অন্তত এ সময়ের তিনখানি ফিল্ম 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৭০), 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১) ও 'জনঅরণ্য' (১৯৭৫) আমাদের অভিজ্ঞতায় নিয়ে এল অন্য এক সত্যজিৎকে। ১৯৬৯-এ কেন্দ্রে 'প্রগতিশীল' সরকারের আবির্ভাব, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, 'গরীবী হঠাও' শ্লোগান প্রভৃতি প্রসব করল বৃহৎ নাস্তি। নিষ্ফল চতুর অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ, ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণভার, জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কের পুঁজি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে নিয়োগ ইত্যাদি বিষয় বাড়িয়ে তুলল সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক উৎকেন্দ্রিকতা ও নিরবচ্ছিন্ন বেকারি। সত্যজিতের উল্লিখিত ট্রিলজিতে ঘটল তার কিছু ভগ্ন প্রকাশ।

'প্রতিদ্বন্দ্বী'র কেন্দ্রীয় চরিত্র সিদ্ধার্থ ক্রুদ্ধ, কিন্তু তার ভাই টুনুর মত সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যায় নি। এদেশের অজস্র শিক্ষিত বেকারের মধ্যে একজন সে। ইন্টারভিউ দেয় চাকরি পায় না, ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে অবহেলা ও অপমানের প্রতিবাদে একটি অফিসে বিস্ফোরণ ঘটে তার পরিণামে আখ্যাত (বা ধিকৃত) হয় কম্যুনিস্ট হিসেবে। একদা বাল্য স্নেহসঙ্গী বোনের সঙ্গে তৈরি হয় অনতিক্রম্য দূরত্ব। ছোটভাইও তার সহনশীলতার প্রতি প্রকাশ করে বিরাগ। প্রেমিকা কেয়াকেও দিতে পারে না ইতিবাচক কোনও প্রতিশ্রুতি। ফলত সিদ্ধার্থের মননে বাসা বাঁধে অনিকেতী মনোভাব। চিন্তায় ও কাজে তাই ঘটাতে পারে না গভীর সংযোগ। অবশেষে একটি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি নিয়ে চলে যায় মফঃস্বলে, তার মানসিক সান্ত্বনার আশ্রয় হয় পাখিদের গান ও 'রাম নাম সত্ হায়'। সোজা কথায়, সিদ্ধার্থ আর নিজস্ব জীবনের মুখোমুখি হতে পারে না, সে পালিয়ে যায় শহরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা থেকে। এমনকি নিজের কাছ থেকেও। এ সহজ নিষ্ক্রমণ ও সরল সমাধান সৃষ্টি করে এক পরাজিত 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র যে লড়াই শুরু হবার আগেই আত্মসমর্পণ করে বসে থাকে। বাংলার ১৯৭০ কি সত্যই এতটা সরলীকরণে বিশ্বাসী ছিল?

'সীমাবদ্ধ'ও একই কারণে সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। শ্যামলেন্দু নামক মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিত পাটনার তরুণটি প্রবল উচ্চাশার তাগিদে নিজের শ্রেণী ছেড়ে ক্রমে অনুপ্রবেশ করল মালিকদের শ্রেণীতে। বুর্জোয়া সভ্যতার অনতিক্রম্য ব্যাধি ক্রমে তাকে কিভাবে আচ্ছন্ন করল তারই প্রকাশ সত্যজিৎ ঘটিয়েছেন এ ফিল্মে। স্বভাবতই এ আরোহণের পথটি মসৃণ ছিল না। দরকারে দালাল লাগিয়ে কারখানায় ধর্মঘট ঘটিয়ে, এমনকি একজন শ্রমিকেরও প্রাণের বিনিময়ে শ্যামলেন্দু 'বোর্ড অব ডিরেকটরস্'-এর অন্তর্ভুক্ত হল। শ্যামলেন্দুর দ্বিতীয় সত্তা নিয়ে পর্দায় এল তার শ্যালিকা টুটুল। তার অবদমিত উচ্চাশাও প্রকাশ পেল রেসের মাঠে ও অন্যত্র। যদিও শেষপর্যন্ত ভগ্নীপতির বিবেককে তিরস্কার করেই যেন নিস্ক্রান্ত হল সে, তবু তার অবস্থিতি ও অভিব্যক্তি যথার্থ কার্যকারণকে অনুসরণ করতে ব্যর্থই হল। শেষদৃশ্যে বহুতল বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে শ্যামলেন্দুর ওঠা (কেননা লোডশেডিংয়ের জন্যে লিফ্‌ট ছিল অচল) কি নিজের শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার একাকীত্বেরই দ্যোতনা করছে? কিন্তু এ ব্যঞ্জনাও তো একমাত্রিক সরলতায় আক্রান্ত হয়ে রইল। শ্যামলেন্দু দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণে তেমন ব্যর্থ হলেও স্বয়ং সত্যজিৎ জানিয়েছেন 'আই অ্যাম স্লাইটলি সিমপ্যাথেটিক টু হিম হোয়াইল আই ডু নট অ্যাডমায়ার হোয়ট হি ইজ ডুয়িং।' কেননা সত্যজিতের ধারণা অনুযায়ী, 'হি ইজ নট কোয়াইট এ বক্সওয়ালা, বাট ইন এভিটেভলি ইন ফিউচার হি উইল বিকাম এ বক্সওয়ালা।' তত্ত্ব হিসেবে সিদ্ধান্তটি ভাল, কিন্তু তার শিল্পরূপ কি আধুনিককালের এ ধরনের জটিলতাকে অন্তত খানিকটা প্রকাশেও সক্ষম? বিষয়টি দাবী করে যে তির্যক ও আবর্তসমৃদ্ধ নির্মিতি, 'সীমাবদ্ধ' তা আয়ত্ত করতে পারে নি।

তুলনায় 'জন অরণ্য' শিল্পগতভাবে অনেকটাই বিশ্বাসযোগ্য। অবশ্য সরলীকরণের চিহ্ন এ ছবিতেও প্রকট। সত্তর দশকের গোড়ায় কলকাতায় উত্তাল বিভ্রান্তি, পরীক্ষা হলে নির্বিচার টোকাটুকি, পরীক্ষকের গাফিলতি ও যান্ত্রিক মানসিকতার ফলে সোমনাথের বাজে রেজাল্ট— এ সবই ফিল্মে এসেছে প্রায় ডকুমেন্টারি ধরনে। কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে মাও সে তুংয়ের ছবি ও তাঁর সমর্থনে শুধুমাত্র কিছু শ্লোগানের উদ্ধৃতি, আবার মাও-কে সরিয়ে ক্রমে সেখানে ইন্দিরা গান্ধীর ছবির আবির্ভাব, সমকালীন কলকাতাকে সেলুলয়েডে অনূদিত করেছে বেশ বিশ্বস্ততা নিয়ে। এখানে একটি তথ্যের উল্লেখ সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সত্যজিৎ প্রয়াত হলে দূরদর্শনের ন্যাশনাল নেটওয়র্কে 'জন অরণ্য' দেখানো হলে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল যে মাওয়ের প্রতিকৃতির স্থলে ইন্দিরা গান্ধীর আবির্ভাবের অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। কোন মনোভাব নিয়ে কে এ কীর্তিটি করলেন তা অবশ্য আমাদের জানা নেই।

যাক সে কথা। 'জন অরণ্য' কলকাতার অসংখ্য বেকার থেকে বেছে একটি তরুণের জীবিকা খুঁজে নেবার ছবি। এ কলকাতায় একটি সাধারণ চাকরির জন্য দরখাস্ত পড়ে এক লাখ; ইন্টারভিউতে ডেকে অপমানিত করা হয় তাদের কয়েকজনকে। এমনকি চাকরির সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগ নেই এমন বেয়াড়া প্রশ্নও করেন কোনও কর্তা। জানতে চাওয়া হয় চাঁদের ওজন কত এবং তার জবাব না দিয়ে প্রতিবাদ করলে অভদ্রভাবে প্রার্থীকে বলা হয়, 'দ্যাটস নট ফর ইউ টু জাজ'। গরীবী হঠাও এবং ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের জেল্লা ঝরে গিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির পচা কাঠামো বেরিয়ে পড়েছে ততদিনে। তার

ফলে জীবিকার তাড়নায় শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে সোমনাথকে বেছে নিতে হয় দালালির পথ এবং সে পথের সাফল্য আসে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুর বোনকে পণ্য হিসেবে কারখানার 'পারচেজ' অধিকর্তার ঘরে রাতের বেলা পৌঁছে দিয়ে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে কণা অবসরপ্রাপ্ত বাবার অসহায় অবস্থা ও দাদার বেকারির দুর্দশা দেখে শুধুমাত্র খাওয়া পরার জন্যে নিজেই নির্বাচন করেছে এ পথ।

এ কাহিনীটিও অতীব সরল—সরলতর তার বিন্যাস। তবু বলতে হয় এতটা 'সিনিক' ফিল্ম সত্যজিৎ নির্মাণ করেন নি আর কখনও। নটবরের মাধ্যমে এ ছবিতে সত্যজিতের ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা, 'আপনি এই যে সৎ লোক হবার জন্য ছটফট করছেন— এর থেকে কী আশা করছেন আপনি? এ জন্য পদ্মশ্রী পাবেন আপনি? শ্রেফ চরিত্র ভালো বলে খেতাব পেয়েছে একজন লোক—এ রকম কোনও উদাহরণ দিতে পারেন?—আজকের দিনে, আপনি একটা লোকের নাম করুন—পাবলিক ফিগার— একেবারে টপ থেকে ধরুন—যার নামে আজ পর্যন্ত একটাও কলঙ্ক রটে নি, তার চরিত্র স্পটলেস বলে জানা গেছে প্রমাণ পাওয়া গেছে—?' স্বভাবতই 'জন-অরণ্যে'র নায়ক সোমনাথ কেন, সম্ভবত স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের কোনও বিবেকবান ব্যক্তিই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে না। দেশের আবহাওয়াকে রাজনীতি কতটা গুলিয়ে দিলে পৌঁছনো যায় এমন উপলব্ধিতে তাব বোধহয় পরিমাপ হয় না। অন্তত সত্তর দশকের মধ্যভাগ পশ্চিমবঙ্গে এ পরিস্থিতিরই সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু এ ছবিতেও সত্যজিতের রাজনৈতিক প্রতীতির তেমন গভীবতা দেখা যায় না। এ বেকার বাহিনীব উৎস কোথায়, মূল্যবোধের ধ্বস্ততার কারণ কি তা নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি। তাঁর অন্বেষণ আটকে থাকে শুধুই বহিরঙ্গে। আভ্যন্তরীণ জটিলতা নিয়ে ব্যস্ত হন না কখনওই। তাই সোমনাথের কাছে চাকরিতে একটি পদের জন্যে তিনলাখ দরখাস্ত গেছে শুনে তার বাবা দ্বৈপায়ন বলেন, 'সর্বনাশ! সাধে কি এরা বিপ্লব করতে চায়?' যেন বেকার বাহিনী দিয়ে তৈরি হয় বিপ্লবের সৈন্যদল। বিপ্লবের জন্যে যে দরকার হয় না শ্রেণী চেতনা, বিশেষ রাজনৈতিক শিক্ষা এবং নেতৃত্বের সক্ষমতা ও পারঙ্গমতা। মধ্যবিত্ত বাঙালিয়ানার পবিসীমাতেই তাই আটকে থাকে এ ছবির মেসেজ।

আসলে সত্যজিৎ সমকালীন সমস্যাগুলোকে চিনে নিতে চেয়েছেন, কিন্তু কখনওই নেমে আসতে পাবেন নি জটিলতাব সমতলে। নিজের অর্জিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের চুড়োয় বসে তাকাতে চেয়েছেন নিচের দিকে, সমবেদনাও ছিল তাঁর অবশ্যই, কিন্তু সমাজের প্রখর নিষ্ঠুরতাকে চিহ্নিত ও অপাবৃত করার মেজাজ তাঁর ছিল না। শুধু সমবেদনাই সার্থক শিল্প সৃজনে সমর্থ হয় না, একাত্মতার বোধও রূপনির্মিতিতে সমান জরুরি।

সাতের দশকে পরিচালনা করেছিলেন তাঁর প্রথম হিন্দী ছবি 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'। এ কালের অগ্রগণ্য লেখক প্রেমচন্দ রচিত গল্প এ ছবির উৎস। গত শতকের অযোধ্যায় রাজনৈতিক পালাবদলের কালে সাধারণ মানুষের চেতনায় জড়িত ছিল যে জড়তা ছোটগল্পের সংক্ষিপ্তিতে প্রেমচন্দ তার তীব্র প্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রসঙ্গত লু সুনের লেখা 'আ-কিউ' পাঠকের মনে পড়বে। এ গল্পেও লু সুনের আক্রমণেব লক্ষ্য ছিল চীনদেশি

মানুষের অসহ্য নিস্পৃহতা ও নিরাবেগ, অজস্র অত্যাচারেও যা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে না। রাজনীতির কোন্ কূটখেলায় নির্ধারিত হতে চলেছে একটি জাতির ভবিষ্যৎ, অথচ নাগরিকরা সে বিষয়ে আশ্চর্য উদাসীন, 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'-তে ঘটেছে তারই ব্যঙ্গ মিশ্রিত করুণ প্রতিফলন। সত্যজিৎ গল্পটিকে অনুসরণ করেছেন বিশ্বস্ততা নিয়ে, কিন্তু অতিমাত্রায় ডকুমেন্টেশন প্রেমচন্দ অভিলষিত তীব্রতাকে অনেকটাই স্তিমিত করে দিয়েছে। একটি ছোট গল্পকে ধ্রুপদী আঙ্গিকে রূপান্তরিত করলে আসে যে আরোপিত মন্থরতা, এ ফিল্ম তার থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

আশির দশকে সত্যজিৎ যে তিনখানি ফিল্ম পরিচালনা করেছেন তার প্রতিটির মূল বিষয় রাজনীতি। এ তিনটি ফিল্ম হল 'হীরক রাজার দেশে'(১৯৮০), 'ঘরে বাইরে' (১৯৮৪) এবং 'গণশত্রু' (১৯৮৯)। তাছাড়া টেলিভিশনের জন্যে এ দশকের গোড়ায় আরও নির্দিষ্ট করে বলতে ১৯৮২-তে, নির্মাণ করেছিলেন দু'খানি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি— 'পিকু' ও 'সদগতি'।

এ দশকের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের তিনখানি ছবিই রাজনীতি নির্ভর। প্রায় এগার বছরের ব্যবধানে ফিরে এল গুপী-বাঘা, তাদের ঔজ্জ্বল্য অনেকটাই হারিয়ে। এ ছবির নির্মাণকালে অবশ্যই সত্যজিতের স্মরণে ছিল মাত্র গুটিকতক বছর আগেকার জরুরি অবস্থার কথা। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত সারা দেশে চলেছিল যে তানাশাহীর তাণ্ডব, সত্যজিৎ যেন তাকেই রূপকের মোড়কে পরিবেশন করলেন দর্শকদের কাছে। কিন্তু এ রূপক এতটাই বর্ণবিহীন ও একমাত্রিক যে তার অভিঘাত তেমন জোরালো হল না। অবশ্য সংলগ্ন প্রায় সব বিষয়ই ছিল এ ছবিতে। হীরকরাজা ও পারিষদবর্গের অবর্ণনীয় অত্যাচার, শ্রমিক জীবনের দুঃসহ দুঃখ, শিশুমনকে ফ্যাসিবাদী শিক্ষার আওতায় এনে তাদের চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করার চেষ্টা এবং সর্বোপবি এ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্ফুরণ ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনা এসেছে 'হীরক রাজার দেশে'-তে। কিন্তু এত সব সংঘটনা এমনকি গুপীবাঘার যাদুস্পর্শও, উজ্জীবিত করতে সক্ষম হল না ফিল্মটিকে। যে রহস্য ও ব্যঞ্জনা একটি সার্থক শিল্পে অভিলষিত, এখানে লক্ষিত হল তার নিদারুণ অনুপস্থিতি। ফ্যান্টাসির কিছু নিজস্ব চাহিদা থাকে, তা সময়কে মেনেই ছাড়িয়ে যায় সময়কে, কল্পনার অবাধ বিস্তার সেখানে অভিব্যক্ত হয় পরিমিত মেনে, স্বপ্ন ও সত্যের সার্থক মিলন ঘটায়। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এ এই মিলন সম্পন্ন ও সার্থক হয়েছিল, সেখানে শরীরে অশরীরে মিলে রচিত হয়েছিল একটি নান্দনিক বিশ্ব। কিন্তু রাজনীতির সরলীকৃত বোধ 'হীরক রাজার দেশে'-কে বিপর্যস্ত করল। গুপীবাঘার প্রত্যাবর্তন তাই সুখের হল না।

'হীরক রাজার দেশে' সত্যজিতের নিজের রচনা, তবু তার ব্যর্থতা আমাদের বিষন্ন করে। কিন্তু আমাদের যথার্থই ক্ষুব্ধ করে তোলে পরবর্তী ছবি দু'খানি—'ঘরে বাইরে' ও 'গণশত্রু'। 'ঘরে বাইরে' নিয়ে সতজিতের চিন্তা ভাবনার শুরু নাকি 'পথের পাঁচালী' পর্বেরও আগে। রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসখানি নিয়ে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে আবির্ভূত হতে চেয়েছিলেন। তখন হলে এ ফিল্ম কেমন হত এ জল্পনা এখন অর্থহীন। কিন্তু নিজের শিল্পী জীবনের প্রায় উপান্তে এসে যখন তিনি পরিবেশন করেন 'ঘরে বাইরে' তা আমাদের মনে আর প্রত্যাশিত সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় না। অথচ রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে রচিত তাঁর ফিল্মসমূহের মধ্যে এটিতেই তিনি মূল কাহিনীকে বোধকরি

অনুসরণ করেছেন সবচাইতে বেশি। কিন্তু প্লটের শুধু বাইরের কাঠামোটি অনুসৃত হলে তার শিল্পধর্ম মার খায়। অন্তত 'ঘরে বাইরে'র ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। 'নষ্টনীড়' থেকে 'চারুলতা' বহিরঙ্গে বেশ খানিকটা সরে গেলেও ফিল্মটি সার্থক হয়েছিল গল্পের আন্তর সত্তার শিল্পিত বিস্তারে।

'ঘরে বাইরে'-তে সত্যজিৎ শুধু নিয়েছেন নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপের অংশটুকু এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সামান্য আবেগ। প্রসঙ্গত অবশ্য বনেদি বাড়ির বধূ হিসেবে বিমলার প্রথম বাইরে আসার বিষয়টিকেও রাখা হয়েছে। কিন্তু তা এতটাই আরোপিত ও কৃত্রিম এবং বিমলার অভিব্যক্তি এ অংশে এতটাই যান্ত্রিক যে প্রত্যাশিত সংশক্তি জাগাতে সক্ষম হয় না। এ ফিল্মের সবচাইতে অসুবিধের জায়গা হল এই যে মূল উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন, ফিল্মটিতে তা নির্মমভাবে মুছে ফেলা হয়েছে। ইউরোপের রাষ্ট্রমুখ্য মানসিকতা ভারতের সমাজ ভিত্তিক সভ্যতার সঙ্গে এসে সৃষ্টি করেছে যে সমস্যা, এ উপন্যাসের সন্দীপ ও নিখিলেশের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার গরিষ্ঠ অংশ জুড়ে রয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বটি বুঝে নেবার চেষ্টা, আত্মশক্তি উপলব্ধির গভীর প্রয়াস। 'ঘরে বাইরে'তে এ রাজনৈতিক ভিত্তিটিকেই বিনষ্ট করা হয়েছে। তাই ও ব্যাপক তাৎপর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে মূলত কাহিনীব কাঠামোটিকে অনুসরণ করায় ফিল্মে সন্দীপকে মনে হয়েছে ভিলেন, নিখিলেশকে নিবীর্য ও বিমলাকে নিতান্তই পরপুরুষে আকৃষ্ট বিভ্রান্ত একজন রমণী। অথচ রবীন্দ্রনাথেব অভিপ্রায় ও উপন্যাসে সম্ভবত ছিল এ দু'টি বিপরীতধর্মী ভাবনার মধ্যে বিমলাকে ফেলে কোন্ পথটি সঠিক তা চিহ্নিত করা। এ জন্যেই নিখিলেশ 'ঘর' এবং সন্দীপ 'বাইর'। উপন্যাসে থেকে রাজনীতির মূল সমস্যাটিকে এড়িয়ে অথবা তাকে তরল করে সত্যজিৎ ফিল্মটিকে নিতান্তই সাদা মাটা হিসেবে উপস্থাপিত কবেছেন। একটি নারী ও দু'টি পুরুষের শুধুমাত্র মানসিক সমস্যা এ উপন্যাসের উপজীব্য নয়। 'ঘরে বাইরে' অবশ্যই একটি রাজনৈতিক উপন্যাস।

'গণশত্রু'ও একই দুর্বলতায় আক্রান্ত। কেউ কেউ বলেন, 'অ্যান এনিমি অব দ্য পীপল' (১৮৮২) নাকি ইবসেন লিখেছিলেন সমালোচক ও এক শ্রেণীর দর্শকের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে যারা তার অব্যবহিত আগে লেখা 'গোস্টস্'কে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু একথা সবটা ঠিক নয়। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন 'অ্যান এনিমি অব দ্য পীপল' ইবসেন লিখতে শুরু করেন 'গোস্টস্' লেখার আগেই। মাঝে কিছুদিন 'এনিমি' রচনায় বিরতি দিয়ে 'গোস্টস্' লিখে ফেলেন। তাই 'গোস্টস্'-এর সমালোচনার জবাবে 'এনিমি' লেখা হয়েছিল এ সিদ্ধান্ত করা মুশকিল।

সেকালে স্বীকৃত নরওয়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বুয়োর্ণসেনকে লেখা ৪ঠা আগস্ট ১৯৮২ তারিখের চিঠিতে ইবসেন জানাচ্ছেন তিনি 'অ্যান এনিমি অব দ্য পীপল' নাটকটির 'ফাইনাল ফর্ম' দিতে ব্যস্ত। একই চিঠিতে তিতি প্রশ্ন তুলেছেন সামাজিক সমস্যাবলীর তুলনায় রাজনীতি অগ্রাধিকার পেলে কি তার ফল ভাল হয়? খেদ প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন নরওয়েবাসীদের কাছে সামাজিক সমস্যার কোনও গুরুত্ব যেন নেই। এ ব্যাপারে ইবসেনের অভিমত হল প্রগতির প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের

তুলনায় মানুষকে মুক্ত করা অনেক বেশি দরকারি।

বুয়োর্ণসেনকে লেখা চিঠিতে ইবসেন রাজনীতি বনাম সমাজনীতির যে প্রশ্নটি তুলেছেন তারই শিল্পিত রূপ 'অ্যান এনিমি অব দ্য পীপল'। এ নাটকে জনগণের নৈতিকতার সমস্যা, রাজনীতিবিদদের পেশাদারী চাতুর্য, ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পারিক তির্যক অথচ সুস্থ সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে জোরাল অভিমত নাট্যকার প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী স্পষ্টই বোঝা যায় সমাজের নিচু তলার শিশুদের যদি সঠিকভাবে চালনা করা যায়, তাহলে এমন দিন অবশ্যই আসবে যখন ধূর্ত মতলব-বাজ নেকড়ে সদৃশ রাজনীতিবিদদের সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। তাই যদিও নাটকের শেষে ডঃ স্টকমান বলেন, 'দ্য স্ট্রংগেস্ট ম্যান ইজ হি হু স্ট্যাণ্ডস অ্যালোন', তবু শেষ পর্যন্ত ডঃ স্টকমানের মত মানুষেরা আর 'একলা' থাকবেন না— এ প্রত্যয় নাটকের উপসংহারে স্বতই দ্যোতিত। তার আগে পর্যন্ত স্বভাবত স্বতন্ত্র মানুষটি আদর্শের দিক থেকে 'একলা' অথচ 'শক্তিমান' হিসেবে 'সুদূর নির্জনে উত্থিত' হতে থাকেন।

ডঃ স্টকমান পেশাদার রাজনীতিক ছিলেন না। জনমনকে প্রভাবিত করার কৌশল তাঁর জানা ছিল না। নাটকে অন্তত এ প্রতীতি অস্পষ্ট থাকে না যে সমাজমনস্ক মানবপ্রীতিতে ভরপুর ডঃ স্টকমানের মননে খানিক বাস্তববুদ্ধি যুক্ত হলে ভবিষ্যতে তিনি সক্ষম হবেন জনচিত্ত বিজয়ে, তাঁর সংযোগ ঘটবে উদার ও সহানুভূতি সম্পন্ন মানুষদের সঙ্গে। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে তাঁর অবেগ সমৃদ্ধ সংলাপ সে সম্ভাবনাই জাগিয়ে তোলে। শুধুমাত্র ভাল করবার ইচ্ছা থাকলেই সমাজের ভাল করা যায় না। সমাজ বিজ্ঞান ও সংলগ্ন মানুষদের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যিক। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের উপান্তে এসে ইবসেন দেখিয়েছেন ডঃ স্টকমানের মনে তখন এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা না গড়ে উঠলেও একটি স্বচ্ছ চেতনা ক্রমশ তাঁকে অধিকার করছে। অন্যথায় সমাজের 'নেকড়েদের' কথা তিনি বলতেন না—'উই শ্যাল ড্রাইভ অল দ্য উল্‌ভস আউট অব দ্য কান্‌ট্রি'-এবং কোন্ পদ্ধতিতে হিংস্র পশুদের তিনি তাড়াতে সমর্থ হবেন সে পন্থাও তাঁর কাছে এভাবে উন্মোচিত হত না।

তথাকথিত জনগণের মনস্তত্ত্বের স্বরূপ, রাজনীতি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি নিয়ে ইবসেন তাঁর নাটকের চতুর্থ অঙ্কে যে সব প্রশ্ন তুলেছিলেন, ডঃ স্টকমান সোচ্চার হয়েছিলেন 'ব্রুট মেজরিটি'র বিরুদ্ধে, আক্রমণ করেছিলেন জনগণের নৈতিক দুর্বলতাকে, 'গণশত্রু'-তে সত্যজিৎ যেন সযত্নে পরিহার করে যান সেসব সিকোয়েন্স ও সংলাপ। সত্যসন্ধানী একক ব্যক্তি ন্যায়কে আশ্রয় যখন রুখে দাঁড়ান যাবতীয় অন্ধতা ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে, তখন স্বার্থন্বেষী মহলের চক্রান্ত ও প্রচারে বিভ্রান্ত জনতা সেই আদর্শলগ্ন মানুষটিকেই অভিহিত করে 'গণশত্রু' হিসেবে। জনতার মূঢ়তা, রাজনীতিবিদদের ষড়যন্ত্র, প্রচার মাধ্যমের অপরিসীম নোংরামির মুখোশ খুলে দেন ডাক্তার।

সত্যজিতের 'গণশত্রু' সম্পূর্ণ বর্জন করেছে নাটকের মূল্যবান একান্ত প্রয়োজনীয় এ অংশটিকে। তার ফলে ইবসেন বিধ্বস্ত হয়েছেন আদর্শগতভাবে, নাটকের মূল বিষয়টি বিবর্ণ হয়েছে মাত্রাছাড়া সরলীকরণে এবং 'অ্যান এনিমি অব দ্য পীপল' প্রবলভাবে সরে এসেছে তার নিজস্ব জগৎ থেকে। ডঃ স্টকমানের মত পজিটিভ চরিত্রটি পরিণতি

পায় স্তিমিতপ্রায় অশোকের মধ্যে। সৌমিত্রের মত অভিনেতাও তখন তাঁকে আর জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পাবেন না। নিশীথের (মূল নাটকের বড় ভাই পিটার স্টকমান সত্যজিতের ছবিতে রূপান্তরিত হয়েছেন ছোট ভাই নিশীথ নামে) কূটবুদ্ধির পাশে তাই তাঁকে নিতান্তই ম্যাড়মেড়ে মনে হয়। ডঃ স্টকমানের উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ তখন পুরোপুরি বিলুপ্ত। বিস্মিত দর্শক অবলোকন করেন শুধু অশোকের অসহায় আত্মসমর্পণ। 'গণশত্রু'তে তখন আর 'গণ' নিজস্ব চারিত্র্যে স্থিত থাকে না, 'শত্রু'ও হারায় তার শিল্পগত বিশ্বাসযোগ্যতা।

এ সিকোয়েন্সের দুর্বলতা স্বভাবতই সংক্রামিত হয়েছে ফিল্মের সপ্তম সিকোয়েন্সে, নাটকেব যেটি পঞ্চম অঙ্ক। এ দৃশ্যে নাটকেব নিবিড় বুনোট সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। সমাজকে 'নেকড়েমুক্ত' করার দায়বদ্ধতা ডাক্তার এখানে একবারও ঘোষণা করেন না। রাস্তাব ছেলেমেয়েদের নিয়ে নতুন নাগবিক গড়ে তোলাব কথা অশোকের উচ্চারণে থাকে অদৃশ্য, ধ্বণিত হয় না আগামী প্রজন্মেব ওপর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ও আস্থা। ফিল্মটি শেষ হয রণেনের মত নড়বড়ে মেকি বুদ্ধিজীবী ও তার ক্ষীণকণ্ঠ অনুগামীদের সাজানো শ্লোগানে। মূল নাটকেব অগাধ প্রত্যযব পবিসমাপ্তি ঘটে নিতান্তই মাঝারি ধরনের মধ্যবিত্তযানায।

প্রশ্ন উঠতে পাবে পবিচালক কি ফিল্মেব প্রয়োজনে মূল বচনাকে পাল্টানোব অধিকারী নন? অবশ্যই অধিকাবী, তবে তা শিল্পেব শর্ত মেনে। ইবসেনের এ মহৎ নাট্যকর্মটিব মূল ভিত্তিকে ধ্বস্ত কবাব অধিকার কাবও নেই, এমন কি সত্যজিতেরও নেই। 'অপবাজিত' ও 'নষ্টনীড়' পবিবর্তিত হযেছিল শিল্পকে স্বীকাব করে, বিভূতিভূষণ ও রবীন্দ্রনাথেব প্রাণনাকে অবিকৃত রেখে। তার ফলে দর্শকদেব অভিজ্ঞতায় অর্জিত হয়েছিল সমৃদ্ধতর বাস্তব যা আদর্শেব নিষ্কাশিত রূপ। 'গণশত্রু' সে বাস্তবকে বিনষ্ট করেছে।

'শাখা প্রশাখা' (১৯৯০)-তেও সত্যজিৎ ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় প্রসঙ্গটি এনেছেন। তবে ফিল্মের মূল বিষযের সঙ্গে তার কতটা সংলগ্নতা বযেছে তা বিচার্য। 'শাখা-প্রশাখা' আধুনিকালেব মূল্যবোধহীনতাকে আক্রমণ করতে চেয়েছে। সাবা পৃথিবীতে সমাজেব সর্বস্তরে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন সত্যজিৎ। সমাজতন্ত্রের পতন এ অবক্ষয়েবই একটি প্রকাশ কিনা তা নিয়ে অবশ্য কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি এ ছবিতে। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে প্রসঙ্গটি এসেছে। আনন্দ মজুমদারের অসুস্থতার খবর পেয়ে তিন ছেলে কলকাতা থেকে তাঁকে দেখতে এসেছে। তিনজনের মধ্যে প্রবোধ ও প্রবীর বিবাহিত, প্রতাপ অকৃতদাব। অসুস্থ আনন্দবাবুকে খুশি করতেই তারা একদিন পিকনিকে যায়। সেখানেই সেজ প্রবীর ছোট ভাই প্রতাপকে হঠাৎ বলে, 'তুই কি এখনও নিজেকে মার্কসিস্ট বলিস?' বিস্মিত প্রতাপেব জিজ্ঞাসা, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? এ ব্যাপাবে যখন তোমার অ্যাবসোলিউট্‌লি কোনও ইন্টারেস্ট নেই?' প্রবীর তাকে বিরক্ত করার জন্য বলে, 'সোসালিজম্-এর এই হাল দেখে তোর মুখ বন্ধ হয়ে গেছে তাই না?'

এ সিকোয়েন্সে উপস্থিত অন্যসব চরিত্রেব মত দর্শকরাও সহজেই বুঝতে পারেন এ সংলাপগুলোর মধ্যে কোনও আন্তরিকতা নেই। অংশটি ফিল্মে পুরোপুরি প্রক্ষিপ্ত,

প্রতাপের প্রতি প্রবীরের বিশুদ্ধ লেগপুলিং। এবং তার মনস্তাত্ত্বিক কারণও ছিল অন্যত্র নিহিত। ফিল্মের মূল সমস্যার সঙ্গে তাই এ সংলাপসমূহের, জৈবিক যোগ নেই। 'টেলিরামা'র প্রতিবেদকের কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে সত্যজিতের উদ্বেগ ও ভবিষ্যতের প্রতি যে আস্থা অভিব্যক্ত হয়েছে, তার সামান্যতম প্রতিফলনও ঘটেনি এসব সংলাপে।

আসলে সত্যজিতের মানসিকতা অস্থির সময়ে যেন স্বস্তি পায় না। তিনি অবশ্যই সমাজসচেতন, কিন্তু রাজনীতির প্রশস্ত পথ বা গলিঘুঁজি এড়িয়ে চলেন নিজস্বতা নিয়ে। যা মানবিক, সুদূর অথবা অন্তরঙ্গ তার কাব্যময় প্রকাশেই স্বচ্ছন্দ থাকেন তিনি। তাই পঞ্চাশের বীভৎস মন্বন্তরও তাঁর অভিজ্ঞতায় হয়ে ওঠে রঙিন। 'অশনি সংকেত' তখন আর নিষ্ঠুর বাস্তবতা নিয়ে আমাদের সামনে আসে না, অনেকটাই যেন হয়ে ওঠে রোম্যান্টিক।

এবং সেজন্যই তিনি 'সদগতি'তে সফল হন! প্রেমচন্দের এ কাহিনীতে রাজনীতির প্রত্যক্ষতা নেই, আছে তথাকথিত নিচুবর্গের মানুষদের প্রতি নির্মম আচরণের প্রামাণ্য চেহারা। অসাধারণ পরিমিতি ও মানবতাবোধ স্বল্পদৈর্ঘ্যের এ ফিল্মটিকে দিয়েছে মহাকাব্যিক বিস্তার। দুখি কামারের প্রতি ঘাসিরামের হৃদয়হীন ব্যবহার শ্রেণীশাসিত ভারতীয় সমাজের সঠিক চেহারাটিকে তুলে ধরেছে। জাতপাত ও ধর্ম যে শোষণ ও পীড়নেরই অঙ্গ সত্যজিৎ তার অভিব্যক্তি ঘটান অনবদ্য মুন্সিয়ানায়। তখনই প্রমাণিত হয় যা-ব্যঞ্জনাঋদ্ধ, দ্যোতনাময়, অন্তরঙ্গ অথচ গভীর এমন বিষয়ই তাঁর কাছে বরণীয়। প্রত্যক্ষ রাজনীতিকে শিল্পে অনূদিত করার মানসিকতা তাঁর ছিল না, তার কারুকৃতিও আয়ত্তে আনার জন্যে কখনও যত্নবান হন নি সত্যজিৎ। অবশ্য তার ফলে বাংলা ফিল্মের কতটা ক্ষতি বা লাভ হয়েছে তা বিচার করবে ভবিষ্যৎ।

সত্যজিৎ রায়ের করা 'পরশ পাথর'-এর পোস্টার

অপু থেকে পিকু

রুশতী সেন

অপুকে সবাই চেনে, গহন শালবনে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে, দিদির সঙ্গে গলা মিলিয়ে যে বলেছিল 'নেবুর পাতায় করমচা/হে বৃষ্টি ধরে যা—'। বৃষ্টি ধরল বটে, কিন্তু দিদি আর রইল না বেশিদিন। সেই বর্ষায় ভিজে দিদির জ্বর, যে অসুখ আর সারে নি। শিশু অপুকে দেখেছি, দিদি সকালে দাঁত মেজে দিত, চুল আঁচড়ে দিত। 'পথের পাঁচালী' ছবিতে দিদির মৃত্যুর পরে অপু যখন প্রথম পর্দায় আসে, সেই সকালে সে নিজে দাঁত মাজছে, চুল আঁচড়ে নিচ্ছে। শিশুর জগৎ যে অন্তহীন নিশ্চিতিতে পরিপূর্ণ থাকে, অপুর জীবনে সে নিশ্চয়তার প্রথম বেসুর —তার দিদির মৃত্যু। তার পর 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার' ব্যেপে অপুর জগৎ নিশ্চিন্দিপুর থেকে বারাণসী, বারাণসী থেকে মনসাপোতা—এমন করে ঘুরতে ঘুরতে শহর কলকাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। যে অপুকে আমরা জন্মের আগে থেকে জানি, সে তখন যুবক। বাধা বিঘ্ন তার জীবনে এসেছে কম নয়। সেই শৈশব থেকে শুরু করে প্রতি মুহূর্তে অপুকে বাঁচবার তাগিদে লড়তে হয়েছে। তবু শিশুসুলভ অসহায় নির্ভরতায় আঁকড়ে ধরবার মতো মানুষ তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন ব্যেপে সে পেয়েছে। সে নির্ভরতাকে কী পরম যত্নে লালন করতে চেয়েছেন মা সর্বজয়া, তার পর স্ত্রী অপর্ণা, এমন কি প্রণবের মতো বন্ধু।

আর ছন্নছাড়া অপু তার সাবালক যন্ত্রণার নিবাময় খুঁজতে শেষ পর্যন্ত ছুটে এসেছে এক শৈশবের দূয়ারে। সে শৈশব বড় অসহায়। আজন্ম মাতৃহীন কাজল মাতুলালয়ের তীব্র শাসনে বেড়ে ওঠে, কল্পনায় তৈরি করে নেয় বাবার এক বরাভয় মূর্তি। অপুকে কাজল চেনে না, বালক শুধু জানে যে তার বাবা কলকাতায় থাকে। অপুকে সে বিশ্বাস করেছিল—কলকাতায় আমার বাবা থাকে, তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে? লোকটা রাজি হয়ে গেল দেখে কাজল যখন উপকারীর পরিচয় শুধোয়, অপু বলে, আমি তোমার বন্ধু, কাজল। অপুর কাঁধে বসে আছে আর অপু এগিয়ে যাচ্ছে। সাবালক মনন নিশ্চিতির আশায় শৈশবের কাছে এসেছিল। কিন্তু কাজলের শৈশবে অপুর শিশুকালের সেই অনাবিল নিশ্চয়তা নেই। অপুর নিশ্চিন্দিপুর ছিল, দিদি ছিল, বাবা-মা ছিল। আর কাজলের এতদিন ধরে শুধু ছিল কিছু গুরুজন। 'নেবুর পাতায় কবমচা'র সেই পরম বিশ্বাস তো এই ভাগ্যহীন শৈশবকেও দিতে হবে। অপু তাই প্রথম সুযোগেই কাজলের বন্ধু হতে চায়। এই বন্ধুত্বের দাবিতে অপু যেন সাবালক জগতের সব অন্ধকারকে দীপান্বিত করে দিল। অপুর শৈশব থেকে কাজলের শৈশবে এসে মনে হলো, কাজলও পারবে বাল্য থেকে কৈশোরের, যৌবনের পাড় ভেঙে এগোতে এগোতে নতুন আলো জ্বালতে, বিশেষত যখন সে পেয়েছে বাবার মতো বন্ধু।

আসলে শিশুই পারে; শৈশবের, বাল্যের মুখোশবিহীন, নিশ্চিত মুখই পারে সাবালক জীবনের সব সংশয়, সব ভ্রান্তিকে ভেঙে দিতে। তার পরিণাম কখনো হয় মর্মন্তুদ,

তবু তা সত্য। এই সত্য ভাষণ অবিচ্ছেদ্য জড়িয়ে আছে সত্যজিৎ রায়ের দীর্ঘ শিল্পকর্মে। চরম পরিণামে যাওয়ার আগে শৈশবের কাছে তিনি বার বার ফিরে আসেন— কারণ শিশুর চেয়ে সত্যবাদী, শিশুর চেয়ে শক্তিশালী বোধ হয় প্রকৃতি ছাড়া আর কেউ নয়। শিশুর সেই নিশ্চিতির জোরই যেমন তিনটি ছবি জুড়ে থাকা অপুর কাহিনীকে এক আশ্চর্য প্রসাদে সমাপ্ত করেছিল, তেমনি মর্মান্তিক হাহাকার এনেছিল আরেক শিশু অন্য এক ছবিতে '...এরা আমায় মেরে ফেলবে...।' দয়াময়ীর ভিতর-বাহির অব্যক্ত আর্তনাদে ফেটে পড়তে চায় যেন—আমি দেবী নই, দেবী নই।

কিন্তু খোকার কাকীমা খোকাকে বাদ দিয়ে কিছুতেই নিঃসংশয় হতে পারে নি যে সে দেবী নয়। মনে পড়ে, দেবীর পুজো আর আরতি, প্রসাদ আর চরণামৃত বিতরণের পরে ক্লান্ত দয়াময়ী ঘরে শোয়া, বারান্দায় খেলা করছে খোকা। তার কাঠের বল গড়িয়ে আসে দয়াময়ীর ঘরে। বল নিতে খোকা ঘরে এলে দয়াময়ী হাত বাড়িয়ে ইশারায় খোকাকে কাছে ডাকে। খোকা যায় না। সে তার কাকীমাকে জানত, কাকীমার কাছে খেতে, শুতে, গল্প শুনতে বড় ভালোবাসত। কিন্তু এ যে দেবী—এর ঘরের কুলুঙ্গি তে শুকনো ফুলের মালা। দেবী খোকার অচেনা। খোকার এই প্রত্যাখ্যানেই দেবীর মনে পড়ে যায় দয়াময়ীকে, মনে আসে ঘরকন্নার কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্বামীর নানান আবদারের কথা, মনে আসে বিয়ের রাত্রির কথা। এই প্রথম আমরা দেখি, দেবী তার মানবজীবনের স্মৃতিতে আকুল হয়ে কাঁদছে। অসুখের ঘোরে খোকা দেবী দয়াময়ীকে ডাকে নি, ডেকেছিল কাকীমাকে। কিন্তু কাকীমার তখন দেবীত্ব ছাড়া কোনো পরিচয় নেই। সেই দেবীর কাছেই নিয়ে যাওয়া হলো খোকাকে, বন্ধ হলো সব চিকিৎসা, দেবীর চরণামৃতই একমাত্র ওষুধ। খোকা মরে তার কাকীমাকে দেবীত্বের অভিসম্পাত থেকে মুক্তি দিয়ে গেল। সেই মুক্তির যন্ত্রণায় কাকীমার সামনে মরণ ছাড়া জীবনের আর কোনো পথ খোলা ছিল না।

কী আশ্চর্য নিশ্চয়তায় পরম সত্যটি যে কেমন করে বলে শিশু তা বিশ্লেষণের অতীত। কিন্তু জীবনে তা যেমন সত্য, শিল্পেও তেমনি। তাই মনে পড়ে 'পরশপাথর' ছবিতে ছাতু ময়রার লেনের নিম্নমধ্যবিত্ত বালক পলটুকে। কয়েকটা খেলনা আর এক ঠোঙা লজেন্সের বিনিময়ে কত সহজে সে তার 'পরশপাথর' মার্বেলটা পরেশবাবুকে দিয়ে দেয়। আসলে ওই মার্বেলে তার তো কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, জড়িয়ে আছে শুধুই নির্মল আনন্দ আর বিস্ময়—কাণ্ড দেখ, মারল সে পল্টনকে অ্যাটম বোমা দিয়ে, আর লোহার পল্টন হয়ে গেল সোনার! তবু পরশপাথর নিয়ে যখন পরেশবাবু চলে যাচ্ছেন, পলটু হঠাৎ বলেছিল; 'আর কাউকে দিও না কিন্তু জ্যাঠামশাই।' পলটুর এই সংলাপ বাদ দিয়ে 'পরশপাথর' ছবি স্বচ্ছন্দ গতিতেই চলতে পারত। পলটুও খুব সম্ভব নাবালক কৌতুকের আনন্দেই পরশপাথরের ব্যাপারটা জ্যাঠামশাই আর নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু যত গোল বাধল তো তখনি, যখন জ্যাঠামশাই পলটুর কথার অবাধ্য হয়ে সেই ককটেল পার্টিতে সকলের সামনে বের করে ফেললেন পাথরটা। তার পর কত কাণ্ডই না হলো— শেষ অবধি প্রিয়তোষ হেনরী বিশ্বাস হজম করে ফেলল পরশপাথর; আর আমরা দেখলাম পর পর দু'টি দৃশ্য—শেঠজি কৃপারাম কাচালুর সোনার ভেনাস লোহার হয়ে গেল: পলটুর সোনার পল্টন লোহার হয়ে গেল।

ওই সময় পলটুর পল্টন আর একবার দেখে একটা অভিব্যক্তি মনে আসে; পলটু, যে প্রথম লোহাকে সোনা হতে দেখেছিল, সোনা আবার লোহা হওয়ায় তারই এল গেল সব থেকে কম। কারণ ওই একটাই, পলটু যে বালক, কী অসীম শক্তি তার, পরশপাথরের জায়গায় আর একটা মার্বেল পেয়ে সে অনায়াসে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

শৈশবের এই আশ্চর্য ক্ষমতায় সত্যজিৎ রায়ের বিশ্বাস দৃঢ়। তাই শিশুর নিশ্চিতি সাবালকে এনে রূপকথার চিত্ররূপে কী অসাধারণ শিল্প তিনি নির্মাণ করেছিলেন। যারা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় গাইতে পারে— মুন্ডু গেলে খাবটা কী—তাদের শিশুমন নিয়ে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, যতই না কেন বারান্দায় রাজকুমারীকে দেখে উত্তেজিত বোধ করুক তারা। শৈশবকে সাহায্য করতে যেমন আসে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী থেকে শুরু করে আকাশের পরী, সাগরপারের যাদুকর, এখানে তেমনি এসেছিল গহন বনে ভূতের রাজা গুপী গায়েন আর বাঘা বায়েনের সহায়তায়। এ ছবিতে তাই আলাদা করে কোনো শৈশবের প্রতীকের প্রয়োজন হয় নি। দুটি প্রাপ্তবয়স্ক শিশুর জয়ের কাহিনী 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'। শিল্পীর কৃতিত্ব সেখানেই যে এদের সহজ সরল গানের মধ্যে দিয়ে, এদের সংলাপ ও গতিতেই সাবালক যন্ত্রণার মুহূর্ত তিনি দেখালেন। মনে পড়ে, হল্লার রাজামশাইকে নিয়ে কারারুদ্ধ গুপীর সেই অসামান্য গান—'ত্যজিয়ে সোনার গদি রাজা মাঠে নেমে যদি হাওয়া খায়/তবে রাজা শান্তি পায়!' অথবা ভূতের রাজার বরে তালি বাজিয়ে খেতে বসেছে গুপী-বাঘা, কারাগারের দরজায় হল্লাব সেই বুভুক্ষু প্রহরীটি। ওই খাবারের লোভেই সে গুপী-বাঘাকে মুক্তি দেয, তাব পর ঝাঁপিয়ে পড়ে খাবারের থালায়। সে মুহূর্তের ব্যঞ্জনায় সত্যজিৎ রায় শিশুর মনেও সাবালক অনুভব এনেছিলেন। আবার হল্লার অনুচরটি শুণ্ডীরাজ্য দেখে এসে অত্যাচারী মন্ত্রীমশাইকে জানায়, শুণ্ডীদেশে যুদ্ধের আয়োজন নেই, তবে ক্ষেতে ধান আছে, গাছে ফুল আছে, ফল আছে, লোকের মুখে হাসি আছে। এই সংলাপ হয়তো শুধু রূপকথাতেই সম্ভব; আবার এও সত্য, যে ওই ক্ষুধার্ত, নিরন্ন অসহায মানুষটির পুরো মন আর কোনো সংলাপে এমন হাহাকার করে উঠতে পারে না।

দেড় দশকের বব্যধানে সেই গুপী-বাঘাকে দেখলাম, বয়সই বেড়েছে শুধু, মনে এতটুকু কালি লাগে নি, রাজার জামাই হয়েও। 'হীরক রাজার দেশে' গিয়ে গান গেয়ে বাঘ পোষ মানাচ্ছে তারা, '...পায়ে পড়ি বাঘমামা/কোরো নাকো রাগ, মামা—/ তুমি যে এ ঘরে কে তা জানত?' উদয়ন পণ্ডিতকে নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই খুব সরল ভাবে বলেছে 'আমার ভালো লোক।... আমরা ভালোর দলে।'

একটা ব্যাপারে মনে প্রশ্ন আসতে পারে। গুপী-বাঘা শেষ পর্যন্ত গরিব মানুষকে হীরে ঘুষ দিল—এটা কি তাদের জয়ের পথে কাঁটা মতো নয়! অবশ্য ঘুষ কিন্তু গুপী-বাঘা হীরক রাজ্যেই প্রথম দেয় নি, হল্লাতেও দিয়েছিল। আকাশ থেকে মিষ্টির হাঁড়ি নামলে, ছবির শিল্পগত গুণের দিক থেকে সেটা অনেক বেশি বাহারে হয়, নিপুণ হয় ঠিকই; কিন্তু গরিব মানুষকে খেতে দিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত করা যদি নীতিবিরুদ্ধ না হয়, তবে অত্যাচারী রাজার কোষাগারর থেকে জাদুমন্ত্রে, জাদুসংগীতে হীরা বের করে তা গরিব মানুষকে বিলিয়ে দিলে, তা এত দোষের হবে কেন? অবশ্য মিষ্টিটা হাজার হলেও খাবার জিনিস, শিশুদের কাছের জিনিস; কিন্তু হীরে, টাকা-পয়সা, অর্থ—এসব

থেকে শিশুমনকে যত দূরে রাখা যায়, ততই ভাল। কিন্তু এই ভালোটার সঙ্গে গত দশ-পনের বছরের সমাজ ইতিহাস কোনো সহযোগিতা করে নি। শিশুরা তাদের জিভে ক্যাডবেরির স্বাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই চকোলেটের দামটা ক্রমশই আরো দক্ষতায় মিলিয়ে নিতে শিখেছে। তবে শিশু তো, মুখোশ তো নেই, তাই সোজাসুজিই বলে ফেলছে, কতটা তারা বোঝে। পরিপার্শ্ব, আত্মীয় পরিজন, নানান পসরায় সাজানো চক্‌মকে বাজার, সব মিলে কতখানি বুঝতে হচ্ছে তাদের। বাঘাও তো খুব সাদামাঠা ভাবেই বলেছিল হীরকবাসীদের — 'হীরা চাই, হীরা?' গুপা-বাঘা দশ-পনের বছরে এইটুকুই বড় হয়েছে — মিঠাই থেকে হীরা। আর গুপী-বাঘার বন্ধু সব শৈশব? তারা বোধহয় সাবালক হয়েছে অনেক বেশি। 'তাই 'কাঞ্চনজঙঘার'র টুক্‌লু হয়ে গেছে আজকের 'পিকু'।

গভীর কুয়াশায় 'কাঞ্চনজঙঘা' দেখা যাচ্ছে না। সেই ঘন কুয়াশার মধ্যে লাল টুক্‌টুকে কোট-পরা টুক্‌লু ঘোড়ায় চড়ে ঘুরছে — একবার, দুবার বার বার। ঘোড়ার উপর থেকে সে দূরে দাঁড়ানো মাকে দেখতে পায়। আনন্দে ডেকে ওঠে, 'মা! দুবার হলো — আবার ঘুরছি!' মা তখন স্বামীকে লুকিয়ে প্রেমিককে চিঠি পড়ার আড়াল খুঁজছে — টুক্‌লুর ডাকে সে আড়াল তছনছ হয়ে যায়। টুক্‌লু জানে না, যে সম্পর্কের অবলম্বনে তার জীবন, নিশ্চিতি, প্রসাদ, মা-বাবার সেই সম্পর্কে কী নিদারুণ ভঙ্গুরতা! দার্জিলিঙের কুয়াশাকে পিছনে রেখে টুক্‌লুর মা-বাবা অনিমা আর শঙ্কর আজ মুখোমুখি হয়েছে — যা ভাঙছে, তাকে কি তারা পুরোপুরি ভেঙে ফেলবে? এমন সময় টুক্‌লু দ্বিতীয়বার মাকে ডাকে। কী অগাধ নিশ্চয়তায় সে আনন্দে গেয়ে চলে, 'Baa baa black sheep/Have you any wool? .....' টুক্‌লুর ওই 'Three bags full......' এর অনাবিল আনন্দ মা-বাবা ফিরিয়ে নেবে কেমন করে? তাই যা ভাঙছে, তাকে সযত্নে জোড়া দেওয়ার চেষ্টাই করবে অনিমা ও শঙ্কর। টুক্‌লু ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে আসে মা-বাবার দিকে, বাবার কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, মাকে বলে, 'মা—বাড়ি চলো।'

পরম বিশ্বাসে মাকে ডেকেছিল আরেক শিশু বাড়ির বাগানে ঘুরতে ঘুরতে। মা তাকে বলেছিল, বাগানে গিয়ে নতুন পাওয়া আঁকার খাতা আর নতুন রকমের কলম দিয়ে প্রতিটি ফুলের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে মিলিয়ে ছবি আঁকতে। এই মজার খেলাটা খেলতে খেলতে পিকু অসুবিধায় পড়েছে — তার সামনে একটা সাদা শাপলা ফুল, কিন্তু কলমে তো সাদা রঙ নেই। তাই মাকে ডাকে সে, 'আমি সাদা ফুল কালো রঙ দিয়ে আঁকছি মা — সাদা রঙ নেই।' কোন উত্তর আসে না। হিতশকাকু আর মা তখন বিছানায় আলিঙ্গনাবদ্ধ। হিতেশকাকু তো ওই সুন্দর উপহারগুলো ঘুষ হিসাবেই এনেছে — পিকুর মায়ের সঙ্গে শুতে গেলে মায়ের ছেলেকে যেটুকু দিতেই হয়। মাও যে ওই মজার খেলাটা পিকুকে দেখিয়ে দিল, সেও আসঙ্গলিপ্সার নিবৃত্তির আয়োজন সম্পূর্ণ করতে। কিন্তু পিকুর শৈশবকে খেলাটা টেনেছিল। সেই টানটাকে হাতে-কলমে অনুভব করতে সে ছুটে গিয়েছিল বাগানে। তবু ও তো পিকু — পিকুব হাতে সাদা ফুল কালো হবে কেমন করে? তাই সাদা শাপলাটাকে কালো দিয়ে আঁকা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে যায় খাতায় আঁকা ফুলের ছবিতে — পিকুকে যেতে হয় বাড়ির দিকে।

মনে পড়ে ঘোড়ায় চড়তে যাওয়ার আগে টুক্‌লুর মা মেয়েকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, 'বাবাকে টা টা করবে না বুঝি?' বাবাও সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু সকালে বাবার অফিসে বেরোনোর আভাস পেয়ে পিকু যখন নিজে থেকেই টা-টা করতে ছুটে যায়, মুখটা ঘোরানোরও ফুরসত হয় না ভদ্রলোকের, শুধু হাতটা বের করে দেন গাড়ির জানলা দিয়ে। বিচ্ছিন্ন, নিরলম্ব হাত একটা —পিকু সেটার দিকেই কিছুক্ষণ চেয়েছিল। আর এখন, পিকু যখন বাগান থেকে বাড়ির দিকে ছুট লাগায়, কেউ স্বতঃস্ফূর্ত হেসে দু হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে টেনে নেয় না। মায়ের বন্ধ শোয়ার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পিকু শোনে ভিতরে মা আর হিতেশকাকুর ঝগড়া। যদিও পিকুকে সরানোর ব্যাপারটা সীমা ভালেই ম্যানেজ করেছিল, পিকুর ওই সাদা-কালোর অনুমতি চাওয়ার ঝামেলায় হিতেশের আসঙ্গসুখে কিঞ্চিত বিঘ্ন ঘটে গেছে। সকালে মুখে যে শব্দটা করে পিকু পাশের বাড়ির কুকুরের চিৎকার থামিয়েছিল, মায়ের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পিকু সেই আওয়াজটাই করে আরেকবার, 'চোপ!' স্বাভাবিক যে ভিতরটা শান্ত হবে, আর হলোও তাই।

সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তা পীড়িত করলে আমাদের — পিকুকে বড্ড বেশি বড় হতে হলো যেন। আমার তো দেখেছি বাবাকে ডেকে সাড়া না পেয়ে টুক্‌লু কেমন নিশ্চিন্তেবেড়াতে বেড়াতে ডেকেছে দিদিমাকে, 'দিদা!— আমি চারবার ঘুরেছি — আবার ঘুরছি!........' দিদিমা হেসেছে নাতনির দিকে তাকিয়ে। শঙ্কর যখন মেয়ের কথা বলতে বলতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে, '....সেও তো বোকা, সেও তো ভুল করেছে?.. ... বাবা-মায়ের প্রতি এমন সরল বিশ্বাস। তুমি-আমি যে তারচোখের মণি.....', তার সে ক্ষোভ একাকার হয়ে যায় টুক্‌লুর দিদিমার গানে, 'এ পরবাসে রবে কে!' পিকুর পরবাসের একমাত্র আশ্রয় তার দাদু। দাদুর বড় অসুখ, দুবার স্ট্রোক হয়ে গেছে। বাগান থেকে বাড়ি এসে দাদুকে আর পায় না পিকু — বেলের উপর দাদুর একটা হাত স্থির, ডাকবার চেষ্টায় ব্যর্থ, অন্য হাতটা বুকের উপর, দাদুর পাল্‌স্‌ থেমে গেছে। এবারে পিকু কী করবে? মার দিক থেকে এই মুহূর্তে সে না হয় চোখ সরিয়ে নিল। কিন্তু তার পর? সামনেরটেবিলে রাখা বেগুনি ফুলটার ছবি পিকু বেগুনি রঙ দিয়ে এঁকে যায় তার খাতায়, কিন্তু সে খাতা-কলম তো হিতেশকাকুর আনা ঘুষ। এই নির্মম বাস্তবকে পিকু কোনো-না-কোনো ভাবে বুঝতে শুরু করেছে। তাই ভাঙতে শুরু করছে শৈশবের নিশ্চিত মাধুর্য। শৈশবের একাকিত্ব যেখানে প্রকট হয়ে ওঠে, আর সেই একাকিত্বের, অনিশ্চিতির দায় যে কোথায়, তা যখন বড় বেশি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া হয়, দায়িত্বের পীড়নে কেউ বলেন এ ছবি অবাস্তব, কেউ বলেন অভদ্র। অথচ হিতেশ-সীমা-রঞ্জনদের মতো ভদ্রলোকের সমাজেই না আমাদের অবস্থান!

অবশ্য ভদ্রলোক আরো আছেন। রঙবেরঙের আঁকার খাতা আর মূল্যবান আঁকবার কলম তাঁদের ছেলে-মেয়েদের নাগালের বাইরে। একটি অপরিসর ঘরে এক মশারির তলায় গোটা সংসারটাকে যাদের টিকিয়ে রাখতে হয়। তেমন বাপের ছেলেও কিন্তু ছবি আঁকে, সাদাসিধে খাতায়, কম দামি রঙ-পেন্সিলে। এমনই একজন ছেলে 'সোনার কেল্লা'-র মুকুল। মুকুল জাতিস্মর — এই খবরটা সাংবাদিকতার দৌলতে গোটা সমাজ জেনে গেছে। মুকুলের বাবাকে দেখি কী, নিদারুণ আকুলতায় ছেলের মনের নিশ্চিতি ফিরিয়ে দিতে চান। সামান্য বইয়ের দোকান তাঁর, নিতান্ত স্বল্পবিত্ত মানুষ, তবু সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় ছেলেকে নিয়ে মর্মস্পর্শী ব্যাকুলতা। এ ছবিতে সত্যজিৎ রায় মুকুলকে

আবার তার মা-বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত রাখেন। মানসিক টানাপোড়েন থেকে মুকুলকে নিয়ে যান শৈশবের অভ্যস্ত আশ্রয়ে। ফেলুদার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ানো সেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাবার অসহায় আর্তিতে মনে হয়, তবে কি ঐশ্বর্যের বারুদ তেমন জোর নেই বলেই এই বাবা ছেলের নিশ্চিতির জন্য নিজের মনকে এমন অকাতরে জ্বালতে চান?

ঐশ্বর্যের সঙ্গে নিশ্চয়তার সুর মেলানো কতখানি অলীক, পিকুকে যখন তার ঘরভর্তি খেলনার মধ্যে ছন্নছাড়া ঘুরতে দেখি, তখনি বুঝি। সত্যজিৎ রায় তাঁর শিল্পকর্মে এই বোধ নির্মাণ করেছেন বহুদিন আগে একটি নির্বাক, স্বল্পায়তন ছবিতে, যার নাম ছিল 'ট্যু'। দুটি বালক একে অপরকে নিজেদের খেলনা দেখাচ্ছে। একজনের সামাজিক অবস্থান পিকুর মতোই, খেলনা-ঠাসা এক ঘরে তার বাস, দেশলাই জ্বালিয়ে বেলুন ফাটানো তার খেলা। একটা বাঁশির সুর শুনে সে দেখে রাস্তার একটি দীনদরিদ্র ছেলে পবম আনন্দে বাঁশি বাজাচ্ছে। মাউথ অর্গানের তীব্র শব্দে ছেলেটি ওই বাঁশিকে হারিয়ে দিতে চায়। দুটি অসম পরিবেশের শিশু খেলনার লড়াই চালায়। দরিদ্র ছেলেটির একমাত্র ঘুড়ি অন্যজন বন্দুক ছুঁড়ে ফাটিয়ে ছিঁড়ে দেয় — কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, ছেলেটি তবু নিশ্চিন্ত। অনেক খেলনায় সাজানো ঘরে এক দিকে যখন ব্লক দিয়ে বানানো একটা মনুমেন্ট, অন্য দিক থেকে ছুটে আসছে একটা খেলনার রোবট, মাথায় চুইংগাম লাগানো। রোবট এসে মনুমেন্টকে ধাক্কা মেরে ভেঙে দেয়। ঠিক তক্ষুনি বাইরে নিঃস্ব ছেলেটির বাঁশি প্রসন্ন সুরে বেজে ওঠে। শিশুর নিশ্চিতিকে তাই ঐশ্বর্যের সীমায় বাঁধা যায় না। রাস্তার শিশুই এখানে হয়ে যায় নিশ্চিতির প্রতীক। তেমনি মনে আছে 'কাঞ্চনজঙঘা' ছবির শেষে মহাপ্রতাপী রায়-বাহাদুর ইন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁর অধীন আত্মীয়স্বজনদের কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি তখনো জানেন না যে গোটা ঘটনাটাই চলে গেছে তাঁর বিরুদ্ধে। বেকারযুবক অশোক তো নিজের চেষ্টাতেই চাকরি জুটিয়ে নেবে বলে দিয়েছেই রায়বাহাদুরের সব বারুদ ফুবিয়ে, এমন কি নিজের মেয়ে মনীষাও বাবার মনোমতো বিলেতফেরত ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে নিজের জীবন জড়াতে আপত্তি করেছে। আর সেই যে বিলেত পাশ ইঞ্জিনিয়র, সারা বিকেল মনীষাকে ঘোরাবার ব্যর্থ চেষ্টায় ক্লান্ত, পরাজিত ; কুয়াশা কেটে কাঞ্চনজঙঘা দেখা যাবে কি যাবে না, মনীষার সঙ্গে ধরা সেই বাজির চকোলেটটা তাকে দিয়ে দিতে দেখেছি নেপালি ভিখারি ছেলেটাকে, বলেছে সে, 'নে — তোরই জিত।' ইন্দ্রনাথ যখন একা একা সবাইকে খুঁজছেন, একমাত্র মানুষ যে তাঁর সামনে থাকে, সে হলো ওই ভিখারী বালক — আনন্দে গান গাইছে আর চকোলেট খাচ্ছে। ছেলেটার সানন্দ উপস্থিতি যেন রায়বাহাদুরের সারাজীবনের প্রাপ্য অনিশ্চিতিকে প্রমাণ করছে, ভেঙে দিচ্ছে তাঁর একনায়কশাসিত রাজ্যের সর্বব্যাপী শৃঙ্খলা। মানুষের হারজিতের প্রতীক, সত্যের উপমা তাই হতে পারে যে কোনো শিশুই। সে নিশ্চিতিতে শিশুর বিশেষ ঐশ্বর্য লাগে না। শৈশবের খেলায় বাইরের থেকে অন্তরের উপকরণ সর্বদাই অনেক বেশি জরুরি।

পিকুর বাঁচার সমস্যাটা তাই থেকেই যায়। পিকুর খেলনা উপচে পড়া ঘর, তার জ্বলজ্বলে সুন্দর জামাকাপড়, এমন কি তার হাতের রঙিন ছবি, কোনো কিছুই তার শৈশবকে নিশ্চিত বাল্যের সংজ্ঞায় মেলাতে পারে না। তার শিশু সুলভ বিশ্বাসের মূল্যে

সব বয়স্কই যে মুনাফা লুটছে, এ বোধ যেন তার কাছে আসতে শুরু করেছে। একমাত্র বন্ধু দাদুও তো আজ থেকে আর নেই। এতখানি একাকিত্ব, এতদূর অনিশ্চিতি, সাবালক বোধবুদ্ধির এই বোঝা নিয়েই তো পিকুকে বাল্য থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের পাড় ভাঙতে হবে। সে যে চারপাশের অন্ধকারকে আরেক নতুন আলোর বৈভবে দীপান্বিত করে দিতে পারবে, এমন আশা তো পিকুর সুকুমার মুখের অসহায় বিচ্ছিন্ন চোখ দুটি দিতে পারে না। পিকুর কাহিনীতে এসে শৈশব তাই আর নিশ্চিতির প্রতীক রইল না। এই না থাকার বাস্তবকে সুস্পষ্ট বিন্যাস দিলেন সত্যজিৎ রায়। ফলে পিকুর পূর্ববর্তী প্রজন্ম সামনের অনিশ্চিত আতঙ্কগ্রস্ত বাল্যের দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্য নিজেদের পরাভব বুঝতে পারল। যে পরাভব সব চেয়ে বেশি বুঝিয়ে দিতে শিশুই পারে; সাবালক তাই সাধারণত ততটা ঝুঁকি নেওয়ার ভরসা পায় না। উন্নতির নেশায় বিমূঢ় 'সীমাবদ্ধ'র সেই এক্জিকিউটিভ শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি তাই ঘরে রাখে কেবল ছেলের ছবি, একমাত্র ছেলেকে রাখে দার্জিলিঙে। গ্রামের ব্রাহ্মণেব দুয়ারে দুখী চাঁড়ালের মৃতদেহও সর্বপ্রথম দেখে এক বালক। ওই বালকের নিঃশব্দ উপস্থিতি, সপ্রশ্ন দৃষ্টি ব্রাহ্মণকে কী ব্যতিব্যস্তই না করে। দুখীর মৃতদেহ সরানোর আগে 'সদগতি'র ব্রাহ্মণকে তাই ছেলেটাকে সামনে থেকে সরাবার ভাবনা ভাবতে হয়।

পরাভবকে স্বীকৃতি দেওয়া কঠিন। কিন্তু সে দায় যাদের তাদেরই থাকে। শিল্পীর দায় বর্তায় শিল্পে। শৈশবের উপমায় অপু থেকে পিকু পর্যন্ত সে দায়িত্বে শিল্পীর কোনো ফাঁক নেই।

কিন্তু পিকুব বাঁচার সমস্যাটা কি সমাজের সব স্তরেই সমান সত্য? সাতের দশকে আমরা দেখেছি, নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনে অভ্যস্ত শৈশবের অনিশ্চিতিতে আনতে হয়েছে জাতিস্মরের উপমা। অথচ আশেপাশে এমন মুকুলের তো অভাব নেই যাদের মা-বাবারা পেটভরা জলখাবার থেকে ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করে, একটা উঁচুদরের ভালো ইংরেজি মিডিয়ম স্কুলে পাঠাবার জন্য। আর স্কুলের সেই আবহাওয়ায় অনেক সময়ই মুকুলরা নিজেদের জীবনের সঙ্গে কোথাও কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না। সেখানে পিকুর দল অনেক স্বচ্ছন্দে দার্জিলিঙের কাঞ্চনজঙঘা থেকে রাজস্থানের জয়সলমীর বেড়ানোর অভিজ্ঞতা, হিতেশ কাকুদের কাছ থেকে পাওয়া অভিনব উপহারের বিশেষত্ব ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বলে চলে। মুকুল হয়তো সেই সব আনন্দকাহিনীতে অংশ নেওয়ার জন্য, নিজেকে পিকুর সমপরিচয়ের যোগ্য করে তুলবার জন্য, কোথায় কোন ফাঁকে দেখা সোনার কেল্লার ছবিকে মনে মনে নানান কল্পনায় সাজিয়ে জাতিস্মর হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু 'সোনার কেল্লা' ছবির জাতিস্মর তেমন বানিয়ে তোলা নয়। মুকুলের পরিপার্শ্বকে যতটুকু দেখেছি, তাতে শৈশবের অনিশ্চয়তায় সমাজের দায় বড় একটা বুঝি নি। তাই প্রশ্ন থেকে যায় যে ছাতুময়রার গলির পলটুরা কি আজও শৈশবের প্রসাদে ওরকম স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে সাবলীল? নাকি তাদের শৈশবেও ভাঙন ধরেছে? এর উত্তর আমাদের সামাজিক দৈনন্দিনে বিন্যস্ত থাকতে বাধ্য। শৈশবের বিন্যাসে সত্যজিৎ রায়ের নিশ্চিতি আমাদের প্রত্যাশা বাড়ায়। অপু-কাজলের দেওয়া-নেওয়ার আশ্চর্য প্রসাদে তিনি শুরু করেছিলেন। ভাবতে ভালো লাগে, পলটুদের বর্তমান শৈশবে নিহিত ওই উত্তরকে তিনিই কোনোদিন শিল্পে জীবন দেবেন।

সম্পাদক সত্যজিৎ

রেবন্ত গোস্বামী

চিত্রনাট্য লেখা থেকে শুরু করে একটা ছবির শুটিং শেষ হওয়া পর্যন্ত—না সেখানেই নয়—একেবারে এডিটিং হওয়া পর্যন্ত সে এক অমানুষিক ব্যস্ততাময় পরিশ্রমের ব্যাপার। বিশেষত তাঁর মতো মানুষের পক্ষে—প্রতিটি ডিটেল্‌সের ওপর যাঁর লক্ষ। তার ওপর আছে সঙ্গীত পরিচালনা, দরকার হলে গীত রচনা। সেগুলিও তো তাঁর নিজের। তাই শুধু যদি চলচ্চিত্রকাব হিসাবে তাঁর পরিচয় হত, তা হলেও তিনি হতেন একজন ব্যস্ততম মানুষ।

কিন্তু তাঁর আরো পরিচয় আছে। ছায়াছবির পরিচালক হিসাবে বিখ্যাত হওয়ার আগে তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। তাঁর আঁকা ছবি আর প্রচ্ছদই বোধহয় সিগনেটেব বইগুলোকে এক আলাদা মর্যাদা দিয়েছিল। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের সেই নামাবলী প্রচ্ছদ, কুমায়ুনের মানুষখেকোব সেই গুলিবিদ্ধ বাঘের ছালের প্রচ্ছদ আর নানক, আম আঁটির ভেঁপু বা রাজকাহিনীর সেই অলংকরণ—সে কি ভোলা যায়। তাঁর সেই তুলি তো আজও সচল—এই সচল ছবি করার ফাঁকেও।

তাছাড়া আছে—লেখা। দুটি অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি কিশোর সাহিত্যে হৈ চৈ এনে ফেলেছিলেন—প্রফেসর শঙ্কু আব ফেলুদা। এদের এনে নিজেকেই বিপদে ফেললেন। বাংলার কিশোর জগৎ (হয়তো নেপথ্যে তাদেব মা-বাবাও) আজ আর তাঁকে থামতে দিতে চান না। শুধু কি প্রফেসর শঙ্কু, ফেলুদা বা তারিণী খুড়ো? নানান স্বাদের গল্পও—ডজনে ডজনে। তাছাড়া আছে মজার ছড়ার আশ্চর্য অনুবাদ। ছোটদের জন্যে চেষ্টা ফিল্ম তোলার সময়কার মজাদার ঘটনার সব গল্প। সিনেমা নিয়ে ইংরাজি আর বাংলায় সিরিয়াস লেখা।

একটা দিনে তো মোটে চব্বিশ ঘন্টা সময়। তার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া ঘুমানো—এসবও তো আছে। পবিচিত জনের সঙ্গে একটু দেখা সাক্ষাৎ গল্পগুজব—এগুলোও দরকার। তাছাড়া নানান রকমের বই পড়া। এরপরে বুঝি আর সময় থাকে না।

কিন্তু সত্যিকারের কর্মব্যস্ত মানুষ বোধহয় 'সময়াভাব' কথাটার সঙ্গে পরিচিত নন। কারণ এর পরেও একটা কাজে তিনি অনেকখানি সময় ব্যয় করেন। তাঁর অন্য কাজের মতোই সমান আন্তরিকভাবে। সেই কাজ একটা কিশোব পত্রিকাব সম্পাদনার কাজ। পত্রিকাটির না, তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, বংশপরিচয় বা বৈশিষ্ট্য আজ কারো অজানা নেই। এই কাজে যখন তিনি বসেন, তখন ভুলে যান, সমগ্র বিশ্ব তাঁর পরের চলচ্চিত্রটির জন্যে আগ্রহে চেয়ে রয়েছে। তখন তিনি সম্পাদক সত্যজিৎ রায়।

ষাটের দশকের শুরুতে 'সন্দেশ'-এর যখন 'দ্বিতীয় জন্ম' হল, তখন তাঁব সঙ্গে সহযোগী সম্পাদক হিসাবে ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে সুভাষবাবু সন্দেশে নেই। আছেন অন্য দুজন। দুজনেই বাংলা শিশুসাহিত্যের বিশিষ্ট নাম। সত্যজিতের পিসি

শ্রীমতী লীলা মজুমদার আর পিসতুতো দিদি শ্রীমতী নলিনী দাশ। প্রথমে নলিনী দাশ ও লীলা মজুমদার যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখা বাছাই করে মনোনীত লেখাগুলি সত্যজিতের কাছে পাঠান। সত্যজিৎ করেন চূড়ান্ত মনোনয়ন। মনোনীত লেখার অলংকরণ কোন শিল্পী করবেন সেটা ঠিক করেন তিনি। কোনো কোনো লেখার অলংকরণ (illustration) তিনি নিজেই করে দেন। কোনো লেখা মনোনীত হলেও নামকরণটা হয়তো ঠিক পছন্দ হল না। বদলে দেন। লেখক তখন অবাক হয়ে ভাবেন যে এই লেখার এত ভালো একটা নাম দেওয়া যেত, সেটা তো তাঁর নিজের মাথায় আসে নি। তাছাড়া তিনি পত্রিকার লে-আউট করেন, প্রচ্ছদ আঁকেন।

অনেক লেখক হয়তো লেখেন অসাধারণ, কিন্তু বানানের ব্যাপারে একেবারে বল্গাহীন অশ্বারোহী। ছোটখাটো বানানও তিনি ঠিক করে দেন। গদ্যে 'সাথে' কোনো কোনো অঞ্চলে চললেও তিনি হয়ত ওটা 'সঙ্গে' করে দেওযাই ভালো মনে কবলেন। এইরকম। কারো ছড়া বা কবিতাকে আরো সরস কবার জন্যে কলম চালাতে চালাতে এমনও হয়েছে যে সেটা প্রায় নতুন রূপ পেয়ে গিয়েছে।

যেটা হয়ত অন্যের কাছে খুবই তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে হবে, সম্পাদক সত্যজিতের কাছে তারও গুরুত্ব আছে। ছোটদের কাগজ—তাই আবো নিখুঁত হওয়া চাই। একজন প্রখ্যাত লেখিকার গল্পে একটি চরিত্রের নাম বিদেশী উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা হয়েছিল—য়াগা। বাঙালী শিশুদের চোখে এখনও বানানটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকতে পারে। এটাকে 'ইয়াগা' লিখলে কেমন হয়? তবে লেখিকাকে না জানিয়ে সেটা করা কি ঠিক হবে? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। লেখিকার ঘবে টেলিফোন বেজে উঠল। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় ফোন করছেন। তিনি তো অবাক। আবো অবাক টেলিফোন করার কাবণটা জেনে। কিন্তু মুহূর্তে বুঝে নিলেন, সত্যজিৎ বায় বলেই এটা সম্ভব। এই ক্ষণে তিনি যে একটা বিশিষ্ট ছোটদের পত্রিকার দায়িত্বশীল সম্পাদক।

প্রয়োজন হলে সত্যজিৎ রায় অনেক লেখা লেখককে দিয়েই rewrite করিয়েছেন। লেখকই সেখানে সম্পাদনাব কাজ করছেন। ফলে তাঁব 'পরিমার্জিত' লেখা স্বাভাবিকভাবেই আরো নিখুঁত হয। কখনো মৌখিকভাবে, কখনো ছোট 'নোট' দিয়ে আবার কখনো বা দীর্ঘ চিঠি লিখে সত্যজিৎ লেখককে পরামর্শ দিয়েছেন, কিভাবে লেখাটাকে আরো নিখুঁত, আবো রসোত্তীর্ণ করা যায় সে বিষয়ে। প্রায় প্রথম থেকেই সন্দেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বয়েছে। তাই আমার নিজেবও একাধিকবার এই পরামর্শ বা নির্দেশ লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে অনুজ লেখকের প্রতি তাঁর নির্দেশ যেন অভিনেতার প্রতি পবিচালক সত্যজিতেব নির্দেশের মতোই তাকে আরো নিখুঁত করে তোলে। অনেক বছব আগে আমাব একটি লেখা সম্বন্ধে তিনি আমাকে যে চিঠি লেখেন, তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। এতে বোঝা যায, একটা লেখা নিয়ে কতট চিন্তা করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, চিঠিটা ব্যক্তিগত হলেও এব উপদেশ আমার মনে হয়, অনেক অনেক ভাবী লেখককেই পথ নির্দেশ করবে। তাই চিঠিব অংশটুকু উদ্ধৃত করেই আমার লেখা শেষ করছি।

"তোমার ভাষা ভালো, তোমার observation ও ভালো, কিন্তু কাঠামো আর plotting-এ দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে। অনেকগুলো টুকবো টুকবো দিনেব টুকরো টুকরো

ঘটনার ভিড়ে গল্প মাঝে মাঝে একেবারেই হারিয়ে যাচ্ছে। সেটা লেখার সময়ও তুমি অনুভব করেছ নিশ্চয়ই, না হলে প্রতি ২/৩ পৃষ্ঠা পর পর একটা করে ছেদচিহ্ন পড়বে কেন? উপন্যাসকে পরিচ্ছেদে ভাগ করা অভ্যাস কর। তাছাড়া গল্প যদি ধারাবাহিকভাবে ছাপতে হয়, তাহলে প্রথম পরিচ্ছেদেই (অর্থাৎ তোমার খাতার দশ পৃষ্ঠার মধ্যেই) গল্প কোনদিকে অগ্রসর হবে, তার tension কিসে থেকে আসবে—এর একটা ইঙ্গিত দিতে হবে—না হলে পাঠকের কৌতূহল বজায় থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ যে যে চরিত্র গল্পে প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করবে, তাদের সকলকেই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় establish করতে হবে। গল্পের শেষ দিকে অযথা নতুন চরিত্রের অবতারণ না করাই ভালো। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না তা বলছি না; কিন্তু ছোট উপন্যাসে (যেমন 'শঙ্খপাহাড়') এ নিয়ম মানতেই হবে, না হলে কাহিনী reralistic না হয়ে naturalistic হয়ে যাবে—যেটা আর্ট নয়। আমার মতে, 'শঙ্খপাহাড়' আরো ছোট গল্প হওয়া দরকার। এ-লাইনে চিন্তা করে ওটাকে rewrite কর।'

বলাবাহুল্য rewrite করা 'শঙ্খপাহাড়' উপন্যাসটি সন্দেশে প্রকাশিত হওয়ার পরে কোনো সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় নি এই অধমকে।

ও সি. গাঙ্গুলির আঁকা সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ও সি গাঙ্গুলি
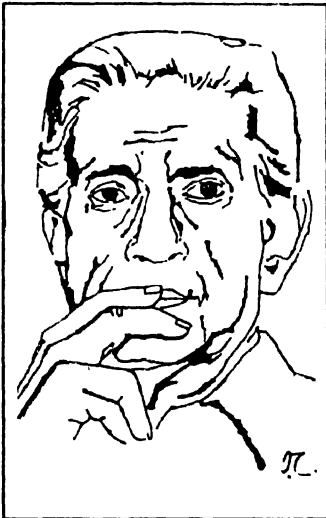
সত্যজিতের শিশুচিত্র

নন্দন মিত্র

বাংলায় সম্পদশালী শিশু সাহিত্য থাকলেও শিশুদের জন্য ভাল বাংলা চলচ্চিত্র খুব কমই নির্মিত হয়েছে। আর যা-ও বা হয়েছে তার সিংহভাগই সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর কিছু সুবিধাও ছিল, কারণ রায় পরিবার থেকেই বাংলার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিকরা এসেছিলেন। ফলে শিশুদের যে জগৎ সে-সম্পর্কে সত্যজিতের একটা স্পষ্ট ধারনা থাকাই স্বাভাবিক। পরে 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে তিনি হাতে-কলমে কাজের মধ্যে দিয়েই শিশুদের জগতে প্রবেশ করলেন এবং শিশু-মনস্কতা সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারনা আরও পুষ্ট হল। সর্বোপরি তিনি নিজেও একজন শিশু-সাহিত্যিকরূপে আত্মপ্রকাশ করছিলেন।

শিশুচিত্রের স্তরভেদ আছে। সব শিশুচিত্র সব বয়সের শিশুদের বোধগম্য বা গ্রহণীয় না-ও হতে পারে। একেবারে ছোট শিশুদের ভাল লাগে রূপকথার গল্প বা জন্তু-জানোয়ারের ওপর তোলা ছবি। সম্ভবত সত্যজিৎ রায় এদের কথা ভেবেই উপেন্দ্রকিশোরের রূপকথা অবলম্বনে নির্মাণ করেছিলেন 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' ছবিটি। আর সত্যজিতের সৃষ্টিশীলতায় তা শুধু বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হয়ে উঠল না, হল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ছবি। জনপ্রিয়তার নিরিখে (কলকাতায় সম্মিলিত ১০০ সপ্তাহ) সর্বাধিক চলার রেকর্ড এখনও অম্লান রয়েছে।

একটি সার্থক শিশুচিত্র বয়স্কদের বিনোদিত করে আর রূপক হলে বয়স্কদের দৃষ্টিতে তা অতিরিক্ত মাত্রাও পেতে পারে। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি যে, আমাদের দেশের শিশুচিত্র নিয়ে আলোচনার সময় বিশেষ করে তা সত্যজিৎ রায় নির্মিত ছবিটি কি কারণে শিশুচিত্র হয়ে উঠল সে আলোচনা প্রায় হয় না। যা থাকে তা হল বয়স্কদের দৃষ্টিভঙ্গি তে আলোচনা। ফলে একটি শিশুচিত্র শিশুদের কাছে উপভোগ্য হল কিনা বা তাদের মানসিকতায় ছবিটি কি প্রভাব ফেলল—এ-সব থাকে উপেক্ষিত। আমার আলোচনাকে আমি শিশুচিত্রের সার্থকতা-অসার্থকতার প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব।

উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-এর কথার ভাষাকে সত্যজিৎ যখন চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপান্তর ঘটালেন তখন সেট-সেটিং, ক্যামেরা, মেক-আপ, সংলাপ, গান, সম্পাদনা প্রভৃতি চলচ্চিত্রের বিভিন্ন অঙ্গকে তিনি শিশু-মনস্কতার উপযোগী করে ব্যবহার করলেন। ফলে কাহিনীর রূপকথার যে জগৎকে তারা কল্পনা করত তা প্রত্যক্ষ করায় তার উপভোগ্যতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল।

ছবির বাস্তব অংশে গ্রাম থেকে বিতাড়িত গুপী যখন প্রবাদ-প্রবচনের মতই সন্ধ্যার মুখে বনের ধারে এসে পড়ে বাঘের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল, তখন শিশুমনে যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় ঢোলে জল পড়ার আওয়াজ তার সঠিক পরিপূরক। অবশ্য বাঘের বদলে বাঘার সঙ্গে দেখা হয়। এটা লক্ষণীয় যে বাঘার গ্রাম থেকে বিতাড়নের কাহিনী দেখানো

হয় না, যে লোভ বেশিরভাগ পরিচালকই সম্বরণ করতে পারতেন না। এটাই পরিমিতিবোধ।

ভূতের রাজার আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই রূপকথার জগৎ শুরু। ছবিটি ভূত নামক কুসংস্কার থেকে শিশুমনকে মুক্ত করতে না পারলেও পুরানো ধারনায় ভাঙ্গন আনল। ছবির (কাহিনীরও) ভূত ভীতির সঞ্চার না করে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করল এবং গুপী-বাঘার ভাগ্য ফিরিয়ে দিল। এখানে লক্ষ্যণীয় যে আমরা দেখি যে গুপী-বাঘা ভূতের রাজার সঙ্গে কথা বলছে আবার বর পাওয়ার পর দেখি যে তারা ঘুমোচ্ছে। অর্থাৎ সমস্ত ব্যপারটাই বাস্তব না স্বপ্ন এটা পরিচালক শিশুদের কাছে একটু ঘোলাটে করেই রেখেছেন। আর ভূতের রাজার পেছনে চালচিত্রে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারের মাধ্যমে সত্যজিৎ কি সায়েন্স ফিকশনের কথা বললেন। সেটা কি অন্যগ্রহের মানুষ, না আর অন্য কিছু?

এই ছবিতে গুপি-বাঘার প্রধান অস্ত্র গান। মানুষের গান-বাজনা যে অনুভূতি আনে বা তাকে ক্ষণিকের জন্যেও তন্ময় করে দেয়, এই বাস্তব ক্ষমতাকেই রূপকথার অংশে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যাদুকর বরফি-র ক্ষমতাও যে অলৌকিক নয় বরং বিজ্ঞাননির্ভর, তার প্রমাণ তার ল্যাবরেটরি আর অনিচ্ছুক সৈন্যদের যুদ্ধে পাঠানো হয় সম্মোহন করার ভঙ্গিতে।

ছবিতে রূপকথার জগৎ ঠিকমত সৃষ্টি করতে না পারলে শিশুদের মন যে ভরবে না—এটা সত্যজিৎ জানতেন। অথচ বাংলা ছবির সীমিত বাজারের জন্য এলাহি খরচ সম্ভব নয়। তাই নিজের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে তাঁকে সেই অভাব পূরণ করতে হয়েছে। নেগেটিভ ব্যবহার করে তিনি ভূতের রাজাকে রূপ দিলেন আর টেপের গতির হেরফের করে মানুষের স্বরকে বিকৃত করলেন এবং সেইভাবে ভূতের রাজার গলার স্বরের এফেক্ট আনলেন। আর ভূতের নাচের দৃশ্য তিনি যে পদ্ধতিতে তুললেন তা এক কথায় অভিনব। এই ভূতের নাচের দৃশ্যটি এবং তার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের অপূর্ব ব্যবহার এ-ছবির সম্পদ। এই দৃশ্যটি শিশু থেকে বয়স্ক সবাই খুব উপভোগ করবে, আর বোদ্ধারা এই নাচের মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকে খুঁজে নিতে পারেন।

রূপকথার জগৎ সৃষ্টিতে মেক-আপ বিরাট ভূমিকা নেয়। নানা দেশের সাজ-সজ্জা থেকে সত্যজিৎ উপকরণ সংগ্রহ করেন। যাদুকর বরফি-র কালো চৌকো চশমা ঢাকা চোখ ও দাড়ি ঢাকা মুখ তাকে শিশুদের কাছে বেশ রহস্যময় করে তোলে। তার মাথার দুটো শিং পিকিং অপেরা থেকে নেওয়া। শুণ্ডির রাজার সাদা পোশাক বিপরীতে হাল্লা রাজার পোশাকে কালো ভাবে কুচক্রীর ছাপের ইঙ্গিত দেয়।

সেট-সেটিং-এও রূপকথার পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। হাল্লার রাজার ঘরে হিংস্র পশুদের মুখ ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করে আর শুণ্ডির রাজ্যে গুপি-বাঘার ঘরে ময়ূর-ঘোড়ার নক্সা দেখা যায়। ঘরের মধ্যে ফোয়ারা এক আনন্দময় পরিবেশের আভাস দেয়। ছবিটিকে জমিয়ে রাখতে গান একটি মস্ত বড় ভূমিকা নেয়। এই গানের মধ্য দিয়ে সত্যজিতের এক অন্য প্রতিভার সন্ধান আমরা পাই। এই গানগুলির সহজ সরল ভাষা ও সুর শিশুমন স্পর্শ করে। এই গান দিয়েই গুপী-বাঘা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে।

'গুগাবাবা'-র পরবর্তী পর্যায়ের ছবি 'হীরক রাজার দেশে'। ছবিটির রস একেবারে ছোট শিশুরা ততটা আস্বাদন করতে পারবে না, যতটা পারবে কিশোররা। এর একটা কারণ হতে পারে ওই ছবির কাহিনীকার সত্যজিৎ নিজে যিনি মূলত কিশোরদের জন্যই গল্প লিখতেন। তবে জরুরি অবস্থার অব্যবহিত পরে নির্মিত এই ছবিটিতে জরুরি অবস্থাকালীন স্বৈরতান্ত্রিকতা সত্যজিতের শিল্পীমনকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। সত্যজিৎ নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে দরিদ্রদেব উৎখাত কবার দৃশ্যটা জরুরি অবস্থার সময়ে দিল্লিতে অনুরূপ ঘটনাব ('great clean up') প্রতিফলন। ফলে ছবিটি পুবাপুরি রূপকথা হয় না, বাস্তব এসে মেশে। শুধুমাত্র গুপি-বাঘার গান দিয়ে রাজা পরাভূত হয় না, জনশক্তির প্রয়োজন হয়। শিক্ষক উদয়ন, তার ছাত্ররা এবং শ্রমিক-কৃষক সেই সংগ্রামে অংশ নেয়। গুপি-বাঘা সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে মাত্র। রূপকথা না হয়ে ছবিটি হয়ে যায় রূপক। তাই আধুনিক সমাজে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সত্যজিতেব কটাক্ষ বা মগজ ধোলাইযেব মত ব্যাপাবগুলি, যেগুলি সবাসরি বলায় বাধা-বিপত্তি অনেক, সেগুলি রূপক হিসাবে আসে। তবে এগুলি ছোট শিশুদের কাছে কঠিন হলেও কিশোবদেব বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। রাজসভার দৃশ্যটিতে বোঝা যায় দেশের আসল অবস্থাটি—একদিকে রাজা ও তার সভ্যসদ ও অন্যদিকে অভুক্ত, অর্ধভুক্ত ও অত্যাচারিত মানুষ। সভায় ব্যবহৃত লোকগীতিটি কত সহজ সরল অথচ কথা, সুর ও গাওয়ার গুণে কত হৃদযবিদারক যা কিশোর মনেও মানবিক অনুভূতির সৃষ্টি করবে।

শিশু চলচ্চিত্রের অন্যতম শর্ত হল বিনোদনের সঙ্গে তাদের মনে শিক্ষার বীজ বহন করা। আমার বিশ্বাস যে ছবিটি দেখার পর শোষিত মানুষদের প্রতি কিশোরদের মনে সহানুভূতির উদ্রেক করবে। আব সেটা হলে একটা মস্ত লাভ।

তবে ছবি দেখতে এসে ছোট শিশুরা একেবারে নিরাশ হয না। 'গুগাবাবা'-র মতই আছে মন মাতানো সহজ-সবল গান। আর আধুনিক কবিতাতেই যখন ছন্দের অভাব, সত্যজিৎ সংলাপেই নিয়ে এলেন ছন্দ। আব বাজকোষে সত্যজিৎ যেভাবে বাঘ হাজিব করেছেন (সঙ্গে গান) তাতে শিশুমনে একসঙ্গে বিস্ময়, শিহবণ ও পুলক জাগে। শেষ দৃশ্যে—মূর্তি ভাঙাব দৃশ্যটিতে—প্রেক্ষাগৃহের কলবব থেকে বোঝা যায় শিশুরা দৃশ্যটি খুবই উপভোগ করেছে। তবে মূর্তি ভাঙাব দৃশ্যে বাজাব নিজের অংশগ্রহণ শিশু-মনস্কতার দিক দিয়ে আমার নেতিবাচক মনে হয়েছে। বাজার শাস্তি হওয়াই সমুচিত ছিল।

সত্যজিতেব অপব দুটি শিশুচিত্র তাঁরই সৃষ্ট ফেলুদা চরিত্রকে অবলম্বন করে মূলত কিশোরদের জন্য নির্মিত গোয়েন্দারহস্য। কিশোর-মনে ভায়োলেন্সেব ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সত্যজিৎ সজাগ। বুদ্ধির জোর যার একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, তা-ই এই ধরনের কাহিনীতে অপবাধকে ধবতে সাহায্য কবে।

'সোনার কেল্লা' ছবিব কাহিনীব উৎস জাতিস্মবতা। এব অবশ্য এখনও কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায়নি। ছবিটি দেখতে কিশোরদের ভাল লাগবে রঙে তোলা নৈসর্গিক দৃশ্যের জন্য। ভাল লাগে লালমোহনবাবুদেবও। আর ফেলুদার জ্ঞানের পরিধি বিবাট। তার কথাবার্তায় তোপ্‌সেব সঙ্গে কিশোরবাও জ্ঞানালোকিত হয়।

'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবিটিতে কিন্তু শুধু অপরাধীদেরই খুঁজে বার করা হয় না।

বক-ধার্মিকদের মুখোশ খুলে ফেলা হয়। ছবিটিতে ভণ্ড সাধুটির নাম 'মছলিবাবা'; কারণ সে নাকি সাঁতার কেটে কাশীতে এসেছিল। নামটায় যেমন শিশুরা বেশ মজা পাবে আবার নামটির মধ্য দিয়ে কিশোর-মনে একটি সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হবে; কারণ নামটির সঙ্গে বক-ধার্মিক কথাটির যেন কোথায় মিল আছে। আর কাশীকে প্রেক্ষাপট হিসাবে বেছে নেওয়ার কারণ মনে হয় যে ওখানেই বহু সাধু-সন্ন্যাসীর নানারকম অলৌকিক কার্যকলাপের কথা শোনা যায়। মছলিবাবার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে তিনি প্রচলিত বিশ্বাসকে আঘাত করলেন। ফেলুনাথের দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখালেন যে এইসব ভণ্ডরা শুধু প্রতারক নয়, এদের সঙ্গে underworld-এরও যোগাযোগ থাকে। আর বডি বিল্ডারের পেশীর সঙ্গে মন্দিরের কারুকার্যকে তুলনা করে তিনি মানুষের চিন্তা ও রুচি পরিবর্তনের বার্তা ঘোষণা করলেন।

আমি সবশেষে সত্যজিৎ যাটের দশকের গোড়ায় ১৬ মি. মি. ক্যামেরায় বিদেশী টেলিভিশনের জন্য 'টু' বলে ১৫/২০ মিনিটের যে ছবিটি তোলেন তার সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়ে আমরা আলোচনার যবনিকা টানব। ছবির দুটি মূল চরিত্রেই শিশু। একটি শিশু ধনী যে প্রকাণ্ড অট্টালিকায় থাকে আর অন্যজন দরিদ্র, সে অদূরে একটি কুঁড়ে ঘরে বাস করে। এসব দ্বন্দ্ব (সত্যজিৎ যাকে খুনসুটি বলেছেন) এ-ছবির প্রধান উপজীব্য। ছবিটিতে কোনও সংলাপ নেই— শুধু আছে সঙ্গীত। ধনী শিশুটির আছে ঘরভর্তি নানারকম আধুনিক খেলনা আর দরিদ্র শিশুটির নানারকম টুকিটাকি খেলনা ও একটি বাঁশি। দরিদ্র শিশুটি বাঁশি বাজায় আর তা দেখে ধনী শিশুটি ক্ল্যারিওনেট বাজিয়ে ওঠে। এইভাবে চলে জারিজুরি খাটানোর প্রতিযোগিতা। শেষমেষ দরিদ্র ছেলেটি ঘুড়ি ওড়ায়। তখন না পেরে ধনী শিশুটি এয়ার গান দিয়ে ঘুড়িটি দেয় ফাঁসিয়ে। কিন্তু ধনী শিশুটির দম দেওয়া রোবটটি তার খেলাঘরটিকে দিল ভেঙে গুঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে দরিদ্র শিশুটি আবার তার বাঁশিতে সুর তুলেছে।

সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত 'অপরাজিত' ছবির হেড মাস্টারমশাই-এর স্কেচ এবং কলকাতায় অপুর বাসাবাড়ির রেখাচিত্র
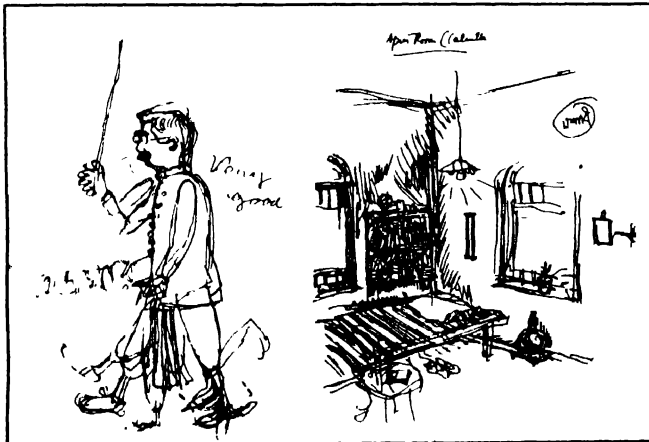
বনলতা সেন-এর প্রচ্ছদ ও সত্যজিৎ রায়

অরূপরতন বসু

ছোটবেলার কথা যদি ভাবি, তাহলে তার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে 'আম আঁটির ভেঁপু', যার ছবি, মলাট সবকিছুই সত্যজিৎ রায়ের আঁকা। 'পথের পাঁচালী' অনেক পরের ব্যাপার। ছবি 'পথের পাঁচালী' নয়, উপন্যাস। ফলে 'পথের পাঁচালী' ছবি যখন দেখতে যাই, তখন 'আম আঁটির ভেঁপু'র কথাই মনে থেকেছে। ছোট মফঃস্বল শহরের বৃষ্টি, অন্ধকার রাত, ঘন সবুজ কচুরী পাতায় রূপোর কৌটোর মতো ঝকঝকে বৃষ্টির ফোঁটা, অন্ধকারে ব্যাঙের ডাক, গাছগাছালি, মাঠ, ঘাস, এসবই এমন একটা অভিজ্ঞতা যেখানে আম আঁটির ভেঁপুর মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ রায়ের জন্য দরজা আগে থেকেই খোলা ছিল। শেষ কৈশোরের জগতে আমরা বিভূতিভূষণের মধ্য দিয়ে সত্যজিৎকে আবিষ্কার করেছি, আর সত্যজিৎ ফিল্মের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেছেন বিভূতিভূষণকে। বোর্হেস নাকি কোথাও বলেছেন ঃ কবি হচ্ছেন আবিষ্কারক, উদ্ভাবক নন।...এই অর্থে জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ আবিষ্কার করেছেন বাঙলার পাড়া-গাঁর গাছগাছালি নদী জল অন্ধকারের রহস্যকে কিন্তু ছাপাই-এর উদ্ভাবক হচ্ছেন গুটেনবার্গ। চলচ্চিত্রও এই দিক থেকে দেখতে গেলে এক উদ্ভাবনা, কেননা, তা আগে থেকেই পাড়া-গাঁর নিসর্গের মতো কোথাও ছিল না। যেমন ছাপার হরফের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ বা বিভূতিভূষণ আবিষ্কার করেছেন বিভূতিভূষণকে, বিভূতিভূষণের মধ্য দিয়ে বপসী বাঙলাকে। কাজেই যখন শুনতে পাই ক্রুফো নাকি কোনো এক আর্ন্তজাতিক উৎসবে 'পথের পাঁচালী' দেখতে দেখতে বাইরে বেরিয়ে এসে বলেন 'Pad-Pad-Paddyfield-through the Paddyfields of Bengal'—তখন আশ্চর্য হই না।

ইয়োরোপীয় আধুনিকতা, তা শিল্প সাহিত্য চলচ্চিত্র যারই হোক না কেন, তা আমাদের চেয়ে এতই আলাদা যে সেখানকার আধুনিক শিল্পী সাহিত্যিকদের পক্ষে এখানকার শিল্প সাহিত্য চলচ্চিত্রের আধুনিকতাকে বোঝা বেশ মুশকিল। একসময় তো খোদ সার্ত্র অনুন্নত দেশগুলিতে আধুনিক শিল্পচর্চা প্রায় নিষিদ্ধ করারই ফতোয়া জারি করেছিলেন। তাঁর মতে রাজনৈতিক সংগ্রামই ছিল পিছিয়ে পড়া গরীব দেশগুলির শিল্প-সাহিত্যকর্মীদের একমাত্র ও প্রধান কাজ। যদ্দুর মনে পড়ছে বোধহয় ফ্রানৎস ফার্নঁ-প্রসঙ্গে তিনি এই কথা বলেছিলেন। অবশ্য এই সার্ত্র নিজেই এখন খোদ ফ্রান্সেই বাতিল হয়ে যেতে বসেছেন বলে শোনা যায়। এমনকি কোনো কোনো অতি আধুনিক ফরাসি ভাবুকদের মতে আধুনিক যুগও নাকি শেষ হয়েছে, এখন শুরু হয়েছে পোস্ট মর্ডানিজমের পালা। এ বিষয়ে আপাতত আমাব পক্ষে কোনো আলোচনায় যাওয়া নিরাপদ নয়। যেহেতু এখানে আধুনিকতার সংজ্ঞাই এখনো ঠিকঠাক নির্ণয় করা যায়নি। তবু যদি

জীবনানন্দকে এদেশে আধুনিকতার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরি, তাহলে আবু সয়ীদ আইয়ুব যে 'অমঙ্গল চেতনা' 'অশুভ চেতনা'কে আধুনিকতার একটি প্রধান লক্ষণ হিশেবে ভেবেছিলেন তা না মানলেও চলে। অর্থাৎ জীবনানন্দের উপন্যাসগুলি লক্ষ করলেই আমরা দেখব যে 'অশুভ চেতনা', বা 'অমঙ্গল চেতনা' (বা পাপবোধ, যা কিনা বোদলেয়ারীয় ভাবনার একটি প্রধান উপাদান) বাদ দিয়েও এখানে আধুনিকতার একটি অবস্থান নির্মাণ করা সম্ভব। বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমরা জীবনানন্দর 'কারুবাসনা' উপন্যাসে লক্ষ করব, যখন তার নায়ক বলে ঃ

(১) '...এক মুহূর্তের ভিতরেই সমস্ত অতীত ভবিষ্যতের প্রেম, স্বপ্ন ও সফলতার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক খুঁজে পাই আমি, এই সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে আলো অন্ধকারের পথে অবিরাম চলতে ইচ্ছে করে।'

(২) 'কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে...আমার সংসারকে ভরে দিয়েছে ছাই-কালি-ধূলির শূন্যতায়...এমনই অস্বাভাবিক অবৈধ মানুষ সে, এই আর্টিস্ট।'

(৩) 'চৌকাঠের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে যে মরণ, সেরকম মৃত্যু নয় আউটরাম ঘাটে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যার সোনালি মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করে, মনে হয় আর যেন পৃথিবীতে ফিরে না আসি।'

যদিও আমি ১, ২, ৩ নম্বর দিয়েছি আমার বোঝার সুবিধার জন্য, তবু অন্য কেউ এর চেয়ে আরো অন্যভাবে অন্য কোনো উপাদান খুঁজে বের করতে পারবেন। তবে আমি এটা বলব যে, এই তিনটি সূত্রের মধ্যে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রধান উপাদানগুলিকে পাওয়া যাবে। কোনো খ্রীষ্টীয় অশুভ বা অমঙ্গল চেতনা নয়, বরং একমুহূর্তের ভিতর সম্পূর্ণ জীবনকে আবিষ্কার করা, 'সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে আলো অন্ধকারের পথে অবিরাম চলতে' চাওয়া, এটাই হচ্ছে প্রধান ব্যাপার। আর এসবই সম্ভব যখন প্রচলিত সফলতার রাস্তা ছেড়ে, বেরিয়ে এসে অনুভব করতে ইচ্ছে করে মহাসময়ের আলো, ইতিহাস থেকে বেরিয়ে এসে অনুভব করতে ইচ্ছে করে সৃষ্টির প্রাগৈতিহাসিক আদিম সত্তাকে। আর এসবই আধুনিকতার লক্ষণ, যেহেতু সাহিত্যে আধুনিকতা ইয়োরোপে উনিশ শতকে শুরুই হয় বণিকতন্ত্রী প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির দমন ও পীড়নের হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহৃত যান্ত্রিক যুক্তিবাদী ধ্যানধারনার বিরুদ্ধে। অনেকে অবশ্য মনে করেন আধুনিকতা হচ্ছে মূলত বণিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবাদ। কিন্তু মনে হয়, উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় আধুনিকতা ছিল বস্তুতপক্ষে 'যুক্তি' ও 'বিষয়গত বাস্তবতা'র স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যেহেতু নিউটনীয় বিজ্ঞানের আদলে বিশ্বজগৎ ও মানবশরীরকে যুক্তিবাদীরা ভাবছেন একটি নিখুঁত যন্ত্রের মতো। যাকে ঈশ্বরের শূন্য সিংহাসন থেকে অর্থাৎ বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণের 'বিষয়' বা অবজেক্ট হিশেবে দেখে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায় ও টেবিলে শোয়ানো লাশের মতো কাটাছেঁড়া করা যায়, ও যার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব এবং যাকে দরকারমতো নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব। এরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে একদা ডস্টয়েভস্কির নায়ক তার 'ভূতলবাসীর ডায়েরী'তে বলে : 'আমি জানি দুই আর দুয়ে চার, তবু আমি বলব পাঁচ, আমি জানি আমি অসুস্থ তবু আমি ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাব না।' অন্যদিকে তাঁর 'কারেসপনডেন্সেস' কবিতায় বোদলেয়ার

বলেন, 'প্রকৃতি হচ্ছে এক মন্দির যার চারটি স্তম্ভ কথা বলছে রহস্যময় ভাষায়। প্রতীকের ঘন অরণ্য পেরিয়ে, ভূতত্ত্ববিদের মতো মানুষ তার মর্ম উদ্ধার করতে পারে।...যেমন দূর থেকে বহু প্রতিধ্বনি একসঙ্গে বেজে উঠতে পারে, তেমনই আলো, ধ্বনি, সুগন্ধ আর নানা রঙ-এর মধ্যে চলছে অবিরাম বার্তা বিনিময়..'

জীবনানন্দর লেখাতেও আমরা এরকমই অনেক কিছু লক্ষ করব, যখন তাঁর নায়ক সৃষ্টির রহস্যের সঙ্গে নিজের হৃদয়ের রহস্য মেলাতে চায়, সাংসারিক সফলতার রাস্তা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায় শিল্পের জগতে, যেখানে সে ব্যবহারিক দিক থেকে ব্যর্থ হতে বাধ্য, আবার কাজ, উদ্যোগ, সংসার কিংবা ইতিহাসের রাস্তা থেকে বেরিয়ে সে চলে যেতে চায়, সোনালি মেঘের, অনন্ত আলোয় যেখানে শুধুই থাকা শুধুই 'হওয়া' যায় অনন্ত সময় ধ'রে।

আপাতত এর চেয়ে কোনো সরল বা সুবোধ্য ব্যাখ্যা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এবার পথের পাঁচালীর তিনটি খণ্ড যথাক্রমে, অপু-ট্রিলজির কথা যদি আমরা ভাবি, তাহলে দেখব, সত্যজিৎ, তাঁর চলচ্চিত্রে নিছকই পাড়াগাঁর 'দারিদ্র' বা অপুর জীবনসংগ্রামের কোনো 'সুন্দর' তথ্যচিত্র বা কাহিনীচিত্র দেখান নি। বিভূতিভূষণের মূল কাহিনীতেও তা ছিল না, বরঞ্চ আধুনিকতার যে উপাদান আমি জীবনানন্দ প্রসঙ্গে বলেছি, সেসবই ছিল মূল পথের পাঁচালীতে-ও। যে কারণে বিভূতিভূষণও আমাদেব অন্যতম আধুনিক লেখক। যদিও তাঁর সমস্ত উপন্যাসেই তিনি তা নন, কিন্তু 'পথের পাঁচালী' বা 'আরণ্যকে', অবশ্যই এই দিক থেকে দেখতে গেলে সত্যজিতের 'অপু-ট্রিলজি' অবশ্যই আধুনিক ছবি। অথচ ফরাসি আধুনিকতাব পুরোধাদের কাছে তা মনে হয়নি। আশ্চর্য ব্যাপার। আবার অন্য দিকে আরেকটি জিনিসও লক্ষ করার মতো, জীবনানন্দর 'বনলতা সেনের' প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা যে সত্যজিৎ রায়ের, সেই সত্যজিৎ রায় আধুনিক বাঙলা সাহিত্য বা সাহিত্যের আধুনিকতা বা জীবনানন্দ সম্পর্কে কোথাও কিছু লিখলেন না। এও ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার! আবাব যতই তিনি পরবর্তীকালে ছবি করেছেন, ততই মনে হয়েছে তিনি যেন ক্রমেই একজন সমাজসেবক, একজন লোকশিক্ষক তথা, জীবনানন্দের ভাষায় বলা যায়, একজন 'সচ্চরিত্র হেডমাস্টার' হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন।

জীবনেব শেষপর্যায়ে তিনি পেয়েছেন চূড়ান্ত সফলতা, চূড়ান্ত পুরস্কার, ফলে তিনি, ফের জীবনানন্দর ভাষায় বলা যায়, 'অস্বাভাবিক, অবৈধ-মানুষ' আর ছিলেন না। তাহলে কি জীবনানন্দ ভুল বলেছেন? আর্টিস্ট কি তাহলে অস্বাভাবিক, অবৈধ ও ব্যর্থ মানুষ নয়? নাকি জীবনানন্দ ঠিকই বলেছেন! চূড়ান্ত সফল, বৈধ ও স্বাভাবিক মানুষ কি তাহলে আর্টিস্ট নয়?

এখন এই প্রশ্নের সামনেই আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এর উত্তর কী তা আমার জানা নেই।

৪
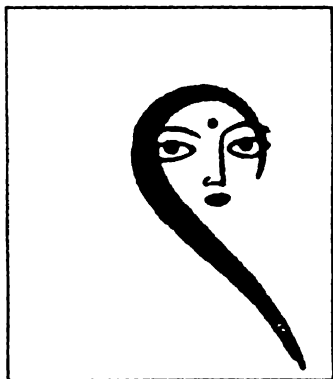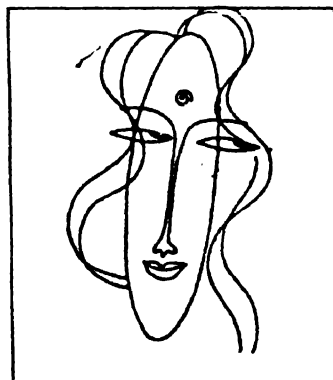
সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রচ্ছদ

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রচ্ছদ
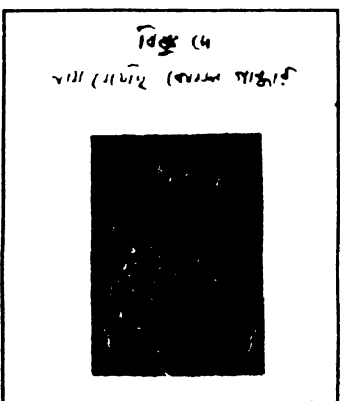
ভিন্ন সত্যজিৎ রায়

পরিতোষ সেন

কয়েক সপ্তাহ আগে দিল্লীতে Village Gallery-তে অনুষ্ঠিত সত্যজিৎ রায়ের আঁকা-বিজ্ঞাপনী তথা গ্র্যাফিক ডিজাইনের কিছু চমৎকার নিদর্শনের একটি প্রদর্শনী বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। এ-শিল্পে তাঁর বিচিত্র কর্মকান্ডের কথা আমাদের টুকরো টুকরো ভাবে জানা থাকলেও, একসঙ্গে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভারকে আগে কোথাও দেখা যায়নি। বই এবং ম্যাগাজিনের মলাট, গল্পের ইলাস্ট্রেশান, ওষুধের বিজ্ঞাপন, সিনেমার পোস্টার, তাঁর নিজের ছায়াছবির জন্যে বিভিন্ন চরিত্রের পোশাক-আশাক, তাদের মেক-আপের রকম-সকম, সেটের সাজ-সরঞ্জাম, তাছাড়া প্রতিটি শটের জন্যে আঁকা ফ্রেম ইত্যাদির বহু নমুনা এই প্রদর্শনীতে রাখা ছিল। এবং এগুলো বেছে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় নিজেই। এখানে তাঁর সে-সব কাজের কথা বলতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা একটু-আধটু যদি এসেই যায় পাঠকেরা আশা করি তা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করবেন না।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়ত ১৯৪৩ কিংবা ১৯৪৪ সালে। আমার যতদূর মনে পড়ে তখন তিনি সবেমাত্র শান্তিনিকেতনের কলাভবনে কিছুদিন অধ্যয়ন করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। যদিও সেখানে তাঁর গুরু ছিলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, তা সত্ত্বেও, তিনি একদিকে যেমন পেয়েছিলেন "মাস্টারমশাই" (নন্দলাল বসু)-এর সান্নিধ্য তেমনি দেখেছিলেন রামকিংকরের মত জাত ভাস্করকে কাছে থেকে। তাছাড়া, তারও আগে যে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের স্নেহাশীর্বাদ লাভ করেছিলেন তাও আমাদের জানা আছে। যদিও শান্তিনিকেতনের পাঠ তিনি শেষ করতে পারেননি কিন্তু এসব শিল্পী-মনীষীদের এবং রবীন্দ্রনাথের নানা রচনার মধ্য দিয়ে সাঁওতাল পরগনার গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রকৃতির বিচিত্র এবং অপূর্ব সৌন্দর্যকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন। এবং সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে তাঁর চোখ খুলে গিয়েছিল। এই অমূল্য এবং অভূতপূর্ব সুযোগ দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ধারণা গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করেছিল। এর সঙ্গে ভারতবর্ষের ধ্রুপদী এবং লোকায়ত শিল্প, নৃত্যকলা এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল তাঁর প্রচুর ; সেই সব কলাবিদ্যার রসগ্রহণ করতেও শিখেছিলেন সঠিকভাবে। শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে বিশ্বসাহিত্য এবং শিল্প বিষয়ক নানা গ্রন্থের পঠনপাঠন তাঁর মনের দিগন্তকেও বিশেষভাবে প্রসারিত করেছিল। এই গ্রন্থাগারে আর্ট এবং সিনেমা সম্পর্কে যা কিছু বই-এর সংগ্রহ ছিল, তা তিনি চটপট পড়ে ফেললেন। ভবিষ্যতের একজন সেরা ছায়াছবির নির্মাতা এবং নকশা-শিল্পীর (designer) মানসিক প্রস্তুতির বীজ দুটি এখানে একই সঙ্গে রোপিত হল।

অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ার জন্য শান্তিনিকেতনে পাঠ অসমাপ্ত রেখে

অ্যাডভারটাইজিং শিল্পে বা আজকের ভাষায় বলতে গেলে গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে একটি চাকরি খুঁজে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন সত্যজিৎ। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রতিভা একদিন না একদিন উদঘাটিত হতে বাধ্য। কবির ভাষায় বলতে হয় "বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন, গন্ধ তার লুকোবে কোথায়।"

সত্যজিৎ তৎকালীন ডি জে কিমার-এ (এখন যার নাম ক্লারিয়ান অ্যাডভারটাইজিং সার্ভিসেস লিমিটেড) ভিসুয়ালাইজার-কাম-ডিজাইনার হিসাবে নিযুক্ত হলেন। এ কাজে তাঁকে কখনও কখনও হয় পূর্ণাঙ্গ একটি নকশা করে একটি কাজ ছাপার পর কি রকম দেখতে হবে তার একটি অবিকল ছবি ফুটিয়ে তুলতে হত (Visualisation) নয়ত করতে হত পত্রপত্রিকার জন্যে একটি ব্যাপক প্রচারমূলক কাজের করণীয় যাবতীয় কাজ।

সে সময় তিনি এবং তাঁর সমসাময়িক দু'জন শিল্পী ও সি গাঙ্গুলি এবং অন্নদা মুন্সী চেষ্টা করেছিলেন ছবি আঁকা এবং টাইপের ব্যবহারেব এমন একটি ধারা প্রবর্তন করতে যা তাঁদের করা ডিজাইনের চেহারাকে সামগ্রিকভাবে কবে তুলবে ভারতীয়। চার-এর দশকের শেষ কয়েক বছর এবং পাঁচ-এর দশকের সেই সব অতি উচ্চস্তরের সংবাদপত্র, পোস্টার এবং সিনেমা স্লাইডের কথা আজ যখন মনে আসে তখন সেই দিনগুলিকে ফিরে পাবাব জন্য একটা প্রবল ইচ্ছা মনে জাগে। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই তিনজন শিল্পী যে রচনাশৈলীর উদ্ভাবন করেছিলেন তা সে সময়ের অন্যান্য অ্যাডভারটাইজিং প্রতিষ্ঠানে কবা কেতাবীযানা (academısm) এবং একঘেয়েমি ভরা রচনাশৈলীর থেকে ছিল একেবারে আলাদা জাতের জিনিস। বলা বাহুল্য তাঁদের কাজে নতুনত্ব এবং বলিষ্ঠতা তাঁদের নিয়োগকর্তা এবং খরিদ্দারদেব মন জুগিয়েছিল বিশেষভাবে। এখানে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই যে মানুষের দেহাবয়ব আঁকার ব্যাপারে সত্যজিৎ ছিলেন বিশেষ পারঙ্গম। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে বহু গ্রাফিক ডিজাইনারেরই দুর্বলতা ধরা পড়ে।

যদিও অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর নবাবিষ্কৃত ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু ছায়াছবির নির্মাণের জন্য তিনি কমার্সিয়াল আর্টেব জগৎ থেকে দূরে সরে গেলেন, ডিটেকটিভ গল্প এবং সায়েন্স ফিকশানের লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর দেখা গেল যে বইয়ের জন্য ভালো ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে তিনি পারেননি। তিনি শুধু নিজের গল্পের জন্যই ছবি আঁকেননি। কয়েক বছর ধরে তাঁর পিতামহের বন্ধ হয়ে যাওয়া কিশোরদের মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ' কুড়ি বছর আগে নতুন করে প্রকাশনা শুরু করার পব তার জন্য মলাট প্রস্তুত করেছেন আর এঁকেছেন অন্যান্য বহু ছবি। কিন্তু আমার বদ্ধমূল ধারণা তাঁর দক্ষতা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উদঘাটিত হয়েছে কলম অথবা তুলি দিয়ে আঁকা হরফের ভিতর দিয়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যালিগ্রাফি।

ক্যালিগ্রাফিতে তিনি পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে। দীর্ঘকাল উঁচুদরের সৃজনশীল ক্যালিগ্রাফারের দৃষ্টিতে তিনি টাইপোগ্রাফির চর্চা করেছেন। তার ফলশ্রুতিরূপে আমরা পেলাম ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় অসংখ্য নতুন চেহারার অক্ষর দিয়ে তৈরি পোস্টার, শিরোনামা (banner) এবং বইয়ের বাইরের আবরণ (book jacket)। এতে বই, ম্যাগাজিন, রেকর্ডের ঢাকা

ইত্যাদির ভিতর দিয়ে গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে তিনি নতুন প্রেরণার সন্ধান জোগালেন। সিগনেট প্রেস, যা আজ বন্ধ হয়ে আছে, ৫০-এর দশকে তার জন্য বইয়ের ডিজাইন, মুদ্রিত পৃষ্ঠার বিন্যাস, টাইপোগ্রাফি এবং বইয়ের আবরণ তৈরির কাজের ধারার মোড় তিনি এমনভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর নানা কাজকে মুদ্রণের জগতে আদর্শ বলে তখন মেনে নেওয়া হয়েছিল এবং আজও তা হয়ে আছে। আগেই বলেছি বইয়ের মলাট তৈরির কাজে নতুন নতুন নকশা প্রবর্তন করার ক্ষমতা তাঁর ছিল অপরিসীম। আপাতদৃষ্টিতে যা খেলাচ্ছলে করা জিনিস বলে মনে হতে পারে এবং আসলে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলশ্রুতি, তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল তাঁর বহু বছর ধরে করা বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'এক্ষণ'-এর তিনটি হরফ দিয়ে তৈরি মলাটের নকশা। বই কিংবা ম্যাগাজিনের মলাট তৈরিব ক্ষেত্রে নতুন নতুন নকশা এবং হরফ উদ্ভাবনের শক্তি আমার মতে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

তারপর শুরু হল তাঁর নিজের ছায়াছবির জন্য পোস্টার, ব্যানার-হোর্ডিং এবং স্লাইড তৈরি। সেগুলি দেখে অন্যান্য শিল্পীদের চোখ খুলে গেল। হল ওই সব কাজের একটি নতুন ধারাব আবিষ্কার। কলকাতার রাস্তার বড় বড় মোড়ে অপু-দুর্গাকে নিয়ে সৃষ্ট তিনটি বিয়োগান্তক ছবির জন্য আঁকা বড় বড় ব্যানার (banner) বিল-বোর্ড ইত্যাদির কথা কেউ কি ভুলতে পেরেছেন। সেসব কাজেব ভিতর দিয়ে যে নতুন ধরনের চিন্তা, ডিজাইন সম্পর্কে অভিনব ধ্যান-ধারণা এবং অপূর্ব করলিপি লিখন ভঙ্গি দেখা গিয়েছিল তাকে অনাদর করতে তখন কেউই ,পারেননি। সিনেমা শিল্পে তাঁর প্রতিভার অত্যাশ্চর্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রেও তাঁর সৃজনশীলতা অভূতপূর্ব এক স্তরে উন্নীত হয়েছিল। উনিশ শতকের বাংলা গ্রন্থচিত্রণ এবং তৎকালীন কাঠ খোদাই করা হরফের রূপ দেখে সত্যজিতের মনে আমাদের লোকায়ত শিল্পের ট্রাডিশন সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল তা থেকে বলিষ্ঠ রেখা এবং সরলতায় ভূষিত এই সব কাজকে বিশিষ্টভাবে ভারতীয় গন্ধী করে তুলেছিলেন তিনি। এই ধরনের অনেক জিনিসের মধ্যে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল তাঁর 'দেবী' ছবিটির জন্য প্রচারমূলক কাজ। বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিতভাব উচ্চস্তরেব নকশা ও বিন্যাস, হাতে আঁকা হরফের মাধ্যমে অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে। ছবির সঙ্গে হরফের এই মিলন ত্রুটিহীন। খুব কম ডিজাইনারই সত্যজিৎ রায়ের মত টাইপের গুণাগুণ সম্পর্কে সচেতন। গ্রাফিক ডিজাইনাবরা বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করেন যে "ছাপার হরফ কথা বলতে পারে" আর এ কথাটির সবচেয়ে ভালো প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব কাজের মধ্যে। তিনি তাঁর কর্মজীবনের গোড়া থেকেই জানতেন যে একটি হরফ কেবলমাত্র চিহ্ন নয়, নিজস্ব প্রসাদগুণে তা একটি ছবির মত জিনিস, এবং তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে বুঝতে পারা যায় যে তার ভাব প্রকাশের শক্তি প্রচন্ড। সরল নান্দনিক আকর্ষণে, ভাবগত উষ্ণতায় এবং চরম সৌন্দর্য অথচ সূক্ষ্ম অবয়বগত বৈশিষ্ট্যে মানবিকতার রসসিক্ত বহু রকমের হরফ আছে রোমান টাইপের মধ্যে। আবার অনেক কঠিন, শক্তিব্যঞ্জক টাইপও আছে যেগুলির আকর্ষণ-শক্তি অন্য টাইপের তুলনায় মোটেই কম নয়।

অধিকাংশ পাঠকই খেয়াল করেন না যে একটি ছাপার হরফের গঠন এবং

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সঙ্গে প্রকৃতির সৃষ্ট এবং মানুষের তৈরি দৃশ্যমান জগতের অনেক কিছুর মিল থাকতে পারে। দুটি মাত্র উদাহরণ দেবার জন্য বলব কোন কোন হরফে আছে নারীদেহের অবরোহণ এবং আরোহণের কমনীয়তারও ছান্দিক আভাস আবার অন্যান্য হরফে রয়েছে সুন্দর এবং বলিষ্ঠভাবে নকশা করা ইমারতের রাজকীয় মর্যাদা। কুড়ি বছর আগে সত্যজিৎ যখন এক মার্কিন টাইপ ফাইন্ড্রির জন্য "রে-রোমান", "ডাফনিস" এবং "বিজার" টাইপের নকশা করেছিলেন তখন তিনি কেবল এই কথাগুলিই মনে রাখেননি তার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর করলিপি লিখন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান, নৈপুণ্য এবং উদ্ভাবন শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। বর্ণমালার সবগুলি হরফ সম্বলিত এক সেট টাইপ তৈরি করার জন্য কি অসীম ধৈর্য, কি অন্তহীন শ্রমের মাধ্যমে কত ভুলভ্রান্তিকে অতিক্রম করেই না হরফের অবয়বের সঠিক আকৃতিটি খুঁজে নিতে হয়। চরম ব্যস্ততা এবং অপরিসীম কাজের মধ্যে পুরোপুরি তিন সেট টাইপের নকশা করার সময় করে নিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে তাঁর কি অসীম কর্মক্ষমতা কি গভীর অধ্যবসায় এবং ছাপার হরফের প্রতি কি গভীর প্রেম! আমরা যারা তাঁকে বিগত কয়েক দশক ধরে চিনি তারা তাঁকে প্রশংসা করতে গিয়ে একথা না বলে পারব না যে তিনি সবচেয়ে ভালো অর্থে একজন প্রকৃত workaholic যাকে বাংলায় হয়ত 'কাজ-মাতাল' বলা যায়, তাঁর বহুমুখী সৃজনী শক্তি মানুষকে হতবাক করে দেয় এবং তাঁরই অর্ধেক বয়সের বহুজনের মনে নিজেদের কর্মতৎপরতার অভাবের জন্য লজ্জাবোধ জাগিয়ে তোলে।

১৯৪০-এ আমি ইন্দোরে একটি স্কুলে ছবি আঁকা শেখাতাম। দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে অথবা শীতের সংক্ষিপ্ত ছুটিতে আমার কলকাতায় ফেরার একটা বড় আকর্ষণ ছিল সত্যজিতের বালিগঞ্জ পাড়ার একতলার ফ্ল্যাটে প্রায়ই উপস্থিত হবার সুযোগ। সেখানেই আমি প্রথম টি এস এলিয়টের নিজের গলায় 'ওয়েইস্টল্যান্ড' কাব্যের আবৃত্তি শুনেছি; সে রেকর্ডগুলি প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন এইচ এম ভি (এখন যার নাম ই এম আই) । এই সময়েই আমি তাঁর সংগ্রহ করা ইউরোপের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেরও বহু রেকর্ড শুনেছিলাম। একদিন কথায় কথায় তিনি বললেন যে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটিকে অবলম্বন করে একটি চলচিত্রের স্ক্রিপ্ট তৈরি করার কথা তিনি ভাবছেন। কিন্তু কোনও কারণে খুব অল্পদিনের মধ্যেই সে পরিকল্পনা তাঁর মনে আর রইল না। শেষ পর্যন্ত সে ছবিটি করলেন তার থেকে প্রায় চার দশক পরে। প্যারিসে বছর পাঁচেক কাটিয়ে ১৯৫৪-তে দেশে ফিরে তাঁর মুখ থেকে শুনি 'পথের পাঁচালী' ছবিটি করার জন্য তাঁর গভীর আকাঙক্ষার কথা। কি উত্তেজিত হয়েই না তিনি সে কথা আমাকে বলেছিলেন এবং ছবিটির অংশবিশেষ দেখবার জন্য আমাকে কি সহৃদয় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তা আমার খুবই স্পষ্টভাবে আজও মনে আছে। 'পথের পাঁচালীর' জন্য করা প্রতিটি স্কেচ এবং হিজিবিজি করে আঁকা নানা ছবির সঙ্গে পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণ, ঠেকনো দেওয়ার নানা জিনিস এবং স্ক্রিপ্টের অন্তর্গত চরিত্রগুলি সম্বন্ধে বাংলায় লেখা নোটের সঙ্গে ছবির পরপর দৃশ্যগুলিতে দেখবার জিনিসগুলি চোখেব সামনে কিভাবে তুলে ধরা হবে খুব দ্রুত গতিতে আঁকা তার সব বিবরণের সঙ্গে তার জন্য ক্যামেরা কোথায় কোথায় বসানো হবে তা আমাকে দেখালেন। আমি জানতে

চাইলাম সব প্রস্তুতির আয়োজন কবার দরকাব কি। এ প্রশ্নের খুবই তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর চট করে দেবার সময় তিনি বলেছিলেন, 'ছবি তৈরির সবচেয়ে শক্ত কাজগুলির মধ্যে একটি হল ঠিক কোনখানে ক্যামেরা বসিয়ে কোন শটটি তুলতে হবে তা আগে থেকেই ঠিক করে নেয়া।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একথাও বললেন যে তিনি যা করেছেন তা হল স্থির চিত্রের পরিবর্তে একটি চলচ্চিত্র তোলার প্রথম কাজ। আমরা যাবা পরিচালক হিসাবে তাঁকে কাজ করতে দেখেছি তাবা জানি যে তাঁব ছবিতে একজন পেশাদার ক্যামেরাম্যান থাকলেও ক্যামেরা সংক্রান্ত সব নির্দেশ তিনি নিজেই দিয়ে থাকেন। একটি ছায়াছবির চাক্ষুষ দিকটি তাঁব কাছে তাঁর সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত কাহিনীর মতই গুরুত্বপূর্ণ— একটির থেকে অপরটিকে আলাদা করা যায় না। শিল্পী হিসাবে এদিকটিতে প্রখর নজর রাখাই হল তাঁর ছবিব সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

গীতধর্মী শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে উপরেব স্তরে তিনি অধিষ্ঠিত। 'পথের পাঁচালী' থেকে 'শাখা প্রশাখা' পর্যন্ত তাঁর গীতধর্মী মানসিকতা তাঁর সব ছবিগুলিকে একই লেখকের লেখা গ্রন্থের মত বা একই সুরকারের রচিত সঙ্গীতেব মত এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে এবং এই ব্যাপাবটি পরম পরিপূর্ণতায় রূপায়িত হয়েছে তাঁব সাম্প্রতিকতম ছবিতে। ছবিটি এখনও মুক্তিলাভ না করলেও আমি সেটি দু'বাব দেখেছি। একজন চিত্রকর হিসাবে বিনা দ্বিধায় একথা বলতে পাবি যে একদিকে ছবিটির চাক্ষষ ঐশ্বর্য যেমন আমাকে চমৎকৃত কবেছে অপরদিকে তার প্রায়োগিক সূক্ষ্মতার পবিপূর্ণতা অনুভব করেছি বাবেবারে। এসব কথা আমি একটি কাবণবশতই বলছি। আমি যখনই কোন ছবি দেখি সেটি ক্যামেরার লেন্সের ভিতব দিয়ে দেখবার চেষ্টা করি। সত্যজিৎ রায়েব বহু ছবির শুটিং দেখাব ফলে সাধারণত আমি চেষ্টা কবি তাব প্রতিটি পদক্ষেপ মুগ্ধ বিস্ময়ে বুঝে নিতে। চলচ্চিত্রের নিজস্ব যে ভাষা আছে তা বুঝে নিতে। এই ভাবে নান্দনিক দিক থেকে এবং প্রয়োগ কৌশলেব পরিপ্রেক্ষিতে ছবি দেখা ব্যাপাবটি উপভোগ করতে আমার বিশেষ সুবিধা হয। শিল্পের বিচারে চবম সাফল্য অর্জন কবাব প্রচেষ্টায় কালি আব কলম অথবা তুলি দিয়ে প্রাথমিক কাজ করে সত্যজিৎ যে বিশেষ লাভবান হযে থাকেন এ বিষয়ে আমাব কোন সন্দেহ নেই। এই সহজ এবং সবল স্কেচগুলো নিঃসন্দেহে খুব তাড়াতাড়ি কবা, তবুও নিঁখুতভাবে দেখা জিনিসের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং প্রাণশক্তির ছাপ তাতে সুস্পষ্ট হয়ে আছে আর তার সঙ্গে আছে জন্মগতভাবে গীতধর্ম একজন শিল্পীব প্রতিভার স্বাক্ষব। রৈখিক বচনাকৌশলে সর্বপ্রকার গোঁড়ামিকে বিসর্জন দিয়ে মুক্ত মনে কাগজেব উপব উপস্থাপনায় এবং সুস্পষ্ট অনাসক্তির উদাহরণরূপে এই স্কেচগুলি অতি উচ্চমার্গের সৃজনশীল মনেব অবদান। এর পেছনে আছে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে এক কলাবিশাবদেব মনেব দাবি পূবণেব চেষ্টা। স্কেচগুলির মধ্যে ছবির বিভিন্ন পাত্রপাত্রীব প্রতিকৃতিগুলিকে দেখতে পাওয়া যায নানা মেজাজে এবং বিভিন্ন ভঙ্গিতে। এই ধরনের কাজের মধ্যে এগুলিকে তাঁব সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেওয়া যায়। অতি উচ্চ পর্যায়েব নৈপুণ্য অর্জন না করলে কেউ ডাকটিকিটের আকার এবং আয়তনেব মধ্যে মিতব্যযীভাবে এবং পবিষ্কাব করে মানব চবিত্রকে এত সুস্পষ্টভাবে রূপায়িত কবতে পাবে না। যে বেখাগুলো দিয়ে মানব দেহের পরিচয বা অবযবগত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসূচক দিকগুলো তুলে ধবেন সে-

রেখার গতি সহজ, নিশ্চিত এবং দৃঢ় এবং তা বহু বছরের কলম এবং তুলিচালনার ফলশ্রুতি।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীটির অন্যতম আরেকটি চিত্তাকর্ষক জিনিস হল একটি অ্যালবাম যাতে সত্যজিতের একেবারে গোড়ার দিকের একটি ছবির প্রাথমিক পরিকল্পনার নমুনা আছে—সেটি তবলাসঙ্গত সহযোগে সেতার বাদনরত রবিশঙ্করকে নিয়ে তাঁর অভীপ্সিত একটি ডকুমেন্ট্রি চিত্রের খসড়া। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সত্যজিৎ আমাকে এই ছবিগুলি দেখিয়েছিলেন। এমন হতে পারে যে উদয়শঙ্করের ব্যালে-চিত্র 'কল্পনা' দেখে এই ছবিটি করার প্রেরণা জেগেছিল তাঁর মনে—যে ব্যালে চিত্রটির প্রতিটি ফ্রেমের ছবি ঘুটেঘুটে অন্ধকার হলঘরে বসে স্টিল-ক্যামেরায় তুলে বাড়িতে বসে দিনের পর দিন পরীক্ষা করেছিলেন তিনি। সেই সব স্থির চিত্র দেখিয়ে সিনে-ক্যামেরা সঠিকভাবে বসবার কৌশল সম্পর্কে আমাকে তিনি বিশদভাবে অবহিত করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন নাটকীয় আলোকসম্পাত, নৃত্যের এবং তবলাবাদনের ক্লোজ-আপে তোলা সাদা-কালোর মায়াবী খেলার প্রতি। যদিও রবিশঙ্করকে নিয়ে এই ছবিটি শেষ পর্যন্ত তোলা হয়নি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সত্যজিৎ এই অনুশীলনটি করে শুধু বিশেষ আনন্দলাভই করেননি, এর থেকে শিখেওছিলেন অনেক কিছু, পেয়েছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাণেব নানা খুঁটিনাটির আভাস। সাদা, কালোয় এই স্কেচগুলি এবং পরবর্তীকালে তাঁর একের পর এক ছবি সম্পর্কিত খুব তাড়াতাড়িতে কয়েকটি লাইনে আঁকা লাল-মলাটের হিসেবের খাতার পাতাগুলি আমাদের দেশে ছায়াছবির ইতিহাসে অভূতপূর্ব সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সিনেমার জগতে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে হাতে গোনা যায় এমন মাত্র কয়েকজন, যাঁরা শিল্পী হিসেবেও কৃতী বলে স্বীকৃত হয়েছেন যেমন ফেলিনি, কুরোসাওয়া, আইজেনস্টাইন, আন্তোনিয়নী —সত্যজিৎ রায় তাঁর এই শিল্প প্রতিভার বৈচিত্র্যে তাঁদের মধ্যে অন্যতম বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না।

আশা করা যাচ্ছে যে সত্যজিৎ রায়ের ৭০ তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে যে-কর্মসূচি কলকাতাবাসীবা তৈবি করছেন বলে শোনা যাচ্ছে তার মধ্যে দিল্লীর Village Gallery-তে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীটির মত তাঁর পূর্বোক্ত কর্মকাণ্ডের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী তাঁর সারা জীবনের কর্ম এবং বাসস্থান কলকাতায়ও হবে।

সত্যজিৎ-সৃষ্ট ইংরাজি হরফ — 'রে-রোমান'

Ray Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

(&$£.,:;-""!?¢%/*)

গ্রাফিক শিল্পী সত্যজিৎ রায়

রঘুনাথ গোস্বামী

গত চল্লিশ বছর ধরে যাঁরা বিজ্ঞাপন-শিল্প আর বইয়ের ডিজাইনের ক্রমবিবর্তন দেখে আসছেন তাঁরা সত্যজিৎ রায়ের গ্রাফিক শিল্পের সঙ্গে সুপরিচিত।

সত্যজিৎ ১৯৪৩ সনে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে বিজ্ঞাপন জগতে যোগ দেন আর ১৯৫৩ সনে এই পেশা তিনি ছেড়ে দেন। এই অল্প কয়েক বছরের মধ্যে কলাকার রূপে সত্যজিৎ ছাপার মাধ্যমে ভিস্যুয়াল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যে শিল্প সৃষ্টি করলেন তা একেবারে নতুন এবং সেগুলিতে তাঁর প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। বিজ্ঞাপন-শিল্প গড়ে উঠেছে মূলত ভিস্যুয়াল কমিউনিকেশন সংক্রান্তি সমস্যাকে কেন্দ্র করে। কোন ভাব, ধারণা, কল্পনা বা অভিপ্রায়কে চাক্ষুষ করে তোলা, পণ্য অথবা সার্ভিস বিশেষের চাহিদা বাড়ানোর জন্য নেত্রগ্রাহ্য প্রচার-সমস্যার সমাধান করা ও এর কৃৎকৌশল আবিষ্কার করাই এর কাজ।

বিজ্ঞাপন আর প্রকাশনে যে গ্রাফিক শিল্পী কাজ করবেন, তাঁর পক্ষে একটি ব্যক্তিগত শৈলী বা স্টাইল গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া শিল্পীর সেই ক্ষমতার দরকার যা দিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব স্টাইলকে বিভিন্ন কাজে প্রয়োজন অনুসারে হেরফের করে সুষ্ঠুভাবে লাগাতে পারেন। পেশাগত চাহিদার কারণে কখনও হয়ত দরকার একটা বিশেষ বাতাবরণ সৃষ্টি করা, কখনও প্রচারের প্রয়োজনে বিজ্ঞাপন সৃষ্টি করা, কখনও নিছক চিত্রবস্তু সর্জনাই এর উদ্দেশ্য হতে পারে।

সত্যজিৎ রায়ের প্রধান কৃতিত্ব হল ভিস্যুয়াল কমিউনিকেশন সংক্রান্ত শিল্পকলার ক্ষেত্রে তিনি ঠিক এই জিনিসগুলো করতে সক্ষম হয়েছেন ঃ কয়েক বছরের মধ্যে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর নিজস্ব স্টাইল বা ঢং আর সঙ্গে সঙ্গে সেই স্টাইলকে লাগিয়েছেন সুদক্ষভাবে বিভিন্ন কমিউনিকেশনের কাজে। বিজ্ঞাপন-শিল্প বা প্রকাশনা---উভয় ক্ষেত্রেই সত্যজিতের সম্বন্ধে এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

সত্যজিৎ আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট গ্রাফিক শিল্পী। তাঁর কাজ মৌলিকতা আর শিল্পদক্ষতার গুণে আরও হাজারটা কাজের ভিড়ের মধ্যে সহজেই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। তাঁর ডিজাইন আর গ্রাফিক কাজের মধ্যে রয়েছে মনকে বিমুগ্ধ করার মতন সরলতা---'যা সকল অলঙ্কারের সার'। আর দেখলে মনে হয় যে শিল্পী সেগুলিকে সৃষ্টি করার সময় মজা পেয়েছেন। সে যাই হোক, এই সব কাজের মূল উদ্দেশ্যগুলি সব সময়েই সুস্পষ্ট কোনও অনুভূতি বা বাতাবরণ সৃষ্টি করা, কোন অভিপ্রায় বা চিন্তাকে প্রকাশ করা বা কোন পণ্য বা ভাব 'বিক্রি' করা। বিজ্ঞাপন-শিল্পের সুপরিচিত পরিভাষায় 'to convey a thought, or to sell an idea or product'। সত্যজিৎ তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে কমার্শিয়াল আর্ট একাধারে সভ্য, মর্যাদাপূর্ণ আর কার্যকরী, শিল্পগুণসমন্বিত, সৃজনশীল আর ফলপ্রসূ কাব্যগুণমন্ডিত

ও কমিউনিকেটিভ হতে পারে।

আজ আমরা কমার্শিয়াল আর্ট বলতে যা বুঝি আমাদের দেশে এই শতাব্দীর বিশের দশক অব্দি তা অজানা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়া পর্যন্ত আমাদের বড় বড় বিজ্ঞাপনের এজেন্সিগুলো সাহেবদের আওতায় ছিল আর আমাদের কমার্শিয়াল আর্টের ধরনটা ছিল ফিরিঙ্গি গোছের। আমাদের তদানীন্তন দিশি কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের জ্ঞান আর কৃতিত্ব ছিল একান্তভাবেই বিদেশি পুস্তক আর পত্রপত্রিকা নির্ভর আর লজ্জাজনকভাবে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁদের আঁকা কাজগুলো হত বিদেশি বিজ্ঞাপনের সরাসরি বা অক্ষম নকল। তথাকথিত কমার্শিয়াল আর্টকে ভিস্যুয়াল কমিউনিকেশনের মাধ্যম হতে হলে কমার্শিয়াল আর্টে প্রতিফলিত হতে হবে দেশের মানুষের হাসি কান্না, পছন্দ অপছন্দ, আচার-ব্যবহার, প্রথা আর ঐতিহ্যকে। তাই এটা একেবারেই অবাস্তব যে আমাদের দেশের কমার্শিযাল আর্টকে বিদেশে কমার্শিয়াল আর্টের অন্ধ অনুকরণ করতে হবে।

বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে নবজাগরণের ভাবধারার জোয়ার এসেছিল গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। শিল্পকলাতেও তার প্রভাবের কথা আমরা জানি। দেরীতে হলেও এদেশের বিজ্ঞাপন শিল্পেও এই চেতনার তরঙ্গ যখন এসে পৌঁছাল তখন আমাদের কিছু শিল্পী আর বিজ্ঞাপনের জগতের লোকেদের মধ্যে একটা দেশজ 'ইডিয়াম' বা ভাষা তৈরির প্রেরণা দেখা দিল। এঁরাই প্রচলন করলেন দেশের নিজস্ব ধারার নতুন গ্রাফিক ডিজাইন আব বিজ্ঞাপন শিল্পকলা। গত চল্লিশ বছরের মধ্যে আমাদের দেশের বিজ্ঞাপন-শিল্প আর প্রকাশনার জগতে একটা বৈপ্লবিক অদলবদল হয়ে গেছে। এই বিপ্লব সম্ভব হয়েছে মূলত আমাদের দেশের কযেকজন প্রতিভাশালী শিল্পীর সৃজনী প্রতিভার দৌলতে। ভারতীয় বিজ্ঞাপনের দুঃসময়ে যুগবদলেব পালা আনতে সত্যজিৎ বায় নতুন দিনের উপযোগী শিল্প সৃষ্টি কবতে শুরু করলেন। একেবারে অভিনব ঢং-এ তিনি ভিস্যুয়াল কমিউনিকেশনের ভাষাকে পরিমার্জিত করলেন।

একজন শিল্পীব বিশিষ্ট স্টাইল তাঁব নিজস্ব সত্তারই বহিঃপ্রকাশ। এই স্টাইল হল কোন জিনিস দেখার ব্যাপারে শিল্পীব নিজস্ব, বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, যা তিনি তাঁর শিল্পে একান্ত নিজের মত কবে রূপ দেন। কোন শিল্পীর শিল্পশৈলী বা স্টাইলে এই দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে একজন শিল্পীব শিল্পের ক্ষেত্রে দেওয়ার কিছু থাকে না। উপলব্ধিকে, অভিজ্ঞতাকে ও শিল্পকে নিজেব মত করে প্রকাশ করার ক্ষমতাকেই স্বকীয়তা বলা হয়।

সত্যজিৎ বায়ের অন্য কোন অবদান যদি নাও থাকত তা হলেও গ্রাফিক কমিউনিকেশনের চিরাচরিত ধাবা চুরমাব করে, পুরনো প্রচল বর্জন করে বিজ্ঞাপন শিল্প ও বই ডিজাইনের ক্ষেত্র থেকে শ্রীহীন সেকেলে এবং অকেজো পদ্ধতি ও প্রকরণের প্রথাকে দূরীভূত করার কাজে অমেয় সহায়তা করার জন্যই তাঁকে সবাই মনে বাখত। তাঁব দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর মৌলিক প্রকাশ ক্ষমতা তাঁর পেশাগত দক্ষতার এক প্রধান হাতিয়ার। এই ক্ষমতা না থাকলে তিনি সামান্য 'ড্রাফটসম্যান' বা ছবি-আঁকিয়েও হতে পাবতেন না। এই ক্ষমতা না থাকলে একটা ছাপা পাতা বড় জোর কমিউনিকেশন-প্রয়াসের একটা পদাতিক উদাহরণের বেশি কিছু হয় না—আঙ্গিকের দিক থেকে নির্ভুল, নীরস এবং অবশ্যই অনামী। খ্যাতনামা আর্ট ডিরেক্টর লিও লিওনি

তাঁর একটা লেখায় বলেছিলেন ঃ

"Self expression gives the graphic artist the style that differentiates him from his fellow designers. It gives his work aesthetic uniqueness, a distinct visual manner. But self expression means more than type preference, the personal gesture of line, original colors, and an individual rhythm. More importantly it relates to a way of approaching and solving problems of communication — to the particular twist of the mind which translates word concepts into visual imagery —to the specific personal way in which graphic symbols were evolved and stated,"

লিও লিওনি যে "Self expression"-কে "the specific personal way of translating word concept into visual imagery" বলে ব্যাখ্যা করেছেন সেটাই হল ভিস্যুয়াল কমিউনিকেশনে সত্যজিতের সাফল্যের মূল রহস্য।

প্রথম জীবনে সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনের কলাভবনে নন্দলাল বসুর কাছে শিক্ষালাভ করেন। সত্যজিৎ লিখেছেন, "আমি জানি না আমার পক্ষে 'পথের পাঁচালী' করা সম্ভব হত কি না, যদি না শান্তিনিকেতনে শিক্ষানবিশীর সুযোগ আমার জীবনে ঘটতো। ঐখানেই মাস্টার মশায়ের পায়ের তলায় বসে আমি শিখেছি প্রকৃতিকে কি করে দেখতে হয়, কিভাবে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে হয় এবং কি করে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ছন্দকে অনুভব করতে হয়।"

"১৯৪০ সনের কোন এক সময়ে আমার মা কলাভবনে আমার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন..... সে সময়ে ভারত শিল্পকলা বা ইন্ডিয়ান স্কুল অফ পেইন্টিং সম্বন্ধে আমার মনে খানিকটা কিন্তু কিন্তু ভাব ছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতন আর নন্দলালের আমাকে দীক্ষিত করতে সময় লাগলো না। এর জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ ....নন্দলালের মতন একজন অসামান্য মানুষ আর শিল্পীই এত অন্তর দিয়ে এত গভীরভাবে নানান জিনিসকে অনুভব করতে পারতেন আর সেই অনুভূতি দিয়ে তাঁর ছাত্রের মনকে রাঙিয়ে দিতে পারতেন।

আজ আমি যা হয়েছি তা হতে পারতাম না যদি 'মাস্টার মশায়ের' পায়ের তলায় বসে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভ না করতাম।"

এইরকম উদ্দীপনাময় পরিবেশে তরুণ সত্যজিৎ শিল্পী হিসেবে তাঁর হাত পাকান আর সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য অভিজ্ঞতাও লাভ করেন। কমার্শিয়াল আর্টের ক্ষেত্রে সত্যজিতের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল যে, তিনি দেশজ শিল্পের অন্তরাত্মাকে পুনরাবিষ্কার করে ভিস্যুয়াল কমিউনিকেশনের মাধ্যমে আমরা যা আজ প্রকাশ করতে চাই তার জন্য একটা জাতীয় ভাষা সৃষ্টি করেছেন। ভিস্যুয়াল কমিউনিকেশনের দেশজ শিল্পের যথাযথ ব্যবহারের সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস তাঁর নিজের কথাতেই সবচেয়ে ভাল ভাবে ব্যক্ত করা যায় ঃ "One thing I must say. The Bengal School, as this has come to be known, is not necessarily without a future. It, however, should progressively concern itself with applied arts, functional arts. In

commercial art, I remember, we used to impart what we used to call 'Banglar Chhanda' (hythm of Bengal), And there is ample scope, I feel for modern commercial art to have a base of Indian art, a base of the Bengal School My training at Kala Vaban has stood by my commercial art "

তাঁর অনেক ডিজাইনেই, পুরনো শিল্পকলার প্রচ্ছন্ন ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে খুব মার্জিত লোকশিল্প বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সূক্ষ্মরুচি আর জন্মসূত্রে পাওয়া অভিজাত পারিবারিক পালিশের প্রতিফলন। শুরু থেকেই আদিম শক্তির সঙ্গে সুষ্ঠু সবলতাব এই মিশ্রণ সত্যজিৎ বায়ের গ্রাফিক শিল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

উনিশ শতকেব তুলনায সম্প্রতিকালে ইলাস্ট্রেশন সম্পূর্ণ ভিন্নতার স্থান অধিকার কবেছে। "Illustration as a facet of graphic art is judged on the level of any other means of artistic expression. Illustration as an element of a graphic design must be judged primarily on its success or failure to make a point. Freq'iently it is judged on both levels " সত্যজিতের ইলাস্ট্রেশন বিখ্যাত গ্রাফিক শিল্পী Bob Gill- এর এই উক্তিব নিরিখেই বিচাব করতে হবে।

গুহার দেওয়ালে গুহাবাসী আদিম মানুষ বেখাচিত্র দিযেই নিজেকে প্রথম প্রকাশ কবেছিল। আদি পর্বে এই বেখাই ছিল ভিস্যুয়াল কমিউনিকেশনেব প্রথম ও প্রধান বাহন—যার ধাব আজও কমেনি। সত্যজিতের চিত্রকর্মে পাওয়া যায় বেখার ব্যবহাবে চূড়ান্ত শক্তির পরিচয—যে রেখা কখনও পরীক্ষামূলক বা দ্বিধাগ্রস্ত, কখনও কম্পমান বা দোলায়িত, কখনও সুদৃঢ় বা অটল। কোন একটা জিনিসেব ছবিকে সেই জিনিসটির মানচিত্র বা বাহ্য সীমারেখা মাত্র হবার দবকার নেই। বেখা তাব নিজগুণে বা যে পবিসবকে তা চাবিদিক থেকে ঘিবে বাখে বহু পরিশ্রম করে আঁকা মানচিত্রের চেয়ে তা ঢেব বেশি অর্থবহ হতে পাবে। এই ভাবেই সত্যজিৎ বেখাব সাহায্যে তাঁব বিষয়বস্তুর চবিত্র, হাস্যবস বা মর্মন্তুদ ভাবকে চাক্ষুষ কবে তুলেছেন।

সত্যজিতেব লাইন ড্রইং বা রেখাচিত্রে অসামান্য দক্ষতা। তাঁর রেখাচিত্রগুলির একটা অসাধাবণ চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। এ বিষয়ে তাঁব নিজেব বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য "I was used to sketching in Western style which lays more stress on outlines that on what is or are within the outlines. Master Mashai (Nandalae) taught me there was something more than superficial outlines artists and painters must be aware of. He taught us that, in objects that most significant aspect was inner rhyhm which must be caught Outlines in themselves are dead things. One must discover, one must feel what is within the outlines and of the object. The element of life and growth —the fundamentals of Nautre —must be felt." এই হল সত্যজিতের রেখাচিত্রের মূল কথা। তবে এই লেখার সঙ্গে তাঁর ছাপা

ছবিগুলো দেখলে তাঁর রেখার সম্বন্ধে আমি কি বলতে চাইছি তার অনেকখানিই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাঁর তুলির মোটা পোঁচে আঁকা ভারি দাগ, তাঁর কলমের টানে ফোটানো হাল্কা দ্বিধাগ্রস্ত রেখা কিম্বা পরিচ্ছন্নভাবে আঁকা সূক্ষ্ম খোলামেলা রেখাচিত্রের রকমফের— এ-সব শুধু শৈলীর কারসাজি নয়, এগুলি বিষয়বস্তুর সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত। যেমন, Ronald Searle- এর আঁকা ছবিব কিছু ইতস্তত ভাবে সূচীমুখ রেখা কোন আঙ্গিকের চালাকি নয়। তা একজন অনুভূতিসম্পন্ন শিল্পীর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। পাশ্চাত্য জগতের একজন স্বনামধন্য শিল্পী Ben Shan-এর কাঁটাতারের বেড়ার মত কন্টকিত রেখা কোনো বক্রোক্তির চেয়ে ঢের বেশি রসিকতার পরিচায়ক।

সত্যজিৎ সব সময়ে নব নব সম্ভাবনার পথ খুঁজে বেড়িয়েছেন। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যবহৃত তথাকথিত ব্যবহারিক শিল্পেও কখন কখনও ছাপাই-ছবির মাধ্যমগত সম্ভ্রান্ত বিশুদ্ধতার সাদৃশ্য সৃষ্টি করার বিবেকী-তাড়নায় তাড়িত হয়ে তিনি অসাধারণ সফলতার সঙ্গে কমার্শিয়াল আর্টে লিনোকাট, উডকাট আর পেপারকাটের ব্যবহার করেছেন—যা আশ্চর্য সৃষ্টিধর্মী। বিজ্ঞাপন ছাড়া বইয়ের ডিজাইনে সত্যজিৎ অসামান্য মনোগ্রাহী কাজ করেছেন। অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রচ্ছদ আর ছবির সমন্বয়ে তাঁর পরিকল্পিত ছোটদের বইগুলি বিশিষ্ট নান্দনিক মূল্যযুক্ত ও অনন্যসাধারণ শিল্পকর্ম। গ্রন্থচিত্রণের ক্ষেত্রে লেখার বাঙ্ময় বিষয়বস্তুর কিছু অবিকল চিত্রানুবাদই গ্রন্থচিত্রণেব শেষ কথা নয়। লেখার রসকে নেত্রগ্রাহ্য করে তুলতে পারা বা সম্প্রসারিত করাটাই উচ্চমানের গ্রন্থচিত্রণের উদ্দেশ্য। একথাটা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায় আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কিছু ছোটদের বই সত্যজিৎ তাঁর অপূর্ব ছবি দিয়ে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

বইয়ের ডিজাইনের ক্ষেত্রে তাঁর একটি সর্বজন পরিচিত কীর্তি হল 'আম আঁটির ভেঁপু' নামে 'পথের পাঁচালী'র ছোটদের জন্যে সচিত্র সংস্করণ। এই বইটিতে তাঁর তুলির অপূর্ব ছন্দময় চিত্রকর্ম বিভূতিভূষণের এই মৃত্যুহীন রচনাকে ঘিরে যেন একটি পদ্মলতা বা arabesque -এর মত ছন্দিত হয়ে রচনায় বর্ণিত গ্রামীণ বাতাবরণকে আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত করেছে। ছবিগুলি দেখলে মনে হয় লেখকের ভাবাবেগ যেন চিত্রকরের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে। এই বইয়ের ছবিগুলির রেখাবলী যেন মিলেমিশে একটি সামগ্রিক ছন্দ সৃষ্টি করেছে ; কিম্বা হয়ত বলা যায় একটি ছন্দোবদ্ধ ঐক্য এনে দিয়েছে। সত্যজিতের অসামান্য সূক্ষ্ম রসিক মনের আমরা পরিচয় পাই তাঁর বাবা সুকুমার রায়ের লেখা কয়েকটি ছোটদের হাসির কবিতা আর গল্পেব জন্য আঁকা তাঁর ছবিতে। সত্যজিতের আঁকা এই সব ছবিগুলি সুকুমার রায়ের লেখার এমনই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে যে সুকুমার রায়ের লেখা পড়তে পড়তে এগুলি অনিবার্যভাবে মনে আসে। লেখা ও ছবির এই ধরনের একাত্মতা বলা বাহুল্য খুবই বিরল। শিল্পী এখানে লেখকের সৃষ্ট শব্দগত বিষয়ের রসকে নেত্রগ্রাহ্য করে তুলে তা সম্প্রসারিত করে পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দ বিবর্ধিত করেছেন। সত্যজিতের আঁকা ছোটদের বইয়ের ছবিগুলিতে সর্বদাই একটি অন্তর্লীন ছন্দ এবং মণ্ডনধর্মিতা বা `decorative element' বলতে যা বোঝায় তার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সত্যজিৎ রায় মাত্র কয়েকটি বই ডিজাইন করেছেন—যা সাধারণত্ব বা পদাতিকতার সিন্ধুতে বিন্দুবৎ বলা যেতে পারে।

তবুও পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন আলোড়িত জলের বৃত্তগুলো আস্তে আস্তে চারিদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে তেমনই সত্যজিতের প্রভাব নতুন যুগের শিল্পীদের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। যে সব শিল্পী বই ডিজাইন বা পত্র-পত্রিকার ছবি আঁকেন তাঁদের অনেককেই তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন। এই অনুপ্রেরণা আর্ট স্কুল আর প্রকাশনার জগতে বা বিজ্ঞাপনেব এজেন্সিতেও দেখা গিয়েছে এবং সত্যজিতের পরবর্তী প্রজন্মের অনেক শিল্পী মৌলিক আর উঁচু জাতের কাজ করছেন।

বিজ্ঞাপন শিল্প সত্যজিৎ অনেক দিন হল ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা মাঝে মাঝেই তাঁর অতুলনীয় গ্রাফিক কাজের নমুনা তাঁর তৈরি চলচ্চিত্রের পোস্টার আর নিজের চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। সত্যজিৎ তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিষ্ঠিত 'সন্দেশ' পত্রিকা নতুন করে বার করেছেন। সত্যজিৎ সন্দেশ-এর জন্যে নিয়মিতভাবে ছবি এঁকেছেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ তাঁর জীবনের পরবর্তীকালেব একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। ছোটদের জন্য তাঁর নিজের লেখা বইয়ের প্রচ্ছদ ও ছবি তিনি দীর্ঘকাল ধরে এঁকে চলেছেন। এটা সত্যিই সুখের কথা যে তিনি এখনও তাঁর অতুলনীয় শক্তি ও শিল্পকুশলতা ছোটদের আনন্দের জন্যে সদ্ব্যবহার কবে যাচ্ছেন।

সত্যজিৎ একজন খুবই বড়মাপের শিল্পী যিনি কমিউনিকেশনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতা সহকারে কাজ করেছেন। তিনি তাঁর শিল্পকর্মে প্রদত্ত বিষয়গুলিকে একদিকে বাস্তবতা আর অন্যদিকে অলঙ্কৃত করে সমান উৎকর্ষ দিয়ে রূপায়িত করেছেন। তিনি তাঁব পেশাকে দ্যুতিমান কবেছেন, মহত্ত্বমণ্ডিত করেছেন। তিনি ব্যবসায়িক শিল্পে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

আমরা সত্যজিৎ রায সম্বন্ধে বৈদিক ঋষির ঊষা-বন্দনার স্তোত্র দিয়ে এই লেখা শেষ করছি ঃ

"কবির মতন, তিনিও আমাদেব ভালবাসার
জিনিসগুলিকে আমাদের সামনে উন্মীলিত কবে দিয়েছেন।"

সত্যজিৎ ায়েব কবা বিজ্ঞাপন শিল্প
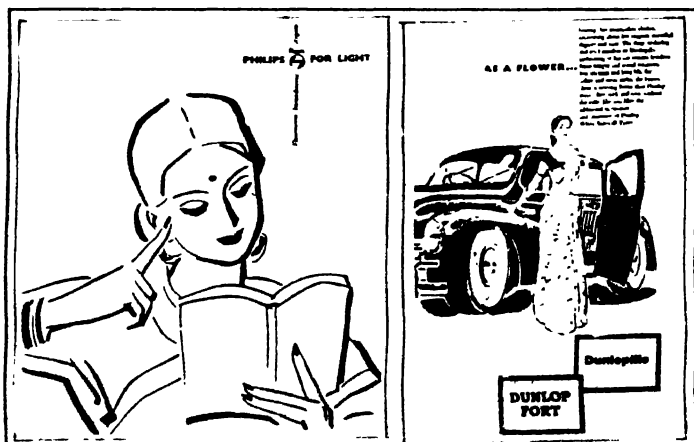
মুদ্রণচর্চায় তিন পুরুষ

দীপঙ্কর সেন

বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাসে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় দুটি পরিবারের মধ্যে একটি ঠাকুরবাড়ি অপরটি উপেন্দ্রকিশোর রায়ের (চৌধুরী) পরিবার। এত বিভিন্ন ধরনের প্রতিভাসম্পন্ন এতজন সন্তান দুটি মাত্র পরিবারের মধ্যে কেমন কবে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। পরাধীন ভারতবর্ষে এমন কিছু মানুষকে আমরা পেয়েছিলাম যাঁদের প্রতিভা শিল্পকলা এবং বিজ্ঞান এই দুটি ক্ষেত্রেই বিকশিত হয়েছিল অতি অসাধারণভাবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শেক্সপীয়ার সম্পর্কে একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভার কথা শিক্ষিত বাঙালিমাত্রই জানেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ গণিতশাস্ত্রেব অধ্যাপক হয়েও অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন নাট্যকার হিসাবে। এরকম আরও উদাহরণ আছে। সম্ভবত এই তালিকায় সবচেয়ে সার্থক শিল্পী ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রাযচৌধুরী, মুদ্রণশিল্পের জগতে যিনি ইউ রায় নামে সুপরিচিত। উপেন্দ্রকিশোর, তাঁর পুত্র সুকুমার এবং পৌত্র সত্যজিতেব বহুমুখী প্রতিভার সম্পর্কে কোন আলোচনা এই প্রবন্ধে কবা হবে না। তাঁদের সৃজনশীল নানাদিকের মধ্যে মাত্র একটির সমীক্ষাই এর মূল উদ্দেশ্য। তিন পুরুষেব এই তিনজন অসাধারণ ব্যক্তির মুদ্রণচর্চার দিকটিই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভারতবর্ষে মুদ্রণকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবার মত মানসিকতার এখনও খুবই অভাব। রবীন্দ্রনাথ "বাংলাভাষা পরিচয়" গ্রন্থে এ বিষয়ে যে মূল্যবান উক্তিটি করেছিলেন তা হল —একদা ছিল না ছাপাখানা, অক্ষরের ব্যবহাব হয় ছিল না, নয় ছিল অল্প। অথচ মানুষ যে-সব কথা সকলকে জানাবার যোগ্য মনে কবেছে দলের প্রতি শ্রদ্ধায়, তাকে বেঁধে রাখতে চেয়েছে এবং চালিয়ে দিতে চেয়েছে পরস্পরের কাছে। ....এই সমস্ত পরীক্ষিত এবং কল্পিত কথাগুলিকে সংক্ষেপ করে বলতে হয়েছে, ছন্দে বাঁধতে হয়েছে, স্থায়িত্ব দেবাব জন্য।......সাহিত্যের প্রথম পর্বে ছন্দ মানুষের শুধু খেয়ালের নয়, প্রয়োজনের একটা বড় সৃষ্টি আধুনিক কালে যেমন সৃষ্টি ; তার ছাপাখানা।' কিন্তু কবির এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব। তাই আমরা সাধারণভাবে আজও বুঝতে শিখিনি যে ভালো লাগুক আব নাই লাগুক প্রত্যেকদিন বারবার দুটি জিনিস আমাদের দেখতে হয় ; এক হল পাকা ঘরবাড়ি, আর দুই হল ছাপা জিনিস। সমসাময়িক কোন সমাজের সাংস্কৃতিক মান নির্ণয় করার জন্য তার স্থাপত্য রীতি এবং মুদ্রিত সামগ্রীর চেয়ে বড় প্রমাণ্য সূত্র আর কিছু নেই। যুরোপে স্থাপত্যকে বলা হয়েছে জমাট বাঁধা সঙ্গীত (frozen music) আর মুদ্রণকে বলা হয়েছে দুটি দিকে সীমায়িত স্থাপত্য (two-dimensional architecture)। সত্যিই সুরুচি, বিচারবোধ এবং সমকালীন শিল্পকৌশল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং নানারকম প্রশ্নের উত্তব মুদ্রণের সমৃদ্ধ এবং বাস্তব চিত্রের ভিতর দিয়ে যতটা পবিস্ফুট হয়ে ওঠে তেমন আর কিছুতে

হয় না।

পাশ্চাত্যে মুদ্রণের মান বিশেষ উন্নত। মুদ্রণের খুঁটিনাটি সম্পর্কে প্রকাশক এবং পাঠকের দৃষ্টি খুবই সজাগ। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বর্তমান শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত উইলিয়াম মরিস, জর্জ বানার্ড শ, অলডাস হাক্সলি প্রমুখ সাহিত্যিকরা মুদ্রণ সম্পর্কে কেবলমাত্র চিন্তা-ভাবনা করেননি, সময় সময় হাতে কলমে কাজও করেছেন। য়ুরোপে এ ট্র্যাডিশন দীর্ঘ দিনের। বেন জনসন তাঁর রচনা মুদ্রণের সময় যত্ন করে প্রুফ পড়তেন। শেক্সপীয়ারের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে গোয়েটে লিখেছিলেন 'শেক্সপীয়াবের জন্মের একশ' বছর আগেই মুদ্রণ আবিষ্কৃত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সে যুগে ছাপা বইকে শ্রদ্ধাব সামগ্রী বলে মনে করা হত। ......শেক্সপীয়ার নিজেও ছাপা বইকে শ্রদ্ধার জিনিস বলে মনে করতেন।' তাই দীর্ঘকাল থেকে য়ুরোপের মানুষ মুদ্রণকে সৌন্দর্য সৃষ্টির একটি উপায় বলে মনে করতে শিখেছে।

য়ুবোপীয় মুদ্রণের ইতিহাসে খুব স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে বিভিন্ন মুদ্রণ পদ্ধতির আবিষ্কার এবং সেগুলির অগ্রগতির জন্য যাঁরা বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁরা কেবলমাত্র কারিগর ছিলেন না, ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী। লিথোগ্রাফিব আবিষ্কারক অ্যালয সেনিফেল্ডার ছিলেন নট এবং নাট্যকার। সম্ভবত সঙ্গীত মুদ্রণের ভিতর দিয়েই হয়েছিল লিথোগ্রাফির সূচনা। সেনিফেল্ডার যখন বিখ্যাত গীতিকার গ্লাইসনারেব কয়েকটি গান মুদ্রণের ভার গ্রহণ করেন তখন তাঁব সঙ্গে কাজ করেছিলেন জার্মানি ওপেরার রোম্যান্টিক স্কুলেব প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মারিযা ফন হ্বেবার।

য়ুরোপের অন্যান্য মুদ্রণকুশলীদের তালিকায় যে-সব শিল্পীদের নাম আমরা দেখতে পাই তাঁদের মধ্যে আছেন জার্মানির আডলফ ফন্ মেন্টসেল, ফ্রান্সের অনর দমিয়ের, ইনিয়াস ফাঁতা লাতুর, স্পেনের গইয়া এবং গ্রেট ব্রিটেনের স্যামুয়েল প্রাউট প্রমুখ শিল্পীরা। তুলুজ লত্রেক অসংখ্য নতুন নতুন পোস্টাব ছেপে লিথোগ্রাফির দিগন্তকে প্রসাবিত কবেছিলেন। লুই রেমেকার, জোসেক পেনেল, হেনরী বোন প্রমুখ শিল্পীদের কাজের মধ্যে দিয়ে লিথোগ্রাফি ব্যাপারটি কি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা উচিত। গোটা লিথোগ্রাফি পদ্ধতিটিই কতকগুলি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সীমায়িত। লিথোগ্রাফি কথাটির অর্থ হল পাথর দিয়ে মুদ্রণ। যে পাথরের উপর লিথো-মুদ্রণের নকশা তৈরি করা হয় তাব রাসায়নিক নাম হল ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। পাথরটির একটি দিকে এক ধরনের তৈলাক্ত কালি দিয়ে কিছু এঁকে নিলে তার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট বা ক্যালসিয়াম ওলিয়েট নামে যে যৌগিক পদার্থ তৈরি হয় তা চটচটে কালিকে আকর্ষণ করে এবং জলকে প্রতিহত করে। এই অংশটি হল পাথরের মুদ্রণীয় অংশ। পাথবটির একই দিকে অমুদ্রণীয় অংশটির জন্য আরেকটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া আবশ্যক। মুদ্রণের সময় সেখানে (অমুদ্রণীয় অংশে) যাতে কালি না ধরে তারও একটা ব্যবস্থা করা দরকার। সেই জন্য পাথরের উপর বেশ করে গাম অ্যারাবিক বা আরবী আঠা মাখালে যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্ট হয় তার নাম ক্যালসিয়াম অ্যারাবিনেট। তা জলকে আকর্ষণ করে আর ছাপাখানার কালিকে প্রতিহত করে।

এমনি করে একটি পাথরের একই দিকে দুটি যৌগিক পদার্থ তৈরি করে নেবাব পর একসঙ্গে কালি এবং জলের প্রলেপ লাগালে জায়গা মতো কালি এবং জল ধবে

নেবার জন্য ছাপার কাজ চলে অনায়াসে। একই রাসায়নিক পদ্ধতিতে দস্তা অথবা অ্যালুমিনিয়ামের পাত থেকে মুদ্রণ চলছে যদিও নামটি আজও আছে লিথোগ্রাফি। এই ধাতব পাত বা চাদরগুলোকে মুদ্রণ যন্ত্রেব বেলনাকার অংশের (cylinder) গায়ে এঁটে নিলে খুবই দ্রুতগতিতে কাজ করা সম্ভব। পাথব বা ধাতব চাদর থেকে সবাসরি কাগজ অথবা অন্য কিছুর ছাপার নাম "ডাইরেক্ট প্রিন্টিং"। আর তা না কবে মুদ্রণীয় ছবি অথবা হবফ একটি রবারের চাদরের উপব ছেপে সেখান থেকে কাগজ, কাপড় বা অন্য কিছুতে ছেপে নেওয়ার পদ্ধতিকে আমবা বলি "অফসেট"। একটা ভুল ধারণা চালু আছে যে অফসেট মানেই লিথোগ্রাফি। এটি ঠিক নয় কারণ লেটারপ্রেস বা আদি যুগের উঁচু মুদ্রণীয় সমতল থেকে ছাপার পদ্ধতির সঙ্গেও অফসেট পদ্ধতি যুক্ত হয়েছে। তাব নাম "ড্রাই অফসেট" বা "লেটাব সেটা"।

উপেন্দ্রকিশোরেব পৈতৃক বাসস্থান ছিল বাংলাদেশেব মৈমনসিং অঞ্চলে। এন্ট্রান্স পবীক্ষায় বৃত্তিলাভ করে তিনি কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। পরে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সামান্য কযেক বছব তিনি বেঁচেছিলেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৫২ বছর। তিনি কোনও দিন বিদেশে যাননি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মুদ্রণের জন্য তিনি যা কবে গেছেন সে স্তবের সৃষ্টিমূলক কাজ আজ পর্যন্ত অপর কোন ভাবতীয করতে পারেননি। অথচ আজ আমাদের দেশে যুরোপ এবং আমেরিকায শিক্ষাপ্রাপ্ত মুদ্রণবিশারদের অভাব নেই। মুদ্রণশিল্পের উন্নতির জন্য সরকারের তরফ থেকে বহু জল্পনা-কল্পনা এবং সুপাবিশ করা হযেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হযেছে বেশ কিছু ডিপ্লোমা এবং তাব থেকে একটু নিম্নস্তরের মুদ্রণ বিদ্যালয। মুদ্রণ বিজ্ঞানে স্নাতক হবাব জন্য এখন তিনটি কলেজ খোলা হয়েছে। তার মধ্যে একটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েব অন্তর্গত। সেটি চালু হযেছে বছরখানেক আগে। সবচেয়ে দুঃখেব কথা হল আমাদের দেশে এখন বহু বড় বড় ছাপাখানা থাকলেও উপেন্দ্রকিশোর এবং সুকুমার রাযের পব মুদ্রণেব কোন মূল শাখায় ভারতীয় মনীষাব কোন স্বাক্ষব আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

পিয়ের য়োসেফ প্রুঁদ মুদ্রণশিল্পেব মাধ্যমে মননের জগৎ থেকে মুদ্রণের জগতে প্রবেশ করেছিলেন। জীবনের প্রায শেষদিন পর্যন্ত এব কোনটির থেকে তিনি সরে যাননি।

কেমন করে উপেন্দ্রকিশোর মুদ্রণকুশলী হযে উঠলেন সে ইতিহাস সত্যিই চিত্তাকর্ষক। বাংলা সাহিত্যে শিশুসাহিত্য রচয়িতা হিসাবে তাঁর স্থান যে প্রায় সবার উপরে একথা অনেকেই মনে করেন।

তাঁর "ছেলেদের রামায়ণ" ছাপাবাব সময় তাব জন্য ছবি ছাপাতে গিয়ে উপযুক্ত মানের প্রায়োগিক প্রকরণের অভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। সেই সময় আমাদের দেশে কাঠের ব্লক ব্যবহার করে সাধারণত যে-ভাবে ছবি ছাপা হত তার মান ছিল খুবই নিচু। তাই ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিত্রমুদ্রণ সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। এর জন্য বিলেত থেকে কিছু যন্ত্রপাতি এনে সেকালের বিখ্যাত ছাপাখানা ইউ রায় অ্যান্ড সন্সের গোড়াপত্তন হয়েছিল।

ফটোগ্রাফ কিংবা শিল্পীর আঁকা ছবির লক্ষ লক্ষ কপি ছেপে নেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন এখন আর নেই। এমনভাবে ছবি ছাপার উপায় আবিষ্কৃত না হলে বিজ্ঞান এবং কলাবিদ্যা চর্চার ব্যাপারে আজ যে একটি বড় রকমের ফাঁক থেকে যেত একথা কেউই অস্বীকার করবেন বলে মনে হয় না। একালে সংবাদপত্রের যাঁরা আগ্রহী পাঠক, তাঁরা নিত্য-নতুন সংবাদের জন্যে যেমন আগ্রহী, অপরদিকে তাঁরা চান সেইসব সংবাদের সঙ্গে যেন যথেষ্ট পরিমাণে ছবি থাকে। মানুষ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমা পার হয়ে চন্দ্রলোকে পাড়ি দিতে পেরেছে এই সংবাদটিই একালের পাঠকের কাছে যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে সে চায় চাঁদের না দেখা পিঠটির ছবি দেখতে। অর্থাৎ নিখুঁতভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে হলেও কেবলমাত্র ছাপার হরফ দিয়ে তা করা যাবে না। তার জন্য ছবিও চাই। একটি ফটোগ্রাফকে সাধারণ কাগজের উপর ছাপতে হলে চিত্রমুদ্রণের আদি যুগে তার জন্য একটি ব্লক তৈরি করে নিতে হত। ব্লক জিনিসটি হল দস্তা অথবা তামার পাতের উপর মুদ্রণীয় ছবিটির একটি অবিকল কপি। ব্লক ''লেটারপ্রেস'' মুদ্রণ পদ্ধতির অতি আবশ্যক এক সরঞ্জাম। ধ্রুপদী বিচারে যে তিনটি মূল প্রথায় ছাপাখানার কাজকে বিভক্ত করা হয়েছিল ''লেটারপ্রেস'' তার মধ্যে প্রাচীনতম। এই পদ্ধতিতে মুদ্রণীয় চিত্র অথবা হরফকে উঁচু করে গড়ে নেওয়া হয়। যে কারণে ইংরেজিতে এর আরেকটি নাম ''রিলিফ প্রসেস''। টাইপ দিয়ে হরফ ছাপা আর ব্লক দিয়ে ছবি ছাপা হল ''লেটারপ্রেস'' মুদ্রণের মূল কথা।

আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে আমরা যে-সব ছাপা ছবি দেখে এসেছি ''লেটারপ্রেস''-এর নিজস্ব ভাষায় সেগুলি হয় ''লাইন'' ছবি নয়ত ''হাফটোন'' ছবি। ''লাইন'' ছবি বলতে বোঝায় রেখাচিত্র—যাতে সাদা আর কালো ছাড়া আর কিছু থাকে না। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে মুদ্রিত অংশটুকু কালোর পরিবর্তে অন্য রঙের কালি দিয়েও ছাপা যেতে পারে। ''হাফটোন'' ছবিতে সাদা আর কালো ছাড়া তাদের মাঝের জায়গাগুলিতে অবস্থিত কালিমার নানাপ্রকার আঁচ অথবা আমেজও থাকে। হাফটোন ব্লকের নেগেটিভ তৈরি করাব জন্য ক্যামেরার ভিতরে যেখানে ফোটোগ্রাফিক প্লেট অথবা ফিল্ম থাকে তার সামনে আড়াআড়িভাবে রুলটানা যে কাচের পর্দা লাগানো হয় তাকে বলে ''হাফটোন স্ক্রিন''।

'এই রুল বা লাইন অতি সূক্ষ্ম—ইঞ্চিতে ৪০ থেকে ২০০ পর্যন্ত সচরাচর ব্যবহার করা হয়। রুল করা এই কাচের মধ্য দিয়ে ছবি তোলায় যে নেগেটিভ আমরা পাই তার আগাগোড়াই লাইন আর ছোট ছোট ফুটকি।' যে স্ক্রিনগুলোকে সাধারণত ''ক্রসলাইন স্ক্রিন'' বলা হয় তাতে থাকে দুইগুচ্ছ সরলরেখা যারা একে অপরকে ৯০ ডিগ্রিতে ছেদ করে। প্রতি গুচ্ছের প্রতিটি লাইন স্ক্রিনের কাচের বাহুর সঙ্গে ৪৫ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত। এছাড়া প্রত্যেক কালো রেখার প্রস্থ মধ্যবর্তী স্বচ্ছ রেখার প্রস্থের একেবারে সমান। এমন জিনিসকে বলে ১ ঃ ১ স্ক্রিন এবং সচরাচর তার ব্যবহারই হয় সর্বাধিক। স্ক্রিনে প্রতি ইঞ্চিতে যত বেশি লাইন থাকে তা দিয়ে ততই সূক্ষ্ম কাজ করা যায়। পরিশেষে একথাই বলতে হয় যে স্ক্রিনের ইঞ্চি প্রতি লাইন সংখ্যা, রুলিঙের কোণের মাপ এবং তার স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ অংশের অনুপাতের উপর নির্ভর করে তা দিয়ে কি শ্রেণীর কাজ করা যাবে। হাফটোন নেগেটিভ থেকে তামা বা দস্তার ফলকে

ছবি তুলে, রাসায়নিক পদ্ধতিতে খোদাই করে ব্লক তৈরি হয়। "হাফটোন স্ক্রিন" ফটোলিথোগ্রাফিক মুদ্রণকেও সুন্দর করে তুলছে। মুদ্রিত কালির পৃথক পৃথক আঁচ বা আমেজকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলাই "হাফটোন স্ক্রিনের" কাজ। উপেন্দ্রকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র অতি সহজ সরলভাবে জানবার মত এই কথাগুলি জানিয়েছিলেন। উপরের উদ্ধৃত অংশটি তাঁরই একটি প্রবন্ধের অংশ। সেই প্রবন্ধের অপর এক অংশে আছে—
'এবার সংক্ষেপে লাইন ছবির ব্লক (ব্লক মানে, যে ছবি থেকে খোদাই ছাপ হয়) তৈরির কথা বলি। প্রথমে ক্যামেরার সাহায্যে মূল ছবিটির (অর্থাৎ যে ছবি থেকে ব্লক বানাতে হবে) একটা নেগেটিভ তোলা হয় যেমন আমরা সাধারণ ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে করে থাকি। কিন্তু এই নেগেটিভ ছবিটি সাধারণ ফটোগ্রাফির মত উল্টো না উঠে সোজাই ওঠে। ক্যামেরার লেন্সের সামনে আয়নায় লাগানো একটি ত্রিকোণ কাচ (Prism) থাকে, তারই সাহায্যে সোজা ছবি ওঠানো যায়।

'নেগেটিভে মূল ছবির সাদা জায়গা কালো (অস্বচ্ছ) ওঠে, কালো জায়গা ওঠে সাদা (স্বচ্ছ)। তারপর তামা বা দস্তার ফলকের উপর শিরিষ, এমোনিয়াম বাইক্রোমেট, ডিমের সাদা অংশ প্রভৃতি মিশিয়ে তৈরী করা একরকম আঠালো জিনিস লাগিয়ে শুকিয়ে নিয়ে অন্ধকার ঘরে একটি কাচ লাগানো ফ্রেমের মধ্যে নেগেটিভের পিছনে তামা বা দস্তার ফলকটি লাগিয়ে কিছুক্ষণ ফ্রেমটিকে রোদে বাখা হয়। যে যে সাদা (স্বচ্ছ) জায়গা আছে, ফলকের সেই সেই জায়গায় রোদ লাগে।

'তারপর ফ্রেম থেকে ফলক খুলে নিয়ে গরম জলে ভিজালে যেসব জায়গায় রোদ লাগেনি তার উপর থেকে আঠালো জিনিসটি উঠে যায়। এবার ওই ফলককে আরকের সাহায্যে খোদাই করা হয়— অর্থাৎ, যেখানে রোদ লেগেছে সেসব জায়গা বাদে অন্য জায়গার আরক ক্ষয় পেয়ে নিচু হয়ে যায় ; ছবির লাইনগুলি উঁচুই থেকে যায়। তারপর আর কি? খোদাই শেষে ফলকটিকে ছোট ঠিক করে কাঠের তক্তার উপর লাগিয়ে ছাপার হরফের সমান উঁচু (০.৯১৮ ইঞ্চি) করা হয়। কাজের সুবিধার জন্য এবং খরচ কমাবার জন্য তামার বা দস্তার পাতলা পাতলা চাদরের উপর খোদাই করা হয় ; শেষে কাঠের উপর মেরে নিয়ে কাজের উপযোগী করা হয়।' সুবিনয়বাবু এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন অন্তত আটান্ন বছর আগে। তারপর ব্লক তৈরি করার কাজের রীতি অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ধাতুর উপর এক্সপোজার দেবার জন্য রোদের অপেক্ষায় বসে থাকার প্রয়োজন আর নেই। বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম আলোর সাহায্যে আজকাল এক্সপোজার দেওয়া হয়।

উপেন্দ্রকিশোরের আবিষ্কৃত জিনিসগুলির মধ্যে দুটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রোসেস ক্যামেরায় (যা দিয়ে ব্লকের জন্য নেগেটিভ তৈরি হয়) হাফটোন স্ক্রিনটিকে নেগেটিভ প্লেট এবং ক্যামেবার লেন্সের মাঝামাঝি ঠিক কোন জায়গায় রাখলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায় তা নির্ণয় করার জন্য গাণিতিক সূত্র আবিষ্কার উপেন্দ্রকিশোরের একটি স্থায়ী কীর্তি। এছাড়া ক্যামেরার লেন্স-এর মধ্যচ্ছদা (stop, aperture or diaphragm) বিভিন্ন রকমের নকশায় 'মালটিপল স্টপস' এবং বিভিন্ন আকারে তৈরি করে নিলে সেগুলির সাহায্যে মুদ্রণীয় চিত্রের কোন অংশের কালির আঁচ বা আমেজ কতখানি নিয়ন্ত্রিত কবা যাবে এ ব্যাপারটিও নানা পরীক্ষা

নিরীক্ষার সাহায্যে বেব করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। তাঁব প্রবর্তিত অন্যান্য কাজের মধ্যে মুদ্রণের 'ডুয়োটোন'' পদ্ধতি এবং ''রে টিন্ট'' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একই ছবির দুটি আলাদা কোণবিশিষ্ট হাফটোন স্ক্রিন দিয়ে তৈরি করে দুটি রঙে তা একই কাগজের উপর দুবাব ছেপে নিলে তা থেকে তিনটি বঙের আঁচ বা আমেজ পাওয়া যায়। যেমন ধরা যাক হলদে আর সিপিয়া। আজও এই পদ্ধতিতে বহু ছবি ছাপা হয় য়ুরোপ এবং আমেরিকায়। উপেন্দ্রকিশোরেব ৬০ ডিগ্রি স্ক্রিনে সাবেকি ৯০ ডিগ্রির পরিবর্তে লাইনগুলি ৬০ ডিগ্রিতে পবস্পরকে ছেদন কবার ফলে ডটের সজ্জা 'হাফটোন ফটোগ্রাফি''কে উন্নততর করে তুলেছিল। তিনি ১৮৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে পেনরোজ অ্যানুয়ালে লেখা একটি প্রবন্ধে এসব কথা লিখেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর শেষ পর্যন্ত দুই গুচ্ছেব পবিবর্তে তিন গুচ্ছ বেখা প্রবর্তন করলেন তাঁর 'থ্রি লাইন স্ক্রিন'। এতে প্রত্যেক গুচ্ছের সমান্তবাল বেখাগুলি একে অপবেব সঙ্গে ৬০ ডিগ্রি কোণ গঠন করেছিল। তবে এই স্ক্রিনকে ঠিকমত কাজে লাগাতে হলে উপযুক্ত আকারেব মধ্যচ্ছদা (স্টপ) অঙ্ক কষে বার করে নেওযা একান্ত আবশ্যক। প্রতারক শুলটসেব সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ''ব্রিটিশ জার্নাল অভ ফটোগ্রাফ'' পত্রিকায় একজন লিখেছিলেন-'হাফটোন ফটোগ্রাফিব ভবিষ্যৎ উন্নতিব জন্য নানাবকম (multiple) মধ্যচ্ছদাব (diaphragin) গুরুত্ব উপলব্ধি কবাব সময আজ হয়েছে।

'এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মকুশলী বলে আমি যাঁকে জানি তিনি হচ্ছেন কলকাতাব ইউ রে। ইনি এই ব্যাপারটিতে গাণিতিক নির্ভুলতা আবোপ করেছেন।' হাওযার্ড ফ্রেমাব নামে আরেকজন বিশেষজ্ঞ বয়েল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করার সময় বলেছিলেন-'—'উপেন্দ্রকিশোব প্রসেসেব (ব্লক তৈবি) কাজেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। বিজ্ঞানসম্মত উপাযে ''পিন হোল'' থিয়োবিব তিনি যে ব্যাখ্যা কবেছেন তা সত্যিই অভূতপূর্ব।' একথা ভাবতবর্ষের বাইবেও অনেক জানতেন। আরেকটি বড় কথা হল যে তাঁর আবিষ্কারেব ব্যবহারিক মূল্য আজও আছে। যে কথাটি দুঃখের তা হল পরাধীন ভাবতবর্ষে জন্মগ্রহণ কবার জন্য প্রচুর সম্মানলাভ কবা সত্ত্বেও চিত্র মুদ্রণের ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য কীর্তিব জন্য পরিপূর্ণ স্বীকৃতি তিনি লাভ কবেননি। এ সম্পর্কে ''পেনবোজেজ অ্যানুয়েল'' (১৯০৫-০৬) খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একাদশ সংখ্যায তিনি লিখেছিলেন। '১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে পেনরোজ অ্যান্ড কোম্পানীব মাধ্যমে মি. লেভিকে আমার নির্দেশ মত একটি স্ক্রিন তৈরি কবতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম এমন একটা স্ক্রিন তৈরি কবা বেশ কঠিন কাজ। মি শুল্‌ট্‌স নামে একজন বিশেষজ্ঞ একথা বলেছিলেন। আমি জানতাম কথাটি সত্যি। তবে আমি এও জানতাম যে কাজটি কঠিন হলেও অসাধ্য নয়।

'স্ক্রিন যাঁবা তৈরি করেন তাঁবা আমাব নির্দেশমত কাজ করতে বাজী না হওযায় আমি বাধ্য হয়ে মি. লেভিকে দিয়ে একটি ৬০ ডিগ্রি ক্রশ লাইন স্ক্রিন তৈরি করিয়ে নিলাম। তাব কিছুদিন পরেই খবর পেলাম মি শুল্‌ট্‌স সেটি নিজেব নামে পেটেন্ট করিয়ে নিয়েছেন।' British fairness এই সুন্দর দৃষ্টান্তটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের কোন তুলনা নেই। মূল ইংবেজি কথাগুলি এতই সুন্দর যে সেগুলি উদ্ধৃত না করে পারা

যায় না। উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন ঃ "To the craft it matters little who gets the credit for a particular invention. What directly concerns them is the addition of a valuable resource to the equipment. (শিল্পজগতে নতুন কিছু আবিষ্কার করে কাব নাম হল সেটি বড় কথা নয়। ব্যবহার্য সাজ সবঞ্জামের সঙ্গে আরেকটি মূল্যবান জিনিস সংযোজিত হল এটিই আসল কথা।)

অসৎ ইংরেজের এই আচরণে তাঁর উপর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল একই রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল একজন দেশীয চোবের কার্যকলাপে। উপেন্দ্রকিশোব কিছু চালাক-চতুর ছেলেকে তাঁর ছাপাখানায় শিক্ষানবিসরূপে গ্রহণ করে তাদেব মুদ্রণ এবং ফটোগ্রাফির কাজ শেখাতেন। বিশ শতকের গোড়াব দিকে এমন এক যুবক কাজ ছেড়ে চলে গেল। তার বুদ্ধি ছিল প্রখর এবং কর্মক্ষমতাও অসামান্য। সে বলে গেল সে নিজের ব্যবসা শুরু করবে। তারপব দেখা গেল সে উপেন্দ্রকিশোরের বেশ কিছু টাকা পয়সা চুরি করে পালিয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর এসব জানতে পেরে আদালতে নালিশ করেননি। শুধু বলেছিলেন — 'এখানে যা শিখেছে তা দিয়ে সে যদি কিছু করে খেতে পারে তা করুক।' প্রচুর টাকা পয়সা থাকলেও কজন এমন কথা বলতে পাবেন।

মুদ্রণ প্রসঙ্গে ফিরে এসে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে "পেনরোজেজ অ্যানুয়াল" পত্রিকায় সম্পাদক উইলিয়াম গ্যাম্বেল কি লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত কবছি ঃ

'...Investigators of the highest eminence, amongst whom I may mention ...U.Ray of Calcutta, whose admirable articles in the Year Book have shown not only a clear grasp of the subject but have suggested new methods of work.

His screen adjusting machine, his diaphargms system, his contribution to the theory of half-tone, his invention of the 60 degree screen, his highly inductive studies in diffraction and his original methods of colour work have all received very favourable notices in the techincal press of Europe and America Amstutz describes his Screen Adjusting Process as a ``unique method'' Verfasser calls it the ``most promising idea of this kind. This apparatus has been supplied to some of the leading technical schools of England where it has been reported upon very favourably. The nett result of these researches is to enable the operator "to do uniform work, with the fullest graduation and detail in it, and with the minimum amount of manupulative skill in the negative making and etching.

'প্রসেস ওযার্ক অ্যান্ড ইলেকট্রোটাইপিং' পত্রিকার মতে — Mr Upendrakisor Ray of Calcutta is far ahead of Europeans and American workers in originality. which is all the more surprising when we consider how far he is from the hub centres of process work.

আমাদের দেশে নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস রচনার সময় যেদিন আসবে, যেদিন

রাজনীতি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ভরতীয় মনীষীদেব কীর্তির কথা স্মরণ করার সময় হবে সেদিন নতুন করে কিছু কথা আমরা বলব । সারা পৃথিবীকে সেদিন আমরা জানিয়ে দেব সবদিক বিবেচনা করলে বিজ্ঞানী হিসাবে জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্ব মার্কনিব চেয়ে অনেক বেশি। উপেন্দ্রকিশোরের অবদান তৎকালীন সারা পৃথিবীব মুদ্রণ বিশাবদদের চেয়ে অনেক বেশি।

শিক্ষিত, বাঙালিমাত্রই জানেন যে সুকুমার রায়ের সাহিত্যবোধ ছিল অসাধাবণ এবং হাস্যবসাত্মক রচনায় তিনি অপরাজেয়। কবি, ছন্দশিল্পী, নাট্যকাব, প্রাবন্ধিক, চিত্রশিল্পী এবং সমাজ সংস্কারক সুকুমার মুদ্রক হিসাবেও কত বড় ছিলেন সেকথা এখনও অনেকে জানেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক হবার পর গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ পেয়ে মুদ্রণশিল্পে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সুকুমার ইংল্যান্ডে গেছিলেন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। বিলেতে যাবাব আগেই উপেন্দ্রকিশোরেব ছবি ছাপার বিষয়ে গবেষণার ফলে যে-সব অতি মূল্যবান জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছিল হাতে-কলমে কাজেব ভিতর দিয়ে সুকুমাব সেগুলি খুব ভালো কবে বুঝে নিয়েছিলেন। সুতরাং মুদ্রণশিল্পে উচ্চশিক্ষা লাভ করাব জন্য অন্য যে-সব ভাবতীয় ছাত্র বিদেশে গেছিলেন তাঁর সঙ্গে তাঁদের কারো কোনদিক থেকে কোন তুলনা করা যায় না। বিলেত থেকে উপেন্দ্রকিশোরকে যে চিঠিগুলি তিনি লিখেছিলেন সেগুলি পড়লে বুঝতে পারা যায় যে মুদ্রণশিল্পে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা নিতে গিয়ে তিনি তাঁব ব্রিটিশ শিক্ষকদেব কত নতুন জিনিস শিখিয়ে আসেন। বিলেত থেকে উপেন্দ্রকিশোর এবং সুবিনয়কে লেখা সুকুমারের চিঠিগুলি পড়লে বুঝতে পাবা যায় যে তাঁব মুদ্রণ সম্পর্কে চিন্তা ছিল কত গভীর। উপেন্দ্রকিশোরেব উপযুক্ত পুত্ররূপে সাহিত্য এবং শিল্পচর্চার সঙ্গে ফলিত বিজ্ঞানেব সাধনাকে তিনি জীবনাচবণ করে তুলেছিলেন। 'সন্দেশ', Penrose's Annual. 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রপত্রিকায তাঁর নানাধরনেব রচনা এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। "পাগলা দাশুব" ভূমিকায় বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায তাঁর অসাধাবণ নৈপুণ্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেই জন্যই তিনি তাঁর বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেবেছিলেন।' আজ পর্যন্ত উপেন্দ্রকিশোর এবং সুকুমার ছাড়া অন্য কোন ভাবতীয়েব মুদ্রণ সম্পর্কে লেখা টেকনিক্যাল প্রবন্ধ Penrose Annual- এ চোখে পড়েনি। সারা পৃথিবীর ইংরেজি জানা মুদ্রকদের কাছে এ বইটি অমূল্য সম্পদ।

২৬ অক্টোবর, ১৯১১-তে লেখা একটি চিঠিতে সুকুমার উপেন্দ্রকিশোরকে লেখেন— 'L.C.C.-তে (London County Council School) ভর্তি হয়ে Photo-lithography আরম্ভ করে দিয়েছি। ..আজ এখানে Halftone negative করা দেখলাম—বড্ড unsystematic. ।' নভেম্বব মাসের প্রথম সপ্তাহের পব লেখা (তারিখ বিহীন) একটি চিঠিতে আছে ঃ 'Halftone বা Printing এখানে শিখবার কিছুই নাই।' পয়লা ডিসেম্বব যে চিঠিখানা লিখেছিলেন তাতে ছিল ঃ 'Photography সম্বন্ধে Concise Knowledge Library Series-এর একটা নতুন বই বেরিয়েছে—বেশ বই। তার মধ্যে "Photoengraving, Collotype etc." বলে একটা ছোট chapter আছে তাতে Halftone-এব জায়গায় লিখছে ঃ "Various shaped

diaphragms are employed, such as lozenge, with extended corners etc: or the Ray multiple Diaphragms, pierced with three or more openings, instead of one large opening, triangular, square, or round."

'.....সোমবার multiple diaphragm দিয়ে L.C.C স্কুলে negative করা হবে'। ১৫ নভেম্বর লন্ডনের ২১ ক্রমওয়েল রোড থেকে লিখেছিলেন—L.C.C.-তে Mr. Griggs-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রোজ দিনের বেলায় লিথোগ্রাফি শিখবার সুবিধা করে নেওয়া যাবে। Mr. Newton সব ঠিক করে দেবেন বলেছেন। খানিকটা L.C.C.-তে আর বাকিটুকু, (printing ইত্যাদি) St. Brides Institute-এ। .. ..এখান থেকে শীগগিরই উঠে যাব ভাবছি, কারণ এখানে পড়াশুনার অসুবিধা। তাছাড়া আমার একটা ছোটখাট Darkroom-এর মতো দরকার—অনেকগুলো promising experiments আছে—সেগুলো workout করতে পারলে কাজে লাগা সম্ভব।' একই জায়গা থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি লেখা চিঠিতে জানিয়েছিলেন— Newton সাহেব বললেন "তোমার যেরকম বন্দোবস্ত হলে সুবিধা হবে আমি তাই করে দিতে রাজি আছি। I take it as a compliment to me that Mr. U. Ray should send his son to study here. I tell you frankly that I can quite appreciate the compliment and am anxious to retain you here"

তাছাড়া আমাকে কতকগুলো firm -এতে আর St. Bride's School-এর Litho Department-এর teacher-এর কাছে introduction চিঠি দিয়েছিলেন। অনেক thanks দিলাম। আর বললাম যে আমিও স্কুল ছাড়তে চাই না—কারণ এখানে সকলেই খুব যত্ন নেয়। Multiple Diaphragm-এর কথা হল। Process Year Book-এর মধ্যে সবচেয়ে তাঁর 60 Screen-এর নমুনাটা পছন্দ হয়েছে। বারবার বলতে লাগলেন—"Capital Print" "Beautiful details & softness...." সোমবার স্কুল খুললেই Multiple Diaphragm দেখাতে বললেন।' ১৬ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে ছিল— 'Offset জিনিসটা যতই দেখছি—আমার ততই ভাল লাগছে। Letterpress printing-এর চেয়েও সহজ।' সে বছরের শেষদিকে ১২ ডিসেম্বরে এর একেবারে উল্টো কথা লিখেছিলেন একটি চিঠিতে . 'Litho থেকে যতটা সাহায্য পাওয়া যাবে মনে করেছিলাম, এখন দেখছি অতটা নয়। কারণ Lithography-র limitations খুবই বেশি। Fine Halftone Work ত হয় না ধরলেই চলে—মোটামুটি (110 lines এর কাছাকাছি) সাধারণ কাজেও একটু damping বা কালি অথবা gum দেওয়ার ইতর বিশেষ হলে ছবির grains ছোটবড় হয়ে gradation ক্রমাগতই বদলাতে থাকে— সুতরাং খুব রঙ চঙে label আর মোটা Poster work ছাড়া litho-র আর কোন advantage দেখি না।' (সুকুমার যে সময় এই মন্তব্য করেছিলেন তখন লিথোগ্রাফি আজকের মত উন্নত হয়ে ওঠেনি। আজ লিথোগ্রাফি নিজস্ব উৎকর্ষে লেটারপ্রেসকে প্রায় স্থানচ্যুত করে দিয়েছে।) বহু অমূল্য তথ্যপূর্ণ এমনই অনেকগুলি চিঠি সত্যজিৎ রায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পাওয়া যায়। স্নেহাস্পদ সিদ্ধার্থ ঘোষ "এক্ষণ" পত্রিকার গ্রীষ্ম ১৩৯১ সংখ্যায় নির্ভরযোগ্য তথ্যপঞ্জী সংকলন করে সেগুলি প্রকাশ করেন। ১৯১২

খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষদিকে সুকুমার ম্যাঞ্চেস্টার মিউনিসিপ্যাল স্কুল অফ টেকনোলজিতে পড়তে গিয়েছিলেন। তার আগেই তিনি একটি স্ক্রিন ক্যালকুলেটার তৈরি করেছিলেন। তার সম্বন্ধে তিনি একটি চিঠিতে মন্তব্য করেন—'.... Idea টা এই একটা sliding scale.

'Stop apertureটা camera extension এর against-এ set করলেই screen mark এর কাছে distance টা read off কবা যাবে। একটা rough calculator বানিয়ে স্কুলে দেখিয়ে এসেছি—ওঁরা খুব খুশি হলেন-Penrose-এর কাছে submit করেছি।' ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল তাঁর ভালো লেগেছিল, ২৪ অক্টোবরেব চিঠিতে জানান—'স্কুলে প্রায় সপ্তাহখানেক কাজ করলাম--সব বিষয়েই খুব সুবিধা বোধ হচ্ছে। L.C.C.-র চেয়ে অনেক ভাল। কাল থেকে Research work আবম্ভ করব। Research-এর subject নিয়েছি—নানাবকম diaphragm আর screen condition-এর দরুন Block-এর টোনটা কি রকম vary কবে তারই measurment. এঁবাও এটা খুব দরকারি subject বলে মনে করছেন, কাবণ এখানের আব লন্ডনের authority দের মধ্যে এ বিষয়ে অনেকটা contradictory বকমের dogmatic মত আছে।' ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ অগাস্টেরর চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত কবে চিঠিব ব্যাপাবটি শেষ করছি। এই চিঠিতে লিখেছিলেন —'....-এর মধ্যে Manchester থেকে খবব পেলাম, সেই যে City & Guilds Examination দিয়েছিলাম তাব নাকি result বেরিয়েছে। আমায় first class, first prize, medal এইসব কি যেন দিয়েছে।' সাফল্য জিনিসটাকে এমন, সহজভাবে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আব কাউকে গ্রহণ করতে বড় একটা দেখা যায়নি।

লীলা মজুমদারের একটি স্মৃতিমূলক লেখায় পড়েছিলাম---'সুকুমার বিজ্ঞানেব ছাত্র ছিলেন। বি এসসি পাশ কবে বিলেতে গিয়ে প্রিন্টিং টেকনোলজি সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন ...ধ্বনি ও ভাষার ক্ষেত্রে তাঁব অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তাঁর অসমাপ্ত বাংলা বর্ণমালা সম্পূর্ণ কবার সাহস আজ পর্যন্ত কারো হয়নি।' বন্ধুবর পরিতোষ সেনের সাহায্যে সত্যজিৎ রায়েব সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা কবার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং সত্যজিৎবাবু তাঁর পিতৃদেব বচিত বর্ণমালা তত্ত্বেব পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ নিজের চোখে দেখবার সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন।

সুকুমার বায তাঁর অকাল মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন আগে মাত্র তিনটি পৃষ্ঠায বংলা বর্ণমালা সংস্কারের প্রাথমিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করেন। ওই কটি পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্তভাবে লেখা শব্দগুলি দেখে অবাক হয়েছিলাম। বাংলাভাষাব যুক্তবর্ণ বিভাজন এবং কার্ন টাইপ বর্জনের উপযোগিতা সবাব আগে তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন। অর্থাৎ বাংলা বর্ণমালার সমস্যা সমাধানের মূল সূত্রটির তিনিই আবিষ্কারক। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, 'তাঁর এই চিন্তার পিছনেও ছিল উপেন্দ্রকিশোরের উজ্জ্বল উপস্থিতি।' উপেন্দ্রকিশোরের শ্রাদ্ধবাসরে সুকুমার যে ভাষণটি পড়েছিলেন তার সংযোজনরূপে বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে জানান— 'বাংলা ছাপার অক্ষবে কিছু কিছু পরিবর্তন করিলে হরফ ঢালাইয়ের কাজ, অনেক সহজ ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য হয এবং ইংরেজী যেমন টাইপরাইটার কল আছে, বাংলারও তেমনি হইতে পারে, তাহা আঁকিয়া এবং প্রবন্ধ

লিখিয়া দেখাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার অনেকটা জানেন।' বাংলা সাহিত্যের সেবা করার সময় পিতাপুত্র বাংলা বর্ণমালার সমস্যাগুলির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সুকুমারের বাংলা হরফ সংস্কারের এই প্রচেষ্টা তারই ফল।

এ বিষয়ে আর কিছু বলার আগে বাংলা বর্ণের আসল সমস্যাটি কি তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ইংরেজিতে ছোট এবং বড় হাতের সব অক্ষর, যুক্তবর্ণ, নানাপ্রকার যতিচিহ্ন এবং স্পেস একটি সম্মিলিত (combined) কেসের ১০০টির চেয়ে কম খোপে রাখা যায়। বাংলাভাষায় যুক্তবর্ণের আধিক্যের জন্য অন্তত চারটি কেসের প্রয়োজন। তাদের মোট খোপের সংখ্যা পাঁচশ'র উপর। বাংলা হস্তলিপির অনুসরণে টাইপ গড়তে গিয়ে যে নকশা চালু হয়ে গেছিল লেটারপ্রেস মুদ্রণের (যা এখনও সর্বাধিক জনপ্রিয় বা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে চালু আছে) যান্ত্রিক প্রয়োজনের সঙ্গে সব সময় তার খাপ খায় না। অসংখ্য কার্ন টাইপ আমাদের মুদ্রণের কাজকে নানাভাবে প্রতিহত করে। যে-সব টাইপের মুদ্রণীয় অংশের নিচে ভার বহন করার বা চাপ সইবার মত কোন অবলম্বন নেই সেগুলিই হল কার্ন টাইপ। ছাপার সময় মুদ্রণযন্ত্রের কালির বোলারের সংস্পর্শে আসার অথবা যে চাপের সাহায্যে ছাপার কাজ হয়ে থাকে তা সইবার মত শক্তি কার্ন টাইপের নেই। ঋ-ফলা, চন্দ্রবিন্দু, হ্রস্ব উকার, দীর্ঘ ঊকার, রেফ ইত্যাদি প্রায় কুড়িটির মত কার্ন টাইপ বাংলা বর্ণমালার আছে। এগুলি টাইপোগ্রাফিকাল গঠনের দোষে ছাপার সময় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ছাপার পর "কর্ম" যদি "কম" "চুরি" যদি হয় "চরি" তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আজ থেকে ছেষট্টি বছর আগে এ সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন সুকুমার। প্রমাণস্বরূপ তাঁর পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার ছবি এখানে দেওয়া হয়েছে। তার কিছু কিছু অংশের আলোচনা করলে সমস্ত জিনিসটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাংলার হ্রস্ব উকারের নানা স্থানে নানা রূপ। সু গু, হু, পু, রু — এর মধ্যে কোনটিকে রাখা হবে? সুকুমার বোধ হয় চেয়েছিলেন "রু"র গঠনটি। ছবির উপরের দিকে ডানদিক ঘেঁষে "সুপুরুষ" শব্দটি দেখলে ত তাই মনে হয়। অন্যান্য কার্ন টাইপের তলায় সাপোর্ট অথবা অবলম্বনের অভাব দূর করার চেষ্টাও করেছিলেন। "দ্যুতি", "চাঁদ", "দূর" ইত্যাদি শব্দগুলি যেভাবে লিখেছেন তার দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে। বর্ণ বিভাজনের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে "গম্ভীর", "অঙ্গ" এবং "চিহ্ন" শব্দগুলির লিপি ভঙ্গিমায়। "ম" এর তলায় "ভ" না দিয়ে তাকে পাশে বসানো হয়েছে। যুক্তবর্ণে যে যে বর্ণের সমাবেশ ঘটেছে সেগুলিকে যাতে চিনতে পারা যায় সে বিষয়েও তাঁর নজর ছিল। ক + র= ক্র এবং ত + র = ত্র বা ত্রা চেয়েছিলেন তিনি। তখনও দ্বিত্ব বর্ণের প্রচলন ছিল। অর্চ্চনা শব্দটিতে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস একটি "চ" কে পার্শ্বিকভাবে উল্টে (Lateral reversal) দিয়েছিলেন। আমরা বলবার সময় বলি Kay অথচ বানানের বেলার আগে "ে" (একার) পরে ক লিখি। এ চিন্তা তাঁর মনে উদিত না হলে তিনি 'ক'-র পরে "ে" চিহ্নটি বসাতেন না। একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাওয়া যায় "রেফ' চিহ্নটি খাড়া করে রেখে এবং "চন্দ্রবিন্দু" কে আংশিকভাবে নামিয়ে এনে তিনি কার্নের সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছিলেন। এমন প্রতিভাশালী একটি মানুষের অকালমৃত্যু না ঘটলে

বাংলা টাইপোগ্রাফির মূল সমস্যাগুলির সমাধান অনেক আগেই হয়ে যেত।

চার্লস চ্যাপলিনের আত্মজীবনীতে আছে যে দুঃসহ অর্থকষ্টে পড়ে তিনি একবার তিন সপ্তাহের জন্য দানবের মত বিরাট একটি মুদ্রণযন্ত্র চালাবার কাজ গ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি নিতান্ত ছেলেমানুষ। সেই করুণ কাহিনীর মধ্যেও তিনি হাস্যরস পরিবেশন করতে ভোলেননি। নমুনা হিসাবে সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করছি। যে কাজের কোনই অভিজ্ঞতা নেই তা তিনি কেমন করে শুরু করেছিলেন তা দেখা যাক। তিনি লিখেছিলেন— To operate it, [a wharfdale printing machine] I had to stand upon a platform five feet high. I felt I was at the top of the Eiffel Tower... The first day I was a nervous wreck from the hungry brute wanting to get ahead of me. Nevertheless I was given the job at twelve shillings per week.

ভারতবর্ষের ছায়াছবির জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাব অধিকাবী সত্যজিৎ বায় এ ব্যাপারে চ্যাপলিনের চেয়ে অনেক বেশি ভাগ্যবান। তিনি আক্ষরিক অর্থে আত্মসচেতন। নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেনঃ '. one who holds typography, type design and calligraphy as among the most sophisticated of art forms...'। টাইপোগ্রাফির মূল উপাদান হল ভাষাজ্ঞান (যাব মধ্যে ব্যাকরণ এবং উচ্চারণ শাস্ত্র দুই-ই পড়ে), শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি এবং কল্পনাশক্তি। এই তিনটি জিনিসই উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার এবং সত্যজিৎকে বিধাতা অকৃপণভাবে দান করেছিলেন। সুতরাং বাংলা টাইপোগ্রাফিকে তাঁরা যে চোখে দেখেছেন তা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যজিৎ রায় "রে রোমান" এবং "রে বিজার" টাইপের নকশা করেছেন ইংরেজি ভাষায়। সেটি যেমন তাঁর একটি দিক আরেকটি দিক হল বাংলা টাইপোগ্রাফি বা অক্ষব বিন্যাসকে যুগোপযোগী কবে তোলা। ছায়াছবির জগতে আসার আগে তিনি একটি ব্রিটিশ অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিতে কাজ করতেন। তখন বইয়ের মলাট তৈরি (jacket design) করার ভার নিয়েছিলেন। বংশের ধারা অনুসারে কোন কাজকে বিশেষ কবে কমার্শিয়াল আর্টকে তিনি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেননি। পরবর্তীকালে দিলীপ গুপ্ত মহাশয়ের সিগনেট প্রেসে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ তৈরি করার ভিতর দিয়ে তাঁর সৃজনমূলক প্রতিভার উপযুক্ত পরিচয় তিনি দিয়েছেন। এ যুগের নান্দনিক চিন্তা-ভাবনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক ক্রোচের মত তিনিও বিশ্বাস কবেন যে 'শিল্প জিনিসটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে একমাত্র কল্পনাশক্তি। শিল্পের সমস্ত ঐশ্বর্য প্রতিফলিত হয় কেবলমাত্র শিল্পীর কল্পনাশক্তির ভিতর দিয়ে। বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস করা, বাস্তব কিংবা কাল্পনিক বলে তাদের আলাদা করে ফেলা, পরিমিত করা বা বর্ণনা করা শিল্পীব কাজ নয়। তার একমাত্র কাজ হল অনুভব কবা এবং সে অনুভূতিকে সার্থকভাবে প্রকাশ করা— আর কিছু নয়।'

রবীন্দ্রনাথও প্রায় একই কথা বলেছিলেন। 'মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে। ... তাই তার কাজের দুটি বিভাগ আছে — একটি তার গরজের; অপরটি তার খেয়ালের অথবা খুশির। হয়ত সেই কারণেই তার খুশির এলাকায় যে পরিমাণ সত্যিকার সম্পদ সঞ্চিত আছে তেমন আর কোথাও নেই...।' টাইপোগ্রাফার

সত্যজিৎ এ-কথাটি উপলব্ধি করেছেন যে সফল টাইপোগ্রাফারকে সংস্কৃতিবান ব্যক্তি হতেই হবে। অতীত ও বর্তমানের ললিতকলা, সাহিত্য এবং মুদ্রণকৌশল ও হরফ সংযোজন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ব্যাপারটি ঠিক পাণ্ডিত্যাভিমান নয়, টাইপোগ্রাফারের এই কথাটি বুঝে নিতে হবে যে অক্ষরবিন্যাসের কৌশল ভাষার মত দ্রবণীয় এবং আধুনিক জীবনধারার মত পরিবর্তনশীল।

চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে ছায়াছবির জগতে আমরা অতুলনীয় গর্ব বোধ করে থাকি। কিন্তু মুদ্রণের, বিশেষ করে টাইপোগ্রাফির জগৎ থেকে ছায়াছবির জন্য তিনি বেশ কিছুটা সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সেখানে আমাদের বড় রকমের একটা ক্ষতি হয়েছে। তাঁর কাছে আমরা অনেক পেয়েছি বলেই এসব কথা উঠছে। তিন পুরুষ ধরে এমনি করে নিজেদের উজাড় করে দেবার আর বোধ হয় একটি মাত্র নজির আছে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে। শুনতে পাওয়া যায় বাখ (Bach) পরিবার এমনি করে পুরুষানুক্রমে তাঁদের সমস্ত সঞ্চয় উজাড় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে ইয়োহান সেবাস্টিয়ান বাখকে ধরা হত সবার উপরে। এক্ষেত্রে তেমন করে কিছু বলা অসম্ভব।

বিশ্বভারতীর প্রকাশনা বিভাগের কিশোরীমোহন সাঁতরা, পুলিনবিহারী সেন প্রমুখ গুণী ব্যক্তিরা রবীন্দ্রনাথের বইগুলির প্রচ্ছদ বা মলাট, তার মার্জিন এবং তার জন্য ব্যবহৃত টাইপ নির্বাচন ইত্যাদিব ভিতর দিযে যে পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় দিয়েছিলেন সত্যজিৎ সে কাজকে আরেক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন এ তো তাঁর তৈরি পোস্টার, লেটার হেডিং এমনকি বিয়েব নিমন্ত্রণের চিঠিগুলো দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

মার্টিন লুথারেব জীবনীমূলক নাটক Luther-এ বিখ্যাত নাট্যকার John Osborne স্বয়ং লুথারের একটি সংলাপে লিখেছেন— The best turn God even did Himself was giving us a printing press. Sometimes I wonder what He'd have done without it. উপেন্দ্রকিশোর থেকে শুরু করে সত্যজিৎ পর্যন্ত মুদ্রণকে এই দৃষ্টিতে দেখেছেন তাই তাঁদের মুদ্রণচর্চা মুদ্রণের সাধনা এবং বোধনায় রূপান্তবিত হযেছে। আমরা মুদ্রকেরা এ কথা ভেবে গর্ব অনুভব করি এঁরা "আমাদের লোক"।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রবন্ধ রচনায় বিশেষভাবে সাহায্যলাভ করেছি রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অব প্রিন্টিং টেকনোলজির অধ্যাপক বিভূতি মজুমদার, অধ্যাপক দিলীপ দাশগুপ্ত এবং গ্রন্থগারিক শ্রীমতী গীতিকা চক্রবর্তীর কাছে থেকে।

যে সব গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি তার মধ্যে Penrose's Annual এর বিভিন্ন সংখ্যা, Oxford Companion to Music Penguin Dictionary of Art 6 Artists, 'এক্ষণ' পত্রিকার গ্রীষ্ম ১৩৯১ ও শারদীয় ১৩৯১, দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশিত "আজব বই" এবং আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত "দু'শত বছরের মুদ্রণ ও প্রকাশন" উল্লেখযোগ্য।

সত্যজিতের গ্রাফিক চেতনা তাঁর চলচ্চিত্রেও প্রভাব ফেলেছে

কে. জি. সুব্রহ্মণ্যম

সত্যজিৎ রায়ের গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে বলার সঠিক লোক আমি নই। আমি তাঁর কাজ সেরকম দেখিনি যাতে কি না একটা নির্দিষ্ট মতামত দেওয়া যায়, অন্তত তাঁর কাজ সম্পর্কে কতটা বলা উচিত বলে আমি মনে করি, সেই পরিমাণ কাজই আমার দেখা হয়নি। তাছাড়া যদিও আমবা উভয়েই পবস্পরেব কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে জানি তাহলেও ওঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনও যোগাযোগ নেই। একবারই ওঁব সঙ্গে দেখা হয়েছিল বোলপুর স্টেশনে। তাও বহু বছব আগে। আমাদের এক চেনাশোনা ব্যক্তি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎ ভিত্তি কবে ব্যক্তি সত্যজিৎ সম্পর্কেও বলার কিছু থাকে না।

অবশ্য সত্যজিৎবাবু এবং আমি শান্তিনিকেতনে কলাভবনে পড়েছিলাম এমন কয়েকজন শিক্ষকের কাছে যাঁদের প্রতি আমরা উভয়েই ঋণী। আমরা সহপাঠী ছিলাম না। বছর কয়েকের ব্যবধান ছিল। তবে ওখানে এমনকিছু ব্যক্তির সঙ্গে আমাব আলাপ হয় যাঁরা সত্যজিতের ব্যক্তিত্বের গুণমুগ্ধ ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর স্বল্পবাসেই সেই মানুষেরা সত্যজিতের বহুমুখী উৎসাহ, মনন এবং প্রতিভাব পরিচয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

তখনকার দিনে গ্রাফিক ডিজাইন (সে সময় বলা হত কমার্শিয়াল আর্ট) নিয়ে কোনও সৃজনশীল শিল্পীই উৎসাহ বোধ করতেন না। অবশ্য যাঁদের কাছে সৃজনমূলক মৌলিক কাজের চেয়ে আর্থিক সাফল্য গুরুত্ব পেত তাঁদেব কথা আলাদা। অন্যদেব ধারণা ছিল গ্রাফিক ডিজাইনে গেলে সে কাজের ধারা তাঁদেব সৃষ্টিক্ষমতাকে সংকুচিত করবে। কল্পনা যাবে বন্দী হয়ে। তা'ড়া সে-লাইনে গেলে শিল্পী থেকে শিল্প নির্দেশক তার থেকে প্রশাসক ইত্যাদি হয়ে কেরিয়ারে সাফল্য হয়ত আসবে কিন্তু তাঁদেব প্রতিভাব ক্ষয় হবে। এই কথা মাথায় রাখলে সত্যজিতবাবুর কৃতিত্ব বোঝা যায়। তিনি গ্রাফিক ডিজাইনে গেলেন, কিন্তু সেটা তাঁর ক্ষমতা ছোট কবে ফেলতে পারল না। বরং গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রটিকে তিনি আরও উর্বর সমৃদ্ধ কবে দিলেন। তাঁর কাজে গ্রাফিক ডিজাইনের দিগন্ত আরও প্রসারিত হল। প্রতিটি গ্রাফিক ডিজাইনেব (বর্তমানে ভিসুয়াল কমিউনিকেশন-এর একটি অংশ) মধ্যেই বয়েছে একটি গ্রাফিক বার্তা, যা দর্শককে শিক্ষিত করে তোলে। এই বার্তাগুলি বিভিন্ন প্রকারের অথবা বিভিন্ন স্তবের হতে পারে।

একেবারে নিচের স্তরে একটি লোককে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে কোনও পণ্য কিনতে প্রলুব্ধ করে। কিঞ্চিৎ ওপরের স্তরে এব তথ্য এমন গ্রহণযোগ্য আকারে পরিবেশন করে যা একই সঙ্গে বিনোদক এবং চিত্তোৎকর্ষী হয়। আবেকটু ওপরের স্তরে এটি জীবনের প্রতি দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। আরও ওপরেব স্তরে এটি দর্শকেব দৃশ্যগত

অনুভূতি প্রবণতা বাড়ায় এবং তাকে চারপাশের জীবন এবং সাংস্কৃতিক জগতের কাছে যেতে সাহায্য করে। এ-ছাড়া এর আরও অন্যদিক তো রয়েছেই।

সৌভাগ্যক্রমে সত্যজিৎবাবুর সেই প্রতিভা, সেই দক্ষতা এবং বুদ্ধি ছিল যা তাঁর সামনে এই সবকটি স্তরে পৌঁছনোব পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর যেটুকু কাজ আমি দেখেছি তাতে বলতে পারি যে তিনি কোনও নিচু স্তরের প্রতি ধাবমান হননি। বরং উচ্চস্তরের কাজেই সময় দিয়েছেন। যেমন বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকা বা পরবর্তীকালে তাঁর চলচ্চিত্রেব কাঠামোয় গ্রাফিক কল্পনার প্রয়োগ। আর সে সবের মাধ্যমেই তিনি তাঁর দর্শককে দৃশ্যগত কল্পনায় এক নতুন সীমা এবং শিহরণের স্পর্শ দিতে পেরেছেন। আমার মনে হয় তাঁর ক্ষেত্রে নির্বাচনে শান্তিনিকেতনের অভিজ্ঞতা খুব কাজে এসেছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন 'মাস্টারমশায়' নন্দলালের কাছে তাঁর ঋণের কথা। বলেছেন কীভাবে তিনি পরিবেশের ছন্দের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার শিক্ষা পেয়েছিলেন। এই শিক্ষাই তাঁর মননের দিগন্ত খুলে দেয়। এবং সম্ভবত এই শিক্ষাই তাঁর মধ্যে এক শৈল্পিক মূল্যবোধের জন্ম দেয়। যেমন, কোনও সংযোগই ভিত্তিগতভাবে সফল হতে পারে না যদি না তা সমাজের সাংস্কৃতিক স্তরের একেবারে মূলে প্রোথিত হয। এবং তার মধ্যে এমন ছন্দ থাকে যা দর্শককে একই সঙ্গে সামনে এবং পিছনে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য করে।

এই উপলব্ধিই সত্যজিৎ রায়ের গ্রাফিক ডিজ়াইনে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। তাঁর উত্তরসূরিরাও তাঁব কাজ থেকে পেয়েছেন নতুন পথেব দিশা। তার আগে যা কাজ হত, সবই পাশ্চাত্য ধারার। এই ধারার অনুসারীবা মনে করতেন যে এই ধারার কাজের উপযোগিতা রয়েছে বিজ্ঞাপনের জগতে যেখানে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হয়ে ওঠে মূলত স্বপ্ন। তাঁদের অভিমত ছিল এই যে পাশ্চাত্য ভাবধারা ভবিষ্যৎ দেখে, প্রগতির অভীপ্সা জাগায। এই মতানুসারীদেব ভ্রান্তিবিলাস বা বিপদ যাই হোকনা কেন তা অবশ্য গুরুগম্ভীর সংযোগের প্রবক্তাদেব মধ্যেও বিদ্যমান। বাহ্যত সত্যজিতবাবুও তাঁদের একজন। তাঁব গ্রাফিক ডিজাইন এবং চলচ্চিত্র উভয়ই আমাদেব সংস্কৃতির এই নতুন দর্শনের পথ আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে। আলো-ছায়াব মধ্যে দিযে যেন এক মৌলিক ভাবনার প্রকাশ অথবা যেন এক আত্মানুসন্ধান।

সত্যজিৎবাবুব গ্রাফিকের কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন যে তাঁর শিল্পশিক্ষায় শান্তিনিকেতনের প্রভাব অতি অল্প। এবং এও বলেন যে শান্তিনিকেতনী শিল্প ভাবনায় তাঁর উৎসাহ তেমন ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি স্বভাবজ দক্ষতা নেই এমন কোনও ছাত্র কোনও শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করতে আসে না। কলাভবনও ছাত্রদের কাছে বরাবর এই ক্ষমতার আশা করেছে। কলাভবন কখনও গ্রাফিক সম্পর্কে নির্দিষ্ট, সুগঠিত শিক্ষাক্রমে ছাত্রদের শেখাযনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কলাভবন তার ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পেরেছে, চাবপাশ সম্পর্কে একটা নতুন স্বচ্ছ ধারণা দিতে পেরেছে।

সত্যজিৎবাবু নিজেও একাধিকবার সে-কথা স্বীকার করেছেন। বেশি কথা কি, সত্যজিৎবাবুর গ্রাফিক কাজকর্ম ভালভাবে দেখলে বোঝা যায় তিনি নন্দলাল বা বিনোদবিহারীব কাজের কাছে কতটা ঋণী। তা সে তাঁর তুলির টানেই হোক বা সাদা-

কালোর ব্যবহারেই হোক বা তাঁর পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার দক্ষতাতেই হোক। সন্দেহ নেই, কলাভবনের শিক্ষা তাঁর নিজের ক্ষমতায় অন্য মাত্রা পেয়েছে। যেমন স্বীকার করতে বাধা নেই কলাভবনের প্রভাবমুক্ত হয়েও তিনি তাঁর আঁকার ভিন্ন ভিন্ন শৈল্পিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তবু এ-কথা সত্য যে তাঁর পূর্বসূরিদের কাজের থেকে সত্যজিৎবাবুর কাজের যে উৎকর্ষ তার অনেকটাই শান্তিনিকেতন-প্রভাবিত। যখন ছাত্র হিসেবে শান্তিনিকেতন যাই তখন অন্য অনেকের মত আমিও 'সহজ পাঠ'-এ মাস্টারমশায়ের আঁকা উৎসাহের সঙ্গে অনুধাবন করি। সে-সব আঁকা, বইয়ের চমৎকার লেখার কাছে গৌণ হয়ে পড়েনি। আঁকা আর লেখা যেন পরস্পরের পরিপূরক ছিল। একটা ভাবনা বা বিষয় পরিস্ফুটনে অঙ্কন যে কোন উঁচু পর্যায়ে যেতে পারে সেগুলি তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আঁকা যে কত রোমান্টিক হতে পারে, রহস্যময় হতে পারে, কতভাবে নিজের পথ-অনুসারী হতে পারে, কত প্রকাশমান হতে পারে, সে-সব আঁকায় আলো-ছায়ার ব্যবহারে তা বোঝা যায়। সত্যজিৎবাবুব সব আঁকা সেই পর্যায়ের নয়। তবে অতি অবশ্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ কিছু কাজ সেই পর্যায়ের। যখন আমি তাঁর অঙ্কিত 'হাতে খড়ি' দেখি তখন সেই মুহূর্তেই আমার মনে হয় এমন একজনের কাজ দেখলাম যিনি শুরু করেছেন সেই জায়গা থেকে যেখানে নন্দলাল শেষ কবছেন তাঁর কাজ। এ-কথা কেউই অস্বীকার করবেন না যে গ্রাফিক ডিজাইনে তাঁর দশ বছরের কর্মকালে সত্যজিৎ এ-দেশে বইয়ের প্রচ্ছদে এবং আঁকায়, ছাপার হরফে, পৃষ্ঠাসজ্জায এক শীলিত এবং বিশেষ দেশজ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। এ-কথাও কেউ অস্বীকাব করবেন না যে তাঁর গ্রাফিক চেতনা তাঁর চলচ্চিত্রে সম্পূর্ণ এবং কখনও বা খণ্ডভাবে প্রভাব ফেলেছে। যদ্দূর মনে পড়ছে সত্যজিৎবাবুর ওপর বেনেগালের তথ্যচিত্রে প্রশ্নোত্তরকালে সত্যজিৎবাবু নিজেই এ-কথা স্বীকার করেছেন।

সত্যজিৎ রায়ের করা 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রের স্কেচ

অনন্য, অন্য সত্যজিৎ

পূর্ণেন্দু পত্রী

জিনিয়াস-এর আধুনিকতম সংজ্ঞা আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, তাঁকে হতে হবে যে-কোনো একটি বা দুটি বিষয় প্রশ্নাতীতরূপে পারদর্শী এবং সেই সঙ্গে একাধিক বিষয়ে গবেষকের মতো কৌতূহলী। অর্থাৎ তাঁকে হতে হবে দা ভিঞ্চি, মাইকেলেঞ্জেলো, গ্যেটে, আইজেনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, পিকাশো, কক্‌তো প্রমুখের বংশধর। সত্যজিৎ রায় নিঃসন্দেহে তাই।

প্রধানত চিত্র পরিচালক হিসেবেই তাঁর বিশ্ব-পরিচয়। কিন্তু চলচ্চিত্রের সীমানার বাইরে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে তাঁর উর্বর অবদান সংখ্যায় যেমন একাধিক, পরিমাণেও তেমনি অজস্র। চলচ্চিত্র ছাড়া, সঙ্গীত-শিশু সাহিত্য-চিত্রকলা-বিজ্ঞাপন শিল্প-ক্যালিগ্রাফি-শিশু সাহিত্যের পত্রিকা সম্পাদনা, বইয়ের চিত্রাঙ্কন ও প্রচ্ছদ, এতগুলো বিষয়ের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর রূপে সার্থক। এ-বছর নিজের 'হীরক-রাজার দেশে' ছবির জন্যে, তিনি অর্জন করেছেন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-পরিচালকের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় তাঁর গান রচনার কৃতিত্বকেও। গীতিকার হিসেবে তাঁর প্রথম উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এ। 'হীরক রাজার দেশে' পৌঁছে গানের সুরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন অতিরিক্ত আর এক মাত্রা, ছন্দোময় সংলাপ, যা গানেরই দোসর। এইভাবেই নিজেকে প্রতিদিন উন্মুক্ত করে চলেছেন তিনি। এক ধরনের ফুল আছে, যার পাপড়িগুলো ক্রমশ উন্মোচিত এবং আরক্ত হয়ে ওঠে রৌদ্রের ধারাবাহিক প্রখরতায়।

সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের ভাবনা-চিন্তা-আলোচনা বিদ্রোহে অথবা বিরুদ্ধ সমালোচনায় যখন কখনো কখনো অস্ত্রের মতো ধারালো হয়ে ওঠে, তখনো কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতে ভুলি না যে, আরও কোনো বৃহত্তর সৃষ্টির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে চলেছেন তিনি, যেহেতু তিনি রয়েছেন প্রতিভার প্রখর রৌদ্রের মধ্যেই। মানুষ হিসেবে তিনি দীর্ঘকায় এবং তাঁর সৃষ্টির জগত বিপুল বলেই হয়তো তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশাগুলোও দীর্ঘবাহু।

তাঁর সৃষ্টির জগতকে প্রদক্ষিণ করতে চাই যদি, প্রথমেই আমাদের ঘুরে তাকাতে হবে তাঁর শিল্পকলার দিকে, প্রতিভার প্রথম রশ্মি বৃত্ত রচনা করেছিল যেখানে। যৌবনের প্রথম ধাপের সিঁড়িতে যখন আমাদের পা, তখন শিল্পে অথবা অ্যাপ্লায়েড আর্টিস্ট হিসেবে তিনি সম্রাট। তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ, বিশেষ করে কবিতার, তখন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে আমাদের। তাঁকে চোখে দেখার আগেই, তাঁর 'পথের পাঁচালী' নির্মাণের সংবাদ কানে পৌঁছনো মাত্রই আমাদের গোটা যৌবনকালটা যে গোপনে শঙ্খধ্বনির মতো আলোড়িত হয়ে উঠেছিল অগ্রিম উচ্ছ্বাসে ও প্রত্যাশায়, তার উৎসের পিছনে ছিল এক নিশ্চিন্ত নির্ভরতাবোধ। আর সেই পরম এবং প্রশ্নহীন নির্ভরতার উৎস ছিল, তাঁর শিল্পকলার

নিত্য-নবীনতার সম্পর্কে আমাদের স্তম্ভিত বিস্ময় এবং বিস্মিত শ্রদ্ধা।

সত্যজিৎ রায় যদি শিল্পী না হতেন, চিত্রপরিচালক হতে পারতেন কিনা, এ প্রশ্ন হঠাৎ চমক দিতে পারে আমাদের। কিন্তু এ-কথায় অবিশ্বাস জানানোব বিন্দুমাত্র উপায় নেই যে, চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সামগ্রিক সাফল্যের পিছনে শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের অবদান অপরিমেয়। এমনকি এ-কথাও দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করা যেতে পারে যে শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের কাছে চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায় প্রতি পদক্ষেপে ঋণী। আর এ তথ্য তো আমাদের সকলেরই জানা যে, অবদান এবং অভিজ্ঞতাব বিচারে শিল্পী সত্যজিৎ রায় চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ বায়েব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। এই বক্তব্য উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করার জন্যে যদি কেউ বলেন যে, হ্যাঁ, সত্যিই তো, যেদিন থেকে তাঁব চিত্রনাট্যেব শুরু, সেদিন থেকেই তো শিল্পকলা অর্থাৎ চিত্রিত স্কেচ অবিচ্ছেদ্যরূপে জুড়ে রয়েছে চিত্রনাট্যের সঙ্গে, তখন আমরা তাকে আরো মনে করিয়ে দিতে পারি যে, চলচ্চিত্র-নির্মাণের জন্য তিনি প্রথম নির্বাচিত করলেন যে-কাহিনী, বেখাচিত্রে সেই বইটিকে অলঙ্কৃত কবার সূত্রেই সে-কাহিনীর সঙ্গে তাঁর প্রথম অন্তরঙ্গ পবিচয। সিগনেট প্রেস থেকে বেরোনো 'আম-আঁটিব ভেঁপু' নামেব ছোট্ট ছিল বৃহৎ 'পথের পাঁচালী'-র সংক্ষিপ্তরূপ। যতদূর জানি, সিগনেট প্রেসেব কর্ণধার দিলীপকুমাব গুপ্ত নিজের সম্পাদনায় গড়েছিলেন ঐ ভেঁপুটি, বিভূতিভূষণ নয়। এবং সত্যজিৎ রায়ও চলচ্চিত্রায়নের মুহূর্তে প্রধানত নির্ভর করেছিলেন ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণের উপরই। তাঁব নিজের স্বীকাবোক্তিও তাই।

"সত্যি কথা বলতে কি ডি. কে-কৃত 'পথেব পাঁচালী'-র সংক্ষিপ্ত সংস্কবণ 'আম আঁটির ভেঁপু' আমাকে চিত্রনাট্যের কাঠামো নির্ধাবণ কবতে অনেকটা সাহায্য কবেছিলো।"

আর ঐ সিগনেট প্রেসেবই অন্যতম পবিচালিকা শ্রীমতী নীলিমা দেবীব লেখায় এই ঘটনা দৈবঘটনাব সম্মান পেযে যায়।

"শুভক্ষণে পবিকল্পনা করা হয়েছিলো 'পথেব পাঁচালী'-র শিশুপাঠ্য সংস্কবণ ঃ 'আম আঁটির ভেঁপু'-র। এই বইয়েব ছবি আঁকতে গিযেই সত্যজিৎ রাযেব কল্পনা উদ্বেল ও সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছিলো—বাংলাদেশের বিধুব-মধুব-উজ্জ্বল-সচকিত যে-শৈশবকে তিনি পবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর চলচ্চিত্রে—'পথের পাঁচালী'তে। যে-চলচ্চিত্র ভারতীয় সংস্কৃতিব ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। 'আম আঁটিব ভেঁপু' আর সত্যজিৎ রায়ের ছবি—এই যোগাযোগেব পিছনে দৈবেব হাত ছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-দৈব হয়তো সিগনেট প্রেসেরই উদ্ভাবন।"

সত্যজিৎ বায়ের বিশদ জীবনী বলতে একটিই বই, যা ইংরেজি ভাষায় মারী সিটনের লেখা। সে বইয়ে ডি.কে অর্থাৎ দিলীপকুমার গুপ্ত এবং সিগনেট প্রেস বলতে গেলে অনুপস্থিতই। বইটির 'ইনডেক্স'-এ ডি কের নামোল্লেখ নেই। তবে ৭৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে তিনটি লাইন।

'ইন ডিউ কোর্স, গুপ্ত এ মেম্বাব অফ দা স্টাফ হু বিকেম এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, এ্যাণ্ড ল্যাটার দা ওনার অফ সিগনেট প্রেস ইনভাইটেড সত্যজিৎ রে টু ওয়ার্ক ফর বোথ অর্গানিজেসনস।''

এই অংশটুকু পড়লে আমাদেব সামান্যতম ধারণাও ঘটে না যে, সত্যজিৎ রায়ের

জীবনে ডি কে এবং সিগনেট প্রেস-এর সাফল্যের পিছনে সত্যজিৎ রায়ের অবদান কতখানি এবং কোন জাতের। শ্রীমতী সিটন সত্যজিৎ জীবনের গোড়াপত্তনের যুগ সম্বন্ধে আরো বিশদরূপে কৌতূহলী হলে, তিন লাইনেব বদলে ডি কে এবং সিগনেট প্রেস অধ্যাযটি আরও সুদীর্ঘ আকাব নিতে পাবত। ঠিক এই বকমভাবেই অনুপস্থিত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের ছাত্র জীবনে যাঁর প্রভাব ছিলো তাঁর উপর সবচেয়ে বেশি। শিল্পশিক্ষাব গুরু হিসাবে যাঁকে তিনি সম্মানিত করেছেন একাধিক প্রবন্ধে এবং একটি তথ্যচিত্রেব মাধ্যমে। সত্যজিৎকে যাঁরা শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় জানেন, তাঁরা যে কম-জানেন এবং ভুল জানেন, মাবী সিটনেব বইটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। ডি কে-র মৃত্যুব পর সত্যজিৎ রায যে প্রবন্ধ লেখেন আমরা এখানে তার কিছুটা বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেবো এই কারণে যে, ঐ দুটি মানুষেব যৌথ-উদ্যোগে আমাদের দেশের গ্রন্থ-প্রকাশনার জগতে ঘটেছিল যে আমূল বিপ্লব, সেই ইতিহাসেব সূত্রেই আমাদের জানা হয়ে যাবে শিল্পী সত্যজিৎ বাযেব একটা বিশেষ পর্বের মৌলিকতাময় উত্থান ও ক্রমবিকাশের ঘটনাবলিও। ১৯৩৪-এ ডি, জে, কীমার নামের বিজ্ঞাপন সংস্থায় তাঁব যোগদান। ১৯৫০ থেকে তাঁর চলচ্চিত্র-জীবনেব শুরু। মাঝখানে এই সুদীর্ঘ সাতটা বছরে তাঁর আত্মপ্রকাশের হাতিযাব ছিলো কাগজ, কলম, কালি এবং তুলি।

"১৯৪৩-এর গোড়ার দিক। কলকাতা শহবে তখন জাপানি বোমার হিড়িক। মাস দুযেক হলো শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে চাকবিব চিন্তা করছি। কলাভবনের তালিম সত্ত্বেও ফাইন আর্টসের দিকে মন ঝোঁকে নি। ইচ্ছা আছে বিজ্ঞাপন শিল্পী হবাব, কিন্তু বিজ্ঞাপনের লাইনে কারুর সঙ্গে পরিচয নেই।..আমাদের বাড়ি তখন প্রাযই আসতেন 'ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড' বৃদ্ধ ললিত মিত্তির। তিনি আমাব সমস্যাব কথা শুনে বললেন, 'কোনো চিন্তা নাই। কীমার কোম্পানীব এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার হইল আমাগো দিলীপ গুপ্ত। তারে আমি খুব চিনি। তমাবে তাব কাছে লইযা যামু।' ললিতবাবুব প্রবোচনায় তাঁব সঙ্গে রসময় রোডে দিলীপ গুপ্তের বাড়িতে গিয়ে হাজিব হলাম। ভদ্রলোক মিনিট দশেক নানান প্রশ্ন করে আমাকে বাজিয়ে দেখাব পব বললেন 'একটা কাল্পনিক প্রোডাক্ট নিযে ছবি ও ক্যাপসান সমেত গোটাচাবেক বিজ্ঞাপনের খসড়া কবে অমুক দিনে অমুক সময়ে পাঁচ নম্বব কাউনসিল হাউস ষ্ট্রীটে আমাদের আপিসে চলে এসো; ক্রম সাহেবের সঙ্গে তোমার মোলাকাত করিযে দেব।...' কীমাব কোম্পানীতে জুনিযর ভিজুয়ালাইজারেব চাকরীতে যোগ দিই এব দুমাস পবে। তখন থেকেই দিলীপ গুপ্ত ওরফে ডি. কে-র সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয়েব সূত্রপাত। বিজ্ঞাপনের জগতে কীমারেব তখন বেশ নামডাক, এবং তার অনেকটাই নাকি ডি.কে-র দৌলতে। ..আমি কাজে যোগ দেবার বছর খানেকেব মধ্যেই ডি.কে সিগনেট প্রেসের পত্তন করেন। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার ও অবনীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য নিয়েই কাজ শুরু। প্রচ্ছদ অঙ্কন এবং প্রযোজনে ইলাস্ট্রেশনের ভাব দিলেন আমাকে। ....বাংলা বইয়ের অঙ্গসৌষ্ঠবে সিগনেট যে সম্পূর্ণ নতুন ধাবাব প্রবর্তন করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মূলে ছিল ডি.কে-র গভীর জ্ঞান, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং একরোখা পারফেকশনিজম্। ...তাঁর মতে বইয়ের বহিবাবরণ হবে এমন যাতে দোকানের কাউণ্টারে আর পাঁচটা বই থেকে পৃথক হয়ে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ছাড়া বইয়ের চরিত্র অনুযাযী তার আকাব আয়তন ও অভ্যন্তরীণ সজ্জার রদবদলেও তিনি

বিশ্বাস করতেন। এই পন্থা অচিরেই সিগনেটের বইয়ে একটা বৈশিষ্ট্য আরোপ করে গ্রন্থপ্রকাশনার জগতে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।''

সত্যজিৎ এবং ডি.কে-র যৌথ-প্রয়াসে বইয়ের জগতে বিপ্লব ঘটে যাওয়ার কথা বলেছি একটু আগে। কোন পথে অথবা কেমন করে ঘটলো সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তা বুঝতে গেলে দশ বারো বছর আগেকার সিগনেট প্রেস-এর যে কোনও একটা বই হাতে নিলেই স্বচ্ছ হয়ে উঠবে জলের মতো। ঐ-সময়কার চল্‌তি দশটা কিংবা দুশোটা বইয়ের সঙ্গে তার তফাৎটা আপনিই ধরা পড়ে যাবে তৎক্ষণাৎ। সিগনেটের বই মানে শুধু সুদৃশ্য প্রচ্ছদ অথবা উৎকৃষ্ট ছাপা অথবা চমৎকার বাঁধাই নয়। টাইটেল, ফল্‌স টাইটেল, লাইনো হরফের সাহায্যে হাতের হরফের এলোমেলো এবং নদী-নালাময় কম্পোজিং-এর বদলে শক্ত বাঁধুনির নিরেট ছাপাই, ছাপানো অংশের চারপাশে যথেষ্ট পরিমাণে সাদা অংশের ছাড়, যা মূলত আলোকিত করে কালো অক্ষরের ভবাট জমিকে, বিষয়-অনুযায়ী প্রায় প্রতিটি বইকেই রেখাঙ্কন বা ইলাস্ট্রেশনে সাজানো, বইযের জন্যে বিজ্ঞাপন, বইয়ের পক্ষে মানানসই সাইজ, হবফ এবং ফরম্যাট, এমন একাধিক বিষয়েব দিকে চোখ পড়বে আমাদের, সিগনেট প্রেসেব আগে, কিছুটা ব্যতিক্রম হিসেবে একমাত্র 'বিশ্বভারতী' কে বাদ দিলে, যা-নিয়ে তখনকার বাজারি প্রকাশকরা মাথা ঘামাযনি কখনো, সম্ভবত ঘামানোর মতো মাথার অভাবেই।

শান্তিনিকেতনে গিয়েও যিনি সহজপ্রাপ্য সান্নিধ্যেব সুযোগ সত্ত্বেও বেছে নিয়েছিলেন রবী্দ্রনাথেব থেকে দূরত্ব, নন্দলাল এবং শান্তিনিকেতনী ঘবানাব মধ্যে বাস করেও ঠিক তেমনি নিজের পক্ষপাতিত্ব ঘোষণা কবেছিলেন তিনি ফাইন আর্টের চেয়ে কমারশিয়াল বা এ্যাপ্লায়েড আর্টের দিকেই। সিগনেট প্রকাশিত বইয়ের অলঙ্করণ, প্রচ্ছদ, অক্ষব এবং বিজ্ঞাপন-রচনাব স্বাধীন-সার্বভৌম সুযোগ হাতে আসার পব এই সত্যজিৎ রায় যে নিজের সমস্ত ক্ষমতা-দক্ষতা এবং প্রতিভাকে উজাড় কবে দিয়েই যুগান্তকাবী সৃজনে মাতবেন, সেটা অনুমান করা এমন কিছু কঠিন নয়।

আর ঘটল ঠিক তাই-ই। সে-একটা সময গেছে যখন সিগনেট-এব সদ্য বেরোনো একটা বইযের সৌবভে আমাদেব দিন-দুপুব-সন্ধে-বাত্রি-সপ্তাহ-মাস খুশিতে বিহ্বল। সে একটা সময় ছিল যখন সত্যজিৎ বায়-এর একটা প্রচ্ছদের অভিনবত্ব থেকে আর এক প্রচ্ছদের অনির্বচনীয়তার দিকে অভিযানের নিরবচ্ছিন্ন দর্শক ছিলাম আমরা।

যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা'ব মলাট আঁকলেন, দেখা গেল, কনডেনসড এবং একস্প্যানডেড মিলিয়ে পাশাপাশি বসিযে দিয়েছেন এমন তিনটি অক্ষর যা ভিন্ন পয়েন্ট এবং ভিন্ন গ্রুপ-এর। অর্কেস্ট্রার প্রাণ ধর্ম যে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন সুরের বৈপরীত্যকে এক অর্থময ঐকতানে মেলানো, এটা জানেন বলেই অক্ষর-বিন্যাসে ফুটিয়ে দিলেন তার আভাস। যেন তবলা, সেতার আর তানপুরা সাজানো রয়েছে পাশাপাশি।

আবার যখন জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রচ্ছদ আঁকলেন, অক্ষর বিন্যাস দেখে মনে হল যেন কবি স্বয়ং তাঁব দ্রুত আবেগময়তাব টানে দোয়াতের নীল কালিতেই ঝটপট নামটা লিখে উঠে গেছেন বা চলে গেছেন কোথাও। এখানে আর ছাপার হরফেব সাহায্য নিলেন না তিনি। ঘুরে তাকালেন ক্যালিগ্রাফির দিকে।

জিম করবেট-এর 'কুমায়ূনেব মানুষখেকো বাঘ' এব প্রচ্ছদের দু-পিঠ জুড়ে বাঘেব

গায়ের লোমশ ডোরা। তারই একটা জায়গায় এক টুকরো ছিন্নভিন্ন সাদা অংশ। যেন বাঘের গায়ে গুলি বিঁধেছে ঠিক ঐখানে। আর ঐ গুলি বেঁধার সাদা অংশটাকেই তিনি কাজে লাগালেন বই ও লেখকেব নাম বসিয়ে দিতে। কিন্তু এখানেই তাঁর বুদ্ধিদীপ্ততার শেষ নয়। প্রচ্ছদের উলটো পিঠে আমরা দেখতে পেলাম ছিন্নভিন্ন সাদা অংশের আকারটা সামনের প্রচ্ছদের চেয়ে বেশ বড়। যেন গুলিটা ও পিঠে লেগে এ পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে বিরাট ক্ষতচিহ্ন এঁকে। এবারে এই বড় মাপের সাদা অংশটাকে তিনি কাজে লাগালেন গ্রন্থ পবিচিতি বা ব্লার্ব-এর জন্য। 'দুরন্ত দুপুর'-এর মলাটে দেখতে পেলাম হুবহু গ্রীষ্মকালীন জ্বলন্ত দুপুরের হলুদ রঙ, প্রচ্ছদেব সমস্ত জমিটা জুড়ে। কবিতার বিষয় যেহেতু আধুনিক 'আববান', তাই জমির উপরে নিবের সরু লাইনে শুয়ে থাকা রমণীব যে ড্রইং, তাতে মাতিসেব ছায়া। আবার যেই আঁকলেন জীবনানন্দেব 'রূপসী বাংলা'ব প্রচ্ছদ, সমস্ত জমিটা ছেয়ে গেল বাংলার মুথো ঘাসের সবুজে। আব সেখানে যে নারীর মুখ আঁকা হল তুলির তড়িৎ টানে, তার পিছনে প্রেরণা হিসেবে বইল বাংলাব লোকায়ত শিল্পের ছাপ।

'পবম পুরুষ শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ'-ব প্রচ্ছদ আঁকাব সময় তিনি বামকৃষ্ণেব মুখ আঁকলেন না। বইটি যে আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ এক অসাধারণ মানুষের জীবনকাহিনী, সেটা মনে বেখেই এব পরিবেশ-রচনায় বেছে নিলেন ভারতবর্ষের চিবপরিচিত নামাবলীর মোটিফ। এবং সে মোটিফ আঁকলেন তুলিতে নয়, কালিতে নয়, সরাসবি রাবার সলিউশনের টিউব দিয়ে। আর এই বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে তোলার দায়িত্বেই বেছে নিলেন পুঁথির প্রাচীন হরফ, নামাঙ্কনেব জন্যে। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে' যিনি এমন সহজ স্বচ্ছন্দ এবং দেশজ জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' এর প্রচ্ছদে, কবিতার অন্তর্জগতকে মনে রেখেই, তিনি হয়ে উঠলেন জটিল এবং বিমূর্তবাদী। সম্পূর্ণ প্রচ্ছদটিকে ছেয়ে বইল যে নারী, তার বিমূর্ত গড়নে আমরা কখনো খুঁজে পেলাম রবীন্দ্রনাথ, কখনো পলক্লী-র সরু লাইনের স্বতস্ফূর্ত আঁকিবুকির বহস্যময় আদল।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তেব 'অমাবস্যা'য আমবা এমন এক নাবী-মূর্তির আদল দেখি, যে যেন সত্যিই অমাবস্যাব কালো অন্ধকাবে তৈরি. 'জোনাকী'-ব প্রচ্ছদে তুলির আঁচড় যেন সত্যিকাবের 'জোনাকী'-ব ভঙ্গীতে উড়ে বেড়ায প্রচ্ছদ জুড়ে. গহন নীলেব জমিতে হালকা নীলের ব্যঞ্জনায়।

একটু মনোযোগ দিলেই আমবা দেখতে পাবো প্রচ্ছদ নির্মাণেব এই বিপুল অভিজ্ঞতা এবং পবীক্ষা-নিরীক্ষাব দুঃসাহস কী আশ্চর্যভাবে সমৃদ্ধ করেছে তাঁর চলচ্চিত্রকে। 'পথের পাঁচালী'ব আগে চলচ্চিত্রের টাইটেল বলতে আমরা বুঝতাম বৃহদাকৃতি এক ধরনের চরিত্রহীন হরফের যথেচ্ছাচার। চলচ্চিত্র হিসাবে যেমন, তেমনি টাইটেল হিসেবেই আমাদেব প্রাচীন সমস্ত ধ্যান-ধারণার উপরে নতুন আলো ছড়ালো 'পথের পাঁচালী'। ঐ ছবির প্রধান চরিত্র হরিহর যেহেতু জীবিকার্জন কবে পুঁথি লিখে এবং পুঁথি পড়ে, তাই সে ছবির টাইটেলে এবড়ো-খেবড়ো নেপালি তুলোট কাগজে ফুটে উঠল বাংলা পুঁথির হরফ। আবার পরের ছবি 'অপরাজিত'-য় এসে গেল ছাপার হরফ। যেহেতু অপুব কলকাতা-বাসের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ছাপাখানা। 'দেবী' ছবির জন্যে তৈবি কবলেন এমন 'লোগো' যার কাঠামো প্রাচীন মন্দিরেব মতো আর যা দেখলেই আমাদের মনে পড়ে যায় অন্ধ ন্যায়-নীতি, বিশ্বাসের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো এক

সংস্কারাচ্ছন্ন যুগের স্মৃতি। খুব সঙ্গতভাবেই 'কাপুরুষ মহাপুরুষ'-এর লেখাঙ্কন তাঁর হাতে পেয়ে গেল মাছের আকৃতি। ভারতীয় ধারণায় মাছ যৌনতার প্রতীক। গোলাকৃতিতে সাজানো দুটি মাছের অর্থ, নর-নারীর মিলন। আবার আমরা 'গভীর জলের মাছ' বলি সেই মানুষকে যার মুখোশটা অমায়িক কিন্তু আসল মুখটা চতুর শয়তানের। মাছের প্রতীক এখানে দুটি স্বতন্ত্র কাহিনীর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে তাৎপর্যময়। বিষয় এবং বক্তব্যের বদল অনুযায়ী যিনি ইতিপূর্বে বদলে দিতে জেনে গেছেন প্রচ্ছদের রেখা-রঙ এবং অক্ষরের বিন্যাস, সেই শিল্পীব নিজস্ব চলচ্চিত্রেও যে সেই অভিজ্ঞতাব ছায়াপাত ঘটবে, এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয় আদৌ।

সিগনেট প্রেসের যখন ভরা যৌবন, তখন সেখান থেকে বেবোতে লাগল বাংলাদেশের গ্রন্থ সংক্রান্ত একটি বুলেটিন। নাম 'টুকরো কথা'। এই 'টুকরো কথা'র জন্যে এক সময়ে তাঁকে আঁকতে হয়েছে অসংখ্য পোর্ট্রেট। পোর্ট্রেট আঁকায় তাঁর দক্ষতাব পরিধি যে কতখানি ব্যাপক তাব নিদর্শন 'টুকবো কথা'র পাতায় পাতায ছড়ানো।

যখন যামিনী রায় বা অবনীন্দ্রনাথ আঁকছেন কলমের সুনির্বাচিত কয়েকটি সবলটানে, তখন জীবনানন্দের বেলায তাঁব গোলাকাব মুখাবযবের অলৌকিক চাউনিব অজ্ঞাত রহস্যকে ফুটিযে তুলতে, অসংখ্য কুচো লাইনের সমাবেশ। স্বামী বিবেকানন্দেব বেলায় শুকনো ব্রাশের মোটা-সরু বলিষ্ঠ টান। আবাব নন্দলাল বসু আঁকাব সময় হুবহু সেই রকম স্টাইল, যেভাবে নিজেব স্কেচ আঁকতেন নন্দলাল। আবার যেই এল গত শতাব্দীর শিবনাথ শাস্ত্রী, অমনি চলে গেলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর কাঠখোদাই-এর কাছাকাছি। 'টুকরো কথা'ব বাইরেও বই বা পত্র-পত্রিকাব জন্যে এঁকেছেন আবও অনেক প্রতিকৃতি যার মধ্যে বয়েছেন ববীন্দ্রনাথ, চ্যাপলিন, গ্রিফিথ, বিনোদবিহারী, আইজেনস্টাইন, সুকুমার রায় প্রমুখেরা।

প্রতিকৃতি আঁকার এই পারদর্শিতা সর্বতোভাবে সহাযক হয়েছে তাঁব চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও। যখন 'অপুব সংসার'-এব নাযক খুঁজে পাচ্ছেন না, কাগজে তাঁব নিজস্ব ধারানুযায়ী চরিত্রটির ফ্রনট ফেস এবং প্রোফাইল এঁকে তুলে দিয়েছিলেন সহযোগীদের হাতে। সহযোগীবা সেই আঁকা ছবির সঙ্গে মিলিযেই আবিষ্কাব করেছিলেন 'অপুর সংসাবে'র নায়ককে।

তারও আগে, তাঁর প্রথম ছবি 'পথেব পাঁচালী'ব শুটিং করছেন যখন বোড়াল গ্রামে, পথ চলতি একটি গ্রাম্য-মানুষকে দেখেই মনে মনে ঠিক কবে নিলেন ছবির মিঠাইওয়ালা চরিত্রটির জন্যে। যখন মিঠাইওয়ালার দৃশ্যগ্রহণের সময় আসন্ন, খোঁজ করলেন মানুষটির। কিন্তু নাম বলতে না পারায় গ্রামের মানুষ চিনতে পারল না কাউকে।

হঠাৎ একটুকরো কাগজ নিয়ে এঁকে দিলেন মানুষটির পোর্ট্রেট। গ্রামের মানুষ তৎক্ষণাৎ চিনে ফেললে তাকে। তিনিও নিজের বাছাই-কবা মানুষকে দিয়েই অভিনয় করিয়ে নিলেন মিঠাইওয়ালাব চরিত্র।

পোর্ট্রেট আঁকার এই নৈপুণ্য তাঁব চলচ্চিত্রকে সাহায্য করেছে ভিন্ন ভাবেও। একটি সম্ভাব্য চরিত্রের নাক-মুখ-চোখ-চুল-চিবুক ও ঠোঁট মিলিয়ে সম্পূর্ণ মুখাবযব কেমন হওয়া উচিত তা আগাম ভেবে নিতে পারতেন তিনি। ফলে অভিনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি সার্থক।

ইলাস্ট্রেটার হিসেবে সত্যজিৎ রায় আমাদের দেশে এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই বিপুল কর্মব্যস্ততার মধ্যে প্রধানত নিজের সম্পাদিত শিশু সাহিত্যের পত্রিকা 'সন্দেশ' এর জন্যেই তাঁকে মাসে কম করে আঁকতে হয় ২০/২৫ টি ইলাস্ট্রেশন। এ ছাড়া রয়েছে অন্যান্য চাহিদা। তাঁর ইলাশট্রেশানের প্রধান গুণ, ডিটেল। ডিটেলের প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ মনোযোগ তাঁর যে কোনো একটি খাঁটি ইলাশট্রেশানের দিকে তাকালেই আমরা বুঝে যাই। অপরিহার্য ডিটেলের সন্নিবেশে গল্পের না-বলা বাস্তবতার গায়ে তিনি এঁটে দিয়েছেন বাস্তবতার এক নতুন মাত্রা। ইলাশট্রেশানের এই কৃতিত্ব তাঁব চলচ্চিত্রকেও সমৃদ্ধ করে আসছে আরম্ভের দিন থেকেই। আইজেনস্টাইন বলেছিলেন, ভালো-মন্দ যেমনই হোক, একজন চিত্রপরিচালকেব পক্ষে বিচ্ছিন্ন শট্ গুলোব একটা ছবি আঁকাটা একান্তভাবেই জরুরি। সত্যজিৎ চিত্রনাট্য লেখেন ছবি এঁকে। কিন্তু এইখানেই দায়িত্ব শেষ নয় তাঁর। তিনি আঁকেন সেট-এর কাঠামো, আঁকেন চরিত্রদেব পোশাক পবিচ্ছদ, আঁকেন বিশেষ বিশেষ মেক-আপ। আর নিজের প্রত্যেকটি ছবিব প্রচারেব জন্যে পোস্টার অথবা স্লাইড অথবা বিজ্ঞাপনের লে-আউট, যার সব কিছুর গায়েই জুড়ে থাকে তাঁব নিজেব পরিকল্পনার ছাপ। বাংলা বইয়েব প্রচ্ছদে যেমন, বাংলা চলচ্চিত্রেব পোস্টার এবং বিজ্ঞাপনের ধরন-ধারণে আমূল বিপ্লব ঘটিয়েছেন তিনি একাই। পরবর্তীকালের আমরা তাঁবই উত্তবসাধক।

সত্যজিৎ রায়েব মুখে প্রথম গান শুনি ১৯৬০-এ, যখন 'দেবী' ছবির শুটিং-এ তাঁর ইউনিটেব সঙ্গে বেশ কযেকটা দিন কাটিয়েছিলাম মুর্শিদাবাদের নিমতিতায়। তখনো নিজের ছবিতে সঙ্গীত পবিচালকেব ভূমিকায় আবির্ভাব ঘটেনি তাঁব। যখন 'তিনকন্যা' ছবিতে হাত দিয়েছেন, সেই সময় একদিন বিকেলে তাঁব লেক টেম্পল রোডেব বাড়িতে গিয়ে হতবাক। ফাঁকা ঘরে মাত্র দুটি মানুষ। তিনি আর পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গীত পরিচালনায সহযোগী অলোকনাথ দে। সত্যজিতবাবু শিস দিয়ে সুব শোনাচ্ছেন আব তা শুনে নোটেশন লিখছেন অলোকনাথ। তাঁর শিস দিয়ে সুব তোলাও মুগ্ধ হয়ে শোনার মত। সেই 'তিনকন্যা' থেকেই নিজেব ছবিব সঙ্গীত পবিচালক তিনি। এখন আর নোটেশন লেখার জন্যে দ্বিতীয় ব্যক্তিব সহযোগিতাবও দরকাব ঘটে না। পিযানোয় তাঁর পাকা হাত। সুর গড়েন পিয়ানো বাজিয়ে। সেখান থেকেই নোটেশান। সেই প্রথম আত্মপ্রকাশের পর থেকে এ পর্যন্ত একটানা নিজেব সবকটি ছবিব গীতিকার ও সুরকাব তিনি নিজেই। নিজের পূর্ণাঙ্গ আর স্বল্প দৈর্ঘ্যেব ছবির সঙ্গে অন্যান্য পবিচালকের পূর্ণাঙ্গ ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি মিলিয়ে এ পর্যন্ত আবহসঙ্গীত বচনা কবেছেন ৩০টিব মতো ছবির। এ তথ্য আমাদের সকলেরই জানা যে, শৈশব থেকেই পাশ্চাত্য-সঙ্গীতেব সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়। পরবর্তীকালে ভারতীয সঙ্গীত সম্বন্ধেও নিজের জ্ঞান বা ধাবণাকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। এখন কলকাতাব ভারতীয় বা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যে কোনো উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানে প্রথম সারির শ্রোতা হিসাবে তাঁকে দেখতে পাওযা কোনো বিস্ময়ের ঘটনা নয়। তাঁর ছবির চিত্রনাট্যেব গঠনের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কাঠামো। আর এ প্রসঙ্গে তিনি আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর অভিযোগ— 'Indian directors tended to overlook the musical aspect of film's structure.'

চলচ্চিত্রে আবহসঙ্গীতের ভূমিকা নিয়ে বাংলায় লেখা তাঁর প্রবন্ধটি পড়লে, আমরা সহজেই বুঝে যাই বিভিন্ন এবং বিপরীতধর্মী মুডকে উজ্জীবিত করতে কত বিভিন্ন ধরনের আবহসঙ্গীত রচনার পরিকল্পনা করতে হয়েছে তাঁকে। বলতে গেলে, প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' থেকেই একই সঙ্গে চলেছে তাঁর দুই ভাষার অন্বেষণ, চলচ্চিত্রের ভাষা এবং আবহসঙ্গীতের ভাষা। আর প্রথম ছবিতেই তিনি ভাঙলেন দীর্ঘকালের আবদ্ধ সংস্কার। আবহ, কণ্ঠ সঙ্গীত, ধ্বনি, ধ্বনির পারস্পেকটিভ, এমনকি সংলাপের ঘনবদ্ধ সংযম যেন বুড়িয়ে-যাওয়া বাংলা ছবির গায়ে পরিয়ে দিল নতুন যৌবনের সাজ। সবাক বাংলা চলচ্চিত্র মুক্তি পেল তার ছক্-কাটা গণ্ডীর সীমাবদ্ধতা থেকে, শব্দের এক ভিন্ন ভূমণ্ডলে। এই প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষ ভাবে মনে পড়বে তাঁর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির স্মৃতি। সেখানে পরিবেশীয় ধ্বনি, মিটিং-এর অ্যাবস্ট্রাক্ট শব্দরূপ, বেড়ালেব ডাক, এবং অন্যান্য ধাতব ঝংকাব মিলিয়ে, আবহসঙ্গীত হয়ে উঠেছিল সমকালীন কলকাতার এক স্মরণীয় সিম্ফনি। আর আবহসঙ্গীতেব চরিত্র এবং প্রয়োজনের যথার্থতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ বলেই একই ছবিতে তিনি ঘটাতে পাবেন ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সহাবস্থান। আবহসঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন রচনা এবং সাক্ষাৎকার থেকে আমরা বুঝতে পারি ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের চেযে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কাছেই যেন সঙ্গীতের দীক্ষা তাঁর। তাই আমবা পড়ি—

"But one element of Western music-namely, modulation from one key to enother I find extermely useful in underlining emotional transitions. The same effect could be obtained by indigenous means also by transition from one Raga to enother. I find Western instruments almost indispensable for creating effects-especially where a dark, sombre mood is aimed at.

১৯৬৯র আগে আমাদের ভাবনায় উঁকি দেয়নি এমন সম্ভাবনা যে, ক্যামেবা ধরার হাতেই কখনো কলম ধববেন তিনি। হঠাৎ ঘটে গেল আমাদেব পক্ষে সেই সৌভাগ্যের অঘটন। ঠাকুবদা উপেন্দ্রকিশোবের হাতে গড়ে ওঠা আর বাবা সুকুমার রায়ের হাতে বড়ো হওযা 'সন্দেশ' নামে এককালেব যে জনপ্রিয় শিশু পত্রিকাটি হারিয়ে গিয়েছিল বিস্মৃতিব আড়ালে, নিজে সম্পাদক হয়ে ঘটালেন তার পুনঃপ্রকাশ। এই সুবাদেই তুলি এবং কলম দুটোর দিকেই গভীর মনঃসংযোগ কবতে হল তাঁকে। নব কলেবর 'সন্দেশ'-এ মাঝে মাঝেই বেরোতে লাগল তাঁর ছোট গল্প, কখনো বা এডোয়ার্ড লিয়রের আজগুবি, ছড়ার অবাক করা অনুবাদ। এসবের কিছুদিন পরেই ধারাবাহিক উপন্যাস 'বাদশাহী আংটি।' এই উপন্যাসেই জন্ম নিল বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাসের এক তুলনাবিহীন চরিত্র ফেলুদা, যার ভালো নাম প্রদোষ মিত্র। পৃথিবীর নামকরা গোয়েন্দা সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেও বোঝা যায়, ফেলুদা অদ্বিতীয়। উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে প্রথম আলোকোজ্জ্বল আবির্ভাবের আগে, ফেলুদাকে অবশ্য দু-বার উঁকি দিয়ে দেখে নিয়েছিলাম আমরা দুটো ছোট গল্পে। 'বাদশাহী আংটির' পর থেকে ফেলুদাকে নিয়ে বছরে কম করে একটা উপন্যাস এখন আমাদেব জন্যে বাঁধা বরাদ্দ। ক্রাইম থ্রিলার-এ যেমন ফেলুদা, অন্যদিকে তেমনি সায়েন্স ফিকশান-এ প্রফেসার শঙ্কু। শঙ্কু বিজ্ঞানী, বুদ্ধিমান, প্রতিভাবানও কিন্তু ফেলুদাব প্রতিভা দিগ্বিজয়ী। ফেলুদা যেন জীবন্ত

এনসাইক্লোপিডিয়া। সাহিত্য, শিল্প, ভাষাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, আইকনোগ্রাফি, ইতিহাস, অ্যানটিকস্, এক কথায় পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় নিয়েই এই ভ্রমণ বিলাসী চরিত্রটির অসাধারণ জ্ঞান এবং আরো জানার অদম্য কৌতূহল। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বুঝি ফেলুদার পোশাকে গা-ঢাকা দেওয়া সত্যজিৎ রায়েরই 'অলটার ইগো'। এমনও হতে পারে যে, কোনও এক দিন সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র আলোচনাতেও অপরিহার্য হয়ে উঠবে তাঁর এই গোয়েন্দা কাহিনীগুলো। আর সেটা অহেতুক নয়। ১৩৭৬-এ 'বাদশাহী আংটি'তে ফেলুদা গুনগুন করে গেয়েছিল ওয়াজেদ আলী শাহের গজল 'যব ছোড় চলি লক্ষ্ণৌ'। ১৩৮৫-তে সেই গান ফিরে এল 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' ছবিতে। এমন অনুমান নিতান্তই অমূলক নয় যে, ১৩৭৬ থেকে পুরনো লক্ষ্ণৌ নিয়ে শুরু হয়ে গেছে তাঁর উৎসাহ এবং গবেষণা। 'বাদশাহী আংটি'র জন্যে প্রথম রয়্যালটির টাকা পেয়েছিলেন যেদিন, চমকে উঠে প্রশ্ন করেছিলেন, 'লিখে আবার টাকা পাওয়া যায় নাকি?' তখন তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না যে, দশ বছরে ঐ একটি বইয়েরই হবে ২১ টি সংস্করণ। এ পর্যন্ত মোট ১৭ খানার মতো গল্প উপন্যাস লিখেছেন তিনি, চলচ্চিত্র বিষয়ক বইপত্র বাদ দিয়ে। এখন পৃথিবীকে চমকে দিয়ে তিনি বলতে পারেন—

'আমার সংসার চলে লেখার টাকায়।'

তাঁর সাহিত্য কর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে লিখতে হয় দীর্ঘ প্রবন্ধ। তেমনি তাঁর জীবনকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, লিখতে হয় দীর্ঘ উপন্যাস। যেহেতু তাঁর মনন আর দশ দিগন্ত-জোড়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে উপমা হিসেবে সমুদ্রই সবচেয়ে স্বাভাবিক।

আমেরিকার অ্যাংরি বা হাংরি জেনারেশনের কবি এ্যালেন গীনস্ বার্গ তাঁর কলকাতা বাসের সময় একদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। গীনস্ কথা বললেন চলচ্চিত্র নিয়ে। আর সত্যজিৎ সারাক্ষণ আমেরিকার আধুনিক কবি ও কবিতার বিষয়ে।

এমনও ঘটে থাকে কখনো যে, হয়তো ঘণ্টা তিনেক সময় কোনো উৎসাহীর সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন বাংলা বানান বা ব্যাকরণ নিয়ে। আবার কোনদিন বেশ কয়েক ঘণ্টার আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল বাংলা-হবফেব চরিত্র। গত বছর কিছুদিনের জন্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন হঠাৎ। স্পণ্ডেলোসিস। এ্যালোপ্যাথির এক্স-রে, ট্রাকশন ইত্যাদিতেও কাজ হল না যখন, ঝুঁকলেন হোমিওপ্যাথির দিকে। অমনি শুরু হয়ে গেল হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়াশুনো। ঐ সূত্রেই আবার যোগ-ব্যায়ামও। আশ্চর্য হবো না এই মুহূর্তে যদি কোনো পাঠকের চোখে ভেসে ওঠে 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর সেই বিশ্বশ্রী খেতাবওয়ালা ব্যায়ামবীরের ছবি। শুনেছি এক সময় 'প্যাবা-সাইকলজি' নিয়েও চর্চা করেছেন গভীর। হয়তো তারই পরিণাম, 'সোনার কেল্লা'।

শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের বিচার করতে গিয়ে হয়তো কখনো কখনো আমাদের ঠোঁটে ফুলঝুরির মতো ঠিকরে বেরোয় বিরূপ সমালোচনার ফুলকি। তখন হয়তো তাঁর দৈর্ঘ্যকে ছেঁটে ঈষৎ ছোটো করতে ছুটি আমরা। কিন্তু যখনই মুখোমুখি হই সমগ্র সত্যজিতের, চমকে উঠি নিজেদের খর্বতায। বুঝতে দেরি হয় না, এখন এসে দাঁড়িয়েছি এক পর্বতের পাদদেশে।

চিত্রকর সত্যজিৎ রায়

শোভন সোম

মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসিকতায় আর্ট করা উচ্ছন্নে যাবারই নামান্তর। যে ছেলে মুখস্থ-বিদ্যার তৎপরতায় সরকারি বা সওদাগরি দফতরের উচ্চতম কুরশিতে অধিষ্ঠানের যোগ্যতা অর্জন করে, বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে সেই ছেলে সোনার টুকরো, হিরের টুকরো। যে ছেলে লেখাপড়া শিখেও আর্টের মতো সৃজনধর্মী কিছু করার কথা ভাবে, গড্ডলপ্রবাহের সুখ না চেয়ে নিজেকে অপূর্ব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত করতে চায়, বাঙালি ভাবে তার মতিভ্রম হয়েছে। ইংরাজিতে অসাধারণ দক্ষতা সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায় নামের ছাত্রটি ইংরাজিতে উচ্চশিক্ষার জন্য না গিয়ে আর্ট করছে জেনে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ভেবেছিলেন, মেধাবী ছেলের দুর্মতি হয়েছে।

বাঙালি মনীষী হিসাবে চিহ্নিত অনেকেরই ক্ষেত্রে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। জীবনের প্রথম পর্বে কৃতবিদ্য হলেও মধ্য বয়সে পৌঁছে তাঁরা সৃষ্টিশীল কাজকর্ম ছেড়ে বাণীবিতরক মনীষী হয়ে যান। এদিক থেকে ব্যতিক্রমদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। এই দুজন রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়। ব্রাহ্ম উত্তরাধিকারার্জিত মূল্যবোধের জন্যই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক, এই দুজন জীবনের সবক্ষেত্রে কিছু কঠোর নিয়ম এবং সময়বোধ মেনে চলতেন। এই ঘড়িধরা সময়বোধ, পরিমিতিবোধ তাঁদের কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনে সহায়তা করেছে। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবে পরিচিতি ও যশের থেকে চিত্রবিদ্যায় পৌঁছেছিলেন। সত্যজিৎ রায় চিত্রবিদ্যা থেকে চলচ্চিত্রের জগতে পৌঁছেছিলেন। দুজনের ক্ষেত্রেই চিত্রবিদ্যায় অধিকার লক্ষ্য করা যায়। বাঙালি মনীষী সাধারণত একমুখী, বড়জোর দ্বিমুখী। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিতের প্রতিভা ছিল বহুমুখী, বিচিত্রদ্যুতিক। দুজনের কেউই চিত্রবিদ্যাকে মতিচ্ছন্নতার পথে যাবার দুর্মতি হিসাবে দেখেন নি। এদিক থেকে তাঁদের বিচারবোধ ছিল মধ্যবিত্ত মানসিকতার ঊর্ধ্বে। মধ্যবিত্তের মানসিকতা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলেই যখন অভিজাত শিল্পরসিক বাঙালিও বিজ্ঞাপনশিল্পকে দেশলাইয়ের লেবেল ভেবে নাক সিঁটকোতো, তখন সত্যজিৎ, প্রেসিডেন্সির মতো এলিটিস্ট কলেজের ছাত্র, শান্তিনিকেতনের মতো ফিনিশিং স্কুলের ছাত্র হয়েও পঁয়ষট্টি টাকা বেতনে বিজ্ঞাপন শিল্পীর চাকরি নিয়েছিলেন, তিনি ভদ্রলোকের মতো ফাইন আর্ট করেন নি। এই ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

ছবি আঁকায় সত্যজিৎ বস্তুত স্বশিক্ষিত ছিলেন। ঠাকুরদা ও বাবার অঙ্কনপ্রতিভা, পরিবারের পরিবেশ ও রুচিবোধ থেকে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে সৃজনবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল—তিনি আঁকার তুলি আর লেখার কলম হাতে না নিয়ে পারেন নি। শান্তিনিকেতনে তিনি কলাভবনে ছবি আঁকা শেখার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। কলাভবনে সিলেবাস রুটিন পরীক্ষা ইত্যাদির কোনো কড়াকড়ি ছিল না। ছাত্ররা যাতে শিক্ষকদের সান্নিধ্যে আপনা থেকেই স্বাধীন সৃষ্টির পথে এগোতে পাবে, এমনই একটি পরিবেশ

কলাভবনে তৈরি ছিল। ছাত্রদের উপরও কাজের বোঝা চাপানো হতো না। হাত মকসোর সঙ্গে সেখানে ইন্দ্রিয়শিক্ষার উপযুক্ত বাতাবরণ ছিল। অনেকের ধারণা, কলাভবনে তিনি ক্লাস-টাস করতেন না। কিন্তু কলাভবনের সংগ্রহে সত্যজিৎ রায়ের করা যে লিনোকাট আছে, তা সেই ধারণা দূর করে। তবে ক্লাসের কাজে তিনি খুব একটা গা লাগাতেন না, এমন কথাও তাঁর শিক্ষকেরা বলেছেন। কিন্তু সত্যজিৎ রায় বলেছেন, নন্দলালের সান্নিধ্যে না এলে তাঁর 'পথের পাঁচালী' সম্ভব হতো না। এই কথার সত্যতা রয়েছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনের ইন্দ্রিয়শিক্ষার মধ্যে। বলা বাহুল্য, কলাভবনে সাবেক আর্টস্কুলের মতো বন্ধ ঘরে কৃত্রিম আলোর নিচে জড়বস্তু রেখে ছবি আঁকা শেখবার রেওয়াজ ছিল না। সেখানে উন্মুক্ত পরিবেশে, সাঁওতাল গ্রামে, আশপাশের বসতিতে, গাছপালা বাগানে অবাধ বিচরণের মধ্যে চলমান জীবনের অনুপুঙ্খ অবলোকনের ও স্কেচ করার যে ধরতা তিনি পেয়েছিলেন, তারই পরিণামে 'পথের পাঁচালী'র মতো সংবেদনশীল অনুপুঙ্খের রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল। কলকাতার কৃত্রিমতার বাইরে শান্তিনিকেতনে প্রত্যক্ষ সচল জীবনের সংস্পর্শেই তাঁর সংবেদন যে জাগ্রত হয়েছিল, নন্দলালের তৈরি সিলেবাস রুটিনের রসহীনতা মুক্ত বাতাবরণে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেখানেই তাৎকালিক ইংরাজির অধ্যাপক অ্যালেক্স অ্যারোনসনের সাহচর্যে ও সান্নিধ্যে সংগীতের প্রতি তাঁর আগ্রহ নিবিড় হয়ে উঠেছিল। পরিবারে সংগীতের, শিল্পের, সাহিত্য-সংস্কৃতির ও বিবিধ বিদ্যাচর্চার যে পরিবেশ তৈরি ছিল, তারই বিস্তার সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনে পেয়েছিলেন।

কলাভবনে নির্দিষ্ট সময় পার না-করেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন ও বিজ্ঞাপনসংস্থায় চাকরি নেন। তাঁর ঠাকুরদা ও বাবা ফাইন আর্টের চর্চা করেন নি। এদেশের শিশুদের কথা ভেবেই তাঁরা লেখার কলম ও আঁকার তুলি হাতে নিয়েছিলেন। শিশুমনের খোরাক জোগানের জন্য তাঁরা কেবল সাহিত্যরচনাকেই নির্ভর করেন নি, সেই সাহিত্যরচনার সমান মানের সচিত্রণেও তাঁরা তৎপর হয়েছিলেন। বুক ইলাস্ট্রেশনকে অনেকে বিজ্ঞাপনশিল্প মনে করলেও সত্যজিতের ঠাকুরদা ও বাবা উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার সে ধরনের ছুঁৎমার্গে বিশ্বাস করতেন না। সত্যজিৎও তা করেন নি। বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসিক শর্তবদ্ধতা তাঁর ছিল না।

হালে বিজ্ঞাপনশিল্প আলোকচিত্রনির্ভর। সত্যজিৎ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে বিজ্ঞাপনশিল্পে আসেন তখন বিজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ ভিশুয়্যাল বা ছবি হাতে আঁকতে হতো। বলা বাহুল্য, আঁকায় অতি পারঙ্গম না-হলে এই লাইনে নেওয়া হতো না। সত্যজিৎ যেসব ছবি বিজ্ঞাপনের ভিশুয়্যাল হিসাবে এঁকেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো ম্যালেরিয়া নিরোধক বড়ি প্যালুড্রিন-এর জন্য ভিশুয়্যাল।

প্যালুড্রিনের ভিশুয়্যাল থেকে সিগনেট প্রেসের বইয়ের সচিত্রণও তাঁর ফেলুদা-প্রফেসর শঙ্কু ও অন্যান্য গল্পের সচিত্রণে আমরা অঙ্কনের তিনটি বিশিষ্ট শৈলী লক্ষ্য করি এবং এই সূত্র থেকেই চলচ্চিত্রের ভিশুয়্যালের সঙ্গে তাঁর ছবির ইমেজের একটি আন্তর্সম্পর্ক দেখতে পাই। এই আন্তর্সম্পর্কের দিকটি সত্যজিৎ সম্পর্কিত কোনো রচনায় কেউ দেখেন নি।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, চিত্রজগৎ থেকেই সত্যজিৎ চলচ্চিত্র জগতে পৌঁছেছিলেন

এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' কিশোর সংস্করণের ছবি আঁকার সূত্রেই তিনি এই গল্পের চলচ্চিত্রের কথা ভেবেছিলেন। সম্ভবত, চিত্রকর যে গূঢ় অভিনিবেশে অনুপুঙ্খসহ দৃশ্যজগৎকে দেখেন সাহিত্য, কাব্য, নাটক বা অন্য মাধ্যমের শিল্পী সেভাবে দেখেন না। এমন একটি উক্তি একবগ্‌গা শোনাতে পারে বলেই এর একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। চিত্রকলার প্রথম পাঠই হলো স্কেচ ও স্টাডি যা দৃষ্টজগতের আধারে করতে হয়। স্কেচে চিত্রকর চলমান রূপের ছন্দটি অতি দ্রুত তাৎক্ষণিক রেখায় ধরেন, সেখানে রূপের ভঙ্গি ও ছন্দই বিবেচ্য। প্রতিটি রূপের একটি বিশেষ চরিত্রগত ভঙ্গি আছে যে ভঙ্গিতে রূপটি আপনাকে অভিব্যক্ত করে। এই বিশেষ ভঙ্গি, অন্তর্নিহিত ছন্দ ধরাই স্কেচের কাজ, যা চট্‌জলদি করতে হয়। স্টাডি বা অনুশীলনে শিক্ষানবিস তন্নতন্ন করে অনুপুঙ্খকে দেখেন। শিল্পী চর্মচক্ষু দিয়ে যা দেখেন তারই বিশ্বস্ত, স্বভাবনিষ্ঠ রূপটি তিনি রেখারঙে, কলমেব আঁচড়ে, তুলির ছোপে অনূদিত করে দৃষ্টজগতের সদৃশরূপটি আঁকেন। সুতরাং তাঁকে রূপের ভঙ্গি, ছন্দ, বিশ্বস্ত বিবরণ সবই তৈরি করতে হয়।

শিল্পী এই স্কেচ ও স্টাডি পর্বে স্বভাবনিষ্ঠ দৃশ্যরূপটিই সরাসরি ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু কাব্যে, গল্পে-উপন্যাসে, নাটকে সাহিত্যিক যা দেখেন সেটিকে তিনি শব্দরূপের মাধ্যমে অনুবাদ করেন। ছবিতে যে দেখা দৃষ্টরূপেই উঠে আসে, সাহিত্যে সেই দেখা শব্দরূপের অনুবাদে মাধ্যমান্তরিত হয়। ছবিতে দর্শক দেখেন হুবহু, সাহিত্যে পাঠক শব্দসজ্জার ভিতর দিয়ে দেখার একটি কল্প-প্রতিরূপ তৈরি কবে নেন। দৃষ্ট জগতের বিশ্বস্ত প্রতিরূপ নির্মাণে চিত্রকর কেবল তন্নতন্ন করেই দেখেন না, তিনি কতখানি বিশ্বস্তভাবে দেখেছেন, তার উপর তাঁর দেখার সার্থকতা নির্ভর করে। স্টাডির দেখায় তাই বাছবিচার চলে না, যা চলে সাহিত্যের প্রয়োজনে দেখায়।

সত্যজিতেব আঁকা ছবিগুলি সচিত্রণমুলক অর্থাৎ সাহিত্যসঙ্গযুক্ত বা কোনো প্রদত্ত প্রসঙ্গের চিত্রণ। এদিক থেকে তাঁর আঁকা সচিত্রণমূলক ছবিগুলিকে স্পষ্ট তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

প্যালুড্রিনের বিজ্ঞাপনটিকে আমরা তাঁব আঁকা প্রথম পর্বের ছবি হিসাবে দেখি। এই ছবিতে সূক্ষ্ম কলমের রেখায় ঔপনিবেশিক আমলের গৃহসজ্জাসহ এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বৈঠকখানার ছুটিব দিনেব পরিবেশ অত্যন্ত অনুপুঙ্খসহ কৌতুকজনকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ ছবিতে যা দেখা যায়, এখানেও তেমনি সমস্ত ঘটনাটাই শিল্পী একটু দূরত্ব থেকে দেখেছেন, অর্থাৎ ছবির পুরোভূমিতে কোনো প্রধান পাত্রপাত্রী বা ঘটনাটি উপস্থিত নয়। মূল ঘটনাটি উপস্থাপিত একেবারে ছবির মধ্যবিন্দুতে। গোটা ব্যাপারটাই ঘটে যাচ্ছে দর্শক থেকে একটা ভিশুয়্যাল দূরত্বে। এ ছাড়া সবকিছুই সমানভাবে অনুপুঙ্খমণ্ডিত। এখানে কোনো একটা বিশেষ জায়গার উপর জোর দেওয়া হয় নি। গোটা ছবিই সূক্ষ্ম সমান রেখায় আঁকা এবং মডেলিং বা ছায়াতপের আভাসবর্জিত।

দ্বিতীয় পর্বের ছবি হিসাবে আমরা সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত ছোটোদের বইগুলির সচিত্রণের দিকে তাকাতে পারি। যেমন 'নালক', 'আম আঁটির ভেঁপু' ইত্যাদি। এই বইগুলি সচিত্রণ স্টাইলাইজড এবং এখানে তিনি কলমের সঙ্গে তুলিও ব্যবহাব

করেছেন। ছবিগুলি প্যানেলধর্মী এবং তুলিতে টানা মোটা থেকে সরু পরিণাহ বা কন্টুর রেখার ভিতর দিকে তিনি আঁজির মতো ছোটো ছোটো তির্যক রেখার সারি টেনে সামান্য মডেলিং বা ডৌলের আভাস দিয়েছেন। এই ছবিগুলিতেও অবয়বগুলি বা রূপগুলিকে দর্শক একটু ভিশুয়্যাল দূরত্বে দেখতে পান। সুকুমার রায়ের বইতে আঁকা তাঁর ছবিগুলিতে হাস্যরসের সঙ্গে তাল দিয়ে কমিক্যাল সিচুয়েশন তৈরির ব্যাপার দেখা যায়। এখানে তিনি কলম, তুলি একই সঙ্গে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ ও সুকুমারের বইয়ের সচিত্রণেই তাঁর শৈলী সবচেয়ে বেশি স্বাধীন এবং স্ফূর্ত। স্বভাবনিষ্ঠতার বা ন্যাচারেলিজমের পরিবর্তে একটি কল্পনাপ্রসূত সিচুয়েশন তৈরিই এইসব লেখকের বইয়ের জন্য আঁকা ছবিতে আমরা লক্ষ্য করে থাকি।

এরপরে তৃতীয় বা শেষ পর্বের ছবি, যা তিনি আঁকেন তাঁর নিজেরই বইয়ের জন্য। সেই ছবিতে ঘটে সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যা বাঙলা বইয়ের সচিত্রণের জগতে বলা যায় অভিনব।

এর আগেও আমরা বাঙলা বইয়ের সচিত্রণে বহু সক্ষম চিত্রকবের দেখা পেয়েছি যাঁদের ছবি তুলনাহীন। কিন্তু সেই তুলনাহীনের দলেও সত্যজিৎ তাঁব অসাধাবণত্বে হয়ে উঠলেন বিশিষ্ট।

তাঁর এই বৈশিষ্ট্য আমরা কয়েকটি ছবি থেকেই বুঝতে পারি। উদাহরণ হিসাবে আমরা 'জয় বাবা ফেলুনাথে'র বাবো সংখ্যক পৃষ্ঠাব ছবি দেখতে পাবি। এইসব ছবি তিনি কলমে তুলিতে নানা স্থূলত্বের রেখায়, কোথাও কালোর আয়তনে, এঁকেছেন। ঐ ছবিটিতে কেদারঘাটে চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকা মছলিবাবাব পেছন দিক গাঢ় কালোতে লিপ্ত এবং এই চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকা মছলিবাবার অবয়ব যেন ছবির পুরোভূমি জুড়ে দর্শকের কাছে চলে আসছে। মধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে অঘোর চক্কোত্তি আর দূর পৃষ্ঠভূমিতে ছাতার নিচে একটি অবয়ব, রেখাব হ্যাচিং-এ লিপ্ত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ফোটোগ্রাফেব মতো তিনটি অবয়বকে শিল্পী পার্সপেক্‌টিভ বা পরিপ্রেক্ষিতের ধর্ম ও অনুপাত অনুসারে ছবিব তিনটি মাত্রায় বা পুবোভূমি, মধ্যভূমি ও পৃষ্ঠভূমিতে সাজিয়েছেন, যা দেখতে একেবাবে সিনেমাব ভিশুয়্যালের মতো। তাঁর শৈলীও এখানে স্বভাবধর্মী। রেখাব প্রয়োগ, কালো আয়তনের প্রয়োগেও তিনি পবিপ্রেক্ষিতগত ত্রিমাত্রিকতা ব্যবহার করেছেন। এই ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে সিনেমাব ফোটোগ্রাফ বা ভিশুয়্যালের জ্ঞান ছাড়া এই ছবি আঁকা বা কল্পনা কবা সম্ভব নয়।

এই পর্বে তাঁর ছবির কল্পনা সিনেমার ফ্রেমের ভিশুয়্যালেব সঙ্গেই মিলে গিয়েছিল এবং সচিত্রণ ও চলচ্চিত্র—এই দুটি মাধ্যমেব সেতুবন্ধ ঘটেছিল।

'কৈলাশে কেলেঙ্কাবি'ব আশি সংখ্যক পৃষ্ঠার চমকপ্রদ ছবিতে পুবোভূমির দুটি অবয়বের মাথা তুলির মোটা বেখায় কণ্টুবে আঁকা। যেন ঐ দুটি সামনে দাঁড়ানো মানুষেব কাঁধের ভাগ দিয়ে আমরা অন্ধকারে হঠাৎ টর্চ ফেলা বক্ষিতকে দেখছি, অন্ধকারে আবছা মূর্তির মতো, ঠিক যেমন চোখের উপর টর্চেব আলো ফেললে পেছনেব লোকটিকে দেখায়। এই ডাইমেনশনে বা ত্রিমাত্রায় দেখা, এই কাঁধের উপর দিয়ে বা আর্শ্চয সব অ্যাঙ্গল থেকে দেখার ব্যাপারটা তিনিই কল্পনা করতে পারেন যাঁব সিনেমাব ভিশুয়্যাল সম্পর্কিত জ্ঞান রয়েছে। এই বইযের একুশ সংখ্যক পৃষ্ঠায় গাড়ির ভিতব থেকে দেখা মানুষ, দূরের গাড়ি, দূরের মানুষেও সেই ত্রিমাত্রিক ব্যাপার ও আশ্চর্য অ্যাঙ্গল লক্ষ্য করা যাবে। 'ডবল ফেলুদা' বইয়ের বাষট্টি সংখ্যক পৃষ্ঠার ছবিতে সেই ত্রিমাত্রিকতা ছাড়াও মনে হবে উপর থেকে ক্যামেরা তাক কবে ছবি তোলা হয়েছে।

এ ছাড়াও, এইসব ছবিতে কাট অফ এজ্-ব্যাপার, চলচ্চিত্রের মতোই লক্ষ্য করা যায়, যে কাট্ অফ এজ্-ব্যাপার আমবা দেগা-র ছবিতে পাই। 'কৈলাশে কেলেঙ্কারি'র পাঁচ সংখ্যক পৃষ্ঠায় মূর্তির মাথা হাতে ফেলুদার অবয়ব ছবির পুরোভূমিতে আধখানা দৃশ্যমান, যা ছবিকে বিস্তার দিয়েছে। এইভাবে বিশেষ করে পুরোভূমি ও মধ্যভূমির অবয়বে কাট্ অফ এজ্ ডিভাইস্ ব্যবহাব করে সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের ফ্রেমকেই ইলাস্ট্রেশনে এনেছেন।

'কৈলাশে কেলেঙ্কারি'র একুশ সংখ্যক পৃষ্ঠাব ছবিতে, 'ছিন্নমস্তাব অভিশাপ' বইয়ের বাষট্টি সংখ্যক পৃষ্ঠার ছবিতে দেখা যাচ্ছে গাড়িব পিছনের দিক, বাঘেব সামনের দিক-বাকিটা এখনো ফ্রেমে ঢোকে নি। এ কারণেও এই পর্বেব ছবিতে ফোটোগ্রাফির ফ্রেমের ব্যাপারটি আরো বেশি করেই বর্তেছে। এই কাট্ অফ এজের ব্যাপার গল্পের সচিত্রায়নে ছিল অভিনব।

ডাইমেনশন বা মাত্রাগত দূরত্ব তিনি অবযবেব আনুপাতিক আয়তন, আসবাবেব

বিন্যাস, রেখার ও কালোর ব্যবহার দিয়ে করেছেন যার দরুন তিনটি মাত্রার পারস্পরিক অবস্থিতির মধ্যেও স্পেস্ রিলিফ তৈরি হয়েছে। এই পর্বের অঙ্কন যেমন স্বভাবনিষ্ঠ, অঙ্গেলেব দিক থেকেও ছবি যেমন বৈচিত্র্যে ভরপুর এবং প্রতিটি ছবিই উপস্থাপনার দিক থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি এই পর্বেব শৈলীও সবচেয়ে বৈচিত্র্যময। নানা স্থূলত্বের রেখা, কালোর আয়তনিক প্রয়োগ, স্ক্রিন ও হ্যাচিংএর প্রয়োগ অনুপাত এবং প্রয়োজনমতো ব্যবহৃত হয়েছে।

এই পর্বেব সচিত্রণে সত্যজিৎ তাঁর তিনটি মাধ্যমকে এক সূত্রে গেঁথেছিলেন। এক, নিজেরই গল্পেব বর্ণনার ভিশুয়েলাইজেশন হিসাবে এই ছবি আঁকা, এখানে গল্প থেকে ছবির জন্ম। দুই, এই বর্ণনার বিশ্বস্ততার খাতিরে তিনি স্বভাবনিষ্ঠ অঙ্কনের আশ্রয় নিয়েছিলেন, যা সিনেমায় স্বভাবনিষ্ঠ ভিশুয়্যাল দিয়ে দেখানো হয়ে থাকে। তিন, গল্পের স্বভাবনিষ্ঠ ভিশুয়েলাইজেশনে তিনি সিনেমার ক্যামেরা ম্যানের চোখ, অ্যাঙ্গেল, পরিপ্রেক্ষিত, ভিশ্যুয়্যাল রিলিফ ও বৈচিত্র্য দিয়েই গল্পের এক-একটি প্রসঙ্গ বা মুহূর্তকে যেন সিনেমার ফ্রেমেই বেঁধেছিলেন।

চিত্রকর সত্যজিতের এই ছবিতেই তাঁর সৃষ্টির বিচিত্র মাধ্যমগুলি সার্থকভাবে এসে সমন্বিত হয়েছিল বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। সত্যজিতের ছবিতে সেই বিভিন্ন মাধ্যমের আন্তর্সম্পর্ক অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্তর্সম্পর্কের দিকটি সত্যজিৎ-বিশ্লেষণে কেউ করেন নি। চিত্রবিদ্যা দিয়ে ও চিত্রকর-জীবিকায় তাঁর জীবনের শুরু হয়েছিল। শেষে তিনি হলেন চলচ্চিত্রকর। চলচ্চিত্রকব হয়ে তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের রূপায়ণে যেমন চিত্রকরের দৃষ্টিতে দেখা ডিটেল্‌স বা অনুপুঙ্খের ব্যাপার, চিত্রকরের কম্পোজিশন আনলেন, তেমনি তাঁর আঁকা গল্পের ছবিতেও দেখা গেল চলচ্চিকরের দৃষ্টিগত ব্যাপার। শান্তিনিকেতনেব শিক্ষায় ইন্দ্রিয়শিক্ষার ব্যাপার তাঁকে জীবনের দিকে গভীরভাবে তাকাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই ইন্দ্রিয় শিক্ষা স্টিললাইফ স্টাডির মতো জড়বস্তুর চর্চা ছিল না। শান্তিনিকেতনের স্কেচে চলমান জীবনের মূল ছন্দ ও গতির প্রাণময়তা ধববার কথাই ছাত্রদের বলা হতো। এই শিক্ষাতেই তাঁর সচিত্রণেও যেমন কোনো অবয়বেই জড়ত্ব নেই, প্রতিটি অবয়ব সপ্রাণ, গতিময়, ভঙ্গিময়, তেমনি তাঁর চলচ্চিত্রেও স্থির মূহুর্ত আমরা পাই না। এইখানেই চিত্রকর সত্যজিতের বৈশিষ্ট্য।

বস্তুত, প্রথম দুটি পর্বের ছবি ছিল আলঙ্কারিক, সমতলীয় ও নকশাগত মজ্জার দিকেই লক্ষ্য ছিল নিবদ্ধ। শেষ পর্বের ইলাস্ট্রেশন হয়ে উঠেছিল ত্রিমাত্রিক, স্বভাবনিষ্ঠ, চলচ্চিত্রের মতোই স্পেসের গভীরতাসম্পন্ন এবং এই পর্বেই তাঁর চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র হয়েছিল সমন্বিত। চিত্রকলাকে তিনি চলচ্চিত্রের এবং চলচ্চিত্রকে চিত্রকলাব দৃষ্টিতে মিলিয়ে দিয়ে বাঙলা ছবিতে অসাধারণ কাণ্ড করেছিলেন।

সত্যজিৎ রায়ের করা বিজ্ঞাপন চিত্র

সত্যজিৎ রায়ের করা 'এক্ষণ পত্রিকা'র প্রচ্ছদ

৫

'শাখা প্রশাখা' ছবির আবহসংগীতের একাংশের স্বরলিপি

সত্যজিৎ রায় ঃ সংগীত ও সংগীতবীক্ষা

সুধীর চক্রবর্তী

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে সংগীতেব সঙ্গে আমাদের যে অভিজ্ঞতা ঘটে, তা মিশ্র ধরনের। তাঁর ছবিতে খাঁটি ভারতীয় রাগরাগিণী আছে, পাশ্চাত্য সুরকারদের প্রসিদ্ধ কিছু রচনার মনোজ্ঞ প্রয়োগ আছে আবার খাঁটি বাংলা গান ও রবীন্দ্রসংগীতের স্বাভাবিক বিন্যাস আছে। এর বাইরে ছবির লোকেশন অনুযায়ী স্থানীয় লোকসংগীতের কিছু টুকরো ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। খানদানী রাগদারী কিছু কিছু বিখ্যাত খেয়াল-ঠুংরির অনুষঙ্গ তাঁব ছবিতে ভাবাবহ নির্মাণের ব্যাপাবে কাজে লাগিয়েছেন। তাছাড়া, যেমন 'ঘরে বাইরে' ছবিতে বিমলার বিলিতি গান শেখার সুবাদে ইংরেজি গানের একটু ভিক্টোরিয়ান ধরন তিনি অনায়াসে আমাদের উপহাব দেন। দীক্ষিত শ্রোতা অবশ্য এতটাও লক্ষ করেন যে 'শাখাপ্রশাখা' ছবিতে প্রশান্তর অন্তর্মনের পরিশুদ্ধ চেতনাকে বোঝাতে গিয়ে সত্যজিৎ বায় 'গ্রোগেরিযান চ্যান্ট'-এর মতো দুর্লভ সুরবিন্যাসকে অসামান্য সামর্থে বুনে দেন। এতসব কিছুর পরেও সত্যজিৎ বায়ের সাংগীতিক সৃজনী ও সৃষ্টিব মেধা নতুন নতুন পথ খোঁজে। 'তিন কন্যা' থেকে 'আগন্তুক' পর্যন্ত তাঁর নানা চলচ্চিত্রের নিরীক্ষায় বিভিন্ন মুড, বিভিন্ন অ্যাকশন ও বিভিন্ন সিচ্যুয়েশন বোঝাবার জন্য তিনি তৈরি করেন ছোট ছোট মিউজিক্যাল পিস্। যেমন 'তিনকন্যা'ব অন্তর্গত 'মণিহারা'য় The Fateful Night, 'কাঞ্চনজঙঘা'য় The Mist, 'চারুলতায' Bhupati's Grief, 'সোনার কেল্লা'য় The Camel Ride, 'পিকু'তে Grandpa's Death, 'ঘরে বাইরে'ব Nikhilesh-Theme। এইসব সাংগীতিক অনুষঙ্গের টুকরো দেশি-বিদেশি যন্ত্রানুযঙ্গ মিশিয়ে সত্যজিৎ রায় ছবির চিত্রনাট্যের সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি করে নিয়েছেন। সেইদিক থেকে বিচার করলে সংগীত সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে একটি অবিভাজ্য অংশ এবং অত্যাজ্য স্মৃতি।

শিল্পের মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রকে আধুনিককালে আমাদের এক মিশ্র মাধ্যম বলেই মনে হয়। এতে দৃশ্য ও শ্রব্যগুণ ছাড়াও নাট্য এবং অন্য নানা শিল্প বিভঙ্গ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে আধুনিক চিত্র-ভাষার সর্বাঙ্গীণ পারদর্শিতার খুব নিপুণ পরিচয় আছে। তার কাবণ ছবি তুলতে তুলতে একটার পর একটা অভিজ্ঞতায় জাবিত হতে হতে তিনি চলচ্চিত্রেব প্রতিটি উপাদান সম্পর্কে সচেতনতায় উত্তরণ করতে থাকেন। প্রাথমিকভাবে তাঁর ছবিগুলিতে চিত্রনাট্যের পারিপাট্য, দৃশ্যরচনাব চিত্রকল্প এবং ডিটেলসের ব্যবহাব আমাদের চমকে দেয়। ছবিগুলির অন্তর্নিহিত দেশীয়তা ও সাহিত্যগুণ আমাদের যতটা আকৃষ্ট করে সেই অনুপাতে সাংগীতিক প্রযোগ কিছুটা আরোপিত মনে হয়। তার কারণ রবিশঙ্কব, আলী আকবর বা বিলায়েৎ খাঁব মতো অভিজ্ঞ শিল্পী ও স্রষ্টা যতই সাংগীতিক উৎকর্ষ দেখান তবুও তা সত্যজিতের প্রথম কটি ছবিব সঙ্গে

অবিভাজ্যভাবে মিশে যেতে পারেনি। তবুও যে সত্যজিৎ তাঁর প্রথম দিকের ছবি কটিতে অন্য সুরকারদের ওপর নির্ভর করেছিলেন তার কারণ চলচ্চিত্রের সাংগীতিক মাধ্যম সম্পর্কে তাঁর সেই সময়কার সরেজমিন অনভিজ্ঞতা বা সংশয়। ১৯৬১ সাল বরাবর 'তিন কন্যা' ও তথ্যচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ' করবার সময় তিনি সংগীত পরিচালনার কাজটি নিজেই করতে শুরু করেন। আসলে চলচ্চিত্রে সংগীত প্রয়োগের ও সাংগীতিক অনুষঙ্গ রচনার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগবিধি ততদিনে তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছেন। সত্যজিৎ রায়ের নির্মাণ ও সৃষ্টির ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, তিনি চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত সবকিছুই নিষ্ঠা ও প্রয়াসের সঙ্গে আত্তীকরণ করে নিতে পারতেন। পাশ্চাত্য স্টাফ নোটেশন রচনার কৌশল আয়ত্ত করে তাঁর ঘরের অর্গানে প্রয়োজনীয় মিউজিক্যাল পিস, আবহসংগীত এমন কি স্বরচিত গানের সুর তৈরি করে নিতেন। তাঁর গ্রহিষ্ণু মন বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীতের সুরের বিন্যাসকে সহজেই ধরতে পেরেছিল। সেইজন্যই 'সোনার কেল্লা'য় রাজস্থানী লোকগীত, 'কাঞ্চনজঙঘা'য় পাহাড়ী গানের সুর আবার 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ বেনারসী ঘরানার গান তিনি সুন্দরভাবে গ্রথিত করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীতের নানা পর্যায় তাঁর চলচ্চিত্রে খুব সংযতভাবে ও শিল্পীজনোচিত গভীরতায় ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষণীয় যে তাঁর ছবিতে, এমনকি শ্যামাসংগীত, ফিকিরচাঁদী ও অতুলপ্রসাদের গান প্রযুক্ত হয়েছে কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তকে তিনি একেবারেই ব্যবহার করেননি।

চলচ্চিত্রে সতজিৎ রায়ের সংগীতভাবনা যে বিশেষভাবেই সফল এবং আলোচনাযোগ্য তার কারণ সংগীত তাঁর ছবিতে কোন অবকাশ বিনোদন বা ফাঁক ভরানোর কাজে আসেনি। সংগীত তাঁর সামগ্রিক চিত্রভাষার একটি অপরিত্যাজ্য উপাদান। তাঁর সামগ্রিক চলচ্চিত্র ভাবনার যে সুনির্দিষ্ট ছক অবলম্বনে তাঁর ছবিগুলি গড়ে ওঠে, তার মর্মমূলে সাংগীতিক ভাবনাও গৃহীত। চিত্রনাট্য রচনার স্তর থেকেই তাঁর সংগীতভাবনার সূচনা ঘটত। একদিক থেকে ভাবতে গেলে চলচ্চিত্র ও সংগীতের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম মিল আছে। সত্যজিৎ রায় একটি সাক্ষাৎকারে একবাব বলেছিলেন ঃ

'মূলত একটি ভীষণ মিল আছে চলচ্চিত্র ও সংগীতে। ...ফিল্মে একটা অন্ধকার ঘরে যখন আপনাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল তখন ঐ দেড় ঘণ্টা ধরে পুরোটা চলার পরে ঐ একবারের মধ্যেই আপনাকে পুরো জিনিসটা বুঝে ফেলতে হচ্ছে। সেরকম সংগীতও। একটা রেকর্ডের ওপর আপনি যখন নিডলটা রাখলেন যতক্ষণ না রেকর্ডটা শেষ হচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট সময়, সেই সময়ের মধ্যে তার বিস্তৃতি, তার ফর্ম। এই ফর্মটাই হচ্ছে একটা সময়ের মধ্যে বিস্তৃত যেটার এদিক-ওদিক করবার উপায় নেই। সংগীত যেরকম, চলচ্চিত্রও সেরকম। একটা ভীষণ মিল রয়েছে। কাজেই সংগীতে যেমন ছন্দের প্রয়োজন, চলচ্চিত্রেরও তেমনি ছন্দের প্রয়োজন।'

'তিনকন্যা' থেকে 'আগন্তুক' পর্যন্ত তিরিশ বছর ব্যাপী সত্যজিৎ রায় তাঁর বিভিন্ন চলচ্চিত্রে সংগীত যোজনা করেছেন। সচরাচর বাংলা চলচ্চিত্রে সংগীত যেমন একটা চাপিয়ে দেওয়া বিষয় বলে মনে হয়, যেন দুধের ওপরে সর, সত্যজিতের চলচ্চিত্র ও সংগীত তেমন মনে হয় না, কেননা তা মূল নির্মিতিরই অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

I get my ideas fairly quickly—sometimes as early as in the scenario stage. I jot them down as they come. Usually they come clothed in a certain orchestral colour, and I make a note of that too. But the actual work of scoring has to wait until I am through with everything else, including final cutting. Of all the stages of film making, I find it is the orchestration of the music that needs my greatest concentration.

সংগীত রচনার দক্ষতা এবং সাংগীতিক প্রয়োগের সিদ্ধতা—এই দুই ব্যাপারেই সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রে যে অভিনবত্ব ও সাফল্যের চিহ্ন রেখেছেন তার কয়েকটি নির্দিষ্ট সূত্র আমরা অনুমান করতে পারি। প্রথমত, নানাধরনের দেশি-বিদেশি সংগীত শোনার ও বোঝার পরম্পরা তাঁর পক্ষে ছিল স্বচ্ছ। দ্বিতীয়ত, পিতৃপিতামহ এবং মাতামহ ও মাতৃধারা থেকে তিনি একটি বলিষ্ঠ ও সুযোগ্য গানের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, যেহেতু আমাদের দেশ, বিশেষত বঙ্গদেশ হল গানেরই পরিবেশে সমৃদ্ধ, তাই গান রচনা বাঙালি স্রষ্টাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ কাজ। তাঁর পিতা সুকুমার রায়ও গান লিখেছেন। এইখানে একটি কথা স্পষ্ট করে বুঝে নিলে ভাল হয়। কথাটা এই যে, সংগীত ও গান কথা দুটির তাৎপর্য এক নয়। কেননা সংগীত বলতে সাধারণত বোঝায় music এবং গান বলতে বোঝায় song । এই দুইয়ের মধ্যে ব্যাপকতার দিক থেকে গানের ক্ষমতা সীমায়িত কেননা তা শব্দ বা বাণীতে আবদ্ধ। সেইজন্য এক দেশের উৎকৃষ্ট গানের রস আরেক দেশের শ্রোতা উপলব্ধি করতে পারে না। একই কারণে রবার্ট বার্নসের স্কচ গানে যেমন বাঙালি পুরো আনন্দ পায় না, তেমনই রামপ্রসাদী গানে সাহেবদের আনন্দ পাবার কারণ নেই। যদিও এই দু'রকম গানই নিজের নিজের দেশে খুব জনপ্রিয় ও রসোত্তীর্ণ। মিউজিকে এই বাণীর বাধা বা দেশীয়তার বেড়া নেই। তা প্রধানত যন্ত্রেই রূপায়িত হয়। বহুতর যন্ত্রে ও বিন্যাসে বিচিত্র ধ্বনি সুষমায়, স্বরে ও বিস্বরে। সেখানে মেলোডির চেয়ে হারমনির প্রাধান্য। যে সুর ও স্বর মানুষের কণ্ঠ দিয়ে উদগীত হতে পারে না তাকেই ধরতে চায় মিউজিক বা যন্ত্রসংগীত। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, 'অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে', সংগীতের কারবার সুরের এই অংশ নিয়ে যা স্বপ্নিত, কল্পিত, অসম-সুষম বিন্যাসে যার বিপুল প্রেক্ষাপট স্রষ্টার অন্তর্জগতে শুধু ধরা দেয়। তাকে ধরবার জন্যই পিয়ানো কিংবা অর্গ্যানের সৃষ্টি ও বিস্তার এবং সেই যন্ত্রের মধ্যে বিশুদ্ধ সংগীতের প্রাণভোমরাটিকে আবিষ্কার করবার জন্যই পাশ্চাত্যে জন্মেছিলেন হেডেন, মোজার্ট, বাখ, শুমান, শোঁপা, বেটোফেন বা চাইকভস্কির মত আত্মবেদনাভরা শিল্পী। তাঁদের আনন্দ আর আর্তি, নৈরাশ্য আর বিষাদ আবার উচ্ছলতা বা স্বপ্নাতুর রহস্য মিউজিককে নানা মাত্রা দিয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর একজন ভায়েলোনিস্ট ছিলেন—এই তথ্যের সঙ্গে বাড়তি যেটুকু আমরা জানি তা হল কৈশোর থেকে সত্যজিতের পাশ্চাত্য মিউজিক সম্পর্কে অনুরাগ ও নানা রেকর্ড শোনার অভিজ্ঞতা। বিশেষভাবে তাঁর পছন্দ ছিল বেটোফেন, বাখ ও মোজার্টের বাজনা। তাঁর নিজের ছবির জন্য পরবর্তীকালে এইসব বিখ্যাত সংগীতকারের নানা সুরের টুকরো যেমন তিনি ছবিতে ছিটিয়ে দিয়েছেন তেমনি এঁদের ভাবনার সাংগীতিক মেধা দিয়ে তৈরি করেছেন নানা মিউজিক্যাল পিস। তার ফলে বাংলা চলচ্চিত্রের

বহুদিনের ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক রচনার পারম্পর্য ভেঙে তাঁর ছবিতে সংগীতেব একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভর রূপ গড়ে উঠেছে। এই বিশেষ সংগীত নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানারকম যন্ত্রকে তিনি আশ্চর্য মিশ্রণে ব্যবহার করেছেন। সেতারের পাশে বেহালা, সরোদের পাশে চেলো, পিয়ানোর পাশে বাঁশি তিনি চটকদারি নৈপুণ্যে ভরিয়ে দিয়েছেন। তুলনামূলকভাবে পারকাশন যন্ত্র তাঁর সংগীত নির্মাণে কিছুটা কম ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু' গানে মেঘের অনুষঙ্গে পাখোয়াজের ব্যবহাব অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। 'চারুলতা' ও 'ঘরে বাইবে' ছবিতে যথাক্রমে 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' ও 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ' গান দুটির সুরের বিন্যাস অভ্যস্ত ধাঁচকে ভেঙে একটা টানা অর্কেস্ট্রায় রূপান্তরিত হয়ে শ্রোতার কাছে আনন্দদায়ক এক নতুন অভিভব সৃষ্টি করে। রবীন্দ্র-সংগীতের সুরেব চলনটি রক্ষা করে অথচ তার ধাঁচটি ভেঙে তিনি এসব জায়গায় এক ধরনেব নতুন মিউজিক সৃষ্টি করেছেন। তাঁব এই সৃষ্টির ইঙ্গিত যদি আমরা বুঝতে পারি তবে ভবিষ্যতে বাংলা চলচ্চিত্রে নেপথ্য সংগীত হিসাবে রবীন্দ্র সংগীতের যথাযথ সুর বাজানোর ছেলেখেলা বন্ধ হতে পারে।

সংগীত রচনায় দেশি-বিদেশি সুরেব মিশ্রণ ঘটানোর ক্ষেত্রে এবং গান বচনার সাবলীলতা থেকে সত্যজিৎ বায়ের সাংগীতিক বোধবুদ্ধি ও নৈপুণ্যের যে পরিচয় ফুটে ওঠে, তা অবশ্য আমার খুব বিস্ময়কর মনে হয না কাবণ তিনি বাঙালি এবং তাঁর আগে ববীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এই কাজ পারদর্শিতার সঙ্গে করে গেছেন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তাঁকে অনেক কিছু নতুন করে ভাবতে হয়েছিল। তাঁর চিত্রনাট্য রচনার কৌশল, ডিটেলেব ব্যবহার, ক্যামেবার দৃষ্টিকোণ, দৃশ্যসজ্জার বাস্তবময়তা এবং কুশীলবেব কস্ট্যুম সবই তাঁকে পুরনো পথ ভেঙে আবিষ্কার করতে হয়েছিল। কিন্তু সংগীত রচনা ও গান বাঁধার একটা সোজা সড়ক তাঁর সামনে তৈরি করা ছিল। তার একটা গড়পরতা কাঁচা রাস্তা ছিল যাত্রা ও থিয়েটারের পবম্পরায়। আব একটি পাকা রাস্তা ছিল রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত নির্মাণের মেধাবী ইঙ্গিতে। উনিশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধে এই দুজন বাঙালি সংগীতকার বাংলাগানের ভবিষ্যৎ বনিয়াদ গড়ে দিয়েছিলেন। এঁদের প্রয়াস একই সঙ্গে মঞ্চ ও লিরিককে আশ্রয় করেছিল। দু'জনেবই প্রচুর পরিমাণে বিলেতি নাটক ও অপেরা দেখার অভিজ্ঞতা ছিল এবং তার সুরসার তাঁরা বাংলাগানে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ভরে দিয়েছিলেন। তাঁদের গানে একটি সূক্ষ্ম নাটকীয় চলন এবং গঠনে দেশি-বিদেশি উপাদান মিশ্রণের কৃতিত্ব তারিফ করবার মতো। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনায়াস কৃতিত্ব লক্ষ্য কবা যায় 'বাল্মিকী প্রতিভা' গীতিনাট্যে। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে যে সত্যজিৎ বায় তাঁর 'ববীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে 'বাল্মিকী প্রতিভা'র একাধিক গানের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছিলেন আবিষ্ট হয়ে। ভবিষ্যতে 'বাল্মীকি প্রতিভা' নিয়ে আরও কিছু কাজ করবেন, এমন ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছিলেন। আমাদেব রামপ্রসাদ-নিধুবাবুর ঐতিহ্য ভরা লিরিকের দেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম অপেরাটিক দৃষ্টিভঙ্গি আনেন। সত্যজিৎ তাঁর চলচ্চিত্রে এই অপেরাটিক দৃষ্টিভঙ্গির নানা পরিচয় বেখেছেন। সবচেয়ে সফল পরিচয় তাঁর 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ও 'হীবক রাজার দেশে' ছবিতে। দুটি ছবিতেই অপেরার নানা বাঁক ও স্ফুরণ একটু খেয়াল কবলেই চোখে পড়ে। কিন্তু সবাই কি লক্ষ্য করেছেন যে গুপীর গানের সঙ্গে বাঘাও মাঝে মাঝে গলা মেলায়? অথচ তার শুধু বাজাবারই কথা। সবাই

বুঝেছেন কি এই প্রয়োগের তাৎপর্য যে গুপী-বাঘা তাদের গানের প্রতি পংক্তি কেন দু'বার করে গায়? এই দৃষ্টিভঙ্গিই তো অপেরাটিক। অন্তর্মর্ম লিরিকের ধার দিয়েও তারা যায় না।

কিন্তু বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে বড় যে দান তা হল গানকে রাগবশ্যতার হাত থেকে উদ্ধার করা। এঁদের আগে বাংলাগানের যে নির্মিতি তা অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, একটি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ রাগের (যেমন ইমন, খাম্বাজ বা ভৈরবী) ঠাটের ওপর বাণী বসিয়ে দেওয়া হত। কোন শব্দের বা গীতবাণীর যে আলাদা কোন ব্যাপকতা আছে সে কথা এই রাগ বিন্যাসে কোন মূল্য পায়নি। রাগ বিন্যাসে যে কাঠামোগত উচ্চাবচতা, তা রাগের নিয়মকেই মেনে চলেছে, বাণীর স্বতন্ত্র্যকে মূল্য দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে এবং দ্বিজেন্দ্রলাল অনেকাংশে গানের ক্ষেত্রে বাণীর স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেন স্বর ও সুরের নতুন বিন্যাসের উদ্ভাবনে। তার ফলে শ্রোতাদের পক্ষে নতুন এই অভিজ্ঞতা হয় যে, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' শুনলে মনে হয় একটা নতুন গান শোনা গেল। তার ঠাট যে ইমন, তা মনে রইল না।

শব্দের এই নতুন সুরময় দ্যোতনাকে আবিষ্কার করাই কম্পোজারের কাজ। কম্পোজার বলতে এখানে নিছক গীতিকার বা সুরকারকে বোঝায় না, তার চেয়েও অন্য মাত্রার ও অন্য মহিমার স্রষ্টাকে বোঝায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কম্পোজার সত্তার বহুমাত্রিক নিরীক্ষা রেখে গেছেন তাঁর নানা গানে। 'ও যে মানে না মানা' গানটির দ্বিতীয় পংক্তিতে 'না-না-না' তিনবার তিন সুরে উচ্চারিত হয়। তাতে ভাবের যে অভিনব দোলাচল ফোটে তা রবীন্দ্রনাথের আগে আমরা বাংলা গানে কখনও শুনি নি। কিংবা ধরা যাক 'আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে' এই গানে যে প্রস্ফুটতা তাকে রবীন্দ্রনাথ বোঝাবার জন্য বিন্যাস করেন এক নতুন সুরের ছক, যা বাংলা গানে অভিনব, তা শোনালেন।

মা-া পা II -গা-মা-দা/ -দপা-ণা ণদা। পা-া-া/পা দা পা। মা পা পা/ পদা-ণদা-পা। মগা-া-া/গ পা-া-া।
আ০০ ০ ০ ০০ ০ ০ লো ০ র্‌অমলকমল খা০ ০ ০ নি০ ০ ০ কে ০০০
। সা-ঋ-গা/-মা-পা-দা। -মা-পা-দা/ -ন-র্সা-র্ঋা। -ঋর্সা-া-র্জ্ঞ / র্জ্ঞ র্ঋা র্সা-া। ণা-া দা/ দা-পা-মা।
কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ফুট০ লে ০ ০ আ ০ ০
।-গা-মা-দা/ -দ পা- ণা ণদা। পা-া-া/ -া-া-া।
০ ০ ০ ০ ০ ০ লো ০ ০ ০ ০ র্‌

এই অভিনবত্ব ভাবে এবং সুরে সম্মিলিত। গানের ভাব রেখাকে অনুসরণ করলে বোঝা যায়, বিশেষ এক আলোর 'অমল কমলখানি' ফোটাই এখানে শেষ কথা নয়। তার গায়ে গায়ে উঠে এসেছে এই বিস্ময় যে সেই কমলখানি কে ফোটাল! কম্পোজারের সাংগীতিক মেধা কোন প্রচলিত রাগের সুনিশ্চিত গঠনকে অনুসরণ না করে ধরতে চেয়েছে ভাবের রহস্যকে। তার প্রথম রহস্য হচ্ছে এক অত্যাশ্চর্য আলো এবং তার অঙ্গাঙ্গী রহস্য হল, তা কে ফোটাল। সুরের গতিরেখা 'আলো' এবং 'কে' এই দুটি শব্দকে আশ্রয় করে অত্যাশ্চর্য বিচ্ছুরণে গানকে ভরে দেয়।

এমন গান, এমন অনেক গান যে দেশে আছে, সেই দেশে যদি সত্যজিৎ রায়ের মতো সংগীতমনস্ক সৃষ্টিশীল ও ইঙ্গিতগ্রাহী শিল্পী জন্মান এবং কাজে লাগাতে পারেন তাঁর সংগীতিক সৃজনসত্তাকে তবে তাঁর সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। তিনি তাঁর তিরিশ বছরের সংগীত

পরিচালকের জীবনে কম্পোজারের বহুরকম নিরীক্ষা ও উত্তরণের চিহ্ন আমাদের কাছে রেখে গেছেন। 'দেবী' ছবিতে —'এবার তোরে চিনেছি মা' সংগীত রচনায় তাঁর যে প্রথাবদ্ধতা, 'চিড়িয়াখানা' ছবিতে আড়ি ছন্দে 'ভালোবাসার তুমি কী জানো' গানে বাংলা থিয়েটারি ঢঙের অনুরণনকে অতিক্রম করে তিনি পৌছে যান সাবলীল 'গুপী গাইনে'র গানে। তাঁর সংগীতবোধ এক একটা উত্তরণ চিহ্ন এসব ছবিতে ধরা আছে। 'পথের পাঁচালী'তে ইন্দির ঠাকরুণের গলায় ফিকিরচাঁদী গান 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে', 'পোস্ট মাস্টার' ছবিতে গ্রাম্য বৃদ্ধার কণ্ঠে সুর আটকে শুধুই হাত নেড়ে তান-বাতলানো কিংবা 'চারুলতা'য় চারুর কণ্ঠে 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' এক একটি অসামান্য period piece। এইসবকে পেরিয়ে সত্যজিতের নতুন একটি ছবিতে গুপী যখন গেয়ে ওঠে ' দেখো রে নয়ন মেলে, জগতের বাহার' তখন ভৈরবীর ধাঁচে শুধু নয়ন মেলে আশ্চর্য বিস্ময়ে নয়, শ্রবণ পেতে শুনি এক অসামান্য সংগীতকারের আগমন-সংবাদ।

সংগীতকাররূপে সত্যজিৎ রায়ের সাফল্য খুব আকস্মিক নয়। এর জন্য যেমন তাঁর পূর্ব প্রস্তুতি ছিল তেমনই দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্টতা ছিল। 'চারুলতা' ছবি সম্পর্কে সত্যজিৎ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁর সঙ্গীত প্রয়োগ বিষয়েও। 'তিনকন্যা'-তে প্রথম স্বাধীন সংগীত পরিচালনার পর 'চারুলতা'র সমসময়ে যে তাঁর সন্তুষ্টি এল তার কারণ অভিজ্ঞতা। নিজেই বলেছেন ঃ

আজ অবধি যে কটা ছবিতে আমি নিজে সঙ্গীত রচনার দায়িত্ব নিয়েছি তার মধ্যে চারুলতার সঙ্গীত আমার কাছে অপেক্ষাকৃত সাবলীল ও সুপ্রযুক্ত বলে মনে হয়েছে। এর একটা কারণ অবিশ্যি অভিজ্ঞতা। আবহসঙ্গীতের কাজে অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। ছবির মেজাজ' সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকলেও কোন্ দৃশ্যে বা কোন্-কোন্ যন্ত্রে কোন্ সুর কোন্ লয়ে কোন্ তালে বাজালে এই মেজাজের সঙ্গে মিলবে, এ জ্ঞান সহজলভ্য নয়।

এর পিঠোপিঠি তাঁর মন্তব্য খুব প্রনিধাণযোগ্য। বলেছেন, তাই সঙ্গীতের কাজে এখনও অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যায়। শেখারও আছে এখনও অনেক কিছুই। বিশেষত বাংলাদেশে—যেখানে জাতীয় জীবনে মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তায়, বাড়িঘরদোরের চেহারার কোন স্পষ্ট চরিত্র নেই—সবই যেখানে পাঁচমিশেলি খিচুড়ি, সেদেশের পটভূমিকার আধুনিক ছবির আবহঙ্গীত রচনা এক দুরূহ ব্যাপার। অথচ এ চ্যালেঞ্জ এড়ানো চলে না।

সত্যজিতের চলচ্চিত্রে এই ব্যাপারটি লক্ষণীয়। তিনি এড়াতে চান, পেরোতে চান। সেই পেরোনোর পথে নতুন নতুন উপলব্ধি হয় সংগীত রচনার ক্ষেত্রে, হাতে-কলমে কাজ করতে গিয়ে। দেশি-বিদেশি সুর-স্বরের তফাৎ বোঝেন সংলগ্ন যন্ত্রবাদ্যগুলির নিজস্বতা লক্ষ্য করে। তখন তাঁর মনে এই কথা জাগে যে,

পাশ্চাত্য সংগীতের সুনির্দিষ্ট কোনও গড়ন নেই—সহজেই তা প্রয়োজন মেটাতে পারে স্বরগ্রামের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, সুর সংগতি ও সুরবৈচিত্র্য মিলিয়ে। এ দেশে একটি রাগ থেকে অন্য রাগে রূপান্তরের সম্ভাবনাটা নাটকীয়।

তাঁর ছবিতে সংগীতের ব্যবহারে এই নাটকীয়তা আলাদা করে বুঝে নিতে হবে। 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে 'রিমঝিম ঘন ঘন রে' গান তিনি ব্যবহার করেছিলেন এই দৃষ্টিকোণ

থেকে। অর্থাৎ রাগাশ্রিত সুরে বিদেশি চলন।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে আর একটা ভাবনা আছে। নায়ক বা নায়িকার কথা বলার যে স্কেল তার সঙ্গে সংগতি রেখে তিনি গায়ক-গায়িকা নির্বাচিত করতেন। এ ব্যাপাবে তাঁর কোনও দ্বিধা ও চক্ষুলজ্জা ছিল না। উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর 'দেবব্রত বিশ্বাস' তথ্যচিত্রে সত্যজিৎ জর্জের কণ্ঠ ও গায়ন সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা ব্যক্ত করেছেন অথচ নিজেব কোনও ছবির কোনও পুরুষ চরিত্রের মুখে দেবব্রত'র কণ্ঠ কাজে লাগান নি। অথচ কিশোরকুমারের (যিনি আদপেই রবীন্দ্র সংগীতের মানুষই নন) কণ্ঠ কাজে লাগাতে পিছপা হননি। দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে পারফরমেন্সটাই প্রধান বিবেচ্য তাঁর কাছে, পারফরমার যিনিই হোন না কেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর একটি মতামত উদ্ধৃতিযোগ্য। হিন্দি চলচ্চিত্রের গায়ন প্রসঙ্গে তাঁর মনে হয়েছেঃ

Another strange practice that the public blandly accepts is that whoever breaks into song in a film does so in the voice of one of a half-a-dozon popular singers who seem to have cornered the playback market. Once in a long while, through sheer accident, the singing voice may match with the speaking one, but it is never expected to. To one not familiar with the practice, the change of timbre usually comes as a jolt But, for the audience, here the jolt would probably come if they did not recognise one of their six favourites in the playback.

ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই হালকা চালাকি, এই ঝাঁকি মাবার ব্যাপাবটা তাঁর অরুচিকর লেগেছে। কণ্ঠধ্বনি timbre তাঁর কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। Singing voice আর Speaking voice-কে এক করে ভেবে তিনি চলচ্চিত্রে একটা নতুন বাঁক নিয়েছেন। অমল আর সন্দীপের কণ্ঠে কিশোরকুমার ব্যবহৃত হয়েছেন ১৯৬৪ থেকে ১৯৮৪ সালের দীর্ঘ কুড়ি বছরেব ব্যবধানে, তার কারণ দুটি চরিত্রেই ছিলেন সৌমিত্র। অথচ গুপির গান গাইবার জন্য অনুপ ঘোষালকে বেছে নেন সত্যজিৎ, যেহেতু অনুপের গলা সর্বদিকে খেলে। এই কণ্ঠবাদনেব অনবদ্য কৃৎকৌশল গাযকের আছে জেনেই তিনি 'গুগা বাবা'র গানেব সুর রচনায় মার্গ গান, লোকগান, বিলিতি স্বরক্ষেপণ এবং কর্ণাটকী ধরন সবই ব্যবহার করেছেন। তাঁর দৃষ্টি এ ব্যাপাবে নাটকীয। কেননা ভূতের বাজার বরে অনুস্বরের গুপী কেমন করে সুরদক্ষতায় তা পেশ করতে গেলে গানের বৈচিত্র্য, বিশেষত সুরে ও কণ্ঠের সাবলীল বিচবণে তা বোঝাতে হবে। অনুপের কণ্ঠ ঐশ্বর্যবহুল, সুরেলা ও গতিময়। অথচ সন্দীপ চরিত্রের যে গাম্ভীর্য ও Restraint তা ফোটাতে কিশোর কুমারকেই ব্যবহার করেন পরিচালক। একই ব্যাপার দেখা যায় 'কাঞ্চনজঙঘা'য় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ঠাকুরবাড়ির গায়কী ব্যবহারে বা 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে পাহাড়ি সান্যালের কণ্ঠে লক্ষ্মৌ ঘরানার ঢঙে অতুলপ্রসাদের গানে।

সত্যজিতের সংগীতবোধের ব্যাপ্তি ও সংগীত প্রয়োগের নৈপুণ্য বোঝাতে মিতায়তন নিবন্ধ যথেষ্ট নয়। তাঁর সৃজনমুলক গান নিয়েও আলাদা নিবন্ধ হতে পারে। উপস্থিত এই বলে ক্ষান্ত হওয়া যাক, সংগীত সত্যজিতের চলচ্চিত্রের উপাদান বা অঙ্গ নয়, সংগীত তাঁর চলচ্চিত্রের বিষয়গত। সেইজন্য বহুসময় সুররচনা তিনি আগে করেছেন, ছবির শ্যুটিং তখনও হয়তো শুরুই হয়নি।

কয়েকটি সাংগীতিক মুহূর্ত ও কয়েকটি মুহূর্তের সংগীত

দীপক চৌধুরী

ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের এক মহান সূচনার পঁচিশটা বছর পার হয়ে গেল। 'পথের পাঁচালী'র স্মৃতি রোমন্থনে আজও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। বুক ভরে টানতে চেষ্টা করি নিশ্চিন্দিপুরের সেই ভিজে মাটির গন্ধ। কত কথা মনে পড়ে যায়, এক গভীর অনুভূতি চোখের পাতা দুটো বুজিয়ে দেয়, আর একটা দীর্ঘশ্বাস হৃদয় ঠেলে বেরিয়ে আসে।

যে কোনও সার্থক শিল্প সৃষ্টিই বোধহয় এইভাবে বুকের ভেতর এক একটা দীর্ঘশ্বাসের জন্ম দেয়, আর প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসের সাথে আমাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে আর এক নতুন আলোর জগতে। তবুও 'পথের পাঁচালী'র প্রতি আমাদের দুর্বলতা বোধহয় একটা বিশেষ ধরনেরই। যেহেতু এটাই ছিল সেই 'ছবি' যা শৈশবের ঘুম ভাঙিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল আমাদের এক নতুন উষার আলোব মুখোমুখি। যে আলোর রং গন্ধ আজও আমাদের শরীর ও মনের গভীরে একাকার হয়ে আছে।

চলচ্চিত্রের সঠিক রূপায়ণ বোধহয় তখনই সম্ভব যখন তার অন্তরের সুর ও মেজাজটিকে ঠিকমতো ধরতে পারা যায় আর সেই মেজাজটিকে ঘিরেই ব্যবহার হতে থাকে তার আঙ্গিকের উপাদানগুলি। তাই সার্থক চলচ্চিত্রে সবকটি আঙ্গিকের মধ্যেই অনুভূত হয় এক নিবিড় আত্মীয়তা—যা ক্রমশ একাত্ম হয়ে থাকে তার অন্তরের সুরটির সাথে। চলচ্চিত্রের সাথে সংগীতেরও এই একাত্মতাই সার্থক চলচ্চিত্র সংগীতের বোধহয় একমাত্র সংজ্ঞা।

সংগীত যদিও সুর-তাল-লয় ও ভাব-সৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে নিজেই একটি মহান শিল্প, কিন্তু চলচ্চিত্রে সে তার এই নিজস্বতাকে নির্বাসন দিয়ে এক দেহে লীন হয়ে যেতে থাকে চলচ্চিত্রের বিশেষ ভাব ও নান্দনিক চেতনাটির সঙ্গে। আর তখনই একটি বিশেষ মাত্রা আরোপ করতে সক্ষম হয় সে চলচ্চিত্রের নান্দনিক সৌন্দর্যটিতে। আরও সম্পূর্ণ করে তুলে ধরে তার অন্তরের রূপটি।

'পথের পাঁচালী'তেও অনুভূত হয়েছিল 'ছবি'র সাথে সংগীতের এই একাত্মতা। তার আগে দু-একটা বিচ্ছিন্ন চেষ্টা যে না হয়েছিল এমন নয়, কিন্তু সংগীতের এই রকম বাস্তব সংগত প্রয়োগ এর আগে বোধহয় এমন করে কখনও হয়নি এ দেশের চলচ্চিত্রে।

চলচ্চিত্রের সার্থক সংগীত রচনার জন্য ভীষণভাবেই প্রয়োজন এক চলচ্চিত্র বোধের, যা অর্জিত হয় চলচ্চিত্রের প্রতি এক গভীর ভালোবাসা থেকে। এই বোধের, এই প্রেমের প্রকাশ রবিশংকরের মধ্যে সঠিকভাবে দেখতে এবং চিনতে ভুল করেননি সত্যজিৎ রায়। তাই নির্দ্বিধায় তিনি তুলে দিয়েছিলেন ববিশংকরেব হাতে তাঁর প্রথম

চলচ্চিত্রটির সংগীত রচনার দায়িত্ব।

রবিশংকর ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্র সংগীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দিয়েছিলেন 'ধরতীকে লাল', 'নীচানগর' প্রভৃতি সৃজনমূলক ছবিগুলির মাধ্যমে, আর করেছিলেন সেই যুগান্তকারী সংগীত রচনা 'ডিস্‌কভারী অব ইণ্ডিয়া'। রবিশংকরের এই কাজগুলিকে মনে রেখে সত্যজিৎ সম্যকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে একমাত্র রবিশংকরই পারেন 'পথের পাচালী'র অন্তরের সুরটিকে সঠিকভাবে চিনতে, বুঝতে এবং রূপ দিয়ে জাগিয়ে তুলতে। এ এক আশ্চর্য নির্বাচন। যার ফলস্বরূপ আমরা লাভ করেছিলাম চিত্রকল্পের সাথে সংগীতের একাকার হয়ে যাওয়ার সেই শিহরনমূলক অভিজ্ঞতাটি।

মনে আছে অন্ধকারের মধ্যে পাখোয়াজের বর্ণনাময় সংগীত নিয়ে 'পথের পাঁচালী'র নামপত্র শুরু হল। সে সংগীত একাত্ম হল এক নতুন পথচলার ছন্দে। যা ছিল 'ছবি'র থীম্, যে চলার শুরু জীবনের শুরু থেকে, কোনও দিনও যা থামবে না, থামতে পারে না। সময়ের বাঁশি যে তাকে ক্রমশই সামনে এগিয়ে নিয়ে চলে— নিশ্চিন্দিপুরের পথ দিয়ে। অপু-দুর্গার হাত ধরে চলতেই থাকে সেই পাগল-করা বাঁশিটা। বাঁশিটা ডাকে, পাখোয়াজের ছন্দময় তালের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে ছোট্ট জীবনের সেতারের তারে বেজে ওঠে কত স্বপ্ন, কত স্মৃতি-বিস্মৃতির গুঞ্জন। চরৈবেতি বাঁশির সুর আর পাখোয়াজের ছন্দ তোলপাড় করে চলে। সময়ের পথ ধরে সব কিছুই এগিয়ে চলতে থাকে সম্মুখ-পানের সেই বাঁশির সুরকে ছুঁতে, যা অনেক অনেক নিশ্চিন্দিপুরের আকাশ-বাতাস-মাটি সকাল-দুপুর-সন্ধে, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ, হাসি-কান্না, পাওয়া-না-পাওয়া সব কিছুর অনুভবের মধ্য দিয়ে মৃদু-পরিহাসকে প্রচ্ছন্ন রেখে এগিয়ে চলেছে এক অন্তবিহীন পথে। —এই তো 'পথের পাঁচালী'র মূল সুর, যে সুর ঘিরে গড়ে উঠেছে কয়েকটা সামান্য জীবনের অসামান্য ইতিকথা। এ ছাড়া 'পথের পাঁচালী'র টাইটেল মিউজিক আর কি-ই বা হতে পারত ? কিসেই বা মনে ধরত চার লাইনের ওই প্রাণ-কাঁপানো থীম্ মিউজিকের প্রকাশটি ওই নির্জন বাঁশিটি ছাড়া?.....

বাঁশবনের ফাঁকে হাওয়ার শব্দকে চমকে দিয়ে দুর্গার ছোট্ট হাতের ঠেলায় ইন্দির ঠাকরুণের প্রাণহীন দেহটা মাটিতে শব্দ তোলে। কত অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের চিহ্ন সারা গায়ে মেখে সম্বলহীন বৃদ্ধার শেষ সম্পত্তি তোবড়ানো ঘটিটা ছোট্ট জলায় গড়িয়ে পড়ে। খুবই সাধারণ অথচ ওই ধাতব শব্দটাই এক সামান্য মৃত্যুকে ঘিরে সৃষ্টি করে এক অসামান্য আবহের। রেখে যায় ইন্দির ঠাকরুণের শেষ পরিচয়টি স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবার আগে। শব্দ নিয়ে এই খেলা সত্যজিতের পক্ষেই যেন সম্ভব ছিল।......

কতকালের সেই পথ দিয়ে ইন্দির ঠাকরুণ বিদায় নিলেন। শেষ যাত্রার সুরে রইল ইন্দির ঠাকরুণের একান্ত গাওয়া কত সন্ধ্যার গান—হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে। গানের সুরটি যন্ত্রের একটি তারে বাজতে থাকে। বাজতে থাকেন ইন্দির ঠাকরুণ আমাদের বুকের মাঝে।.. .....

ছোট্ট একটি পুকুর, মলিন তার জল, জলজ পাতার ফাঁকে গঙ্গাফড়িং নাচে। অসম তালে কিন্তু ছন্দময় গতিতে। ছোট্ট প্রাণের ছন্দে যেন বিশ্বভরা প্রাণের সেই অসীম ছন্দময়তা। এক বিস্ময়কর চিত্রসৃষ্টি। রবিশংকরের সেতারেও 'গৌড় সারং', 'মাণ্ড',

'বিলাবল' রাগগুলি একাকার হয়ে বাজতে থাকে এক অপূর্ব মাটির সুরে, 'রূপক' তালের ছন্দে, মিশে যায় অসীম ছন্দের আনন্দময়তায়, বিশ্বভরা প্রাণের অন্তহীন বিস্ময়ে; যা রক্তের গভীরে খেলা করে।

নিশ্চিন্দিপুরের আকাশজুড়ে ঘনিয়ে আসে গভীব কালো মেঘ। সেই জগৎজোড়া প্রলয় মেঘের নীচে দুর্গা কুমারী ব্রতর ছড়া বলে বিড়বিড় করে। কিশোরী মন স্বপ্ন দেখে এক অজানা যৌবনের, জীবনের। শুরু হয় মেঘের সাথে পাখোয়াজের দিম্-দিম্ বোল। শব্দ আর সংগীত এক সাথে একাত্ম হয়ে ক্রমশ গভীর হতে থাকে। দুর্গার যৌবন স্বপ্ন যেন ঝংকার তোলে প্রকৃতির হৃদয়ে—সুরমণ্ডলের তারগুলি বেজে ওঠে সেই স্বপ্নের অনুরণনে। পাখোয়াজ আর সুবমণ্ডল আসন্ন বর্ষাব সেই ভযংকর অথচ সুন্দরের বিচিত্র রূপটি তুলে ধরে। বৃষ্টি নামে। খুশিতে উচ্ছল দুর্গা দু-হাত মেলে দিয়ে মুখ তুলে ধবতে চায় প্রকৃতির মাঝে। বৃষ্টি উত্তাল হয়ে ওঠে, ভেঙে পড়ে আকাশ। এলোচুলে বৃষ্টির সাথে মিশে যায় দুর্গা অথবা দুর্গার সাথে বৃষ্টি। আর তখনই পাখোয়াজ সুরমণ্ডলকে ছাপিয়ে নাচতে থাকে সেতার 'দেশ' রাগেব মূর্চ্ছনায়, বর্ষাব সাথে দুর্গার মনের তালে তাল মিলিয়ে। যে বাগের গভীরে অন্তরীণ হয়ে আছে বর্ষাব সাথে ভারতীয় হৃদয়ের সেই বিশেষ আত্মীযতার রেশটি। পাখোযাজ, সুরমণ্ডল, সেতার একাকার হয়ে যায়। একাকার হয়ে যায মেঘ, বৃষ্টি, প্রকৃতি আর দুর্গা।......

আবহ শব্দের নিপুণ ব্যবহার কী অপরূপ সাংগীতিক আবহ গড়ে তুলতে পারে তার এক চূড়ান্ত উদাহরণ হয়ে থাকবে দুর্গার মৃত্যু মুহূর্তটি। ঝড়ের রাতে শীতল মৃত্যুব দীর্ঘক্ষণের অস্তিত্ব। অথচ বিশ্বপ্রকৃতির ওই প্রলয়ংকর দৃশ্যটি বচিত হয়েছে শুধু ঘর এবং ঘবেব মধ্যে যা-কিছু আছে সেই সব নিয়ে। এই জীর্ণ ঘরটিকে দিয়েই আমরা বাইরের পরিমণ্ডলকে বুঝতে পারি। ঝড়ের প্রতিরোধ শতচ্ছিন্ন পর্দাব নিষ্ফল প্রয়াসেব ধ্বনি, নড়বড়ে বন্ধ দবজার খট খট শব্দটা ধীবে বাড়তেই থাকে। অবশেষে নির্মমভাবে ছিঁড়ে যায় জানলার পর্দাব একটা দিক। আব ক্রমশ ভয়ংকর হতে থাকে জীর্ণ দরজার সাথে ততোধিক জীর্ণ খিলেব ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ। কী নিদারুণ পরিহাস! মৃত্যু যেন এক্ষুনি সব প্রতিরোধ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে ঢুকে পড়তে চায় ঘরের মাঝে। দুর্গা অসহ্য যন্ত্রণায় মা-মা শব্দে ছটফট করতে থাকে। তখন অপু ঘুমে নিঃসাড়। অসহায় সর্বজয়া প্রাণপণে তার সমস্ত শরীর দিয়ে দুর্গাকে আগলে ধরে। উন্মত্ত ঝড়ের সাথে ক্ষীণ দরজার মতই যেন অসহায় সর্বজয়ার সাথে মৃত্যু-দুতের নির্মম খেলা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে থাকে।

অবশেষে দুর্গাকে এক সময় চলে যেতেই হয়। আমাদের পরিচিত নিশ্চিন্দিপুরকে গ্রাস করে এক সীমাহীন শূন্যতা। শূন্যতা হরিহরের ভিটেতে—সবার মনে। আর সেই সীমাহীন শূন্যতা আরও গভীবতর হতে থাকে ববিশংকরের সেতারে 'মারোয়া'র বিষাদ-করুণ গম্ভীর আলাপে। অবশেষে আলাপ কখন যেন 'জোড়' অঙ্গে পৌঁছয। সেতারের সাথে যোগ হয় পাখোয়াজের ছন্দ। শূন্যতার মাঝে ফিরে আসে নিরূপায় জীবনের আবার পথ চলার মৃদু ছন্দটি।..

বহুদিন বাদে হরিহব ফিরে আসছে নিশ্চিন্দিপুরে। ভিটেব কাছে এসে অপু দুর্গাকে ডাকে। কোনও সাড়া পায় না। ভাঙা দরজায শব্দ তুলে বাড়ির ভেতর দাওয়ায় দাঁড়াতেই

সর্বজয়াকে দেখতে পায়। সর্বজয়া নীরবে কয়েকটি তাৎক্ষণিক কর্তব্য করে যায় শুধু। এর পর হবিহর সরল আনন্দে তার বিদেশ থেকে কিনে আনা জিনিসগুলো এক-এক করে বার করে তুলে ধরতে থাকে সর্বজয়ার সামনে। সর্বজয়া নিস্পন্দ নিথর দৃষ্টিতে তাকিয়েই শুধু থাকে। আমাদের নাড়ির স্পন্দন হতে থাকে দ্রুততর। অবশেষে দুর্গার জন্য কিনে আনা ডুরে শাড়িটা তুলে ধরতেই ভেঙে যায় সর্বজয়াব এতক্ষণের এতদিনের রূদ্ধ কান্নার বাঁধা। শাড়িটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে মুখ চেপে ধরে সে । আমরা সর্বজয়ার শাড়িতে ঢাকা মুখটা দেখতে পাই না, কান্নার আবেগে কেঁপে ওঠা শরীরের ঝাঁকুনিটা দেখি। কান্নার প্রতিধ্বনিটি শুনি। তারসানাই-এর তারে 'পটদীপ'-এর মর্মান্তিক গমক আর মীড়গুলি যেন মুঠো কবে ছড়িয়ে দেয সর্বজযার অসহায় কান্নাকে আকাশে বাতাসে আমাদের মনে। 'পটদীপ' রাগের সন্ধ্যার করুণ বিষণ্ণতা নেমে আসে হরিহরের ভিটেতে ওই শেষ দুপুরেই। মনে হতে থাকে ওদের জীবনের সব স্বপ্ন সব আশা সব কল্পনা যেন ধূসর আঁধাবে লীন। আর কোনও দিনও বুঝি নিশ্চিন্দিপুরের আকাশে সকাল আসবে না। ...

কিন্তু তবুও সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, আবাব ওঠে—আব এমনি এক উদয়াস্ত খেলার মাঝে একদিন ঘনিযে আসে সেই অমোঘ মুহূর্তটি যখন বাবামা'র সাথে অপুকেও চলে যেতে হবে চিরদিনেব মত নিশ্চিন্দিপুরকে ছেড়ে। এ বিদায় তার শৈশবের সমস্ত স্মৃতি স্বপ্ন আর দিদির সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন কবে অন্য কোথাও অন্য কোনওখানে।

হরিহর সর্বজয়া অপু আব তাদের ছোট্ট সংসারটি নিয়ে গরুর গাড়ি চলতে শুরু কবে নিশ্চিন্দিপুরেব পথ ধরে। থমকে যাওযা গ্রামের নিস্তব্ধতার মধ্যে গরুর গাড়ির চাকার কর্কশ শব্দটা শুধু শোনা যায়। দুলতে-দুলতে সব কিছুই সরে যায় পিছনের দিকে। যখন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হরিহর, কান্নায় গুমরে ওঠে সর্বজয়া, আব অপলক দৃষ্টিতে ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকিযে থাকে অপু—এদের নিয়ে গাড়িটা এগোতেই থাকে, যেতে থাকে দূবে আরও দূরে ; আর তখনই আকাশে-বাতাসে ভেসে ওঠে এগিযে চলার সেই সুরটি—কখনও বাঁশিতে কখনও সেতারে। অবশেষে বাঁশি আর সেতারে একই সাথে যেন ভবিয়ে দিতে চায় সারা জগৎটাকে চরৈবেতির মন্ত্রে। শুধু অবোধ বালক অপু কেমন করেই বা জানবে পথ কখনও ফিরে আসে না, এগিয়েই চলে সামনের দিকে। বাঁশিটা বাজতেই থাকে। অনুভব করি বুকের মাঝে কখন যেন জমে উঠেছে অনিঃশেষ পথের পাঁচালী। তখন হৃদয় শূন্য করে বেবিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস।

সত্যজিৎ রায়ের আবহসংগীত

গৌতম ঘোষ

"আজ অবধি যে ক'টা ছবিতে আমি নিজে সংগীত রচনার দায়িত্ব নিয়েছি তার মধ্যে 'চারুলতা'র সংগীত আমার কাছে অপেক্ষাকৃত সাবলীল ও সুপ্রযুক্ত বলে মনে হয়েছে। এর একটা কারণ অবিশ্যি অভিজ্ঞতা। আবহসংগীতের কাজে অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। ছবির মেজাজ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধাবণা থাকলেও কোন্ দৃশ্যে কোন্ বা কোন্ কোন্ যন্ত্রে কোন্ সুর কোন্ লয়ে কোন্ তালে বাজালে সেই মেজাজের সঙ্গে মিলবে, এ জ্ঞান সহজলভ্য নয়। তাই সঙ্গীতের কাজে এখনও অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়। শেখারও আছে এখনও অনেক কিছুই। বিশেষত বাংলাদেশে—যেখানে জাতীয় জীবনে, মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে, কথাবর্তায় বাড়িঘর দোরেব চেহারার পটভূমিকায় আধুনিক ছবির আবহসংগীত বচনা এক দুরূহ ব্যাপার। অথচ এ চ্যালেঞ্জ এড়ানো চলে না।" এ-কথা বলেছেন সত্যজিৎ রায়।

এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি সিনেমার আবহসংগীত নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। অথচ তিনি কখনই একজন সংগীত-স্রষ্টা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চান নি।

আমরা জানি যে শৈশব থেকে একটা সাংগীতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সত্যজিৎ রায় বড় হয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায়। "হ্যাঁ, আমি সাংগীতিক পবিমণ্ডলের মধ্যেই বড় হয়েছি। আমাব বাবার দিক থেকে আমাব ঠাকুর্দা উপেন্দ্রকিশোর বেহালা বাজাতেন। অর্গ্যান বাজিয়ে গান গাইতেন, পাখোয়াজ বাজাতেন। আমার মায়ের দিক থেকে আমার প্রমাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত একজন বিখ্যাত সংগীত-স্রষ্টা ছিলেন। আমার মামা ছিলেন অতুলপ্রসাদ, মাসি ছিলেন কনক বিশ্বাস, সাহানাদেবী, পিসি ছিলেন মালতী ঘোষাল,— ওই বাবার দিক থেকে আর মায়ের দিক থেকে এমন একটা সাংগীতিক পরিবেশ পাওয়ায় আমার মধ্যেও একটা সাংগীতিক বোধ বা চেতনা অর্থাৎ সংগীতের প্রতি একটা গভীর অনুরাগ বা ভালবাসা তৈরি হয়েছিল।

নিজের পরিবার, তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ, ঠাকুর পরিবারের সংগীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও তার স্মৃতি, কারণ 'মরি লো মরি' শুনব যখন অমিয়া ঠাকুরের গলায় তা শুনতে চাইব। সেই যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শুনেছি দাঁড়িয়ে গাইতেন আজও আমার কাছে তা স্মৃতি হয়ে আছে।"

শৈশব থেকে মা সুপ্রভা রায়ের গলায় শোনা গান আব পরিবারের নামীঅনামী অনেক সংগীতরসিক ও স্রষ্টাদের সংস্পর্শ বালক সত্যজিতের কানে 'সা' ধরিয়ে দিয়েছিল ও তাল, লয়, মাত্রা সম্পর্কে প্রাথমিক বোধ তৈরি করতে সাহায্য করেছিল।

পরবর্তীকালে সংগীতের প্রতি অনুরাগ ও অধ্যয়ন, বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্য মার্গ সংগীত তাঁর কৈশোর ও যৌবনের প্রধান আবেগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধুমাত্র রেকর্ড

বাজিয়ে শোনা নয়, বিখ্যাত কম্পোজারদের স্টাফ নোটেশনের বই পড়ে সংগীত উপভোগ ও অধ্যয়ন করা যে সে সংগীত রসিকের কাজ নয়।

সংগীত সম্পর্কে গভীর বোধ ও পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক পর্যায়ে সংগীত রচনার কাজে হাত দেন নি। আর যখন দিয়েছেন সেটাও শুধুমাত্র নিজের ছবির জন্য (দুই একটি ব্যতিক্রম—শেক্সপীয়রওয়ালা, হরিসাধন দাশগুপ্তর কয়েকটি তথ্যচিত্র, বাক্সবদল, সন্দীপ রায়ের ছবি ইত্যাদি) ছবির প্রয়োজনে; আর এই কাজ শুরু হয়েছে 'তিনকন্যা' ছবির সময়কাল থেকে। এর কারণ কি?

সত্যজিৎ একদিকে যেমন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, অন্যদিকে তেমন ছিলেন অত্যন্ত সচেতন শিল্পী। কি করতে যাচ্ছি, কেন করতে যাচ্ছি, কাদের জন্য করব এসব না ভেবে উনি কোনো কাজ করেন নি বলেই আমার ধারণা।

যখনই তিনি ঠিক করলেন যে চলচ্চিত্র হবে তাঁর মাধ্যম, তখন থেকেই চলচ্চিত্রই হয়ে দাঁড়াল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা। অন্যান্য মাধ্যম সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞানকে তিনি পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত করলেন সিনেমায়। যাতে তাঁর চলচ্চিত্র আরও সংগঠিত হয়, পরিশীলিত হয়। ঐ পর্বে সিনেমা তৈরির বাইরে আলাদা করে কোনো মাধ্যম নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

প্রথম পর্বে নির্মিত ছ'টি কাহিনীচিত্রে এবং ১৯৬১'র গোড়ার দিকে নির্মিত 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে তিনি নিজে সংগীত পরিচালনা বা মৌলিক রচনা করেন নি। তাঁর শিল্পধারার দিকে একটু আলোকপাত করলেই বোঝা যায় যে ওটা ছিল প্রস্তুতি পর্ব। যে কোনো বড় মাপের শিল্পীর মতই সত্যজিতের শিল্পকর্মে কোনো ফাঁকি বা সহজে উতরে যাওয়ার জায়গা ছিল না। সিনেমার প্রতিটি বিভাগের ব্যবহারিক দিকটা না জেনে তিনি কখনই কাজে হাত দেন নি; এবং অকপটে স্বীকার করেছেন কোথায় ভুল-ভ্রান্তি ও খামতি ছিল। কিভাবে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সিনেমার মত একটা জটিল মাধ্যমকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন। এই ক্রমাগ্রসরণ সত্যজিতের সংগীত রচনার মধ্যেও সুস্পষ্ট। সিনেমার জন্য আবহসংগীত কোনো মহান সংগীত রচনা নয়, আর সিনেমাকে বাদ দিয়ে এর গুরুত্বও প্রায় নেই বললেই চলে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সাবলীল ও সুপ্রযুক্ত আবহসংগীত একটা ছবির ভাব প্রকাশে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। আর এই সংগীত রচনার জন্য এক ধরনের পারদর্শিতার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমী চলচ্চিত্রে আবহসংগীতের ক্ষেত্রে তাই ভাস্বর হয়ে আছে অনেক সংগীত রচয়িতার নাম, এল্‌মার বার্ণস্টাইন, নিনো রোটা, রেন্‌জো বোসোলিনি প্রমুখ।

আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্রে কতিপয় সংগীত পরিচালক সুচিন্তিত আবহসংগীত রচনা করে সুনাম অর্জন করেছেন ও জনপ্রিয়তাও পেয়েছেন।

কিন্তু প্রাক্-সত্যজিৎ যুগে এইসব প্রতিভাবান সঙ্গীত পরিচালকদের প্রধান অন্তরায় ছিল সেইসব ছবির চলচ্চিত্রগুণ। ফলে তাঁদের কাজের ধারাবাহিকতা বাখা সম্ভব হয় নি। সত্যজিৎ রায় একের পর এক ভিন্ন স্বাদের চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে দেখালেন যে দৃশ্যকল্প, শব্দ, সংলাপ, অভিনয়ের মতই আবহসংগীত পরিচালকের একটা মস্ত বড় হাতিয়ার। ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে সিনেমায় একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হতে পারে। আবহসংগীত শুধুমাত্র সংগীত নয়। এটা চিত্রনাট্যের মূল থীমেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সত্যজিতের আবহসংগীতের বিশেষত্ব কি, পরবর্তী প্রজন্মের চলচ্চিত্রকার ও আবহসংগীত রচয়িতারা কি কি জানলে উপকৃত হবেন, সেইসব উপাদানগুলো নিয়ে এবার একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব।

(১) একটা বিষয়বস্তু নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হবে; তা সে কাহিনীভিত্তিক হোক বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত হোক কিংবা প্রামাণ্য কোনো ঘটনা থেকেই হোক। প্রাথমিক পর্যায় হ'ল চিত্রনাট্যের খসড়া ও চিত্রনাট্য রচনা। এই প্রাথমিক পর্যায়ে ভেবে ফেলা উচিৎ বিষয়বস্তু ও তার চলচ্চিত্র প্রয়োগে আবহসংগীতেব ভূমিকা কি বা প্রয়োজন কতটা। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক যদি সংগীত রচয়িতা নাও হন তাহলেও একটা ইঙ্গিত থাকতে পারে মূল থীমের ভাব প্রকাশের জন্য কি ধবনের সাংগীতিক প্রয়োগ প্রযোজন। যদি আদৌ প্রয়োজন না হয়, সেটাও ভাবনাব মধ্যে বাখতে হবে।

এই ভাবনা একাধারে যেমন চিত্রনাট্যেব কাঠামোকে সাহায্য করবে আবার পাশাপাশি একেকটা দৃশ্য গঠন, পবিপার্শ্ব ও চরিত্রাবলীর সংমিশ্রণে বা সংঘাতে বিষয়বস্তু অথবা একটা বিশেষ মুহূর্তের ভাব প্রকাশে শব্দের কি ভূমিকা, তাব আভাস বাখবে। সেই শব্দ সংলাপ হতে পারে, অন্যান্য সমান্তরাল ও অসমান্তবাল শব্দ হতে পারে, আবহসংগীত হতে পারে অথবা নৈঃশব্দ্যও হতে পাবে। চলচ্চিত্র নির্মাণেব এই পর্যায়ে চিত্রনাট্যকার পরিচালকের মাথায় আবহসংগীতের ব্যবহার সম্পর্কে যদি একটা প্রাথমিব ধারণা থাকে, তাহলে আবহসংগীত চিত্রনাট্যেব মূল থীমেব অঙ্গ হযে ওঠে; ছবির শেষে গিয়ে শূন্যস্থান পূরণেব মত অবস্থা হয় না। সত্যজিৎ লিখেছেন, "এখানে পরিচালকের দায়িত্ব অনেকখানি। ছবির মূল সুরটি পরিচালকেব চেয়ে বেশি ভাল করে আব কে জানবে? বিশেষত ছবি যদি নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে নতুন আঙ্গিকে বচিত হয় তাহলে সে ছবিতে আবহসংগীতের প্রয়োজন আছে কিনা—বা থাকলে তাব প্রকৃতি কেমন হবে তা পরিচালকেরই স্থির করা উচিৎ।"

(২) আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে এই পর্ব শুরু করছি। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে 'সীমাবদ্ধ' ছবির শ্যুটিং চলছে। কলকাতার বহুতল বাড়ির একটা ফ্ল্যাটেব সেট। ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে রাতের কলকাতার একটা আঁকা সিনারি। চরিত্ররা সংলাপ শেষ ক'রে এবং যা যা ক''ব ক'রে ফ্রেম আউট হল। শট্ তখনও চলছে। ক্যামেরার পেছন থেকে মানিকদার গলা, 'হাওযা'। ফ্রেমের বাইরে রাখা বড় বড় ফ্যানগুলো ঘুরতে শুরু করল। হাওয়ায় জানলার পর্দা উড়তে লাগল। হয়ত ক্যামেরার একটু মুভমেণ্ট ছিল, ঠিক মনে নেই এখন। তবে এখনও যেটা কানে লেগে আছে তা হ'ল ক্যামেরা অপারেট করতে করতে মানিকদা শিস্ দিচ্ছিলেন। তখন কিছুই বুঝতে পারি নি। হাতে-কলমে ছবি কবতে গিয়ে ধরতে পেরেছিলাম, উনি আবহ-সংগীতের দৈর্ঘ্য ও মুড শট্ চলাকালীন আন্দাজ করে নিচ্ছিলেন।

আবহসংগীতের ভাবনা শ্যুটিং করার খুবই কাজে লাগতে পারে। কোনো দৃশ্যে সংলাপের একটা বিরতিতে সংগীত আসবে ও চলে যাবে। পরিচালক হয়ত চান ঠিক ঐ মুহূর্তে অভিনেতা তার অভিব্যক্তিতে বিশেষ একটা ভাব প্রকাশ করুক বা সংলাপের মধ্যেই একটা বিশেষ লয়ে পরবর্তীকালে আবহসংগীত মিশ্রিত হবে। হয়ত প্রয়োজনে পরিচালক অভিনেতাকে বলতে পারেন সংলাপের গতি মন্থর করতে। এই রকম অজস্র

সম্ভাবনা ছড়িয়ে থাকে দৃশ্য গঠন ও আবহসংগীতের সম্পর্কের মধ্যে। এ ছাড়াও থাকে আবহসংগীতের প্রয়োগ যদি ভাব প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় হয় তাহলে সেই মত ক্যামেরা মুভমেন্টের গতি নির্ধারণ করা। ছবির কোনো অংশে হয়ত সংলাপ থাকবেই না—মন্তাজ পদ্ধতিতে কাহিনীব একটা অংশ বলা হবে—আবহসংগীতের প্রয়োজনে। এখানে শট্ টেকিং ও সম্পাদনার ছন্দ আবহসংগীতের ছন্দের সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়বে। এটা দু'রকমভাবে হতে পারে ঃ এক, আবহের ছন্দ-লয় মাথায় রেখে শট্ নেওয়া ও সম্পাদনার টেবিলে শট্ সাজানো। দুই, সম্পাদিত দৃশ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আবহসংগীত রচনা করা। শ্যুটিং ও সম্পাদনার সময়ে অনেক দৃশ্য রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের জাগতিক ধ্বনি একটা সাংগীতিক ব্যঞ্জনাব সৃষ্টি করতে পারে। সব কিছুই নির্ভর করে পরিচালকের রুচি, পরিমিতিবোধ ও প্রয়োগ সম্পর্কীয় ধারণার উপর। সত্যজিতের ভাষায়, 'এখানে সুবকারকে একটি কথা মনে রাখতে হয়। সেটা হল এই যে, ছবি প্রধানত চোখে দেখার জিনিস। দৃশ্যবস্তু ছাড়া ছবিতে যা থাকে তার মধ্যে প্রধান হ'ল সংলাপ—কারণ, কাহিনীর অনেকখানিই ব্যক্ত হয় সংলাপেব মাধ্যমে। আবও কিছুটা বলা হয় যাবতীয় ধ্বনিব সাহায্যে। ঐ বলার কাজে আবহসংগীতের কাজ সবচেয়ে পবে। কারণ সংগীতেব ব্যঞ্জনা আছে, কিন্তু পরিষ্কার কোনো ভাষা নেই। এখানে সাযুজ্যের একটা প্রশ্ন আসে। সব কথায় সব সুব বসে না। গান সেখানেই সার্থক যেখানে সুর হ'ল ভাষার ব্যঞ্জক। চলচ্চিত্রের আবহসংগীতও ব্যঞ্জকেরই ভূমিকা গ্রহণ করে—যদি তা সুপ্রযুক্ত হয়।''

(৩) সত্যজিৎ-এব শিল্পকর্ম সুসংবদ্ধ। আগেই বলেছি যে, চিত্রনাট্য ও চিত্রগ্রহণেব সময়ে পরিচালকের মাথায আবহসংগীত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকার ফলে সংগীতের আনাগোনা হয অত্যন্ত সাবলীলভাবে। সংলাপ ও অন্যান্য ধ্বনির মধ্যে আবহসংগীত মিশ্রিত হয়ে আসে ও মিলিয়ে যায়, করে দেয় এক একটা মুহূর্ত, যুক্ত হয় নতুন ব্যঞ্জনা। আবহসংগীত আলাদা করে কানে লাগে না; পুবো সাউণ্ডট্র্যাকেবই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ভাব প্রকাশ করে যায়। সত্যজিতের আবহসংগীতের কযেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। প্রথমতঃ সাউণ্ডট্র্যাক আবহসংগীত দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়। আগাগোড়াই যদি ছবিতে আবহসংগীত বাজতে থাকে তাহলে এর গুরুত্ব হ্রাস পেতে বাধ্য। আবহসংগীত কোলাহলে পরিণত হয়। সত্যজিতের আবহ গুপ্তবাণের মত; উনি জানেন ঠিক কোন মুহূর্তে তা ছুঁড়তে হবে। দ্বিতীয়ত সত্যজিতের আবহসংগীত রচিত হয়েছে বিষয়বস্তুর মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। ফলে তাঁর ছবিতে 'থীম' মিউজিকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রায় সবকটা ছবিতেই অনেক ধরনের কম্পোজিশনের ব্যবহার নেই। একটা কি দু'টো মূল সুর ভিন্ন তাল, লয়, মাত্রায ফেলে যন্ত্রানুষঙ্গ বদলে সারা ছবিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দৃশ্যের মুড অনুযায়ী এমনভাবে প্রযোগ করা হয়েছে যে বোঝাই যায় না একই সুর বাজছে। আবার কখনও কখনও সচেতনভাবে একই কম্পোজিশন বার বার ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যেমন 'চারুলতা' ও 'অশনি সংকেত' ছবিতে। যখনই ঐ সঙ্গীত আসে দর্শক যেন কিছুর সূত্র পান, ইঙ্গিত পান; একটা বিশেষ অনুভূতি তাঁর অবচেতন মনকে স্পর্শ করে যায়। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা প্রতিটি চলচ্চিত্রকারের শিক্ষণীয়, তা হ'ল শব্দ পুনর্যোজনার কথা মাথায বেখে সংগীত বচনা করা ও 'অর্কেস্ট্রা'

পরিচালনা কবা। ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার কবা যাক। কোনো একটা পীস্ রচনা করা হ'ল, এবার বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে বা একক যন্ত্রে বাজানো হ'ল, সেটা রেকর্ডিস্ট তাঁর প্রয়োজনে রেকর্ডিং volume-এ রেকর্ড করে নিলেন। কিন্তু শব্দ পুনর্যোজনা মিশ্রণের সময়ে সংলাপ, অন্যান্য ধ্বনি এবং বিশেষ দৃশ্যের মুড অনুযায়ী সেই পীস্টা ঠিক কোন্ volume-এ মিশ্রিত সাউণ্ডট্র্যাকে শোনা যাবে সেটা মূল্যায়ন করাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। হয়ত দৃশ্যের চাহিদা অনুযায়ী এমন volume-এর দবকার যেখানে এসে প্রয়োজনীয় chord-গুলো আর শোনাই গেল না। এখানেই প্রয়োজন সংগীত রচয়িতা ও অ্যারেঞ্জারের দক্ষতার। এখানে সত্যজিৎ রায় একেবারে দশ গোল মেরে বসে আছেন। তাঁর রচনা ও অ্যারেঞ্জমেন্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান সত্যিই অবাক করে দেয়।

সত্যজিৎ রায় আবহসংগীত রচনায় মূলত পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের কাঠামোকেই অনুসরণ করেছেন। কারণ এই কাঠামোতে অর্কেস্ট্রা তৈবি কবতে অনেক সুবিধা আব দৃশ্যের সীমিত সময়-সীমাব মধ্যে একটা রচনাকে বিস্তৃত করা যায়। ধরা যাক, একটা পীসের সময় হচ্ছে সাতচল্লিশ সেকেণ্ড। এরই মধ্যে যন্ত্রের পরিবর্তন হবে, কাউণ্টার পয়েণ্ট আসবে। শট্ পরিবর্তন বা ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে তিন জায়গায় variation হবে; সতেরো সেকেণ্ড, বত্রিশ সেকেণ্ড, আবার বিয়াল্লিশ সেকেণ্ডে। পাশ্চাত্য সংগীতেব কাঠামোয় এটা খুব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কবা যায়। পাশ্চাত্য সংগীত থেকে উনি যেমন অনেক কিছু নিয়েছেন, পাশাপাশি মার্গসংগীতও স্থান পেয়েছে ওঁর আবহে। কোনো একটা রাগ বা গৎ ভেঙে রচনা করেছেন; পাশ্চাত্য সংগীতের melody ও chord মিলিয়ে দিয়েছেন তার সঙ্গে। আবার কখনও নিয়েছেন রবীন্দ্রসংগীতের সুর থেকে, লোকসংগীতের'সুর থেকে। সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁর আবহসংগীতে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি তৈবি করতে পেরেছেন নিজস্ব একটা স্টাইল। একটা বইয়ের মলাট দেখেই যেমন চেনা যায়, এটা সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি। তেমনই আবহসংগীত শুনলেই বোঝা যায়, এটা সত্যজিৎ রায়ের 'কম্পোজিশন'। সত্যজিৎ আবহসংগীত বচনায় মুক্ত বাতাস এনেছেন, গোঁড়ামিকে ভেঙে দিয়েছেন। সত্যিই আবহসংগীত রচনায় কোনো 'জাত বজায় রাখার তাগিদ নেই'। আবহ সংগীত শুধুমাত্র সঙ্গত নয়; একে নিয়ে ভাবতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে এবং ছবির ভাবের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। তাহলেই এই বিমূর্ত অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনা উপলব্ধ হবে। সত্যজিৎ রায়ের 'আবহসংগীত প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত কবে এই রচনা শেষ করছি—

"আবহসংগীতের ব্যবহারে সংগীতের শাস্ত্রীয় ব্যাকরণ নিয়ে গোঁড়ামি সম্পূর্ণ অর্থহীন, কারণ নিছক সংগীত হিসাবে আবহসংগীতের মূল্যায়নের কোন প্রয়োজনই নেই। যে-কোন যন্ত্রের দ্বারা ছন্দ বা সুর উত্থাপন সম্ভব, তারই ব্যবহার আবহসংগীতে চলতে পারে। সেতার, সরোদ, পাখোয়াজের সঙ্গে ঘটি বাটি পেয়ালা পিরিচ বাজিয়ে আমারই কোন ছবির সুর রচনা করেছিলেন রবিশঙ্কর। এ ধরনের প্রয়াস সংগীতের আসবে নীতিবিরুদ্ধ পাগলামো বলে মনে হত। কিন্তু এর ফলে যে আবহসংগীত রচিত হল, তা যদি ছবির সঙ্গে তাল রাখতে সক্ষম হয় তবে সে সংগীত শুধু-সংগীত নয়— রসোত্তীর্ণও বটে।"

সঙ্গীতেও যিনি পথপ্রদর্শক

দীপেন্দু চক্রবর্তী

অনেক কিছুর মত চলচ্চিত্রের সঙ্গীতেও সত্যজিৎ আমাদের পথপ্রদর্শক। হাতগুনতি পরিচালক, যাঁরা সত্যজিতের আগেই চলচ্চিত্রের ভাষা নিয়ে কিঞ্চিৎ মাথা ঘমিয়েছেন (যেমন শান্তারাম, বিমল রায়, মধু বসু, নীতিন বসু), তাঁদের নজর চলচ্চিত্রের অন্য উপাদানের দিকে খানিকটা পড়লেও উপেক্ষিত থেকে গেছে সঙ্গীতের ভূমিকাটি। সঙ্গীত [illegible] যে ধারণা প্রচলিত ছিল তখন, এবং এখনও, সেই কতিপয় মনোরম এবং অবাস্তব গান এবং সংলাপ ও অ্যাকশানের নেপথ্যে জোরালো কিছু যন্ত্রসঙ্গীত, তারই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় চলচ্চিত্রে। এমন কি নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' অনেক দিক থেকে 'পথের পাঁচালী'র অগ্রদূত হলেও সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক'ও ব্যতিক্রম নয়।

চলচ্চিত্রে 'পথের পাঁচালী' যে-নতুন পথটির সন্ধান দেয় তাতে আবহসঙ্গীতেরও শুরু হয় নতুন অভিযান। এই প্রথম দেখা গেল পটভূমিকা, বিষয় ও ভাব অনুসারে সঙ্গীত পরিকল্পনা ও তার যথাযথ প্রয়োগ। এই প্রথম দেখা গেল একজন ধ্রুপদী যন্ত্রবিদের অনন্য প্রতিভাকে চলচ্চিত্রের সাঙ্গীতিক দাবি পূরণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। তথাকথিত পেশাদার আবহসঙ্গীতবিশারদদের সহজলভ্য সহযোগিতা সত্ত্বেও। অথচ অজস্র যন্ত্রের মেকী পশ্চিমী অর্কেস্ট্রার কোলাহলের পরিবর্তে রবিশংকরের মত ধ্রুপদী শিল্পীর পক্ষে যা করা নিতান্তই স্বাভাবিক হত, তা কিন্তু হয় নি—তিনি নানান ভারতীয় রাগের একটা রাগমালা ছড়িয়ে দিতে পারতেন গোটা ছবিতে। পরিবর্তে আমরা শুনি এমন সুর যা বাঁশবন, কাশবন, আদিগন্ত প্রসারিত মাঠের উদাস করা মর্মসঙ্গীত। উদয়শংকরের 'কল্পনা'য় অবশ্যই সঙ্গীতের প্রয়োগ ছিল পরীক্ষামূলক, তবে তা অনেকটাই গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের স্বার্থে। রবিশংকরের যে-সুরসৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'কে অনন্যতা দান করেছে তাতে অপেরাটিক মেজাজ থাকার কথা নয়, অথচ তা-ও কম পরীক্ষামূলক নয়। অন্য সঙ্গীত পরিচালক হলে (যেমনটি দেখি এখনও) একতারা বাজিয়ে বা অন্য যন্ত্রে বাউলাঙ্গের সুর ছড়িয়ে গ্রামবাংলার একটি পরিচিত 'মুড' উপহার দিয়েই কৃতার্থবোধ করতেন। রবিশংকর 'পথের পাঁচালী'র নেপথ্য সঙ্গীতে প্রাধান্য দিলেন সেতার অথবা বাঁশি এবং ধ্রুপদী রাগ ও লোকসঙ্গীতের এক অভূতপূর্ব মিশ্রণ। এই প্রথম পাওয়া গেল চলচ্চিত্রের থিম মিউজিক যা ঘুরে ফিরে আসে অপু-ট্রিলজিতে, তৈরি হয় একটা ভাবগত ঐক্যসূত্র।

এই সঙ্গীত নির্দেশনার কৃতিত্ব মূলত রবিশংকরের। তবে চলচ্চিত্রের পরিচালক যেহেতু এখানে সত্যজিৎ রায়, যিনি নিজেই সঙ্গীতরসিক, সঙ্গীতবিদ এবং সঙ্গীতসাধক পিতামহের যোগ্য বংশধর, এবং যেহেতু সত্যজিৎ সেই জাতের পরিচালক, যিনি চলচ্চিত্র-নির্মাণের সমস্ত বিভাগে সক্রিয় ভূমিকা নিতে সমান আগ্রহী, তাই এমন অনুমান করা

অসঙ্গত নয় যে অপু-ট্রিলজিতে যেমন, তেমনি 'জলসাঘর,' 'পরশপাথর', 'দেবী'-তেও তিনি বিখ্যাত ওস্তাদদের (যেমন আলি আকবর, বিলায়েত খাঁ) সঙ্গীতপ্রয়োগে নিজের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেন নি।

'তিন-কন্যা' থেকে সত্যজিৎ যে নিজেই সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন তার জবাবদিহি তিনি নিজেই দিয়েছেন একাধিকবার। শুধুই ওস্তাদদের ব্যস্ততা নয়, চলচ্চিত্র-সঙ্গীতের নিজস্ব ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁর ক্রমবর্ধমান ব্যগ্রতাও একটি কারণ। ওস্তাদদের সঙ্গীত কোন ক্ষেত্রে কতটুকু অপরিহার্য তার পরিমাপ সত্যজিৎ যে নিজেই করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে 'পথের পাঁচালী'তে, যখন দেখি দুর্গার মৃত্যুতে সর্বজয়ার ক্রন্দনদৃশ্যে কোনো আবহসঙ্গীত নেই, কেননা সত্যজিৎ আমাদের প্রস্তুত করছেন একটা ক্লাইম্যাক্সের জন্য, যখন সর্বজয়া হরিহরের হাত থেকে মৃতকন্যার জন্য আনা উপহার নিয়ে কান্নায় লুটিয়ে পড়বে, এবং তার সানাই-এর উঁচু পর্দায় ছড়িয়ে পড়বে সেই কান্নার ধ্বনি। লক্ষণীয়, সর্বজয়ার কান্নার আওয়াজ আমাদের কানে আসে না, আমরা শুনি যন্ত্রের কান্না। গতানুগতিক পরিচালনায় একই সঙ্গে মানুষের কান্না ও যন্ত্রের কান্না (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেহালা) সমানতালে ঊর্ধ্বগামী হয়। এখানেই সত্যজিতের ব্যতিক্রমী প্রয়োগ— যেমন সঙ্গীতে তেমনি দৃশ্য পরিকল্পনায়। 'অপরাজিত' ছবিতে হরিহরের মৃত্যুর মুহূর্তেও বেজে ওঠে নেপথ্যযন্ত্র, কিন্তু সর্বজয়ার 'কি হল!' আর্তনাদ পরের শটেই (যেখানে অজস্র পায়রা হঠাৎ উড়ে যায়) শোনা যায় এই যন্ত্র সঙ্গীতের মাঝখানে। যে-কাঁদছে তাকে আমরা দেখছি না! কিন্তু তার আর্তনাদ শুনছি যন্ত্র সঙ্গীতের আবহ ও অজস্র পায়রার পাখাঝাপটানির মধ্যে। সংলাপ-সঙ্গীত ও প্রাকৃতিক শব্দের এ এক অভিনব মিশ্রণ। এ কৃতিত্ব সত্যজিতের, রবিশংকরের নয়।

বরং বলা যেতে পারে রবিশংকর কোনো কোনো মুহূর্তে প্রথাগত সঙ্গীতের আশ্রয় নিয়েছেন, যেমন 'পথের পাঁচালী'তে মিষ্টিওয়ালার দৃশ্যে লঘুছন্দের ব্যবহার। 'পরশপাথরে'ও মুহুর্মুহু লঘুছন্দের সুর শোনা যায়। সত্যজিৎ এই ফর্মুলা মাফিক কমিক মিউজিকের বিশেষ পক্ষপাতী যে ছিলেন না (বরং কটাক্ষই করেছেন বাণিজ্যিক ছবির সঙ্গীত আলোচনায়) তার প্রমাণ হয় 'সমাপ্তি'র লঘু-মুহূর্তে।

অথচ, আজ তা ভাবতে বেশ কৌতুককর মনে হয়, 'তিনকন্যা'য় সত্যজিতের সঙ্গীত পরিচালনা নিয়ে কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের মন্তব্য শোনা গিয়েছিল। অথচ 'শেক্সপীয়রওয়ালা'র সঙ্গীত পরিচালনায় সত্যজিতের ডাক আসে। সত্যজিৎ জোর করে ক্ষমতার বাইরে পা দিচ্ছেন! রবিশংকরের সুর-মাধুর্য কোথায় তাঁর আবহসঙ্গীতে? এত সংক্ষিপ্ত কেন তাঁর আবহসঙ্গীত? ঠিক এইরকম একটি চলচ্চিত্র বিষয়ক অজ্ঞতায় যখন আমরা সোচ্চার, সত্যজিৎ তাঁর একের পর এক ছবিতে এবং প্রবন্ধে দেখিয়ে দিতে লাগলেন ঃ সঙ্গীত চলচ্চিত্রের একটি সহযোগী উপাদান মাত্র, তার বেশি নয়; সঙ্গীত functional, মোটেই decorative নয়; একই অনুভূতি যা সংলাপে প্রকাশ পাচ্ছে তার বাড়তি অভিব্যক্তি যন্ত্র-সঙ্গীতে পাশাপাশি ঘটলে তা হবে tautological (রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ডে accompaniment-এর একটি হাস্যকর বৈশিষ্ট্য যা সঙ্গীত অর্থহীন যদি না তা মুহূর্তের মুড বা আবেগে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

চলচ্চিত্র-সঙ্গীতের মাধুর্য যদি ক্রমাগত মুগ্ধ করে তবে তাতে আমাদের মনোযোগ

স্থানান্তরিত হয়—গৌণ হয়ে যায় দৃশ্যমান বস্তু। সত্যজিতের নিজস্ব সঙ্গীত তাই ছবির ভাষায় সূক্ষ্ম আঁচড়ের মত—একটি মুহূর্তকে উজ্জ্বল করার জন্য যতটুকু না হলে নয়। ক্রমশই এই সূক্ষ্ম সুরপ্রবাহ আবাব সংক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শেষদিককার ছবিতে। সূক্ষ্মতা, সংক্ষিপ্ততা, পরিমিতি—এই হল তার সার্বিক লক্ষণ। এর পাশাপাশি বৃহত্তর ভূমিকা নেয় প্রাকৃতিক শব্দাবলি ও অবশ্যই নীববতা। 'সদগতি'তে দুখী চামারেব কুড়ুল দ্রুত ওঠানামা করার একটি বিশেষ মুহূর্ত থেকে সঙ্গীতের সূচনা ও দ্রুত বিস্তার কুড়ুলের ছন্দকে আরো তীব্র কবে তোলে, এবং তৈরি করে এক রুদ্ধশ্বাস টেনশন, যার শেষে দুখীর পতন ও মৃত্যু এবং এক ভয়ঙ্কব নীরবতা। 'চারুলতা'য় চারুর দোলনা দ্রুত দুলতে থাকে, ক্যামেবা ক্রমশ এগিয়ে যায়, — সংগীতেব আবোহণও তীব্র হয়। শট-বিন্যাসের অন্তর্লীন ছন্দকে এইভাবে টেনে বাব করে আনে যন্ত্রসঙ্গীত। কিন্তু তারই আগে ও পরে থাকে এক অবশ্যপ্রয়োজনীয় নীরবতা। একটানা যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার সত্যজিতেব প্রথম দিককার ছবিতেও পাওযা যায না, যদিও তুলনায় তা সেখানে খানিকটা উচ্চগ্রামে বাঁধা।

প্রাকৃতিক শব্দের নিপুণ প্রযোগ সত্যজিতের আবহের একটি বিশেষ রীতি। কিন্তু 'কাঞ্চনজঙঘা' ও 'সদগতি'তে খচ্চব ও গোরুর ঘণ্টিব ধ্বনি শুধুই আবহ নয়, তার প্রতীকী আবেদনও অনুধাবনযোগ্য। বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বচনার কাজে যথোপযুক্ত গানেব নির্বাচন, যা কিনা পটভূমিকাকে স্পষ্ট করে তোলে, সত্যজিতের একাধিক ছবির দৃশ্যকে আমাদের অভিজ্ঞতার খুব কাছে নিয়ে আসে—যেমন দেহাতি গান 'অভিযানে'র নেপথ্যে, বা 'পবশ পাথবে' পবেশবাবুর গলিতে পাশেব বাড়ি থেকে ভেসে আসা ছোট্ট মেয়েব গানেব রেওয়াজ, উত্তর কলকাতার সান্ধ্যজীবনের একটি অনুষঙ্গ। ভারতীয় ছবিতে এইভাবে বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ফুটিয়ে তোলাব জন্য বিশেষ বিশেষ গানের টুকরো ব্যবহার করার আজ যে-রীতিটি বেশ প্রচলিত হয়ে উঠেছে তার সূচনা সত্যজিতের হাতেই।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে সঙ্গীত বলতে এখনও বোঝায় একধবনেব 'চিত্রহার'— ছবিব নিজস্ব ভাষা যেখানে অনুপস্থিত, যেখানে দৃশ্যবস্তু উপস্থিত গানের অজুহাত হিসেবে। 'ছিন্নমূল' ও 'নাগরিক'-এ গান ছিল না। অপু-ট্রিলজিতেও গান নেই। এ যেন সচেতন বিদ্রোহ দেশী ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু তার পরের ছবিগুলিতে সত্যজিৎ গান রেখেছেন, বোধহয় বাঙালির জীবনে গানের অপরিহার্যতা মনে বেখে। 'পরশপাথরে' পরেশবাবুর স্ত্রী গান করেন—একটি প্রাচীন গীতি। 'কাঞ্চনজঙঘা'য় রায়বাহাদুরের স্ত্রী গান করেন 'এ পরবাসে রবে কে', 'মণিহারা'য় শুনি 'বাজে করুণ সুরে', 'পোস্টমাস্টারে' আছে গ্রামের বৃদ্ধেব কণ্ঠে এক গ্রাম্য গান, 'দেবী'তে শ্যামাসংগীত, 'চারুলতা'য় একাধিক গান, 'ঘরে-বাইবে'তেও তাই। কিন্তু একটি গানকেও তার প্রেক্ষিতের বাইরে টেনে আনা যাবে না, একটি গানও অপ্রয়োজনীয় মনে হয় না। প্রায়শই সত্যজিৎ গান থামিয়ে দেন মাঝপথে। পুরো গান বাখেন যদিওবা, তার প্রেক্ষিতও তৈরি করে রাখেন।

'জলসাঘর' যেহেতু গানের আসরের ছবি, সেখানে নানান গীত-বাদ্য-নৃত্যকে সম্যক গুরুত্ব দিতেই হয়। কিন্তু আমবা নতুন কিছু পেয়ে যাই জলসাঘরের দরজা খোলার পর যখন অতীতের টুকবো টুকরো স্মৃতিব মত টুকরো টুকরো গান নেপথ্যে ভেসে ওঠে, একের সঙ্গে আর একটি মিশে যায। এইবকম গানেব মিশ্রণ ও সম্পাদনাব জন্য

লাগে পরিচালকের নিজস্ব সঙ্গীত চেতনা ও অভিজ্ঞতা, যা সত্যজিতের ছিল উত্তরাধিকারসূত্রে। ঋত্বিক ঘটকেরও ছিল গভীর সঙ্গীতবোধ। তবে বলতেই হয় তাঁর ছবিতে কোনো কোনো গানের প্রয়োগ মুগ্ধ করলেও (যে রাতে মোর দুয়ারগুলি—'মেঘে ঢাকা তারা'; কেন চেয়ে আছো গো মা—'যুক্তি তক্কো গপ্পো'), 'কোমল গান্ধারে' এবং 'সুবর্ণরেখায়' একাধিক গান যেন গানের জন্য রাখা হয়েছে। 'চারুলতা'য় 'আমি চিনি গো চিনি' গানটি এমন লঘুভাবে গাওয়া হয়েছে যে এ গান ঐ বিশেষ পরিস্থিতির বাইরে ভাবাই যায় না। কিশোরকুমারকে দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ানোয় অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু সেকালের রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী যে আজকের মত ছিল না, সেটা তাঁরা মনে রাখেন নি। সত্যজিৎ ধরতে পেরেছিলেন এই সেকেলে মেজাজটা কিশোরকুমারের গায়কীতে পাওয়া যাবে। তাই 'ঘরে-বাইরে'তেও তিনি তাঁকেই ডাকেন গানের জন্য।

এরপর আসে মিউজিক্যাল ছবির প্রসঙ্গ। 'গুপী গাইন'-এর বাস্তব ফ্যান্টাসি মেশানো জগতের সঙ্গে মিলিয়ে সত্যজিৎ যেরকম কথা ও সুর সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা ভারতীয় চলচ্চিত্রে নেই। উদয়শংকরের 'কল্পনা'-ও ফ্যান্টাসি ছিল, কিন্তু তার গান ছিল নৃত্যের পরিপূরক। সত্যজিতের ছবিতে গান অপেরার নিয়ম অনুসারে সংলাপের অন্য নাম। গুপীর গ্রাম্য সংস্কৃতির পক্ষে স্বাভাবিক হবে এমন কথা ও সুরের মূল কাঠামোর মধ্যে তিনি উত্তর ভারতীয় রাগ, কর্ণাটিকী স্টাইল, এবং পশ্চিমী উপাদান এমনভাবে এনেছেন যে তা প্রতিটি ক্ষেত্রে [illegible]র্থ হয়ে ওঠে। সলিল চৌধুরী 'মর্জিনা-আবদুল্লা' ছবিতে যেখানে ব্যর্থ হন তাঁর অনন্য প্রতিভা নিয়ে, সত্যজিৎ সেখানে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছন প্রতিষ্ঠিত গীতিকার ও সুরকার না হয়েও। কারণ সত্যজিতের গান চলচ্চিত্রে ভাষায় রূপ পায়, সলিলের গানে চলচ্চিত্রের নিজস্ব স্বাক্ষর থাকে না। এখানেও গায়ক-নির্বাচনে সত্যজিৎ সাহস দেখান। চলচ্চিত্রের নিজস্ব শর্ত অনুসারে চরিত্রানুগ গায়ক হিসেবে তিনি বেছে নেন অনুপ ঘোষালকে গুপী-বাঘার সব কটি ছবিতে। কেননা অনুপের কণ্ঠ ও গায়কীতে সেই কাম্য গ্রামীণ সরলতা মেলে। 'চিড়িয়াখানা' ছবিতে একটি ছোট্ট গান দিয়ে ('ভালোবাসার তুমি কি জানো?') সত্যজিতের গীতিকার সুরকার জীবনে যে যাত্রা শুরু তা ক্রমেই প্রসারিত হয়েছে মিউজিক্যাল ছবিগুলোতে। কিন্তু অন্য ছবিতে তিনি নিজের সুরের গান চাপিয়ে দেন নি, যা দিয়েছেন তপন সিংহ 'অতিথি' বা 'হার্মোনিয়ম' ছবিতে।

নিজস্ব সৃজনশীলতার রাশ টেনে ধরার মানসিক দৃঢ়তা ছিল বলেই সত্যজিৎ সুরের মোহে ভেসে যান নি—গানের জন্য ছবি না করে ছবির জন্য গান বেঁধেছেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' করার বহুদিনের পরিকল্পনাটা যদি বাস্তবায়িত হতো তবে আমরা মিউজিক্যাল ছবির একটা আদর্শ ভারতীয় রূপ পেতাম। যে-দেশে প্রায় সব বাণিজ্যিক ছবিই গানের সংখ্যার দিক থেকে 'মিউজিক্যাল', অথচ প্রকৃত 'মিউজিক্যাল' ছবি তৈরি হয় না, সেখানে সত্যজিৎই প্রথম দেখালেন মিউজিক্যাল ছবিরও একটা প্রয়োজন আছে, এবং তার স্বভাব-প্রকৃতিও কতটা ভিন্ন।

ঘুরে ফিরে আবার গোড়ার কথাতেই আসতে হয়—সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের সঙ্গীতেও আমাদের পথপ্রদর্শক, আমাদের শিক্ষাগুরু। গুরুরও বিচ্যুতি ঘটে, সত্যজিৎও ব্যতিক্রম

নন। 'জনঅরণ্যে' রেডিওতে গান হয় 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে,' যার সঙ্গে কোনো বাজনা নেই, রেডিওতে যা হয় না, রাষ্ট্রীয় শোকের মুহূর্ত ছাড়া। কিন্তু এমন বিচ্যুতি এতই নগণ্য যে তাতে তাঁর সিদ্ধির উচ্চতা বিন্দুমাত্র খর্ব হয় না। ভারতীয় যন্ত্রে পাশ্চাত্য সোনাটার ভঙ্গীতে যে সুরতরঙ্গ তিনি তাঁর চলচ্চিত্রে যুক্ত করেছেন তার অন্তর্নিহিত রূপটি যেমন নতুন তেমনি নতুন তার প্রয়োগ-পদ্ধতি। এজন্যই সত্যজিতের চলচ্চিত্র-সঙ্গীত পৃথক আলোচনার দাবী করতে পারে। উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর "Music of Ray" বিষয়টি উত্থাপন করেছে মাত্র, প্রয়োজন আরো গভীর গবেষণামূলক তথ্যচিত্র, যা থেকে আগামী প্রজন্মের পরিচালকেরা শিক্ষা গ্রহণ করবেন, এবং আশা করা যায়, ভারতীয় আর্ট-ফিলমের এখনো এই উপেক্ষিত দিকটি পুষ্টিলাভের একটা সুযোগ পেয়ে যাবে।

সত্যজিৎ ঃ চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত

ধ্রুব গুপ্ত

চলচ্চিত্র কনিষ্ঠতম শিল্পমাধ্যম হওয়ার কারণে এতে পূর্বের অন্যান্য শিল্পমাধ্যম, যথা—চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সাহিত্য, নাট্যকলা ও সঙ্গীতের উত্তরাধিকার আত্মস্থ হয়েছে। হয়েছে বলেই এ মাধ্যমের "নির্ভেজালত্ব" নিয়ে এত সংশয় উপস্থিত। জ্যঁ লুক গদার একমাত্র অতীতের শব্দহীন চলচ্চিত্রকেই সেই সম্মান দিতে প্রস্তুত, কিন্তু সেখানেও তো আমরা দেখি টাইটেল-এর মাধ্যমে থেকে থেকে সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে। তা ছাড়া নির্মাণকালে না হলেও প্রদর্শনকালে সেখানে সঙ্গে সঙ্গীত বাজানো হতো, সে প্রজেক্টরের অস্বস্তিকর আওয়াজ ঢাকা দেওয়া বা ছবির গতির সঙ্গে বাইরের সঙ্গীতের গতিকে মিলিয়ে দিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা যে উদ্দেশ্যেই হোক। তবে নিঃশব্দের যুগে আইজেনস্টাইনের "পোটেম্‌কিন"-এর জন্য মাইজেল-এর সৃষ্ট সঙ্গীতের বিশেষ নান্দনিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল বলে আমরা শুনেছি।

সবাক যুগে চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ভূমিকা অন্যরকম হয়ে গেল, বলা বাহুল্য। কেন না, সংলাপ বা অন্যান্য শব্দের সঙ্গে সঙ্গীতও সেখানে চিত্রশরীরে যুক্ত হল। এই সঙ্গীতযুক্তি চলচ্চিত্রক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পী এবং অশিল্পী নিজের নিজের উদ্দেশ্য বা শিল্পভাবনা অনুযায়ী যাঁর যাঁর মতো করে করেছেন। যেমন ধরা যাক তাঁদের কথা যাঁরা মনে করে নেন দর্শকরা সঙ্গীতপ্রিয় এবং বিশেষ বিশেষ প্লে-ব্যাক সিঙ্গারদের গাওয়া গান শুনতেই তাঁরা ফিল্ম দেখতে যান, ঠিক যেমন বিশেষ বিশেষ চিত্রতারকাদের পর্দায় দেখবেন বলেই অনেকে ছবি দেখতে ছোটেন। চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে সঙ্গীতেব ভূমিকা সম্পর্কে এইরকম যাঁদের ধারণা তাঁবা বলা বাহুল্য প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে ছবিতে গুচ্ছের গান এবং পঞ্চাশরকম বাদ্যযন্ত্রের আর্তনাদ সহকারে শব্দের প্লাবন বইয়ে দেবেন। কিন্তু এরকম মনে করেন না এমন লোকেরও অভাব নেই। বেশ কিছু পরিচালক আছেন যাঁরা ছবিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ হিসেব করে করেন, অন্যরকম ভাবনায় প্রণোদিত হয়ে করেন, সংযতভাবে করেন, বিশেষ আবেগ বা বুদ্ধির পরিচালনায় করেন, বিশেষ নান্দনিক উদ্দেশ্য সাধনে করেন। বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক ব্রেসঁ (Bresson) তো এ ব্যাপারে ভয়ঙ্কর কৃপণ, কেননা, তাঁর ধারণা, সঙ্গীতের এমন একটা মাদকতা আছে যা চলচ্চিত্রে বিশিষ্ট শিল্পগুণ থেকে দর্শকের মন অন্যদিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সে কারণেই তিনি এত কৃপণ এবং যখনই তাঁর ছবিতে সঙ্গীত শোনা যায়, যেটুকু শোনা যায়, তিনি শেষপর্যন্ত তার উৎসটা দেখিয়ে দেন—অর্থাৎ তাকে "ব্যাকগ্রাউণ্ড এফেক্ট" সৃষ্টির কাজ না করিয়ে সেখানে সঙ্গীতকেও 'দৃষ্টিগ্রাহ্য' করে তোলা হয় একভাবে। আন্তনিয়নির গোড়ার দিককার ছবিতেও এই ধরনের 'কৃপণতার' চিহ্ন আছে।

ওই দু'জনের মতো 'কৃপণ' না হলেও সঙ্গীতের প্রয়োগে সত্যজিৎ রায় মোটের ওপর সংযমধর্মী। চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের প্রয়োগবৈশিষ্টের জন্য অনেকেই তাঁর চলচ্চিত্রকর্মের

সেই দিকটির প্রতি বিশেষভাবে গুণগ্রাহী এবং সেই গুণগ্রাহীদের মধ্যে জার্মানির চলচ্চিত্রকার হার্টজগ্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত প্রয়োগে তাঁর এই সিদ্ধির একটা বিশেষ কারণ, তিনি কেবল একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞই নন, সঙ্গীতস্রষ্টাও। এ সুবিধাটা সব চলচ্চিত্রকারদের থাকতে দেখা যায় না। সত্যজিতের সঙ্গীত-সম্পৃক্তি সম্ভবত অনেকটাই তাঁর বাল্য ও প্রাক্‌যৌবন অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। তিনি নিজেই তাঁর কথা বলেছেন নানা সাক্ষাৎকারে। তাঁর বাড়িতে ছিল সাঙ্গীতিক আবহাওয়া; মা-মাসিরা ছিলেন সুগায়িকা, কনক দাসের কথা তিনি বলছেন তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রীতির প্রেক্ষিত হিসাবে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাঁর বিশেষ অধিগমনেরও সে রকম পটভূমিকা আছে। তিনি নিজেই বলেছেন, একটু উচ্চবর্গীয় শিক্ষিত বাঙালির ঘরে তখন চালিয়াপিনের বা বেটোফেনের ভায়োলিন কনচের্টোর রেকর্ড থাকত। শ্যাম বেনেগালের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন 'I was surrounded by music' (সীগাল বুকস্ প্রকাশিত Benegal on Roy দ্রষ্টব্য)। যুবাবস্থায় তিনি ক্যালকাটা সিম্‌ফনি অর্কেস্ট্রাতে অনুষ্ঠানের নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন এবং তিনিই জানাচ্ছেন আর-একজন বিশিষ্ট শ্রোতা ছিলেন নীরদ সি চৌধুরী মহাশয়। শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নের সময় একজন জার্মান ইহুদি ডঃ আরন্‌সনের সান্নিধ্য তাঁকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত করেছিল সে কথাও তিনি জানান। এই পাশ্চাত্যসঙ্গীত-জ্ঞান, শুধু চলচ্চিত্র সঙ্গীতের প্রয়োগ ক্ষেত্রেই নয়, অন্যভাবেও তাঁর চলচ্চিত্রভাবনাকে কী ভাবে কিছুটা পরিচালিত করেছিল সে কথায় পরে আসছি। তার আগে এখানেই একটা কথা বলে নেওয়া যায় বোধ হয়। সম্প্রতি তাঁকে পরিপূর্ণভাবে হলিউড-চলচ্চিত্র সংস্কৃতির সন্তান বলে প্রতিপন্ন করার একটা প্রবণতা সমালোচকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তার একটি কারণ তিনি নিজেও। আজকাল ঘন ঘন তিনি জন ফোর্ডের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা বলছেন। এবার অস্কার প্রাপ্তি সে ধারণাকে হয়তো আরও পুষ্ট করবে! আমার এ নিবন্ধে সে তর্কে যাওয়ার কোনও অবকাশ নেই, তবে তাঁর চলচ্চিত্রকর্মে আমেরিকান চলচ্চিত্রের উৎকৃষ্ট দিকটির উত্তরাধিকার নিশ্চয় বর্তালেও "হলিউডী আদর্শ" বলতে আমরা যা বুঝি, সত্যজিতের পূর্ণ 'অথর'-কেন্দ্রিক, উৎকৃষ্ট ছবিগুলির মধ্যে তার তেমন কিছু নেই। সঙ্গীতক্ষেত্রে নেইই। মনে রাখতে হবে ওঁর যুবাবয়সে করা 'ঘরে বাইরে'র চিত্রনাট্যটি তিনি পরে বর্জন করেছিলেন ওটা বড় বেশি 'হলিউড-গন্ধী' হয়েছিল এই বিবেচনাতে।

সে কথা যাক, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখা যাবে তিনি নিজেই শ্যাম বেনেগালকে বলছেন, The "American films drowned in Music--I never Liked, you know" —এবং তার পরেই বলছেন, ওই আমেরিকাতেই শিল্পসম্মতভাবে সঙ্গীত কী ভাবে প্রয়োগ করা যায় তা তিনি আমেরিকাতে নন-আমেরিকান অর্থাৎ ইউরোপ থেকে আসা চলচ্চিত্রকারদের কাজ থেকে অনুধাবন করেছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে রেনোয়ার "দ্য সাদার্নার" ছবি উল্লেখ করেছেন। 'আবহসঙ্গীত' বিষয়ে তিনি বাংলাতে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন 'দেশ' পত্রিকারই বিনোদন সংখ্যার (১৯৬৪) জন্য, যা পরে তাঁর 'বিষয় চলচ্চিত্র' পুস্তকের অন্তর্গত হয়েছে। সেখানেও তিনি মোটের ওপর চলচ্চিত্রে সঙ্গীত প্রয়োগে সংযম, চলচ্চিত্রের প্রয়োজনকে সর্বাগ্রে মাথায় রাখা, সঙ্গীত পরিচালককে সর্বদা ছবির পরিচালকের 'অনুগত' থাকা বা নিয়ন্ত্রণে থাকা বিষয়ে যে সব কথা বলছেন

তা হলিউডি প্রথার একেবারে পরিপন্থী (অর্সন ওয়েলস্ বা ফোর্ড বা হিচকক্‌কে, চ্যাপলিনকে 'হলিউডী প্রথার শিল্পী' বলার মানে নেই আমার কাছে)। সুরকারদেব পরিপূর্ণভাবে চলচ্চিত্র পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে রাখা আমাদের বড় মাপের সঙ্গীতশিল্পীদের ক্ষেত্রে তেমন সম্ভব হচ্ছিল না, 'তিনকন্যার' পর থেকে সত্যজিতের নিজের ছবির সঙ্গীত নিজে রচনা করার পিছনে সেটা একটা বড় কারণ ছিল অন্যান্য কারণের সঙ্গে।

ছবির ভাবকে তার জন্য রচিত সঙ্গীত অনুসরণ করবে, ছবিব দাবির কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে, এ কথা বলতে গিয়ে তিনি 'স্টক' মিউজিক বিষয়েও তাঁর বিরূপতা প্রকাশ করেছেন, যে ভাবে করেছেন তাতে বোঝা যাবে সঙ্গীতে ''টটোলজিকাল'' প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি বীতশ্রদ্ধ। এবং এই সূত্রেই বলেছেন, ''প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যবস্তু, কথা ও ধ্বনির সাহায্যে ছবিতে যা বলা হল, তার উপরে সঙ্গীতের প্রলেপ দিয়ে বক্তব্যকে আরও পরিস্ফুট বা আরও আবেগময় করার প্রয়োজন যদি পরিচালক বোধ করেন, তবেই তিনি আবহসঙ্গীতের আশ্রয় নেন।'' আরও বলেন ''করুণ দৃশ্যে যদি পরিচালকদেব দোষে কারুণ্যের অভাব ঘটে থাকে তা হলে বেহালা বা তাব সানাইবাদকের করুণতম স্বরোচ্ছাসও সে অভাব পূরণ করতে অক্ষম।'' অর্থাৎ দুর্গার মৃত্যু সংবাদ যেখানে সর্বজয়া হরিহরকে দিচ্ছে ('পথের পাঁচালী') সেখানে ছবির গঠনে হবিহবেব সংলাপে এবং সর্বজয়ার নীরবতা ও কান্নায় ভাঙা মুখের সন্নিবেশে একটি অনবদ্য দৃশ্য রচিত না হলে তারসানাই-এর আর্তনাদ সেখানে নিষ্ফল হত; সঙ্গীত সেখানে দৃশ্যটিকে ''আরও আবেগময়'' হতে সহায়তা করেছে। এখানেই অন্য একটা কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। এখানে সঙ্গীত প্রয়োগের গুণগ্রাহীদের মধ্যে দু-একজনকে অভিযোগ করতে শুনেছি, ওই সঙ্গীতই ছিল যথেষ্ট, তাকে ছাপিয়ে হরিহরেব 'দুর্গা-দুর্গামা' বলে আর্তনাদেব প্রয়োজন ছিল না। একটা সাধারণ 'প্রয়োজন' তো ছিলই, আমরা পরেব শটেই দেখি অপু দোকান থেকে ফেরার পথে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ দূর থেকে বাবার কণ্ঠস্বর তাকে জানান দিচ্ছে, বাবা ফিরে এসেছেন। তা ছাড়াও সাঙ্গীতিক আর্তনাদটি একভাবে সর্বজয়ার বাস্তব আর্তনাদের বিকল্পের কাজ কবেছে—তার সঙ্গে হরিহরের কণ্ঠেব আর্তনাদ সুপ্রযুক্ত। সে যাই হোক, তবে এ কথা ঠিক যে টটোলজিকে বিশেষ প্রশ্রয় না দিলেও এবং ফর্মুলা আশ্রয় (অর্থাৎ 'নাটকীয়' মুহূর্তে ঝাঁঝ) না করলেও সত্যজিতের সঙ্গীত প্রয়োগ দৃশ্যের ভাবের অনুসারী, তার সঙ্গে কোনও প্রবল বৈপরীত্য সৃষ্টিকারী নয়। দৃশ্যে শ্রাব্যে সেখানে তেমন কোনও ''অ্যান্‌টিথিসিস'' রচিত হয় না যা ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্র রচনায় আমরা দেখি। তবে সে অনুসৃতি অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসাধাবণভাবে সার্থক এবং সে ক্ষেত্রে তিনি ছবিব প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে কী যন্ত্রে বা সঙ্গীতের চরিত্রে ভারতীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই ভাণ্ডার থেকেই রসদ নিয়েছেন।

তাঁর পাশ্চাত্য সঙ্গীত প্রীতি বিষয়ে একটি কথা এখানে বলে নেওয়া যায়। চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা শুধু প্রয়োগের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, তার অন্য একটি নান্দনিক দিক আছে। সঙ্গীতের গঠন বা প্রকৃতি চলচ্চিত্রের গঠন বা প্রকৃতিকে কিছু শিক্ষা দিয়েছে কি না, এটি একটি জটিল তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ। আইজেনস্টাইনের তাত্ত্বিক আলোচনা পড়লে দেখা যায় তিনি দৃশ্য ও দৃশ্যের পারম্পর্য রচনায় সাঙ্গীতিক চেতনা

দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। নিজেই পোটেম্‌কিনের ব্যাখ্যায় "পলিফনির" প্রভাবের কথা বলেছেন, কাউন্টার পয়েন্টের প্রসঙ্গ এনেছেন। কথাগুলি আমাদের চিত্রসমালোচনায় আপ্তবাক্যের মতো ব্যবহার না করাই উচিত বলে আমার মনে হয়। কেননা 'পলিফনি'র একটা সাধারণ ও একটা বিশেষ ইতিহাসাশ্রিত (নবম থেকে ষোড়শ শতাব্দী) সংজ্ঞা আছে। সাধারণ সংজ্ঞাটিবও বহু স্বর-সমন্বয়েব চরিত্র একটি দৃশ্যবাহী শিল্পে কী ভাবে বিধৃত হতে পারে এটা এমন একটা জটিল প্রশ্ন, যার আলোচনা করার জায়গা এ প্রবন্ধে নেই। সত্যজিৎ রায় মাঝে মাঝে তাঁর ছবিতে মোৎসার্টিয় সঙ্গীতের প্রভাবের (তাঁর সুরসৃষ্টিব ক্ষেত্রে একমাত্র প্রভাব হিসাবে তিনি সন্দীপ রায়ের 'গুপী বাঘা ফিরে এল'-র একটি সঙ্গীতাংশকে নিজেই নির্দিষ্ট করেছেন সম্প্রতি একটি বেতার ভাষণে) কথা বলেছেন। 'অসঁব্‌ল্‌' (Ensemble)- এর কথাও তাঁর চলচ্চিত্র রচনায় প্রায়ই বলা হয়। দ্বিতীয়টির একটা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাখ্যা আছে। ওই কথাটিতে এমন একটি ইঙ্গিত আছে যে ছবিতে একাধিক চরিত্র, একাধিক 'মুড', একাধিক ছোট ছোট ঘটনা, একাধিক ভাবনা সমান গুরুত্ব নিয়ে সুন্দর ছন্দে সন্নিবিষ্ট হলে আমরা তাতে 'অসঁব্‌ল্‌'-এব আস্বাদ পাই। সে দিক থেকে গোটা 'কাঞ্চনজঙঘা' ছবিটাই তাই এবং তার চিত্রনাট্যেই আমরা একটা সাঙ্গীতিক চরিত্র পাই। 'অরণ্যের দিনবাত্রি' বা পরে 'শাখাপ্রশাখা'ও এক্ষেত্রে স্মবণীয়। 'অরণ্যেব দিনরাত্রি'-তে একই ফ্রেমে, সম্পাদনার সাহায্য না নিয়েই সে রসটি সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে একপাশে 'মেমারি গেম' তুঙ্গে উঠছে, অন্যপাশে হেরে যাওয়া দু'জন (শুভেন্দু ও কাবেরী) 'সাঁওতালী গয়না' নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে—একই ফ্রেমে দুটি সম্পর্ক গড়ে বা গড়ে উঠেই ভেঙে যাওয়াব উদ্যোগ দৃষ্টিগ্রাহ্য হিসাবে ধরা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল, চলচ্চিত্রকাব নিজে এর সৃষ্টিপর্বে সাঙ্গীতিক চেতনা দ্বারা নিশ্চয় প্রভাবিত হয়েছেন—তিনি যখন নিজেই তা ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু একজন দর্শককে সেই "সম্মেলকতা"-র রসগ্রহণ করার পক্ষে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ওই প্রসঙ্গ গুলি মাথায রাখা অত্যাবশ্যক কি? দেখা যাবে এ ধরনেব দুটি ভিন্ন শিল্পের সাধর্ম্য ধাবণার এবংবিধ আবশ্যকতা বিষয়ে কুর্ট ভাইল (যিনি সঙ্গীত বচয়িতা হিসাবে ছিলেন বের্তোল ব্রেষ্‌টের সহযোগী) সংশয় প্রকাশ কবেছেন।

জটিল তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বরং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের আলোচনা করা যাক। ভারতীয় সঙ্গীত প্রযোগের একটি বিশেষ দিকের কথা দিয়ে শুরু করি। উপরে উল্লেখিত বাংলা প্রবন্ধটিতে ভারতীয় রাগ সঙ্গীত প্রয়োগ বিষয়ে সত্যজিৎ রায় বলছেন, 'বাগাশ্রিত সুর ব্যবহার হলেও তার সঙ্গে তবলার সঙ্গত একেবারেই অচল।' শুধু এটুকু পড়ে লোকের ধারণা হতে পারে যে, সত্যজিৎ ছবিতে বুঝি ওই রকম পারকাশন একদম প্রযোগ করেননি। তাবপরই মনে হবে 'জলসাঘর'-এর কথা, রোশেন কুমারীর নাচের সঙ্গে বাঁয়া তবলার ক্লোজ আপের কথা। কিন্তু এখানে পার্থক্যটা লক্ষ্য করার মত, 'জলসাঘর' ছবিতে ভারতীয় রাগ সঙ্গীত 'আবহ' সঙ্গীত নয়, সেখানে সঙ্গীত 'ব্যাকগ্রাউন্ড'-এ নেই, সেখানে সামন্ত সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে, বিশ্বম্ভরের অবসেশন-এর কেন্দ্র হিসাবে, তার স্ত্রীর সতীন হিসাবে, সঙ্গীত ছবির একটি চরিত্র বিশেষ। ওই কথাটিব মাধ্যমে সত্যজিৎ বলতে চেয়েছেন যে, তাল প্রযুক্ত সুবদ্ধ ভারতীয় রাগের প্রয়োগে যে মাদকতা সৃষ্টি হবে তা ছবি থেকে দর্শকের মন সরিয়ে

নিতে পারে। তবে আবহ হিসাবেও তিনি পারকাশন ব্যবহার করেননি তা নয়, 'পরশ পাথর'-এ কমিক এফেক্ট তৈরির জন্য তার বিশেষ প্রয়োগ আছে। 'অপরাজিত' ছবিতে বেচারা কথক ঠাকুরটি যখন হরিহরের বাড়ি চা খেয়ে যেতে যেতে নিজের জন্য পাত্রীর খোঁজ করছে তখন সাউন্ড ট্র্যাকে আমরা মৃদু তবলার বোল শুনতে পাই যা দৃশ্যটির একটি শাব্দিক পট তৈরি করে। সেটাও কিন্তু একদিক থেকে দেখতে গেলে যাকে 'ইন্‌সিডেন্টাল সাউন্ড' বলে তাই। একটু ভাবলে বোঝা যাবে ওটা আসছে দোতলা থেকে, নন্দবাবু তার সান্ধ্য অনুশীলন করছিলেন। পক্ষান্তরে অতিনাটকীয়তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে 'ইনসিডেন্টাল সাউন্ড'-এর সাঙ্গীতিক প্রায়োগের কিছু নিদর্শন সত্যজিতের ছবিতে আছে। 'মহানগর' ছবিতে আরতিব চাকবি নেবার খবর যখন সুব্রত বাবার কাছে ভাঙছে, সে মুহূর্তে আমরা রাস্তায় একটা মোটরের হর্ন-এর আওযাজ পাই যেটি একটি বিশেষ এফেক্ট তৈরি করে। 'কাঞ্চনজঙঘা' ছবিতে একটি অনবদ্য মুহূর্তে, যখন ইঞ্জিনিযার অশোক মনীষার কাছ থেকে তাব আবেদনের একটি বিশেষ উত্তবের অধীব প্রতীক্ষান্তে শুনছে 'আমার মনে হয় mist হবে', তখন তার উৎকণ্ঠার পট হিসাবে সত্যজিৎ পাশ দিয়ে চলে-যাওয়া পাহাড়ীদের ভেড়ার দলের গলার ঘণ্টাধ্বনিকে ব্যবহাব কবেছেন। 'কাঞ্চনজঙঘা' প্রসঙ্গ যখন উঠে এল তখন আরো দুটো কথা এখানে বলে নিই। অতি সূক্ষ্মভাবে 'কাঞ্চনজঙঘা'য দেখানো হচ্ছে যে অশোক 'is not Moni's type' (মনীষার জামাইবাবুর কথা)। 'কুয়াশা প্রসঙ্গ' তার মধ্যে একটি, যে কুযাশা মনীষাব মনে একটা অনির্বচনীয় অনুভূতি আনে, আর 'ওযার্লড্‌লি' উদ্যোগী পুরুষ অশোক বলে, 'হ্যাঁ, it is healthy'। রুচি বিষয়ে এ ব্যঙ্গ আবাব ফিরে আসে—অসম মনেব দুই ব্যক্তির অন্তরঙ্গ আলোচনা ক্ষেত্রে, মনীষার মুখে 'আপনি ঘবে-বাইরে পড়েন নি?' —সংলাপে। বহুকাল পরে 'শাখাপ্রশাখা' ছবিতে অনুরূপ জায়গা আসে দেখি, যখন মমতা অভিনীত চরিত্রটি তার স্বামী (দীপংকর দে)-কে রুচি বিষয়ে ব্যঙ্গ কববে, সত্যজিৎ সেখানে সঙ্গীতের আশ্রয় নিয়েছেন। দুর্নীতির প্রতিবাদ চিহ্নস্বরূপ উন্মাদ বড় ভাই (সৌমিত্র) জন্ সেবাস্টিয়ান বাখ-এর সঙ্গীতে আশ্রয় নিয়েছে, রাতে তাব আওয়াজ অন্য ভাইদের বিরক্ত করছে। সেখানে সে সঙ্গীতকে চিনতে না পাবাব জন্য স্ত্রী স্বামীকে যে ঠাট্টাটি করছেন (নামও শোনোনি বোধহয়) তা বড় বেশি প্রকট, তাব মধ্যে 'কাঞ্চনজঙঘা'র সেই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাটি পাওয়া যায না। 'কাঞ্চনজঙঘা'ব আবেকটি সম্পদ 'এ পববাসে' রবীন্দ্রসঙ্গীতটির অনবদ্য প্রয়োগ। সাধাবণত বাংলা ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রয়োগ বড় জোর অর্থহীনভাবে আলঙ্কারিক হয়ে থাকে, তার বিশেষ তাৎপর্য থাকে না। তাৎপর্যমণ্ডিতভাবে বাংলা সংস্কৃতির এই বিশিষ্ট সম্পদকে চলচ্চিত্রে প্রয়োগ করেছেন সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটক। 'কাঞ্চনজঙঘা'তে দেখি লাবণ্যের ব্যক্তিত্ব তার প্রতাপশালী স্বামীর দাপটে চাপা পড়েছে। দার্জিলিঙ-এর বিশেষ আবহাওয়াতে বিশিষ্ট মুহূর্তে বহুকাল পরে তিনি আপন মনে বিষণ্ণ গান গেয়ে ওঠেন অসীমেব দিকে তাকিয়ে 'এ পরবাসে রবে কে'। দাদা জগদীশ (পাহাড়ী সান্যাল) সস্নেহে বলেন 'কতকাল পবে তুই গান গাইলি'। তারপর মুহূর্তেই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে; ঐ বিষণ্ণ গান গেয়েও লাবণ্যের যেন একটা ক্যাথারসিস হয়, তিনি সাহস সঞ্চয় করে বলেন, 'এক্ষুণি মণিকে একটা কথা বলা দরকার, সে যেন নিজে যা ভাল বোঝে তাই কবে'— অর্থাৎ রুদ্ধ আবেগকে গানের

মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে তিনি যে মুক্তির ভাব বোধ করেন, তাই তাঁকে তার স্বামীর পরুষ প্রতাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার স্পর্ধা যোগায়। সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে রুদ্ধ আবেগকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে পথ করে দেবার নিদর্শন আছে ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে 'যে বাতে মোর দুয়ারগুলি' গানের প্রয়োগে।

গানের নানা ধরনের প্রয়োগেব (প্রধানত বুদ্ধিগত, ততটা আবেগগত নয়) অজস্র নিদর্শন আছে 'চারুলতা' ছবিতে। তিনি রামমোহন রায় রচিত ধ্রুপদের ('মনে করো শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর') পাশেই নিধুবাবুব টপ্পা সন্নিবেশ করে ঐ দুটি গানে উনিশ শতকী ব্রাহ্ম ও বাবুকালচারকে একত্রে ধরে প্রেক্ষাপট রচনা কবেন। একে আমরা হয়ত লঘুভাবে 'কাউন্টাব পয়েন্ট' বলতেও পারি, এবং নিশিকান্তর চোখ টিপে, 'আরেকটু লিবারাল হয়ে' টপ্পা গাওয়ানোব প্রস্তাবে 'লিবাবাল' কথাটিব চমৎকার পানিং (রামমোহন রায় বাংলার 'সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম লিবারাল' বলে ভূপতি গানটি দিয়ে গ্লাডস্টোনের বিজয় উপলক্ষে আয়োজিত সভা আরম্ভ করতে গিয়ে) এই 'কাউন্টার পয়েন্টের' সূচনা বিন্দু। রামমোহনেব গানটি আমাদেব যেন টেনে নিযে যায় অন্য ঘরে, যেখানে গানটি শুনে ব্রিস্টলে রামমোহনের সমাধি প্রসঙ্গ ঘিবে অমল ও চারুর 'ব' অনুপ্রাস ভিত্তিক সংলাপ শুনি, যা চারুকে সন্নিকট করবে অমলের। ততক্ষণে টপ্পাটি শুরু হয়ে গেছে। দূর থেকে শোনা যায়। বিজয়-সভা, উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতা ও চারু-অমলের ঘনিষ্ঠতা, এই তিনটি স্তরকে গানদুটি সুন্দরভাবে গেঁথে দেয়। কথাবিহীন গানের সুর প্রয়োগের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত ছবিতে আছে। রোমান্টিক সাহিত্য (অমল) ও রাজনীতি (ভূপতি)র আপেক্ষিত গুরুত্ব নিয়ে ভূপতির তর্কের মধ্যে অমল পিয়ানোতে একটা সুর ভাঁজে— ভূপতি মন্তব্য করে 'Queen saved হবে, দেশের হবে কী?' অর্থাৎ অমল 'God save the Queen' বাজাচ্ছিল। থীম মিউজিকের মত করে চারুলতাতে যা বাজানো হয়েছে তার সুর 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে'-কে ভেঙে তৈরি। ঐ গানটি সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি। সত্যজিৎ রায় ১৯৭২ সালে একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, ঐ গানটির ভাবমণ্ডল তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, কথাটি চিনে নিতে পারা জরুবি নয় ছবির পক্ষে। কিন্তু ছবির একটি মুহূর্তে অমল যখন জীবনে সুখ দুঃখ, বিরহ বিচ্ছেদ-এর ঢেউ ওঠা পড়ার দ্বৈততার কথা চারুকে বলে, তখন সেই সংলাপে, যাঁরা গানটি চেনেন তাঁরা তার একটি সাক্ষাৎ প্রতিফলন পেয়ে যেতে পারেন।

'চারুলতা'তে মম•চিত্তের সুরের পৌনঃপৌনিক ব্যবহারে ঐ শব্দগুচ্ছের যেমন একটা অনুষঙ্গগত মূল্য তৈরি হয়, সে জাতীয় অনুষঙ্গগত মূল্যের অপূর্ব নিদর্শন 'পথের পাঁচালী'র টাইটল মিউজিক। রবিশংকরের তৈরি ঐ প্যাটার্নটি শোনামাত্র আমাদের মনে বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির 'চেনা দিনের গন্ধ আসে'। 'পথের পাঁচালী'তেই শুধু তা নানা ভাবে নানারূপে একাধিক বার প্রযুক্ত হয়নি—সত্যজিৎ রায় তাকে 'অপরাজিত'-তে এবং 'অপুর সংসার'-এও প্রয়োগ করেছেন। 'অপরাজিত'তে কাশীত্যাগ করার পর সর্বজয়ার দীর্ঘ ট্রেন যাত্রায় বিহারের রুক্ষ প্রকৃতিকে ডিসলভ্ করে যেই ট্রেনের জানালা দিয়ে কলাগাছসমন্বিত বঙ্গভূমির ল্যাণ্ডস্কেপ দেখা দেয়, তখন ঐ সুরটি বেজে ওঠে, সর্বজয়ার বিষণ্ণ মুখে হাসি দেখা দেয়, (একটি প্রবন্ধে এই কাজটি সম্পর্কে ঋত্বিক ঘটক লিখেছিলেন 'এখানে সত্যজিৎ রায় একটি কাণ্ড করেছেন') মনসাপোতার ইস্কুলে ইন্সপেক্টরের সামনে

অপু যখন আবৃত্তি করে 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল' তখন নেপথ্যে আবার ঐ সুরটি বাজে। 'অপুর সংসার'-এ রাতের নির্জন কলকাতাতে আবেগ ভরে অপু যখন বন্ধু পুলুর কাছে তাব উপন্যাস ('আত্মজীবনী') -এর কথা মেলে ধরে তখন আবার নেপথ্যে আমরা ঐ সুর শুনি। এইভাবে ঐ সুবটি একটি 'চিহ্ন' হয়ে যায় গভীর অর্থে।

চারুলতাতে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' প্রয়োগে সত্যজিতের চিত্ররচনা রীতি থেকে একটা পার্থক্য দেখা যায়, প্রধানত বাস্তববাদের আদর্শে ধৃত সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে যেটা বড় একটা দেখা যায় না। অমল বা চারুর মুখে সেখানে অন্য যেসব গানের টুকরো টাকরা আছে (ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বা জয়দেবের পদ) তা সৌমিত্র ও মাধবী নিজেদের কণ্ঠে 'স্বাভাবিক' ভাবে গেয়েছেন। এ গানে শুধু যে কিশোরকুমার-এব নিটোল কণ্ঠস্বরে নিটোল গান শুনি তাই নয়, পিয়ানো থেকে উঠে ওয়ালৎস -এর ঢঙে গানটি গাইবার সময়েও যন্ত্রানুষঙ্গ প্রবলভাবে সঙ্গে থাকে— তাতে যেন অপেরাটিক ঢং এসে যায়। এমনিতে চটি বোনাব দৃশ্যে 'দাদাব কী সৌভাগ্য' তোমাবও হবে' এই সংলাপ সুরে উচ্চারণ করিয়ে সত্যজিৎ রায় অপেরার ঢঙটি এনে দেন, কিন্তু তা একভাবে ঠাকুরবাড়ির এবং তৎকালের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটা ছবিতে ধরায়। 'গুপী বাঘা' ছবিগুলির জন্য তিনি যেভাবে গানের প্রয়োগ করেন তারই ছোট একটা ভূমিকা পাওয়া যায় 'আমি চিনি গো চিনি তোমাবে' গানের ঐ প্রকার প্রযোগে। গুপী বাঘার জগৎ ফ্যান্টাসির জগৎ—যেখানে সঙ্গীতের প্রকবণ ও প্রকৃতি অন্যরকম, সেখানে 'কম্পোজার' সত্যজিৎ রায় নিজেকে মেলে ধরবাব অনেক বেশি সুযোগ পেয়েছেন এবং তা চরিতার্থও করেছেন রাবীন্দ্রিক সুর, কর্ণাটকী ঢঙ, লোকসঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রসদ নিয়ে এবং অনুপ ঘোষালের সুকণ্ঠ নিয়ে। তবে সেখানেও তার স্বভাবজ সংযম তাকে আতিশয্যকে প্রশ্রয় দিতে বাধা দিয়েছে। যেখানে অসাঙ্গীতি শব্দকে অনুষঙ্গ হিসাবে বেশি কার্যকর মনে হবে সেখানে সেই শব্দকে প্রায় সঙ্গীতের পর্যায়ে তুলেছেন, এমনকি সিঁড়ির ওপর জুতোর শব্দকেও, ('সীমাবদ্ধে' লিফ্ট খারাপ বলে শ্যামলেন্দুর সিঁড়ি ভাঙার দীর্ঘ দৃশ্য) সেখানে সঙ্গীত লাগিযে ভাবী বিপর্যয়ের আভাস দেননি।

অবশ্য চলচ্চিত্রে অন্য ধরনের সঙ্গীতভাবনা প্রয়োগেব নিদর্শন আছে, কিন্তু কথা হ'ল এই যে, সত্যজিৎ তাঁর স্বধর্মে স্থিত থেকে সঙ্গীত প্রয়োগে সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁর সংযম-কে খোঁচা মেরে অনেককে ভারতের নাট্যশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি সহকারে চলচ্চিত্রশিল্পে ভারতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে সাধারণ ভারতীয় ছবির 'কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারী, ইম্ফল হতে সিন্ধু, নেচে নেচে নায়ক-নায়িকার গেয়ে বেড়ানো, গাছেব ডাল ধরে জেলের গরাদ ধরে গান গাওয়ার' নামে ককিয়ে ওঠাকে, তাত্ত্বিক সমর্থন করতে দেখা গেছে। ভাগ্য ভাল যে নানা রকম 'ভারতীয়ত্ব' আছে এবং শিল্পী হিসাবে সত্যজিৎ রায় বিশেষ বকম 'ভারতীয়ত্বের' প্রতিভূ, কোনো সবকারি বা ব্যবসায়িক 'ভারতীয়ত্বের' নন।
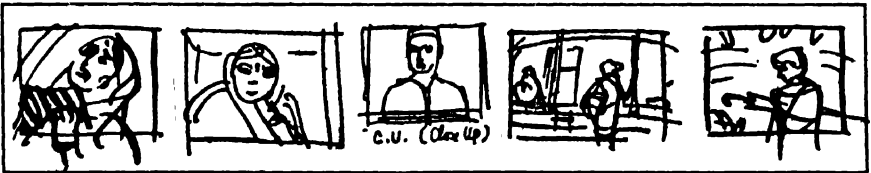
সত্যজিৎ রায়ের অঙ্কন
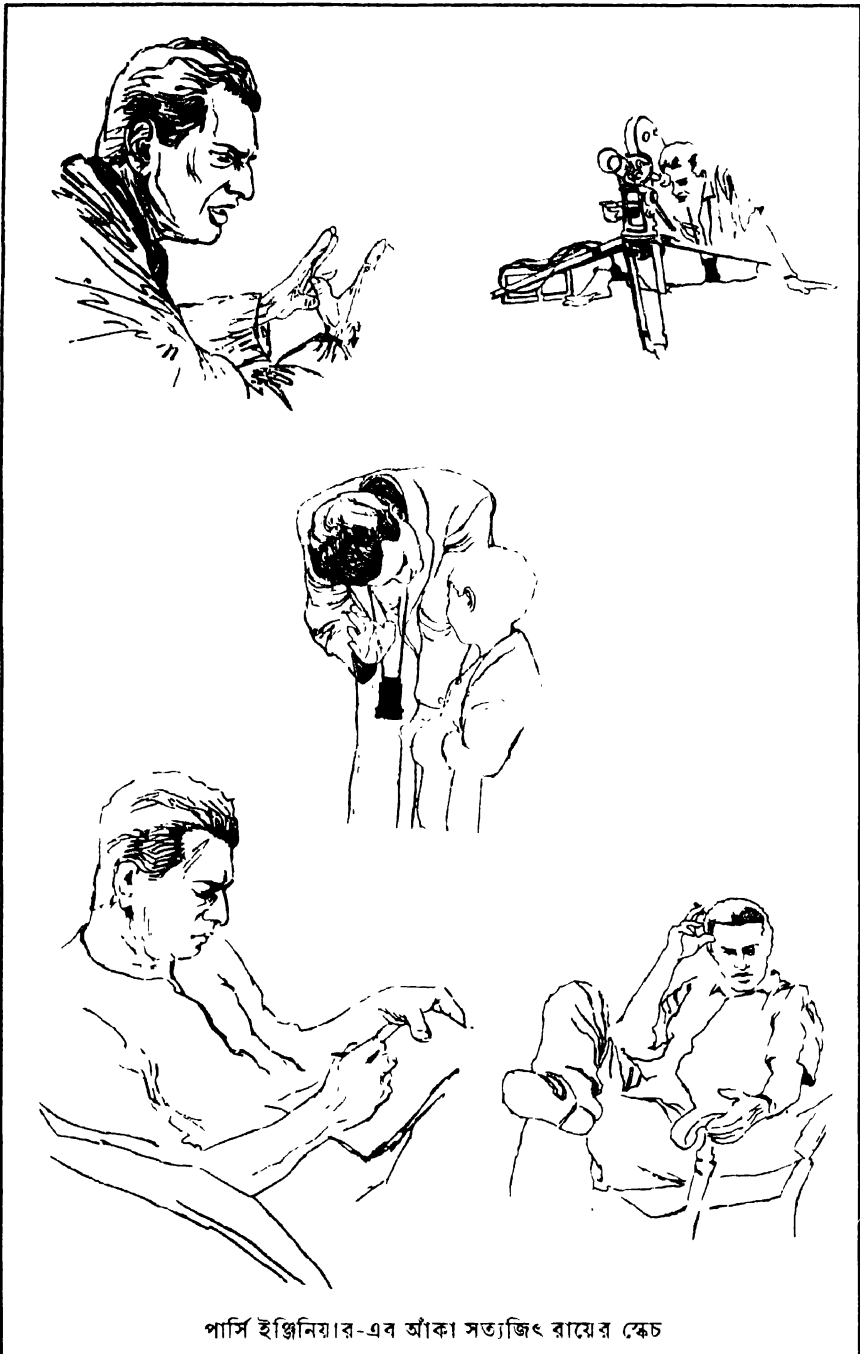
পার্সি ইঞ্জিনিয়ার-এর আঁকা সত্যজিৎ রায়ের স্কেচ

গল্পের দর্পণে সত্যজিৎ রায়

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়ের গল্প পড়তে পড়তে আমরা একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে চেনা হয়ে যায়—তিনি ফিল্মের সত্যজিৎ হতেও পারেন, নাও পারেন। ববঞ্চ বলা ভাল; গল্পের ভিতর দিয়ে যাকে পাই তিনি ব্যক্তি হিসেবে একটা পুরোমাপের মানুষ—স্ববিরোধ সমেত আস্তো মানুষ। স্ববিরোধ সমন্বিত আস্তো প্রাণবান অখণ্ডতার জন্যই সেই ব্যক্তিটি এত চিত্তাকর্ষক। তাঁর গল্পের ভিতর দিয়ে সে ব্যক্তিটিকে প্রত্যক্ষে পেয়ে যাই বলে সরাসরি তাঁর সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা আমি কখনো করিনি। করিনি যে তার অবশ্য দুটো কাবণ আছে। এক, সে কার্যকারণের অভাব। দুই, একটি শ্রুতিলব্ধ অভিজ্ঞতা। আমরা এক সহকর্মী 'অপরাজিত' চিত্রস্থ হবাব পর কলকাতার রাস্তায় শ্রীরাযকে দেখতে পেয়ে বলে বসেছিল—'দারুণ বই হয়েছে মিঃ বায়।' মিঃ রায় নাকি কোনো জবাব দেননি—স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণটাও উচ্চারণ করেন নি। এই সূত্রেই সংযত হলাম ফেলুদাকে দেখে—গায়ে পড়ে আলাপ ফেলুদা পছন্দ করেন না। কিন্তু তাতে কোনো আফশোস নেই। কেননা গল্পগুলি পড়তে পড়তে বিকল্পে একজন চোখের সামনে ভেসে ওঠেন—যার আকার প্রকার হাঁটা চলা খাওযা দাওয়া রুচি অরুচি এমনকি পড়াশুনায় আগ্রহ পর্যন্ত নিটোল বৃত্তে সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

'মাথায় বড়ো' কথাটিকে শ্লেষার্থে ধরার আগে দেখতে পাই তাঁর প্রধান চরিত্ররা সকলেই সাধারণ বাঙালির চেয়ে দীর্ঘতর। তাঁর প্রোফেসর শঙ্কু সাড়ে ছফিটের বেশি, ''খগম্''-এর ইমলি বাবা বসে থাকলে বোঝা যায় না, দাঁড়ালে টের পাওয়া যায় কত লম্বা। বাতিকবাবু ছ-ফুট। ফেলুদাও উঁচু মাপের মানুষ। তপেশও কৈশোরেই পাঁচ-সাত। নীহাব দত্ত ছয়। তাই বলে সবাই তো সমান মাপের হয় না। ''অনাথবাবুর ভয়'' গল্পের অনাথবাবু, ''পটলবাবু ফিল্মস্টার'' গল্পের পটলবাবু, ''প্রোফেসর হিজি বিজ্ বিজ'' গল্পের হিজিবিজ্ বিজ বেঁটে মানুষ—কিন্তু মজাটা এই যে, এরা কেউ ছোট মাপের মানুষ নয়। এইবার আমার ব্যবহৃত 'মাথায় বড়ো' কথাটিকে শ্লেষার্থে নেবার সময় এল। অনাথবাবু পটলবাবু হিজিবিজ্ বিজ মনে মেধায় স্বপ্নে সন্ধানে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচুমাপের মানুষ। এ্যাভারেজ আকৃতির মধ্যেও থাকে অসাধারণ কোনো অভিপ্রায়—যে অস্তিত্ব অন্তর্গূঢ়, তার একটা ইঙ্গিত এসব চরিত্রগুলির মধ্যে চমকায়। তখন বেশ বোঝা যায় একটা মনের সাবয়ব সান্নিধ্য গল্পগুলিতে কবোষ্ণ হয়ে উঠছে—বাইরের মাপের দিকে নয়, ভিতরে মাপের প্রতি অদম্য কৌতূহল যার চরিত্র। ঠিক স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, তবু আভাসে আবছায়ায় উঁকি দেয় সেই মানুষটির জীবনকে দেখার একটা ভঙ্গি। লম্বা মানুষগুলি প্রায়ই যাকে বলে সাক্‌সেসফুল ম্যান। খ্যাতির সম্পদে সম্পন্ন প্রোফেসর শঙ্কু, সাফল্যে স্বচ্ছল প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর প্রদোষ মিত্র। অপেক্ষাকৃত হ্রস্বকায় মানুষগুলি সেই অনুপাতে উজ্জ্বল নয়, বাইরের বাজারে দাম কষার প্রতিযোগিতায়

তারা বিশেষ জেতে নি। কিন্তু এই চরিত্রগুলির ভিতর দিয়ে এদের স্রষ্টাকে চেনা যায়। পর্থিব পাওয়া বা না-পাওয়ার নিরিখ ব্যবহার করে যে যাচাই শেষ করা যায় না— এ চরিত্রগুলি যেন সে কথাই বলে।

আমরা যারা এ্যাভারেজ, পদক বা তক্‌মা যাদের ছুঁয়ে যায়নি, তারাই ব্যস্ত একথা প্রমাণ করতে যে, সকলেই আমরা সেই ছাব্বিশ ইঞ্চিব মাপের মধ্যে বন্দী। সত্যজিৎবাবু প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী বলেই জানেন, বঙ্কুবাবুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি স্কুলের ভূগোল টিচারেব খোপে বন্দী করে রাখা যায় না। শ্রীপতি মজুমদারের আড্ডার মেম্বররা অথবা অনুল্লেখ্য প্রচ্ছদের কারণে ক্লাসের ছাত্ররা যতই চেষ্টা করুক না কেন বঙ্কুবাবুকে আরো ছোটত্বে চিহ্নিত কবতে—আদ্যোপান্ত বঙ্কুবাবু কখনো তা নন। জীবন তাকে আপাতবিচারে দিয়েছে অকিঞ্চিৎকরত্ব। তা শুধু স্থূল হৃদযহীনতার কাছে নিরুপায় আত্মসমর্পণ। 'বঙ্কুবাবু' কিন্তু কখনো বাগেন নি। কেবল মাঝে মাঝে গলা খাঁকরিয়ে বলেছেন—'ছিঃ।' এই 'ছিঃ' অনেক তথাকথিত বৈপ্লবিক আস্ফালনের চেয়ে মানবিকতর ধিক্কার। এটাই লেখকেব নিজেব গলাব স্বর—অনুত্তেজিত অথচ দৃঢ, উপেক্ষায় সংক্ষিপ্ত হতে জানে সে স্বর, কিন্তু মনোভাবেব অভিব্যক্তিতে অব্যর্থ নির্ভুল তার উচ্চারণ। বোঝা যায লেখকটি এমন একজন, যিনি অর্থনীতির পাতায় মোড়া মানুষ খোঁজেন না, খোঁজেন না বাজনৈতিক সংবাদপত্রের ঠোঙায় পোরা মানুষ। নামহীন সংসারে অবযবহীন পরিচয়হীন মানুষকেও তিনি চান না। তিনি বরঞ্চ বিবর্ণ বঙ্কুবাবুর জীবনের সীসক ধূসরতার মাঝখানে ধবিযে দিতে চান তার শীর্ণতম স্বর্ণরেখাটির অস্তিত্ব—ক্লাসভর্তি দুষ্টু ছেলেদেব মধ্যে দু-একটি করে ভাল ছাত্র প্রতিবারেই থাকে ; বঙ্কুবাবু তাদের সঙ্গে ভাব কবে তাদের পড়িয়ে এত আনন্দ পান যে, তাতেই তাঁর মাস্টারি সার্থক হয়ে যায়। তাদের তিনি বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেশ বিদেশের আশ্চর্য ঘটনা শোনান—অফ্রিকার গল্প, মেরু অবিষ্কারেব গল্প, ব্রেজিলের মানুষখেকো মাছের গল্প—তিনি চমৎকার গল্প বলতে পারেন। দেখতে দেখতে বঙ্কুবাবু কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি স্কুলের ভূগোল আর বাংলা ক্লাসের চাব দেওয়াল ছাড়িয়ে নিজের মাপের বাইরে চলে যান আর তিনি খুঁজে পান নিজেব অবিকল সত্তাকে। সত্যজিৎবাবু আমাদের বলছেন এভাবে যেতে গেলে মাথা ঠুকে যায়—শ্রীপতি উকিলের অড্ডায় তাই যেত বঙ্কুবাবু। মাথা খাড়া রাখার উপায়ও আমরা পেয়ে যাই ক্রেনিয়াস গ্রহের অ্যাং-এর কাছ থেকে—''অতিরিক্ত নিরীহতা কোনো কাজেব কথা নয, অন্যায়ের প্রতিবাদ কবতেই হয়।' অ্যাং-মশাইয়ের কাছ থেকে একথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আলাপ অরেকটু ঘন হয়। আমি চিনতে পাবি এক চাপা বিদ্রূপে ভরা হাসি। 'অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই হয়'—ইত্যাদি কথাগুলি এই গ্রহের মানুষেব মুখ দিয়ে উচ্চারণ করালে তা বস্তপচা অনৃত ভাষণ হয়ে যেত। এই গ্রহে বুঝি আর ওকথা বলার লোক নেই—বঙ্কুবাবুরা, মানে আমরা, এটা বুঝি। তাই সুদূর ক্রেনিয়াস গ্রহেব পথছুট্ আকাশযাত্রার অবতারণা। আরো একটু বুঝতে পাবি—শ্রীরায় অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতকীয় অর্থে রোমান্টিক নন—কিন্তু বিংশ শতকেব শেষ প্রহরে দাঁড়িয়ে প্রসারিত মহাকাশ চেতনা ও পরমাণু চেতনা থেকে নবতম বিস্ময়েব উপাদান সংগ্রহ করে তিনি মানবিক অশেষত্বের আরেক দরজা খুঁজে পান। বঙ্কুবাবুর প্রত্যহের ছকবাঁধা অস্তিত্বের উপর সেই মহাকাশ বিস্ফোবিত

হয়েছিল। এক লহমায় 'বেঙ্গলি কায়স্থ বঙ্কুবিহারী দত্ত' আত্মপরিচয়ের জন্য অরেকটি শব্দ ব্যবহার করেন—যা তিনি এতদিন উচ্চরণ করেন নি— 'মানুষ'। আরো লক্ষ করি তিনি শ্রোতা বা পাঠক হিসাবে বেছে নেন তাদেব যারা ছোট হলেও 'খোকা' নয়। বড়ো হলেও 'পাকা নয়।

"পটলবাবু ফিল্মস্টার" গল্পের পটলবাবুও বাহান্ন বছবের মানুষটি, বেঁটেখাটো মাথায় টাক— বাইরের বিচারে মনিহাবি দোকানদার, ছোট বাঙালি আপিসের কেরানি, বীমার দালাল। হ্রস্ব পরিচিতির মানুষই বটে। কিন্তু ভিতরের মাপে তিনি অভিনয় শিল্পী। এই গল্পটি পড়তে পড়তে যেমন আমরা একদিকে পেযে যাই পটলবাবুকে তেমন আর একদিকে পেয়ে যাই সত্যজিৎ বাবুকে। যে মুহূর্তে তিনি তার পার্ট বলে (আঃ) বুঝতে পারেন উৎরে গেছে ব্যাপাবটা, সেই মুহূর্তে তিনি আর দশ-বিশ-পঁচিশ টাকাব এক্‌স্ট্রা নন। বাইরের পাওযাব ছোট্ট খোপে তিনি আর বন্দী নন। ফিল্ম কোম্পানীর কাছ থেকে পাওনা টাকার তোযাক্কা না কবেই তিনি হাঁটা দিলেন। দুটো গল্পের মূল সুর একটা— অন্তর্লব্ধ আত্মপ্রত্যয়েব মুক্তি। 'আঃ' এই ক্ষুদ্র অব্যয়টিব অনন্ত সম্ভাবনা পটলবাবুর সামনে যখন খুলে যায় তখন কিন্তু আমবা কেবল ববেন মল্লিকেব ছবিতে স্পিকিং পার্ট-এর জন্য মহাভারত অভিনেতাকেই দেখি না, অভিনয় শিক্ষক সত্যজিৎ রায়কেও দেখতে পাই। 'আঃ' যে কতগুলো তা শ্রীরায় পটলবাবুব কান দিয়ে আমাদের শুনিয়ে দেন। ব্যক্তি সত্যজিৎ রায়ের আরেকটি দিক এই গল্পে ফুটে ওঠে পরোক্ষে— সেটা হল তাঁর শৈল্পিক বিনয। ফিল্ম জগতেব একটা দিন দিযে এই গল্প। তিনি নিজে যে জগতেব বিশ্ববন্দিত মানুষ। গল্পটিতে কিন্তু ছবি তোলার অনুপুঙ্খ অতি পরিমিত মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা রাস্তায় দাঁড়িযে স্যুটিং দেখলে যতটুকু দেখতে পাই তার বেশি কিছু নেই। এটা তাঁর নিজস্ব বিনয় এবং ছোটগল্পেব শিল্পজ্ঞান—দুয়েবই পরিচায়ক। এবং, "একটা কথা মনে রেখো পটল যত ছোট পার্টই তোমাকে দেওযা হোক, তুমি জেনে রেখো তাতে কোনো অপমান নেই। শিল্পী হিসেবে তোমার কৃতিত্ব হবে সেই ছোট পার্টটি থেকেও শেষ বসটুকু নিংড়ে বার কবে তাকে সার্থক কবে তোলা"— এই কথাব সঙ্গে মিশে থাকা সংযত সুরেলা গলাব আওয়াজ চিনতে বাংলাদেশে কারো ভুল হবার কথা নয়।

আমরা এখনো রয়েছি ব্যক্তিব বাইরের মাপ ও ভিতরের মাপেব ভেদঅভেদের সম্পর্কে শ্রীরায়ের অভিনিবেশের বৈশিষ্টের এলাকাব। এ হিসাবনিকাশ শেষ হবে না যদি না আমরা তাঁর পুতুলপ্রীতির উল্লেখ করি। অন্তত তিনটি গল্পের কথা এখনি সবার মনে পড়বে—"ফ্রিংস্" "ভূতো" আর "প্রোফেসব শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল"। শ্রীরায়ের একটা বিশেষ মোটিফ যেন এই পুতুল। এই তিনটি গল্পেব সম্পূর্ণ আলাদা স্বাদের মধ্যে সামান্য সূত্র একটাই— পুতুলদের পুতুলত্ব অস্বীকার। পুতুল-নিশ্চেতনার হাত থেকে মুক্তি— এমন কি মৃত প্রমাণিত হয়েও—এটা "ফ্রিংস" আর 'ভূতো" গল্পেব সাবাৎসার। "প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চয পুতুল" গল্পে লেখক অসামান্য সতর্কতায রূপকের ফাঁদে পা ফেলার বিপদ থেকে বাঁচলেন— কিন্তু জোবের সঙ্গে সত্যি কথাটা বলে দিলেন— মানুষকে পুতুল বানানোর বিপদ পুতুলকর্তাকেই পোহাতে হবে। 'ভূতো" গল্পেব শেষটা

পড়তে গিয়ে খুবই ক্ষীণভাবে মনে পড়ে বিখ্যাত ইংরাজি গল্প ''ফেস্ ইন্ দি ওয়াল''— কিন্তু সে স্মৃতি একান্তই গৌণ হয় গল্পটির মূল বক্তব্যের দিকে নজর দিলে। সে কথায় পরে আসছি।

তাঁর ছোটগল্পের পুতুল প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বুঝি বলার আছে। শ্রীরায় যেমন পুতুল নিয়ে ভাবতে ভালবাসেন তেমন দৈত্য নিয়েও ভাবতে ভালবাসেন। নিশ্চয় পাঠকদের মনে পড়বে ''ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি''র বিধুশেখরকে, ''মরুরহস্য'' গল্পের ডিমেট্রিয়াসকে বা ''বৃহচ্চঞ্চু' গল্পের পাখিটিকে। এর মধ্যে ডিমেট্রিয়াসের গল্পটি শ্রীরায়ের বক্তব্যের প্রতিনিধি— মাপের বাইরে চলে যাওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। পুতুল গল্পগুলিতে যেমন লং শটে দেখা মানুষকেই দেখা গেল, বৃহচ্চঞ্চু বা ডিমেট্রিয়াসের গল্পে সেই লং শট্ ব্যবহৃত হয়নি। যা মাপের বাইরে চলে যায়, তা জীবন অথবা শিল্প দুয়েরই বাইরে চলে যায়। বিধুশেখব শেষ পর্যন্ত উধাও, ''হিপনোজেন'' গল্পের ওডিন ও থব এবং তাদের স্রষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বৃহচ্চঞ্চু জঙ্গলে বিলীন, তার ধারালো চঞ্চুর কাজ ফুরিয়ে গেল, ডিমেট্রিয়াসের গবেষণার করুণ সমাপ্তি হল— পুতুল আর দৈত্য মিলিয়ে দেখলে এবার একটা কথার কাছে এসে আমরা দাঁড়াই। পুতুলের বেলায় তিনি বলছেন প্রাণেব প্রতিবিম্ব সর্বত্র, দৈত্যের বেলায় তিনি কতকটা যেন বলছেন প্রাণের সঙ্গে কোনো গুণিতক চিহ্ন যোগ করা নিয়মের বাইরে যাওযা— তা যেয়ো না। তিনি প্রাণের প্রতিবিম্ব খোজেন কায়াছায়ার যোগাযোগ মিলিয়ে— খুঁজতে কতটা ভালবাসেন তার পরিচয় ''সদানন্দের খুদে জগৎ'' গল্পটি। সদানন্দের কাছে পিঁপড়েরা মানুষের ছবি নয় শুধু, ক্ষুদ্রকায় মানুষ। গল্পটা একটা রুগ্ন ছেলের বিমর্ষ গল্প হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু সত্যজিৎ তাঁর নিজেব দিক থেকে বিষয়টিকে ধরেছেন— রোগশয্যায় বিচ্ছিন্ন ছেলেটি হার মানেনি। সে তার নিজের জগৎপরিমণ্ডল খুঁজে নিয়েছে। ছোট মাপের একটা দর্পণে সে প্রতিফলিত হতে দেখেছে তার অভিজ্ঞতার জগৎ সে শুধু দেখেই ক্ষান্ত হয়নি, সে সেই জগতের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাতেও চেয়েছে। এখানে শ্রীরায় বাংলাদেশের এক নামকবা সাহিত্য ভবনের— উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদারের ঐতিহ্যবাহী। এঁরা চার জনেই একটা ব্যাপারে গভীর বিশ্বাসী—ছোট্ট প্রাণের অপরাজেয়তা।

আগেই বলেছি লেখাগুলির ভিতরে একটা আলাদা আভা ছড়ায় লেখকটির ব্যক্তিস্বভাব। আশ্বিন মাসে সাড়ে পাঁচটায় সন্ধ্যা হয় কিনা— একথা যিনি জানেন, তিনি ভূত-সন্ধানী অনাথবাবু অবশ্যই— কিন্তু আকাশের আলোর খোঁজ যাকে নিয়ত রাখতে হয় সেই সত্যজিৎবাবুও বটে। আর পাঁচজন বাঙালিকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন আশ্বিন মাসে কটায় সন্ধ্যা হয়, পাঁচ দুগুণে দশ রকম উত্তর পাবেন। ''রতনবাবু আর সেই লোকটা'' গল্পে রতনবাবু বেড়াতে গিয়ে যে-সব ব্যাপার খুঁজে পান, 'অন্যদের চোখে হয়ত এসব জিনিস খুবই সামান্য— যেমন রাজাভাতখাওয়ার একটা বুড়ো অশ্বত্থ গাছ— যেটা একটা কুল গাছ আর একটা নারকেল গাছকে পাকিয়ে উঠেছে, মহেশগঞ্জে একটা নীলকুঠির ভস্মাবশেষ, ময়নাতে একটা মিষ্টির দোকানের ডালের বরফি।' এই দেখার ক্ষমতা অবশ্য সত্যজিৎবাবুর। যেখানে সচরাচরের চোখ পৌঁছয় না সেখানে যে তাঁর চোখ পৌঁছয় সে তো আমরা জানিই। সসঙ্কোচে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে যায়, অনুমান করতে

ভাল লাগে যে তাঁরও হয়ত ভাত আর হাতরুটি একসঙ্গে খেতে ভাল লাগে— মাছের ঝোলের সঙ্গে ভাত আর, ডাল তরকারির সঙ্গে রুটি (রতনবাবুর এটাই ছিল রেয়াজ)। জগন্নাথের দোকানের লুচি আর ছোলাব ডাল তাঁকেও হয়তো টানে। ছোলার ডালের আগে 'মিষ্টি' বিশেষণ বসাতে তিনি ভুলে গেছেন মাত্র এই কারণে যে, দোকানটার নামই তো 'মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। ফেলুদার মধ্যাহ্ন ভোজে মুগের ডাল, মাছের ঝাল, চাটনি— এই খাঁটি বাঙালি খানা বোধ হয় তাঁরও পক্ষপাত ধন্য। ''অতিথি'' গল্পের ভদ্রলোকটির মতোই খাওয়া পবা নিয়ে তাঁবও কোনো 'ফাস্' করার অভ্যাস নেই। মাছ ডিম তাঁর কাছেও হয়তো বিবোধীবস্তু নয়— শেষে তো দই-এর প্লেট থাকবেই। শুধু অনুমান কবতে ভাল লাগে আর পাঁচজন বাঙালির মতো সারা দিনের কাজকর্মের শেষে ডিনারটাই তাঁবও প্রিয় খাবার সময়। কাজের মানুযের পক্ষে খাওয়ার সময় খুব বেশি মেলে না।

উপকরণ বহুল্য তো কর্মের প্রতিবন্ধক। তখন রসনার দাবি উপেক্ষণীয়। তাই প্রোফেসব শঙ্কু তাঁর বিচিত্র উদ্ভাবনী প্রতিভার সবটাই একটি সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথিক বিন্দুতে সংহৃত করে নেন— বটিকা ইণ্ডিকা। এটা আর কিছু নয কর্মময় সত্যজিতের ইচ্ছাপূরণ— এরকম একটা হোমিওপ্যাথিক গুলি হলে কাজের কত সুবিধা হয়! আমাদের বিজ্ঞানীদেব স্বদেশ কৌতূহলী হওযা আবশ্যিক। তাই বুঝি বটিকাইণ্ডিকার মৌল উপাদান বট ফলের বস। শঙ্কুর ব্যোম যাত্রার রকেটের উপাদান ব্যাঙেব ছাতা, সাপের খোলস, কচ্ছপের ডিমের খোলা। এই অতিশ্রুত বস্তু নিয়ে যে গুলি হাতে করে আমরা সচরাচর দেখিনি, তার সঙ্গে পিতার জন্মে নাম শুনিনি ট্যানট্রাস ব্য একুইয়স ভেলো সিলিকা দ্রুত মিশলে যে বিজ্ঞানের রাজ্যে নয়, কল্পনার রাজ্যে অনটন ঘটে যেতে পারে— অতিকল্পনার উপব বাঙালি পাঠকের সেই বিশ্বাসকে শঙ্কুর স্রষ্টাও ভালবাসেন।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলছি, ''প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য'' গল্পে দুশো সাতাত্তরটা ব্যারাম সারে এরকম একটি শঙ্কু-উদ্ভাবিত ট্যাবলেটের নাম রয়েছে এ্যানাইহিলিন। নামটা শঙ্কুর কাছেই আমরা যেন শুনেছিলাম মিব্যাকিউরল। এ্যানাইহিলিন সর্বঘ্ন অস্ত্রটার নাম নয়?'

এই ভাবে জানতে জানতে চিনতে চিনতে দু একটা প্রশ্নও জেগে ওঠে। আমি সত্যজিৎবাবুর খুব কম গল্পে পারিবারিক পটভূমি ব্যবহৃত হতে দেখেছি, কেন? লীলা মজুমদারের গল্পে যেমন চরিত্র পাত্রটি সুনির্দিষ্ট পারিবারিক পথে সুপরিচিত সম্পর্ক সূত্রে গ্রথিত, সত্যজিৎবাবুর গল্পে তা পাই না— পেলেও খুব কম। প্রোফেসর শঙ্কুর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, প্রাইভেট ইন্‌ভেস্টিগেটর ফেলুদা না হয় দুনিয়ার তাবৎ প্রাইভেট ইন্‌ভেস্টিগেটরদের টাইপে বিন্যস্ত, কিন্তু তাঁর তিন ডজন গল্পের মধ্যে বাঙালি সংসারের সবচিন্ ছবি ক'বার দেখেছি— ভাবতে হয়, খুব ভাবতে হয়। গল্পের মানুষগুলি— প্রধান চরিত্রগুলিকে একলা অবস্থায় ধরতেই যেন লেখক অধিক পছন্দ করেন। স্বল্প পরিচিত যে সব স্টেশন ছড়িয়ে আছে টাইম টেবিলের পাতায় তাদেরই এক জায়গায়, গোপালপুর সৈকতে, অফ সীজন্-এ দার্জিলিঙে জনবিরল পথে. বা ট্রেনের উঁচু শ্রেণীর কামরায় লম্বা পাড়ির সময়েই তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। রতনবাবুর সঙ্গে আলাপ কলকাতায় মধ্যবিত্ত পাড়ায় হতে পারে না, বাতিকবাবুকে খুঁজে পাই না নৈহাটি, ইছাপুরে,

ফ্রিৎস্‌কে পুনরুদ্ধারের জন্য সুদূর রাজস্থানের বুন্দি অবধি যেতে হবে। আমরা তাতে অসম্মত নই। বরঞ্চ এ কথাই বলবো যে এব একটা আলাদা প্লেজার আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন পটভূমির ভূগোল নিয়ে নয়—আমার প্রশ্ন পটভূমির বিজনতায়। এমন কি কলকাতায় বিপিন চৌধুরীও একেবারে একলা মানুষ। "সহদেব বাবুর প্রোর্ট্রেট" গল্পে সহদেব বাবু বা "অসমঞ্জবাবুর কুকুর" গল্পের অসমঞ্জবাবুও একলা—একেবারেই একলা। বদনবাবু যিনি কলকাতাতেই টেবোড্যাকটিলেব ডিম পেয়ে যচ্ছিলেন তিনি অতীব স্নেহশীল বাবা বটেই, কিন্তু সেই স্নেহ— সম্পর্ক নিয়ে এ গল্প নয়। ব্যক্তি পাত্রগুলির জীবনের পারিবারিক বা হৃদয় ঘটিত কোনো সম্পর্ক-রস তাঁর গল্পে সাধারণত আসে না। হয়তো এর ভিতর দিয়েও তাঁব মনের একদিকের ছবি রেখাঙ্কিত হয়ে ওঠে। আজকেব সম্পর্কগুলি নানা জটিলতার মোকাবেলা করে অহরহ। সে আঁকাবাঁকা জটিল বেখার ছায়া পড়ে তাদেব গায়ে। ফিল্‌ম স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় তো সে চ্যালেঞ্জেব মুখোমুখি হয়েছেন বারে বারে। সম্পর্কের গড়াভাঙা নিয়ে সেলুলয়েডে তিনি অনেক কথা বলছেন, বলবেন। ছোট গল্পে তিনি খুঁজে নেন মনেব মুক্তির আরেক দিগন্ত— সম্পর্কেব জটিলতা নয়, ব্যক্তি পাত্র সংক্রান্ত বিস্ময়টা সেখানে বড়ো কথা। তিনি ছোট ছেলেদের জন্য গল্প লেখেন না— গল্প লেখেন নিজেব জন্য। ছোট ছেলের জগৎ তাঁর বিষয—যেখানে বিস্ময় আব বিশ্বাস আর কল্পনা এই ভঙ্গুব জটিল বয়স্ক জীবনে একটা আলাদা আলো ছড়ায়। কতখানি সে আলো ঐ গল্পগুলি ছড়ায়, আব সেই সঙ্গেই তিনি ছোট ছেলেদের কতটা বিশ্বাস করেন, পাবিবারিক ঐতিহ্যসূত্রে লব্ধ সেই বিশ্বাস আজ সময়ের অনিবার্য হস্তক্ষেপে তাঁব কাছে কতটা নৈতিক প্রত্যযে পবিণত হয়েছে, তার প্রমাণ হিসাবে দুটি গল্পের উল্লেখ কববো— "পিণ্টুর দাদু" আব "অতিথি"। প্রথমোক্ত গল্পটিতে পিণ্টুর জগতে দাদুর প্রবেশের মূল্য প্রধান কথা। দ্বিতীযোক্ত গল্পটিতে দাদুর কাছে মণ্টুর মূল্যের তাৎপর্য প্রধান কথা। ওর মনটা এখনো কাঁচা, ওতেই ছাপটা পড়বে ভালো—দাদুর একথা মণ্টুদের সমাজে শ্রীরায়েবও বিশ্বাস। "অতিথি" গল্পটিতে আজকের আত্মরক্ষাসর্বস্ব, স্বকেন্দ্রিক, তাই সন্দিগ্ধ মধ্যবিত্ত জীবন চর্চাব মাঝখানে একটি ছোটছেলেব বিশ্বগ্রাহী কৌতূহল, বিশ্বাস কবাব ক্ষমতার বলিষ্ঠ পরিচয ফুটে ওঠে। তাঁর একটা প্রধান ভালবাসার জায়গা এটা। ফটিকচাঁদ যে অসামান্য সৃষ্টি তাব কাবণ ফটিকচাঁদের বিশুদ্ধ জীবনাগ্রহ। এটা তাঁর নিজের ব্যাপারও বটে।

কিন্তু তাহলেও, একথা সত্যি, গায়ে পড়া আলাপী তিনি পছন্দ করেন না। প্রোফেসর শঙ্কুর প্রতিবেশী অবিনাশবাবুরাই হয়তো তাঁর এ ব্যাপাবে হেতু। স্তিমিত-কল্পনা, নিস্তাপ, প্রশ্নহীনতা আর ছকা রসিকতা অবিনাশবাবুদেব পরিচয়চিহ্ন। এঁরা অপরের কর্মনাশাও বটে। এঁর মুলোর খেতে শঙ্কুর রকেট গোঁৎ খেয়ে পড়ায় শঙ্কু ক্ষুব্ধ হয়েছিল রকেটের জন্য, মুলোর জন্য নয়— সাব্‌লাইম এখানে বিডিক্যুলাস হয়েছে শঙ্কুর অজান্তে। তবে অবিনাশবাবু মনে রাখবেন নিশ্চয় যে এহেন তাঁকেও শঙ্কু অফ্রিকা নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীরায় যেন বলছেন— কি আর কবা যাবে, সহ্যই করতে হবে এঁদের। কেননা অবিনাশবাবু কি মাথায় বড়ো শঙ্কুব কোনো কাজেই লাগে না— জটায়ু ভুল লিখলে আর বললেও মাথায় বড়ো ফেলু মিত্তিরকে কি কোনো সাহায্যই করেনি। লক্ষ করি তাঁর কোনো গল্পই অপরে বলছে না— অন্তত এতদিন বলেনি। অর্থাৎ আড্ডায় বলা

গল্পের রীতি প্রকরণ তাঁকে টানে না তেমন। আরো একটা জিজ্ঞাসা জাগে যিনি 'মহাপুরুষ' ফিল্ম করেন, তিনি কেন ইম্‌লি বাবা সৃষ্টি করেন, কেন লেখেন ভূতের গল্প। আমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ করছি না "খগম্" বা "অনাথবাবুর ভয়" প্রভৃতি গল্পের অতিপ্রাকৃত রসে, কিন্তু প্রশ্নটা জাগে 'কেন'। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গেই উত্তরটা বোধ হয় আপনিই এসে যায়— তাঁর আগ্রহ রসে। ভূত আছে কিনা ও জিজ্ঞাসা নিরর্থক— ভূতের রস আছে। আর কৌতূহল তাঁর তো অনন্ত— প্রাচীন মিশর, তার দেবতত্ত্ব, আদিম আফ্রিকা, পুরাতন কলকাতা, প্রাণীজগতের আদি বিবর্তনের পাণ্ডুরতম অধ্যায়, মহাকাশ, মেরু, মরু, ব্রেজিলের জঙ্গল,— তাঁর কৌতূহলের মানুষ। তাঁর ছোট্ট ছোট্ট পাঠক মানুষেরা ছোট মানুষ নয়। সে জগতে ম্যাজিক এবং বিজ্ঞান, প্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃতের সহবস্থান বিচিত্রতর। কর্মী সত্যজিতের বিশ্রামের জগৎ সেটা। আরেকটা প্রশ্ন— প্রশ্নটা ঠিক আমার নয়— একটা খুদে পাঠিকার—তাঁর তিন বারোং ছত্রিশটা গল্পে একটাও ছোট মেয়ে নেই; এবং প্রায় নদী নেই, পাহাড় আছে বেশী, জঙ্গল আছে কয়েকবার, মরু আছে, কিন্তু নদী খুব কম— কেন; নদী তবু খুঁজে পেয়েছি রতনবাবুর গল্পে— কিন্তু বাচ্চা মেয়েরা— স্নেহশীল বাঙালি ভদ্রলোকের কাছে যারা সকৌতুক আগ্রহ সঞ্চার করে। তারা তাঁর লেখায় প্রায় নেই—একেবারেই নেই। সদানন্দের একটা বোন থাকতে পারতো না। কী হত "ভক্ত" গল্পের পাঠকটি পাঠিকা হলেঃ

যে নিজের কেরিয়ার রচিত হবার পর, সে যে ধরনের কেরিয়ার হোক না কেন, ভুলে যায় তার ইতিহাসের গোড়ার পাতার মানুষদের সে ব্যক্তি শ্রীরায়ের কাছে তিরস্কারের পাত্র। তাঁর একাধিক গল্পে আজকের বিস্মৃতিপরায়ণ কিন্তু, কীর্তিঅভিমানী মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি প্রধান কথা হয়ে উঠেছে। "ভূতো" গল্পের নবীন অক্রুর চৌধুরীকে অসম্মান করেছিল। অক্রুর তার সাজা দিলেন। কিন্তু বিশেষ করে উল্লেখ করতে পারি "বিপিন চৌধুরীর স্মৃতি ভ্রম" "দুই ম্যাজিশিয়ান" "সহদেববাবুর পোর্ট্রেট" এমন কি "মিঃ শাসমলের শেষ রাত্রি" যিনি বঙ্কুবাবুর বেলায় অ্যাং মশাইয়ের গলায় বঙ্কুবাবুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতে, নিরীহভাব আতিশয্য বিসর্জন দিতে, তিনিই চুনিলালের চিঠি মারফৎ বিপিনবাবুকে শেখালেন 'হঠাৎ বড়লোক হওয়ার কুফল'। একজন দুঃস্থ বাল্যবন্ধুর জন্য একটা উপায় করে দিতে পারা বিপিন চৌধুরীর পক্ষে অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তার চকচকে সফল, আত্মনিমগ্ন জীবনযাত্রায় বাল্যবন্ধু একটা দুঃস্মৃতি মাত্র। তাই তার স্মৃতিভ্রংশের শাস্তি। সহদেববাবুর অবস্থাটাও তাই। আগে যারা খুব কাছের লোক ছিল, তারা এখন তাঁকে দেখলে চট করে চিনতে পারে না, বা চিনলেও সাহস করে এগিয়ে এসে কথা বলে না। সহদেববাবুরও খুব ইচ্ছে নেই যে তারা তাঁকে চেনে। সহদেববাবুকে শাস্তি পেতেই হল। সুরপতি গুরুকেই ভুলে যেতে বসেছিল—তবু যে শাস্তি তার হল না, সে বরঞ্চ পুরস্কৃতই হল সে শুধু ভুল শুধরে নিয়েছিল বলে। মিঃ শাসমলের অপরাধ গুরুতর, তাই তাঁর শাস্তিও গুরুতর। কীভাবে বাঁচতে হয়, কীভাবে বিনয়ে ও নম্রতায় জীবনকে গ্রহণ করতে হয় শ্রীরায়ের এসব গল্পগুলির ভিতর দিয়ে তারই হদিস মেলে। সাফল্য অর্জনীয় ঃ বর্জনীয় সাফল্যের তালিকায় হেলান দিয়ে নিজেরই অতীতকে অস্বীকার— যা একদা নিজের সত্তার অংশ ছিল, তাকে উপেক্ষা। এসব গল্প থেকে বোঝা যায়, তিনি উদ্বিগ্ন আজকের

প্রতিযোগিতাপবায়ণ সাফল্যমৃগয়াবীরদের ব্যবহারে। তাঁর উদ্বিগ্নতার আরেকটা দিককেও চেনা যায় এক ধরনের গল্পে। ''আশ্চর্য প্রাণী'' গল্পে মানুষের যে সাধনা অতিমানবিকত্বকে আয়ত্ত করতে চাইছে সে সাধনার পরিণতি কল্পনা করা হয়েছে—'যে অবস্থায় মানুষের উত্তর পুরুষ একটা মাংসপিণ্ডের মতো মাটিতে পড়ে থাকবে, তার হাত থাকবে না, চলবার, কাজ করবার, চিন্তা কববার শক্তি থাকবে না, কেবল দুটি প্রকাণ্ড চোখ দিয়ে সে পৃথিবীর শেষ অবস্থাটা ক্লান্তভাবে চেয়ে চেয়ে দেখবে' এই ভবিষ্যৎ বিভীষিকার সামনে দিশাহারা শঙ্কু বিহ্বল রায়েরই ছবি। তবে সে অনেক দূরের কথা।

আপাতত তিনি যে ধরনের মানুষ, তিনি বাঙালি হয়েও বিশ্ব নাগরিক। এই প্রযুক্তি পরঙ্গম বিশ্বে ভূমণ্ডল অনেক ছোট হয়ে গেছে—সুতরাং তাঁর প্রধান নায়ক ফেলু এবং শঙ্কু দুজনেই ভ্রমণবসে সজীব। শঙ্কুর পৃথিবী—ফেলুর ভরতবর্ষ—দুয়ে মিলে একজন। শঙ্কুর 'অমনিস্কোপ' যেমন অবারিত ফেলুর বুদ্ধির স্কোপও তেমনি অগাধ। একজন খাঁটি বাঙালি—একালেব বাঙালি—তাই মণ্টুর মামা বলেন, 'বাপের বাড়ির মায়া একবার কাটাতে পারলে সারা পৃথিবীটাই হয়ে যায় নিজের ঘর। সাদা কালো ছোট বড় জংলী সভ্য সব এক হয়ে যায়'। অথচ এই বিশ্বগ্রাহী কৌতূহলের মাঝখানেও ভুলে যেতে দিতে চান না কাউকে তাদের নিজের নিজেব উৎস ভূমিকে, ছোটবেলার বন্ধুদের—''ক্লাসফ্রেণ্ড'' আর ''চিলে কোঠা'' গল্প তার প্রমাণ।

রায়চৌধুরী পরিবারের বিচিত্র উজ্জ্বল পরিবেশে বিমর্ষ নিঃসঙ্গতাব কোনো অবকাশ ছিল না। পুণ্যলতার লেখা থেকে অথবা সত্যজিৎ বায়ের 'যখন ছোট ছিলাম' থেকে ভালভাবেই অনুমান করা যায় দুঃখ বা বেদনাব কালো ছায়া এ পরিবারের প্রবল প্রাণশক্তির কাছে সহজে হার মানতে। প্রাণের প্রবলতার দুটি মুখ এক, সে কল্পনা করতে ভয় খায় না, দুই কৌতুকের ঝিকিমিকি প্রাণ স্রোতে সদাই খেলা করে। উপেন্দ্রকিশোরের জমজমাট পরিবারে বিত্ত থেকে চিত্ত ছিল অনেক বেশি— জীবন সেখানে স্রোতের মতো প্রাণবন্ত বলে কেউ কোথাও আবদ্ধ ছিল না—না কীর্তির অহংকারে, না বয়সের গরিমায়। সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত অহমিকাব ক্ষুদ্র 'আমি' সেখানে মাথা চাড়া দিত না বলেই বড় 'আমি'-র আত্মবিকাশের পথ ছিল অনবরুদ্ধ। 'যখন ছোট ছিলাম' অথবা পুণ্যলতার লেখা থেকে আমরা এই পরিবারের অনর্গল প্রাণময় মেশামেশিব অবিরল সাক্ষ্য পাই। উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার এই প্রাধান দুই রায় শিশুর অমলিন অফুরন্ত জগতে তাঁদের মননকর্ম নিবেদন করেছিলেন। পারিবারিক ব্যবহারিক জীবনেও তার দ্বিরাচরণ ছিল না। উপেন্দ্রকিশোর জিজ্ঞাসু শিশুকে থামিয়ে দেবার কুমন্ত্রণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। রেলগাড়ির বিস্মিত সহযাত্রী দেখেছিলেন কীভাবে তিনি বাচ্চাদের সঙ্গে মনের অবাধ সেতুবন্ধন রচনা করেন। সুকুমার রায় তাঁর অদ্ভুত মনগড়া জন্তুজানোয়ারদের প্রথম রচনা করেছেন ছোট ভাইবোনদের খুশি করতে গিয়ে। আজকে সময়ের দিক থেকে এত তফাতে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটির একটি অন্য তাৎপর্যও চোখে পড়ে। পরাধীন ভারতে, অষ্টাবক্র সমাজে, নানা বন্ধনে জর্জর অস্তিত্বের তাড়নায় যে আবেগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছুটে গিয়েছিলেন প্রকৃতির কাছে, তারই সঙ্গে বুঝি তুলনায় পুরোগামী রায়দের শিশুর জগতে ঘুরে বেড়ানো। শিশুর নিশ্চিতি, শিশুর অকৃত্রিমতা, বন্ধনবিমুগ্ধতা, অবাধ কল্পনার

দুঃসাহস, ছকবাঁধা ব্যাপারে অরুচি—আমাদেব স্বাধীনতাস্পৃহারই অন্য রূপক। ঠিক এমনভাবে তাঁরা কেউ কথাটি বলেন নি। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট জগতের বিচিত্র অবাধ প্রান্তরে মুক্তি নিতে নিতে আজও এই কথাটি এমন কবেই আমাদের মনে হয়। এই কথাটি এমন করে নয, কিন্তু অন্যরকমে মনে হয় সত্যজিৎ রায়ের গল্প পড়তে পড়তেও। সেখানে আমরা যে সব চরিত্রের দেখা পাই তারা আমাদেব বাস্তব জগতেরই বাসিন্দা। কিন্তু জীবনের বিশালতা সম্বন্ধে কল্পনার সাহস তাদের অনেকেবই উপাদানে ব্যবহৃত। আমাদের খণ্ডিত অস্তিত্বেব সমস্যাসংকুল জগতটা সেখানে মাথা চাড়া দেয় না। তার বদলে পাই মহাকাশেব সংকেত, অতল সমুদ্রের ডাক, মরু বা মেরুর ইশারা অথবা মানুষের, একান্তই ছাপোশা সাধারণ মানুষের অশেষত্বের ঠিকানা। প্রযুক্তি পারঙ্গম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে মানুষেব গল্প তিনি শোনান সে মানুষ গাণিতিক সিদ্ধির জগতে গণিতের অতীত মানুষ। সুতরাং বাযচৌধুরী পরিবারের ঐতিহ্যপটেই তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিও প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত পাত্র। এই গল্পগুলির চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ সমীক্ষা বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য।

রায়চৌধুরী পরিবারের কীর্তিমান ঐতিহ্যেব দিকে সতর্ক দৃষ্টিরেখে সত্যজিৎ রায় তাঁর ক্ষেত্র নির্বাচন কবেছেন। উপেন্দ্রকিশোরেব লক্ষ্য ছিল সব শিশুবা যাবা সবে মায়ের কোল থেকে নেমে পড়েছে, ডিঙিয়েছে বর্ণপরিচযের বেড়া। টুনটুনির বই যেন তাদের গলাব আওযাজ আর বাক্যবন্ধেব প্রতিধ্বনিতে নির্মিত। সুখলতা বাওয়ের গল্পও তাই। সবে যারা বাক্য গড়তে শিখেছে তাদেব মাপ অনুযায়ীই যেন সে গদ্যের জগৎ গড়া। পক্ষান্তবে সুকুমার রায়ের গল্প যাদের উদ্দেশ্যে রচিত, তারা আর একটু বড়— আজকের ভাষায ক্লাস সিক্স সেভেন স্ট্যাণ্ডার্ডের ছেলে তারা। তারা নির্দোষ দুর্বুদ্ধিতা, নিছক নির্বুদ্ধিতা, গুল দেবার কল্পনাশক্তি, মজা করাব দামাল অভিপ্রায় এ সব নিয়ে গড়ে উঠেছে সুকুমাব রাযেব গল্প। সে প্রধানাংশে স্কুল স্টোরি। বাংলা শিশু সাহিত্যে নতুন সামগ্রী। সুকুমাব রায়ের কল্পনা ও অভিজ্ঞতা থেকে সম্ভব হয়েছে পাগলা দাশুর মতো চিরস্থায়ী চবিত্র। তাব পাগলামির মধ্যে একটা মেথড ছিল। সে জন্যই সে পাগলামি গভীরতর বাস্তব তাৎপর্যের ঠিকানা দিতে পারে—'যাও সবে নিজ নিজ নিজ কাজে'—আজও আমাদের কাছে বহু আড়ম্বরপূর্ণ অভিপ্রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ যবনিকাসম্পাতী বচন। পাগলা দাশুকে স্কুল স্টোরির পটভূমি ছাড়া ভাবাই যায় না।

সত্যজিৎ বায় কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। প্রথমেই লক্ষ করি তিনি সুকুমার রায় বা লীলা মজুমদারেব মতো একটিও স্কুল স্টোরি লিখলেন না। দ্বিতীয় লক্ষণীয়, তাঁর গল্পে ছোট ছেলে বলতে যা বোঝায তার সংখ্যা অনুপাতে কম। ''সদানন্দের খুদে জগৎ'' ''পিন্টুর দাদু'' বা, ''অতিথি'' গল্পের মতো ছোটছেলেরই গল্প তাঁর খুব বেশী নেই। এব মধ্যে ''সদানন্দের খুদে জগৎ'' ছোটবা কতখানি ধবতে পারবে জানি না, গল্পটির মধ্যে ছোটছেলের নৈতিক জগতের টেন্‌শন্ যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেটাও বালকভোগ্য নয়। তবু ছোট ছেলের মনোজগতের এমন প্রতিচ্ছবি দুর্লভ। তৃতীয় লক্ষণীয়—এবং এটাই তাঁর গল্পের আসল কথা— সে সব গল্প ছোটদের গল্প এই অর্থে যে ছোটরা বড়দের বিষয়ে যে সব গল্প শুনতে চায় এগুলো সেই জাতীয় গল্প। তার

মানে এই নয় যে, বড়দের জীবনের সতর্ক নির্বাচিত অংশ নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। সেই সতর্কতা থাকলে শিল্প হিসাবে গল্পগুলি মাটি হ'ত। বলবার কথাটা এই, তিনি বড়দের চরিত্র পাত্র করে গল্প লিখলেও সেগুলো অন্যদের মতো মজার গল্প নয়, কেবল এ্যাডভেঞ্চার স্টোরি নয়। তাঁর পৃথক কৃতিত্ব ছোটদের জন্য বড় বয়সীদের গল্প বলতে বসে সকলকে গল্প শোনানো। অথচ এ গল্প একদিকের বিচারে ছোটদেরই গল্প। যে পাঠকেরা তাঁর মূল লক্ষ্য তাদের জীবনসম্বন্ধীয় নিজস্ব এ্যাটিচ্যুডকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করে এসব গল্প লেখা। সুকুমার রায়ের গল্প বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর চমৎকার মন্তব্যটি আমরা মনে রাখি—'সুকুমার রায়ের প্রত্যেক গল্পেই উপদেশ আছে, কিন্তু সেটা বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত নয়, ভিতর থেকেই প্রকাশ পাওয়া; সে উপদেশ সেই জাতের, যা বালকেরা নিজেরাই মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞচিত্তে নিয়ে থাকে জীবন থেকে।' এই জন্যই তাদের উপভোগ কখনো ব্যাহত হয় না, তাদের বয়সোচিত নানারকম ছলচাতুরী, বোকামি ও দুষ্টুমির শেষে জব্দ হওয়ার দৃশ্যটিতে নিজেরাই তারা প্রাণ খুলে হাসে; সত্যজিৎ রায়ের গল্পে বাইরে থেকে ভিতব থেকে কোথাও থেকেই কোনো উপদেশ নেই। বড় ছোট নির্বিশেষে সেখানে একবয়সী হয়ে যায়, সেই আসরে সত্যজিৎ রায় এমন গল্প বলেন, যার যদি কিছু জানাবার কথা থাকে তা হল— বিশ্বাস করো জগৎকে আর জীবনকে।

জগতেব বেলায় বিশ্বাস করো অসীম রহস্যে ভরা আ-মর্ত্য-নীহারিকা। জীবনের বেলায় বিশ্বাস করো— এব সুস্থিত নৈতিক নর্ম্ ভেঙে দেওয়া ঠিক নয়। ভূগোল বা মহাকাশ-বিশারদের মতো বা নীতিবেত্তার মতো তিনি এ কথা বলেন না কিন্তু। সর্বপ্রথমে সেগুলি গল্প, সবশেষেও সেগুলি গল্প। সুকুমাব রায়েব বালক চরিত্রগুলির পরবর্তী ক্লাশে উন্নীত রূপ লীলা মজুমদারের কোনো কোনো গল্পে পাওয়া যায়। সুকুমাব রায়ের কোনো কোনা চরিত্রের উপভোগ্য নতুন রূপাযণ দেখা লীলা মজুমদারের চমৎকার কিছু গল্পে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে সুকুমার বায়ের জগ্যিদাস কে। আজগুবি গল্প বলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার। এক হিসাবে এ ক্ষমতা যত হাসির খোরাক যোগান দিক না কেন অন্যার্থে এতো তার কল্পনাশক্তিরই প্রমাণ। লীলা মজুমদারের বিখ্যাত গল্পের হরিনারায়ণ চরিত্র যেন জগ্যিদাসের দূব সম্পর্কের মাসতুতো ভাই। ছোট ছেলের প্রথম পাওয়া সমাজজীবন তার স্কুলজীবন। জগ্যিদাস ও হরিনারায়ণকে সেই সমাজজীবনেই পাওয়া যায়। সত্যজিৎ রায় সযত্নে তাঁর গল্পে এই সমাজবদ্ধ বালক বা কিশোরকে পাশ কাটিয়েছেন। তাকে নিয়ে কৌতুকগল্প লিখতে গেলে সেই সমাজজীবনের গুরুগম্ভীর নিয়মবদ্ধতার মাঝখানে সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কোন্ অসঙ্গতি সৃষ্টি করছে সেটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে সত্যজিৎ রায় হাসির গল্প বলতে যা বোঝায় তা লেখেন নি বললেই হয়, যদিও তাঁর গল্পে হিউমার প্রচুর। তাঁর গল্পের প্রধান চরিত্র পাত্রদের একাকীত্বের কথা আমি পূর্বে এক রচনায় বলেছি। এখানে এই বিষয়টি আরেকটু তলিয়ে দেখতে চাই।

'যখন ছোট ছিলাম' এই অসামান্য স্মৃতিকথা নানা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সে আলোচনার ক্ষেত্র আলাদা। কিন্তু যার স্মৃতিকথা এই বইটি তার নিজস্ব ব্যক্তিবৈশিষ্টের গভীর গহনের একটা চাবিকাঠি এই বইটির প্রারম্ভে লেখক আনমনে আমাদের হাতে তুলে দিলেন। চাবিকাঠিটা সম্পূর্ণ রায়চৌধুরী পরিবাবের মর্মশালায় তৈরি— 'সাধারণ অসাধারণ প্রভেদ বড়দের মতো করে ছোটরা করে না, তাই তাদের মেলামেশার কোনো

বাছবিচার থাকে না। এ ব্যাপারে গুরুজনের বিচার যে ছোটরা সবসময় বোঝে বা মানে তাও নয়।' এই উক্তিটি রায়চৌধুরী পবিবারের মর্মশালায় প্রস্তুত এ কথা বলার কারণ আর কিছু নয়— কথাটির মধ্যে ছোটছেলের চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের ও প্রথামুক্ত ভাবনা ভাবার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া আছে। সেই স্বীকৃতির প্রতিষ্ঠা স্থাপনে রায়চৌধুরী পরিবারের তিন পুরুষের আত্মনিবেদন বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসের সামগ্রী। 'যখন ছোট ছিলাম' বইটি অবশ্যই স্মৃতিকথা। সে স্মৃতিকথায় মেলে শ্রীরায়ের মানসিক গঠনের গোড়াপত্তনের আদিকথা। 'আসলে আমার অনেকটা সময় একাই কাটাতে হ'ত'। এই একাকীত্বকে পূরণ করতে গিয়ে সেদিনের বালককে নিজের জগৎ কিছুটা নিজেকেই নির্মাণ করে নিতে হয়েছে। জানলার উল্‌টোদিকেব দেওয়ালে বাইরের জগতের ছায়াছবি, দরজার ছোট্ট ফুটোয় ঘষা কাচ ধরে বাইরে দৃশ্য খুদে আকারে দেখা, চারখণ্ডে রোমান্স অফ ফেমাস লাইভস, স্টিরিওস্কোপ— এই সবই আলো ধরতে চাইছে এমন এক বালকতরুর বিচিত্র ডালপালা। এইখানে আমাদের মাথা স্বতঃই নত হয়ে আসে সত্যজিৎ জননী সুপ্রভা দেবীব উদ্দেশ্যে। একান্ত অসময়ে পিতৃহারা সেই বালকটিকে তিনি অযথা সহানুভূতির ভারে বিব্রত করেন নি। তিনি জানতেন সে বালককে মানুষ করতে গেলে, ছন্দের বন্ধনে থেকেও কবিতা যেমন স্বাধীনতা ভোগ করে, বালকটিকে তেমনই স্বাধীনতা দিতে হয়! তাই বোধ হয় সত্যজিতেব একলা থাকার বেলাটুকুতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নি। এই বালকের জননীর পক্ষে এই জ্ঞানটুকু খুব জরুবী ছিল, কতটুকু এই বালককে বাধতে হবে আর কতখানি ছাড়তে হবে। তার সেই একাকীত্বের কিয়দংশ ভর্তি হত ছেদিলাল আর হরেনের উদ্ভাবন নিপুণ কর্মঠ সখ্যে। চাবিকাঠি, মেটে লণ্ঠন, ঘুড়ি— এগুলো তো সেই একাকী বালকের অনন্দলোক আবিষ্কারেব পথে এক একটা কুড়িয়ে পাওয়া রত্ন। নিজের মতো করে যে বাড়তে পায় নিজের মতো করে সে দেখতে শেখে। রায়চৌধুবী পরিবারের ছড়ানো চৌহদ্দির মধ্যে সে বালক আর একটা কথা বুঝেছিল যে, সেখানকার প্রধান চরিত্রগুলি আপন আপন অভিনব এককত্বে অনন্য। কেউ তাঁরা বাঁধা চৌখুপিতে খাপ খাওয়ানোব জন্য জন্মাননি।

খনদাদু কুলদারঞ্জন রায, মুগুব ভাঁজতেন, ক্রিকেট মাঠে সেঞ্চুরি হাঁকাতেন, প্রপেলারের মত লাঠি ঘোরাতে পারতেন— অন্য সাক্ষ্য থেকে বলছি ঘুলঘুলি দিয়ে হাত বাড়িয়ে খপ্‌ করে পাতিকাক ধরতেন,— কিন্তু আসল মানুষটি শিল্পী। ছোটকাকা সুবিমল রায় প্রতিটি গ্রাস বত্রিশ বার চিবোতেন, চার রকম রঙের কালিতে একটা দুরনুমেয় লজিক ধরে এক একটি বাক্যের শব্দগুলি লিখতেন। কিন্তু আমাদেরই পরিচিত চায়ের যে বারোটি ধরন তিনি লিখে রেখে গেছেন, শুধু তার জোরেই তাকে আমরা যথার্থ প্রতিভা বলতে পারি। এই কাকা-ভাইপোর সকৌতুক স্নেহ শ্রদ্ধার ভিত্তিভূমিটি শ্রীরায়ের পরবর্তী জীবনে নানা গল্পে বিচিত্র রসসঞ্চারী হয়েছে। তোপ্‌সে-ফেলুদা সম্পর্ক, হারুণ-ফটিক সম্পর্ক, শিবু-ফটিকদা সম্পর্ক এখানে আমাদের মনে পড়ে। লীলা মজুমদারের গল্পের সঙ্গে এখানেও সত্যজিৎ রায়ের গল্পের একটা তফাত দেখা যায়। লীলা মজুমদারের গল্পে বালকটির দরকার হয় একটি শক্তপোক্ত মাঝবয়সী মাদার টাইপ। 'পদিপিসির বর্মীবাক্সে'র সেই ফরমিডেব্‌ল অবিস্মবণীয় দিদিমাটি যেমন। সত্যজিৎ রায়ের কিশোর চরিত্রটি মাদার-টাইপের ধারে কাছে ঘেঁসে না। তার দরকার কল্পনাকে নাড়া

দিতে পারে এমন একটি বয়সের বড় যুবক চরিত্র। তার কারণ লীলা মজুমদারের চঞ্চল বালকটির আত্মরক্ষার দরকার। সত্যজিৎ রায়ের উন্মুখ কিশোরটির বিশ্ব রহস্যের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানোর জন্য সেতু দরকার।

সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্পে দেখিয়েছেন ব্যক্তির একাকীত্বের তথা অনন্যতার জন্য কোনো বৃহৎ কীর্তির ঠেক্‌নোর দরকার হয় না। ব্যক্তিত্বের অশেষত্ব একান্তভাবেই ব্যক্তির স্বোপার্জিত ব্যাপার। সত্যজিৎ রায়ের পটলবাবু ফিলম্ স্টার, বঙ্কুবাবুর বন্ধু প্রভৃতি গল্প তথাকথিত অকিঞ্চিৎকর মানুষেব অন্তর্গত অশেষত্বর গল্প। সাধাবণের সাদা পোশাকে সংসার তাঁদের ঢেকে রাখলেও— সেটাই এসব গল্পের মূলকথা। ফেলুদা সিরিজের সিধু জ্যাঠা এইরকম লোক। বঙ্কুবাবু আর পটলবাবুর মধ্যে মিলটা লক্ষ করার মতো। জীবন তাদের দুজনের জন্যই দুটো ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। একজন কাঁকুরগাছি প্রাইমারি স্কুলের ভূগোলের মাস্টার, আরেকজন চাকরি খোযানো গেবস্ত মানুষ। কিন্তু শতেক লাঞ্ছনা সহ্য করেও বঙ্কুবাবু নিষ্ঠার সঙ্গে ভূগোল পড়ান। পটলবাবু সত্যি সত্যি অভিনয়-শিল্পী। সিধু জ্যাঠার নাম ধাম ক্রিয়াকর্ম ফেলুদা ছাড়া কেউ জানে না। তিনি জানানোর জন্য ব্যস্তও নন। কিন্তু যেটা তিনি নিজের কাজ বলে ধরে নিয়েছেন সেখানে তিনি একনিষ্ঠ একাগ্র। এই অকৃত্রিমতা এসব চরিত্রেব বৈশিষ্ট্য। বাইরের সংসারের নানা ধাক্কায়, নানা লাঞ্ছনায় বঙ্কুবাবু পটলবাবুর মতো মানুষরা ক্লান্ত হয না শুধু অন্তরের মৃগনাভিটুকু অক্ষুণ্ণ বলে। সংসাবেব মাপকাঠিতে অপেক্ষাকৃত সফল প্রতিবেশীরা তাঁকে মজা ও টিপ্পনীর বিষয় বলে মনে করে—কিন্তু ক্রেনিয়াস গ্রহের উন্নততর প্রাণী অ্যাং তাদের উন্নততর যন্ত্রে ঘব ফেবতা বঙ্কুবাবুকেই তাঁদেব যন্ত্রেব ভিতব দিযে দেখিয়ে যান, নর্থ পোলের অন্তহীন ববফের মরুভূমি, অরোরা বেবিয়ালিস, সিন্ধুঘোটক, পেঙ্গুইন। দেখিয়ে যান ব্রেজিলের জটিল অবণ্যেব অসূর্যম্পশ্য ভীষণতার মধ্যে অ্যানাকণ্ডা সাপ, পিরান্‌হা মাছের বিভীষিকা। এই অতি অকিঞ্চিৎকর ভূগোলের মাস্টারেব জীবনে যে বিশ্বব্যাকুলতা লুকিযে আছে তার এক আশ্চর্য পরিচয় এই অংশটি। তার অস্তিত্বেব দীনতা ঘুচে গেল— বিশাল পৃথিবীর ও পৃথিবীরও ওপারেব মহাকাশের সংস্পর্শে। আমবা বেশ অনুমান কবতে পাবি পবের দিন কাঁকুবগাছি প্রাইমাবি স্কুলে ভূগোলের ক্লাশের মেধাবী আগ্রহী ছাত্রটির কাছে একটি প্রত্যক্ষদর্শীব বিববণ দিয়ে এই শিক্ষক ধন্য হবে. পটলবাবুব গল্পটিব পরিসমাপ্তিতে পটলবাবুর উপলব্ধিটি বড় কথা। আর্থিক প্রাপ্তিব জন্য তাঁর আর অপেক্ষা করাব দরকার হল না—কেননা অভিনয় শিল্পের মূল রহস্যেব অসীমতা তাঁব কাছে ধরা দিয়েছে। শিল্পী জানে সব পাওযার বড় পাওয়া এটাই। হয়তো নিঃসম্পৃক্ত এ অনুমান—তথাপি ভাবতে ইচ্ছে হয়, পথের পাঁচালীর দূর্লঙ্ঘ্য অর্থাভাবের দিনে অর্ধসমাপ্ত ছবিটির শিল্পরহস্যের দিকে তাকিয়ে তার স্রষ্টাও কোনোদিন ভেবেছিলেন—আমি তো জেনেছি আমার বলা কী বকম হবে।

কিন্তু এ প্রশ্নটা সত্যজিৎবাবুব গল্প পড়তে পড়তে ক্রমশই অনিবার্য হয়ে ওঠে— ঠিক ছেলেদের জন্য লেখা কোন গল্পগুলি? বাইরের দিক থেকে তার একটা মীমাংসা বোধ হয় আমবা কবতে পারি। যে গল্পগুলি রায়চৌধুরী পরিবারের ধারাধরনের আত্মীয় সেগুলই নিছক বালকভোগ্য গল্প। যেমন ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর প্রথম ডাযেরিটি পড়তে গিয়ে আনমনে একবার ভাবতে হবেই হেসোরাম হুঁশিয়াবেব ডায়েরি। অন্তত একবারও

মনে হবেই দুই আবিষ্কারকের অভিযানের দুঃসাহসের মিল, অজ্ঞাতপূর্বকে আবিষ্কারের পর লাগসই নামকরণের দক্ষতা। হেশোরাম হুঁশিযারের হাস্যকবতা বাদ দিলে শঙ্কুর প্রাথমিক উপাদান নজরে পড়ে। প্রোফেসর শঙ্কুর গবেষণাগারের উপাদানগুলির প্রসঙ্গেও সুকুমার রায়ের প্রোফেসর নিধিরাম পাটকেলের গবেষণাগারেব বিচিত্র উপাদানগুলির কথা মনে পড়বে। প্রোফেসার পাটকেলের গোলার মধ্যে ছিল বিছুটির আরক, লঙ্কার ধোঁয়া, ছারপোকার আতব, গাঁদালেব রস, পচা মূলোর এক্‌সট্র্যাক্ট। প্রোফেসর শঙ্কুর রকেটের উপাদানে ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস, কচ্ছপের ডিমের খোলা তার সঙ্গে একুইয়স ভেলোসিলিকা। তবে শঙ্কু অতি দ্রুত এই প্রাথমিক অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। প্রহ্লাদের সাংসাবিক অভিজ্ঞতার উপর সহিষ্ণুতা তাঁর মধ্যে মিলবে না। তিনি আত্মপ্রত্যয়ী বৈজ্ঞানিক। অনেক কীর্তির অধিকারী। তাঁর আবিষ্কৃত মিরাকিউরল ম্যাঙ্গোরেঞ্জ, এ্যানাইহিলিন, অরনিমন্, রিমেমব্রেন, অক্সিমোর, বটিকা ইণ্ডিকা, অম্‌নিস্কোপ, স্নাফগান, মাইক্রোসোনোগ্রাফ ক্যামেরাপিড, সম্‌নোলিন, লিঙ্গুয়াগ্রাফরোবু প্রভৃতি ঔষধ, যন্ত্র, অস্ত্র ও গ্যাজেট সরলার্থে বিস্ময়কর। তাঁকে আমরা আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে সসম্মানে অবলীলাক্রমে ঘুরে বেড়াতে দেখি। কিন্তু তিনি খাঁটি বাঙালি। অবিনাশবাবুর মতো একান্ত এ্যাভারেজ প্রতিবেশীকে তিনি অম্লান বদনে সহ্য করেন সকৌতুকে। কোনো খাঁটি বাঙালি টাকাওয়ালা লোকের টাকার ডাঁট সহ্য করতে পারে না— শঙ্কুও পারে না। খাঁটি বাঙালির বসুধৈব কুটুম্বকম্। সায়েব দেখলে সে মাথা হারায় না। শঙ্কুরও উত্তরস্বাধীনতা ভারতীয়ের বিশ্বনাগরিকত্ব বোধ শ্রদ্ধার্হ। এ সবই আমরা বড়রা বিশেষভাবে উপভোগ করি। মাপের বাইরে চলে যেওনা— প্রযুক্তবিদ্যায় পারঙ্গম বিশ্বের প্রতি এটাই শঙ্কুর বাণী। ডিমিট্রিয়াসের গল্প, আশ্চর্য পুতুলের গল্প সেকথাই বলছে। তবে এসব সত্ত্বেও শঙ্কুর গল্প বিশেষ করে কিশোরভোগ্য গল্প। সে সব গল্পের প্রথম দিকের দুটি তিনটি বাদ দিলে সব গল্পেরই ঘটনাস্থল সুদূর বিদেশ। ভ্রমণবসের সঙ্গে রহস্যরস মিশিয়ে তার সঙ্গে যথোপযুক্ত এ্যাডভেঞ্চার রস জুড়ে দিলে কী জিনিস দাঁড়ায় স্বদেশের পটে তার নিদর্শন ফেলুদার কাহিনী, বিদেশের পটে তার নিদর্শন প্রোফেসব শঙ্কু। দুটোই দুই অর্থে আবিষ্কারের কাহিনী।

কিন্তু শঙ্কুর গল্প এ সব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এমন সব গভীর প্রশ্ন নিয়ে আমাদের সম্মুখীন হয়েছে যা বয়স্ক মানুষের প্রশ্ন। ''কম্পু' গল্পটির কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। ইলেকট্রনিক্‌স্-এর সম্ভাবিত শেষ কীর্তি সেই ক্ষুদ্রকার গোলকটির নাম কম্পু। সে সব প্রশ্নের উত্তর জানে। জানতে জানতে সে মানবিক জ্ঞানের সীমানা পেরিয়ে গেল, হয়ে উঠল অন্তর্যামী, হযে উঠল ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। পবিশেষে সে তার প্রদত্ত দেহত্যাগের আগে সব থেকে চূড়ান্ত প্রশ্নেব মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ''কম্পু'' আমাব মতে শঙ্কু সিরিজের শিখরী গল্প। কম্পু যেন প্রাচীন সর্বজ্ঞ ভারতীয ঋষির কম্প্যুটর প্রতীক। সেই প্রাচীন ঋষির মতোই সে জানতে জানতে জেনেছে জানার শেষ নেই— কিন্তু সে থামে নি। ঋষির মতোই সেও নিজের জন্য কিছু চায় না। কিন্তু মানুষকে দিতে চায় তার জ্ঞানের ফল। জাপানকে সে বলে দিয়ে গেল প্রাকৃতিক পীড়ণ থেকে রক্ষা পাবার কৌশল। তাবপর প্রাচীন নচিকেতার মতো সব শেষে উচ্চাবণ কবেছে তাব শেষ পরম প্রশ্নের নিজস্ব উত্তর পাবাব সংবাদ। এ গল্প ঠিক বালকভোগ্য গল্প নয়—

না হয়ে ভালই হয়েছে। এরকম দৃষ্টান্ত অবশ্য সংখ্যায় বেশি নয়। রায়চৌধুরী পরিবারের শিশু সাহিত্যের মূল্য উৎসটি তিনি আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন "প্রোফেসর হিজিবিজবিজ" গল্পে। আমার কিন্তু গল্পটিতে 'হ-য-ব-র-ল' বা 'আবোলতাবোল'কে ছাপিয়ে মনে পড়ে ওয়েলস-এর 'আইল্যাণ্ড অফ ডক্টর মোরো'। মোরোর ট্র্যাজিক গবেষণার সঙ্গে প্রোফেসর হিজিবিজবিজ্-এর বিচিত্র ভয়াবহ গবেষণার মিল আছে। গোপালপুর সীকোস্ট-এ নির্জন পরিবেশে "ষষ্ঠীচরণ" কেমন একটা গা ছমছমে পরিবেশ সৃষ্টি করে। সে রসটার উত্তমর্ণ ওয়েল্স নন কিন্তু। সুকুমার রায়কেও পাশ কাটিয়েছেন লেখক আশ্চর্য তৎপরতায়। অদ্ভুত রস ও হাস্যরসের মিশ্রণ থেকে তিনি সযত্নে হাস্যরসটি এখানে ছেঁকে বার করে দিয়েছেন। যা রইল তা অদ্ভুত ও ভয়ানকের মোক্ষম বিমিশ্র স্বাদ।

সত্যজিৎ রায়ের অলৌকিক গল্পগুলির বেলাতেও বলতে পারি এগুলি পড়ে আমরা বড়রা যদিও সম্যক তৃপ্তি পাই, তথাপি এগুলি ছেলেদের জন্যই লেখা। কিন্তু একটু বড় ছেলেরা এর লক্ষ্য। লীলা মজুমদারের হাতে থেকে আমরা খুব চমৎকার ভূতের গল্প পেয়েছি। কিন্তু সে গল্পের লক্ষ্য অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেরা। রায় ও মজুমদার দুজনেরই ভূতের গল্পের প্রিয় পটভূমি পরিত্যক্ত নির্জন বাড়ি। লীলা মজুমদারের ভূতেরা তাদের উপভোক্তাদের কথা ভেবেই বোধহয় খুব স্নেহময়, মজারুও কখনো কখনো। ভূতের গল্পের আরেক সার্থকস্রষ্টা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভূতেরা, লীলা মজুমদারের গল্পের ভূতদের ছানাপোনা। সত্যজিৎবাবুর গল্পের ভূতেরা কিন্তু আসল ভূত। এবং তাঁর ভূতের গল্পের বয়স্কভোগ্য সৌন্দর্য গল্পের স্ট্রাকচারে। সকলেই জানেন ভূতের গল্পের প্রধান মজা ভূতের আত্মপ্রকাশে। এ বিষয়ে সত্যজিৎ রায় বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। "অনাথবন্ধুর ভয়" এবং "ব্রাউন সায়েরের বাড়ি" গল্প দুটির তাক্ লাগানো উপসংহার ভৌতিক হতভম্বতা সৃষ্টি করে। এটাই ভালো ভূতের গল্পের আর্ট। অলৌকিক রসের গল্প হলেও "খগম্" ভূতের গল্প নয়। ছোটছেলেদের এ গল্প পড়তে বাধা নেই, উপভোগ করতেও বাধা নেই— কিন্তু এ গল্পের অন্তর্গত তাৎপর্যের তীরটি বয়স্কদের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত। কোনো মানুষ তার সেন্স্ অফ গিল্ট্ বা অপরাধ চেতনার হাত থেকে মুক্তি পায় না। এই বক্তব্যটি সত্যজিৎ রায়ের একাধিক গল্পে দেখা দিয়েছে একাধিক রূপে। সে কথায় আমরা পরে আসছি। "খগম্" গল্পের ব্যাপারটি নাটকীয়। বালকিষণকে ধূর্জটিবাবু অহৈতুকী জিঘাংসায় মেরে ফেললেন, ফলে ক্রুদ্ধ ইমলিবাবার অভিশাপে ধূর্জটিবাবু সাপ হয়ে গেলেন— এই ভয়াবহ গল্পটির পিছনে রয়েছে একটি পুরাতন ভারতীয় মীথ। মীথটি অভিশাপের থীম্‌কে নিয়ে গঠিত। "খগম্" নামটি ধূর্জটিবাবুর মুখে উঠে এল অবচেতনের ধাক্কায়। সে অবচেতন তখন অপরাধবোধে অভিভূত বলেই ইমলিবাবার অভিসম্পাতী মূর্তির সঙ্গে ধূর্জটিবাবু মহাভারতের শাপোদ্যত মুনিকে গুলিয়ে ফেলেছে। বাকিটুকু বিকারের ফল। "মিঃ শাসমলের শেষরাত্রি" গল্পে শেক্স্‌পীয়ারের 'রিচার্ড দি থার্ড'-এর এ্যাভেঞ্জিং ঘোস্টদের কথা মনে পড়বে। সেখানেও কৃতকর্মের অবচেতন-সঞ্চিত পাপবোধ শেষ মুহূর্তে মাথা চাড়া দিয়েছে।

শ্রীরায়ের গল্পের দুটি চরিত্রের কথা একটু আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়— জটায়ু আর অবিনাশবাবু। দুজনেই সাধারণ মাপের বাঙালি। ঘটনাচক্রে দুজনেই জড়িয়ে

পড়েছেন মেধায় মননে অসাধারণ করিৎকর্মা দুজন মানুষের সঙ্গে। এ সম্মেলন হাস্যরসের যথেষ্ট কারণ হতে বাধ্য— হয়েওছে তাই। দুজনের মধ্যে আছে দুরপনেয় বাঙালিয়ানা— সে বাঙালি একটু একটু সাহেব হতে পারলে সুখী হয়—কিন্তু তার বাঙালি স্বভাব শেষ পর্যন্ত দুর্মর। কৃতী প্রতিবেশীকে পরিহাস করতে পারা পড়শী বাঙালির একধরনের মৌতাত। অবিনাশবাবু প্রথমটা ছিলেন সেই মানুষ। প্রতিবেশীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব তাঁর কাছে উপহাসের সামগ্রী। তিনি সে প্রতিবেশীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাফল্যের চেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন নিজের মূলোর খেতের নিরাপত্তার জন্য। তার জন্য খেসারত দাবি করতে ও তাগাদা দিতেও তাঁর বাধেনি। আবার সেই শঙ্কুর সঙ্গে পরে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেও তাঁর কোনো চক্ষুলজ্জা হয়নি। এই বেরিয়ে পড়ার ঘটনা থেকেই বোঝা গেল অবিনাশবাবুর চরিত্রে আরেকটা মাত্রা আছে বাঙালির ভ্রমণপিপাসা। এতেই চরিত্রটি মুক্তি পেল তাব ভাঁড়ামি থেকে। কিন্তু অবিনাশবাবুর ভ্রমণপিপাসা অজানা জায়গা চোখে দেখার অহমিকা তৃপ্তি মাত্র। তাঁর কৌতূহলের কোনো ইতিহাসও নেই, ভবিষ্যৎও নেই। সহযাত্রীদের বিষয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। তিব্বতযাত্রার সাহেব সঙ্গীদের জন্য তিনি মাত্র তিনটি ইংরাজি বাক্য স্থির করে রেখেছিলেন। সকালে গুড মর্নিং, সন্ধ্যায় গুড ইভনিং এবং সাহেবদের কেউ যদি খাদে গড়িয়ে পড়ে যায়, তাহলে গুড বাই। তিনি ভীতু নন ঠিক কথা, কিন্তু তাঁর সাহসের কোনো পরীক্ষাও হয় নি। ঊনিশ শতকীয় বাংলায় গদ্য লেখেন, মানুষটিও সে হিসাবে খাঁটি মফস্বল ব্যাগু। ভিড়ে পড়তে পারবার আশ্চর্য ক্ষমতায় তিনি সিদ্ধ। কৈলাস শৃঙ্গ দেখে সায়েবদেরও তিনি গড় করিয়ে ছেড়েছিলেন — খঁটি বাঙালি লজিক প্রয়োগে — সেক্রেড্, সেক্রেড্ মোর সেক্রেড্ দ্যান কাউ। তা বলে তিনি ইংরাজি জানেন না এমন নয়। ঠিক ঠিক জায়গায় তিনি মোক্ষমভাবে মিল্টনের কাব্য স্মবণ করতে পারেন। নকুড়বাবু সে জায়গায় একান্ত সাদামাটা বর্ণহীন মানুষ। বিনীত ভঙ্গিতে মাটি চেটে ফেলেন যেন এমন ভাষায় চিঠি লেখেন। কিন্তু তাঁর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। অতীত দর্শন, ভবিষৎ দর্শন ইত্যাদি অনেক গুণ আছে এঁর। এমন কি মনগড়া ঘটনাও ইনি অনেক সময় চোখের সামনে দেখতে পান, মনের জোরে অন্য লোককে দেখিয়ে দিতে পাবেন। ''নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো'' গল্পে নকুড়বাবুর প্রতিষ্ঠা। কিন্তু নকুড়বাবুর সম্যক শক্তির আশ্চর্য কাহিনীগত প্রয়োগ ঘটেছে ''প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও'' গল্পে। তাজমহলকে কারবোনির ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে নকুড়বাবুর অলৌকিক শক্তির অদ্ভুত প্রয়োগ বিশ্বাস্য হত না যদি না আমরা আগের গল্পটি পড়ে রাখতাম।

জটায়ু সে তুলনায় একন্তই নাগরিক মানুষ। কলকেতে বাঙালিয়ানায় তার অদ্যন্ত চিহ্নিত। সে যখন 'মিস্টার মিত্তির' বলে ফেলুদাকে ডাকে, তখন ইংরেজি কেতার 'মিস্টার' আর বাগবাজারী 'মিত্তির' শব্দেব পাশাপাশি অবস্থান বুঝিয়ে দেয় লোকটি মোটেই ইংরেজি কেতার ধার ধারে না। ইংরেজি ভাষার প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে দখল তেমন নেই। অম্লানবদনে উল্টোপাল্টা ইংরেজি বলে, যেমন 'ইনকঙ্গিটো' (ইনকগ্‌নিটো)। খুব প্রথম শ্রেণীর কোনো এ্যাম্‌বিশন তার নেই। বোমহর্ষক নামের, 'ভ্যাঙ্কুভারে ভ্যাম্পায়ার' জাতীয় বই লিখে, তাতে অনেক ভুলভাল থাকে — দুমাসে তিন হাজার কপি বাজারে চালাতে পারলেই সে সুখী। ফিল্‌মে বই চললে আরো সুখী।

জীবন দর্শন আছে। সে রহস্যকাহিনী লেখে। ফেলু মিত্তির তাকে রহস্যঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত হবার সুযোগ দিচ্ছে। 'সোনার কেল্লা' ফিল্মে সে যখন জিজ্ঞাসা করে, 'আমরা কি এখন ডেকয়েটদের পিছু পিছু ছুটছি' তখন তার বুক টিপ-টিপ উত্তেজনায় আগ্রহ উদ্বেগে মিশ্রিত মুখচ্ছবিটি সন্তোষ দত্ত খুব চমৎকার ধরে দেন। এই হচ্ছে আসল লোকটা। ফ্যাক্ট ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন, এ কথা জেনেই বোধহয় জটায়ু ফিক্‌শনের জগৎ ছেড়ে ফ্যাক্টস্-এর জগতে ঢুকে পড়েছে। রহস্যকাহিনীর লেখক রহস্য ঘটনার মধ্যে ঢুকে পড়ল এমন একটি চরিত্র অবশ্য এর আগে আমরা ফেলুদা কাহিনীতে পড়েছি— তিনি ''ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'' গল্পের তিনকড়িবাবু। কিন্তু তিনকড়িবাবু সত্যি তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি। তাকে দিয়ে জটায়ুর উদ্দেশ্য মিটত না। আশ্চর্য নয় জটায়ু বিপুল জনপ্রিয় হবে। সংখ্যায় বেশী লোক জটায়ুর মতো লেখকের লেখা পড়তে ভালবাসে— জটায়ু নিজেও জানে সে বড় মাপের মানুষ নয়। তা নিয়ে তার মাথা ব্যথাও নেই। কিন্তু সে ভ্রমেভ্রান্তিতে আগ্রহে কৌতূহলে ভয়ে ভরসায় খুব জ্যান্ত মানুষ। পাঠিকারা তার খুব অনুরাগী। রুণু তাই ফেলুদাকে দেখে প্রথমেই জটায়ুর খবর নিয়েছে। জটায়ুর ভিতু ভাবটাকে পাঠিকারা খুবই উপভোগ করে। ভয়ের মুহূর্তে যে কোনো ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে মহাপ্রাণের নিঃশ্বাস মিশে যাওয়া— চঃ বলতে ছঃ, অথবা 'কে' বলতে গিয়ে 'খে' বলে ফেলা আমাদের মনে পড়ে। উত্তেজনাপ্রবণ ভদ্রলোকটি উত্তেজনার মাথায় যেভাবে গুলিয়ে ফেলেন সেটাও কম উপভোগ্য নয়, যেমন—দি সার্কাস হুইচ এসকেপড্ ফ্রম দি গ্রেট ম্যাজেস্টিক টাইগার— ভদ্রলোক লক্ষ করেননি সেন্‌শটাই প্রায় এসকেপ করছে। ফেলুদা ও তোপ্‌সে কম্‌বিনেশনে কোনো হাস্যরসের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু দ্রষ্টা ও ন্যারেটর তোপ্‌সের চোখে বাগ্‌যত ও র‍্যাশনাল ফেলুদা এবং বাক্‌লুব্ধ ও উত্তেজনাপ্রবণ জটায়ু একসঙ্গে হলে যে চমৎকার অসঙ্গতি সৃষ্টি করে তা উপভোগ্য হাস্যরসের উৎস। 'ছিন্নমস্তার কাহিনীতে' জটায়ু যখন ফস্‌কে যাওয়া বুদ্ধির পৌনঃপৌনিক 'ছ্যা'-ছ্যা'- এর স্রোতে গল্প থামিয়ে ফেলার যোগাড় করছিলেন, তখন ফেলু মিত্তিরের গম্ভীর সংযত ধমকে জটায়ুকে পরে 'ছ্যা' 'ছ্যা' করার নির্দেশ, জটায়ুকে থামিয়ে দিয়ে আমাদের হাসিয়ে দেয়।

কিন্তু যেসব গল্পে বয়স্কপাঠ্য ও কিশোর পাঠ্যের বিভাজন রেখা ভাবা হয়নি, পাঠকও ভাবেন না, সে সব গল্পেই সত্যজিৎ রায়ের শক্তি একটা অন্য মাত্রায় ফুটে ওঠে। একটু ইতস্তত করেই বলে ফেলছি— সে সব গল্পই তাঁর নিজস্ব স্বভাবের সংক্ষিপ্ত যথার্থ পরিচয়। সে স্বভাবের নাম শিল্পীস্বভাব। নানা ভাবে এর প্রকাশ ঘটেছে— নানা স্তরে। শিল্পীর কৌতূহল নিয়ে, শিল্পীর শ্রদ্ধা নিয়ে, বিনয় নিয়ে এবং বিনয়মিশ্রিত প্রত্যয় নিয়ে তিনি জীবনের মুখোমুখি হতে চেয়েছেন। বিশ্বাস করেছেন সব ক্ষতিপূরণ ওখানে। ''টোরোড্যাকটিলের ডিম'' গল্পটি উল্লেখ করছি। বদনবাবু ছাপোষা কেরানি। পঙ্গু ছেলে

[illegible] কে গল্পের যোগান দিতে হয়। তাই মনে মনে তিন গল্প ফাঁদেন— [illegible] বেন বলে। 'টেরোড্যাকটিলের ডিম'' দারিদ্র্যের গল্প নয়, তথাকথিত [illegible] তা এর উপাদান নয়। পঙ্গু ছেলেব জন্য দুঃখী পিতার গল্পও এ নয়। এ এক এমন মানুষের গল্প যে অক্লেশে মাস মাইনের একটা ভারি অংশ পকেটমারকে ধরে দিয়ে আসে এই আনন্দে যে, ছেলের জন্য একটা মোক্ষম গল্প সংগ্রহ করা গেছে। এখানে আসল শিল্পী ওই পকেটমাবটি। যে প্রায় ম্যাজিক দেখিয়েছে হাত সাফাই করে— আর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিসিয়ানের উপযুক্ত হতভম্ব কবে দেওযা প্যাটার করে। এই প্যাটারটাই শিল্প। বদনবাবু শিল্পপ্রাণ বলেই টাকা খোয়ানোর দুঃখের চেয়ে বড়ো করে ধরেছেন ওই প্যাটারের বিস্ময়করত্ব। দবিদ্র সংসারেব রুগ্ন পিতার দুঃখ ধান্ধাকে এ গল্পে মিথ্যা বলা হয়নি। কিন্তু তাব চেযেও বড়ো সত্য বলা হয়েছে বদনবাবুর আনন্দ পাবার ক্ষমতাকে।

অন্যদিক থেকে এরই কারণে বলতে পারি ''অতিথি'' গল্পটির কথা। যে পরিবারটির পটভূমিকা গল্পটিতে ব্যবহাব করা হয়েছে সে পবিবার আর্থিক দারিদ্র্যে ম্লান নয। কিন্তু সে পরিবারের একটা অন্য দাবিদ্র্য বয়েছে। তারা তাদেব সংকীর্ণ সিদ্ধির চার দেওয়ালের মধ্যে ছক বাঁধা অস্তিত্বকে আঁকড়ে থাকে। যা তাদের প্রত্যহ ব্যবহৃত সংজ্ঞার বাইবে তাকে তাবা বিশ্বাস কবতে নারাজ। এবই মাঝখানে এসে হাজির হয়েছিলেন মণ্টুর দাদু --- বিচিত্র বিশ্বের ডাকমোহব বুকে নিয়ে। স্বভাবতই তাঁকে এ বাড়ির মধ্যে যে বুঝে নিতে চেযেছে সে মণ্টু। দাদুও মণ্টুদেব সঙ্গেই গল্প করতেন — সাহাবাব তুয়াবেগদেব গল্প, জাহাজে দুঃসাহসিক যাত্রার গল্প। টাকা পয়সায মাপা সাংসারিক সাফল্যের দ্বাবা স্পষ্ট নয় যে সব বয়সোত্তর মানুষ— তা সে শিশু হোক কিশোর হোক, অথবা প্রৌঢ় হোক সত্যজিৎ বাবুর গল্পের লক্ষ্য তারা। দাদুও তার মানসিকতার উত্তবাধিকারী করে গেছেন মণ্টুকে — সে সেই বযসোত্তর মানবগোষ্ঠীর সদস্য বলে। যে মন পাকা, সে মন শ্রী রায় অথবা ঐ দাদু কারো লক্ষ্য নয়। এটাও শ্রী রায়েব জীবন সমালোচনারই একটা অঙ্গ।

এই জীবন সমালোচনাকেই আবেকটু অন্য মাত্রায় দেখতে পাই আমরা ''অসমঞ্জবাবুর কুকুর'' গল্পে। বিজ্ঞান কাহিনী লেখক ওলাফ স্টেপলডনের একটা উপন্যাসে একটা কুকুর ছিল, বৈজ্ঞানিক তার সারমেয় শরীরে মানবীয় মস্তিষ্ক সৃষ্টি করেছিলেন । অসমঞ্জবাবুর কুকুর সে জাতীয় নয়। অসমঞ্জবাবু সত্যজিৎবাবুর অনেক গল্পেব মতোই একলা মানুষ। পটলবাবু বা বঙ্কুবাবুর মতো সংসারের বাজার দরে তিনিও আদপেই পয়লা মার্কার নন। শাখা ডাকঘরে কেরানি, দেড়খানা ঘরের ভাড়াটিয়া। মাসে দুটো হিন্দী ছবি, একটা বাংলা যাত্রা বা থিয়েটার, হপ্তায় দুদিন মাছ, আর চার প্যাকেট উইল্‌স্ সিগারেট হলেই তাঁর চলে যায। একা মানুষ, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন বিশেষ নেই। এ হেন ব্যক্তি একটি কুকুর যোগাড় করলেন। নাম ব্রাউনী। তাজ্জব ব্যাপার এই যে, কুকুরটি হাসে-- ঠিক জায়গায় হাসে, হাস্যরসের সূত্র অনুযাযী বুঝেসুঝে হাসে। এ গল্পের চূড়ান্ত সীমায় আছে ব্রাউনীকে কিনে ফেলতে ইচ্ছুক এক মার্কিন সাহেবের ব্যাপাব স্যাপার দেখে ব্রাউনীর নতুন হাসি। 'সাহেব ভাবছেন টাকা দিলে দুনিয়ার সব কিছু কেনা যায়, তাই শুনে কুকুর হাসছে'— সাহেব সোনার পার্কার কলম পুনরায়

পকেটবন্দী করে ফিরে যাবার সময় অসমঞ্জবাবুর বিষয়ে বলে গেলেন— হিঁ মাস্ট বিঁ ক্রেঁজি। টাকা দিয়ে মানুষের ভালবাসার সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া যায় এ কথা যে ভাবে সে সবচেয়ে হাস্যকর—আর বিত্তহীন সাধারণ মানুষের ভেতর থেকে একটা অসাধারণ মানুষ বেরিয়ে আসে উপলব্ধির ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে। তখন এক মুহূর্তে নাটকটা পাল্টে যায়। ঝকঝকে চকচকে শ্যামল নন্দী সাহেবের ধাতানির ভয়ে অসমঞ্জবাবুর ওপর কঠিন হতে চায়। কিন্তু অসমঞ্জবাবু ব্রাউনীর হাসির আলোয় সহসা উপেক্ষা করে বসেন ঐ অতলান্তিক পারের ধনকুবেরকে আর কমিশন ভিক্ষু বাঙালি নন্দীকে। এমনি করেই একদা 'কাঞ্চনজঙঘা' ছবির বেকার যুবকটি মনের অপ্রমেয় মানসিক বিস্তারের মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করে বসেছিল উমেদার ভূমিকা। এক হিসাবে সত্যজিৎবাবুর এই গোত্রের সব গল্পই ব্যক্তির আত্মাবিষ্কারের গল্প। তুলে নিতে পারি"দুই ম্যাজিশিয়ান" গল্পটি। ম্যাজিক স্টোরিতে লীলা মজুমদারও সিদ্ধহস্ত। তাঁর সুবিখ্যাত "ভানুমতীর খেল" গল্পটি ম্যাজিকের অপার অবাককাণ্ডেব গল্পই বটে, যদিও শেষ পর্যন্ত গল্পটি ড্রিম স্টোবি। সত্যজিৎ বাবুর গল্পেও একটা স্বপ্ন আছে। কিন্তু তার তাৎপর্য আলাদা। সেই স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ঘটেছে সুরপতিবাবুব আত্মোপলব্ধি। এ গল্পের মূল উপাদানটি রয়েছে সত্যজিৎবাবুর শৈশব স্মৃতিতে। 'যখন ছোট ছিলাম' বইটিতে শেফালো সাহেবের স্টেজের কারসাজি বনাম বিয়ে বাড়িতে দেখা এক বাঙালি ভদ্রলোকের টাকা আংটির ম্যাজিকের স্মৃতি পরিণত চেতনায় "দুই ম্যাজিশিয়ান" গল্পে রূপ ধরেছে। এবং বীজ-বক্তব্যটিও এক-জেনে নিতে হবে কোন্‌টি প্রকৃত শিল্প, খাঁটি ভারতীয় স্বভাব-যুক্ত। সুরপতিকে ত্রিপুরাবাবু বলেছিলেন, 'একজন বিদেশী বুজরুকের বাইরেব জাঁকজমক তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিল। আসল পথ ছেড়ে যে পথে চট করে অর্থ হয়, খ্যাতি হয়, সেই পথে চলে গেলে তুমি।' এখানেই বোঝা যায় ত্রিপুরাবাবু শিল্পী— কলকব্‌জার উপর সে শিল্প নির্ভরশীল নয়। সাধনায়, নিষ্ঠায়, একাগ্রতায় তার রহস্য করায়ত্ত হয়। সুরপতিকে ত্রিপুরাবাবু সেটাই বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। স্বপ্ন ধরে ব্যাখ্যা করলে বলতে পারি সুরপতির অবচেতনে যা ছিল সেটাই ত্রিপুরাবাবুর মুখে ব্যক্ত হয়েছে।

"সহদেববাবুর পোর্ট্রেট' ও "রতনবাবু ও সেই লোকটি' এই গল্প দুটির মধ্যে রস ও রূপের অনেক তফাত। "রতনবাবু ও সেই লোকটি" এক কথায় দারুণ গল্প—বাংলায় কেন, আমার জ্ঞানে আমি কোথাও এরকম গল্প পড়িনি। কিন্তু এই দুটি গল্পেরই মোদ্দা কথা একটাই— আনুরূপ্য কোনো দিক থেকেই মঙ্গলের কারণ হয় না। এর প্রাথমিক বীজ রয়েছে বুঝি "প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু" গল্পে— বোর্গেল্টের উক্তিতে— 'ঠিক ওরই মতো আরেকজন কেউ থাকে সেটাও চাইল না।' যে বিশ্বসভ্যতা আজ সব কিছু ছাঁচে ঢালাই করাব জন্য ব্যস্ত তার শিল্পময় প্রতিবাদ এই গল্প দুটি। রতনবাবু এমন মানুষ যার সঙ্গে কারো মেলে না। তিনি একা তো বটেই, অনন্যও বটে। তিনি খোঁজেনও অনন্যকেই—যা সবই দেখে না, খোঁজে না, সেগুলিই তিনি খোঁজেন। কিন্তু সিনিতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর এক হুবহু ডুপ্লিকেট। এখানেই রতনবাবুর মতো মানুষ বড় ধাক্কা খেলেন। এই একটা জায়গা যেখানে সব উত্তরই তাঁর জানা—কেননা তিনি নিজেই সেই উত্তরগুলো। রতনবাবু সেই অসহ অবস্থা থেকে মুক্তি চাইলেন অনুরূপকে ধ্বংস করে। কিন্তু আনুরূপ্য তো পারস্পরিক -- কে রূপ আর কে অনুরূপ

দুটো জীবনে স্থির হল না বলেই একটা মৃত্যুতেও তা স্থির হলনা। সহদেব বাবু নিজে থেকেই অঙ্কিত প্রতিকৃতির অনুরূপ হতে চেয়েছিলেন। সেই আনুরূপ্য সাধনার ফলে তাঁর অর্জিত সৌভাগ্যের ভাঁটা সরতে শুরু করল। অবশ্য সহদেববাবুর এই দুর্দশা তাঁর একটা কৃতকর্মের শাস্তিও বটে। পোর্ট্রেট ফেরত দিয়ে আবার রিয়ালের জগতে ফিরে এলেন।

সত্যজিৎবাবুর গল্পের একটা বৈশিষ্ট্য হল জীবনচর্চায় কতকগুলি প্রাথমিক নর্মকে স্বীকৃতি দান। একটা নর্ম্ হল ছোটবেলার বন্ধুকে আঘাত করতে হয় না। হলে কি হয় তার প্রমাণ বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম। শৈশবের বন্ধুর কাছে থেকে পাওয়া আঘাতের স্মৃতি মোছে না। তার প্রমাণ ফেলুদার "গোয়েন্দারগিরি" এবং "চিলেকোঠা গল্প"। এই জগতের আর একটি নর্ম' হল তুমি কৃতী হলেও তোমার কৃতিত্বের সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত কৃতজ্ঞতা ও বিনয় —"ভূতো" এবং "দুই ম্যাজিশিয়ান" গল্প তার প্রমাণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকাব সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রধানত স্নেহরসের বশ। তাঁর গল্পে আমরা পাই ক্লাসফ্রেণ্ডের প্রতি সকল অবিশ্বাস, সংশয় এবং তজ্জনিত গ্লানির অবসান ঘটে জয়ের ছেলে সঞ্জয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বদনবাবুর জীবনের টান তাঁর ছেলে বিল্টুর জন্য। পিণ্টুর জগৎ মণ্টুর জগৎ, সদানন্দের জগৎ অনেক বেশী বিশ্বাস্য — একথা তিনি আমাদের শোনান – আমরা যারা নানা খর্বতায় আর সংকীর্ণতায় পীড়িত। ফটিকচাঁদের হারুণও স্নেহমিশ্র সখ্যের বশ। এমন মানুষই যথার্থ শিল্পী। সে শিল্প জীবনের বিশাল গাছে লতা। হারুণ বাবলুকে তার ফটিকচাঁদ পর্বে এ কথাই শেখাল জীবনকে ভালবাসলে তবে শিল্পী হওয়া যায়। আর জীবনকে যে ভালবাসে, সে মুক্ত। সব কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত। এই মুক্তর চেহারাটা বাবলু এর আগে দেখেনি। হারুণ ফটিকচাঁদকে বাবলুর জীবনে অবিস্মরণীয় করে দিল – বাবলু জানল কাকে বলে অকৃত্রিমতা। সত্যজিৎবাবুর শিল্প অকৃত্রিমতার সাহায্যে কৃত্রিমতার প্রতিবাদ। হারুণের মতো সেও আমাদের শেখায় মনের দিক থেকে বড় মাপের মানুষ হতে। আর্টিস্ট কি শুধু একরকম হয়...বলের খেলা, রঙের খেলা, কথার খেলা, সুরের খেলা—এক এক খেলা এক এক স্টাইলে খেলতে হয়। আর শেখাল আর্টিস্টের নিয়মগুলো একটু আলাদা। ফটিকচাঁদ জানল কাকে বলে জীবনের সত্য মুক্তাঙ্গন। একটা কথা তাকে হারুণ বলে গেল জীবনের কোনো অবস্থার জন্যই খেদ থাকে না তার— যে শিল্পকে ভালবাসে।

সব শেষে আলাদা করে বলতে হয় সত্যজিৎ রায়ের গদ্যশৈলী। এ সবটাই তাঁর নিজস্ব। এ গদ্যে কোথাও ফেনা নেই। পাতাবাহার নেই। নিষ্পত্র অথচ ফলবতী লতার মতো মনোজ্ঞ সে গদ্য। তোপ্সের গদ্যে একটা অন্তরঙ্গ সরল কৌতুক আছে— একটা উঁচু ক্লাশের স্কুলের ছেলের স্কুল-ল্যাঙ্গুয়েজ সে স্বভাবত নিঃসংকোচে ব্যবহার করে। ইংরেজি উচ্চারণের বিশুদ্ধতা নিয়ে তার অহংকারও আছে। কেউ ভুল করলে তা নিয়ে 'ফান' করতেও ভাল লাগে। পক্ষান্তরে শঙ্কু স্বভাবগম্ভীর। তার গদ্যও তাই। হিউমার সেখানে যথা সম্ভব স্বল্প। অপরের অজ্ঞতায় সে হাসে না, বিরক্ত হয় না— বোধ হয় নির্বোধের প্রতি অনুকম্পা পোষণ করে। লক্ষ করি যে, শঙ্কুর ভাষার ডায়েরি-রেজিস্টার যেমন সংক্ষেপে সংহত হতে জানে, তোপ্সের ভাষার কিশোর স্মার্টনেশ তেমনি ডাইনামিক। তোপসের বা 'ফটিকচাঁদ' উপন্যাসের শঙ্কুর ভাষার প্রধান গুণ তা

বিশেষণকে বিশেষ প্রশ্রয় দেয় না। দেখাকে শুনিয়ে দেওয়া খুব শক্ত কাজ। এ ভাষার সে ক্ষমতা আছে। এ ভাষার প্রধান লক্ষণ সম্বন্ধে ফেলুদা তোপসে্কে যা বলেছিলেন তা এই —'গাদাগুচ্ছের মর্চে ধরা বিশেষণ আর তথাকথিত লেখাপড়া করা শব্দ ব্যবহার না করে চোখে যা দেখলি সেইটি ঠিক ঠিক সোজাসুজি বলে গেলে কাজ দেবে ঢের বেশি।' কিন্তু তার মানে কিন্তু এ নয় যে এ ভাষায় কবিতা নেই।

'ছোট বড় মেজ সেজো নানান সাইজের সাদা কালো খয়েরি পাটকিলে ছিটদাব সব পাথর ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে, যুগ যুগ ধরে সেগুলোকে মোলায়েম করে পালিশ করে ব্যস্তবাগীশ ভেড়া নদী তড়ি ঘড়ি ছুটে চলেছে দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। এই ঝাঁপের জায়গাই হল রাজরাপ্পা।'

নদীর ছুট আর ঝাঁপ 'ছিন্নমস্তার অভিশাপে'র এই গদ্যে যেন সটান ছায়া ফেলেছে। আসলে একজন আর্টিস্ট যিনি বস্তুকে রঙ সমেত চাক্ষুষ করে দিতে চান— এ গদ্য তাঁর গদ্য। সংযম, যথাযথতা একটা নিখুঁত শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে এখানে। স্ফটিক স্বচ্ছতার সঙ্গে তা তুলনীয়। অথচ দরকারে রঙ ধরাতেও এ জানে।

সত্যজিৎ ঃ সব বয়সের লেখক

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সত্যজিৎ রায়কে যদি শিশুসাহিত্যের স্রষ্টা বলে মানি, তা হলে এই কথাটাও আমাদের মান্য করতে হবে যে, মানুষের শৈশব কখনও ফুরোয় না। ফেলুদা'র কীর্তিকাহিনী পড়ে কি শুধু ছোটরাই মুগ্ধ হয়? অথবা, প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়ে রোমাঞ্চিত হয় কি শুধু তারাই? 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ মগনলাল যখন বলে,'আপনি ঘাবড়াবেন না মোহনবাবু—উ শরবতে বিষ নাই', তখন কি শুধু শিশুদেরই বুক-ঢিবঢিব করতে থাকে? কিংবা, 'প্রফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও' গল্পে দুষ্ট বিজ্ঞানী কারবোনি যখন তাজমহলকে ধ্বংস করতে যায়, তখন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে কি শুধু শিশুদেরই? এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আধ-মিনিটও ভাবতে হয় না। 'বিষ আমি খারাপ জিনিস বলে মনে করি', মগনলালের মুখে এই অভয়বাণী শুনে লালমোহনবাবু যখন শরবতের গেলাশে চুমুক দেন, এবং -- বলতে গেলে প্রায় বিষম খেতে-খেতে– বলেন, 'নিশ্চয়ই— বিষ ইজ–ভেরি ব্যাড', তখন, সেই সাংঘাতিক মুহূর্তেও, শুধু শিশুরা কেন, হেসে ফেলেন তাদের বাপমায়েরাও, এবং প্রোফেসর শঙ্কুর যে গল্পের উল্লেখ একটু আগেই করেছি, তার শেষের দিকে 'রোবটের দুটো হাত একসঙ্গে এগিয়ে গিয়ে' যখন জাপটে ধরে কারবোনিকে, তখন তাজমহলও যে সেইসঙ্গে রক্ষা পেয়ে গেল, এইটে বুঝে শুধু শিশুদেরই নয়, তাদের বাপমায়েদের বুক থেকেও একটা মস্ত বড় দুর্ভাবনার বোঝা নেমে যায়। শিশুরা যেমন খুশি হয়, তাদের বাপমায়েরাও তেমন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়েন।

নানা এজ-গ্রুপের পাঠক-পাঠিকাদের আকর্ষণ করবার, ধরে রাখবার ও তাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যাশার পাত্রকে পূর্ণ করে দেবার এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে সত্যজিতের সাহিত্যেরও। এটা ঠিকই যে, বয়স যাদের নিতান্তই পাঁচ থেকে আটের মধ্যে, অর্থাৎ রূপকাহিনীর মায়াকাজল যাদের চোখ থেকে এখনও মুছে যায়নি, সত্যজিতের অধিকাংশ গল্পেই ঠিক তেমনভাবে তারা নিবিষ্ট হতে পারে না, যেমনভাবে নিবিষ্ট হলে তবেই তার রস পুরোপুরি উপভোগ করা যায়, আর তার মজাটাও পাওয়া যায় পুরো মাত্রায়। (পাছে কেউ ভুল বোঝেন, তাই বলে রাখি যে, কথাটা তাঁর 'অধিকাংশ' গল্প সম্পর্কে সত্য, সমস্ত গল্প সম্পর্কে নয়। কেননা, পাঁচ-সাত বছরের ছেলেমেয়েদেরও যা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ্য, এমন গল্প যে তিনি একেবারেই লেখেননি, তা নয়। তাও তিনি লিখেছেন। তবে তাঁর বেশির ভাগ গল্পই চায় আর-একটু বেশি-বয়সের পাঠক। অর্থাৎ এমন পাঠক, যার মন আর-একটু পরিণত, এবং কল্পনার জগৎ থেকে যে এখনও নির্বাসিত হয়নি বটে, কিন্তু যার কল্পনার চরিত্র ইতিমধ্যে অনেক পরিমাণেই পালটে গিয়েছে।) তাঁর গল্প-উপন্যাসের রস যে আট পেরোলেই পুরো মেলে, তাও বলি না, তবে তখন থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েরা যে সত্যজিতের বইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, এ তো আমরা নিত্য চাক্ষুষ করছি। এও দেখছি যে, হাতটা যে শুধু তারাই বাড়াচ্ছে, তাও নয়, বাড়িয়ে

দিচ্ছেন কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সব বয়সের মানুষ। শুধু ফেলুদা কিংবা প্রোফেসর শঙ্কুর কাহিনী নয়, অন্যান্য গল্পও সত্যজিৎ বেশ-কিছু লিখেছেন। সংখ্যা তারও পঞ্চাশের বেশি বই কম হবে না। সেই যে ১৩৭৭ সালে— অর্থাৎ আজ থেকে একুশ বছর আগে—বেরিয়েছিল 'এক ডজন গপ্‌পো', তারপর সেই একই ধারায়, অর্থাৎ প্রতিটিতে বারোটি করে গল্প নিয়ে, ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও কয়েকটি গল্পগ্রন্থ। লক্ষ করবার, এবং লক্ষ করে বিস্মিত হবার ব্যাপার এই যে, ফেলুদা কিংবা শঙ্কুর কাহিনী বলে কোনও কথা নেই, তাঁর সব বইয়েরই শেষ হয়ে যাচ্ছে মুদ্রণেব পর মুদ্রণ, কিন্তু এর কোনওটি সম্পর্কেই পাঠকসমাজের আগ্রহ কিছুমাত্র ঝিমিয়ে যাচ্ছে না। বালক যুবক হচ্ছে, যুবক প্রৌঢ় হচ্ছেন, প্রৌঢ় বৃদ্ধ হচ্ছেন, আর জীবনের এক-একটা পর্যায় অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গে পালটে যাচ্ছে তাঁদের আগ্রহের নানা কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু লেখক হিসেবে সত্যজিৎ দাঁড়িয়ে আছেন সেই একই জায়গায়, তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে, বিভিন্ন প্রজন্মের পাঠকের আগ্রহ দিনে-দিনে বেড়েছে বই কমেনি।

বাংলা ভাষায় শক্তিধর কথাসাহিত্যিকের অভাব আগেও ছিল না, আজও নেই। কিন্তু বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের পাঠককে আর কেউ কখনও গল্পের মোহিনী মায়ায় এইভাবে বন্দি করে রাখতে পেরেছেন বলে আমরা মনে হয় না। এমন তো নয় যে, তিনি আলাদা-আলাদা গল্প লিখেছেন আলাদা-আলাদা বয়সের পাঠক-পাঠিকার জন্য। গল্প তো একই। কিন্তু এমনই তার জাদু যে, তারই জালে ধরা পড়ে যাচ্ছেন সব বয়সের মানুষ।

সত্যজিৎ কি এমন গল্প আদৌ লেখেননি, যা শুধুই বয়স্কজনেব পাঠ্য? তাও লিখেছেন। কিন্তু সেই একটি-দুটিকে নিতান্তই ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করে যদি তাঁর বাদবাকি গল্পের উপরে চোখ রাখি আমরা তা হলে প্রথমেই যা আমাদের নজর কাড়বে, তা তাঁর বিষযবৈচিত্র্য। আতঙ্ক, অ্যাডভেঞ্চার, ম্যাজিক, মতিভ্রম, বন্ধুত্ব, বিচ্ছেদ, বুজরুকি, বারফট্টাই, ক্ষমা, খলতা ইত্যাদি যে অসংখ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে তৈরি হয়ে উঠেছে তাঁর গল্প, কিংবা গল্পের ভিতরকার নানা ঘটনা, তাতে বুঝতে পারা যায় যে, লেখক হিসাবে তাঁর চোখ ছিল একটা মস্ত বড় জনগোষ্ঠীব উপরে, এবং সেই জনগোষ্ঠীর চারিত্রিক নানা বৈশিষ্ট্যের প্রায় কোনও-কিছুই তার নজর এড়ায়নি। ছেলেবেলায় যারা ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাদের একজন খুব উন্নতি করে অন্যজনকে যদি পাত্তা না দেয়, তা হলে সত্যজিৎ যে খুবই ক্ষুব্ধ হন, তার প্রমাণ রয়েছে দু'দুটি গল্পে ঃ 'ধাপ্পা' ও 'লাখপতি'। লক্ষ করবার বিষয় এই যে, দুটি গল্পেই তিনি গরিব বন্ধু দুটিকে জিতিয়ে দেন, বড়লোকের দেমাক ও দাম্ভিকতা তাদের বুদ্ধির কাছে হার মেনে যায়।

ভূতের গল্পও তিনি বেশ-কিছু লিখেছেন। তার মধ্যে আবার রকমফেরও কিছু কম দেখি না। এখানে দুই রকমের দুটি গল্পের কথা বলি ঃ 'অনাথবাবুর ভয়' ও 'রামধনের বাঁশি'। বছর কুড়ি-বাইশ আগে প্রথম গল্পটি যেদিন পড়ি, বাড়িতে সেদিন আর কেউ ছিল না। রাত্তিরবেলায় গল্পটি পড়েছিলুম। কাজটা ভাল করিনি, কেননা ঘুমের সেদিন বারোটা বেজে যায়। দ্বিতীয় গল্পটিও ভূতেরই গল্প, কিন্তু এ-ভূতের চরিত্র একেবারেই অন্য রকম। সত্যি বলতে কী, রামধন যে ভূত, সে-কথা গল্পের একেবারে শেষে পৌঁছে আমরা জানতে পারি, আর তখনও আমাদের ভালবাসা ধাবিত হয় সেই

বালক-ভূতটির দিকেই, তাকে দেখে যিনি ভির্মি খেয়েছেন, সেই খগেশবাবুর জন্য আমরা একটুও উতলা হই না।

এরই পাশাপাশি আছে সেইসব গল্প, যাতে ভূত-প্রেত না-ই থাক্, অলৌকিক রহস্যের কিছু কম্‌তি নেই। যেমন 'খগম'। এ-গল্প পড়তে-পড়তে গা-শিরশির করেনি, এমন পাঠক আমি তো এ পর্যন্ত একজনও দেখলুম না। কিংবা ধরা যাক 'বহুরূপী' নিকুঞ্জের কথা, সন্ন্যাসীর মেক-আপ নিয়ে তারাপীঠ গিয়ে যে ভেবেছিল, তার ছদ্মবেশটা কেউ ধরতে পারবে না। সেখান থেকে পালিয়ে এসেও সে যে নিস্তাব পায়নি, তার উচিত-শিক্ষাটা যে তখনও বাকি, ঘটনার এই অবশিষ্টাংশ নিয়েই গড়ে উঠেছে এ-গল্পের ক্লাইম্যাক্স। দুটি গল্পের কোনওটিতেই নেই শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নামিয়ে দেবার মতো কোনও ব্যাপার, যা আছে তা শুধুই ভয়েব একটা আবহ মাত্র; কিন্তু এমনই দক্ষতায় সেটি রচিত যে, তারও মধ্যে আমাদের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

সুকুমার রায়ের কয়েকটি অতি-পরিচিত চরিত্রের ভিতের উপরে যাকে তৈরি করে তুলেছেন সত্যজিৎ, সেই 'প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্' গল্পেও যেমন ভয়ের এই আবহের মধ্যে নিশ্বাস নিতে হয় আমাদের, তেমন 'ফ্রিৎস' পড়তে-পড়তেও— অন্তত তাব শেষের দিকে পৌঁছে— আমাদের একটু গা-ছমছম করে। এ দুটিরও বিষয়বস্তু অলৌকিক, এবং দুটিই আসাধারণ গল্প। প্রথমটি, অর্থাৎ 'প্রোফেসর হিজিবিজবিজ্' সম্পর্কে যে বাড়তি-কথাটা না-বললেই নয়, সেটা এই যে, সুকুমার বায়ের লেখার মধ্যে যে-সব আজগুবি প্রাণী এতকাল শুধু হাসিই ফুটিয়েছে আমাদেব মুখে, সত্যজিতেব লেখার মধ্যে তারাই তৈরি করে তোলে এই অলৌকিকতার আবহ।

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা 'আম আঁটির ভেঁপু'-র অলঙ্করণ

সত্যজিতের গল্প যে কীভাবে চল্‌তি নানা বিশ্বাসেব ভিত আলগা করে দেয়, 'সেপ্টোপাসের খিদে'ই সেটা জানিয়ে দিচ্ছে। যাঁদের বিশ্বাস, উদ্ভিদজগৎ বড়ই নিরীহ, এ-গল্প পড়ে তাঁরা মস্ত একটা ধাক্কা খাবেন নিশ্চয়, কারণ, যে-উদ্ভিদটির কথা এখানে বলা হচ্ছে, বিশাল একটি কুকুরকে পিষে মেরেও তার শান্তি হয়নি, ভোজনে বাধা

পড়েছিল বলে কুকুরের মালিকের দিকেও সে বাড়িয়ে দিয়েছিল তার শুঁড়। আমরা যখন পড়ি যে, সেপ্টোপাসের 'শুঁড় যেন মানুষের রক্তের লোভেই হঠাৎ সজাগ হয়ে লোলুপ জিহ্বার মতো লকলক করে উঠল', তখন আমরা একটু চম্‌কে যাই বই কী। যে কান্তিবাবু ছিলেন মস্ত বড় উদ্ভিদপ্রেমিক, দুষ্প্রাপ্য সব গাছপালা সংগ্রহ করেই যিনি তাঁর জীবন কাটাচ্ছিলেন, মধ্য আমেরিকার নিকারাগুয়া হ্রদের কাছে এক গভীর জঙ্গল থেকে যিনি খুব ভালবেসে নিয়ে এসেছিলেন এই সেপ্টোপাসের চারা, অতঃপর যে তিনি ঝিঙে-উচ্ছে-পটোলের মতো নিরীহ সবজির গবেষণায় মন দেবেন, এটা কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তা-ই দিয়েছিলেন।

যেমন নানা কুসংস্কার, তেমন ভণ্ডামিও সত্যজিতের গল্পে কখনও বেহাই পায় না। দৃষ্টান্ত ঃ 'নিতাই ও মহাপুরুষ'। মহাপুরুষের আসনে বসে ভক্তজনকে যে-লোকটি বাণী বিলোচ্ছে, আসলে সে যে তিন-তিনবার প্রোমোশন না-পেয়ে নীচের ক্লাসে আটকে থাকা শ্রীনাথ ওরফে ছেনো ছাড়া আর কেউই নয়, নিতাই সেটা বুঝতে পেরে 'ছেনো' বলে চেঁচিয়েও উঠেছিল। তার জন্য তাকে যেমন বেরিয়ে আসতে হয় সেই আসর থেকে, মহাপুরুষটিকেও তেমন কলকাতা ছেড়ে পাটনায় সরে পড়তে হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, ভণ্ডামির মুখোশটা খুলে দিয়েই সত্যজিতের কাজ এক্ষেত্রে ফুরোতে পারত। তা কিন্তু ফুরোয় না। বিখ্যাত মনুষটির ভণ্ডামির পাশাপাশি অখ্যাত মানুষটির মহত্ত্বেরও একটা আন্দাজ তিনি দিয়ে দেন। খবরের কাগজের রিপোর্টার যখন নিতাইয়ের কাছে এসে বলে, '. আপনি ওভবে চেঁচিয়ে উঠলেন কেন,' নিতাই তখন আসল কথা ফাঁস্ করে না। শুধু বলে, '.. এটা কাগজে ছাপানোর উপযুক্ত খবর নয়।'

সত্যজিতের গল্পে আমরা গ্রহান্তরের মানুষদেরও খুব স্বচ্ছন্দেই ঢুকতে দেখি। কিন্তু কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, তারা আসে দুর্বলকে সাহায্য করতে। এক্ষুনি আমার এই রকমের দুটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। একটি হল 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' আর অন্যটি 'অঙ্ক স্যার, গোলাপিবাবু আর টিপু'। প্রথম গল্পের বঙ্কুবাবু বড়ই নিরীহ মানুষ, ফলে সব্বাই তাঁর পিছনে লাগে। কিন্তু গ্রহান্তরের মানুষ--থুড়ি, অ্যাং-- যেহেতু তাঁর ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে দিয়েছে, তাই সপার্ষদ শ্রীপতিকে এমন কথা বলতে তাঁর আর বাধে না যে, শ্রীপতির যদি মোসাহেবের দরকার হয় তো বঙ্কুবাবু তাঁর পোষা হুলোটাকে পাঠিয়ে দেবেন, সে খুব 'ভাল পা চাটতে পারে'। দ্বিতীয় গল্পের গ্রহান্তরের মানুষটির নাম টিপু দিয়েছে 'গোলাপিবাবু'। টিপুর অঙ্ক-স্যারকে এই 'গোলাপিবাবুটি পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, 'ঠাকুরমার ঝুলি' বইখানা যে তিনি টিপুকে পড়তে দেন নি, সেটা খুব ভাল কাজ হয়নি।

বিষয়বস্তু যা-ই হোক, গল্পের চরিত্র আর পরিবেশকে তিনি যে খুব সহজেই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন, তার একটা কারণ অবশ্যই তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা। তাঁর চোখ শিল্পীর চোখ। ফলে, কারও চুল যে কুচকুচে কালো আর পরিপাটি করে আঁচড়ানো, এটা দেখলেই তাঁর চকচকে কালো গ্রামোফোন-রেকর্ডের কথা মনে পড়ে যায়! অন্যদিকে আবার সমুদ্রের ঢেউ ফিরে যাবার সময় পায়ের তলার বালিও যখন সরে যায়, তখন ওই যে তাঁর মনে হয় যে, বালি নয়, পায়ের তলা দিয়ে যেন অজস্র পিঁপড়ে হেঁটে যাচ্ছে, এই বর্ণনা পড়ে পাঠক একটু চমকে যান বই কী। যেতেই পারেন। কেননা, পাঠকেরও

তখন মনে হয় যে, আরে তাই তো, এই রকমের অনুভূতি তো আমারও হয়েছিল। কোনও মানুষ, কোনও দৃশ্য কিংবা কোনও অনুভূতির বর্ণনা দিতে গিয়ে সত্যজিৎ যে যেটুকু দরকার ঠিক সেইটুকুই বলেন, তার বেশি আর একটিও শব্দ ব্যবহার করেন না, তাও আমাদের চোখে পড়ে। আমরা তখন এটাও বুঝতে পারি যে, বর্ণনার মধ্যে আটকে থাকেননি বলেই তাঁর গল্পও কোথাও থেমে থাকেনি, দ্রুত বেগে সে তার পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের কথা বলি, যার মধ্যে একেবারে গোড়ায় এবং একেবারে শেষে ছাড়া বলতে গেলে কোনও বর্ণনাই নেই। গল্পটির নাম 'টেলিফোন'। দু'দিক থেকে কথা বলছেন দুটি মানুষ, যার মধ্যে একজনকে আবার 'মানুষ'ও বলা চলে না। স্রেফ এই সংলাপের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে এই গল্প।

সংলাপের কথা যখন উঠলই, তখন এটাও বলা দরকার যে, সত্যজিতের গল্পের চরিত্রগুলি যে-ভাষায় কথাবার্তা বলে, তার চেয়ে স্বাভাবিক ভাষা আর কিছুই হতে পারে না। হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, অপিসে-কাছারিতে, ট্রামে-বাসে আমরা নিত্য যে-রকম ভঙ্গিতে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষকে কথা বলতে শুনি, সত্যজিৎ তাঁর চরিত্রগুলির মুখে যেন অবিকল সেই ভঙ্গির সেই কথাগুলিই এনে বসিয়ে দেন। তার মধ্যে যে ইংরেজি শব্দগুলি মাঝে-মাঝে দেখতে পাই, সেগুলিও যেন চারপাশের মানুষজনের মুখ থেকে একেবারে হুবহু তুলে আনা। শুধু ফেলুদা-কাহিনীর লালমোহনবাবু কেন, সত্যজিতের অনেক গল্পের অনেক চরিত্রের মুখ থেকেই বেরিয়ে আসে ওই রকমের ইংরেজি-মেশানো বাংলা। যেমন 'স্পটলাইট' গল্পের ছোটদা বলে, 'লঙ্জিভিটির একটা লিমিট আছে। নেচার মানুষকে সেইভাবেই তৈরি করেছে।' যেমন, 'লাখপতি' গল্পের প্রশান্তবাবু বলেন, 'তুমি রাজি হলে তোমার এই বাল্যবন্ধু খুব গ্রেটফুল বোধ করবে।' যেমন, 'নিতাই ও মহাপুরুষ' গল্পে রসিকলাল বলে, 'আজ যে সে সিদ্ধপুরুষ তাতে কোনো ডাউট নেই।' যেমন 'বারীন ভৌমিকের ব্যারাম' গল্পে নীতীশ ভৌমিক বলেন, '...অথচ অভাব-টভাব নেই, বাপ রিচ ম্যান।'

নিখুঁত বর্ণনা, স্বাদু স্বাভাবিক সংলাপ, বিচিত্র সব বিষয়। আর শৈলী? ওটাকে লুকিয়ে রাখাই যে সেরা শৈলী, সত্যজিতের গল্প যখন পড়ি, এই কথাটা নতুন করে তখন আবার মনে পড়ে যায়।

সত্যজিৎ কোনও বিশেষ বয়সের লেখক নন। তিনি সব বয়সের লেখক। তবু যদি কেউ তাঁকে শিশুসাহিত্যের লেখক হিসাবে চিহ্নিত করতে চান, আমি আপত্তি করব না। শুধু বলব যে, আমার শৈশব এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা 'আম আঁটির ভেঁপু'-র অলঙ্করণ

সত্যজিৎ রায়ের আত্মকথা

সুমিতা চক্রবর্তী

চলচ্চিত্র বিষয়ের বাইরে আজ সত্যজিৎ রায়ের বিশেষ পরিচয় লেখক হিসেবে। বিজ্ঞাপন জগতের কাজের কুশলতা বা বইয়ের মুদ্রণ-অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি বিষয়ে অসামান্য দক্ষতা সত্ত্বেও সেই পরিচয় কিছুটা গৌণ। তাঁর সঙ্গীত-ভাবনাও মূলত চলচ্চিত্রকে ঘিরেই। আর চলচ্চিত্রেরই নিদর্শন সামনে রেখে তাঁকে খুব সহজেই বলা যায় প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পী, কবি, মনস্তত্ত্ববিদ এবং ইতিহাসবিদ।

লেখক সত্যজিৎ কিন্তু চলচ্চিত্র-নিরপেক্ষভাবেই লেখক। তাঁর লেখা সৃজনমূলক অর্থাৎ 'ফিক্‌শন্'। প্রবন্ধিক তাঁকে স্বাধীন অর্থে বলা যায় না। তাঁর বিশিষ্ট প্রবন্ধাবলী চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করেই রচিত। তবু তার বাইরে কলম হাতে নিয়ে তিনি অন্তত দুবার পরিক্রমা করেছেন ভিন্নতর গদ্যরচনার পথ। আর একটি হল একেবারে বিশুদ্ধ অর্থেই সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ, অপরটি একটি অতুলনীয় আত্মস্মৃতি--ছোটদের জন্য। এবং, ছোটদের জন্য বলেই যেন বিশেষ অর্থে বড়দের জন্য।

সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যায় বেশি নয়। তিনটি কি চারটি। তার মধ্যে উল্লেখ্য একটি হল 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত এডওয়ার্ড লিয়ার-এর ছড়ার অনুবাদের মুখবন্ধ হিসেবে রচিত ভূমিকাটি। সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান। অপর একটি প্রবন্ধ— এবং অতীব উল্লেখযোগ্য—পিতা সুকুমার রায়ের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সম্পর্কে সত্যজিতের সশ্রদ্ধ বিশ্লেষণ। এই আলোচনায় কেবল সুকুমার রায় বিষয়ক প্রবন্ধটিই গ্রহণ করা হল। সুকুমার রায়ের পুত্র এবং রায়চৌধুরী পরিবারের স্মরণীয় উত্তরাধিকারের এবং প্রতিভা-ভাস্বর ধারক হিসেবে এই প্রবন্ধটিতে সত্যজিৎ রায় নিজেকে বোঝবারও উপাদান রেখে গেছেন। যে পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী তিনি লেখেননি কিন্তু লিখলে অসাধারণ একটি কাজ হত তারই প্রথম অধ্যায়ের খসড়া যেন এই প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে সুকুমার রায়কে পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে উপেন্দ্রকিশোর সহ রায়চৌধুরী-বাড়ির রেখাচিত্র, আভাসে হলেও সমকালীন দেশ-কালের ইঙ্গিত এবং পাওয়া যাবে পুত্র সত্যজিতের ব্যক্তিত্বেরও কিছু টুকরো। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত সুকুমার রায়ের 'সমগ্র শিশুসাহিত্য' - এর ভূমিকা হিসেবে।

যদি বলা যায়, এই ভূমিকাটি এমন একটি রচনা, যার একটি ছত্রও বর্জন করা চলে না — তবে লেখাটির নিটোলত্বগুণ বোঝা যাবে। সত্যজিৎ অতি শৈশবে পিতৃহীন হওয়ার ফলে পিতার সান্নিধ্য পাননি। তার ফল হতে পারত দু'রকম। ঔদাসীন্য অথবা ভাবাবেগময় ভক্তি। কিন্তু সত্যজিৎ গ্রহণ করেছেন বিরল-সম্ভব তৃতীয় পথটি— নিরপেক্ষ নৈকট্য। এমন কথা বলব না যে, লেখাটি পড়ে মনে হয় — সুকুমার রায় তাঁর কেউই নন। একজন মানুষ সম্পর্কে লিখতে গেলে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার, সামাজিক অবস্থান ও সময়ের প্রেক্ষিত জানার জন্য লেখককে বহু পরিশ্রম করতে হয়। কেবল

জানা নয় —সেই পরিমণ্ডলে মানুষটিকে রেখে তাকে অনুভব করতে হয় — একজন পুত্র, ভাই, স্বামী হিসেবে —এবং একজন স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে। সত্যজিৎ নিজে সেই পরিবারের সন্তান হওয়ায় সেই অনুভবটুকু তাঁকে চেষ্টা করে অর্জন করতে হয়নি। অথচ লেখার সময়ে যে-কোনো বড় শিল্পীর মতোই তিনি বর্জন করতে পেরেছেন ভাবালুতা ও বাহুল্য এরই ফল সেই নিরপেক্ষ নৈকট্য, যা জীবনী বিষয়ক যে কোনো লেখায় থাকা প্রার্থিত। ভাবালুতা ও বাহুল্যের বর্জন তাঁর শিল্পী-মানসেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অল্পকথায় পারিবারিক পরিবেশটির বর্ণনা সেরে সত্যজিৎ রায় মোটামুটি ভাবে কালক্রম অনুসরণ করে সুকুমার রায়ের জীবন ও কর্মের পরিচয় দানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভূমিকা-প্রবন্ধটি মূলত ছোটদের জন্য লেখা হলেও সত্যজিৎ রায় বালখিল্য পাঠকদের জন্য কিছুই তরল করে দেননি। ইংল্যাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুকুমার রায় যে ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন সে-কথার উল্লেখ করেছেন। এমনকি, ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সুকুমার রায়ের সম্পর্ক বিষয়ে চার-পাঁচটি বাক্যে বলে দিয়েছেন সব কথাই। "সমাজের আদিপর্বের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তাঁকে যেমন উদ্বুদ্ধ করত, মনে হয় ঠিক সেই পরিমাণেই তাঁকে হতাশ করেছিল সমকালীন কিছু আদর্শচ্যুতির দৃষ্টান্ত।" —এই বাক্য যে আজকের শিশুদের কাছে খুব প্রাসঙ্গিক হবে না — একথা জেনেও তিনি বাক্যটি বর্জন করেননি, কারণ এই বাক্যে দেখতে পাই সুকুমারব্যক্তিত্বের একটি ঝলক। যে ইঙ্গিতটি অনুক্ত রাখতে চাননি সত্যজিৎ রায়। সব বড় শিল্পীই জানেন, ছোটদের জন্য ওভাবে কিছু বাদ দিতে নেই, ছোটরা তাদের পছন্দমতো বাছাই করে নেয়। এই জানাটুকুই প্রতিভাত হয়েছে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চলচ্চিত্রের ভূতের নাচের ঈষৎ দীর্ঘ দৃশ্যটিতে। সেই নৃত্যে প্রতিফলিত ঐতিহাসিক হানাহানির প্রতিচ্ছায়া ছোটদের অনুধাবন করবার কথা নয়। তবু সেই দৃশ্যটি শিশু-কল্পনাকে অমিত সমৃদ্ধি দান করে।

সুকুমার রায়ের কোনো লেখার কথাই বাদ দেননি তিনি। ছোটদের জন্য তিনি যে পদ্যে ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস লিখেছিলেন 'অতীতের ছবি' নামে — সে বোধ হয় অনেকেই জানবেন এই ভূমিকাটি পড়ে।

সঙ্গত কারণেই লেখাটিতে প্রাধান্য পেয়েছে সুকুমার রায়ের সাহিত্য-কর্মে হাস্যরসের বিশেষ প্রকৃতির বিশ্লেষণ। অত্যন্ত অল্প কথায় সত্যজিৎ এই বিশ্লেষণে তুলনামূলক পদ্ধতি আরোপ করেছেন। একদিক লুইস ক্যারল, কনান ডয়েল এবং এডওয়ার্ড লিয়ার; অন্যদিকে উপেন্দ্রকিশোর এবং রবীন্দ্রনাথেরও হাস্যরস পরিকল্পনার ধরন ও ননসেন্স-কবিতা রচনার প্রবণতার তুলনা তিনি তুলে ধরেছেন — একেবারে উদাহরণসহ।

সুকুমার রায়ের লেখার শব্দ নিয়ে খেলা, ননসেন্স কল্পনা, উদ্ভট পরিস্থিতি ও বিশেষ ধরনের চরিত্র নির্মাণের ক্ষমতা, তাঁর বিজ্ঞান চেতনা ও মজলিশি মেজাজ; তাঁর উপর বিদেশী সাহিত্যের ছায়া — প্রতিটি প্রসঙ্গই তার নিখুঁত ওজনে প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষিত হয়েছে।

সত্যজিৎ রায়ের স্পষ্ট ও সহজ বাগভঙ্গিতে সুকুমার রায়ের সবটুকুই কিভাবে ধরা পড়েছে তা বুঝতে পারি দুটি বাক্যে — "উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমার কেউই আঁকা শেখেননি। উপেন্দ্রকিশোরের কাজ দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই, কিন্তু সুকুমারের কাজে বোঝা যায়।"

যখন সুকুমার রায় রোগক্লিষ্ট, মৃত্যুশয্যায় এবং তাঁর 'গানের পালা সাঙ্গ মোর' পঙ্‌ক্তিটির কথা বলেছেন সত্যজিৎ রায়, তখন ভাবালুতা-বর্জিত প্রীতিমহিম শ্রদ্ধা কিভাবে অতি সাধারণ শব্দগুলিকে দ্যুতিময় করেছে তা প্রবন্ধটির শেষ ছত্রগুলি না পড়লে বোঝা যাবে না।

এই প্রবন্ধটি সত্যজিৎ রায়ের বাল্যজীবন-পরিবেশ সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞাত করে। শিশুসাহিত্য, ছোটদের পত্রিকা ও শিশু-সাহিত্যিক সমাবেশে সমুজ্জ্বল সেই বাড়িটিতে গান, বাজনা, ছবি, ছবির মুদ্রণ, আলোকচিত্র গ্রহণ ও পরিস্ফুটন, প্রেসের কাজকর্ম ইত্যাদির যে নিত্যচর্চা ছিল তারই সারাৎসার ঘনীভূত হয়ে গড়ে উঠেছিলেন এক বিশ্বমানের চলচ্চিত্র-নির্মাতা। যে-চলচ্চিত্র একটি যৌগশিল্প।

সত্যজিতের বিবরণে তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণটি অতি সংযত বলেই তাঁর জীবন-পর্বের এই প্রারম্ভিক চালচিত্রটি ছবির মতই ফুটেছে। এছাড়াও এই লেখাটিতে সত্যজিৎ রায়ের ব্রাহ্ম ব্যাকগ্রাউণ্ড-টা স্পষ্ট হয়। চলচ্চিত্র-নির্মাণ-শিল্পী সত্যজিৎ রায় বহুমুখী ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে একটা ব্রাহ্ম ব্যাপার শেষ পর্যন্তও থেকে গিয়েছিল।

একটি ছোট প্রবন্ধে সুকুমার রায়ের সমগ্র জীবন ও সাহিত্যকর্মের এই সম্পূর্ণতা থেকে একটি প্রবন্ধের দৃষ্টান্তেই সত্যজিৎ রায়কে একজন সাহিত্যসমালোচক বলতে দ্বিধা থাকে না। অবশ্য যে-সব চলচ্চিত্র-পরিচালক বড় লেখকদের লেখা নিয়ে ছবি করেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যময় সাহিত্যসমালোচক।

ছোটদের লক্ষ্য করেই প্রধানত, সত্যজিৎ রেখে গেছেন এক অনতিদীর্ঘ কিন্তু অনবদ্য বাল্যস্মৃতি — 'যখন ছোট ছিলাম'। যেহেতু বড়দের জন্য তিনি পৃথক কোনো স্মৃতিকথা লেখেননি — তাঁর নিজের কথা নিজের ভাষায় বলা হয়েছে এই একটি রচনাতেই। নানা কারণে বইটি অত্যন্ত আকর্ষক।

প্রথমেই চোখে পড়ে দৃশ্য-ডিটেল বিষয়ে তাঁর জাগ্রত সচেতনতা — যা তাঁর চরিত্রেরই অঙ্গ — যে-সচেতনতা চেষ্টা করে আনতে হয় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাটি থেকেই— "কত দেশের কত রকম মোটরগাড়ি যে চলত কলকাতা শহরে তার ইয়ত্তা নেই। সেসব গাড়ির প্রত্যেকটার চেহারা এবং হর্নের আওয়াজ আলাদা। ফোর্ড শেভ হাম্বার ভক্সহল উল্‌স্‌লি ডজ ব্যুইক অস্টিন স্টুডিবেকার মরিস ওলড্‌স-মোবিল ওপ্যাল সিত্রোয়াঁ — এসব গাড়ি এখন শহর থেকে লোপ পেয়ে গেছে। হুড খোলা গাড়ি ক'টা দেখা যায়? খুদে গাড়ি বেবি অস্টিন কালেভদ্রে এক আধটা চোখে পড়ে। আর সাপের মুখওয়ালা 'বোয়া হর্ন লাগানো বিশাল ল্যানসিয়া, লাসাল — এসব আমীরী গাড়ি ত মনে হয় স্বপ্নে দেখা।" এছাড়াও সমস্ত বইটি জুড়ে আরো নানারকম গাড়ির প্রসঙ্গ। সেই সময়ে যে 'ওয়ালফোর্ড' কোম্পানির ডবল ডেকার বাস-এর ছাদ থাকত না সে কথা নিশ্চয়ই অনেকেই জানেন। কিন্তু কথাটি বলেছেন শুধু সত্যজিৎ রায়। এই গাড়ির নামগুলি পড়তে পড়তে 'অভিযান'-এর পরিচালককে দেখতে পাই, দেখতে পাই 'জলসাঘর'-এর নতুন বড়লোক ব্যবসায়ীর গাড়িটিকে।

কেবল মোটর গাড়িই নয়, এরকম ভাবেই সত্যজিৎ টুকরো টুকরো কথায় এঁকে দিয়েছেন কলকাতার কার্নিভাল, হোয়াইটআওয়ে লেইড্‌ল-এর দোকান, ঘুড়ি ওড়ানোর ছবি। সম্পূর্ণ ছবি নয় — তিন চারটি যেন রঙিন আঁচড়—তাতেই ফুটে ওঠে দৃশ্যটির

চরিত্র। ঠিক যেমন 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী'-র কয়েক সেকেণ্ডে দেখানো ঘুড়ি ওড়ানো এবং ভেড়ার লড়াই-এর দৃশ্য।

'শতরঞ্জ কি খিলাড়ির কথায় মনে পড়ে—ছেলেবেলায় বেশ কয়েকবার লখনৌ গিয়েছিলেন সত্যজিৎ। শহরটা যে তাঁকে টানত লিখে গেছেন সে কথা। এছাড়াও গেছেন হাজারিবাগ—'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র সেই প্রকৃত প্রাকৃত পরিবেশে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র নারী-পুরুষ চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে অনেকের মনে। কিন্তু যে কখনো পালামৌ জেলার হাট দেখেছে সে কখনো ভুলবে না এই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হাটটিকে।

আরো নানাধরনের বিবরণের মধ্যে, বিশেষভাবে মন কাড়ে সেই সময়ের সিনেমা ও থিয়েটারের কিছু বিবরণ। তখন নির্বাক ছবির সঙ্গে — কথাহীন কাহিনীর মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শোনানো হত সাহেব-বাদকের অর্গ্যান। বেশ জনপ্রিয় ছিল এই বাজানো। কাগজে বিজ্ঞাপিত হত সেদিনের সুরগুলির তালিকা। 'গ্লোব'-এ সিনেমা শুরু হবার আগে হত নাচ গান। কোনো সাজানো রঙ্গ-রসিকতা নেই অথচ কি অসীম সু-স্বাদু এই বর্ণনা তা অন্যের বিবরণে পাওয়া অসম্ভব।

একটি কথা মনে হয়। বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী খুব বেশি না হলেও কিছু আছে। যে সময়টির কথা সত্যজিৎ বলেছেন — মোটামুটি ভাবে ১৯২৫ থেকে ১৯৩৫—সেই সময়টির কথা এসেছে আরো অনেকের লেখাতেই । কিন্তু এমন সব সুর-ছবি-গতি ছিল কলকাতা শহরের পথে ঘাটে—তার কথা কেন পাইনা তাঁদের লেখায়। ভেবে দেখি—বাংলার আত্মজীবনীকারেরা এখনও প্রধানত রাজনীতির মানুষ অথবা সাহিত্যের । তাঁদের মনোবৃত্তে রাজনীতির ওঠা-পড়া কিংবা বই, লেখক – পত্র-পত্রিকা। সেই জগতের খবরই পাই তাঁদের রচনায়। তাঁরা যেন একলক্ষ্যাভিমুখী ভ্রামণিক। জীবন যে তার বিচিত্র রঙিন গালিচাটির ওপর হাসি খেলা-গানের প্রসন্ন আয়োজন নিয়ে অপেক্ষা করে সহজ মনের মানুষদের জন্য — সেই মন ও সেই জীবনবোধ থাকে না তাঁদের অনেকেরই। সেইটিই ছিল সত্যজিৎ রায়ের। অবশ্য আরো কারো কারো লেখায় পাই স্মৃতিচিত্রের এই ইন্দ্রিয়বেদ্য সরসতা। আগে পেয়েছি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায়। সত্যজিতের মতোই রায়চৌধুরী পরিবারের আর এক বরেণ্য লেখিকা লীলা মজুমদারের রচনায়। আশ্চর্যভাবে পেয়েছি সুকুমার সেনের আত্মজীবনীটিতে। মনে হয়, অন্য রীতিতে হলেও পেতাম কমলকুমার মজুমদারের লেখায় — যদি লিখতেন। এখন হয়তো পেতে পারি যদি রাধাপ্রসাদ গুপ্ত লেখেন স্মৃতিকথা। চলচ্চিত্র যিনি নির্মাণ করবেন তাঁর বিশেষ সংবেদনা থাকতে হবে' দৃশ্য, ধ্বনি, গতি এবং এসবের সুমাত্রিক বিন্যাসের প্রতি। বালক সত্যজিৎ তাঁর ছেলেবেলার যে-সব স্মৃতি সংরক্ষণযোগ্য মনে করেছেন তার দু'একটি উল্লেখ করা যাক। "ভবানীপুরে বকুলবাগনের বাড়িতে এসেই যেটা আমাকে আবাক করেছিল সেটা হল চীনে মাটির টুকরো বসানো নকশা করা মেঝে।" (পৃ.২৩)। সেই নকশা দেখে তাঁর অনেক সময় কেটেছে। কুলদারঞ্জন রায়ের কন্যা ইলার বাড়ির বর্ণনায় লিখেছেন — "জানলার শার্সিতে লাল নীল হলদে-সবুজ কাচ লাগানো মোজাইকের মেঝেওয়ালা এই আদ্যিকালের বাড়িটা আমার খুব মজার লাগত। সামনে বারান্দা ছিল একেবারে বড় রাস্তার উপর।" (পৃ. ১৫)। এই দুটি বর্ণনা থেকেই যেন গড়ে উঠেছে 'ঘরে বাইরে'-র সেই বর্ণিল দীর্ঘ বারান্দাটি। বাড়ির সদর দরজার ফুটোর সামনে ঘষা কাচ ধরলে বাইরের দৃশ্য খুদে আকারে ও

উল্টোভাবে ছায়া ফেলত সেই কাচে। অনেক দীর্ঘ গ্রীষ্ম-দ্বিপ্রহর পথের ছবি দেখে অতিবাহিত করেছিল সেই বালক — যিনি পবে নির্মাণ করবেন 'চারুলতা'-র অনুপম প্রথম দৃশ্যটি।

এই স্মৃতিকথায় দার্জিলিং ও কাঞ্চনজঙঘাকে যেভাবে দেখিয়েছেন সত্যজিৎ তা-ও অভিনিবেশযোগ্য। —"চোখের সামনে দেখছি ডানদিক থেকে রঙ ধরা শুরু হয়েছে। হাঁ করে চেয়ে রইলাম যতক্ষণ না সূর্যের রঙ গোলাপী থেকে সোনালী, সোনালী থেকে রূপালী হয়। ...সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের কাঞ্চনজঙঘার মতো সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও দেখিনি" —বর্ণনাটিতে দৃশ্যের অতিরিক্ত কথা নেই। তবু বর্ণনাই সঞ্চার করে কাঞ্চনজঙঘার সেই মহিমা, যেখানে সব ক্ষুদ্রতা পার হয়ে দাঁড়ায় মানুষ। এমনই দেখা গেছে চলচ্চিত্রের কাঞ্চনজঙঘা-তেও।

সত্যজিৎ রায় এই স্মৃতিকথাটিতে বর্ণনাংশের ওপরই জোর দিয়েছেন। অত্যল্প রেখায় চরিত্র তুলে ধরবার যে আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর — তার খুব বেশি নিদর্শন পাই না। তবু দু-একটি করে বাক্যের সাহায্যেই তিনি তাঁর কোনো কোনো আত্মীয়ের ঈষৎ খেয়ালিপনা, স্কুলের বন্ধু ও শিক্ষকদের ভাবভঙ্গি সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। যে চরিত্রটিকে অতুলনীয় ভাবে পাই এই গ্রন্থে এবং পেয়ে মন ভরে ওঠে সেটি সত্যজিতের মা — সুকুমার জায়া সুপ্রভা দেবীর। আশ্চর্য, তাঁর কথা আব কোথাও প্রায় পাওয়া যায় না। তিনিও ছিলেন সেকালের এক অত্যন্ত শিক্ষিত ও আধুনিক পরিবারের কন্যা। অল্পবয়সে স্বামীর মৃত্যুতে ভেঙে না পড়ে একমাত্র সন্তানকে তার প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করেছিলেন সর্বতোভাবে। শান্ত, আত্মমর্যাদার সঙ্গে যাপন করেছিলেন জীবন। সত্যজিৎ জানিয়েছেন যে, মা'ব কাছ থেকে পেয়েছিলেন চার খণ্ডে 'রোম্যান্স অফ ফেমাস লাইভ্স্', মা নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে শন্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে। সিনেমা-থিয়েটার-গান-জুডো-সাঁতার-ফটো তোলা — সব কিছুর সঙ্গেই পুত্রকে তিনি পরিচিত হতে দিয়েছেন কিন্তু একটি সংযত মাত্রাবোধ-ও বজায় রেখেছেন বরাবর। পরবর্তীকালে সংসারের সব দায় মিটিয়ে সুপ্রভা মহারাণী গার্লস স্কুলে কাজ নিয়েছেন শিক্ষয়িত্রীর। চামড়ার কাজ শিখে, এমনকি তা বিক্রিও করেছেন কিছু ; মাটির মূর্তি গড়তে শিখেছিলেন সুন্দর। বস্তুত — সত্যজিৎ রায়ের মা-কে সম্ভবত একটুখানি পাওয়া গেল একটি গ্রন্থেই।

'যখন ছোট ছিলাম' বইটির দ্বিতীয় ভাগে সত্যজিৎ রায়ের স্কুল-জীবনের স্মৃতিসমূহ স্থান পেয়েছে। পড়তে পড়তে মনে হয় — নানা ধরনের চলচ্চিত্রের মধ্যে একটি স্কুল-স্টোরি কেন তিনি করলেন না! বাংলায় সেরকম কিছু আজও ভালোমতো নেই।

এই গ্রন্থ কৌতুকরসের নয়, অনাবিল ও মধুর স্মৃতিরসের কাহিনী। তবু উছলে ওঠে বিমল হাসির স্রোত যখন পড়ি বালক সত্যজিৎ প্রথম আইসক্রীম মুখে দিয়ে বলেছিলেন — আইসক্রীমটি একটু গরম করে দিতে।

'যখন ছোট ছিলাম' বইটি আমাদের পরবর্তী শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের অনেক ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু মোচন করতে পারে না একটি সবিস্ময় প্রশ্ন। কলকাতা শহরে যে-বালকের জন্ম — সমস্ত শৈশব জুড়ে সম্পন্ন সুসংস্কৃত, ঝকঝকে নাগরিকতা — বড় হয়েও যাঁর গ্রাম জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল না — তিনি কেমন করে সেলুলয়েডে প্রাণ দিলেন দুর্গা আর অপুকে? কেমন করে লিখলেন 'পথের পাঁচালী'-র পুকুর, বাঁশবন, ঝড়, কাশফুলের অপরূপ দৃশ্যকাব্য।

সমালোচক সত্যজিৎ

ধ্রুব গুপ্ত

'Our Films Their Films' নামক প্রবন্ধসংগ্রহের প্রস্তাবনা সত্যজিৎ রায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসবোধসহ এইভাবে আরম্ভ করেছেন, "ফিল্মকরিয়েরা ফিল্মবিষয়ে বড় একটা লেখে না। হয় তারা যে ফিল্মটি তৈরি করছে তাই নিয়ে বড় ব্যস্ত থাকে, অথবা কোনো ফিল্ম করার সুযোগ না পাওয়ায় অসুখী থাকে অথবা ঠিক আগের ছবিটার কাজের ক্লান্তিতে ডুবে থাকে।" কোক্‌তো, আইজেনস্টাইন এবং গদারের ব্যাপারে তিনি বিশেষ বিশেষ কারণ দর্শিয়েছেন। কিন্তু লিখব না লিখব না করেও তিনি নিজে কম একটা লেখেন নি ফিল্‌ম বিষয়ে, বাংলাতে 'বিষয় চলচ্চিত্র' এবং ইংরেজিতে ওপরে উল্লিখিত বইটা তার চাক্ষুষপ্রমাণ।

ওই ভূমিকাতে আরেকটি কথা আছে, " সাধারণত ছবিকরিয়েরা নিজেদের কাজের ফুটনোট যোগ করা থেকে বিরত থাকেন।" কিন্তু তিনি একেবারে বিরত থাকেন নি। 'বিষয় চলচ্চিত্র' খুললে দেখা যাবে অন্তত 'পথের পাঁচালী', 'অপুর সংসার' ও 'চারুলতা' বিষয়ে তিনি দীর্ঘ 'ফুটনোট' যোগ করেছেন। তাছাড়া, ছবি বিষয়ে লেখা মানেই ত নিজের তৈরি ছবির ফুটনোট যোগ করা নয়, এবং আগেই বলা হয়েছে সেক্ষেত্রে অনুরোধ হোক, উপরোধ হোক বা নিজস্ব তাগিদে হোক, বেশকিছু লেখালিখি তিনি করেছেন। এখন চলচ্চিত্রতাত্ত্বিক হিশাবে বালবাহুল্য তাঁকে কেউ একজন আইজেনস্টাইনের সমগোত্রীয় বা সমস্তরের মনে করবে না, ঠিক যেমন ক্যামেরা ছেড়ে কলম ধরলেও তাঁকে আমরা চলচ্চিত্রস্রষ্টা হিশাবেই প্রধানত জানব, লেখক হিশাবে নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তিনি মহৎ লেখক কিনা সে কথা বাদ দিয়েও তাঁর সার্বিক কর্মকাণ্ডের অনুধাবনে যেমন আমরা কিশোর সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর কাজকে অস্বীকার করতে পারব না, বা 'পিকুর ডায়রী'র ব্ল্যাক হিউমার, বিশেষ করে 'আর্য্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু'র মত গল্পকে ফেলতে পারবনা। তেমনি সিনেমাভাবনা ক্ষেত্রে তাঁর লেখাগুলিতেও আমাদের নজর দিতে হবে। নিজের কাজের 'ফুটনোট'গুলির দিকেও। 'ফুটনোট' ব্যাপারটা আরো পায় তাঁর অসংখ্য সাক্ষাৎকারে, সেখানে চলচ্চিত্রবিষয়ক সাধারণ কথাবার্তাও অনেক রয়েছে।

'ফুটনোট' দিতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তাতে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে বলা মানে এই নয় যে, সেখানে যা বলা হয়েছে তা বিনাবিচারে মেনে নিতে হবে। 'পথের পাঁচালী'তে উপন্যাস থেকে ছবিতে রূপান্তর বিষয়ে তাঁর লেখাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু 'নষ্টনীড়' থেকে 'চারুলতা'য় পরিণতি বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ আরো গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তাঁর সব মন্তব্য আমাদের সমর্থনীয় হবে না, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গল্পের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি যে বিষয়গুলি উপস্থাপিত করেছেন, তার অনেকগুলিই তর্কসাপেক্ষ। যদিও ছবিতে তার পরিবর্তনকে আমরা সমর্থন করব, দুটোতে কোনো আবশ্যিক বিরোধ নেই। যেমন যেখানে তিনি বলেছেন, ভূপতির কাছে চারুর মন্দাকে ফেরত পাঠাবার দাবিটা

তাঁর মনে হয়েছে চারুকে খুব ছোট করে দেয়। এ বিচারটিতে আমার মন সায় দেয় না, তাছাড়া চারুকে মহৎ করে দেখাবার এমন কিছু দায় গল্পে বা ছবিতে কোথাও থাকবার কথা নয়। সত্যজিৎ নিজেও তা দেখান নি। স্বল্প আঁচড়ে বারে বারে মন্দার প্রতি চারুর অবজ্ঞা ('প্রাচীনা'র প্রতি 'নবীনা'র অবজ্ঞা, এবং তার চেয়ে আরো একটু বেশি কিছু, 'অমল সান্নিধ্যকে ঘিরে') এমনকি প্রায় নিষ্ঠুরতাকে ছবিতে সত্যজিৎ অনবদ্যভাবে ধরেছেন একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ: একটি অপেক্ষাকৃত অস্থির শটে, "তুই ঠাকুরপোর পানে এত চুন দিস কেন, ওর মুখ পুড়ে যায়। এর পর থেকে ওর পান আমি সাজব" বলে মন্দাকে বিমর্ষ করে চলে যাওয়া। কিন্তু সত্যজিতের মতে সায় দেওয়া বা না দেওয়া এখানে অত বড় কথা নয়, কথা হল এ ধরনের লেখাতে যে সীমিত স্তরে হলেও তার বিশ্লেষণ প্রবণতার চেহারাটা ধরা পড়ছে তা তাঁর মানসিকতা ও তাঁর ছবিকেও বুঝতে বাড়তি সাহায্য করতে পারে।

থিতিয়ে লেখা হয়েছে বিশেষ করে দুটি প্রবন্ধ, 'বিষয় চলচ্চিত্র' এর প্রথম দুটি, 'চলচ্চিত্রের ভাষা : সেকাল ও একাল' এবং 'সোভিয়েত চলচ্চিত্র'। বিস্তৃত ইতিহাসধর্মী লেখা, সহজসরলভাবে হলেও ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটা সামগ্রিকতা আছে, এবং অত্যন্ত সুলিখিত প্রবন্ধ। বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য প্রথম প্রবন্ধটিতে রনোয়ার 'দ্য রুলস্ অফ দ্য গেম' নামক গুরুত্বপূর্ণ ছবিটির বিস্তৃত চমৎকার আলোচনা। সংক্ষেপে কুরোসাওয়া ও ওজুর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ, হলিউডী মোলায়েম প্রথার বিরুদ্ধে অর্সন ওয়েলসের 'সিটিজেন কেন্' ছবিটির প্রবল আঘাতের কথা (কেন্ চরিত্রের আমেরিকান 'আর্কিটাইপত্ব' নির্দেশসহ), ত্রুফোর 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ' ছবির অন্তিম ফ্রিজ শটটির প্রয়োগেব বৈশিষ্ট্য। শেষ ব্যাপারটি তিনি কীভাবে ব্যাখ্যা করেন একটু উদ্ধৃতিযোগে দেখা যাক, "বোঝাই যাচ্ছে, এখানে freeze-এর ব্যবহার শুধু চমকপ্রদই নয়, গভীরভাবে অর্থপূর্ণও বটে— যাকে বলা যায়—stroke of genius। ছেলেটির যাবার আর কোন পথ নেই। সুতরাং সে যতই ছুটুক না কেন, সেটা থেমে থাকারই সামিল। তবে ছোটার ইচ্ছা এবং পরিচালকেব 'ছুটে লাভ নেই' বলার ইচ্ছে একই সঙ্গে এই freeze-এ বলা হয়েছে। এখানে দর্শকদের দিকে চেয়ে থাকারও একটা মানে আছে। তবে মনে হয় যেন ছেলেটি বলতে চাইছে— তোমরাই অর্থাৎ সমাজই আমার এই অসহায় অবস্থার জন্য দায়ী, তোমরাই ভেবে বের কর আমার মত ছেলের সমস্যা মিটবে কী করে।" —সব জানার পর চারু ও ভূপতিরও 'আর সম্পর্ককে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করে লাভ নেই' বলার পর 'চারুলতা'র পরিচালক যে freeze টি অপূর্বভাবে প্রয়োগ করেছিলেন তার পেছনে ত্রুফোর ছবিটির অনুভাবনা কাজ করে থাকতে পারে। এ কথাটা আরো বিশেষ করে এখন বলা দরকার কারণ, সম্প্রতি তাঁর সমস্ত চলচ্চিত্র-কর্মকে হলিউডী রীতির ফসল বলে প্রতিপন্ন করার এক প্রবণতা দেখা গেছে। হলিউডে বসেই হলিউডী রীতিকে ওয়েলসের আঘাত করার কথাটাও এখানে তাই জোর দিয়ে বলার মত। গোদারের চলচ্চিত্রের শৈল্পিক বৈপ্লবিকতার বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি আমরা এই লেখাটিতেই পাই। সেখান থেকে একটি বিশেষ উদ্ধৃতি দেওয়া যাক, "গোদারের ছবি সহজবোধ্য নয়। কিন্তু সেটা গোদারের দোষ নয়। পঞ্চাশ বছর ধরে যে মনোভাব সিনেমাকে আর্থিক লোকসানের ভয় দেখিয়ে least resistance-এর পথে নিয়ে গেছে, এবং দর্শককেও সেই পথে চলতে বাধ্য করেছে, এটা তারই দোষ।"

সত্যজিতের নিজের ছবি, গোদারের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই বলা যায়, তেমন কিছু দুর্বোধ্য নয়, বরং উল্টো, যদিও আমাদের অনেক দর্শক এখনো তাঁর ছবির নুয়ানসগুলিও ধরতে অভ্যস্ত হয় নি। কিন্তু এখানে সেটা বড় কথা নয়, লক্ষ্য করার বিষয় হল এখানে সত্যজিৎ নির্দ্বিধভাবে সিনেমাতে 'পপুলিজম্'-এর পথ ধরে বাজারিমনোবৃত্তির ওকালতিকে অগ্রাহ্য করেছেন। এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে, সত্যজিতের সৃষ্টিশীলতা, সংবেদনশীলতা, চিন্তা যখন মধ্যগগনে।

পরের দিকে তাঁর এখানে প্রকাশিত অনমনীয় মনোভঙ্গি (দুর্বোধ্যতা বিষয়ে, ঝুঁকি নেবার বিষয়ে) একেবারে অপরিবর্তিত ছিল কি ? 'বিষয় চলচ্চিত্র' পুস্তকে 'পরিচালকের দৃষ্টিতে সমালোচক' বলে একটি প্রবন্ধ আছে। তাতে এক জায়গাতে সত্যজিৎ রায় বলছেন, "পরিচালক সমালোচকের কাছ থেকে তার রচনা সম্পর্কে কোনো নতুন জ্ঞান আশা করেন না। যেটা তিনি আশা করেন, সেটা হল সে সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত ধারণার সমর্থন।" যদিও এরপরে তিনি বলছেন সমালোচকের মধ্যে তিনি "বন্ধু ও বোদ্ধা।" খোঁজেন। কিন্তু এর আগে যা বলা হয়েছে তাতে কিন্তু সম্পর্কটা প্রায় প্রভু-ভৃত্য সদৃশ মনে হতে পারে। বলা বাহুল্য এতে সমালোচনা-কর্ম, যা নিয়ে (শুধু সিনেমা-ক্ষেত্রে নয়) এত কথা বলা হয়ে গেছে তার প্রতি তেমন শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় নি, এবং শিল্পীর সহজাত অহমিকাবোধকে যাঁরা সম্মান করেন তাঁরাও অনেকে সমালোচনা-কর্ম বিষয়ে এ ভাবে তাঁর সঙ্গে একমত হবেন না। তিনি নিজে যখন নিজের ছবির ফুটনোট না লিখে অন্যের কাজের সমালোচনা করছেন লিখিতভাবে, তখন কিন্তু কেবল সে সব কাজের স্রষ্টাদের 'ইয়েস ম্যান' হচ্ছেন না। সে যাই হোক, এই সমালোচনা-কর্ম "Our films their films" পুস্তকের কয়েকটি প্রবন্ধে সংক্ষেপে হলেও, মনোগতভাবে করা হয়েছে, তার মধ্যে জাপানি চলচ্চিত্র বিষয়ে ''Calm without fire within'', বা নিঃশব্দ যুগের চলচ্চিত্রবিষয়ক লেখাটি অনবদ্য। কিন্তু এ পুস্তকেও তাঁর সমালোচনা -কর্মের সমস্ত মন্তব্যে আমাদের সায় দেওয়া সম্ভব হবে না। যেমন চ্যাপলিনের সবাক ছবির 'দুর্বলতা' বিষয়ে যে সাধারণ মতটি চালু আছে, দেখা যায় তাতে তাঁর সমর্থন আছে। কিন্তু আমরা অনেকেই "মঁসিয় ভের্দু"কে দুর্বল কাজ মনে করতে পারব না। ঠাট্টা করে 'Indian New Wave' নাম দিয়ে তিনি অনেক 'নব্য' ভারতীয় চলচ্চিত্রকারের কাজকে কিঞ্চিৎ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন। বলছেন মণি কাউলের ছবিতে 'মানবিক' দিকটা অনুপস্থিত, এ কথায় আমরা অনেকে সায় দেব না। অপরপক্ষে হলিউডের সেকালের ও একালের বিচার, ইটালিয়ান চলচ্চিত্র, ব্রিটিশ নিউ ওয়েভ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুলিখিত প্রবন্ধগুলি আমাদের মনোযোগের দাবি রাখবে। আসলে মতভেদ হওয়া বা মতৈক্য হওয়ার চেয়েও এখানে বড় কথা হল একজন বড় মাপের শিল্পী ও বুদ্ধিমান মানুষকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করার কাজে তাঁর সমালোচনা-কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত আবশ্যক।

১৯৭৮ সালে অমল ভট্টাচার্য স্মৃতি বক্তৃতামালাতে তাঁর দেওয়া বক্তৃতা ঘিরে কিন্তু বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল, যা নিরর্থক মনে হয়। বালজাক বা জোলার তুলনায় বাংলা উপন্যাসে ডিটেলের সমৃদ্ধি কম (সেখানে তিনি ব্যতিক্রম নির্দেশ করেছিলেন) বলার মধ্যে এমন কিছু দোষ বর্তায় না, যদি অবশ্য সেই অপেক্ষাকৃত অভাবকে বাংলা সাহিত্যের দোষ বলে চিহ্নিত না করা হয়, বা একজন চলচ্চিত্রকারকে সাহিত্যিকদের ডিটেল সরবরাহ

করতে হবে এমন আবদার না করা হয়। আমরা মনে হয় না সে রকম কোনো বিচার সে উক্তিতে ছিল, যা ছিল তাকে নিছক তাঁর ব্যক্তিগত observation বড়জোর বলা যেতে পারে। শুধু উপন্যাস নয়, একটা ফিল্মেও ডিটেল থাকবে কি থাকবে না সেটা তাদের চরিত্রের ওপর নির্ভর করে, ডিটেল থাকা না থাকার ওপর সে শিল্পকর্মের প্রকৃতমূল্য নির্ভরশীল নাও হতে পারে। ডিটেলনির্ভর ছবিতে তা কীভাবে বচিত বা প্রযুক্ত হল সেটাই আসল কথা। এক্ষেত্রে সাহিত্য থেকেই পাঠ নিয়ে সত্যজিৎ কীভাবে নিজস্ব ডিটেল বচনা করেন তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহবণ আছে 'ঘরে বাইরে'-তে। উপন্যাসে বিমলার সঙ্গে মানবিক দূরত্ব তৈরির পর এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশেব দৃষ্টিকোণ থেকে যে ভাবে শূন্য শোবার ঘর, বিছানা, তার পাশে ধোবার অপেক্ষায় পড়ে থাকা বিমলার ছাড়াকাপড় এবং দেয়ালের কুলুঙ্গিতে নিখিলেশেব ছবির সামনে শুকনো ফুলের বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ নিজে যেন নিখিলেশের চোখকে লেন্সের মত করে নিয়ে ক্যামেরা প্যান করছেন। সত্যজিৎ এটি ছবিতে নকল করেন নি, একটি অন্যরকম ডিটেল প্রয়োগ করেছেন, নিখিলেশেব দৃষ্টিকোণ থেকেই টেবিলের ওপর পড়ে থাকা বিমলার আধখোলা সিঁদুবের কৌটোর ওপ স্লো জুম করেছেন। লাল টকটকে কিছু সিঁদুর উপচে পড়ে আছে। এভাবেই একজন মনোযোগী সাহিত্য পাঠক সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁর অন্য ধরনের শিল্পকর্মে তাকে কাজে লাগাতে পারেন। রঙ-এব কথায় মনে পড়ল, চলচ্চিত্রে রঙ-এর প্রয়োগ বিষয়ে তাঁর যে প্রবন্ধটি 'বিষয় চলচ্চিত্র'-এ আছে তাতেও দেখা যায় রঙ-এর প্রযোগে তার সৃষ্টি বাস্তব ডিটেল রচনার ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাকে অতিক্রম করে অন্য কোনো নান্দনিক (যেমন করা হয়েছে আন্তনিয়নিব 'রেড ডেসার্ট'-এ) প্রতীকী দ্যোতনার কথা তাতে খুব একটা নেই।

সাক্ষাৎকার কে নেন তার ওপর তার গুণাগুণ নির্ভর কবে কিছুটা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই বিষয়ে দেওয়া বিভিন্ন সাক্ষাৎকার একসঙ্গে মিলিয়ে পড়তে একটু অসুবিধায় পড়তে হতে পারে—যেমন 'ঘরে বাইরে' ছবি মূলত প্রেমকাহিনী না মূলত রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক এর বিষয়বস্তু, নাকি দুই-ই, এটা নিয়ে খটকা বাঁধতে পাবে। সেইসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। সাক্ষাৎকার সম্পাদনায় ও উপস্থাপনায় যথেষ্ট সততা বা সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে কিনা। অনেক সময় করা হয় না বলে ছোট-বড় নানা বিপত্তি ঘটে। এ ক্ষেত্রে নিজের কথা বলা হয়ত উচিত নয়, তবু বলছি, একটি জনপ্রিয় পত্রিকায় আমার বলা 'Guardian Lecture' কথাটি 'Garden' হয়ে গিয়ে ছাপা হয়েছে বাগানবক্তৃতা। যাই হোক, সত্যজিতের কয়েকটি সাক্ষাৎকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে সুইডিশ সমালোচক উলে ইসাকসন্‌কে দেওয়া (Sight and sound পত্রিকা, ১৯৭১) ও ১৯৮১ সালে নিউ ইয়র্কে উদয়ন গুপ্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকার দুটি খুবই মূল্যবান (Arts, Politics, Cinema, Cineaste interviews দ্রষ্টব্য)। সেখানে সিনেমার নন্দনতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব এবং বিশেষ করে রাজনীতির সঙ্গে সিনেমার সম্পর্ক বিষয়ে সত্যজিৎ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। এখানে ছাড়াও অন্যত্রও 'রাজনৈতিক চলচ্চিত্র' কথাটির সংজ্ঞা নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন তুলতে দেখা গেছে, এবং 'পোটেমকিন' সম্পর্কে তিনি একটি কথা অত্যন্ত সুন্দবভাবে বলেছেন—বলেছেন ওই ছবিটি তৈরি হয়েছিল বিপ্লব সফল হয়ে যাবার পর, আগে নয় কিন্তু বিপ্লব যেসব মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছিল তাকে সজীব রাখার ক্ষেত্রে ওই ছবিব

তখন বিশেষ ভূমিকা ছিল।

ইসাকসনের সাক্ষাৎকারে গোদারের 'সেরিব্রাল অ্যাপ্রোচ' এবং নিজের ছবিতে হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমন্বয় ঘটাবার প্রতিশ্রুতি বিষয়ে পরিষ্কার কথাবার্তা আছে, যদিও এখানেও তিনি বিতর্কের অবকাশ রেখে গেছেন গোদারের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির কারবার একেবারেই নেই কিনা সেই প্রশ্নকে ঘিরে। এখানে নয়, অন্য সাক্ষাৎকারে ইবসেনের 'জনতার শত্রু' বদলে 'গণশত্রু' করার ব্যাপারে শেষ বদলটা নিয়ে যা বলেছেন (এবং তা যেভাবে তাঁর স্তাবকবৃন্দ এখন পুনরাবৃত্তি করে সত্যজিৎকে সুবিধাজনক 'গণমিত্র' বা গণনেতাই বানিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন!) তাতেও আমরা সংশয় প্রকাশ করব। 'গণশত্রু'র শেষের 'আশাবাদ' আরোপিত বা অসার্থক কিনা সে কথা থাক (আমার ত দুই-ই মনে হয়), কথা হল ডঃ স্টকম্যানের "যে একা দাঁড়ায় তাকে কেউ হারাতে পারেনা" উক্তিকে 'নৈরাশ্যবাদ' বলে চিহ্নিত করা একেবারেই সমর্থনীয় নয়। ওতে "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে"-র প্রবল জোরটা রয়েছে। একথা স্বল্পবুদ্ধি মানুষরা না বুঝুক, কিন্তু 'অপরাজিত'র মত ছবির স্রষ্টা তা মানবেন না তা সেটা আমরা যারা তাঁকে আমাদের চিন্তাজগৎ ও সংস্কৃতির একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে মনে করি তাদের পক্ষে বেদনাদায়ক এবং কিছুটা বিভ্রান্তিকর।

যে সব কথা এখানে বলা হল, প্রয়াণ উপলক্ষে সামাজিক অভ্যাসে তার অনেক কিছুই বলা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু শুধুই 'ইন্দ্রপতন হল' বা 'একটা যুগের শেষ হল' বলে কান্নাকাটি না করে, তাঁর অসামান্য মূল্যবান কথা এবং বিশেষ করে কাজগুলিকে এইভাবে অনুধাবন করার মধ্যেই কি তাঁর মত মানুষের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদনের একটা পথ নেই?

সত্যজিৎ রায় ঃ চলচ্চিত্র ভাবনা

হিতেন ঘোষ

সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদির তুলনায় চলচ্চিত্র অর্বাচীন শিল্প। আর আজও আমাদের দেশে তো বটেই, বিদেশেও অধিকাংশ দর্শকও বয়সের হিসাবে তাই। তবু যন্ত্রসভ্যতার গর্ভজাত এই অনন্য অভিনব শিল্পভাষা ও শিল্পকর্ম অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে প্রকাশক্ষমতায় বৈচিত্র্য ও গভীরতায় এক আশ্চর্য সিদ্ধিতে পৌঁছেছে। সাধারণ দর্শকরুচি হয়তো এই দ্রুতগতির সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে ওঠেনি। দেশে-বিদেশে আজও সম্ভবত তার আদিম অপরিণত শৈশব। তবু জাপান ও পশ্চিমের দেশগুলিতে এই অর্বাচীন দর্শকরুচির খেয়ালে রচিত ছবিতেও প্রয়োগরীতির যে মুনশীয়ানা লক্ষ্য করা যায়, আমাদের দেশের বেশির ভাগ ছবিতে সেই গুণটুকুও অনুপস্থিত। চলচ্চিত্র মাধ্যমের মৌল শর্ত ও প্রয়োগকৌশলের অপরিহার্য প্রকরণগুলি অস্বীকার করেই এদেশে এখনও সর্বসাধারণের অভিনন্দনধন্য ছবিগুলি নির্মিত হয়। রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য পুরস্কারও তাদের কপালেই জোটে। এদিক থেকে আমাদের দেশের অধিকাংশ সুধীজন ও পেশাদার চলচ্চিত্র সমালোচকের রুচির নাবালকত্বও বিস্ময়কর।

তার চেয়েও বিস্ময়কর, এই পরিবেশে সত্যজিৎ রায়ের মতন একজন পরিচালকের অবির্ভাব। বিস্ময়ের কারণ আরও এই যে, সত্যজিৎ-পরবর্তী ভারতীয় তো বটেই বাংলা চলচ্চিত্রেও, বিষয়বস্তু বা আঙ্গিকের দিক থেকে কোন পরিণতির লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে তবে তার সংখ্যা এতই কম যে সাধারণ ভাবে আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্রের চরিত্র নির্ণয়ে তাকে নির্দ্বিধায় অগ্রাহ্য করা চলে। তাছাড়া চরম শিল্পসিদ্ধির মাপকাঠিতে সত্যজিতের সমকক্ষ অন্য কোন পরিচালক এখনও এদেশে দেখা দেননি। একমাত্র সত্যজিৎ রায়ই আন্তর্জাতিক মানের ছবি তৈরি করতে পেরেছেন। এদিক দিয়ে জাপানের সঙ্গে ভারতের অবস্থার পার্থক্য সুস্পষ্ট। জাপানে একই সঙ্গে, বা কিছু আগে পরে, একাধিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিধন্য চলচ্চিত্রকারের আবির্ভাব ঘটেছে।

আলোচ্য গ্রন্থদুটিতে* সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের প্রকরণ, প্রয়োগরীতি ও বিষয়বস্তুগত আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ব্যাধি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। সেই সঙ্গে, বাংলা বইটিতে এদেশে চলচ্চিত্র-সমালোচনার রীতি সম্পর্কে তাঁর কঠোর মনোভাব তীব্র শ্লেষগর্ভ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া বিদেশী চলচ্চিত্র ও পরিচালকদের সম্পর্কে রসজ্ঞ বিশ্লেষণ আছে , আর আছে সিনেমায় রঙ ও সংলাপের ব্যবহার প্রসঙ্গে সুচিন্তিত বক্তব্য। চলচ্চিত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতার সূত্রে বাঁধা পড়েছে কয়েকটি টুকরো টুকরো স্মৃতিকথা—অতীতের প্রীতিস্নিগ্ধ পরিহাস- উজ্জ্বল কয়েকটি মুহূর্ত। রচনাগুলির প্রত্যেকটিই সুলিখিত—সত্যজিতের ইংরেজি ও বাংলা গদ্যরচনায় দক্ষতার পরিচয় বহন করছে।

গ্রন্থদুটির ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, সিনেমা বিষয়ে কোন কিছু লেখায় তাঁর উৎসহ কম। আইজেনস্টাইনের মতন তত্ত্ব প্রচারে উৎসাহ তাঁর নেই; কিংবা ককতোর

(Jean Cocteau) মতন চলচ্চিত্র নির্মাণ তাঁর কাছে কোন উন্নত ধরনের শখ বা খেয়াল নয় যে, তিনি সিনেমার তত্ত্ব আলোচনায় সময় ব্যয় করতে পারেন। অধিকাংশ রচনাই সম্পাদকের তাগিদে লেখা। স্বতঃস্ফূর্ত লেখা বাংলায় মাত্র দুটি—বিরুদ্ধ সমালোচনার জবাবে। ইংরেজিতেও অন্তত দুটি রচনা নিজের তাগিদে লিখেছেন বলে মনে হয়—একটি সংকলনের একেবারে প্রথম নিবন্ধ, অপরটি রেনোয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে লেখা, যার প্রথম প্রকাশ ইংল্যাণ্ডের 'সিকোয়েন্স' পত্রিকায়।

আলোচনার মান, উৎকর্ষ ও গভীরতার বিচারে বাংলা বইটি অত্যন্ত সাধারণ স্তরের। হালকা মেজাজে ভাসাভাসা ধরনের লেখাই বেশী। চলচ্চিত্রের ইতিহাস বিষয়বস্তু ও প্রকরণগত বিবর্তন, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা ক্যামেরার মুভমেণ্ট, সঙ্গীতের ব্যবহার, রঙের প্রয়োজন ইত্যাদি নানা জটিল প্রসঙ্গ অত্যন্ত সংক্ষেপে, সরলীকৃত ভাবে উপস্থিত করে লেখক বাঙালী দর্শককে চলচ্চিত্র বিষয়ে কতখানি শিক্ষিত করে তুলতে পারবেন সন্দেহ। সত্যজিৎ অবশ্যই জানেন, তাঁর আলোচিত বিষয়গুলির প্রতি সামান্যতম সুবিচার করতে হলেও সুদীর্ঘ দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তিনি যখন এ ব্যাপারে উৎসাহী মন, তাঁর মতন মহৎ শিল্পীর নিজের শিল্পপ্রকরণ সম্পর্কে এই ধরনের সংক্ষিপ্ত অগভীর আলোচনা না করাই উচিত ছিল। তাঁর প্রকাশকের মতে চলচ্চিত্রের মতন মাধ্যমের পক্ষে তিনি নাকি অনেক বড়ো মাপের প্রতিভা। আইজেনস্টাইন, রেনোয়া, বা গদারের কথা মনে রাখলে কথাটা যে অর্থহীন, তা বুঝতে দেরি হয় না। সত্যজিৎ নিজেও সেটা বোঝেন।

তবু বাংলা বইটিতে অন্তত দুটি রচনা পেয়ে পাঠক খুশী হবেন। এর একটি 'পথের পাঁচালী' চিত্রনাট্যের একটা সিকোয়েন্স, যার সঙ্গে লেখক মূল উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক অংশের তুলনা করে দেখিয়েছেন, চলচ্চিত্রে উপন্যাসের কাহিনীর রূপান্তর কিভাবে ঘটানো হয়। এই প্রসঙ্গে লেখক যে বিষয়ের উল্লেখ করেন নি তা হল এই যে, একই ঘটনার সার্থক চিত্ররূপান্তর বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। মূল কাহিনীর ভাববস্তু অবিকৃত রেখেই পরিচালক কোন বিশেষ দৃশ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও স্টাইলের প্রয়োজনে দৃশ্যত্ব দানের—নিজস্ব ফরমুলা ব্যবহার করতে পারেন। দৃশ্যত্ব আরোপের কোন বাঁধাধরা ছক থাকতে পারে না। অন্য উল্লেখযোগ্য রচনাটি 'চারুলতা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের প্রথম দিকে ব্যক্তিগত আক্রমণের অংশটি পুণর্মুদ্রণের সময়ে পরিত্যক্ত হলেই ভালো হত। আক্রমণের ভাষা ও রীতি কোন কোন জায়গায় অশালীন হয়ে পড়েছে। তবে চিত্ররূপে মূল কাহিনীর রূপান্তর প্রসঙ্গে সত্যজিতের বক্তব্য নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য। যুক্তি ও তথ্যের অব্যর্থ প্রয়োগে তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধটি একই সঙ্গে তাঁর গভীর সাহিত্যবোধ, নাটক ও উপন্যাসের কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান এবং চলচ্চিত্রের প্রয়োগরীতি বিষয়ে অধিকারের সাক্ষ্য দেয়। সন্দেহ নেই, তাঁর ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গল্পের মূল ভাববস্তু বা থীম অবিকৃত ভাবেই উপস্থিত।

তবে আমার মতে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর চরিত্রচিত্রণ বা কাঠামোগত যে 'ত্রুটি' সত্যজিৎ চিত্রনাট্যে সংশোধন করার প্রয়াস পেয়েছেন, তাতে ছবিতে মূল গল্পের ভাববস্তুর কবিত্বময় অস্পষ্টতার সঙ্গে একটা অসঙ্গতি বা বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'নষ্টনীড়' গল্পে কাঠামোর "ত্রুটি" ও চরিত্রগুলির পরস্পর সম্পর্কের অস্পষ্টতা ভাববস্তুর সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষার সূক্ষ্মতা ও

ইঙ্গিতময়তা গল্পের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাকে সার্থকতা দিয়েছে।

কিন্তু সত্যজিৎ যে মুহূর্তে মূল কাহিনীকে নাটকীয় কাঠামো ও চরিত্ররূপায়নের স্পষ্টতায় ধরতে চেয়েছেন তখনই কাহিনীর পরিণতিতে অনেক বেশি নাটকীয় ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের পরিণতিতে যে didactic moralityর ইঙ্গিত সত্যজিৎ অনুভব করেছেন, তাঁর ছবিতে সেটা অনুভূত হয় না। অথচ ট্র্যাজেডির নাটকীয়তার জন্য অমলের চরিত্রের আমূল রূপান্তর প্রয়োজন। অমল চরিত্রকে অবিকৃত রেখে সম্পর্ক নির্দেশের ক্ষেত্রে বা কাহিনীর ছকে যে মামুলি পরিবর্তন তিনি ঘটিয়েছেন সেটা যথেষ্ট নয়। তাই ছবিতে চারুর আবেগের অভিব্যক্তিতে যে নাটকীয় সম্ভাবনা সুস্পষ্ট, পরিণতিতে তার কোন প্রভাব অনুভূত হয় না। আবার 'নষ্টনীড়' গল্পের নিরাশ্বাস বিষণ্নতা ও আমাদের মনে ছড়িয়ে পড়ে না। চারুর চরিত্রের পরিণতিতে আমরা শুধু "ছেলেমানুষি" দেখি না, দেখি তীব্র এক ট্র্যাজিক ভাবাবেগের প্রকাশ। অমলের আচরণ যখন চারুর এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়েছে, সেক্ষেত্রে ছবির শেষে তার moralistic retreat আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

চলচ্চিত্রে রঙের ব্যবহার সম্পর্কে সত্যজিতের বক্তব্য সর্বত্র গ্রহণযোগ্য বিনা সন্দেহ। একথা সত্যি, এখনকার দিনে বেশির ভাগ ছবিই রঙে তোলা হচ্ছে। তবে সাদাকালো ছবি একেবারে উঠে যায় নি, বা তার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়নি। এদিক দিয়ে নির্বাক ছবির সঙ্গে সাদা-কালো ছবির তুলনা কখনই সার্থক নয়। সত্যজিৎ এখন নির্বাক ছবি করার কথা ভাবতে পারেন না। কিন্তু তিনিই 'অশনি সংকেত'-এর পরে সাদা-কালোর 'জন-অরণ্য' তুলেছেন। ভবিষ্যতে হয়তো আরও সাদা-কালো ছবি করবেন। তিনি যে বাস্তবতার খাতিরে রঙের দাবি তুলেছেন, তার থেকে বড় প্রয়োজন রঙিন ছবির ক্ষেত্রে রয়েছে। রঙে এক ধরনের বাস্তবতা বেশি ধরা গেলেও সাদা-কালো ছবিতে যে এক বিশেষ বাস্তবতার রূপ ফুটে ওঠে রঙের প্রয়োগে তা আচ্ছন্ন হবার সম্ভাবনাই বেশি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রঙের প্রলেপ বাস্তব পরিবেশকে আরও অসহনীয় করে তুলে রসাভাস ঘটাতে পারে। আসলে তথাকথিত বাস্তবতা নয়, আর্টের দাবীই এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। সাদা-কালো ও রঙিন উভয় মাধ্যমেই মহৎ আর্ট সৃষ্টি হয়েছে , হবে।

সত্যজিতের ইংরেজি রচনাগুলি অনেক উন্নত মানের ও পরিণত বুদ্ধির খোরাক। আগেই বলেছি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা। সত্যজিতের ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর এই বিস্ময়কর প্রতিভা স্ফুরণের একটা ইতিবৃত্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁর ইংরেজি গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তার সংক্ষিপ্ত, আংশিক বিবরণ দিয়েছেন। 'পথের পাঁচালী' চিত্রনির্মাণের সময়ে সাধারণ অর্থে তিনি নিতান্তই "অনভিজ্ঞ" ছিলেন। দীর্ঘকাল স্টুডিও চত্বরে ঘোরাঘেরা না করেই, কোন পরিচালকের সাগরেদি ছাড়াই , এমনকি চিত্রনাট্য রচনায় হাত না পাকিয়ে তিনি সরাসরি চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে নেমেছিলেন। আর কোন ভারতীয় পরিচালক এইভাবে চলচ্চিত্র পরিচালনায় হাত দিয়েছেন বিনা সন্দেহ। এর ফলে বোধ হয় তাঁর এই লাভ হয়েছিল যে, ভারতীয় চলচ্চিত্রের অশুভ ও অসুস্থ প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য তাঁকে সময় ও শক্তির অপচয় করতে হয়নি।

সত্যজিৎ রায়ের মত এত বেশি বিদেশী ছবি এত দীর্ঘকাল ধরে আর কোন ভারতীয়

পরিচালক দেখেছেন কিনা সন্দেহ। খুব ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ছবি দেখার নেশা। বেশির ভাগই হলিউডের ছবি। একটা ছোট নোটবুকে সদ্য-দেখা ছবিগুলি সম্পর্কে নিজের মন্তব্য লিখে রাখার অভ্যাস ছিল ছেলেবেলা থেকেই। বিশ্ববিখ্যাত চিত্রতারকাদের নিজস্ব মূল্যায়নও করতেন সেইসঙ্গে। বয়স বাড়ার সঙ্গে চিত্রতারকাদের পরিবর্তে চিত্রপরিচালকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হতে শিখলেন। হলিউডের বিভিন্ন স্টুডিওগুলির বিশেষত্ব লক্ষ্য করতে শিখে স্কুলে পড়বার সময়েই 'এম-জি-এম' কিংবা 'ওয়ার্নার ব্রাদার্স', 'টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরি ফক্স' কিংবা 'প্যারামাউন্ট'-এর ছবি চিনবার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। আরও বড় হয়ে ছবি দেখার সময়ে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে নিজের নোটবুকে বিভিন্ন ছবির বা পরিচালকের 'কাটিঙ'-এর বৈশিষ্ট্য লিখে রাখতেন।

কলেজ ছাড়বার পর সত্যজিতের কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কাটে ফাইন আর্টস শিখতে। কলা বিভাগের লাইব্রেরীতেই প্রথম চলচ্চিত্র বিষয়ে তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পেলেন। যুদ্ধের মাঝখানে চাকরি নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে চলচ্চিত্রের তত্ত্ব ও ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনো শুরু হল। আর সেইসঙ্গে চলল হলিউড প্রযোজিত শ্রেষ্ঠ য়োরপীয় পরিচালকদের ছবি দেখা। এই সূত্রেই পরিচয় ঘটল রেনোয়া ও রেনে ক্লেয়ারের ছবির সঙ্গে। সোভিয়েত ছবি দেখার সুযোগও পেলেন এই সময়ে। 'ইভান দ্য টেরিবল' ছবি এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে এল। কিন্তু শান্তিনিকেতনে নির্বাসনের দিনগুলিতে 'সিটিজেন কেন' মাত্র তিনদিনের জন কলকাতায় এসে চলে যাওয়ায় আপসোস হয়েছিল।

যুদ্ধের শেষে জনকয়েক বন্ধু মিলে এদেশে প্রথম ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলেন। নতুন ছবি ও তার আঙ্গিক নিয়ে ঘরোয়া আলোচনায় মেতে উঠলেন। ভারতীয় ছবির শিল্পগত ব্যর্থতা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখলেন কলকাতার বিখ্যাত এক ইংরেজি দৈনিকে। বর্তমান সংকলনে এই প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তারপর ১৯৪৯ সালে রেনোয়া এলেন কলকাতায় 'দ্য রিভার' ছবি তুলতে। হোটেলে সত্যজিৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হল। সেই আলোচনার ফল 'সিকোয়েন্স' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত তাঁর অন্যতম মূল্যবান প্রবন্ধটি।

এর পরের বছর যে বিলাতী বিজ্ঞাপন সংস্থায় তিনি ভিজুয়ালাইজার পদে নিযুক্ত ছিলেন সেই সংস্থা তাঁকে ইংল্যাণ্ড পাঠাল তাঁকে একজন পুরোদস্তুর বিজ্ঞাপন-শিল্পী বানিয়ে তোলার জন্য। কিন্তু লণ্ডন শহরে পা ফেলবার তিন দিনের মধ্যেই সত্যজিৎ এমন একটি ছবি দেখবার সুযোগ পেলেন যা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। বিজ্ঞাপনশিল্পী হিসেবে সেইদিনই তাঁর কর্মজীবনের পরিসমাপ্তির পর্ব শুরু হল। ডি সিকার 'বাইসিকল থীভ্‌স' দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝেছিলেন তাঁর প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' এই ভাবেই তুলতে হবে—একেবারে স্বাভাবিক লোকেশনে ও নন-অ্যাকটরদের নিয়ে। হলিউডের অবিশ্বাস্য অর্থবাহুল্য ছাড়াও যে ছবি তোলা সম্ভব সে কথা বুঝবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সামান্য সঞ্চিত অর্থ নিয়ে (মাত্র আট হাজার টাকা।) ছবি নির্মাণের কাজে নেমে পড়বার সাহস পেলেন।

ক্রমে নির্মিত হল সেই ছবি, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যা একটা চরম বিস্ময়—আর বিশ্বের চলচ্চিত্র রসিকদের কাছে যা, পেনেলোপি হাউস্টনের ভাষায়, "রিভিলেশান"। "রসোমন"ও বিদেশীদের কাছে অনুরূপ বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু জাপানে আরও

কয়েকজন মহৎ চলচ্চিত্র শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে ; নির্মিত হয়েছে বিভিন্ন পরিচালকের নানান স্টাইলের অসাধারণ কিছু ছবি। কিন্তু ভারতে দ্বিতীয় সত্যজিৎ রায় কোথায়?

সন্দেহ নেই, সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের অভ্যস্ত ধারায় এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। ভারতীয় চলচ্চিত্রের শিল্পগত ব্যর্থতার কারণ, সত্যজিতের মতে, এর কাহিনী বিন্যাসে ও কাহিনী নির্বাচনে পুরাণ ও রূপকথার প্রভাব। পরিবেশ রচনা ও চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে, মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক নির্দেশে, বাস্তবদৃষ্টির অভাব আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সুস্পষ্ট। দেশ ও কালোত্তীর্ণ সর্বজনীন মূল্যবোধের অভাবে অধিকাংশ ছবির আবেদন প্রাদেশিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ পরিচালক সিনেমার মৌলিক ও আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যগুলি উপেক্ষা করে কাহিনীর জটিলতা ও সংলাপ-সঙ্গীতের বাহুল্যে ছবিকে অযথা ভারাক্রান্ত করে তোলেন। এছাড়া রয়েছে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের প্রভাব, যার গঠনে কোন নাটকীয়তা না থাকায় চলচ্চিত্রের গতি ও ছন্দ নিয়ন্ত্রণে বাধার সৃষ্টি হয়। সত্যজিতের ইয়োরোপীয় সঙ্গীতপ্রীতি ও সঙ্গীতবোধ আবাল্যের সাধনায় পরিশীলিত। তাঁর ছবিতে তাই একদিকে যেমন ইয়োরোপীয় গ্রাফিক আর্টসের প্রভাবে প্রতিটি ফ্রেমের দৃশ্যসৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে; বেঠোফেন, বাখ্, মোৎসার্টের কম্পোজিশনের গতিছন্দ সিনেমাশিল্পের মৌলিক শর্তগুলিকে রক্ষা করতেও সাহায্য করে। স্পেস ও টাইমের এক ছন্দোময় গতিশীল কম্পোজিশন হিসাবে তাঁর অধিকাংশ ছবি বিষয়বস্তুর আবেদন ছাড়াই এক মহৎ শিল্পকৃতির বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এ সেই বৈশিষ্ট্য, যা আইজেনস্টাইন, রেনোয়া কিংবা আন্তোনিওনির ছবিকে চিরায়ত শিল্পমূল্যে মণ্ডিত করেছে।

সিনেমার স্বধর্ম ও তার আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নিয়ে সত্যজিৎ তাঁর ছবিতে বিষয়বস্তুর সরলতা, চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টিতে বাস্তবতা ও টীমের আবেদনে এক সর্বজনগ্রাহ্য সূত্রের সন্ধান করেন। অসামান্য শিল্পমূল্য সত্ত্বেও তিনি জানেন, তাঁর ছবি রুচিবান সংখ্যালঘু দর্শকসমাজেই সাড়া তুলতে পারে। কিন্তু ইয়োরোপ আমেরিকায় এই রুচিবান দর্শকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আর তাঁর ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কারধন্য। তাই সব মিলিয়ে শিল্পীর স্বধর্মে স্থিত থেকেও তাঁর পক্ষে এতগুলি ছবি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। তবু 'পথের পাঁচালী' ছবি আবার দেখে তাঁর মনে হয়েছে সমাজ-বাস্তবতার চেয়ে মানবিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের আবেদনই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রামীণ জীবনে সমাজ-সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতাই এজন্য দায়ী বলে তিনি মনে করেন। সেইজন্যই কি তিনি পরবর্তীকালে নাগরিক জীবন নিয়ে ছবি করতে বেশি উৎসাহী হয়েছেন? কিন্তু সত্যজিতের নাগরিক জীবন নিয়ে রচিত ছবিগুলিতে সমাজ সম্পর্কের নির্ভুল তথ্য থাকলেও মানবিক আবেদনের গভীরতা বা তীব্রতা অনেক কম। তার কারণ তাঁর রচিত নাগরিক চরিত্রগুলি বা তাদের জীবননাট্য নিতান্ত বিভ্রান্ত। ভারতবর্ষ এখনও একটা বিপুল গ্রাম। তাই এখানকার নাগরিক জীবনে যথার্থ নাগরিক জীবনচেতনা বা আধুনিকতার স্পর্শ পাওয়া যায় না। আবার গ্রামীণ জীবনধারার সঙ্গে যোগ হারিয়ে শহরের মানুষ এক হিসাবে নিরালম্ব হয়ে পড়েছে। তাই এই না-শহুরে না-গ্রাম্য চরিত্রগুলি তাদের অসম্পূর্ণ, বিকলাঙ্গ, কপট অস্তিত্ব নিয়ে কোন সর্বজনগ্রাহ্য গভীর মানবিক আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না।

জাপানী ছবির আলোচনা করতে গিয়ে সত্যজিৎ দেখিয়েছেন, ওজু প্রমুখ জাপানী

পরিচালকেরা, এমনকি কুরোসাওয়াও, চলচ্চিত্রের মৌলিক বাস্তবতা ও আঙ্গিকগত রীতিকে অক্ষুন্ন রেখে প্রাচীন দেশজ চিত্রকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদির প্রভাব তাঁদের ছবিতে অনায়াসে আনতে পেরেছেন। একটা বিদেশী মিডিয়ামকে এইভাবে দেশজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারার নিগূঢ় রহস্য তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেননি। কিন্তু পরিহাসছলে যখন তিনি বলেন, তাঁর ছবিতে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব আছে ; তখন মনে হয়, তাঁর মনের কোন গোপন অতৃপ্ত বাসনাই ব্যক্ত করছেন—হয়তো ওজুর মতন দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে সিনেমার আঙ্গিকের মিলন ঘটাতে তিনিও অনিচ্ছুক নন।

ব্রিটিশ ছবির তুলনাগত অপকর্ম (ডকুমেনটারি ফিল্ম বাদে) এবং ইদানীং তার টেকনিকাল সমৃদ্ধির আলোচনা প্রসঙ্গে কিংবা ত্রুফোর (Truffaut) হিচকক প্রশস্তির সমালোচনা করতে গিয়ে সত্যজিৎ একটা বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন যে, নিছক টেকনিকের সুষ্ঠু বা সার্থক প্রয়োগের গুণেই কোন ছবি বা পরিচালক মহৎ শিল্পসিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হতে পারেন না। সত্যজিৎ হিচককের ছবির একজন অনুরাগী দর্শক, কিন্তু ত্রুফো যে হিচককে শিল্পী হিসেবে শেকসপীয়ার, দস্তয়েভস্কি বা কাফকার সঙ্গে এক আসনে বসিয়েছেন তাতে তাঁর সায় নেই। ব্রিটেনে চলচ্চিত্র শিল্পের তুলনাগত অনগ্রসরতার কারণ, তাঁর মতে, ইংরেজ জাতির আত্মতৃপ্ত ও কঠোর প্রথানুবর্তী জীবনযাত্রা। বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে সত্যজিতের উক্তির সমর্থন মিলবে। এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ দুই ইংরেজ কবি জাতিতে ইংরেজ নন। একজন আইরিশ, অন্যজন আমেরিকান। শতাব্দীর সবচেয়ে মৌলিক কথাসাহিত্যিক জয়েস এবং শেকসপীয়ারের পরে ইংরেজি ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ—এঁরা দুজনেই আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসী। ব্যতিক্রম কেবল লরেন্স, যিনি ছিলেন খাঁটি ইংরেজ। হয়তো শ্রমিক শ্রেণী থেকে এসেছিলেন বলেই লরেন্সের পক্ষে ইংরেজ জাতির স্বভাবসিদ্ধ আত্মতৃপ্তি ও প্রথানুগত্যকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল। আর তাঁর উপন্যাস তো এই দুই মনোভাবের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড চীৎকার। সে যাই হোক, পেনেলোপি হাউসটনের মতে ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের অনুন্নত মানের জন্য দায়ী ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যিক ও সুধীসমাজ। এঁরা চলচ্চিত্রকে এখনও মহৎ ও অভিজাত শিল্পকলা বলে স্বীকার করেন না। তবে সত্যজিৎ বলেছেন, দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে এবং তার পরে ইংল্যাণ্ডের সমাজে ভাঙন শুরু হয়েছে। ফলে সেখানে বিদ্রোহের মনোভঙ্গি দেখা দিয়েছে। নাটকে এবং কিছুটা চলচ্চিত্রেও ঐতিহ্যগত সমাজবিন্যাসের এই বিপর্যয়-প্রসূত বিদ্রোহের ছাপ পড়ছে। তিনি আশা করছেন অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ চলচ্চিত্রে একটা নবজাগরণ আসবে।

চলচ্চিত্রের বিষয় ও আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের সদাজাগ্রত অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ গদার সম্পর্কে তাঁর মনোভাব। ছবির ভাষার বিবর্তনে গদারের স্থান, তাঁর মতে, খুবই উঁচুতে। গ্রিফিথ, আইজেনষ্টাইন রেনোয়া এবং 'সিটিজেন কেন' ও 'দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট অ্যামবারসন্‌স' ছবি দুটিতে ওয়েল্‌স, চলচ্চিত্রের ভাষাতে গভীরতা ও ব্যাপ্তির নতুন সম্ভাবনা এনে দিয়েছেন। গদারের আসন সত্যজিৎ এঁদের সঙ্গেই চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁর মতে শিল্পের আঙ্গিকগত বিপ্লব বিষয়গত বিপ্লবের হাত ধরেই এগিয়ে চলে। নতুন বিষয়বস্তু প্রকাশের তাগিদেই ভাষার বিবর্তন ঘটে। তিনি বলেছেন, ইংরেজি সাহিত্যে চসার থেকে জয়েস পর্যন্ত ছ'শ বছরের ব্যাপ্তিতে যে বিপ্লব

এসেছে সিনেমায় ষাট বছরেই তা সংঘটিত হতে চলেছে। ইয়োরোপীয় সমাজজীবনের দ্রুত বিপর্যয় চলচ্চিত্র শিল্পের এই আঙ্গিকগত বিবর্তনে প্রতিফলিত।

গদারের একটি ছবি থেকে যে উদাহরণ তিনি দিয়েছেন তাতে তাঁর এই বক্তব্য প্রমাণিত হয়েছে। আবার অন্য দিক দিয়ে দেখলে গদারের এই বিশেষ ফ্রেমিঙের মধ্যে চলচ্চিত্রের আঙ্গিকগত বিবর্তনের একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। গদার শুধু একই ফ্রেমে আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়ে সাবজেকটিভ-অবজেকটিভের অভ্যস্ত সীমারেখা ভেঙে দিয়েছেন, চলচ্চিত্রের সিনট্যাক্সে একটা দুঃসাহসী পবিবর্তন এনেছেন। এমনকি, একে ফ্রেমের মধ্যেই মনটাজের রীতির অনুপ্রবেশ বলা চলে, যা ঘটনা ও আবেগের আপাতবিশৃংখল ও যুক্তিবিরুদ্ধ সন্নিপাত দেখায়। গদারের স্টাইলের এই ব্যাখ্যাব অর্থ এই যে, চলচ্চিত্রে বিবর্তনের ইতিহাসে গদার কোন বিচ্ছিন্ন বা আপতিক ঘটনা নন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় চলচ্চিত্রে "নিউ ওয়েভ"-এর ফ্যাশান সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের কঠোর মনোভাব সমর্থনযোগ্য বলেই মনে হবে। সমাজ এবং ব্যক্তি জীবনের বা মানসিকতার কোন মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া সাম্প্রতিক ফ্যাশানের এই অন্ধ অনুকরণে কোন মহৎ শিল্প সৃজিত হতে পারে না। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তথাকথিত নিউ ওয়েভ আসলে বক্তব্যের দিকে দিয়ে নিতান্তই ওল্ড।

ইংরেজি বচনাগুলির বেশ কয়েকটিতে সত্যজিৎ বার বাব একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। যা কিছু আকস্মিক, ক্ষণস্থায়ী, চঞ্চল, অস্থির, অনিশ্চয়তায় ঘেবা এবং অন্তহীন জীবনপ্রবাহের অঙ্গ, সিগফ্রিড ক্রাসোয়ারের মতে তাই একমাত্র চলচ্চিত্রের বিষয় হবার উপযুক্ত। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন, সতত সঞ্চরমান, ক্ষণজীবী মুহূর্তগুলি কোন যাদুতে মহৎ শিল্পের অক্ষয় গৌরব লাভ করে? মানবিক সম্পর্ক ও মানবজীবনের কোন এক মুহূর্তের সর্বজনগ্রাহ্য আবেদন, গতি ও ছন্দের সংগীতসুলভ লীলা, দৃশ্যবস্তুর সুষম বিন্যাস— চলচ্চিত্রের মহত্ত্ব বিচারের এই উপাদানগুলির কোনটির কতটা গুরুত্ব। ফোর্ডের ছবির কবিত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যজিৎ যা বলেছেন তার থেকে এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর বেরিয়ে আসে না। অবশ্য একথা বলা যায় না যে, অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের ক্ষেত্রে আমরা একেবারে "অবজেকটিভ স্ট্যানডার্ড" নির্দেশ করতে পেরেছি। তবু উপন্যাস বা সিম্‌ফনির ক্ষেত্রে বিচারের মাপকাঠি সিনেমার চেয়ে কিছুটা বেশি অবজেকটিভ। চলচ্চিত্র বিচারের ক্ষেত্রে তাই আমরা শেষ পর্যন্ত "সাবজেকটিভ রেসপন্‌স" বা ব্যক্তিগত অনুভূতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হই। তবে সত্যজিৎ রায়ের মতন চলচ্চিত্র পরিচালক ও চলচ্চিত্র রসিকের ব্যক্তিগত অনুভূতিও এক হিসেবে সমালোচনার অবজেকটিভ বা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মানদণ্ড রূপে গ্রাহ্য হতে পারে।

---

* সত্যজিৎ রায় ঃ বিষয় চলচ্চিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, মূল্য ঃ ১০.০০।

Satyajit Roy : Our films, Their films. Orient Longman Ltd. Price Rs. 60.00

গোয়েন্দা কাহিনীতে সত্যজিৎ ঘরানা

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় একশো বছর (১৩০০ বঙ্গাব্দ) আগেকার কথা। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর', পাঁচকড়ি দে'র বিদেশী ছায়া অবলম্বনে লেখা বা অনুবাদ অথবা তার কিছুদিন-পরে সেক্সটন ব্লেক সিরিজের অনুবাদ- এসবই তখন একশ্রেণীর পাঠকের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিল। তবে জনপ্রিয় হলেও সাহিত্যে গোয়েন্দাকাহিনী তখনও যেন খানিকটা অপাংক্তেয়। সিরিয়াসভাবে বড়দের কথা তখনও কেউ ভাবেননি। কুলদারঞ্জন রায়ের আর্থার কনান ডয়েলের অনুবাদ অথবা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সম্ভবত বিদেশী ছায়া অবলম্বনে লেখা প্রথম ডিটেকটিভ কাহিনী "হীরার কণ্ঠী"—কৈশোরক রচনার পর্যায়ে পড়ে।

বাংলা ডিটেকটিভ গল্পের ইতিহাসে প্রাক্-শরদিন্দু পর্যায়ের গল্পগুলিতে ডিটেকটিভ গল্পের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান— একথা বলা যায় না। গোয়েন্দাকাহিনীর কয়েকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সমস্যা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ সমাধান- এই তিনটি হল প্রকৃত ডিটেকটিভ গল্পের মূল লক্ষণ ;ডিটেকটিভ গল্পের প্রধান আকর্ষণ তার ঘটনার অভিনবত্বে, তার প্লটের প্যাঁচে, তার ভূমিকাগুলির স্বভাব-সঙ্গতিতে, ঘটনাপরম্পরার অনপেক্ষিততায় এবং সব মিলিয়ে অনন্যতায় অথচ সম্ভাব্যতায়। গৌণ আকর্ষণ থাকে ডিটেকটিভের ব্যক্তিত্বে, তার আচরণে, বুদ্ধির প্রখরতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে।[১] হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর লেখায় দুটি নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করেন ; এক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঞ্চার এবং দুই, 'ত্রিশূল ফরমুলা'– অর্থাৎ একজন প্রধান ডিটেকটিভ এবং তাঁর দুই সহায়ক। এই দুটি বৈশিষ্ট্যই পরবর্তীকালে ডিটেকটিভ গল্পের genre-এ assimilated হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শতাব্দীর চারের দশকের শুরু থেকেই গোয়েন্দাকাহিনীর মোড় ফিরতে থাকে। বাংলা ডিটেকটিভ গল্পের নবীনধারার জনক অবশ্যই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ এই গোয়েন্দাকাহিনীমালার কেন্দ্রীয় চরিত্র। আপাতদৃষ্টিতে ব্যোমকেশ বক্সী ও তার সহায়ক বন্ধু অজিতের চরিত্রে কনান ডয়েলের হোম্‌স এবং ওয়াট্‌সনের প্রতিফলন হলেও শরদিন্দুর চরিত্র-চিত্রায়ণে যথেষ্ট মৌলিকতা লক্ষ্য কার যায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিটেকটিভ গল্পে গোয়েন্দার পরিচয়, ব্যক্তিত্ব পাঠককে প্রভাবিত করে। তার আচার-আচরণ, বৈশিষ্ট্য কাহিনীতে নতুন মোড় এনে দেয়, কাহিনীর গতির সঙ্গে, বিশেষ করে প্লটের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়। সাধারণত সব ডিটেকটিভ গল্পেই অপরাধী ও ডিটেকটিভের দ্বৈত-নায়কত্ব থাকে— একজন থাকেন লোকচক্ষুর অন্তরালে আর একজনের অবস্থান ঘটনার বাহ্যপটে এবং পাঠকের মানসপটে। শরদিন্দুর ডিটেকটিভ গল্পে গোয়েন্দাকাহিনীর অন্যান্য লক্ষণ ছাপিয়ে যায় ডিটেকটিভের চরিত্র— সৃষ্টি হয় সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ— ঠিক যেমন কনান ডয়েল সৃষ্টি করেছিলেন শার্লক হোম্‌স, ডরোথি সেয়ার্স লর্ড পিটার উইম্‌সি এবং ফরাসী লেখক মরিস ল ব্ল্যাঁ করেছিলেন লুপ্যাঁ

(Lupin, খানিকটা যার আদলে কনান ডয়েল গড়েছিলেন হোম্‌সকে)।

এই ব্যোমকেশেরই সার্থক উত্তরপুরুষ ফেলুদা। সত্যজিতের রহস্যগল্পের নায়ক। প্রখর ধীমান ব্যক্তি; একটি অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় জীবন্ত চরিত্র। জীবনের অন্ধকার দিক নিয়ে কাজ করলেও যিনি তাজা আলোবাতাস ঢোকার জন্য মনের জানালাটা খোলা রাখতে দ্বিধাবোধ করেন না। ফেলুদা সিরিজের গল্প-উপন্যাসগুলিও ডিটেকটিভ ফেলুদার চরিত্রকেন্দ্রিক।

২

ফেলুদা সিরিজের প্রথম গল্প "ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি" ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে 'সন্দেশ' পত্রিকায় তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। এই ১৯৬৫ সাল থেকেই শুরু হয় ফেলুদা-পর্ব। সেই শুরু— ক্রমশ আধার বিস্তৃত হয়েছে , পটভূমিতে বৈচিত্র্য এসেছে, মননশীল জটিলতায় কাহিনীগুলি অন্য মাত্রা পেয়েছে , কাহিনীর বাঁধুনিও আরো দৃঢ়পিনদ্ধ হয়েছে, বদলে গেছে ফর্ম, ভেঙে গেছে ফরমূলা। সত্যজিতের লেখা ফেলুদা সিরিজের প্রতিটি গল্পই জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁয়েছে। প্রায় প্রতিটি গল্পই হয়েছে বেস্টসেলার। তাঁর গোয়েন্দকাহিনীর এই বিপুল জনপ্রিয়তার মূলে কী? তাঁর লেখার সবসভঙ্গি? কাহিনী জুড়ে টানটান রহস্য আর সাসপেন্স? স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাষায় পরিবেশিত মনোগ্রাহী তথ্যসম্ভার? মননশীল wit না কি গল্পের অদ্ভুত গঠন, যেখানে উদ্বৃত্ত বা Surplusage- এর এতটুকু স্থান নেই? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে গল্পগুলি নিয়ে দু'চার কথা বলতে হয়।

"ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি" (১৯৬৫) সত্যজিতের প্রথম গোয়েন্দা গল্প। গল্পটি প্রথমে 'সন্দেশে' প্রকাশিত হলেও পরে 'একডজন গপ্‌পো' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পের পটভূমি দার্জিলিং। ফেলুদার বয়স তখন ছাব্বিশ আর তোপ্‌সের বয়স তেরো। গল্পে খুনখারাপি নেই, কোনো ভয়ংকর রহস্যের ঘটনাও নেই। ফেলুদা তখন রহস্যজনক ঘটনা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তোপ্‌সের ভাষায় অনেক ডিটেকটিভ বই পড়ে ওব নিজের ডিটেকটিভ বুদ্ধিটা ধারালো হয়ে উঠেছে। প্রথম গল্পে কাহিনীর বিন্যাস দুর্বল, প্লট তেমন বিশ্বাস্যভাবে দানা বাঁধতে পারেনি।

'বাদশাহী আংটী' (১৯৬৯) সত্যজিতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ গোয়েন্দা উপন্যাস। কাহিনীর ঘটনাস্থল ঐতিহাসিক শহর লখনৌ। তখন ফেলুদার বয়স সাতাশ, তোপ্‌সের চোদ্দ। এই উপন্যাসেই লেখক ফেলুদার চরিত্রের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন: "ওকে কেউ কেউ বলে আধাপাগলা, কেউ কেউ বলে খামখেয়ালী, আবার কেউ কেউ বলে কুঁড়ে। আমি কিন্তু জানি ওই বয়সে ফেলুদার মত বুদ্ধি খুব কম লোকের হয়। আর ওর মনের মত কাজ পেলে ওর মত খাটতে খুব কম লোকে পারে। তাছাড়া ও ভালো ক্রিকেট জানে, প্রায় একশো রকম ইনডোব গেম বা ঘরে বসে খেলা জানে, তাসের ম্যাজিক জানে, একটু একটু হিপনটিজম্‌ জানে, ডান হাত বাঁ হাত দু'হাতেই লিখতে জানে।" (পৃ.২) আরও জানা যায় ফেলুদার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা। আর তার সবচেয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা- ডিটেকটিভের কাজে অসামান্য দক্ষতা। তোপ্‌সের কথায় ফেলুদা হল 'শখের ডিটেকটিভ' (পৃ.২) যদিও ফেলুদা সিরিজের শেষ উপন্যাসগুলিতে ফেলুদা পেশাদার ডিটেকটিভদের হার মানায়। এই গল্পে লখ্‌নৌর ভুলভুলাইয়া বা গোলকধাঁধা প্রতীকী মাত্রা পেয়েছে।

পুরো গল্পটাই রহস্যরোমাঞ্চে ঠাসা, শেষ পর্যন্ত ভদ্রবেশী বনবিহারীবাবুর মুখোশ টেনে খুলে দেয় ফেলুদা আর তোপ্সের শেষ কথাই ("এই আংটি রহস্য সমাধানের ব্যাপাবে কেউ যদি সত্যি করে বাদশা হয়ে থাকে, তবে সে ফেলুদাই", পৃ.১০০) হয় পাঠকেরও শেষকথা।

'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' (১৯৭১) গল্পটিতে রহস্য বেশ জটিল আকার ধারণ করে। অমূল্য যমন্তক মূর্তির জন্য শেলভাঙ্কর খুন হন, আর শেলভাঙ্কারের মৃত আত্মা এসে খুনীর নাম জানিয়ে যায় কিন্তু গোয়েন্দা ফেলুদা সহজে বিভ্রান্ত না হযে সঠিক পথে খুনের কিনারা করে। এ গল্পে খুন আছে, কিন্তু ভায়োলেন্স নেই। অতিপ্রাকৃত ও থিওসফির একটা পরোক্ষ ভূমিকা আছে।

'সোনার কেল্লা'র (১৯৭১) পটভূমি রাজস্থান। দুর্বৃত্তের কবল থেকে শিশু জাতিস্মর মুকুলকে উদ্ধারের কাহিনী। প্যারাসাইকোলজি এ গল্পের গৌণ থীম— মনের অলিগলির অন্ধকারের সঙ্গে এ রহস্যের একটা গূঢ় যোগ রয়েছে। তাই কাহিনীর শুরুতেই ফেলুদার মন্তব্য, "মানুষের মনের ব্যাপারটাও জিয়োমেট্রির সাহায্যে বোঝানো যায়" (পৃ. ২)। সাধাসিদে মানুষের মন, প্যাঁচালো মন আর পাগলের মন— সবই এক-এক ধরনের জিয়োমেট্রি। ফেলুদা নিজে কিরকম জ্যামিতিক নক্শার মধ্যে পড়ে— একথা জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দেয়: "একটা মেনি-পয়েন্টেড স্টার বা জ্যোতিষ্ক..." (পৃ.২) আর, "তোপ্সে একটা বিন্দু যেটাকে অভিধানে বলে পরিণামহীন স্থাননির্দেশক চিহ্ন" (পৃ.২), তবে তোপ্সের নিজেকে স্যাটেলাইট হিসাবে ভাবতেই ভালো লাগে।

"বাক্সরহস্য" গল্পে (১৯৭৩) রহস্যের জটপাকানোর জন্য ফেলুদাকে যেতে হয় তুষাররাজ্য সিমলায়, সঙ্গী হয় তোপ্সে আর ব্যুমেরাং নিয়ে লালমোহনবাবু। বাক্স-উদ্ধার নয়, দুর্লভ পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করাই এখানে ফেলুদার কাজ। এখানে এক অপরাধীকে সনাক্ত করার সঙ্গে জড়িয়ে যায় মূল্যবান হীরকরহস্য, কাহিনীর দ্বিস্তরীবিন্যাস লক্ষ্য করার মতো।

'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' (১৯৭৪) গল্পে ভূবনেশ্বরে রাজারানী মন্দিরেব একটি যক্ষীর মাথা চুরির তদন্ত থেকে গল্প শুরু হয় এবং শেষ হয় এলোরার গুহা ও কৈলাসমন্দিরে। এই কাহিনীতে সর্বজ্ঞ সিধুজ্যাঠাই প্রথম ফেলুদাকে এই প্রাচীন শিল্পকলার নমুনা চুরি যাওয়ার ব্যাপারে অবহিত করেন। ভ্যাণ্ডালিজ্মের শাস্তি হয়। গল্পে ভিশুয়াল ডিটেলের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেমন— গল্পের শুরুতে প্লেন ক্র্যাশের জায়গার বর্ণনায় ঃ "এখানে ডানার একটা অংশ, ওখানে ল্যাজের টুকরো, ওইদিকে আবার থুবড়ানো নাকের খানিকটা। তাছাড়া ভাঙাছেঁড়া ফাটাফুটা দোমড়ানো মোচড়ানো পোড়া আধপোড়া সিকিপোড়া কত কী যে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার কোনো হিসাব নেই" (পৃ.১২)
।

সত্যজিতের ষষ্ঠ উপন্যাস 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' (১৯৭৫) শুরু হয় একটা জটিল ধাঁধা দিয়ে। আর কেন যে উপন্যাসটা এইভাবে শুরু করা হয়, তার কাবণও বলে দেয় ফেলুদা— "... ওটা একটা কাযদা। ওতে পাঠককে সুড়সুড়ি দেবে।"—আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলে, "ওটা শুরুতে দিলে গল্পটা যারা পড়বে তাবা প্রথম থেকে মাথা খাটাতে পারবে।" যদিও তোপ্সের মতে, "সংকেতটা সহজ নয়। ফেলুদাকে অবধি প্যাঁচে ফেলে

দিয়েছিল।" পাঠককে এই মাথা ঘামানোতে বাধ্য করাই সত্যজিতের সব গোয়েন্দাকাহিনীরই লক্ষ্য। রহস্যভেদ করতে গিয়ে ফেলুদার মনুষ্য-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ও উপলব্ধি গভীরতর হয়। তার মতে "জানোয়ারের মতিগতি বোঝা মানুষের চেয়ে অনেক সহজ, কারণ জানোয়ারের মন মানুষের মত জট পাকানো নয়। মানুষের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সাদাদিধে, তারও মন একটা বাঘের মনের চেয়ে অনেক বেশি প্যাঁচালো। তাই একজন অপরাধীকে সায়েস্তা করাটা বাঘ মারার চেয়ে কম কৃতিত্ব নয়" (পৃ.৫)। কথাগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের আভাস সজাগ পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না।

'জয়বাবা ফেলুনাথ' (১৯৭৬) রহস্যের ঘটনাস্থল প্রাচীন শহর বারাণসী। গোয়েন্দা গল্প পড়ে শিশুর মন কিভাবে কাল্পনিক হিরোর সঙ্গে একাত্ম হতে পারে-- তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ গল্পের রুকু চরিত্রে। এই গল্পেই পাঠকের প্রথম পরিচয় হয় ভিলেন মগনলাল মেঘরাজের সঙ্গে—; পরে কয়েকটি উপন্যাসে এই চরিত্র আবার ঘুরে আসে— একটি ছাঁচেঢালা টাইপ, villain চরিত্র হিসাবে। এ গল্পে বুদ্ধির পরীক্ষায় ফেলুদা ছাড়িয়ে যায় প্রথম বুদ্ধিমান ও রহস্যপ্রিয় গৃহকর্তাকে, এবং শেষ পর্যন্ত সমস্যা সমাধানে সফল হয়।

'গোরস্থানে সাবধান' (১৯৭৯) কলকাতা শহরের পটভূমিতে লেখা এক অনবদ্য রহস্য কাহিনী। কাহিনী গডউইন পরিবারের দুষ্কর্ম নিয়ে লেখা হলেও পুরোনো কলকাতা এখানে একটি জীবন্ত চরিত্ররূপে উপস্থিত। ফেলুদার মতে "দিল্লী-আগ্রার তুলনায় কলকাতা খোকা শহর হলেও এটাকে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়... কিন্তু... একটা সাহেব মশামাছি সাপব্যাঙ বনবাদাড়ে ভরা মাঠের একপ্রান্তে গঙ্গার ধারে বসে ভাবল এখানে সে কুঠির পত্তন করবে, আর দেখতে দেখতে... একশো বছর যেতে না যেতে গড়ে উঠল এমন একটা শহর যার নাম হয়ে গেল সিটি অফ প্যালেসেজ" (পৃ. ২)। ফেলুদা বলছে ইতিহাসের কলকাতার কথা। উপন্যাসটির ঐতিহাসিক মাত্রা অস্বীকার করার নয়। গল্পবলার গুণে অতীত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রহস্যভেদে দেখা যায় ফেলুদার অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায় জীবন্ত বিশ্বকোষ সিধুজ্যাঠাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ গল্পেও অতীত-বর্তমান এবং মৃত-জীবিতের মধ্যে সেতুবন্ধনে প্ল্যানচেটের ভূমিকা রয়েছে। এখানে কলকাতাতে বসেই ফেলুদা এই "রক্ত-হিম-করা রহস্যজালের' জট খোলে।

'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' (১৯৮১) উপন্যাসে রোমাঞ্চকর ঘটনাটা ঘটে হাজারিবাগে তখন সেখানে ফেলুদা, লালমোহনবাবু ও তোপ্‌সে সকলেই উপস্থিত। কাহিনীর শুরুতে মনে হয় বাঘপালানোর চাঞ্চল্যকর সংবাদের মধ্যেই বোধহয় রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু সত্যজিতের গল্পে কোনো ডিটেলই অতিরিক্ত নয়। কারণ এই বাঘের ট্রেনার/রিংমাস্টার কারাণ্ডিকারই, দেখা যায়, এই রহস্যের সঙ্গে বিস্ময়করভাবে যুক্ত। এক রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বেরিয়ে যায় আর এক রহস্য— , এ কাহিনীর পরতে-পরতে রহস্যের চমক। এক রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে ফেলুদা উন্মোচিত করে আর এক গুপ্তসত্য— মহেশ চৌধুরীর অপরাধ।

'হত্যাপুরী' (১৯৮১) গল্পে অত্যন্ত নাটকীয়ভাব খুনের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে— চিত্রময়ী, প্রায় সিনেম্যাটিক্ ভঙ্গিতে। গল্পের স্ট্রাকচারে একটা বিশেষত্ব আছে। "ডুংরুর কথা" অংশটা এখানে একটা prologue-এর মতো ব্যবহৃত হয়েছে, তারপর আরম্ভ হয়েছে অধ্যায়। Prologue এবং অধ্যায়মালার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনো সম্পর্ক না

থাকলেও, কাহিনীর উপসংহারে বোঝা যায় সমগ্র গল্পটির সঙ্গে এই ভূমিকাটিও organically সম্পর্কিত।

'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' (১৯৮২)—অকুস্থল কাঠমাণ্ডু। নকল যমজের রহস্যভেদ করে সত্য-অন্বেষণে সফল হয় ফেলুদা। এখানেও উপস্থিত সেই ভিলেন চরিত্র—মগনলার মেঘরাজ, এই ধুরন্ধর প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে আগেই লড়েছে ফেলুদা 'জয়বাবা ফেলুনাথ' উপন্যাসে। গল্পটি প্রায় নেপালের গাইডবুক হয়ে দাঁড়ায়। রহস্যকেন্দ্রিক প্লট এবং ঘটনাস্থলের অনুপুঙ্খ বর্ণনা সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। ফেলুদা narrator তোপ্‌সেকে সাবধান করে দেয় যাতে কাঠমাণ্ডু অ্যাডভেঞ্চারের এই বিবরণ "ফেলুদা সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনী যেন টুরিস্ট গাইড না হয়ে যায়" (পৃ.৪৩)।

'টিনটোরেটোর যীশু'র (১৯৮৩)পটভূমি ফেলুদার ভাষায় 'প্রাচোর লণ্ডন' অর্থাৎ হংকং। এ গল্পেও "রুদ্রশেখরের কথা (১)" শীর্ষক একটি প্রবেশক অংশ আছে। তারপর শুরু হয় আসল গল্প— রেনেসাঁসের বিখ্যাত শিল্পী টিনটোরেটোব আঁকা যীশুখ্রীস্টের আসল ছবি উদ্ধার করার রহস্য। গল্পের পরবর্তী অংশ "রুদ্রশেখরের কথা (২)" তাঁর নিজের জবানীতে লেখা নয়, omniscient প্রথম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, এখানে 'point-of-view' বদলে যায়, ফেলুদার উল্লেখও থাকে না।

'দার্জিলিং জমজমাটে'র (১৯৮৭) পটভূমি আবার দার্জিলিং। "ফেলুদার গোয়েন্দাগিরির শুরু এই দার্জিলিং-এই", "দার্জিলিং ফেলুদার খুব প্রিয় জায়গা কারণ এত বৈচিত্র্য আর কোনো প্রদেশে পাওয়া যায় না। এখানে একই সঙ্গে পাওয়া যায় শস্যশ্যামলা, রুক্ষতা। সুন্দরবনের মতো জঙ্গল, গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনার মতো নদী, সমুদ্র, আবাব উত্তরে হিমালয় অর কাঞ্চনজঙ্ঘা।" এ কাহিনীতেও পটভূমির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। রহস্যের ঘটনার সঙ্গে মিলেমিশে যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার বর্ণনা, মেঘলা আকাশ, পড়ন্ত রোদের সোনার রঙ, সূর্যের গোলাপী রঙ, লালটালির ছাদওয়ালা কাঠের বাংলোবাড়ি, সুন্দর বাগান, ঘন ঝাউবন, খাড়াই পাহাড় আর ঝলমলে রুপোলি।

'নয়নরহস্য' (১৯৯১) সম্ভবত সত্যজিতের শেষ ফেলুদা-উপন্যাস। পাঠকের অভিযোগ দিয়ে আবম্ভ হয় গল্প— ফেলুদা ম্রিয়মাণ, ছাপ্পান্নখানা চিঠিতে একই অভিযোগ করে পাঠক (প্লুরাল): "ফেলু মিত্তিরের মামলা আর তেমন জমাটি হচ্ছে না, জটায়ু আর তেমন হাসাতে পারছেন না, তপেশের বিবরণ বিবর্ণ হয়ে আসছে..., এককথায় 'থ্রী মাসকেটিয়ার্স'-এর অকাল বার্ধক্য দেখা দিয়েছে..."। পাঠক প্রধানত কিশোর-কিশোরী বলেই ফেলুদা সব মামলার বিবরণ তাদের দিতে পারে না, তাছাড়া এবার আবার তোপ্‌সেকে গাইড করবে বলে ফেলুদা মনস্থ করে। এ গল্পের মূল বিষয় ম্যাজিক—বালক জ্যোতিষ্ক, যে সংখ্যায় সবকিছুর উত্তর দিতে পারে— সে নিজেই এক চূড়ান্ত চমক। তার আসল নাম নয়ন; তাকে নিয়ে ব্যবসা করে ম্যাজিশিয়ান তরফদার— শেষে নয়নই হয়ে দাঁড়ায় রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু। শেষ পর্যন্ত রহস্যের কিনারা করে ফেলুদা, নয়নকে লোভী দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করে।

পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ছাড়াও ফেলুদাকে নিয়ে বেশ কিছু ছোট এবং বড় গল্পও লেখা হয়েছে। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত "আরো এক ডজন" গল্প-সংকলনে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে তিনটি ফেলুদা-রহস্যকাহিনী; তিনটি কাহিনীই ভিন্নস্বাদের— "শেয়ালদেবতা রহস্য" "সমাদ্দারের

চাবি" এবং "ঘুরঘুটিয়াব ঘটনা"। প্রথমটি চারহাজার বছরের পুরোনো মিশরদেশের শেয়ালমুখী দেবতা আনুবিসের মূর্তি উদ্ধার রহস্য। দ্বিতীয় গল্প— "সমাদ্দারের চাবি"— একটি অসামান্য গোয়েন্দা গল্প। গল্পবলার ভঙ্গিতে যথেষ্ট মুনসীয়ানা লক্ষ্য করা যায়। এ গল্পও ভায়োলেন্স-বর্জিত ; খুনেব বহস্য কিনারা নয়, মূলত 'চাবি' কথাটার প্রকৃত অর্থের মধ্যেই নিহিত রয়েছে রহস্যের চাবিকাঠি। সংগীতশাস্ত্রে সম্যক ও গভীব জ্ঞান না থাকলে এ ধরনের গল্প লেখা সম্ভব নয়। চাবি—অর্থাৎ octave-এর/আটটা সুরের 'Key'— এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন মৃত্যুর আগে রাধারমণ সমাদ্দার। তাঁর সঞ্চিত অর্থ লুকোনো ছিল মেলোকর্ড নামে octave-সম্বলিত একটা যন্ত্রের মধ্যে। রাধারমণের উদ্ভাবনীশক্তি আর জার্মানিব স্পীগ্‌লার কোম্পানিব কাবিগরি মিলে তৈবি এই মেলোকর্ড— এই মেলোকর্ডই রাধারমণেব ব্যাঙ্ক। 'আমাব নামে চাবি'— অর্থাৎ রাধাবমণের নামে চাবি ; "রাধারমণ সামদ্দার অর্থাং রে ধা রে মা ণি সা মা দা দা রে — কী সহজ অথচ কী ক্লেভার, কী চতুব এই ব্যবস্থা!" শাণ দেওয়া বুদ্ধির খানিকটা অংশ খাটিয়ে এই মনধাঁধানো জটিল রহস্য সমাধান করে ফেলুদা।

তৃতীয় রহস্য কাহিনী "ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা" প্রধানত খুনের গল্প। ছেলে বাবাকে খুন করে, সিন্দুকের সাংকেতিক সংখ্যার অর্থ জানতে চায়; শিক্ষিত টিয়া জানে সেই সাংকেতিক শব্দসমষ্টি- "ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন— একটু জিবো"-- ফেলুদাব শাণিত বুদ্ধিতে সংকেতেব অর্থ বেরিয়ে পড়ে— থ্রি নাইন জিবো থ্রি নাইন এইট টু জিরো।

'ফেলুদা অ্যাণ্ড কোং' (১৯৭৯)— সংকলনে রয়েছে দুটি গল্প— "বোম্বাই-এব বোম্বেটে" আর "গোঁসাইপুব সরগরম"। এ দুটি গল্পের প্যাটার্ন একটু অন্যরকম, কাবণ ফেলুদা ছাড়াও অন্য দুটি পার্শ্বচরিত্র লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু এবং তোপ্‌সে এখানে তুলনামূলকভাবে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। বিখ্যাত নওলাখা হাব চোরাইমাল হিসাবে পাচার হওয়াব কাহিনীতেও লালমোহনবাবুকে সচেতনভাবেই highlight করা হয়েছে। 'আরো বারো' গল্প-সংকলনে রয়েছে ফেলুদার রহস্য-অ্যাডভেঞ্চাব "গোলোকধাম বহস্য"। এ গল্পও ভায়োলেন্স বর্জিত। লক্ষ্যণীয় তোপ্‌সের জবানীতে গল্প বলা হলেও, প্রকৃতপক্ষে ফেলুদাই এই narrator-এর গাইড। কিভাবে লিখতে হবে এ বিষয়ে ফেলুদাই নির্দেশ দেয়, যেমন, "নতুন চরিত্র যখন আসবে, তখন গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে দিবি। তুই না দিলে পাঠক নিজেই একটা চেহারা কল্পনা করে নেবে; তারপর হয়ত দেখবে যে তোর বর্ণনার সঙ্গে তার কল্পনার অনেক তফাত" (পৃ ১০৫)।

'এবারো বারো' সংকলনে রয়েছে দুটি গোয়েন্দা কাহিনী— "অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য" এবং "জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা"। —প্রথম গল্পটিতে সমালোচক উল্লিখিত ত্রুটির জবাব লেখক নিজেই একটি ছোটমেয়ের (ঝর্ণার) কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন ঃ "তোপ্‌সে এত মিথ্যে কথা বলে কেন? —একটা বইয়ে লিখেছে ফেলুদা ওর মাসতুতো ভাই, আরেকটায় লিখেছে জ্যাঠতুতো ভাই—মিথ্যেই ত" (পৃ.৯৯)। আর একটি ছোটমেয়ের চরিত্র আমরা পাই "ছিন্নমস্তার অভিশাপ" উপন্যাসে—মেয়েটি দাদুর সঙ্গে হেঁয়ালীর খেলা খেলে এবং সেই হেঁয়ালির পথেই ফেলুদা রহস্যের ক্লু খুঁজে পায়। "জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা" গল্পেও লেখা নিয়ে তোপ্‌সেকে ফেলুদা উপদেশ দেয়—"গল্পের শুরুতেই একগাদা বর্ণনা হড় হড় করে ঢেলে দিলে পাঠক হাবুডুবু খায়; ওটা দিবি গল্পের ফাঁকে ফাঁকে" (পৃ. ১১৭)।

'ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু' (১৯৮৫) —এব দুটি রহস্য কাহিনীর নামঃ "নেপোলিয়নের চিঠি" এবং "এবার কাণ্ড কেদারনাথে"। প্রথম গল্পে নেপোলিয়নের চিঠিই রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু। এ গল্পেরও একটা ঐতিহাসিক মাত্রা আছে— অপূর্ব ভাব ও ভাষায় লেখা এই চিঠি লেখা হয়েছিল ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে। —"চিঠিটা তাঁব শেয চিঠিগুলিব মধ্যে একটা" (পৃ ৩৩)। 'এবার কাণ্ড কেদাবনাথে'- এক অথে উপন্যাস বহস্যোব সমাধান বলা যেতে পারে। কাহিনীতে ভ্রমণ-কাহিনীর উপাদানেব প্রাচুর্য লক্ষ্য কবাব মতো। পটভূমির অনুপুঙ্খ ভৌগোলিক বিবরণ আছে। ভ্রমণ-কাহিনীব ডিটেল লেখক justify কবেছেন পরোক্ষভাবে, ফেলুদার মুখ দিয়ে; যখন তাকে জিজ্ঞাসা কবা হয ''Why are you here? ফেলুদাব উত্তব "প্রধানত ভ্রমণেব উদ্দেশ্যে।" আবাব কাহিনীব মাঝামাঝি জায়গায় ফেলুদা বলে, "আমাদের এখানে আসাব প্রধান উদ্দেশ্য ভ্রমণ। তবে যদি কোনো গণ্ডগোল দেখি তাহলে গোয়েন্দা হয়ে আমাব নিজেকে সংযত বাখা খুবই মুশকিল হবে" (পৃ.৭৯)। ঘটনাচক্রে কাহিনীর শেষে উদ্‌ঘাটিত হয রহস্যোব নায়ক ভবানী উপাধ্যাযেব আসল নাম দুর্গামোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং তিনি লালমোহনবাবুব ছোটকাকা, এবং মহামূল্য লকেটটাব প্রকৃত উত্তরাধিকারী। 'একের পিঠে দুই' এই ছোটগল্প সংকলনে একটি গোয়েন্দা গল্প বয়েছে— "বোসপুকুরে খুন খারাপি"; গল্পটি প্রথমে 'সন্দেশে' বেরিযেছিল। শিরোনামে খুন-খাবাপি থাকলেও এ গল্পে খুনের প্রত্যক্ষ বর্ণনা নেই। একটি দুর্মূল্য, দুর্লভ বস্তু-- 'বেহালাকে (The only amati in India') কেন্দ্র করেই বহস্য ঘনীভূত হয়।

'ডবল ফেলুদা'য় (১৯৮৯) প্রকাশিত দুটি গল্প ঃ " অপ্সরা থিযেটারেব মামলা"এবং "ভূস্বর্গ ভয়ংকর"। "অপ্সরা থিয়েটারের মামলা" গল্পের প্রথমেই বযেছে ফেলুদার মুখে শার্লক হোম্‌সের প্রশস্তি। ফেলুদা স্বীকার করে তার সব শিক্ষাদীক্ষাই এই হোম্‌সের কাছে। রহস্য ঘটনা ঘটে রঙ্গমঞ্চে— আর অনায়াসেই এ রহস্যের জট খোলে ফেলুদা— "এবার বোধ হয় ঘরে বসেই রহস্যোদ্‌ঘাটন হয়ে গেল।"

"ভূস্বর্গ ভয়ংকর" গল্পের পটভূমি কাশ্মীর। এ গল্পেও প্ল্যানচেটেব একটা ভূমিকা রয়েছে। আর তুলনামূলকভাবে খুন এবং ভায়োলেন্সও খানিকটা আছে। মিঃ মল্লিক খুন হন এবং দেখা যায় নিজের ছেলের ফাঁসির দণ্ডের প্রতিশোধ নেয় বাবা (প্রয়াগ মিসির ছদ্মনামে হনুমান রাউত)। তিনজন তিনটি অপরাধের জন্য দায়ী হয়। কারণ আরও একজন (মিঃ সাপ্রু) তার বাবাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর জন্য প্রতিশোধ নেয়।

১৯৯০ সালের শারদীয় সংখ্যার 'সন্দেশে' বেরোয় আর একটি ফেলুদা-উপন্যাস— ''ডাঃ মুন্সীর ডায়রি''। পরে গল্পটি 'সেরা সত্যজিৎ' সংকলনেরও অন্তর্ভুক্ত হয়। মানুষের মনের জটিলতার বিষয়টি এ গল্পে আবার ঘুরে এসেছে। ফেলুদার মতে জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে আসল তফাৎ হল, "জানোয়ার ভান করতে জানে না, অভিনয় জানে না। মনের ভাব লুকোতে জানে না" ('সন্দেশ', অক্টোবর, ১৯৯০, পৃ. ৪২২)।

১৯৯২ সালের ২ মে লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'ফেলুদা প্লাস ফেলুদা'; এতে রয়েছে দুটি গল্প ঃ ''গোলাপী মুক্তা রহস্য'' (এটি 'সন্দেশে' আগে বেরিয়েছিল) এবং "লণ্ডনে ফেলুদা" (এটি 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল)। সোনাহাটিতে রহস্য উদ্‌ঘাটনে যায় ফেলুদা। সংবর্ধনায় গিয়ে রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ে, আবার সাক্ষাৎ হয় মগনলাল মেঘরাজের সঙ্গে; কিন্তু বুদ্ধির দৌড়ে ফেলুদারই জিৎ হয়। ফেলুদা এখন

পরিণত, সে এখন "অগুনতি কেস করছে", আর 'তার চোখে" তোপ্‌সের ভাষায়, "একটা দীপ্তি, সেটা বুদ্ধি পাকবার ফলে হয়েছে।"

"লণ্ডনে ফেলুদা" একটু অন্য ধরনেব বহস্য গল্প। প্রথমে মনে হয় সমস্যাটা এখানে অতি নগণ্য,- একজন পুরোনো বন্ধুকে সনাক্ত করা, একজন স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষকে সাহায্য করাই বোধহয় এ গল্পের থীম। ঘটনাটা ক্রমশ অপরাধ তথা হত্যার দিকে এগিয়ে যায়, রহস্য উদঘাটিত হয় শেষে— ক্যাম নদীতে নৌকো চালাতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যায় ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র পিটার ডেক্সটার। আরও দুটি খুন দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি হয়— মিঃ মজুমদার খুন হন এবং রেজিনাল্ড ডেক্সটাব আত্মহত্যা করে। বাকীটা বুদ্ধিমান পাঠক অনুমান করে নেয়।

৩

ইংরেজি ভাষায় গোয়েন্দাকাহিনী বা বহস্য-রোমাঞ্চ-কাহিনীব অনেকগুলি প্রতিশব্দ আছে —যেমন 'thriller', 'detective story', 'crime-story', 'mystery', 'adventure-mystery story' ইত্যাদি। যদিও প্রচলিত ব্যবহারে প্রায় সমার্থক এ শব্দগুলির মধ্যে বিভাজনের সীমারেখা অতি অস্পষ্ট। নীচের দুটি সংজ্ঞা অনুধাবন করলে কথাটার যাথার্থ্য সহজেই প্রমাণিত হয়। বলা হয়ে থাকে, "What happens in a mystery is always to be considered before how it happens. One half of the work is carpentry. The mystery novel has an intellectual attraction।" [২] অর্থাৎ যাকে 'mystery'উপন্যাস বলা হয় তার মধ্যে একটা বৌদ্ধিক আবেদন থাকে। আবার এও বলা হয়ে থাকে, "The emphasis in a detective novel is on the detection. The first or basic idea for a detective novel, therefore, is apt to be one of method— the way in which the crime was committed, the way in which the murdered fakes an alibi, the way in which the crime is solved।"[৩] এখানে লক্ষ্যণীয় তথাকথিত 'mystery'-গল্পের মধ্যেও ডিটেকটিভ গল্পের উপাদান থাকতে পারে— কিভাবে অপরাধ ঘটে— এই 'how'-এর ওপর জোর ডিটেকটিভ কাহিনীতেও থাকে। আবার 'mystery'— গল্পের মতো বৌদ্ধিক আকর্ষণ ডিটেকটিভ কাহিনীরও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই ইংরেজি প্রতিশব্দ অনুযায়ী গোয়েন্দাগল্পের সঠিক শ্রেণীবিভাজন করা রীতিমতো দুরূহ।

সত্যজিৎ বায়ের ফেলুদাসিরিজের গল্প-উপন্যাসগুলি খাঁটি ডিটেকটিভ গল্পের পর্যায়ে পড়ে, তথাকথিত অ্যাডভেঞ্চার-'mystery'গল্প বা পরীক্ষামূলক (experimental) নন— ফরমূলা পর্যায়ে পড়ে না। লেখক নিজে ছিলেন আর্থার কনান ডয়েলের বিশেষ অনুরাগী পাঠক। আবার আগাথা ক্রিস্টিও তিনি বিস্তর পড়েছিলেন। শরদিন্দুর রহস্যকাহিনীও তাঁকে যথেষ্ট আকর্ষণ করত।[৪] তাঁর গোয়েন্দাকাহিনীর নায়ক ফেলুদার মুখে শোনা যায় কনান ডয়েলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। এই কারণেই প্রচলিত গোয়েন্দাকাহিনীর ফর্ম এবং ট্রাডিশন তিনি কয়েকটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন।

যেমন প্রথমত, কনান ডয়েল বা শরদিন্দুর মতোই তাঁর গোয়েন্দাগল্পগুলি মূলত গোয়েন্দা-চরিত্র-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ কাহিনীর মূল আকর্ষণ—গোয়েন্দা চরিত্র,—ঘটনা পরম্পরা নয়। অনেক সময় পাঠকের একথাও মনে হতে পারে যেন ঘটনার বিন্যাস এই চরিত্রায়ণের

উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। তীক্ষ্ণ মননে, শাণিতবুদ্ধি র দীপ্তিতে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এবং ভদ্রতায় ও রুচিবোধে সত্যজিতের ফেলুদা ব্যোমকেশের যথার্থ উত্তরসূরী।

দ্বিতীয়ত, ফেলুদার গল্প লেখা হয়েছে তোপ্সের 'point-of-view' থেকে, ঠিক যেমন অজিতের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে ব্যোমকেশের রহস্যকাহিনী। ফেলুদার কাহিনীতে তোপ্সেই 'first-person narrator' এবং এটি archetypal কিশোরের দৃষ্টিভঙ্গি। তোপসে ফেলুদার এক অনুরাগী ভক্ত, আবার সে একজন বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষকও বটে। টিনটিন ও অন্যান্য গোয়েন্দা উপন্যাসের জারকরসে জীরিত তার সজাগ চেতনার দর্পণে ফেলুদার চরিত্রের প্রতিটি দিক নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তোপ্সের Point-of-view এই কাহিনীতে একাধারে জীবন্ত চরিত্রায়ণের এক অনবদ্য device এবং পাঠক ও লেখকের মধ্যে হেনরি জেমস্-কথিত 'mutual irradiation'-এর এক সার্থক জমি।

তৃতীয়ত, রহস্যকাহিনীর জটিল গ্রন্থিমোচন অর্থাৎ এর ক্ষেত্রেও তিনি ট্র্যাডিশনাল প্যাটার্নটিই অনুসবণ করেছেন। স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ভিত্তিতে deductive method নয় বরং যুক্তির সোপান বেয়ে, কোনো সূত্র বা ক্লু ধরে অগ্রসর হওয়ার inductive methodই অনুসরণ করেছে ফেলুদা। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় কাহিনীর মূল স্ট্রাকচারটিও গোয়েন্দাকাহিনীর প্রচলিত গৎ-এ বাঁধা। তুলনামূলকভাবে নিরুত্তাপ, নিরুপদ্রব আবহাওয়ায় শুরু, রঙ্গমঞ্চে জনৈক আগন্তুকের প্রবেশ অথবা কোনো বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়ে তৈরি হয় কাহিনীর 'exposition'; প্রথমে রহস্যের আভাস-- পরে রহস্যের ঘনঘটা -- ক্রমশ রহস্যের জাল জটিলতর হতে থাকে— যাকে তাত্ত্বিক ভাষায় বলা হয় 'discriminated occasion', তারপর কাহিনী অপ্রত্যাশিত, চমকপ্রদ মোড় নেয় (Peripetcia), শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির পথে সমাধান ও গ্রন্থিমোচন এবং পরিশেষে 'resolution'-- সেখানে পাঠকের কাছে রহস্যের গ্রন্থিমোচনের প্রতিটি স্তরের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা দেন সফল গোয়েন্দা।

ট্র্যাডিশনাল ডিটেকটিভ কাহিনীর সঙ্গে এই ধরনের আঙ্গিকগত কয়েকটি সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, আমার মনে হয় সত্যজিতের ফেলুদাসিরিজের গল্প-উপন্যাসগুলিকে ঠিক গতানুগতিক ছকবন্দী ডিটেক্‌টিভ গল্প বলা যায় না। কারণ গোয়েন্দাকাহিনী হলেও, এই গোয়েন্দাকাহিনীর কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল সত্যজিতের গোয়েন্দাকাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র ফেলুদা তথাকথিত গোয়েন্দাকাহিনীর ছাঁচেঢালা চরিত্র নয়। ব্যোমকেশের উত্তরসূরী হলেও, ব্যোমকেশের মতো পরিবারের পরিমণ্ডলে তাকে উপস্থাপিত করা হয়নি। এই সিরিজের গল্পে মুখ্য ভূমিকা তার একার— ওয়াটসন বা অজিতের মতো তার তেমন কোনো সাহায্যকারী নেই। ঘটনায় তোপ্সের ভূমিকা নিতান্ত গৌণ, বড়জোর তাকে 'functional narrator' বলা যেতে পারে। আর লালমোহনবাবু আছেন সাধারণ সাদামাটা মানুষের 'archetype এবং কমিক রিলিফ হিসাবে। এবং এই দুটি চরিত্র কোনোভাবেই লেখকের পরিকল্পনার সীমানা ছাড়িয়ে যায় না। কাহিনীতে 'থ্রী মাস্‌কেটিয়ার্স' কথাটা বারবার ব্যবহৃত হয়েছে বটে কিন্তু যৌথ উদ্যোগ ততটা সার্থক ও বিশদভাবে রূপায়িত হয়নি। সত্যজিতের সৃষ্টি এই ত্রয়ী নিঃসংশয়ে অতিমাত্রায় জীবন্ত এবং convincing হলেও, সাবেকি বাংলা ডিটেকটিভ গল্পের 'ত্রিশূল'-প্যাটার্ন তিনি অনুসরণ করেননি।

দ্বিতীয়ত, গল্পগুলিতে তোপ্সে 'narrator' হলেও এক্ষেত্রে ফেলুদার ভূমিকা যথেষ্ট

গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দেখা যায় তোপ্‌সের লেখা নিয়ন্ত্রণ করছে ফেলুদাই– এই নেপথ্য, পরোক্ষ Guide-narrator-এর ভূমিকাটি লক্ষ্য করার মতো। ফেলুদাই তোপ্‌সেকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কিভাবে কাহিনী আরম্ভ করলে পাঠককে সুড়সুড়ি দেওয়া যাবে, "একগাদা বর্ণনা দিলে পাঠক বিরক্ত হতে পারে" বা "জায়গাব বর্ণনা দিতে গিয়ে যেন বইটা" guide-book না হয়ে দাঁড়ায়। আবাব শেযেব দিকের গল্পে দেখা যায় পরিণত ফেলুদা পাঠকের কাছে তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওযায় বেশ চিন্তিত এবং কিভাবে এই হৃত-জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব এ বিষযে লেখক narrator তোপ্‌সের সঙ্গে সিরিয়াস আলোচনারত। ফলে তোপসে থাকা সত্ত্বেও, ফেলুদা যেন পরোক্ষে একটা 'centre of consciousness'-এর ভূমিকা পালন করছে। গল্পবলাব টেকনিকের দিক থেকে এটি নিঃসন্দেহে এক অভিনবত্ব।

আর একটি প্রশ্ন এখানে অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে যায়। ফেলুদার চরিত্র কি 'idealized'? অর্থাৎ ফেলুদা কি অবিশ্বাস্য রকমের আদর্শ ডিটেকটিভ? তার অশেষ গুণ, অনেক দক্ষতা, বহুবিদ্যায় সে পারঙ্গম, তার প্রখর বুদ্ধি আছে, গোয়েন্দাসুলভ পর্যবেক্ষণশক্তি আছে, আর আছে জ্ঞানের অদম্য তৃষ্ণা; তাছাড়া সে ভদ্র, মার্জিত ও রুচিবান। সে কখনো ব্যর্থ হয় না ঠিকই কিন্তু এটাও লক্ষ্য করার মতো লেখক ফেলুদাকে বুদ্ধিবলে কখনও সুপারহিরো হয়ে উঠতে দেননি। ফেলুদার মতো গোয়েন্দাকে বাস্তবানুগ (Life-Like) এবং বিশ্বাস্য করে তোলার জন্যই পাশাপাশি রাখা হয়েছে পরোক্ষভাবে কাল্পনিক স্তরে লালমোহনবাবুর সুপারহিরো গোয়েন্দা প্রখর রুদ্র, যে অবলীলাক্রমে ভুল তথ্য সরবরাহ করতে পারে এবং সাতটা গুলি খেয়েও বেঁচে থাকে। 'মিত্তির'— ফেলুদার পদবীর এই সাদা মধ্যবিত্ত বাঙালী উচ্চারণেই গোয়েন্দাব সঙ্গে পাঠকের দূরত্ব কমে যায়, অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া লাগে। বাঙালীয়ানায় অভ্যস্ত, কয়েকটি ঘরোয়া অভ্যাসে-আচরণে, অমায়িকতায সে পাঠকের নিতান্ত কাছের মানুষ বলে প্রতিভাত হয়। ফেলুদাকে সত্যজিৎ গোয়েন্দাগল্পের 'framed' চরিত্র হতে দেননি, কোনো mannerism– দ্বারা তাকে চিহ্নিত করেননি যেমন লেখকের নিজের মতে হেমেন্দ্রকুমার রায় সুন্দরবাবুর চরিত্রে করেছিলেন-- "এখন হেমেন্দ্রকুমার পড়ে আমার মনে হয় তাঁর লেখায় সফিস্টিকেশন খুব বেশি নেই। যেমন তাঁর চরিত্রগুলো তৈরি চরিত্র নয়। এবং সেই চরিত্রগুলোয় কতকগুলো ম্যানারিজ্‌ম তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। যেমন সুন্দরবাবু খালি 'হুম' করেন। একটা হুমের ব্যাপার আছে, ওই হুম দিয়েই মজা আর কি।"[৫]

সত্যজিতের প্রায় প্রতিটি গোয়েন্দাকাহিনীতেই আমরা দেখি ফেলুদা কখন কী সিদ্ধান্ত নেবে বা তার প্রতিক্রিয়া কী হবে একথা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। গোয়েন্দাচরিত্র খুব সহজেই টাইপ চরিত্রয় যেতে পারে কিন্তু সত্যজিৎ সচেতনভাবে তাকে নিছক টাইপে পর্যবসিত হতে দেননি। চরিত্রটিকে কয়েকটি মানবিক গুণের অধিকারীও করেছেন— তার মধ্যে প্রধান হল শিশুদের সঙ্গে তার আচরণ। অনেক সমালোচকের মতে ফেলুদা লেখকের 'alter ego' অর্থাৎ সত্যজিতের দ্বিতীয় ব্যক্তিসত্তা।[৬] নিজের আদলে তিনি তাঁকে গড়ে নিয়েছেন– নিজের শিক্ষা, রুচিরসবোধকে তাঁর মধ্যে অনায়াসে সঞ্চারিত করেছেন। ফেলুদা এক উঁচুমাপের মানুষ, তাঁর অগাধ অধ্যয়ন, অধ্যবসায় ও তীব্র অনুসন্ধিৎসা। তিনি মার্জিত, পরিশীলিত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, গায়ে পড়ে আলাপ করা পছন্দ করেন না ইত্যাদি। এই অভিমত আংশিক সত্য হলেও, সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ

লালমোহনবাবুর মধ্যেও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি লেখক—সত্যজিতের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। লেখক হিসাবে তাঁর স্বীকৃতি, তাঁর রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পের অনুপ্রাস ঝঙ্কারিত শিরোনাম— হংকংএ হিমশিম, সাহারায় শিহরণ, মাঞ্চুবিয়ার রোমাঞ্চ, হণ্ডুরাসে হাহাকার—তুলনীয় লেখকের গোয়েন্দাকাহিনীর শিরোনাম—কৈলাসে কেলেঙ্কারি, যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে, গ্যাংটকে গণ্ডগোল, দার্জিলিং জমজমাট, এবাব কাণ্ড কেদারনাথে ইত্যাদি। অথবা বলা যায়, লালমোহনবাবুর দর্পণে নিজের লেখা বহস্য উপন্যাস সম্পর্কে একটা detached, অতি পরিশীলিত, সূক্ষ্ম irony উপভোগ করাই ছিল তাঁব উদ্দেশ্য।

সত্যজিতের গোয়েন্দাকাহিনীর আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কাহিনীর পটভূমি বা অকুস্থলের বিরাট ভূমিকা। তাঁর প্রতিটি গোয়েন্দা গল্পেই ঘটনাস্থল যেন সমান্তরালভাবে উপস্থাপিত একটি জীবন্ত চরিত্র। এ প্রসঙ্গে এখানে তাঁব নিজের কয়েকটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন ঃ "জিওগ্রাফি ছাড়াও নানারকম ইনফরমেশন জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। ফেলুদার কথাও ধরুন। ফেলুদা তো আর সারা পৃথিবী ঘোরে না। ফেলুদার গণ্ডী হচ্ছে ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষের মজাদার জায়গাগুলোতে সে যায়। বাজস্থানই বলুন, সিকিমই বলুন, কিংবা বেনারসই বলুন— জায়গাগুলো মোটামুটি আমার দেখা। এবং অমি মুগ্ধ হয়েছি বলেই আমার নিজের ফীলিং-এর কিছুটা পাঠকের মধ্যে সঞ্চাবিত কবতে চেয়েছি। সেই জায়গাগুলোকে যথাসম্ভব জ্যান্ত করে তুলতে চেষ্টা করেছি। শুধু গল্প নয়, প্লট নয়, তার বাইরে বায়লজি, অ্যাস্ট্রোনমি, আর্কিটেকচার ইত্যাদি নানা বিষয়ে যতরকম ইনফরমেশন দেওযা যায়— দেওয়ার চেষ্টা করি। সেটা অবশ্যই গল্পের রস বা গতিকে ব্যহত না করে।"[২]

আমার মনে হয় যেহেতু অপরাধমূলক ঘটনাটিকে তিনি বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত না করে একটি বিশেষ স্থানের সঙ্গে একীভূত (integrate) করতে চেয়েছেন, বোধকরি সেজন্যই তিনি কাহিনীর শিরোনামের সঙ্গে অকুস্থলের নামটিও বিশেষভাবে জুড়ে দিয়েছেন—লক্ষ্যণীয়—কৈলাসে কেলেঙ্কারি, গ্যাংটকে গণ্ডগোল, দার্জিলিং জামজমাট, গোরস্থানে সাবধান, যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে, এবাব কাণ্ড কেদাবনাথে, ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা, লণ্ডনে ফেলুদা, বোসপুকুরে খুনখারাপি, বোম্বাইয়ের বোম্বেটে, ভূস্বর্গ ভযংকর, গোঁসাইপুর সরগরম, হত্যাপুরী (ঘটনাস্থল 'পুরী') ইত্যাদি। পটভূমির এই অতিরিক্ত ভূমিকা তাঁর গোয়েন্দাকাহিনীতে ভ্রমণকাহিনী বা travelogue-এর স্বাদ এনে দেওয়া ছাড়াও একটা নতুন শিক্ষামূলক মাত্রা যোগ করেছে। ফলে গোয়েন্দাকাহিনীর পুরো ফর্মটাই অনেকটা বদলে গেছে। এছাড়াও আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। সেটি হল ফেলুদা সিরিজের প্রায় প্রতিটি গল্পই বিস্ময়করভাবে horror-element-বর্জিত। গোয়েন্দা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হত্যা, অপরাধ, কিন্তু সত্যজিতের লেখায় হত্যার বিবরণ অধিকাংশ সময়েই পরোক্ষভাবে পাঠকের কাছ উপস্থাপিত হয়, আব এই বিবৃতিও অতি সংযত। বেশ কয়েকটি গল্পে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিকের অবতাবণা করা হয়েছে কিন্তু সেগুলি কখনই নিছক 'Sensetional' অথবা 'melodramatic' হয়ে ওঠেনি। কাহিনীর মোড়ে মোড়ে পাঠকের জন্য তিনি চমক সৃষ্টি করেছেন,কাহিনীতে unpredictability-ব উপাদানও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে— এ সবই ভালো গোয়েন্দা কাহিনীর বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তাঁর লেখায় অবিশ্বাস্য গিমিক-এর (incredible gimmick) অস্তিত্ব একেবারেই নেই। নেই বিশুদ্ধ

ভায়োলেন্সের বিশদ অবতারণা যেটি যে-কোনো 'mystery-adventure' গল্পের প্রধান উপাদান (Staple)। রোমহর্ষক না হয়েও কাহিনী যথেষ্ট রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে এবং পাঠককে ধরে রাখতে পারে তাঁর শৈল্পিক উপস্থাপনার প্রসাদগুণে।

অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে "his detective stories are like works of art, too neatly executed, unlike real life"[৮]— এই ভাষ্যটি মেনে নেওয়া যায় না। এখানে সমালোচক 'unlike real life' বলতে সম্ভবত কৃত্রিমতা ও অবাস্তবতাই বুঝিয়েছেন। বাক্যটির মধ্যে একটি স্ববিরোধ লক্ষ্য করা যায়। কারণ সত্যজিতের গোয়েন্দা গল্পের প্লট এবং তার execution অবশ্যই উচ্চমানের শিল্পকর্মের মতো হলেও তার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা একেবারেই নেই, তাঁর প্রতিটি গল্পের মূল বাস্তবতার গভীরে। এবং একথা বলা বাহুল্য কৃত্রিমতার আভাস থাকলে সে শিল্প কখনই উচ্চমানের হতে পারে না। বর্ণনার মুন্সীয়ানায়, ভিস্যুয়াল ডিটেলের প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ততায় তিনি অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস্য করে তুলেছেন, সহৃদয় পাঠকমাত্রই এ বিষয়ে একমত হবেন। 'সহৃদয়' বলতে অবশ্য আমি এখানে নিছক 'Sympathetic reader' গুণগ্রাহী পাঠককে বোঝাচ্ছি না, 'সহৃদয়' অর্থাৎ (সহৃদয় সম্বাদী) অর্থাৎ যিনি text টির সঠিক রসগ্রহণে সদর্থকভাবে ইচ্ছুক এবং যার সঙ্গে 'Critical reader' -এর কোনো বিরোধ নেই।[৯]

গল্পে কিছু ছোটখাটো ত্রুটির উল্লেখ করতে গিয়ে সমালোচক এই ভেবেও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে 'সোনার কেল্লা' উপন্যাসে হেমাঙ্গ হাজরার চেহারা সম্বন্ধে মুকুলের বাবাকে ফেলুদা কেন প্রশ্ন করেনি[১০] — এ সম্বন্ধে একটি যথাযথ পালটা প্রশ্ন করা যেতে পারে— যেমন ফেলুদার সঙ্গে যদি হেমাঙ্গ হাজরার ছবি থাকত, তাহলে রহস্য দানা বাঁধত কী করে? প্লট দাঁড়াত কী করে? আর যদি ধরে নেওয়া যায় ফেলুদার পক্ষে এটি একটি ত্রুটি তাহলে চরিত্রটির বিরুদ্ধে কৃত্রিমতা অথবা idealization-এর অভিযোগ[১১] ধোপে টেঁকে না, সিরিজটিকে নাটক, পরিবেশ ও চরিত্র মিলিয়ে, বিচিত্র ফর্ম আর ভাঙা ফরমুলার সমন্বয়ে এক সার্থক সাহিত্যকর্ম বলে মেনে নিতে হয়।

তথ্যপঞ্জী

১ সুকুমার সেন : 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি', পৃ ১-৩, পৃ.১৪-১৫।
২. Marie.F.Rodell: "Mystery Fiction", Theory and Technique, পৃ. ৯৬।
৩. তদেব : পৃ.১২।
৪. শ্যামলকান্তি দাশ (সম্পাদিত) : 'লেখক সত্যজিৎ', পৃ. ১০৩।
৫. তদেব : পৃ. ১০৩।
৬. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : "সত্যজিতের অলটার ইগো", 'লেখক সত্যজিৎ', পৃ. ৯৮
৭. সাক্ষাৎকার : অরুণ বাগচী, 'লেখক সত্যজিৎ', পৃ. ১০৩।
৮. লীলা মজুমদার: "Classic Detective, Prim and Proper" The Statesman, ৬ নভেম্বর, ১৯৮৮
৯. অতুলচন্দ্র গুপ্ত: "ধ্বনিতত্ত্ব", 'কাব্যজিজ্ঞাসা'।
১০. নন্দরাণী চৌধুরী: "ফেলুদার সঙ্গে ভুলভুলাইয়ায়", 'সত্যজিৎ রায় ঃ ভিন্ন চোখে', সম্পাদক, শীতলচন্দ্রঘোষ ও অরুণকুমার রায়, পৃ. ১৩০।
১১. তদেব ঃ লীলা মজুমদার, "Feluda is perfect. never makes a fool of himself."

ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু

সুপ্রিয় সেন

সত্যজিৎ প্রফেসর শঙ্কুকে সৃষ্টি কবেন এবং যতদুব জানি 'সন্দেশ' পত্রিকার শঙ্কুর প্রথম গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' প্রকাশিত হয। আবম্ভটি করেছেন তাবকবাবুব কাছ থেকে একটি লাল খাতা প্রাপ্তি থেকে। ডায়েরিটা পাওয়া গেছে সুন্দববনে এক উল্কাপাতের গহ্বব থেকে। ডায়েরিটার কালির রং ঘন ঘন পাল্টে যায়। যে কাগজে ডাযেরি লেখা তাতে কুকুর দাঁত বসাতে পাবে না, হাত দিয়ে টেনে ছেঁড়া মানুষের সাধ্য নয। টানলে রবারের মত বেড়ে যায় আর ছাড়লে যে কে সেই। খাতার কাগজ আগুনে পোড়ে না। পাঁচ ঘণ্টা উনুনে রেখে দিলেও তার কিছুই হয় না।

শঙ্কুর পববর্তী যতগুলি গল্প বেরিয়েছে, সবই তাঁর ডায়েরি থেকে। এছাড়া কোন উপায় ছিল না, কেননা প্রথম গল্পেই বলা আছে প্রফেসর শঙ্কু নিরুদ্দেশ। তাঁর সম্বন্ধে নানান গুজব চালু। শেষ পর্যন্ত শঙ্কু আত্মপ্রকাশ কবেন নি। কেবল ডায়েরি থেকে এক একটি উপাখ্যান বেরিয়েছে। তারও মুখবন্ধ আছে। সেটি নিম্নরূপ...

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু বেশ কয়েকবছর যাবৎ নিখোঁজ। তাঁর একটি ডায়রি কিছুদিন আগে আকস্মিকভাবে আমাদের হাতে আসে। 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' নাম দিয়ে আমরা সন্দেশে ছাপিয়েছি। ইতিমধ্যে আমি অনেক অনুসন্ধান করে অবশেষে গিরিডিতে গিয়ে তাঁর বাড়ির সন্ধান পাই; এবং তাঁব কাগজপত্র, গবেষণার সরঞ্জাম সব কিছুরই হদিস পাই। কাগজপত্রের মধ্যে আরো একুশখানা ডায়রি পাওয়া গেছে। তার কয়েকটি পড়েছি, অন্যগুলো পড়ছি। প্রত্যেকটিতে কিছু না কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। তার মধ্যে একটি নিচে দেওয়া হল। ভবিষ্যতে আরো দেওয়ার ইচ্ছে আছে।

এইবার যে গল্পটি বের হল সেটি 'প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়'। কিন্তু এই মুখবন্ধটি দিয়ে সত্যজিৎ নিজেকে বেঁধে ফেললেন। পরবর্তী সমস্ত গল্পগুলোকেই তাঁকে একই আঙ্গিক, অর্থাৎ ডায়েরির ফর্মে বের করতে হল। যেহেতু শেষ পর্যন্ত প্রফেসর শঙ্কু আত্মপ্রকাশ করেনি, তাই প্রায় সব গল্পই দিনানুক্রমিক দিনপঞ্জীর বর্ণনা। দ্বিতীয় গল্পটি অর্থাৎ 'প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়' সব কিছু ঘটে যাওয়ার পর এক নিঃশ্বাসে আদ্যোপান্ত বর্ণনা। কিন্তু এটি ছাড়া আর সবকটি গল্পই কয়েকটি দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ। এই একই আঙ্গিক অনুসরণ করে যাওয়ার ফলে সবকটি গল্পের ছক বা প্যাটার্ণ একইরকম এবং তার ফলে অবশ্যই পাঠকের কাছে আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যের অভাবে একটু পৌনঃপুনিক। বোঝা শক্ত কেন সত্যজিৎ অন্ততঃ কিছু গল্পে অন্যরকম ভাবলেন না। একথা অবিশ্বাস্য যে গল্পগুলির এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না।

দিনলিপির প্রথম দিকে গল্পের স্থান কাল পাত্রের ইনট্রোডাক্শন, পাঠকের সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ক্রমশঃ রহস্যের জটিলতা যেটা পরপর কয়েকদিনের ডায়েরিতে বিধৃত। তারপর ক্লাইম্যাক্স ঘটে যাবার পর অন্তিম দিনে ডায়েরি এবং অধিকাংশ গল্পের শেষে একটি চমক। মোটামুটি এই প্রণালীতেই সব গল্পগুলি লেখা।

বই হয়ে ধারাবাহিক ভাবে শঙ্কুর যে ক'টি গল্প বেরিয়েছে সেগুলো এ—রকমঃ প্রোফেসর শঙ্কু (১৯৬৫), প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা (১৯৭০), সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু(১৯৭৪), মহাসঙ্কটে শঙ্কু(১৯৭৭), স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু (১৯৮০), শঙ্কু একাই ১০০(১৯৮৩)। এই ছ'টি বইতে মোট গল্পের সংখ্যা ২৯। এ ছাড়াও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি এমন গল্প আছে। প্রোফেসর শঙ্কু জনপ্রিয় চরিত্র, খুব নিতান্ত কম লেখেন নি সত্যজিত। সবক'টি গল্পে মূল যে চরিত্রটি, সেটি পরম প্রতিভাধর বাঙ্গালি বৈজ্ঞানিক শঙ্কু। তিনি গিরিডিতে থাকেন, বৃদ্ধ। চেহারা—তাঁর নিজের বর্ণনাতেই 'বিদঘুটে'। প্রথম গল্পটিতেই আছে 'শোবার ঘরে ঢুকতেই একটা বিদঘুটে চেহারার লোকের সামনে পড়তে হোল।' এতই বিদঘুটে যে—'চমকে গিয়ে চিৎকার করেই বুঝতে পারলাম যে ওটা আসলে আয়না এবং লোকটা আর কেউ নয়—আমারই ছায়া।' অথচ পরবর্তী কালে যখন ল্যাবরেটরিতে হামবোল্টের সঙ্গে মিলে একটি প্রাণী সৃষ্টি করলেন ফ্লাস্কের মধ্যে—যেটি শঙ্কুরই প্রতিরূপ—তার বর্ণনা, 'মানুষটি বয়সে বৃদ্ধ। পরনে কোট প্যান্ট, মাথায় চুল নেই বললেই চলে, তবে দাড়ি গোঁফ আছে, আর চোখে এক জোড়া সোনার চশমা। প্রশস্ত ললাট, চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে মেশানো একটা শান্ত সংযত ভাব। এ লোকটাকে আমি আগে অনেকবার দেখেছি। আয়নায়। ইনি হলেন স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর একটি অতি-সংক্ষিপ্ত সংস্করণ'। শঙ্কুর যতগুলি ইলাস্ট্রেশন আছে, তাতেও প্রোফেসরকে আমাদের অন্ততঃ বিদঘুটে মনে হয় না। শঙ্কু কেন অতটা চমকে উঠেছিলেন কে জানে!

আর যারা বিভিন্ন গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে তার মধ্যে একটি শঙ্কুর ভৃত্য প্রহ্লাদ। সাতাশ বছর ধরে শঙ্কুর সঙ্গে কাজ করেও তার বুদ্ধি হয়নি। কিন্তু সে বিশ্বস্ত ভৃত্য। এর বেশি পরিচয় সত্যজিৎ প্রহ্লাদের খুব একটা দেননি। যদিও 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি-তে প্রহ্লাদ বসে বসে রামায়ণ পড়েছে, বাংলাটা সে শিখেছে প্রফেসরের কাছেই। (এখানে একটি অদ্ভুত অনবধানতার প্রমাদ রয়েছে। ব্যোমযাত্রীর অন্যতম যন্ত্রমানব বিধুশেখর প্রহ্লাদের মুখে শোনা 'ঘটোৎকচ বধের' অংশটা আবৃত্তি করে যাচ্ছে। প্রহ্লাদ পড়ছিল রামায়ণ—তাতে বিধুশেখর ঘটোৎকচ বধ কোথায় পেল।)

প্রহ্লাদ বোকা হলেও অবশ্য তার উপস্থিত বুদ্ধি আছে। যদিও বিপদের প্রকৃত গুরুত্ব বোঝা তার সাধ্য নয়, তবু সত্যজিৎ উদ্ভাবিত বাইকর্ণিক অ্যাসিডের উল্টোনো শিশির পদার্থটি যখন 'প্যারাডক্সাইড পাউডারে'র সঙ্গে মিশে বিপর্যয় ঘটাতে যাচ্ছিল তখন প্রহ্লাদ একগাল হেসে হাতের গামছাটা দিয়ে অ্যাসিডটা মুছে ফেলল।

আছে শঙ্কুর পোষা বেড়াল নিউটন। সে শুধু যে কোন কোন অভিযানের সঙ্গী হয়েছে তাই নয়। ইজিপ্সীয় আতংক গল্পে তাকে একটি বিশেষ ভূমিকাও দিয়েছেন সত্যজিৎ।

সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে আর একটি যে চরিত্র এঁকেছেন সত্যজিৎ, তিনি শঙ্কুর প্রতিবেশি অবিনাশবাবু। ফেলুদার গল্পে যেমন জটায়ু, শঙ্কুর কাহিনীতেও অবিনাশবাবু তাই—কমিক রিলিফ। বিজ্ঞানের কথা উঠলেই তিনি ঠাট্টা আর ভাঁড়ামো করেন।

প্রথমদিকে তাঁর উপর শঙ্কুর কিঞ্চিৎ বিরক্তি এবং রাগও ছিল। স্যাকারিনের বদলে সেরকমই একটি বড়ি তিনি অবিনাশবাবুর চায়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এই বড়ি খেলে প্রচণ্ড হাই উঠবে এবং তার পরে হবে গভীর ঘুম। সেই ঘুমের মধ্যে অসম্ভব ভয়ংকর রকমের স্বপ্ন দেখতে হবে। পরবর্তীকালে অবশ্যি অবিনাশবাবু শঙ্কুর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছেন এবং কয়েকটি অভিযানেব সঙ্গী হয়েছেন।

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রফেসর শঙ্কু

এরা ছাড়া আর যারা এসেছেন তাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট চরিত্র নকুড়বাবু। কোন একটি ঘটনার পর তার মধ্যে এক বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে —ক্লেয়ার ভয়েন্স তার অন্যতম। এই অতিপ্রাকৃত শক্তি দিয়ে কল্পনায় যে কোন দৃশ্য সৃষ্টি করে সেটা অন্যকে প্রত্যক্ষ করিয়ে দিতে পারেন নকুড়বাবু। দুটি গল্প, 'নকুড়বাবু ও এল তোরাডো' এবং 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ, এফ. ও' এই দুটিতে নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এই ক'জন ছাড়া একাধিক গল্পে আর্বির্ভূত হয়েছেন এমন ভারতীয় কেউ নেই। হাড়ে

ভেল্কি দেখানো সাধু, মাথায় চোট লেগে সহসা অদ্ভুত পরিণত ও পণ্ডিত হয়ে যাওয়া, খোকা এবং ওর আত্মীয় স্বজন, ডাক্তার-এরকম কয়েকজন এক একটা গল্পেই আছেন। এ ছাড়া আর সব চরিত্রই বিদেশী। কিছু কিছু, খুব অল্প সংখ্যক গল্পের পটভূমিকা গিরিডি, যেমন ম্যাকাওয়ের গল্পটি, গোলক রহস্য, হুংকংএর যাদুকর চী চিং এবং প্রোফেসর শঙ্কু ও ভূত। রক্তমৎস রহস্য গোপালপুরের সমুদ্রবক্ষে, কর্ভাসের প্রথমাংশ গিরিডিতে—বাকী সব গল্পের পটভূমিকা ভারতেরই বাইরে। বিভিন্ন গল্পে শঙ্কুর বিদেশী বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা রয়েছেন যেমন ক্রোল, সন্ডার্স, সামারভিল, এরা ঘুরে ঘুরে এসেছেন।

প্রোফেসর শঙ্কুর গল্পগুলিকে কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কেউ কেউ এগুলিকে কল্পবিজ্ঞান বলতে পারেন। কিন্তু কল্পবিজ্ঞানের প্রাথমিক শর্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এবং প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ও সূত্রগুলোর বাইরে যাওয়া চলবে না। প্রয়োজনে একটু প্রসারণ করা চলতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে জ্যোতিষ, পরাবিজ্ঞান, আত্মার আবির্ভাব, মানুষের সমান বাকশক্তি ও বুদ্ধি সম্পন্ন পাখি, মন্ত্রতন্ত্র, যার সাহায্যে কংকালে দেহ এবং প্রাণসঞ্চার করা যায়—এসব এনে ফেললে তা আর বিজ্ঞানের মধ্যে থাকেনা। বরং শঙ্কুর গল্পগুলিকে ফ্যানটাসি বলা যায়। গল্প বলার সহজ, ঋজু এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য পটভূমি থাকলেও শঙ্কুর কাহিনীগুলি অবশ্যই ফ্যানটাসি।

মনে হয় সত্যজিৎ একান্ত সচেতন ভাবেই মৃদু হেসে এই মজাটি করেছেন। যে রকেট মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেবে তার কম্পাউণ্ডটি তৈরী করতে তিনি ব্যবহার করেছেন ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস আর কচ্ছপের ডিমের খোলা। তার সঙ্গে মিশিয়েছেন 'একুইয়স ভেলোসিলিকা'— বলা বাহুল্য সচেতন ভাবেই এইসব অসম্ভব বস্তুর কথা কল্পনা করেছেন যাতে পাঠকরা, কিশোর পাঠকরা মজাই পায়। বিজ্ঞান বলে ভেবে না বসে। শুনতে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক নামের মত শোনার এমন অনেক নতুন নতুন এ্যাসিড বা কম্পাউণ্ড সত্যজিৎ উল্লেখ করেছেন, যেমন ট্যানট্রাম বোরোপ্যাক্সিনেট, কার্বোডায়াবলিক এ্যাসিড, নাইট্রোঅ্যানাইহিলিন এ্যাসিড, ফেরোসোটাবিল এ্যাসিড, টির‍্যানিয়াম ফসফেট— ইত্যাদি। ইচ্ছে করলেই ব্যাঙের ছাতা বা সাপের খোলস—এসব না বলে তিনি বেরিলিয়াম বা টাঙস্টেন জাতীয় কিছু নাম লিখতে পারতেন। তিনি তা করেননি।

প্রশ্ন হোল কেন? শঙ্কুর স্রষ্টা কি ভেবেছিলেন যে যেহেতু তিনি বিজ্ঞানের লোক নন, সেজন্যে কল্পবিজ্ঞান লেখায় তাঁর অধিকার নেই? অথচ আমরা জানি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সত্যজিতের অগাধ পড়াশোনা ছিল। কিছু কিছু গল্প অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত তো নয়ই, বিজ্ঞানবিরোধীই বলা যায়। যেমন প্রোফেসব শঙ্কু ও ভুত অথবা খোকার গল্পটি। প্রথমতঃ কারো মস্তিষ্কের সেলগুলোতে যে খবরটা সঞ্চিত হয়নি কোনকালে, সেটা কোন অবস্থাতেই তার পক্ষে উচ্চারণ করা অসম্ভব। করভাস্ সপ্লেন্ডেন বা পাসের ডোমেসটিকাস যে কাক এবং চড়াইয়ের ল্যাটিন নাম, এটা খোকার পক্ষে জানা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ মস্তিষ্কের যত ক্ষমতাই থাক শুধু চোখে দেখে কারো চশমার পাওয়ার বলে দিতে পারাও অসম্ভব।

কিন্তু মজা হোল এই যে পড়বার সময় কিশোর পাঠকরা তো বটেই, আমাদের মত ঝুনো বয়স্ক ব্যক্তিরাও বিনা হোঁচটে তরতর করে গল্পের সঙ্গে এগিয়ে যাব। এমনিই সত্যজিতের গল্প বলার গুণ। অকারণ অলংকার বর্জিত অথচ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে গল্পের

মোদ্দা কথাটি এত সহজে বলে গেছেন যে শুরু করলে শেষ করা পর্যন্ত রেহাই নেই।

ডিটেলস সম্পর্কে সত্যজিতের সচেতনতা ও দখল সমগ্র বিশ্বের লোক জানে তাঁর সিনেমার মারফত। গল্পেও তাই। আগেই বলেছি অধিকাংশ গল্পের পটভূমিকা বিদেশ। মিশরের বুবাসটিস, নরওয়ের উত্তরপ্রান্তে কিয়োলেন উপত্যকায় সুলিটেলমা শহর, হাইডেলবার্গ শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া নেকার নদী ও সবুজ অরণ্যে ঢাকা পাহাড়, কঙ্গো প্রদেশের কালেছে শহর থেকে দুবে যেখানে মস্ত মস্ত ফার আর বাদাম গাছের সারি—সর্বত্র সত্যজিৎ সমান সাবলীল ভাবে ভৌগোলিক চিত্রকল্প এঁকে গেছেন। দেশ বিদেশ প্রচুর ঘুরেছেন সত্যজিৎ এবং যে কোন শিল্পীর যেটা সবচেয়ে দরকারী গুণ, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বা অবজারভেশন—সেই বস্তুটি সত্যজিতের অসামান্য। সুইজারল্যাণ্ডে সন্ধ্যেবেলা ঘণ্টার মিষ্টি আওযাজ শোনা যায়, কেননা ঘরে ফেরা গরুগুলোর গলায় ঘণ্টা বাঁধা থাকে—এটা রেফারেন্স বইয়ে পাওয়া কঠিন। চোখ মেলে দেখতে হয়, সত্যজিৎ এসব দেখেছেন এবং পাঠকদের দেখিয়েছেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ইচ্ছে, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর সজীব উৎসাহ। প্রায় সব গল্পেই তাঁর অগাধ পড়াশোনার ফলশ্রুতি, নানান তথ্য। যে কোন গল্পে এত তথ্য আছে যে সত্যজিতের জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে বাস্তবিক চমৎকৃত হ'তে হয়। ফলে গল্পগুলি সহজেই বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে উঠেছে।

কয়েকটি গল্প যেমন ম্যাকাও বা কর্ভাস, দুটোই দুটি পাখির আশ্চর্য কীর্তি, কিম্বা আরো কয়েকটিতে সত্যজিতের পরিমার্জিত রসিকতা গল্পগুলিকে দারুণ সরস করে তুলেছে। ব্যোম যাত্রীর ডায়রিতে বিধুভূষণের প্রাথমিক বাংলা উচ্চারণের অভিনবত্ব যেমন। 'ঘঙো ঘাংঙ কুঁক্ক ঘঙা আগাঁকেকেই ককুং ঘঙা' যে আসলে ধনধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা—এ কেবল সুকুমার রায়ের পুত্রের মস্তিষ্কেই ধরা পড়তে পারে। অসাধারণ।

আরো অনেক কথা লেখার ছিল, বস্তুতঃ সত্যজিতের সৃষ্টি শঙ্কুর কাহিনী নিয়ে গবেষণামূলক বড় প্রবন্ধ হতে পারে। সাম্প্রতিক যে বাংলা বাহুল্যবর্জিত ঋজু, তীক্ষ্ণ এবং মেদহীন, তার প্রকৃষ্ট নমুনা শঙ্কু। অবশ্যই অভিনব এক সংযোজন সাহিত্যে।

কিন্তু শেষ কথা যেটা থেকে যায়, কল্পনার চূড়ান্ত অভিনবত্ব অনেকগুলি গল্পকেই অতি সুখপাঠ্য করে দিয়েছে এ কথা মনে রেখেই বলা যায়, শঙ্কু সম্পর্কে পাঠকদের মনে কিন্তু কোন হৃদয়াবেগই জন্মায় না। শঙ্কুর চরিত্রে এমন কোন বৈশিষ্ট্য সত্যজিৎ দেননি যাতে তাঁকে ভালবাসা যায়। পরম আগ্রহ নিয়ে পড়তে হয় এবং বারবার পড়া যায়, একথা সত্য হলেও সব গল্পগুলিরই আবেদন বুদ্ধির কাছে।

অনধিকারী হলেও বলব সত্যজিতের অধিকাংশ সৃষ্টিরই বোধহয় মূল কথা ওই। আবেদন সর্বসময়েই বুদ্ধির কাছে, হৃদয়ের কাছে নয়। কোথাও দর্শক বা পাঠককে ইনভলভড্ হ'তে হয় না, নিরাসক্ত ভাবে দেখে মুগ্ধ হওয়া যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় গুপী গাইন বাঘা বাইন কিম্বা কিছুটা পথের পাঁচালীর শেষাংশ বা অপুর সংসারের অংশবিশেষ। ওখানে গুপি বাঘার ভাগ্যের সঙ্গে আমরাও জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু অন্যত্র নয়।

জানি ঘোরতর তর্কের ব্যাপার, তবু মনে হয় শঙ্কুর উপাখ্যানগুলোও তাই।

ফেলুদা
দীপ চক্রবর্তী

'দি ফাইনাল প্রবলেম' কাহিনীর বিষয়টি বোধ হয় অনেকেরই জানা। রাইকেনবাকের সেই ভয়ঙ্কর বরফ গলা জলপ্রপাতের তলায় কুটিল মস্তিষ্ক প্রফেসার জেমস মারিয়ার্টির সঙ্গে শার্লক হোমসের দেহও তলিয়ে গিয়েছিল নিশ্চিহ্ন হয়ে। হয়ত এই পরিকল্পনায় ফাঁক একটা ছিল। আর সেই সূত্র ধরেই যে আবার হোমস-কে ফিরিয়ে আনতে হবে তা বোধহয় কোনান ডয়েল স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, কিন্তু জনমতের চাপে, জনপ্রিয়তার টানে, সম্পাদকের সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং দক্ষিণার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে আবার ডয়েল-কে সেই হোমসকেই ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল 'রিটার্ন অব শালর্ক হোমস'-এ। আসলে পৃথিবীতে এমন কিছু মহৎ মিথ্যা আছে যা সত্যের অধিক, কল্পনা কখনও কখনও অতিক্রম করে যায় সৃষ্টি ও তার স্রষ্টাকে। সৃষ্টির মাধুর্য সেইখানেই।

গোয়েন্দা গল্পের সূত্রপাত যদিও এর আগেই। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, শার্লক হোমস-কে জনপ্রিয়তার শিখরে নিয়ে গেলেও এ যুগের বুদ্ধি নির্ভর গোয়েন্দা কাহিনীর প্রথম স্রষ্টা কিন্তু এক মার্কিন লেখক, এডগার অ্যালান পো, মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে যিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, এবং যিনি একই সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যে আধুনিক কবিতার আদিগুরুও, আর এ বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও, কোনান ডয়েল অস্বীকার করলেও, ফরাসী ডিটেকটিভ কাহিনী লেখক এমিল গাবোরিমো দ্বারা কিন্তু তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। মূল প্রশ্ন যদিও সেখানে নয়, কারণ ডয়েল-ই প্রথম পাঠককে বোঝালেন যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে রহস্যের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট করার ক্ষমতা তার করায়ত্ত। আর সেই থেকেই গোয়েন্দা গল্পের প্রতি পাঠকের শুরু হল এক অনবদ্য আকর্ষণ।

বেলজিয়ান এরকুল পোয়ারো-কে নিশ্চয় মনে আছে? ছোটখাটো সৌখিন, মাথা একপাশে ডিমের মত হেলানো। ঠোঁটের উপর মোম মাখানো একজোড়া গোঁফ, মাঝে মাঝে তাতে তা দিয়ে থাকেন। বন্দুক, রিভলবার লাগে না, আসল শক্তি মস্তিষ্কের ধূসর কোষে অর্থাৎ 'লিটিল গ্রেসেলে', আর তাই দিয়েই বাজিমাত। মহিলা লেখক আগাথা ক্রিষ্টিও কিন্তু তাঁর সৃষ্ট এই চরিত্র দ্বারা পাঠক মহলে কম আলোড়ন তোলেন নি। এইভাবে একে একে অনেকেই কমবেশী হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন গোয়েন্দা গল্পে, যার তালিকা খুব একটা সংক্ষিপ্ত নয়। আর এতে করে সুবিধা একটা হয়েছে। সাহিত্যের জগতে ডিটেকটিভ কাহিনী পেয়ে গেছে একটি বিশেষ মাত্রা।

বাংলা সাহিত্যে যদিও এই রহস্য উন্মোচনী কাহিনীর মোটামুটি সূত্রপাত বলা যায় পাঁচকড়ি দে থেকে। অবশ্য এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে দুটি গ্রন্থের নাম আমরা পাই। প্রথমটি 'বাঁকাউল্লার দপ্তর', যার লেখক বরকতউল্লা এবং প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তরে', এবং এই দুটি গ্রন্থ সময়কালে যথেষ্ট জনপ্রিয়ও হয়েছিল। এমনকি যে সময় ইংলণ্ডের 'স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন' পত্রিকায় শার্লক হোমস আবির্ভূত. সেই সময়ে এখানে

'দারোগার দপ্তরে' বেশ রমরমা, কিন্তু এই বই দুটির ক্ষেত্রেই উপজীব্য ছিল সত্য ঘটনা, কারণ দুটি গ্রন্থের লেখকই চাকরি করতেন পুলিশ বিভাগে। ফলে পুস্তক দুটিই ছিল তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতারই ফসল।

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্প কিন্তু পাঁচকড়ি দে-তেই থেমে থাকল না। পরবর্তী পর্বে আবির্ভূত হলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়, শশধর দত্ত। এবং আধুনিক পর্বে গোয়েন্দা গল্পের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্তের মত লেখকেরা। কিন্তু গোয়েন্দা গল্পের সবচেয়ে উত্তরণ ঘটে গেল যেন সত্যজিৎ রায়ের 'ফেলুদা' চরিত্রে।

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ফেলুদা

তীব্র পর্যবেক্ষন শক্তি ও কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করার সঙ্গে সঙ্গে সত্যজিৎ ফেলুদার চরিত্রে মিশিয়ে দিলেন বিদগ্ধতা, ফেলুদাকে বানিয়ে দিলেন মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের এক প্রতিভূ। চারমিনার খান, সর্বত্র দারুণভাবে আত্মপরিচয়ে সমাদৃত হন না। অথচ মেধা ও অনুমান শক্তির দ্বারা প্রথমে প্রভাবিত করেন, তারপর কাজের দ্বারা আদায় করে নেন সমীহ। চমকে দেওয়ার মত ব্যক্তিত্ব থাকলে কি হবে? রহস্যের ব্যাপারে তার আগ্রহ বেশী, না ঘটনা প্রবাহ তাকে জড়িয়ে ফেলে, সে ব্যাপারে তিনি পাঠককে দাঁড় করিয়ে দিলেন দ্বন্দ্বের মুখোমুখি, ভ্রমণ ভালবাসেন আর ভালবাসেন ছোটোদের। জীবনযাপনে বৈচিত্র্য আছে। সব মিলেমিশে ফেলুদার চরিত্রে সত্যজিৎ যোগ করে দিলেন একটি ভিন্ন মাত্রা, যাকে কিশোর, যুবক সকলেরই ভাল লাগে।

ফেলুদার কথা বলতে গেলেই আমার এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার স্মিথের রহস্যভেদের ঘটনা মনে পড়ে যায়। একদিন হঠাৎ মিশর থেকে তিনটি ছোট ছোট হাড়

খামবন্দী হয়ে আসল স্মিথের কাছে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হল মামলার একমাত্র সূত্র এগুলিই এবং সেগুলিই একটি শুকনো কুয়োর তলায় পাওয়া গিয়েছিল। স্মিথ হাড়গুলি নিয়ে শুরু করলেন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অবশেষে রিপোর্ট দিলেন, হাড়গুলি স্ত্রীলোকের, বয়স তেইশ থেকে পঁচিশ। মৃত্যু তিনমাস আগে। হাঁটাচলা করত খুড়িয়ে, মৃত্যু ঘরে তৈরী এক বন্দুকের গুলিতেই। মরণ যন্ত্রণা পেয়েছে সাত থেকে দশদিন। আর খুব আশ্চর্যজনক ভাবে এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ধরা পড়ল অপরাধী।

ঘটনাটা বলার কারণ 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' কাহিনীতে যখন ফেলুদা 'মুড়ো হয় বুড়ো গাছ /হাত গোন ভাত পাঁচ / দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।/ফাল্গুন তাল জোড়/দুই মাঝে ভুঁই ফোঁড় / সন্ধানে ধন্দায় নবাবে।' এই সংকেত থেকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেন সমস্ত রহস্যের, তখন কোথায় জানি ভেসে ওঠে স্মিথের সেই অনুসন্ধিৎসা। ফেলুদা যেন একজন গবেষক, যেখানে তার বিষয়বস্তু শব্দ।

কেন একই কাহিনীতে ফেলুদা যখন মহীতোষবাবুকে খুব দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'মহীতোষবাবু আপনি বৃথাই দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। আমি আপনার শিকারের সক্ষমতা কারুর কাছে প্রকাশ করব না। সেটা আমি শশাঙ্কবাবুকে কথা দিয়েছি। আমি ব্যাপারটা অনেক আগে থেকেই...' তখন ফেলুদাকে মনে হয় অন্য একজন। যন্ত্রণার মনস্তত্ত্ব যার আয়ত্তে। কিম্বা 'নেপোলিয়নের চিঠি '-তে ফেলুদা যখন পেস্টনজীকে সুকৌশলে বাধ্য করেন পোর্সিলেনের দিকে হাত তুলতে এবং নিশ্চিত হতে যে বৃদ্ধের আরথ্রাইটিস আছে কিনা, তখন পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের। অথবা 'বাদশাহী আংটি ' কাহিনীতে ফেলুদা যখন বনবিহারীবাবুকে বলেন, 'কিন্তু এই শেষবার আপনি খালি হাতে যাননি। আপনার সঙ্গে একটা বাক্স ছিল, আর সেই বাক্সের মধ্যে ছিল আপনার চিড়িয়াখানার একটা অধিবাসী—আপনার বিশাল বিষাক্ত আফ্রিকান মাকড়সা—ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার, তাই না?' পিয়ারিলাল বলতে চেয়েছিলেন 'স্পাইডার', কিন্তু পুরো কথাটা সেই অবস্থায় উচ্চারণ করা সম্ভব হয়নি, তাই স্পাইডার হয়ে গিয়েছিল 'স্পাই'। তখন পাঠককে থামতেই হয় চমকের রেশ কাটাতে। ঠিক এইভাবেই ফেলুদা উঠে এসেছেন উত্তরণের চূড়ান্ত পর্বে। কারণ আবিষ্ট করাব ম্যাজিক তার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই আছে। আর এইজন্যই ফেলুদা যেন একজন সার্থক গোয়েন্দা, একজন মানুষ হিসাবেও পরিপূর্ণতার বড় কাছাকাছি।

ফেলুদার সৃষ্টি রহস্য কিন্তু যথেষ্ট অদ্ভুত। কারণ 'সন্দেশে' কিছু লেখার দরকার এই তাগিদ থেকেই সত্যজিৎ রায় একসময়ে কলম ধরেছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ রায় একবার বলেছিলেন, 'সন্দেশে' নেহাত বিলিতি কবিতার অনুবাদ দিয়েই তিনি শুরু করেছিলেন। 'কেননা তখনও আমার জানা ছিল না যে আমি নিজে মৌলিক রচনা করতে পারব।' কিন্তু 'সন্দেশে'র দৌলতেই তিনি লিখেছিলেন প্রথম বড় লেখা। 'বাদশাহী আংটি' ফেলুদার উপন্যাস। প্রশ্নকারী যখন জিগ্যেস করেছিলেন, ফেলুদা-কে পেলেন কোথায়? সত্যজিৎ বলেছিলেন, 'কেন, বিদেশী ডিটেকটিভ গল্প তো আমি চিরকালই পড়ে আসছি।' অথচ কি আশ্চর্য বাংলা সাহিত্যের নিরানব্বইটি গোয়েন্দা গল্প যখন বিদেশী দ্বারা প্রভাবিত, সেখানে ফেলুদা কি করে পারলেন তার মৌলিকত্ব অক্ষুন্ন রাখতে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন একমাত্র ফেলুদা-ই।

ছড়াকার সত্যজিৎ রায়

প্রণব মুখোপাধ্যায়

কোথায় যেন পড়েছিলাম, কারো এক স্মৃতিচারণায়, সত্যজিৎ রায় ট্রেনে বসে আপন মনে লিমেরিক লিখছেন। তাঁর ছোটদের পত্রিকা 'সন্দেশে' নানা সময় প্রকাশিত হয়েছে বাংলায় লিয়রের লিমেরিক। সিনেমা তৈরির কর্মযজ্ঞের ফাঁকে এমনি করেই হয়ত তিনি ছড়ার জগৎটিকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে রেখেছিলেন। বাংলা সংস্কৃতির এই অনবদ্য ধারাটি একদা মহিমান্বিত হয়েছিল সুকুমার রায়েব অদ্ভুত রঙে রসে। সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্যিক সত্তা পরিতৃপ্তি চেয়েছে সেই সম্পদের চর্চায়। তাঁর সৃষ্টিশীল মন নিবিষ্ট হয়েছে ছন্দে, মিলে, ননসেন্স হিউমারের নানা বৈচিত্র্যে। তাই তাঁর ছোটদের জন্য ছড়ার উপহারের ডালিটি ছোট হলেও মহা সমাদরের বস্তু। নানা রঙের ফুলে উপচে পড়ছে সেটা। লিয়র, ক্যারল, হিলেয়ার বেলক, ডার্মি টমসনের আশ্চর্য জগতের রঙ ধরিয়েছেন তিনি দিশি জমিতে। এই জমি 'আদিম কালের চাঁদিম হিম, তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম'-এর আজগুবি রসে সুপুষ্ট এবং উর্বর।

ছড়ার প্রতি এই টান তাঁর শিল্প সচেতনতার স্বাভাবিক প্রকাশ। কঠিন পরিশ্রমের পর হাল্কা রঙ্গব্যঙ্গে নিজেকে মেশানোর তাগিদ যেন এ। নিছক ছেলে ভুলোনো হাল্কা চালের লাইনেও অনেক সময় লুকিয়ে থাকে যুগের ইতিহাস; কোন গভীর মনের কথা কিংবা ঠাট্টা বিদ্রূপ। সেই গভীরতাটুকুই হয় অনুরাগীর উপরি পাওনা। ছবি তৈরির ব্যস্ততার মধ্যেও ছড়ার অসামান্য এই জগতের প্রতি সত্যজিতের মুগ্ধতা কখনও স্তিমিত হয়নি। তাঁর সৃষ্টির বিশালতার এক কোণে ছড়ার হাল্কা জগৎ নির্ভয়ে স্থান করে নিয়েছে।

বংশগত কারণও হয়ত কিছুটা কার্যকর হয়েছে এই প্রয়াসের মূলে। যে সুকুমার রায়ের অমরতার দাবী বাংলা ননসেন্স ছড়ার ঐতিহ্যে, তাঁরই সন্তান সত্যজিৎ। এমন কি, দাদামশাই উপেন্দ্রকিশোরও উদ্ভট অথচ অসামান্য রস সৃষ্টির নমুনা রেখে গেছেন।

কবিতার ধাঁধাঁ ও রহস্য সৃষ্টির আকর্ষণীয় প্রচেষ্টা দেখি সত্যজিতেও। দুই হাতের পাঁচটি করে আঙুল দেখিয়ে ফেলুদা বলছে,

পাঁচ ভাই এক সাথ
মারছে ঘুঁষি খাচ্ছে ভাত
আরো পাঁচ সঙ্গে তার
কেমন আছেন, নমস্কার।
('জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে)

তাঁর রহস্যোপন্যাস 'রয়েল বেঙ্গল রহস্যে'র সেই ছড়ার ধাঁধাঁও অনবদ্য—

মুড়ো হয়ে বুড়ো গাছ
হাত গোন ভাত পাঁচ

দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।
ফাল্গুন তালজোড়
দুই মাঝে ভুঁই ফোঁড়
সন্ধানে ধন্দায় নবাবে।

চিত্রনাট্য তৈরি থেকে শুরু করে ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত শিল্প নির্মাণ পর্বে তাঁর পরিশ্রম ও তন্ময়তার মাঝে যেটুকু ফুরসৎ, তাও ভরে আছে অঙ্কন এবং বাঙলা সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চায়। এই সাহিত্য কর্মের একদিকের মনোযোগ ছড়ার প্রতি। মৌলিক রচনার তাগিদও পরিশ্রমের বাইরে হাল্কা রসের জগতে পরিভ্রমণ করতে যখন মন চায়, তাঁর আগ্রহ নিবদ্ধ হয় ভিক্টোরীয় যুগের light verse- এর দুই মহারথীর প্রতি, এডওয়ার্ড লিয়র (১৮১২-৮৮) ও লুইস ক্যারল (আসল নাম চার্লস লাটউইজ ডাজসন, ১৮৩৩-৯৮)। এঁদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয় যে নামটি, সেটি হল সুকুমার রায়। সত্যজিৎ রায় লিয়রের বুড়োদেব মজার কাণ্ডকারখানার রূপান্তর ঘটান এইভাবে—

বললে বুড়ো, 'বোঝো ব্যাপারখানা—
একটা মোরগ, চারটে শালিকছানা,
দুই রকমের হুতোম প্যাঁচা
একটা বোধহয় হাঁড়িচাঁচা
দাড়ির মধ্যে বেধেঁছে আস্তানা।

চটজলদি সৃষ্টির আনন্দে মশগুল হয়েছেন সত্যজিৎ, লিমেরিক ছাড়াও হাত দিয়েছেন লিয়রের লিরিকে, অসম্ভব জগতের বিচিত্র জীব জানোয়ারের খ্যাপামির হাওয়ার—

'মোরা থোড়াই কেয়ার করি,
এই আমাদের মনের মতন তরী,
ছাঁকনি চড়ে সাগর যাওয়ায় নেইকো কোন ভুল।'
এরাই পাপাঙ্গুল।
অনেক দূরে অনেক দেশের পর
এদের আপন ঘর।
নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল—
পাপাঙ্গুল।

'ডং'এর হতাশা ও নির্বাসন নিয়ে লিয়রের যে আলোছায়ার রাজ্য তা মায়াময় হয়ে ধরা দিয়েছে সত্যজিতের মরমী অনুবাদে—

ডং-এর করুণ বাঁশি
ছাপিয়ে ওঠে বঙ্গীবনের বাঁদরগুলোর হাসি,
বাঁশির সুরে ডং চলে যায় গেয়ে—
'কোথায় গেল, কোথায় আমার পাপাঙ্গুলের মেয়ে?'
মাঝরাতেতে ডংকে যারা দেখে
ছাতের উপর থেকে
সবই মিলে চেঁচিয়ে তারা বলে—
'ওই দেখো ডং! ডং গেল ঐ চলে।

ওই যে ঘাসে, ওই ও-পাশে ডং,
নাকের ডগায় ঝিলিক মারা সং।'

ঘুমভুলিয়ার মাঠ আর বঙ্গীগাছের বনের রহস্যময়তা ছেলেবুড়ো সবার স্বপ্নের দোরে কড়া নাড়বে। লিয়রের 'জাম্ব্‌লি' সত্যজিতের কল্পনায় হয়েছে 'পাপাঙ্গুল'। এক্ষেত্রে যেমন বেশি স্বাধীনতা নিয়েছেন, তেমনি অসাধারণ প্রচেষ্টায় মূলানুগ থেকেছেন লুইস ক্যারলের 'Jabberwocky' কবিতায়। শব্দ কল্পনার মাধ্যমে কবিতায় প্রাণ সৃষ্টি করেছেন ঠিক ক্যারলেরই মত। 'Jabberwocky' হয়েছে 'জাবরখাকি'। দুটি শব্দেই কোন আশ্চর্য প্রাণীর অনুসঙ্গ মনে আসে। অর্থহীন শব্দ বানিয়ে ক্যারল ঠ্যাট্টার ছলে, সাধারণ মানুষের বোধের অতীত যে অ্যাংলো ম্যাক্সন কাব্য, তার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করলেন—

Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves
And the mome raths outgrabe.

সত্যজিৎ বললেন—

বিল্লিগি আর র্স্লিথলে যত টোবে
গালুমগিরি করছে ভেউ-এর ধারে
আর যত সব মিম্‌সে বোরোগোবে
মোমতারাদের গেবগেবিয়ে মারে।

এক কথায়, এ রূপান্তর অভিনব। আভিধানিক কিংবা ব্যবহারিক জগতের উর্ধ্বে। এইসব শব্দ শিশুমনে নানা অভাবনীয় রূপকল্প গড়ে তোলে। তা ব্যাখ্যার অতীত অথচ উপলব্ধিতে আয়ত্তাধীন।

এই ক্যারলেরই অনুপ্রেরণায় লেখা 'রামপাগলের গান'। ম্যাজিকের মত একের পর এক বিভ্রমের জগতকে চোখের সামনে তুলে ধরেন। এই দেখি পাতার ভেঁপু হাতে হাতির ছানা, মুহূর্তে সে হয়ে যায় মোকদ্দমার চিঠি। স্পষ্ট দেখছি গির্জের চূড়ো বেয়ে উঠছে বুনো মোষ। পরক্ষণেই বুঝি চোখের ভুল, ইনি তো আপন পিসের খুড়ো। আবার,

দাদা, পষ্ট চোখে দেখছি গণৎকারে
বলছে তুমি হচ্ছ মহারাজা,
আবার চেয়ে দেখছি আরে এ যে
ঠোঙায় ভরা চিনেবাদাম ভাজা।

অদ্ভুতি অসঙ্গতির এ জগৎ। বুদ্বুদের মত সূক্ষ্ম অবয়বে এ ভেসে থাকে আমাদের চেনা জগতের হাওয়ায়। বিচার বুদ্ধির জলহাওয়ায় এ জগৎ টেঁকে না। যে মন, যে চোখ আর যে শৈলী এর পিছনে ক্রিয়াশীল, তার অধিকারী সবাই হয় না। রাস্কিন তাই বোধহয় লিয়রকে একশো বাছাই লেখকের শীর্ষে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। হয়তো এর পিছনে যুক্তির চেয়ে উচ্ছ্বাস কিছু বেশি ছিল। তবু সে উচ্ছ্বাস অকারণ নয়। এ হল ননসেন্স প্রতিভার প্রতি মুগ্ধতার প্রকাশ। তিনি বুঝেছিলেন লিয়রই পারেন তাঁর দুঃখের জীবনকে, অনাদর আর অবজ্ঞার আঘাতকে এমনভাবে অসম্ভবের দুনিয়ায় এনে খেলা করতে।

ক্যারলই পারেন রাজ্য আর বাঁধাকপি, জুতো আর জাহাজকে এক পংক্তিতে বসাতে। পাগলা বুড়োর কষ্টের গান গেয়েছেন ক্যারল এইভাবে—

He said,'I look for butterflies
That sleep among the wheat:
I make them into mutton--pies,
And sell them in the street.
I sell them unto men,' he said,
'Who said on stormy seas;
And that's the way I get my bread--
A trifle,'if you please.'

বুড়োর এই জগৎটাকে সত্যজিৎ ধরেছেন এইভাবে,—

বুড়ো বলে, 'ধরি আমি ফড়িং-এর ছানা
যেই ছানা ঘুম দেয় মাঠে,
তাই দিয়ে রেঁধে নিয়ে মোগলাই খানা
ফেরি করি গঞ্জের হাটে ;
সেই খানা খেয়ে নিয়ে খালাসির বেটা
পাড়ি দেয় সাগরের জলে—
এই করে কোন মতে খেয়ে আধপেটা
কায়ক্লেশে দিন মোর চলে।'

রাস্কিন বুঝেছিলেন এ জগতের রসগ্রহণ আর্টের সমঝদারির চূড়ান্ত পরীক্ষা।

ছন্দে, মিলে, গানে সুরে ভরে আছে সত্যজিৎ রায়ের গুপী বাঘার জগৎ। 'হীরক রাজার দেশে'র অন্ত্যমিলের কথার গদ্য কথোপকথনে এক নতুন প্রয়োগ রীতির সূচনা করেছে। আর যে খেয়াল রসটির, তাঁর মতে, অনুকরণ চলে না, বিশ্লেষণ চলে না এবং জিনিয়াস ছাড়া যার উদ্ভাবন সম্ভব নয়, তার রঙও মিশে আছে তাঁর বর্ণাঢ্য প্রতিভায়। বাংলা ভাষায় বিদেশী ননসেন্স ছড়ার চর্চায় তাঁর এই অগ্রণী ভূমিকা ভোলবার নয়।

ইংরিজিতে সুকুমার পড়া যেন কাঁটা চামচ দিয়ে সিঙ্গাড়া খাওয়া—বলেছেন কিশোর চট্টোপাধ্যায়, Statesman পত্রিকার Miscellanyতে। সুকুমার রায়ের খেয়াল রস ইংরিজিতে রূপান্তরের সার্থক প্রচেষ্টা চলছে (উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, সুকান্ত চৌধুরীর The Select Nonsense of Sukumar Roy) এবং তারও পথিকৃত সত্যজিৎ রায়। 'আবোল তাবোল' এর কয়েকটি কবিতার ইংরিজি তর্জমা করে সুকুমারকে হাজির করেছেন ইংরেজ ও অবাঙালি রসিক সমাজে। বোম্বাগড়ের নাম দিয়েছেন Bombardia রামগড়ুর হয়েছে Rangaroo। ফলে বাংলার মাটির গন্ধটুকুও বজায় রয়েছে। সুকুমারের ননসেন্স প্রধানতঃ বাঙালি মানসিকতা, ভাবভানার জগৎ। হেড অফিসের বড়বাবু গঙ্গারাম, চণ্ডীদাসের খুড়ো এদের সবার একটা আলাদা বাঙালি পরিচয় আছে। ভাষান্তরে সেই পরিবেশটি ফুটিয়ে তোলা খুব মুশকিল যাতে তাদের এই পরিচয়টা বজায় থাকে। আর তা না থাকলে এ ননসেন্সের আসল মজাটাই মাটি।

রাজা বলেন, "হাজার টাকা ইনাম পাবে সদ্য",
তাই না শুনে উৎসাহেতে উঠ্‌ল বুড়ো মদ্দ।

কিংবা

বললে সবাই, "এই ছেলেটা বাঁচলে পরে তবে,
বুদ্ধি জোরে -এ সংসারে একটা কিছু হবে।"

লাইনগুলির বাঙালিয়ানা অন্য কোন ভাষায় ফোটানো সম্ভব নয়। তবু সত্যজিৎ রায় সুকুমারের হাস্যরসটুকু দক্ষ হাতে পরিবেশন করেছেন।

সত্যজিৎ রায় তাঁর ছড়া সংকলনের নাম আহরণ করেছেন সুকুমারেরই জগৎ থেকে—'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।' কালব্যাধি বুকে অকালমৃত্যুর দিন গুণতে গুণতে এভাবেই কি সুকুমার দেখেছিলেন জীবনকে ? এই প্রবঞ্চনা, এই বিদ্রুপেব উপহারে? দ্বিমাত্রিকতাই তো আপাত সরল নন্‌সেন্স ছড়ার প্রাণ। সে প্রাণের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের অন্তরঙ্গ যোগ।

এই যোগসূত্র আলসেমির প্রশ্রয়ে আরো নিবিড় হোক। 'গুপী বাঘা' ছায়াছবির গান ও কবিতার টুকরো শ্লোগানের মত ছড়িয়ে আছে ছেলে-বুড়োর মুখে মুখে ('তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল', 'বাকি রাখা খাজনা, মোটে ভাল কাজ না', 'দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান' ইত্যাদি)। সত্যজিৎ রায়ই পারেন নন্‌সেন্স ঐতিহ্যের বাহক হয়ে আজকের অসঙ্গতির প্রতি বাঁকা হাসি হাসতে। বাংলার ছড়ার সম্পদ তাঁর হাতে আরো সঞ্জীবিত হবে এই আশার সঞ্চার হোক আমাদের মনে।

সত্যজিতের ছড়া ও রূপকথা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লিয়ার ও ল্যুয়িস্ ক্যারলের, সেই সঙ্গে আরো দুটি বিলিতি লেখার অবলম্বন করে লেখা সত্যজিতের ছড়া-কবিতা কয়টি 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' বইয়ে সংকলিত হয়েছে। তার সবচাইতে প্রসিদ্ধ 'জবরখাকি' ক্যারলের Jabberwocky-র তর্জমা, 'সন্দেশে' (অগষ্ট ১৯৬১) বের হওয়া থেকেই 'আবোল তাবোল' এর পথেঘাটে লেখকের অবাধগতি প্রশ্নাতীত হয়ে উঠেছিল, যদিও এদিকে তাঁর আর মন পড়ে নি। মূল পোর্টম্যান্টো আর উদ্ভট শব্দের সমান্তর বানিয়ে 'বিল্লিগি', 'শিঁথলে', 'গালুমগিরি', 'আর যত সব মিমসে বোরোগোবে/মোমতারাদের গেবগেবিয়ে মারে' এই যে স্বচ্ছন্দ বচন তৈরি করেছিলেন তার এক লাইনও বিকাশ কেন করলেন না, নিশ্চয় প্রশ্ন থেকে যায়। এলিসের বই থেকে আরো তিনটি কবিতা ('মেছো গানে'-র উৎস বলা নেই, সে হল 'লুকিংগ্লাস' ষষ্ঠ হাম্‌টি ডাম্‌টি অধ্যায়ের কবিতা) এবং লিয়ারের দুটি বড়ো কবিতা আঠাশটি লিমেরিক অবশ্য ভাষান্তর করেছেন, 'মূলের হাস্যরস বজায়' রাখতে 'অনুবাদের ক্ষেত্রে অল্পাধিক স্বাধীনতা' নিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেছেন ভূমিকাতে, কিন্তু তর্জমার অধিকাংশেই পিছুটানের চেয়ে প্রবলতর নতুন একটা বাংলা সম্ভবনা যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে, সে লেখক আর পুরন করেন নি। 'সরাসরি অনুবাদ না করে লিয়রেরই আঁকা ছবিগুলি অনুসরণ করে নতুন লিমেরিক রচনা করা হয়েছে' বলে জানালেও, ২,৩ ও ৪ পদ্যপঙ্‌ক্তিতে সংক্ষেপ করে তুলেও সে সব লেখায় মূলের স্মৃতি যথেষ্টই আছে তবু মূল পেরিয়ে যাওয়া মৌলিকের সম্ভবনাও আছে গাঢ় হয়ে। 'ভিড়' বলে তাঁর একটি বিরল সরস কবিতার একটুখানি ঃ

> বাপ রে কী ধাক্কার ধুম দেখ চৌমাথে
> কাতারে কাতারে লোকে গুতোগুঁতি মাতামাতি,
> ফুলবাবু বেচারি মুখখানি পেঁচারই
> রদ্দায় গোঁত্তায় প্রাণ যায় ফুটপাথে।

'ফটিকচাঁদ্' উপন্যাসে পাই ফুলকাটা বাঁশি বজিয়ে হারুণদা ওস্তাদের ভিড় ডাকা ছড়া ঃ

> কাম্! কাম্! কাম্! কাম্!
> কাম্ - ম্ - ম্ - ম্ - ম্-ম্!
> কাম্ সী কাম্ সী চমকদারি
> হর কিস্‌ম্ কি জাদুকরি
> কলকত্তে কি খেল-খিলাড়ী
> লম্বি দাড়ি লং সুপারি
> কাম্ - ম - ম - ম - ম - ম্!

নেহাৎই একটুখানি লেখা। দেখায়-টিপ্পনিতে যে আস্বাদ জমে উঠেছে, ছন্দে-ভাষায় যে দুন্ আর বাজনা জমে উঠেছে এই একটুখানি লেখাতে, তার বাইরে আছে কেবল গুপী-বাঘার কয়েকটি সিনেমার গান। যেমন ভূতের রাজার গান ঃ

হবে হবে হবে হবে
গান হবে ঢোল হবে
সুর হবে তাল হবে লয় হবে
লোকে সব ভ্যাবা চ্যাকা
স্থির হয়ে থেমে যাবে
থেমে যাবে—

বা সহজ রাখালি গান

কেমন বাঁশি বাজায় শোনো মাঠেতে রাখাল—তার সুরে বুঝি জাদু আছে, মন হল মাতাল। এইটুকুই। এইটুকুতেই যে সে ক্ষান্তি হয়ে গেল, বাংলা ছড়া-কবিতার সে ক্ষতি। সত্যজিৎ রায়ের ছোটোদের গল্পের বইয়ের সংখ্যা কম নয়। কাজেই কেবলই সময়াভাব বললে হয়তো সবটা বলা হয় না।

২

'কেমন বাঁশি বাজায় শোনো মাঠেতে রাখাল/তার সুরে বুঝি জাদু আছে, মন হল মাতাল' ঃ পড়লে বা শুনলে মনে হয় লেখকের মন পড়ে আছে সেই আগের কালে যেখানে মাঠ তার রাখাল তার বাঁশির জাদুতে মাতাল হওয়া দিনখানা রয়ে বসে আছে আজও অবিচলে। কিন্তু মসূয়া গ্রাম আর শহর কলকাতা, উপেন্দ্রকিশোর আর সত্যজিতের যে দু পুরুষের তফাত হয়ে গেছে সে চোখে পড়ে গুপী গাইনের গল্প আর ছবি মিলিয়ে পড়লে। একহারা রূপকথার গল্প উপেন্দ্রকিশোরের। ছবি কি তাই? কেবল পুরন বিস্তার তো নয়, তাতে ভাঁজও অনেক। ভাঁজ যে কতখানি, ছবি হবার পর তার মানে নিয়ে যে পরিমাণ কথা উঠেছিল তাইতে বোঝা যায়। অনেকে বললেন, এ হল যুদ্ধ বিরোধিতার, নাট্‌সী প্রতিবাদের, শান্তির বাণী প্রচার করার ছবি। সত্যজিৎ হয়তো করতে চেয়েছিলেন রূপকথারই 'মজাদার গল্প', কিন্তু নিজেই তিনি খোঁজ দিলেন তাঁর বহুভূমিক উপকরণের। পালা সূত্রে ত্রুবাদুর ট্র্যাডিশন থেকে আমেরিকান মিউজিক্যাল কমেডির ট্র্যাডিশন, গান সূত্রে উত্তর ভারতীয় কর্ণাটকী ক্ল্যাসিকাল থেকে বাংলা ফোক্ সংগীত, দৃশ্য রচনা সূত্রে রাজস্থানী মোগলাই পারসিক চৈনিক ইয়োরোপীয় নানা শিল্পের, রূপকথা সূত্রে বিলিতি ফ্যান্টাসির আবহ আর কৌশলের। হাল্লার জাদুকর বরফির চরিত্র তিনি জোড়া লাগিয়েছেন গল্পের সঙ্গে, তার মেক্-আপটা এসেছে পিকিং অপেরা থেকে। ভূতের নাট্যটুকু সম্পূর্ণই নতুন, সত্যজিতের সৃষ্টি। উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বসূত্র যে সেখানে অকিঞ্চিৎকর তার কারণ নেহাৎই সেকেলে গ্রাম্য তাঁর ভূতেরা ঃ 'চল বাবা মোদের গোদার বেটার বে'তে, তোদের খুশি করে দিব' বলে বড়ো জোর তারা আমন্ত্রন করতে পারে গাঁ-খেদা বোকা ছেলে দুটোকে। এই ভূতেদের নিয়ে সত্যজিৎ যা করিয়ে নিয়েছেন তা ব্যাপক বক্তব্যের আর সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ। সত্যজিৎ স্বয়ং বলেছেন, 'চেনা ভূত এনে লাভ কী? বাস্তবকে আনা যাক্ না। ভেবে ভেবে চার জাতের ভূত তৈরি করলাম—রাজা-ভূত, প্রজা-ভূত, বেনে-

ভূত আর সাহেব-ভূত।' রূপকথাকে বাস্তবোচিত করে নেয়ার তথ্যায়ন বইয়ের গোড়া থেকেই আছে। ভূতের বাস্তবতা কিভাবে ঘটল? সে কথা বিশদ করে বলেছেন এক সাক্ষাৎকারে ঃ 'যারা মরেছে অ্যাক্‌চুয়ালি তাদের যদি ভূত হয়— অ্যাকচুয়ালি কতকগুলি ক্লাস অব পীপ্‌ল্ যারা অবভিয়াস্‌লি বাংলাদেশে ছিল—রাজা-রাজড়া তো ছিলই একেবারে বৌদ্ধ আমল থেকে এবং তারপর চাষাভুষোও ছিল, আর সাহেবরা তো প্রচুর আছে — বীরভূমে যেখানে আমরা শুটিং করেছিলাম তার মাইল দশেকের মধ্যেই কবরখানা এবং তারা বহু মরেছে.. তখন চারটে ক্লাসে পরিণত হল জিনিসটা...'। এই চার শ্রেণীর স্ফূর্তি বা নাচ বাঁধা হল কর্ণাটকী 'চালবাদ্য কাচেরি' বলে চতুরঙ্গ পারকাশনের তালে। এক প্রশ্নকারী বলেছিলেন, 'গুপী গাইনে'র চিত্রনাট্য এমনভাবে তৈরি 'যেন ছবি দিয়ে গল্প বলে যাচ্ছেন রূপকথার ভঙ্গিতে। শেষ পরিণতিটাও রূপকথার মতো— রাজপুত্র যেন রাজকন্যাকে...'। সত্যজিৎ বাধা দিয়ে বলেন, 'রূপকথার রাজপুত্র ওভাবে যাচাই করে না। ওটা আধুনিক কালের রীতি। আমি ইচ্ছে করেই করেছি।':সত্যজিৎ নিজে গল্প লিখেছেন যত তার অনেক জায়গাতে রূপকথার টান আছে, আধুনিক কালের রীতিও সেখানে আছে বহুস্তরে।

৩

'গুপী গাইন...' ছবি সূত্রে এক জায়গায় সত্যজিৎ সায়েন্স ফিক্‌শনের প্রভাবের কথাও তুলেছিলেন। ওড়া জুতো পরে গুপী-বাঘা হাল্লার রাজাকে জড়িয়ে ধরে সোজা তুলে নিয়ে গেল শুণ্ডি 'রাজার দরবারে— এই জাদুর একটা বিজ্ঞানকৃতিত্ব একালে খুব সম্ভব, ছবির মেজাজ অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্যতার এইদিকটাতে ঝুঁকে আছে। আধুনিক কালের ঠিকঠাক উপযোগী রূপকথা বলতেও বটে এই সায়েন্স ফিক্‌শন, সব আশ্চর্যের যেখানে বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে, জাদুর বরাত না দিয়ে সে সবই বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাধ্য। সাহিত্য লেখার গোড়াতেই, ১৯৬১-তেই প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুকে নিয়ে সত্যজিৎ হাত দিয়েছিলেন এই বাস্তবমূলক বা বিজ্ঞানমূলক রূপকথায়। রোবট স্পেস্‌শিপ গ্রহান্তরের সব ব্যাপারে এসে পড়েছে 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'-তেই। মঙ্গলগ্রহ বিজ্ঞানগল্পের অতি প্রসিদ্ধ বিষয়ও বটে, এইচ. জি. ওয়েল্‌সের ১৮৯৮-এর গল্পেই মঙ্গলগ্রহবাসী এসে নেমেছিল ইংলণ্ডের গ্রামদেশে—মস্ত কাহিনী সে, রে ব্র্যাডবেরির 'মারসিয়ান্ ক্রনিক্‌ল্'-এ (১৯৫০) ছোটো গল্প-পরম্পরারও দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু সত্যজিতের গল্পেও সিদ্ধ তথ্যের বদলে রয়েছে কল্পনা পুরন, বৃহৎ উদ্দেশ্য বা সূক্ষ্ম রূপকও তাতে অনুমান হয় না, বরং মনে হয় পর পর এই গল্পধারা কেবলই তিনি বানাচ্ছেন একেলে জ্ঞানবিজ্ঞান সজাগ কিন্তু প্রাথমিক পড়ুয়া ছেলেদের জন্যে বিকল্প রূপকথার মতো ক'রে। তাঁর এই লেখা পর পর সংখ্যাতেও হয়ে উঠেছিল অগণিত, তার অনুরাগী মহলও ছাপিয়ে গেছে পরিণত কিশোর পাঠকদের, তার চেয়েও বড়োদের মহলে। তার আগে একটা কথা অবশ্য মনে রাখতে হয়।

মনে রাখতে হয়, এই সব লেখার শুরুর পর্বে সত্যজিৎ তখন বিশ্রুত ফিল্‌ম্‌নির্মাতা, তিন অধ্যায় 'অপু' ছাড়াও 'পরশ পাথর' 'জলসাঘর', 'দেবী' তুলেছেন এবং নানা গুণে সে সব ছবিতে একটা নতুন যুগের পত্তনও হয়ে গেছে তখন তাঁর হাতে। এই কিশোর গল্প-ধারার পাশেও তার ইচ্ছা বা আয়ত্তকে না-দেখা যায় না। বাস্তবে কবিতাতে জড়ানো

সে সব ছবি, ভাবতত্ত্ব খুঁজলে সে সব ছবিতে বড়ো একটা সূত্র বলে চোখে পড়ে একটা পুরোনো-নতুনের দ্বন্দ্ব—'অপরাজিত'-র দুই অপু যারা পুরোনো স্নেহ ফেলে আধুনিক উচ্চাশার দুঃখ ভোগ করে, দেবী আর তাব অসহায় স্বামীর গল্পে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় সংস্কার আর নব্য শিক্ষা, আবার পরশপাথরের জাদু পরিণামে ভেঙে যায় বাস্তবের অভিঘাতে (তবু 'পরশপাথরে' একটু পূর্বচ্ছায়া আছে সায়েন্স ফিক্শনের, যে অর্থে পুরোনো জাদুগির অঘটনঘটানো নব্য বিজ্ঞানীর পূর্বসূরি)। ১৯৬৭তে তোলা 'গুপী গাইন...' ছবিতে পুরোনো-নতুনের ব্যাপারটুকু দেখা গেল আরেকভাবে। সরাসরি রূপকথা উপজীব্য করে এখানে তাঁর সৃষ্টি, তার প্রক্রিয়াটুকুও এখানে তিনি খোলসা করে দিয়েছেন। অনির্দেশ রূপকথা গল্প তাইতে প্রথমাবধিই এগোতে থাকে সব দিকে তথ্য পুরন করে—গানের তথ্য, লোক ব্যবহারের তথ্য, মানুষের সর্বজনীন লোভ আর শান্তিপ্রিয়তার প্রবণতা সব দিকে দৃষ্টি রেখে সে সযৌক্তিক হয়ে উঠতে থাকে পায়ে পায়ে, তারপর ফের আবার খুলে যায় অলৌকিকে—দুজনে হাতে হাতে তালি বাজিয়েই মুহূর্তে বিশ যোজন পার হয়ে যায় অবলীলায়। রচনাপ্রক্রিয়ার এই হল ক্রম ঃ মূল রূপকথা তার বাস্তবায়ন তার অতি বাস্তবকৃতি। 'বাস্তবকে আনা যাক্ না।' এই স্বীকৃত আগ্রহ আসলে সম্ভাব্য আর ফ্যান্টাস্টিকের মেল করে তুলতে। ভূতেদেব বাস্তবিক সমাজপতি স্থির করে দিয়ে, নাচে গানে সক্রিয় সংযুক্ত করে তুলেও যেন মেলতে চাইছেন বাস্তবের সঙ্গে অতিপ্রাকৃতকে। তারপর তাদের কাছে খাওয়ার যাওয়ার গান গাইবার ইচ্ছাবর পেয়ে গল্প উড়ে পড়েছে অলৌকিকে—সেখানেও সারা পথ তার সমাজনির্বন্ধ আর সমাজশুভৈষা। ভালোর সৌন্দর্য, মন্দের নিষ্ঠুরতা আর শেষে সর্বমানুষের নিহিত ভালোর প্রকাশ। স্মরণ করুন, শেষ দিকে 'ভাই রে, তুই বদলাস নি' বলে দুই রাজা যে জড়িয়ে ধরলেন দুজনকে। হাল্লা আর শুণ্ডির রাজা আসলে দুই সহোদর ভাই, পরিস্থিতি বিপাকে হয়ে উঠেছিলেন দুই শত্রু। তা ছাড়াও দেখার থাকে। এখানকার রাজামশায়রাও যে নেহাৎ সাধারণ মানুষের মতো সামান্য, আর গাঁয়ের বোকা ছেলেও অসাধ্য সাধন করে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব পাবার ক্ষমতা রাখে, সে হল রূপকথার সর্বদেশীয় একটা সাধারণ লক্ষণ, তবু গল্প দেখতে দেখতে যে অনেকেরই মনে পড়ে গেছে ১৯১৫ সালের চিহ্নিত বিশ্বাবর্ত তাতে রচয়িতার ব্যাপক উদ্দেশ্যের হদিশ হয়ে পড়ে।

৪

সত্যজিতের বিজ্ঞানগল্পের বিবরণ অপর আলোচনাতে আছে, এ লেখাতে সেই দায়িত্ব নেই। কেবল বলতে হয়, এও তাঁর আরেক রূপকথার গল্প। পাঠক বদলে গেছে বলে তার রূপকথাও বদলে গেছে। তার অভ্যস্ত প্রসঙ্গ-উপকরণের স্থলে এসেছে টাইম মেশিন, রকেট জাহাজ, রোবট বা অ্যাণ্ড্রয়েড, প্রাগিতিহাসের প্রাণীরহস্য থেকে দেখা পাওয়া আশ্চর্জন্তু কম্পিউটার ও প্রযুক্তিবিস্ময়, কুবিজ্ঞানের অভিচার। লেখক বিস্তার করেন নি—তথ্যে আকৃতিতে কিছুতেই, উদ্দেশ্যও তেমন হয়তো নেই— মহাবিশ্ব আর অসহায় বিপন্ন মানুষের যা ভাবী রচনারও দায় নেই, রূপক বলে পড়তে হয় না, তবু তথ্যানুপুঙ্খের বদলে কোথাও মাঝখানে চেয়ে আছে পাঁচাপাঁচি সাধারণ মানুষের চেনামুখ— বঙ্কুবাবু, নিকুঞ্জবাবু, নকুড়বাবু, ঝাঁঝাঁর খোকার বাবা-মা, শঙ্কুবিজ্ঞানীর গবেষণা নিয়ে অন্‌পড়

প্রতিবেশীর ঠাট্টা, অত বড়ো বৈজ্ঞানিকের আটপৌঢ়ে-গোছ আদব ব্যবহার গবেষণাগারটি পর্যন্ত — যার ফলে বিস্ময় বিজ্ঞানের গল্পও একই সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় জলচল হয়ে উঠতে দেরি করে না।

সত্যজিতের এমনি অনেক গল্পে একাকি ছেলের ভাবনা আর ভরসার কথা আছে, দাদার মতো বড়ো কারও উপর শিষ্যোপম আনুগত্যের ব্যাপারও দেখতে পাওয়া যায়। এ সব গল্পের অন্তকরণটুকু বিজ্ঞানগল্পের তুলনাতে গোচরও বটে, কেন-না চমকপ্রদ লেখার বদলে এ হল স্বাভাবিক লেখার গল্প। 'এক ডজন গপ্প' থেকে শুরু হয়ে এমনি গল্প অনেক আছে। এমন-কি ফেলুদা আর তোপসের অতি সপ্রতিভ জুটির নীচেও এই ধরনের একটা মানসিকতা রয়ে গেছে। হারুণদা আর ফটিকচাঁদের সম্বন্ধের ভেতরেও তা আছে। বড়ো বাড়ির ইংরিজি ইশকুলে পড়া ছেলে খারাপ লোকের খপ্পরে, তারপর দুর্ঘটনায় পড়ে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে যান্ত্রিক উচ্চবিত্ত বলয়ের বাইরে— বৈচিত্র্য আর অনিশ্চয়ে ভরা বড়ো পৃথিবীতে, অনিশ্চয়ে সে ভরসা পেয়ে গেছে বীরের মতো জ্যেষ্ঠের, কাজেই বৈচিত্র্য তার চারপাশে জমে উঠেছে রূপকথার মতো, তার আস্বাদে সে ভরপুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বীর জ্যেষ্ঠের লৌকিক, বা আশ্চর্য ক্ষমতাও সত্যজিতের গল্পে আধুনিক উচ্চশিক্ষায় আয়ত্ত কবা। এমন-কি খোলার ঘরবাসী ময়দানে খেলা দেখানো হারুণও জাগলারি নিয়ে পড়াশুনো করেছে, অদেখা হয়েও এন্‌রিকো বাস্‌তেলি তার গুরু। সত্যজিতের অনেক গল্পেই এমনি— সে যুক্তিগ্রাহ্যতার জন্যে হোক, বা তাঁর ইশকুলপড়ুয়া কেরিয়ার-চেতন পাঠকের গ্রাহ্যতার জন্যে হোক — গল্পের কেন্দ্র চরিত্র সব এসেছে উচ্চ-মধ্য মণ্ডলীর চলাচল থেকে — যে কোনো বিদ্যায় বা কাজে-ক্রিয়ায় অবাধিত প্রশ্নাতীত হতে পারে যাদের অধিকার। একটা মাত্র বইয়ে আধুনিক এই আর্থতন্ত্রী ঘের ছাড়া হয়ে গল্প গড়ে উঠেছে কেবলই রূপকথার অনন্য ও আবহমান প্রাক্‌সমাজে। একটু আলাদা করে বলতে হয় তার কথা।

৫

বইখানি 'সুজন হরবোলা'। তার চারটি গল্প ঃ 'সুজন হরবোলা', 'গঙ্গারামের কপাল', 'রতন আর লক্ষ্মী' আর 'কানাইয়ের গল্প'। সুজন গঙ্গারাম রতন কানাই চারজনই গাঁয়ের গরিব ঘরের ছেলে— কেউ মুদির ছেলে, কেউ খেতচাষির, কেউ পুরুতের ঘরের ছেলে, কিন্তু সব একই ধারা, একই বয়স — কানাইয়ের সতেরো, গঙ্গারামের আঠারো, রতন উনিশ আর সুজনও দিব্বি জোয়ান, 'গতরে বেড়েছে, সবল সুস্থ শরীর তার'। একই ধারা কিন্তু চারজনই আলাদা সবার থেকে, তাদের গুণে। একশো পাখির শতেক প্রাণীর ডাক গলায় তুলেছে সুজন। রতনের গলাখানা সুন্দর, সে বাঁশিও বাজায়। গঙ্গারামের এরকম গুণ নেই কিন্তু তার চেহারাটি ভালো, গ্রামে যাত্রা হলে সে রাজপুত্তুর সাজে, তা ছাড়া নদীতে ব্যাঙবাজি খেলতে গিয়ে পায়রার ডিমের আকার রামধনু রঙের একটা সাতশিরা পাথর পেয়ে তার কপাল ফিরে গেছে। আর কানাই, তার এ সব কিছুই হয় নি, খালি বাপের রোগ সারাবার জন্যে দুর্লভ চাঁদনি পাতা যোগাড় করতে সে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। প্রথম তিনজন অসাধ্য সাধন করে গল্পের শেষে পেয়েছে রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়ে যাওয়া রাজকন্যাদের। কানাই রাজকন্যা পেল না, মন্ত্রফলের

শক্তিতে সে গিয়ে হল বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী।

এরা কেউ জবর বর পেয়ে অসমকৃতি হয়ে ওঠা গাঁয়ের বোকা ছেলে নয়, প্রাণের দায়ে দেশ ছাড়েনি, যা পাওয়ার পেয়েছে আপন শ্রমে যত্নে তিতিক্ষায় বুদ্ধিতে সাহসে। শিখে আয়ত্ত রাক্ষসের ডাক ডেকে আকাশী গুহার রাক্ষসকে বের করে এনেছে, তারপর অন্ধ মরীয়া হয়ে বল্লম চালিয়ে দিয়েছে প্রাণীটার যেখানে কলিজা থাকার কথা সেখানটাতে। ডম্বরি পাহাড়গুহার দুর্ধর্ষ দানবকে অভিশাপে রাক্ষস হয়ে যাওয়া রতন যে মারতে পারল, লেখক তার একটা কারণও লিখতে ভোলেন নি, রাক্ষস হওয়া 'রতনের খাদ্য বন্য পশু আর দানবের খাদ্য মানুষ, দানব এই রাক্ষসের সঙ্গে পারবে কেন?' রূপকথার ছেলেরাও জীবন বিপন্ন করে রাক্ষসপুরীতে গিয়ে রাক্ষস মারে, দিঘিতলায় দমডুবে পৌঁছে ছিঁড়ে পিষে ফেলে তাদের জানে তাদের শক্তিধর সহায় আছে কেউ। এখানের ছেলেদের সহায় আত্মশক্তি। এক কানাই-ই জগাইবাবার সাহায্য পেতে পেরেছে 'কানাইয়ের গল্পে' বামন রুম্‌পেলস্টিলট্‌স্কিনের মতো সে তার নামটুকু বলতে পারারও অপেক্ষা করেনি।

আরেকটা ব্যাপারও চোখে পড়ে, সে হল ঃ অনপেক্ষ 'এক যে ছিল'-র রূপকথাতেও এখানে রাজবাড়ি গ্রামবাসী দেশ গাঁ বন নদীর প্রত্যেকটা নামাঙ্কিত, পূর্বাপর জোড়া, ভূগোল জরিপ করে দেওয়া। এক যে দেশের, এক যে রাজার রাজকন্যার চাষির মুদির ব্যাপারীর বদলে এখানে পাই কনকপুরের উজলপুরের জবর নগরের সুনয়না লক্ষ্মী শ্রীমতী রাজকন্যাদের, আজবপুরের দিগ্‌নগরের রাজপুত্র রণবীর চন্দ্রসেনের সঙ্গে তাদের বিয়ে হবে। ক্ষীরা গাঁর উত্তরে তিন ক্রোশ মাঠ পেরোলে তবে চাঁড়ালির বন। পাঁচ ঘর যজমান দিয়ে পুরুত হরিনারান আর তার স্ত্রী অন্নপূর্ণার সংসার, তাদের ছেলে রতন সওদা কিনে আনে গোপীনাথ মুদির দোকান থেকে। নন্দীগ্রামে দু বিঘে জমি আর এক জোড়া হাল বলদ নিয়ে থাকে বলরাম আর তার ছেলে কানাই, বলরামের ব্যারাম হলে দেখতে আসেন অসম্ভব যাঁর নাড়ীজ্ঞান সেই নসু কবরেজ। হরিতালের অঘোর গণৎকারকে দিয়ে গোনাতে গেল গঙ্গারাম—'লম্বা চিমড়ে মানুষটা, গায়ের রং একেবারে আলকাতরার মতো, বয়স কত তা কেউ জানে না।' কেষ্টপুরের মহেশ চোর ফাল্গুন মাসের নিসুতি রাত তিনটেয় বৈকুণ্ঠ গ্রামে এসে সিঁদ দিল তার ঘরে, সেই 'মহেশের বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, পাকানো শরীর, নাকের নীচে পুরু গোঁফ আর গালপাট্টা।'

সব জায়গাটাই নীরন্ধ্র তথ্যায়ন করে লেখা। ক্ষেত্র বিশেষে গণিতিক ধাপ পুরিয়েও লেখা। বাদড়ার বন থেকে বিশাল রূপসা রাজ্য ত্রিশ ক্রোশ পথ, মন্ত্র ফল খেলে হরিণের চেয়ে তিন গুণ জোর হয় ছোটাতে -- তা হলে এক ক্রোশ লাগে তিন মিনিট, মোট দেড় ঘন্টায় পৌঁছে যেতে পারবে সেখানে কানাই। গ্রামের বর্ণনা পড়লে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামের কথা মনে পড়ে -- তেমনি গাছপালা লোকজন ঃ নদীর ঘাট থেকে 'বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গারাম একবার সুবলকাকার বাড়ি হয়ে গেল। সুবলকাকার কদিন থেকে সর্দিজ্বর। তার একটা পা খোঁড়া, তাই সে লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারে না। গঙ্গারাম তাকে এসে দেখার জন্য শশী কবিরাজকে খবর দেয়, শশী রুগি দেখে ঔষধ বলে দিয়ে যায় চাকুলে পাতার রস। সে পাতাও গঙ্গারাম বনবাদাড়ে ঘুরে বিছুটির কামড় খেয়ে যোগাড় করে এনে দেয়। আজ গঙ্গারাম দেখল সুবলকাকা অনেকটা ভালো। একবার

মোক্ষদা-বুড়ির বাড়িতেও যাবার ইচ্ছে ছিল, বুড়ি গ্রামের এক প্রান্তে একা থাকে সেই জন্য। কিন্তু সুবলকাকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখল আকাশে মেঘের ঘনঘটা...'।

এমনি সব গ্রাম আর রাজপুরী নগবের মাঝখানে ক্রোশ ক্রোশ মাঠ, অজগর বন (যেখানে এখনও চালা বেঁধে আছে জগাইবাবা, একশো ছাপ্পান্ন বছর বয়সে যার স্মৃতিশক্তি একটু কমেনি কিন্তু অটুট আছে মন্ত্র ফল কটা), রাক্ষসের গুহা সুদ্ধ গম্ভীর সব পাহাড় যেখানে বিভীষিকা রাক্ষসের বাস। গাঁয়ের একটা ছেলেই সে সব পার হয়ে যাবার পথে রাজার রাজকন্যার রাজপুত্রের দেখা পায়, তারপর সে পৌঁছেও যায় সেই রূপকথার রাজবাড়ি, সেখানে রাজকন্যাকে বিয়ে করে অনায়াসেই বসতে পারে গিয়ে ভবিষ্যতের রাজা হয়ে। কিন্তু কেবলই রাজা আর রাজকন্যা তো নয়, সে সেখানে ফিরিয়ে আনে রুদ্ধ হয়ে যাওয়া পাখির আনন্দ আর প্রজার কল্যাণ। তার আগে গাঁয়েব বাড়িতেও তার খবর দিতে হয়। মামার কাছে খবর যায়, বাপ-মা মরে যে মামার ঘরে সে মানুষ হয়েছে। বাব-মাকে খবব দিযে নিয়াসতে হয় সেই ক্ষীরা গাঁ থেকে, 'তারাও এখানেই থাকবে বিয়ের পর।' সত্যজিতের রূপকথা গল্পেব ছেলেরা তাঁদের গাঁয়ের সঙ্গে এই রাজপুরীরও একটা সহজ সম্বন্ধ বচনা করে দিয়েছে।

সত্যজিৎ রায় ঃ তথ্যপঞ্জি

সত্যজিৎ রায়ের 'জীবনপঞ্জি' প্রস্তুত কবেছেন শ্রীকমলেন্দু সবকার। আনন্দলোক, ৯ মে ১৯৯২ সংখ্যায়।

'চলচ্চিত্রপঞ্জি' দেশপত্রিকাব ৫৯ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ২৮ মার্চ ১৯৯২ থেকে গৃহীত।

রেকর্ড-পঞ্জি, ভিডিও-তে সত্যজিৎ বায়েব ছবিব তালিকা প্রস্তুত করেছেন শ্রী নির্মাল্য আচার্য। এ প্রসঙ্গে লিখছেন তিনি ঃ 'এই কাজে প্রধান সাহায্য যাঁর পেয়েছি তিনি সন্দীপ রায়'। এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৯৯১।

সত্যজিৎ রায়ের গ্রন্থপঞ্জি দেশ পত্রিকাব ৫৯ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ২ মে ১৯৯২ থেকে গৃহীত।

স্বীকৃতি ঃ শ্রী সাগবময় ঘোষ, শ্রী সন্দীপ বায, শ্রী নির্মাল্য আচার্য, শ্রী দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, শ্রী কমলেন্দু সরকাব।

জীবনপঞ্জী

১৯২১ ঃ উত্তব কলকাতার ১০০ গড়পাব রোডে জন্মগ্রহণ করেন সত্যজিৎ বায়। তখন নাম ছিল প্রসাদ। বাবা—সুকুমাব রায়, মা—সুপ্রভা বায়।

১৯২৩ ঃ ২ মে (বাংলা ১৯ বৈশাখ, ১৩৩০) বুধবাব এক শুভ নামকরণ অনুষ্ঠানে প্রসাদ নামেব পরিবর্তে সত্যজিৎ নাম রাখা হয়। ১০ সেপ্টেম্বর কালাজ্বরে মৃত্যু হয় সুকুমার রায়ের।

১৯২৫ ঃ উপেন্দ্রকিশোব রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত 'ইউ বায় অ্যান্ড সন্স' দেউলিয়া বলে ঘোষিত হয়। এই কোম্পানির গুডউইল কিনে নেন করুণাবিন্দু বিশ্বাস।

১৯২৬ ঃ গড়পাব বোড থেকে সুপ্রভা দেবী পুত্র সত্যজিৎকে নিয়ে চলে আসেন বেলতলা রোডে ভাই প্রশান্তকুমার দাসের বাড়িতে।

১৯৩০ ঃ সত্যজিৎ রায় আট বছর ছ'মাস বয়সে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে।

১৯৩৬ ঃ ফোটোগ্রাফির জন্য 'বয়েজ ওন পত্রিকা'ব প্রথম পুরস্কার পান। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস কবেন। ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বিষয়—অর্থনীতি। এই সময় থেকেই সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রেব প্রতি আগ্রহ দেখা যায়।

১৯৪০ ঃ গ্র্যাজুয়েট হবার পব ১৩ জুলাই চলে যান শান্তিনিকেতনে। ভর্তি হন কলাভবনে।

১৯৪১ ঃ সহপাঠীদের সঙ্গে সাঁচী, খাজুরাহো, অজন্তা ইলোরায যান শিক্ষামূলক ভ্রমণে। প্রথম গল্প 'অ্যাবস্ট্রাকশন' (ইংরেজি) প্রকাশিত হয়।

১৯৪২ ঃ কলাভবনের পড়াশুনো শেষ না করেই ফিরে আসেন কলকাতায ডিসেম্বব মাসে।

১৯৪৩ ঃএপ্রিল মাসে ডি জে কীমার বিজ্ঞাপন সংস্থায ভিসুয়ালাইজারের পদে যোগ দেন। সিগনেট প্রেসের ডি কে গুপ্তর সঙ্গে পবিচয হয়। বইয়ের মলাট আঁকা শুরু করেন। 'মৌচাক' পত্রিকায় সত্যজিতেব আঁকা ছবি প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ ঃ চিত্রনাট্য লেখা শুরু কবেন। এই সময় 'ঝিন্দের বন্দী' সহ কয়েকটি চিত্রনাট্য তৈবি কবেন।

১৯৪৫ ঃ 'আম আঁটিব ভেঁপু' বইটির ছবি আঁকেন সত্যজিৎ।

১৯৪৬ ঃ 'ঘরে বাইবে'-এব চিত্রনাট্য তৈরি করেন। হবিসাধন দাশগুপ্তর ছবিটি পরিচালনা করবার কথা ছিল।

১৯৪৭ ঃ ৫ অক্টোবর হবিসাধন দাশগুপ্ত, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, বাম হালদাব এবং চিদানন্দ দাশগুপ্ত মিলে গঠন করেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি।

১৯৪৮ ঃ মা সুপ্রভা দেবীকে নিয়ে চলে যান লেক অ্যাভেনিউয়েব এক বাড়িতে। এই সময় থেকেই চলচ্চিত্র বিযযক লেখাব শুরু। প্রথম লেখা 'হোয়াট ইজ় বং উইথ ইন্ডিয়ান ফিল্মস' প্রকাশিত হয় স্টেটসম্যান দৈনিকে। হরিসাধন দাশগুপ্ত পরিচালিত একটি বিজ্ঞাপনের ছবির চিত্রনাট্য করেন তিনি। ছবির নাম—অ্যা পারফেক্ট ডে।

১৯৫০ ঃ জাঁ রেনোয়া কলকাতায় আসেন 'দ্য বিভাব' ছবিব জন্য। রেনোয়াব সঙ্গে পরিচয় হয় এবং সত্যজিৎ বায় কাজ দেখেন এই ফরাসি পরিচালকের। 'বেনোয়া ইন ক্যালকাটা' লেখাটি প্রকাশিত হয় ব্রিটিশ পত্রিকা 'সিকোয়েন্স'-এ। ডি জে কীমাব-এর আর্ট ডিরেক্টের পদে উন্নীত হন তিনি। বিদেশ যাত্রা। এই সময় বিলেতে গিযে প্রায় একশোটির মতো ছবি দেখেন। প্যাবিস ও ভেনিসেও যান। ডি জে কীমাব থেকে পদত্যাগ করেন। বেনসন্স এজেন্সিতে যোগ দেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রণ প্রদর্শনীতে 'খাইখাই' আব 'অনন্যা' গ্রন্থেব প্রচ্ছদেব জন্য পুবস্কাব পান সত্যজিৎ রায়।

১৯৫১ ঃ কলকাতায় আসেন রুশ পরিচালক পুদভকিন এবং অভিনেতা চেরকাসভ। সত্যজিতের অনুবোধে 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটিতে' ওঁবা বক্তৃতা দেন। 'পথেব পাঁচালী' ছবি করার জন্য ঠিক করেন তিনি।

১৯৫২ ঃ 'পথের পাঁচালী' ছবির শুটিং শুরু কবেন অক্টোবব মাসে। মার্কিন চিত্রপবিচালক জন হিউস্টন কলকাতায় আসেন। তিনি তখন 'পথের পাঁচালী'ব বাশ প্রিন্ট দেখে মুগ্ধ হয়ে যান।

১৯৫৩ ঃ পুত্র সন্দীপ-এর জন্ম হয় ৮ সেপ্টেম্বর।

১৯৫৫ ঃ নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট-এ 'পথের পাঁচালী' প্রথম দেখানো হয়। কলকাতায় মুক্তি পায় ২৬ আগস্ট। ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে তরুণ সাহিত্যিকরা সত্যজিৎ এবং তাঁর শিল্পী ও কলাকুশলীদের সংবর্ধনা জানান।

১৯৫৬ ঃ কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'পথের পাঁচালী' শ্রেষ্ঠ মানবিক আবেগসম্পন্ন চলচ্চিত্র হিসেবে সম্মানলাভ করে। ১১ অক্টোবর দ্বিতীয় ছবি 'অপরাজিত' মুক্তি পায়।

১৯৫৭ ঃ ভেনিস যান। ২৩ সেপ্টেম্বর রনজি স্টেডিয়ামে সত্যজিৎকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

১৯৫৮ ঃ নিউ ইয়র্ক যান। ব্রাসেলস-এ বিশ্বের সেরা সাতজন পরিচালকের দশটি সেরা ছবি নির্বাচন প্রতিযোগিতায় বিচারক।

১৯৫৯ ঃ সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কার এবং পদ্মশ্রী পান সত্যজিৎ।

১৯৬০ ঃ ভিয়েনা ফিল্মোৎসবে বিচারক। নভেম্বর মাসে মৃত্যু হয় মা সুপ্রভা দেবীর।

১৯৬১ ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় 'সন্দেশ' পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ। বাংলা সাহিত্য রচনা শুরু কবেন। লিয়রের ছড়া অবলম্বনে প্রথম লেখা 'পাপাঙ্গুল'। প্রথম শঙ্কুর গল্প প্রকাশিত হয়। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান হন।

১৯৬৩ ঃ 'টাইম' পত্রিকার মতে বিশ্বের সেরা এগারোজন চিত্রপরিচালকের মধ্যে অন্যতম।

১৯৬৪ ঃ বার্লিন এবং মস্কো যাত্রা।

১৯৬৫ ঃ নভেম্বর মাসে প্রথম বাংলা বই 'প্রোফেসর শঙ্কু' প্রকাশিত হয়। দিল্লিতে ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। পদ্মভূষণ হন। প্রথম ফেলুদা সিরিজের গল্প প্রকাশিত হয় 'সন্দেশ' পত্রিকায়।

১৯৬৬ ঃ বার্লিন ও টোকিও যাত্রা।

১৯৬৭ ঃ নিউ ইয়র্ক, প্যাবিস এবং লন্ডন যাত্রা। বছরের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য হিসেবে 'প্রোফেসব শঙ্কু' গ্রন্থটি পুবস্কাব পায়।

১৯৬৮ ঃ ম্যানিলা যাত্রা। মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধান অতিথি।

১৯৬৯ ঃ বার্লিন ও টিউনেসিয়া যাত্রা। সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম ফেলুদার বই 'বাদশাহী আংটি' প্রকাশিত হয়।

১৯৭০ ঃ বার্লিন যাত্রা।

১৯৭১ ঃ তেহবান চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক।

১৯৭২ ঃ টবেন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক।

১৯৭৫ ঃ ভাবতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি।

১৯৭৭ ঃ ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি।

১৯৮০ ঃ 'পথেব পাঁচালী'ব পঁচিশ বছব উপলক্ষে ডি এ ভি পি-র উদ্যোগে সারা বছরব্যাপী ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয বাঙ্গালোবে।

১৯৮১ : নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্ট-এ ফিল্ম ইন্ডিয়া উৎসবের প্রথম পর্যায়ে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী।

১৯৮২ : ২৫ এপ্রিল 'সদগতি' ছবিটি দিয়ে ভারতীয় দূরদর্শনে রঙিন ছবি সম্প্রচার শুরু হয়। ম্যানিলা চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে অন্যতম বিচারক।

১৯৮৩ : ১ অক্টোবর হৃদরোগে আক্রান্ত হন।

১৯৮৪ : ১২ জুন চিকিৎসার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। ১৯ জুন হিউস্টনে বিশ্ববিখ্যাত সেন্ট লিউকস হাসপাতালে বাইপাস হার্ট অপারেশন হন। ২১ জুলাই প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড অপারেশন হয়। কলকাতায় ফেরেন ১৪ আগস্ট।

১৯৮৯ : ডিসেম্বর মাসে পুত্র সন্দীপের বিবাহ।

১৯৯০ : ২২ নভেম্বর নাতি সৌরদীপের জন্ম।

১৯৯১ : বেলজিয়াম থেকে 'সত্যজিৎ রায় অ্যাট সেভেন্টি' শ্রদ্ধার্ঘ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। নতুন ছবির চিত্রনাট্য শেষ করেন।

১৯৯২ : ২৭ জানুয়ারি, সোমবার, অসুস্থতার জন্য ভর্তি করা হয় বেলভিউ নার্সিংহোমে। ২৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, ৫-৪৫ মিনিটে মৃত্যু হয়।

চলচ্চিত্রপঞ্জি

কাহিনী চিত্র

পথের পাঁচালি ১৯৫৫

প্রযোজনা	: পশ্চিমবঙ্গ সরকার
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	: সত্যজিৎ রায়
কাহিনী	: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র	: সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা	: বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	: দুলাল দত্ত
সঙ্গীত	: রবিশঙ্কর

অভিনয় : করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনীবালা দেবী, সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা দাশগুপ্ত প্রমুখ।
মুক্তির তারিখ : ২৬ আগস্ট ১৯৫৫
পরিবেশক : অরোরা ফিল্মস কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রেক্ষাগৃহ : বসুশ্রী, বীণা, ছায়া, শ্রী ও অন্যত্র।

অপরাজিত ১৯৫৬

প্রযোজনা	: এপিক ফিল্মস
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	: সত্যজিৎ রায়
কাহিনী	: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র	: সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা	: বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	: দুলাল দত্ত
সঙ্গীত	: রবিশঙ্কর

অভিনয় : করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পিনাকী সেনগুপ্ত, সমীরণ ঘোষাল প্রমুখ।

পরিবেশক ঃ অরোরা ফিল্মস কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তির তারিখ ঃ ১১ অক্টোবর ১৯৫৬।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ বসুশ্রী, বীণা, প্রাচী ও অন্যত্র।

পরশ পাথর ১৯৫৭

প্রযোজনা ঃ প্রমোদকুমার লাহিড়ী
চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ সত্যজিৎ রায়
কাহিনী ঃ পবশুরাম (রাজশেখর বসু)
আলোকচিত্র ঃ সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
সঙ্গীত ঃ রবিশঙ্কর
অভিনয় ঃ তুলসী চক্রবর্তী, রানীবালা দেবী, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, কালী ব্যানার্জি, সন্তোষ দত্ত প্রমুখ।
পরিবেশক ঃ অরোরা ফিল্মস কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তির তারিখ ঃ ১৭ জানুয়ারি ১৯৫৮।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ রাধা, প্রাচী, পূর্ণ ও অন্যত্র।

জলসাঘর ১৯৫৮

প্রযোজনা ঃ সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন
চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ সত্যজিৎ রায়
কাহিনী ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র ঃ সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
সঙ্গীত ঃ ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খান
অভিনয় ঃ ছবি বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, গঙ্গ ।পদ বসু, তুলসী লাহিড়ী, পিনাকী সেনগুপ্ত প্রমুখ।

পরিবেশক ঃ অরোরা ফিল্মস কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তির তারিখ ঃ ১০ অক্টোবর ১৯৫৮।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ রাধা, প্রাচী, পূর্ণ ও অন্যত্র।

অপুর সংসার ১৯৫৯

প্রযোজনা ঃ সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন
চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ সত্যজিৎ রায়
কাহিনী ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র ঃ সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
সঙ্গীত ঃ রবিশঙ্কর
অভিনয় ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, অলোক চক্রবর্তী, স্বপন মুখোপাধ্যায়, ধীরেশ মজুমদার, শেফালিকা দেবী প্রমুখ।
পরিবেশক ঃ ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তির তারিখ ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ও অন্যত্র।

দেবী ১৯৬০

প্রাযোজনা ঃ সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন
চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ সত্যজিৎ রায়
কাহিনী ঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
আলোকচিত্র ঃ সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
সঙ্গীত ঃ আলি আকবর খান
অভিনয় ঃ ছবি বিশ্বাস, শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।
পরিবেশক ঃ জনতা পিকচার্স অ্যান্ড

থিয়েটার্স লিমিটেড।
মুক্তির তারিখ : ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।
প্রেক্ষাগৃহ : মিনার, বিজলী, ছবিঘর ও অন্যত্র।

তিনকন্যা ১৯৬১

প্রযোজনা : সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন
চিত্রনাট্য সঙ্গীত ও
পবিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবের তিনটি ছোট গল্প : পোস্টমাস্টাব, মণিহাবা ও সমাপ্তি
আলোকচিত্র : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : অনিল চট্টোপাধ্যায়, চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায, (পোস্টমাস্টার)। কালী ব্যানার্জী. কণিকা মজুমদাব, কুমাব রায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী (মণিহারা)। অপর্ণা দাশগুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত (সমাপ্তি)।
পবিবেশক : ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তির তারিখ : ৫ মে ১৯৬১।
প্রেক্ষাগৃহ : রূপবাণী, অরুণা, ভারতী, রিগ্যাল (নতুন দিল্লি) ও অন্যত্র।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ১৯৬২ (রঙিন)

প্রযোজনা : এন. সি. এ প্রোডাকসন
কাহিনী,চিত্রনাট্য,
সঙ্গীত ও পবিচালনা : সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র : সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : ছবি বিশ্বাস, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অলকানন্দা রায়, অনিল চ্যাটার্জী, অনুভা গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, এন বিশ্বনাথন প্রমুখ।
পরিবেশক : এন. সি. এ. প্রোডাকসন।
মুক্তির তারিখ : ১৯ মে ১৯৬২।
প্রেক্ষাগৃহ : রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ও অন্যত্র।

অভিযান ১৯৬২

প্রযোজনা : অভিযাত্রিক
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত
ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র : সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায. ওয়াহিদা রেহমান, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, চারুপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ।
পরিবেশক : ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তির তারিখ : ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২।
প্রেক্ষাগৃহ : শ্রী, প্রাচী, ইন্দিবা ও অন্যত্র।

মহানগর ১৯৬৩

প্রযোজনা : আর. ডি. বনশল
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত
ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : নরেন্দ্রনাথ মিত্র
আলোকচিত্র : সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দোপাধ্যায়, জয়া

ভাদুড়ী, হরেন চট্টোপাধ্যায়, ভিকি রেডউড, শেফালিকা দেবী প্রমুখ।
পরিবেশক ঃ আর. ডি. বি. অ্যান্ড কোং।
মুক্তির তারিখ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিবা ও অন্যত্র।

চারুলতা ১৯৬৪

প্রযোজনা ঃ আর. ডি. বনশল
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত
ও পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ বায
কাহিনী ঃ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব
আলোকচিত্র ঃ সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ মাধবী মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, গীতালি রায়, ভোলানাথ কয়াল প্রমুখ।
পরিবেশক ঃ আর. ডি. বি অ্যান্ড কোং।
মুক্তির তাবিখ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা, অশোকা ও অন্যত্র।

কাপুরুষ ও মহাপুরুষ ১৯৬৫

প্রাযোজনা ঃ আর ডি বনশল
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত
ও পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়
কাহিনী ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র (কাপুরুষ) ও পরশুরাম (মহাপুরুষ)
আলোকচিত্র ঃ সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, হাবাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (কাপুরুষ)। চারুপ্রকাশ ঘোষ, রবি ঘোষ, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সন্তোষ দত্ত (মহাপুরুষ)।
পরিবেশক ঃ আর. ডি. বি. অ্যান্ড কোং।
মুক্তিব তারিখ ঃ ৭ মে ১৯৬৫।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও অন্যত্র।

নাযক ১৯৬৬

প্রযোজনা ঃ আব. ডি. বনশল
কাহিনী, চিত্রনাট্য,
সঙ্গীত ও পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ বায
আলোকচিত্র ঃ সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ উত্তমকুমাব, শর্মিলা ঠাকুর, নির্মল ঘোষ, সুমিতা সান্যাল প্রমুখ।
পবিবেশক ঃ আর. ডি. বি. অ্যান্ড কোং।
মুক্তিব তাবিখ ঃ ৬ মে ১৯৬৬।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও অন্যত্র।

চিড়িয়াখানা ১৯৬৭

প্রযোজনা ঃ স্টার প্রোডাকশনস
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত
ও পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়
কাহিনী ঃ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায
আলোকচিত্র ঃ সৌম্যেন্দু রায
শিল্প নির্দেশনা ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ উত্তমকুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সুশীল মজুমদার, কণিকা মজুমদার, গীতালি রায়, শ্যামল ঘোষাল প্রমুখ।
পরিবেশক ঃ বলাকা পিকচার্স
মুক্তির তারিখ ঃ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ রাধা, পূর্ণ, অরুণা ও অনাত্র।

গুপী গাইন বাঘা বাইন ১৯৬৯ (আংশিক রঙিন)

প্রযোজনা : পূর্ণিমা পিকচার্স
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত
সাজসজ্জা ও
পরিচালনা : সত্যজিৎ বায়
কাহিনী : উপেন্দ্রকিশোব বায়চৌধুবী
আলোকচিত্র : সৌম্যেন্দু বায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : তপেন চট্টোপাধায়, রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, হবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, কামু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।
পরিবেশক : শ্রী বিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটিড।
মুক্তিব তাবিখ : ৮ মে ১৯৬৯।
প্রেক্ষাগৃহ : মিনার, বিজলী, ছবিঘব, গ্লোব (ইংরাজী সাবটাইটেল) ও অন্যত্র।

অরণ্যের দিনরাত্রি ১৯৭০

প্রযোজনা প্রিয়া ফিল্মস
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত
ও পরিচালনা সত্যজিৎ বায়
কাহিনী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
আলোকচিত্র সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, রবি ঘোষ, সিমি, পাহাড়ী সান্যাল, কাবেরী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।
পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তির তারিখ : ১৬ জানুয়ারি ১৯৭০।
প্রেক্ষাগৃহ : দর্পণা, ইন্দিরা ও অন্যত্র।

প্রতিদ্বন্দ্বী ১৯৭০

প্রযোজনা : প্রিয়া ফিল্মস
চিত্রনাট্য,
সঙ্গীত
ও পবিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
আলোকচিত্র : সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী রায়, কৃষ্ণা বসু, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কব চৌধুরী প্রমুখ।
পবিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তিব তাবিখ : ২৯ অক্টোবর ১৯৭০।
প্রেক্ষাগৃহ : মিনার, বিজলী, ছবিঘব ও অন্যত্র।

সীমাবদ্ধ ১৯৭১ (আংশিক রঙিন)

প্রযোজনা : চিত্রাঞ্জলি
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত
ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : শংকর
আলোকচিত্র : সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : বকণ চন্দ, শর্মিলা ঠাকুর, পারমিতা চৌধুরী, অজয় ব্যানার্জি, হবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।
পরিবেশক : পিয়ালী পিকচার্স।
মুক্তির তাবিখ : ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
প্রেক্ষাগৃহ : শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা, নবীনা ও অনাত্র।

অশনি সংকেত ১৯৭৩ (রঙিন)

প্রযোজনা ঃ বলাকা মুভিজ
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত
ও পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়
কাহিনী ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র ঃ সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা ঃ অশোক বসু
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ববিতা, সন্ধ্যা বায, গোবিন্দ চক্রবর্তী, ননী গাঙ্গুলী প্রমুখ।
পবিবেশক ঃ বলাকা মুভিজ প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তির তাবিখ ঃ ১৫ আগস্ট ১৯৭৩ (করমুক্ত)।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ সুচিত্রা, শ্যামাশ্রী, অলকা। ১৬ আগস্ট ১৯৭৩ থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘব-এ মুক্তি পায়।

সোনার কেল্লা ১৯৭৪ (রঙিন)

প্রযোজনা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সবকার
কাহিনী, চিত্রনাট্য,
সঙ্গীত ও পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায
আলোকচিত্র ঃ সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা ঃ অশোক বসু
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, কুশল চক্রবর্তী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, কামু মুখোপাধ্যায, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।
পরিবেশক ঃ ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তিব তারিখ ঃ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৪ (করমুক্ত)।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ বাধা, মিনার্ভা, বীণা, বসুশ্রী ও অন্যত্র।

জন অরণ্য ১৯৭৫

প্রযোজনা ঃ ইনদাস ফিল্মস
চিত্রনাট্য,
সঙ্গীত ও পবিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়
কাহিনী ঃ শংকর
আলোকচিত্র ঃ সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা ঃ অশোক বসু
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, ববি ঘোষ, উৎপল দত্ত, গৌতম চক্রবর্তী, আরতি ভট্টাচার্য প্রমুখ।
পবিবেশক ঃ ইনদাস ফিল্মস।
মুক্তিব তাবিখ ঃ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ মিনাব, বিজলী, ছবিঘর ও অন্যত্র।

শতরঞ্জ কি খিলাড়ী (উর্দু-ইংরেজি) ১৯৭৭ (রঙিন)

প্রযোজনা ঃ সুরেশ জিন্দাল
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত
ও পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়
কাহিনী ঃ প্রেমচন্দ
আলোকচিত্র ঃ সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ সঞ্জীবকুমার, সৈয়দ জাফরী, শাবানা আজমী, আমজাদ খান, রিচার্ড অ্যাটেনবরো, টম অলটার, ফবিদা জালাল, ভিক্টব ব্যানার্জী, ফারুখ শেখ, সমর্থ নারেন প্রমুখ।
পরিবেশক ঃ ডি কে. বি প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তিব তাবিখ ঃ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ লাইট হাউস, বান্টি।

জয়বাবা ফেলুনাথ ১৯৭৮ (রঙিন)

প্রযোজনা ঃ আর. ডি. বনশল
কাহিনী, চিত্রনাট্য,
সঙ্গীত ও পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র ঃ সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা ঃ অশোক বসু
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, উৎপল দত্ত, জিৎ বসু, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।
পরিবেশক ঃ আর. ডি. বি. অ্যান্ড কোং।
মুক্তির তারিখ ঃ ৫ জানুয়ারি ১৯৭৯।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও অন্যত্র।

হীরক রাজার দেশে ১৯৮০ (রঙিন)

প্রযোজনা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কাহিনী, চিত্রনাট্য,
সঙ্গীত ও পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র ঃ সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা ঃ অশোক বসু
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, রবিন মজুমদার, অজয় ব্যানার্জি প্রমুখ।
পরিবেশক ঃ প ব ফিল্ম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন।
মুক্তির তারিখ ঃ ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮০ (করমুক্ত)।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ রাধা, পূর্ণ প্রাচী ও অন্যত্র।

ঘরে বাইরে ১৯৮৪ (রঙিন)

প্রযোজনা ঃ এন. এফ ডি. সি
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত
ও পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়
কাহিনী ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আলোকচিত্র ঃ সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা ঃ অশোক বসু
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভিক্টর ব্যানার্জী, মনোজ মিত্র, ইন্দ্রপ্রমিত রায়, গোপা আইচ, জেনিফার কাপুর প্রমুখ।
পরিবেশক ঃ ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।
মুক্তির তারিখ ঃ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ (লন্ডন)। ৪ জানুয়ারি ১৯৮৫ (কলকাতা)।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ পূর্ণ, প্রাচী, টকি শো হাউস, গ্লোব (সাব-টাইটেল) ও অন্যত্র।

গণশত্রু ১৯৮৯ (রঙিন)

প্রযোজনা ঃ এন. এফ. ডি. সি.
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত
ও পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়
কাহিনী ঃ হেনরিক ইবসেন
আলোকচিত্র ঃ বরুণ রাহা
শিল্প নির্দেশনা ঃ অশোক বসু
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, মমতাশঙ্কর, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, ভীষ্ম গুহঠাকুরতা, রাজারাম যাজ্ঞিক, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।
পরিবেশক ঃ জগৎ সিং দুগার।
মুক্তির তারিখ ঃ প্যারিসে ২৮ জুন ১৯৮৯। লন্ডনে ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৯। কলকাতায় ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০।
প্রেক্ষাগৃহ ঃ মিত্রা, প্রাচী, বসুশ্রী, বীণা ও অন্যত্র।

শাখা প্রশাখা ১৯৯০ (রঙিন)

প্রযোজনা ঃ জেরার্ড দেপার্দ্যু ও ড্যানিয়েল টোসক্যান দ্য প্ল্যানটিয়ের
কাহিনী, চিত্রনাট্য,
সঙ্গীত ও পবিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র ঃ বরুণ বাহা
শিল্প নির্দেশনা ঃ অশোক বসু
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবাধন বন্দ্যোপাধ্যায, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, রঞ্জিত মল্লিক, লিলি চক্রবর্তী, মমতাশঙ্কর, বাজারাম যাজ্ঞিক প্রমুখ।
পরিবেশক ঃ
মুক্তির তাবিখ ঃ প্যারিসে ২১ আগস্ট ১৯৯১। ভাবতে দূবদর্শনে প্রদর্শিত ৫ মে ১৯৯১।

আগন্তুক ১৯৯১ (রঙিন)

প্রযোজনা ঃ এন. এফ. ডি সি
কাহিনী, চিত্রনাট্য,
সঙ্গীত ও পবিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র ঃ বরুণ রাহা
শিল্প নির্দেশনা ঃ অশোক বসু
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ দীপঙ্কর দে, মমতাশঙ্কর, বিক্রম ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, ধৃতিমান চ্যাটার্জি, রবি ঘোষ, সুব্রতা চ্যাটার্জি, প্রমোদ গঙ্গে ।পাধ্যায়, অজিত ব্যানার্জি।
পরিবেশক ঃ এন. এফ. ডি. সি।
মুক্তির তারিখ ঃ বোম্বাই শহরের 'এরোস' প্রেক্ষাগৃহে ২০ ডিসেম্বর ১৯৯১ (কেবল দুপুরের শো)।

তথ্যচিত্র

রবীন্দ্রনাথ ১৯৬১

প্রযোজনা ঃ ফিল্মস ডিভিসন, ভারত সরকার
চিত্রনাট্য, পরিচালনা
ও ধাবাভায্য ঃ সত্যজিৎ রায়
সঙ্গীত ঃ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
আলোকচিত্র ঃ সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয় ঃ রায়া চ্যাটার্জি, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্মবণ ঘোযাল প্রমুখ।

সিকিম ১৯৭১ (বঙিন)

প্রযোজনা ঃ সিকিম-এব বাজা
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত,
পরিচালনা ও
ধারাভায্য ঃ সত্যজিৎ রায
আলোকচিত্র ঃ সৌম্যেন্দু বায়
শিল্প নির্দেশনা ঃ অশোক বসু
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত

দ্য ইনার আই ১৯৭৪ (রঙিন)

প্রযোজনা ঃ ফিল্মস ডিভিসন, ভাবত সরকার
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত,
পরিচালনা ও
ধারাভায্য ঃ সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র ঃ সৌম্যেন্দু রায়
সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত

বালা ১৯৭৬ (রঙিন)

প্রযোজনা ঃ ন্যাশনাল সেন্টার ফর দি পারফর্মিং আর্টস,

	বোম্বাই ও তামিলনাড়ু সরকার
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, পরিচালনা ও ধারাভাষ্য	ঃ সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	ঃ সৌম্যেন্দু রায়
সম্পাদনা	ঃ দুলাল দত্ত

সুকুমার রায় ১৯৮৭ (রঙিন)

প্রযোজনা	ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, ও পরিচালন	ঃ সত্যজিৎ রায়
ধাবাভাষ্য	ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
আলোকচিত্র	ঃ বরুণ রাহা
সম্পাদনা	ঃ দুলাল দত্ত

অভিনয় ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, সন্তোষ দত্ত, তপেন চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ।

দূরদর্শন চিত্র

টু ১৯৬৪

প্রযোজনা	ঃ 'এসো' ওয়ার্ল্ড থিয়েটার
কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা	ঃ সত্যজিৎ রায
আলোকচিত্র	ঃ সৌম্যেন্দু বায়
শিল্প নির্দেশনা	ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	ঃ দুলাল দত্ত
অভিনয়	ঃ রবি কিরণ।

পিকু ১৯৮২ (রঙিন)

প্রযোজনা	ঃ আঁরি ফ্রেজ
কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা	ঃ সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	ঃ সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	ঃ অশোক বসু
সম্পাদনা	ঃ দুলাল দত্ত

অভিনয় ঃ অর্জুন গুহঠাকুরতা, অপর্ণা সেন, শোভেন লাহিড়ী, প্রামোদ গঙ্গে ।পাধ্যায়, ভিক্টর ব্যানার্জি।

সদগতি ১৯৮২ (রঙিন)

প্রযোজনা	ঃ দূরদর্শন, ভারত সরকার
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা	ঃ সত্যজিৎ রায়
কাহিনী	ঃ মুন্সী প্রেমচন্দ
আলোকচিত্র	ঃ সৌম্যেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	ঃ অশোক বসু
সম্পাদনা	ঃ দুলাল দত্ত

অভিনয় ঃ ওম পুবী, স্মিতা পাতিল, রিচা মিশ্র, মোহন আগাসে, গীতা সিদ্ধার্থ প্রমুখ।

(২৫ এপ্রিল ১৯৮২ তারিখে 'সদগতি' প্রদর্শনের মাধ্যমে ভাবতীয় দূরদর্শনে রঙিন ছবি সম্প্রচার শুরু।)

অন্যের ছবিতে সত্যজিৎ রায়

কাহিনী চিত্র

চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত

বাক্স বদল (পরিচালক ঃ নিত্যানন্দ দত্ত)

ফটিকচাঁদ (পরিচালক ঃ সন্দীপ রায়)

সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস (দূরদর্শনের জন্যে নির্মিত ১৩টি চিত্র) (পরিচালক ঃ সন্দীপ রায়)

সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস-২ (দূরদর্শনের জন্যে নির্মিত ৩টি চিত্র) (পরিচালক ঃ সন্দীপ রায়)

সঙ্গীত

শেক্সপীয়রওয়ালা (পরিচালক ঃ জেমস আইভরি)
গুপী বাঘা ফিরে এলো (পরিচালক ঃ সন্দীপ রায়)

তথ্যচিত্র

চিত্রনাট্য
ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল (পরিচালক ঃ হরিসাধন দাশগুপ্ত)
দি স্টোরি অফ স্টিল (টাটা-র সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে নির্মিত)
আওয়ার চিলড্রেন উইল নো ইচ আদাব বেটাব
(ডানলপ হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে নির্মিত)

সঙ্গীত পরিচালনা

গ্লিম্পসেস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল (পবিচালক ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত)
দার্জিলিং ঃ হিমালযান ফ্যান্টাসি (পরিচালক ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত)
গঙ্গাসাগর মেলা (পরিচালক ঃ বংশী চন্দ্রগুপ্ত)
কোয়েস্ট অফ ওয়েলথ (পরিচালক ঃ হবিসাধন দাশগুপ্ত)
হাউস দ্যাট নেভার ডাইজ (পবিচালক ঃ টনি মেয়ার)
বর্ধমান রাজপরিবারের আত্মীয় টনি মেয়ার একদা বর্ধিযুঃ গোবরডাঙার মুখুজ্জে জমিদার পবিবারের জীর্ণ-প্রায় প্রাসাদোপন ভদ্রাসন ও অতিথিশালা এবং তাতে বসবাসকারী ওই পরিবারেব মানুষজন নিয়ে সাদাকালো তথ্য চিত্রটি তুলেছিলেন (১৯৬৯-৭০) সত্যজিৎ রায় ছিলেন সংগীত-পরিচালক। প্রথম প্রদর্শনীর সময় বম্বেতে এ ছবিব নাম ছিল ঃ হাউস দ্যাট ডায়েড। ওই নামে ছবিটির সমালোচনা ছাপা হয় টাইমস্ অব ইন্ডিয়ায় এবং স্টার অ্যান্ড স্টাইল কাগজে। পরে ওই ছবির নাম পরিবর্তন কবা হয়।
ম্যাক্স মুলার (পবিচালক ঃ লেচনার ও জন থিল)

ধারাভাষ্য

ম্যাক্স মুলাব (পবিচালক ঃ লেচনার ও জন থিল)
টাইডাল বোব (পবিচালক ঃ বিজয় মুলে)

বিজ্ঞাপন চিত্র

চিত্রনাট্য
এ পাবফেক্ট ডে (পরিচালক ঃ হরিসাধন দাশগুপ্ত)
সঙ্গীত
'স্যানডোজ'

সত্যজিৎ বিষয়ক তথ্যচিত্র ও টিভি চিত্র

ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টস অফ ইন্ডিয়া ঃ সত্যজিৎ রায় ১৯৬৩

প্রযোজক ঃ ফিল্মস ডিভিশন, ভারত সরকার
পরিচালক ঃ বি ডি গর্গা
ধারাভাষ্য ঃ সত্যজিৎ রায়

ক্রিয়েটিভ পার্সনস ঃ সত্যজিৎ রায় ১৯৬৮

প্রযোজক ঃ ওয়েস্ট-নেট এড্যুকেশনাল টিভি
পরিচালক ঃ জেমস বেভেরিজ

'লেট নাইট লাইন-আপ' অনুষ্ঠান ১৯৬৯

বিবিসি টেলিভিসন
(সত্যজিৎ রায়েব সাক্ষাৎকাব)

সাউথ ব্যাঙ্ক শো ঃ সত্যজিৎ রায় ১৯৭৮

প্রযোজক ঃ লন্ডন উইক এন্ড টেলিভিশন
পরিচালক ঃ মেলভিন ব্র্যাগ

দি মিউজিক অফ সত্যজিৎ রায় ১৯৮৩

প্রযোজনা ঃ এন. এফ. ডি. সি.
পরিচালক ঃ উৎপলেন্দু চক্রবর্তী

সত্যজিৎ রায় ১৯৮৪

প্রযোজক ঃ ফিল্মস ডিভিশন, ভারত সরকার
পরিচালক ঃ শ্যাম বেনেগাল

সত্যজিৎ রায় ঃ পোর্ট্রেট অফ এ ডিরেক্টর ১৯৮৪

প্রযোজক ঃ সেন্ট্রাল টেলিভিসন
পরিচালক ঃ জিয়া মহিউদ্দিন

অমনিবাস ঃ দি সিনেমা অফ সত্যজিৎ রায় ১৯৮৮

প্রযোজক ঃ বিবিসি টিলিভিশন
পরিচালক ঃ অ্যাডাম লো

সত্যজিৎ রায় ঃ ইন্ট্রোস্‌পেকসনস্‌ ১৯৯১

প্রযোজক ও পরিচালক ঃ কে. বিক্রম সিং

মুভি মাস্টার ক্লাস ১৯৯১

পরিচালক ঃ মামুন হাসান
(সত্যজিৎ বায়েব 'অপুর সংসাব' ছবিটিব বিশ্লেষণ। প্রথম দেখান হয় 'বিবিসি চ্যানেল ফোর'-এ ৮ মে ১৯৯১ তারিখে।)

সত্যজিৎ রায় ১৯৯২

প্রযোজক ঃ এইচ. টি. ভি
সাক্ষাৎকার ঃ শর্মিলা ঠাকুর
(ভাবতীয় দূরদর্শনে ২৪ জানুয়ারি ১৯৯২ তারিখে প্রদর্শিত।)

চলচ্চিত্র পুরস্কারের তালিকা

পথের পাঁচালী

১। ভাবত	বাষ্ট্রপতির স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক ১৯৫৫
২। কান (ফ্রান্স) ঃ নবম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।	শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল ১৯৫৬
৩। এডিনবার্গ (স্কটল্যান্ড) ঃ চলচ্চিত্র উৎসব।	ডিপ্লোমা অফ মেরিট ১৯৫৬
৪। ম্যানিলা (ফিলিপিনস) ঃ চলচ্চিত্র উৎসব।	গোল্ডেন ক্যাববাও ১৯৫৬
৫। বোম ঃ চলচ্চিত্র উৎসব।	ভাটিকান পুবস্কাব ১৯৫৬
৬। সানফ্রান্সিসকো ঃ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।	শ্রেষ্ঠ ছবি ও শ্রেষ্ঠ পবিচালনা ১৯৫৭
৭। বার্লিন ঃ আন্তর্জাতি চলচ্চিত্র উৎসব।	সেলজ্‌নিক গোল্ডেন লরেল ১৯৫৭
৮। ভ্যানকুবার (কানাডা)ঃ চলচ্চিত্র উৎসব।	শ্রেষ্ঠ ছবি ১৯৫৮
৯। স্ট্রাটফোর্ড (কানাডা) ঃ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।	চিত্র সমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ছবি ১৯৫৮
১০। নিউ ইয়র্ক ঃ আফ্রো আর্টস থিয়েটার।	শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি হিসেবে সাংস্কৃতিক পুরস্কার ১৯৫৯
১১।ডেনমার্ক ঃ চলচ্চিত্র সম্পাদক সমিতি।	শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি হিসেবে বোডিল পুবস্কার ১৯৬৬
১২। জাপান	শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি, 'কিনিমা জামপো' পুরস্কার ১৯৬৬

অপবাজিত

১। ভেনিস (ইটালি)ঃ চলচ্চিত্র উৎসব।	শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে 'গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক'। ১৯৫৭ 'সিনেমা ন্যুভো' পুবস্কার ১৯৫৭ সমালোচকদেব বিচারে শ্রেষ্ঠ ছবি ১৯৫৮
২। স্যান ফ্রান্‌সিসকো ঃ চলচ্চিত্র উৎসব।	সমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ছবি ও শ্রেষ্ঠ পবিচালনা ১৯৫৮
৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ	১৯৫৮-৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি হিসেবে 'গোল্ডেন লরেল'। ১৯৫৯

৪। বার্লিনঃ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। — 'সেলজনিক গোল্ডেন লরেল' ১৯৬০

৫। ডেনমার্ক — বছরের শ্রেষ্ঠ অ-ইউরোপীয় ছবি হিসেবে 'বোডিল' পুরস্কার ১৯৬৭

পরশপাথর

জলসাঘর

১। ভারত — দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি রাষ্ট্রপতির রৌপ্য পদক ১৯৫৮

২। মস্কো ঃ চলচ্চিত্র উৎসব — শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের জন্য পুরস্কার ১৯৫৯

অপুর সংসার '

১। ভারত — শ্রেষ্ঠ ছবি, রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ১৯৫৯

২। লন্ডন ঃ চলচ্চিত্র উৎসব — 'বেস্ট ওরিজিন্যাল অ্যান্ড ইমাজিনেটিভ' ফিল্ম হিসেবে 'সাদাবল্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ট্রফি' ১৯৬০

৩। এডিনবার্গ চলচ্চিত্র উৎসব — 'ডিপ্লোমা অফ মেরিট' ১৯৬০

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র — 'ন্যাশনাল বোর্ড অফ রিভিউ অফ মোশন পিকচার্স' প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবির পুরস্কার ১৯৬০

অপু চিত্রত্রয়ী (অপু ট্রিলজি)

১। লন্ডন ঃ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। — প্রতিটি চলচ্চিত্রের জন্যে 'উইংটন' পুরস্কার ১৯৬০

দেবী

১। ভারত — শ্রেষ্ঠ ছবি, রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক ১৯৬০

তিনকন্যা

১। ভারত — সমাপ্তি ছবিটির জন্য রাষ্ট্রপতির রৌপপদক ১৯৬১

২। মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়া) — 'সমাপ্তি' ও 'পোস্টমাস্টার' শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে মেলবোর্ন ট্রফি ঃ গোল্ডেন বুমেরাং ১৯৬২

৩। বার্লিন ঃ চলচ্চিত্র উৎসব ঃ — সেলজনিক গোল্ডেন লরেল ১৯৬৩

কাঞ্চনজঙ্ঘা

অভিযান

১। ভাবত — রাষ্ট্রপতির রৌপ পদক১৯৬২

মহানগর

১। ভারত	রাষ্ট্রীয় মানপত্র ১৯৬৩
২। বার্লিন ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	শ্রেষ্ঠ পরিচালক, 'সিলভার বিয়ার' ১৯৬৪

চারুলতা

১। ভারত	শ্রেষ্ঠ ছবি, রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ১৯৬৪
২। বার্লিন ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	শ্রেষ্ঠ পরিচালক, 'সিলভার বিয়ার' ও বিশেষ 'ক্যাথলিক' পুরস্কার ১৯৬৫
৩। আকাপুলকা (মেক্সিকো) চলচ্চিত্র উৎসব	শ্রেষ্ঠ ছবি ১৯৬৫

কাপুরুষ ও মহাপুরুষ

১। কান (ফ্রান্স) ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	বিশেষ পুরস্কার (কাপুরুষ) ১৯৬৬

নায়ক

১। ভারত	দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি, রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য ও কাহিনী ১৯৬৬
২। বার্লিন ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	বিশেষ জুরি পুরস্কার ইউনিক্রিটি, সিনেমা সমালোচক সংঘ প্রদত্ত পুরস্কার ১৯৬৬

চিড়িয়াখানা

১। ভারত	শ্রেষ্ঠ পরিচালক - রূপে জাতীয় পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ১৯৬৭

গুপী গাইন বাঘা বাইন

১। ভারত	রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ পরিচালকের জন্যে রৌপ্যপদক ১৯৬৯
২। অ্যাডিলেড (অস্ট্রেলিয়া) ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	অসাধারণ গুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের জন্য 'সিলভার সাদার্ন ক্রশ' ১৯৬৯
৩। অকল্যান্ড (নিউজিল্যান্ড) ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	শ্রেষ্ঠ মৌলিক ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক ১৯৬৯
৪। টোকিও ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	'মেরিট অ্যাওয়ার্ড, ১৯৭০

৫। মেলবোর্ন ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	শ্রেষ্ঠ ছবি ১৯৭০

অরণ্যের দিনরাত্রি

প্রতিদ্বন্দ্বী

১। ভারত	দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি, রাষ্ট্রপতিব রৌপ্যপদক, শ্রেষ্ঠ পরিচালক ১৯৭১

সীমাবদ্ধ

১। ভারত	শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে বাষ্ট্রপতিব স্বর্ণপদক ১৯৭২
২। ভেনিস ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	FIPRESCI (চলচ্চিত্র সমালোচক সংঘ) পুরস্কাব ১৯৭২

অশনি সংকেত

১। ভাবত	শ্রেষ্ঠ ছবি[illegible] জন্যে বাষ্ট্রপতিব স্বর্ণপদক, [illegible] আবহসঙ্গীত ১৯৭৩
২। পশ্চিবঙ্গ সরকার	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ১৯৭৩
৩। বার্লিন ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	শ্রেষ্ঠ ছবিব জন্যে 'গোল্ডেন বিয়ার' ১৯৭৪

সোনাব কেল্লা

১। ভারত	দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবির জন্যে বাষ্ট্রপত্বিব বৌপপদক, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য, শ্রেষ্ঠ বঙিন আলোকচিত্র ১৯৭৪
২। পশ্চিমবঙ্গ সরকার	শ্রেষ্ঠ ছবি ও শ্রেষ্ঠ পবিচালক ১৯৭৪
৩। তেহ্বান (ইবান) চলচ্চিত্র উৎসব	কিশোবদেব ও তরুণদেব জন্যে নির্মিত শ্রেষ্ঠ প্রাণবন্ত কাহিনীচিত্র—'গোল্ডেন স্ট্যাচুয়েট' পুরস্কাব ১৯৭৫

জন-অরণ্য

১। ভাবত	শ্রেষ্ঠ পবিচালক ১৯৭৫
২। পশ্চিমবঙ্গ সরকাব	শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য ১৯৭৫
৩। [illegible] ভ্যাবি ([illegible]স্লোভাকিয়া) চলচ্চিত্র উৎসব	বিশেষ পুবস্কার ১৯৭৬

শতবঞ্চ কি খিলাড়ী

১। ভারত	জাতীয় পুবস্কার, শ্রেষ্ঠ হিন্দি ছবি, শ্রেষ্ঠ বঙিন আলোকচিত্র ১৯৭৭

জয় বাবা ফেলুনাথ

১। ভাবত	জাতীয় পুবস্কার,

	শ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্র ১৯৭৮
২। হংকং ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	শ্রেষ্ঠ ছবি ১৯৭৯

হীরক বাজার দেশে

১। ভারত	জাতীয় পুবস্কাব, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ গীতরচনা ১৯৮০
২। সাইপ্রাস ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	বিশেষ পুরস্কার ১৯৭৯

ঘবে বাইরে

১। ভাবত	জাতীয় পুবস্কাব, শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি, শ্রেষ্ঠ পোশাক পরিকল্পনা ও শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতার পুরস্কার ১৯৮৪
২। দামাস্কাস (সিরিয়া) ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	বিশেষ স্বর্ণপদক ১৯৮৫

গণশত্রু

১। ভারত	জাতীয় পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি ১৯৮৯

আগন্তুক

১। ভেনিস (ফ্রান্স) ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	FIPRESCI (চলচ্চিত্র সমালোচক) পুবস্কার ১৯৯১

তথ্যচিত্র

রবীন্দ্রনাথ

১। ভাবত	রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ১৯৬১
২। লোকার্নো (সুইজারল্যান্ড) ঃ চলচ্চিত্র উৎসব	শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রের পুরস্কার 'গোল্ডেন শীল' ১৯৬১
৩। মন্টেভিডো (উরুগুয়ে) ঃ তথ্যচিত্র ও পবীক্ষামূলক চলচ্চিত্র উৎসব	বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র হিসেবে পুরস্কৃত ১৯৬২

দ্য ইনাব আই

১। ভাবত	প্রধানমন্ত্রীব স্বর্ণপদক ১৯৭২

টিভি চিত্র

সদগতি

১। ভাবত	বিশেষ জুরি পুরস্কার ১৯৮২

বিশেষ সম্মান ও ব্যক্তিগত পুরস্কার

১৯৩৬ ঃ ভয়েটল্যান্ডার ক্যামেবায ছবি তুলে বিলেতেব 'বয়েজ ওন পেপার' পত্রিকায প্রথম পুরস্কার।

১৯৫৬ ঃ দিল্লিতে আন্তর্জাতিক প্রচ্ছদ প্রদর্শনীতে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-ব 'সংবর্ত' বইয়ের প্রচ্ছদের জন্য স্বর্ণপদক।

১৯৫৭ ঃ ২৩ সেপ্টেম্বর, ইডেন গার্ডেনস-এ বঙ্কি স্টেডিয়ামে নাগরিক সংবর্ধনা।

১৯৫৮ ঃ ব্রাসেলস-এ বিশ্বের সাতজন সেরা পবিচালক দ্বাবা দশটি সেবা ছবি নির্বাচন প্রতিযোগিতায় বিচাবক। ভাবত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী'।

১৯৫৯ ঃ সঙ্গীত নাটক অকাদেমি-ব বিশেষ সম্মান।

১৯৬০ ঃ ভিয়েনা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্নিযা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিশেষ সম্মান।

১৯৬১ ঃ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমন্ডলীর সভাপতি। পশ্চিম জার্মানিব বেটা ফিল্মস-এর মতে বিশ্বেব ছয় জন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের অন্যতম।

১৯৬৩ ঃ মার্কিন 'টাইম' পত্রিকার মতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এগাবোজন চিত্র পরিচালকদেব অন্যতম। মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি।

১৯৬৫ ঃ পদ্মভূষণ। দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমন্ডলীর সভাপতি।

১৯৬৭ ঃ 'প্রোফেসর শঙ্কু' বছরের শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্য গ্রন্থ হিসেবে অকাদেমি পুরস্কার। 'ম্যাগসাই সাই' পুরস্কার। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে বিচাবক।

১৯৬৮ ঃ মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধান অতিথি।

১৯৭১ ঃ যুগোস্লাভিয়া সরকার কর্তৃক 'স্টাব অফ যুগোস্লাভিয়া'। সাহিত্যে আনন্দ পুরস্কার (সুবেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কাব)। তেহবান চলচ্চিত্র উৎসবে বিচাবক।

১৯৭২ ঃ কানাডার টরেন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক।

১৯৭৩ ঃ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টর অফ লেটাবস্'। শিকাগো চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি প্রদত্ত 'গোল্ডেন হুগো'।

১৯৭৪ ঃ লন্ডনের 'রয়্যাল কলেজ অফ আর্টস' কর্তৃক 'ডক্টরেট'। 'এনসাইক্লোপিডিযা ব্রিটানিকা' গ্রন্থে নাম নথীভুক্ত।

১৯৭৫ ঃ দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমন্ডলীর সভাপতি। 'ব্রিটিশ ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটি' তাঁকে 'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক'রূপে সম্মান জানায়। পুনে শহবে নাগরিক সংবর্ধনা।

১৯৭৬ ঃ পদ্মবিভূষণ।

১৯৭৭ ঃ দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমন্ডলীব

সভাপতি। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নর্টন লেকচারস্' দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রিত।

১৯৭৮ ঃ ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি লিট'। বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম'। 'বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি' তাঁকে 'সর্বকালের তিনজন সেরা চিত্র পরিচালকের অন্যতম' আখ্যা দেয়। অপর দু'জন হলেন চার্লি চ্যাপলিন ও ইঙ্গমার বার্গম্যান।

১৯৭৯ ঃ 'বিংশ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ব চলচ্চিত্রে সেরা নয়জন চিত্র পরিচালকের অন্যতম'রূপে সম্মান জানায় মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি।

১৯৮০ ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি লিট'। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি লিট'। 'পথের পাঁচালির' ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'ডি এ ভি পি'-র উদ্যোগে বর্ষব্যাপী ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় বাঙ্গালোর চলচ্চিত্র উৎসবে। পথের পাঁচালি-র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় ডাক বিভাগ বিশেষ 'ক্যানসেলেশন' প্রকাশ করে।

১৯৮১ ঃ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক 'ডক্টরেট'। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি লিট'। 'শিশিরকুমার সাহিত্য পুরস্কার' প্রাপ্তি। 'একেই বলে শুটিং' গ্রন্থটির জন্যে 'শিশু সাহিত্য পরিষদ' প্রদত্ত বছবের শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক হিসেবে 'ফটিক স্মৃতি পুরস্কার'।

১৯৮২ ঃ ম্যানিলা চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমন্ডলীর সভাপতি। কান চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি তাঁকে বিশ্ব চলচ্চিত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্যে 'হেডলেস অ্যাঞ্জেল ট্রফি' দ্বারা সম্মান। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক। ওই উৎসবে তাঁকে বিশ্বের সেরা দশজন চিত্রপরিচালকের অন্যতমরূপে 'গোল্ডেন লায়ন অপ সেন্ট মার্ক' প্রদান করা হয়। রোম চলচ্চিত্র উৎসবে 'ভিসকান্তি' পুবস্কার। শিশু সাহিত্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সবকাব প্রদত্ত 'বিদ্যাসাগব পুরস্কার'। ২৫ এপ্রিল, ভাবতীয় দূরদর্শন প্রযোজিত 'সদগতি' প্রদর্শনের মাধ্যমে দূরদর্শনে রঙিন ছবির সম্প্রচার শুরু।

১৯৮৩ ঃ 'ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট' কর্তৃক বিশেষ ফেলোশিপ।

১৯৮৫ ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টরেট'। 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে' সম্মানিত। 'সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার' অর্জন।

১৯৮৬ ঃ সঙ্গীত নাটক অকাদেমি-র বিশেষ ফেলোশিপ।

১৯৮৭ ঃ ফরাসী সরকার কর্তৃক ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান 'লিজিয়ন অফ অনার'। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি লিট'। দাদাভাই নওরোজি স্মৃতি পুরস্কার। 'টিনটোরেটোর যীশু' গ্রন্থটির জন্যে 'ন্যাশনাল

কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ ট্রেনিং' কর্তৃক শিশু সাহিত্যের পুবস্কাব।

১৯৮৯ ঃ অসম সবকাব প্রদত্ত 'শঙ্কবদেব বঁটা' পুবস্কার। ফ্রান্সে সেবা বিদেশী গ্রন্থেব জন্যে বিশেয পুরস্কাব। মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেব সান্তা ক্রুজ বিশ্ববিদ্যালয প্রদত্ত 'অবসন ওযালেস' পুবস্কাব।

১৯৯০ ঃ 'এশিয়ান পেন্টস' কর্তৃক শিবোমণি পুবস্কার।

১৯৯১ ঃ টোকিও চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি কর্তৃক বিশেস সম্মান। কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'সত্যজিৎ বায রেট্রোসপেকটিভ' এবং সত্যজিৎ বিষযক আলোকচিত্রেব প্রদর্শনী।

১৯৯২ ঃ নিউইযর্কের 'অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার্স' কর্তৃক 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট'-এর জন্যে বিশেষ 'অস্কাব'। 'জাতীয অধ্যাপক' সম্মান।

রেকর্ড-পঞ্জি (Discography)

(বেকর্ড / ক্যাসেট / কমপ্যাক্ট ডিস্ক)

১ (Ravi Shankar Improvisations & Theme From 'PATHER PANCHALI' - (LP 33⅓) WORLD PACIFIC WP 1416 (USA) 1961 WORLD PACIFIC / HMV EALP 1288 (INDIA) 1964

[একটি ক্যাসেটও বেবিযেছে। তথ্য হাতে নেই।]

২.'মণিহাবা' (তিন কন্যা) — 'বাজে করুণ সুবে' (ববীন্দ্রনাথ) ঃ রুমা গুহঠাকুবতা

'বাক্স বদল' — 'আমাব পবাণ যাহা চায়' (রবীন্দ্রনাথ) ঃ রুমা গুহঠাকুবতা MEGAPHONE JNG 6192 (78 RPM) 1965

৩ 'বাক্স বদল' — ' আমাব পবাণ যাহা চায়' (ববীন্দ্রনাথ) ঃ রুমা গুহঠাকুবতা 'মোবা জলে স্থলে' (ববীন্দ্রনাথ) ঃ রুমা গুহঠাকুবতা ও অন্যান্য MEGAPHONE JNG 6191 (78 RPM) 1965

৪ 'দেবী' — 'এবাব তোবে চিনেছি মা' (গীতিকাব সত্যজিৎ বায) ঃ পৃথ্বীশ মুখোপাধ্যায়

'চিড়িয়াখানা' - 'ভালোবাসাব তুমি কি জান' (গীতিকাব সত্যজিৎ রায) ঃ নমিতা ঘোষাল HMV N 77109 (78 RPM) 1967

৫.'গুপী গাইন বাঘা বাইন' - 'ভূতের রাজা দিল বর' (সত্যজিৎ রায়) ঃ অনুপ ঘোষাল, রবি ঘোষ 'দেখরে নয়ন মেলে' (সত্যজিৎ রায) ঃ অনুপ ঘোষাল 'ও মন্ত্রী মশাই' (সত্যজিৎ রায়) ঃ অনুপ ঘোযাল, রবি ঘোয ANGEL RECORDS / EMI 45-AE. 4001 (45 RPM STANDARD PLAY) 1969

৬ 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' - 'মহাবাজা, তোমাবে সেলাম' (সত্যজিৎ বায়)ঃ অনুপ ঘোষাল, ববি ঘোষ)

ANGEL RECORDS / EMI 45-AE 4002 (45 RPM STANDARD PLAY) 1969

৭.'গুপী গাইন বাঘা বাইন' - 'ওবে বাবা দেখ চেয়ে' (সত্যজিৎ বায) ঃ অনুপ ঘোষাল, ববি ঘোষ 'ওরে বাঘা রে, ওরে গুপী বে' (সত্যজিৎ বায) ঃ অনুপ ঘোষাল, রবি ঘোষ 'ওবে বাবা দেখ চেযে' (ঐ) ঃ অনুপ ঘোযাল 'এক যে ছিল বাজা' (ঐ) ঃ অনুপ ঘোষাল, রবি ঘোষ

ANGEL RECORDS / EMI TAE 4029 (45 RPM EXTENDED PLAY) 1696

৯ 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' - REGAL EMI ELRZ-46 (LP $33^1/_3$) 1970 SIDE ONE Title Music, Goopy Theme, Dance of the Ghosts, King of the ghost Gives 3 Boons, দেখবে নযন মেলে, ভূতেব রাজা দিল বর, Goopy & Bagha Land on Snow, the Flutist in the Shundi Fair, মহারাজা তোমারে সেলাম

SIDE TWO · Goopy & Bagha in Their Palace Room, entry of the Hallah King, ওবে বাঘা রে, The Prisoners, ও মন্ত্রীমশাই, Berfi Theme, Search for & Capture of Goopy & Bagha, এক যে ছিল বাজা, হাল্লা চলেছে যুদ্ধে, Camel March, ওরে বাবা দেখ চেয়ে, Goopy & Bagha Approve of the Princesses

১০ 'SHAKESPEARE WALLAH' - EPIC RECORDS, FOOTLIGHT SERIES (LP $33^1/_3$) 1966

STEREO / FLS 15110, MONO / FLM 13110 (USA)

COLUMBIA RECORDS, MONO / 33 EIX 5013 (INDIA)

১১ Ravi Shankar Music From SATYAJIT RAY'S APU TRILOGY EMI ECLP 3411 (LP $33^1/_3$) 1978

১২.'SHATRANJ KE KHILARI' - EMI S/45 NLP 1006 (45 RPM LP) 1977

Contains Songs by Birju Maharaj, Reba Muhuri, Calcutta Youth Choir & Amjad Khan

১৩ 'জয় বাবা ফেলুনাথ' -EMI 7 EPE 5103 (45 RPM EXTENDED PLAY) 1979

Contains Two Traditional Bhajans sung by Reba Muhuri

১৪ 'হীবক রাজাব দেশে' -EMI S/7EPE 5130 (45RPM EXTENDED PLAY) 1981

SIDE ONE · আব বিলম্ব নয়, এসে হীরক দেশে, দুজন ভায়রা ভাই

SIDE TWO . দৃশ্য দেখি অন্য, ধোবোনা কো মন্ত্রীমশাই, পাযে পড়ি বাঘমামা

(সবগুলিরই গীতিকাব ঃ সত্যজিৎ বায।)

১৫.'হীবক বাজার দেশে' -EMI ECSD 3418 (LP $33^1/_3$) 1980

SIDE ONE · মোরা দুজনায় বাজাব জামাই, Growing Old, আব বিলম্ব নয়, Father-in-law

Agrees, King Hirok Arrives, Ministers Get Necklaces, The Professor, The Brain-Washing Machine, কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়, The Reciting of Mantras, Udayan Advises his Students, the Burning of Books, আহা কি আনন্দ

SIDE TWO : সাগরে দেখ চেয়ে, দৃশ্য দেখি অন্য, দেখ গর্বিত বীর, The Poor are Driven Away, The Prosession of Kings, Rings for the Kings, এসে হীরক দেশে, The Hunt for Udayan, দোরোনা কো মন্ত্রী মশাই, পায়ে পড়ি বাঘমামা, Jantar-Mantar, নহি যন্ত্র, দুজন ভায়রা ভাই

(সবগুলিরই গীতিকার ঃ সত্যজিৎ রায়।)

১৬.'গুপী গাইন বাঘা' বাইন' / 'হীরক রাজার দেশে'
EMI ODEON 4TWO 22806 (Cassette) 1982 (Selected Songs)

১৭.'ঘরে বাইরে' - সংলাপ, গান, আবহসংগীত
EMI PSLP 1505 (LP $33^1/_3$) 1985
EMI 4TCS 02F 2575 (Cassette) 1985

১৮.'THE WANDERING COMPANY'-Merchant Ivory Productions-Twenty Fifth Anniversary, 1987
(২টি এল. পি, ২টি ক্যাসেট ও কমপ্যাক্ট ডিস্ক আমেরিকায় প্রকাশিত)।
2 Cassttes - HMV, India, Volume 1 STCS 04F 7298 / Volume 2 STCS 04F 7299

১৯. VOLUME 2 SIDE A contains 5 Tracks From 'SHAKESPEARE WALLAH'
'LE SALON DE MUSIQUE (Jalsaghar) - Ocora, Radio France, 1989
L.P - 559022, HM 57
Cassette - 4 559022, HM 52
Compact Disc - C559022, HM 83
Contains Dialogue, Music & Songs

[বি. দ্র উপরের রেকর্ড-পঞ্জিতে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অন্যের সংগীত পরিচালনা (যেমন, রবিশঙ্কর), সত্যজিৎ রায়ের নিজের ছবিতে নিজের সংগীত পরিচালনা (১৯৬১ থেকে) ও অন্যের ছবিতে সত্যজিৎ রায়ের সংগীত পরিচালনা - সব রেকর্ডই নির্দেশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, সত্যজিৎ রায়ের সংগীত দু'টি এল-পি, দু'টি ক্যাসেট ও একটি কমপ্যাক্ট ডিস্ক-এ সংকলিত হয়ে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। আর আছে 'গুপী-বাঘা ফিরে এলো' ছবির সংগীত।]

ভিডিও-তে সত্যজিৎ রায়ের ছবি

ভারত

১.পথের পাঁচালি — NFDC VIDEO, Bombay (English Sub-titles)

২.অপরাজিত — NFDC VIDEO, Bombay (English Sub-titles)

৩ অপুর সংসার — NFDC VIDEO, Bombay (English Sub-titles)

৪.কাঞ্চনজঙ্ঘা — FENIMA VIDEO, Calcutta (English Sub-titles)

৫.অভিযান —ANGEL VIDEO, Calcutta

৬.চারুলতা —ANGEL VIDEO, Calcutta

৭.সীমাবদ্ধ — BOND VIDEO, Calcutta

৮. THE INNER EYE —FILMS DIVISION VIDEO, Bombay

৯. SATYAJIT RAY by Shyam Benegal — FILMS DIVISION VIDEO, Bombay

(বি. দ্র. Esquire (Overseas) video-তে সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' ও 'চারুলতা' এবং ইংল্যান্ডের Longman Video 'চারুলতা' ছবির ভিডিও ক্যাসেট বার করেছিল। আনুষঙ্গিক তথ্য হাতে নেই।)

ব্রিটেন

1.PATHER PANCHALI : Connoisseur Video (English Sub-Titles)

2.APARAJITO : Connoisseur Video (English Sub-titles)

3.THE WORLD OF APU (APUR SANSAR) : Connoisseur Video (English Sub-titles)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

DIVI (The Goddess), TWO DAUGHTERS (Postmaster, Samapti, (The Conclusion), ASHANI SANKET (Distant Thunder), GHARE BAIRE (The Home and the World) & THE APU TRILOGY

(বিভিন্ন ভিডিও ক্যাটালগ থেকে উপরোক্ত নামগুলি সংকলিত, আনুষঙ্গিক তথ্য দেওয়া গেল না।)

Daphnis

aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

(&$£.:;"'-!?¢%/')

BIZARRE

ABCDEFGHIJKLMNOPQ

RSTUVWXYZ

1234567890

(&$£..:;"'--!?¢%/')
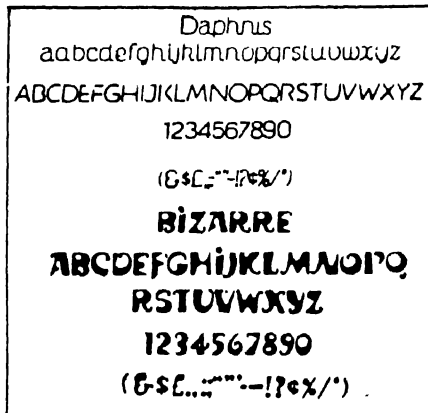
গ্রন্থপঞ্জি

গোয়েন্দা কাহিনী

(ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার)

১। **বাদশাহী আংটি**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৯।

২। **গ্যাংটকে গণ্ডগোল**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭১।

৩। **সোনার কেল্লা**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭১।

৪। **বাক্স রহস্য**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৩।

৫। **কৈলাসে কেলেঙ্কারি**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৪।

৬। **রয়েল বেঙ্গল রহস্য**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৫।

৭। **জয় বাবা ফেলুনাথ**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৬।

৮। **ফেলুদা এন্ড কোং**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭।
(সূচী ঃ বোম্বাইয়েব বোম্বেটে, গোসাঁইপুব সবগবম)

৯। **গোরস্থানে সাবধান**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৯।

১০। **ছিন্নমস্তার অভিশাপ**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।

১১। **হত্যাপুরী**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।

১২। **যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে** । কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮২।

১৩। **টিনটোরেটোর যীশু**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৩।

১৪। **ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৫।
(সূচী ঃ নেপোলিযনের চিঠি, এবাব কাণ্ড কেদারনাথে)

১৫। **দার্জিলিং জমজমাট**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

১৬। **ডবল ফেলুদা**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৯।
(সূচী ঃ অম্ববা থিয়েটাবেব মামলা, ভূস্বর্গ ভযঙ্কব)

১৭। **নয়ন রহস্য**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯১।

কল্প-বিজ্ঞান কাহিনী (প্রোফেসর শঙ্কুব কাহিনী)

১। **প্রোফেসর শঙ্কু**। কলকাতা, নিউ স্ক্রিপ্ট, ১৯৬৫।
(সূচী ঃ ব্যোমযাত্রীব ডাযরি, প্রোফেসব শঙ্কু ও হাড়, প্রোফেসব শঙ্কু ও ম্যাকাও, প্রোফেসব শঙ্কু ও ঈজিপ্সীয আতঙ্ক, প্রোফেসব শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল, প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক-বহস্য, প্রোফেসব শঙ্কু ও চী-চিং। দ্বিতীয় সংস্কবণে প্রোফেসব শঙ্কু ও খোকা এবং
প্রোফেসব শঙ্কু ও ভূত গল্প দুটি যোগ হয়)

২। **প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭০।
(সূচী ঃ প্রোফেসর শঙ্কু ও বোবু, প্রোফেসর শঙ্কু ও কোচাবাম্বার গুহা, প্রোফেসর শঙ্কু ও বক্তমৎস্য বহস্য, প্রোফেসর শঙ্কু ও গোরিলা, প্রোফেসর শঙ্কু ও বাগদাদের বাক্স)

৩। **সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৪।
(সূচী ঃ আশ্চর্য প্রাণী, স্বপ্নদ্বীপ, মরু

রহস্য, কর্ভাস, ডঃ শেবিং-এর স্মরণশক্তি)

৪। **মহাসঙ্কটে শঙ্কু**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭।
(সূচী ঃ শঙ্কুর শনির দশা, শঙ্কুব সুবর্ণ সুযোগ, হিপ্‌নোজেন)

৫। **স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮০।
(সূচী ঃ মানরোদ্বীপেব রহস্য, কম্পু, একশৃঙ্গ অভিযান)

৬। **শঙ্কু একাই ১০০**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৩।
(সূচী ঃ মহাকাশেব দূত, শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান, নকুড়বাবু ও এল ডোবাডো, প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ এফ. ও)

উপন্যাস ও গল্প

১। **এক ডজন গপ্‌পো**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭০।
(সূচী ঃ সেপ্টোপাসের খিদে, বঙ্কুবাবুব বন্ধু, বিপিন চৌধুবীর স্মৃতিভ্রম, দুই ম্যাজিশিযান, অনাথবাবুব ভয়, শিবু আর রাক্ষসেব কথা, টেরোড্যাকটিলেব ডিম, বাদুড় বিভীষিকা, পটলবাবু ফিল্মস্টার, নীল আতঙ্ক, ফেলুদাব গোয়েন্দাগিরি, কৈলাস চৌধুরীর পাথর)

২। **আরো এক ডজন**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৬।
(সূচী ঃ প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্, ফ্রিৎস, ব্রাউন সাহেবেব বাড়ি, সদানন্দের খুদে জগৎ, খগম, বতনবাবু আব সেই লোকটা, ভক্ত, বাতিকবাবু, 'বারীন ভৌমিকের ব্যারাম, শেয়াল-দেবতা রহস্য, সমাদ্দারেব চাবি, ঘুরঘুটিয়াব ঘটনা)

৩। **ফটিকচাঁদ**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৬।

৪। **তিন রকম**। কলকাতা, কথামালা, ১৯৭৯।
(সূচী ঃ আর্যশেখরেব জন্ম ও মৃত্যু, পিকুব ডাযরি, শাখাপ্রশাখা। একটি চিত্রনাট্যেব অংশ)

৫। **আরো বারো**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।
(সূচী ঃ লোডশেডিং, সহদেববাবুব পোর্ট্রেট, বিযফুল, অসমঞ্জবাবুর কুকুর, মিঃ শাসমলেব শেয শাত্রি, ক্লাস ফ্রেন্ড, পিন্টুব দাদু, ভুতো, চিলেকোঠা, অতিথি, বৃহচ্চঞ্চু, গোলোকধাম রহস্য)

৬। **এবারো বারো**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪।
(সূচী ঃ সাধনবাবুব সন্দেহ, মানপত্র, স্পটলাইট, ধাপ্পা, ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট, অঙ্ক স্যাব গোলাপীবাবু আব টিপু, অপদার্থ, ফার্স্টক্লাস কামবা, গগন চৌধুবীব স্টুডিও, বহুরূপী, অম্বব সেন অন্তর্ধান রহস্য, জাহাঙ্গীবেব স্বর্ণমুদ্রা)

৭। **তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৫।
(সূচী ঃ ডুমনিগড়েব মানুষখেকো, কনওয়ে কাস্‌লেব প্রেতাত্মা, শেঠ গঙ্গারামেব ধনদৌলত, লক্ষ্ণৌব ডুয়েল, ধূমলগড়ের হান্টিং লজ, খেলোযাড় তাড়িণীখুড়ো, টলিউডে তারিণীখুড়ো, তারিনীখুড়ো ও বেতাল)

৮। **পিকুর ডায়রি ও অন্যান্য**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৬।
(সূচী ঃ পিকুব ডায়রি, পিকু (চিত্রনাট্য), আর্যশেখবের জন্ম ও মৃত্যু, ময়ূরকণ্ঠী জেলি, সবুজ মানুষ,

শাখা-প্রশাখা (চিত্রনাট্য))

৯। **সুজন হরবোলা**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭।
(সূচী ঃ সুজন হরবোলা, গঙ্গারামের কপাল, রতন আর লক্ষ্মী, কানাইয়ের কথা)

১০। **একের পিঠে দুই**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৮।
(সূচী ঃ অনুকূল, টেলিফোন, আমি ভূত, কাগ্‌তাড়ুয়া, লাখপতি, গণেশ মুৎসুদ্দির পোর্ট্রেট, নিতাই ও মহাপুরুষ, কুটুম-কাটাম, নিধিবামেব ইচ্ছাপূবণ, রামধনের বাঁশী, মাস্টাব অংশুমান, বোসপুকুরে খুনখারাপি)

চিত্রনাট্য

১। **কাঞ্চনজঙ্ঘা**। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭২।

২। **নায়ক**। কলকাতা,, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭৩।

৩। **The Chess Players and other screenplays.** London. Faber and Faber, 1989.
(Contents : The Chess Players, Sadgati, The Alien)

চলচ্চিত্র-বিষয়ক প্রবন্ধ

১। **বিষয় চলচ্চিত্র**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৬। (দ্বিতীয় বা পেপারব্যাক সংস্করণ, ১৯৮২)
(সূচী ঃ চলচ্চিত্রের ভাষা। সেকাল ও একাল, হলিউডের হালচাল, চলচ্চিত্র-রচনা ঃ আঙ্গিক, ভাষা ও ভঙ্গি, ডিটেল সম্পর্কে দু'চার কথা, চলচ্চিত্রের সংলাপ প্রসঙ্গে, পরিচালকের দৃষ্টিতে সমালোচক, 'অপুর সংসার' প্রসঙ্গে, 'চারুলতা' প্রসঙ্গে, দুই চরিত্র, একথা-সেকথা, বিনোদ-দা, রঙীন ছবি)
দ্বিতীয় সংস্করণে 'হলিউডের হালচাল' প্রবন্ধটি বাদ যায় এবং সোভিয়েত চলচ্চিত্র, অতীতের বাংলা ছবি, বাংলা চলচ্চিত্রের আর্টের দিক, আবহসঙ্গীত প্রসঙ্গে, দুটি সমস্যা, ওরফে ইন্দির ঠাকরুণ, শতাব্দীর সিকিভাগ, প্রবন্ধগুলি যুক্ত হয়)

২। **একেই বলে শুটিং**। কলকাতা, নিউস্ক্রিপ্ট, ১৯৭৯।
(সূচী ঃ বাঘের খেলা, হুণ্ডী-ঝুণ্ডী-শুণ্ডী, উট বনাম ট্রেন, হাল্লারাজার সেনা, ফেলুদার সঙ্গে কাশীতে)

৩। **Our films,** Their Films. Calcutta, Orient Longman, 1976.
(Contents . Introduction, What is wrong with Indian films, Extracts from a Benaras diary, A Long time of the little road, Problems of a Bengal film maker, Winding route to music room, Film making, The odds against us, Some aspects of my craft, Those songs. Meetings with a Maharaja, An Indian new wave, Four and a quarter, Renoir in Calcutta, Some Italian films I have seen, Hollywood then and new, Thoughts on the British Cinema, Calm without fire within, Moscow musings. The gold rush, Little man big book, Akira Kurosawa, Tokyo Kyoto and Kurosawa, New wave and old master, Silent films, A tribute to John Ford.)

অনুবাদ

১। **Nonsense Rhymes** (by

Sukumar Ray) . translated by Satyajit Ray. Calcutta, Writers Workshop, 1970

২। **মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৫।

৩। **তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।** কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৬।
এডওয়ার্ড লিয়র, ল্যুইস ক্যারল, হিলেয়ার বেলক ও ডার্মি টমসন-এর কবিতার অনুবাদ)

৪। **ব্রেজিলের কালো বাঘ ও অন্যান্য।** কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭। (সূচী ঃ ব্রেজিলের কালো বাঘ —আর্থার কনান ডয়েল, ব্লু-জন গহ্বরেব বিভীষিকা—আর্থার কনান ডয়েল, ইহুদির কবচ—আর্থার কনান ডয়েল, ঈশ্বরেব ন'লক্ষ কোটি নাম—আর্থাব সি ক্লার্ক, মঙ্গলই স্বর্গ—বে ব্রাডবেরি)

সঙ্কলন

১। **সেরা সত্যজিৎ**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯১।
(সূচী ঃ যখন ছোট ছিলাম, বিপিন চৌধুরীব স্মৃতিভ্রম, পটলবাবু ফিল্মস্টাব, খগম, বতনবাবু আব সেই লোকটা, ভক্ত, অসমঞ্জবাবুর কুকুর, ক্লাস ফ্রেন্ড, বৃহচ্চঞ্চু, লখনৌব ডুয়েল, তারিণীখুড়ো ও বেতাল, শঙ্কুর শনির দশা, নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো, মরুরহস্য, কর্ভাস, সুজন হরবোলা, ব্রেজিলের কালো বাঘ, ফেলুদার সঙ্গে কাশীতে, হুণ্ডী-ঝুণ্ডী-গুণ্ডী, মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প, সোনার কেল্লা, ছিন্নমস্তার অভিশাপ, ডাঃ মুনশীর ডায়রি, পাপাঙ্গুল, লিমেরিক, জবরখাকি, হেনরি কিং-এব অকালমৃত্যু)

সম্পাদনা

১। **চলচ্চিত্র ঃ প্রথম পর্যায়**। সত্যজিৎ রায় ও অন্যান্য সম্পাদিত। কলকাতা, সিগনেট, ১৯৫০।

২। **সুকুমার সাহিত্য সমগ্র; ৩ খণ্ড।** প্রথম দুই খণ্ডেব সহযোগী সম্পাদক ঃ পার্থ বসু)কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৬।

৩। **সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ; ৩ খণ্ড।** সহযোগী সম্পাদক ঃ পার্থ বসু। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৬

৪। **জীবজন্তু**। সুকুমাব রায়। সহযোগী সম্পাদক ঃ পার্থ বসু। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৪।

৫। **সেরা সন্দেশ ঃ** ১৩৬৮-৮৭। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১।

৬। **অশরীরীর আসর**। সত্যজিৎ বায়, লীলা মজুমদাব ও নলিনী দাশ সম্পাদিত। কলকাতা, নিউস্ক্রিপ্ট, ১৯৯১।

৭। **সরস রহস্য**। সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদার ও নলিনী দাশ সম্পাদিত। কলকাতা, নিউস্ক্রিপ্ট, ১৯৯১।

সংযোজন

১। চলচ্চিত্র, সম্পাদকমণ্ডলী ছিলেন কমলকুমার মজুমদার, চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

২। আবো সত্যজিৎ সংকলন ঃ কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২।

অনুবাদে সত্যজিৎ

চিত্রনাট্য

ইংরেজি

1. Satyajit Ray's Pather Panchali. Screenplay with analytical notes by Satish Bahadur. Pune National Film Archive of India. 1981.
2. Pather Panchali; a film by Satyajit Ray—Trans. by Lila Roy. Calcutta, Cine Central, 1984.
3. The Apu Trilogy pather Panchali. Aparajito. Apur Sansar. Trans. by Shampa Banerjee. Calcutta, Seagull Books. 1985

বাংলা

১। পিকু, সদগতি, টু, ইনাব আই . স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। (পিকু বাংলায় রচিত, অন্য তিনটি চিত্রনাট্য ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে মানজাবে হাসীন, হাসিনা গুলকখ ও মানজারে হাসীন) ঢাকা, প্রামাণ্যকাব, ১৯৯১।

জাপানী

১। Ghare Baire : a screenplay Trans. by Tomio Mizokami Osaka. Osaka University of Foreign Studies, 1988.

হিন্দী

1. Kanchenjungha. Trans by Yogendra Chowdhury Delhi. Rajpal & Sons. 1974.
2. Nayak, Trans. by Yogendra Chowdhury. Delhi, Rajpal & Sons, 1976.

চলচ্চিত্র বিষয়ক

ফরাসী

1. Ecrits Sur Le Cinema. Trans. of Our Films, Their Films by Tony Mayer. Paris. U. C. Latters. 1982 (Pocket booked. 1985)

মারাঠী

1. Vishay Chalchitra. Trans. of (বিষয় চলচ্চিত্র) by Vilas Gite. Aurangabad. Saket Prakashan. 1990

গল্প-উপন্যাস

ইংরেজী

1. Phatik Chand, Trans of (ফটিকচাঁদ) by Lila Roy New Delhi, Orient Paperbacks, 1983.
2. Bravo! Professor Shonku. Trans. by Kathleen M. O'Connell. New Delhi, Rupa, 1986.
   আশ্চর্য প্রাণী, স্বপ্নদ্বীপ, ডাঃ শেরিং-এর স্মরণশক্তি—এই তিনটি গল্পের অনুবাদ)
3. The Unicorn Expedition and other Fantastic Tales of India. Trans. by Satyajit Ray. New York. E. P Dutton. 1987.

(সূচী ঃ পটলবাবু ফিল্মস্টাব, নীল আতঙ্ক, খগম, রতনবাবু আব সেই লোকটা, বৃহচ্চঞ্চু, অসমঞ্জবাবুব কুকুর, লক্ষ্ণৌর ডুয়েল, কর্ভাস, কম্পু, মরু রহস্য, এক-শৃঙ্গ অভিযান— ১১টি গল্পেব অনুবাদ)
(এই বইটি ইংল্যাণ্ডে 'Stories' নামে ১৯৮৭ সালেই 'Martin Secker & Warburg' থেকে প্রকাশিত হয। এব 'King Penguin' প্রকাশ কবে বইটিব পেপাব ব্যাক সংস্কবণ)

4. The Adventures of Feluda Trans by Chitrita Banerji New Delhi, Penguin, 1988
(সূচী ঃ সোনাব কেল্লা, বোম্বাইযেব বোম্বেটে, গোলোকধাম বহস্য, গোবস্থানে সাবধান — ৪টি ফেলুদা কাহিনীব অনুবাদ)

জার্মান

1 Fatik Und Der Jongleur Von Kalkutta Trans. by Felix Weigner Solothurn, Verlag Aare, 1989.
(ফটিকচাঁদ অনুবাদ)

2 Feluda · Und Das Goldene Schloss . Eine Kriminalgeschichte Aus Indian, Trans. from English by Rita Peterli, Gottingen, Lamuy, 1991
(সোনার কেল্লা-ব অনুবাদ)

জাপানী

1. The Golden Fortress. Trans. by Naoki Nishioka, Tokyo, Kumon Shuppan Co., 1991

পোলিশ

1 Podroze Profesora Sanku Trans. by Tlumaczyla Elzbieta Walterowa Warszawa, I.W Nasza Ksiegamia, 1982
(সূচী ঃ প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু, প্রোফেসর শঙ্কু ও বক্তমৎস্য রহস্য, আশ্চর্য প্রাণী, স্বপ্নদ্বীপ, মরু বহস্য, কর্ভাস, ডাঃ শেবিং-এব স্মরণশক্তি —গল্পগুলিব অনুবাদ)

ফবাসী

1 Fatik Et Le Jongleur De Calcutta Trans by France Bhattacharya Paris, Bordas, 1981
(ফটিকচাঁদ-এর অনুবাদ)

2 La Nuit De L'Indigo, Trans. by Eric Chedaille, Paris, Presses De La Renaissance, 1987.
(সূচী ঃ পটলবাবু ফিল্মস্টাব, নীল আতঙ্ক, খগম, বতনবাবু আব সেই লোকটা, বৃহচ্চঞ্চু, অসমঞ্জবাবুব কুকুব, লক্ষ্ণৌব ডুয়েল, কর্ভাস, কম্পু, মরু বহস্য, একশৃঙ্গ অভিযান — গল্পগুলিব অনুবাদ)

৩ Authres Novuelles Du Bengale, Trans by Michele Mercier paris, Presses De La Renaissance, 1989
(সূচী ঃ সেপ্টোপাসের খিদে, বঙ্কুবাবুর বন্ধু, বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম, দুই ম্যাজিশিয়ান, অনাথবাবুর ভয়, শিবু আর রাক্ষসের কথা, টেবোড্যাকটিলের ডিম, বাদুড় বিভীষিকা, ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি, কৈলাস চৌধুবীর পাথর — এই গল্পগুলির অনুবাদ)

4 Les Pieces D'or De elahangir Trans by Michele Mercier Paris, Presses De La Renaissance, 1990.
(সূচী ঃ সাধনবাবুর সন্দেহ, স্পটলাইট,

ধাপ্পা, ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট, অঙ্ক স্যার গোলাপীবাবু আর টিপু, ফার্স্ট ক্লাস কামরা, গগন চৌধুরীর স্টুডিও, বহুরূপী, অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য, জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা - গল্পগুলির অনুবাদ)

স্প্যানিশ

1. Fatik Y El Juglar De Calcutta, Trans. by Elena Del Amo. Madrid, Espasa-calpe, 1984 (ফটিকচাঁদ-এর অনুবাদ)

ভারতীয় ভাষা

ওড়িয়া

1. Sunara Gada. Trans. by Bijayalaxmi Mohanty. and Jatindramohan Mohanti Bhubaneswar. Bookland International, 1983. (সোনার কেল্লা'র অনুবাদ)
2. Badsahimudi Trans. By Bijayalaxmi Mohanty and Jatindramohan Mohanty Bhubaneswar. Bookland International. 1985. (বাদশাহী আংটি-র অনুবাদ)

গুজরাটি

1. Professor Shonku, (Satyajit Ray's Science Stories) Trans. by Sukanya Zaveri. Ahmedabad, Gurjar Grantha Ratna Karyalaya, 1981 (সূচী ঃ ডাঃ শেরিং-এর স্মরণশক্তি, শঙ্কুর শনির দশা, হিপ্নোজেন, প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু, প্রোফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও, প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল, মানরো দ্বীপের রহস্য, সেপ্টোপাসের খিদে— প্রোফেসর শঙ্কুর ৮টি গল্পের অনুবাদ)
2. Sonano Kiilo. Trans. by Sukanya Zaveri. Ahmedabad. Gurjar Grantha Ratna Karyalaya, 1987. (সোনার কেল্লা-র অনুবাদ)
3. Gangtokhan Garbad. Trans. by Sukanya zaveri. Ahmedabad. Gurjar Grantha Ratna Karyalaya.1987 গ্যাংটকে গণ্ডগোল-এর অনুবাদ
4. Kathamanduman Hahakar. Trans. by sukanya zaveri. Ahmedabad, Gurjar Grantha Ratna Karyalaya. 1987. (যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে-র অনুবাদ)

তামিল

1 Phatik Chand Trans. by K. Sockalingam (Sokkam) Jaffna. P. Sritharasingh Poobalasingam Book depot, 1987. (ফটিকচাঁদ-এর অনুবাদ)

তেলুগু

1. Phatikchand. (অতিবিক্ত তথ্য জানা যায়নি)

মারাঠী

1. Badshahi Angti. Trans. by S. B. Joshi. Pune, Balvadi Prakashan, 1977. (বাদশাহী আংটি-র অনুবাদ)
2 Bagechan Rahasay. Trans. by Bali Belsarey Pune Srividya Prakashan. 1985. (বাক্স রহস্য-র অনুবাদ)

3. Hatyapuri. Trans. by Bali Belsarey. Pune, Srividya Prakashan. 1985. (হত্যাপুরী-র অনুবাদ)
4. Sonyacha Killa. Trans. by Arun Juvekar Bombay. Majestic Prakashan. 1988. (সোনার কেল্লা-ব অনুবাদ)

মালয়ালাম

---

1 Gangtokkile Ku Zhappam. Trans. by Leela Sarkar. Kottayam (Kerala). D. C. Books. 1981 (গ্যাংটকে গণ্ডগোল-এর অনুবাদ)
2 Sonaar Kella. Trans by Leela sarkar. Kottayam D. C. Books. 1987. (সোনার কেল্লা-ব অনুবাদ)
3 Kalavu Poya Yesu. Trans. by Leela sarkar. Kottayam. D.C Books. 1989. (টিনটোরেটোর যীশু-র অনুবাদ)
4 Bombayile Kollakkaran. Trans.byK.Radhaknshna Kottayam. D.C Books. 1990 (বোম্বাইয়ের বোম্বেটের-র অনুবাদ)

হিন্দি

---

1. Badshahi anguti. Trans. by Hanskumar tiwari. Delhı. radhakrishna Prakashan 1972. (বাদশাহী আংটির অনুবাদ)
2. Professor Shouku. Trans. by Hanskumar Tiwari. Delhi. Radhakrishna Prakshan. 1973. (প্রাফেসর শঙ্কু-বইটির অনুবাদ)
3 Sonay Ka Kila. trans. by (?). Delhi, Rajkamal Prakashan. 1975 (সোনাব কেল্লা-র অনুবাদ)
4 Professor shanku Ke Karaname. Trans. by Hansakumar Tiwari. Delhi, Radhakrishna Prakashan, 1975 (প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা-র অনুবাদ)
5 Gangtok Me Dhopla. trans. by(?) Delhi, radhakrishna Prakashan. 1976 (গ্যাংটকে গণ্ডগোল-এর অনুবাদ)
6. Jab Main Chhota Tha. Trans. by Sandeep Mukherjee. New Delhi Rajkamal Prakashan, 1984. (যখন ছোট ছিলাম-এর অনুবাদ)
7 Barah Kahaniyan. Trans by Yogendra Chowdhury New Delhi Rajpal & Sons. 1985. (এক ডজন গপ্পো-র অনুবাদ)
8. Bombaı Kı Bagı. Trans. by Shikha Sinha New Delhi. Kitab Ghar, 1986. (বোম্বাইয়েব বোম্বেটে-ব অনুবাদ)
9. Jahangir kı Swarnmudra. Trans. by Chandrakiran Ralhi. New Delhı, Rajkamal Prakashan. 1990. (এবারো বারো-র অনুবাদ)

উৎস

১

গড়পার থেকে শান্তিনিকেতন। পার্থ বসু। আনন্দলোক, বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৯। ৯ মে ১৯৯২।

মানিকের ছেলেবেলা। মাধুরী মহলানবীশ। আনন্দবাজাব পত্রিকা, আনন্দমেলা, ৩ মে ১৯৯২।

সত্যজিতের ছেলেবেলা। কল্যাণী কার্লেকব। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি', সত্যজিৎ বায়েব সত্তবতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, আশীর্বাদ প্রকাশন, ১৯৯০।

সত্যজিৎ রায়ের ছেলেবেলা। নলিনী দাশ। নহবত, ২৬ সংকলন, ১৯৮৯।

ষাট বছরের বন্ধু। দিলীপ কুমাব রায়। সন্দেশ, আগষ্ট ১৯৯২।

শান্তিনিকেতন ও কলাভবনের দিনগুলি। দিনকব কৌশিক। আনন্দলোক, বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৯। ৯ মে ১৯৯২।

মানিক। বিজয়া রায়। নবকল্লোল, বর্ষ ৩২ সংখ্যা ১, এপ্রিল ১৯৯১। নবকল্লোল-এ শিরোনাম 'কোনো অবস্থাতেই মানিক বিচলিত নয়'।

'পথের পাঁচালী' প্রসঙ্গে শ্রীমতী বিজয়া রায়। নন্দিতা দত্ত। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫।

সেই কফিহাউসের দিনগুলি ও সত্যজিৎ রায়। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। নহবত, ২৬ সংকলন। ১৯৮৯।

সত্যজিৎ, কিছু স্মৃতি ....। বাম হালদাব। অনুষ্টুপ, বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩। ১৯৯২।

আমাব বন্ধু। হরিসাধন দাশগুপ্ত। দেশ, বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ২২। ২৮ মার্চ ১৯৯২।

মানিকমামা। রুমা গুহঠাকুবতা। নবকল্লোল, বর্ষ ৩২ সংখ্যা ১। এপ্রিল ১৯৯১। নবকল্লোল-এ শিবোনাম 'মানিকমামার সঙ্গ ই একটা বড় শিক্ষা'।

সত্যজিৎ রায়ের ছবির শিল্পনির্দেশনা। বংশী চন্দ্রগুপ্ত। বক্তকববী, বর্ষ ২ সংখ্যা ১। জুন-জুলাই ১৯৯২।

অপবাজিত-ব কথা। অনিল চৌধুবী। এক্ষণ, বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৬। অক্টোবব ১৯৮৪।

সত্যজিৎ রায়। ও সি গাঙ্গুলী। আজকাল, শাবদীয় সংখ্যা ১৯৯২।

মানিকদার সঙ্গে বত্রিশ বছর। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নবকল্লোল, বর্ষ ৩২ সংখ্যা ১। এপ্রিল ১৯৯১।

ফেলুদা এণ্ড কোং। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আজকাল, শাবদীয় সংখ্যা ১৯৯২।

পথের পাঁচালী। উমা দাশগুপ্ত (সেন)। দেশ, বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ২২ ('লাইম লাইট-এ থেকে গেলাম একটা ছবি করেই') ২৮ মার্চ ১৯৯২।

মানিকদা। শর্মিলা ঠাকুব। আনন্দবাজাব পত্রিকা, ('খুব রুমাল চিবোতেন, দিনে একটা রুমাল লাগতই') ২৪ এপ্রিল ১৯৯২।

বিরাট সৈন্যবাহিনী, সুদক্ষ এক সেনাপতি। তপেন চট্টোপাধ্যায়। দেশ, বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ২২। ২৮ মার্চ ১৯৯২।

আমার দেখা সত্যজিৎ। অনিল চট্টোপাধ্যায়। নন্দন, বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৭। জুলাই ১৯৯২

সত্যজিৎ গান গেয়ে যেদিন...। অনুপ ঘোষাল আজকাল, ২৯ এপ্রিল ১৯৯০।

আমার সত্যজিৎ। অরুণ মুখোপাধ্যায়। নন্দন, বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৭। জুলাই ১৯৯২।

মানিকদা। নিমাই ঘোষ। কোরক, মে-আগস্ট ১৯৯২।

সত্যজিৎ ঃ শহুরে অপু। সুনীল গঙ্গে ।পাধ্যায়। সানন্দা, বর্ষ ৬ সংখ্যা ২১। ১৫ মে ১৯৯২।

'যেটুকু পেয়েছি ...'। মাধবী মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী)। আনন্দবাজার পত্রিকা ('যতটুকু পেয়েছি তাতেই আমি ধন্য') ১ মে ১৯৯০।

সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে। অপর্ণা সেন। নন্দন, সেপ্টেম্বব/অক্টোবর ১৯৯২ (সাক্ষাৎকাব ভিত্তিক সংকলন/ইন্দিরা ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় অনুলিখন ঃ ঘনশ্যাম চৌধুবী)

আমার দেখা সত্যজিৎ রায়। মমতাশংকব। নন্দন, বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৭। জুলাই ১৯৯২।

অন্য মানিক। সুব্রত সেনগুপ্ত। আনন্দবাজাব পত্রিকা, ১ মে ১৯৯০।

আমার শিক্ষক। সন্দীপ রায়। আজকাল, শারদীয় সংখ্যা ১৯৯২।

পথের পাঁচালী। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। আজকাল, ('পথের পাঁচালী ঃ স্মৃতিচারণ') বর্ষ ১২ সংখ্যা ২। ২৬ মার্চ ১৯৯২।

একটি চিঠি ঃ পথের পাঁচালী। বিভূতিভূষণ মিত্র। দেশ ('পথের পাঁচালী ছবি প্রসঙ্গে একটি চিঠি' পত্র লেখক বিভূতিভূষণ মিত্র। প্রকাশিত হয় ' আলোচনা' শিবোনামে।) বর্ষ ২২ সংখ্যা ৪৮। ১ অক্টোবর ১৯৫৫।

২

পথের পাঁচালী — সেই সময়ে। কিরণময় রাহা। কল্পনির্ঝর, বর্ষ ১ সংখ্যা ২। জুলাই ১৯৮০।

পৃথিবীরই একটি শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি। শৌভিক (পঙ্কজ দত্ত।)। দেশ, বর্ষ ২২ সংখ্যা ৪৪। ৩ সেপ্টেম্বব ১৯৫৫।

'পথের পাঁচালী'। চিদানন্দ দাশগুপ্ত। প্রথম 'পবিচয়' পত্রিকায়, ১৯৫৫। পরে 'বই নয় ছবি'। জানুয়ারি ১৯৯১।

মূল বইয়ের উদার, ভবঘুরে যাত্রীর সুর বাজে না। ঋত্বিককুমার ঘটক। সিনে টেকনিক, সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭২।

পথের পাঁচালী। নীলকণ্ঠ (দীপেন্দ্র কুমার সান্যাল)। 'অচলপত্র' পবে নিজস্ব 'অপাঠ্য' গ্রন্থ, তারপরে 'চিত্রভাষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৯০।

পথের পাঁচালী। সুধী প্রধান। স্বাধীনতা, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫।

পথের পাঁচালী। ইরাবান বসু বায়। চিত্রভাষ, বর্ষ ১৫ সংখ্যা ২-৪। এপ্রিল-ডিসেম্বব ১৯৮০।

'পথের পাঁচালী'-র প্রাসঙ্গিকতা। সোমেশ্বব ভৌমিক। সিনেমার ভালোমন্দ। মে ১৯৮৬।

একটি ব্যক্তিগত চিঠি। মৃণাল সেন। সিনেমা, আধুনিকতা। জানুয়ারি ১৯৯২।

সত্যজিৎ ও অপরাজিত। মৃণাল সেন।

আনন্দলোক, বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৯। ৯ মে ১৯৯২। ('চলচ্চিত্রকাব সত্যজিৎ রায়ের আত্মপ্রকাশের পববর্তী সময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রে পরিচালক হিসেবে যাঁবা দর্শকদেব দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন এবং শিল্পী ও লেখক হিসেবে যাঁরা কাছ থেকে সত্যজিৎ বায়কে দেখেছেন তাঁদেব কয়েকজন বলছেন সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে।' সম্পাদক, আনন্দলোক।)

অপরাজিত ঃ আবহমান যাত্রাকাহিনী। আলোক সরকাব। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।
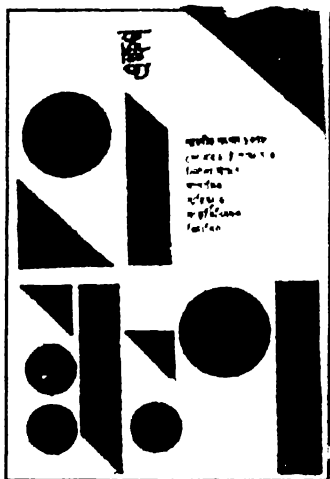
প্রহসনের হীরকদ্যুতি ঃ পরশপাথর (১৯৫৭)। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়। সেপ্টেম্বর ১৯৯০।

জলসাঘর। বিজয়কুমাব দত্ত। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

অপু কাহিনীর যবনিকা। চন্দ্রশেখব। দেশ, জুন ১৯৫৯।

চিরায়ত সিকোয়েন্স ঃ অপুর বিবাহপর্ব। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। ইন্টাব কাট্, চতুর্থ সংকলন। অক্টোবর ১৯৮৯। ('সত্যজিৎ' সুস্থ চলচ্চিত্র প্রচার সংস্থা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।)

একটি চিঠি ঃ অপুর সংসার। ধনঞ্জয় বৈবাগী। দেশ, জুন ১৯৫৯।

ধর্মের বর্বর মুখচ্ছবি ঃ দেবী। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ বায়। সেপ্টেম্বর ১৯৯০।

দেবী। দেবেশ রায়। আজকাল, ২৮ মার্চ ১৯৯২।

তিন কন্যা। দেবীপদ ভট্টাচার্য। চলচ্চিত্র, ববীন্দ্র-সংখ্যা ১৯৬১।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' নিয়ে দু-চার কথা। ধ্রুব গুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৩-৪। ২৪ জুলাই ১৯৯২।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ঃ এক আলোকদিশারী ছবি। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। পটভূমি, জানুযারি-মার্চ ১৯৯৩।

ছবি তৈরির গল্প ঃ অভিযান। আনিরুদ্ধ ধর। সানন্দা, বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩। ৬ সেপ্টেম্বব ১৯৯৩।

অভিযান/১৯৬২। দিলীপ গুপ্ত। 'MONTAGE' No 5/6। জুলাই ১৯৬৬। (অনুবাদ)

অভিযান/১৯৬২। ঋষি চক্রবর্তী। 'MONTAGE' No 5/6। জুলাই ১৯৬৬। (অনুবাদ)

মহানগর। আলোক সরকাব। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

মহানগর। শিখা রুদ্র। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

'নষ্টনীড় ও চারুলতা'। সমরেশ বসু। অয়ন, ১৯৬৪। (পরে 'কোথায় পাবো তারে' স্মারক পুস্তিকা। সমরেশ বসুর ৬৬তম জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৯।)

শিল্পীর স্বাধীনতা। অশোক রুদ্র। পরিচয়, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬৪।

চারুলতা ঃ প্রচ্ছন্ন স্বদেশ। রুশতী সেন। বারোমাস, শারদীয় সংখ্যা ১৯৮৪।

সত্যজিতের 'চারুলতা'। শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

চারুলতা। নিত্যপ্রিয় ঘোষ। মেঠো সুরে তানসেন। জানুয়ারি ১৯৯৩।

কাপুরুষ ও মহাপুরুষ। দীপেন্দু চক্রবর্তী। চিত্রভাষ, বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১-২। জানুয়ারি-জুন ১৯৮৪।

সত্যজিৎ রায়ের নায়ক। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচয়, বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ১০। ১৯৬৬।

প্রসঙ্গ ঃ নায়ক। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয় সত্যজিৎ। মে ১৯৮৮।

নায়ক। দেবকমল মণ্ডল। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

একটি চিঠি ঃ নায়ক। গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচয়, ১৯৬৬।

চিড়িয়াখানা ঃ একটি হতাশার নাম। রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপধ্যোয়। চিত্রকল্প, বর্ষ ১ সংখ্যা ১। মে ১৯৬৮।

দ্যাখরে নয়ন মেলে। আলোক সরকার। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

গুপী গাইন বাঘা বাইন। শুদ্ধশীল বসু। কলকাতা, বর্ষ ১ সংখ্যা ১০। মে ১৯৬৯।

অরণ্যের দিনরাত্রি প্রসঙ্গ। দিলীপ মুখোপাধ্যায়। সত্যজিৎ। জানুয়াবি ১৯৮৬।

অরণ্যের দিনরাত্রি। বিষ্ণু বসু। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

প্রতিদ্বন্দ্বী ঃ তাৎপর্যপূর্ণ ছবি। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎস পাওয়া যায়নি।

সত্যজিৎ রায়-এর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ঃ একটি নবভাষ্য। সুমন্ত চৌধুরী। দৃশ্য, সংখ্যা ৩৩। ডিসেম্বব ১৯৯১।

সীমাবদ্ধ ঃ বিন্দু থেকে বৃত্ত। দিলীপ মুখোপাধ্যায়। সত্যজিৎ। জানুয়ারি ১৯৮৬।

অশনি সংকেত। দিলীপ মুখোপাধ্যায়। সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণাল। নভেম্বর ১৯৮২।

সোনার কেল্লা। প্রলয় শূর। চলচ্চিন্তা, ১৯৭৪।

প্রতিবাদের ছবি। শঙ্খ ঘোষ। কৃত্তিবাস, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬।

পরিচালনার একুশ বছর পরে। নবনীতা দেব সেন। কৃত্তিবাস, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬।

শতরঞ্জ কি খিলাড়ি। নিত্যপ্রিয় ঘোষ। মেঠো সুরে তানসেন। জানুয়ারি ১৯৯৩।

'দাবা খেলোয়াড়' ও আমরা। দীপক মজুমদার। মুভি ও মনতাজ। সংখ্যা ২২। ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯।

'জয় বাবা ফেলুনাথ', সংস্কৃতির বিকৃতি এবং আদি প্রতিমা। সুগত সিংহ। চিত্রবীক্ষণ, বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৩। ডিসেম্বর ১৯৮৩।

হীরক রাজার দেশে। উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। চলচ্চিন্তা, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১১-১২। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮০।

ঘরে বাইরে ঃ রবীন্দ্রনাথের, সত্যজিতের।

পূর্ণেন্দু পত্রী। কোরক, মে-আগস্ট ১৯৯২।

ঘরে বাইরে। নিত্যপ্রিয় ঘোষ। মেঠো সুরে তানসেন। জানুয়ারি ১৯৯৩।

সমালোচনার জবাবে। ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। চিত্রভাষ, বর্ষ ২০ সংখ্যা ১-২। জানুয়ারি-জুন ১৯৮৫। (কথা ছিল প্রবন্ধাকারে লেখার। কিন্তু নানাকারণে তা আর হয়ে উঠল না। তখন ঠিক হলো 'ঘরে বাইরে' নিয়ে চতুর্দিকে যে সমালোচনা হচ্ছে তারই জবাবে ধৃতিমান কিছু বলবেন এবং সেই কথ্য মেজাজটিকেই মোটামুটি অবিকৃত রেখে প্রকাশ করা হলো। — সম্পাদক, চিত্রভাষ।)

একেবারে নতুন সত্যজিৎ ঃ গণশত্রু। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০।

'শাখা-প্রশাখা' ঃ একটি দিক। অরূপ রুদ্র। চিত্রভাষ, বর্ষ ২৬ সংখ্যা ১-২। জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ১৯৯১।

শাখা-প্রশাখা ঃ মূল্যবোধের সংকট। অনিন্দ্য চাকী। চিত্রভাষ, বর্ষ ২৬ সংখ্যা ১-২। জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ১৯৯১।

অতিকায় শাখা প্রশাখা। পার্থপ্রতিম চৌধুরী। পটভূমি, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৩।

শাখা-প্রশাখা ঃ অবনত জীবনের ছবি। সোমেন ঘোষ। মুভি মনতাজ, সংখ্যা ৩১। জুলাই ১৯৯২।

সত্যজিতের আগন্তুক। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দন, বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৭। জুলাই ১৯৯২।

'আগন্তুক' অবশ্যই দর্শনীয় ছবি। মৃগাঙ্কশেখর রায়। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ জুলাই ১৯৯২।

সত্যজিতের ছবিতে সময়ের সামাজিক দায় এবং আগন্তুক। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। মুভি মনতাজ, সংখ্যা ৩২। জুলাই ১৯৯৩।

আগন্তুক ঃ প্রান্তিকতা ও সংহতি। ছন্দক সেনগুপ্ত। এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা। ১৯৯৩।

নৃতত্ত্ব, মানুষের ভবিষ্যৎ ও 'আগন্তুক'। ধীমান দাশগুপ্ত। মুভি মনতাজ, সংখ্যা ৩২। জুলাই ১৯৯৩।

ছবির কবিতা ঃ টু (১৯৬৪)। সুব্রত রুদ্র। কবিতা ও ছবি, পুস্তিকা ভাবনীপুর ফিল্ম ক্লাব। ১৯৭৫।

পিকু। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। দৃশ্য, সংখ্যা ২৭। আগস্ট ১৯৮৩।

সদগতি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দলোক, ১৯৮২।

সত্যজিৎ রায়ের রবীন্দ্রনাথ। কমল সরকার। চলচ্চিত্র, রবীন্দ্রসংখ্যা। ১৯৬১।

রবীন্দ্রনাথ। নিত্যপ্রিয় ঘোষ। মেঠো সুরে তানসেন। জানুয়ারি ১৯৯৩।

সত্যজিৎ রায়ের নিষিদ্ধ চলচ্চিত্র 'সিকিম'। দিলীপ মুখোপাধ্যায়। চিত্রভাষ, বর্ষ ২৬ সংখ্যা ১-৩। জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ১৯৯১।

দি ইনার আই। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রপট, সংখ্যা ৯। অক্টোবর ১৯৭২।

'বালা'। স্বপন সাহা। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মে ১৯৯৩। ('গল্প বলা তথ্যচিত্র' - অংশ)

সুকুমার রায়। প্রলয় শূর। চলচ্চিন্তা, নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা। ১৯৮৭।

সত্যজিৎ রায় ঃ তথ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র। সুনেত্রা ঘটক। দেশ, বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ২৭। ২ মে ১৯৯২।

৩

একমাত্র সত্যজিৎ রায়। ঋত্বিক কুমাব ঘটক। চলচ্চিত্রপত্র, এপ্রিল ১৯৮০।

সত্যজিৎ রায় কি ভারতীয় রেনেসাঁসের ফসল? উৎপল দত্ত। নন্দন, বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৭। জুলাই ১৯৯২।

অপুর অন্তহীন যাত্রাপথে। মৃণাল সেন। আনন্দবাজাব পত্রিকা, ১৪ এপ্রিল ১৯৯২।

সত্যজিৎ । রবিশঙ্কর। স্মৃতি। এপ্রিল ১৯৯২।

ভেসে আসে কণ্ঠস্বর। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায। দেশ, বর্ষ৫৯ সংখ্যা ২৯। ১৬ মে ১৯৯২।

সত্যজিৎ রায় ঃ মানুষ ও শিল্পী। দেবীপদ ভট্টাচার্য। অনুষ্টুপ, বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৩। ১৯৯২।

সত্যজিতে ফিরে তাকান। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চলচ্চিত্র পত্র, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফিল্ম বুলেটিন। এপ্রিল ১৯৮০।

পবিচালক সত্যজিৎ বায়। সেবাব্রত গুপ্ত। নহবত, বর্ষ ২৬। ১৯৮৯।

বাংলা ছায়াছবির নবযুগ ও সত্যজিৎ রায়। স্বপন মজুমদার। দেশ, বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ২২। ২৮ মার্চ ১৯৯২।

পরিচালক সত্যজিৎ রায়। রবি ঘোষ। নন্দন, বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৭। জুলাই ১৯৯২।

সত্তরের দশকের সত্যজিৎ রায়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরশুরাম, বর্ষ ১ সংখ্যা ১। জানুয়াবি-মার্চ ১৯৮১।

সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে একটি লেখার খসড়া। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। নন্দন, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯২।

নগরজীবনের শব্দ ঃ সত্যজিতের ছবিতে। উজ্জ্বল চক্রবর্তী। মুভি মনতাজ, সংখ্যা ৩০। জানুয়ারি ১৯৯০।

কলকাতার মন ঃ সত্যজিৎ রায়ের ছবি। অহস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রকল্প, সংখ্যা ১। ১৯৭০।

সত্যজিৎ রায়, বাঙালি সমাজ ও (অবশ্যম্ভাবীরূপে) রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতির্ময় দত্ত। কলকাতা, ১৯৭০।

শিল্প, সমকালীনতা ও সত্যজিৎ রায়। আশীষ বর্মন। চিত্রপট, সংখ্যা ৯। ১৯৭২।

সত্যজিৎ রায়ের কলকাতা। প্রলয় শূর। মুভি মনতাজ, সংখ্যা ৩০। জানুয়ারি ১৯৯০।

সত্যজিতের রবীন্দ্র-অন্বেষা। পল্লব সেনগুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৩-৪। ২৪ জুলাই ১৯৯২।

সত্যজিৎ রায়ের ভাবনায় বন্ধুতা প্রেম ও মহিলারা। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায় এবং অন্যান্য। সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।

সত্যজিৎ রায়ের বিশ্ববীক্ষায় উত্তরণ। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। দৃশ্য। সংখ্যা ২৭। আগস্ট ১৯৮৩।

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সমাজ বাস্তবতা। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। চলচ্চিন্তা, এপ্রিল-জুন ১৯৯২।

হলিউডে যে তিনটি ছবি সত্যজিৎ করতে পারলেন না। চণ্ডী মুখোপাধ্যায়। কোরক, মে-আগস্ট ১৯৯২।

একে অনেক। নবনীতা দেব সেন। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

চলচ্চিত্রের জাতীয় স্বরূপ ও সত্যজিতের চিন্তাসূত্র। শতদ্রু চাকী। নন্দন, বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৭। জুলাই ১৯৯২।

সত্যজিৎ : বিষয় রাজনীতি। বিষ্ণু বসু। গণনাট্য, বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৫। অক্টোবর ১৯৯২।

অপু থেকে পিকু। রুশতী সেন। বারোমাস, শারদীয় সংখ্যা ১৯৮২।

সম্পাদক সত্যজিৎ। বেবন্ত গোস্বামী। নহবত, সংখ্যা ২৬। ১৯৮৯।

সত্যজিতের শিশুচিত্র। নন্দন মিত্র। নন্দন, জুলাই ১৯৯২।

বনলতা সেন-এর প্রচ্ছদ ও সত্যজিৎ রায়। অরূপরতন বসু। রক্তকরবী, বর্ষ ২ সংখ্যা ১। জুন-জুলাই ১৯৯২।

৪

ভিন্ন সত্যজিৎ রায়। পরিতোষ সেন। দেশ, বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ১৪। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

গ্রাফিক শিল্পী সত্যজিৎ রায়। রঘুনাথ গোস্বামী। দেশ, বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ২২। ২৮ মার্চ ১৯৯২।

মুদ্রণচর্চায় তিন পুরুষ। দীপঙ্কর সেন। দেশ, বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ৩০। ১৭ জুন ১৯৮৯।

সত্যজিতের গ্রাফিক চেতনা তাঁর চলচ্চিত্রেও প্রভাব ফেলেছে। কে, জি, সুব্রহ্মণ্যম। আনন্দলোক, বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৯। ৯ মে ১৯৯২।

অনন্য, অন্য সত্যজিৎ। পূর্ণেন্দু পত্রী। সিনেমা সিনেমা। ১৯৮৩।

চিত্রকর সত্যজিৎ রায়। শোভন সোম। অনুষ্টুপ, বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৩। ১৯৯২।

৫

সত্যজিৎ রায় : সংগীত ও সংগীতবীক্ষা। সুধীব চক্রবর্তী। পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৩-৪। ২৪ জুলাই ১৯৯২।

কয়েকটি সাংগীতিক মুহূর্ত ও কয়েকটি মুহূর্তের সংগীত। দীপক চৌধুরী। যুবমানস, মে ১৯৯২।

সত্যজিৎ রায়ের আবহসংগীত। গৌতম ঘোষ। সত্যজিৎ প্রতিভা। জানুয়ারি ১৯৯৩।

সংগীতেও যিনি পথপ্রদর্শক। দীপেন্দু চক্রবর্তী। কোরক, মে-আগস্ট ১৯৯২। 'উৎস' পাওয়া যায়নি।

সত্যজিৎ : চলচ্চিত্র ও সংগীত। ধ্রুব গুপ্ত। দেশ, বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ২২। ২৮ মার্চ ১৯৯২।

৬

গল্পের দর্পণে সত্যজিৎ রায়। সবোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরপ্রসঙ্গ। আগষ্ট ১৯৮৬।

সত্যজিৎ ঃ সব বয়সের লেখক। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। দেশ, বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ২২। ২৮ মার্চ ১৯৯২।

সত্যজিৎ রায়ের আত্মকথা। সুমিতা চক্রবর্তী। কোরক, মে-আগষ্ট ১৯৯২।

সমালোচক সত্যজিৎ। ধ্রুব গুপ্ত। প্রতিক্ষণ, মে ১৯৯২।

সত্যজিৎ রায় ঃ চলচ্চিত্র ভাবনা। হিতেন ঘোষ। চিত্রভাষ, বর্ষ ১১ সংখ্যা ৩-৪। ১৯৭৬।

গোয়েন্দা কাহিনীতে সত্যজিৎ ঘরানা। সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়। কথাশিল্পী সত্যজিৎ প্রতিভা ও পরম্পরা। জানুয়ারি ১৯৯৩।

ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। সুপ্রিয় সেন। কোরক, মে-আগস্ট ১৯৯২।

ফেলুদা। দীপ চক্রবর্তী। কোরক, মে-আগস্ট ১৯৯২।

ছড়াকার সত্যজিৎ রায়। প্রণব মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যপত্র নহবত, ২৬ বছর পূর্তি সংখ্যা ১৯৮৯।

সত্যজিতের ছড়া ও রূপকথা। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর